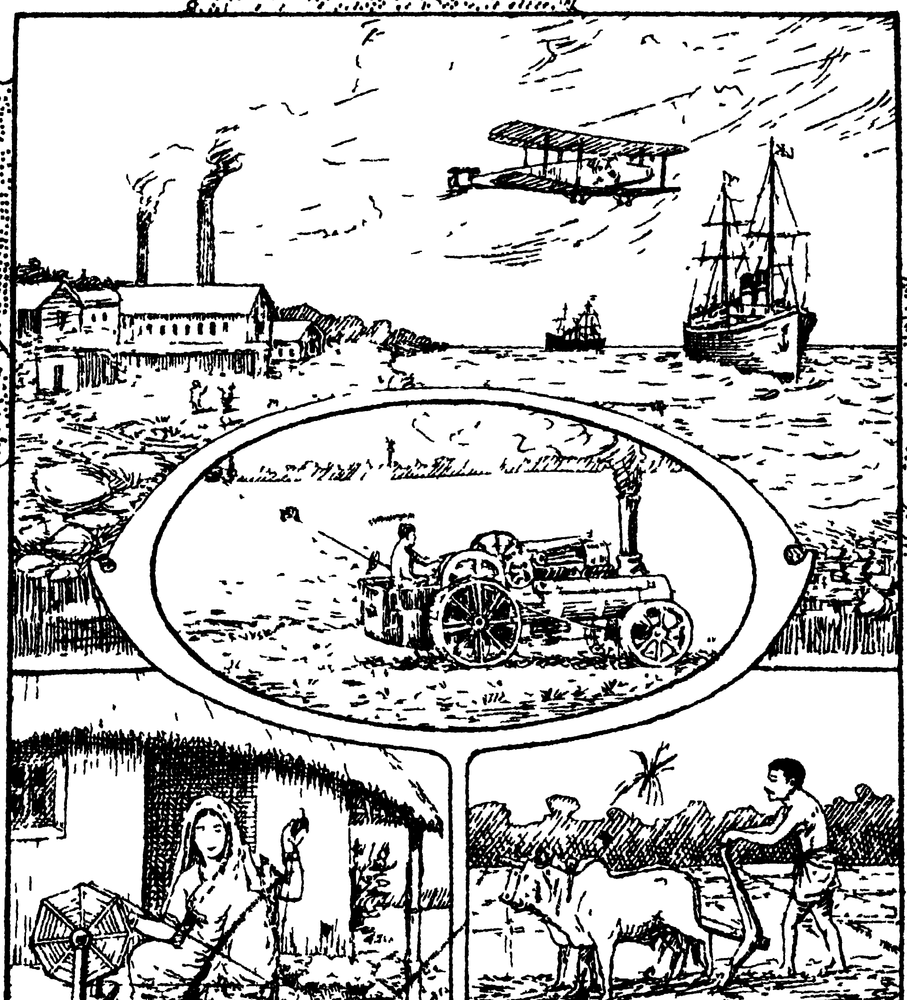
দ্বিতীয় বর্ষ]　　বৈশাখ, ১৩৩৪　　[১ম সংখ্যা

আর্থিক উন্নতি



সম্পাদক

শ্রীবিনয় কুমার সরকার

বার্ষিক মূল্য ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা　　প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

A monthly journal, in **Bengali,** on economics (theoretical and applied), the applications of industrial research and scientific inventions for social welfare and material progress.

The object of the journal is to function as an organ of banking, foreign trade, money-market, insurance, industrialization, agricultural enterprises, railway and shipping economics, public finance, economic legislation, national health, technical education, rural reorganization, municipal administration and other civic interests.

Edited by Professor BENOY KUMAR SARKAR

Section 1 deals with the *wealth of Bengal*, profession by profession. The data are furnished by the reports of correspondents specially employed for the purpose. The standard of life prevailing among cultivators, artisans, fishers, boatmen, leather workers, weavers, shopkeepers, merchants, land owners, exporters, importers, industrial workers sailors, clerks, directors and founders of modern industries, banks and other business establishments—all classes of the Bengali population,—is the main theme of these statistical and objective investigations.

Section 2 deals with the agricultural, manufacturing and *commercial activities of India* (excluding Bengal, but including the Indian states).

Section 3 deals with the *economic developments of the world.* It seeks to interpret the movements in foreign finance, industries and commerce to the Indian businessmen and economists. India's opportunities for co-operation with foreigners in all spheres of international trade and investment constitute likewise a special subject of study. The facts of 'world-economy' involving, as they do, the intimate interdependence of India and the other countries in regard to economic functions and material welfare are placed before the readers in the form of a regular news-service.

Section 4 deals with the movements and pronouncements of the world's prominent bankers, captains of industry, engineers, chemists, experts in technical, commercial and agricultural education, statisticians, economists, finance-ministers and so forth. The *programmes of learned societies*, businessmen's associations, and bankers' institutes etc. fall within this section.

Section 5 is given over to "*interviews*" with specialists on problems of applied economics and economic thought.

In all these sections *Arthik Unnati*, although a monthly, intends to acquire the dynamic character of a weekly or even a daily newspaper.

Special Features :

1. A tabular statement of the contents (with occasional synopsis) of the economic, financial, export-import, statistical and allied journals in the Indian and foreign languages including *French*, *German*, *Italian*, and whenever possible, ***Russian***, *Japanese* and ***Turkish***).
2. Review of books.
3. A serial announcement of Indian and foreign books on economics, banking, commerce, technical education and all other branches of material and social welfare.

N.B. About *fifty per cent* of the monthly devotes itself to **essays and discussions of permanent value** bearing on the methods and problems of the economic sciences. **Bengali translation** or summaries of the views and theories of foreign economists of the present or preceding generations form a marked characteristic of this journal.

Not less than 80 pages every month. Annual subscription Rs. 4-8.

Directors : *Office : 107, Mechuabazar Street, Calcutta.*

Sj. Narendra Nath Law (Calcutta).
Sj. Nalinimohan Roy Chowdhury (Rungpur).
Sj. Tulsichandra Goswami (Serampore).
Sj. Gopaldas Chowdhury (Mymensingh).
Sj. Satya Charan Law (Calcutta).
Sj. Taraknath Mukherjee (Uttarpara).

আর্থিক উন্নতি

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সম্পাদিত

২য় বর্ষ—১৩৩৪

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস

১০৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচিপত্র

বাংলার সম্পদ্

আর্থিক ভারত

দুনিয়ার ধনদৌলত

অ

আ

ই

উ

পত্রিকা জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলী

তর্ক-প্রশ্ন

২য় বর্ষ—১ম সংখ্যা

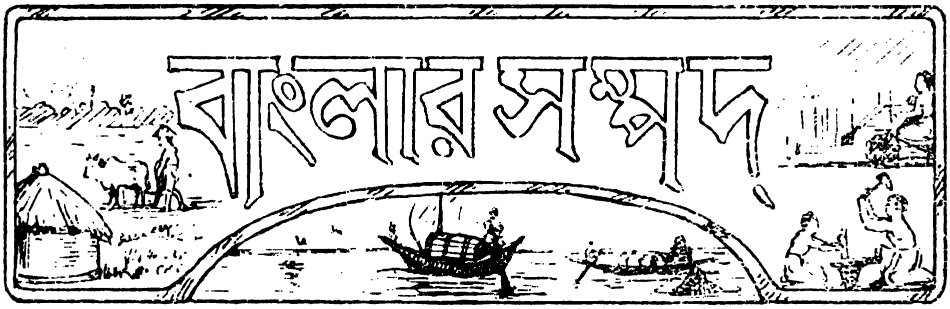
আর্থিক উন্নতি

বৈশাখ—১৩৩৪

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা

যন্ত্রপাতি, কল, লোহালক্কড় ইত্যাদির কারখানা বাংলা দেশে আজকাল মাত্র ১৩৫ টা আছে। এই সমুদয়ে মজুর খাটে ২২,০০০ জন। কিন্তু এই ১৩৫টার ভিতর বাঙালীর তাঁবে ৩০টা কি ৩৫টার বেশী নাই। মোটের উপর বোধ হয় ১,৫০০ জন মজুরের অন্ন বাঙালী কারখানায় জুটিতেছে।

এই কারখানাগুলা "এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্" নামে সাধারণ্যে পরিচিত। মফঃস্বলের লোকেরা প্রায়ই এই সবের খবর রাখে না। কেন না ইহাদের প্রায় সবগুলাই কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলা দেশের মাত্র আট দশটা জেলায় যন্ত্রপাতির কারখানা চলিতেছে। সেই সবের কর্ত্তা হইতেছে রেল-কোম্পানী অথবা কোনো বিদেশী বেপারী-সঙ্ঘ।

২৩৬ কয়লার খাদ

বাংলাদেশে কয়লার খাদ আছে ২৩৬টা। বাংলার খনি বলিলে এক কথায় রাণীগঞ্জ খনি বুঝা হইয়া থাকে। তবে ২৩৬টার ৪টা বাঁকুড়ায় আর ৩টা বীরভূমে অবস্থিত। ১৯২৫ সনে ৩১টা খনিতে কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু অপরদিকে ১৬টা নতুন খাদ খোলা হইয়াছে।

১৯২৫ সনে গোটা ভারতে (ব্রহ্মদেশ সমেত) ৮১০টা কয়লার খাদ খোলা ছিল। খাদসম্পদে বাংলা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী বিহার ও উড়িষ্যা। এই প্রদেশে ৪৮৭টা খাদে কয়লার কাজ চলিয়া থাকে। অর্থাৎ বাংলার ডবলেরও বেশী খাদ বিহার-উড়িষ্যায় চলিতেছে।

খাদের সরঞ্জাম

২৩৬টা খাদের ভিতর ২০৩টাতে বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতির

সাহায্যে কাজ চালানো হয়। কিন্তু বিহার প্রদেশের, ৪৮৭টার ভিতর মাত্র ২৪৭টায় অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকে যন্ত্রপাতির চল আছে। যন্ত্রপাতির রেওয়াজ ভারতের বিভিন্ন কয়লার খাদে এখনো বেশী বাড়ে নাই। ৮১০টার ভিতর মাত্র ৪৭৪টায় আছে, ৩৩৬টায় এখনো নাই। এই হিসাবে বাংলার খাদগুলাকে উন্নত শ্রেণীর বলিতে হইবে।

বাংলার কয়লা প্রায় ৫ কোটি টন

১৯২৫ সনে বাংলার খাদে কয়লা উঠিয়াছিল ৪,৯১৩,৮৫২ টন। বিহারের পরিমাণ ছিল ১৩,৯৩৯,২৪৪ টন, আর গোটা ভারতে ১৯,৯৬৯,০৪১ টন। অর্থাৎ কয়লার উৎপাদনে বাংলা দেশের হিস্যা ভারতের প্রায় চার আনা।

কয়লার মজুর ৪২,৭৮১

বাংলায় কয়লার খাদে ১৯২৫ সনে মজুর খাটিয়াছিল ৪২,৭৮১। খনির ভিতর ২৭,৭৭৫, আর খনির উপর ১৫,০০৬ জন মজুর বাহাল ছিল। খনির ভিতর অর্থাৎ আস্তর্ভৌম কাণ্ডে ১৮,১৮১ জন কয়লা কাটাকাটি করিয়াছে আর ৯,৫৯৪ জন অন্যবিধ কাজে নিযুক্ত ছিল।

আস্তর্ভৌমদের ভিতর ছিল ১১,৯৯৫+৫৯৬০ পুরুষ। আর নারীর সংখ্যা ৬,১৭১+৩৬২৩। বালক-বালিকার সংখ্যা মাত্র ১৫+১১।

খনির উপর যত লোক বাহাল ছিল তাহাদের মধ্যে ১৮৪ জন বালকবালিকা। পুরুষের সংখ্যা ৯,৮৬১ আর নারীর সংখ্যা ৪,৯৬১।

কয়লার মজুরেরা গুনতিতে বিহারে অবশ্য বাংলার চেয়ে বেশী। ঐ প্রদেশে মোট সংখ্যা ১,১৪,৬১১। ১৯১৫ সনে গোটা ভারতে খাদের কুলী ছিল সংখ্যায় ১,৭৩,১৪০। অর্থাৎ বাংলার কুলী গোটা ভারতের তুলনায় চার আনার কিছু কম।

কয়লার কুলীর আর্থিক জীবন

খাদের কাজ দ্বিবিধ:—(১) ভিতরে আর (২) উপরে। প্রত্যেক কাজেই পুরুষ আর স্ত্রী দুই প্রকার মজুরই খাটিতেছে। এই সকল মজুরদের বেতন কিরূপ? প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত,—কাহাকে কত ঘণ্টা খাটিতে হয়?

খনির ভিতরে কাজ করে দুই শ্রেণীর পুরুষ। এক শ্রেণীর লোক কয়লা কাটাকাটি করে। তাহারা সপ্তাহে খাটে ৪২ ঘণ্টা করিয়া, আর এক শ্রেণীর পুরুষ অন্যবিধ কাজে বাহাল, তাহাদিগকে খাটিতে হয় ৪৮ ঘণ্টা। সাপ্তাহিক মজুরি প্রথম শ্রেণীরই বেশী,—৩।৶০ হিসাবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাপ্তাহিক মজুরি ৩৲ টাকা,—অর্থাৎ ফী ঘণ্টায় এক আনা।

আস্তর্ভৌম মেয়েরা খাটে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা। মজুরি তাহাদের সাপ্তাহিক ১৸৵০ আনা।

খনির উপরে মেয়ে-পুরুষ উভয়েই খাটে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া। পুরুষের বেতন ২৷৶০ আনা, মেয়েরা পায় ১৷০ দেড় টাকা।

বিহারের চেয়ে বাংলায় মজুরি কম

মজুরি বাংলার চেয়ে বিহারে ভাল। তবে ঐ প্রদেশে সপ্তাহে খাটিতে হয় খনির উপরে ৫৪ ঘণ্টা করিয়া। কিন্তু পুরুষদের বেতন সপ্তাহে ৩৷০ আনা অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি এক আনার কিছু বেশী। কিন্তু বাংলায় মজুরেরা সেই শ্রেণীর কাজের জন্য পায় ঘণ্টায় এক আনার কিছু কম।

বিহারে মেয়েরা যেখানে ৫৪ ঘণ্টা খাটে সেখানে বেতন তাদের ২।০ আনা, অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি প্রায় আড়াই পয়সা। কিন্তু বাংলায় মেয়েরা সেই শ্রেণীর কাজে ঘণ্টা প্রতি দুই পয়সা মাত্র রোজগার করে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক তথ্য এই যে,—আস্তর্ভৌম মেয়েরা বিহারে যত ঘণ্টা (৪৮) খাটে বাংলায়ও ঠিক তত ঘণ্টাই খাটে। অথচ বিহারে বেতন ২৷০ আনা, আর বাংলায় ১৸৵০ আনা। এই সকল কম-বেশী সম্বন্ধে খোঁজ লওয়া আবশ্যক।

কয়লার কুলীর কর্ম্মক্ষমতা

কুলী প্রতি কত টন কয়লা বাংলা দেশে উঠে? আস্তর্ভৌম কুলীদের সংখ্যা গুণিলে গড় হয় ১৮৭ টন আর

খনির উপর ভিতর দুই অঞ্চলের সকল কুলী (মেয়ে সমেত) গুণিলে গড় হয় ১২০ টন। বিলাতে এই গড়টা ২৭৭ টন আর ২২৪ টন।

এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, বিলাতের খনিতে মেয়ে-মজুর কাজ করে না। কাজেই সেখানে কুলীদের কর্ম্মক্ষমতা গড়পড়তা বেশী দেখা যাইবার কথা।

অধিকন্তু বাংলার খনিতে বিলাতের খনির মতন কলযন্ত্র এখনো বেশী চলে না। বিশেষতঃ শারীরিক মেহনৎ বাঁচাইবার যন্ত্র কম ব্যবহৃত হয়। কাজেই কুলী প্রতি কাজের পরিমাণ বাংলায় বেশী দেখা যায় না।

বাংলায় রেলবৃদ্ধি

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) বাহাদুরাবাদ—গৌহাটী রেল-পথের জরিপ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এই পথ নির্ম্মিত হইলে আসামের উচ্চ ভূমির সহিত ময়মনসিংহ ঢাকা ও চট্টগ্রামের এক নূতন সংযোগ হইবে। আগামী বর্ষে নিম্নলিখিত রেলপথগুলির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবার প্রস্তাব রেলওয়ে বোর্ড করিয়াছে,—(১) নেত্রকোণা—মোহনগঞ্জ ১৭ মাইল, (২) আশুগঞ্জ—সায়েস্তাগঞ্জ ২৬ মাইল, (৩) নওগাঁ—ডিহিং ২৫ মাইল, (৪) ফেণী—বিলনিয়া ১৭ মাইল, (৫) চট্টগ্রাম—ফটিকছড়ি ২৫ মাইল। এই সকল রেলপথ-নির্ম্মাণের খরচ আনুমানিক ৮৫ লক্ষ টাকা।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে যে কয়েকটি স্থানে নূতন রেল করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কয়েকটার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

টাঙ্গাইল-গোপালপুর-জামালপুর লাইন।

মন্তব্য।—আয় কত হয় তাহার উপর ১৯২৬-২৭ সনে নির্ম্মাণের সম্ভাবনা। আয় বেশী হইলে সর্ব্বপ্রথমে এই শাখা নির্ম্মিত হইবে।

ঈশ্বরদি-পাবনা-সাধুগঞ্জ লাইন।

মন্তব্য।—আয় কত হয় তাহা দেখিয়া ১৯২৬-২৭ সনে নির্ম্মিত হইতে পারে। যদি উপযুক্ত আয় হয় তবে নির্ম্মাণের তালিকায় ইহার স্থান চতুর্থ।

ঢাকা-আরিচা লাইন।

মন্তব্য। আয় উপযুক্ত হইলে ভবিষ্যতে নির্ম্মিত হইবে ১৯২৬-২৭ সনে হইবে না।

ফরিদপুর, চরমুগুরিয়া লাইন।

মন্তব্য।—নূতন করিয়া অনুসন্ধানের পরে নির্ম্মিত হইবে কি না স্থির করা হইবে।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে যে কয়েকটি স্থানে নূতন রেল করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নরূপ।

রাজাপুর-রামচন্দ্রপুর লাইন।

মন্তব্য।—১৯২৬-২৭ সনে রেল-নির্ম্মাণের তালিকায় একাদশ স্থান অধিকার করে। নূতন করিয়া পুনরায় অনুসন্ধান হইবে।

নেত্রকোণা-মহুরগঞ্জ লাইন।

মন্তব্য।—১৯২৬-২৭ সনের রেল-নির্ম্মাণের তালিকায় ত্রয়োদশ ও ষোড়শ স্থান পাইয়াছে।

শম্ভুগঞ্জ, বালুয়াঘাট লাইন।

মন্তব্য।—যাত্রী কত হইবে তাহার উপর নির্ম্মাণ নির্ভর করে।

সরার চর—হোসেনপুর লাইন।
হোসেনপুর—কিশোরগঞ্জ ,,
হোসেনপুর—আঠারবাড়ী ,,
আঠারবাড়ী—গোঘবাহার ,,
কিশোরগঞ্জ—করিমগঞ্জ ,,
সরার চর—বাজিতপুর ,,

মন্তব্য।—১৯২৬-২৭ সনের রেল লাইন নির্ম্মাণের তালিকায় চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ স্থানে অবস্থিত। নির্ম্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

মিউনিসিপ্যাল বাঙালীর দৌড়

মিউনিসিপ্যালিটীর সংখ্যা—১১৫
করদাতার সংখ্যা—৩২১,৮১৯
ট্যাক্স্—জনপ্রতি গড়পড়তা ৩/৫ পাই
আয়— ১,০৬,৬৪,২৫৩৲
ব্যয়— ৮৮,৭২,৪৪০৲
শিক্ষা বাবদ ব্যয়—৩,৮১,৩২৪৲, তন্মধ্যে

সরকারী দান—১,১৪,৩৭৭৲।

মিউনিসিপ্যাল আয়ের শতকরা ৫ ভাগ মাত্র শিক্ষায় ব্যয়িত হয়।

মিউনিসিপ্যালিটীর পরিচালিত পাকা রাস্তা ১৩০৬ মাইল; কাঁচা রাস্তা ১৫৬৫ মাইল।

মুচি ও নাপিতের লাইসেন্স

নারায়ণগঞ্জের মিউনিসিপ্যালিটী স্থানীয় মুচি ও নাপিতগণকে বলিয়াছেন যে, তাহারা যদি টাকা দিয়া লাইসেন্স না লয়, তাহা হইলে মিউনিসিপ্যালিটির উপরে তাহাদিগকে তাহাদের ব্যবসায় চালাইতে দেওয়া হইবে না। নাপিত ও মুচিগণ সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের নিকট জানাইলে পরে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছেন—তোমরা রাস্তার উপরে তোমাদের ব্যবসায় চালাইতে থাক।

(ফ্রী প্রেস)

নিমতলায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

দর্ম্মাহাটায় যে অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহাতে ২২টি গুদাম পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এই ২২টি গুদামে বহু লক্ষ টাকার কাঠ গাদা করা ছিল। দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে আনন্দময়ীর মন্দিরের সামনে একটি কাঠগোলাতে প্রথম আগুন লাগে। আগুন লাগিবার কারণ ঠিক করিয়া জানা যায় নাই, তবে ঐ স্থানের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে অনেকেই বলিল যে, গোলার ঘরে কেহ বিড়ি খাইয়া তাহার শেষ অংশ জ্বলন্ত অবস্থায় ফেলিয়া দেয়। এই সামান্য অবহেলার ফল এই ভীষণ কাণ্ড। কয়েকজন বলিল যে, আগুন নাকি ইচ্ছা করিয়াই কেহ লাগাইয়া দিয়াছে। এই সকল কথার অবশ্য কোনও প্রমাণ নাই। ঠিক কেমন করিয়া যে আগুন লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ফায়ারব্রিগেড ২ ঘণ্টা ধরিয়া ১৪টি ইঞ্জিন চালাইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আগুনকে বশে আনে। প্রবল উত্তরা হাওয়ার জন্য ইহাদের কার্য্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়। কাঠগোলার লোকেরা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারে নাই, পরে বিপদ জানিয়া তাহারা কোনও রকমে প্রাণ লইয়া গোলা ছাড়িয়া বাহিরে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। কাঠগোলার সঙ্গে তিনটি পানের এবং দুইটি মুদির দোকানও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। সকাল ৬টার সময় দুইটি ছাড়া সব ফায়ারব্রিগেড ইঞ্জিন চলিয়া যায়। এই দুইটি ইঞ্জিন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত জল চালাইয়াছে। ১০টার সময় গিয়া দেখিলাম তখনও পোড়া কাঠের গাদায় আগুন রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ধোঁয়াও উঠিতেছে। ইতস্ততঃ কয়েকজন লোক অত্যন্ত বিষণ্নমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খোঁজ করিয়া জানিলাম, ইহাদেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কয়েকটী বাড়ীও পুড়িয়া গিয়াছে। বিরাট ধ্বংসলীলার পরিমাণ কি ভীষণ তাহা চোখে না দেখিলে বুঝা যায় না। অনেক দরিদ্র লোক কাঠগোলার আশেপাশে বাস করিত। কাল রাত্রে তাহাদের যাহা কিছু সামান্য ছিল সবই আগুনের মুখে গিয়াছে। একস্থানে দেখিলাম, কয়েকজন মজুর ছাইয়ের গাদা ঘাটিতেছে। এইখানে নাকি তাহাদের সকলেরই সামান্য সামান্য পুঁজি একটি টিনের প্যাটরাতে ছিল। কয়েকজন সাহেবকে দেখিলাম ঘোরাফেরা করিতেছে। শুনিলাম ইহারা ইন্সিওর্যান্স কোম্পানীদের লোক। কয়েকটী গোলা ইন্সিওর করা ছিল।

এখনও সমস্ত বিবরণ ভাল করিয়া জানা যায় নাই। কয়েকজন মজুর নাকি কাঠের গাদায় চাপা পড়িয়া মরিয়াছে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ফায়ারব্রিগেডের লোকেরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ভীষণ বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আগুন নিবাইবার জন্য যে প্রকার কার্য্য করিয়াছে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বেলা ১০টার সময়েও দেখিলাম, কয়েকজন ফায়ারব্রিগেডের লোক সর্ব্বাঙ্গে ছাই কাদা ইত্যাদি মাখিয়া জল চালাইতেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এত বড় অগ্নিকাণ্ড কলিকাতায় আর হয় নাই। ইহাতে বহুলক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

(আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা)

পথের ধূলা

চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রে ও মলয়ার মলয় হিল্লোলে রাস্তার ধূলাসমূহ এমনি ভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে যে,

লোকের তিষ্টিয়া থাকা দায় হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার দুই ধারের দোকানদারদের জিনিষপত্রে ধূলি স্তূপীকৃত ভাবে পতিত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করিয়াও উহার অত্যাচার হইতে লোক বাঁচিতে পারিতেছে না। মিঠাই আদি খাবারের দোকানের কথা আর কি বলিব? ধূলি-মিশ্রিত খাবার খাইয়া লোকদিগের নানা অসুখ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আশা করি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সত্বর রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবেন। (নোয়াখালী হিতৈষী)

শ্মশান ও স্বাস্থ্য

শ্মশানঘাটে পারাপারের খেয়ার ব্যবস্থা করিয়া ডিঃ বোর্ড শনৈঃ শনৈঃ সাধারণের বিরাগভাজন হইতেছেন। এ সম্বন্ধে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা লেখালেখি হওয়া সত্ত্বেও বোর্ড প্রকৃত ব্যাপারে কানে তুলা দিয়াছেন। এই দক্ষিণা হাওয়ার সময় শব-দাহের গন্ধে লোকে খেয়াঘাটে তিষ্ঠিতে পারে না। অনেক লোককে আমরা বমি করিতে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। সাধারণের জীবন লইয়া এ প্রকার ছিনিমিনি খেলা সাধারণের প্রতিনিধিদের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমরা স্বায়ত্তশাসন পাই না বলিয়া সরকারের নিন্দা করি বটে, কিন্তু আমার দেশের লোক, যাহাদের হস্তে দেশের সুখ, স্বাস্থ্য নির্ভর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বহু চেষ্টায়ও তাহাদের হাত হইতে শ্মশান ও খেয়ার সমাধান হইল না। ঘরে এক দ্রব্য চাহিলে যদি না পাওয়া যায় পরের নিকট দাবী করিব কেমন করিয়া? ডিঃ বোর্ড যদি সত্বর ইহার প্রতিকার না করেন তবে সাধারণে স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার্থে উর্দ্ধতন রাজপুরুষের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইবেন। তাহার পূর্ব্বে আমরা বোর্ডের সুযোগ্য সভ্যদিগকে একবার এই সময় খেয়াঘাটে শবদাহের সময় অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপস্থিত থাকিয়া লোকে কেন যে অভিযোগ করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করি। সহর হইতে এস্থান বেশী দূরে নয়, গাড়ী ঘোড়া, মোটর সব যানই এখানে আসে। সুতরাং এই স্থানে আসিতে কষ্টও সমধিক হইবে না।

(খুলনাবাসী)

জলের অভাব

(১)

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত কয়েক স্থানে পানীয় জলের অভাবে কলেরা, উদরাময় ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবিষয়ে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

(২)

মহকুমা চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত গোড়াইটুপী, গহেরপুর, বড় ও ছোট আতীয়া, তীর্থদহ, পোষ্টবেহার ও খাড়াগোদা কালুবোল প্রভৃতি গ্রামসকলে পানীয় জলের ভীষণ কষ্ট হইতেছে। সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গ্রামবাসীরা নলকূপ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিতেছে। এ বিষয়ে জেলাবোর্ড প্রভৃতির কৃপাদৃষ্টির প্রয়োজন। (বঙ্গরত্ন, কৃষ্ণনগর)

বেঙ্গল ইন্‌শিওর্যান্স অ্যাণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

বীমাকারিগণকে সুবিধাজনক সর্ত্তে ও বাড়ীঘর সরবরাহ করিবার সঙ্কল্প লইয়া ১৯১৯ সনে কলিকাতায় এই কোম্পানীটি খাড়া করা হয়। কোম্পানীটি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

প্রদর্শনী ট্রেন

ই, বি, রেলের প্রদর্শনী ট্রেনখানি ১৯শে মার্চ্চ কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিল। প্রাতে রেল ষ্টেশনে প্রদর্শনী হইয়াছিল। সমস্ত দিন গাড়ীখানি সকলকে দেখান হইয়াছে। নদীয়ার মহারাজার ভবনে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে বায়স্কোপ দেখানো হইয়াছে। মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

পরলোকে শ্রীকালী ঘোষ

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী শ্রীকালী ঘোষ মহাশয় গত ২৫শে ফাল্গুন বুধবার রাত্রিকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। সন ১২৬০ সালে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার গোয়ালনগর

গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন—যে বয়সলাভ অনেক বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটে না। তিনি সেই বয়সে পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার জন্য আমরা শোকানুভব করিতেছি। তাহার কারণ, নব্যবঙ্গের শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাহসী ও সাধু শ্রীকালী বাবুর একটি নির্দ্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থান ছিল; সে স্থান তিনি অর্দ্ধ-শতাব্দীর শ্রমে অধিকার করিয়াছিলেন ; সে স্থান পূর্ণ করিবার মত কাহাকেও আজ দেখিতে পাইতেছি না। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বলিতেন,—"শ্রীকালী বাবুর শোণিতে একবিন্দু অসাধুতা নাই।" ব্যবসার ক্ষেত্রে ইহা সামান্য কথা নহে। শ্রীকালী বাবুর কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার রাধাবাজারের ঘোষ মিত্র কোম্পানীর ছোট অফিসটিই ছিল না। দেশে ব্যবসা পত্তনের যত প্রয়াস বাঙ্গালী গত ৩০ বৎসরের মধ্যে করিয়াছে, সে সকলেরই সহিত তাঁহার কোন না কোনরূপ যোগাযোগ ছিল। তিনি অকাতরে উপদেশ ও অবসর দিয়া সে সকলের সাফল্যসাধনে সাহায্য করিতেন। গত ৩০ বৎসরে বাঙ্গালীর শিল্পপ্রতিষ্ঠাদিতে কোন্ কাজ শ্রীকালী বাবুকে বাদ দিয়া হইয়াছে ? স্বদেশী যুগে তাঁতের কাজ—কলের তাঁত প্রচলন, দিয়াশলাইয়ের কারখানা, পেন্সিলের কারখানা, সাবানের কারখানা, কাচের কারখানা—কোন্‌টিতে শ্রীকালী বাবুর সাহায্য বা উপদেশ বা উভয়ই ছিল না ? শ্রীকালী বাবুর উপদেশ ব্যতীত সার নীলরতন বা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতেন কি না সন্দেহ। শ্রীকালী বাবুর সাহায্য ব্যতীত বাঙ্গালী অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ের পথ দেখিতে পাইত না।

শ্রীকালী বাবুকে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি স্বদেশীর সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ নেতৃগণের সহিত এক যোগে কাজ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত পূর্ব্বে যে শিল্প ব্যবসা সমিতির অধিবেশন হইত, তাহাতেই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল।

শ্রীকালী বাবু ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা প্রবল থাকায় তিনি নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। বাট্টার মত জটিল বিষয়েও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনেককে সাহায্য করিত। তিনি দীর্ঘকাল বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স—বণিক সভার কার্য্য-নির্ব্বাহমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন এবং তথায় বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীদিগের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সাহস ও সাধুতা থাকায় তিনি কখন বিষণ্ণ বা নিরাশ হইতেন না। ব্যবসার ক্ষেত্রে জোয়ার ও ভাঁটা আছে। তাঁহাকেও ভাঁটার টান সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধবয়সেও তিনি তাহাতে নিরাশ হয়েন নাই, পরন্তু পূর্ণো-দ্যমে কাজ করিতেন। কাজেই তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তিনি অন্তরে গীতার উপদেশ অনুভব করিয়াছিলেন—কর্ম্মেই তোমার অধিকার।

তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফল তিনি যতটুকু সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা সামান্য, কিন্তু তাহার অধিক ফল সম্ভোগ করিবে তাঁহার দেশবাসী। তাহাদের মধ্যে অনেকে শ্রীকালী বাবুর নাম শুনে নাই ; উত্তরকালে তাঁহার নাম—এই তেজস্বী, কিন্তু বিনয়ী, স্পষ্টবাদী, কিন্তু মিষ্টস্বভাব বাঙ্গালীর নাম বিস্মৃতির অতল তলে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার শিল্পপ্রতিষ্ঠার যুগে শ্রীকালী বাবু যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা—যাহারা তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়াছি, স্নেহ লাভ করিয়াছি—কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার ন্যায় সামাজিক 'সেকেলে' বাঙ্গালীর সংখ্যার ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইতেছে। তিনি তাঁহার প্রথম বয়সের বাঙ্গালী সমাজের অনেক কথা জানিতেন। এ বিষয়ে কেন পৃথিবীর নানা বিষয়ে তিনি 'তথ্যের খনি' ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীকালী বাবুর মৃত্যুতে আমরা একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু হারাইলাম। তিনি ব্যক্তিগত হিসাবেই কেবল আমাদের বন্ধু ছিলেন না। তিনি "বসুমতীর"ও পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও নিয়মিত পাঠক ছিলেন। যখন দৃষ্টিশক্তির হীনতাহেতু তিনি আর বড় বাহিরে যাতায়াত করিতেন না, তখনও

'বসুমতী'-সাহিত্য-মন্দিরে তাঁহার আগমন বন্ধ হয় নাই। নিত্য তাঁহাকে "বসুমতী" পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত। এই সকল কারণে আজ আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

আজ তাঁহার স্মৃতি সম্মুখে রাখিয়া আমরা কামনা করিতেছি—বাঙ্গালায় তাঁহার আদর্শ অনুকৃত হউক, বাঙ্গালী সাহসে, সাধুতায়, ব্যবসা-বুদ্ধিতে শ্রীকালী বাবুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার দারিদ্র্য-সমস্যা-সমাধানে সাফল্যলাভ করুক। (বসুমতী)

বাঙ্গালী জাহাজ-কোম্পানী

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাটের চালান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চট্‌কল সমূহে আসে। এই সকল চট্‌কলের মালিক ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। কেবল মাত্র দুইটি চট্‌কল ভারতবাসীর। ইণ্ডিয়া জুট্ মিলস্ এসোসিয়েশ্যনের মারফতে পাট ক্রয় করিবার চুক্তিপত্র হয়। তাঁহারা সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন যে, পাটের চালান কেবল মাত্র (১) আই, জি, এস, এন রেলওয়ে কোম্পানী লিঃ (২) আর, এস্, এন কোম্পানী (৩) বি, এ, এস্, এস্ কোঃ লিঃ এই তিন কোম্পানীর জাহাজে পাঠাইতে হইবে। বলা বাহুল্য এই তিনটি কোম্পানীই বিদেশীয় ইংরেজদের। ভাগ্যকুলের বিখ্যাত রায়বংশের মেসার্স শ্রীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক পরিচালিত আর একটি জাহাজ কোম্পানী আছে, তাহার নাম ইষ্টবেঙ্গল ষ্টিম সার্ভিস লিঃ। এই দেশীয় ষ্টীমার কোম্পানীর যাহাতে ক্ষতি হয়, ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্ এসোসিয়েশ্যন তাহারই বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

রাজসাহী কৃষি কলেজ

আজকালকার বেকার-সমস্যার দিনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থকরী বিদ্যা ঢুকাইবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। রাজসাহী কলেজে কৃষি-বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জোর চেষ্টা চলিতেছে। উত্তরবঙ্গে জমীদার ও ভূস্বামীর সংখ্যা খুব বেশী। রাজসাহীতে উচ্চ কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এই সকল জমীদার, জোদ্দার ও তালুকদারদের তনয়গণ কৃষিবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদের প্রচেষ্টায় হাত দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

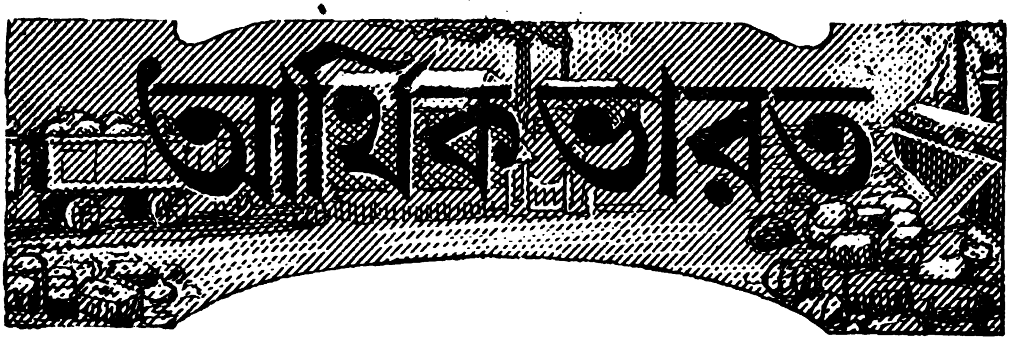
বসন্তকুমার এগ্রিকালচারাল এনডাউমেন্ট ফণ্ড শীঘ্রই ৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। ঐ টাকা খাটাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এন, এন গাঙ্গুলী মহাশয় এক স্কিম প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সরকার এখনও ঐ খসরা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কৃষিকমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন।

রাজসাহীর এই প্রস্তাবিত কৃষি কলেজে ছাত্রদিগকে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। তিন বৎসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রদিগকে কৃষি ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে

চট্টগ্রাম বন্দর

ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশ্যনের এক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, (১) চট্টগ্রাম বন্দরে ফায়ার ব্রিগেড (অগ্নি নিবারণী সঙ্ঘ) চাই। (২) আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর চট্টগ্রাম হইতে আকিয়াব বন্দর পর্য্যন্ত ইন্দোবর্ম্মা রেলওয়ে কোম্পানী নাম দিয়া রেল খুলিবার সঙ্কল্প অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা চাই। (৩) চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি-সাধন-কল্পে সরকারের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। (৪) টীম্বার ও টিন আমদানি রপ্তানির সুবিধার জন্য ষ্টিমার ও রেল কোম্পানী যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।



ভারতবাসীর বড় বড় আধুনিক ব্যাঙ্ক

আজকাল ভারতে মাত্র ২৯টা জয়েন্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক চলিতেছে। কোনোটার মূলধনই ৫ লাখ টাকার কম নয়। এই সমুদয়ে লোকজনের গচ্ছিত টাকা খাটিতেছে ৫৩ কোটি।

১৯০৫ সনে এই ধরণের ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৯টা মাত্র। আর তাহাদের খাতায় গচ্ছিত ছিল ১২ কোটি। দেখা যাইতেছে যে, বিশ বাইশ বৎসরে ব্যাঙ্ক-সংখ্যা বাড়িয়াছে ৩ গুণের বেশী আর গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৪ গুণের বেশী।

ভারতে মাঝারি ও ছোট ব্যাঙ্ক

ভারত-সন্তানের পরিচালিত আধুনিক ব্যাঙ্ক আরও আছে। এইগুলার সংখ্যা ৪০। প্রত্যেকটার মূলধন এক লাখ হইতে ৫ লাখ টাকা পর্য্যন্ত। এইগুলাকে "মাঝারি" ব্যাঙ্ক বলা চলে।

তাহা ছাড়া "ছোট" "ছোট" ব্যাঙ্কও গুন্‌তিতে আজ-কাল মন্দ নয়। গোটা ভারতে প্রায় ৭০০ ছিল ১৯২৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত। তাহাদের পুঁজির পরিমাণ ১ লাখের নীচে।

ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্ক

ভারতীয় আধুনিক ব্যাঙ্ক বলিতে ৭৪০টা ছোট ও মাঝারি আর ২৯টা বড় প্রতিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক-সম্পদ্ বলিলে বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলার নাম করাও দরকার। তাহাদের সংখ্যা ১৮। এইগুলার সংখ্যা ১৯০৫ সনে মাত্র ১০। ১৯০৫ সনে লোকজনের টাকা গচ্ছিত ছিল ১৭ কোটি। আজকাল পরিমাণটা ৭১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ এই কয় বৎসরে গচ্ছিত ৪ গুণের কিছু বেশী বাড়িয়াছে। বাড়তির অনুপাতটা স্বদেশী বড় ব্যাঙ্কেরও এইরূপ।

এই ১৮টা ব্যাঙ্ককে দুইভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। প্রথম ভাগে পড়ে ৫টা। এইগুলার কারবার অধিকাংশই ভারতের ভিতর চলে। অপর ১৩টার আসল কারবার চলে বিদেশে। ভারতে এইসকল প্রতিষ্ঠান বিদেশী কেন্দ্র-কারবারের শাখা বা প্রতিনিধিমাত্র।

১৮টা ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটাই বিদেশে রেজিষ্টারীকৃত। ইহাদের মূলধনও বিদেশী মুদ্রায় জমা এবং গণনা করা হয়। তবে ভারতের কারবারে স্বদেশী টাকার চল আছে।

একস্‌চেঞ্জ-ব্যাঙ্ক

এই ব্যাঙ্কগুলাকে একস্‌চেঞ্জ-ব্যাঙ্ক বা বিনিময়-ব্যাঙ্ক বলে। বিদেশী টাকাকড়ির লেনদেন এইসকল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাঙ্কে চলিতে পারে না। বিনিময়ের কারবারটা এই সকল বিদেশী ব্যাঙ্কের একচেটিয়া।

স্বদেশী শিল্পের সংরক্ষণ-শুল্ক

বিদেশ হইতে কাগজ আমদানি হইলে তাহার উপর ভারত সরকার একটা শুল্ক চাপাইয়া থাকে। শুল্কের হার পাউণ্ড প্রতি এক আনা। টিনের পাত আমদানির উপরও সংরক্ষণ-শুল্ক আছে। হারটা সম্প্রতি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোহা ও ইস্পাত ত এক্ষণে পক্ষপাত-মূলক শুল্কই ভোগ করিতেছে। স্বদেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলাও

আমদানি-শুল্কের প্রভাবে সংরক্ষিত হইতেছে। বিদেশী দিয়াশলাইয়ের উপর বেশ কড়া হারে শুল্ক বসানো আছে। অপর দিকে দেশে যাহাতে তাঁতের কারখানাগুলা সহজে টিঁকিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কারখানায় যে সকল যন্ত্রপাতি লাগে তাহার আমদানি সহজসাধ্য করা হইয়াছে। আগে তাঁতের যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক ছিল শতকরা ১৫ টাকা। এক্ষণে শুল্কের হার শতকরা ২৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিল্পগুলাকে স্বদেশী বলা হইতেছে এই জন্য যে,—ভারতের চৌহদ্দির ভিতর কারখানাসমূহ অবস্থিত। মূলধন ভারতীয় কি বিদেশী সে কথা স্বতন্ত্র। তবে কারবারটা স্বদেশী ভাবে কিংবা বিদেশী ভাবে চলুক,—নানা হিসাবে দেশের লোকের লাভ ও উপকার মন্দ নয়।

হেসিয়ান রপ্তানি

মেসার্স কেশোরাম পোদ্দার অ্যাণ্ড কোং যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় হেসিয়ান ব্যাগ ছাড়া ১৪৫ কোটি গজ হেসিয়ান চট ১৯২৬ সনে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১৪৩½ কোটি গজ। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকা হেসিয়ানের বড় খরিদ্দার।

বর্ম্মায় রবার

১৯২৫-২৬ সনে বর্ম্মায় ৭৯,৪৩৭ একর জমিতে রবার উৎপন্ন হয়। মার্গুই জেলাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রবার জন্মে।

দাক্ষিণাত্যে চাষবাস

দাক্ষিণাত্যের ক্যানাল প্রদেশের প্রধান ফসল ইক্ষু। বর্ত্তমানে ভারত বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর পনর কোটি টাকার চিনি আমদানি করে। এই দিক্ দিয়া এদেশে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই অঞ্চলের অনেক কিষাণই গরিব। অবস্থাপন্ন কিষাণরাই মাত্র ইক্ষু চাষ করিতে সমর্থ কারণ ইহা ব্যয়সাপেক্ষ। সেই কারণে দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ সুবিধামত চলিতেছে না। এখানকার কৃষি-কর্ম্মচারীরা ইক্ষুর পরিবর্ত্তে তুলার চাষ প্রবর্ত্তনের কাজে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। নীরা ক্যানাল অঞ্চলে প্রতি একরে তুলার চাষে ৫০ হইতে ১০০ টাকা লাভ পাওয়া গিয়াছে। নীরার পাঁচ হাজার একর জমি তুলার চাষে আনা হইয়াছে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উন্নত শ্রেণীর বীচি সমেত তুলা এখানে একর প্রতি ৩০ মণ ফলিতে পারে। পুনার কৃষি-প্রদর্শনীতে এই অঞ্চলের এক কিষাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা প্রদর্শন করায় একটি মেডেল পাইয়াছে।

তুলা ছাড়া অন্যান্য ফসল জন্মাইবার আয়োজনও চলিতেছে। ফলের চাষের দিকে অনেকে মন দিয়াছেন। বরমতীর দুইজন কৃষক এক অজন্মা ভূখণ্ডে সুন্দর ফলের বাগিচা তৈয়ারী করিয়া দেখাইয়াছে যে, ইহাও একটি লাভ-জনক কৃষি-সম্পদ্। মালগাঁয়ে ফলের একটা খাস প্রদর্শনী পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কৃষকরা এদিকে অনেকটা মনোযোগ দিয়াছে।

হায়দ্রাবাদে দশ বৎসরের সমবায়

১৯২৬ সনের শেষ পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদে ১৭০৮টি সমবায় সমিতি ছিল। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ছিল ৪৫৫২৩ জন এবং মূলধন ছিল ১১১ লক্ষের উপর। ইহা হইল দশ বৎসরের দৌড়। মাদ্রাজে গত সন পর্য্যন্ত ১৩৩৩টি সমবায় সমিতি ছিল আর ইহাদের মূলধন ছিল ১২৩ লক্ষ। বোম্বাই প্রদেশে ঐ সময়ে মাত্র ৬৯৮টি সমিতি ও ৬৬ লক্ষ টাকা মূলধন ছিল।

লৌহ-ইস্পাত শিল্প

১৯১১-১২ সনে মাত্র দশ হাজার টন লৌহ ইস্পাত উৎপাদন করা হইয়াছিল। বিগত সনে ঐ সংখ্যা ৩৬০ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। অন্যদিকে ১৯১১-১২ সনে ৮৫৫ হাজার টন ইস্পাত আমদানি হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯৮ হাজার টনে গিয়া পৌছিয়াছে।

ইহার দ্বারা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আমদানি ইস্পাতের প্রসার-সম্ভাবনা খুবই বেশী।

ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটি

মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ঐ সমিতির এক অধিবেশনে ধার্য্য হইয়াছে, ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আর্থিক বৎসরের প্রচার-বিভাগের কার্য্যের জন্য ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞাপনের জন্য ঐ সনে ৩৫ হাজার পাউণ্ড খরচ করা হইবে এবং জার্ম্মাণিতে ১০ হাজার পাউণ্ডের বিজ্ঞাপন চালান হইবে।

কৃষি-কমিশনের তদন্ত-খরচা

হাউস অব্ কমন্সের এক প্রশ্নোত্তরে সহকারী ভারত সচিব আর্ল উইণ্টারটন সাহেব বলিয়াছেন যে, কৃষি-কমিশনের তদন্ত-খরচা অনুমান ৯৬ হাজার পাউণ্ড হইবে।

সিংহলের চা-ব্যবসায়

সিংহল চেম্বার অব্ কমার্সের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, জে, ওয়াল ১৯২৬ সনে সিংহলের চা-শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ সনে সিংহল হইতে বিশ-কোটি পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। রুশিয়ায় কিন্তু রপ্তানির হার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পারস্য উপসাগরের নিকটস্থ দেশগুলিও কম মাল খরিদ করিতেছে। অন্য দিকে ইউনাইটেড কিংডম ও নিউজিল্যাণ্ড যথাক্রমে পূর্ব্ব বৎসরের চাইতে ৭৫ লক্ষ ও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড বেশী চা ক্রয় করিয়াছে।

লঙ্কাদ্বীপে নূতন কোম্পানী

কলম্বোতে ডাউন সাইড্ ষ্টেট কোম্পানী লিমিটেড নামে এক নূতন কোম্পানী খোলা হইয়াছে। এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য নিউগালওয়ে জেলার ডাউন সাইড সম্পত্তি ক্রয় করা। ইহা ১০০০০০০ টাকা মূলধনে প্রতি শেয়ার ১০ টাকা হিসাবে ১০০০০০ শেয়ার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

সিংহলের কোম্পানীগুলির সচ্ছলতা

বিগত সনে চা ও রবার কোম্পানীর অংশীদারগণকে মোটা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। রায়াগম কোম্পানী শতকরা ৪৭½ ভাগ, অভিচ্ছাওয়ালা টি অ্যাণ্ড রবার কোং ৯০ ভাগ, কালান্দা রবার কোং ৪০ ভাগ, কেলানি টি গার্ডেন লিঃ ৩৫ ভাগ, মহারাজা ষ্টেট লিঃ ৮০ ভাগ এবং হিনওয়ার-ওয়ালা রবার কোং ৮০ভাগ লভ্যাংশ অংশীদারদিগকে দিয়াছে।

পাঞ্জাবের সুদখোর মহাজন

পাঞ্জাব ঋণদাতা মহাজনগণের স্বর্ণভূমি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পাঞ্জাবের কিষাণরা ৯০ কোটি টাকার ঋণে আবদ্ধ। অর্থাৎ কৃষিজীবিগণের প্রত্যেকে ৭৬৲ টাকা পরিমাণে ঋণী বা ঐ প্রদেশের ভূমিকরের ১৯ গুণ ঋণ তাহাদের স্কন্ধে। পাঞ্জাবের মহাজনদের সংখ্যা গোটা ভারতের ঋণদাতা মহাজনগণের তিন গুণ।

ঋণের কারণ

অনেক গ্রামেই গরিব জমীদারের বাস। ইহারা বাস্তবিক পক্ষে মহাজনদের কেনা গোলাম। অনেক ক্ষেত্রেই অমিতব্যয়িতা বা মোকদ্দমার জন্য টাকা কর্জ্জ লওয়ার প্রয়োজন হয়। গো-মড়ক, অফলা প্রভৃতির জন্য গৃহস্থকে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। কিন্তু একবার মহাজনের হাতে গিয়া পড়িলে আর তার নিস্তার নাই। সুদ তস্য সুদ চক্রহারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শতকরা ৫০, ৭৫ ভাগ সুদ তাহাকে টানিতে হয়। প্রত্যেক মরশুমের সময় মহাজন গৃহস্থের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের শস্য রাখিয়া অবশিষ্ট লইয়া যায়। খাতকদের নিকট হইতে কি উপায়ে টাকা আদায় করিতে হয় পাঞ্জাবের মহাজন সে বিষয়ে পাকা ওস্তাদ। অন্য দিক্ দেখুন। একটা লোক ১০০ টাকা কর্জ্জ করিলে মাত্র ৯৬৲ বা ৯৭৲ টাকা পায়। কারণ মহাজনের তথাকথিত প্রাথমিক খরচা তাহাকে বহন করিতে হয়। তারপর এ কিস্তিতে ও কিস্তিতে এক বস্তা যব, গম বা দুই বস্তা ছোলা এক বোঝা খড় এ সব মহাজনের নজর সেলামী

বাবদ দিতে হয়। এর আর কোন ওয়াশীল নাই। মহাজনের খাতায় ইহার কোন জমা থাকে না। আর কোন খাতকই মহাজনের খাতা পরীক্ষা করিবার আস্পর্দ্ধা রাখে না। পাঞ্জাবের গরিব জাট কিষাণরা এইভাবে মহাজনের মানুষ-পেষা কলে নিষ্পেষিত হয়। এই জোঁকের রক্ত-শোষণ হইতে তাহাদের উদ্ধারের আর কোন পথ থাকে না।

পাঞ্জাবের শাইলক

পাঞ্জাবের মহাজনেরা অবিকল ইহুদি শাইলকের ছাঁচে ঢালাই করা। তার কাছে কোন আবেদন-নিবেদন, ক্রন্দন অনুরোধ উপরোধ নাই। তার প্রাণে এতটুকু দয়া নাই। নিরক্ষর অজ্ঞ চাষীদের সর্ব্বনাশ-সাধনে সে মজবুত। ইহাতেই তাহার আনন্দ। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে মোগল আমলের বিখ্যাত ভ্রমণকারী তাভার্ণিয়ারের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "পাঞ্জাবের মহাজনেরা সব চাইতে ধূর্ত্ত ইহুদিদিগকে এই সুদের ব্যবসায় দুই কলম শিখাইয়া দিবার ক্ষমতা রাখে।"

সমবায় আন্দোলন

কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানগুলি পাঞ্জাবের জেলায় জেলায় পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের ধাক্কায় পাঞ্জাবের মহাজনগণ অনেকটা মুস্কিলে পড়িয়াছেন। অনেকে টাকা ধার দেওয়ার চাইতে ফার্ম্ম খোলা লাভজনক মনে করিতেছে। কিন্তু সুদের ব্যবসা এখনও পুরা-দস্তুর চলিতেছে।

বর্ম্মায় বাঙালী

বর্ম্মার বনে, বন্দরে, তেলের খনিতে, রবারের কারখানায় চায়ের বাগানে আফিস আদালতে অর্থাৎ গোটা বর্ম্মার মাটীতে আজ হাজার হাজার বাঙালী অন্নসংস্থান করিতেছে। আরও অনেকে ছুটিয়াছে বর্ম্মার পথে রেঙ্গুনের জাহাজে। সুজলা সুফলা বাংলা দেশের মাটী ছাড়িয়া বাঙালীর বর্ম্মা-অভিযানের রহস্য কি? আজ বর্ম্মার মাটীতে প্রবাসী বাঙালীরা এক ছোট বাংলার পত্তন করিয়াছে। তাহারা সেখানে দস্তুরমত একটা সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। দুই চারিখানা সংবাদপত্র বাংলা ও ইংরেজী তাহারা চালাইতেছে। বর্ম্মার মোট লোক-সংখ্যা ১৩,১৬৯,০৯৯। ইহার মধ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা ৮৮৭,০৭৭।

বর্ম্মার কৃষি-সম্পদ্

বর্ম্মা কৃষিপ্রধান দেশ। শস্যশ্যামলা বর্ম্মার ক্ষেত-খামারে শতকরা ৭৫জন অধিবাসীর ভরণ-পোষণ হয়। ঠিক বাংলার মত জলবায়ুর আবহাওয়া এখানে। বর্ম্মায় দেড় কোটি একরের বেশী চাষের জমি। পাঁচ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে দুই তিনবার ফসল উৎপন্ন করা হয়। বর্ম্মার চাষ-আবাদের কাজে আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতির চলন এখনও হয় নাই। বাংলার চাষীদের মতই আদিম কালের সাজ-সরঞ্জাম বর্ম্মার কিষাণেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রায় সকল কিষাণদেরই নিজের নিজের হাল-বলদ আছে। মাঠের ও গৃহস্থালীর কাজ তাহারা নিজেরাই সম্পন্ন করে। কিন্তু যে যে জেলায় চাষের জমি বেশী, সেই সকল অঞ্চলে মজুর দ্বারাও চাষের কাজ করান হয় এবং বলদ ও কৃষির অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া করিয়াও আনা হয়।

বর্ম্মায় জল-সরবরাহ

আদিকাল হইতেই অপেক্ষাকৃত শুষ্ক প্রদেশের জমিতে জল-সরবরাহের কাজ ভালভাবে চলিয়া আসিতেছে। বর্ম্মার সাত লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহের জন্য অনেক খালবিল নদীনালা পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে। এই সকল খালবিল নদীনালা প্রভৃতি সকলই ধান উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সবুজ, হলুদ, কাল, পাটকেল প্রভৃতি নানা বর্ণের ধান বর্ম্মার মাটীতে ফলে।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক ক্ষেত-খামারের জমি আছে। বর্ম্মার কিষাণেরা পাহাড়ের শিলা পাথর কাটিয়া ঝরণা ধারা ঐ সব জমিতে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যায়। এই সকল পাহাড়িয়া জমিতে সাধারণতঃ ধান তুলা গম ভুট্টা তামাক প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে।

বর্ম্মার কিষাণরা নিজের নিজের জমিকে সন্তানের চাইতেও বেশী ভালবাসে। ঐ জমি হস্তান্তর করিতে তাহারা ঘৃণা ও অসম্মান বোধ করে।

ধান

দক্ষিণ বর্ম্মার তিন ভাগের দুইভাগই চাষের জমি এবং ইহার সাতভাগের ছয় ভাগ জমিতেই ধানের চাষ করা হয়। বর্ম্মার ধান চাউলে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বন্যা-প্লাবিত বাংলার জেলাগুলির অন্নকষ্ট নিবারিত হয়। উত্তর অঞ্চলের (আপার বার্ম্মার) অর্দ্ধেক জমিতে ধান জন্মে। অবশিষ্ট জমিতে যব, গম ভুট্টা কলাই প্রভৃতি রবিশস্য ফলে। মোটের উপর ধানই বর্ম্মার সবচাইতে বড় খামার।

রেঙ্গুনের গগনস্পর্শী কলকারখানায় এই সকল ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করা হয়। তাহার পর জাহাজে বোঝাই করিয়া দেশ-বিদেশে ঐ সকল চাউল রপ্তানি করা হয়। রেঙ্গুনের মত অতবড় ধান চাউলের বন্দর দুনিয়ায় আর একটি দ্বিতীয় নাই। ইহার সঙ্গে আর কোন বন্দরের তুলনা হয় না।

দক্ষিণ অঞ্চলের চাষ-বাস কতকটা এক ঘেয়ে রকমের। জুন মাসে ধানের চারা দেওয়া হয়, সেপ্টেম্বরে রোপণ করা ও ডিসেম্বর জানুয়ারীতে ধান কাটা হয়। বর্ম্মার ভূমি খুব উর্ব্বরা। ইহাতে কদাচিৎ সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

বিশেষ ফসল

বিশেষ ফসলের মধ্যে চায়ের স্থান প্রধান। আপার বার্ম্মার শান ষ্টেট ও কাথা জেলায় চায়ের চাস খুব বেশী। চীন সীমান্তের ধার দিয়া সলোইনের ওপারে শান রাষ্ট্রের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে আফিম তৈয়ারী হয়। কোকাংএ "পপি" (আফিমের ডগা) প্রধান ফসল।

বর্ম্মায় তুলা

আগের মত তুলা জন্মে না। পাহাড়িয়া অঞ্চলের অনেক স্থানেই আদিম অধিবাসীরা তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি উৎপন্ন করে। মেয়েরা সুতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, ধোলাই, রং করা প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের উৎপন্ন অনেকটা পরিমাণ তুলা চীনে রপ্তানি করা হয়। বর্ম্মার তুলা ঠিক ভারতে উৎপন্ন তুলার মত।

এতদ্ব্যতীত সুপারি, নারিকেল ও অন্যান্য ফলের বাগান বর্ম্মায় যথেষ্ট আছে। মান্দালে অঞ্চলে আম বাগান প্রায়ই দেখা যায়। আকের ক্ষেতও বর্ম্মায় আছে।

বর্ম্মার বন-সম্পদ্

বর্ম্মার আর্থিক জীবনে বন-জঙ্গলের দাম খুব বেশী। রিজার্ভ বা সরকারী বন-বিভাগের অধীনে ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল বন আছে। ইহা ছাড়া আরও ১১৫,০০০ বর্গ মাইল বন-জঙ্গল বর্ম্মায় আছে। সরকার প্রতি বৎসর ১০৭,০০০ টন সেগুণ ও শিশু কাঠ এই বন-বিভাগে পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত ফার্ম্ম বর্ম্মায় আছে। বোম্বে-বর্ম্মা ট্রেডিং কর্পোরেশ্যান ও ষ্টিল ব্রাদার্স ইহাদের মধ্যে প্রধান। এই দুইটি কোম্পানী প্রতি বৎসর ৩৪৪,০০০ টন টিম্বার বর্ম্মার বন-জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য কোম্পানীর বখরায় ৪৩১,০০০ টন পড়ে। একমাত্র জ্বালানী কাঠই ৮২৪,০০০ টন বর্ম্মার বনে পাওয়া যায়।

বর্ম্মার খনিজ সম্পদ্

যুদ্ধের সময় ত্যাভয় ও মার্গুই জেলা হইতে প্রাপ্ত টিন ও উলফ্রাম শিল্প খুব জোর চলিয়াছিল। যুদ্ধের পর ঐ দুই শিল্পের বাজার খুব মন্দা যাইতেছে। সরকার এই দুই খনিজ শিল্পের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতেছেন। যদিও এই সকল সাহায্য সত্বেও অনেক খনি বন্ধ করিতে হইতেছে। উত্তরাঞ্চলের শান ষ্টেটের বহুইন জেলায় রৌপ্য দস্তা সীসা প্রভৃতির খনি আছে। বার্ম্মা কর্পোরেশ্যন এই সকল খনিজ সম্পদ্ লুণ্ঠন করিতেছেন। মাইতকারণা জেলার স্বর্ণ-খনি হইতে স্বর্ণোদ্ধারের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ কোম্পানী কোনরূপ আশা পাইতেছেন না।

বর্ম্মার তেল

বর্ম্মার খনিজ সম্পদের মধ্যে তেলের স্থান শ্রেষ্ঠ। পারস্যের পর দুনিয়ার কুত্রাপি বর্ম্মার মত তেলের কারবার নাই। জগদ্বিখ্যাত বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর পত্তন হয় এখানকার মাটীতে। ম্যাগুই জেলার ইনাংইয়াং নামক স্থানেই সব চাইতে বৃহৎ ও পুরাতন তেলের ভাঁটি আছে। বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর অধিকাংশ তেল-কূপ এখানে আছে। প্যাকোই ও মিনবু জেলা হইতেও আজকাল যথেষ্টপরিমাণ তেল পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইনাংইয়াংএর তেলের মাঠ হইতে বর্ম্মার উৎপন্ন তিন ভাগের দুইভাগ তেল পাওয়া যায়। বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী তেলের নল-যোগে ঐ খনিজ অপরিষ্কৃত তেল রেঙ্গুন সহরে লইয়া যায়।

রেঙ্গুনের রিফাইনারী বা তেল পরিষ্কার করিবার কারখানাতে ঐ তেল পরিষ্কৃত করা হয়। অন্যান্য কোম্পানী ফ্লাটে (মাল জাহাজে) করিয়া অপরিষ্কৃত তেল রেঙ্গুনে আনয়ন করে। পরিষ্কৃত তেল, পেট্রোল প্রভৃতি ভারত-বর্ষের ও দুনিয়ার অন্যান্য বাজারে রপ্তানি করা হয়।

রবার

ইহা ছাড়া বর্ম্মার রবার-শিল্পও খুব জোরে চলিতেছে। প্রায় আশী হাজার একর জমিতে রবার জন্মে।

বর্ম্মার শিল্প-কারখানা

বর্ম্মায় ৮৮২টি ফ্যাক্টরি বা কারখানা আছে। ইহার পাঁচ ভাগের তিন ভাগই চাউল প্রস্তুত করার কারবারে খাটে। আর ছয় ভাগের একভাগই করাতের কারখানা। অবশিষ্ট তূলা, তেল ও পেট্রোলিয়ামের কারখানা।

বর্ম্মার দিন-মজুর

ঐ সমস্ত কারখানায় গড়ে প্রায় নব্বই হাজারে মজুর খাটে। ১৯২১ সনের সেন্সাসে (আদম সুমারী) দেখা যায় ১,৯৩৫,৭২৯ জন বর্ম্মাবাসী বা শতকরা ২৮·৪৮ জন কল-কারখানায় কাজ করে। ইহার মধ্যে চাষ-বাসের কাজে নিযুক্ত লোক ধরা হয় নাই।

অন্যান্য দেশের মত ফ্যাক্টরি-জাত দ্রব্যাদি গৃহ-শিল্পের ধ্বংসসাধন করিতেছে। বর্ম্মাবাসীর আদিম শিল্প অনেকটা লোপ পাইতে বসিয়াছে। তবে মান্দালে জেলার অমরা-পুরা নামক স্থানে রেশমশিল্প আবার জাঁকিয়া উঠিতেছে। কাঠের উপর খোদিত কারু-শিল্প এখনও চলিতেছে। তবে এগুলি আগেকার মত সমাদৃত হয় না।

ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইনশিওর্যান্স কোং লিঃ

১৯১৩ সনে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বীমা কোম্পানী। ১৯২৫ সনে ঐ কোম্পানীর লাইফ অ্যাশুওর্যান্স ফণ্ড ৭,৮৭,৮৬১ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এ ছাড়া কোম্পানীর বর্ত্তমানে রিজার্ভ ফণ্ডে ৪২,৪৭৫ টাকা আছে। কোম্পানীর টোটাল অ্যাসেট ১৩,২১,৪৩৫ টাকা। মোটের উপর এই প্রতিষ্ঠানটি খুব সচ্ছল।

ভারতে বিদেশী বাজার

ভারতবর্ষ হইতে যত মাল বিদেশে যায় তাহার প্রধান খরিদ্দার বিলাত। ইংরেজরা ভারতীয় মালের শতকরা ২১ অংশ খরিদ করে। ইংল্যাণ্ডের পরে ভারতের বড় বাজার হইতেছে জাপান। ভারতবাসী জাপানীদের নিকট তাহার বিদেশী বিক্রীর শতকরা ১৫ অংশ বেচিতেছে। জাপানের নীচে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বড় বাজার। মার্কিণ জাতি ভারতীয় রপ্তানির শতকরা ১০ অংশ খরিদ করে। তাহাদের পরে জার্ম্মাণির ঠাঁই। জার্ম্মাণরা শতকরা ৭ অংশ খরিদ করে। তাহার পরে ফ্রান্স ও ইতালি প্রায় কাছাকাছি। ভারতীয় রপ্তানির শতকরা ৫.৫ অংশ ফ্রান্সে আর ৫ অংশ ইতালিতে যায়। এই শতকরা ৫ অংশের অর্থ ১৯.২০ কোটি টাকা। ইতালিয়ানরা ভারতবর্ষের নিকট হইতে এই পরিমাণ টাকার মাল খরিদ করিয়া থাকে। মোটের উপর প্রায় ৪০০ কোটি টাকা দামের মাল ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়।

ভারতে মোটরকার

১৯২৫-২৬ সনে ভারতবর্ষে ৪ কোটি টাকা দামের

মোটরগাড়ীর আমদানি হইয়াছে। অটোমোবিল আসিয়াছে ১৩০০০ খানা, মোটর সাইকেল ২০০০ আর লরি ও বাস ৫,০০০। বুঝিতে হইবে যে, ভারতসন্তানের মোটর-ক্ষুধা খুব জবর। আর এই ক্ষুধা বাড়িয়াছেও খুব দ্রুত। ১৯১৩।১৪ সনের পূর্ব্বেকার অবস্থা আলোচনা করিলেই কাণ্ডটা বুঝা যাইবে সহজে। সে যুগে ফী বৎসর অটোমোবিল আসিত গড়পড়তা মাত্র ২,০০০ খানা আর মোটর সাইকেল আসিত ১,০০০ খানা। সে কালে,—সেই মান্ধাতার যুগে, লরি বা বাস জাতীয় যান আসিত কিনা জানা যায় না। কেন না সরকারের আমদানি তালিকায় এই চিজের কোনো স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। বুঝিতে হইবে যে, বাস বস্তুটা তখনও "উল্লেখযোগ্য" ছিল না অথবা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আমদানি হইত না।

চেক-খালাস-ভবন

ভারতে আজকাল ৭টা "ক্লীয়ারিং হাউস" বা চেক-খালাস-ভবন চলিতেছে। কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ, করাচি ও রেঙ্গুন এই পাঁচ সহরে এতদিন পাঁচটা ছিল। ১৯২০ সনে কানপুরে একটা আর ১৯২১ সনে লাহোরে একটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯২০ সনে ৩১,৪৯, ১৮,০০.০০০ টাকার চেক খালাস হইবার জন্য এই সকল ভবনে আসিয়াছিল। এত বেশী আর কখনো ভারতে দেখা যায় নাই। ১৯২৩ সনের পরিমাণ ১৮,৭৬,১৯,০০,০০০ টাকা।

এই হিসাবে ভারতের সঙ্গে বিলাতের তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের চেক-অভ্যাসটার ওজন করা সম্ভব। ১৯২৩ সনে বিলাতে চেক খালাস হইয়াছিল ৩৬,৬২৭, ৫৯২,০০০ পাউণ্ড। এই অঙ্কটা সেই বৎসরের ভারতীয় অঙ্কের ৩০ গুণেরও বেশী।

মার্কিণ মুল্লুক বিলাতকেও হারায়। ইংরেজ-খালাসের ২৷৷০ গুণ বেশী খালাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রে সেই বৎসর। সেদেশে প্রায় ২৫০টা ক্লীয়ারিং হাউস আছে।



দুনিয়ার ধনদৌলত

রুমেনিয়ার তরুণ মজুর

রুমেনিয়ার মজুর-সচিব দেশের ভিতরকার বিভিন্ন মজুর সমিতির নিকট তরুণ ও মেয়ে মজুর বিষয়ক একটা আইনের খসড়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে ওয়াশিংটনের মজুর-বিধিটাই কাজে পরিণত করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

এই আইনে ১৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনো লোককে মজুররূপে বাহাল করা চলিবে না। তরুণ মাত্রকে বাহাল করিবার পূর্ব্বে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সার্টিফিকেট আনাইয়া দেখিতে হইবে। এই সার্টিফিকেট সরকারী বা নাগরিক ডাক্তারেরা বিনা পয়সায় দিতে বাধ্য।

নৈশ কাজের আইনকানুন

যে সকল যুবার বয়স ১৮বৎসরের কম তাহাদিগকে কোনো নৈশ কাজে বাহাল করা চলিবে না। ১৮ বৎসরের বেশী বয়সেরও মেয়েদিগকে কোনো প্রকার নৈশ কাজে বাহাল করা নিষিদ্ধ।

রাত্রি বলিলে বুঝিতে হইবে কম সে কম ১১ঘণ্টার ছুটি। ১৬ বৎসর বয়সের যুবাদের সম্বন্ধে আর যে কোনো বয়সের মেয়েদের সম্বন্ধে রাত্রি ১০টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত আট ঘণ্টার ছুটি বিধিবদ্ধ। ১৬ বৎসরের বেশী বয়সের যুবাদের বেলায় ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাত ঘণ্টা বুঝিতে হইবে।

কোনো কোনো কারবারের নৈশ কাজ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবার অধিকার মজুর-সচিবের হাতে থাকিবে। যে যে কারখানায় অনবরত কাজ চালানো আবশ্যক তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। হোটেল রেষ্টরাণ্ট, মিঠাইয়ের দোকান ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্রের জন্য ঘণ্টা সম্বন্ধে ব্যতিরেক করা চলিবে; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কম সে কম ১১ ঘণ্টাব্যাপী নৈশ ছুটি চাই-ই চাই।

কখনো কখনো ঋতু অনুসারে কাজের ভিড় অত্যধিক বাড়িয়া যায়। সেই সময়ে মজুর-সচিব নৈশ ছুটির মাত্রাটা কিছু কমাইয়া দিতে অধিকারী। কিন্তু মোটের উপর বৎসরে ৬০ দিনের বেশী এইরূপ কমানো চলিবে না। কমানোটার অবশ্য দৌড় ১১ ঘণ্টার জায়গায় ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত।

মজুরদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

সরকারী কারখানা-পরিদর্শক যে-কোনো সময়ে কারখানার ভিতর প্রবেশ করিয়া মজুরদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে অধিকারী। যে-মজুরকে যে-কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে সে শারীরিক হিসাবে সেই কাজের উপযুক্ত কিনা তাহা বুঝিয়া দেখা পরিদর্শকের কর্ত্তব্য। কারখানার মালিকও পরিদর্শকের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য।

মাতৃমঙ্গলের মজুর-বিধি

সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে প্রত্যেক মেয়ে-মজুর একটা ছুটি ভোগ করিতে অধিকারী। ছুটির মাত্রা ঠিক করিয়া দিবে সরকারী চিকিৎসক।

সন্তান-জন্মের পর ছয় সপ্তাহ ধরিয়া কোনো মেয়ে মজুরি করিতে পারিবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছয় সপ্তাহের বেশী সময়ও জননী-মজুরদের কাজ নিষিদ্ধ।

সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে ও পরে যে-কয় দিন মেয়ে-মজুরেরা কাজ বন্ধ রাখিতে অধিকারী সেই কয়দিনের জন্য তাহাদিগকে একটা ভাতা দিতে প্রত্যেক কারখানাই বাধ্য। চিকিৎসার খরচও অবশ্য কারখানা হইতে আসিবে।

অন্যান্য মজুরদের দৈনিক ছুটি যেরূপ জননী-মজুরদের দৈনিক ছুটিও সেইরূপ। তাহার উপর অতিরিক্ত ছুটি তাহাদিগকে দিতে হইবে। যে-কয় দিন তাহারা সন্তানকে দুধ খাওয়াইতে বাধ্য সে-কয় দিন তাহারা দিনে দুইবার করিয়া ছুটি পাইবে। প্রত্যেক বারই ছুটির মাত্রা আধ ঘণ্টা। এই ছুটির জন্য তাহাদের দর্মাহা কাটা যাইবে না।

মালিকদের সাজা

অন্যান্য আইনের মতন রুমেনিয়ার মজুর-বিধিটার সঙ্গেও একটা সাজার ব্যবস্থা আছে। যদি কোনো মালিক তরুণ-মজুর নৈশ কাজ অথবা জননী-মজুর সম্পর্কিত নিয়ম-গুলা মানিয়া না চলে তাহা হইলে প্রথম অপরাধের জন্য সাজা ১০০০ হইতে ৫০০০ লেই। পরবর্ত্তী অপরাধের সাজা ৫০০০ হইতে ২০,০০০ লেই। ১০০০ লেইয়ের দাম আজকাল প্রায় ১৫।১৬ টাকা।

রবারের বাজার

১৯২৬ সনে রবারের সবচাইতে বড় খরিদ্দার মোটরের দেশ যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৩৬৮০০০ টন রবার খরিদ করে ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৩৮৬,০০০ টন। এক বৎসরে ১৮ হাজার টন কমিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য দেশে রবার বেশী বিক্রয় হয়। ফলে পূর্ব্ব বৎসরের চাইতে ঐ বৎসরে মাত্র ৪ হাজার টন রবারের কাটতি কম পড়ে। ১৯২৬ সনে পুরাতন মাল হইতে বিশ হাজার টন রবার ফিরাইয়া পাওয়া যায়। ইহার ১৫,০০০ টনের ক্রেতা ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ওস্তাদেরা বলিতেছেন,—১৯২৭ সনে ৬০৭,০০০ টন রবার কাটতি হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্র টায়ারের জন্য বেশী রবার ক্রয় করিবে বলিয়া মনে হয়। দুনিয়ার অন্যান্য দেশ রবার ক্রয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় না আসিলেও ঐ সমস্ত দেশে রবারের কাটতি বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রেট বৃটেনে গত বৎসরের চাইতে শতকরা ৪০ ভাগ কাটতি বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই বৎসরে ৫৭৭,০০০ টন রবার উৎপাদন করা হইবে। তাহা হইলে চাহিদার চাইতে ৩৩ হাজার টন কম উৎপন্ন হইবে। এই ঘাটতি মজুত মাল হইতে মিটান হইবে।

ইংরেজ সিনেমা কোম্পানী

বৃটিশ সিনেমা শিল্পের উন্নতিকল্পে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে বৃটিশ ইনকর্পোরেটেড পিকচার্স নাম দিয়া একটি কোম্পানীর পত্তন করা হইয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে ইহার শাখা খোলা হইবে। ভারত শাখা স্থাপনের ভার লইয়াছেন স্যার চিমনলাল শীতলভাদ।

ফরাসী সরকার ও দিয়াশলাই

ফরাসী সরকার আইন প্রণয়ন দ্বারা ফ্রান্সে দিয়াশলাই-শিল্প ফরাসীদের একচেটিয়া ভাবে রাখিবার আয়োজন করিতে-ছেন। এই ব্যবস্থার ফলে ম্যাচ তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত একটা খাস ফরাসী কোম্পানী খাড়া করা হইবে। ঐ কোম্পানীতে বিদেশী মূলধন শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী থাকিতে পারিবে না এবং বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্স সকলেই ফরাসী নিযুক্ত হইবেন কেবল স্কাণ্ডিনেভিয়ার একজন প্রতি-নিধি ইহার মধ্যে থাকিবেন।

জাপানী তাঁবে তূলার চাষ

জাপানের বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলিকে কাঁচা মালের জন্য বিদেশীর দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। এই অসুবিধা দূরকরণার্থ পেরু ও ব্রেজিলের জাপানী উপনিবেশসমূহে তূলা জন্মাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে তোকিওতে পেরুর কট কোম্পানী নামক একটি তূলা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কানাডা ফুচি কোং ব্রেজিলে তূলা উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবে।

পেরুর বাজারে মার্কিণ বনাম জার্ম্মাণী

পেরুতে জার্ম্মাণ কাপড় ও লোহালক্কড়ের জিনিষের

আমদানি বৃদ্ধি পাইতেছে। মোটরগাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির বেশী আমদানি হইতেছে। কিন্তু মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, টায়ার প্রভৃতি মোটর সাজসরঞ্জাম আমদানি যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই বেশীর ভাগ এখনও বর্ত্তমান আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মোটর ও সড়ক

যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাড়ীর চলন খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানকার বড় বড় সহরে যান-বাহন-সমস্যা প্রবলাকারে দেখা দিয়াছে। ইহার জন্য অনেক সহরে পুরাতন রাজপথ প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত ও নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য প্রভূত অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অনেক সহর ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িতে হইবে।

বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তাঘাটে ২,২০,০০,০০০ মোটর গাড়ী চলিতেছে। ১৯২৬ সনে আরও ৪৫ লক্ষ গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯২৬ সনে ২৫ হাজার মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

রুশিয়ায় চায়ের বাজার

গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত লণ্ডন সহরের "রাশিয়ান টি ট্রাষ্ট" নামক প্রতিষ্ঠানটি রাশিয়ান চায়ের জোগান দিত। অন্যান্য পণ্য-সম্ভারের মত চাও সোভিয়েট গণতন্ত্র-কর্তৃক খাস সরকারী তত্ত্বাবধানে খরিদ করা হয়। যাহা হউক ঐ কোম্পানীটি কোন কারণবশতঃ উঠিয়া যায়। বর্ত্তমানে সেন্ট্রোসোজু নামক একটি রুশ সমবায় প্রতিষ্ঠান রুশের চা সরবরাহ করিয়া থাকে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ইংল্যণ্ডে অবস্থিত।

যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়ার লোক বৎসরে ১৫ কোটি পাউণ্ড চা পান করিত। ইহার ৭ কোটি পাউণ্ড চীন দেশ হইতে ও অবশিষ্ট শতকরা ৩০ ভাগ কলিকাতা, কলম্বো ও বাতাভিয়া হইতে আমদানি হইত। ১৯২৪-২৫ সনে রুশিয়া লণ্ডন হইতে ১২০ লক্ষ পাউণ্ড আমদানি করে এবং ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সরাসরি কলিকাতা হইতে আনয়ন করে। রুশিয়ায় চা-খোরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চা রুশিয়ার লোকে ক্রয় করিবে।

জুগোশ্লাভিয়ার মজুর-জীবন

বল্কান অঞ্চলের জুগোশ্লাভিয়া দেশ খনি-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী। এখানকার বস্‌নিয়া প্রদেশের সরকারী খনিওয়ালাদের সঙ্গে খনির কুলীদের একটা সমঝোতা কায়েম হইয়াছে। সমঝোতাটাকে আইনে বিধিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

আটঘণ্টার রোজ অবশ্য প্রথম কথা। যে-যে কাজে মেহনৎ অতি-বেশী অথবা স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর টান বেশী পড়িবার কথা, সেই সকল কাজের মজুরেরা রোজ ছয় ঘণ্টা, এমন কি চার ঘণ্টা মাত্র কাজ করিবে।

ইহুদি ও মুসলমানদের ছুটীর নিয়ম

ফী সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা পুরাপুরি ছুটী থাকা চাই-ই চাই। এই ৩৬ ঘণ্টার ভিতর রবিবারের চব্বিশ ঘণ্টা গুনিতে হইবে খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য। বস্‌নিয়া প্রদেশ সাবেক কালে তুর্কীর অধীন ছিল। ঐ মুল্লুকে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা কম নয়। সুতরাং মুসলমান মজুরদের জন্য রবিবারের বদলে অন্য কোনো দিনের চব্বিশ ঘণ্টা ছুটী ধরা হইয়াছে। ইহুদিদের জন্যও একটা স্বতন্ত্র চব্বিশ ঘণ্টার ছুটী ধার্য্য করা হইয়াছে। মুসলমানরা আর ইহুদিরা রবিবার পুরা রোজ কাজ করিতে অধিকারী। আর সেই কাজের জন্য তাহাদিগকে নিয়মিত মজুরিও দিতে হইবে।

অতিরিক্ত কাজে ছুটী ও মজুরি

এমন অনেক কাজ আছে যেখানে মজুরদের অনবরত মেহনৎ করিতে হয়। সেই সকল কাজের বেলায় মজুরেরা প্রত্যেক দুই সপ্তাহে একবার করিয়া পুরা চব্বিশ ঘণ্টা ছুটী ভোগ করিবে।

আট ঘণ্টার রোজের চাইতে কোনো দিন কোন মজুর যদি বেশী সময় কাজ করে তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত সময়ের জন্য ঘণ্টা প্রতি দেড়া মজুরি পাইবে। খ্রীষ্টিয়ানরা রবিবারের জন্য অতিরিক্ত কাজ করিলে দেড়া মজুরিই পাইতে অধিকারী।

ভিত্-মজুরির উপর নানা দফা

মজুরি নির্দ্ধারণের নিয়ম নিম্নরূপ। প্রথমেই একটা সার্ব্বজনিক সর্ব্বনিম্ন হার ঠিক করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেকেই এই হারে মজুরি পায়। এইটাকে "ভিত্-মজুরি" বলা চলে। তাহার উপর প্রত্যেককেই চার দফায় চার প্রকার মজুরি দেওয়া হয়। (১) খাইখরচ বাবদ মজুরেরা পায় ভিত্-মজুরির ডবল। (২) মজুরেরা বিনা ভাড়ায় ঘরবাড়ী ও (কোনো ক্ষেত্রে) (৩) গৃহস্থালীর জন্য বিনা পয়সায় প্রত্যেক মজুরই কয়লা পাইয়া থাকে। (৪) সংসারের কাজে যে সব জিনিষপত্র লাগে মজুরেরা বাজার-দরের চেয়ে কিছু সস্তায় সেই সব কিনিতে পারে। এইজন্য বিশেষ কতকগুলা সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমিতি আছে।

বার্ষিক দক্ষিণা

ফী বৎসরই হিসাব-নিকাশের সময় প্রত্যেক মজুরগণ খনির কর্ত্তাদের নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা পাইতে অধিকারী। কোন্ মজুর কত বৎসর কাজ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে দক্ষিণার হার। যে সকল মজুর ১০ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহারা পায় ৬০ দিনার। যাহারা ২০ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদের বার্ষিক দক্ষিণা ১০০ দিনার। আজকাল ভারতের এক টাকায় প্রায় ২০ দিনার।

ছুটীর সময় অন্যকাজ নিষিদ্ধ

সরকারী খনিতে যে সকল মজুরেরা কাজ করে তাহারা বৎসরে কয়েক দিন পুরা ছুটী ভোগ করিতে অধিকারী। ছুটীর দিনও তাহারা পুরা বেতন পাইবে। যাহারা কম সে কম ৫ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ৪ দিন, আর যাহারা ২০ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ১২ দিন ছুটী দিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু এই ছুটীর সময় মজুরেরা যদি অন্য কোথাও মাহিয়ানা লইয়া কাজ করিতে যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে আর ছুটী দেওয়া হইবে না।

মজুর-সঙ্ঘ ও বণিক-সঙ্ঘ

মজুর-সঙ্ঘের সঙ্গে একত্রে আলোচনা না করিয়া সরকারী খনিওয়ালারা মজুর-জীবন-সম্পর্কিত কোনো ব্যবস্থায় হাত দিবেন না এইরূপ চুক্তি হইয়াছে। কোনো বিরোধ উপস্থিত হইলে খনি-সম্পর্কিত শাসন-বিভাগ তাহার বিচার করিবে। অথবা বণিক-সঙ্ঘের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মীমাংসা করা হইবে।

লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণে ৮৮ কোটি টাকা

১৯২৫-২৬ এই দুই বৎসরে জার্ম্মাণির নিকট হইতে লড়াইয়ের "রেপারেশ্যন" বা ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্রশক্তিপুঞ্জ ১,১৭৬ মিলিয়ন মার্ক পাইয়াছে। আমাদের হিসাবে বুঝিতে হইবে ৮৮ কোটি ২০ লাখ টাকা। এই পরিমাণের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ,—৪১৫·৬ মিলিয়ন মার্ক জার্ম্মাণিকে দিতে হইয়াছে নগদ বিদেশী সিক্কায়। মালের আকারে জার্ম্মাণি এই সকল শক্তিকে দিয়াছে ৬৫৫ মিলিয়ন মার্ক (= ৪৯ কোটি ২০ লাখ টাকা)।

৪৯ কোটি টাকার জার্ম্মাণ রপ্তানি

মাল বাবদ জার্ম্মাণি ৪৯·২০ লাখ টাকা দিয়াছে এই কথাটার মানে কি? ডয়েস সাহেবের পরিচালিত ক্ষতিপূরণের মোসাবিদা অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণির শত্রুরা এই পরিমাণ টাকার মাল জার্ম্মাণির নিকট হইতে খরিদ করিয়াছে। জার্ম্মাণ বেপারীরা এই সকল দেশের বেপারীদের নিকট এই দামের মাল বেচিয়াছে। অর্থাৎ এই দেনা-পাওনাটা পুরাপুরি বাণিজ্যিক লেনদেন মাত্র। ইহার ভিতর বিনা পয়সায় জার্ম্মাণির নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া বড় মানুষ হইবার কোনো ব্যবস্থা নাই। জার্ম্মাণির কারখানাগুলাও এই সকল দেশে নিয়মিতরূপে মাল বেচিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহাতে জার্ম্মাণ শিল্পের বিস্তৃতি আর জার্ম্মাণ রপ্তানির প্রসার-বৃদ্ধি ঘটিতেছে। উনপঞ্চাশ কোটি টাকার মাল রপ্তানির জন্য, জার্ম্মাণরা নিশ্চিন্তে বাজার পাইয়াছে।

"মিত্র"-দেশে জার্ম্মাণ বাজার

"মিত্র-শক্তিপুঞ্জ" অর্থাৎ জার্ম্মাণির শত্রুরা এই উনপঞ্চাশ কোটি টাকার অর্ডার দিয়া জার্ম্মাণিকে লাভবান ই করিয়া তুলিয়াছে। শিল্প-বাণিজ্যের নানা বিভাগে জার্ম্মাণির কর্ম্মতৎপরতা আর কর্ম্মক্ষমতা বজায় আছে।

জার্ম্মাণির নিকট হইতে কোন্ দেশ কত মূল্যের কোন্ কোন্ জিনিস খরিদ করিয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

	দেশ ...	মাল ...	মার্ক (মিলিয়নে)
১।	ফ্রান্স	রাসায়নিক সার, নাইট্রেট ইত্যাদি ...	৯৯
২।	বেলজিয়াম	„ ...	৩·৬
৩।	ফ্রান্স	গাড়ী ও জাহাজ ...	৪৬
৪।	বেলজিয়াম	„ ...	৫
৫।	ফ্রান্স	সেলুলজ, কাগজ, বই ও পত্রিকা ...	৪০
৬।	বেলজিয়াম	„ ...	৬
৭।	ফ্রান্স	যন্ত্রপাতি ও এঞ্জিন ইত্যাদি	২৬·৬
৮।	বেলজিয়াম	„ ...	৮·৩
৯।	ফ্রান্স	মামুলি ধাতু ও ধাতুজ দ্রব্য ...	১৭.৫
১০।	বেলজিয়াম	„ ...	৮.৭
১১।	ফ্রান্স	রেল-স্লাপার, টেলিগ্রাফের থাম্বা, যন্ত্রবদ্ধ কাঠ ...	৩১
১১।	বেলজিয়াম	„ ...	৯
১৩।	ফ্রান্স	কৃষিজাত দ্রব্য, তামাক, চিনি, জানোআর ইত্যাদি ...	৪২
১৪।	„	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ...	১
১৫।	বেলজিয়াম	„ „ ...	৫
১৬।	ইতালি	„ ...	৪·৯
১৭।	জাপান	„ ...	১·৫
১৮।	রুমেনিয়া	„ ...	১·২
১৯।	গ্রীস	কাঠের ঘরবাড়ী ...	৯·৫

বুঝিতে হইবে যে, কি রাসায়নিক, কি বৈদ্যুতিক কারবার, কি কৃষিকর্ম্ম, কি বন-সম্পদ্, সকল বিভাগেই জার্ম্মাণির শিল্প জোরের সহিত চলিতেছে।

রুশিয়ার ক্রমিক উন্নতি

রুশিয়ার মাল বিদেশে রপ্তানি হইতেছে মন্দ নয়। কিন্তু এখনো প্রাক-যুদ্ধ যুগের শতকরা ৮৬·৪ অংশ মাত্র জমিতে আবাদ চলিতেছে। কাজেই ফসল-রপ্তানির বৃদ্ধি আস্তে আস্তে চলিতেছে। অপর দিকে রুশ গবর্মেণ্ট বিদেশী মাল কিনিতেছে প্রায় নগদা-নগদি। বিলাতের ল্যাঙ্কাশিয়ারে রুশিয়ার অর্ডার ছিল তাঁত যন্ত্র সম্বন্ধে। রুশিয়া মালগুলা পাইবামাত্রই দাম সমঝাইয়া দিতে পারিয়াছে।

ইতালিতে বিলাতী কয়লা

ধর্ম্মঘটের সময় বিলাতী কয়লার আমদানি স্থগিত ছিল। তাহাতে ইতালিয়ান কারখানাগুলার ক্ষতি হইয়াছে বিস্তর। বর্ত্তমানে বিলাতী কয়লা আসিতেছে নিয়মিতরূপে। দাম এখন চড়া। এদিকে ইতালিয়ান ক্রেতারা প্রাক্-ধর্ম্মঘট দামের চেয়ে বেশী-কিছু দিতে রাজি নয়। কাজেই ইংরেজে-ইতালিয়ানে বচসা চলিতেছে। বুঝিতে হইবে রুশিয়ার অবস্থা সচ্ছলই বটে। তবে চাষ-আবাদ এখনো "মান্ধাতার আমলের" অবস্থায় রহিয়াছে অনেকটা। বাজারে ফসল ফেলিবার সুযোগ সুবিধা খুবই কম। এই সবদিকে উন্নতি হইলে রুশ গবর্মেণ্ট বিদেশে মাল বেচিতে পারিবে বেশী বেশী। কাজেই বিদেশী মাল কিনিবার ক্ষমতাও বাড়িতে থাকিবে। জার্ম্মাণরা ধীরে ধীরে রুশ বাজার দখল করিয়া বসিতেছে। মোজা, গেঞ্জি—রেশমী ও সূতী—দুইদিকেই রুশিয়ার জার্ম্মাণ বাজার বাড়িতেছে।

সুইডেনের লোহা-সঙ্ঘ

বিলাতী ধর্ম্মঘটের অবসান হওয়ায় সুইডেনের আর্থিক জীবনেও সুবাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। কয়লার অভাব ঘুচিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহার কারখানা-

গুলাও হাঁপ ছাড়িয়াছে। চারটা বড় বড় লোহার কারখানা সঙ্ঘ-বদ্ধ হইল। বর্ত্তমান দুনিয়া ট্রাষ্ট-কার্টেলের দুনিয়া।

রাসায়নিক কারবারের বিলাতী সঙ্ঘ

বিলাতে সম্প্রতি "ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ" (সাম্রাজ্যিক রসায়ন-শিল্প) নামে এক বিপুল সঙ্ঘ কায়েম হইয়াছে। এই সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা ৪। ইহাদের প্রত্যেকেই আবার বহুসংখ্যক কারবারের সঙ্ঘ। সুতরাং "ইম্পীরিয়াল"টা সঙ্ঘের সঙ্ঘ। যে চারটা রাসায়নিক কারবার সঙ্ঘবদ্ধ হইল তাহাদের নাম :—(১) ব্রন্নার মণ্ড অ্যাণ্ড কোং, (২) নোবেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, (৩) বৃটিশ ডাইষ্টাফ্‌স্ কর্পোরেশন, (৪) ইউনাইটেড আলকালি কোং। মহাসঙ্ঘের মূল পুঁজি হইল ৬৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। অংশীর সংখ্যা ৮২,৬৮০,০০০। এই বিপুল কারখানার পরিচালক তের জন। তাঁহাদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব লাট রেডিং।

ইতালিতে বিদেশী মোসাফির

বিদেশীরা ইতালিতে পর্য্যটন করিতে আসে ফী বৎসর লাখে লাখে। বিদেশী মোসাফিরদের চলা-ফেরায় ইতালিয়ানরা বিস্তর টাকা রোজগার করে। বস্তুতঃ পর্য্যটকদের খাওয়া-পরা, বিলাস বাবুগিরি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ইতালিয়ান নরনারীর অতি-বড় ব্যবসা। এই ব্যবসায় লাখ লাখ নরনারী অন্ন-সংস্থান করিতেছে। চাষ, কুটির-শিল্প, কারখানা ফ্যাকটরি, রেল, জাহাজ ইত্যাদি নানা বিভাগেই বিদেশী মোসাফিরদের নিকট হইতে ইতালির আয় প্রচুর।

নিম্নের তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিদেশী পর্য্যটকদের সংখ্যা দেওয়া হইতেছে :—

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৯১০	১৭৯,৪৭১	৩৩৮,৬৩৭	৭৮১,১২১
১৯২২	১৮৩,২৮৯	৩৮৮,৮৪৯	৮৬৩,৫১৪
১৯২৩	২৩৪,৭৪৯	৪২৯,৩২৪	৮১০,৯৯৩
১৯২৪	২৭৪,৬৭১	৫৫৩,৮১৫	৮৫১,৪৯২
১৯২৫	৩২৯,৬৯১	৭০৫,৭৩১	১,০৭৭,৪৭২

১৯২৫ সন ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানদের তীর্থ-বর্ষ। বিপুল "কুম্ভ-মেলা" গোছের কাণ্ড। মোসাফিরির খরচ গড়পড়তা দৈনিক ১৭৫ লিয়ার (১৯২৩ সনে)। বিলাতী টাকায় ইহার অর্থ ১ পাউণ্ড ১৫ শি। ১৯২৫ সনে গড় ২০০ লিয়ার (১ পাউণ্ড ১৩ শি ৬ পে)।

মোটর জাহাজ বনাম বাষ্প-জাহাজ

মোটরে জাহাজ চালানো শিল্প-জগতের এক নতুন ঘটনা। কিন্তু এই নতুন দিকে সৃষ্টি বাড়িতেছে অবিরত ভাবে। ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাসে দুনিয়ায় ছিল ২,৫৮০ খানা মোটর জাহাজ। "ওজনে" তাহাদের পরিমাণ ৩,৪৫৫,০০০ টন।

দেশ	জাহাজ-সংখ্যা	টন—"ওজন"
ইংল্যাণ্ড	৫২৪	১,০৬৫,২১৮
নরওয়ে	২৬৩	৫০২,৬০৮
সুইডেন	২১০	৩১১,১১২
জার্ম্মাণি	২৪৬	৩০৮,৪০৪
যুক্তরাষ্ট্র	৩১৯	২৯২,৩৯৩
ডেনমার্ক	১১৭	২১৩,৪১৪
ইতালি	১১৭	২০৪,০৫২
হল্যাণ্ড	১৭২	১৬৪,৬৩২

একশ' টনের কম যে সবের ওজন সে সব ধরা হয় নাই।

এই গেল জাহাজ-শিল্পে নবীনতম আবিষ্কারের হিসাব। "সেকেলে" অর্থাৎ বাষ্প-চালিত জাহাজের টন-"ওজন" ১৯২৬ সনের অক্টোবরে মোটর জাহাজের প্রায় ১৮ গুণ,—৫৭,৩৮৩,০০০ টন ;—যথা—

দেশ	জাহাজ-সংখ্যা	টন
ইংল্যাণ্ড	৯,০৩৯	২০,৬১২,৪৮৭
যুক্তরাষ্ট্র	৩,৪২২	১১ ৮৮০,৭৪৭
জাপান	১,৯৭২	৩,৯৪৮,৫৭১
ফ্রান্স	১,৫০৭	৩,২৬০,৪৫০
ইতালি	১,০৯৩	২,৯৪৭,৭৪১
জার্ম্মাণি	১,৭২৪	২,৭১১,৮৬৪
হল্যাণ্ড	৯২০	২,৩৯৬,৪৯৮
নরওয়ে	১,৫৪৩	২,২৭৯,২২৫
স্পেন	৭৪৫	১,১১৮,৫৬৭
সুইডেন	১,০১১	১,০১৪,৫২৪

আমরা আদার বেপারী। জাহাজের খবর রাখিয়া লাভ নাই! মনে রাখা উচিত যে বর্ত্তমান জগতের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অবস্থা এইরূপ। কাজেই খবরাখবর রাখাটা নেহাৎ আহাম্মুকি নয়।



ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বৈশ্যসাহাসমাজে বিবাহ-সংস্কার

বৈশ্যসাহা জাতি বাঙ্গালাদেশে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে। এই জাতি শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু। ইহারা অন্যান্য বর্ণ যথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি জাতির নিকট ভাল ব্যবহার পায় না, কারণ অন্যান্য বর্ণ এতদিন বিশ্বাস করিত না যে, ইহারা বৈশ্যবংশসম্ভূত। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় উচ্চমনা শিক্ষিত ব্যক্তি ও নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহারা যে বৈশ্যবংশসম্ভূত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও আমাদের সমাজে ২।৪ জন শিক্ষিত লোক, গভর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মচারী ও উকিল, চিকিৎসক প্রভৃতি আছেন তথাপি অশিক্ষিতের তুলনায় তাঁহারা শতাংশের এককাংশও নহেন। আমাদের সমাজদেহে নানা প্রকার কুসংস্কার বর্ত্তমান। যদি জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হয় ও মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হয় তবে আমাদিগকে সামাজিক কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হইবে ও সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। শিক্ষার বিস্তার না হইলে সামাজিক কুসংস্কার দূর হইতে পারে না। সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে প্রথমতঃ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এই ধারণা জন্মাইতে হইবে যে, আমাদিগকে মানুষ হইতে হইলে আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, কারণ সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে কোনও প্রকার সামাজিক স্থায়ী উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। সেই কারণে বঙ্গের বিভিন্ন বৈশ্যসাহা জাতির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই মিলন সম্ভব হয় এক বিবাহের দ্বারা। বিভিন্ন সমাজে বিবাহের আদান প্রদান চলিলে বিভিন্ন সমাজের নানাপ্রকার লোকের সহিত ভাবের আদানপ্রদান হয়, তাহাতে সামাজিক উন্নতির সাহায্য হয়। এই উদ্দেশ্যে ঢাকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র দাস ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রকুমার সাহা এম, এ প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে অবাধ-বিবাহ-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সকল দেশেই, সকল সমাজেই যুবকগণ জাতির মেরুদণ্ড, আশাভরসা। যুবকগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করে তবে সামাজিক উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। তজ্জন্য আমরা স্বজাতীয় যুবকগণকে আহ্বান করিতেছি। অচিরেই তাঁহারা যেন সারা দেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইতে যত্নবান হন। যদি 'অবাধ বিবাহ সমিতি' হইতে কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, সহকারী সম্পাদক, বৈশ্যসাহা সুহৃদ, কোহিনুর প্রেস, চট্টগ্রাম অথবা শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রকুমার সাহা, এম, এ, সম্পাদক, অবাধ-বিবাহ সমিতি, ১৪নং যোগীনগর, উয়ারী ঢাকা ঠিকানায় পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন। পত্র সাদরে গ্রহণ করা হয় ও বিশেষ যত্নের সহিত উত্তর দেওয়া হয়।

অবাধ-বিবাহ-সমিতির পক্ষ হইতে
নিবেদক—শ্রীকিরণচন্দ্র সাহা বি, এ
বিনোদপুর (ফরিদপুর)

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়

সার্কুলার রোডের উপরস্থ মূকবধির বিদ্যালয়গৃহে গতকল্য বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা হইয়া গিয়াছে। সন্তোষের রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় বিস্তর জনসমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মাননীয় মিঃ জে, ডোনাল্ড, চাঁচলের রাজা বাহাদুর, নসীপুরের রাজা বাহাদুর, মিঃ ওয়াটসন, রায় ডাঃ

চুনীলাল বসু বাহাদুর, রায় বাহাদুর পি, এন, মুখাজ্জী, মিঃ আর, ডি, মেটা, মিঃ জে, সি, দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। স্কুলের সেক্রেটারী রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত বার্ষিক বিবরণ পাঠ প্রসঙ্গে জানান যে, এবার স্কুলে ১০৮ জন ছাত্র আছে; ৬৬ জন ছাত্রাশ্রমে বাস করিতেছে, ইহাদের ৮জন বালিকা। শ্রমশিল্প বিভাগে সারা বৎসরই কাজ চলিয়াছে এবং উহার ফলও অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে। বার্ষিক বিবরণী পাঠ করার পর রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত জানান যে, চাঁচলের (মালদহ) রাজা স্কুলের সাধারণ অর্থভাণ্ডারে একলক্ষ টাকা ও স্কুল ফণ্ডে ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন—এই সংবাদে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হয়।

স্কুলের মূক-বধির ছাত্রগণের দ্বারা সুন্দর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং মূক-বধির ছাত্রগণ রামায়ণের নির্ব্বাক অভিনয় প্রদর্শন করে।

সন্তোষের রাজা ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে বলেন যে, মূক-বধিরদিগের শিক্ষা একটী অত্যাশ্চর্য্য জিনিস এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অদ্ভুত সাফল্য। মূক-বধিরদিগকে এইরূপে শিক্ষাদান করিয়া সমাজে তাহাদিগকে আসনদান করার জন্য রাজা স্কুলের শিক্ষকদিগকে ধন্যবাদ দান করেন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদানন্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বাস বনাম ট্রাম

কয়েকদিন পূর্ব্বে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটী নূতন বাস-কোম্পানী সংগঠনের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা দেশবাসীর যতখানি ঔৎসুক্য উদ্দীপিত করা উচিত ছিল তাহা করে নাই। ট্রামের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলিকাতার রাজপথে যেদিন প্রথম দেশীয় কোম্পানীর বাস চলিতে আরম্ভ করিল সেদিন বোধ করি কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এত অত্যল্পকালের মধ্যে উক্ত বাসের সংখ্যা এমন বাড়িয়া উঠিবে যে, ট্রামওয়ে কোম্পানীর মত অর্থশালী ব্যবসায়ীরাও রীতিমত ঘায়েল হইয়া শিশু দেশীয় বাস-কোম্পানীদের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।

দেশীয় বাস কোম্পানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া ইতিমধ্যেই ট্রাম কোম্পানীকে ভাড়ার হার কমাইতে হইয়াছে। অথচ একদিন এই ভাড়া-হ্রাসের জন্য কলিকাতার অধিবাসীরা কত অনুরোধই না তাঁহাদের জানাইয়াছিল। বিদেশী কর্ত্তাদের তখন টনক নড়ে নাই। এখন লাঙ্গুলে পদার্পণ হওয়াতেই বেচারী ট্রামযাত্রীর জন্য মহাপ্রভুদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। নয়ন মন ভুলাইবার জন্য গাড়ীর নূতন রং হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে আসনগুলি শীঘ্রই কুশনযুক্ত করিবার আয়োজন হইতেছে। জানি না কর্ত্তারা ভবিষ্যতে আরো কত সুখের ব্যবস্থা করিবেন।

ট্রাম কোম্পানী পূর্ব্বেই কলিকাতার রাস্তায় বাস নামাইয়াছিলেন। এখন শুনিতেছি তাঁহারা নূতন কোম্পানী সংগঠন করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বাস চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। একদিকে প্রভূত অর্থশালী ট্রামওয়ে কোম্পানী, অপর দিকে সম্বলশূন্য দেশীয় বাসের স্বত্বাধিকারী। এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল কি হইবে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিবার কোনরূপ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

আজ আমাদের দেশীয় বাস কোম্পানীদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য—অচিরে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। কলিকাতার রাস্তায় দেশীয় কোম্পানীর প্রায় চারিশত বাস চলিতেছে। এই সকল বাসের স্বত্বাধিকারীরা যদি অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান হন, তাহা হইলে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। নতুবা সহায়হীন একক বাস কোম্পানীকে গলা টিপিয়া মারা কিছু শক্ত কাজ নয়। দেশীয় বাস কোম্পানীদের একটি এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপ আমাদের জানা নাই। যদি এই এসোসিয়েশনকে সুদৃঢ়ভাবে গঠন করা যায় তাহা হইলে অযথা কালবিলম্ব না করিয়া তাহাই করা কর্ত্তব্য। আমরা চাই দেশীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়া দেশের অর্থে দেশবাসীকে প্রতিপালন করুন। আমাদের ত্রুটীতে সে অর্থ যেন বিদেশী লুটিয়া লইয়া যাইতে না পারে। (আত্মশক্তি)

বৃহত্তর ভারত পরিষদ্

সম্প্রতি বৃহত্তর ভারত পরিষদের এক সভার অধিবেশনে মিঃ জে, এম, সেন—স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় প্রস্তাব করেন যে,—সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক কর্ম্মচারীদের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হউক। প্রফেসর এম, এম, বসু এই প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। ডাঃ কালিদাস নাগ সমিতির অনারারী সেক্রেটারী মহোদয় সমিতির ৬ মাসের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু গণ্যমান্য মানী ও গুণী সমিতির আদর্শ ও কার্য্য-শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। লর্ড সিংহ, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির ন্যায় লোকও সমিতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক হইয়াছেন। পিথাপুরামের রাজা অনুগ্রহপূর্ব্বক বৃহত্তর ভারত পরিষদকে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষসাধনের জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য বৃহত্তর ভারত পরিষদ্ চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

ভারতের বহু সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমিতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমিতির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং ফরাসী প্রত্ন-বিদ্যা বিদ্যালয় ইহার এসোসিয়েট মেম্বার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। এই সমিতির কার্য্যশক্তির বিস্তৃতি সাধারণের সহানুভূতির উপরই নির্ভর করে। প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কীয় কাগজপত্র, বুলেটিন, পুস্তিকা প্রভৃতি সমিতি প্রস্তুত করিতেছেন। সমিতির সেক্রেটারী জনসাধারণের নিকট স্থায়ী প্রচার-ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেন। ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখার্জ্জী—বাঙ্গালার সহঃ একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল অর্থকমিটির পক্ষ হইতে একখানি পরিকল্পনা দাখিল করেন এবং টাকা উঠাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করেন।

মিঃ অশোক চাটার্জ্জী বি, এ (ক্যাণ্টাব) অর্থ-কমিটির সদস্য পরিকল্পনা উত্থাপন করিয়া সমিতির সমর্থক ও পৃষ্ঠ-পোষকদিগকে একটি রিজার্ভ ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া সমিতির আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে অনুরোধ করেন। প্রফেসার বিনয়কুমার সরকার প্রস্তাব করেন যে, এশিয়ার প্রচলিত ভাষাসমূহ—বিশেষতঃ চীনা ও জাপানী ভাষা শিক্ষা দানের জন্য কিছু অর্থ ব্যবস্থা করা দরকার। শ্রীযুত সরকার বলেন, যদি আমরা এশিয়ার প্রতিবেশী জাতিসমূহের সহিত আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, তাহা হইলে ভারতীয় ছাত্র ও গুণি-গণের আধুনিক ভাষাসমূহের অন্ততঃ একটি ভাষা জানিয়া রাখা দরকার। শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন বৃহত্তর ভারত পরিষদের একখানি মূল্যবান গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

নারী-শিক্ষা সমিতি

গত ১৯শে মার্চ্চ শনিবার নারী-শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে এক মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী হয়। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনী তিন দিন খোলা ছিল। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, হাওড়া, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে শিল্পদ্রব্য আসিয়াছিল। এই তিন দিন প্রায় দুই হাজার দর্শক এই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। শনিবারদিন স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। রবিবার দিন শুধু মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ দিন বহু বনিয়াদী ঘরের মহিলারা প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। সোমবার দিনও মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই দুইদিন সন্ধ্যাকালে জন-সমাগম এত বেশী হইয়াছিল যে, রবিবার দিন সাড়ে ছয়টা এবং পরদিন সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা রাখিতে হইয়াছিল।

বহুবিধ পণ্যসম্ভারে প্রদর্শনী-ক্ষেত্র রীতিমত একটি মেলায় পরিণত হইয়াছিল।

কুমারী চারুলতা সেন প্রদর্শনী কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। প্রদর্শনীটি সফল করিবার জন্য কমিটি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা, বাণীভবনের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা, এবং মহিলা শিল্প-ভবনের কর্ত্তারা সমস্ত ব্যবস্থার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা এস, সি, রায়, শ্রীযুক্তা লীলা বসু, শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা গুহ, শ্রীযুক্তা পি, এন, দত্ত, শ্রীযুক্তা চারুবালা মিত্র, সেক্রেটারী মহোদয়াকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা ছাত্র

সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ আনন্দ সহকারে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছে।

শ্রীযুক্তা বি, এল, মিত্র, শ্রীযুক্তা শান্তা নাগ, কুমারী এস, ঘোষ, শ্রীযুক্তা চারুবালা মিত্র, শ্রীযুক্তা ডি, এম, বসু, শ্রীযুক্তা এম, এল, ব্যানার্জ্জী, শ্রীমতী ক্র্যাম্‌রিশ, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী পুরস্কার যোগ্য জিনিষ বাছাই করিয়াছিলেন।

যে সমস্ত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলা এই কঠিন কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন নারীশিক্ষা সমিতি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনে আর্থিক কথা

হাওড়াজেলার মাজু নামক গণ্ডগ্রামে এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন দিনাজপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁহার অভিভাষণে দেশের আর্থিক ও সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ছিল। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

যোগীন্দ্র বাবু বলিতেছেন :—দেশের কৃষক এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের কোথায় ব্যথা তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কংগ্রেস শক্তিশালী হইবে তখন যখন দেশের কৃষকগণ এবং কুলী মজুরগণ কংগ্রেসের পতাকা নিজেরা বহন করিবে। তাহাদের সুখদুঃখের ভাগী আমাদিগকে হইতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদাই তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা। হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলনক্ষেত্র এই সকল কাজের মধ্যে। হিন্দুমুসলমানের সুখের এবং দুঃখের কাহিনী একই। তাহাদের দুঃখের প্রতিকারও একই উপায়ে হইতে পারে। যে ব্যাধিতে পল্লী ধ্বংস করিতেছে তাহা হিন্দুমুসলমান বলিয়া কোনো ভেদ বুদ্ধি প্রয়োগ করে না। যে প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক-আইন দেশে জারি হইয়াছে তাহাতে হিন্দুমুসলমানের জন্য পৃথক বিধান করা হয় নাই। যে দণ্ডবিধি ইংরাজরাজ্যে প্রচলিত তাহাতে জাতিভেদের উল্লেখ নাই। পানীয় জলের অভাব হইলে তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সমান ভাবে বিপন্ন করে। বন্যার প্লাবন হিন্দু মুসলমান স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলকেই সমান ভাবে বিপর্য্যস্ত করে। এ সকল কথা সরল পল্লীবাসী বুঝে। তাহারা যদি তাহাদিগের প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মীর সন্ধান পায় তাহা হইলে দলে দলে তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইবে। তখন তাহারা বিচার করিবে না যে সে কর্ম্মী হিন্দু না মুসলমান, ব্রাহ্মণ না শূদ্র। এই পল্লীই কংগ্রেস-কর্ম্মীর প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। পল্লীবাসীর মধ্যে সত্যকার প্রীতির বন্ধন আছে। আজ আমরা যে সকল মারামারি কাটাকাটি এবং নানারূপ অত্যাচারের কাহিনী দেশের সর্ব্বত্র শুনিতেছি এবং প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা এদেশের হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত পরিচয় দেয় না। যেখানে কোনো গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে সেইখানেই অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, কোনো স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া কুমতির তাড়নায় পল্লীবাসী নিজ প্রতিবেশীর উপরে অত্যাচার করিয়াছে এবং সে অত্যাচারের ফলে আইনের ফাঁদে পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিতেছে। তাই আমার মনে হয় আজকার দিনে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের উপর গুরুতর দায়িত্বের ভার আসিয়াছে। তাহাদিগকে এই ভার বহন করিতে হইবে। যদি কংগ্রেসের কাজ দেশের মধ্যে চালান যায় তাহা হইলে পল্লীবাসীকে কংগ্রেসের গণ্ডির ভিতরে আনয়ন করা যাইতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক সকল বিরোধের অবসান হয়। আজ আপনাদিগকে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো চুক্তিপত্র করিয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করা বৃথা হইবে। তাহারা যখন বুঝিবে এই বিবাদে তাহাদের প্রকৃত স্বার্থের হানি হইতেছে তখনই তাহারা বিবাদ পরিত্যাগ করিবে।

বঙ্গে যৌবন-আন্দোলন

মাজুতে বঙ্গীয় যুবক-সম্মিলনের অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথমে যুবক সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল বটে, কিন্তু

তাহাতে বর্ত্তমান বাঙ্গালার বহু প্রয়োজনীয় সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, পণপ্রথা, নির্য্যাতিতা নারীকে সমাজে গ্রহণ বা বর্জ্জন, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা, বেকার-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা প্রভৃতি কোনো বিষয়ই তিনি বাদ দেন নাই। বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায়কে যে আজ জাতির সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, সে কথা পরবর্ত্তী বক্তৃগণও স্বীকার করিয়াছেন। শৈলেন্দ্রবাবুর যুক্তিগুলি যদি যুবকসমাজ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কাজ করিতে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শৈলেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার পর অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও শ্রীযুত শশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার যুবক-সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া নিম্নরূপ বলেন :—

"বক্তৃতা করা আমার ব্যবসা নহে। আমি কোনরূপ দলাদলিতে মিশিতে ইচ্ছা করি না। আমার মনে হয় দেশে বক্তৃতার অপেক্ষা কাজ অধিক হওয়া দরকার, সেই জন্য উহার বিপরীত ভাব দেখিলে আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস আমাদের কাজের পরিমাণ দিন দিন যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই অনুপাতে আমরা কাজ কম করিতেছি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা আজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমাদিগকে অনেক অধিক কাজ করিতে হইবে। নচেৎ শুধু বড় বড় মণ্ডপ ও বড় বড় বক্তৃতামঞ্চ নির্ম্মাণ করিলে দেশের কোন উপকার হইবে না।

"যুবক আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমি বার বার বাঙ্গালার যুবক-সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিয়াছি। আজ যাহারা জোয়ান—যাহাদের বয়স ১৮, ২০ বা ২২ বৎসর তাহারাই বাঙ্গালার প্রকৃত নেতা। আপনারা ইতিহাসে দেখিবেন—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঐ বয়সের ছেলেরাই বাঙ্গালা দেশকে চালাইয়াছিল,—১৯২০ খৃষ্টাব্দেও তাঁহারাই দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, আজও দেশে যেটুকু আন্দোলন আছে তাহা যুবক দলই চালাইতেছে। যুবক-সম্মিলনের পরে এই স্থানেই বৃদ্ধদিগের সম্মিলন হইবে—বৃদ্ধরা চিরদিনই তরুণ-সম্মিলনের আধ্যাত্মিক শক্তির পিছনে পিছনে যাইবে। আমি যেসকল কথা বলিলাম, সেগুলি আমার প্রাণের কথা। আমি কাহাকেও এই মত গ্রহণ করিতে বলি না। আমার মত আমি ভোটে চড়াইয়া পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী নহি।

"চিন্তা ও কার্য্য দু'য়ের ভারই চিরদিন সকল দেশে যুবক সম্প্রদায় মাথা পাতিয়া লইয়াছে। বৃদ্ধরা সর্ব্বত্র তরুণদিগের সঙ্গে গিয়াছে, ইহাই দুনিয়ার নিয়ম।"

তাহার পর বিনয়বাবু তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার পাঠের ভাবভঙ্গীতে সকলে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া একমনে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর কলিকাতার যাদুঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং কুমিল্লার শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার যুবক-সম্প্রদায়কে কতকগুলি উপদেশবাণী শুনাইয়াছিলেন। (বসুমতী)

নমঃশূদ্র মহিলা সম্মিলন

ফরিদপুর জেলায় কোটালীপাড়া থানার অন্তর্গত সোনাইলবাড়ী নামক স্থানে উত্তর কোটালীপাড়া হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিগত ১৯শে চৈত্র নমো-ব্রহ্মমিশন সোসাইটির উদ্যোগে "উত্তর কোটালীপাড়া নারী-মঙ্গল সমিতির এক বিরাট সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনে প্রায় পাঁচশত নমঃশূদ্র মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে আগত নমোব্রহ্মমিশন সোসাইটির সভাপতি ও বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর কর্ম্মী শ্রীযুত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উত্তর কোটালীপাড়া হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণের চেষ্টায় স্বেচ্ছাসেবিকার দল সুগঠিত হইয়াছিল।

নমঃশূদ্র সমাজে নারী-জাগরণের এই দৃশ্য বাস্তবিকই এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবী, শ্রীযুক্তা ফুলবালা বারিক, শ্রীযুক্তা বিধুমুখী বিশ্বাস, শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী হালদার প্রভৃতি মহিলাগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু প্রস্তাব উপস্থিত হয় ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মহিলাগণের সকলেরই মনোভাব এই যে, এতকাল পুরুষগণ শিক্ষায় দীক্ষায় তাঁহাদিগকে পুরুষের সমকক্ষ করিতে পারেন নাই। ইহার ফল-ভোগ সকলেরই করিতে হইতেছে। এখন নারীগণকে নিজেরাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

উত্তর কোটালীপাড়া হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়টিকেই এখন আমাদের এই অঞ্চলের নারী-জাগরণ-আন্দোলনের কেন্দ্র করিতে হইবে। এই স্কুলে ট্রেনিং ক্লাস, শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা সব বজায় রাখিতে হইবে। প্রায় দুইশত মহিলা মুষ্টিভিক্ষা দিতে স্বীকৃত হন।

সন্ধ্যায় সভাপতি মহাশয় শিশুমঙ্গল, নারীমঙ্গল এবং নারীর বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতীকার বিষয়ে ছায়াচিত্র-সাহায্যে অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। মহিলাগণ নীরবে অতি আগ্রহের সহিত রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা শুনেন। ইহার পর প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবী নারীগণের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগণেশচন্দ্র বিশ্বাস

সম্পাদক—নমোব্রহ্ম মিশন সোসাইটি

ভিয়েনার ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক হবীজার

পঁচাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করা উপলক্ষ্যে ভিয়েনার ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক হবীজারকে অভিনন্দিত করা হয়। সেই অভিনন্দনের স্মারকরূপে গত বৎসর একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আরও দুই তিনখানা গ্রন্থ বাহির করা হইবে। সম্পাদক-সঙ্ঘে আছেন তিন জন। হবীজারের পদে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি বাহাল হইয়াছেন তিনি এই তিনের একজন। তাঁহার নাম হান্স্ মায়ার। অষ্ট্রিয়ার সরকারী ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাইশ আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফেট্টার মায়ারের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতেছেন। মার্কিণ মুলুক হইতে ১৩ জন ধনবিজ্ঞান-সেবী হবীজার-স্মারক গ্রন্থাবলীতে প্রবন্ধ দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নামজাদা ও প্রবীণ। ভিসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলি ও কমন্স্, হার্ভার্ডের কার্ভার, জন্স্ হপ্‌কিন্সের কেম্মারার, কলাম্বিয়ার সেলিগ্‌ম্যান, জন বেট্স ক্লার্ক আর তস্য পুত্র জন মরিস ক্লার্ক ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ভারতে অপরিচিত নন। কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে এই স্মারক-গ্রন্থাবলী বাহির হইতেছে তাঁহার নাম ও কাম সম্বন্ধে বোধ হয় ভারতে বেশী-কিছু জানা নাই। ধনবিজ্ঞানবিদ্যার পঠন-পাঠন আমাদের দেশে কত নীচুদরের জিনিষ তাহার অন্যতম প্রমাণ এই।

হবীজারের মতামত ইংরেজি ধনসাহিত্যে প্রচারিত করেন স্কটল্যাণ্ডের পণ্ডিত স্মার্ট। ধনবিজ্ঞানে অষ্ট্রিয়ান চিন্তা বলিলে যাহা বুঝা যায়, হবীজার তাহারই অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। "মার্জিন্যাল ইউটিলিটি" অর্থাৎ কাজকর্ম্মের সীমান্ত-সুখ আর সীমান্ত-দুঃখ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এই অষ্ট্রিয়ান গবেষণা-প্রণালীর মোটা কথা।

সমাজ-শাস্ত্রের গবেষণা-পরিষৎ

যুক্তরাষ্ট্রে ধনবিজ্ঞান-সম্পর্কিত অনুসন্ধানসমিতি গুন্‌তিতে অনেক। "সোশ্যাল সায়েন্স রীসার্চ কাউন্‌সিল" নামক সমাজ-শাস্ত্রের গবেষণা-পরিষৎ অন্যতম। ফী বৎসর এই পরিষৎ কয়েকজন ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিতকে বিভিন্ন বিভাগের জন্য গবেষক বাহাল করিয়া থাকে। গবেষণার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। বর্ত্তমান বর্ষে উনিশ জন গবেষক মোতায়েন আছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় মজুর-আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বাহাল হইয়াছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুড্‌রিচ্।

টেনেসি প্রদেশের টাসকিউলাস কলেজের অধ্যাপক গিল্ড কোনো ছোট মার্কিণ শহরের মজুরজীবন আলোচনা করিবেন। বিলাতে বার্থ-কন্‌ট্রোল (জন্ম-সংযম) আন্দোলন (আজকাল কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে তাহার গবেষণায় মোতায়েন আছেন আইওয়া প্রদেশের কোনো কলেজের অধ্যাপক হাইম্‌স।

মার্কিণ অধ্যাপক জন বেট্‌স্ ক্লার্ক

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক জন বেট্‌স্ ক্লার্ক এই বৎসর জানুয়ারি মাসে আশী বৎসর পূর্ণ করিলেন। জন্ম তারিখে (২৬ জানুয়ারি) নিউ ইয়র্ক শহরের ইউনিভার্সিটি ক্লাব-গৃহে একটা বৈজ্ঞানিক "ফলার" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মহোচ্ছবের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান। বাছিয়া বাছিয়া মাত্র আশী জন অতিথির জন্য "পাতপিঁড়ি" করা হইয়াছিল। অধিকাংশই বুড়ার দল। খানাপিনা ছাড়া একটা আধ্যাত্মিক স্মৃতির ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ধনবিজ্ঞানবিদ্যার সেবকেরা ক্লার্কের নামে নিজ নিজ আলোচ্য-বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন। এইগুলা ক্লার্ক-স্মৃতিগ্রন্থ নামে বাহির হইতেছে।

জন বেট্‌স্ ক্লার্ক-প্রণীত গ্রন্থাবলী দুনিয়ার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু ভারতবর্ষে এইসকল বইয়ের কোনো কোনোটা কখনও টেক্‌স্‌টবুকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। ক্লার্কের "ফিলজফি অব্ ওয়েল্‌থ্" (ধন-দর্শন) আর "ডিষ্ট্রিবিউশ্যন অব্ ওয়েল্‌থ্" (ধন-বন্টন) প্রসিদ্ধ। এই দুই বই দুনিয়ার অর্থনৈতিক সাহিত্যে মার্কিণ ধনবিজ্ঞানসেবীদের অতি উৎকৃষ্ট দান। একালের "ক্লাসিক" হিসাবে বই দুইটা সকল দেশে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

ক্লার্কের আলোচনা-প্রণালীটাও "ক্লাসিক"। তিনি মানবজীবনের স্বার্থাস্বার্থ-বিষয়ক কতকগুলা মূল সূত্র স্বীকার করিয়া লইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত। সহজে এই প্রণালীকে "ডিডাক্‌টিভ" বা অবরোহণ-প্রণালী বলা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ হইতে সুরু করিয়া ক্রমশঃ কোনো সার্ব্বজনিক ও সনাতন সত্যে "আরোহণ" করিবার রীতি ক্লার্কের বিশেষত্ব নয়। এই হিসাবে সেকালের "ক্লাসিক" রিকার্ডো আর একালের ক্লাসিক ক্লার্ক এক গোত্রের অন্তর্গত। রিকার্ডোর রচনার কিয়দংশ ইতিমধ্যে "আর্থিক উন্নতি"র কয়েক সংখ্যায় অনূদিত হইয়াছে।

ডিডাক্‌টিভ প্রণালী কটমট চিজ। ক্লার্কও কটমট। কিন্তু ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রবেশলাভ করিতে হইলে একমাত্র ঐতিহাসিক প্রণালী ধরিয়া চলিলে বেশীদূর যাওয়া সম্ভবপর নয়। আজকালকার দিনে ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর জয়জয়কার চলিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্লাসিক রীতির ডিডাক্‌টিভ প্রথাও খুব জোরের সহিতই চলিতেছে। জন বেট্‌স ক্লার্কের গুণগ্রাহীদের সংখ্যা বেশ পুরু।

কুদরতী মাল বিষয়ক জার্ম্মাণ প্রদর্শনী ও সম্মিলন

জার্ম্মাণির শিল্পজগতে কুদরতী মাল সম্বন্ধে গভীরতর গবেষণা সুরু হইয়াছে। লোহা, ইস্পাত, তামা, অ্যালিউমিনিয়ম, ম্যাগনিজিয়াম, সীসা, দস্তা, সোনা, রূপা, ফস্‌ফোরাস ইত্যাদি প্রত্যেক ধাতুর দ্রব্য-গুণ বিশ্লেষণ করিবার জন্য কারখানার এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। শীঘ্রই বার্লিনে একটা বিপুল প্রদর্শনী খোলা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

ফ্রান্সে মাছ খাওয়াইবার আন্দোলন

প্যারিসের "আঁস্তিতিউ ওসিয়ানো গ্রাফিক" (সমুদ্র-তত্ত্ব-পরিষৎ) ফরাসী জাতিকে বেশী বেশী মাছ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা কায়েম করা হইয়াছে। মোটের উপর ১৫,০০০ ফ্রাঁ পুরস্কারের জন্য খরচ করা হইবে। প্রবন্ধ-লেখকেরা জাহাজে রেলে মাছ চালান দিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী বিবৃত করিবেন। মাছ তাজা রাখিয়া বেচিবার কৌশল আবিষ্কার করাই "অ্যাস্তিতিউ"য়ের প্রধান লক্ষ্য।

লণ্ডনে মার্কিণ অধ্যাপক

আমেরিকা হইতেও ইংরেজরা ধনবিজ্ঞানবিদ্যার অধ্যাপক আমদানি করিয়া লইয়া যাইতেছে। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনান পেন্‌শ্যন লওয়ায় মার্কিণ অধ্যাপক ইয়ং তাঁহার পদে বাহাল হইয়াছেন। ইয়ং ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক।

ধনবিজ্ঞানবিদ্যার দেড় শ' বৎসর

ইংরেজ দার্শনিক অ্যাডামস্মিথ-প্রণীত "হেবল্‌থ্‌ অব নেশ্যন্‌স্‌" (দুনিয়ার ধনদৌলত) ঐতিহাসিক হিসাবে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার ঋগ্‌বেদস্বরূপ। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই কেতাব বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক সাহিত্যে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহারা এই গ্রন্থকেই নিজেদের "গ্রন্থসাহের" বিবেচনা করিয়া থাকেন। কম সে কম বিলাতে আর আমেরিকায় এই দস্তুর। ফরাসীরা অ্যাডাম স্মিথকে একদম আদি গুরু সমঝিতে অভ্যস্ত নয়। তবে জার্ম্মাণিতে এই বিষয়ে কোনো আপত্তি দেখা যায় না।

১৭৭৬ সন হইতে আজ দেড়শ' বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। "দুনিয়ার ধনদৌলত" গ্রন্থের "জয়ন্তী" স্বরূপ কয়েকটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যাপক হল্যাণ্ডার "মত-প্রবর্ত্তক অ্যাডাম স্মিথ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। অ্যাডাম স্মিথের মতামত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন অধ্যাপক, জন মরিস ক্লার্ক। অধ্যাপক ডগলাস "অ্যাডামস্মিথ-প্রচারিত মূল্যবিজ্ঞান ও ধন-বণ্টননীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। অধ্যাপক হ্বিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল "অ্যাডামস্মিথের অবাধ আর্থিক নীতি।" বক্তৃতাগুলা পুস্তকাকারে বাহির হইতেছে।

বিলাতে আর্থিক ইতিহাসের ইজ্জৎ

আর্থিক ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে লিলিয়ান নোল্‌স্‌ বিলাতের একজন নামজাদা লোক ছিলেন। "লণ্ডন স্কুল অব্‌ ইকনমিক্‌স্‌" নামক লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ধনবিজ্ঞানবিদ্যালয়ে আজকাল এই বিভাগে যতটা উৎকর্ষ দেখা যায় নোল্‌স্‌ তাহার অন্যতম প্রধান উৎস। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নোল্‌সের নামে একটা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আর্থিক ইতিহাসঘটিত কোনো বিষয়ে গবেষণা চালাইবার জন্য বৃত্তিটা দেওয়া হইবে।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ্জ আন্‌ুইনও আর্থিক ইতিহাস বিদ্যায় ইংরেজি ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের অন্যতম বড় খুঁটা ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে সেই সব একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার আয়োজন চলিতেছে। সম্পাদক হইয়াছেন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টনে। আন্‌ুইনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে নানা কথা "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদক প্রণীত "ইংরেজের জন্মভূমি" গ্রন্থে বিবৃত আছে।

লণ্ডনে ধনবিজ্ঞান-সম্মেলন

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা শিখাইবার জন্য যে সকল অধ্যাপক বাহাল আছেন তাঁহারা লণ্ডনে এক সম্মেলন বসাইয়াছিলেন। এই হইতেছে চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান। ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা শিখাইবার প্রণালী সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। তাহার একটায় অধ্যাপক বোলে বলিয়াছেন:—তথ্য ও অঙ্কের হিস্যা বাড়াইয়া দেওয়া দরকার। দেশের ভিতরকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগকে সেই সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তোলা বাঞ্ছনীয়। এক বক্তৃতায় জেনেহ্বার বিশ্ব-রাষ্ট্রপরিষদের প্রবর্ত্তিত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হয়।

সরকারী তদন্তে মার্শ্যালের মতামত

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন ষ্টুয়ার্ট মিল ছিলেন যুবক ভারতের ধনবিজ্ঞান-গুরু। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সেই ঠাঁই ছিল মার্শ্যালের। এখনও বহুকাল মার্শ্যালের ইজ্জৎ থাকিবে। মার্শ্যাল তিনখানা মোটা মোটা বইয়ের গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। বই তিনটার নাম নিম্নরূপ:—(১) প্রিন্‌সিপল্‌স্‌ অব্‌ ইকনমিক্‌স্‌ (ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্র), (২) ইণ্ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড ট্রেড (আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের সংগঠন), (৩) মানি, ক্রেডিট অ্যাণ্ড কমার্স (টাকাকড়ির লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য)। প্রথম বইটা সুপরিচিত। অন্য দুইটার মাল ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইতেছে। প্রথমটার অধিকাংশই "দার্শনিক" তত্ত্বে পরিপূর্ণ। "তত্ত্বাংশ" অপর দুইটার প্রধান কথা নয়।

আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ, অধ্যায়ে যে ধরণের তথ্য থাকে মোটের উপর সেই ধরণের তথ্যই শৃঙ্খলীকৃতরূপে মার্শ্যালের শেষ দুই গ্রন্থে ঠাঁই পাইয়াছে। "বস্তুনিষ্ঠ" অর্থনৈতিক সাহিত্য হিসাবে এই দুই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান্। কিন্তু মার্শ্যালের আসল ক্ষমতা বুঝিতে হইলে "প্রিন্‌সিপল্‌স্"টাই ঘাঁটিতে হইবে।

অন্যান্য ধনবিজ্ঞানসেবীর মতন মার্শ্যালকেও বিভিন্ন সরকারী তদন্তে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। এই জবানবন্দি-গুলার ভিতর মার্শ্যালের দার্শনিক পাণ্ডিত্য আর কার্য্যকরী বিদ্যা দুই-ই এক সঙ্গে পাকড়াও করিতে পারা যায়। বিলাতের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি নামক ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ এই সব রচনাকে "অফিশ্যাল পেপার্স" (সরকারী রচনা, নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল রচনা নিম্ন-লিখিত ছয় উপলক্ষ্য লইয়া প্রণীত :—

(১) ১৮৮৬ সনে বিলাতী শিল্প-বাণিজ্যের "মন্দা" দশা আলোচনা করিবার জন্য মুদ্রা ও মূল্য বিষয়ক তদন্ত বসে। সেই তদন্তে মার্শ্যাল ছিলেন অন্যতম সাক্ষী। তাঁহার সেই সময়কার কথাগুলা আজও অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

(২) ১৮৮৭ সনে অনুষ্ঠিত সোনা ও রূপা বিষয়ক তদন্ত-কমিটির নিকট মার্শ্যালের জবানবন্দি।

(৩) ১৮৯৩ সনে অনুষ্ঠিত দরিদ্র-বৃদ্ধদের আর্থিক জীবন বিষয়ক তদন্ত-কমিটির নিকট সাক্ষ্য।

(৪) ভারতীয় মুদ্রা-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য (১৮৯৮)।

(৫) সাম্রাজ্যিক ও স্থানীয় করসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও ফলাফল-নির্ণয় (১৮৯৯)।

(৬) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের শুল্ক-নীতি-বিষয়ক গবেষণা (১৯০৩)।

মার্কিণ-জার্ম্মাণ ছাত্র-বিনিময়

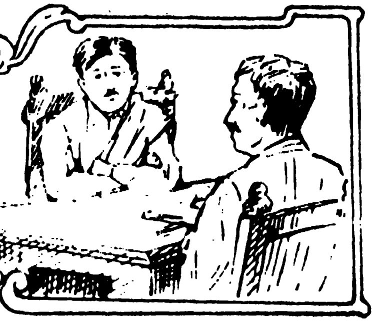
আমেরিকায় জার্ম্মাণ-বিদ্বেষ বেশ কমিয়া আসিতেছে। নিউইয়র্কের "ইনষ্টিটিউট অব্ ইণ্টার্ণাশনাল এডুকেশ্যান"এর (আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা-সংঙ্ঘ) সংস্রবে "আমেরিকান-জার্ম্মাণ ষ্টুডেণ্ট-এক্‌স্‌চেঞ্জ" নামক প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ মার্কিণ ছাত্রছাত্রী পাঠানো হইবে জার্ম্মাণিতে আর জার্ম্মাণ ছাত্রছাত্রী আমদানি করা হইবে যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯২৭-২৮ সনের জন্য কয়েকটা বৃত্তি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হইয়াছে। জার্ম্মাণিতে একবৎসর কাল থাকিয়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করা আর খোরপোষের জন্য যাহা-কিছু লাগিতে পারে সবই দিবে।

কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা

জাপানের কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজি ভাষায় একখানা ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা বাহির হইতেছে। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। নাম "কিয়োতো ইউনিভার্সিটি ইকনমিক রিভিউ।" প্রথম সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে :—(১) কার্ল মার্ক্‌স্ প্রচারিত সামাজিক চেতনার নানারূপ, (২) জাপানে আর্থিক ক্রমবিকাশের বিশেষত্ব, (৩) জাহাজ-কোম্পানীর সঙ্ঘ-গঠন, (৪) জাপানে আত্মহত্যার শ্রেণীবিভাগ, (৫) জাপান ও কোড়ীয়ার ভূমিবিধান, (৬) ভবিষ্যতের উপনিবেশ-নীতি, (৭) জাপানী মুদ্রা-ব্যবস্থায় সোনার কাগজ, ইত্যাদি।

সম্পাদক-সঙ্ঘ বলিতেছেন :—"১৯২০ সন পর্য্যন্ত জাপানী ধনবিজ্ঞান-সেবীদের চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রভাব অত্যধিক ছিল। এই সময়ে জাপানে স্বদেশী ভাব পরিস্ফুট হইতে সুরু করে। একটা স্বতন্ত্র জাপানী ধনবিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতেছে।"

মোলাকাৎ



স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানী

(ভাগ্যকুলের শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়ের সঙ্গে কথোপকথন)

["ইষ্টবেঙ্গল রিভার ষ্টীম সার্ভিস" নামক ষ্টীমার কোম্পানীর বড় আফিস কলিকাতায়। এই কোম্পানীর পরিচালনা করিতেছেন ঢাকার (ভাগ্যকুলের) রাজা শ্রীনাথ রায় অ্যাণ্ড ব্রাদার্স। তাঁহারা ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌। এই পরিবারের শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়ের সঙ্গে সম্প্রতি আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত নিম্নরূপ।]

প্রশ্ন—আপনাদের ষ্টীমার কোম্পানীর নাম কি ?

উত্তর—ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টীম সার্ভিস লিমিটেড্‌।

প্রঃ—কোন্ ষ্টেশন থেকে কোন্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলে ?

উঃ—চাঁদপুর, কমলাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা। কেবল মাল চলাচল করে।

প্রঃ—কলিকাতা থেকে চাঁদপুর কোন্ পথে যায় ?

উঃ—সুন্দরবন দিয়া যায়। আজকাল মাদারীপুরের পথ বন্ধ। আগে ঐ পথে যেত।

প্রঃ—পথে বড় বড় ষ্টেশন পড়ে কটা ?

উঃ—ষ্টেশন্ একটাও নাই, একেবারে চাঁদপুর যায়। তার পর কমলাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যায়। ঢাকা ওদিককার সীমানা।

প্রঃ—কলিকাতায় ষ্টেশন কোথায় ?

উঃ—জগন্নাথঘাট।

প্রঃ—কয়খানা ষ্টীমার চলে ?

উঃ—৭ খানা। আর একখানা তৈয়ারী হচ্ছে।

প্রঃ—রোজ চলে ?

উঃ—আমাদের সারভিস সাপ্তাহিক।

প্রঃ—ষ্টীমার তৈয়ারী হয় কোথায় ?

উঃ—আগে ইংরেজ কোম্পানীর কারখানায় তৈয়ারী হ'ত। এখন আমাদের নিজেদের কারখানা হয়েছে,—ইষ্ট বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস—কাশীপুরে। বাইরের কাজও সেখানে লওয়া হয়।

প্রঃ—কোন্ কোন্ ধরণের কাজ এই কারখানায় চলে ?

উঃ—ষ্টীমার আর ফ্ল্যাট তৈয়ারী ও মেরামত হয়, জুট প্রেস হয়, অন্য সব লোহালক্কড়ের কারবারও আছে।

প্রঃ—কত দিন ধরে এই এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা চল্‌ছে ?

উঃ—প্রায় ২০ বৎসর।

প্রঃ—কত লোক খাটে ?

উঃ—প্রায় ৩০০।

প্রঃ—সব বাঙ্গালী, না অ-বাঙ্গালীও আছে ?

উঃ—সবই বাঙ্গালী।

প্রঃ—ষ্টীমারে খালাসী সব সুদ্ধ কত জন খাটে ?

উঃ—আন্দাজ ৩।৪শ' লোক হবে।

প্রঃ—ষ্টীমারের সঙ্গে ফ্ল্যাট কয়খানা আছে ?

উঃ—২০খানা, তা ছাড়া কার্গো-বোট আছে খান ১৮।

প্রঃ—কার্গো বোট কোন্‌গুলি ?

উঃ—যেগুলিতে মাল চালান করা হয়।

প্রঃ—ষ্টীমার চালাবার জন্য সারঙ ইত্যাদির কাজে অধিকাংশ কি মুসলমান, না, হিন্দুও আছে ?

উঃ—সব মুসলমান।

প্রঃ—কি কি জিনিষ চালান হয় ?

উঃ—কলিকাতার যে সব জিনিষ মফঃস্বলে যায় সবই চালান হয়। বিদেশ থেকে যে সব জিনিষ আসে তাই বেশী।

প্রঃ—মফঃস্বল থেকে কি কি জিনিষ আসে?

উঃ—বেশীর ভাগ পাট, চাউল খুব সামান্য, চাউল নৌকাতে বেশী আসে।

প্রঃ—মফঃস্বল থেকে যে সব জিনিষ আসে সে সব কি দেশের মধ্যেই নানা জেলায় বিলি হয়, না বিদেশে যায়?

উঃ—কলিকাতার কারখানায় পাটের চাহিদা আছে।

প্রঃ—কলিকাতা থেকে মফঃস্বলে এবং মফঃস্বল থেকে কলিকাতায় সমান পরিমাণ জিনিষ চালান হয় কি?

উঃ—কলিকাতা থেকে মফঃস্বলে বেশী যায়। কলিকাতায় আসে কম, কেননা কলিকাতার বিদেশী মিল আমাদের পাট একেবারে নেয় না।

প্রঃ—তাহলে খরচের দিক্ থেকে আপনাদের যাওয়ার ক্ষেপে বেশী পড়ে, না আসবার দিকে বেশী পড়ে?

উঃ—এখান থেকে যেতে বেশী মাল পাই।

প্রঃ—কয়দিন লাগে যেতে?

উঃ—৬।৭ দিন।

প্রঃ—মফঃস্বলে যারা কারবার করে তারা প্রধানতঃ কোন দেশী লোক?

উঃ—পূর্ব্ববঙ্গের লোকই বেশী। এদিককার লোক এবং মাড়োয়ারীও আছে।

প্রঃ—তারা কি রকম দরের ব্যবসা করে?

উঃ—সব রকম আছে।

প্রঃ—আপনাদের যতগুলি ষ্টেশন আছে তাতে কর্ম্মচারী বাহাল করে কে?

উঃ—কমলাঘাট, চাঁদপুর প্রভৃতি জায়গায় আমাদের যে এজেন্ট আছে তারাই লোক নিযুক্ত করে।

প্রঃ—বাঙ্গালীর অধীনে আর কোনো ষ্টীমার লাইন আছে কি?

উঃ—আমাদের শরিকদের মধ্যে কেহ কেহ করেছিল। মুরারী আর হরেন্দ্র এদের ৩টী কোম্পানী ছিল। নামও আলাদা আলাদা ছিল, একটী বেঙ্গল ষ্টীম-শিপ কোম্পানী, আর একটী হরেন্দ্র রায় ষ্টীম শিপ কোম্পানী-এই ধরণের। এখন এগুলি উঠে গেছে। প্রতিযোগিতা ছিল খুব বেশী। তাতে পারে নি বলে উঠে গেল। এ ছাড়া মহেশ চৌধুরীর ঠাকুর কোম্পানীও একটা ছিল।

প্রঃ—যে পথে আপনাদের মাল চলাচল হয় সেই পথেই কি সাধারণতঃ নৌকা চলে?

উঃ—নৌকার পথ আলাদা। তারা সুন্দর বন দিয়ে যায় না, খালের পথ দিয়ে যায়, মাদারীপুর গিয়ে এক পথে পড়ে।

প্রঃ—সাধারণতঃ নৌকায় কত মাল চলাচল হয়?

উঃ—সেকথা খাল-বিভাগের কর্ম্মচারীরা বলতে পারে। আমার পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন।

প্রঃ—তাদের আফিস কোথায়?

উঃ—কলিকাতায়ই—উল্টাডিঙ্গিতে।

প্রঃ—"ক্যানাল ডিপার্টমেণ্ট" বল্লে কোন পথ বুঝায়?

উঃ—খুলনার পথ।

প্রঃ—আপনাদের পথে প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী কারা? যে লাইনে আপনাদের মাল চলাচল হয়, কার সঙ্গে আপনাদিগকে টক্কর দিতে হয়?

উঃ—আই, জি, এস, এন, আসাম বেঙ্গল এবং রিভার ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী এই ৩টীর সঙ্গে।

প্রঃ—এরা কতদিনের কোম্পানী?

উঃ—আসাম বেঙ্গল আমাদের ২।৩ বৎসর আগের হবে, আর সব অনেক আগের।

প্রঃ—কি দেখে এই ব্যবসায় আপনাদের ঝোঁক গেল?

উঃ—একটা ব্যবসা চালানো ছাড়া আর কোনো মতলব ছিল না।

প্রঃ—আগে আপনাদের নৌকার কোনো ব্যবসা ছিল?

উঃ— না, ছিল না। তবে কলিকাতা থেকে আমাদের চাউল ও অন্যান্য জিনিষ নৌকায় আসত যেত।

প্রঃ—মাল চলাচলের মাশুল এই ৪টী কোম্পানী কি একই হারে আদায় করে?

উঃ—একই হারে।

প্রঃ—পৌঁছোয় একই সময় ?

উঃ—হাঁ, একই সময়।

প্রঃ—৩টী বিদেশী কোম্পানী কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ?

উঃ—আলাদা ব্যবস্থাও আছে, আবার সংযুক্ত ব্যবস্থাও আছে।

প্রঃ—বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে তাল ঠিক রেখে কাজ চালাতে কোন বিষয়ে গোলমালে পড়তে হয়েছে কি ?

উঃ—হাঁ টক্কর খুব জবর চলে। এমন কি "রেট কাটিং" পর্য্যন্ত হয়েছে। আমরা অবশ্য রেট কাটিংএ যাই নি। ভৈরব অঞ্চলে কিছু কমিয়েছি। আমরা যাতে মাল না পাই তারা সে চেষ্টা করে; অধিকন্ত আমাদের ফ্ল্যাটে মাল আস্‌লে কারখানার মালিকেরা টাকা এড্‌ভান্স করে না। বিদেশী ফ্ল্যাটে মাল গেলে কারখানা ওয়ালারা ৯০ % এড্‌ভান্স করে। ধরুন নারায়ণগঞ্জ থেকে মাল পাঠিয়েছে, এখানে "বিল অব্‌ লেডিং" আস্‌ল। ঐ বিল দালালকে দিলে সে টাকা এনে দেয়। কিন্তু আমাদের বিল দেখালে টাকা দেয় না। যখন আমাদের কোম্পানী ছোট ছিল, মাত্র ২।৩খানা ষ্টীমার ছিল তখন বিদেশী মিলওয়ালারা আপত্তি করত না, আমাদের বিল অব্‌ লেডিংএর উপর ৯০% এড্‌ভান্স করত। যখন আমরা বাড়তে আরম্ভ করলাম, যখন বড় কোম্পানী হয়ে পড়লাম তখন থেকে আমাদিগকে খাটো করবার জন্য এইসব করছে। আমাদের বিল অব্‌ লেডিংএর উপর এড্‌ভান্স করা হয় না। তবে যখন তাগিদ খুব বেশী তখন আপত্তি করে না।

প্রঃ—মফঃস্বলের যে সকল লোক কলিকাতায় পাট বেচতে যায় তারা তাহলে ইংরেজের ষ্টীমারে মাল পাঠাতে বাধ্য ?

উঃ—হাঁ, কারণ আমরা পাঠালে তারা রিসিভ্‌ করবে না। শুধু এড্‌ভান্স করে না তা নয়, আমরা নিজেরা এড্‌ভান্স করতাম তবু নিবে না, পাট "রিফিয়ুজ" করে।

প্রঃ—তাহলে আপনাদের জাহাজে পাট বেশী আসে না ?

উঃ—খুব কম আসে। যে সব জায়গায় পাট বিক্রী হয় সে সব জায়গায় যদি চালান দিতে না পারি তবে উপায় কি ? কলের মালিকেরা সোজাসুজি বলে, "তোমরা রাজার জাহাজে (আমাদের জাহাজকে রাজার জাহাজ বলে) মাল দিয়েছ, তোমাদের পাট নিব না।"

প্রঃ—কি করে এর প্রতিকার হতে পারে ?

উঃ—এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে লিখেছিলাম। কোনো সাহায্য পাই নি। এটা যদি আমাদের গভর্মেণ্ট হত তাহলে এরূপ হতনা। দেশের উন্নতির দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকত। কিন্তু ওঁরা কোন দৃষ্টি করেন না।

প্রঃ—ষ্টীমারগুলি সারা বৎসর ধরে চলে ?

উঃ—হাঁ, সব সময় চলে। কারণ কলিকাতার মাল আমরা মফঃস্বলের জন্য পাই।

প্রঃ—বীমার ব্যবস্থা কিরূপ ? এদিকে ত বোধ হয় দেশী কোম্পানী নাই ?

উঃ—যদিও আমাদের জাহাজ খারাপ নয় এবং লোকসানের ঝুঁকি কম, তবুও সময় সময় আমাদিগকে উচ্চ হারে ইন্‌শিওর করতে হয়। এখন সেটা কমিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইন্‌শিওরেন্স অ্যাসোসিয়েশ্যন ত বিদেশী কলওয়ালাদেরই এক দলের লোক। তারা যা করবে তাই হবে।

প্রঃ—কলিকাতায় যে অ্যাসোসিয়েশ্যন আছে তারাই কি এই সব করে ?

উঃ—জুটমিল কোম্পানীগুলা ষ্টীমার কোম্পানীকে সাহায্য করবার জন্য এই সব করে। আমাদের স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এরা বীমা কোম্পানীকে ধরে। বীমা-কোম্পানীর টান বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর দিকে।

প্রঃ—পাটের কল, জাহাজ কোম্পানী আর বীমা-কোম্পানী তিন কারবারই স্বদেশী ষ্টীমার-কোম্পানীর বিরুদ্ধে একপ্রকার খোলাখুলিই সঙ্ঘবদ্ধ। সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু একটা আন্দোলন হয়েছে কি ?

উঃ—হাঁ। সেদিনকার "কমার্শ্যাল কংগ্রেসে"ও আন্দোলনটা তুলেছিলাম।

প্রঃ—আপনাদের ষ্টীমার কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হয় কি?

উঃ—নিশ্চয়। আমরা যে লিমিটেড্ কোম্পানী।

প্রঃ—শেয়ার বিক্রী হয়?

উঃ—হয়।

প্রঃ—কত টাকা মূলধন?

উঃ—প্রায় ৯ লাখ টাকা।

প্রঃ—শেয়ার-হোল্ডারদের সংখ্যা কত?

উঃ—প্রায় ১২০০।

প্রঃ—আফিস কোথায়?

উঃ—৮৫ শোভাবাজার ষ্ট্রীটে।

প্রঃ—আপনার সঙ্গে কোম্পানীর সম্বন্ধ কি?

উঃ—আমি ম্যানেজিং এজেণ্ট।

প্রঃ—কিছু ডিভিডেণ্ট দিতে পেরেছেন?

উঃ—আগে ৪ বৎসর দিতে পারি নি। গত ২ বৎসর কিছু দিয়েছি। প্রথম যখন কোম্পানী খাড়া করি তখন ১২ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছিলাম। এ সব দেখে বিদেশীরা প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। যুদ্ধের সময় গবর্মেণ্ট আমাদের অর্দ্ধেক ষ্টীমার ও ফ্ল্যাট বিক্রী করতে বাধ্য করেন। অবশ্য তার দাম পেয়েছি। কিন্তু কারবার কমে এসেছে।

প্রঃ—এখন আপনারা যে ষ্টীমার তৈয়ারী করেন, তার এঞ্জিন কি বিলাত থেকে আনেন?

উঃ—আগে বিলাত থেকে আনতাম। এখন টাটা কোম্পানীর নিকট থেকে আনছি। এনে এখানে ফিট করি।

প্রঃ—আপনাদের সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার কি বিদেশী?

উঃ—হাঁ, এটা হচ্ছে ডক, এঞ্জিনিয়ারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। স্কিল্ড্ লেবার সব ইণ্ডিয়ান। রেলী ব্রাদ্রার্সের জাহাজ নারায়ণগঞ্জ থেকে নিয়ে এসে এখানে মেরামত করে।

প্রঃ—এই ধরণের কারখানা কটা আছে?

উঃ—আমাদের চেয়ে বড় বড় কারখানা ইংরেজ কোম্পানীর আছে, যেমন মার্টিন, জর্ডন কোম্পানী ইত্যাদি। স্বদেশী কোম্পানী আমাদের চাইতে বড় নাই।

প্রঃ—এখানকার কর্ত্তা একজন ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার। আর অন্যান্য সকলে সাধারণ মজুর?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—জাহাজ ষ্টীমার ইত্যাদি বিষয়ক উন্নতির কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চান?

উঃ—ব্যাপার হচ্ছে এই—বিদেশী কারখানাওয়ালারা চায় না যে আধুনিক ধরণের স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য বেড়ে উঠুক। তারা চায় আমরা চাষী থেকে যাই। প্রোটেক্‌শ্যন (সংরক্ষণ) শুল্ক বসানো হচ্ছে স্বদেশী কোম্পানীর জন্য। কিন্তু এই শুল্কের সুফল ভোগ করছে বিদেশী মূলধনের মালিকেরা।

প্রঃ—তাহলে দাঁড়াল এই—

(১) এখানকার জুট কোম্পানী আপনাদিগকে চেপে রাখতে চায়।

(২) ইন্‌শিওর কোম্পানী গোলমাল করছে।

উঃ—তার উপর আর এক বিপদ। পাট মজুত করার জন্য গুদাম পর্য্যন্ত আমরা পাই না। ফলে যারা মাল পাঠাতে চায়, তারা আমাদের মারফৎ পাঠাতে ভয় পায়।



পত্রিকা-জগৎ

দি আয়রণ এজ

১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধীয় সচিত্র সাপ্তাহিক। নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত। ১৯২৬ সনের ১৬ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় ৮০পৃষ্ঠা পড়িবার মাল আছে। ইহা ছাড়া ২৩০ পৃষ্ঠার সচিত্র বিজ্ঞাপন ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। লৌহ ইস্পাত বিষয় উচ্চাঙ্গের মৌলিক রচনা ও ঐ সম্পর্কিত তথ্যমূলক সংবাদ এই সাপ্তাহিকের বিশেষত্ব। এই সংখ্যায় আছে—(১) লোহা ঢালাই করিবার খরচা, (২) কয়লার উপকারিতা-বৃদ্ধির চেষ্টা।

দি ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন

১৮৪৪ সনে প্রতিষ্ঠিত লণ্ডন শহরের মাসিক পত্রিকা। ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ সংখ্যায় আছে মোট ৩৮২ পৃষ্ঠা। ইহার ৩৪ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠাগুলিতেও যথেষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। দুনিয়ার বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বীমা-প্রতিষ্ঠানের একটা খসড়া ইহাতে পাওয়া যায়। এই সংখ্যার রচনার মধ্যে আছে—(১) ব্যাঙ্কিং মুনাফা ও আয়-ব্যয়ের জের, (২) কর্জ্জ ও বাণিজ্য, (৩) ১৯২৬ সনের বীমা, (৪) স্কটিস ব্যাঙ্কিং, (৫) কোম্পানীর আইনকানুন, (৬) অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের অবস্থা, (৭) ১৯২৬ সনের ব্যাঙ্ক কারবারের লেনদেন, (৮) ব্যাঙ্কিং রেট, চার্ট ও ষ্ট্যাটিস্টিক্স, (৯) মুদ্রা পর্য্যালোচনা, (১০) ষ্টক এক্সচেঞ্জের দর, (১১) শ্রীযুক্ত লরেন্স কুরি, চেয়ারম্যান লণ্ডন ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কার্স ও প্রেসিডেণ্ট বৃটিশ ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, (১২) ব্যাঙ্ক-রিপোর্টসমূহের তুলনামূলক আলোচনা, (১৩) ব্যাঙ্ক অব্ লণ্ডন, (১৪) ব্যাঙ্ক অব্ মন্ট্রিল, (১৫) ব্যাঙ্ক ছোকরাগণের শিক্ষণীয় বিভাগ, (১৬) ইনশিওর‍্যান্স ও অ্যাকচুয়ারী বিষয়ক সংবাদ, (১৭) বিল্ডিং সোসাইটির উন্নতি, (১৮) বীমা-বিভাগ—(ক) নয়া ধরণের জীবনবীমার কারবার, (খ) ১৯২৫ সনের মজুর-ক্ষতিপূরণ, (গ) মুনাফাশূন্য প্রিমিয়াম রেট, (ঘ) আন্তর্জ্জাতিক অ্যাকচুয়ারী কংগ্রেস, (ঙ) ইনশিওর‍্যান্স সম্পর্কিত নানা কথা, (চ) নারী-নিয়োগ, (ছ) চীনবিপ্লব ও বীমা-প্রতিষ্ঠান, (জ) লড়াইয়ের ঝুঁকি-বিষয়ক লাভালাভ।

দি ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত শিল্প-ব্যবসায়-বিষয়ক একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক। ইহাতে প্রতিমাসে একশতের উপর সচিত্র বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা থাকে। ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ সংখ্যায় পড়িবার মাল আছে—(১) বোম্বাই বজেট, (২) ভারতীয় লৌহ-সংরক্ষণ, (৩) ফেব্রুয়ারী মাসের শিল্প-ব্যবসা পর্য্যালোচনা, (৪) স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, (৫) সুরাটের কলা ও গৃহ-শিল্প, (৬) বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য, (৭) লাঙ্কাশিয়ার বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা, (৮) ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাস, (৯) শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়।

দি টাইমস ট্রেড অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল সাপ্লিমেণ্ট

বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯২৬। প্রায় একশত পৃষ্ঠার বহু কলকারখানার চিত্র সমেত সচিত্র সংখ্যা। ইহার প্রধান বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা হইল। (১) বেলজিয়ামের আর্থিক আরোগ্য-লাভ, (হেনরী জ্যাসপার বেলজিয়ামের প্রধান মন্ত্রী), (২) কারেন্সি

ষ্ট্যাবিলিজেশন (মুদ্রা স্থিরীকরণ), (৩) বেলজিয়ান কঙ্গো, (৪)বেলজিয়ামের বিজলী-যুগ, (৫) কয়লা ও কোক, (৬) লোহা ও ইস্পাত, (৭) দস্তা গলান, (৮) বেলজিয়ামের রপ্তানি, (৯) কাগজ-শিল্প, (১০) বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদন (১১) সিমেণ্ট শিল্প, (১২) চর্ম্ম-ব্যবসায়, (১৩) বেলজিয়ামের প্রতিযোগিতা শক্তি, (১৪) কাচ-নির্ম্মাণ, (১৫) বেলজিয়ামের রেল-(১৬) তুলা-শিল্পের সমবায়, (১৭) বেলজিয়ামে বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স, (১৮) স্বর্ণ সমুদ্র (১৯) লা' চেম্বার দে কমার্স বেল্জে লণ্ডার্স, (২০) বেলজিয়ামে ব্যাঙ্কিং, (২১) মনস্, (২২) আনটোয়ার্প, (২৩) সুগার বিট, (২৪) ঘেণ্ট বন্দর, (২৫) ফ্লাণ্ডার রাজধানী, (২৬) কঙ্গোর কৃষি খনি ও যান-বাহন (২৭) লুক্সেমবুর্গের গ্রাণ্ডডাচি, (২৮) লুক্সেমবুর্গ খনিজ শিল্প, (২৯) লুক্সেমবুর্গের লৌহ-ইস্পাত শিল্প কারখানা, (৩০) বেলজিয়ামে ব্লাষ্টফার্ণেসের চলন, (৩১) কঙ্গোর কতকগুলি আমদানি।

দি টাইম্‌স্ এডুকেশন্যাল সাপ্লিমেণ্ট

টাইম্‌স পত্রের শিক্ষা-বিষয়ক ক্রোড়পত্র। সাপ্তাহিক। প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়। লণ্ডন। ৩পে। পত্র-সংখ্যা ১২+৪।

২৯শে জানুয়ারী, ১৯২৭ এ আছে—

প্রধান প্রবন্ধ—(১) স্কুলের পুনর্গঠন।

(২) মধ্য স্কুলগুলিতে বেসরকারী দান। সরকার-শাসিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেসরকারী দান উঠিয়া যাইতেছে। এই সমস্যা লইয়া হেড মাষ্টারদের অ্যাসোসিয়েশন মাথা ঘামাইয়াছে।

বিশেষ প্রবন্ধ—(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বোর্ডিং স্কুল।

(২) ক্লাসের কাজ।

(৩) বালক ও বই।

(৪) বড়োদাতে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা। ফল নানা-কারণে আশানুরূপ হয় নাই। লেখক বলেন, 'দেদার টাকা খরচ করিয়া শিক্ষার যদি বিস্তার না ঘটে, উপায় কি? ভারতের অবস্থা বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষে অনুকূল নাও হইতে পারে।"

(৫) অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে নারী পড়ুয়ার সংখ্যা সীটের চেয়ে বেশী বলিয়া "বাছাই" করিবার প্রথা আছে! এই সূত্রে মেয়েদেরকে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়, তা লইয়া অভিযোগ ও প্রতিকারের প্রার্থনা।

(৬) শিল্প ও ব্যবসায় সার (লর্ড লণ্ডনডেরীর উক্তি)। (৭) স্কুল ষ্ট্যাণ্ডার্ড (এক ডিরেক্টারের মত)। (৮) চীনে সৈন্য প্রেরিত হইল। (৯) অবকাশ সময়ে কি শিক্ষা করা যাইতে পারে?

(১০) দু'খানা বইয়ের সমালোচনা ও নিম্নলিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কিঞ্চিৎ খবরাখবর—স্কটল্যাণ্ডের এডুকেশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, এবার্ডীনের দুগ্ধ-গবেষণাগার, রাউলেট ইন্‌ষ্টিটিউট; আইরিশের প্রবর্ত্তন, কুটির শিল্প ইত্যাদি।

২২ জানুয়ারী, ১৯২৭।

ইহাতে আছে :—

প্রধান প্রবন্ধ—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও রাষ্ট্র।

(২) ভূগোলের পঠন-পাঠন।

বিশেষ প্রবন্ধ—

(১) ভারতীয় রবার।

(২) গ্রেডিংয়েতে একটা পরীক্ষা।

(৩) ভারতের সরকারী স্কুল সমস্যাটা ক্রমেই বাড়িতেছে; জাতীয়তা-বোধ; ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য উত্তরোত্তর বেশী ছাত্র বিদেশে যাইতেছে। উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এরা যেন অন্ততঃ অন্য একটা ইয়োরোপীয় ভাষা—ফরাসী বা জার্ম্মাণ—না শিখিয়া ঘরের বাহির না হয়।

(৫) ফরাসী কেন? ইতালীয়ান ও স্পেনিশ ভাষার স্বপক্ষে ওকালতী রহিয়াছে।

(৬) ক্লাসের জন্য দরকারী কাজ। ইংরাজীর পাঠ। "শিক্ষা-ব্যবস্থায় খেলার স্থান" নামক বইয়ের ক্ষুদ্র সমালোচনা ও নিম্নলিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু বিবরণ স্থান পাইয়াছে। (১) স্কটল্যাণ্ড, (২) আয়ারল্যাণ্ড, (৩) ওয়েল্‌স্। এডিনবার্গ, গ্লাসগো, পার্থ সম্মেলন, হিরিয়ট ওয়াট কলেজ, ওয়েল্‌স্ ন্যাশনাল স্কুল অব্ মেডিসিন, উইলিয়ম ভিন্‌সেণ্ট ইত্যাদির বক্তৃতা, ইউনিভারসিটি কলেজ কার্ডিফ, আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইরিশ ভাষার প্রবর্ত্তন।

(৭) গ্রামে বালকদের জীবন। ছেলেদের চরিত্র উন্নত করিবার জন্য কমিউনিটি কেন্দ্র।

(৮) চীনে সঙ্কট (বৃটিশ কেবিনেটের নীতি)।

(৯) ডাক টিকিটে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

(১০) চাষ শিক্ষা।

(১১) সিটি অব্ লণ্ডন চেয়ার।

ফরওয়ার্ড

দৈনিক। কলিকাতা। স্বরাজ্যদল তথা কংগ্রেসের মুখপত্র। ১ আনা। মার্চ্চ, ১৯২৭। পত্রসংখ্যা ১২ ও ১৬র মধ্যে। রবিবার দিন ২০ হইতে ২৮ পৃষ্ঠা থাকে ও দফায় দফায় বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং, অর্থতত্ত্ব, শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।

রংয়ের ব্যবসায়—

(১) যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে

যে সব দেশ কয়লা আলকাতরা ডাইষ্টাফ (রং) উৎপাদন করে তাদের প্রকৃত উৎপন্নের পরিমাণ দরকারের বেশী দাঁড়াইয়াছে। অধিকন্তু, এখনো অনেক বছর ধরিয়া টান পড়িলে তার যোগান দেওয়া চলিবে।

১৯১৩ সনে জগতের উৎপাদন ছিল ১৷৹ লক্ষ টনের উপর ডাইষ্টাফ। তন্মধ্যে একা জার্ম্মাণি তৈয়ারী করিয়াছে ১৷৹ লক্ষ টন ও রপ্তানি করিয়াছে ১ লক্ষ টন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সুইট্‌সারল্যাণ্ডের স্থান ছিল দ্বিতীয়। উৎপাদন বছরে ১০,৫০০০ টন। তার ৯০% রপ্তানি হইত।

১৯১৩ সনে ইংল্যাণ্ডে ডাইষ্টাফ ৪,০০০ টনে দাঁড়াইয়াছিল। অর্দ্ধেকটা বিদেশ হইতে আমদানি হইত।

ঐ বৎসরে আমেরিকার উৎপাদন ৩,০০০ টনের অনধিক ছিল।

বাকী ৭½ হাজার টন অল্প অল্প করিয়া অন্যান্য দেশে ছড়ান ছিল।

যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণির উৎপাদন হ্রাস পায়। সেই সুযোগে অন্যান্য দেশ প্রাণপণে চেষ্টা করে তাদের স্ব স্ব উৎপাদন বাড়াইবার জন্য। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ত বড় বড় ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেই। ইতালি, জাপান, পোল্যাণ্ড, স্পেন, ইত্যাদি স্থানেও ঐ ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

এদিকে জার্ম্মাণিও চুপ করিয়া থাকে নাই। নানা তোড়জোড়ের সাহায্যে জার্ম্মাণির আদায়ের পরিমাণ ২৫% বাড়িয়াছে। তাতে জগতের উৎপাদন-শক্তি দ্বিগুণিত হইয়াছে।

(২) জার্ম্মাণির প্রাধান্য

অন্যান্য উৎপাদক শক্তি-সমূহ টারিফ, সাবসিডি, আমদানি-বাধা প্রভৃতি বহুবিধ উপায় চেষ্টা করিয়াও জার্ম্মাণিকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। আন্তর্জাতিক কারবারে জার্ম্মাণি আজও প্রধান। আর মজার কথা এই যে, মিত্র-শক্তিবর্গই প্রকারান্তরে জার্ম্মাণির এই বৃদ্ধির সাহায্য করিতেছে।

১৯২১ সনে উৎপাদনের পরিমাণ ৫১,৮০০ টন ছিল। ১৯২২ সনে উহা বাড়িয়া ৮৬,০০০ টন হইয়াছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বের ⅗ অংশেরও বেশী।

১৯২৩ সনে রূঢ় অধিকৃত হয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গোলযোগ ঘটে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ জার্ম্মাণি হাজার হাজার টন ডাইষ্টাফ্ দেওয়ায় মিত্র-শক্তিবর্গের ঐ ব্যবসায়ে সমূহ ক্ষতি ঘটে।

১৯২৪ সনে জার্ম্মাণ উৎপাদন আবার ৭৫,০০০ টন ফিরিয়া পায়। নানাপ্রকার লক্ষণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণি অনতিবিলম্বে বিশ্বের বাজারে তার পূর্ব্বস্থান ফিরিয়া পাইবে।

কারবারের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া জার্ম্মাণি সম্প্রতি বিদেশে বিক্রয়তত্ত্বের দিকে মনোযোগ দিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে,—বিশেষতঃ রুশিয়া, জাপান ও স্পেনে—জাতীয় চুক্তি খাড়া করা হইয়াছে। অন্যত্র খুব শক্ত কেন্দ্রীকৃত এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। এ দেশের আই, জি, ডাইষ্টাফ্ লিমিটেড্ এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান। ইহা জার্ম্মাণির অধ্যবসায় ও যত্নের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ বটে। এই সব ব্যবসায়ে জার্ম্মাণি তার উন্নত রাসায়নিক জ্ঞানেরও প্রয়োগ করিতেছে।

(৩) আমেরিকার বাড়্

ডাইষ্টাফ ব্যবসায়ে সব চেয়ে বেশী উন্নতি হইয়াছে আমেরিকার। ১৯১৪ সনে উৎপাদন ছিল ২৯৪০ টন। ১৯১৮ সনে বাড়িতে বাড়িতে হয় ২৬,০০০ টন। অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বকার আমদানির সমান। ১৯২৩ সনে মোট প্রকৃত উৎপন্ন হয় ৪১,৭০০ টন। ১৯২৪ সনে ৩০,৫২০ টন। ১৯২৫ সনে ৩৮,৪০০ টন।

দেশের বেপারীরাই খরচ করিয়াছে ৯০%। আর রপ্তানি হইয়াছে ১১,৫০০ টন।

আমেরিকার এই রপ্তানি ব্যবসাটা বড় লাভজনক হয় নাই। প্রধান কারণ হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের পরস্পর প্রতিযোগিতা। জার্ম্মাণির বাইরে দেশগুলি চড়া দরের সামগ্রী লইয়া বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে। আমেরিকার রপ্তানির অধিকাংশটাঃ হইতেছে সিন্‌থেটিক নীল ও সাল্‌ফার ব্লাকের মত সস্তা রং। তবে মনে হয় ট্রাষ্টগঠন দ্বারা আমেরিকা শীঘ্রই অন্যান্য দিকেও অগ্রসর হইবে।

(৪) বৃটেনের অবস্থা আশাপ্রদ নয়

আমদানি-বাধা, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি সত্ত্বেও বৃটেনে এই ব্যবসাটা মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ডাইষ্টাফ (আমদানি শাসন) অ্যাক্ট ১৯২১, জানুয়ারী হইতে বলবৎ হয়। তার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংরেজের বাজার নানা প্রকারের উৎপন্নে ছাইয়া গিয়াছিল।

১৯২২ সনের বৃটিশ উৎপাদন ৯,০০০ টনের উপরে উঠিয়াছিল। ইহা যুদ্ধের পূর্ব্বকার পরিমাণের দ্বিগুণ।

১৯২৩ সনে ফরাসী রূঢ় অধিকার করায় জার্ম্মাণির উৎপাদন কম হয়। তাতে এখানকার উৎপাদন বাড়িয়া হয় ১৪,৬৭০ টন। সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি ৩৫০% বাড়ে। কিন্তু চড়া দরের সমস্যাটা বিব্রত করিতে থাকে।

১৯২৪ সনে উৎপাদন ১৪,৭৮০ টনে দাঁড়াইল। ১৯২৫ সনে ১৪,৪২০ টনে নামিল। এই পরিমাণের ৯০০ টন হইতেছে সিন্‌থেটিক নীল। তা না হইলে এ ব্যবসায়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হইত।

১৯২৩ সন থেকে আমদানি হইতে বৃটিশ রপ্তানি বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু রপ্তানির মোট পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। এ বছর (১৯২৬) ১৯২৫এর ⅓ অংশ মাত্র বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা।

(৫) অন্যান্য দেশের কথা

যুদ্ধের পর হইতে ফ্রান্সের উৎপাদনে সুন্দর উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯২৪ সনে ১৪,৯৭৯ টনে উঠিয়াছিল। ১৯২৫ সনে ১৪,৫৪৯ টনে নামিয়া যায়। কারণ আমেরিকার মত ফ্রান্সকেও রপ্তানির বাজারে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সুইট্‌সারল্যাণ্ডের বর্ত্তমান উৎপাদন যুদ্ধের পূর্ব্বকার অর্দ্ধেক মাত্র। জার্ম্মাণির প্রতিযোগিতাহেতু ১৯১৯ সন থেকে জাপানের পরিমাণটা ৭,০০০ টনের নীচে নামিতে আরম্ভ করে। ইতালিতে ৪,৫০০ টন উৎপন্ন হইতেছে। ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। পোল্যাণ্ডের উৎপাদন-ক্ষমতা ২০০০ টন, কিন্তু উৎপাদন করিতেছে ৬০০ টন।

দি জার্ণাল অব্ দি টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রি

ম্যানচেষ্টার টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত সরকারী পত্রিকা। ইহাতে বৃটিশ তুলা, পশম, লিনেন, সিল্ক প্রভৃতি শিল্পের বৃটিশ গবেষণাগারের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৯২৭ সনের জানুয়ারী সংখ্যাতে আছে—(১) ল্যাঙ্কাশিয়ার বিভাগ—ইতালীর শিল্প অবস্থা, (২) ইয়র্কশিয়ার বিভাগ—বস্ত্রশিল্পে রংএর কারিগরী, (৩) লণ্ডন বিভাগ—ইম্পীরিয়াল ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের সরকারী মুখপত্র। কলিকাতা। প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়। /০ আনা। পত্রসংখ্যা ৪৮। কিন্তু অর্দ্ধেকেরও বেশী বিজ্ঞাপনে এবং বাজার-দরে পূর্ণ হয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ৫ই মার্চ্চ, ১৯২৭ এই দুই সংখ্যায় কর্পোরেশ্যন কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত শাক্লাতোয়ালাকে প্রদত্ত অভিনন্দন ও তার উত্তর ছাপা হইয়াছে।

অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত সাপুরজি শাক্লাতোয়ালা, এম্, পি

মহাশয়,

আমরা, কলিকাতা কর্পোরেশ্যানের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ আপনাকে এই নগরীতে সাদরে ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছি।

আমাদের মাতৃভূমির আর্থিক জাগরণের জন্য আপনার কার্য্যাবলীর কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। ব্যবসায়-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোক্তাদের একজনরূপে আপনি ধৈর্য্যের সহিত নীরবে ও লোকচক্ষুর অগোচরে মাতৃভূমির গুপ্ত শক্তিসমূহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আপনার চেষ্টায় ভারতের এক জাতীয় ব্যবসায় বিপুলকায় হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আপনার অদম্য উৎসাহে এবং দরিদ্র, দুর্ব্বল ও পদদলিতদের জন্য অদ্বিতীয় সেবায় আপনি বৃটিশ কমন্স-গৃহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই কথা মনে করিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। ভারতের এক সুযোগ্য সন্তানকে পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাচন করিয়া আপনার উদার ও মহৎ জনপদ আমাদের মাতৃভূমিকে যে সম্মান দেখাইয়াছে তাহা আমরা অঙ্গীকার করিতেছি।

আপনি আপনার দেশের সেবায় আপনার অক্লান্ত শক্তি, আপনার মনোহর বক্তৃতার ক্ষমতা এবং আপনার পদমর্য্যাদাপ্রসূত বহু সুযোগ-সুবিধা নিয়োজিত করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া দেশের সেবা করিতে থাকুন ও আপনার প্রশংসমান দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে থাকুন।

বন্দেমাতরম্।

আপনার সহিত মাতৃ-ভূমির সেবায় রত

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউনসিলারগণ,

জে, এম সেনগুপ্ত

মেয়র।

শ্রীযুক্ত শাক্লাতোয়ালা এই অভিনন্দনের উত্তরে যে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন তার সার মর্ম্ম এইরূপ :—"বর্ত্তমান জগতে নব নব ঘটনা ও চিন্তা-ধারার সাক্ষিরূপে আজ আমি এই অভিনন্দন গ্রহণ করিতে দাঁড়াইয়াছি। কারণ আমি জানি মানুষের দোষগুণ বিচারের সময় তার জীবিতকালে নয়; কিন্তু মৃত্যুর পরে। আমি ইহাও জানি যে, বর্ত্তমান কালে শুধু ভারতে অথবা গ্রেট বৃটেনে নয় কিন্তু সমগ্র জগতে জনগণ আর অন্ধভাবে কাহাকেও অভিনন্দন দিতে প্রস্তুত নয়। রাজাই হোক্, রাজকুমারই হোক্ বা রাজপ্রতিনিধিই হোক্, যে-ই কোন নূতন স্থানে আসে অমনি সেখানকার অধিবাসীরা তর্কপ্রশ্ন করে, এ লোকটা আমাদের জন্য কি করিয়াছে এবং তারপর সিদ্ধান্ত করে—অভিনন্দন দিবে অথবা দিবে না। আমিও সেইরূপ চিত্ত লইয়া এই অভিনন্দন গ্রহণ করিতেছি। 'কোন বাধা না মানিয়া অগ্রসর হইয়া যাইব। আমার দেশবাসিগণকে তথা যে কোন ব্যক্তিকে আমার যে কোন ভাবে সেবা করিবার ক্ষমতা আছে, সেবা করিয়া যাইব।' কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ আজ আমায় এই আদেশ দিলেন বুঝিতেছি।

"এই দুঃখময় জগতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শত্রুতা ত আছেই। অনিচ্ছাকৃত যন্ত্রচালিতবৎ শত্রুতাও যথেষ্ট আছে। আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া শুনিয়া যন্ত্রের মত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিন্দা বা প্রশংসা করিয়া থাকি। আপনারা ব্যাটারসীর নাগরিকদের উল্লেখ করিয়াছেন আর আমার তাদের কথা মনে পড়িতেছে। কলিকাতাবাসিগণ ব্যাটারসীর উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন। শক্তি, ঐশ্বর্য্য, প্রতিভা, ধন-সম্পদ, কারুণ্য, ডিমোক্রাটিক স্বাধীনতা কিছু বাকী নাই। আর আমি দেখিতেছি আপনাদের মত সেখানকার লোকেরাও "শ্লাম"বাসী, অধিকারবঞ্চিত হতভাগ্য, পেটের তাড়নায় ২৪ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"মনুষ্যের এই অবনতি এবং নারীর অধঃপতনের জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী। তাই আমি সাম্রাজ্যবাদের চিরকেলে ঘোরতর দুষমন্। আমি দেখিয়াছি এই সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর পক্ষে যত বড় অভিশাপ ইংল্যাণ্ডের দারিদ্র্য-পীড়িত জনগণের পক্ষেও তত বড় অভিশাপ। ভবিষ্যতে একটা অতি-বড় বিপদের মুখ হইতে গ্রেট বৃটেনকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি ও আমার বন্ধুগণ দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতেছি—যেন জগতের সকল জাতি স্বাধীন ভাবে মৈত্রীবদ্ধ হইয়া

বাস করিতে পারে। জগতের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ ক্ষুধার তাড়নায় দিশাহারা। তারা আর্থিক স্বাধীনতা বিকাইয়া দিয়াছে। তাই অন্য সকল প্রকার অধিকার হইতেও তারা ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহাদের মুক্তি চাই।

"আমি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য—প্রকাশ্য সভ্য। এই জন্য কেহ কেহ আমাকে অভিনন্দন দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁদের নিকট আমার প্রথম আবেদন এই যে, তাঁরা এখনি পদত্যাগ করুন। প্রত্যেক কাউনসিলার আগে কমিউনিষ্ট, তারপর কাউনসিলার। বস্তুতঃ, সকল মিউনিসিপ্যাল করপোরেশ্যানই সত্যকার জীবনের কমিউনিজ্‌মের বিকাশ ছাড়া কিছু নয়। সকলে মিলিত ও যুক্তভাবে জনগণের সেবা করা। কমিউনিষ্টদের প্রধান যুক্তিইত এই যে, 'ওখানে থামিলে চলিবে না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে—রাষ্ট্রেও ঐ পরীক্ষাটা হোক্।

"কর্পোরেশ্যানের সার্থকতাটা কি শুনি। কতকগুলি বিষয় আছে তা সাহস করিয়া ব্যক্তিবিশেষের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। আমরা চাইনা যে, প্রত্যেক লোটা বা গ্লাস জল আমাদের অত আনা খরচ করিয়া খাইতে হয়। সেইজন্য কর্পোরেশ্যান আমাদের জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যদি ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে জাতির অজ্ঞতা ও অন্ধকার শত বৎসরেও কি দূর হইবে? অথবা হাঁসপাতালের কথা ধরা যাক্। জগতের জাতিবর্গকে যদি লিমিটেড্ কোম্পানীর উপর নির্ভর করিতে হইত, তবে রোগীদের দুর্দ্দশার একশেষ হইত।

"সুতরাং দেখা যাইতেছে সমাজের কয়েকটি মাত্র ব্যক্তি সমগ্র সম্পত্তিটা ভোগ করিবে এইরূপ অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশ্যান। আর এই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশ্যানের শাসকগণ সমগ্র অন্তরের সহিত কমিউনিষ্ট হইতে বাধ্য।

আমার কোন কোন ভারতস্থ বৃটিশ বন্ধু মনে করেন কমিউনিজ্‌ম ও সোশিয়েলিজ্‌ম আজ পশ্চিমদেশগুলির উপর পূর্ব্বদেশের আক্রমণের একটা রূপ। তা ভুল। সমগ্র ইয়োরোপের মধ্যে গ্রেট বৃটেনেই সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মময় সোশিয়েলিজ্‌মের মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছিল। আর আজ রুশিয়া গ্রেট বৃটেনকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

"আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলিকাতার ঘরবাড়ীগুলি দেখিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট হাউস্‌ই বল, বাগান বাড়ীই বল, পাটকলের মালিকদের ঘরই বল, আর সেখানকার মজুরদের খোলার ঘরই বল আমি চোখে দেখিলাম। কিবা ভারত, কিবা ঈজিপট, কিবা মধ্যযুগের আমেরিকা ও ইয়োরোপ বাস্তু-নির্ম্মাণরীতির উৎকর্ষের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এগুলি মানুষের কীর্ত্তি ও গৌরবস্থল। তারই সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ গৃহনামের অযোগ্য কলের মজুরদের বাসস্থানগুলি।

"আমি বলি, আপনারা ২।৩ জন প্রতিনিধিকে ভিয়েনায় পাঠাইয়া দিন। তাঁরা দেখিয়া আসুন কমিউনিষ্টরা সেখানে কি বিপুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তারা গৃহ-সমস্যার কি চমৎকার সমাধান করিতেছে। বোম্বাই, আহম্মদাবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ, করাচী, কলিকাতার সাক্ষাৎ শমন-সদৃশ, সর্ব্বপ্রকার জীবাণুপূর্ণ গ্রামগুলির দিকে তাকাই, আর তাদের কথা মনে পড়িয়া যায়।

"এই সূত্রে শহর ডাব্লিন বা শহর কর্ক ও ঘুরিয়া আসা দরকার। কুটিরের চারিদিকে ছোট ছোট চষা জমির খণ্ড। আর তার সঙ্গে একটা করিয়া নিজ নিজ গোয়াল ঘর যুক্ত রহিয়াছে। আইরিশ্ ওয়ার্কিং পার্টি সেগুলি তুলিয়া দিয়াছে ও চালাইতেছে।

"আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে, আমরা প্রতি নির্ব্বাচনের সময় গ্রেট বৃটেন ও ইয়োরোপে মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একটা করিয়া কমিউনিষ্ট প্রোগ্রাম খাড়া করি। আমরা-বলি, শহরের কর্পোরেশ্যানের প্রথম কর্ত্তব্য সমগ্র দুধের যোগান ও রুটির যোগান হাতে রাখা ও বণ্টন করা। পুরাণা নিয়মটা কি ছিল? না, আমরা কতকগুলি অজ্ঞ, অসহায়, দারিদ্র্য-পীড়িত লোককে বলিয়া দিতাম, কলিকাতাবাসীদের দুধের যোগানটা উৎপাদন করিবার ভার লইয়া তোমাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া লও।" এই সব লোক অনেক অনেক মণ দুধ লইয়া সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিবে। কিন্তু তাদের এক ছটাক দুধও নিজের স্ত্রী বা পুত্রের জন্য

লইবার এক্তিয়ার নাই। দুধ বেচিয়া তাকে মুনাফা রাখিতে হইবে, তবে সে বাঁচিয়া থাকিবে। গোয়াল ঘর পরিষ্কার না করিয়া অথবা তার গরু বাছুরকে ভাল খাইতে না দিয়া যদি তার চলে, তবে কখনই সে পয়সা খরচ করিবে না। দুধের মধ্যে জীবাণু জন্মিলে, তার কি? সে ত দু'পয়সা বেশী পাইল। আর ঐ দু'পয়সা বেশী পাইবার জন্যই সে দুধে জল মিশাইতে ইতস্ততঃ করে না।

"এই সব কর্ত্তব্যের অবহেলা নিবারণের জন্য ইন্স্পেক্টার ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ-কারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু দুধে জল মিশাইবার পূর্ব্বে বা রোগের জীবাণু জন্মিবার পূর্ব্বে ত কোনো প্রতীকার থাকে না। আমরা বলি, "সমাজের এই পুরাণা অবস্থাটাই উঠাইয়া দাও। দুধ বেচিয়া লাভ করিবে এই অবস্থাটাই দূর করিয়া দাও। ইন্স্পেক্টার ইত্যাদি রাখিবার প্রয়োজন নাই। কর্পোরেশ্যন স্বয়ং স্বাস্থ্যকর গোশালা স্থানে স্থানে নির্ম্মাণ করুক। সেগুলিকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করুক। তারপর গোয়ালাদিগকে এই কথা বলা হোক্, 'দুধ বেচিয়া তোমাকে আর লাভ করিতে হইবে না। তোমাকে যথেষ্ট পয়সা দিবার বন্দোবস্ত আমরা করিয়া দিতেছি। তোমার কাজ হইবে শুধু নিয়মিতভাবে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ঐ খাঁটি দুধ ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া"। তখন আর একটা লোকেও দুধে জল মিশাইয়া লোক মারিবার চেষ্টা করিবে না।

"রুটি ও ময়দা সম্বন্ধেও আমরা ঐ ব্যবস্থা করিতে চাই। ধর একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোক সারাদিন খাটিয়া ক্লান্ত হইয়াছে। তাকে বলা হইল, 'গম খাও; তোমার দুর্ব্বল ও শ্রান্ত শরীরের পূর্ব্ব শক্তি ফিরিয়া আসিবে।' তখন সেই ময়দা বা গমে যদি বিক্রেতা আধাআধি ভেজাল মিশাইয়া থাকে, সেই পুরুষ বা স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ হয়? সে অবশ্য মরে না। কিন্তু তার শরীরের জন্য যা দরকার তা সে পায় না। দিন দিন তার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। হয়ত ৫।৭।১০ বৎসর পরে যক্ষ্মা বা অন্য কোনো উৎকট বেয়ারামে আক্রান্ত হয়।

"সেই জন্য আমরা বলি, 'কমিউনিজ্‌মের নামে ভয় পাইও না। গরিবেরা তাদের অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনমত পাইতেছে না। প্রত্যেক কর্পোরেশ্যনের কো-অপারেটিভ্ রীতিতে সেগুলি পাইবার ব্যবস্থা করা দরকার।

"গ্রেট বৃটেনের গরিব মজুরদের বিদেশাগত মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই মাংস প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসে। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ার কোনো বণিকই মাংস বেচিয়া পাউণ্ড প্রতি কখনো ৵১০ আনার বেশী পায় নাই। অথচ ব্যাটারসীর বা অন্য স্থানের কোনো মজুর তা গড়ে ৸৵১০র কমে কিনিতে পায় না। ফলে সে তার দরকার মত খাদ্য পায় না। কিন্তু সেখানে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ভার লইয়াছে হাজার হাজার লোককে খাইতে দিবে। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল পাইকারী দরে মাংসটা কিনিয়া আনে ও মাত্র ।৵১০ আনা পাউণ্ড দরে বেচিতে সমর্থ হয়। আমরা বলি, গ্রেট বৃটেনের সকল কর্পোরেশ্যন যদি এই নীতি অবলম্বন করে, তবে মাংসের মত এমন একটা দরকারী জিনিষের যোগানটা কত সহজ হইয়া যায়। কলিকাতা কর্পোরেশ্যনও যদি এই প্রথায় চাউল, গম, ময়দা, শস্য, লবণ, ঘী ইত্যাদি কিনিয়া খুচরা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, তবে লোকে সস্তায় জিনিষ পায় এবং জিনিষটাও খাটি পায়।

"ওয়াণ্ডস্ওয়ার্থ আমার বরো ব্যাটারসীর লাগালাগি। সেখানে এক বিদ্যুতের কারবার মাথাপিছু ।৵০ করিয়া আদায় করে। অথচ ব্যাটারসী বরো কাউন্সিল ব্যাটারসীবাসীদিগের নিকট মাত্র ৵০ আনা করিয়া লইয়া বিজলী সরবরাহ করিতেছে।

"এখানকার গবর্ণমেণ্ট বিদেশী। লোকের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশ্যনের অন্ততঃ এইটুকু ক্ষমতা আছে যে, কলিকাতাবাসীরা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এখন যত খরচ করে তার অর্দ্ধেক খরচ করিয়া সেগুলি পাইতে পারে। এ কাজটা সোশিয়েলিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

"কেহ কেহ বলে কলিকাতা কর্পোরেশ্যন এই রকম সব কাজ হাতে লইলে বণিক ইত্যাদির স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে। তা মোটেই নয়। আর ধর যেন হইলই।

তাতেই বা কি? মুষ্টিমেয় কতকগুলি ধনী ব্যক্তির লাভের অঙ্কটা কিছু কম হইবে। কিন্তু তার বদলে লক্ষ লক্ষ লোক তাদের শক্তি ও স্বাস্থ্য যদি ফিরিয়া পায়, তবে কতকগুলি বণিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাতির পক্ষে কি আসে যায়? কিন্তু এই বণিকদেরও নালিশ করিবার কি আছে? ছোট দোকান বড় দোকানের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু সে জন্য ছোট দোকান কি বলিতে পারে, "তোমার দোকান বন্ধ কর?" কলিকাতা কর্পোরেশন যদি ঢের জিনিষ পাইকারী দরে কিনিয়া সস্তায় বেচিতে সমর্থ হয়, তবে কারও তা লইয়া অভিযোগ করিবার অধিকার নাই।

"গৃহ-সমস্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা। ব্যাটারসী মিউনিসিপ্যাল বরো লক্ষ কাজের ফর্দ্দ হাতে লইয়াছে। ভিয়েনা কর্পোরেশন নারীদের জন্য সস্তা বাড়ী-ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রভূত লাভবান্ হইতেছে। সেই সব আয়তনের মধ্যে ডাক্তার বৈদ্যের দরকার কমিয়াছে। মৃত্যু-হার নামিতেছে। পরিচ্ছন্নতা-প্রিয়তা বাড়িতেছে।

"অট্টালিকার দেশ কলিকাতাতে এখনো বর্ব্বর প্রথার জের চলিতেছে। প্রাসাদশ্রেণীর পাশেই ন্যক্কার-জনক ঘরবাড়ী সব দাঁড়াইয়া আছে। যারা প্রাসাদে বাস করে প্রাসাদ তাদেরই। কাজেই তাদের কোনো ভাড়া দিতে হয় না। তাদের দেওয়ালে অথবা গাঁথনীতে ফাট ধরিয়াছে কি অমনি মেরামতের অথবা সাজাবার ধুম পড়িয়া যায়। আমরা কমিউনিষ্টরা এদের এই কাজের জন্য গাল দিই না। বরং বলি, 'ঠিকই করিতেছে। নিজের থাকিবার জায়গাটাকে আরও উপযোগী করিতেছে। আমরা গাল দিই যখন এই লোকেরা পাটকলের মজুরদের জন্য যা ইচ্ছা তাই বাড়ীঘর তৈয়ারী করিয়া দেয়। মজা এই, এই সব বিশ্রী বাসস্থানের জন্যও মজুরদের বাড়ী-ভাড়া দিতে হয়। আর সে ভাড়াটা ঐ বাসস্থানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হয় না, ব্যয়িত হয় লাখপতির প্রাসাদের জন্য। লাখপতি তার অট্টালিকায় একটা ছোট ছিদ্র দেখিলে একদিন অপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু তার ভাড়াটের বেলায় তারম্বরণ ধারণ অন্যরকম হইয়া যায়।

"আমরা জগতের সকল কর্পোরেশনকে ডাকিয়া বলিতেছি, "লোকে তার বাস-স্থানের বাবদ যে ভাড়াটা দিল, সেই টাকাটাও তার নিজের বাড়ীর উন্নতির জন্য ব্যয় হয় না! এ কি রকম ব্যবস্থা?" আমরা বলি, 'সোভিয়েট মিউনিসিপ্যালিটিগুলির এ বিষয়ে কার্য্যপ্রণালী উৎকৃষ্টতর।' তাদের মতে "বাড়ী জমীদারের নয়, মিউনিসিপ্যাল নাগরিকদের"। তারা লোকদের ডাকিয়া বলে, 'জমীদার নামক ব্যক্তিটার হাতে তোমার ঘর-বাড়ীর টাকাটা তুলিয়া দিও না। সড়কে সড়কে একজন করিয়া সেক্রেটারী নিয়োগ কর। টাকাটা তার হাতে দাও।' কর্পোরেশনের কাজ হইতেছে সেক্রেটারীকে তার সড়কের বাড়ীগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলা ও হুকুম দেওয়া 'এই সম্পত্তিটা খারাপ অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাকে ঠিক করিয়া দাও।' এইরূপে ভাড়াটা কো-অপারেটিভ প্রচার সাহায্যে সংগৃহীত হয়। আর প্রত্যেক বছর খারাপ সম্পত্তি ভাল হইয়া যায়। বাড়ীকেনার মুখ্য উদ্দেশ্য জমীদারের আয় বাড়ানো, সে বাড়ীতে লোক কষ্ট করিয়া থাকিবে বা থাকিবে না—সেটা গৌণ কথা। এই মামুলি প্রথার মূলোচ্ছেদ যদি হয়, তবে কলিকাতা কর্পোরেশন আর ভুআ কাউন্সিল থাকিবে না, কলিকাতাবাসীর রক্ষক ও বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে।

"কেহ কেহ বলিবে, 'এইত বল্‌শেভিকী বাত। সকল জিনিষ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবার কথা!' কিন্তু বাজেয়াপ্ত করিতেছে কে? জমীদারেরা নয় কি? যে টাকাটা ন্যায়তঃ প্রজা বা ভাড়াটেদের জন্য ব্যয় হওয়া উচিত, জমীদাররা তাই সরাইয়া রাখিতেছে। আমি শুধু বলিতেছি, এই জুলুম বন্ধ করিয়া দাও, ভাড়ার টাকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তাদের হাতে তুলিয়া দাও।

"মিতব্যয়ী ও ধনী দুই জন সমাজের দুই প্রান্তে দণ্ডায়মান। দুইজনই দাগী, তুল্য অপরাধী। ধনীদের উপর আমাদের কোনো আক্রোশ নাই। তারা বরং কৃপার পাত্র। তারা সমাজ-ব্যবস্থার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তারা না জানিয়া পরের অমঙ্গল করিতেছে। ব্যক্তিগত মুনাফা বা সম্পত্তির কোনো প্রয়োজন আছে কি? আজ সকালে

করাচীর এক কাগজে পড়িতেছিলাম, 'একজন লোক বহুকষ্টে মিতব্যয়িতার ফলে ২০০৲ টাকা জমাইয়াছে।' ২০০৲ টাকা কেন? আপনাদের মধ্যে ক'জন লোক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন পত্নীপুত্রদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইবার পক্ষে, যথেষ্ট পরিচ্ছদ ও আশ্রয় যোগাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত উপার্জ্জন করিতেছেন? ক'জন তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি অনুযায়ী উপার্জ্জন করেন? ক'জন বলিতে পারেন স্ত্রীর প্রসবকালে সুচিকিৎসার অভাব হইবে না? বা বৃদ্ধবয়সে পিতামাতাকে সুখেস্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিবেন? খুব অল্প কয়জন। বাকী সবারই এই সব অভাব দূর করিবার সামর্থ্য নাই। সমাজ তাদের উপদেশ দিতেছে, 'টাকা জমাও, মিতব্যয়ী হও।' কিন্তু প্রত্যেকটা পয়সা জমাইবার সময় সন্তানদের অ-যথেষ্ট বরাদ্দ হইতে আরও কিছু বাদ দেওয়া হইতেছে। ইহা পাপ।

"তারপর ধনীরা কি করিতেছে? বড় উকীল, ডাক্তার অধ্যাপক অথবা এঞ্জিনিয়ার বলে আমি আমার পত্নী-পুত্রদের পরম সুখের মধ্যে রাখিব। ছেলেদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জায়গায় শিক্ষা দিব।' আমরা বলি বেশ কথা। তোমার কাজ করিয়া যাও। কিন্তু সকল মানবকে সমান হিত লাভ করিতে দাও।' এইরূপ একজন ব্যক্তি হয়ত বলিবে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ঠিকমত ও শৃঙ্খলামত পাইবার জন্য আমি প্রতিদিন ২০০৲ টাকা চাই। আমরা বলি তথাস্তু। এই নাও, কিন্তু তারপর? আমরা দেখি উকীল, সার্জ্জন, এঞ্জিনিয়ার, বড় ডাক্তার, বড় ম্যানেজিং ডিরেক্টার, খনির মালিক দিন ২০০ টাকায় সন্তুষ্ট নয়। সে তার ফী বাড়াইয়া দিন হাজার বা দু'হাজার টাকা চাহিতেছে, অথবা ঘরভাড়া বাড়াইয়া লাভের চেষ্টা দেখিতেছে। এটাও পাপ। বর্ত্তমান সমাজের ব্যবস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অন্যায়। তাই সে এরূপ করিতেছে। পীড়িত হইলে, বৃদ্ধ হইলে, অথবা নিহত হইলে সমাজ অত্যন্ত নির্দ্দয় আচরণ করে—শাস্তি দেয়। ব্যাধি বার্দ্ধক্য দৈবে মানব তার সমগ্র আয় হইতে চিরকালের জন্য বা কিছুকালের জন্য বঞ্চিত হয়। একটা চোরকে জেলে পূরিয়া সমাজ তার খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, শুইতে খাট দেয়, অসুখ হইলে ডাক্তার দেখায়। অথচ যদি পীড়িত হই, বুড়া হইয়া কাজে অশক্ত হইয়া যাই অথবা নিহত হই, সমাজ বলে, তোমার জন্য আর আমার কোন দায় রহিল না।

"সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা এরূপ সমাজের অবশ্যম্ভাবী ফল। যে যত পারে তার প্রতিবেশীকে প্রবঞ্চনা করিয়া, পয়সা জমাইতে চায়। আর এই সবগুলি তখন ধর্ম্ম আখ্যা পায়। এগুলি পাপ। আমরা কমিউনিষ্টরা বলি, জীবনের এই দুঃসহ অবস্থার অবসান করিয়া দিতে চাই। আমরা সমগ্র সমাজকেই কলিকাতা কর্পোরেশ্যানে পরিণত করিতে চাই। জাতীয় জীবনের কতকগুলি বিভাগ মাত্র নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে মিলিত অধিকার, নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে মিলিত কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রের প্রতিব্যক্তির জন্য ন্যায্য অপক্ষপাত বণ্টনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চাই। আর প্রত্যেক নরনারীকে বলিতে চাই, যতক্ষণ তুমি সৎ থাকিবে, আপনার শক্তিসাধ্যঅনুযায়ী সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার ব্যাধি বার্দ্ধক্যে ও দৈবে তোমার পরিবার-পরিজনকে সুচারুরূপে পালন করিবার ভার সমাজ লইতেছে। একবার নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে, ব্যক্তিগত মুনাফার লোভ এবং সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার প্রয়োজন দূর হইয়া যাইবে।"

এম্পায়ার কটন রিভিউ

জানুয়ারী, ১৯২৭।

এই সংখ্যায় কতকগুলি প্রবন্ধে তুলা খরচ সম্বন্ধে অনেকগুলি দরকারী আঁকজোক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১–১৩ সনের সহিত ১৯২৪-২৬ সনের একটা তুলনাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ লোকে জানে যে, বৃটিশ তুলার কলওয়ালাদের ভাগ্য মন্দ হইয়াছে। কিন্তু এই মন্দ যে কত মন্দ, তা সাধারণে ধারণা করিতে পারে না। সমগ্র বিশ্বের উৎপাদনে অদল বদল হইয়া গিয়াছে। তার সঙ্গে তুলনা করিলে দুরবস্থাটা আরো স্পষ্ট হইবে।

একটা বিশেষ কথা এই যে, কাঁচা তুলার দর হঠাৎ নামিয়া গিয়াছে; এবং বৃটিশ তুলার বেপারীদের একটা

শ্রেণীমাত্র (যদিও সর্ব্ববৃহৎ শ্রেণী) অবনত হইয়াছে। যে সব কোম্পানী তুলার নানা প্রকার সূক্ষ্ম কাজ করে ও উন্নততর সূতা ব্যবহার করে বিদেশীদের সহিত টক্কর দিয়া তারাই ভালভাবে টি'কিয়া আছে।

সব চেয়ে বড় ঘটনা হইতেছে এশিয়ার দেশগুলির তুলার খরচ অসম্ভবরকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অতি-বাড়টা হইয়াছে প্রধানতঃ জাপানের পক্ষে। চীন এবং ভারতও অবশ্য ভাগ পাইয়াছে। এই বৃদ্ধিটা ভারতীয় তুলার জন্য ৩৯% হইতে মিশরীয় তুলার জন্য ১২৮% হইয়াছে। গড়পড়্তা ৫১%।

১৯১১-১৩ সনের তুলনায় ১৯২৪-২৬ সনের তুলার খরচের হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হিসাব নিয়ে দেওয়া যাইতেছে :—

ইংল্যাণ্ড	−২৭%
ইয়োরোপ	−১৫%
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	+২৬%
এশিয়া	+৫১%
সমগ্র জগৎ	+৬%

বৃটিশ তুলার খরচ কম হইয়াছে সমগ্রটাই সস্তাদরের আমেরিকান্ তুলার পর্য্যায়ে। উহা ১৯২৪-২৬ সনে ১৯১১-১৩ সন হইতে ৪০% কম।

মিশরীয় তুলার খরচ বাড়িয়াছে ৭% এশিয়া ভিন্ন আর কোন প্রতিযোগী দেশের পরিমাণ এত বড় হয় নাই। মিশর সমগ্র জগতকে যত তুলা দেয় তার ৫০% ইংল্যাণ্ডের জঠরে যায়।

ভারতীয় তুলা ও টুকিটাকি বাড়িয়াছে যথাক্রমে ২৫৮% ও ১২৯%। কিন্তু অনুরূপ বৃদ্ধি ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের পক্ষেও ঘটিয়াছে। আর অন্য একটা হেতু এই যে, নূতন নূতন আয়তনে তুলার চাষ হইতেছে।

তুলার জিনিসের উৎকৃষ্টতায় ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা এখনো বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মোট জিনিষ তৈয়ারীতে ৪০% হ্রাস অথবা প্রায় ৩০ লক্ষ বেলের ঘাট্তি বড় সহজ ব্যাপার নয়। এর ফলটা ম্যাঞ্চেষ্টার ও তার চারি পাশেই দেখা যাইতেছে।

আত্মশক্তি

ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক। কলিকাতা। শুক্রবার ২০ ফাল্গুন, ১৩৩৩, ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯২৭। /০ আনা। পত্রসংখ্যা ২০।

উল্লেখযোগ্য রচনা।—(১) চলতি পথে—সরকারের কর্ত্তব্য-প্রিয়তা (বাঙ্গালা সরকারের রাজকোষে বহু টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কারণ জলনিকাশের ব্যবস্থা, কচুরী পানা নিবারণ, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সমিতি স্থাপন ইত্যাদি বহু দরকারী কাজে হাত দেওয়া হয় নাই। অথচ পুলিশের জন্য বরাদ্দটা খরচ হইয়া গিয়াছে, আবার ঋণও করা হইতেছে।) কংগ্রেসে গোলমালের অবসান; কুষ্টিয়ায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ; পাবনার হাঙ্গামার জের; রাজবন্দী ও বাঙ্গালা সরকার। (২) ভূত ও সরিষা, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক বলিতেছেন, সরিষা দিয়া ভূত ছাড়ান হয়। কিন্তু সরিষার মধ্যেই যদি ভূত ঢুকিয়া থাকে, তবে আর ভূত তাড়াইবে কে? ১৯০৫ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় তথা ভারতে স্বাধীনতা প্রচেষ্টার অনেক রূপ দেখা গেল। তবু আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম। ইহার কারণ কি? "যাঁরা স্বাধীনতা চান তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতা চান না, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত প্রভুত্ব চান।" "দেশে রাজনীতি লইয়া যা-কিছু আন্দোলন, তা উকীল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার জমীদার, ডাক্তার, ব্যবসাদার, মহাজন, ইস্কুলমাষ্টার, সংবাদ-পত্রসেবী ও তাহাদের সন্তান-সন্ততির একচেটিয়া জিনিষ।" অথচ সামাজিক ও আর্থিক হিসাবে দেশের শতকরা ৯৯ জনকে ছোট করিয়া রাখিয়াই এরা বড় হইয়াছেন।"

(৩) যৌবন ও ভবিষ্যৎ জাতি-গঠন। আলবার্ট হলে বঙ্গীয় যুবক সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত সাপুরজী শাক্লাতোবালা যা বলেন, তারই বঙ্গানুবাদ। বক্তার মোট বক্তব্যটা এইরূপ :—

"দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে গত যুগের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সফলতা লাভ করে নাই। নূতন যাত্রা-পথ তৈয়ারী করিয়া লইবার দাবী যৌবন

করিতেছে। কিন্তু তার চেয়ে যে প্রয়াস সফল হয় নাই তা জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করাই ভাল।

"সকল নবীন অনুষ্ঠানে দুইটি জিনিষ একান্ত দরকার। (ক) অতীতে যা করা হইয়াছে ও তার কি ফল ফলিয়াছে সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ পর্য্যালোচনা। (খ) এমন যুগান্তকারী মনোভাব যা কোন পরিবর্ত্তনকেই মানিয়া লইতে ভীত বা চকিত হয় না।

"যুবকযুবতীরা মনীষা-সম্পন্ন হোক্, পিতৃ-পিতামহের বাধাবিপত্তির কথা বুঝিতে শিখুক, তাঁরা কি করিতে পারিতেন তা উপলব্ধি করুক। নূতন কর্ম্মধারায় ভবিষ্যতে কি হইবে সে ভাবনা না ভাবিয়া সাহস, উৎসাহ ও উন্নত মনের সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত হউক।

"ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ডে ইয়ং মেনস কমিউনিষ্টিক লীগ মোতায়েন আছে। ১২ বছরের ছেলেরাও এই লীগে বক্তৃতা করিতে পারে। টাইপিষ্ট কোনো কোনো মহিলা এত অল্পবয়স্ক যে সংসারের কিছুই জানে না। তারাও বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইতে ভয় পায় না। এই লইয়া খবরের কাগজে বিদ্রূপ হইয়াছিল। এই সব কাগজের প্রতিনিধিরাই টিট্‌কারী দিতেছিল, 'ক্যাণ্টনী সৈন্য যুদ্ধ করিতে আসিতেছে! চীনা বালকেরা অভিযান করিয়াছে!!' সেই পুরাতন রক্ষণশীল বৃটিশ মনোভাব! ঐ অর্থহীন নিষ্ঠুর মনোবৃত্তিই কোটি কোটি মানবকে তাদের স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বেশীদিন নয়। এই নীচ মনোবৃত্তি চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শেফিল্ডের বালকেরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে। চীনের অল্পবয়স্ক বালকেরা রাজকীয় সেনাদলকে তুচ্ছ করিয়াছে। যৌবনের জয়জয়কার। রুশিয়া, ফ্রান্স, গ্রেট্ বৃটেন বা চীন পৃথিবীর যেখানেই যাওয়া যাক্ না, সকল দেশের যুবকেরা বুঝিতে শিখিতেছে, তারাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

"এই জাগরণের অর্থ কি? পূর্ব্বে লোকের অন্ধ বিশ্বাস ছিল, যুবকদের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যোগ দেওয়া উচিত নয়। এও মিথ্যা কুসংস্কার মাত্র। এদেশেও বিদেশীর কর্ত্তৃত্বে ঐ মতবাদ প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, কোন পুস্তকেই রাজনৈতিক প্রচার বাদ পড়ে নাই। সর্ব্বত্রই ইংরেজের উজ্জ্বল চিত্র। যেন ভগবান্ ইংরেজদের জন্যই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরেজ শিশুদের মনে এই মনোভাবের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য নীতিবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। সাম্যবাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। রক্ষণশীল নরনারীরা সরকারের কাছে নালিশ করিয়াছে আমরা নাকি বলশেভিক মন্ত্র প্রচার করিতেছি। কোন মানুষই রাজনৈতিক প্রভাব বা প্রতিপত্তি হইতে মুক্ত নয়। যে সব গৃহে আমরা বাস করি, যে সব পরিচ্ছদ আমরা নিত্য পরি, আমাদের পাঠ্যপুস্তকসমূহে, সংবাদ পত্রে, মন্দিরে, মস্‌জিদে, প্রচার কার্য্যে সর্ব্বত্রই সুবিধাবাদীদের স্বার্থ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও প্রভাব রহিয়াছে। তাহাই ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এই জাগরণ।

"বিজ্ঞান দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। আজকাল প্রতি ঘণ্টায় নানা রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটিতেছে। জগতের গতির সহিত প্রত্যেকের জীবন ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই সব সংবাদ প্রভৃতি তন্ন তন্ন পর্য্যালোচনা করা, কি হইতে কি হয় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। ইহাই রাজনীতি।

"ইংল্যাণ্ড, রুশিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের তরুণদলের সহিত এদেশের তরুণদলের একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। ইংল্যাণ্ডের ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগের অধিকাংশ সভ্যের বয়স ৮, ৯, ১০, ১২ বৎসর ইউরোপের প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পর একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ এবং সঙ্ঘবদ্ধ। কিন্তু এদেশে বোম্বাইর "ষ্টুডেণ্টস্ ব্রাদারহুড" বাঙ্গালার "যুবক সমিতি" করাচীর "জোরোস্ট্রিয়ান যুবক সঙ্ঘ" ইত্যাদি কেহ কারও খবর রাখে না। সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ায় এই আন্দোলন সফল হইতেছে না। দেশব্যাপী এক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানই "ইয়ং কমরেড্‌স লীগ অব্ ইণ্ডিয়া" এই নাম গ্রহণ করুক। বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ সর্ব্বত্রই নিজ নিজ পত্রিকা থাকিবে। পরস্পর পরস্পরের বিষয় জানিতে পারিবে, জগতেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

"ভারতে, আফ্রিকায়, চীনে, প্যালেষ্টাইনে, মেসোপটে-

মিয়ায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বড় উন্নতিশীল ও উদার। সেইজন্য ১৫০ বছরের পর ভারতে ৬% শিক্ষিত আর ৯৪ °/০ অজ্ঞ! অন্য দিকে "সর্ব্বস্বান্ত" ও "ভিক্ষুক" রুশিয়ায় যুবকদের সাহায্যে শিক্ষার বিস্তার ৫ বছরে হইয়াছে ৬°/০ হইতে ৮২°/০।

"গরিবদের সঙ্গে মিশিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে, উন্নত করিতে হইবে। এদেশের গবর্ণমেণ্টের নীতি "শক্তিই স্বত্ব।" গবর্ণমেণ্ট তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুক, জনমত অপ্রতিহত হইয়া উঠিবে। আমরা উন্নততর জগতে বাস করিতে চাই, মানুষ হইতে চাই। তজ্জন্য সেই মনোভাব চাই যা যে-কোন নিগড় ভাঙ্গিতে পারে। দেশের জন্য প্রাণত্যাগও তুচ্ছ করে।"

(৪) বর্ত্তমান জগৎ (শ্রীপ্রমোদকুমার সেন)—রুশিয়ার উপর ইংরেজের ক্রোধ (স'র অষ্টেন চেম্বারলেন সোভিয়েট রুশিয়াকে যে হুম্‌কি দেখাইয়া চিঠি দিয়াছিলেন তার আলোচনা); চীনে বিরাট যুদ্ধের সম্ভাবনা; দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী।

(৫) কৃষি ও বাণিজ্য। (৬) দোষের প্রমাণ কোথায় (শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) (৭)—"মিথ্যার পসরা বহি ফিরি দ্বারে দ্বারে" (শ্রীশরৎচন্দ্র বসু)।

(৮) আলোচনা—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষ্যে লর্ড লিটন বলিয়াছেন, "আপনারা সকলেই স্বদেশপ্রেমিক ইহা আমি ধরিয়া লইতে পারি। কেহ মনে করেন রাজনীতিক স্বাধীনতা বাহির হইতে আশীর্ব্বাদের মত আসিতে পারে, কাহারও মতে স্বাধীনতা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, কাহারও মতে উহা চাপ দিয়া আদায় করিতে হয়। কিন্তু সকলেই ভ্রান্ত। রাষ্ট্র বাহির হইতে গড়িয়া তোলা যায়। কিন্তু জাতি ভিতর হইতে গড়ে। বিদেশীরা বাঙ্গালাকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অংশীভূত করিয়াছে। কিন্তু ইহাকে ভারতীয় জাতির অংশস্বরূপ করিতে কেবল আপনারাই অধিকারী। যদি ভারতকে স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, সহজ এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার-সম্পন্ন দেখিতে চান—তবে প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। জাতি হইতেই জাতি গঠন করিতে হইবে। ভারত সম্বন্ধে চিন্তা করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালাকে আপনাদের আগে চিন্তা করিতে হইবে। এবং বাঙ্গালাদেশের জন্য কিছু করিতে হইলে আগে বাঙ্গালী হইতে হইবে। শক্তিশালী হইতে হইবে। মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ব্যাধিজীর্ণ দেহভার, চঞ্চলমতি এবং দুর্ব্বলচরিত্র লইয়া কোনো জাতি বড় হয় না। যে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, দেশের দরিদ্রদিগকে জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত রাখাকে সে জাতির কলঙ্ক স্বরূপ মনে করে।"

(৮) বেকার-সমস্যা (শ্রীহৃষীকেশ সেন)।

রেহ্বিয়ু একনমিক অ্যাঁতার্ণ্যাশন্যাল

ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক পত্র। ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে ইংরেজ স্যার চার্লস মাগারা তুলা-শিল্পের আন্তর্জ্জাতিক তথ্যসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। মাগারা হইতেছেন তুলা-বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক ফেডারেশনের (সঙ্ঘের) প্রথম সভাপতি। দুনিয়ার সকল দেশে সুতার কারবার করে যে সব কারখানার মালিক, তাহাদের ভিতর সমঝোতা কায়েম করার প্রস্তাব এই প্রবন্ধের মোদ্দা। রুশিয়ার খনি-শিল্প সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন জেরিকফ্। বাকু জনপদের তেল, পেচোরার কয়লা আর সীসা এই কয় বস্তু প্রধান আলোচ্য বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-সচিব হুভার আমেরিকান বণিক-সঙ্ঘের সম্মুখে একটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার ফরাসী তর্জ্জমা এই পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। হুভারের মতে মজুরির হারবৃদ্ধি আর মালের মূল্য-হ্রাস এই দুই বস্তু মার্কিণ ধনোৎপাদনের বনিয়াদ। ধ্বংসকারী টক্কর আর গঠনমূলক টক্কর এই দুই প্রকার টক্কর বিশ্লেষণ করা হুভারের এক মতলব। আর একটা বড় তথ্য সম্বন্ধে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। হুভার বলিতেছেন যে, আজকালকার আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলে ধনী পুঁজিপতিদের তাঁবে নয়। তাহাদের অধীন (বেতন প্রাপ্ত) কর্ম্মদক্ষ ও সুবিবেচক পরিচালকদের (ডিরেক্টরদের) তাঁবে। বাস্তবিক পক্ষে ডিরেক্টরদের কর্ত্তৃত্বই বর্ত্তমান যুগের আর্থিক গড়নের বিশেষত্ব।

ফরাসী পণ্ডিত লেমোআন জার্ম্মানির শিল্প-সংসারে কেন্দ্রীকরণের ধারা যুদ্ধের পর কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র দিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন,—এ কিছু নূতন চিত্র নয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেও জার্ম্মাণশিল্পের গতি এই দিকেই ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি-সম্পদ্ আর্জ্জেণ্টিনা-ব্রেজিল-উরুগুয়ের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হাতের রচনা।

রেহ্বিু অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

ফরাসী ভাষায় সম্পাদিত মাসিক শিল্প-পত্রিকা। ১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আছে,—(১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনোৎপাদনে "যুক্তি-যোগ", (২) ফরাসী কয়লার বন্দরগুলাকে বর্ত্তমান মোতাবেক করিবার উপায়, (৩) চেম্বার অব্ শিপিং (জাহাজ-সঙ্ঘ) কর্ত্তৃক ইংল্যাণ্ডের বন্দর-বিষয়ক তদন্ত কায়েম, (৪) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বাধাবিঘ্ন, (৫) রংয়ের ব্যবসায় সঙ্ঘগঠন, (৬) কৃত্রিম রেশমের শিল্পে ইতালির দুর্যোগ, (৭) কৃষি-সমবায় চতুর্দ্দশ ফরাসী কংগ্রেস, (৮) জার্ম্মাণিতে ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার কাজে কর্জ্জ-সাহায্য, (৯) ১৯২৪ সন হইতে রূপার বাজার।

রেহ্বিু আঁতার্ণ্যাশন্যাল দু ত্রাহ্বাই

জেনেহ্বার বিশ্বরাষ্ট্রপরিষৎ হইতে প্রকাশিত মজুর, মজুরি বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকা। ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে আলবেয়ার তামা "আটঘণ্টার রোজ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়াছেন। এই দিকে কোন্ দেশের গবর্মেণ্ট কতটা কাজ করিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত এই রচনার প্রথম কথা। ইংল্যাণ্ডে খনির মজুর সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আইন কায়েম হইয়াছে তাহাতে আটঘণ্টার রোজ বিষয়ক নিয়ম পুরাপুরি পালিত হয় না। এদিকে ইতালিতেও নতুন আইনের ফলে আট ঘণ্টার রোজ বিষয়ক নিয়মটা চাপা পড়িবার সম্ভাবনা।

তামা বলিতেছেন,—"ইংল্যাণ্ডের আর ইতালির নূতন আইনগুলা বিশেষ মারাত্মক নয় বটে; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থায় ঐক্য কায়েম করিতে হইলে এই ধরণের দুই ব্যতিরেক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।" তাঁহার মতে এই সকল ব্যতিরেকের ব্যবস্থায় মজুরদের কর্ম্মজীবন খানিকটা নীচ ধাপে নামিয়া আসিতে বাধ্য। অথচ মালোৎপাদনের পরিমাণও যে বাড়িয়া যাইবে এরূপ কোনো সম্ভাবনা নাই।

আঁরি ফুস্ ১৯২৫ সনের বেকার-বিষয়ক তথ্য ও অঙ্ক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই কারখানার সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে বেকার-সমস্যার যোগাযোগ নিবিড়। বহির্ব্বাণিজ্যের উঠানামার সঙ্গেও যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু তত বেশী নয়।

বুল্তাঁ দ' লা শাঁবর দ' কম্যার্স দ' পারি

প্যারিসের বণিক-সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯২৬ সনের শেষ তিন মাসে আছে:—(১) আটঘণ্টার রোজ বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি (বোদে), (২) প্যারিস জনপদের গৃহ-সমস্যা, (৩) বিদেশে ফরাসী দূত ও কন্সালদের আর্থিক জীবন। লেখক ব্রিজঁ বলিতেছেন,—"১৯২৬ সনে বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স নগরে ইংরেজ রাষ্ট্রপ্রতিনিধি পাইতেন বৎসরে ৭০৪,০০০ বেলজিয়াম ফ্রাঁ, ব্রেজিলের প্রতিনিধি পাইতেন ১৯২,০০০ ফ্রাঁ, কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিনিধি পাইতেন ১৮৫,০০০ ফ্রাঁ মাত্র। প্রতিনিধিদের অবস্থাই এইরূপ। সহকারী কেরাণী ইত্যাদির অবস্থা এই অনুপাতের চেয়েও ছোটো দরের। ইহাতে বিদেশে ফ্রান্সের ইজ্জৎ যায়।" (৪) রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর কর রদ করা আবশ্যক (সুরি)। (৫) মজুর-ডুনিয়ায় বিরোধ ঘুচাইবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ল্যোব্‌লিট্‌জ্ বলিতেছেন,—"এ জন্য কোনো আইন কায়েম হওয়া উচিত নয়। হইলেই গণ্ডগোল বেশী বাড়িবে। যে-যে দলে বিরোধ তাহারা আপনা হইতেই স্বাধীনভাবে বিরোধ ঘুচাইবার কাজে অগ্রসর হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।"



প্রবাসী ইতালিয়ান নরনারীর অর্থকথা

জাপানীরা বিদেশে যায়। তাহাদের সুখদুঃখ তদবির করিবার জন্য জাপান-সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইতালিয়ান নরনারীরা বিদেশে গেলেও স্বদেশী গবর্মেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণ কিছু কিছু ভোগ করে। অধিকন্তু প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে তাহারা ইতালিয়ান গবর্মেণ্টের নিকট হইতে নানা প্রকার সাহায্য ও পরামর্শ পাইয়া থাকে।

লোকেরা দেশত্যাগী হইয়া বিদেশে যায়,—অন্নবস্ত্রের তাড়নায়। কাজেই লোক-রপ্তানি কাণ্ড আর্থিক জীবনের এক বড় দফা। অপর দিকে যেসকল দেশের ভিতর বিদেশী লোক আসিয়া বসবাস করে, সেই সকল দেশেও ধনসম্পদ-বৃদ্ধির জন্যই লোকের চাহিদা থাকে। লোক-আমদানি ঘটে চাষবাসের জন্য, ফ্যাক্টরি-কারখানার জন্য, রেল কর্ম্মকেন্দ্রের জন্য ইত্যাদি। এক কথায় সকল দিক্ হইতেই জীবনের এক বড় কথা হইতেছে লোকজনের আন্তর্জ্জাতিক চলাচল বা আমদানি-রপ্তানি।

ভারতে আমরা লোকজনের আমদানি-রপ্তানি কাণ্ডটা গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিতে সুরু করি নাই। বিদেশ-প্রবাসী ভারতসন্তানের আর্থিক তত্ত্ব এখনো স্পষ্টরূপে আমাদের মগজে বসে নাই। কিন্তু জাপানীরা আর ইতালিয়ানরা এই দিকে কি কি করিতেছে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাইলে আমাদের ধনবিজ্ঞানসেবীদের মাথা খুলিতে পারে। সম্প্রতি ইতালির কথা বলিতেছি।

রোমে "কমিসারিয়াত জেনেরালে দেল্ এমি গ্রৎসিয়নে" (বহির্গমনের বড় আফিস) অবস্থিত। এই আফিসের কাজ-কর্ম্ম আজকাল সর্ব্বত্র সুবিদিত। কাজকর্ম্মের ধরণ-ধারণ নিম্নলিখিত নয় খানা পুঁথি হইতে কথঞ্চিৎ আন্দাজ করা চলে,—

(১) "লা লেজ্জে এ ইল রেগ লামেন্ত দেল্ এমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমনের আইনকানুন ও শাসনপ্রণালী)। ২৬০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।

(২) "ইল কমিসারিয়াত জেনেরালে দেল্ এমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমনের বড় আফিস)। লোক-রপ্তানি-বিষয়ক শাসন কর্ম্ম সবই এই কমিসারিয়াত হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাঁহারা বর্ত্তমানযুগের" বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে ওস্তাদ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ইতালির এই বড় আফিসের কর্ম্মকৌশলটা রপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। বৃত্তান্ত ৪৭ পৃষ্ঠায় সারা হইয়াছে।

(৩) "ইল ফন্দ প্যার লেমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমনের ধন-ভাণ্ডার)। লোক-রপ্তানির কাজে যেসব টাকা-কড়ির দরকার হয় তাহার উৎপত্তি আর খরচপত্রের কথা বিবৃত আছে ৩২ পৃষ্ঠায়।

(৪) লাসিস্তেন্‌ৎসা ইজীনিক-সানিতারিয়া আলি এমি-গ্রান্তি দা পার্তে দেল্ল স্তাত ইতালিয়ান" (প্রবাসগামীদের জন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক সরকারী সাহায্য), ৪৩ পৃষ্ঠা।

(৫) "লা প্রেপারাৎসিয়নে কুল্‌তুরালে এ প্রোফেসনালে দেল্ এমিগ্রান্তে ইন্ পাত্রিয়া" (প্রবাসগামীদিগকে বিদেশে খাওয়া পরা ও চলাফেরার অনুরূপ শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা)। ৫০ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে যে সকল কথা বিবৃত আছে তাহার দিকে ভারতবাসীর নজর ফেলা আবশ্যক। বিদেশের ভাষা বিদেশী সমাজ, বিদেশের লেনদেন আর সৌজন্য শিষ্টাচার সম্বন্ধে নেহাৎ আনাড়ি যাহারা তাহারা বিদেশে যাইয়া উল্লেখযোগ্য ফললাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ

বিদেশীয়াও নবাগত "বাঙাল"গুলাকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। ইতালিয়ান নরনারী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহুক্ষেত্রে অপদস্থ হইয়াছে। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে ইতালিয়ানরা আজকাল বিদেশ-প্রবাসী হইবার সময় স্বদেশেই যথাসম্ভব বিদেশী চালচলন শিখিতে সুরু করিয়া দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিব, অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করিব, মার্কিণ মুল্লুকে বসবাস করিব,—অথচ হাঁড়িকুঁড়ি, শিল নোড়া, আর "হাঁচি টিকৃটিকি" কিছুই বাদ দিব না, এই নীতি অবলম্বন করিলে বিদেশে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। যুবক ভারত এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝুন। ইতালি যে ইতালি,—ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার,—সেও "ইতালিয়ান স্বদেশী সমাজ লইয়া" মার্কিণ মুল্লুকে হাজির হইলে কল্কে পায় না। ইতালি বর্ত্তমাননিষ্ঠ,—তাই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেছে। ভারতবাসীর এই সম্বন্ধে ইতালির নিকট অনেক-কিছু শিখিবার আছে।

(৬) "লা স্বালরিজাৎসিঅনে দেল্ এমিগ্রান্তে প্যব্ মেৎস দেই কন্ত্রাত্তি দিলাহ্বর" (মজুরির চুক্তি অনুসারে প্রবাসীদের আর্থিক কিম্মৎ কতটা), ৭০ পৃষ্ঠা।

(৭) "লে স্তাতিস্তিকে দেল্ এমিগ্রাৎসিয়নে ইতালিয়ানা (১৮৭৬-১৯২৪)."—(ইতালিয়ান লোকরপ্তানির অঙ্ক-সংখ্যা,—৫০ বৎসরের তালিকা), ৫২ পৃষ্ঠা।

(৮) "আফকর্দি এ ত্রাত্তাতি দি লাহ্বর দেল্ ইতালিয়া কন্ আল্‌ত্রি প্যেজি" (ইতালির সঙ্গে অন্যান্য দেশের মজুর-বিষয়ক সমঝৌতা ও সন্ধি), ১৮৬ পৃষ্ঠা।

(৯) "লা তুতেলা জুরিসফিৎস্নালে দেলি এমিগ্রান্তি" (প্রবাসগামীদের রক্ষণাবেক্ষণ), ৬২ পৃষ্ঠা।

লোক-সংখ্যা-বিষয়ক গবেষণায় বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবীরা এখনো হাত দেখাইতেছেন না। কিন্তু হাত মক্স করিতে সুরু করিলেই লোকজনের আন্তর্জ্জাতিক গতিবিধি সম্বন্ধে মাথা খেলাইতেই হইবে। আর তখনই ইতালিয়ান "কমিসারিয়াতে"-প্রকাশিত পুঁথিগুলার ডাক পড়িতে বাধ্য। এই নয় খানা বই ১৯২৫-২৬ সনে বাহির হইয়াছে।

বহির্গমনকাণ্ডে ইতালিয়ানদের দরদ খুব বেশী। তুরিণ শহরের "সোসিয়েতা এদিত্রিচে ইণ্টার্ণাৎসিঅনালে" কোম্পানী একখানা বই বাহির করিয়াছে। তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাম "লা পিউ গ্রান্দে ইতালিয়া "(বৃহত্তর ইতালি)। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বজেলি এই গ্রন্থের সম্পাদক। দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে স্বাধীন বিদেশে ইতালিয়ান নরনারীর বর্ত্তমান অবস্থা। দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় ইতালির অধীন বিদেশে—ইতালিয়ান "উপনিবেশে"—ইতালিয়ান নরনারীর জীবনযাত্রা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইতালিয়ান নরনারীকে বিদেশে যাইতে দিবার পূর্ব্বে স্বদেশেই বিদেশ সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছু কিছু শিখানো হইয়া থাকে। বিদেশ-দক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে কি কি শিখানো হয়? এই বিষয়ে একখান বই আছে মিচ্চি-প্রণীত। ১৯২৫ সনে প্রকাশিত। নাম "লেমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমন)। পৃষ্ঠা ২৬২। প্রথম অংশে আছে লোকজনের আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বকথা। দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় বহির্গমনের কর্ম্মকাণ্ড। ইতালির গবর্ণমেণ্ট লোক-রপ্তানি কাণ্ডটা কি কৌশলে শাসন করিতেছে তাহার খুঁটিনাটি বিবৃত আছে। আর তৃতীয় অংশে আছে যে সকল দেশে ইতালিয়ানরা যায় সেই সকল দেশের লোক-আমদানি বিষয়ক নিয়ম কানুন।

লোরোপ মাল্‌থুজিয়েন

ফরাসী পণ্ডিত বুর্দ্র লোকসংখ্যা-বিষয়ক বিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিকটা গভীরতর ("ইণ্টেন্‌সিভ্") আলোচনা চালাইয়া একটা পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। ফ্রান্সে এই পুঁথির স্বপক্ষে বিপক্ষে আলোচনা চলিতেছে। প্রকাশক প্যারিসের লিব্রেয়ারি কলবেয়ার। কেতাবের নাম "লোরপ মাল্‌থুজিয়েন" (ম্যালথাস-প্রচারিত লোক-নীতির অধীন ইয়োরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান অবস্থা)।

ইয়োরামেরিকায় লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে কি কমিতেছে এই বিষয়ে মাথা ঘামানো আজকাল ধনবিজ্ঞানসেবীদের এক বড় ধান্ধা। দুনিয়ায় সাদা চামড়াওয়ালা নরনারীর প্রভুত্ব বজায় থাকিবে কি না,—থাকিলে কোথায় কতদিন, এই সকল প্রশ্নের জবাব লোক-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর

করিতেছে। সমস্যাটা একমাত্র অর্থনৈতিক নয়। খাঁটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্তর্গত হিসাবে লোক-সংখ্যা-বিষয়ক আলোচনা পশ্চিম মুল্লুকের সকল মহলেই উচুঁ ঠাঁই অধিকার করিতেছে। এশিয়ায় আর আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ-নীতি এই সকল আলোচনার ফলে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে,—ভবিষ্যতে আরও হইবে। কাজেই পশ্চিমা পণ্ডিতদের লোক-বিষয়ক গবেষণা ভারত-সন্তানের পক্ষে যে যার পর নাই দামী সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

বৃল্র্ঁ যে সকল দিকে গভীরতর আলোচনার পক্ষপাতী তাহার প্রধান কথা নিম্নরূপ:—ধরা যাউক,—কোনো একটা দেশের লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে কিংবা কমিতেছে। এই বাড়া-কমার অর্থ কি? বুল্রঁর মতে বাড়া-কমা কাণ্ডটা বিশ্লেষণ না করা পর্য্যন্ত এই তথ্যটা জানিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। বাড়া-কমা বিশ্লেষণ করা যাইবে কোন্ প্রণালীতে? বয়স অনুসারে দেশের লোকের শ্রেণী-বিভাগই আসল তথ্য। জন্মসংখ্যা যখন কমিতেছে তখন আগে কমে শিশুদের সংখ্যা তার পর কমে প্রবীণদের সংখ্যা। এই অবস্থায় গুনতিতে বাড়িয়া চলে একমাত্র বুড়াবুড়ীরা।

বুল্রঁ সনাতন ফরাসী ধনবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া বলিতেন:—"লোকসংখ্যা বাড়াইবার কমাইবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইনকানুন অথবা পারিবারিক ভাতা ইত্যাদি বিষয়ক নিয়ম অনাবশ্যক।" এই ধরণের "লেস্‌সে ফেয়ার" (সরকারী হস্তক্ষেপ নিষেধ) নীতি "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক"এর (ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ) পণ্ডিতবর্গের মন-মাফিক কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাপক জিদ-সম্পাদিত "রেভিয়্যু দেকোনোমী পোলিটিক" পত্রিকার যাঁহারা পৃষ্ঠপোষক তাঁহারা আর্থিক ব্যবস্থায় সরকারী শাসন, সরকারী সাহায্য, সরকারী আইন-কানুন, এক কথায় সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী নন। তাঁহারা ফ্রান্সে জন্ম-সংখ্যা বাড়াইবার মতলবে গবর্মেণ্টকে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে অনুরোধ করিতেছেন।

মূলধন ও বিনিময়

ইতালিয়ান পণ্ডিত ক্রজারা "সাজ্জ্য সুল্লে তেওরিয়ে দেল্ল স্কাম্ব্য এ দেল্লা কাপিতালিজ্জাৎসিয়নে" (বিনিময় ও পুঁজিনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ) বাহির করিয়াছেন (কাপ্পেল্লি কোং, বলঞা, ১৯২৬,১২৬ পৃষ্ঠা)। এই কেতাবের এক ফরাসী সমালোচনা দেখিলাম। সমালোচক আলবেয়ার আফতালিয়ঁ। প্রধানতঃ আডামস্মিথ-প্রচারিত মতামতের সমালোচনা করা ক্রজারার উদ্দেশ্য। পুঁজির প্রকৃতি, ধনোৎপাদনে পুঁজির ঠাঁই ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীন গবেষণাও আছে। বর্ত্তমান ইতালিতে পুঁজির অভাব খুব বেশী। সেই দিকে নজর রাখিয়া লেখক দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন। ইংরেজি ও ইতালিয়ান ধন-সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যে ক্রজারার দখল নাই। ফরাসী গ্রন্থাবলী বর্জ্জিত হইয়াছে। এমন কি অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত বোম বাভার্ক প্রণীত সুবিখ্যাত গ্রন্থও বাদ পড়িয়াছে। আফ্‌তালিয়ঁ বলিতেছেন এই যে, "বোম্-বাভার্কের পুঁজিবিষয়ক গ্রন্থ বর্ত্তমান জগতের ধন-সাহিত্যে অন্যতম ক্লাসিক।"

মূলধনের আমদানি-রপ্তানি

স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সকল দেশেই বিদেশী পুঁজি আমদানি করা হইয়াছে ও হইতেছে। আর বোধ হয় ভবিষ্যতেও অনুন্নত জাতিরা উন্নত জাতির ধনভাণ্ডার হইতে পুঁজি আমদানি করিয়া দেশোন্নতির নানা কাজ চালাইতে থাকিবে। কিন্তু পুঁজি রপ্তানি করায় অর্থাৎ বিদেশে ধার দেওয়ায় বা অন্য উপায়ে খাটানোয় ধনী দেশগুলার স্বার্থ কতটা? কাজেই মালের আমদানি-রপ্তানি আর লোকজনের আমদানি-রপ্তানি এই দুই আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের মতন টাকা-কড়ির আমদানি-রপ্তানিও ধনবিজ্ঞানসেবীদের দার্শনিক খোরাক জোগাইয়া থাকে। ভারতে এই তত্ত্বের দিকে পণ্ডিতদের নজর এখনো বেশী পড়ে নাই। পুঁজি-নীতি, পুঁজি-সংগঠন, স্বদেশী পুঁজির সঙ্গে বিদেশী পুঁজির সম্বন্ধ ইত্যাদি তথ্য লইয়া

মাথা খেলাইবার দিকে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-সেবীদিগকে শীঘ্রই অগ্রসর হইতে হইবে।

প্যারিসের সিরে কোং এই বিষয়ের বিজ্ঞান-বস্তু লইয়া একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন (১১৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৬)। গ্রন্থকারের নাম বারেইয়ে-ফুশে। বইটার নাম "লেক্‌স্ পর্তাসিওঁ এ ল্যাঁপর্তাসিওঁ দে কাপিতো এ লেজ্ আম্প্লোআ আ লে ত্রাঁজে" (পুঁজি ও সম্পত্তির আমদানি-রপ্তানি)।

ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ। বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করিবার বিরুদ্ধে ফরাসী গবর্মেণ্ট কড়া আইন কায়েম করিয়াছে। ফ্রান্সের টাকাকড়ি ফ্রান্সেই থাকিবে, এই হইতেছে সরকারী নীতি। গবর্মেণ্ট মাঝে মাঝে আইনটার কড়াক্কড়ি নরম করিবার কথা বলে বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনকানুন ক্রমশই বেশী কঠোর ও জটিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মজার কথা, এত কঠোর আইন সত্ত্বেও ফরাসীরা লুকাইয়া ফরাসী পুঁজি বিদেশে রপ্তানি করিতেছে। পুঁজি-রপ্তানি বন্ধ করা আইনের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য মনে হইতেছে।

বারেইয়ে-ফুশের বইটা ফরাসী আইনগুলার সঙ্কলন-গ্রন্থ। তবে পুঁজি-রপ্তানির বিরুদ্ধে আইন কায়েম করিবার যুক্তিগুলাও দেখানো হইয়াছে।

সমাজ-ব্যাধির ফরাসী চিকিৎসক

পাশ্চাত্য সাহিত্যে "সমাজ" শব্দ ব্যবহার করিলে মোটের উপর এক কথায় আর্থিক লেনদেন বুঝা হইয়া থাকে। সমাজ-ব্যাধি, সমাজ-বিরোধ, সামাজিক অশান্তি ইত্যাদি কথায় আর্থিক দুর্দ্দশার এপীঠ ওপীঠ বুঝিতে হইবে। আর তাহার দাওয়াইও আজকাল একপ্রকার সুপরিচিত বস্তু। নাম তাহার "সোশ্যালিজম্" অথবা তাহার মাসতুত, খুড়তুত ভাই স্বরূপ "কমিউনিজম্" ইত্যাদি।

মনে রাখিতে হইবে যে,—ইয়োরামেরিকার ধন-সাহিত্যে "সমাজ-সংস্কারে"র ঘর খুবই বড়। ধনবিজ্ঞান-সেবীদের ভিতর হাজার হাজার লোক সমাজ-ব্যাধির দাওয়াই ঢুঁড়িবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। পাশ্চাত্য নরনারীর আধ্যাত্মিকতা, ভাবুকতা, কর্ম্মদক্ষতা, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদির অনেক-কিছুই এই চিকিৎসার বিজ্ঞানে আর চিকিৎসার আন্দোলনে লিপ্ত আছে।

ফরাসী সমাজ-সংস্কারক লুসিআঁ দেলিনিয্যার এই বিজ্ঞানের আর আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ প্রতিনিধি। তাঁহার উল্টাপক্ষীয় পণ্ডিতেরাও তাঁহার পাণ্ডিত্যের এবং আন্তরিকতার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার একখানা বই বাহির হইয়াছে (১৯২৬)। প্রকাশক প্যারিসের ফ্রাঁস এদিসিওঁ। বইটা "লা ফ্যাঁ দু মাল সোসিয়াল" (সমাজ-দুঃখের অবসান)। সেকালের বুদ্ধদেব বা সেইণ্ট পল ইত্যাদি মহাত্মারা দুঃখ বিশ্লেষণ করিতেন আর দুঃখ নির্ব্বাণের পাতিও দিতেন। একালের মহাত্মারাও দুঃখ-বিশ্লেষণে আর দুঃখের শ্রেণীবিভাগে কম ওস্তাদ নন। আর একালকার "নির্ব্বাণ-তত্ত্বটাও তুচ্ছ করিবার চিজ নয়।

দেলিনিয্যার ইত্যাদি সমাজসংস্কারকের বিচারে আধুনিক দুঃখ নিম্নলিখিত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে!—(১) মাদকতা, (২) বেশ্যাবৃত্তি, (৩) আইন ভাঙা, (৪) লড়াই, (৫) দারিদ্র্য, (৬) ভিক্ষাবৃত্তি (৭) লোক-ক্ষয় ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই ধরণের আরও অনেক-কিছু উল্লেখ করা সম্ভব। আজকাল-কার সমাজ-সংস্কারকেরা বর্ত্তমান পুঁজিপতিশাসিত সমাজ-ব্যবস্থাকে এই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ সমঝিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের চিকিৎসাপ্রণালী অতি সহজ। তাঁহারা বলেন—"দাও তুলে পুঁজি-নীতি, সমাজ আপনা-আপনিই দুরস্ত হইয়া আসিবে।"

সমাজ-সংস্কারকদের জুতা খাইতে খাইতে পুঁজি-নীতির ধুরন্ধরেরা অনেক বিষয়ে নরম হইয়া আসিয়াছেন। মজুরদের কারখানাজীবন, মজুরদের সঙ্গে উপরওয়ালাদের ব্যবহার, মজুরির হার, মজুরদের ঘরবাড়ী ইত্যাদি নানা বিভাগে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুঁজি-নীতির ধুরন্ধরেরা জিজ্ঞাসা করিতে অধিকারী, "বহুৎআচ্ছা,—না হয় পুঁজি দুনিয়া হইতে উঠিয়াই গেল। তখন দুনিয়া হইতে মাদকতা, বেশ্যাবৃত্তি দারিদ্র্য ইত্যাদি উঠিয়া যাইবে কি? এই সকল দুঃখ জগতের সকল দেশেই আর সকল যুগেই কোনো না কোনো আকারে দেখা যায় কেন?"

জন্ম-সংযম

অন্যান্য পাশ্চাত্য পারিভাষিক শব্দের মতন জন্ম-সংযম (বার্থ-কন্ট্রোল) শব্দটাও ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তবে এই শব্দের অন্তর্গত বস্তুটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যতটা চলে ভারতে তাহার শতাংশও চলে কিনা সন্দেহ। কাজেই বার্থ-কন্ট্রোল নামে যে একটা বিপুল আন্দোলন চলিতেছে তাহা ভারতের বড় বড় পণ্ডিতমহলেও বোধ হয় সু-জানা নয়। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে এক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস বসিবে। তাহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই জন্ম-সংযম আন্দোলনের পাণ্ডা।

১৯২৩ সনে আমেরিকার বাল্টিমোর ও শিকাগো শহরে "জন্ম-সংযম সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সম্মেলনে যে সব প্রবন্ধ পঠিত হয় সেইগুলা একত্রে গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। কয়েকটা প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) লোক-বৃদ্ধির দৌরাত্ম্য (প্যর্ল)।
(২) লোক-সংখ্যায় দুনিয়ার গতি (রস)।
(৩) জন্মসংযম ও মানসিক স্বাস্থ্য (চ্যাপম্যান)।
(৪) জন্মসংযম ও জনগণের স্বাস্থ্য (স্প্যাট)।
(৫) জন্মসংযমের প্রাণবিজ্ঞান (ঈষ্ট)।
(৬) জন্মসংযমের ধর্ম্ম ও নীতি (রুবেনষ্টাইন)।

কিন্তু জন্মসংযম শব্দটার অর্থ কি? এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন,—পরিবারের লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার অধিকার যদি পিতামাতার হাতে থাকে তাহা হইলে বলিব যে জন্মসংযম কাজে পরিণত হইতেছে (চ্যাপম্যান)। ইহুদি পুরোহিত রুবেনষ্টাইন জন্মসংযম কথাটা পছন্দ করেন না। তিনি ধর্ম্ম ও নীতির তরফ হইতে লোকসংখ্যা সমস্যাটা আলোচনা করিতে চাহেন। তাঁহার মতে "স্বেচ্ছাপিতৃত্ব" ("ভলাণ্টারি পেরেণ্টহুড") শব্দটা বলিলে ভাল হয়। মার্কিণ মুল্লুকে জন্মসংযম আন্দোলনের মাথা হইতেছেন শ্রীমতী স্যাঙ্গার। জন্মসংযম শব্দের ব্যাখ্যা স্যাঙ্গারের রচনায় নানারূপ।

প্রথমতঃ লোকসংখ্যা কমাইবার যত প্রকার কৌশল থাকিতে পারে সবই স্যাঙ্গারের বিচারে জন্মসংযমের সামিল। কিন্তু স্যাঙ্গার ভাষা সংযত করিয়া অনেক সময় অন্যান্য কথাও বলিয়া থাকেন। "স্বাস্থ্যসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সন্তান-সৃষ্টির ক্ষমতাকে শাসন করা হইতেছে জন্মের সংযম-সাধন।

বস্তুটার অর্থ সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ। জন্মসংযমের ফলাফলও নানা পাণ্ডা নানারূপে দেখিয়া থাকেন। জগতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। এত বাড়া উচিত নয়। দুনিয়ায় দারিদ্র্য দেখা দিবে এইরূপ চিন্তা হইতেছে প্যর্ল, রস ইত্যাদি পণ্ডিতের। অপরদিকে সুপ্রজনন বা ইউজেনিক্‌স্‌ বিদ্যার পাণ্ডারা সংসারে অভিনব উৎকর্ষশীল নরনারীর জন্ম আশা করিয়া জন্মসংযমের সুফল দেখাইয়া থাকেন। অবশ্য সুপ্রজনন-বাদীরা সামাজিক হিসাবে অকর্ম্মণ্য বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর নরনারী সংসার হইতে দূরীভূত করিবার মতলবেই জন্মসংযমের পক্ষপাতী হইয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা মধ্যবিত্ত ও মজুর পরিবারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজে জন্মসংযমের আন্দোলন চালাইতেছেন। ভারতবর্ষে এই দিক্‌ হইতে তলাইয়া মজাইয়া বুঝিবার অনেক কথা আছে। দরিদ্র মস্তিষ্কজীবী শ্রেণীর কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে জন্মসংযমের আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইবে।

যে বইটার বিবরণ দেওয়া গেল তাহার নাম "বার্থ কন্ট্রোল"। সম্পাদক আডোল্‌ফ্‌ মায়ার। প্রকাশক বাল্টিমোরের হ্বিলিয়ম্‌স্‌ (১৯২৫, ১৭১ পৃষ্ঠা)।

বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক

ভারতসন্তান স্বদেশেই ব্যাঙ্ক কায়েম করিবার ব্যবসায় পাকিয়া উঠে নাই, বিদেশে ব্যাঙ্ক চালাইবে কোথা হইতে? কিন্তু বিদেশীরা ভারতে বড় বড় ব্যাঙ্ক চালাইতেছে। জার্ম্মাণদের ব্যাঙ্কও ভারতে একদিন ছিল। আজ এখনো নাই। কিন্তু অন্যান্য বিদেশে জার্ম্মাণদের ব্যাঙ্ক আজও আছে। সেইগুলার অবস্থা কিরূপ তাহার বৃত্তান্ত পাইতেছি "ডী লয়েরে এণ্টহ্বিকলুঙ্‌ ডেস্‌ ডায়চেন আউসলাণ্ড্‌স্‌ বাঙ্ক হ্বেজেন্‌স্‌ ১৯১৪-২৫" (বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান

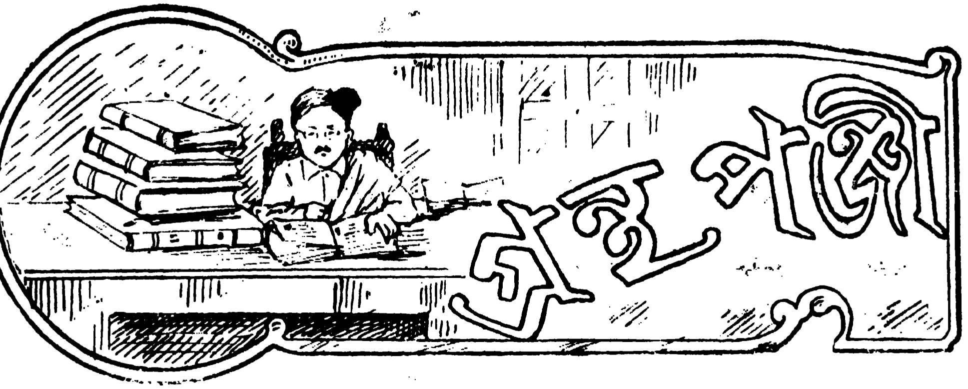
অবস্থা—১৯১৪ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত সময়ের বৃত্তান্ত) নামক গ্রন্থে। দুইজন লেখকের সমবেত চেষ্টায় বই তৈয়ারী হইয়াছে। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বার্লিনের স্পোট কোং প্রকাশক (১৯২৫, ৪'৫০ মার্ক)।

গ্রন্থে জার্ম্মাণ মুলুকে যে সকল বিদেশী ব্যাঙ্কের কাজ চলিতেছে তাহার খবরও আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কের সকল শ্রেণীর আকার-প্রকারই লেখকদের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রথম অংশে বিবৃত আছে বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-প্রণালী। প্রথমতঃ,—বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে "ইণ্টারেস্সেন-গেমাইন্ শাফ্‌ট্" (স্বার্থ-সাম্য) কায়েম করিয়া কাজ চালানো অনেক জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের দস্তুর। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী ব্যাঙ্কের মূলধন জোগাইয়া অথবা মোটা মোটা শেয়ার কিনিয়া কোনো কোনো জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক কাজ চালাইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে প্রতিনিধির কাজ দেওয়াও দস্তুর। চতুর্থতঃ, বিদেশে শাখা ব্যাঙ্ক কায়েম করা এক কর্ম্মপ্রণালী। পঞ্চমতঃ, বিদেশে একদম স্বাধীন ব্যাঙ্ক কায়েম করাও জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের রেওয়াজ।

বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের মূর্ত্তি উক্ত পাঁচ শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের কাজ নিম্নরূপ,—(১) স্থানীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করা, (২) আমদানি-রপ্তানির কাজে হিস্যা লওয়া, (৩) শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজি সাহায্য করা, (৪) সরকারী, নাগরিক বা অন্যবিধ সার্ব্বজনিক কারবারের জন্য কর্জ্জ তুলিয়া দেওয়া।

গ্রন্থের তৃতীয় অংশে জগতের নানা দেশে যে সকল জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক চলিতেছে তাহাদের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ আছে। দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা সকল অঞ্চলের তথ্যই আছে।



"ডী আরবাইট্‌স্‌-লাইষ্টুঙ্‌ ফোর উণ্ড লাখ ডেম ক্রীগে" (যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে মজুরদের মেহনতের ফলাফল,—যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার ফ্যাক্টরিতে গবেষণা চালাইয়া তথ্য ও সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে)—হেন্‌ৎসেল, ষ্টুটগার্ট, পোশেল কোং, ১৯২৫, ৮+১৩৫ পৃষ্ঠা, ৮ মার্ক।

"লা রে-ওর্গানিজাসিআঁ দেজ উজিন সুইভাঁ লে মেতদ টেলার-টম্প্‌সঁ (টেলার-প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে কারখানার পুনর্গঠন)—ব্যাত্রঁা, প্যারিস,—লাং লোআ কোং, দুই খণ্ড ১৮১+২৬৪ পৃষ্ঠা ১১০ ফ্রাঁ।

"ইণ্ট্রোডাকশ্যন টু সোশ্যাল ষ্টাটিষ্টিক্‌স্‌" (সামাজিক সংখ্যাবিজ্ঞানের ভূমিকা)—ডিট্‌মার, শিকাগো, শ'কোং) ১৯২৬, ১৭৭ পৃষ্ঠা ২·৫০ ডলার।

"সোশ্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌" (সামাজিক সংখ্যা-বিজ্ঞান)—এল্‌মার, লস্‌ এঞ্জেলেস, রেমিলার কোং, ১৯২৬, ৩০৬ পৃষ্ঠা, ২·৫০ ডলার।

"ষ্টাটিষ্টিক উণ্ড গেজেল্‌শাফ্‌ট্‌স্‌লেরে" (সংখ্যা-বিজ্ঞান ও সমাজ-তত্ত্ব)। দ্বিতীয় খণ্ড "বেফোলকারুংস্‌-ষ্টাটিষ্টিক" (লোকজনের সংখ্যা-শ্রেণী),—ফোন মার, ট্যিবিঙ্গেন, মোর কোং, ১৯২৬, ৩২০ পৃষ্ঠা।

"কমার্শ্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল অর্গ্যানিজেশ্যন্‌স্‌ অব্‌ দি ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌" (যুক্ত-রাষ্ট্রের বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি),—ওয়াশিংটনের ফেডারাল দরবার হইতে প্রকাশিত। ১৯১ পৃষ্ঠা, ৬০ সেণ্ট।

"দি ব্রেক ডাউন অব্‌ সোশ্যালিজম" (সাম্যবাদের পতন) আর্থার শ্যাডওয়েল, এম, এ, এম, ডি, এল, এল, ডি, প্রণীত, বেন কোম্পানী প্রকাশিত মূল্য, ১০ শিঃ ৬ পেঃ।

"মার্কস্‌ লেনিন অ্যাণ্ড দি সায়েন্স অব্‌ রিভলিউশ্যন" (মার্কস্‌ লেনিন ও বিদ্রোহ-বিজ্ঞান)। ম্যাক্‌স্‌ ইষ্টম্যান প্রণীত, অ্যালেন আনউইন, মূল্য ৭ শিঃ ৬ পেঃ।

"দি ইকনমিক কন্‌সিকোয়েন্সেস্‌ অব্‌ সোশ্যালিজম," (সাম্যবাদের আর্থিক ফলাফল) জর্জ্জ ডব্লিউ, গাফ প্রণীত। ওয়েষ্টমিনষ্টার লাইব্রেরী, (ফিলিপ অ্যালান, ৩ শিঃ ৬ পেঃ)।

"ক্যাপিটালিজ্‌ম ইজ সোশ্যালিজ্‌ম উইথ ইকনমিক অ্যাডজাষ্টমেণ্ট্‌স্‌" (আর্থিক অদলবদলসহ পুঁজিনীতিই সমাজ-তন্ত্র) জে, টেলর পেডি প্রণীত। (লংম্যানস, ৭ শিঃ ৬ পেঃ)।

"দি থিয়োরি অব্‌ ইন্টার্ণ্যাশন্যাল প্রাইসেজ" (আন্তর্জ্জাতিক মূল্য সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব)—এঞ্জেল, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। ৫ ডলার।

"মার্কেটিং অব্‌ অ্যাগ্রিকালচার‍্যাল প্রডাক্‌ট্‌স্‌" (কৃষিজ দ্রব্য বাজারে ফেলা)—বয়াল,—নিউইয়র্ক, ম্যাক-গ্র হিল কোং, ১৯২৫, ৮+৪৭৯ পৃষ্ঠা।

মধ্যপ্রদেশের কয়লায় বাঙালীর সুযোগ

সন ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসের এক খণ্ড আর্থিক উন্নতি দেখিয়া মধ্যপ্রদেশে কয়লার ব্যবসা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধটী এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতুল নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কারবার সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ হইতে দিতেছি।

শ্রীযুক্ত প্রতুল নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এখানে প্রায় ১০ মাইল ব্যাপী কয়লার জায়গা লইয়া তাহাতে "কলিয়ারি" কায়েম করিতে প্রায় ২ লক্ষ টাকার উপর খরচ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কয়লার বাজার নরম। এই কারণে কয়লা উত্তোলন করিয়া রেল বোঝাই করা পর্য্যন্ত কম খরচ করা আবশ্যক। কাজেই মেশিনারী ট্রাম লাইন, কয়লার ইঞ্জিন ইত্যাদি আবশ্যক। কয়লার বাজার নরম ও গরম হইয়াই থাকে। "কোল ইণ্ডাষ্ট্রী" ভারতবর্ষে প্রায় ৬০।৭০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। প্রতি ৩।৪ বৎসর অন্তর নরম এবং পুনরায় ৩।৪ বৎসর গরম হয়। ইহাই কয়লার বাজারের স্বাভাবিক দস্তুর। প্রতি ২০ বৎসর অন্তর বাজার এমন গরম হয় যে, কাল মাটী পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে পায় না।

কয়লার বাজার যখন নরম তখনই কলিয়ারিসমূহে মেশিনারী, ট্রাম লাইন ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত সময়। (১) নরম বাজারে কম খরচ হয় এবং কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যায়। কম খরচে বাজারে বিক্রয় করিয়া লাভও হইয়া থাকে। (২) যখন গরম বাজার আসে তখন মেশিনারী থাকিলে প্রচুর কয়লা উঠাইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতাও হইয়া থাকে। সে সময় বেশী উঠাইয়া বিক্রয় করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হইবে।

এমত অবস্থায় উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মেশিনারী ইত্যাদির জন্য দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই টাকার ব্যবস্থার জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে কোন ব্যাঙ্কার সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি ইচ্ছুক। কারণ মেশিনারী, ট্রাম লাইন ইত্যাদি বসিলে, গোগাড়ী, ঢোলাই ইত্যাদি অতিরিক্ত খরচ কম হইবে। বোম্বাই কিংবা কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কার বা মহাজন যদি সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা সরবরাহ করেন, তাঁহাকে শতকরা বার্ষিক ৫।৬ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে এবং যতদিন টাকা ফেরত না দেওয়া হইবে ততদিন ফী টন ষ্টীম কয়লার উপর ।০ চারি আনা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

দুই লক্ষ টাকা মেশিনারী প্রভৃতির জন্য কলিয়ারিতে খরচ হওয়ার পর কম পক্ষে ১টী ইনক্লাইন খাদ মুখ দ্বারা দুই রেল হইতে ৪ চার রেল কয়লা দৈনিক উঠিতে পারিবে। তাহা হইলে ১১টী ইনক্লাইন খাদ হইতে দৈনিক ২২ হইতে ৪৪ রেল কয়লা উৎপন্ন হইবে। যদি ইহা অপেক্ষা বেশী রেজিং করান আবশ্যক হয় তবে প্রতি ১১টী খাদে ১টী করিয়া আরও ১১টী ইনক্লাইন বাড়াইলে উহার দ্বিগুণ রেজিং হইবে। আবশ্যক হইলে ১ রেক বা ৬০ রেলগাড়ী দৈনিক রেজিং হইয়া বেশ গাড়ী বোঝাই হইতে পারে। এক রেক বা ৬০ গাড়ী কয়লা ১০০০ টন হইবে। যদি মহাজনগণ ।০ চারি আনা হিঃ কমিশন পান তাহা হইলে দৈনিক ২৫০৲ টাকা পাইবেন। যদি মাসের মধ্যে ২৫।২৬ দিন কলিয়ারির কার্য্য চলে তাহা হইলে মাসিক ৬২৫০৲ টাকা পাইতে পারেন। যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহার সম্পূর্ণ টাকা মিটিয়া যাইবে মহাজন কমিশন পাইবার হকদার থাকিবেন। ইহা ছাড়া নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পাইবেন। উক্ত কয়লার খাদ অন্ততপক্ষে ৬০।৭০ বৎসর চলিবে।

যদি কলিকাতার কোন মহাজন এই কার্য্যে টাকা সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে শ্রীযুক্ত প্রতুল নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পরাসিয়া পোঃ জেলা ছিন্দওয়ারা সি, পি, ঠিকানায় লিখিয়া জানিতে পারেন। আমার বিবেচনায় এ সর্ত্তে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপেক্ষা ব্যাঙ্কারের বা মহাজনের বেশী লাভ হইবে। যদি কোন মহাজন উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত সর্ত্তে টাকা দেন তিনি

লাভবান হইবেন ও একজন ভারতবাসীকে ব্যবসায়ে উন্নতির সাহায্য করাও হইবে। কলিকাতায় বহু ধনবান ব্যক্তি আছেন, মনোযোগ ও ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের যে কেহ এ কার্য্য করিতে পারেন।

(২) যদি কোন মহাজন কলিয়ারির কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক সময়ে বা ২।৩ কিস্তিতে ২।৩ লক্ষ টাকা মেশিনারী ইত্যাদি বাবদ দিলে তাঁহাকে ½ অর্দ্ধেক অংশ দিয়া অংশী করিয়া লইতে পারেন। কার্য্যাদি মহাজন নিজে চালাইতে ইচ্ছা করিলে পারিবেন। "পার্টনারশিপ" দলিল সি, পি গভর্ণমেণ্টের মনোনীত সার্টিফিকেট যুক্ত ব্যক্তি হইলে হইবে। এ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি রাজি থাকিলে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিতে পারেন।

(৩) যদি কেহ সি, পি গবর্ম্মেণ্টের সার্টিফিকেটযুক্ত না হন এবং এ কার্য্যে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে লিমিটেড কোং রেজেষ্ট্রী করিয়া কলিয়ারির মূল্য ৩।৪ লক্ষ টাকা ধার্য্য করিয়া উহার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা নগদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া বাকী টাকার ঐ কোং শেয়ার সার্টিফিকেট তাঁহাকে দিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যত টাকার শেয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে, মহাজন ব্যক্তিও তত টাকা নগদ দিয়া শেয়ার সার্টিফিকেট লইয়া উভয়ে সমান শেয়ার বা অংশ লাভ করিবেন। মহাজন ব্যক্তির শেয়ার লওয়ার দরুণ টাকা হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া মেশিনারী ইত্যাদি বসাইয়া উক্ত ব্যক্তি ম্যানেজীং এজেণ্ট হইয়া কার্য্য চালাইবেন। আরও বেশী মূলধন আবশ্যক হইলে বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া বাকী টাকা উঠান যাইতে পারিবে। উভয়ের সমান অংশ থাকা আবশ্যক। উভয়ে অংশ মত লাভের টাকা লইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি ১০ হাজার ১৫, হাজার, ২০ হাজার, ২৫ হাজার কিংবা তদূর্দ্ধে টাকা ব্যয় করিয়া এই লাভবান কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ১১টী কলিয়ারিতে ১১ জন রেজিং কণ্ট্রাক্টর আবশ্যক—৫ হাজার বা বেশী টাকা ডিপোজিট দিয়াও যদি একটী খাদের রেজিং ঠিকা লয়েন তবে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে ৫০০।৬০০ টাকার অধিক সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে প্রথম অবস্থায় লাভ পাইবেন। পরে ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি কলিয়ারির ম্যানেজিং কণ্ট্রাক্ট লইতে চাহেন, তিনি কয়লা উঠাইবেন ও বিক্রয় করিবেন। ২।৫ বৎসরের জন্য তাহা হইলে কম হারে প্রতিটন প্রাপ্য রাখিয়া নূতন জায়গা তাঁহাকে দিবেন। তিনি নিজ খরচা দ্বারা ইনক্লাইন ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া নিজের কার্য্য ওয়াদা কালতক চালাইবেন ও যত টন কয়লা হইবে প্রতি টন ৷৷০ আনা হিঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিতে থাকিবেন। ইহা ছাড়া যদি কেহ কতক জায়গা বা ১টী কলিয়ারি উপযুক্ত মূল্যে লইতে রাজি হন তাহাও লইতে পারেন। মূল্যাধিক্য ব্যতীত কলিয়ারি বিক্রয় করা হইবে না। তিনি নিজে প্রফেশনাল ম্যান, কার্য্য করাই তাঁহার ইচ্ছা। তবে মেশিনারী ইত্যাদি করিবার জন্য ইচ্ছুক বলিয়াই তিনি এ সব কথা কহিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি এই সম্বন্ধে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক থাকেন, পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন।

(৬) যদি কোন কয়লাব্যবসায়ী ১ কিংবা ২ লক্ষ টন কয়লার সওয়া পত্র করিয়া প্রতিটন ১৲ একটাকা হিঃ অগ্রিম ১ কিংবা ২ লক্ষ টাকা দেন, বাজার দর অপেক্ষা ৷৷০ আট আনা কিংবা ১৲ এক টাকা কম মূল্যে কণ্ট্রাক্ট করা হইবে। বোম্বাই, বেরার, মধ্যভারত প্রদেশে যাহাদের কাজ-কর্ম্ম, জিনিং ফ্যাক্টরী, উইভিং মিল ইত্যাদি আছে, তাঁহারাও কণ্ট্রাক্ট করিতে পারেন। এখানে আসিয়া আফিস খুলিয়া বসিয়া কার্য্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক কণ্ট্রাক্ট করা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইবে। কারণ এখানে কয়লার চাহিদা খুব বেশী। সাইডিংয়ে ১ রেল কয়লা উপস্থিত হইতে না হইতে খরিদ্দার নিজেরা আফিসে আসিয়া মাল লইবার জন্য উপস্থিত হন। নিকটবর্ত্তী স্থানে লোকাল কয়লার খরচ জন্য বিক্রয়ের অসুবিধা নাই। মূল্যও নরম বাজারে টন প্রতি ৬৲।৬৷৷০ টাকা পাওয়া যায়। বেঙ্গল অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। উপস্থিত যদি কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে কয়লার বাজার পুনরায়

গরম হইতে আরম্ভ করিবে। এমত অবস্থায় এ সম্বন্ধে সত্বর ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়া যাইবে।

(৭) যদি কোন রেজিং কন্ট্রাক্টর ৪ দফা সর্ত্তানুযায়ী ও কোন খরিদ্দার ৬ দফা সর্ত্তানুযায়ী একত্র মিলিত হইয়া কোন একটী বা দুইটী বা ততোঽধিক ইনক্লাইন খাদ লইয়া কার্য্য চালান, তাহা হইলে একস্থানে ৪।৫ বৎসর বা ততোঽধিক কালের মত বেশী পরিমাণ কয়লার সওয়া করিয়া উঠাইয়া বিক্রয় করিতে পারেন। উভয়ে পরস্পর আত্মীয় হইতে পারিবেন না। ইহাতে কার্য্য নিজেদের হাতে ও বিক্রয় নিজেদের হাতে থাকিবে। মালিক খাদানকে প্রতি সপ্তাহে ডিস্প্যাচ কয়লার উপর উভয়ের কণ্টাক্ট সর্ত্তানুসারে—যথা খরিদ্দার বিক্রীত কয়লার মূল্য বাবদ বিলের প্রাপ্য টাকা মিটাইবেন অর্থাৎ বিল লইবেন এবং রেজিং ঠিকাদার কয়লা ডিস্প্যাচ মোতাবেক প্রাপ্য বিলের টাকা মিটাইয়া পাওয়ার রসিদ লিখিয়া দিবেন। বস্তুতঃ, খরিদ্দার ও ঠিকাদার একত্র মিলিত থাকায় টাকার আদান-প্রদান তাঁহারা করিবেন কেবল কাগজে কন্ট্রাক্টের সর্ত্তানুসারে জমাখরচ হইবে। এসব সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিতে পারেন। ইঁহার কয়লার কোয়ালিটী উত্তম। বিক্রয়ের কোনরূপ অসুবিধা নাই।

আর্থিক আসামের এক কাঁচ্চা

এবারকার ঋতুটা বাসন্তী ধানের পক্ষে অনুকূল ছিল।

গত বছর শ্রীহট্ট জেলায় ফসলের মোট আয়তন ছিল ১,৯১,৩০০ একর। এ বছর হইয়াছে ১,৯১,৬০০ একর।

গত বছরের মত এবারও গড়পড়তাটা ঠিক আছে। একর প্রতি ৯ হন্দর স্বাভাবিক উৎপন্ন বলিয়া ধরিয়া লইলে গত বছরের মোট উৎপাদন ছিল ১৭,২১,৭০০ হন্দর। এ বছর হইয়াছে ১৭,২৪,৪০০ হন্দর।

২৫শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তার বিবরণ এই-রূপ :—

অধিকাংশ জেলায় জলবাতাস উত্তম ছিল। চা'র উৎপাটন আকের মাড়াই, তিলের বপন জোর চলিতেছে।

কাছারে পাট বপন আরম্ভ হইয়াছে। আলুর ফসল পাকিবার সময় হইয়াছে। আদায় মন্দ হইবে না। বিচালি যথেষ্ট নাই।

শ্রীহট্টে ঋতুটা সাধারণতঃ প্রতিকূল গিয়াছে। হৈমন্তিক ধান্য ও পাটের জন্য বিস্তারিত ভাবে চাষবাস চলিতেছে। চা কোপান শেষ হইয়াছে। চা পাতা শীঘ্রই ছিঁড়া হইবে। ভবিষ্যৎ আদায় আশাপ্রদ বোধ হইতেছে।

এক স্থান হইতে গো-মড়কের সংবাদ আসিয়াছে।

নাগা পাহাড়ে খুব গরম ও শুক্না বাতাস বহিতেছে। কোহিমায় গরু বাছুরের পা ও মুখের বেয়রাম দেখা দিয়াছে।

চা কোপান, হৈমন্তিক ধান ও পাটের জন্য মাটি চষা, আক মাড়াই চলিতেছে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর জেলায়।

মণিপুরে চাষের কাজ চলিতেছে। বিচালি ও ঘাসের অবস্থা ভাল হইতেছে। ঘোড়ার চোখের অসুখ দেখা দিয়াছে।

মফঃস্বলের মগজ

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, কলিকাতার বাহিরের বাঙালীরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে না। এক বৎসর বাঙ্‌লার মফঃস্বলের পত্রিকাগুলা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া বুঝিতেছি যে আমাদের বিশ্বাসটা যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং এইরূপই বুঝিতেছি যে,—কলিকাতার মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক কাগজে যে ধরণের চিন্তা বাহির হইয়া থাকে মফঃস্বলের কাগজে তাহা হইতে কোনো নিকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যায় না। বাঙ্‌লার পল্লী-জনপদগুলা চিন্তা-ক্ষেত্রে প্রায় কলিকাতার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। এই কথাটা বাঙালী সমাজের ভিতর সাধারণ্যে স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক। যখন তখন যেখানে সেখানে কলিকাতার প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লইলে মফঃস্বলের মগজের প্রতি অবিচার করা হইবে।

ফরিদপুর-বরিশাল রেলপথ

"ঢাকা-প্রকাশ" রেলপথের সু-কু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত ফরিদপুর-বরিশাল রেলওয়ের স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। রচনাটা উদ্ধৃত করিতেছি।

বরিশাল বঙ্গের অন্নক্ষেত্র। সুতরাং বঙ্গে বরিশালের গুরুত্ব অত্যধিক। রেলযোগে বরিশালকে বঙ্গের অন্যান্য জিলার সহিত সংযুক্ত করার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করে নাই। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তাব হইয়াছিল, বরিশাল হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইতে পারে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। তদনুসারে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানী পথের জরিপও করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। দশ বৎসর হইল পুনরায় সে বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। পথে বহু নদী অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া, জলপথে ব্যবসায়াদি পরিচালনা ও গমনাগমনের অসুবিধা বিবেচনায় সে বারও আলোচনায় কোন ফল হয় নাই। বরিশাল নদ-নদী-পরিবেষ্টিত বলিয়া এ পর্য্যন্ত তথায় রেলপথ নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইতেছে না।

সম্প্রতি ভারতগবর্মেণ্ট ফরিদপুর ও বরিশালের মধ্যে রেলপথ-নির্ম্মাণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-গবর্মেণ্ট বরিশাল হইতে মাদারিপুর ও চরমুগরিয়া হইয়া ফরিদপুর পর্য্যন্ত রেলপথ জরিপ করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়েকে আদেশ দিয়াছেন। এইরূপ নির্ম্মাণ কিরূপ ব্যয় সাপেক্ষ তাহা অবগত হওয়াই ভারতগবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য। শুনিতেছি, ছয় মাসের মধ্যেই এই জরিপকার্য্য পরিসমাপ্ত হইবে, এবং তৎপর কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব মঞ্জুর করার জন্য ভারতগবর্মেণ্ট ও রেলওয়ে বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন। এই রেলপথ ৮১ মাইল দীর্ঘ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, এবং একার্য্যের ব্যয় এককোটি ৪০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নির্ণয় করিয়াছেন। ভারতগবর্মেণ্ট ও রেলওয়ে বোর্ড যদি প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে আগামী ১৯২৮ সনের শীতকালে রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং ১৯৩১ সনে নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে পারা যাইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস। এই রেল-পথে ৫১৬টী নদী পড়িয়াছে; উহার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রকাশ, প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার ব্যয়ভার রেলওয়ে বোর্ড বহন করিবেন।

এই রেলপথ দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে কিনা, তাহা এখনও ঠিক বুঝা যাইতেছে না। অনেকে এ সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা করিতেছেন। দেশে অন্নাভাবের সম্ভাবনা যেরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে রপ্তানির সুযোগ যত বেশী ঘটিবে ততই খাদ্যশস্যাদি দুর্ম্মূল্য হইবে বলিয়া ইহাদের ধারণা। এ ধারণা একান্ত অমূলক এমন কথা বলা যাইতে পারে না। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন

ভারতের সর্ব্বত্র আহার্য্য শস্যের মূল্য সমান করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি রেলপথ বিস্তারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং রেলপথে বরিশালের শস্য-সম্পদ্ নানাস্থানে প্রেরিত হইলে পূর্ব্ববঙ্গে যে ধান চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি হইতে পারে, এরূপ অনুমান অবশ্যই একেবারে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। তবে রেলপথে যে কেবল রপ্তানিরই সুযোগ ঘটিবে তাহা নহে; উহাতে আমদানিরও সুবিধা হইবে। তারপর দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে রেলপথের অভাবও এখন বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়া থাকে; কাজেই প্রস্তাবিত রেলপথ সত্বর নির্ম্মিত হইলে কতক পরিমাণে যে সুবিধা হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

সরকারী কৃষি-বিভাগ

গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধে "বরিশাল হিতৈষী" যে সমালোচনা ছাপিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :—

বাঙ্গালা সরকারের বাজেটে ১৯২২-২৩ সনের বাবদ কৃষি-বিভাগের খরচ মবলগ ১৭০০০০৲ ও ১৯২৫-২৬ সনের বাবদ মবলগ ১৭১৮৩১৯৲ টাকা ধরা হইয়াছে।

এখন, কি কি দরুণে এই মোট টাকাটা খরচ হইয়াছে তাহা আমরা একবার সরকারী বাজেটেরই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। তবেই বুঝা যাইবে ঠিক খাঁটি কৃষি-কার্য্যের জন্য কয়টা টাকা খরচ হয় এবং তদ্দারা এই বাংলা দেশের কৃষির উন্নতিই বা কি পরিমাণ হইয়াছে বা হইতে পারে। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, এই বাংলা প্রদেশের জন-সংখ্যা মোট ৪৬৬,৫৫,৩৬০ এবং ইহার শতকরা ৮০ ভাগই কৃষিজীবী এবং ইহারাই বছরে প্রায় ৩০,০০০০৲ টাকা ভূমি-কর (ল্যাণ্ড ট্যাক্স) দিয়া থাকে। যদি ঐ গোটা টাকাটাই খাঁটি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় হইত, তবে গ্রাম্য সাধারণের দিক্ দিয়া অবশ্যই কিছু না কিছু ফল দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু তাহাও হইতেছে না। এ-হেন একটা বিভাগের অস্তিত্ব গ্রাম্য সাধারণের কয়জন উপলব্ধি করেন?

পশু-চিকিৎসা বিভাগ

কৃষি-বিভাগের জন্য ধরা ঐ ১৭ লক্ষ টাকা, হইতে প্রথমেই আমরা দেখি পশু-চিকিৎসা খাতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে ৩৬৩০০০৲ টাকা। অবশ্য সকল দেশেই কৃষি-বিভাগের সহিত পশু-চিকিৎসা বিভাগ সংযুক্ত থাকে এবং থাকাও আবশ্যক বটে। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে পশু-চিকিৎসা বিভাগ দিয়া কি উপকার হয়? এ দেশের পশু-চিকিৎসা বিভাগ সরকারেরই নিজ সামরিক ও বে-সামরিক কার্য্যের অঙ্গস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তজ্জন্যই এই বিভাগের কার্য্যস্থল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর হুদ্দার মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। এই বিভাগের দ্বারা দূর দূরান্তরের গ্রামের কৃষি-কার্য্যের কি উন্নতি হইতে পারে ও কি আশা করা যায়? পশু বা দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই বিভাগের প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্কই নাই। প্রধানতঃ ইহা একটী নাগরিক প্রতিষ্ঠান। যে সকল যুবক এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহারা সাধারণতঃ সরকারী সামরিক প্রয়োজনে এবং আংশিকভাবে সহরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। আর এতৎসঙ্গে যে হাঁসপাতালটী আছে তাহাও ঐ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। আজকাল অবশ্য জিলাবোর্ডসমূহে কতক কতক পশুচিকিৎসক নিযুক্ত হইতেছে; কিন্তু তাহাদের দরুণ খরচটাও কৃষিবিভাগীয় ঐ বরাদ্দ হইতে দেওয়া হয়।

সমবায় ঋণ-দান সমিতি

এই বিভাগের জন্যও কৃষি-বিভাগের বাবদ ধরা ঐ ১৭ লক্ষ টাকা হইতে মবলগ ৪৬৩০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। যাদের জন্য এই বিভাগের সৃষ্টি তারা ইহার কদর স্বীকার না করিলেও কর্ত্তারা তাদের ঘাড়ের উপর এটিকে চাপাইয়াছেন। উল্লিখিত গোটা টাকাটাই কিন্তু বেতন, যাতায়াত, শৈলাবাস ও ঘরভাড়া ইত্যাদি খাতে খরচ হইয়া থাকে। সমিতিগুলির আসল কার্য্যের জন্য বরাদ্দ কিন্তু মাত্র ৩২০০০৲ টাকা। এই বিভাগের ব্যাঙ্ক আছে। তাহাতে সাধারণতঃ যাহারা টাকা আমানত রাখে তাহারা কৃষিজীবী শ্রেণীর নহে।

আমানতকারীদিগকে ব্যাঙ্ক শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে সুদ দিয়া থাকে ও ঋণ-গৃহীতাদের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ৯৲—১৫৲ টাকা হারে সুদ আদায় করিয়া থাকে। ফলে ব্যাঙ্কের তহবিলে মোটা লাভই

দাঁড়াইবার কথা। সমিতিগুলির গুণাবলী চারিদিকে ঢক্কা-নিনাদে বিঘোষিত হইতেছে,—নিষ্ঠুর কৃষিজীবী মহাজনদের হাত হইতে নিরীহ দরিদ্র কৃষককুলকে রক্ষা করাই নাকি ইহাদের লক্ষ্য। বস্তুতই যদি সমিতিগুলি খুব সফলপ্রযত্ন হইয়া থাকে, তবে কেন এই বিভাগের জন্য গরিবের মাথায় বাড়ি দিয়া আদায় করা ট্যাক্স হইতে অত-গুলি টাকা ব্যয় করা হয়? সুদের হার বা আরও হ্রাস করা হয় না কেন? এই বিভাগের আয়ের দ্বারাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া উচিত।

এই হস্তান্তরিত কৃষিবিভাগের জন্য বাকী রহিল মাত্র অল্পাধিক ১০ লক্ষ টাকা। এ টাকাটাও যদি সমুদয় খাঁটি কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হইত, তবু মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। এই টাকা হইতে ১৯২২-২৩ সনে ১৬০০০০৲ ও ১৯২৫-২৬ সনে প্রায় ২ লক্ষ টাকা "কোম্পানীর বাগানের" জন্য ব্যয় করা হইয়াছে।

রেশমের চাষ

এই বাবদের খরচটাও এই বিভাগের উপর চাপান হইয়াছে। এজন্য ১৭০০০০৲ অর্থাৎ প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। একজন ডেপুটী ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় কার্য্যালয় বহরমপুরে স্থাপিত হইয়াছে। এক কি দুইজন ইয়োরোপীয় মহিলা রেশম চাষের ওস্তাদ হিসাবে তথায় নিযুক্ত আছেন। বাংলা প্রদেশের কৃষি-কার্য্যের (এগ্রিক্যালচার) সহিত এই ডেপুটী ডিরেক্টর মহোদয়ের কোনই সংস্রব নাই। রেশমের সহিত বরং শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সম্পর্ক আছে। কিন্তু কৃষি বিভাগের সহিত ইহার কি সম্পর্ক? এখন এই বিভাগের ব্যয়-ভার দরিদ্র কৃষককুলের স্কন্ধে চাপান সঙ্গত হইয়াছে কিনা জনসাধারণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

তত্ত্বাবধান-খরচ

উপরোক্ত উপ-বিভাগসমূহের ব্যয় বাদে বাকী থাকে মাত্র কিছু কম ৭ লক্ষ টাকা—খাঁটি কৃষিকার্য্যের জন্য। এ টাকাটাও আবার নিম্নলিখিতভাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে :—

(১) ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বেতন ৪৫০০০৲ (২) উচ্চ শ্রেণীর পরিদর্শকগণের বেতন ৩৮৫০০০৲ অর্থাৎ মোট ৪৩০০০০৲ টাকা। কিন্তু ইঁহারা কি পরিদর্শন করেন? সমস্ত বাংলা দেশের পরীক্ষাধীন কৃষি-কেন্দ্রসমূহের ও একটী মাত্র কৃষি-বিদ্যালয়ের ব্যয় মোট ২ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই ২ লক্ষ টাকার কার্য্য পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। এই সকল কৃষি-কেন্দ্রে আবশ্যক পশু, বীজ, সার ও যন্ত্রাদির জন্য ৪১০০০৲ টাকা বরাদ্দ এবং এই সব অমূল্য লওয়াজিমাকে কেন্দ্র করিয়া যত সব বড় বড় ইয়োরোপীয় ওস্তাদ (এক্সপার্টস), রাসায়নিক প্রভৃতি বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করিয়া থাকেন।

এই বিভাগের যে টাকাটা সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলে উপস্থিত করা হয়, তন্মধ্যে পশু, সার ও বীজের বাবদ দেখা যায় মাত্র এই ৪১০০০৲ একচল্লিশ হাজার টাকা। ১৯২৫-২৬ সনের বাজেটে কচুরী পানা ধ্বংসের জন্য ২৫০০০৲ টাকা ও উৎকৃষ্ট পাট ও ধানের বীজ বিতরণের জন্য ১৯০০০৲ টাকা ধরা হইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু পাট ও ধানের বীজ বিনামূল্যে বিতরিত হয় কিনা আমরা জানি না। বিনামূল্যে বিতরিত না হইলে এজন্য পৃথক কোন খরচ বরাদ্দ করা সঙ্গত নহে।

গোধন বনাম ট্রাক্টর

"খুলনাবাসী"র প্রচারিত কৃষি ও গোধন বিষয়ক মন্তব্যে ট্রাক্টরের অসুবিধা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা বাঙ্‌লাদেশের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিনা ভাবিবার কথা। কিন্তু আলোচনাটা বাঙালী পাঠকমাত্রের চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এ দেশের কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে, গোবংশের ক্রমাবনতির পথ বন্ধ করিতে আত্মনিয়োগ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ম্মিত বাষ্পচালিত যন্ত্রাদি বাংলার বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত যন্ত্রপাতির মূল্য অত্যধিক। তারপর অসুবিধাও অনেক। বৃহদাকার যন্ত্রাদির কথা বাদ দিলেও ক্ষুদ্র আকারের কলের লাঙ্গলের মূল্য ১৭০০৲। কর্ষণের সময়

ইহার সঙ্গে একজন লোক থাকিতে হয়। কিন্তু এক ব্যক্তির পক্ষে কর্ষণের সবটা সময় ইহার সঙ্গে ছুটা সম্ভব নয়। এক বিঘা জমি কর্ষণ করিতে লাঙ্গলটীকে প্রায় ৩০ মাইল পথ আবর্ত্তন করিতে হইবে। সুতরাং এক বিঘা জমি চাষ করিতে হইলে ১০জন লোকের প্রয়োজন; কারণ এক জনের পক্ষে রৌদ্রে ৩ মাইলের অধিক লাঙ্গলের সঙ্গে ছুটিয়া বেড়ান সম্ভব নয়। তারপর ইহার দ্বারা আবাদের জমি বা নরম জমি চাষ করা চলে না। একসঙ্গে ৬।৭ বিঘা জমি না হইলে ইহার ব্যবহারদ্বারা লাভবান হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং এই মিডিয়াম ট্রাকটর বা কলের লাঙ্গল দ্বারা যে আমাদের কোন উপকার হইবে এমন আশা করা যায় না। কারণ ইহার পরিচালন-ব্যাপারে একে যেমন ব্যয় বাহুল্য, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত জমি কর্ষণের পক্ষে ইহার দ্বারা কোন ফল হইবে না।

আমাদের দেশে কৃষকের এক সঙ্গে ৩।৪ বিঘা জমি খুব কমই আছে। যাহা আছে তাহাও আবাদে; কিন্তু সেখানে ইহা দ্বারা কোন ফল হইবে না, তথায় বলরামের হালই প্রশস্ত।

তাই মনে হয় এদেশের কৃষির সম্যক উন্নতিসাধন করিতে হইলে গোজাতির উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বলদের দ্বারা যেমন একদিকে চাষ করা যায় অন্যদিকে তেমনি গোবরের দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা যায়। গোবরের দ্বারা উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয় এবং ইহাতে এক কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না।

বর্ত্তমানে এদেশের গোজাতি অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। তাহাদের আকৃতিগত অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বলহীন, অকর্ম্মণ্য ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। গো-মড়ক বাংলার নানাস্থানে প্রতিনিয়তই লাগিয়া আছে এবং উহার দ্বারা গো-বংশ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। অন্যান্য দেশে গো-জাতির প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয় এবং তাহাদের উন্নতির দিকে যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয়, বাংলায় অথবা ভারতে তাহার অণুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। আমরা ইংরেজকে গো-খাদক বলিয়া জানি; কিন্তু ইংরেজের দেশে গো-জাতির প্রতি যে যত্ন হয় আমাদের গোমাতার উপাসক হিন্দুর দেশে তার শতাংশের একাংশও হয় না।

এদেশে গরুর উপযুক্ত চিকিৎসা ও চারণক্ষেত্রের ব্যবস্থা নাই। গরুর মালিক কৃষক-সম্প্রদায় বড় গরিব; তাহারা অতি কষ্টে দুবেলা দুমুঠা অন্ন পায় কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে গরুর জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য পর্য্যন্ত সরবরাহ করা অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে এদেশের গোজাতির খাদ্যাভাব ইহাদের অবনতির আর একটী কারণ।

উপযুক্তসংখ্যক বলদের অভাবে আমাদের দেশের কৃষকগণ গোজাতিকে অতিমাত্র খাটায়। ইহাতে অল্প দিনেই ইহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া যায়।

উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান বৃষের অভাবে গোবংশের দৈহিক অবনতি হইতেছে এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। গোজাতিকে বাঁচাইতে হইলে, গোজাতির আবশ্যক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যাহাতে বলবান, সুস্থ গো-বৎস উৎপাদিত হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দান করা উচিত।

দুধ ও সমবায়

পনর বিশ বৎসর পূর্ব্বে সমবায় নীতিটার দিকে উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীরও সুনজর ছিল না। আজ বাংলার সকল সমাজে সমবায় প্রথাকে দিগ্বিজয়ী দেখিতেছি। মফঃস্বলের কাগজে এই সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ প্রবন্ধাদি বাহির হইয়া থাকে। "পল্লী মঙ্গলে"র একটা রচনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—

সমবায় সমিতিসমূহের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার মিঃ ডনোভন ও বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার রায় জে, এম, মিত্র বাহাদুর একদিন বারাসতে গিয়াছিলেন। পথে এক গ্রামে তাঁহাদের একজন মুসলমানের সহিত দেখা হইল। মুসলমানটীর মুখে এক ঘোরতর নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে তাঁহাদিগকে বলিল যে, তাহাদের এক বিবাহ উপলক্ষ্যে গোয়ালারা দই দিতে অস্বীকার করায় তাহারা গোয়ালাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে এবং নিজেরাই দুধের ব্যবসায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহারা কিছুতেই গোয়ালাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না।

তাহাদের কেবল ক্ষতিই হইতেছে। তথাপি জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা তখনও দুধের কারবার করিতেছে।

মিঃ ডনোভন ও মিত্র মহাশয় ঐ মুসলমানের কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাঠের উপর দিয়া দুই মাইল পথ হাঁটিয়া তাহার গ্রামে গেলেন। তাঁহারা ঐ গ্রামে সমবায় পদ্ধতিতে দুগ্ধবিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটী সমবায় সমিতি গঠন করিলেন। সমিতি রেজিষ্টারি হইল, কিন্তু প্রথম অবস্থায় দিনে ১৫ কি ৩০ সেরের বেশী দুধ পাওয়া গেল না।

গোয়ালারা ইতিপূর্ব্বে দুধের ব্যবসায় খুব লাভ করিত। তাহারা গরুর মালিকের নিকট হইতে প্রতি মণ (৫০ সের) ৬৷৷০ টাকা দরে অর্থাৎ প্রতি সের ৵০ আনা দরে কিনিত। সমবায় সমিতি প্রতি মণ ৭৷৷০ টাকা কিংবা আরো বেশী মূল্যে কিনিতে লাগিল। তারপর গোয়ালারা বাঁশের উপর আঁক কাটিয়া যে হিসাব রাখিত তাহাতেও গরুর মালিকেরা খুবই প্রতারিত হইত। সমবায় সমিতি পাস বহি রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিল। এইরূপে গরুর মালিকদের এবং সমিতিরও বেশ লাভ হইতে লাগিল। আর এই লাভ দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। গরুর মালিকেরা বিনা ঝঞ্ঝাটে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতেছে দেখিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সমবায় সমিতি গঠন করিল। এইরূপে গোয়ালাদিগকে বর্জ্জন করিবার ফলে সমবায় সমিতির সৃষ্টি হইল।

কালক্রমে অনেকগুলি দুগ্ধ-বিক্রয় সমিতির সমবায়ে সম্মিলনীর সৃষ্টি হইল। প্রথমে সম্মিলনীর কতকটা ক্ষতি হইতেছিল, কিন্তু সতর্কতা সহকারে কাজ করার ফলে ক্রমে ক্রমে লাভ হইতে লাগিল। ১৯১৯–২০ সনে সম্মিলনীর আয় ২১৩৩ পর্য্যন্ত হইল। ১৯২৪-২৫ সনে লাভের পরিমাণ ২০১৪৬৲ হইল। ১৯১৭ সনে ৩০শে জুনের পূর্ব্বে মাত্র ৪১০৲ মূল্যের দুগ্ধ বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯২৪-২৫ সনে প্রায় ১২০০০০৲ দুগ্ধ বিক্রয় হইল। ১৯২১-২২ সনে সম্মিলনীর সভ্য-সংখ্যা ২৪৬৮ ছিল এবং প্রতিদিন ৩২ মণ দুগ্ধের যোগাড় হইত।

সমবায় সমিতির প্রভাবে গোয়ালারা বিতাড়িত হইয়াছে। ফলে গরুর-মালিকেরাই সমস্ত লাভ পাইতেছে চাষাদের এত দিন দুধের ব্যবসায়ের দিকে বড় একটা ঝোঁক ছিল না। এখন তাহারা এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ দেখিয়া আরও বেশী গরু রাখিতেছে। তাহাদের কয়েকজন মিলিয়া পুনা হইতে মণ্টগোমারী ষাঁড় আমদানি করিয়াছে। অভিজ্ঞতার ফলে গরুর মালিকেরা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, গরুকে ভাল খাওয়াইলে পরিণামে বেশ লাভ হয়। সম্মিলনীর মূলধন ১৯২০-২১ সনে ৫০০৫৪৲ ছিল। ১৯২৪-২৫ সনে ৭৫৬৩৪৲ টাকা হইয়াছে। পরন্তু ১১৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে সম্মিলনীর যে বাড়ী ও যন্ত্রাদি আছে তাহার মূল্যও প্রায় ১২০০০০৲ টাকা হইবে।

(স্থানীয় দুগ্ধ ব্যবসায়িগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের লিখিত এই সুন্দর প্রবন্ধটি আমরা সঙ্কলন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে প্রত্যহ বহু পরিমাণে দুগ্ধ বিক্রী হইয়া থাকে। গ্রাম হইতে গরুর মালিকদের নিকট দাদন দিয়া গোয়ালারা এই দুগ্ধ সহরে আনয়ন করে। গো-পালকদের মধ্যে এইরূপ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে এতদ্দেশে দুগ্ধ ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইবে। কোন উদ্যোগী ব্যক্তি একাজে হাত দিবেন কি ?—পল্লীমঙ্গল সম্পাদক।)

চায়ের উপর আয়-কর

চা আজকাল বাঙালীর নয়া ধনদৌলতের খনি। কাজেই চায়ের ব্যবসায় উন্নতি অবনতি লইয়া অনেক দরদী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। "জনমত" বলিতেছেন :—

এবার হঠাৎ ভারত-সরকার চা বাগানের আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপর আয়-কর ধার্য্য করিয়া রপ্তানি-শুল্ক উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত-সরকারের অর্থ-সচিব সার বেসিল ব্ল্যাকেট দেখাইয়াছেন যে, ইহা দ্বারা ৫০ লক্ষ টাকা আয় কমিবে ও ৪৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে। হঠাৎ ভারত-সরকার ৫ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়া এত কৃপা করিলেন কেন ? ইংরেজ চা-কর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কর্ণেল ক্রফোর্ড ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার ভারতসরকারের বাজেট সম্বন্ধে বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন

নাই। যখন চায়ের উপর প্রথম আয়-কর ধার্য্য করা হয় তখন মিঃ মিলিগান ও কর্ণেল ক্রফোর্ড এখানে আসিয়া ভারতবাসী চা-করগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, চা-বাগানের আয়ের এক-চতুর্থের বেশী অ-কৃষি আয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং এক চতুর্থের বেশী আয়ের উপর আয়-কর ধার্য্য হইতে পারে না। আজ হঠাৎ অর্দ্ধেক আয় অ-কৃষি আয় বলিয়া গণ্য হইল কোন হিসাবে? ইংরেজ চা-কর সম্প্রদায়ই বা চুপচাপ কেন? ভারতবাসী চা-কর সম্প্রদায়কে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করাই হইল না। সার বেসিল ব্ল্যাকেট অবশ্য চা-ব্যবসা সম্বন্ধে একজন পুরাদস্তুর সমজদার ব্যক্তি নন। তিনি হয়ত ইংরেজ চা-করগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই সরকারী ৫ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে রাজী হইয়াছেন। এখন দেখা যাক্ ফলে কি হইবে। লঙ্কাদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি চা-আবাদী দেশে রপ্তানি-শুল্ক নাই ঠিক। কিন্তু সেখানে শতকরা পঞ্চাশ টাকা আয়ের উপর আয়-কর আছে কি? রপ্তানি-শুল্ক উঠিয়া যাওয়ায় রপ্তানি-কারকদের সুবিধা হইল। তাহারা বিনা শুল্কে রপ্তানি করিয়া লণ্ডন, কলম্বো, মেলবোর্ণ, সিডনি, সানফ্রানসিস্কো প্রভৃতি বন্দরে চা লইয়া যাইয়া অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রভূতভাবে লাভবান হইতে পারিবেন। কিন্তু ভারতবাসী চা-করগণ কি করিবেন? তাঁহাদের সে সুবিধা হইবে কি? আবার এ কথা বলা চলিতে পারে যে, রপ্তানি-শুল্ক উঠিয়া গেলে চায়ের দর বাড়িবে। রপ্তানি-শুল্ক থাকা সত্বেও গড়ে ১৲, ১।০ চা বিক্রয় হইয়াছে। এখন যদি গড়ে /০ বা ৵০ দাম বৃদ্ধি হয় তবে রপ্তানি-শুল্ক উঠিয়া যাওয়ার জন্য দাম বাড়িল না কচি পাতা তুলিয়া ভাল চা করার জন্য দাম বাড়িল, কি বুঝা যাইবে? আয়-কর যে ডবল হইল, ইহা হইল সম্পূর্ণ বাস্তব জিনিষ—বেশ অনুভব করা যাইবে। আর শুল্ক উঠিয়া যাওয়ায় যদি দাম কিছু বেশী বৃদ্ধি পায় সেটা হইবে নিতান্ত অবাস্তব লাভ—ধরা ছোঁয়া বা তৌল করা কঠিন। বলিতে পারেন ইংরেজ কোম্পানীও আয়-কর দিবে। তা ঠিক্, কিন্তু তাহাদের হেড্ আফিস বিলাতে। এক শিলিং ছয় পেন্স করিয়া টাকার মূল্য হইলে তাহারা এখানে টাকায় কিনিয়া বিলাতে ষ্টারলিংএ বিক্রয় করিয়া যত টাকা লাভবান হইবে, তাহাতে আয়-করের টাকা উঠিয়া যাইবে না কি? এবার চায়ের দাম অন্যায় ধুয়া তুলিয়া কমাইয়া দিয়া কলিকাতার দালালগণ কি এই জন্যই পূর্ব্ব হইতে সব জানিয়া শুনিয়া বেনামীতে চা খরিদ করিয়া রাখিল? জলপাইগুড়ি ভারতীয় চা-কর সম্প্রাদায়ের পক্ষ হইতে যাহা ছিল তাহাই বজায় রাখিবার জন্য আয়-কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া, সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ চন্দ্র সান্যাল মহাশয় তারযোগে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিবের নিকট নিবেদন করেন। বিবৃত আপত্তি পরে পাঠান হইতেছে। শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুক্ত নবাব সাহেবের আহ্বানে ভারতীয় চা-করদের সভা হইতেছে। দেখা যাক্ কত দূর ফল ফলে। চায়ের ব্যবসায়ে বাঙ্গালীরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ফলে এই ব্যবস্থা হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লায় বাঙ্গালীর হাত হইতে কয়লার ব্যবসা চলিয়া গেল। এখন চায়ের কি হয় দেখা যাক্। সবই শুল্কের মারপ্যাচ।

নবীন দুনিয়ায় কুটিরশিল্প

কুটির-শিল্পের কথা উঠিলে বাঙালী লেখক ও বক্তারা অতি-উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। "প্রাস্তবাসী" এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভিতর বস্তুনিষ্ঠা আছে প্রচুর। প্রবন্ধটা উদ্ধৃত করিতেছি।

বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে কুটির-শিল্প প্রায় সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন ইহার পুনরুদ্ধারের জন্য শুধু ভারতবর্ষে যে প্রধান প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা নহে, সমগ্র জগতে এজন্য এক বিষম সাড়া পড়িয়াছে। শ্রমবল কেন্দ্রীভূত করিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সহরে সহরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার উদ্যোগ এযুগের বিশেষত্ব। এ উদ্দেশ্যে দেশে দেশে বহু কারখানা, বহু মিল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও শিল্পসমস্যার সমাধান হইতেছে না। ধনী কলওয়ালাগণের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ দরিদ্র শ্রমিকগণের দ্বন্দ্ব ক্রমে যেরূপ ভীষণাকার ধারণ করিতেছে তাহাতে মনে হয়, কলকারখানায় এরূপ শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। প্রতিযোগিতার এই কর্ম্মমূলক

যুগে শুধু যে বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির, শক্তির সহিত শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অহরহঃ বিশ্বের শিল্পসমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে এমন নয়, যতদূর সম্ভব অল্পমূল্যে শ্রমশক্তি নিয়োগের প্রতিযোগিতাও বর্ত্তমানে এত কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিষ্ঠাবান হইতে না পারিলে কোন্ কলকারখানাই টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং ধনবল ও শ্রমবলের সংঘর্ষ যতই জটিল হইয়া উঠিতেছে ততই কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পল্লীতে পল্লীতে সরাইয়া দেওয়ার প্রবল চেষ্টা সর্ব্ব-দেশেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে ইউরোপ জনবহুল নগরে নগরে কলকারখানার অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল। সেই ইউরোপই আবার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রতি ঘরে ঘরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণিতে কুটির-শিল্প প্রবর্ত্তনের যে অদম্য চেষ্টা চলিতেছে, জাপান যাহার অনুকরণ করিতেছে এবং যাহাতে আমেরিকাও সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে শিল্প-রাজ্যে বাস্তবিকই যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

ভারতবর্ষে এ আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। কিন্তু বিস্তৃতভাবে কুটিরশিল্প প্রবর্ত্তনের কোন কার্য্যকর পন্থা এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। মান্ধাতার আমলের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া এবিষয়ে সুফল লাভ করা সুদূর-পরাহত। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের যে ঢেউ এদেশ প্লাবিত করিয়াছে, নব নব যন্ত্রসৃষ্টি, নব নব অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার প্রভৃতি দ্বারা দূরকে নিকট অভাবনীয়কে করতলগত করার যে পাশ্চাত্য প্রচেষ্টা এদেশকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া পুরুষপরম্পরাগত একঘেয়ে প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে কুটির-শিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ছোটখাট যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার সাহায্যে আধুনিক রুচির উপযোগী শিল্পসম্ভার প্রতিগৃহে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এ সমস্যার সহজেই সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের প্রকৃতি ও অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য ইহার সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু ভারতবাসীর স্বভাবজাড্য ও কর্ম্মবিমুখতা ইহার বিশাল অন্তরায়। ত্রিশ কোটি নরনারী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে ২৩কোটি ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২শত ৫০ জন কৃষিজীবী ও কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই সকল কৃষিজীবী বৎসরের কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও বহু সময় অলসভাবে কর্ত্তন করিয়া থাকে। তাহাদের অবসর সময় শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত হইলে আশাতীত সাফল্যলাভ অবশ্য-ম্ভাবী। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে গ্রাম্য শিল্পের উপযুক্ত ছোট ছোট যন্ত্রপাতি আনয়ন করিয়া দেশের প্রয়োজনমত প্রভূতপরিমাণে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই সকল লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বভাবজাড্য বিদূরিত হইবে এবং তাহারা কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিবে। এভাবে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত গ্রামিকগণের সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শিল্পনির্ম্মাণ-ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে; এবং কলকারখানায় প্রস্তুত শিল্পের সঙ্গে কুটির-শিল্পের প্রতি-যোগিতা সম্ভবপর হইবে। অনায়াসলব্ধ শ্রমবলপরিচালিত অনাড়ম্বর শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধ প্রশমিত হইবে। ধনদৌলত সমাজের মাত্র কতিপয় লোকের অঙ্কশায়ী না হইয়া সর্ব্বজনভোগ্য হইবে এবং কৃষক ও শ্রমিকগণের দুর্দ্দশার অবসান হইবে।

কুটিরশিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে এখনও যেসকল গ্রাম্যশিল্প কোনরূপে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। তৎপর ছোট ছোট যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেসকল নূতন শিল্প অল্প মূলধনে চালাইতে পারা যায়, সে সকলের প্রবর্ত্তন করিয়া কৃষকগণ ও নারীগণকে তাহাদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপে নিব, দিয়াশলাই, পেন্সিল, কলমের হাণ্ডেল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি গৃহে গৃহে উৎপন্ন হইতে পারে। ইন্ডাষ্ট্রীয়েল কেমিষ্ট্রীতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকবৃন্দের সাহায্যে কাঠ, মাটী, টিন এবং লৌহ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য হইতে বহুবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। পাটের বস্তা, চট, গেঞ্জী, মোজা, জামা, বোতাম প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য এইরূপে কল-সাহায্যে অল্পায়াসলব্ধ হইতে পারে। সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার,

চর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি বহুবিধ সম্প্রদায় তাহাদের স্বীয় স্বীয় শিল্পব্যবসায়ে উদাসীনতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। বহুকাল যে শিল্পকার্য্য তাহাদের একচেটিয়া ছিল, তাহা এখন পরহস্তগত হইতে চলিয়াছে। উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া যাহাতে তাহারা আবার প্রতিষ্ঠাবান হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্ত্রশিল্প কুটিরশিল্পের প্রধানতম। চরকা-সাহায্যে, সুতাকাটা উন্নততর উপায়ে তাঁতবুনা প্রভৃতি কার্য্যে অবসরমত জনসাধারণ আত্মনিয়োগ করিতে যতই অভ্যস্ত হইবে ততই বস্ত্র-সমস্যার সমাধানে সাফল্যলাভ করিবে। বর্ত্তমান যুগের অভাব ও প্রয়োজন হিসাবে কাগজ-শিল্পও নগণ্য নহে। এককালে এ শিল্পে এদেশবাসী বিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। তাহার পুনরুদ্ধার অত্যাবশ্যক। প্রতীচ্যের প্রতিযোগিতায় লুপ্তগৌরব রেশম-শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে জনবিরল অরণ্যময় বহু প্রাচীন গ্রামের সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। ভারতে মাত্র ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক শিল্পের সেবা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬ শত ২২ জন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি করিয়া থাকে। বিস্তৃত আকারে কুটিরশিল্প প্রবর্ত্তিত হইলে ইহার পাঁচগুণ লোক শুধু শিল্প ও বাণিজ্যদ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারিবে। সুতরাং গ্রাম্যশিল্প যাহাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান হইতে পারে, ভারতের লুপ্ত গৌরব, লুপ্ত সমৃদ্ধি যাহাতে পুনরাগত হইতে পারে তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

গরুর প্রাণ ও বাঙালীর জান

গোসেবার কথায় বাঙালীরা,—বিশেষতঃ হিন্দুরা অনেক সময় আবল তাবল বকিয়া থাকেন। কিন্তু আজকাল মফঃস্বলের সাপ্তাহিকেও সংযত চিন্তাপূর্ণ কাজের কথা আলোচিত হইতেছে। "গোদুগ্ধ ও বাঙালীর স্বাস্থ্য" শীর্ষক রচনায় "ময়মনসিংহ সমাচার" যথেষ্ট তথ্য-নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধটা নিম্নরূপ :—

বাঙ্গালী যে দিন দিন ভগ্নস্বাস্থ্য ও হীনশক্তি হইয়া পড়িতেছে এ বিষয়ে আর আজ সন্দেহের কোন কারণ নাই। বাঙ্গালীর এই অবস্থার যে অন্যতম প্রধান কারণ বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের অভাব, তাহাও অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি ডাক্তার হেরাল্ডমেন বিলাতের বৃটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ্চ কাউন্‌সিলের সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অন্যান্য খাদ্যের চেয়ে শিশুদেহের পক্ষে বিশুদ্ধ গোদুগ্ধই অধিকতর উপযোগী ও স্বাস্থ্যপ্রদ। তিনি চারি বৎসরকাল ধরিয়া প্রায় ৫০০শত বালককে গোদুগ্ধ পান করাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক শিশুর দৈনিক এক পাইট দুগ্ধ পান করা আবশ্যক। আমাদের জনৈক দেশীয় চিকিৎসকও বলেন যে, শিশুকাল হইতে নিয়মিতভাবে গোদুগ্ধ পান করিতে পাইলে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি বেশ সতেজ ও সবল থাকে এবং কোন রোগে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। এখন বাংলার সহরের ত কথাই নাই, মফঃস্বলেও গৃহস্থের ঘরে গাভী কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা খুবই কম। ইহার মূল কারণ গোসেবার ত্রুটি, এবং তাহা কতকটা স্বেচ্ছাকৃত ও কতকটা অবস্থাকৃত। বাঙ্গালী স্বভাবসুলভ আলস্যবশতঃ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও বিদেশাগত সহজলভ্য দ্রব্যাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। তাই আজ গোদুগ্ধের স্থান বিলাতী জমাট দুগ্ধ, মেলিন্স ফুড্ প্রভৃতি অধিকার করিয়াছে। এইগুলি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থের কোনই শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূমির মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গোচারণের জন্য পতিত মাঠ আজ কৃষকের চাষের জমিতে পরিণত হইয়াছে। ফলে গোজাতির আহার্য্যও দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই ফলে গোজাতির অবনতি ও গো-সেবার অসুবিধা ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বকার দিনে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যেরূপ ছিল এখন সেরূপ নাই। তখন প্রায় সকল গৃহেই দুগ্ধবতী গাভী ছিল এবং গো-সেবার ফলে গাভী প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিত। ফলে গো-দুগ্ধ তেমন দুষ্প্রাপ্য ছিলনা। সে কালে পল্লীগ্রামে গো-দুগ্ধের জন্য অর্থব্যয় করিতে হইত না। দুগ্ধ বিক্রয় করা

পল্লীবাসিগণ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করিত। তাই সেকালের ছেলেপিলে পেট ভরিয়া খাঁটি দুগ্ধ খাইতে পারিত। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যও তখন অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং বাঙ্গালীর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতঃ ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ সুলভ হয় তজ্জন্য প্রতি গ্রামে গোচারণের মাঠ রক্ষার উপায় অবলম্বন করা গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অবশ্যকর্ত্তব্য।

পল্লী-সেবার নয়া ঢঙ্

আমরা বাঙালী লেখক ও পাঠকদিগকে মফঃস্বলের চিন্তা-সম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি। পল্লীর সঙ্গে সহযোগ কায়েম করিলে কলিকাতার মগজটাও তাজা ঘীয়ে ভরিয়া উঠিবে। পল্লী-সেবার এ এক নয়া ঢঙ্ বাতলানো যাইতেছে। পণ্ডিতেরা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

কলিকাতার নগরশাসন—সেকাল ও একাল

তাহেরুদ্দিন আহ্‌মদ

কলিকাতার নগর-শাসনের ইতিহাস বলিতে গেলে সেই ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। তখন সর্ব্বপ্রথম কর্পোরেশ্যান নামে একটি নগর-শাসন-সমিতির পত্তন হয়। সেকালে একজন মেয়র ও নয়জন অল্ডারম্যান লইয়া কার্য্যারম্ভ করা হয়। জমির কর ও নগর সম্পর্কিত অন্য প্রাপ্য আদায় করা এবং তাহাদ্বারা রাস্তাঘাট নালা নর্দ্দমার মেরামতকার্য্য সম্পন্ন করা প্রধানতঃ এইগুলিই ইঁহাদের কার্য্য ছিল। কিন্তু এই শেষোক্ত নগর-উন্নতির কার্য্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইত তাহা প্রয়োজন-অনুপাতে অতি সামান্য হওয়ায় ১৭৫৭ সনে কলিকাতার বাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর একটা পাকা তহবিল কায়েম করিবার চেষ্টা চলে, যদিও এই প্রচেষ্টা কোনই কাজে আসে নাই।

সেকালে নগরেরর শান্তি-শৃঙ্খলার ভার পুলিশ কমিশনার বা কলিকাতা পুলিশের বড় কর্ত্তার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তখন শান্তি শৃঙ্খলার কাজ সুচারুভাবে চলিলেও ১৭৮০ সনে সহর কিরূপ নোংরা এবং ইহার স্বাস্থ্য কিরূপ জঘন্য ছিল এ সম্বন্ধে ম্যাকিনটশ সাহেব এক বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "কালিফোর্ণিয়ার পশ্চিম প্রান্ত হইতে জাপানের পূর্ব্ব সীমানা পর্য্যন্ত কোথায়ও কোম্পানী-শাসিত বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরের মত এমন একটা বিশ্রী স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যেখানে সেখানে এলোমেলো ভাবে সাজান কুণ্ডলীপাকান কতকগুলি দালান কোঠা, ঘরবাড়ী, কুঁড়ে চালা, রাস্তাঘাট, অলি গলি, পুকুর ইঁদারা ইত্যাদি মিলিয়া যে একটা জঘন্য পূতিগন্ধময় স্থানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই নাম কলিকাতা সহর। গঠন-প্রণালী এমনই জঘন্য ও মানুষের রুচি, স্বাস্থ্য, বিচার-বুদ্ধি, শোভনশীলতা এবং সাধারণ সুখ-সুবিধার প্রতি এমনই উপেক্ষা দেখান হইয়াছে যে ইহা একান্ত ন্যক্কারজনক। সহরে যাহা কিছু পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা নজরে পড়ে তাহা কেবল ক্ষুধার্ত্ত নিশাচর শৃগালকুল এবং শকুনি, চিল, কাক প্রভৃতি বুভুক্ষু পক্ষীদের দৌলতে। ঠিক একইরূপে সরকারী রাস্তার আশে পাশের বাড়ী হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহার কৃপায় সহরবাসী দূষিত বদ্ধ খানা ডোবার জল হইতে সৃষ্ট মশকের হাত হইতে ক্ষণিকের জন্য আরাম ও শান্তি পাইয়া থাকে।"

যাহা হউক ১৭৯৪ সনে তৃতীয় জর্জ্জের আমলে জাষ্টিস অব্ দি পিস নামক খেতাবধারী শান্তি-সদস্য লইয়া কতক-

গুলি নগরপ্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়। ইঁহাদের হাতে নগরশাসনের ভার দেওয়া হয় এবং নাগরিকগণের উপর নিয়মিত কর বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইঁহাদের সময়ে সার্কুলার রোড পাকা করা হয় এবং সহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার কাজও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনেক দোষ ত্রুটী তখনও থাকিয়া যায়। সাধারণ নালা নর্দমা ও জল-নিকাশের অনেক ত্রুটী দেখিয়া এবং হাট বাজার কসাইখানা বসান সম্বন্ধে কোনরূপ শৃঙ্খলা বিধান না দেখিয়া এবং বাড়ী ঘর নির্ম্মাণে এলোমেলো প্রণালী ও রাস্তাঘাটের বিপজ্জনক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া লর্ড ওয়েলেসলী ৩০ জন সদস্য লইয়া সহরের প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনের জন্য এক টাউন ইম্‌প্রুভমেণ্ট কমিটি (নগর উন্নতিসাধন সমিতি) নিযুক্ত করেন।

এতদ্ব্যতীত সেকালে লটারীর সাহায্যে নগর-উন্নতির নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইত। ১৭৯৩ সন হইতে এইরূপ লটারীর সাহায্যে সংগৃহীত অর্থের শতকরা দশ ভাগ সরকারী পূর্ত্তকার্য্য ও অন্যান্য দাতব্য প্রচেষ্টার জন্য পৃথক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। যতদিন টাউন ইম্‌প্রুভমেণ্ট কমিটি ছিল ততদিন এই সব কার্য্যের ভার ঐ সমিতিই গ্রহণ করিতেন; কিন্তু ১৮১৭ সনে লটারী কমিটি গঠিত হওয়ার পর হইতে প্রায় বিশ বৎসর এই সমিতিই ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিতেন। এই লটারী কমিটির সময়ে নগরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই সময় টাউন হল (নগর ভবন) স্থাপিত হয়, বেলেঘাটা ক্যানাল খনন করা হয়; এবং অনেকগুলি বড় বড় সড়ক তৈয়ারী হয়। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ডরোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কীডষ্ট্রীট, ক্যানাল রোড, ম্যাঙ্গো লেন, এবং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার বিশেষ করিয়া সহরের উত্তর সীমানা,—সেই শ্যামবাজার হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণ পল্লীর সাহেব পাড়া পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ বিশালকায় রাজপথ বর্ত্তমান কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ও ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট নামে অভিহিত হয় তাহাও এই সময়েরই কীর্ত্তি। এই সব সুদীর্ঘ রাস্তার সংলগ্ন ৪টি চত্বরও (স্কোয়ার) এই যুগের। ইহা ছাড়া রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থাও এই সময় অনেকটা বাড়ান হয়।

তারপর ১৮২০ সনে বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে সহরের রাস্তাগুলিকে পাকা নিটোল করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হয়। বিলাতের জনমত কিন্তু তখন মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের জন্য এরূপভাবে অর্থব্যয় করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। এইরূপ নগরের নানাবিধ হিত-সাধন ও শ্রীবৃদ্ধির কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর ১৮৩৬ সনে এই লটারী-কমিটির অবসান ঘটে। ইতিমধ্যে ১৭৯৪ সনে তৃতীয় জর্জ্জের শাসনকালে জাষ্টিস অব্ দি পিস নামক শান্তি সদস্যদিগের উপর নগর পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। তাঁহারা বাড়ী ও মাদক দ্রব্যের লাইসেন্স বাবদ আদায়ী ট্যাক্‌স হইতে নগরের সৌকর্য্যসাধন এবং সহরের পুলিশের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮১৯ সনে এইরূপ বাড়ী হইতে সংগৃহীত ট্যাক্‌সের পরিমাণ ২৷৷০ লক্ষ টাকার উপর হয়। ইহা ব্যতীত আরও ১৷৷০ লক্ষ টাকা আবকারী হইতে পাওয়া যাইত। কিন্তু এই সময় নগর শাসন ও পুলিশের দরুণ ৫৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ঘাটতি সরকার পূরণ করেন।

১৮১০ সনে মিউনিসিপ্যাল করনীতি সহরতলী সমূহেও প্রয়োগ করা হয়। ১৮৪০ সনে নাগরিক সভায় যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাহার ফলে কলিকাতাকে প্রধানতঃ ৪টি বিভাগে ভাগ করা হয় ও এই নিয়ম করা হয়, যদি করদাতা-গণের ⅔ অংশ লোক আবেদন করেন তাহা হইলে সহরের বাড়ীসমূহের উপর কর ধার্য্য করিবার ভার তাঁহাদের হাতেই দেওয়া হইবে, এবং উক্ত প্রকারে টাকার শতকরা ৫ ভাগ তাঁহারা নিজেরা আদায় ও ব্যয় করিতেও পারিবেন। এই আইন কোনই কাজে না আসায় ১৮৪৭ সনে জাষ্টিস অব্ দি পিস গণের হাত হইতে নাগরিয় সভার দায়িত্বভার উঠাইয়া লওয়া হয় ও ৭ জন বেতনভোগী সভ্য লইয়া নগরশাসন ও ইহার উন্নতিকল্পে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। ইহার সভ্যগণের ৪জন করদাতা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। ইঁহাদের হাতে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, কলিকাতার উন্নতি ও সংস্কারবিধানকল্পে ইঁহারা সম্পত্তি খরিদ ও তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন। ইঁহাদের হস্তে রাস্তাঘাট ও নালা

নর্দ্দমার সুব্যবস্থা করিবার ভারও ন্যস্ত হয়। ১৮৫২ সনে ইঁহাদের সংখ্যা কমাইয়া ৪জন করা হয়, দুইজন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ও দুইজন করদাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। ইঁহারা উর্দ্ধসংখ্যা ২৫০৲ পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পাইবার অধিকারী হন। এই সময়ে বাড়ীর উপর ধার্য্য ট্যাক্সের হার প্রথমে শতকরা ৬॥০ ভাগ ও পরে ৭॥০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। আলোর ট্যাক্স শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া অশ্ব ও অন্যান্য যান-বাহনের উপর পূর্ব্ব হইতেই সেই ১৮৪৭ সনের মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। সেকালে কমিশনারগণকে (নাগরিক সভার সভ্য) নগরের পয়ঃ-প্রণালী ও মলপূর্ণ জল নিকাশের ব্যবস্থা করণার্থ ১॥০ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিতে হইত। ১৮৫৬ সনে কমিশনার-গণের সংখ্যা কমিতে কমিতে মাত্র তিন জন বাহাল থাকে। ইঁহারা সকলেই তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুরের দ্বারা নিযুক্ত হইতেন।

পুনরায় ১৮৬৩ সনে কলিকাতার সমুদয় শান্তি-সদস্য ও মফঃস্বলের যে সমস্ত শান্তিসদস্য কলিকাতায় থাকিতেন তাঁহাদিগকে লইয়া এক কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির হস্তে নগর শাসনের যাবতীয় ভার অর্পণ করা হয়। সদস্যেরা নিজেদের একজন সহকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া ইঁহাদের সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (হেলথ অফিসার), এঞ্জিনিয়ার, সারভেয়ার তহশীলদার (ট্যাক্স কলেক্টর), করনির্দ্ধারক (অ্যাসেসর), প্রভৃতি ছিলেন। এই সময়ে জলের ট্যাক্স উর্দ্ধতন শতকরা দশভাগ ধার্য্য করা হয়। ইঁহাদের আমলে পয়ঃপ্রণালী ও কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৬৬ সনে মিউনিসিপ্যাল কসাইখানা ও ১৮৭৪ সনে নিউমার্কেট স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া সহরের বড় বড় রাস্তার পাশ দিয়া পাদ-পথ (ফুটপাথ) তৈয়ারী হয়। বিডনস্কোয়ার এই সময়ের কীর্ত্তি। মোটের উপর এই সকল নগর-উন্নতির কার্য্যে সে সময় কম সে কম দুই কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

১৮৭৬ সনে কর্পোরেশনের চেহারা একদম বদলাইয়া ফেলা হয়। নবগঠিত কর্পোরেশ্যনের ৭২ জন কমিশনারের ৪৮ জনই করদাতাগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও বাকী ২৪ জন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক মনোনীত হন। এই নব গঠিত নাগরিক সভার আমলে পূর্ব্বকালীন অসমাপ্ত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং সহরের বিশুদ্ধ ও ময়লা জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করে। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এই সময় হ্যারিসন রোডের নির্ম্মাণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৮৮৪ সনে সার্কুলার রোডের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে অবস্থিত সহরতলীর কিয়দংশ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে আনয়ন করিয়া ইহার সীমানা বর্দ্ধিত করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ৭টি ওয়ার্ড এবং সহরের উত্তর বিভাগের তিনটি ওয়ার্ড কর্পোরে-শনের সহিত যুক্ত হয় এবং কমিশনারগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৭৫ জন সাব্যস্ত করা হয়। ইঁহাদের ৫০ জন নির্ব্বাচিত এবং ১৫ জন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত, অবশিষ্ট ১০ জন বাংলার বণিকসভা (বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স), বাণিজ্য সংসদ (ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন) ও পোর্ট কমিশনার্স দ্বারা মনোনীত। পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে এই নাগরিক সভা কর্ত্তৃক ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহের বিস্তৃতি সাধন করা হয়, এবং মাটীর নীচেকার পয়ঃপ্রণালীসমূহ বৃদ্ধি করা হয়, ধোবীখানা স্থাপিত হয় এবং কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর পচা পুকুর ভরাট করিয়া তাহার উপর রাস্তা ও চত্বর (স্কোয়ার) নির্ম্মাণ করা হয়।

১৮৯৯ সনের তিন আইনের বলে শাসন পরি-সংশোধিত হইয়া কর্পোরেশ্যন, জেনারেল কমিটি ও চেয়ারম্যান এই তিনের কর্ত্তৃত্ব হয়। একজন সরকারী মনোনীত চেয়ারম্যান এবং ৫০ জন কমিশনার লইয়া কর্পোরেশ্যন গঠিত হয়। ইহার কমিশনারগণের ২৫ জন ওয়ার্ড নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হন এবং অবশিষ্ট ২৫ জনের ৪ জন বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স (বাংলার বণিক সভা), ৪ জন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (ব্যবসা সঙ্ঘ) ২ জন পোর্ট কমিসনার্স, এবং ১৫ জন স্থানীয় সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হন। জেনারেল কমিটি একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন কমিসনার লইয়া গঠিত হয়। সদস্যগণের মধ্যে

৪ জন ওয়ার্ড কমিশনার কর্ত্তৃক, ও ৪জন ওয়ার্ড কমিটির কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪জন স্থানীয় সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। সম্পূর্ণ কার্য্য-ক্ষমতা চেয়ারম্যানের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং আইনে যে যে স্থলে পরিষ্কার উল্লেখ আছে সেই সেই বিষয় কর্পোরেশ্যন বা জেনারেল কমিটির সম্মতিসাপেক্ষ করা হয়। আলোচনা সমিতি ও কার্য্যকরী সমিতির মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত কার্য্যের ভার কর্পোরেশ্যনের হাতে দেওয়া সম্ভবপর নয় অথচ সেগুলি এত গুরুতর বিষয় যে, তাহা কেবল মাত্র চেয়ারম্যানের হাতে ফেলিয়া রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়, জেনারেল কমিটি কেবল সেই সমস্ত বিষয়ই সম্পন্ন করিতেন।

কর্পোরেশ্যনকে আধুনিক জীবনসম্মত করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত ১৯২৩ সনের তিন আইন অনুসারে সম্প্রতি ইহার আইনকানুনের এক আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯২৪ সনের এপ্রিল মাস হইতে এই নব্য-ব্যবস্থানুযায়ী বর্ত্তমান নাগরিক সভার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

এই আইন প্রণয়নের ফলে প্রথমতঃ কর্পোরেশ্যনের সীমানা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, গার্ডেনরিচ, টালীগঞ্জের কিয়দংশ এবং সহরের দক্ষিণোপকণ্ঠে অবস্থিত ডকনির্ম্মাণার্থ পোর্ট-কমিশনারগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত জমি কর্পোরেশ্যনের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার সীমানা ১১ বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কর্পোরেশ্যনের নাগরিক সংখ্যা ১,৬৯,০০০ স্থলে ১০,৫৫,০০০ তে গিয়া ঠেকিয়াছে। কাশীপুর ও চিৎপুর ৩০, ৩১, ৩২ নামক তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়াছে। মাণিকতলাকে ২৮, ২৯ ওয়ার্ডে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার উপর সমস্ত গার্ডেনরিচ ও ভবানীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন পোর্ট কমিশনারগণের ডক বিস্তৃতির জমি লইয়া ২৫নং ওয়ার্ডটির সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইজন্ত সাউথ সুবার্বণ মিউনিসিপ্যালিটীর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কলিকাতা কর্পোরেশ্যনকে দশ বৎসর ধরিয়া ৮ হাজার টাকা হিসাবে দিতে হইবে। ইহা ছাড়া যে তিনটি মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির উন্নতিবিধানকল্পে এই নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন মোতাবেক কাজ চলিবার তৃতীয় বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া দশম বৎসর পর্য্যন্ত কম পক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরাতন মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন কয়েকটী ওয়ার্ডের চেহারা একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। আবার বালীগঞ্জ ওয়ার্ডটিকে ভাঙ্গিয়া বালীগঞ্জ ২১নং ওয়ার্ডে, ও টালীগঞ্জ ২৭নং ওয়ার্ডে পরিণত করা হইয়াছে। পূর্ব্বের ১৮নং ওয়ার্ডটি বর্ত্তমানে ২৫নং এর সহিত যোগ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৯, ২২, ২৩ ও ২৪ ওয়ার্ড গুলিতেও ছোট খাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৮৮৮ সনের পর হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত কর্পোরেশ্যনের অধীন ২৫টি ওয়ার্ড ছিল। নূতন আইনের ফলে ৭টি ওয়ার্ড বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ৩২টি ওয়ার্ড কর্পোরেশ্যনের তাঁবে আসিয়াছে।

নূতন আইন অনুসারে কর্পোরেশ্যনের সীমানা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার শাসন-পদ্ধতি গণতন্ত্রমূলক করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এবং বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্ব্বাচন-প্রথারও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কর্পোরেশ্যন ৯০ জন কমিশনার বা নগর সদস্য লইয়া গঠিত; ইঁহাদের ৬৩ জন করদাতাগণকর্ত্তৃক সাধারণ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত। আবার জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে ১৫ জন সদস্য মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়ার বিধি আছে। ইঁহাদের সম্বন্ধে আবার নিয়ম করা হইয়াছে যে, নূতন আইন অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবার পর প্রথম তিনটি নির্ব্বাচনে ইঁহারা কেবলমাত্র মুসলমান নির্ব্বাচক-মণ্ডলী দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইবেন। চতুর্থ নির্ব্বাচন হইতে মুসলমান সদস্যগণও মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলী (মিক্সড্ ইলেকটরেট) দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। বঙ্গীয় বণিক সভা বর্ত্তমানে ৪ জনের স্থলে ৬ জন সদস্য প্রেরণে অধিকারী হইয়াছেন। কলিকাতার ব্যবসা সঙ্ঘ (ট্রেড্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন) ও পোর্ট কমিশনারগণ যথাক্রমে পূর্ব্বের মত ৪ ও ২ জন সভ্য মনোনীত করিতে অধিকারী। সরকারের মনোনয়ন ক্ষমতা ১৫ হইতে ১০ জনে হ্রাস করা হইয়াছে। এই সর্ব্বসাকল্যে বর্ত্তমান ৮৫ জন সহর মাতব্বরকে বর্ত্তমানে কাউন্সিলর নামে অভিহিত করা হয় এবং অবশিষ্ট ৫ জনকে অল্ডারম্যান বলা হয়।

প্রত্যেক সাধারণ নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচিত এই ৮৫ জন কাউন্সিলর কর্ত্তৃক ৫ জন অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। অল্ডারম্যান নগরের সম্ভ্রান্ত পুরবাসিগণের মধ্য হইতে গৃহীত হয়। কোন নির্ব্বাচিত কাউন্সিলর অল্ডারম্যান হইতে অধিকারী নহেন। প্রত্যেক তিন বৎসর পর সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, এবং কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণের কার্য্যকাল তিন বৎসর করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর কর্পোরেশ্যানের কাউন্সিলরগণ মিলিত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে একজন অবৈতনিক মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত করেন। কর্পোরেশ্যানের কাউন্সিলরগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দরুণই যে ইহার শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হইয়াছে এরূপ নহে, ইহার আরও অনেকগুলি কারণ আছে। ভোট দিবার যোগ্যতা কম করার ফলে অনেক বেশী লোক নির্ব্বাচকমণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছে। ফলে ভোটাধিকার অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নারীদিগেরও ভোট দিবার এবং সভ্য হইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তারপর ব্যালট প্রথায় ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

পুরাতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ভোটাধিকারী হইতে হইলে নির্ব্বাচনের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে স্থায়ী ট্যাক্সের দরুণই হউক কিংবা লাইসেন্স বাবদ ট্যাকসের দরুণই হউক অথবা উভয় প্রকার ট্যাক্সের দরুণই হউক বার্ষিক ২৪৲ কর কর্পোরেশ্যানকে দিতে হইত। অধুনা এই ভোটাধিকারের যোগ্যতা ১২৲ টাকায় নামান হইয়াছে। পূর্ব্বে আবার এই ভোটাধিকার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ও সম্পত্তির মালিকগণের এবং কয়েক শ্রেণীর লাইসেন্সওয়ালাগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, আর ইহাদের নাম পূর্ব্ব হইতেই কর্পোরেশ্যানের খাতায় নথীভুক্ত করিয়া রাখা হইত। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যে কোন ভাড়াটে গোটাবাড়ী কিংবা তাহার কোন একটা অংশের জন্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৬ মাস ধরিয়া কম পক্ষে মাসিক ২৫৲ টাকা দিলেই নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী। ইহা ছাড়া সামান্য একটা কুঁড়ে ঘর বা বাড়ীর মালিক যদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কম পক্ষে ১২৲ স্থায়ী কর প্রদান করেন তিনিই ভোটার হইতে পারেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল ট্যাক্সের টাকার পরিমাণ অনুযায়ী একটি ওয়ার্ডের একজন ভোটার ঊর্দ্ধসংখ্যা ১১টি ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন; আর সেই ভোট এমন কি মাত্র একজন প্রার্থীকে দেওয়া চলিত। নূতন ব্যবস্থায় এই প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনকার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ভোটার যত লোক কাউন্সিলরের পদপ্রার্থী থাকিবেন ততগুলি ভোট দিতে পারিবেন; কিন্তু একজন পদপ্রার্থীকে কোন নির্ব্বাচক একের বেশী ভোট দিতে পারেন না। পূর্ব্বে ১৯১০ সনে নিয়ম ছিল যে চেয়ারম্যান, কর্পোরেশ্যান ও জেনারেল কমিটি প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিত এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যান ও জেনারেল কমিটির সভাপতি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে সর্ব্বত্র একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চালাইতেন। বর্ত্তমান আইন অনুসারে এই প্রথা রহিত পূর্ব্বক একমাত্র কর্পোরেশ্যানের হাতেই কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও কর্পোরেশ্যানের ক্ষমতা যথেচ্ছভাবে চালাইবার স্পৃহাকে দমন করিবার অস্ত্র সরকারের হাতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান কর্পোরেশ্যানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম রাখা হইয়াছে চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কর্পোরেশ্যান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন বটে, কিন্তু সেই নিয়োগ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার হাতে আইনে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া কর্পোরেশ্যান তাঁহার হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিবেন তিনি শুধু সেই সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে অধিকারী। কর্পোরেশ্যানের সভা সমিতিতে তাঁহার সভাপতিত্ব করিবার কোন অধিকার নাই; তিনি কেবল সাধারণ সভ্যের মত সভার আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে অধিকারী নহেন। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিয়োগ ছাড়া ডেপুটি কর্ম্মকর্ত্তা, প্রধান এঞ্জিনিয়ার এবং স্বাস্থ্যপরিদর্শক প্রভৃতি আরও কতকগুলি বড় বড় পদের নিয়োগও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কিন্তু হাজার টাকা কিংবা তাহার চাইতে বেশী বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলেই সরকারের অনুমতি লইতে

হইত। পূর্ব্বে কারখানা বা কণ্ট্রাক্টের কাজে লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইলেই সরকারের অনুমতি লইতে হইত। এক্ষণে ২॥০ লক্ষ টাকার কম খরচের জন্য সরকারের অনুমতি লওয়ার কোন আবশ্যক করে না। বর্ত্তমানে নূতন কোন উপবিধি প্রণয়ন করিতে হইলে সরকারের অনুমতি চাইতে হইবে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান আইনে সরকারের হাতে আরও কিছু কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা রাখা হইয়াছে। কর্পোরেশ্যনের কোন কাজকে সরকার যদি আইন-বিগহিত মনে করেন তাহা বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা সরকারের আছে এবং তাহা নাকচ করিবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক সরকার তাহা করিতে পারেন।

কর্পোরেশ্যনের আয়-ব্যয়ও অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরতলীর যে সমস্ত ওয়ার্ড কর্পোরেশানের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে তাহার উন্নতি বিধানের জন্য কর্পোরেশ্যনকে দশ বৎসর কাল প্রতি বৎসর ৮ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের ভিতরে সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক ন্যূনকল্পে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। সহরের দুগ্ধ-সরবরাহের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধাগার, গো-পালন ভূমি ও গো-শালা প্রভৃতি স্থাপনের জন্য কর্পোরেশ্যনকে বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহরের খাদ্যদ্রব্য ও ভেজাল সম্বন্ধেও কর্পোরেশ্যনের নূতন আইনে পরিষ্কার বিধি-নির্দ্দেশ আছে। নগর রচনায় শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও সুরুচি রক্ষার্থ বিল্ডিং সারভেয়ার (ইমারত পরিদর্শকের) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত লাইসেন্স-প্রাপ্ত ইমারত পরিদর্শকগণ কর্ত্তৃক বাড়ীর নক্সা, প্লান প্রভৃতি না করাইয়া লইলে কর্পোরেশ্যন বাড়ীর মালিক-দিগকে গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি না দিতে পারেন। ৫০ হাজার-টাকা বা ঐ পরিমাণ মূল্যের সৌধনির্ম্মাণ-কার্য্যে মালিককে লাইসেন্স-প্রাপ্ত ইমারত পরিদর্শক নিয়োগ করিতে হইবে।

জীবন-বীমায় সমবায়

আমাদের দেশে এক হাজার ও তদতিরিক্ত টাকার জীবন বীমা করিবার জন্য অনেকগুলি দেশী ও বিদেশী কোম্পানী আছে। ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক কোম্পানী পাঁচ শত টাকার পর্য্যন্ত বীমা লয়। কিন্তু উপ-রোক্ত সকল কোম্পানীই বীমা লইবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া ভাল ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নেয়। এই সকল কোম্পানীতে চাষী প্রজারা, মজুরেরা বা দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা উচ্চহারে প্রিমিয়াম দিয়া বীমা করিতে অসমর্থ। এইরূপ লোক আমাদের দেশে বার আনারও বেশী। সঞ্চয়ের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত না থাকায় ইহাদের মৃত্যুর পর পরিবারবর্গকে বিশেষ আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যদি কিছুদিন কাজ না থাকে বা অসুখে ভোগে মজুরের তখন দুঃখের অন্ত থাকে না। চাষীদের তো কথাই নাই। একবার বা দুইবার ভাল ফসল না হইলে হাহাকার পড়িয়া যায়। এই তো গেল এক শ্রেণীর লোকের কথা।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা কো-অপারেটীভ সোসাইটী হইতে টাকা ধার করেন। সাধারণতঃ টাকা ধার লইবার সময় তাহাদিগকে এক বা ততোঽধিক মেম্বরকে জামিন দিতে হয়। অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, কো-অপারেটীভ সোসাইটীর টাকা পরিশোধ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইলে যে সকল মেম্বর জামিন হইয়াছিলেন তাহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং সময় সময় তাহাদের নিজ তহবিল হইতে কো-অপারেটীভের দেনা পরিশোধ করিতে হয়। যদি টাকা ধার করিবার সময় ইহাদের অন্ততঃ ঋণ পরিশোধ করার মত জীবন বীমা করা থাকে তবে মৃত্যু হইলেও জীবন বীমা কোম্পানী হইতে টাকা আদায় সম্ভবপর হয়। এরূপ জীবন বীমার বন্দোবস্ত হইলে কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজের বিশেষ প্রসার লাভ করিবে আশা করা যায়।

পরস্পরের সাহায্যে ভবিষ্যৎ সঞ্চয় ও কো-অপারেটিভ

সোসাইটিগুলির কাজের সহায়তার জন্য একটি কো-অপারেটিভ ইন্‌শিওর‍্যান্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

ইহাতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—

(১) কো-অপারেটীভ সোসাইটীর বীমা একজনের জীবনের উপর পাচ শত টাকার বেশী হইবে না। সাধারণতঃ বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় বীমা দেওয়া হইবে। কিন্তু যাহাদিগকে ডাক্তারী পরীক্ষার পর বীমা দেওয়া হইবে তাহাদের প্রিমিয়ামের হার কম হইবে ও বীমার সম্পূর্ণ সুবিধাগুলি প্রথম প্রিমিয়াম দিবার পর হইতেই বর্ত্তিবে।

(২) ১০, ১৫, ২০, বা ২৫ বৎসরের এন্‌ডাওমেণ্ট বীমা অথবা জীবন-স্বত্ব বীমা দেওয়া হইবে। বীমাকারীর বয়স ১৮ বৎসরের কম হইবে না বা ৫৫ বৎসরের বেশী হইবে না। যত বেশী বয়স হইবে এনডাওমেণ্টের সময় তত কম হইবে। যথা ৩০ বৎসর বয়স্ক লোকের ২৫ বৎসরের এণ্ডাওমেণ্ট হইতে পারে। কিন্তু ৪৫ বৎসর বয়স হইলে ১০ বৎসরের বেশী হইবে না।

(৩) যদি বীমাকারীর কোন "অ্যাক্‌সিডেণ্টে" (আকস্মিক দুর্ঘটনায়) মৃত্যু হয় যথা বজ্রপাতে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, ষ্টীমার বা রেলদুর্ঘটনায় অথবা কোন মোটর বা গাড়ী চাপায় বা কোন বন্য কি গৃহপালিত জন্তুর আক্রমণে অথবা অন্য কোন অ্যাক্‌সিডেণ্টে মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণ বীমার টাকা দেওয়া হইবে।

(৪) যাহাদিগকে ডাক্তারী পরীক্ষার পর বীমা দেওয়া হইবে তাহাদিগকে প্রথম প্রিমিয়াম দিবার পর যে কোন কারণে মৃত্যু হইলে বীমার পূর্ণ টাকা দেওয়া হইবে।

(৫) যাহাদিগকে বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় বীমা দেওয়া হইবে প্যারা (৬)তে উল্লিখিত কারণ ব্যতীত ৬ মাসের ভিতর মৃত্যু হইলে প্রদত্ত প্রিমিয়ামগুলিই ফেরত দেওয়া হইবে। দুই বৎসরের ভিতরও মৃত্যু হইলে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের দ্বিগুণ ফেরত দেওয়া হইবে। প্রথম প্রিমিয়াম দিবার ২ বৎসর পর মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া হইবে (অবশ্য সোসাইটীর নিকট যদি ধার থাকে সেটা বাদে)।

সমবায় জীবন বীমা সমিতির সংস্থিতি

প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে বা বিশেষ কোন স্থানে মেম্বরের মধ্য হইতে গ্রাম্য পরামর্শ সমিতি নিযুক্ত হইবে। উক্ত গ্রাম্য পরামর্শ সমিতির মেম্বরগুলি মহকুমার স্থানীয় সমিতির মেম্বরগণকে মনোনীত করিবেন। এবং লোক্যাল বোর্ডের মেম্বরগুলি কলিকাতার ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরগুলিকে মনোনীত করিবেন।

ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য

সমবায় জীবনবীমা সোসাইটী জেনারেল সেক্রেটারী, অরগ্যানাইজর, জীবনবীমা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার বা অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে যেরূপ সর্ত্তে তাহারা ভাল মনে করেন সেই সর্ত্তে নিয়োগ করিবেন। ম্যানেজিং কমিটির নির্দ্দেশমতে প্রত্যেক মহকুমাতে লোক্যাল বোর্ড কার্য্য করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে একটি কোম্পানীর শাখা আফিসের যে সকল কাজ তাহারা সেগুলি করিবেন।

প্রত্যেক লোকাল বোর্ড আফিসের অধীনে কতকগুলি গ্রাম্য পরামর্শ সমিতি থাকিবে এবং ম্যানেজিং কমিটি ও লোকাল বোর্ডের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিবে।

সমবায় জীবনবীমা সমিতির সহিত সমবায় সমিতিগুলির সম্বন্ধ

প্রত্যেক উন্নত জাতির ভিতর দেখা যায় যে, তাহাদের দেশে ব্যাঙ্ক আর বীমা কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সমবায় জীবন বীমা সোসাইটির অতিরিক্ত টাকা ম্যানেজিং কমিটি রেজিষ্ট্রার বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে কো-অপারেটীভ সোসাইটীগুলিতে খাটাইবেন। আবার এদিকে সমবায় জীবন বীমা সোসাইটীতে যাহারা বীমা করিবেন, তাহাদের টাকা কর্জ্জ করিবার দরকার হইলে যাহাতে তাহারা কর্জ্জ পাইবার সুবিধা পান কো-অপারেটীভ সোসাইটীগুলি সেরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। ফলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ও সমবায় বীমা সমিতি উভয়ের কার্য্য বিশেষ প্রসার লাভ করিবে।

এ ক্ষেত্রে দু' একটী কথা বলা নিতান্ত অনাবশ্যক হইবে না। ইতিপূর্ব্বে পাঁচশত টাকা বা তাহার কম জীবনবীমার কোম্পানী অনেকগুলি হইয়াছিল। তাহাদের উঠিয়া যাইবার কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলিই প্রধান :—

(১) সেই সকল কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার কোন বীমা-অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু সমবায় বীমা সোসাইটীতে প্রিমিয়ামের হার অ্যাকচুয়ারি দ্বারা অনুমোদিত হইবে। প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারণই আসল ভিত্তি।

(২) সে সকল কোম্পানীতে খরচের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। যাঁহা ইচ্ছা তাহাই ব্যয় করা হইত। সমবায় জীবন-বীমা সোসাইটীতে বীমা-বিশেষজ্ঞের অনুমোদন অনুসারে খরচ হইবে।

(৩) সে সকল কোম্পানীতে প্রিমিয়ামের সঞ্চিত টাকা খাটাইবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম কিছুই ছিল না। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সেই টাকা যাহাতে তাহাতে ব্যয় করা হইত। কিন্তু সমবায় জীবন বীমা সোসাইটীর টাকা কো-অপারেটীভ আইনে রেজিষ্ট্রারের অনুমতি অনুসারে টাকা খাটাইবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী খাটান হইবে। অতএব সঞ্চিত টাকা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম থাকিবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সাধারণের অবগতি ও মতামতের জন্য দেওয়া হইল। যদি কেহ এবিষয়ে কিছু জানিবার বা মতামত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বাধিত হইব। জবাব পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা এক আনা ষ্ট্যাম্প সহ পত্র দিবেন।

("ভাণ্ডার")

ঠিকানা—ইনশিওর‍্যান্স্ ম্যান
২২ নং এজরা ম্যানশ্যন, কলিকাতা।

রাজপুতানায় খাওয়াপরা

শ্রীযোগেশ চন্দ্র পাল, প্রেম মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন

কিছুদিন হইল রাজপুতানার কোন কোন্ সহরে এবং অনেকগুলি গ্রামে গিয়াছিলাম। বৃটিশ ভারতের গ্রামের তুলনায় দেশীয় রাজাদের শাসিত গ্রামগুলির অবস্থা কিরূপ, তাহা অবগত হওয়াই ছিল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজপুতানার প্রত্যেক গ্রামের সহিত বৃটিশ ভারতের গ্রামের অনেক পার্থক্য আছে। "রাজপুতানার গ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা সে কথা বলিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল রাজপুতানার দেশীয় দুই একটী রাজ্যের প্রজাদের সুখ সুবিধার কথাই বলিব।

ভরতপুর, জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রজারা বৃটিশ ভারতের প্রজার তুলনায় অধিক সুখে বাস করে। বৃটিশ ভারতের প্রজার ন্যায় দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও কৃষিজীবী। একদিকে রাজপুতানা মরুভূমি, শস্য সেখানে অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। অন্যদিক ভারতের অন্যান্য প্রদেশ রাজপুতানার তুলনায় অধিক উর্ব্বর এবং সেখানে অধিক শস্য জন্মিয়া থাকে। এমত অবস্থায় বৃটিশ ভারতের প্রজার তুলনায় রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দ সুখী কেন? কিন্তু ইহার ভিতর ভাবিবার কিছু নাই। দেশীয় রাজগণ অনেক অংশে বিলাসিতা প্রভৃতি ও মাদকতার বশবর্ত্তী হইলেও, নিজের প্রজার উপর একটু দৃষ্টি দিয়া থাকেন এবংপ্রজার সুখের জন্য দুই একটা আইন কানুনও করিয়া থাকেন। ভরতপুর, জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের দ্রব্য রাজ্যের বাহিরে যাইতে পারে না। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশেই ব্যয় হউক ইহাই রাজার ইচ্ছা। তবে রাজ্যের বাহিরে যাওয়া যে একেবারে বন্ধ তাহা নহে। যে সকল দ্রব্য ব্যবসায়িগণ বাহিরে নিতে চায়, তাহার উপর ভয়ানক ভাবে কর বসান হয়। এত অধিক কর দিয়া ব্যবসায়িগণ লাভবান হইতে পারে না। এই সকল কারণে দেশীয় রাজ্যে বসবাস করা খাওয়া পরার দিক্ হইতে সুবিধাজনক।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত রাজপুতানার ভূমি তত

উর্ব্বরা নহে। এই জন্য শস্য এখানে কম জন্মিয়া থাকে। শস্য যাহা জন্মে তাহা কেবল জলসেচনের জন্য ও কৃষকদের শরীরের রক্ত জল করা পরিশ্রমে। তত অনুর্ব্বর প্রদেশেও দুর্ভিক্ষ নাই,অথচ উর্ব্বর বৃটিশ ভারতে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে।

বৃটিশ ভারতে কোথায়ও বার আনা সেরের কমে পুরী পাওয়ার উপায় নাই। যাহারা চাল খায় না, কেবল রুটী পুরী খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, তাহারা যদি গরিব হয় এবং তাহাদের আয় যদি দৈনিক চার ছয় পয়সা হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। রাজপুতানার অনেক সহর আমরা দেখিয়াছি। কোন সহরেই পাঁচ আনা সেরের অধিক মূল্যের পুরী আমরা দেখি নাই; গ্রামের ত কথাই নাই। আবার ঐ সকল পুরী কালকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের মত ভেজাল ঘীতে ভাজা নহে; উহা খাঁটি ঘীতে ভাজা; খাইতেও বেশ সুস্বাদু।

বৃটিশ ভারতে ত ভাল খাঁটি ঘী পাওয়াই মুস্কিল। আবার যাহা পাওয়া যায় তাহা আড়াই টাকা তিন টাকা সেরের কমে পাওয়া যায় না। ভেজাল ঘীও বাজারে দুই টাকা আড়াই টাকা সের বিক্রয় হয়। দেশীয় রাজ্যে ভেজাল ঘী পাওয়া যায় না। যে ঘী পাওয়া যায় তাহা একদম খাঁটি। মূল্যও জিনিষের তুলনায় কম। গ্রামে এক সের খাঁটি ঘী এক টাকায় পাওয়া যায়, আর সহরে এক টাকা হইতে দেড় টাকায় মিলে। ঘীর মত দুধও বেশ সস্তা।

ই, বি, রেলওয়ে "প্রদর্শনী" ট্রেণ

ই, বি, রেলওয়ের এক ডিমনষ্ট্রেশন ট্রেণ সারা "ব্রড্ গেজ" ঘুরিয়া আসিয়াছে। গত ২৬শে মার্চ্চ হইতে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উহা শিয়ালদহ ষ্টেশনের পার্সেল শেডে রাখা হইয়াছিল।

এই প্রদর্শনী ট্রেণটা কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত। যথা—

১। "পাবলিসিটি কার"। এই গাড়ী খবর দিতেছে, ভারতের কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ রেল চলিতেছে।

২। "পাবলিক্ হেল্থ ডিপার্টমেন্ট"। ৫টী অংশ আছে—(ক) কি করিয়া কলেরা নিবারিত ও প্রশমিত হয় (খ) ম্যালেরিয়া (গ) বসন্ত (ঘ) মাতৃ-মঙ্গল (ঙ) খাদ্য-বিচার।

৩। ভেটারিনারি ডিপার্টমেন্ট বা পশুবিভাগ। চার্ট ও ছবির সাহায্যে দেখাইতেছে,কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বেয়ারাম-পীড়া গরুবাছুরকে আক্রমণ করে এবং কিরূপেই বা টীকা ইত্যাদি দ্বারা তা নিবারিত হইতে পারে।

৪। অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বা কৃষি-বিভাগ। রেশম উৎপাদন ইহার অন্তর্গত। ভারত ও জাপানের বিভিন্ন স্থানের ককুন পালন ছবিতে দেখান হইতেছে। পাট ও তুলার আঁশ প্রদর্শনীতে রহিয়াছে। বোতলে করিয়া নানা রকম গুণের মাটি নানা নদীতীর হইতে যোগাড় করা হইয়াছে ও তাদের উর্ব্বরাশক্তি পরীক্ষিত হইতেছে।

৫। গবর্মেন্ট উইভিং ইন্‌ষ্টিটিউট্ বা সরকারী বয়ন-শালা। বহু শাখাযুক্ত শাটল বক্স লুম, চরকা, রেশমপ্রদর্শনী ইহাতে আছে।

৬। বেঙ্গল ট্যানারি ইন্‌ষ্টিটিউট বা বঙ্গীয় চর্ম্ম-শালা। চামড়া ট্যানিং ও কেমিক্যালের বিভিন্ন রকম দেখাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান দেখাইতেছে, গরুবাছুরকে যথেষ্ট খাইতে না দিলে, বসন্তের দাগ থাকিলে ও অন্যান্য কারণে চামড়া নষ্ট হয়। ভাল চামড়া পাইবার উপায় গরুবাছুরের স্বাস্থ্যরক্ষায় ও চাষীদের যত্ন লওয়ায়।

৭। দি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট বা সমবায় বিভাগ। চড়া দরে সুদ আদায় করিয়া মহাজনেরা চাষীদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই কথাটা বহু সুন্দর ছবির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর এর প্রতীকার যে সমবায় তাও দেখান হইয়াছে।

৮। ইণ্ডিয়া টী কোম্পানী বা ভারতীয় চায়ে বাজার। এই বিভাগে শিবসাগর, দেরাদুন, কাছাড়, দার্জ্জিলিং শ্রীহট্ট, তরাই, ডুয়ার্স এবং সুরমা উপত্যকায় উৎপাদিত চা দেখান হইয়াছে। চা-বাগানের যন্ত্রপাতি তোড়জোড়ও বাদ যায় নাই।

"আর্থিক উন্নতি"র হালখাতা

৯৬০ পৃষ্ঠা

আমাদের জন্মদিন ফিরিয়া আসিল। বার মাসে "আর্থিক উন্নতি"র ৯৬০ পৃষ্ঠা মাত্র ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই জন্য সম্পাদককে যত মেহনৎ করিতে হইয়াছে সেই মেহনতে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারের প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রা-নীতি-বিষয়ক, অথবা ব্যাঙ্ক-ব্যবসা-বিষয়ক, অথবা বহির্বাণিজ্য-বিষয়ক অথবা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বাংলা বই লেখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু স্বদেশ-সেবার সেই পথ বর্জ্জন করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে "পাঁচ ফুলে সাজি" জাতীয় অর্থনৈতিক মাসিক পত্রিকা।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

আমাদের এই পথে বন্ধু জুটিয়াছেন অনেক। একটা নয়া বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। মফঃস্বলের বহুসংখ্যক পল্লীতে "আর্থিক উন্নতি"র পৃষ্ঠপোষক আছেন। তাঁহারা কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবিকা অর্জ্জন করেন, কেহ বা কৃষি-সমবায়-সমিতির সম্পাদক, কেহ বা ইস্কুল-কলেজের কর্ণধার। তাঁহাদের অনেকে ব্যাঙ্ক চালাই-তেছেন, অনেকে বীমা-সমিতির এজেন্ট, অনেকে যন্ত্রপাতির কারবারে নিযুক্ত। এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, মজুর-সেবক, কিষাণ-সেবক, সরকারী চাকুর্য্যে, সংবাদপত্রের সম্পাদক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক আমাদিগকে নানা উপায়ে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি। ভবিষ্যতেও তাঁহাদের আর তাঁহাদের বন্ধুবর্গের আনুকূল্য প্রার্থনা করি।

আমাদের অসম্পূর্ণতা

এই নূতন পথে মেহনতের মাপে সার্থকতা লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। "হাতী ঘোড়া" কিছু করিবার মতলব কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু মতলবটা যাহাই থাকুক না কেন,—কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র অসম্পূর্ণতা পদে পদে দেখা দিয়াছে। বীমা, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বইও নাই, পত্রিকাও নাই। সাধারণ মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই সকল বিষয়ে যে সব আলোচনা বাহির হয়, তাহা পরিমাণ হিসাবে বা মালের উৎকর্ষ হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদনে দেশের ভিতরকার অন্যান্য পত্রিকা হইতে উল্লেখযোগ্য আত্মিক সাহায্য পাওয়া যায় না। বাংলার বিভিন্ন কাগজ হইতে, বিশেষতঃ মফঃস্বলের পত্রিকা হইতে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার দিকে ঝোঁক আমাদের প্রবল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য একমাত্র নিজ পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফল অতি স্বাভাবিক। প্রায় কোনো বিষয়ই খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আলোচনা করা ঘটিয়া উঠে না। আমাদের এই অসম্পূর্ণতা শুধরাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে দেশের ভিতর ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ বিষয়ক পাচ সাতটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাগজের প্রতিষ্ঠা। বহুসংখ্যক লেখক ও পত্রিকা একসঙ্গে বাজারে দেখা না দিলে,—সহযোগিতার অভাবে "আর্থিক উন্নতি" প্রায়ই আংশিক ও অপূর্ণ থাকিতে বাধ্য।

আর্থিক জীবনের সকল বিভাগ

"আর্থিক উন্নতি"র আলোচনা-ক্ষেত্র বিশ্বজোড়া। আলোচ্য বিষয়গুলারও সীমানা নাই। কোনো বিষয় সুবিস্তৃতরূপে খতাইয়া দেখিতে হইলে তাহার জন্য অনেক পৃষ্ঠা দেওয়া দরকার। অধিকন্তু কয়েক সংখ্যা ধরিয়া ধারা-বাহিক রূপে প্রবন্ধ বা আলোচনা বাহির করাও আবশ্যক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে আর্থিক জীবন সম্বন্ধীয় কোনো

এক বিশিষ্ট বিভাগের পত্রিকা দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। তাহাতে বর্ত্তমান পত্রিকার লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না। আর্থিক জীবনের সকল প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করাই "আর্থিক উন্নতির" উদ্দেশ্য।

পত্রিকা-সম্পাদনের বিশ্বরূপ

ইংরেজি, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান এই পাঁচ ভাষায় সম্পাদিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক অর্থ-পত্রিকা সর্ব্বদা আমাদের চোখের সম্মুখে থাকে। কেবল সম্মুখে থাকে মাত্র নয়,—এই সকল পত্রিকার আকার-প্রকার, লেখক-পাঠক-সমালোচক, রচনা-সমালোচনা-টীকাটিপ্পনী ইত্যাদি সব-কিছুই "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকগণের নিকট হাজির করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। অর্থনৈতিক পত্রিকার সম্পাদন-বস্তুটা কি তাহা এই উপায়ে বাঙালী পাঠক সমাজে সহজেই ধরা পড়িবার কথা।

কোন্ দেশের সাহিত্যে কিরূপ তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হয় তাহার সঙ্গে বাঙালীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত করাইয়া দেওয়া "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম ধান্ধা। এই উপায়ে দুনিয়ার মাপকাঠি দিয়া আমরা নিজ নিজ জীবন, কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী জরীপ করিতে অভ্যস্ত হইতে পারি। বাঙালী সমাজকে পত্রিকা-সম্পাদনের বিশ্বরূপ দেখাইয়া "আর্থিক উন্নতি" নিজেই নিজের সমালোচনায় সাহায্য করিতেছে। আর জগতের চিন্তাক্ষেত্রে বাঙালীর ঠাঁই কোথায় তাহাও চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইতেছে। কি ব্যক্তি, কি জাতি,—উভয়ের পক্ষেই আত্মসমালোচনা একটা মস্ত আধ্যাত্মিক দাওয়াই, আর তাহার জন্য বস্তুনিষ্ঠ বিশ্ব-বোধ অত্যাবশ্যক। "আর্থিক উন্নতি"র সাহায্যে বাঙালী সমাজ নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে খানিকটা সজ্ঞান হইতে পারিতেছে,—বিশ্বাস করি।

মার্কিণ ধনসাহিত্য ও যুবক ভারত

বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থায় ধনবিজ্ঞান বিদ্যা বলিলে যুবক ভারত প্রধানতঃ,—বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র ইংরেজ পণ্ডিতদের রচনাই বুঝিত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-৭) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুবক বাংলার আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা কায়েম হয়। ইয়াঙ্কিস্থানের নরনারী যুবক ভারতের প্রিয় হইয়া উঠে। তখন হইতে মার্কিণ মুল্লুকের অর্থনৈতিক সাহিত্য ভারতের চৌহদ্দির ভিতর কিছু কিছু করিয়া প্রবেশ করিতে থাকে। আমেরিকার প্রবাসী-ভারতসন্তানেরা ভারতে মার্কিণ কৃতিত্ব প্রচার করিবার কাজে অন্যতম বা একমাত্র অগ্রণী। এই প্রচারের অন্যতম ফল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিণ ধন-সাহিত্যের সরকারী ইজ্জৎ-প্রতিষ্ঠা।

এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে,—যুবক-ভারতের পশ্চাতে পশ্চাতে আশুতোষ যতদিকে চলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাহার ভিতর তাঁহার আমেরিকা-প্রীতির দিক্টা অন্যতম। ১৯২০-২৫ সনের ভিতর মার্কিণ ধন-সাহিত্য কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ধন-সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সমান আসন পাইয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে আমেরিকার আর মার নাই বলা যাইতে পারে।

মার্কিণ পাণ্ডিত্যের দিগ্বিজয়

যুবক ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে ইংরেজ চিন্তার সঙ্গে মার্কিণ চিন্তার টক্কর চলা ভাল। ইহাতে আমাদের আত্মার বিস্তারসাধন ঘটিবে। অধিকন্তু আজ ১৯২৭ সনে বেশ খোলাখুলি জানিয়া রাখা দরকার যে,—আমেরিকার পাণ্ডিত্য ইয়োরোপের পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত হইয়া থাকে। ফরাসী জার্ম্মাণ আর ইতালিয়ান পত্রিকায় ও পরিষদে মার্কিণ ধন-সাহিত্যের কদর দিন দিন বাড়িতেছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণও আমেরিকার নামে আর নাক সিটকাইতে চেষ্টা করেন না। ইয়াঙ্কি পাণ্ডিত্যের দিগ্বিজয় সুরু হইয়াছে। আমেরিকার নরনারী কোন্ কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ চিন্তা করিতেছে অথবা কোন্ কর্ম্মকেন্দ্র কিরূপ কৌশলে চালাইতেছে তাহা জানিবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখিতেছি ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান পণ্ডিত সংসারে আর কেজো মহলে। "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদনে বিশ্বশক্তির এই মূর্ত্তি

বাদ পড়ে নাই। ভবিষ্যতেও বরাবরই মার্কিণ চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বজায় রাখিয়া চলা হইবে।

ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধন-সাহিত্য

মার্কিণ চিন্তা-ধারার সঙ্গে যুবক বাংলার আত্মীয়তা যত নিবিড় ফরাসী ও জার্ম্মাণ চিন্তা-ধারার সঙ্গে তত নিবিড় নয়। এইখানে কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা দরকার। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলার বিজ্ঞানসেবীরা আজকাল অনেকেই ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত আছেন। অধিকন্তু বাংলাদেশে প্রাচীন ভারতের ভাষা, সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যার চর্চ্চা যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের বৈঠকেও ফরাসী আর জার্ম্মাণ ভাষা আস্তে আস্তে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিগত পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর বাঙালী চিত্তের এইরূপ প্রসার কথঞ্চিৎ সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার বাঙালী সেবকেরা প্রায় সকলেই ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় অনভিজ্ঞ। অর্থাৎ এক যুবক বাংলায় এক সঙ্গে দুই মাপকাঠি চলিতেছে। পদার্থবিদ্যা আর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এই দুই শ্রেণীর বিদ্যা-সেবকেরা যে দরের বিজ্ঞান-চর্চ্চায় হাত দেখাইতেছেন, ধন-বিজ্ঞান ইত্যাদির সেবকেরা সেই দরের কোঠায় উঠিতে পারেন নাই।

"আর্থিক উন্নতি"কে প্রতি পদে এই অবস্থাটা মনে রাখিয়া চলিতে হয়। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির অর্থনৈতিক চিন্তা-প্রণালীর সাহায্যে যুবক বাংলার মগজটা বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা আমাদের অন্যতম ধান্ধা। ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধন-পাণ্ডিত্যের স্বপক্ষে বিশেষ কোনো ওকালতী করা বোধ হয় ভারতে আর দরকার নাই। তবে ভারতের শিক্ষা-কেন্দ্রে ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধন-সাহিত্য ইয়াঙ্কি ও ইংরেজ ধন-সাহিত্যের সমান ইজ্জৎ পাইবার অধিকারী,—এ কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করিতে অনেক ভারতসন্তান আজও নারাজ। দুঃখের কথা।

ইতালি ও জাপান

"আর্থিক উন্নতি"র ফী সংখ্যায়ই ইতালিয়ান আর জাপানী তথ্য ও তত্ত্বের কিছু কিছু হিসাবনিকাশ করা হইয়াছে। ইতালি আর জাপানকে যুবক ভারতের চিন্তা-মণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আমাদের অন্যতম ধান্ধা। ইতালি ইয়োরোপের "সভ্য" বা "উন্নত" বা "যন্ত্র-নিষ্ঠ" বা "ধনশালী" দেশগুলার ভিতর নিকৃষ্ট। কম সে কম ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর ফ্রান্সের নীচে ইতালিকে ঠাঁই দেওয়া যাইতে পারে। আর জাপান হইতেছে এই সকল বিষয়ে এশিয়ার সেরা,—এক হিসাবে যুবক ভারতের আদর্শস্থল।

ঘটনাচক্রে প্রাচ্য জাপান এবং পাশ্চাত্য ইতালি সভ্যতার সিঁড়িতে প্রায় এক ধাপেই অবস্থিত। উভয়ের সমস্যাই একরূপ। উভয়েই আজও কৃষি-প্রধান অবস্থায় রহিয়াছে। উভয়কেই আস্তে আস্তে যন্ত্র-নিষ্ঠ, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠ, শিল্প-নিষ্ঠ সভ্যতার কোঠায় উঠিতে হইতেছে। এই সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত আজ তিন দেশ,— ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর আমেরিকা। এই তিন দেশকে ধ্রুবতারা করিয়া জাপান আর ইতালি জীবন-সাধনায় ব্রতী রহিয়াছে। ফ্রান্সের ঠাঁই এই তিন দেশের কিছু নীচে।

এইখানেই ভারতের সঙ্গে ইতালির আর জাপানের আধ্যাত্মিক সংযোগ অতি নিকট। আজ আমরা ভারতে আর্থিক জীবনের যে ধাপে রহিয়াছি ইতালি আর জাপান ঠিক যেন তাহার পরের ধাপ। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর আমেরিকা পর্য্যন্ত "প্রোমোশ্যন" পাইতে হইলে যুবক ভারতকে ইতালি জাপান নামক পুলটা পার হইয়া যাইতে হইবে। এই কারণে ইতালিয়ানরা নিজের দেশটাকে আর্থিক হিসাবে "সভ্য" করিয়া তুলিবার জন্য যে সকল সাধনা করিতেছে, জাপানীরা আর্থিক উন্নতির জন্য যাহা-কিছু করিতেছে, সবই যুবক বাংলার পক্ষে ভাল করিয়া রপ্ত করা দরকার।

জাপানী ভাষা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ইংরেজী ফরাসী ও জার্ম্মাণের সাহায্যে জাপানকে বাংলায় প্রচার করা হইতেছে। আর খোদ ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

পত্রিকার রায় আর্থিক উন্নতির পাঠকেরা কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছেন।

সমসাময়িক আর্থিক ইতিহাস

এই এক বৎসরের ৯৭০ পৃষ্ঠায় কত মাল ছাপা হইয়াছে তাহার শ্রেণীবদ্ধ সূচী এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের শেষ অংশে প্রকাশ করা গেল। সেইটা দেখিলেই মালুম হইবে এক বৎসরের "বাংলার সম্পদ্" বস্তুটা কি। তাহার পরই "আর্থিক ভারত" বস্তুর বাৎসরিক কিস্মৎ ও এক সঙ্গে পাকড়াও করা সম্ভব। আর এই দুই দফা একত্র করিলে তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায় "দুনিয়ার ধনদৌলত" বস্তুর সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা চলিতে পারিবে। বুঝা যাইবে দুনিয়ার মাঝে আমরা আজ কোথায়।

ধনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী

এই তিন অধ্যায়ে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে সেই সবই হইতেছে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার আসল ল্যাবরেটরী বা পরীক্ষালয়। এই ধরণের তথ্যের সঙ্গে যে-সকল লোকের "হাতে কলমে" যোগাযোগ ছিল না, তাঁহারা কোনোদিনই ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত হইতে পারেন নাই। ইয়োরামেরিকার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-সেবীর মগজটা পরখ করিয়া দেখিলে তাহার ভিতর পাওয়া যাইবে, এই তিন অধ্যায়ে বিবৃত আর্থিক ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য ও অঙ্কের সঙ্গে হামেশা মোলাকাৎ।

বর্ত্তমান সংখ্যার কোনো একস্থানে একবার বলা হইয়াছে যে, মার্শ্যালের "ইণ্ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড ট্রেড" আর "মানি, কমার্স, ক্রেডিট" নামক ঢাউস বই দুইটার আগাগোড়াই এই ধরণের তথ্যগুলা সাজাইয়া গুছাইয়া বলা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি "প্রিন্‌সিপল্‌স্ অব্ ইকনমিক্‌স্" নামক মার্শ্যালের ধনসম্পত্তি-বিষয়ক "দার্শনিক" গ্রন্থের সূত্রগুলার পশ্চাতেও এই ধরণের নিরেট তথ্যই বিরাজ করিতেছে।

বস্তুতথ্যনিষ্ঠা ও তথ্য-সংগ্রহ

এই শ্রেণীর তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রণালী নানাবিধ। কৃষিক্ষেত্রে বিচরণ, পল্লী-পর্য্যটন আর বস্তি-নিরীক্ষণ এক উপায়। কারখানায় কারখানায় ঘুরিয়া ফিরিয়া মজুরদের মালিকদের ঘরবাহির দুই দিক্ বুঝিয়া বেড়ানো আর এক উপায়। রেল-আফিসে, ষ্টীমার ষ্টেশনে ফেরিঘাটে, রাস্তায় সড়কে লোকজনের আর মালপত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা অন্য উপায়। তাহা ছাড়া, ষ্টক-এক্‌স্‌চেঞ্জের দালাল-পাড়ায় নাক গুঁজিয়া পাটের "গন্ধ," তেলের "গন্ধ" শুঁকিয়া আসা অন্য এক উপায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্ম্মগুলা স্বচক্ষে দেখা আর মুটে-মজুর-কিষাণ-জমীদার, মনিবমালিক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁসা-ঘেঁসি করা তথ্য-সংগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল মহল্লেই সব সময়ে কোনো লোকের পক্ষে হাজির থাকা সম্ভব নয়। কাজেই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক-বিবরণী, কারখানার বার্ষিক হিসাব, মজুর-সমিতির ইস্তাহার, গবর্মেণ্টের সরকারী বাণিজ্য-সংবাদ ইত্যাদি দলিল অত্যাবশ্যক। যে-সকল দেশের সংবাদ-পত্রগুলা দেশ-নিষ্ঠ সেই সকল দেশের সংবাদপত্রসমূহ বস্তু-নিষ্ঠ ধন-সাহিত্যের দলিল।

"আর্থিক উন্নতি"র তথ্য-নিষ্ঠায় এই দুই প্রণালীই পরিস্ফুট। তাহারই অন্যতম নিদর্শন "মোলাকাৎ" অধ্যায়। নিজের মতামত পুরাপুরি চাপিয়া রাখিয়া অন্যান্য লোকের অভিজ্ঞতাগুলা প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া বস্তুনিষ্ঠরূপে খুলিয়া ধরা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। বার মাসে যে বার শ্রেণীর নরনারীর অভিজ্ঞতা বাংলা ভাষায় প্রচার করা গিয়াছে তাহা ভারতীয় সাহিত্যে বোধ হয় নতুন চিজ।

ধনবিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য

"সমালোচনা" বলিলে "আর্থিক উন্নতি" যাহা বুঝিয়া থাকে তাহা অতি সহজ। গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত মালের চুম্বকই আমাদের সমালোচনা-অধ্যায়ের প্রাণ। অধ্যায়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা বেশী নয়। প্রায় সব সময়েই "নমোনমঃ" করিয়া সারিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বার মাসে যে কয় পৃষ্ঠা সমালোচনার অধ্যায়ে বাহির হইয়াছে তাহা একত্র করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে আধুনিক ধনবিজ্ঞান-

সাহিত্যের আকার-প্রকার সম্বন্ধে খানিকটা জ্যান্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ ও জাপানী,—এই সাত জাতির পণ্ডিতেরা আজকাল যে-সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে সকলেরই কব্‌জায় আসিবে। "আর্থিক উন্নতি"র আকারের একখানা মাসিক পত্রিকা আগাগোড়া একমাত্র এই ধরণের সমালোচনা-প্রকাশের জন্য মোতায়েন থাকিলে তবেই যুবক বাংলার ইজ্জৎ রক্ষা হইতে পারে।

বাংলায় ধনদৌলতবিষয়ক বিশ্ব-সাহিত্য বাঁটা যাইতেছে "পত্রিকা-জগৎ" অধ্যায়েও। মাসের পর মাস দুনিয়া কোন্ কোন্ চিন্তার পর কোন্ কোন্ চিন্তায় আসিয়া খাড়া হইতেছে তাহা গত বৎসরের সংখ্যাগুলা একত্রে দেখিলে সহজেই ধরিতে পারা যায়। আর এই চিন্তা-ভাণ্ডারে কোন্ ব্যক্তির বা কোন্ জাতির দান কতখানি তাহাও হাতে হাতে ধরা পড়ে। বাঙালীর আর অন্যান্য ভারতবাসীর মগজও সঙ্গে সঙ্গে যাচাই হইয়া যাইতেছে।

রিকার্ডো, রবার্ট ওয়েন ও লুই ব্লাঁ

ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলা "ক্লাসিক" বা "শ্রেষ্ঠ" রচনা বাংলা ভাষায় প্রচার করা আর্থিক উন্নতির অন্যতম ধান্ধা। গত বৎসর এইরূপ তিনটা রচনা বাংলায় তর্জ্জমা করা হইয়াছে। তাহার ভিতর রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্ব এক হিসাবে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার মূলসূত্র স্বরূপ। অপর দুইটা রচনা ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ ও রিস্ত্ প্রণীত "আর্থিক মতবাদের ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে অনূদিত। একটায় ইংরেজ মজুর-সেবক ওয়েনের ধন-দর্শন, অপরটায় ফরাসী ধনসাম্যবাদী লুই ব্লাঁর মজুর-বিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। এই তিনটা রচনাই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসে অবশ্যপাঠ্যের অন্তর্গত।

রিকার্ডো পারিভাষিক হিসাবে তথাকথিত "ক্লাসিক' বা বনিয়াদি ধাঁচের ধনবিজ্ঞানের প্রতিনিধি। আর অপর দুইজন হইলেন তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী ধনবিজ্ঞানের জন্মদাতা। প্রথম বৎসরেই "আর্থিক উন্নতি" ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার দুই তরফ এক সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যসেবীর সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে।

সমসাময়িক ধনবিজ্ঞানে মূল্য-তত্ত্বের ইজ্জৎ

আজকালকার দুনিয়ায় কোন্ কোন্ আর্থিক সমস্যা বিশ্ববাসীর আর ধনবিজ্ঞানসেবীর বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে, গত বৎসরের "আর্থিক উন্নতি"র পাতায় পাতায় তাহার চিহ্নোৎ রহিয়াছে যথেষ্ট। বার্ষিক সূচীটা দেখিলেই মালুম হইবে।

কিন্তু এই সূচীও এক বিশ্বকোষ বিশেষ। তাহার ভিতর হাতড়াইতে হাতড়াইতে হয়রান হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আর বাস্তবিক পক্ষে, আজকালকার ধন-সাহিত্যে আলোচিত হয় না এমন জিনিষ নাই। তাহার ভিতর হইতে দুই চারটা দফা আলগা করিয়া দেখাইয়া গেলে হয়ত আধুনিক পাণ্ডিত্যের উপর অবিচার করা হইবে।

তাহা সত্ত্বেও দুই চারটা দফা স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিবেচনা করিতেছি। প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে,—খাঁটি "থিয়োরি" বা দার্শনিক "তত্ত্ব" আজকালকার ধন-সাহিত্যে অল্পমাত্র ঠাঁই অধিকার করে। যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় যে,—তত্ত্বাংশ প্রায়ই নাই। গ্রন্থপঞ্জী হইতেও বুঝা যায় যে, তত্ত্বের দিকে নজর আজকালকার পণ্ডিতদের খুবই অল্প। বিশ্ববাসীর মাথাটা আজকাল খেলিতেছে বেশী করিয়া "তথ্যে"র দিকে, অঙ্কের দিকে, "ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের দিকে।

আর একটুকু খুলিয়া বলা দরকার। এই ক্ষেত্রে "তত্ত্ব" বলিলে একমাত্র মূল্য-তত্ত্ব বুঝিতেছি। প্রাকৃতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের যে ইজ্জৎ, আর্থিক জগতে মূল্য-তত্ত্বের ইজ্জৎ ঠিক সেইরূপ। কি রেলের মাসুল, কি ব্যাঙ্কের সুদ-ডিস্কাউন্ট, কি মজুরদের বেতন, কি চাষীর কর, কি মালিকের মুনাফা,—সবই "ভ্যালু" বা মূল্য-তত্ত্বের অন্তর্গত। আর একমাত্র এই তত্ত্বটাই হইতেছে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার আসল দার্শনিক ভিত্তি।

"আর্থিক উন্নতি" যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই যুগে এই মূল্য-তত্ত্ব বেশী আলোচিত হয় না। এই সম্বন্ধে যে

কয়টা মতামত বাজারে চলিয়া আসিতেছে সেই সবেরই ঘষামাজা কিছু কিছু ঘটিতেছে। তবে সেই দিকেও নজর অল্প। নজরটা কত অল্প তাহা আমাদের বার সংখ্যায় কিছু কিছু জানা গিয়াছে।

দুর্যোগ-তত্ত্ব নবীন ধনবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড

আজকালকার পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন "ক্রাইসিস" বা আর্থিক দুর্যোগ-তত্ত্ব। ধূমকেতুর মতন কয়েক বৎসর পর পর সংসারে এই দুর্যোগ দেখা দিয়া থাকে। এই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করা, আর সম্ভব হইলে সেটাকে পাকড়াও করিয়া ঘাড় মটকাইয়া দেওয়া হইতেছে এখনকার ধন-চিন্তার এক বড় সমস্যা।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে,—মূল্য-তত্ত্বের আলোচনাও এই দুর্যোগ-তত্ত্বের আনুষঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, ধনোৎপাদন, ধন-বিতরণ, মজুরির হার, বাজারের দর,—সব-কিছুই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণের এপীঠ ওপীঠ বিশেষ। আর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা-নীতি, নোট ছাড়িবার কৌশল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম এই সব কথাও দুর্যোগ-তত্ত্বের বড় কথা। কারেন্সী আর ব্যাঙ্কিং স্বাধীন-ভাবেও আজকাল খুব বেশী আলোচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু "ক্রাইসিস"-তত্ত্বের সঙ্গে এই টাকাকড়ি-তত্ত্বের যোগাযোগ আজকাল বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

মোটের উপর ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধন-বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।

নবীন ধনবিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্য ও তত্ত্ব

"আর্থিক উন্নতি"র সংখ্যায় সংখ্যায় দেখা গিয়াছে যে,—বেকার-সমস্যার তত্ত্বকথা বুঝিবার জন্য জগতের পণ্ডিতেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তথ্য বা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ মাত্র সংগ্রহ করিয়াই ধনবিজ্ঞানসেবীরা নিশ্চিন্ত নন। অনেক ক্ষেত্রেই "বেকার" আর আর্থিক ধূমকেতুটা এক সঙ্গে আলোচিত হইয়া থাকে।

আর একটা বড় আলোচ্য বিষয়,—সমসাময়িক শিল্প-বিপ্লব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আর একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছে। এই বিপ্লবের একটা তরফ হইতেছে নয়া নয়া যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। অপর দিক্ হইতেছে ট্রাষ্ট, কার্টেল ইত্যাদি নামধারী সঙ্ঘ-গঠন। এই সকল বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে বুঝা কঠিন। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র সাহিত্যে তাহার পরিচয় কিছু কিছু দেওয়া গিয়াছে।

নবীন ধনবিজ্ঞানের তৃতীয় কথা-বস্তু হইতেছে আর্থিক জীবনে গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ। "সেকেলে" ধনবিজ্ঞান ছিল "স্বাধীনতা"-পন্থী। অর্থাৎ গবর্মেণ্টকে নরনারীর আর্থিক জীবন শাসন করিতে না দেওয়াই দেশোন্নতির উপায় বিবেচিত হইত। ইহারই নাম রিকার্ডো-প্রমুখ পণ্ডিতদের "ক্লাসিক" নীতি। আর আজকাল দেশোন্নতির রীতিনীতি হইতেছে ঠিক উল্টা। কি "ক্রাইসিস," কি বেকার কি সঙ্ঘ-শাসন—সর্ব্বত্রই চাই গবর্মেণ্টের তদ্বির ও রক্ষণা-বেক্ষণ। ইহাকে বলা যাইতে পারে সোশ্যালিষ্ট দর্শনের জয়জয়কার।

দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্র

তথ্যই হউক বা তত্ত্বই হউক, দেশীই হউক বা বিদেশীই হউক, "আর্থিক উন্নতি"র সকল প্রকার আলোচনার লক্ষ্য এক। সে হইতেছে দেশোন্নতি আর দেশোন্নতির যন্ত্রপাতি নির্দ্ধারণ। এক বৎসর ধরিয়া "আর্থিক উন্নতি" দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্রই প্রচার করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বিশেষ কোনো মত বা পথ সম্বন্ধে প্রচারের ধাওয়া খাড়া করিবার দিকে এই পত্রিকার ঝোঁক নাই। খোলা মাঠে প্রত্যেক মত আর প্রত্যেক পথ আলোচিত হইয়াছে,—ভবিষ্যতেও সেইরূপই হইবে।

ফলতঃ, "আর্থিক উন্নতি" কুটির-পন্থীও বটে আবার ফ্যাকটরি-নীতিও এই পত্রিকা জোরের সহিতই প্রচার করে।

হস্তশিল্প সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"র সংবাদ-পরিমাণ কম নয়, অথচ যন্ত্রপাতির দর্শন-চর্চ্চা আর লোহালক্কড়ের গুণগানও এই আসরে খুব বেশীই চলিয়াছে। দেশের নানা কেন্দ্রে ছোট বড় মাঝারি ব্যাঙ্ক কায়েম করিয়া স্বদেশী পুঁজির ভাণ্ডার পুষ্ট করিবার দিকে "আর্থিক উন্নতি"র ঝোঁক প্রবল,—কিন্তু ভারতে বিদেশী পুঁজির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও এই পত্রিকা যথেষ্ট আস্থা দেখাইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি" মজুর-পন্থী আর মজুর-সেবক সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি-নিষ্ঠা আর মধ্যবিত্তের উৎকর্ষ প্রচার করাও এই পত্রিকার স্বধর্ম্ম। জমিজমার আইনকানুন শুধরাইবার কাজে "আর্থিক উন্নতি" চরম বৈজ্ঞানিক উপায় আমদানি করিতে চাহে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্ষতিগ্রস্ত ধনী ও অন্যান্য নরনারীকে পুনর্গঠিত সমাজের জন্য কর্ম্মদক্ষ করিয়া তুলিতেও আগাগোড়াই এই পত্রিকার প্রয়াস রহিয়াছে।

বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের এম, এ

"আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের ভিতর যদি কেহ ম্যাট্রিকুলেশন ইণ্টার্মীডিয়েট বিদ্যা মাত্রের অধিকারী থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা রিকার্ডো ইত্যাদি সম্বন্ধে এম, এ'র বিদ্যাই দখল করিতে পারিয়াছেন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের দেশে এম, এ ক্লাসে যাহা-কিছু মুখস্থ করানো হয় তাহার সবটাই হাতী-ঘোড়া নয়। বাংলাভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিলে এম, এ বিদ্যার অনেক-কিছুই ম্যাট্রিকুলেশন বা ইণ্টার্মীডিয়েটে চালানো সম্ভব।

বস্তুতঃ "আর্থিক উন্নতি"তে যাহা কিছু বাহির হয় তাহার অধিকাংশই কম সে কম ভারতীয় এম, এ মাপের মাল। অথবা এমন কি এম, এ'র পরবর্ত্তী গবেষণা, অনুসন্ধান বা "রীসার্চ" ধাপের তথ্য ও তত্ত্ব রূপে বিবৃত করিলেই এই পত্রিকার অধিকাংশ সংবাদ, টিপ্পনী, সমালোচনা বা প্রবন্ধের যথার্থ চরিত্র প্রকাশ করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ার হোমরাচোমরারা যাহা কিছু বলিতেছে বা করিতেছে প্রধানতঃ বা একমাত্র তাহাই "আর্থিক উন্নতি"র সওদা। অর্থাৎ ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চরম কথাগুলা এই পত্রিকার মারফৎ বাংলা সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

মাসের পর মাস, জগতের ধনবিজ্ঞান পত্রিকায় যে সমুদয় তথ্য আলোচিত হইয়া থাকে সেই সমুদয় দেড় দুই আড়াই বৎসর পর পর গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। আর বিদেশে বইগুলা প্রকাশিত হইবার পাঁচ সাত বৎসর পর,—অনেক সময়ে দশ বিশ বৎসর পর,—আমরা সেই সব বই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সট্‌বুক নির্দ্ধারিত করিতে অভ্যস্ত। কাজেই যাহারা বাংলা ভাষার সাহায্যে ফী মাসেই ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ ও জাপানী পণ্ডিতদের রচনাগুলা সংক্ষেপে গণ্ডূষ করিতে পারিতেছেন তাঁহারা যথাসম্ভব বর্ত্তমাননিষ্ঠ রূপে এই বিদ্যার আসরে চলাফেরা করিতে সমর্থ।

আর বিশ্ব-সাহিত্যের গতিটা কোন্ দিকে তাহা জানিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আর্থিক অবস্থার যথোচিত সমালোচনা করিবার সুযোগও তাঁহাদের জুটিতেছে। দেশী-বিদেশীর চর্চ্চা এক সঙ্গে চালানো আমাদের আর এক বড় ধান্ধা।

ধনবিজ্ঞানে বাঙালী স্বরাজ

তবে "আর্থিক উন্নতি"র অসম্পূর্ণতার কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। প্রতি মাসে মাত্র আশী পৃষ্ঠা। আর ধনবিজ্ঞানবিদ্যার গবেষক বাঙালী সমাজে এখনো বিরল। যদিও বা দু'একজন দেখা যায় তাঁহারা বাংলা ভাষায় কলম চালাইতে বোধ হয় রাজি নন। কিন্তু যদি ধনবিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়া বাংলার ধনবিজ্ঞানসেবীরা বাংলাভাষায় পাঁচ সাতখানা সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক চালাইবার পথে অগ্রসর হন তাহা হইলে অল্পকালের ভিতর ধনবিজ্ঞানে বাঙালী স্বরাজ কায়েম হইতে পারে।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

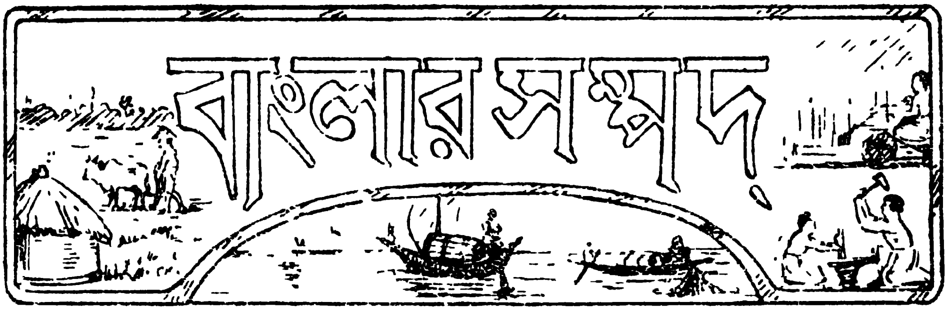
আর্থিক উন্নতি

২য় বর্ষ—২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন

এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক পাওনাদারদের টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সোজা কথায় ইহার নাম ব্যাঙ্ক-ফেল। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ১৯০৭ সনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। মৃত্যুকালে এই প্রতিষ্ঠানের বয়স ছিল প্রায় বিশ বৎসর।

বাঙালী জাতির দুশ্চিন্তা

স্বদেশী আন্দোলন বলিলে বাঙালীরা যত-কিছু সমঝিতে অভ্যস্ত তাহার ভিতর এই ব্যাঙ্কটা ছিল অন্যতম। এই ব্যাঙ্কটার সঙ্গে বিগত বিশ বৎসরের বহুবিধ বাঙালী শিল্প-বাণিজ্যের যোগাযোগও ছিল গভীর। কাজেই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন-কাণ্ডটা বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে একটা বড়-গোছের দুর্যোগ বিবেচিত হইতেছে। গোটা স্বদেশী আন্দোলনই যেন ফেল মারিল এই ধরণের একটা সন্দেহ মাথা তুলিয়াছে। আর বাঙালীর ভবিষ্যৎ শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধেও ঘোরতর দুশ্চিন্তা দেশের নানা মহলে দেখা দিয়াছে। একটা নৈরাশ্য ও কর্ম্মবিহ্বলতা দেশসুদ্ধ লোককে ছাইয়া ফেলিতেছে।

এই ব্যাঙ্কটা বাঙালীর "সবে ধন নীলমণি" নয়

কিন্তু দেশের অবস্থাটা তলাইয়া মজাইয়া দেখিলে অত্য-ধিক দুশ্চিন্তা বা দুঃখবাদের কারণ আছে বলিয়া মনে হইবে না। আজ যদি ১৯০৭।১০ সন হইত তাহা হইলে হয়ত বাঙালী সমাজে গভীর নৈরাশ্যের ঠাঁই থাকিত। এমন কি ১৯১৪।১৫ সনের অবস্থা থাকিলেও আজ বাঙালীর পক্ষে অতি বড় দুর্দ্দিন বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বাঙালী জাতির

"সবে ধন নীলমণি" নয়। কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এই ব্যাঙ্কের একটা ঠিকানা ছিল বটে। তাহাতে বাঙালী জাতির ইজ্জৎ খানিকটা বাড়িয়াছিল সন্দেহ নাই।

জলপাইগুড়ি ও যশোহরের বড় বড় ব্যাঙ্ক

কিন্তু আজ বাংলার নরনারীকে খোলা চোখে ছুনিয়া দেখিয়া বেড়াইতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিব যে,—জলপাইগুড়ির বড় ব্যাঙ্কটা আর যশোহরের বড় ব্যাঙ্কটা প্রত্যেকেই কলিকাতার এই তথাকথিত "জাতীয়" প্রতিষ্ঠানের প্রায় জুড়িদার। আর এই দুইটার ধনশক্তি এবং কর্ম্ম-পরিমাণ একত্র করিলে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক তাহার নিকট কানা হইয়া যাইত।

স্বদেশী আন্দোলনের বিরাট শক্তি

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের গায়ে "ন্যাশন্যাল" দাগটা দেখিবামাত্র তাহার ভিতর সমগ্র বাঙালীর সমবেত কৃতিত্ব দেখিতে বসা আহাম্মুকি। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের সময়ে এই প্রতিষ্ঠান জন্মিয়াছিল বলিয়া এইটাকেই বাঙালীর একমাত্র স্বদেশী ব্যাঙ্ক কারবার সমঝিতে গেলে অন্যায় করা হইবে।

বাংলার জেলায় জেলায় জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্ক

বাংলার নরনারী আজ দশ বার বৎসর ধরিয়া জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, পল্লীতে পল্লীতে বহুসংখ্যক লোন আফিস ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক চালাইতেছে। এইগুলার প্রত্যেকটাই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মতনই "জয়েণ্টষ্টক লিমিটেড" কোম্পানী। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটাই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মতনই নানা প্রকার ব্যাঙ্ক কারবার চালাইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটাই বিভিন্ন পরিচালকের সমবেত মস্তিষ্কের জোরে চালানো হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটারই আয়-ব্যয় পাশ-করা অডিটার কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটাই ফী বৎসর ব্যালান্স শীট বা উদ্বর্ত্তপত্র প্রচার করিতে অভ্যস্ত। এই সকল কথা "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের পক্ষে নতুন সংবাদ নয়।

বাঙালীর তাঁবে শ'চারেক "আধুনিক" ব্যাঙ্ক

এই সকল ব্যাঙ্ক গুনতিতে বড় কম নয়। সংখ্যায় ইহারা প্রায় শ'চারেক। বুঝিতে হইবে যে, বাংলাদেশে "আধুনিক রীতির" ব্যাঙ্ক কারবার আর তাহার আনুষঙ্গিক ব্যবসা-বাণিজ্য আজ কোনো তথাকথিত স্বদেশী ব্যাঙ্কের বা ব্যাঙ্ক-পরিচালকের একচেটিয়া কেরদানির উপর নির্ভর করে না। বাঙালী জাতি কয়েক বৎসর ধরিয়া খুব বিস্তৃত ও গভীর ভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যবসাটাকে শক্ত মুঠার ভিতর পাকড়াও করিতে চেষ্টা করিতেছে। বাংলার মফঃস্বলকে যাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া চলেন প্রধানতঃ তাঁহারাই কলিকাতার একটা প্রতিষ্ঠানের অকালমৃত্যুতে হাহুতাশ করিতে থাকিবেন মাত্র। কিন্তু এইরূপ হাহুতাশ কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-গৌরব

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, গবর্মেণ্টনিয়ন্ত্রিত কৃষি সমবায় বিষয়ক ব্যাঙ্কগুলা এই শ'চারেক বাঙালী ব্যাঙ্কের অঙ্কে গুনিতেছি না। এই শ'চারেক প্রতিষ্ঠান সবই ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক পূরা স্বাধীন "পাশ্চাত্য" মতের বাঙালী-ব্যাঙ্ক। এই সমুদয় ব্যাঙ্কের গলদ ও দুর্ব্বলতা আছে অনেক। তাহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের তুলনায় এই সমুদয় ব্যাঙ্কের গলদ বেশী তাহা প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা সম্বন্ধে কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক মফঃস্বলের প্রতিষ্ঠানগুলাকে উন্নত শ্রেণীর কোনো কৌশল শিখাইতে পারিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই কলিকাতার ব্যাঙ্কটা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া বাঙালীর ভবিষ্যৎ শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি সম্বন্ধে অন্ধকার দেখিতে বসিবার কিছুমাত্র দরকার নাই। মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-গৌরব বাঙালী জাতিকে আজ ঘাড় খাড়া রাখিয়া সুস্থিরভাবে ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন সোসাবিদা চালাইবার সুযোগ দিতেছে। কলিকাতার বাঙালী মফঃস্বলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকুক।

ক্ষতিগ্রস্ত কাহারা ?

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতনে কয়েকটা বাঙালী কারখানার আর ব্যবসায়ী মহাজনের অল্প-বিস্তর ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ব্যাঙ্ক-ফেল ঘটিলে কতকগুলা লোকের গায়ে আঁচড় লাগিতে বাধ্য। অধিকন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের অনেকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে শিখিতেছিল। তাহাদের অনেকেরই ক্ষতি হইবে। এই সকল ক্ষতির জন্য আমরা যার পর নাই দুঃখিত। কিন্তু কোন্ কারবারের বা গৃহস্থের হিস্যায় কতটা ক্ষতি পড়িবে তাহা ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা না জানা পর্য্যন্ত কিছুই বলা চলে না। যে-যে ব্যক্তির বা কারবারের কপালে লোকসান লেখা আছে তাহাদের দুরবস্থায় সহানুভূতি দেখানো ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভবপর নয়।

লোকসানের পরিমাণ বেশী নয়

এই সকল নানা শ্রেণীর ক্ষতি হজম করিয়াও বলিতেছি যে, বাংলাদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এই ব্যাঙ্কের পতনে বেশী ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে পারে না। যে সমাজে শ'চারেক ব্যাঙ্কের সঙ্গে গৃহস্থালী, মহাজনী, জমীদারি আর আধুনিক আমদানি-রপ্তানি সু-জড়িত সেই সমাজে একটা মাত্র ব্যাঙ্কের ফেল-মারায় আর্থিক জীবনের পক্ষে অত্যধিক আলোড়িত হওয়া অসম্ভব।

ব্যাঙ্ক-ফেলের সনাতন কারণ

ব্যাঙ্কটা ফেল মারিল কেন? ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ির হিসাব যতদিন আইনের চোখে যাচাই না হয় ততদিন কানাঘুষা নানারকম চলিবে। কিন্তু এই সব কানাঘুষায় কান না দিয়াও একটা কথা এখনি বলা চলে। ব্যাঙ্ক-ফেলের কারণ সর্ব্বত্রই একরূপ। যে টাকাটা লোকের নিকট হইতে আমানত স্বরূপ জমা হইতেছে, সেই টাকাটা অন্যান্য লোকের নিকট কারবারে খাটাইবার জন্য ধার দিতে হইবে। আমানতকারীরা যদি যখন-তখন টাকা তুলিয়া লইতে চায় তাহা হইলে "বেশীদিন" ধরিয়া কোনো কারবারে খাটাইবার জন্য টাকা ধার দিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে দুর্যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। কয়েক বৎসর হইল রোমের "ইতালিয়ান দি স্কন্ত" ব্যাঙ্ক এই দুর্যোগেই চিৎ হইয়াছিল। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র যে দিন বাজারে বাহির হইবে সেদিন হয়ত ঠিক এইরূপ দুর্যোগের তথ্যই বেশ মোটা হারে পাওয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক যে-সকল কারবারকে টাকা ধার দিয়াছিল তাহারা "অল্প সময়ের" ভিতর অথবা "যথাসময়ে" হয়ত টাকা ফেরৎ দিতে সমর্থ নয়। এই গেল ব্যাঙ্ক ফেলের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সনাতন ও সার্ব্বজনীন কারণ। তবে প্রায় সর্ব্বত্রই অন্যান্য "হযবরল"ও থাকে বিস্তর। সেদিকে সম্প্রতি মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

শাপে বর,—আত্ম-সমালোচনার সূত্রপাত

"শাপে বর" হইতে চলিল মনে হইতেছে। এই বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা জীবনের নানাক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন চালাইয়া চলিতেছি। কিন্তু এই আন্দোলনের সু-কু আমরা স্বাধীন ভাবে পরখ করিয়া দেখিতে সাহসী হই নাই। সর্ব্বত্রই আমরা নামজাদা লোকের মতামত, পয়সাওয়ালা লোকের কর্ম্ম-কৌশল, স্বার্থ-ত্যাগী বীরবরের পাণ্ডিত্য, তথাকথিত বিশেষজ্ঞের কর্ম্ম-কেরদানি বিনা বাক্যব্যয়ে পূজা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত। পূজা খাইতে খাইতে আমাদের "জন-নায়ক" "ওস্তাদ" "মহাপ্রভুদের ভুঁড়ি পুরু হইয়া গিয়াছে। আর আমাদের দেশের লোকও নিজ নিজ চিন্তাশক্তিকে ভোঁতা করিয়া ছাড়িয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মগজেই যে কিছু কিছু ঘী থাকে সেই খেয়াল নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আত্ম-সমালোচনা আমাদের সমাজে নাই। দেশের দোষ থাকিতে পারে এইরূপ চিন্তা করা পর্য্যন্ত পাপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

এমন অবস্থায় একটা নামজাদা স্বদেশী কিছু কাৎ হইয়া পড়ায় প্রকারান্তরে একটা মস্ত লাভই হইয়াছে। এই বার বেশ জোরের সহিত আত্ম-সমালোচনা নামক আধ্যাত্মিক দাওয়াই বাঙালী সমাজে কাজ করিতে থাকিবে। "যত দোষ নন্দ-ঘোষ"—এই নীতি আর যখন তখন বাজারে চলিবে না। আমাদের চরিত্রেও কতকগুলা দুর্ব্বলতা আছে,—

বাংলার নরনারীকে কর্ম্মদক্ষতায় বড় হইতে হইবে,—ভারতীয় সমাজে মগজ-মেরামতের জন্য স্বতন্ত্র আন্দোলন আবশ্যক ইত্যাদি খেয়াল দেশের নানা ঘাঁটিতে এক সঙ্গে দেখা দিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। আত্ম-সমালোচনার সূত্রপাত হইলেই যুবক ভারতে একটা নবযুগ সুরু হইবে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের অকালমৃত্যু যুবক বাংলাকে কানে ধরিয়া শিখাইয়া দিতেছে,—"ওরে বাপু, 'মধুর বহিবে বায় বেয়ে যাবে রঙ্গে'—সে দিন আর নাই। সাধু সাবধান! জীবনের মাপকাঠি বাড়াইয়া চল্, কর্ম্মদক্ষতার মাত্রা বাড়াইবার ব্যবস্থা কর্, মাথাটাকে পাকাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হ'।"

ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞানের বাঙালী-আন্দোলন

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই যুগান্তরের একটা লক্ষণ দেখিতে পাইব। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। বাংলা দেশে আজকাল শ'চারেক ব্যাঙ্কের সঙ্গে কম সে কম পাঁচ হাজার লোক ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ছোট বড় মাঝারি কাজে মোতায়েন আছে। এই সকল ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীর অনেকেই ব্যাঙ্ক-বিষয়ক বিদ্যা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার পর ঠেকিয়া ঠেকিয়া হাতে কলমে যাহা-কিছু শিখিয়াছেন তাহার জোরেই বাঙালীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসা চলিতেছে। কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাঙ্ক-টেক্‌নিক শিখিবার ও শিখাইবার ব্যবস্থা করা জরুরি হইয়া পড়িয়াছিল। সেই কথাটা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ফেল মারা উপলক্ষ্যে প্রচুর পরিমাণে বুঝা যাইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অভাবটা মিটাইবার কিছু কিছু ব্যবস্থাও করা হইতে থাকিবে।

ব্যাঙ্ক-ফেলের কারণ আলোচনা করিতে গিয়াই দেশের মামুলি লোকেরাও ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক-কিছু শিখিয়া ফেলিবেন। আর ব্যাঙ্ক-পরিচালক ও ব্যাঙ্ক-কেরাণী এই দুই শ্রেণীর লোকেও বিষয়টা ব্যাপক ভাবে বুঝিবার জন্য যত্ন লইতে থাকিবেন। আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর বাংলা দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় ব্যাঙ্ক বিষয়ে একটা বড় গোছের সাহিত্যই গড়িয়া উঠিবে। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা আর পাঠশালার ব্যবস্থাও শিক্ষা-সংসারের একটা নূতনত্ব হইবে। সকল তরফ হইতে বাংলাদেশে একটা ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞানের আন্দোলন আশা করিতে পারি।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সম্মেলন

এই উপলক্ষ্যে আমরা একটা প্রস্তাব করিতেছি। বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ শীঘ্রই একটা সর্ব্ববঙ্গ ব্যাঙ্ক-সম্মেলনের ব্যবস্থা করুন। বাঙালীর তাঁবে আজকাল যে সকল লোন-আফিস আর অন্যান্য শ্রেণীর ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মফঃস্বলের কোন কেন্দ্রে অথবা কলিকাতায় সমবেত হউন। বাঙালী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা আর তাহা উন্নত করিবার উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মদক্ষ ও চিন্তাদক্ষ লোকেরা পরামর্শ করুন। তাহা হইলে "কত ধানে কত চাল" বুঝিতে পারিয়া বাঙালী জাতি ভবিষ্যতের জন্য কর্ম্ম-পথ বাছিয়া লইতে পারিবে। এইরূপ সম্মেলন বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইলে ব্যাঙ্ক-বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙালীর চিন্তা ত পুষ্ট হইতে থাকিবেই সঙ্গে সঙ্গে বিপুলায়তন আধুনিকতম ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাও বাঙালীর কব্‌জার পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে।

কচুরী পানার অত্যাচার

কচুরী পানার প্রাচুর্য্যহেতু কুমার নদীর অনেক স্থানে বাঁধের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে ভাঙ্গা, মকসুদপুর প্রভৃতি স্থানের মহাজনের মাল-বোঝাই নৌকা আটক পড়ায় ঐ অঞ্চলে মোটেই মাল সরবরাহ সুবিধাজনক হইতেছে না। হাটে বাজারে ব্যবসায়িগণ যথোপযুক্ত দ্রব্যাদির আমদানি করিতে পারিতেছে না। যান-বাহনের মধ্যে ভারবাহী অশ্ব—তাহারও সংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত ভাড়ার হার অত্যন্ত বেশী। রাস্তা না থাকায় এ অঞ্চলে গো-মহিষের গাড়ীর চলাচল নাই। মোকাম হইতে মালপত্র আনিতে যে প্রকার অসুবিধা হইতেছে, খরচও তদনুরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। তৈল, লবণ প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। লবণ প্রতি সের ৵৫, আলু ।•, তৈল ৸৵• ইত্যাদি। এর পর দর আরও বাড়িয়া যাইবে। বিদেশ

হইতে আমদানি মাল বোঝাই নৌকাসকল এযাবৎকাল কুমার নদী দিয়াই এ অঞ্চলে আসিত। কচুরী পানার দৌরাত্ম্যে নৌকা চলাচল বন্ধের দরুণ এ দিকে দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যাইতেছে। সরকার ও জিলা বোর্ডের এ দিকে বিশেষ নজর থাকা বাঞ্ছনীয়। (পঞ্চায়েৎ)

পাবনা বীণাপাণি টেলারিং ইস্কুল

সুদক্ষ দর্জ্জি রাখিয়া এই বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রকার শেলাই কাজ উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ১০৲।১৫৲ টাকা মাহিয়ানার চাকুরীর জন্য যুবকগণ রাস্তায় রাস্তায় উমেদারী করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা ইচ্ছা করিলে এখানে এক বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করিয়াই এক প্রকার বিনা মূলধনে মাসিক ৪০।৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। পল্লীর বেকার যুবকগণের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। গ্রামে বসিয়া যাহারা অন্নচিন্তায় অন্ধকার দেখিতেছে আর নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া দিন দিনঃশক্তি সামর্থ্য ক্ষয় করিতেছে এখানে এক বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করিয়া গ্রামে একটি শেলাইয়ের কল লইয়া বসিলে অনায়াসে স্বাধীনভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে। গ্রামে একটি জামার দরকার হইলে সহরে আসিয়া তৈয়ারী করাইয়া লইয়া যাইতে হয়। গ্রামবাসীদের ইহাতে অনেক অসুবিধা দূর হইবে, গ্রামের পয়সাও বাহিরে যাইবে না। বিশেষ বিবরণের জন্য উক্ত ইস্কুলের সেক্রেটারীর নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে। (সুরাজ)

গো-চিকিৎসায় ওঝা বনাম ডাক্তার

নদীয়ার "জাগরণ" নিম্নলিখিত চিঠিখানা ছাপিয়াছেন :— কুষ্টিয়া মহকুমার সরকারী পশু-চিকিৎসক মাননীয় মৌলবী আবদুর রসিদ সাহেবের সুচিকিৎসার ফলে আমার একটী এক বৎসরের 'বকনা বাছুর' ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ গ্রামের ২।১ জন ওঝাকে ডাকি। তারা দেখিয়া ২।১টা গাছ-গাছড়া দিল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল দর্শিল না। শেষে হতাশ হইয়া এই ডাক্তার সাহেবকে আহ্বান করি।

এইরূপ বিনা চিকিৎসায় পাড়াগাঁয়ে প্রতি বৎসর যে কত গরু অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে এবং তজ্জন্য যে কত দরিদ্র কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অতএব আমি শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ও কৃষকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন যখনই তাঁহাদের গরু মহিষ ইত্যাদি কোনরূপ পীড়াগ্রস্ত হয় তখন গ্রামের অশিক্ষিত ও অবিবেচক ওঝাদের চালে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হন। গরু বাছুর ইত্যাদি পীড়াগ্রস্ত হইলে সরকারী পশু-চিকিৎসককে আহ্বান করিলে হাতে হাতে সুফল ভোগ করিবেন।

নিবেদক
ডাঃ—খন্দকার মহম্মদ তাজউদ্দিন
মেম্বর, শমনপুর ইউনিয়ন বোর্ড।

কুমিল্লার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

গত সংখ্যার পত্রিকায় ইংরেজী স্তম্ভে কুমিল্লা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাম্য সমিতির মেম্বরগণ প্রেফারেন্সাল শেয়ার-হোলডারদের তাড়াইয়া ব্যাঙ্কটী তাঁহাদের কবলস্থ করার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবৈধ চেষ্টার ফলে ব্যাঙ্কের বিনাশ দশা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অনেকই ডিপজিটের টাকা উঠাইয়া নিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই ইহার মূলে কার্য্য করিতেছে। পরিতাপের বিষয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই বিদ্বেষ-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছেন। ইনস্পেক্টার এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের জামাতা কাজেই তিনি বেপরওয়া। রেজিষ্ট্রার মহাশয় আছেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থায়—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি এই নিয়ে ব্যস্ত। মাননীয় মিনিষ্টার মহোদয় কি ব্যাঙ্কটীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন না? (ত্রিপুরাহিতৈষী)

জলপাইগুড়ির সিনেমা কোম্পানী

কিছুদিন মফঃস্বলে বায়স্কোপ প্রদর্শন করিয়া তড়িৎ সিনেমা কোম্পানী গত রবিবার হইতে সহরে প্রদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম কয়েক দিন দর্শক-সংখ্যা মোটেই আশানুরূপ হয় নাই। বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর

পরিচালিত সুদামা বা কৃষ্ণসখা অভিনয়ে দর্শকের ভিড় হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির দুর্যোগবশতঃ গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার অভিনয় হইতে পারে নাই। মানুষ মাত্রেই আনন্দ চায় এবং সেই জন্য থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমানে থিয়েটার অপেক্ষা বায়স্কোপ সাধারণের অধিক প্রিয়। কিন্তু এই বায়স্কোপের ছবির জন্য আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। কাজেই আমাদের দেশের অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সুদামার ন্যায় ছায়াচিত্র প্রস্তুত করিয়া সাধারণের আনন্দের পরিপুষ্টি করিতে পারিলে দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী দেশীয় ব্যবসায় গড়িয়া উঠিবে। তড়িৎ সিনেমা কোম্পানী জলপাইগুড়ি সহরে অল্প-ব্যয়সাধ্য নির্ম্মল আনন্দের সুবিধা করিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের। মানুষ আনন্দের জন্য সাধ্যাতীত ব্যয় করে, করিবেও; কিন্তু সেই ব্যয় নির্ম্মলভাবে হইলে মনুষ্যত্বের হানি হয় না, সাধারণের ইহা উপলব্ধি করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

(ত্রিস্রোতা)

কলেরায় ৬০ হাজার বাঙালীর মৃত্যু

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এবার কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯২৫ সনে বাঙ্গালা দেশে কলেরাতে ৩৪০০০ হাজার লোক মারা গিয়াছিল। ১৯২৬ সনের মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ৬০০০০ হাজার। এবারকার মৃত্যুসংখ্যা আরও বেশী হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের পরেই কলেরাতে বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুসংখ্যা বেশী। গত ৩০ বৎসরের হিসাবে প্রকাশ যে গড়ে বার্ষিক ১ লক্ষ লোক বাঙ্গালা দেশে কলেরাতে মারা গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, পল্লীতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই কলেরা বিস্তারের প্রধান কারণ। এই গ্রীষ্মকালে পল্লীর খাল বিল নদীনালা সব শুকাইয়া যায় এবং পল্লীর লোকেরা 'কাদা গোলা' জল পাইতে বাধ্য হয়। ফলে কলেরা ও আমাশয় অনিবার্য্য। তাহার উপর বর্ষার জল পড়িলে এই রোগ আরও প্রবল হইয়া উঠে। অতএব কলেরা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার পল্লীতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় কলেরার টীকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাল কথা। কিন্তু বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিলে গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাইবে এবং কোন স্থায়ী প্রতিকার হইবে না।

(শান্তিবার্ত্তা)

চা-বাগানে বিদ্যালয়।

১৯২৫-২৬ সনের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ঐ বৎসর জলপাইগুড়ি জিলায় ৫৬টি চা বাগান বিদ্যালয় ছিল তন্মধ্যে ১০টি "এ" শ্রেণীর, ২৪টি "বি" শ্রেণীর এবং ২৪টি "সি" শ্রেণীর। বিদ্যালয়ে মোট ১০৪২ ছাত্র ছিল। মোট ২৮১১৲ ব্যয় হইয়াছিল। আমরা যতদূর জানি এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা মোটেই সন্তোষজনক নহে। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কতটী দেশী বাগানে অবস্থিত ইহার উল্লেখ নাই। তবে অধিক সংখ্যকই বিদেশীয় পরিচালিত বাগানে ইহাই আমাদের সংবাদ। আশা করি দেশীয় চা-বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ কুলীদের শিক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন। কেন না শিক্ষায় কার্য্যক্ষমতা বাড়ে বই কমে না।

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতিসাধন করিয়া উহাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করিবার জন্য যে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন চট্টগ্রামের পোর্ট ট্রাষ্টের কমিশনার তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। উক্ত বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইংলণ্ড হইতে একখানি উত্তম ড্রেজার আনয়ন জন্য মেসার্স রেণ্ডাল পামারের প্রস্তাব গ্রহণপূর্ব্বক অনুমোদন জন্য উহা প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ঢাকা-আরিচা রেলপথ

শ্রীযুত এস, মুখোপাধ্যায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ফুলবাড়ীয়া ও মাণিকগঞ্জ পথে ঢাকা-আরিচা রেলপথের বিস্তৃত জরিপের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ মাণিকগঞ্জের পশ্চিমে

জাগীর নামক স্থানে ধলেশ্বরী পার হইয়া ধানরাই পথে টাঙ্গি হইতে আবিচা পর্য্যন্ত অপর একটী রেলপথ জরিপ করিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড ই, বি, রেলপথের এজেন্টকে আদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বেই উক্ত জরিপ কার্য্য শেষ হইবে। ই, বি, রেলপথের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব জে, এন, বসু ঐ জরিপ কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন।

বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা

(১৯২৫-২৬ সনের সরকারী রিপোর্ট)

বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০৯২৩

ছাত্র „ ১৬৫০,৫৫৫

বিদ্যালয়ের ব্যয় ৬২,৩৩,১০৭৲

একটী বিদ্যালয় পোষণের ব্যয় ১২২।৴৫ এবং একটী ছাত্রের ব্যয় গড়ে ৩৻৫।

আলোচ্য বর্ষে ১৩,৩২,২৮৭ জন ভারতীয় ছাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে, তন্মধ্যে ৫৪৪৮০ জন বালিকা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কথিত বর্ষে ৬২৭,৭১৯ জন হিন্দু ও ৬৯৬,২৬৫ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। আলোচ্য বর্ষে হিন্দু বালকদিগের মধ্যে শতকরা ৫·৯ জন ও মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৫·৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একুনে ৫১,৭৭,১৬২ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৭·৮৬ টাকা সরকারী তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বরিশাল-ফরিদপুর রেল লাইন

বরিশাল হইতে গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে বোর্ডের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন গিয়াছে যে, খুলনা লাইনের নওয়াপাড়া ও পিপলাখাটি ষ্টেশন যোগ করিয়া একটী লাইন এই লাইন হইতে খোলা উচিত। পিপলাখাটি হইতে ২৭ মাইল উত্তরে প্রস্তাবিত ফরিদপুর বরিশাল লাইনের টরাক ষ্টেশন ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। একদিকের রাস্তা ১৯১১ সনে জরিপ করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত মোট দূরত্ব ১৭৬ মাইল। ইহাতে দেখা যায় পিপলাখাটি হইতে ষ্টীমারে চাঁদপুর আসিতে অনেক কম সময় লাগিবে। ঐ স্থান হইতে চাঁদপুর ৩০ মাইল ও নারায়ণগঞ্জ ৬৭ মাইল। উভয় সহরই পাট আমদানির কেন্দ্রস্থল।

কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা

১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে এদেশীয় বালকদের জন্য কলিকাতায় ৪২৯টি স্কুল ছিল এবং ইহাতে ২৮০৩৫ ছাত্র ছিল। পূর্ব্ব বৎসর এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪০০ ও ২৪৯১২। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক বৎসরে স্কুলের এবং ছাত্রের সংখ্যা উভয়ই বাড়িয়াছে। উক্ত ২৮০৩৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭১১২ জন হিন্দু, মুসলমান ১০৫৬২ জন। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতার এইসকল স্কুলের গৃহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিক্ সন্তোষজনকই ছিল।

প্রদর্শনী-ট্রেণে সমবায়

ই, বি, রেলওয়ের ডিমন্‌ষ্ট্রেশন্ ট্রেন গত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া বাংলার ২৯টী স্থানে কৃষি, শিল্প গো-পালন, স্বাস্থ্য ও সমবায় প্রদর্শনী দেখাইয়া ২৩শে মার্চ্চ কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। ২৬শে হইতে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত শিয়ালদহে এই রেলপ্রদর্শনী সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল। প্রায় দুই লক্ষের অধিক লোক এই প্রদর্শনী দেখিয়াছে ও নানা বিষয়ের বক্তৃতা শুনিয়াছে।

কুমিল্লায় প্রদর্শনী ট্রেণ

প্রদর্শনী গাড়ীতে সমবায়, কৃষি, শিল্প, পশু-চিকিৎসা মোটরগাড়ী, কলকব্জা প্রভৃতি নানাবিষয়ের প্রদর্শনীদ্রব্য ছিল। এই বিভাগগুলির মধ্যে সমবায় বিভাগটাই অতি মনোরম হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের মাটীর তৈয়ারী কৃষকের ঘর, কৃষকের শস্য ধনভাণ্ডার কচুরী পানা মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য ঘরের চাল, টুপী প্রভৃতি পদার্থে কিরূপে পরিণত করা যায় তাহার মডেল, নদীর নিকটবর্ত্তী উচ্চ জমিকে জলসিক্ত করিয়া আবাদোপযোগী করিবার মডেল প্রভৃতি বেশ চমৎকার দেখাইতেছিল। শিল্প বিভাগে চরকার সূতা

তাঁতের কাপড় বাগেরহাটের নানাপ্রকার সুলভ ছিট বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। প্রত্যেক গাড়ীখানিই সুন্দর ভাবে চিত্রে সজ্জিত করা হইয়াছিল। (ত্রিপুরাহিতৈষী)

বঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষার মাপজোক

আইন শিক্ষা

আইন অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা ৩৮০৪। ঐ সংখ্যার মধ্যে ৩১৮৬ জন হিন্দু, ৫৮৯ জন মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ২৯ জন।)

ডাক্তারী শিক্ষা

কলেজ সংখ্যা ৩

(মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়া কলেজ এবং স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন)।

ছাত্রের সংখা ১৫৯৯ (১৩ জন ছাত্রী)। উক্ত ছাত্রের মধ্যে ১৪১৫ জন হিন্দু, ১৩৭ জন মুসলমান ও ৩৭ জন অন্য সম্প্রদায়ের।

স্কুল সংখ্যা ৮।

ছাত্রসংখ্যা ১৮০৪ (৩৪ জন ছাত্রী)।

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২৯৪ (ঐ ছাত্রের মধ্যে ২৪৪ জন হিন্দু ৩০ জন মুসলমান ও ১৭ জন অন্য সম্প্রদায়ের)।

ঢাকার আসানুল্লা বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা ৪২৮ (উক্ত সংখ্যার মধ্যে ৩৭৭ জন হিন্দু, ৪৮ জন মুসলমান, ৩ জন অন্য সম্প্রদায়ের)।

আর্ট স্কুল

সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ৩৫৪ জন (৩৩৩ জন হিন্দু, ১৪ জন মুসলমান অবশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের)।

বাণিজ্য বিদ্যালয়

সরকারী কমার্শ্যাল ইনষ্টিটিউট—ছাত্রের সংখ্যা ১৮১।

সরকারী বয়নবিদ্যালয়

ছাত্রসংখ্যা ৭৫।

মফঃস্বলের পথঘাট

আর্থিক বাংলার একটা বড় তথ্য মফঃস্বলে সড়কের অভাব অথবা দুরবস্থা। যে-কোনো জেলার সাপ্তাহিক সংবাদেরই "মোদ্দা" একপ্রকার। নিম্নে একটা নমুনা দেওয়া গেল:—

পাথরাইল অলোয়া রাস্তা যদিও লোকাল বোর্ডের কিন্তু ট্রাফিক অত্যন্ত বেশী। লোকাল বোর্ড হইতে ইহা মেরামতের জন্য যে টাকা মঞ্জুর হয় তাহা এত সামান্য যে রাস্তার অবস্থা ক্রমে খারাপ হইয়া যাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে রাস্তা প্রায় এক ফুট নীচু হইয়া গিয়াছে। করটীয়া, পাথরাইল, দেলদুয়ার, জামুকী, পাকুল্যা, মুজাপুর, দেওহাটা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের লোকের ষ্টীমার ষ্টেশনে যাওয়ার ইহা একমাত্র পথ। দিবারাত্রি গাড়ীঘোড়া চলাচল করে। অতএব এই রাস্তা মেরামতের জন্য পর্য্যাপ্ত টাকা মঞ্জুর হওয়া দরকার।

বাঙালীর জলকষ্ট

কাটিহালী ও বাড়রী দুইটী বৃহৎ গ্রামে দিন দিনই অত্যন্ত জলের অভাব লক্ষিত হইতেছে। এই বৃহৎ গ্রাম দুইটীর মধ্যে ৫।৬টী সচ্ছতোয়া পুষ্করিণী আছে কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোকই পঙ্কিল-অপেয় জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন গ্রামে সচ্ছতোয়া পুষ্করিণীর অভাব ছিল না, তখন এই গ্রাম দুইটির স্বাস্থ্যসম্পদ্ অক্ষুণ্ণ ছিল—তেমন কোনও আধিব্যাধির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইত না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জলের অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, বেরি বেরি, কালাজ্বর ইত্যাদি দেখা দিয়াছে। কাটিহালী ও বাড়রী গ্রামের মধ্যে গত্যন্তরবিহীন অবস্থায় ব্যবহারোপযোগী ২।৪টী পুকুর আছে বটে; কিন্তু সমস্ত গ্রামবাসীর ব্যবহারের নিমিত্ত কোন ভাল পুকুর নাই ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারি। এই গ্রামদ্বয়ের প্রকাশ্য স্থানে স্থানে অন্ততঃ ৪।৫ নলকূপ ও পুকুরের দরকার। আমরা এই বিষয়ে সদাশয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

প্রকাশ থাকে যে সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের করুণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে যেন "তেলা মাথায় তেল দেওয়া" না হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের সুবিধার্থ কোনও স্থানে উহা প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই আমাদের বাঞ্ছনীয়।

নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ রেল

ময়মনসিংহের এক স্থানীয় সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য বাহির হইয়াছে :—

"আমরা অবগত হইলাম নেত্রকোণা হইতে মোহনগঞ্জ পর্য্যন্ত যে নূতন রেলপথ মঞ্জুর হইয়াছে তাহার ভূমি ক্রয় করার জন্য নোটীস দেওয়া হইয়াছে। ঐ রাস্তার কাজ নাকি ২বৎসরে শেষ হইবে। মোহনগঞ্জ এ অঞ্চলের একটা প্রসিদ্ধ বাজার। এ বাজার হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের বহু জিনিষ রপ্তানি হইবে। রেল লাইন আসায় নেত্রকোণায় পূর্ব্বাপেক্ষা মৎস্যাদির আমদানি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই রেল লাইন হইলে এ অসুবিধা আরও বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

মক্তব ও টোল

১৯২৫-২৬ সনের বঙ্গীয় শিক্ষাবিবরণীতে বঙ্গদেশের মক্তব ও টোলের সংখ্যা, ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা এবং ব্যয়ের কথা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

মক্তব

বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা (বালকদের জন্য)	১২১৬৬
ঐ (বালিকাদের জন্য)	৬১৪২
ছাত্রসংখ্যা	৪০২০৯৫
ছাত্রীসংখ্যা	১১৬০৪০

ব্যয়

প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত	৪৫৯৮৫৮৲
ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল ফাণ্ড হইতে	২০৬৩৪৮৲
মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ড হইতে	৩১৪৮৮৲
ছাত্রবেতন হইতে	৫২২১৯৩৲
অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত	২৪৫৮৭৩৲

টোল

বিদ্যালয়ের সংখ্যা	(বালকদিগের জন্য)	১১৯
ঐ	(বালিকাদের জন্য)	০
ছাত্রসংখ্যা		১০২৪০
ছাত্রীসংখ্যা		৪১

ব্যয়

প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত	৩৯৫০০৲
ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল ফাণ্ড হইতে	৩২২০০৲
মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ড হইতে	১১৬৩২৲
ছাত্রবেতন	০
অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত	১৪৬৩৮৭৲

উপরে যে বিদ্যালয়গুলিকে মক্তব এই সাধারণ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে তাহার ভিতরে দুই শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, যথা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিশেষ বিদ্যালয়। মক্তবের ভিতরে প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই সংখ্যা অধিক। সুতরাং এই শ্রেণীর মক্তবেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং ব্যয়ও অধিক। সংস্কৃত টোলে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, এগুলি শুধু সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়। যে সকল মক্তব এইরূপ বিশেষ বিদ্যালয় তাহার সংখ্যা অতি অল্প। সর্ব্বসমেত মাত্র ২৯৯টী। ইহাতে ছাত্রছাত্রীরও মোট সংখ্যা ৭১৭৫ মাত্র। এই হিসাবে মক্তব অপেক্ষা টোলের সংখ্যাই অধিক এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেশী। মক্তব নামে মুসলমান বালক-বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রাথমিক স্কুল থাকাতে আপাতদৃষ্টিতে মক্তব-সংখ্যা এত অধিক দেখা যায়।

নূতন কৃষি-বিদ্যালয়

দি ফার্টিলাইজীং প্রোপেগেণ্ডা অব ইণ্ডিয়া লিঃ কর্তৃক টালিগঞ্জে একটি কৃষি-বিদ্যালয় ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সা ওয়ালেস্ অ্যাণ্ড কোং লিঃ তাহার সেক্রেটারী। স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিতে কিঞ্চিদধিক একবৎসর লাগিবে। বেতন আহার ও বাসস্থানের নিমিত্ত কিছুই লাগিবে না।

মফঃস্বলে কলের লাঙ্গল

ময়মনসিংহের সাজাদপুর থানার এলাকায় গোটালিয়া

নামক স্থানের উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রসন্তানগণ বাবু খগেন্দ্রচন্দ্র রায় ও বাবু অম্বিকাচরণ রায়ের তত্ত্বাবধানে একটী যৌথ কোম্পানী গঠনপূর্ব্বক দুইটি মোটর লাঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা অতি সন্তোষের সহিত তদ্দ্বারা জমি অতি উত্তমরূপে চাষ করিতেছেন। পোটালিয়াতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুণ্ড প্রভৃতি ধনীর ছেলেরাও মুটে মজুরের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

ট্রাম ও বাস

গত বৎসরে ট্রাম কোম্পানীর ১১৯০৮৪৫ টাকা লাভ হইয়াছে। তার পূর্ব্ববৎসর ৩২৮৫৬৬০ টাকা লাভ হইয়াছিল। গত বৎসরের লভ্যাংশ হইতে অংশীদারেরা শতকরা ৫৲ টাকা পাইবেন। তার পূর্ব্ববৎসরে শতকরা ৭৸০ টাকা পাইয়াছিলেন। কোম্পানীর ডাইরেক্টরেরা মনে করেন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বাসের প্রতিযোগিতার দরুণ কোম্পানীর আয় এত কম হইয়াছে। সম্প্রতি ট্রামের ভাড়া অনেক কমিয়াছে। ট্রাম কোম্পানী মাসিক টিকিটের বন্দোবস্তও করিয়াছেন। গাড়ীর নূতন সুন্দর সবুজ রং হইয়াছে। ইন্‌স্পেক্টারের সংখ্যা বাড়াইয়া চুরির সম্ভাবনা কমান হইয়াছে। অল্প বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া অধিক বেতনের পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত করা হইতেছে। নানা ভাবে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ট্রাম কোম্পানীর এজেণ্ট মিঃ ডেইন বলিয়াছেন, "বাস্তবিক ট্রামের সহিত বাসের প্রতিযোগিতা নাই। কারণ ট্রাম কোম্পানী রাস্তা ব্যবহার করার জন্য করপোরেশনকে টাকা দেয়, বাসকোম্পানী তাহা দেয় না। বাস চলার দরুণ রাস্তা যে নষ্ট হয় তাহার মেরামতের খরচ সহরবাসীরাই ট্যাক্সরূপে দেয়। ট্রামকে তুলিয়া দিতে হইলে ৪০০০ বাসের প্রয়োজন। এত অধিকসংখ্যক বাস্ কলিকাতার মত সহরে চলিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে ট্রাফিক পুলিশের খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে।"

বাঙ্গালার কৃষি-পরীক্ষাগার

এযাবৎ কোন্ ফার্ম্মে কত ক্ষতি হইয়াছে তার তালিকা :—

ফার্ম্ম	ক্ষতির পরিমাণ
শিউড়ি	৬,৪৫৫৲
বহরমপুর	৫,৫৮৫৲
যশোহর খাস মহাল	১০৩৲
কুমিল্লা	২,৩৭৬৲
ময়মনসিংহ	৫৫০৲
বরিশাল	৫০৬৲
ধানবাড়ী	৫৭৬৲
জামালপুর	৩৫১৲
রঙ্গপুর	১,১৪৫৲
বুড়ীর হাট	৪,০৯৩৲
বগুড়া	২,৬৬০৲
পাবনা	১,৫২২৲

গ্রামে জলদানের ব্যবস্থা

(১) ১৯২৪-২৫ সনে সরকার হইতে মোট টাকা দেওয়া হইয়াছিল ৫০,০০০৲

(২) ১৯২৫—২৬ সনে ... ২,৫০,০০০৲

এই খরচটা বাঙ্গালার বিভিন্ন বিভাগে এইরূপ হইয়াছিল :—

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
প্রেসিডেন্সি	২০,০০০৲	৭৫,০০০৲
বর্দ্ধমান	৩০,০০০৲	৭৫,০০০৲
রাজসাহী	•	৫০,০০০৲
ঢাকা	•	৩০,০০০৲
চট্টগ্রাম	•	২০,০০০৲

প্রধানতঃ নলকূপ বসানো পুষ্করিণী-সংস্কার ও নানাবিধ কূপ খননে এই সব টাকা খরচ করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনশিওর‍্যান্স সোসাইটি

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠানটি সেই স্বদেশী আমলে গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানে ইহা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহা বাস্তবিকই বাংলার ও বাঙালীর গৌরবের জিনিষ। এইখানে এই বীমা প্রতিষ্ঠানটির বিগত ৫ বৎসরের

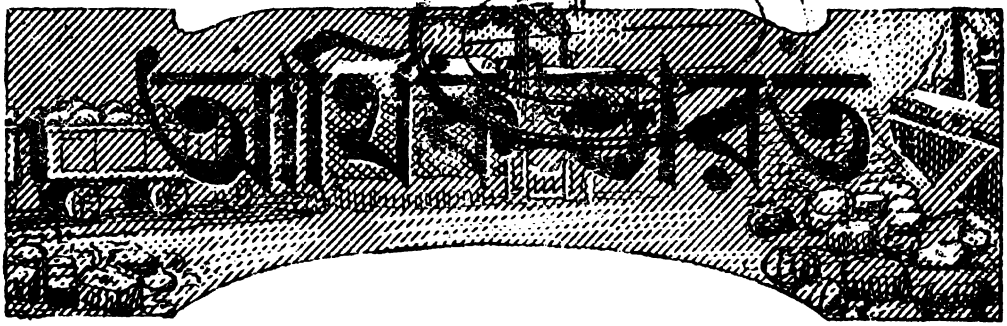
কাজের হিসাব দেওয়া গেল। ৩০শে এপ্রিল বৎসর শেষ হয়।

	বীমা তহবিল	প্রিমিয়াম আয়
১৯২২	৪৪,৭০,৮২৫	৬,৯৮,৩০৪
১৯২৩	৪৮,৭২,৬৬৭	৭,৮২,৭৭৯
১৯২৪	৫২,৫০.৩১৫	৮,৮৯,৬৯৭
১৯২৫	৫৬,৫১,১৮০	৯,৭৮,৭৩৪
১৯২৬	৬২,১৪,২৫৫	১১,৫৬,৪৩১

	নূতন বীমার পরিমাণ	বৎসরের মোট ব্যবসার বহর
১৯২২	২৩,৬৩,২৫০	১,৪১,৮৫.৪৩৭
১৯২৩	৩০,৮১,০০০	১,৫১,৭০,৭৯৯
১৯২৪	৩৭,১২,২৫০	১,৭০,৩৩,৪৮০
১৯২৫	৪৯,০৭,১০০	১,৯৮,৮৪,২২১
১৯২৬	৬০,৫১,৭৫০	২,৩৫,৭১,০৩৪

এ সংখ্যাগুলি খুবই আশাপ্রদ। এই বীমা প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৭ সনের ৩০শে এপ্রিলে সমাপ্ত ৪ বৎসরের জন্য প্রতি বৎসর হাজারকরা ৫৲ টাকা করিয়া বোনাস্ দিয়াছিল। ১৯২২ সনে ঐ সমিতি প্রতি বৎসর হাজারকরা ১৫ টাকা করিয়া অংশীদারদিগকে প্রদান করে। এই বৎসরের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে লভ্যাংশের বখরা দেওয়া হইবে তাহা গতবারের তুলনায় অনেকটা বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সমিতির ইনভেষ্টমেণ্ট (শিল্প-ব্যবসা প্রভৃতিতে টাকা খাটান ও লাগান) লাভজনক হইয়াছে। সমিতির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রভূত পরিমাণে দায়ী।



ভারতের রেল-সম্পদ

বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথগুলা একত্রে লম্বায় ৩৮,৫৭৯ মাইল। এইসব তৈয়ারী করিতে খরচ পড়িয়াছে ৭৫৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক এক মাইল পথের খরচ গড়-পড়তা ১,৯৫,৪৪৩। মাইল প্রতি প্রায় ২ লাখ টাকা ধরা যাইতে পারে।

৬০ কোটি মোসাফির আর ৮ কোটি টন মাল

ফী বৎসর মোটের উপর ৬০ কোটি লোক রেলপথে যাতায়াত করে। আর মাল চলাচলের পরিমাণ ৮ কোটি টন। অর্থাৎ ভারতের লোক-সংখ্যা সংক্ষেপে ৩০ কোটি ধরিয়া লইলে প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া রেলে মোসাফির করে। আর ফী মোসাফির গড়পড়তা প্রায় সিকি টন (৭ মণ) মাল লইয়া চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত।

রেলের লাভালাভ

১৯২৫-২৬ সনে রেলের লাভ ১৯২৪-২৫ সনের সমান হয় নাই। তবুও ৯ কোটি ২৬ লাখ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে মূল পুঁজির উপর শতকরা ৫·৩১ টাকা পড়ে। ১৯২৪-২৫ সনে নিট লাভ ছিল ১৩ কোটি ১৬ লাখ টাকা। দুই বৎসরের লাভ একত্রে ২২ কোটি ৪২ লাখ।

এই লাভটা দুই হিস্যায় বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২ কোটি টাকা জমা হইয়াছে ভারত-গবর্মেন্টের সরকারী খাজনা-বিভাগে। আর রেল "রিজার্ভ" নামক রেলশাসনের মজুত-গচ্ছিত বিভাগে জমা করিয়া রাখা হইয়াছে ১০ কোটি টাকা। কোনো বৎসর লোকসান ঘটিলে অথবা অতিরিক্ত খরচের দরকার পড়িলে এই গচ্ছিত ভাঙিয়া খরচ করা চলিবে।

বর্ষার প্রভাবে রেলের আয়

আমাদের দেশে চাষীর উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে সু-বর্ষা, কু-বর্ষার উপর। বর্ষা ঋতু এক হিসাবে সমগ্র আর্থিক ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ। গবর্মেন্টের সরকারী খাজানার হ্রাস-বৃদ্ধি সু-বর্ষা কু-বর্ষার উপর নির্ভর করে। আবার রেল-আয়ের উঠানামাও বর্ষার প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কেননা চাষ-আবাদে মাল বেশী কি কম উৎপন্ন হইল তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় রেল-পথে মাল-চলাচল বেশী কি কম হইবে।

কাজেই "মনসুন"-ঋতুর সু-কু আলোচনা করা আর বর্ষার ঠিকুজি রাখা গবর্মেন্টের খাজাঞ্চি-বিভাগের মতন ভারতীয় রেল-কোম্পানীরও বড় ধান্ধা। তাহার উপর নদনদীতে বন্যার মাত্রা বাড়িলে কমিলেও রেল বিভাগকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। অর্থাৎ সকল প্রকারে চাষ-আবাদের উন্নতি-ঘটা রেল কোম্পানীর আসল স্বার্থ।

কয়লা-চালান ও রেল

দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়লা-চালানের সু-বন্দোবস্ত করা রেল-কোম্পানীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মালগাড়ী গুনতিতে ছিল কম। তখনকার দিনে যে খাদে কয়লা বেশী উঠিত সেই খাদের জন্য বেশী গাড়ী জোগান হইত। কাজেই বড় বড় খাদের কাছেই মালগাড়ীর ডিপো থাকিত বড়। আর

তাহার ফলে কয়লার ক্রেতারাও বড় বড় খাদেরই খরিদ্দার হইবার সুযোগ পাইত। ছোট ছোট খাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা ছিল যার পর নাই অনিষ্টকর।

১৯২৪-২৬ সনে মাল-গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। গাড়ীগুলা ছোট-বড়-মাঝারি সকল প্রকার খাদের কয়লাই বহিয়া লইবার জন্য যেখানে সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারে। কাজেই বড় খাদের মালিকেরা এখন আর অন্যায় সুযোগ ভোগ করিতে পায় না। বড় খাদের কয়লায় আর ছোট খাদের কয়লায় টক্কর চলিতেছে। খরিদ্দারেরা এখন একসঙ্গে সকল খাদের কয়লার দর যাচাই করিয়া কয়লা খরিদ করিতে সমর্থ। ছোট খাদের কয়লা পছন্দ হইলেও কোনো ক্ষতি নাই। কেননা সেখান হইতে মাল বহিয়া আনিবার জন্য গাড়ী পাওয়া যায়। ফলতঃ, টক্করের ফলে কয়লার বাজার অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু উঁচু শ্রেণীর, মাঝারি শ্রেণীর, আর নিম্ন শ্রেণীর কয়লা নামে নানা প্রকার কয়লা বাজারে দেখা দিয়াছে। আজকালকার বাজারে শ্রেণী হিসাবে কয়লার দরও স্বতন্ত্র। নিম্ন শ্রেণীর কয়লা বাজারে আজকাল বিক্রী করা কঠিন।

মাল-গাড়ীর জোগানে উন্নতিবিধান

কয়লা-চালানের নতুন সুযোগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আজকাল মালগাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। আসল কথা সংখ্যা-বৃদ্ধিই মালগাড়ীর জোগানে উন্নতি-বিধানের একমাত্র কারণ নয়। মালগাড়ীর জোগানে উন্নতি অনেকগুলা বিভিন্ন রকমের ছোট-বড়-মাঝারি উন্নতির উপর নির্ভর করিয়াছে। অর্থাৎ নূতন নূতন মালগাড়ীর সংখ্যা না বাড়িলেও একমাত্র ঐ সকল উন্নতি দুই চারিটা ঘটিলেই মালগাড়ীর জোগানে উন্নতি দেখা দিত।

একটা বড় কারণ হইতেছে গাড়ীগুলা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার সুব্যবস্থা। মালটা পাইবামাত্র তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা করা আর এক কারণ। এই ব্যবস্থায় কোনো এক জায়গায় গাড়ীগুলা বেশীক্ষণ নিশ্চলভাবে ফেলিয়া রাখিতে হয় না। অধিকন্তু গাড়ীগুলা যাহাতে এক ক্ষেপ শেষ করিবামাত্র নিজ নিজ আড্ডায় ফিরিয়া আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও একটা বড় কথা। এই সবই শাসন সম্পর্কিত কাজ। নতুন গাড়ী তৈয়ারী না করিয়াও একমাত্র গাড়ী শাসনের উন্নতিসাধন করিলেই গাড়ীর জোগান উন্নত হইতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শাসন-বিষয়ক উন্নতি একটা উল্লেখযোগ্য বস্তু।

গাড়ী-শাসনের টেক্‌নিক্যাল তথ্য

গাড়ী-বিষয়ক শাসনে উন্নতি একমাত্র কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান বা সময়-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে না। এটাও একটা কটমট টেক্‌নিক্যাল চিজ। রেলপথগুলাকে শক্ত করা দরকার হয়। রেলের বাঁধ পুল ইত্যাদি অনুষ্ঠানও মজবুত করিয়া রাখা আর একটা উপায়। ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী সাজাইবার গুছাইবার জন্য সুবিস্তৃত উঠান চাই। এই উঠান বাড়ানোর অর্থ কতকগুলা নতুন নতুন রেল পাতিবার ব্যবস্থা করা। কোনো কোনো রেল লাইনে রাস্তাটার উপর এক সঙ্গে পাশাপাশি দুইটা গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করা অন্যতম উপায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে এইরূপ পাশাপাশি ডবল রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। মাল গাড়ীর গতি বাড়াইয়া দেওয়া একটা বড় কথা। তাহার জন্য আবার নতুন এঞ্জিনের ব্যবস্থা করা দরকার। অধিকন্তু মাল গাড়ীর কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যখন তখন মেরামতের জন্য গাড়ীগুলাকে যদি কারখানায় পাঠাইতে হয় তাহা হইলে উপযুক্তসংখ্যক গাড়ী অনেক সময়েই জুটিতে পারে না। গাড়ীর কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইবার অর্থ বেশী দামের উৎকৃষ্ট সরঞ্জামের গাড়ী তৈয়ারী করা। এক সঙ্গে এত দিকে উন্নতি সাধন করিতে পারিলে গাড়ী-শাসনে উন্নতি আপনাআপনিই ঘটিয়া থাকে। আর তখন গাড়ী-জোগানের উন্নতিও সহজসাধ্য হইয়া আসে। রেলপথের এই টেক্‌নিক্যাল কথাগুলা ভারতীয় রেল-তত্ত্বজ্ঞের মগজে বসা আবশ্যক।

মাল-গাড়ীতে ভ্যাকুয়াম-ব্রেক

"রেল সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ, আ, ক, খ, না জানিয়াও আমরা ভ্যাকুয়াম ব্রেক" নামক কল-কৌশলের

খবর রাখি। এই "ব্রেক" কৌশলটা যে সকল গাড়ীতে ভাল সেই সকল গাড়ী চলে ভাল। মোসাফিরদের আরাম-ও ঘটে বেশ। সাধারণতঃ মালগাড়ীতে এই "ব্রেকের" ব্যবস্থা থাকে না,—অন্ততঃ পক্ষে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত থাকিত না। আজকাল মালগাড়ীতেও ভ্যাকুয়াম ব্রেক লাগানো হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য পয়সার খেলা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন রেল-ঘটিত যন্ত্রপাতির বেলায়ও "যত গুড় তত মিষ্টি।" হঠাৎ মালগাড়ীগুলা নিরাপদে দ্রুত চলে। এক কথায় শেষ পর্য্যন্ত কম খরচায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

এঞ্জিন-সঙ্ঘের ব্যবস্থা

এক একটা এঞ্জিন লম্বা লম্বা গাড়ী টানিতে গিয়া বড় শীঘ্র হয়রাণ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু প্রত্যেক ষ্টেশনেই অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে হয়। একটা বলদে লাঙ্গল টানার অবস্থা দেখিলেই বিষয়টা কিছু বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যদি একাধিক এঞ্জিন একখানা গাড়ীর জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় তাহা হইলে লম্বা লম্বা গাড়ী বহুদূরবর্ত্তী ষ্টেশন পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে টানিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। এঞ্জিনটাকে বড় শীঘ্র ছুটি দিবার দরকার পড়ে না। প্রত্যেক এঞ্জিন হইতেই মোটের উপর ঘণ্টা প্রতি বেশী কাজ পাওয়া যায়। কয়লার খরচও লাগে কম। জোড়া বলদ হালে জুতিলে এই ধরণেরই খরচপত্র বাঁচে দেখা যায়। ভারতীয় রেলপথের কোনো কোনোটায় এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ এঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ী টানানো হইতেছে। তাহাতে গাড়ী-শাসনে আর অন্যান্য রেল-কারবারে কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বিদ্যুতের রেল

যে সকল অঞ্চলে ঘনঘন গাড়ী-চলাচল আবশ্যক সেই সকল অঞ্চলে কয়লার ঠাঁইয়ে বিদ্যুৎ কায়েম হইয়াছে। বিদ্যুতের রেল ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। বড় বড় শহরের আশে-পাশের সঙ্গে রেলসম্বন্ধ বিদ্যুতের সাহায্যেই ঘটিতে থাকিবে। জল-বিদ্যুতের কারখানা যে যে জনপদের বিশেষত্ব সেই সকল জনপদে বিদ্যুতের রেলই চলিবে। পাহাড়ী অঞ্চলে উৎরাইয়ের পথে বিদ্যুতের সাহায্য বেশ কাজে লাগিবে। যে সকল ঠাঁইয়ে কয়লার অভাব সেই সকল ঠাঁইয়েও বিদ্যুৎই রেল চালাইবে। আজকাল বাংলা দেশে বিদ্যুতের রেল নাই। বোম্বাই অঞ্চলে এই দিকে সূত্রপাত হইয়াছে। বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

মেরামতের কারখানা

রেলওয়ে-সংক্রান্ত মেরামতি কাজের পরিমাণ খুব বেশী। গাড়ী বা যন্ত্রপাতি নতুন তৈয়ারী করার কাজ যত মেরামতির কাজ প্রায় তাহার সমান। কাজেই মেরামতের কারখানা-গুলা বিজ্ঞানসম্মতরূপে শাসন করা আবশ্যক। এই দিকে পূর্ব্বে কোনো কাজ হয় নাই। সম্প্রতি স্যার ভিন্‌সেণ্ট রাভেন সাহেবের একটা তদন্ত-বিবরণ বাহির হইয়াছে। তাহাতে কারখানা-গুলার সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করা হইবে। যন্ত্রপাতি কলকব্জার মেরামত সাধারণতঃ কোন্ কোন্ দিকে কত দরকার তাহা প্রথম হইতেই আন্দাজ করিয়া লওয়া সম্ভব। আর সেই আন্দাজমাফিক জিনিসপত্র বেশী বেশী তৈয়ারী করিয়া রাখিলে অল্প খরচে বেশী ফললাভের সম্ভাবনা।

রেলের জন্য সরঞ্জাম খরিদ ও তৈয়ারী

এতদিন রেলের "ষ্টোর্স" বা সরঞ্জাম কেনা হইত বিদেশ হইতে। কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া এই লাইনে "স্বদেশী" আন্দোলন চলিতেছে। ভারতেই আজকাল অনেক সরঞ্জাম খরিদ করা হয়। তাহার ফলে রেলের খরিদ-বিভাগ পুনর্গঠিত হইয়াছে।

কোনো কোনো জিনিস খরিদ না করিয়া রেলের কারখানায়ই তৈয়ারী করিয়া লইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সুতরাং রেল সরঞ্জাম আজকাল দুইভাগে বিভক্ত:—(১) খরিদা, (২) ঘরে তৈয়ারী।

সরঞ্জাম বিভাগের কর্ত্তা এখন খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজের পরিচালক। "ভাঁড়ার ঘর," দেশেবিদেশে মাল খরিদ করা, জিনিষপত্র তৈয়ারী করা, আর সরঞ্জামের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সকল দিকেই তাঁহার নজর পড়ে।

রেল-উন্নতির নানা কৌশল

বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর অন্যান্য নানা কৌশলে রেলের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। (১) বিভিন্ন রেলপথের সঙ্গে পরস্পর হিসাব-নিকাশের জন্য একটা "ক্লীয়ারিং-হাউস" (খোলসা ভবন) বা নিষ্পত্তি-ভবন কায়েম করা হইয়াছে। (২) মাল-চলাচলের উপর মাসুল যথাসম্ভব ন্যায্যভাবে স্থির করিবার জন্য "রেট্‌স্‌-অ্যাডভাইজরি কমিটি" (মাশুলবিষয়ক পরামর্শ-সমিতি) কায়েম করা হইয়াছে। (৩) রেল বিষয়ক অঙ্ক ও তথ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থার উন্নতি-বিধান করা হইয়াছে। (৪) গাড়ীগুলার আর যন্ত্রপাতির ভালমন্দ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ কায়েম করা হইয়াছে।

৩০০০ মাইল নূতন পথে কাজ চলিতেছে

আজকাল ভারতের নানা গলিঘোঁচে ৬৭টা নতুন নতুন রেলপথ তৈয়ারী হইতেছে। এইগুলা লম্বায় ২,২০০ মাইল। এই গেল বৃটিশ ভারতের কথা। তাহা ছাড়া,—"রিয়াসতে" অর্থাৎ রাজ-রাজড়াদের ভারতে ১৯টা নতুন রেলপথে ৭৭৫ মাইল খোলা হইতেছে। মোটের উপর প্রায় ৩,০০০ মাইল নতুন পথে কাজ চলিতেছে।

নতুন নতুন রেলপথের মোসাবিদা

আজ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভিতর ১৫৯টা নতুন পথ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাতে ৯,০০০ মাইলের মোসাবিদা আছে। ১৯৩২ সনের শেষের দিকে ৬,০০০ মাইল নতুন রেলপথ খোলা হইয়া যাইবে। আর তখন প্রায় ৩,০০০ মাইলে কাজ চলিতে থাকিবে।

রেল-লাইনে অন্ন-সংস্থান

রেলপথের বিস্তারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে আর ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কিন্তু আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। বহুসংখ্যক লোকের স্থায়ী অন্নসংস্থানও রেল-পথের এক মস্ত কথা। আজকালকার ৩৮৫,৭৯ মাইলে ৭॥০ লাখ লোকের ভাতকাপড় জুটিতেছে। এই সাড়ে সাত লাখের ভিতর মোটা মাহিয়ানাওয়ালা বিদেশী বা দো-আঁসলাদিগকে বাদ দিলে সকলেই খাঁটি ভারতসন্তান।

কাজেই ১৯৩২ সনের ভিতর যদি ৬,০০০ মাইল নতুন পথ খোলা হইয়া যায় তাহা হইলে আরও অনেক কুলী-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ারের অন্নসংস্থান ঘটিতে পারিবে। একথা সহজেই বিশ্বাস করা চলে। তবে ৩৮,৫৭৯ মাইলের জন্য যদি ৭॥০ লাখের ডাক পড়ে তাহা হইলে নতুন ৬,০০০ মাইলের জন্য ঠিক সেই অনুপাতে লোকের ডাক পড়িবেই এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কেননা কোনো কারবার যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে তাহা চালাইবার জন্য লোকজনের সংখ্যা সেই পরিমাণে বাড়ানো আবশ্যক হয় না।

এইক্ষেত্রে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। দেখা গিয়াছে যে, ফী মাইল রেলপথের জন্য গড়ে প্রায় ২ লাখ টাকা পড়ে। এই দুই লাখ টাকা খরচ হয় কিসে? একটা বড় হিস্যা যায় লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালে। তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আসে। কাজেই এই খরচের অধিকাংশই বিদেশীর ভোগে যায়। তাহা ছাড়া আর সবই খরচ হয় লোকের মেহনতের মজুরি বাবদ। মাথার মেহনতের উঁচু দিকটা অধিকাংশই বিদেশীদের কপালে লেখা। অবশিষ্ট ভারতসন্তানের। হাতপায়ের মজুরি সবই অবশ্য ভারতবাসীর একচেটিয়া। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাইল প্রতি দুই লাখ টাকার অনেক-কিছুই শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় নরনারীর অন্ন জোগাইয়া থাকে। অনেক দিক্ হইতেই রেল আমাদের আর্থিক উন্নতির এক বড় খুঁটা।

রেল-কর্ম্মচারীদের জন্য বিদ্যালয়

রেল-চালানো একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। এই বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করিয়া লওয়া ভারতীয় রেল কোম্পানী-গুলা আজকাল নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে। রেলের জন্য লোক বাহাল করিবার পরই তাহাদিগকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই ধরণের ইস্কুল আগে ছিল না। অধিকন্তু যে সকল লোক অনেক দিন হইতে রেলের কাজে বাহাল আছে তাহাদিগকেও পুনরায় ইস্কুলে আনিয়া

তাজা করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভবিষ্যতে ব্যবস্থাটা ক্রমেই পাকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

ভারতীয় রেলের শাসন

ভারতবর্ষে আজকাল যে প্রণালীতে রেলপথ শাসিত হয় তাহার প্রধান কথা তিনটি। প্রথমতঃ, রেলপথের খরচপত্র গবর্মেন্টের সরকারী খাজাঞ্চি বিভাগের অধীন নয়। ১৯২৪ সনে রেল-"কোষ" ভারত-সরকারের রাজস্ব-বিভাগ হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রেলপথ-গুলা "স্বরাজ" ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় কথা বিভিন্ন রেলপথের পরস্পর-সম্বন্ধবিষয়ক। রেল-শাসনের জন্য কেন্দ্র কমিটি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কেন্দ্র-কমিটির এক্তিয়ার যাহাতে কমিয়া যায় তাহার দিকে লক্ষ্য রহিয়াছে। রেলপথগুলা প্রত্যেকেই যথাসম্ভব এক একটা স্বরাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তৃতীয়তঃ "ব্রড্‌গেজ" বা চওড়া-রাস্তার রেলপথগুলার অধিকাংশই গবর্মেন্টের সরকারী ভাবে শাসিত হয়। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, রেল-শাসনের স্বরাজটা বাস্তবিক পক্ষে গবর্মেন্টের এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগের স্বতন্ত্রতা।

ভারতে জীবন বীমা

গবর্ণমেন্ট অ্যাকচুয়ারী ১৯২৫ সনের জন্য জীবনবীমা কোম্পানী সম্বন্ধে এই বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন:—১৯১২ সনের লাইফ্ অ্যাশিওর‍্যান্স অ্যাক্ট হওয়ার পর অবধি ভারতে ৮৬টি কোম্পানী মোতায়েন হইয়াছে। এর ২৯টা লাল বাতি জ্বালাইয়াছে।

ডিভিডেণ্ড

এই বৎসর ৩%র কিছু উপরে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

সুদের হার

যুদ্ধের সময়কার চেয়ে ১২% বেশী করিয়া সুদের হার ভারতীয় কোম্পানীগুলি পাইতেছে। কিন্তু এই হার গত ৪ বছরের যে-কোনো সময় অপেক্ষা কম এবং ক্রমাগত কমিতেছে।

অ্যাসেট্

'ভারতীয় কোম্পানীগুলির অধিকাংশ অ্যাসেট্ ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটি। মোট দাম ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ইহা গত বছরের চেয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা বেশী।

পুঁজিপাটা

ভারতীয় কোম্পানীগুলির পরিশোধিত পুঁজিপাটা এ বছর ১¼ লক্ষ বাড়িয়াছে। এখন ইহা দাঁড়াইয়াছে ৫৬¼ লক্ষের উপরে। এর ১৭¼ লক্ষ হইতেছে প্রাথমিক ও তত্ত্বাবধান খরচ।

৮ কোটি টাকা

১৯২৫ সনের শেষাবধি ৪৭ কোটি টাকার পলিসি বাহির হইয়াছে। ঐ বছরের টাকার পরিমাণ ৮ কোটি।

মৃত্যুর হার

যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গালা ও বোম্বাইতে হিন্দু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মৃত্যুর হার খুব বেশী। বাঙ্গালায় মুসলমান নারী ও পঞ্জাবে হিন্দু নারী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মরে।

ভারতে মদের আমদানি

ভারতসন্তান মুখে মুখে বুদ্ধদেবের শিষ্য আর উপনিষদের ভক্ত। কিন্তু মদ-আমদানির আধ্যাত্মিকতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নের তালিকায় মদ-আমদানির বহর বুঝা যাইবে:—

১৯১১--১২	... ...	১,৯৩,৯০,০০০
১৯১৫--১৬	... ...	১,৮৭,৩৪,০০০
১৯২০--২১	... ...	৪,৯০,০২,০০০
১৯২১--২২	... ...	৩,৭৬,৬১,৫৪৭
১৯২২--২৩	... ...	৩,৪২,৭৩,৮৫৪
১৯২৩--২৪	... ...	৩,২১,৪৫,০৮০

দেখা যাইতেছে যে ত্রিশ কোটি ভারত-সন্তান ৩ কোটি ২১ লাখ ৪৫ হাজার আশী টাকার বিদেশী মদ হজম করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অবশ্য বিদেশী নরনারীর চাহিদাটাও ধরিতে হইবে

করাচীর আর্থিক কথা

১৯২৫-২৬ সনে করাচীর তুলা-রপ্তানির ব্যবসা খুব সন্তোষজনক বলিতে হইবে। ঐ সনে মোট ১,০৪৮,৭০৩ গাঁইট তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ৮,৪৯,২১৭। ১৯২৬-২৭ সনে রপ্তানি মালের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু মরসুমের সময় আবহাওয়ার অবস্থা ভাল না থাকায় উৎপাদনের হার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। সরকারী অনুমান এ সনে গত সনের চাইতে ৪,৯৫২,০০০ গাঁইট তুলা বেশী জন্মিবে। ব্যবসার অবস্থা ততটা সন্তোষজনক নয়। যুক্তরাষ্ট্রে অসম্ভব রকম তুলা উৎপাদনের ফলে দুনিয়ার তুলার বাজারে স্বভাবতই একটা মন্দা ভাব আসিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ঐ মরসুমে ৫০০ পাউণ্ডের গাঁইটের প্রায় ২ কোটি গাঁইট তুলা উৎপাদন করায় দুনিয়ার তুলার ব্যবসায় এইরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। বাহিরের চাহিদা খুব কমিয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার তুলার অধিকাংশ চাহিদামাফিক না হওয়ায় তুলার বাজারে এদেশী মালের টান পড়ে। মূল্যের দিক্ দিয়াও অনেকটা উন্নতি দেখা যায়। বিগত ডিসেম্বরে তুলার বাজারে যে দাম চলতি ছিল তাহার চাইতে শতকরা ২০ ভাগ দাম বৃদ্ধি পায়। অবস্থা ক্রমেই উন্নতির দিকে যাইতেছিল। ইহার মধ্যে চীনের রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য তুলার বাজারে আবার একটা মন্দাভাব দেখা দিয়াছে। কিছু দিন হইতে চাহিদা খুব কমিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক সুক্কর ব্যারেজ ও সাটলেজ উপত্যকার জল-প্রণালী সম্পূর্ণ হইয়া গেলেই বৎসরের পর বৎসর করাচীর তুলা-শিল্প দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে।

১৯২৫-২৬ সনে করাচীতে মাত্র ৪,৭০৪,০০০, টন গম উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রায় ১ কোটি টন গম ঐ ভূখণ্ডে জন্মে। ফসল কম উৎপন্ন হওয়ায় গমের দাম চড়িয়া যায়। ১৯২৬ সনে মাত্র ১৫৫,৭৬৭ টন গম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পূর্ব্ব সনে রপ্তানি হইয়াছিল ৪০২,৩০৮ টন এবং ১৯২৪ সনে দশলক্ষ টনের বেশী গম রপ্তানি হয়। ১৯২৬-২৭ সনে ফসলের অবস্থা ততটা আশাজনক না হইলেও গত সনের চাইতে ভাল এটা বলা যায়।

পঞ্জাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা

পঞ্জাবের অনেক গ্রামে ও নগরে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে। ইতিমধ্যেই ২৯টি জেলার ২১টিতে উহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতে বিলাতী বনাম "অন্যান্য বিদেশী"

ইস্পাত

শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশী ইস্পাত বিলাত হইতে এ দেশে আমদানি হয়। ১৯২৪-২৫ এবং ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের আমদানির হার এইরূপ:—

	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫
ইংলণ্ড	১২২১৭২ হাঃ	১২,০৫,৩০ হাঃ
বেলজিয়াম	২,৮২২৫ „	৩,৭২,০৪ „
জার্ম্মাণি	১,১৪ লক্ষ টাকা	১,৬৪,৭৩ „

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট ১৮ কোটি টাকায় বিদেশী ইস্পাত আমদানি হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৬৮ ভাগ বিলাতের আর বাকী শতকরা ১৫ ভাগ বেলজিয়ামের, ৬ ভাগ জার্ম্মাণির এবং ১০ ভাগ অন্যান্য দেশের। সুতরাং প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশী ইস্পাত বিলাত হইতে আমদানি হয়। এখন "রক্ষণ" ব্যবস্থার দ্বারা বিলাতের এই ৭০ ভাগ ইস্পাতের উপর শুল্ক কমাইয়া দেওয়া হইল। বাকী ৩০ ভাগ বিদেশী ইস্পাতের উপর উচ্চ শুল্ক বসানো হইয়াছে।



আর্থিক জগতের নবীন গড়ন

আজকালকার দুনিয়ায় বহুসংখ্যক শিল্প-কারখানা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রদ করিয়া এক একটা কেন্দ্রীকৃত ঐক্যবদ্ধ শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত। এই ধরণের শিল্প-সংগঠনকে "ট্রাষ্ট" বলে। আমরা তাহাকে পারিভাষিক হিসাবে "সঙ্ঘ" রূপে বিবৃত করিয়া থাকি।

জার্ম্মাণি, আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড এই তিন দেশ ট্রাষ্ট-গঠনে দুনিয়ার অগ্রণী। "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকেরা বর্ত্তমান জগতের এই নবীনতম গড়নের সঙ্গে সুপরিচিত। বস্তুতঃ ভারতে যাঁহারা ধনবিজ্ঞান বিদ্যার উচ্চতম আসরে বসিয়া গবেষণা অনুসন্ধান রীসার্চ ইত্যাদিতে মন লাগাইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই সঙ্ঘ-চরিত্র সঙ্ঘ-বিকাশ, সঙ্ঘ-প্রভাব, সঙ্ঘ-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা অন্যতম বিশেষ ধান্ধা হওয়ার উপযুক্ত।

রুশিয়ার ট্রাষ্ট-সঙ্ঘ

ইয়োরোপের সকল দেশই জার্ম্মাণি, আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডের সমান উন্নত নয়, রুশিয়া ত নয়ই; কিন্তু তবুও আর্থিক জগতের এই নবীন গড়ন রুশিয়ায়ও বেশ পাকা ঘর করিয়া বসিয়াছে। রুশিয়ার বড় বড় কারখানার অনেকগুলা আজকাল ৩৫৭টা ট্রাষ্ট-সঙ্ঘের অধীন শাসিত হইতেছে। এই সঙ্ঘগুলাকে ছোট বড় মাঝারি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। ছোট ট্রাষ্টের সংখ্যা ২৫৮, মাঝারির সংখ্যা ৬৩, আর বড়গুলা গুনতিতে ৩৬।

ছোট বড় সঙ্ঘের বহর

রুশ ধনবিজ্ঞান-সেবীরা কিরূপ মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া ছোট সঙ্ঘ, বড় সঙ্ঘ ইত্যাদি সঙ্ঘের শ্রেণী-বিভাগ করিতে অভ্যস্ত? একটা লক্ষণ হইতেছে মজুরদের সংখ্যা। বড় বড় ৩৬টা সঙ্ঘের তাঁবে যে সকল কারখানা চলিতেছে তাহাতে মোটের উপর ১০,৬৭,৮৭৬ মজুর কাজ করে। গড়পড়তা তাহা হইলে সঙ্ঘ প্রতি ২৯,৬৬৩ মজুর গুনিতে হইবে। ছোট ছোট ২৫৮ সঙ্ঘ ১,৯৯,৪১৭ মজুরের ভাত কাপড় যোগায়। সুতরাং গড়ে ৭৭৩ মজুর ফী ছোট সঙ্ঘের অধীন।

মাঝারি সঙ্ঘ

মাঝারি সঙ্ঘ কাহাকে বলিব? সোহ্বিয়েট রুশিয়ার বড় বড় কারখানায় ১৯২৬ সনে ১৬,৬১,৮০০ মজুর কাজ করিয়াছে। তাহার শতকরা মাত্র ১২ জন ২৫৮টা ছোট সঙ্ঘের অধীন। অবশিষ্ট ৮৮ জন ৯৯টা বড় ও মাঝারি সঙ্ঘের তাঁবে কাজ করে। মাঝারি সঙ্ঘের লোক-সংখ্যা ৩,৯৪,৫০৭। গড়ে তাহা হইলে ৬,২৬২ জন।

বয়ন কারখানায় ২৯ সঙ্ঘ

বড় ও মাঝারি সঙ্ঘের সংখ্যা ৯৯টা। তাহার ভিতর ২৯টা এক বয়ন কারখানার মুল্লুকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীকরণ বেশ দ্রুতবেগে চলিতেছে। চলতি সালে মস্কো অঞ্চলের ৬টা ট্রাষ্ট ভাঙ্গিয়া ৩টা ট্রাষ্ট গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ছোট ছোট ট্রাষ্টের অস্তিত্ব লোপ আর তাহাদের ঠাঁইয়ে বড় বড় ট্রাষ্টের উৎপত্তি বর্ত্তমান রুশ আর্থিক জীবনের এক বিশেষ লক্ষণ। এই হিসাবে সোহ্বিয়েট রুশিয়া আর্থিক জীবনের নবীনতম ধাপে চলিতেছে বলা যাইতে পারে।

শিল্প হিসাবে সঙ্ঘ-সংখ্যা

পাথরের শিল্পে ১১টা বড় ও মাঝারি সঙ্ঘ চলিতেছে। কাঠের শিল্পে ৫টা মাঝারি সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়। ৭টা

বড় আর ৩টা মাঝারি সঙ্ঘ কয়লার খাদ শাসন করিতেছে। ধাতুর খনিতেও একটা বড় আর ৩টা মাঝারি সঙ্ঘের হাত রহিয়াছে।

চেকো-শ্লোহ্বাকিয়ায় ভারত-সন্তানের সুবিধা

অনেক ভারতসন্তান সস্তায় বিদেশ-প্রবাসের সন্ধান ঢুঁড়িতেছেন। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের চেয়ে ইতালি আজকাল সস্তা। সম্প্রতি চেকো-শ্লোহ্বাকিয়া হইতে একজন অধ্যাপক জানাইয়াছেন যে, বার্লিনে বা লাইপৎসিগে যে খাওয়ার জন্য এক মার্ক (জার্ম্মাণ) দিতে হয় সেই খাওয়ার জন্য প্রাগ সহরে (চেকো-শ্লোহ্বাকিয়ায়) সিকি মার্ক দিতে হয়। ১ মার্ক আমাদের প্রায় বার আনা। চেকোশ্লোহ্বাকিয়ার ৮ ক্রাউন ১ জার্ম্মাণ মার্কের সমান। ১ ক্রাউন আমাদের দেড় আনা। ২ ক্রাউনে "ব্রেকফাষ্ট" (প্রাতরাশ) চলে।

মাসিক ঘরভাড়ার জন্য ২০০।৩০০ ক্রাউন (প্রায় ২০।৩০ টাকা) লাগে। ঘর আর খাওয়া সমেত মাসিক ৬০০।৭০০ ক্রাউন (৬০।৭০ টাকা) দরকার হয়।

চেক-মুল্লুক শিল্পপ্রধান

সেকালে অর্থাৎ ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত চেকোশ্লোহ্বাকিয়া অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশ ছিল। সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবনের উৎকর্ষ ইত্যাদি সকল বিষয়েই জার্ম্মাণ "কুল্টুরের" যা-কিছু সবই চেকোশ্লোহ্বাকিয়ায় মজুত আছে। একটা বিশেষ কথা এই যে,—চেকোশ্লোহ্বাকিয়া শিল্প-প্রধান কারখানা-প্রধান দেশ। এই জনপদের সঙ্গে যুবক ভারতের আত্মীয়তা জমিয়া উঠিলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। ঐ দেশে আজকাল ঘোরতর ভাবে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। "নেটিভরা" জার্ম্মাণ ভাষা বয়কট করিয়াছে। চেক্ ভাষার চল বাড়ানো হইতেছে। অবশ্য এই ভাষার লড়াইটা প্রধানতঃ বা একমাত্র জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে চালানো হয়। ভারত-সন্তান যদি জার্ম্মাণ ভাষায় কথা কহিতে চাহে তাহা হইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার চরমপন্থীরাও তাহার সঙ্গে জার্ম্মাণ চালাইতে আপত্তি করিবে না।

দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশের জীবন বীমা

শ্রীযুক্ত হল্যাণ্ড আমেরিকার ন্যাশনাল লাইফ ইনশিওর্যান্স কোম্পানীর সভাপতি। তিনি সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে অনুষ্ঠিত আমেরিকার বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রেসিডেন্টদের এক বৈঠকে ২৮টি দেশের বীমা জীবনের একটা পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দেশের লোক কত টাকা বীমা করিয়াছে তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

যুক্তরাষ্ট্র	৬৩,৭৭৯,৭৪১,০০০	ডলার
গ্রেটবৃটেন	৯,৫৩৭,০৫৯,০০০	"
কানাডা	৩,২৮৫,০২৮,০০০	"
জাপান	২,৪০৪,৭৬২,০০০	"
অষ্ট্রেলিয়া	১,৭০৮,৩৮২,০০০	"
নেদারল্যাণ্ডস্	৯৬১,২৬২,০০০	"
সুইডেন	৮৬৪,১০৭,০০০	"
জার্ম্মাণি	৭১৩,৭৪৬,০০০	"
ফ্রান্স	৭০১,৮৫৫,০০০	"
ব্রেজিল	৪২৬,৯৯৭,০০০	"
সুইট্সারল্যাণ্ড	৩৯৭,৮০৬,০০০	"
ডেন্মার্ক	৩৯২,৫৪৭,০০০	"
নরওয়ে	৩৯২,১১১,০০০	"
ইতালি	৩৩৭,৪৭১,০০০	"

হল্যাণ্ড সাহেবের হিসাব মত দেখা যায় যে ১৯২৪ সনে গোটা দুনিয়ার লোকে ২৭০০ কোটি টাকা বা ৯০,০০০,০০০,০০০ ডলার বীমা করে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানই সেরা। দুনিয়ার সমগ্র বীমা কারবারের ৳ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে সম্পন্ন হয় এবং ১/১০ অংশ গ্রেটবৃটেনে ও ৩/১০ অংশ কানাডায় সম্পন্ন হয়। গোটা ইংরেজীভাষাভাষী দেশ ধরিয়া দেখা যায় যে, দুনিয়ার ৬ ভাগের ৫ ভাগ বীমা কারবার ঐ সকল দেশে চলে অর্থাৎ ইংরেজ সন্তান ১৯২৪ সনে ৭৮,০০০,০০০,০০০ ডলার বীমা করে।

যুক্তরাষ্ট্রে বীমা কারবার অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২০ সনে আমেরিকানরা ৮৫০ কোটি ডলার বীমা করিয়াছিল। ১৯২৪ সনে ঐ সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩৮০ কোটি ডলার দাঁড়াইয়াছে। গ্রেটবৃটেনে কিন্তু বীমার পরিমাণ ঐ সময়ে মাত্র ৪০০ কোটি ডলার হইতে ৯৫০ কোটি ডলারে উঠিয়াছে।

১৯২৭ সনে শিক্ষা বাবদ ইংরেজের খরচ

বোর্ড অব্ এডুকেশন হইতে এক খসড়া বাহির হইয়াছে তাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কম টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য খরচ বেশী হইবে।

আগামী আর্থিক বৎসরে শিক্ষা বাবদ মোট ব্যয় করা হইবে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার পাউণ্ড বেশী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, ট্রেনিং কলেজে, বিজ্ঞান ও আর্ট কলেজে প্রবেশার্থীদের বৃত্তির পরিমাণ বাড়ান হইয়াছে। মোট পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ পাউণ্ড।

শিক্ষকদের পেন্সনের ব্যবস্থায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়ায় মেয়ে ভোটার বেশী

এবারকার অষ্ট্রীয়ান পার্ল্যামেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে পুরুষের চাইতে মেয়ে ভোটারের সংখ্যা ঢের বেশী ছিল। ভিয়েনা সহরে ৬৯৮ হাজার মেয়ে ভোট দিয়াছিল আর পুরুষ ভোট দেয় মাত্র ৫৬৪ হাজার। শতকরা ৯০ জন ভোটদাতা নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছিল।

দুইটি ব্যাঙ্কের রিপোর্ট

চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া অ্যাণ্ড চায়নার ১৯২৬ সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সনে ব্যাঙ্কের ৭৭৯,৫৭৬ পাউণ্ড মুনাফা হইয়াছে। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৭৫৬,১৫৪ পাউণ্ড। পূর্ব্বকার জায় ২০৯, ২৭৮ পাউণ্ড টানিয়া ১৯২৬ সনে মোট ৯৮৭,৮৫৪ পাউণ্ড হইয়াছে। ডিরেক্টরগণ অংশীদারদিগকে বাৎসরিক শতকরা ১৪ ভাগ ও প্রত্যেক অংশ প্রতি ৬ শিঃ ৩ পেঃ করিয়া বোনাস দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। এই ব্যবস্থায় অংশীদারগণ শতকরা ২০$\frac{1}{8}$ ভাগ মুনাফা পাইবেন এবং ২১৫,৩৫৪ পাউণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে।

মার্কাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার মুনাফা ১৯২৬ সনে দাঁড়াইয়াছে ২৫০,৭৮১ পাউণ্ড। ১৯২৫ সনে ছিল ২৫৭,৬৬৩ পাউণ্ড। পূর্ব্ব বৎসরের অবশিষ্ট ১৬২,৮৮৫ পাউণ্ড ধরিয়া ১৯২৬ সনে ৪১৩৬৬৬ পাউণ্ড মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে শতকরা ১৬ ভাগ মুনাফা অংশীদারদিগকে দেওয়া হইবে এবং ১৬০,৬৬৬ পাউণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে।

জাপানের সুজুকি ফার্ম্ম

জাপানের জগদ্বিখ্যাত সুজুকি ফার্ম্ম বাধ্য হইয়া সকল প্রকার নূতন কারবার বন্ধ করায় ও মহাজনদের বিলের টাকা পরিশোধ স্থগিত রাখায় বর্ত্তমানে জাপানের ব্যাঙ্ক মহলে এক আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এই সাময়িক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বেশী দিন টিঁকিবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ ইতিমধ্যেই জাপান হইতে সুসংবাদ আসিতেছে। ব্যাঙ্ক অব্ জাপানের প্রতি লোকের আস্থা পূর্ব্বের মতই প্রবল আছে। প্রতিদিন ব্যাঙ্ক হইতে যে পরিমাণ টাকা লোকে তুলিয়া লইতেছে তাহার চাইতে বেশী পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে তাহারা জমা রাখিতেছে।

জাপানের এই সাময়িক সঙ্কটের গোড়ায় কিন্তু জাপানের শ্রেষ্ঠ ফার্ম্ম সুজুকি কোম্পানী। এই বিপুল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন একজন জাপানী মহিলা। শ্রীমতী ইয়ন সুজুকিই আজ ইহার মালিক। লোকে বলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার বেশী। তিনি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী রমণী।

এই মহিলা-কর্ত্তৃক গঠিত ও পরিচালিত বিরাট সুজুকি কোম্পানীর কারবারের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। শ্রীমতী ইয়ন সুজুকির বাণিজ্যতরণী বড় বড় সকল সমুদ্র-পথে চলাফেরা করে। জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা এবং মালয় ষ্টেটে তাঁহার কারখানা আছে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, স্যান ফ্রান্সিসকো, সাংহাই,

কলিকাতা প্রভৃতি দুনিয়ার বড় বড় সহর বন্দরে সুজুকি কোম্পানীর আফিস আছে।

বড় বড় অর্ণবপোত, জাহাজ নির্ম্মাণের ডক, ইস্পাত কারখানা, চিনি প্রস্তুতের রিফাইনারি, ময়দার কল, কটন মিল, রেশম কারখানা, অ্যালকোহল ও মদ তৈয়ারীর কারখানা, রবার ফ্যাক্টরী, বীমা ও ব্যাঙ্ক কোম্পানী এই সকল রকমের বিরাট প্রতিষ্ঠান সুজুকি কোম্পানীর তাঁবে।

দুনিয়ার মেয়ে মহলের সেরা ধনী শ্রীমতী ইয়ন সুজুকির পারিবারিক ও কর্ম্মময় জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইনি ১৭ বৎসর বয়সে এক চিনির রিফাইনারির কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে পরিণীতা হন। ১৯০৫ সনে তাঁর স্বামী দুই সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। শ্রীমতী সুজুকি তাঁহার স্বামীর রিফাইনারি কারখানা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই। তিনি সুজুকি কোম্পানী নাম দিয়া অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঐ কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই অসামান্য কর্ম্মপটু মহিলার একনিষ্ঠার জন্য আজ বর্ত্তমান সুজুকি কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কোম্পানীর শতকরা ৯৮ ভাগ অংশ ঐ জাপানী মহিলার। বিগত যুদ্ধের সময় ঐ কোম্পানী প্রায় ১৫ কোটি টাকা লাভ করিয়া লয়।

শিল্প-ব্যবসায় দশ লক্ষ পাউণ্ড

বৃটিশ ফিল্ম উৎপাদন করিবার জন্য এক সাম্রাজ্যব্যাপী সঙ্ঘ খাড়া করা হইয়াছে দশ লক্ষ পাউণ্ডে। নাম বৃটিশ ইন্‌করপোরেটেড্ পিক্‌চারস্ লিমিটেড্।

১৪ জন বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিকের লেখা এই সূত্রে যোগাড় করা হইয়াছে।

এরই অন্তর্গত হইয়া কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে শাখা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতের কোম্পানীটা তৈয়ারী করিবার ভার লইয়াছেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার সার চিমনলাল শীতলভাড।

রবার দুনিয়া

১৯১৯ সনে যুক্তরাষ্ট্র ২৩০,০০০ টন রবার ব্যবহার করে। ১৯২০ সনে ঐ সংখ্যা ১০০০০ টন কমিয়া ২২০,০০০ টন দাঁড়ায়। ১৯২১ সনে যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা আরও কমিয়া যাইয়া ১৮০,০০০ টন হয়। এই কয়েক বৎসরই বিলাতের রবার গুদামে মাল মজুত হইতে থাকে। কারণ রবারের সব চাইতে বড় খরিদ্দার যুক্তরাষ্ট্র। ১৯২৩ সনে লণ্ডনের গুদামে অবিক্রীত ৮০ হাজার টন রবার জমা হয়। ইহাতে অনেক রবার-ব্যবসায়ী হতাশ হইয়া পড়েন। অনেক রবার উৎপাদনকারী কোম্পানী ভয় খাইয়া যায়। ১৯১০ সনের 'বুমের' (সচ্ছলতার জোয়ারের) সময় যে সকল কোম্পানী গজাইয়া উঠিয়াছিল তাহারা সম্মুখে কেবল নিরাশার ছবি দেখিতে পান। বাজারে আট আনায় রবার পাউণ্ড বিকাইতে আরম্ভ করিলে ইঁহারা সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

রবারের অবস্থা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সরকার এক কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটি মালয় ষ্টেট্‌স ও অন্যান্য বৃটিশ উৎপাদন-কেন্দ্রে উৎপাদন কমাইবার জন্য এক মোসাবিদা করেন।

রবার উৎপাদনের কাজে ইংরেজের পরেই ওলন্দাজ-গণের স্থান। তাহাদিগকেও রবার উৎপাদন কমাইবার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু ওলন্দাজগণ ইহাতে সম্মত হয়েন না। ইংরেজ একাই উৎপন্নহার কমাইয়া দেয়। ওলন্দাজগণ কিন্তু পূর্ব্বের মতই উৎপাদন করিয়া যাইতে থাকে এবং ইহাতে ইহাদের কোনই ঘাটতি দিতে হয় নাই।

এই সময় হইতে রবারের দাম চড়িতে চড়িতে পাউণ্ড প্রতি ৪ শিলিং ৩ পেন্স দাঁড়ায়। বৃটিশ উৎপাদন কমিয়া যাইতে থাকে। অন্যদিকে ওলন্দাজগণের উৎপাদনের হার বাড়িতে থাকে।

১৯২১ সনে দুনিয়ার উৎপন্ন রবারের শতকরা ৭২ ভাগ ছিল ইংরেজের। ১৯২৬ সনে দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬১ ভাগ এবং বর্ত্তমান সনে ঐ উৎপন্ন হার আরও কমিয়া শতকরা ৫২·৩ ভাগ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। অন্যদিকে ওলন্দাজগণ ১৯২১ সনে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ রবার উৎপাদন করিত। ১৯২৬ সনেই তাহারা ৩৪·৬এর কোঠায় পৌঁছিয়াছে এবং ১৯২৭ সনে দুনিয়ার উৎপন্ন

রবারের শতকরা ৩৭·২ ভাগ যে ইহারা যোগান দিবে ইহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

আমেরিকার চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলেই বৃটিশ রবারের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিবার জন্য ষ্টিভেন্সন অ্যাক্টের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ঐ আইন কার্য্যে পরিণত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমেরিকার চাহিদা বাড়িতে থাকে। ১৯২১ সনের ১৮০,০০০ টন ১৯২২ সনে এক-বৎসরের মধ্যেই ২৩৯,০০০ টনে দাঁড়ায়। ১৯২৩ সনে ঐ সংখ্যা ৩০৪,০০০ টনে উঠে। ১৯২৪ সনে আমেরিকা ৩৩৫,০০০ টন রবার ক্রয় করে এবং ১৯২৫ সনে সে ছিল ৩৪৬,০০০ টন রবারের ক্রেতা।

এটা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, আমেরিকার চাহিদা এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই রবারের দাম চড়িয়া যায়। রবার-শিল্পের এই নূতন সচ্ছলতার যুগে ইংরেজের রবার উৎপাদন কিন্তু ষ্টিভেন্সন অ্যাক্টের ফলে কমিতে থাকে। ঐ আইন দ্বারা ইংরেজের লাভ মোটেই হয় নাই, পরন্তু প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং ব্যবসাটা অনেকটা ওলন্দাজগণের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

বৃটেনের প্রতিকূল আর্থিক বৎসর

৩১শে মার্চ্চ ১৯২৭ বৃটেনের আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইল। আয়ের চেয়ে খরচ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউণ্ড (৪৫ কোটি ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা) বেশী।

রাজস্ব ধরা হইয়াছিল ৮০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। বছর শেষে দেখা যাইতেছে উহার ১ কোটি ৯০ লক্ষ পরিমাণ পাওয়া যায় নাই। ট্যাক্‌স হইতে সংগৃহীত রাজস্বের প্রধান আশ্রয় হইতেছে—কাষ্টম্‌স্, আবকারী, মোটর কর, সম্পত্তি কর, ষ্ট্যাম্পস্, আয়কর, অতিকর (সুপার ট্যাক্‌স)। তন্মধ্যে সম্পত্তিকর (১৩ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড উদ্বৃত্ত) মাত্র প্রত্যাশিত রাজস্ব যোগাইয়াছে।

ব্যাঙ্কের হার চড়া ছিল। আর কয়লার খনির ধর্ম্মঘট হেতু ডিসকাউন্ট হারও উচা ছিল। সুতরাং জাতীয় ঋণের সুদ বাবদ বেশী করিয়া টাকা দিতে হইয়াছে। প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত ব্যয় ছাড়াইয়া গিয়াছে।

গত বৎসর কয়লার সাবসিডি রূপে দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের ব্যয়াধিক্যটা তারই মধ্যে গিয়াছিল।

এ বছরের সাবসিডিটা মাত্র ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। তা সত্ত্বেও এ বছরে ধর্ম্মঘট হেতু কোষাগারের পরোক্ষ ক্ষতিটা গুরুতর হইয়াছে।

বৃটেনে মোটরগাড়ীর ব্যবহার

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ বৃটেনে মোটর গাড়ী অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হইতেছে।

২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব তিন মাসে মোটরকারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার হইতে ৫ লক্ষ ৭২ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

আর ভাড়া-খাটা গাড়ীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৩ হাজার হইতে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার হইয়াছে।

কাইরো করাচীর উড়িবার পথ

বৃটিশ আকাশযানকে পারশ্যের উপর দিয়া উড়িবার ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হউক এই মর্ম্মে বৃটিশ ও পারশ্য গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে একটা সুন্দর রকম নিষ্পত্তি হইবে।

পারশ্যের মত এই যে, এতদুদ্দেশ্যে একটা অস্থায়ী চুক্তি মজলিশে উপস্থাপিত করা হইবে।

ইতালির রাষ্ট্রবিৎ তৈয়ারীর প্রচেষ্টা

ইতালির সহকারী পররাষ্ট্রসচিব গ্রাঁদি চেম্বারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর ইতালিয় রাষ্ট্রধুরন্ধরগণকে রাষ্ট্রদৌত্য বিভাগের অধীনে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। সেখান হইতে স্থির হইবে কে দূত হইবে আর কে অন্য-কিছু হইবে।

অধিকন্তু মুসলিনীর প্ল্যান অনুসারে উপাধি ইত্যাদি বর্জ্জিত হইবে। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীদিগের নামের পূর্ব্বে আর "হিজ এক্সেলেন্সি"র ব্যবহার হইবে না।

জার্ম্মাণি পাট কেলটি মারিয়াছে

বৃটেনে, তার উপনিবেশগুলিতে ও যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মাণ দ্রব্যের বিরুদ্ধে কতকগুলি কানুন মোতায়েন আছে।

সম্প্রতি (মার্চ ৩০, ১৯২৭) গবর্ণমেন্ট রাইশ্‌ষ্টাগে এক অ্যান্টি ডাম্পিং বিল (ব্যবসা মাটি করিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে আইন) হাজির করিতেছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট হারের উল্লেখ নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে খুসীমত "জার্ম্মাণ ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে" টারিফ বাড়াইয়া দিতে পারিবে।

আলোক নগর

কোড়িয়ার এক শহরের নাম কৃহ্বাঙ্গজু বা আলোক নগর। লোক-সংখ্যা ২০,০০০। যে প্রদেশের কেন্দ্র এই স্থান তার আয়তন ১০০ বর্গ মাইল ও লোক-সংখ্যা ৯ লক্ষ। এইপ্রদেশ কোড়িয়ার শস্যভূমি।

"ফল-ভারাবনত ভেলভেটের মত সবুজ সবুজ মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরের মত নীল মেঘ-চুম্বিত আকাশ এই হইল কৃহ্বাঙ্গজু। এর চেয়ে সুন্দর স্থান পৃথিবীতে আর নাই"। কোড়িয়া মিশনফীল্ড নামক পত্রিকায় এই রকম কবিতায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে কহ্বাঙ্গজু লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত এক সামান্য স্থান মাত্র ছিল। কিন্তু ১৯১৫ সনে কৃহ্বাঙ্গজু হইতে দশ মাইল দূরে শোটেরি নামে এক নূতন ষ্টেশন পর্য্যন্ত ইস্পাতের রেল লাইন বাড়ান হইয়াছিল। ১৯২২ সনে নিজ শহরের মধ্যেই শাখা লাইন খোলা হইয়াছিল।

কৃহ্বাঙ্গজু আর মধ্যযুগের এক পুরাণো পচা শহর নয়। বিজলীর বাতি ও জলের কল হইয়াছে। পুলিশের সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। ১৪০টা ফোর্ড মোটরকার সড়ক-গুলিতে যাতায়াত করিতেছে।

কিন্তু এত সব উন্নতি সত্ত্বেও এ স্থানের ঘরগুলি খড়ো ঘর। আর ২০০০ বছর পূর্ব্বেকার নাগরিক জীবনের সঙ্গে আজিকার নাগরিক জীবনের কোন প্রভেদ নাই।

এই ছোট জায়গায় সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হইতেছে, ২৫ বছর পূর্ব্বে একদল আমেরিকান প্রেসবিটেরিয়ান পাদ্রী তাঁদের কাজের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে এইখান দিয়া যান। তাদের আড্ডা ছিল দক্ষিণ চুন্না প্রদেশ। তাঁদের একজন, ডাক্তার বেল, প্রথমতঃ নাজুকে বেশী অগ্রসর দেখিয়া সে স্থান মনোনীত করেন। কিন্তু সেখানকার লোকদিগকে উদাসীন দেখিয়া তিনি কৃহ্বাঙ্গজুতে আসিলেন। তখন হইতে এই স্থান কোড়িয়ার এক বড় ষ্টেশন রূপে গড়িয়া উঠিল।

১৯০৫ সনে জমি কিনিয়া ঘরবাড়ী তৈয়ারী আরম্ভ হইল। গাছ রোপণ করা হইল। দশ বছর এইরূপ চলিল। তারপর ১৯১৪ সনে ৩টা রেসিডেন্স, ১টা হাঁসপাতাল, ২টা স্কুল, ও ১টা বাইব্‌ল ক্লাসের বাড়ী উঠিল। তার পরে আরও ১টা রেসিডেন্স, স্ত্রীলোকদের বাইব্‌ল স্কুল ও ডর্মিটরি, বালক শিল্প শিক্ষালয়, নারী-শিল্প শিক্ষালয়, বালিকা বিদ্যালয়, ধাত্রী-ভবন ও বিদেশীদের জন্য ভজনালয় উঠিয়াছে। গির্জ্জার সংখ্যা ৪। সভ্যসংখ্যা ৫০০। একটা বৃহত্তম কুষ্ঠ আশ্রমও রহিয়াছে।

প্রদেশটারও প্রসার ঘটিয়াছে। ৩০টার উপর সুশাসিত গির্জ্জায় ২ হাজারের উপর সভ্য আছে। স্কুল ২০টা ও পাদ্রী ৪ জন।

পাদ্রীদের চেষ্টায় শিক্ষাতেও উন্নতি ঘটিতেছে। ১৯০৮ সনে এক প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হয়। বৎসরের মধ্যে ছাত্রী-সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫। এক্ষণে ইহা জেনি স্কোয়ার মেমরিয়েল স্কুল নামে চলিতেছে। বালিকা পড়িতেছে ২০০ জন। শিক্ষক খাটিতেছে ১২ জন।

অন্য একটা প্রতিষ্ঠান বেশ ভালভাবে চলিতেছে। নাম নীল বাইব্‌ল স্কুল। এটা মিস্ শেপিং নামক এক মহিলা পাদ্রীর কীর্ত্তি। কৃহ্বাঙ্গজু শহরে ছেলেবুড়া ইতর ভদ্র সবাই তাঁকে চিনে। তিনি এক দিনও ছুটি না লইয়া আজ ১৪ বছর খাটিতেছেন। তাঁর মাহিয়ানার অধিকাংশটাই যায় গরিব দুঃখীর দুর্দ্দশা মোচনে ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-বিধানে। তিনি একাধারে গ্রাজুয়েট ও পাশ করা ধাত্রী।

তিনি বলিতেছেন; "বিবাহিত মেয়েদের ও বড় মেয়েদের শিক্ষার জন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এটাকে খাড়া করিয়াছিলাম। ৪ বছর আমাকে ইহা একাকী চালাইতে হইয়াছিল। ১৯২৪ সন হইতে মিশন এর ভার লইয়াছে।"



ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

১। দেশী

"রাডিয়ো"য় কলেরা-বক্তৃতা

এতদিন চলিতেছিল "কলের গান।" আজকাল চলিতেছে কলের বক্তৃতা। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলেরা সম্বন্ধে কলে একটা বক্তৃতা প্রচারিত হইয়াছে। বক্তৃতাটা "রাডিয়ো"র সাহায্যে কলিকাতার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। নিজ নিজ ঘরে বসিয়া গৃহস্থরা কলের কৃপায় কলেরা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতামত জানিতে পারিয়াছে।

ব্যাক্‌টিরিঅলজিষ্ট অমূল্যচন্দ্র উকিল

বক্তা ছিলেন ব্যাক্‌টিরিঅলজিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল। অমূল্যবাবু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম, বি। যুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে পল্টনের চিকিৎসক বিভাগে উচ্চ পদ দেওয়া হইয়াছিল। পরে তিনি প্যারিসের প্যাস্তুয়র ইন্‌ষ্টিটিউট নামক ব্যাক্‌টিরি-অলজি বিদ্যাবিষয়ক অনুসন্ধানভবনে ফরাসী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক "রীসার্চ" ও গবেষণা চালাইয়াছেন। তাহার পর তিনি জার্ম্মাণিতে গিয়া বার্লিনের কখ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটে অনুসন্ধানকাজে নিজকে মোতায়েন রাখেন। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি এবং ইংল্যাণ্ড এই তিন দেশের চিকিৎসা-বিষয়ক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা প্রকার প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম্ম এবং পরিচালনা-প্রণালী স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ তাঁহার জুটিয়াছিল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ওষুধপত্র ইত্যাদি যে সকল কারখানায় তৈয়ারী হয়, সেই সমুদয় কারখানা পরিদর্শন করিবার জন্যও অমূল্যবাবু বিদেশে কিছু কিছু সময় দিয়াছেন। অধিকন্তু ভারতীয় চিকিৎসক এবং বিজ্ঞান-গবেষকদের সঙ্গে যাহাতে ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পণ্ডিতদের কর্ম্মবিনিময় ও ভাব-বিনিময় সহজসাধ্য হয়, তাহার চেষ্টায়ও তিনি নানা স্থানে সুযোগ ঢুঁড়িয়াছেন। ফ্রান্সের স্ত্রাস্‌বুর নগরে ১৯২২ সনে একটা বিপুল আন্তর্জ্জাতিক চিকিৎসক সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে অমূল্যবাবু অন্যতম ভারত-প্রতিনিধি ছিলেন।

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে অমূল্য বাবু কলিকাতার (হ্যারিসন রোডের) ব্যাক্‌টিরিঅলজিক্যাল ক্লিনিক নামক স্বাস্থ্য-পরীক্ষাভবনে গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই ক্লিনিকের প্রস্তুত ভ্যাক্‌সিন, সিরাম ইত্যাদি ওষুধ বাংলাদেশে সুপরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতি, খাদ্যোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে অমূল্যবাবু মাঝে মাঝে প্রবন্ধ-পুস্তিকা রচনা করিতেছেন। তাহার কোনো কোনোটা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রচারিতও হইয়াছে। কিছুদিন হইল যক্ষ্মারোগ হইতে আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে অমূল্য বাবুর এক ইংরেজি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলেরা সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ প্রচারিত হইল।

অমূল্যবাবু ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক। এই কলেজ হইতে একটি চিকিৎসা ত্রৈমাসিক বাহির হয়। তাহার সম্পাদন-ভার অমূল্যবাবুর হাতে। অমূল্যবাবু চিকিৎসা-বিভাগের সাহায্যে সমাজ-সেবার নানা দিকে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার পরামর্শ লইলে আমাদের পল্লীসেবকদের উপকার হইতে পারে।

নরনারীর সংখ্যা, স্বাস্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতা

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের মুখ্য যোগাযোগ নাই। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ধনবিজ্ঞানের এক জ্যান্ত আলোচ্য বিষয়। তাহা ছাড়া চিকিৎসা-শিল্পের ওষুধপত্র, চিকিৎসাব্যবসার যন্ত্রপাতি এই দুই জিনিষের সঙ্গে ভাতকাপড়, খাওয়া-পরা, মূল্য-তত্ত্ব, মজুরি-তত্ত্ব ইত্যাদির যোগাযোগ নিবিড়। এই সকল কারণে "আর্থিক উন্নতি"র রচনাবলীর ভিতর লোক-সংখ্যা, জন্ম-সংযম, পারিবারিক ভাতা, গৃহ-সমস্যা, নরনারীর স্বাস্থ্যোন্নতি, জনগণের খাদ্য-তালিকা, খোরপোষের মাপকাঠি, সামাজিক জীবন-বীমা ইত্যাদি বিষয়ের কথা অনেক সময়েই আলোচিত হইয়া থাকে। নরনারীর কর্ম্মদক্ষতা আর জীবনবত্তা বাড়াইবার কৌশল ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার আসরে আসরে বিশেষরূপে আলোচিত না হইলে এই বিজ্ঞানের অঙ্গহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। কলেরার অর্থ-কথা, ম্যালেরিয়ার অর্থ-কথা, যক্ষ্মার অর্থ-কথা সবই আমাদের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স-সেবীদের গভীর-ভাবে বিচারের বস্তু। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের সঙ্গে ধনবিজ্ঞানসেবীদের সহযোগ কায়েম করা দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্রের এক মুখ্য উদ্দেশ্য।

"কৃষক ও শ্রমিক দলের" আকাঙ্ক্ষা

(ক) রাষ্ট্রীয় দাবী

আঠার বৎসর ও তার বেশী বয়সের নারী ও পুরুষ মাত্রকেই ভোটের অধিকার দেওয়া, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য দূর করা এবং প্রেসের, বক্তৃতার ও সমিতি-গঠনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া।

(খ) অর্থনৈতিক দাবী

১। যথাসম্ভব পরোক্ষভাবে ট্যাক্স গ্রহণ প্রথা তুলিয়া দেওয়া ও ক্রমবর্দ্ধিত হারে মাসিক ২০০ টাকা হইতে অধিক আয়ের উপর ইন্‌কাম ট্যাক্স ধার্য্য করা।

২। সকল জমীদারি প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা ও ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৩। চাষের উপযুক্ত ভূমিসমূহ সরকারের দ্বারা কেবলমাত্র চাষীদিগকেই বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান করা।

৪। ভূমির উৎপন্ন ফসলের তারতম্য অনুসারে ভূমিকর ধার্য্য করা ও কোনও অবস্থাতেই সে কর উৎপন্ন ফসলের শতকরা দশ ভাগের বেশী হইতে না দেওয়া।

৫। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া শতকরা ৭ টাকার অনধিক সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়া।

৬। ঋণের টাকা শোধ না দিতে পারার জন্য চাষীর চাষের জমি হস্তান্তরিত হইতে না দেওয়া।

৭। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষীদিগকে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা।

৮। কারখানার শ্রমিকগণের জন্য আইনের দ্বারা ৮ ঘণ্টায় দিন ও সাড়ে পাঁচদিনে সপ্তাহ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। নারী ও বালক শ্রমিকগণের জন্য আরও কম সময় নির্দ্ধারিত করা।

৯। শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম বেতনের হার নির্দ্ধারণ করা।

১০। সকল প্রকার শ্রমিকগণের জন্য বার্দ্ধক্য, রোগ ও কর্ম্মহীনতার ইন্‌শিওর‍্যান্স যাহাতে হয় আইনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা।

১১। শ্রমিকগণের ক্ষতিরপূরণ ও মালিকগণের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে আইন আছে তার প্রসার আরও বৃদ্ধি করা এবং সে আইন যাহাতে কার্য্যকর হয় তাহার চেষ্টা করা।

১২। খনি ও কারখানাসমূহে শ্রমিকগণকে বিপদ হইতে বাঁচানোর জন্য বর্ত্তমানে যে সকল উন্নত উপায়-সমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছে সে সমুদয়ের ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করাইয়া লওয়া।

১৩। শ্রমিকগণকে সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(গ) সামাজিক দাবী

১। জনসাধারণের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা।

২। শ্রমিক কৃষকগণের জন্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা এবং নারীদিগের গর্ভাবস্থার জন্য সেবাসদন স্থাপন করা।

৩। শ্রমিক ও কৃষকগণকে স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায়সমূহ শিক্ষা দেওয়া।

৪। কারখানার মালিকগণের দ্বারা শ্রমিকগণের জন্য অল্প ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা।

৫। নারী ও বালক শ্রমিককে যাহাতে কোনও প্রকার বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত না করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

৬। ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালককে যাহাতে কোনও কারখানার কাজে নিযুক্ত করা না হয়, আইনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা।

আফগানিস্থানে বাঙালী মুসলমান এঞ্জিনিয়ার

নোয়াখালির মহম্মদ অবৈদুল্লা বিলাতের বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট। আফগানিস্থান দেশে তিনি খনিজ সম্পদ্ তদন্ত করিবার জন্য এঞ্জিনিয়ার বাহাল হইয়াছেন। বেতন মাসিক ১,৫০০ টাকা। কিছুকাল ধরিয়া অবৈদুল্লা ভোপাল রাজ্যের ভূতত্ত্ব ও খনিবিভাগের কর্ত্তা ছিলেন।

কালনা মহিলা-সমিতি

গত ১২ই বৈশাখ স্থানীয় হিন্দু-বালিকাবিদ্যালয়ে এই শিশু-সমিতিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিস ইন্‌স্পেক্টার বাবুর পত্নী শ্রীমতী সরযুবালা দেবী সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সমিতিটির উন্নতির জন্য তেমন দৃষ্টিদান করিতেছেন না। মিসেস্ এণ্ডারসন প্রমুখ ইউরোপীয় মহিলারা প্রতি সভায় যোগ দিতেছেন, কিন্তু আমাদের স্থানীয় ভগ্নীদের কোনই সহানুভূতি পাইতেছি না। আমি প্রত্যেক ভগ্নীকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হউন। আমরা কি চিরদিনই পিছাইয়া থাকিব? পর্দ্দাপ্রথা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই সভার অধিবেশন হয়। সকলে এই সব সভায় যোগ দিয়া সমিতিকে পুষ্ট করিয়া তুলুন।

বিনীতা

শ্রীকুসুমকুমারী ঘোষ

সম্পাদিকা, কালনা মহিলা-সমিতি।

(পল্লীবাসী)

লীগ্ অব্ নেশ্যন্‌স্ সম্বন্ধে রামানন্দবাবু

প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা যথাযথ ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। তিনি স্বচক্ষে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অভিমত অশ্রদ্ধেয় নহে। আমরা আশাকরি তিনি এবিষয়ে যথার্থ বিবরণ প্রকাশ করিবেন। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ একটী সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান। তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল ও বিবিধ। ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য মহৎ। এত অল্প সময়ে তাঁহারা সফলকাম না হইলেও আমরা শুধু এতবড় একটা মহৎ কল্পনাকেই প্রশংসা করি। এক হাজার বৎসর পাশাপাশি বাস করিয়াও ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান এখন পর্য্যন্ত মিলনের কল্পনা করিতে অক্ষম; আর পাশ্চাত্যজাতি বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিবার ও নগরের নানাবিধ পাপ দূর করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! ইহা কি নিতান্ত কম কথা? (সঞ্জীবনী)

ট্রেণ-প্রদর্শনী ও সমবায়-বক্তৃতা

প্রদর্শনী ট্রেণের সম্পর্কে ২৮শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে ম্যান্‌সন্ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা বক্তা নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সমবায় বিভাগের শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস "তোরা দেশটা জুড়ে ছেলে বুড়ো চিনে নে রে সমবায়" সঙ্গীতে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই ট্রেণের সকল প্রকার ব্যবস্থার

ভার ছিল ই, বি, রেলওয়ের পাবলিসিটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এ, কে, গুপ্তের উপর এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নের ফলে এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটি কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। লোক-শিক্ষার জন্য এরূপ প্রচেষ্টা আমাদের দেশে এই প্রথম। এই প্রদর্শনী দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, দেশের সমৃদ্ধির উপরই সকল শ্রেণীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে; আর এই সমৃদ্ধি নির্ভর করে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা দেশে প্রচুর অর্থোৎপাদন ও অর্থাগমের উপর। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশময় নানা প্রকার সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা ব্যতীত দেশের দুরবস্থা অপনোদনের যে আর অন্য উপায় নাই তাহা বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের প্রদর্শনী গাড়ীতে নানাপ্রকার মডেল, বিভিন্ন সমবায় সমিতির ফটোগ্রাফ, চার্ট ও চিত্রের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছিল। দেশের কৃষক ও শিল্পীদিগকে দারিদ্র্য ও অনশন হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে রাজা হইতে মুটে মজুর পর্য্যন্ত কেহই যে বাঁচিতে পারে না এই ধ্রুব সত্যটী সমবায়-প্রদর্শনী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃতির ফলে কত প্রকারে দেশের কল্যাণ সাধিত হইতেছে ও কত লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে দেশে গড়িয়া উঠিতেছে তাহা দর্শকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সমবায় প্রদর্শনীর ভার ন্যস্ত ছিল—সমবায় সমিতিসমূহের ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেনগুপ্তের উপর। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির পক্ষ হইতে বিশ্বভারতীয় পল্লীসংস্কার বিভাগের শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ট্রেণের সহিত থাকিয়া বিভিন্ন স্থানে সমবায় সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রাজসাহী জিলার বক্তা মৌলবী দেওয়ান নসীরুদ্দিন আহম্মদ সাহেবও কয়েক স্থানে সমবায় সম্বন্ধে সরল ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা দেন। প্রত্যেক স্থানেই দর্শকগণ যেরূপ আগ্রহসহকারে এই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন ও বক্তৃতাদি শুনিয়াছেন তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

(ভাণ্ডার)

মাজু কন্‌ফারেন্সে খাদি প্রদর্শনী

মাজুতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে একটি প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে বাংলার কয়েকটি খাদিকেন্দ্র যোগদান করিয়াছিল। খাদি-প্রতিষ্ঠানের ষ্টলটিতে বহুপ্রকারের খাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। রং, পাড়, ছাপ—এত বিভিন্ন রকমের ছিল যে, তাহা বিস্ময়কর। কতকগুলি শাড়ী প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহাদের জমিন, পাড়, বয়ন ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরী শাড়ী প্রভৃতির মতই সুন্দর। চমৎকার কারুকার্য্য-খচিত খদ্দরের ঢাকাই জামদানি অনেকগুলি ছিল। তোয়ালে, সুজনী, পর্দ্দা, আধুনিক মার্জ্জিত রুচি-অনুযায়ী ফ্রক জ্যাকেট, ব্লাউজ প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। খদ্দর-শিল্প বাংলায় কত শীঘ্র যে কতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে এই প্রদর্শনীটি যাঁহারা একটু ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। প্রদর্শনীতে খাদি-প্রতিষ্ঠানের অনেক টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে।

যুবক মুসলমান

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য মিঃ ওয়াই, সি, আরিফ সাহেব গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতাপ্রবাসী বহুসংখ্যক মুসলমান ছাত্রকে, বহুবাজার ষ্ট্রীটে তাঁহার কার্য্যালয়ে আহ্বানপূর্ব্বক অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছেন।

তিনি মুসলমান ছাত্রগণকে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে মফঃস্বলের অশিক্ষিত জনসাধারণকে ধর্ম্মসংক্রান্ত সাম্প্রদায়িকতার অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দেওয়াই যুবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য। এই সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে দেশের যে কি ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ছাত্রগণেরই কর্ত্তব্য। যদি মসজিদের নিকটে বাদ্য সম্বন্ধে লোকে সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটু উদার অভিমত পোষণ করিত, তাহা হইলে পোনাবালিয়ার ব্যাপার কখনই সংঘটিত হইত না এবং কতকগুলি অশিক্ষিত দরিদ্র

ব্যক্তিকেও অকারণে প্রাণ হারাইতে হইত না। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই মফঃস্বলের এই হিন্দু মুসলমানের বিরোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুদের ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে নির্ব্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত ইহা পল্লীগ্রামের মুসলমানদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আমরা মুসলমান ছাত্রগণকে তাহাদের বিচক্ষণ নেতার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া জন্মভূমির প্রকৃত হিতসাধন করিবার জন্ম সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি। (কান্দীবান্ধব)

শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষালয়

হাওড়া জেলার শিক্ষক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে (৩রা এপ্রিল ১৯২৭) সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার। অভিভাষণের ভিতর অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলাও ছিল :—

বি-এস্-সি, পি-এইচ্,ডি, বি,এল, ইত্যাদি বিদ্যার বা ডিগ্রীর নিন্দা করা আমার মতলব নয়। এইগুলার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। এই সকল চাপরাশ ভালই। বলিতেছি মাত্র এই যে, একমাত্র এইগুলায় আর কুলাইতেছে না। অন্যান্য রংয়ের চাপরাশও চাই। অন্যান্য রকমের বিদ্যা, অন্যান্য ঢংয়ের ডিগ্রী উপাধি বা ডিপ্লোমা, অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক সার্টিফিকেট আমাদের তরুণ-তরুণী মহলে ছড়ানো দরকার। এই নতুন ধরণের ডিগ্রী ডিপ্লোমা বাজারে ছাড়িবার জন্য নতুন ধরণের কারখানা কায়েম করা আবশ্যক। মামুলি ইণ্টারমীডিয়েট বা বি,এ, বি,এস-সির পাঠশালায় তা চলিতে পারে না।

কিরূপ পাঠশালার কথা বলিতেছি এক কথায় বিবৃত করা সহজ নয়। সেইগুলার নাম কোথাও বা হইবে টেক্‌নিক্যাল স্কুল, কোথাও বা বাণিজ্য-বিদ্যালয়, কখনও হয়ত ব্যাঙ্কিং পাঠশালা কখনও বা বয়ন বিদ্যালয় ইত্যাদি। আবার কখনও রেশম বিদ্যালয়, দুগ্ধ বিদ্যালয়, কৃষিপরীক্ষাগার বা ঐ জাতীয় নামে এই সব বিদ্যাপীঠ পরিচিত হইবে। মফঃস্বলের চাষ-আবাদ, ব্যবসা, শিল্প-কর্ম্ম ইত্যাদি যে যে জনপদে যেরূপ, সেই সেই জনপদে সেইরূপ বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপীঠের নামকরণও নানা শ্রেণীর হইবে। জনপদগত বৈচিত্র্য স্কুলগুলার বিভিন্নতা সম্পাদন করিবে।

নামের জন্য সম্প্রতি আসে যায় না। কামের কথা বলিতেছি। ইস্কুলগুলার পাঠ-ক্রম যাহাতে নতুন নতুন উপায়ে ধনোৎপাদনের সহায়ক হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাই আসল কথা।

(১) ছবি ও নক্‌সা

প্রথমেই নজর দেওয়া দরকার ছবি আঁকা আর নক্সা করিতে পারার দিকে। আঠার উনিশ বৎসরের লোকেরা কোনো একটা কারখানায় ঘণ্টা খানেক যন্ত্র-পাতি দেখিয়া আসিয়া নকসার দ্বারা তাহা যদি বুঝাইতে পারে তাহা হইলে বুঝিব যে, যুবক বাংলার পেটে নতুন একটা বিদ্যা পড়িয়াছে।

(২) যন্ত্রপাতি

দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হইবে লোহালক্কড় আর যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাটির অন্তর্গত। বিভিন্ন যন্ত্রের নানা অংশ খুলিয়া আবার জোড়া লাগাইতে পারা বাঙালী ভদ্র সমাজে একটা নতুন যোগ্যতার সামিল বিবেচিত হইবে। কলগুলার ব্যবহার, কল মেরামত আর কল দেখিয়া তাহার ভাল মন্দ সমঝিয়া লওয়া—এই সব বিদ্যা এখন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যন্ত্রপাতি দেখিবামাত্র আঁতকাইয়া উঠা অথবা ভীম-রতি লাগা আজ বাংলার আবহাওয়ায় মিশিয়া রহিয়াছে। জেলায় জেলায় এমন সব বিদ্যাপীঠ কায়েম করা দরকার, যাহাতে রকমারি লোহার গড়ন, ঢালাই, খোদাই কাজ, ক্রেণ, চাকা, ইত্যাদি সবই আটপৌরে জিনিষে দাঁড়াইয়া যায়।

(৩) দ্রব্য-পরিচয়

নতুন ইস্কুলগুলার তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হইবে বিভিন্ন দ্রব্যের নাম ও গুণ। লোহা, তামা, কাঁসা, পিতল হইতে সুরু করিয়া মাঙ্গানিজ, অভ্র কয়লা ইত্যাদি ধাতুজ বস্তু ঘাটাঘাঁটি করা আর তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য-ঘটিত কদর

আলোচনা করা হইবে এক দিক্। তাহা ছাড়া কৃষিজ আর পশুজ মালের উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি এবং শিল্প-কর্ম্মে প্রয়োগের বৃত্তান্তও এই দ্রব্য-পরিচয়ের অন্তর্গত থাকিবে।

(৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়া

চতুর্থ শিক্ষণীয় বিদ্যা রসায়ন। আজকালকার দিনে মামুলি গৃহস্থালীতেও রাসায়নিক বস্তুর রেওয়াজ আছে। তাহা ছাড়া গ্যাস বা অ্যাসিড নামধারী বস্তুর দরকার পড়ে না এমন কোন সহর বা সাব-ডিভিসন আজকাল বাংলা দেশে নাই। কাজেই দোকান হাট আর গৃহস্থালীর জন্য কিঞ্চিৎ-কিছু রাসায়নিক জ্ঞান বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চাষামহলেও বাঁটিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

(৫) বাজার-বিদ্যা

পঞ্চম বিষয় হইতেছে বাজার-হাটের মর্ম্ম-বিশ্লেষণ করা। কেনা-বেচার তত্ত্ব, হাটুয়া ব্যাপারী আড়তদারদের স্বধর্ম্ম, বিজ্ঞাপন-প্রণালী, খরচপত্র, হিসাব নিকাশ, মালের উৎপাদন-বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ক কথা এই বিদ্যার অন্তর্গত। টাকা-কড়ির গল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের ঠাঁই, রেলষ্টীমার প্রভৃতির কাহিনী ইত্যাদি সবই এই গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িবে। এক কথায় আর্থিক ভূগোল ও ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আর ধনবিজ্ঞানের কিছু কিছু এই বিভাগের শিক্ষণীয় বিষয়।

এই পাঁচটা বিষয় অবশ্য গ্রহণীয়। তাহার উপর সাধারণ শিক্ষণীয় বস্তু হিসাবে সাহিত্য, অঙ্ক, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি কিছু কিছু রাখা চলিতে পারে। প্রত্যেক ইস্কুলেই জনপদ হিসাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের—বিশেষতঃ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থায়,—কিছু কিছু বিশেষত্ব থাকিবে। সর্ব্বত্রই কম সে কম তিন বৎসর ধরিয়া লেখাপড়া শিখানো চলিবে। মোটের উপর ১৮।১৯ বৎসর বয়সের ছাত্রেরা এই কারখানা হইতে নতুন ধরণের বিদ্যার সাক্ষীস্বরূপ নতুন নতুন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লইয়া বাহির হইতে পারিবে। তাহারা আজকালকার বি-এ, বি, এস্-সির চেয়ে কোনো অংশে নীচু দরের লোক হইবে না।

প্রত্যেক জেলায় এই ধরণের ৩।৪টা ইস্কুল গড়িয়া তুলিবার দিকে আমাদের নজর ফেলা আবশ্যক। এক একটা ইস্কুল চালাইতে বৎসরে ২০।২৫ হাজার টাকা লাগিবার কথা। তাহা ছাড়া ছোট ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ লাইব্রেরি ও বাড়ীঘরের জন্য প্রত্যেকটায় এককালীন ৩০ হাজার টাকা লাগিতে পারে। টাকাটা তোলা উচিত প্রথমে জেলার ধনী লোকদের নিকট হইতে। তাহার পর মিউনিসিপ্যালিটি আর ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের নিকট আবেদন চলিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট ধরণা দিয়া পড়িতে হইবেই জানা কথা।

এই সকল শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষালয় কায়েম হইলেই ভদ্রলোকের ঘরে ঘরে হাঁড়ি চড়িবে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। বেকার-সমস্যার মীমাংসা অত সহজ সরল নয়। তবে আমাদের চাষ-আবাদ, তাঁতের কাজ, ছুতার, মিস্ত্রীর শিল্প, চুনের কাজ, মুণের কাজ, নৌকা ও গাড়ী তৈয়ারী-মেরামতির কারবার সবই খানিকটা উন্নত প্রণালীতে চলিতে পারিবে। ইহা নিশ্চিত যে বাংলার আর্থিক জীবন এ যাবৎ যে আদিম অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা ছাড়াইয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত যুগের প্রথম ধাপে পা ফেলিতে পারিবে। অধিকন্তু পল্লী ও জনপদগুলা আর্থিক সুযোগের বিভিন্নতা-মাফিক বিভিন্ন ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার পথ পাইবে।

ফরাসী সমাজে এই বিদ্যাপীঠের তারিফ খুব বেশী। এইগুলা "একল প্রাতিক দ' কম্যাস এ দাঁাদ্স্ত্রী" নামে পরিচিত। এই জাতীয় পাঠশালার জার্ম্মাণ নাম "ফাখ্-শুলে"। মার্কিণ মুল্লুকে আর ইংল্যাণ্ডে এই ধরণের বিদ্যা-কেন্দ্রের অভাব নাই। ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখিয়া শুনিয়া আর সেই সম্বন্ধে সমালোচনা ও বাগবিতণ্ডা শুনিয়া আমাদের গরিব দেশের পক্ষে বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা মোতাবেক যেরূপ খাপ খায় সেইরূপ একটা মোসাবিদা সংক্ষেপে প্রচার করা গেল। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষালয় সম্বন্ধে "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" নামক গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবসায়ী আর

ধন-বিজ্ঞানসেবীরা দেশোন্নতির উপায় সম্বন্ধে নানা সঙ্কেত পাইবেন আশা করি।

নদী-সংস্কার ও ম্যালেরিয়া

পল্লীগ্রামের উন্নতির মূলে বিরাট বাধা এই ম্যালেরিয়া-রাক্ষস, সর্ব্ববিধ আয়োজন অনুষ্ঠানের অন্তরায় এই নূতন জ্বর বা পুরাণ জ্বর, কালাজ্বর। কলেরা বসন্ত আদি রোগ কখন কখনও দেশব্যাপী হয়, জীবন নাশকও হইতে পারে, কিন্তু সে সমুদয় গড়ে ৩।৪ বৎসর অন্তর এক বার সপ্তাহ কয়েক থাকে; কিন্তু ম্যালেরিয়া যে নিত্য-সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার আদিম কারণ যাহাই হউক, বিশেষজ্ঞরা বলেন মধ্যবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া গঙ্গা নদীর যে মূল অববাহিকা ভাগীরথী স্বরূপে ছোট নদী, খাল, বিল আদিতে প্রাণ সঞ্চার করিত, তাহাকে প্রধানতঃ সরকারের অবহেলায় মূল গঙ্গানদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মজিয়া গিয়া সংযোগ রহিত হইতে দেওয়ায়, ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেশ মধ্যে প্রথম অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি। আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদের কিছু উত্তর হইতেই ভাগীরথীতে ১২ মাসের মধ্যে ৯ মাসও জল থাকে না, হাঁটিয়া পার হইতে হয়। তাহার উত্তরে গঙ্গার সংযোগ। গঙ্গার সহিত সংযোগ স্থল বা মোহনা পর্য্যন্ত ভাগীরথীর খাদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে নিয়মিত চাষ হইয়া থাকে। কাজেই পঞ্জিকাতে পর্য্যন্ত উল্লেখ হইয়াছে "কচিচ্ছিন্না কচিস্থিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী তদৈব প্রবল কলি"। এই কলি মাহাত্ম্যের প্রথম প্রচারই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া বলিতে হইবে। ম্যালেরিয়ার আরও পরিপোষণ হইতেছে রেলের উচ্চ বাঁধে। ১৮৬৫ সনে "বর্দ্ধমানের জ্বর"। কারণ পূর্ব্ব বৎসরেই কলিকাতায় পাথুরিয়া কয়লা আনিতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ই, আই, রেল পাতা হইয়াছিল। সেইরূপ ১৮৬২-৬৩ সনের রেলের বাঁধ। প্রায়ই আশে পাশের জমি হইতে গড়ে ৪।৫ হাত উঁচু। ছোট নদী-নালা দিয়া জল চলাচল জন্ম সর্ব্বত্র পুল করা হয় না, গড়ে ১॥০।২ মাইলে একটা করিয়া সাঁকো। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণ এতদিনে স্বীকার করিতেছেন বর্ত্তমান রেলের বন্দোবস্তে জল নিকাশের বাধা বা বিষম তারতম্যেই মাটীতে জল বসিয়া গিয়া ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়। সরকারের মর্জ্জি মত কর্ম্ম। নদিয়ার নদীবিভাগ গঠিত করিয়া কলিকাতার উত্তর ৪০।৫০ মাইল পর্য্যন্ত যে নদী সংস্কার কার্য্য চলে, তাহা একটু বড় করিয়া গোদাগাড়ী হইতে মুর্শীদাবাদ কাটোয়া নবদ্বীপ পর্য্যন্ত চালাইলেই পুনরায় নদীসমূহের তথা বাঙ্গালার শ্রী ফিরিবে, দেশবাসী স্বাস্থ্যবান হইবে। বোধ হয় স্বরাজ না হইলে বাঙ্গালায় সে ব্যবস্থাও হইবে না, দেশের এ দুর্দ্দশাও ঘুচিবে না। অথচ ঐরূপ করিলেই ইতালির ভূমি-সংস্কার ও ম্যালেরিয়া বিতাড়নরূপ কার্য্যসাধন হইবে।

(হিন্দু)

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বেঙ্গল ন্যাশন্যালের দুরবস্থায় অনেকেই বঙ্গলক্ষ্মীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়াছেন, কারণ এ দুইটী প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সম্বদ্ধ। ইহাদের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে টাকাকড়ি পর্য্যন্ত সকলই পরস্পর নির্ভরশীল ছিল। তা ছাড়া বঙ্গলক্ষ্মীর অধিকাংশ টাকা বেঙ্গল ন্যাশন্যালে জমা ছিল। এ অবস্থায় বঙ্গলক্ষ্মীর কি হইবে তা জানিবার জন্য দেশবাসীর উৎসুক হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইতিমধ্যেই নানারূপ গুজব উঠিয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী বর্ত্তমানে ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্কের হাতে আছে এবং ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষই এখন বেঙ্গল ন্যাশন্যালে গচ্ছিত টাকার জন্য তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু টাকা যে আর ফেরৎ পাইবেন না ইহা ত একরূপ স্থির নিশ্চিত। তাহা হইলে কি হইবে? অনেকেই বলিতেছেন ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক তাহা হইলে বঙ্গলক্ষ্মীকে বিক্রয় করিয়া তাহাদের টাকা আদায় করিবেন এবং ইতিমধ্যেই বঙ্গলক্ষ্মীকে ক্রয় করিবার জন্য এণ্ড্রু ইউল এবং বিড়্লা ব্রাদার্স নাকি তৎপর হইয়াছেন—বাজার গুজব এইরূপ।

কিন্তু সত্যই যদি অবস্থা এরূপ হয় তাহা হইলে আমাদের মনে হয় বাঙালীর বঙ্গলক্ষ্মী যেন কোনও বাঙালীই ক্রয় করেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল গেলেও বঙ্গলক্ষ্মী যাহাতে বাঙালীর তত্ত্বাবধানে থাকে তাহার জন্য আশা করি

ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বাঙালী বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

বাঙালীর বঙ্গলক্ষ্মীকে বাঙালীরই রাখিতে হইবে।

(আত্মশক্তি)

দশম বার্ষিক হিন্দু মহাসভা

পাটনায় হিন্দুমহাসভার যে দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, ঐ অধিবেশনে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে এই সভা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। মহাসভা স্বামীজির কার্য্যাদির প্রতি শ্রদ্ধার সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, হিন্দুজাতির উন্নতি বিধান জন্য তিনি ত্যাগমূলক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যে মহৎ কার্য্যে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সেই কার্য্যের প্রভূত ক্ষতি হইল। হিন্দু মহাসভা হিন্দু সাধারণকে স্বামীজির জীবনের ব্রত শুদ্ধিসংগঠন একটা শক্তি সহকারে চালাইতে অনুরোধ করিতেছেন, যাহাতে আর কোনো দুর্ব্বৃত্ত স্বামীজির হত্যার ন্যায় নৃশংস কার্য্য করিতে সাহসী না হয়। প্রস্তাবটী সভাপতি নিজে উত্থাপন করেন।

(২) আমাদের নারীজাতির সতীত্ব পবিত্রতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সাহসী নেপালী যুবক খড়্গ বাহাদুর যে আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, হিন্দু মহাসভা উহা সমর্থন করিতেছেন এবং তাহার দণ্ড ক্ষমা করিবার জন্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) মহাসভা হিন্দু সাধারণকে শিবাজীর ত্রি-শতাব্দী উৎসব উদ্‌যাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং ঐ দিন দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলীর আলোচনা ও স্মরণ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন।

(৪) হিন্দুর সমাজদেহে নূতন জীবন ও উৎসাহের অনুপ্রেরণা আনিয়া দিবার জন্য মহাসভা বিভিন্ন শাখা সভা-সমূহকে যথারীতি উৎসব আড়ম্বরের সহিত (১) বুদ্ধদেবের (২) রাণা প্রতাপের (৩) গুরুগোবিন্দের (৪) বীর বান্দার (৫) শিবাজীর (৬) স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৫) কালাপাহাড়ী নামক স্থানের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সাধারণ সরকারী রাস্তা ব্যবহার করিবার তুল্যাধিকার আছে এবং রাজপথ সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত—মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই বিচারের প্রশংসা হিন্দু মহাসভা করিতেছেন এবং চারি-দিকের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন অস্পৃশ্যদিগকে অবাধে সাধারণ রাস্তাসমূহ ব্যবহারের অধিকার দান করেন এবং তাহাদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করেন। যাহাতে তাহারা অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য না হয়, সভা দক্ষিণ ভারতের নেতাদিগকে এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৬) এই মহাসভা চীনাদিগকে নিজেদের ভাই বলিয়াই গণ্য করেন। কেননা ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসক,—বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটা মাত্র প্রয়োজনীয় অংশ-বিশেষ। এজন্য হিন্দুসভা শীঘ্র শীঘ্র চীনের গৃহবিরোধের নিরশন কামনা করেন এবং চীনাদের স্বাধীনতা ও আত্ম-অধিকার সাব্যস্তের ও রক্ষার চেষ্টাকে বৈদেশিকগণ যে সমূলে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে, মহাসভা তাহাদের সেই কার্য্যে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৭) বেগার ব্যবস্থা এখনও রহিয়া গিয়াছে এবং দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে, এজন্য সভা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন এবং বেগার প্রথা যাহাতে বন্ধ হয় এজন্য সর-কারকে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৮) সভ্যতা ও ধর্ম্ম উভয়তই খাসিয়া, ভীল কোল ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি হিন্দু সমাজেরই অংশ; কিন্তু গত আদমসুমারিতে ইহাদিগকে জড়বাদী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং হিন্দুসমাজ হইতে তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সভা এজন্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন যে,

আগামী আদমসুমারিতে যেন ইহাদিগকে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৯) পাবনার হিন্দুদের উপর সামরিক পুলিশের করভার আরোপ করায় ও মুসলমানদের হস্তে লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হিন্দুদের ক্ষতিপূরণের করভার আরোপ করায় এই সভা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। এবং সরকারকে ঐ করভার প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(১০) রাজপথ ও সাধারণ রাস্তাসমূহ দিয়া সাধারণ শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অধিকার বিশেষতঃ হিন্দুদের ধর্ম্মসঙ্গত চিরাচরিত অধিকার আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বিচারালয় প্রিভিকাউন্সিলেও ঐ অধিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। এমত অবস্থায় অধস্তন সরকারী কর্ম্মচারিবর্গ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ফৌজদারী আইন ও পুলিশ আইনের অপব্যবহার করিয়া হিন্দুর ঐ অধিকারের সঙ্কোচসাধন করিতেছেন। মহাসভা ইহাতে অতিমাত্রায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দুমহাসভা হিন্দুদিগকে এতৎসম্পর্কীয় অবাধ অধিকার ভোগের উপর জিদ ধরিতে অনুরোধ করিতেছেন এবং এই অধিকার রক্ষাকল্পে সর্ব্ববিধ আইনসঙ্গত উপায়ে হিন্দুদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(১১) (ক) পটুয়াখালির হিন্দুসাধারণ ও সত্যাগ্রহিগণ সাধারণ রাস্তা দিয়া হিন্দুর গীতবাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অবাধ ও চিরাচরিত অধিকার রক্ষার জন্য যে ভাবে একক লড়াই করিতেছেন হিন্দু সভা তজ্জন্য তাহাদিগের প্রশংসা করিতেছেন এবং সমস্ত হিন্দু সভাকে বিশেষতঃ বাঙ্গালার হিন্দু সভাসমূহকে সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন। (খ) চিরাচরিত অধিকার রক্ষাকল্পে পটুয়াখালির হিন্দু সত্যাগ্রহিগণ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত উপায়ে সত্যাগ্রহ করিতেছেন এবং অশান্তি যাহা কিছু অন্য সম্প্রদায়ের লোকের জন্যই হইতেছে, এমত অবস্থায় হিন্দুদের উপর সামরিক পুলিশের করভার ন্যস্ত করায় সভা সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

(১২) উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে এই সভা অস্পৃশ্যদিগকে বিদ্যালয়ে, মন্দিরে অবাধ অধিকার, কূপ স্পর্শের অধিকার দানের জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যে কোন বর্ণের যে কোন সম্প্রদায়ের একজন হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের দিক হইতে অন্য একজন অহিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(১৩) বিধবাগণ সত্যধর্ম্মের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে সসম্মানে জীবন যাপন করিতে পারেন তজ্জন্য হিন্দু মহাসভা বাড়ীতে বা আশ্রমে বিধবাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলেন এবং যাহাতে বিধবাগণ কুপথগামী না হয় বা অন্য ধর্ম্মের কবলে পতিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন।

(১৪) বিহারের স্কুলের কোন বিশেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত উর্দ্দু ও হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করায় এই সভা উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

(১৫) আইন সভাসমূহে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক ভেদের নিরশনকল্পে হিন্দু সভা যে কোন প্রস্তাব আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

(১৬) হিন্দু মহাসভা মিঃ জিন্নার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন বিশেষ সংখ্যাধিক্যের সুযোগ দিবার জন্য কোন নূতন প্রদেশ বা আইনসভা গঠনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। হিন্দু মহাসভা ঐ বিষয়টী এখনও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আলোচনার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না।

(১৭) হিন্দু মহাসভা (১) সমস্ত আইন সভায় মিশ্র নির্ব্বাচন (২) জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটাধিকার সংরক্ষণ (৩) প্রতি প্রদেশে ভোট দানের তুল্যাধিকার (৪) ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকার রক্ষার আইনানুগ ব্যবস্থা—এ কয়েকটী বিষয় আলোচনার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

একটী প্রস্তাবে মুসলমান অত্যাচারের সময় বলবন্ত সিংহ ও তাহার পত্নী কৃষ্ণা দেবী যে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন তাহার প্রশংসা করা হয়। অন্য একটী প্রস্তাবে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় নিহত ব্যক্তিদিগের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। অন্য একটী প্রস্তাবে নাভার মহারাজের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

গ্রাম্য মহাজন

ষ্টেট্সম্যান কাগজে "ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস, কেশব আয়াঙ্গার দেশের ঋণদাতা মহাজনদের সম্বন্ধে লিখিতেছেন "গ্রাম্য এলাকায় এই ধরণের সুদখোর মহাজনই সর্ব্বে সর্ব্বা। সাধারণতঃ তাঁহাদের একতিয়ার একচেটিয়া। সহরবাসী কুসীদজীবিগণের চাইতে তাঁহাদের সুদের লাভের বখরা ঢের বেশী। সুদ আদায় সম্পর্কে তাহাদের কোন বিধিব্যবস্থা নাই। এ সম্পর্কে খাতাপত্রে কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ গড়ে শতকরা ২৫ ভাগ লভ্যাংশ ঋণদাতাগণ আদায় করেন। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া তাঁহারা টাকা ধার দেন। আদালতে নালিশ ফরিয়াদ করিয়া ইহারা গৃহস্থের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দেন, কারণ অধিকাংশ স্থলেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা হয়। কৃষকদের ঋণ পরিশোধের বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না।

পুঁজির স্বল্পতা ও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ অল্প কালের জন্য ধার্য্য হওয়ায় বর্ত্তমানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি-গুলি (সমবায় প্রতিষ্ঠান) দেশের মধ্যে বেশী প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। গোটা দেশ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান দ্বারা ছাইয়া ফেলিতে হইলে কেবল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক (জমি রেহানী ব্যাঙ্ক), জয়েণ্ট ষ্টক কো-অপারেটিভ সেলিং সিণ্ডিকেট (সমবায় বিক্রয় প্রতিষ্ঠান) এবং মজুরসঙ্ঘ ও এজেন্সি গড়িয়া তুলিলে চলিবে না, পরন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এগুলির যোগাযোগ সম্পন্ন করিলেই ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এদেশে বর্ত্তমান জগতের অনুরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে অধ্যাপক আয়াঙ্গারের মতে তিনটি জিনিষ অবশ্যপ্রয়োজনীয়। (১) স্থানীয় প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাঙ্কের কাজ কারবার চালাইতে হইবে। চলতি হিসাবে ২৫০্ টাকার কম থাকিতে পারিবে না এরূপ ব্যবস্থা কেবল ঐ সমস্ত জায়গাতেই সম্ভব যে যে স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ১৫০টি শাখা স্থাপন করা হইয়াছে। (২) ব্যাঙ্কের কাজ কারবার পরিচালনা করিতে বর্ত্তমান যে অর্থব্যয় হয় তাহা কমাইতে হইবে। (৩) সব চাইতে বড় কথা এই যে, গভর্ণমেণ্টকে সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক ও ট্রাষ্ট ফণ্ডের গচ্ছিত টাকা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে খাটাইতে হইবে। তবেই ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

হিন্দু-সংগঠন ও "সঞ্জীবনী"

(১)

আমরা দুঃখিত হইলাম, পাটনা হিন্দু মহাসভায় এইরূপ একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, মুসলমানেরা যে হিন্দু নারী অপহরণ করিতেছে হিন্দুরা ও গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিকারে যত্নবান হউন। বাংলার নারী-নিগ্রহ ব্যাপারকে আমরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি না। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ আমাদের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। আমরা প্রতি সপ্তাহে সঞ্জীবনীর চতুর্থ পৃষ্ঠায় গত ১৩৩০ সাল হইতে নারী-নিগ্রহের বিবরণের একটী তালিকা প্রকাশ করিতেছি ; তাহাতে দেখা যাইবে হিন্দু দুর্ব্বৃত্ত হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে ;—মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আর হিন্দু মহাসভার কর্ত্তারা জানিয়া রাখুন, হিন্দু দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তও আছে। ইন্দ্রিয় লালসার মহাপাপ উভয় সম্প্রদায়কে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে ;—হিন্দু আপনার বিশুদ্ধতার গর্ব্ব করিতে পারে না, মুসলমানও কলুষিত হইয়াছে। জাতীয় পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উভয়েরই সম্মিলিত চেষ্টায় কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। (সঞ্জীবনী)

(২)

নারীনিগ্রহ ব্যাপারকে অমরা দুই প্রকারে দেখিতে পারি। প্রথমতঃ ইহা নিজেই একটা রোগ। তাহার প্রতিকারের জন্য দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিচারালয়ে আনিয়া শাস্তি-প্রদান, গ্রাম্য রক্ষিদল গঠন, নারীদিগকে শক্তিমতী করা, পুলিশ প্রহরীর সুব্যবস্থা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন। দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে জনসাধারণ অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া এই সকল পন্থা অবলম্বন করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাতে নারীনিগ্রহ একেবারে নির্ম্মূল হইবে না। কারণ ইহার আর এক দিক্ আছে। তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, নারীনিগ্রহ আর একটি সাংঘাতিক রোগের বাহ্য লক্ষণ। সুতরাং লক্ষণের চিকিৎসা না করিয়া মূল রোগ ধরিতে হয়। সেই রোগটি কি?—আমাদের সমাজে ও অন্তঃপুরে নারী-নির্য্যাতন। আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাজের কথাই বলিতেছি। বাল্য বিবাহ, অবরোধ প্রথা স্ত্রীশিক্ষার অভাব, নির্য্যাতনের এই সকল সুযোগ হিন্দুদের সমাজে যেমন মুসলমানদের সমাজেও তেমনই আছে। হিন্দুর অবরোধ প্রথা মুসলমানের মত এত কঠোর নহে। আবার মুসলমান সমাজে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার রীতি প্রচলিত থাকায় স্বামী অথবা শ্বশুর শাশুড়ীর নির্য্যাতন হিন্দুসমাজের মত এত প্রবল হইতে পারে না। যাহা হউক নারী-নির্য্যাতনে উভয় সমাজই সমভাবে কলঙ্কিত।

হিন্দু বধূ স্বামিকর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হইলে তাহার পক্ষে স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এমন অবস্থায় সে সহজেই দুর্ব্বৃত্তদের কবলে পতিত হয়। মুসলমান বধূগণ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহারা দুর্ব্বৃত্তগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হন। হিন্দু কুলবধূ সামান্য অপরাধেই সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া থাকেন। দুর্ব্বৃত্তগণের পক্ষে ইহা একটী উত্তম সুযোগ।

সুতরাং দেখা যায়, হিন্দু নারীগণেরই আশঙ্কা অধিক। ইহা নিবারিত হওয়ার একমাত্র উপায় (১) অন্তঃপুরে স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ী কর্ত্তৃক বধূর নির্য্যাতন প্রতিরোধ করা (২) ধর্ষিতা নারীকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা। এই দুইটী উপায় অবলম্বিত না হইলে নারী-নিগ্রহের মূলতঃ কোন প্রতিকার হইবে না।

সুবর্ণলতার ঘটনা সঞ্জীবনীর পাঠকগণ অবগত আছেন। কিরূপে স্বামি-কর্ত্তৃক প্রহৃত ও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত সে অনন্যোপায় হইয়া রাত্রিতে রাস্তার উপর বসিয়া ছিল; তখন এক দুর্ব্বৃত্ত গাড়োয়ান তাহাকে ভুলাইয়া নেয় ও তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। বিচারে সেই গাড়োয়ান খালাস পাইয়াছে। কিন্তু স্বামীর কি শাস্তি সমাজপতিরা দিয়াছেন?

সম্প্রতি রিস্ড়া (হুগলী) হইতে একটী হিন্দু কুলবধূ তাহার স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া গৃহের বাহির হইয়া আসে। মাদারীপুর হইতে আর একটী হিন্দু বধূ তদ্রূপ স্বামিকর্ত্তৃক নির্য্যাতিতা হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয়। এই দুইটি হতভাগিনী নারী কলিকাতাস্থিত নারীরক্ষা সমিতির সম্পাদকের নিকট আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছিল।

এইত হিন্দুসমাজের অবস্থা। অথচ এই হিন্দুরাই মুসলমানদিগের উপর খড়গহস্ত হইয়াছে;—কেন?—তাহারা হিন্দুনারীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, এই অপরাধ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মুসলমানগণ হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার করিবার পূর্ব্বে কি অন্তঃপুরে তাহারা ততোঽধিক নির্য্যাতিত ও উৎপীড়িত হয় না?

সরকারী কমার্শ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট

সরকারী কমার্শ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত এডিস্ ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছেন,—

"ভারতে এম, সি, সির আগমনে ও ক্রিকেট খেলোয়াড় গবর্ণরের মনোনয়নে সর্ব্বত্র একটা ক্রিকেটের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এই আবহাওয়াটাকে তোমরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে লইয়া যাও। এর মূলসূত্র হইল ৩টি—(১) খেলিবার সময় প্রবঞ্চনা করিও না (২) নিজের দলের মঙ্গলের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ (৩) নিজের যতদূর সাধ্য ততদূর ভাল করিয়া খেল।

"ব্যবসায়ী জীবনের প্রথম ও প্রধান মূলধন সততা। সেই সততাকে সর্ব্বদা অবলম্বন কর।"

প্রিন্সিপাল বাৎসরিক রিপোর্ট পড়েন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের কথা এইরূপ বিবৃত করেন,—

"এখানে শিক্ষার কাল দুই বছর। যুবকেরা স্কুল ছাড়িয়া বছর দুই এস্থানে দিনের বেলায় ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা পাইতে পারে। তাদের মধ্যে ব্যবসায়ীর মনোভাব

সৃষ্টি করাই এই প্রতিষ্ঠান চায়। তারপর কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াও ঐসব যুবক ইচ্ছা করিলে রাত্রিস্কুলের ক্লাসে যোগ দিয়া তাদের পাঠ চালাইতে পারে। তাতে লব্ধ জ্ঞানটা কাজে খাটাইবারও সুযোগ ঘটে।

"আইন কলেজ হইতে যেমন জজের উদ্ভব হয় সেইরূপ কমার্শ্যাল স্কুল হইতেও সদ্য সদ্য বণিক তৈয়ারী করা অসম্ভব নয়। বিচার-বুদ্ধি অবশ্য অভিজ্ঞতার বলে হয়। আর ঐ অভিজ্ঞতা সময়-সাপেক্ষ।"

ইংরেজ ধনী রাউন্ট্রি ও ভারতের দারিদ্র্য

বিলাতের "ইয়র্ক শহরের কোকো কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত রাউন্ট্রী কিছুদিন হইল সস্ত্রীক ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের এই কোকো কারখানাটি সব চাইতে বড়। ইহার অধীনে ৭০০০ লোক খাটে। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী রাউন্ট্রী ভারতের মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্যই এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি দেশে ফিরিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিগত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া ভারতবর্ষে ঘুরিতেছি। এই অল্প সময়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা এদেশের শ্রমজীবিগণের অবস্থা সম্বন্ধে কোন মত করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু একটা বিষয় যাহা আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছে সেটার কথা আমি উল্লেখ করিবই। ভারতের নরনারীর ঘোর দারিদ্র্য আমার অন্তরে বড় আঘাত করিয়াছে।

"জগতের মজুর আন্দোলনের গোড়ার কথা 'জীবন-যাত্রার মাপকাঠি উঁচু কর।'

"শ্রমজীবীদের কেবল মাত্র উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করিলেই চলিবে না, পরন্তু তাহাদিগকে আর্থিক হিসাবে উন্নত করিতে হইবে। এদেশের ত্রিশকোটি নরনারীর ক্রয়ক্ষমতা একরূপ নাই বলিলেই চলে। ধরুন আমি আমার চকলেট ভারতবাসীর নিকট বেচিতে চাই। কিন্তু আমি জানি তাহারা ইহা কিনিবে না, বিদেশী জিনিষ বলিয়া নয়, পরন্তু তাহাদের কিনিবার মত পয়সা নাই। দেশের লোকের শোষণ-ক্ষমতা নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। ইহাই ভারতের শ্রম অবস্থার জন্য দায়ী। আমি মনিবদের দিক্ হইতে কথা বলিতেছি। আমি যদি এদেশের কোন কার-খানার মনিব হইতাম সকলের আগে আমি দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতাম। ইহাই সব চাইতে বড় কাজ। কারণ তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িলেই আমার কারখানার উৎপন্ন মাল বেশী কাটতি হইবে। আমার ব্যবসাও দ্রুত সচ্ছল হইবে।

মজুরদের সঙ্গে দোস্তিকর

"মজুর অসন্তোষ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে মজুরদিগকে বিশ্বাস করা। তাহাদিকে বুঝিতে দাও যে তাহারা তোমার চাকর নয়, পরন্তু এ ব্যবসা তাদেরই। তাহা হইলেই তাহারা মনপ্রাণ দিয়া কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। ইয়র্ক শহরে আমাদের কোনো কারখানাতে অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারি। যখন তখন মজুর সর্দ্দারদের ডাকিয়া আমি বলিতাম, "দেখ ভাইসব, এ ব্যবসা তোমাদেরই। এ কারবার হইতে বেশী মুনাফা যদি তোমরা আনিতে পার তোমাদের বেতন আমি বাড়াইয়া দিব। তোমরা প্রাণপণ তোমাদের কর্ম্মকুশলতা ও ব্যবসায়ের মুনাফা বাড়াইবার চেষ্টায় থাক।" আমি যদি ভারতীয় কোন কারবারের মালিক হইতাম এখানেও আমি ঠিক ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিতাম। সর্ব্বপ্রথমে আমার নিজের কারবারে আমি এই ভাবে কাজ আরম্ভ করিতাম এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে আর সকলকেও ভারতের নরনারীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়াইবার এই বিপুল প্রচেষ্টায় আমার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতাম।

প্রাথমিক বিদ্যালয় চাই

"দেশের মজুরদের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। আমি জানি ভারতে এখনই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিলাতে ট্রেড ইউনিয়নের চাপে সেখানকার মনিবদের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি নিজে একজন মনিব; কিন্তু, আমার মনে হয় আমাদের

উপর এই চাপ পড়ায় সাধারণ মজুরদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে আমরা যত্নবান হইয়াছি। বিলাতের ট্রেড বোর্ডের কাজও খুব প্রশংসাজনক। আপনাদের অধীন মজুরেরা যদি সব সময় 'জো হুজুর' এই দাসত্বসূচক মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করে এবং আপনাদের প্রত্যেক খামখেয়াল মানিয়া চলে, তবে কোন দিনই তাহাদের অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নয়। শিল্প-বাণিজ্যে ও অন্যান্য ব্যাপারে প্রয়োজন বুঝিয়াই উপায় উদ্ভাবিত হয়। বিলাতের শিল্প সঙ্কটের ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।"

তরুণ ভারতের মস্তিষ্ক সংস্কারের যন্ত্র

গতকল্য (১৭ এপ্রিল) নিখিলবঙ্গ শিক্ষকসম্মিলনের শিক্ষা ও সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করিবার সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বলেন, স্বাধীনতা ও স্বরাজ শব্দের অর্থ এক একজন এক এক রূপ করিয়া থাকেন। সকলে উহার অর্থ বুঝিতে পারে না; কিন্তু 'জাতীয় হিত-সাধন' কথাটার অর্থ সর্ব্বসাধারণেই বুঝিতে পারে। যে দেশে হাঁসপাতাল, মেডিক্যাল ইস্কুল ও অনাথ আশ্রমাদি আছে, সে দেশের লোক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে যে, যে দেশে ঐ সব নাই সে দেশ অপেক্ষা তাহাদের দেশ অধিকতর উন্নত। যে দেশের লোক ৩ বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় যে দেশে ইস্কুল কলেজ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে সে দেশ যে দ্রুত জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের অধিবাসিবৃন্দের উন্নতি বুঝিবার এই একটা উপায়। তিনি শ্রোতৃবর্গকে এই দিক দিয়া বাঙ্গালী জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিতে অনুরোধ করেন।

বক্তা বলেন, দুঃখের বিষয় গত স্বদেশী আন্দোলনে বা অসহযোগ আন্দোলনের সময় কোন নেতাই দেশের প্রকৃত জনহিতকর কৃষি-উন্নতি বা সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেন নাই। এ সমস্ত বিভাগ সম্পূর্ণরূপে সরকারের দয়ার উপরই এতাবৎ নির্ভর করিয়া আসিতেছে। সরকার এই সমস্ত হিতকর কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন বলিয়াই কি দেশহিতৈষিগণের ঐগুলি সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে? বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে বক্তা বলেন,—যাহাদের হাতে নগদ টাকা আছে, কেবলমাত্র তাহারাই চাকুরী সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলা এ বিষয়ে বড়ই গরিব। যদি বৈদেশিকগণ এ দেশের লোকের হাতে তাহাদের মূলধন ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু বৈদেশিক মূলধন খাটান বিষয়ে একশ্রেণীর স্বদেশ-প্রেমিকদিগের প্রবল গোঁড়ামি দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে প্রফেসার সরকার বলেন, হিন্দু মুসলমান মিলন অবশ্যই আসিবে, আসিতে বাধ্য; কিন্তু এই মিলন লাভ করিবার জন্য অনেক বিরোধ ও অনৈক্যের মধ্য দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আত্মশক্তির উপর পূর্ণ আস্থা রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। গভীর বন্ধুতা ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই এইসব বিভেদ বিদ্বেষ অনৈক্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বক্তা হিন্দুদিগকে আরবী, পার্শী, উর্দ্দু ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করেন। (ফ্রী প্রেস)

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ও "আত্মশক্তি"

ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার চৌদ্দ দিন পরে, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক 'এসোসিয়েটেড্ প্রেসের' মারফৎ এক বিবরণ-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশিত বিবরণীতে ব্যাঙ্কের কোনও ডিরেক্টরের স্বাক্ষর নাই, শুধু লেখা আছে, "বেঙ্গল ন্যাশন্যালের ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য বর্ত্তমানে বেঙ্গল ন্যাশন্যালের ডিরেক্টর কে কে তাহা জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে শোনা গিয়াছিল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তীর স্থানে মৈমনসিংহের মহারাজা, তাছাড়া মিঃ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, মিঃ পি, এল, রায়, মিঃ বি, কে, লাহিড়ী ও মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এই পাঁচজন ডিরেক্টর আছেন। পরে জানা গেল মৈমনসিংহের মহারাজা এবং মিঃ দত্ত কিছুদিন পূর্ব্বেই পদত্যাগ করিয়াছেন এবং মিঃ পি, এল, রায় বহুদিন হইল বিলাতে রহিয়াছেন—তিনিও ডিরেক্টর নাই বলিলেই চলে। বাকী রহিলেন মিঃ লাহিড়ী ও মিঃ ব্যানার্জ্জি। ঐরূপ

পদত্যাগের পর নূতন ডিরেক্টর নিয়োজিত হয় নাই, পুরাতনের পাঁচ জনের মধ্যে মাত্র দুই জন বর্ত্তমান। এই দুই জনও যদি ব্যাঙ্কের বিবরণী পত্রে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন (করিয়াছেন কিনা জানা নাই) তাহা হইলেও উহা আইনানুসারে সঙ্গত হইবে কি না আলোচ্য বিষয়। যাহাই হউক ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি যে কিছুদিন হইল সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গঠিত ছিল না, তাহা পূর্ব্বের সংবাদগুলি হইতেই প্রকাশ। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কার্য্য-পরিচালনে যে গোলমাল হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ব্যাঙ্কের বড় বড় ডিরেক্টরগণ কি কারণে এতদিন ব্যাঙ্কের সকল কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কেনই বা পদত্যাগ করিয়াছেন তাহার কারণ কেহ জানাইবেন কি?

যাহা হউক, বিবরণীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্ক-কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যপরিচালন-দক্ষতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ :—

ব্যাঙ্কে সর্ব্বসুদ্ধ টাকা আমানত ছিল এক কোটি এক লক্ষ ৮৬ হাজার; আর ব্যাঙ্ক ধার বা বিভিন্নরূপে খাটাইয়া যে টাকা ছড়াইয়াছেন তাহার পরিমাণ এক কোটি পনর লক্ষ। এই খাটানো টাকার মধ্যে বন্ধকী জমা আছে ৪০,০০০ হাজার টাকার। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ধার দিয়াছেন এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কোনও বন্ধক বা জমা না রাখিয়াই বিভিন্ন লোককে ধার দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন বন্ধকী জিনিষের পরিবর্ত্তে চল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে আর ব্যাঙ্কের অংশীদারদের নিকট হইতে অনাদায়ী ৭ লক্ষ টাকা পাইবার সম্ভাবনা আছে—অবশিষ্ট টাকা পাইবার আশা নাই।

এইরূপ হিসাব দিয়া ডিরেক্টরগণ আশ্বাস দিয়াছেন ব্যাঙ্কে যাঁহারা টাকা আমানত করিয়াছিলেন তাঁহাদের একেবারে হতাশ হইবার আশঙ্কা নাই, তাঁহারা টাকায় আট আনা হিসাবে পাইতে পারেন—অবশ্য যদি সমস্ত টাকা আদায় হয়।

ব্যাঙ্কের পতনের কারণ দেখাইতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আত্মশক্তি ও ফরওয়ার্ডের "হিতৈষিগণ" ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। বিবরণীতে আছে ব্যাঙ্কের এক কোটি পনর লক্ষ টাকার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র দলিলপত্র বা বন্ধকী জিনিষ হাতে রাখিয়া ধার দেওয়া হইয়াছিল। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং ৫০ লক্ষ টাকা বিনা বন্ধকে ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ টাকা আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য জনান নাই কোন্ কোন্ স্বদেশী কোম্পানীকে বা কোন্ কোন্ ভাগ্যবানকে বিনা বন্ধকে টাকা দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে হয়ত জানা যাইত কোন ব্যক্তির মধ্যস্থতায় বা কাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কি কাজ করা হইয়াছে।

পতনের কারণ সম্বন্ধে কর্ত্তারা জানাইয়াছেন, গত ১৯২৬ সন হইতে কোম্পানী বেশ ভালই চলিতেছিল এবং ঐ সময় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে আমানত হইয়াছিল। তাহার পর এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল হইবার পর হইতেই বেঙ্গল ন্যাশন্যালের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দশলক্ষ টাকা ধার করিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও বিপদের অবসান হইল না। পরে গত জানুয়ারী মাস হইতে আবার যে টাকার অভাব হইল তাহা আর কিছুতেই কুলানো গেল না। বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্কের দ্বার বন্ধ করিতে হইল।

ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের বিবরণী হইতেই প্রকাশ ফরওয়ার্ড বা আত্মশক্তিতে লেখালেখি হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে এবং বহুদিন হইতেই তাহাকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে হইয়াছে। তবু অভিযোগ যে ফরওয়ার্ড-আত্মশক্তির জন্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল গেল। এরূপ একের পিণ্ডি অপরের স্কন্ধে চাপানোর অভিসন্ধি কি তাহা আজ আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল সম্প্রতি বন্ধ হইলেও উহার পুনরুজ্জীবনের কথা হইতেছে। এ সংবাদ যে অতিশয় শুভ তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ প্রস্তাবের ভিতরে এক দুরভিসন্ধি আছে। যাহাতে গত কয়েক বৎস-

রের কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধান না হয় এবং প্রকৃত দোষী কে তাহার নিরাকরণ না হয় তজ্জন্যই আজ এত সত্বর পুনরুজ্জীবনের এত কথা। আমদের মনে হয় ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান দুর্গতির ইতিহাস সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করায় দোষীকে মুক্তি দেওয়া এবং চোরের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে মাত্র। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক, বাঙ্গালীর সত্যতা অক্ষুন্ন থাকুক ইহা আমরা সকলেই চাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের দোষ কোথায়, কাহার বা কাহাদের অন্যায় আচরণের ফলে আজ সহস্র বাঙালীর ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে তাহার নিরাকণ পূর্ব্বে করিতে হইবে। নতুবা পুনর্গঠনের সকল চেষ্টা মাত্রচোরকে প্রশ্রয় দেওয়ায় পরিণত হইবে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ও "আনন্দ বাজার"

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণের বর্ণনাপত্র প্রকাশিত হইবার পর হইতে দেশীয় ও এংলো ইণ্ডিয়ান পরিচালিত সংবাদপত্রে তাহার তীব্র সমালোচনা হইতেছে। সকলেই ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের নানারূপ অমার্জ্জনীয় ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের তিরস্কার করিতেছেন, কিন্তু আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় ব্যাঙ্কের এই শোচনীয় দুর্গতির সময়ে কেবলমাত্র তাহার ত্রুটী বিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে চাই না। অতীতের ত্রুটী বিচ্যুতি গলদ্ যাহা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও, এই জাতীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির গুরুতর দায়িত্ব আছে।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই ব্যাঙ্কটী সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙ্গালীর অর্থে পরিচালিত হইত। ইহার আমানতকারীদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। আজ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে। তারপরে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এই ব্যাঙ্কটী প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। দেশী বা বিদেশী পরিচালিত অন্য কোন ব্যাঙ্কই দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের জন্য তাহা করে নাই।

বহু দেশীয় ব্যবসায়ী এই ব্যাঙ্কের নিকট ঋণী আছে। যদি এই ব্যাঙ্কটী উঠিয়া যায়, তবে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে, অনেক দেশীয় ব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশ হইবে, বাঙ্গালার বহু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোককে পথে বসিতে হইবে; তা ছাড়া বাঙ্গালীর ব্যবসা-বুদ্ধির সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইবে, ভবিষ্যতে কোন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক বা যৌথ কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

অতএব বহু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ নিবারণের জন্য, বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ককে কিরূপে পুনর্গঠিত করা যায়, সেই চেষ্টাই আজ সকলকে করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া কিছু নূতন বা বিচিত্র ব্যাপার নহে। অন্য দেশেও এরূপ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাতে হতাশ হয় নাই, আবার সেই ব্যাঙ্ককেই অনেক ক্ষেত্রে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ভারতবর্ষেও পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেলে, লালা হরকিষণলাল প্রভৃতির চেষ্টায় আবার নূতন জাতীয় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ যদি আমরা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ককে লিকুইডেশনে যাইতে দিই তবে আমানতকারী বা অংশীদার কাহারও কোন লাভ হইবে না। বরং যদি ধৈর্য্যের সঙ্গে আপাততঃ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া ব্যাঙ্কটি পুনর্গঠিত করা যায়, তবে সকল দিকই রক্ষা পাইতে পারে।

ব্যাঙ্কটি কি ভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনো পন্থা নির্দেশ করিতে চাই না, করিবার মত বিশেষজ্ঞও আমরা নহি। আমরা বাঙ্গালার ধনী ও প্রভাবশালী লোকদিগকে, এবং ব্যবসায়ে—বিশেষভাবে ব্যাঙ্কের কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এ সম্বন্ধে চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও অংশীদারগণের সভা আগামী ৩০শে মে হইবে, তৎপূর্ব্বেই এসম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের বক্তব্য বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ব্যাঙ্কটী পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি, ব্যাঙ্কের হিতকামী সকলে তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। দেশের অনেক লোক বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ইহা সত্য। কিন্তু ব্যাঙ্কটীর পুনর্গঠনের

অনুকূলে যে জনমত গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাও আমরা দেখিতেছি। এই পুনর্গঠনের চেষ্টা সফল হউক, বাঙ্গালীর জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষিত হউক, ইহাই আমরা চাই।

বিজ্ঞানাচার্য্য মেঘনাদ সাহা এফ,আর,এস

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানসমাজে আজ অধ্যাপক মেঘনাদের নাম অবিদিত নাই। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রণাসভা ডক্টর মেঘনাদকে উক্ত সোসাইটির ফেলো মনোনীত করিয়াছেন। রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হওয়া এক অতুল সম্মান ও গৌরবের কথা। সাহিত্যক্ষেত্রে অথবা বিজ্ঞানের গবেষণাকার্য্যে বিশেষরূপ মৌলিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলে এই সম্মানলাভ হয় না। অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে যে উচ্চ অভিমত প্রতীচ্য পোষণ করেন, তাহার সম্যক নিদর্শন এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি এই রয়্যাল সোসাটির ফেলো নির্ব্বাচন ব্যাপারে।

মেঘনাদ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় শেওড়াতলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধনী পিতার গৃহে সাচ্ছল্যের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন; স্বোপার্জ্জিত স্বল্প আয় দ্বারা তাঁহার বৃহৎ সংসারের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে হইয়া উঠিত না। কাজেই শৈশব হইতে মেঘনাদকে অভাব-অনাটনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তি পরিস্ফুট হয়। শৈশব হইতে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। ১৯০৫ সনে সিমুলিয়া গ্রাম হইতে মাইনর পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকার কে, এল, জুবিলী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন; কিন্তু অঙ্ক ও রসায়নশাস্ত্রে প্রথম হন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ব্যবহারিক অঙ্কশাস্ত্রে বিএস-সি ও এম, এস-সিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যর আশুতোষ তাঁহাকে পদার্থ-বিদ্যা ও মিশ্র অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে বিজ্ঞান কলেজে নিযুক্ত করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি,এস-সি ডিগ্রি ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রদান করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। ইম্পীরিয়াল কলেজ অব্ সায়েন্সের অধ্যাপক এ, ফাউলারের সহিত কিছুকাল কার্য্য করিয়া "থার্ম্যাল আইওনিজেশ্যান অব্ গ্যাস" সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশ করেন। তাঁহার এই থিওরি স্যার নরম্যান লকিয়ার ও অধ্যাপক পিকারিং কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যগুলির সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিল। পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণার্থে বার্লিনে যাইয়া তথাকার অধ্যাপক ন্যর্নস্টের গবেষণাগারে নিযুক্ত থাকেন। যখন তিনি এই গবেষণায় ব্যাপৃত, তখন এক নিমন্ত্রণ আসিল মিউনিকের অধ্যাপক সমারফিল্ডের নিকট হইতে; বিষয় তাঁহার গবেষণার বিষয়গুলি বক্তৃতার মধ্য দিয়া তথাকার সমবেত পদার্থবিদ্যাবিশারদদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কলিকাতার বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে ব্যাপৃত হন। ১৯২৩ সন হইতে তিনি এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিতেছেন।

(প্রকৃতি)

২। বিদেশী

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন বিল ও ভারতীয় মজুর

ব্রিটিশ ট্রেড্ ইউনিয়ন বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ফেডারেশন এক মন্তব্য পাশ করিয়াছেন। যদিও কেহই মনে করিবেন না যে, এই মন্তব্যের ফলে বিলাতের মন্ত্রিসভা বিলটি পরিত্যাগ করিবেন তবুও এই প্রকার মন্তব্যের

আবশ্যকতা আছে। বিলাতের শ্রমিকবৃন্দের সহিত ভারতীয় শ্রমিকবৃন্দের সমস্বার্থ সংযোগ অতীব আবশ্যক। বিলাতের শ্রমিক আন্দোলন যদি ধনিকগণের চেষ্টার ফলে কিছুদিনের জন্যও পিছাইয়া পড়ে তাহা হইলে ভারতের পক্ষে বিশেষ শুভ নয়। ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল পাশ হইয়া যাইবেই, কারণ পার্ল্যামেণ্টে ধনিকদের সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীরা যে তাহাদের সাধ্যমত বিলাতের শ্রমজীবীদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত এইটা আমাদের বিশেষভাবে তাঁহাদের জানান উচিত। (গণ-বাণী)

রপ্তানি ব্যবসায় ছাত্রবৃত্তি

হার্ব্বার্ট হুইটওয়ার্থ ম্যানচেষ্টারের বিখ্যাত হার্ব্বার্টহুইট-ওয়ার্থ লিঃ নামক তুলা-শিল্প কারখানার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি তুলা ও বয়ন শিল্পের রপ্তানি বিভাগে উপযুক্ত লোক তৈয়ারী করিবার মানসে দশ হাজার পাউণ্ড দিয়া এক তহবিল কায়েম করিয়াছেন। এই পুঁজি হইতে প্রতি বৎসর ৪৫০ হইতে ৫০০ পাউণ্ড সুদ জমিবে। সাধারণতঃ শিক্ষিত যুবকগণ ডাক্তারী, ওকালতি, হিসাব পরীক্ষকতা প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করেন। ঐ অর্থদ্বারা এইরূপ শিক্ষিত যুবকগণকে বস্ত্র-শিল্প শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করা যাইবে। তাঁহাদিগকে তুলা শিল্প সম্বন্ধে টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বস্ত্র নির্ম্মাণ, বিদেশে তৈয়ারী মালের বাজার ও ব্যক্তিগত মগজের সৃষ্টি-শক্তি-বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভাগে তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। দক্ষিণ আমেরিকার বাজারগুলি দখল করিবার উদ্দেশ্যে সেলসম্যান-শিল্প (বিক্রয় পদ্ধতি) ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় বা ইস্কুল অব্ টেকনলজি কিংবা বিদেশে এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবার বেতন ও অন্যান্য খরচা উক্ত বৃত্তি দ্বারা দেওয়া সম্ভব হইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ল্যাঙ্কাশিয়ার দুনিয়ার কটন পিসগুড সরবরাহের সব চাইতে বড় কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর হইতে জাপান, বেলজিয়াম ও ইতালির সঙ্গে ল্যাঙ্কা-শিয়রের জোর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই জন্যই ইংরেজ পূর্ব্ব হইতে সজাগ হইতেছে।

দুনিয়ার বাজারে বিলাতী দালাল

ম্যানচেষ্টারের বিখ্যাত বস্ত্র-বয়ন-কারখানার মালিক হার্ব্বার্ট হুইটওয়ার্থ সাহেব "এক্সপোর্ট ওয়র্ল্ড" পত্রিকায় লিখিতেছেন,—বিদেশের বড় বড় বাজারে প্রায় ছয়মাস কাল পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, ম্যান-চেষ্টারের মাল ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকায় অন্যান্য বৃটিশ পণ্যের যথেষ্ট সুবিধা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসকল বাজারে অধিকাংশ স্থলে বৃটিশ মালের এজেণ্ট স্পেনিয়ার্ড, বা জার্ম্মাণ। ইঁহারা আবার এই সঙ্গে ফরাসী, জার্ম্মাণ বা আমেরিকান মালেরও দালাল। কাজে কাজেই এহেন এজেণ্টদের সময় খুব অল্প। তাঁরা যে যে মালে কম পরিশ্রম লাগে ও বেশী কমিশন আসে সেই সকল মালের দিকে বেশী নজর দেন।

আবার প্রাচ্যের বাজারে এমন অনেক বৃটিশ এজেণ্টদের সঙ্গে মোলাকাৎ হইয়াছে, যাঁহারা কতকগুলি ইংলিশ টেকস্‌টাইল ফার্ম্মের দালালী করা ছাড়াও পেণ্ট ভার্নিস রং মশলা প্রভৃতি বিলাতী কোম্পানী ও অন্যান্য দেশের কম্বলের ফার্ম্ম, এমন কি অষ্ট্রেলিয়ার জ্যাম জেলী কোম্পানীর দালালী করিয়া পয়সা রোজগার করিয়া থাকেন। স্বভাবতই তাঁহারা একমাত্র বৃটিশ টেকস্‌টাইল ফার্ম্মের মাল ক্রয়ের কাজে বেশী সময় ব্যয় করিতে পারেন না। এই কারণে অনেক স্থলেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের কাটতি বাড়িতেছে না। এখন চাই খাস বিলাতী শিক্ষিত টেকস্‌টাইল এক্স-পোর্টার। ইহাদের একমাত্র কাজ হইবে দুনিয়ার বাজারে বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করা। আমেরিকার দাঁও মারিবার পদ্ধতি বা বুমিং না হইলে আমাদের উন্নতির পথ নাই।

জাহাজে মাল-রপ্তানির খরচা

ম্যানচেষ্টারের রিং ইয়ার্ণ অ্যাসোসিয়েশুনের এক প্রীতি-ভোজে শ্রীযুক্ত আর, ওয়াডিংটন, বৃটিশ বৈদেশিক শিল্প-

বাণিজ্যের এক স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট খুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ফ্রেট সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান খুব কম একথাও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। বিলাত হইতে ক্যানাডায় চালানী মালের জন্য জাহাজে যে রপ্তানি খরচা ধরা হয়, ইয়োরোপের অন্যান্য বন্দরের খরচা তার অর্দ্ধেক। বক্তা কিছু দিন পূর্ব্বে ক্যানাডাতে কতকগুলি মাল পাঠান। তাঁহার স্বদেশে টন প্রতি পাঠানোর খরচা ৮৫ শিলিং ধরা হয়। কন্টিনেন্টাল পোর্ট হইতে ঐ ধরণের মাল ঐ একই জাহাজে প্রেরণ করিতে টন প্রতি ৪২৷৷০ শিলিং লাগে।

ইউগ্যাণ্ডায় ইংরেজ, মার্কিণ, জাপানী

ল্যাঙ্কাশিয়ারের উৎপন্ন মালের দশভাগের নয় ভাগ কোড়া অবস্থায় ম্যান্‌চেষ্টারের বণিকদের নিকট বিক্রী হয়। কারিগর বা মালিকের লাভের বখরা ঐ খানেই শেষ হয়। শ্রীযুক্ত ওয়াডিংটন বলিয়াছেন, "এরূপ অবস্থা আগেকার দিনে চলিতে পারিত। আজকালকার দুরবস্থার সময় ইহার পরিবর্ত্তন চাই। এই ধরুন না ইউগ্যাণ্ডার কথা। এদেশে তুলা প্রস্তুতের জন্য আমরা হাজার হাজার টাকা ঢালিয়াছি। ইহার জন্য আমরা অমানুষিক চেষ্টা করিয়াছি এবং ল্যাঙ্কাশিয়ারের টাকায় দেশটা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। আজ-কাল অবস্থা দেখুন। জাপান ইউগ্যাণ্ডাতে কম সে কম আধ কোটি গজ কোড়া কাপড় রপ্তানি করিতেছে। আমেরিকা ১৫ লক্ষ গজ পাঠাইতেছে। এদের তুলনায় ল্যাঙ্কাশিয়ারের রপ্তানি একেবারেই নগণ্য।

জাপান বনাম ইংল্যাণ্ড

আমরা জাপানের সঙ্গে লড়িয়া উঠিতে পারিব না, এই ধারণায় নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। দুনিয়ার কোন বাজারে যেখানেই এতটুকু বস্ত্র-শিল্পের মাল বিক্রয় হইবে ঠিক তাহাতে ল্যাঙ্কাশিয়ারের ভাগ থাকা চাই। জাপান সাময়িক একটা সুবিধা পাইয়া গিয়াছে। এটা অস্থায়ী। মুদ্রার দাম কমিয়া যাওয়ায় জাপান আমাদের উপর শতকরা ২৫ ভাগ সুবিধা পাইয়াছিল। সুখের বিষয় যে, সে সুবিধা আজকাল আর নাই। জাপানী পার্ল্যামেন্টে মজুর সম্বন্ধে আইন করা হইতেছে। বর্ত্তমানে জাপানী মিলগুলি মাসের ২৮ দিনে ২২ ঘণ্টা করিয়া চলিতেছে। জাপানে শ্রম-বিষয়ক আইনের কড়াকড়ি হইলেই ল্যাঙ্কাশিয়ার তখন বুঝিয়া লইতে পারিবে। প্রাচ্যের এই সকল দুর্নীতিমূলক প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিলেই আমরা চাঙ্গা হইয়া উঠিব।

"এম্পিরাডিও" সাম্রাজ্যিক তারহীন

"হ্বিম্‌ এম্পিরাডিও" নামক তারহীন টেলিগ্রাফের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্য গাঁথা হইয়া গেল। ১৪ এপ্রিল তারিখে ১০,৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যোগা-যোগ "সাক্ষাৎ"ভাবে কায়েম হইয়াছে। এক মিনিটে ৩০০ শব্দের কথা পাঠান সম্ভব।

১৯২৬ সনের অক্টোবর মাস হইতে ক্যানাডার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের তারহীন রাডিওয় "সাক্ষাৎ" সম্বন্ধ চলিতেছে। এই পথ ২,৮০০ মাইল লম্বা।

এইবার অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আর ক্যানাডার সঙ্গে ইংরেজরা বিলাতে বসিয়া টেলিফোনে কথা বলিবার ব্যবস্থা করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিলাতে তারহীন টেলিফোন সুরু হইয়া গিয়াছে।

জার্ম্মাণ যন্ত্রবীর ফোন বাখ্‌

ষ্টুটগার্টের টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং অধ্যাপক ফোন বাখ ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে ৮০ বৎসর পূর্ণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ারেরা একটা উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর বয়সে বাখ্‌ নাওসিট্‌সের যন্ত্রপাতির কারখানায় সর্ব্বপ্রধান ডিরেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ৩১ বৎসর বয়সে ষ্টুটগার্টে অধ্যাপনা সুরু করেন। তাঁহার লেখা মাশিনেন-এলেমেন্টে" (যন্ত্রপাতির অ, আ, ক, খ) যন্ত্রবিদ্যায় যুবক জার্ম্মাণির বনিয়াদ-স্বরূপ। জার্ম্মাণির "ফারাইন ডয়চার এঞ্জিনিয়ার" নামক এঞ্জিনি-য়ারিং-পরিষদের উন্নতিসাধনে বাখ ৫০ বৎসর ধরিয়া যত্ন লইতেছেন। "ফ্যাক্টরি-কারখানা ইত্যাদির কাজে উন্নতি দেখাইবার জন্যও ফোর্শুঙ অর্থাৎ রীসার্চ, গবেষণা বা অনুসন্ধান আবশ্যক" তাঁহার এই বাণী জার্ম্মাণির

প্রত্যেক বড় বড় কারখানায়ই অনুসৃত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন কারখানাগুলায়ও এক একটা ছোট বড় মাঝারি রীসার্চ-ইনষ্টিটিউট কায়েম হইয়াছে। তাহাতে জার্ম্মাণ সমাজের অনেক বড় বড় বিজ্ঞানসেবী অনন্য-চিত্ত হইয়া শিল্প-গবেষণা করিতেছেন। জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ারিং পরিষদের পত্রিকায় বাখের লেখা ২০০টা গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে। বাখের মোসাবিদা অনুসারে জার্ম্মাণির বিভিন্ন কারখানায় যে-সকল শিল্প-গবেষণা অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই সকল একত্র করিয়া এক পর্য্যায় রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩০০টা শিল্প-গবেষণা বাহির হইয়াছে।

ইংরেজ চীন-বিশেষজ্ঞ সুটহিল

পাদ্রী সুটহিল অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। বর্ত্তমান চীন-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি লীড্‌সে গিয়া একটা বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন।

সুটহিল বলিয়াছেন:—"চীনে আমরা আছি বাণিজ্যের জন্য। বাণিজ্য শব্দটা শুনিবামাত্র ইংল্যাণ্ডের মজুর দল নাক সিট্‌কাইতে সুরু করেন। কিন্তু ইংরেজ মজুরদের মনে রাখা উচিত যে, এই চীন বাণিজ্যই লাখ লাখ ইংরেজ নরনারীর রুটিমাখন জোগাইতেছে। অপর দিকে কোটি কোটি চীনার ভাতের বাটি পূর্ণ করিতেছে এই বাণিজ্য-সম্বন্ধ।"

বক্তৃতার আর এক অংশ নিম্নরূপ:—"ইংরেজরা চীনাদের রক্ত শোষণ করিতেছে একথা ঠিক নহে। আজকাল চীনে আধুনিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত ১২০টা কারখানা চলিতেছে। তাহার ভিতর মাত্র ৪টা ইংরেজদের তাঁবে। জাপানীরা ৪৫টার মালিক। অবশিষ্ট ৭১টা সবই চীনাদের সম্পত্তি। ইংরেজ মালিকেরা চীনা মজুরদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। একথা এক ইংরেজ মজুর-প্রতিনিধিও অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া খোলাখুলি বলিয়াছেন।"

২৩টা জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০,৩০৩ ছাত্রছাত্রী

১৯২৬ সনে জার্ম্মণির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০,৬২১ ছাত্র ও ছাত্রী উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিল। নিম্নের তালিকার অঙ্কগুলা দ্রষ্টব্য:—

বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র	ছাত্রী
১। বার্লিন	৮,০১৭	১,৩২৭
২। বন	৩,৫৫১	৫২১
৩। ব্রেসলাও	৩,৯৯০	৪৫৪
৪। অ্যার্লাঙ্গেন	১,২৪৪	৫৬
৫। ফ্রাঙ্কফুর্ট	২,৫৩৪	৮৩০
৬। ফ্রাইবুর্গ	২,৬৯৫	৪৫০
৭। গীস্‌সে	১,২৭৭	৮০
৮। গ্যেটিঙ্গেন	২,৩৬৭	২৪৩
৯। গ্রাইফস্‌ হ্বাল্ড	৯৭২	১৪৪
১০। হাল্লে	২,১২১	১৩২
১১। হাম্বুর্গ	১,৬৫৩	৩৩৯
১২। হাইডেলবার্গ	২,১৮৩	৪৩১
১৩। য়েনা	১,৮১৩	২৫৯
১৪। কীল	১,৫৯৪	২০৭
১৫। ক্যেল্‌ন	৪,২১৮	৫৭৮
১৬। ক্যেনিগস্‌ব্যার্গ	১,৬২০	২৩৬
১৭। লাইপৎসিগ	৪,২৩৪	৪০৫
১৮। মার্বুর্গ	২,০৩৬	৩৫১
১৯। মিন্‌খেন (মিউনিক)	৬,০৬৭	৯৪৯
২০। ম্যিন্‌ষ্টার	২,৩৮৪	৪৬৬
২১। রষ্টক	৮৫০	১১৬
২২। টিবিঙ্গেন	২,৫৭০	১৮২
২৩। হ্বিয়ৎসবুর্গ	১,৮৮৫	১২৮
	৬১,৯৩৫	৮,৩৬৮

জার্ম্মাণ মাপে ভারতীয় পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট

তাহা হইলে সংখ্যাটা মোটের উপর দাঁড়ায় ৭০,৩০৩।

"ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স" বিদ্যাটা নিছক সংখ্যার বিদ্যা নয়। একমাত্র নাক গুনিলেই যথার্থ লোক-সংখ্যা বাহির হয় না। কাজেই বর্ত্তমান সংখ্যাটা কিছু তলাইয়া বুঝা দরকার।

জার্ম্মাণিতে বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে কি বুঝা যায়? টেক্‌নিক্যাল্ কলেজ, কৃষি-কলেজ, বন-কলেজ—এই তিন প্রকার কলেজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। এই সমুদয়ের সব-কিছুই ২৩টা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত।

অপর দিকে জিজ্ঞাস্য—কিরূপ ছাত্রছাত্রী—অর্থাৎ কয়টা পাশের পর পুরুষ-নারীরা জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে অধিকারী? ১৪ বৎসর বয়সে বাধ্যতামূলক পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া যাহারা "গিমনাজিয়ুম্" অথবা "রেয়াল-শুলে" নামক মধ্য বিদ্যালয়ে যায় একমাত্র তাহারাই কয়েক বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে। মধ্য বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিতে হয় সাধারণতঃ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে। এই পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা যে সকল সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিদ্যার চর্চ্চা করে তাহার ওজন আমাদের ভারতীয় বি-এ, বি, এস্-সির সমান অথবা প্রায় কাছাকাছি। আমাদের ইণ্টারমীডিয়েট জার্ম্মাণ গিম্‌নাজিয়ুম্-রেয়াল শুলের অনেক নীচে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের ইণ্টারমীডিয়েট আর বি, এ, বি,এস্-সি, ক্লাসগুলাকে জার্ম্মাণ ঢংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত বিবেচনা করা উচিত। একমাত্র পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসগুলাকে অর্থাৎ এম্, এ, এম, এস্-সি, বি, এল্ এবং এম, বি পরীক্ষার জন্য যে সকল ছাত্র তৈয়ারী হইতেছে, তাহাদিগকে বাহ্যতঃ জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমান বিবেচনা করা সম্ভব। এই সমতাটা কিন্তু সামাজিক বা ব্যবহারিক হিসাবে বুঝিতে হইবে, যথার্থ গুণ হিসাবে বুঝা চলিবে না। কেননা, জার্ম্মাণ গিমনাজিয়ুম্-রেআলগুলের শিক্ষকেরা যে দরের বিদ্বান্ আমাদের ইস্কুলকলেজের মাষ্টারেরা অনেকেই সেই দরের লোক নন। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে আসিয়া জার্ম্মাণ ছাত্রেরা তিনচার বৎসর কাটায়। এই সময়ে তাহারা যাহা-কিছু শিখে তাহা শিখাইবার মতন পণ্ডিত ভারতীয় পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক মহলে বড় বেশী নাই। একটা সোজা কথা বলিলেই চলিবে। জার্ম্মাণির অধ্যাপকেরা নিজেই গবেষক ও লেখক। আর ভারতের অধ্যাপকেরা ইংরেজ, মার্কিণ, জার্ম্মাণ ইত্যাদি বিদেশী অধ্যাপকদের লেখা বই ছাত্রদিগকে মুখস্থ করাইবার জন্যই বাহাল হন। পরের কথা কপ্‌চানো সাধারণতঃ আমাদের স্বধর্ম্ম।

আর এক কথা। আমাদের দেশে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্রদিগকে মাত্র দুই বৎসর কাটাইতে হয়। কাজেই সকল দিক্ হইতে বিদ্যা-চর্চ্চার দৌড় হিসাবে ভারতীয় পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রেরা জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে নিকৃষ্ট। এম্-এ, এম্-এস্-সি পাশের পর আরও দুই তিন বৎসর নিয়মিত লেখাপড়া করিবার সুযোগ পাইলে ভারতীয় ছাত্রেরা জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছাকাছি গিয়া ঠেকিতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বে নয়।

একটা প্রমাণ এখনই দিতেছি। ভারতীয় এম, এ, এম, এস্-সি উপাধিধারী লোকেরা জার্ম্মাণিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার পূর্ব্বে সাধারণতঃ কোনো ভারত-সন্তান জার্ম্মাণ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পায় না। অর্থাৎ গিম্‌নাজিয়ুম-রেআল শুলের জার্ম্মাণ ছাত্রেরা যত বৎসর পরে জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয় প্রায় ঠিক তত বৎসর পরে ভারতীয় এম এ, এম-এস্-সিরা জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়া থাকে।

এইবার কলিকাতা আর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ, এম-এস-সি, বি, এল আর এম, বি ক্লাসগুলায় যে কয়জন ছাত্র পড়িতেছে, তাহাদের সংখ্যা একত্র করিয়া দেখা যাইতে পারে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব, ৭০,৩০৩জন জার্ম্মাণ তরুণ-তরুণীদের তুলনায়, কি [illegible] আর কি গুণ হিসাবে যুবক বাংলার চরম শিক্ষার্থীদের [illegible] কত নীচে অবস্থিত। কেন না গোটা বাংলায় এম,এ, এম,এস-সি পড়ে মাত্র ১,৫০০জন। আর বি, এল, এম,বি ছাত্রের সংখ্যা হাজার দেড়েকের বেশী হইবে না।

৬ কোটি জার্ম্মাণদের সমাজে ৭০ হাজারের বেশী পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ছাত্রী থাকিলে, ৪॥০ কোটি বাঙালীর সমাজে ৫২॥০ হাজার থাকা উচিত। আর এই সাড়ে বায়ান্ন হাজারের জন্য অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর ধরিয়া এম-এ, এম্,এস-সি পড়াইবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ দরের বিজ্ঞানসেবী, ইতিহাসসেবী, অধ্যাপক বাঙালী সমাজে থাকা

চাই। আর চাই জার্ম্মাণ বহরের ল্যাবরেটারি, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম ইত্যাদি মাষ্টার ছাত্রদের খোরপোষ।

দুনিয়া কোথায় উঠিয়া গিয়াছে তাহা সমঝিবার পক্ষে জার্ম্মাণ গঙ্গকাঠি যুবক বাংলার কাজে লাগিবে। তবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থামাফিক ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা না করিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার বাতিক চাগিলে আমাদের মাথা বিগড়াইয়া যাইবে মাত্র। এইরূপ বদ খেয়াল হইতে নিজকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য আমাদের করিৎকর্ম্মা লোকদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কুনার্ড কোম্পানীতে স্যার টমাস রয়ডেনের বক্তৃতা

কুনার্ড নামক ইংরেজ জাহাজ কোম্পানী আমেরিকার পথে যাতায়াত সম্বন্ধে অন্যতম বড় বৃটিশ প্রতিষ্ঠান। এই কারবারের বার্ষিক হিসাব-নিকাশের সভায় স্যার টমাস রয়ডেন যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার মোদ্দা হইতেছে "তেল বনাম কয়লা।"

তেলের সাহায্যে জাহাজ চালানো খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কয়লার খরচ তত বেশী নয়। কুনার্ড কোম্পানীর কোনো কোনো জাহাজকে পুনরায় কয়লার হাতে সঁপিয়া দিবার প্রস্তাব চলিতেছে। কয়লার যুগ দুনিয়া হইতে এখনো চলিয়া যায় নাই। ইতি ভাবার্থঃ।

বিগত ছয় সাত মাস ধরিয়া তেলের দর বেশ চড়া চলিতেছে। তাহার অন্যতম কারণ কয়লার খাদে ধর্ম্মঘট। কয়লার ঘাঁকতি পড়ায় সর্ব্বত্র তেলের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তেলের মূল্য-বৃদ্ধি। রয়ডেন বলিতেছেন,—"তেলের দর নামিবার সম্ভাবনা সম্প্রতি নেহাৎ কম।"

বড় বড় জাহাজ কোম্পানী হইতেছে তেলের প্রধান খরিদ্দার। তেলের দর-বৃদ্ধি এই সকল কোম্পানীর পক্ষে যার পর নাই অসুবিধাজনক। কোম্পানীগুলা মাল আমদানি-রপ্তানির কাজে মোতায়েন আছে। যে সকল সওদাগর মাল আমদানি বা রপ্তানি করে তাহাদের সঙ্গে ঠিক তারিখের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই জাহাজ-কোম্পানীর চুক্তি করিয়া রাখিতে হয়। কাজেই তেলের জোগানটা প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া না রাখিলে এই সকল কোম্পানীর চলে না।

অপর দিকে তেলওয়ালারা শেয়ানা কম নয়। তাহারা কিছু কিছু দাম কমাইতে রাজি আছে। তবে দরটা চড়া রাখাই তাহাদের মতলব। বিশেষতঃ একটা কারণ দেখা যাইতেছে। তেলওয়ালারা জানে যে, কয়লায় ফিরিয়া যাওয়া জাহাজ কোম্পানীর পক্ষে কিছু নিন্দনীয় কথা। কেন না কয়লার জাহাজগুলা স্বভাবতই কিছু নোংরা ও অপরিষ্কার হইয়া পড়ে। তেলে এঞ্জিন চলিলে তাহার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ত্রুটি ঘটে না। কয়লার জন্য জাহাজে যতটা মালগুদাম দরকার হয় তাহার চেয়ে কম জায়গায় তেল জমা করিয়া রাখা সম্ভব। অধিকন্তু তদবিরের জন্য বেশী মজুর মিস্ত্রীর দরকার হয় না; কিন্তু কয়লার জন্য সেবক চাই বিস্তর।

এইখানে জানিয়া রাখা উচিত যে, ছোট ছোট জাহাজের বেলায় তেল-বিষয়ক এইসকল সুবিধার যুক্তি খাটে না। তাহাদের পক্ষে কয়লার রেওয়াজ বড় শীঘ্র বন্ধ হইবে না। তেলওয়ালারা সম্প্রতি বড় বড় কোম্পানীগুলাকে তাঁবে রাখিতে সচেষ্ট। ছোট ছোট কোম্পানীগুলাকে তেলের আওতায় আনার চেষ্টা কিছুকালের জন্য ধামা চাপা থাকিল।

২২৷৷০ কোটি টাকার বিদেশী ডিম জার্ম্মাণিতে আমদানি হয়।

জার্ম্মাণিতে ৭,৫০,০০,০০০ (সাত কোটি পঞ্চাশ লাখ) মুর্গী, হাঁস ও পায়রা প্রতিপালিত হয়। অর্থাৎ জনপ্রতি একটার বেশী চিড়িয়া জার্ম্মাণদের কপালে পড়ে না। এই কারণে জার্ম্মাণিতে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি মার্ক (২২৷৷০ কোটি টাকা) দামের ডিম বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

৩,০০০ টাকার মুর্গীর ব্যবসায় মাসিক ৭৫৲ লাভ

এই জন্য এক ব্যক্তি "ফির্স হাউস" (গৃহস্থালী) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় জার্ম্মাণ গিন্নীদিগকে মুর্গীর ব্যবসায়

লাগিয়া যাইতে পরামর্শ দিতেছেন। ৪০০০ মার্ক (৩০০০ টাকা) ব্যাঙ্কে খাটাইলে বার্ষিক সুদ বড় জোর শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে ১৬০ মার্ক। অর্থাৎ মাসে ১৩।১৪ মার্কের বেশী পাওয়া যায় না। কিন্তু মুর্গীর ব্যবসায় ১০০ মার্ক পর্য্যন্ত মাসিক নিট লাভ পাইবার সম্ভাবনা।

২০০ মুর্গী লইয়া কুটির শিল্পের মোসাবিদা

জার্ম্মাণ লেখকের চিন্তাপ্রণালী নিম্নরূপ :—

এক একটা মুর্গী সাধারণতঃ ৩০ মাস ধরিয়া ডিম পাড়ে। এই ২॥০ বৎসরে মুর্গীর জন্য খোরপোষ লাগে ২৯ মার্ক (প্রায় ২২টাকা)। বৎসরে ডিম ১৫০টার কম পাওয়া যায় না। কখনো কখনো ১৮০।২০০ পর্য্যন্ত ডিম পাওয়া যায়। এক একটা ডিমের দাম ১০।১১ ফেন্নিগ (প্রায় এক আনা বা সাড়ে চার পয়সা)। অতএব আড়াই বৎসরে একটা মুর্গী প্রায় ৪৩ মার্ক (=প্রায় ৩২ টাকা) দামের ডিম দেয়। তাহার পর মুর্গীটাকে বেচিয়া ফেলিলে পাওয়া যায় ৪ মার্ক (=৩টাকা)। অর্থাৎ মুর্গীটার জন্য খরচ প্রায় ২২ টাকা আর সেটা হইতে আয় প্রায় ৩৫ টাকা। অতএব নিট লাভ প্রায় ১৩ টাকা। বরবাতের জন্য ৩ মার্ক (২।০) ফেলিয়া দেওয়া যাউক। তাহা হইলে কম সে কম মুর্গী প্রতি ১৫ (মার্ক প্রায় ১১ টাকা) "হেসে খেলে" থাকে।

দেখা যাইতেছে ৩০ মাসে ১৫ মার্ক লাভ ফী মুর্গীতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মাসে ½ মার্ক। অতএব যদি ২০০টা মুর্গী লইয়া ব্যবসা করা যায় তাহা হইলে মাস মাস ১০০ মার্ক (=৭৫৲ টাকা) খাঁটি নিট লাভ দাঁড়াইতে বাধ্য।

২০০টা মুর্গী পুষিতে কত টাকা মূলধন চাই? জবাব ৪০০০ মার্ক (=৩,০০০ টাকা)। ২০০টার চেয়ে কম মুর্গী লইয়া ব্যবসা সুরু করা উচিত নয়। পুঁজির জোর বেশী থাকিলে ৩০০।৪০০।৫০০টা পর্য্যন্ত লইয়া ব্যবসা চালানো যাইতে পারে। সবই অবশ্য পারিবারিক "কুটির শিল্পের" কথা বলা হইতেছে।

বাঙালী পরিবারের পক্ষে এই মোসাবিদা অনুসারে কাজ চালানো সম্ভব কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল।

ভল্‌তা সম্বন্ধে সেনেটার মার্কনির বক্তৃতা

ইতালির বিদ্যুদ্-বীর ভল্‌তার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই বৎসর ইতালিতে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা হইতে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও দেবেন্দ্রমোহন বসু এই সম্মেলনে যোগ দিতে যাইবেন।

ইতিমধ্যেই ইতালির নানা স্থানে ভল্‌তা উৎসব সুরু হইয়াছে। সেদিন ভেনিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের জন্য বিদ্যুদ্-বীর মার্কনি একটা বক্তৃতা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় ছিল ভল্‌তার কৃতিত্ব।

মোলাকাৎ



মফঃস্বলের লোন-আফিস

শ্রীযুক্ত জে, সি, দাসের মতামত

(বাংলাদেশের জেলায় জেলায় আজকাল মোটের উপর প্রায় শ'চারেক লোন-আফিস নামক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। এই সকল ধন-কেন্দ্রের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জে, সি, দাসের সঙ্গে আমাদের যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছে নিম্নে তাহার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইল। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

মিঃ দাস আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার পরে স্বদেশে আসিয়া স্বাধীনভাবে ব্যাঙ্কিং ও অডিটিং ব্যবসা চালাইতেছেন। বিলাতের অ্যাকাউন্টিং বিদ্যার সার্টিফিকেটও তাঁহার আছে। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নামক প্রতিষ্ঠান তাঁহার মেহনতের ফল।)

প্রশ্ন—বাংলা দেশে ছোট বড় মাঝারি লোন অফিস ও ব্যাঙ্ক আছে কয়টা ?

উত্তর—বাংলা বিহার ছোটনাগপুর ও আসাম মিলে আড়াই তিন শ'এর বেশী হবে। ছোটনাগপুর, পুরী ও আসামের ব্যাঙ্ক সব বাঙ্গালীদের হাতে।

প্রঃ—পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ হিসাবে কিছু ভাগ করতে পারেন কি ? কোন্ দিকে বেশী ?

উঃ—উত্তর বঙ্গে বেশী।

প্রঃ—কোনোটার নাম-লোন অফিস কোনোটার নাম ব্যাঙ্ক কেন ?

উঃ—কারবার একই। কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিবার সময় যার যেমন খেয়াল তেমন নাম লেখে। কচিৎ কখনো দু'এক ক্ষেত্রে বিশেষত্বগুলার দিকে লক্ষ্য রেখে নাম রাখা হয়।

প্রঃ—ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজ কি কি ?

উঃ—(১) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে ব্যক্তিগত জামিনে টাকা কর্জ্জ দেওয়া। (২) জমীদার তালুকদারদিগকে জমি বন্ধক রেখে ধার দেওয়া। (৩) কেউ মোকর্দ্দমা করতে এসেছে, টাকার দরকার। উকিল দেখছে মক্কেলের টাকা নাই, মোকর্দ্দমা চলে না। কোনো কোম্পানী থেকে তাকে টাকা পাইয়ে দিবে। (৪) মক্কেলের খাতিরে একজন উকীল এইরূপে আর একজনকে সাহায্য করে, মোকর্দ্দমা চলতে থাকে। এই সকল ব্যাঙ্কে উকীলদের লাভ বিস্তর।

প্রঃ—তাহলে উকীলরাই লোন আফিসগুলার সর্ব্বেসর্ব্বা ?

উঃ—খোলাখোলি ভাবে একথা বলছি। কলিকাতায় "কমার্শ্যাল গেজেট" নামক সাপ্তাহিকে আমি এ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধও লিখেছি। একথা প্রচারিত হলে উকীলেরা অপমান বোধ করবেন না। কেন না অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে মক্কেলদেরকে টাকা পাইয়ে দেওয়াও উকীলদের অন্যতম ব্যবসা।

প্রঃ—ব্যক্তিগত জামিনটার নিয়ম কিরূপ ?

উঃ—"প্রোনোট" চালানো অর্থাৎ হাতের চিঠিতে (হ্যাণ্ডনোটে) টাকা দেওয়া। লোকটার জমিজমা নাই, কাগজ সই করে দিল, তাকে ৫০০৲ টাকা দেওয়া হল।

প্রঃ—আপনি বল্লেন নাম লোন অফিসই হউক কি ব্যাঙ্কই হউক কাজ এক রকম। তা হলে এগুলিকে (অর্থাৎ মফঃস্বলে যেগুলি চলছে) খাঁটি ব্যাঙ্ক বলতে আপনার আপত্তি আছে কি?

উঃ—২।১ খাঁটি ব্যাঙ্ক আছে। সাধারণতঃ যা চল্‌ছে সেগুলিকে ব্যাঙ্ক বলতে রাজী নই। তবে "মর্টগেজ-ব্যাঙ্ক" বলা চলে।

প্রঃ—কি ভাবে চল্লে মফঃস্বলের লোন অফিসকে ব্যাঙ্ক বলতে রাজী আছেন?

উঃ—মর্টগেজে টাকা না দিয়ে বেপারীদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন চালাবার জন্য যদি টাকা দেওয়া হয় তবে ব্যাঙ্ক বলব। ধরুন চাউল, ডাল, তেল, নুণ, কাপড়, জুতা, জামা এ সব কলিকাতা থেকে মফঃস্বলে যাচ্ছে কিংবা সেখান থেকে আর কোথাও বেরোচ্ছে। টাকা না হলে এ সব জিনিস যাতায়াত করতে পারে না। কিন্তু সে টাকাটা এই সব লোন অফিস সরবরাহ করে না।

প্রঃ—তা হলে মাল চলাচলের ব্যবসা অর্থাৎ আসল অন্তর্ব্বাণিজ্যটা চালাচ্ছে কারা?

উঃ—দেশী মহাজন, মাড়োয়ারী ইত্যাদি।

প্রঃ—বাঙালী মহাজন আর মাড়োয়ারীরা কি রকম ভাবে চালান?

উঃ—ধরুন চাউল কিনলাম। দিনাজপুর থেকে চাউল চালান হল। চালানি রসিদ দেখে মাড়োয়ারী আমাকে টাকা আগাম দিয়ে দেয়। কিন্তু লোন-অফিস নামক ব্যাঙ্কের কাছে গেলে আমি টাকা পাই না।

প্রঃ—মাল পাঠাবার রসিদ দেখেই কি মাড়োয়ারী টাকা দেয়?

উঃ—হাঁ। যে চাউলের কারবার করছে তার বাজার-নাম জেনে নেয়। এমন কি অনেক সময় রসিদ ছোঁয়ও না। বিশ্বাস করেই টাকা দিয়ে দেয়। বেপারীর গুদামে চাউল ডাল তেল নুণের পরিমাণ দেখে মাড়োয়ারী টাকা দেয়।

প্রঃ—কত দিনের জন্য দেয়?

উঃ—খুব অল্প দিনের জন্য। ৬দিনের বেশী নয়।

প্রঃ—ঠকে না?

উঃ—কখন কখন ঠকতে পারে।

প্রঃ—সুদ কি রকম চায়?

উঃ—শতকরা ১২ হইতে ১৮ টাকা।

প্রঃ—এটা কি প্রত্যেক জেলাতে এক রকম, না ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন রকম?

উঃ—ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন রকম। বেপারীর লাভের মাত্রা অনুসারে মহাজন সুদ হাঁকিতে অভ্যস্ত।

প্রঃ—মফঃস্বলের লোন অফিস এবং ব্যাঙ্ক কেন বেশী অগ্রসর হতে পারে না?

উঃ—মফঃস্বলে যে সব ব্যাঙ্ক চলছে তার প্রধান পরিচালক উকীলরা। ব্যবসাদারকে টাকা দিলে উকীলের পয়সা আসবে না। কিন্তু সম্পত্তি বন্ধকের ব্যবস্থা থাকলে উকীলদের পকেটে দু'চার পয়সা আসতে বাধ্য। ১৪ বৎসর ব্যাঙ্কগুলা অডিট করে এইরূপই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

প্রঃ—জমি বন্ধক রাখার ব্যবস্থায় কোনো প্রকার গণ্ডগোল আছে কি?

উঃ—কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা দাম বাড়াবার প্রয়াস দেখা যায় বটে; কিন্তু বেশীর ভাগেই জুয়াচুরি চলে না। কিন্তু মর্টগেজ-প্রথায় ব্যাঙ্কের অসুবিধা অনেক। যে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে তার ৯৫ পার্সেন্টই আমানত জমা, হয় চলতি হিসাবে, না হয় সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাবে, তা না হয় ৩ মাস ৬ মাস ১ বৎসর ২ বৎসর মেয়াদে। কিন্তু জমি মর্টগেজে সে টাকাটা ধার দিলে তৎক্ষণাৎ আটক হয়ে গেল। জমির বন্ধক খালাস করে নগদ টাকা হাতে ফিরিয়ে পাওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে খুবই কঠিন।

প্রঃ—আপনি বলছেন আমাদের মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ মর্টগেজ ব্যাঙ্ক। আচ্ছা কোন প্রণালীতে চালালে মর্টগেজ-ব্যাঙ্ক ভাল রকম চলতে পারে? এই সকল ব্যাঙ্ক সেই প্রণালীতে চালান হয় না কি?

উঃ—মর্টগেজ ব্যবসায় ব্যাঙ্কের পক্ষে যাওয়া সম্ভব যদি নিজ

পুঁজিতে নগদ টাকার জোর থাকে। ক্যাপিট্যাল পুরু হলে বেশীদিনের জন্য জমিতে টাকা আটকে রাখা চলে। কিন্তু আমাদের মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক বেশীদিনের জন্য টাকা দিচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে শর্ট পীরিয়ডের জন্য। এই হচ্ছে গোড়ার গলদ। ডিপজিটর যখন ব্যাঙ্কের কাছে টাকা চায় তখন ব্যাঙ্ক সে টাকা দিতে পারে না, বলে "সবুর কর দিচ্ছি"। বাগের-হাট ও পাবনার ১৫।১৬টী ব্যাঙ্ক এবং লোন কোম্পানী টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। ১০ বৎসরের ভিতর মফঃস্বলের অনেক ব্যাঙ্ক "লিকুইডিশ্যানে" যাবে। কিন্তু তাতেও উকীলদের লোকসান নাই। কেননা জমি বন্ধকের কাজে, জমি পরীক্ষার কাজে, বন্ধকটা তদবির করার কাজে, শেষ পর্য্যন্ত কর্জ্জ উশুল করার কাজে, আগাগোড়াই ব্যাঙ্ক উকীলদের সাহায্য নিতে বাধ্য। কিন্তু বেপারীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন চালালে ব্যাঙ্ক উকীলদের তাঁবে বেশী যেতে পারে না।

প্রঃ—তাহলে মফঃস্বলের ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ আপনার মতে উকীলের কর্ত্তামি ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস?

উঃ—প্রথমতঃ, তারা উকীল বলে স্বভাবতই অনভ্যাস দোষে ব্যবসার দিকে টাকা দিতে নারাজ। দ্বিতীয়তঃ, জমি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেওয়াতে পারলে ভবিষ্যতে মামলা মোকর্দ্দমার দরুণ লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক ধাপেই উকীলের সুবিধা। কাজেই ব্যাঙ্ক দাঁড়াচ্ছে উকীলদের নিজ ব্যবসায়ের কর্ম্মকেন্দ্র। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কের তৃতীয় দুর্ব্বলতার কারণ হচ্ছে কম সময়ের জন্য তারা টাকা জমা পাচ্ছে কিন্তু ধার দিচ্ছে বেশী এবং অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য।

প্রঃ—তা ছাড়া আর কিছু আছে?

উঃ—ব্যাঙ্কগুলি মফঃস্বলের জমীদার হয়ে উঠেছে। মর্টগেজ তারা বুঝে, আইন বুঝে, আর কিছু বুঝে না। আসল কথা উকীল ব্যবসাতে যেতে চায় না, এবং ওকালতী ব্যবসার সঙ্গে মর্টগেজ জিনিষ জড়িয়ে রয়েছে।

প্রঃ—আজকালকার দুরবস্থার ধাঁচোয়া কিছু বাৎলাতে পারেন?

উঃ—বর্ত্তমান অবস্থায়, যে সুদের হারে টাকা জমা করা আছে তা তুলে দেওয়াই শ্রেয়। তার বদলে "প্রেফারেন্স শেয়ার" দেওয়া লোন অফিস-গুলির প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায়। আমাদের দুর্ব্বলতা নিবারণের উপায় হচ্ছে ডিপজিটরদের কাছে ব্যাঙ্কের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রী করা। ডিপজিটর চায় বাঁধা হারে সুদ। কিন্তু সুদটা ডিপজিটের সুদ হিসাবে না দিয়ে অন্য কৌশলে দেওয়াও সম্ভব। ডিপজিটরকে "প্রেফারেন্স" (পক্ষপাতমূলক) অংশ দিয়ে যদি "শেয়ার হোল্ডার" (অংশীদার) করে নেওয়া হয় তবে ডিপজিটর যখন তখন টাকা চাইতে পারবে না। ব্যাঙ্কের তহবিলে যত টাকা পুঁজি আসে তার অধিকাংশ টাকা যদি অনেক দিনের জন্য ধার দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠে তাহলে আমানতকারীরা নিজেরা অংশীদার বলে যখন তখন ২।৪ মাসের ভিতর টাকা তুলে নিবার চেষ্টা করতে পারে না, কাজেই ব্যাঙ্কের তহবিল প্রথম থেকে খুব শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড়ায়। এই রকম অবস্থা হলে সত্যিকার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক খাড়া হতে পারে। কিন্তু সেদিকে আজ পর্য্যন্ত আমাদের নজর যায় নাই।

প্রঃ—বাংলা দেশের সব ব্যাঙ্কই কি মর্টগেজ ব্যাঙ্ক?

উঃ—চিটাগং মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, যা ধান চাউলের ব্যবসার উপর বেশী কাজ করে, তার অবস্থা অন্যরূপ। জলপাই-গুড়ি ব্যাঙ্ক, যা এখন বেড়ে উঠছে তার টাকা পয়সাও আটকে থাকে না। যশোহর লোন কোম্পানীটা মর্টগেজ-ব্যাঙ্ক। ময়মনসিংহ ইষ্টবেঙ্গল কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক যা জুট ও ২।৪টী টিগার্ডেনের জন্য টাকা জোগায় তার টাকাও যেন গতিশীলই বটে। একদম কোনো দু'এক জায়গায় তাহা আটকিয়ে নাই।

প্রঃ—তাহলে বাংলা দেশের মর্টগেজ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে মোটের উপর আপনার পরামর্শ কি? আপনি কি মনে করেন প্রেফারেন্স শেয়ার করানো কঠিন?

উঃ—না কঠিন নয়। ডিপজিটররা টাকা যখন পাবে না, তখন কঠিন নয়। কেহ টাকা পাচ্ছে না।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক খাড়া করবার সময় যদি প্রেফারেন্স শেয়ার ছাড়া যায় তাহলে চলতে পারে?

উঃ—হাঁ পারে।

প্রঃ—তার মানে ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্য শেয়ার-হোল্ডার (অংশীদার)-সংখ্যা বাড়ান। কেহ যদি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করতে চায় এবং তাতে কতকগুলা প্রেফারেন্স শেয়ার হবে, তাহলে বেশী লোক ঐ ব্যাঙ্কে আসতে চাইবে কি?

উঃ—"প্রেফারেন্স শেয়ারে" যদি না আসে তাহলে ডিপজিটের টাকা মর্টগেজে ঢালা উচিত হবে না।

প্রঃ—ক্যাপিট্যাল খুব বড় করে ব্যাঙ্ক সুরু করবার ক্ষমতা বাংলা দেশের আছে কি?

উঃ—না, কারো নাই। কম ক্যাপিট্যাল নিয়ে বেশী ডিভিডেণ্ড মারবে এই উদ্দেশ্যে অনেকে ব্যাঙ্ক করে।

প্রঃ—ক্যাপিট্যাল বাড়াবার যে প্রণালী বলছেন অর্থাৎ প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রী করা, তার সুযোগ এখন কোথায়? যারা ডিপজিট দিয়ে টাকা পাচ্ছে না, তাদেরকে প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডার করে বাঁচিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রথম থেকেই কোনো নতুন ব্যাঙ্কের জন্য তা করা সম্ভব কি? আপনি যা বলছেন তা ত "আপদ্-ধর্ম্ম" গোছের?

উঃ—কেহ চেষ্টা করেনি। তবে মফঃস্বলে স্থানীয় করিৎ-কর্ম্মা আর ব্যবসাবুদ্ধিওয়ালা লোকেরা একত্র হবে যদি চেষ্টা করেন তাহলে আমি মনে করি না এটা একেবারে অসম্ভব। প্রেফারেন্স শেয়ার করতে হলে এই ভাবে করতে হবে,—"৬৷৭ পার্সেণ্ট প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর দিব, তারপর লাভের একটা অংশ দিব সেটা কমিশন।"

প্রঃ—প্রেফারেন্স শেয়ার যদি ক্যাপিট্যালে এসে হাজির হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক ডিপজিটের টাকা পাবে কোথায়?

উঃ—আপনি বলছেন ক্যাপিট্যাল ফাণ্ডে এটা ব্যবহার করতে করতে যদি লকট্ আপ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? লিকুইড ফাণ্ড যেটা আছে সেটা খাটাবে। এখন ব্যাঙ্ক যে বিপদে পড়েছে তাতে তারা শীঘ্র শীঘ্র ডিপজিটরদের ডেকে বলুক, "এই হচ্ছে তোমাদের এবং আমাদের বাঁচবার পথ"। অর্থাৎ এখন থেকে ডিপজিটরেরা মর্টগেজে টাকা না ফেলে প্রেফারেন্স শেয়ারে টাকা দিক। তবে তারা বাঁচতে পারে।

প্রঃ—প্রেফারেন্স শেয়ার শব্দটা জানে এই রকম কত লোক বাংলা দেশে আছে?

উঃ—অতি কম।

প্রঃ—বাংলা দেশে প্রায় ৪০০ লোন অফিস আছে, তাতে টাকাও জুটছে অনেক। প্রেফারেন্স শেয়ার বিষয়ক লাইনে অগ্রসর হওয়া যদি তাদের স্বার্থ হয় তাহলে কোন্ প্রণালীতে চেষ্টা করা যেতে পারে?

উঃ—এদেশে ২টা লোন কোম্পানী মিলে কখনও কাজ করবে না। রেষারেষি থেকে নূতন নূতন লোন কোম্পানীর সৃষ্টি হচ্ছে। এ একটা করছে, দেখাদেখি ও আর একটা করল। এর একটা কো-অর্ডিনেশন একেবারে সম্ভব নয়। ১৯১৫ সন থেকে আমি চেষ্টা করছি। যশোরের যদুবাবু, দিনাজপুরের যোগেন বাবু, ছোটনাগপুরের গিরীন গুপ্ত, রংপুরের হরিনাথ অধিকারী (তিনি অনেক ব্যাঙ্ক কায়েম করেছেন) এঁদের নিয়ে আমি রংপুর, দিনাজপুর, যশোহরে গিয়াছি। প্রায় ২৷৩ বৎসর চেষ্টার পরে এঁরা একটা সেণ্ট্রাল লোন কোম্পানী করতে রাজী হন বড় ক্যাপিট্যাল নিয়ে। এঁরা ক্যাপিট্যাল সাবস্-ক্রাইব করবেন, ডিরেক্টর থাকবেন লোন কোম্পানীর রেপ্রেজেণ্টেটিভ হিসাবে, এই ছিল কথা, কিন্তু এঁরা শেষ পর্য্যন্ত একমত হতে পারেন নি। ১৯১৮ সনে যখন "আর্টিক্‌লস্" আর "মেমোরেণ্ডাম্" নিয়ে

ঘুরতাম তখন দেখলাম কিছুতেই মিল হতে পারে না। সেই অবস্থায় যে সেন্ট্রাল লোন কোম্পানী নাম দিয়াছিল সেই নামে একাকী সামান্ত লোন কোম্পানী খাড়া করি। তার সিগনেটরীর ভিতর যত্নবাবু, যোগেনবাবু, গিরীন বাবু ছিলেন। রেজেষ্টারীর পর মনে হল বাজে কাজ করছি, বন্ধ করলাম। আবার খেয়াল হল একটু একটু কাজ আরম্ভ করলাম। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠল। ১৯২৬ সনে নাম বদলে' দিয়েছি। "বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ" নাম এখন চলেছে।

প্রঃ—"লোন অফিস" নাম বদলালেন কেন?

উঃ—কলিকাতায় লোন অফিস নামটা মানায় না। মফঃস্বলে লোন অফিস নাম যেমন সম্মানজনক কলিকাতায় তা নয়। এখানকার অধিকাংশ লোন অফিস গহনা, ঘড়ি বা ফার্ণিচার বন্ধক রাখে।

প্রঃ—মফঃস্বলের লোন অফিসগুলিকে খাঁটি ব্যবসায়ের কাজে পরিণত করা সম্ভবপর কি?

উঃ—কোনো কোনো কোম্পানী একটু একটু ব্যবসার দিকে যেতে চায়; কিন্তু দেখে শুনে ভয় খায়। এদিকে এখনও বেশী কিছু হয় নি।

প্রঃ—কি উপায়ে এদেরকে ব্যবসায়ের দিকে চালানো যেতে পারে?

উঃ—ব্যবসাদারকে এর ভিতর আসুন। উকীলের হাত থেকে ব্যাঙ্ক ব্যবসাটিকে উদ্ধার করুন, অথবা উকীলদেরকে ব্যবসা বুঝাতে পারলে ভাল হয়। উকীলরা স্থানীয় সম্মানার্হ লোক। এঁরা ব্যাঙ্কে না থাকলে কেহ টাকা জমা দিতে চাইবে না। যারা ব্যবসাদার লোক তারা এ সবের ভিতর ঢুকতে চায় না। পরের টাকার ঝঞ্ঝাট তারা কেন রাখবে? লিমিটেড কোম্পানীর দায়িত্ব তাদের কাগজপত্র এসব তারা বুঝেও না রাখতেও চায় না।

প্রঃ—তাহলে কি উকীলদের উপরেই নির্ভর করতে হবে?

উঃ—আমরা সবাই উকীল ব্যারিষ্টার হচ্ছি, তাদের ছাড়া লোক পাব কোথায়?

প্রঃ—উকীলদের দিয়ে মফঃস্বলে খাঁটি ব্যাঙ্ক চালাতে হলে প্রথম অবস্থায় কোন্ কাজ সুরু করতে হবে?

উঃ—আজকাল যেখানে যে মালপত্রের লেনদেন সেইখানে সেই লেনদেনের কারবারে টাকা সাহায্য করতে হবে।

প্রঃ—ব্যবসার কাগজ-পত্র (কমার্শ্যাল পেপার) মফঃস্বলে কিরূপ চলে?

উঃ—মফঃস্বলে কমার্শ্যাল পেপার কিছু নাই। আছে মালপত্র। ৫০০ মণ চাউল গুদামে তুলছি। তার দাম ৪ হাজার টাকা। তাকে তিন হাজার কি সাড়ে তিন হাজার টাকা দেওয়া যেতে পারে। এর ভিতর আমার একটা নির্দ্দিষ্ট লাভ থাকবে,—ব্যস্! এ সকলের বিশেষ কোন কাগজপত্র নাই। ব্যবসাদারেরা এখনও কাগজপত্রের ভিতর যায় না।

প্রঃ—তাহলে জিনিষগুলি বন্ধক রইল কার তাঁবে?

উঃ—বেপারীর তাঁবে। মালপত্র নিয়ে সারা বৎসর যে এই কাজ করল তাকে বিশ্বাস করে ব্যবসাদার টাকা দিবে। ব্যবসাদার টাকা মেরে দেওয়ার জন্য আসে না, ব্যবসা থেকে কিছু লাভ নিতে আসে।

উঃ—তাহলে উকীলকে বলবেন ব্যবসাদার দেখে টাকা দাও?

উঃ—যারা ব্যবসা করে তাদেরকে মাড়োয়ারীরা বিশ্বাস করে টাকা দেয়; কিন্তু এই সমস্ত মাড়োয়ারী যাদের ভিতর টাকা খাটায় উকীলেরা তাদেরকে দিবেনা। এই জিনিষ উকীলরা সব বুঝে, তারা আহাম্মক নয়। তারা মর্টগেজের ঝঞ্ঝাটই চায়। এতে হরদম লাভের সম্ভাবনা।

প্রঃ—মফঃস্বলে মফঃস্বলে হুণ্ডি কি রকম চলে?

উঃ—হুণ্ডি চলে কলিকাতা সহরে। তবে মফঃস্বলেও কোথাও কোথাও চলে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের কথা বলতে পারি, সেখানে কি রকম ভাবে টাকা আমদানি হয়। কলিকাতা থেকে—ধরুন, কাপড় যায়। বিক্রী করে' সেখানে টাকা জমা হয় অর্থাৎ কাপড়ের মহাজনের হাতে টাকা জমে। পাটের মহাজনকে টাকা দিয়ে সে হুণ্ডি নিয়ে গেল এবং তাহা দ্বারা সে কলি-

কাতার মহাজনকে পেমেণ্ট করল। কলিকাতার যে হুণ্ডি পেল সে পাটের মহাজনের কাছে গিয়ে টাকা নিয়ে এল। এই রকম করে বেশীর ভাগ টাকা আদান-প্রদান হয়। তারপর ধরুন ঢাকাতে আমরা ২০ জন কাপড়ওয়ালা আছি। ২০ হাজার টাকার কাপর এল; সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে এটা কিনবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কতদিনে বিক্রী হবে জানিনা। কলিকাতার অনেকে ধার পায়, ২ দফায় পেমেণ্ট করে, অনেকে বাকী পায়। ঢাকার শুকলাল পোদ্দার কাপড়ের কারবারে বড়লোক। তারা কাপড় দেখে টাকা ফিন্যান্স করে তার জন্য একটা ডিস্‌কাউণ্ট নেয়, নিয়ে মহাজনকে পেমেণ্ট করে। যখন কাপড় বিক্রী হয়ে টাকা আমদানি হয় তখন শুকলাল পোদ্দারের আড়তে তারা টাকা পেমেণ্ট করে। কলিকাতায় সে টাকার হুণ্ডি পাঠিয়ে দেয় যেটা দিয়ে মহাজনেরা টাকা নেয় এবং ব্যাঙ্ক বিজ্‌নেস করে, হুণ্ডি দিয়ে টাকা বের করে নেয়। মফঃস্বলের প্রডাক্টের উপর টাকা দিতে লোন অফিস ও ব্যাঙ্ক খুব রাজী আছে। জমি ছাড়া আরো জিনিষ আছে। মর্টগেজ, রেজিষ্ট্রেসন ইত্যাদির ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে যদি কিছু করা যায় তাহা হইলে ব্যবসায়ের জন্য টাকা নিতে অনেকেই রাজী হয়। আমি বলছি যদি এই লাইনটীকে এমন কোন রকমে সিকিউর করা যায়—মর্টগেজ হবেনা, রেজিষ্ট্রেসন হবেনা এই রকম উপায়ে সিকিউরিটী ক্রিয়েট করা যদি যায় তাহা হলে ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারে। মহাজন মর্টগেজ টর্টগেজ বুঝেনা। আমি ব্যবসা করছি, আমার জায়গা-জমি আছে, ব্যবসা আছে, তাই দেখে মহাজন ১০।২০ হাজার টাকা দিবে; কিন্তু লোন কোম্পানী বলবে দলিলপত্র নিয়ে এস। মর্টগেজের হাত থেকে নিয়ে যদি লিয়েন ক্রিয়েট করা যায় তা হলে সিকিউরিটী লোন যাকে বলে সেটা পেলাম। এই প্রণালীতে উকীল কিছু পেল না মফঃস্বলের লোন অফিস এই কাজ করতে সাহস করবে।

প্রঃ—আপনি মহাজনকে স্বতন্ত্র কিছু করতে বলছেন না, আপনি বলছেন মর্টগেজ করবে না, যে সম্পত্তি আছে সেটা ব্যাঙ্ক স্বীকার করুক।

উঃ—প্রত্যেক ব্যবসাদার ক্রেডিট পাচ্ছে, শুধু উকীল-পরিচালিত লোন কোম্পানী থেকে পায় না। তাকে যেতে হবে মাড়োয়ারীর কাছে। মাড়োয়ারী মাল সাপ্লাই করে, সে মালও মারে, ব্যাজও মারে। আমাদের যারা বিজ্‌নেস করে তারা এই প্রণালীতে কিছু পায় না। বাঙালী উকীল ডিরেক্টরেরা যদি এই প্রণালী ধরেন তাহলে পারেন। পারজোয়ার হোসিয়ারী কলে সব বাঙালী কিন্তু সূতা আসে বোম্বাই থেকে। ফ্যাক্টরী আছে গেঞ্জি তৈয়ারী করে। লক্ষ টাকার গেঞ্জি তারা বিক্রী করে। মাড়োয়ারীর কাছ থেকে টাকা আনতে হয়। টাকা কলিকাতার কোনো লোন কোম্পানীর কাছ থেকে পায় না। মাড়োয়ারীরা ১০।১২ পার্সেণ্ট সুদে টাকা দিবে। উকীল ডিরেক্টরেরা টাকা দিতে প্রাণান্ত বাধা দিবে। মফঃস্বলে চাষ-ব্যবসা চলছে। মাড়োয়ারীরা চাষীদিগকে টাকা দাদন দেয়। তোমার যে মাল হবে সমস্ত আমাকে দিবে, টাকা নাও। মাড়োয়ারীরা না জেনেই টাকা অ্যাড্‌ভান্স করছে। তাতে চাষীদের খরচ চলে গেল। তার সঙ্গে চুক্তি রইল তোমার মাল আমার কাছে বিক্রী করবে।

প্রঃ—তাহলে মাড়োয়ারীর কার্য্যপ্রণালীটা বাঙালী লোন কোম্পানীকে আত্মস্থ করতে হবে।

উপস্থিত জনৈক ভদ্রলোক :—তা পারব না, মাড়োয়ারীরা মোটা লোকসান দেয়। সেটা অন্য সময় পুষিয়ে নেয়।

উঃ—ধরুন ৪০ লক্ষ টাকার ডিপজিট আছে; তার ভিতর ১০ লক্ষ এমন লোককে ধার দেওয়া হয়েছে যা আদায় হবে না। এই লোকসানটা সওয়াও সম্ভব। এসব কথা উকীলের পক্ষে বুঝা কঠিন নয়। উকীলেরা একবার খাঁটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগলে এ জিনিষ ভাল চলবে। মাড়োয়ারীর চেয়েও আমরা ভাল পারব।

প্রঃ—মাড়োয়ারীরা যে প্রণালীতে কাজ করছে সেটা লোন অফিসে আনলে ক্ষতি কি ?

উঃ—ক্ষতি নাই কিন্তু আপনি পারবেন না।

প্রঃ—লোন অফিসের বিজ্‌নেস যদি ব্যাঙ্কে পরিণত করতে হয় মাড়োয়ারীর কর্ম্মপ্রণালী না নিয়ে উপায় কি ?

উঃ—মফঃস্বলের লোক অতিমাত্রায় পুরাতনপন্থী। নতুন পথে আসতে চায় না। এই কর্ম্মপ্রণালীকে মাড়োয়ারীর প্রণালী বলা উচিত নয়। বাঙালীর কর্ম্মপ্রণালীই মাড়োয়ারী নিয়েছে। মর্টগেজ থেকে যে প্রণালীতে বিজনেস গড়ে উঠে সেটা ষ্টাডি করে সেভাবে চলতে হবে। বিজনেস মেথড্ বদলাবে না।

প্রঃ—এক এক জায়গায় এক একটা জিনিষ বেশী হয়। প্রত্যেক জিনিষের মরসুম আছে। কোনো জিনিষ ৩ মাসে কোনো জিনিস ৬ মাসে হয়। বৎসরের বাকী সময়টাতে কি করা যেতে পারে ?

উঃ—এ সম্বন্ধে ২টী প্রণালী আছে—(১) ইন্টার-ব্যাঙ্ক ট্রান্‌জ্যাকশন (২) কোনো একটা সেন্ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউশন কলিকাতায় করে সিজনের যে ফসল সেটার ট্রানজ্যাকশন করা। তার চাইতে সহজ উপায়—ধরুন জলপাইগুড়ির চা নিজেরা যদি ফিন্যান্স করি। লক্ষ লক্ষ টাকা জমতে আরম্ভ করল, কোথায় কোথায় টাকা দিতে হবে নিজেদের লোক দিয়ে ইন্‌ভেষ্টিগেট করা। তাহলে নিজ চোখে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে টাকা দিতে পারি। এখন আমরা টাকা ফেলি কোথায় জানতে পারি না।

প্রঃ—আপনি বলছেন কোনো কোনো ব্যাঙ্ক আপনি অডিট করেন। অডিট বিদ্যাটা কি ?

উঃ—"ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ অ্যাক্ট" অনুসারে বৎসরে অন্ততঃ একবার একটা "ব্যাল্যান্স শীট" (উদ্বর্ত্তপত্র) হবে এবং সেটা অডিটেড্ হবে।

প্রঃ—যে অডিট করবে, সে কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার কি ডিরেক্টর হতে পারে ?

উঃ—শেয়ার-হোল্ডার হতে পারে, অফিশ্যাল ডিরেক্টর হতে পারে না।

প্রঃ—তার কাজ কি ?

উঃ—কাজ হচ্ছে একাউন্টিং। কোম্পানী যে ব্যাল্যান্স শীট তৈয়ারী করবে সেটা খাতাপত্র আর আইন অনুসারে হচ্ছে কিনা, পাওনা টাকা ও সম্পত্তি যা আছে তা ঠিক ঠিক দেখান হল কিনা ইত্যাদি দেখা অডিটরের কাজ।

প্রঃ—এই অডিট কারবার আমাদের দেশে বেশী চলছে কি ?

উঃ—নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক লিমিটেড্ কোম্পানী নিজ হিসাব অডিট করাতে বাধ্য। জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী মাত্রেরই এই নিয়ম। "প্রাইভেট" কোম্পানীর অডিট বাধ্যতামূলক নয়; কিন্তু অনেকে করান। এমন কি পার্টনারশিপ, জমীদারি প্রভৃতি অনেকে অডিট করান। যাঁরা আইনতঃ করাতে বাধ্য নয় তাঁরাও করান। ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় বলে, প্রাইভেট ফারম, দোকান ইত্যাদি অনেকে অডিট করান। কর্ম্মচারীরা শাসনে থাকবে এই জন্য কেহ কেহ জমীদারি অডিট করান। এক রাজা-উপাধিধারী জমীদার তাঁর জমীদারি অডিট করতে আমাকে ৫॥০ হাজার টাকার চুক্তিতে নিয়ে যান, ৫০০ টাকা অগ্রিম দেন। যেখানে যাই খাতাপত্র কিছু পাই না, তখন রাজাকে বল্লাম, "মশায়, কি অডিট করব ? কাগজপত্র যে কিছু পাচ্ছি না।" তিনি বল্লেন "সেজন্য ভাববেন না, অডিট হচ্ছে এই ধারণাটা যে জমীদারিতে ঢুকেছে এতেই আপনাকে যা দিয়েছি তার বেশী লাভ আমার হবে।" ঠিক ঠিক অডিট হয় না। কেন না যথারীতি অডিট করবার পারিশ্রমিক কেহ দেয় না। কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা চায় সই দিয়ে যাই। কারণ আইনে তা চায়। একটা কোম্পানী ভাল করে অডিট করতে হলে যতটা খাটতে হয় তার উপযুক্ত ফিস্ কেহ দেয় না। অবশ্য কম ফিস্ অ্যাকসেপ্ট করা অডিটরের অন্যায়। তবে অডিট সম্বন্ধে গলদ গোড়ায়ই রয়েছে। অনেক স্থলেই দেখা যায়,

পাওনার কিছু অংশ নগদ টাকা আর সব বন্ধকী বা রেহানী পাওনা কিংবা হাত চিঠা। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর আইন বলে কর্জ্জগুলাকে নানা শ্রেণীতে বিভক্তভাবে দেখাতে হবে। যথা,—(১) এমন কর্জ্জ যার জন্য জামিন আছে, (২) এমন কর্জ্জ যার জন্য জামিন নাই, (৩) এমন কর্জ্জ যা আদায় হবার সম্ভাবনা খুব বেশী, (৪) এমন কর্জ্জ যা আদায় হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ইত্যাদি। কিন্তু অডিটরের পক্ষে এইসব জানা নেহাৎ কঠিন। অডিটর শুধু দেখবে তামাদি হচ্ছে কিনা, পার্টির দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা সে জানে না। লোকটা ইনসলভেণ্ট কিনা জানে না। হয়ত লক্ষপতি ২ হাজার টাকার হাণ্ড নোট দিচ্ছে, অথবা সে নিঃস্ব ব্যক্তিও হতে পারে। অডিটর আইনজ্ঞ ব্যক্তি নয়, মর্টগেজের আসল দাম কি অডিটর জানে না। এটা ডিরেক্টরদের ডিউটী। তাঁরা যা ধরিয়ে দেন, অডিটরকে যে লিষ্টি দেন সেই অনুসারে অডিটরকে চলতে হবে। তাঁরা সার্টিফাই করবেন। একটা পার্টিকেও অডিটর জানে না।

প্রঃ—অডিটরের এই সকল দেখবার সুযোগ বিলাতী ব্যবসা-ক্ষেত্রে আছে কি?

প্রঃ—না, নাই। অডিটর শুধু কাগজগুলা মিলিয়ে নেয়। কিন্তু সে-সব বাজারে বিকাবে কিনা তা দেখে না। কাগজপত্র দেখেই সে খালাস। মফঃস্বল ব্যাঙ্কের দশা দেখলেই বুঝবেন। জমির উপর মর্টগেজ চলছে। ৬ বৎসর পরে নালিশ করল, ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাঙ্ক অডিট করতে গিয়ে লেখা হচ্ছে বন্ধকটার অবস্থা ভালই! তারপর দেখুন মর্টগেজের দাম প্রতিমুহূর্ত্তে বদলাইতে পারে। সুতরাং অডিট করা ডকুমেণ্টের মূল্য কিছু নাই।

প্রঃ—আইনতঃ এটাকে শাসন করবার উপায় কি?

উঃ—মর্টগেজে টাকা দিতে হলে একটা ডিক্লেয়ারড্ ভেলুএশ্যন অব্ দি ডিরেক্টরস্ থাকা দরকার। সেজন্য ফরমে ৩টি কলাম থাকবে। কিন্তু এখন বন্ধকওয়ালা কর্জ্জে যা দেখান হচ্ছে তার কোন মূল্য নাই।

প্রঃ—মফঃস্বলের বিজ্‌নেস ক্লাসিফাইড ভাবে দেখাবার সুবিধা আছে কি? বাংলা দেশে শ'চারেক ব্যাঙ্ক আছে। ৩ কোটি টাকার কারবার চলছে। এর কিম্মৎ জানবার কি কি উপায় আছে?

উঃ—তৈয়ারী কাগজপত্র বিশেষ কিছু পাবেন না। খুঁজে বের করে নিতে হবে। ব্যালান্স শীট যা আছে তার ৯৯ পার্সেণ্ট সিকিউরিটী অন্ মর্টগেজেস্। তার থেকে হিসাব করুন দেখবেন ৭৫ পার্সেণ্ট ফাণ্ড ল্যাণ্ড মর্টগেজে পড়ে রয়েছে।

প্রঃ—কোন ব্যাঙ্ক কোন্ লাইনে কত টাকা খাটাচ্ছে তার অঙ্কটা আমি জানতে চাই। ব্যাঙ্ক ব্যবসাটা টেক্‌নিক্যাল হিসাবে কোন্ দিকে অগ্রসর হচ্ছে এইটা আমার জানতে ইচ্ছা। বুঝবার উপায় কি কি?

উঃ—বাংলায় একটা ফরম দেখেছিলাম, একজন মোক্তার লিখেছিলেন। ৩৮ বৎসর আগে বই বেরিয়েছিল। হরিনাথ বাবুর কাছে দেখেছিলাম। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে খোঁজ করলে পেতে পারেন।

প্রঃ—বার চোদ্দ বৎসর আগে ব্যাঙ্ক বিজ্‌নেস খুব সামান্য ছিল, এখন এর প্রসার বেড়েছে। আপনি কি মনে করেন?

উঃ—লোকে এখনও তেমন নিষ্ঠার সহিত এতে যোগ দেয় নি মনে হচ্ছে। নিষ্ঠা থাকলে এটা সফলতার পথে অগ্রসর হতে পারে। সেই লাইনে এই ব্যবসাকে পরিচালিত করা উচিত।

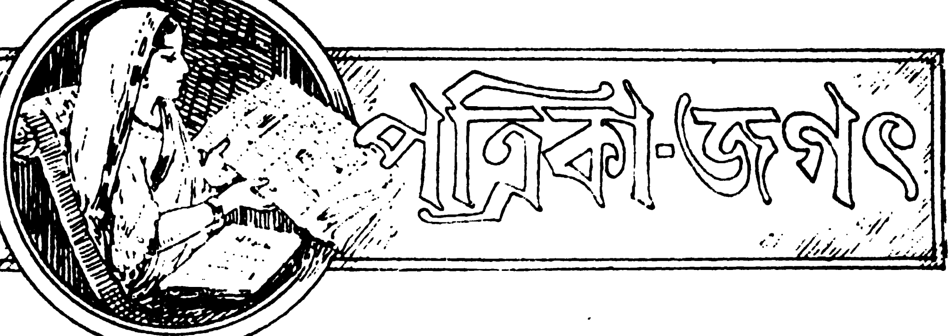
প্রঃ—ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন্ লাইনে আমাদের যাওয়া উচিত তার অনুসন্ধান যদি করতে হয় তাহলে প্রথম দরকার করে বর্ত্তমান অবস্থাটা বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝা। অতগুলি ব্যাঙ্ক, অত ডিরেক্টর ইত্যাদি ইত্যাদি বিবরণ হতে প্রকৃত ব্যাঙ্কের ব্যাপার কিছু বুঝা যায় না, কেবল মূলধনের পরিমাণ, লাভের পরিমাণ বুঝা যায় মাত্র।

উঃ—এই লাইনে যদি যান ব্যাঙ্কের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স করলে তথ্য সকলেই দিবে। উদ্দেশ্য দেখে কেহ

আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। ডিটেল্‌স্ দেওয়ার ক্ষমতা হয়ত অনেকের নাই, কি কি দরকার আপনাকে বের করে নিতে হবে। লিখলে সকলেই সাহায্য করবে।

প্রঃ—একটা বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সম্মিলন কায়েম করে মফঃস্বলের ব্যাঙ্কারদিগকে এক জায়গায় একত্র করা যায় কি?

উঃ—জানবার ইচ্ছা শিখবার ইচ্ছা অনেকের আছে। বৎসরে ২।১ বার সকল ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাকেই কলিকাতায় পাবেন। আমার বিশ্বাস বঙ্গীয় ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশ্বন যদি কায়েম করেন, অনেক মেম্বর পাবেন। কিন্তু কলিকাতায় করলে হবে না। ধরুন এ বাবদ ১৪ হাজার টাকা উঠল। বিলিয়ার্ড পার্টি, চা, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানে সব খরচ হয়ে গেল। মফঃস্বলে তা নাই। তথায় কাঁসার গ্লাস কাছে পেলে কাচের গ্লাস কেউ ছোঁবেন না। সেখানে সতরঞ্চির উপর চাদর বিছিয়ে রেড়ীর তেলের বাতি দিয়েই কাজ সারবেন। হোটেলে কখনও তাঁরা খাবেন না, ভগ্নীপতির ভাগিনার বাড়ীতে থাকবেন। কলকাতায় এসে কোনো রকমে দুটী গরম ভাত পেলেই তাঁরা বর্ত্তে যান। তবে খরচপত্রের জাঁকজমক না করে কল্‌কাতায় যদি একটা সর্ব্ববঙ্গ ব্যাঙ্কিং ইন্‌ষ্টিটিউট বা ঐ ধরণের একটা আড্ডা খাড়া করতে পারেন তাহলে মফঃস্বলেরও উপকার হয় কলকাতারও উপকার হয়, আর বাংলা দেশে ব্যাঙ্ক-বিষয়ক ব্যবসা ও বিদ্যা দুইই উন্নত হতে পারে।



মান্থলি লেবার রিভিউ

(আমেরিকার ফেডারেল দরবার হইতে প্রকাশিত)। ১৯২৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় ২৫০ পৃষ্ঠার মাল আছে। (ক) বিশেষ রচনা (১) আমেরিকান শিল্প কারখানায় ৫ দিনের কর্ম্ম-সপ্তাহ (২) ফোর্ড কারখানায় সপ্তাহে ৫ দিন কাজ (৩) কর্ম্ম-সপ্তাহ হ্রাস ও মজুর-সঙ্ঘ (৪) ৫ দিনের কর্ম্ম-সপ্তাহ ও কতকগুলি মনিবের মতামত (৫) নরফোকের একটি মিউনিসিপ্যাল বাজার। (খ) শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা (১) গমের ফার্ম্মে মজুরদের উৎপাদন-ক্ষমতা। (গ) শিল্প-সম্বন্ধ ও শ্রম-অবস্থা (১) বিলাতে কয়লার খনির বিরোধ (২) মজুরির হার পরিবর্ত্তন। (ঘ) ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ স্যাকচেওয়ান, উরুগুয়া প্রভৃতি স্থানের নিম্নতম মজুরি-হার। (ঙ) শিল্প-দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (১) ১৯২৫ সনের শেষ পর্য্যন্ত লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় দৈব দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা (২) বিনা দুর্ঘটনায় ইমারত নির্ম্মাণ (৩) জাহাজ নির্ম্মাণে নির্ব্বিঘ্নতা (৪) সড়ক-রেলওয়ের অধীন কর্ম্মচারিগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা (৫) ক্যালিফের পেট্রোলিয়াম শিল্প কারখানায় দৈব দুর্ঘটনা (৬) বিভিন্ন দেশের দৈব দুর্ঘটনা (৭) বিলাতের পশম কারখানায় হস্তদ্বারা ভার উঠান (৮) বৃটিশ ফ্যাক্টরীর শিল্প-অবস্থা ও ব্যাধি (৯) নিউজিল্যাণ্ডের শিল্প-কারখানায় দৈব দুর্ঘটনা ১৯২৫ (১০) সুইডেনের রঞ্জন-কার্য্যে শ্বেত সীসা ব্যবহার রহিত করণ। (চ) মজুরদের ক্ষতিপূরণ ও সামাজিক-বীমা (১) মিসোরির শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ আইন রেফারেণ্ডাম কর্ত্তৃক গৃহীত (২) বেকারদের স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থা (৩) হাঁসপাতাল-বিষয়ক মজুরদের ক্ষতিপূরণ সমস্যা (৪) নিউইয়র্কের মজুরদের ক্ষতিপূরণ রিপোর্ট (৫) বিভিন্ন দেশে ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-বীমা (৬) আর্জ্জেন্টীনায় ক্ষতিপূরণ আইন স্থগিত করণ। (৭) ফ্রান্সে মজুরদের সংশোধিত ক্ষতিপূরণ আইন। (ছ) সমবায় (১) বিদেশে সমবায় আন্দোলন—অষ্ট্রীয়া, চেকো শ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, রুশিয়া ও সুইডেন। (জ) শ্রমবিষয়ক সম্মিলনী ও সভাসমিতি (১) আমেরিকান ফেডারেশ্যন অব্‌ লেবারের ১৯২৬ সনের অধিবেশন (২) ট্রেড ও লেবার কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন (৩) ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯২৬ সনের অধিবেশন। (ঝ) বিলাতের কয়লা-ধর্ম্মঘটের সময় মজুর-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান। (ঞ) সরকারী কাজে মেয়েদের ইজ্জৎ (১৯২৬)। (ট) শ্রম আইন ও কোর্টের রায় (১) বেআইনী ধর্ম্মঘট নিবারণের ব্যবস্থা (২) আর্জ্জেন্টীনায় রবিবার বিশ্রাম আইন। (ঠ) শিল্প-বিরোধ (১) যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাসে ধর্ম্মঘট ও লকআউট (বহিষ্করণ) (২) যুক্তরাষ্ট্রের মজুর-দপ্তরের পঞ্চায়েতি কাজ। (ড) মজুরির হার ও কাজের ঘণ্টা (১) ইংলিশ পটারি শিল্প (২) জার্ম্মাণ পটারি শিল্প (৩) প্রকৃত মজুরির আন্তর্জ্জাতিক তুলনা (৪) ১৯১৭ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত চিলীর মজুরির হার (৫) কলম্বিয়ার মজুরি (৬) হ্যামবুর্গের মজুরির হার (৬) পর্ত্তুগালের সরকারী দপ্তরে কাজের ঘণ্টা ও মজুরির ব্যবস্থা। (ঢ) চাকুরীর বাজার (১) যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ শিল্প-কারখানায় ১৯২৬ সনের অক্টোবরে লোক বাহাল (২) ১৯১৪ সন হইতে চাকুরী বাকুরীর পরিবর্ত্তন (৩) যুক্তরাষ্ট্রের রেল সড়কে লোক নিয়োগ ও তাহাদের রোজগার (৪) বিভিন্ন রাষ্ট্রের এমপ্লয়-

মেণ্ট রিপোর্ট (৫) চিলীর কর্ম্মের বহর। (৭) (১) যুক্ত রাষ্ট্রে জিনিষপত্রের দাম ও জীবনযাত্রা-প্রণালী (২) যুক্ত-রাষ্ট্রের ও অন্যান্য দেশের খুচরা ও পাইকারি বাজার-দর।

জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

প্যারিসের শিল্প-দৈনিক। নবীন ইতালির শিল্প-প্রসার সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। এক সংখ্যায় কয়লা-চোঁআনোর কারবার বিবৃত হইয়াছে।

ইতালিতে বিলাতী ও জার্ম্মাণ কয়লা

ইতালি কয়লার খাদে নেহাৎ দরিদ্র। মাত্র দুই অঞ্চলে কয়লা উঠে,—টাস্কানি প্রদেশে আর অষ্ট্রীয়া হইতে নতুন দখল করা ইষ্ট্রীয়া প্রদেশে। মোটের উপর কয়লা উৎপন্ন হয় ফী বৎসর মাত্র প্রায় ১০লাখ টন। কিন্তু ইতালির নানা কারবারে আর গৃহস্থালীতে বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টন। প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি দশ লাখ আমদানি করিতে হয়। ইতালির বিদেশী কয়লা আসে প্রধানতঃ বিলাত হইতে। তাহার পরেই জার্ম্মাণরা ইতালির কয়লা জোগাইয়া থাকে। মার্কিণ মুল্লুক ও অন্যান্য দেশ হইতে মাত্র ৯।১০ লাখ টন আসে। ১৯২৪ সন হইতে ইতালির কয়লার বাজারে প্রবল টক্কর চলিতেছে ইংরেজে আর জার্ম্মাণে।

যাহা হউক, বিদেশী কয়লার উপর নির্ভর করিয়াও ইতালিয়ানরা বিগত আট দশ বৎসরের ভিতর একটা বিপুল কয়লার শিল্প খাড়া করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের মতন ইতালিও আধুনিক শিল্প-হিসাবে ছোকরা মাত্র। ইতালির স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের মতন কাল-কার জিনিষ। কাজেই আর্থিক ইতালির যৌবন-শক্তি বাঙালী ধন-বিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষে যার পর নাই চিত্তাকর্ষক হইবার সম্ভাবনা।

কয়লা-চোঁআনোর কারবার

ভারতবাসী কয়লা-চোঁআনো কারবারটা সাধারণতঃ বুঝে না। নেহাৎ যাঁহারা শিল্প-দক্ষ রাসায়নিক বা এঞ্জিনি-য়ার একমাত্র তাঁহারাই আমাদের দেশে কয়লার ডিষ্টিলেশুন কাণ্ডটার সংবাদ রাখেন। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের আখড়ায় এই কাণ্ডটার খবরাখবর একদম পৌঁছে না। অথচ বর্ত্তমান জগতের আর্থিক উন্নতি বলিলে যতগুলা "গোড়ার কথা" বুঝা যায় তাহার ভিতর কয়লা চোঁআনো অন্যতম। এই কারবারকে এক সঙ্গে নানা দিকে ইতালিয়ানরা পাকড়াও করিতে চেষ্টা করিতেছে। সফলতাও জুটিয়াছে তাহাদের কপালে ঢের। মাত্র তিন চার বৎসরের কার্য্যফলই ইতালিকে কয়লা-শিল্পে ইয়োরোপের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য দেশে পরিণত করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত,—প্রাক্-যুদ্ধযুগে,—জার্ম্মাণরা ইতালির বাজারে বাজারে কয়লা-চোঁআনোর শিল্প-জাত দ্রব্য জোগাইয়া পয়সা রোজগার করিত। আজ এই সকল দ্রব্যের শতকরা ৬৬ অংশ ইতালিয়ান নিজেই স্বদেশে তৈয়ারী করিতেছে। স্বদেশী কারবার ইতালিকে এই লাইনে প্রায় পুরাপুরি স্বাধীন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। আজ নিজ দরকারের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র ইতালি জার্ম্মাণি হইতে আমদানি করিয়া থাকে।

কয়লা-চোঁআনোর শিল্প একটা বড় গোছের "চাবি-শিল্প" (কী-ইণ্ডাষ্ট্রী)। প্রথমতঃ বারুদ বা বিস্ফোটক সম্পর্কিত লড়াইয়ের সরঞ্জাম এই চোঁআনো দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। "এক্স্-প্লোসিভ" "জাতীয় বস্তু তৈয়ারী করিতে হইলে কয়লা চোঁআনোর মাল লাগে বিস্তর। কাজেই এই কারবারে পরের উপর নির্ভর না করার অর্থ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ঢাল আপন কব্জায় রাখা। দ্বিতীয়তঃ, রংয়ের কারবারটাও এই কয়লা চোঁআনো শিল্পেরই অন্যতম সন্তান। রং বস্তুটা শুনিতে নেহাৎ ছেলে খেলার মতন। কিন্তু দুনিয়ার ভিতর এমন কোনো জিনিষ নাই যাহাতে কোনো না কোনো আকারে রংয়ের ডাক না পড়ে। কাজেই রং প্রস্তুত করিবার শিল্পে যে--দেশটা স্বাধীন সে আর্থিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই স্বরাজ-শীল। এইখানে জানিয়া রাখা ভাল যে, রংয়ের কারবারে জার্ম্মাণরা ধরাখানাকে এক প্রকার সরা বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। কোটি কোটি টাকা ঢালিয়াও ইংরেজ আর মার্কিণ সরকার জার্ম্মাণ রংয়ের কারবারকে ঘাল করিতে পারিতেছে না। শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ রংয়ের বেপারীদের সঙ্গে ইংরেজ আর মার্কিণ বেপারীরা রফা করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেছে। যাহা হউক এই রংয়ের কারবারেও ইতালিয়ানরা

"হাত মক্স" করিতেছে আর খানিকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছে। আর্থিক দুনিয়ার এই একটা নতুন ঘটনা।

কোক্,—ইস্পাত গ্যাসের কারখানায় চোঁআনো

অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও কয়লা চোঁআনোর কারবার ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় স্বস্বপ্রধানরূপে চলিতেছিল। "কোককয়লা" প্রস্তুত করিবার কারখানাগুলা তাহাদের অন্যতম। অবশ্য "কোক" কারখানা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। (১) কতকগুলা একদম স্বাধীন। (২) কতকগুলা ইস্পাত-লোহার কারখানার আনুষঙ্গিকভাবে পরিচালিত হয়। যে-যে জায়গায় যে-উদ্দেশ্যেই বা যে-প্রণালীতেই কয়লা হইতে কোক তৈয়ারী হউক না কেন, কয়লার চোঁআনো সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে বাধ্য।

কয়লা চোঁআনো অন্যান্য শিল্পের সঙ্গেও অবশ্যম্ভাবী। ইতালিতেও সেইরূপ হইত। শহরে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের অধীনে গ্যাসের কারখানা পরিচালিত হয়। কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিতে হইলেই চোঁআনোও ঘটিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও সকল শহরেই গ্যাসকারখানার মালিক কর্পোরেশন নয়। স্বাধীন ব্যবসায়ী কোম্পানীও গ্যাস তৈয়ারী করিয়া থাকে। কাজেই ইতালিতেও কয়লা চোঁআনোর কারবার শহরে শহরে অনেকগুলা ছিল।

তাহা ছাড়া কোনো কোনো কারখানায় কয়লা চোঁআনো হইতে উৎপন্ন আসল চিজটার চাহিদা নাই। আসল চিজটার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাচক্রে যে সব কঠিন বা তরল বাজে মাল (বাই-প্রডাক্ট) বাহির হয় সেইগুলা ব্যবহার করিয়া নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কাজে অনেক কোম্পানী মোতায়েন থাকে। কিন্তু সেই সব কোম্পানীকেও স্বাধীনভাবে কয়লা চোঁআইয়া লইতে হয়।

ইতালিতে বিদেশী গ্যাস কোম্পানী

সুতরাং কি কোকের কারবারে, কি লোহার কারবারে কি গ্যাসের কারবারে, কি অন্যান্য কারবারে,—নানা কর্ম্মক্ষেত্রে কয়লা-চোঁয়ানো ইতালির রপ্ত ছিল। এই কারণে ফরাসী আর বেলজিয়াম বেপারীরাও ইতালির নানা শহরে কোম্পানী কায়েম করিয়া গ্যাস কারখানার যন্ত্রপাতি বেচিতে পারিত। বিদেশী ধনীরা অনেক সময়ে ইতালিতে নিজ নিজ পুঁজি খাটাইয়া গ্যাসের কারখানাও খুলিয়াছে। কোন কোনো শহর বিদেশী পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত গ্যাসের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত ছিল। জেনোআ, রোম, ফ্লরেন্স, ভেনিস এবং বলঞা ইত্যাদি ইতালির সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শহরগুলায়ও বিদেশীদের গ্যাস-কারখানা ইতালিয়ানদের ঘরে ঘরে আলো জোগাইয়াছে। এসব বেশী পুরাণা ইতিহাসের তথ্য নয়। যাহা হউক পুঁজিটা আর গ্যাসের যন্ত্রপাতিটা বিদেশী হইলেও কয়লা-চোঁআনোটা ইতালির চৌহদ্দির ভিতরই অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

এই গেল গ্যাস-কারখানার চোঁআনো। কোক-কারখানা ইতালিতে যুদ্ধের পূর্ব্বেও বেশ বাড়িতেছিল। ১৯১৩ সনে ৪৯৮,৪৪২ অর্থাৎ প্রায় ৫ লাখ টন কোক ইতালিতে তৈয়ারী হইয়াছিল। কাজেই এই ক্ষেত্রেও চোঁআনো-শিল্প নেহাৎ নগণ্য নয়। তবে চোঁআনোর "বাই-প্রডাক্ট" ব্যবহার করিবার জন্য যে সকল কারবার থাকা সম্ভব সেই সবের বহর ইতালিতে প্রাক্-যুদ্ধ যুগে উল্লেখযোগ্য ছিল না বলিলেই চলে।

রকমারি গ্যাস-শাসন

গ্যাস কারখানার শাসন ও পরিচালনা সম্বন্ধে ইতালির অভিজ্ঞতা নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমতঃ কোথাও কোথাও বিদেশী কোম্পানীর হাতে ছিল গ্যাসের জোগান। যুদ্ধের পর বিদেশী কোম্পানীর হাত হইতে কোনো কোনো নগর গ্যাস প্রস্তুত করণ কাড়িয়া লয়। এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক জেনোআ। এখানে ফরাসী কোম্পানীর হাতে ছিল গ্যাস কারখানাটা। ১৯২৩ সনে মিউনিসিপ্যাল গ্যাস কারখানা কায়েম হয়।

রোমের দৃষ্টান্ত অন্য রকমের। এইখানে ইংরেজ কোম্পানী ছিল গ্যাসের মালিক। কোম্পানীতে ইতালিয়ানদের টাকও খাটিত। ১৯২২-২৩ সনে এই শহরের কর্পোরেশন একটা মিউনিসিপ্যাল গ্যাসকারখানা কায়েম করিয়াছে। "স্বাধীন" (যদিও বিদেশী) এবং মিউনিসিপ্যাল এই দুই কারখানাই শহরে আজও গ্যাস জোগাইতেছে। এইরূপ

"দ্বৈত" গ্যাস জোগান ইতালির অন্যান্য শহরেও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্যাস জোগাইবার আর এক প্রণালী হইতেছে পুরাপুরি মিউনিসিপ্যাল এবং স্বদেশী। বহু নগর নিজ নিজ গ্যাসের জন্য কারখানা নিজেই চালাইত। কিন্তু কারখানাগুলাকে নবীনতম যন্ত্রপাতি লাগাইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন মালুম হইতে থাকে। ছোট ছোট শহরগুলা নাগরিক ধনভাণ্ডার হইতে সেই পরিমাণ মূলধন খাটাইতে অসমর্থ হয়। কাজেই ক্রমশঃ স্বাধীন কোম্পানীর হাতে গ্যাস কারখানাগুলা আসিয়া পড়িয়াছে। এইগুলা সবই স্বদেশী। ইহাদের পুঁজির অভাব নাই। কিন্তু এই সব ছোট ছোট কারখানা প্রথম হইতেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্জ্জন করিয়া একটা বড়গোছের কেন্দ্রীকৃত ঐক্যবদ্ধ গ্যাস-সঙ্ঘের অন্তর্গত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।

ইতালিয়ান গ্যাস-সঙ্ঘের গোড়া পত্তন

১৯২৩ সনে টাস্কানি প্রদেশের তুরিণ শহরে এক বিপুল গ্যাস-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। মূলধন ১ কোটি লিয়ার। তখনকার দিনে এই পুঁজির দাম প্রায় ২০ লাখ টাকা। কোম্পানীর নাম "সচ্যেতা ইতালিয়ানা প্যার ইল গাস্" (ইতালিয়ান গ্যাস কোম্পানী)।

প্রথমেই "সচ্যেতা" ফ্লরেন্স আর ভেনিসের ফরাসী গ্যাস কোম্পানী দুইটার হাত হইতে গ্যাস জোগানের অধিকার ছিনিয়া লইল। তাহার পর সঙ্ঘটা তুরিণ আর মিলান শহরের স্বদেশী গ্যাস কারখানাগুলার অধিকাংশ "শেয়ার" খরিদ করিয়া ফেলে। লিভর্ণ, ত্রিয়েস্তে ইত্যাদি শহরের গ্যাস-কোম্পানীগুলার অংশও আধাআধির বেশী "সচ্যেতা" নিজ হাতে টানিয়া আনে। উত্তর ইতালির ৩০টা শহরের গ্যাস-জোগান এইরূপে সঙ্ঘের তাঁবে আসিয়া পড়ে।

গ্যাস-সঙ্ঘ তাহার পর রাসায়নিক শিল্পে নাক গুঁজিতে সুরু করে। রংয়ের শিল্পের দিকেই নজর বেশী থাকে। ইতালির সব-সে সেরা কোক-কারখানাগুলার উপরও এক্তিয়ার কায়েম হয়। তুরিণ শহরে "সচ্যেতা এস্প্লদেন্তি এ প্রদত্তি কিমিকি" নামক বিস্ফোটক ও রাসায়নিক কারখানা ছিল। এইটা প্যারিসের এক ফরাসী কারখানার শাখা। ১৯২৫ সনে গ্যাস-সঙ্ঘ তুরিণের কারখানাটাকে উদরস্থ করিয়া বসে, আর তাহার পরেই একটা নতুন বিস্ফোটক-কারখানা কায়েম করে। এই নতুন "সচ্যেতা এস্প্লদেন্তি"র মূলধন ৩ কোটি লিয়ার। এই কারখানা আজকাল কষ্টিক আল্‌কালি তৈয়ারী করার ব্যবসায় প্রসিদ্ধ। গ্যাস-সঙ্ঘের পরবর্ত্তী কীর্ত্তি হইতেছে লিগুরিয়া প্রদেশের ভার্বিলিয়া অঞ্চলে লোহার "পাইরাইট"-ঘটিত বস্তুবিষয়ক কারখানা-প্রতিষ্ঠা। এই কারখানায়ই সাল্‌-ফিউরিক অ্যাসিডও তৈয়ারী হয়। সঙ্গে সঙ্গে "আজোজেন" নামক কারখানা সঙ্ঘের উপরও গ্যাস-সঙ্ঘ কর্ত্তামি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

ইতালির প্রথম ট্রাষ্ট

কোম্পানীটা সংক্ষেপে "ইতাল্‌গাস" নামে পরিচিত। তিনচার বৎসরের ভিতর গ্যাস-সঙ্ঘের পুঁজি ১৫০ মিলিয়ন লিয়ারে (প্রায় ১৷৹ কোটি টাকায়) আসিয়া ঠেকিয়াছে। ১৯২৬ সনের প্রথম দিকে ব্লেয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানী নামক নিউ ইয়র্কের এক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ইতালগাসকে ৫০ লাখ ডলার (১৷৹ কোটি টাকা) কর্জ্জ দিয়াছে। বর্ত্তমানে এই সঙ্ঘের তাঁবে নানা শ্রেণীর "ভারি রাসায়নিক মাল" তৈয়ারী হইতেছে। কয়লার "বাইপ্রডাক্‌ট" "তেজী" অ্যাসিড, আলকালি, ক্লোরিণ-জ দ্রব্য, অ্যামোনিয়া-ঘটিত মিশ্র পদার্থ ইত্যাদি বস্তু এই সমুদয় "ভারি" মালের অন্তর্গত। অপর দিকে "মিহি" কেমিক্যালও হরেক প্রকার ইতাল-গাসের তাঁবে আছে। কৃষি-শিল্পে ব্যবহারোপযোগী বিস্ফোটক তাহাদের অন্যতম। লড়াইয়ের বিস্ফোটক আর এক চিজ। তাহা ছাড়া রং, বার্ণিশ ইত্যাদিও আছে।

ইতালির অন্ততঃ ৫০টা ছোট বড় মাঝারি শিল্প-কারখানা ইতালগাসের তাঁবে চলিতেছে। এইগুলার পুঁজির কম-সে কম আধাআধি অংশ সঙ্ঘেরই সম্পত্তি।

বৎসরে ৬ লাখ টন কয়লা ইতালগাসের কারখানায় কারখানায় খরচ হয়। ২২ কোটি কিউবিক মিটার গ্যাস আর ৩,৪০,০০০ টন কোক এই পরিমাণ কয়লার সন্তান।

১৯২৬ সনের মাঝামাঝি ইতালির আর্থিক জীবনে জার্ম্মাণ-মার্কিণ-ইংরেজ ঢঙের একটা বিপুল "ট্রাষ্ট" প্রথম

দেখা দিল। কয়লা নামক কুদরতী মাল হইতে সুরু করিয়া উপরের দিকে সূক্ষ্মতম রাসায়নিক দ্রব্য পর্য্যন্ত নানা স্তরের শিল্প-বস্তু এক পুঁজি-প্রতিষ্ঠানের তাঁবে শাসন করা ইতালির অভিজ্ঞতায় এই নূতন।

আটপ্রকার বিভিন্ন কারবারের রাসায়নিক সঙ্ঘ

ইতাল্‌গাসের তাঁবে যে সকল শিল্প শাসিত হইতেছে সেইগুলাকে প্রধানতঃ আট বিভিন্ন স্বাধীন কারবারে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই আবার এক একটা বা একাধিক উপ-সঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছে। কারবারগুলার কাজ নিম্নরূপ:—(১) গ্যাস ও কোক প্রস্তুত করা। (২) ইস্পাত-লোহা সম্পর্কিত কোক প্রস্তুত করা। (৩) গ্যাস-কোক কারখানার "বাজে মাল" চোঁআইয়া হাইড্রোজেন বাহির করা আর তাহার সাহায্যে অ্যামোনিয়া-ঘটিত দ্রব্য তৈয়ারী করা। হাই-ড্রোজেন আল্‌গাও বিক্রী হয়। (৪) কয়লার "বাজে মাল" হইতে তেল নিংড়াইয়া লওয়া আর তাহার সাহায্যে ন্যাপ্‌-থালিন ইত্যাদি বস্তু অথবা বিস্ফোটক তৈয়ারী করা। হাইড্রোজেনের মতন কয়লার তেলও আল্‌গা বিক্রী হয়। (৫) কয়লা হইতে রং ও বিস্ফোটক তৈয়ারী করিতে যে সব চিজ "অর্দ্ধপথে" তৈয়ারী হয় সেই সবকে "ইন্টার্মীডিয়েট" বা মধ্যম বস্তু বলে। আনিলিন তেল ও "লবণ", ক্লোরিণ-জ দ্রব্য, বেন্‌জল, ন্যাপথালিন ইত্যাদির অ্যামোনিয়া-মিশ্রিত পদার্থ, সোডিয়াম-সাল্‌ফেট এবং আরও অনেক জিনিষ এইরূপ মধ্যম। এইসব তৈয়ারী করিবার কাজেও কতকগুলা কারখানা মোতায়েন আছে। (৬) রং প্রস্তুত করা। (৭) ওষুধ প্রস্তুত করা। (৮) বিস্ফোটক প্রস্তুত করা।

সঙ্ঘ ক্রমেই বাড়িতেছে। বনেল্লি কোম্পানী রংয়ের ব্যবসায় যোগ দিবার জন্য ইতালগাসের কুক্ষিগত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

মাতৃমন্দির

বৈশাখ, ১৩৩৪,—"সমাজতন্ত্রে নারী-সমস্যা" (শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্ত, এম, এ, পি-এইচ্‌-ডি)।

প্রবাসী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪,"বীরভূমের শর্করা-শিল্প (শ্রীগৌরীহর মিত্র)।

বঙ্গবাণী

বৈশাখ ১৩৩৪, "কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক" (শ্রীধীরেন্দ্রলাল দে)।

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, "বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের প্রভাব" (শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার)।

মডার্ণ রিভিউ

মে, ১৯২৭:—(১) সাম্রাজ্যামি-বিরোধী কংগ্রেস,— ব্রুসেলসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক পরাধীন দেশের সম্মেলন (বকর আলি মির্জা)। (২) আর্থিক হিসাবে কর্ম্মদক্ষতা কাহাকে বলে (শ্রীরজনীকান্ত দাস)।

প্রকৃতি

দ্বৈমাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা, বসন্ত সংখ্যা ১৩৩৩:—

নাইট্রোজেনের আর্থিক কথা

এপর্য্যন্ত নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক উপকারিতা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; এইবার অন্যান্য পার্থিব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্‌। জমির সার রূপে, অনেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য, বিশেষতঃ যুদ্ধবিগ্রহের বারুদ প্রভৃতি আগ্নেয় পদার্থ প্রস্তুতকরণে যবক্ষারদ্রাবক (নাইট্রিক এসিড্‌) ক্ষারিণবাষ্প (এমোনিয়া), সোরা প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি নামক প্রদেশে সোরার যে প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক স্তূপ আছে, তাহাই এ যাবৎ প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ যোগাইয়া আসিয়াছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভেরগারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, চিলি প্রদেশের সোরা প্রতিবৎসর যে বিপুল পরিমাণে খরচ হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই সেখানকার সোরা ফুরাইয়া যাইবে। বিগত যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণি এই সোরার অভাব বুঝিয়াছিল; কারণ

তখন আমেরিকা হইতে জার্ম্মাণিতে সোরা আমদানি বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই জার্ম্মাণির গোলাগুলির বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগাইবার বিশেষ অসুবিধা হয়। জার্ম্মাণির রাসায়নিক পণ্ডিতগণ তখন বায়ুমণ্ডল হইতে কিরূপে সুবিধা-মত নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, এইরূপ একটী কার্য্যকর উপায় বাহির করিবার জন্য মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। অবশ্য যুদ্ধের বহুপূর্ব্ব হইতেই অনেকে এই চেষ্টা করিতেছিলেন। বার্কল্যাণ্ড, হেবার প্রমুখ মনীষিগণ এ বিষয়ে অনেকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময়েই এই প্রচেষ্টা খুব বেশী সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং আজকালকার দিনে যবক্ষারদ্রাবক, ক্ষারিণ বাষ্প প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রচুরপরিমাণে বায়ু-মণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে সংশ্লেষণদ্বারা প্রস্তুত হইতেছে।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে আমাদের বিশেষভাবে কাজে লাগাইবার জন্য যে সকল উপায় এ যাবৎ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আগে আমাদের একটা বিষয় বুঝিতে হইবে। কোন একটা বিশেষ দরকারী জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলে, জিনিষটা যাহাতে যতদূর সম্ভব সস্তায় তৈয়ারী হয় সেটাও দেখা উচিত। বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে অবশ্য কোন দাম লাগে না; বায়ুমণ্ডলে বিনা খরচায় অক্সিজেনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কাজেই এই দুইয়ের সংশ্লেষণ দ্বারা কোন সুবিধামত জিনিষ প্রস্তুত করা যায় কি না, পণ্ডিতগণ প্রথমে তাহারই অনু-সন্ধান করিতে থাকেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ক্রুক্‌স্ সাহেব প্রথমে দেখান যে, যদি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাট্রোজেনকে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বৃত্তাংশের খুব বেশী উত্তাপের মধ্য দিয়া চালনা করা যায়, তবে উভয়ের সংশ্লেষণে আদগ্নমরুত (নাইট্রিক্ অক্সাইড) প্রস্তুত হয়। এই আদগ্নমরুত হইতে সুবিধামত অনেক দরকারী নাইট্রোজেন-যুক্ত জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে। ইহার পরে র‍্যালে, ম্যাক্‌ডুগাল ও হাউল্‌স্, বার্কল্যাণ্ড পলিং, সনহেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ক্রুক্‌সের উদ্ভাবিত এই উপায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

যে সকল দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া নাইট্রোজেন যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে অক্সি-জেনের পর হাইড্রোজেনের দাম কম। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হেবার দেখাইয়াছেন যে, যদি তিন ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ নাইট্রোজেন খুব বেশী চাপে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়া চালনা করা যায়, তবে উভয়ের সংশ্লেষণে ক্ষারিণবাষ্প উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি স্বনামধন্য ক্লড্ ক্ষারিণবাষ্প তৈয়ারী করিবার এই উপায়ের প্রচুর উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরই অঙ্গারক (কার্ব্বন্) সর্ব্বাপেক্ষা কম দামী জিনিষ। কাজেই নাইট্রোজেনের সহিত অঙ্গারকের সুবিধামত সংশ্লেষণ সম্ভব কি না, তাহা লইয়া বিস্তর চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। বার্থেলো, হোয়ার-ম্যান্, বুনসেন্, প্লেফেয়ার প্রভৃতি রাসায়নিক পণ্ডিতের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা এই বিষয়ে অনেকটা সফলকামও হইয়াছেন।

এখন মোটামুটী কথাটা দাঁড়াইল এই—পূর্ব্বে যে আশঙ্কা হইয়াছিল চিলির সোরা ফুরাইয়া গেলে বৈজ্ঞানিক জগতে হাহাকার উঠিবে, সে ভয় এখন একেবারে না হউক অন্ততঃ অনেকটা দূর হইয়াছে। অবশ্য একেবারে সেই আশঙ্কা দূর করিতে হইলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাইবার যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার আরও উন্নতি-সাধন আবশ্যক। তবে এরূপ আশা করা খুবই সঙ্গত যে, জ্ঞানপিপাসু বৈজ্ঞানিকেরা শীঘ্রই এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারিবেন।

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বি,এস-সি

জার্ণ্যাল অব পোলিটিক্যাল ইকনমি

৩৫ বৎসর চলিতেছে। শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান পরিষদ হইতে প্রকাশিত দ্বৈমাসিক। মার্চ্চ ১৯২৭ সংখ্যায় আছে (১) ইতালীতে শিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যাপীঠ (ই, সি, লঙ্গোবার্দ্দি) (২) শ্রম বিরোধের এলাকা (রয়াল মন্টোগোমারি) (৩) বিখ্যাত ওনিদা কমিউনিটি লিঃ প্রতিষ্ঠানের মজুরনীতি (৪) অগ্নি ও জাহাজ বীমার ব্যবসায় টাকা খাটাইবার পক্ষে সরকারী সাহায্য।

সঞ্জীবনী

ভারতে বিদেশী আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়। এ কার্য্যে তিনি দেশীয় লোকের নিকট আশানুরূপ সাহায্য পান নাই। তথাপি পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত না হইতে তাঁহার চেষ্টার সুফল দেখা গিয়াছে। রামমোহন যে প্রভাত আনয়ন করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ তার প্রথম সূর্য্যালোক।

পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া তথাকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে,—ভারতের জাতীয়তা যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই সঙ্কল্প ছিল। জাপান কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করিল, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম বিদ্যা নহে;—শিল্পবিদ্যা ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য ভারতবাসীর বিদেশে যাওয়া আবশ্যক এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন।

আজ ভারতের অপরাপর প্রদেশের মত বাংলা দেশেও বাঙ্গালীর নিজের অনেক শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান আছে। এদেশের যুবকেরা ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, জার্ম্মাণিতে ও জাপানে যাইয়া এঞ্জিনিয়ারিং, সূত্র প্রস্তুত প্রণালী, রংয়ের কাজ, চামড়া তৈয়ারী, সাবান, কাগজ, কাচ, চীনামাটির বাসন, এনামেল প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ১৯০০ সনের আরম্ভে এই উৎসাহ খুব দেখা গিয়াছিল। ২৫ বৎসর পরে আজ সেই উৎসাহ,—সেই কর্ম্মশক্তি,—সেই দৃঢ় সঙ্কল্প আর নাই।

হিন্দুদের পুরাণে আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত চিরশত্রু দৈত্য-পুরীতে যাইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেও কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হন নাই। হিন্দুগণ এই উপাখ্যানের মর্ম্ম না বুঝিয়া জাতি ও ধর্ম্মভয়ের ভয়ে সমুদ্রযাত্রা বর্জ্জন করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

১৯০০ সনের কিছু পূর্ব্ব হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ অধিক ২০ বৎসর মধ্যে অনেক বাঙ্গালী যুবক বিদেশ হইতে কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা দেশের সুসন্তান। আজ তাহাদের জন্য বাঙ্গালার গৌরব বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯২০ সনের পর হইতে এই গৌরব-গিরিচূড়া ক্রমশঃ উন্নত না হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এক নূতন বাধা উপস্থিত। দেশের মধ্যে এইরূপ ভাব প্রচার করা হইয়াছে যে বিদেশে আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নাই। ঘরেই আমাদের সব আছে। বিদেশীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন নাই। সকলেই বুঝিতে পারেন, স্বদেশ-ভক্তির অপব্যাখ্যানেই এইভাব বদ্ধমূল হইয়াছে।

অনেক যুবক স্কুল কলেজ ছাড়িয়াছে, বিজ্ঞানের চর্চ্চায় আর তাহাদের আগ্রহ নাই। বিদেশীর উদ্ভাবিত কল কব্জাকে তাহারা সয়তানের অনুচর বলিয়া নিন্দা করে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল কি? বাংলার শিল্প-বাণিজ্য, ভারতের কৃষি-সম্পদ বিদেশীর হস্তগত হইতেছে।

ইংরাজ ধনীব্যক্তিরা পঞ্জাবে ও মান্দ্রাজে নূতন কাগজের কল স্থাপন করিল। সুইডেনের সওদাগরেরা কলিকাতায় আসিয়া দিয়াশলাইয়ের কারখানা খুলিল। জাপানীরা বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল ক্রয় করিয়া লইল। আর ভারত-বাসীরা, বাঙ্গালীরা বলিতেছে, "আমরা অন্তর্ম্মুখীন হইয়াছি, আমাদের ঘরেই সব আছে"। মূর্খতা আর কারে বলে!

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় মহৎ ব্যক্তির চেষ্টায় কলি-কাতায় একটী শিল্পবিদ্যা-পরিষৎ গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া শিল্পশিক্ষার্থী ভারতীয় যুবকগণকে বিদেশে পাঠাইতেন। সেই সমিতির সাহায্যে বহুসংখ্যক ভারতীয় যুবক গত কয়েক বৎসরে বিদেশ হইতে নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন। সেই সভা এখন মৃতপ্রায়; ধনী ব্যক্তিরা নূতন ভাবে প্রণোদিত হইয়া আর তাহাতে চাঁদা দেন না। এখনও কত শত যুবক আগ্রহের সহিত তাঁহাদের নিকট প্রার্থী স্বরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহারা প্রার্থীদিগকে নিরাশ করিতে বাধ্য হন।

১৯০০ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ২০ বৎসরে বাংলা-দেশ যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল। গত ছয় বৎসরে ততোহধিক পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী যদি এখনও তাহার অবস্থা বুঝিতে না পারে, তবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহার দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।



আর্থিক দুনিয়ার গতি

"জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা" নামক ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান মাসিকের সম্পাদক জর্জ্জ্য মর্ত্তারা "প্রস্পেত্তিভে একনমিকে,—১৯২৭" (১৯২৭ সনে আর্থিক দুনিয়ার গতি) নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। মর্ত্তারা নব-প্রতিষ্ঠিত মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রোম ইতালির রাষ্ট্র-কেন্দ্র বটে, কিন্তু শিল্পকেন্দ্র, ব্যবসা-কেন্দ্র, ব্যাঙ্ক-কেন্দ্র হইতেছে মিলান। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা দুই বৎসর পূর্ব্বেও মিলানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলনা। যাহা হউক, ইতালির অন্যতম প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত মিলানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহাল আছেন।

ইতালিয়ান অধ্যাপক মর্ত্তারা

মর্ত্তারার বইটা মিলানের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ৫০০। মূল্য ৪০ লিয়ার, "আর্থিক দুনিয়ার গতি" নামে এক একখানা বই ফী বৎসর বৎসরের প্রথম দিকে বাহির হইয়া থাকে। ১৯২৭ সনের বইটা সপ্তম সংখ্যা। যে বৎসর বইটা বাহির হয় সেই বৎসর দুনিয়ার কোথায় কিরূপ আর্থিক লেনদেন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহাই বিবৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করাই এই গ্রন্থের মতলব। কিন্তু মোটের উপর অতীতের কাহিনীই এই রূপ রচনার প্রাণ।

তবে নেহাৎ ফটোগ্রাফ বলা চলেনা। কেননা কোনো এক মুহূর্ত্তের তথ্য প্রকাশ এই গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। সিনেমার ছবিতে যেরূপ মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত মূর্ত্তি পায়, মর্ত্তারার "প্রস্পেত্তিভে" সেইরূপ ঘটনা-ধারার চিত্র। এক কথায় ইতিহাস বলিলেও দোষ হইবে না। কিন্তু অনেক লোকেরই,—বিশেষতঃ কেজো লোকের,—ভবিষ্যৎটা আন্দাজ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হয়। সেইসব লোকের পক্ষে "আর্থিক দুনিয়ার গতি"র মতন বই যার পর নাই মূল্যবান্। অবশ্য প্রায় প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীরই ফলন সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বাধা থাকা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আর্থিক জগতে প্রায়ই যখন-তখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিতেছে।

এই রয়্যাল অক্টেভো আকারের ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী ঢাউস বইটার ভিতর মর্ত্তারা ১৮টা বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ১৮টা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের সূচী নিম্নরূপ :—(১) শস্য, (২) মদ, (৩) অলিভ তেল, (৪) ফলমূল ও শাকসব্জী, (৫) রেশম, (৬) কৃত্রিম রেশম, (৭) তুলা, (৮) হেম্প্, (৯) পশম, (১০) কয়লা, (১১) কেরোসিন তেল, (১২) জল-বিজলী, (১৩) লোহা, (১৪) তামা, (১৫) জাহাজ, (১৬) রেল, (১৭) রাজস্ব, (১৮) টাকাকড়ি। বাদ পড়িয়াছে লোকজনের বহির্গমন। অধিকন্তু মজুর ও মজুরি সম্বন্ধে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নাই।

রেল, রাজস্ব আর টাকাকড়ি বিষয়ক প্রবন্ধ তিনটা একমাত্র ইতালিয়ান তথ্যের সংগ্রহ। অন্যান্য প্রবন্ধগুলা গোটা দুনিয়ার কথায় ভরা।

কেরোসিন তেলের শিল্পবাণিজ্য

কেরোসিন তেল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রণালী বিবৃত করিলে গ্রন্থের কাঠামটা বুঝা যাইবে। মর্ত্তারা বলিতেছেন যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কেরোসিন তেল পরিষ্কার করিবার পর প্রধানতঃ আলো জ্বালিবার কাজে তাহা ব্যবহার করা হইত। আর পরিষ্কার করিবার পর তেলের যে গাদ পড়িয়া থাকে

তাহা লাগানো হইত চাকা, কলকব্জার প্যাঁচ ইত্যাদি লোহার জিনিষ পালিশ করিবার জন্ত। কিন্তু বিগত আড়াই দশকে বিজলী বাতি কেরোসিনের আলোর ঠাঁই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আলোর জন্ত কেরোসিনের চাহিদা কম। কাজেই একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে ঘটনাচক্রে মোটর গাড়ীর আবিষ্কার ও চলা-চল কেরোসিনের ইজ্জৎ বাঁচাইয়া দিয়াছে। এদিকে ডীজেল এঞ্জিনের তেল-ক্ষুধা জবর। সঙ্গে সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তেলের গাদগুলাকে উচ্চ শ্রেণীর মালে পরিণত করা হইয়াছে। আর এই মাল ঘর গরম করিবার ষ্টোভ ইত্যাদি যন্ত্রে বেশ ব্যবহারোপযোগী। ফলতঃ সকল দিক্ হইতেই তেলের চাহিদা বাড়িতেছে। বাষ্পের বদলে তেল ব্যবহার করিতে পারিলে এঞ্জিনটার জন্ত কম জায়গা দরকার হয়। এই সুবিধা থাকায় তেলের দিকে সকলেরই টান বেশী।

তুনিয়ায় আজকাল যত কয়লা উঠে তাহার শতকরা ১২ অংশ উৎপন্ন হয় তেল। আর তুনিয়ায় সকল প্রকার কয়লার তাপশক্তি যত তার শতকরা ১৫ কি ১৮ অংশ হইতেছে তেলের। তেল তুনিয়ায় হুহু করিয়া দিগ্বিজয় চালাইতেছে। কেননা ১৯১৪ সনেও,—অর্থাৎ যুদ্ধের সমসমকালে কয়লার তুলনায় তেলের অনুপাত আজকালকার অনুপাতের তিন-ভাগের একভাগ মাত্র ছিল। আটোমোবিল আর উড়ো জাহাজ একমাত্র তেলের উপর নির্ভর করে। তেল লইয়াই বহুসংখ্যক "স্থাবর জঙ্গম" এঞ্জিন চলিয়া থাকে। লড়াইয়ের জন্ত যে সব নয়া নয়া জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে সবই তেলের দাস। আর বাণিজ্য-জাহাজের শতকরা ৩০টা তেলের জোরে চলে।

তেলের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলা বিবৃত করিয়াছেন :—

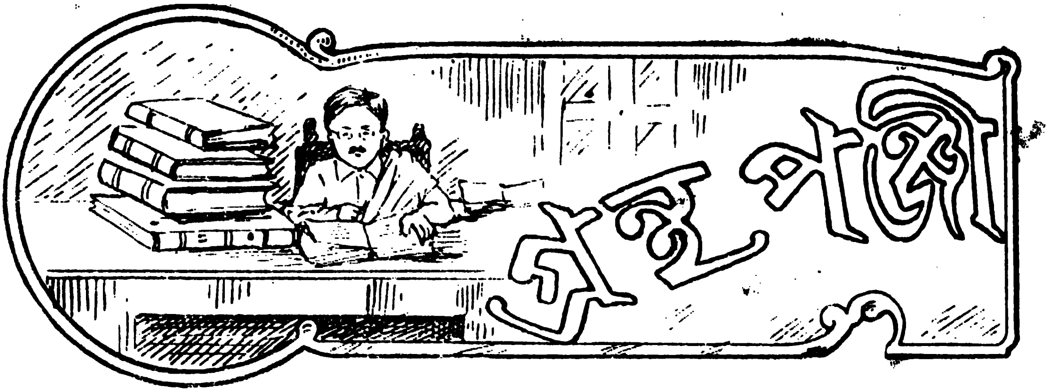
(১) তেলের তুনিয়া,—ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ; শিল্প-বৃত্তান্ত (মার্কিণ, বৃটিশ, ওলন্দাজ ও রুশ তেল-ট্রাষ্টের কথা), তেলের জন্ত লড়াই, ১৯১২—১৯২৬ পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ (৪ কোটি ৮৪ লাখ টন হইতে ১৪ কোটি ৭১ লাখ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে) ; তেল-উৎপাদক দেশের বিবরণ ; আন্তর্জ্জাতিক তেলের বাজার, তেল খরিদ করে কোথায় কাহারা ; বাজার--দর ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত।

(২) ইতালির তেল-সম্পদ,—ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক কথা, কবে কত উৎপন্ন হইয়াছে ; বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ; বাজার-দর।

(৩) বর্ত্তমান অবস্থা—(ক) তুনিয়ায়। তেল পরিষ্কার করিবার কৌশলে উন্নতিসাধিত হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প পরিমাণ তেল উৎপন্ন হইলেও নানাবিধ কাজ অনেক পরিমাণে একসঙ্গে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তেলের উৎপত্তি মেক্‌সিকো ছাড়া—অন্যান্ত দেশে বাড়তির দিকেই দেখা যাইতেছে। অপর দিকে কয়লার দাম কমিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু কয়লার ব্যবহার সম্বন্ধেও উন্নতি হইয়াছে। কাজেই কয়লার সঙ্গে লড়াইয়ে তেলের সুযোগ এখন কিছু কম।

(খ) ইতালিতে। তেলের ক্ষুধা বাড়তির দিকে।

মর্ত্তারার মগজে লোহা, তামা, রেশম, পশম ইত্যাদি সব চিজ সম্বন্ধেই এইরূপ বিশ্ব-বোধ ঘর করিতেছে। এই ধরণের তথ্যনিষ্ঠ তুনিয়া-মন্থনকারী ধনবিজ্ঞানসেবক ইতালিতে অনেক। বাঙালী সমাজে এইরূপ গবেষক দেখা দিবে কবে ?



"ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল কম্বিনেশ্যন ইন ইংল্যাণ্ড" (বিলাতে শিল্প-সঙ্ঘ), ফিট্‌স্‌জেরাল্ড, পিটম্যান কোং, লণ্ডন। ১৯২৭, ১০ শি ৬ পে।

স্থল্ কস্ত দি প্রছুৎসিয়নে নেই চিক্লি একনমিকি" (আর্থিক চক্রে মাল-উৎপাদনবিষয়ক খরচপত্রের প্রভাব), প্যাপি, সাম্পাওলেজি কোং, রোম ১৯২৬, ৭·৫০ লিয়ার।

"লেজ্‌ ওরিজিন দ্য কাপিতালিস্‌ম্ মডার্ণ" (আধুনিক পুঁজি-নীতির প্রারম্ভ), সে, কোলাঁ্যা কোং, প্যারিস, ১৯২৬ ৮ ফ্রাঁ।

"ডিস্‌ক্রিমিনেটিং ডিউটীজ্‌ অ্যাণ্ড দি আমেরিকান মার্চ্যাণ্ট মেরীণ" (পক্ষপাতমূলক শুল্ক-ব্যবস্থা ও মার্কিণ বাণিজ্য নৌবহরের উপর তাহার প্রভাব),—ম্যাক্‌ফোয়েল, হ্বিলসন কোং, নিউইয়র্ক ১৯২৬, ২.৪০ ডলার।

"সাজ্জ্য ইস্তর্ণ আলা দিস্ত্রিবিউৎসিয়নে দেল রেদ্দিত নেল আগ্রিকলতুরা ইতালিয়ান।" (ইতালিয়ান কৃষিকর্ম্মে ফসলের ভাগাভাগি বিষয়ক প্রবন্ধ),—তাস্‌সিনারি, ফেদারাৎ-সিয়নে ইতালিয়ানা কন্‌সর্‌সি আগ্রারী, প্যাচেন্‌ৎসা, ১৯২৬; ২৫ লিয়ার।

"আন্নুয়্যার দ' লা লেজিস্‌লাসিঅঁ দ্য ত্রাহ্বাই" (মজুর-বিষয়ক আইনকানুনের বর্ষপঞ্জী),—দুই খণ্ড, বেলজিয়ামের ব্রুসেলস নগর হইতে প্রকাশিত, ১৯২৫-২৬, ৪৫ ফ্রাঁ।

"ষ্টাডি অব্‌ দি ওশেন্‌স" (সাগর-গবেষণা)—জনষ্টোন, আর্ণল্ড কোং, লণ্ডন, ১৯২৬, ৮+২১৫পৃষ্ঠা, ১০ শি ৬ পে।

"এলেক্‌ট্রিৎসিটেট ইম ব্যর্গবাও" (খনির কাজে বিজলী),-ফিলিপ্পি, গ্র্যুইটার কোং, বার্লিন, ১২+৩৯০ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ১১.৫০ মার্ক।

"রেলওয়ে-ইয়ারবুক" (রেলপথের বর্ষপঞ্জী), রেলওয়ে পাব্‌লিশিং কোং, লণ্ডন, ৬৩+৫৮৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ৫ শি।

"ডাস হোল্‌ৎস ইন টেক্‌নিক উণ্ড গেহ্বের্বে" (শিল্প-বাণিজ্যে কাঠের ঠাঁই),—জর্ডান, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌স্‌, লণ্ডন, ১৯২৬, ১০ শি।

"লে রেশের্শ দ' পেত্রোল আঁ ফ্রাঁস" (ফ্রান্সে কেরোসিন-গবেষণা), পাহ্বলোহ্বস্‌কি, শার্ল কোং, প্যারিস, ১০৩ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ১২ ফ্রাঁ।

"লাণ্ডেস্‌ এলেক্‌ট্রিৎসিটেটস্‌-হ্বের্কে" প্রাদেশিক (ব্যাহ্বেরিয়াণ) বিজলী-কারখানার কথা (বিদ্যুৎ-এঞ্জিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলরের ৭০ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে তাঁহার সহযোগী এঞ্জিনিয়ারদের উৎসব-রচনা),—ওলডেনবুর্গ কোং, মিউনিক, ১১+৩৯৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ২৬ মার্ক।

"সাইকলজি ইন অ্যাডভার্টাইজিং" (বিজ্ঞাপন-প্রচারে চিত্ত-তত্ত্ব), পফেনব্যার্গার; শ কোং; শিকাগো ১৯২৫।

শিলঙ্ হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক লিমিটেড্

শ্রীআনন্দকিশোর দাস, এম, এ, বি, এস-সি, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী

শিলঙ্ খাসিয়া জন্তিয়া পাহাড়ের প্রধান শহর এবং আসামের রাজধানী। ইহার উচ্চতা প্রায় পাঁচহাজার ফুট এবং আব্‌হাওয়া স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম।

দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি শৈলাবাস হইতে এই শহরের একটু পার্থক্য আছে। ইহা আসামের লাটের কেবল গ্রীষ্মাবাসই নহে, পরন্তু ইহা তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান বটে। সেই হিসাবে ইহার মূল্য অপরাপর শৈলাবাস হইতে অনেক বেশী; কারণ 'সেক্রেটেরিয়েট' ও অন্যান্য প্রধান প্রধান অফিস এখানে স্থায়ী ভাবে আছে এবং তত্তৎ বিভাগের কর্ত্তাদেরও ইহা স্থায়ী বাসস্থান।

শহরটীর লোকসংখ্যা ১৬।১৭ হাজার। স্থানীয় অধিবাসী প্রধানতঃ খাসিয়া জাতি; তবে কার্য্যব্যপদেশে বহু ইংরেজ, বাঙালী, আসামী ও মাড়োয়ারীও এই স্থানে বাস করেন। অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী শহরটির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। তন্মধ্যে সেণ্ট এডমাণ্ডস্, পাইন মাউণ্ট, লরেটো প্রভৃতি স্কুলগৃহ, প্যাস্তয়র ইন্‌ষ্টিটিউট ও রবার্টস্ সাহেবের হাঁসপাতাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাস্তাঘাট অতি সুন্দর ও পরিষ্কার এবং পাইন বৃক্ষের সারি উহাকে আরও সুদৃশ্য করিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এহেন শহরটিকে ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বেও সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে একরকম ডুবিয়াই থাকিতে হইত। মফঃস্বলস্থ ছোট ছোট শহরের ন্যায় অতি দূরে দূরে স্থাপিত আলোক-স্তম্ভগুলি হইতে যে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি নির্গত হইত, তাহা অন্ধকারকে দৃশ্যমান করিত মাত্র।

সন্ধ্যার পর চলাফিরা করা বড়ই অসুবিধাজনক ও বিপদসঙ্কুল ছিল। লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে জানাইতেছেন যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এখানে বেড়াইতে আসিয়া একদা সন্ধ্যার অনতিকাল পরে জেলরোড্ নামক পল্লী হইতে লাবান পল্লীতে যাইতে বাধ্য হন। পথে তিন চারিবার পদস্খলিত ও অঙ্গবিশেষ আহত হওয়ার পরে জনৈক সহযাত্রীর বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। শহরটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া রাস্তা সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর উঁচুনীচু ও রাস্তার পাশে পাশে বেশ চড়াই উৎড়াইও আছে। কাজেই অন্ধকারে চলাফেরা দস্তুরমত বিপদসঙ্কুল সন্দেহ নাই। লেখকের দশায় পড়িয়া জনৈক বিশিষ্ট আগন্তুক নাকি অর্দ্ধ মাইল পরিমাণ রাস্তা চলিবার জন্য জনৈক লণ্ঠনধারী পরিচালককে দশটাকা পরিমাণ বখশিস্ দিয়াছিলেন।

এই জাতীয় অসুবিধা সর্ব্বসাধারণেরই ছিল এবং ইহা দূরীকরণ-মানসে সময় সময় শহরটীকে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করার প্রস্তাব হইয়াছে। শহরের চারিপাশে বেশ বড় বড় জলপ্রপাত আছে। তাহাদের শক্তিদ্বারা তাড়িত সৃষ্টি করতঃ শহরটীকে আলোকিত করার প্রস্তাব ১৯০৫ সনে হয়। তখন আসাম পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাড়িত-বিশেষজ্ঞ মিষ্টার মিয়র নামক জনৈক সাহেব গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে বিডন জলপ্রপাত ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ড জরিপ করিয়াছিলেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ঐ জলপ্রপাত-শক্তি দ্বারা শহর আলোকিত করায় একটী প্রণালী লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই আসাম পুনরায় বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় যথোচিত অর্থ ও উদ্যমের অভাবে উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

তৎপর দীর্ঘ ষোড়শবর্ষমধ্যে এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আর কোনো চেষ্টা হয় নাই। অবশেষে ১৯২১ সনে কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের উদ্যোগে "শিলঙ্ হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক লিমিটেড" নামে একটী যৌথ কোম্পানী গঠিত হয় এবং ১৯২৩ সনের অক্টোবর মাসে বৈদ্যুতিক আলোকে

শহরটী সর্ব্বপ্রথম আলোকিত হয়। যাঁহাদের উত্তম ও অধ্যবসায়ে এই অনুষ্ঠানের সুচনা হয়, তন্মধ্যে কোম্পানীর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুত রমানাথ দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাসিয়া পাহাড়ের মাইলেস নামক ষ্টেটের খাসিয়া রাজা ও কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ও উদ্যোক্তাদের অন্যতম।

পুলিশ বাজারের নিম্নে ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ধাতব যন্ত্রাদি প্রস্তুতের একটী ছোট কারখানা আছে। ইহা জনৈক খাসিয়া কারিগর-কর্ত্তৃক পরিচালিত। কারখানার পার্শ্বদেশ দিয়া একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জলস্রোত প্রবাহিত। এই জলস্রোতের শক্তির সাহায্যে কারখানার "মোটর" পরিচালিত করিবার খেয়াল রমানাথ বাবুর মাথায় ঢুকিলে তিনি ঐ কারিগরের সহায়তায় একটী ছোট জল টার্বাইন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পটী কার্য্যে পরিণত করেন। ক্রমে উহা অপেক্ষা শক্তিশালী "উম-খ্রা" নামক জলস্রোতের সহায়তায় হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিকের বর্ত্তমান বাঁধের সন্নিকটে একটী যাঁতার কল স্থাপিত করেন। এবং সেই সময় হইতেই ঐ শক্তির সাহায্যে তাড়িত সৃষ্টি করিয়া উহাদ্বারা বিবিধ প্রকার কুটীর-শিল্প সৃষ্টি করার স্বপ্ন রমানাথবাবুর মনে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ তাড়িতালোকে শহরটীকে আলোকিত করার কথাও তিনি ভাবিতে থাকেন। তদভিপ্রায়ে বিডন জল-প্রপাত ও তাহার পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডের মালিক, পূর্ব্বোল্লিখিত মাইলেস্ ষ্টেটের রাজার সহিত, এই বিষয় আলোচনা করিয়া ঐ সকল জমির বন্দোবস্ত লওয়া হয়। কেন না, উপরি উক্ত "উম-খ্রা" জলপ্রবাহই বিডন জল-প্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে বটে,—কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কল্পিত ঐ বিরাট অনুষ্ঠানকে কার্য্যে পরিণত করার অর্থবল রমানাথ বাবু বা খাসিয়া রাজা কাহারই ছিল না। ঘটনাক্রমে এই সময়ে কলিকাতার ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় শিলঙ্ আসেন ও এই অনুষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভে তাঁহার প্রচুর আর্থিক সহায়তাই কোম্পানীটীকে স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবসর-প্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বার্ণেল হারবার্ট ও ডাক্তার রায়ের ব্যারিষ্টার ও এঞ্জিনিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়ের কথাও এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সহায়তা ও সহানুভূতি ভিন্ন এই প্রয়াস ফলপ্রদ হইত কিনা সন্দেহ। ইহার সূচনায় ব্যারিষ্টার রায় মহাশয় আইনের বিবিধ প্রকার জটিল সমস্যা সমাধান করেন। এঞ্জিনিয়ার রায় মহাশয় পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও সর্ব্ববিধ যন্ত্রাদি সুকৌশলে যথাস্থানে স্থাপিত করেন। ডাক্তার রায় মহাশয় তদীয় সঞ্চিত প্রচুর অর্থ কর্ম্মীদের হস্তে ন্যস্ত করেন। খাসিয়া রাজা জমির বন্দোবস্ত ও আলোক-স্তম্ভের নিমিত্ত প্রকাণ্ড খুটীগুলি সংগ্রহ করেন। মেজর হার্ব্বার্ট দীর্ঘকালের সরকারী কার্য্যের অভিজ্ঞতার ফলে রাজকীয় বাধাবিঘ্ন সকল দূর করেন। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র স্যান্যাল প্রথম হইতেই কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় এবং উৎসাহে কাজটী দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সর্ব্বোপরি রমানাথবাবু তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও বিরাট অধ্যবসায় দ্বারা সমগ্র অনুষ্ঠানটীর কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহাদের সমবেত চেষ্টা ও অভিজ্ঞতা এই অনুষ্ঠান-টীকে সফলকাম করিতে যেভাবে সহায়তা করিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উম-খ্রার জল-প্রবাহই বিডন জল-প্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। উম-খ্রা একটী পার্ব্বত্য নদী। পোলো খেলার মাঠের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া প্যাস্ত্যুর ইন্‌ষ্টিটিউট ও জেল রোডের মধ্যদিয়া উহা প্রবাহিত। তৎপর শিলঙের পশ্চিম প্রান্তে, গৌহাটী-শিলঙ রাস্তার উপরিস্থিত মৌলাই-সেতুর নিম্নদেশ বাহিয়া উহা হইতে প্রায় ১২।১৩ শত ফুট দূরে পর্ব্বতবিশেষের শীর্ষদেশে ইহা জলপ্রপাতে পরিণত হইয়াছে এবং তথা হইতে ৮।৯ শত ফুট নিম্নে পর্ব্বতের সানুদেশে পতিত হইয়াছে। এই পতনশীল জল-স্রোতের শক্তি আহরণ করিয়া উহাকে উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই জন্যই উহাকে "হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক" কহে।

পূর্ব্বোক্ত মৌলাই সেতুর অনতিদূরে একটী সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধিয়া উম-খ্রা জলস্রোতটীকে প্রথমতঃ দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে এবং একটী "সুইজগেটের সাহায্যে ঐ বিভক্ত জল-

স্রোতের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধারাকে নালা ও নলের সহায়তায় প্রবাহিত করিয়া বিডন জলপ্রপাতের তুঙ্গদেশে আনয়ন করিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত কৃত্রিম পুষ্করিণীতে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নালাটী কেবল প্রস্তরময় প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত এবং ১২ শত ফুটে উহার গড়ান্ সর্ব্বত্র ছয়ফুট মাত্র। কাজেই ইহা নির্ম্মাণ করা কতবড় আয়াসসাধ্য ব্যাপার বিশেষজ্ঞমাত্রেই তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তৎপর ঐ পুষ্করিণী হইতে নির্দ্দিষ্ট আয়তনের নল দ্বারা ঐ বারিধারা এককালে ছয়শত ফুট নীত হইয়াছে। এই জলধারার চাপে জল টার্ব্বাইন নামক যন্ত্রটীর চাকা প্রতি মিনিটে অন্যূন সহস্রবার বিঘূর্ণিত হইতেছে। ইহা দ্বারাই জলস্রোতটীর প্রচণ্ড শক্তির পরিমাণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। এই শক্তি যথোচিত যন্ত্রাদির সাহায্যে ক্রমে তাড়িতশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মূল যন্ত্রাগারে এই তাড়িত-শক্তির পরিমাণ ২২০০ "ভোল্ট।" তথা হইতে তারের সহযোগে ঐ তাড়িতপ্রবাহ শহরের বিভিন্নস্থানে শাখা যন্ত্রাগারগুলিতে নীত হইয়াছে এবং তথায় যন্ত্রাদির সহযোগে পূর্ব্বোক্ত তাড়িত-শক্তিকে দশমাংশে ক্ষীণ করিয়া শহরের সর্ব্বত্র উহা দ্বারা বৈদ্যুতিক আলোকমালার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

১৯২১ সনের জুলাই মাসে এই কোম্পানী গঠিত হয় এবং ১৯২২ সনে সরকার হইতে লাইসেন্স (অনুমতি পত্র) পাওয়া যায়। অনুমান ঐ সনের মে মাসে কার্য্যারম্ভ হয়, এবং ১৯২৩ সনের অক্টোবর মাসে শিলঙ্ শহর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সর্ব্বপ্রথম আলোকিত হয়। কার্য্যারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮ মাস কাল মাত্র সময় লাগিয়াছিল। শত শত বাধা অতিক্রম করিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ একটী অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিতে পারা কম শ্লাঘার কথা নহে।

এই কোম্পানী সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ইহার প্রথম উদ্যোক্তাগণ কোম্পানী গঠনকালে পারিশ্রমিক এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, কার্য্যকালে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন।

মোট ২৩ মাইল পরিমিত রাস্তা এই কোম্পানী প্রদত্ত আলোকে আলোকিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে মাত্র ১৯৮টী সাধারণ বাতি ছিল, সে স্থলে অধুনা ৫০০টী বাতি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটী খুব উজ্জ্বল ৫০টা মোমবাতির আলো দান করে। শহরের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। আলোক-স্তম্ভ, তার, বাতি প্রভৃতির সমস্ত খরচ কোম্পানী বহন করিয়া মাসিক ৪৲ চারি টাকা মাত্র হারে সমস্ত রাত্রি আলো দান করিতেছে।

হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর প্রধান শত্রু ভূমিকম্প। যদি প্রবল ভূমিকম্পে কখনো জলস্রোতের ধারা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় অথবা যন্ত্রাগার সকল ধ্বংস হয়, তবে এককালে সমস্ত শহর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। গৃহাদি নির্ম্মাণ ও যন্ত্রাদি স্থাপন বিষয়ে ঐরূপ আশঙ্কার প্রতিষেধক সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা কোম্পানী অবলম্বন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের সুবিধা এই যে, সূচনা-খরচ কিছু অতিরিক্ত হইলেও বাষ্প বা তেল চালিত এঞ্জিনের ন্যায় ইহাতে কয়লা বা তেলের খরচ নাই। কাজেই কোম্পানীর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাড়িত-শক্তির মূল্য ক্রমে হ্রাস পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

কোম্পানীর মূলধন ৫ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ৪,৪৬,৭৭০৲ পরিমাণ টাকার অংশ বিক্রী হইয়াছে এবং ৩,১১,৯৮৯৲ টাকা আদায় হইয়াছে। বিগত তিন বৎসর যাবৎ কোম্পানী ডিভিডেণ্ড দিতেছেন। আলোকের পরিমাণ শহরে যতই বৃদ্ধি পাইবে, লাভের পরিমাণও ক্রমশঃ সেই হারেই বাড়িতে থাকিবে।

শিলঙের মতন ঠাণ্ডা জায়গায় পাখার দরকার কখনই হয় না। কাজেই দিবাভাগে তাড়িত শক্তির সম্পূর্ণ অপচয় হইতেছে। ছোট ছোট কত প্রকার কুটীর-শিল্প তাড়িত-সাহায্যে চলিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নে কয়েকটীর মাত্র উল্লেখ করা গেল। ইহাদের প্রত্যেকটী অতি অল্প মূলধনে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

১। কাঠ সংক্রান্ত যে-কোনো শিল্প চালানো সম্ভব; ইহার জন্য অত্যধিক যন্ত্রাদির দরকার হয় না।

২। সুরকীর কল।

৩। আটা, গম ইত্যাদি তৈয়ারী করা।

৪। চাউলের ও তৈলের কল ইত্যাদি।

এক কথায়,—আজকাল যে-যে কারখানায় বাষ্প ব্যবহৃত হইতেছে তাহার প্রত্যেকটায়ই বিদ্যুৎ লাগানো যাইতে পারে। আশা করা যায় কর্ম্মী যুবকবৃন্দ তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহকে শিল্প-বাণিজ্যের দিকে প্রধাবিত করিবেন তাহা হইলে নিজেরা স্বাধীনভাবে এবং গৌরবের সহিত জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন এবং এই দেশীয় কোম্পানীরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। এই প্রকার কুটীর-শিল্পের জন্য কোম্পানী সামান্য মূল্যে তাড়িত-শক্তি সরবরাহ করিতে সততই প্রস্তুত। কারণ আলোক দান করা অপেক্ষাও কুটীরশিল্পের উন্নতি উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। শুনিতে পাই ইয়োরোপের আল্পস্ জনপদে এমন জলপ্রপাত নাই, যাহার শক্তি আহরণ করা না হইতেছে। তথায় সামান্য মূলধনের দ্বারা সূত্রধর, কর্ম্মকার, রুটিওয়ালা, কুম্ভকার ইত্যাদি কুটীর-শিল্পীরা নিজ পুত্রকন্যাগণের সহায়তায় গৃহে বসিয়া যথেষ্ট রোজগার করিতেছে। এইদিকে আমাদের লোক-জনের চক্ষু খুলিলে আমরাও বিদ্যুতের সাহায্যে নবীনতম প্রণালীতে গৃহস্থালী ও আর্থিক জীবন চালাইতে সমর্থ হইব।

ডিরেক্টরগণের নাম

১। কর্ণেল ডি, হার্ব্বার্ট

২। মাইলেসের খাসিয়া রাজা

৩। তুলসী চন্দ্র গোস্বামী

৪। সুবোধ চন্দ্র রায়

৫। রীড সাহেব

৬। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়,

৭। সাধন চন্দ্র রায়, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার

৮। রমানাথ দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর্

শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে পত্রব্যবহার করিলে পাঠকেরা ব্যবসা-সংক্রান্ত অন্যান্য কথা জানিতে পারিবেন।

তারকাঁটা শিল্পের সংরক্ষণ

শ্রীরামচন্দ্র বসাক

১। সংরক্ষণের উপযোগিতা

তারকাঁটার মুখ্য প্রয়োগ মালপত্র বাক্সবন্দী করতে। সে হিসাবে অপরাপর শিল্পকে এর মুখ চাইতে হয়। তা ছাড়া করোগেট টিন ছাইতে, সিমেণ্ট জমানোর কাজে, ঢালাই-য়ের জন্য ছাঁচ গড়তে, জুতা ছাতা ও ছবির কাজেও কাঁটার বিশেষ আবশ্যক। এই সমস্ত প্রয়োজনে ১২০০০ টন কাঁটা ৫০লক্ষ টাকার অধিক মূল্যে প্রতি বৎসর বিদেশ হতে ভারতে আনীত হয়। সুতরাং তারকাঁটা সংরক্ষণের যোগ্য পাত্র।

তদ্ব্যতীত, তার নির্ম্মাণ বিশেষভাবে আমাদের উপস্থিত শিল্পাবস্থার উপযোগী। অনেক দিন পূর্ব্ব হতে শিল্পসাধনা করে পাশ্চাত্য জাতি প্রভূত অর্থ, নৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতা অর্জ্জন করেছে। যৌথপ্রথায় অপরিমিত অর্থব্যয়ে ভূরি-উৎপাদন তাদের শিল্পতন্ত্রের বীজমন্ত্র। স্মরণাতীত কাল হতে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পের পক্ষপাতী। তাহাই আমাদের চিরন্তন প্রথা ও মজ্জাগত প্রবৃত্তি। তারই অনুসরণে ও প্রকাণ্ড কারখানায় বহু শ্রমিকের সমাবেশে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে ফিস্‌ক্যাল কমিশন্ দেশের স্থানে স্থানে নাতিবৃহৎ কারখানা স্থাপনের সমর্থন করেছেন। তারকাঁটার নির্ম্মাণ তার বিশেষ উপযোগী, কারণ, :—

প্রথমতঃ, ইহাতে উচুদরের নৈপুণ্যের মোটেই দরকার হয় না। একথা ট্যারিফবোর্ড মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। প্রক্রিয়াটা অনায়াসে ও অচিরে যে-কোনো কারিগর আয়ত্ত করে নিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের যে মূলধনের অভাব তারও এতে নিতান্ত অল্প আবশ্যক। ভারতের বাৎসরিক কাঁটার খরচ ১২০০০ টন। বৎসর ৬০০ টন মাল উৎপাদনের উপযোগী সমস্ত সরঞ্জাম মায় কারখানা গৃহের খরচ ১৫০০০৲ টাকার অধিক নয়। আর তেমন ২০টী কারখানার বর্ত্তমানে যথেষ্ট অবসর আছে।

তৃতীয়তঃ, কারিগরের অসঙ্গত সমাবেশের আশঙ্কা মোটেই নাই। গোটা ভারতের মোট খরচার কুলান কর্‌তে ৩৪ শতের অধিক লোক দরকার হয় না।

টারিফ বোর্ড বলেছেন, রীতিমত সংরক্ষিত হইলে ছোট ছোট কাঁটার কারখানায় দেশ ছেয়ে ফেল্‌বে।

২। সংরক্ষণের প্রয়োজন ও উপস্থিত ব্যবস্থা

দেশী তারকাঁটার জন্য কিছুদিন যাবৎ পাওয়া যাবে না। বিদেশী তার ও বিদেশী কাঁটার দামের প্রভেদ এত অল্প যে তা থেকে কাঁটা কেটে বিদেশী কাঁটার দামে বেচা যায় না। কাজেই, কাঁটার উপর প্রতি টনে ৬০৲ টাকা রক্ষণ-শুল্ক বসান হয়েছে।

৩। এই ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত হয়নি

একটা বাজে তর্কের দোহাই দিয়ে কাঁটার উপাদান তারের উপরও ৬০৲ টাকা দাদন বসান হয়েছে। ফলে, বিদেশী তার ও কাঁটার দামের পার্থক্য পূর্ব্বের মতই অপর্য্যাপ্ত রয়ে গেছে, সুতরাং কাঁটার দাদন কোনও কাজেরই হয় নি।

৪। সমান দাদনের কারণ ও তাহার খণ্ডন

দু'টো অনুমানের উপর নির্ভর করে তার ও কাঁটার উপর সমান দাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল। (ক) জার্ম্মাণি তুল্য মূল্যে তার ও কাঁটা বেচে, আর (খ) তার কারণ জার্ম্মাণিতে টুক্‌রা ফেলা তারে কাঁটা হয়।

সম্প্রতি অবধারিত হয়েছে, জার্ম্মাণির তার ও কাঁটার দামে ২০৲ টাকার ইতরবিশেষ আছে। তবে এই কুড়িটী টাকায় কাঁটা কাটার পুরো খরচ কুলায় না। টুক্‌রা তারে কাঁটা কেটে এই অসংকুলানের পূরণ করা যে সম্ভব নয় তা বোর্ডকে বাধ্য হয়ে স্বীকার কর্‌তে হয়েছে, কেননা, কাঁটার মোট উৎপাদনের অতি নগণ্য অংশমাত্র সেরূপে জন্মাতে পারে, আর তাতে খরচাও বেড়ে যায়।

অগত্যা বোর্ড নূতন কারণ ধরে বসেছেন—ভূরি উৎপাদন আর তার ও কাঁটার একসঙ্গে নির্ম্মাণ।

ভূরি উৎপাদনে পড়্‌তায় অনেক সময় সুসার হয় বটে; কিন্তু কাঁটার মত সর্ব্বতোভাবে শ্রমনিরপেক্ষ শিল্পে সে কথা ষোলআনায় খাটে না। কারণ এতাদৃশ ক্ষেত্রে পড়্‌তার সমস্ত খরচগুলা উৎপাদনের সমানুপাতে বেড়ে যায়। আর টুক্‌রা তারের কথা না টেঁকাতে তার ও কাঁটার একত্র নির্ম্মাণের সুসারটাও লোপ পেয়েছে। বেলজিয়াম, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এ দু'টো প্রথাই পূর্ণমাত্রায় বাহাল আছে, কিন্তু কেহই জার্ম্মাণির মত সস্তায় কাঁটা বেচতে পারে না।

৫। জার্ম্মাণির কৃতিত্ব

জার্ম্মাণির কৃতিত্ব তার বহির্ব্বাণিজ্যনীতিতে। সকল জিনিষই সেখানে এত অত্যধিক উৎপাদিত হয় যে, তার অধিকাংশ স্বদেশে কাটে না। কাজেই, কাঁটার মত আর সকল জিনিষই তাকে পড়্‌তার অপেক্ষা কম দামে বিদেশে বেচতে হয়। তাতে যা ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করার জন্য সেখানে প্রত্যেক শিল্পকে আশ্রয় করে এক একটি শিল্পসঙ্ঘ স্থাপিত রয়েছে। নিজের শিল্পোৎপন্ন সামগ্রী রপ্তানির জন্য পদার্থান্তরের প্রস্তুত-কারণ দেশে বিক্রয় করবার সময় এই শিল্পসঙ্ঘ হতে মূল্যের কিয়দংশ বাট্টা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে কাঁটার নিমিত্ত তারের দামের বাট্টা টন প্রতি ১৬৲ টাকা। এই ১৬৲ টাকা আর কাঁটার দামের আধিক্য যে ২০৲ টাকা, দুয়ে মিলে কাঁটার খরচ পোষায় ৩৬৲ টাকা। বোর্ডের হিসাবমত ভারতে এই খরচা ৪০৲ টাকা। তাহলেই এই বাট্টা প্রথাই জার্ম্মাণির সস্তায় কাঁটা বেচার যে একমাত্র কারণ তাতে সন্দেহ নাই।

৬। কাঁটার উপর বেশী দাদনের যৌক্তিকতা

সুতরাং এই কৃত্রিম প্রথার প্রতিষেধ করবার জন্য তারের অপেক্ষা কাঁটার উপর বেশী দাদন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আর যে কারণে সমান দাদন দেওয়া হয়েছিল তাও যখন টিঁকিল না, তখন ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সমীচীন মৌলিক ব্যবস্থা যে উপাদান পদার্থের উপর দাদন বসালে

উৎপন্ন দ্রব্যের উপর তার অধিক দাদন বসাতেই হবে, তার ব্যতিক্রম করা কোনমতেই চলে না।

৭। বোর্ডের আপত্তি

(ক) জার্ম্মাণি বাট্টা-প্রথা ছাড়্‌বে না আর কস্মিন্‌কালেও কাঁটার উপর দাদন তুলে দেওয়া যাবে না।

জার্ম্মাণি এতদিন যে অবাধে এই প্রথা চালাতে পেরেছে তার কারণ, ঘর পর কেহই তাতে প্রবল আপত্তি তোলে নি। সম্প্রতি জার্ম্মাণিতে এই প্রথার বিরুদ্ধে শক্ত আইন জারি হয়েছে। আর জার্ম্মাণির বিদেশী ক্রেতারাও ইহার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণির পণ্যের উপর মোটা কর বসিয়েছে এবং নিজেদের দরকার মেটাবার বিপুল আয়োজন করেছে। বাধ্য হয়ে জার্ম্মাণিকে সাধের প্রথা ত্যাগ করতেই হবে।

(খ) সস্তার কারিগর ছাড়া কাঁটা নির্ম্মাণের দ্বিতীয় সুবিধা নাই।

বছর দুই পূর্ব্বে বোর্ড বড় গলা করে বলেছিলেন—"সুবিধা অনেক। যথা, মূলধনের অল্পতা, নৈপুণ্যের অপ্রয়োজন এবং কাট্‌তির প্রাচুর্য্য।"

(গ) লোক প্রতিপালন ও নৈপুণ্যলাভের অবসর অল্প।

ইংলণ্ডেও কাঁটার কাজে ৪০০ শতের অধিক লোক নাই। তবুও সেখানে কাঁটার উপর রক্ষণকর বসেছে।

নৈপুণ্য সম্বন্ধে বোর্ড পূর্ব্বে বলেছেন, কাঁটার কল শ্রমনিরপেক্ষ হলেও যথেষ্ট পরিমাণে নৈপুণ্যসাপেক্ষ। জামশেদপুরের কারখানায় সেইজন্য আজও একজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন।

(ঘ) জামশেদ্‌পুর কোম্পানী হটে যাবে।

তার কারণ, টাটাকোম্পানীর কাছ থেকে শিক্ পাবে মনে করে জাম্‌শেদ্‌পুর কোম্পানী নিজেদের আস্তানা সেখানেই পেতেছিল। এখন টাটা কোম্পানী শিক যোগাতে না পারায় কলিকাতা হতে শিক্ কারখানায় নিতে হয়, সুতরাং রেলভাড়া ঘাড়ে চেপে গেছে। তার জন্য দায়ী কি কাঁটাওয়ালারা?

৮। উপসংহার

কাঁটার সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও ব্যবস্থাপক সভার হাতে। সভ্যমহোদয়েরা তৎপূর্ব্বে উভয় দিকের উপরিউক্ত যুক্তিগুলি একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচার করে দেখবেন ইহাই অনুরোধ।

অর্থসমস্যা ও শিক্ষাসংস্কার

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম, এ, বি, এল

অমন যে কবি কালিদাস, কথিত আছে যে একদিন তাঁহারও রাজসভায় কবিত্ব শক্তির যথোচিত স্ফূরণ হইতেছিলনা; কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন যে "অন্নচিন্তা চমৎকারা"ই ইহার হেতু। সেদিন কবিবরের হাঁড়ীতে চাল বাড়ন্ত ছিল বলিয়াই কবির প্রতিভাও পড়ন্ত হইয়া আসিয়াছিল। কবিরা সর্ব্বত্রই অন্তর্দ্দর্শী ও স্পষ্টবাদী। সুতরাং প্রাচ্য মহাকবি যেমন অকপটেই অন্নচিন্তার চমৎকারিত্ব স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই পাশ্চাত্য কবি গ্রেও সমান মুক্তকণ্ঠেই উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইসব কবিবাক্য সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই অল্পাধিক পরিমাণে বাস্তব সত্যেতে প্রতিফলিত হইতে দেখা গেলেও, আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশে ও বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত অথবা তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজের পক্ষে ইহার সত্যতা যেরূপ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি হইতেছে তাহাতে এবিষয়ে আর কোন সংশয়ের অবকাশ পর্য্যন্ত থাকেনা।

আমি এই প্রবন্ধে অন্নসমস্যার ব্যাপক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিনা; বর্ত্তমানে আমাদের দেশের এই উৎকট সমস্যার উৎপত্তির মূলীভূত কারণ কি কি; কি কি

ঘটনার পুঞ্জীভূত সমাবেশে এই অবস্থায় আমরা আসিয়া উপনীত হইয়াছি ; এবং কি কি প্রণালী ও পদ্ধতির অনুসরণ করিলে ইহার একটা সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে—সমগ্র ভারতীয় সমাজের, এমন কি সমস্ত বঙ্গীয় সমাজের দিক্ দিয়া এবিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে অনেক বিবেচনা ও বিচার করিবার আছে ; অতবড় বিষয়ের অবতারণা এই স্থলে করিবার অবকাশ নাই। শুধু বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমাজের দিক্ হইতে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিতে কাহাদিগকে বুঝা যায় সে সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না, কারণ অল্পাধিক অস্পষ্ট হইলেও মোটামুটি একটা ঠিক ধারণা এবিষয়ে আমাদের সকলেরই একপ্রকার আছে, এবং সেই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই এই প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতে পারে। অবশ্য এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা যে একেবারে স্থির ও অনড় হইয়া আছে তাহা নহে। আজ যাহাদিগকে সাধারণতঃ ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করা হয় না দু'দিন বাদে হয়ত তাহারা ভদ্রলোকের কোঠায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে উপস্থিত হন। এবং তাহার বিপরীতও ক্বচিৎ ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। মোটামুটি আভিজাত্য, শিক্ষা ও অর্থশালিতা এই তিনেরই অল্পাধিক সমাবেশে এই তথাকথিত ভদ্রলোকের উৎপত্তি। এই তিন উপাদানের মধ্যেও আবার প্রথমোক্ত দুইটিরই প্রাধান্য বেশী লক্ষিত হয় ; এবং এই দুইটীর মধ্যেও তারতম্য করিতে গেলে দেখা যায় যে, শিক্ষার উপরই "ভদ্রস্থতা" বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের ভিতরে ঐতিহাসিক কারণে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ভিতরেই শিক্ষার প্রচার হইয়াছে বেশী। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—ইহারাই বহুকাল হইতে বিদ্বান্ শ্রেণী বলিয়া পরিচিত। ইহার কারণ সকলেরই সুবিদিত। হিন্দুসমাজ যে আচার ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে আবদ্ধ তাহাতে ব্রাহ্মণ সমাজে যে বিদ্যাবত্তা ও লেখানুশীলনের বেশী প্রচার হইবে, এবং তৎকারণে বংশ-পরম্পরাক্রমে ও আবেষ্টনের প্রভাবে ব্রাহ্মণসমাজ অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণধী এবং মেধাবী হইবে ইহাত একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলিলেও চলে। এবং কতকটা কম পরিমাণে হইলেও, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজেও এই একই কারণে মানসিক উৎকর্ষ ও অনুশীলন অধিক। মুসলমান-আধিপত্যের সময়েও এই তিন-শ্রেণী হইতেই বহুল পরিমাণে রাজকর্ম্মচারী ও লিপিকুশল কেরাণীর উদ্ভব হইত। এবং তারপর যখন বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ-আধিপত্যের সূত্রপাত হইল ও তৎসঙ্গে ইংরাজীতে অভিজ্ঞ কেরাণী ও রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগ হইতে লাগিল, এবং সেই রকম লোক পাইবার জন্য ইংরাজী শিক্ষার গোড়া-পত্তন হইল, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের এই নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা ছিল বলিয়াই এই নবশিক্ষার প্রথম সুযোগ ও সুবিধা তাহারাই আয়ত্ত করিয়া লইল। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে সেই পরিমাণ লেখাপড়ার প্রচলন ছিলনা বলিয়া ও মুসলমান সমাজে নবপ্রচারিত শিক্ষার প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল বলিয়া, ইহারা সে পরিমাণে এবং তত শীঘ্র সেই সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই ; এবং পারে নাই বলিয়াই তাহারা অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে। সেই অনুন্নতি হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর ও মুসলমানসমাজ এখনও পুরাপুরি ভাবে দূর করিতে পারে নাই। কাজেই সুশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর যেসব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন সে সব বৃত্তিতে তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে। আজ যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধবহ্নিতে সমস্ত প্রদেশ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল কারণও মুসলমান সমাজের এই ঐতিহাসিক শিক্ষাবিমুখতা ও তজ্জনিত অনুন্নতি এবং হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের ভিতরেও যে বিদ্রোহ ভাব কতকটা লক্ষিত হইতেছে তাহারও অন্যতম কারণ ইহাই। অবশ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও অল্পাধিক পরিমাণে আছে বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক, হিন্দু-সমাজের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষার উত্তরাধিকারের ফলে এবং ইংরাজী শিক্ষাকে তাঁহারা অত্যন্ত অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, শিক্ষিত সমাজ বলিতে যাহা বুঝি, হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীই তাহার মেরুদণ্ড। বিগত শতাব্দ ধরিয়া বাঙ্গালায় যে সমস্ত আন্দোলন, যে সমস্ত সমবেত প্রচেষ্টা, যে সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের কীর্ত্তি। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আনন্দমোহন বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ যে মনীষিবৃন্দ বিগত শতাব্দ ধরিয়া জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে ধর্ম্মে সাহিত্যে বিজ্ঞানে রাজনীতিতে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন ও ভারতে বরেণ্য হইয়াছেন ইঁহাদের সকলেই হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণী হইতে উদ্ভূত। এবং ইহা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই, কারণ শিক্ষা ও অনুশীলন এই শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসারও এখন বাড়িয়া গিয়াছে; মুসলমানসমাজ ও হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর, যাহারা স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত ছিল, তাহারাও শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইতেছে; এবং তাহার ফলে শিক্ষিত সমাজের পরিধি দিনের পর দিন বিস্তৃততর হইতেছে; এবং তথাকথিত ভদ্রলোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। যাহারাই দুই এক পুরুষ কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতেছে ও সহরে আসিয়া শিক্ষিতজনোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এবং আচারেব্যবহারে পোষাকেপরিচ্ছদে আদবকায়দায় উচ্চশ্রেণীর অনুসরণ করিতেছে তাহারাই এক পুরুষে না হউক দুই পুরুষে "ভদ্রলোকের" পদবীতে আরোহণ করিতেছে। নাগরিক সভ্যতার তুমুল স্রোতের ভিতরে পড়িয়া তথাকথিত নিম্নস্তরের লোক আপনাদের বিশিষ্টতা ও জাতব্যবসা হারাইয়া মসীজীবী ও সার্ট-কোট-কোঁচাধারী "ভদ্রলোক" বনিয়া যাইতেছে। এবং এই বিপুলপুষ্ট ভদ্রলোকশ্রেণী দিনের পর দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে এবং অল্পাধিক পরিমাণে ইংরাজীশিক্ষার অধিকারী হইয়া শিক্ষাভিমানীর চিরপ্রচলিত বৃত্তিগুলির প্রতি স্বভাবতঃই ধাবমান হওয়াতে বর্ত্তমানে একটা উৎকট সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যখন শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল, যখন উচ্চশ্রেণীর লোকের ভিতরেও ইংরাজীশিক্ষা অতি অল্প লোকেই অনুশীলন করিত, তখন সেই সব শিক্ষিত লোক সহজেই যে রাজকার্য্য পাইত অথবা ডাক্তারী, ওকালতী, মাষ্টারী, প্রফেসারী, কেরাণীগিরি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষাসাপেক্ষ বৃত্তিতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্তু বর্ত্তমানে যখন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যা সহস্র গুণ বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু মনের সেই প্রাচীন সংস্কার ঘুচিয়া যায় নাই যে উপরিলিখিত বৃত্তিগুলিই শিক্ষিত ভদ্রলোকের বিশিষ্ট ও সম্মানিত ভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায়—চাকুরী ও "ভদ্রলোকী" বৃত্তির গণ্ডী যখন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অথচ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে হাজার হাজার ম্যাট্রিকুলেট ও গ্রাজুয়েট পাস করিয়া বাহির হইতেছে—তখন অর্থনীতির চিরন্তন জোগান এবং চাহিদার বিধি অনুসারে অর্থের বাজারে যে গ্রাজুয়েট ও শিক্ষিতের দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে, এবং একজন যদি বা ঐ সব পন্থায় অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয় আর ৯৯৯ জন যে বিফলমনোরথ হইয়া বিষণ্ণ ও ভগ্নহৃদয়ে কোনপ্রকারে অতিকষ্টে কাল কাটাইবে, তাহাতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যে ইস্কুল কলেজের পড়ার ফলে পাস করিয়া বাহির হইলেই একটা ভাল চাকুরী জুটিয়া যাইত, একটা বড় উকীল বা বড় ডাক্তার হওয়া যাইত এবং সারা জীবন স্বচ্ছন্দভাবে থাকিয়া বংশধরদিগের জন্য প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রয়াণ করা যাইত, সেই ইস্কুলকলেজেরই তাদৃশ শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পাস করিয়াও যখন ২৫৲।৩০৲ টাকা মাসিক বেতনের কোন কর্ম্ম যোগাড় করিতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় এবং অনেক সময় পাওয়াই যায় না এবং তথাকথিত সম্মানিত স্বাধীন ব্যবসায় ওকালতী ও ডাক্তারীতেও সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ত তখন সে শিক্ষাপদ্ধতির উপরে এবং মোটামুটি ভাবে আমাদের আবেষ্টনের উপরেই একটা ধিক্কার ও বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবং স্বভাবতঃই লোকের মনে হয় যে, শিক্ষাপদ্ধতিই সেকেলে হইয়া গিয়াছে, এখন আর ইহাদ্বারা কাজ চলে না: চাকুরী, ডাক্তারী ওকালতী প্রভৃতি মামুলী যে কয়েকটা বৃত্তি অবলম্বনে সুবিধা করিয়া দিবার জন্য শিক্ষা প্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যই যখন

সিদ্ধ হইতেছে না, যখন অন্য জীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে নচেৎ বাঁচিয়া থাকিবার আশা নাই, তখন শিক্ষাপদ্ধতিকেও সেই নূতনতর উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে, শিক্ষার আমূল সংস্কার করিতে হইবে। তাই আজ নানাবিধ বৃত্তিশিক্ষার (ভোকেশ্যনাল এডুকেশ্যন) নূতন নূতন পরীক্ষার (এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট) জন্য দেশের শিক্ষিত সমাজ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন ধীরভাবে বিচার্য্য প্রথমতঃ এই যে কিপ্রকারে শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত হইলে এই কঠিন অর্থসমস্যার সমাধান হইতে পারে, এবং দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাসংস্কার দ্বারা কতটুকুই বা সমাধান সম্ভব। আমার বিবেচনায় এই দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন অপেক্ষাও গুরুতর এবং ইহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে শুধু শুধু চেঁচামেচিই সার হইবে, এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাসংস্কারের ফলে সমস্যার আশানুরূপ লাঘব না দেখিয়া আমরা অবসন্ন ও নিরাশ হইয়াই পড়িব। কাযেই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্যক্ আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রশ্ন হইতেছে এই, শিক্ষাপ্রণালী জাতির অর্থসমস্যাকে কিভাবে ও কতটুকু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে? জীবিকা ও অর্থার্জ্জনের উপায় বিবিধ। সমাজের সমস্ত লোকেই কোন না কোন প্রকারে নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতেছে; সব দেশে ও সব কালে ও সব অবস্থাতেই এইরূপ হইয়া থাকে; ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। তবে অবশ্য কেহ বা স্বচ্ছন্দে থাকে, কেহ বা কায়ক্লেশে কোনপ্রকারে কষ্টেসৃষ্টে নিজের ও পরিবারের প্রতিপালন করিয়া থাকে। কোন সমগ্র সমাজ ধরিতে গেলে, অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে এই জীবিকার উপায় কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য, এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে জীবিকার উপায় যাহাকে সচরাচর মাথার কাজ বলা হয় তাহাই,—যাহাকে বাঙ্গালী সমাজে ভদ্রলোকের বৃত্তি বলিয়া ধরা হয়, রাজসরকারে চাকুরী, কেরাণীগিরি, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি। এবং স্বভাবতঃ এই শেষোক্ত জীবিকোপার্জ্জনগুলি শিক্ষিত লোকেরাই অবলম্বন করিয়া থাকে, কারণ অশিক্ষিতের পক্ষে এই ভাবে জীবিকার্জ্জন করা অসম্ভব। যদি কোন একটা অনুপাতের অবতারণা করা যায়, তবে মোটামুটি এই রকম ধরিলে বেশী ভুল হইবে না যে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত লোক শতকরা প্রায় ৯৫ জন ও ভদ্রলোকী চাকুরী বা বৃত্তিতে লিপ্ত লোক শতকরা পাঁচজনের অধিক নহে। অবশ্য সমাজের অবস্থাভেদে ইহার অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে বোধ করি মোটামুটি এই রকমই অনুপাত হইবে। এই বিবিধ বৃত্তির মধ্যে প্রধান প্রভেদ শিক্ষা ও শিক্ষার অভাব নহে, প্রধান প্রভেদ এই যে প্রথমোক্ত বৃত্তি কার্য্যতঃ অসীম অথবা সমাজের জনসংখ্যাদ্বারা সীমাবদ্ধ; কিন্তু শেষোক্ত বৃত্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—সমাজের পক্ষে এই সমস্ত বৃত্তি ও ব্যবসায়ের যাহা প্রয়োজন তাহা অল্পসংখ্যক লোক দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই আহার আবশ্যক, কাযেই আহার্য্য পদার্থের উৎপাদন দরকার; এবং জনসংখ্যা যত বেশী আহার্য্যের পরিমাণও সেই অনুপাতেই বেশী। কাযেই এই আহার্য্য উৎপাদন, একস্থান হইতে অপরস্থানে আহার্য্যের চলাচল করা, প্রভৃতি কার্য্যে অসংখ্য লোকের ব্যাপৃত থাকা দরকার। আহার্য্য ছাড়া আরও অনেক অবশ্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ আছে তাহারও উৎপাদন ও সরবরাহ সমাজের পক্ষে অবশ্যকরণীয়, যথা বস্ত্র, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র আসবাব, ঘরদরজার মালমসলা ইত্যাদি। তা ছাড়া, একেবারে আবশ্যক জিনিষ ব্যতীত এমন অনেক জিনিষ আছে যাহাকে বিলাসসামগ্রী বলিলে চলে, ভালর জন্যই হউক বা মন্দর জন্যই হউক, অর্থনীতির দিক্ দিয়া তাহাতে বড় একটা আসিয়া যায় না, সমাজ তাহা চায় এবং তাহার উৎপাদন ও সরবরাহে বিস্তর লোকের ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, এক কথায় সমাজের আবশ্যক দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যাপারে সমাজের অধিকাংশ লোক ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য। এবং সমাজের চাহিদা যত বাড়ে, তাহা জনসংখ্যা বাড়িয়াই হউক বা অভাব ও জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়াই হউক, এই সমস্ত বেপারীদের সংখ্যাও

সেই অনুপাতেই বাড়ে। সুতরাং অন্নসমস্যা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোকদিগের খুব উৎকট হইয়া উঠে না। অবশ্য আকস্মিক দুর্ভিক্ষাদি বা আর্থিক দুর্যোগের (ক্রাইসিস্) কথা স্বতন্ত্র। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, অস্বাভাবিক অবস্থায় কৃষি-বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদিগেরও দারিদ্র্য উপস্থিত হইতে পারে। যেমন, সাধারণতঃ কোন দেশে যে পরিমাণ লোক কৃষিকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে হঠাৎ যদি আরও বহু লোক নিজের জাতীয় ব্যবসা, যথা শিল্পাদি, হারাইয়া সেই কৃষিকর্ম্মেই আসিয়া যোগদান করে, তাহা হইলে জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ বাড়িয়া যাইবে; আগে জন প্রতি কৃষি হইতে যত আয় হইত তাহা কমিয়া যাইবে, এবং অর্থাগমের অন্য উপায় দূরীভূত হওয়াতে দারিদ্র্য গুরুতর হইবে। আর এক কারণে হইতে পারে, দিনের পর দিন সেই চিরপ্রচলিত আদিম প্রণালীতে কর্ষিত হইয়া নূতন নূতন উত্তম সারের অভাবে জমির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইতে পারে, দায়াধিকারের বিধি অনুসারে পুরুষপরম্পরায় জমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ হইয়া যাওয়াতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন নূতন যন্ত্র সহযোগে গভীরতর আবাদ অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে, এবং কাজেই কৃষককুল দরিদ্রতর হইয়া পড়িতে পারে। আমাদের দেশে কৃষিজীবিগণের ভিতরে এই সকল-প্রকার অন্তরায়ই উপস্থিত হইয়াছে, কাযেই অন্য সুসভ্য দেশের তুলনায় আমাদের কৃষককুলের অবস্থা শোচনীয়। শিল্পকার্য্যে ব্যাপৃত শ্রেণীদিগেরও দুরবস্থা উপস্থিত হয় উন্নততর প্রণালীতে শিল্পোৎপাদনক্ষম দেশের সহিত প্রতিযোগিতায়। যেমন পাশ্চাত্য দেশের কলকব্জা-যন্ত্র-পরিচালিত বিপুল দ্রব্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের দেশের শিল্পীদিগের কুটির-শিল্প প্রভৃতি বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবং ইহার প্রতিবিধান করিতে গেলে সেই আদিম হস্ত-পরিচালিত তাঁত চরকা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কারখানার প্রবর্ত্তন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে যাহাই হউক, এসব হইল প্রণালীর কথা—বস্তুতঃ যে মোটা কথাটা বলা হইয়াছে তাহার ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না এবং সে কথাটা এই যে, শিল্পকৃষিবাণিজ্যের প্রসারের কোন সীমা নাই, অথবা সমাজের যাহা সীমা ইহাদেরও তাহাই। তবে কত লোক কৃষির দিকে যাইবে, আর কত বা শিল্পবাণিজ্যের দিকে যাইবে তাহা সামাজিক আবেষ্টনের উপর নির্ভর করে। সব দেশেই, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব্বে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ লোকই কৃষিতে লিপ্ত থাকিত এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকিত। কাযেই জনসংখ্যা গ্রামেই ছিল বেশী, নগরে ছিল অত্যন্ত কম। আমাদের দেশে এখনও প্রায় সেই অবস্থাই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিগত একশত বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য অনেক দেশে অনুপাতটার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; বহুসংখ্যক লোক কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া শিল্পবাণিজ্যাদিতে রত হইয়াছে; গ্রাম হইতে ক্রমশঃই নগরের দিকে লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; এবং সভ্যতা ক্রমশঃই গ্রাম্য হইতে নাগরিক আকার ধারণ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ডেই এই ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এমন কি এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, নগরের লোকসংখ্যা গ্রামের লোক সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে নাগরিক জনসংখ্যা গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় বিশ ভাগের এক ভাগ। জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে শিল্প-প্রাধান্য আর নগর-প্রাধান্য এখনও অতটা হইয়া উঠে নাই; তবে ঝোঁক ঐ দিকে। এবং যদি ঝোঁকের কথাই ধরা যায় তবে আমাদের এই সব সনাতন প্রাচ্য দেশগুলি, ভারতবর্ষ, চীন, তুরস্ক, মিশর—ইহাদেরও ঝোঁক ঐদিকে। গতি ঐ কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্পবাণিজ্যপ্রধান দেশ হইবার দিকে। তবে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই এই পর্য্যন্ত। যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য অসংখ্য লোকের সংস্থান করিতে পারে এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার যে বৃত্তি—শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সব বৃত্তির দিকে স্বভাবতঃ ধাবিত হন—তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিছু কিছু প্রসার যে হয় না তাহা নয়, কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে তাহা নগণ্য বলিলেই হয়। রাজকার্য্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোকেরই আবশ্যক হয়। ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি বৃত্তিতে সংখ্যা একেবারে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া নাই বটে, কিন্তু

একটা স্বাভাবিক সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিয়া গেলে জীবিকার উপায় হিসাবেই ঐ বৃত্তিগুলি অতি নিকৃষ্ট ও নিরর্থক হইয়া পড়ে, কারণ গড়পড়তায় আয় এত কমিয়া যায় যে, ইহা দ্বারা অধিকসংখ্যক লোকের আর জীবিকা অর্জ্জন করা চলে না। কাযেই অধিকাংশ লোক এই দিকে ধাবিত হইলে নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে এই সব বৃত্তিতে বেকার, বুভুক্ষা, অনাহার, ও অকাল-মৃত্যু এক রকম নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে। এবং শিক্ষার পদ্ধতি বদলাইয়া ইহার কিছু একটা সমাধান করা যায় কিনা এই বিষয় লইয়া সমস্ত শিক্ষিত সমাজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। কারণ "অন্নচিন্তা চমৎকারা।"

বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক প্রভেদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহাতে শিক্ষা-সংস্কারে অন্ন-সমস্যা সমাধানের সাহায্য কতটুকু করিতে পারে তাহা তলাইয়া বুঝিবার সুবিধা হইবে। এবং তলাইয়া বুঝা দরকার। হঠাৎ বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যেটা হাতের কাছে আসে সেইটাকেই পরম অবলম্বন মনে করিয়া এবং সর্ব্বরোগের ঔষধ বোধ করিয়া তাহারই প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কায অধিকদূর অগ্রসর হয় না; পরন্তু উহা আশানুরূপ ফল দায়ক না হওয়ায় অনেক সময় অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও অবসাদেরই কারণ হয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমরা ভুক্তভোগী। বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তোষ প্রকৃত ও স্বাভাবিক। কিন্তু অসন্তুষ্ট ও অতিষ্ঠ হইয়া যে কোন মহাত্মা যে কোন অবধৌতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া বিবিধ অনুপান সহযোগে রাতারাতি রাজনৈতিক আরোগ্য আনিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন অমনি আমরা চোখ কাণ বুজিয়া বিচার বিবেচনার মাথা খাইয়া অম্লানবদনে সেই সব অনুপান ও মুষ্টিযোগ গলাধঃকরণ করিয়াছি। এবং তাহার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশেষ কোনই ফল হয় নাই, এবং নিষ্ফলতার নৈরাশ্য ও অবসাদ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, শিক্ষাসংস্কার দ্বারা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা দরকার ও অনুপাত-জ্ঞান পরিপূর্ণ মাত্রাতেই থাকা আবশ্যক; নচেৎ আজ এই পরীক্ষা করা গেল কাল ওই পরীক্ষা করা গেল, শিক্ষার অনেক রকম হেরফেরই হয়ত দেখা গেল। কিন্তু বিশেষ কিছু চটকদার ফলোদয় না হওয়ায় আবার নৈরাশ্য আসিয়া ঘিরিয়া বসিবে, অবসন্ন হইয়া ভাবিতে থাকিব, নাঃ ওসব শিক্ষাসংস্কার ফংস্কার কিছু না, সব "বাতিক", আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব। অসম্ভব কিছু আশা করিয়া বসিলে এই রকম হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাই বাস্তব তথ্যের সঙ্গে একটু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর উপর জীবিকার্জ্জনের উপায় কতটুকু নির্ভর করে এবং কতটাই বা করে না সে বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণার দরকার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চাকুরীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ, তা কি সরকারী চাকুরী, কি প্রাইভেট, কি বণিক-অফিসের চাকুরী; এবং স্পেশ্যালাইজড্ বৃত্তির ভিতরেও যাহার চাহিদা সমাজের পক্ষ হইতে খুব সঙ্কীর্ণ, তাহা টেক্‌নিক্যাল লাইনেই হউক বা অন্য কোন প্রকারেরই হউক, তাহাও স্বাভাবিকভাবে একপ্রকার সীমাবদ্ধ। কাযেই শিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালী—যাহাতে প্রধানতঃ সাহিত্য-সংক্রান্ত এবং থিয়োরেটিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়—যদি অনেকটা পরিবর্ত্তন করাও হয় বিশেষ বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা দিয়া, তাহা হইলেও যদি সমাজের তরফ হইতে সেই সব শিল্প-বৃত্তির বেশী চাহিদা না থাকে তবে সে শিক্ষাসংস্কারের দ্বারা শিক্ষিত সমাজের অর্থসমস্যার বেশী লাঘব হইবে না। একটু খুঁটিনাটিতে নামা যাউক তাহা হইলে আশা করি আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। আজ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষিত সমাজের বেকার-সমস্যা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই সব মামুলী ভদ্রলোকী পন্থা ধরিয়া আর পেট চলে না তাহা অনুভূত হইতেছে। কাযেই কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের দিকে—যে দিকে চাহিদা অসীম—শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনেক কৃতবিদ্য শিক্ষিতব্যক্তি সেই মামুলী প্রচলিত বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াই—নানারকম ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেমিক্যাল ওয়ার্কস করিয়াছেন, বইয়ের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনোহারী দোকান, সাবানের

কারখানা, কাপড়ের কল, গেঞ্জিমোজার কল, ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন। অনেকে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অনেকে হন নাই এবং যাঁহারা হন নাই তাঁহাদেরও কৃতকার্য্য না হইবার কারণ যে বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার অভাব একথাও অধিকাংশ স্থলে বলা চলে না। অধিকাংশ স্থলেই কারণ হইয়াছে পুঁজির অভাব, ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতার অভাব (যাহা কোন ইস্কুলের বৃত্তিশিক্ষা পূরণ করিতে পারে না), বিদেশী সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার অক্ষমতা, অনেকস্থলে ব্যাবসায়িক সাধুতার অভাব। এবং আমাদের দেশে নূতন নূতন ব্যবসায় ও শিল্পবাণিজ্যের দিকে সরকারের উদাসীনতা ব্যবসায়ের উন্নতি ও কৃতকার্য্যতার পথে একটা বড় পরিপন্থী হইয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও গবর্ণমেণ্টের আর্থিক সাহায্য, সংরক্ষণশুল্ক এসব সরকার হইতে কিছুই করা হইত না। এখন অবশ্য জনমতের চাপে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কর্ম্মপ্রণালী বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সংরক্ষণনীতি সরকারের কর্ম্মপ্রণালীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। তাহাতে ভবিষ্যতে উন্নতি কিছু দ্রুততর হইবে আশা করা যায়। অবশ্য সরকারের উদাসীনতার উপরই আমাদের অকৃতকার্য্যতার সমস্ত দায়িত্ব আরোপ করিয়া আমি নিজেদের দায়িত্বের চাপ মোটেই এড়াইবার পক্ষপাতী নহি। সেই একই উদাসীন অথবা পরিপন্থী গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া যদি মাড়োয়ারী কি ভাটিয়া কি পার্শী বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন এবং আমরা না হইতে পারি তবে তাহা আমাদের নিজেদের ত্রুটি একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যাহা হউক, এই প্রকারে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি শিল্প-বাণিজ্যাদির দিকে আকৃষ্ট হইল। স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত হইলেও শিক্ষিত সমাজের এই ঝোঁকটাকে সে আরও বলদান করিল। নিজের দেশের শিল্পের উন্নতি ও পুনরুদ্ধারের দিকে মনোযোগ পড়িল।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ॥"

এই প্রাচীন বাণী গৃহে গৃহে উচ্চারিত হইতে লাগিল। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নিজেরা সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে যুবকদিগকে নানা দেশে বিদেশে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যার্জ্জন করিবার জন্য পাঠাইলেন। নিজেদের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টনিরপেক্ষভাবে একটা বড় টেক্‌নিক্যাল প্রতিষ্ঠান খোলা হইল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলেজগুলির বিজ্ঞান-বিভাগে হাজার হাজার ছেলে ঝুঁকিয়া পড়িল। (অপ্রত্যাশিতভাবে বলিলাম এই জন্য যে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা মাহাত্মা গান্ধী যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার প্রতি খড়গহস্ত থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।) অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের আহ্বানে বালক ও যুবকদিগের বিদ্যালয় পরিত্যাগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রেরণা কতটা ছিল ঠিক বলা যায় না, কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া যে চাকুরী-বাকুরী পাওয়া যায় না এই অর্থনৈতিক প্রেরণা অনেকটাই ছিল তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কাজেই ছেলেরা ইস্কুল কলেজের মামুলী সাহিত্য-বিভাগ ছাড়িয়া দিয়া মহাত্মার হিন্দী ও চরকা ক্লাসে গিয়া ভর্ত্তি হইবার জন্য মোটেই ঔৎসুক্য দেখায় নাই। ভীড় করিল বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে, সরকারী কমার্শ্যাল ইনষ্টিটিউটে, টাইপরাইটিং শর্টহ্যাণ্ডের ইস্কুলে, বাগবাজারের পলিটেকনিকে, আর গোলামখানার আই, এস্-সি ক্লাসে। এবং ছেলেদের অভিভাবকদিগের তরফ হইতে উচ্চ কলরব উঠিল যে, ইস্কুলগুলিতে বৃত্তিশিক্ষা চাই, চরকা তাঁত, টুকরি তৈয়ারী, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম উন্মেষের সময়ে বিদেশে নানাবিধ কলা ও কারু বিদ্যা শিখিবার জন্য যুবক প্রেরণ করিবার যে উৎসাহ এবং অসহযোগ আন্দোলনের ফলস্বরূপ টেকনিক্যাল ও বিজ্ঞান লাইনের উপর যে অতিরিক্ত ঝোঁক, কিছুকাল পরেই সেটা অনেকটা কমিয়া গেল। এমন কি, ইস্কুলের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু তাঁতীর কায, একটু মিস্ত্রীর কায, একটু কামারের কায ইত্যাদি বৃত্তিশিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য অভিভাবকদিগের ও জনসাধারণের যে উৎসাহ, তাহাও যেন বিবেচনা ও বিচারের ভারে কতকটা

মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। এ মন্থরতা ও বিচারবিতর্কের ভাব আমি মোটেই অমঙ্গলজনক মনে করি না। এটা আবশ্যক ও ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। সায়েন্টিফিক য্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল য্যাসোসিয়েশ্যান হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া যে সব উৎসাহী যুবক দেশে ফিরিয়াছিলেন আজ পনের বিশ বছর আগে, তাহাদের অধিকাংশই কিছুদিন কোন স্বাধীন ব্যবসা ফাঁদিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া—এবং এই নিষ্ফলতা প্রধানতঃ মূলধন এবং কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার অভাবে হইয়াছে—তারপরে সেই চিরপ্রচলিত সরকারী কিংবা অন্য কোনবিধ চাকুরীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা চাকুরীতে ঢুকিতে পারিয়াছেন তাঁহারা এক হিসাবে অন্নসমস্যা সমাধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশ যাহা আশা করিয়াছিল তাহা পায় নাই; টেকনিক্যালবিদ্যায় কৃতবিদ্য সকল ব্যক্তি ঢুকিতে পারে এরূপ সংখ্যক ফ্যাকটরি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানও দেশে নাই। আসল কথা, টেকনিক্যাল শিক্ষা এবং শিল্পোন্নতি সমতালে অগ্রসর হওয়া দরকার। না হইলে যা হইবার তাহাই আমাদের হইয়াছে। দেশী ও বিদেশী ইস্কুল হইতে উচ্চশ্রেণীর টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ হইয়া যুবকেরা বাহির হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র নাই; নিজেদের বড় মূলধন নাই; অনেক কোম্পানী ফেল পড়াতে ধনীদিগের অর্থ অত্যন্ত "লাজুক", কাজেই নূতন প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করা অনেক স্থলেই হইয়া উঠে নাই এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান এমন বহুসংখ্যক ও এমন বৃহৎ বেশী নাই যে অন্ততঃ চাকুরী হিসাবেও সেখানে ঢুকিয়া পড়া যাইতে পারে। কাজেই আগেও যে সরকারী চাকুরী কি প্রফেসারী খুঁজিতে হইত পরেও তাহাই হইল। অসহযোগের পর যে টেক্‌নিক্যাল ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ঝোঁক তাহাও এই একই কারণে মন্দীভূত হইয়া গেল। এমন দিন ছিল যে টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে পাস করিয়া বাহির হইলেই অন্ততঃ চাকুরী পাওয়াই যাইত। কিন্তু অধিকসংখ্যক লোক বৎসর বৎসর বাহির হওয়াতে সাধারণ বিদ্যার দিকে যে বিপদ সেই বিপদ টেকনিক্যাল লাইনেও হইয়াছে। এবং তাহারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় যে সব শত শত আই, এস্-সি-উৎসাহী ছেলে ১৯২২।২৩ সনে কলেজগুলিতে ভীড় করিয়াছিল তাহারা আই, এস্-সি পাশ করিয়া অতি অনুতপ্তচিত্তে আবার আর্ট কোর্স ধরিয়া বি-এ পাশ করিয়া যথারীতি বি,এল অথবা এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া পূর্ব্ববৎই বি,এল কিংবা এম, এ হইয়া ওকালতী কিংবা মাষ্টারীর চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। এই সব ছেলেরা এখন দুঃখিত কিন্তু বিজ্ঞ হইয়া বাহির হইয়াছে। তবে "বিজ্ঞ" হউক না হউক, দুঃখিত যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্রো নাস্তি।

শিক্ষাসংস্কারের জন্য সত্যসত্যই কোন চেষ্টা করিতে হইলে আমাদের বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের এই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা উড়াইয়া দিলে চলিবেনা; পরন্তু এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে এই ধারণা অনেক পরিমাণে জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে, শিক্ষার প্রণালী অবস্থা ও অভাবের তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ও একান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু এই প্রণালীপরিবর্ত্তন দ্বারাই যে শিক্ষিত শ্রেণীর অর্থসমস্যার বড় বেশী একটা কিছু সমাধান হইবে ইহা আশা করার কোন হেতু নাই। দুই দিক্ দিয়া ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। প্রথমতঃ যে সমস্ত বৃত্তি সঙ্কীর্ণ—এবং পূর্ব্বেই দেখিয়াছি শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত বৃত্তিগুলি অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত—যথা ওকালতী, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারিং, মাষ্টারী, প্রফেসারী, কেরাণীগিরি, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি—সেই সমস্ত বৃত্তিতে বহুসংখ্যক লোকের অন্নসংস্থান কখনই হইতে পারেনা, তা বিদ্যালয়ে যত উৎকৃষ্ট প্রকার বৃত্তিশিক্ষাই প্রদত্ত হউক না। আইন কলেজে উৎকৃষ্ট রূপে আইন পড়ান হউক, মেডিক্যাল কলেজে উৎকৃষ্টরূপে ভেষজ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হউক, টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা উত্তম রূপে দেওয়া হউক, এসবই খুব ভাল জিনিষ সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্থসমস্যার সমাধানের দিক্ হইতে ইহাতে কাজ যে খুব বেশী অগ্রসর করিয়া দিবে তাহা নয়। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত মেডিক্যাল ইস্কুল ও টেক্‌নিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল খুব বেশী বাড়া দরকার, কারণ দেশের অভাব মোচন করিবার জন্য এই সব বৃত্তিতে যত লোকের দরকার তত লোক এদিকে এখনও আসে নাই। কিন্তু সেই পরিমাণ লোক এইসব

দিকে আসিয়া পড়িলে পর—এবং আশা করা যায় যে, দশ-পনের বছরের ভিতরে সে রকম অবস্থা বাঙ্গালা দেশে হইবে—আবার সেই সীমায় আসিয়া পড়িব; অর্থসমস্যার সুমাধান স্থায়ী ভাবে বড় বেশী একটা কিছু হইবে না। আমি অবশ্য এই সব প্রতিষ্ঠান যে বহুল পরিমাণে বাড়া উচিত তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেছিনা—পরন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অভাব ও অবস্থার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাদিগের আরও বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়—কিন্তু ভদ্রলোক সমাজের আর্থিক সমস্যার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমার মনে হয় যে ইহা দ্বারা কোন স্থায়ী সমাধান হয় না। সুতরাং দেখা গেল যে, যে বৃত্তিশিক্ষা এই সমস্ত প্রচলিত সঙ্কীর্ণ বৃত্তির জন্য উপযোগী করিয়া তোলে তাহা দ্বারা বেশী দূর অগ্রসর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ মনে হইতে পারে যে স্পেশ্যালাইজ্‌ড বৃত্তিশিক্ষা দ্বারা যে শুধু নানাবিধ চাকুরীরই সুবিধা করা হইবে ইহার মানে কি? নিজেরা যাহাতে উত্তরজীবনে স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে এই জন্যই বৃত্তিশিক্ষার দরকার। কথাটা সত্য; এবং যদি বিদ্যালয়-প্রদত্ত বৃত্তিশিক্ষা লাভ করিলেই কৃষিশিল্প-বাণিজ্যাদি স্বাধীন ও অসীম বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন সম্ভব হইত, তাহা হইলে শিক্ষাসংস্কারের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুতঃই কি তাহাই? বিদ্যালয়ে স্পেশ্যালাইজ্‌ড শিক্ষা পাইলে কিছু সুবিধা হয় তাহা ঠিক, কিন্তু সেই শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যে আরও কত শত কারণের উপর নির্ভর করে তাহা এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমাদের জানিতে কিছু বাকী আছে কি? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম, এম-কম পাস করা গ্রাজুয়েটেরা, আমাদের টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা, বিদেশ-প্রত্যাগত বিশেষজ্ঞ যুবকগণ তেমন কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়া পুনরায় সেই মামুলী চাকুরী বাকুরীর দিকে লালায়িত হইতেছেন কেন? কারণ-ত স্পষ্ট, শুধু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া বিশেষজ্ঞ করিয়া ছাড়িয়া দিলেই সবটা হইল না, বাহিরের শিল্পবাণিজ্যের তদনুযায়ী বিস্তার হওয়া চাই। শিল্প-কারখানা যদি বহুসংখ্যক থাকে তাহা হইলে এই সব বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; মূলধন যদি লজ্জা ছাড়িয়া বাণিজ্যের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ে তবেই তাহার সাহায্যে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ নব নব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া নিজেদের ও সমাজের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন, নচেৎ একটা বেঙ্গল কেমিক্যাল কি একটা বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল কয়জন লোককে খাটাইতে পারে? শিল্পবাণিজ্যের জগতে এই যে সমস্ত অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তন তাহা অতি অল্পাংশেই বিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষা-প্রণালীর উপর নির্ভর করে এবং অত্যন্ত অধিক অংশেই অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করে—যথা জাতিগত সংস্কার (কাষ্ট ট্রাডিসনস্) অভ্যাস, ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা, সাধুতা, মূলধনের সচ্ছলতা, ইত্যাদি। সুতরাং যদি স্বীকার-করিয়া লওয়াও যায় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করিলেই বৃত্তিশিক্ষায় বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়, তাহা হইলেও অন্যান্য আবেষ্টনের আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে শুধু শিক্ষাসংস্কার দ্বারাই বেশী দূর অগ্রসর হইবার কোন আশা নাই। বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু তাঁত চরকা চালানো বা হাতুড়ী পেটা বা করাত করা শিক্ষা দিলেই যে ছেলেরা বিশেষজ্ঞ হইয়া এইসব ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে ইহাও আশা করা অসঙ্গত। অবশ্য এইসব হাতের শিক্ষার একটা মূল্য আছে। সর্ব্বদা পুস্তকনিবদ্ধ দৃষ্টি একটু এদিক্ ওদিক্ ফিরাইতে শেখে, একটু হাত চালাইতে অভ্যাস হয়, কতকটা স্বাবলম্বী হওয়া যায় কাজেই সংযম ও শাসন (ডিসিপ্লিন) হিসাবে ইহার মূল্য আছে। যেমন সাধারণ সাহিত্য ও দর্শনশিক্ষার আর এক প্রকার চরিত্র-গঠনমূলক (কাল্‌চারল্) মূল্য আছে, এবং মানুষের মনের পক্ষে সে মূল্য খুব সামান্য নয়, এবং শুধু হাতুড়ীপেটা দ্বারা সে শিক্ষার অভাব পূরণ হয়না। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে যে সব বৃত্তিশিক্ষা—এই সব ছুতারগিরি মিস্ত্রীগিরি, বয়ন ইত্যাদি—ইহার কতকটার পূর্ব্বোক্তরূপ মূল্য থাকিলেও ব্যবসায়ে পারদর্শিতা হিসাবে মূল্য অতি সামান্য, এমন কি নাই বলিলেও চলে। কারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলে, যাহাদের জাতব্যবসা

কামারগিরি বা মিস্ত্রীগিরি বা তাঁতীগিরি নয়, তাহারা যে শুধু বিদ্যালয়ে ঐ ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ঐ ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া জীবিকার উপায় করিবে তাহার আশা সুদূরপরাহত। কেবলমাত্র নৈতিক মূল্য হিসাবে এইটুকু লাভ হইতে পারে যে, হাতের কাযকে তাহারা আর ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না, এই পর্য্যন্ত। অবশ্য এটা কিছু কম লাভ নহে, কিন্তু অর্থসমস্যার সমাধানে যে বেশী-কিছু সাহায্য করিবে এমনও নহে। এই মাত্র যে কথা বলিলাম সে কথা অবশ্য শুধু সাধারণ ইস্কুলে আনুষঙ্গিক ভাবে বৃত্তিশিক্ষা দেবার প্রস্তাব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; যে সমস্ত বিদ্যালয় বিশিষ্ট (স্পেশ্যালাইজ্‌ড) বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। সেই সব বিদ্যালয় হইতে বিশেষজ্ঞ বাহির হইতে পারে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই সব বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের স্ব স্ব অধীত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবেন কিনা তাহা আরও অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

সুতরাং যে দ্বিতীয় প্রশ্নটী লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম আমার মনে হয় যে তাহার সদুত্তর ইহাই যে, শিক্ষাসংস্কার দ্বারা বিশিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার পথ কথঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে বটে, কিন্তু খুব বেশী কিছু যে হইবে তাহা নয়। আর্থিক সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান করিতে হইলে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার, আমাদের জাতিগত ও শ্রেণীগত অভ্যাস এবং ঝোঁক ও গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বাণিজ্যনীতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিয়া তবে শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হইতে হইবে—তাহা হইলে আর নৈরাশ্যের কোন কারণ থাকিবে না। কারণ তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, শিক্ষাসংস্কারে অনেক উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু ইহাদ্বারা রাতারাতি স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এবং অত্যধিক আশা না করার দরুণই হতোদ্যম ও অবসন্ন হইবার কোন কারণ থাকিবে না। প্রথম প্রশ্নের আলোচনা তখন ধীর ভাবে করা যাইবে—যে কোন্ কোন্ দিক্ দিয়া শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক; শুধু অর্থনৈতিক হিসাবেই নয়, শুধু জীবিকার্জ্জনের দিক্ দিয়াই নয় কিন্তু "অনুশীলনের" দিক্ দিয়া, উদার মানবতার দিক্ দিয়াও, কি উপায়ে শিক্ষা-পদ্ধতিকে পরিচালিত করা সমীচীন এই গুরুতর প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার তখনই সম্ভাবনা হইবে। এই প্রশ্ন অতীব গুরুতর এবং ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিতসমাজের সুধীবৃন্দের মনোযোগ এই দিকে ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছে। ব্যাপক ভাবে ও গভীর ভাবে ও ধীর ভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা হওয়া আবশ্যক; এবং আশা করি আমাদের সমাজের মনীষিগণ এই ভাবেই শিক্ষাসমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

গন্ধক

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, কেমিষ্ট, রাখামাইনস্, সিংভূম

আমাদের ঘরের বীজাণু ধ্বংস করিবার জন্য আমরা গন্ধক পোড়াই, ডাক্তারেরা ঘায়ের মলম তৈয়ারী করিবার জন্য গন্ধক ব্যবহার করেন। গার্হস্থ্য জীবনে আমাদের গন্ধকের সহিত এরূপ পরিচয়। রাসায়নিক জগতে গন্ধক সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গন্ধক, লৌহগন্ধক (পাইরাইটস্) সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারী করিবার গোড়ার বস্তু। সালফিউরিক অ্যাসিডকে রাসায়নিকরা শিল্পজননী বলিয়া থাকেন। এই শিল্পজননীর মাপকাঠিতে দেশের সভ্যতার অবস্থা ঠিক হয়। এটা অবশ্য রাসায়নিকদের তৈয়ারী মাপকাঠি। আমাদের দেশ এই মাপকাঠিতে খুব নিম্নস্তরে। আমাদের দেশে গন্ধকের খনির অভাব। এই খনির অভাব আমাদের দেশে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের একটী প্রধান অন্তরায়। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বেলুচিস্থানে গন্ধকের খনি পাওয়া

গিয়াছে। কিন্তু সেখানে মাত্র ১০ হাজার টন গন্ধক পাওয়া যাইতে পারে (বুলেটিনস্ অব্ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীজ অ্যাণ্ড লেবার—নং ২৮)। আমাদের দেশে গন্ধকের অভাব ও উপযুক্ত পরিমাণ লৌহগন্ধকের (পাইরাইটস্) অভাব, কিন্তু ব্রহ্মদেশের বডুইন খনিতে প্রচুর পরিমাণে দস্তাগন্ধক (জিঙ্কব্লেণ্ডি) পাওয়া যায় ও ইহা হইতেও সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারী হইতে পারে।

বডুইন খনির মালিকেরা (ইংরেজ) দস্তাগন্ধক হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারী করিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সে চেষ্টা বন্ধ রাখিয়াছেন।

যে সব স্থানে গন্ধক সুলভ সেখানে সালফিউরিক অ্যাসিডের জন্য গন্ধকের ব্যবহার। পাইরাইটসের দামের অনুপাতে গন্ধক মূল্যবান হইলে পাইরাটসের ব্যবহার হয়। মোটামুটি হিসাবে আমরা একটন পাইরাইটস ব্যবহার করিলে যে পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড পাই, সেই পরিমাণ গন্ধক ব্যবহার করিলে তাহার দ্বিগুণ অ্যাসিড পাই। এই হিসাবে গন্ধক পাইরাইটস্ অপেক্ষা আদরণীয়।

আমাদের দেশে বাৎসরিক গড়ে বিশহাজার টন সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। এর জন্য সমস্ত গন্ধকই বিদেশ হইতে আমদানি হয়। জাপান ও ইতালি ইহার অধিকাংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। আমেরিকায় বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টন সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। পৃথিবীতে বাৎসরিক ১ কোটি টনের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১৮৫ কোটি, আর আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ৩১ কোটী ৯০ লক্ষ (১৯২১ সনের হিসাব)। এই অনুপাতে আমরা যদি 'গড়' সভ্যতায় উঠিতে চাই তাহা হইলে আমাদের দেশে বিশহাজার টনের জায়গায় ১৭ লক্ষ টনের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আমেরিকায় কোন্ কার্য্যে কি পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সার প্রস্তুত	...	শতকরা	৫১·৯
পেট্রোলিয়ম পরিষ্কার	...	”	১১·৭
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প	...	”	৮·১
অ্যালাম প্রস্তুত	...	”	৪·৬
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত	...	”	৩·২
নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত	...	”	৩·১
বয়ন শিল্প	...	”	৩·১
অন্যান্য অ্যাসিড প্রস্তুত	...	”	৪·৭
অন্যান্য কার্য্য	...	”	১০·২
			১০০·০

ইহা হইতে বুঝা যায় সার প্রস্তুত কার্য্যে আমেরিকা তার সমগ্র সালফিউরিক অ্যাসিডের অর্দ্ধেকের উপর ব্যবহার করে।

সালফিউরিক অ্যাসিড নির্ম্মাণে গন্ধকের প্রধান ব্যবহার। তা ছাড়াও ইহার নানাবিধ ব্যবহার আছে। আঙ্গুর গাছকে পোকামাকড়ের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আঙ্গুর গাছে গন্ধক ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্যে সমগ্র ইউরোপে বাৎসরিক ১ লক্ষ টন গন্ধক খরচ হয়। কাগজ শিল্পে কাগজের পাল্প তৈয়ারী করিবার জন্য বাইসালফাইটের দরকার। ইহাতেও দেখা গিয়াছে, এক টন কাগজ তৈয়ারী করিতে ২৮ পাউণ্ড গন্ধক্ লাগে। দিয়াশলাই তৈয়ারী করিতে গন্ধক লাগে। বারুদ (গান পাউডার) নির্ম্মাণে গন্ধকের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। গান পাউডারে শতকরা দশভাগ গন্ধক লাগে। রবার ভালকানাইজিংএ গন্ধকের দরকার। সোডিয়াম থাইওসালফেট, কারবনডাইসালফাইড ইত্যাদি কয়েকটী রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করিতে গন্ধকের ব্যবহার অপরিহার্য্য।

পাইরাইটস্ ও জিঙ্কোব্লেণ্ডি ছাড়া আরও কয়েকটা গন্ধকযুক্ত দ্রব্য আমরা খনিজ অবস্থায় পাই। তন্মধ্যে ক্যালসিয়াম সালফেট অ্যানহাইড্রাইড হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারী করিবার চেষ্টা কোন কোন জায়গায় হইয়াছে।

পৃথিবীতে যে সব জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত ও অগ্নিপ্রস্রবণ হয়, আমরা সে সব জায়গায় গন্ধকের সন্ধান পাইয়া থাকি।

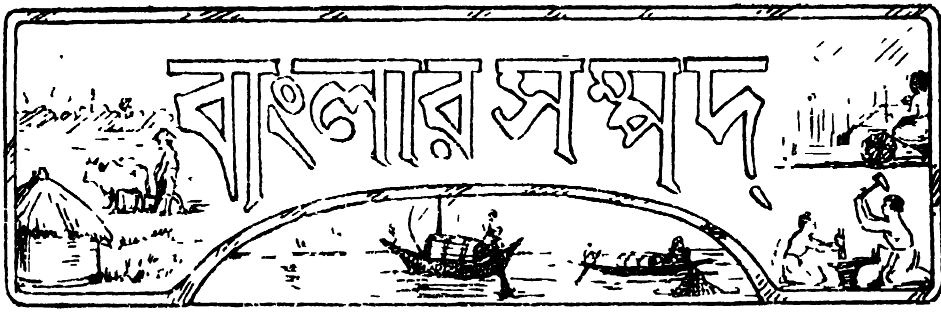
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২য় বর্ষ—৩য় সংখ্যা আর্থিক উন্নতি আষাঢ়—১৩৩৪

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



কলিকাতা-পূর্ব্ববঙ্গ খালের খরচ ৬।০ লাখ টাকা

খালে খালে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করা সম্ভব। পথে নদীও পড়ে। পথটা ৮৩৪ মাইল লম্বা। সরকারী খাল-বিভাগের অধীনে এই জলপথ শাসিত হইয়া থাকে। ১৯২৫-২৬ সনে এই পথের জন্য খরচ পড়িয়াছিল ৬,২৩,৪০৩ টাকা। মালের নৌকা ইত্যাদি হইতে উসুল হইয়াছিল মাত্র ৪,৭৪,২৪১ টাকা। ১,৪৯, ১৬২ টাকা লোকসান পড়ে। এই দেড়লাখ টাকা লোকসানের জন্য দায়ী প্রধানতঃ কলিকাতার আশে-পাশের পুল-মেরামতের কাজ।

তাহা ছাড়া দুইটা "ড্রেজার" মেরামত করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু দোআগ্রা খালটাও চাঁছিতে হইযাছে। এই জন্য অতিরিক্ত খরচ পড়িয়াছে।

মেদিনীপুরের খাল-সম্পদ্

মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রায় ৭০ মাইল লম্বা বড় বড় খাল আছে। শাখা-প্রশাখা প্রায় ২৮৫ মাইল। খালের সাহায্যে চাষের জন্য জলসেচ চলে। নৌকাপথে চলাফেরা করাও সম্ভব। ফী বৎসর প্রায় ২,২৫,০০০ বিঘা জমি খালের জলে চাষ করা হইযা থাকে। প্রায় ৫০ মাইল লম্বা পথ জলযানের যাতায়াতের জন্য খোলা রহিযাছে।

ফরিদপুরের খাল

ফরিদপুর জেলায় মধুমতীর সঙ্গে কুমার দরিয়ার যোগা-যোগ কায়েম করা হইয়াছে। এই খালটা মাদারীপুর বিল পথ নামে পরিচিত। খাল রক্ষা করার এক বড় ধান্ধা হইতেছে তলা চাঁছিয়া দুরস্ত রাখা। ১৯২৫-২৬ সনে কুমার

নদীর এক অংশ চাঁছিতে বিস্তর টাকা খরচ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া কোথাও কোথাও নদী ও খালের আশপাশ কাটিয়া কিছু বিস্তৃত করা আবশ্যক হয়। এইজন্যও গত বৎসর টাকা লাগিয়াছে অনেক। মোটের উপর এই দুই কাজের জন্য ১,৩৪,৯৫৬ টাকা খরচ হইয়াছে। প্রায় ১৩ মাইল লম্বা পথ ড্রেজ্ করিতে (চাঁছিতে) হইয়াছিল।

নদীয়ার নদীতে সরকারী খরচ ৩১৷৷০ হাজার টাকা

প্রায় সকল নদী ও খাল হইতেই যাতায়াতের কর আদায় করা গবর্মেণ্টের দস্তর। কোনো কোনো জেলার নদীগুলাকে করমুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে নদীয়া জেলার নদীগুলা এই হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কাজেই নদীপথে গবর্মেণ্টের কোনো আয় নাই। তবে নদীগুলা দুরস্ত রাখিতে খরচ পড়ে। ১৯২৫-২৬ সনে খরচের মাত্রা ৩১,৪৩৩ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর পরিমাণ ছিল ২৬,৭৫২ টাকা। প্রায় ৪৷৷০ হাজার টাকা বেশী।

হাওড়া জেলার খাল ইজারা

খাল-শাসনের প্রণালী নানাবিধ। হাওড়া জেলার একটা ছোট খাল ইজারা দেওয়া হইয়াছে। ইজারার মিয়াদ ছয় বৎসর। ১৯২১ সনের ১৫ জুন মিয়াদ সুরু হইয়াছে। ইজারাদার ফী বৎসর ২,০০০ টাকা করিয়া গবর্মেণ্টকে দিতে বাধ্য। খাল মেরামত করার দায়িত্ব তাহার নিজের ঘাড়ে। তবে সরকারী সেচ-বিভাগের পরামর্শ ও হুকুম অনুসারে খাল-মেরামত ও খাল-রক্ষা কাজ চালাইতে হয়। খালটা দামোদর আর রূপনারায়ণ এই দুই নদীকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে। গাদ্ঘাটা-বক্সি খাল নামে ইহা পরিচিত।

ইডেন খালের পানীয় জল

খালগুলা কোথাও যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির জন্য কাটা হইয়াছে কোথাও বা চাষের জন্য জল সেচই খাল কাটার প্রধান উদ্দেশ্য। কোথাও কোথাও দুই উদ্দেশ্যই এক সঙ্গে সিদ্ধ হয়। আবার পানীয় জল সরবরাহও কোনো কোনো অঞ্চলে প্রধান বা অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ইডেন খাল কাটা হইয়াছিল। খালটা বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলায় অবস্থিত। আজকাল এই খালের জল চাষের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯২৫-২৬ সনে প্রায় ৭২,০০০ বিঘা জমি এই জলে চষা হইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে চষা হইয়াছিল ৬৩,০০০ বিঘা। দামোদরের খালটা সম্পূর্ণ হইলে ইডেন খালের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত প্রণালীতে কায়েম হইতে পারিবে। তখন ইডেন খালের জলাভাব থাকিবে না।

নতুন খালের ব্যবস্থা

চব্বিশ পরগণার নবি-ইছাপুর খালটা বাড়ানো হইতেছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে এই জন্য ৩৮,৭৬৫ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার আমিরাবাদ খালের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

যশোহর জেলার মেহেরপুর-ভৈরব আর গোবরানালা খালের উন্নতিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভৈরবের উন্নতি-বিধানও আলোচিত হইয়াছে। নবগঙ্গার সঙ্গে ভৈরবের যোগাযোগও জল্পন-কল্পনের মধ্যে আছে।

খুলনা জেলার আলাইপুর খালের উন্নতি-সাধন সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছে।

মরা নদী "ধোলাই"য়ের আয়োজন

নদনদীর জলে দুনিয়া ধোআ-পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। আবার ঘটনাচক্রে অনেক সময়ে নদনদীকেও ধুইয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক হয়। এইরূপ নদী-ধোলাইয়ের কারবারকে বলে "ফ্লাশিং"। এই জন্য দরকার হয় এক দরিয়ার পানি আর এক দরিয়ায় আনিয়া ঢালা বা বহানো। মরা নদী-গুলাকে তাজা ও চাঙ্গা করিয়া তুলিবার পক্ষে এই এক বড় উপায়। বাংলাদেশের অনেক নদীর পক্ষেই এইরূপ ফ্লাশিং-চিকিৎসা জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। নদীয়া জেলার নদীগুলা সম্বন্ধে এই দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯২৫-২৬ সনে মাপা-জোকার কাজ কিছু কিছু হইয়াছে। মাথাভাঙ্গার জলে নবগঙ্গাকে জিয়াইয়া রাখা যায় কিনা বুঝিবার জন্য

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। জলঙ্গির জলের উপরও দৃষ্টি আছে।

ধূম-মলিন কলিকাতা

ধূলিপিঙ্গল কলিকাতা ও ধূমমলিন কলিকাতা—কলিকাতার এই দুই মূর্ত্তি কার অজ্ঞাত আছে? ধূলার ব্যবস্থার ভার কর্পোরেশ্যন হাতে লইয়াছে। প্রতিদিন সড়কগুলির উপর গ্যালন গ্যালন জল পড়িতেছে।

কিন্তু ধোঁয়াকে শাসন করিবার কোন উপায় আছে কি? ধোঁয়া কমাইবার বা দূর করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি?

ধোঁয়া বাহির হয় রেল ষ্টীমার হইতে, কারখানার চিম্‌নী দিয়া, ঘর-বাড়ীর চিম্‌নী দিয়া, চিম্‌নী না থাকিলে জানালা-দরজা দিয়া। অধিকাংশই কয়লার ধোঁয়া।

কলিকাতায় যক্ষ্মা ইত্যাদি বেয়ারামে অনেক লোক মরে, যার জন্য ধোঁয়া বহু পরিমাণে দায়ী। ধোঁয়া ফুস্‌ফুস্ খারাপ করিয়া দেয়।

বাঙ্গালাদেশে এই ধোঁয়ার উপদ্রব কমাইবার বা দূর করিবার জন্য যে "বঙ্গীয় ধূম-উপদ্রব কমিশন" নিযুক্ত রহিয়াছে, তা সম্ভবতঃ অনেকের জানা নাই। এঁরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানকে ধূম-শূন্য করিতে চাহিতেছেন। এই কমিশন আজ ২১ বছর যাবৎ কাজ করিতেছেন। ১৯২৬ সনের একবিংশতিতম রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে।

ধোঁয়ার সৃষ্টিটা বাণিজ্য-ব্যপদেশে হইতে পারে, যেমন রেল-জাহাজ-কারখানার ধোঁয়া। ধোঁয়াটা ঘরোয়া কাজের জন্যও হইতে পারে, যেমন রান্নাবান্নাতে চুলার ধোঁয়া। কিন্তু ধোঁয়াকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—

(ক) যে ধোঁয়া উপরে উঠিয়া যায় ও বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়।

(খ) যে ধোঁয়া তলাতেই পড়িয়া থাকে বা অল্পমাত্র উপরে উঠে। শীতকালে কলিকাতা কি রকম ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জামা কাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা হয়। ভোরের বেলা প্রতিদিন উঠিয়া দেখি নাকের ভিতর একরাশ কালি ঢুকিয়াছে। এই সব "খ" শ্রেণীর ধোঁয়ার কীর্ত্তি।

এই রিপোর্টে প্রধানতঃ "ক" শ্রেণীর ধোঁয়ার কথা আলোচিত হইয়াছে।

সভা-সমিতি

এই বছর মোট মিটিংএর সংখ্যা ১১। কাজটা সুপ্রণালীতে চালাইবার জন্য বিভাগটাকে কতকগুলি সাব কমিটিতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ সাবকমিটিগুলির প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে। তাতে কাজের সুবিধা বাড়িয়াছে।

কারখানার চিম্‌নি

গত বছর কারখানার চিম্‌নি হইতে যে ধোঁয়া বাহির হইত তা ঘণ্টায় ১·১৯ মিনিটব্যাপী গাঢ়তম কাল ধোঁয়ার সমান ছিল। এই বছরে কমিয়া ·৯৮ মিনিটব্যাপী হইয়াছে। ২১ বছরের মধ্যে এত কম আর হয় নাই।

কিঞ্চিৎ আঁকজোক

প্রতিদিনকার গাঢ়তম কাল ধোঁয়ার পরিমাণটা কত? ১৯০৬ সনে কমিশন যখন প্রথম কাজ আরম্ভ করে, তখন ছিল ২ লক্ষ মিনিট। এই বছরে দাঁড়াইয়াছে ১৫,০০০ মিনিটে। গত বছর ছিল ১৮,০০০ মিনিট।

এই হারে কমাইতে হইলে সর্ব্বদা দরকার মনোযোগ ও পর্য্যবেক্ষণ। আজ কমিশন উঠিয়া গেলে কাল আবার ১৯০৬ সনের অবস্থা ফিরিয়া আসিতে দেরী হইবে না।

ধোঁয়ার কাণ্ড

এইবার ধোঁয়ার কীর্ত্তির দিকে নজর দেওয়া যাক্। কলিকাতায় যত মৃত্যু হয় তার ½ অংশ ঘটে ফুস্‌ফুসের পীড়ায়। ডাক্তাররা বলেন, "আর্থিক অবস্থা ভাল হোক্ বা মন্দ হোক্, ধোঁয়ার উপদ্রবে ঐ পীড়ায় মানুষের মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে, লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে ও অন্যান্য বেয়ারাম পীড়ায় সহজে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ধোঁয়ার উপদ্রবে জমির উর্ব্বরতা ৫০% কমিয়া যায়, খাদ্য-দ্রব্য বিষাক্ত হয়। যে সব জিলায় ধোঁয়া আছে সেখানে গরু ঘাস বা বিচালি খাইলে, তাদের দুধ দিবার শক্তি অল্পদিন

বজায় থাকে। দুধটাও খারাপ হয়, দুধ "মাগ্‌গি" হওয়া অনিবার্য্য।

এই সব গরুর দুধে ফস্‌ফোরিক অ্যাসিডের তুলনায় চুণের অনুপাতটা বড় নীচু। সেজন্য এ দুধ খাওয়াইলে শিশুদের রিকেট নামে পীড়া হয়।

ধোঁয়াতে সালফারাস্ (গন্ধকময়) বাষ্প থাকে। সেই বাষ্প ইমারতের গাঁথনিতে জারণ ধরাইয়া দেয়। এই অনিষ্টটা শুধু ধোঁয়ামলিন শহরগুলিতেই আবদ্ধ থাকে না। বাতাসে জারণ বাষ্প আশে পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত উড়াইয়া লইয়া যায়। সেই সব স্থানেও ক্ষতি হয়।

ধোঁয়ার উপদ্রবে সমাজের ধনদৌলতেরও অপচয় হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারে এক ধোঁয়ার জন্যই ধোপার বিল হয় বছরে ৩৮ লক্ষ টাকা। গ্রেট্ বৃটেনে ধোঁয়ার উপদ্রবে বছরে মোট খরচ হয় ৬০ কোটি টাকা।

* এইরূপ ক্ষতির পরিমাণটা কলিকাতায় কত? বাঙ্গালাদেশেই বা কত? ভারতেই বা কত? কোনো হিসাবের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুবক ভারতের কর্ত্তব্য ধোঁয়ার আর্থিক ক্ষতির প্রত্যেক দফার হিসাব রাখা।

প্রতীকার কি

বিগত ২০।৩০ বছরে এক নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে—কমবাশ্‌চ্যন এঞ্জিনিয়ার। এঁরা ধোঁয়া হ্রাসের আর্থিক সমাধানটা অনেকখানি বাৎলাইয়া দিয়াছেন।

বিগত দুই শতাব্দীতে ফ্যাক্টরী ইনডাষ্ট্রীয়েলিজ্‌মের (কারখানা শিল্প) দরুণ, ধোঁয়ার উপদ্রবে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন খর্ব্ব করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শিল্পী কারিগর ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়া গেলে চলে না। এই সব নূতন লোক কোথা হইতে আসিয়াছ? শহরের লোক অকেজো হইয়া যাইবার পর গ্রাম্য জনপদ হইতে লোকের পর লোক আসিয়া সেই স্থান পূরণ করিয়াছে। তাদেরও জীবন নষ্ট হইয়াছে।

এ অবস্থার প্রতীকারের কোন উপায় নাই কি? ভুক্তভোগীরা বলিল, "আছে। কারখানাগুলিকে শহরের বাইরে লইয়া গেলেই ত হয়"। এই প্রস্তাবটাকে সকল দিক্ হইতে ভাবিয়া দেখিয়া নাকচ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, কারখানা-কলগুলি শহরগুলির বাইরে গেলেই সকল আপদ্ শান্তি হইবে না। প্রথমতঃ কারিগর ইত্যাদি ধোঁয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তাদের ধোঁয়ার মধ্যেই কাজ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় কারণ আরো গুরুতর। যে শহর হইতে কল কারখানা দূরে সরাইয়া লওয়া হইবে, বাতাসে সেই শহরেই হয়ত ময়লা কালি উড়াইয়া নিয়া আসিবে। কলিকাতার কথাই ধরা যাক্। শহরের বাইরে উত্তরে ও দক্ষিণে অনেক কল চলিতেছে। উত্তুরে বাতাসের সময় উত্তরের ধোঁয়া কলিকাতায় আসিয়া ঢুকে, আর দক্ষিণে বাতাসে দক্ষিণের ধোঁয়া নগরে ঢুকে। অতএব অবস্থা হয় "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

অনেক বাঙালী কবি হয়ত উত্তুরে ও দক্ষিণে হাওয়া নিয়া কবিতা লিখিতেছেন। তাঁরা হয়ত বুঝিতেও পারিতেছেন না, ঠিক সেই সময় উত্তুরে বা দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে তাঁদের শরীরের ভিতর কি বিষ ঢুকিতেছে।

আর একটা কথা। কলিকাতার বন্দরে যে সব ষ্টীমার জাহাজ লাগে ও নদীর মধ্যে যাতায়াত করে, এই নীতি অনুসারে সেগুলিকে ২০ মাইল দূরে রাখিতে হইবে। তাতে পারাপারের বিস্তর অসুবিধা ত হইবেই, কোটি কোটি টাকার বাণিজ্যও নষ্ট হইয়া যাইবে।

কে বড়

কমিশন রায় দিয়াছেন যে (খ) শ্রেণীর ধোঁয়াই বেশী দাগী। তারা বলিতেছেন, "এটা মারাত্মক রকমে সাংঘাতিক।"

কয়েকটা উদাহরণ

কমিশন কি কাজ করিয়াছে তার একটু আলোচনা করা যাক্। কলিকাতাকে কতকগুলি ষ্টেশনে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কলিকাতার একটা বড় ষ্টেশনে ধোঁয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধেতে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, কমবাশচ্যন এঞ্জিনিয়ার লাগান হইয়াছে। ফল হইয়াছে কি? জ্বালানি কাঠের বিল হইতে বছরে ৩ লাখ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। আর চিম্‌নিগুলি এখন বলিতে গেলে ধূমশূন্য দাঁড়াইয়াছে।

অন্য একটা ষ্টেশনে মালিকরা এই প্রণালী খাটাইবে স্থির করিয়াছে। খরচ পড়িবে অনুমান ৮৩,০০০ টাকা। আর বছরে ৫২,০০০ বাঁচিয়া যাইবে, এইরূপ অনুমান হয়।

লোকে কমিশনের কাছে প্রতীকারের জন্য যখন-তখন আবেদন করিতেছে। এবছরে ৪৮টা অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। গত বছর অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৫৯। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ তুচ্ছ ছিল। কিন্তু যেখানে সম্ভব, সেখানেই সাহায্য করা হইয়াছে। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল। তার ফলে বহু সাবধানে পরীক্ষা ও দীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের দরকার হইয়াছে। সীমার বাহির হইতেও কোন কোন জিলা সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছে। তাদের যথাযথ উপদেশ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ষ্টীমারে ধোঁয়া

ষ্টীমার ও নৌকা সাধারণতঃ কলিকাতার বাসাবাড়ীর অদূরে থামে। এগুলির নীচু চোঙা হইতে ধোঁয়া, ঝুল, গন্ধক-মাখা বাষ্প ইত্যাদি বাহির হইয়া নিকটের ঘরবাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ে। জাহাজের "ষ্টোভ হোল্ডে" বা "ইন্ধন গৃহে" কাজ করা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টকর হয়। ইন্ধন গৃহ নির্ম্মাণের দোষে এই সব ঘটে।

যে ষ্টীমার হইতে অপরিমিত ধোঁয়া বাহির হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, "কয়লার টিউব" (দাহক নল)গুলি একেই ত ছোট তার উপর সেগুলির ভিতরে এক একটা "সুপার হিটার" (অতিতাপক) ভরিয়া রাখা হইয়াছে। ফলে "ড্রাফ্‌ট্" বা নক্সা নষ্ট হইয়াছে, "কয়লা"গুলির "ষ্টিমিং সামর্থ্য কমাইয়া দিয়াছে। সাগর-দরিয়ায় এক বন্দর হইতে অন্য বন্দর পর্য্যন্ত যাতায়াত কালে বাষ্পের সঙ্গে কাল ধোঁয়ার অনবরত ঝটাপটী চলিয়াছে। ড্রাফ্‌ট্ বাধাটা সরাইয়া দিবার বন্দোবস্ত যদি করা যায়, তবে বয়লারের ষ্টিমিং সামর্থ্য বাড়ে, খরচ কম হয়, ধোঁয়া কমিয়া যায়, এঞ্জিনিয়ার কর্ম্মচারীরা ও ষ্টোভ হোল্ড খালাসীরা আর অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে বাধ্য হয় না।

একটা পাটের কলের উপর পরীক্ষার ফল

মনে রাখিতে হইবে যে, ধোঁয়া সমস্যাটার একেবারে গোড়া কাটিয়া দেশছাড়া করিবার প্রচেষ্টা নূতন। আগে চেষ্টা ছিল "কাল ধোঁয়ার পরিমাণ যত পার কমাও।" এখনকার প্রশ্ন হইতেছে, "ওটা একেবারে নির্ম্মূল হয় কি না দেখ।" সুতরাং কমিশনকে পুরাণা প্রথা ছাড়িয়া নূতন প্রথা ধরিতে হইয়াছে। পুরাণা প্রথায় (ক) শ্রেণীর ধোঁয়া আর কমাইবার উপায় ছিলনা। এই বছর হইতে নূতন প্রথায় কাজ আরম্ভ হওয়াতে এই ধোঁয়া ক্রমাগত কমাইতে পারা যাইবে। আর একটা সুবিধা এই হইবে যে, এই প্রথাতে "খ" শ্রেণীর ধোঁয়াকেও কায়দায় ফেলা যাইবে।

সম্প্রতি কলিকাতার একটা বড় পাট কলে, হাতে জ্বালান পুরাণা ল্যাঙ্কাশিয়ার ব্যাটারি বয়লারের পরিবর্ত্তে একই ধরণের ও একই মাপের নূতন নূতন বয়লার বসান হইয়াছিল। কয়লা পোড়াইবার সময় বাতাস চাই। এই বাতাস গরম করিবার জন্য নূতন বয়লারগুলির সঙ্গে বায়ুর "পুরস্তাপক" (প্রিহিটার) জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাষ্পটা শুকাইয়া ফেলা দরকার। সেজন্য বাষ্প "অতি-তাপক" জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সব আয়োজনের ফলে সমস্ত সময় ধরিয়া ড্রাফ্‌ট্ ও টেম্‌পারেচার বা তাপ কি থাকে, আর কতখানি বাষ্পই বা বাহির হয়, তা ধরিবার জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। পুরাণা বাষ্প এঞ্জিনটা অবশ্য বদ্‌লান হয় নাই।

এইরূপ "পুরস্তাপ" ও "অতি-তাপের" ফল কি হইয়াছে? আগে লাগিত ৬০ টন বা প্রায় ১৬০০ মণ কয়লা দিনে। এখন সেখানে দিনে লাগিতেছে ৩৮ টন বা হাজার মণের কিছু বেশী কয়লা।

এর পর এঞ্জিনিয়ার আপনার কলা-নৈপুণ্য দেখাইলেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে "জ্বালানি" ব্যবহার যে কতদূর ফলপ্রদ এইবার বুঝা যাইবে।

"কমবাশচ্যান ইন্‌ডিকেটর" জুড়িয়া দেওয়া হইল জ্বালানি ও বাতাসের ঠিক অনুপাতটা জানিবার জন্য। ড্রাফটা যাতে আরও তাড়াতাড়ি ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলে, সেজন্য এক "ড্রাফট ফ্যান" লাগান হইল। "ফারনেসে"র উপরে যে বাতাস পাওয়া যাইত, তার পরিমাণ বাড়ান হইল। "ফারনেস টেম্‌পারেচার" যাতে সর্ব্বোচ্চ হয় এবং

"ফারনেস্ গ্যাসগুলি"র মিশ্রণ যাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় সে বিষয়ে কোন ত্রুটি রহিল না। এইসবের পর দেখা গেল যে, কয়লা পুড়িতেছে মাত্র ২৮ টন বা ৮০০ মণের কিছু অধিক।

এই কলটা এখন আগের চেয়ে খারাপ কয়লা ব্যবহার করিতেছে। তাতে মিলের লাভ হইতেছে দুই দিকে—(১) কয়লার বিল খাটো হইয়াছে (২) কম কয়লা লাগিতেছে বলিয়া ঢের পয়সা বাঁচিতেছে। এই মিলে যত কিছু কল-কব্জা, বাড়ীঘর সম্পত্তি আছে ২½ বছরের মধ্যে এইরূপে তার সমস্ত খরচটা উঠিয়া আসিবে।

তারপর এই কলের চিম্‌নি হইতে ধোঁয়া কালি বাহির হইয়া সমগ্র পথ বিষাক্ত করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়া ঢুকিত। এখন প্রায় নির্ধূম হইয়া গিয়াছে। আর কমবাশচ্যান ভাল হয় বলিয়া, যেটুকু ধোঁয়া বাহির হয় তা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে আগের চেয়ে কম অহিতকর।

এই উন্নতির একটা বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় ফায়ারম্যানের সাহায্যে হাতে জ্বালাইয়া ইহা করা হইয়াছে। কমিশন বলিতেছেন, "একস্থানে যা করা হইয়াছে, অন্য সব জায়গায়—জলে ও স্থলে-তা করা সম্ভব।"

বাংলার কৃষি

বঙ্গীয় সরকারী কৃসি বিভাগ ১৯২৫-২৬ সনে যে যে কাজ করিয়াছে, "কলিকাতা গেজেটে" গবর্ণমেণ্ট তার এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সেই রিপোর্টের মর্ম্ম নিম্নরূপ:—

কৃষি-শিক্ষা

পাঞ্জাবের উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলগুলিতে যে প্রণালীতে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে, গবর্ণমেণ্ট বছর শেষে তা এই প্রদেশের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। তজ্জন্য বাজেটে নির্দ্দিষ্ট টাকাও পাওয়া গিয়াছে।

কৃষি সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা

কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল যে ঢাকাতে এক কৃসি-বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করিয়া উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে। এখন স্থির হইয়াছে যে সেই সঙ্কল্পকে অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। তদুদ্দেশ্যে টাকা হাতে পাইলেই দরকারী বাড়ীঘর তৈয়ারী আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিবার জন্য কি কি গুণ থাকা দরকার ও ইহার ছাত্রদিগকে শুধুমাত্র অমিশ্র বিজ্ঞান শিখাইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা কিরূপ হইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য "রাজকীয় কমিশনে"র রিপোর্ট বাহির হওয়া অবধি অপেক্ষা করা হইতেছে।

এদিকে লোকের সহানুভূতির অভাবে ঢাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে, যথেষ্ট ছাত্র পাওয়া যাইতেছে না। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রতীকারের দরকার।

গবেষণা ও পরীক্ষা

গবেষণা বিভাগে, উদ্ভিদ (পেশী-বিদ্যা ও কীট-বিদ্যা ইহার অন্তর্গত) অংশ ও রসায়ন অংশে চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা চলিতেছে।

(ক) উদ্ভিদ

(১) এই বিভাগ হইতে উন্নত ধরণের এক প্রকার ধান বাহির হইয়াছে। এখন প্রশ্ন—কি করিয়া এই ধানটাকে আশপাশের চাষীদের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়?

ধানের বীজ বাঁটিয়া দেওয়া পাটের বীজ বাঁটিয়া দেওয়ার মত সোজা কাজ নয়। কারণ,

(অ) চাষীরা নিজেদের বীজ মজুত রাখে। তাদের প্রত্যেক বছরই যোগানের অন্বেষণে যাইতে হয় না।

(আ) সব ধানের বীজ এক জাতের নয়। তাদের ফসল পাকিবার সময় এক নয়। গুণও বিভিন্ন। কিন্তু চাষীরা কোন বাছ-বিচার করে না, পাশাপাশি বপন করে ফলে সবগুলি মিশিয়া খিচুড়ি বনিয়া যায়।

(ই) রেল ইত্যাদির ভাড়া এত বেশী যে, ধানের বীজ কোন দূরবর্ত্তী স্থানে চালান দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই সব কারণে একটা "স্কীম" খাড়া করা হইয়াছে যে, কৃষি সভাগুলির মধ্য দিয়া বা প্রতিপত্তিশালী চাষীদের মধ্য দিয়া ধান্য-বীজের ছোট ছোট ক্ষেত গঠন করা হউক। প্রত্যেক দ্বিতীয় বছরে এই সব বীজের ক্ষেতকে সরকারী ক্ষেত হইতে নূতন বীজ দেওয়া হইবে। ইহারা তা বাড়াইয়া চারিপাশের ক্ষেতগুলির মধ্যে বাঁটিয়া দিবে।

এই বছর ঢাকা ও মৈমনসিংহ জিলায় ১৩টা ধান্য বীজের ক্ষেত্র খোলা হইয়াছে।

(২) এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পান গাছ জন্মে। এ-যাবৎ এই পান-শস্যের সমূহ ক্ষতি হইয়া আসিতেছিল। পানগাছগুলি বেয়ারামে মরিয়া যাইতেছিল বা নষ্ট হইতেছিল। সম্প্রতি বেয়ারামের কারণটা নিশ্চিতরূপে ধরা পড়িয়াছে। এক প্রকার ফাঙ্গাস এই দুষ্কার্য্যের জন্য দায়ী।

(খ) আঁশ

বহুদিনব্যাপী অনুসন্ধানের পর আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যান্ত্রিক আবর্জ্জনা—যেমন আখের মজ্জা, এবং পাতা আগাছা পচা খড় ইত্যাদি গবাদির মূত্রের সঙ্গে মিলাইয়া ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ উদ্ভিদের খাওয়ার উপযোগী হয়। ইহাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ পচা গোবরের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী

ক্ষেতের আবর্জ্জনা হইতে "ঢাকা ক্ষেতে" এই কৃত্রিম সার ১৭ টন বা দু'হাজার মণের উপর প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) রসায়ন

আখ ও তামাক লইয়া ক্রমাগত পরীক্ষা চলিতেছে। হরিৎ "তান্না" আখ ও সি, ও. ২১৩ ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে।

এই বছর কোন কোন স্থানের ইক্ষু ক্ষেতে হরিৎ "তান্না"র প্রচলন করিয়া "প্রদর্শনী" হইয়াছিল।

যশোর জিলায় "প্রদর্শনী" কালে তালের রস যে পাত্রে যোগাড় হয় তাতে চূণ লেপিয়া দিবার ও রস জ্বাল দিবার জন্য ম্যাকগ্ল্যাশান চুলা ব্যবহার করার মূল্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কচুরীপানার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে কি কি তোড়জোড় দরকার এতদিনে তা জানা গিয়াছে। মাদারীপুর "বিলে" কচুরীপানা সাফ করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এটা পরীক্ষামূলক। এই উদ্দেশ্যে এক বিশেষ "বাহন" বা বা নৌকা তৈয়ারী হইয়াছিল।

চাষে উন্নতি

(১) মালদহ ও রাঙ্গামাটি

এই বছর মালদহ ও রাঙ্গামাটির ক্ষেতের জন্য ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।

(২) দিনাজপুর ও ময়নাগুড়ি

১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দিনাজপুরের ক্ষেত-বাড়ীর ভার এই বিভাগ পায়। আর ময়নাগুড়ির খামার বছর শেষে সমর্পণ করা হয়।

(৩) নদীয়া কৃষ্ণনগর

বছর শেষে নদীয়াতে "কোম্পানীর বাগান" নামে পরিচিত প্রায় ৪৫০ একর জমি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে লওয়া হয়। কৃষি বিভাগের কাজে না আসা অবধি এটার ভার "খাস মহাল" রূপে কলেক্টরের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে এই আয়তনে জিলা-ক্ষেত সঙ্গে সঙ্গে একটা "দুগ্ধ-শালা" স্থাপন করিবার কল্পনা চলিতেছে। "কৃষি-পরিচালক" ইতিমধ্যে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কিশোরগঞ্জে প্রচলিত "বর্গা" প্রথায় জমি চাষ করিতে দেওয়া হোক্ ও ঐ স্থানের উপযোগী উন্নত ধরণের শস্যাদি রোপণ করা হউক।

(৪) ২৪ পরগণা—বারাসত

২৪ পরগণার জন্য বারাসতে এক জিলা ক্ষেত করিবার কল্পনা চলিতেছে।

(৫) কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ ক্ষেত চাষীদের সহযোগে রূপান্তরিত বর্গা প্রথায় চাষ করা হয়। সেখানে এই বছর প্রায় ২,০০০৲ টাকা নিট্ মুনাফা পাওয়া গিয়াছে। মোট খরচ পড়িয়াছে ২,৫৭০, টাকা। তন্মধ্যে পুঁজিপাটা খরচ ১,০৮৭৲ টাকাও আছে।

(৬) বেসরকারী ক্ষেত

প্রেসিডেন্সি বিভাগে, বর্দ্ধমান বিভাগে, রাজসাহী বিভাগে বেসরকারী ক্ষেতের সংখ্যা বাড়িতেছে। এবছর সবসুদ্ধ ১০০টা ক্ষেত হইয়াছে। তার মানে দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস দেখা দিয়াছে। এই সব ক্ষেত কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীদের পরামর্শ ও উপদেশমত চালিত হইতেছে।

(৭) উৎকৃষ্ট গবাদি

রংপুর গো-শালাতে ও ঢাকা গোশালাতে গবাদির

বংশোন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে একজন গৃহপালিত জন্তু বিষয়ে "ওস্তাদ"কে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই ওস্তাদের সাহায্যে লোকের মধ্যে বিভাগীয় "কুলীন" বলদ চালান যাইবে।

(৮) কৃষি-বিষয়ক এঞ্জিনিয়ারিং

শীঘ্রই একজন কৃষি-এঞ্জিনিয়ার লাগান হইবে। তখন কৃষিতে এঞ্জিনিয়ারিং সমস্যাগুলি সহজ হইয়া উঠিবে।

বীজ-বণ্টন ও প্রচার

এবার পাটের দর চড়া ছিল। সুতরাং বিভাগীয় পাট বীজ লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছিল, কুলাইয়া উঠে নাই। এবছর এজেণ্ট ১১০ টন বা প্রায় ৩০০০ মণ পাট-বীজ বিভাগ হইতে বেচিয়াছিল।

উন্নত প্রকারের পাটবীজের ব্যবহার যাতে তাড়াতাড়ি, বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে "লণ্ডন জুট এসোসিয়েশন দয়া করিয়া ১,৫০০ বীজ দিয়াছিল। গবর্মেণ্ট তা গ্রহণ করায় সেই বীজ ১৯২৭ সনে বিতরিত হইয়াছে।

এই বিভাগের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। লোকে মর্য্যাদা বুঝিতেছে। কিন্তু এজন্য বাহ্য প্রচার, আন্দোলন-আলোচনারও দরকার। তাই গবর্মেণ্ট সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, আরও ৭ জন অতিরিক্ত কৃষি কর্ম্মচারী (জিলা) নিয়োগ করিবেন। জিলাগুলি এই:—চট্টগ্রাম, নদীয়া, ২৪ পরগণা-হাওড়া, খুলনা, মেদিনাপুর, নোয়াখালি ও হুগলি। টাকা পাইলে এই নিয়োগ হইবে।

কয়েকজন জিলা কর্ম্মচারী, বিশেষ করিয়া নদীয়া, মালদহ ফরিদপুর, রংপুর ও হুগলির কর্ম্মচারীরা, নিজ নিজ জিলার কৃষির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ইত্যাদির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন।

রেশমের চাষ

গবর্মেণ্ট নার্সারিগুলির প্রধান কাজ হইতেছে ব্যাধি-মুক্ত "নিস্তারি ও ছোটপলু"র বীজ বাহির করা। বহরম-পুরের প্রধান আড্ডা হইতে অন্য নার্সারিগুলিকেও বাছিয়া বাছিয়া "পালক"বিশেষকে যোগান দিবার জন্য নিস্তারির বংশ বাড়ান হইয়াছে। অধিকন্তু জাত-"পালক"দেরও বীজ যোগান দেওয়া হইয়াছে।

নার্সারিগুলি উৎপাদন করিয়াছে ২১,২৬২ কাহন বীজ "গুটি" আর আদায় হইয়াছে ৭১,২৪২৲ টাকা। রেশমের বাজারে মাল জড় হওয়ায় গুটির দর নামিয়াছে। তাই আদায়টা কম হইয়াছে।

এ বছর বিভাগীয় পরিদর্শকদের তাঁবে নির্ব্বাচিত "পালক"রা ১৮,০০০ হইতে ১৯,০০০র মধ্যে বীজ উৎপন্ন করিয়াছে।

মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ ও বীরভুম জিলার কোনো কোনো গ্রামে উন্নতপ্রণালীতে ব্যাধিমুক্ত বীজ উৎপাদন সম্বন্ধে প্রদর্শনী ও প্রচার হইয়াছে। বাঁকুড়ায় রেশমের ব্যবসা পুনর্গঠিত হইতেছে এবং ৫৩টা গুটি-উৎপাদক গ্রাম বিভাগীয় সহায়তা পাইতেছে।

অভয়-আশ্রমের খাদি বিক্রয়

(১)

বৎসর	উৎপাদন	বিক্রয়
১৯২৪	২১,০১৩৲	২১,৮২২
১৯২৫	৮৮,০০০৲	৭৪,৬১০৲
১৯২৬	১,৫১,৩৯৫৲	১,৪৫,৬২২৲

(২)

"জাতীয় সপ্তাহে" (৬ এপ্রিল হইতে ১৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত, ১৯২৭) খাদি বিক্রয়ের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। কলিকাতা অভয় আশ্রমের শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন—

"মোট বেচা হইয়াছে ৮,০৮৬৵৬ পাই। অর্থাৎ দৈনিক গড় হাজার টাকার বেশী। হিসাবটা এইরূপ:—

কেন্দ্রের নাম	
১। কলিকাতা ...	... ২৬৭১৲
২। কুমিল্লা ...	... ২৩২৪।৵৩ পাই
৩। বাঁকুড়া ...	... ৯০০৲
৪। উত্তর বঙ্গ ...	... ৬৫০৲
৫। বরিশাল ...	... ৩৬৩৵৯ পাই
৬। মেদিনীপুর ...	... ৩৪৭।৯ পাই

৭। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা	...	২৯৪৸৴৹
৮। বহরমপুর	...	...	২১৩।৹
৯। হবিগঞ্জ	...	...	১০৪৸৶৬ পাই
১০। কৃষ্ণনগর	...	...	১৫০৶৩ পাই
১১। ফরিদপুর	...	...	৬৭৸৶৬ পাই
		মোট	৮০৮৸৶৬ পাই

সমবায়ে বাঙালী

৩০শে জুন ১৯২৬ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে সমবায়-সমিতির অবস্থা এইরূপ :—

কর্ম্মচারী

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র রেজিষ্ট্রারের কাজ সারা বছর ধরিয়া করিয়াছেন। বড় চাকুরীগুলিতে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ২৫টা নতুন অডিটর বা হিসাব-পরীক্ষকের পদ সৃষ্ট হইয়াছে।

বছর শেষ হইবার পর (১) চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী রেজিষ্ট্রারের জন্য আলাদা আলাদা আফিস্ কাছারি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চট্টগ্রাম সহকারীর কর্ম্মস্থল চট্টগ্রামে উঠিয়া আসিয়াছে। বর্দ্ধমান সহকারীর কর্ম্মস্থল এখনো স্থির হয় নাই।

(২) এক অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টরের পদ সৃষ্ট হইয়াছে।

(৩) ম্যালেরিয়া-নিবারক সমিতিগুলির হিসাব পরিদর্শনের জন্য আরও ৩ জন অডিটর নিযুক্ত হইয়াছে। অতএব এখন অডিটরের মোট সংখ্যা দাঁড়াইল ৯৮।

আন্দোলনের প্রসার

সব রকমের সমিতি ছিল ১১,০৮১। বাড়িয়া হইয়াছে ১২,৮১৯ (অর্থাৎ বাড়্‌টা ১৫·৬%)।

মোট সভ্যের সংখ্যা ছিল ৩,৮৫,৫৯৯। বাড়িয়া হইয়াছে ৪,৫৩,০৩১ (অর্থাৎ বাড়্‌টা) ১৭·৪%।

মোট কেজো পুঁজিপাটার পরিমাণ ছিল ৬,১৮,৩৮,৫৫০৲ টাকা। ২১.৭% বাড়িয়াছে।

প্রাইমারি বা মূল সমিতির বিবরণ

(ক) কৃষি-সমবায়

(১) ঋণদান সমিতি

এ প্রদেশের মোট সমিতির সংখ্যার ৮৭·৩% অংশ হইতেছে কৃষি ঋণ-দান সমিতি। পূর্ব্ব বৎসরে সংগ্রহ হইয়াছিল ৬২·৭১ লক্ষ টাকা। এই বৎসরে হইয়াছে ৭৯·৮৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ যথাক্রমে ৪১·৮% ও ৪৫·৫% অংশ। "ওভারডিউ" বা বে-ওয়াদার পরিমাণ কমিয়া হইয়াছে ২৪·১%। অবশ্য এটাও নেহাৎ সামান্য নয়!

গত বছর সমিতির তাঁবে যে পুঁজিপাটা ছিল তা দ্বিগুণিত হইয়াছে।

(২) কৃষিদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় সমিতি

একসঙ্গে কৃষির উৎপন্নগুলিকে বাজারে বেচিয়া ফেলা এক মহা সমস্যা। অনেক ঝঞ্ঝাট। বিশেষ পাটে গুরুতর ফট্‌কা জুয়া চলে ও দরের উঠানামা অত্যন্ত দ্রুত হয়। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমিতিগুলি বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিক্রয়-সমিতির সংখ্যা ৩৩ হইতে ৫৩তে উঠিয়াছে।

সভ্যসংখ্যা ৫,৩৩৭ ,, ৯,৫৬৫তে ,, ।

কেজো পুঁজিপাটার পরিমাণ ৯৪,৪১৯৲ টাকা হইতে ২,৩৪,০৮৮৲ টাকাতে উঠিয়াছে।

পাট-বিক্রয় সমিতিগুলি "চাপ-কল" বসাইয়াছে, উপযুক্ত ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছে, আর বছর শেষ হইবার পর হইতে সোজাসুজি মিল ও রপ্তানির আড়তগুলির সঙ্গে জোর কারবার চালাইতেছে।

ধান্য-বিক্রয় সমিতিগুলিকে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। ব্যবস্থাটা এইরূপ :—নতুন নতুন সমিতিগুলিকে গোড়ার দিকে পরিদর্শক রাখিবার খরচ পোষাইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট দিবেন। তাছাড়া কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ধান রাখিবার জন্য গুদাম স্থাপন বাবদ্ গবর্ণমেণ্ট ৩ বছরের জন্য টাকাটা দান করিবেন।

(৩) জল-সেচ সমিতি

নদী-নালার জল বহাইবার কোন নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই।

জল-সেচ সমিতির সংখ্যা ছিল ২৬৮। এবারে হইয়াছে ৩৫০। পূর্ব্বে সেচিত আয়তনের মোট পরিমাণ ছিল ৬২,১৪৯ বিঘা। এবারে হইয়াছে ৭০,৬৭২ বিঘা।

এই বিস্তারটা পূর্ব্বের ন্যায় বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় প্রধানতঃ ঘটিয়াছে।

(৪) চাষী সমবায়-সভা

চাষী সভা ২০ ছিল ২১ হইয়াছে।

সভ্য-সংখ্যা ৩২৫ ছিল ৮,২৪৯ হইয়াছে।

মোট কেজো পুঁজিপাটা ৮,৩৮১ টাকা ছিল ৩১,০২৪ হইয়াছে।

এই সভাগুলি এখনো এক একটা পরীক্ষামাত্র। দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

(৫) উৎপাদন বিক্রয় সমিতি—দুগ্ধ সমিতি

এইরূপ সমিতির সংখ্যা ৬৩ হইতে ৭৪ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭১টা অবস্থিত বারাসতে। এই ৭১টাই কলিকাতার দুগ্ধ ইউনিয়ানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

কলিকাতার ইউনিয়ান্ কর্পোরেশ্যনের সাহায্য পাইয়া এক সুন্দর দুগ্ধ-শালা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দুধ রক্ষিত ও বিতরিত হয়। দুগ্ধ-সমিতিগুলির কৃপায় (১) উৎপাদকেরা ঘরে দু'পয়সা বেশী আনিতে পারিতেছে। এরা প্রধানতঃ চাষী—গো-পালনটা একটা গৌণ বৃত্তি। (২) উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। গত ৫ বছরে মোট আদায়ের পরিমাণ ৩ গুণ হইয়াছে। আর মাথাপিছু তা দ্বিগুণ হইয়াছে। এই ইউনিয়ান কলিকাতার দুগ্ধ-সমস্যা সমাধানের ভার হাতে লইয়াছে।

(৬) নওগাঁ গাঁজা চাষীদের সমবায় সমিতি লিমিটেড্

এই সমিতি মুনাফার কিয়দংশ সাধারণের হিতজনক কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে।

(খ) অন্যান্য সমবায়

তাঁতী সমিতির সংখ্যা এখন ২৩৩। তন্মধ্যে বাগের-হাট কো-অপারেটিভ্ উইভিং ইউনিয়ান এক কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছে।

রেশম দেশের একটা প্রাচীন শিল্প ছিল। এই ব্যবসার পুনরুদ্ধারকল্পে মালদহে সমবায়-প্রণালীতে এক ব্যবসায় খাড়া করা হইয়াছে।

ষ্টোরস্ সমিতিগুলি ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। সংখ্যা ৭১ হইতে ৬৬তে নামিয়া গিয়াছে।

এ বৎসর লক্ষ্য করিবার বিষয়ঃ—৫টা নারীদের সমবায় সমিতি (মহিলা সমিতি)।

কেন্দ্রীয় সমিতি

(১) শিল্প ইউনিয়ান বা শিল্প-সঙ্ঘ

এই সমিতিগুলির সংখ্যা বাড়ে নাই। ঢাকা ইউনি-য়ানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ইহার "পৌষ মাস" চলিতেছে। বাঁকুড়া ইউনিয়ান পুঁজি বেচিতে কষ্ট পাইতেছে।

(২) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

এ বছর ৭টা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নূতন হইয়াছে। মোট সংখ্যা হইল ৯৮। ইহাদের তাঁবে সমিতির সংখ্যা ৯,০৪৬ হইতে ১১,১৫২ হইয়াছে। শেয়ার বেচিয়া গচ্ছিত পুঁজিপাটা ২৫·২৯ লক্ষ টাকা হইতে ২৯·৫৭ লক্ষ টাকাতে উঠিয়াছে। রিজার্ভ ফাণ্ড ছিল ১১·৪১ লক্ষ টাকা, হইয়াছে ১৩·২০ লক্ষ টাকা। তাদের মোট কেজো পুঁজিপাটার পরিমাণ ২·০৫ কোটি হইতে ২·৪০ কোটি টাকাতে উঠিয়াছে। সমিতিগুলির নিকট হইতে সংগ্রহের মোট পরিমাণ ৮৫·৪৭ লক্ষ টাকা হইতে ২·০৫ কোটি টাকাতে উঠিয়াছে।

(৩) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

এই ব্যাঙ্কের এ বৎসরের লেনদেনের কারবার গতবারের দ্বিগুণ হইয়াছে। "হস্তান্তরে"র পরিমাণ গত বছর ছিল ২·৫ কোটি টাকা, এ বছরে হইয়াছে ৫ কোটি টাকা। মুনাফা ৬৯,৬৪৬৲ টাকা হইতে ১,৪৫,৬৪৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের সাফল্যের জন্য গত দুই বছর শ্রীযুক্ত বি, এন, সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

(৪) ম্যালেরিয়া নিবারণী সেণ্ট্রাল সমবায় সমিতি

সেণ্ট্রাল সমিতির তাঁবে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সংখ্যা ৪৩৩ হইতে ৮৬৯ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬৩টি সমিতি বা ৩০% রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। গত বৎসর মাত্র ৯৮টি বা ২২·৬% রেজিষ্ট্রী করা ছিল।

(৫) বঙ্গীয় সমবায়-সমিতি সংগঠন লিমিটেড্

এই সমিতিটা এ বছর পুনর্গঠিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। এই প্রদেশের ৬,৫০০ সমিতির উপর বা ৫০% এর বেশী ইহার কুক্ষিগত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আরও ৭,০০০, টাকা ইহাকে দান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য,—ইহার কাজ আরও ভালভাবে চলে। সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা দুইখানার উন্নতি হয়, সমবায় সম্বন্ধে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সমবায় সাহিত্যের এক অবৈতনিক পাঠাগার ও লাইব্রেরী কলেজস্কোয়ারের কাছাকাছি কোথাও স্থাপন করা যায় ও সমবায় নীতি শিখাইবার ক্লাসের বন্দোবস্ত হয়। এই তালিকার অধিকাংশ কাজেই হাত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সমবায় শিখাইবার ক্লাস এখনো বসে নাই।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

এই বৎসরের এপ্রিল মাসে ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অ্যাক্ট (১৯১৩ সনের ৭ম ধারা) অনুসারে ২৫টা নতুন কোম্পানী মোতায়েন হইয়াছে। মোট অনুমোদিত পুঁজিপাটার পরিমাণ ১,০৬,২৫,০০০, টাকা। সম্পূর্ণ হিসাব এইরূপ :—

৪	ব্যাঙ্কিং	২,৭০,০০০৲
২	লোন (ঋণ-দান) ...	২,০০,০০০৲
২	ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট (টাকা খাটানো ও ট্রাষ্ট) ...	১৮,০০,০০০৲
১	জীবন, অগ্নি ও নৌ বীমা ...	১,০০,০০০৲
১	মোটর নির্ম্মাণ ও বিক্রয় ...	২,০০,০০০৲
১	অন্যান্য যান-বাহন ...	১৫,০০০৲
২	রাসায়নিক ও ঐ ধরণের বাণিজ্য	২,৫০,০০০৲
১	পাবলিক সারভিস্ (সাধারণের হিতকারী কোম্পানী) গ্যাস, জল, বিদ্যুৎ শক্তি, টেলিফোন্	২,০০,০০০৲
১	কাদামাটি, পাথর, সিমেণ্ট, চুণ ও অন্যান্যমাল, ইমারতের উপযোগী	৪,০০,০০০৲
৫	অন্যান্য বাণিজ্য ও দ্রব্য নির্ম্মাণ	৪,৪০,০০০৲
১	পাটের কল	৫০,০০,০০০৲
২	চা রোপণ (বা চাষ) ...	৫,০০,০০০৲
২	অন্যান্য চাষ	১২,৫০,০০০৲
মোট ২৫		১,০৬,২৫,০০০৲

অবশ্য এইগুলার কোন্‌টা খাঁটি বাঙালীর প্রতিষ্ঠান তাহা বুঝা কঠিন।

ই, বি রেলওয়ের প্রসার

স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে ই, বি, রেলওয়ে ৪০০ মাইল নূতন রেলপথ খুলিবে। এই রেলপথ-গুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট জনপদের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আগামী বছরে খরচ হইবে ৩১৩৩৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১৫১ লক্ষ ব্যয় করা হইবে নূতন লাইন নির্ম্মাণে। আর ১৬২,৩৮ লক্ষ খরচ হইবে খোলা লাইনের কাজ ও "রোলিং ষ্টক" বাবদ।

বাঙ্গালার বাণিজ্যের ইতিহাসে এ একটা স্মরণীয় ঘটনা হইতে চলিল।

নয়া লাইন

১। নকুল—রামপুর-বোয়ালিয়া—নাটোর—আমপুরা—নবাবগঞ্জ লাইন—৫১ মাইল, অনুমিত খরচ ১২১ লক্ষ টাকা।

২। সৈদ্বিয়া—বহরমপুর—ভেড়ামারা লাইন—৯২ মাইল, অনুমিত খরচ ১৪৪ লক্ষ টাকা।

৩। ঈশ্বরদি—পাবনা লাইন—১৫ মাইল, অনুমিত খরচ ১৫ লক্ষ টাকা।

৪। সিংহজানি—টাঙ্গাইল—পিঙ্গলা লাইন-৫৫ মাইল, অনুমিত খরচ ৫৫ লক্ষ টাকা।

৫। ফরিদপুর—চরমুগুরিয়া—বরিশাল লাইন—৮১ মাইল, অনুমিত খরচ ১৪০ লক্ষ টাকা।

৬। মৈমনসিংহ—পিঙ্গলা লাইন—৩২ মাইল, অনুমিত খরচ ৩২ লক্ষ টাকা।

৭। সিরাজগঞ্জ—নোখিলা—বগুড়া লাইন—৪২ মাইল, অনুমিত খরচ ৩৮ লক্ষ টাকা।

৮। কৃষ্ণনগর—জলঙ্গি লাইন—৫৫ মাইল, অনুমিত খরচ ২৮ লক্ষ টাকা।

৯। পার্ব্বতীপুর—বোনারপাড়া লাইন—৫৬ মাইল, অনুমিত খরচ ৪৫ লক্ষ টাকা।

১০। ঢাকা—আরিচা লাইন——৯২ মাইল, অনুমিত খরচ ৩২৫ লক্ষ টাকা।

১১। বরশোল—শান্তাহার লাইন——৯০ মাইল, অনুমিত খরচ ৭৯ লক্ষ টাকা।

১২। রাজবাড়ী—কামারখালি—যশোহর লাইন—৫৬ মাইল, অনুমিত খরচ ৬৭ লক্ষ টাকা।

১৩। তিস্তা নদী সার্ভে—৪৫ মাইল। (২)

১৪। দিনাজপুর রুহিয়া লাইন—৫২ মাইল, অনুমিত খরচ ৩৫ লক্ষ টাকা।

১৫। ধামুরা-লক্ষীকান্তপুর লাইন—১৯ মাইল, অনুমিত খরচ ১৮ লক্ষ টাকা।

বাংলার বাহিরে

বিহার-উড়িষ্যায়—পূর্ণিয়া—ধামদহ লাইন—৫২ মাইল, অনুমিত খরচ ৪৩ লক্ষ টাকা।

আসামে (১) তেজপুর-সাঙ্গলা লাইন—৫০ মাইল, অনুমিত খরচ ৪৫ লক্ষ টাকা।

(২) পাঠশালা-জঙ্গলা লাইন—৭০ মাইল, অনুমিত খরচ ৭০ লক্ষ টাকা।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ক্যানাল

পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য সোজা রাস্তা কায়েম করিবার মানসে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ক্যানাল খননের প্রস্তাব উঠে। ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে সরকার এই প্রচেষ্টার জন্য নামমাত্র ২৫ হাজার টাকা দাবী করেন। দেশী সদস্যেরা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। ইউরোপীয় সভ্যগণও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব-বঙ্গের নদীগুলি যেরূপ দ্রুত মরিয়া যাইতেছে তাহাতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ক্যানাল খনন প্রচেষ্টায় হাত না দিলে পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতার মধ্যে স্থাপিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে।

সংশোধিত আনুমানিক ব্যয় ২৭,৯২৩,১২২ টাকা হইবে। ইহার মধ্যে ৬৮,৪২,০০০ ইতিমধ্যেই খরচ হইয়া গিয়াছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ক্যানাল খননের কার্য্যে দেরী করিলে আরও টাকা এইরূপ ভাবে অযথা অপব্যয় হইবে।

সেই জন্য বাংলা সরকার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা ক্যানাল হইতে কিরূপ আয় হইবে সে সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিবেন কমিটি এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে :—

প্রেসিডেন্ট—শ্রীযুক্ত এমার (চেয়ারম্যান ক্যালকাট ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট)। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত আর, বি, লার্ড, (মেসার্স টমাস ডাফ এণ্ড কোং) ইনি বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের প্রতিনিধি। শ্রীযুক্ত জে, এন, বোস (মেসার্স বেনেট এণ্ড কোং এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি। শ্রীযুক্ত জে, ওয়াই, ফিলিপ (মেসার্স ম্যাকনিল এণ্ড কোং) ইনি ইয়োরোপীয় ইনল্যাণ্ড ষ্টীমার কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করিবেন। শ্রীযুক্ত জে, এন, রায় (মেসার্স রাজা শ্রীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদার্স) ইনি ইণ্ডিয়ান ষ্টীমার কোং মনোনীত সদস্য। শ্রীযুক্ত টি, এইচ, বেলিস ইনি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রতিনিধি।

বাংলা দেশে হিন্দুমুসলমানের শিক্ষা

কোন্ শ্রেণীর বিদ্যালয়	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
আর্ট কলেজ	২৪১২৩	২০১১০	৩১৩১
ল কলেজ	৩৬৩৪	২০৭৬	৫২৬
মেডিকেল কলেজ	১৬৮২	১৪৮৬	১৪০
এঞ্জিনিয়ারিং „	৩২১	২৬৮	২৯
টিচিং কলেজ	১৪০	৮৫	২৪
কমার্স কলেজ	৬২৪	৫৯৩	৩০
পশু চিকিৎসা „	১৩২	৭৩	৪৫
মোট	৩০,৬৫৬	২৬০৯১	৩৯২৬

বালকদের স্কুল

হাইস্কুল	১০০১০১	৮৩৭৯৬	১৪৬০৪
মিডল „	৮৪৮১৯	৬৮১৯৫	১৪৬৭৩

প্রাইমারি	১৪৭৮০৪৮	৭২৪৪২০	৭২৬৯২২
	বালিকাদের স্কুল		
হাইস্কুল	১৪১৯	৭১০	১৩
মিডল	২২২৩	৭৮৮	৩৫
প্রাইমারি	৩১৭৪৪৪	১২৯৯৬৪	১৭৮০৪৫
মোট	১.৯৮৯৪৪	৯৭৮৭৩	৯৩৩৪৯২

	হিন্দু	মুসলমান	
কলেজে	৮৫·২ %	১২·৪ %	
স্কুলে	৫০·৮ "	৪৭·০ "	
হাই স্কুলে	৮৩·৭ "	১৪·৫ "	বালক
মিডল "	৮০·৪ "	১৭·৩ "	বালক
নিম্ন "	৪৯ "	৪৯·২ "	বালক
হাই স্কুলে	৫০·২ "	১ "	বালিকা
মিডল "	৪৬·৫ "	১·৬ "	বালিকা
নিম্ন "	৪০·৯ "	৫৬ "	বালিকা

কালনা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

আমরা কালনা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯২৫ সনের জুলাই হইতে ১৯২৬ সনের জুন পর্য্যন্ত অষ্টম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের সর্ব্ববিধ উন্নতি হইয়াছে। সভ্য-সংখ্যা ৯২ হইতে ৯৯ ও কেজো মূলধন ১৭৯২৪৫৵০ হইতে ১৯৮০১৪ হইয়াছে। লাভ হইয়াছে ৩৪৮৫৷৴২ পাই।

বর্ষারম্ভে অংশজাত মূলধন ছিল ২১২৮০৲ টাকা মাত্র। বর্ষশেষে তাহা ৩৫৩৪০৲ টাকায় উঠিয়াছে। এই বৎসর ৪০৬টি নূতন শেয়ারও বিক্রয় হইয়াছে। বর্ষশেষে মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১৮৬২০৫৶০। সুদ শতকরা ৯৵০ হিসাবে ধার্য্য আছে।

সংযুক্ত সমিতিসমূহের কার্য্যপদ্ধতি সমালোচনা করিলে কিন্তু তাদৃশ আশার সঞ্চার হয় না। বিবরণীতে প্রকাশ-"ক্রয় বিক্রয় সমিতির অবস্থা উপযুক্ত মূলধন অভাবে আশাপ্রদ নহে।" কিন্তু ৯৯টি সমিতির মধ্যে একটি মাত্র ক্রয় বিক্রয় সমিতি ছাড়া বাকী ৯৮টিই ঋণদান সমিতি। ঋণদান সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ও কার্য্য ভাল চলিলে বুঝিতে হইবে যে, লোকের টাকা কর্জ্জ লইবার প্রবৃত্তিই বাড়িতেছে। কিন্তু যে সমিতির উন্নতি হইলে সভ্যগণ লাভবান্ হইতে পারিতেন, সেই সমিতি ৯৯টির মধ্যে মাত্র ১টী। তাহারও অবস্থা "আশাপ্রদ নহে"। বিবরণী এই ষ্টোরের "আভ্যন্তরীণ ত্রুটির"ও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে আর ধামা চাকা দিয়া না রাখিয়া ডিরেক্টরগণ এই একটি মাত্র গৌরবের প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করুন, তাঁহাদেরও মুখরক্ষা হইবে।

তারপর ঋণদান সমিতির অবস্থাই বা ভাল কোথায়? কালনা শহরের দুটি সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট ঋণদান সমিতির কথা ছাড়িয়া দিলে, বাকী ৯৬টী গ্রাম্য ঋণদান সমিতি। বিবরণীতে প্রকাশ "গ্রাম্য সমিতিগুলির পঞ্চায়েৎগণই বেশী টাকা কাজে লইয়া থাকেন। ইহা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারাই ঋণের কিস্তি খেলাপ করাতে অন্যান্য সভ্যেরা ঋণ পরিশোধে ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন।" বলা বাহুল্য, এ অবস্থা নিতান্তই নিন্দনীয়। টাকা ধার পাইবার সুবিধার জন্যই যদি আমরা সমবায়ের ভক্ত হই, অথচ সমবায় পদ্ধতিতে কোন লাভমূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ইহাকে কিছুতেই সুলক্ষণ বলিতে পারিব না।

সমবায় প্রথা সার্থক করিবার পক্ষে বহু কর্ম্মঠ সেবকের প্রয়োজন। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বসু মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু একজনের উপর ভার ছাড়িয়া দিলে কখনই কোন কাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না। কর্ম্মীর পর কর্ম্মীরা আসিয়া না দাঁড়াইলে কর্ম্মের ধারা শক্তিশালী হয় না। আমরা আশা করি, বর্ত্তমান বর্ষে নব-নির্ব্বাচিত ডিরেক্টরগণ অধিকতর পরিশ্রম করিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য সফল করিয়া তুলিবেন। তথাপি এই আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের বহুমুখী কার্য্যধারা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি এবং সেজন্য ডিরেক্টরগণকে, বিশেষতঃ দীনবন্ধু বাবুকে, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

(পল্লীবাসী)

অগ্নিকাণ্ডে আর্থিক ক্ষতি

নিম্নলিখিত পত্রখানি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সম্পাদক কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিকট লিখিয়াছেন,—

"নিমতলা এলাকায় গত কয়েক মাসে যে সমস্ত অগ্নিকাণ্ড হয়, বিশেষ করিয়া গত ২২শে মার্চ্চ নিমতলা কাঠগোলায় যে ভীষণ ক্ষতিকর অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে, এই সমস্তের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য চেম্বারের কমিটি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। চেম্বারের কমিটি জানিতে পারিয়াছেন যে, গত ২২শে মার্চ্চের অগ্নিকাণ্ডে ৩২টী ফার্ম্মের প্রায় তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ফায়ার ব্রিগেড যদি কালবিলম্ব না করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইত তবে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হইত বলিয়া মনে হয়। চেম্বারের কমিটির নিকট খবর আসিয়াছে যে, ফায়ার ব্রিগেড আগুন লাগিবার প্রায় একঘণ্টা পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এই বিলম্বের ফলে করদাতাদের বহু কষ্ট এবং ক্ষতি ভোগ করিতে হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ড দমন করিতে এই প্রকার বিলম্ব ফায়ার ব্রিগেডের এই প্রথম নয়। নিমতলার পূর্ব্বের কোন কোন অগ্নিকাণ্ডেও ফায়ার ব্রিগেড এই প্রকার বিলম্ব করিয়াছে। গত বিশ বৎসরে ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সনের অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতির পরিমাণ ১৫লক্ষ টাকা। ১৯২৫ সনের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি হয় ১লক্ষ টাকা। গত মাসে নিমতলা অঞ্চলে আরো দুইটি অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। একটি নিমতলা ষ্ট্রীটে, অন্যটি দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে। এই সম্পর্কে ইহা বলা উচিত যে, কাঠগোলা ইত্যাদির খুব কম ক্ষেত্রেই বীমা হইয়া থাকে। গোলাওয়ালাদের বেঙ্গল অ্যাক্ট ১এর দরুণ যে বিশেষ ট্যাক্স দিতে হয়, তাহার উপর আবার গোলা বীমা করিবার ব্যয়ভার তাহারা বহন করিতে পারে না।

"ফায়ার ব্রিগেডের নিমতলা অঞ্চলের কাঠগোলাগুলির অগ্নি-নিবারণে অ-তৎপরতা এবং বিলম্বের জন্য কাঠগোলা-ওয়ালাদের অভিযোগের তদন্ত হওয়া আবশ্যক। অভিযোগের প্রতিকার হওয়ারও একান্ত প্রয়োজন। এই অভিযোগের তদন্তের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইবেন—তাঁহারা নিমতলা বা তাহার কাছাকাছি কোন স্থানে একটী ফায়ার বিগ্রেড আড্ডা স্থাপন করার কথাও বিবেচনা করিবেন। ইহা সম্ভবপর হইলে ঐ অঞ্চলের অগ্নিকাণ্ড দমন করা অনেক সহজ হইবে।

"চেম্বার অব্ কমার্সের কমিটি আশা করেন যে, তাঁহাদের প্রস্তাব কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট সুবিবেচনা লাভে বঞ্চিত হইবে না।"

মুচিগণের উন্নতি

যশোহর জিলার স্থানে স্থানে অস্পৃশ্যতা দূর করা সম্পর্কে আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। যশোহরের সদর মহকুমার অধীন গঙ্গানন্দপুর নামক গ্রামের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ মুচিদিগের সামাজিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মুচিদিগের বালকবালিকাগণের শিক্ষার জন্য তাঁহারা একটী অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে ঐ সকল বালক-বালিকাদিগকে তাঁহারা ভদ্রলোক বালকরূপেই গণ্য করিবেন। হিন্দু সমাজের এই অঙ্গটি বহু দিন যাবৎ অবনত ছিল। মুচিগণের আর্থিক, নৈতিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য যশোহর জিলার অন্তর্গত কাগমারি গ্রামে গত ৮ই মে যশোহর ও নদীয়াবাসী মুচিদিগের একটী মহতী জনসভার অধিবেশন হয়।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সহঃ সম্পাদক শ্রীযুত মহীতোষ রায় চৌধুরী ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যশোহর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "যশোহর" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত আনন্দমোহন চৌধুরী, যশোহর জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ রায়, উকীল শ্রীযুত টিকেন্দ্রজিৎ মজুমদার প্রভৃতি ঐ সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুত দীনেশ দাস প্রভৃতি রুইদাস (মুচি) সম্প্রদায়ের ধনী ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ কলিকাতা হইতে আসিয়া ঐ সভায় যোগদান করেন। দেশবন্ধু পল্লী-সংগঠন সমিতি ও বঙ্গদেশের সরকারী সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগ ঐ সভায় আলোক-চিত্র প্রদর্শন করেন। সভাপতি

মহীতোষবাবু ও চন্দ্রকান্তবাবু মুচি-সমাজের উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন করিবার জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে অনুরোধ করেন। সভায় ৩।৪ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

যশোহরে নদীসংস্কার

যশোহর জেলার মধ্যে প্রবাহিত ভৈরব, বেগবতী, চিত্রা, নবগঙ্গা প্রভৃতি অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া এক্ষণে রোগের খনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই জলাভাব। যে জল আছে তাহাও শেওলা জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং কীটাণুপূর্ণ। অধিকাংশ গ্রামে পুষ্করিণী নাই। অধিবাসিগণকে বাধ্য হইয়া সেই কীটাণুপূর্ণ পচা জল স্নান, কাপড়াদি কাচা ও পানের জন্য ব্যবহার করিতে হয়। নবগঙ্গা নদীর অল্প জলে স্থানীয় জেলেগণ মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত বৃক্ষের ডাল দ্বারা কাঠা বা কুমার দিয়া জলকে আরও পচাইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে নবগঙ্গা নদীর একসের জল ছাকিলে অন্ততঃ আধসের পরিমাণ ময়লা পাওয়া যায়। আবার শ্রাবণ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে কৃষকগণ নদীতে পাট পচাইয়া জলকে বিষতুল্য করিয়া থাকে। কৃষকগণকে ঐ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য কেহই নাই। স্থানীয় দফাদার চৌকীদারগণ ঐ সময়ে পাট পচাইবার জন্য কৃষকগণের নিকট কিছু কিছু চাঁদা বা জরিমানা আদায় করিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে দিয়া থাকে। ঐ টাকাকে জরিমানা বলা যায় না, কারণ জরিমানা হইলে ঐ সমস্ত পাটের জাগ উঠাইয়া লইতে হয়; কিন্তু তাহা হয় না এবং কিছু টাকা দিয়া কৃষকগণ নিশ্চিন্তে পাট পচায়। এই সমস্ত বিষয়ে এবং যাহাতে মাঝে মাঝে পুষ্করিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং খানা গর্ত্ত বুজান ও জঙ্গল পরিষ্কার হয় তজ্জন্য আমরা স্থানীয় মহকুমা ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণের ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা চেষ্টা করিলে দেশবাসীর উপকার করিতে ও করাইতে পারেন। যশোহরের নদী-সংস্কার সমিতিতে কে কে মেম্বার হইয়াছেন তাহা জানি না। তাঁহারা বর্ত্তমানে কি কি করিতেছেন, কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন বা কিরূপ আশা ভরসা করেন বা কি কারণে কার্য্যে অসুবিধা হইতেছে, তদ্বিষয়ে যদি মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা অনেকটা অবগত হইতে পারি ও ভরসা পাই। নবগঙ্গা নদীর সংস্কারকল্পে পরিমাপ হইয়াছে এবং মাথাভাঙ্গা ও জঙ্গলী নদী হইতে জলস্রোত প্রবাহিত করান যায় কি না, তাহার চেষ্টা হইতেছিল। সেই চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে বা কার্য্য আরম্ভ কি প্রকারে হইয়াছে বা কতদিনে হইবে, তাহা জানিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব। এ সম্বন্ধে নদীয়া-যশোহর নদী-সংস্কার-সমিতি যদি আমাদিগকে কিছু জানান্, তাহা হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড যদি কম সুদে টাকা ধার দিয়া পুষ্করিণী কাটাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও অনেক স্থলে পুষ্করিণী হইতে পারে। জেলাবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেশী পরিমাণ চিকিৎসক নিযুক্ত করিবার যুক্তি অপেক্ষা যাহাতে লোক অসুস্থ না হয়, বা হঠাৎ সংক্রামক ব্যাধির উদ্ভব না হয় তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রতিষেধক ব্যবস্থাই উত্তম। এ সম্বন্ধে দেশের নেতাগণ ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ উদ্যোগী ও অবহিত হইলে আরও সুখের বিষয় হয়। মামলা মোকর্দ্দমায় অগ্রণী হওয়া বা অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করাইবার জন্য মাতব্বর হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রী :—যশোহর

(আনন্দ বাজার পত্রিকার সংবাদদাতা)

জলকষ্ট

শ্রীপুর বলাগড় ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত কালীগড় গ্রামে ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত কূপ পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতি শুকাইয়া গিয়াছে। যেগুলিতে সামান্য জল আছে তাহাও অত্যন্ত আবিল এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। গরু বাছুর ছাগল মহিষের পানীয় জলের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য স্নানীয় ও পানীয় জলের জন্য একান্ত কষ্ট হইতেছে। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রতি বৎসর পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয় না। জেলা বোর্ড পল্লীগ্রামে জলসরবরাহের জন্য ৫ বৎসর বিস্তর অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এই দুর্ভাগ্য গ্রামের দুঃখের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত

হইতেছে। পার্শ্ববর্তী কোনও কোনও গ্রামে ইতিপূর্ব্বে কূপ ইঁদারা প্রভৃতি খনন করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। অদ্যাবধি এই গ্রামে একটি কূপও খনন করা হয় নাই। কম পক্ষে ৪টি কূপ অথবা নলকূপ এই গ্রামে জল-সরবরাহের জন্য আবশ্যক। আমরা জেলার কর্ত্তৃপক্ষ এবং স্বায়ত্তশাসনের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

(পল্লীবাসী, কালনা)

বাঙালীর মৎস্য-চিন্তা

বাঙ্গালা দেশে মৎস্য হিন্দু-মুসলমানের নিত্যকার খাদ্য। নিত্য যে পরিমাণ মৎস্য লোকে আহার করে বোধ হয় অনুপাতে তদনুরূপ জন্মে না। মৎস্যাহারের প্রতি লোকের যেরূপ আগ্রহ দেখা যায়, মৎস্যের চাষ বা উৎপাদনের প্রতি সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় না। মৎস্যের ব্যবসা লাভজনক হইলেও উহাতে নদীমাতৃক বাঙ্গালা দেশের লোকের কোন উদ্যোগ উৎসাহ নাই। কাজেই মৎস্য ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইতেছে। যেমন দেশে গোজাতির অবনতিতে দুগ্ধ ও ঘৃতের অভাব হইতে চলিয়াছে কাজেই লোকের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হেতু শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে মৎস্যে ডিম হয়। আষাঢ়ের নূতন জলে ঐ ডিমে বহুল মৎস্য জন্মে। আজকালকার দিনে কেহ শাস্ত্র মানে না। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে মৎস্য খাওয়া ত্যাগ করে না; এ অবস্থায় সরকার যদি আইন করিয়া রিজার্ভ ফরেষ্টে হরিণ ও পাখী মারার মত দুই মাস মৎস্য ধরা নিষিদ্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে নদী ও দেশ মৎস্যে ভরিয়া যায়। (খুলনা)

পাটকলের কুলীদের দাবী

গত ৮ই মে ১৯২৭ রবিবার দিন বাংলার চটকলের কর্ম্মচারীদের সমিতি "বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের" কার্য্যকরী সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

১। যেহেতু ভাটপাড়ার রিলায়্যান্স জুট মিলস্ বিনা নোটিশে কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার অন্যায় অজুহাতে বহুতর কর্ম্মচারীর বেতন বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন ও পরে আদালত কর্ত্তৃক তাহাদের এই অধিকার অগ্রাহ্য হইয়াছে, সেই হেতু এই সভা উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন অতঃপর ঐ বেআইনী কাজ হইতে নিরস্ত হইয়া দরিদ্র কর্ম্মচারীদের পরিশ্রমলভ্য বেতন আদালতের সাহায্য ব্যতীতই পাইবার সুযোগ দেন।

২। এই সভা বাংলার চটকলসমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের কারখানাগুলি হইতে সত্বর "ঘুস" এবং "ডালি" দেওয়ার কুপ্রথা তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের দুর্ণাম ও কর্ম্মচারীদের আর্থিক ক্ষতি নিবারণ করেন।

৩। এই সভা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন বাংলার কলকারখানাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক-শিশুদের শিক্ষা ও রক্ষার জন্য সত্বর উপযুক্তসংখ্যক অবৈতনিক স্কুল এবং শিশু পালনাগার প্রতিষ্ঠার জন্য কারখানার মালিকগণের সাহায্যে আবশ্যক উপায় অবলম্বন করেন।

৪। এই সভা ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যেন কারখানার আইন অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগকে "কর্ম্মচারীদের ক্ষতিপূরণ আইনের" কথা "কারখানা আইনের" ন্যায় অবগত করাইবার জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বন করেন।

অনুন্নত জাতির জলগ্রহণ

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে নদীয়া জেলার মুন্সীগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের আড়ৎ বাটীর সম্মুখস্থ ময়দানে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের শ্রীযুক্ত বাবু হৃষিকেশ বিশ্বাস, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ বিশ্বাস, জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের উদ্যোগে এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নানাবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করান যে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনই হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। বিধবাবিবাহ জাতির ধ্বংসের হেতু না হইয়া জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইবার একমাত্র উপায়। বক্তৃতাশেষে পণ্ডিতমহাশয় সর্ব্বাগ্রে সূত্রধর, স্বর্ণকার, পাটনী, সাধুখাঁ, হিন্দুকাহার, যোগী, রাজবংশী, রজক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তিগণের প্রদত্ত জল গ্রহণ করেন এবং তাহার মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উপস্থিত আপামর সাধারণ সকলেই পরস্পরের জল গ্রহণ করেন। সমগ্র জাতির বিরাট মিলনানন্দ বাস্তবিকই একটি দেখিবার জিনিষ হইয়াছিল।

নর্দ্দমা পরিষ্কার ও কুলীজীবন

'আনন্দবাজারের' পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েকমাস পূর্ব্বে হাওড়ায় গ্যাস ষ্ট্রীটের পাকা নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতে যাইয়া সাতজন কুলীর মৃত্যু হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের পাকা নর্দ্দমাতে নামিয়া আর একজন কুলীর মৃত্যু হয়। এইরূপ দুর্ঘটনা আরও ২।৪টী ঘটিয়াছে। নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতে যাইয়া হতভাগ্য কুলীরা যে বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারায় ইহার জন্য দায়ী কে? ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস "অমৃতবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে, ওরিয়েণ্টাল গ্যাসকোম্পানীর কারখানার নির্গত বিষাক্ত পদার্থ গ্যাস-ষ্ট্রীটের নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করাতেই হাওড়ায় শোচনীয় ঘটনা ঘটে। ডাঃ দাস ওরিয়েণ্টাল গ্যাসকোম্পানীর বিরুদ্ধে এই কারণে ফৌজদারী অভিযোগ আনিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিষয়টী গুরুতর হইলেও কেহই ডাঃ দাসের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

সুন্দরীমোহন বাবুর পত্রে আরও প্রকাশ যে, উক্তরূপে নর্দ্দমা পরিষ্কার না হওয়াতেই বিষাক্ত বাষ্প জমিতে থাকে এবং তাহার ফলে মাঝে মাঝে হতভাগ্য কুলীদের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। কেবল তাহাই নয়, ইহার ফলে নর্দ্দমার ময়লা বিশুদ্ধ জলের পাইপের ছিদ্রের মধ্যদিয়া প্রবেশ করিয়া পানীয় জলও দূষিত করিয়া দেয়। গত বৎসর ছাতাওয়ালা গলিতে এই কারণে কলেরা ও টাইফয়েড রোগের আবির্ভাব হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হয়। এবারেও উত্তর কলিকাতায় বিশুদ্ধ জলের পাইপ ফাটিয়া এইভাবে জল দূষিত হইতেছে ইহা আমরা বলিয়াছি।

ডাঃ দাস আরও একটী অদ্ভুদ রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ময়লা বহন করিবার জন্য কলিকাতার রাস্তায় দুই প্রকারের নর্দ্দমা আছে। সরু পাইপ নর্দ্দমা ও বড় পাকা নর্দ্দমা। পাইপ নর্দ্দমা দিয়া ময়লা গিয়া বড় পাকা নর্দ্দমাগুলিতে পড়ে। পাইপ-নর্দ্দমাগুলি পরিষ্কার করিবার ভার কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ারদের উপর এবং বড় পাকা নর্দ্দমাগুলি পরিষ্কার করিবার ভার ড্রেনেজ বিভাগের এঞ্জিনিয়ারদের উপর। ড্রেনেজ এঞ্জিনিয়ারেরা বলেন, তাঁহারা কি করিবেন? ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ারেরা পাইপ নর্দ্দমা পরিষ্কার না করিলে বড় পাকা নর্দ্দমাগুলি পরিষ্কার থাকিবে কিরূপে? ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ারেরাও অপর পক্ষের ঘাড়ে উল্টা চাপ দেন। এই ভাবে উভয়ের ঝগড়ার ফলে নর্দ্দমা অপরিষ্কার থাকিয়া যায় এবং বিষাক্ত গ্যাসে হতভাগ্য কুলীদের মৃত্যু হয় এবং কলের জল দূষিত হইয়া করদাতারা কলেরা ও টাইফয়েডে মরে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই? প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ মুখার্জ্জির দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেছি। কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারদেরও এ সম্বন্ধে গুরুতর দায়িত্ব আছে। (আনন্দবাজার)

নদীয়ার জুয়াড়ী

নদীয়া জিলায় বহু স্থানেই জুয়াড়ীরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স লইয়া জুয়ার ব্যবসায় করিয়া থাকে। ইহাদের পুঁজিপাটার মধ্যে একটী হাওয়ার বন্দুক, বোর্ড, ও জন-কয়েক অংশীদার খেলোয়াড়। ইহাতেই তাহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। জুয়াড়ীরা তাহাদের খেলা যে জুয়া নহে ইহা কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া লাইসেন্স লয়। এজন্য হাঁসপাতাল, হরিসভা বা কোন প্রতিষ্ঠানে তাহাদিগকে

কিছু কিছু চাঁদা দিতে হয়। ইহাই তাহাদের একমাত্র খরচ। তার পর, তাহারা প্রকাশ্য বাজারে বসিয়া নির্ব্বিবাদে লোকের চক্ষে ধুলি দিয়া খেলার ফাঁদ পাতিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। রাণাঘাটের রেলবাজারে ইহাদের উৎপাতে লোকে ঘুমাইতে পারে না। আমরা সেদিনও দেখিলাম, বার্ত্তাবহ সম্পাদকের বাড়ীর পশ্চিমে কয়েক রশি মাত্র দূরে জুয়াড়ীরা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে খেলা করিয়াছে। তাহাদের চীৎকার, গালাগালি, গণ্ডগোলে আমরা ঘুমাইতে পারি নাই। শান্তিরক্ষক পুলিশ দাঁড়াইয়া এই জুয়াখেলার মজা দেখিয়াছে এবং উপভোগ করিয়াছে। রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ঐরূপ গোলমাল ও চীৎকার নিবারণ করা যে তাহাদের কর্ত্তব্য, তাহা তাহাদের বলা সত্ত্বেও কর্ণপাত করে নাই। বাজার করিতে আসিয়া অনেক নির্ব্বোধ পল্লীগ্রামবাসীকে জুয়া খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ফিরিয়া গৃহে যাইতে দেখিয়াছি। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পর্য্যন্ত এই খেলায় যোগ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে আমরা দেখিয়াছি। আমরা জানি, এই জুয়াখেলা নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয়। কিন্তু তথাপি কেন যে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের এই অন্যায় ব্যবসায়ে প্রশ্রয় দেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা আশা করি, আমাদের নদীয়ার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরদ্বয় এইজাতীয় জুয়া খেলা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া নদীয়াবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন। (বার্ত্তাবহ)

কৃষ্ণনগর টেকনিক্যাল স্কুল

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে একটী টেক্‌নি-ক্যাল বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। ডিঃ বিঃ অফিসের পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে স্কুল গৃহ ও কারখানা গৃহ প্রস্তুত হইতেছে। যেরূপ দ্রুত গতিতে কার্য্য চলিতেছে তাহাতে বোধ হয় এবারই জুলাই মাসের সেসনে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবে। সদাশয় জমীদার মিঃ এম্, পাল চৌধুরী মহোদয় ও তাঁহার সহোদরগণ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ডিঃ বিঃ অফিসকে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষার্থী কমিতেছে

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য যে সকল ছাত্রছাত্রী প্রস্তুত হয় তাহাদের সংখ্যা ১৯২২ সন হইতে ছয় বৎসর ধরিয়া কমিয়া আসিতেছে। ইহা আমাদের আর্থিক উন্নতির পক্ষে যার পর নাই ক্ষতিজনক। নিম্নের তালিকা হইতে দেশের দুরবস্থা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের সংখ্যা	শতকরা অনুপাত
১৯১১	৬১৭৪	৪৩৪১	৭০·৩
১৯১২	৮৮৬২	৫৬৯৯	৬৪·৩
১৯১৩	৯৪৭৭	৬৯৩৭	৭৩·১
১৯১৪	১১৪২৮	৬৮৬৪	৬০·৩
১৯১৫	১২৬১৭	৭৫৯৮	৬০·৭৪
১৯১৬	১৪২২১	৮২৮০	৫৮·৭
১৯১৭	১৬০৮৮	১১২৭৮	৭১·৭
১৯১৮	১৪৬৭৫	৮৬১১	৫৮·৬৭
১৯১৯	১৫৯২২	১০২৪১	৬৪·৭
১৯২০	১৭৫৬১	১১৭৬৩	৬৭·৫
১৯২১	১৯১২৫	১৪৪৮২	৮১·৫
১৯২২	১৯১৩১	১৪৯৬২	৭৯·০৯
১৯২৩	১৮৮৬৭	১৩৮৫৩	৭৪·০৪
১৯২৪	১৮৪২১	১৪১৫৭	৭৭·৫
১৯২৫	১৯০৮২	১৩৯৭৮	৭৩·৮
১৯২৬	১৬৪০৬	৯২৮৮	৫৭·২
১৯২৭	১৫৭৫৪	৮৩৮৮	৫৩·০৫

পরীক্ষায় পাশ-ফেলের কথা এক্ষেত্রে তুলিতেছি না। বাঙালী সমাজে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত বিদ্যার কোঠায় বেশী লোক উঠিতেছে না, এই তথ্যটাই ভয়াবহ। কেন না ইহার অর্থ অতি সোজা। এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত ও তথা-কথিত ভদ্রলোকের সংখ্যা যথোচিত বাড়িতে পারিবে না। এই সংখ্যা কমিয়া যাওয়া আমাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের বিশেষ অন্তরায়।

বাংলার নারী শিক্ষা

১৯২৫-২৬ সনের বাংলার নারী শিক্ষার বিবরণ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বর্ষে দেশীয় বালিকা শিক্ষালয় ১৩৪৯৪ হইতে ১৩৯২২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা ৩১৭,৮৭৩ হইতে ৩৩২,০৯৯ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৪১০৫০ হিন্দু ও ১৮৭,৭৭৭ মুসলমান বালিকা, অবশিষ্ট ভিন্নজাতীয়। এই শিক্ষালয়গুলি শিক্ষাবিভাগ-সংসৃষ্ট।

শিক্ষা বিভাগের সম্পর্কশূন্য শিক্ষালয়ের সংখ্যা কথিত বর্ষে ২৫৪। এইগুলিতে ছাত্রীসংখ্যা মোট ৬,৫৮৮। তন্মধ্যে ২,৮৭৬ হিন্দু ও ৩,৪১২ মুসলমান ও ৩০০ ভিন্নজাতীয় বালিকা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর বিভাগের ২ জন মহিলা ইন্সপেক্টর ও ১২ জন সহকারিণী নিযুক্ত ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের ইণ্টারমিডিয়েট ডিপার্টমেণ্ট লইয়া ৪টী আর্টস্ কলেজ ছিল। ২টী সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত ও অন্য ২টি বেসরকারী ব্যয়ে পরিচালিত।

আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় ছাত্রীদিগের জন্য ১৮টী হাই-স্কুল ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর ছিল ১৬টী। কৃষ্ণনগর ও জলপাই-গুরিতে ২টী নূতন স্থাপিত হইল। কথিত বর্ষে ছাত্রী-সংখ্যা ৪,৫০৪ ও পূর্ব্ব বৎসর ৩,৭৯০ ছিল। ১৮টীর মধ্যে ৪টী সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত, বাকীগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত।

এই বর্ষে ভারতীয় ছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক স্কুল ৪৮টী ছিল ও পূর্ব্ব বৎসর ৩৬টি ছিল। ছাত্রীসংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ৫৮৬১ ও পূর্ব্ব বর্ষে ৪,৭২৩ ছিল। মধ্যবাঙ্গালা স্কুল ২৬টী ও ছাত্রীসংখ্যা ২,৫৭৬। পূর্ব্ব বৎসর ১৭টী স্কুল ও ছাত্রীসংখ্যা ২,৭২০ ছিল। আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩,৭৮২ (পূর্ব্ববর্ষে ১[illegible]৬৪) ও ছাত্রীসংখ্যা ৩১৭,৩৩৩ (পূর্ব্ব বৎসর ৩০৫,০০০) ছিল। নারীশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

কারিগরি ও শিল্প শিক্ষার জন্য আলোচ্য বর্ষে ৪২টী স্কুল ছিল ও পূর্ব্ববর্ষে ৪৬টী ছিল। এইগুলির অধিকাংশ মিশন পরিচালিত।

আলোচ্য বর্ষে ৫৪ জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী ১,৩১১ জন ছাত্রীকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই পদ্ধতি বিশেষ কাজের হইতেছে না।

সূচীকার্য্য শিক্ষা এবার উন্নতি লাভ করিয়াছে। সূচীকার্য্যে সরকারের সাহায্যদানই এই উন্নতির হেতু।

বঙ্গের মিউনিসিপালিটিসমূহ

এ বৎসর মিউনিসিপালিটির সংখ্যা হইতেছে ১১৫। গত বছরেও তাই ছিল। ২৫টা মিউনিসিপালিটীতে নূতন করিয়া নির্ব্বাচন হইয়াছে।

অসংখ্য মামলা মোকদ্দমা

নিম্নলিখিত ৯টী মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচন ও উপ-নির্ব্বাচন লইয়া সিভিল মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে—ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, নোয়াখালি, পাবনা, শিউরি নারায়ণগঞ্জ, কুটবা ও উত্তর বারাকপুর।

অধিবেশনের মোট সংখ্যা ২,৩৫৪। তন্মধ্যে কোরাম্ অভাবে ১৫৩টি হইতে পারে নাই আর ১৯৯টাকে বাতিল করা হইয়াছিল। আগের বছর এই দু'য়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫১ ও ১৮৭।

এই অকৃতকার্য্যতা সব চেয়ে বেশী হইয়াছে কোট-চাঁদপুরে। ৩৪টা অধিবেশনের মধ্যে ১৩টা হইতে পারে নাই আর ১৩টা বাতিল হইয়াছিল। সোনামুখীতে ১৬টার মধ্যে ১০টা হইতে পারে নাই। বাদুরিয়াতে অর্দ্ধেক এবং নবদ্বীপ ও বরহমপুরে ⅓ অংশের বেশী অধিবেশন বিফল হইয়াছিল।

করদাতার সংখ্যা বাড়িয়াছে

করদাতার মোট সংখ্যা ৩,১৭,৮৯৫ হইতে ৩,২১,৮১৯ হইয়াছে। আগের বছরের মত এ বছরও মোট লোক সংখ্যার ১৫·৮% জন করদাতা। মাথাপিছু গড়পড়্তা করের পরিমাণ আগে ছিল ৩ টাকা ৪ পাই এখন হইয়াছে ৩/৫ পাই। কিন্তু এই প্রদেশে মিউনিসিপালিটির কর-ভারের পরিমাণ অত্যন্ত নীচু। খুব কম কর দেওয়া মানেই মিউনি-সিপালিটিকে খুব কম কাজ হাতে লওয়ার সামর্থ্য দেওয়া।

উদাহরণ,—মেডিকেল বিভাগে মাথাপিছু ছয় পয়সারও কম ব্যয় করা হয় ২২টা মিউনিসিপালিটিতে। তুল্য ব্যয় হয়

২৯টা মিউনিসিপালিটীতে স্বাস্থ্যের (স্যানিটেশন) জন্য। তুল্য ব্যয় হয় ৪০টাতে শিক্ষার জন্য।

বে-সরকারী সম্পত্তির উপর কর চাপান আছে বাৎসরিক দামের ৫°/০ হইতে ৬°/০এর মধ্যে। কিন্তু সরকারী সম্পত্তি-গুলি উর্দ্ধতম সীমায় কর দিতেছে ৭½°/০।

৮৪টি মিউনিসিপালিটিতে এসেস্‌মেন্টের সম্পূর্ণ বা আংশিক পরীক্ষা হইয়াছে। তাতে মোট আদায় ১½ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

এই প্রদেশ হইতে মোট আদায় ৫৯ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৬০ লক্ষ হইয়াছে। কিন্তু চলিত খাকৃতি বা টানের উপর শতকরা আদায় ৯৫·৩ হইতে ৯৪·৩তে নামিয়াছে। সর্ব্বনিম্ন রাশি হইতেছে ৬৮·৬ (রাজপুর)।

তহবিল মিলানো

"রেমিশনের" পরিমাণ ২,৮৬'৮৪৪৲ টাকা হইতে ২,২৮, ৩৪১৲ টাকাতে নামিয়াছে। এই টাকা চলিত টানের ৩·৬°/০।

বছর শেষে ঋণের পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকা হইতে ১৪¾ লক্ষে উঠিয়াছে। এর ৫লক্ষ টাকার জন্য একা হাওড়া দায়ী। ৩১শে মার্চ্চ ঐ মিউনিসিপালিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ২৬,১৪০৲ টাকা জমা দিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহা হইলে ঋণটা দাঁড়ায় ৪,৭৯,৬৯৮৲ টাকায়।

যে সব মিউনিসিপালিটি বেশী রকম ঋণগ্রস্ত, তাদের নাম—ঢাকা, ময়মনসিংহ, বালি, হুগ্‌লি চুঁচুড়া, টালিগঞ্জ, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ।

টালিগঞ্জের ৪৪·২ অনাদায় রহিয়াছে। চট্টগ্রামের ঋণের ২,২০৪৲ টাকা সরকারী কোঠাবাড়ীর জন্য আর ১৬,১৩৪৲ টাকা সাধারণের কাছে বাকী আছে।

কমিশনারদের গাফিলি

এই প্রকার অনাদায়ের কারণ কি ? লোকাল একাউন্টস্‌ পরীক্ষক বলিতেছেন যে, জয়নগর, বারাকপুর, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ দম্‌দম্‌, উত্তর দম্‌দম্‌, সাতক্ষীরা, নেত্রকোণা, মহেশপুর, রঙ্গপুর ও অন্য কয়েকটা মিউনিসিপালিটিতে, কমিশনাররা নিজেদের কর শোধে অত্যন্ত গাফিলি করিয়াছেন। কর্ত্তারা এরূপ উদাসীন, অন্য লোকের ত কথাই নাই। এমন নিয়ম করা উচিত যে, কমিশনাররা গাফিলি করিলে আর নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।"

পূর্ব্ববারের জেরসুদ্ধ মোট আদায় ১,০৬,০৩,৩৮১ টাকা হইতে ১,০৬,৬৪,২৫৩৲ টাকায় উঠিয়াছে। মোট খরচ হইতেছে ৮৬,১৩,৭১৩৲ টাকা (১৯২৪-২৫) ; ৮৮,৭২,৪৪০৲ টাকা (১৯২৫-২৬)। হাতে রহিল ১৭,৯১,৮১৩৲টাকা। পূর্ব্ব বছর ছিল ১৯,৮৯,৬৬৮/টাকা। সব চেয়ে বেশী মজুত আছে হাওড়ায়—৩,৯২,৩৩৫/টাকা।

সরকারী সাহায্যসুদ্ধ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে মোট ৫,৮১,৩২৪৲ টাকা। ইহা মিউনিসিপাল আয়ের ৫°/০। সরকারী সাহায্য ১,১৪,৩৭৯৲ টাকা। পূর্ব্ব বছর এই ব্যয়টা ছিল ২,৯৪,৩২১৲ টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি ব্যতীত সকল বিভাগেই ব্যয় বাড়িয়াছে। এই বাড়টা সব চেয়ে বেশী হইয়াছে দার্জ্জিলিং মিউনিসিপালিটিতে। সেখানে ব্যয়টা ১০,৭৪৪৲ টাকা হইতে ৩২,২৪৯ টাকাতে উঠিয়াছে। সমগ্র প্রদেশে মোট ব্যয় ৬৩,০০০ টাকা বাড়িয়াছে।

আয়টা খাটানো হয় নাই

১৭টা মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ প্রতি ৭টার মধ্যে ১টা মিউনিসিপালিটি তাদের আয়ের ৩·২°/০ অংশ ব্যয় করিতে সমর্থ হয় নাই। এই টাকায় প্রাইমারি স্কুলে যারা শিক্ষা পায় তাদের অর্দ্ধেক শিক্ষা পাইতে পারিত। এই হারটা ৬০টা মিউনিসিপালিটির বেলায় ৫°/০ আর ১৫টার বেলায় ১০°/০এর উপর।

রঙ্গপুরে শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তার অর্দ্ধেকটা (৯২০৬ টাকা) পাওয়া গিয়াছে শিক্ষা কর হইতে। এই কর মিউনিসিপাল ভ্যালুয়েশনের ১·৮°/০ হারে বসান হইয়াছে।

হুগলি চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর, মিউনিসিপালিটি হুগলি জেলায় প্রধান। কিন্তু এদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হুগলি চুঁচুড়ার ঋণ ৪৪,২২২ টাকা। আর শ্রীরামপুরের ঋণ ২২,৩৪৪ টাকা। এই দুই স্থানের তহবিল হইতেছে ১০,০৬৭ টাকা ও ৭,৫৪৫ টাকা।

সাধারণতঃ কল-কারখানাওয়ালা অনেকগুলি শহর

সুশাসিত হইতেছে। আধা-গ্রাম্য কতকগুলি ছোট ছোট মিউনিসিপালিটিতে বেশ উৎসাহ ও কর্ম্মকুশলতা দেখা যায় যেমন, কুষ্টিয়া, বীরনগর, নলহাটি।

মালদহে রেশম-সমবায়

মালদহের রেশম-শিল্পের উদ্ধারসাধন মানসে বাংলার সরকার ঐ স্থানে একটী সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ করিতেছেন। বন্দোবস্ত শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং মূলধন এক কোটি টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমবায়ের জন্য এই টাকা তোলার চেষ্টা চলিতেছে। মালদহে রেশম হইতে বার্ষিক আয় এক কোটি টাকা। এখানে এতকাল মাড়োয়ারী-গণের প্রচুর প্রভুত্ব ছিল। যাহারা তুত জন্মায় তাহারা এযাবৎ উহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকায় নানা প্রকারের অসুবিধা সহ্য করিতেছিল। সঙ্কল্পিত সমিতির সদস্যেরা ঐ সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তুতগুলি ব্যাধি-বিমুক্ত হয়, রেশমের সূতা নির্দ্দোষ হয় ও অগমান না হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের "চরম সময়"

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিত বর্ণনা পত্র বাহির করিয়াছেন :—

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধনসহ এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই মূলধনের মধ্যে ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৩ শত টাকার অংশ বিক্রী হয়। অংশ বিক্রয় করিয়া ৮ লক্ষ ৫ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা পাওয়া যায়।

প্রথম বিপদ

সাত বৎসর চলিবার পর ব্যাঙ্কটীর দুঃসময় উপস্থিত হয়। ফলে পরিচালক সংসদের কিছু পরিবর্ত্তন করা হয় এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী উক্ত সংসদের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্থায়ী ও চলতি আমানত খাতে ব্যাঙ্কে ২৫ লক্ষ টাকা গচ্ছিত ছিল। ব্যাঙ্কটির দুঃসময়ে এবং মামলা-মোকদ্দমার ফলে ঐ আমানত হ্রাস পাইয়া ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। ইহা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কথা। ব্যাঙ্ক তথাপি কাজ চালাইতে থাকে এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমানতের টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক পতনের ফল

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এলায়েন্স ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় ব্যাঙ্কের উপর লোকের বিশ্বাস কমিয়া যায়। ৩০শে এপ্রিল তারিখ এই ব্যাঙ্কের উপর পাওনাদারেরা চড়াও করে। চার দিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। সেই সময় আমানতদারদিগকে ২৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ধার করা হয় এবং অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে দেওয়া হয়। এই টাকা তুলিয়া লওয়ার পরও কয়েক মাস যাবৎ অল্প অল্প টাকা তুলিয়া লওয়া চলিতে থাকে। নগদ টাকার অভাবে পরিচালকদিগকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়। এদিকে লোকেও আর টাকা জমা দেয় না। শেষকালে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যখন সর্ব্বত্র ব্যবসায়ে একটা মন্দা পড়িল সে সময় ব্যাঙ্ক নিজের টাকা আদায় করিতে পারিল না। তখন পরিচালকবর্গ বাধ্য হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আরো দশ লক্ষ টাকা ধার লইলেন। অতঃপর ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল হইতে লাগিল এবং আমানতদারেরাও টাকা জমা দিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ব্যাঙ্ক আর নগদ টাকা জমাইতে পারিল না। ফলে এই হইল যে, গত এপ্রিল মাসে পুনরায় যখন ব্যাঙ্ক হইতে খুব বেশী টাকা তুলিয়া লওয়া আরম্ভ হইল সে সময় ব্যাঙ্ক আর টাকা দিয়া উঠিতে পারিল না।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অবস্থা

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যে পরিমাণ টাকা তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা অধিক আমানত করা হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারীতে ৮৩ হাজার টাকা অধিক আমানত ছিল ; কিন্তু মার্চ্চ মাসে আমানত অপেক্ষা ১৪ হাজার টাকা অধিক তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। তারপর এপ্রিল মাসে আমানত অপেক্ষা ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অধিক তুলিয়া লওয়া হয়। অধিকন্তু আরো ৪ লক্ষ টাকা তুলিয়া লইবার দাবী হইয়াছিল।

শেষ চেষ্টা

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ব্যাঙ্ককে খুব বেশী টাকা পরিশোধ করিতে হয়। ফলে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। পরিচালকবর্গ টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করেন। তাঁহারা অতি সামান্য টাকাই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ২৭শে তারিখ অপরাহ্ণে দেখা যায় যে, যদি খুব মোটা রকমের টাকা সংগ্রহ না করা যায়, তবে ব্যাঙ্ক আর চলে না। টাকা সংগ্রহের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়। শেষকালে ২৮শে তারিখ পূর্ব্বাহ্ণে পরিচালকবর্গ টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

ব্যাঙ্কের কর্জ্জ

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নামে ১০ লক্ষ টাকা করিয়া দুই খানি রেহানী কবলা আছে। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধের জন্য কয়েকটি বিশেষ সিকিউরিটি নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধিকন্তু অনিশ্চিত সম্পত্তি হিসাবে ব্যাঙ্কের সমগ্র ব্যবসায়টিই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকী কবলায় আবদ্ধ আছে। শেষোক্ত কবলায় এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত আছে যে, ব্যাঙ্ক যদি টাকা দেওয়া বন্ধ করে, তবে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক রিসিভার নিযুক্ত করিয়া সমগ্র ব্যাঙ্কটিকে দখল করিতে পারিবে। এই সর্ত্তের বলে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, গত ২৮শে এপ্রিল, অপরাহ্ণে মেসার্স লাভলক এণ্ড লুইস ফার্ম্মের তিনজন লোককে রিসিভার নিযুক্ত করে এবং তাঁহারা ব্যাঙ্কটিকে দখল করেন।

নগদ টাকা এবং যাহাদ্বারা অবিলম্বে টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব এইরূপ সিকিউরিটির অভাবেই ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।

ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা

ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

ব্যাঙ্কের দেয়

স্থায়ী আমানত	৪৪০৭২০৯৸০
চলতি খাতে	৩০৮৬৭১০/৫
সেভিং ব্যাঙ্ক	১৩৯৫৮৪৷৴৩
কর্জ্জ	২০৫২৬৮২৸২
মোট	১০১৮৬১৮৭৴১০

১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৮৭ টাকা ২ আনা ১০ পাই।

ব্যাঙ্কের প্রাপ্য

ব্যাঙ্ক মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা ১৩ আনা ৫ পাই পাটাইতেছে। তন্মধ্যে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি, সম্পত্তি বা সহজে আদায়যোগ্য জিনিষে ন্যস্ত আছে। ব্যবসায়ীদিগকে ব্যাঙ্ক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার কোনো সিকিউরিটি নাই।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, দেনা হইতে পাওনা সাড়ে তের লক্ষ টাকা বেশী। আবশ্যক হইলে বিক্রীত অংশের অবশিষ্ট মূল্য বাবদ প্রায় ৭ লক্ষ টাকাও যোগ করা যায়।

বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিগুলি হইতে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলে হাতে সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা থাকে। তারপর ব্যবসায়ীদিগকে প্রদত্ত ২৫ লক্ষ টাকা আছে। ৫০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেওয়া আছে এবং অংশ বিক্রয়ের অবশিষ্ট মূল্য হইতে ৭ লক্ষ টাকা পাওনা আছে। এই সমস্ত যোগ করিয়া মোট ৯৭ লক্ষ টাকা হয়। সাধারণ পাওনাদারেরা পাইবে প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ দেনা অপেক্ষা পাওনা প্রায় ২১ লক্ষ টাকা বেশী। ব্যবসায়ীদিগকে যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে এবং সাধারণ দেনাদারের নিকট যে টাকা পাওনা আছে, তাহার মধ্যে কি পরিমাণ টাকা আদায় হইবে, তাহা বলা সম্ভব নহে; কিন্তু পরিচালকবর্গের বিশ্বাস এই যে, যদি পাওনা টাকা সুবিবেচনার সহিত আদায় করা হয়, তবে বেশ মোটা রকম অংশই আদায় হইবে। খুব কম করিয়া অনুমান করিলেও সাধারণ পাওনাদার ও আমানতকারেরা তাঁহাদের প্রাপ্য টাকার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ টাকা নিশ্চয়ই পাইবেন।

আর্থিক ভারত

মান্দ্রাজে ধর্ম্মঘট

বাঙ্গালোরের বিন্নী মিলের দরজায় তালা পড়িয়াছে। প্রায় ৪০০ শ্রমিক কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। এই সম্পর্কে "মাদ্রাজ মেল" পত্রের বাঙ্গালোরস্থিত সংবাদদাতা যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ যে, কোনও শ্রমিকের শেষ সৎকারে যোগদান করার জন্য চারিজন মজুর ছুটী প্রার্থনা করে। ইহাদিগকে কয়েক ঘণ্টার ছুটী দিয়া বলা হয় যে, তাহারা যেন উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কাজে ফিরিয়া আসে। বিদায়প্রাপ্ত মজুরগণ ঐ সময়ে কার্য্যে হাজির না হওয়ায় ম্যানেজারের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়। ইহার প্রতিবাদকল্পে মজুরগণ ধর্ম্মঘট করিয়া বসে। কর্ত্তৃপক্ষ তখন বলেন যে, তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা হইবে। তখন ইহারা পুনরায় কাজে ফিরিয়া যায়।

বিগত বৃহস্পতিবার দিন আবার গোলযোগ দেখা যায়। বিদায় ও মজুরি সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়া শ্রমিকগণ বলে যে, অচিরে সেইগুলির প্রতিকার না হইলে তাহারা আর কার্য্যে যোগদান করিবে না। অতঃপর আবার ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়।

মিলের কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি নোটিশ মিলের দরজায় ঝুলাইয়া দিয়াছেন :—"শ্রমিকদের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মঘটের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, অদ্য (৭ই মে) ১২-৩০ মিনিট হইতে দ্বিতীয় আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত মিলের কার্য্য বন্ধ থাকিবে।"

চা-করের অত্যাচার

গৌহাটী হইতে প্রকাশিত "অসমীয়া" নামক সপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশ—বিগত ২৩শে মে তারিখে নুমলীগড় চা-বাগানের ম্যানেজার মিষ্টার জে, আর, সিঙ্গলটন সাহেব তাহার কলঘরের মিস্ত্রীকে কিল, চড় ও লাথি মারিয়া কলঘর হইতে বাহির করিয়া দেন এবং অতঃপর তাহাকে আফিসে লইয়া গিয়া আরও গাল মন্দ দিয়া কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়া দেন।

ফিটার মিস্ত্রীর দোষ এই যে, সে ব্যক্তি নুমলীগড় চা-বাগানে কম মাহিনা পাইতেছিল বলিয়া বিহরা নামক অপর একটি চা-বাগানে যায় এবং তথায় বেশী মাহিনায় চাকুরীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া সাহেবকে নোটীশ দেয় যে, সে ২রা জুন হইতে কাজ ছাড়িয়া দিবে। এই কথা শুনিয়া সিঙ্গলটন সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন এবং উপরোক্তভাবে ফিটার মিস্ত্রীকে মারপিট করেন।

এই কাণ্ড দেখিয়া বড় কেরাণী ও বড় মোহরার বাদে বাকী পাঁচজন কেরাণী সাহেবকে বলেন,—"সাহেব তুমি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। তোমার ইচ্ছা হইলে তাহাকে বরখাস্ত করিতে পার। কোনও কারণেই তুমি মিস্ত্রীকে এরূপ অন্যায় ভাবে মারপিট করিতে পার না। তুমি বিনা কারণে ভদ্রলোকের অপমান করিয়াছ। মিস্ত্রী ভদ্রলোকের সন্তান। তুমি যদি ইহার প্রতিকার না কর, তবে এখানে থাকিয়া কাজ করা আমাদের পক্ষে দায় হইবে।" উত্তরে সাহেব বলেন,—"তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, কাজ ছাড়িয়া যাও।"

অতঃপর এই পাঁচজন কেরাণী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বাড়ী যাইতে মনস্থ করিলেন। যাহাতে সু-মীমাংসা হয় তজ্জন্য একবার বাগানের উপরওয়ালা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। অতঃপর ছেলেমেয়ে সহ জিনিষপত্র লইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য কেরাণীগণ সাহেবের নিকট গাড়ী চাহিলেন। কিন্তু সাহেব তাহা দিলেন না। তখন ঘটনার বিবরণ তারযোগে গোলাঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বোকাখাট থানার দারোগার নিকট জ্ঞাপন করা হয়। সংবাদ পাইয়া বোকাখাট থানার একজন দারোগা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ঘটনার তদন্ত করিয়া ফিটার মিস্ত্রীকে পরীক্ষা করিবার জন্য গোলাঘাটে লইয়া চলিয়া যান।

এদিকে পুলিশ আসিয়াছে দেখিয়া সাহেব একটু ভীত হন এবং মেয়েছেলে লইয়া বাড়ী যাইবার জন্য কেরাণীদিগকে দুই তিনখানি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মালপত্রসহ গাড়ী বাগানের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলে দেখা যায় যে, গেট বন্ধ করা আছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সাহেব গেটের চাবি লইয়া ক্লাবে আমোদ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া চাবি আনিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কাজেই অপেক্ষা করিতে হইল। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় মিঃ সিঙ্গলটন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিলে বহুকষ্টে তাহার নিকট হইতে চাবি উদ্ধার করা হয়। তখন কেরাণীবাবুগণ কোনো প্রকারে মেয়েছেলে ও মালপত্র লইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু এত রাত্রে আর কোথায় যাইবেন? কাজেই বাধ্য হইয়া সে রাত্র ধনশিড়ি নদীর তীরে যাপন করিতে হয়। পরদিন বহু কষ্টে তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছেন।

বাঙ্গালোরে ফলের চাষ

বাঙ্গালোরে পয়লা নম্বরের আপেল ফল জন্মে। এক একর আপেলের জমিতে হাজার টাকার উপর নেট আয় হয়। ১৯২১ সনে সর্ব্বপ্রথম আপেলের আবাদে উৎকর্ষ সাধনের জন্য মনোযোগ দেওয়া হয়। সেই সময় দেখা যায় শতকরা ৫০টি আপেল পোকাধরা। ফলের এই পোকা-ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আপেল গাছের পাতায় প্রথমে পোকা বাসা বাঁধে। ক্রমে তাহা ফলের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। মহীশূর সরকারের চেষ্টায় বর্ত্তমানে এই পোকাব্যাধি হইতে অনেকটা নিস্তার লাভ করা গিয়াছে। সম্প্রতি পেষ্ট অ্যাক্ট বা পোকা আইনের বলে ব্যাধিগ্রস্ত আপেল চারা মহীশূর রাজ্য হইতে বহিষ্কার করার আয়োজন চলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৩০ রকমের আপেল চারা আমদানি করা হইয়াছে এবং সেগুলির পরীক্ষা চলিতেছে। ইহাদের মধ্যে "রোম বিউটী" জাতীয় আপেল খুব আশানুরূপ ফল দর্শাইয়াছে। এই গাছে দেশী আপেল গাছের চাইতে তিনগুণ বেশী ফল ধরে। আর এগুলির রং ও আস্বাদ খুব সুন্দর ও মিষ্ট। কিষাণরা এই জাতীয় আপেল জন্মাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে।

প্রতি বৎসর একা বাঙ্গালোর অষ্ট্রেলিয়া হইতে হাজার আপেল চারা আমদানি করিত। কিন্তু বিগত দুই বৎসরে ঐ সংখ্যা দশ হাজারে উঠিয়াছে। স্থানীয় চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

আপেল ছাড়া অন্যান্য ফলেরও আবাদ এই অঞ্চলে চলিতেছে। ১২০ রকমের আম ও ৭৫ রকমের অষ্ট্রেলিয়ান আঙ্গুরের পরীক্ষা চলিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোসাবিদা

হিল্টন-ইয়ং কারেন্সী কমিশনের অন্যতম প্রস্তাব ভারতে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠা করা। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থসচিব স্যার বেসিল ব্লাকেট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটী বিল উপস্থিত করিবেন। উক্ত "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" বিল অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত হইবে ও ব্যাঙ্কটীকে নিম্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতাগুলি প্রদান করা হইবে।

১। ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ কোটি টাকা নির্দ্ধারিত হইবে।

২। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক "রিজার্ভ ব্যাঙ্কের" শতকরা ৩০ ভাগ মূলধন সরবরাহ করিবে।

৩। ভারতীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ "রিজার্ভ ব্যাঙ্কের" ৩০ ভাগ মূলধন সরবরাহ করিবে ও বক্রী মূলধন সাধারণে সরবরাহ করিবে।

৪। "রিজার্ভ ব্যাঙ্কের" সমুদয় অংশীদারগণ ব্যাঙ্ক পরিচালনের জন্য ৯ জন ডিরেক্টর মনোনীত করিবেন ও গবর্ণমেণ্ট একজন গবর্ণর, একজন ডেপুটী গবর্ণর ও তিনজন ডিরেক্টর মনোনীত করিবেন।

৫। ব্যাঙ্কের হেড অফিস বোম্বাই শহরে স্থাপিত হইবে।

৬। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে" নোট প্রচলনের ক্ষমতা ২৫ বৎসরের জন্য প্রদান করা হইবে এবং ঐ ব্যাঙ্কের নোট প্রচলনাদির কার্য্যাবলী "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের" নিয়মানুসারে পরিচালিত হইবে। যে পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে, তাহার অর্দ্ধেকের জন্য "নোট-প্রচলন বিভাগকে" স্বর্ণ ও গোল্ড সিকিউরিটি মজুত রাখিতে হইবে।

৭। ১৯৩১ সনের ১লা জুনের পূর্ব্বে "ব্যাঙ্ককে" স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে ও "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে লিকুইডেশনে যাইতে পারিবে না। যদি কোনদিন ব্যাঙ্কটী লিকুইডেশনে যায় তাহা হইলে "ব্যাঙ্কের" দেনা পাওনা মিটাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার শতকরা ৬০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের ও ৪০ ভাগ অংশীদারগণের প্রাপ্য হইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল

ভারতের কৃষি কথা

ভারতের জনসংখ্যা ৩১০ কোটির উপর। ভারতের প্রত্যেক ৪ জনের ৩ জন তাহাদের ভরণপোষণের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। বৃটিশ ভারতে উৎপন্ন সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১০০ কোটি পাউণ্ডের বেশী। ১৯২৫-২৬ সনে ভারতবর্ষের উৎপন্ন জিনিষের হিসাব এখানে দেওয়া হইল:—৩০,৫৭২,০০০ টন চাউল। ৮,৭০৪,০০০ টন গম, ১৫,৬২৮,০০০ টন অন্যান্য খাদ্য শস্য, ৩৫,৮৫৬,০০০ টন তৈল শস্য, ২৯,৩০,০০০ টন গুড়, ৬,০৭৫,০০০ গাঁট তুলা, এবং ১০,৮৩৯,০০০ বেল পাট। ঐ সনে ভারত আরও ৩৬৩,৫০৬,০০০ পাউণ্ড চা, ২২,১০৬,০০০ পাউণ্ড কফি, ১৯,৯৭০,০০০ পাউণ্ড রবার এবং ৩,০২৪,০০০ পাউণ্ড নীল উৎপাদন করে।

রপ্তানির আয়

১৯২৫-২৬ সনে ভারতবর্ষ ২৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ বিদেশে তুলা বিক্রয় করিয়া পায় ৬৩,৭৫০,০০০ পাউণ্ড। পাটে পায় ২৫,২৫০,০০০ পাউণ্ড, খাদ্য শস্য যব গম কলাই প্রভৃতি রপ্তানি করিয়া পায় ৩২,০০০,০০০ পাউণ্ড, তৈল শস্য বিক্রয় করিয়া পায় ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং চা বিক্রয় হইতে পায় ১৮,০০০,০০০ পাউণ্ড।

আমরা বেচি বেশী কিনি কম

এই সকল কাঁচা মাল বিক্রয় করিয়া ভারত যে টাকা পায় তাহা দ্বারা ঐ সনে সে ১৫১,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের শিল্পজাত মাল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে সমর্থ হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ১৯২৫-২৬ সনে বিদেশীদের কাছে আমরা ২৫ কোটি টাকার মাল বেচিয়াছি এবং কিনিয়াছি মাত্র ১৫ কোটি টাকার মাল।

নয়া যান-বাহনের প্রভাব

আগেকার দিনে ভারতের প্রত্যেক জনপদই স্বাবলম্বী ছিল। পল্লীতে যাহা জন্মিত তাহাই ঐ পল্লীবাসীর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ভাত-কাপড়ের জন্য ভিন্ন গাঁয়ের দিকে তাহাদিগকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। নিজেরাই নিজেদের অভাব মিটাইত। দেশে রেল ষ্টীমার ও অন্যান্য যান-বাহন প্রচলনের ফলে এই ধারা বদলাইয়া যায়। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে জিলায় জিলায় আদান-প্রদানের ভাব জাগিয়া উঠে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারাও বদলাইয়া গিয়াছে।

উন্নত প্রণালীর যানবাহন সৃষ্টির ফলে পাট, তুলা, ধান চাউল, যব, গম, কলাই, চা, তামাক প্রভৃতি শস্যের চাষ-

আবাদও ক্রমবৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যও এদেশে বহুল পরিমাণে আমদানি হইতে থাকে।

ইম্পীরিয়াল অ্যাগ্রিকালচার্যাল ডিপার্টমেণ্ট

ভারতে কৃষিউন্নতির দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়ে ১৯০১ সনে। ঐ সময়ে ইম্পীরিয়াল অ্যাগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্ট নামক একটি সরকারী কৃষিদপ্তর ভারত সরকার কর্তৃক কায়েম হয়। ১৯০৩ সনে এই কৃষি বিভাগ কর্তৃক বিহারের অন্তর্গত পুসা নামক স্থানেই ইম্পীরিয়াল অ্যাগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (সরকারী কৃষি গবেষণাগার) নামক একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে উন্নত প্রণালীর কৃষি-গবেষণার সকল প্রকার সাজ সরঞ্জামই এখানে আছে। কৃষিসংক্রান্ত মিউজিয়াম ল্যাবরেটরী-লাইব্রেরী ইহার প্রধান কয়েকটী অঙ্গ। বাঙ্গালোর শহরেও এরূপ একটি কৃষি প্রতিষ্ঠান আছে।

উন্নত বীজ

এই কৃষি-গবেষণাগার হইতে উন্নত প্রণালীর শস্য বীজ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের মত এই বিশাল কৃষি মহাদেশের পক্ষে পুসা বা বাঙ্গালোরের মত ২।১টা ছোট খাট কৃষি প্রতিষ্ঠান যে মরুভূমিতে বারিবিন্দুবৎ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। যাহা হউক এইসকল কৃষি প্রতিষ্ঠান হইতে বর্ত্তমানে যে কাজ পাওয়া যাইতেছে তাহা খুব সন্তোষজনক না হইলেও নিরাশাজনক নয়। ১৯২৫-২৬ সনে যত একর জমিতে ফসল বোনা হয় তাহার শতকরা ১২ ভাগ জমিতে অর্থাৎ ৩০ লক্ষ একর জমিতে ঐ সকল কৃষি-ভবনের পরীক্ষিত উন্নত প্রণালীর বীজ বপন করা হয়। বর্ত্তমানে গম চাষে পুসার উন্নত বীজ ব্যবহার করায় অভাবনীয় ফল পাওয়া যাইতেছে। ভারতের অন্যান্য কৃষির একটু আধটু পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

আখের চাষ

২,৭৫০,০০০ একর জমিতে আখের চাষ হয়। ইহা সত্ত্বেও ভারতকে গত সনে ৭লক্ষ টন সাদা চিনি ১ কোটি পাউণ্ড দাম দিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ করা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে বিদেশী চিনি খাইতে হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ আখের ফসলের ফলন নাই। দুনিয়ার সব চাইতে কম ফলন হয় ভারতের আখ ফসলের। স্বদেশ-ভক্তদের সক্ল প্রযত্নে দেখিতে হইবে আখের ফলন কিসে বাড়ে। মাদ্রাজের কয়াম্বাটর নামক স্থানের ইম্পীরিয়াল কেন ব্রীডিং ষ্টেশনে এই দিকে বেশ কাজ হইতেছে। নূতন নূতন ধরণের আখের এখানে পরীক্ষা করা হইতেছে। আখের জমি কি রকম হওয়া চাই, কি রকম মাটীতে কি রকম ফসল ফলে—এসবই এখানে হাতে কলমে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এখানকার কাজ কারবার দেখিয়া মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আখ চাষের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। প্রতি একর আখের জমিতে ১১ হইতে ২০ টন পর্য্যন্ত ফসল ফলিবে এরূপ আশা করা যায়।

ভারতীয় তামাক

ভারতবর্ষ ৮,৫০০,০০০পাউণ্ড তামাক (তামাক পাতা-সিগার সিগারেট) আমদানি করে। ইহার জন্য তাহাকে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি টাকা বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিতে হয়। আর ভারতবর্ষ তাহার স্বদেশী তামাক রপ্তানি করে ৩৮, ০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার জন্য সে মাত্র ৭৫০,০০০পাউণ্ড দাম পায়। বিদেশীরা মাত্র ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড তামাক বেচিয়া আমাদের নিকট হইতে প্রায় ২ কোটি টাকা আদায় করে। আর আমরা বিদেশীদের নিকট ৩৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ বিদেশীদের ৪॥ গুণ মাল বেচিয়া পাই মাত্র ৭॥ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ বিদেশীদের ঠিক অর্দ্ধেক দাম। ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ, আমরা কাঁচা মাল বেচি আর তারা বেচে তৈয়ারী মাল। আমাদের চাইতে তাদের তামাক অনেকটা ভাল। পুসার কৃষি-কেন্দ্রে আমেরিকান তামাকের নমুনার পরীক্ষা চলিতেছে। বিদেশীদের মত দাম পাইতে হইলে আমাদিগকে তাহাদের মত উৎকৃষ্ট জিনিষ বাজারে বাহির করিতে হইবে। দেশের স্বদেশ-সেবকরা এদিকে অগ্রসর হউন।

গো-সমস্যা

গো-সমস্যা ভারতের সবচাইতে বড় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ভারতকে ধরাপৃষ্ঠে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার গোজাতির উন্নতি সকলের আগে চাই। মুসলমানেরা গোখাদক, পল্টনে গরু খায়, বিদেশের বাজারে জাহাজ বোঝাই হইয়া গরু চালান হয়—ইহাই এদেশের গো-জাতির সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ নয়। দেশে গোজাতির আহার্য্য জিনিষের খুব বেশী অভাব। আমাদের দেশের গরু পেট পূরিয়া খাইতে পারে না। তার উপর মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে গো-মড়ক গো-পীড়া জেলাকে জেলা গরু উজাড় করে। গো-জাতির ধ্বংসের মূলে আর একটা বড় কারণ দেখা যায়। সেটা হইতেছে প্রজনন করিবার উপযুক্ত ষাঁড়ের অভাব। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে গোজাতি একটা কত বড় প্রয়োজনীয় সম্পদ্ তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। দেশের ঘোর দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ গো-জাতির অবনতি। দেশের মানুষ দুধ খাইতে পায় না। ভারতের সরকারী কৃষি কেন্দ্র পুসাতে গো-জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এই দিকে স্বদেশ-সেবকগণের স্বাধীন দৃষ্টিও চাই।

চাষবাসের নয়া নয়া কলযন্ত্র ও সার

ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে সকলের আগে চাই চাষ-আবাদের কাজে বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর সাজসরঞ্জাম। কলের যন্ত্রপাতির ব্যবহার চাই ভারতের চাষীদের মধ্যে। দেশের কৃষককুলের মধ্যে যত বেশী সংখ্যক উন্নত প্রণালীর কৃষি-যন্ত্রপাতির আদর হইবে দেশোন্নতির কাজ তত দ্রুত অগ্রসর হইবে। এই কাজের ভার লইতে হইবে দেশের গ্রাজুয়েট ম্যাট্রিকুলেশন-পাশকরা ছেলেদেরকে। কৃষি কলেজে কিছু দিন শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা এই দিকে পরীক্ষা চালাইতে থাকুক। বর্ত্তমানে কৃষি-বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার আর কৃষি কলকারখানা যন্ত্রপাতির মালিকরা এই সকল যুবকগণকে উৎসাহপ্রদান করিতে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে ক্রমশঃ চাষী মহলেও তাহাদের নতুন নতুন কলযন্ত্র সার ইত্যাদির চলন বাড়িতে থাকিবে।

বাঁশ বেত ও কাঠের দুর্ভিক্ষ

শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সমস্ত জঙ্গল ফরেষ্ট কর্ম্মচারীরা ইজারা বন্দোবস্ত দিতেছেন। ইজারাদার প্রায়ই তাহাদের ইচ্ছামত মূল্যে বাঁশ বেত জ্বালানিকাঠ প্রভৃতি বিক্রয় করে। ইহাতে দেশের দরিদ্র লোকের পক্ষে ঘরদরজা প্রস্তুত করা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। অতএব কাউন্সিল সভ্যগণকে অনুরোধ করি যে, এই বিষয় আসাম গবর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করা হউক। প্রত্যেকের আবশ্যক জিনিষ জঙ্গল হইতে লইবার আদেশ দেওয়া হউক অথবা ইজারাদারদিগকে নির্দ্দিষ্ট দরে বাঁশ, বেত, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক, এই বিষয় দেশবাসীমাত্রেরই মনোনিবেশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। (জনশক্তি)

ভারতীয় দারিদ্র্যের মাপজোক

ভারতের মাথাপিছু গড়ে বাৎসরিক আয় কত? অন্যান্য দেশের বা কত? একবার তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

	দেশের নাম		কত টাকা আয়
১।	যুক্তরাষ্ট্র	...	১১১৬৲
২।	গ্রেট বৃটেন	...	৬৯৬৲
৩।	ফ্রান্স	...	৫৪৬৲
৪।	জার্ম্মাণি	...	৪৬৮৲
৫।	ইতালি	...	৩৩৩৲
৬।	ভারতবর্ষ	...	৩০৲

ভারতের অঙ্কটা গবর্মেণ্টের দেওয়া। বছরে ৩০৲ টাকা ৪৮০ আনা হইলে দৈনিক আয় ⁄৪ পাই বা ১৬ পাই হয়।

ভারত-সন্তানের আয়ু

ভারতে জীবনকালের দৈর্ঘ্য গড়ে কমিতেছে। হ্রস্বাকার ও দুর্ব্বল লোকের সৃষ্টি হইতেছে। প্রাণশক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে ও সব রকম বেয়ারাম-পীড়া চাপিয়া বসিতেছে। দারিদ্র্যই ইহার কারণ।

কোন্ দেশের লোক কতদিন বাঁচে? ভারতের লোকই বা কত দিন বাঁচে? হিসাব নিম্নরূপ।

দেশের নাম		গড়ে কত বছর বাঁচে
১। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্	...	৫১.৫
২। যুক্তরাষ্ট্র	...	৫০.০
৩। ফ্রান্স	...	৪৮.৫
৪। জার্ম্মাণি	...	৪৭.৪
৫। ইতালি	...	৪৭.০
৬। জাপান	...	৪১.৩
৭। ভারতবর্ষ	...	২৪.৭

ইহার অর্থ কেহ বুঝিয়া দেখিয়াছেন কি? শিশু-মৃত্যু ঘটিতেছে ভারতে প্রচুর।

১৮৭৫ হইতে ১৯২৫ অবধি ৫০ বছরের মধ্যে নানাবিধ কারণে ভারতে ২৫ কোটির উপর লোক মরিয়াছে। এই মৃত্যুর অনেকখানি নিবারণ করা যাইত। দেশ-সেবকগণের এদিকে গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

ভারতে মৃত্যুর হার

ভারতে হাজারকরা কতজন লোক মরে? অন্যান্য দেশেই বা কত মরে? নীচের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

দেশের নাম	লোকবল	হাজার করা মৃত্যুর হার
১। নিউজীল্যাণ্ড	১২ লক্ষ	৯.৫
২। অষ্ট্রীয়া	৫৫ লক্ষ	১০.৫
৩। নিউফাউণ্ড ল্যাণ্ড	২½ লক্ষ	১০.৬
৪। যুক্তরাষ্ট্র	১০ কোটি	১২.৯
৫। নরওয়ে	২৬ লক্ষ	১৪.২
৬। সুইডেন	৬০ লক্ষ	১৩.৮
৭। যুক্তরাজ্য	৪ কোটি ৫৪ লক্ষ	১৪.৬
৮। বেলজিয়াম	৭৫ লক্ষ	১৫.২
৯। জার্ম্মাণি	৬ কোটি	১৬.২
১০। ভারতবর্ষ	৩১ কোটি	৩০.০

১৮৯৬ হইতে ১৯২৬ সন অবধি ৩০ বছরের মধ্যে ভারতে প্লেগে মরিয়াছে ১ কোটি লোক, আর কলেরায় মরিয়াছে আরও ১ কোটি।

১৯১৮ সনের অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর এই তিন মাসের মধ্যে ভারতে ৭০ লক্ষ লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরিয়াছে।

শিশু-মৃত্যু

প্রত্যেক বছর ভারতে ২০ লক্ষ শিশু জন্মিবামাত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। যারা বাঁচে তারাও অনেকে দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে ১ জন অথবা হয়ত ৪ জনের মধ্যে একজন এক বছরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র শহরগুলিতে এই হার আরও বেশী।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের শিশু-মৃত্যুর হার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে আমাদের মনুষ্য-শক্তির কিরূপ অপচয় ঘটিতেছে।

দেশের নাম		শতকরা শিশু-মৃত্যুর হার
১। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্	...	৭.৫
২। ফ্রান্স	...	৮.৫
৩। বেলজিয়াম	...	১০.৭
৪। জার্ম্মাণি	..	১০.৮
৫। স্পেন	...	১৪.৫
৬। ইতালি	...	১৬.১
৭। জাপান	...	১৬.৬
৮। ভারত	...	১৯.৪

ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে এই হার অনেক বেশী।

স্থানের নাম		হাজার করা মৃত্যুহার
১। ক্রিশ্চিয়ানিয়া	...	৫৪
২। নিউইয়র্ক	...	৭১
৩। লণ্ডন	...	৮০
৪। হামবুর্গ	...	৯৫
৫। বার্লিন	...	১৩৫
৬। বোম্বে (১৯২৪)	...	৬৩৪

প্রত্যেক বছর ১৩ লক্ষ ভারতীয় নরনারী ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে। এর উপর দুর্ভিক্ষে ও অনশনে মৃত্যু আছে।

সবগুলি যোগ দিলে কোন্ চিত্র আমরা পাই? জগতে ভারতের স্থান কোথায়?

ভারতীয় রেলে মাল চলাচল

(১৯২৫-২৬)

	কত মিলিয়ন টন	কত কোটি টাকা
১। কয়লা ও কোক্	২২.০১	৮.৯৫
২। রেলওয়ে ষ্টোর	২০.৩০	২.৯১
৩। গম	২.০৯	২.১২
৪। কোটা ও আকোটা চাউল	৫.৯২	৪.৪২
৫। ছোলা, মুগ, কলাই, জোয়ার, বাজরা ও অন্যান্য শস্য	৪.৬৩	৪.১৯
৬। মার্ব্বেল ও পাথর	৩.৭৮	০.৯৪
৭। ধাতুযুক্ত মৃত্তিকা	২.৯০	১.০৭
৮। লবণ	২.১৪	১.৭৪
৯। অখোদাই কাঠ	২.১৯	১.০৬
১০। সাদা ও ময়লা চিনি	১.০৬	১.৮৫
১১। তেলের বীজ	৩.৫২	৩.৬৯
১২। কাঁচা তুলা ও তুলার শিল্প	২.৫৭	৬.৪২
১৩। কাঁচা পাট	১.৫১	১.২৩
১৪। বিচালি	০.৯৯	০.৫৯
১৫। তাজা ফলমূল ও তরিতরকারী	১.২৪	০.৯১
১৬। খোদাই লোহা ও ইস্পাত	১.০০	২.০৫
১৭। কেরোসিন তেল	১.৩৭	২.০৬
১৮। গুড়, তালের মাৎ ইত্যাদি	১.১০	১.০৬
১৯। অন্যান্য দ্রব্য	১৯.৩৫	১৪.৮২

বলা বাহুল্য, এই হিসাবের মধ্যে এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে পাঠানো মাল ও ভারতের বাহিরে পাঠানো মাল সব এক সঙ্গে ধরা হইয়াছে। রেলওয়ে ষ্টোর রেলের জন্য আসে, তাতে কাজেই খুব কম ভাড়া লাগে। আর রেল কয়লা পোড়াইয়া থাকে তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়।

কাঁচামাল বনাম শিল্পজাত দ্রব্যের রেলে চলাচল

	কত মিলিয়ন টন	কত কোটি টাকা
কৃষিজাত উৎপন্ন, তেলের বীজ ও খাদ্যপণ্য ধরিয়া	২৪.৩৯	২১.৮০
বনজাত উৎপন্ন ও অখোদাই কাঠ	২.১৯	১.০৬
খনিজ উৎপন্ন	২৮.০৯	১০.৯৬
মোট কাঁচা উৎপন্ন	৫৫.২৭	৩৩.৮২
শিল্পজাত পণ্য	৫.৫৪	১০.৫৪
অন্যান্য দ্রব্য	১৯.৩৫	১৪.৮২
রেলওয়ে ষ্টোর বাদে মোট	৮০.১৬	৫৯.১৮

দেখা যাইতেছে ভারতীয় রেলের মাল চলাচল বাণিজ্যের মোটা অংশটা হইতেছে সস্তা দরের কাঁচা দ্রব্যাদি।

	মোট টনের শতকরা কত অংশ	মোট টাকার শতকরা কত অংশ
কৃষিজাত উৎপন্ন তেলের বীজ ও খাদ্যপণ্য ধরিয়া	৩০.৪৩	৩৬.৮৫
বনজাত উৎপন্ন ও অখোদাই কাঠ	২.৭৩	১.৭৯
খনিজ উৎপন্ন	৩৫.৭৯	১৮.৫১
মোট কাঁচা পণ্য	৬৮.৯৫	৫৭.১৫
শিল্পজাত পণ্য	৬.৯১	১৭.৮১
অন্যান্য দ্রব্য	২৪.১৪	২৫.০৪
	১০০.০০০	১০০.০০০

বড়োদায় নুনের কারখানা

বড়োদার ডিরেক্টর অব্ কমার্স বলিয়াছেন, "বড়োদার তথা ভারতের ব্যবসায় জগতের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। তার হেতু হইবে এই ওখা নুনের কারখানা।"

গত ৫ই মে, ১৯২৭ বড়োদার দেওয়ান শ্রীযুক্ত কৃষ্ণা-চারিয়ার ওখা বন্দরের নিকটে এক বিস্তীর্ণ নুনের কারখানার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

ওখা নুনের কারখানা তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্য বঙ্গদেশের ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বাজারে নুন যোগানো। আশা করা যাইতেছে প্রথমকার দিকে বছরে ৭৫ হাজার টন বা ২০ লক্ষ মণের উপর নুন পাওয়া যাইবে। স্থানটা বঙ্গদেশের সমগ্র অভাবই মিটাইতে সমর্থ বটে। কিন্তু এখনকার কার্য্য-তালিকা অনেকটা সঙ্কীর্ণ। বঙ্গদেশে ও বিদেশে নুন পাঠাইবার অনুমতি ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাভ করিতে হইবে। বাঙ্গালার আমদানির মাত্র ⅓ ভাগ যোগানোই হইতেছে বর্ত্তমান ধান্ধা।

কোম্পানী বড়োদা সরকার হইতে অনেকগুলি মূল্যবান "কনসেশন" ও সুবিধা পাইয়াছে। ১৭০০ একর বিস্তৃত জায়গাটা ধরিতে গেলে বিনা পয়সাই পাওয়া গিয়াছে।

কোম্পানী এক্ষণে মেসার্স ভোলকার্ট ব্রাদার্সের সহিত যুক্ত আছে। ভোলকার্ট ব্রাদার্স বাঙ্গালায় এই কোম্পানীর এজেণ্টরূপে কাজ করিবে।

এই কারখানার ফলে ওখা বন্দরে জাহাজ সমাগম হইবে ও বাণিজ্য বাড়িবে, জামনগরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, দ্বারকা রেলওয়ের আয় বাড়িবে এইরূপ আশা হয়।

ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনকালে দেওয়ান কৃষ্ণচারিয়ায় বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের লোকের কপাল, বিশেষ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানের অধিবাসীদের কপাল এই কারখানার সঙ্গে জড়িত রহিবে। এই কারখানায় হাজার হাজার গ্রামবাসী কাজ পাইবে।"

বিহারের হাঁসপাতাল ও ডিস্পেন্সারি

(১৯২৩-২৫)

১৯২৩ সনে বিহার ও উড়িষ্যায় হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারির সংখ্যা ৪৮৫ ছিল। ১৯২৫ সনে তা হইয়াছে ৫৯৮।

এই সময়ের মধ্যে ১৬৫টা নূতন প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে আর ৫২টা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই নূতনগুলির অধিকাংশই গ্রাম্য লোকালবোর্ড ইত্যাদির কীর্ত্তি। লক্ষ্যটা হইতেছে প্রত্যেক থানায় এক একটা ডিস্পেন্সারি থাকিবে। এই সময়ের শেষ দিকে গ্রামে গ্রামে ৪২৩টা ডিস্পেন্সারি খোলা হইয়াছে। থানার সংখ্যা ৫৩৯।

ভ্রাম্যমান্ ডিস্পেন্সারির সংখ্যা ১৬ হইতে কমিয়া ৩ হইয়াছে। এই ৩ টার ২টা আছে আন্দুল জিলায় ও ১টা সারণে আছে। সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনরা এগুলিকে ভাল-বাসে না। অবিরত ঘোরাফেরা বড় বিরক্তিকর। তার চেয়ে কোন জায়গায় স্থির হইয়া বসিলে ছেলেপিলের শিক্ষাদীক্ষার সুবিধা হয়, প্র্যাকটিসও জমান যায়।

কোন্ বছর কত রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে তার হিসাব :—

১৯২৩ সনে	৫৩,৩৭৯ জন
১৯২৪ "	৩০,৪৩৯ "
১৯২৫ "	৭,৪৭৮ "

ডিস্পেন্সারি

সরকারী ডিস্পেন্সারি ২৭ থেকে ২৮ হইয়াছে। আর "সরকারী বিশেষ ক্লাসের" সংখ্যা ৩১ হইতে ২৮ হইয়াছে।

লোকাল ফাণ্ড ডিস্পেন্সারি ১২১টা বাড়িয়াছে। সর্ব্ব-মোট ১৩২টা নূতন ডিস্পেন্সারি খোলা হইয়াছে আর ৭টা অন্যত্র হইতে এই শ্রেণীতে বদলী করা হইয়াছে।

আরও ৩ রকম ডিস্পেন্সারি আছে—সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী, সাহায্য ছাড়া বেসরকারী ও রেলওয়ে। সাহায্য-প্রাপ্ত বেসরকারী ডিস্পেন্সারি ১৯ হইতে ১৭তে নামিয়াছে সাহায্য-হীন বেসরকারী ডিস্পেন্সারি ৭৪ হইতে ৬৪তে নামিয়াছে। রেলওয়ে ডিস্পেন্সারি ৫৩ হইতে ৫৯তে উঠিয়াছে।

রোগীদের জন্য শয্যা-সংখ্যা

সন	পুরুষদের শয্যার সংখ্যা	স্ত্রীলোকদের শয্যার সংখ্যা	মোট
১৯২২ শেষ	২,৯৬৪	১,৩৩১	৪,২৯৫
১৯২৫ "	৩,২৬৮	১,৩৮৯	৪,৬৫৭

অতএব শয্যা বাড়িয়াছে ৩৬২টা। এই বৃদ্ধিটা নিম্ন-রূপে ভাগ হইয়াছে। প্রধানগুলি মাত্র দেওয়া হইল।

পাটনা জেনারেল হাঁসপাতাল—

	অতিরিক্ত ৯২টা শয্যা করা হইয়াছে		
পুরী কলেরা হাঁসপাতালে "	৬০টা	"	"
আরা সদর হাঁসপাতালে "	৪২টা	"	"
ডালটনগঞ্জ সদর হাঁসপাতাল "	২৬টা	"	"
সেণ্ট কলাম্বাস জেনানা হাসপাতালে (হাজারিবাগ) "	১৪টা	"	"
মোট	২৩৪ শয্যা		

উপস্থিতি

সন	ভিতর রোগীর সংখ্যা	বাহির রোগীর সংখ্যা	মোট
১৯২২	৬৩,৩৯২	৪০,৯৩,৫১২	৪১,৫৬,৯০৪
১৯২৩	৬৪,৩৭১	৪৫,৯১,৯৫৭	৪৬,৫৬,৩২৮
১৯২৪	৬৪,৮০৯	৫০,৯৯,৯৬২	৫১,৬৪,৭৭১
১৯২৫	৬৮,৮২৭	৫৩,৪২,৫৩৬	৫৪,১১,৩৬৩

১৯২৫ সনের মৃত্যুহার সর্ব্বনিম্ন—হাজারে মাত্র ২৩·৭ জন। প্রধান বেয়ারাম যক্ষ্মা, হুকওয়ার্ম, কুষ্ঠ।

যক্ষ্মা সর্ব্বত্র

এই প্রদেশে যক্ষ্মারোগগ্রস্তের চিকিৎসা এইরূপ :—

সন	ভিতর রোগী	বাহির রোগী	মোট
১৯২৩	৭৮৫	৮,১৩৯	৮,৯২৪
১৯২৪	৮৫৫	৯,৪৭৮	১০,৩৩৩
১৯২৫	১,০৫১	১১,৪৮১	১২,৫৩২

ইহাতে মনে হইতে পারে যক্ষ্মা সাধারণ বেয়ারাম নয়। কিন্তু তা সত্য নয়। যক্ষ্মা সর্ব্বত্র। গরিবদের বাসস্থান অত্যন্ত খারাপ। আর মেয়েরা পর্দ্দার ভিতর থাকে। এই দুই কারণে যক্ষ্মার প্রকোপ। ১৯২৪ সনে গবর্ণমেণ্ট ধরমপুর স্বাস্থ্য নিবাসে একটা বিশেষ টাকা দিয়াছেন এদেশের রোগীদের ব্যবস্থা করার জন্য।

হুকওয়ার্ম

১৯২৩ সনে ১১,৪৫০ জন। ১৯২৫ সনে ১০,৭০৯ জন।

কুষ্ঠ

এই প্রদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১২,২৬৯ (মে, ১৯২১) ৮টা কুষ্ঠাশ্রম চলিতেছে।

মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার হাঁসপাতাল দুইটা—রাঁচি ইয়োরোপীয় মেণ্টাল হাঁসপাতাল ও রাঁচি ভারতীয় মেণ্টাল হাসপাতাল।

বাণিজ্যে রেল বনাম জাহাজ

জাহাজের সঙ্গে পাল্লায় জিতিবার জন্য রেল কোম্পানী মাল চলাচলের ভাড়া কমাইয়া দিয়াছে, তাতে জাহাজের খুব ক্ষতি হইয়াছে।

১৯২৩-২৪ সনে রেলের ভাড়া সাংঘাতিক রকম নামান হইয়াছে। কিন্তু তার পুরা কাজটা আরম্ভ হইয়াছে ১৯২৪-২৫ সন হইতে। কলিকাতা হইতে ভায়া ওয়াল্‌টেয়ার মাল চলাচলের একটা হিসাব এইরূপ :—

আকোটা চাল

কোন্‌স্থান হইতে		১৯২৩-২৪ টন		১৯২৪-২৫ টন
কলিকাতার বন্দর :—				
শালিমার	...	১৪,১৫২	...	২৮,৪৪২
রামকৃষ্ণপুর	...	২৫,৬৫৩	...	৫৯,৩৭৪
উড়িষ্যার বন্দর :—				
জলাসোর	...	...	...	১,৬৩১
বাস্তা	...	...	...	৭৯৩
বালাসোর	...	১৩	...	১,২৬৩
খন্তাপাড়া	...	...	...	৯৪৯
সোরো	...	...	...	১,৪৭৮
কটক	...	২,৫৮৫	...	৭,৭৮২
		৪২,৪০৩		১০১,৭১২

১,০১,৭১২ টন ১৯২৪-২৫ সনে
৪২,৪০৩ টন ১৯২৩-২৪ সনে

৫৯,৩০৯ টন বেশী

কোটা চাল

কোন্ স্থান হইতে	১৯২৩-২৪ টন	১৯২৪-২৫ টন
উড়িষ্যার বন্দর :—		
জলাসোর	২২৫	৩২৫
বালাসোর	৯১৩	২,১৭৫
কটক	৩,২৯৬	৫,২৩৯
	৪,৪৩৪	৭,৭৫৯

৭,৭৫৯ টন ১৯২৪-২৫ সনে
৪,৪৩৪ টন ১৯২৩-২৪ সনে

৩,৩২৫ টন বেশী

ধান্য, গোধুম, মুগ, কলাই ইত্যাদি

	১৯২৩-২৪ টন	১৯২৪-২৫ টন
শালিমার ভায়া ওয়ালটেয়ার	৫০১৮	৪,৬৩২
রামকৃষ্ণপুর ভায়া ঐ	৭,১১৮	১৪,৪১১
কটক ভায়া ঐ	৩১৪	৩,৭৪৪
	১২,৪৫০	২২,৭৮৯

২২,৭৮৯ টন ১৯২৪ ২৫ সনে
১২,৪৫০ টন ১৯২৩-২৪ সনে

১০,৩৩৯ টন বেশী

মোট বেশীর পরিমাণ

আকোটা চাল	৫৯,৩০৯ টন
কোটা চাল	৩,৩২৫ টন
ধান্য গোধুম ইত্যাদি	১,০৩৩৯ টন

৭২,৯৭৩ টন বা ১৯,০০,৩২৫ মণ।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী ভারতের আর্থিক সমস্যা

অন্যান্য দেশের মত ভারতকেও যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্কটে পড়িতে হইযাছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অবস্থা এক সঙ্গে তুলনা করিলে সাধারণতঃ কারবারে আস্থার অভাব সব চাইতে বেশী পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদনকারী ও ভোগকর্ত্তা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই আস্থার অভাব দেখা যায়। যুদ্ধের ফলে অনেক নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইযাছে, অনেক নূতন কারবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন ব্যবসায়ী মহলে আস্থার অভাবের জন্যই এগুলির সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ বিরতির পরে আর্থিক দুনিয়ার সর্ব্বত্রই একটা শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়। জিনিষ পত্রের অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাভাব সকল দেশেই দেখা যায়। ইহার ফলে নূতন নূতন ব্যবসা কেন্দ্র, নূতন নূতন কারবার, নূতন নূতন কোম্পানী খাড়া হইয়া উঠে। যুদ্ধের ফলে অনেক পুরাতন কারবার সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি জগতের চাহিদা সরবরাহের কাজে লাগিয়া পড়ে। নূতন নূতন শিল্পে দস্তুরমত একটা জোর প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। আজও ইহার অবসান ঘটে নাই বরং ইহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে দুনিয়ার চাহিদার চাইতে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়। কাজে কাজেই অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে ব্যবসাবাণিজ্য মহলে একটা মন্দাভাব দেখা যায়। আজও ইহা হইতে দুনিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারে নাই।

বাজার-দরের ওঠা নামা

কারবারে আস্থার অভাবের অন্যতম কারণ হইতেছে পাইকারী দরের (হোলসেল প্রাইসের) খুব বেশী রকম উঠানামা। বাজারের এই অনিশ্চয়তার ভাব যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ের একটা বড় লক্ষণ। ভারতের বাজার-দর হইতে ইহার ঢের প্রমাণ উল্লেখ করা যায়।

কাঁচা মালের দামে আর শিল্পজাত মালের দামে প্রভেদ

যুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থায় ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে দেখা যায় কাঁচা মালে ও কারখানায় উৎপন্ন মালের বাজার-দরে ঢের তফাৎ। ১৯১৯-২০ সনের "বুম" (শিল্পবাণিজ্যে

জোয়ার) এর সময় যখন সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্য ক্রমেই চড়িতেছিল তখন কাঁচা মালের দাম কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় বড় বেশী বাড়ে নাই।

শিল্প-কারখানায় খরচ-বৃদ্ধি

এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। শিল্প কারখানায় উৎপন্ন জিনিষের বাজার নির্ভর করে কাঁচা মালের দামের উপর। শিল্পজাত মালের দর কাঁচা মালের চাইতে কিছু বেশী হইবেই। এই স্থানে শিল্পজাত মালের দাম চড়িল কিন্তু কাঁচা মালের দাম ততটা চড়িল না। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, শিল্প-কারখানায় উৎপাদনের খরচ নিশ্চয়ই বাড়িয়া গিয়াছে, মজুরীর হার চড়িয়াছে, শিল্প-কারখানা পরিচালনার খরচ বাড়িয়াছে, ট্যাক্স বেশী দিতে হইতেছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে এই সকল বিভাগেই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

পাট ও তুলা বনাম পাটশিল্প ও তূলা-শিল্প

ভারতে ১৯১৪ সনে কাঁচা পাটের দাম যদি ১০০ ধরা হয় ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা উঠিয়াছে ১২০ এর কোঠায় কিন্তু পাট হইতে উৎপন্ন জিনিষের দাম বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ১৪৭। বিগত জানুয়ারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৩ ও ১৩৯। কুচো শিল্পের কথা ধরা যাউক। ১৯১৪ সনের দরের চাইতে ভারতের কাঁচা তুলার দর গড়ে ১৯২৬ সনে শতকরা ৪৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৪ সনে যদি ১০০ হয় ১৯২৬ সনে ১৪৭ দাঁড়াইয়াছে। তুলা হইতে প্রস্তুত জিনিষের দর ১৯১৪ সনের চাইতে শতকরা ৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসে কাঁচা তুলা ও শিল্পজাত মালের দর যথাক্রমে ১২৭ ও ১৫৬।

চাই আরও বেশী রপ্তানি

মনে রাখিতে হইবে ভারতের আমদানি দ্রব্যের ৪ ভাগের ৩ ভাগ শিল্পজাত মাল এবং তাহার রপ্তানির ৪ ভাগের ৩ ভাগ কাঁচা মাল ও ১ ভাগ শিল্পজাত মাল। আমরা কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাই বেশী আর বিদেশীর তৈয়ারী শিল্পজাত মাল দেশে আমদানি করি। উপরের অঙ্ক হইতে দেখা যাইতেছে যে, কাঁচা মালের চাইতে শিল্পজাত মালের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা হইলে ভারতে বর্ত্তমানের আমদানির বহর ঠিক রাখিতে হইলে তাহাকে আরও বেশী দাম দিতে হইবে অর্থাৎ আরও বেশী কাঁচা মাল বিদেশীদের নিকট বেচিতে হইবে এবং তবেই ভারত বিদেশীদের নিকট শিল্পজাত মাল যাহা কিনিত সেই অঙ্ক ঠিক রাখিতে পারিবে।

কাপড়ের দাম

তুলায় প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় ১৯২০ সনে একেবারে শতকরা ২২৫ ভাগ অর্থাৎ ডবলেরও বেশী চড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে দাম অনেটা বাড়িয়া গিয়াছে। বস্ত্রের বাজার দরে বর্ত্তমানে শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি চলিতেছে। বস্ত্র শিল্পে এই অসম্ভব রকম বৃদ্ধির হারই যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের আমদানি হ্রাস করণের জন্ত অনেকটা দায়ী। আজকাল আবার কাপড়ের দাম কমিয়া আসিয়াছে। কাজেই আমদানি-বৃদ্ধির দিকে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি।

ফসলের দশমাংশ রপ্তানি

কৃষিই ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিল্প। ভারতের রপ্তানি মালের দশ ভাগের নয় ভাগই কৃষি হইতে প্রাপ্ত। এই রপ্তানির অঙ্ক হইতেই ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাপ করা চলে না। কৃষি দ্বারা যে উৎপাদন হয় তাহার সামান্ত অংশ মাত্র বিদেশে প্রেরিত হয়।

খাদ্য শস্য ও তৈল শস্যের কথা ধরা যাউক। সরকারী হিসাবে ৫৯লক্ষ টন জন্মে। ইহার মাত্র ৫লক্ষ টন বিদেশে চালান দেওয়া হয়। পাট ও তুলার কাঁচা ও তৈয়ারী মালের গাঁইট কিন্তু ঐ তুলনায় খুব বেশী রপ্তানি করা হয়। চা এবং কফিও বিদেশে অপেক্ষাকৃত বেশী পাঠান হয়। কিন্তু গুড় বা চিনি ভারতে যাহা জন্মে তাহা কেবলমাত্র দেশের কাজের জন্তই ব্যবহৃত হয়। মোটের উপর প্রত্যেক দশ একর জমির এক একরের ফসল মাত্র বিদেশের বাজারে বেচিবার জন্ত জন্মান হয়।

চিনির জন্য ভারত পরমুখাপেক্ষী

খাদ্য শস্যের দিক্ দিয়া দেখিলে ভারত কতকটা স্বাবলম্বী একথা বলা চলে। দেশের মাটীতে যে রকম জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহাতেই তাহার খাওয়ার কাজ চলিয়া যায়। এক মাত্র চিনির জন্য ভারতকে পরের দ্বারস্থ হইতে হয়। জাভা বস্তা বস্তা চিনি না পাঠাইলে ভারতবাসীর মিষ্টমুখ করা হয় না।

তৈলশস্যের রপ্তানি-হ্রাস

যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য তৈল শস্য হইতে বেশী পরিমাণে তৈল উৎপাদন করা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ তাহার উৎপন্ন তৈল শস্যের প্রায় অর্দ্ধেক বিদেশে চালান দিত অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ৩০লক্ষ টন তৈল শস্যের অর্দ্ধেক যাইত বিদেশের বাজারে। বর্ত্তমান সময়ে ভারত যদিও ৪০লক্ষ টনের উপর তৈল শস্য উৎপাদন করে কিন্তু রপ্তানির হার ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। কাঁচা মাল বিদেশে যত কম প্রেরিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ মাল আবার দেশে গুদামজাত হইয়া থাকিলে দেশের আর্থিক ক্ষতি। এগুলি দেশের শিল্প-কারখানার কাজে লাগান চাই। দেশের মধ্যে শিল্প-কারখানা যত বাড়িবে কাঁচা মালের রপ্তানি তত কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। আর বিদেশী-দের তৈয়ারী জিনিষও ভারতবাসী দিন দিন বর্জ্জন করিতে পারিবে। রাই সরিষা প্রভৃতি তৈল শস্য দেশে থাকিয়া গেলে দেশের গোজাতির অনেক উন্নতি হইতে পারে। কারণ বর্ত্তমান গো-সমস্যার প্রধানতম কারণ গোজাতির খাদ্যাভাব। খৈল গরুর পুষ্টিকর খাদ্য। তৈল শস্য বাহিরে চালান হইয়া না গেলে দেশে ঐ শস্য পেষণ করিয়া প্রভূত পরিমাণে খৈল পাওয়া যাইবে।

কয়লা রপ্তানি

ভারতের খনিজ শিল্পের অবস্থা ততটা সন্তোষজনক না হইলেও নিরাশাজনক নয়। ইংলণ্ডের মত কয়লা-শিল্পের মন্দাভাব ভারতেও দেখা দেয়। যাহা হউক খনি হইতে বর্ত্তমানে যে কয়লা উঠান হইতেছে তাহার পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের চাইতে বেশী। বাজারে বিক্রয়-প্রণালী উন্নত হইলে ভারতীয় কয়লারও খুব কাটতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে ভারতীয় কয়লা তাহার হারাণো বিদেশী হাট-বাজার পুনরায় দখল করিয়া বসিতেছে। ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষ ২লক্ষ টন কয়লা বিদেশে পাঠায়। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।

লৌহের কারবারে উন্নতি

ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প হইতেছে লৌহ ও ইস্পাত। যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থায় ভারতে মাত্র ২১৮,০০০ টন পিগ আয়রন বা কাঁচা লোহা তৈয়ারী হইত। বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যা ৯০০,০০০ টনে দাঁড়াইয়াছে। টাটা কারখানায় যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থায় ৫০হাজার টন লোহার জিনিষ উৎপাদন করা হইত। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ সংখ্যা ৩৮০,০০০টনে দাঁড়াইয়াছে। লৌহ-শিল্পে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফলে ভারতীয় লৌহ-শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সিমেণ্টের ব্যবসা

সিমেণ্ট বা বিলাতী মাটীর শিল্পে খুব বেশী উন্নতি পরি-লক্ষিত হয়। ভারতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ সিমেণ্ট প্রয়োজন হয়, তাহার চাইতে উৎপন্ন হয় বেশী। ১৯১৪ সনে ১হাজার টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইত, ১৯২২ সনে দেড়শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০,০০০ টনে দাঁড়ায়। ১৯২৪ সনে ২৬০,০০০ টন সিমেণ্ট ভারতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ কাটতি খুব বাড়িতেছে। সিমেণ্ট শিল্প খুব আশাজনক।

দুনিয়ার চাহিদা ও ভারতীয় চটকল

পাটের ব্যবসা কতকটা একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে রহিয়াছে। বিলাতী জুট মিলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকস্থলে ফেল মারিয়া যাইতেছে। দেশের জুট মিলগুলির অধিকাংশই বিলাতী কলওয়ালাদের হাতে। দুনিয়ার সমুদয় বস্তা ও চটের চাহিদা একমাত্র কলিকাতার পাটকলগুলির দ্বারাই সরবরাহ হওয়া সম্ভব এবং বর্ত্তমানে হইয়াও থাকে। দুনিয়ার চাহিদা যে পর্য্যন্ত না আরও বৃদ্ধি পাইবে সে পর্য্যন্ত পাটকলগুলি তাহাদের বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্র বা কলকারখানা বাড়াইবে না স্থির করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরে ৩৫ কোটি পাটের বস্তা প্রস্তুত করা হইত, বর্ত্তমানে হইতেছে ৪৫ কোটি বস্তা। যুদ্ধের পূর্ব্বে চট ছালা প্রস্তুত হইত ১০০ কোটি গজ, বর্ত্তমানে হইতেছে ১৫০ কোটি গজ।

চীনের বাজার, জাপানের বস্ত্রশিল্প আর বোম্বাইয়ের মিল

বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পে বর্ত্তমানে মন্দাভাব চলিতেছে। চীনের বাজার হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটা দুঃসময় আসিয়াছে। চীন ভারতের নিকট হইতে অনেক পরিমাণ সূতা ক্রয় করিত। বর্ত্তমানে চীনের বাজার নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদিগকে দেশের মধ্যে কাপড় তৈয়ারীর বিভাগ বাড়াইতে হইয়াছে। যে সকল সূতা যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশে চালান দেওয়া হইত তাহা দ্বারা ভারতের মধ্যেই কাপড় প্রস্তুত করা হইতেছে। ফলে যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমানে ভারতের কলকারখানায় উৎপন্ন বস্ত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। পূর্ব্বে ১০০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইত ভারতের কলকারখানায়। বর্ত্তমানে হইতেছে ২০০ কোটি গজ। বর্ত্তমানে দেশের বস্ত্রশিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে জাপান। বোম্বাইয়ের বস্ত্র-শিল্পীরা জাপান বয়কট আন্দোলন পূরাদমে চালাইতেছেন। বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা জাপানের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন। বস্ত্রশিল্পের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য তাঁহারা আরজি করিয়া এক কমিশন বসান। এই কমিশন (টারিফ বোর্ড) জাপানী বস্ত্রের উপর শুল্ক বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। জাপানীরাও কিন্তু ভারি হুঁসিয়ার। তাহারা বলিতেছে, "যদি জাপানী মালের উপর শুল্কহার বাড়াইয়া দাও, আমরা ভারতে কলকারখানা স্থাপন করিব—ভারতের মাটীতে জাপানী পুঁজিদ্বারা বস্ত্রশিল্পের সৌধ গড়িয়া তুলিব।"

সংরক্ষণ-নীতির অপর দিক্

মোটের উপর ভারতীয় শিল্পগুলির অবস্থা খুবই আশাজনক। দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকেই বর্ত্তমানে টারিফ বোর্ডের সমক্ষে আরজি পেশ করিয়াছেন যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকারের সংরক্ষণ-নীতি দেশের অবলম্বন করা উচিত। আমরা সাধারণতঃ সংরক্ষণ-নীতির স্বপক্ষে। কিন্তু সংরক্ষণ-নীতি দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সকল সময়েই মঙ্গলজনক কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। ভারতবাসীর ক্রয়ক্ষমতা খুব কম। ভারতবাসীকে বিদেশীদের কাছে তার উৎপন্ন মাল বেচিতেই হইবে। বিদেশী হাট বাজারে টিঁকিয়া থাকিবার উপযুক্ত ক্ষমতা সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনে ভারতীয় শিল্পগুলি অর্জ্জন করিবে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। কোন শিল্পে সংরক্ষণ-নীতি চালাইতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আগে ভাবিয়া দেখা দরকার। সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনে ঐ শিল্প স্বাবলম্বী হইবে—কাঁচা মালের রসদ সে ইচ্ছামত পাইবে—উপযুক্ত পরিমাণ মজুর-শক্তি তাহার মিলিবে—আর তাহার তৈয়ারী মাল কিনিবার উপযুক্ত ক্রেতা তাহার জুটিবে।



জার্ম্মাণ নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

আজকাল হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আগাথে লাশ্‌স জার্ম্মাণির প্রথম ও একমাত্র মহিলা অধ্যাপক। এইদিকে ইনি আর কতকাল "সবে ধন নীলমণি" থাকিবেন জানা নাই। বোধ হয় বেশী দিন নয়—কেননা এক সঙ্গে নানা কর্ম্মক্ষেত্রে জার্ম্মাণ নারীর আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিকাশ পাইতেছে।

জার্ম্মাণির স্ত্রীলোকেরা ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে। তারা নির্ব্বাচনের জন্যও দাঁড়াইতে পারে। রমণী আজ রাইখষ্টাগের সভ্য, প্রাদেশিক ডায়েটের সভ্য এবং মন্ত্রি-পরিষদের কাউন্সিলার।

৩০ বছর আগে প্রথম জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্ত্রীলোকদিগকে "অতিথি" হিসাবে ঢুকিতে দেয়। তাও আবার ডাক্তারি ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ শিখিবার জন্য। কিন্তু আজ তারা যা-খুসী শিখিতে পারে, বাধা নাই। রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়াছে।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে রমণী যে যে কাজ করিতেছে তার গুটকয়েক এই—বিজ্ঞান গবেষণা-মন্দিরগুলিতে স্ত্রী সহকারীরা সুন্দর গবেষণা করিয়াছে; আইন ও অর্থশাস্ত্রের স্ত্রী-গ্রাজুয়েটেরা সামাজিক হিতসাধনার্থ কারখানা ইত্যাদিতে পুলিশ কর্ম্মচারীর কাজ করিতেছে।

১৯১৩ সনে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ১৯৫, ১৯২৭ সনে হইয়াছে ১৬২৭।

১৯২৬ সনের শীত-পর্ব্বে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নারী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭,২৫৯। ১৯১৪ সনে মাত্র ৪,১০০ জন পড়িত। ৭,২৫৯ ছাত্রীর মধ্যে, ৩০৫০ জন দর্শন, ১২০০ জন বিজ্ঞান, ১১৫০ জন আইন ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ১২০০ জন ডাক্তারি, ২৫০ জন দন্ত-বিজ্ঞান, ২৭০ জন ফার্ম্মাসি ও ৫৯ জন ধর্ম্মতত্ত্ব পড়িতেছিল।

টেক্‌নিক্যাল কলেজে ছাত্রীসংখ্যা—১৯১৩ সনে ৬২। ১৯২৩ সনে ৪৭১।

"১৯২০ সনে জার্ম্মাণির মোট লোকসংখ্যা ৬ কোটির মধ্যে ৯৫ লক্ষ স্ত্রীলোক ব্যবসাবাণিজ্য চাকরী ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল; যুক্তরাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যা ১১ কোটির মধ্যে ৮৫ লক্ষ স্ত্রীলোক ঐরূপে লিপ্ত ছিল; আর ইংলণ্ডের মোট লোকসংখ্যা ৪ কোটির মধ্যে ৬৫ লক্ষ ঐরূপে লিপ্ত ছিল।

ইংল্যণ্ডের নারী

(১)

ইংল্যণ্ডের নারীরা এক্ষণে ষ্ট্রেট-সেট্‌লমেণ্ট, নায়েগ্রা, গোল্ড কোষ্ট ইত্যাদির মত অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন দ্বীপগুলিতে সরকারী চাকরী লইয়া যাইতেছে। তাদের কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি।

(২)

বিলাতের সুসজ্জিত এক নারী গড়ে যে কাপড়চোপড় পরে তার ওজন ৩ পা. ৪½ আ.। ঠিক সেই সময়ে তার স্বামীর পোষাকের ভার ১২ পা. ১১ আ.।

রৌপ্যের রপ্তানি

যুক্তরাষ্ট্র হইতে মার্চ্চ মাসে (১৯২৭) নিম্নরূপ রৌপ্যের রপ্তানি হইয়াছে :—

ভারতে	...	...	৫৬,২৩,৯০৭ আউন্স
ইংল্যাণ্ডে	...	...	৬,৫৫,৮৮০ ”
জার্ম্মাণিতে	...	...	২,৬৬,৩৮৫ ”
চীনে	...	...	১,৭৩,৯৯৯ ”

লণ্ডন হইতে ভারতে রৌপ্য আসিয়াছে ২২,৩৫,০০ পাউণ্ডের।

জাপানী মহিলা য়োনে সুজুকি

জাপানে সম্প্রতি ব্যাঙ্কিং “সঙ্কট” চলিতেছে। ইহার পিছনে ফিরিয়া দেখিতে পাই বিশ্ব-বিখ্যাত এক বিপুল বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান চালাইতেছে এক জাপানী রমণী। শ্রীমতী য়োনে সুজুকি “সেকেলে” নারী। কিন্তু তাঁর নাম দেশ-বিদেশে পরিচিত। তিনি ৩ কোটি পাউণ্ডের মালিক।

শ্রীমতী সুজুকি অত্যন্ত সাদাসিধে। কখনও দেশী ছাড়া ইয়োরোপীয় পোষাক পরেন না। নেহাৎ ছোটখাট নগণ্য বাড়ীতে থাকেন। মাদুরের উপর এই রমণীটিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিবে না সুজুকি এণ্ড কোং'র মত অতবড় একটা ব্যাপারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ইনি। অথচ ইঁহার ধন-সম্পত্তির বহরটা একবার দেখুন :—

জাহাজের “বহর”, কতকগুলি জাহাজ তৈয়ারীর “প্রাঙ্গণ” কতকগুলি ইস্পাতের কারখানা, চিনি শোধন করার কারখানা, ময়দার মিল, কটন মিল, মদ্য শোধনাগার, সেলুলয়েডের কারখানা, রবারের কারখানা, শুঁড়িখানা, বীমা কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক।

ইনি জগতের কাঁচা কর্পূরের প্রায় একচেটিয়া অধিকারিণী এবং চাউল, গম, চিনি, “বিন্” ও অন্য উৎপন্ন দ্রব্যের সর্ব্ব-প্রধান ক্রেতা এবং বিক্রেতা।

লণ্ডনস্থ এক জাপানী বণিক্ এই মহিলার সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন,—

“শ্রীযুক্তা সুজুকি জাপানের বাহিরে কখনও পদার্পণ করেন নাই। জাপানেও বেশী বেড়ান নাই। ইনি ইয়োরোপীয়ের পোষাক পরেন না বটে, কিন্তু আধুনিক আবিষ্কার-গুলির টন্‌টনে সমজ্‌দার। টেলিফোন ব্যবহার করেন, মোটরকারে চড়েন এবং আলোক জ্বালিবার জন্য বা তাপ দিবার জন্য একদম নয়া প্রণালী কাজে লাগান।

“এঁর স্বামী প্রথমে এক চিনি শোধনাগার খুলেন। তখন কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল কম। ১৯০৫ সনে ভদ্রলোক মারা যান। শ্রীমতী দুই পুত্র লইয়া বিধবা হইলেন। চিনি শোধনাগার তাঁর হাতে আসিল। সেই জিনিষই আজ বিরাট সুজুকি এণ্ড কোং হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

“বিগত মহাযুদ্ধের শেষভাগে ইনি অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ চালের দাম অত্যন্ত চড়িয়া গিয়াছিল। সরকার ৩।৪টি মাত্র চাউল আমদানির অনুমতি দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুজুকি কোং ছিল।

“টোকিওর আফিসগুলি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শ্রীমতীকে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতে হইয়াছিল।”

এই কোম্পানীর এক শাখা লণ্ডনে আছে। তার আফিস কাছারি বেশ বড়। তথাকার ম্যানেজার বলিতেছেন,—

“কই নূতন ব্যবসা না লইবার আমি ত কোন আদেশ পাই নাই। সুজুকি এণ্ড কোং'র বিভিন্ন কারখানাগুলি আইনতঃ পরস্পর হইতে স্বাধীন।

“সমগ্র কারবারটার জগৎ ব্যাপিয়া এজেন্সী আছে ৩০টা। ইহার তাঁবে ১০ টা “কার্গো শিপ” বহর আছে। জাহাজ তৈয়ারীর “প্রাঙ্গণ” কোবেতে। ইস্পাতের কারখানাও কোবেতে।”

পারশ্যের ভারতীয় বাণিজ্য

এবছর (১৯২৫-২৬) পূর্ব্ব-পারশ্যের বাণিজ্যকে বহুবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

(ক) গত মে মাসের মাঝামাঝিতে চা ও চিনির উপর “একচেটিয়া ট্যাক্স বা কর” চাপান হইয়াছিল। করটা গোড়া হইতে আদায় করিবার কথা। উদ্দেশ্য, পারশ্যে যেন রেলের প্রসার বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া এই দুই দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক ত আছেই।

পূর্ব্ব পারশ্যে বাণিজ্যের প্রধান জিনিষ চা ও চিনি। ১৯২৪-২৫ সনে দুশকি ডুজ্দাপ এক্সটেনসন রেলে যত

টন মাল চলাচল হইয়াছে তার অর্দ্ধেকেরও বেশীটা চা ও চিনি।

এ বছর একচেটিয়া করের দরুণ চা-চিনির আমদানি ৩৬% কমিয়াছে। ফলে রেলে বাহিত মালের ওজন ৩,০০০ টন কম পড়িয়াছে। আর পারশ্যে মোট ৩০ লক্ষ টাকার আমদানি কম হইয়াছে।

(খ) ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, হইতে আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের উপরেই কম্পাউণ্ড রোড ট্যাক্স নামে এক নূতন কর বসান হইয়াছে। পুরাণা সড়ক-নজরাণা ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের জায়গায় এটা আসিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় কর-আদায় প্রথা স্থগিত হইয়াছে। অশা, এই নূতন ব্যবস্থায় যে টাকা উঠিবে তাতে মিউনিসিপ্যালিটির টাকা জুটিবে, সড়ক রক্ষা ও নির্ম্মাণ চলিবে।

এই কর মাত্র একমাস প্রচলিত হইয়াছে। বাণিজ্যের উপর ইহার কার্য্য এখনও বুঝা যাইতেছে না।

এই সব বাধা সত্ত্বেও পারশ্যের এই বছরের বাণিজ্য পরিমাণের মোট দাম অন্য যে কোন বছরের চেয়ে, এমন কি ১৯২৫ সনের চেয়েও, বেশী। ১৯২৫ সনের তুলনায় এ বছর আমদানি ১২½ লক্ষ টাকা কম, প্রায় ২,৪০০ টন ওজনে কম।

চা-চিনির থাকৃতিতে রেলের ওজনে ২,০০০ টন কম পড়ায় রেলের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

আমদানি কমিয়াছে। কিন্তু পারশ্য হইতে ভারতে রপ্তানি বাড়িয়াছে। অন্যান্য বছর হইতে অনেক বেশী রপ্তানি গিয়াছে। রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে পশম, কার্পেট, চামড়া ও অভ্র।

আমদানিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বস্ত্রাদি-ঘটিত পণ্যদ্রব্যে, তুলার সূতায়, কলে, খনিজ তেলে ও মোটর, মোটর লরী ইত্যাদিতে। আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া রপ্তানির পরিমাণ ১৫০% বাড়িয়াছে।

নবীন আফগান

বর্ত্তমান আমিরের আমলে যে আফগান জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে সেকথা বলাই বাহুল্য। এই ভাবে উন্নতির গতি চলিলে অনতিবিলম্বে আফগান জাতি ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নত দেশগুলির সমান আসন দাবী করিবে।

এই নব্য আফগান জাগরণের মূলে দেখিতে পাই আমির আমানুল্লা খাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষমতা। আফগানিস্থানে আজ সকল শ্রেণীর লোকের শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। নবপর্য্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া নাম করা কৃতী ছাত্রগণকে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। পুরাতনকে পায়ে ঠেলিয়া নয়া আবহাওয়া-সৃষ্টির প্রচেষ্টা সকলের পছন্দ হয় নাই। আফগানিস্থানে এই নবীন মতাবলম্বী দলের সমালোচক ঢের আছে।

এক দলের মতে উন্নতি খুব দ্রুত হইতেছে। ইঁহারা হইতেছেন সংরক্ষণশীল। পুরাতনকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে ইঁহারা মোটেই রাজী নন। তরুণদের সামাজিক বিপ্লবকে ইঁহারা একটা অনাসৃষ্টি মনে করেন। আর এক দল বোধ হয় পুরাপুরি "স্বদেশী"। ইঁহারা বলিতেছেন "বিদেশে বিদ্যাশিক্ষার্থ আমাদের যুবকদের পাঠাইয়া বিদেশীদের হাতে হাজার হাজার টাকা তুলিয়া দেওয়া নেহাৎ আহাম্মুকি। আর ঐ সমস্ত দেশের আবহাওয়ায় আমাদের তরুণমতি যুবকদের মাথা খাওয়া হয়। তাহাদের নীতিজ্ঞান তো মোটেই বাড়ে না, পরন্তু বিদেশীদের ধরণধারণ হজম করিয়া তাহারা আস্ত খচ্চর বনিয়া যায়। দেশের সামাজিক রীতি-নীতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।" আফগানিস্থানের পুরোহিত কুল অর্থাৎ মোল্লা সমাজ দেশে আধুনিক বিজ্ঞান প্রচলন করিবার ঘোর বিপক্ষে।

দক্ষিণ আমেরিকায় রেলওয়ে বিস্তার

লা পাজ যুঙ্গা রেলওয়ে শেষ করিবার জন্য শীঘ্রই বড় এঞ্জিনিয়ার কোম্পানীকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে। লাইনটি ১৩৫ কিলোমিটার অর্থাৎ ৮৪½ মাইল লম্বা হইবে। ইহার মধ্যে ৮৫ কিলোমিটার ইতিমধ্যে তৈয়ারী সারা। ১৯১৫

সন হইতে এই রেল লাইন গড়িবার কাজ আরম্ভ হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বেণী নদীর শেষ পর্য্যন্ত লাইনটিকে বিস্তারিত করা হইবে। প্রতিষ্ঠাতৃগণের এই সঙ্কল্প যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে প্যাসিফিক অঞ্চলও আমাজান মোহানার অন্যান্য নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হইবে এবং ইহার ফলে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের চিলি বন্দরের সঙ্গে উত্তর ভূখণ্ডের ব্রেজিলিয়ান বন্দর পারার সঙ্গে একটানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এই লাইনটা শেষ হইলে পর বৎসর এই লাইনে বিশ হাজার টন মাল আনা নেওয়া করা হইবে। কোকো পাতা রপ্তানির কাজে এই লাইনটি বিশেষ উপকারে লাগিবে।

কানাডায় ইংরেজের বস্তি

বৃটিশ দ্বীপ হইতে ওণ্টারিও ও সমুদ্রতীরস্থ দেশগুলি কানাডার কৃষিক্ষেত্রে ইংরেজ বালক আমদানি করিয়াছে। মণিটোবাও করিবে।

মণিটোবা সরকার এতদুদ্দেশ্যে চাষের জায়গা যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। চাষের কাজে তৈয়ারী হইবার সময়ের খরচাটা পোষাইবার জন্য ফিডারেল গবর্মেণ্ট মাথাপিছু ১৮ পাউণ্ড বা প্রায় ২৭০৲ টাকা করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

এ বছর হাজারখানেক ইংরেজ বালক গ্রেটবৃটেন হইতে চালান আসিবে বলিয়া বিশ্বাস।

কৃষি-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেছে—ম্যাক্‌ডোনাল্ড কৃষি কলেজ, সাঁতে আনে দে বেলেভি, কোয়েবাক এবং কানাডা—প্রশান্ত সাগর রেলওয়ে।

কানাডায় সোণার খনি

এ বৎসরের প্রথম তিনমাসে ওণ্টারিও প্রদেশের সোণার খনি হইতে ৭,৭০১,০০০ ডলার মূল্যের সোণার পাত পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসরের ঠিক ঐ সময়ের উৎপাদনের তুলনায় এ বৎসরে ১ লক্ষ ডলার মূল্যের সোণা বেশী পাওয়া গিয়াছে। কার্কল্যাণ্ড হ্রদ প্রদেশেই উৎপন্নের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ওণ্টারিও, কুইবেক ও উত্তর মনিটোবা প্রদেশসমূহের খনিজ রত্নসম্ভার উত্তোলনের কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু নূতন কোন বিষয়ে হাত দিবার উপযুক্ত মূলধন পাওয়া যাইতেছে না।

কানাডায় মোটর উৎপাদন

কানাডায় গত মার্চ্চ মাসে ২২,৬২৩ খানা মোটর তৈয়ারী হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের চাইতে শতকরা ১৮ ভাগ বেশী উৎপাদন করা হইয়াছে। এ বৎসরের প্রথম তিন মাসে ৫৬,৬৫৪ খানা মোটর তৈয়ারী হয়। এগুলির দাম ৩৩,৭৬৩,০০০ ডলার। উৎপাদনের হার গত সনের মতই রহিয়াছে। বেশী বৃদ্ধি দেখা যায় না। কানাডার মোটর-শিল্পের একজন মস্ত বড় ব্যবসায়ী তাঁহার ওশাওয়া নামক স্থানের কারখানাটি আরও বাড়াইতেছেন। এই কাজে তিনি ১৫ লক্ষ টাকা ঢালিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

কানাডার তামাক

"ভার্জ্জিনিয়া টোবাকো" বলিয়া বাজারে যে সকল সিগারেট, চুরুট প্রভৃতির চলন আছে তাহার অধিকাংশই কানাডার মাটীতে জন্মে। গত জানুয়ারী মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সনে কানাডা ২,০০৪,৪২৭ ডলার মূল্যের তামাক পাতা ও অন্যান্য তৈয়ারী তামাক-মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কানাডা এই বৎসরে তিনগুণ মাল বেশী রপ্তানি করিয়াছে। যে সন চলিতেছে এই সনে কানাডার তামাক রপ্তানি আরও বৃদ্ধি পাইবে।

কানাডার তেল

পশ্চিম কানাডা অঞ্চলে ব্যবসার উপযুক্ত পরিমাণে পেট্রোলিয়াম তেল প্রস্তুত করা হইতেছে। ১৮৮৪ সন থেকে কানাডার তেলের ভাঁটি অন্বেষণের কাজে লোক খাটিতেছে; কিন্তু এই অল্প কিছু দিন হইল মাত্র কানাডাবাসী তাহাদের এতদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ১৯২৬ সনে আলবার্টা প্রদেশের টার্ণার উপত্যকার এক তেলের ভাঁটি হইতে ১৯৩,৭২৩ ব্যারেল পেট্রোলিয়াম তেল পাওয়া গিয়াছে।

অন্যান্য তিনটি তৈলকূপ হইতেও ঐ পরিমাণ করিয়া তেল উঠিয়াছে। টার্ণার উপত্যকায় দৈনিক ৮৫০ ব্যারেল করিয়া পেট্রোলিয়াম তৈল উত্তোলন করা হইতেছে। বর্ত্তমানে ১ ব্যারেল পেট্রোলিয়ামের বাজার-দর ৪ ডলার। এই হিসাবে কানাডাবাসী টার্ণার উপত্যকার খাদ হইতে প্রতিদিন ৩,৪০০ ডলার করিয়া রোজগার করিতেছে। ইহা ৪টি তৈলকূপের কামাই।

দক্ষিণ আমেরিকায় পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বিনা তার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ভার দেওয়া হইয়াছে মার্কণি কোম্পানীর হাতে। ১৯২১ সনে পেরু সরকারের নিকট মার্কণি কোম্পানী প্রথম কণ্ট্রাক্ট পায়।

লণ্ডনে ভারতীয় হোটেল

বীরস্বামী নামক একজন ভারতীয় ইংলণ্ডে একটী হোটেল খুলিয়াছেন। তিনি সেখানে এই পর্য্যন্ত ১০০ জন ভারতীয়কে চাকরী দিয়াছেন। তাঁহারা হোটেল লব্ধ আয়ে পড়াশুনা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে বীরস্বামী স্থির করিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডনে একটী কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় শাকসব্জী উৎপাদন করিবেন। তিনি আশা করেন, আরও কয়েক জন ভারতীয়কে এই কাজে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের পড়াশুনার পক্ষে সহায়তা করিতে পারিবেন।

ইংল্যণ্ডের মোটর ব্যবসা

(১)

১৯২৬ সনে এই প্রথম ইংরেজ যত মোটর আমদানি করিয়াছে তার চেয়ে বেশী রপ্তানি পাঠাইয়াছে। এর আগে বরাবর আমদানিটা বেশী হইয়াছে।

(২)

ইংল্যণ্ডে প্রত্যেক ২০ জনের মধ্যে একজনের মোটর গাড়ী আছে। আমেরিকায় প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে একজন মোটরগাড়ীর মালিক।

বিলাতে ফলের কাটতি

বিলাতের লোক এখন আগের চেয়ে বেশী ফল খায়। প্রত্যেকে গড়ে কোন্ ফল কত খায় তার তালিকা নিম্নরূপ :—

অ্যাপল (আতাজাতীয় ফল)	৯৩
কমলালেবু	৬৭
কলা	৫২
লেমন (লেবুজাতীয় ফল)	১৫
মোট	২২৭

এটা হইল বছরের হিসাব।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ইংল্যণ্ডের লোক গড়ে আগের চেয়ে বেশী বাঁচিতেছে। এই ফল খাওয়ার সঙ্গে তার সংস্রব আছে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা হওয়া দরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিম

যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বৎসর ৩৬ কোটি ডিম রপ্তানি করিয়া থাকে।



ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বয়নশুল্ক তদন্ত-সমিতির মতামত

তদন্ত-সমিতি মনে করেন যে, বয়ন-শিল্পে বোম্বাইতে যতটা মন্দা দেখা যাইতেছে অন্যত্র ততটা নহে। এই মন্দার জন্য কলের মালিকরা কতকাংশে দায়ী। জাপান এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রতিযোগিতাও কতকাংশে দায়ী। সমিতি মনে করেন না যে, বিলাতের প্রতিযোগিতা মন্দার অন্যতম কারণ।

সূতা এবং কাপড় প্রস্তুতে জাপানী প্রতিযোগিতাই বিষম হইয়া উঠিয়াছে। জাপানে শ্রমিকদের মজুরীর হার ভারতের তুলনায় সামান্য। সুতরাং ভারত জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কাজে কাজেই ভারতের বস্ত্রশিল্পকে সাহায্য করা আবশ্যক।

সাহায্যের স্বরূপ এবং পরিমাণ সম্বন্ধে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজা হরকিষণ কাউল প্রভৃতি অধিকাংশ সদস্য প্রতি পাউণ্ড সূতার জন্য এক আনা করিয়া সাহায্য করিতে বলেন। ইহাতে বৎসরে ৩৯ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। এই টাকা তুলিবার জন্য আমদানি শুল্ক তিন বৎসরের জন্য ১১% স্থলে ১৫% করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। হস্তচালিত তাঁতের জন্য যে সমস্ত সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার উপর কোন শুল্ক বৃদ্ধি না করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সমিতির সদস্য মিঃ নয়েম সাধারণ ভাবে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জাপানী বস্ত্র ও সূতার উপর আমদানি শুল্ক ৪৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-জাপান সর্ত্তানুসারে যত সম্ভব সত্বর এই শুল্ক বসান যায় তাহা করিতে হইবে।

আরো কম খরচায় যাহাতে পণ্য উৎপাদিত হইতে পারে তজ্জন্য এই সমিতি কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। এই শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য সমিতি কলকব্জা এবং সাজসরঞ্জামের উপর আমদানি শুল্ক রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বোম্বাই এবং আমেদাবাদের কলওয়ালারা আমদানিশুল্ক বিশেষ ভাবে বৃদ্ধিকরিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন সমিতির মতে তাহা সমীচীন নহে। তূলার উপর রপ্তানি শুল্ক বসান অথবা কোম্পানীর উপর হইতে সুপারট্যাক্স তুলিয়া দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

গবর্মেণ্ট রিপোর্টখানি আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কলওয়ালাদিগকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য। কারণ জনসাধারণের উপর কর বসাইয়া কলওলাদিগকে সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মাণে সাহায্য করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ফলে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করার প্রস্তাবও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাহ্য হইল।

গবর্মেণ্ট এবিষয়ে একমত যে, সংশোধিত কারখানা আইন কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত জাপানের কলওয়ালারা ভারতীয় কলওয়ালাদিগের অপেক্ষা শতকরা ৪।৫ টাকা বেশী লাভ পায়। এই সুবিধার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে তাহাদিগকে ১১ টাকা করিয়া শুল্ক দিতে হইতেছে। সুতরাং জাপানী বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক বর্দ্ধিত করিবার কোন কারণ নাই। সূতার উপর কর বসাইলে ভারতীয় তাঁতীদের ক্ষতি হইবে। সুতরাং গবর্মেণ্ট এবিষয়ে মেজরিটি এবং মাইনরিটি উভয় রিপোর্টই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বয়নশিল্পের কলকব্জার উপর কর

কাপড়ের কলের উপর আমদানি শুল্ক রহিত করার প্রস্তাবে গবর্মেণ্টের মত এই যে, তাঁহারা বিভিন্ন শিল্পকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন না। একটি শিল্পের জন্য বিনা শুল্কে কলকব্জা আসিবে, আর একটি শিল্পকে কর দিতে হইবে এব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নহে। গবর্মেণ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব করিবেন যে, তিন বৎসরের জন্য কাপড়ের কলকব্জা ও সাজসরঞ্জামের উপর হইতে আমদানি শুল্ক রহিত করা হউক। এই আইনের ফলে বর্ত্তমান বৎসর ৪৫ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য বৎসর ৮৫ লক্ষ টাকা করিয়া ক্ষতি হইবে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে এই আমদানি শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইবে।

ভারতের নৌবাণিজ্য

২১মে তারিখে পুনার শিবাজী মন্দির-প্রাঙ্গণে এক জনসভায় মিঃ সারাভাই নিমচাঁদ হাজী এম্, এল্, এ ভারতের নৌবাণিজ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। মিঃ কেলকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিঃ হাজী বলেন:—অদ্য আমি মারাঠা সাম্রাজ্যের সংস্থাপক শ্রীশিবাজী মহারাজের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া বক্তৃতা করিতেছি। তাঁহারই আমলে ভারতীয় বাণিজ্যবহর এবং সামরিক নৌবহর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমি অর্থনীতির দিক্ দিয়া এ বিষয়টী আলোচনা করিতেছি। ভারতের সমুদ্র উপকূল ৪হাজার মাইল বিস্তৃত। এই উপকূলে বহু সমৃদ্ধিশালী বন্দর অবস্থিত। সুতরাং ভারতবর্ষে বাণিজ্য-বহরের একটা স্বাভাবিক আবশ্যকতা আছে। যদি আমাদিগকে বাণিজ্যের ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হয়, তবে ঔপকূলিক বাণিজ্য বহর গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের ঔপকূলিক বাণিজ্য একটা বিরাট ব্যাপার। প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টন মাল বন্দর হইতে বন্দরান্তরে নীত হয়। ৭ হাজার টন মাল বহনযোগ্য ৮০ খানি জাহাজ হইলেই এই বাণিজ্য চলিতে পারে। বর্ত্তমানে এই মাল যাতায়াতের ভাড়া পড়ে ১০ কোটি টাকা। ভারতবর্ষ বাণিজ্যপ্রধান দেশ হইবে ইহাই প্রকৃতির আদেশ। সামুদ্রিক বাণিজ্যে একদিন ভারতবর্ষ ছিল্ অগ্রণী। আজ যদি আবার সেই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হয়, তবে জাহাজগুলি ভারতবাসীর হাতে থাকা চাই। তাহা হইলেই আপনারা আর্থিক দাসত্বের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। ঔপকূলিক বাণিজ্য দেশবাসীর হস্তে থাকাই আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিধান।

তৃতীয়শ্রেণীর রেল-মোসাফির

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অভাব-অভিযোগের প্রতি রেল ও ষ্টীমার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যাত্রিদিবস উদ্‌যাপনকল্পে সম্প্রতি কলিকাতার এলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কে, সি, গুপ্ত, মহীতোষ রায় চৌধুরী, শরৎচন্দ্র বসু, কালীদাস নাগ, মাখনলাল সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—"সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া আমি দুঃখিত। এই উদ্দেশ্যের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা তাঁহারা সম্যক অবগত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্দ্দশা বুকিং আফিস হইতে আরম্ভ হইয়া গন্তব্য স্থানে না পৌছান পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এক ভারত ছাড়া আর কোন দেশে এইরূপ চলিতে পারে না। নিখিল বঙ্গ যাত্রী সমিতির পক্ষ হইতে আপনারা যাত্রীদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র উহা প্রচার করিতে থাকুন।"

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যাত্রীদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি স্থায়ী অফিস স্থাপন করিতে হইবে ও প্রতিকারের জন্য অবিরত আন্দোলন চালাইতে হইবে। তিনি বলেন আমি ইয়োরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিদেশের রেল-লাইনগুলিতে নিম্ন শ্রেণীর যাত্রীদের সুখসুবিধার যে

ব্যবস্থা দেখিয়াছি, তাহার সহিত ভারতের রেলসমূহের নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের ব্যবস্থার তুলনা করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। এ সমস্ত বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলে দেশে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, অন্ততঃ রেলওয়ে বোর্ডের সমস্ত চাকুরী ভারতীয়দের হাতে আনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বক্তা বলেন, আমরা এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া করিয়া নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিতেছি এবং নিজেদেরই আত্মসম্মান খর্ব্ব করিতেছি। আমাদের কখনও অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা উচিত নহে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, জনমতকে জাগ্রত করিয়া তোলা অপেক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান ও বিবেক-জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের অর্থে রেলকর্তৃপক্ষ-পুষ্ট তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধেই তাহারা একেবারে উদাসীন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধার ও বসিবার স্থানের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। এবিষয়ে ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যদের উপর চাপ দেওয়া সকলের কর্ত্তব্য। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও মহীতোষ রায় চৌধুরী বক্তৃতা করেন। পরে সভায় যাত্রীদের অভাব অভিযোগের প্রতি রেল ও ষ্টীমার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ১০টী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় কৃষি-মঙ্গল-পরিষৎ

গত ২১শে মে শনিবার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহে সভ্যদের এক সভা হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র।

সভার উদ্দেশ্য কৃষি ও তত্তুল্য ব্যবসাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো একটা সংগঠন কায়েম করা। এই সংগঠনের কাজ হইবে—(ক) কৃষির উৎপাদন বাড়ানো, (খ) গবাদির ও অন্যান্য পশু-বংশের উন্নতিসাধন, (গ) সমবায়-প্রথার ও বিশেষ বিশেষ স্থানে সুপ্রণালীবদ্ধ ব্যাঙ্কিংএর সাহায্যে গ্রাম্য ক্রেডিট্ গঠন ও বীজ পাওয়ার ক্ষেত্র স্থাপন, (ঘ) শস্যের উন্নত ধরণের বীজ ও উন্নত প্রণালীর কৃষির প্রচলন। এই সংগঠন কৃষি-শিক্ষার দিক্ হইতে ও আর্থিক দিক্ হইতে কুটির-শিল্পেরও খবরদারি করিবে। নাম হইবে "বঙ্গীয় কৃষি-মঙ্গল-পরিষৎ"।

জিলায় জিলায়, সাবডিভিসনে সাবডিভিসনে, গ্রামে গ্রামে এই আদর্শ অনুযায়ী সভাসমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

এই সমিতি শীঘ্রই কতকগুলি সাব্‌কমিটি বসাইবে। তন্মধ্যে কয়েকটা এই :—(ক) কৃষি শিক্ষার খসড়া তৈয়ারী করা, (খ) প্রচার সাব্‌কমিটি, (গ) গ্রাম্য ক্রেডিটের অবস্থা ভাল করিবার জন্য সাব্-কমিটি, (ঘ) গবাদির উন্নতি কিসে হয় তাহার অনুসন্ধানের সাব্-কমিটি।

সমিতি নানা কাগজ-পত্র ইত্যাদি রাখিবে ও দরকার মত লেখা, পুস্তিকা, কাগজ ইত্যাদি ছাপাইয়া নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিবে। যে কেহ এই সমিতির সভ্য হইতে পারে।

কর্ম্মচারি-বৃন্দ :—সার পি, সি মিত্র (সভাপতি), রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক (সহঃ সভাপতি), আর, এন, ঠাকুর ও শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদক) লেপটেনাণ্ট বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় (কোষাধ্যক্ষ)।

ভারতীয় নাবিক-সঙ্ঘ

কলিকাতার ভারতীয় নাবিক-সঙ্ঘ অনেক দিনকার পুরাতন সঙ্ঘ। এ সঙ্ঘটির সভ্যগণের স্বার্থ-সংযোগের গতি উল্টাদিকে চলেছে। তার ফলে শুধু যে পুরাতন একটি সঙ্ঘ ভেঙে তিনটিতে পরিণত হয়েছে তা নয়, আরো একটি নূতন সঙ্ঘও সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে গঠিত হয়েছে। প্রথমে সমুদ্রগামী নাবিকমাত্রই ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘের সভ্য হতে পারত। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে নদীতে যে সকল ষ্টীমার চলাচল করে থাকে সে সমুদয়ের নাবিকগণের ভারতীয় নাবিক সমিতির সভ্য হওয়ার অধিকার ছিল না। তার পরে সুকানীগণ মূল সঙ্ঘ হতে পৃথক হয়ে কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন নাম দিয়ে সম্পূর্ণ নূতন সঙ্ঘ গঠন করে নিয়েছেন। নদীসমূহে চলাচলকারী ষ্টীমারসমূহের নাবিক-

গণও ম্যারিনার্স ইউনিয়ন নাম দিয়ে আর একটি সঙ্ঘ গঠন করেছেন। এত বিচ্ছিন্ন হয়েও ব্যাপার মেটেনি। মূল সঙ্ঘটি আরো একবার ভেঙেছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সিমেন্স ইউনিয়ন নাম দিয়ে আর একটি সঙ্ঘও কিছুকাল পূর্ব্বে গঠিত হয়েছে। ভারতীয় নাবিকগণের সঙ্ঘ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সঙ্ঘরূপে গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কেননা নাবিকগণ দেশ বিদেশে যাওয়া আসা করে বলে উন্নত দেশসমূহের হাওয়া তাদের গায়ে লেগে থাকে। কিন্তু, কার্য্যতঃ ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘ বা সঙ্ঘগুলি দিন দিনই দুর্ব্বল হতে দুর্ব্বলতর হচ্ছে। এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ এই হচ্ছে যে, যাঁরা আপনা হতে নাবিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই ট্রেড্ ইউনিয়নিজ্‌ম্ বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদ মোটেই বোঝেন না। দ্বিতীয় কারণ এই হচ্ছে যে নেতৃগণের অধিকাংশই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বা নাম করার জন্যে নাবিক সঙ্ঘসমূহ গঠনে মনোনিবেশ করেছেন। তাই তাঁরা ততটুকুই মাত্র কাজ করে থাকেন যতটুকু তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি বা নামের জন্যে প্রয়োজন হয়ে থাকে। রোগীর মরা বাঁচাতে কিছুই এসে যায় না, মোল্লার প্রয়োজন হালুয়া আর রুটির।

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের শ্রমিক-সঙ্ঘবাদীরা যখন শিল্পানুষ্ঠানমূলক সঙ্ঘগঠনে ব্যাপৃত হয়েছেন তখন কলিকাতা নাবিক সঙ্ঘের নেতৃগণ সঙ্ঘটিকে ভেঙে নানা ভাগে বিভক্ত করে ব্যবসায়গত সঙ্ঘ করে তুলেছেন। সত্য বটে মিঃ দাউদের মৌরসী মোকর্‌রী নেতৃত্বের সহিত ঠোকাঠুকি বেধেছিল বলে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সিমেন্স ইউনিয়ন"টী পৃথক ভাবে গঠিত হয়েছে। কিন্তু, অপর দু'টি সঙ্ঘ কোন প্রকারের ঝগড়ার ফলে পৃথকভাবে গঠিত হয়নি। উচিত ছিল জাহাজের শ্রমিকমাত্রকেই নিয়ে নাবিক সঙ্ঘ তা সে শ্রমিক সাগরে চলাচলকারী জাহাজেরই হোক্ কিংবা গড়ে তোলা নদীতে চলাচলকারী জাহাজেরই হোক্। বাস্তবিক পক্ষে সঙ্ঘগুলিকে বিচ্ছিন্ন হতে দিয়ে নাবিকদের সংহতি শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে দেওয়া হয়েছে। নাবিক মাত্রেরই মনে সমস্বার্থের ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়ার পরিবর্ত্তে তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ সৃষ্টি করে দেওয়া হচ্ছে। এত বেশী বুদ্ধি না থাক্‌লে কি কেউ কখনো শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করতে আসে ?

ট্রেনিং ক্লাস খুলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নাবিকদিগকে সঙ্ঘবাদের নীতি ও মত শিক্ষা দেবার যেমন সুবিধা আছে এমন সুবিধা অন্য কোনো শিল্পের শ্রমিকগণের পক্ষে নেই। বহুসংখ্যক বেকার নাবিক সর্ব্বদাই ঘরে বসে থাকে। তাদেরকে সঙ্ঘবাদের নীতিগুলি শিক্ষা দিলে নাবিকরা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারত। কিন্তু, সেদিকে কাহারো লক্ষ্য নেই। শুনেছি "কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন" ও "ম্যারিনার্স ইউনিয়নের" হাতে কিছু টাকা কড়িও আছে। কিন্তু সঙ্ঘদ্বয় প্রচার-কার্য্যের কোনো ব্যবস্থা কখনো করেছে বলে আমরা আজো শুনিনি। (গণবাণী)

উত্তর বঙ্গ জমীদারি কর্ম্মচারী সমিতি

বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মিলিত হইয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য না করিলে কোন কার্য্যে সুফল লাভের আশা করা যায় না। এজন্য আমি প্রথমতঃ উত্তর বঙ্গের জমীদার এষ্টেটের কর্ম্মচারিগণের অভাব অভিযোগ আলোচনার জন্য "উত্তর বঙ্গ জমীদারি কর্ম্মচারী সমিতি" নামে সভা স্থাপন করতঃ কার্য্যারম্ভের ইচ্ছা করিতেছি। এই কার্য্যে উত্তর বঙ্গের জমীদারি এষ্টেটের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনীয়। তাঁহাদের মতামত পাইলে সমিতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। আশা করি এই সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বসু,
নায়েব বাগদ্বার এষ্টেট, কাশিমবাজার রাজ ;
পোঃ বালুয়া (রঙ্গপুর)।

ক্ষত্রিয় কর্ম্মকার পরিষদ্

এই সমিতির কার্য্যালয় সাতক্ষীরা টাউনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যবঙ্গে বিশেষভাবে পুরাগত অস্ত্রশস্ত্র-আভরণাদিজীবী ক্ষত্রিয় কর্ম্মকার শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য,

সামাজিকতা ও ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ক আলোচনাদি সমিতির উদ্দেশ্য। খুলনা টাউন সন্নিহিত খালীশপুরস্থ "ক্ষত্রিয় কর্ম্মকার আদিসভা" নামক অন্যতম উপকেন্দ্রীয় সমিতির, এবং কলিকাতা পটুয়াটোলাস্থ "ক্ষত্রিয় কর্ম্মকার সমাজ" নামক কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত এই পরিষদের সমন্বয় আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে এই সমিতির একাদশ বার্ষিক একটী বিশেষ কার্য্যকরী সভা আহ্বানের চেষ্টা চলিতেছে। স্বশ্রেণীবর্গের-ক্ষত্রিয় কর্ম্মকারগণের—সহানুভূতি ও সাহায্যাদি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়বর্ম্মণ, বি, এল, সম্পাদক, ক্ষত্রিয় কর্ম্মকার পরিষদ, সাতক্ষীরা পোঃ (খুলনা)।

পাবনার সূত্রধর

সলপ, নারিনা, গড়দহ, মাছিপুর, মোনাহরা, বলসা বাড়ী, তাড়াবাড়ী, নলসোন্দা, মাটিকোড়া, রায় দৌলতপুর, জামতলী রসুলপুর, খুকনী দৌলতপুর, বরিয়া এবং ঘোষগাতির সূত্রধরেরা হিন্দুসমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে জলচল হইবার জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। এই সমস্ত সূত্রধরের প্রতিনিধিরা সলপের জমীদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁহারা প্রতিনিধিদিগকে সলপে পণ্ডিতদিগের একটি সভার ব্যবস্থা করিতে বলেন। পণ্ডিতেরা সূত্রধরদের দাবী সম্বন্ধে শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবেন।

মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য শিক্ষাসমিতি

অদ্য অপরাহ্নে স্থানীয় তিলক স্মৃতিমন্দিরে মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য-শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ৭৫টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রায় ৫ শত প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জি, এস, বেজ প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা করেন। বড়োদার শ্রীযুক্ত সর্দ্দার দত্তাত্রেয় চিন্তামণ মজুমদার ওরফে অবসাহেব মজুমদার ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—পুণা, নাসিক, আমেদাবাদ, বড়োদা, নাগপুর, অমরাবতী, সাতারা, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যায়াম শিক্ষালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যুবকগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ইহা অবশ্য মঙ্গলজনক। বিদ্যালয়ে যে ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

ব্যায়াম স্বাস্থ্যশিক্ষার একটি অঙ্গ। আমাদিগের ধর্ম্মে স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান আছে। শীতল জলে স্নান, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান প্রভৃতিতে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। নৈতিক শিক্ষা, ভগবানে ও ধর্ম্মে বিশ্বাস, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি দ্বারাও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

বাল্যকালই স্বাস্থ্যশিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত সময়। আমাদের সকল দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্যশিক্ষার নিয়মাবলী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ব্যায়াম করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি লোকে মহিলাগণের স্বাস্থ্য-শিক্ষার পক্ষপাতী। পুরুষের ন্যায় শ্রমসাধ্য ব্যায়াম মহিলাগণের পক্ষে উপযুক্ত না হইতে পারে, কিন্তু শরীর-ধারণের জন্যও ব্যায়াম আবশ্যক। যে সকল মহিলাকে শারীরিক শ্রমসাধ্য কোনও কার্য্য করিতে না হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্যায়াম নিতান্ত আবশ্যক। যে সকল মহিলা ব্যায়াম করেন, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্যও বর্দ্ধিত হয়।

পাশ্চাত্য ব্যায়ামপদ্ধতি আমাদিগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

(পুণা, ২৪ মে)

বঙ্গীয় জনশক্তি মহাসভা

গত ১লা মে ফরিদপুর জিলার রাহুথড় মঠে উক্ত মহাসভার এক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অভয় আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়, টেংরার জমীদার শ্রীযুক্ত হরিহর দাস চৌধুরী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ঐ সভায় যোগদান করেন। সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, তথাকথিত অস্পৃশ্য নমঃশূদ্ররাই এই সভা আহ্বান করিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন একজন নমঃশূদ্র নেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ডাক্তার সুরেশ ব্যানার্জ্জির বক্তৃতা

এই সভায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নরূপ :—

তথাকথিত অস্পৃশ্য বিশেষতঃ নমঃশূদ্রগণের প্রতি

(১) আপনারা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ন্যায় আপনারাও হিন্দু এবং হিন্দুর উন্নতিতে আপনাদের উন্নতি ও হিন্দুর অবনতিতে আপনাদের অবনতি।

(২) সুতরাং অহিন্দু অপর কোনও সম্প্রদায়ের সংযোগে ও সাহায্যে আপনারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবেন না। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন অহিন্দু সম্প্রদায় প্রেমবশতঃ আপনাদিগকে সাহায্য করিতেছে না। আজ আপনাদের সাহায্যে তাহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে দুর্ব্বল ও ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এই উদ্দেশ্য সফল হইলে, তাহারা আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। যাহারা এইরূপ কাজে আপনাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে, তাহারা স্বদেশ ও সমাজের শত্রু। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই তাহারা ইহা করিতেছে। তাহাদের উপদেশ আপনারা বিষবৎ ত্যাগ করিবেন।

(৩) এই কথা সত্য যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আপনাদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে এবং তাহার আশু প্রতীকারের প্রয়োজন। এই সব অত্যাচার দূর করিবার জন্য অনেক শিক্ষিত হিন্দু প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এই সব হিন্দুদিগকে তাহাদের উদ্দেশ্যসাধনে যদি আপনারা সাধ্যমত সাহায্য করেন তবে এই দীর্ঘকালের প্রথা দূর হইয়া যাইবে।

হিন্দু জনসাধারণের প্রতি

(১) হিন্দু সমাজের একতার উপরই ভারতের স্বরাজ-লাভ বিশেষভাবে নির্ভর করে। অস্পৃশ্যতা ও জন্মগত জাতিভেদ প্রথাই হিন্দু সমাজকে নানা ভাগে বিভক্ত ও ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং স্বরাজকামী প্রত্যেক ভারতবাসীরই প্রাণপণে এই প্রথাদ্বয়কে দূর করিতে চেষ্টা করা উচিত।

(২) জন্মগত জাতিভেদ প্রথা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। জাতিভেদ প্রথা দূর হইলে হিন্দুসমাজও সঙ্ঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এই প্রথা দূর করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবিলম্বে অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) শিক্ষিত হিন্দুদিগকে অশিক্ষিত হিন্দুদের পাড়ায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

(খ) নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে হিন্দু মন্দির মাত্রেই উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের ন্যায় প্রবেশের অধিকার দিতে হইবে।

(গ) উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক ব্যাপারে নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে মিলিবার সুযোগ দিতে হইবে।

(ঘ) সামাজিক ব্যাপারে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যাহাতে একপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব প্রচলিত হইলে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ আপনাআপনিই প্রচলিত হইবে।

(৩) উপরি উক্ত উপায়গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে স্বার্থত্যাগী শিক্ষিত হিন্দু যুবকদিগকে পল্লীগ্রামে বাস করিতে হইবে এবং সকল প্রকারে গ্রামবাসীদিগের সেবা ও সাহায্য করিতে হইবে। এই সব যুবকদের আদর্শেই পল্লীবাসী মৃতপ্রায়-হিন্দুগণ নবনব ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে।

(৪) কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে কৃষি ব্যতীত পল্লীগ্রামে বাস করা অসম্ভব। এই জন্য এই সমস্ত যুবকদিগকে স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিতে এবং সকল প্রকার কৃষিকাজ শিখিতে হইবে। ইহাদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরাও লাঙ্গল ধরিবে। উন্মুক্ত ময়দানে লাঙ্গল চালনার দ্বারাই দুর্ব্বল ও ভীরু হিন্দু সবল ও সাহসী হইয়া উঠিবে।

সাক্‌লাতোয়ালার মতে মহাত্মা গান্ধি আর্থিক উন্নতির অন্তরায়

শ্রীযুক্ত গান্ধির নিকট লিখিত এক খোলা চিঠিতে শ্রীযুক্ত সাক্‌লাতোয়ালা খদ্দর ও চরকার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে আর্থিক দিক্ দিয়া কিষাণের অবসর সময়ে আয় বৃদ্ধির অজুহাত একেবারেই খেলো। মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ অন্যান্য দেশকর্ত্তৃক অবলম্বিত আন্দোলন ও নিয়ম-পদ্ধতি দ্বারা মানব-জীবনের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে চরকা আন্দোলন দ্বারা তাহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। ইহার চাইতে কৃষির উন্নতিকল্পে সরকারের ক্যানাল বা খাল খনন মোসাবিদা ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা কৃষককুলের দশগুণ আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করিবে। সাকলাতোয়ালা আরও বলিয়াছেন আপনি যদি রাজনৈতিক দাবীর কথা না তুলিতেন তাহা হইলে আপনি আজ জনসাধারণের উপর এতটা প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিতেন না। আর যদি আপনার চরকা আন্দোলনের গোড়ায় একমাত্র আর্থিক উদ্দেশ্য রহিয়া থাকে তাহা হইলে আমি বলিব দেশের আর্থিক জাগরণের জন্য যাঁহারা অন্যান্য দেশের অনুরূপ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সঙ্গে অসহযোগ করিয়া আপনি দেশের আপামর জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং ধনিক সম্প্রদায়ের হিতার্থ সাহায্য করিতেছেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকার শ্রম ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ-রূপে সঙ্ঘবদ্ধ। ভারতীয় মজুরদের অবস্থা এত শোচনীয় যে, দুনিয়ার সভ্য দেশে তাহা একরূপ অচিন্তনীয়। আপনার ভারতের মনিব সম্প্রদায়কে সমর্থন করিবার চেষ্টা এদেশের নিষ্পেষিত মজুর শ্রেণীর দিক্ দিয়া একটা অমার্জ্জনীয় ভণ্ডামি। যে প্রকারে কোন কোন মরসুমে জমীদারের আমলারা তাহাদের রায়তদের নিকট হইতে অর্দ্ধআনায় একদিনের খাটুনী জবরদস্তি করিয়া আদায় করিয়া লয় তাহা অন্যান্য কিষাণ-সঙ্ঘওয়ালা দেশের নিকট মনুষ্যত্বের ঘোর অবমান-জনক।

সরকারী চাকুরেদের দাবী

শিলংএ সরকারী কর্ম্মচারী বৈঠকের সভাপতিরূপে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলিয়াছেন—সরকারী কর্ম্ম-চারীরা যে নিজেদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। বৃটিশ সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারত গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের আন্দোলনও আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও শ্রমিকরা ক্রমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারে ভারতেও সকল দিক্ দিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইতেছে।

আজকাল ভারতের শিল্প-জগতে একটা বিপ্লব দেখা দিয়াছে। ভারতবাসী আজ বণিকদের বাণিজ্যবাদের আর্থিক উন্নতির রহস্য যে কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য এবিষয়ে তাহাদের চেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সবে মাত্র তাহাদের 'হাতেখড়ি' হইয়াছে এবং তাহারা বাণিজ্যবাদের ক, খ, গ শিক্ষা করিতেছে। এই সঙ্গে শ্রমিক জগতেও একটা সাড়া পড়িয়াছে; তাহাও উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যাহা যাহা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। এই সময়েও যদি আমাদের দেশের সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ চুপ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলেই বরং বিস্মিত হইবার অধিক কারণ ঘটিত।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে এদেশে একটা মনো-ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার ফলেই এদেশবাসীরা এতদিন পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সু-নজরে দেখেন নাই। এই শ্রেণীর আমলাদের প্রতি তাহারা যেন একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছেন। আমার মনে হয়, এখন আর সে দিন নাই। এই সময় হইতে আমাদের বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

এখন আমাদিগকে সরকারী চাকুরেদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইবে। সরকারী চাকুরেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে তাহারা সমাজের অস্পৃশ্য শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে; কাজেই তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করা বর্ত্ত-মানে প্রয়োজন হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে, সমাজের দিক্ হইতে ইহাদের কোনই উপযোগিতা নাই। ইহারা বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাতের পুতুল ও কলকব্জা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সমাজ-জীবনে ইহাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা বাধ্য হইয়া আমলাতন্ত্রের

ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন সত্য, তথাপি ইহারা নানাপ্রকারে সমাজের সেবা ও কল্যাণ করিয়া থাকেন। কাজেই তাহাদের পরিশ্রম ও সেবা কখনও উপেক্ষণীয় কিংবা ঘৃণার যোগ্য নহে। সত্যকথা বলিতে কি, কেরাণীদের সাহায্য না পাইলে বর্ত্তমান সমাজ ও সভ্যতা অচল হইত।

আমি জানি যে, উক্ত শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীরা যতটা উদ্বেগ, নির্য্যাতন ও পরিশ্রম বরণ করিয়া থাকেন, কার্য্যক্ষেত্রে ততটা আর্থিক লাভ তাহাদের হয় না। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের কথা। আমার মনে হয়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কেরাণীদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক-কিছু এখনও কর্ত্তব্য আছে। এবিষয়ে সরকারের কর্ত্তব্যই অধিক, তবে দেশবাসীর কর্ত্তব্যও নিতান্ত কম নহে। পরিশেষে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি আমার একটু বলিবার আছে। তাহারা সর্ব্বদাই মনে করেন যে, তাহারা যেন আমাদের সমাজের কেহ নন—সমাজে তাহাদের স্থান নাই এবং এই সমাজকে দিবার মত তাহাদের কিছু নাই। এই ধারণাও নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রকারের শ্রমেরই একটা মূল্য আছে। তাহা ছাড়া দেশের ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, দেশের যাহারা নেতা, চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক তাহারা কেবল রাজা মহারাজার ছেলেও বংশধর নহেন। এই কেরাণীকুলের সন্তানগণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতের জননায়ক, চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়করূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষা মহৎদান সমাজকে আর কি দেওয়া যাইতে পারে?"

(অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

মার্কিণ ছাত্রীদের শফর

আমেরিকার ৭৫ জন ছাত্রী ৪২৫ জন আণ্ডারগ্রাজুয়েট্ ছাত্রের সহিত "রাইনডাম" নামে তাদের "বিশ্ববিদ্যালয়-জাহাজে" সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিতেছে। তারা মোট ৩০,০০০ মাইল বেড়াইয়াছে। দেশ দেখিয়াছে জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, যবদ্বীপ, সিংহল, মিশর আরব, প্যালেষ্টাইন, তুরস্ক, গ্রীস্, ফ্রান্স, নরওয়ে ইত্যাদি।

তারা এই ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়ে "বিদ্যাকূল" নামে একটা দৈনিকও চালাইয়াছে। তাতে দিনকার খবর ও হাসি মস্করা বাহির হইত। নূতন কতকগুলি বিবাহের সম্পর্কও হইয়াছে।

কুমারী ইজাবেল বিয়ার নামক জনৈক ছাত্রী বলিতেছে, "ফরাসী বা আমেরিকান্ বালিকার তুলনায় ইংরেজ বালিকাকে পাড়াগেঁয়ে বলিতে হয়। এমন কি ওয়েষ্ট এণ্ডের বালিকাদেরও সভ্য বলিতে বাঁধে। এদের রংটা খাসা, কিন্তু পাগুলি একটু যেন বেশী বড়।

"ইংরেজ বালিকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমি লই নাই। কিন্তু লণ্ডনে এত বালিকা যে প্রকাশ্যে সিগারেট্ খায়, তা আমি জানিতাম না। ইহা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। বালিকারা রেস্তরাণ্টে ঢুকিয়া সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া ফস্ করিয়া সিগারেট্ ধরাইয়া বসে। আমাদের নিউ ইয়র্কে এদৃশ্য বিরল।

"ইংরেজ-পুঙ্গবরা ভদ্র বটে। তারা নারীরপ্রতি এত বেশী সৌজন্য দেখায় যে আমাদের কাছে "সেকেলে" লাগে। এরা নিজেদের মনোভাব লুকাইয়া রাখিতে ওস্তাদ। সময় সময় কাঠখোট্টা বলিয়া মনে হয়।

"ইংরেজ পুরুষ দেখিতে বেশ সুন্দর বটে, কিন্তু সাধারণ আমেরিকানের বিশেষ নিউ ইয়র্কবাসীর মতন নয়।

"লণ্ডনের সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক বায়স্কোপে গিয়াও সুখ পাই না। মনে হয় রঙ্গালয় বিষয়ে লণ্ডন নিউইয়র্ককে নকল করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু নকলটা বড় খারাপ হইয়াছে।"

বৃটেনের নারী-সমস্যা

১৯২১ সনের ইংল্যণ্ড ও ওয়েল্‌সের সেন্সাস্ অনুসারে নারীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে। এখন পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ২০ লক্ষ (?) বেশী। এই মেয়েদের কি উপায় হইবে তাহা লইয়া অনেকে মাথা ঘামাইতেছেন।

সকলে যখন বিবাহ করিতে পারিবে না, তখন চাকরী বাকরী বা ব্যবসা ইত্যাদির চেষ্টা দেখিতেই হইবে। ইতিমধ্যেই নানা বৃত্তিতে রমণী-পুরুষে প্রতিযোগিতা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষাকার্য্যে আগে পুরুষরাই শুধু ছিল, মেয়েদের প্রায় দেখা যাইত না। এখন ত শিক্ষা-ব্যাপারের শাসন-ব্যবস্থাটাই মেয়েদের হাতে চলিয়া গিয়াছে।

মেয়ে ডাক্তার এত হইয়াছে যে, অনেকে অতি কষ্টে খাওয়া পরার সংস্থান করে।

আশঙ্কা হয় যে ক্রমে ক্রমে নারীরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষদিগকে স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে।

এর প্রতীকারের উপায় কি ?

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বহুসংখ্যক নারীকে উপনিবেশ-গুলিতে চালান দিবার একটা সুবন্দোবস্ত করা হোক্। সেখানে তারা বিবাহ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

এ বিষয়ে স্বয়ং নারীদের মতামত শুনা যাক্ :—

লেডি এস্কুইথ :—মেয়েমানুষ ঘরই চায়। সিগারেটই খাক আর খাটো স্কার্টই পরুক, প্রত্যেক যুবতী স্বামী চায়। মা হইবার সাধ অনেকের। কিন্তু দুঃখের কথা তাদের সে সাধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অথচ বিপুল বৃটিশ সাম্রাজ্যে বহু স্থানের বাসিন্দারা "হা নারী" "হা নারী" করিয়া চাহিয়া আছে। বস্তুতঃ দরকার হইতেছে সাম্রাজ্যের লোকবলকে পূর্ণ বণ্টন করিয়া দেওয়া। আজিকার বৈজ্ঞানিক যুগে উপনিবেশ-বাসিনীর একা একা ভয় করিবার সম্ভাবনা নাই। তারা বেশ "স-ফলা" বৃত্তিতে নিযুক্ত হইবে।

কুমারী সিবিল থর্ণডিক :—নারী সংখ্যায় বেশী থাকা সুলক্ষণ। অনেকে আছে যারা বিবাহ করিতে চায় না। তাদের পথ মুক্ত। বিবাহক্ষেত্রে ছাড়া নারীরা যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, তা বুঝা যাইবে।

লেডি ফ্রান্সেস্, বেলফুর :—জগতে চিরকালই নারীর সংখ্যা বেশী ছিল ও থাকিবে। উপায় উদ্ভাবন মেয়েরা নিজেরাই করিবে।

কুমারী জোসেফাইন্ ক্লায়েন্স্ ঔপন্যাসিক :—এই ২০ লক্ষ নারী যুবতী নয় বলিয়া আমার ধারণা। রিচমণ্ড পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি প্রত্যেক বালিকারই একটি করিয়া বালকবন্ধু আছে। বুড়া, প্রৌঢ়া, যুদ্ধের দরুণ বিধবা এরাই দল পুষ্ট করিয়াছে।

কুমারী অক্টোভিফ লিউইন, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের চিকিৎসা পরামর্শ দাতা ও নারী-স্বাধীনতা লীগের সভ্য :—বিবাহ না করিয়াও সুখী হওয়া যায়।

বিলাতে শিক্ষক সম্মেলন

লুটনের শ্রীযুক্ত এফ্, ম্যাণ্ডার মার্গেটে জাতীয় শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতিরূপে বলিয়াছেন,—

"আমাদের স্কুলগুলি এখনও কল্পনা-জগতে রহিয়াছে, একটা "হেতে-হাতুড়ে" জাতের স্কুল হইয়া উঠে নাই।

"বালক-বালিকা সমান বুদ্ধি বা ক্ষমতা লইয়া জন্মে না। তাদের সমান করিয়া তোলাও যায় না। অথচ দেখিতেছি, কলের মত একই রকম শিক্ষা সকলে পাইতেছে। এই যন্ত্রবৎ সমরূপতা শিক্ষার শত্রু।

মগজের ঘী অপচয়

"কারো মগজে ঘী বাড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু সহজেই ঘীটা নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। একটা ছেলে বা মেয়ে যা শিখিতে চায় না তা জোর করিয়া শিখাইতেছি। অথচ অন্য একটা ছেলে বা মেয়ে যা শিখিতে চায়, তা তাকে শিখিতে দিতেছি না। এমন করিলে জাতীয় মগজের ঘী শুকাইতে কতক্ষণ লাগে ?

"উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা চাই। তার দুই খুঁটা হইতেছে, পার্সেণ্টেজ দান ও স্কুল-জীবনের মিয়াদ বাড়ানো।

স্কুলের পরীক্ষা

"স্কুলের পরীক্ষার মত এমন অস্বাভাবিক অপ্রীতিকর ও ক্ষতিকর জিনিষ আর কিছুই নাই।"

লেডি হেনরীর দান

লেডি হেনরী আমেরিকান্ তাম্র-পতি শ্রীযুক্ত লিওনার্ড লিউইসনের কন্যা। তিনি ইংল্যাণ্ডের সার চার্লস হেনরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি বৃটিশ ও আমেরিকান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১২ লক্ষ পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন্। যে-সব নরনারী ইংল্যাণ্ড হইতে হার্ভার্ড অথবা ইয়েলে পড়িতে যাইবে আর যে-সব আমেরিকান্ অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে আসিয়া পড়িবে এই টাকা হইতে সেই সব নরনারীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।



জেনেহ্বার বিশ্ব-রাষ্ট্র-পরিষৎ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতামত

জেনেহ্বার "লীগ্ অব্ নেশ্যন্স্" (বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ) সম্বন্ধে "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিগত এপ্রিল মাসে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত নিম্নরূপ। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

প্রশ্নঃ—আপনি ইয়োরোপে ছিলেন কদ্দিন?

উঃ—১লা আগষ্ট আমি বোম্বাই থেকে যাত্রা করি আর ৩০শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরে আসি। মোটের উপর সাড়ে তিন মাস আন্দাজ ছিলাম।

প্রঃ—কটা দেশ দেখা হয়েছে?

উঃ—যে দেশগুলির ভিতর দিয়ে রেলে চলে গিয়েছি সেগুলি সুদ্ধ ধরলে হবে ইতালী, ফ্রান্স, সুইট্সারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, জুগোশ্লাভিয়া ও অষ্ট্রীয়া।

প্রঃ—সুইট্সারল্যাণ্ড ছাড়া অন্যদেশে কদ্দিন ছিলেন?

উঃ—ইংলণ্ডে ১২দিন; ফ্রান্সে ২ বারে ৫ দিন; ইতালীতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র রেলে কেটেছে; জার্ম্মাণিতে এক হপ্তা আন্দাজ; জুগোশ্লাভিয়ায় এক হপ্তা; অষ্ট্রীয়ায় ৬ দিন।

প্রঃ—সুইটসারল্যাণ্ডে কদ্দিন ছিলেন?

উঃ—সেখানে পৌছি ৪ঠা সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বর বরাবর ছিলাম, আবার বোধ হয় ২২শে অক্টোবর সেখানে যাই ও ৪ঠা নবেম্বর চলে আসি। সব সুদ্ধ ৩৭।৩৮ দিন।

প্রঃ—সুইটসারল্যাণ্ডের কোন্ কোন্ জায়গায় ছিলেন?

উঃ—জেনেহ্বায়।

প্রঃ—হোটেলে?

উঃ—হাঁ, "পেনশ্যান" শ্রেণীর হোটেলে ছিলাম। হোটেলটা খুব "ফ্যাশনেব্‌ল" নয়। তবে সাধারণ ভাবে আরামদায়ক বটে। খরচপত্র মাঝারি গোছের। লোকজনেরা ব্যবহার ভাল করেছে। যখন আমি পীড়িত হয়ে পড়ি তখন অতিরিক্ত পয়সা না নিয়ে রোগীর পথ্যাদি আমাকে দিয়েছে।

প্রঃ—হোটেলে অতিথি ছিল কয়জন?

উঃ—ঠিক মনে নাই।

প্রঃ—অতিথিদের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে?

উঃ—না বেশী হয় নি। তবে একজন ইংরেজ কাগজের কারখানার মালিক বা এজেণ্ট আমাকে দেখে মনে করল শিকার হতে পারে, নিজের থেকে পরিচয় করল, বল্ল "আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কি করেন?" পরিচয় দেওয়াতে তৎক্ষণাৎ বল্ল, "কাগজ কোথা থেকে নেন?" আমি বল্লাম স্থানীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে নিই, ছাপার কাগজ ডিকসনের কাছ থেকে নিই। তিনি বল্লেন, তাঁদের কাগজ ভাল, কোম্পানীর নাম মেসার্স লেপার্ড এণ্ড স্মিথ।

প্রঃ—যতক্ষণ আপনার নাম না বলেছেন, বা কাউকে কার্ড না দিয়েছেন ততক্ষণ লোকেরা সাধারণতঃ আপনাকে কোন্ দেশের লোক ভাবত? এ সম্বন্ধে কখনো কিছু সন্দেহ করেছেন কি?

উঃ—যখন বার্লিন থেকে প্যারিসে আসি তখন একজন

আমেরিকান আমাকে আমেরিকান বলে মনে করেছিল। কেন তা জানিনা। ভিয়েনার এক বৃদ্ধ আমাকে ভারতবর্ষের লোক বলে মনে করেছিল। জেনেহ্বায় যে হোটেলে ছিলাম একটা লোক, ফরাসী কি সুইস হবে, আমাকে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিল আমি আমেরিকান কিনা। আমি বল্লাম, "না, আমি ভারতবাসী।" লোকেরা আমাকে সাধারণতঃ কোন্ দেশের লোক মনে করত তা আমি জানতে পারি নি।

প্রঃ—জেনেহ্বায় থাকার সময় কোন উল্লেখযোগ্য নরনারীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি? কারুর নাম মনে আছে?

উঃ—কোন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। আপনি "রেহ্বিয়ু পোলিটিক অ্যাঁতার্ন্যাশন্যাল" নামে একখানা সুইটসারল্যাণ্ডের কাগজ দেখে থাকবেন—ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় বাহির হয়। তার এডিটর ফেলিক্স্ভেলী লোকটি ইহুদি—তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি বসু ইনষ্টিটিউটের নাম শুনেছেন। আমার লেখা এবং আমাদের দেশের খবর তিনি আমার নিকট চেয়েছিলেন। তার পর তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে চিঠি লিখেছিলেন। আমি তখন পীড়িত, যেতে পারি নি, চিঠি লিখে জানালাম ভাল হলে যাব। আবার চিঠি পেলাম—ফ্রান্সে গিয়া প্রোফেসার গেডিজের সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি বলে পাঠালাম প্রোফেসার গেডিস আমার বন্ধু। জুরিখ শহরের একজন মুসলমান সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি ভারতবর্ষের লোক বলে পরিচয় দিলেন, নাম প্রোফেসর এম, ওয়ালী খাঁ। তিনি একদিন হোটেলে এসেছিলেন, বল্লেন "যদি কখনও আমি জুরিখ দেখতে যাই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমেরিকার প্রসিদ্ধ কুমারী অ্যাডামস্‌কে দেখেছি দূর হতে। বৃদ্ধা, কমিটি মিটিংএর নোট নিচ্ছেন। অবশ্য ফরাসী ব্রিয়াঁকে দেখেছি—লোকে ঘিরে রয়েছে। এই দেখিয়ে লীগের সংবাদ-বিভাগের কর্ম্মচারী ইংরেজ কমিং আমাকে বল্লেন উহা প্রসিদ্ধি লাভ করার শাস্তি। ভাইকাউন্ট সেসিলকে দেখেছি। একটু কুঁজো হয়ে গেছেন, বয়সও হয়েছে, স্বাস্থ্য ভাল নয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদের সেক্রেটারী প্যাটিক বল্লেন-ভাইকাউন্ট সেসিলের ভাইসরয় হওয়ার কথা হয়েছিল কিন্তু তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল নয় বলেই তিনি রাজী হন নি। ভারতীয় প্রতিনিধিদের তরফ হতে মধ্যাহ্নভোজ দেওয়া হয়েছিল, ভোজের সময় ছিল আড়াইটা। দেখলাম—তার প্রধান অতিথি নিজেই খুব দেরীতে এলেন। তিনি কানে শুনতে পান না, যন্ত্র কানে দিয়ে কথা বলেন। তাঁর পাশে আমি বসেছিলাম, খুব ভদ্র, অনেক কথা বল্লেন। "ওয়াই, এম, সি, এ"র জেমস্ সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বসন্ত মল্লিকের সঙ্গে রাস্তায় পরিচয় হয়। খাঁ বাহাদুর সেখ আবদুল কাদেরের সঙ্গেও পরিচয় হয়।

প্রঃ—"অ্যাসেম্ব্লী" আর "কাউন্সিল," লীগের এই দুই সভার শাসন-প্রণালী কিরূপ?

উঃ—প্রথমেই বলে রাখি যে লীগের একটা সেক্রেটারিয়েট বা কর্ম্মচারী-দপ্তর আছে। যারা তার স্থায়ী কর্ম্মচারী তারা সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী করে দেয়। স্যার এরিক ড্রামণ্ড গোড়া থেকে সেক্রেটারী ছিলেন। বেশীর ভাগ কর্ম্মচারী ইংরেজ কিংবা ফরাসী। বোধ হয় সেক্রেটারিয়েটের দপ্তরে ইংরেজেরই প্রাধান্য। আর একটা বড় বিভাগ হচ্ছে ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস (আন্তর্জ্জাতিক মজুর ও মজুরি বিষয়ক দপ্তর)। তার ডিরেক্টর ফরাসী, ডেপুটি ডিরেক্টর ইংরেজ, কিন্তু সেক্রেটারিয়েটই লীগের কাজকর্ম্ম করে, সংবাদ সংগ্রহ করে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে, পরে নানা বিভাগে বিলি করে দেয়। লীগের দুইটা শাসন-সভা। তার ভিতর "কাউন্সিলই" আসল কর্ত্তা। সদা সর্ব্বদা এই কাউন্সিলের মিটিং বসে আর "অ্যাসেম্ব্লী" সভা বৎসরে মাত্র একবার

সেপ্টেম্বর মাসে বসে। তার কাছে যেসব বিষয়ের আলোচনা আসে সেসব "কাউন্সিলের" মারফৎ পৌঁছে। আর "কাউন্সিলে" যাকিছুর আলোচনা হয় তার সবটাই সেক্রেটারিয়াট তৈয়ারী করে দেয়। তা ছাড়া যখন অ্যাসেম্ব্লীর মিটিং হয় তখন সব দেশের প্রতিনিধি নিয়ে ৬টা কমিটি গঠিত হয়, বেশীও হতে পারে। এই সকল কমিটির কোনটী আর্থিক, কোনটী মজুরসংক্রান্ত, কোনটী স্বাস্থ্যবিষয়ক, কোনটী টাকাকড়ির পুনর্গঠন বিষয়ক, কোনটীতে "ম্যাণ্ডেট" নামক পরাধীনতার দলিলসংক্রান্ত কাজ-কর্ম্ম আলোচিত হয়, কোনটিতে স্বদেশবিতাড়িত অথবা দেশহীন আশ্রয়-প্রার্থী নরনারীর তদবির করে। প্রতিনিধি-সংখ্যা খুব অল্প। এক এক জনকে ২।৩।৪ কমিটিও দিয়ে দেয়, তাতে কাজ ভাল হয় না।

প্রঃ—"কাউন্সিলের" সঙ্গে "অ্যাসেম্ব্লীর" আইনসঙ্গত সম্বন্ধ কি রকম?

উঃ—"কাউন্সিল" কতকটা অ্যাসেম্ব্লীর ক্যাবিনেটের মত। জিনিষ তৈয়ার করে এনে দেয় কাউন্সিল। কাউন্সিলের মেম্বর ১৪ জন। আর অ্যাসেম্ব্লীতে ৫৭টী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি আছে। সুতরাং কাউন্সিলে অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধি নাই। অনেক দেশের প্রতিনিধি আপত্তি করে যে, কাউন্সিল লীগের প্রায় সব ক্ষমতা বাজেয়াপ্ত করে বসেছে। তারা হয়ত বাস্তবিক ক্ষতি অনুভব করে থাকবে। তবে আর একটা বড় কারণ আছে। কাউন্সিলের ৫টি স্থায়ী আসন ৫টী বড় রাষ্ট্র-শক্তির দখলে আছে; যথা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও জার্ম্মাণি। আর ৩টী আসন অধিকার করে নেহাৎ নগণ্য দেশ—যথা স্যালভ্যাডর, কলাম্বিয়া ও বোধহয় চিলি, যারা শক্তিমান জাতিসমূহের ইঙ্গিতে পরিচালিত হতে পারে। বড় বড় ষ্টেটগুলা এমন ভাবে চলাফেরা করে যাতে অন্য কোন শক্তিশালী দেশের পক্ষে কাউন্সিলে আসন পাওয়া অসম্ভব হয়। এইরূপই আমার ধারণা।

প্রঃ—অ্যাসেম্ব্লী থেকে কি কাউন্সিল নির্ব্বাচিত হয়?

উঃ—হাঁ, প্রত্যেক ষ্টেটের একটী করে ভোট আছে।

প্রঃ—অ্যাসেম্ব্লীতে সবসুদ্ধ মেম্বর কত জন?

উঃ—৫৭ × ৩ = ১৭১ জন। তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা ১৭১ জনেরও ভোট মাত্র ৫৭টা। অর্থাৎ দেশ প্রতি এক একটা ভোট। এক একটী ষ্টেট থেকে ৩ জন ডেলিগেট আসবার কথা কিন্তু লোকজন আসে বিস্তর। কোনো রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কয়েকজন আনা চলে। পোল্যাণ্ড বোধ হয় ৩০ জন এনেছিল। ভারতবর্ষ থেকে আগে কম যেত, লেখালেখি করাতে গতবার ৩ জন ডেলিগেট ও ৩ জন সাবষ্টিটিউট ডেলিগেট গিয়েছিল। একসপার্ট এড্ভাইজার যাই নি। কোনো প্রতিনিধি যদি উপস্থিত থাকতে না পারে তার জায়গায় একজন বদল-প্রতিনিধি বসতে পারে। তাকে বলে সাবষ্টিটিউট ডেলিগেট।

প্রঃ—এই যে ডেলিগেট ও সাবষ্টিটিউট-ডেলিগেট যায়, এদের সকল প্রকার খরচ কি লীগ বহন করে, না স্বাধীন ভাবে প্রত্যেক দেশ বহন করে?

উঃ—আমার বোধ হয় যে দেশ ডেলিগেট পাঠায় সে বহন করে। বাজেট দেখে তাই মনে হয়।

প্রঃ—অ্যাসেম্ব্লী থেকে কাউন্সিলে যারা নির্ব্বাচিত হয় তারা সবসুদ্ধ কদ্দিন থাকে?

উঃ—তারা অ্যাসেম্ব্লীর মিটিং আরম্ভ হওয়ার হপ্তা খানেক আগে যায় ও শেষ হওয়ার হপ্তা খানেক পর পর্য্যন্ত থাকে। কাউন্সিল মিটিং নানান জায়গায় বৎসরে যে কোন সময়ে বসতে পারে।

প্রঃ—কাউন্সিলের ১৪ জন মেম্বরের কথা বল্লেন, তাদের এই সময়কার সমস্ত খরচ নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে বহন করে না গবর্মেণ্ট বা লীগ বহন করে?

উঃ—স্ব স্ব গবর্মেণ্ট বহন করে।

প্রঃ—কাউন্সিলের যারা মেম্বর তাদের বয়স কি রকম ধরণের, তারা কি দরের লোক, কি চাকরী করে?

উঃ—আমি যতটা দেখলাম খুব ছোকরা কেহ নয়। মধ্যম

বয়সের লোকই বেশী, বুড়াও আছে, খুব বুড়া বেশী নাই। আমাদের হিসাবে বুড়া বলে মনে হল ভাই-কাউন্ট সেসিল, অষ্টিন চেম্বারলেন ও ব্রিয়াঁ, ষ্ট্রেসেমানের বয়স বুঝতে পারলাম না, মাথাটা বড়, বেশ সুস্থ।

প্রঃ—লীগের যে খরচপত্র হয় তার একটা খসড়া হিসাব দিতে পারেন?

উঃ—প্রথমতঃ সেক্রেটেরিয়াটের খরচ, তারপর ইন্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিসের খরচ, চিঠিপত্রের খরচ। মাহিনাও খুব বেশী বেশী। বিশেষজ্ঞ যারা যায় তাদের খরচ লীগ থেকে দিতে হয় না, গবর্মেন্ট দেয়। লীগ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যে সব ডেলিগেট পাঠায়—স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে—তাদের জন্য কোথা থেকে টাকা আসে আমি বলতে পারি না। তবে স্পেশ্যাল খরচের জন্য চাঁদা তোলা হয়, যেমন রুশিয়া করেছিল।

প্রঃ—যে কয়টা কমিটি আছে তার ভিতর আর্থিক জীবন সম্বন্ধে কমিটি কটা?

উঃ—একটা।

প্রঃ—আপনি যখন ছিলেন তখন বিশেষ কোনো বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল কি?

উঃ—দাসত্ব আর মজুরি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। ভারতবর্ষের দিক্‌টায় গবর্মেন্টের কথা বলা হয়েছে। স্যার উইলিয়ম ভিন্সেন্ট বলেছিলেন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট থেকে শ্লেভারী তুলে দিবেন। অবশ্য কোনো গ্যারান্টি দেওয়া হয় নি।

প্রঃ—ইন্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস ও লীগ সেক্রেটারিয়াট এই ২টার মধ্যে কোন্‌টাতে লোকজন বেশী?

উঃ—আমার বোধ হয় সেক্রেটেরিয়াটে লোক বেশী, খরচও বেশী হয়। লেবার অফিসও কম নয়। ইংরেজের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, ২২০টী পদে বাহাল ইংরেজ। তা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ইত্যাদি ডমিনিয়নের লোক আলাদা।

প্রঃ—ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে লীগে যে টাকা দেওয়া হয় সেক্রেটেরিয়াট ও ইন্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিসে সে টাকা ভাগ করে নিবার দস্তুর কি?

উঃ—ওরা বজেট তৈয়ারী করে, যত টাকা তাকে শ' নয়েক দফায় "ইউনিটে" ভাগ করে। "ইউনিট" অনুসারে টাকা দিতে হয়। ভারতবর্ষকে ৫৬ কি ৫৭ ইউনিট দিতে হয়। সকলের চেয়ে বেশী দেয় ইংলণ্ড, তারপর ফ্রান্স, জাপান ও ইতালী সমান সমান দেয়, তার নীচে ভারতবর্ষ। ১৯২৭ সনে বোধ হয় জার্ম্মাণি ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী দিবে। এই কয়টা বাদ দিলে ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে বেশী দেয়। আমরা লাখ সাতেক টাকা দিই।

প্রঃ—ভারতবর্ষ থেকে যে টাকা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বা অ্যাসেম্ব্লীতে আলোচনা হয় কি?

উঃ—না হয় না। এটা ভোটএব্‌ল কি নন্‌-ভোটএব্‌ল্ বলতে পারি না, বোধ হয় নন-ভোটএব্‌ল। এর উপর ভোট দিবার অধিকার ভারতবাসীর নাই। চেষ্টা বার বার করা হয়েছে, যাতে যে ডেলিগেট পাঠান হবে তার সম্বন্ধে যেন ব্যবস্থাপক সভার কিছু হাত থাকে। তা ছাড়া ডেলিগেশনের হেড্‌ ভারতবর্ষের লোক হওয়া চাই এবং ব্যবস্থাপক সভা তাদেরকে নমিনেট করবে, অন্ততঃ পক্ষে ভারত-সন্তান হবে, গবর্মেন্ট বাছাই করবে, তাতেও গবর্মেন্ট রাজী হয় নি। শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস জবাব দিয়েছেন যে, ইংরেজকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের লীডার করবার কারণ এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনগুলা সম্বন্ধে ইংরেজের জ্ঞানই বেশী।

প্রঃ—লীগ রাষ্ট্রীয় হিসাবে আমাদের কোনো উপকার করতে পারে কি?

উঃ—রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে লীগ আমাদের কোনও উপকার করতে পারে না একথা সকলেই স্বীকার করেন। যাঁরা লীগের পক্ষপাতী তারাও স্বীকার করেন। তবে অন্যান্য দিকে হয়ত কিছু উপকার হতে

পারে। লীগের স্বাস্থ্য-বিভাগ সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে।

প্রঃ—লীগের সংস্রবে অথবা স্বাধীনভাবে কোনো ভারতবাসী যদি জেনেহ্বায় থাকে তাতে আমাদের দেশের কিছু উপকার করা সম্ভবপর কি ?

উঃ—খুব সম্ভব। কিন্তু যোগ্য লোক হওয়া চাই। পৃথিবীর খবর, শুধু রাষ্ট্রনৈতিক খবর নয়—শিক্ষা, সাহিত্য সুকুমার শিল্প, আর্থিক ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে ওস্তাদ না হলে কোনো ভারতবাসী নামজাদা বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। নিজের বিষয়টি জানে এমন লোক জেনেহ্বায় গেলে কাজ হবে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের লোকজন সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা ভাল হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অন্য দেশের লোকজনের সঙ্গে মিশে নানান রকম খবর সংগ্রহ করা সম্ভব। আর সেটা আমাদের খুব কাজে লাগতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি এইরূপ লোক জেনেহ্বায় থাকা খুব ভাল। যদি কেহ অল্পদিনের জন্যও যায় তাও বেশ উপকারজনক মনে করি। এই ধরুন আমি মাত্র ২।৩ ঘণ্টা ভেনিসে ছিলাম, কেবল পাশ করে চলে গিয়েছি, তাতেও আমার ইতালী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হয়েছে।

প্রঃ—জেনেহ্বায় থেকে আমাদের দেশের লোক কোন্ কোন্ প্রণালীতে কাজ করতে পারে ?

উঃ—সেটা প্রত্যেকের নিজ নিজ ঝোঁক, কর্ম্মক্ষমতা আর বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করবে। পলিটিকস সম্বন্ধে যদি খবর নিতে চান তবে তাঁকে যোগাড় যন্ত্র করে নিতে হবে। জেনেহ্বায় ভালমন্দ সব রকম লোকই আছে। লীগের সভার সময় জেনেহ্বায় থাকলে বেশ ভাল কাজ হয়। ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিসের লাইব্রেরী খুব ভাল। মজুর দুনিয়া, আর্থিক জগৎ, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সব রকম সংবাদ পাওয়া যায়। ভারী সুন্দর লাইব্রেরী, একজন ভাল গবেষক যদি কাজ করতে চায় তার পক্ষে এর চেয়ে বেশী চমৎকার জায়গা পাওয়া কঠিন। এইরূপ নানা ধরণের উদ্দেশ্য নিয়ে গেলে ২।১ বৎসর সেখানে থাকা উচিত। ভাল ভাল গবেষক পাঠান আমাদের দেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটির পক্ষে আবশ্যক। নেহাৎ পরীক্ষার্থী ছেলে-ছোকরা পাঠালে হবে না।

প্রঃ—জেনেহ্বায় খরচপত্র কি রকম ?

উঃ—অ্যাসেম্ব্লীর সময় হোটেলের দর বেড়ে যায়। আমি অ্যাসেম্ব্লী মিটিংএর সময় একবার ছিলাম আবার পরেও একবার ছিলাম। এই দুই বারের ঘরভাড়ার প্রভেদ দৈনিক ৩ সুইস্ ফ্রাঙ্ক। অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ২ টাকা তফাৎ। তারা নিজের থেকে কমিয়ে দিল, আমি এক হোটেলে দু'বার ছিলাম, প্রথম যে ভাড়া চেয়েছিল পরের বার তার চেয়ে কম নিয়েছিল। আমাকে কিছু বলতে হয় নি। ঋতু হিসাবে প্রভেদ করাই দস্তুর।

প্রঃ—যারা খাওয়া সমেত ঘরভাড়া দিয়ে হোটেলে থাকে তাদের খরচ পড়ে কত করে ?

উঃ—আমার বোধ হয় রোজ ১৪ ফ্রাঙ্ক, ঠিক মনে পড়ে না। স্নান করলে ২ ফ্রাঙ্ক মোট ১৬ ফ্রাঙ্ক লাগে। ঘরে খাবার এনে দিতে হলে ২৫ সেণ্ট বেশী লাগে। কেহ যদি বেশীদিন থাকতে চায় তার পক্ষে হোটেলে থাকা সঙ্গত নয়। কোনো বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে ঘর ভাড়া করে থাকা ভাল। তাতে আমি অনুমান করি একজনের মাসিক ১০০ থেকে ১২৫ টাকায় বেশ চলতে পারে জেনেহ্বার মত জায়গায়।

প্রঃ—দুনিয়ার সকল প্রকার হালচাল, জ্ঞানবিজ্ঞান, টাকা কড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য জেনেহ্বা, প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্ক, তোকিও ইত্যাদি শহরে যদি ভারত-সন্তানেরা দলে দলে যেতে চায় আপনি তাদের স্বপক্ষে মত দিতে রাজি হবেন কি ?

উঃ—নিশ্চয়। আমরা ইংলণ্ডে যেয়ে অনেক টাকা নষ্ট করি। অষ্ট্রীয়ার হ্বিয়েনায় চিকিৎসা-শিক্ষা খুব ভাল। সেখানে ১২৫-১৫০ টাকায় বেশ চলতে পারে। হ্বিয়েনার এক রেষ্টরাণ্টে আমরা দুপুর বেলা

খেলাম। হিসাব করে দেখলাম এক এক জনের ॥৵৹ আনা লাগল। বেশ খেলাম।

প্রঃ—আপনি এখন বিদেশ ও বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে যুবক বাঙলার আত্মিক ও আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দু'চার কথা বলবেন কি ?

উঃ—মোটের উপর কথা হল ওদের দেশের যেটা দারিদ্র্য সেটা আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বেশী। সাধারণ ভাবে বলছি। আমি যতগুলি দেশের মধ্য দিয়ে গেলাম তাতে দারিদ্র্যের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। কেবল ভিয়েনায় দেখেছি। যা দেখলাম তাও বাইরে রাস্তায়। তবে আমাদের দেশের ছেলেপিলের চেয়ে অষ্ট্রীয়ার ছেলেপিলেরা বেশী সুস্থ। আসল কথা ইয়োরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই ছেলেপিলে বেশ সুস্থ, স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বত্র সজোরে হেঁটে যায়, তাদের পায়ের মাংসপেশী বেশ দৃঢ়, স্বাস্থ্য ভাল। শুনেছি যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণি খুব কষ্ট পেয়েছে, দরিদ্র হয়েছে। আমি কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখলাম না, আমি অবশ্য রেল থেকে দেশ দেখেছি মাত্র। স্বচক্ষে দেখা বার্লিন আর ড্রেসডেন। বার্লিনের মহিলা চিত্রকরের ষ্টুডিও দেখবার জন্য আমি আর রবিবাবু গিয়েছিলাম। সেখানকার রাস্তা চৌরঙ্গির রাস্তার মত প্রশস্ত, বাড়ীঘরগুলি চমৎকার। প্যারিস আর লণ্ডনেও তাই। হোটেল থেকে বেরিয়ে ২৷৩ ঘণ্টা হেঁটে ফিরে এসে দেখি জুতা, তেমনি পরিষ্কার আছে যেমন পরিষ্কার জুতা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমি যতগুলি শহর দেখেছি, রাস্তায় বেড়াতে গিয়ে কোনো স্থানে কোনো দুর্গন্ধ পাই নি। ইয়োরোপীয়ানদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল, স্বাস্থ্যের দিকেও খুব দৃষ্টি। এটা বেশ ভাল কথা, তবে কথা হচ্ছে ওরা যে রকম ঐশ্বর্য্যে অভ্যস্ত, আমাদের দেশের মত দুর্দ্দশা হলে করবে কি ? তেমন দুর্দ্দশা হবে কিনা জানিনা, হলে কি করবে ? আমরা সহ্য করতে অভ্যস্ত, যে-কোনো রকমে থাকতে পারি। ওদের সহ্য করবার ক্ষমতা বেশী কি কম এখনো তার আসল পরীক্ষা হয় নি। সে যাহোক আমাদের দেশের সুবিবেচক ও করিৎকর্ম্মা লোকেরা ইয়োরোপে গিয়ে নানা রকম লোক জনের সঙ্গে মিলেমিশে কিছুকাল কাটাতে পারলে ভারতবর্ষের সকল প্রকার উন্নতির নানা পথ প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ঠাওরাতে পারবে এইরূপই আমার বিশ্বাস।



ফরাসী ভাষায় আর্থিক পত্রিকা

আমরা অনেক সময়ে এরূপ বিদেশী কেতাব-পত্রিকার নাম উল্লেখ করিয়া থাকি যাহা দেশে বসিয়া চোখে দেখিবার সম্ভাবনা অধিকাংশ ভারত-সন্তানের পক্ষেই খুব কম। তাহা ছাড়া কখনো কখনো পত্রিকা-গ্রন্থাবলীর কাঠখোট্টা সূচীপত্র মাত্র ছাপিয়া থাকি। তাহাতে রচনাগুলার শাঁস কিছুই পাওয়া যায়না। এইরূপ ছাপাছাপির একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে,—ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় নতুন নতুন গবেষণা-রীসার্চ আর ধনবিজ্ঞানের সুবিস্তৃত চৌহদ্দিটা সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক-লেখক-গবেষকদের কর্ম্মক্ষেত্র বাড়াইয়া দিবার ইঙ্গিত করা।

ফরাসী ভাষায় যেসকল আর্থিক পত্রিকা বাহির হইতেছে তাহার কতকগুলির নাম প্যারিসের ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের নিকট হইতে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলা অনুবাদ সহ ছাপিয়া দেওয়া গেল। বাংলা নামগুলা পড়িলেই বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবীরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কিছু কিছু ঠাওরাইতে পারিবেন। "আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন বিভাগে যে ধরণের মাল বাহির হয় সেই ধরণের মাল সম্বন্ধে এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্রিকা বাহির করিবার জন্য কয়েক দল গবেষক ও লেখক আবশ্যক ; কিন্তু এই ধরণের তথ্য ও তত্ত্বের পাঠক বাঙালী সমাজে আছে কিনা অথবা জুটিবে কিনা সেকথা পরে বিবেচ্য। এখন চাই অনুসন্ধান, রীসার্চ, গবেষণা আর লেখালেখির জন্য উচ্চশিক্ষিত নরনারীর কর্ত্তব্যজ্ঞান।

১। লাক্‌তিভিতে ফ্রাঁসেজ এ এত্রাঁজেয়ার (ফরাসী ও বিদেশী কর্ম্মকাণ্ড) ২। বুলতাঁ দে লাসোসিয়াসিওঁ ফ্রাঁস গ্রাঁদব্রতাঞ (ফরাসী-ইংরেজ সমিতির পত্রিকা), ৩। বুলতাঁ দ'লা বাঁক ন্যাসন্যাল ফ্রঁাসেজ দু কম্যার্স একস্‌তেরিয়্যর (বহির্ব্বাণিজ্যবিষয়ক ফরাসী ব্যাঙ্কের সমাচার) ৪। বুলতাঁ বিব্‌লিও গ্রাফিক দ' দকুমাঁতাসিওঁ আঁ্যাতার্ণ্যাসন্যাল কঁতাপরাণ (আন্তর্জ্জাতিক দুনিয়ার দলিল বিষয়ক পত্রিকা), ৫। বুলতাঁ দ'লা শাঁবর দ' কম্যার্স ফ্রাঁকো-পর্ত্তুগেজ (ফরাসী পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য-ভবনের পত্রিকা) ৬। বুলতাঁ ফিদুসিয়্যার (কর্জ্জলগ্নির সংবাদপত্র) ৭। বুলতাঁ দ'লা সোসিয়েতে দাঁকুরাজমাঁ পুর ল্যাঁদুস্ত্রী ন্যাসন্যাল (স্বদেশী শিল্প-প্রসার-সমিতির পত্রিকা) ৮। বুলতাঁ দ' লুনিওঁ দেজ অ্যাসোসিয়াসিওঁ দেজ্‌ আঁসিয়াঁজ্‌ এলেভ দেজ্‌ একল সুপেরিয়্যার দ' কম্যার্স (বাণিজ্য-বিদ্যালয়সমূহের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের সঙ্ঘ-পত্রিকা) ৯। লে দোকুমাঁ দু ত্রাভাই (মজুর-দলিল) ১০। লে-কোনোমিক্ (আর্থিক) ১১। লেকোনোমিস্ত্‌ পার্লাঁ্য-মাঁতেয়ার (আইন-সভার অর্থকথা) ১২। লা ফ্রাঁস একোনোমিক এ ফিনাঁসিয়্যার (ফ্রান্সের আর্থিক ও রাজস্ব চিত্র) ১৩। ল'জুর্নাল দ'লা বুর্স্‌ এ দ'লা বাঁক (ষ্টক এক্‌সচেঞ্জ ও ব্যাঙ্ক-পত্রিকা) ১৪। জুর্ণাল দেজ একোনোমিস্ত্‌ (ধনবিজ্ঞান-সেবীদের পত্রিকা) ১৫। জুর্ণাল দ' লা সোসিয়েতে ন্যাসন্যাল দ'র্ত্তিকুলত্যির দ'ফ্রাঁস (ফরাসী-বৃক্ষ-পরিষৎ পত্রিকা) ১৬। লা লীগ দু লিবর-এশাঁজ (অশুল্ক-বাণিজ্য-পরিষৎ) ১৭। ল'মঁদ একোনোমিক (আর্থিক দুনিয়া) ১৮। লা রেফর্ম সোসিয়াল (সমাজ-সংস্কার) ১৯। লা রিভিয়্যু একনমিক এ ফিনাঁসিয়্যার (আর্থিক ও রাজস্ব-পত্রিকা) ২০। লা রিভিয়্যু একোনোমিক এ ফিনাঁসিয়্যার দ' বর্দোঁ এ দু স্যিদ-ওয়েস্ত্‌ (বর্দো

ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব জনপদের আর্থিক পত্রিকা) ২১। লা রিভ্যি অ্যাঁতার্ণ্যাশন্যাল দ'লা প্রেপ্রিয়েতে ফঁসিয়্যার বাতী (ঘরবাড়ী জোতজমার আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকা) ২২। লা ভ্যী ফিনাঁসিয়্যার (মজুর-জীবন)।

"ড্যয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ্‌"
শিল্প-গবেষণা বনাম বিজ্ঞান-গবেষণা

ভারতে আজকাল ইতিহাস-গবেষণার মতন বিজ্ঞান-গবেষণা নামক "রীসার্চ" বা অনুসন্ধান চিজটা পণ্ডিত মহলে অনেকটা "ডালভাত" গোছের সুপরিচিত বস্তু হইয়া গিয়াছে। কম সে কম ঐতিহাসিক গবেষণা আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শব্দটা আমরা হামেশা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু শিল্প-গবেষণা, যন্ত্র-গবেষণা, কারখানা-গবেষণা, ফ্যাক্টরি গবেষণা ইত্যাদি গবেষণা কি চিজ? এই সম্বন্ধে আমাদের সুধীমহলেও জল্পন-কল্পন খুব কমই হইয়া থাকে।

"ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল রীসার্চ" শব্দের রেওয়াজ এমন কি ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার আর কেমিষ্টদের আখড়ায়ও বড় একটা শুনা যায়না। ধনবিজ্ঞানসেবীদের আসরে শিল্প-গবেষণা বস্তুটার আলোচনার আশা করা উচিত বটে; কিন্তু ভারতের ধনবিজ্ঞান-বেপারীরা আজও এই সওদার তেজারতি করিতে সুরু করেন নাই। যাহা হউক, অন্যান্য বিদ্যা-কলার মতন "ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল রীসার্চ" বস্তুটায়ও ইয়োরামেরিকাই যুবক ভারতের দীক্ষাগুরু আর পথ-প্রদর্শক। "পশ্চিমারা" এই কর্ম্মক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বিলাতে শিল্প-গবেষণার প্রপাগাণ্ডা

এইবার বিলাতের শিল্প-গবেষণা আলোচনা করা যাউক। বার্লিনের "ড্যয়চে আল্‌গে-মাইনে ৎসাইটুঙ্‌" নামক দৈনিক পত্র রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, কৃষিশিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি মানবজীবনের সকল প্রকার অভিব্যক্তি সম্বন্ধেই সংবাদ ও সমালোচনার বিশ্বকোষ বিশেষ। এই পত্রিকায় একজন জার্ম্মাণ লেখক ইংরেজ সমাজে শিল্প-গবেষণার কদর কতটা তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিছুকাল ধরিয়া বিলাতের কৃষিশিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক নানা পত্রিকায় ইংরেজ জাতিকে আর্থিক জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য বেশ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন চলিতেছিল। আর আজকাল যে-কোনো ইংরেজি দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিকে ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্যার গবেষণাসমূহের নিবিড় যোগাযোগ কায়েম করিবার কথা উঠিয়াছে।

এইসকল দেখিয়া শুনিয়া বিদেশীদের সহজেই একটা সন্দেহ উপস্থিত হইবার কথা। তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে, "ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যালে ফোর্শুঙ্‌" বা শিল্পবিষয়ক অনুসন্ধান-গবেষণা-রীসার্চ বোধ হয় বিলাতী সমাজে একটা নেহাৎ নয়া জিনিষ। ইংরেজরা বুঝি নিজ নিজ ফ্যাক্টরি কারখানাগুলিতে আন্দাজ-অনুমান-খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই ধনোৎপাদন করিতে অভ্যস্ত। তাহাদের সমাজে বুঝি অঙ্ক কষিয়া হিসাব করিয়া রসায়ন-এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্যার আবিষ্কারগুলা কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা নাই। অথবা আজকালকার এই আন্দোলনের পূর্ব্বে একপ্রকার ছিল না।

জার্ম্মাণ লেখক বলিতেছেন যে, এইরূপ সন্দেহ করিলে ভুল করা হইবে। শিল্প-গবেষণার স্বপক্ষে আজকাল কয়েক বৎসর ধরিয়া বিলাতের বৈঠকে বৈঠকে যে "প্রপাগাণ্ডা" চলিতেছে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজদের ফ্যাক্টরি-কারখানা-খনিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে আর বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে মাল তৈয়ারীর ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

বিলাতী শিল্প-গবেষণার প্রথম যুগ (১৮৯৩)

প্রায় চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে,—১৮৯৩ সনে, স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্যকরী টেক্‌নিক্যাল বিজ্ঞানবিদ্যা শিখাইবার জন্য অধ্যাপকের পদ কায়েম করা হয়। গ্লাসগো বিলাতের অন্যতম বিপুল ফ্যাকটরি-কেন্দ্র। সকল প্রকার শিল্পদক্ষের আর শিল্পবীরের, বিশেষতঃ এঞ্জিনিয়ারের বাথান রূপে গ্লাসগো জগতেও প্রসিদ্ধ। এই কেন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে প্রয়োগমূলক টেক্‌নিক্যাল বিজ্ঞানের জন্য উচ্চ অঙ্গের অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইবামাত্র বিলাতের সকল

কারখানা-কেন্দ্রে, শিল্প-কেন্দ্রে আর বিদ্যা-কেন্দ্রে ফ্যাক্টরির সঙ্গে বিজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সহযোগ কায়েমের আন্দোলন সুরু হয়। শিল্প-কর্ম্মে অর্থাৎ মাল-তৈয়ারীর কাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব ছড়ানো আবশ্যক,—এই সূত্র সমাজে বেশ ছড়াইয়া পড়ে। প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান আর এঞ্জিনিয়ারিং শিখাইবার জন্য বিলাতের নানা বিদ্যালয়ে উচ্চতম অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট করা হইতে থাকে।

নতুন নতুন অধ্যাপকের সৃষ্টি করাই সেই যুগের একমাত্র লক্ষণ নয়। তখনকার দিনে বিলাতে বহুসংখ্যক বিজ্ঞান মন্দির, বিজ্ঞান বিদ্যালয়, বিজ্ঞান পরিষৎ ছিল। এই সমুদয়ের আবহাওয়ায় উচ্চশ্রেণীর পঠনপাঠন, অনুসন্ধান, গবেষণা, আবিষ্কারও সাধিত হইত। তবে এই নতুন যুগ-ধর্ম্মের জোরে শিল্পের মুলুকে আর কারখানার নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্য-সৃষ্টি কাণ্ডে বৈজ্ঞানিক মন্দির-বিদ্যালয়-পরিষদের আবহাওয়া হইতে নবনব পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিবার আগ্রহ দেখা দিতে লাগিল। এই গেল বিলাতী শিল্প-গবেষণার প্রথম যুগ।

ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি (১৯০২)

প্রথম নয় দশ বৎসরের কাজকর্ম্ম কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯০২ সনে "ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি" নামে একটা স্বতন্ত্র গবেষণা মন্দির কায়েম হয়। এই ল্যাবরেটরিকে শাসন-পরিচালনা করিবার এক্তিয়ার দেওয়া হয় সুপ্রসিদ্ধ "রয়্যাল সোসাইটি" নামক বিজ্ঞান-পরিষদের হাতে। এই পরিষৎ অবশ্য আড়াই শ' বৎসরের বেশী পুরাণা প্রতিষ্ঠান, সপ্তদশ শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রথমেই মাপজোকের গবেষণায় লাগিয়া যায়। তাহার ফলে লম্বা চৌড়া দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদি জরীপ করিবার কলকব্জা, যন্ত্রপাতি নির্ভুল রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। হালকা ভারি ইত্যাদি ওজন মাপিবার কাজেও চরম সূক্ষ্মতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিজলী শক্তির প্রয়োগক্ষেত্রে যে সব হিসাব নিকাশ আবশ্যক সেই সমুদয়ও ঠিকঠাক নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া ল্যাবরেটরির অন্যতম প্রথম কাজ। এই সকল কাজের বৈজ্ঞানিক কিম্মৎ ঢের। যাঁহারা বিজ্ঞানসেবী তাঁহাদের নিকট এই সমুদয়ের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দরকার হয় নাই। কিন্তু বৃটিশ গবর্মেণ্ট অল্পকালের ভিতরই বুঝিলেন যে, এই ধরণের গবেষণার প্রভাব আর্থিক, জীবনেও প্রচুর। বুঝিবামাত্রই ল্যাবরেটরির উপর জলের মতন টাকা খরচ করিবার মেজাজ খেলিতে থাকে।

১৯০২ সনে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর ল্যাবরেটরিতে খরচ হয় মাত্র ৪,০০০ পাউণ্ড (৬০,০০০ টাকা)। আর ১৯২৫ সনে খরচ হইয়াছে ১,৭০,০০০ পাউণ্ড। আজকালকার হিসাবে ইহার দাম প্রায় ২২,৯০,০০০৲ অর্থাৎ প্রায় ২২।২৩ লাখ টাকা।

ল্যাবরেটরির নিকট বিলাতের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কারখানা হইতে নানা প্রকার মাপজোকের আর যন্ত্র-গবেষণার ফরমায়েস আসে। এই সকল ফরমায়েস মাফিক কাজ করিবার জন্য ল্যাবরেটরি কারখানাওয়ালাদের নিকট হইতে দস্তর মাফিক "ফী" বা মজুরি আদায় করিয়া থাকে। ১৯২৫ সনে এইরূপ ফরমায়েসের মজুরি হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ৬৷৷ বা ৭ লাখ টাকা)।

জার্ম্মাণিতে এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার নাম "ফিজিকালিশ—টেখনিশে রাইখস্ আনষ্টাল্ট" (পদার্থ-বিদ্যা-বিষয়ক টেক্‌নিক্যাল গবেষণা ভবন) প্রতিষ্ঠান বার্লিনে অবস্থিত। খরচপত্র আসে "রাইখ" এর অর্থাৎ সাম্রাজ্যের তহবিল হইতে।

লণ্ডনের ল্যাবরেটরিতে গবেষণার ক্ষেত্র বার্লিন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী বিস্তৃত। ধাতু-ঘটিত গবেষণায় ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি মাথা খেলাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধানও রীতিমত চলে। এই সকল রীসার্চের জন্য জার্ম্মাণ সমাজে বার্লিন প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত অন্যান্য গবেষণা-ভবন আছে। লণ্ডনের ল্যাবরেটরিতে যে সকল বিজ্ঞানবীর কাজ করিতেছেন তাঁহাদের ভিতর ষ্টাণ্টন, সাউথওয়েল আর রোজেন-হাইন ইত্যাদি পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ।

লড়াইয়ের যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সুফল

এক একটা লড়াই আসে আর জগতে জ্ঞানবিজ্ঞান বাড়াইবার ধুম পড়িয়া যায়। মানবজাতি যুগে যুগে আর্থিক, যান্ত্রিক আর বৈজ্ঞানিক জীবনের অনেক বড় বড় আবিষ্কার লড়াইয়ের হিড়িকেই লাভ করিয়াছে। লড়াই না থাকিলে দুনিয়ায় সভ্যতা নামক বস্তু বিকাশ লাভ করিত কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ পক্ষে এইরূপ সন্দেহ বিজ্ঞানবিরোধী বা যুক্তিহীন বিবেচিত হইবে না। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা একটা চরম সত্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রও মানবজাতিকে অনেক অমৃত উপহার দিয়াছে। তাহার ভিতর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিজ্ঞানসংক্রান্ত আবিষ্কার আর যন্ত্রপাতির উন্নতি ও উদ্ভাবন অন্যতম। আর জগতের সকল দেশেই এই সকল আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের পরিপুষ্টির জন্য গবেষণা-ভবন কায়েম করা অথবা কায়েম করার প্রবৃত্তিও এই সেদিনকার মহালড়াইয়ের অন্যতম সুফল।

বিজ্ঞানশিল্প-গবেষণার "ডিপার্টমেণ্ট"

ইংরেজরা বিশ্বযুদ্ধের যুগে যে গবেষণা-ভবনটা কায়েম করিয়াছে তাহা বিলাতের ফ্যাক্টরি-জগতে, মালোৎপাদনের কর্ম্মক্ষেত্রে আর আর্থিক জীবনের নানা বিভাগে যার পর নাই ফলপ্রসূ হইয়াছে। সে ১৯১৫ সনের কথা। বৃটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষে তখন এইরূপ একটা অনুসন্ধান-প্রতিষ্ঠান কায়েম না করিয়া সাম্রাজ্য, বাণিজ্য আর শিল্প বাঁচাইবার উপায় ছিল না। প্রতিষ্ঠানটার নাম শুনিয়া তাহার কাম বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা এটাকে "ডিপার্টমেণ্ট অব্ সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রীসার্চ" নামে জন্ম দেওয়া হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠানটা সরকারী কর্ম্মকেন্দ্রের অন্যতম বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট) বিশেষ। ইন্‌ষ্টিটিউট, অ্যাকাডেমি, সোসাইটি ইত্যাদি নামে একটা বিজ্ঞানমণ্ডলীর যে ইজ্জৎ জাহির হয় "ডিপার্টমেণ্ট" নামে সাধারণতঃ সেই ইজ্জৎ মালুম হয় না। যাহা হউক, এই "বিজ্ঞান-শিল্প-গবেষণার ডিপার্টমেণ্ট" আর্থিক বিলাতে এক যুগান্তর আনিয়াছে। সেই যুগান্তরের বন্যা ইংরেজ সমাজে আজও চলিতেছে।

বিলাতের সকল প্রকার ফ্যাক্টরি-কারখানাকে চরম বিজ্ঞানের নবীনতম আবিষ্কার-উদ্ভাবনের দ্বারা পুনর্গঠিত করা এই "ডিপার্টমেণ্টে"র লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকল স্তরের সকল প্রকার শিক্ষাব্যবস্থাকে শিল্প-বিজ্ঞান-গবেষণার প্রভাবে আনিয়া ইংরেজ জাতির চরিত্র রূপান্তরিত করা আর এক উদ্দেশ্য।

"ডিপার্টমেণ্টে"র শাখা-প্রশাখা-উপশাখা বিস্তর। এই সকল শাখা-সমিতির উপশাখা-সমিতির সভ্য সকলেই সরকারী চাকরো নন। তাঁহারা সরকারীই হউন বা বে-সরকারী হউন, প্রত্যেকেই কোনো বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা কোনো শিল্প-বিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য অথবা কোনো নামজাদা ফ্যাক্টরি কারখানা খাদের বড় কর্ম্মকর্ত্তা। এই ধরণের বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমিতির প্রভাবে ইংল্যাণ্ডের ছোট-খাটো শিল্প-কারখানাগুলা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা ও খামখেয়ালি বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে ছোট-বড় মাঝারি প্রত্যেক কারবারই বিরাট বৃটিশ ধনোৎপাদন ও ধন-বিতরণের কাজে অল্প-বিস্তর সহযোগিতা করিতেছে। কেননা কোনো না কোনো উপায়ে দেশের অধিকাংশ ফ্যাক্টরিই "ডিপার্টমেণ্টে"র কোনো না কোনো শাখা-সমিতির মারফৎ সমগ্র দেশোন্নতির সূত্রে গাঁথা হইয়া পড়িয়াছে। একদম আল্‌গা ভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করা কোনো কারবারের পক্ষেই আর সম্ভবপর নয়।

আজকালকার দিনে দুনিয়ার সর্ব্বত্র "ট্রাষ্ট" জাতীয় বিপুল সঙ্ঘ ধনোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে। বিলাত এই নবীন আর্থিক গড়নের মাপকাঠিতে জার্ম্মাণি আর আমেরিকার নীচেই বা প্রায় সমান-সমানই দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিলাত অন্যান্য দেশের মতনই বহুসংখ্যক "ছোট কারবার" বা "মাঝারি" কারবার পোষণ করিতেছে। "কুটিরশিল্পে"র যুগ বিলাতে আজও চলিতেছে বলিলে দোষ হইবে না।

ধনোৎপাদনের বহর যে সকল কারখানায় নেহাৎ ক্ষুদ্র সেই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে শিল্প-গবেষণা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্যই বিলাতের অসংখ্য ফ্যাক্টরি ও খাদ আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলসমূহ কাজে লাগাইতে অসমর্থ ছিল। নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের প্রভাবে মালোৎপাদন সহজ-সাধ্য ও সস্তা হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে কিছুকাল ধরিয়া খানিকটা নগদ টাকা ঢালিতে হয়। বলা বাহুল্য, কোনো দেশের কোনো ক্ষুদ্র কারবারের পক্ষে, কোনো "কুটিরশিল্পের পক্ষে,—এইরূপ সময়-খরচ আর পয়সা-খরচ সম্ভবপর নয়। বিলাতেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দেশের ভিতর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক-জীবনে, কারখানার পরিচালনায়, মাল তৈয়ারীর কর্ম্মক্ষেত্রে এই প্রসারের প্রভাব পড়িতে পারে নাই।

এইখানেই "ডিপার্টমেন্টে"র আর তাহার বহুসংখ্যক "শাখা-প্রশাখা"র কৃতিত্ব। ছোট ছোট কারবারগুলা কোনো না কোনো শাখাসমিতির সভ্য হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক শিল্প-কর্ম্মীর পক্ষেই অল্পখরচে বা বিনা খরচে গবেষণার ফলসমূহ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া চলা ফেরা করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আগে শিল্পবিষয়ক গবেষণার, রীসার্চের আর আবিষ্কারের কথা শুনিলে যে সব লোকের ভীমরতি লাগিত আজকাল তাহারাই এই সব চিজকে মুড়িমুড়কি বা অন্যকোনো আটপৌরে জিনিষের মতন নিজ কব্জায় বাঁধিয়া রাখিতেছে।

গবেষণায় লোকসান গবর্মেন্টের, লাভ পুঁজিপতির

আর যেখানেই খরচপত্রের ভয়ে বিজ্ঞান-শিল্পের গবেষণা মাথা খাড়া করিতে পারিতেছে না সেইখানেই আজ-কালকার ইংরেজরা জানে,—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"। ইংরেজ শিল্প-গবেষকদের মা-বাপ প্রকারান্তরে বৃটিশ গবর্মেন্ট। ছোট ছোট গবেষণাভবনগুলা সরকারী সাহায্যে কাজ চালাইয়া চলিতেছে। প্রথম গবর্মেন্টের তহবিল হইতে বেশ মোটা হারে অর্থসাহায্য আসে। শিল্প-কারখানায় বিজ্ঞানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার মতলবে অথবা তাড়াতাড়ি বাড়াইয়া দিবার জন্য গবর্মেন্ট সকল গবেষণা-ভবনেই বেশী বেশী টাকা ঢালিতে প্রস্তুত। ক্রমশঃ কারখানাওয়ালারা যখন গবেষণার ফলসমূহ হইতে আর্থিক হিসাবে লাভবান হইবার পথে আসিয়া দাঁড়ায় তখন গবর্মেন্টের নিকট হইতে টাকা লওয়া হয় না। শিল্প-ফ্যাক্টরিগুলা স্বয়ংই তখন গবেষণার জন্য ট্যাঁক হইতে টাকা ছাড়িতে লাগিয়া যায়।

শিল্প-গবেষণা প্রথমে সরকারী খরচে, পরে কারখানার খরচে,—এই নীতি বিলাতের প্রায় সকল শিল্পসৃষ্টির কারবারেই দেখিতে পাইতেছি। ফটোগ্রাফীর কারখানায় উন্নতিসাধন করিবার জন্য প্রথম অবস্থায় গবর্মেন্টকে জলের মতন টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। এখন কারখানা-সমূহ নিজেই গবেণষার জন্য লোক বাহাল করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালয়ের জন্য যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানায়ও এই দস্তুর দেখা গিয়াছে। অটোমোবিল-ফ্যাক্টরিতে, জুতার কারখানায়, সিমেন্ট তৈয়ারীর কারবারে ও গবেষণার জন্য গবর্মেন্টই অগ্রণী। পরে মেজাজ খেলিয়াছে পুঁজি-পতিদের। চিনি, তুলা, লোহা, রবার, যে-কোনো শিল্পের দিকেই তাকাই না কেন গবেষণার কাজটা গবর্মেন্ট সুরু করিয়াছে। এমন কি, কাপড় ধোলাই করায়, মিঠাই তৈয়ারী করায় আর আটা ভাঙায়ও গবর্মেন্টই গবেষণার পথ-প্রদর্শক। কারবারের মালিকেরা গবর্মেন্টের টাকায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনগুলা যাচাই করাইয়া লইয়া পরে সেই সব নিজ নিজ ফ্যাক্টরিতে কায়েম করিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-গবেষণার জন্য স্বাধীনভাবে টাকা খাটাইবার দিকে তাহাদের মতি গিয়াছে। লোকসানের যুগটা গবর্মেন্টের আর লাভের যুগটা পুঁজিপতির,—এই হইতেছে শিল্প-গবেষণার সনাতন রীতি।

ভবিষ্যতের জন্য গবেষণা

মালতৈয়ারীর জন্য যে সকল কারখানা মোতায়েন আছে তাহাদিগকে এইরূপে টেক্‌নিক্যাল পরামর্শ জোগাইয়া সাহায্য করা "ডিপার্টমেন্টের" নানা সমিতির আর উপ-সমিতির অন্যতম ধান্ধা। তাহা ছাড়া "ডিপার্টমেন্ট" এমন

কতকগুলা অনুসন্ধানে মাথা ঘামাইতেছে যে-সবের জন্য দেশের ভিতরকার কোনো ফ্যাকটরি-কারখানা-বাঁদে এখনো কোনো চাহিদা নাই। আলোকরশ্মি সম্বন্ধে "ডিপার্টমেণ্ট"র গবেষণাগুলা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার সরঞ্জাম সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা চলিতেছে সেইসবও এইরূপ। অ্যালকহলকে শক্তিরূপে ব্যবহার করিয়া কলকব্জা যন্ত্রপাতি চালাইবার জন্য বহুসংখ্যক গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া কারখানায় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভাবন হইতেছে। এই সকলদিকে কোনো বেপারী এখনো স্বাধীন ভাবে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ডিপার্টমেণ্টের নিকট কোনো সমস্যা তুলে নাই। কিন্তু দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে এই সকল সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক হইবে এইরূপ সমঝিয়া "ডিপার্টমেণ্ট এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে।

বে-সরকারী শিল্প-গবেষণা

শিল্প-গবেষণা চালানো এক মাত্র গবর্মেণ্টেরই দায়িত্ব অর্থাৎ গবর্মেণ্ট ছাড়া আর কেহ শিল্প-গবেষণায় স্বাধীনভাবে খরচপত্র করে না এইরূপ বুঝিলে আর্থিক বিলাত সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে। "ডিপার্টমেণ্ট"র বহির্ভূত বে-সরকারী শিল্প-গবেষণার আকার-প্রকার নিন্দনীয় নয়। বস্তুতঃ প্রাক্-যুদ্ধ যুগেও বে-সরকারী শিল্প-গবেষণার ফলে বিলাতী সমাজে যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিদ্যুতের কারবারে বড় বড় কারখানাগুলা বহুদিন হইতেই গবেষণার ইজ্জৎ সমঝিয়া চলিতেছে। খাদের কাজেও মালিকেরা অনেক দিন ধরিয়া গবেষণা চালাইয়া আসিতেছে। আর ধাতু-সংক্রান্ত নানা ফ্যাক্টরির পুঁজিপতিরাও যে গবেষণার কিম্মৎ বুঝিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত "ডিপার্টমেণ্ট" কায়েম হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বে-সরকারী গবেষণাসমূহ প্রধানতঃ কারখানার প্রয়োগের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু খাঁটি তত্ত্ব-মূলক বিজ্ঞানের রাজ্যেও এই সমুদয়ের মূল্য কম নয়।

এঞ্জিনিয়ারিং গড়ন-পরিষৎ

এইখানে শিল্প-গবেষণার আর একটা প্রতিষ্ঠান উল্লেখ-যোগ্য। তাহার নাম "বৃটিশ এঞ্জিনিয়ারিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ অ্যাসোসিয়েশ্যন"। সহজে এইটার নাম দেওয়া যাইতে পারে "যন্ত্রপাতির ছাঁচ (গড়ন) পরিষৎ"। আজকালকার বাজারে এক একটা কল-কব্জারই রকমারি গড়ন বিক্রী হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কলে কলে, যন্ত্রে যন্ত্রে আসল প্রভেদ কিছুই নাই। কিন্তু কারখানায় কারখানায় টক্কর চালাইবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ মার্কা-মারা ভিন্ন ভিন্ন টাইপের (ছাঁচের) কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই ধরণের দ্রব্য-বৈচিত্র্য অনর্থক মেহনৎ আর টাকাকড়ির অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। "শিল্প-বাণিজ্যের ট্রাষ্ট ও কার্টেল-মূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বে একবার এই বিষয়টা আলোচিত হইয়াছে। এই অপব্যয় রুখিবার মতলবে ইংল্যাণ্ডের এঞ্জিনিয়ারেরা একটা অ্যাসোসিয়েশ্যন কায়েম করিয়াছেন। জার্ম্মাণিতেও এই ধরণের একটা সমিতি আছে। নাম "নর্মেন্-আউসশুস ড্যর ডায়চেন ইণ্ডুষ্ট্রী" (জার্ম্মাণ-শিল্পের ছাঁচ-সমিতি)। "ষ্ট্যাণ্ডার্ড," "টাইপ," "নর্ম্" ইত্যাদি শব্দে দ্রব্যের "গড়ন," "রূপ" বা "ছাঁচ" বুঝিতে হইবে।

ইতিমধ্যেই নানা কারখানায় এই অ্যাসোসিয়েশ্যনের "প্রপাগাণ্ডা" সুফল দেখাইয়াছে। সিমেণ্ট-শিল্পের মালিকেরা আজকাল আর অনর্থক রকমারি মাল বাজারে চালিতে প্রবৃত্ত হয় না। ইস্পাতের কারবারে "টাইপ"-সংযম দেখা দিয়াছে। বিজলী-বাতির বাজারে ছাঁচগুলার সংখ্যা এক্ষণে গুণিয়া শেষ করা যায়। আগুন জ্বালিবার অথবা ঘর গরম করিবার যন্ত্রপাতির রূপ-বৈচিত্র্য অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। চাবীর গড়নেও এখন আর অসংখ্য বিভিন্নতা দেখা যায় না। জার্ম্মাণির মতন বিলাতেও এঞ্জিনিয়ারদের ছাঁচ-বিষয়ক সংযম-বুদ্ধি আর্থিক জগতে একটা সীমানা কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে এই "গড়ন"-বৈচিত্র্যে অসংযম এতদূরে গিয়া ঠেকিয়াছিল যে, শিল্প-সংস্কারের পাণ্ডারা "বৃটিশ এঞ্জিনিয়ারিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ অ্যাসোসিয়েশ্যনে"র মতন অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশ্যন কায়েম করিবার পক্ষপাতী।

"পল্লীবাসী"

ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্ক

দেশের অন্তর্বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের বহুল প্রতিষ্ঠার আবশ্যক। প্রতি আমদানি ও রপ্তানিকেন্দ্রে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাধু ব্যবসায়িগণ অসাধু ব্যবসায়ীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া যথেষ্ট উপকৃত হয়।

এই কালনা সহর হইতে প্রতি সন মোটামুটি ৪।৫ লক্ষ মণ পাট, ২।৩ লক্ষ মণ আলু, ১০।১২ লক্ষ মণ ধান্য চাউল কলিকাতা, চেতলা, জগদ্দল, পাণিহাটী, যশোহর, খুলনা, বরিশাল ও নদীয়া জেলার বহু ব্যবসায়কেন্দ্রে রপ্তানি হয়। এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লক্ষ টাকার কাপড় মুদিখানার নানাবিধ দ্রব্য নানাবিধ ষ্টেশনারী জিনিষ ও লোহা, কাঠ, কাঠ কাটিবার জিনিষ আমদানি হয়। যদি কালনায় কোনও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ও ঐসকল কেন্দ্রে শাখা থাকে এবং সাধারণের স্বার্থদৃষ্টি ও রক্ষা করিয়া সকল স্থানের সাধু ব্যবসায়ীদিগকে অংশীদার করা হয়, তবে ব্যবসায়ীদের যে কি উপকার করা হয় তাহা বর্ণনাতীত। ইহাতে আমদানিকারক ব্যবসায়িগণ অসাধু ব্যবসায়ীর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন এবং তাগাদাদার মারা যাইবার ভয় থাকে না। কেবল উদ্যোগী পুরুষের অভাব। আমরা দেশের উদ্যোগী ধনী ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

"হিন্দু"

বিধবা-বিবাহ

লাহোর 'বিধবা বিবাহক সভার' সম্পাদক জানাইতেছেন,—উক্ত সভার ভারতের বিভিন্ন শাখা হইতে গত এপ্রিল মাসে ৩৫৭টী বিধবা বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ১১৮৮টি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ২৬০, ক্ষত্রিয় ১৫৬, আরোরা ১৪১, অগ্রবাল ১৬৩, কায়স্থ ৬৬, রাজপুত ১১১, শিখ ১২২, অন্যান্য জাতি ১৬৯টী। ইহার মধ্যে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ৬২৫, যুক্ত প্রদেশে ৩৬৫, সিন্ধুতে ১, দিল্লীতে ২৬, বাঙ্গালায় ৬১, মান্দ্রাজে ১৮, মধ্য ভারতে ২, বিহার উড়িষ্যায় ৪৮, রাজপুতানায় ৩১, আসামে ১১টী। 'বিধবা বিবাহক সভা' গত ৪ মাসে বাঙ্গালাদেশে ৬১টী বিধবা বিবাহের সংবাদ পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য গত চারিমাসে বাঙ্গালার এক টাঙ্গাইল মহকুমাতেই শতাধিক বিধবা বিবাহ হইয়াছে। বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা, আবশ্যকতা বাঙ্গালী হিন্দুরা ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা আশার কথা। বাঙ্গালী হিন্দুর অনেক সম্প্রদায় বিবাহযোগ্যা কুমারী কন্যার অভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আদমসুমারীর হিসাব দিয়া আমরা বহুবার সমাজ-ধ্বংসের ভয়াবহ চিত্র দেখাইয়াছি। ৯৯ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু নারীর মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ বিধবা। তাহার মধ্যে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বিধবার সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। এই ভাবে হিন্দু সমাজ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। তাহার সাক্ষী কাশী-নবদ্বীপ-বৃন্দাবন, তাহার সাক্ষী সহরের কদর্য্য পল্লী-গুলি, তাহার সাক্ষী আজ বাঙ্গালাব্যাপী নারীহরণ ও নারী নির্য্যাতন।

এক দিকে গৃহে গৃহে বালবিধবা অন্যদিকে বয়স্ক লোক অবিবাহিত বা বিপত্নীক। পল্লীতে পল্লীতে বিবাহের আশায় হতাশ হইয়া কত সমর্থ উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি "ভেক্" লইয়া বৈষ্ণব সাজিয়া আখড়া খুলিয়াছে আর এই আখড়াগুলি হইতে বয়স্কা চতুরা বৈষ্ণবীরা ভিক্ষার জন্য গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকিয়া বালবিধবাদিগকে বাক্ছলনায় ভুলাইয়া, আখড়া নামক পাপ নিকেতনগুলি পুষ্ট করিতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত এই পাপাচারের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা—বরং নানাভাবে এই আখড়াগুলিকে সাহায্য করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতেছে বলিয়া মনে করে। এই পাপস্রোতে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর দুর্নীতির ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় হিন্দু ছিল ৷৷৵০, মুসলমান ছিল।৶০। আজ ৫০ বৎসরে উল্টাদিকে ৸০, ৶০ হইয়াছে। আর আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজপতিগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্বকথা চক্ষু বুজিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন!

ধোপা, নাপিত, ঢুলী, মালী, তন্তুবায়, মাঝি প্রভৃতি

কতিপয় সম্প্রদায়ের প্রতি চাহিয়া দেখিলেই এই শোচনীয় দৃশ্য দেখা যায়। অসম্ভব কন্যাপণে অর্থাভাবে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিতে পারে না; প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় গিয়া একটী বালিকা বিবাহ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আর একটী বালবিধবার উদ্ভব হয়। এই ভয়াবহ অবস্থা দূর করিতে হইলে, সমাজে আরও বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

আর এক দিকে তথাকথিত উচ্চ জাতির মধ্যেও বিবাহ-যোগ্য কন্যার প্রাচুর্য্য নাই। ইংরাজী শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' নামধেয় নূতন সম্প্রদায়ে কন্যার প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাতে যদি কেহ অনুমান করেন, 'ভদ্রলোকদের' বিধবা বিবাহের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহারা ভুল করিবেন। কেননা সকলেই পাশ করা বর-কন্যার প্রাচুর্য্য অনুভব করেন। একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলন হইলেই এই ভ্রান্তি ঘুচিবে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, কুলীন, বঙ্গজ, শ্রোত্রীয় বংশজ, কাপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিলে তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায়ও বুঝিতে পারিবেন,—ভ্রান্ত দেশাচারের দাসত্ব করিয়া তাহারা নারীহত্যার পথ করিতেছেন।

সুখের বিষয়, সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আজ হিন্দু-সমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবং সমাজের নানাস্থানে জাতির নারীহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্য হইতেছে। লাহোরে মহাপ্রাণ স্যর গঙ্গারাম ৭ লক্ষটাকা বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য দান করিয়া জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গলায়ও এইরূপ একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। দেশের হিন্দু জমীদারগণ সচেষ্ট হইলে, বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পথের বাধা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইবে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের হৃদয় হইতে একদা বাল-বিধবার দুঃখে যে কারুণ্য-ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল সে ধারা শুকায় নাই, বহুদিন ফল্গুর ন্যায় অন্তঃসলিলা থাকিয়া আজ তাহা উদার-হৃদয় স্বজাতি-প্রেমিকগণের চেষ্টায় দেশের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

"ইকনমিক জিওগ্রাফি"

ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত আর্থিক ভূগোল। এপ্রিল ১৯২৭ সংখ্যায় আছে। (১) চিলির ব্যবসা-বাণিজ্য (২) সাইবেরিয়া ভবিষ্যতের শস্যভাণ্ডার (বোরিস বেস্কি) (৩) বন্দর সেণ্ট জুয়ান পার্ব্বত্য প্রদেশের ব্যবহার (ডব্লিউ ডব্লিউ অ্যাটউড) (৪) অ্যামেরিকান কটন বেল্টের জন্য বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিযোগিতা (লুই বাডার) (৫) প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইয়োরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্য পথ (হার্ডম্যান এফ ক্লেল্যাণ্ড) (৬) ট্রিনিদাদের কাকাও শিল্পের আর্থিক জরিপ (সি, ওয়াই, সেপার্ড) (৭) কলাম্বিয়ার আন্তর্জ্জাতিক উন্নতি (জি, টি, রেনার)।

"ইণ্টারন্যাশনাল রিভিউ অব্ দি সায়েন্স অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অব্ অ্যাগ্রিকালচার"

রোমের আন্তর্জ্জাতিক কৃষিভবন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত কৃষিবিজ্ঞান ত্রৈমাসিক। চারিবৎসর চলিয়া আসিতেছে। প্রতি সংখ্যায় আড়াই শত পৃষ্ঠার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও তথ্য প্রভৃতি থাকে। বড় বড় বিশেষজ্ঞ অর্থনীতি-বিশারদ পণ্ডিত ইহার লেখক। অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় আছে। (১) পারশ্যে রেশম আবাদ (দেবু দেঁ, এল, আর, তেহেরানস্থিত পারশ্যের রেশম শিল্প-ভবনের ডিরেক্টর) (২) খাদ্য শস্যের বিশ্লেষণ (ই, এম ব্রাস্কোভিসি, বুখারেষ্টের শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য-গবেষণা মন্দিরের অধ্যাপক) (৩) কৃষি শ্রমের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী—জার্ম্মাণিতে ইহার উন্নতি এবং ইহার আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনীয়তা (অধ্যাপক ডাক্তার ডব্লিউ সিডরফ (৪) সায়েণ্টিফিক ইনষ্টিটিউট অব অ্যাগ্রিকালচারাল টেকনলজি—কিয়েফ (আই,এ,কোজায়েস্কা) (৫) মাটী বিজ্ঞানের আন্তর্জ্জাতিক সমিতির বিবরণ (১০০ পৃষ্ঠা) (৬) রাসায়নিক সারের আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের বিবরণ (৫০ পৃষ্ঠা) (৭) হাঁস মুর্গী প্রভৃতি পক্ষী পালন বিষয়ক আন্তর্জ্জাতির সমিতির রিপোর্ট (৮) কৃষি সংবাদ—গ্রীষ্ম ও শীতপ্রধান দেশের শস্য; চাষ-আবাদ-পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি; ধনবিজ্ঞান ও কৃষি; চারাগাছ বাঁচানো।



সোহ্বিয়েট রুশিয়ায় রাষ্ট্রশাসন ও আর্থিক জীবন

রুশ গবর্মেণ্ট ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বিপুল বই বাহির করিয়াছেন। কেতাবটা ফরাসী ভাষায় লিখিত (নাম "আন্নুয়্যার পোলিটিকি এ একোনোমিক পুর লানে ১৯২৫।২৬" (১৯২৫।২৬ সনের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক পঞ্জিকা)। বইখানা টেক্স্ট বুকের মতন করিয়া গিলিবার উপযুক্ত। বাজে বক্তৃতা অথবা প্রপাগাণ্ডা,—যথা কমিউনিজ্‌মের গুণ-গান ইত্যাদি মাল আগাগোড়া বর্জ্জিত হইয়াছে। আমরা "ইম্পীরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থাবলীর ভারত বিষয়ক ভৌগলিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক এই তিন খণ্ডে যে সকল তথ্য পাই সেই শ্রেণীর তথ্যই এই রুশ বর্ষ-পঞ্জীতে আছে। রুশিয়া সম্বন্ধে না জানিয়া শুনিয়া আবল তাবল বকিবার লোক দুনিয়ার সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভারতেও অবশ্য দেখিতে পাই। অধিকন্তু দু'চার জন স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষীয় ইংরেজ বা মার্কিণ পর্য্যটকের এক কাঁচ্চা তথ্য-মূলক আর বাকীটা উচ্ছ্বাসমূলক বই পড়িয়া ভারতবাসী রুশ-ক্ষুধা মিটাইতে অভ্যস্ত। এই অবস্থায় "আন্নুয়্যার"খানা আমাদের উচ্চশিক্ষিত সাহিত্য-সেবী, কাউন্সিল-সভ্য, কংগ্রেস-বীর, সাংবাদিক ও ধনবিজ্ঞানসেবক ইত্যাদি নরনারীর হাতে পড়িলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

দেশটার নাম

বইটা বড় বড় চার অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে আছে সোহ্বিয়েট রুশিয়ার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও লোক-সংখ্যা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বদেশী নাম যেমন ইউ, এস্, এ (সংক্ষেপে) সেইরূপ নবীন রুশিয়ার জন্মদাতারা তাহাদের সন্তানকে "ইউ, আর, এস, এস্" নাম দিয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত নামের পুরা অর্থ "ইউনিয়ন" "রিপাব্লিক" "সোশ্যালিষ্ট" "সোহ্বিয়েট অর্থাৎ সোশ্যালিষ্টধর্ম্মী সোহ্বিয় শাসনমূলক রিপাব্লিকান যুক্তরাষ্ট্র। ইহার ভিতর "রুশিয়া" শব্দটাই নাই। অতএব মার্কিণ মুল্লুককে যদি আমরা বাংলা দেশে সহজে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অথবা মাত্র যুক্তরাষ্ট্র বলিতে অধিকারী হইতে পারি তাহা হইলে সোহ্বিয়েট রুশিয়াকেও সোহ্বিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বলা চলিতে পারে।

রুশ ও অ-রুশ

১৯২৫ সনের আদমসুমারিতে রুশ যুক্তরাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৯৭ লাখ ৫৬ হাজার ৯০০। তাহার ভিতর পল্লীবাসী প্রায় ১১ কোটি ৬৭ লাখ আর নগরবাসী মাত্র ২ কোটি ২৯ লাখ।

রুশিয়ায় রুশ "জাতীয়" বা রুশ"রক্তের" (?) লোক ছাড়াও বিস্তর অ-রুশ নরনারীর বাস। রুশ-"জাতি" বা রুশ-রক্তের লোক বলিলে বড় বড় তিন জাতি বা উপজাতি বুঝায়,—(১) মহারুশ (২) উক্রেণ আর (৩) শ্বেতরুশ। মান্ধাতার আমলে,—অর্থাৎ বাদশাহী রুশিয়ায়,—যথা ১৮৯৭ সনের আদমসুমারিতে এই তিন জাতীয় "খাঁটি" রুশরক্তওয়ালা লোকের প্রায় আধাআধি ছিল অ-রুশ জাতীয় লোকের সংখ্যা। অনুপাত নিম্নরূপঃ—রুশ ৬৫·৫% আর অ-রুশ ৩৫·৫%।

বোলশেহ্বিক রুশিয়ায় অ-রুশ নরনারীর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। তাহারা অনেকে লাগাও দেশের বাসিন্দা রূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ফলতঃ সোহ্বিয়েট রুশিয়ার রক্তমাংস প্রধানতঃ রুশ। ১ কোটি ৪০ লাখ নরনারীর

শতকরা ৭৮·২ জন খাঁটি রুশ (আগে যেখানে ছিল ৬৫·৫ মাত্র)। আজকাল অ-রুশ জাতীয় রুশিয়ার বাসিন্দা হইতেছে শতকরা ২২·৮ জন।

রুশিয়ার অ-রুশ জাতি বলিলে প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর লোক বুঝা যায়। (১) শ্লাভ জাতীয় লোক, যথা পোল, এস্থোনিয়ান, লেট, রুমেণিয়ান ইত্যাদি। এই সব লোক পূর্ব্বে ছিল রুশ জনসংখ্যার শতকরা ৯·৬। আজ শতকরা দাঁড়াইয়াছে ০·৮ মাত্র। (২) ইহুদি। জারের রুশিয়ায় ইহুদিরা ছিল শতকরা ৪। এক্ষণে সংখ্যা হইয়াছে শত করা ১·৮। (৩) ফিন। ইহাদের সংখ্যা শতকরা ৪·৫ হইতে ৩·৩ এ নামিয়াছে। (৪) জার্ম্মাণ। আজকাল শতকরা ০·৯ মাত্র। পূর্ব্বে ছিল ১·৪। (৫) এশিয়ান—যথা তাতার, কির্গীজ, কালমুক, মোগল ইত্যাদি। ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে ছিল শতকরা ১০·৭। আজকাল রুশিয়ার অধিবাসীর ১০০ জনের ভিতর ১২ জনই এশিয়ান (বৌদ্ধ-মুসলমান)। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে এশিয়ান সমস্যা একটা গুরুতর চিজ।

ছয়টা রিপাব্লিক

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্র-গড়ন। শাসন ও নির্ব্বাচন-প্রণালী, এই অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্য বিষয়। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-বিষয়ক ও রাষ্ট্রীয় জনপদ।

এই শাসন-বিষয়ক জনপদগুলা সহজে বুঝিয়া উঠা যে-সে লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইউ, আর, এস, এস হইল সমগ্র দেশটার নাম। কিন্তু এই ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র একটা ফেডারেশ্যান বিশেষ। এই ফেডারেশ্যনের প্রত্যেক জনপদ স্বরাজশীল। জনপদগুলা প্রত্যেকেই আবার কতকগুলা স্বরাজশীল কেন্দ্রের এক একটা ফেডারেশ্যান।

দেশটার নামের গায়ে লেখা আছে "রিপাব্লিক। ইউ, আর, এস, এস্ ছয়টা রিপাব্লিকের ইউনিয়ন। এই রিপাব্লিক-গুলার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

১। রুশ সোভিয়েটের সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিক। এইটার মানে বুঝা অতি কঠিন। সহজে বলা যাইতে পারে যে, এই জনপদে "মহারুশ" নামক জাতির বাস। লোক-সংখ্যা ৯ কোটি ৬৭ লাখ ৪৬ হাজার ৩০০। অর্থাৎ সমগ্র ইউনিয়নের শতকরা ৬১·৮ জন লোক এই জনপদের বাসিন্দা।

এই জনপদটা বড় বড় দুই ভাগে বিভক্ত। উপবিভাগ সহ এই দুই বিভাগ নিম্নরূপ :—

(ক) ইয়োরোপীয়ান অংশ :—(১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (এই অঞ্চলে লেনিনগ্র্যাড অবস্থিত), (২) উত্তর-পূব অঞ্চল, (৩) মধ্য শিল্প-জনপদ (এই অঞ্চলে মস্কো আর নিশনি-নভগরদ বড় শহর), (৪) ভিয়াৎকা আর ভেৎলুকা অঞ্চল, (৫) ভলগা অঞ্চল, (৬) মধ্য কৃষি-জনপদ, (৭) উরাল পাহাড়ী অঞ্চল, (৮) উত্তর ককেসাস অঞ্চল, (৯) দাগে-স্তান (১০) ক্রিমিয়া।

(খ) এশিয়ান অংশ :—(১) সাইবিরিয়া, (২) কির্গীজ-(৩) প্রাচ্যতম অঞ্চল (আমুর বৈকালের অপরপার, সমুদ্রের কিনারা, সাগালিয়েন দ্বীপ)।

এই ১৩টা জনপদ, অঞ্চল বা প্রদেশের কোনোটা রিপাব্লিক নামে পরিচিত, কোনোটা "রিজ্যন" বা মামুলি জনপদ। 'রিজ্যন" বলিলে সাধারণ আভ্যন্তরীণ স্বরাজশীল মুল্লুক বুঝিতে হইবে। "রিপাব্লিক" নামে যে সকল মুল্লুক পরিচিত সেই সকল মুল্লুকের ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ স্বরাজের চেয়েও বেশী। এইগুলা মামুলি স্বায়ত্ত-শাসন ছাড়াও অনেকটা খাঁটি স্বাধীনতা ভোগ করে। এইজন্য তাহাদের কেন্দ্র-কমিটি আর জনগণের "কমিসার"-সভা আছে।

২। উক্রেণ রিপাব্লিক।

৩। শ্বেতরুশ রিপাব্লিক।

৪। "ককেসাস পাহাড়ের অপর পার" রিপাব্লিক। এই জনপদ তিনটা রিপাব্লিকের ফেডারেশ্যন,—যথা (১) আজরবেজান (২) জর্জ্জিয়া (৩) আর্ম্মিণিয়া।

৫। উজ্‌বেকিস্থান (প্রধাননগর সমরকন্দ)

৬। তুর্কমেনিস্থান।

৭টা কমিসার সভা, ১৯ জন প্রেসিডেণ্ট

ভারতবাসীর পক্ষে রুশিয়ার শাসন-প্রণালী বুঝিতে

হইলে প্রথমে ইউ, আর, এস, এস্ এর গবর্মেণ্টকে ভারত-গবর্মেণ্টের অনুরূপ কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে এই ছয়টা রিপাব্লিক বাঙ্‌লা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ইত্যাদি প্রদেশের অনুরূপ দাঁড়াইবে। অধিকন্তু বুঝিতে হইবে যেন বঙ্গীয় সোভিয়েট রিপাব্লিকের বা পাঞ্জাবী সোভিয়েট রিপাব্লিকের যে সব জেলা তাহার ভিতর কোনোটা "রিপাব্লিক" আর কোনোটা "রিজ্যন"। অর্থাৎ প্রত্যেক জেলাই পুরামাত্রায় সমান সমান, আত্মকর্তৃত্বশীল নয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা দরকার। কল্পনা করিতে হইবে যেন বাঙ্‌লা রিপাব্লিকের প্রতিনিধি গিয়া ভারত-গবর্মেণ্টে বসিতেছে। আবার ভারত গবর্মেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ বিভাগের পাঁচ প্রতিনিধি বঙ্গীয় শাসন-পরিষদে আসিয়া বসিতেছে। এই ধরণের ফেডারেশ্যন প্রণালী জগতে অদ্বিতীয়।

প্রত্যেক রিপাব্লিকের শাসন-পরিষৎকে "সেণ্ট্র্যাল এক্‌সেকিউটিভ কমিটি" বলে। ভারতীয় পরিভাষায় ইহার নাম প্রদেশে প্রদেশে "এক্‌সেকিউটিভ কাউন্‌সিল"। কমিটির মাথায় প্রেসিডেণ্ট, আমাদের যেমন ছোট লাট, গবর্ণর ইত্যাদি। তবে এই কমিটির সকল সভ্যই সোভিয়েট কংগ্রেস কর্তৃক নির্ব্বাচিত। পরিভাষায় মন্ত্রি-সভাকে বলে জনগণের "কমিসার-সভা"। এই কমিসার সভার সভ্যেরা প্রাদেশিক শাসন-পরিষদ্ বা সেণ্ট্র্যাল এক্‌সেকিউটিভ কমিটি কর্তৃক বাহাল করা লোক। এই প্রণালী ছয়টা রিপাব্লিকের প্রত্যেকটা সম্বন্ধেই খাটে।

ছয় রিপাব্লিকের যে ফেডারেশ্যন অর্থাৎ ইউ, আর, এস, এস্ (আমাদের ভারত-গবর্মেণ্ট) তাহাতেও জনগণের কমিসার সভা বসে। অতএব বুঝিতে হইবে রুশিয়ায় আজকাল সাতটা স্বতন্ত্র কমিসার সভা চলিতেছে। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক প্রদেশেই একটা করিয়া মন্ত্রিসভা আছে। এইগুলা অবশ্য লেজিস্‌লেটিভ আসেম্‌ব্লি বা কাউন্সিল নয়।

রুশিয়ায় সভাপতি কয়জন? প্রত্যেক কমিসার সভার একজন করিয়া প্রেসিডেণ্ট। এই গেল ছয় জন। তাহা ছাড়া প্রত্যেক রিপাব্লিকের এক জন করিয়া সেণ্ট্র্যাল কমিটির বা শাসন-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট। এই গেল ছয় জন। তাহা ছাড়া ইউ, আর, এস্, এস এর কমিসার সভার একজন প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু মজার কথা এই, ইউ, আর, এস্, এস নামক যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় সেণ্ট্র্যাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট বলিয়া কোনো একজন ব্যক্তির ঠাঁই নাই। বুঝিতে হইবে যেন, ভারত-গবর্মেণ্টের মাথায় বড়লাট নামক কোনো শাসনকর্ত্তা নাই। আছে ছয় ছয় জন প্রেসিডেণ্ট। অতএব রুশিয়ার সভাপতি বা প্রেসিডেণ্ট দাঁড়াইল নিম্নরূপ :—

ছয় রিপাব্লিকের কমিসার-সভার প্রেসিডেণ্ট	৬
" " সেণ্ট্র্যাল কমিটির "	৬
ইউ, আর, এস, এস এর কমিসার-সভার "	১
" " " সেণ্ট্র্যাল কমিটির "	৬
প্রেসিডেণ্ট সংখ্যা	১৯

রীকফ্ নামক যে ব্যক্তি লেনিনের পর গদিতে বসিয়াছেন সেই ব্যক্তির নেতৃত্ব তাহা হইলে কোথায়? এই ব্যক্তি আমাদের সুপরিচিত বড়লাটও নহেন আর রুশ-পরিচিত "জার" বাদশাও নহেন, মার্কিণ মুলুকের বা ফরাসী মুলুকের প্রেসিডেণ্টও নহেন, আর বিলাতের রাজাও নহেন। ইনি হইতেছেন ইউ, আর, এস, এস নামক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিসার সভার প্রেসিডেণ্ট মাত্র। এমন কি ইনি এই যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট্র্যাল এক্‌সেকিউটিভ কমিটির প্রেসিডেণ্টও নন। তবে রীকফ্ আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম নম্বর রিপাব্লিকে অর্থাৎ মহারুশ রিপাব্লিকেরও কমিসার সভার প্রেসিডেণ্ট।

আর্থিক জীবনের মন্ত্রী ৬৮ জন

জনগণের কমিসার বলিলে আমাদের সুপরিচিত মন্ত্রী বুঝিতে হইবে। এই ধরণের মন্ত্রী প্রত্যেক রিপাব্লিকে ১৬ জন করিয়া। তাহার ভিতর ৫ জন আসে ইউ, আর, এস, এস হইতে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৬ জনের ভিতর ১০ জনই আর্থিক জীবনবিষয়ক ধান্ধা লইয়া মাথা খেলাইয়া থাকে। এই দশ জন কমিসারের

কাজ ও বিভাগ নিম্নরূপ :—(১) দেশোন্নতির অর্থ-নীতি, (২) অন্তর্বাণিজ্য, (৩) কৃষি, (৪) মজুর ও চাষী তদবির, (৫) সমাজ-সেবা, (৬) মজুরির বাজার, (৭) রাজস্ব, (৮) বহির্বাণিজ্য, (৯) ডাক ও তার, (১০) পথঘাট। শেষের তিন বিভাগের কাজের জন্য কমিসার আসে কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট হইতে।

ছয় রিপাব্লিকে তাহা হইলে ৬০ জন কমিসার আর্থিক ধান্দায় মোতায়েন আছেন। অধিকন্তু কেন্দ্র গবর্মেণ্টের (ইউ, আর, এস, এস্) কমিসার সভায় ৮ জন এইরূপ বিভাগের কর্ত্তা। সমাজ-সেবা আর কৃষি এই দুই ধান্দা প্রত্যেক রিপাব্লিকের নিজস্ব। কেন্দ্র গবর্মেণ্ট এই দুই দিকে স্বতন্ত্রভাবে মাথা খেলায় না। দাড়াইল তাহা হইলে ৬৮ জন আর্থিক মন্ত্রী। প্রত্যেক কমিসারের দপ্তরে আবার আট দশ জন করিয়া বিশেষজ্ঞ বাহাল করা দস্তুর।

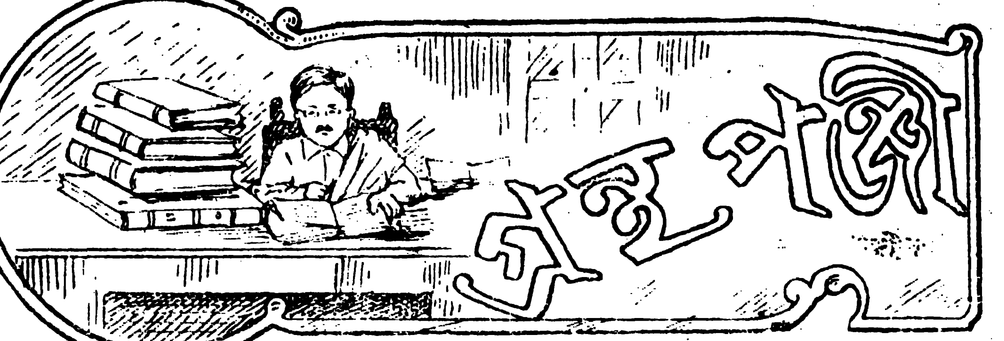
আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা। এই জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলা বিবৃত হইয়াছে :—(ক) কৃষিকর্ম্ম ও কৃষিজ মালের রপ্তানি, (খ) বনসম্পদ্।

(গ) শিল্প কর্ম্ম :—(১) কয়লার খাদ, (২) কেরোসিন তৈল, (৩) লোহা, মাঙ্গানিজ, সীসা, ক্রোম, রূপা ইত্যাদি ধাতুর খনি, (৪) লবণের কারবার, (৫) মণি-রত্ন, (৬) লোহার কারখানা, (৭) ধাতু-ঘটিত এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকটরি, (৮) বিজলীর কারখানা, (৯) কাঠের ফ্যাক্টরি, (১০) রাসায়নিক কারখানা, (১১) সীমেণ্ট, কাচ, পোর্স লেন ইত্যাদি, (১২) বয়ন-শিল্প, (১৩) চামড়ার কারখানা, (১৪) খাদ্যদ্রব্যের ফ্যাকটরি, (১৫) কাগজের কারখানা, (১৬) ছাপাখানা, (১৭) মাছের কারবার, (১৮) জীবজন্তুর লোম ও ছাল।

(ঘ) বিজলী শক্তির ব্যবহার-বৃদ্ধি, (ঙ) রাজস্ব ও টাকা-কড়ি, (চ) বহির্বাণিজ্য, (ছ) শিল্প-বাণিজ্যে কন্‌সেশ্যান-নীতি, (জ) অন্তর্বাণিজ্য, (ঝ) সমবায়, (ঞ) রেল, উড়োজাহাজ, খাল হ্রদ নদী চলাচল, অটোমোবিল, সমুদ্র-বাণিজ্য, (ট) ডাক, তার, টেলিফোন, (ঠ) নগর-শাসন, (ড) সরকারী বীমা-প্রথা।

চতুর্থ অধ্যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে তথ্য বিবৃত করিতেছে। বিষয়গুলা নিম্নরূপ :—(১) মজুরবিষয়ক আইনকানুন, (২) মজুর-সমিতির ক্রম-বিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থা, (৩) বিচার ব্যবস্থা, (৪) শিক্ষা-পদ্ধতি, (৫) ধর্ম্মকর্ম্ম, (৬) বিজ্ঞান, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, সঙ্গীত, মিউজিয়াম, থিয়েটার, সিনেমা, সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশ, বইয়ের দোকান, (৭) সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্য (৮) সরকারী সমাজ-সেবা, (৯) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীদের ঠাঁই।



"লি আফারি মারিতিমি" (সমুদ্র-বাণিজ্য-বিষয়ক আর্থিক ব্যবস্থা), বিজিঞানি, সচোতে এদিত্রিচে তস্কানা কোং, ১৯২৫, ৩০ লিয়ার।

"লে শেম্যাঁ দ' ফ্যর আঁ বেলজিক" বেলজিয়ামের রেলপথ)—দ লেনার, লামার্তিন কোং, ব্রুসেলস, ১৯২৭।

"ল্যাঁদিস মোনেতেথ্যার এ লা তেয়রী দ লা মোনে" (মুদ্রা-স্থচী ও মুদ্রা-তত্ত্ব), দিহ্বিজিয়া, সিরে কোং, প্যারিস, ১৯২৬।

"মার্কেটিং প্রব্লেম", (বাজারে মাল ফেলার সমস্যা), এলবোর্ণ, লংম্যান্স কোং, লণ্ডন, ১৯২৬, ১০ শি।

"বিজনেস্ ইকনমিকস্" (ব্যবসায়ের অর্থকথা),—অ্যাশলে,—লংম্যানস্ কোং, লণ্ডন, ১৯২৬, ২ শি ৬ পে।

"লে প্রি দ' মনপল" (একচেটিয়া অধিকারাধীন দ্রব্যের মূল্য),—সাশো, পাইলে কোং প্যারিস, ১৯২৬, ২৫ ফ্রাঁ।

"ফেডার‍্যাল ইন্টার্মিডিয়েট ক্রেডিট সিষ্টেম্" (যুক্তরাষ্ট্রে "নাতি-দীর্ঘ" মেয়াদে সরকারী কৃষি-কর্জ্জের ব্যবস্থা),—বেল্লার, ম্যাক্‌মিলান কোং, নিউইয়র্ক, ১৯২৬, ২·৫০ ডলার।

"লর্দ্র কো-অপারাতিফ" (সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা),—লাম্বার্ণ,—আলকাঁ কোং, প্যারিস, ১৯২৬, ৪০ ফ্রাঁ।

"ডী মডার্ণে ইণ্ডাষ্ট্রী-আর্বাইটার শাফট" (বর্ত্তমান জগতের কারখানা-মজুর),—হিলব্রাণ্ট মোরিটস্ কোং, ষ্টুটগার্ট, ১৯২৬, ৪·৫০ মার্ক।

"হেবেজেস্ অ্যাণ্ড দি ষ্টেট" (মজুরি ও রাষ্ট্র), ব্যর্ণস্, কিং কোং লণ্ডন, ১৯২৬, ১৬ শি।

"ষ্টাডি অন্ দি মিনিমাম হেবজ" (নিম্নতম মজুরি বিষয়ক গবেষণা)—রিচার্ডসন, অ্যালেন অ্যাণ্ড আন্সুইন কোং, লণ্ডন, ১৯২৭, ৭ শি ৬ পে।

"ল রেতুর আ লেতাইঅঁ-অর" (স্বর্ণমানে পুনরাগমন),—লাকু, পেইঅ কোং, প্যারিস, ১৯২৬, ২২ ফ্রা।

"ডাস আইন কোমেন" (আয়),—গুষ্টার, মোর কোং ট্যিবিঙ্গেন, ১৯২৬, ৬·৬০ মার্ক।

"ট্র্যানস্পোর্টেশ্যন" (যানবাহন),—টপিং ও ডেম্পসে, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, নিউহেভেন, ১৯২৬।

"এসে দ' সোসিঅলজি একনমিক" (আর্থিক ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক রচনাবলী),—স্কালফাতি, আননিমা মাণা এদিতরিয়ালে কোং, রোম, ১০২৬, ১১ লিয়ার।

কৃষিশিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

কৃষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল নানা কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কৃষকদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে না পারিলে বাঙ্গালী সমাজের আর উন্নতি নাই একথাও অনেকে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, কৃষকগণ যথার্থই লাভবান হইতে পারিবে তাহা আজিও কেহ বিস্তারিতভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, যে, বাঙ্গালার কৃষকেরা নিতান্ত মূর্খ ও সহস্র প্রকারে অজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু কৃষিবিষয়ে তাদের নূতন কিছু শিখাইবার নাই। এই-রূপ নানা জনের নানা কথা স্মরণ রাখিয়া বাঙ্গালার কৃষকদের শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করা উচিত।

এদেশে এখন যেভাবে কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করে তাহা কোন্ স্মরণাতীত কালে, কোন্ আদর্শ কৃষক প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। এই কৃষি-পদ্ধতির যখন এবং যেরূপেই উৎপত্তি হউক, ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দেবতার অনুগ্রহের উপর স্থাপন করা হইয়াছে। চাষের সহিত জলের কিরূপ সম্বন্ধ একথা পুরাকালের কৃষকগণ ভালই জানিতেন। কিন্তু বোধহয় পরিশ্রমের লাঘব করিবার জন্য বাঙ্গালার অসংখ্য নদনদীর অফুরন্ত জল-সম্ভারের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ পড়ে নাই। তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতির সঞ্চিত ভাণ্ডার কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু জ্যোতিষগণনাদি বিবিধ বিদ্যার বলে বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়া বিশেষতঃ স্থানীয় বারি-বর্ষণ ও তল্লক্ষণাদি নিরূপণ করিলেন, এবং কোন্ ফসলের জন্য, কোন্ জমিতে কোন্ সময়ে কতবার হাল দিতে হয় তাহার পৃথক পৃথক আর্য্যা স্থির করিয়া দিলেন। বাঙ্গালার কৃষকগণও সেই সমস্ত ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের আদেশ ও উপদেশ অন্ধবিশ্বাসে পালন করিয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু আজ এমন সময় আসিয়াছে যে, উক্ত কৃষি-ফর-মুলাগুলি সেরূপ ফলপ্রদ হইতেছে না। নিম্নলিখিত অন্তরায়-গুলি বাঙ্গালার কৃষকের জীবনপথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। (১) চিরাচরিত নিয়ম মানিয়া বাঙ্গালার আকাশে মেঘসঞ্চার ও বৃষ্টিপাত হইতেছে না। সুতরাং লব্ধ অভিজ্ঞতা কৃষকদের তাদৃশ কাজে লাগিতেছে না। (২) উৎপন্ন ফসলের গতি বাঙ্গালার গণ্ডী পার হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এজন্য কৃষকের সঞ্চয় করিবার শক্তির লোপ ঘটিয়াছে। (৩) জমির উর্ব্বরতাশক্তির হ্রাস হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কারণ নির্ণয় করা যায়; তন্মধ্যে কৃষকদের দারিদ্র্য ও উপযুক্ত সার ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে চাষের জমিতে পর্য্যায়-প্রথা চলিত থাকায় সার ব্যবহার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। এখন পর্য্যায় প্রথার লোপ ও পর্য্যাপ্ত সারের অভাব বাঙ্গালায় অনুর্ব্বতার সৃষ্টি করিয়াছে। গো-জাতির অবনতিও ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। (৪) ব্যয়-বাহুল্য বর্ত্তমান সভ্যতার অনুকরণে ভদ্রজীবন (ডিসেণ্ট লিভিং) যাপনের আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব্বে কৃষকেরা পেট পুরিয়া খাইয়া শীতাতপের সর্ব্ববিধ উৎপীড়ন অম্লানবদনে পিঠ পাতিয়া সহ্য করিত। কিন্তু এখন নিজের ও পুত্রপরিজনের বেশভূষা ও কিছু-না-কিছু বাবুগিরির জন্য অনেক অর্থব্যয় হয়। কাজে কাজেই সেই পরিমাণে আহার্য্যের খরচের অভাব পড়ে। সুতরাং পুষ্টির অভাবে শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এবং আধিব্যাধির অত্যাচার আর কেবল পিঠের উপর দিয়া যাইতেছে না—মর্ম্মে আঘাত করিতেছে। আরো নানা কারণে আহার্য্য দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। (৫) দেশের বিকৃত জল-হাওয়াও কৃষকদের দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ। কিন্তু ধরিতে গেলে কৃষকেরাই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পাট চাষের বিস্তার বাঙ্গালার জলহাওয়া দূষিত করিয়া বর্ত্তমান শোচনীয়

অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। পাট বাঙ্গালার অন্যতম কৃষিসম্পদ্ এবং যে যে ফসলের চাষ করিয়া চাষীরা দু'টী পয়সার মুখ দেখিতে পায় পাট তাহাদের অগ্রগণ্য। কিন্তু পাটগাছ হইতে পাটতন্তু পৃথক করিবার প্রণালীর মধ্যেই কৃষকের সর্ব্বনাশ নিহিত। পাটগাছ না পচাইলে ইহার তন্তু পৃথক করা যায় না। সেজন্য পাটপ্রধান গ্রামগুলিতে উৎপন্ন পাট-গাছগুলি পচাইবার জন্য গ্রামের সমস্ত জল নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি অধিবাসীদের পানীয় জলটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। পাট পচিলে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং জল বিষাক্ত হইয়া নীল বর্ণ ধারণ করে। তখন মৎস্যাদি জলচর জীবগুলি পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে না। ঐ বিষাক্ত জল মনুষ্যশরীরে কতদূর অনিষ্টসাধন করে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার উপর পাট কাটিবার ও ধুইবার সময় কৃষক ও মজুরকে সমস্ত দিন সেই বিষাক্ত জলে আবক্ষ নিমগ্ন থাকিয়া কাজ করিতে হয়। অর্থাৎ তাহারা জগতের হাটে পাট সরবরাহ করিতে যাইয়া জগতের আধি-ব্যাধি স্বকীয় ক্ষীণ দেহে আশ্রয় দিয়া থাকে। তখন পাট বিক্রয়লব্ধ অর্থের চতুর্গুণ খরচ করিয়াও বাঁচিবার পথ বাহির করিতে পারে না। যাঁহারা কৃষকদের মঙ্গল এবং দেশে পাট বিনিময়ে অর্থাগম ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পাট চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাট দ্বারা অনর্থবিস্তারের প্রতিরোধ করিবেন। তবেই দেশের বাস্তবিক মঙ্গল হইবে। পাটের কোন অংশই গোখাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় না বলিয়া পাটচাষের বিস্তার গোজাতির উন্নতির অন্যতম অন্তরায়। (৬) গোজাতির অবনতি কৃষকদিগের দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে, কারণ গরু হীনবল হইলে জমির সুকর্ষণ সম্ভব হয় না এবং শস্যও আশানুরূপ ফলে না।

মোটামুটি এই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার কৃষকের কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। তাহার উপর কৃষিকার্য্য আজকাল প্রকৃত ব্যবসায় বলিয়া গণ্য করা যায়। কোনো মুদিখানার দোকানদার যেমন তাহার কতগুলি খরিদ্দার ও কোন্ সময়ে তাঁহাদের কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার উপর নজর রাখিয়া নিজের দোকানপানি সুসজ্জিত করে এবং অন্য দোকানদার কিরূপ দরে মালপত্র বিক্রয় করিতেছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া নিজের খরিদ্দারের মনস্তুষ্টি করিয়া লাভ করে, কৃষকদেরও আজকাল তেমনি বাজারের চাহিদা বুঝিয়া ও বিদেশীয় কৃষকদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে আবশ্যক উৎকৃষ্টতর ফসল উৎপাদন করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশে পূর্ব্বে (বেশীদিন নহে—১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে) যে সময়ে যেভাবে বৃষ্টিপাত হইত এখন আর সেরূপ হইতেছে না। শীতকালে বর্ষার আবির্ভাব এবং বৎসরের যে-কোনো সময়ে ঝটিকা দেখা দিতেছে। সেজন্য আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন বশতঃ কৃষকেরা চাষে আর আদৌ লাভবান হইতে পারিতেছে না। আমাদের দেখা উচিত এইরূপ নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ায় অন্যদেশে কিরূপে চাষাবাদ করে অথবা বাঙ্গালাদেশের সমান আবহাওয়াবিশিষ্ট দেশ পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহারা কৃষিকার্য্যে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাহাদের পদ্ধতি উৎকৃষ্ট হইলে তাহা আমাদের দেশে চালান সম্ভব কিনা এবং কিরূপে চালান যায় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালার কৃষকেরা নিরক্ষর ও বিচ্ছিন্ন। বাঙ্গালার চাষ-আবাদ কৃষকের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। জগতের অন্যান্য সমস্ত দেশই একতায় উন্নত ও বলবান। সুতরাং কৃষকদের তথা কৃষির উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কৃষকদের নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্মুখে এমন আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের শিক্ষা কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হয় এবং তাহারা সহজেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদেশীয় কৃষকগণ কিরূপে উন্নতি করিয়াছে, সেই আদর্শই আমাদের বর্ত্তমান অবলম্বন। কিন্তু বিদেশীয় পদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুকরণের মধ্যে আমাদের মুক্তি লুক্কায়িত নাই। তাহাদের অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী আমাদের সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও জল-বায়ুর মধ্যে কতদূর কার্য্যকর হইবে তাহাই বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন ও জল-সেকের জন্য আমরা এখনই আমেরিকার ন্যায় কল-কজার প্রচলন করিতে পারিব না, কিন্তু আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে আমাদের সংহত শক্তি ও বুদ্ধি-

বিবেচনার উপর। ফসল উৎপাদনের যেমন প্রয়োজন তেমনি তাহা যথাসময়ে যথাযোগ্য বাজারদরে বিক্রয় করারও দরকার। উপযুক্ত দর না পাইলে সকলে মিলিয়া সেই দ্রব্য যতদিন না সুবিধামত দর পাওয়া যায় ততদিন মজুত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন এবং কাঁচামাল হইতে সম্ভব মত পাকামালের সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্য হইতে লভ্যাংশ বাহির করিয়া লইবার উপায় শিক্ষাও কৃষি-শিক্ষার অন্তর্গত। কৃষকদের নিরক্ষরতা ঘুচিয়া যেন দায়িত্ববোধ ও দূরদর্শিতা জন্মে।

চাষের উন্নতি ও গোজাতির উন্নতি বোধ হয় একই কথা। উৎকৃষ্ট প্রজনন-প্রথা ইত্যাদি নানা প্রকারে গোজাতির উন্নতি করিতে পারা যায়। কিন্তু পর্য্যাপ্ত আহার্য্য ও নির্ম্মল পানীয় এবং স্বাস্থ্যকর গোয়ালঘরই তাহাদের উন্নতির প্রধান উপায়। পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে সকলেই প্রায় হৃষ্টপুষ্ট হয়। আজকাল যদি প্রয়োজনমত চারণভূমি রাখিবার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে মানুষের প্রয়োজনমত যেমন নানাবিধ শস্যের চাষ হয়, সেইরূপ গরুর খাদ্যের জন্যও নির্দ্দিষ্ট ফসলের বা ঘাসের চাষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষজ্ঞগণ "গিনি ঘাসের" চাষ করিতেছেন। আমাদের দেশীয় ফসলেরও চাষ করা যায়। যশোহর জেলার স্থানে স্থানে দেখিয়াছি, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে, অর্থাৎ "আশু" ধান্য পাকিবার পূর্ব্বে গরু বাছুরের আহার্য্যের অভাব হয়। সে জন্য স্থানীয় কৃষকগণ জ্যৈষ্ঠের শেষে "ভুরা"র চাষ করে। "ভুরা" ঘাস দেখিতে প্রায় "শ্যামা" ঘাসের মত। ইহার বীজগুলি পোস্ত-বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র। ভুরা ঘাস পাকিলে অনেক দরিদ্র কৃষক ইহার বীজ বাহির করিয়া অতি উপাদেয় পায়স রাঁধিয়া থাকে। প্রকারান্তরে ভুরা ঘাস, মানুষ ও গরু উভয়েরই উপকারে লাগে।

শিক্ষা শব্দের যত প্রকার অর্থ ও সূত্র থাকুক না কেন, ইহার একটী ব্যবহারিক দিক্ আছে। তৎপ্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। জগতের মধ্যে নিজের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় এবং ঐ স্থান স্বীয় অধিকারে অব্যাহত রাখিবার যোগ্যতা অর্জ্জন শিক্ষার ব্যবহারিক অর্থ। জগতের মধ্যে নিজেদের স্থান কোথায় তাহা কৃষকেরা অবশ্যই জানে, কিন্তু কিরূপে সসম্মানে ও অনায়াসে তাহা বজায় রাখিতে হয় তাহা তাহারা আদৌ জানে না। আজ যুগ-পরিবর্ত্তনের দিনে, জগতের সহিত প্রতিযোগিতার দিনে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিল্পবিদ্যা, সংসার পালন, দূরদর্শিতা, একতা এবং অর্থনীতিজ্ঞান শস্যোৎপাদনজ্ঞানের পরিপুষ্টি মাত্র। সুতরাং এই নূতন যুগের উদ্বোধনের দিনে কৃষিশিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা যুগপ্রবর্ত্তকগণের ভাবিবার বিষয়।

কালবৈশাখীর আর্থিক কথা

(১)

মাদারীপুর

মাদারীপুর রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তারযোগে জানাইয়াছেন,—মাদারীপুরের প্রবল ঝড়ে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। তাহার সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। গত ১লা বৈশাখ যে ঝড় আমাদের মহকুমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার সহৃদয় জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইতেছে। শেষ সংবাদ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ৪৬টি গ্রামের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে চরমুগরিয়া, চরখাগদি, খাগদি, আমিরাবাদ, ঘাটমাঝি, ঝিকরহাটি, মুস্তফার, বথয়েরভাদা পিয়ারপুর, এওজ, শিরখাঁড়া, বল্লভাদ, ইসিবপুর, কালিকাপুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এবং বহুশত লোক আহত হইয়াছে।

এই অঞ্চলে খুব কম বৃক্ষই দাঁড়াইয়া আছে। শস্যও ভীষণ-ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের যে তালিকা পাইয়াছি, তাহাতে জানা যায় প্রায় ৪০০০ পরিবার গৃহহীন ; তাহার উপর প্রত্যহ অপরাহ্নে শিলাবৃষ্টি হইতেছে। বহুলোক কাছারীর গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছে। আমরা সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু অর্থাভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। বহু পরিবারকে ঘর তৈয়ারী করিবার খরচ দিতে হইবে। অবিলম্বে যাহাতে সাহায্য প্রেরিত হয়, সেজন্য আমরা মহানুভব জনসাধারণের নিকট আবেদন করি।

(২)

নোয়াখালি

৯ই তারিখে অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে নোয়াখালির লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, থানার বহু গ্রামের উপর দিয়া যে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা বহিয়া গিয়াছে, তাহা উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে আসে। এই ঘূর্ণীর পরিসর প্রস্থে ৩০০ হইতে ৬০০ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে ১২ হইতে ১৫ মাইল। যতদূর জানা যায় ঘূর্ণী লক্ষ্মীপুর থানার হাসনাবাদ গ্রাম হইতে আরম্ভ হয় এবং মমিনপুর, রসিকপুর, নন্দীগ্রাম, মদনপুর, রাইপুর, কারাইটালি, তোতারখালি, বনালিয়া, পুনিয়ানগর, ছরকাইমতা, ভবানীজীবনপুর, লক্ষণপুর, ইটালিয়া, বাবুপুর হইয়া একেবারে বেগমগঞ্জ থানার দিকে অগ্রসর হয়। সেখানেই ইহা ভীষণ আকার ধারণ করে এবং পথি মধ্যে যাহা পায়, তাহাই উড়াইয়া লইয়া যায়। জেলার হেলথ অফিসার ডাঃ বি, এম, গুপ্ত এসোসিয়েটেড্ প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, যতদূর জানা গিয়াছে এই ঘূর্ণীর ফলে ২০টী গ্রামের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় সমস্ত গৃহই হয় ভূমিসাৎ হইয়াছে নয় উড়িয়া গিয়াছে। এখানকার গ্রাম-বাসীদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন সুপারী ও নারিকেল গাছগুলি একেবারে সমস্তই ধরাশায়ী হইয়াছে। টিনের চালগুলি বহুদূরে উড়িয়া কোথাও গাছের সঙ্গে, কোথাও বা রাস্তায় প্রোথিত হইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৭৫ হাজারের কম নহে।

এখন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩ জনের মৃত্যুর বিষয় জানা গিয়াছে। বহু লোক আহত হইয়াছে, কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পতিত বৃক্ষাদির জন্য পুষ্করিণীগুলির জল দূষিত হইতেছে, এবং ইহার ফলে কলেরা ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ হওয়ার আশঙ্কা আছে। ডাঃ গুপ্ত ভাইসচেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে একজন স্বাস্থ্য ইন্স্পেক্টর ও একজন ডাক্তারকে এই সমস্ত পল্লীতে আবশ্যক ঔষধ ও প্রতিষেধকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা দত্তপাড়া এণ্টি-ম্যালেরিয়াল সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত একযোগে কাজ করিবেন এবং পীড়িতদের চিকিৎসা-বিধান করিবেন। পতিত বৃক্ষাদি পুষ্করিণী হইতে তুলিবার জন্য ৪০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

১৪ই তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লার্ক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি নাকি এই দুর্যোগ সত্বেও হস্তীপৃষ্ঠে, কোথাও পদব্রজে সমস্ত ঘটনাস্থল-গুলি ভ্রমণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ক্ষতির পরিমাণ ও কি ভাবে সাহায্যদানের প্রয়োজন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া অবগত হওয়া।

ডাঃ গুপ্ত আরও বলিয়াছেন, দত্তপাড়া এণ্টিম্যালেরিয়াল সমিতি ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গঠিত হইয়াছে। জমীদার শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুহ রায় ইহার সভাপতি ও স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ চৌধুরী ইহার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশীকুমার ঘোষ, অনন্তকুমার বসু ও প্রভাতচন্দ্র মজুমদারের পরিচালনায় ৭০ জন স্বেচ্ছাসেবক,—ইহার অধিকাংশই বিদ্যালয়ের ছাত্র, প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছে। বিহারের সরকারী সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত কালীকুমার মজুমদার এখন ছুটিতে এখানেই আছেন, তিনিও যথাসাধ্য চিকিৎসাবিধান করিতেছেন।

ইষ্টারের ছুটীর পর কোর্টগুলি খুলিলেই একটি জনসভার অধিবেশন হইবে এবং সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিবারও ব্যবস্থা হইবে। তবে ক্ষতির যেরূপ পরিমাণ তাহাতে বাহিরের সাহায্যেরও প্রয়োজন হইবে।

মার্কিণ চোখে আর্থিক জাপান

জাপানী ইয়েন আবার আগেকার সোনার দরে বিকাইতেছে। ইয়েনের দর চড়িয়া পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ায় জাপানের অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ মোটেই সন্তুষ্ট হন নাই। কেননা তাঁহারা বরাবরই মত প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন যে, মুদ্রার দাম খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হওয়া চাই, তাহা হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। হঠাৎ টাকার বাজার চড়িয়া গেলে শিল্প ব্যবসার কাজে অনেকটা বাধাবিঘ্ন আসিতে পারে এরূপ আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। কিন্তু জাপানের ব্যবসায়ী মহল হঠাৎ মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি কামনা না করিলেও অগত্যা তাঁহাদিগের এই অবস্থা মানিয়া লইতে হইয়াছে। ডেন্‌মার্ক ও নরওয়ের মত জাপানী মুদ্রার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে একটা বড় রকমের সুনাম আছে। দুনিয়ার বিনিময়-ব্যবসায়ীদের ধারণা এই যে, এইসকল দেশে মুদ্রার দাম কখনও পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, এমনকি স্বর্ণের সঙ্গে মুদ্রার পূর্ব্বে যে সম্বন্ধ ছিল সেই অবস্থায় পুনরায় ইহারা স্বর্ণকে স্থিরীকৃত করিয়া ছাড়িবে।

জগতের বিনিময় বাজারে এই সকল প্রচারিত মতামত জাপানে মুদ্রার দাম চড়িয়া যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। জাপান সরকার টাকার বাজারের উন্নতি কামনা করিতেন না এরূপ নহে। তবে মুদ্রার এই মূল্য-বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হউক ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল।

এই টাকার বাজার কোন্ সময় হইতে চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে? বিগত মহাযুদ্ধের ফলে জাপানী মুদ্রার দাম পড়িয়া গিয়াছিল না। ১৯২৩ সনের ভীষণ ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক তাণ্ডবলীলাই এই পতনের একমাত্র কারণ। যুদ্ধের সময় বরাবর জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা সচ্ছল ছিল। জাপানের রপ্তানি পণ্য-সম্ভার আমদানি মালের চাইতে বেশী ছিল। প্রভূত পরিমাণ সোনায় এবং বিদেশে লাগান ও খাটান পুঁজির সুদে তার খাজাঞ্চিখানা বোঝাই হইয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের অনির্দ্দিষ্টতার জন্য অন্যান্য দেশের মত জাপানও ঐ সময় অবাধ ভাবে স্বর্ণ রপ্তানি বন্ধ করে। যুদ্ধের পর দুনিয়ার টাকার বাজারে এক বিপ্লব দেখা দেয়। জিনিষ-পত্রের দাম চড়িয়া যায়। টাকার ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যায়। ১৯২০ সনের প্রথম ভাগ হইতে জাপানে এই অবস্থা সুরু হয়। জাপানের বিনিময় বাজারের উঠানামা ১৯২৩ পর্য্যন্ত মন্দাভাবে চলিতে থাকে। জাপানের এই সময়কার ব্যবসা-বাণিজ্য বড় সুবিধাজনক ছিল না। স্বর্ণ রপ্তানির প্রতিরোধ তখনও চলিতেছিল। ঐ সময় জাপানী ইয়েনের দাম ছিল মার্কিণ ডলার হিসাবে ৪৯·৮৪ সেণ্ট (এক সেণ্টের দাম প্রায় দুই পয়সা)। ১৯২৩ সনের গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ভূমিকম্পের ঠিক পূর্ব্বে ইয়েন ৪৯ সেণ্টে বিকাইত। এই সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্প না হইলে স্বর্ণ-রপ্তানির উপর চড়া শুল্ক হয়ত উঠিয়া যাইত।

এই সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্পের ফলে জাপানকে বিদেশ হইতে বিভিন্ন ধরণের কলকারখানা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালপত্র প্রভূত পরিমাণে আমদানি করিতে হয়। জাপান সরকার ও জাপানী ব্যবসায়িগণ এই সময় মুদ্রার দাম চড়ান ভাল বিবেচনা করেন না। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সময় তাঁহারা টাকার বাজার না চড়াইয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে ইয়েনের দাম কমিয়া ৩৮ সেণ্টে দাঁড়ায়। ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসে ইয়েন গড়ে ৩৮॥০ সেণ্টে বিকাইত। ১৯২৫ সনে জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যে একটা বড় রকমের উন্নতি দেখা যায়। ১৯২৩ সনে রপ্তানির চাইতে ৫৩৪,৪৮০,০০০ ইয়েনের মাল বেশী আমদানি হইয়াছিল, ১৯২৪ সনে ঐ সংখ্যা ৬৪৬,৫৫৭,০০০ ইয়েনে দাঁড়ায়। ১৯২৫ সনে জাপান তাহার রপ্তানির চাইতে মাত্র ২৬৭,০৬৬,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল বেশী খরিদ করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সাফল্যে জাপানের অবস্থা ফিরিয়া যায়। ইয়েনের দাম ১৯২৫ সন হইতে চড়িতে থাকে। ঐ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এক ইয়েনের মূল্য ৪০·৫১ সেন্টে উঠিয়া যায়। ডিসেম্বরে বৃদ্ধি পাইয়া ৪২·৯৭ সেন্ট হয়। ১৯২৬ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে যথাক্রমে এক ইয়েনের বিনিময়ে ৪৪·২৫ ও ৪৫ সেন্ট পাওয়া যাইত। এই সময় জাপানের ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সরকার বর্ত্তমান স্বর্ণ-রপ্তানি-প্রতিবন্ধক আইন প্রত্যাহার করা সঙ্গত মনে করেন কিনা।

অর্থসচিব ইহার উত্তরে বলেন যে, সরকার বরাবর মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন যে, তাহারা ইহা বর্ত্তমানে সঙ্গত মনে করেন না। জাপান সরকার খুব আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমানের সাময়িক চড়া টাকার বিনিময়-বাজার বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। কারণ এটা ব্যবসায়ীদের অতি বিশ্বাসের ফল মাত্র। স্বর্ণের উপর ধার্য্য চড়া রপ্তানি-শুল্ক উঠাইবার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে নাই। জাপানের ব্যবসায়িগণ যদি সরকারের সদিচ্ছা বুঝিতে পারেন এবং তদনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য চালান তাহা হইলে মুদ্রার স্বাভাবিক অবস্থা আপনা হইতেই ফিরিয়া আসিবে।

জিনিষপত্রের দাম দ্রুত পড়িয়া যাউক জাপান সরকার ইহা ইচ্ছা করেন না। অন্যদিকে মুদ্রার দাম চড়িয়া যাওয়া মানে জাপানী রপ্তানির দাম কমিয়া যাওয়া। ১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসে রেশমের কাঁচামালের গাঁইট ২ হাজার ইয়েন মূল্যে বাজারে চলিতেছিল। মুদ্রার মূল্য চড়িয়া যাওয়ার ফলে ঐ বৎসরের এপ্রিল মাসেই দর ·১৪৫০ ইয়েনে নামিয়া যায়।

১৯২৬ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত জাপানের আমদানি-রপ্তানির হিসাবে দেখা যায়, ঐ মাসে জাপান আমদানির চাইতে ৫ কোটি ইয়েন মূল্যের জিনিষ বেশী রপ্তানি করে। কিন্তু ঐ সনের দশ মাসের রপ্তানি একসঙ্গে করিলে দেখা যায় যে, জাপান বিদেশের বাজারে যত মাল বেচিয়াছে তার চাইতে ৩৪৮,৯০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল বেশী খরিদ করিয়াছে।

বৎসরের শেষভাগে জাপানের রপ্তানির হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনুমান করা গিয়াছে যে, ঐ সনে জাপান রপ্তানি মালের চাইতে ৩০ কোটি ইয়েনের মাল বেশী আমদানি করে।

এই বিরাট আমদানি-রপ্তানির বহর হইতে সহজেই জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপা যায়। জাপান এই বিশালকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে কোটি কোটি টাকা ঘরে তুলিতেছে। জাপানের জাহাজ কোম্পানীগুলি লাল হইয়া যাইতেছে। তাহারা মাল আনা-নেওয়ার কাজে মোটা হারে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। আর বিদেশের বাজারে জাপানের লাগান ও খাটান পুঁজির লাভের বখরায় জাপানী সওদাগরেরা ফুলিয়া যাইতেছে।

জাপানী মুদ্রাকে স্বাভাবিক স্বর্ণ মূল্যের তক্তে পুনঃস্থাপন করিবার প্রচেষ্টায় জাপান সরকার বর্ত্তমানে অনেকখানি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সেদিনও জাপানের ব্যাঙ্কারদের সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া অর্থসচিব মহাশয় সম্পূর্ণ স্বর্ণ-মান স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইয়েন বর্ত্তমানে বাস্তবিক-পক্ষে ঐ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা স্বর্ণ ইয়েনের মূল্য স্থিরীকরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এরূপ নহে। পরন্তু এই উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যেক আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হইয়াছে।

জাপানে ভূমিকম্প, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৈব দুর্ঘটনা লাগিয়াই আছে। সেদিনও ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে ও কয়েক শত জাপানী নরনারী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ভারতে এরূপ উপর্য্যুপরি দৈব দুর্ঘটনা ঘটিলে আর্থিক জীবন সম্ভবতঃ ভাঙ্গিয়া যাইত। জাপানের আর্থিক জীবনের বাঁধন খুবই সুদৃঢ় বলিতে হইবে। এতগুলি ধ্বংসকারী প্রাকৃতিক তাণ্ডবলীলা তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিতে পারে নাই। সে প্রত্যেক বারেই গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর সকল দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দুরবস্থা উপস্থিত হয়। জাপানও ইহার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। ইহা ছাড়াও তাহার এই ভূমিকম্পের নূতন বালাই। জাপান সরকার খুব মিতব্যয়িতার সহিত

রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করেন। দেশের লোকদিগকে তাহাদের ঘরোআ ব্যাপারেও সরকার মিতব্যয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। শুল্কনীতির পরিবর্ত্তন দ্বারা জাপান সরকার বিলাস-দ্রব্য আমদানি একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিদেশী ঋণ গ্রহণ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। জাপান সরকার আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ হইতে বিরত হইয়াছেন। ১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আর্থিক বৎসরের জাতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, জাপান সরকারের হাতে ঐ বৎসর ৫৪৬,৩৮৩,০০০ ইয়েন অর্থাৎ ৯২ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। যুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ভাবের সময় জাপান সরকার প্রত্যেক বৎসরই আয় ব্যয়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্থ দেখাইতে পারিয়াছেন।

অযথা খরচ করা জাপানী জনসাধারণের নীতিবিরুদ্ধ। খুব সতর্কতার সহিত জাপানীরা অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। বেকার লোকদের জন্য সেখানে কোন "ভাতার" বন্দোবস্ত নাই। সেখানকার পারিবারিক জীবন ও সামাজিক আচার ব্যবহার এরূপ যে ভাতার কোন প্রয়োজনীয়তা তাহারা অনুভব করে না। প্রত্যেক পরিবার তাহার অন্তর্ভুক্ত বেকার বা অকর্ম্মা লোকদের ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। দুইটি দেশের মধ্যে দূরত্ব খুব সামান্য থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্বন্ধ খুব সুদৃঢ় ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯২৫ সনে জাপানের রপ্তানির মধ্যে রেশমের কাঁচামাল ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। ইহার শতকরা ৯৫ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সনে জাপানের আমদানি মালের শতকরা ২৫ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসিয়াছিল। ভারতের স্থান তার পরেই। আর কোন দেশ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত মালের মূল্যের ⅛ অংশের বেশী মাল জাপানে রপ্তানি করে নাই।

১৯২৩ সনে জাপান সরকারকে ভূমিকম্প, ঝড়, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বগ্রাসী দৈব দুর্ঘটনার জন্য বিদেশ হইতে খুব বেশী পরিমাণ মাল আমদানি করিতে হয়। এইজন্য ঐ বৎসর তাহাকে বিদেশীর হাতে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ পাঠাইতে হয়। যুদ্ধের সময় জাপান কর্ত্তৃক বিদেশে সঞ্চিত পুঁজি হইতে ঐ সকল টাকা পরিশোধ করা হয়। ব্যাঙ্ক অব্ জাপানে গচ্ছিত সোনায় হাত দিতে হয় নাই। বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে প্রচলিত নোটের শতকরা ৮০ ভাগ সোনা ঐ ব্যাঙ্কে জমা আছে। মোটের উপর টাকার বাজার খুব সচ্ছল বলিতে হইবে। জাপানের সামনে এখনও বড় বড় সমস্যা আছে। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত ইয়োকোহামা ও তোকিও সহরকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, জাপান সবচাইতে বড় ধাক্কা কাটাইয়া দিয়াছে।

বিদেশী বাজারে চাই চা-দক্ষ বাঙালী

চায়ের বাগানে ও ব্যবসায় আজকালকার বাঙালী একটা নয়া সম্পদের খনি ঢুঁড়িয়া পাইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় খনির মতন এই খনিও ভারতসন্তানের হাতে কতদিন থাকিবে তাহা বিশেষ সতর্কভাবে আলোচনা করিয়া দেখা দরকার। আমরা পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে দু'একবার কিছু ইঙ্গিত করিয়াছি। ভবিষ্যতেও এই দিকে আলোচনা চালাইতে হইবে।

যখনই আমাদের দেশে স্বদেশী কোনো কারবারে কোনো প্রকার দুর্যোগ উপস্থিত হয় তখনই আমরা সোজাসুজি বিদেশী বণিক, শিল্পপতি আর ধনকুবেরদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে লাগিয়া যাই। আজ ল্যাঙ্কাশিয়ারের দোষ দেখি, কাল দেখি জাপানী তাঁতীদের, পরশু হয়ত মার্কিণ পুঁজিপতিরাই আমাদের আর্থিক বিফলতার মোটা কারণ বলিয়া মালুম হইতে থাকে। আর

আজকাল যখন-তখন যেখানে-সেখানে গবর্মেণ্টের রেল-নীতি আর মুদ্রানীতিকে ভারতীয় দারিদ্র্যের আর বেকার-সমস্যার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করা ভারতীয় ধনবিজ্ঞানদক্ষ আর স্বদেশ-সেবক পণ্ডিতগণের রেওয়াজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

"বিদেশী সয়তান" (চীনা কায়দায় বলা যাইতে পারে, "ফরেণ ডেভিল") গুলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের আর্থিক ক্ষতির কারণ নয় এরূপ বলা হইতেছে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসল কারণ আর জবর কারণ হইতেছে ঘরোআ। আমাদের শিল্পী-বণিক-চাষী-পুঁজিপতিরা অনেক সময়েই অকর্ম্মণ্য, ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ আর দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে নিরেট আনাড়ি। এক কথায়,—বর্ত্তমান জগতের আর্থিক আখড়ায় ভারতসন্তান নেহাৎ চ্যাংড়া। আমরা অতি-কচি শিশু—অথচ লড়িতে হয় সর্ব্বদাই জবরদস্ত পালোয়ানদের সঙ্গে।

চায়ের দুনিয়ায় বিদেশীরা বাঙ্গালীকে যখন-তখন কুপো-কষা করিয়া মারিতে পারে। যদি মারে, ত টেক্‌নিক্যাল কর্ম্মদক্ষতা আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসিদ্ধ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য চালাইবার জোরেই মারিবে। অতি স্বাভাবিক কারণেই আমরা মরিব। চায়ের ব্যবসায় বিদেশী কোম্পানীরা যে সকল যন্ত্রঘটিত, চাষ-ঘটিত, বাজার-ঘটিত আর শাসন-ঘটিত কায়দা কায়েম করিতেছে সেই সকল কায়দার সঙ্গে টক্কর দিবার যোগ্যতা যদি বাঙালীর থাকে তাহা হইলেই বাঙালী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

একটা আশার কথা এই যে, বাঙালী নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতে রাজি নয়। নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিবার মতন লোক দু'একজন এখানে ওখানে দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বলতাটা পুরাপুরি বুঝিবার ক্ষমতা কয়জন বাঙালীর আছে জানি না। অথবা থাকিলেও দুর্ব্বলতা শুধরাইবার জন্য যে-সকল কর্ম্ম-কৌশল অবলম্বন করা উচিত তাহা অবলম্বন করা বাঙালী চা-ব্যবসায়ীদের হাড়ে কুলাইবে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র।

জলপাইগুড়ির "জনমত" চায়ের ব্যবসায় বাঙালীর ভবিষ্যৎ কিছু অন্ধকারময় দেখিতেছেন। ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার একটা কায়দাও এই কাগজে বাৎলানো হইয়াছে। রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই দিকে অনেক বাঙালীর একসঙ্গে দৃষ্টি পড়া আবশ্যক।

"এবার চা'র বাজার নরম পড়িয়াছে বলিয়া একটা হৈ চৈ হইতেছে। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে ইংলিশম্যান পত্রে একটি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছে তাহাতে অনেক ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সন্দর্ভলেখক বলেন যে, চা বিক্রয়ের বাজার খুলিবার সময় হইতেই কলিকাতার দালালগণ এবৎসর ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) পাউণ্ড চা অধিক হইবে বলিয়া হৈ চৈ করিয়া বাজার নরম করিয়া দেন, কিন্তু এখন বাজার শেষ হইতে চলিল এখন দেখা যাইতেছে মোটমাট ৬০,০০০০০ (ষাট লক্ষ) পাউণ্ড অধিক চা হইয়াছে। লণ্ডন বাজারে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড বেশী গিয়াছে এবং অন্যান্য বাজারে একলক্ষ পাউণ্ডের বেশী যায় নাই; বাকী চা কোথায় গেল? যদি ভারতেই বাকী চা বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে দুঃখিত হইবার কারণ নাই কেন না বুঝিতে হইবে যে, চায়ের বাজারের প্রসার হইয়াছে। এইরূপ অযথা হৈ চৈ করিয়া বাজার নরম করিয়া তাহারা অন্যায় লাভের আশায় বেনামীতে চা কিনিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এখন তাহারা সকল বাগানেই চা কম উৎপন্ন করিবার উপদেশ দিতেছেন। ফলে আগামী বর্ষে অগ্নি-মূল্যে চা বিক্রয় হইবে ও তাঁহারা তাঁহাদের কেনা চা বেশী দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবেন। দালালদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে এইরূপই হইবে। আগামী বর্ষে স্থানীয় ভারতবাসি-পরিচালিত চা-বাগানগুলির চা ভারতের বাহিরে অর্থাৎ লণ্ডনের বাজারে চালান দিয়া বিক্রয় করিবার কথা হইতেছে। আমরা মনে করি, সোডার বোতলের ফেনপুঞ্জের মতন এ উৎসাহ প্রথম বাজারেই কমিয়া যাইবে। কর্ত্তৃপক্ষের দৃঢ়তার সহিত সঙ্কল্পিত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। কলম্বো বাজারে দাম বেশী কমে নাই। কলিকাতায় চারটি ইংরেজ দালাল কোম্পানী আছে, তাহাদের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। একটি বাঙ্গালী পরিচালিত দালাল-কোম্পানী করা এখন অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি ভারতবাসি-পরিচালিত সমস্ত বাগানের চা তাঁহাদিগের নিকট পাঠান যায় তবে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে সফল হইতে পারিবেন

বলিয়া আশা করা যায়। বলিতে পারেন উহা করিতে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু উপায় কি? করিতেই হইবে, নতুবা ভারতবাসি-পরিচালিত চা কোম্পানীগুলির দুর্দ্দিন শীঘ্রই আসিবে। আমাদের কর্ত্তব্য প্রত্যেক চা-কোম্পানী হইতে মোটা রকমের চাঁদা লইয়া একটি প্রচার-সমিতি গঠিত করিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে খবরের কাগজের সাহায্যে প্রচার-কার্য্য চালান ও তদ্দেশীয় ধনীদিগের সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া একটি বড় রকমের দালাল কোম্পানী গঠন করা এবং উক্ত কোম্পানী হইতে শিক্ষিত যুবকগণকে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, কলম্বো, বাটেভিয়া, মেলবোর্ণ, সিডনি প্রভৃতি সহরে এজেন্ট স্বরূপে রাখা। তাহারা তথাকার খবর-বার্ত্তা রাখিবে ও কার্য্য পরিচালনার সুবিধা করিবে। ভারতবাসি-পরিচালিত চা-বাগানের যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে তাহাদিগকে ভারতবাসী চা-কর সভা (ইণ্ডিয়ান টী প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, করিতে হইয়াছে। এখন ঐ সভাকে কার্য্যকর ও প্রভাবশালী করিতে হইলে ক্রম-প্রসারের আবশ্যক। কেবল নেমীবর্ত্ত ধরিয়া চলিলে আর চলিবে না। বাঙ্গালীর হাতে কয়লার ব্যবসায় অনেক পরিমাণে ছিল। এখন তাহা গিয়াছে। ইংরেজ-পরিচালিত কয়লার ব্যবসায়ের তত বেশী হানি হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালীদের হাতের ব্যবসায় কচ্ছীদের হাতে চলিয়া গেল কেন? দূরদৃষ্টি ও সময়োচিত ব্যবস্থা না করিবার ফলে সব গেল। পাটের ব্যবসায় বাঙ্গালীদের হাত হইতে অবাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া গেল, কয়লা গেল, লাক্ষাও গিয়াছে, কোটি টাকার তিব্বতী পশমের ব্যবসায় অবাঙ্গালীদের হাতে, এমন কি চামড়ার ব্যবসায় এবং হাড়-হাড্ডির ব্যবসায়ও অবাঙ্গালীর হাতে, যদিও এখনও বাঙ্গালী মুসলমানের নামে চলিতেছে মাত্র। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ যদি বৈদেশিক বাজারের সহিত পরিচিত হয় তবে ক্রমশঃ নূতন নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্ভব হইতে পারে, বেকার-সমস্যা দূরীভূত হইতে পারে, অর্থ-সমস্যা কতকটা সরল হইতে পারে। চাই এখন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা ত্যাগ ও সমবেত প্রচেষ্টা।"

মৎস্যের চাষ

শ্রীকামদারঞ্জন বিশ্বাস, বি, এ

মৎস্য বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। বাঙ্গালী বলি কেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় বা জাতির ইহা প্রধান খাদ্য বলা যাইতে পারে। এই মৎস্যের সংখ্যা দিন দিন যে ভাবে হ্রাস হইতেছে তাহাতে মনে হয় এমন একদিন আসিবে যখন ইহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইবে। তখন দেশবাসী তাহার এই প্রধান খাদ্য সামগ্রী হারাইয়া স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। তাই আজ সকলকেই ইহার অভাব দূরীকরণ বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে কি কি কারণে আজ দেশে মৎস্যের অভাব ঘটিয়াছে এবং তৎপর সেই সেই কারণ-সমূহের বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা উহাদিগকে দূরীভূত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইতে হইবে।

দেশের বিল ও নদীগুলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। ইহাদের এই দুরবস্থার মূলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খাল নালা প্রভৃতির জল চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহাদের সংস্কার অভাবে বিল ও নদীসমূহে যথেষ্ট জল জমিতে পারে না। তৎপর উত্তম পানীয় জলের জন্য যেমন একদিকে পুষ্করিণীগুলি পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে তেমনি সেইগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মাছ জন্মানেরও বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পুকুরের মাছ দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিশেষ সহায়ক হয়। অভাব-অসুবিধাতে পুকুরের মাছে দরিদ্র দেশ-বাসীর কঠিন জীবন যাপনে যথেষ্ট সাহায্য হয় এবং ইহার সংস্কার অন্যান্য বৃহৎ সংস্কার ব্যাপারের চেয়ে কম আয়াস-

সাধ্য। কাজেই ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন বিষয়ে মনোযোগী হইলে অনেকের মৎস্য-কষ্টের অপেক্ষাকৃত লাঘব হইতে পারে। দেশবাসী জানে যে মৎস্য ছাড়া তাহাদের আহার সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা ইহাদের চাষ দ্বারা মৎস্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে অত্যন্ত উদাসীন।

বর্ত্তমানে দেশে মৎস্য-ভোজী মনুষ্যের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণ মৎস্য অল্পসংখ্যক লোকে আহার করিত তাহাই আজ অধিক-সংখ্যক লোককে আহার করিতে বাধ্য হয়। কাজেই লোকে এখন আর পূর্ব্বের মত আহার্য্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে খাইতে পায় না। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য দিনদিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। রেল ষ্টীমার প্রভৃতি দ্বারাও এক স্থানের মৎস্য অন্যত্র চলিয়া যায়। ইহাতে এক স্থানের অভাব অন্য স্থান দ্বারা পরিপূরণ হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই হেতু মোটের উপর দেশে মৎস্যের অপ্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে মানুষ শাস্ত্রের উপদেশানুসারে বৈশাখ মাসে মৎস্য ভক্ষণ করিত না। কারণ সেই সময়ে ইহার পেটে ডিম থাকে এবং একটি মৎস্যের ভক্ষণে সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু বর্ত্তমানে লোকে আর পূর্ব্বের মত শাস্ত্রের কথা শুনিতে ইচ্ছুক নহে। কাজেই এই বিধিবহির্ভূত কার্য্য করার জন্যও দেশে মৎস্যাভাব দেখা দিয়াছে। এই কথা আজ ভালরূপে বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রের নিষেধ-বিধি পালনে পরাঙ্মুখতাই আমাদের এই মৎস্য-কষ্টের মূলীভূত কারণ।

পল্লীগ্রামের পুকুরে ডিম ফেলার প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। বর্ষাকালে আষাঢ় মাসের প্রথমে বড় বড় নদী হইতে জেলেরা যে সকল ডিম ধরিত উহাই পুকুরে মৎস্য চাষের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। কিন্তু এখন আর পল্লীবাসী সেই সমস্ত প্রণালী অবলম্বনে মৎস্য-বৃদ্ধির প্রতি তেমন মনোযোগী নহে।

বর্ত্তমানে দেশে পাট-চাষের আধিক্য হেতু লোকে স্থানে অস্থানে পাট পচাইয়া জল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এই পচা জলে মৎস্যও নষ্ট হইয়া যায় এবং লোকের স্বাস্থ্য-হানিও ঘটে।

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের বিল খালে শস্যের ও স্বাস্থ্যের হানিকর জার্ম্মাণ দাম দেখা দিয়াছে এবং ইহার উৎপত্তির ফলে জল খারাপ হওয়ায় মৎস্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

পুকুরের জল ও মৎস্য আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে আসে। কাজেই ইহার প্রতি অত্যাচার করিলে উভয়টাই নষ্ট হইয়া যায়। এই অত্যাচারের ফলে আমাদের যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ যে দেশবাসী স্বাস্থ্যহীনতাহেতু পঙ্গুপ্রায় হইয়া মনুষ্যজনোচিত সকল প্রকার করণীয় ব্যাপারে অকৃতকার্য্য ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে তাহার মূলে বহুবিধ অসংযম ও বিধিবহির্ভূত কার্য্যই দৃষ্ট হয়।

দেশে মৎস্যের হ্রাসহেতু ধীবরদের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহারা সুখেস্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারে না। তাহাদের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে যাহাতে "ডিমওয়ালা" মৎস্য অযথা নষ্ট না হইয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাতে তাহাদের মৎস্য-প্রাপ্তি ব্যাপারে আংশিক সুবিধা হইতে পারে সন্দেহ নাই। পুকুরে ও নদীতে মৎস্য সংরক্ষণ ও চাষ দ্বারা ব্যবসায় করিলে ধীবরদের ও অন্যান্য মৎস্য-ব্যবসায়ীদের সুবিধা হইতে পারে। মৎস্যের ব্যবসায় কম লাভজনক নহে। এই ব্যবসায়ের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মৎস্যাভাব সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। দেশের কোন কোন স্থানে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য ও কতক পরিমাণে হইতেছে বটে কিন্তু দেশব্যাপী চেষ্টা ব্যতীত এই বৃহৎ অভাব দূরীভূত হওয়া সম্ভবপর নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিল, নদী খাল নালা ও পুকুর প্রভৃতির সংস্কার করিলে মৎস্য-বৃদ্ধি হইতে পারে। এখন অল্পায়াসসাধ্য পুকুর সংস্কার দ্বারা ও তৎপর ইহার ভিতর ডিম ফুটাইয়া কি প্রকারে মৎস্যের চাষ কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত। মৎস্যের ডিম চেষ্টা করিলে প্রায় সকল পুকুরেই ফুটান সম্ভবপর হয়। ডিম ফুটাইবার সময়ে শোল, বোয়াল প্রভৃতি হিংস্র জাতীয় মৎস্যের কবল হইতে ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক

রক্ষা করিতে হইবে। তাহা না হইলে এই চেষ্টা প্রারম্ভকালেই বিফল হইয়া যাইবে। তারপর ডিম ফুটিলে পর ময়দা, চাউলের গুড়া প্রভৃতি খাদ্যের দরকার। পোনাগুলি একটু বড় হইলে স্থানান্তরিত করিলে ভাল হয়।

তারপর পোনা ছাড়িয়া পুকুরে মৎস্য বৃদ্ধি করা যায়। তবে অতি ক্ষুদ্র পোনা ছাড়া উচিত নহে। কারণ ইহাদের কতক ছাড়ার পর আপনাআপনি মরিয়া যায় এবং অধিকাংশ হিংস্র জাতীয় মৎস্যের দ্বারা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই পুকুরের আয়তন দৃষ্টে অপেক্ষাকৃত বড় পোনা ছাড়া উচিত। পোনা ছাড়ার পর মাঝে মাঝে চুন ছড়াইয়া দিলে মাছের বিশেষ উপকার হয়। কারণ ইহাতে মাছ সতেজ ও বর্দ্ধিত হয় এবং উহার বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। শামুক ও ঝিনুক পুকুরে থাকা ভাল। কারণ ইহারা শিশু অবস্থায় মাছের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের ডিমও মৎস্যের সুখাদ্য। মৎস্যের পক্ষে খৈল ও গোময় উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুকুরে পাকের আধিক্য ও পচা দল, প্যানা ও দাম মৎস্যের পক্ষে অনিষ্টকারী। কারণ ইহাতে মৎস্যের ছাটা রোগ হয় এবং এই রোগে অনেক মৎস্য মরিয়া যায়। এই রোগ হইলে মাছের মাথার উপর ব্রণের মত চাক বাঁধে। এই রোগাক্রান্ত মৎস্য ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই ভাবে প্রত্যেক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া মৎস্যের চাষ করিতে পারিলে দেশে মৎস্য-কষ্টের অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে মনে করি। দেশে মৎস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "মাছ দুধ আমাদের প্রধান খাদ্য। আজ যদি সেই মাছ দুধই দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কি করিয়া বাঁচিব? চতুর্দ্দিকে আমরা যে পরিমাণে নিঃস্ব ও প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছি আজ যদি খাদ্যাভাবে আমরা দৈহিক বল ও স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে সকল প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যে বিফলমনোরথ হইব ইহা ধ্রুব সত্য। জগতের প্রত্যেক জাতিই স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে মনোযোগী; কিন্তু আমরাই কেবল দিন দিন নানা প্রকারে স্বাস্থ্য-ধনহীন হইয়া হীনবীর্য্য ও কাপুরুষ বনিয়া যাইতেছি। ইহা যে জাতীয়তা হিসাবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে আমাদের প্রত্যেকেরই বুঝিতে হইবে এবং তৎপর দেশে স্বাস্থ্যকর সামগ্রীর যথেষ্ট পরিমাণে উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্বর যাহাতে লুপ্ত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার সংসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে। তা না হইলে, "আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিব। অরণ্যরোদন কেহই শুনিবে না।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

তর্ক-প্রশ্ন

পোদজাতি কি মৎস্যজীবী ?

গত ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার "আর্থিক উন্নতি"তে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় "পঞ্চান্ন গ্রামের পোদ, বাগ্‌দী ও অন্যান্য জাতি" শীর্ষক প্রবন্ধে পোদজাতির জীবিকা সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আদৌ সত্য নহে। তিনি বলিতে চান পোদ জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মৎস্যজীবী; কেবলমাত্র ইহাদের "কিঞ্চিৎ শিক্ষিত বা অর্থশালী" একদল নব্য সভ্যতার আলোক-স্পর্শে মৎস্যজীবীর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় ও কৃষিকর্ম্মাদি অবলম্বনে মৎস্যজীবী শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে।

পোদ জাতি বা তাহার যে কোনও থাক্ বা শ্রেণী যে ধীবরবৃত্তিক সে সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের উক্তির ভিত্তি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক জানিতে দিলে বাধিত হইব। এই জাতি কস্মিন্‌কালে মৎস্যজীবী ছিল না;—বর্ত্তমানেও নাই। অবশ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ সমাজের ন্যায় ইহারাও মৎস্যাদির "ভেড়ীর" মালিক এবং স্বহস্তে মৎস্যাদি স্বব্যবহারের জন্যই ধরিয়া থাকে—ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ধীবরের ন্যায়

মৎস্যাদি ধরিয়া বিক্রয় করিতে লেখক মহাশয় পোদজাতিকে কোথায় কোন্ থানা বা গ্রামে দেখিয়াছেন জানাইলে বড়ই অনুগৃহীত হইব।

পোদজাতি যে ধীবরবৃত্তিক অর্থাৎ স্বহস্তে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে না, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি। ২৪ পরগণা জিলার "পঞ্চান্নগ্রাম" বলিয়া লেখক মহাশয় যে স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহার সংবাদ "আর্থিক উন্নতির" মাননীয় পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ এবং অধিকাংশ পাঠকমণ্ডলী অবিদিত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করি। কারণ উহা কলিকাতার ঘনিষ্ঠ বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। এইস্থানের পোদজাতি যে আদৌ ধীবরবৃত্তিক নহে, তাহা "আর্থিক উন্নতি"র সুধী পাঠকবর্গ একটু চক্ষু চালাইয়া অনুসন্ধান করিলেই অবগত হইতে পারিবেন। শুধু এই স্থানের নহে, বঙ্গদেশের যে কোনও নগর, থানা বা পল্লীর অধিবাসী পোদজাতি সম্বন্ধে আমাদের এই একই উক্তি।

লেখক মহাশয়ের কথিত "নব্য সভ্যতার" সংস্পর্শে আসিবার বহুপূর্ব্বেও যে পোদজাতি মৎস্যজীবীর পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ কৃষিজীবী ছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ কবি রামেশ্বর লিখিত প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ "শিবায়ন" বা শিবসংকীর্ত্তনে পাওয়া যায়। এই 'শিবায়নে'র একটী বর্ণনায় দেবী পার্ব্বতী দৈন্য ও ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিকারের জন্য মহাদেবকে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। তাহার উত্তরে মহাদেব বলিতেছেন,—

"বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষা-দুঃখে সুখে আছি আকিঞ্চন পণে।
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
ফল সম্পূর্ণ যার নাহি তার ডর॥"

এই স্থলে কৃষকের বৃত্তি অর্থে কবি 'পোদবৃত্তি' প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা অতি সহজেই বোধগম্য হইবে প্রাচীনকালে পোদজাতির সর্ব্বজনবিদিত জীবিকা কৃষিকর্ম্মই ছিল। পোদজাতিই যে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষক ছিল তাহা এই উক্তিদ্বারা যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। কবি রামেশ্বরের এই কাব্য রায় সাহেব দীনেশবাবুর মতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী—অর্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন। ইহারও পূর্ব্বে ষোড়শ শতাব্দীতে কবি ৺ঘনরাম তদীয় 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে ইছাই ঘোষের নগর স্থাপন প্রসঙ্গে পোদজাতির সম্মানিত আসন লাভের বিষয়ে উক্তি করিয়াছিলেন। ("বঙ্গবাসী" সম্পাদক ৺যোগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত 'ধর্ম্মমঙ্গলের' মূল ও উক্ত বসুমহাশয় সংযোজিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ধীবরদের সম্মানিত আসন ছিল না ইহা বলা বাহুল্য।

এই জাতির প্রতি ঈর্ষাবশতঃ অলক্ষ্যে কোনও জাতিবিদ্বেষী কর্ম্মচারীর অমূলক সংবাদে ১৯১১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে পোদজাতি মৎস্যজীবী বলিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টেই পোদজাতির জীবিকা সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী উক্তি এমন আছে যদ্দারা এইরূপ বৃত্তি নির্দ্দেশের অমূলকত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। যাহাহউক ১৯১১ সনের সেন্সাসে মাননীয় সেন্সাস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় তদীয় ১৭।১।২১ তারিখযুক্ত ১৬৫০ সি নম্বর পত্রে ঐরূপ বৃত্তি-নির্দ্দেশ যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

গত ১৩৩১ সালের মাঘ সংখ্যা "সাহিত্য সমাজ" মাসিক পত্রে 'কেবট জাতি' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় পোদজাতির মৎস্যজীবিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়া পরে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পরবর্ত্তী মাসের (১৩৩১, ফাল্গুন) "সাহিত্য সমাজে" তাহা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ
সম্পাদক, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার',
মেদিনীপুর।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

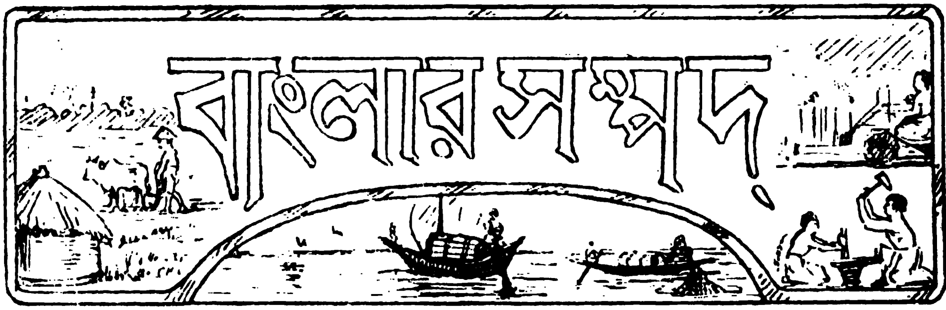
আর্থিক উন্নতি

২য় বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা | শ্রাবণ—১৩৩৪

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



বাঙালীর মোটর-ক্ষুধা

১৯২৬ সনে মোটর সাইকেল বেশী আমদানি হইয়াছে। অন্য রকম মোটর গাড়ীর বৃদ্ধির হার কমিয়া গিয়াছে।

মোটর অম্‌নিবাস্ আমদানিতে ভাঁটা পড়ার অর্থ না হয় বুঝা গেল। ১৯২৫ সনে এই জিনিষটা হঠাৎ ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং তারপর আর অত বেশী আমদানির আশা করা যায় না। কিন্তু মোটরকার আরও বাড়া উচিত ছিল।

বাংলার মোটরে দুনিয়ার হিস্যা

	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	কানাডা	ইতালি	ফ্রান্স
১৯২৫	৭১১	১,১৭৮	১,৫১০	২৮৮	১১৮
১৯২৬	৮২৮	১,৭৯৭	৯২২	৪৭৭	২৩৪

যুক্তরাজ্য হইতে আমদানিটা আরও বাড়িত কিন্তু কয়লার ধর্ম্মঘট হেতু বাড়িতে পায় নাই।

মোটর ভারত বনাম মোটর বাংলা

সমগ্র ভারতে কানাডা হইতে আমদানি মাত্র ২৯৮ কমিয়াছে আর যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি কমিয়াছে ১১৪।

ভারি গাড়ী

	যুক্তরাজ্য	কানাডা	আমেরিকা
১৯২৫	১৮৬	৭১১	[illegible]
১৯২৬	১১৭	৪২৭	৯৫০

গোটা ভারতে কানাডা হইতে ১,১৫১ গাড়ী ও আমেরিকা হইতে ৩০৮ গাড়ী বেশী আসিয়াছে।

মোটর সাইকেল

মোট ৭৪১ মোটর সাইকেলের মধ্যে যুক্তরাজ্য ৭০৯ যোগাইয়াছ।

টিউব ও টায়ার

টায়ারের মোট পরিমাণ—৮১,৮৫১টা
যুক্তরাজ্য পাঠাইয়াছে— ৩৩,৮২২টা
মোট টিউবের সংখ্যা— ৮৯,৫৩৩
যুক্তরাজ্যের হিস্যা— ৪৬,১০৯

ফরাসী ও যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যাও বাড়িয়াছে। কিন্তু কানাডার হিস্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পাটের বাজার

"ফাষ্ট" রেডি শিপমেণ্ট ৫৬।।০ অল্পই কেনা-বেচা হইয়াছে। বিক্রেতারা "ফাষ্ট" ৫৭৲ "লাইটনিংস" ৪৬।।০ এবং "হার্ট" ৩৫।।০ চাহিতেছেন। ঐ দরে ক্রেতা নাই।

নূতন পাট "ফাষ্ট" আগষ্ট ডেলিভারি ৫৯৲এবং সেপ্টেম্বর ৫০দর পাওয়া গিয়াছে। বিক্রেতা নাই।

খোলাপাট নূতন নামমাত্র "থ্রী" ১১।০ "ফোর" ১০।০ এবং রিজেক্শন ৯৲ দর উঠিয়াছে।

গত ৫ই জুন তারিখে হাটখোলায়—

আমদানি—......
রপ্তানি—১০০০ মণ
মজুত—৩৬০,০০০ মণ

বেলারগণ ৯।।০-১১৲ মূল্যে ৬০০০ মণ এবং কলওয়ালারা ৭৲-৯৲ মূল্যে ৪০০ মণ ক্রয় করিয়াছেন। গত সন এই তারিখে মূল্য ছিল ৮।।০-১৪৲।

বাংলার কয়লা

কিছুকাল যাবৎ বাংলার কয়লার ব্যবসা নানা কারণে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এমন সময় বিলাতের কয়লার খাদে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হওয়ায় বাতাস ফিরিয়া গেল।

২,৯৭,২২৩ টন কয়লা রপ্তানি

১৯২৬ সনের শেষ ৩ মাসে কয়লার ডকগুলিতে গেলে দেখা যাইত যে ষ্টীমারগুলিতে ক্রমাগত কয়লা বোঝাই হইতেছে এবং কয়লা লইয়া জাহাজগুলি বন্দর ত্যাগ করিতেছে।

নবেম্বর মাসকে কয়লার জাহাজী-চালান হিসাবে রেকর্ড বিবেচনা করা যায়। বন্দর হইতে সর্ব্বমোট কয়লা রওনা হইয়াছে ৩,৫৬,৫৮০ টন। ঐ মাসে কয়লার ডক্ এবং গার্ডেনরীচ্ হইতে কয়লা-রপ্তানির মোট প্রকৃত পরিমাণ ২,৯৭,২২৩ টন। ১৯১৩ সনের ডিসেম্বরের পর আজ অবধি এত উর্দ্ধ পরিমাণ আর রপ্তানি হয় নাই। ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩,২২,০১৯ টন।

কোন দেশের কত খাঁই

ভারতের বাহিরে বাংলার কয়লা-রপ্তানি বাড়িয়াছে।

ঈজিপ্ট নিয়াছে...১,০৫,৭১১ টন
যুক্তরাজ্য......... ৪৮,৮৬৮ "

বাংলা দেশ এই প্রথম ইংরেজকে কয়লা যোগাইতেছে।

জাহাজ-ভাড়া

অক্টোবর-নবেম্বরের শীতে ইংলণ্ডের কয়লা চাই। কয়লা নিবার জাহাজ-ভাড়া দস্তুরমত বাড়িয়াছে। তাই রপ্তানির অনুরূপ মুনাফা হয় নাই।

উপকূল বাণিজ্য

"কোষ্টিং ট্রেড্" বা উপকূল বাণিজ্য ১৯২০-২১ সনের অঙ্কগুলিতে পৌছিয়াছে। ঐ বৎসরের শেষে জাহাজ-যাত্রার নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত হয়। ঐ বৎসরের বিদেশী রপ্তানি ছিল ১১,৩৫,৭২২ টন।

ধর্ম্মঘটের দরুণ বাংলার কয়লার বাজারের উন্নতি হওয়া সত্বেও ঐ পরিমাণে এখনও দাঁড়ায় নাই। টারিফ বোর্ড কয়লা-সংরক্ষণের বিপক্ষে রায় দিয়াছেন।

দি ন্যাশন্যাল ডাই অ্যাণ্ড ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কস্

এই প্রতিষ্ঠানটাকে সম্পূর্ণ স্বদেশী বিবেচনা করা চলে। ইহার মজুর হইতে পরিচালক অবধি সবাই ভারত-বাসী। অথচ বিদেশী কোম্পানীর সহিত টক্করে এটা ফেল্ মারে নাই। বরং আলিপুরের ষ্টেট হাউসে বিদেশী কারবারের চেয়ে ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই কোম্পানী নিম্নলিখিত খরিদ্দারসমূহকে অনেক টাকার বর্ষাতি, বর্ষাতি-ছাতি, "ত্র্যাম্প পলিন" ও নানাবিধ বর্ষাতির দ্রব্য যোগাইতেছে।

ই, বি, রেলওয়ে
ইণ্ডিয়ান্ অর্ডিন্যান্স ডিপার্টমেণ্ট
বিহার উড়িষ্যা পুলিশ ফোর্স
কলিকাতা কর্পোরেশ্যন
কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেড্
দি টী ডিষ্ট্রিক্টস্ লেবার এসোসিয়েশন, ইত্যাদি।

গবর্মেণ্ট ও রেলওয়ে "বস্ত্র" যোগাইবার কণ্ট্রাক্টর বি, সি, নয়ান অ্যাণ্ড ব্রাদার্স এই কোম্পানীর এজেণ্ট। ইঁহারা ৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতার "শো রুমে" রেইনফ্ বর্ষাতি ও ছাতি প্রভৃতি খুচরা বিক্রয়ের জন্ত দেখাইতেছেন।

কলিকাতার মৃত্যু-হার

কলিকাতার হাজারকরা মৃত্যুর হার নিম্নরূপ :—

১৯২৩ সনে ... ২৮'৬
১৯২৫ সনে ... ৩১'৭
১৯২৬ সনে ... ৩৩'৫

১৯২৫ সনে মৃত্যুর হার বাড়িবার জন্ত প্রধানতঃ বসন্ত মহামারিকে দায়ী করা যাইতে পারে। ঐ বৎসর এক বসন্তেই ৩৩০৪ জন লোক মরিয়াছে।

কর্পোরেশুনের ব্যবস্থায় টীকা দেওয়া হইয়াছিল ২,৫৬,৯৮৫। কর্পোরেশুন নিজের খরচে ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালে রোগীদের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তা ছাড়া গরিবদের জন্ত কর্পোরেশুন ১৬৫টি শয্যা লইয়া এক হাঁসপাতাল খুলিয়াছিল।

১৯২৬ সনে বেশী মৃত্যু-হারের কারণ বেরি-বেরি। চাউলের গুদামগুলিকে শুক্না খটখটে ও আলো-বাতাস-পূর্ণ করার চেষ্টা হইয়াছে। গরিবদের ঘরে ঘরে গিয়া চিকিৎসার জন্ত জন কয়েক অতিরিক্ত ডাক্তার রাখা হইয়াছে।

বাঁকুড়ায় কৃত্রিম রেশম

বাঁকুড়া জিলাস্থ প্রায় ১৬০০ তাঁতী নিঃস্ব অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ ৪ বৎসর যাবৎ বিদেশী কৃত্রিম রেশমের কাপড় আমাদের দেশে প্রচুর আমদানি হওয়ায় ভারতীয় রেশমের কাপড়ের দাম খুব কমিয়া গিয়াছে সুতরাং প্রবল প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে না পারাই তাহাদের এই দুর্দ্দশার কারণ। দুঃখের বিষয় এই যে, সরকারের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াও ইহার কোনো প্রতীকার হয় নাই। বৃটিশ-রাজ্য শিল্প-প্রদর্শনীতে বহুল পরিমাণে ভারতীয় রেশমী কাপড় প্রদর্শনই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

([illegible])

বীরভূমে জুয়াড়ি-শাসন

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, বীরভূমের বর্ত্তমান কালেক্টর মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দে মহাশয় স্থির করিয়াছেন, বীরভূমে কোনো মেলায় বা কোনো সহরে তিনি কোনো জুয়াড়ীকে জুয়া খেলিবার লাইসেন্স দিবেন না। বীরভূমের ভিন্ন ভিন্ন মেলা হইতে জুয়ার কলঙ্ককে দূর করিবার জন্ত সাধারণের পক্ষ হইতে বিশেষ আন্দোলন সত্বেও ফল পাওয়া যায় নাই। এত দিন পরে জুয়ার বাজার বন্ধ হইয়াছে। একথা সত্য হইলে, সাধারণের কাছে মাননীয় কালেক্টর বাহাদুর বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র হইবেন। আমরা প্রার্থনা করি এ সংবাদ সত্য হউক।

(বীরভূম বাণী)

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের রিসীভার

ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্কের আবেদন অনুসারে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ গ্রেগরী বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের জন্য তিন জনকে রিসীভার নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় ৬·৬০ কোটি টাকার আমদানি

কলিকাতা মাসে মাসে কত টাকা মূল্যের আমদানি রপ্তানি করে? ১৯২৭সনে মে মাসের হিসাবটা লওয়া যাউক।

ভারতের বাহির হইতে কলিকাতায় আমদানি আসিয়াছে ৬·৬০ কোটি টাকার। এপ্রিল মাসে আসিয়াছিল ৭·৩৩ কোটি টাকার। গত বছরের মে মাসের তুলনায় আমদানি কমিয়াছে ৭১ লাখ টাকার।

গত বছরের সঙ্গে তুলনা

১৯২৬ সনের মে মাসের তুলনায় ১৯২৭ সনের মে মাসের প্রধান প্রধান আমদানির অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়:—

	লাখ টাকা	হ্রাসবৃদ্ধি (লাখ টাকা)
তুলার দ্রব্যাদি	২,৫৪	—৩১
লোহা ও ইস্পাত	৮০	—২
মেসিনারি ও মিলওয়ার্ক	৪৪	+১
তেল, খনিজ	৩৫	+৩
চিনি	৩০	+১
অন্যান্য ধাতু	২০	—৫
লোহা ও তামার বাসন	১৪	—৭
সুপারি	১১	—১
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১০	+১
লিকার	৭	+২

তুলার দর নামিয়াছে

১৯২৬ সনের মে মাসে তুলার মাল ছিল ৯.২ কোটি গজ। দাম ২·৬৪ কোটি টাকা। ১৯২৭ সনের মে মাসে তুলার মাল হইয়াছে ৯.৭ কোটি গজ। দাম ২.৩৩ কোটি টাকা।

অর্থাৎ তুলার দর নামিয়া গিয়াছে। সে জন্য আমদানির দামটা দিয়া তাহার পরিমাণ বিচার করা চলে না।

৮·৭০ কোটি টাকার রপ্তানি

রপ্তানি আসিয়াছে ৮·৭০ কোটি টাকার। এপ্রিলে রপ্তানি আসিয়াছিল ৯·৮৪ কোটি টাকার। কিন্তু গত বছরের মে মাসের তুলনায় রপ্তানি বাড়িয়াছে ১·২২ কোটি টাকার।

গত বছরের সঙ্গে তুলনা

	লাখ টাকা	হ্রাসবৃদ্ধি (লাখ টাকা)
পাট ম্যানুফ্যাকচার	৪,০৮	—১০
কাঁচা পাট	১,৫০	+৬২
গালা	৫২	+১৩
চামড়া ইত্যাদি	৪৫	+১০
শস্য, মুগকলাই ও ময়দা	২৫	+১৩
তিল, সরিষা ইত্যাদি	১৮	+১
চা	১৮	—১৫
পিগ আয়রণ	২৭	+৮
ম্যাঙ্গানিজ্ ওর	১১	+৩

কলিকাতার রপ্তানি

রপ্তানির রাজা হইতেছে পাট ম্যানুফ্যাক্চার। রপ্তানি বাণিজ্যের মোট মূল্যের আধাটা এই বাবদ পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ পাট-কাপড় যুক্তরাষ্ট্র নিয়াছে। আর নেটাল পাটে তৈয়ারী ব্যাগ সকলের চেয়ে বেশী নিয়াছে।

কাঁচা পাট এপ্রিলের তুলনায় কম রপ্তানি হইয়াছে। বাণিজ্যের বেশী ভাগটা জার্ম্মাণির সহিত চলিয়াছে।

গালার প্রধান খরিদ্দার যুক্তরাষ্ট্র, হাইড্সের জার্ম্মাণি, স্কিন্সের যুক্তরাষ্ট্র।

মাস্কাট রাজ্য চাউলের এক বড় বাজার। জাপান অধিকাংশ পিগ্ আয়রণ ও বেলজিয়াম্ ম্যাঙ্গানিজ্ নিয়াছে।

চট্টগ্রামে শিক্ষা-করের প্রস্তাব

শিক্ষা-কর বসাইবার জন্য সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধে চট্টগ্রাম জিলাবোর্ডে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া জিলা স্কুল বোর্ড গঠন করা হইবে। কমিটীতে সকল মহকুমা হাকিম, জিলা স্কুল ইন্‌স্পেক্টার, জিলা বোর্ডের ৩ জন সদস্য ও ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের ৯ জন সদস্য থাকিবেন। সরকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন রায়তদিগের নিকট হইতে টাকায় ৪ পয়সা ও জমীদারদিগের নিকট হইতে টাকায় ৫ পয়সা শিক্ষাকর আদায় করা হইবে। জিলাবোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন, রায়তদিগের নিকট টাকায় ২ পয়সা, যে সকল জমাদার ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত কর দেন, তাহাদিগের নিকট টাকায় ৫ পয়সা শিক্ষাকর আদায় করা হউক এবং জিলা বোর্ডকে আদায়ের ভার দেওয়া হউক।

(ত্রিপুরা হিতৈষী)

কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
	টন	টন
"শিপিং" বা জাহাজ চলাচল		
"গ্রস্" বা স্থূল টনেজ		
পৌঁছানর হিসাব	৬৪,৫৩,৯৮২	৬৯,৭২,৪২৬
নিট্ টনেজ	৩৮,৮৭,৫৬০	৪১,৭৫,২০৪
মাল হাতে আসিয়াছে—		
আমদানি		
জেটিতে	৯,৫১,৪৪২	৯,৬৩,২৯৭
ডকে	৩,৫২,৭১৪	৪,৫৫,৫৭৭
দরিয়ায়	১২,২১,৩২২	১১,২৬,৯৩৮
মোট আমদানি	২৫,২৫,৪৭৮	২৫,৪৫,৮১২
রপ্তানি		
সাধারণ	১৪,৯৪,৪৪২	১৪,৬৫,৮৫৪
কয়লা	১৭,৯৬,৪৪২	২৪,৭৬,৭৯৪
দরিয়ায়	১৭,৬৪,৪৭১	১৬,২২,৩৫৪
মোট রপ্তানি	৫০,৫৫,৩৫৫	৫৫,৬৫,০৫২

আয়-ব্যয়ের হিসাব

	বাজেট এষ্টিমেট	রিভাইস্‌ড এষ্টিমেট	সন্নিকর্ষ অ্যাক্‌চুয়াল্‌স
	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা
১৯২৫-২৬ সনের			
জের	৩·৮৮	৫·৩৭	৫·৩৭
আয়	৩০৩·৭১	২৯৩·৯১	৩০৪·৩৫
	৩০৭·৫৯	২৯৯·২৮	৩০৯·৭২
খরচ	২৯৮·৯৩	২৮৮·৪৩	২৮৬·৬৫
হাতে	৮·৬৬	১০·৮৫	২৩·০৭

ইহা ছাড়া কমিশনারদের বিভিন্ন ফাণ্ডে ধৃত সিকিউরিটির দাম ৭·৬৫ লাখ টাকা বাড়িয়াছে। সেজন্য কমিশনাররা রেভিনিউ (রাজস্ব) রিজার্ভ ফাণ্ডে ২৫ লাখ টাকা রাখিয়া দিয়াছেন। ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা মোট মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১৫ লাখ টাকা। অন্য সব বছরের চেয়ে বেশী হইলেও এটাকে অত্যধিক মনে করিবার প্রয়োজন নাই। কিং জর্জ্জ ডকের সুদে ও কাজে এর অনেকখানি খরচ হইয়া যাইবে।

১৯২৬-২৭ হইতে আনীত জের হইবে ৫,৭২ লাখ টাকা। ১৯২৭-২৮ সনের আদায়ের পরিমাণটা ৩০২,৬১ লাখ টাকা।

চট্টগ্রাম বিভাগে ঝড়

১৯২৭ সনের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে এবার চট্টগ্রাম বিভাগে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের পর মনে হইতেছিল যেন ঐ ভূভাগে ভয়ানক যুদ্ধের ফলে বাড়ী ঘর সব গোলাগুলির আঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া রহিয়াছে। পর পর ৪টা ঝড় দেখা দিয়াছে। সেগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :—

প্রথম ঝড়

২৬শে মার্চ্চ, ৪টার (বিকাল) সময়ে আরম্ভ হয়। ঝড়ের গতি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। নোয়াখালি জিলার ফেণী ও ছাগলনায়া থানার কোন কোন স্থানের উপর এবং চট্টগ্রাম জিলার মিরসরাই থানার নিকট-

বর্ত্তী গ্রামগুলিতে (এদিকে ৫টার সময়) ইহার প্রকোপ দেখা গিয়াছিল। ঝড়টা ১ ঘণ্টাকাল ছিল। ঘর ইত্যাদি চাপা পড়িয়া লোক মরিয়াছে ৪জন—৩জন নোয়াখালিতে; ১জন চাটগাঁয়ে।

নোয়াখালিতে প্রায় ৪,০০০ কুড়েঘরে গুরুতর অনিষ্ট হয়। ক্ষতির পরিমাণ ৪০,০০০৲। চট্টগ্রামে ৮০০ বাটীর দুরবস্থা হইয়াছে। এখানেও ক্ষতির পরিমাণ ৪০,০০০৲।

নোয়াখালিতে চাঁদা তুলিবার জন্য রিলীফ্ কমিটি তৈয়ারী হয়; সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ঋণ বাহির করে; রিলীফ্ ফাণ্ড হইতে কুটির তুলিয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্ট ১,৫০০৲ টাকা দেয়; ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দরকারী ঔষধাদি দিতে এক ডাক্তার নিযুক্ত করে।

চট্টগ্রামে বাড়ীঘর তৈয়ারী করিবার জন্য গরিবদের বাঁশ কাঠ ইত্যাদি সরকারী বন হইতে কাটিবার পাশ দেওয়া হয়। গবর্মেণ্ট কৃষিঋণ হিসাবে বিতরণের জন্য ৫,০০০৲ দেয়।

দ্বিতীয় ঝড়

৯ই এপ্রিল বিকাল ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে আরম্ভ হয় এবং নোয়াখালি জিলার লক্ষ্মীপুর ও বেগমগঞ্জ থানার কতকগুলি গ্রামের উপর দিয়া বহিয়া যায়।

প্রকাশ যে, চাষী ও মজুরদের ৩৭৫টা কুড়েঘর পড়িয়া যায়, ১১ জন লোক মরে ও ৫০ জন আহত হয়। সম্ভবতঃ মৃত্যুর খবরটায় অত্যুক্তি আছে। ক্ষতির পরিমাণ ৭০,০০০৲ টাকা। সুপারি এবং নারিকেল গাছের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির পরিমাণ কত এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

গবর্মেণ্ট সেণ্ট্রাল রিলীফ্ ফাণ্ড হইতে ৭৫০৲ টাকা দান করে ও ১০,০০০৲ টাকার কৃষি-ঋণ বাহির করে। জিলার জজ সাহেব চাঁদার খাতা খুলেন। জিলা-বোর্ড ৮০০৲ টাকা দেয় ও দূষিত পুকুর হইতে ময়লা-উদ্ধারের বন্দোবস্ত করে।

তৃতীয় ঝড়

তৃতীয় ঝড় দেখা দেয় ১৬ই এপ্রিল দুপুর ১২টায়। এই ঝড় চট্টগ্রামে হাথাজারি ও ফটিকচারি থানার প্রায় ১০ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া ২ ঘণ্টা ধরিয়া প্রলয় কাণ্ড ঘটাইতে থাকে। প্রকাশ,১৭০০ বাড়ীঘরের অনিষ্ট হয়। দুইজন মানুষ ও ১টা গরু মরে। সাবরেজিষ্ট্রারি আফিস্, পোষ্টাফিস্, রোসাঙ্গিরি উচ্চ ইংরেজী স্কুল, মির্জ্জাপুর মধ্য ইংরেজী স্কুল ইত্যাদি সরকারী বাড়ীঘরের অনিষ্ট হয়। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ৬০,০০০৲ টাকা।

সরকারী বন হইতে বাঁশ লইবার জন্য 'পাশ' দেওয়া হইয়াছে। গবর্মেণ্ট হইতে ১,০০০৲ ও জিলা বোর্ড হইতে ২,০০০৲ পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামে চাঁদা আদায়ের জন্য রিলীফ্ কমিটি গঠিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনও কাজ করিতেছে।

চতুর্থ ঝড়

১৮ই এপ্রিল সন্দীপ ও কক্সবাজার হইতে প্রচণ্ড ঝড়ের খবর পাওয়া গিয়াছে। গুরুতর অনিষ্টের কথা এখনও জানা যায় নাই।

আগরতলা, মুন্সীগঞ্জ, রঙ্গপুর ইত্যাদি বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতেও অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টির খবর আসিয়াছে।

পাট-শস্যের পূর্ব্বাভাষ

পাটের বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি লিখিতেছেন—

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে পাট সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট বাহির হইবে। পাট-ব্যবসায়ীরা এই রিপোর্টের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

স্থানীয় কাগজগুলিতে প্রতি সপ্তাহে পাট-শস্যের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এইগুলি দেখিয়া হিসাব করিলে পরিমাণটা দাঁড়ায় ১ কোটি ৫ লক্ষ বেল।

এই হিসাব যদি সত্য হয় তবে বাজার-দর নিশ্চয় নামিয়া যাইবে। ১৯২৮ সনের সেপ্টেম্বর অবধি আর কোন উন্নতির আশা থাকিবে না।

কিন্তু আমার মনে হয় না পাটের বাজার আরও নাবিবে। জুলাই অবধি কিছু নামিলে নামিতেও পারে। কিন্তু সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ হইবার পর পাটের অবস্থা ভাল হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা।

পাটের অবস্থা এবছর মোটেই অনুকূল নয়। জল-প্লাবন, বৃষ্টি, ঝড় এবং শিলাপাতে প্রচুর পাট নষ্ট হইয়াছে। রোপিত স্থানের তুলনায় আদায়টা অনেক কম হইবে।

পাটের অবস্থা

ত্রিপুরা, নিম্ন মৈমনসিংহ, ঢাকা ও আসামের পাটের বেশী অনিষ্ট হইয়াছে। আসামের কোন কোন জিলায় অসময়ে জলপ্লাবন হওয়ায় নিম্নভূমিতে পাট রোপণ করা যায় নাই। বড় বড় জিলাতে চাষীরা দরকারের সময় বৃষ্টি পায় নাই। ওদিকে চারাগাছ যখন ৪ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি, সে সময় অতি-বৃষ্টিতে অনেক গাছ নষ্ট হইয়াছে। ইহাতে চাষীরা আগাছা তুলিয়া ফেলিতে পারে নাই।

গত বছরের চেয়ে এবার সব নদীতেই জল বেশী। মোটামুটি হিসাব করিলে আদায়টা ৯০ লক্ষ বেল হইবে। বাজার খুব স্থির থাকিবে না। কিন্তু সরকারী পূর্ব্বাভাব প্রকাশ হইবার পর অবস্থার নিশ্চয় উন্নতি ঘটিবে।

আদায়টার হিসাব কতকটা এইরূপ :—

দেশ	বেল
পূর্ব্ববঙ্গ	৫৫,১৪,৮৫৮
উত্তর বঙ্গ	২৩,৮৪,২৫২
আসাম	৪,৬০,৩৯০
বিহার ও উড়িষ্যা	৬,৪০,৫০০
	৯০,০০,০০০

ভিন্ন ভিন্ন জিলার বিবরণ

পাবনা :—বীজ-বপন ৸৵০ আনা। অনিষ্ট ৴০ আনা। জলবাতাস অনুকূল। অবস্থা সন্তোষজনক।

মালদহ :—বীজ-বপন ৸০ আনা। অনিষ্ট নাই। জলবাতাস অনুকূল। অবস্থা সন্তোষজনক।

ঢাকা :—বীজ-বপন ৸৵০ আনা। অনিষ্ট ৶০ আনা। আগাছা তুলিবার জন্য শুক্‌না দিনের দরকার। অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

মৈমনসিংহ :—বীজ-বপন ৸৵০। অনিষ্ট ৴০। জলবাতাস অনুকূল। শুক্‌না দিনের দরকার। অবস্থা ভাল।

ফরিদপুর :—বীজ-বপন ৸৵০ আনা। অনিষ্ট ৴০ আনা। আগাছা তুলিবার জন্য শুক্‌না দিনের দরকার। জলবায়ু অনুকূল। অবস্থা সন্তোষজনক।

ত্রিপুরা :—বীজ-বপন ৸৵০ আনা। অনিষ্ট ৶০ আনা। শুক্‌না দিনের আশু দরকার। অবস্থা একটুও সন্তোষজনক নয়।

আসাম :—দরং, কামরূপ, গোয়ালপাড়া ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক জিলাতে শুক্‌না দিনের দরকার। অবস্থা ভাল নয়। জলবাতাস অনুকূল নয়।

বিহার ও উড়িষ্যা :—শস্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই। অবস্থা সন্তোষজনক।

উত্তর বঙ্গ :—শস্যের অবস্থা অনুকূল। অনিষ্ট সামান্য। আগাছা তুলিবার জন্য শুক্‌না দিনের দরকার।

সমবায়ের প্রসার

বাংলা দেশে সমবায় আন্দোলন কিরূপ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে ও কত বিভিন্নদিকে তাহা প্রসারিত করা যায় এবং জাতি-সংগঠনের কার্য্যে সমবায় কিরূপ উপযোগী তাহা সমবায় বিভাগের ১৯২৬ সনের রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়। ১৯২৫ সনে সর্ব্বপ্রকার সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১১,০৮১, ১৯২৬ সনে হইয়াছে ১২,৮১৬টি। অর্থাৎ ১ বৎসরে মোট ১,৭৩৮টী সমিতি বাড়িয়াছে। ১৯২২-২৩ সনে সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ৬,৬৭৬টী। সুতরাং দেখা যাইতেছে ৫ বৎসরে সমিতির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

মূলধন বৃদ্ধি

সমিতিগুলির মোট মূলধন ১৯২৫ সনে ৩,১৮,৩৮,৫৫০৲ টাকা ছিল, ১৯২৩ সনে উহা বাড়িয়া ৭,৫২,৭৭,০১৮৲ টাকা হইয়াছে অর্থাৎ বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৩৪,৩৮,৪৬৮৲ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ ১,১০,৭২,২৬০৲ টাকা।

ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের সহিত তুলনা

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় যাহারা একেবারে

হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন ও ভাবিতেছেন যে, বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধি একেবারেই নাই তাঁহারা সমবায় সমিতির বৎসর বৎসর এককোটি দেড়কোটি করিয়া মূলধন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিলে অনেকটা সান্ত্বনা পাইবেন। বিশেষতঃ এই গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই সাধারণরূপে শিক্ষিত লোকের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। একটী ব্যাঙ্ক চালাইতে কলিকাতার বাঙ্গালী উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু পল্লীবাসীদের চেষ্টায় বৎসরে সেইরূপ ব্যাঙ্কের মূলধনের অপেক্ষাও অনেক বেশী মূলধন সংগৃহীত হইতেছে।

সমবায় সমিতির সম্পদ্

সমবায় সমিতিগুলির মূলধন ১৯২৬ সনে সাড়ে সাত কোটির উপর ছিল কিন্তু ইহাতে একই টাকার হিসাব বিভিন্ন স্থানে দেখান হইয়াছে; সমিতিগুলির প্রকৃত সম্পদ্ ১৯২২-২৩ সনে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ছিল, ১৯২৩-২৪ সনে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ, ১৯২৪-২৫ সনে ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ এবং আলোচ্য বর্ষে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ হইয়াছে। সমিতির সংখ্যা যেরূপ ৫ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে, সমিতির মূলধনও তেমনিই ৫ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

মেম্বারের সংখ্যা-বৃদ্ধি

সমবায় সমিতিগুলির মোট সভ্য সংখ্যা ১৯২৫ সনে ছিল ৩,৮৫,৫৯৯ জন। ১৯২৬ সনে সভ্যসংখ্যা হইয়াছে ৪,৫৩,০৩১ জন। এবৎসর সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৯,৪৩২; পূর্ব্ব বৎসরে ৪৫,৮৯১ জন সভ্য বাড়িয়াছিল। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৪½ কোটি ধরিলে শতকরা ১ জন মাত্র সমবায় সমিতির সভ্য হইয়াছে। গত বৎসরে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি সন্তোষজনক হইলেও বঙ্গদেশে যে পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া উচিত তাহার অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। একজন সভ্যের পরিবারে গড়ে ৫ জন লোক ধরিলে দেখা যায় যে দেশের সকল পরিবারে সভ্য করিতে হইলে সমিতির যত মেম্বর হওয়া উচিত তাহার মাত্র ২০ ভাগের ১ ভাগ মেম্বর হইয়াছে।

সমিতিগুলির বিভাগ

প্রাথমিক ঋণদান সমিতি

সমস্ত সমিতির মধ্যে ইহাদের সংখ্যা ১১,০৬৯টী অর্থাৎ শতকরা ৮৭·৩টী। ইহাদের প্রত্যেকটীর গড় মেম্বর সংখ্যা ২৫ জন। ইহাদের মোট মূলধন আড়াই কোটির উপর। ইহাদের মধ্যে ৩৩টী শস্যব্যাঙ্ক বা ধর্ম্মগোলা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৪টী।

কৃষি ক্রয় বিক্রয় সমিতি

এই শ্রেণীর সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩৩ হইতে ৫৩টী হইয়াছে। ইহাদের মেম্বারের সংখ্যা ৫,৩৩৭ হইতে ৯,৫৬৫ হইয়াছে। মূলধন ৯৪,৪১৯ হইতে ২,৩৪,৮২৮ হইয়াছে। এই সমিতিগুলিকে গঠন করিবার জন্য সমবায় বিভাগ হইতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই সমিতিগুলির কার্য্য ১৯২৭ সনে আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং এই রিপোর্টে তাহাদের বিবরণ কিছু নাই; কিন্তু ১৯২৩ সনেই সমিতির সংখ্যা শতকরা ৫০ বৃদ্ধি, সভ্য-সংখ্যা শতকরা ৯০ বৃদ্ধি ও মূলধন শতকরা ১৪৯ বৃদ্ধি সহজ কথা নহে।

পাট বিক্রয় সমিতি

কৃষকেরা যাহাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পায় ও বিদেশী ব্যবসায়ী ও ফাট্‌কাবাজদের হাতে যাইয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে এই সমিতিগুলি গঠন করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে চাঁদপুর সমিতিই অগ্রগণ্য ইহার অংশগত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। এই সমিতি বড় বড় গুদামের বন্দোবস্ত করিয়াছে। পাট চালান দিবার জন্য একখানি ষ্টীমার ও কয়েকখানি নৌকা খরিদ করিয়াছে ও একটী প্রেসিং মেসিন স্থাপন করিয়াছে। ময়মনসিংহে সরিষাবাড়ী নামক স্থানে, পাবনা জিলায় ভাঙ্গুরিয়াতে ও সিরাজগঞ্জে এবং রাজসাহী জিলায় নওগাঁয়ে, নদীয়া জেলায় আলমডাঙ্গায় পাটক্রয় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ও প্রকাণ্ড আকারে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই আন্দোলন সফল হইলে বাংলাদেশের কৃষকদিগের বার্ষিক অন্ততঃ ১০ কোটি টাকা লাভ হইবে।

সেচ সমিতি

বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলায় ৩৫০টী সমবায় সেচসমিতির সাহায্যে ৭০ হাজার বিঘায় জলসেচনের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দুগ্ধ সমিতি

৭৪টী দুগ্ধ-সমিতি প্রত্যহ কলিকাতায় ১১০ মণ বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছে ও বড় সহর এবং মিউনিসিপ্যালিটী-গুলির দুগ্ধ-সমস্যা সমাধানের একটী উপায় নির্দ্দেশ করিতেছে।

সমবায় ভাণ্ডার

ইহাদের কাজ ভাল চলিতেছে না। সমিতির সংখ্যাও ৭১ হইতে কমিয়া ৫৭ হইয়াছে। দুই একটী ষ্টোরে কিছু লাভ হইলেও মোটের উপর কিছু লোকসান হইয়াছে।

শিল্প সমিতি

শিল্প সমিতির সংখ্যা ৩০৮ হইতে ৪৯২ হইয়াছে। বয়ন সমিতির সংখ্যা ২৩৩টী। বাগেরহাটে ভারতের প্রথম সমবায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মালদহে একটী সিল্ক ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে। এ ছাড়া ৫টী মহিলা সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। মহিলারা কাটছাঁট ও সেলাই শিক্ষা করিবার মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্য এইরূপ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। মহিলাদের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের প্রসার এই প্রথম।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

আলোচ্য বর্ষে ৭টী নূতন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মোট সংখ্যা ৯১ হইতে ৯৮ হইয়াছে। ইহাদের অংশগত মূলধন ২৯·৫৭ লক্ষ, রক্ষিত তহবিল ১০·২০ লক্ষ এবং কাজে খাটানো মূলধন ২ কোটি ৫৭ লক্ষ হইয়াছে।

প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

এইটীই বাঙ্গালার সকল সমবায় ব্যাঙ্কের শীর্ষে। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে ইহার কাজে খাটানো মূলধন ছিল ২½ কোটি; কিন্তু এ বৎসর ইহার পরিমাণ ৫ কোটি হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইহার লাভের পরিমাণ ৬৯,৬৪৬৲ টাকা। আলোচ্য বর্ষে ইহার লাভ হইয়াছে ১৪৫,৬৪৫ টাকা।

অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সমিতি

পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে এই শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা ছিল ৪৩৩, আলোচ্য বর্ষে ৮৬৯। ইহাদের মধ্যে ২৬৩টী রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

এই সকল সমিতিছাড়া বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যেই ইহার সহিত সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা ৬৫০০০ হইয়াছে। এই সমিতির উদ্যোগে সমবায় আন্দোলন বে-সরকারী লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। সমিতি একটী সমবায় পুস্তকাগার ও পঠনালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং বাংলায় 'ভাণ্ডার' নামে ১ খানা মাসিক পত্র ও ইংরাজীতে কো-অপারেটিভ জার্ণাল নামে ১ খানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বক্তৃতা ও সমবায়-শিক্ষা-কেন্দ্রের ব্যবস্থাও করিতেছেন।

ন্যাশনাল ইন্‌শিওর্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্

(১)

ডিরেক্টরদের বিবরণ এইরূপ :—

১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল ৪,৪০৫টী
টাকার পরিমাণ একত্রে ... ৮৫,৭৭,৫০০৲
তন্মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে ... ৩,৬৭০টী
নূতন পলিসিতে বীমার পরিমাণ ... ৬৭,২৫,৫০০৲

বাকীগুলি হয় গ্রহণ করা হয় নাই নয়ত যে সর্ত্তে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রস্তাবকারীদের মনোমত হয় নাই অথবা এখনও কথাবার্ত্তা শেষ হয় নাই।

নূতন বীমা ব্যবসায়ে নিট্ বাৎসরিক নূতন প্রিমিয়াম আয়, পুনঃবীমা করণের টাকা বাদ দিয়া ৩,৩৪,৭৯৪৸৴ আনা
মৃত্যু-হেতু প্রাপ্ত দাবীর পরিমাণ ... ৩,১৮,৯৯৯৷৹ আনা
এনডাওমেণ্ট এশিওর্যান্স পাকা বাবদ ... ২,৬০,৪২৪৲
"ইন্‌ভেষ্টমেণ্টে"র উপর কোম্পানীর
"ইণ্টারিম" আয় (আয়-কর বাদ দিয়া) ৪,৯৪,৫৩৫৲৬ পাই
"সিকিউরিটি" বেচার উপর
মুনাফা পাওয়া গিয়াছে ... ৬১,১৬৬৷৴৹ আনা

জীবন-বীমা ফাণ্ড (ইন্‌ভেষ্টমেন্ট রিজার্ভ ফাণ্ড সুদ্ধ) ... ৮৩,০২,৪৭৪।৶১০ পাই
বৎসরের আরম্ভে ছিল ... ৭২,৬৬,৮১৭।৵৫ পাই
অতএব ফাণ্ডে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ... ১০,৩৫,৬৫৭৵৫ পাই

১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বরে চলিত বাজার দরে ষ্টক এক্সচেঞ্জ ইন্‌ভেষ্টমেন্ট সব লেখা হইয়াছে।

জীবনবীমা রাজস্ব হিসাবে প্রিমিয়াম্ আয়ের তুলনায় ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালনা খরচ—২৫.২% (১৯২৫); ২৭.৩% (১৯২৪)।

১৯২৩ সন হইতে ষ্টাফ্ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রচলিত করা হয়। বহু বিবেচনার পর এই বৎসরের গোড়া হইতে ইহা বন্ধ করা হয়। তৎপরিবর্ত্তে একটা ষ্টাফ্ পেন্সন স্কীম করা হইয়াছে।

এই বৎসর হইতে কোম্পানী অগ্নিবীমার কাজ বন্ধ করিয়াছে। অবশ্য তার আগে সব দেনা-শোধ হইয়াছে।

(২)

১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি ন্যাশন্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেডের দরুণ ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার হাতে যে সিকিউরিটি গচ্ছিত আছে তার বিবরণ এইরূপ :—

	আসল দাম
৩য় ৪%, ১৯০৭ এ/ও'র পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	২৫,০০০৲
২য় ৪%, ১৯০৬ এর „ „ „	২,০০০৲
৪%, ১৯১০ এর „ „ „	১,২৫,০০০
৪%, ১৯১৩ এর „ „ „	৩০,০০০৲
৫%, ১৯১৬ এর „ „ „	১,০০,০০০৲
৬%, ১৯২৫ এর „ „ „	৭,৫০,০০০৲
৪%, ১৯০৭/৮ এন/এন্ মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার	২৫,০০০৲
৪%, ১৯১২/১৩ এর „ „	১,০০,০০০৲
৪%, ১৯১৫/১৬ এর „ „	২০,০০০৲
৩য় ৫½%, ১৯১৯/২০ এর „ „	২৮,০০০৲
৩% গবর্ণমেন্ট প্রমিসরি নোট ১৮৯৬/৯৭	২,২০০৲
৩½% „ „ „ ১৮৫৪/৫৫	১,০০০৲
৩½% „ „ „ ১৮৬৫	৫,০০০৲
৩½% „ „ „ ১৯০০/১	১,০০০৲
৫% বণ্ডস্ দেয় ১৯৩৩	১,০০,০০০৲
৫% ভারতীয় "যুদ্ধ-ঋণ" দেয় ১৯২৯।৪৭	৫,৮৫,০০০৲
৫% ঋণ দেয় ১৯৪৫।৫৫ ...	৭,৬৬,০০০৲
৫½% যুদ্ধ বণ্ড দেয় ১৯২৮ ...	১,০০,০০০৲
৬% বণ্ড দেয় ১৯২৬ ...	৬,০০০৲
৬% বণ্ড দেয় ১৯৩০ ...	৮১,৭০০৲
৬½ বোম্বে গবর্ণমেন্ট ডেভেলপ্‌মেন্ট ঋণ ১৯২০ দেয় ১৯৩৫ ...	২৮,০০০৲
৬¾% মহীশূর গবর্ণমেন্ট ঋণ ১৯৪০	১,৫০০
৬¾%, পাঞ্জাব বণ্ড দেয় ১৯৩৩ ...	৪০০,০০০
৪%, রেঙ্গুন পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ১৯০৬ দেয় ১৯৫০ „ ...	২,২৫,০০০
৪%, করাচী „ ১৯১৪ দেয় ১৯৪৪	২,২৫,০০০
৮%, কানপুর টেক্সটাইল লিমিটেড্ ডিবেঞ্চার দেয় ১৯৩২ ...	১,০৫,০০০
৭%, ওয়েভারলি জুট মিলস কোং লিমিটেড্ ডিবেঞ্চার দেয় ১৯৪৫ ...	১,০০,০০০
৪৮ সম্পূর্ণ শোধিত "অংশ" ইম্পারিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ বোম্বে রেজিষ্টার ...	২৪,০০০
১৮৪ ঐ কলিকাতা রেজিষ্টার ...	৯২,০০০
৫৪ ঐ মান্দ্রাজ রেজিষ্টার ...	২৭,০০০



ভারতে শিল্প-নিষ্ঠার ক্রমিক প্রসার

এই কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষ শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। কেবল তাহার কাঁচা মাল উৎপাদনের হার বাড়ে নাই, পরন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের হারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে কলকারখানার প্রচলন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী এঞ্জিনিয়ার ধনবিজ্ঞানবিদ সমাজসেবক অনেকেই অধ্যাত্মবাদের ভারত-ভূমিকে শিল্পনিষ্ঠার আখড়ায় পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন। শিল্পযুগ ঐ দেখা যায়। ভারতের মুক্তিফৌজ এদিকে অগ্রসর হইতেছেন। কাঁচা মাল ভারতের শিল্প-কারখানায় পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজে লাগান হইতেছে। এই সকল কাজে বিদেশী পুঁজিপতিরাও টাকা ঢালিয়া ভারতের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিতেছেন। ভারতসন্তানের ভিতর যাঁহারা পাকা ব্যবসায়ী ও শিল্প-সমজদার তাঁহারা নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের টাকার বাজারে হাজির হইয়া দুনিয়ার ধনী সম্প্রদায়কে ভারতীয় কৃষি-শিল্পে টাকা ঢালিতে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহা হইলে আমাদের আর্থিক উন্নতি আরও দ্রুত সাধিত হইবে।

ভারতীয় জল ও স্থল কাষ্টম্ রাজস্ব

(ক) ১৯২৭ সনের মে মাসে সর্ব্বমোট ভারতীয় জল ও স্থল কাষ্টম রাজস্বের পরিমাণ (লবণ-রাজস্ব বাদে) ৩,৫৫ লক্ষ টাকা। এই পরিমাণটা গত এপ্রিল মাসে ছিল ৩,৭৫ লক্ষ টাকা, ১৯২৬ সনের মে মাসে ছিল ৩,৮০ লক্ষ টাকা।

(খ) ১৯২৭ সনের এপ্রিল মে এই দুইমাসে আদায়ী

মোট রাজস্বের পরিমাণ	...	৭,৩০½ লক্ষ টাকা
১৯২৬ সনের ঐ সময়ে	...	৭,৭৯½ লক্ষ টাকা
(গ) আমদানি শুল্ক হইতে লওয়া গিয়াছে		৬,০৭½ লক্ষ টাকা
রপ্তানি শুল্ক হইতে	...	৮৫ লক্ষ টাকা
মোটর স্পিরিটের উপর আব্গারী মাশুল		১৬½ লক্ষ টাকা
কেরাসীন তেলের উপর ঐ	...	১৩½ লক্ষ টাকা
স্থল কাষ্টম ও বিবিধ	...	৮ লক্ষ টাকা

(ঘ) খনিজ তেল, সাদা ও ধূসর কটন পীস্গুড্স্, তামাক, সূতা এবং রেশমী ও তুলা ব্যতীত অন্যান্য বস্ত্র, কাগজ এবং ষ্টেশনারীর উপর হইতে আমদানি শুল্ক আর কাঁচা পাটের উপর হইতে রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়াছে।

অন্যদিকে চিনি, লোহা ও ইস্পাত (রেলওয়ের যন্ত্রপাতি সুদ্ধ), দিয়াশলাই ও দিয়াশলাইয়ের কাঠ ইত্যাদি, মোটরকার লোহা ও ইস্পাত ভিন্ন অন্যান্য ধাতু, ছুরিকাঁচি ও লোহা-তামার বাসন, তুলার সূতা, রঙচঙ পীসগুডস রেশম পীসগুডস এবং মদ ইত্যাদির উপর হইতে আমদানি শুল্ক এবং চাউল ও পাকা পাটের উপর হইতে রপ্তানি শুল্ক ও কেরাসীনের উপর হইতে আবগারী মাশুলের পরিমাণ অনেকখানি কম হইয়াছে।

(ঙ) ১৯২৭ সনের এপ্রিল মে দুই মাসে অ-সরকারী আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক বিশেষ শুল্ক বসাইয়া পাওয়া গিয়াছে ৫৫ লক্ষ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ষ্টোরের উপর শুল্কের পরিমাণ সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধরিয়া ১২ লক্ষ টাকা। ১৯২৬ সনে ইহার পরিমাণ ঐ সময়ে ১৬ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় কাষ্টম বিভাগের হিসাব

(১৯২৫-২৬)

বৎসর	রাজস্ব	খরচ
১৯২১-২২	৩৪,৯৫,০৭,০১৫	৫৪,৫২,৯০৪
১৯২২-২৩	৪১,৯৬,১৬,৩৩৫	৫৯,৬৬,৬৪০
১৯২৩-২৪	৪১,৪৪,৭৬,৮৭১	৬০,০৯,৩৯৭
১৯২৪-২৫	৪৯,৪৭,৭০,০৩৯	৬৪,১৭,৫৪৭
১৯২৫-২৬	৪৯,২৮,৮২,৮৪১	৬৬,৭৪,৫৭৩

শুল্ক-হ্রাস

১৯২৪-২৫ সনের তুলনায় ১৯২৫-২৬ সনের আমদানি রপ্তানির দাম কিছু কমিয়াছে। যে শুল্ক আদায় হইয়াছে তাহাও কম। প্রধান শুল্ক-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে—

চিনিতে ... ... ৭১ লক্ষ টাকা
লোহা ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ... ৬৬ লক্ষ টাকা
মোটরকার ইত্যাদিতে ... ... ২৬ লক্ষ টাকা
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ... ... ২০ লক্ষ টাকা
চাউল রপ্তানি শুল্ক ... ... ১৭ লক্ষ টাকা
খনিজ তেলে ... ... ১১ লক্ষ টাকা

অন্যদিকে প্রধান হ্রাস ঘটিয়াছে—

কটন পীস্‌গুড্‌সে ... ... ১৬৭ লক্ষ টাকা
কটন আবগারীতে ... ... ৭০ লক্ষ টাকা
ধাতু ইত্যাদিতে (১০%) ... ৪৮ লক্ষ টাকা
তামাকে ... ... ১৮ লক্ষ টাকা

কাষ্টম সম্বন্ধীয় অপরাধ

(ক) ভারতের অধিকাংশ কোকেন আমদানি হইয়াছে সুদূর প্রাচী হইতে। এই বছর সব চেয়ে বড় বাজেয়াপ্তের বিবরণ এইরূপ :—

রেঙ্গুনে— ৮২৫ আউন্স
কলিকাতাতে—৫২৫ ”
বোম্বেতে— ২৭৫ ”
কলিকাতাতে—২৫০, ১৯৮, ১৪৯ আউন্স

শুল্কাগার হইতে ধৃত মোট কোকেনের পরিমাণ ৩,৪৫৩ আউন্স।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন শুল্কাগার হইতে বাধাদানকারী কর্ম্মচারীরা ২,৯৫০ পাউণ্ড আফিং ধরিয়াছে। অধিকাংশ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রদেশ হইতে ব্রহ্মদেশে লুকাইয়া চালান করা হইয়াছিল। বড় বড় "ধরা পড়া"র পরিমাণ :—

কলিকাতাতে—২৩৪ পাউণ্ড
রেঙ্গুনে— ২,৬৭৯ ”

(গ) অধিকাংশ গোলা-বন্দুক কলিকাতাতে ধরা পড়িয়াছে। সব চেয়ে বেশী শাস্তির টাকা হইয়াছে লুকাইয়া "কেদারস্" চালান দিবার জন্য। মোট শাস্তির টাকার পরিমাণ ১৩,৬৬৯৲। তন্মধ্যে কলিকাতার ৩টা কেদার-চালান সম্পর্কেই অর্থদণ্ড হইয়াছে ১০, ৭৫০৲।

কটন আবগারি

কটন আবগারি শুল্ক ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৫ হইতে বন্ধ করা হয়। তারপর ১৯২৬ সনের ফিনান্স অ্যাক্ট অনুসারে উহা একদম রদ হইয়া যায়।

মোটর স্পিরিট ও কেরোসীন আবগারি

৩টী মাত্র দেশে তেল শোধিত হয়। এই ৩টা দেশেই শুধু শুল্ক আদায় করা হইয়া থাকে। ৩টা দেশের নাম—

(১) ব্রহ্মদেশ
(২) আসাম
(৩) পাঞ্জাব

১৯২৫ সনের ১লা এপ্রেল হইতে মোটর স্পিরিটের শুল্ক গ্যালন প্রতি ।৶০ আনা হইতে ।০ আনা করা হইয়াছে। কেরোসীনের উপর শুল্ক প্রতি গ্যালনে ⁄০ আনা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

দাতব্য

যে সব জাহাজ রবিবারে বা ছুটীর দিনে কাজ করে তাদের জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা হইতে

প্রথমতঃ বেশী খাটার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের ফী দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ শতকরা কিছু অংশ কলিকাতার কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তারপর যা বাকী থাকে, সেই টাকা সময় সময় এমন সব দাতব্য আলয়ে বিতরণ করা হয় যেখানে শুল্ক-কর্ম্মচারীরা বা নাবিকরা উপকৃত হয়। কলিকাতাতে বাংলার গবর্মেণ্টের নিযুক্ত এক কমিটি আছে। এই কমিটি নাবিকদের উদ্দেশ্যে টাকা লইয়া সকল জাতের নাবিকদের হিতসাধক কাজে ব্যয় করিয়া থাকে।

হিসাব

"অডিট্" বা হিসাব-পরিদর্শন ও হিসাব আলাদা আলাদা রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কলিকাতা শুল্কাগারে কনট্রোলার অব্ কাষ্টমসের অধীনে এক পে ও একাউণ্টস্ কর্ম্মচারী রাখিয়া পরীক্ষা চলিতেছে। পরে এই বন্দোবস্ত অন্যান্য শুল্কাগারেও করা হইবে। ইহাতে আর্থিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবে।

বোম্বে বন্দরের জন্য একজন অতিরিক্ত "কলেক্টর অব্ কাষ্টমস্" বা শুল্ক কলেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে "হোয়ার্ফ" ও "জেটিতে" জিনিষপত্র আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা হইবে আশা করা যায়।

কলিকাতা শুল্ক ল্যাবরেটারি বা গবেষণা মন্দির

ইহাই ভারতের প্রধান শুল্ক গবেষণা মন্দির। মদ ইত্যাদি পরীক্ষার ক্ষেত্র এখানেই। আর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের আব্গারি বিভাগের অনেক পরিমাণ কাজ এখানে সম্পন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত জেক্স্ এই ল্যাবরেটারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ইনি কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ গবেষণা চালাইয়াছেন। যথা, স্পিরিট "অ-স্বাভাবিক" করণের পক্ষে মহীশূর কাঠ "নাফ্থার" উপযোগিতা পরীক্ষা, প্রচলিত অ-স্বাভাবিকের ফর্ম্মূলা পরিবর্ত্তন ও বাজারে "পাওয়ার এলকোহলে"র উপযোগিতা।

অন্যান্য বন্দরে দ্রব্যাদির রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। প্রস্তাব হইয়াছে যে, কলিকাতার শুল্ক ও আবগারি বিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষকের অধীনে প্রত্যেক শুল্কাগারে একটা করিয়া রাসায়নিক ল্যাবরেটারি রাখা হইবে।

পঞ্জাবে নয়া সড়ক ও পথ

পঞ্জাবের ডাক চলাচলের পথগুলির দিকে—মেলপথ ও সড়ক উভয়ের উপর, দৃষ্টি ও মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কতকগুলি অত্যন্ত দরকারী পথ জরীপ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সব চেয়ে জরুরী কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে লায়লাপুর, জারাণবালা ও চুকুহুম্রা-চিনিয়ট্ লাইনে।

সড়ক সম্পর্কে, লোয়ার ঝিলাম ক্যানাল কলোনীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইয়াছে। শাহপুর জিলা-বোর্ড ১৫০ মাইল খোয়া বাঁধান পাকা সড়ক তৈয়ারী করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এ ছাড়া পূর্ত্তবিভাগের অধীনে অসংখ্য শাখা-সড়ক গঠিত হইতেছে।

লাহোর জিলার লায়লাপুরে ও চুনিয়ানে অবস্থিত লোয়ার চেনাব কলোনীতে ধীরে ধীরে উন্নতি হইতেছে। সমস্ত কলোনীগুলিতেই অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে। কাজ হয় নাই। তবে জিলাবোর্ডগুলির এদিকে নজর পড়িয়াছে। আশা করা যায় কমিউনিকেশন বোর্ডের সহায়তায় ও উপদেশে খারাপ গ্রাম্য সড়কগুলির সংস্কার শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যাইবে। জমিবিলি ও নীলাম ডাক সব কলোনীতেই জোর চলিতেছে।

আপার ঝিলাম ক্যানাল কলোনীর দৃশ্য বদলাইয়া যাইতেছে। সেখানে লোয়ার চেনাব কলোনীর সামান্য জিলাগুলির মত অবস্থা দেখা দিতেছে। শেখুপুরার সব চেয়ে বড় সহর হইল "সাঙ্গলা হিল।" সেখানে মস্ত বড় এক বাজার বসিয়া গিয়াছে। অনেক ফ্যাক্টরী ও মিল চলিতেছে।

নীলবার কলোনীতে আরাফবালা এক নগর হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি কলোনীতে অশ্বপালন ও উৎপাদনে উৎসাহ দিয়া বেশ সুফল ফলিয়াছে। সার্গোধা এবং লোয়ার বারিডোয়াব ক্যানাল কলোনীতে ঘোড়-দৌড়ের জন্য এমন উৎকৃষ্ট ঘোড়া তৈয়ারী হইতেছে যে ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া

হইতে আর ঘোড়া আমদানি করিতে হইবে না। অথচ এই ঘোড়া সস্তা।

আসামের জমির খাজনার কিঞ্চিৎ নমুনা

বাঁদর চলিহা মরিয়ানীর অদূরবর্ত্তী এক স্থান। আসামে সম্প্রতি জমি জরীপ আরম্ভ হইয়াছে। জরীপ কর্ম্মচারী বাঁদর চলিহা বাগিচা ও বাঁদর চলিহা গাঁও সম্বন্ধে খাজনার কথা এইরূপ জানাইয়াছেন :—

জমির বিশেষ নাম		বাঁদর চলিহা বাগিচা	বাঁদর চলিহা গাঁও
১। ভালবারি বিঘা প্রতি		২৶০	১৸৵০
২। বারি	”	১৷৵০	১৷৶০
৩। টেক্‌লা বারি	”	৸৴০	৷৶০
৪। দ'চমা পড়া	”	১৸৵০	১৷৷৵০
৫। বাম্	” ”	১৶০	১৲
৬। দ' আলুটিয়া	”	১৷৶০	১৷০
৭। বাম্	” ”	৸৴০	৷৷৶০
৮। দ' বালুচটিয়া	”	১৴০	৸৶০
৯। বাম্	” ”	৷৵০	৷৷৴০
১০। বাম জলাটক	”	১৴০	৸৶০
১১। দ'	” ”	৷৵০	৷৴০
১২। চেচুকিয়া	”	৷৷৴০	৷৷০
১৩। ফারিঙ্গাচি	”	৷৷৴০	৷৷০

ভারতে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

(১৯২৭, এপ্রিল)

১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে ২৮টা কোম্পানী ৬৫ লক্ষ টাকা লইয়া গঠিত হয়।

১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে ৪১টা কোম্পানী ১,৮৫ লক্ষ টাকা লইয়া গঠিত হইয়াছে।

এই সনের মার্চ্চ মাসে ৪৭টা কোম্পানী ১,৩৮ লক্ষ টাকা লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

এই সনের এপ্রিল মাসে সব চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান :—

(১) বাঙ্গালার ইষ্ট বেঙ্গল জুট মিল্‌স্

(২) বোম্বাইয়ের বোম্বে ষ্টীমশিপ

প্রত্যেকটার অনুমোদিত পুঁজিপাটার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে ১১টা লিমিটেড কোম্পানী কাজ বন্ধ করিয়া দেউলিয়া হইয়াছে অথবা উপিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের মোট অনুমোদিত পুঁজিপাটার পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ টাকা। আর ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে ১১টা কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছিল। কিন্তু এগুলি উপিয়া যায় এপ্রিল মাসে। ইহাদের একত্র পুঁজিপাটার পরিমাণ ১,২২ লক্ষ টাকা।

১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে অনুমোদিত পুঁজিপাটার পরিমাণে নিট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ২৮ লক্ষ টাকার উপর। এই বৃদ্ধিটা শুধু বর্ত্তমান জয়েণ্টষ্টকগুলিতে ঘটিয়াছে।

ভারতের সরকারী রেলওয়ে

১৯২৭ সনের ১৪ মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত সরকার-শাসিত রেলওয়ের মোট স্থূল আয় ২০৬ লক্ষ টাকা। তার আগের সপ্তাহে আয় হইয়াছে ২০২ লক্ষ টাকা। ১৯২৬ সনের ১৪ মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল তাতে স্থূল আয় হইয়াছিল ১৯২ লক্ষ টাকা।

১৯২৬ সনের ১৪ মে যে বছর শেষ হইয়াছিল তাতে সরকারী রেলওয়েগুলির একত্রে মোট স্থূল আয় হয় ১২৮৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। আর ১৯২৭, ১৪ মে পর্য্যন্ত এক বছরে হইয়াছে ১২৮৪ কোটি টাকা।

প্রধান প্রধান রেলওয়েগুলির আয় এইরূপ :—

রেলওয়ের নাম	১৯২৬ সনের ১৪ মে পর্য্যন্ত	১৯২৭ সনের ১৪ মে পর্য্যন্ত
এ, বি	১৮ লক্ষ	২০ লক্ষ
বি, এন্	১০৫ ”	১১৭ ”
বি, বি অ্যাণ্ড সি, আই	১৫০ ”	১৫৪ ”
বার্ম্মা	৬৪ ”	৬৬ ”
ই, বি	৬০ ”	৭৭ ”
ই, আই	২৩৯ ”	২৬৮ ”
জি, আই, পি	১৯৫ ”	১৮৯ ”
এম, অ্যাণ্ড এস্, এম্	১০৯ ”	১০৩ ”
এন্, ডাব্লিউ	১৮২ ”	১৮৬ ”
এস্, আই	৬৮ ”	৬৯ ”

গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে (১৪ মে, ১৯২৭) বোম্বে বড়োদা, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ছাড়া অন্য সব রেলওয়ের স্থূল আয় বাড়িয়াছে। গত বছরের এই সপ্তাহের তুলনায় গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা ও মান্দ্রাজ অ্যাণ্ড সাদার্ণ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ছাড়া আর সব রেলওয়ের আয় বাড়িয়াছে। বাড়টা এইরূপ হইয়াছে :—

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ৬১ লক্ষ টাকা। হেতু প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর বৃদ্ধি এবং কয়লা ও সাধারণ পণ্য বেশী হইয়াছে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ৩ লক্ষ টাকা। হেতু ট্রাফিক বৃদ্ধি এবং কয়লা, চুণা, ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা,চাউল, কাঠ, নুন, খাদ্যসম্ভার ও পাট বেশী বহন।

আগ্রা-অযোধ্যার ফসলের বিবরণ (১৯২৬)

অন্য শস্যের সঙ্গে মিশাইয়া ধারে ধারে ও লাইনে লাইনে মসিনা বীজ ও রাই বীজ লাগান হয়। ১৯২৫ সনে এইরূপ রোপিত মসিনা ও রাইয়ের জমির আয়তন যথাক্রমে ৭০,২,০০০ একর ও ২৪,৪৯,০০০ একর ছিল। ১৯২৬ সনে ইহার আনুমানিক আয়তন মোটামুটি ৬,৬৮,০০০ একর ও ২২,৪১,০০০ একর দাঁড়াইয়াছে।

কতকগুলি জিলাতে তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ও অত্যধিক বাতাসের ফলে শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং "নর্ম্যালে"র তুলনায় আদায়টা কিছু কম হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশে নর্ম্যালের ৮৩% মসিনা ও ৭৫ % রাই পাওয়া যাইবে। গত বছর এই উভয়ের ৭০ % পাওয়া গিয়াছিল।

অন্য কিছুর সহিত মসিনা রোপণ না করিয়া ১৯২৫ সনের আদায় ছিল ৫৯.০০৭ টন। আর ১৯২৬ সনে হইয়াছে ৬৭,১৪৬ টন। ঐরূপ রাইয়ের আদায় ২৩,৬৭৪ টন (১৯২৫) ও ২৭,৮১৫ টন (১৯২৬)। অন্যান্য শস্যের সঙ্গে মিশাইয়া প্রধানতঃ নিজ-গৃহের অভাব মোচন জন্য উৎপাদিত মসিনা-বীজ ও রাই-বীজের পরিমাণ যথাক্রমে ১,১৪,০০০ ও ৪,২১,০০০ টন।

গম

বিশুদ্ধ গমের ক্ষেত আছে। আবার বালি ও ছোলা ইত্যাদির সহিতও গম রোপণ করা হয়। সম্প্রতি তার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। এখন আয়তনের পরিমাণ ৬৭,১৬,৯০০ একর। ১৯২৫ সনে ছিল ৬৮,৭৭,৭৪০ একর। সুতরাং এ বছর ১,৬০,৮৩১ একর কম বা ২·৩% কম।

শস্য পাকিবার সময় খুব জোরে বাতাস হওয়ায় কয়েকটা জিলায় শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশে নর্ম্যালের ৮০ % শস্য পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। গত বছর পাওয়া গিয়াছিল ৭৫ %।

শুধু গমের ক্ষেত্র হইতে ১৯,৫৫,০০০ টন পাইবার সম্ভাবনা আছে। ১৯২৫-২৬ সনে ১৮,০৩,০০০ টন পাওয়া গিয়াছিল। বালি ও ছোলা ইত্যাদির সঙ্গে রোপিত গম এবছর (১৯২৬-২৭) ৫,৩৯,০০০ টন পাওয়া গিয়াছে। এ বছর মোট গম ২৪,৯৪,০০০ টন পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে। গত বছরের অনুমানটা ছিল ২২.৮৪,০০০ টন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিল ২২,৮৭,০০০ টন।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এশিওর্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

এই কোম্পানীর গত ৩০ বছরের উন্নতির বিবরণ নিম্নরূপ :—

২৮ শে ফেব্রুয়ারী যে বছর শেষ হইয়াছে	নূতন পলিসির টাকার পরিমাণ	প্রিমিয়াম ও সুদ হইতে বাৎসরিক আয়	মোট পাওনা
১৮৯৮	১০,৫৯,০০০৲	৫১,০০০৲	৮৪,০০০৲
১৯০২	১৬,৭৭,০০০৲	২,১৩,০০০৲	৩,৬৩,০০০৲
১৯১২	৬২,৬৬,০০০৲	১৮,২৮,০০০৲	৫৮,৯৩,০০০৲
১৯২২	৭০,২৯,০০০৲	৩৭,০২,০০০৲	১,৯৪,৬৮,০০০৲
১৯২৭	১,০৬,৪৪,০০০৲	৫২,৮৪,০০০৲	২,৯৫.০৯,০০০৲

ভারতে উক্ত কোম্পানীর অবস্থা নিঃসন্দেহ খুব ভাল। সম্প্রতি হেড আফিসের জন্য ঘরবাড়ী কিনিয়া তথায় গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টরেরা আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছিলেন। বাড়ীটা খুব চমৎকার লাইফ আফিস্ হইবার উপযোগী। ছাদ বেশ উঁচু। কোঠাগুলি বেশ উজ্জ্বল, আলো-বাতাস-পূর্ণ।

এই কোম্পানী ১৮৯৭ সনে স্থাপিত হয়। সেই বৎসরই বোম্বেতে প্রথম প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে ঐরকম দুঃসময়ে কোম্পানীর কাজ আরম্ভ করা ও ভবিষ্যতে লাভের আশা করা কম দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে। প্রশংসাটা তখনকার ম্যানেজারদের প্রাপ্য। এই কোম্পানী ভারতের বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের বন্ধুস্বরূপ কাজ করিয়া আসিয়াছে।

ভারতীয় সূতা ও সূতায় বোনা দ্রব্য

"কমার্শ্যাল ইন্‌টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট" বা বাণিজ্যিক সংবাদ বিভাগের রিপোর্ট এইরূপ :—

(১) ভারতীয় কটন মিলগুলিতে বিগত মার্চ্চ মাসে—

সূতার পরিমাণ ...	৭ কোটি পাউণ্ড
সূতায় তৈয়ারী দ্রব্যের পরিমাণ	৪½ কোটি পাউণ্ড
১৯২৬ (মার্চ্চ মাসে) সূতার পরিমাণ	৬·৬ কোটি পাউণ্ড
" " " সূতার দ্রব্য	৪·২ কোটি পাউণ্ড

অর্থাৎ বৃদ্ধিটা যথাক্রমে—৬% ও ৯·৬%।

(২) তুলার বছর আরম্ভ হয় সেপ্টেম্বর মাস হইতে

১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৭ সনের মার্চ্চ অবধি

৬ মাসে কাটা সূতার পরিমাণ	৪৭.৪ কোটি পাউণ্ড
ঐ সময়ে সূতার তৈয়ারী দ্রব্যের পরিমাণ	৩১.৬ কোটি পাউণ্ড
১৯২৫-২৬ সনের ঐ ছয়মাসে সূতা	৩৬.৭ কোটি পাউণ্ড
এবং সূতায় তৈয়ারী দ্রব্য	২৭.৪ কোটি পাউণ্ড

(৩) ১৯২৬ সনের এপ্রিল হইতে ১৯২৭ সনের মার্চ্চ অবধি—

কাটা সূতার পরিমাণ	৮০.৭ কোটি পাউণ্ড
সূতায় বোনা দ্রব্যের পরিমাণ	৫৩.৯ কোটি পাউণ্ড

(৪) বৃটিশ ভারত হইতে সমুদ্র-পথে ভারতীয় সূতা রপ্তানির হিসাব (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ অবধি)—

১৯২৪-২৫ সনে	...	৩.৭ কোটি পাউণ্ড
১৯২৫-২৬ সনে	...	৩.২ কোটি পাউণ্ড
১৯২৬-২৭ সনে	...	৪.২ কোটি পাউণ্ড

(৫) ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে—

মোটা সূতার উৎপাদন-পরিমাণ ...	৫.৯ কোটি পাউণ্ড
বাহির হইতে আমদানি আসিয়াছে মাত্র	১.১ লক্ষ পাউণ্ড
মিডিয়াম কাউন্টের উৎপাদন	১.০ কোটি পাউণ্ড
আমদানির পরিমাণ	২২ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড
ফাইন কাউন্টের উৎপাদন	১০ লক্ষ ২৮ হাজার পাউণ্ড
আমদানির পরিমাণ	৬ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড

চিনিখোর ভারত

চিনির আমদানি পরিমাণে বাড়িয়াছে অল্প—

১৯২৫-২৬ সনে...৩,১৪,৪৭৫ টন

১৯২৬-২৭ সনে...৩,২৩,৮৮৭ "

কিন্তু দামটা বাড়িয়াছে অনেক বেশী—

১৯২৫-২৬...৬২৫.৯৪ লাখ টাকা

১৯২৬-২৭...৭১৯.৮০ " "

দরের গতি

জাভাতে চিনির ফসল ভাল হয় নাই। এই বৎসর মরিশস্ ও কিউবাতে প্রবল ঝড় হওয়ায় ঐ দুই স্থানের চিনির ক্ষেতও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সব কারণে চিনির দর বেশ দৃঢ় ছিল অর্থাৎ বেশী নামা-উঠা করে নাই।

চীন ও ইয়োরোপ

কিন্তু শেষ কয়েক মাসে চীন তার রাষ্ট্রীয় গোলযোগের জন্য জাভার চিনি লইতে অস্বীকার করে; কিউবা চিনির জন্য ইয়োরোপের খাঁইটাও আশানুরূপ হয় নাই। ফলে সারা দুনিয়ায় চিনির দর নামিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বাজার

কলিকাতার বাজারের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় বাজারের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।

কাথিয়াবাড় বন্দরের ভিতর দিয়া আনীত চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব একথা বোম্বাই ও করাচী কিছুকাল যাবৎ বুঝিতে পারিয়াছে।

কিন্তু এই বছরের শেষের দিকে কলিকাতার এক জবর ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ যাবৎ কানপুর ও আগ্রা বাজার খাঁটি কলিকাতার বাজার বলিয়া মনে করিয়া আসা হইতেছিল। বস্তুতঃ, ঐ দুই বাজারে কাথিয়াবাড় দিয়া চিনি আমদানি হইতেছে।

ষ্টক-বৃদ্ধি

ফলে জাভা হইতে দ্রুতবেগে যে যোগান আসিতেছিল তা জমিতেই থাকিল। বাহির হইবার পথ পাইল না।

ডিসেম্বরের শেষ হইতে মার্চ্চের শেষ অবধি ষ্টক ২০ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ৪৪ হাজার টন হইয়াছে।

জাভা চিনি

১৯২৫-২৬—৩,০৯,৪৫৬ টন

১৯২৬-২৭—৩,০৫,২৮৪ „

আমদানি সমস্ত চিনি বছর শেষের পূর্ব্বে শুল্কাগারে জমা-বন্দী হইলে সম্ভবতঃ এ বছরের পরিমাণটা গত বছরের চেয়ে অল্পমাত্র বেশী হইত।

বীট-চিনি

১৯২৫-২৬ আমদানি…২,১১৫ টন

১৯২৬-২৭ „ …১১,১৯৩ „

যুক্তরাজ্য হইতে আসিয়াছে মাত্র ১৭৫ টন। কিন্তু যোগানের অধিকাংশ আসিয়াছে জার্ম্মাণি ও চেকো-শ্লোভাকিয়া হইতে।

খাঁড় গুড়

আমদানি নিম্নরূপ—

১৯২৫-২৬—৬৫,৫৭৮ টন

১৯২৬-২৭—৮৬,৫৭৯ „

ভারতে লবণের আমদানি

সকলের আগে চোখে পড়ে যে, যুক্তরাজ্য হইতে নুনের আমদানি ভয়ানক পড়িয়া গিয়াছে। হেতু বিলাতের ধর্ম্মঘট। ১৯১৮-১৯ হইতে ইহাই সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ।

কিন্তু যোগান কমিয়া যাওয়ায় যুক্তরাজ্যের নুনের দাম চড়িয়াছে। অন্যান্য বাবদেও দর বাড়িয়াছে।

জার্ম্মাণির পোয়াবারো

এ বছরও এডেনই লবণের সর্ব্ববৃহৎ যোগানদার। জার্ম্মাণি ভারতের বাজারে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ নুন বেচিয়াছে এবং দাম আদায় করিয়াছে ডবলেরও বেশী।

ষ্টক

ষ্টকের অবস্থা এইরূপ :—

১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ—৫৬,৭৬৮ টন।

১৯২৭ „ „ „ —৪৩,০১০ „

সিমলায় লঙ্কাকাণ্ড

১২ই জুন মধ্যরাত্রে সিমলার প্রধান সড়ক মলের ধারে ধারে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। ভোলারামের মদের দোকানের সামনে আগুনটা প্রথমতঃ লাগে। ৬টা বাড়ী এক-দম পুড়িয়া যায় ও অন্য কতকগুলি অল্প-বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগুনটা ঠিক কোন্‌খানে কখন লাগিয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। যখন এই আগুন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক ডিপো ও মেসার্স ঘন্টমল পান্নালালের মধ্যবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে তখন ইহাতে লোকের দৃষ্টি পড়ে। সমগ্র সিমলা শহর জাগরিত ও ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে।

আগুন লাগার আধ ঘণ্টা পরে ফায়ার ব্রিগেড অকুস্থলে উপস্থিত হয়। ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। ২॥০টার পূর্ব্বে আগুন সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই।

এরূপ আগুন সিমলায় ইতিপূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। লোক মরে নাই; কিন্তু সম্পত্তিনাশের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা হইবে। ইহার কিয়দংশ ইন্‌শিওর করা ছিল।

শ্রীযুক্ত আব্দুল আজিজ, প্যারিস হাউস, উবেরায় লিমিটেড ও উকিম ব্রাদার্স্‌রা রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু তাদের মালপত্র অনেক বিনষ্ট হইয়াছে।

কাশী বিদ্যাপীঠ

স্কুল বিভাগের শেষ পরীক্ষার নাম বিশারদ পরীক্ষা।

এই পরীক্ষা অথবা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়া কলেজ বিভাগে প্রবেশ করা যায়।

কলেজ বিভাগে ৪ বছর পড়িতে হয়। তার বন্দোবস্ত এইরূপ :—

(১) প্রথম ২ বৎসর। যে যে বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দিবার চেষ্টা করা হয়, সেগুলির নাম হিন্দী, সংস্কৃত, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ও ইংরেজী।

(২) শেষ ২ বৎসর। নীচের যে কোন একটা বিষয়ে ছাত্রদিগকে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। (ক) ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র (খ) দর্শন (গ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতা।

সকল প্রকার শিক্ষা হিন্দী ভাষার সাহায্যে দেওয়া হয়। ৫০টা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বাপেক্ষা দামী বৃত্তিগুলির মূল্য ১০৲। কোন ছাত্র ১৫৲ টাকার কমে চালাইতে পারে না।

লেক্‌চার অথবা বাসস্থান বাবদ কোন খরচা লওয়া হয় না। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে ভর্ত্তি হইবার সময়।

ভারতের আমদানি

১৯২৬ সনের মে মাসের সহিত ১৯২৭ সনের মে মাসের আমদানির তুলনা এইরূপ :—

	লাখ টাকা	হ্রাস-বৃদ্ধি (লাখ টাকা)
খাদ্য, পানীয়, তামাক	২,১৫	১৪
কাঁচা মাল ও শিল্পজাত নয় এমন দ্রব্য	২,৫৩	+১৬
সম্পূর্ণ অথবা প্রধানতঃ শিল্প (ম্যানুফ্যাক্‌চার) জাত দ্রব্য	১৫,৩৫	—২০
জ্যান্ত জানোয়ার	১	—৪
ডাক বিভাগ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি	৩০	+৩

খাদ্যের মধ্যে চিনির আমদানি কমিয়াছে, কিন্তু গম বাড়াতে তার কিছু পূরণ হইয়াছে। কাঁচা মালের বৃদ্ধিটা প্রধানতঃ কাঁচা তুলা আমদানির দরুণ। লোহা তামার বাসন ("হার্ডওয়্যার") ও তুলাজাত দ্রব্যের দাম কমাতে শিল্পজাত আমদানির মূল্য কম হইয়াছে।

রপ্তানি ভারত

১৯২৬ সনের মে মাসের সহিত ১৯২৭ সনের মে মাসের রপ্তানির তুলনাটা এইরূপ :—

	লাখ টাকা	হ্রাস-বৃদ্ধি (লাখ টাকা)
খাদ্য, পানীয়, তামাক	৭০৭	+৪৬
কাঁচা মাল ও উৎপন্ন দ্রব্য	৯,৮২	—১,৪৫
সম্পূর্ণ অথবা প্রধানতঃ শিল্প-জাত দ্রব্য	৭,১০	+৬৬

খাদ্য শস্য (প্রধানতঃ চাউল) ও কফির রপ্তানি বাড়িয়াছে। কাঁচা তুলা, তিসির রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে, যদিও কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়ায় তার কিছুটা পূরণ হইয়াছে। গানি কাপড়, আফিং ও পীসগুড্‌ বাড়াতে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে নূতন নূতন পথে লাইন খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এই বছরে খরচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ৯৯·২৫ লাখ টাকা। তন্মধ্যে ৬০·৯০ লাখ খরচ হইবে যে সব লাইন আরম্ভ হইয়াছে ও হইবে তাহাতে। যে যে জনপদের মধ্য দিয়া লাইন যাইবে তার অধিকাংশই উর্ব্বর। সুতরাং রেল খুলিলে লাভের সম্ভাবনা আছে। এই বছরের বাজেটে নিম্নলিখিত নূতন লাইনগুলি তৈয়ারীর সংস্থান করা হইয়াছে—

শিবসাগর রোড খোয়াঙ রেলওয়ে—৩৮ মাইল। আনুমানিক খরচ ৩৩·২০ লাখ টাকা।

ফারকাটিং—বাদলীপাড়া জোরহাট রেলওয়ে—৪২ মাইল। আনুমানিক খরচ ৩০·৪৮ লাখ টাকা।

নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ রেলওয়ে—১৭ মাইল। ২০·৩০ লাখ টাকা।

জাহাজ ভারত

	ভারতে পৌঁছিয়াছে	ভারত ছাড়িয়াছে
১৯২৬—মে	২২৯	২৮০
১৯২৭—মে	২৫৪	২৫৫

এটা হইতেছে মাল-জাহাজের হিসাব।

আবকারী রাজস্ব

সন	"লিকার" ও ড্রাগ বাবদ মোট আদায় (টাকা)	লিকার আদায় (টাকা)	ড্রাগ আদায় (টাকা)	লিকার দোকানের সংখ্যা	ড্রাগ দোকানের সংখ্যা
১৯০১-০২	৬,১৬,৮৭,৮৪৬	৪,৫১,১৯,৫১৮	১,৬৩,৪১,৪৮৩	৮৪,৯২৫	২০,১৫৫
১৯০৪-০৫	৭,৭৬,৮১,১৫০	৫,৭৬,৪৫,২২৩	১,৯৭,৯৬,৮২৭	৯১,১৩৮	২১,৯৭৮
১৯০৮-০৯	৯,৫৮,১০,২২৪	৭,১২,৩৫,৭৪১	২,৪২,৫৮,৬১৮	৭৩,৩৫০	২০,০০৫
১৯১২-১৩	১২,৩২,৭২,৩৯২	৯,২৮,৬৩,৭৫৩	২,৯৯,৮১,১৮৪	৫৯,৮৬৫	১৮,৭৬৭
১৯১৬-১৭	১৩,৮০,৯২,১৮৬	১০,১৫,৬৫,৮৫৪	৩,৫০,৫২,২৩১	৫১,৮২৪	১৭,১৭৭
১৯২০-২১	২০,৩৭,৩৮,২৯১	১৫,৫৮,৭৬,৮৪২	৪,৭০,০০,৭৬৮	৪৮,৩৮৮	১৬,৬৫১
১৯২৪-২৫	১৯,২৪,৯০,৪০১	১৪,৩৩,৭৮,২০৯	৪,৭৮,০২,৯৪০	৪৪,৬৯৬	১৪,৪২৫

বৃটিশ ভারতে লিকার (১৯২৫-২৬)

(১) মদ্য-(ক)

দেশের নাম	দেশজ স্পিরিট ইম্পীরিয়াল্ এল, পি গ্যালন	আমদানি স্পিরিট্স্ ইম্পীরিয়াল গ্যালন	আমদানি "ওয়াইন" ইম্পীরিয়াল গ্যালন	আমদানি মল্ট লিকার ইম্পীরিয়াল গ্যালন
বোম্বাই	১৩,৮৭,৩৯০	২,১৭,২৪০	২৯,৭৯২	৪,৯৯,৩৪৪
বঙ্গদেশ	৬,৩২,৩৫১	২,২৩,১৬৮	৩৭,৭৬৭	৪,৩১,৮৪২
যুক্ত প্রদেশ	৩,৭১,৪৫৩	৬৯,৭২১	১৬,৩৭৭	২,১৫,২৬৫
পাঞ্জাব	৩,০২,৭৫৮	৫২,৯০৭	১৮,০৪৫	১,৯৭,০৬৭
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫,৫৪,৩৭৫	১৪,৮১৪	২,৩৬৬	১,৮৫,৫৯৭
আসাম	২,৩৭,৪৮০	—	২,৯৪৪	২২,৬৫৪
উঃ-পঃ সীমান্ত	২১,২৯৩	১৮,০৯৪	৫,০০৬	৯২,৩৪৪
বিহার উড়িষ্যা	১১,২৪,০০৯	১৫,৯৯০	৫,৩০০	৮০,৫৯৩
ব্রহ্মদেশ	১,০৮,৭৬৬	—	—	—

ভারতীয় মদ-(খ) ও ঔষধ-মদ-(গ)

দেশের নাম	ভারতীয় স্পিরিট ইম্পীরিয়াল গ্যালন	ভারতীয় মল্ট লিকার ইম্পীরিয়াল গ্যালন	ঔষধার্থ মদ ইম্পীরিয়াল গ্যালন
বোম্বাই	৭,১১৯	২২,৬৭০	—
বঙ্গদেশ	—	—	৯,৪০১
যুক্তপ্রদেশ	২৭,৮৫৬	১,০৬,৭০০	—
পাঞ্জাব	১৪,৪৫১	১৫,০৭,২৮৬	৫২২

দেশের নাম	ভারতীয় স্পিরিট ইম্পীরিয়্যাল গ্যালন	ভারতীয় মল্ট লিকার ইম্পারিয়্যাল গ্যালন	ঔষধার্থ মদ ইম্পারিয়্যাল গ্যালন
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৬,২৮১	১,৩৪,১৯৭	২৬০
আসাম	—	—	১৩২
উঃ-পঃ সীমান্ত	৮,৮৫৩	২,১১,০৯৯	—
বিহার-উড়িষ্যা	৫৬৫	—	৬৭৭
ব্রহ্মদেশ	১,৮০০	১,৮১,৯৭৬	—

(২) আফিং (ক)—চরস্ (খ)—গাঁজা (গ)—ভাঙ্ (ঘ)

দেশের নাম	আফিং-সের	চরস্-সের	গাঁজা—সের	ভাঙ্—সের
বোম্বাই	২৪,৫৫১	—	৪৪,৪৪১	৭,৬৬১
বঙ্গদেশ	৩৯,৯৪৫	২,৭৫১	৭১,৪৭৩	১৭,৪৭৭
যুক্তপ্রদেশ	২১,৯৯৬	২৪,৭৭৪	১১,৪৮৬	১,১৫,৭১৪
পাঞ্জাব	৩৪,৯২৯	৪৪,৭৯২	—	১,১০,০৪০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩১,৭৪৫	—	২৪,৮৫৮	১,৭৪৩
আসাম	৩৩,৬২৬	—	১৮,৫৫৭	—
উঃ-পঃ-সীমান্ত	১,৯১১	৪৩১	—	৪,৫৫৪
বিহার-উড়িষ্যা	৩৪,৫৪৯	—	৬৩,৮৯৭	১২,৭৮২
ব্রহ্মদেশ	২৭,২৪১	১২২৮	—	—

৩২ কোটি ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার-ধনরত্ন আমদানি

১৯২৭ সনের মে মাসে ভারতে প্রজাগণ ৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ধনরত্ন আমদানি করিয়াছে। ১৯২৬ সনের মে মাসে করিয়াছিল ৫০ কোটি ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার।

ভারত হইতে ধন-রত্নের রপ্তানিটা যথাক্রমে ১৮ লক্ষ (১৯২৭,মে) ও ১৯ লক্ষ (১৯২৬,মে) টাকার।

পাঞ্জাবের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

পাঞ্জাবের "ডিরেক্টর অব্ ইন্ডাষ্ট্রীজ্", গত ৩ বছরে (১৯২৪-২৬) ঐ প্রদেশে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর কিরূপ প্রসার হইয়াছে তার সম্বন্ধে বহু তথ্য ও অঙ্ক তাঁর রিপোর্টে বাহির করিয়াছেন।

১৯২৪ সনে এই বিভাগ পাঞ্জাব গবর্মেণ্টের ব্যবসা বিভাগের সহিত মিশিয়া যায়। ১৯২৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ পাঞ্জাবে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড্ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৩০।

তারপর ৩ বছরে ৮৭টা নূতন কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ৪৬ টা দেউলিয়া হইয়াছে অথবা বিভাগের রেজিষ্টার হইতে তাহাদের নাম কাটা হইয়াছে।

১৮টা ব্যাঙ্কিং কোম্পানী

নূতন কোম্পানীগুলির মধ্যে ১৮টা ব্যাঙ্কিং কোম্পানী। গত ৩ বছরের অঙ্কগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একথা স্পষ্ট হয় যে, শিল্প-প্রসারকামী প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে বাণিজ্যিক ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশ্যনগুলিই জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী আকারে বেশী গড়িয়া উঠিয়াছে।

কতকগুলি দোষ

কতকগুলি কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ দুই প্রকার প্রস্পেক্টাস্ বাহির করিয়াছে। একটা রেজিষ্ট্রারের কাছে

দাখিল করিয়াছে, অন্যটা অংশীদারদের বিলাইয়াছে। এইরূপ জুয়াচুরি কিছু কিছু ধরা পড়ায় লোকে সাবধান হইয়াছে।

কোন কোন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টররা গুরুতর প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়াছে। আইনের সাহায্যে ইহাদিগকে দমনের চেষ্টা হইতেছে।

ব্যালান্স শীট পরীক্ষা করা অনেক স্থলে কষ্টকর হইয়াছে। কারণ কোন কোন কোম্পানী বুঝেনা জয়েণ্ট ষ্টক প্রতিষ্ঠানে প্রধান অস্ত্র হইতেছে ভাল অডিট্।

৩৭টা ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠান

সোসাইটিস্ রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে ৪৬টা কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৭টা ধর্ম্ম ও শিক্ষাদানমূলক।

চায়ের বাজার

মোটের উপর বৎসরটাকে উৎপাদনকারীদের পক্ষে সুবৎসরই বলিতে হইবে। তবে বছরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে গত বছরের দ্বিতীয়ার্দ্ধের চেয়ে দর নামিয়া গিয়াছে।

প্রথমার্দ্ধে দর চড়া ছিল। সেই সুযোগে বহু উৎপাদক দাঁও মারিতে গিয়া চা তোলার কাজ ভাল করে নাই অর্থাৎ বাছিয়া বাছিয়া ভাল পাতা তুলে নাই। এদিকে ভারতে ও বিদেশে যে গত বছরের চেয়ে অনেক বেশী চা উৎপাদিত হইয়াছে, সে খেয়াল হয় নাই। ফলে লণ্ডনে চায়ের ষ্টক ক্রমাগত জমিতে থাকে ও প্রকাশ্য নীলাম হইতে প্রচুর পরিমাণে সরান হইতে থাকে। দর ক্রমাগত নামিতে থাকে।

বাজারে এত চা আসিতে থাকিলে দর না নামিয়া যায় না। বাছিয়া চা না তোলার ফল ফলিতে লাগিল। সামান্য চা ক্ষতি দিয়া বিক্রী করিতে হইল। ১লা মার্চ হইতে রপ্তানি-শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবু ১৯২৭ সনের চিত্রটা উজ্জ্বল নয়। লণ্ডনে জমা ষ্টকের পরিমাণ দেদার। আর অধিকাংশ জিলায় সুবৃষ্টি হওয়াতে প্রথম কয়েক মাসে আদায়টা বেশ ভারি হইবে। আশা করা যায়, কোম্পানীগুলি ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের বাৎসরিক সভায় আবেদনগুলিতে কর্ণপাত করিবে অর্থাৎ চায়ের পরিমাণের দিকে দৃষ্টি না দিয়া গুণের দিকে দৃষ্টি দিবে।

উৎপাদন ২ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড বেশী

জুলাই মাসে একটু ভাঁটা পড়িয়াছিল। তা ছাড়া সারা বছর চমৎকার ঋতু ছিল। অক্টোবরের শেষে ১৯২৬ সনের ঐ সময়ের পরিমাণের চেয়ে ফসল দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড বেশী।

উত্তর ভারতে ৩৪ কোটি পাউণ্ড চা

১৯২০-২১ সনের "বিভ্রাট" যাতে না ঘটে সেজন্য স্থির হয় যে, ১৯২৬ সনের নবেম্বর ২০ হইতে চা ম্যানুফ্যাকচার বন্ধ থাকিবে। ৮৫% কোম্পানী এই উপায় অবলম্বন করে। তাতে উত্তর ভারতে ১৯২৫ সনের তুলনায় বাড়্‌তিটা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডে নামিয়াছে। ১৯২৬ সনে উত্তর ভারতের অনুমিত আদায় ৩৪ কোটি পাউণ্ড। ১৯২৫ সনে ইহা ছিল ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। দুঃখের বিষয়, দারজ্জিলিং ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চা অল্প জন্মিয়াছে।

ভারতীয় চা-রপ্তানি

(১৯২৭ ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৭ ২১শে জুন, পর্য্যন্ত)

	সীজ্‌ন ১৯২৭-২৮	সীজ্‌ন ১৯২৬-২৭
যুক্তরাজ্য (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম)	১,১৮,৮৫,৯৯৪	১,৮৯,২৬,৫৪০
অষ্ট্রেলিয়া ...	১৮,৪২২	৫,৪২৪
কানাডা ...	২,৬৯,২৭৮	২,৬০,৫৫৬
যুক্তরাষ্ট্র ...	১,০১,২৭১	১,৫৭,৮৭২
দক্ষিণ আমেরিকা	১,০৮,১২৫	৬৬,১০০
হাম্বুর্গ ও ব্রেমেন	৮০,৯১৯	১,২৬,৭৯১
ইয়োরোপীয় বন্দরসমূহ	৪১,৪২২	৭৯,৪৭৮
কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল	৬,০০০	...
হাঙ্কো	...	...

হুব্‌লাডি হেবোষ্টক্	৪,০৮,৬৪৪	...
মস্কো	...	...
সাংহাই	১,৫০০	৫০০
বাতুম্	৫,১০০	১৯,৮০০
বোম্বাই রেলে	৮,৬৭,৯৮৪	৩,৮৮,৬৮৭
” জলে	৪,৪০,১৫৫	১,৫৮,২০৬
ভারতীয় বন্দর	৯৭,৩৭৭	১,৫৫,০০০
পারশ্য উপসাগর	৪.৮২,৬৭৬	৩,৬৬,৩৫০
ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্ট	৬৬,৭৭১	৬৯,৩৯০
ব্রহ্মদেশ	৬.৫৬,০৮৪	৫,১৭,৬৪৮
মিশর	৩,০০,৮৬৫	১,৭৫,০৪৬
আফ্রিকা (উত্তর)	৪৯,০৭৮	১৪,৫২৯
” (দক্ষিণ)	৫৪,৮৭১	১.০০,৩৬৬
অন্যান্য স্থান	৯৭.৪৪৩	৩১,৬৫৭
মোট পাউণ্ড	১,৬০,৩৯,৯৭৯	২,১৭,১৯,৯৪০

দক্ষিণ ভারত হইতে ঐ কালে রপ্তানি—

যুক্তরাজ্য	৩১,৭১,৪৮৯	৩০,৪৬,১৭৮
কলম্বো	২,৮৩,১৮৯	৩,৪৫,৪৭৮
অন্যান্য স্থান	৪৬,৬৫৪	৭৫,৪১৮
মোট পাউণ্ড	১৫,০১,৩৩২	৩৪,৬৭,০৭৪

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রসার

“হরতাল” ইত্যাদির ফলে বি, এন, রেলের এবার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া রেলবৃদ্ধি বন্ধ থাকিবে না। তবে কোন কোন প্ল্যান এখন বাদ দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে এই উদ্দেশ্যে ৩২৪.৩৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। তন্মধ্যে নয়া কনষ্ট্রাক্‌শনে”র জন্য ১৩২.৬৬ লক্ষ টাকা, ও লাইনের কাজ খুলিবার জন্য ১৯১.৭২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ৪টা লাইনের জন্য নিম্নরূপ খরচ হইবে :—

(১) তম্‌সার রোড তিড়োড়ি রেলওয়ে—৩০ মাইল। খরচ—৪২½ লাখ।

(২) বর্কাখানা-ছাণ্ডিল রেলওয়ে—১৭ মাইল। খরচ —২১৫ লাখ।

(৩) রাইপুর-পার্ব্বতীপুর রেলওয়ে ২৩৪ মাইল। খরচ —৪১২ লাখ।

(৪) কেন্দ্‌লা কলিয়ারি ব্রাঞ্চ (সহায়ক সাইডিং সুদ্ধ) ৬ মাইল। খরচ ১০½ লাখ।

এগুলিতে কাজ নাকি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিহার-উড়িষ্যার হাজারিবাগ জিলার বোকারা কয়লা খনি অবধি বোকারা-রামগড় এক্সটেনশন গিয়াছে। কেন্দ্‌লা কলিয়ারি ব্রাঞ্চ তারই এক শাখা হইবে।

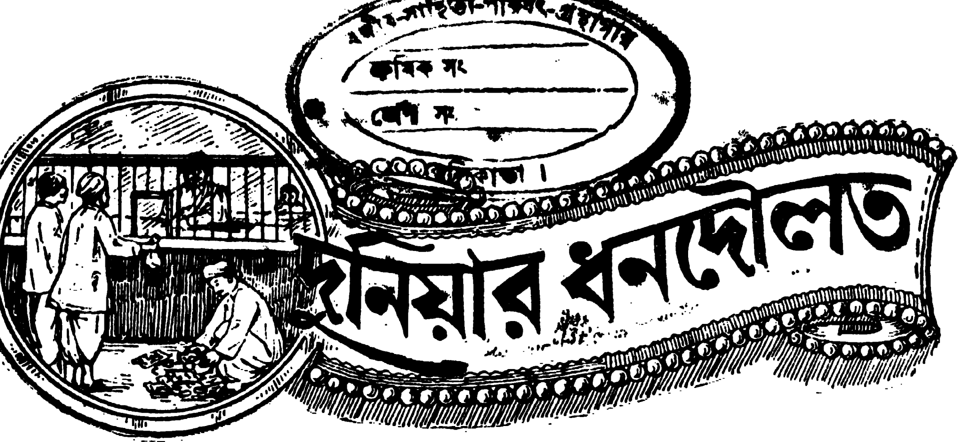
বর্ত্তমান বর্ষে লাইন খোলার কাজে ১৯১·৭২ লাখের ভিতর ১০০ লাখ খরচ হইবে এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে ও ৪৬ লাখ রোলিং ষ্টক বাবদ। প্রস্তাব আছে যে, বাণিজ্য চলাচলের সৌকর্য্যার্থে ও খরচ সংক্ষেপের জন্য অনেকগুলি “ষ্টেশন ইয়ার্ড” নব আদর্শে গঠিত হইবে ও কোন কোন স্থানে নয়া নয়া “ক্রসিং ষ্টেশন” বসাইতে হইবে।

“ষ্টেশন ইয়ার্ড” নূতন করিয়া গঠন করিবার জন্য ৯½ লাখ ও নয়া “ক্রসিং ষ্টেশন” করিবার জন্য ৩ লাখ টাকার বরাদ্দ হইয়াছে।

যে সব “ষ্টেশন ইয়ার্ড” নূতন আদর্শে গঠিত হইবে, তার কতকগুলির নাম :—বিলাসপুর, রায়পুর, শালিমার, ভদ্রক, পলাশ। মনে রাখিতে হইবে, বিলাসপুর ও রায়পুর হইতেছে এই রেলওয়ের মধ্যপ্রদেশস্থ দুই বড় রেলওয়ে জিলা ; শালিমারে (কলিকাতার নিকটে) রেলওয়ে ওয়ার্কশপ আছে ; কয়েক মাস আগে মান্দ্রাজ লাইনে ভদ্রকে গুরুতর কলিশন ঘটে।

কয়লা বাণিজ্যের “খাঁই” মিটাইতে গোইলকড়া-মনোহরপুর সেকশনটাকে দ্বিগুণ করা হইবে। খরচ পড়িবে ১০ লাখ। খড়্গপুরে সেটলমেণ্ট ও ওয়ার্কশপগুলির জন্য আরও বিদ্যুতের দরকার। তাই সেখানে একটা “পাওয়ার হাউস্” তৈয়ারী হইবে। বরাদ্দ ৭ লাখ।

ইহা ছাড়া আরও ১১টি লাইন ৫০০ মাইল ব্যাপিয়া খোলা হইবে। নির্ম্মাণ শেষ হইবে ১৯৩২ সনে।



যুক্তরাষ্ট্র জাপানী রেশমের বড় খরিদ্দার

১৯২৬ সনে জাপান তাহার রপ্তানি কাঁচা রেশমের শতকরা ৯৬ ভাগ বেচিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এবং বাকী ৪ ভাগ বেচিয়াছিল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের নিকট। আমেরিকার শিল্ক অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯২৬ সনে আমেরিকা জাপান হইতে ৪২১,০০০ বেল রেশম অর্থাৎ বিদেশ হইতে আগত রেশমের শতকরা ৮৪ ভাগ আমদানি করে। বিদেশ হইতে আমেরিকা ঐ সনে মোট ৫০৪,০০০ রেশম আমদানি করে। আমেরিকার রেশম চাহিদার শতকরা ৮৪ ভাগ জাপান, ১৫ ভাগ চীন এবং মাত্র ১ ভাগ ফ্রান্স ও ইতালী যোগায়। ১৯২৫ সনের তুলনায় আমেরিকার আমদানির হার শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাংহাই বন্দর হইতে রপ্তানি করা চীনা রেশমের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৪১,০০০ বেল আমেরিকা ১৯২৬ সনে ক্রয় করে। চীনের লড়াই থাকা সত্ত্বেও ১৯২৫ সনের চাইতে আমেরিকায় চীনা রেশম আমদানির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উক্রেণিয়ায় যন্ত্র-কারখানা

“সাদার্ণ মেশিনারি ট্রাষ্ট” কর্ত্তৃক যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় উক্রেণিয়ার এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অনেকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। ঐ ট্রাষ্টের ৫টি কারখানায় যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয় তাহা যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী। এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মাত্র নিযুক্ত করা হয়। লুগানস্ক ও চার্কোর রেলকারখানায় যাত্রী গাড়ী ও এঞ্জিনের বয়লার নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইতেছে। কৃষ্ণ সমুদ্র ও আজব সমুদ্রের যাত্রী ও মালবাহী-জাহাজ জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানায় নির্ম্মিত হইতেছে।

রুশিয়ার বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৬-২৭ আর্থিক সনের প্রথম ছয়মাসে সোভিয়েট গণতন্ত্র ৮০৭,৮০০ টন পেট্রোলিয়াম বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময় রপ্তানি হইয়াছিল ৬২৬,০০০ টন। রুশিয়ার আমদানি বাণিজ্যে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃটেশের হিস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩৯.৪ ভাগ। ইজিপ্টের বাড়িয়াছে ১১২.৯ ভাগ, ইতালীর ২৯.৮ ভাগ। রুশিয়ার পেট্রলিয়ামের শতকরা ৮৯.২ ভাগ যায় ইয়োরোপের বাজারে আর বাকী যায় প্রাচ্য দেশে।

হলাণ্ডের কয়লা শিল্প

ওলন্দাজ সরকারের একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলিতেছেন, ১৯২৭ সনে হলাণ্ডের খনি হইতে ৯,০০০,০০০ টন কয়লা পাওয়া যাইবে। গত সন ৬,১৯ ৫,০০০ টন কয়লা উৎপন্ন হয়। ঐ সনে আরও ৬৮৮,০০০ টন কোক কয়লা হলাণ্ডের খনিতে জন্মে। কয়লা-শহর হইতে আশেপাশের জনপদসমূহে গ্যাস সরবরাহ করিবার আয়োজন চলিতেছে। হিরলেন শহরে সর্ব্বপ্রথম গ্যাস সরবরাহ করা হইবে। ইহার পরেই হোয়েন্স ব্রোক, সিট্টার্ড প্রভৃতি শহরে গ্যাসের চলন করা হইবে।

স্পেনে স্বদেশী আন্দোলন

স্পেন সরকার স্পেনের বিদেশী কোম্পানীগুলিকে

স্বদেশী করিবার চেষ্টায় আছেন। একাজ সোজা নয়। ইহা সম্পন্ন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। হয় বিদেশী কোম্পানীগুলিকে বিস্তর টাকা দিয়া কিনিয়া লইতে হইবে, নতুবা স্বদেশী কোম্পানীগুলিকে খুব বেশী রকম সরকারী সাহায্য দিয়া বিদেশীদের ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য করিতে হইবে।

তুর্কীর খনিজ সম্পদ্

খনিজ সম্পদ্ উদ্ধারের চেষ্টা তুরস্কে জোর চলিতেছে। আনাটোলিয়া প্রদেশের খনি-জেলাসমূহে খনি-বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীরা পরীক্ষা চালাইতেছে। মুখলা নামক স্থানে যে খনিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানকার ম্যাঙ্গানিজ ভাঁটি হইতে ম্যাঙ্গানিজ সংগ্রহ করিবার কাজে তিন ইয়ার জোট করিয়াছে। এটা সরকারী সম্পত্তি। ৬০০,০০০ পাউণ্ড মূলধন লইয়া একটা তুর্কী লিমিটেড কোম্পানী খাড়া করা হইয়াছে। এই কোম্পানী মাকড়ির খনির ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলন করিবে। ঐ খনি সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে হার হোরিচ কোলবার নামক জার্ম্মাণের হাতে। ঐ লিমিটেড কোম্পানী ইতিমধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমাসিয়া জেলাগুলির নব-আবিষ্কৃত কয়লা খাদের কয়লা সংগ্রহের জন্য ৪ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে আর একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণির বস্ত্র-শিল্পে সচ্ছলতা

জার্ম্মাণির বেকার লোকের সংখ্যা আগের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কমিয়াছে। রপ্তানির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণ কটন মিলগুলি গত ৫।৬ মাসের উৎপন্ন মাল বেচিয়া সাবাড় করিয়াছে। ৩।৪ মাস এমন কি তাহার বেশী দিন পর্য্যন্ত কাপড়ের কলগুলিতে পূর্ণ সময় কাজ কারবার চলিবে। গত এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণ বস্ত্রালয়ে শতকরা ৯৮খানি তাঁত চলিয়াছে। বস্ত্রের যেরূপ অর্ডার আসিয়াছে তাহাতে জার্ম্মাণ বস্ত্রশিল্পীদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। জার্ম্মাণির পশম মিলগুলির অবস্থাও সচ্ছল। অর্ডার খুব আসিতেছে। অনেক কলকারখানায় অতিরিক্ত তাঁত বসাইতে হইয়াছে।

পোলাণ্ডে অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি

কয়লা-রপ্তানির জন্য একটা নূতন রেলওয়ে স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ৬ হাজার মজুর খাটিতেছে। পোলাণ্ডে অ্যালুমিনিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল খনিতে শতকরা ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যাইবে। পোলাণ্ডে কাটউহস নামক স্থানে প্রথম আলুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি স্থাপন করিবার জন্য এক কোম্পানীর পত্তন করা হইয়াছে। ঐ ফ্যাক্টরিতে বৎসরে ২,৪০০ টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা হইবে।

ইংল্যাণ্ডে বাড়ী নির্ম্মাণ

বিলাতে বাড়ী তৈয়ারীর হার ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত সন ২ লক্ষ গৃহ প্রস্তুত হয়। মার্চ্চ মাসে যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সনে ২১৭,০০০ গৃহ বিলাতে প্রস্তুত হইয়াছে। যুদ্ধের পর এ পর্য্যন্ত ৮৮৬,০০০খানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা ১০ লক্ষে উঠিবে।

বন্দুক বিক্রেতা ইংরেজ

১৫ই জুন ১৯২৫ হইতে ৩০শে মার্চ্চ ১৯২৭ পর্য্যন্ত ইংরেজ বন্দুক ব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের তালিকা এইরূপ :—

দেশের নাম	বন্দুক (গান্)	লিউইস্ বন্দুক	মেসিন গান্
পোল্যাণ্ড	১০৭	১২	—
গ্রীস্	৬	—	—
ইতালি	১৫	—	—
অ্যাবিসিনিয়া	১২	২৪	—
চিলি	১৪১	—	—
আর্জেন্‌টিনা	৮০	১৩৫	—
জাপান	—	৭৫	৩১১
বেলজিয়াম্	—	৬০	২০
ফিন্‌ল্যাণ্ড	—	—	১২৯
লিথুনিয়া	—	—	৫০
লাত্‌ভিয়া	—	—	১১
			ও ১০০ মেসিন রাইফ্‌ল
মোট	৩৬১ গান,	৩০৬ লিইউস্ গান,	৫২১ মেসিন গান ও ১০০ মেসিন রাইফ্‌ল

সর্ব্ব মোট—১২[illegible]।

তুলার বাজার

১

আজকাল পোল্যাণ্ডকে তুলা আনিতে হয় জার্ম্মাণির মধ্য দিয়া। আমেরিকার কয়েকজন টাকাকড়ির বেপারী লণ্ডনে গবর্মেণ্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে আসিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে বরাবর পোল্যাণ্ডে তুলা চালান দিতে হইবে। ইহাতে অন্ততঃ ৭°/০ খরচ কমিয়া যাইবে বলিয়া অনুমান হয়।

২

শ্রীযুত তাগামাকি জাপানী তুলার "স্পিনারস্ অ্যাসোসিয়েশ্যনে"র বোম্বাইস্থিত প্রতিনিধি। তিনি বলিতেছেন,—

"টেক্সটাইল টারিফ্ বোর্ড জাপানী পীস্‌গুড্‌সের উপর আমদানি শুল্কটা বাড়াইতে বলিয়াছেন। এই বাড়টা যদি সত্য সত্যই ৪°/০ হয় তবে জাপানী বাণিজ্য কাবু হইবে। সুতরাং ভারতে জাপানী মিল খোলা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকিবে না।

"ম্যানেজিং ষ্টাফ্ অবশ্য জাপানী হইবে; কিন্তু জাপানী মজুর নিয়া আসা হইবে না। একমাত্র ভারতীয় মজুর নিযুক্ত হইবে।"

বিলাতে বেগুনের চাষ

লণ্ডনের রিজেণ্ট ষ্ট্রীট নামক সড়কে শ্রীযুক্ত বীরস্বামীর এক "ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ" বা ভারতীয় হোটেল আছে। তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক নূতন ভিত্ স্থাপন কালে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি বিলাতে বেগুন জন্মাইবেন বলিয়া আশা করেন।

মোলাকাৎ কালে তিনি বলিয়াছেন, ১৯২৬ সনের শেষভাগে ৬ জন সঙ্গতিহীন কৃষিবিদ্‌কে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ লণ্ডনের এক ক্ষেতে বসাইয়া দিয়াছিলেন। তারা যন্ত্রদ্বারা চাষ করিবার পশ্চিমা রীতিনীতি আয়ত্ত করিতেছে, শীঘ্রই যথেষ্ট টাকা জমা হইলে ভারতে ফিরিয়া যাইবে, নিজেদের জমি কিনিয়া লইবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আরম্ভ করিবে।

দোকানটায় ভবিষ্যতে নানা রকম ভারতীয় শিক্ষিতরকারী পাওয়া যাইবে। আর ইহা ভারতীয় কৃষিবিদ্‌দের ইস্কুল বিশেষও হইবে। রেস্তোরাঁর চাকরেদের সংখ্যা প্রায় ১০০ এবং তারা নানা জাতের ও ধর্ম্মের ভারতীয়। এদের মধ্যে কয়েক জন খুব নামজাদা ছাত্রও আছে। তারা অস্থায়ী খানসামার কাজ করিয়া নিজেদের পড়ার খরচ চালাইতেছে।

অষ্ট্রীয়ার ইস্পাত শিল্প

অষ্ট্রীয়ার আর্থিক উন্নতির বহর ধীরে ধীরে চলিলেও দেশোন্নতির কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। বেকার লোকের সংখ্যা আগেকার তুলনায় ৫৩ হাজার কমিয়াছে। লৌহ ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন গত সনের শেষ তিন মাসের চাইতে ঢের বেশী। বাড়ী নির্ম্মাণের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং দালান কোঠা নির্ম্মাণের কাজে ব্যবহৃত লোহার মোটা মোটা অর্ডার এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীরা পাইতেছে। জার্ম্মাণির বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্রীর সাফল্য ইতিমধ্যেই অষ্ট্রীয়ায় পরিলক্ষিত হইতেছে। জার্ম্মাণ কণ্ট্রাক্টরদের নিমিত্ত অষ্ট্রীয়ানরা এই শিল্পের প্রয়োজনীয় অনেকটা পরিমাণ মাল সরবরাহ করে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার সঙ্গে কোনরূপ ব্যবসা-সংক্রান্ত সর্ত্ত না থাকায় অষ্ট্রীয়ার কটন মিলগুলি খুব লাভবান হইতেছে। মোটরের কারখানাগুলিতে সকল সময় কাজ হইতেছে না।

বিলাতে "ক্ষুদে" পুঁজিপতি বৃদ্ধি

১৯২৪ সনে লেবার গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্পব্যবসা কমিটির সম্প্রতি প্রকাশিত তৃতীয় অস্থায়ী রিপোর্টে বিলাতের পুঁজিপতিদের ধনদৌলতের একটা খসড়া পাওয়া যায়।

এই রিপোর্টে পাঁচটি বড় বড় ব্যাঙ্কে ও ১৮টি শিল্পব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে এবং জাহাজে ও বীমা কোম্পানীতে বিলাতের লোকের ধনদৌলত কি পরিমাণ খাটিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্ব্বসমেত ২১২,০০০,০০০ পাউণ্ড মূলধন আছে এবং এগুলি ৭৭৫,০০০টি অংশে বিভক্ত। গড়ে প্রত্যেক অংশীদারপিছু ২৭২ পাউণ্ড মূলধন দাঁড়ায়।

এই ১৮টি বড় বড় কারবারের শতকরা ৮৬টি অংশ

৫০০ পাউণ্ডের কম। ৪টি বড় বড় রেলওয়ে কোম্পানীতে শতকরা ৫৬ ভাগ পুঁজি ৫০০ পাউণ্ডের অধিক নয়।

সাধারণের অর্থে পুষ্ট মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাবেও দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত পুঁজি-পতিগণের সংখ্যা আশ্চর্য্য রকমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

গবর্মেণ্ট ষ্টকে খাটানো পুঁজি ধরিলে এই ধরণের পুঁজি-পতিদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। ছোটখাটো "ক্ষুদে" পুঁজি-পতিরাই প্রকারান্তরে বিপুল বিলাতী ধনসম্পদের মালিক।

ট্যাঙ্গানিকায় মাংস-ক্যানিং

আফ্রিকার কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানিকাপ্রদেশদ্বয়ে প্রায় নয় মিলিয়ন গো-মহিষ নানারূপ কারণে সামান্য কয়েকটি স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং অন্য সব বড় বড় জেলায় মাংসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তথাকার সিণ্ডিকেট গো-মহিষের মাংস-সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাহা হইলে অনেক জেলাই উপকৃত হইতে পারিবে। সিণ্ডিকেটের প্রধান উদ্দেশ্য—ক্যানিং কারখানা স্থাপন করা। কিন্তু তাহা করিতে হইলে অনেক মূলধনের প্রয়োজন। যতদিন তাহা না মিলে, ততদিন মাংস-সংরক্ষণের কার্য্য চলিবে। ইতিমধ্যেই কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশের শ্রমজীবীদিগকে বহুল পরিমাণে সংরক্ষিত মাংস সরবরাহ করা হইতেছে। নিয়মিত ভাবে পুষ্টিকর মাংস পাইলে শ্রমিকদিগের কান্তি বর্দ্ধিত হইবে এবং কাজেকাজেই তাহাদের কাজের ফলও বেশী পাওয়া যাইবে।

সিণ্ডিকেট আশা করেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা ক্যানিং কারখানা স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। পূর্ব্ব আফ্রিকায় পূর্ব্বোক্ত জন্তু অনেক আছে। তাহাদের সংখ্যা উরুগোয়ে অপেক্ষা প্রায় এক মিলিয়ন বেশী। সুতরাং বলা যায়, এইরূপ একটা ব্যবসায়ের বিশাল ক্ষেত্র তথায় বিদ্যমান।

লণ্ডনের জেনার‍্যাল ইলেকট্রিক কোম্পানী

লণ্ডনের "দি জেনার‍্যাল ইলেকট্রিক কোম্পানী" বা সার্ব্বজনীন বিদ্যুৎ কোম্পানী সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে খুব বড় অর্ডার পাইয়াছে। অর্ডারের দাম ১ লাখ টাকা। অর্ডারটা দিয়াছে লণ্ডনের "ইণ্ডিয়ান্ কপার কর্পোরেশ্যন" বা "ভারতীয় তামা-সঙ্ঘ"। সঙ্ঘের খনি ছোটনাগপুরে। তজ্জন্য যা-কিছু কলকব্জার দরকার সব বিজলী কোম্পানী যোগাইবার ভার লইয়াছে।

এই দোকানের কলিকাতাস্থ শাখার নাম জেনার‍্যাল ইলেকট্রিক কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্।

বৃটিশ বাণিজ্য ও বৃটিশ জীবন

(১)

১৯২৭, এপ্রিল মাসের বোর্ড অব্ ট্রেড রিটার্ণ এইরূপ :-

আমদানি	...	...	১০,০৭,৫০,০০০ পাউণ্ড
রপ্তানি	...	...	৫,২৬,১০,০০০ "

(২)

মজুর-সচিব স্থির করিয়াছেন যে এপ্রিল (১৯২৭) মাসে ইংল্যাণ্ডে "কষ্ট অব্ লিভিং" বা "খানাপিনার খরচ" ১৯১৪ সনের জুলাই মাসের তুলনায় শতকরা প্রায় ৬৪ পেন্স বেশী। এক মাস আগে অর্থাৎ মার্চ্চ মাসে ইহা শতকরা ৬৫ পেন্স বেশী ছিল। আর ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে ইহা শতকরা ৬৭ পেন্স বেশী ছিল।

(৩)

জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ অবধি (১৯২৭) ৩ মাসে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে জন্মের চেয়ে মৃত্যু বেশী হইয়াছে ১৬৪৪টা। আর ১৯২৬ সনের ঐ সময়ের মৃত্যু-সংখ্যার চেয়ে এই মৃত্যু-সংখ্যা ৩৮১৯৬ বেশী। এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা। আর্মিষ্টিসের পরের বছর ছাড়া অন্য যে-কোন ৪ বছরের তুলনায় এই ৪ বছরের জন্মহার নিম্নতর।

আমেরিকায় জলপ্লাবন

প্রথমে একটা খবর আসিল যে ভার্জিনিয়ার নরদোল্ড নামক স্থানে এক এয়ারোপ্লেনে বজ্রপাত হয় ও ৮ জন লোক মরে। ইহা যে আমেরিকার অভূতপূর্ব্ব জল-প্লাবনের পূর্ব্বাভাষ তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। পর পর তারিখ-গুলি সাজাইয়া ঘটনা সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এত বড় জলপ্লাবনের কথা ইতিহাসেও কমই শুনা গিয়াছে।

১লা মে, ১৯২৭। মিসিসিপি নদীর বাঁধ ৪ জায়গায় ভাঙ্গিয়াছে। পয়ড্রাসের কাছে বাঁধ কাটিয়া দিলে জল গিয়া মেক্‌সিকো উপসাগরে পড়িবে আশা করা হইয়াছিল। সে আশা সফল হয় নাই। ৪,০০০ পাউণ্ড ডিনামাইট্‌ ব্যবহার করা হইয়াছে। আরও ৪,০০০ পাউণ্ড দরকার হইলে লাগান হইবে।

হ্বিক্‌সবুর্গ শহরের অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক। আরকান্‌সাল নদী মাইলখানেক ব্যাপিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম আরকান্‌সালের ৫টা জনপদকে প্লাবিত করিতেছে।

শ্রীযুক্ত হুভার ব্রড্‌কাষ্টে লক্ষ লক্ষ লোককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমেরিকার ইতিহাসে এত বড় জলপ্লাবন আর ঘটে নাই। লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ৬০ লক্ষ একর জমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আর ক্ষতির পরিমাণ ২০ কোটি ডলার। লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া লইবার জন্য আট্‌লান্টিক তীর হইতে ট্রেণে করিয়া "রক্ষক" দল আসিতেছে"।

২রা মে লুসিয়ানা রাষ্ট্রের উত্তরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া সত্ত্বেও জলের স্রোত প্রবল রহিয়াছে। কনকড়িয়া প্রদেশের প্লাবনের সহিত আরও ৩ হাজার বর্গ মাইল যোগ হইল। ইয়াজু নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে ইডেনের কাছে এবং ১০ হাজার একর জমি জলে ডুবাইয়া দিয়াছে।

৪ঠা মে। এক্ষণে লুসিয়ানা, আরকান্‌সাল ও মিসিসিপিতে ১৫,০০০ বর্গ মাইল জমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

৫ই মে। উত্তর ও মধ্য লুসিয়ানার ১৩টা "প্যারিশ্‌"—১০০ শহর, নগর, গ্রাম লইয়া—জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। লোকজন সব পলাইয়া গিয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব লুসিয়ানায় ৪,০০০ বর্গ মাইল জমি তাড়াতাড়ি অতলে তলাইয়া যাইতেছে। হ্বিক্‌সবুর্গ ও নাচেজের মধ্যবর্ত্তী দুই স্থানে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। গৃহ-হীনের সংখ্যা ২½ লক্ষ। চাউল, তুলা, ইক্ষু ও তেলবীজের জমিগুলি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। মোট ক্ষতিটা অবর্ণনীয়।

২½ লক্ষ গৃহহীন লোক অবিশ্রান্ত দারুণ বৃষ্টিতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। লুসিয়ানার উত্তর ও মধ্য প্যারিশ্‌-গুলিতে আরও ৪৫ হাজার লোক বিপন্ন। সেখানে এক প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি হইতেছে। বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে প্রায় ৫ লক্ষ একর তুলা ও চিনির জমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

শুধু লুসিয়ানাতেই ৩০ লক্ষ একর জমি জলের নীচে গিয়াছে। (এগুলি নিউ অর্লিন্‌সের খবর)

৯ই মে, নিউইয়র্ক। পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলিতে প্রবলবেগে বারিপাত ও ঘূর্ণীবাত্যা হইতেছে। ১১ জন লোক হত হইয়াছে।

মধ্য মিসৌরিতে টর্ণেডোতে কতকগুলি স্ত্রীলোক ও শিশু মারা পড়ে। আর টেকসাসের গার্‌ল্যাণ্ডে কতকগুলি মরে। রকী মাউন্টেন রাষ্ট্রগুলি যেন বরফের কম্বলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

১০ই মে, পপ্‌লার ব্লাফ। ব্যবসাপাড়ার উপর দিয়া টর্ণেডো বহিয়া গিয়াছে। ঐ আয়তনে (২০০ গজ × ৩০০ গজ) একটা বাড়ীও আস্ত নাই। ১০০ লোক মরিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০ লক্ষ ডলার। গত রাত্রিতে সমগ্র শহর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

দুনিয়ার রবার বাজারে বৃটেন বনাম আমেরিকা

দুনিয়ার রবার বাজারে বৃটেনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের টক্কর চলিতেছে।

বাৎসরিক ষ্ট্যাটিষ্টিক অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র বিগত ১২ মাসে তার আগের বছরের চেয়ে ১৩,৭৭০ টন কম রবার ব্যবহার করিয়াছে। আর বৃটেন ১০,৮১৫ টন বেশী ব্যবহার করিয়াছে।

বাজারের অবস্থা পর্য্যালোচনা কালে মেসার্স ক্লড্‌. ম্যাথিসন অ্যাণ্ড গ্যারিট্‌ কোম্পানী বলিতেছে, "আমেরিকার বিপুল টায়ারের ব্যবসা সত্ত্বেও "কিছুকাল ধরিয়া বৃটিশ টায়ার রপ্তানি আমেরিকার রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশী দামের হইতেছে।

"অধিকাংশ বৃটিশ বেপারী সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'চষা' রবার ও সুপার কোয়ালিটি মিশরীয় কর্ড ব্যবহার করে। সুতরাং এটা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, সমগ্র দুনিয়া বৃটিশ টায়ারের মর্ম্ম ও মূল্য বুঝিতেছে। বৃটিশ টায়ারের রবার উপাদানটা প্রায় সবখানি নতুন চষা রবার। আর আমে-

রিকান্ টায়ারের ⅞ অংশ রবার পুরাণা অর্থাৎ পুরাণা রবার হইতে বাছিয়া লওয়া।"

বলা বাহুল্য এটা ইংরেজের দেওয়া ছবি, কিন্তু সম্পূর্ণ ছবি নয়। অধিকাংশ কাঁচা রবার ইংরেজের তাঁবে রহিয়াছে। সত্যের অপলাপ না করিয়া ইংরেজকে দুনিয়ার রবার-সম্রাট বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ রবারের উপর এমন কড়া ও চড়া রপ্তানি-শুল্ক বসাইয়াছে যে, আমেরিকায় তা লইয়া বহু আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। শুধু রবার লইয়া উভয়ের মধ্যে এরূপ মনান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে যে, যুদ্ধ হইতে হইতে হয় নাই আর কি! সুতরাং রবার সম্বন্ধে ইংরেজের প্রত্যেক কথা যথেষ্ট বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

নিউইয়র্কে ঝড়

১০ মে, নিউইয়র্ক। মধ্য পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে টর্ণেডোতে পপ্‌লার ব্লাফের সংখ্যা ধরিয়া মৃত্যুর সংখ্যা ১৫০। আহত হইয়াছে হাজার জন।

১১ মে। মধ্য পশ্চিমে টর্ণেডোতে নিহত হইয়াছে এই সপ্তাহে ২২৫ জন। ১০০০ জন আহত হইয়াছে। আর অসংখ্য লোক গৃহহীন হইয়াছে।

১৫ মে, নিউ অর্লিন্স্। এক সপ্তাহ চুপচাপের পর লুসিয়ানায় আবার জল বাড়িতেছে। বড় ও ছোট অন্ততঃ ১২টা ভাঙ্গন নিউ অর্লিন্সের ১৭৫ মাইলের মধ্যে ঘটিয়াছে। শত শত লোক মিসিসিপিকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এখন নিরাশ হইয়া সকলে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে। মিসিসিপি-প্লাবনে সাহায্যের জন্য ১ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার দেওয়া হইয়াছে।

বেয়ুও দেজ্ গ্লেইসেস্ লুসিয়ানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শর্করা-ক্ষেত্র রক্ষা করিত। উহার বাঁধে ৬০০ ফুট ভাঙ্গন হওয়াতে এই চিনির দেশ বিপন্ন হইয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে যে, আরও ৪০ লক্ষ একর জমি জলে ডুবিবে ও আরও ২½ লক্ষ লোক গৃহহীন হইবে। আর একটা ভাঙ্গনের খবর আসিয়াছে বোর্ডলিওন হিবেল। টোরাস্ বাঁধ রক্ষার জন্য বৃথা প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে।

১৫মে, নিউইয়র্ক। সরকারী অনুমান মতে, প্লাবনে ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছে ২৫ কোটি ডলার।

বিলাতে ধর্ম্মঘটে ক্ষতি

বিলাতের পার্ল্যামেণ্টে ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল সম্বন্ধে আলোচনার সময় স্যার লেস্লি স্কট ধর্ম্মঘটে কত ক্ষতি হয় তাহা দেখাইয়াছেন। গত বৎসর বিলাতে সর্ব্বসমেত ১৬ কোটি ২০ লক্ষ কার্য্য-দিন নষ্ট হইয়াছে। শ্রমিকদের মজুরি গড়ে রোজ ২৲ টাকা ধরিলেও ঐ সময়ের মজুরির পরিমাণ ৩২ কোটি টাকা। মালিকদের ক্ষতি হইয়াছে ইহারও অনেক গুণ।

রুশিয়ার সহিত ইংল্যণ্ডের বাণিজ্য

১৯২৬ সনে ইংল্যণ্ড রুশিয়ায় ১৪,৪২৭,০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে এবং রুশিয়া হইতে ২৪,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের জিনিস কিনিয়াছে। ইংল্যণ্ডের আমদানির মধ্যে খাদ্যাদি ও বাহাদুরী কাঠ প্রধান। রুশিয়ার সহিত ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায় এখন তাহার বাণিজ্যের বহরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর পড়িতেছে। কারণ এই বাণিজ্যের লোপ হইলে যাহারা বেকার হইবে তাহাদের কাছে ত আবার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

জার্ম্মাণিতে মজুরি-বৃদ্ধি

জার্ম্মাণিতে কয়েকটা শ্রমশিল্পে মজুরির পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু সংখ্যাবিজ্ঞানে জার্ম্মাণগণ এতই তৎপর যে, সে সামান্য বৃদ্ধিও কড়াক্রান্তি ধরিয়া হিসাব করিয়া রিপোর্ট বাহির হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে সুদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ঘণ্টায় ৯৫ ফেন্নিগ ও সপ্তাহে ৪৬·৪৩ মার্ক ছিল। (১ মার্ক=১০০ ফেন্নিগ=১ শিলিঙ্=১১ আনা)। মার্চ মাসে ইহাদের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬ ফেন্নিগ ও ৪৬·৯২ মার্ক হইয়াছে। সাধারণ শ্রমিকদের মজুরি ফেব্রুয়ারী মাসে ঘণ্টায় ৬৬·৮ ফেন্নিগ ও সপ্তাহে ৩৪·৫২ মার্ক ছিল, মার্চ মাসে ঘণ্টায় ৬৭·৪ ফেন্নিগ ও সপ্তাহে ৩৪·৮০ মার্ক হইয়াছে।

এগুলি সকলই গড় ধরিয়া হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বয়নশিল্পের মজুরি সকলের চেয়ে কম। দক্ষ শ্রমিকরা সপ্তাহে ৩১·৯৭ মার্ক পায় ও সাধারণ শ্রমিকরা সপ্তাহে ২৪.৪৬ মার্ক পাইয়া থাকে। সব চেয়ে কম মজুরি সপ্তাহে ১০৲ টাকার কাছাকাছি হইবে।

দুনিয়ার গম

শীতের ফসল কোথায় কেমন হইবে তার একটা আগাম আভাস এইরূপ পাওয়া গিয়াছে :—

সন	দেশ	একর	টন
১৯২৭	যুক্তরাষ্ট্র	...	১,৫৯,০৯,০০০
১৯২৬	ঐ	...	১,৪৭,০৩,০০০
১৯২৬-২৭	অষ্ট্রেলিয়া	১,১৪,৩১,০০০	৪৪,১১,০০০
১৯২৫-২৬ সনের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার বৃদ্ধি	...	+১২%	+৪৫%
১৯২৬-২৭	আর্জেন্টিনা	১,৯২,৭৫,০০০	৫৯,১৫,০০০
১৯২৫-২৬	ঐ	১,৯১,৯৮,০০০	৫১,২০,০০০

রোমের আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-মন্দির হইতে ১৯২৭ সনের শীতের গম সম্বন্ধে এই খবর পাওয়া গিয়াছে :—

দেশ		একর
ফ্রান্স	...	১,২৯,৭৬,০০০
ইতালি	...	১,২৩,১৫,০০০
উক্রেণিয়া	...	৯৫,০০,০০০
রুমানিয়া	...	৬৩,৭১,০০০
আলজিরিয়া[১]	...	৩৭,০৭,০০০
পোল্যাণ্ড	...	২৬,৩৯,০০৯
বুলগেরিয়া	...	২৪,০৯,০০০
ফরাসী মরক্কো[১]	...	২১,৬২,০০০
চেকোশ্লোভাকিয়া	...	১৪,৩৭,০০০
টিউনিস[১]	...	১২,৩৬,০০০
কানাডা	...	৮,০৮,০০০

"১" চিহ্নিত দেশগুলির শীত ও বসন্ত উভয় ফসলই ধরা হইয়াছে।

দেশবিদেশের তৈল-বীজ

রোমের আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-মন্দির হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মসিনা তৈল-বীজের জমির আয়তন ও পরিমাণ হইয়াছে :—

সন	দেশ	একর	টন
১৯২৫	যুক্তরাষ্ট্র	৩০,৭৮,০০০	৫,৬১,০০০
১৯২৬	ঐ	২৮,৯৭,০০০	৪,৮৬,০০০
১৯২৫	কানাডা	১১,২৮,০০০	২,৩২,০০০
১৯২৬	ঐ	৮,১৬,০০০	১,৪৯,০০০
১৯২৬-২৭	আর্জেন্টিনা	৬৬,৭২,০০০	১৭,২৭,০০০
১৯২৫-২৬	ঐ	−৮% কম	+৮% বেশী

বিলাতে আকাশযান

ইম্পীরিয়্যাল এয়ার ওয়েজ লিমিটেড্ কোম্পানীর ২০,০০০ পাউণ্ড লোকসান পড়িয়াছে। তাই অনেক অংশীদার বলিতেছেন, কোম্পানীটা গুটান হউক। কিন্তু ঐ কোম্পানীর চেয়ারম্যান্ স্যর এরিক গেড্ডিজ বলেন, এক এঞ্জিনবিশিষ্ট যন্ত্রের পরিবর্ত্তে বহু এঞ্জিনবিশিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করার জন্যই ঐ লোকসান পড়িয়াছে। এক এঞ্জিন বিশিষ্ট যন্ত্রে খরচ হয় ১৯,০০০ পাউণ্ড এবং বহু এঞ্জিনবিশিষ্ট যন্ত্রে খরচ হয় ৬৩,০০০ পাউণ্ড। এক এঞ্জিনবিশিষ্ট যন্ত্রের উপর লোকের আস্থা নাই বলিয়া সেগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আকাশযানে দ্রব্যাদি বহুবিলম্বে বিলি হওয়ায় বাণিজ্যের দিক্ দিয়া অনেকে ইহার গৌরব স্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা ইহাতে চড়িয়া যাতায়াতের পক্ষপাতী। ইহাতেই আকাশযান বহরের কৃতিত্ব বুঝা যাইবে।

যাহা হউক বর্ত্তমান ফিনান্শ্যাল বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসে ইহাতে বাণিজ্যও ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা যত যাত্রী বহন করিয়াছে, সমস্ত গত বৎসরেও ততটা করে নাই। ঐ সময়ের মধ্যে ইহা ৯,০০০,০০০ পাউণ্ডের সোণা-রূপা এবং মূল্যবান ধাতু বহন করিয়াছে।

ইতালির মজুরির নমুনা

ইতালির বিভিন্ন স্থানের মজুরির কিঞ্চিৎ নমুনা নীচে দেওয়া যাইতেছে। অঙ্কটা ঘণ্টায় কষা হইয়াছে।

ব্যবসার নাম	কোন্ শ্রেণীর কারিগর	মজুরি	স্থানের নাম
বিল্ডিং ট্রেড্ বা ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবসা	সর্ব্বাপেক্ষা ওস্তাদ ব্যক্তি	৯ পেন্স	ক্যালাব্রিআ
	প্ল্যাষ্টারার	৪½ পে	
	বালক	৩ পে	
	বালিকা	১½ পে	
রাজমিস্ত্রী	১ম শ্রেণীর রাজমিস্ত্রী	১০½ পে	রোম্
	২য় শ্রেণীর রাজমিস্ত্রী	৭½ পে	
	বালক	৫ পে	
মেটাল ওয়ার্কার	১ম শ্রেণীর	৬ পে	পিদমন্ত
	২য় শ্রেণার	৫ পে	
	৩য় শ্রেণীর	২½ পে হইতে ৪ পে'র মধ্যে	
	সব চেয়ে বেশী যে কারিগর পায়	৪ শি, ৬ পে, দিন	ভেনিস্
	১৭ ঘণ্টা খাটিয়া গড়ে মজুরি রোজ	২ শি, ৬ পে হইতে ৩ শি	

দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানি-বৃদ্ধি

১৯২৫ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন অন্যান্য দেশসমূহে ৮৫,৬০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে। ১৯২৪ সনের তুলনায় ঐ অঙ্ক ৭,৭৫০,০০০ পাউণ্ড বেশী। ১৯২৪ সনে ইউনিয়নে ৬৩,০০০,০০০ পাউণ্ডের জিনিষ আমদানি হয়। তৎপূর্ব্ব বৎসর হয় ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ডের জিনিষ। ভুট্টা ও পশমই প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। ভুট্টা জন্মে ২৫,০০০,০০০ বস্তা অর্থাৎ ৫০০,০০০,০০০০ পাউণ্ড ওজনের। এই ওজনের ভুট্টা পূর্ব্বে কখন হয় নাই। নেটাল চিনির রপ্তানি ৫০,০০০ টন বাড়িয়াছে। ১৯২৪ সনে মাত্র ১০,০০০ টন রপ্তানি হয় এবং ১৯২৫ সনে ৬০,০০০ টন। ১৯২৪ সনে মেরিণো পশম রপ্তানি হয় ১৬৬,০০০,০০০ পাউণ্ড ওজনের এবং ১৯২৫ সনে ২২০,৬৬৮,০০০ পাউণ্ড ওজনের। বাড়িয়াছে ৫৪,৬৬৮,০০০ পাউণ্ড। এই সংখ্যার সঙ্গে ৭,৯০০,০০০ পাউণ্ড মার্জ্জিত পশম যোগ করিতে হইবে।

তুলার ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা পড়া সত্ত্বেও ১৯২৫ সনে রপ্তানি হয় ৬,৯৮১,০০০ পাউণ্ড ওজনের। পূর্ব্ব বৎসর হয় ৩,২৯৯,০০০ পাউণ্ড। সুতরাং ১৯২৫ সনের রপ্তানি দ্বিগুণেরও অধিক। ১৯২৬ সনে হয়ত ১৯২৫ সনেরও অধিক হইবে। কারণ, আশা করা যাইতেছে, প্রায় ১২,৫০০,০০০ পাউণ্ড ফসল উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে দুই বৎসরেই দক্ষিণ আফ্রিকার তুলার উৎপাদন চারিগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের রপ্তানির নির্ঘণ্ট নিয়ে দেওয়া গেল :—

খনিজ ও ধাতু দ্রব্য		৫২,০০০,০০০ পাউণ্ড	মূল্যের
কৃষিদ্রব্য	...	৩২,০০০০ পাউণ্ড	”
শিল্পদ্রব্য	...	৩,০০০,০০০০ পাউণ্ড	”

গ্রেশাম্ লাইফ্ অ্যাশিওর্যান্স সোসাইটি লিমিটেড্

১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ডিরেক্টরদের রিপোর্ট এইরূপ :—

পলিসি বাহির হইয়াছে … ৪,৬৫৩ টা

টাকা বীমা করা হইয়াছে … ২০,৩১৯৪৪ পা,

নূতন অ্যাশিওর্যান্স সম্পূর্ণ হওয়ার দরুণ প্রিমিয়াম্ … ৯২,৯০৭ পা, ৫ শি, ৫পে,

তন্মধ্যে "সিঙ্গ্ল প্রিমিয়াম্" ৯৮৯ পা, ১২ শি, ২ পে

বার্ষিক বৃত্তি (অ্যানুইটি) হেতু প্রাপ্ত "কনসিডারেশন" … ৪৯,৪৮৩ পা, ১৭ শি, ৫ পে,

সোসাইটির বাৎসরিক দান … ৬,৬৬১ পা, ৫শি, ৪পে,

প্রিমিয়াম, সুদ এবং খাজানা হইতে প্রাপ্ত … ১০,৭৪,৩০৬ পা, ৫শি, ২পে,

মৃত্যু হেতু দাবী ও তার সঙ্গে "বোনাস এডিশন" যোগ দিয়া … ১,৯০,৪১০ পা, ১৪শি, ৭পে

বয়স হেতু বা সময় শেষ হওয়ায় "এনডাওমেণ্ট" থাকায় দাবী … ২,৮২,২৬৮ পা, ৮শি, ১১পে,

১১৩ জন বার্ষিক বৃত্তিধারী মরায় সোসাইটি মুক্তি পাইয়াছে … ২,৬৮৪ পা, ১৯শি, ৭পে

নূতন ব্যবসার হিসাবের বিভিন্ন দফা গত বৎসরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। কারণ ১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর কোনো কোনো বিদেশী সিক্কায় নূতন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিনিময় হার অবলম্বন করা হইয়াছে।

ব্যালান্স শীটে প্রদর্শিত "পাওনার" পরিমাণ … ৬৭,৬১,৮৫৫ পা, ১৫শি, ৭পে,

ফাণ্ডের উপর আদায়ী সুদের হার, আয়-কর বাদ দিবার পর … শতকরা ৪ পা, ১৭ শি, ২পে

বাঁক দ ফ্রাস

ফরাসী ব্যাঙ্ক দেদার (তাল) সোণা কিনিতেছে। মে মাসের মাঝামাঝি (১৯২৭) ফ্রান্স নাকি "ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড" হইতে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণতাল কিনিয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড বলিতেছে, "ফ্রান্স নিউ ইয়র্কে এর চেয়ে অনেক বেশী স্বর্ণতাল কিনিতেছে।"

শ্রীযুক্ত পঁয়কারে "চেম্বার অব্ ডেপুটি"র আর্থিক সমিতিকে জানাইয়াছেন যে, নূতন "কনসোলিডেশন লোন" এপর্য্যন্ত ১৫০০ কোটি ফ্রাঁ ঘরে আনিয়াছে। আরও চাই।"

তারহীন টেলিফোন

আন্তর্জ্জাতিক সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ বিগত কয়েক বৎসরে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই বিভাগে অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। আগেকার টেলিফোন টেলিগ্রাফের সঙ্গে "তারহীন" জুটিয়া দুনিয়ার মানব সমাজকে আরও ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। তারহীন টেলিগ্রাফ টেলিফোন জগতের মানব সমাজকে এক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছে। মার্কিণের লোক ঘরে বসিয়া হাজার হাজার মাইল দূরস্থিত বিলাতপ্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করিতেছে। "ওয়্যারলেস" টেলিফোনের উপর দুনিয়ার অতিবড় ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইহার ফলে দুনিয়ায় এক বিপুল পরিবর্ত্তন আসিবার সম্ভাবনা আছে। ইয়োরোপে তারহীন টেলিফোনের চলন এখনও হয় নাই। আমেরিকা এই ক্ষেত্রে দুনিয়ার পথপ্রদর্শক। টেলিভিশান আর আজকাল পরীক্ষাধীন নহে। বাস্তবের কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার বিকাশ দেখিতে পাইতেছি।

আমেরিকার কৃষিকর্ম্মে ওয়্যারলেস

যুক্তরাষ্ট্রের ১,২৫২,১২৬টি কৃষি-ফার্ম্মে তারহীন (ওয়্যারলেস) যন্ত্র আছে। সরকারী কৃষি-দপ্তরের ঘরে বসিয়া এই সকল ফার্ম্মের নিকট কৃষির উন্নতি-বিষয়ক খবর পাঠান হয়। কৃষি বক্তৃতা কৃষি রিপোর্ট ঐ সকল ফার্ম্মের লোক ঘরে বসিয়া শুনিতে পায়। ১৯২৫ সনের হিসাবে দেখা যায় আমেরিকার ৫৫৩,০০৮টি ফার্ম্ম তারহীন যন্ত্র ব্যবহার

করিত। তাহা হইলে এক বৎসরে শতকরা ১২৬ ভাগ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইণ্ডিয়ানা, আইওয়া প্রভৃতি কৃষি জনপদে এমন কি শতকরা ১৬০ হইতে ৩৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার ফেডারেল দপ্তরের কৃষি ও আর্থিক সংবাদ এই সকল কৃষি জনপদের কিষাণগণ কর্তৃক বিনাতারের সাহায্যে শ্রুত হইয়া থাকে।

তোকিওর সরাইখানা

তোকিওতে নানাবিধ খাদ্য ও পানীয় গৃহের মোট সংখ্যা	...	২৬,১৯০
হ্বেটার বা পুরুষ-পরিচারক খাটিতেছে	...	২২,৬৮২ জন
স্ত্রী-পরিচারিকা খাটিতেছে	...	২৬,০৪৩ ,,
মোট		৪৮,৭২৫ ,,
স্ত্রীপরিচারিকাদের মধ্যে রীতিমত দর্মাহা পায় মাত্র		১৫৩১ ,,

ইহাদের মাসিক দর্মাহা......১৫ হইতে ২০ ইয়েনের মধ্যে।

বাকী পরিচারিকারা হয় একদম দর্মাহা পায় না, নয়ত নামমাত্র পায়। অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশ **'বকশীস'** হিসাবে এত পায় যে তাতে অন্ততঃ তাদের গাড়ী ভাড়া, পোষাকপরিচ্ছদ, পাউডার ও অন্যান্য দরকারী সাজসজ্জার দাম উঠিয়া যায়। অধিকাংশ "গৃহে" বালিকাদিগকে ও পুরুষ চাকরদিগকে অন্ততঃ দুই বেলা করিয়া বিনা পয়সায় খাইতে দেওয়া হয়।

অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে অধিকাংশ বালিকা কোন না কোন প্রকার স্কুলের শিক্ষা পাইয়াছে।

বালিকাদের হাইস্কুলগুলি হইতে গ্রাজুয়েট্ আসিয়াছে	২৫১জন
আংশিক ভাবে হাইস্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা	২৭০ ,,
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছে ...	১৮,০৬৫ ,,
আংশিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়াছে	৪,৫৩৭ ,,
কোন স্কুলে যায় নাই	৪,৯২৫ ,,

বিগত মাসখানেকের ভিতর পুলিশ ৩১টা রেস্তোরাঁ বা সরাইখানার মালিককে ও ১৩৩ জন পরিচারিকাকে ধরিয়া শাস্তি দিয়াছে। অপরাধ অসভ্য বা অশ্লীল ব্যবহার ও চরিত্র।

সরাইখানার শ্রেণী-বিভাগ

সরাইখানা	সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ইউরোপীয় কাফে ও রেস্তোঁরা	৫,০৯১	৫,৬০৩	৯,২৮৭
হাল্কা জাপানী "মিলস্ হাউস" বা খাদ্যাগার	৪,৮৫৩	২,০৫৫	২,৯৯৪
"সোবায়া"	৩,৬৯৩	৩,৫৩৩	১,৮৫১
"শিরু কোয়া"	২,৪৯৪	১,৩৬৬	৯১০
"সুকিয়াকি" গৃহ	১,৯৯৭	২,২০২	৩,২১২
চীনা রেস্তোঁরা	১,৮২২	১,৭১৭	১,৪৬৭
"সুশিয়া"	১,৬৮১	১,৬২৮	৮২৭
চা ও কফি গৃহ	৯৭২	৬৮৮	৬৭৫
জাপানী রেস্তোঁরা	৯৪২	২,৩০৮	৩,১৯৯
অন্যান্য	২,৬৪৩	১,৫৫২	১,৫১৫
মোট	২৬,১৯০	২২,৬৮২	২৬,০৪৩

অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রী পরিচারিকা দিনে ১০ হইতে ১৫ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া থাকে। সকালে ৯টা হইতে রাত্রি ১১টা—১২টা অবধি হাজিরা দিতে হয়। কোন কোন "গৃহে" চাকর বাকরদের মাসে ২ দিন করিয়া ছুটি দেয়।

জেনারেল অ্যাক্‌সিডেণ্ট ফায়ার অ্যাণ্ড লাইফ্ অ্যাশিওর‍্যান্স

ডিরেক্টরদের রিপোর্ট এইরূপ :—

৩১শে ডিসেম্বর, (১৯২৬) যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে

	পা,	শি,	পে,
নিট্ আয়	৭৪,৯১,২৩৭	২	৪
নিট্ ব্যয় ...	৬৮,৭৮,৪৬৫	১৭	৮
হাতে রহিয়াছে ...	৬,১২,৭৭১	৪	৮
ভিন্ন ভিন্ন রিজার্ভের দত্ত পরিমাণ যোগ করিলে ...	৩,৬৬,৫৬৪	৪	৬
লাভ ও ক্ষতির হিসাবের ক্রেডিটে, হাতে রহিয়াছে, গত বৎসরের জের যোগ করিয়া ...	৪,৬১,৫৩২	৬	৫

দেওয়া হইয়াছে—
ইণ্টারিম বা মধ্যকাল ডিভিডেণ্ড
(১) প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর
২২½% হারে (২) অর্ডিনারী
শেয়ারের উপর ১৫% হারে—
আয় কর বাদ দিবার পর ... পা ৫৪,৬৮০—০—০

প্রস্তাব আছে যে—
প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর একটা
ফাইন্যাল বা অন্তিম ডিভিডেণ্ড
২২½ হারে দেওয়া হইবে
(বৎসরের হারটা দাঁড়ায় ৫%,
দেয় ১৯২৭ সনের ২রা মে)
আয়কর বাদে পরিমাণ ... ৫,০০০—০—০

অর্ডিনারি শেয়ারের উপর
একটা ফাইন্যাল ডিভিডেণ্ড ১৭½%
হারে দেওয়া হইবে (বৎসরের)
হারটা দাঁড়ায় ৩২½%); দেয়
১৯২৭ সনের ২রা মে। আয়কর
বাদ দিবার পর পরিমাণ ... ৫৭,০৬০—০—০

ব্যালান্স শীটে বিবৃত ফাণ্ডের
পরিমাণ ... ... ১,০৪,৮৪,৯৭৮—৯—৬
তন্মধ্যে ডাঁক পুঁজিপাটা ১২,৪২,০০০—০—০

জীবন (বীমা)—
১৯২৬ সনে নূতন জীবন বীমার
স্থূল পরিমাণ ... ১৪,০১,৪০৬—১৮—০
রি-অ্যাশিওর্যান্স বা পুনর্বীমা
বাদ দিলে ... ... ১৩,৬০,৯০৬—১৮—০
গত বৎসর (১৯২৫) দুই
কোম্পানী একত্রে পাইয়াছিল ... ৯,৫৭,৭২৬—০—০

নূতন ও নবীকৃত জীবন—
প্রিমিয়াম্ (পুনর্বীমাগুলি
বাদ দিয়া) ... ... ৩,৩৯,১৬৮—১০—১০
২৭৬টা পলিসিতে, মৃত্যু-হেতু
দাবী ... ... ১,১০,৯৩৬—৬—৮
এন্ডাওমেণ্ট ম্যাচুরিটি বা
সম্পত্তির পরিণতি হেতু দাবী
৩১৭টা পলিসির ... ৭১,৫৪৯—৩—৫
লাইফ্ অ্যাশিওর্যান্স অ্যাণ্ড
একুইটি ফাণ্ড বা জীবন বীমা
ও বার্ষিক বৃত্তির মূলধন ২৬,০৫,২৬,৭১০—১০—৮
গত বছরের (১৯২৫) তুলনায়
এ বছর বৃদ্ধি পাইয়াছে ... ৮৩,০২৯—১৬—৫

সমুদ্র—
সামুদ্রিক বিভাগে নিট প্রিমিয়াম
আয় দাঁড়াইয়াছে ... ৪২,০২৭—০—৮
গত বছর (১৯২৫) ইহা ছিল ... ২৮,৬০৯—১৮—৩

অগ্নি—
নিট প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ... ৬,৬১,৫২১—১১—৪
গত বছর ছিল ... ৫,১২,৬৫৮—০—৩
ক্ষতি ও বাকী পড়ার পরিমাণ ... ৩৯.৩৫%
১৯২৫ সনে ইহা ছিল ... ৪৪.৬৭%

দৈব ও সাধারণ—
দৈব ও সাধারণ বিভাগে নিট
প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছে ... ৬০,৯৬,৬৬১—১—৫
১৯২৫ সনে ছিল ... ৫৬,৯৩,৬৬০—৮—৯
ক্ষতি ও বাকীর পরিমাণ—৬০·২৫%
১৯২৫ সনের " ৬০·১৯%



(ক) দেশী

ভারতে দিয়াশলাই শিল্প

ভারতবর্ষে বহু দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে দেশীয় কাঠ এবং বাহির হইতে আনীত অন্যান্য কাঠ ব্যবহৃত হয়।

দিয়াশলাই হইতে প্রাপ্ত মাশুল-রাজস্ব ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। ১৯২২-২৩ সনে এই রাজস্ব দাঁড়ায় ১,৫৪ লক্ষ টাকা, ১৯২৩-২৪ সনে ১,৩৮ লক্ষ, কিন্তু ১৯২৫-২৬ সনে কেবল মাত্র ১,১৮ লক্ষ টাকা। ভারতীয় কারখানাগুলি যতই যান্ত্রিক অসুবিধা হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এই দিক্‌কার রাজস্বের অবনতি ততই শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

এই সব কারণে ভারত সরকার মনে করেন, এই বিষয়ে একটা অনুসন্ধান আবশ্যক। তাই; তাঁহারা শুল্কবোর্ডের উপর অনুসন্ধানের ভার দিয়াছেন। অনুসন্ধানের প্রথম প্রশ্ন—ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশনের রিপোর্টের ৯৭ম অনুচ্ছেদে বিবৃত তিনটি সর্ত্ত ভারতের দিয়াশলাই সম্বন্ধে খাটে কি না এবং এই শিল্পকে সংরক্ষণ করা হইবে কি না। হইলে, শুল্কবোর্ড রিপোর্ট দিবেন কত হারে আমদানি শুল্ক বসান যায়, যাহাতে দিয়াশলাই শিল্পের সংরক্ষণ চলিতে পারে এবং সংরক্ষণের কি কি উপায় যথাযোগ্য ভাবে অবলম্বনীয়। আর, না হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্ট দিয়াশলাইয়ের উপর মাশুল ইচ্ছানুরূপ কমাইয়া দিবেন। তাহাতে খরিদ্দার এবং তাঁহাদের রাজস্ব উভয়দিকেরই সুবিধা হইবে। কিন্তু শুল্কের বর্ত্তমান হারের ফলে ভারতে এই শিল্পসম্বন্ধে লোকের কতটা নিরূঢ় স্বত্ব জন্মিয়াছে, এই স্বত্ব সম্বন্ধে কতটুকু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য এবং শুল্কের বর্ত্তমান হার রাখিলে ভারতে দিয়াশলাই শিল্পের কতটুকু উন্নতির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে শুল্কবোর্ড রিপোর্ট দিবেন।

বর্ত্তমান শুল্কহারের ফলে ভারতে দিয়াশলাই শিল্প মাথা তুলিয়াছে। সুতরাং সেই শিল্প এবং বর্ত্তমান শুল্কের হার বজায় রাখিবার পক্ষে যদি শুল্ক বোর্ড মত দেন, তবে ঐ শিল্পের উপর যথাযোগ্য ট্যাক্স বসাইয়া মাশুল-রাজস্বের ক্ষতির আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পূরণ হইতে পারিবে কি না, তদ্বিষয়ে শুল্কবোর্ড রিপোর্ট দিবেন। অনারেব্‌ল কমার্স মেম্বর কাউন্সিল অব্‌ ষ্টেটে ১৯২৪ সনের ২৪শে মার্চ তারিখ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি শুল্ক-বোর্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

দিয়াশলাই শিল্পের ভবিষ্যৎ

টারিফ বোর্ড বা করধার্য্য করিবার সমিতি দিয়াশলাই শিল্প রক্ষা করিবার জন্য কি করিবেন এখন তাহা বলা কঠিন। তবে তাঁহারা যদি বিদেশ হইতে আমদানি দিয়াশলাইয়ের উপর বিশেষ শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াই চুপ করিয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে না। কেননা আমেরিকা ও সুইডেনের কয়েকজন ধনকুবের ভারতের সমস্ত দিয়াশলাইয়ের কারখানা ক্রয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। তার পরে বস্ত্রশিল্পের কথা। কয়েক মাস পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে রিপোর্ট বা মন্তব্য

বাহির হইবার কথা ছিল। শুনা যাইতেছে পাছে জাপানকে চটাইলে চীনদেশে অসুবিধা হয়, সেই জন্য আজ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। তা ছাড়া ইহাও প্রকাশ যে, জাপান ভারতে কল প্রতিষ্ঠা করিবে। বোম্বাই সহরে ইতিমধ্যেই একটি জাপানী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। এই ভাবে সকল দিক্ দিয়াই ভারতীয় শিল্প নষ্ট করিবার সুযোগ আজও বিদেশীর আছে। যতদিন শাসন-নীতির পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার হইবে না। তবে যতটা হয়, তাহার জন্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(জাগরণ)

চরকায় লাভালাভ

ব্যক্তিগত লাভের দিক্ হইতে খদ্দরের প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা বোঝা সহজ। তাহার পরিচয় চোখের উপরেই পাওয়া যায়। যে দু'বেলা দু'মুঠো উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারে না, সে যদি চরকায় সূতা কাটিয়া দিনে দুইটি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারে তবে তাহার পক্ষে উহাই পরম লাভের জিনিষ। যে দেশের লোকের গড়পড়তা দৈনিক উপার্জ্জন ৪পয়সা মাত্র, সে দেশে দুই পয়সা বাড়ীতে উপার্জ্জন যে উপেক্ষার বস্তু নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার অধিকাংশ পরিবারই একান্নভুক্ত পরিবার। চার পাঁচ বা ততোঽধিক লোক লইয়া এই সব পরিবার গঠিত। বেশীর ভাগ পরিবারেই দুইএক জন লোক মাত্র উপার্জ্জনক্ষম, বাদবাকী এই দুই একজন উপার্জ্জনক্ষম লোকের উপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং তাহাদের অধিকাংশ সময় বিনা কাজেই কাটিয়া যায়। ইচ্ছা করিয়াই যে তাহারা আলস্যে কাটায় তাহা নহে। কাজের অভাবেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অলস জীবন যাপন করিতে হয়। পরিবারের যে সমস্ত লোক বসিয়া থাকে তাহারা দিনে দুইটি পয়সা উপার্জ্জন করিয়াও পারিবারিক অসচ্ছলতার মুহূর্ত্তে যদি সাহায্য করিতে পারে তবে অনেক কিছু করা হয়। বাঙ্গালায় এমন পরিবার খুব কম আছে মাসিক চার পাঁচ টাকার বাড়্তি উপার্জ্জনে যাহাদের মাথা হইতে অনেক দুঃখের বোঝা নামিয়া না যায়। পরিবারের দুইজন লোক চরকা কাটিলেও ঘরে বসিয়া মাসে ৪।৫ টাকা উপার্জ্জন করা চলে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেই চরকার প্রয়োজন সেইখানেই শেষ হয় না। জাতির প্রয়োজনের পথেও ইহার দাম অল্প নহে। চরকার রাজনৈতিক উপযোগিতা যে সমস্ত আছে তাহার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে। কারণ হিসাবের মাপকাঠিতে ফেলিয়া তাহাকে পরিমাণ করিবার উপায় নাই। তাহা কাজ করিয়া এবং তাহার ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া বুঝা যায়। কিন্তু ইহার অর্থনৈতিক মূল্য হিসাব করিয়াই বলিয়া দেওয়া চলে এবং সে হিসাবের খাতায় ভুল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি। ইহার দুইকোটি লোক যদি চরকা কাটে তবে সেই একমাত্র চরকাহ ইতেই জাতির উপার্জ্জনের পরিমাণ দৈনিক ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা হয়। অর্থাৎ মাসিক প্রায় দুই কোটি এবং বৎসরে প্রায় ২৩ কোটি টাকা এক চরকা হইতেই উপার্জ্জন করা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে অসম্ভব নহে।

তাহা ছাড়া ইহার আনুসঙ্গিক উপার্জ্জনগুলি ধরিলে চরকার দানের পরিমাণটা আরও অনেক বাড়িয়া যায়। সূতার যে মূল্য, সূতায় তৈয়ারী বস্ত্রের মূল্য তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী। সুতরাং চরকায় সূতা কাটিলে বাঙ্গালাদেশ বিনা আয়াসে এমন একটি শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে যে, তাহা হইতে বৎসরে ৩০।৪০ কোটি টাকা উপার্জ্জন করাও তাহার পক্ষে কঠিন হয় না। যে শিল্প এত বড় একটা উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া দিতে পারে, জাতীয় সম্পদ্ হিসাবে সে শিল্পের উপযোগিতা কে অস্বীকার করিতে পারে? তাহা ছাড়া তাঁতী, মিস্ত্রী প্রভৃতি আরো অনেকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা ইহার ভিতর আছে। সুতরাং ইহার সম্পর্কিত শিল্পগুলির কথা স্মরণ করিলে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কোনোই উপায় থাকে না।

ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের সমষ্টি লইয়াই জাতীয় উপার্জ্জনের হিসাব-নিকাশ লাভ-লোকসান নির্ণীত হয়। সুতরাং

চরকায় জনপ্রতি দৈনিক উপার্জ্জন দুই পয়সা হইলেও ইহাকে উপেক্ষা করিবার কোনো কারণ নাই। বস্তুতঃ সমস্ত লোককে উপার্জ্জনের সুযোগ দিয়া জাতীয় সম্পদ্ এরূপভাবে পুষ্ট করিবার উপযোগী শিল্প এই একটিমাত্রই আছে। মহীশূরের বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর কিছুদিন পূর্ব্বে চরকা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও এই হিসাব কিতাবেরই কথা। শিল্প-বিশেষজ্ঞের সেই উক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যহ ২৷৷০ ঘণ্টাকাল চরকা কাটিলে মাসে ২৷৷০ টাকা উপার্জ্জন করা যায়। প্রত্যেক পরিবারে যদি লোক গড়ে ৫ জন করিয়া থাকে এবং সেই পরিবারের দুইজন লোকও যদি প্রত্যহ ২৷৷০ ঘণ্টা সময় চরকা কাটে, তাহা হইলে এই রাজ্যের লোকের মোট অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ হইবে, মাসিক ৫০ লক্ষ টাকা অথবা বৎসরে ৬ কোটি টাকা। সমালোচকেরা কি চরকা কাটিতে নিষেধ করিয়া তাহাদিগকে এই বিপুল আয় হইতে বঞ্চিত করিবেন? যদি দেশের শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ সম্প্রদায় খদ্দরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহা হইলে এই শিল্পটি দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আশাকরি তাঁহার এই উক্তি আমাদের দেশের অনুসন্ধিৎসু মনগুলিকে ঘা দিতে সমর্থ হইবে। অনুসন্ধিৎসা জাগিলে চরকার মূল্য বুঝিতে যে দেরী হইবে না, তাহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

(খাদিপ্রতিষ্ঠান,—কলিকাতা)

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সে ভারতের তৈল-বীজ বিষয়ক বক্তৃতা

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের উদ্যোগে, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস মহাশয় গত ৬ই মে, (১৯২৭) তারিখে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভারতে তৈল-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ"। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দাস বলিয়াছেন :—

ভারতবর্ষ হইতেছে তৈল-বীজ জন্মাইবার প্রধান আড্ডা। ভারতের মোট আয়তন ১৮,০৫,৩৩২ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে গড়ে ৪ কোটি একরের উপর জমিতে তৈল-বীজ জন্মে (তুলার বীজও ধরা হইতেছে)। জগতের আর কোন দেশ এত রকম-বেরকমের তৈল-বীজ উৎপাদন করিতে পারে না।

ভারতবর্ষ বছরে ৫০ লক্ষ টনের উপর বা প্রায় ১৪ কোটি মণ তৈল-বীজ উৎপাদন করে। তার দাম ৫ কোটি পাউণ্ড বা ৭৫ কোটি টাকা। ভারত হইতে যে তৈল-বীজ, তৈল ও খইল ইত্যাদি রপ্তানি হয় তার মোট দাম বছরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বা ২৭ কোটি টাকা।

ভারতে নিম্নলিখিত তৈল-বীজগুলি উৎপাদিত হয় :—

কোপ্রা, তুলা, মূলা, শালগম, সরিষা, তিল, রেড়ী, মসিনা বা তিসি, পোস্ত, চীনাবাদাম, চা-বীজ, তামাক-বীজ, সূর্য্যমুখী ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া, জন্তুজাত চর্ব্বি ও তৈল আছে।

তৈল-চর্ব্বি খাওয়ার জন্যও ব্যবহার হয়, শিল্প-বাণিজ্যের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

খাওয়ার জন্য কাঁচা তৈল, ছাঁকা তৈল, শোধিত তৈল, তরকারী ঘী, নকল মাখন, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। আর শিল্প বাণিজ্যের তরফ্ হইতে, সাবান, মোমবাতি, "লুব্রিকেটর" (যা দিয়া পিছল বা আল্গা করা যায়) বসা, পেণ্ট, বার্ণিশ, ছাপিবার কালি, "তৈল-কাপড়," নকল রবার, নকল চামড়া ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে তৈল ও চর্ব্বির দরকার হয়।

খইল ইত্যাদি তৈল-ব্যবসার অবান্তর উৎপন্ন রূপে ঢের কাজে লাগে। জগতের সর্ব্বত্র গরুর খাদ্য ও জমির সার হিসাবে ইহাদের খুব আদর। ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রথা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ঢুকিলে এই সবের টান খুব বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ ভারতের তৈল-ব্যবসার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

তৈল-বীজের রপ্তানি

নীচের অঙ্কগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে তৈল-বীজ রপ্তানিতে দুনিয়ায় ভারতের স্থান কোথায়।

বীজের নাম		জগতের রপ্তানির তুলনায় ভারতের অংশ		জগতের তৈল-বীজের কতটা ভারতে উৎপন্ন হয়
কোপ্রা	...	৭%	...	অঙ্কটা জানা নাই
মহুয়া	...	১০০%	...	ঐ
তুলার বীজ	...	৩১%	...	৫°/০ হইতে ১০°/০ পর্য্যন্ত
তিল	...	৪২°/০	...	১৭°/০
রেড়ী	...	৯৮°/০	...	জানা নাই
রাই ও সরিষা	...	৬৫°/০	...	১১°/০
চীনাবাদাম	...	৪৫°/০	...	৮০°/০
তিসি	...	২০°/০	...	৮০°/০
পোস্ত বীজ	...	৭৫°/০	...	জানা নাই

মোটামুটি ধরিতে গেলে ভারতে উৎপাদিত তৈল-বীজের প্রায় ২৫°/০ রপ্তানি হয়। বাকীটা দেশে থাকে। কিন্তু দেশের ব্যবহারের মধ্যে অপচয় অনেকখানি। ঘানির প্রচলন এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। এই উপায়ে বীজ হইতে তৈল বাহির করা অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর। খইলের মধ্যে বীজ-তৈলের ১০°/০ হইতে ৩০°/০ অংশ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। তাতে অনেক তৈল নষ্ট ত হয়ই, পরন্তু ঐ খইলও গরুর খাদ্যরূপে বা সাররূপে ব্যবহার করা যায় না। করিলে অনিষ্ট হয়। এটা সমূহ জাতীয় ক্ষতি।

কি করিয়া তৈল বাহির করা যায়

বিদেশী রাষ্ট্রগুলি তৈল-রপ্তানির উপর গুরুভার শুল্ক চাপাইয়াছে, কিন্তু তৈল-বীজ বা খইলের উপর চাপায় নাই। এর ফল ভারতের পক্ষে বিষম হইয়াছে। কারণ ভারত নিজে নিজে বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে ও চড়া শুল্ক দিয়াও মুনাফা আদায় করিতে পারে না।

ঘানিটা সেকেলে জিনিষ। কতকগুলি আধুনিক উপায়ে ও যন্ত্রের সাহায্যে বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লওয়া যায়। কোন কোনটা ভারতীয় অবস্থার পক্ষেও বেশ উপযোগী। এই প্রক্রিয়াগুলি প্রধানতঃ হইতেছে—

(১) বীজ পিষিয়া বাহির করা।

(২) বীজ চুয়াইয়া বাহির করা।

বীজ পিষিয়া তৈল বাহির করিবার জন্ম জল-চাপ যন্ত্র ও "এক্সপেলার" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চুয়াইবার নিমিত্ত নানা দ্রাবক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। যথা পেট্রোলিয়াম ইথার বেন্‌জোল, পেট্রোল,কার্ব্বন,—ডাইসালফাইড. কার্ব্বন্ টেট্রোক্লোরাইড ইত্যাদি।

চাপ-যন্ত্রের চেয়ে এক্সপেলারগুলি বেশী লাভজনক। কারণ, তাতে শক্তি খরচ হয় কম, কিন্তু তৈল বাহির হয় বেশী। সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে "দ্রাবকের" সাহায্যে তৈল চুয়াইয়া বাহির করা। এই প্রক্রিয়াতে প্রায় সবটা তৈলই বীজ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, খইলের মধ্যে ১°/০ হইতেও কম তৈল অবশিষ্ট থাকে।

এক্সপেলার ব্যবহার করিয়া যে খইল পাওয়া যায় তাতে তৈল থাকে ৫°/০ হইতে ৭°/০।

চুয়াইয়া বাহির করিলে যে খইল হয় তা গবাদি পশুর পক্ষে ও সারের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক্সপেলার ও জল-চাপ যন্ত্রের খইলগুলিও মন্দ নয়। কিন্তু ঘানির খইল সর্ব্ব-নিকৃষ্ট।

ভারতে সব চেয়ে বেশী বীজ উৎপাদিত হয় তুলার। আর তুলার বীজের রপ্তানিই সব চেয়ে কম। সুতরাং বেশীর ভাগটাই দেশের মধ্যে থাকে ও গবাদির খাদ্য ও জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় চাষী তুলার বীজ হইতে প্রাপ্ত খইল না খাওয়াইয়া তুলার বীজ খাওয়াইতে ভালবাসে। এতে গবাদির অত্যন্ত অনিষ্ট হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান তৈল-বীজ হইতেছে তুলার বীজ। সেখানে বীজ হইতে তৈল বাহির করে আর তৈল হইতে ষ্টিয়েরাইন বাহির করে। এই ষ্টিয়েরাইন নকল মাখন নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকী তৈলটা শোধিত ও হাইড্রোজেনীকৃত করিয়া খাদ্যে ও শিল্প-বাণিজ্যে লাগান হয়। খইলটা খুব দামী সারে পরিণত হয়। তাতে থাকে—

নাইট্রোজেন—৬.৭৯°/০

ফসফরিক অ্যাসিড্—২.৮৮°/০

পটাশ—১.৭৭°/০

সুতরাং ভারতের ক্ষতিটা সহজেই অনুমেয়।

"সাফা" তেলের এখনও ঢের উন্নতি করা যাইতে পারে। জীবন-যাত্রার উঠা-পড়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাফা তেলের টান বাড়িতেছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপকদিগকে তেলের হাইড্রোজেনীকরণের দিকে বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। অনেক সস্তা তেল আছে। সেগুলিকে খাদ্যে ও শিল্পবাণিজ্যে ব্যবহার করিতে হইবে ও দামী চর্ব্বিতে পরিণত করা যাইবে। তরকারী-ঘী বা সব্জী-ঘীর ব্যবহার ভারতের সর্ব্বত্র খুব ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই ঘী আসে হল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে। কিন্তু এই ঘী খুব কম খরচায় সস্তা তেল হইতে ভারতবর্ষেই তৈয়ারী হইতে পারে। বাজারে তার কাটতিও খুব হইবে। কলিকাতায় ভাল সরিষার তৈল যে দরে বিকায় সেই দরে বেচিয়াও বেশ মোটা মুনাফা মারা যায়। তাছাড়া পরিবদের মহা উপকার হইবে। তারা কম খরচে স্বাস্থ্যকর চর্ব্বি খাইতে পাইবে।

আবর্জ্জনায় আয়

দেশের আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া যদি আমরা চলিতে না পারি, তবে আমাদের অবস্থা যে ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে?

উন্নতিশীল দেশসমূহ দেশের সামান্য খড়কুটাটী পর্য্যন্ত কাজে লাগাইবার জন্য কতই না বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়াছে। আর আমরা মান্ধাতার আমল হইতে এক ভাবে চলিয়া ক্রমশঃ মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি।

পাশ্চাত্য দেশের মিউনিসিপ্যাল সহরগুলির ওঁচলা আবর্জ্জনা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার আদি প্রস্তুত হইয়া হাজার হাজার টাকা আয় হইতেছে। আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটীগুলি ঐ সকল ওঁচলা মাটীতে পরিণত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেছে। এমন কি অনেক মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানাভাবে বিশেষ বেগ পাইতেও হয়। আবার এই সকল মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণই অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আদি জনহিতকর কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না।

পল্লীগ্রামের উদ্যমশীল কৃষক গোবর ছাড়া গ্রামের ওঁচলা আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়া সারকুড়ে ফেলিয়া পচাইয়া সার প্রস্তুত করে। ঐ সার গোবর-সার অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হইলেও, ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করে। আজকাল গোবরের অভাবে গরুর সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় পল্লীগ্রামে যথেষ্ট সারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কৃষকগণ অচাষী গৃহস্থের নিকট হইতে অতি নিকৃষ্ট ছাই সার প্রতিবস্তা ৵০,৶০ আনায় খরিদ করে।

আমাদের দেশের মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে ৫০০০ হইতে ১০০০০ হাজার লোকের বাস। এরূপ মিউনিসিপ্যালিটীতে দৈনিক ১৫০ হইতে ৩০০ গাড়ী পর্য্যন্ত ওঁচলা হয়। উহাদের মধ্যে খোলা আদি অকেজো অংশ বাদ দিলেও কম্‌সে কম্‌ ১০০ হইতে ২০০ গাড়ী সারের উপযোগী ওঁচলা পাওয়া যাইতে পারে। উহা পচাইলে অন্ততঃপক্ষে ১০ হইতে ২০ গাড়ী সার হইতে পারে। প্রতি গাড়ী ন্যূনপক্ষে ১৲ টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেও মোটামুটি হিসাবে ৩৫০০৲ হইতে ৭০০০৲ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। ওঁচলা বাছাই প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত খরচ বাদ দিলে ৩০০০৲ হইতে ৬০০০৲ টাকা নিট আয় হইতে পারে।

এরূপ ব্যবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটীর প্রভূত উপকৃত হয়ই, অধিকন্তু দেশের কৃষিরও প্রভূত মঙ্গল হয়—কৃষিপ্রধান দেশের ধনবৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এ দিকে লক্ষ্য করিবেন কি?

(পল্লীবাসী)

কৃষি শিল্প প্রদর্শনী

বাখরগঞ্জ জিলায় শিক্ষিতজনপ্রধান গৈলাগ্রামে একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। উক্ত গ্রামের পেন্সন-প্রাপ্ত সুপারিন্‌টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। নানা স্থান হইতে স্ত্রীপুরুষ বহু লোক আগ্রহভরে আসিয়া প্রদর্শিত বস্তুসমূহ দেখিয়াছেন। সমাজহিতসাধন সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ কলিকাতা হইতে চিত্র-সহযোগে স্বাস্থ্য ও পল্লী-মঙ্গল সম্বন্ধে

বক্তৃতা করিয়া প্রদর্শনীর সাফল্য ও সার্থকতা সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয়

চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয়ের সম্পাদক এম, এন, ঘোষ মহাশয় সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছেন,—"এই বিদ্যালয়টির প্রতি দেশের অনেক লোকের বিশেষ দৃষ্টি আছে। যাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের ছেলেরা কৃষিকার্য্য স্বহস্তে সহজ উপায়ে করিতে পারে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কৃতসঙ্কল্প এবং তাঁহারা এ বিষয়ে অনেকটা সফলতাও লাভ করিয়াছেন। গত বৎসর দ্বিতীয় বার্ষিকের ৮টি ছাত্র মিলিয়া ১০ বিঘা জমি চাষ করিয়া ২৫৲ টাকা লাভ করে। এবার তাহারা প্রায় ১ শত বিঘা জমি নিজেরা স্বহস্তে চাষ করিতেছে। লভ্যাংশ সমস্তই তাহাদিগকে দিবেন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন; এই ছেলেদের কাজের প্রতি উৎসাহ এবং আসক্তি দেখিলে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। আমাদের খুবই ভরসা হয় এই ছেলেরা দেশে নতুন যুগ আনিবে। ইহারা যেমনই কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান, তেমনই পরিশ্রমী। রৌদ্র-বৃষ্টিকে ইহারা গ্রাহ্য করেনা এবং জিনিষ উৎপন্ন করা হইতে বাজারে বিক্রয় করা পর্য্যন্ত নিজেরা সব স্বহস্তে করিতেছে। ইহাদের নিকট কোনও কাজই নীচ নহে। ইহাদিগকে যেমনই লাঙ্গল ধরিতে, নিংড়াইতে ও জলসেচন করিতে দেখা যায় তেমনই শাক-সব্জী গাড়ী বোঝাই করিয়া অথবা মাথায় করিয়া বিক্রয় করিতেও দেখা যায়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে যাহারা বিদ্যালয়ে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতেছে, তাহারা সকলেই সদ্বংশ-সম্ভূত।

"সর্ব্বসমেত ৪২টি ছাত্র এই স্কুলে ভর্ত্তি হয়, তন্মধ্যে এই ৮টি মাত্র বালক কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ মত কাজ করিতে পারিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেই ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা হয়। এতদিন কর্ত্তৃপক্ষ নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদের আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং নতুন ১০।১২টি ছাত্র লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু যাহারা হাতে কলমে কাজ করিতে নারাজ তাহাদিগকে লওয়া হইবে না। স্বাস্থ্যবান পরিশ্রমী বালক, বাঙ্গালা লেখাপড়া-জানা হইলেও হইবে; যাহারা পুরাতন ছাত্রদের সহিত রীতিমত পরিশ্রম করিতে পারিবে, তাহাদিগকে মজুরি দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ ছাত্ররা স্বাবলম্বী হইয়া যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।"

কংগ্রেসে জনমত

বোম্বাই সহরে কোনো বক্তৃতায় মিঃ হর্নিম্যান নাকি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস হইতে যতদিন না জন কতক আত্মম্ভরী নেতার দল বিদূরিত হইতেছে, ততদিন স্বরাজ লাভ অসম্ভব। কথাটা ভাবিবার। বর্ত্তমানের কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতা কিছুমাত্রই নাই; দেশের স্বার্থের সহিত ইহার সম্বন্ধ কোথায়? শুধু জনকতক মোটরবিহারী উচ্চশিক্ষিত অর্থশালী ব্যক্তিই কংগ্রেসের নিয়ামক। ইহা দেশের উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। বৈদেশিক ব্যুরোক্রাসীর দেশীয় সংস্করণ! এই প্রভুত্ববাদ দেশদ্রোহিতার প্রকারান্তর। জাতির সমবেত চেষ্টায় ইহার প্রতিকার করিবার দিন আসিয়াছে। (উজ্জ্বল ভারত)

স্বায়ত্তশাসনে রাজন্যগণ

ভারতের শাসনসংস্কার তদন্ত সম্পর্কে 'রয়্যাল কমিশন' আসিতেছে। এই কমিশন যদি ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দানের সুপারিশ করিয়া বসেন, তাহা হইলে ভারতীয় রাজন্য-গণের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা একটা প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি, রাজন্যসম্প্রদায় ইহার মীমাংসার জন্য একটু যে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপে প্রকাশ। কমিশন বিলাত হইতে আসিবে, অতএব কমিশনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে বিলাতে গিয়া তাহার গোড়া বাঁধাই কর্ত্তব্য। তাই ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে ইতিমধ্যেই বিলাতে দুইজন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা বিলাতে গিয়াই বিলাতী সংবাদপত্রসমূহের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণেও সমর্থ হইয়াছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভারতের সামন্ত রাজগণের

নানা সুবিধা অসুবিধার আলোচনা চলিতেছে। স্যার মাইকেল ওডায়ার প্রমুখ অনেকেই সংবাদপত্রে লেখালেখি আরম্ভ করিয়াছেন। স্যার মাইকেল ঝুনা সিভিলিয়ান; ভারতের সিভিল সার্ভিস বিভাগের সকল স্তরে—ম্যাজিষ্ট্রারি হইতে ছোট লাটগিরি পর্য্যন্ত—কাজ করিয়া, তিনি ভারতীয় রাজ্যসমূহেরও রাজন্যগণের অবস্থা সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান—বিশেষতঃ স্যার মাইকেলের মত মেজাজের সিভিলিয়ানেরা—যে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভের নামে আঁৎকাইয়া উঠেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় রাজন্যগণও কি ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভের পক্ষপাতী? তাঁহাদের প্রতিনিধিরা যে প্রস্তাব লইয়া বিলাতে দরবার করিতে গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইবে। তবে তাঁহাদের প্রতিনিধিরা বিলাতের জনসাধারণকে জানাইয়াছেন,—"বাঁচো এবং বাঁচিতে দাও" ইহাই তাঁহাদের নীতি। তবেই, তোমরা যদি তোমাদের সুবিধা করিয়া লইতে চাও, তাহা হইলে আমরাই বা আমাদের সুবিধা করিতে ছাড়িব কেন ইহাই দাঁড়াইল নাকি? আয়ারল্যাণ্ড যখন স্বায়ত্তশাসন লাভ করে, তখন সেখানকার আলষ্টার প্রদেশের অধিবাসীরা তাহার বিরোধী হইয়াছিল। ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন কি কাহারও বিনা বিরোধে প্রতিষ্ঠিত হইবে? ভারতে স্বরাজ হউক আর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিতই হউক, বৃটিশ গবরর্মেন্টের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের যে সন্ধি বিদ্যমান, সেই সন্ধি অনুসারে যাহাতে রাজন্যগণের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহা করিতেই হইবে। তাঁহারা এখন বৃটিশজাতিকে সেই সন্ধির বাধ্য-বাধকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। স্বার্থে ঘা লাগিলে সকলেই ত্রিভুবন অন্ধকার দেখে—তা' সে সিভিলিয়ানই কি, আর স্বদেশী সামন্ত রাজন্যবর্গই কি। তাই চারিদিকে সামাল সামাল রব। দেশীয় রাজন্যবর্গের এই যে অহেতুক চিত্তচাঞ্চল্য এটা একটা সিভিলিয়ানী চালবাজীর ফল নহে ত?

(বঙ্গবাসী)

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক সম্মিলনী

গত ২৫শে ও ২৬শে জুন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে কাঁচড়াপাড়ায় ই, বি, রেলওয়ের শ্রমিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় শ্রমিকদের একজন বিশেষ দরদী এবং বাংলাদেশের কয়েকটী ইউনিয়ন তাঁহার অর্থসাহায্যেই টিঁকিয়া আছে। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ৫২ হাজার ই,বি, রেলের কর্ম্মচারীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উন্নত জীবন-যাত্রার উপযোগী মজুরী দাবী করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এদেশের শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তাহা তাঁহার অভিভাষণটী পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। ইউনিয়নের মেম্বারদিগের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত মজুরেরা স্থান পায় সে কথাও তিনি বিশেষ করিয়া বলেন। সম্মিলনের প্রস্তাবগুলিও বেশ উপযোগী হইয়াছে।

বিশ্বসমবায় উৎসব

জুলাই মাসের প্রথম শনিবারে সমস্ত পৃথিবীতে সমবায় উৎসব হইয়া থাকে। গত তিন বৎসর হইতে বাংলাদেশেও এ উৎসব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বসমবায় উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিকতা আজকাল আর কথার কথা নহে, তাহা বাস্তব আকারেই আমাদের চক্ষুর সামনে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(খ) বিদেশী

জেনেভায় বিশ্বশ্রমিক সম্মিলন

জেনেভায় বিশ্বশ্রমিক সম্মিলনের দশম অধিবেশন গত ১৬ই জুন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনে কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার ফলাফল সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

রোগবীমা

শ্রমশিল্পের ও ব্যবসায় সম্পর্কীয় শ্রমিকগণের এবং গৃহসম্পর্কীয় ভৃত্যদিগের অসুস্থতার জন্য বীমা করিবার সম্বন্ধে একটী মুসাবিদা ৯৭ ভোটে পাশ হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে ৯ জন ভোট দিয়াছিলেন।

কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদিগের রোগবীমার মুসাবিদা ৮৫ ভোটে পাশ হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধেও ৯ জনে ভোট দিয়াছিলেন।

সমাজ হইতে সকলেরই বীমা করিবার সম্বন্ধে ঐ সম্মিলন একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। উহা ৯৯ ভোটে পাশ হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেহ ভোট দেন নাই।

যে সকল স্থানে লোক-সংখ্যা কম, সেখানে কিরূপে বীমা প্রচলিত করা যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী প্রস্তাব হয়। ৭৯ বনাম ০ ভোটে প্রস্তাবটী পাশ হইয়াছে।

পরস্পর মিলনের স্বাধীনতা

শ্রমিকদিগের পরস্পর মিলন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের মুসাবিদা করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সম্মিলনে ৪৪ বনাম ৪২ ভোটে সে মুসাবিদা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে এই প্রশ্ন পুনরায় উঠাইবার প্রস্তাবও ৩৩ বনাম ২৮ ভোটে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বনিম্ন মজুরি

শ্রমিকদিগের সর্ব্বনিম্ন মজুরি স্থির করিবার সম্বন্ধে যে প্রশ্নাবলীর মুসাবিদা ছিল, তাহা ৮০ বনাম ১৯ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। আগামী অধিবেশনে এই বিষয়টী উত্থাপনের প্রস্তাব ৮৯ বনাম ২২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

পরস্পর মিলনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কনফারেন্স যেরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ভালই বলা যায়। কিন্তু প্রস্তাব পাশ হইলেও তদনুসারে কার্য্য ঠিক হয় না। যে সকল কনভেনশন অন্যান্য দেশের সরকারগুলি সমর্থন করিয়াছেন তাহা কতদূর কার্য্যকর হইয়াছে দেখিবার জন্য যে কমিটি আছে তাহার রিপোর্ট খুব আশাপ্রদ নহে। ভবিষ্যতে যাহাতে কার্য্য আরও ভালভাবে চলে তাহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। ফল কি হইবে পরে বুঝা যাইবে। বৃটিশ সরকার এখনও ঘণ্টা সম্বন্ধীয় কনভেনশ্যান করেন নাই বলিয়া সম্মিলনে অনেকে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ বৃটিশ সরকার এই কনভেনশ্যান পাশ করিতে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন।

অবাধ বাণিজ্যের স্বপক্ষে

সম্প্রতি লণ্ডন সমবায় সমিতিগুলির এক সম্মেলন ষ্ট্র্যাণ্ড ডব্লিউ সির এসেম্ব্র হলে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোগকর্ত্তা কব্‌ডেন ক্লাব। প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অর্থশাস্ত্রবিদ শ্রীযুক্ত জে, এম, রবার্টসন তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, "ব্যবসা বাণিজ্য নিরাপদ করার ছলে এই দেশে অবাধ বাণিজ্য নীতিটারই মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমার সাধ যে এমন একটা দল গঠিত হউক যার ব্রত হইবে অবাধ বাণিজ্য।"

শ্রীযুক্ত বি, পিয়ার্সের কথায় একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটার মধ্যে অবাধ বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন করিতে হইবে এই নীতির বিরুদ্ধে বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের আক্রমণ নিন্দনীয়।

কলিকাতা বনাম সিঙ্গাপুর

সার রোণাল্ড রস্ গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৪ মাসব্যাপী ২০ হাজার মাইল ভ্রমণের পর লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তিনি ভারতে এবং মালয়ে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের ব্যবস্থাসকল দেখিয়া বেড়াইয়াছেন।

স্যর রোণাল্ড বলিতেছেন, ম্যালেরিয়া নিবারণ বিষয়ে "সমগ্র সাম্রাজ্যে সিঙাপুরের মত আর কোন শহর এরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই।"

তাঁর মতে ম্যালেরিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিবন্ধক হইতেছে মশারি (বেড-নেট)। মালয় খুব সম্ভবতঃ আপনার কুল

হইতে ম্যালেরিয়াকে তাড়াইতে সমর্থ হইবে। কিন্তু সিঙাপুরের কাছে কলিকাতার অনেক-কিছু শিখিবার আছে।

সার রোনাল্ড রস্ বলেন, "কলিকাতায় গরিবদের বাস-স্থানের উন্নতি-বিধান অবিলম্বে আবশ্যক। কোন কোন স্থানে ভারতীয়দিগকে কেন যে আন্দামানী অসভ্যদের মত থাকিতে দেওয়া হইতেছে তা আমার মাথায় ঢোকে না। বাজারগুলি এখনও ভয়াবহ। ৩০ বছর আগের অভিজ্ঞতায় যা দেখিয়াছি, আজও তাই চলিতেছে।"

দুনিয়ার কাঁচা তামা

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অনেক তামার উৎপাদককে লইয়া সম্প্রতি এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। দেশের বাইরে কাঁচা তামা বেচা নিয়ন্ত্রিত করা ইহার উদ্দেশ্য। এই বিষয় লইয়া সম্প্রতি পার্ল্যামেণ্টে সওয়াল-জবাব হয়।

বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট বলেন, "আমি জানি অনেক বড় বড় ইউরোপীয় কারবারও ঐ দলে যোগ দিয়াছে; আর এই কোম্পানী-গঠনের পর হইতে বৃটিশ খাদকদের কাছে আমেরিকান খাদকদের চেয়ে চড়া দর উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

"সাম্রাজ্যে তামা উৎপাদনকারীদের আমি সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "রবার ও তামার আর্থিক রহস্যটা একপ্রকারের নয়। রবারের দর সারা দুনিয়ায় এক। কিন্তু তামার দর এক এক জায়গায় এক এক রকম।"

তোকিয়োতে বিশ্ব-এঞ্জিনিয়ারিং কংগ্রেস

"জাপান টাইম্‌স" জানাইতেছে যে, ১৯২৯ সনের শরৎ কালে তোকিয়োতে বিশ্ব-এঞ্জিনিয়ারিং কংগ্রেস খুলিবে। তাহাতে ৩০টা ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবে।

কংগ্রেস সফল করিবার জন্য বিশিষ্ট প্ল্যান খাড়া করা চাই। সেই উদ্দেশ্যে এক "উদ্যোগ সমিতি" মোতায়েন হইয়াছে। তাতে আছে বৈজ্ঞানিক, ব্যেপারী, সরকারী চাকুরে। সমিতি শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিবে।

কংগ্রেসটাকে ১৭টা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা হইবে। কয়েকটা শাখা এইরূপ:—সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং "আর্কিটেক্‌চার" বা বাস্তু-নির্ম্মাণ, বিদ্যুৎ ব্যবসায় সংক্রান্ত সংখ্যা-বিজ্ঞান (ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্), ফ্যাক্টরী তত্ত্বাবধান (ম্যানেজমেণ্ট), নভশ্চরণ, ট্রান্সপোর্টেশন বা যানবাহন, নগর নির্ম্মাণ, বন্দর উন্নতি, জ্বালানি, প্রাকৃতিক শক্তি ইত্যাদি।

জ্ঞান-বিনিময় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য

৩০টা দেশের প্রত্যেকের যে যে দিকে জ্ঞান আছে, অপর সকলকে তাহা জানান এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। শুধু "থিয়োরেটিক্যাল" আলোচনাতেই এই কংগ্রেসের কাজ শেষ হইবে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে দুনিয়ার খুব স্বাচ্ছন্দ্য ও কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।

কংগ্রেসের আনুসঙ্গিক রূপে এক প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীও থাকিবে।

প্যান-প্যাসিফিক গুড্ রিলেশন্‌স ক্লাব

প্রশান্ত মহাসাগরের এপার-ওপারের সম্পর্কটা মোলায়েম রাখিবার জন্য জাপানে এই নামে এক ক্লাব মোতায়েন রহিয়াছে।

ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হইতেছেন তোকিয়োর ইম্পীরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের হোঙ্গোর ল কলেজের অধ্যাপক কেনজো তাকায়ানাজি। আর চেয়ারম্যান হইতেছেন ব্যবহারাজীব মসুজিমা।

জেনেভায় ভারতীয় শ্রমিক

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শ্রমিকদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের সম্বন্ধে নিত্য নানা অনুযোগ শুনা যায়। এই দরিদ্র শ্রমজীবিগণের লাঞ্ছনা নিবারণের জন্য আন্দোলনের কোলাহল শুনা যায় না, এমন দিন নাই। কিন্তু তাহাদের কথা কে শুনে? গরিবের কথা কে কাণে তুলিবে? পাশ্চাত্য দেশের

শ্রমিকেরা আন্দোলন করিয়া করিয়া তাহাদের অধিকার বজায়ের পক্ষে তবু কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থা এখনও অতীব শোচনীয়। ভারতে শ্রমিক সম্প্রদায় একান্তভাবেই ধনীদের হাতের মুঠার ভিতর আবদ্ধ। অধিকতর অনিষ্টের আশঙ্কায় তাহারা সাহস করিয়া মনের কথাও মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত বি, ভি, গিরি নির্জ্জিত লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত ভারতীয় শ্রমিক সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগের কথা তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা, সেদিন জেনেভার জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে বিবৃত করিয়াছিলেন। ভারতের শ্রমিকেরা আঠারো আনা খাটিয়াও ষোল আনা মজুরি পায় না; ফলে, গ্রাসাচ্ছাদনের দরুণ তাহাদিগকে সারাজীবন ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না; অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসহেতু নানাবিধ ব্যাধি ভোগ করিয়া থাকে; যে দিন কাজ বন্ধ, সেই দিন মজুরিও বন্ধ; সারাজীবন শ্রম করিয়াও বার্দ্ধক্যে অপটু হইলে আর কোনো উপায়ই থাকে না। গবর্মেণ্ট ইহার প্রতিকার বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। অনেক সময় গবর্মেণ্ট ধনিক সম্প্রদায়েরই পক্ষ লইয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত গিরি এই সকল কথাই জাতিসঙ্ঘকে শুনাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি ইহার প্রতিকার হইবে? জাতি-সঙ্ঘ ইয়োরোপের স্বাধীনজাতির—স্বাধীন রাজ-শক্তিসমূহের—ইষ্ট-সাধনের জন্যই গঠিত। তাঁহারা কি পরাধীন ভারতবাসীর এই দুঃখমোচনের জন্য কিছু করিবেন? পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকদল সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়াছে, তাই তাহারা সেখানে শক্তি-সম্পন্ন। ভারতের শ্রমিকদল কি তেমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে? যতদিন তাহারা তাহাতে সমর্থ না হইবে, ততদিন তাহাদের সকল আবেদন-নিবেদনই যে অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

(বঙ্গবাণী)

নির্য্যাতিত জাতিসঙ্ঘে জহরলাল নেহ্‌রু

"নির্য্যাতিত জাতিসঙ্ঘ" বা "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস"—নামটি একটু নূতন শোনায় বটে; কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বোধহয় এতবড় গুরুতর ঘটনা খুব কমই ঘটিয়াছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহ্‌রু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে এই আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিকট নির্য্যাতিত জাতিসঙ্ঘ বা আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের বিবরণ দিয়াছেন।

আজ সমগ্র পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত; একদিকে অত্যাচারী, পরশোষক, সাম্রাজ্যবাদীর দল; অন্যদিকে নির্য্যাতিত, অত্যাচার-পীড়িত, পরাধীন, দুর্ব্বল জাতির দল। বৈজ্ঞানিক নামধারী তথাকথিত দানবীয় সভ্যতার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আজ প্রবল সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তে এবং তাহারই বলে তাহারা পৃথিবীর দুর্ব্বল জাতিদিগকে শাসন, পেষণ, লুণ্ঠন, পীড়ন, নির্য্যাতন করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, যাহাতে এই শোষণ ও লুণ্ঠনকার্য্য উত্তমরূপে সমবায় প্রণালীতে চলিতে পারে, সেজন্য ইদানীং সাম্রাজ্যবাদীরা লীগ অব্ নেশনস্ বা বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ নাম দিয়া একটা সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বদস্যুদলের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য বিশ্বশক্তিরই বিকাশের ফলে আজ এই নির্য্যাতিত জাতিসঙ্ঘ এবং আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের সৃষ্টি। ইহার উদ্দেশ্য—(১) সাম্রাজ্যবাদ পরাধীন দেশ ও উপনিবেশ সমূহে যে ঘোর অত্যাচার করিতেছে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও আলোচনা করা; (২) বিভিন্ন নির্য্যাতিত ও পরাধীন দেশে যে স্বাধীনতার আন্দোলন চলিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা-স্থাপন; (৩) স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন; (৪) সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া একটী স্থায়ী সঙ্ঘ গঠন। এককথায় সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস, পরাধীনতার অবসান এবং মানুষের মুক্তি—ইহাই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য; সুতরাং এই সঙ্ঘই যে সত্যকার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত জহরলালের বর্ণনায় প্রকাশ যে, এসিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ নির্য্যাতিত ও পরাধীন জাতির প্রতিনিধিরাই এই সঙ্ঘে যোগ দিয়াছিলেন। মিশর,

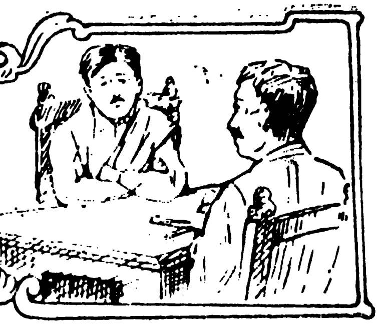
পারস্য, ভারতবর্ষ, সিরিয়া, সুমাত্রা, জাভা, আনাম, কোরিয়া, মরক্কো, ফরাসী অধিকৃত উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো অধিবাসিগণ, উত্তর আমেরিকার নিগ্রো, দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটী দুর্ব্বল রাষ্ট্র, মরক্কো, বৃটিশ শ্রমিকদল—ইহাদের সকলেরই প্রতিনিধি আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর দুর্ব্বল পরাধীন জাতিরা যাহাতে মুক্তিলাভ করে, বিভিন্ন দেশের নির্য্যাতিত জাতিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যাহাতে যোগসূত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হয়, এই দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

চীন ও ভারতবর্ষ এসিয়ার এই দুই বিরাট জাতি আজ নির্য্যাতিত—সাম্রাজ্যবাদীদের রথচক্রে নিষ্পেষিত; সুতরাং এই দুই জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের কার্য্য কংগ্রেসে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা সভাস্থলে স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করিয়া এবং ভারতের মুক্তি যে বিশ্বমানবের মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য্য এই সত্য জ্ঞাপন করিয়া কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত ও চীনের সাহচর্য্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। বৃটিশ শ্রমিকদলের প্রতিনিধিরা ভারত ও চীনের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা জানি, প্রত্যেক পরাধীন জাতিকেই নিজ শক্তিবলে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে; কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিশ্বশক্তিকে অস্বীকার করা নিতান্ত মূর্খতা। আজ জগতের নির্য্যাতিত জাতিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্বাধীনতালাভের জন্য নব নব পন্থা অনুসরণ করিয়াছে। আমরা যদি বিশ্বব্যাপী এই বিরাট স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেই, জগতের অন্যান্য নির্য্যাতিত জাতিদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া দুর্গম পথের যাত্রী হই, তবে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়া সহজেই আমরা অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব,—সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা পৃথিবী হইতে দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইবে। সেদিন হয়ত এখনও দূরবর্ত্তী, কিন্তু সেই অনাগতের পূজার আয়োজন আজই আমাদিগকে করিতে হইবে।

(আনন্দবাজার)

মোলাকাৎ



ওয়েটিং রুমের বেয়ারা

[প্রত্যেক বছর ৭ই, ৮ই ও ৯ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনে একটা উৎসব হয়। গত ১৩৩৩ সনের ৬ই পৌষ ঐ উৎসবে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করি। কুলীর কারসাজির দরুণ ২।১ মিনিটের এদিক্ ওদিক্ হওয়ায় বোলপুরগামী ট্রেন মিস্ করি। বাসায় ফিরিয়া না আসিয়া বর্দ্ধমানগামী এক ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম। ইচ্ছা সেখানে ঘণ্টা ২।৩ কাটাইয়া বোলপুরের জন্য একটা ট্রেণ ধরিব। বর্দ্ধমানের ওয়েটিং রুমের এক বেয়ারার সঙ্গে নিম্নরূপ আলাপ হয়। শ্রীসুধাকান্ত দে]

বেয়ারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

প্র—তুমি কে? তোমাকে ত চিনিতে পারিতেছি না।

উ—আজ্ঞে, আমি এই ওয়েটিং রুমের বেয়ারা।

প্র—ওঃ! আচ্ছা তোমার মনিব কে?

উ—রেল কোম্পানী।

প্র—তোমার কাজটা কি শুনিতে পাই?

উ—ট্রেণ আসিবার আগে দেখি যেন ওয়েটিং রুমের ঘরগুলি খোলা থাকে। আর বাবুরা আসিলে তাদের এটা-সেটা ফরমাস্ খাটিয়া থাকি।

প্র—কিন্তু মধ্যম শ্রেণীর এই বিশ্রাম-ঘরটা ত বড় সুবিধার নয় হে। চেয়ার টেবিলগুলি নোংড়া ময়লা। বেতের চেয়ার ২।১টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ভাল যেগুলি তাতে ছারপোকার অসহ্য উৎপাত। তারপর মেজেতে ধূলা। ঝাঁট দেওয়া হয় না কি?

উ—আজ্ঞে হয়ে থাকে। কিন্তু সে আমার কাজ নয়।

প্র—পায়খানাটা ত নরক-কুণ্ড! কখনই সাফ হয় না কি?

উ—হয় বৈ কি, মহাশয়!

প্র—কে সাফ্ করে?

উ—রেলের মেথর। ঘরের মেজেও সেই ঝাঁটপাট্ দেয়।

প্র—আচ্ছা বল দেখি—তুমি ত এই ঘরের হাল দেখিতেছ—ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা কেমন করিয়া আসিয়া এই ঘরে দু'দণ্ডের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে? এইরকম ঘরে অপেক্ষা করিতে হইবে একথা মনে করিলে আমার ভ্রমণের সখই ত চলিয়া যায়।

উ—এ যে মধ্যম শ্রেণীর বিশ্রাম ঘর!

প্র—তা বটে। ভুলিয়া গিয়াছিলাম মধ্যম শ্রেণীদের যত্নের দরকার নাই। তৃতীয় শ্রেণীর কোন বিশ্রাম ঘর আছে কি?

উ—আজ্ঞে না।

প্র—দরকার হইলে তারা থাকে কোথায়?

উ—ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে।

প্র—তারা সেখানে শোয়, বসে, সব করে?

উ—আজ্ঞে হাঁ।

প্র—কফ, থুথু ফেলে, পানের পিক্ ফেলে?

উ—আজ্ঞে হাঁ। মেথর অবশ্য দুইবেলা ঝাঁট দেয়।

প্র—তাতে সব জঞ্জাল দূর হয় কি? প্লাটফর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে কি?

উ—আজ্ঞে না। তবে যখনি আমাদের চোখে পড়ে ধমক দিয়া নিবারণ করি।

প্র—সব সময়ে কর কি?

উ—না মহাশয়, সব সময়ে করি না। সব সময় করা সম্ভব নয়। যখন সম্ভব তখনও করি না। অনেক সময় চোখ বুজিয়া থাকি। কারণ, কাহাতক

লোককে নিবারণ করা যায়? কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আপনি গিয়া ১ম-২য় শ্রেণীর বসিবার ঘরে বসিতে পারেন। সেখানে আপনার মত বোলপুরযাত্রী কয়েকজন ভদ্রলোক ও মহিলা আছেন।

প্র—তুমি কি করিয়া জানিলে, তাঁরা বোলপুর যাইবেন?

উ—আমি তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি। আজ সেখানে আমার কাজও বেশ জুটিয়াছে। তাঁরা চা খাইবেন, চা আনিয়া দিব। আরও নানা ফুট ফরমাস খাটিতেছি।

প্র—কিন্তু আমার কাছে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট নাই।

উ—তা হইলই বা। সেজন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না। আজ আর কেহ দেখিতে আসিবে না। আপনি অনায়াসে সেখানে থাকিতে পারেন।

প্র—ধর যদি কেহ দেখিতে আসে।

উ—তাতেও ভয়ের কিছু নাই। আমি বলিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

প্র—তবে তোমাদের ভয়টা কিসের? তোমরা ইচ্ছা করিলে যখন তখন যাকে তাকে ত সে ঘরে বসাইতে পার।

উ—না মহাশয়, তা পারি না।

প্র—কেন পার না? কোন্ ক্ষেত্রে পার না?

উ—যদি প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহেব যাত্রী বসিবার ঘরে না থাকে, তবেই স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাদিগকে সেখানে বসাইতে পারি। সাহেব থাকিলে পারি না।

প্র—এমন কি, সময় সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোককে জোর করিয়া উঠাইয়াও দাও?

উ—আজ্ঞে হাঁ। কি করিব উপায় নাই। নচেৎ চাকরী থাকে না।

প্র—আচ্ছা তুমি যে আমাকে ঐ ভাল ঘরে নিয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছ, সত্য করিয়া বল ত কিসের লোভে।

উ—কিসের আবার লোভে? দেখিতেছি আপনি এখানে কষ্ট পাইতেছেন। আর ঐ ঘরের তাঁরা একস্থানেরই যাত্রী। একত্র হইলে গল্পগুজব চলিতে পারে। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তা মহাশয়, তাতে যদি আপনি খুসী হইয়া যাইবার সময় ২।৪ পয়সা দিয়া যান সে ত আপনার দয়া। কিন্তু সেটা আলাদা কথা।

প্র—তুমি জাতিতে কি, জানিতে পারি কি?

উ—আজ্ঞে, আমি মুসলমান।

প্র—আশ্চর্য্য! তোমার কথায় বার্ত্তায় বা ব্যবহারে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে ত মুসলমান বলিয়া মনে করি নাই। ঠিক হিন্দুর মত। তুমি গরু খাও?

উ—ছি মহাশয়! ও কথা বলিবেন না। ও কথা শুনিলেও পাপ। গরু ভগবতী, দুধ দেয়। তাকে কি খাইতে আছে?

প্র—কিন্তু দুধ না দেওয়া গরুও ত আছে। দেশে রোগা গরুর সংখ্যা কম নয়। সেগুলি খাইলে কি দোষ হয়?

উ—মহাশয়, গরু রোগাই হোক, আর মোটাই হোক, আমরা গরু খাই না। আপনি পাপের কথা আর বলিবেন না।

প্র—পাপ বলিতেছ কেন? তোমাদের শাস্ত্রেত গরু খাইতে নিষেধ নাই। বরং অনেক মুসলমান গরু খাওয়াকেই ধর্ম্ম বিবেচনা করে।

উ—কিন্তু বাংলা দেশের অনেক মুসলমান গরু খায় না।

প্র—তা হইতে পারে। কিন্তু অনেকে খায় একথা ত তুমি অস্বীকার করিতে পার না। দেখ, আমাকে ভুল বুঝিও না। যদি মনে করিয়া থাক তুমি গরু খাও এই কথা শুনিলে তোমার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মিবে, তবে তোমার ভুল হইয়াছে। আমার মতে ছাগল, ভেড়া শূয়ার ইত্যাদি খাওয়া যদি দোষের বা পাপের না হয়, তবে গরু খাওয়াও নয়। গরু খাও বলিয়া লাঞ্ছিত হইবার কিছু নাই। আমি সরলভাবে তোমার কাছে সত্য কথাটা জানিতে চাহিয়াছিলাম, তুমি গরু খাও কি না?

উ—কি জানেন মহাশয়, আপনার কথাগুলি ঠিক বলিয়া বোধ হয়। তবে খাওয়াটা রুচির উপর নির্ভর

করে। যার রুচি হয় সে গরু খায়, যার হয় না, সে খায় না। গরু খাওয়া যাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তারা গরু খাওয়া লইয়া কোন রকম মাথা ঘামায় না, অনায়াসে খায়।

প্র—বেয়ারার চাকরী করিয়া তুমি মাসে কত টাকা পাও?

উ—১৫৲ টাকা।

প্র—তোমার জমিজমা কিছু আছে কি?

উ—আজ্ঞে না।

প্র—এই কি তোমার সমস্ত?

উ—আরও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকি।

প্র—কি উপায়ে?

উ—মহাশয়, সে আপনাদেরই পাঁচজনের অনুগ্রহে। আপনারা যাইবার সময় সিকিটা দু'আনীটা বক্‌শীস দিয়া যান। তাতেই গরিবের উপকার হয়।

প্র—তুমি কি প্রত্যেকের কাছেই বক্‌শীস চাহিয়া থাক?

উ—কেহ কেহ স্ব-ইচ্ছায় দেয়। চাহিলে সকলেই প্রায় কিছু না কিছু দেয়। ২।১ জন অবশ্য তাড়াইয়াও দেয়।

প্র—সাহেবদের কাছে কিছু পাও?

উ—আজ্ঞে হাঁ। তবে সকলে দেয় না। যারা দেয় তারা সাধারণতঃ বাঙ্গালী বাবুদের চেয়ে বেশী দেয়। কিন্তু কোন সাহেবের কাছে চাহিতে পারি না। যার ইচ্ছা সে আপনি দিয়া যায়।

প্র—সাহেবদের কাছে চাহিতে ভয় পাও কেন?

উ—যে সাহেব দিবে না, সে শুধু ধমক দিয়া তাড়াইয়া নিরস্ত হইবে না, আমার নামে নালিশ করিয়া যাইবে। চাকরীটি খোয়া যাইবে। বাঙ্গালীরা তা করে না।

প্র—চাকরী খোয়া যাইবে কেন? বকশীস লওয়াটা কি অন্যায় কাজ?

উ—না মহাশয়, বক্‌শীস লওয়াটা অন্যায় নয়, কিন্তু বকশীস চাওয়াটা অন্যায় ও বে-আইনী।

প্র—বক্‌শীস বাবদ মাসে তুমি কত পাও?

উ—আজ্ঞে, মাসে ৫।৬ টাকার বেশী হইবে না। কখনো কপালক্রমে ৮।১০ টাকাও জুটে।

প্র—এই ২০।২১ টাকায় তোমার সংসার খরচ চলে?

উ—আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে চলে। কিন্তু অসুখবিসুখ হইলেই বিপদ।

প্র—তোমাকে কি সারাদিনই ষ্টেশনে হাজিরা দিতে হয়?

উ—আজ্ঞে হাঁ, এক রকম তাই। রাত্রেও নিস্তার নাই। ১৫৲ টাকায় আমাকে দিনরাত পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে। ছুটছাট যে সময় পাই, তা কাজে লাগে না। সে রকম কাজ কোথায় পাইব? সুতরাং আমার আয় বাড়াইবার পথ নাই।

প্র—তোমার পরিবারে কে কে আছে?

উ—আমি, আমার স্ত্রী এবং এক পুত্র। আমার ভাইরা পৃথক বাস করে।

প্র—তোমার মাসিক খরচের হিসাবটা একবার দাও দেখি। খাওয়ার জন্য কত যায়? অন্যান্য খরচই বা কত?

উ—ছেলেকে মাষ্টারে পড়ায়, দিতে হয় ২৲ টাকা। ঘর ভাড়া বাবদ যায় ২৲ টাকা। বাকীটায় খাওয়া চলে।

প্র—পরার কি কর?

উ—মহাশয়, ঐ টাকাতেই কুলাইয়া লইতে হয়। মাঝে মাঝে এটা ওটা বাদ দিতে হয়। কখন কখন মাসে ২৪।২৫ টাকা খরচ হইয়া গেলে ধার করিতে হয়।

প্র—তোমার ছেলেকে কি পড়াও?

উ—প্রধানতঃ বাংলা। উর্দ্দুও পড়ে।

প্র—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্ত্রী কোন কাজ করে না? সে যদি খাটিত, তবে ত তোমাদের আর দু'দশটাকা বাড়িয়া যাইত। সংসারের অবস্থা সচ্ছল হইত।

উ—(জিভ কাটিয়া) ও কি কথা বলিতেছেন মহাশয়? আমার স্ত্রী মুসলমান স্ত্রী হইয়া বাইরে পুরুষদের মধ্যে কাজ করিতে যাইবে? না খাইতে পাইয়া মরিয়া

গেলেও না। গরিব বলিয়া আমাদের কি মান-সম্ভ্রম জ্ঞান নাই?

প্র—ভাল। তোমার ঋণ আছে কি?

উ—আজ্ঞে হাঁ।

প্র—কত?

উ—৪।৫শ টাকার হইবে।

প্র—ঋণটা কেন করিয়াছিলে?

উ—প্রধানতঃ অসুখ বিসুখের জন্য।

প্র—কত করিয়া সুদ দিতেছ?

উ—টাকায় /০ আনা করিয়া।

প্র—ধার দিয়াছে কে? কাবুলী কি?

উ—না মহাশয়। স্থানীয় ভদ্রলোকদের কাছে টাকাটা ধার লইয়াছি।

প্র—কাবুলীরা বুঝি বেশী বিরক্ত করে?

উ—আজ্ঞে বাবুদের চেয়ে কাবুলীরা ঢের ভাল। তারা বাবুদের মত অত অত্যাচার করে না। তারা মাস মাস সুদের টাকাটা পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। আসলের জন্য তাগাদা করে না। কিন্তু বাবুদের সুদ ত চাই-ই তার উপর আসলের জন্য নিত্য তাগাদা—মারধর পর্য্যন্ত।

প্র—মারধর কেন?

উ—মহাশয়, বাবুদের সর্ব্বদা ভয়—লোকটা মরিলেই আমাদের টাকাটা গেল। তাই যখন তখন টাকা চাহিয়া বসে। কখনো কখনো বাড়ীচড়াও করিয়া টাকার জন্য মারধর পর্য্যন্ত করে। সব মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়।

প্র—যারা টাকা ধার দিয়াছে, তারা কি গরিব?

উ—আজ্ঞে না, তাদের টাকার কোন অভাব নাই। তারা সুদখোর।

প্র—তুমি বলিতেছ, মহাজন হিসাবে কাবুলীরা বাবুদের চেয়ে লোক ভাল। তা যদি হয় তুমি এই ৪।৫শ টাকার ধার বাবুদের কাছে কেন লইয়াছ? কাবুলীর কাছে লইলে না কেন?

উ—মহাশয়, অনেক সময় আমাদের হাত পা বাঁধা থাকে। বাবুরা সর্ব্বদা শহরে থাকেন। যখন খুসী গিয়া তাঁদের কাছে ইচ্ছামত ধার নিয়া আসিতে পারি। অবশ্য কিছু না কিছু বন্ধক রাখিতে হয়ই। কিন্তু কাবুলীদের সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। তারপর বাবুদের সঙ্গে নানা রকমে বাধ্যবাধকতা জন্মে। ঋণ দিবার সময় মিষ্টি করিয়া কথা কহে। আমরা একবার ঋণ করিয়া তা সহজে শোধ দিতে পারি না। কি করিয়া পারিব? দেখিতেছেন ত যা পাই তাতেই কুলাইয়া উঠিতে পারি না। আবার ঋণ করিতে হইলে পুরাণ মহাজনদের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নাই। অনেক সময় ঋণের সর্ত্তও সেইরকম থাকে। সুতরাং পাকে প্রকারে আমাদিগকে বাবুদের কবলে পড়িতে হয়।

প্র—তুমি বলিয়াছিলে না যে বোলপুর যাত্রীদের চা আনিয়া দিবে? কোথা হইতে চা আনিয়া দিবে? বাজার হইতে কি?

উ—আজ্ঞে না। এই প্ল্যাটফর্ম্মে একটা চায়ের দোকান রহিয়াছে দেখেন নাই কি?

প্র—দেখিয়াছি। সেটা মুসলমানদের দোকান বলিয়া বোধ হইতেছে।

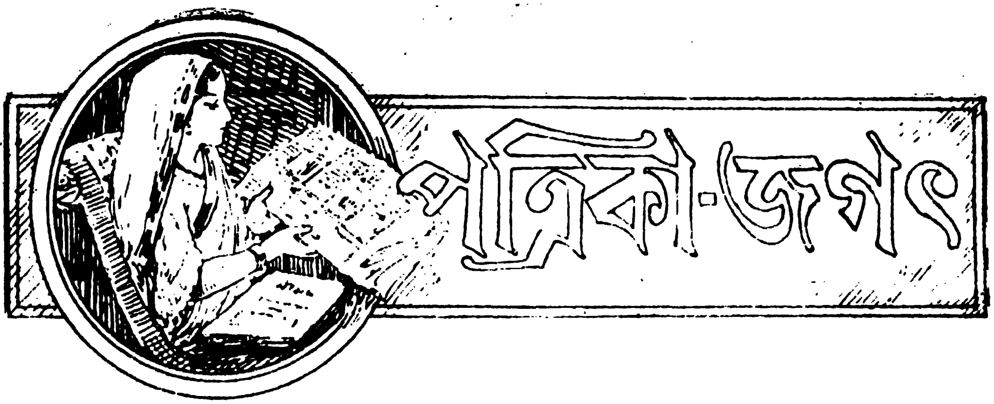
উ—আজ্ঞে হাঁ।

প্র—কিছুক্ষণ আগে ষ্টেশনের আশপাশটা একটু ঘুরিয়া দেখিয়াছি। তাতে ২।৪টা দোকান যা চোখে পড়িল সবইত মুসলমানদের বলিয়া মনে হইল।

উ—আজ্ঞে হাঁ, এখানে ২।৪টা মুসলমানের দোকান আছে বটে।

প্র—আচ্ছা বর্দ্ধমান শহরের সর্ব্বত্রই কি এইরূপ? অর্থাৎ আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি তোমাদের এখানে যত মুসলমান আছে তাদের অনেকেরই কি জীবিকা উপার্জ্জনের এইরূপ চেষ্টা আছে?

উ—তা হইলে আর আমাদের ভাবনা কি ছিল? হিন্দুর তুলনায় বর্দ্ধমান শহরে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য। মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে গরিব। মুসলমানদের মধ্যে একটিও ধনী ব্যক্তি পাইবেন না। আর মুসলমানরা সকল বিষয়েই এখানকার হিন্দুদের পশ্চাতে রহিয়াছে।



"আর্থিক উন্নতি"র নিবেদন

সবিনয় নিবেদন,

মফঃস্বলের আর্থিক জীবন ও আর্থিক চিন্তার সঙ্গে কলিকাতার চিন্তা ও কর্ম্মরাশির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কায়েম করা আমাদের পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা গত বৎসর "আর্থিক উন্নতি"র পাতায় পাতায় বাংলার বিভিন্ন জেলা, সাবডিভিশন ও পল্লীগ্রামকে পাঠক ও লেখক-বর্গের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছি। বাংলাদেশের কর্ম্মমণ্ডলে ও চিন্তা-সম্পদে মফঃস্বলের ছোট বড় মাঝারি দানগুলা সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট। বাঙালী মাথাওয়ালা ও কর্ম্মনিষ্ঠ জনগণকে সর্ব্বদা সেই দিকে সজাগ করিয়া রাখায় আমাদের প্রয়াস রহিয়াছে।

অপরদিকে "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ আমরা গোটা দুনিয়ার সাধনা ও বাণী বাংলাদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত করাইতে চেষ্টা করিতেছি। বাংলার প্রত্যেক জনপদ, মহকুমা আর নগর যাহাতে সমানভাবে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য সর্ব্বদাই আমরা মোতায়েন রহিয়াছি। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর ধনদৌলত-বিষয়ক বিজ্ঞানদর্শনের চর্চ্চায় ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ, রুশ আর জাপানী এই সাত জাতির কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরেরা যাহা-কিছু আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন অথবা সমাধা করিতেছেন তাহার অনেক-কিছুই বাংলা দেশের আজ না হয় কাল কাজে লাগিতে বাধ্য। বাঙালী পল্লীবাসীর আর শহুরে লোকের সেবায় সেই সব আদর্শ ও নমুনা হাজির করিয়া "আর্থিক উন্নতি" বাঙালী জাতিকে আর্থিক জীবনের পরবর্ত্তী ধাপ দেখাইয়া দিতেছে। দুনিয়ার গতি কোন্ দিকে তাহা বুঝিলেই বাঙালী তাহার অবস্থা-মাফিক ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আমরা পাঠক, লেখক ও সমালোচক চাই। কুটীর-শিল্পী, মিস্ত্রী, সমবায়ের প্রচারক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, পল্লী-সেবক, উকিল, চিকিৎসক, ব্যাঙ্কার, বীমা-সমিতির এজেন্ট ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনারীই "আর্থিক উন্নতি"কে নিজ মুখপত্র মনে করিয়া স্বদেশ-সেবার কার্য্যে সহায় হউন।

পত্রিকা-সম্পাদকগণ, আপনারাও ফী মাসেই আমাদের সংবাদ-প্রবন্ধ অনুবাদ সমালোচনার যেখান হইতে ইচ্ছা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া বাঙালী সমাজের সকল স্তরে উচ্চতম ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার বিস্তারসাধনে যত্ন লইলে আমরা যার পর নাই বাধিত ও উপকৃত হইব। আপনাদের হাতেই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তথ্য-নিষ্ঠ বর্ত্তমান-সেবী ভবিষ্য-পন্থী আর্থিক-উন্নতির আন্দোলন প্রায় ষোল আনা নির্ভর করিতেছে। যে গুরু দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়ে রহিয়াছে সেই দায়িত্বের কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া এই অনুরোধ-পত্র খতম করিতেছি। ইতি

"ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার"

ইহাকে ভারত সরকারের বন-বিভাগের মুখপত্র বিবেচনা করা চলে। মাসিক। দেরাদুন। সেপ্টে ১৯২৭। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬০। এই পত্র ৫৩ বছর যাবৎ চলিতেছে। জানুয়ারী হইতে বছর আরম্ভ হয়। "বন, কৃষি শিকার ও ভ্রমণবিষয়ক পত্রিকা।" বার্ষিক মূল্য ভারতে ১৫৲ টাকা।

প্রবন্ধাবলী :—

১। "ফরেষ্ট টাইপ" বা "বন-ছাঁচ" তত্ত্ব। মাটির দিকে চাহিয়া অথবা গাছের দিকে চাহিয়া বন-ছাঁচ নির্ণীত হইবে? এই প্রশ্নের সুমীমাংসার উপর দুনিয়ার বহু বন-বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য খরচের কথাটাও আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের বন-কর্ম্মচারীরা এই বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন।

এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের কর্ম্মচারীরা বহু দিবস যাবৎ নানাপ্রকার পরীক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি কাযাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি এই বিষয়ে তাঁর গবেষণার ফল "অ্যাকটা ফোরেষ্টালিআ ফেন্নিকা নং ২৯" তে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রচার করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু গবেষকদের আসল বইখানা পড়িয়া দেখা দরকার। হেলসিংফোর্স হইতে "সোসাইটি অব্ ফরেষ্ট্রী ইন্ ফিন্‌ল্যাণ্ড" কর্ত্তৃক তার ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কাযাণ্ডারের মতে "গাছ গজাইবার, গাছ কাটিবার, আদর্শ ক্ষেত জন্মাইবার, দো-আঁশলা গাছ তৈয়ারী করিবার" প্রণালী ইত্যাদি শুদ্ধ নয়। তিনি বন-ছাঁচ ধরিতে গিয়া স্থানের উপর জোর দিতেছেন। স্থানের উপর জোর দেওয়ার অর্থ কি? তিনি বলিতেছেন, "কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখ। সেখানে কোন্ শ্রেণীর গাছ সব চেয়ে বেশী জন্মে ও বাঁচে দেখ। তারপর পর পর জন্ম-বহুলতা ও স্থায়িত্ব অনুসারে অন্য গাছগুলিকে সাজাও।" এইরূপ করিবার মস্ত এক সুবিধা এই যে, একটা আন্তর্জ্জাতিক বন-বিভাগীয় সংখ্যা-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। তাতে কোন্ গাছ কোনখানে জন্মান যাইবে কি যাইবে না, সে সমস্যা সহজ হইয়া আসে।

কাযাণ্ডারের আবিষ্কৃত নয়া তত্ত্বের মূল্য ভারতের পক্ষেও খুব বেশী। কাযাণ্ডার এক স্বাভাবিক সমভাবাপন্ন, সার্ব্বজনীন ও আন্তর্জ্জাতিক প্রণালীতে স্থানের বিশেষত্ব পরীক্ষার কথা বলিয়াছেন। ইহাতে সার দেওয়া, মূল্য নির্ণয়, বনের তত্ত্বাবধান, ও বন সংক্রান্ত সংখ্যাতত্ত্ব, বন-বিভাগের সমগ্রনীতি উপকৃত হইবে।

কাযাণ্ডারকে এক মস্ত বড় চিন্তাবীররূপে পূজা করা যায়। তাঁর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতীয় বন ঢুঁড়িয়া বেড়াইলে আমাদের দেশেও বহু নূতন তথ্য ও তত্ত্ব বাহির হইবে।

২। বৃক্ষ-বসতিতে আগুনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় (জি, এস্, শারলে আই, এফ, এস্)। ডকিন্স ও শারলে এই দুই ভদ্রলোকের ভিতর কথার কাটাকাটি হইতেছে। এটা শারলের উত্তর।

আমাদের মত আনাড়িদের মনে হইতে পারে, "আগুনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সম্বন্ধে আবার কি দুই মত হইতে পারে? আগুন লাগিলে গাছকে যে করিয়া হোক্ বাঁচাইতে হইবে।" বন-বিভাগও এককালে এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিত।

কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, সে নীতি প্রকৃষ্ট বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়। বনের মধ্যে আপনা আপনি আগুন লাগিয়া যায়। সেই আগুনে যে-সব গাছ ধ্বংস হওয়া দরকার, সেগুলি ধ্বংস পায়। যেগুলি টিঁকিয়া থাকে বা আবার হয় সেগুলিই উৎকৃষ্ট। প্রকৃতি এই উপায়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া আপন বন-সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ঘটাইতেছে।

অবশ্য বনের মধ্যে আগুন লাগাটা সকল সময়েই উপকারী নয়। কোন সময়ে উপকারী? এই লইয়াই মতদ্বৈধ।

ডকিন্সের মতে, "গাছ আবার বাড়িতে আরম্ভ করার পূর্ব্বে আগুন লাগাটাই মঙ্গলজনক। বাড়্টা থামিয়া যাওয়ার পর আগুন লাগিলে সর্ব্বনাশ। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার, নবেম্বর ১৯২৬।

শারলে বলিতেছেন, "মোটেই না। ঠিক তার উল্টা কথাটা সত্য। শৈশবে আগুন ধরিয়া যাওয়াটাই খারাপ।"

এই তর্কাতর্কিটাকে পুঁথিগত বলিলে বেশী দোষ হইবে না। কারণ দুই জনের একজনও বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই বিষয় লইয়া কোন প্রকার পরীক্ষা চালান নাই। বলা বাহুল্য, ভারতীয় বনবিভাগের এদিকে একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

৩। কাগজের মণ্ড তৈয়ারী করা যায় কিনা দেখিবার জন্য যুক্তপ্রদেশের চাক্রাটা বনবিভাগ পরিদর্শনের রিপোর্ট

(ডব্লিউ রেইট, দেরাদুনস্থ বন-সংক্রান্ত গবেষণামন্দিরে, কাগজ-মণ্ড বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী)।

রিপোর্ট'টা ৭টা প্যারাগ্রাফে বিভক্ত। সমস্ত রিপোর্টের বক্তব্যটা এক নিঃশ্বাসে বলা চলে এইরূপ—"এ-স্থানে কাগজের মণ্ড তৈয়ারী কোন প্রকারেই হইবে না।" মণ্ড তৈয়ারী করা যায় না, এমন নয়। বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তৈয়ারী যদি বা হইল, তা অন্য কারণে ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কিন্তু রিপোর্টের কতকগুলি তথ্য ও পরীক্ষার মূল্য আছে, অস্বীকার করা যায় না।

কাঠকে কাগজের মণ্ডে পরিণত করিবার উপায় দুটি—(১) মেকানিক্যাল বা যন্ত্রসাহায্যে। (২) কেমিক্যাল বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

এই নির্ব্বাচিত স্থানটাতে যন্ত্র সাহায্যে কোন ফল হইবে না। সাফ কাগজ পাওয়া যাইবে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট কাগজ মিলিবে। ফ্যাক্টরী পরীক্ষার ফল নিম্নরূপ :—

মিশ্রিত "স্প্রুস" ও "ফার"—সাল্‌ফেট প্রণালীতে "ডাইজেশন"।

সোডার খাদন—কাঁচা কাঠের ওজনের উপর ২৫%।

ব্লিচ্‌ খাদন—কাঁচা কাঠের ওজনের উপর ৫·৬২%।

ব্লিচ না করা মণ্ডের আদায় ৩৮·৭৮% } কাঁচা কাঠের
ব্লিচ করা মণ্ডের আদায়— ৩৬·২০% } ওজনের উপর

এইগুলি সাদা মণ্ড উৎপাদনের অঙ্ক। আমেরিকা অথবা নরওয়ে সুইডেনের তুলনায় নিন্দনীয় নয়। উৎকর্ষটাও সন্তোষজনক।

কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধান বিঘ্ন পরিমাণ এবং খরচ। স্প্রুস্‌ ও ফার একত্রে বাৎসরিক ২½ লক্ষ ঘন ফুটের বেশী হইবে না। কিন্তু আর্থিক কোনপ্রকার প্রচেষ্টার জন্য দরকার বৎসরে অন্ততঃ ৬ হাজার টন অর্থাৎ ১২ লক্ষ ঘন ফুট। তেওড়ি গাঢ়োয়াল জঙ্গলে হয়ত যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

তারপর বর্ত্তমান প্রণালীতে খরচটা জবর হইবে। স-মিল, কাগজের মিল, সীজ্‌নিং কিল্‌ন, বাক্স তৈয়ারী ইত্যাদি ইত্যাদি ত আছেই। তা ছাড়া রেলভাড়া ও জলশক্তি কাজে লাগাইবার খরচ আছে। নদী, খাল বা ঝরণা আছে বটে। কিন্তু সেগুলির শক্তি কাজে লাগান অসম্ভব।

সুতরাং মণ্ড তৈয়ারীর স্বপ্নটা আকাশকুসুম মাত্র। ইতি রিপোর্ট। এই রিপোর্টে পাওয়া গেছে ৩টা কথা—(১) ১২ লক্ষ ঘন ফুট কাঠ বছরে লাগিবে। (২) পুঁজিপাটা খরচ হইবে ২৫ লাখ টাকা। (৩) অন্ততঃ ৩০ বছর ধরিয়া প্রতি বছর ১২ লক্ষ ঘন ফুট দরকার হইবে এবং ফ্যাক্টরীতে প্রতি ঘনফুটে খরচ ।৵০ আনার বেশী পড়িবে না।

৪। আন্দামান—ইজি চেয়ারে বসিয়া ভূতত্ত্বের হিসাব (টি, ভি, আয়ার, পি, এফ, এস)। আন্দামানের পাহাড়ে পর্ব্বতে, দরিয়া সাগরে, সৈকতভূমিতে ও সমতলে কোন্‌ কোন্‌ যুগের পরিচয় পাওয়া যায় তার শিক্ষাপ্রদ বিবরণ।

৫। পাখি। একপ্রকার অসভ্য জাতি। এরা অত্যন্ত সহজে কি করিয়া বিভিন্ন জীবজন্তু ধরিতে পারে তার ২।১টা উদাহরণ।

প্রবন্ধ ছাড়া আছে ৪খানা কেতাবের সমালোচনা, অন্য কাগজ হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র।

কেতাব চারখানার নাম :—

(ক) কাশ্মীর রাজ্যের বন-বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট ১৯২৫-২৬। কাশ্মীর রাজ্যের বন-বিভাগটা খুব মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। আয়তন ৯,৫০০ বর্গ মাইল। ঐ বছরে স্থূল আয় সর্ব্বাধিক হইয়াছে—৬৬,৭৫,০০০ টাকা। নিট্‌ লাভ ৩৬,১৫,০০০ টাকা। আর একবার মাত্র এর চেয়ে বেশী লাভ হইয়াছে। একটা আশার কথা এই, ভবিষ্যতে এই আয়টা না কমিবার সম্ভাবনা। কারণ ২৭,১২,০০০ টাকার কাঠ ও জ্বালানি কাঠ গুদামে জমা আছে। "কুথ" বেচিয়া রাজ্যের খুব লাভ হয়। কারণ যোগাড় ধরিবার খরচ পড়ে মাত্র ১১।৵০ আনা মণপ্রতি। আর প্রতি মণ বেচা হইয়াছে ২৮৭৲ টাকা দরে। ৭০০০ মণ বেচা গিয়াছে।

বনের ভিতর দিয়া সড়ক তৈয়ারী করিতে (২৮২ মাইল) ৫৮,০০০ টাকা খরচ পড়িয়াছে। মাইল প্রতি খরচটা কম বলিতে হইবে—২০৬৲ টাকা।

(খ) বৃটিশ ভারতে "ফনা' বা পাছপীলা, কোলিওপ্তেরা। (ক্রাইসোমেলিনা ও হাল্‌তিসিনা) এস্‌. মৌলিক। ১৯২৬। টেলর অ্যাণ্ড ফ্রান্সিস, লণ্ডন।

দুনিয়ার "ফনা" সম্বন্ধে দেশবিদেশে এই ধরণের যত বই বাহির হইয়াছে, তার মধ্যে ভারতের কেতাবগুলি সেরা। এমন বই নাকি আর কোথাও বাহির হয় নাই।

(গ) বৃটিশ বার্ক-বীট্‌ল বা গাছের ছালের পোকা। বুলেটিন নং ৮। ফরেষ্ট্রী কমিশন লণ্ডন। জে, ডব্লিউ, মুনরো ১৯২৬। সম্রাটের ষ্টেশনারী আফিস। ২ শি, ৬ পে।

এই বিষয়ে অধিকাংশ সাহিত্য জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত। নানাস্থান হইতে কুড়াইয়া এই সারমর্ম্ম ইংরেজীতে বাহির হইয়াছে।

(ঘ) সুইয়েটেনিয়া মেহগ্‌নি জাক্‌ এন্‌ সুইয়েটেনিয়া মাক্রোফিল্লা কিং।

এই বইখানি বাহির হইয়াছে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডীজ্‌ গবেষণা মন্দির হইতে। সুন্দর সুন্দর ছবিতে পূর্ণ। বাঁধাই চমৎকার। মেহগ্‌নি কাঠের দুই "জাতি"র কথা আলোচিত হইয়াছে। প্লেট আছে ৩০টা। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ইংরেজী চুম্বক দেওয়া হইয়াছে। ফুটনোটে ইংরেজীতে ছবির বিষয়ও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জাপানে আজ ৫০ বছর ধরিয়া মেহগ্‌নি কাঠের চাষ হইতেছে। এই ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। জাভার মেহগ্‌নির ব্যবসা একটা বড় ব্যবসা। ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ, মধ্য আমেরিকা স্পেন ও অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থানে মেহগ্‌নি গাছ দেখা যায়।

"কোয়াটারলি টেক্‌নিক্যাল বুলেটিন্‌ অব্‌ রেলওয়ে বোর্ড"

রেলওয়ে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এই বুলেটিন পরিচালিত হয়। ত্রৈমাসিক। দেরাদুনস্থ ভারত-সরকারের গবেষণা মন্দিরের সহিত ভারতীয় রেলওয়ের সম্পর্কের দিক্‌। দেরাদুনের বন-সংক্রান্ত গবেষণা মন্দিরের এক শাখার নাম আর্থিক বা অর্থনৈতিক শাখা। এই শাখায় যে কাজ হইতেছে, তার অনেকটা বন-বিভাগের যতখানি উপকার করিবে, ভারতের রেলওয়েরও ততখানি উপকার হইবে। এ কথাটা রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মাথায় এখনও ঢুকে নাই।

কাঠ পরীক্ষার কারখানায় (টিম্বার টেষ্টিং ওয়ার্কশপ) প্রত্যেক কাঠ খুব শুদ্ধরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। কাঠ পরীক্ষার লেবরেটরিগুলিতে ১১টা খুব শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সব চেয়ে শক্তিশালীটার কাজ করিবার পরিমাণ লক্ষ পাউণ্ড (ওজন); আর চাপ ধরিবার ক্ষমতা $\frac{1}{10000}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। আজ পর্য্যন্ত ৩০টা কাঠ পরীক্ষা করা হইয়াছে।

এই বিভাগের পরীক্ষার ফলগুলি "রোটারি ইনডেক্‌সের" সাহায্যে দেখান হইয়াছে। যে কেহ "ফরেষ্ট ইকনমিষ্টে"র নিকট চাহিবামাত্র পাইতে পারে। রোটারি ইন্‌ডেক্স দুই প্রকারের—(১) সাধারণবোধ্য, সেগুণ কাঠের সঙ্গে তুলনা করিয়া অন্য সব কাঠের শক্তি দেখান হইয়াছে। সেগুণ কাঠকে সর্ব্বত্রই ১০০ ধরা হয়। (২) এঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষায়।

রেলওয়ের জন্য "স্লীপারের" দরকার হয়। সম্প্রতি এই লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। কোন্‌ কোন্‌ কাঠে সব চেয়ে ভাল স্লীপার হয় ও দেশ বিদেশের স্লীপারের তুলনায় সেগুলির স্থান দেখাইয়া তালিকা তৈয়ারী হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের টিম্বার টেষ্টিং লেবরেটরিতেও ঠিক এই ভাবে কাজ হইতেছে। সুতরাং তুলনা করাটা সোজা। এই তুলনায় বুঝিতে পারি ভারতীয় "লরেল" আমেরিকার লিষ্টে দ্বিতীয় স্থান পায়; ওকের (আমেরিকার খুব মূল্যবান্‌ স্লীপার) উপরে থাকে; আর ডাগলাস্‌ ফারের স্লীপারের দামের অঙ্কের চেয়ে এর দামের (উৎকর্ষের, দরের নয়) অঙ্ক দ্বিগুণ দাঁড়ায়।

এই গবেষণা-মন্দিরের কাজ নানা ভাবে বনবিভাগের উৎকর্ষ সাধন করিতেছে। যেমন, সম্প্রতি শিলংএ যে কনফারেন্স হইয়াছিল, তাতে স্থির হইয়াছে আসামে "ক্রিওসোটিং প্ল্যাণ্ট" বসান দরকার।

স্লীপার ছাড়া, মেঝেয় পাতিবার জন্য বা রেলগাড়ীর নানা অংশের জন্য নানা রকম কাঠের, ইম্‌প্রেগনেশন, টেলিগ্রাফের খুঁটা, প্ল্যাটফর্ম্মে "পেভিং ব্লক" ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা লইয়াও এই বিভাগ মাথা ঘামাইয়া থাকে। কাঠ সীজন্‌ করার সমস্যাটাও দফায় দফায় আলোচিত হইতেছে। মোর্সেলেস্‌ নামে এক সুইড এক নয়া ধরণের কিল্‌ন্‌ আবিষ্কার করিয়াছে। তাতে ৪৮ঘণ্টা বা তারও কম সময়ে কাঠ

সীজন্ করা চলিবে। ভারতে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলেই খরচ অনেক সংক্ষেপ হইবে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ "টিম্বার টেষ্টিং, উড প্রিজার্ভিং ও "সীজনিং" এই ৩ বিভাগ হইতে অনবরত চেষ্টা হইতেছে সেগুণ, শাল দেওদার ব্যতীত আর কোন কোন গাছ হইতে টেঁকসই স্লীপার সস্তায় বাহির করা যায় কি না।

রেলগাড়ী তৈয়ারীর জন্য "প্ল্যাঙ্ক" এর "কিল্‌ন সীজনিঙ" চাই। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান হইতে ২০০ টন টিম্বার দেরাদুনে পৌছিয়াছে। সেগুলিকে "কিল্‌ন সীজন" করিয়া ভিন্ন ভিন্ন "ওয়াগন শপে" পাঠান হইয়াছে। এ পরীক্ষাটা কিছু দিন ধরিয়া চলিবে।

এছাড়া রেলওয়ে বোর্ডের হুকুমমত লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ১৯২৭,১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে ৪টা কোচ তৈয়ারী হইবে। কাঠ নির্ব্বাচন করিবেন ফরেষ্ট ইকনমিষ্ট। লিলুয়াতে সেগুলিকে "পরিবর্ত্তিত" করিয়া বর্ষাকালে দেরাদুন পাঠান হইবে। সেখানে বিনা পয়সায় কিল্‌ন সীজন করিয়া দেওয়া হইবে। দুইটা কোচ একএকটা পুরা কাঠে তৈয়ারী হইবে। বাকী দুইটা ভিন্ন ভিন্ন রকম কাঠে তৈয়ারী হইবে।

ই, আই, আর সম্প্রতি শিশুগাছের কাঠে এক নয়া ডাইনিং সেলুন তৈয়ারী করিয়াছে।

কয়েকটা "আর্থিক" পত্রিকা

(ক) ইণ্ডিয়ান্ এঞ্জিনিয়ারিং, ৮১ তম ভাগ। নং ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬। ১৯শে ও ২৬শে মার্চ্চ এবং ২রা, ৯ই, ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৭।

(খ) টিম্বার ট্রেডস্ জার্ণেল, ১০১। নং ২৬৩৫, ২৬৩৬, ২৬৩৭, ২৬৩৮ ও ২৬৩৯। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ৫ই, ১২ই, ১৯শে ও ২৬শে মার্চ্চ, ১৯২৭।

(গ) দি ট্রপিক্যাল অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট, ৬৮ তম ভাগ। নং ২, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।

(ঘ) এম্পায়ার ফরেষ্ট্রী জার্ণেল ৫ম ভাগ। নং ২, ১৯২৬।

(ঙ) সি লিয়ারি অ্যাণ্ড কোংর লণ্ডন মার্কেট রিপোর্টস্ ১লা হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।

(চ) সুগারকেন ব্রিডিং—ইন্‌ডিকেশন অব্ ইন্‌হেরিটেন্স—মেম্যরস্ অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ অ্যাগ্রিকালচার ইন্ ইণ্ডিয়া ১৪ শ ভাগ। নং ৩। বোটানিক্যাল সিরিজ জানুয়ারি, ১৯২৭।

(ছ) দি অ্যাগ্রিকাল্‌চারাল জার্ণেল অব্ ইণ্ডিয়া ২২শ ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ড। মার্চ্চ, ১৯২৭।

"প্রবাসী"

মাসিক। কলিকাতা। ॥০ আনা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪। ১৪৪ পৃষ্ঠা। বীরভূমের শর্করা-শিল্প। শ্রীগৌরীহর মিত্র। শর্করা-শিল্পের প্রসঙ্গে এই কয়টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে :—(১) চিনি, (২) মোরব্বা, (৩) মিষ্টান্ন, (৪) বাটা বাতাসা।

লেখকের বক্তব্য :—(ক) আজ কাল বিদেশী চিনি স্বদেশী চিনিকে পরাজিত করিয়াছে। (খ) প্রধানতঃ আখের গুড় হইতেই বীরভূম চিনি প্রস্তুত হইত। (গ) ইক্ষু পেষণ করিয়া রস বাহির করিবার জন্য "মহাশাল" ব্যবহার করিত। ৫০।৬০ ভাগ রসও জুটিত কি না সন্দেহ। এখন লোহার রোলারের সাহায্যে ৮০ ভাগ রস পাওয়া যায়। (ঘ) ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১০/১২ কোটি টাকা মূল্যের চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হয়। পূর্ব্বে কুঁমুটিয়ার গুড়ের মণ ২৲ ও চিনির মণ ৭।৮ টাকা ছিল। তাই দৈনিক ১০০—১৫০ মণ চিনি তৈয়ারী হইত। এখন গুড়ের দর ৬৲ টাকা হইতে ৮৲টাকা। এখানকার চিনি ১৬৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতে হয়। বিদেশী চিনির মণ ১২৲ বা ১২॥০। কাজেই দেশী চিনি পরাস্ত হইতেছে। (ঙ) বর্ত্তমানে এখানে অল্প পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়। (চ) অধিকাংশ মোরব্বা ॥০—৸৴০ আনা সের দরে বিক্রয় হয়। কোন কোন ফলের মোরব্বার দাম ১৲ হইতে ১।০ হয়। মোরব্বার কারবারে সাধারণতঃ সের প্রতি ৴০—৵০ আনা লাভ থাকে। (ছ) দুবরাজপুরের বাতাসা ওজনে আধ সের তিন পোয়া ও ব্যাসে দেড়হস্ত পরিমিতও হইয়া থাকে।

বীরভূমের যে সব স্থানে চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল, তার কয়েকটার নাম—কুঁমুটিয়া, দুবরাজপুর, পণ্ডিতপুর, তাঁতিপাড়া, রাজগঞ্জ, করমকেল, জামপলে, রামপুর, মল্লিক-

পুর, কালিপুর, মহুদরী, ভেড়াগারি, হজরতপুর, ঘোট্টালি, উপুন্দী, কড়ামিঠা, বোলপুরের সন্নিকটবর্ত্তী আদিত্যপুর। চিনি রপ্তানি হইত কান্দি, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে। অন্যান্য স্থান হইতে দাদনকারীরা আসিয়া চিনি লইয়া যাইত। ৪ প্রকার চিনি-নির্ম্মাণ-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

"মিলন"

১৮৪৮ শক। বসন্ত সংখ্যা। পত্র-সংখ্যা ৮৪।

সম্ভবতঃ দ্বৈমাসিক। এক এক ঋতুতে একএকখানা ছাপা হয়। ৮ নং সুবলচন্দ্র লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। অস্থায়ী ম্যানেজার মৌঃ কামালুদ্দিন আহ্মদ। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। স্কুলের ছাত্রদের জন্য ২৲ টাকা।

আসাম ছাত্র সম্মিলন বলিয়া একটা প্রতিষ্ঠান আছে। এই কাগজ তার মুখপত্র। বস্তুতঃ এই কাগজকে এক হিসাবে শিক্ষিত যুবক আসামের ভাব ও চিন্তাধারার অগ্রদূত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। আসামী ভাষায় পরিচালিত।

সম্পাদকের নাম শ্রীযুক্ত বিনন্দ চন্দ্র বরুয়া বি, এ। একটা সম্পাদক-সমিতি আছে। ম্যানেজার ও সম্পাদক ব্যতীত অন্য সভ্যদের নাম—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ বরুয়া, শ্রীযুক্ত পুষ্পধর চলিহা, শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বরুয়া বি, এস-সি, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী প্রসাদ বরুয়া। উল্লেখযোগ্য রচনা :—

(১) জার্ম্মাণির জ্ঞান সাধনা—শ্রীকৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ (উচ্চারণ হণ্ডিকৈ)। ইনি ৯ বছর জার্ম্মাণিতে কাটাইয়া আসিয়াছেন। অধ্যয়নের বিষয় ছিল রুশ ও গ্রীক সাহিত্য। ইনি বলিতেছেন—"শিক্ষাপ্রণালী আর জ্ঞানসাধনার একটা পার্থক্য আছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স আদি দেশের শিক্ষাপ্রণালী এক নয়। ইংলণ্ডে পরীক্ষা আর ডিগ্রীর যতখানি প্রাধান্য জার্ম্মাণিতে ততখানি নয়। বস্তুতঃ জার্ম্মাণ পরীক্ষা পাশ করা বা জার্ম্মাণ ডিগ্রী লাভ করা সহজ কাজ। কিন্তু জার্ম্মাণ অধ্যয়ন ও আলোচনা-প্রণালী আয়ত্ত করা সাধারণ কথা নয়। কারণ, তা হইল একটা ব্রত, মানসিক প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"ফরাসী মনীষী রেঁণাই জার্ম্মাণির জ্ঞান-সাধনাকে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অবশ্য জ্ঞানচর্চ্চা ও লোকের দেশ দখল করা এক নয়। ইংরেজ পণ্ডিত স্যর জন সিলি একস্থানে বলিয়াছেন, জার্ম্মাণি যে ভাবে অন্যান্য অনেক দেশকে তাদের ইতিহাস শিখাইতেছে, সেই ভাবে কেহই জার্ম্মাণিকে জার্ম্মাণ ইতিহাস শিখাইতে পারে নাই। সিলি ইতিহাসের বিষয়ে যা বলিয়াছেন অনেক সাহিত্যের পক্ষেও সেই কথা খাটে। ভারতের ঋগ্‌বেদ জার্ম্মাণ মেক্সমুলার, ইংলণ্ডের পুরাণা আইন জার্ম্মাণ লিবারমেন, আধুনিক ইতালির সাহিত্য ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনা জার্ম্মাণ গাস্‌পার প্রভৃতির কীর্ত্তিস্থল। প্রাচীন ফরাসী বা রুশ ভাষার আলোচনা ভাল করিয়া হইতেছে জার্ম্মাণিতেই। জার্ম্মাণি যেন সমগ্র জ্ঞান-সাম্রাজ্য জয় করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।"

(২) অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ—শ্রীআলোক চন্দ্র রাজখোয়া। ১৯২৬ সনে ডিব্রুগড়ে আসাম ছাত্র সম্মিলনের ১১শ অধিবেশন বসে। তাহাতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

লেখক কয়েকটা কাজের কথা বেশ বস্তুনিষ্ঠভাবে পাড়িয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি কানি অর্থাৎ আফিং ও চুরট খাওয়ার প্রথার মূলোচ্ছেদের জন্য সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে বলিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কয়েকটা কথা ভাবিয়া দেখিবার মত। "সুস্থ সবল ও নীরোগ যুবকগণ যে শুধু নিজেরাই সুখী তা নয়, তাঁরা জাতীয় সম্পত্তি।" "আসামী শিল্পীর কাপড়, জাপি, খরাই (ঝাঁপি, পেঁৗরা) লোপ পাইতে বসিয়াছে। আসামী বাঁরৈ যার হাতের ফুলকাটা শিল বা পাথরের মূর্ত্তি দেউল ইত্যাদি আজও আসাম-শিল্পের গৌরব সে কোথায়?" "আসামী খেতিয়ক (চাষী) আজ দীনদরিদ্র। ছেলেরা স্কুল কলেজের পড়াশুনা বাদে অন্যকিছু পড়িতে চায় না।"

(৩) আসামী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটা কথা—প্রবন্ধটি বেশ গুছাইয়া লেখা ও সুযুক্তিপূর্ণ। একস্থানে আছে—আসামে এত মৈমনসিংহবাসীর আগমন হইয়াছে, আসামী যদি তাহাদিগকে নিজের অর্থাৎ আসামী করিয়া লইতে না পারে তবে আসামী জাতি কখনও অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে আসামী শিখানো উচিত নয় কি?

(৪) ছাত্র-মঙ্গল। মৌঃ কামালুদ্দিন আহামদ। (৫) স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি। শ্রীলক্ষ্মী প্রিয়া চলিহা। (৬) আসামী শিল্প-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ। শ্রীপার্ব্বতী প্রসাদ বরুয়া।

এই পত্রের সর্ব্বত্র তরুণ আসামের প্রাণের স্পন্দন শুনা যাইতেছে। ৩।৪ বছর আগে আসামী যুবক সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদ করিয়া চলিত। আজ সেখানে সর্ব্বত্র স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতামত ফুটিয়া উঠিতেছে। বহুস্থলে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ দেখা দিলেও আমরা আসামী মনের এই নব জাগরণকে সাদরে অভিনন্দন জানাইতেছি।

"দি ইণ্ডাস্"

লণ্ডন। ভারতীয় ছাত্রদের ইউনিয়ান ও হষ্টেলের মুখপত্র মে, ১৯২৭।

শ্রীযুক্ত ভারুচা এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "হে ভারতীয় ছাত্র, তোমরা একবার ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকে নেক নজর দাও। শুধুমাত্র ইংরেজি অথবা স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকেই ছুটিয়া যাইও না।" তাঁহার প্রবন্ধের সারমর্ম্ম :—

ভারতীয় ছাত্রের একচোখামি

নিজের দেশের সমস্যাগুলি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য বিদেশে যাওয়ার দরকার আছে। জাপানী ও চীনা ছাত্ররা সেই উদ্দেশ্য লইয়া ইয়োরোপে আসে। তারা সমগ্র ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়ে, এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে না। তারা উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া একএক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদ্যা চাখিয়া বেড়ায়। তাদের কাছে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ডেনমার্ক—সব দেশই কুলীন্ দেশ।

সম্প্রতি আফ্‌গানিস্থানের গবর্মেণ্টও আফ্‌গান ছাত্র-দিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহ দিতেছে।

কিন্তু ভারতীয় ছাত্র বিদ্যার্জ্জনের জন্য ইংলণ্ডের বাইরে বড় যায় না। তাদের কাম্যস্থান অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন বা এডিনবারা।

ইহাতে অনেক সময় হাস্যজনক অবস্থা উপস্থিত হয়। ভারতীয় ছাত্র সমবায় আন্দোলনের কথা জানিবার জন্য ডেনমার্কে না গিয়া যায় লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌সে। আর ধন-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য যায় অক্সফোর্ডে। জার্ম্মাণি বা ফ্রান্সে যাওয়ার কথা মনে পড়ে না।

রোগ-নির্ণয়

এই রোগের কারণ কি? কেহ কেহ বলে, ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ইয়োরোপীয় ভাষা সাধারণতঃ জানে না। সুতরাং শুধু ভাষা শিখিতেই বৃথা সময় নষ্ট করিতে সে রাজী নয়।

এযুক্তি টেঁকসই নয়। ভারতীয় ছাত্র কি অন্য ছাত্রদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন যে চেষ্টা করিয়া একটা দু'টা ইয়োরোপীয় ভাষা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারিবে না? বিশেষ আজকাল ইয়োরোপের অধিকাংশ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যত্নের সহিত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আর ভাষা শিখিতে যে সময় যায় তাহা কখনও বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া মনে করা উচিত নয়। একটা নূতন ভাষা শিখা মানে একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করা।

চাকরী মিলিবে না

অন্য এক যুক্তি এই যে, গায়ে ইংরেজী ছাপ, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী, থাকিলে যত সহজে চাকরী মিলে, ইউরোপীয় ছাপে তত সহজে চাকরী মিলে না। এটা অবশ্য সত্য কথা।

কিন্তু তাতেই বা কি? জ্ঞানের জন্য জ্ঞানার্জ্জনের কথা নাই বা ধরা হইল। জাপানী ছাত্রেরা সারা ইয়োরোপ জুড়িয়া বিদেশী গুরুর পদতলে বসিয়া শিক্ষা করার ফলে জাপান কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাও উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু কাজের দিক্ হইতে বলা চলে, ভারতীয় ছাত্র যদি সত্য সত্য বিভিন্ন ইয়োরোপীয় বিদ্যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আয়ত্ত করিয়া আসিতে পারে, তার কাজের অভাব হইবে না। সে নিজেই নিজের কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে এবং এত কাজ পাইবে যে, জীবনে সমস্তটা করিয়া উঠিতে পারিবে না। ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনার ব্যবস্থা ও সুবিধা অত্যন্ত চমৎকার। দলে দলে ভারতীয় ছাত্র গিয়া এইগুলির সদ্ব্যবহার করা উচিত।

ফরাসী বিশ্ব-বিদ্যালয়

ফ্রান্সের ৪টা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম—প্যারিস্, ষ্ট্রাস্‌বুর, গ্রেনোব্‌ল্, মঁপেইয়ে।

প্যারিসকে এক হিসাবে ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র-স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। এখানে অসংখ্য প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কৃষি-শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে গ্রেনোব বিখ্যাত। স্ত্রাসবুরের বিজ্ঞান-বিভাগ আধুনিক প্রণালীতে উৎকৃষ্টভাবে সজ্জিত।

মঁপেইয়ের বিশ্ববিদ্যাপীঠ

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বলা যাইতেছে। এটিকে একটি সুন্দর আধুনিক বিশ্ববিদ্যাপীঠ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। সংশ্লেষণমূলক পঠন-পাঠন ও আন্তর্জ্জাতিক জ্ঞান-সহযোগ ইহার নব ধারা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানচর্চ্চা; বিশেষতঃ ডাক্তারি বিজ্ঞানের কথা বহুকাল যাবৎ দেশবিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, ডাক্তারি, বিজ্ঞানসমূহ, ভাষা-শিক্ষা, ফার্ম্মাসীর ফ্যাকাল্টি মোতায়েন রহিয়াছে; উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অঁ্যাস্তিতিউ বা মন্দির আছে। আর আছে কৃষির জাতীয় কলেজ, কমার্স বা বাণিজ্য সম্বন্ধে কলেজ, আর্ট বা চিত্র বিদ্যালয় ও সঙ্গীত বিদ্যালয় একটা করিয়া; বিদেশী ছাত্রদের জন্য এক অঁ্যাস্তিতিউ রহিয়াছে। সেখানে বিদেশীদের সুবিধামাফিক শিক্ষা-দানের বন্দোবস্ত আছে।

পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট্ গবেষণার সুযোগ ও সুবিধাও রহিয়াছে আইন-ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের জন্য ডক্টরেট্ দেওয়া হয়।

ফরাসী দেশের বিশ্ব-ভারতী

প্রফেসর প্যাট্রিক গেডিজের নাম ভারতে সুপরিচিত। ইনি মঁপেইয়েতে আসিয়া এক ফরাসী বিশ্ব-ভারতী গঠনের কাজে লাগিয়া গিয়াছেন।

শহর হইতে মাইল দুই দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা "কলেজ দেজ্ একোসে" তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার কাজ হইবে দুইটা—(১) এডিন্‌বারার আউট্‌লুক্ টাওয়ারের মত সমাজ-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি বিশেষ হওয়া; (২) ছাত্রদের বাসের জন্য হল-রূপে পরিণত হওয়া।

এই কলেজ ফ্রান্সের "রীজনাল (জনপদগত) জরীপ করিবার ষ্টেশন বিশেষ হইবে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই বাদ যাইবে না।

সোসিওলজি বা সমাজতত্ত্বে সংশ্লেষণমূলক পঠন-পাঠনের পক্ষে মঁপেইয়ের মত স্থান খুব কম আছে। ইতিহাস এবং শিল্পকলার দিক্ হইতে—ইহা যে "রীজনে" অবস্থিত তাহাতে ফরাসী ও ইয়োরোপীয় সভ্যতার বহু মনুমেণ্ট ও ভগ্নাবশেষ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে—পূর্ব্ব রোমান্, গ্যালো-রোমান্ ভিসিগথিক্, কারোলিসিয়ান্, গথিক ও আধুনিক চিহ্নের অপ্রতুল নাই। লেজ্ আইজিস্—"প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজধানী" মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। ওস্তাদ প্রত্ন-তাত্ত্বিকের অধীনে এখানে প্রাগৈতিহাসিক আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে।

প্রাকৃতিক ও লৌকিক ভূগোলের উপাদান এখানে যথেষ্ট রহিয়াছে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচনার জন্য এখানকার বোটানিক্যাল ষ্টেশন কাজে লাগিবে। জীব-বিজ্ঞানের জন্য ছেটেতে অবস্থিত জুলজিক্যাল ষ্টেশনের সহায়তা পাওয়া যাইবে।

জ্ঞানের পথে বিশ্ব-মিত্রতা

মতলব রহিয়াছে এই প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞানের পথে একটা আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের ব্যাপাররূপে গড়িয়া তোলা। স্কচদের জন্য তৈয়ারী স্কট কলেজ একটা ব্যতিক্রম কিছু নয়। ক্রমে ক্রমে ফরাসী, জার্ম্মাণ, ভারতীয়, জাপানী, চীনা ইত্যাদি কলেজও খাড়া করা হইবে। সেই সেই কলেজে সকল দেশের যুবকরা মিলিত হইয়া একে অন্যের সহিত পরিচিত হইবে, আলোচনা করিবে, পাঠ করিবে ও পরস্পর পরস্পরের সভ্যতা, জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিবে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন গ্রাজুয়েট গত বছরের মধ্যে, ভারতীয় পুনর্গঠন সমস্যা বিষয়ে থিসিস্ লিখিয়া ডক্টরেট্ পাইয়াছে। আরও কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র থিসিস্ তৈয়ারী করিতেছে।

আগামী আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখাইবার জন্য তিন সপ্তাহব্যাপী মোসা-ফিরির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।



জাপানে প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি

১৯২৩ সনে জাপানে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। সে কথা সকলের মনে আছে। বস্তুতঃ, ইহার পূর্ব্বে জাপানে যত ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, কি ধ্বংসপ্রাপ্ত আয়তনের বিশালতার দিক্ হইতে, কি ক্ষতির পরিমাণের দিক্ হইতে ইহার তুলনায় সেগুলি কিছুই নয়।

এই ভূমিকম্পের একটা ইতিহাস জাপান সরকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তার একটা ইংরেজী সংস্করণও বাহির হইয়াছে। পুস্তকের নাম "এ হিষ্টরি অব্ দি গ্রেট আর্থকোয়েক" বা "মহা-ভূমিকম্পের ইতিহাস।" প্রকাশক "বুরো অব্ সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স, হোম আফিস্, ইম্পীরিয়াল জাপানিজ গবর্ণমেণ্ট", তোকিয়ো। ডিসেম্বর, ১৯২৬। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬১৫।

এই বিপুল গ্রন্থ হইতে একদিকে প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তির পরিষ্কার ছবি যেমন পাই, অন্য দিকে তেমনি অদম্য, তাজা জাপানী বীর-হৃদয়ের ও দুনিয়ার দেশ বিদেশের মানবের বদান্যতার পরিচয় পাইয়া থাকি।

১৯২৩ সনের ১লা সেপ্টেম্বর দিনটা জাপানীর মনে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। গ্রীষ্ম অতীত হইয়া শরৎ দেখা দিয়াছে মাত্র। তথাপি অসহ্য গরম। শোরাণ জিলা ও বস উপদ্বীপ সাগামি বে ও প্রশান্ত সাগরের তীরে অবস্থিত দুই স্বাস্থ্যকর জায়গা। তোকিও ও অন্যান্য স্থান হইতে হাজার হাজার লোক সমুদ্রতীরের হাওয়া খাইতে এই দুই জায়গায় আসিয়াছে।

এমন সময় দুপুরের ঠিক পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১টা বাজিয়া ৫৮ মি ৪৪ সে'র সময় ভয়ানক ভাবে ভূ-কম্প হইতে লাগিল। ঘরবাড়ী সব থরথর কাঁপিতে লাগিল। ঠিক পর পর আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ভূমি-কম্প হইল। তারপর কতবার যে ছোট বড় মাঝারি রকমের ভূমিকম্প হইল তার সীমা-সংখ্যা নাই।

ভূমি-কম্পের কীর্ত্তি

জাপান সাম্রাজ্যের রাজধানী তোকিয়োর অনেকখানি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। প্রধান বাণিজ্যিক বন্দর ইয়োকোহামার চিহ্ন মুছিয়া গেল। সমগ্র জাতির পক্ষে এই ক্ষতি অবর্ণনীয়। অন্যান্য বহু স্থানের বহু লোক প্রাণ হারাইল ও বহু সম্পত্তি নষ্ট হইল।

৯১,৩৪৪ জন লোক মরিল। ১৩,২৭৫ জনের খোঁজ পাওয়া যায় নাই। ১৬,৫১৪ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। ৩৫,৫৬০ জন অল্প আহত হইয়াছিল। আর যত লোকের ঘরবাড়ী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল বা পড়িয়া গিয়াছিল বা সমুদ্রের বাণে ভাসিয়া গিয়াছিল তাদের সংখ্যা ২৫,৪৮,০৯২। এই দুর্ঘটনায় ৭,০০,১১৩টা বাড়ীঘরের ক্ষতি হইয়াছিল ও ৩৪,০৪,৮৯৮ জন লোককে ভুগিতে হইয়াছিল। তাছাড়া অসংখ্য ব্যাঙ্ক, দূতাবাস গবর্ণমেণ্ট বিভাগ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী লাইব্রেরী, হাঁসপাতাল, ক্লাব, থিয়েটার ইত্যাদি ভবন বিনষ্ট হইয়া যায়।

জাপানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

২রা সেপ্টেম্বর বিশেষ বিধান ও আইন জারি হইল। সম্রাটের অনুশাসন বাহির হইল, তৎক্ষণাৎ পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করা হোক্। ঐ দিনই "এমারজেন্সি রিলীফ্ বুরো" স্থাপিত হইল ও নিম্নলিখিত ৯ দফায় কার্য্যপ্রণালী স্থির হইয়া গেল।

(১) শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য স্থলসৈন্য, জলসৈন্য ও পুলিশ একযোগে কাজ করিবে।

(২) "প্রেফেক্চার" ও শহরগুলি এই মুহূর্ত্ত হইতেই দুঃস্থদের সেবা ও সাহায্য আরম্ভ করিবে, খাদ্য ও পানীয় জল যোগাইবে, কুটিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। পয়সা জুটিবে নিজেদের তোলা "রিলীফ ফাণ্ড" হইতে। তাতে না কুলাইলে বাকীটা সরকার হইতে দেওয়া হইবে।

(৩) স্থানীয় গবর্ণররা এখনই খাদ্য-সামগ্রী, কুটির নির্ম্মাণের উপাদান ও অন্যান্য দ্রব্য মিউনিসিপ্যাল আফিসের সাহায্যে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে।

(৪) মোটরকার, ঘোড়ার গাড়ী, হাতে ঠেলা গাড়ী, গ্যাসোলিন ইত্যাদি যা-কিছু হাতের কাছে পাওয়া যাইবে সব লোকদের মাল-চালানের জন্য পাকড়াও ও ব্যবহার করা হইবে।

(৫) যে সব দুঃস্থ ব্যক্তি বিপদের জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়, তাদেরকে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের রেলে করিয়া যথাস্থানে বিনা পয়সায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(৬) খাদ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য দৈনিক প্রয়োজনীয় জিনিষ বেচিয়া লাভের চেষ্টাকে দমন করিয়া রাখা হইবে।

(৭) গবর্ণমেন্টের হাতে যে জ্বালানি কাঠ এবং খাদ্য সামগ্রী আছে তা বিতরণ করিয়া দিবার জন্য "ফিন্যান্স্ ডিপার্টমেন্ট" বা আর্থিক বিভাগ, "অ্যাগ্রিকালচার্যাল ডিপার্টমেন্ট" বা কৃষি-বিভাগ এবং "হাউসহোল্ড ডিপার্টমেন্ট" বা ঘর-গৃহস্থালী বিভাগ একসঙ্গে মিলিয়া ব্যবস্থা করিবে।

(৮) লোকের মন যাতে অকারণে উত্তেজিত হইতে না পারে সে জন্য প্রকৃত খবর দিয়া সরকার এক "বুলেটিন" প্রকাশ করিবে।

(৯) রেড ক্রস্ সোসাইটি ও অন্যান্য দাতব্য হাঁসপাতালকে এখনই আহতদের সেবার কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। স্কুল-বাড়ীগুলিতে ও অন্যান্য সরকারী কোঠা-বাড়ীতে অস্থায়ী হাঁসপাতাল খোলা হইবে। বেসরকারী ডাক্তাররা সেখানে রোগী দেখিবে।

বিদেশী দানের পরিমাণ

৪ঠা সেপ্টেম্বর যুবরাজ প্রধান মন্ত্রীকে "মোলাকাৎ" করেন। ঐ দিন সম্রাট তাঁর নিজের তহবিল হইতে যুবরাজের মারফৎ ১ কোটি ইয়েন পাঠাইয়া দেন। অন্য দেশ হইতেও টাকা আসিতে থাকে। লীগ অব্ নেশন্স্ ও অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক সভাও সাধ্যমত দান করে।

"নিগোশিয়েব্‌ল" পেপার বাদ দিয়া ১৯২৪ সনের মে মাসের শেষ অবধি মোট বিদেশী দানের পরিমাণ ৬,১৬,৩৫,৬৮৩ ইয়েন। খরচ করিয়া হাতে ছিল ৫৯,৫৯,৫৬৫ ইয়েন। এটা আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিতে ও পঙ্গু ইত্যাদিদের কাজ যোটাইতে খরচ করা হইয়াছে।

পৃথিবীর তূলা

দুনিয়ার তূলার দেশ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ৭৯টি পরিচ্ছেদে ৭৯টি দেশের বিষয় আলোচিত। কি কি বিষয় দ্বারা কোন্ কোন্ দেশ নিয়ন্ত্রিত তাহার কথাও ইহাতে আছে। আলোচনা তথ্য-মূলক। আলোচিত দেশের মধ্যে অনেক স্থানেই তূলা জন্মে না যথা কুইন্স্‌ল্যাণ্ড, রোডেশিয়া। কিন্তু তথাপি সে দেশগুলি তূলা-উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট বলিয়া পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যদি মূল্যের দিক্ দিয়া প্রচুর প্রলোভন সৃষ্টি করা যায়, যথোচিত শ্রম এবং মাল চালানের সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়, তবে সেস্থানগুলিতে তূলা জন্মান অসম্ভব নহে।

এশিয়ার নিম্নলিখিত দেশগুলি পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। সিংহল, চীন, সাইপ্রাস, ডাচ ইষ্টইণ্ডিজ, ভারতবর্ষ ইণ্ডোচীন, ইরাক, জাপান, কোরিয়া, পারস্য, এশিয়াগত রুশিয়া, শ্যাম, সিরিয়া, এশিয়াগত তুরস্ক। উৎপাদন এবং রপ্তানি হিসাবে যুক্তরাজ্যের পরেই ভারতবর্ষ। এখানে ২৭,৪৩৫ একর ভূমিতে তূলার চাষ এবং ২,৪২০,৪০০ পাউণ্ড তূলা হয়। ১৯২২-২৩ সনের "কটন ট্রান্সপোর্ট আইন" অনুসারে ঐসব ক্ষেত্রে মিশ্রণের জন্য নিকৃষ্টতর তূলার আমদানি রদ হইয়াছে। ভারত হইতে যে তূলা রপ্তানি হয়, তাহার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ যায় জাপানে। কিন্তু চীনদেশে আর পূর্ব্বমত রপ্তানি হয় না। যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যাণ্ড দেশের সহিত ভারতের এই বাণিজ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে।

পুস্তকখানির শেষে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ আছে। আধুনিকতম সংবাদই আলোচনার উপাদান। লণ্ডনের কিং কোং প্রকাশক। নাম "কটন গ্রোইঙ্ কান্ট্রিজ্ প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড পোটেন্‌শ্যাল"।

ভারতের সমস্যা

"সান্‌ডে ওয়ার্কার" বা "রবিবারের মজুর" লণ্ডন হইতে প্রকাশিত কমিউনিষ্ট পত্রিকা। এই পত্রিকায় একখানা নব-প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচক শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পল।

বইয়ের নাম "দি ফিউচার অব্ ইণ্ডিয়ান্ পলিটিকস" বা "ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ"। লেখক শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায়। ১৯২৭। ১১ পৃষ্ঠা। দাম ১ শি, ৬পে। প্রকাশক কমিউনিষ্ট বুকশপ্ ১৬ কিংষ্ট্রীট কোভেণ্ট গার্ডেন, ডব্লিউ সি আই।

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায়ের নাম ভারতবাসীর নিকট একেবারে অপরিচিত নয়। চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের সভাপতি থাকা কালে ইনি রুশিয়া হইতে তাঁর নিকট এক লম্বা খোলা চিঠি লেখেন।

শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পল বলিতেছেন, "ভারতে বৃটিশ ইম্পীরিয়্যালিজ্‌মের সঙ্গে একটা সংগ্রাম চলিতেছে। সাধারণ মজুর একটা কথা শুধু বুঝিতে পারে না। ন্যাশ-নালিষ্ট নেতা বা দলপতিরা তাঁদের পলিসি বা কার্য্যপ্রণালী কেন এত ঘন ঘন বদলান।

"শ্রীযুক্ত রায় এই কথাটার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ইহা আজকালকার ন্যাশানালিষ্ট নেতাদের বস্তুনিষ্ঠার ফল। যেমন যেমন আর্থিক অবস্থা, অভাব ও স্বার্থ বদলাইতেছে অমনি তাঁরা নিজেদের পলিসিরও মোড় ঘুরাইয়া দিতেছেন।"

ধনীতে ধনীতে লড়াই

শ্রীযুক্ত রায় দেখাইতেছেন যে, গোড়াতে বৃটিশ ইম্পীরিয়্যালিষ্টদের বাধ্য হইয়া দেশী ব্যবসায়ী ও ধনীদের হাতে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। দেশী বিদেশী উভয় ধনীর লক্ষ্য ছিল এক। সে লক্ষ্যের নাম মজুর ও চাষীদের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া আপনাদের পেট ভরানো।

গরিবদের রক্ত শোষণ করায় দেশী ধনীদের আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল যে লুণ্ঠনের সমগ্র ফলটা বৃটিশ ইম্পারিয়্যালিষ্টরা এখান হইতে কুড়াইয়া লইয়া যাইবে। বস্তুতঃ, তাদের চেঁচামেচির একটা বড় বিষয় ছিল এই, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের আর্থিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিতে বাধা দিতেছে।

অর্থাৎ সাদা কথায় কালা পুঁজিপতিরা বুঝিয়াছিল যে তারা সাদাচামড়া মনিবদের চেয়ে অনেক বেশী ভাল করিয়া কালা জনগণকে শোষণ করিতে পারিবে।

ইহাদের চেঁচামেচিতে বাধ্য হইয়া ইংরেজকে নিজের গ্রাস হইতে কিছু ভাগ দিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভিতর দিয়া দেশী পুঁজিপতিরা বিদেশী পুঁজিপতিদের সহিত ভারতকে শোষণ করিতেছিল।

ধনী বনাম দরিদ্র

ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বণিকরা বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অসন্তোষকে একত্র করিয়া এমন আন্দোলন চালাইল যে, একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হইল।

বৃটিশ ইম্পীরিয়্যালিজ্‌ম তার চিরন্তন প্রথা অবলম্বন করিল। জোর করিয়া ও ভয় দেখাইয়া এই আন্দোলনকে দুই টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। ভারতীয় পুঁজিপতিদের বেশ বড় বড় "কনসেশন" দিল, আর মজুর, চাষী ও মধ্যবিত্তদের দাবাইয়া রাখিল।

ভারতীয় বণিক্ এবং সওদাগররা যেই কনসেশন পাইল অমনি বৃটিশ ইম্পীরিয়্যালিজ্‌মের সঙ্গে যোগ দিয়া মজুর ও মধ্যবিত্তদের হাড় গুড়া করিবার কাজে লাগিয়া গেল। বলা বাহুল্য, জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ডই হইল ইহারা।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বপক্ষাচরণ

ভারতে বৃটেনের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বজায় থাকিবার মূল হেতু হইল এই যে, বৃটেনের বিরোধিতা করা ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতিকূল। বৃটিশ ও ভারতীয় বুরজোআরা একযোগে ভারত-শোষণের কাজ চালাইতেছে। ভারতীয়

বুর্জোআরা আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে রাখিয়াছে।

মজুররা সন্ধি করিবে না

চাষী ও মজুররা সম্পূর্ণরূপে জাতীয় আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা চাহিবে। তারা বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবে। তখন এক নূতন অবস্থার উদয় হইবে।

দেশের চাষী, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের পক্ষে বৃটিশ ইম্‌পীরিয়্যালিজ্‌মের সঙ্গে কোন প্রকার আর্থিক রফা করা একদম অসম্ভব। কারণ ইহাদিগকে লুট করিয়াই ইম্‌পীরিয়্যালিজ্‌ম টি'কিয়া আছে।

জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থীদের প্রোগ্রামে রহিয়াছে—ভূস্বামী বা জমীদার ও খাজনা লক্ষ্য করিয়া আর্থিক দাবী-দাওয়া, ৮ ঘণ্টা রোজ ও মজুরির নিম্নতম হার নির্দ্দেশ, পরোক্ষ করের পরিমাণ-হ্রাস ও আয়-কর বৃদ্ধি। বলা বাহুল্য এগুলি একেবারে ইম্পীরিয়্যালিজমের গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিতেছে। জাতীয় জাগরণকে বিপ্লবের পথ দিয়া না গিয়া উপায় নাই।

ভারতের জয়ে বৃটেনের জয়

দুনিয়ার মানবের ⅕ অংশ ভারতে বাস করে। সেটা বড় কম কথা হয়। বৃটিশ লেবার ও ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের পক্ষে ভারতের ভবিষ্যৎটা এক গুরুতর বিষয়।

যদি ইম্‌পীরিয়্যালিজম্ ৩১½ কোটি ভারতীয় মজুরকে বেশী ঘণ্টা রোজ খাটাইয়া অল্প বেতন লইতে বাধ্য করে ও বিশ্বের বাজারে মাল ছাড়িতে সমর্থ হয়, তবে বৃটিশ মজুরের মজুরি ও ঘণ্টার দুর্দ্দশা হইবে না কি?

ভারতে বা অন্যত্র ইম্পীরিয়্যালিজ্‌মের পরাজয়ের অর্থ বৃটেনের মজুরদের জয়লাভ, তাতে সন্দেহ নাই।

বৃটিশ ষ্ট্রাইকের কারণ

ইংরেজ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত এইচ, জি, ওয়েল্‌স দেশ-বিদেশে পরিচিত ব্যক্তি। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাঁর প্রত্যেকটা উপন্যাসই সমস্যামূলক। বর্ত্তমান যুগের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাশীল বিশ্লেষণগুলি তাঁর গ্রন্থে স্থান পাইয়া থাকে। অথচ তাহাতে তাঁর কোন পুস্তকের রস-মাধুর্য্যের হানি হয় না।

ওয়েল্‌সের লেখার আদর ইয়োরোপে বেশ দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁর লেখা পড়িয়া সুখ পায়। ভারতেও তাঁর বই অনেকে পড়িয়াছেন।

ওয়েল্‌সের নূতন বই

ওয়েল্‌স সম্প্রতি অর্থনৈতিক সমস্যামূলক একখান কেতাব লিখিয়াছেন। নাম "মিনহোয়াইল" বা "ইতিমধ্যে" বইয়ের প্রকাশক লণ্ডনের আর্নেষ্ট বেন লিমিটেড কোম্পানী।

"দি অব্‌জার্ভার" নামক পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে আর্নেষ্ট বেন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্ট শ্রীযুক্ত ভিক্টর গোলা নেজ বলিয়াছেন,—

"এই উপন্যাস তুমুল আলোচনা ও তর্কাতর্কির সৃষ্টি করিবে। কারণ, উপন্যাসের মূল কথাই হইতেছে, কয়লা বিতণ্ডা চালনা করিবার প্রণালীর জন্য বর্ত্তমান রক্ষণশী গবর্মেণ্টের, বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত বল্ড্‌ইন ও শ্রীযুক্ত চার্চ্চিলের অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করা। শ্রীযুক্ত ওয়েল্‌স এ বিতণ্ডার যে গতি ও নিদান নির্ণয় করিয়াছেন, অনেকে তা স্বীকার করিবে; অন্য অনেকে খুব জোরের সঙ্গে বলিবে না, না, না।

ফিলিপ রাইল্যাণ্ডস্

গ্রন্থের প্রধান চরিত্র হইল ফিলিপ রাইল্যাণ্ডস্। সে তার স্ত্রী সিল্ভিয়াকে লইয়া ভেন্তিমিলিয়রে এক ভবনে সম কাটাইতে আসিয়াছে। ২।১টা ছোট খাট "কাণ্ডে"র পর ফিলিপ ও সিল্ভিয়া আসন্ন কয়লা ষ্ট্রাইকে"র খবর পাইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। ফিলিপ ইহার কারণ ও ইহার সহিত পারিবারিক যোগাযোগটা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ফিলিপের চোখে এই "ভূকম্পটার" পরিমাপ চলিতেছে ফিলিপ সরল, সংসারানভিজ্ঞ, আদর্শবাদী কিন্তু সৎ ও চিন্তাশীল। কয়লা ধর্ম্মঘটের অনুসন্ধানে আসিয়া দেখিল, তার টাকা, দুর্ভিক্ষ টাকা, তার সঙ্গীরা অকথ্য আচরণ করিতেছে তার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

ওয়েল্সের সিদ্ধান্ত এই যে, রাইল্যাণ্ডসের মত লোকদের ইতালিতে আরামে সফর করিবার অভ্যাস করিলে চলিবে না। তারা নিজ দেশে ফিরিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সকল প্রকার বোঝা আপনাদের ঘাড়ে তুলিয়া না লইলে মঙ্গল নাই।

চাষী বাঙ্‌লা

১৯২৪-২৫ সনের গবর্মেণ্ট কৃষি-বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে অবগত হওয়া যায়, বাংলাদেশে ২ মিলিয়ন একর জমিতে পাটের চাষ হয়। সরকার হইতে যে সমস্ত বীজ সরবরাহ হইয়া থাকে, যদি তাহা এই সমস্ত জমিতে লাগান যাইত, তবে চাষীর আয় একর প্রতি ২০্ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৫ ক্রোর টাকা অথবা বাংলার লোকসংখ্যার অনুপাতে মাথাপ্রতি ১্ টাকা বাড়িয়া যাইত। স্থানীয় বাজার দর অপেক্ষা সরকার প্রদত্ত বীজের মূল্য অধিক। তথাপি চাষীরা এবৎসর সরকারের নিকট হইতে প্রায় ২,০০০ মণ বীজ ক্রয় করিয়াছে। উহা ২০,০০০ একর জমিতে বুনিতে পারা যায়। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, চাষীরা সরকারী পাটের বীজ পছন্দ করে। এই বীজে পাটের চাষ হইলে, একর প্রতি পাট অধিক জন্মিবে। সুতরাং যদি পাটের দরকার বেশী না থাকে, তবে প্রয়োজনীয় পাট সরকারী বীজের সাহায্যে অল্পপরিমিত একর জমিতে জন্মাইয়া অবশিষ্ট জমিতে অন্যবিধ ফসল জন্মাইতে পারা যায়।

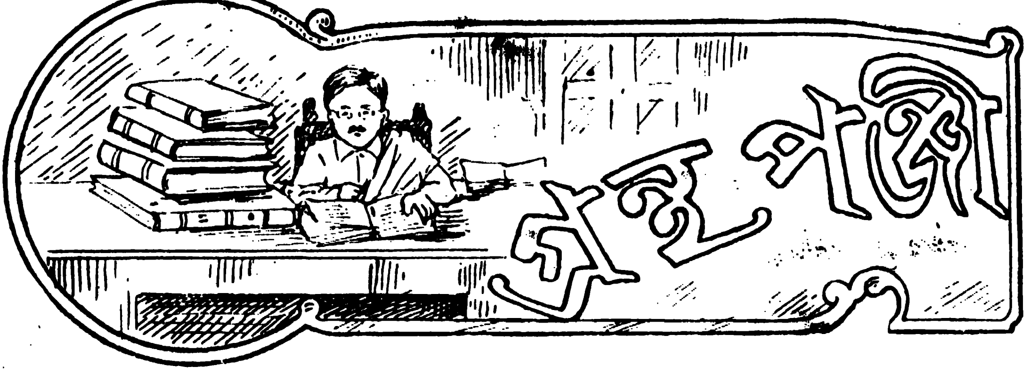
পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলা এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রায় ১২ মিলিয়ন একর জমিতে আউস ও আমন ধান্য জন্মে। ইহার প্রায় ½ অংশে উন্নত ধান্য বীজের সাহায্যে প্রতি একরে তিন মণ ধান্য উৎপন্ন করা যায়। প্রতি একরে ৭্ টাকা খরচ করিয়া ধান্যে মোট আয় হইতে পারে ৫½ ক্রোর টাকা অথবা লোকসংখ্যার অনুপাতে মাথাপ্রতি বৎসরে ১০ আনা। পশ্চিম বঙ্গে ধান্য সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। তাহার ফলে হয়ত আয় আরও বাড়িয়া যাইবে।

বাংলা দেশে তুলা খুব কম জন্মে। ইহা লইয়াও গবেষণা চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটিতে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। ধারোয়ার আমেরিকান তুলা পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় বেশ ফল দেখাইয়াছে। ঐ তুলা শীত ঋতুর ফসল বলিয়া চর জমিতে উহার আবাদে ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে।

তামাকের চাষ পড়িয়া যাইতেছে। সরকারী বীজের চাহিদা যোগানের উপরে গিয়াছে।

রংপুর গোশালায় পরীক্ষিত ফলানুসারে বাংলাদেশের গো-জাতির উন্নয়নচেষ্টা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কৃষি-সম্বন্ধীয় শিক্ষার অনেক রকমে বিস্তার সাধন চলিতেছে। রেশম ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় কি না, তৎসম্বন্ধেও অনুসন্ধান হইতেছে। অন্যান্য অনেক বিষয়ের কাজই আরব্ধ হইয়াছে।

রিপোর্ট বলে, কৃষিকার্য্যে বৎসরে দশলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাংলা দেশ ৭০ লক্ষ টাকা আয় করিতেছে। ভাল-রকম কৃষির কাজ শিক্ষা করিলে, আয় আরও বাড়িয়া যাইবে। এই সব অঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে, কৃষিবিভাগের সততায় এবং বাংলাদেশের কল্যাণে তাঁহাদের ধনপ্রয়োগের সুব্যবস্থায় কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আশা করা যায়, কৃষি-বিভাগ ন্যায্য কোন দাবী করিলে, বঙ্গবাসী তাহা একবাক্যে অনুমোদন করিবে, গবেষণা ও প্রচারকার্য্যে অধিক লোকের প্রয়োজন হইলে, তাহা মঞ্জুর করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। মঞ্জুর হইলে তাহা বিফল হইবে না। বোধহয় এই আবেদন ফিনান্স সদস্য ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের হৃদয় দ্রবীভুত করিতে পারিবে।



"ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল কম্প্যারিজন অব্ প্রাইস চেঞ্জেস্ (মূল্য পরিবর্ত্তনের আন্তর্জ্জাতিক তুলনাসাধন), বোলে, লণ্ডন, ১৯২৬, ১৫ পৃষ্ঠা।

"ফ্যাক্টর্স অ্যাফেক্টিং প্রাইসেজ" (মূল্য-গঠনের শক্তিপুঞ্জ), ব্যাস; হ্বাসিংটন, ১৯২৬, ৪০ পৃষ্ঠা।

"রিলেশ্যান অব ট্র্যান্সপোর্টেশ্যান কষ্টস্ টু কষ্টস্ অব প্রোডাক্শ্যন (মালসৃষ্টির খরচে যানবাহনের হিস্যা), হ্বাসিংটন, গবর্মেণ্ট প্রিণ্টিং আফিস, ৯৪ পৃষ্ঠা।

"রেকল্ৎ, সিক্ল মেতেঅরোলোজিক এ একোনোমিক (ফসল, ঋতু-পর্য্যায় আর আর্থিক চক্র), হ্বাইনষ্টাইন, মস্কো, ১৯২৬, ৬০ পৃষ্ঠা।

"ৎসুর জীবেন-যারহুণ্ডার্ট-ফায়ার ডার রাইখ্স্ ফ্রাইহাইট লিবেক্স্ (লিবেক শহরের স্বাধীন জীবনের সপ্ত শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রণীত নগরের আর্থিক গড়ন) ১৯২৬, ২৮৯ পৃষ্ঠা।

"আগ্রার-এণ্টহ্বিকলুঙ্ উণ্ড আগ্রার-রেফোলুট্সিয়োন ইন রুসলাণ্ড" (রুশিয়ার কৃষি ও ভূমি বিপ্লব) ক্রুট্স্কুস, বার্লিন সাক্ কোং, ১৯২৬, ২৪৯ পৃষ্ঠা, ১২ মার্ক।

"লা রেফোর্ম আগ্রেয়ার আঁ রুস্সি" (রুশিয়ার ভূমি-সংস্কার) দোদে বাঁগেল, প্যারিস লা বন্ ইদে কোং, ১৯২৬, ১৮০ পৃষ্ঠা, ১৫ ফ্রাঁ।

"ডাস মডার্ণে রুসলাণ্ড" (আধুনিক রুশিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন),—ফারিয়ার কিহ্বীচ হ্বার্শাও (পোল্যাণ্ড) জিগার্ণিয়া স্পোলেচনেৰ্ব্বে কোং, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

"ডাস আমেরিকারনিশে হ্বির্টশাফটস-হ্বুণ্ডার" (মার্কিণ মুল্লুকের আর্থিক তাজব), হির্শ বার্লিন ফিশার কোং ১৯২৬, ২৭৪ পৃষ্ঠা ৬ মার্ক।

"হ্বির্টশাফটলিখে এণ্টহ্বিকলুঙ লিবেক্স জাইট বেগিন ডেস নয়েনৎসেনটেন যারহুণ্ডার্টস" (লিবেক শহরের আর্থিক ক্রমবিকাশ,—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে) কাইবেল শ্মিট কোং, লিবেক ১৯২৬।

"রুর‍্যাল স্কটল্যাণ্ড ডিউরিং দি ওয়ার (স্কটল্যাণ্ডের পল্লী ও কৃষিব্যবস্থা যুদ্ধের সময়কার অবস্থা) জোনস, ডাঙ্কান কোনাকার ও স্কট, লণ্ডন মিলফোর্ড কোং ১৯২৬ ৩১১ ১৬ পৃষ্ঠা ১২শি ৬শে।

"লা বুর্স এ সে প্র্যাঁসিপ" (ষ্টকের বাজার) কারাবেলি প্যারিস রুসো কোং ১৯২৬, ২০৮ পৃষ্ঠা, ২০ফ্রাঁ।

"লেজ আস্সিরাঁস সোসিয়াল (সমাজবীমা) শোভো, প্যারিস পেইয়ো কোং ১৯২৬, ২৮৫ পৃষ্ঠা ৯ ফ্রাঁ।

"প্রিঞ্চিপি দি সিয়েনৎসা দেল্লে ফিনানৎসে এ দি দিরিত্ত ফিনানৎসিয়ার (রাজস্ব-বিজ্ঞান ও রাজস্ব-বিধান) স্পত ও ইপ্পলিত,—রোম সাম্প্রন কোং, ১৯২৬, ৮+৪২৬ পৃষ্ঠা ১৬·৫০ লিয়ার।

"হ্যাণ্ডবুক অব্ সেফ্টি অ্যাণ্ড অ্যাকসিডেণ্ট্ প্রিভেনশ্যন" (দৈব হইতে জীবন রক্ষা আর দৈব নিবারণের উপায়), লাঙ্গে, নিউ ইয়র্ক, এঞ্জিনিয়ারিং ম্যাগাজিন কোং, ১৯২৬, ২৪+৫১২ পৃষ্ঠা, ৫ ডলার।

"আন্-এম্প্লয়মেণ্ট অ্যাজ অ্যান ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল প্রব্লেম" (বেকারের বিশ্ব-সমস্যা), রীস ও মর্গ্যান, লণ্ডন, কিং কোং, ১৯২৬, ১৫+১৮৮ পৃষ্ঠা ১০শি ৬পে।

ইতালির বাণিজ্য-বিদ্যালয়

ইয়োরোপে ইতালির ঘর হলেও তার উন্নতি চলেছে এশিয়ার ধাপে। কোনো কোনো হিসাবে আমাদের ভারতবর্ষ ও ইতালির মধ্যে খুব বেশী তফাৎ মালুম হয় না। ভারত ও ইতালি এ দু'টি দেশের মধ্যে এত সাদৃশ্য বর্ত্তমান রয়েছে যে, এ দুটিকে জমজভাই বলা চলে। কপালফেরেই যেন দুইটা দুই মহাদেশে গিয়ে পড়েছে। নব্য ইতালি বেশীদিনের চিজ নয়। জোর ৬০।৬৫ বা ৭০ বছর এর বয়স। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইতালি কয়েকটা টুকরায় বিভক্ত ছিল। রোমের মালিক ছিলেন সেকালের প্রবলপ্রতাপান্বিত পোপ-রাজ। হ্বেনেসিয়া প্রদেশ, যার মধ্যে সেই রমণীয় হ্বেনিস নগরী, সেটা ছিল অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের একতিয়ারে। ইতালির আর খানিকটা অংশ ছিল সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্গত। সার্ডিনিয়ার রাজা খুব স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইতালির হয়ে ইনি লড়েন এবং জয়যুক্ত হন। ১৮৬১ সনে গোটা ইতালির তক্তে তাঁকে বসায়ে দেওয়া হয়।

রাজা হ্বিক্টর এমানুয়েল, কাহ্বুর ও মহাবীর গারিবাল্‌দির আমল থেকে নব্য ইতালির গোড়াপত্তন হয়েছে বলা চলে। ১৮৬৬ সনে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ফলে হ্বেনেসিয়া প্রদেশ ইতালির সঙ্গে যুক্ত হয়। রোমের পোপ-সম্রাটগণের একতিয়ার শেষ হয় ১৮৭০ সনে। তখন থেকে রোম হয় গোটা ইতালির রাজধানী। তা হলে দেখা যায়, বর্ত্তমান ইতালি ৬০ বছরের কীর্ত্তি। এই ৬০ বছরের ইতালি ভারত-সন্তানের একটা বড় শিক্ষাস্থল। এই সময়ে ইতালি যা করেছে তা এমন কিছু হাতী ঘোড়া নয়। প্রবীণের কোঠা ছেড়ে নবীনের কোঠায় আসতে ইতালির যত কিছু আয়োজন উপকরণ সে সবই আয়ত্ত করতে ভারতবাসীর বেশী বেগ পেতে হবে না বিশ্বাস করা চলে। মাৎসিনি, গারিবাল্‌দি, কাহ্বুর, এমানুয়েল ইতালির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। যুবক ইতালি গড়নের হাতে খড়ি মাত্র তাঁরা সম্পন্ন করে যান। আজ নবীন ইতালির আর্থিক স্বাধীনতার কথা আমরা আলোচনা করব। ইতালির ঐ নব জাগরণের দিনে দেশের যথার্থ স্বদেশী নেতারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে ইতালির আর্থিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় উদ্যোগী হয়ে উঠেন। দেশের আর্থিক স্বাধীনতা না হলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে মূল্যহীন একথা ইতালির স্বদেশসেবকরা ভাল করেই সমঝেছিলেন। দেশকে গড়ে তুলবার কাজে যে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় নেতার দল ছাড়া দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে বিভিন্ন ধারার কর্ম্মীর আবশ্যকতা আছে, ইহা তাঁহারা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। দেশোদ্ধার তথাকথিত "স্বদেশী নেতাগণেরই" একচেটে ব্যবসা নয়। উকিল ব্যারিষ্টারই এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। চাই এঞ্জিনিয়ার, চাই রাসায়নিক, চাই ব্যাঙ্কার, চাই মহাজন, চাই বড় বড় ব্যবসায়ী, চাই ধনবিজ্ঞানদক্ষ পণ্ডিত, চাই কুলি মজুর, চাই গাঁয়ের কিষাণ। সকলের সমবেত চেষ্টা চাই দেশোন্নতির কাজে।

এগুলির জন্ম দেওয়ার কাজে জরুরি চাই দেশের মধ্যে ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ, চাই কৃষি কলেজ, চাই শিল্প বিদ্যালয়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চাই অসংখ্য শিল্প কারখানা "ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম" বা শিল্প শিক্ষার আখড়া।

সেকালের ইতালি ও একালের ভারত

১৮৬০-৬৫ সন। ইতালির তখনকার অবস্থা কতকটা যেন আজকালকার ভারতবর্ষের অনুরূপই ছিল। শিল্প—বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষালাভের কোনো ব্যবস্থাই সেকালে ছিল না। এদেশে যেমন আজকাল মোটা মোটা খরচায় এক একটা ডিপার্টমেণ্ট অব্ অ্যাগ্রিকালচার (কৃষি-দপ্তর)

ইণ্ডাষ্ট্রিস বিল্ডিংস (শিল্পভবন) প্রভৃতি পোষা হচ্ছে (এগুলির দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে দেশের কাজ হোক বা না হোক) সেইরূপ ইতালিতেও সেকালে ঐ ধরণের কতকগুলি কেতা-দুরস্ত অকেজো কৃষি-শিল্প-দপ্তর সরকার কর্ত্তৃক পোষা হইত। তখনকার দিনে শিল্পব্যবসা ও বাণিজ্যের দিকে লোকের ততটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় নাই। শিল্প-শিক্ষা তখনকার দিনে মামুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করাও সহজসাধ্য ছিল না। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল শিল্প ব্যবসা কখন ইস্কুল কলেজে পড়ে শিক্ষালাভ হয় না। যেমন এদেশের অনেক চাষী ও ব্যবসায়ী বলে থাকে "চাষবাস ব্যবসা আবার যদি ইস্কুলে পড়ে শিখতে হয় তবেই হয়েছে! যার যে ব্যবসা তার পক্ষে সেইটাই খাটে। কামারের ছেলে কোনদিন কুমোর হয়ে হাঁড়ি গড়তে যাবে না বা জোলা কোনদিন মন্ত্রীগিরি পাবে না। যার যার বাপদাদার ব্যবসা তার তার থাকবে।" ইতালির তিনদিকে সমুদ্র। দেশটার বড় বড় বিখ্যাত সহর সবগুলিই এক একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর। ব্যবসায়ী ইতালীয়ানরা সকলের আগে ব্যবসা বাণিজ্যের বিদ্যালয়ের অভাব উপলব্ধি করেন।

ইতালিয়ান অধ্যাপক লুৎসাত্তি

মামুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহিরে এই ধরণের ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ স্থাপনের চিন্তা সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপক লুৎসাত্তির মাথায় খেলে। তিনি তখন একজন উদীয়মান ছোকরা ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত। পরে ইতালির সমবায় আন্দোলনে ইনি খুব নাম করে ফেলেছেন।

ইনি সেকালে ইয়োরোপের ফিনান্সের একজন প্রধানতম অথরিটি ছিলেন। দেশের আর্থিক জাগরণের পক্ষে ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ যে খুব দরকারী এই মতটা সর্ব্ব প্রথম ইনিই দেশের মধ্যে প্রচার করেন। গত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়েছে।

ভেনিসের বাণিজ্য-বিদ্যালয়

ভেনিস তখন ইতালির সব চাইতে বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। ভেনিসের মত সহরে একটা ব্যবসা বাণিজ্যের বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলার আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন এবং ইস্কুলের একটা মোসাবিদা প্রস্তুত করে ফেলেন। ভেনিসের নগর-সভা (মিউনিসিপ্যালিটি) ও বাণিজ্য সভা (চেম্বার অব কমার্স) এবং সরকার এই মহদনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মতি প্রদান করেন। ভেনিসের এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাসাদে এই ইস্কুল স্থাপন করবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অনুমতি করেন। এই কাজের ভার দেওয়া হয় সেনেটার ফ্রান্সিস্কো ফেরেরার উপর। ইনি একজন সিভিলিয়ান—তাঁর সময়কার ইতালির শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানপণ্ডিত। ১৮৬৮ সনে এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতাগণের এটি গড়ে তোলার গোড়ার উদ্দেশ্য ছিল ধনবিজ্ঞান বিভাগে অধিকসংখ্যক শিক্ষক সৃষ্টি করা। শিল্প বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য সকলের আগে চাই উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষক। তখনকার দিনে কেবল ইতালি নয় গোটা ইয়োরোপে শিল্প ব্যবসা শিক্ষার উচ্চ প্রতিষ্ঠান একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমশ্রেণীর ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ সর্ব্ব প্রথম ১৮৫২ সনে বেলজিয়ামের আঁতোয়ার্প নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইয়োরোপের উচ্চ ব্যবসা বাণিজ্যের আদি বিদ্যাপীঠ। তার পরেই অ্যালসাসের স্থান। ভেনিসে স্থাপিত বিদ্যালয়টি এই হিসাবে তৃতীয় স্থান পাইবার যোগ্য। ভেনিসের ইস্কুলটি আঁতোয়ার্পের অনুকরণে গড়িয়া তোলা হয়।

সেনেটার ফ্রান্সিস্কো এই বিদ্যাপীঠের সর্ব্বপ্রথম ডিরেক্টর (পরিচালক) নিযুক্ত হন। ইনি ছিলেন পলিটিক্যাল ইকনমির "লিবারেল" মতের বড় পাণ্ডা এবং সেই জন্য এমন কি শিক্ষাক্ষেত্রেও সরকারী হস্তক্ষেপের ঘোর বিপক্ষে। এই বিরাট পুরুষের মৃত্যুর পর আলেস্সাণ্ড্রো পাসকোলেৎ ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন। ইনি একজন মস্ত বড় আইন ব্যবসায়ী ও পার্ল্যামেন্টের মেম্বর ছিলেন। ১৯০৫ সনে ইঁহার মৃত্যুর পর এনরিকো ক্যাস্তেল নুভো তাঁর স্থানে পরিচালক নির্ব্বাচিত হন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে ইঁহার জ্ঞান অসাধারণ ছিল। ১৯১১ সনে ইনি অবসর গ্রহণ করেন এবং পর বৎসর মারা যান। ইনিই

সর্ব্বশেষ আজীবনকাল পর্য্যন্ত ডিরেক্টরের পদে সমাসীন ছিলেন। বর্ত্তমানে নিত্তি-প্রবর্ত্তিত আইনের বলে ১৯১৩ সন থেকে প্রত্যেক তিন বৎসরের জন্য মাত্র একজন করে ডিরেক্টর নির্ব্বাচন করা হয়।

পলিটিক্যাল ইকনমি, ইকনমিক জিওগ্রাফি (ধনবিজ্ঞান ভূগোল) ষ্ট্যাটিসটিক্স (তথ্যরাশিবিজ্ঞান) অ্যাকাউন্টেন্সি (জমাখরচ বিদ্যা) মার্কান্টাইল ও ব্যাঙ্কিং টেক্‌নিক (ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার খুঁটিনাটি) ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা এই ভেনিস বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক ভাষা-শিক্ষা বিভাগে পূর্ব্বে সামান্য একটু আধটু জার্ম্মাণ ফরাসী ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐ অ আ ক খ পর্য্যন্তই ঐ বিভাগের দৌড় ছিল। প্রথম অবস্থায় ঐ বিভাগের তেমন কোন বিশেষত্ব ছিলনা। বর্ত্তমানে এখানে আধুনিক ভাষা সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ প্রভৃতি আধুনিক ভাষাসমূহের পঠন-পাঠনের কাজ এখানে হয়ে থাকে। ঐ সকল ভাষার উচ্চ সাহিত্য এখানকার শিক্ষণীয় বিষয়। বিভিন্ন ভাষার লাইব্রেরীর সংগ্রহও খুব বেশী। ফোসকারি প্রাসাদের সবচাইতে সুন্দর কোঠায় এই লাইব্রেরীটি অবস্থিত। এখানে ধনবিজ্ঞানের বহু মূল্যবান সংগ্রহ রক্ষিত আছে।

বাণিজ্য-কলেজের অধ্যাপক

এই কমার্শ্যাল ইস্কুলের অধ্যাপনার কাজে ইতালির বাঘা বাঘা পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। কেউ বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানবিদ, কেউ মস্তবড় ব্যবসায়ী, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। এইরূপে সমাজের বিভিন্ন বিভাগের লোকের সাধনা নিযুক্ত আছে এই প্রতিষ্ঠানের সেবায়। অধ্যাপক বেস্তা ৪০ বৎসর এখানে একাউন্টেন্সি (জমাখরচ বিদ্যা) শিক্ষা দিতেছেন। বর্ত্তমানে ইতালিতে ঐ বিদ্যার যত ছাত্র অধ্যাপক ও চাকুরে আছেন সকলেই ইঁহাকে গুরুরূপে কুর্ণিশ করে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা বিরাট পুরুষ সেনেটার ফ্রান্সিস্‌কো ফেরেরার চাইতে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার কাজে এই বৃদ্ধ একাউন্টেন্সি অধ্যাপকের দানও কম নয়। এখানকার আরও দু'জন প্রধান অধ্যাপক হচ্ছেন মাফে´ ও পান্তালেঅনি। ইতালির অন্যতম ব্যবসা-কেন্দ্র বারি সহরে আর একটি উচ্চ-দরের কমার্শ্যাল স্কুল স্থাপিত হলে পর শেষোক্ত অধ্যাপক ঐ স্থলে যান। অধ্যাপক টোমাসো ফোর্ণারি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। ইনি দক্ষিণ ইতালির ধনবিজ্ঞানসেবি-গণের সম্পর্কে একখানি বহু প্রশংসিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এক্ষণে ইঁহার বয়স ৮৪ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও ইনি ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করে থাকেন।

আইন, ষ্ট্যাটিষ্টিক্স ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনার কাজও এখানে করা হয়। এইসকল বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপকের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল। সেনেটার বদ্য ইতালির কেন্দ্রীয় ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স আফিসের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, ভ্যালেন্তি কৃষি-ধনবিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ লেখক, সেনেটার কার্লো ফ্রাঞ্চিস্ক ফেরেরা অর্থনীতি ও দেশ-শাসন-বিষয়ক আইনকানুনের একজন বড় পণ্ডিত, কার্লো আসকোলি প্রভৃতি বড় বড় আইন ব্যবসায়ী, ঐতিহাসিক রেনাত্ত ফুলিন, গণিত-পণ্ডিত তিত মার্ত্তিনি ভূগোল-বিশারদ জিউসোপ্‌প ক্যারারো, রাসায়নিক জিজিও ইতালিয়ান ভাষার অধ্যাপনার কাজে গত ৩০ বৎসর থেকে নিযুক্ত অধ্যাপক সেনেটার ফ্রাদেলেও প্রভৃতি পণ্ডিত ভেনিস্‌ বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক বা ছাত্র ছিলেন। ইঁহাদের অনেকে বর্ত্তমানে এইখানে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনবিজ্ঞানের অন্যান্য পণ্ডিত-দিগকে ছাত্রদের সামনে বিভিন্ন বিভাগের অর্জ্জিত তাঁদের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করবার জন্য বিদ্যাপীঠের তরফ থেকে আহ্বান করা হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও ধনবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণকে মাঝে মাঝে ঐ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করা হয়। ইতালির ধনবিজ্ঞানপণ্ডিত ও ব্যবসায়িগণ ঐ বিদ্যাপীঠে তাঁদের অবসর সময়ে বক্তৃতাদি প্রদান করে থাকেন।

ভেনিস-বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব

ভেনিসের এই বিদ্যাপীঠটি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান মাত্র

নয়, পরন্তু এটা একটা "জাতীয়" প্রতিষ্ঠান। কোন একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণাগার এটি নয়। দেশের সকল প্রকার আর্থিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষাকেন্দ্র ভেনিসের এই বিদ্যাপীঠ।

এই বিদ্যাপীঠ থেকে যে সব ছাত্র বের হয় তাদের মধ্য থেকেই আবার অনেকে এর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়। ছেলেবেলায় এর ছাত্র থাকে আর বয়সের সময় এরই অধ্যাপনার কাজে তারা জীবন কাটায়। এটা একটা সামান্য বিদ্যাপীঠ নয়—সাধনা-মন্দির, ইতালির গৌরবের ধন। এই বিদ্যাপীঠে শিক্ষা লাভ করা ও ইহার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হওয়াকে ইতালিয়ানরা খুব বড় গৌরব বলে মনে করে।

১৮৮৩ সনে সরকার এই বিদ্যাপীঠের অধিকার স্বীকার করেন। এই বিদ্যাপীঠের সার্টিফিকেটের ইজ্জৎ সরকার কর্তৃক মানিয়া লওয়া হয়। ধনবিজ্ঞান, আইন, ও অ্যাকাউন্টেন্সি (হিসাব নিকাশ বিদ্যা) বিভাগে সরকারী ডিপ্লোমা দিবার অধিকার এই বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষগণের হাতে অর্পণ করা হয়।

ভেনিস বিদ্যাপীঠের পাশকরা ছাত্রদের অল্প কয়েকজন মাত্র ব্যবসা লাইনে প্রবেশ করে। অনেকেই বড় বড় চাকুরী গ্রহণ করে। ব্যবসা আফিসে, শিল্প কারখানায়, ব্যাঙ্কে জেনারেল ডিরেক্টর বা ম্যানেজার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি উচ্চ পদে তারা নিযুক্ত হয়। ইতালির আধুনিক উচ্চ কমার্শ্যাল ইস্কুল ও সেকেণ্ডারি ইস্কুল সমূহের বুক কিপিং একাউন্টেন্সি, আইন, ধনবিজ্ঞান, প্রভৃতি বিভাগের অধিকাংশ অধ্যাপক ও শিক্ষক সরবরাহ করে ভেনিসের এই বিদ্যাপীঠ।

জেনোআ বনাম ভেনিস

জেনোআ ইতালির অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর। এ সহরের লোকের অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যতরণী বাঁধা থাকে জেনোআর ঘাটে। অতীতের এই বাণিজ্য-কেন্দ্র, জেনোআ নগরের অধিবাসীরা বুঝিতে পেরেছিল যে, উচ্চ শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয় না হলে আধুনিক ব্যবসা মহলে টিকে থাকা সম্ভবপর হবে না। জেনোআর ইস্কুল কিন্তু ভেনিসের ইস্কুলের মত পণ্ডিতগণের চেষ্টায় গড়ে উঠে নাই। পরন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকরা ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বাস্তবের দিকে এঁদের বেশী ঝোঁক ছিল। বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা করা বা তথ্যসংগ্রহ করা এঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। হাতে কলমে ব্যবসা করবার শিক্ষা দান করা ও উপযুক্ত ব্যবসায়ী তৈয়ারী করা ছিল এঁদের উদ্দেশ্য।

ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তাধারা ছেলেদের মগজে ঢুকানোর চাইতে তাদিগকে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী করে তোলবার ভার নেয় জেনোআর উচ্চ বাণিজ্য বিদ্যাপীঠ। এই জন্যই ইহা ইতালির উচ্চ সামুদ্রিক ব্যবসাবাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান আড্ডায় কায়েম করা হয়। ভেনিসের ইস্কুল ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তাধারা যুবকদের মাথায় এনে দিত। বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে ঐগুলি কাজে খাটানোর ব্যবস্থা করা হয় জেনোআর ইস্কুলে। দুইটার এই বিভিন্নতা থাকায় দুইটাই বিভিন্ন ধারায় সমপ্রয়োজনীয়। এর শিক্ষকতার কাজও উপযুক্ত অধ্যাপকগণের হাতে ন্যস্ত আছে। এর অনেক কৃতী ছাত্র সামুদ্রিক ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় খুব নামযশ অর্জ্জন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্রই আজকাল জেনোআর সওদাগর।

বারির বাণিজ্য বিদ্যালয়

বারি নামক সহরে ইতালির তৃতীয় কমার্শ্যাল ইস্কুল স্থাপন করা হয় ১৮৮৬ সনে। এটি নেপলসের পরে দক্ষিণ ইতালির সর্ব্বপ্রধান সহর। বারি বন্দর আদ্রিয়াতিক সাগরের কূলে অবস্থিত। ইতালির অন্যান্য সহরগুলির তুলনায় এর জন-সংখ্যা সব চাইতে বেশী দ্রুত বেড়ে চলেছে। এটি দক্ষিণ আদ্রিয়াতিক প্রদেশ ও আপুলিয়া অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ঐ সকল প্রদেশের ছাত্ররা এখানে পাঠাভ্যাসের সুযোগ পায়। কিন্তু ইতালির অন্যান্য অঞ্চল থেকে ছাত্র আসবার সুবিধা নাই। যুদ্ধের সময় এর ছাত্র-সংখ্যা অনেক কমে যায়। যুদ্ধের পর ৬০০ শতে উঠে। ইতালির মধ্যে এই ধরণের আরও ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এক সময় বারির অনেক অধ্যাপক ঐ সকল নূতন নূতন বিদ্যাপীঠে চাকুরী গ্রহণ করে এখান-

কার কাজে ইস্তাফা প্রদান করতে থাকেন। ইহার ফলে বারিকে কতকটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। বর্ত্তমানে অন্যান্য নূতন অধ্যাপক দ্বারা শিক্ষকতার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। গত বৎসর এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আদ্রিয়াতিকের পূর্ব্ব উপকূলের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ থাকায় কালে কালে বারি একটা প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হবে।

১৯০৬ পর্য্যন্ত ইতালিতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য মাত্র এই তিনটি বিদ্যালয়ই উল্লেখ-যোগ্য ছিল। এ তিনটিই ইতালির প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বন্দরে অবস্থিত। আদ্রিয়াতিক সমুদ্রের পারে দুইটি ও তিরহেনিয়ান উপকূলে একটি। ১৯০৬ সনে ইতালিতে এই ধরণের আরও দুইটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি রোমে ও আর একটি তুরিণে।

রোমের বাণিজ্য কলেজ

রোমের প্রতিষ্ঠানটি ধনবিজ্ঞানের একটা দিক্ গ্রহণ করেছে। ভেনিসের চাইতেও এর মাপকাঠি কিছু উঁচু করা হয়েছে। সেকেণ্ডারি গ্রেডের উচ্চ বাণিজ্য বিদ্যালয়ের মধ্যে এর স্থানই সকলের উপরে এবং এই হিসাবে ইহাই সর্ব্ব-পুরাতন।

রোমের এই বিদ্যাপীঠেই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণে অধ্যাপক ও ছাত্র লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৩ সনের আইন মোতাবেক এটাকে ইতালির অন্যান্য ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠের সমান শ্রেণীতে স্থাপন করা হয়, যদিও ইহার অনেক বিশেষত্ব এখনও অক্ষুন্ন আছে। অন্যান্য বিষয়ের পঠন পাঠন ছাড়া রসায়ন ও দ্রব্যতত্ত্ব বিভাগে দুইবৎসরের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এটা বিজিনেস ফ্যাকাল্টির বাইরে এবং এতে সরকারী চাকুরে এবং সেনাদলের লোক যোগ দিতে অধিকারী। রাজধানীতে বিদ্যাপীঠটি স্থাপিত হওয়ায় ইতালির বিভিন্ন স্থানের বড় বড় অধ্যাপক এখানে অধ্যাপনা করবার জন্যে স্বতই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এবং বাস্তবিক পক্ষে খুব নাম-করা অধ্যাপক ও ধনবিজ্ঞানপণ্ডিত এখানকার শিক্ষকতা করে থাকেন। আর্থিক ইতালির বড় বড় ব্যাঙ্ক, বীমা আফিস, সরকারী আফিস-আদালত প্রভৃতি রাজধানীতে থাকার ফলে রোমের এই বিদ্যাপীঠে ভাল ভাল অধ্যাপক সহজেই মিলে।

ইতালির আর ছয়টা বাণিজ্য বিদ্যালয়

তুরিণ শিল্প বাণিজ্যের একটি বড় সহর। অ্যাকাউণ্টেন্সির শিক্ষক সৃষ্টিকরা তুরিণের বড় বিশেষত্ব। উল্লিখিত ৫টি ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ ছাড়াও কাতানিয়া, নেপ্‌লস (১৯২০) ও ত্রিয়েস্তে প্রভৃতি ইতালির অন্যান্য বন্দরে উচ্চাঙ্গের বাণিজ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত মিলান ও পালেরমো সহরে দুইটি অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে।

এইস্থানে ইতালির আটটি ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠের ছাত্র-সংখ্যার হিসাব দেওয়া গেল। এই তালিকা থেকে সহজেই ঐ বিদ্যালয়গুলির কিঞ্চিৎ বুঝতে পারা যাবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ৫০০০ ইতালিয়ান ছাত্রছাত্রী

১৯৩৪-৩৫ সনে ভেনিসের বিদ্যাপীঠের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১৮৬; ১৯২৩-২৪ সনে ছিল ৬৬০।

১৯০৬ সনে রোমের বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩৮৩। ১৯২৩-২৪ সনে ছিল ৮৭৯ জন। বারির ইস্কুলে ঐ দুই সনে যথাক্রমে ১২৯ ও ৩২৬ জন ছাত্র ছিল। তুরিণে ছিল যথাক্রমে ১১৯ ও ৬২১ জন। জেনোআর বিদ্যাপীঠে ১৯০৪-৫ সনে ছিল ১০৭, ১৯২৩-২৪ সনে ছিল ৪৩২। নেপল্‌স, কাতানিয়া ও ত্রিয়েস্তের বিদ্যালয়ে ১৯২৩-২৪ সনে যথাক্রমে ৬৬৩, ২৩১ ও ২৯৭ জন ছাত্র ছিল। ১৯২৩-২৪ সনে মিলান ও পালেরমো অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৭৯, ৩৯৮ জন। বর্ত্তমানে ইতালির ধনোৎপাদনের এই ১০টি বিদ্যাপীঠের মোট ছাত্র-সংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর।

বর্ত্তমান জগৎ ও বাণিজ্য-বিদ্যালয়

ইতালি খুব বড় ব্যবসায়ী জাত। তা সত্ত্বেও আজ-কালকার প্রতিযোগিতার দিনে ব্যবসা জগতে টিঁকে

থাকবার জন্য ইতালিকে এতগুলি বাণিজ্য-বিষয়ক ইস্কুল গড়ে তুলতে হয়েছে। ব্যবসায়ীর ছেলে হলেই সে বড় ব্যবসায়ী হবে তার কোনো মানে নাই। কিংবা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টা ডিগ্রিধারী যুবক সহজেই ব্যবসা বাণিজ্যে নাম কিনে ফেলবে এরূপ আশা করা যায় না। আজকালকার দিনে প্রত্যেকটা লাইনে বিশেষজ্ঞের আদর। যে-সে লোক পাটের দালাল বা মরিচের বেপারীও হতে পারে না। এ সব হতে হলে ঐসব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা চাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বহির্গত যুবক একটা গঞ্জি ও মোজার বা মনোহারি জিনিষের দোকান খুললে পস্তাইতে বাধ্য হবে।

আজকালকার দিনে ব্যবসবাণিজ্য করতে হলে যেন তেন প্রকারেণ ভাবে চলে না। ব্যবসা-বুদ্ধি অর্জ্জনের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন জিনিষ ও হাট-বাজারের সঙ্গে ভালরকম পরিচিত হওয়া চাই। এই জন্য দেশের মধ্যে চাই নতুন ধরণের বিদ্যাপীঠ। সাধারণ শিক্ষালাভ ছাড়াও এই সমস্ত শিক্ষালাভার্থ বিশেষ ইস্কুল কলেজে কিছুদিন কাটান আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতের বেকার-সমস্যার দিনে ঐ ধরণের বিদ্যাপীঠের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা আর বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার করে না। আশা করি ইতালির উল্লিখিত ১০টি ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ ভারতের স্বদেশ-সেবকদের চোখের সামনে একটা নতুন রাস্তা খুলে দিতে সমর্থ হবে।

পূর্ব্ব আফ্রিকার বাণিজ্য-সম্পদ্

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ, কাম্পালা, উগাণ্ডা

দেশ বিদেশের কথা জানবার জন্য মানুষের যেন কেমন একটু আগ্রহ দেখা যায়। এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এক দেশের সহিত অপর দেশ মিলিত হয়ে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধন করে। একের সহিত অপরের আদান-প্রদানই নূতন সমাজ ও সভ্যতার বিস্তার করে।

একদিন ছিল ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে সমাজ, সভ্যতা, যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হত ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বাণিজ্যের রথচক্রের গতি অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে। এযুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ শত্রুতা মিত্রতা সবই যেন বাণিজ্যের গতির সঙ্গে চলেছে। ধর্ম্মের নামে যে স্পন্দন সৃষ্টি হত তা আজ আর নেই। পোপের সেই অখণ্ড প্রতাপ, রোমের বাদশার বিপুল ক্ষমতা আজ অস্তমিত। আজ তীর্থস্থান অধিকারের জন্য ক্রুসেড যুদ্ধ এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ব্যবসার ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্য "ওপিয়াম ওয়ার" (আফিংয়ের লড়াই) এক সপ্তাহের মধ্যে জগতে বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে ভারতের ইতিহাস, চীনের ইতিহাস, পারস্যের ইতিহাস, এক কথায় বলতে গেলে বাণিজ্য পোতের কুটিল গতি, কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত, কখনও হাসিভরা কখনও বিভীষিকাময়। এ বৈশ্যের যুগ, অর্থের ঝঙ্কারে রণবাদ্য বেজে ওঠে, বণিকের স্বার্থ-বুদ্ধিই আজ সন্ধি ও যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

ভারতের মর্ম্মান্তিক ব্যথা, চীনের আর্ত্তনাদ আজ সকলে জানে ও বোঝে ; কিন্তু এই সাহারা মরুভূমির উপর দিয়ে সমস্ত আফ্রিকাময় যে কি গভীর হাহাকার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে সে কথা সভ্যজগত এখনও জানে না। এত বড় একটা মহাদেশ যার লিখবার একটা ভাষা নেই, এমন একটা জাতিকে কেউ জানতে চায় না, বুঝতে চায় না!

আজ এখানে ইংরেজ রাজা, এ রাজ্যের ইতিহাস যতদূর বুঝতে পারি বাণিজ্যের ইতিহাস। ইংরেজ এসে উপনিবেশ স্থাপন করে, বাণিজ্যের একাতপত্র অধিপতি হয়ে বাস

করছে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অনেকে এসে যখন বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করল, তখনই উঠল কেনিয়া সমস্যা, সাউথ আফ্রিকার মামলা, কালায় ধলায় বিবাদ।

দূর হতে আমরা অনেকে মনে করি আফ্রিকাটা বুঝি একটা মরুভূমি ধূ ধূ করছে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি না। আফ্রিকা ধনধান্যে পূর্ণ, আফ্রিকার তুলা, খনিজ পদার্থ, রবার, কফি, হাতীর দাঁত, বাণিজ্যজগতের পরম সম্পদ্। শুধু উগাণ্ডা ও কেনিয়ার বাণিজ্য-সম্পদের কথা মনে করলে এ দেশের কথা কিছু বোঝা যায়। তুলার ব্যবসা জগতে এক প্রধান ব্যবসা, ইজিপ্টের তুলা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে; কিন্তু ইজিপ্টের পরই উগাণ্ডার তুলা জগতে স্থান লাভ করেছে। বর্ত্তমানে এ দেশের রাজনীতি, শিক্ষা ও সভ্যতা, আফ্রিকার এই বাণিজ্য সম্পদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করছে।

সত্য বটে ভারতবাসী আজ নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে বাস করছে; কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ভারতীয়েরা এখানে এমন দৃঢ়ভাবে ভিত্তি স্থাপন করেছে যে, ইংরেজ বণিকের অতি-লোভ আমাদের সহসা বিতাড়িত করতে পারবে না। আমেদাবাদের ধনকুবের শেঠ আম্বালাল সারাভাই, বম্বের স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ আফ্রিকায় বাণিজ্যের বিরাট সৌধ স্থাপন করে ভারতের নাম ও যশ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আজ এই স্বার্থের সংঘর্ষের দিনে, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় বাণিজ্যকে আশ্রয় করে ভারতীয় উপনিবেশ পরিপুষ্ট করুন। এদেশে ব্যবসার এখনও অনেক সুযোগ ও সুবিধা আছে। ভারতের তরুণ সম্প্রদায় এদেশে এসে ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপন করে নিজেদের ধনবল জনবল বৃদ্ধি করুন। এদেশের ভাষা শিক্ষা করে বম্বে ও পাঞ্জাবের অনেকে এসে নানাপ্রকার ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপন করে সমৃদ্ধিলাভ করেছেন। উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীকে লাভ করে থাকেন, যাঁদের সুযোগ ও সুবিধা আছে, তাঁরা অগ্রসর হউন।

নিয়ে উগাণ্ডা ও কেনিয়ার প্রধান কয়েকটী দ্রব্যের তালিকা দেওয়া গেল।

কেনিয়া ও উগাণ্ডার সমবেত রপ্তানি

		১৯২৫		১৯২৬	
		পরিমাণ	মূল্য (পাউণ্ড)	পরিমাণ	মূল্য (পাউণ্ড)
কাফি (কাঁচা)	হন্দর	১৭৭,১৪১	৯৬৩,৯২০	১৭৪,১৩১	৮৯৪,০৮০
,, (তৈয়ারী)	,,	১৭	১২১	৩৪	২৫৮
তুলা (কাঁচা)	সেন্তাল	৭৮৫,৮৪৯	৪,৬৯৪,৩৩৯	৭২৪,৬৯৯½	৩০৫৬,৯৪০
তিসি	টন	২৪২	৩,৭৭৬	৮৬½	১,২৪৪
তিল	,,	৩,২৪৪	৬৯,৩৭১	৩,৭৯৯½	৮০,৬৮৯
তুলার বীজ	,,	২১,৯৫৮	১২২,৯৬৫	৩৫,৩৬৫	১৯৪,৯১৫
পশম	হন্দর	৪,৯২৯	৩৭,৭৭৬	৭,৪৫৪	৬২,৪৫০
সোডা কার্বনেট	টন	৪৮,৩০৬	২১৩,৬৮০	১৯,৪২৭	৮৭,৪২৬
তামাক	,,	৯,৭৮২	১৪১	২০,৫৮৩	২৭৪
রবার (কাঁচা) (আবাদের তৈয়ারী)	সেন্তাল	৭,৯৯২	৬৮,২৭৬	১৩,৬২৯	১৩৬,৬২৪
রবার (বিনা আবাদে পাওয়া)	,,	৭৩০	৪,৪৩৪	২৮৪	১,৬৩৭
হাতীর দাঁত	হন্দর	৫৯৭	৫৫,৮৫২	৪৭৪½	৪১,৩৯৬
গরুর চামড়া	,,	৬৯,০৯২	২৯৭,৯০১	৫৯,২৭০	২০৭,৭৮১
ছাগ ভেড়ার চামড়া	,,	৮৮০,৭৭৪	৫৮,৫৬৯	১০৭৮,৯৩৫	৬০,৬৫৪
অন্যান্য চামড়া	,,	৩,৬১৭	২,৪৮৩	৩,৭৯০	৩,৮৯২

উগাণ্ডা প্রদেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে কফি উৎপন্ন হয়। ইয়োরোপীয়ানরা এদেশে এসে কফির চাষ অতিরিক্ত বৃদ্ধি করেছে। আফ্রিকানরাও প্রচুর পরিমাণে কফির চাষ আরম্ভ করেছে। মাউণ্ট এল্গনের পাদদেশে "রুবান্তা" কফির চাষের জন্য নানা দেশে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। এই কফির বিশেষত্ব এই যে, চাষ করলেই লোকে কৃতকার্য্য হয়।

বিনা আবাদে পাওয়া (প্রাকৃতিক) রবারের রপ্তানি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। "পারা" রবারের চাষই আজকাল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। উগাণ্ডা প্রদেশে পারা রবারের চাষ খুব ভাল হয়, পোকায় বড় একটা ক্ষতি করে না; কিন্তু বৃক্ষের বল্কলে অনেক সময় নানাপ্রকার রোগ দেখা যায়।

১৮৯৯ সনে উগাণ্ডা রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। শস্য, গম, চা, ধনে এসব জিনিসের আমদানি প্রধানতঃ ভারতবর্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

বাঙ্গালার পাট

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন, দিনাজপুর

গত ২৩শে অগ্রহায়ণের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের "বাঙ্গালায় পাটের চাষ" প্রবন্ধটির একটুকু আলোচনা করিতে চাই। এই সকল বিষয়ের আলোচনা যত অধিক হইতে থাকিবে ততই ইহার জটিলতা কমিয়া গিয়া প্রকৃত উপকারের পথ খুলিয়া যাইবে।

হরদয়ালবাবু বলিতেছেন, "অনেকে বলেন পাট কৃষকেরা ঘরে রাখিতে পারিলে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে"। কথাটি বড় মিথ্যা নয়; কিন্তু হরদয়ালবাবু কৃষকের উহা না পারিবার যেসকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমার নিকট উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় নাই। কারণ আমি দু' একজন সম্পন্ন গৃহস্থকে পাট ধানের খড়ের মত পুঁজি করিয়া রাখিয়া ২।৩ বৎসর পরে উপযুক্ত দর পাইয়া ধুলিমুষ্টি হইতে সোনামুষ্টি সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি। উপরের পাট কতকাংশ রৌদ্রে ও জলে নষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। পুরাতন পাটের দরও হরদয়াল বাবুর ধারণামত সমগুণবিশিষ্ট নূতন পাটের দরের অর্দ্ধেক হয় না, ২।১ টাকা মাত্র কম হয়। ইঁদুর আর আগুনে হরদয়ালবাবুর বড় ভয়। ইহাই নাকি কৃষকের পাট পুঁজি করিতে অক্ষমতার হেতু। পাট রক্ষা করিবার এই ঝুঁকিটুকু সহ্য করিবার শক্তি ও সাহস না থাকিলে, নিজের জিনিস নিজে আগলাইবার বলটুকু না থাকিলে ইঁদুরে ত খাইবেই। তাহা বলিয়া রোদন করা অশোভনই হইয়া থাকে। কৃষক আগুনের ভয়ে ভীত হইয়া বৃক্ষতলে ত বাস করে না। তবে এ ক্ষেত্রে বিচলিত হইবার হেতু কি? বাঙ্গালার কৃষক পাটের দর মাঝে মাঝে পাইলেও মামলা মোকদ্দমার কুপ্রবৃত্তি এবং নানারূপ ইচ্ছাকৃত সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধিতে দুর্দ্দশার গণ্ডী কোন-রূপেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না। দারিদ্র্যই কৃষকের সকল দুঃখের হেতু। তাহারা জানে সকলই কিন্তু রাখিতে পারে না উদরের দায়ে। যাহাদের শুধু নুন লঙ্কা সহযোগেও দু'বেলা দু'মুষ্টি অন্ন মুখে উঠে না, যাহাদের কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তাহাদের কি আবার দরের ভরসায় উৎপন্ন জিনিষ ঘরে ফেলিয়া রাখিবার সবুর সয়? মাঠে জিনিষ থাকিতেই মণ প্রতি দর ধার্য্যে দাদনে বিক্রয় হইয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশে পাট বপন কোন ক্রমেই অমঙ্গলজনক বা অসঙ্গত মনে হয় না। বিদেশের দু'টি পয়সা শুধু এই ফসলের বলেই ঘরে আসে। পাটই বাঙ্গালার লক্ষ্মী। পাটই বাঙ্গালীর সম্পদ্। পাট বপনে নিষেধ বাক্য আত্ম হত্যার

পরামর্শ স্বরূপ। এক বিঘা জমির পাটে উপযুক্ত মত দর পাইলে এক বিঘা জমির ধান অপেক্ষা কৃষকের লাভ হয় অনেক বেশী। পাট আবাদের অবস্থা ভাল শুনিলে ভূম্যধিকারীর মুখে হাসি ফুটে—তামাদী সুদ্ধ খাজানাটা আদায় হইবে। ব্যবহারাজীব সম্প্রদায়ের চিত্ত প্রফুল্ল হয়—তাহাদের আর রক্তহীন দেহে হুল ফুটাইয়া রক্তপানের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হইবে না। মহাজন খুসী—তাহাদের অনাদায়ী সুদগুলি আদায় হইয়া সুদে খাটিবে। চিকিৎসক উৎফুল্ল—আর্ত্তের গৃহে তাহাদের ডাক বাড়িবে। কৃষক খুসী—তাহাদের হাতে দুটী কাঁচা টাকা আসিবে, খড়ের চালাখানা টিনের হবে। কৃষক-পত্নীর মনে প্রচ্ছন্ন আশা এবারে তাহার একগাছা রূপার হাঁসুলী হবে। তবে দেশে পাটের আবাদ চায় না কে? এবং ইহাতে সর্ব্বনাশই বা কাহার হয় বলিয়া হর দয়াল বাবু পাট বপনের এত বিরোধী বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। অর্থাগম যে স্থানে সেই খানেই ব্যয়-বৃদ্ধি হয় এবং তদানুষঙ্গিক বিলাসিতাও অল্পবিস্তর আসিয়া থাকে। কৃষক ত যক্ষ নয় যে, ধন আগলাইয়া বসিয়া থাকিবে। পাটের দর পাইয়া বোধ হয় এখন অনেক কৃষককেই আর বর্ষার জলে ছেলে-পিলে সহ শতছিদ্র খড়ের ঘরে বসিয়া ভিজিয়া ভিজিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইতেছে না। সম্পদের লক্ষণে ঋণ মিলে সহজে। তাই আজ কৃষক ঋণ করিয়াও চিকিৎসক ডাকিয়া মৃতকল্প পুত্র পরিবারকে রক্ষা করিতে সাহসী হইতেছে। একটুকু দুধ, যাহার জন্য নাগ মহাশয় এত বলিয়াছেন, তাহাও অন্যে না পাইলে, পাটের দরের দরুণ দুটি গাভী আজ তাহার গোয়াল আলো করিতেছে, তাহার দৌলতে প্রয়োজনমত সে পাইতেছে। বাজারের ভাল মাছটুকুও তাহার জোটে। এই সকল দেখিয়া একালে একদল বাবুর চক্ষুজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে আর মুখে বলিতেছেন "বেটাদের পাটের টাকা, আমাদের জিনিষ কেনা দায় হইয়াছে।" এইরূপ বিষাদোক্তির গরলে নিজ প্রকৃতি প্রকাশ এবং অসদ্ভাবেরই বৃদ্ধি হইতেছে। কত শিক্ষিত মহামহারথী যে পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত বিপুল বৈভবরাশি বিলাসিতার সেবায় নিত্য হারাইতেছে সে সম্বন্ধেত কাহাকেও একটী কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে শুনি না।

দেশে আমাদের নেতা কে বা কাহারা তাহাত আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সেকালে দেশে একজন নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার পর স্বল্প দিনের জন্য একজন পাইয়াছিলাম তিনি চিত্তরঞ্জন। উভয়েই ভগবানের কোলে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। এখন যাহারা বর্ত্তমান তাহাদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। এ দুঃসময়ে ভূম্যধিকারী শ্রেণীরই প্রজাকুল সহ মিলিয়া মিশিয়া দেশের কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ভূম্যধিকারি-শ্রেণী দশচক্রে সাকার কি নিরাকার সেই সম্বন্ধেই এখন বিশেষ সন্দেহ। খাজনা আইনের যত পরিবর্ত্তনই হোক না কেন এই উভয় শ্রেণীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। আর কাহারও সহিত কৃষককুলের এমন সম্বন্ধ নয় এবং ইহাদের উভয় শ্রেণীর ভালমন্দে আর কাহাকেও পাইবে না বলিয়াই তাহারা নেতা সাজিয়া একবার ভূম্যধিকারী দ্বারা প্রজার পৃষ্ঠে আবার প্রজার দ্বারা ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠে লগুড়াঘাত করায়। ইহাই তাহাদের দেশ-হিতৈষণার সাক্ষ্য।

দেশে প্রকৃত উন্নতিকামী যদি কেহ থাকেন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশে আবাদী জমির পরিমাণ কত, তন্মধ্যে কি পরিমাণ জমিতে ধান এবং কত জমিতে পাট দেওয়াইতে পারিলে উচ্চ মূল্যে উভয় জিনিষই বিক্রয় হইয়া দেশের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে এবং কিরূপে বণিক সম্প্রদায়ের হাত হইতে কৃষকের নিজের হাতে তাহার পাটের দর আনা যাইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা। আমাদের মনে হয় বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় নূতন করিয়া নেতৃশ্রেণী গঠিত হইয়া পাট ক্রয় বিক্রয়ের যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে পাটের দর অদূর ভবিষ্যতে দেশের লোকের হাতে আসিয়া দেশের এবং কৃষককুলের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের ভাবিয়া উপায়োদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য।

এতদিন ভূম্যধিকারীর পতিত জমি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহাতে গোচারণ হইত এখন পাটের কৃপায় জমিগুলির আদর হইয়াছে। ভূম্যধিকারী প্রজা বিলি করিয়া এবং কৃষক আবাদ করিয়া লাভবান হইতেছে। ইহার প্রতিরোধের চেষ্টার নাম পরশ্রীকাতরতা

নয় কি? যদি প্রত্যেক গ্রামে গো-চারণভূমি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা গো-রক্ষার জন্য সকলে উপলব্ধি করেন তবে তদনুরূপ জমিগুলি গ্রাম হইতে কর নির্দ্ধারণে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারেন। তাহাতে ভূম্যধিকারীদের কোনই আপত্তি হইবার কথা নহে। ভূম্যধিকারীর মধু মহালে মৌচাক ভাঙ্গিয়া এবং জলাশয়ে মৎস্য ধরিয়া প্রজাবৃন্দের জমা নির্দ্ধারণে সমবেত ভাবে উপভোগ করিবার ব্যবস্থা এখনও অনেক স্থলে না দেখা যায় এমন নহে। পাটের দর কৃষক মাঝে মাঝে যাহা পাইতেছে তাহাতেই কৃষক আশায় আশায় অনেক পতিত জমিও আবাদ করিতেছে। ইহাতে ধানের তুলনায় পাটের আবাদ বাড়িতেছে। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে যত জমি আবাদ হইতেছে তাহার অধিকাংশই, আমার মনে হয়, অকৃষক জোতদারের হাতে। এসব জমি আবাদ হয় ভাগ চাষী দ্বারা। এসকল অকৃষক জোতদারের ইচ্ছানুসারেই তাহাদের কৃষক আধিয়ারগণ জমিতে ফসল দিতে বাধ্য হয়। কৃষকগণের স্বার্থ ধান বপনে কিন্তু তাহাদের প্রভু ব্যবসান্তরে অর্থসম্পদসম্পন্ন জোতদারের কাম্য রৌপ্য চক্র। ধানের জমি কমিয়া পাটবপন বৃদ্ধির ইহাই প্রধান কারণ।

নাগ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন যে, ধানের আবাদ কমিয়া যাওয়ায় গোজাতির খাদ্যের অভাবই দুগ্ধের মূল্য-বৃদ্ধির হেতু। আমার কিন্তু তাহা মনে হয় না। গত পূর্ব্ব বৎসর দেশব্যাপী গো-মরকই দুগ্ধের মূল্য-বৃদ্ধির হেতু। তৎপূর্ব্ব বৎসরও অনেক জেলাতেই পাড়াগাঁয়ে দুগ্ধের দর টাকায় দশসের ছিল। ঐ এক বৎসরের মরকের ফলেই গত পূর্ব্ব বৎসর বাঙ্গালা দেশে প্রায় সর্ব্বত্র টকায় প্রায় ৩।৪ সের দর হইয়াছিল। পাটের আবাদ সমভাবেই চলিতেছে। গত বৎসর দর কিন্তু পুনরায় ৮।১০ সের পল্লীগ্রামে অনেক স্থানেই হইয়াছে। ইহা অবশ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছুই নহে। আমাদের দেশে যে দুগ্ধ এখন হয় তাহা সর্ব্বসাধারণ ত দূরের কথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্যেও ঘটে কদাচিৎ। এ প্রশ্নের সমাধানের উপর জাতির সুখ, স্বাস্থ্য, উন্নতি নির্ভর করে।

লৌহ গালাই

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইনস্, সিংভূম

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট জামশেদপুরের টাটা কোম্পানীকে ইস্পাত তৈয়ারী করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য ইস্পাত আমদানির উপর পক্ষপাতমূলক শুল্ক বসাইয়াছেন। আমাদের দেশে লৌহ ইস্পাত শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের এই দ্বিতীয় বারের চেষ্টা। তিন বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আবার গবর্ণমেণ্ট সাত বৎসরের জন্য আমাদের ইস্পাত শিল্পের উন্নতিকল্পে পক্ষপাতমূলক শুল্কের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমদানি ইস্পাতের উপর এরূপ ভাবে শুল্কের ব্যবস্থা হইয়াছে যাহাতে ইংল্যণ্ডের ইস্পাতের এদেশে আমদানির অসুবিধা না হয়। জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম্ ইত্যাদি দেশের উপরই গবর্ণমেণ্টের আক্রোশ বেশী। লেজিসলেটিভ্ অ্যাসেমব্লীতে যখন ইস্পাত শিল্প বাঁচাইবার জন্য আমদানি ইস্পাতের উপর শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তখন দেশীয় সকল সদস্যগণই এক বাক্যে তাহার সমর্থন করেন। গত লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লীতে আমরা যতগুলি সরকারী বা বেসরকারী প্রস্তাব দেখিয়াছি তার মধ্যে ইস্পাত বিলই সর্ব্বপেক্ষা বেশী আনুকূল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু যখন এই শুল্কের হাত হইতে ইংল্যণ্ডকে রেহাই দিবার প্রস্তাব হইল তখন অনেক দেশীয় সদস্য ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক ভারতের একমাত্র ইস্পাত নির্ম্মাণ-

কারক টাটা কোম্পানী ইস্পাত সংরক্ষণের স্বপক্ষে গবর্মেণ্টের নিকট যে জবানবন্দী করিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা কিছু বলিব। পাঠকেরা বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের দেশ এখন দুনিয়ার সবদেশের চেয়ে সস্তা দরে লৌহ গালাই করিতেছে ও আমাদের দেশের তৈয়ারী লৌহ জাপান, আমেরিকা, ইতালি ইত্যাদি দেশে রপ্তানিও হইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের দেশে যদি সব চেয়ে সস্তা দরে লৌহ তৈয়ারী হয় তবে আবার ইস্পাত-শিল্প সংরক্ষণের জন্য এরূপ শুল্ক বসাইবার ব্যবস্থা কেন? টাটা কোম্পানী তাঁহাদের তরফ হইতে তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন। (১) আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা ১৩·৩ টাকা দিয়া বিদেশ হইতে ১৫ টাকার সমান বিদেশী ইস্পাত আমদানি করিতে লাগিল। (২) বিদেশের ইস্পাতের মালিকেরা তাঁহাদের কাটতির অধিক ইস্পাত তৈয়ারী করায় তাঁহারা কম দরে আমাদের দেশে ইস্পাত বিক্রয় করিতে লাগিল। এই রকম কার্য্যকে ইংরাজীতে ডাম্পিং বলে। (৩) টাটা কোম্পানী বলিতেছেন তাঁহাদের কারখানা যে পরিমাণ ইস্পাত তৈয়ারী করিতে সমর্থ এখনও তাঁহারা সেই পরিমাণ তৈয়ারী করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহাদের অনেক যন্ত্রপাতি কর্ম্মহীন অবস্থায় আছে। এজন্য তাঁহারা আরও সাত বৎসর সময় চান।

গত ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত টাটা কোম্পানীর ব্লাষ্ট ফারনেসে (হাওয়া চুল্লী) লৌহ গালাই করিবার জন্য টন প্রতি কিরূপ খরচ পড়িয়াছিল তাহার একটা 'গড়' তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ টন লৌহ গালাই করিবার খরচের তালিকা

হিসাবের দফা	পরিমাণ (পাউণ্ড হিসাবে)	মূল্য (টন প্রতি)	খরচ (টাকার পরিমাণ দশমিক ভগ্নাংশে)
লৌহপ্রস্তর	৩,৫৯৬	৩—৪—২ পাই	৫·২৩
ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর	৪১	১৬—৪—৩ "	·৩০
কোক্	২,৬৮১	১০—১০—৪ "	১২·৭৪
ডলোমাইট	২৬৮	৪—৯—৯ "	·৫৫
চুণাপাথর	৮০৯	৪—১৪—৪ "	১·৭৭
টুকরালৌহ (স্ক্র্যাপ)	১৫০	২০—০—০ "	১·৩৪
পারিশ্রমিক	...	...	১·৬৭
ষ্টীম (বাষ্প)	...	...	১·৩২
চুল্লীর ইট্	...	...	·১০
চুল্লী মেরামত	...	...	·৩৮
বৈদ্যুতিক খরচাদি	...	...	১·০০
অন্যান্য খরচ	...	...	১·৪১
মোট	...	...	২৭·৭১

ব্লাষ্ট ফারনেসের উত্তপ্ত গ্যাস বয়লারে উত্তাপ দেওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। সে জন্য লৌহ গালাইয়ের খরচে ঐ উত্তপ্ত গ্যাসের দামটা জমা পড়িবে ও লৌহ গালাই করিয়া ছাঁচে ঢালিবার সময় কিছু লৌহ টুকরার গরবরাদ হয়। সেই টুকরা লৌহের দামও ঐ গালাই খরচে জমা পড়িবে।

এক টন লৌহ গালাইয়ের খরচ ২৭.৭১ টাকা হইতে

উত্তপ্ত গ্যাসের বাবদ ১·২৭ টাকা ও টুকরা লৌহ বাবদ ·৪১ টাকা মোট ১·৬৮ টাকা বাদ পড়িবে। এক টন লৌহ তৈয়ারী করার খরচ (২৭·৭১-১·৬৮) =২৬·০৩ টাকা।

গত বৎসর (১৯২৫-২৬ সনে) আমাদের দেশ হইতে কোন্ কোন্ দেশে কি পরিমাণ লৌহ রপ্তানি হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

টনের হিসাব

জাপান	আমেরিকা	চীন	আফ্রিকা	ইতালি	ম্যানিল্যা	অষ্ট্রেলিয়া	অন্যান্য দেশ	মোট
৬৯,২২০	৩৯,৬৮৩	১,৭৭৫	৬৪২	১,৭০০	৭৯২	১,৫০৩	৮৬৬	১,১৬,১৮১

বাঙ্গালায় ও আসামে চায়ের ব্যবসা

শ্রীনরেন্দ্র নাথ সেন এম, এ, বি, এল

বন্য চা গাছ বেশ উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু বাগান করিলে চা-গাছকে বেশী বড় হইতে দেওয়া হয় না। প্রথমে নার্সারিতে চায়ের বীজ রোপণ করা হয়। তারপর চারা বাহির হইলে উঠাইয়া নিয়া ৪ফুট অন্তর বাগানে পোতা হয়। তখন ক্রমাগত কলম চলিতে থাকে, যেন গাছ উঁচু দিকে না বাড়িয়া ঝোপ্ হয়। অর্থাৎ লক্ষ্য থাকে কিসে খুব বেশী চা-পাতা পাওয়া যাইবে।

মজুর

জঙ্গল কাটা, মাটি কোপান, আগাছা বাছা, চা-পাতা তোলা, সার দেওয়া, সড়ক ও পথ্য তৈয়ারী করা ইত্যাদি সকল কাজেই দিন-মজুরের দরকার হয়। যথেষ্ট মজুর না পাইলে চা-বাগানে সফলতা সুদূরপরাহত। সাধারণ মজুররা এসব কাজ অনায়াসে করিতে পারে। পাতা তোলা ও কলম করাতেই যা-কিছু বুদ্ধি ও শিক্ষার দরকার হয়।

ফিজি ও মরিসাসে প্রতি বৎসর অসংখ্য মজুর প্রেরিত হইতেছে। জগতের অন্যান্য জায়গায়ও মজুর যাইতেছে। সুতরাং চা-বাগানের জন্য কুলীর কোন দিন অভাব হইবে এমন মনে হয় না। অভাব রহিয়াছে পুঁজিপাটার।

কুলী চালান যায় প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চল হইতে, বেহারের রাঁচি ও অন্যান্য স্থান হইতে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে।

পুঁজিপাটা

দু'পাঁচটা বাদে অধিকাংশ চা-বাগান জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী। বৃটিশ পুঁজিপতিরা এখন প্রায় ৬½ লক্ষ একর জমিতে চা-আবাদ করিতেছে। এবং এই বৃটিশ ইন্‌ভেষ্টমেন্টের বর্ত্তমান বাজার দর প্রায় ৬৫ কেটি টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

১½ কোটি টাকার ভারতীয় মূলধন প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে চা-আবাদের জন্য খাটিতেছে। ইহার বর্ত্তমান বাজার দর ৩ কোটি টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

ভারতীয় চা-ব্যবসার প্রধান আড্ডা হইতেছে উত্তর বঙ্গের ছোট্ট শহর জলপাইগুড়িতে। এখানে ৫৫টা কোম্পানীর হেড অফিস্ বর্ত্তমান। খাটানো পুঁজিপাটার মোট পরিমাণ ১ কোটি টাকার উপর।

জলপাইগুড়িতে চা-ব্যবসার প্রথম প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় শ্রীনা[illegible] চক্রবর্ত্তী (ইনি ডেপুটি কমিশনারের আফিসে সামান্য কেরাণী ছিলেন) ও খান বাহাদুর রহিম বক্স। কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ চা-ব্যবসায় বাঙ্গালী উকিলদের দ্বারা চালিত হইতেছে।

পরিচালনা

ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ম্যানেজিং এজেণ্টরা চালায়। কলিকাতার বড় বড় ইয়োরোপীয় কারবারগুলির প্রত্যেকে

এক বা অধিক চা-বাগান হাতে আছে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্টরা চালায়। জলপাইগুড়িতে ডিরেক্টররা নিজেরাই পরিচালনার ভার লইয়াছেন।

চা-বাগানের কাজের ধারা

প্রথমতঃ, প্রথম চাষের ৩ বৎসর না গেলে চা পাতা তোলা যায় না। তৃতীয় বছর হইতে ফসলের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। অবশেষে ৫ম বা ৬ষ্ঠ বছরে উর্দ্ধতম পরিমাণে চা-পাতা পাওয়া যায়। সুবিবেচনার সহিত কলম করিলে ও সার দিলে এই উর্দ্ধতম পরিমাণ ৭০।৮০ বছর পর্য্যন্ত মিলিতে পারে। তার চেয়ে বেশীদিনও মিলিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ৪।৫ শত একরের চা-বাগানকে চাষ-যোগ্য করিতে ও তাহাতে প্রয়োজনমত আধুনিক যন্ত্রাদি লাগাইতে ২।৩ লক্ষ টাকার পুঁজিপাটা খরচ হইয়া যায়। তার উপর ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বা ফসল বন্ধক রাখিয়া আরও ১ লাখ টাকা বাগানে খরচ করা দরকার। এই টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? ঠিক এই সময়ে ব্যাঙ্ক-গুলি আসিয়া দরকারি টাকা ধার দেয়। চা-কোম্পানী এই ঋণটা পরে অনায়াসে শুধিতে পারে। শোধ করিবার টাকাটা চা বেচিয়াই জুটিয়া থাকে। বস্তুতঃ, পরিচালনার ব্যবস্থা যদি ভাল হয় তবে ৬ষ্ঠ বছরেই সব ঋণ শোধ হইয়া যায়। ৭ম বছর হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া আরম্ভ হয়। চা-গাছ ৭০।৮০ বছর বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং প্রথম ৭ বৎসর কিছু না পাইলেও অংশীদারদের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

বৃটিশ বাগানগুলির অর্থসাহায্যটা প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার ইয়োরোপীয় ব্যাঙ্কগুলি করে। যদিও ম্যানেজিং এজেন্টদের একাজ করিবার কথা, তারা শুধু কখনো কখনো ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইবার জন্য নিজেদের ক্রেডিট্ ধার দেয়। বাগান বন্ধক রাখিয়া বা ডিবেঞ্চার বাহির করিয়াও টাকা যোগাড় হইতে পারে।

জলপাইগুড়ির কারবারগুলি তাদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক হইতে অর্থসাহায্য লয়। ৬।৭টা ব্যাঙ্ক শুধু এই উদ্দেশ্য লইয়াই জলপাইগুড়িতে গঠিত হইয়াছিল ও চালিত হইয়া আসিতেছে। ডিরেক্টররা নিজেদের দায়িত্বে অথবা বাগান বন্ধক রাখিয়া জলপাইগুড়িতে ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে টাকা ধার লন।

চা-বাগান হইতে সীসার পাতে মোড়া কাঠের বাক্সের ভিতর চা পুরিয়া এক বা অন্য দালালের কাছে পাঠান হয়। বাক্সের ভিতর ন্যূনাধিক ১মণ চা থাকে। দালালরা পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল বিক্রেতা কোম্পানীদের জানায়। চা বেচিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে এই বাক্সগুলি বাজারে আনা হয় এবং নীলামে সব চেয়ে চড়া দর যে বলে তার কাছে বেচা হয়। অধিকাংশ ক্রেতাই আবার নিজেরা লণ্ডন ও দুনিয়ার অন্যান্য স্থানে এই চায়ের বাক্সের প্রেরক। কোন কোন বড় ইয়োরোপীয় বাগান সোজা লণ্ডনে চা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করে। সেখানে নীলামে চা বেচা হয়।

সাধারণতঃ জুন মাস হইতে চা বেচা আরম্ভ হয় ও পরবর্ত্তী বৎসরের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

চা অ্যাসোসিয়েশন ও তাদের কাজ

(ক) আসাম লেবার বোর্ড বাগানের কাজে মজুর বা কুলী পাওয়া বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

(খ) প্ল্যাণ্টারস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ বাগানের স্বার্থ দেখা ও বাগানসংক্রান্ত সকল বিষয়ের তদ্বির করা। এই অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা দুইটা—ইণ্ডিয়ান টী প্ল্যাণ্টারস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রধানতঃ জলপাইগুড়ির কারবার-গুলি লইয়া গঠিত এবং ইয়োরোপীয়ান্ টী প্ল্যাণ্টারস্ অ্যাসোসিয়েশন।

(গ) ব্রোকারস্ অ্যাসোসিয়েশন দেখে কিসে চা-বেচাটায় উৎকর্ষ লাভ ঘটিতে পারে।

(ঘ) ইণ্ডিয়ান টী অ্যাসোসিয়েশন চা কোম্পানীগুলির স্বার্থ-রক্ষা করিতে যত্নবান থাকে। ইহার আফিস লণ্ডনে ও কলিকাতায় উভয় জায়গায় আছে।

(ঙ) ইণ্ডিয়ান্ টী সেস কমিটি দুনিয়ার বিভিন্ন বাজারে চা বেচিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে যাহাতে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য প্রপাগাণ্ডা

চালাইতেছে ; এবং সর্ব্বদা নয়া নয়া বাজার সৃষ্টি করিবার জন্য ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছে। ইণ্ডিয়ান টি সেস অ্যাক্ট অনুসারে প্রতি পাউণ্ডে ৳ পাই দিতে হয়। এই রাজস্ব দ্বারা প্রপাগাণ্ডার কাজ জোরসে চলিতেছে। মোট টাকাটা বড় কম উঠে না। ১৯২২-২৩ সনে উঠিয়াছিল ৭,৩২,০০০৲ টাকা।

মুনাফা

প্রতি পাউণ্ড চা তৈয়ারী করিতে গড়ে ইয়োরোপীয় বাগানে খরচ পড়ে ৷৷● আনার কম নয় ; আর ভারতীয় বাগানে ।৶০ আনার কম নয়।

গড়ে বেচা দর প্রতি পাউণ্ডে ৷৷৶০ আনা হইতে ১৶০ আনার মধ্যে উঠানামা করে। এই দরের কম বেশী নির্ভর করে চার গুণের উপর ও চা-বাজারের অবস্থার উপর।

সুতরাং গড়ে মণপ্রতি ১৫৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকার মধ্যে একটা পরিষ্কার মুনাফার অঙ্ক থাকে দেখা যাইতেছে।

বলা বাহুল্য ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ শুধু চড়া দরের উপর নির্ভর করে না। খরচের উপরও নির্ভর করে।

ভারতীয় চায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী

ভারতে চা জন্মে প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গে ও আসামে। দক্ষিণ ভারতেও কিছু জন্মে। ভাল চা উৎপন্ন করিবার জন্য দরকার মাটি, তুলিবার প্রণালী ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতীয় চায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহলী, চীনা, জাভা ও সুমাত্রা চা। চীনে "ব্ল্যাক টী" বা কৃষ্ণ চায়ের খুব টান। কিন্তু সেখানে "গ্রীন্ টী" বা সবুজ চায়ের মত কৃষ্ণ চা জন্মায় না।

কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় চায়ের বাজার বিশেষ কাবু হয় নাই। কারণ দুনিয়ায় চায়ের খরচ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে।

কোন্ দেশ মোট কত পাউণ্ড চা উৎপাদন করে তার একটা তালিকা এইরূপ :—

(১) ভারত

১৯২৩-২৪	...	৩৪,৪৭,৪৪,১১১
১৯২৪-২৫	...	৩৫,৬০,৪১,০০০

(২) সিংহল

১৯২৩-২৪	...	১৮,১৯,৩৯,৭৩১
১৯২৪-২৫	...	২০,০৯,৩৩,০০০

(৩) চীন

১৯২৩-২৪	...	১০,৬৮,৫৬,০০০

(৪) জাভা

১৯২৩-২৪	...	৯,৭৪,৭৫,০০০
১৯২৪-২৫	...	১০,৩২,৮৮,০০০

(৫) সুমাত্রা

১৯২৩-২৪	...	১,৬৮,৩৪,০০০
১৯২৪-২৫	...	১,৭৭,১৭,০০০

চা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ

অতি উৎপাদনে চায়ের চড়া দর নামিয়া গিয়া ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই আশঙ্কা সত্য হইবে না।

(ক) নূতন নূতন দেশ, যথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা, পারস্য, মিশর, মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি, চা-খাদক ক্রেতা হিসাবে দেখা দিয়াছে। তাতে দিন দিন চায়ের বাজার প্রসারিত হইতেছে।

(খ) ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মত চা-খোর দেশগুলিতে চা বাগান করার অভ্যাস দ্রুতগতিতে আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

(গ) নয়া নয়া আয়তনেও চা-বাগান হইতেছে। কিন্তু কৃষ্ণ চা বাজারে আসিতে সময় লাগে। ইতিমধ্যে চায়ের কাটতি বাড়াইবার প্রচেষ্টা ক্রমাগত সফল হইতেছে।

(ঘ) দুনিয়ার টানের দিকে চাহিয়া উৎপাদনটা হয়। উৎপাদন বেশী হইলে টি অ্যাসোসিয়েশন তৎক্ষণাৎ কোম্পানীগুলিকে জানাইয়া দেয়। কোম্পানীরাও উৎপাদন কমাইতে চেষ্টা করে ও উৎকৃষ্টভাবে পাতা তোলা আরম্ভ করে অর্থাৎ বাছিয়া বাছিয়া পাতা তোলে।

চা-ব্যবসায়ে কত টাকা খাটিতেছে

চায়ের ব্যবসায়ে খাটানো মোট পুঁজিপাটার পরিমাণ ৪১২ কোটি টাকার উপর হইবে। তন্মধ্যে মাত্র ১২ কোটি টাকা ভারতীয়। আর এই সমস্তটাই জোগাইতেছে বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি।

ভারতীয় বনাম বৃটিশ চা কোম্পানী

কোম্পানীর নাম	রেজিষ্ট্রির সন	কত টাকার পুঁজিপাটা চাঁদা আদায় হইয়াছে	কত একরে চা হইতেছে	কত মণ চা পাওয়া গিয়াছে	শতকরা ডিভিডেণ্ডের হার ১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	শেয়ারের দাম	এক্ষণে শেয়ারের বাজার দর	১৯২৪ সনে গড়ে পাউণ্ড প্রতি চায়ের দর	কত টাকার রিজার্ভ ফাণ্ড
আটিয়াবাড়ী	১৯০০	৭৫,০০০	১০৩৪	৮৫১৬	—	২৫০	৩৫০	২০০	৫০	১২২৫	—	১,১২,০০০
গুইঙ্গঝোরা	১৮৯২	৫০,০০০	৬১২	৩৩০০	—	৩০০	২৩০	১৪০	৫০	৯০০	—	১,৭৯,০০০
জলপাইগুড়ি	১৮৭৯	৫০,০০০	৬৩০	৫৫১৫	—	৩১০	৩২৫	১৫০	২৫০	৫২০০	—	১,০০,০০০
রামঝোরা	১৯০৭	১,৩০,০০০	৮৫৮	৭০০০	—	২০০	২০০	১১৬	৫০	৬৫০	—	১,২৬,৭৭০
দেব পাড়া	১৯০৯	১,৩৫,২০০	৯০০	৬১১৮	—	২১০	২১০	১০৬	৫০	৬৫০	—	৫৭,০০০
গোপালপুর	১৯১২	১,৫০,০০০	৮৬৮	৭৫৩৪	—	১০	১২৪	১২৪	২৫	৩৪০	—	১,৫৫,০০০
বৃটিশ—												
নিউ ডুয়ার্স্	১৮৯৭	৪ লক্ষ	৯৯৭	১০,০৬৬	৫৫	১১৫	২২৫	—	১০০	৫০০-৭৫০	১/১১	৫,০৫,৯২১
চুনা ভুট্টি	১৮৯৪	৪ লক্ষ	৮৬৬	৮০৯৬	৩০	১০০	১৫০	—	১০০	৩৫২-৬১০	১/২	৩,৫২,১৫৮
নিউসিনাটোলিয়া		২॥ লক্ষ	৯৬৫	৭৬৩২	৮০	১০০	১২৫	—	১০০	৫৪০-৮৫৪॥০	১/২	২,৩৩,৯৪৫
কিংস্লি ডোলাঘাট	১৮৯৭	৪॥ লক্ষ	১৫২৬	১১,০৩৩	৮০	১০০	১০০	—	১০০	৫০০-৬৫০	১।১০	১,৫৭,৫৮৯
মেঘোলা	১৮৭৪	১,৩৮,০০০	৪৪১	৪০১২	৬০	৮০	১০০	—	১০০	৪৭০-৭৫০	১।/৬	৯০,৭২২
ভাতপোওয়া	১৯০০	২॥ লক্ষ	১১৪৮	৯৬৭৯	৫০	৭০	৮০	—	১০	৫৪॥-৭৫	১৪	২০৮,৯২৬

কাশ্মীরের রেশম শিল্প

তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ

কাশ্মীরের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর রেশম-শিল্পের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ঠিক কোন খবর পাওয়া যায় না। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তাহার ফলে শিল্পের বিশৃঙ্খলাই ইহার জন্য দায়ী।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে মির্জ্জা হায়দার এই অঞ্চলে তুঁত গাছের প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, সেকালে লোকে রেশম পোকার আহারের জন্যই মাত্র ঐ সকল গাছের পাতা ব্যবহার করিত। আইন-ই-আকবরীর গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রেশম শিল্পের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে (১৬০৫-১৬২৮) কাশ্মীরের রেশম শিল্প ঠিক আকবরের আমলের অবস্থার অনুরূপ ছিল। সেকালের লোক ইয়ারখন্দ হইতে গুটী পোকার ডিম আমদানি করিত এবং গুটী লালনপালন করিত।

১৮৪৬ সনে জনৈক ভারতীয় পর্য্যটক কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া বলেন যে, এখানে সেখানে উপত্যকার ধারে ছাড়া ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে গ্রামবাসীরা রেশম প্রস্তুত করিত। তাহাদের মধ্যে কোন জোট ছিল না। রেশম শিল্প কতকটা সীমানার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কতকগুলি লোক আদিম কালের পদ্ধতি অনুযায়ী গুটী পোকা লালনপালন করিত এবং তাহা হইতে রেশম সূতা প্রস্তুত করিত। ইহারা নিজেরাই নিজেদের কুটিরে কুটিরে তাঁত খাটাইয়া রেশম বস্ত্র বুনিত। ব্যবসার আকারে তখনও লোকে রেশম শিল্পে হাত দেয় নাই এবং যানবাহনের সুবিধাও সেকালে

ছিল না। এইসকল কারণের জন্যই রেশম শিল্পে তখনকার দিনে কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হয় নাই। ইহা সত্বেও প্রতি বৎসর রাজ সরকার অন্যূন ২৫ হাজার টাকা রেশম শিল্প হইতে পাইত। রেশম শিল্পে সেরূপ শৃঙ্খলা থাকিলে সরকারের পাঁচ গুণ বেশী আয় হইত।

১৮৪৬ সনে দুইজন ইতালীয়ান রেশম-শিল্পী কাশ্মীর পরিভ্রমণ করেন। এখান হইতে তাঁহারা গুটী পোকার কতকগুলি ডিম লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে খুব বড় আকারে রেশম শিল্প চলিতেছিল।

১৮৬৯ সন পর্য্যন্ত শিল্পের অবস্থা এইরূপ ভাবে চলিতেছিল। তখন কাশ্মীর সিংহাসনে মহারাজা স্যার রণবীর সিংহ সমাসীন। তিনি রেশম শিল্পের সম্বন্ধে একজন বড় উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় রেশম শিল্পে একটা নব জাগরণ আসে এবং প্রভূত পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হইতে থাকে। সূতা প্রস্তত ও বয়নের কাজ ভাল ভাবে চলিলেও শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের অভাব তখনকার দিনে খুব পরিলক্ষিত হইত।

১৮৭৮ সনে রেশম শিল্পে এক বড় প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ সনে রেশম-মারীর জন্য প্রায় সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৮২ সন পর্য্যন্ত ঢিমে তেতালা ভাবে শিল্পের গতি চলিতে থাকে। রেশমের বীজের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যাইতে থাকে এবং রেশমশিল্প একরূপ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়।

১৮৮৯ সনে স্যার এডওয়ার্ড বাক সাহেবের পরামর্শানুযায়ী ডিম উৎপাদন করণার্থ পাস্তুয়র পদ্ধতি দ্বারা অণুবীক্ষণ গবেষণা চালাইবার নিমিত্ত জনৈক বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞের সাহায্য লওয়া হয় এবং জনৈক কাশ্মিরী ভদ্রলোককে এই শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করিবার জন্য বাংলা দেশে প্রেরণ করা হয়। ১৮৮৯ হইতে ১৮৯৪ সন পর্য্যন্ত রেশম শিল্পের ভার কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৮৯৪ সনে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে সেটেলমেণ্ট কমিশনার স্যার ওয়াল্টার লরেন্সের উপর ঐ কার্য্যভার অর্পণ করা হয়।

১৮৮৯ সনে লাহোরের আর্ট স্কুলের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জন লকউড কিপলিং কাশ্মীর পরিভ্রমণ করিয়া গ্রেটবৃটেন ও আয়ার্লণ্ডের সিল্ক অ্যাসোসিয়েশ্যনের প্রেসিডেণ্ট স্যার টমাস ওয়ারডল মহাশয়কে কাশ্মীরে প্রভূত পরিমাণে রেশম উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন।

১৮৯০ হইতে ১৮৯৬ সনের মধ্যে স্যার টমাস ওয়ারডল পত্র ব্যবহার দ্বারা কাশ্মীরের এই প্রধান শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কাশ্মীর রাজ্যের ইংরেজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল পেরি নিসবেট, সহকারী ভারত-সচিব স্যার আর্থার গডলে ও ইণ্ডিয়া আফিসের স্যার জর্জ্জ বার্ড উডের সহায়তা কামনা করেন।

১৮৯৬ সনে স্যার এডালবার্ট টালবট কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। তিনি রেশম শিল্প সম্বন্ধে স্যার টমাস ওয়ারডলের আশাজনক রিপোর্ট পাঠ করিয়া মৃতপ্রায় রেশম শিল্পকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যবসার আকারে বিরাটভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য তদানীন্তন মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংহ বাহাদুরকে অনুরোধ করেন।

১৮৯৭ সনে কাশ্মীর সরকারের পক্ষ হইতে গুটী পোকার ডিম ক্রয় করিবার নিমিত্ত ভারত সচিব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্যার টমাস ওয়ারডল ফ্রান্স ও ইতালি গমন করেন। ঐ বৎসরই বাংলার রেশম শিল্প সম্বন্ধে বিশ বৎসরের অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত সি, ই, ওয়াল্টন মহাশয়কে কাশ্মীর রাজ্যের ডিরেক্টর অব সেরিকালচার পদে নিযুক্ত করা হয়। ওয়াল্টন সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই রেশম শিল্পের আখড়াগুলি পরিদর্শন করেন। নাশিমবাগের নিকট রঘুনাথপুরা যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে, ঐ স্থানে আদিম কালের কতকগুলি সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা রেশম প্রস্তত হয় এবং সেগুলি একরূপ অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। এইরূপ আরও অন্যান্য রেশম শিল্পের আড্ডা পরিদর্শন করিয়া তিনি এগুলির উন্নতি-বিধানার্থ মনোযোগ দেন। তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টায় রামবাগে (যেখানে বর্ত্তমানে বিরাট রেশম ফ্যাক্টরি চলিতেছে) ৪২৪টি টাকুসম্বলিত দুইটি নূতন ফিলেচার (যে যন্ত্র দ্বারা কোকুন বা গুটী হইতে রেশম সংগ্রহ করা হয়) খাটান

হয়। প্রতি বৎসরই রেশম শিল্প বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফিলেচারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। অবশেষে ১৯০৪ সনে ফিলেচারের সংখ্যা দশ হয় এবং তাহাতে ১৮৬৪টি টাকু চলিতে থাকে। ১৮৯৮ সনে ১৯২০ আউন্স ডিম আমদানি করা হইয়াছিল। ১৯০৩ সনে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ হাজার আউন্স দাঁড়ায়।

১৯০৪ সনে ওয়াল্টন সাহেবের মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত এইচ, ডি, ডগলাস তদানীন্তন সহকারী রেশম ডিরেক্টর তাঁহার স্থানে উন্নীত হন। ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত রেশম-শিল্প উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐ সময়ে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত ফ্যাক্টরী সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। ছয়টি দ্বিতল রেশম ভবন ১,২৭২টি টাকু সমেত এবং সমস্ত বৎসরের কোকুন প্রায় ৫৮ হাজার মণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এই বিপর্য্যয়ের ফলে সমস্ত রেশম শিল্প গুটাইতে হয়। এবং বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে। তাহার পরই যুদ্ধ। মহা যুদ্ধের ফলে গোটা ইয়োরোপের রেশম-বাজার একরূপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাও কাশ্মীরের রেশম শিল্পের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ।

১৯১৩ সনের শেষ ভাগে ডগলাস সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে পর ১৯১৪ সনে শ্রীযুক্ত এম, এল, ম্যাকনমরা ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েন। তিনি দরবারের আদেশানুযায়ী অবিলম্বে রেশম কারখানাগুলি পুনর্গঠন করিবার জন্য লাগিয়া পড়েন। যুদ্ধের জন্য ইয়োরোপ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে না পারায় পুনর্গঠনের কাজে অনেকটা দেরী হইয়া যায়। এমন কি ভারতবর্ষে যে সকল যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইত তাহাও খুব দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইসকল কারণের জন্য মাত্র ১৯১৮ সনে ফ্যাক্টরি পুনঃগঠনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ বৎসর হইতে রেশম উৎপাদনের কাজ পুরা দমে চলিয়া আসিতেছে।

১৯২২ সনে ইতালি হইতে আনীত ৪টি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রেশম নির্ম্মাণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষাকার্য্য চালান হয়। এই পরীক্ষায় যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। গত ১৯২৫ সনের জুলাই মাস হইতে ঐ ধরণের আধুনিক একটী কল স্থাপন করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হইতেছে। গড়ে গত ৫ বৎসরের উৎপন্ন রেশমের পরিমাণ ১,৮০,০০০ পাউণ্ড উত্তম সিল্ক এবং ১,৩২,০০০ পাউণ্ড রিজেকশান সিল্ক।

ইয়োরোপে কাশ্মীর রেশমের প্রধান প্রধান বাজার হইতেছে লণ্ডন, লিয়ঁ, মার্সেই, এবং ভারতবর্ষে বেনারস। অমৃতসহর, এক মুলতান। কতকটা সিল্ক ব্যাংককেও চালান দেওয়া হয়।

তর্ক-প্রশ্ন

পোদজাতির মাছ-ধরা

গত আষাঢ় সংখ্যা "আর্থিক উন্নতি"তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ করণ মহাশয় "পোদজাতি কি মৎস্যজীবী" নামক প্রতিবাদ প্রশ্নে লিখিয়াছেন, "পোদজাতি বা তাহার কোনও থাক বা শ্রেণী যে ধীবরবৃত্তিক সে সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের উক্তির ভিত্তি কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানিতে দিলে বাধিত হইব।"

উক্ত করণ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন, "এই জাতি কস্মিন্ কালে মৎস্যজীবী ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। তদুপরি তিনি বলিয়াছন, "পোদজাতিকে কোথায় কোন্ থানা বা গ্রামে মৎস্যজীবীরূপে দেখিয়াছেন জানাইলে বড়ই অনুগৃহীত হইব।"

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত ওরূপ কথা আমি লিখি নাই। আমি বাল্যকাল হইতে বর্ত্তমান ৫৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, বিবিধ কারণে পদ্মরাজ জাতির সহিত পরিচিত আছি। আমার কতিপয় পরম বন্ধু পদ্মরাজ জাতির মধ্যে আজিও আছেন। তাঁহারা আমার ভ্রাতৃস্থানীয়।

কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণপুর, কাঁটাতলা, বামুনঘাটা, ভাড়দহ, চিংড়িঘাটা প্রভৃতি স্থানে পদ্মরাজ জাতীয় লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে অবস্থান করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম-জীবনের সহিত আমি বিশেষ ভাবে পরিচিত রহিয়াছি।

আমি প্রত্যক্ষরূপে যাহা দেখিতেছি তাহাই লিখিয়াছি। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ধাপা নামক স্থান নিবাসী পদ্মরাজ বন্ধুগণ, বর্ত্তমানেও মৎস্যব্যবসায়ী রহিয়াছেন।

ভেড়ী নামক জলকরের মালিক অনেক পদ্মরাজগণ আছেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদের স্বজাতীয়েরা 'আনা'তে অবস্থান করেন এবং বেড়-জাল টানিয়া মৎস্য ধরেন বা ধরান। এই প্রকারে যে মাছ ধরা হয় উহা তাঁহাদের আহারের জন্য নহে তাঁহারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বেড়-জাল টানিয়া যে মাছ-ধরা হয়, সেই মাছ শ্রমজীবী দ্বারা বহন করাইয়া ঘাট বা সায়ের নামক বিক্রয়-কেন্দ্রে আনা হয়। এই সায়েরের মালিকমধ্যে পদ্মরাজগণও আছেন। সায়েরের 'কয়াল' মধ্যে পদ্মরাজ বন্ধুরাও আছেন। তাঁহারা মাছ বিক্রয় করেন। এই সায়ের হইতে মাছ ক্রয় করিয়া, তথাকথিত মাছুয়ারা হাটে বাজারে বিক্রয় করে। খুচরা মাছ বিক্রয় করিতে পদ্মরাজদিগকে দেখা যায় না, অথবা পদ্মরাজ মহিলারা কখন হাটে বাজারে গমন করেন না।

পদ্মরাজ বন্ধুগণ—বেড়-জাল, ক্ষেপলাজাল দিয়া মাছ ধরেন এবং সেই মাছ সায়েরে বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই বর্ণনার মধ্যে মিথ্যা কল্পনা আদৌ নাই।

শ্রীহরিদাস পালিত
৯এ বদন রায় লেন, বেলেঘাটা
কলিকাতা।

বর্ম্মার তেল

বৈশাখ মাসের আর্থিক উন্নতিতে "বর্ম্মার তেল" শীর্ষক সংবাদে "পারস্যের পর দুনিয়ার কুত্রাপি বর্ম্মার মত তেলের কারবার নাই" পড়িয়া লেখকের বিস্মৃতির কথা মনে হইতেছে। তিনি রক্‌ফেলারের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং, নোবেল ব্রাদার্সের রাশিয়ার তেলের খনির কথা ভুলিয়া গেলেন কি? মাইনিং ম্যাগাজিনে (ভলিয়ুম ৩৩, সংখ্যা ৫—নভেম্বর, ১৯২৫) দেখিতে পাই তেলের কারবারে দুনিয়ার ভিতর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ১ম স্থান, মেক্সিকোর ২য়, রাশিয়ার ৩য়, পারস্যের ৪র্থ, ইষ্ট ইণ্ডিজের ৫ম, রুমেনিয়ার ৬ষ্ঠ, ভারতবর্ষের (বর্ম্মা) ৭ম ও পেরুর ৮ম স্থান। ১৯২৩ সনে দুনিয়ায় ১,১৪,৯০০,০০০ ব্যারেল তেল উত্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে উত্থিত হইয়াছিল ৮,৩২০,০০০। অর্থাৎ দুনিয়ার তেলের কারবারে ভারতবর্ষের হিস্যা $\frac{1}{1২৫}$!

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইন্‌স, সিংভূম

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

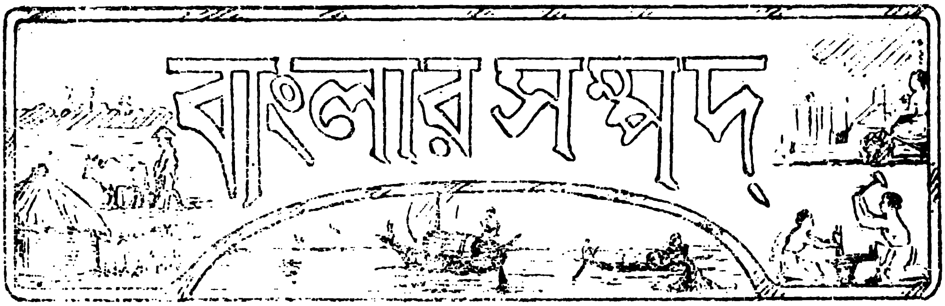
আর্থিক উন্নতি

২য় বর্ষ—৫ম সংখ্যা ভাদ্র—১৩৩৪

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্‌।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



কলিকাতার বাড়ীভাড়া

বাড়ীভাড়া আইন উঠিয়া গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার অনেক বাড়ীওয়ালাই ভাড়াটিয়াদিগকে পূর্ব্ববৎ রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেরামতের কথা তাঁহারা কানে তুলিতেই চাহেন না, পক্ষান্তরে কথায় কথায়—ছুতায় নাতায়—বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য রক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে বাড়ীর ভাড়া ৩০৲ ত্রিশ টাকা, একবার ভাড়াটিয়া উঠিলেই এক পোঁচ গোলা মাখাইয়া দেওয়ার পর অমনি তাহার ডাক হইতেছে ৪৫৲ পয়তাল্লিশ টাকা। কিন্তু এখনও ইহাতে তেমন সুফল হইতেছে না। বাজারে বাড়ীর আর পূর্ব্বের মত প্রবল টান নাই; ফলে অনেক বাড়ীই দীর্ঘকাল খালি পড়িয়া থাকিতেছে। তবে তাহাতেও মধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়ার কোন সুবিধা হইতেছে না; কারণ বাড়ীওয়ালারা একেবারে কাঠ কবুল, তাঁহারা খালি বাড়ী ফেলিয়া রাখিবেন তাহাও ভাল, তথাপি ভাড়ার হার কমাইয়া দিবেন না। চিরকালই কি কলিকাতায় বাড়ীওয়ালা-দের সহিত ভাড়াটিয়াদের এই রকম টানাটানি চলিবে? ইহার কি স্থায়ী মীমাংসার কোন উপায়ই হইতে পারে না?

(বঙ্গবাসী)

ইষ্টবেঙ্গল জুট মিল

কতিপয় উৎসাহী ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চেষ্টায় ঢাকায় ইষ্টবেঙ্গল জুট মিল নামক একটী চটের কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। উদ্যোক্তাগণ প্রায় সকলেই পাকা ব্যবসায়ী। তাঁহাদের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এরূপ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে দেশের আর্থিক উন্নতির ও বেকার সমস্যা সমাধানের খুবই সম্ভাবনা।

(পঞ্চায়েৎ)

চরবড়ুতে কলেরা

প্রায় ৪।৫ মাস যাবৎ চরবড়ুতে কলেরা লাগিয়াই আছে। বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রতিকারের কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। সম্প্রতি মহাজন হাটের সংলগ্ন গ্রামে কলেরা রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। প্রত্যহই ২।৩ জন করিয়া লোক মরিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে; এরূপ বর্ষার সময় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এস্থানে কলেরা পরিলক্ষিত হয় নাই। বর্ত্তমানে লোকেরা ভয়ে জড়সড় অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। তদ্দরুণ কৃষি কাজেরও ব্যাঘাত হইতেছে। আমরা এদিকে কর্ত্তৃপক্ষের আশুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (দেশের বাণী)

সিরাজগঞ্জে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গন

ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাঙ্গন ক্রমেই সিরাজগঞ্জ সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজদিগের সমাধিক্ষেত্রটি ২।১ দিনের মধ্যেই নদের গর্ভে লীন হইয়া যাইবে। রেলওয়ে ষ্টেসনটি দক্ষিণ দিকে এক মাইল সরিয়া যাইবে। (পঞ্চায়েৎ)

কৃষি ঋণ

সবং থানার বন্যাক্লিষ্ট অধিবাসিগণকে বীজধান্য ক্রয় করিবার জন্য গবর্মেণ্ট কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমতঃ গবর্মেণ্ট অফিসারগণ কৃষি ঋণ স্বরূপে প্রায় ২০০০০৲ কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে সকলে কৃষি ঋণের নিয়মাবলী অবগত হইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল। অফিসারগণ তাহাদিগকে স্তোক বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, বড় দিনের ছুটীর পর টাকা দেওয়া হইবে; কিন্তু এখনও তাহার কোন ব্যবস্থাই হইল না। এক্ষণে কৃষকগণ বীজধান্যের অভাবে বপন-কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিতেছে না। তাহারা অবগত হইয়াছে যে, ভূতপূর্ব্ব সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের জন্য ১৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বিপন্ন কৃষকবৃন্দের কাতর আবেদন শ্রবণ করিবেন কি? এখনও বীজ সংগ্রহের ও বপনের সময় আছে। এ বিষয়ের প্রতিকারকল্পে আমরা মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আশাকরি তিনি অতি শীঘ্র কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইবেন। (মেদিনী বান্ধব)

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের কাপড় বাজারে বাহির হইয়াছে। এই মিলে ১০০ তাঁত ও ১২ হাজার চরকা চলিতেছে। সূক্ষ্ম সূতার জন্য শীঘ্রই আরও ১০ হাজার চরকা বসিবে।

(সম্মিলনী)

কাঁথি-বেলদা রেল

আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী কাঁথি-বেলদা রাস্তায় রেল চালাইবার উদ্যোগী হইয়াছেন। এই রেল-পথের পরিমাপাদি কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং সত্বর পথের নির্ম্মাণ কার্য্যও আরম্ভ হইবে। সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর যে কার্য্য-তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আগামী পাঁচ বৎসরের অর্থাৎ ১৯৩২ সনের মধ্যে কাঁথি-বেলদা রাস্তায় রেল চলিতে পারিবে বলিয়া কোম্পানী আশা দিয়াছেন। কণ্টাই রোড ষ্টেশন অর্থাৎ বেলদা হইতে কাঁথি পর্য্যন্ত এই নূতন রেল-পথের দূরত্ব ৩৩ মাইল হইবে এবং উহাতে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। (নীহার)

পাবনায় ব্যাঙ্ক

পাবনাতে ৫।৬টী ব্যাঙ্ক আছে। প্রথমতঃ এলায়েন্স ব্যাঙ্ক তৎপর ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতনের ফলে বাঙ্গালার মফঃস্বলের ব্যাঙ্কে যে ধাক্কা লাগিয়াছে পাবনাও তাহার ফল ভোগ করিতেছে। পাবনার ব্যাঙ্কগুলি শুধু লগ্নি কারবার করিত। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে এই সব ব্যাঙ্ক হইতে কোন দিনই টাকা পাওয়া যাইত না। এখন এই সব ব্যাঙ্ক লগ্নি কারবারও একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অবস্থা খুবই জটিল সমস্যাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উৎকট আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়া কেহ কোন কর্ত্তব্য স্থির

করিতে পারিতেছে না। কিছুদিন হইল রায় রাধিকা ভূষণ রায় বাহাদুরের উদ্যোগে "তাড়াশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড" নামে একটী নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক হইতে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে টাকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রকারের ব্যাঙ্কের সংখ্যা-বৃদ্ধি না হইলে কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত বা পরিচালিত হইতে পারিবে না। (স্বরাজ)

খুলনায় নূতন ব্যাঙ্ক

খুলনা সহরে বারজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে চলিল। এই ব্যাঙ্কের মূলধন একলক্ষ টাকা প্রতি অংশ ১০৲ টাকা করিয়া ১০০০০ অংশে বিভক্ত। ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই কর্ম্মঠ এবং উদ্যোগী। ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠান-পত্র আমরা দেখিয়াছি। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য মহৎ। উন্নতিশীল বারজীবী সম্প্রদায়ের সত্যনিষ্ঠা ধর্ম্মভীরুতা ইত্যাদি গুণ আলোচনা করিলে মনে হয় এই ব্যাঙ্কটী শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইতিমধ্যেই এক হাজার শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কের উন্নতি কামনা করি। (খুলনাবাসী)

চাকুরেদের যৌথ-সমিতি

নোয়াখালী কালেক্টরীর কর্ম্মচারীদের একটি যৌথ-সমিতি আছে। এ জিলায় কো-অপারেটিভ্ কারবারে এই সমিতিই সর্ব্বপ্রথম হাত দেয়। গত বুধবার কালেক্টরী অফিসের গৃহে উক্ত সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। কালেক্টরীর অন্যতম সেরেস্তাদার প্রবীণ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আলোচ্য বর্ষে সমিতির ১৩৩৭৲ টাকা লাভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৩২৲ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা হইয়াছে। অংশীদারগণ শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে লাভ পাইবেন। (দেশের বাণী)

তিস্তার ভাঙ্গন

গত বৎসর তিস্তা নদী রেল লাইন ভাঙ্গিয়া ফেলায় বি, ডি, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ দুইটী নূতন রেলপথ প্রস্তুত করাইয়া কোন রকমে কাজ চালাইয়াছিলেন। এ বৎসর যদি আবার রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যায়, সেই আশঙ্কায় রেলকোম্পানী ভোটপাটী হইতে দোমহনী পর্য্যন্ত একটি নূতন রাস্তা করিয়াছেন। ইহাতে এখনও লাইন পাতা হয় নাই। এই লাইন বর্ত্তমান লাইনের পূর্ব্ব দিক্ দিয়া গিয়াছে।

গত কয়েকদিন যাবৎ অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় নদী জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং বার্নিশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসরের ভাঙ্গনের মুখ দিয়া বার্নিশ বাজারের দিকে জল ঢুকিতেছে। বর্ত্তমান রেলপথ, ডুয়ার্স রোড ডিভিসনের রাস্তা এবং নূতন রেলপথের জন্য মাটী ফেলিয়া যে রাস্তা করা হইয়াছে সেই রাস্তার উভয় দিক্ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফলে উল্লাভাবরী তালুক এইভাবেই একরকম জলে ভাসিয়া গিয়াছে। নদীর মূর্ত্তি অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়াছে। রেল লাইনের যে কি অবস্থা হইবে বলা যায় না। রেল লাইন এ বৎসরই ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সকলেই আশঙ্কা করেন। রেল লাইন ভাঙ্গিয়া গেলে ডুয়ার্সে খাদ্য-দ্রব্যাদি এবং কলকব্জা কয়লা বা চা-বাগানের অথবা অন্যান্য কারবারের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য আমদানি করা এবং সর্ব্ববিধ জিনিষ রপ্তানি করা গত বৎসরের মত কিছুকাল বন্ধ হইয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এখন হইতে প্রত্যেক বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ এবং ম্যানেজার বাবুদের এ বিষয় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক বাগানেরই প্রয়োজনীয় যেসমস্ত দ্রব্যাদি মায় কয়লা যাহার সরবরাহ কার্য্য শেষ হয় নাই—তাঁহাদের শীঘ্রই তাহা লইয়া শেষ করা প্রয়োজন। বাগানের মজুত চা অবিলম্বে চালান দেওয়া এবং অতঃপর যাহাতে চা মোটেই মজুত হইতে না পারে সে বিষয় কড়া নজর রাখা প্রয়োজন। কলিকাতার চায়ের বাজারে ভাল চায়ের যথেষ্ট আদর আছে। খারাপ চা এখনও মোটামুটী ভাল দরে বিক্রী হইতেছে। সে হিসাবেও এই সময় চা যথাসম্ভব বিক্রয় করিয়া ফেলা দরকার। (ত্রিস্রোতা)

কলিকাতার পাটের বাজার

গত ২৭শে জুন সোমবার পাটের ও হাটের বাজারে বেশ

টান ছিল। ঐ দিন "ফার্ষ্ট" মার্কা রেডি ডেলিভারি ৬৩৲ টাকায়, "লাইটনিং" মার্কা জুলাই মাসের প্রথমে ডেলিভারি ৫২৷৷০ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

নূতন পাট "ফার্ষ্ট" আগষ্ট ডেলিভারি ৬২৷৷০ এবং সেপ্টেম্বরে ডেলিভারি ৬১৷৷০ মূল্যে ক্রেতা ছিল; কিন্তু বিক্রেতা বড় অধিক ছিল না। খোলা পাটের বাজারও একটু গরম ছিল, কিন্তু কলওয়ালারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, ইয়োরোপীয় কোটেশনে "থ্রী" ১১৷৷০, ফোর ১০৷৷০, রিজেকশন ৯৲ টাকা দর উঠিয়াছিল।

২৬শে জুন তারিখে হাটখোলাতে আমদানি—১০০০মণ, রপ্তানি—২৩০০০মণ। ঐ তারিখে বেলারগণ ৬৲ হইতে ১২৲ মূল্যের ১৬৫০০ মণ এবং কলওয়ালারা ৬৲ হইতে ৯৸৴১০ মূল্যে ৬৫০০ মণ পাট ক্রয় করিয়াছেন। গত বৎসর এই তারিখে পাটের মূল্য ৯৲ হইতে ১৮৷৷০পর্য্যন্ত ছিল।

মোটর ও সড়ক

নেত্রকোণা হইতে বারাহাট্টা অভিমুখে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মোটরবাসের অবাধ চলাচলের জন্য রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রায় অর্দ্ধহাত গভীর গর্ত্ত হইয়াছে। ইহাতে ঐ রাস্তায় যাতায়াতকারী যানবাহনাদির অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এই রাস্তার প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বারহাট্টা থানার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা হইতে রামপুর দশহাল গ্রামাভিমুখে যে লোকাল বোর্ডের রাস্তা নির্ম্মাণ হইতেছে তাহা আজ ৩৷৪ বৎসর মধ্যেও সুসম্পন্ন না হওয়ায় ঐ স্থানের অধিবাসীর অত্যন্ত অসুবিধার কারণ ঘটিয়াছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে এত অল্পস্থানব্যাপী রাস্তা নির্ম্মাণ না হওয়া লোকাল বোর্ডের পক্ষে সুনামের বিষয় নহে। আমরা এতদ্‌সম্বন্ধে বর্ত্তমান কর্ম্মী চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (প্রান্তবাসী)

বাংলার বহির্ব্বাণিজ্য (১৯২৬-২৭)

১৯২৬-২৭ সনের বাংলার সামুদ্রিক ব্যবসাবাণিজ্যের রিপোর্টে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব বৎসরের চাইতে এ বৎসরে মালপত্রের দাম খুব নামিয়া গিয়াছে। নিম্নে এক সঙ্গে ৫ বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল।

১৯২৬-২৭ সনে	২,৫৯,৩৯,৩২,৩৫৭	টাকার ব্যবসা হইয়াছে
১৯২৫-২৬ সনে	২,৭৬,৮৬,৬৩,৭৯৯	" " "
১৯২৪-২৫ সনে	২,৮৩,২৪,১১,১৮০	" " "
১৯২৩-২৪ সনে	২,৫৫,৩২,৫৪,৪৯৪	" " "
১৯২২-২৩ সনে	২,৪৫,১২,৫৭,০৩০	" " "

জিনিষপত্রের দাম কমিয়া যাওয়ার জন্যই টাকার দিক্ দিয়া মোট ব্যবসায়ে এইরূপ কম্‌তি পরিলক্ষিত হয়।

পোর্ট কমিশনারদের হিসাবে দেখা যায়, ১৯২৫-২৬ সনে মোট ৩,৮৮৭,৫৬০ টন বোঝাই জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করে। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৪,১৭৫,২০৪ টন। ইহা হইতে মালের দিক্ দিয়া বরং ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিই দৃষ্টিগোচর হয়।

ধর্ম্মঘট ও দাঙ্গা

এ বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে (১) বিলাতের কয়লা ধর্ম্মঘট ও (২) কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিলাতে ধর্ম্মঘটের ফলে এদেশী কয়লা ব্যবসার অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহাতে সাধারণ আমদানি ব্যবসার ক্ষতি হইয়াছিল। কলিকাতার হাঙ্গামার ফলে সমস্ত ব্যবসা মহল খুব অসুবিধায় পড়িয়াছিল।

বাংলার আমদানি ব্যবসায় বিলাতের হিস্যা শতকরা ৪ ভাগ ও রপ্তানি ব্যবসায় শতকরা ১½ ভাগ কম পড়ে। জার্ম্মাণি ও যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি হয়।

১৯২৬-২৭ সনে কলিকাতায় ৮০,১২,২৮,৮৯৩ টাকার চিনি আমদানি হয়। গত বৎসরে ৭৩,০৮,৮৪,১৭৮ টাকার চিনি কলিকাতায় আমদানি হয় এবং ১৯২৪-২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৮৬,৮৩,০৩,৯৫৯।

মদ

এই সনে ৯৮.৪২ লক্ষ টাকার মদ আমদানি হয়। ১৯২৫-২৬ সনে ঐ আমদানির মূল্য ছিল ৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা।

চিনি

চিনির আমদানি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সনে ছিল ৩১৪,৪৭৫ টন, এবারে ৩২৩,৮৮৭ টন। চিনির দাম বাড়িয়া যাওয়ায় দামের দিক্ দিয়া আমদানির বৃদ্ধি খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। গত সনে আমদানি চিনির দাম ছিল ৬২৫০৯৪ লক্ষ, বর্ত্তমানে হইতেছে ৭১৯০৮০ লক্ষ। জাভা ও মরিশাসের অনেক ফসল ঝড় বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য চিনির দাম ক্রমশই চড়িত, কিন্তু চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় জাভা হইতে চীনে চিনি আমদানির কাজ স্থগিত থাকে। এইজন্য চিনির বাজার অনেকটা নরম হইয়া উঠে। কিউবার চিনিরও ইয়োরোপে আশানুরূপ কাট্‌তি হয় না। এই জন্যই চিনির দাম অনেকটা পড়িয়া যায়।

লবণ

এই সনে ১,০২.৭৫ লক্ষ টাকার ৪৩৬,৩১৩ টন লবণ আমদানি হয়। ধর্ম্মঘটের ফলে বিলাতী লবণের দাম চড়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম লবণ এদেশে আসে। এডেনই সব চাইতে বেশী পরিমাণ লবণ সরবরাহ করে। জার্ম্মাণির লবণ আসিয়াছে একেবারে ডবল পরিমাণ।

তামাক

কাঁচা তামাক আমদানির পরিমাণ ২,৫৯৫,৩৫৯ পাউণ্ড হইতে ৩,০৪৯,০৭০ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। এই সনে ১,৩৩২,২২৩ পাউণ্ড সিগারেট আমদানি হয়। ১৯২৫-২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১,০৩২,১৯৪ পাউণ্ড। এদেশে সিগারেট-সেবীর সংখ্যা দিন দিন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ২।১টা বিদেশী সিগারেট কোম্পানী বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। ১৯২২-২৩ সনে সব চাইতে বেশী সিগারেট এদেশে আসে। ১৯২৭ সনে সিগারেট আমদানির পরিমাণ উহা হইতে বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। সিগারেটের দরও অনেক কমাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্যান্য সনের তুলনায় টাকার দিক্ দিয়া কম হইলেও মালের দিক্ দিয়া আমদানির হিস্যা মোটেই কম নয়, বরং বেশী।

মোটর গাড়ী

আলোচ্য বৎসরে মোটর গাড়ী ট্যাক্সি ইত্যাদি মোট ৪,১৭৭খানা আমদানি হয়। এইগুলির মূল্য ৮৯.১৯ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে আমদানি গাড়ীর সংখ্যা ছিল ৩,৮৫৩ এবং ইহাদের মূল্য ছিল ৭৯.৮৯ লক্ষ টাকা। মোটর বাস, লরিই বেশী আমদানি হইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে ১,৪৪৩ খানা বাস ও লরি আমদানি করা হয়। এইগুলির দাম ৩১.০৫ লক্ষ। মোটর বাস বেশী পরিমাণ আমদানি না হইলে প্রাইভেট মোটর গাড়ী, ট্যাক্সি ও মোটর সাইকেল আরও বেশী আমদানি হইত। বিলাতে কয়লা ধর্ম্মঘট না হইলে সেখানকার মোটর আমদানির হিস্যা আরও বেশী হইত। ইংলণ্ডের ভাগে ৭১১ ছিল, এ সনে ৮২৮ খানা পড়িয়াছে। আমেরিকার আমদানি ১১৭৮ হইতে ১৭৯৭তে উঠিয়াছে। কানাডার হিস্যায় কিন্তু কম পড়িয়াছে—পূর্ব্ব বৎসরে ১৫১০খানা গাড়ী বাংলায় রপ্তানি করে, আর আলোচ্য বৎসরে পাঠায় মাত্র ৯২২ খানা। ইতালি ও ফ্রান্সের হিস্যা যথাক্রমে ২৮৮ ও ১১৮ হইতে ৪৭৭ ও ১২৪ হইয়াছে।

মোটর বাস ও লরি

বাস ও লরি প্রভৃতি ভারি গাড়ী ইংলণ্ড হইতে আসে ১২৭খানা। পূর্ব্ব সনে ইংলণ্ড হইতে আমদানি ছিল ১৮৬ খানা। কানাডা ৪২৭ খানা পাঠায়। পূর্ব্ব সনে পাঠায় ৭১১ খানা। আমেরিকা কিন্তু এ দফায়ও তাহার হিস্যা ৫১৮ হইতে একেবারে ৯৫০ করিয়াছে অর্থাৎ একেবারে ডবল। সমগ্র ভারতে কিন্তু কানাডার গাড়ীর পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যার তুলনায় ১,১৫১ খানা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার বৃদ্ধি হয় মাত্র ৩০৮ খানা।

মোটর সাইকেল

মোটর সাইকেল প্রেরণের ব্যাপারে ইংরেজের সঙ্গে আর কেউ পারে নাই। বাংলার মোট আমদানি ৭৫১ খানা মোটর সাইকেলের মধ্যে ৭০৯ খানা একা ইংলণ্ড পাঠায়।

মোটর গাড়ীর সাজ সরঞ্জামের দাম অনেকটা কমিয়া যাওয়ায় টায়ার টিউব খুব বেশী আমদানি হইতে থাকে। ইংলণ্ডই সব চাইতে বেশী টায়ার টিউব পাঠাইয়াছে।

মোট ৮১,৮৫১টি টায়ারের মধ্যে ইংলণ্ড পাঠাইয়াছে ৩৩,৮২২ ও মোট ৮৯,৫৫৩টি টিউবের ৪৬,১০৯টিই ইংলণ্ড বাংলায় পাঠাইয়াছে। ফ্রান্স আমেরিকাও রপ্তানির হার পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়াইয়াছে। কানাডা অপেক্ষাকৃত খুব কম পাঠাইয়াছে।

যন্ত্রপাতি

আলোচ্য বৎসরে মোট ৪,১১,০৪,০০২ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি হয়। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড একাই বাংলায় ৩,৩৫,৫৫,২৭৪ টাকার মাল বিক্রয় করে। ১৯২৫-২৬ সনে ৪,৪৬,৮৯,৫৫৯ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি হয়। ইংলণ্ডের ভাগে পড়ে ৩,৮৩,৪৬,০৯০। কয়লা ধর্ম্মঘটের ফলে ইংলণ্ডের ভাগে এবার সামান্য কিছু কম পড়িয়াছে। মোটের উপর পূর্ব্ব সনের তুলনায় যন্ত্রপাতিও এসনে কম আমদানি হইয়াছে। পাট, চা ও চিনির কল ও যন্ত্রপাতির আমদানি খুব কমিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সোডাওয়াটার, জুতা, কাগজ প্রভৃতির কল ও যন্ত্রপাতি বেশী আমদানি হইয়াছে। এ ছাড়া কয়লার খনির যন্ত্রপাতি চাউল ও আটার কল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির আমদানি অপেক্ষাকৃত অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেলাইয়ের কল ও টাইপরাইটারের আমদানিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাট কলের যন্ত্রপাতি

পাট কলের যন্ত্রপাতির আমদানি ৮১ লক্ষ হইতে ৬৪ লক্ষে নামিয়াছে।

ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারী

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আমদানি ৪৪,৯৫,৫৪৫ টাকা হইতে ৫৬,১৭,৩৭৪ টাকায় উঠিয়াছে। রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও রোলিং ষ্টক সরকারী ও বেসরকারী দুইয়ের আমদানিই কম হইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে ৩,৬৮,১৯,৯২৪ টাকার রেল যন্ত্রপাতি আমদানি হয়। এ সনে হইয়াছে মাত্র ২,৪৬,৬৮,৯২৯ টাকার।

কাগজ

সংরক্ষণ নীতির জন্য পূর্ব্ব বৎসরে বিদেশী কাগজ (প্রিণ্টিং পেপার) আমদানি কম পড়িয়া যায়। এ সনে অবস্থা বেশী উন্নত না হইলেও ১৯২৫-২৬ সনের চাইতে আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। লিখিবার কাগজ খুব আমদানি হইয়াছে। স্বদেশী কাগজ শিল্পের উন্নতিই ইহার জন্য দায়ী।

প্যাকিং কাগজ ও পুরাতন খবরের কাগজের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বদেশী কাগজ শিল্পের জন্য খুব বেশী পরিমাণ মাল মশলা আমদানি হইয়াছে।

বাংলার রপ্তানি কম

১৯২৬-২৭ সনে কলিকাতা হইতে মোট ১,২৬,৩৩,৫৩,৮৯৬ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল ১,৪৫,৪৫,৪৯,৪৮৭ টাকা। রপ্তানী মালের মধ্যে পাট, চা, লাক্ষা ও চামড়ার হিস্যাই সব চাইতে বেশী। ১৮,৭৮,৯৭ লক্ষ টাকার ২,২৮,৮৩৯,২২১ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হয়। বৎসরের প্রথম ভাগে চায়ের বাজার বেশ একটু চড়া ছিল। এই লোভে অনেক চা-বাগান খুব বেশী চা পাতা তুলিয়া ফেলে। ফলে চাহিদার চাইতে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং চায়ের বাজার পড়িয়া যায়। গত ১লা মার্চ্চ হইতে চা রপ্তানি-কর উঠাইয়া দিলেও এই মন্দাভাব দূর হয় না। চা-বাগানগুলিতে খুব বেশী পরিমাণ চা গুদামজাত হইয়া আছে এবং চায়ের মরশুম ভাল পড়ায় এবারকার চা ফসল খুব ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চা ব্যবসার উন্নতি করিতে হইলে বাজারের চাহিদা অনুরূপ মাল উৎপাদন করিতে হইবে এবং চায়ের কিস্মৎটা বাড়াইতে হইবে।

বাংলার কয়লা

১৯২৫-২৬ সনে মোট ৩,০২৭,১৩৩ টন কয়লা বাংলা

হইতে রপ্তানি করা হয়। পূর্ব্ব সনে ২,০৪৭,৫২৯ টন কয়লা রপ্তানি করা হয়। বিলাতের কয়লাখনিগুলিতে ধর্ম্মঘটের ফলে বাংলার কয়লা ব্যবসা খুব এক বড় দাঁও মারিয়া লয়। এক নভেম্বর মাসেই ৩৫৬,৫৮০ টন কয়লা রপ্তানি হয়। কয়লা ডক গার্ডেনরীচ হইতে ঐ মাসে ২৯৭,২২৩ টন কয়লা রপ্তানি করা হয়। এটা একটা রেকর্ড কোয়ান্টিটি। ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসের পর আর এত রপ্তানি কোন সনে দেখা যায় নাই। ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে ৩২২,০১৯ টন কয়লা গার্ডেনরীচ ও কয়লা ডক হইতে রপ্তানি করা হয়।

ঐ সনে মিশরে ও ইংলণ্ডে যথাক্রমে ১০৫,৭১১ ও ৪৮,৮৬৮ টন কয়লা রপ্তানি হয়। বাংলা সর্ব্বপ্রথম ঐ সনে ইংলণ্ডে কয়লা পাঠায়।

পাট

গত সনে ৭৮,৬৫'২০ লক্ষ টাকার ১,৫৩৬,১৮৯ টন পাট বিদেশে রপ্তানি হয়। পূর্ব্ব সনের তুলনায় পাট রপ্তানি শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আর কোন বৎসরে এত পাট রপ্তানি হয় না। পাট খুব বেশী পরিমাণ জমানোর ফলে পাটের বাজার পড়িয়া যায়। পূর্ব্ব সনের তুলনায় গত সনে মূল্যের দিক্ দিয়া রপ্তানি পাটের দাম শতকরা ১৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৬ সনে পাট কলগুলির ২'৭৩ কোটি টাকা মুনাফা হয়। ১৯২৫ সনের চাইতে এসনে ৩'৬৬২ কোটি টাকা কম মুনাফা হইয়াছে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক জুট সেস (পাট ট্যাক্স) আদায়ের পরিমাণ ১১'৪৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়।

বিলাতের পাট শিল্পের অবস্থাও খুব খারাপ যাইতেছিল। ঐ সনে ৮৫৯৪০৪ বেল অর্ডারী পাটের মাত্র ৬৩,১৪০ বেল বৎসরের প্রথম ভাগে অর্থাৎ এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বিলাত গিয়া পৌঁছে। পাটের বাজার পড়িয়া যাওয়ায় জার্ম্মাণির ভারি সুবিধা হয়। গত সনে পাটের বাজারে জার্ম্মাণি ছিল বড় খরিদ্দার। ফ্রান্স আমেরিকাও বেশী বেশী মাল কিনিয়াছিল। বেলজিয়াম স্পেন হইতেও আশানুরূপ অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইতালি, ব্রাজিল ও জাপান তাহাদের ক্রয়ের হিস্যা কমাইয়াছিল।

মালদহে কলেরা

সহরে প্রবলভাবে কলেরা দেখা দিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক বোর্ড ও ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি কলেরাদলনে চেষ্টিত হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যের কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটি করিবেন কি? তাঁহাদের গুদামজাত ব্লিচিং পাউডার চুনে পরিণত হইয়াছে। সেগুলি তাঁহারা মুক্ত হস্তে দান করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে সার পদার্থ কিছুই নাই। ডিষ্ট্রীক বোর্ডের অল্প বিস্তর যাহা মজুত ছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। কলেরার টিকা দেওয়া সহরের কোন কোন অংশে বেশ জোরে চলিতেছে। আবার ভাগ্যহীন পল্লীতে কোন খোঁজ-খবরই নাই। এ সকল ব্যাপারে সমদর্শিতা না থাকিলে নানা কথা উঠিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহার অভাব নাই। শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সাহার একটী প্রস্তাব ছিল যে সহরের অত্যন্ত নোংরা অংশগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তাহার সংশোধন করা ও রোগের বীজাণুরহিত করা—সে প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঘাটে ঘাটে বেশ পুলিশের বন্দোবস্ত দেখা যায়, কিন্তু সহরের বুকের উপর লোকে যে শৌচ কর্ম্ম সারিয়া রোগের সৃষ্টি করিয়াছে, তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর কিছুতেই পতিত হইল না। (মালদহ সমাচার)

কো-অপারেটিভ জুট সেল ও সাপ্লাই কোম্পানী

দশ লক্ষ টাকা মূলধনে নারায়ণগঞ্জে উপরিউক্ত নামে একটি পাট বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য সমবায় নীতিতে পাটের ব্যবসা করিয়া কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা। প্রতি অংশ দশ টাকা হিসাবে সম্প্রতি দুই লক্ষ টাকার অংশ বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২ হাজার টাকার অংশ ইতিমধ্যে বিক্রয় হইয়াছে। এই কোম্পানীর জন্য নারায়ণগঞ্জে নদীর অপর পারে ৩৭ বিঘা জমি ক্রয়ের জন্য কলিকাতা গেজেটে নোটিস বাহির হইয়াছে এবং ৮০ হাজার টাকায়

অফিস গৃহ ও গুদাম প্রস্তুতের জন্য কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। ২০০০০৲ টাকা মূল্যে দুইখানি লঞ্চও কোম্পানী ক্রয় করিয়াছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরের সংখ্যা ১৫ জন। তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের মহকুমা হাকিম এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান এবং রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বাহাদুর ভাইস-চেয়ারম্যান। অপর ১৩ জনই মুসলমান। মৌলবী মফিজউদ্দিন আহাম্মদ এতদিন অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিলেন। সম্প্রতি মিঃ পি, এম, মরিসনকে ৭৫০৲ মাসিক বেতনে ম্যানেজার ও সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন হইতে ৭০ হাজার টাকা ঋণ লইয়া কোম্পানী সম্প্রতি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন; ঐ কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট স্যর রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি ও আমানতকারিগণ সকলেই হিন্দু। কিছুদিন হইল সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার রায় যামিনী মোহন মিত্র বাহাদুর জুট সেল এণ্ড সাপ্লাই কোম্পানীর কর্ম্মচারি-নিয়োগ কার্য্য সমাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম নব নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিরপেক্ষ বিচারে ও যোগ্যতা অনুসারে মুসলমান সংখ্যা অধিক হইয়া থাকিলে, কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু যদি সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়। প্রকাশ অনেক যোগ্যতর হিন্দুর আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমান প্রার্থিদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে কার্য্যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে এবং হিন্দুগণ অংশ ক্রয় করিতে আপত্তি করিলে তাহার জন্য কে দায়ী হইবে?

(পঞ্চায়েৎ)

নোয়াখালীতে কৃষি-গোলা

বঙ্গের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ মেকলিন্ গত ১৪ই জুন নোয়াখালীতে গিয়াছিলেন। তিনি মাইজদি নামক স্থানে একটি আদর্শ কৃষিগোলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে জনসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ১০০ শত বিঘা ব্যাপী একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালী সহরটি নদীর কুক্ষিগত হওয়ার অবস্থায় উপনীত হইলে গবর্মেণ্ট এখানে সহর স্থানান্তরিত করার অভিপ্রায়ে এই স্থানটি ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে ১৩০০০৲ ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। মিঃ মেকলিন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কৃষি বিদ্যালয়

বর্দ্ধমান জেলার অধীন অমরপুর নিবাসী রায় বাহাদুর মন্মথনাথ পাল মহাশয়ের স্থাপিত ফ্রী বিমলা অ্যাগ্রিকালচারাল হাইস্কুল অমরপুর গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বিশেষ উপকার করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু দরিদ্র ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করিয়া আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পল্লীর ভিতর সামান্য পাঠশালায় পড়া ছাড়া দরিদ্র বালকদিগের লেখাপড়া শিখিবার কোন উপায় ছিল না। সেই পল্লীর আজ এরূপ উন্নতি আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। (শক্তি)



স্যর গঙ্গারামের দান

স্যর গঙ্গরাম লণ্ডনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি হিন্দু সমাজের, বিশেষতঃ বিধবা ও স্ত্রীলোকদিগের, উন্নতিকল্পে ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে লাহোরের ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা একটি। বর্ত্তমান সমগ্র ভারতে এই সভার প্রায় ২০০ শত শাখা আছে। হরিদ্বার মথুরা ও লাহোরে ৩টি বিধবা আশ্রম আছে। গত ১৩ বৎসরের মধ্যে এই সভা হইতে হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে ১২ হাজারের অধিক বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

কাটা নোট সম্বন্ধে নূতন নিয়ম

কাটা নোটের টাকা দেওয়া সম্বন্ধে সম্প্রতি গবর্মেণ্ট যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে নোট কাটা সম্বন্ধে লোককে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। এই নিয়মে পূর্ব্বের মত ১০৲ টাকা ও ৫৲ টাকার অর্দ্ধাংশ নোটের উপর পূরা দাবী অথবা অর্দ্ধেক দাবীও চলিবে না। ১৲ টাকা ও ২॥০ টাকার নোটেয় মত পূর্ব্বোক্ত দরের নোটের অর্দ্ধেক অথবা গরমিল নম্বরের নোটের দাবী আদৌ চলিবে না। ১০৲ ও ৫৲ টাকার নোটের অর্দ্ধাংশের বেশী দাখিল না করিলে আবেদন গ্রাহ্য হইবে না; কিন্তু অর্দ্ধাংশের বেশী দাখিল করিলে ২১ দিনের মধ্যেই আবেদনকারী পূরা টাকা পাইবেন। ৫০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের নোটের অর্দ্ধেক নোট দাখিল করিলে যদি সেই দাখিলের তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে অপরার্দ্ধের উপর কোন দাবী না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধেকের উপর অর্দ্ধেক টাকা আবেদনকারী পাইবেন। কিন্তু যদি কেহ অর্দ্ধেকের উপর নোটের পূর্ণ দাবী করেন তাহা হইলে তিনি যে পূর্ণ নোটের মালিক তাহা প্রমাণ করিলেও পূর্ব্বের মত প্রমাণ করা মাত্রই টাকা পাইবেন না। তাঁহাকে অন্ততঃ ৫ বৎসর বিলম্ব করিতে হইবে। কারণ তাহার টাকা পাইতে প্রমাণ করিতে হইবে যে, অপরার্দ্ধ এইরূপ ভাবে হারাইয়াছে যে তাহা আর পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ভারতের কয়লা

গত মে মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন খনি হইতে যে পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত ও চালান হইয়াছে, চীফ ইন্‌স্পেক্টর অব্ মাইন্‌স্ তাহার নিম্নলিখিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন।

স্থান	উত্তোলন	চালান
আসাম	৩৩৬৮৯ টন	৩২৫২০ টন
বেলুচীস্থান	১০৫২ „	১৫৫৫ „
রাণীগঞ্জ	৪৭৫৪০৯ „	৪৪২১২৮ „
বিহার উড়িষ্যা	১২২২৫৪২ „	১২৩৯৯৫১ „
মধ্যপ্রদেশ	৫২৬০৮ „	৪০৮৯০ „
পাঞ্জাব	৬৫১৯ „	৬৯৯২ „
মোট	১৭৮৬৮০৮ „	১৭৭৩০৩৬ টন

হরীতকী রপ্তানি

এক বৎসরে আমাদের দেশ হইতে কত হরীতকী রপ্তানি হইয়াছে এবং তাহার দাম কত টাকা দেখুন।

সন	টন	পাউণ্ড
১৯২০—২১	৩৯,৬৪৭	২৭১,৮৭৩
১৯২১—২২	৬১,৯৪৭	৩৯১,১০৬
১৯২২—২৩	৭২,০:৮	৪৯৩,৩৬৭

অর্থাৎ মোট তিন বৎসরে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। অথচ ইহা অযত্নসম্ভূত বনস্পতির দান। কোন কষ্ট নাই—কেবল কুড়াইয়া লইতে হইয়াছে। তথাপি আমরা নিরন্ন! (আত্মশক্তি)

সিংহল হইতে চা-রপ্তানি

(জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত)

১৯২৪	...	...কৃষ্ণ	৬,২৪,১৯,৪৪২	পাউণ্ড
		সবুজ	৬,৬৫,৭৪৮	"
১৯২৫	...	...কৃষ্ণ	৬,৩৫,৬৫,০৬৯	"
		সবুজ	৪,৫১,৬৭৯	"
১৯২৬	...	...কৃষ্ণ	৬,৪৭,৪২,৬৯২	"
		সবুজ	৩,৮০,৪৫৪	"
১৯২৭	...	...কৃষ্ণ	৭,০৮,৬৯,৪৫৩	"
		সবুজ	৫,৫১,৬৩৩	"

কলিকাতা হইতে চা-রপ্তানির পরিমাণ

(এপ্রিল, ১৯২৭)

যে দেশে প্রেরিত হইয়াছে		পাউণ্ড
এডেন ও ডিপেন্‌ডেন্সি	...	১৭,১৬৮
ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকা	...	২০,৫১২
পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	...	১,২০০
ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান	...	১,৩০,২১২
আর্জেন্টিন্ রিপাব্‌লিক্	...	২০,০০০
আর্মেনিয়া	...	৪,৫২০
বাহ্রীন্ দ্বীপপুঞ্জ	...	৪৪,৫৫০
বৃটিশ গিনিয়া	...	৪,৫২০
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ	...	৭৫০
চিলি	...	৮৩,৯৭২
মিশর	...	১,৬২,৪০৬
ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেট্‌স	...	১,৪৬৩
ফ্রান্স	...	৫০
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	...	২,৫৫০
জার্ম্মাণি	...	২০
কেনিয়া কলোনি	...	৯১,৬৬৬
মরিশাস ও ডিপেন্‌ডেন্সি	...	২০০
মেসোপটেমিয়া	...	৭৮,৩১৭
প্যালেষ্টাইন	...	২,০৮০
পারস্য	...	১,০২,৭২৭
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা প্রটেক্‌টরেট		৬০০
সেচেলেস	...	২,১৫৪
শ্যাম	...	৪২০
সোমালিল্যাণ্ড প্রটেক্‌টরেট্	...	২,৭৫০
ষ্ট্রেটস সেট্‌লমেণ্ট	...	২১,৯৬৩
টাঙ্গানিকা টেরিটরি	...	৬,৭২০
এশিয়াস্থ তুরস্ক	...	১৯,৭৬৭
ইয়োরোপীয় তুরস্ক	...	১০,৫০০
জাঞ্জিবার	...	৬,৬০৫
		৮,২০,৩৬৭ পাঃ

দক্ষিণ ভারতীয় বন্দর হইতে চা রপ্তানি

(এপ্রিল, ১৯২৭)

মান্দ্রাজ হইতে			পাউণ্ড
	যুক্তরাজ্যে	...	২,৪৯,৪৯২
	ইয়োরোপে	...	১০০
	এশিয়ায়	...	৫৯৬
			২,৫০,১৮৮ পাঃ
কালিকট হইতে		...	পাউণ্ড
	সিংহলে	...	২২,৭৮৩
	যুক্তরাজ্যে	...	৮,৫৮,৩৪১
	আমেরিকায়	...	৬,০০৫
			৮,৮৭,১২৪ পাঃ
কোচিন হইতে			
	সিংহলে	...	১৬,৯৭১

যুক্তরাজ্যে	৭,৯২,১৭২	
	৮,০৮,২৪৩	,,
ম্যাঙ্গালোর হইতে		
এশিয়ায়	২,১০৫	
টেলিচেরি হইতে		
যুক্তরাজ্যে	২৭,২৫৭	
টিউটিকোরিণ হইতে		
সিংহলে	২,২১,৫২৩	
যুক্তরাজ্যে	১১,৮০,৬৬৯	
অষ্ট্রেলিয়ায়	৭০০	
	১৪,০২,৮৯২	,,
এলেপ্পি হইতে		
সিংহলে	২২,৭১২	
যুক্তরাজ্যে	৬৬,৫৫৮	
	৪৬,২৭০	,,

টাঙ্গাইলের বাজার দর

পাকীর ওজন

পাট প্রতিমণ	...	৭৲ হইতে ১২৲
সরিষা প্রতিমণ	...	৮৲—৯৲
তিল প্রতিমণ	...	৭৲—৮৲
ধান টাকায়	...	/৮ সের
দুগ্ধ প্রতিসের	...	৶০—৶১০

৬০ তোলায় প্রতি সের

জিনিস	...	দর
চাউল টাকায়	...	/৬ সের
মোটা চাউল টাকায়	...	/৬॥
সুপারি	...	॥৵০
কাঁচামরিচ (লঙ্কা)	...	৵০
শুকনামরিচ (লঙ্কা)	...	॥০
ঘৃত	...	২৲
ময়দা	...	৶১০
গুড়	...	।০
চিনি	...	।৵০
তামাক :—		
মতিহার	...	॥০—॥৵০
কোচাইরা	...	।৵০—॥০
ডাইল :—		
মটর	...	৵১০
খেসারি	...	/১০
বুট	...	৶০
মুগ	...	।৵০
মসুর	...	৶০
অড়হর	...	৶০
মাস	...	৵১০
তৈল	...	॥৵০
লবণ	...	/৫
হরিদ্রা	...	।৵০
কেরোসিন :—		
সাদা	...	৶০
লাল	...	৵১০

(টাঙ্গাইল হিতৈষী)

বোম্বাই হইতে রপ্তানি

(এপ্রিল, ১৯২৭)

		পাউণ্ড
পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	...	১,১৬০
জার্ম্মাণি	...	২০
ইতালি	...	৩০০
কেনিয়া কলোনি	...	২,৩০০
মরিশাস্ ও ডিপেন্‌ডেন্সি	...	৪৭৫
মেসোপটেমিয়া	...	১,২৯৩
মুসকাট টেরিটরি ও ট্রসিয়াল ওমান্		৯৭৮
আরবের অন্যান্য দেশী রাজ্য	...	১,৪৭০
পারস্য	...	১৯,১৪১
সেচেলেস	...	২৪০
ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্ট (লাবুয়ান্ সুদ্ধ)		৬,৩৭৫

টাঙ্গানিকা টেরিটরি	...	৪০০
জাঞ্জিবার	...	১২০
		৩৪,২১২ পা

কলিকাতা হইতে ভারতীয় বন্দরসমূহে চা রপ্তানি

(এপ্রিল, ১৯২৭)

আকিয়াব	...	১৫,৮২২
বোম্বাই	...	২০,২১৪
কালিকট	...	৩,০০০
কোচিন	...	১০,৮০০
করাচী	...	২,১৬০
কিয়াউক্‌পিয়াউ	...	৬৪০
মান্দ্রাজ	...	২৪,৭০৪
মান্দবী	...	৪,৮৮৪
রেঙ্গুন	...	২,০৭,৩৩৮
সেণ্ডাওয়ে	...	৯৬০
		৪,৮০,৫২২ পা

দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরসমূহ হইতে চা রপ্তানি

(এপ্রিল, ১৯২৭)

মান্দ্রাজ	১,৫৫২
কালিকট	২২,৯৪৭
কোচিন	১২,০১৪
ম্যাঙ্গালোর	২০০
টেলিচেরী	৪৪০
	৩৭,১৫৩ „

চা রপ্তানির হিসাব

(এপ্রিল, ১৯২৭)

		পাউণ্ড
কলিকাতা হইতে গ্রেট বৃটেনে রপ্তানি	কৃষ্ণ	৫৯৯,৭২২
	সবুজ	০
চট্টগ্রাম হইতে গ্রেট বৃটেনে রপ্তানি	কৃষ্ণ	০
	সবুজ	০
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে রপ্তানি	কৃষ্ণ	৭৪,৫৩১ পা
	সবুজ	০
উত্তর আমেরিকাতে রপ্তানি	কৃষ্ণ	২,৩১,৮২৬ পা
	সবুজ	০
অন্যান্য বিদেশী রাজ্যে রপ্তানি	কৃষ্ণ	৮,১০,৩৬৭ পা
	সবুজ	০
দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরসমূহ হইতে বিদেশে রপ্তানি	কৃষ্ণ	৩৪,৬৪,১৭৯ পা
	সবুজ	০
বোম্বাই হইতে বিদেশে রপ্তানি	কৃষ্ণ	৩৪,২১২ পা
	সবুজ	০

১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল, (১৯২৭) অবধি মোট রপ্তানি ৫২,২৪,৮৯৭ পাউণ্ড।

ভদ্রবাটী লৌহকারখানা

স্যর এম, বিশ্বেসরায়া মহীশূর সরকারের দেওয়ান ছিলেন। ইনি এদেশে ধনবিজ্ঞানের একজন প্রামাণ্য পণ্ডিত। মহীশূরের "ভদ্রবাটী আয়রণ ওয়ার্কসে"র সম্পর্কে ইনি কিছুদিন হইল ইয়োরামেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। দেশ দেখিয়াছেন অনেকগুলি। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড, সুইডেন, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত দেশের লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্যর বিশ্বেসরায়া পরিদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি ভদ্রবাটী আয়রণ ওয়ার্কসের কাজে খাটাইবেন। তিনি সম্প্রতি ভদ্রবাটী লৌহ কারখানার উন্নতিবিষয়ক এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশের বহুবিধ লৌহ ইস্পাত কারখানার মালিক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে স্যর বিশ্বেসরায়ার যেসকল আলোচনা হইয়াছিল তাহারই সার মর্ম্ম ঐ বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা এখানে ইহার খানিকটা প্রকাশ করিলাম।

ভদ্রবাটী আয়রণ ওয়ার্কসটি স্থাপনের সময় প্রয়োজনের চাইতে অধিক পুঁজি ইহাতে ঢালা হয় এবং এপর্য্যন্ত লৌহ কারখানাটি আশানুরূপ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। এ

দেশে ও বিদেশের কোন স্থানে ইহা অপেক্ষা সুদক্ষভাবে পরিচালনার কাজ হইতে পারে না। কারখানার শ্রমজীবী ও কারিগরগণকে আরও সুদক্ষ করিতে হইবে। ভদ্রবাটী আয়রণ ওয়ার্কসের উৎপন্ন লৌহ ইস্পাত বেচিবার জন্য বাজারের অন্বেষণে থাকিতে হইবে, দেশ ও বিদেশে ইহার ভাল কাটতি করিবার জন্য যথাবিধি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এসব সম্পন্ন করিতে আরও দুই দশ বৎসর অবশ্যই কাটিয়া যাইবে।

লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের অনেক অসুবিধা এখন দূরীভূত হইয়াছে। লৌহ প্লাণ্ট আজকাল যে পরিমাণ মাল উৎপাদন করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ আশানুরূপ। উৎপন্ন মালের প্রায় সবটাই বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। বিগত সনগুলিতে যত ঘাটতিই দিতে হউক না কেন, বর্ত্তমানে মহীশূর সরকারের ভাণ্ডারে বাৎসরিক ১০ লক্ষ করিয়া টাকা জমা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভদ্রবাটীর লৌহভবনে বর্ত্তমানে ৫০০০ লোকের অন্ন-সংস্থান হইতেছে। ভদ্রবাটী আয়রণ ওয়ার্কসের প্রাথমিক আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭৮ লক্ষ টাকা; কারখানাটি সম্পূর্ণ করিতে মোট ১৬২ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

স্যর বিশ্বেসরায়া তাঁহার বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কারখানাটির আর্থিক অবস্থা আরও সচ্ছল করিতে হইলে ইহার কর্ম্মক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। গোড়াতে প্লাণ্টটির কটাহ (ব্লাষ্ট ফারনেস) দ্বারা প্রতিদিন ৫০ হইতে ৬০ টন পিগ আয়রণ প্রস্তুত করিবার কথা ছিল; কিন্তু তদানীন্তন প্রধান পরিচালক পেরিন সাহেব বলেন যে, কারখানাটির উৎপাদন-ক্ষমতা শীঘ্রই বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৯১৬ সনের ১লা মে পেরিন সাহেব ঐ লৌহ কারখানাটির যে মোসাবিদা প্রস্তুত করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ঐ কারখানাটির কর্ম্মক্ষেত্র দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। কারণ দিন প্রতি মাত্র ৫০ টন করিয়া লৌহ উৎপাদন করিলে উৎপাদন খরচা কম পড়িবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে ৫৭ টন করিয়া লৌহ উৎপাদন করা হইতেছে। ঐ সংখ্যা ৮০ টনে পৌছাইতে হইলে ব্লাষ্ট ফারনেসটি আরও বড় করিতে হইবে এবং ইহা সম্পন্ন করিতে ২·৮০ লক্ষ টাকার পুঁজি দরকার হইবে।

গত বৎসরে ৪·২০ লক্ষ টাকা দিয়া একটা ফাউনড্রি খোলা হয়। বর্ত্তমানে এই কারখানাটির কাজ কারবার সন্তোষজনক রূপে সম্পন্ন হইতেছে। চাহিদা মিটাইবার জন্য আরও ৬ লক্ষ টাকা ঐ কারবারে ঢালা হইবে। কারখানা হইতে যথেষ্ট লাভ হইতেছে। কারখানা বাড়াইলে ভদ্রবাটীর পিগ আয়রণ অনেকটা পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে এবং বিদেশের বাজারেও বর্ত্তমানের মত অধিক পরিমাণে পিগ চালান দিবার দরকার হইবে না। বিদেশে পিগ রপ্তানিতে ভারতীয় লৌহ শিল্পের বড় বেশী লাভ হয় না। অন্যদিকে অত্যধিক জাহাজ ভাড়া বিদেশীর পকেটে যায়।

ইস্পাতের শিল্পে মহীশূর

মহীশূর রাজ্যে ছোট খাট আকারে ইস্পাত প্রস্তুতের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এ অঞ্চলে আজ ২৫ বছর হইতে সেকেলে ধরণে ইস্পাত উৎপাদনের কাজ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাধারণে যেরূপ ইস্পাত ও ইস্পাতের যন্ত্রপাতি পাইতে ইচ্ছা করে তাহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা সম্ভবপর নয়। অনেক সময় বিদেশী পর্য্যটক ভদ্রবাটীর লৌহ কারখানার পরিচালকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "কেন মহাশয় আপনারাতো খুব সস্তায়ই ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারেন তবে কেন এই লাভজনক ব্যবসাটির ফল উপভোগ করিতেছেন না?" পেরিন সাহেবও তাঁহার আদি মোসাবিদায় ইস্পাত-শিল্পের, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত ছিলেন। সরকারের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, গ্রাম্য কর্ম্মকার গাড়ীর চাকা ও চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য ইস্পাতের পাত ও ডাণ্ডার অভাব খুব বেশী করিয়া উপলব্ধি করে। এইসকল চাহিদা মিটাইবার জন্য ও অন্যান্য সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া ১৪ লক্ষ টাকার দ্বারা আপাততঃ ছোট খাট ভাবে একটা ইস্পাত কারখানা খোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ কারখানায় প্রতিদিন ২৫ টন পর্য্যন্ত ইস্পাত উৎপাদন করা চলিবে। এই প্রস্তাব যদি কার্য্যে পরিণত করা হয় তাহা

হইলে মহীশূর রাজ্যে এই ধরণের অনেক নূতন শিল্প গজাইয়া উঠিবে এবং গ্রাম্য কারিগর ও কর্ম্মকারগণের আবার সুদিন ফিরিয়া আসিবে।

রেলওয়ে শ্লীপার

শাল, সেগুণ ও দেবদারু কাঠের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ভারতীয় রেলওয়ে কোম্পানীগুলি রেল-সড়কের স্থায়ী শ্লীপারের বন্দোবস্ত করিতেছে। ভদ্রবাটী কারখানায় প্রস্তুত ক্রিওজোট নামক এক প্রকার আলকাতরা জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা রেল সড়কের শ্লীপারগুলি মাখাইয়া লইলে সেগুলি বেশী দিন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। দেরাদুনের বন-গবেষণা ভবন (ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট) অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, কাঠ রক্ষার জন্য এক প্রকার বিশেষ খনিজ তেলই বেশী উপকারী। বর্ত্তমানে ভদ্রবাটীতে ঐ কাঠরক্ষক তৈল প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করা হইবে। দেরাদুনের বন-বিভাগ এজন্য যে মোসাবিদা পাঠাইয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটা স্বতন্ত্র প্ল্যান্ট প্রস্তুত করিতে হইবে।

টাকু (ববিন) শিল্প

এই সঙ্গে ১·২০ লক্ষ টাকা খরচায় একটা স্বতন্ত্র ববিন কারখানা খুলিবার কথা উঠিয়াছে। ঐ কারখানায় এক সময়ে ৩ হাজার টন ববিন প্রস্তুত করা চলিবে। দেশের মধ্যে টেকোর যেরূপ চাহিদা এবং স্বদেশী বস্ত্রশিল্প যেরূপ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ঐ কারখানায় যে পুঁজি ঢালা হইবে তাহার শতকরা ৪০ ভাগ লাভ হইবার খুবই সম্ভাবনা।

মহীশূরে পাল্প ও কাগজ শিল্প

বর্ত্তমানে মহীশূরের ট্রাম লাইনের ধার দিয়া ভদ্রবাটী আয়রণ ওয়ার্কসের যে বাঁশবন আছে তাহার বাঁশ দ্বারা কাগজ প্রস্তুতের জন্য একটা কাগজের মিল শীঘ্রই খোলা হইবে। ইহাদ্বারা একদিকে বাঁশ বন হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হইবে ও অন্য দিকে বাঁশ বনের সংলগ্ন শান গাছগুলির উন্নতি সাধন করা হইবে।

স্যর বিশ্বেসরায়া উল্লিখিত কয়েক দফা প্রস্তাবে মহীশূর রাজ্যের আর্থিক উন্নতির এক বিরাট স্কিম প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার সকলগুলি কাজে খাটাইতে হইলে মহীশূর সরকারের প্রাথমিক ব্যয় হইবে কম পক্ষে ৫৫ লক্ষ টাকা। এই অর্থ আগামী দুই বৎসরের মধ্যেই সরকার সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন। মহীশূরের ব্যবস্থাপক সভা যদি এই আর্থিক উন্নতির প্রস্তাববাণীতে সম্মতি দেয় তবে মহীশূর রাজ্য আর্থিক সম্পদের হিসাবে বিশেষরূপে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। লৌহ-ইস্পাত শিল্প একটা আন্তর্জ্জাতিক শিল্প। বর্ত্তমানের এই বিশ্ব-প্রতিযোগিতার দিনে ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে ব্যবসাসংক্রান্ত ও যন্ত্রপাতিবিষয়ক আধুনিক দক্ষতা অর্জ্জন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্যর বিশ্বেসরায়া বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতায় জানিতে পারিয়াছেন যে, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করা যায় না। ৪।৫ বৎসর কারবারটি সুচারুরূপে পরিচালনা করিলে পর লাভ আপনা হইতেই আসিবে। এইসকল কথা চিন্তা করিলে মহীশূরের লৌহ শিল্প ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বরং মহীশূরের লৌহ ইস্পাত শিল্পটি বর্ত্তমানে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে এই কথাই বলিতে হয়। আগামী বৎসরে কারখানার খরচখরচা বাদে ৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ত্তমানের এইসকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অদূর ভবিষ্যতে জারছোপা জলপ্রপাতের উপর ১০ হাজার অশ্বশক্তির একটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট স্থাপন করা হইবে। এই বৈদ্যুতিক জলশক্তির দ্বারা ভদ্রবাটী আয়রণ ওয়ার্কসের উৎপাদন খরচা অনেকটা পরিমাণে কমিয়া যাইবে। অন্যদিকে ঐ বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা শিমগা, দেবনগর ও অন্যান্য ছোট বড় সহর ও পল্লীতে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করা হইবে ও ঐ সমস্ত স্থানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য বৈদ্যুতিক রসদ সরবরাহ করা হইবে।



দুনিয়ার ধনদৌলত

জাপানের ফ্যাক্টরী মজুর

গত বছর (১৯২৬) জুলাই মাস হইতে জাপানী ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট বা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু 'স্ত্রীলোকেরা রাত্রে কাজ করিতে পাইবে না' এই আইন ১৯২৯ জুলাই মাসের আগে প্রচলিত হইবে না।

কতকগুলি বড় ফ্যাক্টরী এই আইন্‌টা আগে ভাগেই আঁচ করিয়া সেই অনুসারে কাজ চালাইতেছিল। ওরিয়েণ্টাল স্পিনিং কোম্পানীর ওজি ফ্যাক্টরী ১৯২৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে রাত্রে কাজ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তার ফলটা সম্প্রতি এক জাপানী কাগজে "শিল্পীর হিতসাধনে" প্রকাশিত হইয়াছে ও আন্তর্জ্জাতিক মজুর আফিসের মুখপত্র "ব্যবসা ও মজুর সন্দেশে" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা নিম্নরূপ।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যে উন্নতি ঘটিয়াছে। আর রক্তহীন ফোলা মুখ বা "স্পিনিং ফ্যাক্টরীর রং" একটাও দেখা যাইতেছে না। পীড়া এবং "টার্ণওভার" দুইটাই কমিয়াছে। কিন্তু উপস্থিতের সংখ্যা বাড়িয়াছে; প্রতি শ্রমিক আগের চেয়ে বেশী স্পিণ্ডল চালাইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনুপস্থিতের শতকরাটা আশ্চর্য্যরকম কমিয়া গিয়াছে। কাজ হয় দুইবার। ১ম বার ভোর ৫টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত। মাঝে ৭½টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আধা ঘণ্টা হাজিরা খাইতে ছুটী দেওয়া হয়। ২য় বার ২টা হইতে রাত ১১টা পর্য্যন্ত। রাত্রিতে খাওয়ার ছুটী দেওয়া হয় ৭½টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আধ ঘণ্টা।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের বিদেশী গ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্র অ-শ্বেত বাসিন্দা অবশ্য চায় না; কিন্তু ইয়োরোপ হইতে শ্বেত বাসিন্দা গ্রহণ আমেরিকার অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্যে একটা আইন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন দেশের ভাগে কত লোক পাঠাইবার পালা প্রত্যেক বছর পড়িবে। বলা বাহুল্য ইউরোপের অনেক দেশই আমেরিকাতে বাড়তি লোকজন পাঠাইতে চায়।

এই আইন যুদ্ধের পর হইতে কায়েম রহিয়াছে। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট কুলিজ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক গ্রহণের নিয়মগুলির কিছু অদল-বদল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

তদনুসারে গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বরাদ্দটা অনেক বাড়িবে। ঐ দুই স্থান হইতে ৩৪,০০৭ জনের স্থানে ৭৩,০৩৯ জন প্রতি বছর আমেরিকায় গিয়া চিরস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের ফ্রী ষ্টেটের বরাদ্দ ২৬,৫৬৭ হইতে কমিয়া ১৩,৮৬২ হইয়াছে। অথচ আমেরিকার বহু আইরিস্‌ এই দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে আগত আইরিস্‌দের বংশধর।

যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের নয়া নীতির ভিতরকার কথাটা হইতেছে, শুধু বড় বড় শহরে থাকিতে ভালবাসে এমন লোককে গবর্ণমেণ্ট চায় না। আইরিসরা, ইতালিয়ানরা ও ইহুদিরা শহর-ঘেঁষা। সেইজন্য তাদের কম করিয়া নেওয়া হইবে।

আর এক কথা। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তারা শুধু যে চাষী বা

ক্ষেতের মজুরদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বৃটিশ ও উত্তর আইরিস "সংখ্যা" বাড়াইতে মনস্থ করিয়াছেন, তা নয়। চাষী চাই; কিন্তু বুদ্ধিমান শিল্পী বিশেষ করিয়া এঞ্জিনিয়ার-দের চাই।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইয়োরোপীয়ের বিদেশ-গমনের আকাঙ্ক্ষা হাবভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান করা হইয়াছে। একজন সরকারী চাকুরে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাতে জানা যায় ৫০ লক্ষ ইয়োরোপীয়ান—অধিকাংশই মধ্য ইয়োরোপীয়ান্ ও কোন কোন ভূমধ্য-দেশের অধিবাসী—আমেরিকা গমনের জন্য সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছে।

জল-বাণিজ্যে জার্ম্মাণি

জার্ম্মাণি বাণিজ্য ব্যাপারে সাগর-দরিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চায়। তার বাণিজ্য-জাহাজের "টনেজ" দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে সাগরে সাগরে তার যত জাহাজ যাতায়াত করিতেছে, তার ৮০% "লম্বা পাড়ি" দেয়।

হাম্বুর্গ-আমেরিকান্ শাখার চেয়ারম্যান ডাক্তার কুনো বলেন, "জার্ম্মাণ মার্কেন্টাইল মেরিণ অত্যন্ত আপ্ টু ডেট্ অর্থাৎ একেলে। বাণিজ্যিক জাহাজের ৪০% ৫ বছরের চেয়েও কম পুরাণা। ঐ বয়সের জন্য সারা দুনিয়ার গড়্-পড়্তা ১৬·৫%। তেল চালিত জাহাজের সংখ্যা বেশী।

"জার্ম্মাণির বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মাণ নীতি হইতেছে ভীমকায় সমুদ্র-বিলাসী জাহাজ তৈয়ারী না করিয়া মাঝারি গোছের জাহাজ তৈয়ারী করা। অতিকায় জাহাজ অনেক বন্দরে ঢুকিতে পারে না। কিন্তু ছোটগুলি অনায়াসে ইচ্ছামত বন্দরে ঢুকিয়া মাল দেওয়া নেওয়া করিতে পারে। অর্থাৎ পাড়িও জমে পয়সাও জমে।"

সুইডেনে রেলওয়ে বনাম মোটর

রেলগাড়ী সেকেলে যানবাহনে পরিণত হইতে চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে রেলগাড়ী কেবলমাত্র মাল পত্র আনা নেওয়া করিবে এরূপ আশা করা যায়। স্থানীয় যাতায়াতের জন্য অনেক সহরেই দ্রুত মোটর বাসের রেওয়াজ হইয়াছে। দূর দেশে যাতায়াতের জন্য শীঘ্রই উড়ো জাহাজ নিযুক্ত হইবে। সুইডেনে রেলওয়ে ও মোটর বাসের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সুইডেনের ৩৫,০০০ কিলো (এক কিলো = ⅝ মাইল) রাস্তায় ৪ হাজার খানি অমনিবাস চলিতেছে। সুইডেনের মোট রেল সড়ক কিন্তু মাত্র ১৬,০০০ কিলো। আর এগুলিতে ৩৫০০ রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। কিন্তু ১,৪০০ অমনিবাস রাস্তায় কমসে কম ২০,০০০ বাস ষ্টপ আছে। সেদিন সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্‌ম সহরে বাস ও রেলওয়ে প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। রেল-প্রতিনিধিরা বলেন তাঁহাদের স্বার্থের দিক্ বিবেচনা করিয়া ও রেলের বহুদিনের সেবার কথা চিন্তা করিয়া মোটর বাসের সংখ্যা হ্রাস করা উচিত। মোটর বাস কোম্পানীগুলি যাহাতে সড়ক-কর বেশী করিয়া দেয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। রেল কোম্পানীগুলি নিজেদের স্বতন্ত্র মোটর বাস খুলিবার জন্য বিশেষ সুবিধাও দাবী করে। সুইডেনের রেল ও মোটর বাস কোম্পানীগুলি একজোট হইবার চেষ্টা করিতেছে।

গোটেনবুর্গে জাতীয় মেলা

সেদিন গোটেনবুর্গ সহরে সুইস জাতির দশম জাতীয় মেলা হইয়া গেল। মেলা দেখিতে দর্শক আসিয়াছিল ৯২,০০০। ১৯১৮ সনের প্রথম মেলার উৎসব ৪২,০০০ লোক লইয়া সম্পন্ন হয়। দশ বৎসর পরে ডবলের বেশী দর্শক হইয়াছে। মেলায় যে সকল বণিক, ব্যবসায়ী ও দোকানদার দোকান পসার খুলিয়াছিল তাহারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়াছে। কাহাকেও ঘাট্‌তি দিতে হয় নাই। ছোট বড় সকল ব্যবসায়ীই অল্পবিস্তর লাভ করিয়াছে। এক টিম্বার মহাজন এ মেলায় তাঁহার সকল কাঠ বেচিয়া গুদাম সাবাড় করিয়াছেন। আমাদের দেশে এমনিতর বড় বড় জাতীয় মেলা হওয়া খুব ভাল। শীতের দিকে পল্লী ও সহর গ্রামে ছোটখাট মেলা হয়। কিন্তু সেগুলি নেহাৎ সেকেলে ধরণের। তার কিছুই বিশেষত্ব নাই। সাধারণ হাট বাজারের মতই কোন বর্দ্ধিষ্ণু জনপদে কিছুদিনের জন্য বাজার বসে মাত্র। আমাদের

স্বদেশী মেলায় বাদাম তেলের খাবার বিক্রয় হয় বেশী। আর বিক্রয় হয় জার্ম্মাণির খেলনা ও জাপানী কাচের চুড়ি।

ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের জাতীয় আয়

"ন্যাশনাল বিউরো অব্‌ ইকনমিক রিসার্চ্চ" বা "আর্থিক গবেষণার জাতীয় প্রতিষ্ঠান" অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছে যে, ১৯২৬ সনে আমেরিকাবাসীদের মোট আয় একত্রে ৮৯৬৮ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ছিল। ১৯২১ সনে পরিমাণটা ছিল ৬২৭৩ কোটি ৬০ লক্ষ। অর্থাৎ ৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় ৪৩% বাড়িয়াছে।

কিন্তু এই বৃদ্ধিটা দ্বারা প্রকৃত বৃদ্ধিটা জানা যায় না। কারণ ১৯২১ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত ডলারের ক্রয়-ক্ষমতায় নানারূপ ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ, প্রকৃত বৃদ্ধিটা কিছু কম হইবে।

ইংল্যাণ্ডের ঐশ্বর্য্য

১৯২৬ সনের যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় বিলাতী মুদ্রায় দাঁড়ায় ১৮৫০ কোটি পাউণ্ড। ১৯২৪ সনের যুক্তরাজ্যের নিট জাতীয় আয় হইয়াছিল মোট ৩৮০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

মেহনতের মজুরি

আর্থিক গবেষণার জাতীয় প্রতিষ্ঠান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ২,০১০ ডলার (প্রায় ৪১০ পাউণ্ড)। হিসাবটা ১৯২৬ সনের। ১৯২১ সনে ছিল ১,৫৩৭ ডলার। অর্থাৎ ৫ বছরে ৩১% বাড়িয়াছে।

আমেরিকার ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করিতেছে ?

১৯২৪ সনের সহিত ১৯২৫ সনের কয়েকটা তুলনা এইরূপ :—

৫,০০০ ডলারের উপর আয় যাদের তারা বাড়িয়াছে		১৬½%
২৫,০০০	" " " " " "	৩১½ "
১০০,০০০	" " " " " "	৮৮ "
৩০০,০০০	" " " " " "	১০৪ "
১০,০০,০০০	" " " " " "	১৭৯ "

অর্থাৎ ডলারগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে জমায়েৎ হইতেছে। অন্যদিকে গরিবদের, বিশেষ মজুরদের, আয় বাড়িতেছে না। সোজা কথায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িতেছে।

আমেরিকার সমাজ ভঙ্গুর নয় কেন ?

জাপানের 'সৈনিচি' পত্রের মতে ডলারে ডলার আনে। যে যত বড় লোক সে তত অল্পায়াসে ডলার উপার্জ্জন করে। এইজন্য ওখানকার কেহ কেহ বলিতেছেন, সুদের প্রথা উঠাইয়া দাও। কিন্তু ধনী দরিদ্রের এত বৈষম্য সত্ত্বেও আমেরিকার সমাজ কি করিয়া টিঁকিয়া আছে ? তার কারণ আমেরিকায় ধনী ও দরিদ্র বলিয়া বিশেষ বিশেষ শ্রেণী নাই। আপন চেষ্টায় সেখানে দরিদ্র ক্রমাগত ধনী হইতেছে। আবার ধনী দরিদ্র হইতেছে।

বুলগেরিয়ার বিদ্যুৎ মোসাবিদা

তার্ণোভোর জেনারেল কাউন্সিল তার্ণোভো সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা চালাইতে মনস্থ করিয়াছে। কম খরচায় যাহাতে সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইতে পারে ইহাই ঐ প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য। ১৯২৮ সনের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগী কোম্পানীর মোসাবিদা পৌঁছিয়া যাওয়া চাই। এই প্রতিযোগিতায় দুইটি পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

বুলগেরিয়ায় গোলাপ চাষ

এবৎসরের গোলাপফুলের মরশুম খুব ভাল। গোলাপ বাগানের ফুলগুলিও খুব উত্তম এবং সেগুলির কিম্মৎও খুব বেশী। কাজান লাইক ও কার্লোভো জিলায় ফুল তোলার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ ফিল্ম বাণিজ্য

ওয়েম্‌ব্লির "প্যালেস্‌ অব্‌ এঞ্জিনিয়ারিং" বা এঞ্জিনিয়ারিং প্রাসাদ দুনিয়ার সর্ব্ববৃহৎ আচ্ছাদিত কংক্রিট ইমারত। ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীর এক বিশেষ দর্শনযোগ্য বস্তুও বটে।

এই প্রাসাদ ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি (পূর্ব্বে এগুলি প্রদর্শনী ভূমির অংশমাত্র ছিল) সম্প্রতি বৃটিশ ফিল্ম উৎপাদনকারী-দের কাছে ১,৪৭,৫০০ পাউণ্ডে বেচা হইয়াছে। মোট জমির আয়তন ৩৫ একর।

প্রাসাদটা হইবে ষ্টুডিও। বাগানগুলি ও হ্রদটা "সিন" বা "দৃশ্যের" কাজে লাগিবে। এই জল্পনার পিছনে আর্থিক সহায়ক হইতেছেন শ্রীযুক্ত রুপার্ট ম্যাসন। ইনি একজন ল্যাঙ্কাশিয়ারের্ তুলার বেপারী।

বাক্সটনের গবেষণা মন্দির

কয়লার খাদে কাজ করিবার সময় নানাপ্রকার দুর্যোগ ও বিপদের সম্ভাবনা আছে। 'খাদের বিঘ্নহীনতা কিসে বাড়ান যায়' এই বিষয় লইয়া গবেষণা করিবার জন্য ১৪ই জুন (১৯২৭), তারিখে "মাইনার্স ওয়েলফেয়ার কমিটি"র চেয়ারম্যান লর্ড চেম্‌সফোর্ড বাক্সটনে এক মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন।

মাইনারস্ ফেডারেশনের সভাপতি স্যর হার্ব্বার্ট স্মিথ খনি-সচিব ও খনির মালিকদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

স্যর হার্ব্বার্ট স্মিথ বলেন, "আমি অনেক মস্ত মস্ত গবেষণা কার্য্যের আশা করিতেছি। বিশেষ করিয়া খনিতে আগুন লাগা কি করিয়া বন্ধ করা ও থামান যায় এই বিষয়ে।

"দুইটি মাত্র বিষয় আছে যেখানে খাদের কুলী ও তার মালিক একমত। প্রথমতঃ, কি করিয়া জীবনটাকে বাঁচান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অক্ষত রাখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যখন ড্যামেজ্ হইয়াছে, তখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎকার বা চিকিৎসা কি ?"

চিলির এঞ্জিনিয়ারিং মোসাবিদা

চিলিকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন দেশে পরিণত করিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। কোন বিষয়ে তাহাকে যাহাতে বিদেশী বাজারের দিকে চাহিয়া থাকিতে না হয়, কোন জিনিষের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তাহার জন্য কোন ত্রুটিই করা হইতেছেনা। রেলওয়ে ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যানবাহনের বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত তামার তার প্রস্তুতের ভার দেওয়া হইয়াছে চিলির এক স্বদেশী ফ্যাক্টরির উপর। তামার খনি ও সালফিউরিক অ্যাসিডের ভাঁটি চিলিতে যথেষ্ট আছে। ঐ ফ্যাক্টরিটি খুব সরেশ তামার তার প্রস্তুত করিবে বলিয়া আশা করা যায়। তামার তার ছাড়া বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও ঐ কারখানায় প্রস্তুত করা হইবে। চিলির শিল্প কারখানার কাজের জন্য রাইও মায়পো নামক স্থানে এক বিরাট বিদ্যুৎ ভাঁটি (প্ল্যাণ্ট) স্থাপন করা হইবে। চিলির দক্ষিণাঞ্চলে ইতিমধ্যেই কতকগুলি প্ল্যাণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমেরিকাকে চা খাওয়াইবার জন্য ইংরেজের মাথাব্যথা

স্যর চার্লস হিঘাম্ সম্প্রতি সারা আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাঁর উদ্দেশ্যটাকে এক কথায় বলা চলে, "ভো ভো আমেরিকা চা খাও, আরও চা খাও।" তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে আরও চা-পায়ী করিয়া তুলিতে চান।

স্যর চার্লস হিঘাম্ এক মোলাকাতে বলিতেছেন, "গত ২৬ বছরের প্রত্যেক ৩ মাসের চেয়ে বৃটেন ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসে ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা বেশী বেচিয়াছে আমেরিকায়। সবটাই ভারতীয় চা।

"৪বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে যত লোক চা খাইত, আজ তার দ্বিগুণ লোকে খাইতেছে।

"এখন আমেরিকা দুনিয়ার সমগ্র যোগানের $\frac{1}{6}$ অংশ চা খায়। যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের দোকানের সংখ্যা ৩২,০০০। ৩ বছর আগে মাত্র ৩০০ ছিল।"

মনে রাখিতে হইবে আইন দ্বারা মদ্য পান নিবারণ করাতে আমেরিকানদের চায়ের পিপাসা বাড়িয়াছে ও বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সুবিধা হইয়াছে।

বৃটিশ বাণিজ্যে উন্নতি

বৃটিশ বোর্ড অব্ ট্রেড্ অনুসারে বৃটিশ বাণিজ্যের উন্নতিটা বেশ নিশ্চিতরূপে দেখা দিয়াছে।

সকল রকম রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তুলা, কয়লা, লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ের অঙ্কগুলি দেখিলে বুঝা যায় এগুলি চাগিয়া উঠিয়াছে।

গত বছরের মে মাসের আমদানি ১২ কোটি পাউণ্ডের উপরে বেশী আসিয়াছে।

ঐ তুলনায় রপ্তানির বৃদ্ধি ১৭২ লক্ষ পাউণ্ডের উপরে।

ফরমোসার চাউল

২৭মে, (১৯২৭) খবর আসিয়াছে যে, ফরমোসায় এ বছর (১৯২৭) প্রথম ধানের ফসলটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আয়তনের পরিমাণ ৬,৪৮,৯৯২ একর। ১৯২৬ সনের আয়তনের চেয়ে ইহা ৫% ও গত ৫ বছরের গড়পড়তার চেয়ে ১১·৪% বেশী।

মোট আদায় এষ্টিমেট করা হইয়াছে ১,৭৩,৫৫,৬৮৩ বুশেল। গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধিটা ২০% ও গত ৫ বছরের গড়পড়তার তুলনায় ১৮%।

সোহ্বিয়েট ইউনিয়নের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

যুগোষ্টাল নামক দক্ষিণ রুশিয়ার ষ্টিল ট্রাষ্ট গত এপ্রিল মাসে ৩,১৮০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ইস্পাত প্রস্তুত করিয়াছে। পিগ আয়রণ প্রস্তুত করিয়াছে ১৭৫,৫৭৯ টন ও রোল্ড আয়রণ ১১৯,৫২১ টন এবং মাটীন লোহা প্রস্তুত করিয়াছে ১৫৪,৫৫১ টন।

মধ্য এশিয়ার কয়লা খনিগুলিকে মধ্য এশিয়া কোলট্রাষ্ট নাম দিয়া একটা সম্মিলিত কোম্পানী কায়েম করিবার নিমিত্ত রুশিয়ার সর্ব্বপ্রধান আর্থিক সংসদ সরকারের নিকট আবেদন পেশ করিয়াছে।

রুশিয়ার গ্রোজনী নামক স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ঐ স্থানে একটা তৈল খনি পাওয়া গিয়াছে। ঐ খনি হইতে প্রতিদিন ২,৪২০ টন করিয়া তৈল উঠিতেছে।

সুইট্স্যারল্যাণ্ডে সড়ক

সড়কের উপর মোটর ইত্যাদির সোয়ারী এক প্রকার জীব, আর পথচারী ব্যক্তি আর এক প্রকার জীব। এই দুইয়ের জন্য দুই প্রকার নীতির প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। সম্প্রতি সুইস্ পার্ল্যামেণ্ট এই দুই নীতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এক বিল পাশ করিয়াছিল। উদ্দেশ্য নং ১ মোটর সাইকেল আরোহীদের খুব সুবিধা করিয়া দেওয়া। নং ২ যান—বাহনের চলাচলে পথচারীদের বিপদ হইতে রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

কিন্তু পার্ল্যামেণ্টের বাহিরে এই বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উঠিল। এটা পছন্দ হইল না পথচারীদের, না মোটরওয়ালাদের।

মোটরওয়ালাদের অভিযোগ এই যে, "শহরের বাইরে গতির বেগ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বা প্রায় ৩০ মাইল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এটা অত্যন্ত কম।" মোটরকার ক্লাবগুলি বলিল, "আরে মোলো! সাইকেল-আরোহী বা পথচারীরা একটুও জখম হইতে পারিবে না। হইলেই এই বিল অনুসারে তাদের শাস্তি হইবে। তা অপরাধ যত সামান্যই হোক্ না। একদম নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে পারিলে শুধু বেচারারা রেহাই পাইবে নচেৎ নয়।"

পথচারীরা নালিশ করিল, "বা বেশ মজাত! মোটর-ওয়ালাদের পোয়াবারোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে আর কি! প্রত্যেক মোটর-চালককে বীমা করিয়া রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঝুঁকিটা গিয়া পড়িতেছে বীমা কোম্পানীদের ঘাড়ে। ইহাতে মোটরওয়ালাদের কাণ্ডজ্ঞান বাড়িবে? দায়িত্বজ্ঞান বাড়িবে?

পার্ল্যামেণ্টের উভয় সঙ্কট। তার উপর হোটেল ব্যবসায়ীরা ও বিদেশী মোসাফিরের সঙ্গে কারবারীরা আসিয়া জুটিল। তারা আপত্তি করিতে লাগিল, "বাধ্যতামূলক বীমার প্রথা ত প্রচলিত হইল। বিদেশী মোটরকারগুলিকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়া কথা কওয়া হইবে না। অর্থাৎ বিদেশীরা সুইস্ সড়কগুলি বয়কট করিবে।

এমন কি সাইকেলবিহারীরা পর্য্যন্ত বলিয়া বসিল, "সংখ্যা লেখা পাতটা ব্যবহার করিতে বাধ্য করাইয়া আমাদের অপমান করা হইতেছে।"

সুইস্ পার্ল্যামেণ্টের দুই কূল নষ্ট হইল। অবশেষে এক রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা হইল। সওয়া দুই লক্ষ জন

বিলটার সমর্থন করিল। আর ৩ লক্ষ ২৯ হাজার জন বিলের বিপক্ষে মত দিল।

সুতরাং বিলটা নাকচ হইয়া গেল।

গ্রন্থ সহর লাইপৎসিগ

বার্লিনে বই ছাপার খুব বড় কারবার চলে। কিন্তু গ্রন্থ কারবারে লাইপৎসিগের স্থান বার্লিনেরও উপরে। লাইপৎসিগে নয় শত পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা আছে। অনেক সময় লাইপৎসিগকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুস্তক-প্রকাশক সহর বলা হয়। বর্ত্তমানে লাইপৎসিগ সহরে বিরাট পুস্তকপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হইয়াছে। এটাকে আন্তর্জ্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী বলা হয়। এই মেলা দেখিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে বই-পড়ুয়াদের ভিড় জমে। জার্ম্মাণিতে এত বড় মেলা আর দেখা যায় না। মেলাটা সম্পূর্ণরূপে কয়েকজন জার্ম্মাণ আর্টিষ্টের তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয়। রসজ্ঞ চাই ইহার পাণ্ডা হইলেও পুস্তক প্রস্তুতের ব্যবসা ও ফিকির ফন্দি ইহারা ভুলিয়া যায় না। জার্ম্মাণিতে গ্রাফিক ও টাইপোগ্রাফিক্যাল শিল্পের ও আন্তর্জ্জাতিক মেলা হইয়া থাকে।

এই মেলায় সকল দেশের পুস্তক-শিল্পের মালমশলা প্রদর্শিত হইবে। ইহাতে দপ্তরী-সমাজও পূরাদস্তর যোগ দিবে। খুব বেশী দামী বাঁধান বই থেকে আরম্ভ করিয়া সামান্য কাগজের মলাটের বাঁধা বই ঐ মেলায় প্রদর্শিত হইবে।

জার্ম্মাণির পুস্তক-শিল্পের গোটা পরিচয় দিবার নিমিত্ত জার্ম্মাণির বিখ্যাত সাহিত্যিক গ্যারহার্ট হফটম্যানের বিগত ৪০ বৎসরের সাহিত্যসৃষ্টির সমাবেশ করা হইবে ঐ মেলায়।

শিশুদের একটা স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। ইহাতে শিশু-সাহিত্য শিশুদের খেলা ধূলা বিষয়ক পুঁথি পুস্তক থাকিবে। লাইপৎসিগের এই বিশ্বমেলায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম অষ্ট্রীয়া, ইতালি, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনাভিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, রুশিয়া, বুলগেরিয়া, দেনমার্ক, গ্রীস, নেদার্ল্যাণ্ডস্, জুগো-শ্লাভিয়া, রুমাণিয়া ও স্পেন প্রভৃতি ইয়োরামেরিকার দেশসমূহ হইতে দর্শক, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক জমায়েৎ হয়। এমন কি স্বাধীন এশিয়ার জাপানও এই মেলায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

লাইপৎসিগের পুস্তক-বাজার

লাইপৎসিগের "কলেজ স্কোয়ারে" প্রতিবৎসর শত শত পুস্তক ব্যবসায়ী একত্র জমা হয় ও তাহাদের ব্যবসা সংক্রান্ত টাকা কড়ি ও অন্যান্য বিষয়ের হিসাব নিকাশ করে। এটাকে পুস্তক ব্যবসায়িগণের রয়্যাল এক্সচেঞ্জ বলা চলে। লাইপৎসিগে ১১ হাজার পুস্তক প্রস্তুত ও প্রকাশের ফার্ম্ম আছে। ঐ সকল ফার্ম্মে ৯৫ হাজার লোক খাটে। দুইশত ছাপাখানা আছে ঐ সহরে। তা ছাড়া শত শত দপ্তরী কোম্পানী ও টাইপ কারখানা আছে।

ইংলণ্ডে ডিপথিরিয়া রাক্ষসী

ইংরেজ জাত, বিশেষ করিয়া ইংরেজ শিশুগণ, লণ্ডনে ডিপথিরিয়ার প্রকোপে উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে। এক হাম ও নিউমোনিয়া বাদে অন্য কোন বেয়ারামে এত লোক পীড়িত হয় না ও মরে না।

কিন্তু এই ডিপথিরিয়ার বিরুদ্ধেও প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে। শ্‌সিক টেষ্ট ও ইমিউনিজেশন (পরীক্ষা ও টিকা) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইতেছে। এই প্রণাটাকে লণ্ডনের স্কুলগুলিতে কাজে খাটাইতে গেলে একুনে ৮৫ হাজার কি লাখ পাউণ্ড খরচ পড়িবে।

খরচের উপর মায়া করিলে চলিবে না। কারণ, ১৯২১ সনে একা শহর লণ্ডনে ডিপথিরিয়ার জন্য করদাতাদের প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। প্রত্যেক ডিপথিরিয়া কেসের খরচ ৩০ পাউণ্ড।

ডিপথিরিয়ার হিসাবে ইয়োরোপের এবং ইংলণ্ডের রাজধানীগুলির মধ্যে লণ্ডনের সেরা স্থান। শ্‌সিক প্রণালী অবলম্বন করিলে বহু শিশুর প্রাণরক্ষা পাইবে সন্দেহ নাই।

সাবাস লিণ্ডবের্গ

ইয়োরোপে ফ্রান্স আজ আকাশ-যানের ব্যাপারে অপ্রতি-

দ্বন্দ্বী বলিয়া স্বীকৃত। কাপ্তেন নান্‌গেসারের মাথায় আসিল আটলান্টিকের উপর দিয়া প্যারিস হইতে নিউইয়র্কে না থামিয়া উড়িয়া যাইবেন। এ পথে এর আগে কেহ না থামিয়া উড়িতে পারে নাই।

নান্‌গেসার উড়িলেন। কিন্তু তার পর তাঁর আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। তিনি পথ হারাইয়াছেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকান্ কাপ্তেন লিণ্ডবের্গ নিউইয়র্ক হইতে উড়িয়া ২২মে তারিখে প্যারিসের লা বুর্‌জেত এয়ারোড্রোমে পৌঁছিয়াছেন ও ২৫,০০০ ডলারের ওটলিজ প্রাইজ পাইয়াছেন।

দুনিয়ার বাজারে আমেরিকান্ বায়ুবীর আপনার শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল। আমেরিকার আনন্দ অবর্ণনীয়। প্রেসিডেণ্ট কুলিজ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক নরনারী এই কৃতিত্বে উৎফুল্ল। নিউইয়র্কের সড়কে নরনারীরা আনন্দে নাচিয়া গাইয়া বেড়াইয়াছে।

লিণ্ডবের্গ না থামিয়া ৩৬১০ মাইল উড়িয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্যারিসে ও লণ্ডনে বিপুল জনতা হইয়াছিল তাঁহাকে দেখিবার জন্য। প্যারিস ও লণ্ডন নানাপ্রকারে তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছে। লিণ্ডবের্গ বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজ একবার উড়িতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। আবার উড়িতে চেষ্টা করিতেছে। আর আমরা কোথায়?

ইরাক্ হইতে ভূমধ্যসাগর অবধি তেলের নল

খানাফিন তেল কোম্পানী ইঙ্গ-পারশ্য তেল কোম্পানীর শাখা-প্রতিষ্ঠান বিশেষ। ঐ কোম্পানীর আলহ্বান্দস্থ নূতন "রিফাইনারি" বা শোধনাগার খুলিবার কালে রাজা ফৈজুল বলেন, "দুনিয়া শীঘ্রই একটা সুসংবাদ পাইবে। ইরাক্ হইতে ভূমধ্যসাগর অবধি তেলের নল-লাইন তৈয়ারী হইয়া যাইবে।"

এই উৎসবটায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা ও বহু গণ্য মান্য বৃটিশ ও ইরাকী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

কলোনের যন্ত্র-মেলা

কলোন সহরে যন্ত্র প্রদর্শনী হইয়া গেল। বিভিন্ন রকমের মোটর ট্রাক্‌সও ভারি ভারি শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি ছিল ঐ প্রদর্শনীর মাল। যুদ্ধের পরে অনেক গোলা বারুদ প্রস্তুত করিবার কোম্পানী উঠিয়া যায়। দেশের মধ্যে মোটর ট্রাক্‌স ও কম পড়িয়া যায়। ঐ কোম্পানীগুলি মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কারখানাসমূহে পরিণত হয়। এই মোটর মেলায় ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বড় বড় কোম্পানীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জার্ম্মাণির বৃহৎ ক্রুপ কোম্পানী ঐ মেলার হোতা। ফরাসী, ইতালি এবং স্পেনও তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় জার্ম্মাণিতে মেলা ও প্রদর্শনীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। রুড় অঞ্চলে একটা নিখিল জার্ম্মাণ কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। জার্ম্মাণ সরকারের অর্থ-সচিব ঐ মেলার উদ্বোধন করিয়াছেন।

রুশিয়ার এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা

সোভিয়েট সেণ্ট্রাল কনসেশ্যান কমিশন ও সুইডিশ এশিয়া (য়্যালমেনা স্বেনস্কা এলেকটিসকা আকৃতিক বোলাগেট) নামক সুইডিশ কোম্পানীর মধ্যে যে রফা হইয়াছে তাহাতে রুশিয়ার জারোস্লাফ নামক স্থানের বিরাট সুইডিশ এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আগামী ৩৫ বৎসরের মধ্যে রুশিয়ান সম্পত্তিতে পরিগণিত হইবে। ঐ কোম্পানীতে প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক মোটর প্রস্তুত হইতেছে। রুশিয়ানদের বৈদ্যুতিক মোটরের চাহিদা খুব বেশী। প্রতিবৎসর ৪০ লক্ষ টন মাল ঐ কোম্পানী প্রস্তুত করিবে এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। রুশিয়ার এই সুইডিস কোম্পানীটি কারখানার কাজে সুইডিস মজুর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা রাখে।

আমেরিকার রেশম-আন্দোলন

আমেরিকার সিল্ক অ্যাসোসিয়েশ্যন (রেশম সমিতি) রেশম প্রচারের জন্য খুব প্রপাগাণ্ডা চালাইতেছে। রেশমের

প্রতি সাধারণের অনুরাগ সৃষ্টির জন্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। লায়ন্স সিল্ক উৎপাদনকারিগণের সঙ্গে রেশমসমিতি সহযোগিতায় কাজ চালাইতেছে। নিউ-ইয়র্ক সহরে শীঘ্রই একটা বড় আন্তর্জ্জাতিক রেশম মেলা খোলা হইবে। ইহা ছাড়া একটা জাতীয় রেশম সপ্তাহ আমেরিকায় পালন করা হইবে। বিজ্ঞাপনের কাজ জোর চালাইবার জন্যও যথাবিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণির বিদ্যুৎ কারবার

বিদ্যুৎ কারবার সঙ্ঘের ১৯২৬ সনের রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ বৎসর জার্ম্মাণির বিদ্যুৎকারখানাগুলি ৫,৭০০,০০০ কিলোওয়াটস্ শক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৫,০০০,০০০ কিলোওয়াটস্। কারবার একরূপ স্বাভাবিক ভাবেই চলে, কিন্তু কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাওয়ায় বিদ্যুৎশক্তি কম খরচ হইতে থাকে।

ইংলণ্ডে জন্মিতেছে কম মরিতেছে বেশী

২২শে মের "সান্‌ডে ক্রনিকল" লিখিতেছে :—

এই বৎসরের প্রথম ৩ মাসের হিসাব—

জন্ম—১,৬৭,১২৬

মৃত্যু—১,৬৮,৬৭০

১৯১৯ সনের প্রথম ৩ মাস ছাড়া আর কোন বছরের প্রথম ৩ মাসে জন্মের হার এত কম হয় নাই। "সিভিল রেজিষ্ট্রেশনে"র প্রচলন হওয়া অবধি ইংল্যণ্ড ও ওয়েল্‌সের মৃত্যুর হার এই তৃতীয়বার জন্মের হারের চেয়ে বেশী হইয়াছে।

বিগত ৩ বৎসরে মৃত্যুর চেয়ে জন্ম কত বেশী হইয়াছে, তার হিসাব—

১৯২৪—২৫,১১৫

১৯২৫—৩৭,২২৪

১৯২৬—৪৩,৪৭৭

ব্যাধির হাতে

ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসে ১৭,৯৩১ বা ১০·৬২% মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বসন্তের ৬,১৫৬ কেসের মধ্যে ১৯টা সাংঘাতিক দাঁড়াইয়াছিল।

জন্ম-মৃত্যুর তুলনা

১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসের তুলনায় ১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসে ৬,৯২৫ জন্ম বেশী ছিল। কিন্তু ১৯২৬ সনের শেষ ৩ মাসে ২,৬৩৭ জন্ম কম ছিল। ১৯২৬ সনের প্রথম ৪ মাসে ১৯২৭ সনের প্রথম ৪ মাসের চেয়ে মৃত্যু-সংখ্যা ৩৮,১৯৬ কম ছিল।

রবারের দরে ভাঁটা

সম্প্রতি রবারের দর অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত গ্রামেরি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমি জানি রবারের দর নামিতেছে। কিন্তু রবার-বাধা-নীতি উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা গবর্মেণ্টের নাই।"

ইতালির কাচ শিল্প

গত চারি বৎসরের হিসাব হইতে বুঝা যায়, ইতালির কাচ ও ক্রিষ্টাল শিল্প ক্রমেই উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। ইতালি ১৯২৩ সনে ৮৮,২০০,০০০, ১৯২৪ সনে ৯৩,৬০০,০০০ ও ১৯২৫ সনে ১১১,৯০০,০০০ লাঃ মূল্যের কাচ ও ক্রিষ্টাল দ্রব্য প্রস্তুত করে ও বিদেশে পাঠায়। ১৯২৬ সনের সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে ইহা ১৯২৫এর চাইতে আরও বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়।

পর্ত্তুগীজ আফ্রিকার রৌপ্যখনি

জাম্বোজিয়া মাইনিং কোম্পানী তাহার অংশীদারগণকে জানাইয়াছে যে, চিওকো নামক স্থানে এক রৌপ্যখনি বাহির হইয়াছে। ঐ খনিতে টনপ্রতি ১৪ হইতে ৩৩ আউন্স করিয়া রৌপ্য পাওয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া ঐ খনিতে তামা, সীসা এবং দস্তাও পাওয়া যাইতেছে। অনেকস্থলে স্বর্ণও মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে। এই খনির রত্নসম্ভার সম্পূর্ণরূপে আহরণ করিবার নিমিত্ত জাম্বোজিয়া মাইনিং কোম্পানী ঐ খনির সহিত অন্যান্য রেল লাইন যুক্ত করিবার

অভিপ্রায়ে এক নূতন রেলসড়ক নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই কাজের জন্ত জাম্বোজিয়া নদীর উপর পুল প্রস্তুত করিতে হইবে।

রুশিয়ার সোনার খনি

রুশিয়ার চরম আর্থিক সভা (সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিল) রুশিয়ার সকল সোনার খনি কোম্পানীগুলিকে এক জোটে আনিবার চেষ্টায় আছে। সকল প্রকাল স্বার্থ জড়াইয়া এক নূতন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান ইহাদের উদ্দেশ্য। এই নয়া কোম্পানীতে কেবল মাত্র আর্থিক সভারই অংশ থাকিবে না, পরন্তু কমিশারিয়েট অব্ ফিনান্স (আর্থিক সংবাদ বিভাগ) ও রুশিয়ার ষ্টেট ব্যাঙ্কের অংশ এই কোম্পানীতে থাকিবে। আপাততঃ দেড়কোটি রুবল বা ১৫ লক্ষ পাউণ্ড লইয়া এই কোম্পানীটি খোলা হইবে। এই টাকা ফিনান্স কমিশারিয়েট ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক দিবেন। এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে রুশিয়ার স্বর্ণ-খনিগুলির প্রভূত উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিশেষ স্বাধীন প্রদেশগুলিতে স্থানীয় কোম্পানীর হস্তে স্বর্ণতাল তুলিবার ভার ন্যস্ত করা হইবে ; কিন্তু এগুলি পরিচালনার ক্ষমতা থাকিবে ঐ কেন্দ্রীয় প্রধান কোম্পানীর হাতে এবং কোম্পানী ঐসকল স্থানীয় খনির মালিকদের নিকট হইতে উচিত মূল্যে স্বর্ণ খরিদ করিয়া লইবে। এই বৎসরে ১০ লক্ষ রুবল বা ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণতাল খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইবে।

ইংরেজের গো-সেবা

মানুষের খাদ্য-শস্যের চাইতে পশুর খাদ্য-শস্য কম প্রয়োজনীয় নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের এলাকায় যত ঘাসের জমি আছে তাহা দ্বারা ২০ কোটি গরু ও ২০ কেটি মেষ প্রতিপালিত হয়। ইংলণ্ডে যে পরিমাণ ঘাসের ফসল উৎপন্ন হয় তাহার দাম ইংলণ্ডের খাদ্য শস্যের চাইতে তিনগুণ বেশী। এখন বুঝুন ইংরেজের গো-সেবা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়। বিলাতের মানুষ ও পশু কেবল নিজের দেশের খাদ্যসম্ভারের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে পারে না। ইংলণ্ডে মানুষের ও পশুর খাদ্য-ফসল যাহা জন্মে তাহাদ্বারা মাত্র ৩ মাসের খোরাক চলিতে পারে। সম্বৎসরের জন্য ইংলণ্ডকে তাহার জগৎজোড়া জমীদারির উপর নির্ভর করিতে হয়। ১৯২৪সনে ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ হইতে ৫৩,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের খাদ্য শস্য যথা যব গম চাউল, বার্লি ইত্যাদি আমদানি করে এবং ১৫৭০০০০০০ মূল্যের মাংস পশম, চামড়া ও ডেয়ারী ফার্ম্মের উৎপন্ন দ্রব্য যথা মাখন, ছানা, প্রভৃতি আমদানি করে।

ইংরেজ দুগ্ধজাত পদার্থ খুব বেশী খায়। ইংরেজ অন্যান্য বিদেশ ও নিজের সাম্রাজ্য হইতে যতদ্রব্য আমদানি করে তাহার মধ্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যের স্থান তৃতীয়। ১৯২৪ সনের হিসাবে দেখা যায় ইংলণ্ড ১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের খাদ্য শস্য ও ময়দা আমদানি করে। ইংরেজ বিদেশের হাট বাজার হইতে ঐ সনে ১০৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাংস খরিদ করে। আর দুগ্ধজাত দ্রব্য ক্রয় করে ৭০,০০০,০০০ পাউণ্ডের।

ইংরেজ সন্তান খাঁটি দুধ তো দেশে প্রচুর পরিমাণেই খাইতে পায়। কিন্তু ইহা ছাড়াও বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে মাখন ও পনির আমদানি করে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৪ সনে এই বিভাগে ইংরেজের আমদানির হার শতকরা ৪৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিলাতে সিমেণ্ট সঙ্ঘ

তিনটি বৃহৎ সিমেণ্ট উৎপাদক কোম্পানী পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট সেলিং অ্যাণ্ড ডিষ্ট্রীবিউটিং কোম্পানী নাম দিয়া এক প্রকাণ্ড সিমেণ্ট সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে। ইহার মূলধন আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। এই সম্মিলিত কোম্পানীটির প্রধান কাজ হইবে ঐ তিন কোম্পানীর প্রস্তুত মাল দেশে ও বিদেশে বিক্রয় করিবার যথাবিধি ব্যবস্থা করা। ইতি মধ্যেই হাজার টনের উপর অর্ডার আসিয়াছে।



(ক) দেশী

ধনিক ও শ্রমিক

বর্ত্তমান যুগে যে সকল আন্দোলন অতি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে তন্মধ্যে ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ প্রধানতম। ইয়োরোপ ও আমেরিকা এ আন্দোলনে অতিমাত্রায় উদ্বেলিত। ভারতবর্ষেও আন্দোলনের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এতকাল অর্থ-গৌরবে গৌরবান্বিত এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বদেশেই সমাজসৌধের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়া আত্ম-প্রাধান্য খাটাইয়া মানমর্য্যাদার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি হীনগৌরব সাধারণ শ্রমিকদল সে উচ্চ আসন হইতে তাহাদিগকে নামাইয়া নিজেরা গৌরবময় স্থান অধিকার করিবার জন্য তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। এ আন্দোলনে সর্ব্বদেশেরই শ্রমিকদল মাতিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষও তেমন পিছনে নয়। ধনিকগণ শ্রমিকগণের প্রভুরূপে অর্থবলে তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বিনা পরিশ্রমে তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থের অধিকাংশ লাভ করিয়া থাকেন ও তাহাদের রক্তমাংস শোষণ করিয়া ভোগ বিলাসে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। এদিকে শ্রমিকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিদাঘ মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপ অগ্রাহ্য করিয়া ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া ধনিকগণের কার্য্যসাধনপূর্ব্বক তাহাদের তৃপ্তিসাধনার্থ শ্রমলব্ধ অর্থ তাদের পায়ে ঢালিয়া থাকে। তাহারা এত পরিশ্রম করিয়াও দিন দু'বেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায় না। অভাব রাক্ষসীর লেলিহান জিহ্বা সর্ব্বদা তাহাদের রক্তশোষণে তৎপর। ধনিকগণের হাতে আত্মবিক্রয় করিয়া তাহারা কোন রূপে দিনপাত করিয়া থাকে। এরূপ দুর্ব্বহ জীবন আর তাহারা কতকাল বহন করিবে। তাই তাহাদের নিজেদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের জন্য মরণপণ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

ইয়োরোপ আমেরিকার তো কথাই নাই, ভারতবর্ষেও মিল কারখানা প্রভৃতিতে শ্রমিকগণের প্রায়ই ধর্ম্মঘটের কথা শুনা যায়। শ্রমমূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহারা এই আন্দোলনে মাতোয়ারা হইয়াছে। ধনিকগণ কারবারে টাকা খাটাইয়া যে লাভ করিতে পারিতেছেন তাহার প্রায় সবই নিজেরা আত্মসাৎ করিতেছেন, আর অতি সামান্যমাত্র শ্রমিকগণের শ্রমমূল্য-স্বরূপ প্রদান করিতেছেন। শ্রমিকগণ এই অবস্থার উন্নতি-কল্পে এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অভ্যস্ত হইতেছে। সাম্যবাদের মন্ত্র তাহাদের মধ্যে ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিধাতার চক্ষে ধনিক ও শ্রমিক সবই সমান। তবে কর্ম্মবিমুখ ধনিকগণ অলস ভাবে কালক্ষেপ করিয়াও অর্থ-প্রাচুর্য্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, আর কর্ম্মময়জীবন শ্রমিকগণ অন্নবস্ত্রাভাবে হাহুতাশ করিয়া যেন বিধাতার বিধি মানিয়া স্রোতাধীন ভাসিয়া যাইতেছে। এই বৈষম্যের কারণ কি? এই কৃত্রিম বৈষম্য সবলে ছিন্ন করিতে হইবে। শ্রমমূল্য যথোচিত রূপে কড়ায়গণ্ডায় আদায় করিতে হইবে, এই সঙ্কল্পসাধনে শ্রমিকগণ বদ্ধপরিকর হইতেছে। ফলে ধনিকগণ আর তাহাদের পূর্ব্ব প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না।

ধনিক ভূস্বামী ও ব্যবসায়িগণ বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এমন শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন যে, শ্রমসাধ্য কর্ম্মে মজুরগণের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের চলা

শক্ত। শ্রমিকগণ তাহাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া না দিলে তাহাদের উদর পূর্ণ হওয়া দুরূহ। মজুরগণের রক্ত-মাংস-ব্যয়ে অর্জ্জিত নয়নাভিরাম সুবর্ণ রজত শুধু তাহাদের তৃপ্তি-বিধানে সমর্থ হয় না। এই আন্দোলনের যতই ক্রমবিকাশ হইতেছে ধনিকগণ ততই প্রমাদ গণিতেছেন। প্রভূত ভূসম্পত্তি, বিশাল কলকারখানা প্রভৃতি থাকিতেও তাহারা নিজেরা ইহাদের সদ্ব্যবহার করিতে অপারগ। তাহাদের হাত-পা যেন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। শুধু মাথার শক্তিতে ও বিধাতার কৃপাতিশয্যে তাহারা শ্রমিকগণের উপর টেক্কা মারিয়া আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে এই সংঘর্ষ বিশালাকার ধারণ করিলে এ দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইবে। শ্রমিকগণ সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ও ধনিকগণ মস্তক স্বরূপ। সমাজের নিজ নিজ দিক্ হইতে উভয়েরই যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে। সমাজের এই উভয় অঙ্গের মধ্যে সংঘর্ষ না হইয়া যাহাতে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধিত হয় তাহা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকগণ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত এবং সমবায় ও সহযোগিতার অমোঘ শক্তিতে বলীয়ান হইলে ও ধনিকগণ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করিতে কুণ্ঠিত না হইলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন অটুট থাকিবে এবং দেশ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ সাধনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে এই ভাবে এই নব সমস্যার সমাধান অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(প্রান্তবাসী)

চির-রোগীদের জন্য ব্যবস্থা

কলিকাতার পথেঘাটে বহু কুষ্ঠরোগী, অন্ধ, আতুর, আশ্রয়চ্যুতা নারী ইত্যাদি দেখা যায়। ইহারা নানাপ্রকারে অধিবাসীদের অকল্যাণ ও অপকারের কারণ হইয়া রহিয়াছে। অথচ ইহাদের থাকিবার বা সেবা পাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গা নাই।

সম্প্রতি এই প্রকার লোকদের জন্য ভবন বা আশ্রয়-স্থানের ব্যবস্থা কর্পোরেশন হইতে করা হইয়াছে।

জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যালয় ১০০ শয্যা পাতিবার অনুমতি চাহিয়াছিল। তাহা মঞ্জুর হইয়াছে। এক্ষণে ৩০টি শয্যা লইয়া ঐরূপ রোগীদের এক হাঁসপাতাল আরম্ভ করা হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানের খরচ কুলাইবার জন্য কর্পোরেশ্যান এক-কালীন ৫,০০০৲ টাকা ও বাৎসরিক ১০,০০০৲ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যণ্ড, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে দীর্ঘ ৯ বৎসর অতিবাহিত করিয়া আসামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসাম সাহিত্য সম্মিলন হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়।

অতঃপর ডাক্তার সন্দিকৈ জোড়হাটে ছাত্রদের সম্মিলনে সভাপতির কাজ করেন। তিনি বলেন,—

"ইয়োরোপে ছেলেপিলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় যেন তারা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে। সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির ব্রতই তাই। আর আমাদের দেশে ৮ বৎসর পরিশ্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে পৌঁছায় ও সেখানে আরও ৪।৫ বছর সময় নষ্ট করে। ইংল্যণ্ডে, জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে হাজার হাজার সেকেণ্ডারী স্কুলের পড়ুয়া এমন বিদ্যা পায় যা আমাদের এম, এ'রাও পায় কিনা সন্দেহ।

জার্ম্মাণির শিক্ষাব্যবস্থা

"সেকেণ্ডারী শিক্ষা বিষয়ে জার্ম্মাণি দুনিয়ার সেরা। সেখানে ৩ ধারায় শিক্ষাদান চলিয়া থাকে—

(১) গিমনাসিয়ুম্। এখানে সাহিত্যিক শিক্ষা—ল্যাটিন ও গ্রীক সুদ্ধ—দেওয়া হয়।

(২) রেআল-গিমনাসিয়ুম। এখানে "আধুনিক বিষয়ে" শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) রেআল-শুলে। এগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

"বিভিন্ন রুচি অনুসারে ছাত্রেরা কেহ আইন, কেহ উচ্চতর বিজ্ঞান, কেহ বা সাহিত্য পড়ে।

"ভারতের স্কুলমাষ্টারদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

ইংল্যাণ্ডে, জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাই স্কুলের মাষ্টার হইতে পায়। দুঃখের বিষয় ভারতের স্কুল-শিক্ষা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

"স্কুলে শিক্ষা-বিকাশের আর এক বাধা আমাদের সাহিত্য ও ভাষার অবনত অবস্থা। নিজ ভাষায় তাড়াতাড়ি সব বিষয় শিখা যায়।

"জার্ম্মাণিতে উন্নত প্রণালীর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার জন্যই বৈজ্ঞানিক বাণিজ্যে এরূপ উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশেও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বিস্তার হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।"

ভারতীয় চাষীদের দাবী

আহম্মদাবাদের "দি ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মারস্ অ্যাণ্ড পেজান্টস্ ফেডারেশন বা "ভারতীয় চাষী সম্মিলন" ভারত-সচিবের কাছে নিম্ন মর্ম্মে এক চিঠি পাঠাইয়াছে,—

"বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছে, ভারতের চাষী লোকদের হিত ও মঙ্গল সাধন করা হইবে। ভারতের সমগ্র জনবলের ৭২% চাষী বা কৃষক। আর গত সেন্সাস অনুসারে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ৮%।

"ভারতের যে কোন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ঘটুক তার প্রত্যক্ষ ফলটা অর্শিবে লক্ষ লক্ষ চাষীর উপরে বা সম্রাটের শতকরা ৭২ জন প্রজার উপর। তাদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষার অবস্থার উপর হাত পড়িবে। সুতরাং এই লক্ষ লক্ষ প্রজার দিকে চাহিয়া আগামী কমিশনে অন্ততঃ এমন একজন ভারতবাসীকে নির্ব্বাচিত করা হোক্ যিনি তাদের মর্ম্মজ্ঞ।

"এদিকে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মাত্র ৩% জনের ভোট দিবার অধিকার আছে। লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী প্রজা তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে না। এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতীকার দরকার।"

কলিকাতা দন্ত-বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের রিপোর্ট

এই প্রতিষ্ঠান ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোকের হিতসাধন করিয়াছে কিনা তাহার বিচারভার জনসাধারণের উপর। তবে আমরা অন্য কোন উপকার করিয়া থাকি আর না থাকি কতকগুলি বালকবালিকার জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়াছি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। ভারতবর্ষে দন্তবিদ্যার এখনও শৈশবাবস্থা। সসম্ভ্রমে জীবিকা উপার্জ্জনেচ্ছু অনেকেই জানে না যে দন্তবিদ্যাশিক্ষা তাহাদের পক্ষে কত উপযোগী এবং সুযোগপূর্ণ এবং তদ্দ্বারা তাহারা দেশের কতদূর সুখ ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারে। আজকাল অনেকেই কার্য্যকরী শিক্ষার কথা বলিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে লোকেরা দন্তবিদ্যা-শিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে জানিতে পারে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। অদ্যকার পুরস্কার বিতরণী সভার মত অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারাই সেই বিজ্ঞাপন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে এবং আমাদের কার্য্যকলাপও সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিয়া থাকে।

ছাত্র-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা মোটে ৩৫ জন ছিল। তন্মধ্যে ৩২ জন বালক এবং ৩ জন বালিকা। ১৩ জন ছাত্র কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯২৬ সনের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে কলেজের উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতি দর্শনে আমরা সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। দন্তবিদ্যায় সাধারণ চিকিৎসা বিদ্যার মত অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সুযোগ বা সুবিধা আছে বলিয়া ক্রমশঃ যে লোকে অনুভব করিতে পারিতেছে ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমাদের আনন্দ হয়। এই বিদ্যালয়ের একটী বিশেষত্ব এই যে, এই বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের এবং ব্রহ্ম, সিংহল ও শ্যামদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নভাষী ছাত্র অধ্যয়ন করে। ইহার একমাত্র কারণ এই বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের মধ্যে এইটীই একমাত্র বিদ্যালয় যেখানে পূর্ণমাত্রায় দন্ত বিদ্যাসম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

অধ্যয়নকাল

গত বৎসর হইতে কলেজের অধ্যয়নকাল ৩ বৎসর

করা হইয়াছে। কলেজের পরীক্ষা সংসদ পাশ্চাত্য দেশের প্রধান প্রধান দন্তবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকাসমূহ আলোচনা করিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য একটী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, যদ্দারা আমাদের বর্ত্তমান অভাবসমূহ সম্যক পূরণ হইবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। এতদসম্পর্কে সমালোচকদিগকে এইমাত্র স্মরণ করাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯২১ সনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকে কোনও দন্ত চিকিৎসকের নিকট কিছুকাল শিক্ষানবিশীর পর মাত্র দুই বৎসর দন্তবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া দন্তবিদ্যাশিক্ষা পরিসমাপ্ত করিত। এই হিসাবে ধরিতে গেলে আমাদের ক্রমোন্নতি মন্থর গতিতে হইয়াছে বলা যায় না। তথাপি অর্থ-বলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিলাভ করা আমাদের ইচ্ছা।

বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাস হইতে আমরা বহুবাজারের এই নূতন প্রশস্ত বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছি। এই বাড়ী পুরাতন বাড়ী অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। এইখানে আমরা বিজ্ঞানাগার, বক্তৃতাগার প্রভৃতির জন্য বড় বড় কামরা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কলেজ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকিলে আরও কয়েকবৎসর এই বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ছাত্রদের পাঠাগারের জন্য একটি কামরা নির্দ্দেশ করা গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে একটি পুস্তকাগারও খোলা হইয়াছে। অস্ত্রোপচারের সময় ছাত্রগণ উপস্থিত থাকিয়া যাতে ভালরূপে দেখিতে ও শিখিতে পারে তজ্জন্য নাতিবৃহৎ একটি গ্যালারি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাঁসপাতাল বিভাগের জন্যও যথেষ্ট স্থান দেওয়া গিয়াছে। ইহাতে ছাত্রগণের কার্য্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পর্দ্দানশীন মহিলাদিগের জন্য একটি কামরা ব্যবহার করা যাইতে পারে। নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসাতেই পূর্ব্বোক্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি। অন্যান্য বৎসর স্থানাভাবে কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশন অন্যত্র করিতে হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা নূতন বাড়ীর প্রশস্ত হল কামরায় সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ।

কলেজের পুরাতন ছাত্র

কলেজের পূর্ব্বতন ছাত্রদের কয়েকখানা চিঠি আমাদের নিকট আসিয়াছে। তাহা পাঠ করিলে আমাদের ছাত্রগণ সংসারে প্রবেশ করিয়া কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছে তাহা বুঝা যাইবে। তাহাদিগকে আমাদের সাধ্যমত ভাল শিক্ষা দিতে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করি নাই। তাহারা যে যেখানেই ব্যবসা আরম্ভ করুক না কেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে উন্নতিলাভ করিতেছে। ইহাই হইল বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরীক্ষা-সংসদ

এই উপলক্ষ্যে পরীক্ষা সংসদের সভ্যবৃন্দকে একাগ্রমনে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা একদল শিক্ষক পাইতে সমর্থ হইয়াছি যাঁহারা স্বল্পমাত্র ভাতা গ্রহণ করিয়া কলেজের জন্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন। বাস্তবিকই এরূপ শিক্ষকবর্গ কলেজের সম্পদ্‌স্বরূপ এবং তাঁহাদিগকে ছাড়া কলেজ বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিত না। শিক্ষক মণ্ডলীর সকলেই কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার। তাঁহাদের অবসর অতি অল্প। তথাপি তাঁহারা নামমাত্র ভাতা গ্রহণ করিয়া যে কলেজের জন্য তাঁহাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উন্নত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্থিক অবস্থা

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবার কলেজের আয়ব্যয় সমান হইয়াছে। এরূপ হওয়া কলেজের পক্ষে এই প্রথম। এযাবৎ আমরা কাহারও নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হই নাই। তথাপি কলেজ যে বর্ত্তমান সচ্ছল অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে তাহা অতীব সুলক্ষণ বলিতে হইবে। একমাত্র প্রাপ্ত ফি দ্বারাই কলেজের সব ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে।

কলেজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানাগারের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক গবেষণাগার স্থাপন করিতে হইবে। অর্থ-সাহায্যের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। তাঁহারা সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা নগরীর, গৌরবের বিষয় এই যে, ভারতের প্রথম দন্তবিদ্যালয় কলিকাতাতেই স্থাপিত হইয়াছে। যেদিন লোকে দন্তবিদ্যার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে শিখিবে সেদিন আমাদের অর্থ-সাহায্যের প্রার্থনা বিফল হইবে না। তবে আমাদিগকে অদম্য উৎসাহে প্রতিনিয়ত প্রচার-ব্রতে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

দানশীল জনসাধারণকে এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, দন্তবিদ্যা শিক্ষার সাহায্য করা অর্থে ছাত্র-সমাজকে সাহায্য করা বুঝায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে লোকের যুগযুগান্তরের কষ্ট দূর করা বুঝায়। এই অনুষ্ঠানকে সাহায্য দান করিলে তাহা সুপাত্রেই প্রদত্ত হইবে। তাহাতে লোক-সেবা ও জাতিগঠনের সহায়তা দুইই হইবে।

হাঁসপাতাল বিভাগ

১৯২৬ সনের মার্চ্চমাস হইতে ১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলেজের ছাত্রগণ টিউটরিয়্যাল ডেণ্টাল সার্জ্জনের তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত রোগী দেখিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে হাঁসপাতালে মোট রোগীর সংখ্যা			২৩২০
"	"	" দন্তচিকিৎসা	৮০
"	"	" দাঁত ভর্ত্তি করা	১১২৫
"	"	" রুট ক্যানেল চিকিৎসা	১৩৬
"	"	" দাঁত তোলা	৪২৬৭
"	"	" কৃত্রিম দাঁত বসান	৩০৪৯

দাঁত ভর্ত্তি করিতে ও কৃত্রিম দাঁত বসাইতে সামান্য মাত্র চার্জ্জ করা হয় এবং দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। কলেজের দন্ত-চিকিৎসা বিভাগ কলিকাতা ও সহরতলীর দরিদ্র অধিবাসিবৃন্দের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। কলেজের দন্ত-চিকিৎসা বিভাগ না থাকিলে এই সমস্ত লোকের অনেকেই নীরবে সমস্ত দন্ত-রোগ ভোগ করিত। স্কুলের অনেক ছাত্রেরই দন্ত-চিকিৎসকের ফি দিয়া চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা নাই। এমন ছাত্র-দিগকে হাঁসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ

আমাদেশ ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্রদ। এতদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিদ্যায় যে বিভাগকে অবহেলা করিয়া আশা হইতেছে সেই বিভাগের শিক্ষার আয়োজন করিতে আমরা চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সবেমাত্র নূতন, এখনও ইহার শৈশব দশা।

প্রথম আরব্ধ সকল কাজের ন্যায় আমাদের এই কাজও বিপদ-সঙ্কুল। আমরা জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য ও উৎসাহ নাও পাইতে পারি; কিন্তু আমাদের আনন্দ কাজ করায়, লোকের প্রশংসায় নহে। বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মত দন্ত-বিদ্যায় উপাধি-প্রদান প্রথা আমাদের দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও প্রবর্ত্তন করেন নাই। গবর্মেণ্টও তাহার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। এই সমস্ত বিষম ভুলের সংশোধন যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা আন্দোলন চালাইতে থাকিব। যাবতীয় উন্নতির মূল আমাদের ন্যায় নীরব কর্ম্মপটুতা। ইতিমধ্যেই আমরা শুনিতে পাইতেছি কোনও কোনও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব প্রদেশে দন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছেন। আমরা বলি আমাদের এই বিদ্যালয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। যে দিন দেখিব প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এক একটি করিয়া দন্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, সে দিন বুঝিব আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করিয়াছি।

যুবক ব্রহ্মের শিক্ষা-অনুসন্ধান

গত এপ্রিলমাসে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশের যুবকদের টেক্‌নিক্যাল ও ভোকেশন্যাল শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটি বসাইয়াছেন।

কমিটির চেয়ারম্যান হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ই, সি, নিহেবন রেঙ্গুন পোর্ট ট্রাষ্টের প্রধান এঞ্জিনিয়ার ; আর সেক্রেটারী হইয়াছেন রেঙ্গুন গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ডাব্লিউ, জি, ফ্রেঞ্চ।

কমিটি বসিবার পূর্ব্বে কাজের সুবিধার জন্য চেয়ারম্যানের পূর্ব্বাহ্ণে লিখিত প্রস্তাব অনুসারে এই কয়টা সম্পূর্ণ পৃথক সাব-কমিটির সৃষ্টি হয় :—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্।

(খ) সকল শ্রেণীর "কমার্শ্যাল" বা বাণিজ্যিক স্কুল।

(গ) ভোকেশন্যাল স্কুল এবং কৃষি ও আনুষঙ্গিক শিক্ষা।

(ঘ) অন্যান্য ভোকেশন্যাল প্রতিষ্ঠান।

বাঙ্গালায় শ্রেণীবিশেষের শিক্ষা

(১৯২৫-২৬)

বঙ্গদেশে ভারতীয় নরপতি বা সর্দ্দারদের ছেলেপিলের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুরের প্রতিষ্ঠানে নিজামৎ পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ৪টা হোটেলের মধ্যে ১টা একমাত্র নিজামৎ পরিবারের জন্য। এ বছর এ হষ্টেলে ২৬টি ছেলে ছিল। গত বছরেও ২৬ জন ছিল। খরচ হইয়াছে ৬,২১১৲ টাকা।

ক। "অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা

"আদিম" জাতিগুলির মধ্যে সাঁওতালরা ও শিক্ষায় অনুন্নতদের মধ্যে নমঃশূদ্র ও পোদরা বিশেষ উন্নতি দেখাইতেছে।

১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ অবধি শিক্ষায় অনুন্নতদের মোট ২,৫৪,৮৩৩ জন বালক ও ২৩,১৭২ জন বালিকা শিক্ষা পাইতেছিল।

(১) কলিকাতা

এবছর খৃষ্টান পাদ্রীদের অধীনে ১৩টা ও হিন্দুদের তত্ত্বাবধানে ৬টা প্রাইমারি স্কুল চালিত হইয়াছে। এগুলি প্রধানতঃ শিক্ষায় অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য। এই সব স্কুলে মোট ৮০৭ জন ছাত্র পড়িয়াছে। তন্মধ্যে ৪৯৭ জন অনুন্নত শ্রেণীর।

(২) প্রেসিডেন্সি বিভাগ।

কলিকাতার বাহিরে এই বিভাগে ৩১ মার্চ্চ (১৯২৬) পর্য্যন্ত স্কুলগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীর ৭৯,৯৯৪ জন বালক, ৬৩,৭৭৮ জন বালিকা পড়িতেছিল।

যশোহর জিলার অন্তর্গত নশিয়াহাটির উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ও মুলিয়াট্ ও ফুলিয়ার মধ্য ইংরেজী স্কুলদ্বয়ে প্রধানতঃ নমঃশূদ্ররা পড়ে। স্কুলগুলির মাষ্টার-পণ্ডিত প্রায় সবাই নমঃশূদ্র।

খুলনা জিলায় প্রধানতঃ নমঃশূদ্র ও পোদদের শিক্ষা-কাজে ১০টা মধ্য ইংরেজী স্কুল আছে।

২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জিলার অনেক প্রাইমারি স্কুলে প্রধানতঃ অনুন্নতঃ শ্রেণীর ছেলেপিলেরা শিক্ষা পায়। ২৪ পরগণা জিলার ৩টা প্রাইমারি স্কুল সাসেক্স ট্রাষ্ট ফাণ্ডের আয় হইতে চালিত হইতেছে।

এই বছর অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ১০টা মধ্য ও ১৬টা উচ্চ প্রাইমারি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

(৩) বর্দ্ধমান বিভাগ

বর্দ্ধমান বিভাগে নানা "আদিম" জাতির বাস। তন্মধ্যে সাঁওতালরা সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

এই বছর স্কুলের সংখ্যা এইরূপ :—

উচ্চ ইংরেজী স্কুল	—১টা
মধ্য বাঙ্গালা „	—২টা
প্রাইমারি „	—২৩৬টা
গুরু-ট্রেনিং „	—২টা
শিল্প স্কুল „	—২টা
মোট	—২৪৩টা

শ্রেণীবিশেষের শিক্ষার জন্য এই স্কুলগুলি। খরচ পড়িয়াছে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২৫,৬১৫৲ টাকা, জিলা ফাণ্ড হইতে ২,৮৫৮৲ টাকা। স্কুলগুলিতে ছাত্র হইয়াছে ৫৬,৪৪৮ জন।

১টা মধ্য, ৬টা উচ্চ প্রাইমারি ও ৮টা নিম্ন প্রাইমারি বৃত্তি এই ছাত্রদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) ঢাকা বিভাগ

৩১ মার্চ্চ (১৯২৬) জানা যায়, প্রধানতঃ শিক্ষায় অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ৯৯, ছাত্রসংখ্যা ৩,৪৪১ জন। এই স্কুলগুলির মধ্যে ৯টা শুধু জেলেদের জন্য, ৬টা মুচিদের জন্য, ২৬টা নমঃশূদ্রের জন্য ও ১৯টা দোয়াইদের (?) জন্য। মুচি ও জেলেদের স্কুলগুলি অবৈতনিক।

ফরিদপুর জিলায় অষ্ট্রেলিয়ান পাদ্রীদের স্থাপিত ওরাকান্দি ইংরেজী স্কুল, এবং গোপীনাথপুর ইংরেজী স্কুল দ্বয়ে বেশীর ভাগ নমঃশূদ্রের ছেলেরা পড়িতে আসে। এ ছাড়া ১০টা মধ্য ইংরেজী স্কুলে ও অনেকগুলি প্রাইমারি স্কুলে প্রধানতঃ নমঃশূদ্র বালকেরা পড়ে।

সুন্দর বনে "উপনিবেশ" স্থাপন চলিতেছে। মগেদের জন্য বাখরগঞ্জ জিলা বোর্ড ১২টা অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল চালাইতেছে।

(৫) চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রধান আদিম জাতি হইতেছে চকমা, মগ, তিপ্রা।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িয়া ছেলেপিলেদের শিক্ষার জন্য ১টা উচ্চ ইংরেজী স্কুল, ২টা মধ্য স্কুল, ১৫৮টা প্রাইমারি স্কুল ও ৩৮টা "দেশী" (কিয়াঙ্) স্কুল চলিতেছে। প্রাইমারি স্কুলের জন্য শিক্ষক তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রকোণার পাদ্রীরা এক স্কুল চালাইতেছে।

ত্রিপুরা জিলার লালমাই পাহাড়ে তিপ্রাদের জন্য ৩টা অবৈতনিক স্কুল চলিতেছে।

কক্সবাজার সাবডিভিসনে ৫টা সরকারী বর্ম্মা স্কুল, ৪টা প্রাইমারি স্কুল, ১টা মধ্য ইংরেজী স্কুল ও মগ ছাত্রদের জন্য ২০১টা কিয়াঙ্ স্কুল রহিয়াছে।

এই গেল আদিম অধিবাসীদের কথা। তা ছাড়া অন্য অনুন্নত শ্রেণীদের ১৯,৭১৪ জন চট্টগ্রাম বিভাগের উচ্চ, মধ্য ও প্রাইমারি স্কুলে পাঠ লইয়াছে। তন্মধ্যে বালক ১৬,৮৪৯ ও বালিকা ২,৮৬৫।

এই অনুন্নত শ্রেণী হইতে ৯ জন মধ্য ও ৪০ জন প্রাইমারি বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

(৬) রাজসাহী বিভাগ

দিনাজপুর জিলায় ৫৩টা (+১টা মধ্য ইংরেজী) সাঁওতাল স্কুলে ১,৬১২ জন ছাত্র পড়িয়াছে। তন্মধ্যে ৭টা প্রাইমারি স্কুল প্রত্যক্ষভাবে দিনাজপুর সাঁওতাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন ছিল, আর ২৩টা সাহায্য পাইত। সাঁওতাল শিক্ষা বোর্ডের এই প্রতিষ্ঠানগুলি এ বছর প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২,৩৪২৲ টাকা ও জিলা ফাণ্ড হইতে ১,৯৬৫৲ টাকা পাইয়াছে।

মালদহ শিক্ষা বোর্ড ১০টা প্রাইমারি স্কুলে বিশেষ বিশেষ হারে বৃত্তি দিয়াছে। বছর-শেষে জিলায় সাঁওতাল স্কুলের সংখ্যা ৩০ হইয়াছে।

রাজসাহী জিলায় প্রধানতঃ নমঃশূদ্রের জন্য ২টা স্কুল ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য ৭টা স্কুল ছিল।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি (বাঙ্গালা ও আসাম) এই বিভাগের অনুন্নতদের শিক্ষাকল্পে বিভিন্ন স্থানে ৪০৫টা স্কুল চালাইয়াছে। এই সমিতি এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বছর বছর ৬,২৫৯৲ টাকা করিয়া পায়।

খ। বিকলাঙ্গের শিক্ষা

কারসিয়াঙে শারীরিক ও মানসিক বিকলাঙ্গ ইয়োরোপীয় ছেলেমেয়েদের জন্য "চিলড্রেন্স হাউস্" বা "ছেলেমেয়েদের ঘর" নামে এক প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯২৬, ৩১ মার্চ্চ এখানে ১৫ জন ছেলেমেয়ে ছিল।

কলিকাতার মূকবধির বিদ্যালয়ে ১০৬ জন শিক্ষা পাইয়াছে। তন্মধ্যে বালিকা ১৬ জন। কলিকাতার অন্ধ বিদ্যালয় উঠিয়া ২৪পরগণা জিলার অন্তঃপাতী বেহালায় গিয়াছে। নূতন বাড়ী তৈয়ারীর জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে ৫১,০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। স্কুলে ৪৫ জন শিক্ষা পাইয়াছে। তন্মধ্যে বালিকা ১৩ জন। এই স্কুলে লিখিতে পড়িতে, অঙ্ক করিতে, গান করিতে, কাপড় বুনিতে, ও ছুতারের কাজ করিতে শিখান হয়।

ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশালের অন্ধবিদ্যালয়গুলিতে যথাক্রমে ২০,৮ ও ১৩ জন শিক্ষালাভ করিয়াছে।

এই বছর মৈমনসিংহে ১৪ জন অন্ধ বালককে লইয়া একটা অন্ধবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামের মূক-বধির বিদ্যালয়ের ক্লাসে ১১জন পড়িয়াছে, তন্মধ্যে বালিকা ৪ জন।

গ। চা-বাগানের স্কুল

জলপাইগুড়ি জিলাতে প্রত্যেক শ্রেণীর স্কুল-সংখ্যা এইরূপ :—

ক্লাস "এ"—১০
ক্লাস "বি"—২৪
ক্লাস "সি"—২২

মোট—৫৬

বছরশেষে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১,০৪২। এই স্কুলগুলির জন্য খরচ পড়িয়াছে মোট ২,৮১১৲।

দারজিলিঙ জিলায় চা-বাগান স্কুল ছিল ৫২টা। ছাত্র পড়িয়াছে ১,১৪০ জন। এইগুলিতে খরচ পড়িয়াছে ৯,২৮৪৲ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ও জিলা বোর্ড হইতে যথাক্রমে ৪,৬৮৫৲ টাকা ও ৩৬০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ঘ। ফ্যাক্টরীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা

২৪পরগণা জিলায় মিলের মজুরদের ছেলেমেয়েরা মিলের হাতার ভিতরে অবস্থিত প্রাইমারি স্কুলে ও মক্তরে শিক্ষা পায়।

তিতাগড়ে এক বিশেষ প্রাথমিক স্কুল আছে। সেখানে হিন্দী, উর্দ্দু, তেলেগু শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্কুলটা মাসে মাসে ৬০৲ টাকা করিয়া সাহায্য পায়। চালক মিলের কর্ত্তারা।

ইছাপুরে রাইফ্‌ল ফ্যাক্টরী স্কুল বেশ জনপ্রিয়। এবছর প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২,৭০০৲ টাকা পাইয়াছে। ইছাপুরে আর একটা আন্‌এইডেড্ স্কুল আছে। সেটা মেটাল ফ্যাক্টরীর মালিকরা চালায়।

ঙ। জৈনদের শিক্ষা

৩১ মার্চ্চ (১৯২৬), তারিখে বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত জৈন স্কুলে ৪৯ জন ছাত্র ছিল। গত বছর এই সময় ছাত্র-সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ জন।

চ। মুসলমানদের শিক্ষা

এবছর সকল রকম ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান পড়ুয়ার সংখ্যা ১০,৫২,৩৬৬ জন হইয়াছে। গত বছর ছিল ১০,১৮,৫৯৩। মোট ছাত্রের তুলনায় মুসলমান ছাত্রের অনুপাত ৪৭·৬%। গত বছর ছিল ৪৭·৩%।

এই অনুপাত কোন্ শিক্ষাক্ষেত্রে কিরূপ তা নিয়ে বুঝান যাইতেছে :—

	কলেজ		স্কুল		
	আর্টস্	প্রফেসনাল	উচ্চ	মধ্য	প্রাইমারি
১৯২৪-২৫ সন	১২·৯%	১২·২%	১৪·৬%	১৭·২%	৫০·৫%
১৯২৫-২৬ সন	১৩·৭%	১৩·২%	১৫·০%	১৭·৬%	৫০·৫%

মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য কত খরচ হয়, ঠিক করিয়া বলা শক্ত ; কারণ, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাটা আলাদা নয়, স্কুলের সব জাতের সঙ্গে হয়।

(খ) বিদেশী

লাইপৎসিগে কেতাব-প্রদর্শণী

"অব্‌জার্ভার" নামক পত্রের এক সংবাদদাতা বার্লিন হইতে লিখিতেছেন :—

আন্তর্জ্জাতিক কেতাব-প্রদর্শণী লাইপ্‌ৎসিগে খোলা হইবে শীঘ্রই। চারু শিল্পের দিক্ হইতে ব্যাপারটা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ হইবে।

ভাল ভাল বই দেখান হইবে। ভাল বইয়ের অর্থ দেখিতে সুন্দর বই।

জার্ম্মাণি এবিষয়ে এক নয়া পথে মাথা খেলাইয়াছে। একটিমাত্র লেখকের গ্রন্থাবলীর রকমারির সংস্করণ দেখাইয়া পুস্তক প্রকাশের উন্নতির ধাপগুলি দেখান হইবে।

ছাপা ও বাইণ্ডিং বিষয়ে জার্ম্মাণ উন্নতি দেখাইবার জন্য

গেয়ারহার্ট হাউপট মনে মনোনীত হইয়াছেন। তাঁর কেতাবের নানা সংস্করণ এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইবে।

ছেলেপিলেদের বই-কেতাবের এক বিশেষ বিভাগ থাকিবে। জার্ম্মাণি মাত্র ৩০টা দেখাইবে।

ফরাসী ইংরেজের কয়লা চায় না

১৩ই জুনের একটা খবরে প্রকাশ:—

ফরাসী আইন জারি হইয়াছে যে, লাইসেন্স ব্যতীত ইংরেজের কয়লা ফ্রান্সে ঢুকিতে পাইবে না। ইহাতে ইংরেজ গবর্মেণ্ট চঞ্চল ও চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত এ, এম্, সামুয়েল কমন্স-গৃহে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, "ফরাসী রেলওয়েগুলিকে কয়লা জোগাইবার জন্য, সাউথ ওয়েলস্ ২০ লক্ষ টনের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল। তার গতি কি হইবে?"

সামুয়েল পরে বলিয়াছেন, "আমাদের রাজদূত ফ্রান্সের অনেক হাতে পায়ে ধরার পর কিছু সুরাহা হইয়াছে। অন্ততঃ যে সব কণ্ট্রাক্ট লওয়া হইয়াছে সেগুলি রদ হইবে না। মিয়াদের সময়টা ১০ই জুন পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ গোপনীয় বৈঠক

সম্প্রতি (১৩।১৪ জুন) ইংরেজ ও জার্ম্মাণ শিল্প-পতিদের মধ্যে বৈঠকটা শেষ হইয়াছে। এটা আরম্ভ হইয়াছিল ইংল্যাণ্ডে গত ডিসেম্বর মাস হইতে। উদ্দেশ্য ইয়োরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি করা৷ এই বৈঠকের উদ্যোক্তা জার্ম্মাণ ডাইষ্টাফ্ কর্পোরেশন। ইংরেজ প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন যানবাহন-মন্ত্রী ও কর্ণেল অ্যাস্লি। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ চ্যান্সেলার কুনো একজন প্রতিনিধি।

বৈঠকটা গোপনীয় অর্থাৎ ইহার সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার উপায় নাই। তবে মোদ্দা কথা কয়টা এই প্রকার:—

(১) কৃষি ও শিল্প—পরস্পরেরর সম্পর্কটা দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর করা দরকার।

(২) প্রস্তাব হইয়াছে আগামী ষ্টকহল্‌ম্ আন্তর্জ্জাতিক চেম্বার অব্ কমার্স কংগ্রেসে বাণিজ্য-সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক সালিশীর কথা পাড়া হইবে। বৈঠকের এই প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি আছে।

(৩) দেশে দেশে ইঙ্গ-জার্ম্মাণ অধ্যাপক ও ছাত্র বিনিময় চলিবে।

(৪) উভয় জাতির গাহেকদের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা হইবে।

বৃটিশ প্রতিনিধি বলিয়াছেন, "এই বৈঠকের ফলে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটিবে।"

রুশিয়ার সহিত ইংরেজের বিবাদ

অ্যাংলো-রুশিয়ান পার্ল্যামেণ্টারি কমিটি এক নিবেদনে বলিতেছে—

"বাণিজ্য-সমঝৌতা রুশের সঙ্গে বাতিল করায় রুশের সঙ্গে আমাদের একটা বড় রকম ব্যবসা মাটি হইয়া গেল।

"১৯২০ সন হইতে এই ব্যবসার "টার্ণ ওভার" বা কিস্তিগত মূল্য কম্ সে কম ২০ কোটি পাউণ্ড একথা রুশো-বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্সের বিবরণ হইতে জানিতে পারি।

"অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনের বেকার-সমস্যা ও "কষ্ট্ অব্ লিভিং" বা "রাহা খরচ" এই দুই বাবদেই ইংরেজকে আবার চোখে অন্ধকার দেখিতে হইল বলিয়া।"

২২২৭ সনের মানব জীবন

ডাক্তার লুই ডাবলিন আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-তত্ত্বজ্ঞ। তিনি সম্প্রতি এক বাবা জীবন-বীমা কোম্পানীর ষ্ট্যাটিষ্টিক বা আঁকজোক বিভাগ হইতে এক দুনিয়াজোড়া জরীপের ফল প্রকাশ করিয়াছেন। কোম্পানীটি অবশ্য আমেরিকার।

শ্রীযুক্ত ডাবলিন বলিতেছেন, "মানবজাতি সুস্থতর ও সুন্দরতর হইতেছে। গড়ে তার আয়ুও বাড়িতেছে। সুতরাং বুদ্ধিমত্তাও বাড়িতেছে।

"আমাদের অঙ্ক হইতে জানিতে পারি ১০০ বৎসর আগে যে শিশু জন্মিত সে আজিকার শিশুর জীবনের অর্দ্ধেকটা মাত্র বাঁচিতে পাইত।

"আর সব-কিছু যদি সমান থাকে, এবং ক্যানসার, ব্রাইট পীড়া ও বাত যদি আরোগ্য করা সম্ভব হয়, তবে ৩০০ বছর পরে যে শিশু জন্মিবে সে আজিকার শিশুর চেয়ে দ্বিগুণ সময় বাঁচিয়া থাকিবে। অর্থাৎ শত বৎসর অবধি বাঁচিবে।

"১৮০০ সনে মনুষ্য-জীবনের পরমায়ু গড়ে ছিল ৩৪ বছরেরও কম। আজকালকার রিপোর্টে দেখা যায় তা দাঁড়াইয়াছে ৫৯·২ বৎসরে।

"ক্যান্সারের আরোগ্যোপায় বাহির হইলে গড়পড়তা পরমায়ু তৎক্ষণাৎ ৪ বছর বাড়িয়া যাইবে। ব্রাইট পীড়ার নিশ্চিত আরোগ্যতে আরও ২ বছর বাড়িবে।

"আর্থিক হিসাবটাও মূল্যবান্। আজও যে শিশু জন্মিতেছে তার দাম ১,৪৪৭ পাউণ্ড। ইহার ভবিষ্যৎ উপার্জ্জন-ক্ষমতার দাম ৮,২০০ পাউণ্ডের কাছাকাছি। আর্থিক দিক্ হইতে দেখিলে আজিকার দিনে সন্তান-পালনটা একটা মস্ত বড় লাভজনক ব্যবসায়ে টাকা খাটানোর মত।

"প্রত্যেক বছর বিজ্ঞানের সাহায্যে শিশু-মৃত্যুতে হ্রাস ঘটিতেছে। অর্থাৎ টাকা খাটানোটা উত্তরোত্তর লাভজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রত্যেক বছর যুক্তরাষ্ট্রে জন্মের পর ১ বছরের মধ্যে নিবারণসাধ্য কারণে ১ লক্ষ ২০ হাজার করিয়া শিশু-মৃত্যু ঘটে। নিট্ ভবিষ্যৎ অর্জ্জন-ক্ষমতাকে ধরিয়া ইহাদের পুঁজিপাটার দাম ১৫ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি। এক্ষণে বেশী বেশী শিশু সর্ব্বত্র বাঁচিয়া থাকিতেছে ও যুবকরা বেশী দিন বাঁচিতেছে।

"ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অনেক বেশী সুন্দর হইবে। কিন্তু টাক পড়াটা বাড়িবে।"

"আমাদের কাজ মানুষের পরমায়ুর মিয়াদ কিসে বাড়ে তাহা দেখা। অন্য লোকেরা দেখিতেছে ও খাটিতেছে কিসে দীর্ঘ পরমায়ু ঘটনাপূর্ণ ও কাজের হয়।"

আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র-সঙ্ঘ

জেনেভার ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ষ্টুডেণ্ট সার্ভিসের পক্ষ হইতে এক মহিলা মহাত্মা গান্ধীকে এক চিঠি লিখিয়াছেন। তার কিছুটা এইরূপ :—

"গান্ধীজি, আমাদের আন্তর্জ্জাতিক পড়ুয়া পত্রিকা "ভোক্স ষ্টুডেন্শিয়াম্" বা "পড়ুয়াদের বাণী"তে আপনার লেখা একটা প্রবন্ধ চাই। কাগজটা বাহির হইবে জুলাই মাসের শেষ তারিখে। তার প্রবন্ধগুলি অন্ততঃ ৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে পাওয়া চাই। আপনি যদি ইতিমধ্যে একটা প্রবন্ধ লিখিবার সময় না পান, দয়া করিয়া অন্ততঃ বাণী হিসাবে কয়েক লাইন লিখিয়া পাঠাইবেন।"

লীগ অব্ নেশন্‌সের আন্তর্জাতিক মজুর আফিসের জাপানী সভ্য শ্রীযুক্ত আয়ুসাহরা এক মেমর‍্যাণ্ডুম তৈয়ারী করিয়াছেন। ইনি উক্ত ছাত্র-সঙ্ঘের পূর্ব্ব-পশ্চিম কমিশনের চেয়ারম্যানও বটেন। আগামী গ্রীষ্ম সম্মিলনে এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে। এবং ভোক্স ষ্টুডেন্শিয়ামের জুলাই সংখ্যায় এবিষয়ে অনেক প্রবন্ধ বাহির হইবে যাতে ছাত্রেরা প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারে।

গান্ধীর নিকট একখানা মেমোরেণ্ডাম পাঠাইয়া উক্ত মহিলা বলিতেছেন, "গান্ধীজি, জানি আপনার সময় খুব কম। কিন্তু আপনি যদি কষ্ট করিয়া আধঘণ্টা সময়ও আমাদের জন্য দেন, তা বৃথা হইবে না। সকল দেশের হাজার হাজার পড়ুয়া আপনার বাণী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। তারা আপনাকে জগৎ বা বিশ্ব-বিবেকের প্রধান পুরোহিত রূপে ঠাওরাইতেছে।"

মেমর‍্যাণ্ডাম

জগতের মানুষ সর্ব্বত্র এক। কোন বিশেষ দেশে জন্মিয়াছে বলিয়া মানুষ বিশেষ গুণের অধিকারী হইবে বা অসাধারণ কিছু হইবে, এমন হইতে পারে না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্যার অর্থটা কি ?

ইহার কোন অর্থ নাই। প্রাচ্য দেশ একটা অস্পষ্ট কথা। বিগত কয়েক দশক যাবৎ প্রাচ্য জগতের জনগণ জাগিয়া উঠিয়াছে ও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। তার সাক্ষী জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, প্রাচ্যের নিকটতর তুরস্ক ও মিশর।

পাশ্চাত্য দেশ, ইয়োরোপ ও আমেরিকা গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে বাকী সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে ও শোষণ করিতেছে। কিন্তু আজিকার জাগ্রত

প্রাচ্য এই অধীনতা ও অত্যাচারের পাশ ছিন্ন করিতে চায়। বলা বাহুল্য সেদিন সুদূর নয় যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে একটা তুমুল শক্তি-পরীক্ষা ঘটিবে। এই সমস্যা কেমন করিয়া সমাধান করা হইবে ?

আমরা সকল দেশের ছাত্রদিগকে আহ্বান করিতেছি এই বিশ্বসমস্যাটাকে তাদের দিক্ হইতে গুরুতর ভাবে আলোচনা করিতে। কারণ আজিকার পড়ুয়া কাল নেতা হইবে। তারই কাঁধে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ ব্যবস্থা ও শাসনের দায়িত্ব পড়িবে। এক কথায় তার দেশের ভবিষ্যৎ তাহাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ফিল্মের সাহায্যে শিক্ষাদান

বৃটিশ ইনষ্ট্রাক্‌শনাল ফিল্মের এডুকেশন্যাল অ্যাডভাইসার বা শিক্ষাসংক্রান্ত উপদেষ্টা কুমারী ফিল্ড সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"শুধু স্কুলের ব্যাপারে নয়, সাধারণের শিক্ষা-ব্যাপারেও ৫ দেশের ফিল্ম বৃটেনকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই দেশগুলির নাম যথাক্রমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি ও রুশিয়া।"

আমেরিকার দৃষ্টান্ত

কুমারী ফিল্ডের বক্তৃতার সারমর্ম্ম এইরূপ :—"আমেরিকার কথা আলাদা—সেখানে ধনী লোকের কম্‌তি নাই। বহু ধনীর টাকাতে সহজে ফিল্ম দেখাইবার কলকব্জা কিনা হইয়াছে। অনেক দোকান ক্লাসে ফিল্ম দেখাইবার ভার লইয়াছে।

"কিন্তু সাধারণ পিক্‌চার হাউস্ বা বায়োস্কোপ গৃহে ঠিক ইংল্যাণ্ডের মত যা-তা ছবি ছেলেদের দেখান হয়। বাছ বিচার নাই।"

"কাজেই বায়োস্কোপ কোম্পানী ও সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এমন দৃশ্য বিরল নহে—একই সড়কের দুই ধারে দুই রকম ছবি দেখান হইতেছে। একদিকে রহিয়াছে কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। অন্যদিকে রহিয়াছে গির্জ্জায়।

ফ্রান্সের সরকারী স্কুলে

"১৯২১ সনে শিক্ষা বোর্ডের তাঁবে এক বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হয়। সরকার স্থির করেন, যে কোন স্কুল বা প্রতিষ্ঠান ফিল্ম দেখিতে চায়, বিভাগ হইতে বিনামূল্যে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

"ঐ বৎসর ৫০০ ফিল্ম পাঠান হয়। গত বছর (১৯২৬) ৩৪,০০০ ফিল্ম পাঠান হয়।

"সরকার-নিরপেক্ষ হইয়া লিঅঁ জনপদ ফিল্মের মিউনিসিপ্যাল ব্যবসা আরম্ভ করে। শহরের প্রতিষ্ঠান হইতে স্কুলে, হলে, ফ্যাক্টরীতে ফিল্ম পাঠান হয়। ইহার ব্যবসা এবং শিক্ষাদান এই দুই উদ্দেশ্যই আছে। এই প্রণালীতে বেশ টাকা উঠিতেছে। সেই টাকা আবার আরও ফিল্ম কিনিতে ব্যয়িত হয়।

ইতালির আইন

"ইতালিতে এক আইন মোতায়েন রহিয়াছে যে প্রত্যেক বড় শহর জাতীয় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে ফিল্ম দেখাইবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য।

জার্ম্মাণ প্রচেষ্টার রূপ

"জার্ম্মাণিতে মাষ্টারদের ও ছেলেপিলের বাপমাদের ইউনিয়ন রহিয়াছে। এই উভয় প্রকার ইউনিয়ন একত্র হইয়া ছেলেদের জন্য ভাল শিক্ষাপ্রদ ফিল্ম দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। ছেলেদের স্কুলের সময়ের মধ্যেই ফিল্ম দেখাইয়া লইয়া আসা হয়।

রুশিয়ায়

"গত বছর (১৯২৬) রুশিয়ার গবর্মেণ্ট স্কুল ও কলেজগুলিতে খাটাইবার জন্য ২,০০০ ফিল্ম যন্ত্রের অর্ডার দিয়াছিল

ইংল্যাণ্ডে—ব্যাটারসী ও লিভারপুল

"ইংল্যাণ্ডের ব্যাটারসী ও লিভারপুল অঞ্চলদ্বয়ে এ বিষয়ে একটু পরীক্ষা করা হইয়াছে।

"ব্যাটারসীতে উদ্দেশ্য ছিল ছেলেমেয়েদের মিছামিছি রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান বন্ধ করা। ফিল্ম দেখাইবার জন্য টাউনহল সাজান হইল। ওখানে ১,১০০ জন ধরে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় স্কুলছুটির পর ছবি দেখান হইল।

"ছেলেরা স্কুলেই ২পে অথবা ৪পে দিয়া দিত। ছবি দেখিবার জন্য এত কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল যে, শেষে সীটের সংখ্যা স্কুলগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইল। মাষ্টারেরা আবার সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

"শিক্ষা বিষয়ে দুইটা ফিল্ম দেখান হইত। মাঝে থাকিত একটা প্রহসন ফিল্ম ও দুঃসাহস ফিল্ম। মাষ্টারদের কাছে পূর্ব্বাহ্নেই ছাত্রদের বুঝাইবার জন্য ইতিহাস, ভূগোল, এমন কি ইংরেজী পাঠের পর্য্যন্ত নোট পাঠান হইত।

"ব্যবসা হিসাবে পরীক্ষাটা বেশ উৎরাইয়াছে। কতকগুলি ব্যবসায়ী লেক্‌চার হাউসের ম্যানেজার এখন এ বিষয়ে লইয়া মাথা ঘামাইতেছে।

"লিভারপুলের কর্ত্তারা প্রাথমিক স্কুলের বড় ছেলে-মেয়েদের সপ্তাহে একদিন করিয়া বায়োস্কোপ দেখাইতেন। তারা ক্লাসে যে বিষয় পড়িত সেই বিষয়ে ফিল্ম দেখান হইত! ফিল্ম দেখার পরে উহা লইয়া আলোচনা হইত।"

নব-যুগের স্রষ্টা জার্ম্মাণি

জার্ম্মাণিতে সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার ও পরীক্ষা হইতেছে। বিনা তারে টেলিগ্রামের কথা আমরা জানি। বিনা তারে ছবি, লেখার নকল ইত্যাদি পাঠাইবার চেষ্টাও সাথক হইতে চলিয়াছে।

পরীক্ষাটা হইতেছে বার্লিন হইতে ভিয়েনা অবধি বিনা তারে ছবি পাঠাইবার প্রণালী বিষয়ে।

যে যন্ত্রদ্বারা ফটোগ্রাফ হইবে, তার নাম "কার্লোগ্রাফ"। আর ফটোগ্রাফ করা "ডকুমেণ্ট" বা দলিলকে "কার্লোগ্রাম" বলা হইবে। জার্ম্মাণির প্রত্যেক বড় ডাকঘরে একটা করিয়া এইরূপ যন্ত্র রাখা হইবে। বর্ত্তমান কোইংস্‌বুষ্টের্‌-হৌসেনের বেতার ষ্টেশন এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ ডাকমন্ত্রীবিভাগের বেতার কমিশনার ডাক্তার হান্‌স্ ব্রেডো "বার্লিনের টাগেব্লাট্‌" পত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যক্তির টেক্‌নিক্যাল অভিজ্ঞতা খুব বেশী। তিনি বলিতেছেন, "কার্লোগ্রাফ সফল হইল বলিয়া, বেশী দেরী নাই।"

লাইপ্‌ৎসিগের অধ্যাপক কারোলুসের নির্দ্দেশমত টেলেফুঙ্কেন কোম্পানী এই প্রক্রিয়াটাকে ক্রমাগত বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টিত আছে। এই কোম্পানীর টেক্‌নিক্যাল ডিরেক্টর কাউণ্ট আর্কো ডাক্তার ব্রেডোর মতে সায় দিয়াছেন।

এদিকে অধ্যাপক কারোলুস্ "গতি-প্রেরণ" বিষয়ে আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁর চোখের সামনে বিশাল সম্ভাবনার রাজ্য খুলিয়া গিয়াছে।

কার্লোগ্রাফের বিশেষত্ব

ডাক্তার ব্রেডো কার্লোগ্রাফ হইতে কি কি সুবিধা পাওয়া যাইবে, তার একটা হিসাব এইরূপ দিয়াছেন :—

(১) ফটোগ্রাফে তোলা চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম খুব তাড়াতাড়ি পাঠান যাইবে। উদাহরণ, ১২ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ খানা চিঠি অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠান ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে পাওয়া সম্ভব হইবে। (খ) সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে বা আকাশ-যানে যন্ত্র থাকিলে ঐরূপ তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া যাইবে। (গ) ইহার তুলনায় টেলিফোন নেহাৎ সেকেলে হইয়া পড়িবে। শর্টহ্যাণ্ডে হাজার কথা পাঠানোও সহজ কথা নয়।

(২) ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ হইতেও বিস্তর সুবিধা হইবে। ব্যাঙ্কিং গৃহগুলি ইচ্ছা করিলেই চেকের, বিনিময় হারের নক্সার অবিকল (নকল) পাণ্ডুলিপি পাইবে। লেজার বইয়ের পাতার ফটোগ্রাফও মিলিবে। আর খরিদ্দারদের কাছে খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টগুলির ফটোগ্রাফ পাঠাইয়া দিলেই চলিবে।

(৩) আইন ও বিচারকার্য্যের সহায়তা ও সুবিধা হইবে। হাতপা'র আঙ্গুলের ছাপের ছবি যেখানে খুসী তৎক্ষণাৎ পাঠান যাইবে। কোন লোকের কাছে সন্দেহ-

জনক অস্ত্র বা ধনসম্পত্তি পাওয়া গেলে পৃথিবীর অপর-প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ লওয়া সম্ভব হইবে সেই লোক প্রকৃত দোষী কি না। ইহাতে দোষীকে শাস্তি দিতে ও নির্দ্দোষকে মুক্ত করিতে অনর্থক বিলম্ব ঘটিবে না।

(৪) কাগজ-পরিচালনায় এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। বিদেশে যারা ঢুঁড়িয়া বেড়ায় অর্থাৎ বিশেষ সংবাদ দাতাগণ শুধু সঙ্গে একটা বেতার ফটোগ্রাফির "অল্পদূরের ঢেউ প্রেরক" যন্ত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। আর ছবিই হোক, স্থানীয় কোন কাগজের লেখাই হোক বা নিজের তোলা অসভ্য মানবের ফটো বা তার বাসস্থানের ফটোই হোক—সব-কিছু পরের সংখ্যা কাগজ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইবে। টেলিগ্রাফ্ আফিসের কামড়াকামড়িও বিদূরিত হইবে।

(৫) সমুদ্রে জাহাজগুলিতে কোডের পরিবর্ত্তে জল বাতাসের চার্টের পাণ্ডুলিপি পাঠান যাইবে। ইহাতে ঢের কষ্ট ও সময়ের লাঘব হইবে।

(৬) যুদ্ধের সময় জলে স্থলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিনা আয়াসে আদেশ ইত্যাদি আকাশ দিয়া পাঠান চলিবে।

(৭) লোকে ঘরে বসিয়া বৈজ্ঞানিক বা অন্য প্রকার শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কথা তৎক্ষণাৎ জানিয়া লইতে পারিবে ও কাজে লাগাইবে।

আন্তর্জ্জাতিক সংবাদপত্র সম্মেলন

কলোনে এক বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। সেখানে এক "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল প্রেস্ এক্‌জিবিশন" বা আন্তর্জ্জাতিক সংবাদপত্র প্রদর্শনী মে হইতে অক্টোবর (১৯২৮) অবধি খোলা থাকিবে। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট বৃটিশ ও অন্যান্য গবর্মেণ্টকে তথায় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছেন।

এখনও পাকা সরকারী খবর বাহির হয় নাই। কিন্তু কাজকর্ম্ম বেশ অগ্রসর হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের আন্তর্জ্জাতিকতাটা প্রস্ফুটিত করিবার জন্য এক্‌জিবিশন ভূমির সেণ্ট্রাল এভেনিউ বিদেশী গবর্মেণ্টদের "প্যাভিলিয়ন" বা মঞ্চ তৈয়ারীর জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

এক্‌জিবিশন ভূমির আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ মিটার। ইহা ক্যাথেড্রালের ঠিক উল্টা দিকে রেলওয়ে ব্রিজের সামনে রাইনের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। জায়গাটা বেশ মনোরম।

২২টা বাছা বাছা দেশের সংবাদপত্র বিশেষ বিশেষ ভাগ হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। নিজ নিজ কাগজের উন্নতির বিভিন্ন মানসিক ও বৈজ্ঞানিক স্তর তারা দেখাইবে স্থির হইয়াছে।

এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠান এই প্রথম। দুনিয়ার সকল ব্যাপারে আজকালকার সংবাদপত্র কি অসীম প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের পিছনে কিরূপ মাথা ও মন কাজ করিতেছে তার আভাস ইহা হইতে মিলিবে।

ফাঁসি দেওয়া সম্বন্ধে হেনরি ফোর্ড

কোন লোককে খুন করা অন্যায়। প্রত্যেকে একথা স্বীকার করে। ইহাতে যে খুন করে তার নিজের কোন লাভ হয় না, সমাজেরও কোন মঙ্গল হয় না। 'দারিদ্র্য দূর করিবার ঔষধ দান' যেমন ভুল ধারণা, 'পাপ শোধরাইবার ঔষধ ফাঁসি দেওয়া' ও তেমনি ভুল ধারণা।

"আমি বুঝিতেই পারি না কেমন করিয়া কেহ ফাঁসির স্বপক্ষে মত দিতে পারে, যদি না সে নিজেই জল্লাদ হয়। আমার ত মনে হয় এমন খুব কম নাগরিকই পাওয়া যাইবে যে এ কাজ লইতে চাহিবে। তবে কেন রাষ্ট্রকে বল, কোন নাগরিকের সাহায্যে অমুককে হত্যা কর?"

দুনিয়ার তুলা

"সাম্রাজ্যে তুলা জন্মাইবার কর্পোরেশনে"র বাৎসরিক সাধারণ সভায় স্যর ফিলিপ্ কানলিফ্-লিষ্টার সভাপতির কাজ করেন।

লর্ড ডার্বি কাউন্সিলের রিপোর্ট দাখিল করিবার কালে বলেন যে, "দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে জলপ্লাবনের ফলে দুনিয়ার তুলা উৎপাদনে কত ক্ষতি হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু ক্ষতিটা যে ভীষণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের আশার কথাই এই যে, সাম্রাজ্যের গ্রীষ্মমণ্ডল ও

নাতিগ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলিতে সাম্রাজ্যের তুলা বেশ চলিতেছে। এতটা আশা করি নাই।

"তুলার উপর শুল্ক আইনটার মিয়াদ ১৯২৮ সনে শেষ হইবে। আনন্দের বিষয়, কর্পোরেশ্যনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা আমদানি তুলার উপর বেল প্রতি ৬ পেন্স "লেভি"র চেষ্টা দেখিতেছেন। বিফল হইলে গবর্মেণ্ট হইতে হয়ত সাবসিডির বন্দোবস্ত হইবে।"

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন" বলিতেছে, "তুলার বাণিজ্যটা ছোট-খাট বস্তু নয়। উপনিবেশগুলির প্রসার ও উন্নতির প্রাণ হইল তুলা। সুতরাং গবর্মেণ্ট কখনই উদাসীন থাকিতে পারে না।"

জেনেহ্বায় স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জেনেহ্বার "লেবার কনফারেন্স" বা মজুর সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন স্যর অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্যর অতুল তাঁর অভিভাষণে বলিয়াছেন, "এশিয়ায় অসংখ্য শ্রমিক কাজ করিতেছে। আর বর্ত্তমান প্রণালীর ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কারবার দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘ শুধুমাত্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার কথা বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। এশিয়ার কথাও বিবেচনা করিতে হইবে।

"সন্তোষের বিষয় এই যে, জাপানে ও ভারতে শুধু সব রাজনৈতিক দল নয়, মনিব ও মজুররাও একযোগে ব্যবসা-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন নীতি অঙ্গীকার করিয়াছে। মজুর-সঙ্ঘের উৎপত্তি ও স্থিতির অর্থ হ্বার্সাই সন্ধির মূলনীতিগুলি সকল দেশ মানিয়া চলিতেছে।

"আমার আশা এই যে, বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মব্যস্ততা ও কর্ম্মপীড়নের সহিত প্রাচ্য-সুলভ জীবনের শান্ত দান্ত ভাব মিলিত হইবে। আর সেই মিলন ঘটাইবে মজুর-সংগঠন।"

টাঙ্গানিকায় ইংরেজ

লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্সের পূর্ব্ব-আফ্রিকা বিভাগের এক সভাতে স্যর হামফ্রে লেগেট্ সভাপতিত্ব করেন (২রা এপ্রিল, ১৯২৭)। এই সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "টাঙ্গানিকায় অ-বৃটিশদের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িতেছে। বৃটিশরা যাতে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে, সেজন্য গবর্মেণ্টের সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব-আফ্রিকার রাজ্যগুলির "ফেডারেশন" বা একীকরণ ঘটিলে বৃটিশ বাণিজ্যের সুবিধা বাড়িবে। যতদিন তা না হয়, ততদিন টাঙ্গানিকার ও নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের কাজকর্ম্ম একত্র চালাইবার বন্দোবস্ত করা হউক।"

মেজর ওয়াল্‌স বিগত সেন্সাসের অঙ্কপত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,—

"এশিয়াবাসীর সংখ্যা ছিল ১৫,০০০। আর ইয়োরোপীয়ের সংখ্যা ২৫,০০০। অতঃপর ভূতপূর্ব্ব শত্রু (জার্ম্মাণি ইত্যাদি) প্রজাদের ঢুকিতে দেওয়া হয়। ফলে বৃটিশ বেসরকারী লোক এখন সংখ্যায় ন্যূন হইয়া পড়িয়াছে।"

দুনিয়ার তামাম পড়ুয়ার তীর্থস্থান প্যারিস

লীগ অব্ নেশনস্

সেক্রেটারিয়েট (স্থায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠান)	কাউন্সিল (চালক সমিতি)	অ্যাসেম্ব্লি (পরামর্শ সমিতি)

সেক্রেটারিয়েট —

[নানা শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেক শাখা এক সেক্রেটারী জেনারেল দ্বারা চালিত হয়। এক শাখার নাম—]

সেকৃশন অব্ ইন্টার্ন্যাশন্যাল বুরো [ইহার উদ্দেশ্য সকল প্রকার আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ কায়েম করা]

কমিটি অন্ ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন [এই কমিটিতে আছেন—
অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, (অক্সফোর্ড), ডাক্তার লোরেণ্টৎস্ (লেভেন), স্যর জগদীশ বসু (ভারতবর্ষ), কুমারী কুরি (রেডিয়াম আবিষ্কর্ত্রী, প্যারিস), অধ্যাপক আইনষ্টাইন (বার্লিন), প্যালভে (ভূতপূর্ব্ব ফরাসী প্রধান মন্ত্রী)]

কমিটির ইতিহাস

এই কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ :—

কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে "ইন্টার্ণ্যাশনাল কমিটি অন ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন" বা "জ্ঞান সহযোগিতার আন্তর্জ্জাতিক কমিটি"র জন্ম হয়। ১৯২১ সনে দ্বিতীয় অ্যাসেম্ব্লি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ইহার কাজ হইতেছে জ্ঞান-সহযোগিতা ও জ্ঞান লেনদেনের প্রসার বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলি লইয়া মাথা ঘামানো।

এই উদ্দেশ্যে দেশে দেশে এইরূপ জাতীয় কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। এই জাতীয় কমিটিগুলি নিজ নিজ দেশের সহিত আন্তর্জ্জাতিক কমিটির ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার পক্ষে মধ্যবর্ত্তীর কাজ করিবে।

ইন্টার্ণ্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইন্টেলেকচুয়্যাল কো-অপারেশন

১৯২৪ সনে ফরাসী গবর্মেণ্টের বদান্যতায় এই আঁস্তিতিউ খাড়া হয় প্যারিসে। ফ্রান্সের জ্ঞান-সহযোগ কমিটি এই প্রতিষ্ঠানের "গবর্ণিং বডি" বা শাসক সমিতির কাজ করে, বাজেট তৈয়ারী করে, আঁস্তিতিউর কাজের খসড়া তৈয়ারী করে, "কমিটি অব্ ডিরেক্টরস্" ও আঁস্তিতিউর ডিরেক্টর এবং কর্ম্মচারী নিয়োগ করে।

কমিটি অব্ ডিরেক্টরের সভ্য-সংখ্যা ৫ জন। এই ৫ জন ৫ ভিন্ন দেশের ব্যক্তি। "গবর্ণিং বডি"র চেয়ারম্যান্ ইঁহাদের একজন।

আঁস্তিতিউর কাজ কমিটির বিভিন্ন বিভাগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া কয়েক শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। কতকগুলি বিষয় :—

বিশ্ববিদ্যালয় "সেকশন",
গ্রন্থপঞ্জী "সেকশন" ও বৈজ্ঞানিক "সেকশন",
আইন "সেকশন",
"আর্টিষ্টিক" সম্বন্ধের জন্য "সেকশন",
লাইব্রেরী সম্বন্ধের জন্য "সেকসন",
সাধারণ কাজকর্ম্ম চালাইবার "সেকশন",
সংবাদ "সেকশন"।

ছাত্র-সঙ্ঘ

১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে জেনেভাতে "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল অর্গ্যানিজেসন অব্ ষ্টুডেণ্টস্" বা আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র-সঙ্ঘের প্রথম বৈঠক বসে। দ্বিতীয় বৈঠক বসিয়াছিল এই সনের ১১ই ও ১২ই এপ্রিল—জেনেভাতে।

এই বৈঠকগুলি লীগ অব্ নেশন্‌সের তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে হয়।

১৯২৭ সনের প্রস্তাব

এ বছর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

১। ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল অর্গ্যানিজেশন অব্ ষ্টুডেণ্টসের "সেণ্ট্রাল বিউরো" অর্থাৎ প্রধান আড্ডা প্যারিসের "ইণ্টার্ণ্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশনে" স্থাপিত হোক।

২। আধা সরকারী গোছের আন্তর্জ্জাতিক সার্টিফিকেট দিয়া পড়ুয়াদের দেশভ্রমণের সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক। পড়ুয়াদের ছাত্রত্ব প্রমাণের পক্ষে এই সার্টিফিকেটগুলি যথেষ্ট হইবে ও গবর্ণমেণ্ট পাসপোর্ট যোগাড় করিয়া দিতেও পড়ুয়ারা যে স্থানে গবেষণা চালাইতে চায় সেখানে পরিচয় করাইয়া দিতে রাজী থাকিবে।

৩। অন্যদেশে গবেষণা চালাইবার জন্য বা চাকুরী করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে ডিপ্লোমাগুলির মূল্য যাচাই হওয়া দরকার।

৪। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বর্ত্তমানে এক মস্ত অসুবিধা এই যে, কোন দেশে কিরূপ গবেষণা হইতেছে বা কতদূর হইয়াছে তাহা না জানায় একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হয়ত মাথা ঘামায়। এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া ১৯২৮ সনের বৈঠকে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের ও বুদ্ধিজীবীদের ভিতর বেকার-সমস্যার অনুসন্ধানের জন্য একটা আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন অ্যাসোসিয়েশন খাড়া করা হোক।

৬। ১৯২৮ সনে কলোনে আন্তর্জ্জাতিক "প্রেস একস্‌পোজিশন" বা সংবাদপত্র প্রদর্শনী হইবে। তাতে যোগ দেওয়া হইবে ও সারা দুনিয়ায় আন্তর্জ্জাতিক পড়ুয়াদের আন্দোলন সম্বন্ধে সকল প্রকার সাহিত্য দেখান হইবে।

কে কে উপস্থিত ছিলেন ?

কয়েকজনের নাম :—

শ্রীযুক্ত হেনমিকি (ইন্টার্ণ্যাশন্যাল ফেডারেশন অব্‌ ইউনিভার্সিটিস পরিষৎ)।

শ্রীযুক্ত কোৎসশ্লিগ (ইন্টার্ণ্যাশনাল অর্গ্যানিজেশন ফর অ্যাসিসট্যান্স টু ইউনিভার্সিটি ষ্টুডেন্টস বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান)।

শ্রীযুক্ত ষ্টাইনিগ (ইউনিভার্সেল অ্যাসোসিয়েশ্যন অব্‌ জুইশ ষ্টুডেন্টস বা ইহুদী ছাত্রদের বিশ্বজনীন সভা)।

কুমারী বোসান্‌কোয়েট (ইন্টার্ণ্যাশন্যাল ফেডারেশন অব্‌ ইউনিভার্সিটি উইমেন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের আন্তর্জ্জাতিক মিলন-ভূমি)।

শ্রীযুক্ত হেনরিওড (ওয়ার্লডস ক্রিশ্চিয়ান ষ্টুডেন্টস্‌ ফেডারেশ্যন বা দুনিয়ার খৃষ্টান পড়ুয়াদের মিলন ভূমি)।

শ্রীযুক্ত পামিরি ("প্যাক্স রোমানা"—পত্রিকা)

শ্রীযুক্ত বার্লিন্‌স্কি (ইন্টার্ণ্যাশন্যাল কন্‌ফিডারেশন অব ষ্টুডেন্টস বা পড়ুয়াদের আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ)।

শ্রীযুক্ত জি, ফোগেল (ফরেন বুরো অব্‌ জার্ম্মাণ ষ্টুডেন্ট (বিদেশ গমনের বুরো)।

শ্রীযুক্ত জি, এ, জনষ্টন (লেবার বা মজুর বুরো)।

শ্রীযুক্ত এ, জিস্মার্ণ
শ্রীযুক্ত এফ্‌, মিচেল
{ ইন্টার্ণ্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্‌ ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশনের প্রতিনিধিদ্বয়।

রাজকীয় প্রাসাদ

ফরাসী গবর্ণমেন্ট ২০ লক্ষ ফ্রাঁ র বিনিময়ে ভূতপূর্ব্ব রাজকীয় প্রাসাদ লীগকে দিয়াছে। এটাই ছাত্র-সঙ্ঘের প্রস্তাবিত প্রধান আড্ডা হইবে।

প্লেগ সম্বন্ধে চীনা ওস্তাদ

ডাক্তার যু লিয়েন তেন, "মাঞ্চুরিয়া প্লেগ প্রিভেনশন সার্ভিসের" ডিরেক্টর ও প্রধান মেডিক্যাল অফিসার বা বড় কর্ত্তা। ইনি প্লেগ সম্বন্ধে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের মধ্যে একজন। সম্প্রতি তাঁর একখানা খুব দামী কেতাব বাহির হইয়াছে। নাম "ট্রিটিজ্‌ অন্‌ নিউমোনিক প্লেগ্‌" বা নিউমোনিক প্লেগ্‌ বিষয়ক প্রস্তাব। প্রকাশক জেনেভার লীগ অব্‌ নেশনের "হেলথ সেক্‌শন"।

ডাক্তার যু লিয়েন তেন এখন প্লেগ সম্বন্ধে ইয়োরোপে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। এক মোলাকাতে এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

"এই বিষয়ে গোটা দুনিয়ার একযোগে কাজ করা দরকার। বিষয়টাকে আয়ত্ত করিবার জন্য লীগ অব নেশনস এক বিশেষ কমিশন মধ্য এশিয়ায় পাঠাইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য, "মারমট" বা খরগোসের মত বড় পাহাড়ে ইঁদুর গ্রস্ত স্থানগুলির অন্বেষণ। এই ইঁদুরগুলি হিমালয় হইতে চীনা সাগর অবধি দেখা যায়। ইহারাই নিউমোনিক প্লেগের বীজাণু বহন করিয়া বেড়ায়। প্লেগ বন্ধ করিবার একটা উপায় এই জন্তুর শিকারীদের লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা। এদের চামড়া এত দামী যে, বছর বছর অনেক মারমট শিকার করা হয়। লাইসেন্সের প্রবর্ত্তন করিলে ব্যবসাটা কমিবে ও শিকারীরা এদের অপকারিতা বুঝিবে। এ জন্তুর গায়ের মাছি হইতেই শুধু প্লেগের বিষ ছড়ায় না, ইহাদের কাশিতে ও থুথুতেও ঐ বিষ আছে।

ডিপথিরিয়ায় ইংল্যণ্ডের ক্ষতি

মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের ডাক্তার জে, গ্রাহাম ফোর্বেস্‌ লিখিত রিপোর্ট "ডিপ্‌থিরিয়ার প্রতিষেধ" বাহির করিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় বড় বড় শহরে শিশুদের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ডিপথিরিয়া।

১৯২১ সনে একমাত্র ডিপথিরিয়ার দরুণ লণ্ডন করদাতৃগণের প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। আর প্রত্যেক ডিপথিরিয়া রোগীর জন্য ৩০ পাউণ্ড করিয়া

খরচ হয়। এই টাকায় ২০০ জন ছেলেমেয়েকে রক্ষা করা যায়।

লণ্ডনের পরই পোর্টসমাউথ ও ব্রিষ্টল গত ১৫ বৎসর যাবৎ অনবরত অন্যান্য লোকবহুল জনপদের চেয়ে বেশী ডিপথিরিয়া হেতু মৃত্যুহার দেখাইয়াছে। ঐ সময়ে এডিনবারা, বার্মিংহাম ও গ্লাসগোতে এই বেয়ারামের প্রকোপ কিছু কম হইলেও, সমগ্র ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের গড়পড়তা হারের চেয়ে অনেক উঁচু।

অথচ ম্যাঞ্চেষ্টার, শেফিল্ড, লীড্‌স, ব্রাডফোর্ড, নিউকাস্‌ল, কার্ডিফ প্রভৃতি স্থানের ডিপথিরিয়ার হার ক্রমাগতই ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের গড়পড়তা হারের নীচে রহিয়াছে।

ইংরেজের প্রতি রুশের মনোভাব

বৃটিশ পুলিশ লণ্ডনে আর্কোস্ হাউস খানাতল্লাসী ইত্যাদি করিবার পর "ডেলি মেলে"র রিগাস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছে :—

মস্কোর বৃটিশ লিগেশনের সম্মুখে উত্তেজিত জনতার এরূপ ভীড় হইয়াছিল যে, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ডাকিয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে হইয়াছিল। মস্কোবাসীরা তাদের মনোভাব জানাইবার জন্য এক মিছিল বাহির করিয়াছিল।

"প্রাফদা" ও "ইজভেষ্টিয়া" আর্কোস্ "চড়াও"র কাহিনী প্রকাশ করিবামাত্র মস্কো, পেট্রোগ্রাড, খারকোফ, ওডেসা কাজান, পের্ম ও অন্যান্য রুশ ব্যবসাকেন্দ্রে বহুজনপূর্ণ সভা-সমিতি ডাকা হইয়াছিল। রুশিয়ায় প্রায় সমস্ত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ফ্যাক্টরী ইংরেজের বিরুদ্ধে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য শনিবার কাজ বন্ধ রাখিয়াছিল।

জাতীয় বাণিজ্যের কমিশনার শ্রীযুক্ত মিকোয়াল মস্কোর সভাতে বিপুল জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন, "লণ্ডনের চাঙ্-সো-লিনরা তাদের নির্ব্বুদ্ধিতা দ্বারা আমাদের উত্তেজিত করিতে যত চেষ্টাই করুক, আমরা যুদ্ধে নামিতেছি না।"

(ডেলি মেল লণ্ডন হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা, রক্ষণশীল)

ইজ্‌ভেষ্টিয়া

মস্কোর দৈনিক পত্রিকা। এক সংখ্যায় প্রকাশ :—

বৃটিশ মিশনের সামনে এক প্রকাণ্ড মিছিল হইয়াছিল। তাতে স্যর অষ্টেন চেম্বারলেন ও চীনা মার্শাল চাঙ-সো-লিনের কাগজে তৈয়ারী বিদ্রূপাত্মক ছবি বাহির করা হইয়াছিল। দু'জনেই দু'চার পা করিয়া যায় আর ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরকে চুম্বন ও কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়ায়। এই ছবি সড়কে সড়কে দেখান হইয়াছিল ও পিছনে পিছনে অসংখ্য লোক গিয়াছিল।

কোন কোন যুবক রুশ চীৎকার করিতেছিল, "ইংল্যাণ্ডের আর্থিক বয়কট আরম্ভ কর।" "ইংরেজের টাকাতে তৈয়ারী গবর্ণমেন্টের হাত হইতে বাহির হইয়া এস।" "একই গাছে চেম্বারলেন ও চাঙ সো-লিন্‌কে লটকাইয়া ফাঁসি দাও ইত্যাদি।"

ইজভেষ্টিয়া মনে করে লণ্ডন পলিসি "মোটা-বুদ্ধি"দের কাজ। এই রকম করিয়া সোভিয়েট্‌কে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করা বৃথা। ইংলণ্ড যদি তার কাজের জন্য ক্ষমা না চায়, তবে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট তাদের বাণিজ্য অন্য দেশের সঙ্গে চালাইবে। বোলসেভিকদের মাথা অবশ্য গরম।

মস্কো বলে, "বৃটেনকে বয়কট কর"

আর্কোস চড়াওর কাহিনী প্রকাশ হইবামাত্র সড়কে সড়কে বৃটিশদ্বেষী মিছিল বাহির হইয়াছে। লোকেরা পতাকাহস্তে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। বক্তারা চীৎকার করিয়া বলিয়াছে "ওগো, তোমরা আজ হইতেই বৃটিশ দ্রব্য বয়কট্ করিতে আরম্ভ করিয়া দাও।"

ইজভেষ্টিয়াকে সোভিয়েটের মুখপত্রস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। তার নিজের কথা এইরূপ—

"এমনটা যে হইবে আমরা আগেই জানিতাম। স্যর অষ্টেন চেম্বারলেন কি আগের থেকেই ভয় দেখাইয়া রাখেন নাই? পিকিনের দৃষ্টান্তে লণ্ডনের উৎসাহ বাড়িয়াছে। আর ইঙ্গ-সোভিয়েটের সম্বন্ধ শেষ করিবার এটাত মাত্র আরম্ভ।

"আসল কথা ইংরেজের এখন বিষম রকম ঘরোয়া বিবাদ চলিতেছে। ট্রেড ইউনিয়ন বিলটা অগ্নিকুণ্ড বিশেষ। ইংরেজ উহা হাতেও রাখিতে পারিতেছে না, ফেলিয়াও দিতে পারিতেছে না। তাই দেশের লোকের মন কোন ছুতায় অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য সোভিয়েটের সঙ্গে এই কাণ্ডটা ঘটাইয়াছে।

কিন্তু আমাদের সঙ্গে বিরোধের মজাটি ইংরেজ একদিন টের পাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃটেন সেই সময় চড়াও করিয়াছে যখন সোভিয়েট বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডেই বহু লক্ষ রুবলের যন্ত্রপাতি কিনিতে মনস্থ করিয়াছিল।"

আন্তর্জ্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলন

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে আগামী ২৪শে আগষ্ট জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হইবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

সম্মিলনের প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে, কি প্রকারে অল্প খরচায় অধিকতর দ্রুতভাবে বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করা যায়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করা। এক দেশের সম্বন্ধে অন্য দেশের যে ভুল ধারণা হইতে পারে, ইহাদ্বারা তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা হইবে। সম্মেলনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংবাদপত্র সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা আছে, তাহার আলোচনা করা। কারণ, এই সমস্ত সমস্যা পূরণ করিতে পারিলে উহা জনসাধারণের মতামতকে শান্ত করিবার পক্ষে অনুকূল হইবে।

মোলাকাৎ



আসামী চাষী-গৃহস্থের কথা

[মরিয়াণীর সড়ক ধরিয়া চলিতেছি। সড়কে ধুলা। সড়কের দুই ধারে চা-বাগান। নদীর উপর পুল রহিয়াছে। পুলের কাছে এক আসামীর সঙ্গে দেখা। তার সহিত চলিতে চলিতে যে কথাবার্ত্তা হয় তার সারমর্ম্ম নিম্নরূপ।

শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রশ্ন—তুমি কোথায় যাইতেছ?

উত্তর—চার আলির দিকে (অর্থাৎ চৌমাথায়)।

প্রঃ—কোথায় গিয়াছিলে?

উঃ—জোড়হাটে।

প্রঃ—কি উদ্দেশ্যে?

উঃ—উদ্দেশ্য সচরাচর যা হইয়া থাকে। একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে গিয়াছিলাম।

প্রঃ—মোকদ্দমার কি হইল?

উঃ—দিন পড়িয়াছে।

প্রঃ—আজ শুধু জোড়হাট যাওয়া-আসা সার হইল?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—ট্রেণে গিয়াছিলে, না হাঁটিয়া?

উঃ—হাঁটিয়া গিয়াছি হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। মোটে ১২ মাইল পথ।

প্রঃ—তুমি কোনও কাজ কর কি?

উঃ—না।

প্রঃ—কি কর?

উঃ—আমি চাষী গৃহস্থ।

প্রঃ—তুমি চাষ করিয়া খাও?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তোমার কত জমি আছে?

উঃ—১২ পুরা (অর্থাৎ ৩ বিঘা)।

প্রঃ—এটা কি তোমার মোট জমির পরিমাণ?

উঃ—আমার ক্ষেতের পরিমাণ। ঘর বাড়ীর জন্য গিয়াছে, ১½।২ পুরা। অর্থাৎ আমার ১৩।১৪ পুরা জমি।

প্রঃ—তুমি কি তোমার ক্ষেত নিজে চষ! না লোক দিয়া চষাও?

উঃ—না, লোক রাখি না। নিজেরা মাটি কোপাই ও হাল মারি।

প্রঃ—এই বৈশাখ মাসে ত তোমাদের হাল মারিবার সময় হইয়া আসিল।

উঃ—হাঁ। প্রথম বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেতগুলি একবার করিয়া নিড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রঃ—তোমার পরিবারে কয়জন লোক আছে? তোমার হাল মারার কাজে সাহায্য করে কয় জন?

উঃ—৫ জন।

প্রঃ—মোটে ৫ জন?

উঃ—হায় মহাশয়! আমার দুরদৃষ্টের কথা কি বলিব? একদিন আমার ঘরে ১২।১৪ জন শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষ ছিল। মরিতে মরিতে আজ গিয়া ৫ জনে ঠেকিয়াছে। ইহার পর শেষ অবধি কয়জন টিঁকিবে কে জানে?

প্রঃ—মাত্র ৫ জন লইয়া চাষের কাজে অসুবিধা হয় না?

উঃ—হয় বৈ কি। আরও কমিলে বাহিরের লোক আমদানি করিতে হইবে।

প্রঃ—তোমাদের এত লোক কিসে মরিল ?

উঃ—বসন্তে।

প্রঃ—বসন্তে কি শুধু তোমার ঘরে লোক মরিয়াছে ? না, অন্যান্য ঘরেও লোক মারা গিয়াছে ?

উঃ—সমস্ত গ্রামের মধ্যে কারও বাড়ী বাকী নাই। প্রতি বছর বসন্ত রোগ অনেকগুলি প্রাণ হরণ করিতেছে।

প্রঃ—বসন্তের প্রতীকারের জন্য কিছু কর না ?

উঃ—কি আর করিব ? করিলেও অদৃষ্টের হাত কি কেহ এড়াইতে পারে ? যার অদৃষ্টে যা আছে, তা ঘটিবে। অদৃষ্টের সহিত যুঝিয়া কোন লাভ নাই।

প্রঃ—তোমার ক্ষেতে তুমি কি লাগাও ?

উঃ—ধান।

প্রঃ—শুধু ধান ? আর কিছু নয় ?

উঃ—না।

প্রঃ—কয়বার ধান লাগাও ?

উঃ—দুইবার।

প্রঃ—তোমার ১২ পুরা মাটিতে যে ধান হয়, তাতে সম্বৎসরের খোরপোষ চলে কি ?

উঃ—মহাশয়, আগের দিনে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতাম। কিন্তু এখন সব জিনিষ মাগ্গা হইয়া গিয়াছে। কোন রকমে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া আছি।

প্রঃ—সকল আসামী গৃহস্থেরই কিছু না কিছু মাটি আছে ?

উঃ—সকলেরই নাই, তবে অনেকের কাছে।

প্রঃ—এ বিষয়ে তোমরা ভাগ্যবান্। ক্ষেত হইতেই তোমাদের কতকটা আয় হয়। পেটের তাড়নায় চা-বাগানে ছুটিতে হয় না।

উঃ—কে বলিল ছুটিতে হয় না ?

প্রঃ—কেরাণী বা ডাক্তারের কথা বলিতেছি না। চা-বাগানের কুলির কাজে কই আসামী মজুর দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।

উঃ—আপনি কত আসামী মজুর বাগানের কাজে দেখিতে চান ? আমি দেখাইয়া দিব।

প্রঃ—আমার যে ধারণা ছিল, আসামীরা বাগানের কাজে নাই।

উঃ—আপনার সেই আসাম আর আজিকার আসাম এক জিনিষ নয়। আসামে সত্যযুগের অবসান হইয়াছে।

প্রঃ—কেমন করিয়া ?

উঃ—আসামের অধিকাংশ স্থানে এখন আর পতিত জমি বা জঙ্গলা জমি পাইবেন না। যা আছে তাও শীঘ্র সাফ হইয়া যাইবে ও দখল হইয়া যাইবে।

প্রঃ—কে দখল করিতেছে ?

উঃ—মৈমনসিংহের মুসলমানরা কেমন করিয়া দলে দলে আসিয়া নওগাঁ জিলা দখল করিয়া বসিয়াছে, আপনি সে কথা শোনেন নাই কি ?

প্রঃ—হাঁ জানি বটে, দুই লক্ষ মুসলমান আসিয়া নওগাঁর জঙ্গল ইত্যাদি কাটিয়া তথায় বসবাস করিতেছে। বছর দুই হইল তা চাক্ষুষও দেখিয়া আসিয়াছি।

উঃ—এদিকেও নোয়াখালি, মৈমনসিংহ ইত্যাদি স্থানের বাঙ্গালী মুসলমানরা জায়গা দখল করিয়াছে।

প্রঃ—তাতে তোমাদের কি কি অসুবিধা হইয়াছে ?

উঃ—আমরা আর জমি পাই না। যা পাই তার দর বাড়িতেছে অন্যদিকে জিনিষপত্রের দর বাড়িতেছে।

প্রঃ—বাঙ্গালী ভদ্রলোক জমি কিনিয়া চাষবাসের ফলে বড়লোক হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত জানা আছে কি ?

উঃ—আছে। এক ব্যক্তি শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া জমি লয় ও ধান বেচার কারবার আরম্ভ করে। লোকটি অল্পদিনের মধ্যে বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে—বিস্তর জমি-জমা করিয়াছে।

প্রঃ—তুমি বলিতেছিলে না আসামী মজুর চা-বাগানে মাটির কাজ করিতেছে ?

উঃ—হাঁ, কুলির কাজ করিতেছে।

প্রঃ—কোথায় ?

উঃ—কোথায় নয় বলুন। এই কাঠালগুড়ি বাগানে, মরিয়াণী বাগানে, কি অন্য যে কোন বাগানে যান আসামী মজুরকে খাটিতে দেখিবেন। পেটের জ্বালায় না খাটিয়া উপায় কি ?

প্রঃ—তোমার জাতটা কি ?

উঃ—আহোম।

প্রঃ—সাধারণ আসামীদের সঙ্গে তোমাদের কোন পার্থক্য আছে কি ?

উঃ—আছে বৈ কি। আমরা ব্রাহ্মণের প্রতাপ মানি না। অর্থাৎ বিয়া সাদী ক্রিয়া-কলাপে আমাদের বামুনের দরকার হয় না।

প্রঃ—আচ্ছা দেখ তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তোমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরা কোথাকার ব্রাহ্মণ ? কোথা হইতে আসিল ? এরা তোমাদের নিজের দেশের লোক কি ? অর্থাৎ আসামী কি ?

উঃ—তবে আর কোন দেশের হইবে ?

প্রঃ—প্রশ্নটা বুঝিয়া দেখ। এখন হয়ত আসামী বনিয়া গিয়াছে। কিন্তু আগে কি বিদেশ হইতে আসিয়াছিল ? ধর, মন্দির জিনিষটা তোমাদের আছে কি ?

উঃ—না। আমাদের নামঘর আছে।

প্রঃ—সেখানে কি কর ?

উঃ—সেখানে গ্রামের পুরুষ স্ত্রীলোক ছেলে বুড়া "গোট খাই" (জড় হই)। তারপর সকলে মিলিয়া নাম গান করি, "কথা পাতি" অথবা গ্রামের নানা গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করি।

প্রঃ—নামঘরে তোমরা কোনো রকম মূর্ত্তি রাখ না কেন ?

উঃ—মূর্ত্তি রাখা আমাদের দস্তর নয়। শঙ্কর দেও(ব) প্রবর্ত্তিত মহাপুরুষী(খী)য়া ধর্ম্মে মূর্ত্তি-পূজা নাই।

প্রঃ—তবে শিবসাগরে যে ৩টা প্রকাণ্ড মন্দির মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেগুলি কার কীর্ত্তি ?

উঃ—আহোম রাজাদের।

প্রঃ—কিন্তু আহোমরা মূর্ত্তি পূজা চালাইতে গেল কেন ?

উঃ—তা বলিতে পারিব না। তবে শুনিয়াছি সেখানকার পুরোহিতরা বাঙ্গালা হইতে আনীত পুরোহিতদের বংশধর।

প্রঃ—ব্রাহ্মণরা খুব মান্য ব্যক্তি ?

উঃ—নিশ্চয়।

প্রঃ—তারা কোন কাজ করিয়া খায় কি ?

উঃ—না মহাশয়। সাধারণতঃ ইহাদের মত অলস আর নাই। সম্পূর্ণরূপে পরের উপর খায়। এরা আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিল।

প্রঃ—কেমন করিয়া ?

উঃ—ধরুন, আপনার বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসিল। আপনি কৃতার্থ হইয়া গেলেন আর কি! রাজা আসিলেও হয়ত আপনি এত খুসী হইবেন না। তারপর আপনার সংসার-খরচ কুলাক্ বা না কুলাক্ আপনার সামর্থ্য থাকুক্ বা না থাকুক্, আপনাকে ষোড়শোপচারে পূজা দিতে হইবে ও খাওয়াইতে হইবে। বাস্তবিক, এদের সেবা করিতে গিয়া অনেক আসামী পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—ঋণের দায়ে ডুবিয়া গিয়াছে।

প্রঃ—তবু ত তোমরা পরম ভক্ত।

উঃ—ভক্ত যা দেখিতেছেন বাহিরে। আসামী বহু পরিবার এদের জ্বালায় "তিতিবিরক্ত" হইয়া গিয়াছে। আর ব্রাহ্মণদেরও অবিচারটা দেখুন! আপনার ঘরে আসিলে তাকে খাইতে দিতে হইবে, কাপড় দিতে, যাইবার জন্য পথ খরচ জোগাইতে হইবে। তাছাড়া তার সকল রকম অন্যায় আব্দার ও বাবুগিরির পয়সা আপনাকে দিতে হইবে। কাঁহাতক সহ্য করা যায় ?

প্র—তুমি কি বলিতে চাও সব লোক এ রকম ?

উঃ—না। সদাশয় লোকও আছেন। কিন্তু অধিকাংশই এইরূপ।

প্রঃ—তোমরা টাকা ধার নাও কার কাছ থেকে ?

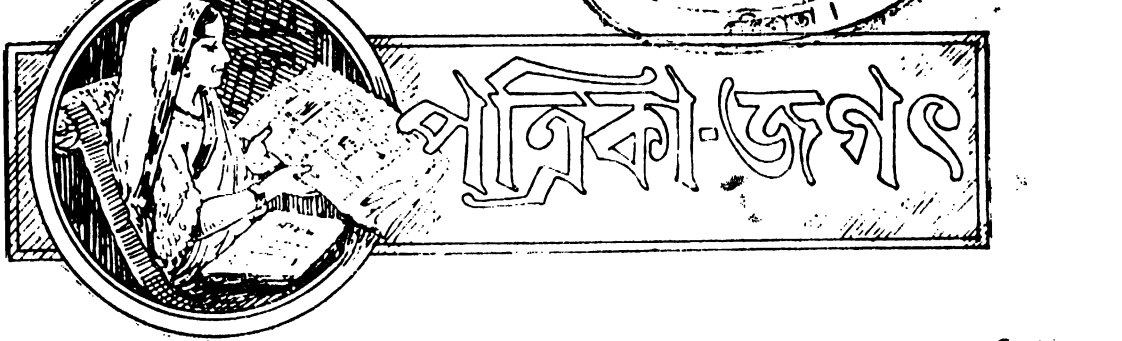
উঃ—"কৈঁয়া" অর্থাৎ মাড়োয়ারীর কাছে।

প্রঃ—তোমাদের বোধ হয় কালেভদ্রে ঋণ করিতে হয় ?

উঃ—না মহাশয়! আমাদের অনেকেরই আজকাল "কৈঁয়া-গোলা"র দেনা বাড়িতেছে। আগের কালে আমাদের ঋণ এত বেশী ছিল না।

প্রঃ—সুদ দিতে হয় না ?

উঃ—কৈঁয়ার সুদ বড় বেশী। সেজন্য আসলটা শোধ করা আমাদের পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সুদ গণিতে গণিতে প্রাণান্ত।



"মান্থলী লেবার রিভিউ"

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল দপ্তর হইতে প্রকাশিত আর্থিক মাসিক। মার্চ্চ (১৯২৭) সংখ্যা। প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠার বহু তথ্যমূলক সংবাদপুর্ণ রচনা ও সংবাদ-সম্ভারে ইহার কলেবর পুষ্ট। ইহার কতকগুলি মূল প্রবন্ধ ও অন্যান্য সংগ্রহের সারমর্ম্ম এখানে দেওয়া হইল।

(১) যুক্তরাষ্ট্রের রেল সড়কে মজুরের উৎপাদন-ক্ষমতা। (লেখক ওয়াল্টার এইচ, ডানলপ)। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, বিগত ১৯১৫ সন হইতে হিসাব ধরিলে বর্ত্তমানে শ্রমজীবী প্রতি উৎপাদন-ক্ষমতা শতকরা ৪০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৮৯০ সন হইতে হিসাব ধরিলে বৃদ্ধিটা গড়ে শতকরা ১৮০ গুণ হইয়াছে। রচনায় যে সকল চার্ট ও তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ বৃদ্ধি কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে।

(২) ফ্যাক্টরি লেবার টার্ণওভার। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মেট্রোপলিটান লাইফ ইনশিওর্যান্স কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত বেরিজ এই প্রবন্ধে ১৭৫টি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ৮,০০,০০০ শ্রমজীবীর এক সূচিপত্র তালিকা প্রস্তুত করিয়া আমেরিকার মজুর ও মজুর-সমস্যা আলোচনা করিয়াছেন।

(৩) কারখানায় ও আফিসে খাবার ঘর। আমেরিকার অনেক শিল্পকারখানা-ভবনে শ্রমজীবিগণের আহারের জন্য স্বতন্ত্র খাবার ঘরের ব্যবস্থা আছে। বিউরো অব লেবার ষ্ট্যাটিসটিক্স অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, ১,৯৭৭,০০০ কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবী সম্বলিত আমেরিকার ৪৩০টি শিল্প-কারখানার ৩০৩টিতে মনিব কর্ত্তৃক ১,১৭৫,৩৮৮ শ্রমজীবী ও চাকুরেয়র আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রমজীবীদিগকে নিজের গাঁইট হইতে পয়সা খরচ করিতে হইলেও তাহারা খাবারটা খুব ভাল পায়। আর বাজারের জিনিষের চাইতে ঐ সকল লাঞ্চরুমের খাদ্য-দ্রব্যের দামও সস্তা এবং জিনিষও খুব টাটকা। অনেক সময় মনিবদিগকে ক্ষতি দিয়া ঐ আহার-ঘরগুলি চালাইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরণের হোটেল নজরে পড়ে। ক্যাফেটেরিয়ার ও রেস্তরঁ। রেস্তরঁর চাইতে ক্যাফেটেরিয়ারের আদর বেশী। ৩০৩টি কোম্পানীর ২৫৯টিতে ক্যাফেটেরিয়ার আছে ও ২৬টিতে রেস্তরঁ আছে। আর বাকী আটটাতে দুইই আছে। রেস্তরঁতে সাধারণতঃ আফিস চাকরেদের খাওয়ান দাওয়ান হয়। আর ক্যাফেটেরিয়ারে সর্ব্বসাধারণের জন্য আহারের ব্যবস্থা আছে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ক্যাফেটেরিয়ার খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৬ সনে ২২৩টি কারখানায় ১১২টি ছিল, আর রেস্তঁর ছিল ১২৮টি। বর্ত্তমানে ৩০৩টি শিল্প-ভবনের ২৭৭টি ক্যাফে ও মাত্র ৪৪টি রেস্তরঁ আছে। সুপ, শাকসব্জী, মাংস, কেক, কফি স্যাণ্ডউইচ এ সবই এই সকল হোটেলে পাওয়া যায়। আমেরিকার কারখানা ও আফিসের এই ধরণের হোটেলে ৪ থেকে ৬ মিনিটের মধ্যে ৪০০ লোক খাওয়ান চলে। এক একটা শিল্প-কারখানায় লাঞ্চরুম (খাবার ঘর) ছাড়াও কারখানার বিভিন্ন অংশে ২০টি করিয়া বুথ (ছোট খাবার মজলিশ) আছে। প্রত্যেকটিতে গ্যাস ষ্টোভ ও প্রয়োজনীয় বাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। একই পাকশালায় এই সকল

বুথের খাবার তৈয়ারী হয়। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বেই এই সকল খাবার মজলিশে আহার্য্য দ্রব্য ঠেলাগাড়ী করিয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং সেগুলি গরম রাখিবার জন্য গ্যাসচুল্লির উপর রাখা হয়। এই সকল বুথে প্রতিদিন ২০০ করিয়া লোককে আহার করান হয়। আমেরিকার কারখানা ও আফিসের প্রায় অর্দ্ধেক লোক এই সকল বুথে আহার করে।

অধিকাংশ স্থলেই এই আফিস হোটেলগুলি কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন কোন স্থলে বাহিরের লোকেও কতকগুলি হোটেল পরিচালনা করে। আমেরিকার এই ধরণের ২৬৫টি আফিস হোটেলের ৩৩টি মাত্র বাহিরের লোকদ্বারা পরিচালিত, ২৩টি চাকুরে সংসদের তত্ত্বাবধানে ও বাকীগুলি কোম্পানী মনিবের তাঁবে। চাকুরে সংসদের একটা লাঞ্চরুমে ৬০০ লোক রোজ আহার করে। এটা সম্পূর্ণ মজুর ও চাকুরেদের দ্বারা পরিচালিত। গত বৎসরে খরচপত্র বাদে এই সরাইয়ের ২৮৬ ডলার লাভ হয়। মনিবরা ঐ সকল সরাইয়ের আলো গ্যাস, কয়লা ও স্থানের ব্যবস্থা করে।

সামান্য কয়েকটা আমেরিকান কোম্পানী মাত্র বিনা পয়সায় তাহাদের আফিস ও কারখানার লোকদের খাবার খাওয়ায়। চা, কফি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য অনেক কোম্পানীই তাহাদের অধীন কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীদের বিনাপয়সায় খাওয়াইয়া থাকে। আমেরিকার ৭টি ফার্ম্মে বিনা পয়সায় প্রত্যেক চাকুরে ও মজুরকে মধ্যাহ্ন ভোজন করায়। এই ফার্ম্মগুলিতে ২০০ হইতে ৮০০ শত পর্য্যন্ত লোক দৈনিক খাটে। মজুরদের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই ঐ সকল ফার্ম্মের মালিকরা উদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন। এইভাবে খাইতে না পারিলে অনেক শ্রমিক ও চাকুরের যে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা আছে, কর্ম্মদক্ষতা কমিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, এ তাঁহারা বেশ বুঝিয়া থাকেন। এরূপ ভাল খাবার তাহারা যে পয়সা খরচ করিয়া খাইতে পারিবে না এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল আফিস সরাইয়ের খাবার মধ্যে প্রধানতঃ সুপ, মাংস, দুই প্রকার শাকসব্জী, তরকারী, রুটী, মাখন, চা, কফি, দুধ ও ফলমূল থাকে। আমেরিকার একটা কোম্পানী ইহার ৯০০ শত শ্রমজীবীর প্রত্যেকের জন্য একবার মাত্র আহারের বাবদ ৩৪ সেণ্ট করিয়া খরচ করেন। আর একটা আমেরিকান কোম্পানী আজ ২০ বৎসর ধরিয়া তাহার অধীন লোকদের মধ্যাহ্ন-ভোজন করাইতেছে। শনিবার আমেরিকার আফিস ও কারখানাগুলি ১২টায় বন্ধ হয়। ঐ দিন ও রবিবার ছাড়া সপ্তাহে ৫ দিন ঐ কোম্পানী তাহার শ্রমজীবী ও চাকুরেদেরকে আহার করাইয়া থাকে। এইসকল আফিস সরাইয়ের খাবার জিনিসও খুব উত্তম। আমেরিকার ক্যাফেটেরিয়ারে প্রতিদিন ৮,০০০ করিয়া লোক আহার করে। একটা কোম্পানীর, ৪,০০০ লোকের মধ্যে ৪০০ লোক অফিসে বিনা পয়সায় খাবার খাইতে পায়। ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আফিস কেরাণীদের বিনা পয়সায় খাবার খাইতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক জনপিছু ৬০ সেণ্ট করিয়া খরচ হয়।

একটা আফিস সরাইয়ে ৪৫০ জনকে মাত্র জনপ্রতি ১০ সেণ্ট হারে খাওয়ান হয়। ঐ আফিসের ৩০০ মেয়ে কর্ম্মচারীকে আবার একেবারে বিনা পয়সায় খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে প্রত্যেক মিল পিছু ৪১ সেণ্ট খরচ হয়। আমেরিকার ২১৭টি আফিস সরাই সম্পূর্ণ কোম্পানী পরিচালিত। ইহার মধ্যে ১৩৪টিই ক্ষতি দিয়া খাবার খাওয়ায়। ৭৯টি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এবং ৪টিতে খরচপত্র বাদে কিছু লাভ জমিয়াছে। এই শেষোক্ত ৪টির একটিতে প্রত্যহ ৫,০০০ লোক আহার করে। এই ৪টি আফিস সরাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাছে বেশী মাল ক্রয় করায় পাইকারী দরের সুবিধা পাইয়া থাকে। বেশী লোক আহার করে ও এক একবারে বেশী করিয়া পাইকারী দরে জিনিষ কেনা হয় বলিয়াই ঐ ৪টি আফিস সরাইয়ে লাভ হইয়াছে। দৈনিক ১১০০ চাইতে কম লোক আহার করিলে ইহাদেরও ক্ষতি দিতে হইবে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের জুতাশিল্পে মজুরের হার। ১৯২৪ সনের তুলনায় ১৯২৬ সনে যুক্তরাষ্ট্রে জুতার দর চড়িয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৬ সনে ঐ সকল জুতা কারখানায় সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা শতকরা ১১.৪ ভাগ কমিয়াছে;

কিন্তু ঘণ্টা হিসাবে ঐ সনের তুলনায় বর্ত্তমানে মজুরি বাড়িয়াছে শতকরা ১১৮·৩ ভাগ এবং সাপ্তাহিক রোজগারের হার শতকরা ৯৩·৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ প্রবন্ধে বুরো অব্ লেবার ষ্টাটিসটিকস্ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।

(৫) শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা—মানুষ বনাম যন্ত্রপাতি-শিল্পসম্বন্ধ ও শ্রম অবস্থা—আমেরিকার চেলিব্রস সিল্কমিলের অবস্থালোচনা। ৯০ বৎসর ধরিয়া এই কোম্পানীটি চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে ২৩ হাজার লোক খাটে। ৩৬ একর জমির উপর ইহা স্থাপিত। ইহার ২৯৫টি বাড়ী আছে। ৩টা বোর্ডিং ঘর ও ঐগুলিতে সর্ব্বসমেত ৪২৬টি পরিবারের বাস-স্থানের ব্যবস্থা আছে। ঐ কোম্পানীতে দোকান সেলস্‌ম্যান ছাড়া সাধারণ কাজের লোক ৪,৪০০ জন অর্থাৎ ৮৯ ভাগ। শ্রমজীবী ৬ ভাগ, ৫ ভাগ পরিদর্শক। শ্রমজীবী ও চাকরোর ৬০ ভাগ পুরুষ, ৪০ ভাগ মেয়ে। ১৬ থেকে ১৮ রকমের জাতি এখানে অন্নসংস্থান করে। আমেরিকান, ইতালীয়ান, অষ্ট্রীয়ান, জার্ম্মাণ সবই এখানে আছে। আমেরিকাবাসী শতকরা ৪৬ জন, আইরিশ ১৮ জন, ইতালীয়ান ৯ জন, জার্ম্মাণ ৬ জন এবং বাকী অন্যান্য বিভিন্ন জাতির লোক এখানে কাজ করে। ইহাদের শতকরা ৬৭ ভাগ আমেরিকান নাগরিক এবং ৯৬½ ভাগ লেখাপড়া জানে। ১৬ থেকে ২০ বছর বয়সের লোক শতকরা ১১ জন, ২০ থেকে ৩০ বছরের ২৯ জন, ৩০ থেকে ৪০ বছরের ২৮ জন, ৪০ থেকে ৫০ বছরের ১৭ জন, ৫০ থেকে ৬০ বছরের ১০ জন, ৬০ থেকে ৭০ বৎসরের ৪ জন, এবং ৭০ এর উপর ১ জন। বিগত ৯০ বৎসরের মধ্যে সাপ্তাহিক কাজের সময় ৭২ হইতে ৪৮ ঘণ্টায় দাঁড়াইয়াছে। গড়ে পুরুষ ৪৫·৫ ঘণ্টা ও স্ত্রী ৪২ ঘণ্টা এবং উভয়ের হিস্যায় ৪৪.১· ঘণ্টা করিয়া পড়ে।

দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (ক) ১৯২৫ সনে আমেরিকার শিল্পকারখানায় দৈব দুর্ঘটনার তালিকা। (খ) ইংলণ্ডের গ্রাম্য শ্রমজীবিগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা। ১৯২৫ সনের ১৫ই ডিসেম্বর বিলাতের গ্রাম্য শ্রমজীবিগণের বাসস্থানের জন্য পার্ল্যামেণ্টে এক আইন প্রণয়ন করা হয়। রাজা তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন।

কো-অপারেটিভ গৃহ ও কর্জ্জ সমিতি। ওয়ার্কমেনস্ কম্পেনসেশ্যন অ্যাণ্ড সোশ্যাল ইনশিওর‍্যান্স (শ্রমজীবিগণের ক্ষতিপূরণ ও সামাজিক বীমা)। শিল্প-কারখানায় বার্দ্ধক্য-বীমা-সমস্যা। পেনিসিলভেনিয়ার বার্দ্ধক্য বীমা কমিশন। কমিশন ১৯২৫ সনের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৩,০০০ কোম্পানীর বিবরণ চাহিয়া পাঠায়। ঐ সকল কেম্পানী বৃদ্ধ শ্রমজীবিগণের কি ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকে জানাইতে অনুরোধ করা হয়।

এই কোম্পানীগুলির মধ্যে ১৬০০ কোম্পানী উত্তর প্রেরণ করে। ইহার মধ্যে ৫৯৮টি বলে যে, তাহারা বার্দ্ধক্য সময় শ্রমজীবীদের একটা করিয়া বোনাস দেয়। ৩৭০টী বলে যে তাহাদের পেন্সান ও বোনাস দুইয়ের ব্যবস্থাই আছে। ২২৪টি কোম্পানীর পেন্সান বা বোনাস কিছুইর ব্যবস্থা নাই। তবে গুণানুসারে তাহারা অবসর গ্রহণের সময় শ্রমজীবীদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুরস্কার দিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-কারখানার সর্ব্বসমেত পেন্সানের হিস্যা লক্ষ ডলারের উপর নয়। ৬৫ বৎসরের বেশী ১,৮০০,০০০ বৃদ্ধ আমেরিকায় আছে। ইহাদের অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পেন্সান বা ভাতার উপর নির্ভর করে। বিগত আর্থিক বৎসরে আমেরিকা ৭০,০০০ লোককে ৪৩,০০০,০০০ ডলার বার্দ্ধক্য পেন্সান স্বরূপ দেয়।

"টাইম্‌স"

৭ই জুলাই, ১৯২৭।

(১) রাজা ফুয়াদের লণ্ডন আগমন (রাজা জর্জ্জ ও ফুয়াদের কোলাকুলি, সম্ভাষণ, অভিবাদন ইত্যাদির বিবরণ)।

(২) ফিনান্স বিল (পার্ল্যামেণ্টে সমালোচনা ও চার্চহিলের উত্তর)।

(৩) চীনাদের জন্য চীনদেশ (চাঙ্গ-সো-লিনের ঘোষণা-পত্র)।

(৪) বোরোডিনের প্রপাগাণ্ডা ফ্যাক্টরী।

(৫) জেনেহবা নৌ-বৈঠক (যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের মতামত)।

(৬) কানাডিয়ান্ জুবিলি বা পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

(৭) পার্ল্যামেণ্ট সপ্তাহ (চা-শুল্ক—স্বাস্থ্য-মন্ত্রী—ইংলাণ্ডের মৃত্যুর হার হাজারকরা ১২·২ হইতে ১১·৬ ও শিশু মৃত্যু ৭৬ হইতে ৭০ হইয়াছে। গৃহ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। বাড়ী তৈয়ারীর জন্য ২৭ লক্ষ একর জমি যোগাড়ের কথা হইতেছে। ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল্। "মানি লেণ্ডারস্" বা মহাজনের বিল পাশ হইল)।

(৮) বৃটেন ও সোভিয়েট্ (ভাইকাউণ্ট গ্রে ও স্যর জনসন্ হিক্সের মতামত)।

(৯) যুবক তুর্ক (প্রাচীন তুর্ক নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কিরূপে যুবক তুর্কে পরিণত হইতেছে তাহার আভাষ।

(১০) রাজা ফুয়াদ, সংস্কারক ও বিজ্ঞানের উৎসাহদাতা।

(১১) বার্লিন লোন (এই হপ্তায় বার্লিনের দুনিয়ার বাজারে ঋণগ্রহণের কায়দা সম্বন্ধে আলোচনা)।

(১২) ফ্রী ষ্টেট সিক্কা বিল।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে আছে—(১) রাজা ফুয়াদের আগমন। (২) ৬০ বছর উপনিবেশ (কানাডা সম্বন্ধে)। (৩) পিয়ার বংশানুক্রমে নহে (হাউস্ অব্ লর্ডস সংস্কারের যে প্রস্তাব চলিতেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা)। (৪) ট্রেড ইউনিয়ন ও রাষ্ট্র। (৫) কংগ্রেসে অ্যাক্‌চুয়ারিগণ। এ বৎসর অ্যাক্‌চুয়ারি কংগ্রেস লণ্ডনে বসে। যুদ্ধ হওয়া অবধি ইহাই প্রথম কংগ্রেস ও ষোড়শ অধিবেশন। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে "সোশ্যাল ইন্‌শিওর্যান্স" বা সামাজিক বীমা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট অ্যাক্‌চুয়ারি স্যর আলফ্রেড্ ওয়াট্‌সন দেখাইয়াছেন, ১৯২৫ সনে বার্দ্ধক্য-হেতু পেন্সান ৩ কোটি পাউণ্ডের উপর উঠিয়াছে। এই হারে ১৯৫৫ সনে ইহা দ্বিগুণিত হইবে। অথচ কার্য্য-পটু লোকের সংখ্যা বাড়িবে মাত্র ১৫%। গ্রেট বৃটেনে ব্যবসা-সম্পর্কে বীমার পরিমাণ ১০০ কোটি পাউণ্ডের উপর। ইহা ১৯১৩ সনের ডবল। ১৯২৬ সনের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের বীমার পরিমাণ ১৪০০ কোটি ডলার বা ৩০০ কোটি পাউণ্ড। ১০ বছর আগে ইহা ৪৮০ কোটি ডলার বা ১০০ কোটি পাউণ্ড ছিল)।

৩০শে জুন, ১৯২৭।

(১) ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ (বার্মিংহামের দৃষ্টান্ত)।

(২) নৌশক্তির ভবিষ্যৎ।

(৩) নূতন ফ্রী ষ্টেট্ পার্লেমেণ্ট।

(৪) ট্রোট্‌স্‌কি ও তাঁর দল (ট্রোট্‌স্‌কি ও জিনোভিয়েফ কি কারণে সোভিয়েট্ কর্ত্তৃত্ব হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা)।

(৫) হোনানের লাল বল্লম। (উত্তর চীনে বলশেভিক প্রভাব বাড়িতেছে)।

(৬) সোভিয়েট্ শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্য (সব মাটি আর কি!)

(৭) উপনিবেশে বালকদের পাঠানো।

(৮) ইঙ্গ আর্জেণ্টিন মিতালি (বাণিজ্যে ও আর্থিক ব্যাপারে সহযোগিতা)।

(৯) বিদেশী ঋণ (নানা দেশের প্রচেষ্টা)।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ—(১) স্বাগতম্ (ডিউক অব্ ইয়র্কের প্রত্যাবর্ত্তনে)। (২) পরিবর্ত্তনশীল মেঘমালা বা আকাশ (চীনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা ও মন্তব্য)। (৩) শ্রীযুক্ত কস্‌গ্রেভের প্রত্যাবর্ত্তন। (৪) বন্ধুতার ছলনা (বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন রুশিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখিতে চায়। সেই লইয়া বিদ্রূপ ও কঠোর সমালোচনা)। (৫) লিষ্টার ও সেভের মধ্যস্থলে। (৬) লর্ডস্‌দের বিবর্ত্তন। (৭) দিনের দৈর্ঘ্য।

"দি ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্ণেল"

কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত। মাসিক। কলিকাতা।

জুলাই, ১৯২৭। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৪। এই মাসে এই পত্রিকা ২২ বছরে পড়িল।

সম্পাদকীয় হইতে জানিতে পারি—কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের সভ্য-সংখ্যা ৫০০র উপর। গত বছর ৩২ জনের ৩০টি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বাস্থ্য-তত্ত্বের কথা নানা দিক্ হইতে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা করিয়াছেন দেশী ও ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ।

পুষ্টিবিজ্ঞান ও অর্থতত্ত্ব

দেশোন্নতি অথবা দেশ-সেবার অর্থ কি ? এই পত্রিকার ভাষায় বলি, "দেশের উন্নতি অর্থ, ৭৫% আর্থিক উন্নতি, আর বাকী ২৫% সামাজিক উন্নতি।"

মানুষ বাড়িতে পায় না দুই কারণে—(১) খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে পীড়ার বীজাণু আসিয়া শরীরের ভিতর ঢোকে। (২) অপর্য্যাপ্ত বা অপুষ্টিকর খাদ্য-গ্রহণ। শেষোক্ত কারণটি যে সমগ্র সমাজের পক্ষে পরম অনিষ্টকারী সে বিষয়ে স্বাস্থ্য-বিদ্‌গণ একমত।

ডাক্তার মার্শ্যাল তাঁর "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অব্ ইকনমিক্‌স্" নামে প্রকাণ্ড গ্রন্থে জনগণের স্বাস্থ্যকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁর মতে "শুধু বাঁচিয়া থাকাই যথেষ্ট নয়। ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অর্থশাস্ত্র সেই পথ বাৎলাইয়া দিতে বাধ্য।"

কিন্তু ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে ? প্রথমতঃ, পেট ভরিয়া খাইতে হইবে। দুই বেলা যদি পেট পুরিয়া খাইতে না পাই, তবে খাটিব কিসের জোরে ? অনাহারে বা অল্পাহারে থাকিয়া কাজ করিলে বেয়ারাম পীড়ার বিরুদ্ধে যুঝিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, কাজ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, কাজও নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হয়।

তারপর প্রশ্ন কোন্ প্রকার খাদ্য খাইব ? মাখন, ঘী, দুধ ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ আমাদের খাদ্য-তালিকা হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতীকারের উপায় কি ?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রন্ধন-বিজ্ঞানের কথা আসিয়া পড়ে। যা-তা করিয়া রান্না করিলেই চলে না। তারও একটা প্রণালী আছে, তর্কবিজ্ঞান আছে। কাঁচা বনাম পাকার মামলা নিষ্পত্তি হওয়া মাত্র দরকার এমন রন্ধন-প্রণালীর আবিষ্কার, যাতে সহজে হজম হয়, রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় ইত্যাদি।

ব্যাধির ঠিকুজি

খাদ্য সম্পর্কে অশেষ প্রকার প্রশ্ন ও অনুসন্ধান চলিতে পারে। খাদ্যের স্বাদ, ওজন, প্রকরণ, উপাদান ইত্যাদি লইয়া বহু প্রকারের গবেষণা চলিতে পারে।

আমরা গরু, ভেড়া কুকুর ইত্যাদি জীবজন্তু পালিয়া থাকি। তাদের যা ইচ্ছা খাইতে দি কি ? তাদের নিকট হইতে আমরা প্রভূততম কাজ আদায় করিয়া লইতে চাই। সেজন্য এমন খাদ্য দেই যেন তারা সর্ব্বদা কর্ম্মঠ থাকে। অর্থাৎ তারা কি খায় না খায় সে বিষয়ে আমরা উদাসীন থাকি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অত্যন্ত সাধারণ সত্যটা আমরা নিজেদের বেলায় ভুলিয়া যাই। যা তা খাই। রোগে ভুগি। কর্ম্ম-শক্তি হারাই।

ইহার প্রতিবিধান কে করিবে ? ডাক্তার না অর্থ-শাস্ত্রবিদ্ ? শিশু-মৃত্যু, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যনাশ, যক্ষ্মার দ্রুত প্রসার, জাতীয় জীবনী-শক্তির অপচয় কে নিবারণ করিবে ? ডাক্তারি শাস্ত্র না অর্থশাস্ত্র ?

বস্তুতঃ, এ সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আর অর্থবিজ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন নয়। একে অন্যকে নিরন্তর সাহায্য না করিলে সমাজ-সেবার এক অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

কর-তত্ত্বের বিশেষ নীতি

কর-তত্ত্বের সহিত জাতীয় স্বাস্থ্যের কোন সম্পর্ক আছে কি ? আপাত দৃষ্টিতে নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কর-তত্ত্বটা একটা বিচ্ছিন্ন একক ব্যাপার নয়। কর দিবার সামর্থ্যের হিসাব না লইয়া কর বসাইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইতে পারে, রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে।

কোন জাতির কাজ করিবার ক্ষমতা, স্বাস্থ্য ও কর-সামর্থ্য তার পুষ্টির উপর নির্ভর করে, মাথা-পিছু তার কত আয় সেই হিসাবের উপর নির্ভর করে না। মাথা-পিছু বেশী আয় হইলেও সে ভাতে মরিতে পারে। একটা কারণ অজ্ঞতা হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাকে শিখাইয়া দিতে হইবে, কি খাইতে হইবে, কতখানি খাইতে হইবে, কি খাইতে হইবে না। তার পুষ্টিবিধান ঘটিলে সে সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে বেশী কাজ করিতে পারিবে। অপেক্ষাকৃত বেশী কর-ভার গ্রহণ করিতেও তার আপত্তি হইতে পারে না।

তোকিও ও মস্কোর স্বাস্থ্য-মন্দির

জাতীয় স্বাস্থ্য একটা একটানা জিনিষ নয়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র ও ভিন্ন ভিন্ন সময় না ধরিলে ভুল হইবে।

খাদ্যের রসায়ন, রূপান্তর, শরীর-বিজ্ঞান, বিকৃতি, পরমাণু ও আণবিক তত্ত্ব আছে। রন্ধন-বিদ্যা ও বিজ্ঞান ফেলিয়া দিবার বস্তু নয়। তারপর সমাজে সবাই কিছু আর একশ্রেণীর লোক নয়। চাষী, কারখানার মজুর, দিন-মজুর, চাকর কেরাণী, শিক্ষক, ইস্কুলের ছাত্র, শিশু, রমণী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার কার প্রয়োজন কিরূপ। অজীর্ণ, উদরাময় ইত্যাদি পেটের অসুখে ও বহুমূত্র, বাত ইত্যাদিতে প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার কোন্ স্থানে কোন্ বেয়ারামের প্রাদুর্ভাব কেন রহিয়াছে বা নাই, খাদ্য-দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে কোথায় কিরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

এ সব কাজ জাতি-নির্ম্মাণের প্রথম অধ্যায়। খাপছাড়া ভাবে একজন দু'জনের কাজ নয়। সেইজন্য সম্পাদকীয় পরামর্শ হইতেছে এইরূপ নানা দিকে মাথা খেলাইবার জন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা গবেষণা মন্দির খাড়া করিবার। তাঁদের নজির হইতেছে জাপান ও রুশিয়া।

তোকিও ও মস্কোর সরকারী ইন্‌ষ্টিটিউটদ্বয়ে পুষ্টি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক আলোচনা-বিশ্লেষণ চলিতেছে। কাজের নমুনা—খাদ্যের উপকরণ সম্বন্ধে গবেষণা (জীবজন্তু ও উদ্ভিদের রাজ্য হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য পাই, কি প্রকারে উৎপাদন করি, রক্ষা করি ও বণ্টন করি); বাজে উৎপন্ন-গুলিকে কি করিয়া কাজে লাগান যায়; গরিবদের জন্য সস্তা অথচ পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া (তা সকল সময়েই হোক্ বা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি খাদ্য-সঙ্কটের সময়েই হোক্); কি করিয়া খাদ্যের অত্যাবশ্যক উপকরণ-গুলি অক্ষত রাখিয়া রান্না করা চলে; শরীরের বাড় ও প্রজনন-শক্তির সহিত খাদ্যের সম্পর্ক কি? বাজারে যে সব খাদ্যদ্রব্য বিক্রী হয় সেগুলির পরীক্ষা ও নূতন নূতম খাদ্যের উদ্ভাবন।

সোভিয়েট রুশিয়ায় ডাক্তারি গবেষণা

ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ব্যাক্‌টিরিয়োলজি বা জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক ও কলিকাতা চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালের পরিদর্শক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ উকীল লিখিত প্রবন্ধ)।

সমাজ-সেবক অমূল্য চরণের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে তোকিও ও মস্কোর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান মন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে। অমূল্যবাবু এই সংখ্যায় রুশিয়ার বিপুল প্রচেষ্টার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিয়াছেন। এই পরিচয়ের বিশেষত্ব এই যে, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-মন্দিরের কয়েকজন পৃথিবীবিখ্যাত গবেষকদের নিকট তিনি ইহা সাক্ষাৎভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাদের কয়েকজনের নাম—অধ্যাপক এল, টারাস্‌সেভিচ্, রুশিয়ার মেডিক্যাল গবেষণার ডিরেক্টর; অধ্যাপক ডি জ্বাবোলোটনি, লেনিনগ্রাডের পরীক্ষামূলক ভেষজ-মন্দিরের ডিরেক্টর; বিখ্যাত শরীর-তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক পাভলোভ ইত্যাদি।

সোভিয়েট রিপাব্লিক হইতে একখানা কেতাব বাহির হইয়াছে। নাম সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারী বিজ্ঞান-মন্দিরের রিপোর্ট (১৯১৯-১৯২৪)। মস্কো হইতে প্রকাশিত। এই রিপোর্ট হইতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান মন্দিরের বিকাশের ধারা ও কার্য্যাবলীর কথা জানিতে পারি।

রুশিয়াতে ৩৩টি মেডিক্যাল গবেষণাগার আছে। গবেষকগণ মাসে পায় মাত্র ২৫ হইতে ১৫০ রুবল্। ইহা অতি সামান্য। কিন্তু কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মস্কোর স্বাস্থ্য-মন্দির অধ্যাপক টারাস্‌সেভিচের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। সেক্রেটারীর নাম ডাক্তার ভি,এ, লুবার্শ। ১৮৬১ সন হইতে একটা কেন্দ্রীয় লেবরেটরি থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯১২ সন হইতেই ইহার কাজ আরম্ভ হয়। ইহার নিম্নলিখিত ৮ টি বিভাগ আছে :—

১। সেরা ও ভ্যাক্‌সিন্ (টীকা) আয়ত্ত করিবার ইন্‌ষ্টিটিউট বা মন্দির। ১৯১৯ সনে স্থাপিত। কর্ত্তা টারা-স্‌সেভিচ্। সাহায্য করিতেছেন ১ জন সেক্রেটারি, ৭ জন

ডাক্তার, ৫ জন কম্পাউণ্ডার, ৭ জন টেকনিক্যাল সহায়ক। ইহার ৪টি বিভাগ আছে। তন্মধ্যে ১ম ও ২য় বিভাগের কাজ হইতেছে রুশিয়ার কোথায় কত প্রকারের সেরা আছে তাহা জানা, সেগুলির ক্ষমতা ও নিরাপদতা পরীক্ষা করা এবং ভ্যাকসিন তৈয়ারী করিবার কত প্রকার উপায় আছে, ডোজ কি হইবে, রোগ-নিবারণের শক্তি কতদূর ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করা।

২। প্রোটোজোয়াল অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলের ব্যাধি গবেষণা-মন্দির। পরিচালক অধ্যাপক মারৎসিনেহ্বস্কি। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান চলিতেছে। ১৯১৮ সনে স্থাপিত।

এই মন্দিরের ৫টী বিভাগ আছে (১) প্রোটোজ্জলজি-অধ্যাপক ই, আই, মারৎসিনোহ্বস্কি (২) কেমো থেরাপি আই এ এস মোরোভিন্‌সৎএল্ফ (৩) এন্টোমোলজি ভি, ভি, নিকোলস্কি (৪) হেলমিনথোলজি, অধ্যাপক কে, আই, ক্রিয়াবিনে (৫) ক্লিনিক্যাল ডাক্তার মাক্রামে নোসিনা।

এই মন্দিরে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ডাক্তারদের ৩ মাসে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ম্যালেরিয়া, প্লেগ গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের ব্যাধি ও হেলমিন্‌থোলজির জন্য এক একটা মিউজিয়াম মোতায়েন রহিয়াছে। "দি রুশিয়ান জার্ণেল অব্ ট্রপিক্যাল ডিজিজেস্" নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ইহার অধীনে ১০০টা ম্যালেরিয়া বুরোর কাজ পরিচালিত হয়। মস্কো ও বোখারাতে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান ও তুর্কিস্থান বোখারা আর্ম্মেনিয়াতে (১৯২১, ১৯২২, ১৯২৩) হেলমিনথোলজিক্যাল অভিযান গিয়াছে।

৩। হাইজিন মন্দির। কর্ত্তা অধ্যাপক পি, এন, ডিয়াট্রোপটোফ। ১৯২৪ পর্য্যন্ত ইহার ৭টী বিভাগ ছিল। (১) সাধারণ মড়ক-সংক্রান্ত হাইজিন (২) জল সম্বন্ধে হাইজিন (৩) জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা (৪) ও (৫) ডিস্-ইন্‌ফেকশন ও ডিসইনসেকশন (৬) অসুখবিসুখ সংক্রান্ত হাইজিন (৭) ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হাইজিন।

এই মন্দিরের গবেষকেরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন :—

(১) কলেরার মড়কত্ব।

শিশুদের ছোঁয়াচে রোগের মড়কত্ব।

(২) আন্ত্রিক ছোঁয়াতে অন্ত্রের মধ্য হইতে আন্ত্রিক জীবাণুর অদৃশ্য হইয়া যাইবার হেতু।

(৩) মানুষের এক্টো ও এণ্ডো প্যারাসাইটের (পরগাছা) বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা হইতে পারে, ছোঁয়াচে রোগ কি প্রকারে শরীরের ভিতর ঢুকে, পোকা বা বীজাণু কি করিয়া ঢুকে ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান।

২৪০ টা মৌলিক তৈল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, তাদের উপাদান কি এবং ডিসইন্‌ফেকশন করিবার প্রক্রিয়ার কতখানি।

(৪) জল বিশ্লেষণ করিতে হইলে কি কি প্রণালী অবলম্বনীয়।

(৫) খাদ্য হাইজিন, ও খাদ্য বিশ্লেষণ ও ভেজাল কি কি উপায়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজ করা চলে। দোকানে যে খাদ্য-সামগ্রী বিক্রী হয় স্বভাবতঃ তার উপাদান কি এই বিষয় লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে।

(৬) ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত হাইজিন লইয়া গবেষণা। ব্যবসাবাণিজ্যের হাইজিন কি? নিম্নের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ব্যাপারটা কতক বোধগম্য হইবে।

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের কাজ করিবার ক্ষমতা কিরূপ? যুবকদের? পুরুষদের? স্ত্রীলোকদের?

(খ) শিল্প-বিষের সঞ্চার কি কি আকারে ঘটিতেছে?

(গ) কার্য্য করিবার ক্ষমতার উপর বহিঃশক্তি, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, ধুলা ইত্যাদির প্রভাব কিরূপ?

(ঘ) শিল্প-বাণিজ্যে ক্লান্তি-তত্ব সম্বন্ধে গবেষণা।

(ঙ) স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে বাতাস আয়োনাইজ করার মূল্য কি?

(চ) স্যানিটারি টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক আলোচনা।

৪। পুষ্টি-গঠন বিদ্যার পরীক্ষামূলক মন্দির। কর্ত্তা অধ্যাপক এম, এন, শাটেরনিকোফ। ১৯১৯ সনে স্থাপিত। ইহার ৫টী বিভিন্ন বিভাগ আছে।

জীবজন্তুতে পুষ্টিদ্রব্যাদি ও শক্তির বিনিময় বা পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক অবস্থাতেইবা কিরূপ হয়, আর আলো, তাপ, জলবায়ু ও খাদ্য-গঠনের উনিশ-বিশেই বা কিরূপ হয় এই

বিষয় লইয়া মাথা ঘামানো হইল এই মন্দিরের ধান্ধা। সেজন্ত নানাপ্রকার পরীক্ষা ও শরীর লইয়া কাটা ছেঁড়া এখানে নিরন্তর চলিতেছে। রুটি, ছাগলের দুধ, গম, বাঁধাকপি ইত্যাদি লইয়া অনেকপ্রকার নাড়াচাড়া হইয়াছে।

জাপানেও ঠিক এই ধরণের একটা মন্দির আছে। তার নাম "পুষ্টির নিমিত্ত রাজকীয় গবর্ণমেণ্ট মন্দির।" ধাম তোকিও। আর কর্ম্মকর্ত্তা ডাক্তার সৈকি। সেখানেও নানাদিকে জোরসে কাজ চলিতেছে।

বস্তুতঃ, আমাদের দেশেও পুষ্টিতত্ত্ব লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিবার দরকার আছে। সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্যের আবিষ্কার করা আমাদেরও ঘরোয়া সমস্যা বটে।

৫। বায়ো-কেমিষ্ট্রী বা জৈব-রসায়ন মন্দির।

এই মন্দির সরকারী রসায়ন মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। ইহাকে ইয়োরোপের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানালয়ের একটি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কর্ত্তা অধ্যাপক এ, এন্, বাখ। রক্ত ইত্যাদি লইয়া ৫ বিভিন্ন বিভাগে কাজ হইতেছে।

প্রত্যেক বছর এই মন্দির হইতে ৭৫-১০০ ব্যক্তি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হয়। ডাক্তারদের বছরে একবার করিয়া এন্‌জিমোলজি সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৬। মাইক্রোবোলজি মন্দির।

১৯২১ সনে স্থাপিত। বৃদ্ধি ইত্যাদি লইয়া আলোচনা হয়। ৫টী বিভাগ আছে। এই মন্দিরের প্রধান আলোচ্য বিষয় ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ও অন্যান্য জ্বরজারি, ডিপথিরিয়া কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্ত্তমানে এইসব দিকে কাজ হইতেছে।

৭। পরীক্ষামূলক বায়োলজি বা জীবতত্ত্ব মন্দির।

কর্ত্তা অধ্যাপক এন, কে, কোলটৎসোফ ১৯১৮ সনে স্থাপিত। ইহার ৭টী বিভাগ। এক কথায় বলা চলে, মানুষ ও পশুর উপর হেরিডিটি বা বংশ-প্রভাব বিভিন্ন বিভাগে আবিষ্কার করাই এই মন্দিরের মূল উদ্দেশ্য।

৮। যক্ষ্মা গবেষণা মন্দির।

১৯২২ সনে স্থাপিত। যতদূর পর্য্যন্ত ও যতদিক্ দিয়া যক্ষ্মার আলোচনা ও পরীক্ষা চলিতে পারে তাহাই হইতেছে।



আর্থিক ইতিহাসের দলিল

আমরা ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে বাঙালী জাতিকে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ধারাসমূহের সঙ্গে সুপরিচিত দেখিতে ইচ্ছা করি। এই ধারাসমূহের গতি কোন্ দিকে তাহা অনেক উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী পণ্ডিতেরও ভাল করিয়া জানা নাই। এই কারণে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা আর ভবিষ্যতের জন্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিচারের বেলায় গোলযোগ উপস্থিত হয়।

সম্প্রতি হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে একখানা দলিল-দস্তাবেজের বই বাহির হইয়াছে। লেখকের নাম পোস্তমুস। তিনি আমষ্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ইতিহাস-বিদ্যার অধ্যাপক। বইখানা ওলন্দাজ ভাষায় লেখা হয় নাই, লেখা হইয়াছে ফরাসীতে। কেতাবের নাম রেক্যই দ' দোকুমাঁ অ্যাঁতার্ণাশুনো রেলাতিফ্ আ লিস্তোয়ার একোনোমিক ১৮১৪-১৯২৪ (১৮১৪ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত আর্থিক ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক দলিল-সংগ্রহ)। প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে ১৯২৫ সনে, ৮৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে আছে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর জার্ম্মাণি এই তিন দেশের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সন্ধিবিষয়ক মূল কাগজপত্র।

বুঝা যাইতেছে যে, আর্থিক জীবনের আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন সম্বন্ধে এই তিন দেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে সকল সন্ধি কায়েম করিয়াছে এই বই সেই সমুদয় সন্ধিরই সংগ্রহালয়। কথাটা বাঙালী সমাজে বেশ বুঝিয়া রাখা উচিত। কেননা আন্তর্জ্জাতিক মেলামেশা, সমঝৌতা, আর বুঝাপড়া হইতেছে বর্ত্তমান জগতে আর্থিক উন্নতির এক মস্ত বনিয়াদ। আজকালকার দুনিয়ায় পৃথিবীর অতি নগণ্য পল্লীর নগণ্য চাষী বা মজুরের আর্থিক জীবনও জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই সকল আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-আন্দোলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

আমাদের পত্রিকার নানা অধ্যায়ে এই তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পোস্তমুসের গ্রন্থে প্রথমেই বিবৃত হইয়াছে ১৮১৪-১৫ সনের হ্বিয়েনার সন্ধি। এই সন্ধিতে নেপোলিয়ানী সমর খতম হয়। গোটা সন্ধিটা উদ্ধৃত করা হয় নাই। সন্ধির ১০৮ ধারা হইতে পরবর্ত্তী যে কয় ধারায় আর্থিক ব্যবস্থার কথা আছে, একমাত্র সেই সবই গ্রন্থকারের দৃষ্টি টানিয়া আনিয়াছে।

তাহার পর আছে আফ্রিকার নিগ্রো-জাতীয় নরনারীকে গোলাম রূপে কেনা-বেচা বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা। এক সন্ধির দ্বারা এই গোলাম-ব্যবসা রদ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে ইয়োরামেরিকার আর্থিক জীবন মজুর ও চাষী সম্বন্ধে অনেকটা নতুন পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছে।

ইয়োরোপের রাইন-দরিয়ায় ওলন্দাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, সুইস ইত্যাদি নানা জাতির ষ্টীমার জাহাজ চলাফেরা করে। আমদানি-রপ্তানি চলে বিস্তর। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এই এক বড় বাহনকে সন্ধিপত্রে সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। গ্রন্থে তাহার মোসাবিদাগুলা দেখিতেছি।

১৯১৮ সনের হ্বার্সাই সন্ধি কায়েম হইয়াছে। তাহার ভিতর আর্থিক সর্ত্ত আছে বিস্তর। পরে ১৯২৪ সনে জেনেহ্বায় একটা আর্থিক বুঝা-পড়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহার দ্বারা হ্বার্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলাকে নানা প্রকারে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। তাহারই ফলে দেখা দিয়াছে ডয়েস-প্রবর্ত্তিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। অর্থাৎ আজকাল জার্ম্মাণি যে-যে সর্ত্তে

তাহার বিজেতা শত্রুদিগকে ক্ষতিপূরণ সমঝাইয়া দিতেছে তাহার দলিল হ্বার্সাইয়ের সন্ধি হইতে সরিয়া আসিয়াছে ১৯২৪ সনের জেনেহ্বায় অনুষ্ঠিত "প্রটকলে।"

এই সকল মোটা মোটা আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ছাড়া অন্যান্য আর্থিক সমঝৌতাও পোস্তমুসের গ্রন্থে ঠাঁই পাইয়াছে। হল্যাণ্ডের ৫৭টা ছোট বড় মাঝারি সন্ধি, ওলন্দাজ ভারত (জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ পুঞ্জ)-সম্পর্কিত ৮টা সন্ধি, ফ্রান্সের ২৫টা সন্ধি আর জার্ম্মাণির ৩৬টা সন্ধি এই দলিল-সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৩৬টা জার্ম্মাণ দলিলের মধ্যে আছে ১৯০২ সনের আর ১৯২৫ সনের নবপ্রচারিত শুল্ক-বিধি।

"ইণ্টার্ণ্যাশ্যনাল ল" বা আন্তর্জ্জাতিক আইন নামক বিদ্যা বলিলে যাহা বুঝা যায় বর্ত্তমান গ্রন্থকে তাহার অন্তর্গত বিবেচনা করা চলে। তবে এই বিদ্যা আবার দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। একটার নাম "পাব্লিক" বা রাষ্ট্রগত আর একটার নাম "প্রাইভেট" বা জন-গত। রাষ্ট্র-গত আন্তর্জ্জাতিক আইনে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের লেনদেন, যথা লড়াই, শান্তি, ঔদাসীন্য—নিয়ন্ত্রিত হয়। জন-গত আন্তর্জ্জাতিক আইনের দ্বারা কোনো দুই বা তার চেয়ে বেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী নরনারীর লেনদেন,—যথা ব্যবসাবাণিজ্য, জাতিবিধি, বিবাহ, দেশত্যাগ, নবদেশ-গ্রহণ ইত্যাদি—শাসন করা হইয়া থাকে। পোস্তমুসের গ্রন্থ প্রাইভেট "ইণ্টার্ণ্যাশ্যন্যাল ল" বিদ্যার সামিল। এই বিদ্যার দিকে যুবক ভারতের দৃষ্টি আদৌ পড়িয়াছে কিনা জানিনা। কিন্তু ধনবিজ্ঞান আর আর্থিক বিধিব্যবস্থা লইয়া যে সকল পণ্ডিত, ব্যবসায়ী, বণিক, কংগ্রেস-কর্ম্মী আর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে এই বিদ্যা খুব বেশী জরুরি।

পুঁজি-সঙ্ঘের আইন

বিগত বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার আর্থিক জীবনে একটা নয়া যুগান্তর চলিতেছে। তাহার অন্যতম লক্ষণ কার্টেল, ট্রাষ্ট ইত্যাদি সঙ্ঘের আবির্ভাব। এই সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইয়াছে।

কিন্তু সঙ্ঘ যেমন-যেমন বাড়িতেছে তেমন-তেমন তাহার আকার-প্রকার ধরণ-ধারণও বদলাইয়া যাইতেছে। মামুলি "সঙ্ঘ" শব্দ কায়েম করিলে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক গড়ন বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন গড়নের জন্য কিরূপ রাষ্ট্রীয় আইনকানুন কায়েম করা উচিত, তাহার আলোচনায় ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরা সময় দিয়া থাকেন। ভারতে এই সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার সময় এখনো আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে নবীনতম ধনবিজ্ঞানের কাঠামটা মাঝে মাঝে আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়। সম্প্রতি মাত্র এই-টুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, পুঁজি বা মূলধনের দুনিয়ায় আজকাল প্রধানতঃ তিন গড়ন দেখা যায়। একটাকে মামুলি "বিরাট কারবার" বলা চলে। দ্বিতীয় গড়নের নাম "ট্রাষ্ট"। আর শেয়ার বাজারের বণ্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি ধনদৌলত বিষয়ক কাগজপত্রের সঙ্ঘ হইতেছে তৃতীয় প্রকার গড়ন। তিন প্রকার গড়নের অস্থিমজ্জা আর মাংস পেশী অনেকটা এক ধাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল বিষয় লইয়া ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা জার্ম্মাণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (লাইপৎসিগ, ১৯২৪)। বইটা গ্রুণ্ডলেগুঙ্ ভেস্ রেখ্ট্স ড্যর উণ্টার্ণেমেন্স-ৎসু সামেন ফস্সুঙেন" (কারবার সঙ্ঘ বিষয়ক আইন-কানুনের ভিত্তি)। গ্রন্থকার হাউসমান।

পুঁজি-সঙ্ঘ-বিষয়ক আইন-কানুন বর্ত্তমান জগতে এত জরুরি কেন তাহা ভারতের নরনারীর পক্ষে সহজে বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নয়। কিন্তু দুইএকটা বিলাতী ও ইংরেজি জীবনের দৃষ্টান্তে ইহা বেশ মালুম হইবে। দুইখানা গ্রন্থ এই উপলক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকান টোবাকো কোং" নামক মার্কিণ কারবার আর "ইম্পারিয়্যাল টোবাকো" কোং নামক বিলাতী কারবার দুইটা জগতে প্রসিদ্ধ। এই দুই কোম্পানীর যথেচ্ছচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। লোকেরা তিতিবিরক্ত হইয়া মার্কিণ গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ রুজু করে, "ফেডার‍্যাল ট্রেড কমিশ্যন" নামক যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বাণিজ্য বিচারালয় মোকদ্দমা বিচার করিয়া দেখিতে বাধ্য হইয়াছে। বিচারটা ১৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আর একখানা বইয়ের নাম কম্বিনেশ্যন ইন্ দি

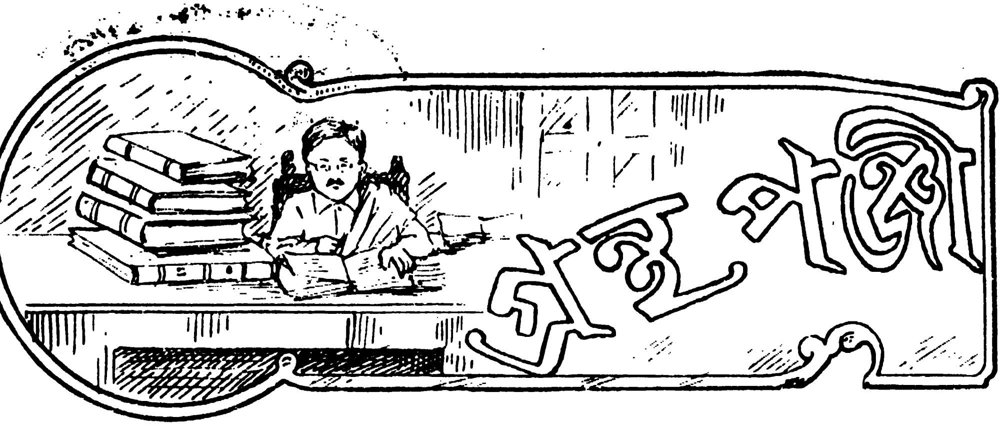
আমেরিকন ব্রেড বেকিং ইণ্ডাষ্ট্রী" (আমেরিকায় রুটিওয়ালাদের সঙ্ঘ)। ১৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখক আল্‌সব্যর্গ, ১৯২৪-২৫ সনে নবগঠিত সঙ্ঘগুলার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশক ষ্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য-গবেষণা বিভাগ।

ধনবিজ্ঞান ও সংবাদপত্র

দুনিয়ার সকল দেশেই প্রত্যেক দৈনিক পত্রের কিয়দংশে থাকে আর্থিক অর্থাৎ কৃষিশিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক সংবাদ। এই অংশটা ভারতীয় সংবাদপত্রে এখনো ভাগ করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু বিদেশী দৈনিকগুলার এই অংশ যারপর নাই শিক্ষাপ্রদ,—খাঁটি ব্যবসাদারের পক্ষেত বটেই, ছাত্র-গবেষক-মাষ্টারদের পক্ষেও। বিদেশী দৈনিক পত্রের কোনো কোনোটা মাঝে মাঝে "আর্থিক উন্নতি"তে উদ্ধৃত ও বিবৃত হইয়াছে।

ভিয়েনার স্প্যেট ও লিণ্ডে কোং ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বই প্রকাশ করিয়াছে (১৯২৬)। লেখকের নাম শ্লেফার। বইয়ের নাম শুনিলে আমাদের ধন-বিজ্ঞান-সেবী এবং সংবাদপত্র-সেবী উভয় শ্রেণীর পক্ষেই চোখ খুলিবার দাওয়াই পাওয়া যাইবে। "ড্যর হাণ্ডেল্‌স-উণ্ড-শিফ্‌-ফার্টস টাইল ড্যর ৎসাইটুঙেন" অর্থাৎ "খবরের কাগজের ব্যবসা-বাণিজ্য আর জাহাজের গতিবিধি বিষয়ক অংশ" নামে যে একখানা বই লেখা চলিতে পারে তাহা আমাদের পণ্ডিত-মহলেও জানা আছে কি না সন্দেহ। এই বইটার ভিতর আছে কি কি মাল? প্রথমেই আছে জার্ম্মাণ আর বিদেশী নোট-ব্যাঙ্কের (ভারতে যাহাকে বলা হইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) কর্ম্ম-প্রণালী। তাহা ছাড়া আছে দুই প্রকার এক্‌সচেঞ্জ বা বিনিময়-বাজারের কথা। প্রথম হইল টাকা-কড়ির বাজার আর দ্বিতীয় শেয়ার, বণ্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদির বাজার। জার্ম্মাণি আর দুনিয়া হইতে তথ্য সংগৃহীত। বর্ত্তমান জগতের রকমারি আর্থিক গড়ন সম্বন্ধে আছে এক অধ্যায়। মালপত্র সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা আছে। তাহার সঙ্গে দুনিয়ার সকল দেশের বড় বড় বাজার আর প্রধান প্রধান কৃষিজ, শিল্পজ মালের বৃত্তান্ত দেখিতে পাই। জাহাজের চলাফেরা আর মাশুল ইত্যাদি আছে অন্য এক অধ্যায়ে। শেষ পর্য্যন্ত "আর্থিক সংবাদ" সম্বন্ধে তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, এই ধরণের বই বাঙালী পণ্ডিতেরা লিখিলে এক সঙ্গে খবরের কাগজওয়ালারা, বণিক-বেপারীরা আর ধন বিজ্ঞানের মাষ্টার-ছাত্রেরা, অধিকন্তু সংবাদপত্রের পাঠকেরাও যার পর নাই উপকৃত হইবেন।



"কারেন্সী, ফিনান্স্ অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং ইন্ চায়না" (চীনের মুদ্রা, রাজস্ব ও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা)—লী, ওয়াশিংটনের সরকারী ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত, ১০+২২০ পৃষ্ঠা ১৯২৬, ০.৩০ সেণ্ট।

"মডার্ণ ফরেণ এক্স্‌চেঞ্জ অ্যাণ্ড ফরেণ ব্যাঙ্কিং" (আধুনিক মুদ্রাবিনিময় ও বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার),—ফিলিপ্স্, লণ্ডন, ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড কোং, ২৯৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ৮ শি ৬ পে।

"ডী ফোর্ম্ বাঙ্ক্‌ম্যোসিগার ট্রান্‌জাক্‌সিওনেন ইম্ ইন্নেরেণ কিনেজিশেন ফার্কেয়ার" (চীনের অন্তর্ব্বাণিজ্যে ব্যাঙ্ক-নোটের রেওয়াজ),—কু, হাম্বুর্গ, ফ্রীড্‌রিখ্‌সেন কোং, ৬+৭৭ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ৫ মার্ক।

"লি ইস্তিতুতি দি ক্রেদিত ফন্দ্যারিও" (ভূমি-ব্যাঙ্ক) —ব্রাসা, তুরিণ, উনিয়নে তিপগ্রাফিক—এদিত্রিচে কোং, ১৩+২৭৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ১৬ লিয়ার।

"আদ্‌মিনিস্ত্রাসিঅঁ ফিনান্সিঁয়্যার দেজ্ আঁতারপ্রিজ্ এ-দে সোসিয়েতে" (কারবার ও কোম্পানীর পুঁজিসংগ্রহ ও পুঁজিশাসন) কাল্মে, প্যারিস্, পেই ও কোং, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৫ ৩০ ফাঁ।

"সার্ভে অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল রিলেশন্স্" (শিল্প-কারখানায় মজুরি, কর্ম্মপরিচালনা ও সামাজিক সংস্রব-বিষয়ক অনুসন্ধান) —বিলাতী গবর্মেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড বিভাগীয় দপ্তর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক সরকারী ষ্টেশনারি অফিস, লণ্ডন, ১৯২৬, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, ৫ শি।

"লা দিসকুপাৎস্যনে এ লাস্‌সিকুরাৎস্যনে কন্ত্র লা দিসকুপাৎস্যনে ইন ইতালিয়া দাল ১৯১৯ আল ১৯২৪" (ইতালিতে বেকার-সমস্যা ও বেকার-বীমা, ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত কালের বৃত্তান্ত),—কাস্‌সা নাৎস্যনালে প্যর লে আস্‌সিকুরাৎস্যনে সচ্যালি নামক সরকারী সমাজ-বীমা-দপ্তর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৮+৩৭৪ পৃষ্ঠা, রোম ১৯২৫ ৩০ লিয়ার।

"মাদার্স্ ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রি" (শিল্প-কারখানায় জননীদের মেহনৎ ও মজুরি)—হাজেস্,—নিউইয়র্ক, নিউরিপাব্লিক কোং, ২৯+২৬৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৫, ১ ডলার।

"ডী সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশেন পার্টাইয়েন" (দুনিয়ার সমাজতন্ত্রী দল),—ফার্গা, হাম্বুর্গ, হয়েম কোং ৩১৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ৪.৫০ মার্ক।

"ইকনমিক্স্ অব্ দি গোল্ড-ষ্ট্যাণ্ডার্ড (স্বর্ণমানের অর্থ-কথা),—জ্যাক, লণ্ডন, কিং কোং,৬+৮৮ পৃষ্ঠা ১৯২৫, ৩ শি।

"ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ (ভারতীয় রেল)—আয়ার, লণ্ডন মিল্‌ফোর্ড কোং, ১৩৩ পৃষ্ঠা ১৯২৫, ৩ শি।

"মার্কেটিং অব্ অ্যাগ্রিক্যাল্‌চারাল প্রডাক্টস্" (কৃষিজ দ্রব্যের বাজার-ব্যবস্থা),—বয়েল, নিউইয়র্ক, ম্যাকগ্র কোং ৮+৪৭৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৫।

"ডী কেমিশে ইণ্ডুষ্ট্রী ডায়েচলাণ্ডস্" (জার্ম্মাণির রাসায়নিক কারবার),—এবাট্, বার্লিন, ফার্লাগ কেমী কোং ৮+১২০ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ৮ মার্ক।

আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র *

যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরা এইটুকু জানেন যে, আমি শুদ্ধ ভাষার ধার ধারিনা। এতদিন ছিল "গুরু-চাণ্ডালী," সেইটে চরমে উঠেছে। এখন চেষ্টায় আছি ভাষাটাকে ষোল আনা চাণ্ডালীতে পরিণত করতে পারি কি না তা দেখতে। কাজেই যাঁরা সংস্কৃতালী শব্দ শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন, তাঁদের কিছুকাল কানে হাত দিয়ে থাকা ভাল।

হিন্দু হষ্টেলের আড্ডা

হিন্দু হষ্টেলের আড্ডাগুলি আপনাদের কাছে কি রকম লাগে জানি না, কিন্তু আমার কাছে খুব ভালই লাগত। কেবল যে ভাল লাগত তা নয়, এগুলিকে আমি যুবক বাংলার জীবনকেন্দ্র সমঝিতে অভ্যস্ত। এই হিন্দু হষ্টেলে আমরা অনেক সময় গুণ্ডামী করেছি। এখানকার "আলগা ঝোল" খেয়ে মানুষ হয়েছে বাংলা দেশের অনেক লোক। এখানকার ঠাকুর-চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করেনি এমন কেহ এখানে এসেছে কিনা জানিনা। তারপর, আমাকে আপনারা মাপ করবেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে ঝগড়া করেনি এমন কোন বাঙ্গালী ছাত্র হিন্দু হষ্টেলে বোধ হয় কোন দিনই ছিল না। এই ধরণের যতকিছু আপনারা আজকাল করছেন,—গায় কুঁজো ছুঁড়ে লড়াই পর্য্যন্ত,—২০।২২ বৎসর আগে আমরা ঠিক তাই করেছি।

হিন্দু হষ্টেলের এসব গুণ ত আছেই, চিরকালই থাকবে। আমার কাছে হিন্দু হষ্টেল আরও অন্যান্য কারণে অতি প্রিয়। এই আড্ডাতেই, এখানকার আব-হাওয়াতেই আমরা ১৯০৫ সন কাটিয়েছি। এখানকার আড্ডায় কান পেতেই আমরা জাপানের কামান দাগা শুনেছি। কেমন করে জাপানের কামান এশিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে যাচ্ছে সে সব আমরা এখানেই গুল্‌তান করতে করতে দেখেছি। এশিয়ার কামান কেমন করে ইয়োরোপ ডিঙ্গিয়ে আমেরিকার পোর্ট্‌স্‌মাউথ শহরে গিয়ে এশিয়াবাসীর দিগ্বিজয় সম্বন্ধে ডিগ্রীজারি করে ছেড়েছে, তাও আমরা হিন্দু হষ্টেলের আড্ডাতে আড্ডাতেই শুনেছি।

ঐ আড্ডাতেই আবার বাংলার ৭ই আগষ্ট আর ১৬ই অক্টোবর জন্মেছে। ভারতের সেই চিরস্মরণীয় ১৯০৫কে আমরা এই হিন্দু হষ্টেলেই পয়দা করেছি। তারই ফলে যুবক বাংলা, যুবক ভারত ইত্যাদি বস্তু। আর তারই ফলে আশুতোস, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদির বীরত্ব, কৃতিত্ব, মহত্ব। কাজেই হিন্দু হষ্টেলের আড্ডা কেবল আমারই জীবনের একটা বড় জিনিষ এরূপ নয়; এটা যুবক বাংলার জীবন-স্মৃতিতে তার জীবনের গতি-ভঙ্গিতে একটা বড়-কিছু করে গিয়েছে। ভবিষ্যতেও হিন্দু হষ্টেল বাংলায় আর ভারতে বড় বড় অনেক-কিছু করবে।

ছোঁড়ারা বুড়োদেরকে মানছে না

কিছুদিন হল আমার সঙ্গে একজন নামজাদা জন-নায়কের কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন—"ওরে বিনয়, আর কি সেদিন আছে? দেশের অবস্থা কেমন বুঝছিস?" আমি বল্লাম—"অবস্থা ত বেশ ভালই মনে হচ্ছে।" তিনি বল্লেন—"তুই এতদিন বিদেশে লম্ফঝম্ফ করে এসে মনে করছিস দেশ খুব বড় হয়েছে। আসল ব্যাপার বুঝতে পার্চ্ছিস না। আজকালকার ছোঁড়াগুলা বেয়াড়া, আমা-দেরকে আর মানছে না।" যেই তিনি একথা বল্লেন তখনি

* কলিকাতা ইডেন হিন্দু হষ্টেলের বার্ষিক মিলনোপলক্ষ্যে সভাপতি শ্রীবিনয়কুমার সরকারের অভিভাষণ। শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরীর লওয়া শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত।

আমি বল্লাম—"যাক, বাঁচা গেছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, দেশটা আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। বুড়োদের বিরুদ্ধে ছোঁড়ারা বিদ্রোহী হচ্ছে।"

ছোঁড়াদের উপর বুড়োদের অত্যাচার এ কয় বছর ধরে ভারতের এক প্রধান তথ্য। কেবল শিক্ষা-কেন্দ্রের আবহাওয়ায় নয়, গোটা যুবক ভারতের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই এ একটা প্রধান বিষ। প্রবীণেরা চেষ্টা করছে ছোঁড়াগুলোকে কোন না কোন উপায়ে জব্দ করতে হবে। নবীন আর প্রবীণে লড়াই চলছে। প্রবীণেরা চেষ্টা করছে নবীন যাতে মাথা না তুলতে পারে, আর নবীনদের মধ্যেও গুটিকয়েক "ভাল ছেলে" আছে, তারা ৫০।৬০।৬৫ বৎসরের বুড়োরা যা-কিছু বলবে, তার মধ্যে হয় একটা দর্শন, না হয় বেদান্ত, না হয় গীতা, কিছু না কিছু খুঁজে বের করবেই করবে। সুতরাং যখনই ঐ নামজাদা জননায়ক মহাশয় বল্লেন—"ছোঁড়ারা বড় ত্যাঁদড় হয়েছে," তক্ষুণি আমি বুঝলাম—এবার তাহলে আধ্যাত্মিক দাওয়াই কিছু বেরিয়েছে। তিনি দুঃখের সহিত বল্লেন—"দেখ্ তোদেরকে আমরা যা-কিছু বলতাম, তোরা তাই করতিস্। আজকালকার দিনের একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্, কোন একটা কাজের কথা বল্, কেহ গায় তুলবে না।" শুনবামাত্রই তাঁকে সোজাসুজি ভাবে জবাব দিলাম, "এই যে ছোঁড়ারা আপনাদেরকে মানতে চায় না, বুঝে রাখুন এইটিই আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের নবীন সুপ্রভাত; ছোঁড়ারা যদি আপনাদিগকে না মানে, আর আপনারা যদি বুঝেন যে, এই ছোঁড়াদের পিছনে পিছনে চলে আপনারাও মানুষ হবেন, তা হলে বুঝব, আপনারা এই বুড়া বয়সে আবার যৌবনের জীবনটা চেখে যেতে পারবেন।"

এই সব কথা আমার ভাল লাগে, এই জন্য, মাপ করবেন "আমি" শব্দ ব্যবহার করেছি, আমার নিজের কথা একটু বলছি। বেয়াড়া ত্যাঁদড় বল্লে যা বুঝায়, ঘটনাচক্রে আমিও তাই। অনেকে আমার সম্বন্ধে মনে করেছেন—"বিদেশ থেকে ফিরে এসে লোকটা বখে' গেছে; আগে ত ছিল ভালই, আজকাল তাকে বুঝাই যাচ্ছে না। ঠিক উল্টো পথে যাচ্ছে।" নিজের কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি এইটুকু শুধু বলতে চাই,—আত্মকাহিনী বলা উদ্দেশ্য নয়—১৭।১৮ বৎসর বয়স থেকে যা-কিছু করেছি অথবা প্রায় ১২ বৎসর বিদেশে থাকবার সময় যা-কিছু করেছি,—সবই ছাপার হরপে লেখা আছে,—তার কিছুই অন্য লোকে যা বলেছে তার সঙ্গে এক প্রকার মেলে না। ১৯১৪ সনের আগেকার যুগেও সকল বিষয়েই বেয়াড়ামি ও ত্যাঁদড়ামি আমার ছিল।

আর এই বিদেশ-প্রবাসের বার বছরও লোকজনের সঙ্গে অমিলেরই প্রকাণ্ড যুগ। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, চীন, জাপান যেখানে যেখানে আমার ডাক পড়েছে, কি প্যারিসের 'আকাদেমী', কি বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়,—সর্ব্বত্রই লোকগুলো দেখেছে—"এই লোকটা যা কিছু বলছে, কোন ফরাসী, জার্ম্মাণ ইংরেজ বা আমেরিকান কখনও তা বলেনি। কেবল তা নয়, ভারতবর্ষের যত লোক বিদেশে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ নিয়ে ৩০।৪০।৫০ বৎসর ধরে যা-কিছু বলেছে, এমন কি ভারতবাসী সম্বন্ধে যে মতামত তারা প্রচার করেছে, তার সঙ্গেও এই লোকটার মিলে না।" আমার সঙ্গে কোন লোকের বনিবনাও হয় না। মজার কথা। সেই জন্যই ফরাসী, জার্ম্মাণ আমেরিকান এরা এসে ডেকে বলেছে—"তুই যা-কিছু বলছিস্, বলে যা। তোকে আমাদের দুয়ারগুলো খুলে দিচ্ছি। আসরে বসে যা পারিস্ বকে যা। আর পারিস্ ত ছাপার হরপেও দাগ রেখে যা কিছু কিছু। আর কেহ তেমন বলছেনা।" আমিও তাদেরকে বলেছি—"ব্যস্, সম্প্রতি আর কিছু আমি চাই না। কেবল তোমাদের আসরে গেয়ে যাবার স্বাধীনতাটুকু পেলেই বর্ত্তে যাই।"

লোকটা বখে' গেছে

আমার বক্তব্য হচ্ছে ত্যাঁদড়ামি। যেদিন থেকে স্বদেশে পদার্পণ করেছি, বোম্বে নামবার পর থেকে যা-কিছু বলেছি, ঘটনাচক্রে দেখছি আমাদের লোকের সঙ্গে মিলছে না। ভারতের স্বদেশ-সেবকেরা বলছে—"বিদেশী মূলধন আমাদের সর্ব্বনাশ করছে"। আমি জোরসে তার উল্টো বলছি। আমি বলছি—"বিদেশী পুঁজিই সম্প্রতি আরও কিছুকাল ভারতের উন্নতির একমাত্র না হোক মস্ত বড় উপায়"। দেশের

যাঁরা মহা পণ্ডিত—লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি সকলেই কৃষি-কমিশনের বিরুদ্ধে বলছেন। সেদিন আমাকে যখন একজন কাগজওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি তার উল্টো বল্লাম। বলে দিলাম—"কৃষি-কমিশনে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই।" কারেন্সি কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে, বোম্বাইয়ের পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস এ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, আসমুদ্র হিমাচল তাকেই ভারত-আত্মার বাণী বলে গ্রহণ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর বিরুদ্ধে মত দিয়েছি। ত্যাঁদড়ের পাল্লায় পড়ে, আশাকরি, আপনারা সে মত গ্রহণ করবেন না।

২০১২৫ বৎসরের ত্যাঁদড়ামি; একদিনের নয়; কাজেই আজকের সভাপতির অভিভাষণে শুদ্ধ ভাষা বলতে একেবারেই অক্ষম, আর তা ছাড়া ত্যাঁদড়ামি ভিন্ন অন্য কিছু বকে যাওয়াও কঠিন। আমি জানি না আপনাদের ধৈর্য্য থাকবে কিনা। গান বাজনা আছে, হাসি-কৌতুক আছে, থিয়েটার আছে। এই আবহাওয়ায় ত্যাঁদড়ের গলাবাজি শুনতে কেউ রাজি হবেন কি? আমি অবশ্য জোর জবরদস্তি করে আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। এখানে না হয়, আজ না হয়, আর কোথাও বা আর কোনদিন ত্যাঁদড়ামি জাহির করবার সুযোগ পাবই পাব।

গড্ডলিকার দর্শন

প্রশ্ন হচ্ছে ত্যাঁদড়, বেয়াড়া বস্তুটা কি? বেয়াড়া অবশ্য একটা জানোয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্যাঁদড় একটা লোকও বটে। বেয়াড়ারা যে বেদান্ত প্রচার করে, সে বেদান্তটা আসে কোত্থেকে? অতি সোজা ভাষায় বলা যেতে পারে বেয়াড়াকে তার উল্টোর সঙ্গে-তুলনা করলে বস্তুটা সহজেই পাকড়াও করা যাবে।

বেয়াড়া বলছে—"এই যে দুনিয়া দেখছ, এটা বড় সুখের বটে, কিন্তু এর চেয়ে আরও সুখের একটা দুনিয়া হতে পারে কিনা দেখা দরকার"। বেয়াড়ার উল্টো যে, সে এ সব লাইনে চিন্তা করে না। সে সকাল বেলা উঠে চা খেয়ে ঘন্টাখানেক খবরের কাগজ পড়ে, ১০টা বাজলে ঝিকে ডেকে বলে "ঝি তেল নিয়ে আয়, নাইবার বেলা হল।" ১০॥০টা ১১টায় তিনি আফিসে বেরুলেন। ৫টায় ফিরে এসে কিছু জলযোগ করে পান চিবুতে চিবুতে হেঁদো কি গোলদিঘীতে গিয়ে হয় 'ফরোয়ার্ড' না হয় 'অমৃতবাজার' কি 'সার্ভেন্ট' নিয়ে গল্পগুজব। ৮॥০টায় আবার কোটরে প্রবেশ, ইত্যাদি। এ জীবন মন্দ নয়, এতে নিন্দা করবার কিছুই নাই, বেশ মোলায়েম বটে।

এই হচ্ছে একপ্রকার চিন্তা-প্রণালী, একপ্রকার দর্শন, একপ্রকার সাধনা। এরকম চিন্তা-প্রণালীর লোক সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। এতে হিসাব লাগে না। যা আছে, যা চলছে সেইটেই "রীতি" সেইটেই "নীতি"। তার বিবেচনায় দুনিয়া এই ভাবে তিন হাজার বৎসর ধরে চলেছে, আরো তিন হাজার বৎসর এই ভাবে চলবে। এই পথের যাত্রী হচ্ছেন গড্ডলিকা-প্রবাহের বৈদান্তিক বা সনাতনপন্থী দার্শনিক।

ত্যাঁদড়ের জগৎ-কথা

বেয়াড়া যে সে বলবে—'সংসারটা সুখের বটে, কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা সংসার কায়েম হতে পারে। যে দুনিয়াতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি তা ছাড়া যে আর একটা দুনিয়া থাকতে পারে না, তা আমি বলি কি করে? আমার রক্তমাংস বলছে যে, আমার হাড়গোড় বদলে যাবার জন্যই তার জন্ম।" সে প্রথমেই সন্দেহ তুলবে, বলবে,— "এই পৃথিবীটা ডান দিকে চলছে, এটাকে বাঁদিকে বোধ হয় চালালেও চালাতে পারি।" ত্যাঁদড় বলবে "পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের দক্ষিণে একটা সাগর, উত্তরে একটা পাহাড় আছে; কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকে ভারত মহাসাগর না হয়ে আর এক জায়গায় থাকলে মহাভারতখানা পঁচে যেত কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। আর্থাৎ পৃথিবীটাকে উল্টেপাল্টে নতুন করে একটু উঁচুতে তুলে ধরা যেতে পারে কিনা দেখা দরকার।" ত্যাঁদড়ের হাতে সে ক্ষমতা আছে কিনা সে কথা সে আলোচনা করে না। সে বলে মাত্র এই যে, পৃথিবীটার দক্ষিণ দিকে অত বড় মহাসমুদ্র না থেকে অন্য কোথাও যদি

থাকত, তাহলে পৃথিবীটা চল্লেও চলতে পারত। তাঁদড় বলছে—

হুড়মুড়িয়ে, আটলাণ্টিক, তুই যাচ্ছিস কোথায় ?
আয় তোরে বেঁধে নিয়ে যাই এশিয়ার পায়।
ভারতসাগর বুড়িয়ে গেছে জলে নাই তার নুণ,
নুণ না পেয়ে পারশী হিন্দু চীনার হাড়ে ঘুণ,
ভারতসাগর ছেঁচে করব আটলাণ্টিকের খাল,
সবার আগে চাঙ্গা হয়ে উঠবে দেশ বাঙ্গাল।

বাঙ্গালীর শারীরিক অসম্পূর্ণতা

তাঁদড় বলছে—"বাঙ্গালী সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। সোজা বসতে পারে না। কুঁজো হয়ে হাঁটে। পাঁচ শ' ফরাসী, হাজার জার্ম্মাণ, দু'হাজার ইংরেজ যখন ইস্কুলে যায়, রেস্ দেখে, থিয়েটার শোনে, ঘাড় সোজা করে হাঁটে, বসে, চলাফেরা করে। কিন্তু যখনই বাঙ্গালীর পাল দেখি, তখনই দেখি তারা চলছে বেঁকে। কেন সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না ?" এখানে তাঁদড় বলবে—"চিরকাল বাঙ্গালীকে বেঁকেই চলতে হবে, তা বোধ হয় নাও হতে পারে"। বাঙ্গালী যেখানে সেখানে হাই তোলে, যখন তখন আঙ্গুল মটকায়, নাক খোঁচায়, কানের ময়লা বার করে শোঁকে, আর চেয়ারে বসে বা আসনে বসে হামেশা পা দোলাতে থাকে। তার না আছে কোন রকম শারীরিক স্থিরতা, না আছে দেহের দৃঢ়তা। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকানদের মধ্যে দেখবেন, ঐ রকম মুদ্রাদোষ নাই। বাঙ্গালীর সমাজে,—তা ছোট বড় সকল মহলেই,—অনেক আছে। এখানে তাঁদড় বলবে—"ভবিষ্যতের বাংলা সম্বন্ধে একথা না খাটতেও পারে"।

চরিত্রহীনতায় বাঙ্গালী

একজন বাঙ্গালী আর একজন বাঙ্গালীকে যত হিংসা করে, একজন বাঙ্গালীর উন্নতিতে আর একজন বাঙ্গালী যত দুঃখিত হয়, কোন জার্ম্মাণ বা ফরাসী তার স্বদেশবাসীর উন্নতিতে তত দুঃখিত হয় কি না সন্দেহ। আপনাদের যিনি যে মহলে আছেন, তিনি প্রতিদিন বোধ হয় সেই মহলের বাঙ্গালীর চরিত্রকথা সম্বন্ধে এই মতই প্রচার করতে বাধ্য হবেন। এমন কি, বিদেশেও যে-সকল বাঙ্গালী ও অন্যান্য ভারতবাসী দেখেছি, তাদের চরিত্র-সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। বন্ধুতে বন্ধুতেও বাঙ্গালী সমাজে আন্তরিকতা নাই। সর্ব্বত্রই জিলিপির প্যাঁচ, কুটিল স্বভাব। আমেরিকায়, জাপানে, ফ্রান্সে, ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে দেখবেন, একজন বাঙ্গালীর উন্নতিতে যদি দুঃখিত হতে হয়, তবে একমাত্র বাঙ্গালীই হবে। এখানে গড্ডলিকা বলছে—"আমি বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছি, তাই থাকব, যেমন চলছি তেমন চলব, যেমন করছি তেমন করব।" তাঁদড় বলছে—"না, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন, তারা হয়ত অন্য কোন প্রণালীতে তাদের জীবন গড়ে তুল্লেও তুলতে পারে। অর্থাৎ বাংলার মাটী, বাংলার জল, আর বাংলার বায়ুতে চিরকাল একমাত্র কুটিল বক্রগতি, বক্রচরিত্র মানুষই পায়দা হবে একথা ঠিক না হতেও পারে।" বাঙ্গালীর চরিত্রে নীচতা, হিংসাপ্রিয়তা এবং পরশ্রীকাতরতা গজিয়ে উঠবেই উঠবে একথা তাঁদড় স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অন্ততঃপক্ষে সেরূপ স্বীকার করাটা তাঁদড়ের দর্শন নয়।

দুনিয়ার পথে ভারত

সহজ কথায় ২।৪ টি বুখনি যদি চালাতে দেন, তাহলে বলব বৌদ্ধ ঋষিরা যেমন "সত্য চতুষ্টয়ের" কথা বলে গেছেন, আমিও তেমনি তাঁদড়ামি-বেদান্তের পাঁচটী সত্য সম্প্রতি প্রচার করতে পারি। প্রথমসূত্র নিম্নরূপ। গড্ডলিকাওয়ালারা বলেন "ভারতবর্ষ ক্রমে জাহান্নামে যাচ্ছে।" তাঁদড় বলছে—"একথা ঠিক নয়, ভারত দুনিয়ার পথেই চলেছে।" আমি ত বাঙ্গালীর বাচ্চা, বিদেশে গিয়ে যখন ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি দেখলাম, তখন ত একথা আমার মনে হয় নি যে, ভারতবর্ষ জাহান্নামে গিয়েছে বা যাচ্ছে। বরং মনে হয়েছে ঠিক উল্টো। দেখেছি যে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা ঠিক যে পথে চলেছে, যে আদর্শে চলেছে, গত একশত বৎসর ধরে ভারতও সেই পথেই চলছে। পশ্চিমের এসব দেশ আগে কৃষিপ্রধান ছিল, এখন আস্তে আস্তে শিল্প-প্রধান, কারখানা-প্রধান যন্ত্র-প্রধান হয়ে

দাঁড়িয়েছে, আমাদের দেশেও ঠিক তাই হয়েছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই আগে পল্লীস্বরাজ ছিল। সেগুলি ভেঙ্গেচুরে এখন সেখানে নতুন কিছু দাঁড়িয়েছে। এই ভারতেও আজ পল্লীসমাজ ভেঙ্গেচুরে নতুন রকম জিনিষ গড়ে উঠেছে। তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনে বিলাত বলে কোন দেশ চিরকাল ছিল না, একটার জায়গায় ৫০টা বিলাত ছিল। ফরাসী দেশে আড়াইশ' রকমের বিভিন্ন আইন-কানুন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ছিল। একটু একটু করে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এসব দেশ এখন "জাতিতে" পরিণত হয়েছে। আমাদের এখানেও রাঢ় বরেন্দ্র বঙ্গ সব ভেঙ্গেচুরে এখন একটা দানা বেঁধে উঠেছে। সেই দানাটা পরাধীনতা সত্ত্বেও ঠিক ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজের দানারই মতন ঐক্যগ্রথিত।

পরাধীনতা বনাম স্বাধীনতা

আমি বলতে চাই, খাঁটি রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা থাকা সত্ত্বেও, আশ্চর্য্যের কথা, ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যে পথে যে আদর্শে এবং যে সভ্যতার দিকে ছুটেছে, এই ভারত এবং এই বাংলাদেশও সেই পথ, সেই আদর্শ এবং সেই সভ্যতার দিকেই ছুটে চলেছে। এ বিষয়ে তাঁাদড়ের যে মত তা সাধারণ মতের ঠিক উল্টো। কেননা, পরাধীন জাতি, সে কিনা আজ সভ্যতার পথে চলেছে? সভ্য, উন্নত ও স্বাধীন দেশের লোকেরা যে প্রণালীতে কাজ চালাচ্ছে, এই পরাধীন দেশের লোকেরাও সেই প্রণালীতে কাজ চালাচ্ছে এটা কল্পনা করা পর্য্যন্ত গড্ডলিকাওয়ালাদের পক্ষে কঠিন। আমি বলতে চাই যে—দুনিয়ার পথ এক, সবাই দুনিয়ার পথে চলেছে। তাই বলে ইংরেজের কাছাকাছি বাঙ্গালী এসেছে, কি ফরাসীর কাছাকাছি মারাঠা এসেছে অথবা জার্ম্মাণের কাছাকাছি পাঞ্জাবী এসেছে তা বলছি না। ভারত যদি আজ স্বাধীন থাকত তাহলেও সভ্যতা, আদর্শ ও জীবনের যে গতি আজ চলছে তাই থাকত, নতুন কিছু হত না। ভারত চরম স্বাধীনতা লাভ করলেও এমন কিছু করতে পারবে না, যা ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরেজ ইত্যাদি জাতের মধ্যে সৃষ্টি হয় নি বা হবে না। ইয়োরোপেও স্বাধীন এবং পরাধীন অথবা নিম-স্বাধীন দেশ আছে। এশিয়ায়ও স্বাধীন এবং পরাধীন দেশ আছে। জিজ্ঞাসা করি, জাপান স্বাধীন থেকেও এমন কিছু অঘটন ঘটাতে পেরেছে কি যা ইয়োরোপ বা আমেরিকা পারে নি? স্বাধীন জাপানী এবং পরাধীন বাঙ্গালী এ দুইয়ে সভ্যতার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোনো তফাৎ যদি আমাকে দেখাতে পারেন, তাহলে বলব—আমি এ পর্য্যন্ত যা-কিছু বলেছি সবই আহাম্মুকী। জাপানীরা এমন কিছু হাতীঘোড়া করেনি, কোনো মার্কামারা, পশ্চিমাদের অজানা নতুন পথে চলছে না। জাপানী ও বাঙ্গালীতে তফাৎ এইটুকু যে, ওদের মানোয়ারী জাহাজ আছে, আমাদের নাই, ওদের কজাতে উড়ো জাহাজ চলে, আমাদের উড়ো জাহাজ নাই, ওদের ট্যাঙ্ক-পল্টন আছে, আমাদের নাই। তা ছাড়া জীবনের আদর্শ, সভ্যতা, ভব্যতা, সমাজ, পল্লীর সঙ্গে শহরের সম্বন্ধ, ফ্যাক্টরীর সঙ্গে চাষের সম্বন্ধ—এসব বিষয়ে যাঁহা বাঙ্গালী, তাঁহা জাপানী, যাঁহা জাপানী, তাঁহা জার্ম্মাণ, যাঁহা জার্ম্মাণ তাঁহা ইংরেজ। আমি বলছি—ভারত পরাধীন তবু সে দুনিয়ার পথেই চলেছে, ভারত বর্ত্তমান জগতেরই অন্যতম অঙ্গ। আজকাল যে পথে চলেছি স্বাধীন থাকলেও আমরা সেই পথেই চলতে থাকব।

আর্থিক অবস্থায় অবনতির কোন চিহ্ন নাই

এইবার দ্বিতীয় সূত্র। গড্ডলিকাওয়ালা বলছে—"আর্থিক হিসাবে ভারতের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলেছে।" এখানে তাঁাদড়ামির দর্শন বলছে—"তা ঠিক না হতেও পারে। ভারতভূমি ক্রমে ক্রমে দরিদ্রতর হচ্ছে, কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা—একথা প্রমাণ করা বড় সোজা নয়।" সামান্য সামান্য ২।১টী বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি। আমি যখন প্যারিসে যাই, দেখি কি? তোফা বাড়ী, তোফা ঘর, সুশ্রী ট্রাম, সুন্দর হোটেল। ফিটফাট লোকজন চলাফেরা করছে, পোষাক-পরিচ্ছদ সব চোস্ত দুরস্ত, টেবিলের উপর নরনারী খাচ্ছে ইত্যাদি। আমরা যখন ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য মাপি তখন দেখি ওদের বাড়ীঘর কি রকম, জমি জোতের পরিমাণ কি, কয়জন খায়, কি খায় ইত্যাদি। আমাদের দেশেও ধনৈশ্বর্য্য জরীপ করবার ঠিক সেই প্রণালীই কায়েম

করা যাক, তাহলে কি দেখতে পাই? ৪০।৫০ বছরের ভিতর ভারতের এবং বাংলাদেশের অবস্থা খারাপ হয়েছে বলে বড় বিশেষ কোন চিহ্ন খুঁজে পাই না। যে মাপে, যে প্রমাণে আমরা বলে থাকি, ইংলণ্ড জার্ম্মাণি, ফ্রান্স জাপান আর্থিক হিসাবে ৫০।৬০।৭০।৮০ বৎসর আগে যা ছিল তার চেয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই প্রণালী ও সেই মাপকাঠিতে বাংলাদেশও উন্নতির দিকেই যাচ্ছে, দারিদ্র্যের দিকে যাচ্ছে না। মোগলাই-মারাঠা আমলে অথবা মৌর্য্য-গুপ্ত আমলে ভারতে সোনার যুগ ছিল না। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণরাও মধ্যযুগে বা প্রাচীনকালে আজকালকার চেয়ে বেশী সুখে ছিল না।

কলের জল ও বালাম চাউল

চোখের সামনে দেখুন, কলিকাতায় যারা আছে তাদের জীবনের প্রধান জিনিষ হচ্ছে কলের জল আর বালাম চাউল। এই দুটি জিনিষ যার পেটে পড়ে তার "ভিটে মাটি উচ্ছন্ন যায়", মতিগতি বিগড়ে যায়। রূপকের সাহায্যে বুঝতে হবে যে—"আধুনিকতা",—সভ্যতাভব্যতা, স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদি যে জনকেন্দ্রে বেড়ে যায় তারই নাম কলিকাতা। কথা হচ্ছে, এই দুটী জিনিষ আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চলনসই চাক্ষুষ বাস্তবগোছের মাপ-কাঠি। জেলায় জেলায় আপনারা মেপে দেখুন—সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ এই দুটী জিনিষ অথবা এই দুটী জিনিষের মাসতুত ভাই-জাতীয় অন্যান্য বস্তু বিগত ৩০।৪০।৫০ বৎসরের ভিতর কত বেড়েছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে গোটা বাংলাদেশে একটীও মিউনিসিপ্যালিটি ছিল না। না থাকার অথবা খারাপ থাকার মানে কি তা আমি ১৯১০-১২ সনে ঢাকায় চলাফেরা করে বুঝেছি। সেই মিউনিসিপ্যালিটীর সংখ্যা আজ যদি ১১৫ হয়ে থাকে অথবা ৫০টীর জায়গায় আজ যদি ১০০টী হয়ে থাকে তাহলে কি বলব যে, আর্থিক হিসাবে বাঙ্গালী সমাজ অবনতির পথে যাচ্ছে?

কেবল মিউনিসিপ্যালিটী নয়, যে-কোন লোকের পরিবারের খবর নিয়ে দেখা যেতে পারে ৩০।৪০।৫০ বৎসর আগে তারা কি খেত, কোন কোন জিনিষ কিনত? এক শহর থেকে আর এক শহরে কিংবা এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় তারা বছরে কতবার যাওয়া-আসা করত? আর যেতে হলে তখন গরুর গাড়ীতে না নৌকায় যাওয়া হত? তার সঙ্গে তুলনায় সেই পরিবার আজকাল কি খায়, কি পরে? এক শহর থেকে আর এক শহরে, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় তারা কতবার যাওয়া আস করে? লোকেরা আড্ডা মারতে দেশদেশান্তরে যায় না, কাজ নিয়েই যায়। বাংলাদেশের অনেক পল্লী সহরেই ফী বৎসর নতুন নতুন নিরেট বাড়ীঘর ২।৪ খানা করে মাথ তুলছে। কাপড়চোপড়ের আকার-প্রকার সমাজসুদ্ধ বেড়ে চলেছে। এ সব জিনিষ জীবন-যাত্রার হিসাবে তুচ্ছ করা চলে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মত হিসাব করে যদি দেখি, আগে আমরা যতখানি চিঠি লেখালেখি করতাম, যত লোক রেলে নৌকায় গরুর গাড়ীতে চড়তাম, থিয়েটারে যেতাম, এখন যদি তার চেয়ে বেশী লোক চিঠি লেখে, ট্রামে চড়ে, রেলে চলে, থিয়েটারে যায়, তাহলে কি বলব আমাদের আর্থিক অবস্থা অবনত হয়েছে? আগে যেখানে মাত্র ৫ জন লোক জামা পরত, এখন সেখানে ২৫ জন লোক জামা পরছে, তাহলে কি বলব আমাদের অবস্থা অবনত হয়েছে? আগে যেখানে ৩ জন চপ কাটলেট খেত—এখন সেখানে ৩০০ লোক যদি চপ কাটলেট খায়—অর্থব্যয়ের অপব্যয়ের কথা বলছি না, বস্তুনিষ্ঠার দিক্ থেকে, টাকা খরচ করবার ক্ষমতার দিক্ থেকে বলছি—তাহলে কি বলব আর্থিক হিসাবে দেশ অবনত হয়েছে? আগে তিনজন লোকের পয়সা ছিল, অতএব তারা ব্যয় করত, এখন তিনশত লোকের পয়সা আছে, খেতে পাচ্ছে, বাবুগিরিও করছে। এটা কি দারিদ্র্যের লক্ষণ, ক্রমিক অধোগতির সাক্ষী?

অর্থনৈতিক মতামতের ওলট-পালট অসম্ভব নয়

আর্থিক হিসাবে আমরা অবনত হচ্ছি—এই মতটা আমাদের দেশে গড্ডলিকার মত চলে আসছে। আর এই ধরণের মতকে আমরা ভারত-আত্মার বাণীস্বরূপ ধরে

নিয়েছি। কিন্তু এসব মত টেঁকসই কি না তা ভেবে দেখাও আমরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। ত্যাঁদড় বলছে "এই সব মতামত ঝেড়ে বেছে দেখবার যুগ এসেছে।" স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল স্রোত যখন ১৯০৫ সনে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ছুটে চলছিল, তখনকার দিনে রমেশচন্দ্র দত্তকে অর্থনৈতিক চিন্তা-হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পীর বলে আমরা বিবেচনা করতাম। বাস্তবিক পক্ষে আমার বিবেচনায় রমেশ চন্দ্রের মত কৃতী পুরুষ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় খুব কমই ছিলেন। যাক এখানে সে কথা পাড়ছি না। বৃটিশ ভারতের আর্থিক ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি স্বদেশী যুগের সমসমকালে দু'খানা বই লিখে গেছেন। সেই বই দু'টাই ছিল আমাদের গীতা-কোরাণ-বেদান্ত স্বরূপ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ১৯২৫-২৬ সনের ছোকরারা, ১৯২৫-২৬ সনের রিসার্চ্চ-ওয়ালারা, অধ্যাপকেরা কি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র যে সব কথা বলে গেছেন, আজকালকার দিনে তা যুবক-ভারতের বা যুবক বাংলার বেদান্ত-স্বরূপ দাঁড়াতে পারে? কিন্তু আমি জানি ১৯০৫-৬ সনে রমেশচন্দ্রের ঐ বহিকে আমরা আর্থিক বেদান্তই বিবেচনা করতাম। এখন লোকেরা ক্রমশঃ বুঝছে যে, রমেশচন্দ্রের সেই মত, যাকে আমরা ভারত-আত্মার বাণী স্বরূপ গ্রহণ করেছি, তা ভারত-আত্মার বাণী নাও হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে কি অবনতি হচ্ছে, সে সম্বন্ধে ২।৪ জন নামজাদা লোক যা-কিছু লিখেছে বা লিখছে, সেগুলিকে ভারত-আত্মার বাণী বা যুবক ভারতের বেদান্ত বা জাতীয় চৈতন্যের প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করা ত্যাঁদড়ের ত্যাঁদড়ামির পক্ষে অসম্ভব। রমেশচন্দ্র যেমন কিছু কিছু বাতিল বিবেচিত হচ্ছেন, তেমনি আজকালকার বাজারে আর্থিক মতামত সম্বন্ধে যা-কিছু "ভারতীয়" "জাতীয়" "স্বদেশী" বলে চলছে, তার অনেকগুলিই বাতিল বিবেচিত হতে চলেছে এবং চলবে। এই গেল ত্যাঁদড়ের ধনবিজ্ঞান। যাকে তাকে যখন তখন ত্যাঁদড়েরা ভারত-আত্মার বাণী, ভারতীয় স্বাদেশিকতার প্রতিমূর্ত্তি স্বীকার করতে নারাজ। স্বদেশনিষ্ঠ বা "জাতীয়" বা "ভারতীয়" বলে যে-সকল মত বাজারে দাঁড়াচ্ছে সেগুলা প্রকৃত পক্ষে স্বদেশনিষ্ঠ না হতেও পারে। অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে ত্যাঁদড়ামির সংশয়বাদ এইরূপ।

মধ্যবিত্তের সৃষ্টি ও পুষ্টি

এখন ত্যাঁদড়ামির তৃতীয় সূত্র প্রচার করা যাক্। মধ্যবিত্ত সমাজ সম্বন্ধে গড্ডলিকাওয়ালারা বলেন—"দেখতে পার্চ্ছনা তাদের কি দুরবস্থা হয়েছে? দেশ অবনতির দিকে যাচ্ছে তার পরিচয় আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।" ত্যাঁদড় বলছে, "তা আমি স্বীকার করতে পারি না। মধ্যবিত্তের দুরবস্থা হয়েছে, এ কথাটা প্রমাণ করা কঠিন। হয়ত হয়নি।" ত্যাঁদড় বলবে—"তুই যখন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত করিস্ তখন কয়টা লোকের নাক গুণে বলিস্? গণনার মধ্যে খুব জোর বামুন কায়েত বৈদ্য ইত্যাদি থাকে। ব্যস, তারা গোটা বাংলায় কত লাখ?" তার চেয়ে যারা একটু উদার-প্রকৃতির লোক তাঁরা বলবেন—"মধ্যবিত্ত বল্লে তাদেরকেও ধরা উচিত, যারা ইস্কুল-কলেজে পাশ করেছে কি ফেল হয়েছে, সাদা জামা, ধোওয়া কাপড়, ধোওয়া চাদর যারা পরে—এসব গুলিকে মধ্যবিত্ত বলা যেতে পারে।"

সমাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গীয় মধ্যবিত্তের অবস্থা খারাপ একথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে কয়জন বাঙ্গালী? আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে একজন লোক এণ্ট্রান্স পাশ করলে দারোগা হত, অথবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কি মুন্সেফ হত। আজকাল এম-এ, পি আর-এস, পি, এইচ ডি, ডি-এস-সি উপাধি পেলেও অনেক সময় একটা চাকুরী জোটে না। গড্ডলিকাওয়ালারা বলছে "এর চাইতে বেশী প্রমাণ আর কি চাও, বাবা?" আমি বলছি—"এতে মধ্যবিত্তের দুরবস্থা কোন মতেই প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় ঠিক উল্টো। দেশটা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। সামান্য পাশের পর কেউ আজকাল হাকিম হতে পারে না। কিন্তু যে যুগে এল-এ ফেল হলেই একটা কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া যেত তার চেয়ে আজকের যুগ হাজারগুণে উন্নত। তখন ঐ রকম

দারোগা বা হাকিম হ'ত গোটা বাঙ্গলা দেশে ১০।১২ জন। আর এখন হাজার হাজার লোক প্রত্যেকেই দারোগা বা হাকিম হয় না বটে, কিন্তু অন্যান্য কিছু হয়। ৪০।৫০।৬০।৭৫ বৎসর আগে গোটা বাংলা দেশে যারা ইংরেজী পড়ত, খবরের কাগজ পড়ত, একখানি বই কিনে তিন পুরুষকে উইল করে দিয়ে যেত, তাদেরকে জ্ঞানী বলা হত। তাদের সংখ্যা ছিল বোধ হয় দেড় দুই বা সাড়ে তিন হাজার। সে যুগটা নিয়ে লাফালাফি করবার কি আছে? কর্ম্মবীর আশুতোষের কল্যাণে আজ সেখানে ১০।১২ হাজার লোক এম-এ, বি এ পাশ কি ফেল হচ্ছে। এরা খবরের কাগজ চালাচ্ছে, গল্প লিখছে, ছবি আঁকছে, গান করছে, নতুন নতুন ব্যবসাতে যাচ্ছে, নানাদিকে বাঙ্গালীর জীবনটাকে বৈচিত্র্যময়, ঐশ্বর্য্যময় করে তুলছে। সকলেই নোট মুখস্থ করে, বি-এ পাশ করছে তা নয়। বি-এ পাশ হউক কি ফেল হউক, লেখাপড়ার ফ্যাক্টরীতে তারা যাচ্ছে। আগে যেখানে ৪।৫ শত ছেলে যেত, এখন সেখানে যায় বিশ হাজার বা তার কাছাকাছি।

সমগ্র মধ্যবিত্তের আয়

আগেকার দিনে কোন পল্লীতে একজন লোক মাত্র এণ্ট্রান্স পাশ করে দারোগাগিরি কি ডেপুটীগিরি পেত, কিন্তু তার পোষ্যবর্গ ছিল ২০।২৫।৫০ জন নিষ্কর্ম্মা লোক। সে যুগটা এমন কোন গৌরবের যুগ নয়। আজকে এণ্ট্রান্স কি বি, এ পাশ করে অথবা ফেল করে সেই একজনের জায়গায় ৩০।৪০।৫০ জন লোক মাসিক ২৫।৫০।৭৫ টাকা রোজগার করছে। ধরুন যেন আগেকার দিনে হাজার লোক প্রত্যেক মাসে ১৫০।২৫০ টাকা রোজগার করত। আজ অন্ততঃ তিন লাখ লোক প্রত্যেকেই মাসে ২৫।৫০।৭৫ টাকা ক'রে রোজগার করছে। কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব করে কথা বলছি না—ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ জাহির করা এক্ষেত্রে এমন সহজও নয়,—আলোচনা-প্রণালীটা মাত্র দেখাচ্ছি। দেখাচ্ছি যে—সমগ্র মধ্যবিত্ত-সমাজে ধনসম্পদ্ বেড়েছে। অতএব যদি কেহ বলেন, গোটা মধ্যবিত্তের অবস্থা খারাপ হচ্ছে, তাঁদের পক্ষে সে কথা হজম করা অসম্ভব। মধ্যবিত্তের দুরবস্থা কোথাও কোথাও থাকতে পারে। কিন্তু সে কালের তুলনায় এ কালের মধ্যবিত্ত বেশী দুরবস্থায় আছে তা স্বীকার করা সহজ নয়।

শ্রেণী-বিপ্লব

তারপর আজ যাকে মধ্যবিত্ত বলছি, ৩০।৪০।৫০।৭৫ বৎসর আগে সে মধ্যবিত্ত ছিল না। আজকে যাকে ভদ্র বলছি, ৩০।৪০।৫০।৭৫ বৎসর আগে সে বোধ হয় ভদ্র গণ্ডীর বহির্ভূত অর্থাৎ "অভদ্র" ছিল। কতজন সে খবর রাখেন? ব্রাহ্মণ হউক কায়স্থই হউক, বৈদ্যই হউক, কি অন্যান্য জাতের লোকই হউক, তারা ১৮১৫—৫৭ সনে আজকালকার মাপকাঠি অনুসারে "ভদ্র"বা মধ্যবিত্ত বিবেচিত হত কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে মাথা খেলানো আবশ্যক। সেদিকে গড্ডলিকা-ওয়ালারা ভ্রূক্ষেপই করেন না। কাজেই আগেকার চেয়ে মধ্যবিত্তের অবস্থা খারাপ হয়েছে, একথা স্বীকার করে চলা সুকঠিন। অধিকন্তু এখনকার মাপকাঠিতে বাংলার আর দুনিয়ার ভদ্রলোকের গণ্ডী অনেক বেশীদুর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। বুঝতে হবে, এই ৫০।৬০।৭০।৮০ বৎসরের ভিতর একটা সমাজ-বিপ্লব, শ্রেণী-বিপ্লব ঘটে গেছে, অর্থাৎ ছোট জাত বড় জাত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এটা কি ভারতের দুরবস্থার লক্ষণ? ছোট জাত ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে। যে পাঠশালার পুঁথি পড়তে পারত না, তার বংশধর মাইনর, এণ্ট্রান্স, এল-এ, বি-এ পাশ করে হাইকোর্টের উকীল হাকিম পর্য্যন্ত হচ্ছে। এগুলি কি ভারতের দুরবস্থার লক্ষণ, মধ্যবিত্তের দুরবস্থার লক্ষণ? অধিকন্তু, ধরা যাক যেন আজকাল কোনো কোনো জেলায় কোনো কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক দুরবস্থা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা বলে বাংলাদেশের গোটা মধ্যবিত্ত সমাজই কষ্টে আছে একথা অন্যান্য পরিবারের লোকজন কোন মতেই স্বীকার করবে না। তা ছাড়া গোটা মধ্যবিত্ত সমাজই যদি রসাতলে যায়, তাহলেও সমগ্র বাংলাদেশ মাটি হতে চলল, একথাও বলা চলবে না। কেন না, ৪॥০ কোটি বাঙ্গালীর সমাজে দুই আড়াই বা তিন লাখ মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য বা অবনতি এমন বিশেষ-কিছু নয়। মধ্যবিত্তের সর্ব্বনাশ ঘটলেও অন্যান্য

শ্রেণীর "পৌষমাস" চালানো অসম্ভব নয়। তাঁদড়ের ধনবিজ্ঞান এইরূপই বিচার করতে অভ্যস্ত।

নবীন বাংলার মেরুদণ্ড—কারখানার মজুর

তারপর চতুর্থ সূত্র। গড্ডলিকাওয়ালারা মধ্যবিত্ত ছেড়ে যখন দেশটার কথা ভাবেন, তখন বড় জোর মাঝে মাঝে চাষীদের কথা বলেন। "কৃষির উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না, চাষীরা হচ্ছে ভারতের, বাংলার মেরুদণ্ড। চাষ জিনিষ আধ্যাত্মিক। এ জিনিষ আর কোথাও ছিল না। চাষী হচ্ছেন ভারতের আদর্শমাফিক লোক।" এইরূপই তাঁদের দর্শন। এখানে তঁ্যাদড় বলবে—"ভবিষ্য ভারতের মেরুদণ্ড, নয়া বাংলার মেরুদণ্ড মধ্যবিত্তও নয়, চাষীও নয়, সে হচ্ছে কারখানার মজুর।" বাংলাদেশে জমির পরিমাণ এত কম, আর চাষীর সংখ্যা এত বেশী যে, কেহ আর চাষের উপর নির্ভর ক'রে পরিবার প্রতিপালন করতে সমর্থ নয়। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে গড়ে তুলবে চাষী একথা যদি বলা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, বক্তা একেবারে চরম নৈরাশ্যের দর্শনে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য যদি কোন চিন্তা করা সম্ভব হয় তাহলে তঁ্যাদড় বলবে—"মধ্যবিত্তের দিকেও তাকিও না, চাষীর দিকেও তাকিও না। যে জিনিষটা একসঙ্গে দুটোকেই রক্ষা করবে, সে হচ্ছে কারখানা, ফ্যাক্টরী বা কল-নিয়ন্ত্রিত, যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক বিধান। যেই এক একটা পল্লীর বুকে ফ্যাক্টরী কায়েম হবে, তখনি চাষীরা নিজ নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে কারখানায় এসে দেখা দিবে, আর ৩০।৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা পাবে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত লোক যারা বি-এ, এম-এ পাশ করে পথ খুঁজে পাচ্ছে না বলে নৈরাশ্যময় হয়ে পড়েছে, তারা ফ্যাক্টরীতে গিয়ে এঞ্জিনিয়ার, কেরাণী, অ্যাকাউন্টেন্ট যা হয় একটা না একটা কিছু হবে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত যে কাজ মাথা আর কলম দিয়ে চালায় সেটা সে ফ্যাক্টরীতে চালাবে। ফ্যাক্টরী একসঙ্গে চাষীকে এবং মধ্যবিত্তকে রক্ষা করবে।" অবশ্য এখানে বলে রাখা উচিত যে, বিগত ১৫।২০ বৎসরের ভিতর মজুরেরা আর্থিক হিসাবে বেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। চাষীদের অবস্থাও আগেকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। কিন্তু মধ্যবিত্তেরা চাষী ও মজুরদের আর্থিক সচ্ছলতাকে দেশের সচ্ছলতা বিবেচনা করতে অভ্যস্ত নয় বলে হিসাবে গণ্ডগোল হয়।

আর একটা কথা জেনে রাখা দরকার। মজুরদের দল পুরু না হ'লে ভারতবর্ষ আধুনিক সভ্যতার কোঠায় উঁচিয়ে যেতে পারবে না। যন্ত্রনিষ্ঠ, সময়-নিষ্ঠ, শাসন-নিষ্ঠ মজুরেরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেই ভারতীয় সমাজে সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, ডেমোক্রেসি ইত্যাদি চিজের আধ্যাত্মিকতা ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। মজুর-দর্শন, মজুর-গীতা, মজুর-বেদান্ত যতদিন ভারতে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত থাকে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক স্বরাজ অসম্ভব।

ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন দেশে যতটুকু ডেমোক্রেসি বা স্বরাজ আজকাল দেখা যায়, তার প্রায় ষোল আনা না হোক অনেকটাই মজুর-সঙ্ঘের আর মজুর-আন্দোলনের দান। বিলাতের কথা ধরুন। সেখানে ১৮৩২ সনের "রাষ্ট্র-সংস্কারে" আসল ডেমোক্রেসি পয়দা হয় নি। এমন কি ১৮৬৬ সনের ধাক্কায়ও এই চিজ বেশী আসে নি। ডেমোক্রেসি বা সাম্যনীতির অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ১৮৮৬ সনের আর তার পরবর্ত্তী আইন-কানুনের সন্তান। এই চল্লিশ বৎসরের আইনকানুনের গোড়ায় মজুর-জীবনের শক্তি ছিল প্রচুর। ১৯২৪-২৫ সনে মজুর-শক্তিই বিলাতী সমাজের একপ্রকার আত্মাশক্তি।

যুবক ভারত আজ ১৮৮৬ সনের বিলাতী আধ্যাত্মিকতা আর তার পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক পাশ্চাত্য ডেমোক্রেসি বা স্বরাজ সমঝিতে অসমর্থ। আমরা এখনো বোধ হয় ১৮৩২-৭৫ সনের পাশ্চাত্য জীবন পাশ করতে পারি নি। ভারতের মজুর-সমাজ যতদিন পর্য্যন্ত না গুনতিতে বেড়ে যায় আর কর্ম্মগুণে মজবুদ হয় ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে আসল স্বরাজ আর ডেমোক্রেসি চাখা অসাধ্যসাধন। স্বদেশ-সেবকেরা, স্বরাজ-সাধকেরা মজুর-আন্দোলনটা পাকিয়ে তুলুন।

মজুর-সংখ্যায় ভারত ও দুনিয়া

গোটা ভারতে আজ মাত্র হাজার ছয়েক কারখান আছে, তাতে অতিমাত্রায় ধরলেও ১৫ লক্ষ মজুর খাটছে

এর থেকে বুঝতে পারবেন আমরা কোথায় আছি। আগে একবার বলেছি—ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে পথে চলেছে, উন্নতি-হিসাবে, আদর্শ-হিসাবে, সভ্যতা-হিসাবে, গতি-হিসাবে, জীবনের ভবিষ্যৎ-হিসাবে, ভারতবর্ষও ঠিক সেই পথে চলেছে। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীন বিলাতে এক্ষেত্রে কোন প্রভেদ নাই। এখন প্রশ্ন এই, আমরা রয়েছি কোথায়? আমার কাছে তার মাপও বাস্তব। ইংরেজ-সমাজে ৪॥০ কোটি লোকের ভিতর যেখানে ৭০।৭৫ লাখ কি ১ কোটি মজুর, বাংলাদেশে ৪॥০–৫ কোটি লোকের ভিতর সেখানে মাত্র ৪ লাখ মজুর। এখন তুলনা যদি করেন, ৪ লাখের সঙ্গে ৭০ লাখ বা এক কোটি মজুরের যে সম্বন্ধ, গোটা বাঙালী সমাজের সঙ্গে বিলাতী সমাজের ঠিক সেই সম্বন্ধ।

এ কথাটাকে আর একদিক্ থেকে আরো সোজা করে বলা যেতে পারে। ইংরেজ-সমাজে কি ফরাসী-মহলে কি জার্ম্মাণিতে ১৬ আনা মানুষ কতগুলি আছে? ৪॥০ কোটি ৫ কোটি মানুষের মধ্যে বাজে মাল সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে ১॥০ কোটি ২ কোটি ১৬ আনা মানুষ মিলে। তার মানে তাদের শরীর সুস্থ সবল, তাদের মাথা ভাল, সজাগ, তেজবীর্য্য আছে। নিজেদের মাথা খেলিয়ে চিন্তা ক'রে তারা কাজ করে এবং নিজেরাই তার ফলভোগ করে। যত রকম দারিদ্র্য ব্যাধি আসতে পারে সব বর্জ্জন করলে, রক্তমাংসের মানুষ যে আকারে পৃথিবীতে দেখা দিতে পারে, তা যদি কল্পনা করতে পারি, তাহলে বলব শতকরা ১০০ অংশ মানুষ অর্থাৎ ১৬ আনা মানুষ পৃথিবীতে খুব কম। কিন্তু অনুপাতের তরফ থেকে মনে হয়েছে যে, বিলাতে ৪॥০ কোটির মধ্যে যদি দেড় কোটি আড়াই কোটি থাকে, বাংলাদেশে ৪॥০ কোটির মধ্যে দেড়, দুই, পাঁচ, দশ হাজার আছে কি না সন্দেহ। অতএব লক্ষ্য হিসাবে আর আদর্শ হিসাবে আধুনিক ইংরেজ আর আধুনিক বাঙ্গালী যদিও এক, কিন্তু কর্ম্মদক্ষতা হিসাবে, জীবনের কিম্মৎ হিসাবে, দশ বিশ হাজারে আর দেড় কোটিতে যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালীতে আর ইংরেজেও সেই সম্বন্ধ। একদম অঙ্ক কষে নিক্তির ওজনে কথা বলছি না, ঠারে ঠোরে এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের সম্বন্ধ বুঝতে চেষ্টা করছি মাত্র। এই যদি বুঝি, তাহলে বুঝতে পারব, এক লক্ষ ইংরেজ এসে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর আধিপত্য করছে কেন।

বাংলার আসল লোক-সংখ্যা

আমরা পাটীগণিতে পড়ি যে, তিনের পিঠে কতকগুলো শূন্য দিলে বিপুল রাশি হয়। কিন্তু ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স যারা ঘাঁটে তারা বলে দিবে, তিনের পিঠে কতকগুলো শূন্য থাকলেই একটা বিপুল রাশি দাঁড়ায় না। শূন্যগুলার মূল্য অনেক সময় এক দামড়িও না হতে পারে। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে এক একটা মানুষ ১০।২০ হাজার লোকের সমান—হাতের জোরে আর মাথার জোরে। হতে পারে বাংলায় ৫ কোটি লোকের বাস। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করেন, "৫ কোটি লোকের কিম্মৎ কতখানি?" আমি বলব "আমাদের লোকসংখ্যা ৫ কোটি নয়, ৫০ হাজার মাত্র।" আর যদি জিজ্ঞাসা করেন—"ইংরেজের সংখ্যা কত?" তখন বলব—"ওরাও ৪॥০-৫ কোটি নয়, হয়ত ২ কোটি কি ২॥০ কোটি।" ওদের আড়াই কোটির সঙ্গে যখন টক্কর দিতে চাই, তখন যদি মনে রাখি আমরা সংখ্যায় মাত্র ৫০ হাজার, তা হলেই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা হয় এবং আমরা বুঝতে পারি ভারত কোথায়—এশিয়া কোথায়। ইয়োরোপের সঙ্গে এশিয়াকে টক্কর দিতে হলে, যুবক এশিয়াকে, যুবক ভারতকে, যুবক বাংলাকে কত হাত পানির নীচ থেকে কাজ সুরু করতে হবে তা একবার মনে মনে কল্পনা করুন, আর যথার্থ আদমসুমারির, দেশের খাঁটি লোক-সংখ্যার কথা ভাবুন।

বৃহত্তর ভারত

এবার বলতে চাই পঞ্চম সূত্র। গড্ডলিকাওয়ালারা বলে থাকেন, "ভারতের উন্নতির একমাত্র উপায় 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' জন্মেছি এদেশে, মরতেও হবে এদেশে।" এই হচ্ছে গড্ডলিকার দর্শন। তাঁদের বলছে—"ভাই, চোখ খুলে একবার দেখ এবং বল—রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁর নামই কর না কেন, এই লোকগুলি কি "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং" কদাপি ন জগাম ? এঁরা তবু অনেকে বিদেশ-ফেরতা লোক বটেন। যাঁরা বিদেশে যান নি, তাঁদের অবস্থাটা কি একবার ভেবে দেখেছেন ?

ইডেন হিন্দু হষ্টেলের আবহাওয়ার ভিতর কেহ বিদেশে যায়নি একথা ঠিক। কিন্তু এর আবহাওয়ার আগাগোড়া বিদেশের প্রতিমূর্ত্তি নয় কি ? এই যে প্রেসিডেন্সি কলেজ, এই যে বিশ্ববিদ্যালয়, এই যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস, চলে যান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, বিশ্বভারতীতে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের আওতায়,—যেখানে যেখানে বাংলা সাহিত্যের চরম নিদর্শন, সুকুমার শিল্পের পরাকাষ্ঠা—শিল্প হিসাবে, সাহিত্য হিসাবে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হিসাবে আমরা যা-কিছু করছি, তার শতকরা ৯৯।৯৯॥০ অংশ বিদেশী মাল নয় কি ? অর্থাৎ একশ' বৎসর ধরে আমরা জীবনে, কর্ম্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আধ্যাত্মিকতায়, রাজনৈতিক চিন্তায়, সংবাদ-পত্রের পরিচালনে একটী মাত্র সূত্র প্রচার করে আসছি। যদিও গড্ডলিকাওয়ালারা তা খুলে বলে না, সে কথা হচ্ছে—"হতে চাও স্বদেশী, ত আগে হও বিদেশী।" বর্ত্তমান ভারতের প্রত্যেক কর্ম্মবীর এবং চিন্তাবীরই এক একজন পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতার অবতার। ভারতটা "বৃহত্তর" হয়েছে তাঁদেরই কৃতিত্বে।

বর্ত্তমান ভারতে পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতা

তা যদি আজ পর্য্যন্ত হয়ে থাকে তাহলে তাঁদড় বলবে, "গড্ডলিকাওয়ালা, বেরো এখান থেকে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভারতের পল্লীতে-পল্লীতে, শহরে-শহরে, পরিবারে-পরিবারে, দোকানে-দোকানে, মুচী-মেথর-মুদ্দাফরাসের সমাজে, চাষীর বাড়ীতে, মজুরের কর্ম্মকেন্দ্রে কায়েম করা হচ্ছে আমাদের একমাত্র সাধনা। একশ' বৎসর ধরে অজ্ঞানে-সজ্ঞানে যা কিছু করেছি, আজ সজ্ঞানে তাই করব।" প্রাণভরে যুবক ভারতকে আজ খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে হবে যে পাশ্চাত্য খোরাক খেয়েই আমরা মানুষ হয়েছি।" এই দেখুন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এখানে বসে আছেন। ইনি কখনও সমুদ্র পাড়ি দেন নি, গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু ইনিও একজন মস্ত 'গো-খাদক'। চসার, শেক্‌সপীয়ার মুখে না দিয়ে ইনি কোন দিন জলস্পর্শ করেন না! এই রকম অখাদ্য-খেকো মানুষ বাংলায় আজ কত ? হাজার হাজার, লাখ লাখ, যারা বি-এ, এম-এ পড়ছে, যত লোক খবরের কাগজ চালাচ্ছে, যত লোক স্বরাজ আন্দোলনের পাণ্ডা, সবাই পশ্চিমা সভ্যতার রস শুষে নিজ নিজ আত্মাকে পুষ্ট করেছে। "অখাদ্য না খেয়ে, হুইটম্যান-আইনষ্টাইন-প্যাস্তয়্যর না পড়ে মানুষ হয়েছে, এমন লোক বর্ত্তমান ভারতে কয় জন আছেন বাপ কা বেটা ? যুবক ভারতের সভ্যতার, যুবক বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের শতকরা ৯৯ অংশ বিদেশী। অতএব আজ যদি আমাদের কিছু কাজ করতে হয় খোলাখুলি সজ্ঞানে বলতে হবে—পাঁচ কোটি নরনারীর প্রত্যেককে ঐ রকম অখাদ্য-খেকো করে পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক দস্তুল-ওয়ালার জাতিতে পরিণত করতে হবে।

জাপানী কায়দা

কথাটা আরো সোজা করে বলা দরকার। আমাদের ছেলেরা ইস্কুল কলেজে এন্ট্রান্স, এল-এ, বি-এ, এম-এ, ডি, এস-সি পাশ করছে করুক। আশুতোষ ৫ হাজারের জায়গায় ৫০ হাজারের পাশের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ৫ কোটি বাঙ্গালীর কাছে ৫০ হাজার মানায় না। ঐ লাইনেই আরও অনেক ফন্দি-ফিকির বের করতে হবে। আশুতোষের পথেই এই কাজ আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। চাই ৮।১০টা আশুতোষ। প্রশ্ন হচ্ছে—কবে একটা জন ষ্টুয়ার্ট মিল বা আইনষ্টাইনের কথা বিদেশীরা এসে আমাদের ইস্কুলে শুনাবে, আর আমরা সেটা মুখস্থ করে মানুষ হব, সে ভাবে চল্লে আর চলবে না। জাপান তা করে না, তুর্কী তা করে না। ওরা বসে থাকে না এই আশায় যে, কবে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ এসে জাপানকে বলবে—"ওরে এই একটা নতুন আবিষ্কার হল, তোদের দেশেও এটা কাজে লাগবে।" ওরা

নিজেরা সকল দেশে গিয়ে নিজের মাথা চালনা ক'রে মাল নিয়ে আসে। জাপানীরা বসে রয়েছে দুনিয়ার সর্ব্বত্র। দূরবীণ লাগিয়ে দেখছে কোথায় কোন্ তারা উঠল। ধরা যাক্ যেন, ফটোগ্রাফের ব্যবসা জার্ম্মাণি চালাচ্ছে। অথবা, ইংরেজ ফরাসী আমেরিকান এক একটা ঘাঁটি আগলে বসে আছে। জাপান তাই দেখছে, দেখে বলছে—"তাইত আমরা ত বসে থাকতে পারি না।" দেশে যত রকম কলকারখানার ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তাতে যোগ দিয়ে কেহ এঞ্জিনিয়ারী করছে, কেহ কারখানা চালাচ্ছে, কেহ গরুর ব্যবসা, কেহ দুধের ব্যবসা ধরছে, কেহ মন্ত্রী, কেহ মজুর-আন্দোলনের কর্ত্তা, কেহ মাষ্টার। এইরূপ ধরণের কাজে ৫।৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা যেই হয়, তখন তারা বেড়িয়ে পড়ে আমেরিকায়—জমিজমা সম্বন্ধে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সেখানে কি হচ্ছে দেখতে। আমেরিকা খতম করে যায় বেলজিয়ামে। সেখানেও শেষ নয়; যায় জার্ম্মাণিতে। এই রকম ক'রে ঘুরতে ঘুরতে ২॥০।৩৫ বৎসর পর ফিরে এসে এরা কাজে লেগে যায়। অথবা পুরানো কাজই বাড়িয়ে তোলে। ২।৩ বৎসর কাজ করতে করতে দেখে যে জীবনটা তেতো হয়ে গেছে, পুরানো হয়ে গেছে, চাঙ্গা হয়ে আসা দরকার, তখন চল আবার বিদেশে। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে তারা জীবনটাকে হরদম তাজা করে তুলছে। এই হচ্ছে জ্যান্ত জাতের জীবন-সাধনা।

বাঙ্গালী তা করছে না। আমরা রয়েছি বসে—কবে ম্যাকমিলান কোম্পানী বই ছাপবে, আর ছাপা হলে কবে তার আড়কাঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে এসে বলবে "দেখুন মশায় ছাপা হয়েছে, টেক্সট বুক করুন"। তখন আমরা বলি—"আচ্ছা রেখে যান, দেখব কি করতে পারি"। যুবক বাংলা কেন পরের উপর নির্ভর করছে? জাপান তা করে না। ইংরেজ কোন্ কোন্ বই নতুন বের করছে, ফরাসী রাসায়নিক কোন্ কায়দা নতুন আবিষ্কার করল, জার্ম্মাণি কোন্ কোন্ গানের কোন্ কোন্ সুর নতুন সৃষ্টি করল তা জানবার জন্য জাপানের লোক মোতায়েন রয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক জাহাজে জাপানীরা বিদেশে যাচ্ছে—বিদেশী সাহিত্য শিল্প, কলকব্জা দেখতে, শিখতে, জানতে ও আমদানি করতে।

গাড়ো আড্ডা বিদেশে

গড্ডলিকা বলছে—"আমরা জন্মেছি এদেশে, ২।১ জন নামজাদা স্বদেশী লোকের কল্যাণে যা-কিছু পেয়েছি তাতেই বেশ চলে যাচ্ছে, বিদেশে যাবার দরকার নাই। বিদেশ থেকে নতুন কিছু আমদানি করবার জন্য মেহনৎ করা অনাবশ্যক। বিদেশীরা আমাদের চেয়ে বড় বেশী উপরের শ্রেণীর লোক নয়।" তাঁদড় বলছে, "আমরা এক সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ বাপকা বেটা লোক চাই।"

একটা আশুতোষ, একটা চিত্তরঞ্জন মরে গেল, আর অমনি আমরা অনাথ ছেলেমেয়ের মত কান্নাকাটি সুরু করলাম, এ অবস্থা কোন মতেই মানুষের অবস্থা নয়। স্বদেশে হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে, এমন কি পয়লা নম্বরের গণ্ডা গণ্ডা লোক একসঙ্গে গড়ে তোলবার সুযোগ নাই; বিদেশে অভিযান না পাঠালে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হবে না, বিদেশের ফোয়ারা থেকে বিদেশী দস্তুলের আমদানি হওয়া চাই হরদম, তা না হলে দেশের লোকগুলো মজবুদ্ হবে না। "আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন বৎসরে ২।১ টা করে মারা যাক, ট্যাঁকে আমাদের আরো রয়েছে"—এই চিন্তা আর এই অবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ জাতি মানুষের অবস্থা প্রাপ্ত হবে না। কবে কালে-ভদ্রে একজন লোক ভাবুকতাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, আর আমরা তীর্থের কাকের মত তার দিকে চেয়ে বসে থাকব—এ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পয়সা না থাকে, বিদেশে যেতে না পার, ঝাঁপিয়ে পড় সমুদ্রে। সাঁতার কেটে জাপানে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হও, এখানে ওখানে যেয়ে ৫।৭ বৎসর ভবঘুরেগিরি কর। বি-এ, এম-এ পাশ করেই বিদেশে গেলে চলবে না। বি-এ, এম-এ পাশ করে কি ফেল করে,'—ফেল হলেও কুছপরোয়া নাই,—ব্যবসাদারী, এঞ্জিনিয়ারী, ওকালতীর অভিজ্ঞতা অর্জন কর; সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে যত বেশী লোক বিদেশে

যেতে পারে ততই ভারতের পক্ষে মঙ্গল। তাকেই বলি "বৃহত্তর ভারত।" গাড়ো আড্ডা বিদেশে। বৃহত্তর ভারত গড়ে তোল অর্থাৎ ভারতের বাহিরে হাজার হাজার ভারত-বাসীর কর্ম্মক্ষেত্র, হাজার হাজার ভারতীয় নরনারীর জীবনকেন্দ্র গড়ে তোলাই আমাদের স্বদেশী এবং স্বরাজ সাধনার অন্যতম বনিয়াদ।

লোক-সমস্যায় জাপান ও ইতালি

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

১। শ্রীযুক্ত তোকু গাওয়া নাকাহাসের অভিমত

শ্রীযুক্ত তোকুগাওয়া নাকাহাসে হারা প্রতিষ্ঠিত ক্যাবিনেটে শিক্ষা-সচিব ছিলেন। কোন আর্থিক পত্রিকায় লিখিত তাঁর এক প্রবন্ধের সার এইরূপ :—

জাপানে লোক-বল প্রবল বেগে বাড়িতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ৩ কোটি হইতে ৬ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ দ্বিগুণ হইয়াছে। জাপানের এই প্রকার বৃদ্ধি দেখিয়া ইয়োরামেরিকা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—এই বুঝি জাপান তার ফাল্তু লোকবলের জন্য নব নব রাজ্য জয়ে বাহির হইল!

স্বদেশে গবর্ণমেণ্ট ও লোকেরাও মহা চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছে। এমন সব নীতি অবলম্বিত হইতেছে, যাতে বিদেশে গিয়া উপনিবেশ-স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই নীতির বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। কিন্তু যে দেশ আমাদের চায় না, সেখানে আমাদের লোক ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়া কিছু ফায়দা আছে কি ?

লোক-বল-সমস্যা লইয়া সরকার ও অন্য কেহ কেহ কেন যে এত বিব্রত ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, বুঝিতে পারি না।

লোক-বৃদ্ধি আশার কথা

লোক বাড়িয়াছে বলিয়া কোন দেশ ধ্বংস পাইয়াছে এমন কথা ত শুনি নাই। উল্টা কথাটাই বরং প্রমাণ করা যায়। জাপানের লোক-বৃদ্ধি আমি কুলক্ষণ মনে না করিয়া সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। লোকবৃদ্ধির অর্থ দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে।

বহু যুগ ধরিয়া জাপানে যে লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে, সে ত আমি সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করি। এই লোক-বৃদ্ধির বহরটা একবার দেখা যাক্।

হাজার বছর পূর্ব্বে নারা যুগে সাম্রাজ্যের লোক-সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষের কম।

তোকু গাওয়া রাজত্বের গোড়ার দিকে, প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লোক গণিয়া পাওয়া গিয়াছিল ২ কোটি।

তারপর তখন হইতে মেইজি আমল অবধি ৩০০ বছরে লোক-সংখ্যা বিশেষ কিছু বাড়ে নাই। তারপর বিদেশীদের বাণিজ্যের জন্য জাপান নিজ বন্দর খুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। লোক-বল হঠাৎ বাড়িয়া ৩ কোটিতে দাঁড়ায়।

সেই লোক-বল ৫০।৬০ বছরে বাড়িয়া ৬ কোটি হইয়াছে।

লোক-বলের এই অসম্ভব বৃদ্ধিতেই জাপানীরা ভয় খাইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কাটা অমূলক। সঙ্কীর্ণতর জমিতে বাস করিতেছে বলিয়া ৬০ বছরের আগেকার জাপানীর চেয়ে আজিকার জাপানী কি বেশী অসুবিধা বোধ করিতেছে? মেইজি আমলের পিতামহদের চেয়ে আমরা কি বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি না?

কত লোক আঁটান যায়?

প্রতি বর্গ মাইলে কত লোক ধরান উচিত, তার কোন নিয়ম নাই। সেটা স্থানীয় অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এখন আমাদের দেশে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়্তা লোক-সংখ্যা ৪০০। ইংল্যাণ্ডে ৩৭৮। ফ্রান্সে জার্ম্মাণিতে ৩১০। হল্যাণ্ডে ৪৮৩। বেলজিয়ামে ৬৫৩।

শেষোক্ত দুই দেশ আমাদের চেয়েও ঘন-অধিষ্ঠিত লোক-বলের অধিকারী। কিন্তু লোক-সংখ্যা বা উপনিবেশ-স্থাপন কোন দিনই তাদের কাছে গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠে নাই। তার কারণ, ঐ দুই দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে। জার্ম্মাণিও আগে তার ফাল্তু লোক-বলের জন্য উপনিবেশ পাইতে লালায়িত ছিল। কিন্তু একই কারণে আজ অল্প লোক জার্ম্মাণির বাইরে যাইতেছে।

আমাদের দেশ যদি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের মত ঘন-অধিষ্ঠিত লোক-বল পালিতে পারে তবে আরও ৩ কোটি লোকের স্থান হইবে।

উপনিবেশ-শাসন ও লোক-সমস্যা

ইয়োরামেরিকার বড় বড় রাষ্ট্রের উপনিবেশ-শাসন-নীতির সহিত লোক-সমস্যা-নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। জার্ম্মাণি এবং ইংল্যাণ্ড উপনিবেশে লোক পাঠাইয়াছে আর্থিক স্বচ্ছতা বাড়াইবার জন্য। কিন্তু স্বদেশবাসীদের কোন দিন উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহ দেয় নাই। বরং স্বদেশের লোক যাতে বেশী বেশী বাইরে না যায়, তজ্জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছে। এরা মনুষ্য-শক্তির অপচয় সহ্য করিতে পারে না। সেজন্য তা নিবারণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

এইভাবে দেখিলে, যাদের যথেষ্ট লোক আছে তাদের কোন সমস্যাই নাই। যাদের লোক কম, সমস্যা তাদেরই। দক্ষিণ আমেরিকায় চাষ করিবার মত বহু জমি পড়িয়া রহিয়াছে। লোকের দরকার। তাই সেখানে ঔপ-নিবেশিকদের আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জাপান কিন্তু দেশের লোককে বাহিরে যাইবার জন্য "সাবসিডি" দিতেছে। উল্টা বুঝিলি রাম!

জাপানের দুঃখের প্রকৃত কারণটা কি?

অনেকের ধারণা এই যে, জাপানের দুঃখ-দারিদ্র্যের কারণ লোক-সংখ্যার অতি-বৃদ্ধি। কিন্তু আমি সেটা কারণ মনে করি না। আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশার কারণ পুঁজিপাটার অভাব ও তজ্জনিত ব্যবসার অভাব।

মজুরির হারের উঠানামা দ্বারা লোকবলের ঘাট্তি বা বাড়্তির কথা বিচার করা চলে। অর্থাৎ লোক কমিয়া গেলে মজুরি বাড়ে, আর লোক বাড়িলে মজুরি কমে।

মেইজি আমল হইতে জাপানে মজুরির হার অনেক বাড়িয়াছে। ইহা দ্বারা কি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না যে, লোকবলের অতিবৃদ্ধির কথাটা কল্পনামাত্র?

লোক-সংখ্যা ও বেকার-সমস্যা

লোক-বলের অতিবৃদ্ধি ও বেকার-সমস্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ—এর চেয়ে মিথ্যা কথা কিছুই নাই। বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থায় কয়েক বছর অন্তর অন্তর ব্যবসায় জোয়ার ভাঁটা দেখা দেয়। ইহা রোধ করা যায় না। ইহার ফল কর্ম্মহীনতা ও বেকার।

এই সঙ্কটের সহিত লোক-বহুলতা বা লোকাল্পতার কোন সম্পর্ক নাই।

অগ্রগামী সভ্যতা ও লোক-সংখ্যা

"কাল্চার"-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার কমে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্বন্ধে জ্ঞান বাড়িলে ও ডাক্তারি সাজসরঞ্জাম সম্পূর্ণ হইলে মৃত্যুর হার কমিয়া যায়।

সংখ্যা-বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি যে, ইয়োরামেরিকায় মৃত্যু-হার যত না কমিয়াছে জন্ম-হার তার চেয়ে ঢের বেশী কমিয়াছে। বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের সম্বন্ধে এই কথা খাটে। সেখানে লোকবল এক ভাবে রহিয়াছে, চাই কি নীচের দিকে নামিতেছে।

আমাদের স্বদেশে তাইশো আমলের গোড়ায় অর্থাৎ ১০ বছর আগে জন্ম-হারে পরিষ্কার হ্রাস দেখা গিয়াছিল। সুতরাং আমার মনে হয় না যে, গত ৬০ বছরের বেগে ভবিষ্যতে আমাদের লোক বাড়িবে।

কেউ জাপানীকে চায় না

জাপান উপনিবেশের বন্দোবস্ত করিতেছে, ধরিয়া

লইলাম। কিন্তু জাপানীরা যাইবে কোথায়? প্রশান্ত সমুদ্রের কূলে একটা দেশও নাই যে জাপানীকে চায়।

সফল উপনিবেশ বলি তাকে যখন জাপানীদের এমন সব দেশে পাঠাইতে পারি যেখানে মজুরির হার আমাদের দেশের চাইতে চড়া। এই সব দেশ হইল কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া। কিন্তু এরা আমাদের নাকের সাম্‌নে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার ২১৪টা জনপদ জাপানী লইতেছে বটে, কিন্তু আমরা যদি রাশি রাশি লোক পাঠাইতে থাকি তারা যে চিরকালই আমাদের চাহিবে, তা কে বলিল?

অন্য দিকে আমাদের কোন কোন নেতা বলিতেছেন, "মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ায় জায়গা আছে। ফাল্‌তু আদ্‌মীদের সেখানে পাঠাইয়া দাও।" জায়গা আছে বুঝিলাম; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, সেখানকার মজুরির হার আমাদের দেশের চাইতে নীচু। তাতে আমাদের অহিত বই হিত হইবে না। তা ছাড়া চীনাকে ছাড়িয়া জাপানীকে কেহ কাজ দিতে চাইবে না। চীনা সস্তা।

লোক-সংখ্যা ও খাদ্য-সমস্যা

লোক-বল ও খাদ্য-সমস্যা একই সমস্যার দুই পীঠ মাত্র। খাদ্য-বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া আমাদের পক্ষে উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে জাপানীরা চিন্তিত।

কিন্তু জাপানের মত অল্পায়তন রাজ্যের পক্ষে খাদ্য-সঙ্কট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ এরূপ ঘন-নিবাস দেশে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা গ্রাম হইতে শহরের দিকে ছুটিতেছে। খাদ্য সামগ্রী কম হওয়ার এও একটা কারণ।

প্রতি বছর আমরা ৩০ কোটি ইয়েন মূল্যের খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া থাকি। আমাদের রপ্তানির মূল্য ১০ কোটি ৫ লক্ষ ইয়েনের বেশী নয়। আমদানি মূল্যের এইরূপ বৃদ্ধি শহরের লোক-সংখ্যা বাড়ার দরুণ ঘটিয়াছে।

ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে কোন কোন চিন্তাবীর উপদেশ দিতেছেন, "খাদ্য বিষয়ে জাপানের আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া উচিত।" কিন্তু আমার বিশ্বাস, ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে এ যুক্তি নিরর্থক।

প্রশ্ন হইতে পারে, "যুদ্ধ-কালে খাদ্য-সামগ্রী কম পড়িতে পারে। তখন কি উপায় হইবে?" আমার জবাব এই, দুই উপায়ে এই ঘাটতি পূরণ করা চলে—(১) খাদ্য সামগ্রীকে সর্ব্বদা শাসনাধীন করিয়া ১০% হইতে ২০% পর্য্যন্ত সংক্ষেপ সম্ভব। (২) খাদ্যের দর চড়াইয়া দেওয়া।"

এই দুই উপায় যদি এক সঙ্গে অবলম্বিত হয় তবে বিনা আয়াসে খাদ্য-বিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া যায়। কারণ জাপান প্রতি বছর মোট যে পরিমাণ খাদ্য আমদানি করে, তা তার সমগ্র উৎপাদনের ১০% মাত্র।

লোক-বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়

কোন একটা জাতিকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য দরকার—এক ইতিহাস, এক আচার-ব্যবহার ও সভ্যতা এবং সঙ্কীর্ণতর স্থানের মধ্যে লোক-বলের ঘন অধিষ্ঠান। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও এগুলির প্রয়োজন।

এই সব দিক্ দিয়া জাপানকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করি। সুতরাং জাপানে লোক-বৃদ্ধি আমার কাছে প্রীতিপ্রদ ঘটনা। বর্ত্তমান বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ৮ লক্ষ। এই হারে বাড়িয়া চলিলেও আগামী ৪০ বছর পর্য্যন্ত আমাদের ভাবনার কোন কারণ নাই।

অন্যদিকে শিক্ষা-বিস্তার, কালচারে উন্নতি ও ধন-সঞ্চয় দ্বারা জন্মের হার কমাইতে সমর্থ হইব। কিন্তু লোক-বৃদ্ধি যে একটা জাতির স্বাস্থ্য, শক্তিমত্তা ও প্রাণের লক্ষণ, তা যেন কোন কালে ভুলিয়া না যাই।

২। ব্যাধি বনাম লোক-বল বৃদ্ধি

উপরে উদ্ধৃত শ্রীযুক্ত নাকাহাসের প্রবন্ধটা অত্যন্ত মূল্যবান্। ইহাতে অল্প কথায় আধুনিক জাপানের আর্থিক ছবির এক টুক্‌রা ভাসিয়া উঠিতেছে। জাপান যে কাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাও বুঝিতে পারি।

বস্তুতঃ, জাপান খোলাখুলি ভাবেই ইয়োরামেরিকাকে

গুরুপদে বরণ করিয়াছে। তাতে লাভ হইয়াছে ষোল আনা। জাপান ইয়োরামেরিকার কোন দেশ বনিয়া যায় নাই। আপনার স্বাতন্ত্র্যটা স্পষ্টতর ও আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইয়োরামেরিকার বিদ্যাগুলি ভাল করিয়া শিখিতে ত্রুটি করে নাই। শুধু শিখিয়াছে বলিলে কম করিয়া বলা হয়—হজম করিয়া ফেলিয়াছে ও কাজে লাগাইয়াছে। এবিষয়ে জাপানের কাছে আমাদের অনেক শিখিবার আছে।

জাপান ইয়োরামেরিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান কতখানি আপনার করিয়া লইয়াছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই সবের মধ্যেও পাওয়া যাইবে। আমি এই কথা বলিতেছি না নাকাহাসের সকল তত্ত্ব নির্ভুল। কিন্তু এই কথা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি—একজন জাপানী শিক্ষা-মন্ত্রীর অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি সরকারী চাকরী জনিত অভিজ্ঞতাগুলির কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তা চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইলেও চলে।

যক্ষ্মার বিরুদ্ধে অভিযান

লোক-বল বাড়িতেছে বলিয়া জাপানকে ব্যাধিমুক্ত দেশ বলিয়া মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু জাপানীরা ব্যাধিতে ভুগিয়া কপালের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে না। ব্যাধির বিরুদ্ধে তারা রীতিমত লড়াই চালাইতেছে। তার একটুখানি আভাষ যক্ষ্মার বিরুদ্ধে অভিযানে পাইতে পারি।

ডাক্তার কারুবে তোকিয়ো প্রিফেক্চুরাল্ হেল্থ বুরোতে মোতায়েন আছেন। তাঁর মতে জাপানে প্রতি বছর গড়ে ১৫ লক্ষের উপর যক্ষ্মারোগী থাকে। তন্মধ্যে বছরে ১ লক্ষ ৪০ হাজার জন মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

১৯০৪-০৫ সনে রুশ-জাপানী যুদ্ধ হয়। জাপানের ইতিহাসে এত বড় যুদ্ধ আর হয় নাই। সেই যুদ্ধে লোক মরিয়াছিল ৮০,০০০। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, যক্ষ্মায় জাপানের লোকক্ষয় কি ভীষণ।

আমেরিকা অথবা ইয়োরোপের প্রায় দ্বিগুণ লোক জাপানে যক্ষ্মাতে মরে। সাধারণতঃ পুরুষরা ২০-২৫ বছরের ভিতর এবং স্ত্রীলোকেরা ১৫-২৫ বছরের ভিতর যক্ষ্মায় বেশী মরে। এক তোকিয়োতে বছরে ১০,০০০ হাজারে এইরূপ ৩০টা করিয়া মৃত্যু ঘটিতেছে।

যক্ষ্মাকে জয় করিতে হইবে

সম্প্রতি "যক্ষ্মাকে জয় করিতে হইবে" এই বাণী বুকে লইয়া সাম্রাজ্যের সব প্রিফেক্চুরাল, মিউনিসিপ্যাল ও গ্রাম্য আফিস, মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, হাঁসপাতাল, স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগে তৃতীয়বার যক্ষ্মার বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করিয়াছে।

হ্যাণ্ডবিল ও পোষ্টারে এই বাণী ছাপিয়া, এই রোগে কত লোক মরিতেছে ও পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি তাহা লিখিয়া দিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেগুলি বিতরণ করা হইয়াছে।

এই রোগের প্রতিবিধান-কল্পে মেট্রোপলিটান্ পুলিশ আফিস নিম্নলিখিত মূল নিয়মগুলি বাহির করিয়াছে।

১। রোদের মধ্যে থাক।

২। সাধ্যমত ব্যায়াম কর।

৩। বিশুদ্ধ বায়ুতে বিচরণ কর।

৪। পুষ্টিকর খাবার খাও।

৫। রোগ বা অসুখ বোধ করিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাক।

জাপানের লোক-বল বৃদ্ধির নমুনা

গবর্ণমেণ্টের সংখ্যা-বিজ্ঞান বুরোর প্রাথমিক হিসাব অনুসারে জাপান-সাম্রাজ্যে গত বছর লোক বাড়িয়াছে ৯,৪০,০৮৫। অনুমান এই যে, সমস্ত তালিকাগুলি পাওয়া গেলে বৃদ্ধিটা ১০ লক্ষের কাছাকাছি গিয়া পৌছিবে।

বুরোর মতে জাপানে জন্মিতেছে বেশী। কিন্তু মরিতেছে অনেক কম। আগের বছরের সহিত তুলনায় একথা আরও স্পষ্ট হয়।

সন	জন্ম	মৃত্যু
১৯২৫	২০,৮৬,০৯১	১২,০০,১০৬
১৯২৬	২১,০০,১২০	১১,৫৯,৬৩৫

অর্থাৎ হাজারকরা মৃত্যুর হার ১৯২৬ সনে ১৯.২ আর ১৯২৫ সনে ২০.৩।

৩। ফালতু জাপানীদের দাঁড়াইবার স্থান কই ?

যক্ষ্মাতে জাপানের লোক-ক্ষয় আছে। জাপানে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার কথা কারও অজ্ঞাত নয়। সুতরাং বলিতে পারি জাপানে ধ্বংস ও সৃষ্টির ক্রিয়া সমান তৎপর।

কিন্তু সৃষ্টির ক্রিয়া জয় লাভ করিতেছে। সব কারণগুলি অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। একটা বড় কথা পাইতেছি—জাপানী চরিত্রের দৃঢ়তা। জাপানী জানে, লোক বাড়িলে তার কষ্ট হইবে। তবু জাপানে অনবরত চেষ্টা চলিতেছে মৃত্যুর হার কমাইবার জন্য।

জাপানের বাহাদুরি এই, জাপানীকে টি'কাইয়া রাখিয়াই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। বলিতেছে না, "চরিয়া খাও গে। তোমার মুখের অন্ন যোগানো আমার কাজ নয়।" জাপান বলিতেছে, "তোমার ভার আমার ভার। তোমাকে কাজ জোটাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিব।"

অথচ ফালতু জাপানীদের কাজ জোটাইয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। অন্য বহু গবর্ণমেণ্টের চেয়ে জাপান গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা বেশী। বিদেশীর ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইতেছে, "জাপানী চাই না।" কিন্তু হটিবার পাত্র জাপানী নয়। এদিকে জাপানীর প্রচেষ্টা এক নয়া মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে।

এক ঢিলে দুই পাখী

নাকাহাসে বলিয়াছেন, "গ্রাম্য জাপানীরা শহরের দিকে ছুটিতেছে। শহরগুলি গিসগিস করিতেছে।"

লোক কমাইবার উপায় হইতেছে উপনিবেশ। উপনিবেশ দুই রকমে হইতে পারে। (১) বিদেশে জাপানীদের পাঠাইয়া দেওয়া। জাপানের পক্ষে এ পথ বন্ধ। (২) সাম্রাজ্যের মধ্যে অল্পলোক-বিশিষ্ট স্থানে জাপানীদের চালান দেওয়া।

এই দ্বিতীয় দফাটা আমাদের আধুনিক "পল্লী-প্রীতি" বা "পল্লী-গঠনে"র আর এক রূপ আর কি! কিন্তু জাপানী পল্লী-প্রীতি চিজটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। সেখানে বক্তৃতা প্রপাগাণ্ডা ইত্যাদির অত্যন্ত অভাব। আর কাজটা লইয়া পরীক্ষা করিতে যাইতেছে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট।

গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে না, "ভো ভো প্রজাবৃন্দ! তোমাদের অভাবে পল্লীগুলির দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এখন শহরের দিকে পিছন ফিরিয়া পল্লীর দিকে মুখ ফিরাও। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে, মাথাব্যথা আমার। আমি অমুক অমুক জায়গা বাছিয়া দিতেছি। পয়সা আমি খরচ করিব। তোমরা, শুধু দয়া করিয়া সেখানে গিয়া বাস ও চাষ কর।"

গবর্ণমেণ্টের বাছাই

এই ব্যাপারটা "পরীক্ষার" জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪টা স্থান বাছিয়াছে। "পরীক্ষা" সফল হইলে আরও স্থান বাছা হইবে। এইসব স্থানে জাপানীদের বসাইয়া দিবার জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ১লক্ষ ইয়েন বরাদ্দ হইয়াছে। এই স্থানগুলি নিম্নরূপ :—

(১) ইয়াবুকিবারা, ফুকুশিমা-কেন—৯,০০০ চোবু (১ চোবু=২½ একর) আয়তনের এক ক্ষেত। যথেষ্ট ঔপনিবেশিক জোগাড় হইলে ৭০,০০০ কোকু অতিরিক্ত চাউল এখান হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

(২) ইমুনুমা, চিবা-কেন—৮,০০০ চোবু। ১লক্ষ কোকু চাউল পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) সাম্বোঙ্গি, আওমোরি-কেন—১০,০০০ চোবু। অধিকাংশই কর্ষণ-যোগ্য।

(৪) কিয়োতোতে উজি নদীর উজানের দিকে চাষযোগ্য ২,৮০০ চোবু জমি। অল্প খরচে বেশ চাষ হইবে।

এই পরীক্ষার জন্য গবর্মেণ্টের মাথা-ব্যথাটা কি? জাপান টাইম্‌স্" বলিতেছে, "এই পরীক্ষায় সফল হইলে, জাপানের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে।" বস্তুতঃ, জাপান সরকার এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে চায়। স্থানবিশেষের জনবহুলতা কমিবে, খাদ্যসম্ভার বাড়িবে। যুদ্ধকালে বিপদের মাত্রা কমিবে।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপের কর্ত্তারা জাপানী উপনিবেশে উৎসাহ দিতেছে। সেখানে আখ, শাকসব্জী ও ধান চাষের জন্য ৩০,০০০ জাপানী লওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান

আখের ক্ষেতকে ৩,০০০ হইতে ১০,০০০ চোবুতে ও কফির বাগানকে ৪০ হইতে ১০০ চোবুতে বাড়ান হইবে। সময় লাগিবে ২ বছর।

ইতালি

১। মুসলিনির মত—লোক-বৃদ্ধি শক্তির লক্ষণ

লোক-বল বৃদ্ধি বিষয়ে জাপানের সহিত ইতালির তুলনা করা চলে। বিশেষ, উপনিবেশ-স্থাপনে উভয় দেশের মতিগতিকে পাশাপাশি দাঁড় করান যায়।

২৬শে মে বিকাল বেলা মুসোলিনি ইতালির পার্ল্যামেন্ট-ভবনে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—

"জন্ম-সংযম! জন্ম-সংযম!! ঐ বুলি আমার কাছে কপ্‌চাইও না। জন্ম-সংযম-বাদীরা বলিতে চায় কি? ইতালির লোক-সংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে? মোটেই না। ইতালিতে যত লোক দরকার, তাই নাই। ৪কোটি লোক ইতালির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। আগামী ২০ বছরের মধ্যে ইতালির লোক-বল বাড়াইয়া ৬ কোটি করিতেই হইবে।

"রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শক্তির মাপকাঠি হইতেছে লোক-বলের আকৃতি। ইয়োরোপীয় দেশগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, একটা সত্য প্রতিভাত হইবে। বৃটেনে, ফ্রান্সে জার্ম্মাণিতে লোক-বৃদ্ধির হারটা ক্রমাগতই কমিয়া যাইতেছে। এদিকে ইতালিকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করি। ইতালির লোক-বৃদ্ধির হারটা বাড়িতেছে।

"ভো ভো ইতালিবাসিগণ! তোমরা জান অবিবাহিত বা চিরকুমারদের উপর কর বসানো হইয়াছে। জন্ম-সংযম লইয়া বাড়াবাড়ি করিলে আমি সন্তানহীন পরিবারদের উপর কর বসাইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না।"

২। ইতালিয়ান্ উপনিবেশের এক টুক্‌রা

এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ত্রিপোলিস্থ সংবাদ-দাতা লিখিতেছেন—

জননী-ভূমি অর্থাৎ ইতালি লোক-সংখ্যার অতি-বৃদ্ধির ফলে সমুদয় লোককে আর ঠাঁই দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ত্রিপোলি জননী-ভূমির দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য ফালতু ইতালিয়ান্‌দের ডাকিতেছে। দক্ষিণ ইতালিয়ান্‌গণ, বিশেষ করিয়া সিসিলি ও কালাব্রিয়ার লোকেরা, সেখানে কোন কষ্ট পাইবে না। মনে হইবে যেন নিজের দেশে রহিয়াছে। এমন কি, উত্তর ইতালির লোকেরাও ওখানকার জলবায়ু বেশ সহ্য করিতে পারিবে।

কিন্তু উপনিবেশ-স্থাপনের বাধাটা বর্ত্তমানে লোকের অভাব নয়, মুদ্রার অভাব।

ত্রিপোলিতে ৩লক্ষ ইতালিয়ানের স্থান আছে

ছোট ছোট চাষীদের সঙ্গতি এত যথেষ্ট নয় যে তারা সেখানে গিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবে। অন্যদিকে ইতালির বড়লোকেরা উপনিবেশের জমির উপর টাকা খাটাইতেও গররাজী।

ত্রিপোলি শহরের চতুর্দ্দিকের গ্রামগুলি হইতে ইতালিয়ান্ চাষীদের প্রায় ৪০,০০০ হেকটার (১ হেক্‌টার=২·৪৭ একর) জমি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেতের গড়পড়তা আয়তন ৫০ হেক্টার বা ১২৫ একর। ১৯২২ সনে পুনর্জ্জয় আরম্ভ হয়। তারপর ২৫০ ঘর ইতালিয়ান্ পরিবারকে অর্থাৎ প্রায় ২,০০০ লোককে সেখানে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনুমান, ত্রিপোলি শেষ পর্য্যন্ত ৩লক্ষ খাঁটি ঔপনিবেশিককে পালিতে সমর্থ হইবে।

গবর্মেণ্টের প্রচেষ্টা

চাষীরা যেখানে গাফিলি করে না, ভাল করিয়া চাষ করে সেখানে জমি তাদেরই থাকিবে।

গবর্মেণ্ট চাষ-যোগ্য জমি কিনিয়া খণ্ডে খণ্ডে ঔপনিবেশিকদের বেচিতেছে। এই খণ্ডগুলির আয়তন ৫০০ হইতে ১,০০০ হেক্টার পর্য্যন্ত। ক্রেতারা প্রথম ২৫ বছর যাবৎ কেহই কোন প্রকার জমি-কর দিবে না।

ত্রিপোলির মূল্য

দেশের কমিশনার কর্ণেল আলোজোর মতে ফ্রান্সের পক্ষে আলজিরিয়া বা টিউনিসের যত দাম, ইতালির পক্ষে

ত্রিপোলির দাম তার চেয়ে ঢের বেশী হইবে। কিন্তু ত্রিপোলিতে মাত্র ৩ লক্ষ ইতালিয়ান ধরিবার স্থান আছে। ইহাতে লোক-বৃদ্ধি-সমস্যার আর কতটুকু সমাধান হইবে?

"আদিম-বাসী" সমস্যা

ত্রিপোলির আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩০ হাজার। ইহাদের বৃদ্ধিটা খুব ধীরে হইতেছে অথবা একদম হইতেছে না।

ঔপনিবেশিকদের মজুরের অভাব ঘটিতেছে। কিন্তু তবু ইতালিয়ানরা চায় না যে আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা বাড়ুক। তাদের মনের দৃঢ় বাসনা ত্রিপোলিকে সম্পূর্ণরূপে ইতালিয়ানদের বাসভূমি করিয়া গড়িয়া তোলা। পরে বর্ণ-সমস্যা লইয়া গোলযোগ হইবে, এ তারা চায় না।

কলিকাতায় জলাভাব

কলিকাতা কর্পোরেশন মধ্যে মধ্যে সহরে জলসরবরাহের সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া লোককে আশ্বাস দেন। এক এক জন এঞ্জিনিয়ার এক একটি নূতন ব্যবস্থা করেন। সহরের করদাতাদের অর্থ জলের মতই খরচ হইয়া যায়, অথচ জলকষ্ট পূর্ব্ববৎই রহিয়া যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতেই কলিকাতার লোককে বলা হইতেছিল, "আর ভয় নাই, এইবার যে ব্যবস্থা হইবে তাহাতে দিবারাত্রি কল টিপিলেই জল পাওয়া যাইবে"। টালায় জলের জন্য বিরাট চৌবাচ্চা করা হয়। তৎপূর্ব্বে সহরের ২ স্থানে—বহুবাজারে ও ভবানীপুরে—পাম্প ছিল। সেই পাম্প চলিলে তাহার জোরে জল চলিত। স্থির হইল—তাহার আর প্রয়োজন হইবে না। টালায় থামের অরণ্যের উপর বিরাট চৌবাচ্চা হইলে জল আপনি কলিকাতার বাড়ীতে দ্বিতলে ও ত্রিতলে কলকল করিয়া বহিবে। টালায় চৌবাচ্চা প্রস্তুত হইল, বহুবাজারের সেকালের গজগিরি করা চৌবাচ্চা ভূমিসাৎ করা হইল, কিন্তু জল মিলিল না। কেন মিলিল না? দেখা গেল কর্ত্তাদের মূলে হাভাত হইয়াছে। তাঁহারা যে পরিমাণ জলের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সহর কলিকাতায় তদপেক্ষা অনেক অধিক জলের প্রয়োজন। বন্দোবস্ত ছিল, টালায় চৌবাচ্চা হইলে দৈনিক ৩ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন জল পাওয়া যাইবে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহাতে ৪ কোটি গ্যালন জল সরবরাহের সম্ভাবনা জানান হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই কলিকাতাবাসীর প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন জল। অর্থাৎ যত জলের প্রয়োজন, তত জল সরবরাহের ব্যবস্থাই হয় নাই। এই যে অব্যবস্থা ইহার জন্য দায়ী কে, তাহা স্থির হয় নাই। স্থির করা কেহ প্রয়োজন মনে করেন নাই। কারণ, যখন দেখা গেল "সব ফক্কিকার", তখনও যাঁহারা সে ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ লইয়া সাগর-পারে গমন করিয়াছেন; সহরে করদাতারা খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইলে তাঁহাদের তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

কলিকাতায় যে অন্য কতগুলি সহরের তুলনায় অধিক জল ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ যে নাই এমন নহে। বাঙ্গালী পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় এ কথা সকলেই জানেন। বাঙ্গালী জলের ব্যবহার করিয়া দেহ হইতে ঘরদ্বার পর্য্যন্ত পরিষ্কার রাখে। কাজেই কলিকাতার সহিত এ বিষয়ে অন্যান্য সহরের তুলনা করিলে কোনরূপ সুফল লাভের আশা থাকিতে পারে না। কলিকাতায় জনপ্রতি ৬৭ গ্যালন জল খরচ হইয়া থাকে; আর বার্ম্মিংহামে ২৮ গ্যালন, লিভারপুলে ৩১ গ্যালন, এবং লণ্ডনে ৩৬ গ্যালন খরচ হয়।

সত্য বটে এই সব সহরে কলের জল বড় বড় কল কারখানার জন্যও ব্যবহৃত হয়, আর কলিকাতার পাটের কলে স্বতন্ত্র জলসরবরাহের সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু লণ্ডন বা লিভারপুল বা বার্ম্মিহাম কলিকাতা নহে। সে সব সহরে লোকে জলের ব্যবহার অল্পই করে। শীতপ্রধান দেশে স্নানপানের জন্য জলের প্রয়োজন স্বভাবতই অল্প হয়। তাহার উপর সে সব দেশে পরিচ্ছন্নতার আদর্শ অন্যরূপ। সে দেশে সাবানের বিজ্ঞাপনে লিখিত হয়, "হাত ও মুখের জন্য অতুলনীয়।" হাত আর মুখ অনাবৃত থাকে, কাজেই দেহের সেই দুই ভাগ পরিষ্কার থাকিলেই সে দেশের লোক সন্তুষ্ট। আমরা জানি এ দেশে অনেক ইংরেজ সৈনিক দেশের অভ্যাস-হেতু স্নানে বিরত থাকায় তাহাদের দেহে কীট জন্মে। সে দেশে দরিদ্র লোক অনেক সময় যে পোষাক কিনিয়া পরে, তাহা ছিঁড়িয়া না যাইলে ছাড়ে না। তাহার সহিত জলের সম্বন্ধ ঘটে না। সেরূপ অবস্থা এ দেশে কল্পনাতীত। কাজেই সে সব দেশের সহিত এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলনা করায় কোন ফল নাই।

কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্যানিটারী এঞ্জিনিয়ার মিষ্টার উইলিয়াম্‌স্ কায়রো সহরের কথা তুলিয়া কলিকাতাবাসীর মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কায়রো সহর মরুমধ্যে অবস্থিত—শুষ্ক। তথায় অধিবাসীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫০ হাজার। সে সহরে অনেকগুলি বড় বড় হোটেল আছে। অথচ কায়রোয় গড়ে জলের খরচ ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার গ্যালন—অর্থাৎ মাথাপিছু ১৭ গ্যালন হইতে ১৮ গ্যালন।"

কিন্তু মিষ্টার উইলিয়ামস একটা কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। কায়রো সহরের পরিচ্ছন্নতার আদর্শ অনুকরণযোগ্য নহে। ভারতবর্ষেও বিকানীর প্রভৃতি স্থানে জলের অভাব এবং সেই সব মরুদেশেও লোকে অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করিয়া তুষ্ট থাকে অর্থাৎ তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়, এমন কথা বলা যায় না।

তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে কলিকাতায় অধিক জল-খরচের কারণ উদ্ভূত হয়। তাঁহারা যে কারণ আবিষ্কার করেন সেরূপ আবিষ্কার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরে আর হয় নাই। তাঁহারা বলেন যত অনর্থের মূল চৌবাচ্ছা। চৌবাচ্ছায় জল ভরিবার জন্য রাত্রিকালে কল খুলিয়া রাখা হয়। তাহাতেই জল নষ্ট হয়। আবার কলিকাতার লোক কল খুলিয়া দিয়া বসিয়া স্নান করে। যদি ২৪ ঘণ্টা কলে জল পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য চৌবাচ্ছায় জল ভরিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন ১০টার ঘড়ীতে ঘা পড়িতে কলের জল চলিয়া যায়, তখন সারা দিনের ব্যবহারের জন্য এবং ঐরূপ রাত্রির জন্য কিছু জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতেই হয়। কিন্তু কর্ত্তারা চৌবাচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরশুরাম যেরূপ কুঠারহস্তে ক্ষত্রিয়নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তেমনই সাবল লইয়া চৌবাচ্ছানাশে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চৌবাচ্ছা নষ্ট করা হয়, কিন্তু তাহাতে সহরবাসীর জলকষ্ট ঘুচে নাই। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "কোন কোন কর্ত্তা বালতীর কারখানা খুলিয়াছেন, তাই চৌবাচ্ছা ভাঙ্গিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।"

যে সময় মিষ্টার উইলিয়াম্‌স্ কলিকাতাবাসীকে জল অপব্যয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছিলেন, সেই সময়ের হিসাব করিলে দেখা যায়, সহরে ৩ লক্ষ লোক রাস্তার কল হইতে জল লইয়া যায়, তাহাদের বাড়ীতে কল নাই। বস্তিতে কল দিতে কর্ত্তারা নারাজ ছিলেন। কাজেই বস্তির লোক রাস্তার কলে জল লইত। সে অবস্থার প্রতীকার আজও হয় নাই।

কর্পোরেশ্যন সহরবাসীকে জলের অপব্যয় বাবদে কড়া শাস্তি দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীতে বাড়ীতে জল মাপিয়া দিবেন বলিয়া মিটার বা পরিমাপ-যন্ত্র বসাইয়াছিলেন। ট্যাক্সের হিসাব ধরিয়া যাহার ভাগে যতটুকু জল পড়া উচিত, তাহার বাড়ীতে তদপেক্ষা অধিক জল খাইলেই তাহাকে সে জন্য মূল্য দিতে হইত; শেষে কিন্তু দেখা যায়, তাহাতে ঈপ্সিত ফল ফলিল না। তখন আবার খরচ করিয়া মিটার তুলিয়া ফেলা হইতে লাগিল। তবে কোন কোন অতি-আগ্রহী এঞ্জিনিয়ার যে কখন কখন নূতন করিয়া বাড়ীকে মিটার বসাইয়া আবার তুলু করিয়া আবার তাহা

তুলিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি। এইরূপ পরীক্ষা অনেক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কলিকাতায় জলসরবরাহের সুব্যবস্থা হইল না। এখন আবার নূতন ব্যবস্থা হইতেছে। তাহার জন্য খরচের বরাদ্দ হইয়াছে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। অবশ্য ইহাতে কুলাইবে কি না জানি না। মিষ্টার উইলসন এই ব্যবস্থার কর্ত্তা। সম্প্রতি তিনি 'ষ্টেটসম্যানের' প্রতিনিধির নিকট এই ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। আমাদের পঞ্জিকায় বৎসরে কয় "আড়া" জল হইবে তাহা লিখা থাকে, কিন্তু পঞ্জিকাখানা আখ-মাড়াই কলে ফেলিয়া পিষিলেও যেমন ১ ফোঁটা জল বাহির হয় না। এই বিস্তৃত বিবরণ হইতেও তেমনই ১ ফোঁটা জলের আশা নাই। নূতন ব্যবস্থা হইতেছে। তাহার জন্য করদাতাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হইবে। অনেক এঞ্জিনীয়ার কনট্রাক্টরের পকেট ভরিবে। কিন্তু সহরবাসী জল পাইবে ত?

এ সন্দেহ ঘনীভুত হইবার কারণ, ২ বৎসর পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছিল বর্ত্তমান কলকজাতেই লোককে অধিক জল দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার পর আর সে ব্যবস্থা নাই—আবার "যথাপূর্ব্বম্"। তাই মনে হয়—এই যে নূতন করিয়া কোটি কোটি টাকা খরচ, ইহার ফলই বা কি হইবে কে বলিতে পারে?

আজকাল কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের যেরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা আরও অধিক হইতেছে। (দৈনিক বসুমতী)

অ্যালুমিনিয়াম

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইনস্, সিংভূম

এখানকার এক দোকানে অ্যালুমিনিয়ামের জিনিষ কিনিতে গেলাম। দোকানদার বলিল "বাবু, সিলভার মাঙতা?" অ্যালুমিনিয়ামের বাসন গরিবের সিলভারের বাসন। বস্তুনিষ্ঠ জগতে অ্যালুমিনিয়াম খুব আদরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধাতু-গালাইবিদেরা অ্যালুমিনিয়াম সুলভ করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কল্পনা করেন, অ্যালুমিনিয়াম সুলভ হইলে তাঁহারা লোহালক্কড়ের জন্য বে-পরওয়া হইবেন। অ্যালুমিনিয়ামের হাল্‌কা-গুণ বস্তুনিষ্ঠ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একটী প্রধান বিষয়। এখন ইমারতাদি তৈয়ারী করিবার জন্য যে সব ভারি লৌহের কড়ি, বরগা বহু আয়াসে উপরে উত্তোলন করা হয়, অ্যালুমিনিয়াম সুলভ হইলে সেই সব কাজ অল্প আয়াসেই সম্পন্ন হইবে। লৌহের জিনিষে যেমন শীঘ্রই মরিচা পড়িয়া যায় ও তাহা নিবারণ করিবার জন্য রং লাগানোর দরকার হয়, অ্যালু-মিনিয়ামে সেরূপ মরিচার ভয় নাই। অ্যালুমিনিয়ামে সামান্য পাত্‌লা মরিচা পড়ে ও সেই পাত্‌লা মরিচাটুকু তাহাকে এমন ভাবে আবৃত করে যে, বাইরের জল-বাতাসে আর তার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

লৌহ বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া আমাদের ব্যবহারে আসিতেছে। অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার তেমন প্রাচীন নয়। ইহা একেবারেই নবীন। অ্যালুমিনিয়াম যে আমাদের মাটিতে আছে তা প্রথম ধরা পড়িল ম্যারগ্রাফের কাছে ১৭৫৪ সনে। তার পর হইতে ধাতু গালাইবিদেরা নানা উপায়ে ইহাকে নিষ্কাশিত করিতে চেষ্টা করিলেন। অ্যালুমিনিয়াম যে আমাদের ব্যবহারে আসিয়াছে তাহা প্রায় ৩০।৪০ বৎসরের কথা। অ্যালুমিনিয়ামের হাল্‌কা গুণের দরুণ বিমানযানের অনেকাংশ অ্যালুমিনিয়ামে তৈয়ারী। আজ-কাল অ্যালুমিনিয়ামের বৈদ্যুতিক পাখা তৈয়ারী করিবার ঝোঁক হইয়াছে। আমরা জানি বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালনের জন্য তামা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। তামার সঞ্চালন-

শক্তি ১০০ ধরিলে অ্যালুমিনিয়ামের সঞ্চালন-শক্তি ৬০। অ্যালুমিনিয়ামের গুরুত্ব তামার গুরুত্বের ৩/১০ অংশ ও বৈদ্যুতিক সঞ্চালন-শক্তি তামার ১/২ অংশ। এই হিসাবে একই ওজনের অ্যালুমিনিয়ামের তার তামার দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চালক। অ্যালুমিনিয়ামের তার তামার তারের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক শক্তি-সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

আমাদের পৃথিবী যত রকম মূল পদার্থে গঠিত তার মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকনের পরেই অ্যালুমিনিয়ামের স্থান, অর্থাৎ ধাতব পদার্থের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের শ্রেষ্ঠ স্থান। আমরা যে সব পাথর হইতে অ্যালুমিনিয়াম গালাই করি, তাহার মধ্যে বক্‌সাইট পাথরই প্রধান। বক্‌সাইট অনেক দেশে পাওয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটে ও জব্বলপুরে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অন্যান্য জায়গায়ও ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহা প্রচুর নয় বলিয়া বিশ্বাস। বক্‌সাইট্‌কে বহু জায়গায় পাওয়া গেলেও ইহাকে গালাইবার হাঙ্গামা আছে। এজন্য ইহা সকল জায়গাতে গালাই হয় না। আমাদের দেশে অ্যালুমিনিয়াম গালানোর সুবিধা এখনও হয় নাই। ইহার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব। অ্যালুমিনিয়ামকে বৈদ্যুতিক উত্তাপে ক্রাইয়োলাইট নামক খনিজ সংযোগে গালাইতে হয়।

আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে অ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত একটী পদার্থের বেশ ব্যবহার আছে। আমরা ঘোলা জল সাফ্ করিবার জন্য যে ফট্‌কিরি ব্যবহার করি তাহা অ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত ও বাজারে ইহা অ্যালাম নামে পরিচিত। জলের কলে (ওয়াটার ওয়ার্কস) অ্যালামের বেশ ব্যবহার আছে। কাপড়ে রং লাগাইবার জন্য এবং চাম্‌ড়া পাকাইবার জন্যও অ্যালামের ব্যবহার হয়। অ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত পদার্থের ডাক্তারীতেও কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

আমাদের কারখানাতে শান্ দেবার জন্য যে পাথর থাকে তাহা করুন্ডামে তৈয়ারী। করুন্ডাম একটী অ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত জিনিষ। অনেক সময় বক্‌সাইটকে পোড়াইয়া নকল করুন্ডাম তৈয়ারী হয়। করুন্ডামকে আমরা খনিজ অবস্থায়ও পাই। স্বচ্ছ করুন্ডামই আমাদের বহুমূল্য রুবি, স্যাফায়ার ইত্যাদি প্রস্তর।

ধাতু গালাইয়ের চুল্লীর বহু উত্তাপ সহ্য করিবার জন্য বক্‌সাইটের ইট তৈয়ারী হইতেছে। এই ইট্ ম্যাগ্‌নেসাইট ইট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমেরিকায় অ্যালুমিনিয়াম-পাথরের কোন্ কার্য্যে কিরূপ ব্যবহার হইতেছে তাহার একটী তালিকা আমরা নিম্নে দিলাম।

অ্যালুমিনিয়াম গালাই	—	৬৯ %
অ্যালুমিনিয়াম রসায়ন দ্রব্য		১০ "
শান ইত্যাদি প্রস্তুত	—	১৯ "
ইষ্টক নির্ম্মাণ	—	২ "

আমাদের দেশে বাৎসরিক ১৪।১৫ লক্ষ টাকার অ্যালুমিনিয়াম ও ৬।৭ লক্ষ টাকার অ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত পদার্থের আমদানি হয়। অ্যালুমিনিয়াম পাউডার পেন্ট তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়। ধাতু গালাইয়ে যখন অধিক উত্তাপের দরকার হয় তখন অ্যালুমিনিয়াম পাউডারের ব্যবহার আছে। যুদ্ধের গোলাগুলির বারুদের জন্যও অ্যালুমিনিয়ামের দরকার। অ্যালুমিনিয়াম লৌহ ও ইস্পাতের সহিত যুক্ত হইয়া উহাদিগকে বিশেষ গুণ-সম্পন্ন করে। অ্যালুমিনিয়াম বিভিন্ন ধাতুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া নানা প্রকারের মিশ্র ধাতু (অ্যালয়) সৃষ্টি করে।

রেল-ষ্টীমারের কুলী

শ্রীমূলচাঁদ মুন্দড়া

এ প্রবন্ধে খুলনায় রেলে ও জাহাজে কাজ করে এমন শ্রমজীবীদের বিষয়ে কিছু আলোচন করিতেছি।

খুলনায় ঐরূপ প্রায় সহস্রাধিক শ্রমিক বাস করে। প্রথমেই ধরুন ৭নং লোকাল ঘাটে, যেখানে মাড়োয়ারীদের পাট, চাউল, ধানের কারবার আছে, সেই খানে, ১০০।১৫০ জন উড়িষ্যা-দেশবাসী শ্রমিক বাস করে। তার পর লোকাল ঘাটের পাশেই দুইটী জাহাজ কোম্পানীর কয়লার প্লটে কাজ করিবার জন্য, তার পিছনেই ৪০০।৫০০ বিলাস পুরের, পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিক বাস করে। ইহার পর মহাজনের কয়লার প্লটে প্রায় ১০০ শত উড়িষ্যা, বিলাসপুর, দারভাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানের শ্রমিক কাজ করে। তার পর কম্বাইণ্ড ঘাটে, যেখানে জাহাজ হইতে রেলে ও রেল হইতে জাহাজে মাল নামান ও বোঝাই করা হয়, প্রায় ২০০।৩০০ শ্রমিক কাজ করে। ইহারা অনেকে ৪নং ঘাটে খোলা টিনের গুদামে বাস করে ও অনেকে সাহেব বাজারের রেলের জায়গার মধ্যে পাকা ঘরে থাকে। ষ্টেসনে যারা ষ্টীমার ও রেল হইতে যাত্রীদের মাল বহিয়া দেয়, তাহাদের সংখ্যাও কম পক্ষে ১০০ শতের কম হইবে না। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ দারভাঙ্গা মুঙ্গের, মির্জ্জাপুর জেলার শ্রমিক। বাজারের মধ্যেও অনেক শ্রমিক বাস করে। ইহারা ডেল্টা ঘাটে মাল-গুদাম ঘাটে ও কখনও কখনও বাজারে কাজ করে। ইহাদের মধ্যে উড়িয়া ও বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যাই বেশী।

উল্লিখিত শ্রমিকগণ দৈনিক যাহা আয় করে, তাহাতে তাহাদের সচ্ছলরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, উহাদেরই অজ্ঞানতার ফলে উহারা অনেক রকম কষ্ট ভোগ করে। উহারা বেশীর ভাগই অশিক্ষিত। উহারা নানা রকম বাজে খরচ করে। হয়ত একটা অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ফেলে, অথচ নিজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে মোটেই কিছু ব্যয় করিতে পারে না। এখানকার প্রত্যেক জাতীয় শ্রমজীবীদের মধ্যে অনেক রকম দোষ ও কুঅভ্যাস আছে। এ সম্বন্ধে আমি যতদূর যাহা জানি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমেই ধরুন বিলাসপুরিয়া স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমজীবীদের কথা। ইহারা নিজের দেশ হইতে সমস্ত পরিবার সমেত এখানে আসিয়া বাস করে। ইহাদের লজ্জা সরম খুবই কম। ইহারা বড়ই অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে। তা ছাড়া ইহাদের সবচেয়ে প্রধান দোষ এই যে, ইহারা অবসর সময়ে জুয়া খেলিয়া সময় সময় নিজেদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করে। জুয়াতে টাকাকড়ি গহনাপত্র, এমন কি, ঘরের স্ত্রী পর্য্যন্ত সময় সময় ইহারা হারাইয়া ফেলে। আর ভাগ্যক্রমে যদি জুয়াতে কিছু টাকাকড়ি পায় তবে মদের দোকানে ও অন্যান্য স্থানে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া পরিশেষে তাহারই ফল ভোগ করে। সর্দ্দার ও বাবুদের নিকট ইহারা অনেক রকম লাঞ্ছনা ভোগ করে। সর্দ্দারদের যাহা প্রাপ্য তাহা ছাড়া ইহাদের নিকট হইতে অনেক উপায়ে বেশী আদায় করা হয়। ফলে ইহাদের হাতে অনেক কম হারে মজুরি পৌঁছায়।

উড়িয়া শ্রমিকরা বড় নিরীহ ধরণের। ইহাদের মধ্যে এখনও কোন রকম জুয়া খেলা বা মদ্যপান করার অভ্যাস ঢোকে নাই। কেহ কেহ গাঁজা বা আফিম খাইয়া থাকে। অধিকাংশ উড়িয়ারা এখনও বাজার হইতে কিনিয়া বিড়ি খায় না। নিজের হাতে যখন তখন, তামাকের পাতা দিয়া চুরুটের মত তৈয়ারী করিয়া তাহাই ব্যবহার করে। অনেকেই দেশে প্রস্তুত খাটো মোটা রঙ্গীন কাপড় পরে। দেশ হইতে স্ত্রীকে কখনও আনে না। মরশুমের সময় এখানে কাজ-

কর্ম্ম করিয়া দেশে গিয়া ৩।৪ মাস বাস করে। স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী থাকে না। নিজের বাসাও ভাল ভাবে পরিষ্কার রাখে না।

বাজারে যে বাঙ্গালী মুসলমান শ্রমিকরা বাস করে, তাহারা বেশ আয় করে। ইহারা অবসর সময়ে যখন বাজারে বেড়াইতে বাহির হয় তখন খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে, ৬৷৭ টাকা দামের জুতা ও খুব পাতলা বিলাতী ধুতি ব্যবহার করে। তখন ইহাদিগকে শ্রমিক বলিয়া চেনা যায় না। ঘরে কিন্তু ইহারা একেবারেই নোংরা থাকে। ইহারা যাহা আয় করে তাহার অধিকাংশ বাজারের বেশ্যাদের হাতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মদের দোকানে ও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য অন্যান্য স্থানে অর্থ ব্যয় করিয়া ইহারা পরিশেষে ঋণপাশে আবদ্ধ হয়।

এইত আমাদের এখানকার শ্রমিকদের অবস্থা। ইহাদের সহিত বিলাতের শ্রমিকদের তুলনা করিয়া দেখা যাউক। বিলাতের শ্রমজীবীরা সকলেই শিক্ষিত। শ্রমজীবী হইলেও তাহারা সমস্ত পৃথিবীর খবর রাখে। প্রতিদিন পুস্তকালয়ে নিয়মিত ভাবে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করে। নৈশ বিদ্যালয়ে নানা রকম কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করে। তাহাদের মনিবগণ সময় সময় আমোদ প্রমোদের জন্য তাহাদের মধ্যে থিয়েটার, বায়স্কোপ ও নানা রকম খেলার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। তথায় এখানকার মত নোংরা ভাবে একই ঘরে অধিকসংখ্যক শ্রমিক বাস করে না। তাহাদের বাসের জন্য মনিবগণ পৃথক পাকা ঘর দিয়া থাকে। শ্রমিকগণ নিজের টাকা সুরক্ষিত ও সঞ্চিত রাখিবার জন্য ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া থাকে। বিলাতের শ্রমিকদের মধ্যে একতা আছে। তাহাদের উচিত প্রাপ্য মনিবগণ যদি সহজে না দেয়, তবে ধর্ম্মঘট করিয়া বাধ্য করিয়া তাহা আদায় করিয়া লয়। তাহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এজন্য তাহাদের স্বাস্থ্যও বেশ সুন্দর থাকে। এবিষয়ে তাহাদের মনিবগণ অনেক সাহায্য করিয়া থাকে, তাই তাহারা আজ এত শিক্ষিত ও উন্নত।

এখানকার শ্রমজীবীরা যদি শিক্ষিত হইত তবে তাহারা অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিত। ইহাদের মনিবগণেরও উচিত ইহাদের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের সাহায্য করা। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত জুয়া খেলা বন্ধ করিবার জন্য শাসকসম্প্রদায় কি করিয়াছেন? আমাদের এখানকার সেবাসমিতিও ইহাদের মধ্যে কাজ করিতে পারেন। সর্ব্বসাধারণকে বিশেষতঃ সাধারণের হিতকর সমস্ত অনুষ্ঠানকে আমি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত কুনীতি নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। (খুলনা)

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেসে শ্রীযদুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

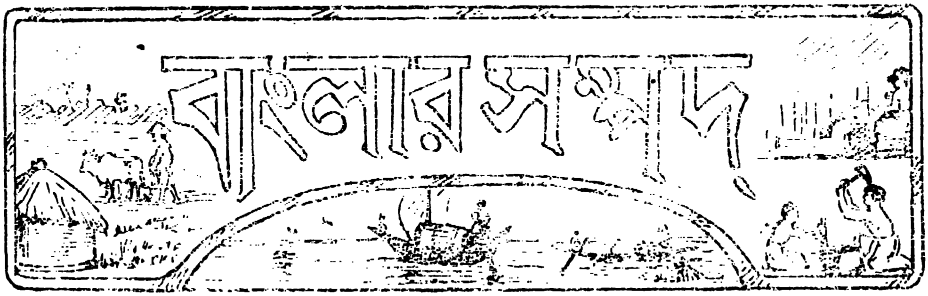
আর্থিক উন্নতি

আশ্বিন—১৩৩৪ ২য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



কলিকাতার বহির্ব্বাণিজ্য

(৯ই জুন, ১৯২৭)

কলিকাতায় প্রতি মাসে কত টাকার দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি হয়? এক মাসের সহিত তার পূর্ব্ব মাসের বা পূর্ব্ব বৎসরের ঐ মাসের তুলনা করিলে হ্রাস দেখা যায় না বৃদ্ধি দেখা যায়? বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশেরই বা কি অবস্থা?

উপরি উক্ত ধরণের প্রশ্নের উত্তর মাঝে মাঝে "দি ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণেল" বা ভারতের বাণিজ্য পত্রিকা হইতে পাওয়া যায়। ইহা ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যিক সন্দেশ ও অঙ্ক বা সংখ্যা-বিজ্ঞানের দপ্তরখানা হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে বাহির হয়। প্রকাশের স্থান কলিকাতা।

৬৳ কোটি টাকা আমদানি

জুন মাসে আমদানির মূল্য ৬·৩৩ কোটি টাকা। মে মাসে ছিল ৬·৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এমাসে ২৭ কোটি টাকার কম জিনিষ বাঙ্গালী বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াছে।

গত বৎসর জুন মাসে আমদানির মূল্য এর চেয়ে ৫৯ লাখ টাকা কম ছিল। অর্থাৎ ৫·৭৪ কোটি টাকার জিনিষ আমদানি হইয়াছিল।

আমদানির জোয়ার ভাঁটা

সব রকম আমদানিতেই আর কিছু এক সঙ্গে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কোনটা বাড়ে, কোনটা কমে। প্রধান প্রধান কতকগুলি আমদানির জোয়ার (+) ভাঁটা (-) দেখান যাইতেছে। মনে রাখিতে হইবে তুলনাটা ১৯২৬ সনের জুনের সঙ্গে।

	লাখ টাকা	হ্রাসবৃদ্ধি
তুলার জিনিষ	২২২	পূর্ব্ববৎ

লোহা ও ইস্পাত	৬৩	+১২
কলকব্জা ও কারখানাযন্ত্র	৪৮	+১৮
খনিজ তেল	৪২	+ ৯
চিনি	৩১	+ ৪
অন্যান্য ধাতু	১৭	পূর্ব্ববৎ
লোহার বাসন প্রভৃতি	১৭	ঐ
রসদ ও অয়েলম্যানুস্ ষ্টোরস্	৯	+ ২
তামাক	৯	— ১
লিকার	৮	+ ২

এই তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে অধিকাংশ দ্রব্যের আমদানি কমিয়া যায় নাই। হয় বাড়িয়াছে, নয়ত আগের মত রহিয়াছে। সুতরাং মোট আমদানির পরিমাণ বেশী হওয়া বিচিত্র নয়।

মোটর গাড়ী

বাঙ্গালা দেশে মাসে মাসে কত মোটর গাড়ী আসিতেছে? জুন মাসে আসিয়াছে ৪৭২ খানা। দাম ৯ লাখ টাকা। ১৯২৬ সনের জুন মাসে আসিয়াছিল ১৯৯ খানা। দাম ৪ লাখ টাকা।

দেখা যায়, সংখ্যার হিসাবে ১৩৮% ও টাকার হিসাবে ১২৫% বাড়িয়াছে। অধিকন্তু ১৯২৬ সনের জুন মাসে প্রতি মোটর কার গড়ে ২০১০৲ দরে বিকাইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি মোটর কারের দর গড়ে ৬০৷৷০ কমিয়া গিয়াছে।

৮৷৷০ কোটি টাকার রপ্তানি

জুন মাসে রপ্তানির মূল্য ৮·৫০ কোটি টাকা। মে মাসে ছিল ৮·৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই মাসে ·২০ কোটি টাকার কম মাল বিদেশে গিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, মে মাসের তুলনায় কলিকাতার কেনা-বেচা দুইই জুন মাসে কম হইয়াছে।

গত বৎসর জুন মাসে এই জুনের চেয়ে ৯৩ লাখ টাকার মাল বেশী রপ্তানি হইয়াছিল। অর্থাৎ ৯.৪৩ কোটি টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল।

আমদানি রপ্তানির মর্ম্মকথা

	আমদানি	রপ্তানি	মোট বাণিজ্য
১৯২৬ জুন	৫·৭৪	৯·৪৩	১৫·১৬
১৯২৭ মে	৬·৬০	৮·৭০	১৫·৩০
১৯২৭ জুন	৬·৩৩	৮·৫০	১৪·৮১

ইহার সহিত আর একটা হিসাব জুড়িয়া দেওয়া দরকার। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে সাধারণতঃ রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশী হইলে তাকে "অনুকূল বাণিজ্য" বলে। আমদানি বেশী হইলে "প্রতিকূল বাণিজ্য" বলে।

বাণিজ্যকে অনুকূল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমদানি রপ্তানি কাটাকাটি গিয়া যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা শোধ করিয়া দিতে হয় সোনায় অর্থাৎ সোনা চালান দিয়া।

মনে রাখিতে হইবে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ভিতরের কথা সোনা চালান আনা নয়, ভিতরের কথা মাল কেনা-বেচা। অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ অন্য কোন বাহিরের দেশ হইতে মাল কিনিলে, সোজাসুজি সেই দেশে টাকা পাঠাইয়া মূল্য শোধ করে না। ঐ মূল্য বা কাছাকাছি মূল্যের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া মূল্য শোধ দেয়।

এইরূপ করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য সোনা দেওয়া নেওয়া করিতে হয়। প্রতিকূল বাণিজ্যের দেশ অনুকূল বাণিজ্যের দেশে সোনা পাঠায়।

ইহাই ডালপালা বাদে আমদানি-রপ্তানির স্থূল মর্ম্ম-কথা। এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বেশী রপ্তানি পাঠাইলে লাভ হইবে মনে করিয়া কোন দেশ যদি আমদানি কমাইয়া দেয় বা নিজ দেশে আমদানি ঢুকিতে বাধা দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার রপ্তানি কমিয়া যাইতে বাধ্য। তাতে মোট বাণিজ্যের আয়তনও কমিয়া যাইবে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ইহাই অ আ ক খ।

বুঝা যাইবে এই ৩ মাসেই কলিকাতার বাণিজ্য অনুকূল। এই অনুকূলতার হিসাব—

১৯২৬ জুন—৩·৬৯ কোটি টাকা
১৯২৭ মে—২·১০ কোটি টাকা
১৯২৭ জুন—২·১৭ কোটি টাকা

শুধু অনুকূলতার দিকে চাহিয়া ও বেচাকেনার হিসাব না লইয়া কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত খাড়া করিলে অন্যায় হইবে।

রপ্তানির জোয়ার ভাঁটা

প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের হিসাব এইরূপ :—

	লাখটাকা	হ্রাস-বৃদ্ধি
পাট শিল্প ...	৩৪২	—১০৩
কাঁচা পাট ...	১২২	— ৮
গালা ...	৭২	+ ২৮
চা ...	৬৯	— ৭
চামড়া	৫১	+ ৮
তেলের বীজ ...	৪২	+ ১৫
গোধূম, ময়দা ইত্যাদি	১৮	— ৭
পিগ্ আয়রণ ...	১৬	+ ৫
ম্যাঙ্গানিজ্ ...	৯	+ ২

পাটের রপ্তানি ১৯২৬ সনের জুন মাসের তুলনায় ভয়ানক রকম পড়িয়া গিয়াছে।

পাটের কাপড় প্রধানতঃ গিয়াছে যুক্তরাষ্ট্রে, আর পাটের থলে গিয়াছে গ্রেট বৃটেনে। কাঁচা পাট প্রধানতঃ জার্ম্মাণি আমদানি করিয়াছে।

বরাবরের মত এবারও যুক্তরাষ্ট্র অধিকাংশ গালা ও ছাগলের চামড়া আর জার্ম্মাণি গরুর চামড়া লইয়াছে।

তেলের বীজ রপ্তানি বেশ বাড়িয়াছে। ইংরেজ তিসির অর্ডার বেশী দিয়াছে।

পিগ্ আয়রণ লইয়াছে জাপান আর ম্যাঙ্গানিজ্ গিয়াছে ইংরেজের জন্মভূমিতে।

ফড়িঙের উপদ্রব

ই, বি, রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ শাখার বেলডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে পলাশী ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে অংশ আছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কতক অঞ্চলকে কালান্তর বলে। এই অঞ্চলে অধিকাংশ জমিতেই আমন ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। চারি পাঁচ বৎসর হইতে এই অঞ্চলে ফড়িঙের ভীষণ উপদ্রব হইতেছে। আমন ধান্যের পাতা শীষ সমুদয়ই ফড়িঙে খাইয়া ফেলে; এই হেতু এতদঞ্চলে কয় বৎসর হইতে ধান্য প্রায় একেবারেই হইতেছে না। ফলে অধিকাংশ জমিই পতিত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই কালান্তর অঞ্চলে সর্ব্বাঙ্গপুর নামে একটী বেশ বড় গ্রাম রহিয়াছে। এখানে প্রায় এক হাজার লোকের বাস এবং অন্যূন পঁচিশ হাজার বিঘা জমি রহিয়াছে। এই গ্রামেই ফড়িঙের উপদ্রব বেশী হইতেছে। শুধু মুর্শিদাবাদ জিলার নহে বাঙ্গালার অনেক জিলার লোকেরই সর্ব্বাঙ্গপুরে জমি আছে। সর্ব্বাঙ্গপুরের পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামেও ফড়িঙের উপদ্রব হইতেছে। শ্যামনগর, বাগী, ডাকাতিয়া, পোতা, সোনাটিকুরী, দুধসর, ঝিকরা, হেররপাড়া, রাইপুর, বাগআঁচড়া, কোদালকাটী, পাটকাবাড়ী, ধুঁধুই, আলামপুর, রাজনগর, রামডহরা, গুরুদাসপুর, কাঞ্চন-নগর প্রভৃতি গ্রামে এই ফড়িঙের উপদ্রবে কৃষককুলের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

কালান্তর অঞ্চল প্রধানতঃ নিম্নভূমি। এখানে বর্ষার সময় প্রায় সমুদয় জমি জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায়। ক্ষেতে দেখা যায় কোথাও ৪।৫ হাত খাড়াই জল, কোথাও বা ১০।১২ হাত জল হইয়া থাকে। এই প্রকার বেশী জলে জন্মাইবার উপযুক্ত ধান্য এই অঞ্চলে আবাদ করা হইয়া থাকে। পিত্তিরাজ, কালবয়রা, অলস, মেহেরফল ইত্যাদি নামধেয় ধান্যের বেশী আবাদ হয়। এই অঞ্চলে যে সব ফড়িঙ্ জন্মাইতেছে, তাহাদের আকারও বেশ বৃহৎ—৩ ইঞ্চি বা কিছু বেশী লম্বা। কার্ত্তিকমাসে যখন বর্ষার জল নামিয়া যায়, ধান্য কাটাও শেষ হয়, তৎকালে অধিকাংশ ফড়িঙ্ মারা যায়। বক, হাড়গিলা, মাণিকজোড়, শামকোল ইত্যাদি বৃহৎকায় পক্ষীরা অধিকাংশ ফড়িঙ্ খাইয়া ফেলে। যে ফড়িঙ্গুলি জীবিত থাকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে তাহারা ডিম পাড়ে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আর বড় ফড়িঙ্ দেখা যায় না, কতকগুলি করিয়া ডিম থোকা বাঁধিয়া থাকে। মাটীর ফাটলায় অনেক ডিম থাকে, লাঙ্গলের চাষে সেই সমুদয় ডিম অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের নব বৃষ্টিপাতে ডিম্ব হইতে ফড়িঙের বাচ্চার উৎপত্তি হয়। ভাদ্র আশ্বিনে ফড়িঙের শরীর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। যত দিন জমি ভাসিয়া না যায়, ততকাল ক্ষুদ্র ফড়িঙগুলি দূর্ব্বা শ্যামা

ইত্যাদি ঘাস খায়, অতঃপর যখন বর্ষার জলপ্লাবনে জমি জলে পূর্ণ হয়, তৎকালে উহারা ধান্যের গাছে উঠিয়া ধান্যের বাইল খায়, ফলে ধান্যের আর শীষ বাহির হইতে পারে না। জলের উপরিভাগে ধান্যের যে সব পাতা থাকে, ফড়িঙে সে পাতাগুলি খাইয়া ফেলে; ডাঁটাগুলি মাত্র খাড়া থাকে। এই হেতু অনেক জমিতে ধান্য কাটিবারই প্রয়োজন হয় না।

এই প্রকার পর পর কয়েক বৎসরের অজন্মায় কালান্তর অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই সকলের মুখে বিষাদের কালিমা পড়িয়া গিয়াছে। এই আপদ্ নিবারণকল্পে কি করা প্রয়োজন তাহা অনেকেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। স্থানীয় জমীদারগণের ও গবর্মেণ্টের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে লালিতা-কুড়ির দাঁড়া ভাঙ্গিলে সারা কালান্তর অঞ্চল ভাসিয়া যাইত, এমন কি, ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইত। অবশ্য সে বৎসর ধান্য ফসল জলপ্লাবনে বিনাশপ্রাপ্ত হইত; কিন্তু এই অপকারের মধ্য দিয়া একটা বড় উপকারও হইত। পোকা, মাকড়, কীট, পতঙ্গ, ফড়িঙ্ প্রভৃতি যাহা কৃষি-কার্য্যের শত্রু, সে সবও ভাসিয়া দূরীভূত হইয়া যাইত এবং জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাইত। বর্ত্তমানে কিন্তু এই প্রকারের প্রবল জলপ্লাবন আর ঘটিতে পায় না।

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র, এম, এ
গঙ্গাধারী গ্রাম, জিতপুর পোঃ
(মুর্শিদাবাদ)

দোকানে সমবায়

(১)

উত্তর মালদহের কতিপয় যুবক সমবেতভাবে চাঁচলের হাটে একটি মনোহারী দোকান কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা সাতশত টাকা করিয়া প্রত্যেকে দিয়া এই কারবার আরম্ভ করেন। মনোহারী দ্রব্য এবং মিলের কাপড় বিক্রয় করিয়া, দুইতিন বৎসরের মধ্যে তাঁহারা, বিশেষ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রথমে যে টাকা তাঁহারা কারবারে দিয়াছিলেন, উহা তুলিয়া লইয়াও বর্ত্তমানে তাঁহাদের প্রত্যেকের অংশে বারশত টাকা করিয়া মূলধন হইয়াছে!

(২)

উক্ত যুবকেরা কলিগ্রামে 'লক্ষ্মীভাণ্ডার' নামে একটি মুদীর দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মূলধন বাবদ প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা করিয়া দিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। গতবৎসর তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন অগ্রীম দেওয়া টাকা তুলিয়া লইয়াছেন, তথাপি এখন তাঁহাদের প্রত্যেকের মূলধন ৭৫৲ টাকা করিয়া উক্ত কারবারে খাটিতেছে।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের পল্লীপথ

বর্ষাকালে এতদঞ্চলের পল্লীগ্রামে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের একমাত্র উপায় নৌকা। কিন্তু আজকাল কয়েক বৎসর যাবৎ কচুরি পানার জন্য নৌকায় যাতায়াত খুবই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল খাল কি জলপথ দিয়া নৌকা সর্ব্বদা যাতায়াত করে সময় সময় হঠাৎ বাতাসে কি অন্য কোন কারণে ঐ সকল খাল কি পথ এইরূপ বন্ধ হইয়া থাকে যে, ১০ মিনিটের পথ ১ ঘণ্টায়ও যাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত খালের দুই দিকের জঙ্গল ও গাছের ডাল ঝুঁকিয়া খালের মধ্যে আসিয়া খালগুলিকে দিনের বেলায়ও অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে স্থানীয় জমীদার কিংবা উভয় পার্শ্বের মালিকগণ যাহাতে বর্ষার পূর্ব্বেই খালের উভয় পার্শ্বের জঙ্গল ও গাছের ডাল ইত্যাদি কাটা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু এখন ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের উপর এই জনহিতকর কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ড সহজে নাম করার জন্যই হউক কিংবা প্রেসিডেণ্ট কিংবা বিশিষ্ট সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য অথবা উপরওয়ালার সুদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'ইউনিয়ন বোর্ড রোড' নামে পল্লীগ্রামে কতকগুলি একপেয়ে ও অনুচ্চ এক প্রকার রাস্তা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল রাস্তা বর্ষার প্রারম্ভেই জলমগ্ন হইয়া যায়, এমন কি অন্য সময়ও সামান্য বৃষ্টিতেই চলাচল কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের মতে ইউনিয়ন বোর্ড পল্লীগ্রামে, এইরূপ 'রোড'

প্রস্তুত না করিয়া যদি ঐ টাকাগুলি দ্বারা বর্ষাকালে চলাচলের পথ খালগুলির প্রতি ও গ্রামের জলনিকাশের ব্যবস্থায় মনোযোগী হন তাহা হইলে পল্লীবাসিগণের অধিকতর উপকার সাধিত হইতে পারে। গত বৎসর ডিঙ্গামাণিক ও ঘড়িসার ইউনিয়ন বোর্ড এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কয়েকটি খাল সুন্দরভাবে পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

আমরা আশা করি সকল ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষই তাহাদের এলাকার সাধারণের চলাচলের খাল ও জলপথগুলি যাহাতে বর্ষাকালে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এই সকল কাজ বিশেষতঃ খালের উভয় পার্শ্বের জঙ্গল কি গাছের ডাল কাটানোর কার্য্য অধিকাংশ স্থলে বিনা ব্যয়েই 'হালদার পুকুরের পারের নোটিস' জারীর ন্যায় কার্য্য দ্বারাই হইতে পারে।

আমরা ইকরকান্দি, সিড্যা, বাঘিয়া, রাহাপাড়া, পণ্ডিতসার, মধুপুর, ডিঙ্গামাণিক, (কার্ত্তিকপুর হইতে ডিঙ্গামাণিক, কলারগাঁও হইয়া যে খাল ঘড়িসার গিয়াছে) এবং গোপালপুর খালের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তৎপ্রতি ঐ সকল স্থানের ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের পক্ষে বর্ষাকালে নৌকাযোগে তাঁহার বোর্ডের এলাকার খালগুলির অবস্থা পরিদর্শন করা আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

কতকগুলি খালে বর্ষার শেষভাগে মাছ ধরিবার জন্য অধিবাসিগণ 'গড়া' দিয়া এইরূপ ভাবে খালের অবস্থা করে যে, অবাধে নৌকা যাতায়াত খুবই কষ্টকর হইয়া পড়ে। সময় সময় গড়ার মালিকের সহিত মাঝিদের তুমুল ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত হয় এবং মাল বোঝাই নৌকা এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে সহ নৌকা 'গড়ায়' ঠেকিয়া বিপদগ্রস্ত হওয়ারও আশঙ্কা জন্মে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভোজেশ্বর খালের অবস্থার প্রতি তত্রত্য ইউনিয়নের কর্ত্তৃপক্ষ এবং সার্কেল অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(ফরিদপুর হিতৈষী)

কলিকাতার স্বাস্থ্য

কলিকাতার চৌহদ্দি মোট ৪৪ বর্গ মাইল লইয়া। ইহার ৩০½ বর্গ মাইল কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে। ২ বর্গ মাইল খাস সরকারের তদারকে। পোর্ট ও ক্যানাল সমেত মোট ১১ বর্গ মাইল পোর্ট কমিশনারগণের শাসনাধীনে। কলিকাতার লোক-সংখ্যা ১০¾ লক্ষ। সহরে ৬১ হাজার ইমারত ও ৫,৫০০ বস্তি আছে। বোম্বাই সহরের সীমানা মাত্র ২৩½ মাইল লইয়া। ইহার তুলনায় কলিকাতার সীমানা ডবল। কিন্তু বোম্বাইয়ের লোক-সংখ্যা কলিকাতার চাইতে বেশী। বোম্বাই সহরে ১১¾ লক্ষ লোক বাস করে এবং ইহাই লোক-সংখ্যার দিক্ দিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর। কলিকাতায় গড়ে একরে প্রতি ৩৮ জন লোক বাস করে। বোম্বাইতে বাস করে ৬৯ জন, ও লণ্ডনে ৬০ জন। কলিকাতার জন্ম-হার হাজার প্রতি ১৯ জন অর্থাৎ বৎসরে কলিকাতা সহরে ২০ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে। বোম্বাই ও লণ্ডনের জন্মহার হাজারকরা ১৭ জন। কলিকাতার লোক-সংখ্যার ⅓ অংশ নারী। লণ্ডনে কিন্তু শতকরা ৫৩ জন মেয়েলোক। কলিকাতার মৃত্যু-হার হাজার করা ৩০ অর্থাৎ বৎসরে ৩০ হাজার করিয়া লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৬ বা ৭ ভাগ মফঃস্বল অঞ্চলের। পুরুষের চাইতে মেয়েদের মৃত্যু-হার দেড় গুণ বেশী। মুসলমানদের মধ্যেই মৃত্যুহার সব চাইতে বেশী। ১৯২৫ সনে হাজার করা ৩৭ জন মুসলমান, ৩১ হিন্দু, ২৮ জন ভারতীয় খৃষ্টান ও ২৪ জন অ-ভারতীয় খৃষ্টান মৃত্যুমুখে পতিত হয়।



আসামের চা-বাগান

আসাম সরকারের কৃষি ডিরেক্টরের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯২৬ সনে আসামে মোট ৯৪১টি চা বাগান ছিল, ১৯২৫ সনে ছিল ৯৩০টি। গত সনে কাছার ও শিবসাগর জেলায় ২টি ডেরাংএ ৩টি ও লক্ষ্মীপুরে ৫টি নূতন চা বাগান খোলা হয়। ১৯২৫ সনের মত গত সনেও কামরূপ জেলার ৫টি বাগানের কাজ বন্ধ ছিল।

আলোচ্য সনে চায়ের জমি ৪১৬,৪৭৬ একর হইতে ৪২০,৫৬৪ একর হয়। ঐ সন ৭,৩৩৬ একর জমিতে নূতন চা আবাদ করা হয় ও ৩,২৪৮ একর চায়ের জমিতে লাভ না পাওয়ায় পরিত্যাগ করা হয়। কাছার, নওগাঁ ও সাদিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য সকল জিলাতেই চায়ের চাষ প্রসার লাভ করে। ঐ সনে চা আবাদী জমির ৪০১,৭৮৮ একর হইতে চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। ১৯২৫ সনে ঐ জমির পরিমাণ ছিল ৪০০,৫৪৪ একর। গত দুই তিন বৎসর হইতে চায়ের ফসল একভাবেই চলিতেছে।

আসাম প্রদেশের ১,৫৭৭,০৪৮ একর জমি চায়ের জমি বলিয়া খ্যাত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার শতকরা মাত্র ২৭ ভাগ জমিতে চা উৎপাদন করা হয়।

চা বাগানের কুলি

ঐ সনে মোট ৫৩২,০২৪ জন দিনমজুর চা-বাগান-গুলিতে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৫ সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৫২৭,৪৯৬। স্থায়ী মজুরের সংখ্যা ছিল ৪৬৩,৮৪৭ জন। ইহারা চা বাগানের খাস গোলাম। ইহা ছাড়া বাহির হইতে স্থায়ী মজুর লওয়া হইয়াছিল ২৯,৯৬৪ ও অস্থায়ী ৩৮,২১৩। পূর্ব্ব সনে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬১, ২২১, ৩০,২৫২, ও ৩৬০২৩ জন। চা বাগানগুলিতে মজুরের চাহিদা এখনও প্রবল আছে।

উৎপাদনের হার

১৯২৬ সনে আসামের চা বাগানগুলিতে ২৪০৪৪৯,৫০৭ পাউণ্ড ব্লাক চা, ১৫৩২১৬৬ পাউণ্ড গ্রিন চা উৎপাদন করা হয়। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ২২৩,৬৬০,৯৭০ ও ১৫১৮৭১৭ পাউণ্ড ছিল। কামরূপ জিলা ছাড়া অন্যান্য সকল চা জিলাগুলিতেই উৎপন্নের হার বৃদ্ধি পায়। উৎপন্নের হার আরও বৃদ্ধি পাইত; কিন্তু গত সনের নভেম্বর মাসে চায়ের বাজারে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, চা খুব বেশী গুদামে জমিয়া যাইবে। এইজন্য চা উৎপাদনের হার কমাইয়া দেওয়া হয়।

গ্রিন টি মাত্র সিলেট জিলার ছয়টি বাগানে ও কাছার নওগাঁর দুইটি বাগানে জন্মে। ১৯২৫ সনের তুলনায় গোটা আসামে একর প্রতি চায়ের উৎপাদনের হার গড়ে ৪০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়। লক্ষ্মীপুর অঞ্চলেই বৃদ্ধি খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়।

বৎসরের গোড়ার দিকে চায়ের বাজার বেশ ভাল ছিল, চায়ে দাম ছিল। শেষভাগে চা বেশী উৎপন্ন হওয়ায় দাম পড়িয়া যায়, শেষে এমন কি উৎপন্ন খরচার নীচে চা বিকাইতে থাকে। চায়ের বীজের চাহিদা বেশ আছে।

ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশ্যনের বিজ্ঞান-বিভাগ টোকলাই নামক স্থানে তাঁহাদের গবেষণার কাজ চালাইতে থাকেন এবং গবেষণার ফলাফল তাঁহাদের প্রকাশিত একখানি ত্রৈমাসিকে বাহির করিতে থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত আসাম সরকার আলোচ্য সনেও ঐ চা-গবেষণা-সমিতিকে ১০ হাজার টাকা বৃত্তি দান করেন।

আসামের কৃষি ডিরেক্টর সাহেবের মতে চায়ের ব্যবসা খুব আশাজনক। ভারতের পুঁজিতে ও ভারতীয়গণ-কর্ত্তৃক নূতন নূতন চা কোম্পানী স্থাপনের দ্বারা বোঝা যায় যে চা বাগানের দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা যে খুব লাভজনক ব্যবসা তাহা তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে। ভারতীয়-পরিচালিত চা-বাগানগুলির পুঁজি খুব সামান্য হইলেও এগুলি ক্রমশঃ উন্নতির দিকে চলিয়াছে। বাজারের চাহিদার চাইতে উৎপন্নের হার বেশী বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই আছে। তবে উপযুক্ত সময় চা পাতা সংগ্রহ করা ও সেগুলির দ্বারা উত্তম চা প্রস্তুত করার দিকেই অনেক চা বাগানের লক্ষ্য।

আফিং ভারত

লিগ অব্ নেশান্স বা জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে সাব্যস্ত হয় যে, ঔষধপত্রাদি ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রতি দশ হাজার লোক মাত্র ৬ সের আফিং ব্যবহার করিতে পারিবে। ইয়োরামেরিকার দেশগুলির কোনটিই ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী আফিং ব্যবহার করে না, বরং অনেক দেশই ঐ সংখ্যায় এখনও পৌছে নাই। ইহার তুলনায় ভারতবাসী কতটা আফিং খায়? গড়ে ভারতের ১০ হাজার লোক ১২ সের করিয়া আফিং সেবন করে। লিগ অব্ নেশান্সের হিসাবের ডবল আফিং খায় ভারতবাসী। নিম্নে ভারতের কয়েকটি প্রদেশের হিসাব দেওয়া হইল।

আসাম

আসাম সব চাইতে বড় আফিংখোর। লিগ অব্ নেশান্সের ৬ সের এখানে খাটে না। আসামের কোন কোন জেলায় ১০ হাজার অধিবাসী ১৭৩, ১৮৯ এমন কি ২৩৭ সের পর্য্যন্ত আফিং খায়। গড়ে গোটা আসামের প্রতি ১০ হাজার লোক ৫২ সের করিয়া আফিং সেবন করে। খাস আসামী লোকদের মধ্যে গড়ে ১৫০ সের চলন আছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবেও আসামের মত কয়েকটি বড় বড় আফিং-খাদক জিলা আছে। ফিরোজপুরের প্রতি ১০ হাজার লোক ৬০ সের করিয়া আফিং খায়। লাহোর, লুধিয়ানা ও অমৃতসহর অঞ্চলেও ঐরূপ অত্যধিক পরিমাণ আফিং কাট্তি হয়। দিল্লী ও আজমীরে প্রতি ১০ হাজারে ৫২ সের আফিং চলে। মোগল বাদসাগণের আমলে আফিংএর চলন খুব বেশী ছিল। এ অঞ্চলে অত্যধিক আফিং কাট্তির ইহাই একমাত্র কারণ।

সিন্ধু প্রদেশ

হায়দ্রাবাদ, করাচী ও সুক্কুর জিলায় আফিংখোরের সংখ্যা খুব বেশী। মোটের উপর এ প্রদেশের প্রতি দশ হাজারে ৫০ সের আফিম চলে।

গুজরাট ও বোম্বাই

গুজরাটের পাঁচ মহলই সবচাইতে খারাপ। এখানকার প্রতি দশ হাজার লোকে ৬০ সের করিয়া আফিং খায়। গুজরাটের শিল্প-সহরগুলিতে আফিংএর খুব বেশী কাট্তি হয়। বোম্বাই প্রদেশে প্রতি ১০ হাজারে ২২ সের আফিং খরচ হয়। এক যুগের মধ্যে বোম্বাই মিল অঞ্চলে আফিংএর কাট্তি শতকরা হাজার ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গোদাবরী জিলা

গোদাবরী জিলার প্রতি ১০ হাজার লোক ৭৫ সের করিয়া আফিং সেবন করে। পূর্ব্ব উপকূলের বালাসোর ও পুরীতেও ঠিক একই অবস্থা। মালয় ও সিঙ্গাপুরে থাকিয়া ঐ অঞ্চলের যে সব লোক দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাদের দ্বারাই এ অঞ্চলে আফিং-সেবন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতা

কলিকাতায় আফিংখোরের সংখ্যা অত্যধিক। এখানকার প্রতি দশ হাজার লোক গড়ে ১৪৪ সের আফিং খায়, অর্থাৎ লিগ অব্ নেশান্সের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ২৪ গুণ আফিং কলিকাতায় কাটতি হয়।

বার্ম্মা

বার্ম্মার প্রতি দশহাজার লোক ২৮ সের করিয়া আফিং খায়। মার্গুই জিলা, যেখানে চীনা মজুর খুব বেশী, সেখানে প্রতি দশ হাজারে ১৪০ সের পর্য্যন্ত আফিং চলে। রেঙ্গুনে ঐ সংখ্যা ১০৮ সের। বার্ম্মায় অত্যধিক আফিং কাটতির একমাত্র কারণ চীনা কুলি মজুর। সরকার খাস বার্ম্মিজগণের মধ্যে আফিং বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু খনি অঞ্চলে সস্তা শ্রমজীবী পাইবার মহান্ উদ্দেশ্যে চীনা কুলিদের মধ্যে আফিং বিক্রয় রহিত করেন নাই। আফিং ব্যবসায়ী ইংরেজ সরকারের কি সুন্দর ব্যবস্থা !

রাজপুতানা

রাজপুতানায় আফিংখোরের সংখ্যা খুবই বেশী। এখানকার মালওয়া নামক স্থানে প্রভূত পরিমাণে আফিং জন্মে। ইহার জন্য আশেপাশের করদ-মিত্র রাজ্যগুলিতেও আফিং-রোগ সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার মাড়োয়ারী বণিকগণ অন্যান্য বাণিজ্য-সম্ভারের মধ্যে লুকাইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে আফিং রপ্তানি করে। ফলে ইহা সুদূর আসামের কুলির গৃহেও প্রবেশলাভ করিয়াছে।

সমৃদ্ধিশালী সিংহল

সিংহলের কাষ্টম কলেক্টর ১৯২৬ সনের আর্থিক রিপোর্টে বলিতেছেন যে, সিংহলের ইতিহাসে ব্যবসা-বাণিজ্যের এরূপ সুবৎসর আর দেখা যায় নাই। ঐ সনে মশলা বাদ দিলে দেখা যায়, পূর্ব্ব সনের চাইতে ৫৪,৬৮৪,৩৮১ ও ১৯২৪ সনের চাইতে ২০৯,৭২২,৫২৪ টাকার ব্যবসা বেশী হইয়াছে। ১৯২৬ সনে মোট ৯২১,৬৯৩,৫৫৫ টাকার ব্যবসা হইয়াছে। ১৯২৩ সন হইতেই সিংহলের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুব ভাল যাইতেছে।

ঐ সনে সিংহলের আমদানি বাণিজ্য হয় ৩৫১,৩২৮,২৪১ টাকার। পূর্ব্ব বৎসরের চাইতে শতকরা ১১ ভাগ আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানি ব্যবসা ১৯২৫ সনের ৪৯২,৪৮৯,২৯৬ টাকা হইতে ৫০৩,২৬২,৪৮৯ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

১৯২৫ সনের চাইতে ১৯২৬ সনে বৃটিশ আমদানি অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের আমদানি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের নিকট হইতে সিংহল সব চাইতে বেশী মাল আমদানি করে। ইউনাইটেড কিংডমের স্থান দ্বিতীয়। তাহার পরেই বার্ম্মার স্থান। সিংহলের আমদানি বাণিজ্যে জার্ম্মাণির স্থান দশম বা একাদশ।

রপ্তানি ব্যবসায়ে সিংহলের বড় খরিদ্দার ইংরেজ ও মার্কিণ। ১৯২৬ সনে ইংলণ্ডে সিংহলের রপ্তানির ৪২.৫৮ ভাগ ও যুক্তরাষ্ট্রে ২৯.৮৬ ভাগ প্রেরিত হয়।

ভারতে সমবায়ের আরম্ভ

ভারতে সমবায়-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ২২ বছর আগে। ১৯০৪ সনে এদেশে প্রথম সমবায়-বিষয়ক আইন পাশ হয়। প্রথমে সমবায়ের বিস্তার খুবই আস্তে হইতে থাকে। তাতে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, এদেশে সমবায় বেশী বিস্তারলাভ করিবে না। ১৯১২ সন পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে মাত্র ৮১৭৭টী সমবায় সমিতি ছিল।

বর্ত্তমান অবস্থা

১৯১২ সনে সমবায় সমিতি-বিষয়ক আইন সংশোধন করিয়া নূতন আইন পাশ করা হয়। তারপর সমবায়ের বিস্তার বেশ তাড়াতাড়িই হইতে আরম্ভ করে। ১৯১০-১১ হইতে ১৯১৫-১৬ পর্য্যন্ত ৫ বছরের গড়ে ১১,৭৪৮৬টী সমিতি ছিল; ১৯১৫-১৬ হইতে ১৯১৯-২০ পর্য্যন্ত গড়ে ২৮,৪৭৭টী সমিতি ছিল; ১৯২০-২১ হইতে ১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত গড়ে ৫৭,৯০৭টী সমিতি এবং ১৯২৫-২৬ সনে সমিতির সংখ্যা হইয়াছে ৮০,১৮২টী। ১৯২৪-২৫ এবং ২৫-২৬ উভয় সনেই প্রায় ১০ হাজার করিয়া নূতন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মোট সভ্য-সংখ্যা ৩,০৫৮,০২৫ জন এবং খাটানো মূলধন ৫৭,৬০,৩৯,০০০ অর্থাৎ গড়ে ১০টী গ্রামের মধ্যে ১টীতে সমবায় সমিতি আছে। প্রতি ১০০ জন লোকের ১ জন সমবায় সমিতির সভ্য, এবং প্রত্যেক সভ্যের খাটানো মূলধন প্রায় ১৮৮ টাকা। দেশে যা দরকার তার তুলনায় সমবায়ের বিস্তার মোটেই পর্য্যাপ্ত

নয়; কিন্তু মোট ২২ বৎসরে এই পর্য্যন্ত হইয়াছে, এটাই আশাপ্রদ।

পাঞ্জাবে সমবায়

ভারতের মধ্যে সমবায় আন্দোলন পাঞ্জাব প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করিয়াছে বলা যেতে পারে। পাঞ্জাবে ১৯২৫-২৬ সনে সমিতির সংখ্যা ছিল ১৪,৫২৬টী, প্রাথমিক সমিতিগুলির মেম্বারের সংখ্যা ৩৯৯,৪৬৬ জন এবং মোট মূলধন ৯,২৮,৯৭,০০০ টাকা। সমিতিগুলির মধ্যে কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা প্রায় ১২৬১৭টী বা প্রায় ৮৭%। অন্যান্য সমিতির মধ্যে ১১২টী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক আছে। তদ্ভিন্ন মিতব্যয় সমিতি (থ্রিপ্‌ট্‌ সোসাইটি), বাধ্যতামূলক শিক্ষাসমিতি, কৃষিযন্ত্র ও বিবিধদ্রব্য সরবরাহ সমিতি, পাঁক পরিষ্কারক সমিতি, গোপালন সমিতি প্রভৃতি নানা নূতন ধরণের সমিতি আছে। তাঁতীদিগের মধ্যে শিল্প সমিতি এবং শস্য বিক্রয়ের কেন্দ্রে কয়েকটী সমবায় শস্য বিক্রয় ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবে এক প্রকার নূতন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাই সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য। এই নূতন সমিতিগুলিকে জোত একত্রকারী সমিতি বলা যায়। এদেশে কোন লোক মারা গেলে তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া নেয়। এতে একটা জোত হয়ত ৫।৭ ভাগ হইয়া যায় এবং চাষের খুব অসুবিধা হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঐ এক অবস্থা। ইহাতে এক জনের হয়ত মোট জমির পরিমাণ যথেষ্ট আছে কিন্তু জোতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত বলিয়া চাষে তেমন লাভ হয় না। এক্ষেত থেকে ও ক্ষেতে যাওয়া আসা দেখা শুনা করা প্রভৃতির জন্য পরিশ্রম ও খরচ বেশী পড়ে। ইচ্ছা থাকিলেও জমিতে জলসেচন দ্বারা বা অন্য উপায়ে জমির উন্নতি করা কঠিন হয়। জমির 'আইলে' অনেক জমি নষ্ট হয়।

এইরূপ নানা অসুবিধা দূর করিবার জন্য পাঞ্জাবে জোত একত্রকারী সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রামস্থ চাষীদিগের জমি পরস্পরের মধ্যে 'এওয়াজ' দিয়া বা বদল করিয়া একজন চাষীর সব জমি যাহাতে যথাসম্ভব এক প্লটে ও এক সঙ্গে হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে। ১৯২৩ সনে এরূপ সমিতি প্রথম স্থাপিত হয়। ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ১৩৩টী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের চেষ্টায় ৩৫,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ড ৪৫০০ 'প্লটে' পরিণত করা হইয়াছে। অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৮ খানা জমি একসঙ্গে করা হইয়াছে। জলন্ধর গ্রামে একজন চাষীর ২০০ খণ্ড জমি ছিল, তাহা সমস্ত এক খণ্ডে পরিণত করা হইয়াছে। ঐ গ্রামে আরও ৫ জনের জমি ১০০ খণ্ডের বেশী ভাগে বিভক্ত ছিল। সে সকলেরই জমি এক এক খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তাহারপুর নামে আর একটি গ্রামে ১৪৩৫ খণ্ড ক্ষেত্র ও ৮৪৪টী 'প্লট' ছিল সমস্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১৫০০ বিঘা। এই সকলগুলি মিলাইয়া এখন মাত্র ৬৩টী 'প্লট' হইয়াছে।

চাষের এই অসুবিধা কমবেশী ভারতের সর্ব্বত্রই আছে। এইরূপভাবে প্লটগুলি একত্র করিতে পারিলে এবং আইন করিয়া একটি প্লটকে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (ধরুন ৩ বিঘা) অপেক্ষা ছোট করিতে না দিলে চাষের খুব উপকার হইতে পারে। এতে উৎপাদন বাড়ে, চাষের খরচ কম হয়, জমির উন্নতি করা সোজা হয়, জমির সীমানা লইয়া মামলামোকদ্দমা বা ঝগড়া বিবাদ কম হয়, কৃষিকার্য্যে যন্ত্রাদি ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। বাংলাদেশে এরূপ প্রচেষ্টা এখনও হয় নাই।

বাংলা

সমবায় সমিতির সংখ্যার দিক্ হইতে পাঞ্জাবের পুরই বাংলার স্থান; কারণ বাংলা দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৯২৬ সনে ছিল ১২৭৭৬টি, সভ্যের সংখ্যা ৩৪৬৫৭১ জন এবং মূলধন ৭,৪৮,২৯,০০০ টাকা। (গত শ্রাবণ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে বাংলাদেশের সমবায় সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে)।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১১,৯৭১টী কিন্তু সভ্য-সংখ্যা ৭৪৫,৬৮৯ জন এবং মূলধনের পরিমাণ ১১,৩৬,৩৫,০০০ টাকা। মাদ্রাজে সমবায় আন্দোলনের

মধ্যে নানা দিক্ হইতে জীবনীশক্তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন, গাড়ীচালক ও মেথর-দিগের সমবায় সমিতি স্থাপন, সমবায়-কর্ম্মীদিগের জন্য শিক্ষার ক্লাস চালান, পশুবীমা সমিতি স্থাপন প্রভৃতি অনেক নূতন নূতন সমবায় প্রচেষ্টা মান্দ্রাজে চলিতেছে। সমবায় ক্রয়বিক্রয় কার্য্যেও মান্দ্রাজের ট্রিপলিকেন ষ্টোর ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯০৪ সনে মাত্র ৩১০ টাকা মূলধন লইয়া এই সমিতি কার্য্য আরম্ভ করে। রকডেল প্রণালীতে কার্য্য হয়। ফলও তদনুরূপ হইয়াছে। ইহাদের অংশগত মূলধন ১৯২২ সনে হইয়াছিল ৬০,০০০ টাকা, রিজার্ভ ফাণ্ডে ৬২,০০০ টাকা, কমন গুড ফাণ্ডে ২৭,০০০ টাকা, সমিতির বাড়ীর দাম ৩০,০০০ টাকা। সমবায় প্রণালীতে শ্রমিকদিগকে সংগঠন করিয়া তাহাদের জন্য কাজ জোগাড় করিবার একটী নূতন চেষ্টাও চলিতেছে। ১৯২৬ সনে এইরূপ সমিতিগুলি ২৪৪,০০০ টাকার কনট্রাক্টের কাজ করিয়াছে।

সমবায় বিভাগেরও পুনর্গঠন সাধিত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশটীকে ৮টী সার্কেলে ভাগ করিয়া এক একটী সার্কেল এক একজন ডেপুটী রেজিষ্ট্রারের অধীনে রাখা হইয়াছে। ৮টী সার্কেল আবার ২৪টী সেকশনে ভাগ করা হইয়াছে এবং এক একটীর চার্জ্জে একজন করিয়া অ্যাসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার রাখা হইয়াছে। সমিতিগুলির পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষার ভারও ক্রমে ক্রমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলি লইতেছে।

বোম্বাই

বোম্বাই প্রদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। কারণ ১৯২৫-২৬ সনে বোম্বাই প্রদেশে মাত্র ৪,৬৫৫টী সমবায় সমিতি ছিল। বিহার ও উড়িষ্যা, সংযুক্ত প্রদেশ, এমন কি বার্ম্মায়ও সমবায় সমিতির সংখ্যা ইহা অপেক্ষা বেশী। কিন্তু সমবায় সমিতির সভ্যসংখ্যা ও মূলধন দ্বারা বিচার করিলে বোম্বাই তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বোম্বাই প্রদেশের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সভ্য-সংখ্যা ৪৩৮,২২৫ এবং সমিতিগুলির মোট মূলধন ৮,৭৮,৬৯,০০০ টাকা। বোম্বাইয়ের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে তুলার ব্যবসায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫-২৬ সনে ইহারা ৫৩॥ লক্ষ টাকার তুলার ব্যবসায় করিয়াছে। তাঁতী সমিতির সংখ্যাও প্রায় ৩০০০ হইবে। এবং ইহাদের মূলধনের পরিমাণও প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

সভাসমিতি করিয়া সমবায়ের প্রচার-কার্য্যও বোম্বাই প্রদেশে খুব বেশী হইতেছে। গত বৎসর বোম্বাইয়ে ২টী নিখিল ভারতীয় সমবায় কনফারেন্স বসিয়াছিল। একটি বিভিন্ন প্রদেশের রেজিষ্ট্রারদিগের, অপরটি ভারতের বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের কনফারেন্স। ভারতে সমবায় সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা এই কনফারেন্স দুইটিতে হইয়াছিল।

ভারত সরকারের আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার তাহাদের প্রয়োজনীয় সমবায় আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারে। এ ব্যাপারেও বোম্বাই প্রদেশ ভারতের মধ্যে অগ্রণী, কারণ কেবল বোম্বাই প্রদেশে প্রাদেশিক সমবায় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যা

বিহার ও উড়িষ্যায় সমবায়ের বিস্তার বেশ ভালই হইতেছে বলা যায়। ১৯২৫-২৬ সনে প্রায় ১০০০ নূতন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু আবার ১২৩টী সমিতি লিকুইডেশ্যনেও গিয়াছে। সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ১৯২৫-২৬ সনে ছিল ৭,২২০টী, প্রাথমিক সমিতিগুলির সভ্য-সংখ্যা ১৯৮,৩৯৮ এবং মূলধন ৪,১০,২৪,০০০ টাকা। ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ৪৫,০০০ বিঘা জমি মহাজনের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ৩০,০০০ বিঘা নূতন জমি সভ্যেরা কিনিয়াছে, এবং সভ্যদিগের গবাদি পশুর সংখ্যাও প্রায় ১ লক্ষ বাড়িয়াছে। শুধু সুদ বাবদ সভ্যদিগের ৩৪,৮৬,০০০ টাকা সাড়ে তিন বৎসরে বাঁচিয়া গিয়াছে। সভ্যদিগের ঋণের পরিমাণ ২ বৎসরে ৬ লক্ষ কমিয়া ৫২ লক্ষ হইয়াছে। সমবায় সমিতিতে ছাড়া সভ্যগণের অন্য মহাজনের নিকট ধার আর নাই বলিলেই চলে। বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে বেশী খরচ না করা

এবং সালিশী দ্বারা বিবাদ মিটানোর চেষ্টাসকল ক্রমশঃ হইতেছে।

সংযুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ

সংযুক্ত প্রদেশে ১৯২৫-২৬ সনে ৬২৩৬টী সমবায় সমিতি ছিল। প্রাথমিক সমিতির সভ্যসংখ্যা ১৫৮,৭১৯ জন এবং মোট মূলধনের পরিমাণ ১,৮৮,১৬,০০০ টাকা ছিল।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ১৯২৫-২৬ সনে ৪,২৫৭টী সমবায় সমিতি ছিল। প্রাথমিক সমিতির সভ্যসংখ্যা মাত্র ৬৯,২২৩ জন। কিন্তু মোট মূলধন ৪,৩২,৯৬,০০০ টাকা।

এই ২টী প্রদেশে সমবায়-আন্দোলন তেমন জোর চলিতেছে না। অনেক সমিতির অবস্থাও সন্তোষজনক নয়; তবে যাহাতে অবস্থার উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে।

আসাম

আসাম প্রদেশে লোকসংখ্যা অল্প এবং নানা কারণে ইহা সমবায় আন্দোলনে পিছাইয়া আছে। সম্প্রতি একটু কার্য্য-কারিতা দেখা যাইতেছে। ১৯২৫-২৬ সনে সমিতির সংখ্যা ৯৪৭টী, সভ্যসংখ্যা ৪৫,৩৮৭ এবং মূলধন ৩৯,১০,০০০ টাকা ছিল। গত বৎসর একটী পাট বিক্রয় সমিতি ও একটী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিলং শহরে কয়েকটী সমবায় ভাণ্ডার চলিতেছে; কিন্তু প্রায় সবগুলিরই অবস্থা আশাপ্রদ নয়। সমবায় সমিতিগুলি আসামে গ্রাম্য রাস্তা নির্ম্মাণ, কালাজ্বরের ঔষধ বিতরণ, উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান ইত্যাদি কার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছে।

বার্ম্মা

বার্ম্মা প্রদেশে ১৯২৫-২৬ সনে ৫,৩৮৩টী সমবায় সমিতি ছিল। ইহাদের মূলধনের পরিমাণ ৪,৭৩,০৪,০০০৲ টাকা। প্রাথমিক সমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা ১৩৫,১৯৬ জন। গতবৎসর শহরের সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য সমিতিগুলি ভাল চলিতেছে না। গত বৎসর কয়েকটী উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

রেঙ্গুন কর্পোরেশনের চেষ্টায় রেঙ্গুনে একটী সমবায় ডেয়ারি খোলা হইয়াছে। পেগু সমবায় চাউলের কল বেশ লাভ করিতেছে এবং লিগেইং সমবায় চাউলের কল তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া ফেলিয়াছে ও তাহাদের চাউল ভাল বলিয়া বাজারে নাম করিয়াছে। মান্দালয় প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্য ভাল চলিতেছে। ইহার স্থায়ী আমানত ৭ লক্ষ বাড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানে ৯০·৫৯ লক্ষ হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্য

সমবায় আন্দোলন দেশীয় রাজ্যগুলিতেও বেশ বিস্তার-লাভ করিতেছে। ১৯২৫-২৬ সনে সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিতে ১১,১৬৬টী সমবায় সমিতি ছিল। তাহাদের সভ্য-সংখ্যা ৩৮৮,৯৩৮ জন এবং মূলধন ৪,৫৯,৭২,০০০ টাকা। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে গোয়ালিয়রে ১৯২৫-২৬ সনে ২৪৯২টী সমবায় সমিতি ছিল, মহীশূর হায়দ্রাবাদ কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ১ হাজারের বেশী করিয়া সমবায় সমিতি ছিল। সমিতিগুলির মোট মূলধন গোয়ালিয়রে ৫০,৬৯,০০০৲। হায়দ্রাবাদে সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন প্রায় দেড় কোটি। মহীশূর, কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সমবায় সমিতি-গুলির মূলধন যথাক্রমে ৯৮,৬৩,০০০৲, ৪৮,২৮০০০৲ এবং ২৩৮০০০০৲ টাকা। বড়োদার সমিতির সংখ্যা ৭৩১টী এবং মূলধনের পরিমাণ ৩৭৯৮০০০৲ টাকা।

সমবায় সমিতিগুলির সভ্য-সংখ্যা ত্রিবাঙ্কুরে ১১৪,০২৫ জন, মহীশূরে ৯২,৯৩১ জন হায়দ্রাবাদে ৪৭,৬২৩ জন, গোয়ালিয়রে ৪৩,১৭৭ এবং কাশ্মীরে ৩০,৭৯৫।

গড় হিসাব

সমগ্র বৃটিশ ভারতে মোট ২৪ কোটি ৫২ লক্ষ লোকের বাস। ইহাদের জন্য মোট ৬৯,০১৬টী সমিতি আছে অর্থাৎ গড়ে ১ লক্ষ লোকের জন্য ২৮.১টী। দেশীয় রাজ্যে মোট ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ লোকের মধ্যে ১১,১৬৬টী অর্থাৎ প্রতি

লক্ষ লোকের জন্য ৩২.৯টী সমিতি আছে। দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশ ভারত অপেক্ষা অগ্রসর। এইরূপ বৃটিশ ভারতে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ১০.৯ জন সমবায় সমিতির সভ্য। এ হিসাবেও বৃটিশ ভারত পশ্চাতে পড়িয়া আছে। মূলধন বৃটিশ ভারতে মোট ৫৩,০০৬৭,০০০৲ টাকা বা গড়ে মাথা পিছু ৩৫ আনা। দেশীয় রাজ্যে মোট মূলধন ৪,৫৯,৭২,০০০৲ টাকা অর্থাৎ মাথা পিছু ২২ আনা। এ হিসাবে বৃটিশ ভারত অগ্রসর বটে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে অল্পদিন। সুতরাং বেশী মূলধন জমাইবার সময় পায় নাই।

শিক্ষিত লোকের অবহেলা

সমবায় যে এদেশে আরও বেশী বিস্তার লাভ করিতেছে না, তার একটা প্রধান কারণ দেশের শিক্ষিত লোকে, এমন কি যাঁরা অর্থনীতি নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁদেরও অনেকে, সমবায়ের উপকারিতা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁরা এ বিষয়ে প্রায় উদাসীন। সমবায়ের যা কিছু প্রসার তা প্রায়ই সরকারী কর্ম্মচারীদের উৎসাহে ও চেষ্টায়। অনেকে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিয়া 'ওট সরকারী জিনিষ' বলিয়া একদম উপেক্ষা করিয়া থাকেন যার উপর দেশের আর্থিক উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তার সঙ্গে অসহযোগ করিয়া থাকা নিতান্তই অবিবেচনার পরিচায়ক। আশার কথা এই যে, আজকাল কেহ কেহ এবিষয়ে মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং নানা নূতন দিকে সমবায়ের প্রসার দেখা যাইতেছে। দেশ যেমন গরিব তাতে দেশের আর্থিক জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে দেশের সার্ব্বজনীন উন্নতি করিতে হইলে—"রাই কুড়িয়ে বেল" করা ছাড়া অন্য সহজ উপায় নাই। এরূপে দেশের আর্থিক ভিত্তি পাকা করিতে সমবায়ের মত ব্যাপক অথচ কার্য্যকর প্রতিষ্ঠান আর কোনটীই নয়। প্রথমেই দরকার শিক্ষিত লোকদের নিজেদের এই আন্দোলনের উপকারিতা বোঝা। তার পরে দরকার যারা অশিক্ষিত, যাদের এ সকল কথা জানিবার তেমন সুযোগ সুবিধা বা ক্ষমতা নাই, তাদের বোঝানো ও নানা ভাবের সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করা। তবেই সমবায়ের সুফল লাভ হইবে এবং দেশ উন্নতির পথে চলিতে থাকিবে।



দুনিয়ার ধনদৌলত

জার্ম্মাণির জাহাজশিল্প

যুদ্ধের পরবর্ত্তী শিল্পজীবনে জার্ম্মাণির জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যবসার (শিপিং ইণ্ডাষ্ট্রী) অভ্যুদয়ই সবচাইতে বেশী উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার। যুদ্ধ ও শান্তি দুইয়ের ফলেই জার্ম্মাণির জাহাজশিল্প ধ্বংস হইয়া যায়। জার্ম্মাণির রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য যাহাতে বিদেশী জাহাজের পরোয়া করিতে না হয় সেইজন্য ১৯২০ সন হইতে জার্ম্মাণিতে জাহাজ গড়িবার আয়োজন অল্পবিস্তর চলিতে থাকে। যুদ্ধ ও শান্তির পরে বিধ্বস্ত জার্ম্মাণি এই কয়েক বৎসরে যাহা এই বিভাগে সম্পন্ন করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য্য-জনক। জার্ম্মাণির বিশেষ মনীষা ও কার্য্যক্ষমতাই ইহার মূলে।

গত বৎসর হ্যামবুর্গ-আমেরিকান লাইনে (ইহা সাধারণতঃ হ্যাপাগ নামে পরিচিত) মোট ৫২০,০০০ টনের জাহাজ ছিল। এই সনে আরও নূতন জাহাজ প্রস্তুত করায় ইহার টনেজ একেবারে ডবল দাঁড়াইয়াছে। জাহাজ শিল্পে ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। কোম্পানী আরও ১৫০,০০০ টনেজের ২০ খানি জাহাজ প্রস্তুতের মোসাবিদা করিয়াছে। মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত হইলে হ্যাপাগ জগতের অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ কোম্পানীর সমকক্ষ হইতে পারিবে।

জার্ম্মাণির জাহাজ-শিল্পের এই উন্নতি সাধন করিতে বিদেশী পুঁজির কোন সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। সম্পূর্ণ স্বদেশী পুঁজি এই কাজে খাটিয়াছে। উল্লিখিত জার্ম্মাণ জাহাজ কোম্পানীটির (হ্যাপাগ) মূলধন ১৫০ লক্ষ মার্ক হইতে ১৬ কোটি মার্কে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার অংশ বাজারে অনায়াসে বিক্রয় হয়। গত সনের আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণ সামুদ্রিক জাহাজের মোট টনেজ ছিল ৩০ লক্ষের উপর। বর্ত্তমানে উহা ৩৫ লক্ষ হইয়াছে। ১৯১৪ সনের তুলনায় বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির জাহাজ-শিল্পে শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

হলাণ্ডে সমুদ্র হইতে জমি উদ্ধার

দুনিয়ার অনেক দেশ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বা দেশ জয় করিয়া তাহাদের সীমানা বৃদ্ধি করিয়াছে; কিন্তু হলাণ্ড ছাড়া নিজের দেশে আর কেহ সাগরের কোল হইতে সীমানা ছিনাইয়া লয় নাই। হলাণ্ড নদী-মাতৃক দেশ! ইহার অনেকস্থান সমুদ্র হইতে কাড়িয়া লওয়া। ঐ ভূভাগকে রক্ষা করিবার জন্য হলাণ্ডে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর আছে। হলাণ্ডে জুইডারজি নামক একটা উপসাগর আছে। ইহা উত্তর সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। বর্ত্তমানে ফ্রিজল্যাণ্ড ও উত্তর হল্যাণ্ডের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া জুইডার-জিকে একটা হ্রদে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বাঁধের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এই বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে ৩০ মাইল লম্বা এক প্রাচীর সমুদ্র হইতে চির-দিনের তরে জুইডারজিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে। ইহার ফলে হাজার বর্গমাইল সুজলা সুফলা চাষের জমি বাহির হইবে। চারিদিক্ হইতে জুইডারজিকে ভরাট করিয়া হ্রদটি সম্পূর্ণ করিয়া আনা হইবে এবং ক্রমে ক্রমে হলাণ্ডে বিস্তর আবাদের জমি বাহির হইবে। উহা একটি স্বচ্ছ হ্রদে পরিণত হইবে এবং রাইন নদীর সঙ্গে ইহার যোগাযোগ থাকিবে।

২৫ জন ডাচ এঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে জুইডারজি উদ্ধারের কাজ চলিতেছে। ইঁহাদের অধীনে হাজার মজুর খাটিতেছে। দুইটি ছোট বাঁধ, যাহাদ্বারা জুইডারজির উৎপত্তিস্থান বাঁধিয়া ফেলা হইবে, তাহার একটি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জুইডারজির উৎপত্তি স্থানে একটি বড় ডকও প্রস্তুত হইয়াছে। জুইডারজি উদ্ধারের কাজে যেসকল জাহাজ, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলির আড্ডা হইয়াছে ঐ ডকে।

বাঁধের বহির্ভাগ একরূপ প্রস্তরে মোড়ক করা হইতেছে। এই প্রস্তররাশি বেলজিয়াম ও জার্ম্মাণি হইতে বার্জ্জ নামক একপ্রকার ভারি মালবাহী নৌকায় আনা হইতেছে। বিদেশ হইতে এই প্রস্তর ক্রয় ও আনয়নের খরচ ২০ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে।

জুইডারজির চারিদিক্ বাঁধিয়া জমি-উদ্ধার করিতে মোট অনুমান ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। কিন্তু ইহার ফলে যে অভাবনীয় সুবিধা ভোগ করা যাইবে তাহার তুলনায় এ খরচ নগণ্য। জুইডারজি উদ্ধারের ফলে কমসে কম ১½ কোটি পাউণ্ড লাভ হইবে। তাহা ছাড়া উত্তর অঞ্চলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়া যাইবে। হ্রদের উৎকৃষ্ট জল পান করিয়া গবাদিও সুমিষ্ট দুগ্ধ দান করিবে। জাহাজ কোম্পানী হইতেও অনেক টাকা আসিবে। আর্থিক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে এই প্রচেষ্টা খুবই লাভজনক বলিতে হইবে।

দশ হাজার বৃটিশ পিয়ানো রপ্তানি

বৃটিশ পিয়ানো রপ্তানির হিসাব এইরূপ :—

১৯২১	...	১,৫৩৮
১৯২২	...	২,৪৪১
১৯২৩	...	৬,৪৬৫
১৯২৪	...	৬,৫২৩
১৯২৫	...	৭,০২৩
১৯২৬	...	১০,০০০

১৯২৭ সনের প্রথম ৪ মাসে রপ্তানি হইয়াছে ৩,৩৫৫ পিয়ানো, দাম ৬৭,৭৬৪ পাউণ্ড। ১৯২৬ সনের প্রথম ৪ মাসে রপ্তানির সংখ্যা ছিল ১,৮৬৯, দাম ৯৩,৪২১ পাউণ্ড।

মনে রাখিতে হইবে দশ হাজার পিয়ানো রপ্তানির অর্থ ১০,০০০ নূতন পিয়ানো বিক্রয় নয়। নূতন পিয়ানো বিক্রয় হইয়াছে ৫,৫০০ মাত্র।

অন্য বাদ্যযন্ত্র

গ্রামোফোন ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ১৯২৭ সনের প্রথম ৪ মাসে রপ্তানি হইয়াছে ১,০৫,৫০২। দাম ৩,৯১,৭৭২ পাউণ্ড। ১৯২৬ সনের প্রথম ৪ মাসে রপ্তানির পরিমাণ ও দাম যথাক্রমে ৮৫,২৫৯ ও ২,৫৯,০১২ পাউণ্ড ছিল।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড

মোট রপ্তানি দশ হাজার পিয়ানোর মধ্যে ৫০% গিয়াছে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বাজারে। অথবা কিনার দিক্ হইতে দেখিলে এই দুই দেশের ক্রেতারা ৬৬⅔% লইয়াছে। আর অন্য সকল স্থানের ক্রেতারা একত্রে ৩৩⅓% লইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে অন্যান্য সব দেশ কম কিনিতেছে। কিন্তু এই দুই দেশের হিস্যা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

পড়্তি বাজার

হল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে, ও ফ্রান্সে বৃটিশ পিয়ানোর বাজার বিশেষভাবে পড়িয়া গিয়াছে। আগে বৎসরে গড়ে হাজার পিয়ানো এই সব স্থানে যাইত। এখন ঢের কম যায়।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ পিয়ানোর বড় বাজার অর্থাৎ ভবিষ্যতে এই দুই স্থানে অনেক হাজার পিয়ানো রপ্তানির সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ৪০০ পিয়ানো আসিত। এখন সেখানে আসিতেছে মাত্র ৬০টা। দক্ষিণ আফ্রিকা গ্রেটবৃটেনের কাছে ৮০০ পিয়ানো কিনিত। এখন মাত্র ২০০টা করিয়া কিনিতেছে।

রুশিয়ায় লোকগণনা

রুশিয়ায় ১৮৯৭ সনে এক সার্ব্বজনিক লোকগণনা হয়। ১৯১৭ সনে আংশিক লোকগণনা হয়। ১৯২০ সনে

লোকগণনার চেষ্টা ঘরোয়া যুদ্ধের দরুণ সন্তোষজনক হয় নাই। তারপর ১৯২৩ সনের নিখিল-রুশ লোকগণনায় শুধু শহরের লোকের হিসাব লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ানের উৎপাদন-শক্তিটা যাচাই করিবার জন্য ১৯২৬ সনে পুনরায় লোকগণনার দরকার হইয়া পড়ে।

এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণকে বাহাল করা হইয়াছিল:—প্রধান ১,৪৩৬ জন, উপদেষ্টা ১৫,৯৯৩, রেজিষ্ট্রার ১,৬৮,৪৫৮। খরচ পড়িয়াছে সর্ব্বমোট ৬০ লক্ষ রুবল।

১৪½ কোটির উপর রুশ

১৮৯৭ সনে বর্ত্তমান সোভিয়েট রিপাব্লিকের লোক সংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৪০ লক্ষ রুশ। ১৯১৪ সনে দাঁড়াইল ১৩ কোটি ৫৫ লক্ষ—অর্থাৎ ৩০°/০ বাড়িল।

১৯২০ সনে রুশিয়ার লোক-সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ১৫ লক্ষ। কমিবার কারণ জার্ম্মাণ যুদ্ধ ও ঘরোয়া যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও বহির্গমন। আর বর্ত্তমান লোকগণনায় পাওয়া গিয়াছে ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ। অর্থাৎ ১৮৯৭ সনের তুলনায় ৩০ বছরে ৩৮°/০ বাড়িয়াছে।

আমেরিকার বাজারে বৃটিশ আসবাব পত্র

আমেরিকার বাজারে দেদার বৃটিশ আসবাব পত্র প্রতি বৎসর গিয়া থাকে। বস্তুতঃ, আমেরিকা বিশেষ করিয়া বৃটেনের আসবাবের পক্ষপাতী।

কিন্তু ১৯২৭ সনের মে মাসের বাণিজ্য-তালিকা হইতে জানিতে পারি যে, যুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ আসবাব রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। এই বছর গত ৪।৫ মাস ধরিয়া আমেরিকাবাসীরা বৃটিশ আসবাব অনেক কম কিনিতেছে।

ফলে এ বছর জানুয়ারী হইতে মে অবধি ৫ মাসে আমেরিকায় মোট ১,৫৩,০০০ পাউণ্ডের আসবাব বিক্রী হইয়াছে। গত বৎসর এই ৫ মাসে ১,০১,০০০ পাউণ্ডের বিক্রী হইয়াছিল। অর্থাৎ ৫ মাসে বৃটেনের ক্ষতির পরিমাণ ১৮,০০০ পাউণ্ড।

উপরন্তু এ বছরের মাসিক গড়টা গত বছরের যে-কোন মাসের গড়ের নীচে রহিয়াছে। অবশ্য কয়লা ধর্ম্মঘটের সময়টা বাদ দিতে হইবে।

কানাডায় খেলনা

১৯২৪ ও ১৯২৫ সনে গ্রেটবৃটেন হইতে কানাডায় খেলনা রপ্তানির হিসাব এইরূপ:—

১৯২৪	ডজন	পাউণ্ড
ডল ও খেলনা	৬,৮৬৫	৩,৭১৮
অ-যান্ত্রিক	৫৩,১৪৩	৩৩,২১৫
অন্যবিধ	...	২৮,৯৯৮
১৯২৫		
ডল ও খেলনা	৩,৬২০	৩,৩৩১
অ-যান্ত্রিক	১৩,৮০২	২,৯১৮
অন্যবিধ	...	২৭,০৬৪

ইংরেজের প্রতিযোগী

দেখা যাইতেছে, ১৯২৫ সনে ইংরেজ প্রতিপদেই হটিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি?

১। বৃটেন হইতে রবারে তৈয়ারী খেলনা রপ্তানির পরিমাণ অত্যন্ত কম।

২। কোন কোন শ্রেণীর খেলনা-নির্ম্মাণে কানাডা নিজেই ওস্তাদ হইয়া উঠিতেছে।

৩। জার্ম্মাণি ও আমেরিকা টক্কর দিতেছে।

৪। ইংরেজের প্যাকিং প্রণালী উৎকৃষ্ট নয়।

জার্ম্মাণির খেলনা রপ্তানি

১৯২৬ সনে জার্ম্মাণির খেলনা রপ্তানি আরও কমিয়াছে। ঐ বৎসর ৩৯,৯০২ মেঃ টন রপ্তানি গিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় হ্রাসটা দামে ৫°/০ ও পরিমাণে ৭%। ১৯২৬ সনের পরিমাণ ১৯১৩ সনের চেয়ে ৩০°/০ কম।

বুঝা যাইতেছে আধুনিক সময়ে জার্ম্মাণ খেলনার দাম চড়িয়াছে। টনপ্রতি গড়পড়তা দামটা ১৯২৩ হইতে

১৯২৬ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে। রপ্তানি কমিবার ইহা একটা কারণ হইতে পারে।

ইয়োরোপ পড়্‌তি বাজার

ইয়োরোপই জার্ম্মাণির চিরকেলে শ্রেষ্ঠ খেলনার বাজার। ইয়োরোপের বাণিজ্যে অত্যন্ত মন্দা পড়িয়াছে। রপ্তানির হ্রাস ঘটিয়াছে ১৫%।

ইংল্যাণ্ডে কয়লা ধর্ম্মঘটের কথা সকলের মনে আছে। ইহার ফলে বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল। জার্ম্মাণ রপ্তানি হ্রাসের এটা একটা কারণ।

অন্য এক কারণ হইতেছে ইতালিয়ান ও ফরাসী প্রতিযোগিতা। ইতালি ও ফ্রান্স যে জার্ম্মাণির চেয়ে ভাল খেলনা তৈয়ারী করিতে পারে, তা নয়। কিন্তু ইতালি ও ফ্রান্সের মুদ্রার দর পড়িয়া যাওয়ায় সুবিধা ঘটিয়াছিল। ঐ দুই দেশ সস্তায় খেলনা বেচিয়াছে।

আমেরিকা ভূভাগে

দক্ষিণ আমেরিকায় জার্ম্মাণ খেলনা রপ্তানি ১৯২৫ সনের চেয়ে ১০% কম হইয়াছে। কিন্তু উত্তর আমেরিকা ৫% বেশী কিনিয়াছে। তন্মধ্যে কানাডায় গিয়াছে ২৯% বেশী ও যুক্তরাষ্ট্রে ৫% বেশী। অর্থাৎ দুই আমেরিকার গতি দুই দিকে।

জার্ম্মাণ খেলনার বাজার—গুণানুসারে

১৯২৬ সনে জার্ম্মাণ খেলনার প্রধান প্রধান বাজার হইতেছে নিম্নরূপ:—

১। গ্রেট বৃটেন
২। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স
৩। নেদারল্যাণ্ডস্‌
৪। কানাডা
৫। অষ্ট্রেলিয়া
৬। আর্জেন্টিনা
৭। ডেন্মার্ক
৮। ভারতবর্ষ
৯। সুইট্‌জারল্যাণ্ড

১৯২৬ সনে গ্রেট বৃটেনে গিয়াছে ১৩,৩৭৫ মেঃ টন আর যুক্তরাষ্ট্রে ১১,২১১ মেঃ টন।

থুরিঙ্গিয়ার পুতুল

আমেরিকার পুতুল চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ থুরিঙ্গিয়ার খেলনা ব্যবসায়ের খুব লাভ হইয়াছে।

১৯২৫ সনের মূল্য ১৪,৯৪,৫৪২ ডলার

১৯২৬ সনের মূল্য ২৯,৫৪,৩২৫ ডলার

অর্থাৎ প্রায় ৫০% বেশী।

এই রপ্তানির প্রায় ৬৬% ছিল ডল। থুরিঙ্গিয়ার খেলনা ব্যবসার প্রধান উপকরণই হইল পুতুল।

কিন্তু নুরেনবার্গ বিভাগে সারা ১৯২৬ সনে ব্যবসার অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। অনেক ফ্যাক্টরীতে কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দিতে হইয়াছে। ওখানে ধাতু-নির্ম্মিত খেলনাই প্রধান জিনিষ।

আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণে

খাঁটি কোন অঙ্ক পাওয়া যায় নাই, কিন্তু বেপারীরা একমত যে, জার্ম্মাণির ভিতর খেলনা-বিক্রয় ১৯২৬ সনে অনেক বাড়িয়াছে। সুতরাং জার্ম্মাণ সওদাগরেরা এই দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতেছে।

১৯২৬ সনে জার্ম্মাণির ভিতর বিদেশী খেলনার আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য সমগ্র খেলনা ব্যবসার ইহা বরাবরই একটা অকিঞ্চিৎকর অংশমাত্র ছিল। ১৯২৬ সনে মোট আমদানির পরিমাণ ৪৫৩ টন। দাম ৪,৯৮,৮১০ ডলার।

যে যে দেশ জার্ম্মাণিতে খেলনা পাঠাইতেছে গুণানুসারে তাদের নাম এইরূপ:—

১। চেকো-শ্লোভাকিয়া
২। অষ্ট্রিয়া
৩। ফ্রান্স
৪। গ্রেট বৃটেন
৫। ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স

অধিকাংশ খেলনা এই সব দেশ হইতে আসিয়াছে। গ্রেটবৃটেন মাত্র ৪১ মেঃ টন পাঠাইয়াছে। ১৯২৫ সনে

পাঠাইয়াছিল ৮০ মেঃ টন। আর চেকো-শ্লোভাকিয়া পাঠাইয়া ছিল ১৩৪ মেঃ টন।

১৯২৬ সনে মোট খেলনা আমদানির পরিমাণ ২৫% হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কতকটা জার্ম্মাণি নিশ্চয় নিজেই পূরণ করিয়াছে। সুতরাং জার্ম্মাণ রপ্তানি কমিবার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে।

কানাডায় চাষের জন্য ট্রাক্টর

উইনিপিগ্ হইতে ট্রেড্ কমিশনার জানাইতেছেন যে, মণিটোবা, সস্কোচেওয়ান ও আলবার্টাতে ৬,৫১৩টা ট্রাক্টর বিক্রী হইয়াছে। ১৯২৫ সনে ৪,০৫৩টা বেচা হইয়াছিল।

স্থানের নাম	১৯২৫	১৯২৬
সস্কোচেওয়ান	২,১৭৬	৩,৭০৪
মণিটোবা	১,০০৮	১,৪৯৮
আলবার্টা	৮৯৬	২,৩১১

যুক্তরাষ্ট্রে সু আমদানি

১৯২১ ও ১৯২৬ সনের চামড়ার বুট ও সু আমদানির হিসাব এইরূপ :—

	পুরুষ ও বালকদের হিস্যা	স্ত্রীলোকদের হিস্যা	শিশুদের হিস্যা
১৯২৫	৩৮%	৩৪%	২৮%
১৯২৬	২১%	৪৫%	৩৩%

চামড়ার বুট ও সু আমদানি মোটের উপর ১৯২৫ সনের চেয়ে ১৯২৬ সনে ৩১% বেশী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র কোথায় জুতা কিনিতেছে ?

১৯২৬ সনের হিসাব

যুক্তরাষ্ট্র কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ জুতা কিনিতেছে ? প্রধান দেশগুলির নাম :—

১। সুইট্জারল্যাণ্ড ...২,৪৮,৮৯২ জোড়া
২। জার্ম্মাণি ......২,০০,৫১৩ জোড়া
৩। যুক্তরাজ্য ....১,৮৫,৪১৬ জোড়া
৪। চেকোশ্লোভাকিয়া...১,৭৪,২৩২ জোড়া
৫। ফ্রান্স ... ১,২৫,৫৭৭ জোড়া
৬। অষ্ট্রিয়া ... ৭৩,৯৭০ জোড়া
৭। কানাডা ... ৩৬,৭৭৮ জোড়া

অষ্ট্রিয়ার জুতা আমদানি

১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসে অষ্ট্রিয়া ১৯২৫ সনের প্রথম ৯ মাসের চেয়ে ২০% বেশী সু আমদানি করিয়াছে। জার্ম্মাণি এবং চেকো শ্লোভাকিয়াই বেশীর ভাগ যোগাইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া যে সু আমদানি করিয়াছে তার ৫০% এর উপর আসিয়াছে জার্ম্মাণি হইতে। চেকো-শ্লোভাকিয়া যোগাইয়াছে প্রায় ৩০%।

বাকী ২০% যোগাইয়াছে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দেশ-গুলি—

(১) ইংল্যাণ্ড
(২) সুইট্সারল্যাণ্ড
(৩) ইতালি
(৪) যুক্তরাষ্ট্র

ইতালিতে কতকগুলি নূতন ফ্যাক্টরী জোরসে পাল্লা দিতেছে।

আফ্রিকায় রেলওয়ে পুল

পর্ত্তুগীজ্ পূর্ব্ব আফ্রিকায় বেইরা রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড পুঙ্গহ্বে নদীর উপর দিয়া এক পুল তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। এই পুলের ১½ মাইল ঠিক জলের উপর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

ইংল্যাণ্ডের ডর্ম্যান লং অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড এই পুল তৈয়ারী করিবার কন্ট্রাক্ট লইয়াছে। কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

কন্ট্রাক্টের মূল্য ১½ লক্ষ পাউণ্ড। শেষ হইতে ১৮ মাস লাগিবে।

সুইট্স্যারল্যাণ্ডের টাইল আমদানি

সাদাসিধে অথবা কারুকার্য্য করা বড় টাইল ও ফ্লাগ্ষ্টোন এবং ভিতের টাইল সুইট্স্যারল্যাণ্ড অনেক পরিমাণ ইতালি

হইতে আমদানি করে। ফ্রান্স হইতে ইতালির চেয়ে কম আসে।

সাদাসিধে অথবা কারুকার্য্য করা, গ্লেজ্ করা অথবা এনামেল করা একরঙা টাইল ও পাথর অধিকাংশ নিম্নলিখিত দেশগুলি যোগাইয়া থাকে।

প্রথম জার্ম্মাণি। তারপর ফ্রান্স। তারপর চেকো-শ্লোভাকিয়া। তারপর বেলজিয়াম।

নানা রঙের টাইল ও পাথর প্রায় সবটাই জার্ম্মাণি হইতে আসে।

জার্ম্মাণি, ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্স হইতে সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড ইট্, নল, টাইল ইত্যাদি আনায়; কিন্তু স্বদেশেও এসব দ্রব্য নির্ম্মাণ-ক্ষমতার উন্নতি লাভ করিতেছে। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু লুইস টাইল রপ্তানি করিতে পারিয়াছে।

সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের প্রধান রপ্তানিদার জার্ম্মাণি। ফ্রান্স পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণ রপ্তানি হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। মাটির বাসন সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডে তৈয়ারী হয়। কিন্তু চীনা মাটির বাসন দেদার আমদানি হয়। জার্ম্মাণিই প্রধান বেপারী। দ্বিতীয় ফ্রান্স। তৃতীয় চেকো-শ্লোভাকিয়া।

গুতেমালায় সড়ক তৈয়ারী

গুতেমালার (দক্ষিণ আমেরিকা) গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, সড়ক তৈয়ারী কাজটা তেজের সহিত চালাইতে হইবে। পুরাণা সড়কগুলিরও সংস্কার করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার যন্ত্রপাতিকে বিনা শুল্কে ঢুকিতে দেওয়া হইবে। ক্রাশার, ট্রাক্টর, রোলার, ড্রেজ, স্ক্যারিফায়ার, লেভেলার গ্রেভার, স্ক্রেপার ও জলের গাড়াও এই সব যন্ত্রপাতির অন্তর্গত।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য

	আমদানি	রপ্তানি
১৯২৪	২,৪৪,৩২,৬৪২ পাউণ্ড	২,৫৭,৫৪,৫০৪ পাউণ্ড
১৯২৫	২,৮৫,৯৮,৪৪৫ ,,	২,৮৮,৭৮,২৩৮ ,,
১৯২৬	২,৯৩,২৪,৩৫২ ,,	২,৯১,৮৮,০৮৩ ,,

শুধু এই দামের দিকে চাহিয়া হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব করিতে গেলে ভুল হইবে। কারণ ইতিমধ্যে আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের দর নামিয়া গিয়াছে। "ইন্‌ডেক্স নাম্বারে" বা "নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায়" এই হিসাব নিম্নরূপ দাঁড়াইবে :—

১৯১৩ দর = ১০০

	আমদানি	রপ্তানি
১৯২৪	৯৫৮	১,০৯০
১৯২৫	১,০৫২	১,১১১
১৯২৬	৯৮৪	১,০৯২

আমদানির প্রকৃতি

১৯২৬ সনের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যগুলি এই :—

১। কয়লা ও কোক্ ৫,৬৬,৯৩০ টন। কয়লা ধর্ম্মঘটের দরুণ ১৯২৫ সনের তুলনায় কয়লা অনেক কম আসিয়াছে। রেলেও কাঠ পোড়ান হইয়াছে।

১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসে আসিয়াছে ১,১৮,৩৪৮ টন

১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসে ,, ৩৬,৫৫১ ,,

গত শীতকালে হেল্‌সিংফোরসে যাওয়াআসা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে নাই বলিয়া ১৯২৭ সনের আমদানি এতটা বাড়িতে পাইয়াছে।

২। অ-পেষা রাই সরিষা ... ১,৪৮,৯৫৮ টন
রাই ময়দা ... ৫,৭০৪ ,,

গত ২ বছরে ফসল ভাল হইয়াছে। তাই রাই সরিষার আমদানি ক্রমাগত কমিয়া গিয়াছে। গত ১৯১৩ সনে অ-পেষা রাই আসিয়াছিল ৬৫,৬১০ টন। কিন্তু মোট রাই ময়দা ১,৯৬,০৬০ টন আসিয়াছিল। অর্থাৎ ১৩ বছর পরে ফিন্‌ল্যাণ্ডের অবস্থা উল্‌টিয়া গিয়াছে।

বুঝিতে হইবে ফিন্‌ল্যাণ্ড নিজেই রাই পিষিতেছে। সেজন্য অনেক কলকারখানাও মোতায়েন হইয়াছে।

৩। অ-পেষা গম ...৯৮৫ টন
গমের আটা ও গ্রোট্ ৮৭,১৪৫ ,,

১৯২৭ সনের প্রথম ৪ মাসে রাই কম আসিয়াছে। কিন্তু গমের আমদানি ৭,৪০০ টন বাড়িয়াছে।

৪। চাউল ও ধান ... ১৫,২৮৬ টন

উপনিবেশ হইতে—

১। চিনি ... ৩৩,৯৮৬ টন

২। কফি ... ১৩,২৩০ ,,

১৯২৫ সনে চিনি ও কফির আমদানি যথাক্রমে ১,১১,০২৯ টন ও ১৮,৯২০ টন ছিল। ১৯২৬ সন হইতে এই দুই দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়াছে। সেজন্য ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে আমদানি খুব বেশী আসিয়াছিল আর ১৯২৬ সনে কমিয়া যায়। ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসে ১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসের চেয়ে এই দ্রব্য দুইটি ৩ গুণ বেশী আমদানি হইয়াছে।

৩। কাঁচা তামাক ... ২,৯৭৪ টন

৪। "ফার্টিলাইজার" ... ১,৭২,১২৪ ,,

১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসে এই দ্রব্য ১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসের চেয়ে ৩ গুণ বেশী আসিয়াছে।

৫। "ব্র্যান" ৭২,৯৬২ টন

৬। তেলের খইল ২০,৯৩৪ ,,

৭। পিগ্ আয়রণ ২০,০২৩ ,,

৮। সিমেণ্ট ৪৭,২৯৫ ,,

১৯২৬ সনে পিগ্ আয়রণের আমদানি বাড়িয়াছে এবং ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাস ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ধাতব ব্যবসায়ে উন্নতি হইতেছে।

সিমেণ্ট লাগে বাড়ীঘর তৈয়ারী করিতে। ফিন্ল্যাণ্ড স্বদেশে উৎপন্ন গোটা সিমেণ্ট ত খরচ করিয়াছেই। অধিকন্তু ১৯২৫ সনের তুলনায় ১৯২৬ সনে ৩ গুণ বেশী সিমেণ্ট আমদানি করিয়াছে। অর্থাৎ ফিন্ল্যাণ্ডে চট্‌পট্ বাড়ীঘর গড়িয়া উঠিতেছে।

৯। চাষের যন্ত্রপাতি ২,৫৭৩ টন

১০। খনিজ তেল ১৮,৫৯০ ,,

১১। কাঁচা তুলা ৮,৭৮৮ ,,

১২। পশম ১,১৮৪ ,,

১৩। ট্যান না করা হাইড্ ৫,০৩২ ,,

১৪। ট্যান্ করা হাইড্ ৫৩৮ ,,

১৫। হেরিং, সল্ট ৬,৪৪৩ ,,

১৬। মোটর কার ৫,১৫৫ খানা

ফিন্ল্যাণ্ডে মোটর গাড়ীর রেওয়াজ

গত ৫ বছর ধরিয়া ফিন্ল্যাণ্ডে মোটর গাড়ীর রেওয়াজ খুব বাড়িয়াছে। হিসাব এই :—

সন	গাড়ীর সংখ্যা	দাম
১৯২২	৩৬৬	৮৩,৪২০ পাউণ্ড
১৯২৩	১,৩০৯	১,৫৬,৯৯৫ ,,
১৯২৪	২,১২১	২,৬২,১৭৬ ,,
১৯২৫	৪,১৭২	৫,১৪,৫০৮ ,,
১৯২৬	৫,১৫৫	৭,৩৯,৮৯৬ ,,

মোটর গাড়ী আমদানি এখনও ক্রমাগত বাড়িতেছে। ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসে ৭০১। দাম ১,৪১,৪৫১ পাউণ্ড। আর ১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসে ৫৬০। দাম ৮১,৩৪৭ পাউণ্ড।

১৯২৫ সনে একখানা মোটর গাড়ীর দাম গড়ে ছিল ১২৩ পাউণ্ড। আর ১৯২৬ সনে উহা দাঁড়াইয়াছে ১৪৩ পাউণ্ড।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মোটর সাইকেলের আমদানি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে :—

সন	সংখ্যা	দাম
১৯২২	৩৫৪	১৫,০২৬ পাউণ্ড
১৯২৩	১,৭০৮	৪১,৪৫১ ,,
১৯২৪	৯৬৫	৩৩,৬৭৯ ,,
১৯২৫	৬৮৮	২১,২৪৩ ,,
১৯২৬	৫৪৫	২০,২০৭ ,,

ফিন্ল্যাণ্ডের রপ্তানি

ফিন্ল্যাণ্ডের বন-বিভাগ বেশ সম্পন্ন। ১৯২৬ সনে না চেরা কাঠের রপ্তানি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

না চেরা কাঠের মধ্যে কাগজের মণ্ডের কাঠ রপ্তানি ঢের বাড়িয়াছে—সমগ্রের ৫০% এর উপর হইয়াছে। কিন্তু খনির উপযোগী কাঠ ঠিক ঐরূপ কমিয়া গিয়াছে।

চেরা কাঠের মধ্যে ১৯২৬ সনে "ডীল" রপ্তানি কমিয়াছে কিন্তু "ব্যাটেন" রপ্তানি বেশ বাড়িয়াছে।

বোর্ডের, বিশেষতঃ প্লেন করা বোর্ডের, রপ্তানি ১৯২৫ সনের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

১৯২৭ সনের ১লা মে তারিখের মধ্যে পৌণে ৯ লক্ষ ষ্ট্যাণ্ডার্ড অথবা ১৯২৭ সনের উৎপন্ন চেরা মালের ৭৫°/。 বিক্রী হইয়া গিয়াছে।

কাগজ রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। কারণ রুশিয়া মাত্র শেষ ৩ মাসে কাগজ কিনিতে আরম্ভ করে। কয়লা ধর্ম্ম-ঘটের দরুণ ইংল্যাণ্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রে কাগজ কম বিক্রী হইয়াছে। এ ছাড়া কানাডিয়ান্ কাগজ আসিয়া ফিনিশ কাগজের সঙ্গে টক্কর দিতেছে। তবু হ্রাসটা সামান্য।

রাসায়নিক পাল্প্ (কাগজের মণ্ড) বাড়িয়াছে। ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসেও এই বৃদ্ধিটা বজায় আছে। কাগজের মণ্ড রপ্তানি ১৯২৬ সনে প্রায় ১৯২৫ সনের মতই হইয়াছে। কিন্তু ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসে ভিজা ও শুক্না দুই রকম মণ্ডই কম রপ্তানি হইয়াছে। অর্থাৎ ফিন্ল্যাণ্ডে কাগজের প্রয়োজন বাড়িয়াছে।

১৯২৬ সনে পাল্প বোর্ডের রপ্তানি কমিতে থাকে। কিন্তু ১৯২৭ সনে উন্নতি দেখা যাইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ "প্লাই উডের" রপ্তানি ক্রমাগত বাড়িতেছে। ১৯২৭ সনে ৫০ হাজার টনের উপর হইয়াছে।

১৯২৬ সনে ১৯২৫ সনের চেয়ে বেশী মাখন রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৬ সনে "চীজ" রপ্তানি প্রায় হাজার টন হ্রাস পাইয়াছে।

কয়েক বৎসর যাবৎ দিয়াশলাই রপ্তানি ক্রমাগত বাড়িতেছে! সুইডিস্ ম্যাচ ট্রাষ্ট এখন ফিন্ল্যাণ্ডের ৬টা দিয়াশলাইয়ের কারখানা দখল করিয়া বসিয়া আছে। ৫টা মাত্র ট্রাষ্টের বাহিরে আছে। কিন্তু ট্রাষ্ট এই ৫টার সহিতও রপ্তানি এবং স্বদেশে বেচিবার দর সম্বন্ধে চুক্তি করিয়া লইয়াছে।

হাইড্ বেশ রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু ১৯২৬ সনের রপ্তানির মূল্য ১৯২৫ সনের চেয়ে কম। অর্থাৎ দর নামিয়াছে।

"ফারে"র রপ্তানির ৫০°/。 বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানি হয় প্রধানতঃ কাঠ বিড়াল, খরগোস, শিয়াল ও ভেড়ার "ফার"।

ফ্রান্সের রপ্তানি দ্রব্য

১৯২৫ সনে ফ্রান্স হইতে যত মূল্যের শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে তার ৪১·৪% পাওয়া গিয়াছে বয়ন শিল্পের বাণিজ্য হইতে। দামের দিকে চাহিয়া রপ্তানিগুলিকে পর পর সাজাইলে এইরূপ হইবে :—

১। রেশম
২। লিনেন
৩। ড্রেপারি
৪। তৈয়ারী ঢাক্না বা কাপড়
৫। তুলার জিনিস
৬। পশমের জিনিস

১৯২৪ সনে ফরাসী তুলার রপ্তানি বাণিজ্য অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৯২৫ সনে ততদূর সৌভাগ্য হয় নাই।

ফরাসী রেশম ব্যবসা গত ২০ বৎসর যাবৎ অব্যাহত ভাবে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে। যুদ্ধের সময় রেশম ক্ষেতের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। যুদ্ধকালে (১৯১৫-১৮) এ ব্যবসার ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, যুদ্ধের পূর্ব্বকার ৫ বছরের (১৯০৯-১৩) গড়টা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। ১৯২৫ সনে ১৯২৪ সনের অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধিকে হার মানিতে হইয়াছে। তাই লিঁঅঁয় রেশম বেপারীদের সঙ্ঘের সভাপতি বলিতেছেন, "এত রেশম আর কোনদিন উৎপাদিত হয় নাই। এত রেশমও আর কোনদিন বেচা হয় নাই। ১৯২৪ সনের চেয়ে ১৯২৫ সনের রেশম ওজনে ১০% ও মূল্যে ১৬·৫°/。 শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন ফরাসী লেসের প্রধান খরিদ্দার। ১৯২৫ সনে গ্রেট বৃটেনে ৩ টন রেশম টুলে রপ্তানি গিয়াছে। ১৯২৪ ও ১৯২৩ সনে ইহার ৩ গুণেরও বেশী গিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯২৩ সনে...১২০ টন
১৯২৪ সনে... ৯২ „
১৯২৫ সনে... ৪১ „



ভারতীয় খালাসী সম্মেলন

কলিকাতায় সি-মেন্স ইউনিয়ানের মধ্যে একটা নেতৃত্বের বিরোধ অনেক দিন থেকে চলছিল। এ বিরোধের ফলে মিঃ আফতাব আলীর প্রচেষ্টায় "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সি-মেন্স ইউনিয়ান" নামক একটী পৃথক ইউনিয়ান গঠিত হয়েছিল। সম্প্রতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে নূতন ইউনিয়ানটী পুনরায় পুরাতনের সহিত এক হয়ে গেছে। মিঃ দাউদ জেনার‍্যাল সেক্রেটারী ছিলেন, এবারে চেয়ারম্যান হলেন। আর জেনার‍্যাল সেক্রেটারী হলেন মিঃ আবদুল মতীন চৌধুরী, বি-এল, এম, এল, এ। মিঃ মুজাম্মিল আলী ও মিঃ আফতাব আলী সহকারী জেনার‍্যাল সেক্রেটারী মনোনীত হয়েছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব ইউনিয়ানের মুরুব্বি থাকবেন।

(গণবাণী)

নিখিল ভারত প্রেস কর্ম্মচারী সম্মেলন

কলিকাতা টাউনহলে উক্ত সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সৈয়দ মহম্মদ পাদসা সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের অভিভাষণের সারমর্ম্ম এই যে, এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য—মালিকগণের নিকট হইতে লাভের অংশ অধিক পরিমাণে আদায় করা। আমরা চাই অধিক বেতন, অল্প কাজ; পরের কাজ করা অপমানজনক নয়। বেতন লইয়া কাজ করাকেই দাসত্ব করা বলা চলে না। মালিক ও শ্রমিকদিগের যদি দায়িত্ববোধ থাকে তাহা হইলে সমস্ত কার্য্যই সুন্দররূপে চলিয়া যায়।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের সারমর্ম্ম :—বিলাতের শ্রমিকদিগের ক্ষমতার তুলনায় ভারতের শ্রমিকদিগের ক্ষমতা অতি কম। সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া প্রেস কর্ম্মচারীদিগের অভাব অভিযোগ ক্রমে ক্রমে দূর করিতে হইবে।

দ্বিতীয় দিনে, বাণিজ্যসংক্রান্ত শ্রমিকদিগের মধ্যে ঐক্যের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া জগতের নানাস্থানের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন বিষয়ে এবং আরও কয়েকটী বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিদেশী কোম্পানীর দান

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর কেরোসিন তেলের কারবার ব্রহ্মদেশে ও ভারতবর্ষে সুবিখ্যাত। এই শ্বেতাঙ্গ বণিকসঙ্ঘ এদেশে আসিয়া কত টাকাই যে উপার্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এদেশ হইতে টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া গিয়া স্বদেশে স্বদেশবাসীর হিতের জন্য তাহা ব্যয় করাই শ্বেতাঙ্গ বণিক-সম্প্রদায়ের এক রকম প্রথা। কিন্তু এই বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী সম্প্রতি একটি কার্য্যে ইহার অন্যথার পরিচয় দিয়াছেন। রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ,—সেখানে একটি মাইনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য এই বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এক লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। আজকাল এক লক্ষ পাউণ্ডের মূল্য অনুমান ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। ইহাতে একটি ভাল রকমের খনিবিদ্যা-শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। সুতরাং বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর দান নিশ্চিতই প্রশংসার্হ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতকাল

হইতে বড় বড় বিদেশী বণিকসঙ্ঘ ব্যবসায় করিয়া কত অর্থই উপার্জ্জন করিতেছেন; তাঁহারা যদি শুধু শোষণ না করিয়া পোষণের জন্য এদেশে এমনই ভাবে কিছু কিছু ব্যয় করেন, তাহা হইলে কি তাহা তাঁহাদের দেশে লোকহিতকর অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইবে না? শুধু বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী নহে, অনেক বিদেশী কোম্পানী এদেশ হইতে ক্রোর ক্রোর টাকা পকেটস্থ করিতেছেন, তাঁহাদের বদ্ধ মুষ্টি কি এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যে খুলিবে না? (বঙ্গবাসী)

বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের ধানভাঙ্গা কল

গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক একটী হাতে চালান ধানভাঙ্গা কল প্রস্তুত হইয়াছে; ইহার কার্য্যকারিতা গ্রাম্য প্রচলিত ঢেঁকির কার্য্যের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ।

এই কলে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া মোটামুটি এই-রূপ ফল পাওয়া গিয়াছে—

১। পনের মিনিটে ইহাতে প্রায় দেড় সের ধান ভাঙ্গা যায় এবং তাহা হইতে এক সের আন্দাজ চাউল পাওয়া যায়।

২। এক পোয়া চাউল হইতে ১৩৩টী ভাঙ্গ্‌টা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ৭৮টী দানার দুই মুখ মাত্র ঈষৎ ভাঙ্গা এবং বাকী ৫৫টী দানা দু'আধখান হইয়া ভাঙ্গা। ইহাতে ক্ষুদের পরিমাণ নাই বলিলেই চলে। অপরতঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ৩০ সের ঢেঁকি ভাঙ্গা চাউলে এক সের হইতে তিন সের পর্য্যন্ত চাউল ভাঙ্গটা অবস্থায় পাওয়া যায়।

৩। এই কলে কেবল মাত্র একটী লোকের দ্বারা এক ঘণ্টায় ছয় সের পর্য্যন্ত চাউল পাওয়া যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় ধরিলেও এই কল হইতে ঘণ্টায় গড়-পড়তা চার সের হিসাবে চাউল পাওয়া যায়।

কিন্তু ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গিতে হইলে অন্ততঃ তিনজন লোকের আবশ্যক এবং মাত্র ৩০ সের চাউল তাহারা চার ঘণ্টা যাবৎ একত্র পরিশ্রম করিলে প্রস্তুত করিতে পারে।

শহরে দুগ্ধ সরবরাহ

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহে এক সভায় ভারতের গো-পালন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মিঃ উইলিয়াম স্মিথ বড় বড় শহরে দুগ্ধ-সরবরাহ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গো-পালন বিষয়ে জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ না করিবেন ততদিন এ সমস্যার সমাধান হইবে না। কলিকাতার ব্যবসায়িগণ তুলা, চিনি, কয়লা ও অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় দুগ্ধ-ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। ভারতে লণ্ডন অপেক্ষাও উচ্চ মূল্যে দুগ্ধ বিক্রয় হয়। সঙ্ঘবদ্ধতা নাই বলিয়া এদেশে দুগ্ধের ব্যবসা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। দূর হইতে অবিকৃত অবস্থায় দুগ্ধ আনা যাইতে পারে কিনা, এবিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। গোপালকগণ উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে রেলে ২৩০ মাইল দূর হইতে দুগ্ধ অবিকৃত অবস্থায় আনয়ন করা যাইতে পারে। শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। সমবায় দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি প্রত্যহ ১০ হাজার পাউণ্ড দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার দ্বারা গো-পালকগণ লাভের সমস্ত অংশ পাইতেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে তাহারা এই ব্যবসায়ে আরও আগ্রহ দেখাইবেন। ঢাকা ও অন্যান্য স্থানেও সমবায় দুগ্ধ সরবরাহ সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইবে, এবং প্রত্যেক জিলায় দুগ্ধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কেন্দ্র খোলা হইবে। এখন দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য।

(ঢাকাপ্রকাশ)

কুটীরশিল্পে গবর্মেণ্ট

বঙ্গের মন্ত্রী মিঃ গজনবী ঢাকায় গিয়া গত ২৭শে জুলাই এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গের কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্গের শিল্পকলার, বিশেষতঃ কুটীরশিল্পের উন্নতিসাধন-পক্ষে শিল্পবিভাগ যথাসাধ্য যত্ন করিতেছেন। সরকারী

শিল্প বিভাগের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্র সম্প্রতি শাঁখ কাটার যে যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে ঢাকার শাঁখার কারবারের অশেষ উন্নতি সাধিত হইবে।”

মন্ত্রীর এই কথাগুলির অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, গবর্মেণ্ট বঙ্গের কুটীরশিল্পের সাহায্যের জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছেন তাহার কোন হিসাবই ইহাতে নাই; আছে কেবল একজন এঞ্জিনিয়ারের একটি যন্ত্র আবিষ্কারের কথা। কিন্তু ঢাকার এই সুপ্রসিদ্ধ শাঁখের কারবারের উন্নতি কি এতদিন যন্ত্রের জন্য আটকাইয়া ছিল? ঢাকার এই শাঁখের ব্যবসায় এককালে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল; কিন্তু তখন এই সব আধুনিক কালোপযোগী যন্ত্রাদির আবিষ্কার হয় নাই। মন্ত্রী যদি মনে করেন যে, যন্ত্র আবিষ্কার করিলেই এই সুপ্রসিদ্ধ শঙ্খশিল্পের যথেষ্ট সাহায্য করা হইল, তবে খুবই ভুল করা হইবে। পূর্ব্বে শঙ্খ সংগ্রহের যেরূপ সুবিধা ছিল এখন আর তাহা নাই। ইতিপূর্ব্বে ঢাকার শঙ্খ ব্যবসায়ীরা একবার তাঁহাদের অসুবিধার কথা গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহার কোন প্রতিবিধান করিয়াছেন কি? বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে শঙ্খ সংগ্রহের সুবিধা হইলে এবং তাহা হইতে তৈয়ারী দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয়ের সুবিধা পাইলে, এই ব্যবসায় আবার সহজেই ফালাও হইয়া উঠিতে পারে। মন্ত্রী মিঃ গজনবী তাহার কিছু উপায় করিতে পারেন কি? এই ভাবেই ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য মন্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—“কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব, তাহা গবর্মেণ্ট করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।” শুধু কথার কারচুপিতে কিছু হইবে না, কুটীরশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে বক্তৃতা ছাড়িয়া কাজে হাত দিতে হইবে। (বঙ্গবাসী)

প্যারিসে শ্রমিক মহাসম্মিলনে গোলমাল

শ্রমিক সঙ্ঘগুলির আন্তর্জ্জাতিক ফেডারেশানের চতুর্থ অধিবেশন প্যারিসে ১লা আগষ্ট হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বসিয়াছিল। ফেডারেশানে নানাবিধ মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। বিলাতের পার্ল্যামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ পার্সেল ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অভিভাষণে বোলসেভিকদিগের প্রশংসা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে আপত্তি উত্থাপন করেন। সভাপতির অভিভাষণে অনেকে মনে করেন যে, তিনি রাশিয়ার শ্রমিকদিগকে ফেডারেশানে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। কার্য্যকরী সমিতির ইংরেজ সেক্রেটারী বলেন যে, কমিটীর প্রধান সেক্রেটারী মিঃ অডিডেগিষ্ট (হল্যাণ্ডের) সহকারী সভাপতি মিঃ জোহাক্সকে (ফ্রান্সের) একপত্রে লিখিয়াছেন যে, রাশিয়ার শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি যাহাতে ফেডারেশানে আসিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার ফলে মিঃ অডিডেগিষ্ট সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকেরাই রাশিয়ার শ্রমিকদিগকে ফেডারেশানে লইবার প্রধান উদ্যোগী; কিন্তু শেষদিন এই লইয়া এমন ঝগড়া হইয়াছে যে, ইয়োরোপের শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি মিঃ পার্সেল ও মিঃ ব্রমিস নামক ইংরেজ প্রতিনিধিদিগকে আফিস হইতে সরাইয়া দিয়া অন্য লোক নির্ব্বাচন করিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানে ফেডারেশানটী অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে গেল।

ফেডারেশানের কার্য্য

ফেডারেশান গত তিন বৎসর অর্থাৎ ১৯২৪-২৫—২৬ সনে কি কার্য্য করিয়াছে তাহারও একটা রিপোর্ট পাঠ করা হয়। তাহাতে দেখা যায়, ফেডারেশানের সভ্য-সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৪ সনের প্রথমে সভ্যসংখ্যা ১৬,৫৩০,০০০ জন ছিল; কিন্তু ১৯২৬ সনের প্রথমে সভ্য-সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ কমিয়া ১৩,১৩১,৮৬৭ জন দাঁড়াইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনটী নূতন দেশ এই ফেডারশানে যোগ দিয়াছে—আর্জ্জেণ্টিনা ৮২,৫৭৪ জন; লিথুয়ানিয়া ১৮,৪৮৬ জন; দক্ষিণ আফ্রিকা ৬০,৬৬০ জন এবং মেমেল ১৪০১ জন। সর্ব্বসমেত ২৪টী দেশের শ্রমিকসঙ্ঘ এই ফেডারেশানের সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত দেশের শ্রমিকসঙ্ঘগুলির মোট সভ্যসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ মাত্র ৩৮% সভ্য ফেডারেশানের সহিত মিলিত যইয়াছে। বাকী ৬২% ইহার বাহিরে

রহিয়াছে। মস্কোর রেড ইণ্টারন্যাশন্যালের সহিত এই ফেডারেশানের বিবাদের ফলে কোনটাই ভাল দাঁড়াইতে পারিতেছে না বলিয়া অনেকে মনে করেন; কিন্তু এই দুই দলকে একত্র করিবার সকল চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। এবার প্যারিস সম্মিলনের ফলে উভয়ের মধ্যে মিলনের বাধা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ায় শ্রমিক-সঙ্ঘ

অষ্ট্রিয়ায় গত বৎসর শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির সভ্যসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সনে সভ্যসংখ্যা ছিল ৮০৭,৫১৫ জন, এ বৎসর দাঁড়াইয়াছে ৭৫৬,৩৯২। ইহার কারণ একদিকে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি অপর দিকে শ্রমিক সঙ্ঘগুলির নিষ্ক্রিয়তা। যা'হক তাহারা ৫৪ খানি সংবাদ পত্র চালাইয়াছে—ইহাদের মধ্যে ৪ খানি সাপ্তাহিক ২২ খানি দ্বৈমাসিক ২২ খানি মাসিক এবং বাকী কয়েক-খানি অন্যান্য প্রকার। শ্রমিক সঙ্ঘগুলি গতবৎসর বেকার-দিগকে সাহায্য করিয়াছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, অসুস্থদিগকে প্রায় ২৫০,০০০ টাকা, অক্ষমদিগকে প্রায় ৩০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য লোকদিগকে প্রায় ৫০০,০০০ টাকা অর্থাৎ মোট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। তাহাদের ১৯২৬ সনের মোট আয় প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

জাপানে শ্রমিক আন্দোলন

জাপানে ১৯২৬ সনে ৪৮৮টি উল্লেখযোগ্য সঙ্ঘ ছিল। ইহাদের সভ্যসংখ্যা ২৮৪,৭৩৯ জন। পূর্ব্ব বৎসরে যত ইউনিয়ান ছিল তাহার মধ্যে ২৫টী উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সভ্য-সংখ্যা ১৩,০০০ বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং মোটের উপর লক্ষণ ভালই বলা চলে। ইউনিয়ানগুলির মধ্যে ট্রানস্‌পোর্ট সম্বন্ধীয় ৩০টী ইউনিয়ানে ১০৭,২২৬ জন সভ্য, যন্ত্রপাতি সম্বন্ধীয় ৭৬টী ইউনিয়ানে ৯৭,০৮৬ জন সভ্য, গ্যাসের কারখানার ৯৫টী ইউনিয়ানে ১৫,৩৯৩ জন এবং রং করার কাজের ২০টী ইউনিয়ানে ১১,৭০০ জন সভ্য আছে। বাকীগুলি অন্যান্য ইউনিয়ানের অন্তর্গত।

জাপানে মে দিবস

শ্রমিকদিগের আন্তর্জ্জাতিক মে দিবসে এবার জাপানে শ্রমিকেরা বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিল। টোকিওতে প্রায় ১৫০০০ শ্রমিক সমবেত হইয়াছিল। তাহারা নিম্নলিখিত শ্লোগানগুলি ব্যবহার করিয়াছিল।

১। ৮ ঘণ্টা কার্য্যকাল স্থাপন ও নিম্নতম মজুরির পরিমাণ নির্দ্ধারণ।

২। ধর্ম্মঘট করার, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ও জমীদারের ক্ষেতের জমি (ফার্ম ল্যাণ্ড) চাষ করিবার অধিকার প্রাপ্তি।

৩। চীনের ব্যাপারে জাপানকে নিরপেক্ষ রাখা।

৪। সাময়িক শ্রমিকদিগের দুর্ঘটনা হইলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

৫। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর ফাটকাবাজী বন্ধ করা।

৬। বেকার-সমস্যার সমাধান করা।

৭। শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন হয় তাহাতে বাধা প্রদান করা।

সাকো ও ভান্‌জেটির প্রাণদণ্ড

সুদীর্ঘ ৭ বৎসর বিচারের প্রহসনের পর আমেরিকায় সাকো ও ভান্‌জেটি নামক ২ জন ইতালিয়ান অরাজতন্ত্রীর প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে। এই বিচার অন্যায় হইয়াছে বলিয়া সমস্ত জগতের শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করিয়াছে। শ্রমিকদের প্রতিবাদের ফলে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি অনেক দেশেই পুলিশের সহিত শ্রমিকদিগের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্র একেবারেই অবিচল। মেসিনগানের সাহায্যে জেল রক্ষা করিয়া জেলের চতুর্দ্দিকে আধ মাইল পর্য্যন্ত পুলিশ ও সৈনিক দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া আদর্শবাদী দুইটী জীবনের শেষ করা হইয়াছে। শ্রমিকেরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছে ও বর্ত্তমানের অসহায় অবস্থা মনে করিয়া বিফল আক্রোশে নিজেরাই জর্জ্জরিত হইতেছে। তার প্রতিধ্বনি ভারতেও শুনা যাইতেছে।

মোলাকাৎ



রেলওয়ে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের মতামত

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এ, বি, রেলের একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার। তাঁর হেড কোয়ার্টার মরিয়াণী। রেল সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তার চুম্বক নিম্নরূপ। শ্রীসুধাকান্ত দে]

প্রশ্ন—আপনাকে প্রায়ই মফঃস্বলে যেতে হয়? প্রায়ই দেখি, আপনার মালপত্র ট্রলি করে ষ্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে।

উত্তর—আমাকে মাসের মধ্যে ১৪।১৫ দিন মফঃস্বলে কাটাতে হয়।

প্রঃ—কিসের জন্য যান?

উঃ—ইন্‌স্পেকৃশনে—কাজের ইন্‌স্পেকৃশন করি। তাছাড়া বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে, যেমন অ্যাকসিডেণ্ট ইত্যাদি, খবর পাওয়া মাত্র যেতে হয়।

প্রঃ—আপনার কাজ সম্বন্ধে মোটামুটি একটু বল্লে খুসী হব।

উঃ—আমি এঞ্জিনিয়ার, এঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই আমাকে দেখতে হয়। যেমন পুল, ঘর-বাড়ী, ষ্টেশন, লাইন। রেল লাইনের খবরদারি সর্ব্বদা করতে হয়। এই সবের সম্পর্কে আফিসের কাজও যথেষ্ট আছে।

প্রঃ—আপনার এলাকাটা কতখানি?

উঃ—বড়পাথার হতে তিনসুকিয়া জংশন পর্য্যন্ত ও নাগিনী-মারা লাইন। মোট ১৫০ মাইল আন্দাজ।

প্রঃ—"অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন" বা শাসনের সুবিধার জন্য আপনাদের সমস্ত রেলওয়েটা কিরূপভাবে বিভক্ত জানতে পারি কি?

উঃ—এজেণ্ট সাহেব সকল "ডিপার্টমেণ্টে"র কর্ত্তা। তাঁর অধীনে তিনটি প্রধান "ডিপার্টমেণ্ট" আছে—এঞ্জিনি-য়ারিং, ট্রাফিক, লোকো। ষ্টোর্স ও মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টও আছে। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের এক জন করিয়া কর্ত্তা আছেন। ধরুন এঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট। এর সকল প্রকার কাজের জন্য "চীফ এঞ্জিনিয়ার" দায়ী। তারপর সমগ্র রেল-ওয়েটাকে কতকগুলি ডিষ্ট্রিক্টে বিভক্ত করা হয়েছে ও এক একটি ডিষ্ট্রিক্ট এক এক "ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারে"র হাতে আছে। ২০০ কি ২৫০ মাইল নিয়ে একটি ডিষ্ট্রিক্ট। আবার ডিষ্ট্রিক্টগুলিকে এক বা ততোঽধিক সাব্‌ডিভিশনে ভাগ করে, এক একটিকে "অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারের হাতে রাখা হয়।

প্রঃ—আপনাদের এই ভাগগুলি কি সরকারী ভাগ অনুসারে হয়?

উঃ—না, সরকারী জিলা বা মহকুমার সঙ্গে আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট প্রভৃতির কোন সম্পর্ক নাই।

প্রঃ—এই সকল রেলওয়ের মাথায় কে?

উঃ—রেলওয়ে বোর্ড।

প্রঃ—আচ্ছা, রেলওয়ে বাজেট্ জেনার‍্যাল বাজেট হইতে পৃথক করা হয়েছে, এতে ভাল ফল হয়েছে কি?

উঃ—হাঁ, নিশ্চয়। এখন দেশের রেলওয়েগুলিকে কারবার

হিসাবে চালান হচ্ছে। আয় ও ব্যয়ের উপর আগাগোড়া সকলকেই কড়া দৃষ্টি রাখতে হয়। পূর্ব্বে ছিল রেলওয়েটা গবর্মেণ্টের একটা ডিপার্টমেণ্ট মাত্র। এখন এ একটা মস্ত বড় জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন কোন একটা এষ্টিমেট্ মঞ্জুর হবার পূর্ব্বে দেখাতে হবে যে, শতকরা অন্ততঃ ৬৲ টাকা লাভ হবে। এখন অ্যাসেম্ব্লিও রেলওয়ের কাজকর্ম্ম এবং অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশনের উপর খুব দৃষ্টি রাখেন।

প্রঃ—ভারতে রেল লাইনের প্রসার কি রকম হচ্ছে ?

উঃ—রেলওয়ে বোর্ড চেষ্টা করছেন আগামী ৫ বছরে প্রতি বছর ১০০০ মাইল করে নতুন লাইন খুলতে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় আমাদের দেশে রেলে চলাফেরা করা যথেষ্ট নিরাপদ ?

উঃ—নিশ্চয়। বছরে ক'টা দুর্ঘটনার কথা শুনতে পান ? নিরাপদ হিসাবে আমাদের দেশের রেলওয়েগুলি অন্যান্য দেশের রেলওয়ের চাইতে নিকৃষ্ট নয়। গত বছর মাত্র পৌণে চারশ' জন রেলওয়ে যাত্রী রেল অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে। একবার মনে করুন ত আমাদের দেশটা কত বড়। ইহার ৪০ হাজার মাইল রেল লাইনের উপর দিয়ে ৬০ কোটি লোক গত বছর চলাফেরা করেছে। অথচ দুর্ঘটনায় মরেছে মাত্র পৌণে চারশ' লোক। এক কলিকাতা শহরে বোধ হয় মোটর গাড়ী চাপা পড়ে বছরে ৪০০ লোকের উপর মারা যায়।

প্রঃ—আমাদের দেশে এই প্রায় ৪০ হাজার মাইল রেল করতে কত মূলধন খরচ হয়েছে এবং কত আয় হয় ?

উঃ—প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। গত বছরেই ২০ কোটি টাকার উপর মূলধন খরচ হয়েছে। আর গত বছর গবর্মেণ্ট এই রেল হতে ৯ কোটি টাকার উপর লাভ করেছেন। তার আগের বছর ১৩ কোটি টাকা।

প্রঃ—এই রেলওয়েগুলিতে কত লোক খাটে ? আর তাদের বাবদ খরচই বা কত পড়ে ?

উঃ—প্রায় ৭½ লক্ষ লোক। ষ্টাফ বাবদ ঠিক কত ব্যয় হয় জানি না। তবে আন্দাজ ৩৫ কোটি টাকা হবে। আমাদের এ, বি, রেলওয়ের প্রায় ৫০ লক্ষ আন্দাজ হবে। ই, বি, রেলের ২¾ কোটি। ই, আই, রেলের ৬ কোটি। জি, আই, পি রেলের ৫½ কোটি। বি, এন, রেলের ২¾ কোটি।

প্র :—এ, বি রেলওয়ের লাভ হয়ে থাকে কি ?

উ :—এতদিন শতকরা ৩৷৷০ লাভ দিতে পারে নাই। তবে গত বছরই প্রথম দিয়েছে। এই রেলের উত্তর ভাগ অর্থাৎ গৌহাটি, লামডিং, তিনসুকিয়া ও দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ বদরপুর, চট্টগ্রাম বেশ লাভজনক। বদরপুর হতে লামডিং পর্য্যন্ত পাহাড় কেটে গভীর বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা করতে খুব খরচ হয়েছে। আর ঐ লাইনটিকে দুরস্ত রাখতেও খুব খরচ হয়। অনেক বড় বড় পুলের উপর দিয়ে ও টানেল কেটে লাইন করতে হয়েছে।

প্র :—আপনারা মজুরদের তলব কত দেন ?

উ :—একেবারে নিম্নস্তরের মজুরদের মাসে ১৪৷১৫ টাকা। কাঠের ও লোহার মিস্ত্রীদের মাসে ৪০৲ হতে ৬০৲। আসামে মজুর যথেষ্ট পাওয়া যায় না। আসামীদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই এসব কাজ আরম্ভ করেছে।

প্র :—একটা কথা মনে পড়্ল। একবার শুনেছিলাম ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে পাণ্ডু-আমিনগাঁর মাঝামাঝি এক পুল তৈয়ারী হবে, সারা ব্রিজের মত। তার কি হল ?

উ :—ওরূপ অনেক গুজবই উঠে। পুল করা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু এত বেশী খরচ হবে যে, তার সুদ কুলাবে না। আসামের বাণিজ্য এমন প্রচুর নয় যে, এই পুলের খরচ বইতে পারে। ভবিষ্যতে হয়ত পারবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বহু দূরে। এখন যে ফেরীতে পারাপারের বন্দোবস্ত আছে, তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

প্র :—আপনাদের রেলে প্রধানতঃ কি কি মাল চলে থাকে ?

উঃ—আসামে চা-বাগানে কল কারখানার সরঞ্জাম সমুদ্র পথে চট্টগ্রামে আসে। সেখান হতে গাড়ীতে করে চালান দেওয়া হয়। তা ছাড়া মাল হচ্ছে অন্যান্য ষ্টোর্স, কয়লা, কেরোসিন তেল, পেট্রোল, চা, ধান, চাউল, কাপড়, আলু ইত্যাদি। আসামে দুইটি কয়লার খনি ও কয়েকটি তেলের খনি আছে। তাদের প্রায় সব উৎপন্ন দ্রব্যই আমাদের রেল দিয়ে যাতায়াত করে।

প্রঃ—আচ্ছা, প্রতি বছর নিশ্চয়ই অনেক টাকার মাল রেলওয়ের জন্য বিদেশ হতে আনাবার প্রয়োজন হয়।

উঃ—হাঁ। গত বছর প্রায় ১৪½ কোটি টাকার মাল বিদেশ হতে আমদানি করা হয়েছে। আর প্রায় ৯ কোটি টাকার মাল এদেশে কেনা হয়েছে। তার মধ্যে ১½ কোটি টাকার মাল টাটা কোম্পানী যোগান দিয়েছে।

প্রঃ—কি বাবদ ?

উঃ—টাটা কোম্পানীর কাছে প্রধানতঃ রেল লাইন কেনা হয়। এদেশে এখন অল্পসংখ্যক মালগাড়ীও তৈয়ারী হয়।

প্রঃ—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আসাম হতে বার্ম্মা পর্য্যন্ত যে লাইন হবার কথা ছিল, তার খবর কি ?

উঃ—খবর আশাপ্রদ নয়। খরচ অনেক হবে ; কিন্তু আয়ের পরিমাণ কম। ৩টী রাস্তার প্রস্তাব হয়েছিল—

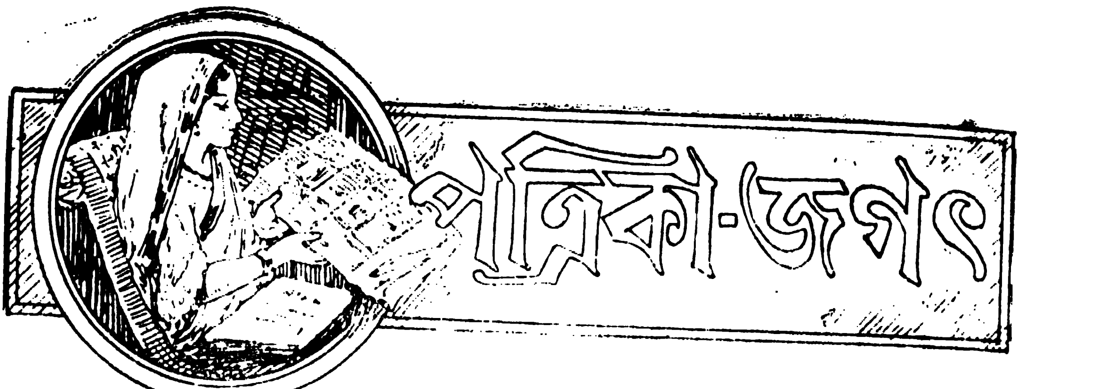
(১) উত্তর রাস্তা লিডো (মার্ঘেরেটার নিকট) হতে বার্ম্মাতে শাহ্‌মৌ পর্য্যন্ত।

(২) লামডিং হতে মণিপুর দিয়ে মানডালের ১৫০ মাইল উত্তরে বার্ম্মা রেলওয়ের সঙ্গে যোগ করা।

(৩) চট্টগ্রাম হতে আকিয়াব দিয়ে বার্ম্মাতে মিন্‌হলা নামক স্থান পর্য্যন্ত।

প্রঃ—আচ্ছা, রেল লাইন করতে কত খরচ পড়ে ?

উঃ—দেশ, নদীঘাট, জমির উচ্চতা প্রভৃতি বুঝে। ব্রড্‌-গেজ ১½ হতে ২ লক্ষ টাকা ও মিটার গেজে ¾ হতে ১¼ লক্ষ টাকা মাইল প্রতি খরচ হতে পারে।



"কোয়ার্টার্লি জার্ণাল অব্ ইকনমিকস্"

ধনবিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্র। মে (১৯২৭) সংখ্যায় আছে (১) বিলাতের কাগজ মুদ্রার হিসাব (আর, ডি, রিচার্ডস) (২) ইংলণ্ডে কাগজের টাকার (নোটের) ক্রমবিকাশ (৩) মানুষের স্বভাব ও আর্থিক ব্যবহার (৪) অর্থনীতিতে বৈজ্ঞানিক প্রসার (৫) যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইয়োরোপে শিল্প-ব্যবসার ধারা ((৬) টাকাতত্ত্ব ও ব্যবসায়ী সমাজ (৭) শ্রম-সমস্যা ও অর্থনীতিবিদ্ (চার্লস ই, পার্সন) (৮) বর্ত্তমান ক্যাপিটালিজ্ম্ (পুঁজি মতবাদ) সম্বন্ধে আধুনিক সাহিত্য (ডব্লিউ, এম, নাইট, প্যারিস) (৯) ফার্ম্মের কাজে কৃষি যন্ত্রপাতি ও মোটর গাড়ীর ব্যবহার (এইচ, ডাব্লিউ, পেক, সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়) (১০) বিলাতী সড়ক ও আর্থার ইয়ং (এডউইন এফ, গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

"নেশ্যন ও এথেনিয়ান"

আর্থিক ও রাজনৈতিক বিলাতী সাপ্তাহিক। ১১ই জুনের সংখ্যায় আছে (১) সাপ্তাহিক খবর (২) আমাদের কয়লার মালিক ও ফরাসী এম্বার্গো (সাময়িক ভাবে বাণিজ্য স্থগিত রাখিবার ফরমাস) (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে জটিল সমস্যা (৪) আর্থিক সম্মেলন ও পরের অবস্থা (স্যার আর্থার সল্টার)।

"সায়েণ্টিফিক আমেরিকান"

আমেরিকার বিজ্ঞান-পত্রিকা। জুলাই (১৯২৭) সংখ্যায় আছে—(১) মার্সে ই কি বাসোপযোগী? (হেনরী নয়েস রাসেল (২) খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ শতাব্দীর আমেরিকান কিস্ (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণে একটা ইতিহাস (৪) আদিম কালের জলসেচন-প্রণালী বনাম আধুনিক ইরিগেশ্যন (সচিত্র) (৫) আমেরিকা সবচাইতে লম্বা সুরঙ্গ (৬) ওয়াশিংটনের কাস্কেড পর্ব্বত মালার মধ্যে ৮ মাইল সরল সুরঙ্গ (৭) তৈল-জগতে আবিষ্কার (৮) আমাদের কৃষিপ্রধান এলিস দ্বীপ (৯) ভার্জি নিয়া এষ্টেটে চারা গাছের গবেষণা (১০) আমেরিকা ভারি হিসাবী (১১) হ্রদ ও নদনদীগুলির সংস্কার সাধন না করা আমেরিকার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি (১২) এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নতুন নতুন আবিষ্কার (১৩) রেডিও ও এরোপ্লেন খবর (১৪) রাসায়নিক জগৎ।

"ইকনমিষ্ট"

শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক বিলাতের আর্থিক সাপ্তাহিক। ১০৪ খণ্ড। ৪৩৭২ সংখ্যা। ১১ই জুনের সংখ্যায় আছে—(১) টাকার বাজার (২) ওয়াসর্তে হত্যা (৩) আর্থিক সম্মেলন ও পরের ধাপ (৪) ফরাসী কয়লা আমদানি শুল্ক। (৫) ডাক্তার স্খাট ও তাঁহার সমালোচকগণ (৬) কো-অপারেটিভ কংগ্রেস (৭) লণ্ডন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীসমূহ (৮) কানাডায় সাধারণ সম্পত্তি (৯) জুগোশ্লাভ আলবেনিয়া সঙ্কট (১০) ফরাসী আমেরিকান দোস্তি (১১) জাপান ও চীন (১২) ভারতীয় কটন টারিফ (শুল্ক কমিশন) রিপোর্ট (১৩) জাহাজ ভাড়া (১৪) ব্যাঙ্ক জোট (১৫) মেক্সিকোর রেলওয়ে রিপোর্ট (১৬) রবার রিপোর্ট (১৭) টিনের অবস্থা (১৮) রুশ এশিয়ার খনির কথা (১৯) দস্তা কর্পোরেশ্যন। (২০) যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি,

ইতালি, আর্জ্জেন্টিনা, জাপান ও হংকং প্রভৃতি স্থানের আর্থিক চিঠি।

"রুমাণিয়া"

বিলাতের ম্যানচেষ্টার গার্জ্জেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত রুমাণিয়া-বিষয়ক আর্থিক পত্রিকা। ২৬ মে (১৯২৭) সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পড়িবার মাল আছে। সচিত্র বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাগুলিতে রুমাণিয়ার বড় বড় আটটি ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন-আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেশের আর্থিক বিজ্ঞাপনও ইহাতে দেখিতে পাইতেছি। সচিত্র রচনাসম্ভারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) রুমাণিয়ার সরকারী খাজাঞ্চিখানা,—বাজেট, জাতীয় ঋণ ও কারেন্সী (মুদ্রানীতি), (রুমাণিয়ার এক আর্থিক সাংবাদিক কর্ত্তৃক লিখিত)

(২) রুমাণিয়ার বিদেশী ঋণের হিসাব।

(৩) ষ্ট্যাবিলিজেশ্যনের আবশ্যকতা, বিদেশী এক্সচেঞ্জ ও সরকারের মত (এ, আই, পপেস্কু) (৪) রুমাণিয়ার ব্যাঙ্কিং অবস্থার গবেষণা—যুদ্ধের পর দ্রুত ব্যাঙ্ক বিস্তার (পাঁএম সিটেস্কু, বাঙ্কা জেনের‍্যাল দে রুমাণী) (৫) রুমাণিয়ান শিল্পের পুঁজির ব্যবস্থা—স্বাদেশিকতা বনাম বিদেশী পুঁজি (আই, রাচুক্যানু, অধ্যাপক, অ্যাকাদেমি দেহতে এতুদে কমার্শিয়ালে—বুখারেষ্ট)

(৬) কৃষি সম্পদের উন্নতি—রুমাণিয়া ইয়োরোপের শস্যভাণ্ডার (জি, জোনেস্কু সিসেসটি, কৃষিমন্ত্রী) (৭) নদী ও সমুদ্রের মৎস্যশিল্প—অফুরন্ত ধনাগমের পথ (জি, অ্যানটিপা, রুমাণিয়ার সায়েন্স অ্যাকাদেমির সদস্য)।

(৮) জমি ব্যবস্থায় বিপ্লব আনয়ন—সমবায় ও পুঁজি (ডেভিড মিত্র্যানি, ক্যার্ণেগি-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বশান্তির আর্থিক ভিতের সেবাইত) (৯) রুমাণিয়ার বন-সম্পদ্ অত্যধিক বনকাটা (১০) রুমাণিয়ার পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ্ আহরণ এখনও প্রথম অবস্থায় (এল, মিরাজেক, রুমাণিয়ান জিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট (১১) রুমাণিয়ার আর্থিক সম্পদ্ ও রুমাণিয়ার সরকারী রেলসড়কের দুইখানি বড় বড় মানচিত্র। (১২) বর্ত্তমান রেলওয়ের একটা বিবরণী (আইওয়ান আই অ্যাপোস টোলেস্কু, রুমাণিয়ান রেলসড়কগুলির ডিরেক্টরগণের স্থায়ী সেক্রেটারী) (১৩) উপেক্ষিত জলপথ ড্যানিউব ও সাগর বাণিজ্যপথ (শিপিং সাংবাদিক কর্ত্তৃক লিখিত) (১৪) কনষ্টানজা বন্দর (সচিত্র) (১৫) ড্যানিউব সেতু (সচিত্র) (১৬) তৈল রপ্তানি ও বাজারদর—কনষ্ট্যাঞ্জার নূতন পাইপ লাইন (বিশেষ তৈল সাংবাদিক কর্ত্তৃক লিখিত (১৭) রুমাণিয়ায় বিদেশী পুঁজিপতিগণের সুবিধা ও সম্ভাবনা (ডাক্তার কষ্টিস ষ্টোইসেস্কু) (১৮) বিদেশী পুঁজি (অধ্যাপক ডি, এন, ড্যাস্কো) (১৯) রুমাণিয়ায় মৎস্য ধরিবার নৌকা ও জেলে (সচিত্র) (২০) কৃষি ও শিল্পব্যবসায়ের বিদ্যাপীঠ, অর্থকরী বিদ্যায় শিক্ষিত লোকের বৃদ্ধি। (২১) কৃষিকার্য্যে সমবায়-নীতি (এল, ম্লাডেণ্টজ, সমবায় প্রতিষ্ঠানের ডিপার্টমেণ্ট্যাল ম্যানেজার) (২২) শিল্পের সরকারী আর্থিক সাহায্য—রুমাণিয়া এখন উচ্চ শুল্ক-দেওয়ালে ঘেরা দেশ (বুখারেষ্টের সাংবাদিক লিখিত)। (২৩) জাতীয় শিল্প-নিষ্ঠার দ্রুত উন্নতি—প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক বৃদ্ধি (বিশেষ সাংবাদিক লিখিত) (২৪) বহির্ব্বাণিজ্যের ধারা—যুদ্ধ ও শান্তির পরিবর্ত্তন (ল্যাজাচ উলিয়েস্কু, অর্থসচিব) (২৫) রুমাণিয়ার সঙ্গে বৃটিশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ—নতুন নতুন লোক চাই (বুখারেষ্টের বৃটিশ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক লিখিত)।

"টাইমসের আর্থিক সাপ্তাহিক"

ব্যাঙ্কিং সংখ্যা জুন ১৮, ১৯২৭। এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ২০ পৃষ্ঠা ও রচনাসম্ভার ২২ পৃষ্ঠা। গোটা দুনিয়ার ব্যাঙ্ক সমূহের ফিরিস্তি ইহাতে আছে। বাংলার ব্যাঙ্ক পরিচালকগণের অবশ্যপাঠ্য।

বিজ্ঞাপন অংশ—ন্যাশনাল প্রভিনশ্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ। ইহার মূলধন ৯,৪৭৯,৪১৬ পাউণ্ড, রিজার্ভ ফণ্ডে আছে ৯,৪৭৯,৪১৬ পাউণ্ড। ১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ডিপজিট জমা ছিল ২৬০,১২৬,১২৫ পাউণ্ড। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে এই ব্যাঙ্কের ১১৫০টি আফিস আছে।

ব্যাঙ্ক অব্ অষ্ট্রেলিয়া। মূলধন ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড, রিজার্ভফণ্ড ৩,৮১০,০০০ পাউণ্ড রিজার্ভ লায়েবিলিটি

৪,০০০,০০০ পাউণ্ড মোট মূলধন ১১,৮১০,০০০ পাউণ্ড। হেড আফিস লণ্ডনে।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ অষ্ট্রেলিয়া লিঃ। বিজ্ঞাপিত মূলধন ১ কোটি পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন আদায় হইয়াছে। রিজার্ভ ফণ্ডে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড আছে। ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত টোটাল অ্যাসেট দাঁড়াইয়াছে ৪২,৯০৯,৭২৬ পাউণ্ড। মেলবোর্ণ শহরে ইহার হেড আফিস।

কমনওয়েল্থ ব্যাঙ্ক অব্ অষ্ট্রেলিয়া। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি অষ্ট্রেলিয়া সরকারের ব্যাঙ্কার। বিগত ১৯২৬ পর্য্যন্ত ইহার জেনারাল ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ৩৩,৭৯১,৪৩৪ পাউণ্ড। সেভিংস ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ৪৬,০৬৩,১২৯ পাঃ, নোট-প্রকাশ বিভাগে ৪৯,৯৩০,২২৬ পাঃ রুরাল ক্রেডিট দপ্তরে ৪১৫,৪৬৩ পাঃ ও অন্যান্য বিভাগে ৫,৫১২,৯৪৯ পাঃ জমা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমানে ১৩৫,৭১৩,২০১ পাউণ্ডের জমীদারি। ইহার হেড আফিস সিডনী শহরে।

দি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিং কোম্পানী অব্ সিডনী লিঃ। মূলধন ৪৬৭১৭১২ পাঃ ১০ শিঃ। রিজার্ভ ফণ্ড ৩,৮৫০,০০০ পাঃ। অংশীদারগণের রিজার্ভ লায়েবিলিটি ৪৭২৩১৮৭পাঃ ১০শিঃ। মোট মূলধন ১৩,২৪৪,৯০০ পাউণ্ড। হেড আফিস সিডনী শহরে।

রয়্যাল ইনশিওর্যান্স কোম্পানী। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই বিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠানটির এজেণ্ট আছে। টোটাল ফণ্ড ৩৫,৭৯০,৯২৭ পাউণ্ড। লণ্ডন ও লিভারপুলে হেড আফিস।

লিভারপুল অ্যাণ্ড লণ্ডন অ্যাণ্ড গ্লোব ইনশিওর্যান্স কোম্পানী। ৯০ বৎসরের প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৬ সনে ইহার আয়ের হিসাবে দেখিতে পাই ১৩,৮৫১ পাউণ্ড মাত্র, আর ঐ সনে অ্যাসেট ছিল ৬৮,০০০ পাঃ। ১৮৬৬ সনে আয় ১,০৭২,৪৫২ পাঃ, অ্যাসেট ৪২৫৬৮৮৭ পাঃ। ১৮৯৬ সনে আয় ২,২৯৬,৪৭৬, অ্যাসেট ৯,৯৫৬,৪২২ পাঃ। ১৯২৬ সনে আয় ১২,১১৮,৩২২ পাঃ, অ্যাসেট ২৪,৮২৩,৫৮৪ পাঃ। হেড আফিস লিভারপুলে।

দি লণ্ডন অ্যাস্যুর্যান্স। ১৭২০ সনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা অগ্নি, সমুদ্র ও জীবনবীমা করিয়া থাকে। ইহার অ্যাসেট ১১০০০,০০০ পাউণ্ডের বেশী হইয়া গিয়াছে। দুনিয়ায় সর্ব্বত্র ইহার এজেণ্ট আছে। বিলাতে হেড্ আফিস।

দি সেণ্ট্রাল ইনশিওর্যান্স কোম্পানী লিঃ। এই বীমা প্রতিষ্ঠানটির অ্যাসেট ২৪,৮০৮,০০০ পাউণ্ডের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহার হেড আফিস লণ্ডনে।

কানাডা লাইফ অ্যাস্যুর্যান্স কোম্পানী। ১৮৮৭ সনে প্রতিষ্ঠিত। এই বীমা প্রতিষ্ঠানটিতে বর্ত্তমানে ১৩৮,৩৬৭,৮৮৪ পাউণ্ড বীমার কারবার চলিতেছে। ইহার মধ্যে নূতন বীমাকারিগণ এই বৎসরে ২৮,২৩৮,১৯১ পাউণ্ডের বীমা করিয়াছেন। ইহার অ্যাসেট ২৬,১৪৮,৭৪৭ পাঃ। এই বৎসরে কোম্পানীটি বীমাকারিগণের ক্ষতিপূরণ দিয়াও ৮৬৬,৮৯৬ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে।

উল্লিখিত বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলির বিজ্ঞাপন মলাটের উপর ছাপা দেখিতেছি। ভিতরের বিজ্ঞাপনের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

বার্কলেজ ব্যাঙ্ক লিঃ। বিজ্ঞাপিত মূলধন ২ কোটি পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ১৮,৮৫৮,২১৭ পাউণ্ড মূলধন আদায় হইয়াছে। অর্থাৎ সামান্য কিছু অংশ মাত্র এখন বাকী আছে। ইহার রিজার্ভ ফণ্ড ১০,২৫০,০০০ পাঃ আছে। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডিপজিট জমা দেখিতেছি ৩০৯,৮৮৩, ৬৯০ পাঃ।

ব্যাঙ্ক অব্ লিভারপুল অ্যাণ্ড মাটিনস্ লিঃ। ১৮,৭৯১,১২০ পাউণ্ড মূল্যের অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অংশীদারগণ ৪,৪৫৪,১৫৪ পাঃ প্রদান করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে ৫৯,৮১৯,৩২৬ পাঃ জমা হইয়াছে।

হংকং অ্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন। স্বীকৃত মূলধন ৫ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে ২ কোটি ৬ ডলারের অংশ বিক্রয় ও টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে। রিজার্ভ ফণ্ড ষ্টার্লিং ৬০ লক্ষ ডলার, রৌপ্য ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার আছে। প্রপ্রাইটরগণের রিজার্ভ লায়েবিলিটিতে ২ কোটি ডলার জমা আছে। হংকংএ ইহার হেড আফিস।

বাঙ্কা দে প্যারি এ্য দে পে-বা ১৮৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত।

২০ কোটি ফ্রাঁ মূলধন। হেড আফিস প্যারি শহরে। আমষ্টারডম, ব্রুসেলস ও জেনেভায় ব্রাঞ্চ আছে।

ক্রেদ্যি লিওনঁ। ইহার সাড়ে পঁচিশ কোটি ফ্রাঁ মূলধন। রিজার্ভ ফণ্ড আছে ২২৭,২৫০,০০০ ফ্রাঁ। ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরে ইহার ৭০০ শত ব্রাঞ্চ আছে। প্যারিতে কেন্দ্রীয় আফিস। লিয়ঁতে হেড আফিস।

বাঙ্কা বেলজ পোর লা এতব্যানজার। স্থিরীকৃত মূলধন ১০ কোটি ফ্রাঁ। ইহার মধ্যে সাড়ে সাতকোটি ফ্রাঁ আদায় হইয়াছে। রিজার্ভ ফণ্ড ৪ কোটি ফ্রাঁ আছে। ব্রুসেলস শহরে হেড আফিস।

বাঙ্কা কমার্শিয়াল ইতালিয়া। ১৮৯৪ সনে প্রতিষ্ঠিত। হেড আফিস মিলান শহরে। ৭০ কোটি লিয়ার মূলধন। ইহার মধ্যে ৫২ কোটি লিয়ার আদায় হইয়াছে। দুনিয়ার বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে ইহার শাখা আছে।

রচনা ও সংবাদ অংশে আছে (১) অন্যান্য দেশের মুদ্রা সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল ধারণা (হেনরী বেল (২) ব্যাঙ্কিং রিপোর্ট (টি, ই, গ্রেগরী ডি, এস-সি (ইকন) লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সির অধ্যাপক) (৩) আর্থিক মানচিত্র ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯২৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত (৪) স্বর্ণের মূল্য কি ? দুইটি সমস্যামূলক উপায় (এইচ, জি, স্পিয়ারিং) (৫) বিদেশী বাণিজ্যের পুঁজি (আর্থিক সংবাদদাতা) বৃটিশ ব্যাঙ্কিং ও কয়লা ধর্ম্মঘটের প্রভাব (৬) বিলাতের দশটি ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের ফিরিস্তি-১৯২৩ হইতে ১৯২৭ (৭) কানাডার কনফেডারেশনের পর হইতে ব্যাঙ্কিং অবস্থা (৮) স্কটিশ ব্যাঙ্ক রেকর্ডস—লণ্ডনের উন্নতি (৯) বিলাতের বাছা বাছা ব্যাঙ্কের কয়েকজন প্রতিনিধি (সচিত্র) (১০) সুইডেনের বিদেশে লাগান ও খাটান পুঁজি। (১১) অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় রিজার্ভ সমস্যা (ডেসমণ্ড বার্ণ, মেলবোর্ণের "হেরাল্ড" কাগজের আর্থিক সম্পাদক)। (১২) ১৯২৬ সনে ফিনিশ ব্যাঙ্কার্স (১৩) নিউজীল্যাণ্ড-রাষ্ট্র ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান (১৪) ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড ব্যাঙ্কসমূহের ফিরিস্তি (১৫) কানাডা সাম্রাজ্যের মধ্যস্থিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ধরণ ধারণ (জেমস্ ওগলে) (১৬) ১৮৬৭ সনে কনফেডারেশনের পর হইতে কানাডার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি (১৭) কাগজ মুদ্রা বা নোট—প্রাচীন ও বর্ত্তমান (১৮) দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্ক ও শিল্প-অবস্থা (জোহানসবুর্গের প্রতিনিধি) (১৯) ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের কানাডা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কথা (২০) পেরু ক্রেদিতে এগ্রিকোলা (ইএগ্রিয়ানো, বাঙ্কো দে রিজার্ভা দেল পেরুর ম্যানেজার) (২১) দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্ক-বিষয়ক আইনকানুন সরকারের প্রস্তাবাবলী (২২) আর্জ্জেণ্টিনায় ব্যাঙ্কিংএর বর্ত্তমান অবস্থা (২৩) ভারতবর্ষ —কারেন্সি ও ক্রেদিত সমস্যা, রয়াল কমিশন (২৪) জাপানের ব্যাঙ্ক আইন (২৫) যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থা (বেঞ্জামিন এম, অ্যাণ্ডারসন পি-এইচ, ডি, চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ইকনমিষ্ট) (২৬) ভারতীয় একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কের রিটার্ণ (২৭) ফ্রান্সের ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানে বিশেষত্ব (অনারেবল জর্জ্জ পিল) (২৮) পোলাণ্ডের আর্থিক অবস্থায় উন্নতির লক্ষণ (২৯) বাইমেটালিজমের পুনরাবির্ভাব—স্বর্ণ হ্রাসের প্রভাব (জে, এফ, ডার্লিং)। (৩০) ইতালির খাজাঞ্চিখানা। (৩১) চেকো-শ্লোভাকিয়া, ব্যাঙ্ক কেন্দ্র প্রাগ শহর (ব্যারেল ব্যারা-সেক পি-এইচ, ডি) (৩২) বেলজিয়ামের টাকাকড়ি (৩৩) হলাণ্ড—আমষ্টারডম বাণিজ্যকেন্দ্রের টাকার বাজার ১৯২৬ (ডাক্তার জি, ভিসারিং, নেদারল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের সভাপতি) (৩৪) ডেন্‌মার্ক—স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন (কার্ল অটো হেনরিকস) (৩৫) জার্ম্মাণির রাইস ব্যাঙ্কের পলিসি (ডাক্তার এরিব ওয়েণ্টার) (৩৬) সুইটসার্ল্যাণ্ড—বিদেশী পুঁজি (৩৭) হাঙ্গারী, বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরতা (আলেক্স দে পপভিক্স পি-এইচ, ডি, হাঙ্গারীর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সভাপতি) (৩৮) ভিয়েনা ও বুদাপেস্তের আর্থিক খবর (ডাক্তার জর্জ্জ টুগেনধাল) (৩৯) চিলীর ব্যাঙ্ক ও কারেন্সী সংস্কার (অগাষ্টন এডওয়ার্ডস, জি, বি, ই)।

"কন্‌টেমপোরারি রিভিউ"

আগষ্ট সংখ্যায় আছে (১) হাউস অব্ লর্ডস (২) লিবারেল অভ্যুত্থান (সার চার্লস হবহাউস) (৩) রুমাণিয়ার অবস্থা (ডাক্তার আর ডব্লিউ

সেটন-ওয়াটসন) (৪) ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা (লর্ড অলিভিয়ার) (৫) ইতালি, জুগোশ্লাভিয়া ও আদ্রিয়াতিক উপকূল (চার্লস উডস্) (৬) আমেরিকায় আর্থিক সমৃদ্ধির বহর ও ইহার কারণ (পি, এ, মলটেনো) (৭) আইরিস ফ্রি ষ্টেটের নির্ব্বাচন (জন এইচ, হামফ্রে) (৮) ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ও তাহার ব্যবস্থা (ডব্লিউ, এইচ, কার্টার) (৯) বৃটনে অরণ্য সৃষ্টি (ডব্লিউ, এল, টেলার (১০) বুমিং আর্কটিক (ফ্রান্সিস ডিকি) (১১) বিদেশী ব্যাপার (জর্জ্জ গ্লাসগো) ।

"এডিনবারা রিভিউ"

জুলাই সংখ্যায় আছে (১) রবার রপ্তানি (এ, সি, মেজেস) (২) আমেরিকার প্রাচুর্য্য ও বৃটিশ শিল্প (ডাক্তার নর্থকট) (৩) প্রাচীন রোমের দানসত্র (হারল্ড ম্যাটিংলি) (৪) নাইজেরিয়া আবিষ্কার (জি, সি, ডাগান) (৫) লণ্ডনের সেতুসমূহ (আর্থার জি, বি, ওয়েষ্ট (৬) সম্পত্তি-বিষয়ক নূতন আইনকানুন (এইচ, জি, র‍্যান্ডাল) (৭) চীন—চীনের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা-বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তকের আলোচনা (জে, ও, পি, ব্লাণ্ড) (৮) ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি—১৯২৭ সনে প্রকাশিত মডার্ণ ইণ্ডিয়া নামক দুইখানি পুস্তকের সমালোচনা (এম, এফ, ওডায়ার) (৯) বিসমার্ক ও দ্বিতীয় উইলিয়াম। (১০) বিলাতের নির্ব্বাচন ও সামাজিক সংস্কার (হারল্ড কক্স) ।

"এম্পায়ার রিভিউ"

আগষ্ট ১৯২৭। (১) বলশেভিজম—অতীত ও বর্ত্তমান (আর্ণল্ড রেকবার্গ) (২) সাইবেরিয়ার ওপারে (৩) অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রম আইন (এলিস কক্স পেরি) (৪) দুনিয়ার নতুন চৌহদ্দি (ডাক্তার ভগান কর্ণিশ) ।

"ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল"

জুলাই ১৯২৭। (১) মিলওনার্স ও সরকার (২) ভারতে কৃষি। (৩) বোম্বাই সরকারের শিল্পদপ্তর (৪) ভারতের হোসিয়ারি শিল্প (এস, ডি, আলটেকার, এম, এ (৫) ওয়ার্প প্রস্তুত করণের উন্নত পন্থা (ডি, এস, অমলসদ) (৬) স্যামুয়েল ক্রম্পটনের শতবার্ষিকী—টেকস্টাইল যন্ত্রপাতির ইতিহাস। (৭) বোম্বাইয়ের মিল ইণ্ডাষ্ট্রী ও মজুর (এস, জি ওয়ার্টি, (৮) উচ্চহারে উৎপাদনকারী টেকস্টাইল মেশিন। (৯) চীনা মাটির সদ্ব্যবহার (১০) বৃটিশ শিল্প ব্যবসা (গিলবার্ট সি, লেটন, 'ইকনমিষ্ট' কাগজের সহঃ সম্পাদক) (১১) বোম্বাইয়ের শিল্প-খবর—করাচীর মিল, করাচীর মজুর-সমস্যা, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, শহরতলী শিল্প, গৃহশিল্প, ডাইং ও ক্যালিকো প্রিণ্টিং (১২) বোম্বাইয়ের শিল্পোন্নতি ও শিল্পশিক্ষা (টেকনিক্যাল এডুকেশন) (১৩) পাঞ্জাবে রং শিল্প (১৪) উচ্চ বয়ন-প্রণালী (এস, সোরাবজি ভূমগারা) (১৫) চামড়া গাঁইট ও চামড়া প্রস্তুতের নিয়মকানুন (জন সি, ম্যানিং) (১৬) ইমারত নির্ম্মাণে অ্যাসবেসটসের স্থান। (১৭) বিহার ও উড়িষ্যায় বয়ন-শিল্পের অবস্থা (১৮) মার্কিণ বয়ন কারখানায় কাজের ঘণ্টা ও মজুরির হার। (১৯) বয়ন-শিল্পে মোটরের হিস্যা (২০) ভারতীয় উদ্ভাবন ও পেটেণ্ট (২১) পশ্চিমা মিলগুলির দুরবস্থা।



দুর্যোগ-দৈত্যের মুগুর

আমরা অনেকবার আর্থিক দুনিয়ার চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই চক্র-তত্ত্বকে নবীন ধন-বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বিবেচনা করা আমাদের দস্তুর। এই-সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা ইংরেজি বইয়ে বড় একটা পাওয়া যাইত না। কিন্তু সম্প্রতি একখানা বেশ বৃহদাকার বই বাহির হইয়াছে। লেখকও লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অধ্যাপক পিগু। ইনি "ছেলে বেলায়" লিখিয়াছিলেন "আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট" বা বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গ্রন্থ। "ইকনমিক্‌স্ অব্ ওয়েলফেয়ার "(সমাজ-মঙ্গলের ধনবিজ্ঞান) গ্রন্থের জন্যই পিগু বিখ্যাত। চক্র-বিষয়ক বইটার নাম "ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল ফ্লাকচুয়েশ্যন্‌স্" (শিল্প-জগতে ওঠানামা)। প্রকাশক ম্যাকমিলান কোং (১৯২৭)। পিগু হইতেছেন মার্শ্যালের ইংরেজ চেলাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নাম-জাদা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা তাঁহার কাজ।

আর্থিক জগতের চক্রবিজ্ঞানটা কি বস্তু তাহা পিগু-প্রণীত গ্রন্থের সূচীটা ঘাঁটিলেই অনেক পরিমাণে মালুম হইবে। গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত :—প্রথমতঃ কারণ-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়তঃ দাওয়াই-নির্দ্দেশ।

কারণের আলোচনায় আছে নিম্নের বিভিন্ন অধ্যায়,—(১) ওঠানামার সাধারণ লক্ষণ (২) পুঁজিপাটার সদ্ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার (৩) লাভের আশার সু-কু প্রভাব (৪) সমাজের শ্রেণী-ভেদ ও তাহার প্রভাবে কেনাবেচার বাজার ও লাভ-লোকসানের দৌড় (৫) শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনায় আধুনিক যুগের জটিলতা। তাহার প্রভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখা কঠিন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-বিচারের ভুলের সম্ভাবনা অনেক (৬) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আস্থাবান থাকার ফলে আবার অতিমাত্রায় সতর্ক হওয়ার বাতিক চাগিয়া যায়, (৭) টাকাকড়ির প্রভাবে চক্র-পরিবর্ত্তন (৮) সাক্ষাৎভাবে ভোগের জন্য যেসকল শিল্প চলে তাহা হইতে অন্যান্য শিল্পের প্রভেদ, (৯) মূলধনের জোগান (১০) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য যেসকল কারণে চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সেই সবের উপর ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রভাব (১১) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জের জোগান, (১২) বাজার-দরের ওঠানামার কারণ-বিশ্লেষণ, (১৩) লাভের আশার সঙ্গে বাজার-দরের যোগাযোগ (১৪) মজুরির হার ও চক্র, (১৫) মজুরদের চলাচল অবাধ নয় (১৬) বিভিন্ন কারণের তুলনাসাধন (১৭) ওঠানামায় তরঙ্গশ্রেণী।

দাওয়াই-নির্দ্দেশ কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ :—

(১) চক্রটা সমাজের ব্যাধি সন্দেহ নাই (২) অবাধ শিল্প-বাণিজ্য-নীতিতে এই ব্যাধি-নিবারণের সম্ভাবনা খুবই কম (৩) ব্যাধির কারণগুলা নিবারিত হইতে পারে (৪) ব্যাধির চিকিৎসাও সম্ভব (৫) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য কারণগুলার নিবারণোপায় (৬) বহুকালব্যাপী দেনা পাওনার যুক্তি (৭) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জ জোগানের দাওয়াই (৮) ডিস্কাউণ্ট-নীতি ও কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক (৯) ডিস্কাউণ্ট-কৌশলের সাহায্য—বাজারদরের ওঠানামা বন্ধ-করা (১০) টাকার বাড়্‌তি কম্‌তি বিষয়ক শাসন (১১) টাকার স্থিরীকরণ (১২) মজুরি স্থিরীকরণ (১৩) চক্র-চিকিৎসা (১৪) মাল-স্রষ্টা আর ভোগ-কর্ত্তাদের স্বাধীন প্রয়াস (১৫) সরকারী হস্তক্ষেপ (১৬) শুল্ক-নীতি (১৭) বেকার খাটাইবার জন্য সরকারী ভাবে কারবার সৃষ্টি (১৮) বেকার-বীমা।

দুর্যোগ-দৈত্য কোনো এক কারণের সন্তান নয়। কাজেই কোনো এক দাওয়াইয়ে এই দৈত্য দমন করা অসম্ভব। ইতি ভাবার্থঃ।

মজুরির সর্ব্বনিম্ন সীমানা

আমাদের দেশে মজুর-আন্দোলন এখনো বেশ পাকিয়া উঠে নাই। কাজেই ভারতীয় মজুরেরা এখনো ইয়োরামেরিকান মজুরদের মতন পুঁজিপতিদের নিকট হইতে লম্বা লম্বা দাবীমাফিক কাজ হাঁসিল করাইয়া লইতে অসমর্থ। কিন্তু ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর মহলে ইয়োরামেরিকান মজুর-আন্দোলনের চরম আদর্শ ও চরম সফলতার সংবাদ অল্পবিস্তর অনেকটা পৌঁছিয়াছে। ইয়োরামেরিকার নানা দেশে আজ প্রায় ১৮।১৯ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বনিম্ন মজুরির আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনে অষ্ট্রেলিয়া দুনিয়ার পথপ্রদর্শক। আন্দোলনটা বহু দেশেই অনেক সফলতা লাভ করিয়াছে। বিলাত এই বিষয়ে এক প্রকার আদাম্নুণ খাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। আন্দোলনটা সর্ব্বত্রই মজুরমহল ছাড়িয়া আইনের কোঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সর্ব্বত্রই এই সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। বিধি-ব্যবস্থার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও জুটিতেছে। রিচার্ডসনের একখানা বইয়ে ভারতসন্তান বহু মূল্যবান তথ্য পাইবেন।

এই সেদিন জেনেহ্বার আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘে বিশ্বব্যাপী নিম্নতম হার স্থিরীকরণের জল্পন-কল্পন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বিলাতে ত কিছুকাল ধরিয়া দেশশুদ্ধ লোককে একটা আইন-সঙ্গত নিম্নতম হারে মজুরি দিবার কথা উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বিলাতের চাষী সমাজে মজুরেরা এইরূপ দেশব্যাপী হার ভোগ করিয়াছে। বইখানাতে সকল তথ্য বিবৃত ত আছেই। লোকসংখ্যার তরফ হইতে সমালোচনাও আছে।

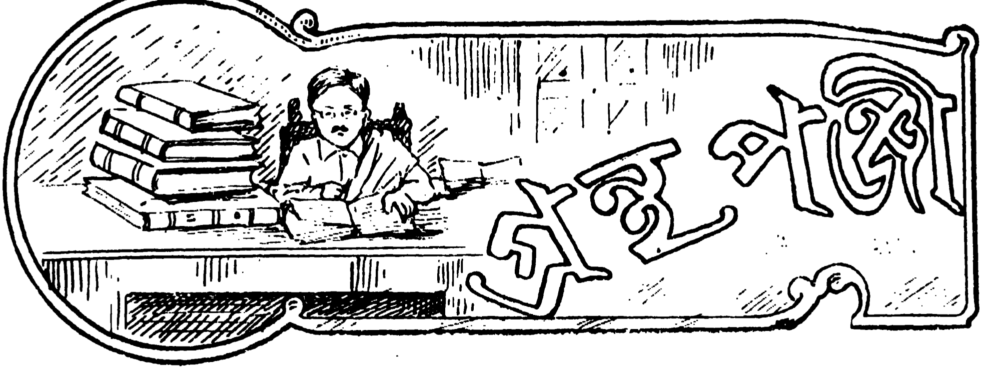
পুঁজি-নিষ্ঠার ক্রমবিকাশ

আর্থিক ভারত পুঁজিনিষ্ঠায় হাত মক্স করিতে শুরু করিয়াছে মাত্র। কিন্তু এই চিজ আর এই চিজের সু-কু ইয়োরামেরিকায় আজ প্রায় একশ' বৎসরের বা তার চেয়ে বেশী বয়সের মাল। "ক্যাপিট্যালিজম্" বস্তুটা আধুনিক যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানা-সম্পদের যমজ ভাই। কাজেই নব্য ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই দুইয়ের চর্চ্চা বর্ত্তমান জগতের অতি মামুলি কথা।

ইংরেজ পণ্ডিত হব্‌সন এই চর্চ্চায় বিলাতী সমাজে নামজাদা। তাঁহার নামডাক বিদেশেও আছে। বইখানার নাম "এভোলিউশ্যন অব্ মডার্ণ ক্যাপিট্যালিজম্।" এই ধরণের বই জার্ম্মাণ সাহিত্যে বিস্তর আছে।

হব্‌সনের বইয়ের এক নতুন সংস্করণ বাহির হইল। এই ধরণের বইয়ের মাল কোনো লোকের পেটে পড়িলে তাঁহাদের মতিগতি যেরূপ হওয়া উচিত তাহার চিহ্নও বাঙালীদের লেখা প্রবন্ধ-কেতাব-পুস্তিকায় বড় একটা চোখে পড়ে না। তাই বইটার দিকে বাংলার পণ্ডিত ও স্বদেশসেবকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"আর্থিক উন্নতি"র নানা অধ্যায়ে কার্টেল, ট্রাষ্ট ইত্যাদির বিবরণ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সেই সম্বন্ধে হব্‌সনের বইয়ে অনেক কথা পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান জগতের পুঁজিপতিরা নিজেই অধিকাংশ সময়ে শিল্প-বাণিজ্য ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য মাথা খাটায় না। তাহার জন্য মোতায়েন আছে সমাজে আর এক শ্রেণীর মাথাওয়ালা লোক। তাহাদিগকে বলে "কম্পানি প্রোমোটার।" তাহারা দেশ-বিদেশের আর্থিক গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। নিজ নিজ এলাকায় যে সকল কারবার লাভজনক হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারবারের মোসাবিদা করা তাহাদের কাজ। খরচপত্র, লাভলোকসান, কাজ চালাইবার প্রণালী ইত্যাদি সব বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা পুঁজিপতিদেরকে এইসকল কারবারে টাকা খাটাইতে পরামর্শ দেয়। এই ধরণের মোসাবিদা আর পরামর্শের মজুরি বড় বড় ক্ষেত্রে বহু বহু লাখ টাকা। অর্থাৎ কম্পানি খাড়া করিবার তোড়জোড়টাই বর্ত্তমান জগতের এক মস্ত ব্যবসা। এই বিষয়ে ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা, এখনো বর্ত্তমান জগতের লোক নয়। আজকালকার বিলাতী সমাজ-দার্শনিকদের ভিতর হব্‌সন অনেকটা চরমমত-ঘেঁশা উদার-পন্থী বিবেচিত হন। ইনি তথাকথিত মধ্যবিত্তদের স্বরাজ খর্ব্ব করিয়া জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্ব বাড়াইবার কৌশল ঢুঁড়িয়া থাকেন। অধিকন্তু আন্তর্জ্জাতিকতা হব্‌সনের অন্যতম লক্ষ্য।



গ্রন্থপঞ্জী

"লা কোয়েসতিযনে আগ্রারিয়া ইন রুস্‌স্যা" (রুশিয়ার কৃষি-সমস্যা),—ক্রেশমান,—ফেদেরাৎসিঅনে ইতালিয়ানা দেই কন্‌সর্ৎসি আগ্রারি, ১৯২৬, ২৫ লিয়ার।

"ঠেওরী ড্যর কোন্যুঙ্কটুর-শোআ-স্কুঙ্গেন" (আর্থিক দুর্যোগের তত্ত্বকথা)—ষ্টুকেন.—যেনা, ফিশার কোং, ১৯২৬, ৩মার্ক ৫০ ফেন্নিগ।

"মার্ক্যান্টিলিজম অ্যাণ্ড দি ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া ট্রেড" (বাণিজ্য-নীতির ধনবিজ্ঞান ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যসম্পদ্‌) টমাস,—লণ্ডন, কিং কোং,—১৯২৬, ৯ শি ৬ পে।

"ফোক্‌—হাইস্কুলস্‌ অব ডেন্‌মার্ক অ্যাণ্ড দি ডেভেল-পমেণ্ট অব এ ফার্মিং কমিউনিটি" (ডেন্‌মার্কের সার্ব্বজনিক বিদ্যাপীঠ ও চাষী সমাজে তাহার প্রভাব),—ব্যর্গট্রুপ সুন্ড ও মান্নিখে, লণ্ডন, অক্‌সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৬ শি।

"লে নেগৎসিয়াৎসিঅনি কারাত্তায়িরসতিকে দেই গ্রান্তি মার্কাতি,—প্রিঞ্চিপি দি তেক্‌নিকা মার্কান্তিলে" (বড় বড় বাজারের বিশেষত্বপূর্ণ কেনাবেচার বৃত্তান্ত ও তত্ত্বকথা)—কাপ্রারা, মিলান, ইস্তিতুত এদিত্তারিয়ালে সিয়েন্তিফিক,—১৯২৬, ৯০ লিয়ার।

"লেজ্‌ এক্‌স্‌ পেরিয়াঁস্‌ মনেতেয়ার কঁতাঁপরান" (সমসাময়িক দুনিয়ার টাকাকড়ি বিষয়ক অভিজ্ঞতা)—বল্লে, প্যারিস। ১৯২৬, ৯ ফ্রাঁ ৮০ সাঁতিম।

"ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফ্লাক্‌চুয়েশুন্‌স্‌" (শিল্প-জগতে ওঠানামা),—পিগু, লণ্ডন, ম্যাকমিলান কোং, ১৯২৭, ২৫ শি।

"মিনিমাম ওয়েজ্‌" (নিম্নতম মজুরি),—রিচার্ডসন,—লণ্ডন, অ্যালেন অ্যাণ্ড আনুইন কোং, ১৯২৭, ৭ শি ৬ পে।

"লা স্তাবিলিজাসিঅঁ মনেতেয়ার অঁ বেলজিক্‌" (বেল-জিয়ামে মুদ্রাস্থিরীকরণ),—ফ্রাঁক্‌, প্যারিস পেইও কোং, ১৯২৭, ১৫ ফ্রাঁ।

"একনমিয়া ইতালিয়ানা" (ইতালির আর্থিক ব্যবস্থা),—আরিয়াস, বলঞা, ৎসানিকেল্লি কোং, ১৯২৬, ৪০লিয়ার।

"এভোলিউশন অব মডার্ণ ক্যাপিট্যালিজ্‌ম (আধুনিক পুঁজিনিষ্ঠার ক্রমবিকাশ),—হব্‌সন, লণ্ডন, স্কট পাব্‌লিশিং কোং, ১৯২৬, ৭ শি ৬ পে।

"লা লো আ দ' লা ভারিয়াসিঅঁ দ' লা ভাল্যয়র এ লে মুভ্‌মাঁ জেনেরো দে প্রি" (মূল্যপরিবর্ত্তনের নিয়ম ও বাজার-দরের ওঠানামা),—বুনাতিয়াঁ, প্যারিস, জিয়ার কোং, ১৯২৭, ১২ ফ্রাঁ।

"স্ক কিল্‌ ফো কোনেৎর দে ক্রীজ্‌ ফিনাঁসিয়ার দ' নোৎর ইস্তোয়ার" (ফরাসী ইতিহাসে আর্থিক দুর্যোগ কাহাকে বলে ?)—মারিঅঁ,—প্যারিস বোআভাঁ্যা কোং, ১৯২৬, ৭ ফ্রাঁ।

বঙ্গীয় অর্থশাস্ত্র পরিষৎ

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম,এ, বি,এল

গত ৫ই বৈশাখ (১৩৩৪) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়। তদুত্তরে অন্যান্য কথার পর তিনি বলেন,—

"একমাত্র সাহিত্যপরিষদে আজ আর বাঙালী জাতির কুলাইতেছে না। মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলি স্পষ্ট ও লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। নব নব জ্ঞানচর্চ্চার সূত্রপাত হইতেছে।

"ইয়োরোপে আজ বিভিন্ন বিদ্যার জন্য বিভিন্ন পরিষৎ কায়েম হইয়াছে। আগে যেখানে একটা মাত্র পরিষৎ নানা বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইত, এখন সেখানে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক একটা পরিষৎ খাড়া রহিয়াছে।

"বাঙ্গালা দেশেও এখন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একের অধিক পরিষৎ স্থাপনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। সাহিত্যপরিষৎ শুধু সাহিত্য ও ব্যাকরণ লইয়া থাকুক। অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যার জন্য এক একটা পরিষৎ স্থাপিত হোক্।"

এই বক্তৃতায় অর্থশাস্ত্র পরিষৎ সম্বন্ধে তিনি কিছু আলোচনাও করেন।

১৩৩১ সনের অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক খসড়া বিনয়বাবু প্রথম সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তাহা লইয়া তিনি সকলকে আলোচনা করিতেও আহ্বান করেন। কিন্তু এযাবৎ তাহা লইয়া কোনপ্রকার আন্দোলন আলোচনা হয় নাই। "প্রবাসী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধটা এক্ষণে পুস্তিকাকারে বাহির হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, এই খসড়া পুনরায় উপস্থিত করিবার সময় আসিয়াছে। ইহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া এবং বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া আমরা এক অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালার কাগজগুলি এই অনুষ্ঠান-পত্রটি নিজ নিজ পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিলে ও ইহার সমালোচনা করিলে আহ্লাদিত হইব।

উদ্দেশ্য

১। বাঙ্গালা ভাষায় অর্থশাস্ত্রের চর্চ্চা কায়েম করা।

২। (ক) বাঙ্গালার
(খ) ভারতের
(গ) দুনিয়ার

আর্থিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসন্ধান করা।

কার্য্যপ্রণালী

১। স্কুলকলেজের অর্থশাস্ত্র পঠনপাঠনের উন্নতি ও বিস্তৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। দেশের ভিতর যে সব আর্থিক সমস্যা হাজির হয়, সেই সবের আলোচনা চলিবে।

৩। আলোচনা, তর্কপ্রশ্ন, বক্তৃতা, সম্মিলন, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের ভিতর অর্থশাস্ত্রে ও আর্থিক জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান ছড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। দেশের নানাকেন্দ্রে অর্থশাস্ত্র ও আর্থিক জীবন বিষয়ক বিদ্যাপীঠ, গ্রন্থশালা বক্তৃতা-ভবন, আলোচনা-গৃহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

৫। কলিকাতা ও মফঃস্বল হইতে প্রশ্ন আসিলে তার উত্তর দিতে হইবে।

বৃত্তি ব্যবস্থা

১। গবেষকেরা সব বাঙ্গালী হইবেন।

২। গবেষকদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৩। অন্ততঃ ৫ জন গবেষক বাহাল থাকিবেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের বৃত্তির ব্যবস্থা মাসে ২০০৲ টাকা। ৫ জন গবেষককে ৫ বছর পালন করিতে ৬০০০০৲ টাকা লাগিবে।

৪। গবেষকদের নিম্নলিখিত খরচগুলি পরিষৎ বহন করিবেন:—

(ক) গবেষণার জন্য দেশের নানা স্থানে ও নানা দেশে পর্য্যটন।

(খ) বিদেশে থাকাকালে খোরপোষ [পরীক্ষায় পাশ বা ডিগ্রীলাভে সাহায্য করা এই বৃত্তির উদ্দেশ্য নয়]।

আন্তর্জ্জাতিক ভাব ও কর্ম্মবিনিময়

১। বাকী ভারতের ও বিদেশের পরিষৎ সমূহের সঙ্গে ভাব ও কর্ম্ম বিনিময়ের সকল রকম ব্যবস্থা থাকিবে।

২। দুনিয়ার কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্যসচিবের আফিস্, বিশ্ব-বিদ্যালয়, পণ্ডিত-সঙ্ঘ শিল্প-পরিষৎ, ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়মণ্ডল, মজুরসমিতি, কিষাণসভা, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, পার্ল্যামেণ্ট ভবন ইত্যাদি চিন্তা ও কর্ম্মকেন্দ্র হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান ও অতীতের তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩। ভারতের নানাস্থানে বিদেশী কন্‌সাল, ব্যাঙ্ক, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বীমা-কোম্পানী, জাহাজ-কোম্পানী ইত্যাদির প্রতিনিধির সহিত বাঙ্গালী জাতির লেনদেন চালানোর পথ খুলিয়া দিতে হইবে।

৪। দেশের সমস্যাসম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের তর্কপ্রণালী ও মতামত চাহিয়া পাঠাইতে হইবে।

৫। বিদেশী বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীকে ভাড়া করিয়া আনা হইবে।

৬। দেশবিদেশের সঙ্গে গ্রন্থ-পত্রিকা ইত্যাদি বিনিময় হইবে।

সভ্য

১। কুড়ি বৎসরের অধিকবয়স্ক যে কোন ব্যক্তি (পুরুষ ও মহিলা) পরিষদের সভ্য হইতে পারিবে।

২। প্রত্যেক সভ্যকে বার্ষিক ৯৲ চাঁদা দিতে হইবে।

৩। ইঁহারা কি কি সুবিধা ভোগ করিবেন তা পরিচালক সমিতি স্থির করিবেন।

পরিচালক সমিতি

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক পরিচালক সমিতি গঠিত হইবে:—

১ অধ্যক্ষ ৫ বছরের জন্য নির্ব্বাচিত
১ গ্রন্থরক্ষক ঐ
৫ গবেষক ঐ

২৫ পরিষদের সভ্যগণ কর্ত্তৃক সাধারণ সভায় দুই বছরের জন্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি—মোট ৩২ জন।

২। পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের স্বরূপ নিম্নপ্রকার হইবে:—

ব্যাঙ্কার	২ জন
রেল-প্রতিনিধি	১ "
জাহাজ "	১ "
বীমা "	১ "
সমবায়সাধক	১ "
শিল্পপতি	১ "
এঞ্জিনিয়ার	১ "
রাসায়নিক	১ "
বৈজ্ঞানিক	১ "
চিকিৎসক	২ "
কর্পোরেশ্যনের প্রতিনিধি	১ "
মজুর প্রতিনিধি	১ "
কাগজ-সম্পাদক	১ "
সরকারী-প্রতিনিধি	১ "
বিদেশী কন্‌সাল	১ "
উকীল	১ "
ব্যারিষ্টার	১ "
ইতিহাসের অধ্যাপক	১ "
নৃতত্ত্বের "	১ "
পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব	১ "
অর্থশাস্ত্রের "	৩ "

৩। এই ২৫ ব্যক্তি সাধারণ সভ্যগণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু নির্ব্বাচন সাধারণ সভায় ভোট দ্বারা হইবে না। সভ্যদের তালিকাটা উপরি উক্ত শ্রেণী অনুসারে ছাপান হইবে ও প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে। সভ্যগণ সেই ছাপান তালিকা হইতে এইরূপ ২৫ জন ব্যক্তিকে নিজ নিজ ভোট দিয়া তাহা অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। প্রত্যেকটা ভোটের কাগজ শীলমোহর করা থাকিবে। অধ্যক্ষ এক সাধারণ সভায় সকল সভ্যের সম্মুখে এই কাগজগুলি উন্মোচন করিবেন।

৪। প্রত্যেক সভ্যের মোট ভোট দিবার ক্ষমতা ২৫। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে একের অধিক ভোট দেওয়া চলিবে না।

৫। এই ২৫ জন পরিচালক সমিতির অবৈতনিক কর্ম্মচারী হইবেন।

৬। ইঁহাদিগকে ৩ ভাগে ভাগ করা হইবে :—

(ক) স্বদেশজ্ঞ	(খ) বিদেশজ্ঞ	(গ) প্রতিনিধি
১। ব্যাঙ্ক	১। ইংল্যাণ্ড	১। বণিক সমাজ
২। মুদ্রা	২। আমেরিকা	২। মজুর সমাজ
৩। রেল	৩। ফ্রান্স	
৪। জাহাজ	৪। জার্ম্মাণি	
৫। বীমা	৫। রুশিয়া	
৬। স্বাস্থ্য	৬। ইতালি	
৭। জমিজমা	৭। জাপান	
৮। এঞ্জিনিয়ারিং	৮। তুরস্ক	
৯। আর্থিক রসায়ন		
১০। নগরশাসন		
১১। শিল্প-বাণিজ্য		

৭। পরিচালকেরা পরিষৎ-সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজের ভার লইবেন। বক্তৃতার ব্যবস্থা, দেশ-বিদেশের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-চালনা, গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশ তাঁদের নিত্যকর্ম্ম।

অধ্যক্ষ

১। ৩০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না।

২। অধ্যক্ষতার জন্য নিম্নলিখিত গুণাবলীর প্রয়োজন :—

(ক) অন্ততঃ ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা সম্বন্ধে চাক্ষুষ পরিচয়।

(খ) বঙ্গভাষায় অন্যূন ৫০০ পৃষ্ঠার মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ কেতাব প্রণয়ন।

(গ) ইংরাজী ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় নিয়মিতরূপে গ্রন্থ-পত্রিকা পাঠ ও পত্র ব্যবহারের ক্ষমতা।

৩। পরিচালক সমিতির নির্ব্বাচিত ২৫ জন সভ্য কর্ত্তৃক অধ্যক্ষ মনোনীত হইবেন। তাঁর কার্য্যকাল ৫ বছর।

৪। অধ্যক্ষের কার্য্যাবলী—

(ক) গবেষকদের কাজের তদ্বির করা

(খ) কাগজ পত্র প্রকাশ করা

(গ) গ্রন্থশালার তত্ত্বাবধান

(ঘ) গবেষক নিয়োগ

৫। অধ্যক্ষের মাসিক বেতন ৫০০৲ টাকা। ৫ বছরে তাঁকে দিতে হইবে ৩০,০০০৲ টাকা।

৬। অধ্যক্ষ পরিচালক সমিতির একজন সভ্য হইবেন, কিন্তু সভাপতিত্ব করিবেন না।

সহকারী অধ্যক্ষ

১। অধ্যক্ষ গবেষকদিগের মধ্যে একজনকে আপনার সহকারী মনোনীত করিবেন।

২। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে তিনি অধ্যক্ষের কাজ করিবেন।

গবেষক

১। সহকারী অধ্যক্ষকে ধরিয়া গবেষকের সংখ্যা ৫ জন।

২। ইহারা ৫ বছরের জন্য মনোনীত হইবেন।

৩। ইহাদের মনোনয়ন ভার অধ্যক্ষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

৪। পরিচালক সমিতি ঠিক করিয়া দিবেন কোন্ কোন্ বিষয়ে গবেষক বাহাল করিতে হইবে। কিন্তু কাহাকে কোন্ বিষয়ে নিযুক্ত করা হইবে তাহা অধ্যক্ষ স্থির করিবেন।

৫। সাধারণভাবে গবেষকদিগের কার্য্যাবলী পরিচালক সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৬। গবেষকদিগের বয়স ২৫।৩০ হইবে।

গ্রন্থ-রক্ষক

১। গ্রন্থরক্ষকও অধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। তাঁর বেতনের ব্যবস্থা গবেষকদের বৃত্তির তুল্য হইবে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

১। বাংলা ভাষায় আপাততঃ ১০ খানা বই ৫ বছরে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। প্রত্যেক কেতাবে অন্ততঃ ৫০০ পৃষ্ঠা থাকিবে।

৩। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ ক্লাসের পাঠ্যগ্রন্থের চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে না।

৪। গবেষকদিগকে লেখকরূপে ধরা হইবে না। গবেষকদের সহযোগে অধ্যক্ষ লেখকদিগকে ঢুঁড়িয়া বাহির করিবেন।

৫। লেখকদিগকে ফুরণ করিয়া পাণ্ডুলিপির উপর দক্ষিণা দেওয়া হইবে।

৬। প্রত্যেক গ্রন্থ ২০০ কপির কম ছাপানো হইবে না। লেখকের দক্ষিণা সহ প্রত্যেক বই প্রকাশের খরচ ১২০০৲ টাকার অনধিক হইবে।

৭। এই সব বিক্রয় ইত্যাদির অধিকার পরিষদের থাকিবে। লেখকেরা পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে এগুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। স্বত্বটা পরিষদের হইবে।

৮। নিম্নলিখিত ১০ বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে :—

১। ব্যাঙ্ক ২। রেল, জাহাজ ৩। বীমা
৪। জমিজমা ৫। কৃষি ও কৃষক ৬। পাট, চা, রবার
৭। অন্যান্য কাঁচামাল (খাদ্য ও অন্যবিধ) ৮। স্বাস্থ্য
৯। শিল্প-কারখানা ১০। আর্থিক রসায়ন।

গ্রন্থশালা ও পাঠাগার

১। গ্রন্থশালা ও পাঠাগারের নিয়মাবলী অধ্যক্ষ গবেষকদের ও গ্রন্থরক্ষকের সঙ্গে একযোগে তৈয়ারী করিবেন।

২। পরিষদের গ্রন্থশালায় অর্থশাস্ত্র ও আর্থিক জীবন-বিষয়ক গ্রন্থ, পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদি থাকিবে। প্রথমেই নগদ ৫০০০৲ দরকার।

৩। বার্ষিক অন্যূন ৫০০৲ টাকার বই কেনা হইবে।

৪। পাঠাগারে বসিয়া যে কোনো লোক কেতাব ও কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করিবার অধিকার পাইবে।

৫। গ্রন্থরক্ষকের বহুভাষাবিদ্ হওয়া সঙ্গত।

খরচপত্র

	মাসিক	বার্ষিক	৫ বছরে
গ্রন্থপ্রকাশ	—	—	১২,০০০৲
গ্রন্থশালা	—	—	৭,৫০০৲
বৃত্তি (৫ জন গবেষক)	৫×২০০৲	৫×২৪০০৲	৬০,০০০৲
বেতন (১ গ্রন্থরক্ষা ও ১ অধ্যক্ষ)	৭০০৲	৮৪০০৲	৪২,০০০৲
৫ জন সহকারী ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় অভিজ্ঞ)	৪০০৲	৪,৮০০৲	২৪,০০০৲
কার্য্যালয়ের সরঞ্জাম	২০০৲	২,৪০০৲	১২,০০০৲
৫ জন সেবক (দপ্তরী সমেত)	১০০৲	১,২০০৲	৬,০০০৲
			১,৬৩,৫০০৲

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত খরচগুলি আছে :—

১। গবেষকদের ভ্রমণ-খরচ ও খোরপোষ

২। বিদেশী অধ্যাপক ইত্যাদির ভাড়া খরচ

৩। পরিষদের কোঠাবাড়ী

অর্থাৎ মোট অন্ততঃ ২ লক্ষ টাকা এখনই আবশ্যক।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

আমরা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বর্ত্তমান জগতের আর্থিক জীবনধারার প্রণালী আয়ত্ত করতে পারি নি। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে, বড় বড় জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর দ্বারা যে ধনোৎপাদন ভারতের সর্ব্বত্র হচ্ছে, তার বেশীর ভাগের উপরই আমাদের কোন হাত নেই। বড় বড় রেল কোম্পানী, ব্যাঙ্কিং কোম্পানী, বীমা কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী, চা বা কফির বাগান, নানা প্রকারের মাইনিং কোম্পানী—এ সকলগুলিরই অর্থ প্রায় বিদেশ হতেই এসে থাকে। এ কথা যে খুবই সত্য তার প্রমাণ হচ্ছে যে, বিদেশে রেজিষ্টারি করা যে সকল কোম্পানী ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭৮০ কোটি টাকা (অবশ্য এর সমস্তটাই যে ভারতে খাটান হয় তা নয়) আর ভারতে রেজিষ্টারি করা কোম্পানীগুলির মূলধন ১২৩ কোটি টাকা। আমরা বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাতে সাহস করি না—বড় বড় আর্থিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিই কেবল আমাদের হাতে। জমিজমা কিনে, বাড়ী করে কিংবা গহনা কিনে আমরা টাকা আটকিয়ে রাখতেই ভালবাসি। নানাপ্রকারের কাঁচা মাল ভারতে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হলেও, ভারতে মজুরের অভাব না থাকলেও, আমাদের শিক্ষিতদের মগজে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকলেও, আমরা বড় বড় কারখানা-শিল্পে টাকা খাটিয়ে দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়াতে অগ্রসর হই না। কারণ আমাদের অভাব প্রথমতঃ আর্থিক বিষয়ের চিন্তা করবার শক্তির এবং দ্বিতীয়তঃ বড় বড় কোম্পানী চালাবার উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে নি। আমরা যে সুযোগ হারিয়েছি, সেই সুযোগ বিদেশীরা নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। ফলে হয়েছে এই যে, তাদের ক্রোর ক্রোর টাকা এই দেশে খাটছে, ক্রোর ক্রোর টাকা তারা লাভ করে সাগরপারে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা হাতের কাছে লক্ষ্মী থাকলেও 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মরছি।

অর্থনীতির দিক্ থেকে দেখলে বৈদেশিক মূলধন যে একেবারে অপকারী বিবেচিত হয়, তা মোটেই নয়। বরং আর্থিক বিষয় পশ্চাৎপদ কোন দেশের পক্ষে বৈদেশিক মূলধন একান্ত আবশ্যক, যদি সেই দেশকে আর্থিক হিসাবে আধুনিক জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। একটী অনুন্নত দেশের পক্ষে আধুনিক কলকারখানার সাহায্যে কিরূপভাবে বিপুল পরিমাণ ধনোৎপাদন হয়, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব, যদি বৈদেশিক মূলধন এসে সে সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে সাহায্য না করে। আমরা আজ দেশে থেকেও কারখানাশিল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাচ্ছি, তা অসম্ভব হতো, যদি বিদেশীরা এই দেশে এসে নিজেদের টাকা খাটিয়ে ষ্টীমার, রেল, ব্যাঙ্ক, ট্রাম, এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে না তুলত। তা ছাড়া কারখানা শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে মজুরের সংখ্যা বাড়ে। কারখানার মজুরেরা চাষীদের চেয়ে বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে। তারা বেশী বুদ্ধিমান হয় ও আধুনিক জীবনের মূল তত্ত্বগুলি সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। এইসকল কারণে দেশের রাজনৈতিক উন্নতি আরও শীঘ্র হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বৈদেশিক মূলধন হতে আরও একটী বিশেষ উপকার হচ্ছে এই যে, নানাপ্রকার কলকারখানা দেশের মধ্যে ঐ মূলধনের সাহায্যে চলতে থাকলে নানাপ্রকার নূতন নূতন কাজকর্ম্মের সৃষ্টি হয়, সুতরাং দারিদ্র্য বা কর্ম্মশূন্যতা অনেক পরিমাণে কমে যায়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার দিক্ থেকে শেষোক্তটাই যে বিশেষ বাঞ্ছনীয় তা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁর 'ইকনমিক্ স্কিম্ ফর্ ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন।

কিন্তু বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য নেওয়ার এক অপ্রিয়

দিক্‌ও আছে। বিদেশীরা সাধারণতঃ টাকা ধার দিয়ে সুদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, তারা নিজেরাই টাকা খাটাতে চায়, আর যা লাভ হয় স্ব স্ব দেশে নিয়ে যেতে চায়, কিংবা সেই দেশেই আবার মূলধনরূপে খাটায়। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা যে দেশে টাকা খাটাচ্ছে সেই দেশের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হয়। কারণ তাদের ভয় যে, সেই দেশ স্বাধীন হলে তাদের পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে। অনেক বছরের পরিশ্রমের ফলে যা কিছু গড়েছিল সবই ছাড়তে হবে। বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে এ ছাড়া আরও কতকগুলি বিশেষ আপত্তির কথা আছে। বিদেশী কোম্পানীগুলি নিজেদেরই ডিরেক্টর মনোনীত করতে চায়। তারা দেশের সামরিক হিসাবে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি নিজেদের আয়ত্তে এনে ফেলে। আর দেশের খনি-গুলি—যা একবার ফুরলে আর পূরণ করবার উপায় নেই—তারা ক্রমে নিঃশেষ করে ফেলে। এই সমস্ত আপত্তি-গুলিই ভারতে যে বৈদেশিক পুঁজি নিয়োজিত হয়েছে তার যথাসম্ভব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর খাটে।

বৈদেশিক মূলধন থেকে উপকার আমরা যথেষ্ট পাই। কিন্তু অপকারের দিক্‌টাও বড় কম নয়। সুতরাং আমাদের বিচার করা দরকার কি করে আমরা এর খারাপ ফলগুলি যথাসম্ভব এড়িয়ে একে আমাদের কাজে লাগাতে পারি।

এই দেশের উপর বৈদেশিক মূলধনের আধিপত্যের (কন্ট্রোল) তারতম্যের অনুসারে 'এক্সটারন্যাল ক্যাপিট্যাল কমিটি' বৈদেশিক মূলধনকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) গবর্ণমেন্ট বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যে সমস্ত টাকা ধার করে আর জয়েন্টষ্টক কোম্পানীর ডিবেঞ্চার প্রভৃতি। এই শ্রেণীর মূলধনের জন্য পুঁজিপতি কেবল সুদ দাবী করতে পারে। (২) বৈদেশিক পুঁজিপতিরা যে সমস্ত টাকা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা-বাণিজ্যে বা উৎপাদনে খাটায়। এই শ্রেণী ও পরবর্তী শ্রেণীর জন্য পুঁজিপতিরা সুদের সঙ্গে লাভও পেয়ে থাকে। (৩) যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজিপতিরা গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা (যেমন 'বাউন্টি') পেয়ে বা খনি কি বন প্রভৃতির অধিকার পেয়ে টাকা খাটায়।

প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। এই প্রকারের মূলধন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, আর এর পরিমাণও কমে আসছে। অবশ্য এই প্রকারের মূলধন কমিয়ে আনা একান্ত আবশ্যক না হলেও তিনটী কারণে অবাঞ্ছনীয় নয়। (ক) গবর্ণমেন্টের বা মিউনিসিপ্যালিটির ঋণ দেশের লোকের হাতে থাকলে দেশবাসীর টাকা খাটাবার অভ্যাস বাড়বে। (খ) ঐ সকল ঋণপত্রগুলি ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা রেখে সহজেই ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য আবশ্যক টাকার পরিমাণ বাড়াতে পারা যাবে। (গ) মুদ্রা-বিনিময়ের জন্য যে লোকসান দিতে হয়, সেই লোকসানের হাত থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এই তিনটী কথা ভেবে দেখলে মনে হয় যে, যদি দেশের ভিতর ধার করতে কিছু বেশী সুদও দিতে হয়, তা হলেও গবর্ণমেন্টের ও মিউনিসি-প্যালিটিগুলির পক্ষে দেশে ধার করাই ভাল।

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে যে সব আপত্তির কথা বলা হয়েছে সেগুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মূলধন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কারণ এই দুই শ্রেণীর মূলধন পুঁজিপতিরা নিজেরাই খাটায়, সুদের সঙ্গে লাভও আদায় করে, আর যে দেশে টাকা খাটানো হচ্ছে সেই দেশের উপর ক্রমে ক্রমে প্রভুত্বও বিস্তার করে। আবার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মূলধনের মধ্যে ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলধনের পরিমাণই বেশী। এই জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধে 'এক্সটার-ন্যাল ক্যাপিট্যাল কমিটি'তে এই দেশের হয়ে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন যে, ভারতে যে সমস্ত নূতন জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কারবার করবে বা কারখানা খুলবে, তাদের সকলেরই এই দেশেই রেজেষ্টারি হওয়া দরকার এবং তাদের মূলধন এই দেশের মুদ্রাতেই প্রকাশিত হওয়া দরকার। অধিকন্তু তাদের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ডিরেক্টর এই দেশের লোক হওয়া এবং এদেশের লোকদের কল-কারখানার কাজ শিখাইবার জন্য তাদের বাধ্য করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রত্যেক কোম্পানীর শেয়ারের নির্দ্দিষ্ট অংশ কেবল ভারতীয়দের হাতেই থাকবে অথবা শেয়ারের আবেদন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল ভারতীয়দের কাছ থেকেই লওয়া হবে—শেয়ার সম্বন্ধে এই দুই প্রকারের

এক প্রকার বন্দোবস্ত করা উচিত। বৈদেশিক মূলধনের এদেশে আসবার পথে এই সকল বাধা সৃষ্টি করবার কথার মূলে এই ধারণা রয়েছে যে, এ দেশে যে পরিমাণ মূলধন অনিয়োজিত হয়ে আছে, তার পরিমাণ সামান্য নয়। সুতরাং আমাদের দেশে কারখানাশিল্পের বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দেশের পুঁজির উপর নির্ভর করা যেতে পারে। বৈদেশিক পুঁজি এ বিষয়ে কেবল গৌণ-স্থানই অধিকার করবে। গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ দেশের মধ্যে ঋণ তুলতে পারছেন (১৯১৩ সন হতে ১০ বৎসরে এই ঋণের পরিমাণ ১৪৫ ক্রোর টাকা থেকে ৩৫৮ ক্রোর টাকায় দাঁড়িয়েছে), ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির মূলধন যে পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে (১৯১৩ সন হতে ১০ বৎসরে এই মূলধনের পরিমাণ ৮০ ক্রোর টাকা থেকে ২৫৪ ক্রোর টাকায় দাঁড়িয়েছে), আর বৎসর বৎসর যে পরিমাণ সোনা রূপা ভারতে আমদানি হচ্ছে (১৯১৩ সন হতে ১০বৎসরে ভারতে মোট ৪৮২ কোটি টাকার সোনারূপা আমদানি হয়েছে), তাতে মনে হয় মুখ্যতঃ দেশের মূলধনের উপর নির্ভর করবার আশা একেবারে আকাশকুসুম নাও হতে পারে।

'এক্সটারন্যাল ক্যাপিট্যাল কমিটি' কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলধনের সম্বন্ধে কোনরূপ সর্তের বন্দোবস্তে রাজী ছিলেন না তাঁরা বলেছিলেন, উপরিউক্ত সর্তগুলি কাজে লাগানো অসম্ভব, আর যেখানে সম্ভব সেখানে ঐগুলিদ্বারা ভারতীয় পুঁজিপতিদেরই স্বার্থের হানি হবে। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে প্রধানতঃ এই কয়টী:—(১) ঐ সর্তগুলি কার্য্যকর হতে পারে কেবল নূতন কোম্পানীগুলির সম্বন্ধেই (২) জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা কমে গিয়ে প্রাইভেট ফার্ম্মের সংখ্যা বেড়ে যাবে (৩) ভারতীয়েরা শেয়ারের জন্য বেশী হারে সুদ দাবী করতে পারবে বটে, কিন্তু শেয়ার কেবল ভারতীয়দের কাছেই বিক্রী করা যাবে বলে শেয়ারের দাম কমে যাবে, এবং তা বেচাও শক্ত হবে (৪) জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলিকে গবর্ণমেণ্টের কড়া শাসনে থাকতে হবে, এবং (৫) অংশীদারদের ডিরেক্টার পছন্দ করার ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় উক্ত কমিটির মেম্বার ছিলেন। তিনি অধিকাংশ মেম্বারের সহিত তাঁর মতভেদ জানাবার সময় ঐ আপত্তিগুলির কথাও আলোচনা করেছিলেন। প্রথম আপত্তিটীর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ঐ সর্তগুলি অন্ততঃ ভবিষ্যতে যে সব নূতন কোম্পানী স্থাপিত হবে, সেগুলির সম্বন্ধে কার্য্যকর হবেই। সুতরাং বৈদেশিকদের এদেশের উপর যে আর্থিক আধিপত্য আছে তা যাতে আর না বাড়ে তা আমরা করতে পারবো। প্রাইভেট ফার্ম্মের পক্ষে বড় স্কেলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা অসম্ভব। সুতরাং দ্বিতীয় আপত্তিটীও ভিত্তিহীন। যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের শেয়ার ভারতীয়দের জন্য না রেখে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল ভারতীয়দেরই শেয়ারের আবেদন গ্রাহ্য করা হয়, তা হলে তৃতীয় আপত্তিটীর বিশেষ জোর থাকে না। চতুর্থ আপত্তিটী নিতান্তই অসার। দেশের লোক যদি চায় যে, গবর্ণমেণ্ট তাদের স্বার্থের জন্যই কোম্পানীগুলিকে কয়েকটী ব্যাপ্যারে শাসন করবে, তা হলে সে বিষয় গবর্ণমেণ্টের বা কোম্পানীগুলির আপত্তি থাকা উচিত নয়। পঞ্চম আপত্তিটীও অসার বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, উক্ত কমিটিই এক শ্রেণীর মূলধন (গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ-সাহায্য-প্রাপ্ত) সম্বন্ধে ঐ প্রকার ব্যবস্থা করতে দ্বিধা করেন নি। যাই হোক্, দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলধন সম্বন্ধে অন্ততঃ যদি এই ব্যবস্থা করা যায় যে, (ক) এই প্রকারের কোম্পানীগুলিকে ভারতবর্ষেই রেজিষ্টারি করতে হবে এবং (খ) শেয়ারের আবেদন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারতীয়দের কাছ থেকেই কেবল লওয়া হবে, তা হলে, আমাদের মনে হয়, দেশের স্বার্থও রক্ষা করা হবে, আর উপরি উক্ত আপত্তিগুলির একটীও খাটবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে উক্ত কমিটি প্রস্তাব করেছিলেন যে, (ক) ঐ মূলধনে চালিত কোম্পানীগুলির নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ডিরেক্টর যেন ভারতীয় হয়। (খ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য তাদের যেন বাধ্য করা হয় এবং (গ) কোম্পানীগুলি যেন এই দেশেই রেজিষ্টারি করা হয় ও তাদের মূলধন যেন এই দেশের মুদ্রাতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ সর্তগুলি কেবল যখন

গবর্মেণ্ট কোন কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য করেন তখনই প্রয়োগ করলে যথেষ্ট হবে না। যে কোন কোম্পানী ভারতের সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ করছে, তাদের সম্বন্ধে ঐ সর্ত্তগুলি প্রযুক্ত হওয়া দরকার। কারণ সংরক্ষণ-শুল্কের জন্য আমরা চড়া দরে জিনিস কিনতে বাধ্য হব, আর তার সমস্ত সুবিধা যদি এদেশীয়দের অধীন কোম্পানীগুলি ভোগ না করে বিদেশীয় মূলধনে স্থাপিত ভারতস্থিত কোম্পানী-গুলিই ভোগ করে, তা হলে সংরক্ষণ-শুল্কের একেবারেই কোন সার্থকতা থাকে না। উপরি উক্ত সর্ত্তগুলি আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে কতদূর যথেষ্ট সে সম্বন্ধেও আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। শ্রীযুক্ত ওয়াদিয়া ও যোশী তাঁদের 'ওয়েল্‌থ অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন যে, ঐ সর্ত্তগুলি মোটেই সন্তোষজনক নয়। এই দেশে রেজিষ্টারি করা হলেও কোম্পানীগুলির বেশীর ভাগ শেয়ারহোল্ডার বিদেশী হওয়া অসম্ভব নয়। বেশীর ভাগ শেয়ারহোল্ডার যদি বিদেশী হয়, তা হলে ভারতীয় ডিরেক্টরদের স্বাধীন-ভাবে কাজ করা অসম্ভব। আর কোম্পানীগুলি যদি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক হয়, তা হলে কেবল নিয়মের চাপে তা দিতে বাধ্য করা অসম্ভব। এই কথাগুলি ভেবে উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় প্রস্তাব করেছেন যে, যদি সত্য সত্যই বিশেষ সাহায্য-প্রাপ্ত কোম্পানীগুলির লাভ যাতে ভারতের বাহিরে না যায় তা করতে হয়, তা হলে ঐ প্রকার কোম্পানীগুলির যাতে কোন বিদেশী শেয়ারহোল্ডার একেবারেই না থাকে সেইরূপ আইন করা একান্ত আবশ্যক।

অনেকস্থলে গবর্ণমেণ্ট খনি বা বনগুলি নামমাত্র মূল্যে বিদেশীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। গবর্ণমেণ্ট স্বপক্ষে বলেন যে, ঐ সকল কার্য্যে ঝুঁকি অনেক, আর খনি বা বনগুলি অব্যবহৃত থাকলে দেশও আর্থিক হিসাবে অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্টাক্ষরে জানানো দরকার যে, আমরা যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে আমাদের জাতীয় বন-সম্পদ্ বা খনিজ-সম্পদ্ হারাতে রাজী নই। গবর্ণমেণ্ট যাতে এ বিষয়ে বিদেশীয়দের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন না করেন সে বিষয়েও আমাদের সজাগ হওয়া দরকার। অতীতে যে গবর্ণমেণ্ট অনেক বারই এইরূপ পক্ষপাতিতা দেখিয়েছেন, তা যাঁরা ভারতের আর্থিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করেন তাঁরা বেশ ভাল রকমেই জানেন।

যে কোন দেশের পক্ষেই বৈদেশিক মূলধন শাসন একটি মস্ত বড় সমস্যা। আবার যদি বৈদেশিক মূলধনের সহায়তা নিতে ইচ্ছুক দেশটী পরাধীন হয়, তা হ'লে সমস্যা আরও গুরুতর হয়। সুতরাং, (১) বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে যতদূর সম্ভব দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করা এবং (২) বৈদেশিক পুঁজিপতিদের প্রভাব যাতে রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায় না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা—এই দুইটী লক্ষ্য স্থির রেখে বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে আমাদের একটী জাতীয় নীতি স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীশিব চন্দ্র দত্ত, এম, এ

কলিকাতার প্রথম বাস্

১৯০৬ সনে হাবড়ার ডব্লিউ লিউইস্ কোম্পানী কলিকাতার সড়কে প্রথম বাস্ বাহির করে। তাদের বাস্ ছিল মাত্র ২টা।

১৯২০ সন ও পরে

১৯২০ সনে ওয়ালফোর্ড অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্ শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাসমণি বাজার অবধি বাস্ চালাইতে লাগিল। ১৯২১ সনে পথ মাণিকতলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। খিদিরপুর ব্রীজ ও গার্ডেনরীচের মধ্যেও বাস্ চলিতে লাগিল।

ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর দোতলা অম্‌নিবাস্ আজকাল কলিকাতার সকলের নিকট পরিচিত। ১৯২১ সনে এই কোম্পানী প্রথম এইরূপ ২টা বাস্ ইংলণ্ড হইতে আনায়। একটা আসিয়াছিল আগামাথা সুদ্ধ সম্পূর্ণ অবস্থায়। অন্যটার খোল ইত্যাদি এখানে তৈয়ারী করা হয়।

প্রায় এই সময়েই কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী নূতন নূতন বাস্ আনাইতে থাকে। এগুলি আনাইবার উদ্দেশ্য—

(১) যেখানে ট্রাম লাইন নাই, লোকে বাসে চড়িয়া সেখানে যাইতে পারিবে।

(২) অনেক সময় ট্রামের কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করে। অথবা বেশী বৃষ্টি হইয়া ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়। এই সব উৎপাতের কালে বাস হাতে থাকিলে সুরাহা হয়।

ভারতীয়ের তাঁবে বাস্

প্রথম "ভারতীয়" বাস্ চলিতে আরম্ভ করে ১৯২১ সনে। ভারতীয় বাসগুলির একত্রে নাম হয় "শিয়ালদহ ও রুকিয়া মোটর সার্ভিস"। এগুলি শিয়ালদহ-বেলিয়াঘাটা পাড়ি দিতে থাকে। তারপর কোম্পানী খিদিরপুর-গার্ডেন-রীচেও কাজ আরম্ভ করে। ট্রাম কোম্পানীর দৃষ্টান্ত উৎসাহজনক না হওয়ায় কোম্পানী ১৯২১ সনের পূর্ব্বে নিজেদের বাহন বাড়াইতে সাহস করে নাই।

যুদ্ধের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবসার অবস্থা সর্ব্বত্রই খারাপ ছিল। কাজেই ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট লিমিটেডের ব্যবসা টিম্ টিম্ করিয়া চলিতেছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত বাসের সংখ্যা বাড়াইতে পারে নাই। ১৯২৪ সনের শেষ দিকে এই কোম্পানী ১০খানা নূতন একতলা বাস্ ইংল্যণ্ড হইতে আমদানি করে। কিন্তু এগুলিতে চড়িয়া আজকালকার বাসে চড়ার আরাম পাওয়া যাইত না। অধিকাংশই বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কাজে আসিত।

১৮ বছর পরে

১৯২৪ সনের শেষ ভাগে কোন কোন ভারতীয় বাসের কর্ত্তা (কোম্পানী নয়) প্রথম অনুমতি পাইলেন যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কলিকাতার সড়কে ট্রাম চলা সত্বেও বাস চালাইতে পারেন।

বলিতে গেলে ১৯২৪-২৭, এই কয় বছর ধরিয়াই বাসের ব্যবসা চলিতেছে।

৪০ লাখ টাকায় ৪৫০ বাস্

এখন কলিকাতায় ৪৫০ খানা বাস্ চলিতেছে। বাসের প্লেটের নম্বর অবশ্য আরও বেশী। কারণ, পুলিশের কৃপায় ইতিমধ্যে ১৫০ খানা বাস কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ট্রামওয়ে কোম্পানীর বাস্ আছে	...	৬০টা
ওয়ালফোর্ড লিমিটেডের ,,	...	২২টা
এ, এ, শোভানের ,,	...	১৮টা
দাস ব্রাদার্স লিমিটেডের ,,	...	৭টা

বাকীগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পত্তি।

ভারতীয়েরা বাস্ ব্যবসায়ে প্রায় ৩০।৪০ লাখ টাকা ঢালিয়া দিয়াছে।

ট্রাম বনাম বাস্

১৯২৪ হইতে আরম্ভ হইয়া দেখিতে দেখিতে বাস্ ব্যবসাটা ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর ১৯২৬ সন হইতেই ট্রামের দুঃসময় আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথমে আসিল ট্রাম কর্ম্মচারীদের বিপুল ধর্ম্মঘট। এই ধর্ম্মঘট ট্রাম কোম্পানীকে ও সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতাবাসীকে বহুদিন ধরিয়া কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তা অনেকের মনে থাকিতে পারে।

গত ৩রা মে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে (১নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন) চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জন জি, বি, ষ্টোন বলেন,—

"আমাদের ট্রামের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির কারণ (১) হিন্দুমুসলমানের লড়াই, (২) অমনিবাসের প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া বিনিময়ের ইতর-বিশেষের জন্য ১০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে।"

বস্তুতঃ, ট্রামের সহিত বাসের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বেশ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গীন অবস্থার পরিচয় আমরা নানাদিক্ হইতে পাই।

লড়াইয়ের মূর্ত্তি

বাসের দিক্ হইতে লড়াইয়ের এক মূর্ত্তির উল্লেখ করি

তেছি। মাস চারেক আগে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে বাস্‌ওয়ালাদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভার মোদ্দা কথাটা এই যে, ট্রাম কোম্পানীকে আর নূতন লাইন পাতিতে দেওয়া না হয় ও কর্পোরেশন সাহায্য না করে।

বলা বাহুল্য, ট্রাম কোম্পানী চুপ করিয়া নাই। ১৯২৭ সনের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট অবধি বাস্‌কে হটাইবার চেষ্টার অনেক সাক্ষ্য আছে; যথা,—

(১) ক্রমাগত ভাড়া হ্রাস।

(২) ট্রামের গতিপথ ঘুরানো ফিরানো।

(৩) জুলাইয়ের ১লা তারিখে "জয়-রাইড" বা।০ আনা মাত্র দক্ষিণায় সমগ্র কলিকাতা শহর প্রদক্ষিণ করানো।

(৪) ট্রামকোম্পানীর বাসের সংখ্যা-বৃদ্ধি।

(৫) বাস্ কোম্পানীদের বাস্ কিনিয়া লইবার চেষ্টা।

লড়াইয়ের ফল

১৯২৪-২৫ সনে ট্রামের আয় ২,১৯,০৪৪ পাউণ্ড বা ৩৮,৮৫,৬৬০টাকা। ডিভিডেণ্ড ৭%

১৯২৫-২৬ সনে ১,৩২,৭২৩ পাউণ্ড বা ১৯,৯০,৮৪৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের আধা। ডিভিডেণ্ড ৫.৫%

১৯২৬-২৭ সনে ১,১৯,৫৭৪ পাউণ্ড বা ১৭,৯৩,৬১০৲ টাকা। ডিভিডেণ্ড ৫%।

১৯২৬ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ বছরে সমস্ত বাসের আয় একত্রে ৬৫,৭০,০০০৲ টাকা।

আমাদের লাভালাভ

বাস্ ও ট্রামের লড়াইয়ে একটা আক্ষেপের কথা শুনিতে পাই, আগে যে লোক চলাচল একা ট্রামে হইত, এখন তা দুইভাগ হইয়া গিয়াছে। তাতে পেট ভরিতেছে—না ট্রামের, না বাসের।

প্রথমতঃ, বাসের আগমনে কলিকাতার ব্যবসায়ের মূলধনের সহিত ৩০ লাখ টাকা অন্ততঃ যোগ হইয়াছে। এ টাকা অলস হইয়া পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯২৬-২৭ সনের হিসাবে জানিতেছি যে, ট্রাম ও বাস্ আরোহীদের হাত হইতে ৮৩,৬৩,৬১০৲টাকা—অর্থাৎ ৮৩½ লাখ টাকার উপর পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ এই পরিমাণ টাকা লোকের হাতে ঘোরাঘুরি করিতেছে। শুধু ট্রাম থাকিলে এত টাকা ঘোরাঘুরি করিতে পাইত কি? সম্ভবতঃ নয়; ধরা যাক্ ৪০ লাখ টাকা করিত। তা হলে ২৪½ লাখ টাকা বেশী চলিতেছে। অর্থাৎ কলিকাতা আজ মাসে ২ লাখ টাকায় বেশী ধনী।

এ ছাড়া শ্রমিক-নিয়োগ বেকার-সমাধান দ্রুতগতির জন্য লোকের সময় ও খরচ সংক্ষেপ, পরস্পর প্রতিযোগিতায় কম ভাড়ার প্রবর্ত্তন ইত্যাদি ত আছেই।

ষ্টেট্ রেলওয়ের কারখানা

ইষ্ট্ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও গ্রেট্-ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা ভারত সরকারের হাতে আসায় ব্রড্ গেজ রেলওয়ের অনেকটা অংশ রেলওয়ে বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে। এঞ্জিন ও রেলগাড়ী মেরামত করিবার উপায়গুলি সমশ্রেণীভুক্ত করা যায় কিনা তাহাই এখন একটা সমস্যা। গাড়ীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। কাজে কাজেইকারখানা-গৃহে উপযুক্ত ভাবে ও পরিমিত ব্যয়ে দ্রব্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কেমন করিয়া অল্প খরচে ও অল্প চেষ্টায় এঞ্জিন ও রেলগাড়ী মেরামতের বিরোধ বাঁচাইয়া সমপ্রাধান্য-বিশিষ্ট করিয়া কারখানার উন্নতি-সাধন করা যাইতে পারে, তাহার পন্থা আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে ষ্টেট্ রেলওয়েজ ওয়ার্কশপ-কমিটি নিযুক্ত হয়।

কমিটি ৭,৫০০ মাইল ঘুরিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কারখানাগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন।—

প্যারেল (এঞ্জিন) মাটুঙ্গা (যাত্রী গাড়ী ও মাল গাড়ী), লাহোর (এঞ্জিন, যাত্রী ও মাল গাড়ী), রাওলপিণ্ডি (ঐ), কাঁচরাপাড়া (ঐ), সৈদপুর (ঐ—মিটার গেজ), জামালপুর (এঞ্জিন), লিলুয়া (যাত্রী ও মাল গাড়ী), ঝান্সী (এঞ্জিন, যাত্রী ও মাল গাড়ী) এবং লক্ষ্ণৌ (ঐ)।

প্রধান রেলওয়ে কারখানাগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য

কমিটি কারখানাগুলি সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্যে বলিয়াছেন, নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের মোঘলপুরা (লাহোর) স্থিত প্রধান কারখানাগুলি নব্য, সুচারুভাবে স্থাপিত এবং সুন্দর সাজসরঞ্জামবিশিষ্ট। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের স্বল্পতা, সমস্ত রকম প্ল্যানিং ও উন্নতির অভাব, সম্পন্ন কাজের অনুপযুক্ত তদারক এবং দোষাবহ বোনাস্ প্রথায় সমস্ত সুবিধা মাটি করিয়া দিতেছে। রাওলপিণ্ডি, সুক্কুর ও করাচির সহকারী কারখানাগুলিতে এখনও অনেক করিবার আছে।

জামালপুরস্থ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এঞ্জিন কারখানায় ইস্পাতের যন্ত্র, রোলিং মিল, পয়েণ্টস ও ক্রসিংস তৈয়ারীর প্রকাণ্ড সরঞ্জাম রহিয়াছে। সেগুলি বেশ সুন্দর স্থানেও স্থাপিত; কিন্তু পুরাতন, যা-তা করিয়া বসান, এবং গায়ে গায়ে লাগানো। একটি রাসায়নিক ও ধাতু নিষ্কর্ষের ল্যাবরেটরী আছে, কিন্তু প্ল্যানিং অথবা প্রোগ্রেস-বিভাগ নাই। লিলুয়ার যাত্রী ও মালবাহক গাড়ীর কারখানা অনেকটা নব্য এবং সুচারুভাবে স্থাপিত। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বডি সেক্‌শনের প্রচুর উৎপাদন প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু মেরামতী কাজের তেমন মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। ষ্টোরস্-প্রথা দোষাবহ।

লক্ষ্ণৌস্থ প্রাচীন আউদ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের এঞ্জিন-কারখানা সুন্দর সাজসরঞ্জাম-বিশিষ্ট। তাহাদের সংস্থানও সন্তোষজনক, কিন্তু মাল ও যাত্রী গাড়ীর কারখানা তেমন নহে। তাহাদের মেরামত ও রঞ্জনের মধ্যে সমতা (ব্যালান্স) দোষাবহ।

প্যারেল (বোম্বাই) স্থিত গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলা রেলওয়ের কারখানাগুলিতে প্ল্যানিং, প্রোগ্রেস ও উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এঞ্জিন মেরামতের উপযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। কাজের ঠিকঠাক মাপ লওয়া হইয়া থাকে। ষ্টোরস্ ব্যবস্থা সুন্দর এবং ধাতু নিষ্কর্ষের একটি ল্যাবরেটরী আছে। শ্রমশক্তি ব্যয়বাহুল্যকর এবং অরক্ষণীয়। এবিষয়ে ঝান্সীর এঞ্জিন কারখানায় বেশ সুবিধা আছে। সংস্থান ও সাজসরঞ্জামের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শেষোক্তটিতে মেরামতের কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। মাটুঙ্গার যাত্রী ও মালবাহক গাড়ীর কারখানা অল্পদিন সংস্থাপিত। সাজসরঞ্জাম দীন। ব্যবস্থার উন্নতি আরো করা চাই। শ্রমব্যয় সাঙ্ঘাতিক।

কাঁচরাপাড়া ও সৈদপুরস্থ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের এঞ্জিন-কারখানা প্রাচীন ও বে-রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বোক্তের সাজসরঞ্জাম অপেক্ষাকৃত ভাল এবং নূতনভাবে গঠিত হইতেছে। ষ্টোরসের ব্যবস্থা ভাল। কাঁচরাপাড়ার যাত্রী ও মালবাহক গাড়ীর কারখানা অনেকটা নূতন, প্রকাণ্ড আকারের এবং ষ্টেট রেলওয়ের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করাতের কল-বিশিষ্ট। কিন্তু অনেকগুলি কারখানার মধ্যে সমতা নাই বলিয়া কার্য্যকাল অল্প।

বে-হিসাবী পরিচালনা

ষ্টেট্-রেলওয়ের বর্ত্তমান কারখানাগুলিতে গাড়ীগুলির মেরামত প্রভৃতি বেশ ভালভাবেই করা হয়; কিন্তু দুই এক জায়গা বাদে আর কোথাও হিসাবমত বা তাড়াতাড়ি তাহা সম্পাদিত হয় না। তাহার কারণ, তদারকের অভাব, অপূর্ণ সরঞ্জাম, কদর্য্য সংস্থাপন এবং সর্ব্বোপরি রীতিমত কাজ করিবার জন্য উপযুক্ত আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার অভাব। সাধারণতঃ, ষ্টেট্ রেলওয়ের কারখানাগুলিতে মেরামতের তালিকা নাই। কাজের প্ল্যানিং ও প্রোগ্রেসিং নাই, তদ্বির নাই এবং পরিমাণ করিবার কোনো নিয়ম নাই। এইগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান কারখানাগুলিকে নূতনভাবে ঢালাই করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে প্রসারিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দেওয়া হইয়াছে:—

নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে। করাচি এবং রাওলপিণ্ডির কারখানাগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

সুক্কুরের কারখানাকে ভাঙ্গিয়া একেবারে নূতন করিয়া আধুনিক প্রণালীতে গঠিত করিতে হইবে। তাহাতে গাড়ী মেরামত করিবার চল্লিশটি খাত এমনভাবে থাকা চাই, যাহাতে তাহা আশীটা পর্য্যন্ত বাড়ান যাইতে পারে।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে। লক্ষৌতে এখন নূতন ভাবে গঠনকার্য্য চলিতেছে। তাহা যাহাতে বর্ত্তমানের অভাব মিটাইতে পারে, এমন করা চাই। জামালপুরকে নূতনভাবে গড়িতে হইবে।

গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে।—প্যারেল ও ঝান্সীর কারখানাগুলি বর্ত্তমানের উপযোগী।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে। কাঁচরাপাড়ার কারখানাগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব পুনর্গঠিত করা উচিত। তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার পক্ষে বর্ত্তমানের ব্যবস্থা নিতান্তই অনুপযোগী। সৈদপুরের কারখানাগুলি অতি কদর্য্যভাবে স্থাপিত। তাহাদিগকে পুনর্গঠিত করা কর্ত্তব্য।

যাত্রী ও মাল গাড়ীর কারখানা

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে। করাচি ও রাওলপিণ্ডির যাত্রী গাড়ীর মেরামতী কারখানাগুলিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। সুক্কুরে নব্য ধরণের মেরামতী কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। অন্যান্য সহকারী-কারখানায় যে সমস্ত যাত্রী গাড়ী পূর্ব্বে মেরামত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার মেরামত করিতে হইলে এবং নূতন গাড়ী প্রস্তুত করিতে হইলে, এইখানে আনিতে হইবে। মোঘলপুরায় আজকাল যে কারখানা আছে, তাহা ছাড়া আরো সু-সরঞ্জামবিশিষ্ট মালবাহক গাড়ীর মেরামতী কারখানা চাই। যথা—

রাওলপিণ্ডি ... ৪০ খানি মালবাহক গাড়ীর জন্য
সুক্কুর ... ৫০ " "
করাচি ... ১০০ " "

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে। লিলুয়ায় গাড়ী মেরামতের কাজ যতদূর সম্ভব কমাইতে হইবে। নূতন গাড়ী নির্ম্মাণের দিকে এই কারখানার সম্পূর্ণ ঝোঁক দেওয়া কর্ত্তব্য। এখানে মালবাহক গাড়ী মেরামতের জায়গা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াইতে হইবে। লক্ষৌ ও অণ্ডালের মালবাহক গাড়ী নির্ম্মাণের ক্ষমতা বাড়াইয়া যাহাতে আরো ৩০০ গাড়ীর জায়গা সেখানে হয়, তাহা করিতে হইবে।

গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে। নিকটবর্ত্তী ইস্পাত তৈয়ারীর কারখানার অংশ ব্যবহার করিয়া মাটুঙ্গায় গাড়ী তৈয়ারীর জায়গা বাড়াইতে হইবে। ঝান্সীরও সেইরূপ বাড়াইতে হইবে। কিন্তু তদ্বিষয়ক প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে খরচ বেশী পড়িবে। তাই কিছু কাটছাঁট করা চাই। মাটুঙ্গার মালবাহক গাড়ী মেরামতের জায়গা ৭২ হইতে ১০৫ করিতে হইবে। ঝান্সী ও ভুসোয়ালে ঐরূপ বাড়াইয়া মোট সংখ্যা ২০০ পর্য্যন্ত করা কর্ত্তব্য।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে। কাজের অনুপাতে কাঁচরাপাড়ার যাত্রীবাহক গাড়ী মেরামতের জায়গা বড়ই কম। সংস্কার করিতে হইলে চাকা এবং যন্ত্র কারখানার ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। মালবাহক গাড়ী মেরামতের কারখানা আকারে বর্ত্তমানের দ্বিগুণ হওয়া চাই। সৈদপুরের কারখানাগুলি পুরাতন এবং কদর্য্যভাবে স্থাপিত বলিয়া পুনর্গঠিত করা আবশ্যক।

অধিকসংখ্যক গাড়ী রাখিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান কারখানাগুলির জনশক্তি এবং যন্ত্রশক্তি বাড়াইবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কমিটি বলেন :—বিভিন্ন রেলওয়ে বিভাগের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক কারখানার বিস্তৃতি এবং পুনর্গঠনের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে, তাহা আগামী দশ বৎসরের আনুমানিক আবশ্যকতার দিকে নজর রাখিয়া পরীক্ষিত ও সমালোচিত হইয়াছে।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে। জামালপুরের পুনর্গঠন প্রস্তাব পুনর্ব্বার বিবেচিত হওয়া উচিত। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে সমস্ত কারখানার পুনর্গঠন চাহেন, কিন্তু তাহা দরকার বলিয়া মনে হয় না। প্রস্তাবিত খাতের সংখ্যা ৭০ পর্য্যন্ত কমান যাইতে পারে এবং প্রথমতঃ বর্ত্তমান কারখানাগুলির মধ্যবর্ত্তী পুরাতন বাড়ীটা পুনর্গঠিত হইতে পারে।

লক্ষৌয়ের সহকারী-কারখানাগুলির পুনর্গঠনে বিস্তর খরচ পড়িবে। কিন্তু কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর কিছু কাটছাঁট করা যায় না। হস্ত বা যন্ত্র দ্বারা তৈয়ারীর কাজ যতদূর সম্ভব জামালপুরে চালান কর্ত্তব্য।

গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা রেলওয়ে। প্যারেলে কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক নাই। কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক এঞ্জিন যত বাড়িবে, তত বাষ্পীয় এঞ্জিনের খাতের সংখ্যা কমাইতে হইবে। ঝান্সীর পুনর্গঠন শীঘ্রই আরম্ভ করিতে হইবে।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে। কাঁচরাপাড়ার পুনর্গঠন-প্রস্তাবে কতকগুলি সহকারী কারখানা অতিবেশী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, তাহাদিগকে কমান হইয়াছে।

যাহা অনুমোদন করা হইয়াছে, তাহাতেই সৈদপুরের ভবিষ্যৎ অভাব মিটিবে।

নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে। সুক্কুরে আরো যাত্রী গাড়ী মেরামতের জায়গা বাড়াইতে হইবে। রাওলপিণ্ডি, করাচি এবং সুক্কুরে যখন ও যেমন দরকার হয়, তদনুসারে মালবাহক গাড়ী মেরামতের অধিকতর সুবিধা থাকা কর্ত্তব্য।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে। লক্ষ্ণৌতে আরো যাত্রী গাড়ী মেরামতের জায়গা রাখিতে হইবে। মাল গাড়ী মেরামতের কারখানা আরো বিস্তৃত করিতে হইলে, তাহা লিলুয়া, লক্ষ্ণৌ অথবা অণ্ডালে করিতে হইবে।

গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে। যাহা অনুমোদন করা হইয়াছে, তাহাতে আগামী দশ বৎসরের অভাব মিটিবে।

খণ্ড খণ্ড অংশ বড় বড় কারখানায় এক স্থানে হওয়া উচিত, তাহা হইলে মেরামতী কারখানাগুলি এই সব কাজ হইতে রেহাই পায়। এতৎসম্বন্ধে কমিটি বলেন,—

জামালপুর ও ঝান্সীতে ঐরূপে কাজ হইতে পারিবে বলিয়া অনুমোদন করা হইয়াছে, তবে ঐরূপ করিতে হইলে মেরামতী কারখানায় প্রচুর যন্ত্রপাতি রাখা আবশ্যক, যাহাতে বিশেষ দরকারী বা অনাদর্শ (নন-ষ্ট্যাণ্ডার্ড) বস্তুগুলির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে।

নিম্নশ্রেণীর চারি চাকার কোচিং গাড়ী নির্ম্মাণের কাজ লিলুয়ায় হইবে (লিলুয়ার ক্ষমতার অতীত হইলে লাহোর তাহাকে সাহায্য করিবে) এবং অন্যান্য বিবিধ চারি চাকার গাড়ী কাঁচরাপাড়াতেই হইবে।

রেলওয়ে কারখানায় বোগী গাড়ীর তলাকার ফ্রেম অনুমোদিত হইয়াছে। তাহাতে খরচ কম পড়িবে এবং তাহা বাহির হইতে আনিতে গিয়া যে কাজের ক্ষতি হয়, তাহাও রহিত হইবে।

স্বদেশ-জাত দ্রব্যের ব্যবহার

একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীন দ্রব্য প্রস্তুতকরণের কারখানার আপাততঃ কোন সুবিধা নাই। ঐ কর্ম্মকে কোন স্থলে কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে, প্রথমে রেল গাড়ীর সমস্ত রকম দফাগুলি আদর্শস্বরূপ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যকার দূরত্বও একটা কঠিন সমস্যা। সুতরাং এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করা হইল।

কারখানায় ব্যবহার করিবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি করা হয়, তাহাদের অধিকাংশই ভারতবর্ষে তৈয়ারী হয় না বা হইতে পারে না—যথা চাকা, টায়ার, নল এবং রবারের দ্রব্য। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য এই দেশে পাওয়া যায় এবং ১৯২৪ সনের নূতন ষ্টোর্স্ পার্চেজ্ আইন অনুসারে কার্য্য হইতেছে। তাহাতেই গভর্ণমেণ্টের নীতি কি তাহা প্রকাশিত আছে। বিশেষ রকম ইস্পাতের দ্রব্য এবং গাড়ীর তলাকার ফ্রেম দেশে তৈয়ারী করিবার পক্ষে মত দেওয়া যাইতেছে এবং বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে যে, ভারতীয় ষ্টোর্স্ বিভাগ যেন সমস্ত রেলওয়েকে জানাইয়া দেন, দেশীয় জিনিষগুলি অসংস্কৃত বা সংস্কৃত অবস্থায় কোথায় কোথায় পাওয়া যায়।

ষ্টেট্ রেলওয়েগুলি তাঁহাদের কারখানায় গাড়ীর খণ্ড খণ্ড অংশগুলি প্রয়োজনমত তৈয়ারী করিয়া লন। বিশেষ কারণবশতঃ সেই সব প্রস্তুত করিতে না পারিলে তাঁহারা বাহির হইতে কিনিয়া থাকেন। 'মেরামতী' ও "প্রস্তুত করণের" মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, বাহিরের দোকানগুলি জিনিষ পাঠাইতে দেরী করিলে অল্প খরচে কাজ চালান বড়ই কঠিন হয়। সুতরাং নিজেদের প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সর্ব্বদা ভাল। বিশেষতঃ রেলওয়ে কারখানাগুলির যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহারা অল্প খরচে কাজ করাইতে পারেন এবং অসংস্কৃত দ্রব্যও কম মূল্যে কিনিতে পারেন। বাহিরের বেসরকারী দোকানগুলির সেরূপ করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং প্রতিযোগিতায় কারখানাগুলিরই জয়। বাহিরের

দোকানগুলি যে দাম উল্লেখ করে তাহার সহিত রেলওয়ের দাম তুলনীয় নয়, কিন্তু তুলনীয় করিয়া তোলা অসম্ভব নহে।

এতদ্ব্যতীত কমিটি আরো কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাও প্রণিধানযোগ্য। যথা :—

(১) চল্‌তি গাড়ী মেরামতের জন্য যে সমস্ত আস্তানা আছে, সেখানে কেবলমাত্র চল্‌তি মেরামতই (রানিং রিপেয়ার) চলিবে। কিন্তু কারখানায় যে সমস্ত মেরামত ভালরূপে চলিতে পারে, তাহা সেখানে হওয়া উচিত নহে।

(২) সমস্ত নূতন কারখানায় অধিকতর শক্তির উত্তোলন-যন্ত্র থাকা উচিত, যাহাতে গাড়ীর আকার ও ওজন বাড়িলে কার্য্যকর হয়।

(৩) কারখানার সঙ্গে সঙ্গে ধাতু-নিকর্ষণ ল্যাবরেটরী থাকা একান্ত আবশ্যক।

(৪) ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কাজ না করাইয়া এঞ্জিনের বয়লারগুলাকে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর কাজ করাইয়াই রেহাই দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে অর্থের দিক্ দিয়াও সুবিধা।

(৫) প্রত্যেক মজুরের কাজের ঠিক সময় না ধরিয়া বোনাস্-পদ্ধতিতে যে মজুরি দেওয়া হয়, তাহা এবং খণ্ড কাজ উভয়েই ব্যয়াধিক্য হইয়া থাকে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের পদ্ধতিটাকে বদলাইবার জন্য বলা যাইতেছে।

(৬) ষ্টোর-রক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলাম আবশ্যক। তাহা না হইলে দ্রব্য-ব্যবহারে মিতব্যয়িতা কিছুতেই দেখা দিবে না।

নোয়াখালিতে শিল্প-সমবায়

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত

কুটীর শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শোচনীয় আর্থিক অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগে এক নোয়াখালি জিলা হইতেই বৎসরে দশ লাখ টাকার অধিক কাপড় রপ্তানি হইত। আজ ইহা আমাদের নিকট আরব্যোপন্যাসের কাহিনী বলিয়া মনে হইতে পারে। এখনও নোয়াখালিতে কয়েকটী খুব বড় বড় কুটীর শিল্পের মাল-মসলা পড়িয়া রহিয়াছে। উপযুক্ত লোকের দ্বারা সেগুলিকে সমবায় প্রণালীতে গড়িয়া তুলিতে পারিলে এই অতি দরিদ্র নিরন্ন জেলার সহস্র সহস্র লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারে। নিম্নে কয়েকটী শিল্প সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) চাটাইয়ের ব্যবসায়

ফেণী, মুহুরীগঞ্জ, কাজিলপুর প্রভৃতি ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে শত শত পরিবার ধাড়া চিকনী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া অন্নসংস্থান করিতেছে। অধিকাংশ মালই চট্টগ্রাম হইয়া আকিয়াব ও রেঙ্গুনে যায়। নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। এই শিল্পে ৩৲।৪৲ টাকা মূলধনই যথেষ্ট। স্ত্রীলোকগণই অধিকাংশ কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু চাটাই রপ্তানির সমগ্র ব্যবসায়টী মাত্র ৩।৪ জন ব্যবসায়ীর মুঠার ভিতরে রহিয়াছে। তাহারা গৃহস্থদিগকে সামান্য কিছু দাদন দিয়া সারা বৎসরের জন্য আটকাইয়া রাখে এবং তৈয়ারী মাল অত্যন্ত কম মূল্যে খরিদ করে। অপরদিকে তাহারা রেঙ্গুনের ব্যবসায়ীদিগকে খুব চড়া দামে মাল সরবরাহ করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। এই রক্তশোষক মধ্যবর্ত্তী পাইকারদিগকে সরাইয়া তৎস্থানে সমবায় সমিতি স্থাপন করিলে সমগ্র লাভই দরিদ্র শিল্পীদিগের হাতে থাকিয়া যায়। এই সমবায় সমিতি নিজেরাই রেঙ্গুন ও আকিয়াবের সহিত রপ্তানির কাজ চালাইতে পারে। বর্ত্তমানে রপ্তানিকারক পাইকারদের মধ্যে কেহ কেহ বৎসরে প্রায় দুই লাখ টাকার মাল চালান করিয়া থাকে। ইহা হইতেই এই শিল্পটী কত বড় অনুমান করা যাইতে পারে।

(২) নারিকেলের দড়ি

নোয়াখালিতে প্রচুর নারিকেল জন্মিয়া থাকে; কিন্তু নারিকেলের ছোবড়াগুলি কোনও কাজেই লাগান হয় না। বোধ হয় অনেক লক্ষ টাকার মাল এভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ ভারতের মালবার উপকূলের প্রায় সর্ব্বত্রই নারিকেলের আঁশ হইতে দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা সে অঞ্চলের একটী প্রধান কুটীর শিল্প। মান্দ্রাজ হইতে কয়েকজন ভাল দড়ি-প্রস্তুত-কারক আনাইলে নোয়াখালির নারিকেল-বহুল স্থানের সর্ব্বত্রই এই শিল্পটার প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডেরই অগ্রণী হওয়া উচিত।

(৩) শণ সূতার ব্যবসায়

নোয়াখালির অনেক স্থানে দাস, নমঃশূদ্র, জালিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শণ হইতে সূতা কাটিয়া জাল প্রস্তুত করার শিল্প প্রচলিত আছে। ইহাদের তৈয়ারী জাল বরিশাল, ফরিদপুর, এমন কি পশ্চিম বাংলায় পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। কিন্তু শিল্পিগণ দরিদ্র ও সঙ্ঘবদ্ধ নহে বলিয়া সস্তায় শণ সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে শণ সস্তায় বাজারে কিনিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিতে পারিলে এই ব্যবসায়টার বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীর সীমার মধ্যেই পাঠানটুলীতে একটী সমবায় দড়িপ্রস্তুতকারক সমিতি আছে। ঐ সমিতির অন্তর্গত গৃহস্থগণ শণ হইতে দড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। সমিতির গুদামে শণ সঞ্চিত থাকে। উহার অগ্নিবীমা করা আছে। এই সমিতির তৈয়ারী দড়ি মালয় ষ্টেট্‌সে পর্য্যন্ত চালান হইয়া থাকে। গত বৎসর প্রায় ৫০ হাজার টাকার দড়ি প্রস্তুত ও বিক্রয় হইয়াছিল। যাহা চট্টগ্রামে সম্ভব হইয়াছে তাহা নোয়াখালিরও নানা স্থানে সম্ভব হইতে পারে।

(৪) বস্ত্র-শিল্প

ইহা নোয়াখালির সর্ব্বপ্রধান শিল্প। এখনও বৎসরে অন্ততঃ ৪।৫ লাখ টাকার তাঁতের কাপড় এ জেলা হইতে বাহিরে রপ্তানি হয়। চৌমোহানী, সোনাপুর ও ফেণীর তাঁতের কাপড়ের ব্যবসায় যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। চৌমোহানী অঞ্চলের তাঁতীরা একত্র হইয়া চৌমোহানীতে একটী সমবায় রঞ্জন সমিতি করিতে পারে। উহাতে ভাল এক্সপার্টের তত্ত্বাবধানে সূতা ও কাপড়ে রং ও ছাপের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে রঞ্জন-শিল্পের কাজও ভাল হইবে এবং ইহার সমগ্র লাভও তাঁতীদিগের হাতেই থাকিবে। ইহা করিতে হইলে সর্ব্বদা ২।৩ জন ছাত্রকে কানপুরের সরকারী রঞ্জন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তৈয়ারী করিয়া আনা উচিত। লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, বেরিলি প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট রং ও ছাপের কাজ হইয়া থাকে। সেখান হইতেও শিল্পী আনাইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

নোয়াখালিতে, বিশেষতঃ জেলার পূর্ব্বাংশে, চরখা ও খদ্দর-শিল্পের বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে। রীতিমত ব্যবস্থা করিতে পারিলে এক ফেণী সবডিভিসন হইতেই বৎসরে ৪।৫ লক্ষ টাকার খদ্দর উৎপাদন করা যাইতে পারে। সস্তার মরসুমে প্রচুর পরিমাণে কাপাস সংগ্রহ করার কোনও ব্যবস্থা না থাকাতেই এখানে খদ্দর ব্যবসায়ের তেমন উন্নতি হইতেছে না এবং খদ্দরের মূল্যও কমাইতে পারা যাইতেছে না। ফেণীতে একটী সমবায় তুলার দোকান স্থাপিত হইলে এ অঞ্চলে খদ্দর ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইত। চট্টগ্রাম, রামগড়, বিলনিয়া, উদয়পুর প্রভৃতি স্থান হইতে কাপাস সংগ্রহ করিয়া ফেণীতে সঞ্চয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে,—যদি কোন সমবায়-অনুষ্ঠান পেছনে থাকে।

এতদ্ব্যতীত নোয়াখালির ধান, পাট, নারিকেল, সুপারি, ডিম প্রভৃতির ব্যবসায়ও সমবায়-প্রণালীতে সংগঠিত করিলে দরিদ্র কৃষকের আয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যাইবে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবন গঠনের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এইরূপ অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ মূল্য আছে। আয়রল্যাণ্ড, ডেন্মার্ক, জার্ম্মাণি, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে সমবায় প্রণালী পল্লী সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। দরিদ্র

কৃষককে নানা প্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাঁড়াইতে শিখাইয়াছে। সর্ব্বোপরি শ্রমিক ও কৃষকের ভিতরে একতা, আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছে। পাইকার, মহাজন ও বিদেশী জমীদারের শোষণে জর্জ্জরিত দরিদ্র নোয়াখালি জেলার পক্ষে সমবায়ের মূল্য অত্যন্ত অধিক।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

১৯২৭ সনের মে মাসে কয়টা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী ভারতে মোতায়েন হইয়াছে? ইহাদের স্বরূপ কি? পুঁজিপাটাই বা কত?

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী লইয়া একটু আলোচনা করা যাক্। বাঙ্গালীর ছেলে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর মর্ম্ম বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। মাসে মাসে অনেকগুলি করিয়া কোম্পানী খাড়া করিতেছে। এইগুলির আলোচনা দ্বারা বাঙ্গালা ও ভারতের ধনদৌলতের এক নূতন মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিবে।

১০ কোটি টাকার ৫১টা কোম্পানী

মে মাসে রেজিষ্ট্রী হইয়াছে ৫১টা কোম্পানী। অনুমোদিত পুঁজিপাটা একত্রে ১২৪ লাখ টাকা। এপ্রিল মাসে কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল ৪১টা। কিন্তু পুঁজিপাটা ছিল ১৮৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় ২৪.৩% বাড়িয়াছে। আর পুঁজিপাটা ৩৩% কমিয়াছে।

গত বছর মে মাসে কোম্পানী খোলা হইয়াছিল ২৮টা। তাদের অনুমোদিত পুঁজিপাটা একত্রে ছিল ৬৬ লাখ টাকা। সুতরাং ঠিক এক বছরে কোম্পানীর সংখ্যা ৮২.১৪% বাড়িয়াছে। আর পুঁজিপাটা বাড়িয়াছে প্রায় ৮৮%।

দেউলিয়া কোম্পানী

২৫টা কোম্পানী এই মাসে দেউলিয়া হইয়া উবিয়া গিয়াছে। পুঁজিপাটার দাম ১২২ লাখ টাকা। ১লা মের পূর্ব্বেই ১৩৪ লাখ টাকার ১২টা কোম্পানী লাল্‌বাতি জ্বালাইয়াছে। কিন্তু তারা মে মাসে উবিয়া যায়।

ভারতের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির অনুমোদিত পুঁজিপাটায় নিট্ ২৫ লাখ টাকার ঘাটতি হইয়াছে।

অগ্রগামী বাঙ্গালা

ভারতের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহে কোন্ দেশের হিস্যা কত তা নীচে দেওয়া যাইতেছে—

দেশের নাম	কোম্পানীর সংখ্যা	পুঁজিপাটার পরিমাণ
বাঙ্গালা	৩০	৪১,৭১,০০০ টাকা
মান্দ্রাজ	৪	১৮,৩০,০০০ "
বোম্বাই	৪	১৮,৪০,০০০ "
যুক্তপ্রদেশ	৫	২৭,০০,০০০ "
বিহার ও উড়িষ্যা	২	১,৫০,০০০ "
পাঞ্জাব	১	১,০০,০০০ "
দিল্লী	১	২০,০০০ "
ব্রহ্মদেশ	০	০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	০	০
আসাম	২	২,০০,০০০ "
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	০	০
আজমীর-মাড়বার	০	০
বেলুচিস্থান	১	১২,০০,০০০ "
কুর্গ	০	০
বাঙ্গালোর	০	০
মহীশূর	০	০
বড়োদা	০	০
ত্রিবাঙ্কুর	১	২,০০,০০০ "
হায়দ্রাবাদ	০	০
মোট	৫১	১২৪,১১,০০০৲

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর শ্রেণী-বিভাগ

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলি নানা ভাগ, উপবিভাগ ও শ্রেণীতে বিভক্ত। ১৯২৭ সনের মে মাসে গোটা ভারতে কোন্ ধরণের কয়টা কোম্পানী মোতায়েন হইয়াছে, তার হিসাবটা লওয়া যাউক।

	কোম্পানীর সংখ্যা	পুঁজিপাটা (টাকায়)
১। ব্যাঙ্কিং লোন ও বীমা		
(ক) ব্যাঙ্কিং ও লোন		
(১) ব্যাঙ্কিং	৭ ...	৭ লাখ
(২) লোন	৬ ...	৪ লাখ ৯০ হাজার
(৩) ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট	—	—
(খ) বীমা		
(১) জীবন, অগ্নি ও নৌ-বীমা	—	—
(২) প্রভিডেণ্ট বীমা	১ ...	১ লাখ
(৩) অন্যান্য	—	—
২। ট্রানজিট্ ও ট্রান্‌সপোর্ট (যানবাহন)		
(ক) জলযান	—	—
(খ) রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে	—	—
(গ) মোটর ট্র্যাক্‌শ, ডিলিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং	২ ...	১ লাখ
(ঘ) ডক, বন্দর, শিপিং ল্যাণ্ডিং, ওয়েআর হাউসিং	—	—
(ঙ) অন্যান্য	—	—
৩। ট্রেডিং অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারিং (শিল্প-বাণিজ্য)		
(ক) মিউচুয়্যাল ট্রেডিং সমিতি	—	—
(খ) ছাপা, প্রকাশ ও মনোহারী	৪ ...	১১লাখ ৮০ হাজার
(গ) রাসায়নিক ও তত্তুল্য ব্যবসা	—	—
(ঘ) লোহা, ইস্পাত ও জাহাজ-নির্ম্মাণ	—	—
(ঙ) এঞ্জিনিয়ারিং	—	—
(চ) ট্যানারি ও চামড়ার ব্যবসা	১ ...	২৫ হাজার
(ছ) সার্ব্বজনীন হিতকারী কোম্পানী—গ্যাস, জল, বিজলী বাতি, শক্তি ও টেলিফোন	২ ...	১৯ লাখ
(জ) মাটি, পাথর, সিমেণ্ট, চুন ও ঘরবাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের অন্যান্য মাল	৩ ...	১৮ লাখ
(ঝ) গ্লাস্	—	—
(ঞ) বরফ ও জমান জল	—	—
(ট) এজেন্সি (ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানী সুদ্ধ)	১ ...	১৩ লাখ ৯৬ হাজার
(ঠ) তামাক (সিগার ইত্যাদি)	—	—
(ড) মোমবাতি সাবান	—	—
(ঢ) ব্রাস ও তামার পাত	—	—
(ণ) দিয়াশলাই	—	—
(ত) অন্যান্য	১০ ...	১৩ লাখ ৯৬ হাজার
৪। মিল ও প্রেস		
(ক) কটন মিল	—	—
(খ) কটন গিনিং, প্রেসিং বেলিং ইত্যাদি	—	—
(গ) জুট মিল	—	—
(ঘ) জুট প্রেস ইত্যাদি	১ ...	২॥০ লাখ
(ঙ) রেশম, পশম, শণ ইত্যাদির মিল	—	—
(চ) কাগজের মিল	—	—
(ছ) চাউলের মিল	২ ...	৫ লাখ
(জ) ময়দার মিল	—	—
(ঝ) স ও টিম্বার মিল	—	—
(ঞ) তেলের কল	২ ...	১১ লাখ

(ট) অন্যান্য মিল ও প্রেস — — —

। চা ও অন্য প্ল্যান্টিং কোম্পানী

(ক) চা ৫ ...২৩লাখ ৩০ হাজার

(খ) কফি ও সিনকোনা — —

(গ) রবার — —

(ঘ) অন্যান্য ২ ... ১ লাখ ২০ হাজার

।। মাইনিং ও কোয়ারিং

(ক) কয়লা ১ ... ১ লাখ

(খ) পাথর ও মার্ব্বেলের খাত — —

(গ) ম্যাঙ্গানিজ — —

(ঘ) অভ্র — —

(ঙ) পেট্রোলিয়াম্ — —

(চ) অন্যান্য — —

৭। সম্পত্তি, জমিজমা ও ঘরবাড়ী— —

৮। মদ তৈয়ারী ও চুঁয়াইবার কারখানা — —

৯। চিনি ম্যানুফ্যাকচার ১ ... ৩ লাখ

১০। হোটেল, থিয়েটার ও প্রমোদশালা — —

১১। অনুল্লেখিত অন্যান্য কোম্পানী — —

মোট ৫১ ... ১২৪,১১,০০০

কোন্ দেশের দৌড় কতটা ?

মে মাসের ৫১টা কোম্পানীর হিসাবটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে। কোন্ ধরণের কতটা কোম্পানী, তারও পরিচয় জানিতেছি। কিন্তু ইহাদের নামধাম অজ্ঞাত রহিয়াছে। কুলশীলের পরিচয় লইতে গিয়া জানিতে পারিব (১) কোন্ দেশ কোন্ ধাপে অবস্থিত, (২) কোন্ বিষয়ে কোন্ দেশের অবস্থা কিরূপ ? (৩) মফঃস্বলের সহিত শহরের তুলনা কিরূপ দাঁড়ায় ? এক একটা বিভাগ লইয়া পরীক্ষা করিব।

১। ব্যাঙ্কিং লোন ও বীমা

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
১	শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঙ্ক	ডিঃ সুখময় দত্ত	নোয়াখালি (বাঙ্গালা)	ব্যাঙ্কিং	১,০০,০০০৲
২	রংপুর কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক	ডিঃ পি, এন্, মজুমদার	রংপুর (ঐ)	ঐ	১,০০,০০০৲
৩	কাঞ্চন ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কোং	ম্যাঃ ডিঃ পি, কে, নিয়োগী	দিনাজপুর (ঐ)	ঐ	১,০০,০০০৲
৪	পল্লী লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	ম্যাঃ ডিঃ বি, এন, চাটার্জ্জি	দৌলতপুর, খুলনা (ঐ)	ঐ	৫০,০০০৲
৫	নীলফামারি নূতন বাজার ব্যাঙ্ক	সেঃ আর, এম্, দাস	নীলফামারি, রংপুর (ঐ)	ঐ	৫০,০০০৲
৬	লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	—	ধুবড়ি (আসাম)	ব্যাঙ্কিং ও লোন	১,০০,০০০৲
৭	ত্রিবাঙ্কুর হিন্দু ব্যাঙ্ক	—	ছেনগান্নুর (ত্রিবাঙ্কুর)	ব্যাঙ্কিং ও চিট্	২,০০,০০০৲
৮	হালুয়াঘাট লোন অফিস	ডিঃ সুরেশ চন্দ্র নাগ	হালুয়াঘাট, মৈমনসিং (বাঙ্গালা)	ঋণদান	২০,০০০৲
৯	কাশীপুর সতীনগাঁও ব্যাঙ্ক	ডিঃ কুমুদ সান্যাল	কাশীপুর, রাজসাহী (ঐ)	ঐ	৫০,০০০৲
১০	মহাদেবপুর কমলা ব্যাঙ্ক	ডিঃ নীলরতন দাস	মহাদেবপুর, ঐ (ঐ)	ঐ	৫০,০০০৲
১১	মহীরামকোল ইউনিয়ান লোন অফিস	সেঃ অবনী দাস	মহীরামকোল, ফুলকোচা পোঃ আঃ, মৈমনসিং (ঐ)	ঐ	৫০,০০০৲
১২	থুরি লোন অফিস	ডিঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	থুরি, জলাপুর পোঃ আঃ, মৈমনসিং (বাঙ্গালা)	ঋণদান	২০,০০০৲

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
১৩।	ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল ন্যাশনাল অ্যাণ্ড রেলওয়ে ট্রেডিং ব্যাঙ্ক	ডিঃ মহম্মদ আবদুর রসিদ মণ্ডল	টাকি, দুর্মুট পোঃ আঃ মৈমনসিং (বাঙ্গালা)	ঋণদান	৩,০০,০০০৲
১৪।	অ্যাকসিডেণ্ট ও জেনারাল এশিওর‍্যান্স কো	এজেণ্ট জনি অ্যাণ্ড কো,	আগাখান বিল্ডিং দালাল ষ্ট্রীট, বোম্বাই	প্রভিডেণ্ট বীমা	১,০০,০০০৲
					১২,৯০,০০০৲

ব্যাঙ্কিং চালাইতেছে ৫টা কোম্পানী। পুঁজিপাটা ৪ লাখ টাকা। ঋণদান অফিস ৬টা আছে। টাকা ৪ লাখ ৯০ হাজার। আর ব্যাঙ্কিং ও ঋণদান ইত্যাদি চালাইতেছে ২ কোম্পানী ৩ লাখ টাকা লইয়া।

এমাসে স্বদেশী বীমা কোম্পানী একটাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। একটা মাত্র কোম্পানী বোম্বাইতে স্থাপিত।

এইপ্রকার ১৪টা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১টাই বঙ্গদেশে। ১টা আসামে। ১টা ত্রিবাঙ্কুরে। ১টা বোম্বাইতে।

বাঙ্গালার ১১টা কোম্পানীর মধ্যে ৩টা মাত্র শহরে। বাকী ৮টা পল্লীতে বা মফঃস্বলে। মফঃস্বলে ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা খাটিতেছে। শহরে খাটিতেছে ৩ লাখ টাকা।

দেখা যায় ব্যাঙ্কিং বিষয়ে বাঙ্গালার শহরই একমাত্র ভরসাস্থল নয়। মফঃস্বলের কিস্মৎও কম নয়। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কলিকাতা বা ঢাকায় একটাও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই।

এই অঙ্কগুলির শতকরা কষিয়া দেখিলে সম্বন্ধগুলি আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

২। ট্র্যানজিট্ ও ট্র্যান্সপোর্ট

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
১৫।	গৌরীপুর মোটর সার্ভিস কো	ডিঃ মহেশ কুমার নিয়োগী	গৌরীপুর, মৈমনসিং (বঙ্গদেশ)	লোক ও মাল বহন করা	৫০,০০০৲
১৬।	ইণ্ডিয়ান্ ট্র্যানস্পোর্ট	ম্যাঃ এজেণ্ট, বেহার ট্রেডার্স লিমিটেড	২ হরিদাস চাটার্জ্জি রোড, গয়া (বিহার উড়িষ্যা)	মোটর লরী ইত্যাদির ব্যবসা	৫,০০০৲
					১,০০,০০০৲

৩। ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাক্চারিং

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
১৭।	নোয়াখালি প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাব্লিশিং কো	ডিঃ পি, এন, সেনগুপ্ত	নোয়াখালি (বাঙ্গালা)	প্রিণ্টার, পাবলিশার, পুস্তক বিক্রেতা ইত্যাদি	৫০,০০০৲
১৮।	ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাড্-ভারটাইজিং	—	৩/১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা	ঐ	১,০০,০০০৲
১৯।	গার্জিয়ান প্রেস্	ম্যাঃ ডিঃ বি, দোদশা	মাদ্রাজ	প্রিণ্টিং ও পাবলিশিং	৩০,০০০৲
২০।	পেপার অ্যাণ্ড ষ্টেসনারি ওয়ার্কস	—	বেনারস, যুক্ত প্রদেশ	ষ্টেশনারি ব্যবসা	১০,০০,০০০৲
২১।	রংপুর ইউরেকা ষ্টোরস্	ডিঃ টি, ডি, লাহিরী	নবাবগঞ্জ (বাঙ্গালা)	চামড়া ও চামড়ার দ্রব্য তৈয়ারী	২৫,০০০৲

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
২২।	গোরখপুর ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কো	—	১৫নং ক্যানিং রোড এলাহাবাদ (যুক্তপ্রদেশ)	বিজলী যোগান	৭,০০,০০০৲
২৩।	কোয়েটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং	—	কোয়েটা, বেলুচিস্থান	ঐ	১২,০০,০০০৲
২৪।	রাজমহল আর্থেন-ওয়ার কোং	ডিঃ হরি দত্ত	৩১ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা	মাটির বাসন তৈয়ারী	১,০০,০০০৲
২৫।	ইউনাইটেড্ সিমেণ্ট কো অব্ ইণ্ডিয়া	ডিঃ মলরাজ খাতাব	ইয়ুসুফ বিল্ডিং, হর্ণবি রোড্, বোম্বাই	সিমেণ্ট, চুন, প্ল্যাষ্টার ম্যানু-ফ্যাক্‌চার	১৬,০০,০০০৲
২৬।	ষ্টোন সাপ্লাইং কো	ডিঃ হাসানালি করমালি	৪ ডান্‌কান রোড, বোম্বাই	পাথর ও ঘরবাড়ী তৈয়ারীর মাল যোগান	১,০০,০০০৲
২৭।	বিল্‌ডারস্ এজেন্সী	—	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা (বাঙ্গালা)	এজেন্সি	২০,০০০৲
২৮।	ট্রপিক্যাল ইলেট্রিক ওয়ার্কস	—	৮৬ রসারোড ভবানীপুর, কলিকাতা	বিজলীর অটো-মবিল যোগান	২০,০০০৲
২৯।	ক্যালকাটা হার্ডওয়ার ম্যানু-ফ্যাক্‌চার	—	৪৩/৪৪ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা	—	১,০০,০০০৲
৩০।	এন্, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স	—	১২ ডালহৌসি স্কোয়ার কলিকাতা	জেনার‍্যাল মার্চেন্টস্	৪,০০,০০০৲
৩১।	ডাক্তার বি, এম, দাস অ্যাণ্ড কোং	—	হসপিটাল রোড, চট্টগ্রাম (বাঙ্গালা)	ঐ	১৬,০০০৲
৩২।	নদর্গর্ণ টি অ্যাণ্ড ট্রেডিং কো	ডিঃ রবীন্দ্র মোহন রায়	জলপাইগুড়ি (বাঙ্গালা)	ঐ	৫০,০০০৲
৩৩।	টী এজেন্সি	—	২ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	চা-ব্যবসায়ী	৫০,০০০৲
৩৪।	বিজয়া এজেন্সি	ডিঃ সুরামাল করমচাঁদ	৯১ ফোর্ট ষ্ট্রীট, বোম্বাই	জেনার‍্যাল মার্চেন্টস্	৪০,০০০৲
৩৫।	সায়েন্টিফিক অ্যাপারেটাস্ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস	—	আগ্রা, যুক্তপ্রদেশ	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসা	২,০০,০০০
৩৬।	ন্যাশন্যাল মার্কেন্টাইল সীণ্ডিকেট	—	বারাণসী, যুক্তপ্রদেশ	জেনার‍্যাল মার্চেন্টস্	৫,০০,০০০৲
৩৭।	রাইট্ পিনুহর্ণ অ্যাণ্ড পার্টনারস্	ডিঃ আর, রাইট	চাঁদনী চক, দিল্লী	কমিশন এজেণ্ট	২০,০০০৲
					৬৩,২১,০০০৲

এই ধরণের মোট ২১টা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টা শহরে স্থাপিত। মাত্র ২টা মফঃস্বলে—রংপুরে ও ত্রিপুরায়। ইহাদের মোট পুঁজিপাটা ৪৫,০০০৲ টাকা। এই মফঃস্বল বাঙ্গালার মফঃস্বল। অর্থাৎ যে মাসে এই বিভাগে বাঙ্গালা দেশই মফঃস্বলের ইজ্জৎ বাঁচাইয়াছে। এই দুইটাকে মাত্র পল্লী প্রতিষ্ঠান বলিলে অন্যায় হইবে না।

বড় বড় শহরগুলির হিস্যা

কলিকাতা ৫, অনুমোদিত পুঁজিপাটা ৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা। বোম্বাই ৩, অনুমোদিত পুঁজিপাটা ১৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা। মান্দ্রাজ ২, অনুমোদিত পুঁজিপাটা ৩০ হাজার টাকা। দিল্লী ১, ২০ হাজার টাকা। এলাহাবাদ ২, ৭ লাখ টাকা।

দেশগুলির হিস্যা

বাঙ্গালা	১০,	পুঁজিপাটা	৯ লাখ ৩১ হাজার টাকা।
বোম্বাই	৩,	,,	১৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা।
মান্দ্রাজ	২,	,,	— ৩০ হাজার টাকা।
যুক্তপ্রদেশ	৪,	,,	২৪ লাখ টাকা।
পাঞ্জাব	২,	পুঁজিপাটা	— ২০ হাজার টাকা।
বেলুচিস্থান	২,	”	১২ লাখ টাকা।

বুঝা যাইতেছে, কলিকাতা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইলেও সম্মিলিত হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার প্রচেষ্টা বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে রূপ ধরিয়া উঠিতেছে। বড় শহর ব্যতীত অন্যত্র ব্যবসা গড়িবার ফন্দিটা বাঙ্গালীর মাথায় বেশী খেলিতেছে একথাটাও বুঝা যাইতেছে।

এই মাসের সর্ব্ববৃহৎ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী হইতেছে বোম্বাইয়ের ইউনাইটেড সীমেণ্ট কোম্পানী অব্ ইণ্ডিয়া। মূলধন ১৬ লাখ টাকা। কিন্তু অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান উভয় দিক্ হইতেই যুক্তপ্রদেশের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের সহিত বাঙ্গালার তফাৎ এই যে, বাঙ্গালা দেশে কলিকাতা আর কতকটা ঢাকা ব্যতীত বড় শহর খুঁজিয়া পাই না। যুক্তপ্রদেশে একের অধিক বড় শহর রহিয়াছে। এমন কি, কে কার চেয়ে বড় ফস্ করিয়া বলা যায় না। যুক্তপ্রদেশের বড় শহরগুলি আরও বড় হইতেছে। কিন্তু ছোট শহরকে বড় করিবার প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা প্রথম হইয়াছে।

৪। মিল্ ও প্রেস্

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
৩৮।	মোরান বেলিং কোঃ	—	৪ লিয়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা	পাট বেলিং প্রেসিং ইত্যাদি	২,৫০,০০০৲
৩৯।	কল্যাণী রাইস মিল্স্	ডিঃ ভোলানাথ সাহা	খাগরা, মুর্শিদাবাদ (বাঙ্গালা)	চালের কল পত্তন	২,৫০,০০০৲
৪০।	যদুনাথ রাইস মিল্স	ডিঃ এইচ, কুণ্ডু	হিলি, বগুড়া (বাঙ্গালা)	মিল গ্রেন মার্চ্চেণ্টস	২,৫০,০০০৲
৪১।	রোড অয়েল্স (ইণ্ডিয়া)	ডিঃ এফ, এ, লিল	৪ লিয়নস রেঞ্জ কলিকাতা	সড়ক তেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা	১০,০০,০০০৲
৪২।	ইউনাইটেড সোপ অ্যাণ্ড অয়েল কোঃ	ডিঃ মিঞা নুরমহম্মদ	৬০ ম্যাকলিয়ড রোড লাহোর, পাঞ্জাব	সাবান, তেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারক	১,০০,০০০৲
					১৮,৫০,০০০৲

৫টা কোম্পানীর ৪টা বাঙ্গালায়। মূলধন ১৭ লাখ টাকা। বাঙ্গালার ৪টা কোম্পানীর ২টা কলিকাতার আর ২টা অন্য স্থানের। বাঙ্গালা দেশে বহু স্থানে চাউলের কল স্থাপন করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। তার পরিচয় এই তালিকায় পাইতেছি। প্রায় সবটা টাকাই বাঙ্গালা দেশে খাটিতেছে ইহা দ্রষ্টব্য।

৫। চা ও প্ল্যাণ্টিং কোম্পানী

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
৪৩।	ষ্টিনথল টী কোঃ	ডিঃ এইচ, এন্, ঘোষ	জলপাইগুড়ি (বাঙ্গালা)	টি, কফি ইত্যাদির চাষ	৩০,০০০৲
৪৪।	রাঙ্গাপানি টী কোঃ	ম্যাঃ এঃ ডাক্তার বি, এম্, দাস কোঃ	হসপিটাল রোড, চট্টগ্রাম (বাঙ্গালা)	ঐ	৫,০০,০০০৲
৪৫।	কোদারি টী এষ্টেট কোঃ	ম্যাঃ এঃ টি, ষ্টেনস অ্যাণ্ড কোঃ	কোয়েমবাটোর (মান্দ্রাজ)	চা রোপণ	২,০০,০০০৲
৪৬।	আউটোরলোনী ভ্যালি এষ্টেটস	সেঃ এ, ই, সাতুর	মান্দ্রাজ	ঐ	১৫,০০,০০০৲
৪৭।	বুড়া গোহাই টী কোঃ	—	গোলাঘাট (আসাম)	ঐ	১,০০,০০০৲
৪৮।	ভিটিয়া লাক ইনডাষ্ট্রীস	ডিঃ কুমার ভট্টাচার্য্য	১৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা	গালার ব্যবসা ও শেলাক ইত্যাদি প্রস্তুত	২০,০০০৲
৪৯।	কোকালুর অ্যাগ্রিকালচার্যাল এষ্টেট	ম্যাঃ ডিঃ ভি, ভি, রামাচারিয়ার	টেলিচেরি (মান্দ্রাজ)	কৃষির উন্নতি	১,০০,০০০৲
					২৪,৫০,০০০৲

৭টা কোম্পানীতে ২৪ লাখ টাকা খাটিতেছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালার ৩টায় ৫ লাখ (কলিকাতার ১টায় ২০,০০০৲), মান্দ্রাজের ৩টায় ১৮ লাখ এবং আসামের ১টায় ১ লাখ টাকা।

চায়ের ব্যবসায় মান্দ্রাজী বাঙ্গালীকে (২৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা) পিছনে ফেলিয়াছে। কোম্পানীর সংখ্যা সমান হইলেও মান্দ্রাজে বাঙ্গালার ৩ গুণেরও বেশী নূতন পুঁজি-পাটা নিযুক্ত হইয়াছে।

৬। মাইনিং ও কোয়ারিং

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
৫০।	বেঙ্গল বিহার কোল এজেন্সি	ডিঃ কে, এইচ, যোশী	মানভূম (বিহার-উড়িষ্যা)	কয়লার খনির মালিক	১,০০,০০০৲

৭। চিনি তৈয়ারী

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিচালক ইত্যাদি	দেশ	উদ্দেশ্য	অনুমোদিত টাকা
৫১।	কুশ্রী সুগার ওয়ার্কস	—	আওথল, সাহারাণপুর, (যুক্তপ্রদেশ)	চিনি প্রস্তুত	৩,০০,০০০
				সর্ব্বমোট	১,২৪,১১,০০০৲

গোটা ভারতের মাসকাবারি

(১) বাঙ্গালা

কোম্পানীর সংখ্যা ও নাম		পুজিপাটার পরিমাণ
৭	ব্যাঙ্কিং ...	৪,০০,০০০৲
৫	লোন অফিস্ ...	৪,৯০,০০০৲
১	মোটর গাড়ী, লরী ইত্যাদি	৫০,০০০৲
২	ছাপা. প্রকাশ, মনোহারী	১,৫০,০০০৲
১	ট্যানারি ও চামড়া	২৫,০০০৲
১	মাটি, পাথর, সিমেণ্ট, চুন ইত্যাদি	১,০০,০০০৲
১	এজেন্সি ...	২০,০০০৲
১	বিজলী অটোমবিল ইত্যাদি	২০,০০০৲
৩	জেনার‍্যাল মার্চেণ্টস্	৪,৬৬,০০০৲
১	চা-বিক্রেতা ...	৫০,০০০৲
১	হার্ডওয়েআর ইত্যাদি	১,০০,০০০৲
১	জুট বেলিং বা পাট বস্তাবন্দি	২,৫০,০০০৲
২	চাউলের কল ...	৫,০০,০০০৲
১	তেলের কল ...	১০,০০,০০০৲
২	চা কোম্পানী ...	৫,৩০,০০০৲
১	গালা কোম্পানী ...	২০,০০০৲
৩১		৪১,৭১,০০০৲

(২) বোম্বাই

১	বীমা ...	১,০০,০০০৲
২	মাটি, পাথর সীমেণ্ট, চুন ইত্যাদি	১৭,০০,০০০৲
১	জেনার‍্যাল মার্চ্চেণ্টস্	৪০,০০০৲
৪		১৮,৪০,০০০৲

(৩) মাদ্রাজ

১	ছাপা,প্রকাশ, মনোহারী	৩০,০০০
২	চা কোম্পানী	১৭,০০,০০০
১	চাষবাস ...	১,০০,০০০
৪		১৮,৩৯,০০০

(৪) যুক্তপ্রদেশ

১	ছাপা, প্রকাশ, মনোহারী	১০,০০,০০০
১	সার্ব্বজনীন হিতকারী কো.	৭.০০,০০০
১	জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্	৫,০০,০০০
১	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	২,০০,০০০
১	চিনির কারখানা	৩,০০,০০০
৫		২৭,০০,০০০

(৫) পাঞ্জাব

১	তেলের কল	১,০০,০০০

(৬) বিহার-উড়িষ্যা

১	মোটর গাড়ী, লরী ইত্যাদি	৫০,০০০
১	কয়লার খনি	১,০০,০০০
২		১,৫০,০০০

(৭) দিল্লী

১	কমিশন এজেণ্ট	২০,০০০

(৮) আসাম

১	ব্যাঙ্কিং ও লোন	১,০০,০০০
১	চা কোম্পানী	১,০০,০০০
২		২,০০,০০০

(৯) বেলুচিস্থান

১	সার্ব্বজনীন হিতকারী কোং (বিজলী)	১২,০০,০০০

(১০) ত্রিবাঙ্কুর

১	ব্যাঙ্কিং ও লোন	২,০০,০০০
৫১ মোট		১২৪,১১,০০০

দেউলিয়া কোম্পানীর হিসাব

১৯২৭ সনের মে মাসে গোটা ভারতে যে সব কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে সেগুলির হিসাব দেওয়া যাইতেছে। সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিফলতার অঙ্কগুলিও কষিয়া দেখা দরকার।

দেশের নাম	কোম্পানীর সংখ্যা	অনুমোদিত পুঁজিপাটা
বাঙ্গালা	২	১১,২৫,০০০
বোম্বাই	৬	৬৮,৪৫,০০০
মান্দ্রাজ	৭	১২,০০,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৫	২৮,০০,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	১	২০,০০০
পাঞ্জাব	১	২০,০০০
ব্রহ্মদেশ	১	১,০০,০০০
ত্রিবাঙ্কুর	২	৭০,০০০
মোট	২৫	১২১,৮০,০০০

এই হিসাব হইতেও বুঝিতে পারিতেছি, অন্যান্য দেশের তুলনায় বঙ্গালীর মাথা কাঁচা নয়।

আমরা ভারতের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী শুধু ১ মাস লইয়া আলোচনা করিলাম। এটা অনুসন্ধানের পথ নির্দ্দেশ মাত্র। গোটা বছর লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা সুরু হওয়া দরকার। তাতে সমগ্র ভারতের আর্থিক উন্নতির এক অধ্যায় প্রকট হইয়া উঠিবে। অনেক মাল মসলাও জুটিবে।

ত্রিবাঙ্কুরে ১৯৩'২৭ লাখ টাকার বাণিজ্য

ত্রিবাঙ্কুরের মোট সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সনে হইয়াছে ১৯৩'২৭ লাখ টাকা। বেসরকারী পণ্যের মূল্য ১৮৭'৫২ লাখ টাকা; আর গবর্ণমেণ্ট ষ্টোরের দাম ৫'৭৫ লাখ টাকা।

বেসরকারী পণ্যের মধ্যে আমদানি ১৩'৯৬ লাখ টাকার, আর রপ্তানি ১৭৩'৫৬ লাখ টাকার।

ত্রিবাঙ্কুরের বন্দরে বন্দরে

ত্রিবাঙ্কুরের বিভিন্ন বন্দরে মাল উঠানামার হিসাব এইরূপ :—

	আমদানি (লাখ টাকা)	রপ্তানি (লাখ টাকা)
আলেপ্পি	৮'৪৬	১৬৮'৬৩
কুইলোন	৫'৫০	০'৭৫
কোলাচেল	•	৪'১৮
মোট	১৩'৯৬	১৭৩'৫৬

আলেপ্পির দড়ি ও মাদুর

আলেপ্পির প্রধান আমদানি দ্রব্য ধাতু (২'৫৪ লাখ)। কতক যুক্তরাজ্য হইতে ও কতক বেলজিয়াম হইতে আসে।

প্রধান প্রধান রপ্তানি এইরূপ :—

দড়াদড়ি, মাদুর, পাটি ইত্যাদি—যুক্তরাজ্য ৩৯'২৮ লাখ
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১১'২৫ লাখ
অষ্ট্রেলিয়া … ৬'৪৪ লাখ
জার্ম্মাণি ইত্যাদি ৫'৫৩ লাখ

৭৫'৮০ লাখ

কাঁচা রবার—সিংহল ২৬'২৭ লাখ
যুক্তরাজ্য ৩'১২ লাখ

২৯'৩৯ লাখ

লঙ্কা—	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	…	২১'৩০ লাখ
	যুক্তরাজ্য	…	২'১৮ লাখ
চা—	যুক্তরাজ্য	…	৮'০২ লাখ
	সিংহল	…	৪'৮২ লাখ
কোপ্রা—	ইতালি	…	৬'৮৪ লাখ
	উত্তর আমেরিকা	…	৫'৫৬ লাখ
	জার্ম্মাণি	…	২'৮৩ লাখ
শুকনা আদা—	অষ্ট্রেলিয়া	…	১'৪১ লাখ

সিংহলের তামাক ও কুইলোনের টাইল

সিংহল হইতে ৫'৬১ লাখ টাকার কাঁচা তামাক কুইলোনে আসে, আর ০'৫০ লাখ টাকার টাইল কুইলোন হইতে সিংহলে যায়। এই দুইটাই আমদানি-রপ্তানির প্রধান দ্রব্য।

কোলাচেলের রপ্তানি

পামিরা গাছের ছাল (১·৫৪ লাখ টাকা) গিয়াছে যুক্তরাজ্যে, বেলজিয়ামে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। আর ইলমেনাইট্‌ বালুকা (২·২৮ লাখ টাকা) ইতালি ও জার্ম্মাণিতে গিয়াছে।

এই বন্দরে আমদানি আসে নাই।

চরখায় লাভালাভ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে খদ্দর প্রচলন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এখনও হাজারকরা একজন বাঙ্গালী খদ্দর পরিধান করে কিনা সন্দেহ। বোধ হয় হাজারকরা এক জন লোক চরখায় হাতও দেয় না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেমন যেখানে-সেখানে চরখা দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন ইহা তেমনি দুর্ল্লভ বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে খদ্দর বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। আমি সে সকল স্থানের কথা কিছুই বলিতেছি না। আমার চারি পার্শ্বে যাহা দেখিতেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি মাত্র।

চরখার প্রচলন-চেষ্টার মধ্যে কত মহাপ্রাণ ব্যক্তির কতই না আশীর্ব্বাদ, আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং অমানুষিক স্বার্থত্যাগ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কই চরখা ত সর্ব্বসাধারণের প্রিয়বস্তু হইতেছে না? ইহার কারণ কি? ইহার অনেকগুলি কারণ আছে, যথা, ভাল চরখার অভাব, মিহি সুতা কাটার অক্ষমতা, মোটা সুতার কাপড় পরিতে অনিচ্ছা, সুতা কাটিয়া কাপড় বুনাইতে অসুবিধা, কাপড় টেঁকসই না হওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা, ভাল তুলার অভাব। কলিকাতার বাজারে যে সমস্ত তুলা পাওয়া যায় তাহার কোনটীই চরখার উপযুক্ত নয়। কম্বোডিয়া, নাগপুর, ওয়াধান ইত্যাদি নামজাদা জায়গায় তুলাও খুব ভাল করিয়া ধুনিয়া না লইলে চরখায় কাটা যায় না। এই সমস্ত তুলা যতই তদ্বির করিয়া লওয়া হউক না কেন, একটানা চরখা চালান যায় না—সুতা অসমানও হয়, প্রায় ছিঁড়িয়াও যায়। তা ছাড়া বাজারের তুলা সবই বহু পুরাতন। পুরাতন হইলে তুলার তন্তুগুলি কর্ক্কশ ও কুঞ্চিত হইয়া যায়। মিলওয়ালারা কিরূপ কৌশলে এই সকল পুরাতন তুলার "ড্রেস" করে, তাহা জানা নাই। তবে বাড়ীতে এরূপ তুলা ধুনিয়া দুরস্ত করা যায় না। এই সমস্ত অসুবিধা বশতঃ চরখা কাটিয়া পর্য্যাপ্ত সুতা পাওয়া যায় না, এবং সুতা পাইলেও কাপড় বুনাইতে পারা যায় না। একবার আমি প্রায় ৪০ কাউণ্টের সুতা কাটিয়াছিলাম। কিন্তু কোথাও কাপড় বুনাইবার সুবিধা না পাইয়া কলিকাতার কোন বিখ্যাত খদ্দরের দোকানে গিয়াছিলাম। সেখানকার কোন ভদ্রলোক সুতা দেখিয়া গজপ্রতি ৸০ বার আনা কাপড়ের মজুরি চাহিলেন। কাপড় বুনান আমার সাধ্যাতীত মনে করিয়া তাঁহারই নিকট সুতা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলাম। তাহাতে তিনি সেরপ্রতি ২৲ টাকার বেশী দাম দিতে চাহিলেন না! প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করিয়া চরখা কাটিলে প্রায় আড়াই মাসে একসের সুতা কাটা যায়। তাহার মধ্যে তুলার দামই ১৲।১০। সুতরাং এই সমস্ত প্রচারকেরা সাধারণকে কেমন উৎসাহ দেন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

ভাল চরখাও বাজারে পাওয়া যায় না। চরখা শব্দহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। "চরখার ঘর্ঘর" এখন কাহারও কানে সুধাবর্ষণ করে না। আবার এদিকেও লক্ষ্য থাকা দরকার যেন গৃহস্থ একটী চরখাই পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করিতে পারে, তাহার গতি যেন দ্রুত হয় এবং অল্প সময়ে বহু সুতা পাকাইয়া গৃহস্থের সময় বাঁচাইতে পারে।

ঘরে ঘরে চরখার চলন করিতে হইলে উৎকৃষ্ট টাট্‌কা তুলা সহজপ্রাপ্য করিতে হইবে। আমি নানাপ্রকার

তুলা লইয়া অনেক রকমে ভাল সুতা কাটিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং দেখিয়াছি আমাদের বাঙ্গালার তুলাই চরখার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং সকলেই তুলা সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন। এদিকে "বুড়ী" কাপাস ও "জটা" কাপাসের গাছ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য কেবলমাত্র চাষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেহই কাপাস গাছ বিস্তৃতভাবে লাগায় না। দু'চারিটী গাছ এখানে সেখানে জন্মায় এই পর্য্যন্ত। "বুড়ী" কাপাসের বীজগুলি বিচ্ছিন্ন। উৎপন্ন তুলার পরিমাণও খুব কম। কিন্তু তন্তুগুলি খুব কোমল ও মিহি সূতার পক্ষে উপযোগী ও বৎসরে প্রায় ৫ মাস ফসল পাওয়া যায়। "জটা" কাপাসের বীজগুলি সজ্জবদ্ধ। তন্তু দীর্ঘ, ও কিঞ্চিৎ স্থূল ও তুলার পরিমাণ অনেক বেশী। ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তুলা পাওয়া যায়। আমার বোধ হয় চরখা কাটিতে এই তুলাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একবার "দৈনিক নায়কে" পড়িয়াছিলাম যে, পূর্ব্বে হিন্দু মহিলারা এত সূক্ষ্ম সূতা কাটিতেন যে, তাহার এক তোলার দৈর্ঘ্য ৪ মাইল বা ৭০০০ হাজার গজ হইত। কথাটী সকলের বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু আমি ইহাতে অবিশ্বাসের কিছু দেখি না। পূর্ব্বে কিরূপ কৌশলে পাঁজ নির্ম্মাণ করা হইত তাহা জানি না। প্রথমতঃ আমার একতোলা সূতা ৫০০ গজের বেশী লম্বা হইত না। পরে চেষ্টা করিতে করিতে ১০০০ গজে পৌঁছায়। সম্প্রতি একদিন মিহি সূতা কাটিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তাহার সিকি তোলার দৈর্ঘ্য ৪০০ গজের উপর হইয়াছিল। যখন ১০০০ গজের তোলার অনুমানে চরখা কাটি তখন ঘণ্টায় ২৫০ হইতে ৩০০ গজ সূতা হয়, আর যখন ২০০০।২৫০০ গজ অনুমানে কাটি তখন ঘণ্টায় প্রায় ২০০ গজের উপর উঠে না। সূতার নম্বর বা কাউণ্টের হিসাব জানি না বলিয়া এইরূপ মনগড়া ভাবে সূক্ষ্মতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

আমার মনে হয় বুড়ী কাপাস অপেক্ষা জটা কাপাস চরখার জন্য বেশী সুবিধাজনক। ইহার পাঁজ করিতে খুব কম সময় লাগে এবং সূতা অল্প সময়েই সমান ও শক্ত হয়, আবার অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বেশী সূতা কাটা যায়। এখন আমাদের দরকার ঘর ঘর যাহাতে জটা কাপাসের ফল হয় তাহার চেষ্টা করা ও কৃষকদিগকে পাটের পরিবর্ত্তে কাপাস চাষ করিতে উৎসাহিত করা। পাটের তুলনায় কাপাস চাষে কম পরিশ্রমের প্রয়োজন। পাট পচাইলে দেশের হাওয়া দূষিত হয় কিন্তু কাপাস দেশের হাওয়া পরিষ্কার রাখে। শিক্ষিত লোকদিগের এদিকে এখনও নজর পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। তাহার পর কথা, যাহাতে গৃহস্থ অল্পব্যয়ে ও অনায়াসে সূতার বিনিময়ে কাপড় গামছা ইত্যাদি বুনাইয়া লইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গৃহস্থের সামনে এমন আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে যেন কাপড় বুনাইবার কোন চিন্তাই তাহার না আসে। অথচ তাহার মনে যেন সতত এরূপ ভাব জাগরূক থাকে যে, বিনিময়ে কাপড় দিবার জন্য তাহারই নিকট সূতা পাইবার আশায় সকলেই বসিয়া আছে।

এখন দেখা উচিত, কি প্রকারে দেশের মধ্যে এইরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়। অবশ্য গজপ্রতি বার আনা মজুরি চাহিলে এরূপ আবহাওয়া আসিবে না। এখন ১।০ হইলে একখানি ১০ হাত কাপড় পাওয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ॥/০ ॥৵০ আনায় পাওয়া যাইত। কাপড় বুনাইবার মজুরি কাপড়ের দাম অপেক্ষা কম হওয়াই দরকার। এক ভদ্রলোক সূতার বিনিময়ে আমাকে ১০ হাত ১ জোড়া কাপড় বুনাইয়া দিয়া ৩॥০ টাকা মজুরি লইয়াছিলেন (ইহার মধ্যে পাড়ের সূতা ও মুগার সূতার দাম ছিল)। কাপড় লইবার সময় আমি বলিয়াছিলাম, "এত পরিশ্রম করিয়া সূতা কাটিবার পরও যদি ৩॥০ টাকা লাগে তাহা হইলে ২॥০ টাকায় মিলের কাপড় কিনিয়া লওয়া ভাল নয় কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "দেখুন দেখি কত সুন্দর হয়েছে। আমি যে ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে পারি।" আমি বলিলাম, "দশটাকা জোড়া কাপড় পরিবার অবস্থা আমার নয়। চরখা কাটিয়া আমার ব্যয় সংক্ষেপ হইতেছে এমন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন?" এবার তিনি নিরুত্তর হইলেন। আমার মনে হয়, 'এইখানেই খদ্দরের প্রবাহ আবদ্ধ রহিয়াছে! এই বালির বাঁধটুকু সরাইতে পারিলেই খদ্দর ছয় মাসের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ প্লাবিত করিবে।

কম মজুরিতে কেন কাপড় বুনান যায় না? কারণ,

(১) তাঁতী বা জোলা, যাহারা বুননকার্য্য করে, তাহাদের মধ্যে "জাতীয়তার" ভাব জাগে নাই। তাহারা ভাবে না যে হাতের সূতায় কাপড় বুনিলে "দেশের" উপকার হয়। (২) হাতের সূতা প্রায়ই অসমান ও সর্ব্বত্র সমশক্তিসম্পন্ন থাকে না। এজন্য কাপড় বুনিতে যথেষ্ট সময় ও সাবধানতার প্রয়োজন। সুতরাং মজুরি অপেক্ষাকৃত বেশী। (৩) সহরের মধ্যে ব্যয়বহুল সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত দোকান-পাট। খদ্দরের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, এই সমস্ত বিলাসব্যয় বহন করিয়াও সাধারণের চিত্তবিনোদন করিতে পারে। সেইজন্য খদ্দর কতিপয় লোকের পোষাকী পরিচ্ছদ হইয়াই রহিয়াছে, আটপৌরে হইতে পারিতেছে না। (৪) তাঁতী এবং জোলা ব্যতীত আর যাহারা দেশের ডাকে বুননকার্য্য শিক্ষা করিয়া দেশসেবা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয়। ইহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী সাধারণ তাঁতী বা জোলার অপেক্ষা অনেক উচ্চ। হয়ত তাহাদের শৈশব বিলাসে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হইয়াছে—তাহাদের হয়ত অনেক উচ্চ আশা ছিল। এখন হয়ত কতক নিরুপায়ে ও কতক দেশসেবার অজুহাতে বুননকার্য্যে মনোনিয়োগ করিয়াছেন কিন্তু হৃদয় দিতে পারেন নাই। এই সকল ভদ্রতাঁতীর মজুরি সেকারণ সাধারণ তাঁতীর মজুরি অপেক্ষা অনেক বেশীই হইতেছে।

পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ৪ প্রকার অন্তরায়ের যথাযথ প্রতিকারগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। (১) জাতীয় শিক্ষার বিস্তার। জাতীয় শিক্ষা অর্থে আমি এই বুঝি যে, যে শিক্ষার বিস্তারে জাতীয় বৃত্তিগুলি উন্নত ও পরিপুষ্ট হইবে—সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির নিরক্ষরতা দুর করিয়া স্ব স্ব কার্য্যকলাপে ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান সজাগ করিয়া দিবে। (২) দেশের মধ্যে ভাল কাপাস চাষের বিস্তার, উৎকৃষ্ট তুলা সরবরাহ এবং ভাল পাঁজ করিবার কৌশল শিক্ষা। (৩) সহরে দোকানের জন্য বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য আসবাব পত্রাদির যথাসম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচ। (৪) যাহারা বড় বড় চাকরী পাইবার আশা রাখে না, দৈনিক আট আনা উপায় করিতে পরিলেই সন্তুষ্ট, তাহাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া নূতন নূতন তাঁতীর সৃজন। যে সমস্ত ভদ্রসন্তান অন্ততঃ উচ্চ মূল্যেও খদ্দর প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদিগকে শত ধন্যবাদ। কিন্তু মাত্র তাহাদের চেষ্টায় খদ্দর প্রচার সফল হইবে না। যাহারা আরো অল্পে সন্তুষ্ট, ইহা তাহাদেরই কাজ। খদ্দর আজ তাহাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে!

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, "ভাল চরখা কাটিতে পারিলে ঘণ্টায় কত উপার্জ্জন করা যায়?" ইহার উত্তর নাই। কারণ তুলার দাম বাদ দিয়া ঘণ্টায় ৴১০ পয়সার বেশী উপার্জ্জন করা যায় কিনা সন্দেহ। সুতরাং "চাকরী ছাড়িয়া চরখা ধর" একথা কখনই বলা যায় না। সূতার কোন কাজেই মজুরি পোষায় না। একটা "খেপলা" জালের দাম ৭৲।৮৲ টাকার বেশী নয়—ইহা বুনিতে কিন্তু একজনের দেড় মাসের উপর সময় লাগে। তথাপি চরখার একটা আর্থিক দিক্ আছে। সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চরখা কাটিবার প্রয়োজন নাই। যখন কোন কাজ থাকে না, তখনই চরখা কাটিবার সময়। যে সময়টা তাস পাশা খেলিয়া বা বৃথা তর্কে বা পরনিন্দায় নষ্ট হয়, সেই সময়ে নিবিষ্ট মনে চরখা কাটিলেই ইহার আর্থিক পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ প্রত্যহ দুই ঘণ্টা চরখা কাটিয়া ৩।৪ জনের পরিধেয় বস্ত্র সরবরাহ করা যায়—গরিব গৃহস্থের পক্ষে সেটা কম লাভ নয়। চরখার আরও একটা প্রয়োজনীয় দিক্ আছে। সকলেই জানেন সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দ (টরে ও টক্কা বা পয়েণ্ট ও বার) টেলিগ্রাফের ভিত্তি। কিন্তু এই সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দের সাধনায় অজ্ঞাতসারে বিষয়-বিশেষে মনোযোগ দিবার শক্তি শতগুণে বাড়িয়া যায়। সেইরূপ চরখার সূতা যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে ততই মানব-মনের স্থূলত্ব কাটিয়া বিমলানন্দ লাভের অবকাশ ঘটিবে।*

* লেখক খানিকটা সূতা কাটিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমরা অভয়-আশ্রমের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইয়াছি। প্রায় ৩০ কাউণ্টের মাল। সের ৬৲ হিসাবে বাজারে বিক্রী হয়। এই ধরণের সূতা কাটিলে মজুরি মিলে সের প্রতি ৪৸০ আনা। এসম্বন্ধে লেখকের চিঠি হইতে নিম্নের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।—আঃ উঃ সম্পাদক।

"আমি ৫০ মিনিটে সূতাটী কাটিয়াছিলাম, দৈর্ঘ্যে ১৬০ গজ বা কিছু বেশী হইয়াছিল। চেষ্টা করিলে আরো বেশী কাটা যায়। যে কেহ চেষ্টা করিলেই মনের মত মিহি কাপড় করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। স্বদেশীওয়ালাদের চটের মত মোটা কাপড় পরিবার কষ্ট পাইতে হয় না এইটুকুই বুঝাইতে চাই। কেহ তুলার গাছ করিতে চাহিলে আমি জটা কাপাসের বীজ সামান্য দিতে পারি। মূল্য লাগিবে না।

বাঙালীর মগজে অর্থনৈতিক চিন্তা

(১) বঙ্গে মজুর-আন্দোলন

শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও ধারা

আজকাল শ্রমিক আন্দোলনের উপর শিক্ষিত সমাজের অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিতেছি। এতদিন পরে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত স্বরাজ-সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের আবশ্যকতা আছে, ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং কংগ্রেস শীঘ্রই শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে আশা দিয়াছেন। শ্রমিকদিগের নিজেদের উল্লেখযোগ্য কোন সাময়িক পত্র নাই। যে কয়খানি আছে তাহা শ্রমিক-সম্প্রদায়-বিশেষের অভাব-অভিযোগের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সেগুলির পাঠকও বেশী নাই। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মুখপত্র এক মাসিক বুলেটিন। তাহারও ক্ষুদ্র ৬।৭ পৃষ্ঠায় কয়েকটী ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিকসঙ্ঘ সম্বন্ধে খবর ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আশার কথা যে, বাংলা দেশে শুধু শ্রমিক অন্দোলনের বিষয় লইয়া আলোচনার জন্য ২।১ খানি ক্ষুদ্রকলেবর কাগজ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কয়দিন টিঁকিবে বলা যায় না। "আত্মশক্তি"তে ধারাবাহিকরূপে শ্রমিক আন্দোলনের কথা আলোচনা হইতেছে ইহা অতীব আনন্দের কথা।

সামান্য সুবিধা

শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি এ সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। শ্রমিক নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়াও দেখিয়াছি। তাঁহাদের সকলের যে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা আছে তাহা নহে। বিলাতের শ্রমিক আন্দোলনের দেখাদেখি এদেশে শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং ন্যূনাধিক ৭ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। নানা রকমের, নানা মতের লোক ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং লক্ষ্য সুস্পষ্ট না থাকায় কার্য্য-প্রণালীরও কোনো নির্দ্দিষ্ট ধারা দেখা যায় নাই। প্রধানতঃ এই কারণে শ্রমিক আন্দোলন এদেশে এখনও বদ্ধমূল হয় নাই। শ্রমিক আন্দোলনের বর্ত্তমান পরিচালকগণের অনেকের ধারণা যে, কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি, ছুটিবৃদ্ধি ও আর কিছু সুখ সুবিধা করিয়া লওয়াই শ্রমজীবী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। গরিব শ্রমজীবীরা দিন আনে দিন খায়; তাহারা ২।১ টাকা বেতন-বৃদ্ধি পাইলেই মনে করে হাতে স্বর্গ পাইলাম। তাহাদের তথাকথিত নেতারাও রাজার বা ধনীর দুয়ার হইতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আনিয়া দিতে পারিলেই মনে করেন, তাহাদের মাথা কিনিয়া ফেলিলেন। শ্রমিকসঙ্ঘের অধিকাংশ সভ্যই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত। তাহারা মনে করে যে, ⁄০,⁄৹ বা।০ আনা মাসিক চাঁদা কিছুদিনের জন্য দিয়া তাহারা চাকুরী সম্বন্ধে বিশেষ একটা কিছু সুবিধা করিয়া লইবে। প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী উভয়েই তাহাদের সঙ্ঘের দরখাস্ত-লেখক মাত্র। এইরকম ধারণা লইয়া শ্রমিক-সঙ্ঘের গড়ন ও পরিচালন হওয়ায় লাভ হইয়াছে এই যে, চাকুরীর সুবিধা হইলেও মেম্বর থাকে না, সুবিধা না হইলেও মেম্বর থাকে না। চাকুরীর সুবিধা হইবে এই আশায় দলে দলে মেম্বর হয়। সুবিধা হইবামাত্র আবার বন্যার মত চলিয়া যায়। তফাৎ এই যে, সুবিধা না হইলে নিরাশ হইয়া নেতাদিগকে গালিগালাজ করিতে করিতে সরিয়া পড়ে। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, অধিকাংশ শ্রমিক-সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় এবং অনেকগুলির অস্তিত্ব কাগজ-পত্রে মাত্র পর্য্যবসিত।

সময় আসিয়াছে

আজ সত্য কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভাসা ভাসা রকমের কথা বলিলে চলিবে না। আসল উদ্দেশ্য শুনিলে এই আন্দোলন হইতে কেহ কেহ হয় ত সরিয়া পড়িবেন,

অনেকগুলি সঙ্ঘের হয় ত একটা ওলট-পালট হইবে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুরাতনের ভিতর দিয়া নূতন যেটী গড়িয়া উঠিবে, সেটী সত্যকার জিনিষ হইবে, প্রাণময় হইবে। যাঁহারা ভারতবর্ষে শ্রমিক-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না। তাঁহাদের যে উদ্দেশ্যই থাকুক তাহা যদি উন্নতির পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। গত ৮ বৎসর কাল এই আন্দোলনের সহিত জড়িত থাকিয়া ইহার লক্ষ্য ও ধারা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং অভিজ্ঞতা যাহা হইয়াছে তাহাতে কয়েকটী বিষয়ে আমার মত নিঃসংকোচে ব্যক্ত করিতে পারি।

সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, সকল জাতীয় আন্দোলনেরই লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। শ্রমিক-আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন। ইহারও চরম লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্র যেমন উর্ব্বর তেমনি প্রশস্ত। বাধা না পাইলে মানুষ নিজের শক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ পায় না। শ্রমিকদিগের দৈনন্দিন অভাব পূরণের বাধা অনেক। এজন্য তাহাদিগের অনবরত আত্মশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। পেটের দায়ে তাহারা এই শক্তির প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয় এবং পেটের দায় অপেক্ষা বড় দায় আর কিছু নাই। দিনের পর দিন এই প্রকার শক্তি প্রয়োগে অভ্যস্ত হইয়া তাহারা সত্যই শক্তিমান হইয়া উঠে। লক্ষ লক্ষ লোক এইভাবে শক্তিমান হইয়া উঠিলে জাতি শক্তিমান হয়।

কৃষক ও মজুর

ভারতের শতকরা ৯৯ জন লোক কৃষক বা মজুর। আমাদের রাজনীতি-বিশারদেরা যখন তাহাদিগের নিকট স্বরাজ-সংগ্রামের বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হন, তাহারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে। একারণ স্বরাজের কুইনাইন বড়ী ধর্ম্মের চিনির মোড়ক দিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়। তাহারা যখন হাজারে হাজারে মহাত্মাজীকে "দর্শন" করিতে আসে, আমরা ভাবি স্বরাজ আগমনের আর বিলম্ব নাই। আমরা ভুলিয়া যাই, যে মনোবৃত্তি লইয়া লক্ষ লক্ষ লোক দেবদর্শন বা তীর্থদর্শনে যায়, সেই মনোবৃত্তি লইয়াই তাহারা মহাত্মাজীর দর্শনলাভ করিতে দূরদূরান্তর হইতে সমবেত হয়। ইহাতে আমাদের স্বরাজ-সাধনার সাফল্যের আশা যতদূর থাকুক বা না থাকুক আত্মপ্রবঞ্চনার অবসর যথেষ্ট আছে। তাহারা যখন হাজারে হাজারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া মহাত্মাজীকে প্রণাম করে তখনই আমাদের জানা উচিত যে, এই সকল লোক গ্রামে বা কারখানায় ফিরিয়া যাইয়া অত্যাচারী জমীদার বা মনিব ধনীকে ঐভাবেই প্রণাম করিবে। চিরকাল তাহারা মাটিতে লুটাইয়াই আসিয়াছে, কখনও মাথা সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া মানুষের মত কথা কহিতে শেখে নাই। শিক্ষিত লোক আমরা কখনও তাহাদের শিখাই নাই। তাহার কারণ বোধ হয় তাহাদিগের সেলামটা আস্টা আমাদিগেরও প্রাপ্য, তাহা হইতে কেন আমরা বঞ্চিত হই!

প্রকৃত উদ্দেশ্য

শ্রমিক-আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই লক্ষ লক্ষ কৃষক ও মজুরকে মানুষের মত দাঁড়াইবার শিক্ষা দান করা। যে কৃষককে অত্যাচারী জমীদার বা পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শিক্ষা বা সু-যোগ আমরা দিই নাই, তাহাকে কি বলিয়া ইংরেজের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে চাহি? আমলাতন্ত্রের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কতটুকু? যে অত্যাচার তাহার দৈনিক জীবনের সঙ্গী হইয়া তাহার মনুষ্যত্ব লোপ করিয়াছে, সে অত্যাচারের কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারিব না, কারণ তাহাতে আমাদের আত্ম-বিরোধ বা "ক্লাস-ওয়ার" জাগিয়া উঠিবে। যে মজুর প্রত্যহ তাহার মনিব বা মনিবের ভৃত্যদিগের হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, তাহাকে আমরা বলিতে পারিব না যে তুমি তদ্দণ্ডেই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবে, কারণ তাহা হইলে "ক্লাস-ওয়ারের" উৎসাহ দেওয়া হয়। ধনী বা জমীদারের শত অত্যাচার বা অবিচারের কথা কিছু বলা হইবে না, কারণ তাঁহারা যে স্বরাজ-সংগ্রামে আমাদের সেনাপতি বা কোষাধ্যক্ষ!

নূতন বাণী

শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে নূতন মন্ত্রে সঞ্জীবিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগের মুক্তির বার্ত্তা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কানে পৌছাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি বা ছুটীবৃদ্ধি শ্রমিক-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, এমন কি উদ্দেশ্য পদবাচ্যই নহে। তাহারা মানুষ হয়, মানুষের মত সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস অর্জ্জন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে। একক তাহারা দুর্ব্বল বটে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাহারা অজেয়। এইভাবে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। "ক্লাস-ওয়ারে"র ভয়ে সত্য কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। একবার নয়, দুইবার নয়, শত শত বার এই কথা শ্রমজীবীদিগকে বলিতে হইবে। তাহাদের চাকুরীর সুখ সুবিধার জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য, সঙ্ঘ তাহা করিবে; কিন্তু একথা তাহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা যেন মাত্র চাকুরীর সুবিধা হইবে এই আশা লইয়া সঙ্ঘে না আসে। শ্রমিক আন্দোলনে আমার সহকর্ম্মীরা অনেকে হয়ত বলিবেন যে, একথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে শ্রমিক সঙ্ঘ-সকল ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, তাঁহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। অত্যাচারে জর্জ্জরিত মানুষের কাছে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির কথা বলিলে সে আশান্বিত উৎফুল্ল হয় দেখিয়াছি। ক্ষুদ্র স্বার্থের, ক্ষুদ্র প্রতিবিধানের কথা অনবরত বলিয়া আমরা তাহার মন খাটো করিয়া তুলি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সামান্য শ্রমিক হইলেও সে মানুষ এবং মানুষের বড় হইবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাতে বিদ্যমান।

প্রাচীনতন্ত্র ও নব্যতন্ত্র

বর্ত্তমান শ্রমিক আন্দোলনে দুইটী স্পষ্ট বিরোধী দল দেখা দিয়াছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব এখনও অনেকটা প্রাচীন লোকদের হাতে আছে; কিন্তু নব্যতন্ত্রের প্রাধান্য বেশ পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলন শীঘ্রই নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি দিল্লীতে 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসে'র গত অধিবেশনে এই নব্য তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। প্রাচীন মতের লোকদিগকে এখনই স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়, এবং বোধ হয় সমীচীনও নহে। বাংলা দেশে নব্যতন্ত্রের লোকদিগের প্রাধান্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন মতের যে কয়েকজন আছেন, তাঁহারা নবীনদিগের নেতৃত্ব ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের এসেম্বলী, কাউন্সিল, করপোরেশন বা জেনেভা গমনের উচ্চাশাও অনেকটা চরিতার্থ হইয়াছে।

নেতাদের বিবাদ

গত ১৬ই বৈশাখ তারিখের "আত্মশক্তিতে" জনৈক লেখক বাংলা দেশের শ্রমিক নেতাদের তথাকথিত বিবাদের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে বাংলাদেশে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সমিতির ন্যায় দুই প্রায় সমান ক্ষমতাশালী বিরুদ্ধ দল নাই। একবৎসর পূর্ব্বে ছিল বটে। "আত্মশক্তি"র লেখক সম্ভবতঃ তখনকার সময়ের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুইদল বলিতে যাহা বুঝায় বর্ত্তমানে বাংলা দেশের শ্রমিক আন্দোলনে সেরূপ কিছু নাই। একজন মাত্র তথাকথিত শ্রমিক নেতা তাঁহার আজ্ঞাবহ দুই তিন জন সহচর লইয়া, তাঁহার একটী দল আছে, এইরূপ হয়ত প্রকাশ করিতেছেন। শ্রমিক আন্দোলনে বর্ত্তমানে তাঁহার আর কোন স্থান নাই এবং সেদিন দেওয়ান চমনলালের সভাপতিত্বে বৌবাজারে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের কেরাণীসঙ্ঘ ব্যতীত অন্য কোন শ্রমিক আন্দোলনের সহিত তিনি কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না। ব্যক্তিগত কথা আমি আর বাড়াইতে চাহি না। যাঁহারা কেবল খবরের কাগজে নাম ছাপাইয়া ও ইয়োরোপের বড় বড় শ্রমজীবী সঙ্ঘের সহিত চিঠি চালাচালি করিয়া আমষ্টার্ডাম বা ক্যাণ্টনে প্রেরিত টেলিগ্রাম ছাপাইয়া সস্তায় নাম কিনিবার প্রয়াসী ছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে এবং তাঁহারা তাহা বুঝিয়াই সরিয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের সহকর্ম্মীরাও প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া "দলছাড়া" হইয়াছেন। শ্রমিকেরাও অনেক ঘা খাইয়া শত্রু মিত্র চিনিতে পারিয়াছে। ফাঁকিবাজি করিয়া এখন আর নেতৃত্ব বজায় রাখা চলিবে না। যাঁহারা প্রকৃত কার্য্য

করিবেন অথবা রাজসম্মানে প্রলুব্ধ হইবেন না, তাঁহাদিগকেই শ্রমিকেরা নেতা বলিয়া গ্রহণ করিবে।

শ্রীমৃণালকান্তি বসু (আত্মশক্তি)

(২) ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমান

সংস্কৃতে একটী শ্লোক আছে—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী
তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

আর্থিক উন্নতি ব্যাপারে মুসলমান জাতি আজ জগতের জাতিনিচয়ের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্রই সাড়ে পনর আনা লোক। আর অন্য সম্প্রদায়ের সাড়ে পনর আনাই অর্থশালী। ইহার কারণ এই যে, মুসলমানগণ চিরকাল বা চিরজীবন ব্যাপিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া নীরবে প্রাণপাত করিবে, এক পয়সা আয়ের স্থলে দুই পয়সা ব্যয় করিয়া বসিবে, কিন্তু আর্থিক উন্নতি যে কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন উপায়াবলম্বন ত দূরের কথা, উপায় সম্বন্ধে চিন্তাও করে না। জগতের জাতিসমূহ প্রত্যেকেই আপনাপন জাতি ও সমাজের উন্নতিসাধনকল্পে নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সমাজের মধ্যে অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া লয়। কিন্তু মুসলমানগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্যবসা-বাণিজ্যই যে অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

জাতি বা সমাজের দৈন্য-দশা ঘুচাইতে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন অনিবার্য্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে লাভ-লোক্‌সান উভয়ই আছে। তবে ব্যক্তিগত লোক্‌সানে মাত্রাটা কিছু মারাত্মক হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে বা যৌথ কারবারে লোক্‌সানের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। যৌথ বাণিজ্যে সে ভয় অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে এক-জনের পক্ষে তা গুরুতর হইয়া পড়ে। কিন্তু যৌথ কারবারে ক্ষতি হইলেও তাহা তত মারাত্মক হয় না। কারণ লাভের অংশটা যেমন সকলেই ভোগ করে, তেমন লোক্‌সানের ভাগটাও একাধিক ব্যক্তির উপর পতিত হইলে তাহা তত কষ্টদায়ক হয় না। এ নিমিত্ত যৌথ কারবার একান্ত প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলজনক।

মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রায় পনর আনা লোকই কৃষিজীবী। কৃষিকার্য্যই যে মানবের জীবন-ধারণের আর এক প্রধান অবলম্বন, তাহা সত্য কথা। কৃষকগণ সম্বৎসরকাল গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য করে। তাহাতে কৃষিজাত ফসলের অনেকটা হাজা শুকা অজন্মা আদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হইয়া যায়। অনেক স্থানে ভাল বীজ, উত্তমরূপে চাষ ইত্যাদির অভাবেও ফসল ভাল হয় না। কি উপায় অবলম্বন করিলে যে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা কৃষকগণ কেহই অবগত নহে। কেন না, তাহাদের সকলেই অশিক্ষিত। ইহার দরুণ ক্রমশই কৃষকের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। আবার অনেকে ঋণ করিয়াও কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ঐ সকল দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ ফল কম উৎপন্ন হইলে কিংবা বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাহাদের ঋণের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে না পারায় কৃষকদের দৈন্য দশা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কৃষকদের এই অভাব দূরীকরণ-মানসে কতিপয় উৎসাহী ও কৃষকদের হিতাকাঙ্ক্ষী লোক চৌমোহানীতে একটী সমবায় যৌথ সরবরাহ ও বিক্রয় সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতিতে কৃষকগণই অধিকাংশ মেম্বর থাকিবে। সমিতি কৃষক মেম্বরগণের সুবিধার জন্য পাট, ধান, ও অন্যান্য ফসলের উৎকৃষ্ট বীজ, সার, লাঙ্গল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিবে। স্থানীয় আবহাওয়া ও বাজার-দরের অবস্থা বিবেচনায় কি ভাবে জমিতে পাট ও ধানের চাষ করা উচিত, সেই সকল বিষয় সমিতি হইতে মেম্বরগণকে অবগত করান হইবে এবং ক্ষেতে কি ভাবে চাষ হইবে ও কিরূপ সার ব্যবহার করিয়া কোন্ সময় চাষ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে যথোচিত ভাবে উপদেশ প্রদান করা হইবে।

এই সমিতির কার্য্যপরিচালনার জন্য চৌমোহানীতে একটী আফিস ও গুদামঘর স্থাপন করা হইবে। চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, রাজগঞ্জ প্রভৃতি ব্যবসার স্থানে অনেকগুলি শাখা আফিসও স্থাপিত হইবে।

উপরোক্ত উপায়ে কৃষিকার্য্য, কৃষক এবং কৃষিজাত ফসলের যে অনেকটা উন্নতি হইতে পারিবে তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। আমরা ইহার উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাহাতে সমিতির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য কৃষকমাত্রকেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং ঐ সমিতির মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিতেছি।

(নোয়াখালি হিতৈষী)

(৩) ট্রেড্ ইউনিয়নিজ্ম বা শ্রমিক-সঙ্ঘবাদ

আন্তর্জ্জাতিক সংগঠন

স্বভাবতই যেমন আশা করা যায়, জাতীয় সঙ্ঘসমূহে যে অনৈক্য বর্ত্তমান আছে তেমন অনৈক্য আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘসমূহেও প্রতিভাত হচ্ছে। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমষ্টার্ডাম ও মস্কোতে শ্রমিকসঙ্ঘসমূহের দু'টী আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র আছে। জগতের শ্রমিক সঙ্ঘসমূহের তিন ভাগের দু'ভাগ এ দু'টি আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশিষ্ট এক ভাগের কোনো আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ নাই।

আমষ্টার্ডাম আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব যুদ্ধের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভ হতেই তা ভেঙে পড়ে। শ্রমিকগণের আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ-সংযোগের কথা ঘোষণা করে এ কেন্দ্র হতে প্রস্তাবসমূহ পাস হয়েছিল। বিশ্বের শান্তি-রক্ষার জন্য দরকার হলে আন্তর্জ্জাতিক গণ-অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করা হবে, এরূপও মীমাংসা করা হয়েছিল। কিন্তু কাজের সময় যখন আসল তখন দেখা গেল যে, নেতৃগণের আন্তর্জ্জাতিক ভাব-প্রবণতার উপরে জাতীয়ত্বের প্রীতিই বিজয় লাভ করেছে। ফলে, আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র ভেঙে গেল এবং আগেকার কতিপয় আন্তর্জ্জাতীয়ত্ববাদী তাদের আপন আপন গবর্ণমেন্টের অত্যন্ত গোঁড়া সমর্থক হয়ে পড়ল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হতেই ১৯১৯ সনে শ্রমিক আন্দোলনকে আবার আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তির উপরে সংহত করার জন্য চেষ্টা করা হোলো। এইরূপে আমষ্টার্ডামের আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র আবার জীবিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যুদ্ধ ব্যাপারে তাদের কর্ত্তব্যহীনতা সত্ত্বেও আমষ্টার্ডামের নেতৃগণের তাতে একটুকু ক্ষতি হয়নি। আগেকার সেই রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপরেই আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র পুনর্গঠিত হলো।

মস্কো আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র

জগতের ইতিহাসের আর একটি সমান উল্লেখযোগ্য ঘটনা—রুশের বিপ্লব—যুদ্ধের পূর্ব্বকার আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রের আমূল সংস্কার মতাবলম্বীদের উপরে সম্পূর্ণ পৃথক ক্রিয়া করেছিল। তাঁদের মতে জাতীয়ত্ববাদী সোশ্যালিষ্টগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত পুরাতন আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রের যত সব মিথ্যা 'থিওরি' ও গাঠনিক দোষ নির্দ্দয়ভাবে যুদ্ধের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। অন্য পক্ষে তাঁদের নিজেদের 'থিওরি"র সত্যতা রুশের শ্রমিকগণের বিজয়ের দ্বারা আরো বেশী করে প্রমাণিত হয়েছিল। এর ফলে, ১৯২০ সনে মস্কো ইন্টারন্যাশন্যাল বা আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র স্থাপিত হলো। দু'টো ইন্টারন্যাশন্যালের থিওরি বা মতগত পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এখানে আমরা প্রথমেই গাঠনিক পার্থক্যগুলিকে পরীক্ষা করে দেখব।

আমষ্টার্ডামের ইন্টারন্যাশন্যাল কতকগুলি জাতীয়ভাবে পূর্ণ আত্ম-সম্পূর্ণ কেন্দ্রের একটা ফেডারেশন বা সন্ধিসূত্রে মিলিত সঙ্ঘ। দৃষ্টান্তস্থলে দেখানো যেতে পারে যে, বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বৃটেন সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি আপনার হাতেই রেখেছে। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রশ্নের উপরেই ইন্টারন্যাশন্যাল চূড়ান্ত মত প্রকাশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াও আমষ্টার্ডাম ইন্টারন্যাশন্যালে বিভিন্ন ব্যবসায়ের শ্রমিকগণের অনেকগুলি আন্তর্জ্জাতিক সেক্রেটারিয়েট বা দপ্তর আছে। এগুলি হচ্ছে এক একটি বিশিষ্ট শিল্পের ইন্টারন্যাশন্যাল ফেডারেশন। যেমন ধাতুর কারখানার শ্রমিকগণের ইন্টারন্যাশন্যাল, খনির শ্রমিকগণের ইন্টারন্যাশন্যাল ইত্যাদি। আমষ্টার্ডাম

ইন্টারন্যাশন্যালের অন্তর্ভুক্ত এ প্রকারের ২৮টি সংগঠন রয়েছে। মূল সংগঠনের ন্যায় এর প্রত্যেকটিই অসংবদ্ধ ফেডারেশন-বিশেষ। নিছক আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা ব্যতীত অন্য কিছুর উপরে এসবের কোনোই ক্ষমতা চলে না।

সংগঠনের এরূপ অসংবদ্ধত্বই হচ্ছে আমষ্টার্ডাম আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য। আর তাদের এ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মস্কোর সহিত তাদের প্রধান গাঠনিক পার্থক্য। মস্কো ইন্টারন্যাশনালের নেতৃগণের মতে অসংবদ্ধ সংগঠনকে কিছুতেই যথেষ্ট বলে মেনে নিতে পারা যায় না। তাঁদের মতে প্রত্যেক জাতীয় প্রশ্নের মধ্যেই একটা আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব আছে। অন্যদেশে বিদ্যমান অবস্থাসমূহের সহিত প্রত্যেক দেশেরই একটা সাক্ষাৎ সংস্রব রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারতের কাপড়ের কলের শ্রমিকগণের সম্বন্ধ রয়েছে তাদের জাপানের ভাইদের সহিত। তাঁরা আন্তর্জ্জাতিক উৎকৃষ্ট ধনিক-সংগঠনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এ সংগঠন কত যোগ্যতার সহিত এক দেশের সহিত আর এক দেশের বিরোধ বাধিয়ে দিচ্ছে। সকল দেশের শ্রমিক সঙ্ঘগুলি একটি মাত্র আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রে সংহত হওয়ার জন্য তাঁরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছেন। তাঁরা চান এমন নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে যা সমগ্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে কাজ করতে সমর্থ হবে।

মস্কো ইন্টারন্যাশন্যালের যান্ত্রিক গঠন নিখুঁত না হলেও এরূপ বিশ্বাসের উপরে গঠিত হয়েছে। জাতীয় অনুষ্ঠানের কার্য্যাবলীকে সঙ্কুচিত না করে কিংবা জাতীয় বিভাগগুলির অনুপ্রেরণাকে হ্রাস না করেই কেন্দ্র-সংগঠন সদরে একটা প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে চায়।

শ্রমিক সঙ্ঘবাদের আকার

ট্রেড্ ইউনিয়নিজম বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদের গঠনের চর্চ্চা ত্যাগ করার পূর্ব্বে আমরা শ্রমিক সঙ্ঘসমূহের বিভিন্ন আকারের প্রতি মনোযোগ করব।

শ্রমিক সঙ্ঘবাদের তিনটি প্রধান আকার রয়েছে :—

১। বিশিষ্ট ব্যবসায় সংক্রান্ত সঙ্ঘবাদ
২। সাধারণ সঙ্ঘবাদ
৩। বৃহৎ শিল্পানুষ্ঠানসংক্রান্ত সঙ্ঘবাদ

বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের সংগঠনগুলি হচ্ছে সঙ্ঘসমূহের প্রাচীনতম আকার। প্রকৃত পক্ষে শ্রমিক আন্দোলনের অতি প্রাথমিক যুগ হতেই এগুলি গঠিত হয়ে আসছে। নামের দ্বারাই সূচিত হচ্ছে যে, এ ইউনিয়নগুলির কার্য্যক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। তারা শ্রমিকদিগকে ব্যবসায়গত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়। অর্থাৎ তাদের মতে ইঞ্জিনিয়ার, ছুতারমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী ও ইঞ্জিনচালক এ সকলেরই পৃথক পৃথক সঙ্ঘ হওয়া উচিত।

সাধারণ সঙ্ঘগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গঠিত হয়েছে। এরূপ সঙ্ঘের উদ্ভব ইংল্যাণ্ডে ১৮৮০ সনে হয়েছে। গোড়ায় এ ইউনিয়নগুলি ঐ সমস্ত শ্রমিকের জন্য গঠিত হয়েছিল, যারা কোনো বিশিষ্ট ব্যবসায়ের সহিত সংসৃষ্ট ছিল না, যেমন ডকের ও বিল্ডিংএর সাময়িক শ্রমিকগণ, ইত্যাদি।

ক্রমশঃ সাধারণ সঙ্ঘগুলিকে আরো সম্প্রসারিত করায় ধারণার উৎকর্ষ সাধিত হলো। এ প্রকারের প্রধান দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের ট্রান্সপোর্ট ও জেনার্যাল ওয়ার্কস্ ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের সভ্য-সংখ্যা ৫ লক্ষ। ডকের শ্রমিক, নাবিক, বাস্চালক ও সাময়িক শ্রমিকগণ এ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ শ্রেণীর শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য বৃহত্তর স্বার্থ সংযোগ হলেও এর দুর্ব্বলতাও আছে। এর দ্বারা এমন সব ব্যবসায়ের শ্রমিকগণকে একত্র করা হয়েছে, যাদের স্বার্থ ঠিক এক নয়। ফলে, যারা দুর্ব্বল তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া একেবারে বন্ধ না হলেও অতি সামান্য মাত্র দেওয়া হয়। সাধারণ সঙ্ঘবাদের আরো মারাত্মক দোষ এই হচ্ছে যে, শ্রমিকদিগকে মণ্ডলীতে বিভক্ত করে তাদের শক্তিকে এর দ্বারা কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে না। অথচ আধুনিক শিল্পানুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার দ্বারা এরূপ মণ্ডলীবিভাগ আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

এদিক্ থেকে বিচার করে দেখ্লে শ্রমিক সঙ্ঘের তৃতীয় আকার অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পানুষ্ঠানের সঙ্ঘবাদই উৎকৃষ্টতম। ব্যবসায়গত সঙ্ঘগুলি সংহত শ্রমিকদের মধ্যে অনাবশ্যক উপবিভাগের সৃষ্টি করে থাকে। সাধারণ সঙ্ঘগুলি এই ভুল অতিক্রম করতে গিয়ে উল্টোদিকে চরমে

পৌঁছেছে। সমস্বার্থ সংযোগের জন্য ফলপ্রসূ সঙ্ঘের সংগঠনে এরা জলাঞ্জলি দিয়েছে। এ সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে শিল্পানুষ্ঠান-হিসাবে সঙ্ঘগঠন করা। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এ আকারের সংগঠন বর্দ্ধিত হয়েছে। এ প্রকারের সংগঠন হচ্ছে অত্যন্ত বেশীরূপ কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-প্রণালীর ফল। শিল্পানুষ্ঠান-মূলক সঙ্ঘগুলি শ্রমিকরা যে যে কারখানায় নিযুক্ত হয় সে কারখানার হিসাবে সাক্ষাৎভাবে তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করে থাকে। তার পরে তাদের বিশিষ্ট কাজ হিসাবে শাখা বিভাগ করা হয়।

ইংল্যাণ্ডের রেলওয়ে শ্রমিকগণের জাতীয় সঙ্ঘ শিল্পানুষ্ঠানমূলক সঙ্ঘের একটা দৃষ্টান্ত। রেলওয়ে-সংক্রান্ত যাবতীয় শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই এ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ট্রান্সপোর্টের এই শাখার সঙ্ঘের অনেক উপবিভাগ আছে; যেমন রেলওয়ে ক্লার্ক, সিগন্যাল মেন, মুটে, আগুনওয়ালা, চালক স্থায়ী ওয়েম্যান প্রভৃতি। এই বিভিন্ন শাখ গুলির প্রতিনিধিগণ ইউনিয়নের উচ্চতম কমিটির সভ্য হয়ে থাকেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ডিষ্ট্রীক্টে বিভাগীয় কমিটিসমূহ গঠিত হয়েছে। এ প্রকার সংগঠনের দ্বারা বিভিন্ন শাখার দাবী ও অভিযোগগুলির প্রতি কখনো ঔদাসীন্য প্রদর্শন হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শিল্পানুষ্ঠানের তরফ থেকে খুব দৃঢ়ভাবে নিয়োগকারিগণের সম্মুখীন হতে পারা যায়।

সংগঠনের ভিত্তি

শিল্পানুষ্ঠানমূলক সঙ্ঘবাদের আরো নিয়মাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, কারখানার স্থিতিই হচ্ছে সংগঠনের ভিত্তি। রেলওয়ে কারখানার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারও একজন রেলওয়ে শ্রমিক এবং রেলওয়ে সঙ্ঘতেই তার যোগদান করা কর্ত্তব্য। একজন ছুতোর যদি জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানায় নিযুক্ত হয়, তা হলে তাকে জাহাজ-নির্ম্মাণকারী শ্রমিকদের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হতে হয়। আর একজন শ্রমিক যদি গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তা হলে সে গৃহ-নির্ম্মাণ-শিল্পের লোক। তাকে রাজমিস্ত্রী ও ইটওয়ালা প্রভৃতির সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

তিন আকারের সঙ্ঘবাদের মধ্যে মনে হয় যে, ব্যবসায়ের সঙ্ঘবাদই বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু অধুনা তাদের অযোগ্যতা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। শক্তিশালী ফেডারেশন ও সম্মিলনসমূহের মধ্যবর্ত্তিতায় ব্যবসায়গত সঙ্ঘবাদের ধারণা এখন দ্রুত তিরোহিত হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীর ফলপ্রসূ ও অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের দিক্ থেকে দেখলে সাধারণ সঙ্ঘবাদের ধারণাও আর আদৃত হয় না। শিল্পানুষ্ঠানমূলক সঙ্ঘবাদের সমস্ত শাখা উপশাখা সহ জাতীয় টেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হবে—এটাই হচ্ছে সকল উন্নত দেশের উন্নতিশীল শ্রমিক-সঙ্ঘবাদীর উদ্দেশ্য। (গণবাণী)

(৪) কৃষকের ভুল

পাট উৎপাদনে বঙ্গীয় কৃষক যে ভ্রান্তি ও অবিবেচনা প্রদর্শন করিয়া থাকে তাহা নিরাকৃত না হইলে তাহার দুর্গতির অবসান কিছুতেই আশা করা যাইতে পারে না। বিশ্ববাসীর চাহিদা অনুযায়ী পাটচাষের ভূমির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা তাহারা কর্ত্তব্য মধ্যে গণনা করে না। অতীতের লাভ লোকসানের গণনা, বর্ত্তমানের চাহিদা, বিবেকবুদ্ধি-পরিচালনে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ তাহাদের চিন্তায় স্থান পায় না। তাহারা মান্ধাতার আমল হইতে যে প্রণালীতে কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারই অনুসরণ করিয়া কল-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কাজ করিয়া যায় মাত্র। ইহার ফলাফলের সঙ্গে তাহাদের ভাগ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত, তাহা হয়ত একবারও ভাবিয়া দেখে না। তাহাদের এই অজ্ঞতা ও অবিবেচনার সুবিধা পাইয়া বিদেশী বণিকগণ তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া কাচমূল্যে সোনা গ্রহণ করিয়া থাকে। এ অবস্থার প্রতিকার ত সুদূরপরাহত নহে, তবে কেন বঙ্গের কৃষকগণ স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া 'দেখি বিধি বিধাতার' এই নীতির অনুসরণে এত তৎপর! তাহার অজ্ঞতা, তাহার কূপমণ্ডুকত্ব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাহার চতুর্দ্দিকে কিরূপভাবে ঘুরিতেছে তাহা তাহার মানস-নেত্র হইতে দূরে রাখিতেছে। এখনও এই অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ও তাহার নিরাকরণে

সচেষ্ট হইলে কৃষকগণের দুর্গতি বহুল পরিমাণে বিদুরিত হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় ২৮লক্ষ একর ভূমিতে পাটের চাষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রতি একরে গড়ে ৩ গাঁইট (প্রতি গাঁইট ৫ মণ) করিয়া ৮৪ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে কয়েক বৎসর যাবৎ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে অনেক কম হইতেছে। ওদিকে কলিকাতা ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে ৭০।৭৫টী মিল পট্টশিল্পের জন্য পরিচালিত হইতেছে। এসকল মিলে যথারীতি কাজ হইলে এক কোটি গাঁইটও বৎসরে ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে প্রচুর নহে। বিদেশেও ৩০।৩৫ লক্ষ গাঁইট রপ্তানি হইতেছে। এমতাবস্থায় বিশ্ববাসীর চাহিদা কম হইবার কথা নহে। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে ছালা, চট ইত্যাদির চাহিদা বিদেশে কম হইয়া পড়ায় ও বহু কাঁচা পাট বৎসরের পর বৎসর মিলসমূহে সঞ্চিত থাকায় এখন পাটের চাহিদা কম হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি উৎপন্ন পাটের যাচাইও পূর্ব্ববৎ হইতেছে না। বিদেশী বেলারগণ শুধু ভাল পাট রপ্তানি করিতে যত্নপর। মিল খারাপ ভাল সব রকমেরই পাট ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাল পাটের পরিমাণ খুব কম হয়। তাহার দামও বাজারে নেহাৎ কম নয়। কিন্তু মিলের চাহিদা অনুযায়ী যোগান যথাসম্ভব অল্পমূল্যে কিনিতে মিলারগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহারা এখন পূর্ব্বের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান না হইয়া তাহাদের একচেটিয়া পাটক্রয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহারা সমবেত ভাবে সভা করিয়া ঐ সভার নির্দ্দেশানুযায়ী পাটের বাজার-দর তাহাদের কুক্ষিগত করিয়া রাখেন। অজ্ঞ কৃষক কিছুদিন পাট ঘরে রাখিয়া পরে পেটের দায়ে তাহা অল্পমূল্যেই বিক্রী করিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় সমবেত শক্তি প্রয়োগে যথাসম্ভব উচ্চমূল্যে পাট বিক্রয় করিবার জন্য কোন প্রচেষ্টা করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য তাহারা ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহাদের জীবন ভার দুঃসহ করিয়া তুলে। কৃষকের এ দুর্গতি দূর করিতে হইলে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

সারা দেশ জুড়িয়া দল বাঁধিয়া কার্য্য-পদ্ধতি ঠিক করিতে হইবে। এইরূপে নির্ব্বাচিত কেন্দ্রশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদনপূর্ব্বক বাজারে উচ্চ মূল্য হইলে বিক্রয় করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহাদের দুর্গতি অচিরে বিদুরিত হইবে। অবশ্য ইহাতে যে শিক্ষা ও সাধনার দরকার তাহা ধীরে ধীরে আয়ত্ত হইবে। যথাসম্ভব কম খরচে অল্প জমিতে বেশী পরিমাণ পাট কি করিলে উৎপন্ন হইতে পারে, তৎপর যথাসম্ভব উচ্চ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া কিরূপে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়, তাহার পন্থা-নির্দ্দেশই সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক।

বিদেশী বণিকগণ এখন যেরূপ যাচাইর আদর্শ করিয়াছেন তাহাতে ১।২।৩।৪ নং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে যে প্রকারের পাট ৩।৪নং বলিয়া অভিহিত হইত, তাহাই এখন ফেরৎ, বি আর, টি আর ইত্যাদি নামে অভিহিত। এই কৃত্রিম উপায়ে তাহারা দরের হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃষক না বেচিয়া পারে না তাই ইহার প্রতীকারে অসমর্থ। আবার জমিতে পাট উৎপাদন করিবার শক্তিও ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গের নেতৃবৃন্দ কৃষকের এই দুর্গতির অপনোদনে সচেষ্ট হইবেন কি? অজ্ঞ কৃষককে সুপরিচালিত করিয়া তাহার অভাব-সময়ে অল্প সুদে ঋণদান করিয়া সমবায় প্রথানুযায়ী উৎপন্ন ফসল বিকি-কিনির ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহারা একদিকে যেমন কৃষকগণের উপকার করিবেন, অপরদিকে তেমন দেশে অধিকতর অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন।

কৃষক আর ঘুমাইও না, অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকিয়া সামান্য টাকার লোভে ঘরের ধন পরের হাতে তুলিয়া দিয়া দুঃসহ জীবন আর কতকাল যাপন করিবে? তুমি সমাজের মেরুদণ্ড, তুমি শক্তিহীন হইলে সমাজের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং সহযোগিতার অমোঘ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উদ্দেশ্য-সাধনে অগ্রসর হও। কূর্ম্মের ন্যায় হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিও না, দেখিবে অচিরে তোমায় চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

(প্রবাসী)

(৫) বাণিজ্যে বাঙালী

আজ আমাদের শৈশবের কথা মনে পড়িতেছে। এই জলপাইগুড়ি সহরে যেখানে মন্তরাম আগড়ওয়ালার দোকান, সেখানে ছিল শ্রীযুক্ত কানাই কুণ্ডুর দোকান। যেখানে শালভাঙ্গার মাড়োয়ারী বাবুদের দোকান, সেখানে ছিল গৌরী কুণ্ডুর দোকান। থানার নিকটে আর্য্য ব্যাঙ্কের সংলগ্ন ভূমিতে ছিল নবীন কুণ্ডুর আড়ৎ। এবং সারদা টী কোম্পানীর আফিসের নিকট ছিল লালচাঁদ কুণ্ডুর আড়ৎ। যেখানে প্রহ্লাদ বাবুর ভূসিমালের দোকান, সেখানে ছিল তারানাথ সাহা ও ধনেশ সাহার দোকান। এবং পচাগড়ের মাড়োয়ারী বাবুদের যেখানে দোকান, তাহা ছিল পল্ম বাবুদের দোকান। ইহারা ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী। ছোট ছোট দোকান আরও কত ছিল ঠিক করিয়া বলা যায় না। পাটের ব্যবসা, কেরোসিনের ব্যবসা ভূসিমালের ব্যবসা ইহাদেরই ছিল একচেটিয়া। ইহারা নৌকা করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে চুন ডাল, গুড়, নারিকেল প্রভৃতি নানাপ্রকার পণ্য আমদানি করিত এবং এখান হইতে তামাক, চাল, ধান প্রভৃতি রপ্তানি করিত। সকলেই ছিল সমৃদ্ধ। তাহাদের কর্ম্মচারী ছিল বাঙ্গালী। তাহাদের অর্থ ব্যয়িত হইত বাঙ্গালীর শুভ কার্য্যে। কিন্তু আজ তাহারা বৃত্তিহীন। আজ তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অবাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং সেই ব্যবসায়ে অর্জ্জিত অর্থ বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের উষরভূমির শ্রী ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে। গত বাৎসরিক হিসাবে দেখ গিয়াছে যে কলিকাতা সহরের সমগ্র সম্পদের দশভাগের তিনভাগ মাত্র বাঙ্গালীর। ইংরেজ ব্যতীত জু, পার্শি, ভাটিয়া, নাখোদা, শিখ, চীনা প্রভৃতিতে কলিকাতার বাজার ভরিয়া গিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" বাঙ্গালীর এই সাধু বাক্য বাঙ্গালায় আজ অনাদৃত। গোঁপ দুরস্ত আপখোরাকী মাসিক কুড়িটাকা মাহিয়ানার মসিজীবী বাবুকে দেশের সম্পদ্ আহরণকারী বণিক হইতে যে দিন বাঙ্গালী বেশী করিয়া সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই বাঙ্গালীর বাণিজ্য-লক্ষ্মীর তিরোধান আরম্ভ হইয়াছে। বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে জাতীয় সম্মানের উপর। দেশ যে বৃত্তিকে সম্মানিত বলিয়া গ্রহণ করিবে দেখিবে একান্ত চিত্তে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দেশের বাঙ্গালী বণিক সম্প্রদায় তোমাদের অবজ্ঞার ফলে লুপ্ত হইয়া গেল। যে দিন তোমরা পরপদলেহী, মেরুদণ্ডহীন চাকুরীয়া অপেক্ষা এই বণিক সম্প্রদায়কে হীন বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিলে সেই দিন হইতেই তুমি তোমার নিজের পায়ে কুঠার হানিয়াছ। মানুষ মাত্রেই সম্মানলোলুপ। কাজেই বাঙ্গালার বণিক সম্প্রদায় তাহাদের অর্জ্জিত অর্থ জমীদারি বা পত্তনী ক্রয় করিয়া পাল চৌধুরী কুণ্ডু চৌধুরী, সাহা চৌধুরী প্রভৃতি হইয়া গেল এবং তাহাদের পুত্র প্রপৌত্রকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া এটর্নি, ব্যারিষ্টার, হাকিম প্রভৃতি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। ফলে গঙ্গাজলজী হনুমানজী, মেটাজী, বাঙ্গালীর বাণিজ্য-সম্পদের মালিক হইয়া উঠিল। আজ প্রকৃতির কঠিন প্রতিশোধ আরম্ভ হইয়াছে। আজ তোমাকে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে এবং তিল তিল করিয়া তোমার অস্থি-মজ্জার ভিতর দিয়া বুঝিতে হইতেছে তুমি কি পাপ করিয়াছ। আজ অ-বাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ীর গদির মুষিক হইয়া তোমাকে তোমার উদরান্নের সংস্থান করিতে হইতেছে মনুষ্য-সমাজে প্রত্যেক বৃত্তিরই সার্থকতা আছে, ভূয়োদর্শনের ফলে এই আশ্রম-ধর্ম্ম ও আশ্রম-বৃত্তি ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল; পুরুষ পরম্পরাগত অভিজ্ঞতার ফলে এক একটী আশ্রম এক একটী বৃত্তিতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। আজ সেই আশ্রমধর্ম্ম ও আশ্রম-বৃত্তির লোপের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাঙ্গনের পালা আসিয়াছে তাহার পরিণামে যে কি গড়িয়া উঠিবে বলা কঠিন। আমরা চাই প্রত্যেক আশ্রম-বৃত্তির বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেক আশ্রম-বৃত্তির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা। আশ্রম-বৃত্তির লোপে কেবল বিপ্লব আনে, আর আশ্রম বৃত্তির পরিপুষ্টিতে আনে শৃঙ্খলা ও দেশের সম্পদ্। (জনমত)

(৬) জাহাজের কাজে ভারত-সন্তান

মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে যে অবস্থা হয়, 'বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস' সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স বা

ভারতীয় বণিকসমিতির পত্র ফিরিঙ্গী মহলে ঠিক সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান ম্যারাইন্ কমিটী ও বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস কমিটীর রিপোর্ট অনুসারে গবর্মেণ্ট আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, উপকূল বাণিজ্য সম্পর্কে 'বেঙ্গল পাইলট সার্ভিসে' কয়েকটী পদ ভারতীয়দের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ভারতীয়দের নিয়োগ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, ভারতীয়দিগকে ঐ সার্ভিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা নয়। একটি নিয়ম এই যে, 'বেঙ্গল পাইলট সার্ভিসে' প্রবেশ করিতে হইলে, বিদেশী সার্ভিস বা বহিঃসমুদ্রগামী জাহাজের কাজে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এই নিয়মের ফলে, কোন ভারতবাসীই যে উক্ত পদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। কেন না বহিঃসমুদ্রগামী জাহাজ সবই বিদেশী কোম্পনীর একচেটিয়া এবং ভারতবাসীরা তাহাতে কোনই কাজ পায় না বা তাহাদের পক্ষে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সেইজন্য ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বেঙ্গল পাইলট সার্ভিসে প্রবেশ-প্রার্থী ভারতীয়দের পক্ষে এই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হোক এবং ভারতীয় উপকূলগামী জাহাজের কাজে অভিজ্ঞতাই তাহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা হোক। অবশ্য বহির্বাণিজ্যের ন্যায় উপকূল বাণিজ্যও প্রায় সমস্তই বিদেশীর হাতে ; তবুও উহারই মধ্যে ভারতীয়দের জাহাজের কাজে শিক্ষালাভ করিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ আছে। ভারতীয়েরা একেই জাহাজের কাজে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ পায় না, তারপর এইভাবে অন্যায় নিয়ম করিলে তাহাদিগকে প্রকারান্তরে বঞ্চিত ও প্রতারিত করা এবং বিদেশীর স্বার্থের জন্য ভারতবাসীর স্বার্থ বলি দেওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের দাবী যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। "বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস" সম্বন্ধে উপকূলসমুদ্রের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট এবং গবর্মেণ্ট সত্যই যদি ভারতবাসীকে উক্ত সার্ভিসে স্থান দিতে চান, তবে তাঁহারা ভারতীয়দের জন্য এইটুকু সুবিধা কেন দিবেন না, তাহা বুঝা কঠিন।

কিন্তু ইণ্ডিয়ান চেম্বারের এই অতি ন্যায্য প্রস্তাবেও ফিরিঙ্গী মহলে তুমুল কলরব উঠিয়াছে। 'ষ্টেটসম্যান' সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন—ভারতীয়েরা বিনা অভিজ্ঞতাতেই পাইলটের কাজে প্রবেশ করিতে চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, ভারতীয়েরা এই সব কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

'ষ্টেটসম্যানের এই বিকৃত মুখভঙ্গী ও নখদন্তবিকাশ আচার্য্য রায়ের ন্যায় ধীরমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে। তিনি 'ষ্টেটসম্যানের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, নিছক নীচ মনোভাব-প্রসূত বর্ণ-বিদ্বেষই উহার মধ্যে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বিদেশী বণিকেরা ভারতের পোতশিল্প, সমুদ্রবাণিজ্য, উপকূল-বাণিজ্য—রাজশক্তির সহায়তায়—অবৈধ আইনের সুযোগ লইয়া এককালে ধ্বংস করিয়াছে। আর আজ তাহারাই জাহাজের কাজে ভারতীয়দের যোগ্যতা লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে। পাইলটের কাজে প্রবেশ করিবার জন্য ভারতীয়দের কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই, একথা কেহ বলে নাই। ইণ্ডিয়ান চেম্বারও নয় আচার্য্য রায়ও নহেন। তাঁহারা কেবল বলিয়াছেন যে উপকূলগামী জাহাজের কাজে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই পাইলটের কাজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি ও তর্ক কে শোনে ? বিদেশী বণিক ও জাহাজ কোম্পানীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতের ক্ষীণ সম্ভাবনাও যে অসহ্য। ষ্টেটসম্যান তাই ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের মত আচার্য্য রায়ের কথার প্রতিবাদে যা-তা বাজে বকিয়াছেন।

আজ ভারতীয়েরা জাহাজের কাজের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু একদিন ভারতীয় লস্কর ও পোতাধ্যক্ষদের চালিত ভারতীয় জাহাজ দেখিয়াই ইংরেজ লস্করেরা মরাকান্না কাঁদিয়াছিল। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ঐসব জাহাজ যখন ইংলণ্ডের বন্দরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল তখন ইংরেজ বণিক, জাহাজওয়ালা, নাবিকদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, "এই ভারতীয় জাহাজ ও ভারতীয়

নাবিক আমাদের অন্ন মারিবে। ইহারা থাকিতে আমরা ভারতে বাণিজ্য করিয়া খাইতে পাইব না। আমাদের জাহাজগুলিও উঠিয়া যাইবে।" ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তখন রাজশক্তি আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা ভক্তের ব্যাকুল-প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ফলে প্রথমেই ভারতীয় লস্কর-চালিত ভারতীয় জাহাজের ইংলণ্ডে গমন বন্ধ হইল। তারপর বহুবৎসরের প্রবল চেষ্টায় আইন ও রাজশক্তির সহায়ে ভারতীয় পোত-শিল্প ধ্বংস হইল। ভারতীয় লস্করকুল প্রায় লোপ পাইল। বহির্ব্বাণিজ্য সমস্তই ভারতীয়দের হাত হইতে বিদেশীদের হাতে যাইয়া পড়িল। সে শোচনীয় ইতিহাস ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার অর্থ-নৈতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তারপর কিরূপে বাঙ্গালার অন্তর্ব্বাণিজ্য সমস্ত বিদেশীদের হাতে গিয়াছে, বাঙ্গালার নদ-নদী ও উপকূলে বিদেশীরা কিরূপে ষ্টিমার ও জাহাজ চালাইয়া সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছে, দেশীয় জাহাজ কোম্পানী, ষ্টিমার কোম্পানী বিদেশীদের অবৈধ প্রতিযোগিতায় কিরূপে অপঘাত মৃত্যুতে মরিয়াছে, সে সুদীর্ঘ ইতিহাস আজ নাই বলিলাম। সেই বিদেশী শোষণকারীর দল ও তাহাদের মুখপত্রগুলি যে আজ আবার জাহাজের কাজে ভারতীয়দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

ভারতের অন্নসমস্যার জটিলতা ভাবিয়া আমরা আকুল। গবর্ণমেণ্ট তো প্রকারান্তরে এই সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন; কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, সামরিক বিভাগ, নৌবিভাগ প্রভৃতি সাহসপূর্ণ সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইতে পরাধীন ভারতবাসীদের বহিষ্কার যে তাহার প্রধান কারণ, এই সহজ কথাটা না বলিলেও চলে। স্বাধীন জাতির যুবকেরা জীবনের সর্ব্ববিভাগে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়, তারপর নিজেদের শক্তিতে পথ কাটিয়া লয়। আর পরাধীন আমরা—কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরি, পাঠশালার গুরুমশায়গিরি, প্রভৃতি কয়েকটি বাঁধারাস্তা ছাড়া আর সবগুলি পথ আমাদের নিকট রুদ্ধ। যদি কখনও ভুল-ক্রমে লোক দেখাইবার জন্য বা সাময়িক উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর জন্য উহাদের কোন একটি রুদ্ধ দ্বার খুলিতে চান, অমনি শকুনি-গৃধিনীর দল চারিদিক হইতে বিষম কলরব করিতে থাকে। জঘন্য স্বার্থপরতা, নীচতা ও বর্ব্বরতার এমন দৃষ্টান্ত আর কোন দেশে দেখা যায় না।

(আনন্দবাজার)

সরকারী চাকুরিয়ার আর্থিক জীবন *

শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী

ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আমাদিগকে আহার করিতে হয় এবং মানুষ বলিয়া আমরা সমাজে বাস করিতে বাধ্য; ফলতঃ যথারীতি আমাদিগকে বস্ত্র পরিতে হয় এবং পোষ্যবর্গকে খাওয়াইতে, পরাইতে, রক্ষা করিতে এবং বিদ্যা শিখাইতে হয়। প্রধানতঃ এই কয়টী উদ্দেশ্যে আমরা চাকুরি গ্রহণ করিয়াছি এবং কেরাণীগিরি চাকুরির শ্রেণীতে পড়িয়াছি।

আমাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বা তদ্ভিন্ন শ্রেণীর বিদ্বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অন্যান্য যে কোনও শ্রেণীর সরকারী কার্য্য—এমন কি একমাত্র শিক্ষা পাইবার সুযোগ দান করিলে পারিভাষিক শ্রেণীর কার্য্যগুলিও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে সমর্থ। কেরাণীগিরি চাকুরিতেও পারিভাষিকত্ব আছে। সরকারী কাগজ ছাড়া, কেরাণীকে বহুবিধ আইন নিয়মও জ্ঞাত থাকিতে হয়।

* শিলঙে অনুষ্ঠিত সরকারী চাকুরিয়া সম্মিলনের সভার এক প্রস্তাব উপলক্ষ্যে (৫ জুন ১৯২৭)।

তাঁহাকে আইন ও নজিরগুলি উল্লেখ করিতে হয়, হিসাব রাখিতে হয়, আদালতে উকীল ব্যারিষ্টারগণ প্রভৃতি বা ব্যবস্থাপক সমাজ যে সব বিষয় সমাধা করিয়া থাকেন সে সব বিষয়েরও সমালোচনা করিতে হয় এবং এমন কি সময় সময় রাজনৈতিক বিষয়ে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ইঙ্গিত বা প্রস্তাব করিতে হয়। ইহা ধ্রুব সত্য যে কেরাণীগণ রাজ্যশাসন কার্য্যের একটী অতি দরকারী অংশ। কেরাণীগণের উপরেই আফিসের কর্ত্তার কৃতকার্য্যতা বা বিফলতা নির্ভর করে এবং কেরাণীগণই দলিলাদির তত্ত্বাবধায়ক।

অন্যান্য শ্রেণীর চাকুরিয়ার শারীরিক অবস্থার সঙ্গে তুলনায় ইহা যথার্থ বলা যাইতে পারে যে, চাকুরির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেরাণী ক্রমশঃ জীবনশক্তি হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু সরকারের জন্য তাঁহাকে যে উপবেশনশীল কার্য্য করিতে হয় ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। কেরাণী গৃহ-বহিস্থিত কার্য্যের ও শারীরিক ব্যায়াম বা ক্রীড়ার কোনও সুযোগ পান না। সুধু তাহাই নহে, অনেকস্থলে কেরাণীকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত, এমন কি বন্ধেও, কাজ করিতে হয়। অনেকস্থলে সরকারী কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে, বা তাঁহার আবশ্যকমত ছুটী দেওয়া হয় না, অথবা কোথাও ছুটী লইবার অতিরিক্ত ব্যয়বহনে অসামর্থ্য হেতু তিনি নিজেই ছুটী চাহিতে পারেন না। এই সমস্তই তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সংক্ষেপতঃ কেরাণী শুধু চাকুরিতেই জীবনপাত করেন। কিন্তু অন্যান্য চাকুরিয়ার সঙ্গে তুলনায় কেরাণীর প্রতি ব্যবহার আদৌ সন্তোষজনক নহে। পৃথিবীর জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তির ভাষায় "কেরাণীগণ শাসনকার্য্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ"। ঐরূপ অন্যান্য প্রশংসাবাক্য, আমরা বক্তৃতা বা লেখায় দেখিতে পাই সত্য, কিন্তু এখানে আমাদিগকে এমন মাহিয়ানা দেওয়া হইতেছে যে, তাহা যে কেবল মাত্র মূল্যানুরূপ নয় তাহা নহে, আমাদের নিতান্ত আবশ্যক ব্যয়বহনের পক্ষেও নিতান্ত অপ্রচুর। আমাদের আরম্ভের বেতনের হার অন্যান্য চাকুরিয়ার অপেক্ষা অল্প এবং শেষ বেতনের হারও তদনুরূপ। অন্যান্য চাকুরিতে বেতন ছাড়া যে সব সুবিধা আছে, যথা বিনা ভাড়ায় বাড়ীতে বাস বা এলাওয়েন্স, তাহা আমাদের নাই।

অপরপক্ষে, ভারত গভর্ণমেণ্টের বড় আফিসেই হউন বা স্থানীয় কোনও ছোট আফিসেই হউন কেরাণী কেরাণী বই কিছুই নহেন। যদি বিদ্যা সমান হয়, তবে উচ্চ আফিসের টাইপিষ্ট্ হইতে ক্ষুদ্র আফিসের টাইপিষ্ট্‌কে, ডেস্‌প্যাচার হইতে ডেস্‌প্যাচারকে, মহাফেজ্ হইতে মহাফেজ্‌কে, ডায়েরিষ্ট্ হইতে ডায়েরিষ্ট্‌কে, ষ্টেনগ্রাফার হইতে ষ্টেন-গ্রাফারকে বেতন সম্পর্কে পৃথকরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। তদ্রূপ, একপ্রকার কার্য্য বিধায়, প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটের নিম্নশ্রেণীর ডিলিং ক্লার্কের সঙ্গে বিভাগীয় উচ্চ আফিসের নিম্নশ্রেণীর ডিলিং ক্লার্কের, উচ্চশ্রেণীর ডিলিং ক্লার্কের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর ডিলিং ক্লার্কের, সমসংখ্যক ডিলিং ক্লার্কের কার্য্যপরিদর্শক হেড্ এসিষ্ট্যাণ্টের সঙ্গে হেড্ এসিষ্ট্যাণ্টের কোন পার্থক্য হইতে পারে না। এমন কি, আফিসের লোকসংখ্যার তারতম্য ছাড়া, সেক্রেটারিয়েটের রেজিষ্ট্রারের কার্য্যের প্রকৃতির সঙ্গে বিভাগীয় উচ্চ আফিসের সর্ব্বপ্রধান কেরাণীর কার্য্যের প্রকৃতির অতি সামান্যই প্রভেদ আছে। যে যে কার্য্য তুল্য সেগুলির বেতনও তুল্য হওয়াই উচিত; কেবলমাত্র যেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যানুযায়ী দায়িত্বের তারতম্য আছে সেখানে ঐ সংখ্যার অনুপাতে বেতনের পার্থক্য হইতে পারে, কিন্তু অন্যত্র পার্থক্যের বলবৎ কারণ নাই।

বাস্তবিক, আমাদের বেতন অন্যান্য শাখার কর্ম্মচারি-গণের বেতন অপেক্ষা অল্প, এবং কেরাণীগণের মধ্যেও এক আফিসের সঙ্গে অন্য আফিসের কেরাণীগণের বেতনের হারের অবাঞ্ছনীয় পার্থক্য বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ একটী বিভাগীয় উচ্চ আফিসের সঙ্গে সেক্রেটারিয়েটের তুলনা করিয়া দেখা যাক। প্রথম আফিসে, যে সব কেরাণী এক একটী ডিলিং ব্রাঞ্চের কেরাণীগণের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য সেক্রেটারিয়েটের ন্যায় হেড্ এসিষ্ট্যাণ্ট নামক পৃথক গ্রেড্ না থাকায়, তাঁহারা ঐ আফিসের উচ্চ বিভাগের "এ" গ্রেডে আছেন। বাস্তবিক ঐ "এ" গ্রেডে প্রাচীন ডিলিংক্লার্ক্‌দিগকে রাখা উচিত ছিল, এবং তাঁহাদের উপযুক্তস্থল অন্যে অধিকার করায় তাঁহাদিগকে "বি" গ্রেডে থাকিতে হইয়াছে। ঐ "বি" গ্রেডে

অপেক্ষাকৃত অল্প প্রাচীন ডিলিং ক্লার্কের স্থান দেওয়া উচিত ছিল। এই প্রকারে বর্ত্তমান বেতনের হার উর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ঐ আফিসের প্রত্যেক কেরাণীর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

পূর্ব্বের ১২৫৲ বা তদূর্দ্ধ বেতনের কার্য্য সেক্রেটারিয়েটের উচ্চবিভাগীয়দের বর্ত্তমান টাইম্ স্কেলের অন্তর্গত বৃদ্ধির পক্ষে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু অপর আফিসের কেরাণীগুলিতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ফলতঃ, বিভাগীয় প্রধান আফিসগুলির হেড্ক্লার্ক্ ও ডিলিং ব্রাঞ্চের হেড্ এসিষ্ট্যাণ্ট্গণের (উচ্চ বিভাগের "এ" গ্রেডের)—যাঁহারা বর্ত্তমান টাইম্ স্কেল আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে এখনও একই কাজ করিতেছেন—ঐ পূর্ব্বের কার্য্য বর্ত্তমান টাইম্ স্কেলের বৃদ্ধির পক্ষে নিস্ফল হইয়াছে, এবং ইহা বর্ত্তমান দুরবস্থা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলে গ্রেডের উচ্চস্থানের গড়পড়তা লাভ করিবার পূর্ব্বেই অনেককে পেন্‌সন লইতে হইবে।

ব্যক্তিগত ভাবে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, বিভাগীয় প্রধান আফিসের একজন কেরাণীর বেতন, সম দক্ষতা ও চাকুরী-কাল সম্পন্ন সেক্রেটারিয়েটের কেরাণীর বেতনের প্রায় অর্দ্ধেক বটে। এমন কি আরম্ভের বেতনের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহার উপযুক্ত কারণ দেখি না।

বর্ত্তমান বেতনের হারের অপ্রাচুর্য্যহেতু, ক্ষতিগ্রস্ত না হইবার জন্য আমাদের অনেককে পূর্ব্বের বেতন রাখিতে হইয়াছে এবং আমাদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁহারা পেন্সন্ গ্রহণের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এবং, যদিও অতি উপযুক্ত, ২০০৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিতে পারিলেন না।

এখানে বর্ত্তমান মহার্ঘ্য হেতু আমরা অনেকেই নিত্য আবশ্যকীয় মাছ তরকারী ইত্যাদি পছন্দমত ক্রয় করিয়া খাইতে পাইনা এবং বাসায় চাকর রাখিতে পারিনা। এইগুলি ও অনেকের মুখাবয়বে যে অতিরিক্ত চিন্তারেখা বা নৈরাশ্য দেখা যায়, তাহাই আমাদের অবস্থার সাক্ষ্যদায়ক। এথাকার দোকান বা ব্যাঙ্কগুলিতে অনুসন্ধান করিলেই যে-কেহ দেখিতে পাইবে যে—সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহাদের কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের আয় পরিপুষ্ট করিতেছে সেই অল্প কয়জন ভিন্ন—আমরা কিরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ছেলেপিলেদিগকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যয় বহন করা আমাদের এক গুরুভার বটে, এবং তাহাদিগকে কলেজে শিক্ষা দেওয়া স্বপ্নের বিষয় দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এই সকলের মূলে কি? ইহার কারণ আমাদের বেতন অল্প। কেহ বলিতে পারেন যে, এখনকার বেতনের হার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু ভ্রাতৃবৃন্দ! যদি তুলনাকারী সর্ব্বপ্রকারের মহার্ঘ্য ও তাহার গতির দ্রুততা বিবেচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান বেতনের হার পূর্ব্বের অপেক্ষা কার্য্যতঃ লঘুই বটে। সাধারণ চাকুরি ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সরবরাহই বেতন নিরূপণ করিয়া থাকে এবং সম্ভবতঃ তাহাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কতক কারণ; কিন্তু রাজভক্ত প্রজা হইয়া নিজেদের রাজ-সরকারে চাকুরি করিয়া, আমরা আশা করি যে একমাত্র ইহাই আমাদের ক্ষেত্রে কার্য্যবিধায়ক হইতে পারে না এবং আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয় সরকারেরই দেখিবার বিষয়। সরকারই আমাদিগকে একত্র হইয়া অভাব অভিযোগ জানাইবার সুযোগ দিয়াছেন এবং ইহা নিশ্চিত যে, যদি আমরা আমাদের বিষয়গুলি ভালরূপে বুঝাইতে পারি তবে নৈরাশ্যের কারণ নাই, যেহেতু আমাদের অভাব অভিযোগ দূর করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নহে, এবং তাঁহাদিগকে বাস্তবিক বুঝাইতে পারিলে তাঁহারা সহজেই তাহা করিতে পারেন।

আমরা আশা করি যে, এমন সময় আসিবে যখন সরকারের অধীন প্রায় এক জাতীয় সকল শ্রম তুল্য মূল্য পাইবে এবং—কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ স্থানের জন্য বিশেষ হার ছাড়া—সমস্ত ভারতবর্ষে তাহার একহার হইবে।

জার্ম্মাণির পুনরুত্থান

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

১। জার্ম্মাণির ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

বিগত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণির হাড়গুঁড়া করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যুবক জার্ম্মাণির প্রাণ তাজা ও আশায় ভরপুর। তাই সকল প্রকার পরাজয়ের মধ্য দিয়াও নবীন জার্ম্মাণি সাধনা দ্বারা আপনার অপরাজেয় চরিত্র গঠন করিতেছে। আজ তার কিছু পরিচয় লইব।

'ইণ্টারন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স' দেশে দেশে বাণিজ্যিক মৈত্রী স্থাপন উদ্দেশ্যে মোতায়েন প্রতিষ্ঠান-বিশেষ। জার্ম্মাণি, ইংল্যণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশে এই প্রতিষ্ঠানের এক একটি শাখা আছে। সম্প্রতি বৃটিশ ন্যাশনাল কমিটি ভিক্টোরিয়া হোটেলে এক ভোজ দেন। বৃটিশ কমিটির চেয়ারম্যান স্যর আর্থার বালফুর সভাপতি ছিলেন এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যবসায়ী যোগ দিয়াছিলেন।

এই ভোজে জার্ম্মাণ ন্যাশনাল কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফ্রান্ৎস্ ফোন মেণ্ডেল্‌স্ জোহন যুদ্ধের পর জার্ম্মাণির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তা এইরূপ :—

জার্ম্মাণির বেকার দল

জার্ম্মাণিতে "ইন্‌ফ্লেশন" বা মুদ্রা "ফাঁপের" কুফলগুলি আজও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। সাহায্য-প্রাপ্ত "কাজ নাই" অবস্থার লোকের তালিকাটা এই রকম—

১৯২৫ সনের ১লা ডিসেম্বর মোট ৬,৭৩,০০০ জন।
১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারী মোট ১৫ লক্ষ জন।
১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ২০ লক্ষ জন।
১৯২৬ সনের নবেম্বর মাসে মোট ১৩ লক্ষ জন।
১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ১৭ লক্ষ জন।
১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে মোট ১৪,৫৮,০০০ জন।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, গত এপ্রিল মাসের তুলনায় এ বছরের বেকারের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু এই অঙ্কগুলি মজুর-বাজারের অবস্থার দ্যোতক নয়। কারণ যে সব লোকের ২৬ সপ্তাহ যাবৎ কাজ নাই, তারা বেকার "বেনিফিট্" বা "ভিক্ষা" পায় না। তারা সাধারণ হিতসাধন কর্ত্তাদের তাঁবে থাকে।

"র‍্যাশনালাইজেশন" বা "যুক্তি-প্রয়োগ"

লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম্মহীন অবস্থায় বসিয়া আছে। এদের গতি কি হইবে? এদের কাজ জোটাইয়া দেওয়া কি সম্ভব হইবে? ফস্ করিয়া উত্তর দেওয়া যায় না। কারণ দেশে যা উৎপন্ন হইবে, তার জন্য যদি দেশের ভিতরে ও বিদেশে যথেষ্ট বাজার না থাকে, তবে বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে বিস্তৃতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। তারই নাম এক কথায় র‍্যাশনালাইজেশন বা যুক্তিপ্রয়োগ। এই নয়া নয়া ব্যবস্থায় জার্ম্মাণির ব্যবসায়-জগতের ছবি গত ১২ মাসে একদম্ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

শ্রম-সংক্ষেপ প্রণালীতে কাজ হইতেছে। তাতে এখানে সেখানে কিছু কিছু কারিগরদের কাজে জবাব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, খরচ সস্তা হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্য সস্তা হওয়ায়, তার টান বাড়িয়াছে। টান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুরেরা ক্রমে ক্রমে কাজ পাইতেছে।

অন্ততঃ এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আর্থিক অবস্থার স্রোত ফিরিয়াছে, ১৯২৬ সনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে উন্নতি দেখা যাইতেছে। উৎপাদন ও টান ধীরে ধীরে ক্রমাগত বাড়িতেছে। বৃটিশ খনিতে মজুর-হাঙ্গামায় জার্ম্মাণির কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে বটে; কিন্তু উৎপাদন

ও টান বাড়ার প্রধান কারণ হইতেছে দরে স্থিরতা, উৎপাদনে উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবসায়ে টাকা খাটানো, টাকা জমানো ও বেকার বৃদ্ধি সত্ত্বেও জাতির ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি।

জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ

বর্ত্তমান জার্ম্মাণির এক বিশেষত্ব হইতেছে, জাতীয় সঙ্ঘ বা "ট্রাষ্ট" সৃষ্টি। দুই বা ততোহধিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান একত্রে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। ইহাও আর্থিক তত্ত্বাবধানে যুক্তি-প্রয়োগের এক মূর্ত্তি।

জার্ম্মাণ বেপারী সাধারণতঃ একাচোরা ও স্বাধীন-চেতা। সুতরাং এইরূপ প্রতিষ্ঠান বিনা বাধায় মোতায়েন হয় নাই। রাষ্ট্রের ভিতর এই যোগাযোগের ফলে অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে লেনদেন চালাইবার পথ প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই সঙ্ঘবদ্ধতা শুধু জাতীয় হইয়াই শেষ হইয়া যায় নাই। ইহা যে আন্তর্জ্জাতিক হইয়া দাঁড়াইবে তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তখন দেশে দেশে সমঝৌতা বাড়িবে এবং শত কাষ্টম্ টারিফ্ বা আমদানি বাধায় যা হয় নাই, তা আনায়াসে হইবে। অর্থাৎ বাজার-অরাজকতা ও দেশে দেশে কামড়াকামড়ি দূর হইবে।

প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে, "আন্তর্জ্জাতিক কাঁচা ইস্পাত এসোসিয়েশন" ও "ফরাসী-জার্ম্মাণ পটাশ্ এগ্রিমেণ্ট বা সমঝৌতা"। এরূপ প্রচেষ্টা আরও হইতেছে।

জার্ম্মাণি এই ধরণের প্রচেষ্টার মূল্য খুব বুঝে। কিন্তু কতকগুলি বিপদও আছে। সেগুলি এড়াইবার জন্য সর্ব্বদা সাবধান হওয়া দরকার। দেখিতে হইবে যেন বাণিজ্য ও শিল্পের গতিশীলতা নষ্ট না হয়, এবং মজুর বা ক্রেতার ক্ষতি করিয়া আর্থিক শক্তির অতিরিক্ত মাত্রায় শোষণ না হয়।

জার্ম্মাণির রেলওয়ে

এই সম্পর্কে জার্ম্মাণ রেলওয়ের নাম করা যাইতে পারে। জার্ম্মাণ রেলওয়েগুলির একাকার ঘটিয়াছে। সব চেয়ে বেশী মুনাফা আদায় করা ইহার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, সমগ্র দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা। যুক্তিপ্রয়োগ নীতি বলিল, রেলওয়েগুলিতে বিজলী বাতির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বৃহত্তর মালগাড়ী সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু টাকাটা কোথায় পাওয়া যায়? এই হইল বড় সমস্যা। আর আর্থিক সমস্যাই সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। জার্ম্মাণি তাও সমাধান করিল।

ফলে দেখা যাইতেছে, যুক্তিপ্রয়োগে উৎপাদন বাড়িল ও বণ্টন ভাল হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাই পুঁজিপাটার অবাধ চলাচল।

জার্ম্মাণির টাকার সংস্থান

সিক্কায় স্থিত ফেলিবার কালে দেখা গেল জার্ম্মাণ পুঁজি-পাটায় কুলাইতেছে না। তখন বিদেশী সহায়তার দরকার হইল। বলা বাহুল্য, বিদেশী ক্রেডিট পাইয়া জার্ম্মাণির বুকে নব বলের সঞ্চার হইল। তা না পাইলে ক্রাইসিস উত্তীর্ণ হওয়া কখনও সম্ভব হইত না। কিন্তু ছবির অন্য দিকটাও মনে রাখিতে হইবে। জার্ম্মাণির বিশাল ঋণ ও তস্য সুদ ভূতের বোঝার মত চাপিয়া বসিয়া আছে। এই বোঝা যে শুধু ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষকে সঙ্কুচিত করিতেছে, তা নয়। ইহাতে সমগ্র জাতি পীড়িত হইতেছে।

জার্ম্মাণির ঋণের বোঝাটা একটু দেখা যাক্। ১৯২৫ সনে এক বছরে এই দেশ ১২০ কোটি মার্ক ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আর ১৯২৬ সনে ড'স্ ঋণ সুদ্ধ দেনার পরিমাণ ১৫০ কোটি। ১৯২৪ সন হইতে ১৯২৬ সনের শেষ অবধি ৪০০ কোটি মার্ক ধার লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইখানেই শেষ হয় নাই। জার্ম্মাণির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য ঢের ঢের বিদেশী পুঁজিপাটা নেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্ত মেণ্ডেলস্ জোহন্ বলিতেছেন, "যুদ্ধের জন্য একটা বিপুল ক্ষতিপূরণের ভার আমাদের কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যাঁরা ঋণের ভারটা চাপাইলেন, তাঁদের নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। তাঁদের জার্ম্মাণ জিনিষ কিনিতে হইবে। দরটাও ঠিকমত দিতে হইবে। নচেৎ জার্ম্মাণি টাকা পাইবে কোথায়? তাঁরা বলিতে

পারেন না, আমরা ক্ষতিপূরণ চাই, কিন্তু তোমাদের জিনিষ কিনিব না।' জার্ম্মাণি যেন ঋণ গ্রহণ করিয়া তার উৎপাদন বহু গুণ বাড়াইয়া ফেলিল। কিন্তু এই ফালতু উৎপন্ন বিদেশী বাজারে উচিত দামে বেচিয়া বিদেশী সিক্কা যদি না পায়, তবে জার্ম্মাণি কি প্রকারে ঋণ শোধ করিবে?"

ক্রাইসিস্ শেষ হওয়ার পর হইতে জার্ম্মাণিতে পুঁজিপাটা মজুত রাখাটা খুব জোর্‌সে চলিতেছে। এক বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান গণিয়া দেখিয়াছে যে, ১৯২৬ সনে নয়া পুঁজিপাটা গঠিত হইয়াছে ৬৩০ কোটি মার্কের। সিক্কা-স্থিতের সময় ধরিতে গেলে সেভিংস্ ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত কিছুই ছিল না। এই আমানত ১লা জানুয়ারী, ১৯২৬ সন হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৬ সন অবধি এক বছরের মধ্যে ১৮০ কোটি মার্ক হইতে ৩০০ কোটি মার্ক দাঁড়াইয়াছে।

১৯১৩ সনের জার্ম্মাণির সঙ্গে ১৯২৭ সনের জার্ম্মাণির কত তফাৎ তা একটা তুলনাতে বুঝা যাইবে। বর্ত্তমান দামে কষিলে, যুদ্ধের পূর্ব্বে নয়া পুঁজিপাটার বাৎসরিক মৌজুদের পরিমাণ ছিল ১১৯০ কোটি মার্ক। উচ্চ দামে কষিলে, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানত দাঁড়াইত মোট ১৯০০ কোটি মার্ক।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই আঁকজোকে ব্যক্তির ধন কত বাড়িয়াছে, তা বুঝা যায় না। কারণ বিদেশী ক্রেডিট্ ও আর্থিক দুরবস্থার দরুণ মার্কের মূল্যহ্রাস এই আঁকজোকে রহিয়াছে।

ঋণের স্বরূপ

"ইন্‌ফ্লেশন" বা ফাঁপের দরুণ ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ঋণ আগের চেয়ে কম হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে রাইখ্ বা সাম্রাজ্যের ঋণ ছিল ৪৯০ কোটি মার্ক। তদন্তর্গত রাষ্ট্র-গুলির একুনে ঋণের পরিমাণ ১৬০০ কোটি মার্ক ছিল। ফাঁপের পর ১৯২৬, ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাইখের মোট ঋণের পরিমাণ ২২০ কোটি মার্ক দাঁড়াইয়াছে। পুনরায় দাম কষিয়া দেওয়া বাবদ ২০০ কোটি মার্ক অবশ্য এর সঙ্গে যোগ দিতে হইবে।

কিন্তু জার্ম্মাণির ঋণের স্বরূপটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে "রিপারেশন" বা ক্ষতিপূরণ ঋণের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। প্রত্যেক বছর বাজেট্ রাজস্ব হইতে একটা মোটা পরিমাণ দিয়া দিতে হইতেছে। ১৯২১ (?) ৩১ আগষ্ট যে আর্থিক বছর শেস হইয়াছে তাতে দিতে হইয়াছে ১৫০ কোটি মার্ক। তার পরের আর্থিক বছরে দেওয়া হইয়াছে ১৭৫ কোটি মার্ক। তারপর বছর বছর ২৫০ কোটি মার্ক করিয়া দিয়া যাইতে হইতেছে।

এ ছাড়া জার্ম্মাণির নিজের ঘরে বোঝা আছে। যুদ্ধের ফলস্বরূপ মোটামুটি ১৫০ কোটি মার্ক বছরে দিতে হইতেছে পেন্সন বাবদ। পেন্সন এবং তদ্রূপ অন্যান্য খরচ বাবদই জার্ম্মাণ বাজেটের অর্দ্ধেকটা ব্যয় হইয়া যায়।

১৯১৩ সনে কষিয়া দেখা হইয়াছিল যে, রাইখ্, রাষ্ট্র ও কমিউনগুলির আর্থিক দায় মাত্র ৪০% ছিল। ইহার মধ্যে নানাপ্রকারে কর-আদায়টা একদম্ ধরা হয় নাই। কিন্তু ঐ আর্থিক দায় ১৯২৬ সনে মোট ১৭৩.৬ মার্কে দাঁড়াইয়াছে। ধনী দেশ বলিবে, "এ ভার তেমন কিছু নয়।" গরিব দেশ বলিবে, "বাপরে! আমার সাধ্য নয়।"

শ্রীযুক্ত মেণ্ডেল্‌স্ জোহন বলিতেছেন, "জার্ম্মাণি আজ আর ধনী দেশ নয়। তার জাতীয় আয় ও জাতীয় ধন উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে। এই দু'টার দিকে চাহিয়া কর-আদায়ের গুরুত্বটা বিবেচনা করিতে হইবে। জার্ম্মাণরা আজ বিস্তৃত ভাবে তাদের গতিশীল পুঁজিপাটা হারাইয়াছে। আয়-কর জনপ্রতি দাঁড়াইয়াছে ৬৯.১৫ মার্ক করিয়া। এই করটা বহু লোকে নিজের উপার্জ্জন হইতে দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তার পুঁজিপাটা সম্পত্তি ধরিয়া টানাটানি করিতে হইতেছে। এই করগুলা হইতেছে,—ব্যবসা বাণিজ্য কর, বাটী-নির্ম্মাণের কর, ব্যবসা চুক্তির কর, গির্জ্জা সম্পর্কিত কর ইত্যাদি।"

২। জার্ম্মাণির ব্যবসায় পুঁজিপাটা

বার্লিনের ডাক্তার ওস্কার হ্বিনগেন লিখিতেছেন, (ফরওয়ার্ড, ২২ মে ১৯২৭)—

গত ১২ মাসে জার্ম্মাণ "শেয়ার মার্কেটে" ঘোরতর

পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ১৯২৬ সনের জানুয়ারীতে বার্লিন বৌর্সের উদ্ধৃত শেয়ার ৮৫% ছিল "পারে"র নীচে বা কাগজে লিখিত মূল্যের ন্যূন মূল্যে ; আর ১৫% ছিল পারের উপরে। ১৯২৭ সনের জানুয়ারীতে অবস্থা উল্‌টিয়া গেল। ঐ মাসের শেষের দিকে ৩২.৮% "পারে"র নীচে আর ৬৭.২% "পারে"র উপরে ছিল। মোটের মাথায় হারগুলি ১২ মাসে ১০০% চড়িয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, জার্ম্মাণ ব্যবসার ভবিষ্যতের উপর দেশে ও বাইরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে।

"ডায়টস্‌শের হ্বোল্কস্‌হ্বির্ট"এ কতকগুলি প্রধান প্রধান শেয়ারের হারের টেব্‌ল্ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

(বার্লিন বৌর্সের উদ্ধৃত শেয়ারের গড়পড়্‌তা বাজার-দর—"ফেস্ ভ্যালু"র শতকরা হিসাবে)।

	১৯২৬ সনের জানুয়ারীর শেষে	১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারীর গোড়ায়
১। জাহাজ কোম্পানী	১১৯.৯	১৭১.৪
২। ব্যাঙ্ক	১১১.৬	২০৩.৩
৩। খনি এবং ঢালাই বাটী	৮১.২	১৭২.৪
৪। পটাশ	১১৮.৯	১৮৬.৫
৫। ধাতব শিল্প	৭০.৮	১৫৩.৮
৬। কল ইত্যাদি	৫০.৮	১১৬.৮
৭। বিদ্যুতের কারবার	৯৮.৩	১৮৮.০
৮। রাসায়নিক ব্যবসায়	১০০.১	২৯০.২
৯। সিমেন্ট ব্যবসায়	৭০.৮	১৮৫.৬
১০। বয়ন ব্যবসায়	৭৯.৮	১৬১.৬

২

ব্যবসায়ে খাটান পুঁজিপাটা হইতে আয় বা উপার্জ্জনটা কিরূপ হইতেছে ? রাইখস ক্রেডিট এ জি এ বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছে। তদনুসারে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা ৮৮১ এবং "নমিন্যাল" বা আপাত পুঁজিপাটার পরিমাণ মোটের মাথায় ৯০০ কোটি মার্কেরও উপরে। এই কোম্পানীগুলি নিম্নলিখিত রূপ ডিভিডেণ্ড বিতরণ করিয়াছে :—

ডিভিডেণ্ড %	জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর শতকরা ১৯২৫ সন	১৯২৬ সন
০	৪৫.৪	৪০.৪
১-৫	১৩.২	১১.৫
৫-৭	১৩.৭	১৪.২
৭-১০	২১.৯	২৬.১
১০' র উপর	৫.৮	৭.৮

৩

যুদ্ধের পূর্ব্বে জয়েণ্ট ষ্টক ক্যাপিট্যালের উপর, ব্যাঙ্কের হারের ১½ গুণ ছিল ডিভিডেণ্ডের দস্তুর। ব্যাঙ্কের হার ৪% ৪½% হইলে জয়েণ্ট ষ্টকের গড়পড়তা আয় হইত ৫¾% ৬¾%। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সুবিধা আর পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জার্ম্মাণ ব্যবসায় আজও ১৯১৪ সনের সমান হইতে পারে নাই।

কতকগুলি কারণ এইরূপ :—নিজ দেশে ও বিদেশে "শর্ট লোন" জন্য সুদ লাগে গড়ে ৭%, আর এই ঋণের পরিমাণ ২০ কোটি মার্ক ; কর গ্রহণ—এই কর এখন পরিমাণে ১৯১৪ সনের ৪।৫ গুণ ; ড'স্ প্ল্যান অনুযায়ী স্থায়ী দায়—বছরে মোট দেয় ৩০ কোটি মার্ক ; তারপর ক্ষতিপূরণের ফলস্বরূপ চড়া রেলভাড়া ইত্যাদি বাবদ গুরুতর দায়। সুতরাং টাকা খাটাইয়া যে যথেষ্ট আয় হয় না, তাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই অবস্থার উন্নতির জন্য দরকার জার্ম্মাণির ও দুনিয়ার বাজারের স্থিরতা।

জার্ম্মাণির যা সাধ্য তা প্রাণপণে করিতেছে। বেশী ফল পাইবার জন্য ফ্যাক্টরীগুলিতে র‍্যাশন্যালাইজেশন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণির উন্নতির বাকীটা একমাত্র জার্ম্মাণির সদিচ্ছা ও শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না।

৩। জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কিং

গত বছর (১৯২৬) মুদ্রার হারে গুরুতর পতন ঘটে। কাজেই জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলির সুদ বাবদ উপার্জ্জনটা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। কিন্তু এই ঘাটতি কতকগুলি কারণে পূরণ হইয়াও উদ্বৃত্ত ছিল। কারণগুলি হইতেছে—বাণিজ্য ও বৌর্সের সংক্রান্ত কাজের বৃদ্ধির ফলে কমিশন আদায়

বেশী হইয়াছে (ব্যাঙ্কিংএর ব্যয়ে হ্রাস ঘটা সত্ত্বেও) এবং খাটানো টাকার দাম বাড়াতে ও ঋণ বাহির করা সফল হওয়াতে মুনাফার প্রসার ঘটিয়াছে।

বড় বড় ৭টা ব্যাঙ্ক

জার্ম্মাণির ৭টা বাঘা বাঘা ব্যাঙ্কের নাম ডায়ট্‌সশে বাঙ্ক, (২) ডিসকোন্টো গেসেলশাফট, (৩) ড্রেসড্‌নের বাঙ্ক, (৪) ডার্ম্মষ্টাড্‌টের উণ্ড নাশ্যনাল বাঙ্ক, (৫) কোমের্‌ৎস উণ্ড প্রিবাট্‌ বাঙ্ক, (৬) বার্লিনের হাণ্ডেলস গেসেলস্‌শাফট্‌ এবং (৭) মিট্টেলডায়ট্‌সশে ক্রেডিট্‌ বাঙ্ক।

এইগুলির বাৎসরিক হিসাব হইতে জানিতে পারা যায় যে, "গ্রস্" বা স্থূল রাজস্বের মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৮৪'১ মিলিয়ন মার্ক (১৯২৫) হইতে ৪১১'৮ মিলিয়ন মার্কে (১৯২৬) উঠিয়াছে। সুদ, ডিস্‌কাউন্ট বা বাট্টা, বিদেশী বিনিময় ইত্যাদি বাবদ্‌ অদায় কমিয়াছে। ১৯২৫ সনে ২৫০'৪ মিলিয়ন মার্ক ছিল, ১৯২৬ সনে হইয়াছে ১৬৬'২ মিলিয়ন মার্ক। অপর দিকে, কমিশন আদায় ৮৫'১ মিলিয়ন হইতে ২০৫'২ মিলিয়ন এবং অন্যান্য মুনাফা ১৪'৬ মিলিয়ন হইতে ৪০'৪ মিলিয়ন মার্কে উঠিয়াছে। শেষোক্ত দফায় প্রকৃত লাভটা বাহির করা শক্ত। কারণ, তার অনেক অজ্ঞাত রিজার্ভ আছে।

৭টা ব্যাঙ্কের খরচের খতিয়ান

৭টা ব্যাঙ্কের ব্যয় হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু বাকী ২টা ব্যাঙ্কের ব্যয় এত বেশী যে মোটের মাথায় ব্যয়টা ৫'৬ মিলিয়ন হইতে ২৯২'৯ মিলিয়ন মার্কে পৌছিয়াছে।

মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে কর বাড়িয়া ৩৫'৪ মিলিয়ন মার্ক হইয়াছে (+ ৫ মিলিয়ন মার্ক ১৯২৫ সনের তুলনায়)।

সন্দেহজনক হিসাবের জন্য সংস্থান বাবদ অধিকাংশ ব্যাঙ্ক স্থূল মুনাফা হইতে এইসব টাকা বাদ্‌ দিয়া রাখিয়াছে। শুধু ডায়ট্‌সশে বাঙ্কের হিসাবে ঠিক মোটটা দেওয়া আছে—৪'৩ মিলিয়ন মার্ক। ১৯২৫ সনে ছিল ৩'৪ মিলিয়ন মার্ক। গত বছর ড্রেস্‌ড্‌নের বাঙ্ক একটা হিসাব দিয়াছিল। তাতে দৃঢ়ীকরণের জন্য ২ মিলিয়ন সংস্থানের কথা ছিল।

৫টা ব্যাঙ্কের মোট নিট্‌ রাজস্ব একত্রে ৭৯.২মিলিয়ন মার্ক (১৯২৬)। গত বছরের তুলনায় ২৭.৪ মিলিয়ন বাড়িয়াছে। এই পরিমাণটা স্থূল মুনাফার প্রায় অনুরূপ বলিতে পারি।

মোট ডিভিডেণ্ডে ৪৩.১ মিলিয়ন (+ ৯'২ মিলিয়ন) মার্ক ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ২৬'২ মিলিয়ন মার্ক বাড়িয়াছে। এটা গত বছরের বণ্টনের চেয়ে ১৬'৮ মিলিয়ন মার্ক বেশী। অতএব নিট বর্দ্ধিত মুনাফার ⅔ অংশ অংশীদারদিগকে ও ⅓ অংশ রিজার্ভে দেওয়া হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

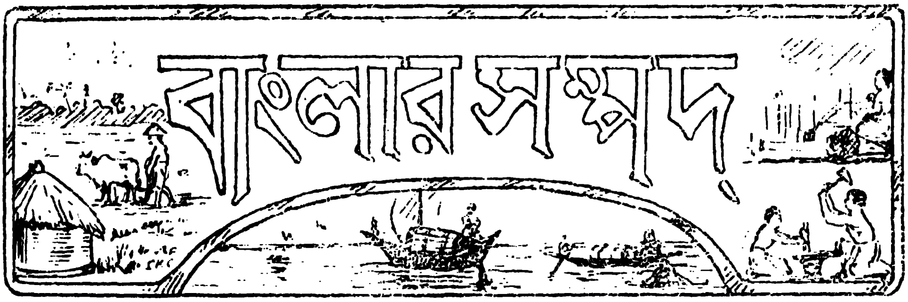
আর্থিক উন্নতি

কার্ত্তিক—১৩৩৪ ২য় বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



বরিশালের বিল অঞ্চল

বরিশাল জেলার গৌরনদী ষ্টেসনের এলাকায় বিল অঞ্চলে শস্যক্ষেত্রগুলি জলে নষ্ট হইতেছে। আমরা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তদানীন্তন কর্ণধার গৌরনদী থানার অধিবাসী রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাদুর ও শ্রেষ্ঠ উকিল ও ভাইস চেয়ারম্যান বাবু রজনীকান্ত দাস গুপ্ত মহাশয়গণকে তাঁহাদের অঞ্চলের রাস্তা ও খালের প্রতি ঝোঁক দেখিয়া বলিয়াছিলাম, ইহাতে বিল ভূমিগুলির উন্নতি হইবে না। কারণ তাঁহারা এত অধিক রাস্তা মঞ্জুর করিয়া নিয়াছেন যে, রাস্তায় জল আটকাইবে ও সময় সময় রাস্তার খাল দিয়া জল আসিয়া শস্য নষ্ট করিবে, মৎস্যগুলিও টিঁকিয়া থাকিবে না। লেখক তাঁহাদের সহিত একজন সরকারী মেম্বর থাকিয়া একথা বলার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান মহাশয়কে বুঝাইয়াছিলেন, আপত্তিকারী গ্রামের অবস্থা জানে না। বোর্ডের রাস্তাস্থিত পাহাড়াঞ্চলের সুন্দর বৃক্ষগুলির ছাল বাকল লোকেরা চাঁচিয়া নিয়া উহা ঔষধে ব্যবহার করে, তাহাতে বৃক্ষগুলি অকালে মারা যায়। ওভারসিয়ার প্রভৃতির বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা দেওয়া হয় না। রাস্তার অনেকগুলি বৃক্ষ দীর্ঘজীবী হয় নাই। ঔষধের জন্য গ্রামের মধ্যে বন জঙ্গল হইতে কবিরাজেরা চিরকাল ছাল, মূল ও বাকল আনিয়া থাকে, এখন তাঁহারা সুযোগ পাইয়াছেন। প্রবীণ মেম্বরেরা ইহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কালে বৃক্ষগুলি টিঁকে নাই। এই সকল বলার উদ্দেশ্য এই—সেকালের মেম্বরেরা বড়ই ক্ষমতাশালী ছিলেন। এখন ঐ সকল প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ ফল দেখা গেল—ক্ষেত্রে শস্য জন্মায় না।

(কাশীপুর নিবাসী)

পাবনার আর্থিক অবস্থা

(১)

পাবনা-সিরাজগঞ্জ রেল লাইন খুলিবার পর হইতেই জেলার কৃষির অবস্থা খারাপ চলিতেছে। যমুনা হুরাসাগর

নদী এবং কালিয়াকর চলন বিলের সাগরোপম বিস্তীর্ণ জলরাশি যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান ভেদ করিয়া এই লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষার জলই সে দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড। তাহার অবাধ গতি রুদ্ধ হওয়াতে এই জেলায় উৎকট আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের গত বন্যার জল এই রেল লাইনে বাধা পাইয়াই লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি প্লাবিত করিয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, অগণিত গোবৎস ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কত লোককে নিরাশ্রয় গৃহহীন করিয়া সমগ্র উত্তরবঙ্গ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। গবর্মেণ্ট ইহাতে বিচলিত হন নাই। গবর্মেণ্ট কিরূপে এই রেল লাইনের গায়ে হাত দিতে পারেন, আর পরাধীন দেশই বা এই সমস্যার কি সমাধান করিতে পারে তাহা আমরা জানি না।

(২)

তাঁতের কাপড়ের জন্য পাবনার যে প্রসিদ্ধি ছিল প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে তাহাও এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। পাবনার চারিপার্শ্বে এবং দুলাই থানার অন্তর্গত আমিনপুর প্রভৃতি গ্রামে উৎকৃষ্ট তাঁতের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঐ সমুদয় বস্ত্র নানা স্থানে রপ্তানি হওয়ায় জেলার ধনাগম হইত। এখন আর সেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে না। সেরূপ ভাবে রপ্তানিও হইতেছে না। পাবনার উৎকৃষ্ট বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইয়া তন্তুবায়-শ্রেণীর মধ্যে উৎকট আর্থিক অভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

(৩)

পাবনাতে কয়েকটী গেঞ্জি ও মোজার কল ব্যতীত অন্য কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান নাই। এই সমুদয় কলের অবস্থা কিরূপ জমিতেছে সাধারণে তাহা বিশেষ অবগত নহে। কয়েকটী কলই লিমিটেড কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের উদ্বর্ত্তপত্র আমরা কোন দিন পাই নাই। তবে আমরা শুনিতে পাইতেছি, প্রত্যেক কোম্পানীর গুদামেই বহু মাল মজুত রহিয়াছে। বিদেশী গেঞ্জির প্রতিযোগিতায় দেশী গেঞ্জি টিঁকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। বোম্বাই প্রদেশের বড় বড় কাপড়ের কলগুলিই যেভাবে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কঠোর প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে কতদিন যে টিঁকিবে কে বলিতে পারে ?

(স্বরাজ)

চট্টগ্রামে জাহাজের ব্যবসা

জাহাজ-নির্ম্মাণ চট্টগ্রামের এক বহু পুরাতন ব্যবসা। জাহাজ তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বে একটা নক্সা মাটিতে তৈয়ারী করা হয়। জাহাজ তৈয়ারী করিবার প্রণালী—

১। ছুতারের এবং কাঠের কাজ।

২। সমস্ত কাঠের তক্তা একসঙ্গে লাগানোর কাজ।

৩। মাস্তুল এবং পাইল তৈয়ারী করা।

৪। তামা এবং পিতলের কাজ।

৫। ছোট ছোট কুঠ্রীর শার্শী, খড়খড়ি বসানো ও দেয়ালের অঙ্কনের কাজ।

৬। পালিশের কাজ।

বলা বাহুল্য, এর প্রত্যেকটিতে পটুতা ও বিচক্ষণতার দরকার হয়।

জাহাজ নির্ম্মাণ করে কে ?

ঘোষালিডাঙ্গার শূদ্র অধিবাসীরাই এই জাহাজের কাজে বিশেষ পটু। মুসলমানও আছে।

মাধবী, কালিকুমার ফকির, মহম্মদ মাড্বল সদাগর প্রভৃতি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে।

কর্ণফুলী নদীর তীরস্থ ২০০ গৃহস্থ দক্ষতার সহিত এই কার্য্য করিয়া আপনাদের সংসার প্রতিপালন করে।

একটা জাহাজ সম্পূর্ণভাবে তৈয়ারী করিতে, ১৫০ জন লোক ৮ ঘণ্টা রোজ কাজ করিলে, ৬ মাস লাগে। ছোট ছোট অনেক বালকের সাহায্য দরকার হয়।

চট্টগ্রামের অনেক বণিক বড় বড় সমুদ্র-যাত্রার জাহাজ তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে। এই সমস্ত জাহাজ মালপত্র-বহনের জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

জাহাজ বিক্রী হয় বম্বেতে, সিংহলে এবং মালাবার বন্দরে। এই ব্যবসার উন্নতির জন্য বঙ্গদেশের বাণিজ্য-বিভাগ অর্থ-সাহায্য করে।

১৬০০০৲ টাকায় রকমারি নৌকা

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রায়ই খোদাই করা নৌকা প্রস্তত হয়। এগুলি নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে চালান হয়।

অন্যান্য নৌকার বিবরণ এইরূপ :—

নাম	কত ভার বহিতে পারে	দাম	মন্তব্য
ছোট সারাং	প্রায় ৮ মণ	২৫৲-৩০৲	—
বড় সারাং	" ১০০ "	১৪০৲	"ছাউনি-কর" ও "চ্যাটাইপাতা" নৌকার নাম।
ভারতুয়া	" ১৫০ "	১৬০৲	ছাউনি খোলা যায়। সারাং অপেক্ষা বড়।
আদ বালাম	২০০-৩০০ মণ	২৫০৲-৩৫০৲	কাঠের তক্তা দিয়া ঘেরা।
গাছ	—	ঐ	আদ্‌বালাম হইতে বড়।
বালাম	প্রায় ৪০০ মণ	৩৫০৲	চারিদিকে কাঠের তক্তা দিয়া ঘেরা।

জালানাও গাছের চেয়ে বড়। সমুদ্র পথে ব্যবহৃত হয়।

"ভুদুন" নামক একপ্রকার বেত দ্বারা নৌকা তৈয়ারী হয়। 'আরাকান' এবং রামুতেও নৌকা তৈয়ারী করিবার জন্য বেশ ভাল কাঠ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামে বছরে ১৬,০০০৲ টাকার নৌকা প্রস্তত হয়।

১॥০ লাখ টাকার ছুতারের কাজ

ছোট ছোট কুঠরী হইতে কাঠের কাজ হয়। এক এক কুঠরীতে ১০।১৫ জন লোক নিযুক্ত আছে। প্রত্যেকের বেতন ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

চট্টগ্রামের কাজের জন্য কাঠ আসে রেঙ্গুন হইতে। কিন্তু কাঠের কাজগুলি কলিকাতার মত সুন্দর হয় না। খোদাই-য়ের কাজের জন্য ছুতাররা ব্যবহার করে—'জারুল,' 'সেগুণ,' চাম্‌বেল প্রভৃতি।

গ্রামের যে-সব ছুতার দরজা, গরুর গাড়ী, চাকা, লাঙ্গল, ঢেঁকি, টেবিল, চেয়ার, আলমারি ইত্যাদি তৈয়ারী করে, তাদের দৈনিক আয় ॥০ আনা হইতে ৸০ আনা।

কিন্তু প্রতি বৎসর প্রায় দেড় লাখ টাকার কাজ হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামের আধুনিকত্ব

চট্টগ্রামে ইঞ্জিন-ওয়ালা বৃহৎ বৃহৎ কারখানা মোতায়েন রহিয়াছে। আখ মাড়িবার ও সুপারি কাটিবার কল প্রস্তত হয়।

কামারেরা মেরামতের কাজ "বল্টু," "হুক্‌" "নাট" প্রস্তুত করে। ষ্টীল ট্রাঙ্কও প্রস্তত করিতে পারে।

চাষবাসের জন্য ও গৃহকর্ম্মাদির জন্য যে-সব লৌহ-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তা গ্রামেই তৈয়ারী হয়।

কামারদের সংখ্যা ৩০০। মাসিক আয় ১৫৲-২০৲।

টিনের বাল্‌তির কারখানা

মফঃস্বল শহরে কেরোসীন তেলের টিন হইতে 'লম্প' "জগ" ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। কিন্তু টিনের বাল্‌তির ব্যবসার জন্য চট্টগ্রামে এক বৃহৎ কারখানা আছে। সেখানে পিতলের ছোট ছোট জিনিষও তৈয়ারী হয়। কারখানায় লোকে মাথা-পিছু মাসে ১৮৲ টাকা পায়।

চট্টগ্রামের পিতলের হুঁকা

চট্টগ্রামের পিতলের হুকা দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ। এখান হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র চালান হয়।

এই হুকা পুরাণা পিতলের দ্রব্যাদি গালাইয়া তৈয়ারী হয়। ৮টী দোকান আছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ২॥০ সের দরে বিক্রী হয়।

৩টি দিয়াশলাইয়ের কারখানা

চট্টগ্রাম্ বিনাজুরি ও পটিয়া এই ৩ স্থানে দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

পটিয়ায় ডাঃ নন্দীর উদ্ভাবিত হাতকলে কাজ চলিতেছে।

দিনে সাত গ্রোস প্রস্তুত হয়। দাম প্রতি গ্রোস ৸৶০ আনা হইতে ১৲ টাকা।

কলের দাম ৪৫০৲ টাকা। কলিকাতায় প্রস্তুত।

গুড় বনাম চিনি

চট্টগ্রামে গুড় বেশী ব্যবহৃত হয়। কেন্দ্রস্থান চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড, মীরসারি, ধুম, রঙ্গলীয়া ইত্যাদি।

আঁখ মাড়িবার জন্য ৩টা মস্ত বড় লোহার কল আনা হইয়াছে। প্রত্যেক কলে ৪টি করিয়া চাকা চলে। এই চাকার মধ্য দিয়া আখের রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। তারপর রস ফুটাইতে হয়।

তৈলের জন্য ইঞ্জিন

ঘানিতে সরিষা দিয়া তৈল বাহির হয়। কলের তৈলের আমদানিও প্রচুর। চালমুগুরা তৈল ও ক্যাষ্টরঅয়েলও প্রস্তুত হয়। এই উদ্দেশ্যে ইঞ্জিন্‌-চালিত কল আনা হইয়াছে।

ইস্‌লামাবাদ সাবানের কারখানা

চট্টগ্রামে ইস্‌লামাবাদ সোপ ফ্যাক্টরী নামে এক বৃহৎ সাবানের কারখানা আছে। ৫ জন লোক মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছে।

কাপড় কাচিবার সাবানই বিশেষ করিয়া প্রস্তুত হইতেছে। গায়ে, মাথার নিম্নস্তরের সাবানও দেখা দিয়াছে।

চট্টগ্রামের 'হল্‌দে কাগজ'

কাজিপুর গ্রাম কাগজের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। কাগজ খুব উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু পোকায় কাটে না বলিয়া গবর্মেণ্ট, জমীদার ও বিদ্যালয়-কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। হল্‌দে কাগজের বহু নথীপত্র আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত রহিয়াছে।

হল্‌দে কাগজ ২০৲ টাকা মণ দরে বিকায়। ৫।৭ জন লোক ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে শ' খানেক কাগজ তৈয়ারী হয়।

পাশের গ্রামগুলি হইতে এই কাগজের মাল-মসলা সংগ্রহ করা হয়।

চামড়া রপ্তানি

চামড়া ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল পঞ্চশালা, বিব্রিহাট, আমজোরবাগ। ৪০ ঘর বণিক কশাইখানা হইতে চামড়া সংগ্রহ করিয়া লবণ মাখাইয়া শুষ্ক করে। তারপর ২০৲ মণ হিসাবে বিক্রী করে।

চামড়া রপ্তানি হয় কলিকাতায়, ঢাকায় ও ব্রহ্মদেশে।

চামড়া-সংস্কার কার্য্যে ১৫০ জন লোক ব্রতী আছে।

স্থানীয় মুচিরা জুতা প্রস্তুত করিয়া মাসে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে।

বিব্রিহাটে মাটির পেয়ালা

বিব্রিহাট, কালিপুর, সাতগড়, কোদলপুর, হালিসহর, মির্জিপুর ইত্যাদি স্থানে হাঁড়ী, কলসী, কুঁজো, হুকা প্রস্তুত হয়।

বিব্রিহাটে মাটির চায়ের পেয়ালা তৈয়ারী হয়।

কুমারেরা মাসে ১৫৲ টাকা উপার্জ্জন করে।

বিব্রিহাট, নসীরাবাদ, ডোমপাড়া, সীতাকুণ্ড ইত্যাদি স্থানে ইট তৈয়ারী হয়।

চট্টগ্রামে ২০ ঘর গৃহস্থ টালি প্রস্তুত করে। গ্রামগুলিতে এই টালি বেশ চড়া দরে বিক্রী হয়।

৫ হাজার টাকার কুরূপের পাতা

চেকরিয়া গ্রামে কুরূপ নামে এক প্রকার চারা জন্মে। ইহার পাতায় ছাতা হয়।

এই ব্যবসাটা সাধারণতঃ মুসলমানদের হাতে।

কুরূপের পাতা নোয়াখালি ও দৌলতগঞ্জে রপ্তানি হয়। বাৎসরিক মূল্য ৫,০০০৲ টাকা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌

বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর ২৭শ বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, ঐ বৎসরে কোম্পানী মোট ২৯ লক্ষ ৫১ হাজার ১৬ টাকার জিনিষ বিক্রয় করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ

১৬ হাজার ২৯১ টাকা। ১৯০১ সনে ৫০ হাজার টাকা মূলধন লইয়া এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন উহার মূলধন হইয়াছে ১৯ লক্ষ টাকা।

ধান্য চাউলের দর

উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধরিয়া অজন্মা ও বন্যার ফলে এতদঞ্চলে ধান্য চাউলের দর দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছি পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য আমদানি হ থাকায় অনেকটা রক্ষা হইয়া যায়। এখন ঐ ধান্যের আম বৃদ্ধি এবং হাটে বাজারে রেঙ্গুন চাউলের আমদানি হও ধান্য চাউলের দর ক্রমশঃ নামিতেছে। এ. দুঃসময়ে চাউল সস্তা হইলে সাধারণের অনেক উপকার হইবে।

(নীহার)

পাটের ফসল

(১) প্রেসিডেন্সি বিভাগ

	পাট চাষের আয়তন (একর)		এক এক ইউনিটের আয়তনে নর্ম্মাল প্রাপ্তির শতকরা		মোট আদায় (বেল) (১ বেল=৪০০ পাউণ্ড)	
	গত বৎসর (সংশোধিত)	এ বৎসর			গত বৎসর	এবৎসর
২৪ পরগণা	৭৬,০০০	৬২,০০০	৭১	৯৬	১,৭২,৪০০	১,৯১,০০
নদিয়া	৯৭,০০০	৭৯,০০০	৮৭	৮৩	২,৬৮,৬০০	২,১১,০০
মুর্শিদাবাদ	৪১,০০০	৩৩,০০০	৭০	৮৪	৯১,৮০০	৮৯,০০
যশোহর	১৩২,০০০	১০৭,০০০	৭৩	১০০	৩০৭,৮০০	৩৪২,০০
খুলনা	৪৮,০০০	৩৯,০০০	১০৫	.৩৭	১৬১,২০০	১১৭,০০
মোট	৩৯৪,০০০	৩২০,০০০	...	...	১,০০১,৮০০	৯৫০,০০

একর প্রতি স্বাভাবিক আদায় ৩·২ বেল্।

বর্দ্ধমান বিভাগ

বর্দ্ধমান	৫,০০০	৫,০০০	৭৭	৮৮	১২,৩০০	১৪,০০
মেদিনীপুর	১১,০০০	৯,০০০	৮০	৯৩.৭৫	২৮,০০০	২৭,০০
হুগ্‌লি	৩৪,০০০	৩১,০০০	৫৩	১১২.৫	৫৮,২০০	১১১,০০
হাব্‌ড়া	১৫,০০০	১২,০০০	৯৩	৯১	৪৪,৮০০	৬৫,০০
মোট	৬৫,০০০	৫৭,০০০	...	...	১৪৩,৩০০	১৮৭,০০

একর প্রতি স্বাভাবিক আদায় ৩.২ বেল্।

রাজসাহী বিভাগ

রাজসাহী	১২৬,০০০	১০৫,০০০	৯১	৮৬	৩৯৯,৬০০	৩১৫,০০
দিনাজপুর	৮৩,০০০	৭৩,০০০	৮৯	৮১	২৫৮,৬০০	২০৮,০০

	পাট চাষের আয়তন (একর)		এক এক ইউনিটের আয়তনে নর্ম্মাল প্রাপ্তির শতকরা		মোট আদায় (বেল) (১ বেল=৪০০ পাউণ্ড)	
	গত বৎসর (সংশোধিত)	এ বৎসর			গত বৎসর	এবৎসর
জলপাইগুড়ি	৫৯,০০০	৪৮,০০০	৯৬	৭৯	১৮৮,০০০	১৩৩,০০০
দার্জ্জিলিঙ	৩,৭০০	৩,৭০০	৬৯	৬৯	৯,০০০	৯,০০০
রংপুর	৩৫২,০০০	৩০৯,০০০	৯৯	৮৭	১,২২০,০০০	৯৪৪,০০০
বগুড়া	১০৪,০০০	১০৫,০০০	৮৫	৮৫	৩০৮,৯০০	৩১২,০০০
পাবনা	১৭৮,০০০	১৫৬,০০০	৯০	৮৯	৫৫৫,৫০০	৪৩৬,০০০
মালদহ	৪৯,০০০	৪৩,০০০	৬৫	৫১	১১১,৯০০	৭৭,০০০
কুচবিহার	৪৩,০০০	২৯,০০০	৭৮	৫০	১১৭,৫০০	৫১,০০০
মোট	৯৯৪,৭০০	৮৭১,৭০০	...	...	৩,১৭২,০০০	২,৫৩৪,০০০

একর প্রতি স্বাভাবিক আদায় ৩·৫ বেল্।

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা	৩১৯,০০০	৩৫০,০০০	৮৬	৮৩	১,২০২,০০০	১,০৮,০০০
মৈমনসিংহ	৭৩০,০০০	৬৬২,০০০	৯৫	৮৭·৮	২,৫৬৪,২০০	২,১৫০,০০০
ফরিদপুর	৩১১,০০০	২৭২,০০০	৯৯	৮৪	১,১৩৮,৩০০	৮৪৯,০০০
বাখরগঞ্জ	৬২,০০০	৫০,০০০	১০২	৮৬	২০৫,০০০	১৬০,০০০
মোট	২,৪৮২,০০০	১,৩৩৪,০০০	...	...	৫,১৩৯,০০০	৪,২৩৯,০০০

একর প্রতি স্বাভাবিক আদায় ৩·৭ বেল্।

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম	২০০	২০০	৯৫	৯৫	৭০০	৭০০
ত্রিপুরা	৩৫০,০০০	৩১৯,০০০	৮৪	৮৪	২,০৮০,১০০	৯৮৯,০০০
নোয়াখালি	৭২,০০০	৫৬,০০০	৮১	৭০	২১৮,৩০০	১৪৬,০০০
ত্রিপুরা রাজ্য	৬,০০০	৪,২০০	৬০	৫২	১৬,৪০০	৮,০০০
মোট	৪১৮.২০০	৩৭৯,৪০০	...	...	১,৩১২,৫০০	১,৪৪৩,৭০০

একর প্রতি স্বাভাবিক আদায় ৩·৭ বেল।

মোট (বাঙ্গালা)	৩,৩৬৩,৯০০	২,৯৬২,১০০	...	...	১০,৭৬৯,২০০	৯,০৫৪,৭০০
ঐ (বিহার-উড়িষ্যা)	২৯৭,০০০	২৪১,০০০	...	...	৮১৮,৩০০	৭১৭,০০০
ঐ (আসাম)	১৮৬,০০০	১৬৮,০০০	...	...	৫৯৯,০০০	৪৫৮,০০০
সর্ব্ব মোট	৩,৮৪৬,৯০০	৩,৩৭১,১০০	...	...	১২,১৮৭,৫০০	১০,২২৯,৭০০০

মালদহে জার্ম্মাণ কল

মালদহের তিন বন্ধুতে মিলিয়া 'মহালক্ষী অয়েল মিল' নামে একটি তেলের কল সামশীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারা এই এক্‌স্‌পেলারটি ক্রুপ কোম্পানীর নিকট হইতে আনাইয়াছেন। অয়েল এঞ্জিন দ্বারা এই কলটি চলিতেছে। এই একটি কলে প্রতিদিন কমসে কম একশত মণ সরিষা পেষাই হইবে।

কলিকাতার বাজার দর

চাল (প্রতিমণ)

বালাম নূতন	৭৸৶—৮৶৹
সীতাভোগ	৯৸৶৹—১০৷৶৹
রেঙ্গুনী আতপ	৬৸৹—৭৸৹
বাঁকতুলসী	৭৸৶—৮৷৹
কাজলা	৬৲—৬৷৹
নাগরা	৭৲—৮৷৹

ডাল—প্রতিমণ

মাষকলাই	৪৶৹—৬৸৹
ঐ বিউলি	৫৶৹—৫৷৹
দেশী অড়হর	৩৶৹—৩৶৹
ঐ কানপুরী	৮৲—৮৸৹
মুগ ভাজা ও কাঁচা	৮৲—১৪৲
ছোলা	৫৲—৭৹
মসুর	৮৲—১০৲
ঐ খাড়ি	৫৸৹—৭৲

কড়াই—(প্রতিমণ)

ছোলা (দেশী)	৭০—৮৲
ঐ পাটনাই	৪৸৹—৫৲
মটর	৪৸৹—৫৲
মসুর	৫৷৹—৬৷৹
খেসারী	২৸৹—৩৲
অড়হর (নূতন)	৬৲—৬৸৹
মাষকলাই	৪৷৹—৫৷৹
কালিকলাই	৪৶৹—৪৶৹
সোনামুগ	৭৲

আটা ময়দা (প্রতিমণ)

উৎকৃষ্ট	৯৶৹
বি-আটা	৮৸৹
১নং আটা	৯৷৹
২নং আটা	৭৸৶৹
৩নং আটা	৬৲
সুজি	৮৷৶৹—৯৶৹

চিনি মিছরি (প্রতিমণ)

কাশীর	২৯৷৹
দোবরা	২৬৲
একবরা	২০৲
সাদা জাভা	১২৷৶৹
লাল জাভা	১৮৸৶৹
কাশীপুর ১নং	২২৲
মিছরি	১৩৷৹

তৈল (প্রতিমণ)

সরিষার (কলের)	২১৷৹—২৫৲
ঐ কানপুরের	২৫৲
নারিকেল (কলের)	২৫৲
ঐ কোচিন	২৫৲
রেড়ীর তৈল	১৬৲
কেরোসিন—	
বাঁদর মার্কা	(বাক্স) ৭৷৶৹
হাতী মার্কা	১০৷/৹
রাইজিং সান	৭৶৹
ভিক্টোরিয়া	৬৷৹

লবণ (১০০ মণ)

লিভারপুল	২২৩৲
এডেন পেষাই	১৮০৷৶৹

ঘৃত (প্রতিমণ)

ভাদুয়া	৯৬৲
শ্রীদার্কা	৯০৲

খুর্জা	৮২৲

সোনারূপা।

সোনা (প্রতি তোলা)—

ইংলিশ বার	২১৸৵০
কলিকাতা টাকশাল	২১৸৶০
বড়াল	২১৸৴০
রূপা (১০০ তোলা)	৫৬৸৶০

মসলা

সুপারী (জাহাজী)	১৭৲—১৮৲
আচিন্ন গোটা	১৬৷৷০
মরিচ	৪১৲—৫৭৲
জিরা	২৪৲—২৮৲
খয়ের	২৫৲—২৯৲
দারুচিনি	১৬৲
ছোট এলাচ (সের)	৯৲—৯৸০
মৌরী	২২৲
কালজীরা	৩০৲—৩৮৲
মেথী	১৫৲

বয়ন-বিদ্যালয়

ডায়মণ্ডহারবার সদর থানার অন্তর্গত পারুল ও আবাদালপুর গ্রামে দুইটী বয়ন-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য থানায়ও চেষ্টা চলিয়াছে। কাপড় বুনিবার জন্য যত সত্বর সম্ভব অন্ততঃ এক হাজার লোক প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এই মহকুমার গ্রাম-সংখ্যা ১০৯৫ ও জন-সংখ্যা পাঁচ লক্ষের উপর।

কোটালীপাড়ায় দুর্ভিক্ষ

কোটালীপাড়ার অন্তর্গত ৩০।৪০টি গ্রামে প্রায় ৫০ হাজার নমঃশূদ্র ও মুসলমান বাস করে। কৃষি-কার্য্যই ইহাদের উপজীবিকার প্রধান সম্বল। ক্রমান্বয়ে গত দুই বৎসর যাবৎ কৃষি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং এবারও কচুরী পানার ভীষণ অত্যাচারে সমস্ত শস্য নষ্ট হওয়ায় ঐ অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গোপালগঞ্জের মহকুমা হাকিম স্থানীয় লোকদের মধ্য হইতে কিছু চাঁদা তুলিয়া ও সরকার পক্ষ হইতে কিছু টাকা দিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে কিছু সাহায্য করিয়াছেন। নমোব্রহ্ম মিশন সোসাইটীও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সোনাইলবাড়ী নামক স্থানে একটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী ও কলিকাতাস্থিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উক্ত সমিতির স্থায়ী ফণ্ডে প্রত্যেকে ১ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। এবৎসরও যখন ঐ অঞ্চলে শস্যাদি জন্মে নাই, তখন আগামী বৎসর আরও ভীষণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে। (ঢাকা প্রকাশ)

পূর্ত্ত-বিভাগের অবহেলা

প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও পশ্চিমের জলের চাপে কাঁথি মহকুমার অধিকাংশ ভাগই প্লাবিত। মাঠে ফসলের চিহ্নমাত্র নাই। এ অবস্থায় জল বাহির করিয়া দিবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই খুলিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ত্ত-বিভাগের অবহেলা ও ক্রটীতে জলনিকাশের পথগুলির ভীষণ দুরবস্থা হইয়াছে। আমরা ঐগুলি পরিদর্শন করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা এই—পিছাবনী (সমুদ্রপুর) স্লুশে ২২টী কপাটের মধ্যে ১১টীর মাত্র কপাট খোলা আছে। ইহার মধ্যে ২টী কপাটের অবস্থা ভাল নহে। বাকী ১১টী কপাটের স্ক্রু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কপাট উঠে না। হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে গত ৪।৫ মাস যাবৎ এই স্লুশ মেরামত কার্য্য চলিতেছে। কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ৭৫৲ টাকা বেতনে এক জন ওভারসিয়ার নিযুক্ত আছেন। কিন্তু এত দীর্ঘ সময়ের পর মাত্র ঐ পরিমাণ কাজ হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ কিছু কাজ হইতে দেখা গেল না। শুনা গেল উপযুক্ত মাহিনা না পাওয়ায় লোকে কার্য্য করিতে রাজি হয় না। লোক লাগাইলে স্ক্রু-ভাঙ্গা কপাটগুলি উঠান সম্ভব, কিন্তু এরূপ গুরুতর প্রয়োজনীয়তা সত্বেও ঐগুলি তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। এই স্লুশ দিয়া ভালরূপে জল নির্গত না হওয়ায় পশ্চিমের জল সমস্ত পাঠ ভাসাইয়া সরপাইর উপর গিয়া চাপ দিতেছে এবং সাতমাইল কেনেল ছাপাইয়া কাঁথির দিকে অগ্রসর হইয়া কাঁথি অঞ্চলকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করিতেছে।

দহসোণামগ্নী স্লুশটীর ৮টী কপাটের মধ্যে ৫টী মাত্র কার্য্য করিতেছে। ২টী স্লুশের বাহিরের কপাট না থাকায় জোয়ারের সময় জল ঢুকিয়া যাইবার ভয়ে কপাট তোলা হয় না। ১টী কপাটের স্ক্রু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহা তুলিতে পারা যায় না। এই তিনটী কপাট ফেলা থাকা সত্ত্বেও ভাঙ্গা ও ফাঁক দিয়া জোয়ারের সময় ভিতরে জল ঢুকিয়া যায়। কাঁথি থানার প্রায় ⅓ অংশের জল এই স্লুশ দিয়া বাহির হয়।

সরপাই স্লুশের ভিতরের দিকে পলি পড়িয়া প্রকাণ্ড ঢিপি জমিয়া গিয়াছে। যদি উহা পরিষ্কার থাকিত, তাহা হইলে সরপাই স্লুশের ভিতর দিয়া আরও সহজে জলের স্রোত যাইতে পারিত। এ বৎসর সরপাই পরিষ্কারের সময় এই কার্য্য করা হয় নাই।

এই প্রধান স্লুশগুলি ব্যতীত দুর্গাপুর, কটকা প্রভৃতি স্লুশের কপাট উঠান যাইতেছে না। ঐগুলি তুলিতে পারিলে বহু স্থানের আবাদ বাঁচিয়া যাইত। পূর্ত্তবিভাগে উচ্চ বেতন দিয়া ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি রাখা হয়; কিন্তু তাঁহাদের কি কোন দায়িত্ব নাই? এই স্লুশগুলি যথাযথ অবস্থায় রক্ষা করা কি তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য নহে? এই দুরবস্থার জন্য তাঁহারা প্রজা-সাধারণের নিকট কি কৈফিয়ৎ দিবেন? ৩১।৭।২৭

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

শ্রীবসন্তকুমার দাস,
কাঁথি কংগ্রেস কমিটীর সভ্য।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল,
কাঁথি লোকালবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান্।

শ্রীভূতেশ্বর পড়্যা,
জলনিকাশ ব্যবস্থা সমিতির সহঃ সম্পাদক।

(নীহার)

সরকারী শিল্প-বিভাগ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের শিল্পবিভাগে একজন শিল্পজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের শিল্পিগণ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে তাঁহার পরামর্শ লইতে পারিবেন। ইহার জন্য কাহাকেও কোন ফি দিতে হইবে না।

(১) ছোট ছোট ফ্যাক্টরীর কল ও কারখানা-বাড়ীর নক্সা প্রস্তুত করা।

(খ) আধুনিক কলকব্জা ও তাহা চালাইবার উপযোগী মোটর, ইঞ্জিন, বয়লার প্রভৃতি নির্ব্বাচন ও ক্রয় করা।

(গ) কিরূপে নব্য উন্নত প্রণালী অনুসারে ফ্যাক্টরী-উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস করা যায়।

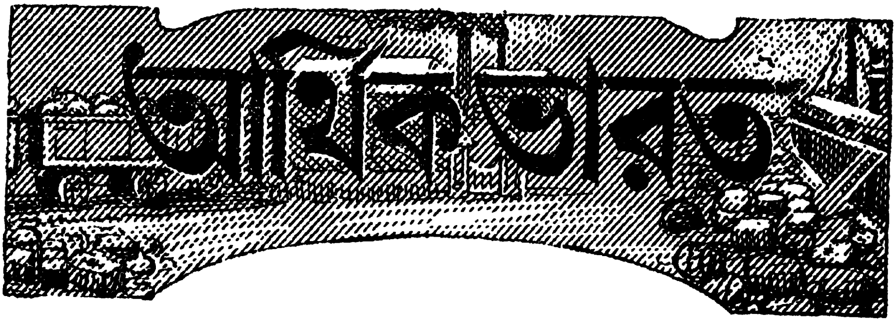
(ঘ) চলতি কল-কব্জাতে যদি কিছু দোষ থাকে তন্নির্ণয় ও সংশোধন।

(ঙ) কাঁচা মাল বা যন্ত্রের দোষে শিল্পকার্য্যে যে সকল অসুবিধা বা সমস্যা উপস্থিত হয় তাহার সমাধান করা।

২। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয় হ্রাস করিয়া যাহাতে বিদেশীয় ও অপরাপর প্রদেশানীত মালের প্রতিযোগিতায় বাজারে উহা অবাধে বিক্রয় করা যাইতে পারে তৎসাধন-উদ্দেশ্যে বিনা খরচে উল্লিখিত পরামর্শ লাভের ব্যবস্থা বিহিত হইল।

৩। সাহায্য-প্রার্থীকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে:—

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনিয়ার,
বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ,
৪০।১।এ, ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



ভারতের জল ও স্থল শুল্ক

(ক) লবণের রাজস্ব বাদে ভারতীয় জল ও স্থল শুল্ক বাবদ ১৯২৭ সনের আগষ্ট মাসের রাজস্বের পরিমাণ ৪ কোটি ৯ লাখ টাকা।

(খ) ঐ ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে পাওয়া গিয়াছিল ৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা।

১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে ৪ কোটি ৬ লাখ টাকা।

(গ) এপ্রিল-আগষ্ট, ১৯২৭ এই ৫ মাসে মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছে ১৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। মাসিক গড়পড়তা ৩ কোটি ৭৫·৬ লাখ টাকা।

১৯২৬ সনের ঐ সময়ে পাওয়া গিয়াছিল ১৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। মাসিক গড়পড়তা ৩ কোটি ৯০·৬ লাখ।

(ঘ) এই ৫ মাসের শুল্কের কয়েকটা দফা এইরূপ :—

আমদানি শুল্ক ...	১৫কোটি ৬৭ লাখ টাকা	
রপ্তানি „ ...	২কোটি ১৫ লাখ টাকা	
মোটর স্পিরিটের উপর আবকারী কর	৪৬	„ „
কেরোসিনের উপর কর	৪০	„ „
স্থল শুল্ক ও বিবিধ	১৫	„ „

(ঙ) কোন কোন আমদানি দ্রব্যের উপর হইতে বেশী শুল্ক আদায় হইয়াছে—

খনিজ তেল,

তামাক,

তুলা ও রেশম ভিন্ন অন্যান্য সূতা ও বয়ন-মাল,

যন্ত্রপাতি

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।

অর্থাৎ দেশের মধ্যে এই ৫ মাসে এই সব দ্রব্যের জন্য টানটা বাড়িয়াছে। ভারতীয় শুল্কাগারের দ্রব্যগুলি দফায় দফায় বিশদভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। খনিজ তেল, তামাক, বয়ন মাল, যন্ত্র, সিমেণ্ট বাহির হইতে বেশী আসার অর্থ কি ?

অর্থ নং ১—এই সব দ্রব্য হয় দেশের মধ্যে একদম নাই অথবা প্রচুর পরিমাণে নাই। নং ২—ইহাদিগের জন্য টানটা এমন প্রবল যে, ইহাদিগকে না কিনিয়া গত্যন্তর নাই। নং ৩—বিশেষ বিশেষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

সিমেণ্ট বেশী আসার অর্থ বেশী বেশী ঘরবাড়ী তৈয়ারী করা। যন্ত্র আনার অর্থ দেশের মধ্যে মিল, ফ্যাক্টরি ইত্যাদির প্রসার।

রপ্তানি-শুল্ক বৃদ্ধির অর্থও পরিষ্কার। ভারতীয় বাণিজ্যিক বুদ্ধি কোন্ কোন্ দিকে খেলিতেছে ও কতখানি সফলতা বা বিফলতা লাভ করিতেছে, তার একটা পরিচয় ও মাপ পাওয়া যায়।

গত ৫ মাসে এই যে দিকে রপ্তানি-শুল্ক বেশী পাওয়া গিয়াছে—কাঁচা পাট, কাঁচা হাইড ও স্কিন, (রপ্তানি-শুল্ক) ; মোটর স্পিরিট (আব্‌কারী কর)।

(চ) এইবার দেখা যাক কোন্ কোন্ দিকে শুল্কটা কম আদায় হইয়াছে। চিনি, দিয়াশলাই ও দিয়াশলাইয়ের স্প্লিণ্ট ও ভিনিয়ার, তুলার সূতি ও পীস্‌গুডস, লোহা ও ইস্পাত ব্যতীত অন্যান্য ধাতব দ্রব্য, লিকার, মোটরকার, রেশমের পীস্‌গুডস, লোহা ও ইস্পাত (রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট সুদ্ধ), কাট্‌লারি (ছুরি কাঁচি) ও হার্ডওয়েয়ার (লোহার বাসন কোসন) ইত্যাদির উপর আমদানি-শুল্ক কম পাওয়া

গিয়াছে। কেরোসিন হইতে প্রাপ্য আবকারী কর বেশী রকম কমিয়াছে।

(ছ) ১৯২৭ সনের এপ্রিল-আগষ্ট ৫ মাসে, ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত আমদানির উপর সংগৃহীত সংরক্ষণমূলক বিশেষ বিশেষ "ডিউটি" বা শুল্কের পরিমাণ ১ কোটি ৬৩½ লাখ টাকা। গবর্মেণ্ট ষ্টোরের উপর শুল্ক (সংরক্ষণ-মূলক শুল্ক ধরিয়া) পাওয়া গিয়াছে ৩৪½ লাখ টাকা। ১৯২৬ সনের ঐ ৫ মাসে পাওয়া গিয়াছিল (৪১ লাখ টাকা)

কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটির সুবৎসর

(ক) জুলাই, ১৯২৭ সনের মোট রাজস্বের পরিমাণ ৫,৭২,৪১৫৲ টাকা। একমাত্র "কনসলিডেটেড্ রেট্" হইতেই পাওয়া গিয়াছে ৪,১৬,৯৬০ টাকা। এই মাসে মোট খরচের পরিমাণ—৪,৩১,৩৯১ টাকা। তন্মধ্যে এঞ্জিনিয়ারের বিভাগের জন্য খরচ হইয়াছে ২,৬৩৪,৪৪১৲ টাকা।

(খ) ১৯২৭ সনের জানুয়ারী হইতে জুলাই এই ৭ মাসে কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

আয়ের প্রধান প্রধান বিষয়—

(১)	কন্সলিডেটেড্ রেট—২৩,২১,৬৭৩ টাকা (সমগ্র রাজস্বের ৭৫%)	
(২)	জল	৫,৯১,০৫৯৲
(৩)	ট্যাক্স	২,১৭,৭৪৮৲
(৪)	লাইসেন্স	১,৮৯,৭৬৫৲
(৫)	বিবিধ	৩,৩২,৭৩৫৲
		মোট ৩৯.৬০,৫১৮৲

ব্যয়ের প্রধান প্রধান বিষয়—

(১)	এঞ্জিনিয়ারের বিভাগ ২১,৬৪,২২২৲ (সমগ্র খরচের ৭৫%)		"
(২)	অনুৎপাদক ব্যয় ...	৪,৫১,২২৭৲	"
(৩)	সাধারণের স্বাস্থ্য-বিভাগ	২,৫৩,২৬৮৲	"
(৪)	জলের কল বিভাগ ...	২,০২,৫০৭৲	"
(৫)	কোষাধ্যক্ষের বিভাগ	১,৫৯,৯৯৭৲	"
		মোট ৩৫,২১,৮৩৪৲	"

(গ) ১৯২৭ সনের আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছিল ৫৮,১২,২৬৮৲। তন্মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ৭ মাসেই আদায় হইয়া গিয়াছে। ২০ লক্ষ টাকা মাত্র অনাদায় রহিয়াছে।

খরচের দিকে ১৯২৭ সনের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। ৭ মাসে খরচ হইয়াছে তার আধা—৩৫ লক্ষ টাকার কিছু উপর।

ফলে দাঁড়াইছে এই যে, গত ৭ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলাইয়া হাতে রহিতেছে ৪,৩৮,৬৮৪৲ টাকা এবং ৯৯ সেণ্ট।

২৪২৪ একরে পাঞ্জাবী তূলা

তূলার বেপারী রূপে ইংরেজ দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ। তার সাক্ষী ম্যাঞ্চেষ্টার। দুনিয়ায় ইংরেজের অতুল প্রতিষ্ঠায় তূলা অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে।

তূলার বাজারে উৎকর্ষের দিক্ হইতে ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সোজা কথা নয়। তবু ইংরেজ ঘুমাইতেছে না। কি উৎপাদন, কি উৎকর্ষ, সকল দিকেই অবিরাম চেষ্টা করিতেছে আরও উন্নতি লাভ করিতে।

ইংরেজের একটা প্রতিষ্ঠান আছে "বৃটিশ কটন গ্রোয়িং এসোসিয়েশন" বা বৃটিশ সাম্রাজ্যে তূলা জন্মানোর সঙ্ঘ। সংক্ষেপে বি, সি, জি, এ। বিপুল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এই এসোসিয়েশন দেশে দেশে ও জনপদে জনপদে চেষ্টা করিতেছে, কিসে ভাল তূলা জন্মে। নানা স্থানে সেই উদ্দেশ্যে শাখাও স্থাপন করিয়াছে।

পাঞ্জাবে এইরূপ একটা শাখা আছে খানেওয়ালে। অধ্যাপক ডব্লিউ, রবার্টসের তত্ত্বাবধানে বি, সি, জি, এ লিমিটেডের এক "ডিমন্ষ্ট্রেশন ফার্ম্ম" সন্তোষজনক ফল দেখাইতেছে। নীচের অঙ্ক-তালিকা হইতে বুঝা যাইবে জমির উর্ব্বরা শক্তি কিরূপভাবে বাড়ানো হইয়াছে।

বৎসর	আয়তন একর	একর প্রতি আদায় মণ
১৯২১-২২	১,৬৮৩	৭·৩৫
১৯২২-২৩	১,৮৬৯	১২·৩৫
১৯২৩-২৪	১,৯৮৯	১৪·৭০

১৯২৪-২৫	২,৪০৪	১৪·৭২
১৯২৫-২৬	২,৪২৪	১৫·৯

(১ মণ=৮২½ পাউণ্ড)

এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ আঁদায় হইতেছে একরপ্রতি ১৫·৯ মণ। পাঞ্জাবে আর কোনও স্থানেই এত পাওয়া যায় না। এর চেয়ে ৩০% কম পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রগুলিতে কোন কোন স্থানে ৭½ একর জমি লইয়া রোপণ করিয়া ২৩।২৪ মণ তুলা পাওয়া গিয়াছে।

খানেওয়ালে ৭,৩০০ একরের ক্ষেত

লাইন করিয়া বীজ বপন ও মেশামেশি করিয়া চাষ এই ক্ষেতের বিশেষত্ব। কায়লাপুরে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই হাতে কলমে এখানে লাগানো হইতেছে। ফল দেখিয়া বুঝা-যাইতেছে, কায়লাপুরের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক পথে চলিতেছে।

খানেওয়াল ইরিগেশন বিভাগের আয়তন ৪,৭১,৬৬৪ একর। আর ক্ষেতে আছে ৭,৩০০ একর। অর্থাৎ ক্ষেতটা বিভাগের ১½% স্থান জুড়িয়া আছে।

২৮৫ এফ্ ছাঁচের তুলা

একমাত্র এসোসিয়েশনের অক্লান্ত চেষ্টায় ২৮৫ এফ্ ছাঁচের তুলা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক মিল্‌নে এই তুলাটা কয়েলাপুর হইতে বাছিয়া লইয়া, ১৯২১ সনে অধ্যাপক রবার্টসকে কয়েক আউন্স দান করেন।

লিভারপুলে এর দাম হইয়াছে "মিডলিং আমেরিকান্ "বা" মধ্যম আমেরিকানের" উপর ১৫০ "পয়েন্ট" বা নম্বর। এ তুলার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। এপর্য্যন্ত খানেওয়ালে যত রকম তুলা রোপণ করা হইয়াছে তার মধ্যে এটার ফসলই সব চেয়ে বেশী হইয়াছে।

১৬ ঘণ্টা রোজে ২০০ বেল্

খানেওয়ালের শেষ রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি, এসোসিয়েশন যে "গিনিং ও বলিং"র কল পাঠাইয়াছে, তা বেশ সুন্দর ভাবে চলিতেছে। দিনে পাওয়া যাইতেছে ২০০ গাঁইট করিয়া। দিনটা অবশ্য ১৬ ঘণ্টায়।

২,৫০০ একরের শাহপুর আয়তন

এসোসিয়েশনের তাঁবে শাহপুর আয়তনটা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। রাবি নদী হইতে পাম্প করিয়া জল আনিয়া ফেলা হইতেছে। চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ১০,০০০ টন কাঠ কাটিয়া সাফ্ করিয়া লইতে হইয়াছিল।

পাঞ্জাবে বি, সি, জি, এ'র কাজের নমুনা

একটা নয়া খস্‌ড়া "সাট্‌লেজ উপত্যকা আয়তনে" খাড়া করা হইয়াছে। আগামী "ঋতু" হইতে এখানে তুলা জন্মানো হইবে।

এসোসিয়েশন বি, সি, জি, এ (পাঞ্জাব) লিমিটেডকে দিয়া নিলি ফ্যাক্টরি লিমিটেডে (নিলি বার) ভাগ লওয়াইয়াছে। "গিনারি"র জন্য দুইটা স্থানের যোগাড় হইয়াছে। একটা বুরেহ্বালে অন্যটা বিহারেতে।

সাট্‌লেজ উপত্যকা আয়তন তৈয়ারীর প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বীজের যোগানটা দখল করা। প্রস্তাব হইয়াছে যে, ৪ এফ্ ও অন্যান্য রকমের দো-আঁশলা আমেরিকান্ চাষ করা হইবে। এর ফলে ভারতীয় তুলার বংশোন্নতি ঘটিবে।

স্থানটা পাঞ্জাবে, খানেওয়াল হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। অধ্যাপক রবার্টস দেখাশুনা করিবেন।

এবৎসর পাঞ্জাবের নিলি ফ্যাক্টরি লিমিটেড্ বুরেহ্বালে এক যন্ত্র বসাইবে বলিয়া ঠিক করে। তদনুসারে দরকারী যন্ত্রপাতির জন্য এসোসিয়েশনের কাছে অর্ডার দিয়াছে। যন্ত্রপাতি চাই—

একটা এয়ার ব্লাষ্ট নিউম্যাটিক ব্যাটারি—৪।৮০
স-গিন্‌ওয়ালা,
৪০ ডি এ রোলার গিন
সীড কটন ওপ্‌নার (তুলার বীজ উন্মোচক)
ঘূর্ণায়মান বাষ্প ছাঁচের জলশক্তি চালিত বলিং প্রেস
প্রচলিত ভারতীয় ফিনিশার প্রেস।

এই সবগুলিই ৩২৫ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট একটা ৪-সিলিণ্ডার তৈল এঞ্জিন দ্বারা চালিত হইবে।

১৫,০০০ একর জমি চাষের বন্দোবস্ত

এই বছর বি, সি, জি, এ (পাঞ্জাব) লিমিটেড আরও একটা কাজ হাতে লইয়াছে। সেটা হইতেছে "বুন্দি চাষ সীণ্ডিকেট্।" প্রায় ১৫০০০ একর জমি চাষ হইবে বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব। ভবিষ্যতে ইহা বাড়াইয়া ২৫,০০০ একর পর্য্যন্ত করা হইতে পারে।

মহীশূরের চন্দনকাঠ

১৯২৫-২৬ সনের মহীশূর বন-বিভাগের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারি যে, রাজ্যের বন-বিভাগ হইতে মহীশূর প্রতি বৎসর ২০০০ টন ভাল চন্দন-কাঠ দিতে পারে। গত বছর কাঠ কাটা হইয়াছিল ২,৫৫৭ টন। চন্দন তৈল বেচিয়া আয় হইয়াছিল ২২ লাখ টাকা। রাজ্যের "কোটিস" হইতে প্রায় ১৮,০০০৲ টাকার রাজস্ব পাওয়া গিয়াছিল।

৬৯৩ বর্গ মাইল জুড়িয়া চন্দন-কাঠ "ভ্যালুয়েশন সার্ভে" বা জরীপ করা হইয়াছে। ইহাতে গাছ আছে প্রায় ২,০০০।

চামারাজানগরের তালুকের রায়তরা বড় হাতীর উপদ্রবে ভুগিতেছিল। বুডিবাডাগাতে এক খেদার অভিযান পাঠাইয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। ৩৪টা হাতী ধরা পড়িয়াছে। নিট রাজস্ব আদায় হইয়াছে প্রায় ৭,০০০৲ টাকা।

১,৮০,৪৭৮ টন জ্বালানি কাঠ

এই বৎসর মোট জ্বালানি কাঠ পাওয়া গিয়াছে ১,৮০,৪৭৮ টন। তন্মধ্যে "আয়রন ওয়ার্কস"কে ১,০৩,৮৬১ টন যোগান হইয়াছে। হাতে আছে ৭৭,১১৭ টন। "আয়রন ওয়ার্কসে"র মজুর-সমস্যার সুরাহা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মোপ্‌লা ল্যাম্বাইন ও সকল শ্রেণীর কুলিকে ভদ্রাবতী বিভাগে স্থায়ী চাষবাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

শিমোগাতে একটি স-মিল চলিতেছে। গবর্ণমেণ্টের মতে এই মিলের বন্দোবস্ত বড়ই খারাপ। রাজস্বে ঘাটতি পড়িতেছে। এ বৎসর, কাঠ-চেরা উপলক্ষ্যে শতকরা "ব্যর্থতা"টা গুরুতর। ৫৯,৪০০ ঘন ফুট টিম্বার চেরা হইয়াছে। কিন্তু মাল পাওয়া গিয়াছে মাত্র ২৫,১৫৭ ঘন ফুট।

৪৮,১৩,৪৬৭৲ টাকার গালা

গালার বাজারে "ভাঁটা" চলিতেছে। সেজন্য গালা ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির কাটতি অনেক কমিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের মতে আরও বেশী বিজ্ঞাপনের দরকার আছে। ষ্টোরস-ক্রয়-সমিতির কর্ত্তব্য দেশজ শীলমোহর-মোম যাতে কিনা হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

মোট গালা বেচা হইয়াছে ৪৮,১৬,৪৬৭ টাকার। টাকা আদায় হইয়াছে ৪০,০৪,২৬৲ টাকা। ১,৮৭,৬৭৮ টাকা কাটাকাটি গিয়াছে। সুতরাং অনাদায় বাকী পড়িয়া আছে ৬,২১,৫২৭ টাকা।

ঔষধ

মহীশূরে ফার্ম্মাসিউটিকালের কাজ বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু অ্যালকোহলের চড়া দরের জন্য এ পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড দিতে পারে নাই। সম্প্রতি আরক প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

মহীশূরে ৩৪টা ট্যানারি

বাঙ্গালোরের কাছাকাছি ৩৪টা ট্যানারি "বার্ক ট্যানিং"এ নিযুক্ত আছে। যেগুলি ভেড়া ও ছাগলের "স্কিন" বা ছাল ট্যান করিতেছিল, সেগুলিই এ বছর উন্নতিলাভ করিয়াছে। বার বার ক্ষতি "ভরিয়া" মহীশূর ট্যানারি সম্প্রতি কাজ বন্ধ করিয়াছে।

প্রতিদিন ৬০ টন তৈল

২০ টা অ্যাণ্ডারসন অয়েল এক্সপেলার কাজ করিতেছে। রোজ মোট তৈল পাওয়া যাইতেছে ৬০ টন করিয়া। খাওয়ার তেল সুপরিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

অন্যান্য ব্যবসায়

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অধীনে কতকগুলি সাবানের কারখানা স্বাধীনভাবে চলিতেছে। কিছু কিছু লাভ হইতেছে।

"মহীশূর পেন্ট ওয়ার্কসে"র কাজ খুব ভাল। কিন্তু পুঁজিপাটার অভাবে কারবারটা উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

হোয়াইট লীড সিণ্ডিকেট ও টুমকুরস্থ শ্লেট পেন্সিল ব্যবসার অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। বার্ণিশ তৈয়ারী হইতেছে। মহীশূরে কতকগুলি টাইলের কারখানা আছে। ইয়েলাহাঙ্কা, মহীশূর, টুমকুর ও বাঙ্গালোরের অবস্থা ভাল।

মহীশূরে রেলের প্রসার

কথা ছিল কান্থর হইতে ঠিক সাগালুর পর্য্যন্ত রেল লাইন খোলা হইবে। কিন্তু মহীশূর রেলওয়েসমূহের এজেন্টের পরামর্শে গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছেন।

এই ট্রেণ খুলিবার পর এক এক দিকে ৩টা করিয়া ট্রেণ ছাড়িলে ক্ষতি হইবে ২,০০,৭৬১ টাকা। আর ১টা করিয়া ট্রেণ ছাড়িলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,৮৬,৫০০ টাকা। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রেলের দরুণ যে "সেস্" বসাইবে, সেই টাকা বাদ দিয়া ঐ রেলের জন্য গবর্মেণ্টকে সর্ব্বমোট ২৪½ লাখ টাকা খরচ করিতে হইবে।

এজেন্ট বলিতেছেন, "কিন্তু এই রেলে মাল-চলাচলের পরিমাণ নেহাৎ নগণ্য হইবে। দিনে এক এক দিকে মাত্র ১৬½ টন। অর্থাৎ প্রায় ২ মালগাড়ী-বোঝাই। অন্য দিকে লাইনের পাশাপাশি বাসেও মাল চলিতে থাকিবে। সুতরাং মাল-চালনা হইতে রেলের আয় বেশী হইবে না।

এজেন্ট অন্য কতকগুলি লাইনের এঞ্জিনিয়ারিং ও ট্রাফিক জরীপ দাখিল করিয়াছেন। সেগুলি এই:—

(১) বীরকন্ন পাস্ ১:৬৬। ২৮·৮২ মাইল। খরচ পড়িবে অনুমান ২৮,৬৬,৪৬৬৲ টাকা।

(২) হোসাকোট পাস্ ১:৮০। ৩০·৮৬ মাইল। আনুমানিক খরচ ৩০,০৪,৫৬০৲ টাকা।

(৩) কাম্বের হালি পাস্ ১:১৬০। ৩৭·৮৫ মাইল। আনুমানিক খরচ ৩৭,৮৩,৭৩৮৲ টাকা।

এজেন্ট বলিতেছেন, "প্রাথমিক খরচ ও 'বুকিং' খরচ উভয় দিক্ হইতেই হোসাকোট সব চেয়ে সস্তা। ইহাতে প্রতি মাইলে রোলিং ষ্টকের দামসুদ্ধ খরচ হইবে ৯৭,৩৬১৲ টাকা। এটাই আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।



বেলজিয়ামের আমদানি বাণিজ্য

(ক) খাদ্য দ্রব্য

(১) ১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসে জমান তাজা গোমাংস আসিয়াছে প্রধানতঃ—

আর্জেন্টিনা হইতে—২৬,৩১৫ টন
অষ্ট্রেলিয়া „ — ৮,১৫১ টন
উরুগুয়া „ — ৭,৬০৩ টন
মোট আমদানিটা—৪৪,৭১০ টন
দাম—১৯·১২ কোটি ফ্রাঁ।

১৯২৫ সনের মোট আমদানি ৬০,৭০৬ টন
দাম—২৩·৯৫ কোটি ফ্রাঁ।

(২) ১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসে ধোঁয়ান বা "সল্‌টেড" মাংস আসিয়াছে—

যুক্তরাষ্ট্র— ১,৭৮১ টন
হল্যাণ্ড— ২৯৫ „
গ্রেটবৃটেন ১৩৮ „
ফ্রান্স ও কানাডা ১৫৩ „
মোট আমদানি—১,৩৬৭ „
১৯২৫ সনে ঐ—৪,০৮৯ „

(৩) ১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসে মাখন আসিয়াছে—

হল্যাণ্ড হইতে—১,১০৭ টন
গ্রেট বৃটেন — ৬৪০ „
—১,২২৪ „ (১৯২৫)

ডেন্মার্ক ও ফ্রান্স হইতে আমদানিও কমিয়াছে।

মোট আমদানি—১,৯১৪ টন।
১৯২৫ আমদানি—৩,১৪৪ টন।

(৪) ১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসে "চীজে"র আমদানি নিম্নরূপ :—

হল্যাণ্ড—৯,৪৭৩ টন
ফ্রান্স — ৮২১ „
সুইট্‌জারল্যাণ্ড ৩১৯ „
মোট— ১১,৪১০ „
১৯২৫— ১২,৯৩৬ „

(৫) এই ৯ মাসে ডিম আসিয়াছে বিদেশ হইতে ৬০ লক্ষ। দাম ৩৬ লক্ষ ফ্রাঁ। ১৯২৫ সনে ডিম আসিয়াছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ।

ডিম যোগাইয়াছে প্রধানতঃ :—
হল্যাণ্ড—৬৭ লক্ষ
জার্ম্মাণি ১২½ „

(৬) ধোঁয়ান ও "সল্‌টেড হেরিং" গত বছরের প্রথম ৯ মাসে আসিয়াছে—

হল্যাণ্ড হইতে—৫,১০০ টন
গ্রেট বৃটেন „ —৩,২০০ „
নরওয়ে „ —২,৩০০ „
মোট —১১,২৮৬ „
১৯২৫ — ৯,২০০ „

(৭) ১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসে গমের আমদানি এইরূপ :—

যুক্তরাষ্ট্র — ২,৬৫,০০০ টন

আর্জেণ্টিনা—২,২০,০০০ টন
কানাডা —১,৬৭,০০০ ,,
রুমাণিয়া — ৬৫,০০০ ,,
রুশিয়া — ৪৩,০০০ ,,
মোট —৮,০২,০০০ ,,
দাম —১৪৭·৭ কোটি ফ্রাঁ।

১৯২৫ সনের আমদানি—৮,৭২,০০০ টন।

(৮) ১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসে বালির আমদানি এই—

যুক্তরাষ্ট্র —৩৮ হাজার টন
রুমাণিয়া —২৭ ,, ,,
ডান্‌ৎসিগ্‌—২৩ ,, ,,
ফ্রান্স —১৬ ,, ,,
কানাডা —১৫ ,, ,,
আর্জেণ্টিনা—১৪ ,, ,,
মোট —১,৭৩ ,, ,,
দাম —১৮·৪ কোটি ফ্রাঁ।

(৯) এই সময়ে ওট্‌স যোগাইয়াছে—

আর্জেণ্টিনা—৫৪,০০০ টন
যুক্তরাষ্ট্র —১৯,৭০০ ,,
কানাডা — ৭,০০০ ,,
মোট —৯৬,০০০ টন

(১০) ৪,৩৬ হাজার টন ভুট্টা আমদানি হইয়াছে প্রধানতঃ আর্জেণ্টিনা, রুমাণিয়া ও হল্যাণ্ড হইতে।

(১১) প্রায় ২৯, হাজার টন চাউল আমদানি হইয়াছে প্রধানতঃ বৃটিশ ভারত, হল্যাণ্ড ও ইতালি হইতে।

(১২) মল্ট• আসিয়াছে মোট ১৫ হাজার টন। তন্মধ্যে ফ্রান্স পাঠাইয়াছে ১১ হাজার টন।

(১৩) আলু আসিয়াছে—

হল্যাণ্ড হইতে—৬৭,০০০ টন
জার্ম্মাণি ,, —১৪,৭০০ ,,
মোট —৯১ হাজার টন

(১৪) কলার আমদানি হইয়াছে—৬,৭০০ টন।

দাম ২·১৫ কোটি ফ্রাঁ।

১৯২৫ সনের আমদানি—৫,৫০০ টন।

দাম ৯০ লক্ষ ফ্রাঁ।

জামৈকা—৪ হাজার টন
হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া—২ হাজার টন।

(১৫) কফির আমদানি ৩০,৯০০ টন।

(১৬) আমদানি ১৯২ টন চায়ের মধ্যে গ্রেট্ বৃটেন হইতে ১১১ টন ও হল্যাণ্ড হইতে ৫৮ টন আসিয়াছে।

(১৭) কোল্‌জা ও রেপ্‌সীডের আমদানি এইরূপ :—

বৃটিশ ভারত—১,১৯০ টন

হল্যাণ্ড ও রুমাণিয়া কম কম যোগাইয়াছে।

মোট — ১,৮০০ টন।
১৯২৫ — ৪,৬০০ টন।

(১৮) মসিনা যোগাইয়াছে—

আর্জেণ্টিনা —৬০ হাজার টন
বৃটিশ ভারত — ৬ ,, ,,
লাত্‌ভিয়া —২,৬০০ ,,
মোট ৭৩,০০০ টন।

(১৯) ৮৫,০০০ টন খইল আসিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড ও গ্রেট বৃটেন (২০,০০০ টন) হইতে।

(খ) শিল্পজাত দ্রব্য

এসেন্স ও এসেন্স তৈল আসিয়াছে মোট ৮৫ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যের। যোগানদার ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন (১৮ লক্ষ ফ্রাঁ), জার্ম্মাণি, ইতালি, সুইট্‌যারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড।

(২) অ্যানিলিন ডাই (রং) যোগাইয়াছে—

যুক্তরাষ্ট্র—৩৯ টন
জার্ম্মাণি—৭৯০ ,,
ফ্রান্স —২৪৭ ,,

(৩) লিনোলিয়াম—

গ্রেট বৃটেন—৬০৫ টন
হল্যাণ্ড —২৪৩ ,,
জার্ম্মাণি —১৪৪ ,,
মোট —১,১০০ ,,

(গ) কাপড় চোপড়

(১) কটন হোসিয়ারির আমদানি

জার্ম্মাণি হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঁর।

মোট মূল্য—৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ফ্রাঁ।

(২) উল হোসিয়ারি

ফ্রান্স— ২৮ লক্ষ ফ্রাঁ

গ্রেটবৃটেন— ১৮ „ „

জার্ম্মাণি— ১৭ „ „

(৩) মেয়েদের কাপড়

ফ্রান্স— ৫২ লক্ষ ফ্রাঁ

মোট— ৫৭ লক্ষ ফ্রাঁ।

(৪) পুরুষের কাপড়

ফ্রান্স— ২৩ লক্ষ ফ্রাঁ

গ্রেটবৃটেন— ৬ „ „

মোট— ৩২ „ „

(ঘ) বিবিধ

(১) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

জার্ম্মাণি— ৪৭ লক্ষ ফ্রাঁ

ফ্রান্স— ৪০ „ „

গ্রেটবৃটেন— ৪ „ „

মোট— ১কোটি ১০লক্ষ ফ্রাঁ।

(২) বিস্কুট আসিয়াছে প্রধানতঃ ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন ও হল্যাণ্ড হইতে।

(৩) পেটেন্ট ঔষধ ইত্যাদি—

ফ্রান্স—১ কোটি ১৫ লক্ষ ফ্রাঁ

জার্ম্মাণি—৩৮ লক্ষ ফ্রাঁ

গ্রেটবৃটেন—২৯ লক্ষ ফ্রাঁ

(৪) পরিষ্কৃত লবণ—

ফ্রান্স—২২,৪০০ টন

গ্রেটবৃটেন—৬,৮০০ টন

(৫) অপরিষ্কৃত লবণ—

ফ্রান্স—৯০,০০০ টন

জার্ম্মাণি—৬০,০০০ টন

(৬) মদ আসিয়াছে ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যের। ফ্রান্স সব চেয়ে বড় যোগানদার। "চক্‌চকে" মদ তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ফ্রাঁর।

(৭) লাইম ফস্‌ফেট্—

টুনিস—১,৫৫,০০০ টন

(৮) কোলটার (আলকাতরা)—

গ্রেটবৃটেন—১৩,০০০ টন

জার্ম্মাণি—১২,৭০০ টন

(৯) পিচ্ আসিয়াছে—

জার্ম্মাণি—৩৫,৭০০ টন

গ্রেটবৃটেন—২৬,০০০ টন (৩২০০০ টন ১৯২৫)

মোট—৬৮,০০০ টন।

বেলজিয়ামের রপ্তানি বাণিজ্য

১৯২৬ সনের প্রথম ৯ মাসের হিসাব :—

(১) "রক্ষিত" মাংস—

ফ্রান্স—৫৮ লক্ষ ফ্রাঁ

গ্রেটবৃটেন—৫১ লক্ষ ফ্রাঁ

মোট—১ কোটি ৫৬ লক্ষ ফ্রাঁ।

(২) কৃত্রিম চর্ব্বি—

গ্রেটবৃটেন—১ কোটি ১৬ লক্ষ ফ্রাঁ

ডেন্মার্ক— ১৪ লক্ষ ফ্রাঁ।

(৩) ডিম গিয়াছে ৩২ কোটি ৮০ লক্ষ; মূল্য ২৩ কোটি ২৫ লক্ষ ফ্রাঁ। ১৯২৫ সনে ঐ সময়ে ডিম গিয়াছিল ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ; মূল্য ৯ কোটি ২০ লক্ষ ফ্রাঁ।

(৪) গমের আটা—

হল্যাণ্ড—১৮,৯০০ টন

জার্ম্মাণি—৩,৬০০ টন

মোট—২৩,৭০০ টন।

১৯২৫—৬৩,৭০০ টন।

(৫) রক্ষিত শাকসব্জী—

৬,৬০০ টন—২ কোটি ৫২ লক্ষ ফ্রাঁ

১৯২৫—৪,৩০০ টন।

প্রধান ক্রেতা—

গ্রেটবৃটেন—৭০ লক্ষ ফ্রাঁ।

ফ্রান্স—৪৮ লক্ষ ফ্রাঁ।

(৬) তাজা ফল—

"পিয়ারস" { গ্রেটবৃটেন—৪ কোটি ১৯ লক্ষ ফ্রাঁ। মোট—৫ কোটি ২৬ লক্ষ ফ্রাঁ।

"অ্যাপ্‌ল" { গ্রেটবৃটেন—৫৫ লক্ষ ফ্রাঁ। মোট—১ কোটি ৩২ লক্ষ ফ্রাঁ।

"প্লাম" { গ্রেটবৃটেন ৫৭ লক্ষ ফ্রাঁ। মোট—৭৫ লক্ষ ফ্রাঁ।

"আঙুর" { গ্রেটবৃটেন—২ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঁ। মোট—৩ কোটি ৭ লক্ষ ফ্রাঁ।

(৭) আলু—

জার্ম্মাণি—৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ফ্রাঁ।

ফ্রান্স— ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ফ্রাঁ।

গ্রেটবৃটেন—১,৪০০ টন ১১ লক্ষ ফ্রাঁ।

১৯২৫—১০,০০০ টন

মোট—১৩৫,৭০০ টন ৭ কোটি ফ্রাঁ।

১৯২৫—৭৫,৬০০ টন।

(৮) অন্যান্য তাজা শাকসব্জী রপ্তানি গিয়াছে মোট ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ফ্রাঁর।

(৯) "পিগ্‌ আয়রণ" রপ্তানি হইয়াছে ১০,১৯৫ টন। তন্মধ্যে গ্রেটবৃটেন ৬৭% র বেশী নিয়াছে।

(১০) কৃত্রিম রেশম—

এ বছর এ ব্যবসাটা আগের মত লাভজনক হয় নাই। তার হেতু এই:—

(ক) বৃটিশ আমদানি শুল্ক

(খ) ফরাসী বিনিময়ের হারে ভাঁটা

(গ) স্বদেশে আসল রেশমের কদর বৃদ্ধি

(ঘ) অন্যান্য দেশে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের দরুণ প্রতিযোগিতা।

(ঙ) অ্যালকোহলের দর বাড়ায় মূল্য বৃদ্ধি

ফ্রান্স—৫২১ টন

গ্রেটবৃটেন—৮১ টন (৩৭০ টন—১৯২৫)

মোট—২,২৬৯ টন ১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ফ্রাঁ।

১৯২৫—২,৪৭৪ টন।

(১১) রাসায়নিক দ্রব্যের রপ্তানি ৩০% বাড়িয়াছে।

(১২) সাধারণ সাবানের আমদানি দ্বিগুণ হইয়াছে—

ফ্রান্স ৭৯৭ টন

গ্রেটবৃটেন—১৯৪ টন (২৬ টন—১৯২৫)

বেলজিয়ামের মোমবাতি রপ্তানি প্রতি বৎসর কমিয়া যাইতেছে।

(১৩) কাঠের ও মোমের দিয়াশলাই পেরু, সিরিয়া ও গ্রেটবৃটেনে যাইতেছে।

(১৪) বেলজিয়ামে ১৪টা মার্গারিণ ফ্যাক্টরী আছে। ১৯২৬ সনের প্রথম ১০ মাসের উৎপাদন—২৪,৭৬৮ টন

সারা ১৯২৫ সনে—৩১,৮২১ টন

আমদানি—৩,২১৯ টন

রপ্তানি—

ফ্রান্স—৫৪০ টন

হল্যাণ্ড—৩১৪ টন

মোট—৯৯০ টন

১৯২৫ (প্রথম ৯ মাস)—১,১২১ টন।

(১৫) কৃত্রিম চর্ব্বি

গ্রেটবৃটেন—১,৫৭৬ টন

মোট—১,৭৭৩ টন।

বেলজিয়ামের কয়লা

বেলজিয়াম বৎসরে ৩ কোটি টন কয়লা পোড়ায়। আর উৎপাদন করে মাত্র ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টন। কোকের ২৫% বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯২৩ সনে বেলজিয়ামের কোকের পরিমাণ ৫০% কম ছিল।

ইয়োরোপ বনাম দুনিয়া

যুদ্ধ লাগিবার পূর্ব্বেই বাণিজ্যিক দুনিয়ায় ইয়োরোপের হিস্যা ৭৫°/০ হইতে কমিয়া ৬৬°/০ দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধ ও তার আনুষঙ্গিক নানা কারণের দরুণ এটা কমিয়া এখন ৫২°/০র নীচে দাঁড়াইয়াছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ধনরত্ন ও সম্পদের হিসাব হইতে জানিতে পারি যে, ইয়োরোপের অংশ প্রায় ৫০% হইতে ৩৩°/০র নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

এ যাবৎ ইয়োরোপকেই আমরা মানব সভ্যতার মধ্যমণিরূপে বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। দুনিয়ায় ধীরে ধীরে ইয়োরোপেরও যে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইতেছে সে কথা মনে রাখা দরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে কিস্তি-শোধের ব্যবস্থা

আমেরিকান্ মোটর গাড়ী ফোর্ডের দামটা একবারে না দিলেও চলে। কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট হারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে শোধ করিয়া গেলেই হইল। ইহাকেই কিস্তি শোধের ব্যবস্থা বলিতেছি।

আমেরিকায় এই ব্যবস্থা সুপ্রচলিত। ইহার একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে, খরিদ্দার দাম দেখিয়া ভড়কাইয়া যায় না। সে তার সাধ্যমত অল্প-পরিমাণ টাকা দিয়া যায়। নিয়মিতভাবে টাকা শোধ করিয়া গেলে, সময়ে আপনা হইতেই সবটা শোধ হইয়া যায়। ইহাতে জিনিষটা দামী হইলেও তার কিনা হইয়া যায়। অথচ অনেক টাকা এক সঙ্গে দিতে হইল না বলিয়া গায় লাগে না।

এই প্রথার বিরুদ্ধে সম্প্রতি ২টা আপত্তির উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) খরিদ্দার ফাঁকি দিতে পারে। অর্থাৎ জিনিষটা লইয়া ও ব্যবহার করিয়া দাম না দিতে পারে বা পলাইয়া যাইতে পারে।

(২) নিয়মিত ভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা শোধ দিতে হয় বলিয়া টাকা সঞ্চয় করিবার সুবিধা হয় না। ক্রেতার জমার ঘর শূন্য থাকে।

এই আপত্তিদ্বয় যে মিথ্যা তা প্রমাণ করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত এম, ডি, আয়ারস্ ১৯২৫ সনের কিস্তি শোধের এক "ষ্ট্যাটিষ্টিক" তৈয়ারী করিয়াছেন। তাহা এইরূপ :—

	মোট বিক্রী	[illegible]	[illegible]
	মিলিয়ন ডলার		
অটোমোবিল, নয়া ও পুরানা	৩,৭৮০	২,৫৪৬	১,৩৭৮
গৃহস্থালীর সাজসজ্জা ...	৭৮৯	৬৮৪	৪৪২
পিয়ানো ...	২৩৪	২০৩	২১২
ফনোগ্রাফ ...	১৭৪	১৩৪	৮৪
সেলাইয়ের কল ...	১০৬	৯৭	৭৭
কাপড় ধোয়া কল ...	১০৪	৯৪	৫১
সম্পত্তির উন্নতি ...	১০৮	৮৩	৪৫
রেডিও সেট্ ...	১৮১	১৩৯	৪১
জুয়েলারি ষ্টোর দ্রব্যাদি...	১০৮	৮৮	৪০
কাপড় চোপড় ...	২৮২	২২৩	৩৬
ট্র্যাক্টর ...	৭৫	৫২	২৮
ভ্যাকুয়াম পরিষ্কারক ...	৫৬	৪৮	২০
ক্ষেত খামারের কল ...	৩১	২৫	১৩
গ্যাস ষ্টোভ ...	২৭	১৩	১২
মেকানিক্যাল রেফ্রীগেটার	১৬	১৪	১১
অন্যান্য দ্রব্য ...	১০৮	৮৮	৪৮
মোট ...	৬,১৭৯	৪,৫৪১	২,৬৩৮

অর্থাৎ সাদা কথায়, এই প্রথা অবলম্বন করার দরুণ যুক্তরাষ্ট্র ৬০০ কোটি ডলার মূল্যের জিনিষ বেচিয়াছে। আর বেচার পর, আগামী বছর ও ভবিষ্যতে ২৫০ কোটি ডলার মাত্র কিস্তিতে পাইবে। সুতরাং ৩৫০ কোটি ডলার বেচার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে প্রায়।

১৯২৫ সনে যুক্তরাষ্ট্রে যত দ্রব্য বিক্রী হইয়াছে তার মোট দাম ৭০০ কোটি ডলার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অনাদায় বাকী পড়িয়া আছে ১৩০০ কোটি ডলার।

কিস্তি শোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে দুই আপত্তির উল্লেখ করিয়াছি, তার একটাও "সংখ্যা" দৃষ্টে টিঁকে না।

প্রথমতঃ অটোমোবিল ফিনান্স কোম্পানিগুলি (কিস্তি-শোধের বেশীটাই এগুলির) মাত্র ½% ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জেনার‍্যাল মোটরস কোম্পানী জানাইতেছে যে, ১৯২৪ সনে তাদের ক্ষতির পরিমাণ (এই বাবদ্) ৫০০০ ডলারেরও কম।

দ্বিতীয়তঃ, কিস্তি-শোধ ব্যবস্থার জন্য যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের সঞ্চয়-ক্ষমতা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। নিম্নের অঙ্ক তার সাক্ষ্য দিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেভিংস আমানতের পরিমাণ—

১৯১২—৪৫ কোটি ডলার

১৯২০—৬৫ " "

১৯২৫—৯৫ " "

ছাগলের উপর কর

৫ই জানুয়ারী ১৯২৭ হইতে ফাসিষ্ট গবর্মেণ্ট ছাগলের উপর এক নয়া কর বসাইয়াছে।

"কোরিয়েরে দেলা সেরা"তে এক চাষ-ওস্তাদ লিখিতেছেন, "ছাগল আস্তাবলে রাখিয়া দাও। অথবা চরিবার সময় চোখে চোখে রাখ। তাহলে ছাগল আমাদের উপকারী বান্ধব হয়।

"তা যদি না কর, তবে ছাগল অত্যন্ত অনিষ্ট করে। দক্ষিণ ইতালির পাহাড়গুলি যে বনশূন্য হইয়া যাইতেছে, তার কারণ সেখানে ছাগল যথেচ্ছা চরিয়া বেড়ায়।

"সুতরাং ছাগল-চরানো নিয়মাধীন করা দরকার। ভবিষ্যৎ ছাগলের অধিকারী যদি আগের থেকে বিশেষ লাইসেন্স না নেয় ও মাথা-পিছু ১০ লিয়ার কর না দেয়, তবে তাকে কোন কোন জায়গায় ছাগল চরাইতে দেওয়া হইবে না।"

ইয়োরোপে ছাগ-সম্পদে বল্কানের নীচেই ইতালির স্থান। প্রত্যেক বর্গমাইলে ১৮টা ছাগল আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ২৪½ লক্ষ ছাগলের উপর নয়া করটা বসান চলিবে।

লিভারপুলে তুলা বিক্রয়

আমেরিকান্ ছাঁচের তুলা লিভারপুলের বাজারে কমিয়া গিয়াছে। এটা ইংরেজের পক্ষে চিন্তার কারণ।

কিন্তু অন্য ছাঁচের তুলা লিভারপুলে কম বিকাইতেছে না। বরং বেশী বিকাইতেছে। ১৯২৬ সনের ৩১ জুলাই তুলার এক "ঋতু" শেষ হইয়াছে। এই ঋতুতে বাকির ছাঁচের তুলা-বিক্রীর হিসাব এইরূপ :—

দক্ষিণ আফ্রিকান্	১৪,২৮০	বেল
পূর্ব্ব "	১২০,২৭০	"
পশ্চিম "	৩৬,৩৬০	"
ব্রাজিলিয়ান্	১২০,০৭০	"
পেরুবিয়ান্	২০৩,৮৮০	"
সুদান	৩৯,৮২০	"
ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান্	৩,২১০	"
সাগর উপদ্বীপের	২,৭২০	"
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ বা ভারতীয়	৩৭,৩৯০	"
অষ্ট্রেলিয়ান্	৯,৮০০	"
বিবিধ	৭,৫৯০	"
মোট—	৫৯৫,৩৯০	"

গতবারের তুলনায় পূর্ব্ব আফ্রিকার হিস্যা বাড়িয়াছে ৫০,০০০ বেল। পশ্চিম আফ্রিকার ১০,০০০ বেল। আর ভারতীয় ইত্যাদির হিস্যায় ৫০,০০০ বেল কম পড়িয়াছে। গত ঋতু হইতে এবারের মোটটা ৪৩, ৬১০ বেল বেশী।

৩৩॥০ লক্ষ পাউণ্ডের তুলা

বৃটিশ কটন গ্রোয়িং এসোসিয়েশন এবছরে (১৯২৬) গত বছরের চেয়ে অনেক বেশী তুলা বাজারে বিক্রয় করিয়াছে। দামটাও পাওয়া গিয়াছে অভূতপূর্ব্ব।

বিগত ৬ বৎসরের বেল ও দাম এইরূপ :—

বৎসর	বেল	দাম
১৯২১	৬৩,৯৬৬	১৫,৯৭,৭০২ পাউণ্ড
১৯২২	৬৭,৩৮৬	১৬,২৮,৭৭৮ "
১৯২৩	৫৪,৬০৬	১৫,৮৮,৪৮০ "
১৯২৪	৫৯,৫৮৩	১৯,২২,০৯৭ "
১৯২৫	৮৪,৩২০	২৫,০২,৯৬৭ "
১৯২৬	১,৩৫,৫২২	৩৩,৬৮,৭৪০ "

সুদানে উৎকৃষ্ট তূলা

১৯২৬ সনের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে "সুদান প্ল্যান্টেশন সীণ্ডিকেট্" গেবিরাতে ৮০,০৩১ ফেড্ডা স্থান জুড়িয়া তূলা রোপণ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের আয়োজন ছিল মাত্র ২১,৬১৬ ফেড্ডা। এবছরের মোট ফসলের পরিমাণ ৯০,৩০৯ বেল।

অর্থাৎ পূর্ব্ব বছরের তুলনায় ফসল-রোপিত ফেডের আয়তন বাড়িয়াছে ৪গুণ, কিন্তু ফসল পাওয়া যায় ৮ গুণ। অথচ তুলাটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

১৯২৬-২৭ ঋতুর জন্য ১,০০,০৫৭ ফেড্ডায় তূলা রোপিত হইয়াছে। আশা করা যায়, এবারও ফসল বেশ ভাল হইয়াছে।

কাসালায় ১১,৪০০ ফেড্ডায় ৫,৪৩৫ বেল্

প্রথমে আশা করা গিয়াছিল যে, গ্যাস্ নদী হইতে সেচের ফলে তুলার ফসলটা বেশ উৎরাইবে। সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কাসালা তূলার কোম্পানী কাসালাতে অনেকখানি আয়তন জুড়িয়া তূলা রোপণ করিতে পারিবে না।

১৯২৫-২৬ সনে তুলার ফসল হইয়াছে ২১,৪০০ ফেড্ডাতে। ফসলের পরিমাণ ৫,৪৩৫ বেল। প্রতি বেল ৪০০ পাউণ্ডের সমান। খুব সন্তোষজনক তুলা পাওয়া গিয়াছে। •

১৯২৫ সনে গ্যাস প্লাবন সুবিধাজনক হওয়ায়, আগামী ঋতুতে ২৬,১০০ ফেড্ডাতে তুলা চাষ চলিতেছে। আশা করা যায় ১৯২৬-২৭ সনের পরিমাণটা ১০,৫০০ বেল হইয়াছে।

টোকার আয়তনে তূলা

লোহিত সাগরের উপরে টোকার আয়তনে তুলার ফসল একদম ব্যর্থ হইয়াছে। মোট ফসল পাওয়া গিয়াছে মাত্র ১০,০৩৫ কাণ্টার। ১৯১৯ সন বাদে এত কম ফসল আর কোনদিন পাওয়া যায় নাই।

দক্ষিণ সুদান

সুদানের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে তুলা জন্মানো দরকার। এজন্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক সহায়তা চাই। কিন্তু এই স্থানগুলি বড়ই অনুন্নত ও দুর্গম। সেজন্য সহসা কেহ এদিকে আসিয়া চেষ্টা-চরিত্র করিতে চায় না।

চাষীদিগকে তুলা জন্মাইবার কৌশল শিখাইবার ও সহায়তা করিবার ভার গবর্ণমেণ্ট লইয়াছে। কেমন করিয়া তুলা জন্মাইতে হয়, তুলার বীজ যোগাড় করা ও বণ্টন করা কি নীতিতে হওয়া উচিত, পোকা ইত্যাদির হাত হইতে তুলার ফসল কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, ইত্যাদি সব বিষয় গবর্ণমেণ্ট চাষীদিগকে শিখাইবার জন্য চাষ-কর্ম্মচারিদের মোতায়েন করিয়াছে।

এই কর্ম্মচারীরা মঙ্গোলিয়া, বাহ্‌র-এল-ঘাজাল, আপার নাইল এবং নুবা পাহাড় প্রদেশগুলিতে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

তুলার চাষে ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে। ৩,৫০০ বেল ফসল পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বছর (১৯২৫) পাওয়া গিয়াছিল ২,৫০০ বেল। তুলাটা খুব ভাল তুলা। সব্‌সে সেরার জন্য মিড্‌লিং আমেরিকানের উপর প্রতি পাউণ্ডে ৪ হইতে ৫ পেন্স পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম্ পাওয়া গিয়াছে।

ইরাকের রেল তুলার বণ্টনে সাহায্য করিতেছে

এসোসিয়েশন ইরাক রেলওয়েসমূহের ৪০ জন ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে যে, এসোসিয়েশনের এজেণ্টের কাজ করিবে। বীজের জন্য আবেদন পত্র আসিলে রেজিষ্ট্রী করিবে ও পত্র-প্রেরকদের কাছে বীজ পৌঁছাইয়া দিবে।

রেলওয়ে পয়সা না লইয়া এসোসিয়েশনের জন্য এই কাজ করিয়া দিয়াছে। এইরূপে ২০ টন তুলার বীজ চাষীদিগের নিকট বণ্টন করা হয়। আশা করা যায়, এই উপায়ে রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে অচিরে সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

তুলার আয়তন টাইগ্রিসের ভাঁটা বহিয়া ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছে। টেসিফোনের নীচের দিকে চলিয়াছে।

নদীতীরে দাঁড়াইলে দেখা যাইবে নৌকা বোঝাই তুলা চলিয়াছে। ছোট ছোট মোটর বোট নৌকা টানিতেছে। আমাদেরও গঙ্গা নদীতে পাট বোঝাই নৌকা অহরহ চোখে পড়িবে। তবে এই নৌকাগুলি মোটর বোট বাহিত নয়।

ইরাকে যথেষ্ট রেলওয়ে নাই

দেশের এবং কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত রেলওয়ে ইরাকে নাই। আর যা আছে পুঁজিপাটার অভাবে তাও ভাল রকম চলিতেছে না। অনেক রোলিং ষ্টক বদলান দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

রেলওয়ের প্রসার মোসল পর্য্যন্ত হওয়া দরকার। আর টাইগ্রিসের উপর বাগ্‌দাদে এক পুল না হইলে বাণিজ্যের ক্ষতি হয়।

মোসল ও আটিল আয়তনে মোটা পরিমাণে শস্যাদি জন্মে। যানবাহনের অভাবের জন্য তুলার উৎপাদন অল্পই বাড়িয়াছে। কিন্তু যা জন্মে অতি উৎকৃষ্ট। উত্তরের শস্য রপ্তানির জন্য পথ চাই। আর চাই তুলা চাষের প্রসারের জন্য কির্‌কুক্‌ হইতে রেল-লাইনের বিস্তার।

সেচ-বিভাগ নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিতেছে। কতকগুলি ছোটখাট প্ল্যানও খাড়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে সব চেয়ে বড় যেটা হাতে লওয়া হইয়াছে সেটা হইল হিলা খালের উপর দাজারা বারেজ। ইহা দিওআনিয়া লিয়া চাষের জনপদগুলির উন্নতি ও বিস্তার সাধন করিবে। হিল্লাতে এক তুলার সম্মেলন বসিয়াছিল। তাতে অনেক শেখ ও ওমরাহ এসোসিয়েশনের কাজ দেখিতে আসিয়াছিল। এসোসিয়েশন বিগত এপ্রিলের বাগ্‌দাদ প্লাবনে ৫০০ পাউণ্ড দান করে।

দুনিয়ার বেতার

১। অষ্ট্রেলিয়ার দৌড়

বেতার-বার্ত্তা প্রেরণ লইয়া দেশে দেশে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া সম্প্রতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

ইংল্যণ্ডে ডার্বি ঘোড়দৌড় প্রতি বৎসরের বিখ্যাত ঘটনা। বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক খবর জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে। ঘোড়ার উপর কোটি কোটি টাকা বাজি রাখা হয়। কাগজগুলিও সর্ব্বাগ্রে খবর পাইবার ও দিবার জন্য কাড়াকাড়ি করে।

এ বছর "কল্ বয়" বাজি জিতিয়াছে অর্থাৎ প্রথম হইয়াছে। এই খবরটা ঘটনার ৩ সেকেণ্ড মাত্র পরে "অষ্ট্রেলিয়ান্ প্রেস এসোসিয়েশন" ও "অষ্ট্রেলিয়ান্ নিউস্‌পেপারস্ কেব্‌ল সারভিস্" "একসচেঞ্জ টেলিগ্রাফ লিমিটেড্ কোম্পানীর" সহিত একযোগে কাজ করিয়া জি, পি, ও'র সাহায্যে "অষ্ট্রেলিয়ান বীম্ সারভিসে"র দ্বারা জানাইয়াছে।

"কল্ বয়" বাজি জিতিবার খুঁটি পার হইবার ৩ সেকেণ্ড পরে মেলবোর্ণ সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাম অফিস্ খবর পাইয়াছে জানাইল ও নামটা বলিয়া দিল। তার ৭ সেকেণ্ড পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘোড়ার নামও জানিল। তার ৪ সেকেণ্ড পরে অর্থাৎ ঘোড় দৌড় শেষ হইবার ১৪ সেকেণ্ড পরে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান কাগজগুলি ডার্বির পূরা খবরটা জানিতে পাইল।

২। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযান

মার্কণি কোম্পানী দক্ষিণ আফ্রিকায় জি, পি, ও'র জন্য বোডামিন ও ব্রিজওয়াটার নামক দুই স্থানে "বীম" বেতার ষ্টেশন খাড়া করিতেছে। "প্রাথমিক পরীক্ষা" শেষ হইয়াছে। যান-বাহন চলাচলের মধ্যে পরীক্ষাটা যদি সন্তোষজনক হয়, তবে ষ্টেশনগুলিকে হপ্তা-ব্যাপী সরকারী পরীক্ষার জন্য জেনার‍্যাল পোষ্ট অফিসের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

পরীক্ষাকালে বেগটা প্রায় সর্ব্বদাই মিনিটে ২০০ হইতে ২৫০ শব্দ ছিল। আর এই বেগটা প্রতিদিন অনেকক্ষণ বজায় রহিয়াছে।

৩। ৫ লক্ষ বেতার টেলিগ্রাম ও ১৬ লক্ষ ফ্রাঁ মুনাফা

বার্ণস্থ মার্কণি রেডিও ষ্টেশন, এস, এ'র ১৯২৬ সনের বাৎসরিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। রিপোর্ট বলিতেছে—

এটা ৫ম বছর। ১ম বছর মাত্র ১ লাখ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছিল। ৫ম বছরে টেলিগ্রামের সংখ্যা

দাঁড়াইয়াছে ৫ লাখ। অর্থাৎ ৫ বছরে ৪০০% বাড়িয়াছে। বুঝিতে হইবে, লোকে কদর বুঝিতেছে।

১৯২৫ সনে কোম্পানী নিম্নলিখিত স্থানগুলির সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছে :—

(ক) লণ্ডন [গ্রেট বৃটেনে রাগবি ও নর্থল্ট ষ্টেশনের সঙ্গেও যোগাযোগ রহিয়াছে।]

(খ) মাদ্রিদ্

(গ) ওয়ার-স

(ঘ) বার্সেলোনা

(ঙ) কোপেনহাগেন

(চ) বেলগ্রেড

ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুষ্ঠানসমূহ উত্তরোত্তর ষ্টেশন বেশী ব্যবহার করায় তৃতীয় এক "ট্র্যান্স-মিটিং সেট্" (প্রেরক দফা) বসাইতে হইয়াছে। ইহাতে ছাপাখানার কার্য্য-সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বছরের শেষ হইতে স্থায়ীভাবে রাত্রে কাজ হইয়া আসিতেছে।

১৯২৬ সনে আদায় হইয়াছে ১০,৭৫,৩৭৭ ফ্রাঁ; খরচ ৫,৯৮,২২৪ ফ্রাঁ। ১৯২৫ সনের তুলনায় ইহা যথাক্রমে ২৮% ও ২০% বেশী।

আগের জেরের সহিত যোগ দিয়া নিট্ মুনাফা হইয়াছে ১,৮৩,২৪৫ ফ্রাঁ। গত বছর ইহা ছিল ১,৪২,৪১২ ফ্রাঁ।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের বেতার সওদা

১৯২৬ সনের মার্চ্চ মাসে যত মূল্যের রেডিও যন্ত্রপাতি রপ্তানি গিয়াছিল, ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে তার চেয়ে ১,৭৩,৫৬৬ ডলার কম মূল্যের গিয়াছে। কিন্তু ১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারীর চেয়ে মার্চ্চের রপ্তানির মূল্য ৭৩,২৩৬ ডলার বেশী।

এই দফায় একটামাত্র দ্রব্য বেশী গিয়াছে—টিউব। তার দরুণ আগের বছরের মার্চ্চ মাসের চেয়ে ৮,৬৮৪ ডলার বেশী পাওয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে রপ্তানি-হ্রাস ঘটিয়াছে :—

(ক) ঘর-গৃহস্থালীর তাতাইবার ও রাঁধিবার উপকরণ

(খ) টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি

(গ) "ইন্সুলেটিং" দ্রব্য

(ঘ) ধাতব চালক ("কনডুইট্"), "আউটলেট্ ও "সুইচ বক্স"

(ঙ) (বাতির জন্য ছাড়া) বৈদ্যুতিক গ্লাস্ ওয়েআর

(চ) খোলা তামার তার

বুঝা যাইতেছে, বেতারের বাজারে যুক্তরাষ্ট্র কাবু হইয়াছে ও হটিয়া যাইতেছে।

৪। ডেন্মার্কের বাজারে ইংরেজ

ডেন্মার্কে রেজেষ্ট্রীকৃত গৃহীতা "সেটে"র সংখ্যা ১½ লক্ষ। কালুণ্ডবোর্গে উন্নততর প্রণালীতে "ব্রডকাষ্টিং"এর জন্য এক নূতন ষ্টেশন নির্ম্মিত হইতেছে। ইহাতে বেতার টেলিফোনের কাজে সুবিধা ও উৎকর্ষ ঘটিবে সন্দেহ নাই।

এই ষ্টেশন এক বৃটিশ কারবারের কীর্ত্তি। ১০৫০-১২৫০ মিটার "ওয়েভ্লেংথে"র উপর একটা ৫ কে, ডব্লিউ, "ট্র্যান্স্-মিটার" বা প্রেরক আছে। এই ষ্টেশন একদম নয়া ধরণের প্রাগের ষ্টেশনের মত।

ডেন্মার্কের বেতারের বাজারে নানা দেশের বেপারীরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতেছে। আগে একটা নিয়ম ছিল যে, যে-সে লোক প্রেরক ষ্টেশন ব্যবহার করিতে পারিবে না। গত বৎসর হইতে এই নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। পরীক্ষার্থে অথবা অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছে দেখাইতে পারিলেই যে-কেহ ষ্টেশন ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং বহু লোক সখ করিয়া বেতার যন্ত্রপাতি কিনিতে চাহিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া বাজারেও বহু উৎপাদক ও বণ্টনকারী দেখা দিয়াছে।

সিকার ভাঁটার দরুণ দুর্ব্বল কারবারগুলিকে পটল তুলিতে হইয়াছে। কিন্তু যেগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাদের মোট উৎপাদন খাদনের চাইতে অনেক বেশী। কাজেই বাজার-দর নামিয়া গিয়াছে ও ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

ডেন্মার্কের বাজারে ইংরেজের প্রতিযোগী রহিয়াছে ৩ দেশ :—

(১) জার্ম্মাণি

(২) ডেন্মার্ক স্বয়ং

(৩) যুক্তরাষ্ট্র

উচ্চ-শ্রেণীর যন্ত্রপাতি যোগানোর বিষয়ে ইংরেজ অগ্রগণ্য। যুক্তরাষ্ট্রও উচ্চ-শ্রেণীর যন্ত্রাদি যোগায়। কিন্তু আমেরিকান্ যন্ত্রপাতির ৬০০ মিটার ওয়েভলেংথের বেশী পাল্লা নয়। অথচ ডেন্মার্কের দরকার তার চেয়ে বেশী। কাজেই এক্ষেত্রে ইংরেজের জয়।

সস্তা ও জনপ্রিয় যন্ত্রাদি যোগানোতে জার্ম্মাণি ও ডেন্মার্ক ইংরেজের উপর টেক্কা দিতেছে। ডেন্মার্কে যত "গৃহীতা সেট" বিক্রী হয় তার আধা ডেনিশ বা বিদেশী অঙ্গ-যুক্ত। আর শক্ত রবারের সাদাসিধে অঙ্গের প্রায় সবটাই ডেনিশ কাঁচা মাল হইতে তৈয়ারী। ডেনিশ রেডিও ম্যানুফ্যাক্চারার্স্ এসোসিয়েশন (ডেনিশ্ রেডিও শিল্পী সঙ্ঘ) সম্প্রতি আমেরিকান উৎপাদকদের সহিত একটা সমঝৌতা কায়েম করিতে বাধ্য হইয়াছে। তদনুসারে গৃহীতা সেট্গুলির নিট দামের উপর ১০ পাউণ্ড রয়েলটি দিতে হইবে।

ব্যাটারি বাদে প্রতি বছর সকল প্রকার বেতার যন্ত্রপাতির মোট আমদানির পরিমাণ ৩০ লক্ষ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ডেন্মার্ক স্বয়ং উৎপাদন করে ১৭ লক্ষ কিলোমিটার। ডেন্মার্ক রেডিওর জন্য ৩৫ লক্ষ কিলোমিটার "প্রাইমারি সেল" (প্রাথমিক কোষ) উৎপাদন করে। সকল শ্রেণীর প্রাইমারি ব্যাটারি মোট ইহার প্রায় দ্বিগুণ উৎপাদিত হয়।

৫। ধ্বনি-জগতে দূরত্ব বনাম স্থায়িত্ব

এ যাবৎ ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশনগুলি ওয়েভলেংথ ফিগার" দ্বারা ধ্বনি প্রকাশ করিয়াছে। আমি এখানে কথা কহিলাম। সেই কথায় ঈথারে স্পন্দন ও ঢেউ উঠিল। বেতার যন্ত্রে সেই ঢেউ ধরিয়া ও মাপিয়া বুঝা গেল কোথা হইতে কি বলিতেছি।

ধ্বনির বেপারীরা বলিলেন, "না এর চেয়ে একটা প্রকৃষ্ট উপায় আছে।" "কিলোসাইক্ল ফিগার" প্রচলিত করিতে হইবে। দূরত্ব মাপিয়া নয়, স্থায়িত্ব মাপিয়া কথা ধরিতে হইবে। ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশনগুলিকে "পুনঃ পুনঃ শব্দায়মানতা" হিসাবে সাজাইতে হইবে। পরিমাপের "ইউনিট" হইবে সেকেণ্ডে অত সাইক্ল" বা চক্র।

উনিয়ন আঁতারনাশিওন্তালে দে রাদিওফোনি জেনেহ্বা আগাগোড়া এ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ সভ্য জগৎ ইহার অনুমোদন করিতেছে। এ জন্য বি, বি, সি সকল দেশে এই প্রথা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ পাঠাইয়াছে। বি, বি, সি'র ষ্টেশনগুলির ওয়েভলেংথ নয়া কিলোসাইকল (= ১০০০ সাইকল) বা সহস্র চক্রে এইরূপ দাঁড়াইতেছে :—

ষ্টেশনের নাম	ওয়েভলেংথ	সহস্র চক্র
ডাভেন্ট্রি	১,৬০৪'৩	১৮৭
অ্যাবারডীন	৫০০	৬০০
বৌর্ণিমাউথ	৪৯১'৮	৬১০
গ্লাসগো	৪০৫'৪	৭৪০
প্লাইমাউথ	৪০০	৭৫০
ম্যাঞ্চেষ্টার	৩৮৪'৬	৭৮০
লণ্ডন	৩৬১'৪	৮৩০
কার্ডিফ	৩৫৩	৮৫০
বার্ম্মিংহাম	৩২৬'১	৯২০
নিউকাস্ল্	৩১২'৫	৯৬০
বেলফাষ্ট	৩০৬'১	৯৮০
লিভারপুল	২৯৭	১,০১০
হাল	২৯৪'১	১,০২০
ষ্টোক	"	"
সোয়ানসী	"	"
ডাণ্ডি	"	"
এডিনবারা	২৮৮'৫	১,০৪০
লীড্স	২৭৭'৮	১,০৮০
নটিংহাম	২৭৫'২	১,০৯০
শেফীল্ড	২৭২'৭	১,১০০
ব্রাডফোর্ড	২৫২'১	১,১৯০

ইয়োরোপীয় ষ্টেশনসমূহ (ওয়েভলেংথ)

অ্যামষ্টারডাম	...	১,৯৫০
বার্সেলোনা	...	৪৬২
ব্রুন্	...	৪৪১'২
ব্রেস্লা	...	৩১৫'৮

বার্লিন	...	৫৬৬
		ও ৪৮৩'৯
ব্রুসেল্‌স্‌	...	৫০৮'৫
বুডাপেষ্ট	...	৫৫৫'৬
বার্ণ	...	৪১১
ফ্রাঙ্কফোর্ট অন্‌ মেইন	...	৪২৮'৬
হাম্বুর্গ	...	৩৯৫'৭
লাইপৎসিগ	...	৩৬৫'৮
লিঅঁ	...	২৯১'৩
মাদ্রিদ, উনিওন রাদিও	...	৩৭৫
মিলান	...	৩২২'৬
ওসলো	...	৪৬১'৫
প্যারি, একোলে সুপিরিয়রে	...	৪৬৪
ইফেল টাওয়ার	...	২৬৫০
প্রাগ	...	৩৪৮'৯
রাদিও-পারি	...	১,৭৬০
রোম	...	৪৫০
ষ্টুটগার্ট	...	৩৭৯'৭
টয়লয়সে	...	৩৮৯'৬
ভিয়েনা	...	৫৭৭
		ও ৫১৭'২

বি, বি, সি বলিতেছে, এগুলিকে অবিলম্বে সহস্রচক্রে রূপান্তরিত করা দরকার।

সহস্রচক্র প্রথার একটা মস্ত বড় সুবিধা এই, ষ্টেশনগুলি অন্ততঃ ১০ কিলোসাইকল অন্তর হওয়াতে ঠোকাঠুকি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দুইটা ষ্টেশনের কথা ধরা যাক ৩০০ ও ৩০২ মিটার। ইহাদের কম্পন যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার হইবে। তফাৎটা ৫ হাজার সাইকল। সাধারণতঃ মানুষের কানে সেকেণ্ডে ৫০০০ কম্পন পৌছায়। কিন্তু সেকেণ্ডে ১০,০০০ কম্পন বা ১০ কিলোসাইকল কোন মানুষই শুনিতে পায় না। ঠোকাঠুকিও হয় না।

মহাযুদ্ধে কাঠের খাঁই

বিগত মহাযুদ্ধে গৃহস্থালীর কাজে ও সেনা-বিভাগের জন্য দেদার কাঠের দরকার হয়। কিন্তু কাঠ বহিয়া লইবে কে? খাদ্য-সামগ্রী যোগাইবার জন্য তখন জাহাজগুলির "হাত আট্‌কা।" কাজেই একধার হইতে কাঠ কাটিয়া বন সাবাড় করিয়া ফেলিবার উদ্যোগ হইল। অন্য দিকে ফরাসী বন হইতে সেনা বিভাগকে কাঠ যোগাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। এইরূপ জাহাজগুলি আবার খাদ্য দ্রব্য বহন করিবার জন্য ছাড় পাইল।

এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজের মাথার টনক নড়িল। মনে হইল, "তাইত, বন বিভাগ রক্ষা করিবার জন্য একটা বিশেষ নীতি অবলম্বন করা চাই।" ইহার ফল হইল—

(১) ১৯১৯ সনের "ফরেষ্ট্রী অ্যাক্ট" বা বন-সংক্রান্ত আইন।

(২) ফরেষ্ট্রী কমিশন স্থাপন।

(৩) অসংখ্য জমি লওয়া ও উন্নত ধরণের বৃক্ষরোপণ-প্রণালী অবলম্বন।

৩½ লক্ষ একর বন-ভূমি

"ক্রাউন উড্‌স" বা রাজকীয় বনসমূহকে ১৯২৪ সনে ফরেষ্ট্রী কমিশনের শাসনাধীন করা হইয়াছে। ইহার আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার একর। তন্মধ্যে ৬০ হাজার একরে কাঠ হয় অথবা উহা বন-বিভাগের সামিল।

এ ছাড়া কমিশন আরও ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমি যোগাড় করিয়াছে। তার ৬০% অথবা ২ লক্ষ ৭ হাজার একর চাষ যোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে।

গ্রেটবৃটেনের বন-রক্ষা

মূল প্রস্তাব হইতেছে গ্রেট বৃটেনে ১৭½ লক্ষ একরের সরকারী বন-বিভাগ তৈয়ারী করিতে হইবে। কমিশন ইতিমধ্যে ৭১,০০০ রোপণ করিয়া সারিয়াছে। উদ্দেশ্য, ১৯২৯ সনের শেষ অবধি মোট ১½ লক্ষ একর রোপণ করা।

কমিশন যে শুধু নিজেই বন-রক্ষার চেষ্টা করিতেছে, তা নয়। স্থানীয় কর্ত্তাদিগকে ও ব্যক্তি-বিশেষকে সাহায্য-দান করিতেছে। তার ফলে ½ লক্ষ একর স্থানে গাছ

রোপিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, ১৯২৯ সনের শেষ অবধি ১ লক্ষ একর সমাপ্ত হইবে।

ইংরেজের জন্মভূমির চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইতেছে

এই জাতীয় বন-রক্ষার প্রচেষ্টার এক ফল হইয়াছে, দেশের চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। আগে যে সব স্থান কোন প্রকার চাষের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই, এখন সেখানে চারা-গাছের সারি গজাইয়া গিয়াছে দেখা যাইবে।

থেটফোর্ড জিলাকে এ বিষয়ের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধরিতে পারি। এখানে অনেক বৎসর ধরিয়া একরের পর একর জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। কিছু জন্মিত না। সম্প্রতি স্কটস্ ও কর্সিকান্ পাইন গাছে এই ভূ-বিভাগ আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। বীজের ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ বছরের চারা অবধি সকল প্রকার গাছই দেখা যাইবে। চাষের উন্নতিটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটিতেছে।

এই বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে ৯,০০০ একর রোপিত হইবে, আর তার পর ৪,৮০০ একর শেষ হইবার কথা। একুনে ৩০ হাজার একরের উপর। চাষের সমগ্র আয়তনটা অনেকগুলি প্লটে বিভক্ত। এক একটা প্লট আয়তনে ৩০ থেকে ৪০ একর পর্য্যন্ত।

এই চাষের ব্যাপারে ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা সম্ভবপর হইয়াছে। লোক-পিছু প্রতিদিন ১০০০ গাছ রোপণ আর কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

বেকার-সমস্যার উত্তর

বন-রক্ষার প্রচেষ্টায় বেকার-সমস্যারও সমাধান হইতেছে। গ্রীষ্মকালে ২,০০০ লোকের ও শীতকালে ৩০০০ লোকের কাজ জুটিতেছে।

বন-বিভাগের কর্ম্মচারী তৈয়ারী করিবারও ধুম পড়িয়া গিয়াছে।



সুরমা উপত্যকা সমবায় সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশন

বিগত ১৯শে মার্চ্চ শনিবার হবিগঞ্জ সহরে সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশন হয়। মহকুমা মাজিষ্ট্রেট মিঃ আই, মজিদ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাস ই, এ, সি, শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চৌধুরী ই, এ, সি, মুনসেফ মিঃ এস, কে, সেন, মিস ইভান্স ও মিস এণ্ড্রোজ, কোঅপারেটিভ সভাসমূহের এসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র নন্দী, কৃষি-বিভাগের সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায়, উকীল শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, মোক্তার মৌলবী মফিজুর রহমান, কৃষি ও সমবায় বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরগণ ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ ও সুরমা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানের সমবায় সমিতির প্রতিনিধি ও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস, এম, এ বাহাদুর সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিজ্ঞতা ও বহু তথ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন।

এই সম্মিলনীতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটা নিম্নরূপ :—

১। মৌলবীবাজার অধিবেশনের ৯ নং সঙ্কল্প পুন-র্গ্রহণ করিয়া স্থির করা হইল যে, শ্রীহট্ট মিরাশদার ব্যাঙ্কের (ল্যাণ্ড-মর্টগেজ ব্যাঙ্ক) জন্য দীর্ঘ মিয়াদ ও অল্পসুদে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য অথবা ঐ ব্যাঙ্ককে ডিবেঞ্চার বাহির করিবার অধিকার দিয়া ডিবেঞ্চারের সুদের জামিন থাকিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

সভাপতি মহোদয় এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। এই সম্মিলনী মনে করেন যে, সমবায় আইনের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন নির্দ্দেশকল্পে সমবায় সমিতির কার্য্যে পারদর্শী কয়েকজন কর্ম্মী লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

৩। বর্ত্তমান সমবায় সমিতির অধিকাংশ সভ্যই সমবায়ের মূলনীতি ও কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে অক্ষম; তাহা-দিগের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার ও শিক্ষাদানকার্য্য না করিলে অদূরভবিষ্যতে এই অঞ্চলে সমবায় আন্দোলনের বিপদাশঙ্কা। এই অবস্থায় এই সম্মিলন—

(ক) সংগঠন সমিতিকে অনুরোধ করেন যে, তাহারা যেন প্রত্যেক মহকুমার জন্য একজন প্রচারক নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করেন।

(খ) গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন যে, তাহারা যেন সংগঠন সমিতির, সরকারী সাহায্য আগামী এপ্রিল হইতে অন্ততঃ ৪,০০০৲ করিয়া দেন।

৪। সমবায় সমিতির স্থির লাভ হইতে শতকরা ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার অধিকার দেওয়া হউক এবং তদনুসারে সমবায় আইনের ৩৪নং ধারা পরিবর্ত্তন করা হউক।

৫। এই সম্মিলন মনে করেন যে, প্রাথমিক সমিতির রিজার্ভ ভাণ্ডারের কোন এক অংশ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে

দীর্ঘতম আমানতে রাখিয়া তদুপরি উর্দ্ধহারে নিয়মিত সুদ পাইবার অনুমতি দেওয়া উচিত।

৬। এই সম্মিলন সমবায় বিভাগ ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহকে অনুরোধ করেন যে, সমবায় বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কাহাকেও ভবিষ্যতে কোন সমবায়-সমিতিতে বেতনভোগী কর্ম্মচারী স্থায়ীভাবে নিযুক্ত না করেন এবং সংগঠন সমিতিকে অনুরোধ করেন, তাহারা যেন সমবায় বিভাগের সহযোগে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সুপারভাইজার এবং সেন্ট্রাল ও টাউন ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষক, কেরাণী ও সেক্রেটারী প্রভৃতিকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ ভাবে বন্দোবস্ত করেন।

৭। এই সম্মিলন মনে করেন যে, প্রতি ছয়মাস অন্তর প্রত্যেক সভ্যের সমিতির নিকট দেনার একটি লিষ্ট প্রত্যেক সমিতির আপিসে টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত এবং তাহার একখণ্ড প্রতিলিপি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৮। এই সম্মিলন মনে করেন যে, সংগঠন সমিতি প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে স্বাস্থ্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলে দেশের জলকষ্ট ও স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্য সমিতির সফলতার জন্য অল্প সুদে ঋণ আবশ্যক। অতএব এই সাম্মলন গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন যে—

(ক) স্বাস্থ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমবায় বিভাগ যেন সংগঠন সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করেন।

(খ) এবং স্বাস্থ্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার মূলধনের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা সুদে গবর্ণমেন্ট ৫০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সংগঠন সমিতিকে ধার দেন।

৯। যে সকল কেন্দ্রে অন্যূন কুড়িটি সমিতি আছে তেমন স্থানে সমিতিসমূহ সুপারভাইজিং ইউনিয়ন স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে সুরমা উপত্যকা সমবায় সংগঠন সমিতি ও কেন্দ্র ব্যাঙ্কসমূহকে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হউক।

১০। সুদের হার কমাইবার জন্য প্রাদেশিক ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করা হউক।

১১। লোকাল বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি তাহাদের সাধারণ তহবিল ও প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা যাহাতে কেন্দ্র ব্যাঙ্কগুলিতে জমা রাখিতে পারেন সেরূপ বিধান করার জন্য সরকার বাহাদুরকে ও লোকাল ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে অনুরোধ জানান হউক।

১২। কেন্দ্র ব্যাঙ্কের অন্তর্গত গ্রাম্য সমিতিগুলির অডিট রিপোর্টের প্রতিলিপি স্ব স্ব কেন্দ্র-ব্যাঙ্কে প্রেরণ করিবার জন্য রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অনুরোধ করা হউক।

১৩। গ্রাম্য সমিতিসমূহ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্য বাবদ যতটাকা দিবেন ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্য বাবদ যতটাকা দিবেন, তাহার বিশগুণ পর্য্যন্ত টাকা যাহাতে ঋণ পাইতে পারেন তদ্রূপ ব্যবস্থা করা হউক।

১৪। সমিতি-রেজিষ্ট্রারদের হুকুম হওয়া মাত্র ঐ সমিতির কাগজপত্রের ভার যাহাতে লিকুইডেটার গ্রহণ করিতে পারেন তদ্রূপ আইনের ব্যবস্থা করার জন্য রেজিষ্ট্রার বাহাদুরকে অনুরোধ করা হউক।

১৫। (ক) প্রতি সমবায় সমিতি দুইজন প্রতিনিধির নামে হিসাব খুলিবার

(খ) সপ্তাহে দুইবার পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার এবং

(গ) সমবায় সমিতির পক্ষে পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে উর্দ্ধসংখ্যায় ২,০০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আমানত রাখিবার অধিকার দিবার জন্য রেজিষ্ট্রার সাহেবের সহযোগে ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হউক।

পুনা স্বদেশী মেলা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পুনা শহরে স্বদেশী বাজার ও শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। সভাপতি ছিলেন স্যর এম, বিশ্বেশ্বরায়া। ইনি মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান এবং বর্ত্তমানে ভারতের একজন বড় আর্থিক পণ্ডিত। অভিভাষণে স্যর বিশ্বেশ্বরায়া যে-সকল আর্থিক বিষয় আলোচনা করেন তাহার কিছু কিছু এখানে দেওয়া হইল।

বোম্বাই প্রদেশ

১৮৭১ সনে বোম্বাই প্রদেশের লোক-সংখ্যা ছিল ২৩০ লক্ষ। ১৯২১ সনে ঐ সংখ্যা ২৬৮ লক্ষে পৌঁছিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যায়, ৫০ বৎসরে বোম্বাইয়ের লোক-সংখ্যা শতকরা ১৬·৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই লোক-সংখ্যার ১৭৩ লক্ষ বা শতকরা ৬৫ ভাগ কৃষিজীবী। গড়ে ভারতের ৭০জন কৃষি দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সাধারণতঃ গড়ে একজন ভারতবাসী মাসিক ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা রোজকার করে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর আয় কিরূপ? একজন জাপানী গড়ে যাহা রোজগার করে একজন ভারতবাসীর রোজগার তাহার ⅙ অংশ মাত্র। একজন ইংরেজের রোজগারের চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ একজন ভারতবাসীর রোজগার। আর একজন মার্কিণ যাহা রোজগার করে একজন ভারতবাসী তাহার মাত্র ত্রিশ ভাগের এক ভাগ রোজগার করে।

দেশের লোক বর্ত্তমান যে নিকৃষ্ট জীবনধারায় সন্তুষ্ট আছে তাহা হইতে উন্নত জীবনের দাবী করুক। ভাল খাবার, ভাল বাসস্থান, উন্নত ও উচ্চ জীবনের আবহাওয়া তাহাদের কাম্য হউক। এই সুখ সুবিধা ভোগ করিতে হইলে তাহাদিগকে আরও অধিকতর পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা চাই, তবেই দেশের লোক বর্ত্তমান জীবনধারায় আর সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিবে না। উচ্চ আশা তাহাদের মনে জাগিবে। কেবল প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। দেশের মধ্যে যন্ত্র ও কল-কারখানার ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে। মেশিনারি ও মেকানিক্যাল শক্তি দ্বারা দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে ভোকেশন্যাল বা অর্থকরী বিদ্যার প্রচলন চাই। কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিদেশী মডেলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-গুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আর্থিক উন্নতির মোসাবিদা

দেশের আর্থিক উন্নতির ৩টি মূল সূত্র। (১) বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা—প্রাথমিক ও অর্থকরী শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে। (২) দেশের উৎপন্ন মাল ও দেশের লোকের অকুপেশ্যানের বিবরণী সংগ্রহ করিতে হইবে ও তাহা যত্নের রক্ষা করিতে হইবে। (৩) শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

দেশের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা বহুদিন হইতে অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। এইজন্য প্রথম দফা অতি আবশ্যক। বোম্বাই প্রদেশের লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৮জন। দুনিয়ার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে ঐ সংখ্যা অবিলম্বে ৭৫এ উঠাইতে হইবে। উৎপাদন ও শ্রমের ষ্টাটিসটিক্স প্রস্তুত করিবার জন্য এবং বৎসরে একবার করিয়া বিবরণী প্রকাশের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণয়ন করা উচিত।

সরকারের কর্ত্তব্য

শিল্প-ব্যবসার উন্নতিকল্পে জাপান সরকার ও দুনিয়ার অন্যান্য স্বাধীন দেশ আপনা হইতেই যত্নবান হয়। ইংলণ্ডও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডন ও বার্মিংহাম শহরে যে বৃটিশ শিল্পমেলা বসিবে তাহার আয়োজন করিতেছেন ইংরেজ সরকারের সামুদ্রিক দপ্তর। ঐ মেলায় যোগদান করিবার জন্য ওভারসিজ ট্রেডের মিনিষ্টার বিভিন্ন দেশকে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন।

দেশের শিল্পোন্নতি ও টেকনিক্যাল ও কমার্শ্যাল শিক্ষা সরকারী সাহায্যে যাহাতে বাধ্যতামূলক করা হয় সেজন্য ব্যবস্থাপক সভাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহে এবং জার্ম্মাণি জাপান প্রভৃতি দেশে সরকার কর্ত্তৃক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় উৎপাদনকারীর সুবিধার্থ এ দেশের সরকারকে রেলওয়ের ভাড়ার উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতে হইবে।

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর শুল্কহার খুব বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার ফলে দেশের লোক ঐগুলি উৎপাদন

করিবার সুযোগ পাইবে। উপযুক্ত শিল্পগুলিকে সরকারী সাহায্য দিতে হইবে। গোটা দেশের একটা শিল্প জরিপ (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সারভে) হওয়া চাই। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র ষ্টোর পারচেজ পলিসি অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশে প্রয়োজনীয় মাল-ক্রয়-নীতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

শিল্প-সংরক্ষণ নীতি

উচ্চহারে সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপন করিলে বৃটিশ ও অন্যান্য বিদেশী উৎপাদনকারী কোম্পানী ভারতবাসীর সঙ্গে যোগ করিয়া এই দেশের উপযোগী কতকগুলি নূতন শিল্প দেশের মধ্যেই আরম্ভ করিতে পারে। অন্যান্য সকল দেশেই মোটরগাড়ীর আমদানি শুল্ক শতকরা ৩৩ হইতে ৫০ ভাগ আর ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। ভারতীয় আমদানি শুল্ক যদি শতকরা ৪০ বা ৫০এ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে দেশের মধ্যেই একটা মোটর গাড়ী শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

'স্বদেশী মালের জন্য স্বদেশী বাজার' সকল উপনিবেশ ও স্বরাজপ্রাপ্ত দেশেই এই নীতি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। উপনিবেশগুলিতে ও জাপানে সরকার আর্ম্মি ও নেভি-ষ্টোরের এবং রেলওয়ের আবশ্যক রসদ স্থানীয় শিল্প কারখানা হইতে সংগ্রহ করেন। আমাদের দেশের ঐ দুই বিরাট বিভাগে যদি স্বদেশী শিল্পকে মাল যোগাইবার একচেটে অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের মধ্যে অনেক নূতন শিল্প মাথা তুলিতে পারে।

পাঁচ কি দশ বৎসরের মধ্যে গোটা দেশ ছোটবড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছাইয়া যাইতে পারে। জাপান এইনীতি অবলম্বন করিয়াই মাত্র ২৫ বৎসরে আজ এত বড়টি হইয়াছে। রেলওয়ে এবং আর্ম্মি নেভির রসদ যোগাইবার অধিকার তাহার ছিল বলিয়াই সে এত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প ব্যবসায় প্রভূত উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছে।

উৎপাদনকারিগণের সম্মিলন

পরের কথা আসিতেছে "দেশের লোক কি দেশের অর্থ-বল ও কর্ম্মক্ষমতা একত্র করিয়া দেশের পতিত শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে?" ইহা করিতে হইলে উৎপাদনকারিগণের জোট চাই। বিদেশে আজকাল ট্রাষ্ট, কম্বাইন, কর্পোরেশন প্রভৃতি বুলিগুলি শিল্পজগতে খুব চলতি হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমাদিগকে ঐ পথ অনুসরণ করিতে হইবে। কয়েকজন অগ্রসর হইয়া একটা শিল্প-জোট কায়েম করিতে পারেন। ইহার একটা ম্যানেজিং কমিটী থাকিবে। তাহার একজন সেক্রেটারী, একজন একাউণ্টেণ্ট ও একটা আফিস থাকিবে।

শিল্প-বোর্ড

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ও চল্‌তি খরচ নির্ব্বাহের জন্য একটা তহবিল কায়েম করা চলিতে পারে। ইহাতে ১০০৲ টাকা পরিমাণ এক একটা অংশ থাকিবে। কোম্পানী বা ব্যক্তিবিশেষ যাঁহারা ঐ শিল্পে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে ইহার অংশ ক্রয় করিতে হইবে। উৎপাদন-কারিগণের সমিতি (ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন) ৮ জন লোক মনোনয়ন করিবেন এবং ঐ তহবিলের অন্যান্য পুঁজিদাতা (ইহারা উৎপাদনকারী নয়) আর আট জন মনোনয়ন করিবেন এবং এই ১৬ জন লইয়া একটা অ্যাড্‌ভাইসার কাউন্সিল চলিতে পারে। ইহারা যে ৪ জন লোককে নির্ব্বাচন করিবেন, তাঁহারাই বোর্ড অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীস নামে অভিহিত হইবেন। পুঁজির তহবিল, কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রভৃতি এই বোর্ডের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। এই চারিজন এমন লোক হওয়া চাই যাঁহারা শিল্প ব্যবসা বা ব্যাঙ্কিংএ লিপ্ত আছেন এবং যাঁহাদের বাজারে একটা সুনাম আছে ও যাঁহাদের উপর সাধারণের একটা আস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে ইঁহারা ইঁহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিবেন।

বোর্ডের কাজ কি হইবে?

এই ধরণের বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার কার্য্যাবলী এইভাবে হওয়া উচিত :—

(১) প্রয়োজন হইলে বোর্ড গভর্ণমেণ্টের নিকট

শিল্প-ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধা জ্ঞাপন করিবে ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি চাহিবে। অবশ্য বোর্ড রাজনৈতিক বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবে না।

(২) যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান সৎভাবে পরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেগুলি যাহাতে ব্যাঙ্কিং বা পুঁজির অভাবে কিম্বা অসৎ প্রতিযোগিতার ফলে কারবার গুটাইয়া না ফেলে বা কারবার স্থগিত না রাখে, সেদিকে এই বোর্ড সর্ব্বদা নজর রাখিবে। দেশের মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমূহ গড়িয়া না উঠা পর্য্যন্ত এই বোর্ড ফিনান্স্যাল কর্পোরেশ্যনের কাজ করিবে। প্রয়োজন হইলে কোন কোন শিল্পের জন্য বাজার ঠিক করিবে। টেক্‌নিক্যাল ও ফিনান্স্যাল যুক্তিপরামর্শ দিবে। চল্‌তি প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় গলদ থাকিলে তাহা দূর করণার্থ সেগুলিকে সাহায্য করিবে। শিল্প ও উৎপাদনের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স সংগ্রহ ও রক্ষা করিবে। বোর্ড দেশের মধ্যে একটা শিল্পজরিপ আরম্ভ করিবে ও নয়া নয়া মোসাবিদা তদারক করিবে। কোম্পানী ও যৌথকারবার গড়ন ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার কাজে এই বোর্ড সাহায্য করিবে।

টেক্‌নিক্যাল সংসদের সাহায্যে বোর্ড দুনিয়ার শিল্প-ব্যবসা আন্দোলন লক্ষ্য করিবে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ যে শিল্পের ঐ আন্দোলনে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া দিবে।

বেকার-সমস্যা

দেশের মধ্যে এমন কাজ নাই যাহা দ্বারা দেশের সকল লোক নিযুক্ত থাকিতে পারে। দেশের মধ্যে বিদেশ হইতে আগত আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের আমদানির স্রোত বন্ধ করিতে হইবে। দেশের লোক যাহাতে নিজেরা গতর খাটাইয়া ঐগুলি প্রস্তুত করিতে বাধ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যে দেশের লোক এত গরিব তাহাদিগকে এভাবে আলস্যপরায়ণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। এই গরিব দেশের লোক কি করিয়া একটা সমৃদ্ধিশালী ধনী দেশের লোকের শ্রম ও কার্য্যক্ষমতায় উৎপন্ন কাপড় পড়িবার ও তাহাদের প্রস্তুত ঘরবাড়ীতে বসবাস করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে?

আমাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের রসদ আছে। মনুষ্যশক্তি আছে অপর্য্যাপ্ত। চাই কেবল কর্ম্মক্ষমতা। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা চাই। ব্যবসা-বুদ্ধি ও নিয়মতন্ত্রতার অভাব খুব বেশী।

শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন চাই

যে পর্য্যন্ত আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার পরিবর্ত্তন না হয় সে পর্য্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্ত্তব্য সাহিত্য কলা প্রভৃতি বিদ্যাক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনলজি ও কমার্স প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যার দিকে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করা। এই-সকল বিদ্যার ভিত্তির কিম্বৎবৃদ্ধি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু কর্ত্তব্য।

মহীশূরে সমবায় আন্দোলন

মহীশূর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন বিশ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে ঐ রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের ১,৭৫০টি সমবায় সমিতি কাজ করিতেছে। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ১০২০০০। মহীশূরের ৬৫০০ গ্রামে সমবায় সমিতি সুচারুভাবে কাজ চালাইতেছে। মহীশূরের লোক-সংখ্যা ৬০ লক্ষ। ইহার মধ্যে এক লক্ষ লোকই সমবায় আন্দোলনে নাম লিখাইয়াছে। দেশটা অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাদের পুঁজি (ওয়াকিং ক্যাপিটাল) ১০৮ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে প্রতি সভ্যের অংশে ১০০ টাকা পড়ে।

পাঞ্জাব জৈন মহাসভা

গতমাসে আম্বলা শহরে পাঞ্জাব জৈন মহাসভার সপ্তম অধিবেশন হইয়া গেল। সভাপতি ছিলেন অমৃতসহরের লালা মোহন লালজি। অন্যান্য বিষয় আলোচনার সময়ে সভাপতি বিভিন্ন জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ দিবার জন্য খুব মৈত্রী জোর দেন। বিবাহ সম্পর্কে বর্ত্তমান অত্যধিক

অপব্যয় ও সামাজিক খানা পিনায় অযথা টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া দেশের আর্থিক অবনতি সাধন করার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র মত প্রকাশ করেন।

কাশীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়

জুলাই মাসের প্রথম ৯।১০ দিনের মধ্যেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে। ছাত্রদিগকে হয় হষ্টেলে থাকিতে হয়, নয়ত প্রো ভাইস্-চ্যান্সলারের মনোনীত কোন না কোন আবাসস্থানে থাকিতে হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ও বৃত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত নিম্নরূপ :—

(১) সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ।

শিক্ষাদানের মাসিক বেতন—

১ম বার্ষিক শ্রেণী—৬৲

৩য় বার্ষিক শ্রেণী—৮৲

৫ম বার্ষিক শ্রেণী—১০৲

বৎসরের মধ্যে মাত্র ১০ মাসের বেতন লওয়া হয়। কৃষি ব্যতীত পড়ুয়ারা নিয়মের মধ্যে উল্লিখিত যে-কোন বিষয় বাছিয়া লইতে পারে। বি, এস-সি পরীক্ষার একটা অপ্‌শনাল বা স্বেচ্ছাধীন বিষয় হইতেছে ব্যবসায় রসায়ন। তজ্জন্য নিয়মিত অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে যে সব বিষয় অধ্যয়ন হয় তার নাম—

(১) সংস্কৃত; (২) ইংরেজী; (৩) দর্শন; (৪) রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি; (৫) রাষ্ট্র-বিজ্ঞান; (৬) ইতিহাস; (৭) পালি; (৮) আরেবিক; (৯) ফার্সি; (১০) হিন্দী; (১১) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতা; (১২) গণিত; (১৩) পদার্থ বিদ্যা; (১৪) রসায়ন শাস্ত্র; (১৫) উদ্ভিদ্-তত্ত্ব; (১৬) জীব-বিজ্ঞান; (১৭) ভূ-তত্ত্ব।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গুণানুসারে অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ত আছেই। বিশেষ বৃত্তিও অনেকগুলি আছে।

সাধারণতঃ জৈন শ্বেতাম্বর মূর্ত্তিপূজক ছাত্রদের জন্য এইরূপ বৃত্তি আছে—

(ক) কুমার সিংহ বৃত্তি—মাসিক ১০৲

(খ) পার্ব্বতী বাঈ জৈন বৃত্তি— „ ২০৲

„ „ ১৫৲

(গ) রতনচাঁদ দলপাত্রম্ শাহ বৃত্তি মাসিক ৩০৲

কোন ক্ষেত্রী ছাত্র ব্যবসায় রসায়ন লইলে তাকে মাসিক ১৬৲ মূল্যের রায় চণ্ডীপ্রসাদ বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

ল কলেজ বাদে ১০% বিনা বেতনে পড়িতে পায়, আর ১০% অর্দ্ধবেতনে পড়িতে পায়। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫% জনকে তাদের শিক্ষার জন্য এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় না।

(২) প্রাচ্য জ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বের কলেজ।

এই কলেজের তিনটি বিভাগ আছে—

(ক) মধ্যম পাঠ

(খ) শাস্ত্রী পাঠ

(গ) শাস্ত্রাচার্য্য পাঠ

ছাত্রদের নিকট হইতে শিক্ষাদানের জন্য কোন বেতন লওয়া হয় না। অথবা এই কলেজের অন্তর্গত হষ্টেলগুলিতে থাকিতেও কোন খরচ দিতে হয় না।

তারকেশ্বরের মহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি কর্ত্তৃক প্রদত্ত টাকা হইতে ৩৩টা বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তদুপরি মাসিক ৮৲ মূল্যের ৩৭টা মধ্যম ছাত্রদিগকে, মাসিক ১০৲ মূল্যের ২০টা বৃত্তি শাস্ত্রীছাত্রদিগকে এবং মাসিক ২৫৲ মূল্যের ৬টা বৃত্তি শাস্ত্রাচার্য্য ছাত্রদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে দেওয়া হয়।

(৩) আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ।

রণবীর সংস্কৃত পাঠশালার যে সব ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদিগকে মাসিক ৪৲ মূল্যের ৬৮টা বৃত্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

প্রবেশিকা বা তুল্যমূল্য পরীক্ষায় পাশ করিলে এই কলেজের মধ্যম পাঠের ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ঢুকা যায়।

ছয়জন বৈদ্য ও ১জন ডাক্তার (এম, বি, এস) লইয়া বাঁধা ষ্টাফ্ গঠিত হইয়াছে। এ ছাড়া বিজ্ঞান-বিভাগের

৪ জন অধ্যাপক আসিয়া আয়ুর্ব্বেদের ছাত্রদিগকে রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও জীব-বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। একজন অতীব অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত কবিরাজের অধীনে একটা বৃহৎ রসায়নশালা চালিত হইতেছে। সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-তৈয়ারীর প্রণালী শিখান হইয়া থাকে। ৩০ একর স্থান জুড়িয়া এক মেডিকো-বোটানিক্যাল বা ভেষজ উদ্যান স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে নানারকম ভেষজ গাছ-গাছড়া রোপিত হইয়াছে।

আশা করা যায় আগামী কলেজী বৎসর হইতে আয়ুর্ব্বেদের ছাত্রদিগকে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে। হাঁসপাতালগুলিতে শয্যার সংখ্যা ২০০ হইয়াছে। এই কলেজে কোন বেতন লওয়া হয় না।

(৪) দি টীচার্স ট্রেনিং কলেজ বা মাষ্টার তৈয়ারীর কলেজ।

এখানে এল-টি ডিগ্রীর জন্য কলা ও বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট্‌-দিগকে তৈয়ারী করা হয়। শিখাইবার জন্য বেতন লওয়া হয় না।

(৫) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের বি, এস, সি ডিগ্রীর পাঠ ৫ বছরেই সমাপ্ত হইয়া যায়। পঞ্চম বৎসরটাতে সম্পূর্ণরূপে হেতে হাতুড়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

যে সব ছাত্র ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা গণিত, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র লইয়া পাশ করিয়াছে, তারা ডিগ্রী কোর্সে ঢুকিতে পারে। আর যারা ম্যাট্রিকুলেশন বা তুল্যমূল্য পরীক্ষা পাশ করিয়াছে, তারা ডিপ্লোমা কোর্সে পড়িতে পায়।

এই কলেজে কতগুলি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে—

(ক) উপযুক্ত আসামী ছাত্রদের জন্য

২টা ভোলানাথ বরুয়া বৃত্তি—প্রত্যেকের মাসিক মূল্য ২৫৲

(খ) উপযুক্ত জৈন ছাত্রদের জন্য

১টা রতন চাঁদ দলপাত্রম্‌ শাহ বৃত্তি মাসিক মূল্য ৩০৲

(গ) উপযুক্ত ক্ষেত্রী ছাত্রদের জন্য

১টা রায় বাহাদুর রতন চাঁদ বৃত্তি—মাসিক মূল্য ২৫৲

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর লণ্ডন ইনষ্টিটিউটের সিটি ও গিল্ড পরীক্ষা হয়। এই কলেজের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট্‌রা সেই পরীক্ষা দিতে পারে।

(৬) মাইনিং ও মেটালার্জি বা খনিবিদ্যা ও ধাতু-বিদ্যা।

যে সব ছাত্র পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন লইয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করিয়াছে অথবা যারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূতত্ত্ব ও রসায়ন লইয়া বি, এস-সি, পাশ করিয়াছে, তারাই ঢুকিতে পাইবে।

(৭) নারীদের কলেজ।

আগামী জুলাই মাস হইতে এই কলেজ খুলিবে। নারী ছাত্রীরা মাথনজী খাতন হষ্টেলে বিনা পয়সায় থাকিতে পারিবে। সেখানে ১০০ জন ছাত্রী থাকিতে পারে। মহাদেবী বিড়লা বৃত্তি নামে ১৫টা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বৃত্তির মূল্য মাসিক ১৪৲ টাকা।

(৮) ল কলেজ।

ল কলেজে দুইভাগ—(ক) প্রিভিয়াস্‌ বা প্রাথমিক ক্লাস (খ) ফাইনাল বা অন্ত্য ক্লাস। উভয়ের বেতন মাসে ১৪৲ টাকা। বছরে মাত্র ১০ মাসের বেতন লওয়া হইয়া থাকে।

হিন্দু বিবাহের বয়স

হিন্দুদিগের মধ্যে বালক-বালিকাগণের বিবাহ নিয়মিত করিবার জন্য ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থা পরিষদে নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিটী উপস্থিত করা হইয়াছিল :—

যেহেতু হিন্দুদিগের মধ্যে বালক-বালিকাগণের বিবাহ নিয়মিত করা ও যে বয়সের নিম্নে এরূপ বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে সেই বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া বিহিত ; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ বিধান করা হইল :— (১) এই আইনটী হিন্দু বালক-বালিকাগণের বিবাহ-বিষয়ক আইন বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে। (২) তপশীলের নির্দ্ধারিত জেলাগুলি সমেত সমগ্র বৃটিশ ভারতে

ইহা প্রচলিত হইবে। এই আইনে—(ক) "হিন্দু' বলিতে জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী ও বৌদ্ধদিগকেও বুঝাইবে। (খ) "অভিভাবক" বলিতে অভিভাবক ও ওয়ার্ডবিষয়ক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আইনের অর্থ নির্দ্দেশমতে কোন অভিভাবককে বুঝাইবে। কোন স্থানে বিরুদ্ধভাবের কোন বিধান থাকা সত্বেও, কোন হিন্দু বালিকার বিবাহের দিনে তাহার বয়স বার বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকিলে, ৪ ধারায় লিখিত বিধানমতে ছাড়া অন্য স্থলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে না।

কোন হিন্দু বালকের বিবাহের দিনে তাঁহার বয়স পনর বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকিলে, তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে না।

বার বৎসরের কমবয়স্কা কোন হিন্দু বালিকার অভিভাবক, সেই বালিকা সাধারণতঃ যে জেলায় বাস করে সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ঐ বালিকার বিবাহ সম্পাদনের জন্য যদি এমন কোন লাইসেন্স ঐ বিবাহের পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন, যাহাতে উক্ত বালিকার বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতা বা অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত বালিকার বিবাহ সিদ্ধ হইবে।

কিন্তু যে স্থলে বালিকার বয়স এগার বৎসরের কম সে স্থলে এরূপ কোন লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারিবে না।

কোন হিন্দু বালিকার অভিভাবক, সেই বালিকার বিবাহার্থ যদি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লাইসেন্স পাইবার জন্য লিখিত দরখাস্ত করেন ও তৎসঙ্গে এফিডেবিট্ করিয়া শপথ করেন যে বালিকার বয়স এগার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এবং ঐ অভিভাবক নিজের বিবেকমতে বিশ্বাস করেন যে, নাবালিকা যে ধর্ম্মাবলম্বী সেই ধর্ম্মের বিধান অনুসারে বালিকাকে আর অবিবাহিতা রাখা উচিত নয়, তাহা হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত অভিভাবককে ঐ বালিকার বিবাহের জন্য লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ

এই আইনের পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। বার বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাদিগের বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া এই সমস্ত বালিকার বৈধব্য নিবারণ করা, এই পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বালক-বালিকাগণের বিবাহের নিম্নতম বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া তাহাদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক দূর করিয়া যতদূর সম্ভব তাহাদের দৈহিক ও নৈতিক অবনতি নিবারণ করা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর এক বৎসরের কমবয়স্কা হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৬১২, ৫ বৎসরের কমবয়স্কা হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২,০২৪, ১০ বৎসরের কমবয়স্কা হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৯৭,৮৫৭ এবং ১৫ বৎসরের কমবয়স্কা হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৩,৩২,০২৪ ছিল। যাহা হউক, এই ব্যাপারে দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুদিগের প্রচলিত আচার ও রীতি অনুসারে এই সমস্ত বালবিধবাদের অধিকাংশেরই পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য বা অসভ্য দেশে তদ্রূপ শোচনীয় ব্যাপার বিদ্যমান নাই। সামাজিক রীতির দ্বারা উৎপীড়িত এই সকল অসহায় বালিকাদিগকে সাহায্য করা আইনের পক্ষে এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে ঐ সমস্ত সামাজিক রীতির উৎপত্তির বা সমর্থনের কারণ যাহাই থাকুক না কেন, উহারা যে এখনকার সময়োপযোগী নহে ও বর্ত্তমানে অশেষ দুঃখের ও ক্ষতির কারণ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

হিন্দুদিগের আইন সম্পর্কীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ ব্রাহ্মণের মতে পুরুষের বিবাহযোগ্য নিম্নতম বয়স ২৪ ও স্ত্রীলোকের ১৬। বয়স ধার্য্য করিতে বালিকার কল্যাণই যদি কেবলমাত্র বিবেচনার বিষয় হইত, তাহা হইলে আইনে কোন বালিকার বৈধ বিবাহের জন্য নিম্নতম বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া ধার্য্য করা উচিত হইত। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক লোক আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, যৌবনোদ্ভবের পর কোন বালিকার অবিবাহিত থাকা উচিত নহে, এবং যেহেতু এই দেশে কোন কোন বালিকা অল্প বয়সে, এমন কি ১২ বৎসর বয়সেই, যৌবন প্রাপ্ত হয়, অতএব এই পাণ্ডুলিপিতে হিন্দু বালিকার বৈধ বিবাহের নিম্নতম বয়স ১২ বৎসর বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিটী যাহাতে একান্ত পরিবর্ত্তন-বিরোধী হিন্দুদিগের মতেও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, সেজন্ত ইহাতে বিধান করা হইয়াছে যে, বিবেকানুমোদিত কারণে ১১ বৎসর বয়সেও হিন্দু বালিকার বিবাহের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন হিন্দুশাস্ত্রেই যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে বালিকাদের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই; এবং বর্ত্তমানে এরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে ও জনসাধারণের মত এরূপ উন্নত হইয়াছে যে, সমাজের অসহায়া বালিকাদের প্রতি যে ঘোরতর অবিচার হইতেছে তাহা দূর করিবার জন্য ও মনুষ্যজাতির একটি বৃহৎ অংশের জীবন-মরণ সম্পর্কীয় স্বার্থের জন্য অত্যাবশ্যক সমাজ-সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে, প্রথম উপায় স্বরূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ১১ বৎসরের কমবয়স্কা বালিকাগণের বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা কর্ত্তব্য।

বালকদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বালকদিগের বিবাহের বয়স ন্যূনকল্পে ১৮ বৎসর ধার্য্য করিবেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী এরূপ আইন খুব গুরুতর পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে করিবে বলিয়া যাহাতে খুব কম আপত্তি উঠিতে পারে। সেই মত এই পাণ্ডুলিপিতে ১৫ বৎসরের কম বয়সে কোন হিন্দু বালকের বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। এমন কি বিলাতেও, যেখানে বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ও অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া সাধারণ নিয়ম নহে, সেখানেও যে বয়সের কমে বালকবালিকাগণের বিবাহ হইতে পারিবে না এমন বয়স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইয়াছে।

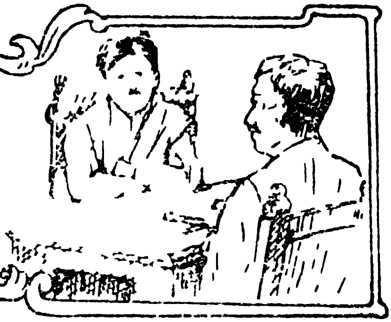
এম্, হরবিলাস সরদা,
এল, গ্রেহাম,
ভারত গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী।

গ্রাম্য শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা

আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, এদেশের শিল্পিগণ যাহাতে কলকব্জা ও কারখানাদি সম্বন্ধে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া বিদেশী প্রতিযোগিতায় সুফল লাভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ জনৈক শিল্পজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিয়া বিনামূল্যে সকলকে আবশ্যকীয় পরামর্শাদি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত এস সি, মিত্র মহাশয় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার কয়েক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ঐ সকল স্থানের গ্রাম্য-শিল্পিগণ কাঁসা, পিত্তল ও লৌহের দ্রব্যাদি যাহাতে আধুনিক শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রাদির সাহায্যে তৈয়ারী করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে উন্নত ধরণের যন্ত্রাদির ব্যবহার-প্রণালী শিখাইবার জন্য একজন লোক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। শুধু নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা কেন আমাদের মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল প্রভৃতি মহকুমার বহু পল্লীতে গ্রাম্য-শিল্পিগণ কাঁসা পিত্তল, লোহা, টীন, বেত, বাঁশ প্রভৃতির অতি সুন্দর সুন্দর নানাপ্রকার দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, অথচ তাঁহারা উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ব্যবহার-বিধি না জানায় প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এ অবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় যদি আমাদের মেদিনীপুর জেলা একবার ঘুরিয়া গ্রাম্য-শিল্পিগণকে উক্তরূপ সাহায্য ও পরামর্শ-দানের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই দৈন্য-দারিদ্র্য-গ্রস্ত দেশের প্রকৃত একটা উপকার করা হয়। আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(নীহার)

মোলাকাৎ



বাঙালীর বর্ষাতির ব্যবসা

[বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের কারখানা ২নং নজরালি লেন-কলিকাতা সার্কুলার রোডে অবস্থিত। তাঁহার সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।—শ্রীসুধাকান্ত দে]

প্রঃ—শুনিয়াছি আপনি আমেরিকা হইতে আসিয়া এখানে বর্ষাতির ব্যবসা আরম্ভ করেন। আপনি কি ওয়াটার প্রুফের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার জন্য আমেরিকা গিয়াছিলেন ?

উঃ—না। প্রথমেই আমি আমেরিকা যাই নাই। আর ওয়াটার প্রুফের কথাটাও গোড়া হইতে মাথায় ঢুকে নাই।

প্রঃ—প্রথমে কোথায় কি উপলক্ষ্যে আপনি গিয়াছিলেন ?

উঃ—প্রথমে গিয়াছিলাম জাপানে। বি, এ পরীক্ষার পর আমি একটা বৃত্তি পাই। সেই বৃত্তি লইয়া কোন টেক্‌নিক্যাল বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য জাপান যাই।

প্রঃ—কোন সনে ?

উঃ—১৯০৬। তখন জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্যে বন্যা বা জোয়ার চলিতেছে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানীরা উৎফুল্লচিত্তে নানা দিকে মাথা খেলাই-তেছে।

প্রঃ—আপনি কি শিখিয়াছিলেন ?

উঃ—আমি প্রথমেই ডাইং ও ক্যালিকো প্রিন্টিং আরম্ভ করি। আমার মনে হইয়াছিল, আমাদের দেশে এটার বেশ "ভবিষ্যৎ" আছে। তাই এটাতে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু জাপানে অবস্থানকালে বৃথা সময় নষ্ট করি নাই। আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য ২।১টা ব্যবসাও শিখিয়াছি। যেমন "কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্ক" বা জমান দুধের রহস্যটাও পাকড়াও করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রঃ—জাপানে থাকা কালে আপনার ছাত্রাবস্থার কথা কিছু জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—ছাত্রাবস্থা মানে কারখানার কুলির অবস্থা আর কি। সবটাই কারখানার ভিতর হাতে কলমে শিখিতে হইত। বাড়ী ফিরিবার সময় কালি-টালি মাখিয়া চেহারা অদ্ভুত হইয়া যাইত। সকাল ৭টার আগে বাহির হইয়া ট্রাম ধরিতাম। কারণ ট্রামের নিয়ম ছিল এই যে, ৭টার আগে ট্রামে উঠিলে যাওয়া আসা দুইটাই ৫ সেন-এ (পয়সায়) চলিত। কিন্তু ৭টার পরে রওনা হইলে আসিতে যাইতে আলাদা আলাদা ভাড়া দুই বাবে ১০ সেন (৵১০) দিতে হইত। আমরা ৭টার আগেই রওনা হইয়া যাইতাম। সঙ্গে খরচ লইয়া যাইতাম। দুপুরে ছুটি হইলে খাবার খাইয়া লইতাম। তারপর আবার কাজ। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতাম।

প্রঃ—কত ঘণ্টা করিয়া খাটিতেন ?

উঃ—৮ ঘণ্টা রোজ।

প্রঃ—আপনার কারখানার মালিক আপনার যত্ন লইতেন কি ?

উঃ—হাঁ, বুড়া লোক খুব ভাল ও সদাশয় ছিলেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস বিচিত্র। ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া

তিনি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। কিন্তু সমস্ত টাকাকড়ি তিনি ধর্ম্মের জন্য দান করিয়া ফতুর হইয়া যান। তারপর নিজের জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য এই ডাইং ও ক্যালিকো প্রিণ্টিং ওয়ার্কস খুলেন। তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন এবং যত্ন করিয়া অনেক জিনিষ শিখাইয়াছেন।

প্রঃ—আপনি বলিতেছিলেন জাপানে থাকিতে দুধ জমানোর উপায় শিখিয়াছিলেন। জাপানে কি এই ব্যবসা বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন? কই, আমরা ত জাপানী কন্‌ডেন্‌সড্ মিল্ক দেখিতে পাই না।

উঃ—জাপানে এ ব্যবসা বেশ চলে। তবে খুব বেশী উৎপাদন হয় না। দেশের মধ্যে যতটা দরকার সেই পরিমাণ তৈয়ারী হয়।

প্রঃ—আপনি জাপানে কতদিন ছিলেন?

উঃ—দেড় বৎসর।

প্রঃ—তারপর কোথায় গেলেন?

উঃ—জাপানে থাকিতে অনুভব করিলাম যে, রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি কলিকাতা হইতে যে জ্ঞান লইয়া আসিয়াছি, তা অত্যন্ত সামান্য। আজকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতখানি বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়, তখন তার সিকিও হইত না। কাঠ পেন্সিল ছিল আমাদের টেষ্ট্ টিউব্। জাপানে থাকিতে আমার মনে হইল উচ্চ রসায়ন বিদ্যাটাকে জানা দরকার। আমেরিকা তার একটা বেশ ভাল ক্ষেত্র। তখনি স্থির করিলাম আমেরিকা যাইতে হইবে।

প্রঃ—আমেরিকায় আপনি কোথায় গেলেন?

উঃ—রসায়ন পড়িবার জন্য আমি প্রথমতঃ কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া ভর্ত্তি হই। কালিফোর্ণিয়ায় ১টার্ম কাটাইয়া আমি ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এটা কালিফোর্ণিয়ারই প্রতিবেশী।

প্রঃ—কালিফোর্ণিয়া ছাড়িয়া ষ্ট্যানফোর্ড কেন গেলেন?

উঃ—তখন নব প্রতিষ্ঠিত ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিষয়ে খুব নাম-ডাক। এই বিশ্ববিদ্যালয় ষ্ট্যানফোর্ড নামক এক ধনী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত। ইনি নিজ জীবনে রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টরিতে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে তার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। লোকে এঁকে রেলওয়ের রাজা বলিয়া ডাকিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি ৩ কোটি ডলার—প্রায় সওয়া নয় ক্রোর টাকা-দান করিয়া যান। ফ্ঁাস নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব দেন ও বলিয়া দেন টাকার জন্য ভাবনা নাই। যেখানে যত সেরা পণ্ডিত আছে এইখানে জড় কর। ফ্র্যাঙ্কলিন, রস, টমাস প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক। যুক্ত-রাষ্ট্রের বর্ত্তমান বাণিজ্য-সচিব হুভারের নাম আজ দেশ বিদেশে পরিচিত। তিনি এখানকার ছাত্র। তিনি প্রথমে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

প্রঃ—আপনি ষ্ট্যানফোর্ডে আসিয়া আবার কি গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন?

উঃ—না। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের মর্জ্জিমাফিক পাঠ্য-তালিকা ঠিক করে। কিন্তু তাতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনাকে মর্য্যাদা দিতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধে না। ওখানে ইউনিট্ প্রথা বর্ত্তমান। অর্থাৎ ৮ বা ১২টা অন্ততঃ বক্তৃতা শুনিলে ১ ইউনিট পাওয়া যায়। এইরূপে অন্ততঃ ১২০ ইউনিট রাখা চাই। আমি কালিফোর্ণিয়ায় ২ টার্ম শেষ করিয়া বাকী ২ টার্ম ষ্ট্যানফোর্ডে পড়িতে লাগিলাম। আমি অবশ্য ৮ বা ১২ ইউনিটের চেয়ে অনেক বেশী রাখিতাম, কারণ যত শিখিতে পারি ততই লাভ।

প্রঃ—আপনি ষ্ট্যানফোর্ডে কতদিন কাটাইলেন ও কি কি শিখিলেন জানিতে চাই।

উঃ—আমি আমেরিকায় আসি ১৯০৭ সনে। আর ষ্ট্যানফোর্ড হইতে গ্রাজুয়েশন পাই ১৯১০ সনে। আমি অবশ্য রসায়ন অধ্যয়ন করি। চিনির ব্যবসার রাসয়নিক তত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকি। ডাক্তার ষ্টিলম্যান তখন ঐ বিষয় পড়াইতেন। ঋষি-

তুল্য লোক। ভারতের সেকালের ঋষিগণের কথা যেমন পড়ি, এই লোকটিকে চাক্ষুষ সেরূপ দেখিয়াছি। সুমিষ্ট ব্যবহার এবং ছাত্রের জন্য ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার তুলনা নাই। মনে রাখিবেন ডাক্তার ষ্টিলম্যানের তুল্য লোক আমেরিকার অধ্যাপক মহলে অনেক আছেন।

প্রঃ—গ্রাজুয়েশনের পরে আপনি আরও পড়াশুনা করিলেন কি ?

উঃ—ষ্ট্যানফোর্ড হইতে পাশ করিয়া আমি মেক্সিকোতে একটা চিনি সম্পর্কে কাজ পাই। আমি সেই কাজ লইব ঠিক করিয়া ভাবিলাম যাইবার আগে একবার কালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইয়া যাই। সেখানে অধ্যাপকদের ও পুরানা সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে দেখা হইবে। সে একটা আনন্দের ব্যাপার। এই আনন্দের স্বাদটা আমাদের দেশে পাওয়া এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। যা হোক্, কালিফোর্ণিয়াতে দেখা করিতে গিয়া তখনকার পাঠ্য-তালিকাতে দেখি অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় রহিয়াছে। অমনি আমার সেগুলি পড়িবার জন্য লোভ হইল। আমার পূর্ব্বতন এক অধ্যাপক 'ও' নীল (জাতিতে আইরিশ) বলিলেন, "বোস্ ! তুমি আমাদের মায়া কাটাইয়া গেলে। আমাদের এখানে আসিয়া পড় না এখন।" আমি বলিলাম, "আমার ত লোভ হইতেছে। কিন্তু জীবিকা-নির্ব্বাহের কি উপায় হইবে ? আপনি যদি তার ব্যবস্থা করিয়া দেন আমি মেক্সিকোর চাকরী ছাড়িয়া দিয়া পড়িতে রাজী আছি।" ও' নীল তখনই আমার জন্য একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়েই আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের রসায়ন পড়াইতে লাগিলাম।

প্রঃ—ইতিপূর্ব্বে ৩ বছর আপনার কেমন করিয়া চলিত ? তখনও বৃত্তি পাইতেন কি ?

উঃ—না। আমেরিকায় আসিয়া আমি আর বৃত্তি পাই নাই। কিন্তু আমেরিকায় যারা পড়িতে আসে, আপনি জানেন তারা সাধারণতঃ বৃত্তি বা বাড়ীর টাকার উপর নির্ভর করে না। আমিও গতর খাটাইয়া নিজের পড়ার খরচ চালাইতাম। এ অবশ্য সেকালের কথা বলিতেছি। একালের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

প্রঃ—আপনাকে ত তবে খুব খাটিতে হইত।

উঃ—সময় কোথা দিয়া যাইত টের পাইতাম না। সকাল হইতে রাত অবধি অবিশ্রান্ত খাটিয়া যাইতাম আমেরিকার থিওরেটিক্যাল ক্লাসগুলি সকালে (৭-১৫ মি) প্রায় আরম্ভ হয়। আর প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসগুলি বিকালে (২টা হইতে) বসে। সকাল বেলা কলেজে যাইবার আগে ঘর গরম করিবার জন্য আগুন জ্বালিয়া দেওয়া, চুলা ধরান, টেবিলে খানা পরিবেষণ করা ইত্যাদি সারিয়া কলেজে ঢুকিতাম। তবে একটা সুবিধা ছিল। সেখানে প্রত্যেক জায়গায় প্রতি কাজ ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হয়। সুতরাং কাজ করিবার—খাটিবার সময় পাওয়া যায় অসীম।

প্রঃ—কালিফোর্ণিয়ায় পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আপনি চিনি সম্বন্ধেই কি পোষ্ট গ্রাজুয়েট পাঠ চালাইতে লাগিলেন ?

উঃ—না। আমি দেখিলাম আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থাতে চিনির ব্যবসা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতবর্ষকে জাভাতে পরিণত করিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে, অথবা গবর্ণমেণ্টকে জাভার গবর্ণমেণ্টের মত টাকা ঢালিতে হইবে। সুতরাং আমি এখানে আসিয়া কৃষি-সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণের কাজে নিযুক্ত হইলাম। সালফিউরিক অ্যাসিড্, সার ইত্যাদি লইয়াও পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য তালিকা যোগাড় করিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিবার অবসর আমার জুটিয়াছিল। আমার থীসিসের (গবেষণার) বিষয় ছিল পটাশ-সমস্যা।

প্রঃ—আপনি পোষ্ট গ্রাজুয়েশন কবে শেষ করিলেন ?

উঃ—১৯১১ সনে। ওখানে গ্রাজুয়েশনের পর এম, এ'র জন্য ১ বছরই যথেষ্ট।

প্রঃ—দেশে ফিরিলেন কবে ?

উঃ—১৯১৪ সনে।

প্রঃ— ইতিমধ্যে আমেরিকায় কি করিলেন ?

উঃ—কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে কাজ করি। ইলিনয় প্রদেশের এক কোম্পানীতে কাজ পাই (১৯১২)। কিন্তু এতে আর কোন গবেষণার অবকাশ পাইলাম না। ভারতেরবর্ত্তমান অবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তাও বেশী নয় মনে হইল, তাই শিকাগোতে পেইন্ট ওয়ার্কস ও বিশ্লেষণযুক্ত কৃষি-বিদ্যা পড়িতে আরম্ভ করি (১৯১৩)। তার পর ইয়োরোপ হইয়া ১৯১৪সনে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

প্রঃ—ভারতবর্ষে আসিয়াই আপনি কি এই বর্ষাতির কারখানা খুলিলেন ?

উঃ—না। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমেই বাঙ্গালা দেশে আসি নাই। মধ্যপ্রদেশে ছিলাম। কি করিব না করিব, তখনও বিশেষ কিছু ঠিক হয় নাই। এমন সময় আমাকে অন্তরীণ করা হইল। অনেক দিন আমেরিকায় ছিলাম। আর গদর আন্দোলনের পরেই দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি, এইজন্য কারাবন্ধ হইলাম।

প্রঃ—কতদিন অন্তরীণ ছিলেন ?

উঃ—৫ বছর। ছাড়া পাইলাম ১৯১৯ সনে।

প্রঃ—আপনার আমেরিকাবাসের বিবরণ হইতে জানিতে পারিলাম যে, বর্ষাতি সম্বন্ধে কোন খেয়াল এর আগে আপনার হয় নাই। এই বর্ষাতির ব্যবসা করিবার ইচ্ছাটা আপানার কেমন করিয়া জন্মিল ?

উঃ—আমি যখন মধ্য প্রদেশে অন্তরীণ অবস্থায় বাস করি, তখন এক পাদ্রী সাহেব আমার কাছে মাঝে মাঝে আসিতেন। এই পাদ্রীর বর্ষাতি সম্বন্ধে বিদ্যাগুলি জানা ছিল। আমি সময় কাটাইবার জন্য কৌতুহলের বশে সেগুলি তাঁর নিকট আয়ত্ত করিয়া লই। তখন আমার প্রথম মনে হইল যে, ভারতে এই একটা ব্যবসার দিক্ রহিয়াছে। এদিকে চেষ্টা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

প্রঃ—ছাড়া পাইয়াই আপনি বুঝি এটা আরম্ভ করিলেম।

উঃ—আমার সঙ্কল্প ছিল এই ব্যবসাটাকে আমি কানপুরে প্রতিষ্ঠা করিব। পুঁজিপাটা ইত্যাদির জন্য চেষ্টাও করিতেছিলাম। এমন সময় অভাবনীয়রূপে বাঙ্গালা দেশে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

প্রঃ—কোন সময়ে ?

উঃ—১৯২৫ সনে।

প্রঃ—তারপর ?

উঃ—এই সময়েই আমি ব্যবসাটার পত্তন কানপুরে না করিয়া কলিকাতায় করি।

প্রঃ—তবে কতদিন যাবৎ আপনারা এই ব্যবসা চালাইতেছেন ?

উঃ—৭।৮ বছর, ১৯১৯-১৯২৭।

প্রঃ—আপনি তাহলে ছাড়া পাইবার পর বেশীদিন কানপুরে থাকেন নাই।

উঃ—না। আমি সেই বছরই কলিকাতায় চলিয়া আসি।

প্রঃ—আপনি জানেন, সম্প্রতি কয়েকটা দেশী বর্ষাতির ব্যবসায় চলিতেছে। এগুলির আগে কি আপনারা বর্ষাতি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ?

উঃ—একটা কথা স্মরণ রাখিবেন। ওয়াটার প্রুফের নানা বিভাগ আছে। তারপলিন ইত্যাদি আমাদের দেশেও আগে তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু রাসায়নিক প্রুফিং বিষয়ে ভারতবর্ষেই আমরা প্রথম। আমাদের আগে এদেশে কেহ এ জিনিষ তৈয়ারী করিয়াছে কিনা জানি না। আধুনিক দেশী কারখানাগুলি আমাদের পরে আসিয়াছে।

প্রঃ—আপনাদের বিজ্ঞাপনের বহিতে দেখিলাম আপনারা লিখিয়াছেন' "প্রাচ্যের সর্ব্ব-বৃহৎ বর্ষাতির নির্ম্মাতা" "এশিয়ার মধ্যে একমাত্র সর্ব্বাঙ্গ—সম্পূর্ণ বর্ষাতির ফ্যাক্টরী"। এগুলি কি বিজ্ঞাপন, না সত্য কথা ?

উঃ—এই দুইটা কথাই সত্য—বিজ্ঞাপন নয়।

প্রঃ—আপনি কি বলিতেছেন, জাপানের মত উন্নত দেশেও বর্ষাতি কারখানা নাই এবং তারা এ বিষয়ে ভারতের পশ্চাতে ?

উঃ—আপনি একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। আমাদের দেশে বর্ষাতির রেওয়াজ কতদিন হইয়াছে, মনে আছে কি ? আমরা ছেলে বেলায় বর্ষাতি চোখে দেখি নাই। ছাতি মাথায় দিয়া অথবা ভিজিতে ভিজিতে ইস্কুল কলেজ করিয়াছি। মনে করিয়া দেখুন, গোড়ার দিকে লোকে বর্ষাতিকে কিরূপ বড় একটা বিলাস-সামগ্রী মনে করিত। জাপানে গিয়াও ব্যতিক্রম দেখি নাই। ম্যাকিণ্টস্ কি চীজ এবং কোন্ কাজে লাগে, তা প্রথম গিয়া মালুম হইল আমেরিকায়। সেখানে দেখিলাম প্রচুর ভাবে বর্ষাতির প্রচলন রহিয়াছে।

প্রঃ—আপনারাই প্রাচ্যের সর্ব্ব-বৃহৎ বর্ষাতি ফ্যাক্টরি দাঁড়াইয়া গিয়াছেন ?

উঃ—এই আখ্যা আমাদের দিলে বেশী অন্যায় হইবে বলিয়া মনে করি না। আমাদের বিশেষত্ব এই যে, আমরা সকল প্রকার কাজই নিজেরা করিতে পারি। আর বাজার যাচাই করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দরটা দেশী বিলাতী সব দরের নীচে।

প্রঃ—আপনারা অন্যদের চেয়ে কম দরে জিনিষ ছাড়েন কি করিয়া ?

উঃ—এই কথাটা আপনার কাছে উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, ইহা হইতে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের হাতের কাজের আদর হইতেছে। বস্তুতঃ, ইংরেজী কাগজওয়ালারা সকলেই বলিতেছে যে, দেশী বর্ষাতির বেপারীর সহিত বিলাতী বেপারীরা টক্কর দিতে গিয়া ফেল মারিতেছে। আগে বর্ষাতি কিনিতে হইলে কোনো না কোনো বিদেশী দোকানে যাইতে হইত। দামও বেশী দিতে হইত। এখন আপনি যেখানে সেখানে বর্ষাতি কিনিতে পারেন আগের চেয়ে ঢের সস্তায়।

প্রঃ—আপনার এই কারখানাটির আয়তন কতখানি ?

উঃ—সমগ্র জমিটার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কি ?

প্রঃ—না, শুধু বর্ষাতি সম্পর্কে আপনার সম্প্রতি যতখানি জমি প্রয়োজন হইতেছে, তার আয়তনটা জানিতে চাই।

উঃ—৪½ বিঘা হইবে।

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন যে, ওয়াটার প্রুফের নানা বিভাগ আছে। আমি এই বিভাগগুলি মোটামুটিভাবে আপনার নিকট জানিতে চাই।

উঃ—আমার প্রতিষ্ঠানটিতে মোটামুটি এই কয় বিভাগে বর্ষাতি সম্পর্কীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইতেছে :—

(১) কেমিক্যাল বা রাসয়নিক প্রুফিং।
(২) তারপলিন বা ক্যান্‌ভাস্ প্রুফিং।
(৩) পেপার বা কাগজ প্রুফিং।
(৪) অয়েল ক্লথ বা তৈল-কাপড় বা রবার ক্লথ।

প্রঃ—আপনারা কি বিলাতী অয়েল ক্লথের মত অয়েল ক্লথ তৈয়ারী করিতেছেন ? বাজারে কেমন বিকাই-তেছে ?

উঃ—আপনি আমাদের অয়েলক্লথকে কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিতে পারিবেন না। বাজারে বেশ চলিতেছে। আমরা দুই দিকে অয়েল না করিয়া একদিকে করিয়াছি। তবে আজ কাল অয়েল ক্লথের চেয়ে রবার ক্লথ লোকে বেশী পছন্দ করে। তাই আমরা রবার ক্লথের দিকে বেশী মনোযোগ দিতেছি।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—অয়েল ক্লথের একটা দোষ এই যে, তাড়াতাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যবহারকালে আপনারাও ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু রবার ক্লথ বেশ টেঁকসই, অথচ অয়েল ক্লথের কাজটা পাওয়া যায়।

প্রঃ—কাগজ প্রুফ্ করিবার প্রয়োজনটা কি ? আমাদের দেশে প্রুফ্‌ড্ কাগজের টান আছে কি ? লোকে চায় কি ? আপনারা এই দিকে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন আর কিরূপ উৎসাহ পাইতেছেন, জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—বিদেশের দিকে একবার তাকাইলে বুঝিতে পারিবেন

কাগজ প্রুফিংটা কত কাজে লাগে। অনেক জিনিষ আছে বৃষ্টি বা হাওয়া লাগিলে নষ্ট হইয়া যায়। ইয়োরামেরিকা হইতে সে সব দূর দেশেও চালান হয়। এগুলিকে তাজা ও অক্ষত রাখিবার উপায় কি? পেপার প্রুফিং। যেমন ধরুন, আপনারা গিলেট্ ক্ষুর দেখিয়াছেন। প্রত্যেকটি ব্লেড্-প্রুফ্‌ড্ পেপারে জড়ানো থাকে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে যে বিস্কুট আসে তার বাহিরে ও ভিতরে এই কাগজ থাকে। আমেরিকা হইতে মুড়ি এবং ঠিক আমাদের মুড়ির মত হরেকপ্রকার খাদ্য দ্রব্য আসে। তাতেও এই কাগজের দরকার হয়। বস্তুতঃ, বহুক্ষেত্রে এই কাগজের শরণ লওয়া ভিন্ন গতি নাই। আমরা আমাদের কারখানায় অতি উৎকৃষ্টভাবে পেপার প্রুফিং করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিলাতীর চেয়ে দরে কম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের লোক এখনও এ জিনিষটার ব্যবহার ভাল করিয়া করিতে শিখে নাই। ঔষধ পত্র, সাবান, এসেন্স, বিস্কুট ইত্যাদিতে সাধারণ কাগজ ব্যবহার না করিয়া এই কাগজ ব্যবহার করিলে বহু উপকার দর্শে। ব্যবসার দিক্ হইতেও জিনিষ ভাল থাকে বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

প্রঃ—তারপলিন নামটা বহুদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। এটা কোন্ জিনিষ?

উঃ—ক্যান্‌ভ্যাস্ প্রুফিংই তারপলিন। আলকাতরা মাখাইয়া কাজে লাগান হইত বলিয়া এই নাম।

প্রঃ—কি রকম ক্যান্‌ভ্যাস প্রুফিং আপনারা করেন?

উঃ—ক্যানভ্যাস্ তৈয়ারী হয় ৩টা দ্রব্য হইতে। (ক) জুট (খ) কটন (গ) ফ্ল্যাক্স আমরা এই ৩ প্রকার ক্যানভ্যাসকেই প্রুফ্ করিয়া থাকি।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনার এই ক্যানভ্যাস-যোগানটা কোথা হইতে পান? দেশের বাজারে পান কি?

উঃ—জুট ও কটনের ক্যানভ্যাস্ স্থানীয় জিনিষ। কিন্তু ফ্ল্যাক্স ক্যানভ্যাস্ বিলাত হইতে আসে। এটা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম।

প্রঃ—আমি দেখিয়াছি যে, প্রুফ্‌ড ক্যানভাস্ বিভিন্ন রঙের হইতেছে। রঙ্‌টা কি আপনারা করিতেছেন?

উঃ—ক্যানভ্যাস্ প্রুফিংএর আগে এক বিশেষ অসুবিধা ছিল। বর্ষাঋতুর আগে রং করিয়া ও প্রুফ্ করিয়া রাখিয়া দিতে হইত। নহিলে শুকাইবার উপায় হইত না। ইহার এক অসুবিধা এই ছিল যে, যোগানটাকে আগে হইতেই তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হইত। অর্ডার মাফিক জিনিষ তৈয়ারীর উপায় ছিল না। ইহাতে কখনও বা ক্ষতি হইত, কখনও বা দরকার মত জিনিষ যোগান যাইত না।

প্রঃ—আপনাদের রাসায়নিক প্রুফিং বিভাগ হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, এবার তা শুনিতে চাই।

উঃ—রাসায়নিক প্রুফিংএর কয়েকটা দ্রব্য এই:—
(ক) রেনকোট বা বর্ষাতি (খ) মোটর হুড্ (গ) হোল্ড-অল্ (ঘ) পর্দ্দা ইত্যাদি।

প্রঃ—প্রুফিংটা আপনারা করিতেছেন বুঝিলাম। কিন্তু কাপড়গুলি দেশী কি? বিদেশী হইলে কোথা হইতে আনান্?

উঃ—রেন্‌কোট্ ইত্যাদির কাপড় দেশী নয়। বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। আমরা প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়াম্ ও হল্যাণ্ড হইতে আনি।

প্রঃ—রেন্‌কোট পর্দ্দা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। এগুলি নানা রকম রঙের হইয়া থাকে। আপনারা কি ক্যানভ্যাসের মত এই ওয়াটার প্রুফের কাপড়ের উপরও রং করান?

উঃ—রেন্‌কোট ইত্যাদির জন্য রং করিবার দরকার হয় না। নানা রঙের কাপড় ইয়োরোপের বাজার হইতেই কিনিয়া আনা হয়।

প্রঃ—আপনি আপনার ব্যবসার বিভাগগুলির যে মোটামুটি হিসাব দিলেন, তার কোনটার আমদানি সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—আমরা তেল-কাপড় তৈয়ারী করিতে পারিলেও বিদেশের বাজার হইতে যথেষ্ট আমদানি করিয়া থাকি। আমাদের উদ্দেশ্য বিদেশের হাল-চাল সর্ব্বদা

মুখস্থ রাখা। তার সহজ উপায় তেল-কাপড়ের আমদানি। আপনি জানেন, আমি শীঘ্রই ২।৪ দিনের মধ্যে ইয়োরোপ যাইতেছি। ইয়োরোপে, বিশেষতঃ জার্ম্মাণিতে, এই সময়ে অনেকগুলি মেলা বসিতেছে। আমি এগুলির সুযোগ গ্রহণ করিতে চাই। দেখিতে চাই, ইংল্যণ্ড, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে কোন্ কোন্ দিকে লেনদেন চালান যাইতে পারে।

প্রঃ—আপনার এই কারখানাতে দর্জ্জির কাজ করে কয়জন ?

উঃ—২০।২৫জন হইবে।

প্রঃ—গড়ে সমগ্র নিযুক্ত লোকের সংখ্যা (কর্ম্মচারী সুদ্ধ) কত ?

উঃ—প্রায় ১০০।

প্রঃ—আপনার এখানে দিনে কটা করিয়া কোট তৈয়ারী হইতেছে ?

উঃ—গোটা ৫০।৬০ করিয়া।

প্রঃ—তাহলে আপনার কোট বেশ কাটিতেছে বলিতে হইবে। আচ্ছা এই ৫০।৬০টা কোটের অর্ডার পাইতেছেন কোথা হইতে ?

উঃ—আমাদের খদ্দের—

(১) গভর্মেণ্টের শাসন বিভাগ

(২) „ রেলওয়ে „

(৩) পুলিশ-বিভাগ

(৪) ভারতীয় সেনা

(৫) মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ড ইত্যাদি।

প্রঃ—আপনার প্রধান খদ্দের কে ?

উঃ—গবর্মেণ্ট। প্রায় আধা তারাই কিনে।

প্রঃ—তবে ত গবর্মেণ্ট আপনাকে খুব সাহায্য করিতেছে।

উঃ—সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। গবর্মেণ্ট শুধু আমার বড় ক্রেতা নয়, অন্যান্য অনেক প্রকারের বহু সাহায্যও আমি তাদের কাছে পাইয়াছি।

প্রঃ—আপনার বর্ষাতি বেচার অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিতেছি। কোথায় আপনার দ্রব্যের কাটতি বেশী ? বাঙ্গালায়, না ভারতের অন্যত্র ?

উঃ—প্রথম প্রথম বাঙ্গালা দেশে জিনিষ বেচিতে বেগ পাইতে হইয়াছে। এখন অবশ্য বাঙ্গালা ও বাকী ভারতে প্রায় সমান বিকাইতেছে। তবে তার মধ্যে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাঙ্গালার শহরগুলিতে, বিশেষতঃ কলিকাতায় বেশী বিক্রী হয়। মফঃস্বল হইতে বেশী অর্ডার পাই না। বাঙ্গালার বাহিরে মফঃস্বল হইতে বেশী অর্ডার আসে।

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন ২০।২৫ জন দর্জ্জি আপনার এখানে কাজ করে। কেমন কাজ করে ? তাদের হাতের কাজ কি খুব ভাল ?

উঃ—আরে মহাশয় ! দর্জ্জি-বিভ্রাটে আমাকে নাস্তানাবুদ হইতে হইতেছে। দর্জ্জি-বিজ্ঞানের প্রধানতঃ দুইটা দিক্। (ক) সেলাই (খ) মাপ (ছাতি, হাতা ইত্যাদির)। কিন্তু আমাদের দর্জ্জিরা এই দুই দিকেই সময় সময় এমন বেকুবের মত কাজ করে যে, ক্রেতার কাছে আমাদের মুখ রক্ষা হয় না। আমি বহু চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে শোধরাইতে পারি নাই।

প্রঃ—ইহাদের প্রধান দোষ কি ?

উঃ—(ক) প্রত্যেক্যেই সব জানে বলিয়া বিশ্বাস করে। বলিয়া দিলে বা শিখাইতে গেলে তাতে কাণ দেয় না।

(খ) হাতে মাহিনা পাইয়া ২।৪।১০ দিন অনর্থক কামাই করিবেই করিবে।

(গ) পয়সা হাতে জুটিলেই মদ খাইবে।

(ঘ) সুযোগ পাইলেই কাজে ফাঁকি দিবে অর্থাৎ হয় কাজ খারাপ করিবে না হয় দেরী করিবে।

প্রঃ—আপনার এখানে হিন্দু দর্জ্জি আছে কি ?

উঃ—না। সব মুসলমান।

প্রঃ—হিন্দু দর্জ্জি রাখেন না কেন ?

উঃ—পাই না। যাদের পাই, তারা আরও অপদার্থ।

প্রঃ—আপনি দর্জ্জি-বিভাগের উন্নতির জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন শুনিতে কৌতূহল হইতেছে।

উঃ—প্রথমতঃ দেখুন আমি ২০০৲ টাকা মাহিনা দিয়া ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগত একজনকে রাখিয়াছিলাম, যাতে দেশী দর্জ্জিদের শিক্ষা ভাল হয়। কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। তারপর আমি ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছি ভদ্রঘরের হিন্দুছেলেরা আমার এখানে আসিয়া দর্জ্জিবিজ্ঞানটা শিখিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করুক্। অনেকে আসিয়াই পিট্টান দিয়াছে। কেহ কেহ আবার আমাকে ঠকাইবার মতলব করিয়াছে। বলিয়াছে, "আমাদের দিন, বাড়ী হইতে করিয়া আনিব।" মতলবটা দর্জ্জি দিয়া করাইয়া লাভের চেষ্টা করিবে। কিন্তু আমরা বরাবর এই নীতি বজায় রাখিয়াছি যে, সমস্ত কাজ-কর্ম্ম আমাদের কারখানার মধ্যে ১০টা-৫টার ভিতর করিতে হইবে। এক টুক্‌রা কাপড়ও কেহ বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে না।

প্রঃ—তাহলে আজও আপনি দর্জ্জি-সমস্যা লইয়া বিব্রত ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—আর কোন সমস্যা আছে কি ?

উঃ—আমার ব্যবসার সব চেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে বাজারে মাল ফেলা। দর্জ্জি-সমস্যা যতই কঠিন হোক্ তাতে কাজ আটকায় না। কিন্তু বাজার বুঝা ও তদনুসারে মাল যোগান বিশেষ কষ্টকর। এক একটা ভুলের জন্য এক এক বছরের সমস্ত ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা ও মর্জ্জির কথা আপনাকে জানিতে হইবে। যখন যে জিনিষটির দরকার তৎক্ষণাৎ তা যোগাইতে হইবে। নচেৎ অন্যে আসিয়া বাজার দখল করিবে। অপর দিকে, বাজারে যা দরকার তার চেয়ে বেশী মাল উৎপাদন করিলে গুদামে পচিতে থাকিবে। এ ছাড়া দরের লড়াই ত প্রতিনিয়তই হইতেছে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনার কি ব্যবসার তত্ত্বাবধানটাকেও বড় সমস্যা বলিয়া মনে হয় নাই ? ঠিক সময়ে ও ঠিক জায়গায় ঠিক লোক না হইলে আপনাকে ভুগিতে হয়—এমন কি ব্যবসায়ে উন্নতি করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়—আপনার ব্যবসার অভিজ্ঞতা এই কথা বলে না কি ?

উঃ—নিশ্চয়। এবিষয়ে আমাদেরকে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতে হয় বৈ কি। নচেৎ সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

প্রঃ—আপনি মাল বেচিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন ?

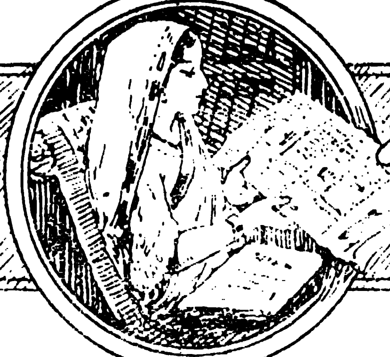
উঃ—প্রধান অস্ত্র দুইটা। (১) আমি স্বয়ং ঘুরিয়া বেড়াই ও ক্যানভাস্ করিয়া বেড়াই। সময় সময় আমাদের লোকও যায়। (২) বিজ্ঞাপন দি। ট্রাম ইত্যাদিও বাদ যায় না।

প্রঃ—আপনার এই কারখানায় সব কাজ প্রায় হাতেই হয়। কলের ব্যবহার হয় না কি ?

উঃ—আমার ইয়োরোপ গমনের এক প্রধান উদ্দেশ্য এই যন্ত্রের মনোনয়ন। আমরা এখানে ইতিমধ্যেই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছি।

প্রঃ—বর্ষাতির ব্যবসার সম্পর্কে আপনি আর কোনও কথা বলিতে চান কি ?

উঃ—আমার বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু কারবারে লিপ্ত হইয়া অন্য কিছু করিবার সময় পাই না। ইচ্ছা আছে যুবক বাঙ্গালীকে ২।১টা দিকে জীবন-সংগ্রামে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য কয়েকটা বিষয় লইয়া কিছু কিছু লিখিব। বহু দেশ ভ্রমণে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে ও নিজে ব্যবসা চালাইতে চালাইতে যে সব সত্য উপলব্ধি করিতেছি—সব যুবক বাঙ্গালার কাণে ঢালিয়া দেওয়াই আমার বাসনা। বাঙ্গালীর ছেলে সব দিকে জয়যুক্ত হইবে—এই আমি দেখিতে চাই। সেদিন "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স" ভবনে এই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তাহা অবশ্য আপনি জানেন।



পত্রিকা-জগৎ

"ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানী"র সাপ্তাহিক

ফী সপ্তাহে আমরা নিউইয়র্কের "ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানী" নামক বিপুল মার্কিণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একখানা ৯।১০ পেজি টাইপ করা চিঠি পাইয়া থাকি। তাহাতে বিবৃত থাকে,—(১) আমেরিকার টাকার বাজার (২) বিদেশী টাকার দর, (৩) বণ্ডের বাজার। অর্থাৎ মার্কিণ কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক কোম্পানীগুলা বাজারে ডিবেঞ্চার বা কর্জ্জ লইবার জন্য যে সকল প্রয়াস করিতেছে তাহার কিস্মৎ (৪) বড় বড় শহরের ব্যাঙ্কগুলা কত টাকার কারবার করিল তাহার হিসাব (৫) আমেরিকার কেনাবেচা ও বাজার-দর (৬) রেলওয়ের মাল চলাচল।

তাহা ছাড়া এক এক সপ্তাহে এক এক প্রকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-লিখিত প্রবন্ধ থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে পাইতেছি, দেশ-বিদেশের তুলার কারখানা।

"ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্কে"র মাসিক

নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক মার্কিণ মুল্লুকের আর একটা জাঁদরেল ব্যাঙ্ক। এঁদের পরিচালকেরা আমাদের নিকট প্রত্যেক মাসে একখানা করিয়া চিঠি পাঠাইয়া থাকেন। "আর্থিক উন্নতির" আকারের ছাপানো ৩২ পৃষ্ঠায় চিঠি সম্পূর্ণ। সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আছে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত,—(১) ব্যবসা-সম্পর্কিত সাধারণ কথা (২) কৃষিকর্ম্মের হালচাল, (৩) টাকার বাজারে কৃষির সুবিধা বৃদ্ধি (৪) কারখানায় লাভের গতিবিধি, (৫) রেলওয়েতে লাভের মাত্রা-হ্রাস, (৬) ঘরবাড়ী তৈয়ারীর ব্যবসা (৭) লোহা ও ইস্পাতের কারবার (৮) অটোমোবিলের বাজার (৯) তামা, সীসা ও দস্তার কারবার (১০) কাপড়-চোপড়ের বাজার (১১) চামড়া ও জুতার ব্যবসায় উন্নতি (১২) কয়লার কাজে হরতাল (১৩) তেলের কারবার (১৪) টাকার বাজার (১৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারবারের প্রভাব (১৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অঙ্গীভূত বারটা ব্যাঙ্কের অবস্থা (১৭) টাকা খাটানো আর ডিবেঞ্চারের দর (১৮) সরকারী ডিবেঞ্চারের বাজার (১৯) নাগরিক ডিবেঞ্চারের মূল্যবৃদ্ধি (২০) রেল-ডিবেঞ্চারের মূল্যবৃদ্ধি (২১) বিদেশী ডিবেঞ্চারের মূল্য অষ্ট্রেলিয়ান ও ফরাসী কর্জ্জ (২২) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশে সোনার টাকায় প্রত্যাবর্ত্তন (২৩) আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজার (২৪) ফেডার‍্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টরেট হ্রাস,—ব্যবসায়ীদের সুযোগ (২৫) আমেরিকায় বিদেশীরা পুঁজি কর্জ্জ লইতেছে বেশী বেশী (২৬) কেন্দ্র ব্যাঙ্কের কর্জ্জের বাজার কতটা শাসন করিতে সমর্থ (২৭) মার্কিণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারবার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিদেশী সমালোচনা (২৮) আমেরিকায় মূল্যহ্রাস ইয়োরোপীয়ানদের পছন্দসই নয় (২৯) দুনিয়ার লেনদেনে স্থিতিসাম্য।

"য়ারবিুখর ফ্যির নাটসিওনাল-য়েকোনোমী উণ্ড ষ্টাটিষ্টিক"

ধনবিজ্ঞান ও তালিকাবিজ্ঞান-বিষয়ক বর্ষপঞ্জী,—জার্ম্মাণির অন্যতম অর্থনৈতিক মাসিক পত্রিকা। নবেম্বর ১৯২৬,—(১) সামাজিক ধন-তত্ত্বের প্রকৃতি (গেক), (২) মালোৎ-পাদনের মার্কিণ রীতি, গাণ্ট, টেলার ও ফোর্ড-প্রবর্ত্তিত তিন প্রণালী। ইয়োরোপে প্রথম দুই প্রণালীর চলন

সম্ভবপর (ফোগেল) (৩) কারখানায় শান্তি সমিতি-সমূহের কার্য্য-ফল (আপোলণ্টে), (৪) বিলাতের মজুর সঙ্ঘ (ফেনিঙ্গার), (৫) মাদকতার তালিকা প্রকাশ (শ্ম্যেন্ডার্স)। ডিসেম্বর ১৯২৬,—(১) ফোন হ্বীজারের মূল্য-তত্ত্ব, রাজস্বতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব (হায়েক) (২) মজুর-পরিদর্শকদের বার্ষিক বিবরণী সম্বন্ধে সমালোচনা (ফ্রিগ্), (৩) বিলাতের মজুরি ও দৈনিক কার্য্যকাল (ফেনিঙ্গার), (৪) সুইট্-সার্ল্যাণ্ডে গমের সরকারী শাসন (স্প্যার্ণিথ্)।

জানুয়ারী ১৯২৭, (১) মুদ্রা, ও কর্জ্জ ও চক্র ডিস্কাউণ্ট-নীতির দ্বারা আর্থিক চক্র পুরাপুরি নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। টাকার মূল্য আর দ্রব্যের মূল্য দুইই স্বাধীনভাবে উঠা-নামা করিতে পারে। কাজেই চক্র-তত্ত্বের উপর মুদ্রা-তত্ত্বের প্রভাব কতটা তাহা বিশ্লেষণ করা অনেক সময়েই সহজ নয়। ১৯২৩-২৬ সনের অষ্ট্রিয়ান আর্থিক ক্রমবিকাশ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে (টাঞ্চার), (২) বিলাতী কয়লার খাদে সঙ্কট (হায়ার), (৩) ১৯২৬ সনের জাহাজ দুনিয়া (হেন্নিগ), (৪) মার্কিণ মজুর-সঙ্ঘ (ফেনিঙ্গার) (১) ধনোৎপাদন ও সামাজিক সুবিচার (হোনেগ্গার), (২) প্রাচীন গ্রীসের ধনোৎপাদন-ব্যবস্থা (রাইখার্ট) (৩) বিজলী সম্বন্ধে নয়া বিলাতী আইন (হায়ার) (৪) বার্লিনে রুটির দর ও খাই খরচ,—১৯২৬ সনের কথা (গুরাৎসে) (৫) নরওয়ে দেশে সরকারী গম-শাসন (স্প্যার্ণিথ)।

মার্চ্চ ১৯২৬ সনের (১) প্রাচীন গ্রাসের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা (রাইখার্ট) (২) জার্ম্মাণির আর্থিক আইন অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯২৬ (৩) ট্রাষ্ট গড়নের তত্ত্বকথা ও তালিকা-তত্ত্ব (লেওনটীফ হ্বাসিনি)।

"ব্যাঙ্কার্স ম্যগাজিন"

আমেরিকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ৮০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আশী বৎসর পূর্ণ হইবার উপলক্ষ্যে এক সংখ্যা বাহির হইয়াছে ১৯২৬ সনের জুন মাসে। প্রকাশক ব্যাঙ্কার্স পাব্লিশিং কোং, নিউইয়র্ক। বার্ষিক চাঁদা ৫ ডলার।

এক ব্যক্তি বলিতেছেন,—"মার্কিণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়ক আইন এখনই পুনর্গঠিত হওয়া আবশ্যক। আর এক ব্যক্তি বলিতেছেন—"এই আইন পুনর্গঠিত করিবার সময় এখনো আসে নাই।" এক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় "ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট" অর্থাৎ টাকা খাটাইবার ব্যবসা চালাইবার জন্য ট্রাষ্ট জাতীয়-ব্যাঙ্ক গঠনে আমেরিকার ক্রমবিকাশ। নিউইয়র্ক সেণ্ট্রাল রেলওয়ে তাহার শতবর্ষ পূর্ণ করিল। তদুপলক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে। দুনিয়ার নানা দেশে ছোট বড় মাঝারি ব্যাঙ্কগুলা বিশালকায় প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হইতেছে। এইরূপ বহরে বৃদ্ধি আর কতদূর চলিবে তাহার আলোচনা আছে এক প্রবন্ধে।

আমেরিকার বহির্ব্বাণিজ্য পুষ্ট করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পরপর ১৩ বৎসর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। ত্রয়োদশ সম্মেলনের বিবরণ দিয়াছেন পত্রিকার সম্পাদক।

বহির্ব্বাণিজ্যের কাজে মার্কিণ ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ টাকা কোন্ প্রণালীতে দিয়া সাহায্য করে তাহার আলোচনা এক প্রবন্ধে পাইতেছি। আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলা যথা ফ্লরিডা জর্জ্জিয়া ইত্যাদি মুল্লুকে,—ব্যবসাবাণিজ্য বাড়াইবার উপায় আলোচনা করিয়াছেন একজন। ক্যানাডা দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের লেনদেন এক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বিলাতের সার্ব্বজনিক ধর্ম্মঘট-সম্পর্কিত নানা প্রকার ব্যক্তিসঙ্ঘবিষয়ক সচিত্র বিবরণ এক রচনায় পাইতেছি। বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য কর্জ্জের সুযোগ বাড়ানো আবশ্যক কি ? এই প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে এক প্রবন্ধে।

১৯২৬ সনের ইয়োরোপ, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক আইন কানুন, দুনিয়ার ধনদৌলত, বিনিময়ের হার ও বাজার দর বিষয়ক বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, নয়া নয়া মার্কিণ ব্যাঙ্কের ঘরবাড়ী, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের চলাফেরা, ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন প্রণালী, মার্কিণ-ব্যাঙ্ক সম্মেলনের অধিবেশন ইত্যাদি নানা বিষয়, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রচনাও ইহাতে আছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থ সমালোচনা আর গ্রন্থপঞ্জী কাগজের কিয়দংশ অধিকার করিতেছে।

"রেহ্বিয়ু দেকোনোমী পোলিটিক"

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা, দ্বৈমাসিক। অধ্যাপক জিদ সম্পাদক। মে-জুন (১৯২৭ সন) আছে (ক) প্রবন্ধ (১) যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির কর্ম্মকৌশল, কৃষিকর্ম্মের ভবিষ্যৎ বুঝিবার প্রণালী, আর্থিক চক্র—অধ্যাপক মুরের প্রদর্শিত পন্থা, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত পন্থা, ফিশার, কার্স্‌বেন এবং ওয়ার্কিংয়ের কর্ম্মপ্রণালী, মার্কিণ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সঙ্গে আর্থিক চক্রের যোগাযোগ (আলব্যেয়ার আকতারিওঁ), (২) সঞ্চয়ের উপর ট্যাক্স (উম্বার্ত্তো রিচ্চি), (৩) জেনেহ্বায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন (রেণে হফহ্যার) (খ) আর্থিক দুনিয়ার গতিবিধি (১) জার্ম্মাণির আর্থিক জীবন (আঁরি লাওফেন বুর্গার), (২) রুশিয়ার আর্থিক জীবন (এনিয়াশেফ), (গ) দলিল (১) সমবায়ের সমাজ (জিদ), (২) বিশ্ববাণিজ্য, ১৯১১ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে জেনেহ্বায়। এই দলিলের উপর টীকাটিপ্পনী (জাঁ লেস্কুর), (ঘ) আর্থিক আইনকানুন,—মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে ফরাসী পার্ল্যামেন্ট যে সকল আইনজারি করিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে,—(১) কৃষি, (২) উপনিবেশ, (৩) বাণিজ্য, কারখানা, শুল্ক, (৪) সরকারী খাজাঞ্চিখানা ও টাকার বাজার, (৫) মজুর, মজুরী ও সমাজ জীবন, (৬) মাল জাহাজ, জলে স্থলে (সাঁ জ্যার্ম), (ঙ) গ্রন্থ সমালোচনা দশখানা বইয়ের খতিয়ান। (চ) পত্রিকা-জগৎ—(১) ফরাসী ভাষার ১১খানা, (২) জার্ম্মাণ ভাষার ২খানা, (৩) ইংরেজী ভাষার ২খানা, (৪) ইতালিয়ান ভাষার ১খানা, (৫) ওলন্দাজ ভাষার ১খানা। ২৩ জন লেখক এই বিভাগের জন্য বাহাল আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ফরাসী পণ্ডিত মহলে নামজাদা। অর্থাৎ পত্রিকাজগতের চুম্বক প্রকাশ করিবার দায়িত্ব লইয়া থাকেন ফ্রান্সের নং ১ শ্রেণীর পণ্ডিত। (ছ) গ্রন্থসূচী।

"জার্ণালে দেলি একনমিস্তি"

ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা। নবেম্বর ১৯২৬, (১) ইতালিকে আর্থিক হিসাবে স্বাধীন কবিরার উপায়। বড় বড় দেশগুলার ভিতর ইতালির মতন পরাধীন দেশ আর একটিও নাই। ইতালিকে স্বাধীন করিতে হইলে প্রথমতঃ শুল্কনীতির সংস্কার আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ চাই টেক্‌নিক্যাল আর যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত উন্নতি (মর্ত্তারা), (২) মূল্য-সমস্যা (কার্লি), । ফেব্রুয়ারি ১৯২৭,—(১) ঝুঁকির অর্থকথা। ঝুঁকি একমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে না। বর্ত্তমানের তথ্যসমূহ আর অতীতের বিকাশকথা না জানার দরুণও ঝুঁকি-সমস্যা উপস্থিত হয় (কেস্‌মা), (২) বেলজিয়ামের মুদ্রা-স্থিরীকরণ (ফস্‌সাতি), (৩) নেপল্‌স্‌ বন্দর (মিলনো)। মার্চ্চ ১৯২৭,—(১) সঙ্কট-তত্ত্ব (দেল হ্বেক্কি) (২) মুদ্রার পরিমাণ-হ্রাস। ইহাতে ইতালির সকল প্রকার সম্পত্তিওয়ালা লোকদিগের লাভ হইয়াছে (দনভিত)।



চাষ-বর্জ্জন ও পল্লী-বর্জ্জন

লোকেরা যখন পল্লী বর্জ্জন করিয়া শহরে আসিয়া বাস করিতে চায় তখন ভারতে আমরা লোকজনকে গালাগালি করিতে লাগিয়া যাই। তাহাদেরকে বচন শুনাই,—"ব্যাক্ টু ভিলেজ—পল্লীতে ফিরে যা, পল্লীতে থাক্ পল্লীই স্বর্গ" ইত্যাদি।

এই ধরণের আর এক কাণ্ড ভারতে সুপরিচিত। যখনই দেখি যে, কিষাণেরা চাষ-আবাদ ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে, কারখানায় মজুরি করিতে আসিতেছে, তখনই তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হওয়া ভারতীয় "দার্শনিক" ও স্বদেশ-সেবকগণের এক মস্ত রেওয়াজ। এই বিষয়ে আমাদের বেদান্ত হইতেছে,—"কারখানাগুলা পাশবিক, ম্লেচ্ছ। ব্যাক্ টু ল্যাণ্ড-যা ফিরে চাষ-আবাদের জমিতে, কৃষিকর্ম্ম আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপোষক" ইত্যাদি।

আমাদের পণ্ডিতগণের বেদান্ত যাই হউক না কেন, তথ্য দুইটা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। আর্থিক ভারতের প্রথম নিরেট তথ্য হইতেছে পল্লীবর্জ্জনের ঝোঁক। আর দ্বিতীয় নিরেট তথ্য চাষ-বর্জ্জনের ঝোঁক।

এই দুই ধরণের বর্জ্জন-কাণ্ড ভারতেরই একচেটিয়া আর্থিক তথ্য নয়। "একালের" দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য দেখা যাইতেছে,—কি বিলাতে, কি ফ্রান্সে, কি জার্ম্মাণিতে, কি অন্যান্য দেশে। অবস্থাটা বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ করিবার জন্য ইয়োরামেরিকায় বিপুল সাহিত্য রচিত হইয়া গিয়াছে। এই সাহিত্য-রচনার শেষ অধ্যায় আজও দেখা যাইতেছে না। সকল দেশেই অনেক পাকা পাকা মাথা সর্ব্বদা এই অবস্থা-বিশ্লেষণের কারবারে মোতায়েন আছে। সঙ্গে সঙ্গে "ব্যবস্থা", "পাতি" বা "দাওয়াই" আবিষ্কারের দিকেও বহু পাশ্চাত্য মগজের বহুবিধ প্রয়াস দেখা গিয়াছে। সেই সকল প্রয়াস আজও চলিতেছে।

অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিকের সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট মিখায়েল হাইনিশ ধনবিজ্ঞানের এই বিভাগে অনেক দিন ধরিয়া মাথা খেলাইতেছেন। ১৯২৪ সনে তাঁহার লেখা এক প্রকাণ্ড বই বাহির হইয়াছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রায় শ' চারেক রয়্যাল অকটেভো আকারের। প্রকাশক জার্ম্মাণির য়েনা নগরের ফিশার কোম্পানী।

বইটার নাম "লাণ্ড-ফ্লু'খ্‌ট"। জার্ম্মাণ ভাষায় "লাণ্ড" শব্দের দুই অর্থ:—(১) জমি (২) পল্লী। বইয়ের নামে বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার "লাণ্ড" (জমি বা পল্লী) হইতে "পলায়নের" কথা বিবৃত করিতেছেন। ঘটনাচক্রে হাইনিশ এক ঢিলে দুই পাখীই মারিয়াছেন। এক পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে তিনি পল্লীবর্জ্জন আর জমি (চাষ)-বর্জ্জন দুই-ই আলোচনার ভার লইয়াছেন।

প্রথমেই জানিয়া রাখা উচিত যে, চাষ-আবাদ বা কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেই যে লোকেরা নগর-বাসী হইয়া পড়ে, এরূপ বুঝিবার কারণ নাই। কেননা বর্ত্তমান যুগে বড় বড় শিল্প-কারখানা অনেক সময়েই শহরের বাহিরে কায়েম হইয়া থাকে। কাজেই শহুরে লোক না হইয়াও লোকজনের পক্ষে চাষ-বর্জ্জন করা সম্ভব। অর্থাৎ চাষ-বর্জ্জন ঘটিলেই পল্লী-বর্জ্জন ঘটা অবশ্যম্ভাবী নয়। চাষীরা চাষ হইতে পলায়ন করিয়াও মফঃস্বলের পল্লীতে থাকিতে সমর্থ। সুতরাং চাষ-বর্জ্জন আর পল্লী-বর্জ্জন দুইটা স্বতন্ত্র বস্তু, আর স্বতন্ত্ররূপে আলোচ্য।

চাষ আজকালকার দুনিয়ায় লোক-প্রিয় ব্যবসা নয়। এই কথাটা বুঝাইবার জন্য হাইনিশ ইয়োরোপের নানা

দেশের একাল সেকাল আমাদের নিকট খুলিয়া ধরিয়াছেন। আর তথ্য ও অঙ্কের তালিকা দিয়াও চাষের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহ বস্তুটা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনাটা তুলনা-মূলক। গ্রন্থকারের বিশেষ দৃষ্টি অবশ্য জন্মভূমি অষ্ট্রিয়ার জন্য দাওয়াই আবিষ্কার করিবার দিকে। কিন্তু মোটের উপর বইখানাকে গোটা ইয়োরোপেরই বর্ত্তমান অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার অন্যতম প্রচারক বিবেচনা করা চলিতে পারে। আমাদের ভারতেও যাঁহারা চাষ-ব্যাধির চিকিৎসায় হাত পাকস করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে হাই-নিশের সঙ্গে দু'এক বার ডাকিয়া আলাপ করা ভালই।

অধ্যাপক জেরিঙের "আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ"

আগেই বলিয়াছি যে, চাষ-ব্যাধির দাওয়াই আবিষ্কার করিবার জন্য ইয়োরামেরিকার অনেক বাঘা বাঘা ধন-"ডক্টর" বহুদিন হইতেই সচেষ্ট আছেন। একজন পাকা "চাষ-চিকিৎসকের" নাম জেরিঙ্। তাঁহার পাঁতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাহির হইয়াছিল। ১৮৯২ সনে জেরিঙের এক বই বাহির হয়। তাহার নাম "ইন্নেরে কোলোনিজাট্সিওন" (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন)। জেরিঙ্ এখনো বাঁচিয়া আছেন। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্ম্মাণিতে শিল্প-কার-খানার ধুম সুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে চাষ-বর্জ্জন চলিতে থাকে। ফ্যাক্টরিগুলা গাঁকে গাঁ উজাড় করিয়া নরনারীকে নিজ নিজ বাস্তুভিটা ছাড়াইতেছিল। শিল্পের টানে চাষ হইতেছিল নিষ্প্রভ। আবাদের জন্য আর লোক জুটিত না। কি করা যাইবে? নানা চিকিৎসক নানা প্রকার মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারই অন্যতম হইতেছে "আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ"। "উপনিবেশ" বলিলে সেকালের জার্ম্মাণরা, ফরাসীরা, ইংরেজরা বুঝিত ইয়োরাপের বাহিরে,—আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদি মহাদেশে গিয়া শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের নয়া নয়া বাসভূমি কায়েম করা। জেরিঙ্ বলিলেন,—"এখন দরকার পড়িয়াছে, দেশের ভিতরেই মফঃস্বলের নানা অঞ্চলে দেশী লোকের ঘরবাড়ী গড়িয়া তোলা। জার্ম্মাণ নরনারী যাহাতে চাষের কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা হউক। চাষ-ব্যবসাটাকে চাষীদের সমাজে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা হউক। তাহা অবশ্য একমাত্র বা প্রধানতঃ বক্তৃতার জোরে সম্ভবপর নয়। এজন্য গবর্মেণ্ট লাখলাখ টাকা খরচ করুক। খরচ করিয়া করিয়া সুবিধাজনক সর্ত্তে লোকজনকে নতুন নতুন জমির মালিকরূপে গড়িয়া তোলা হউক। ইত্যাদি"।

জেরিঙের মতামত বিস্মার্কের যুগে, বিশেষতঃ ১৮৮০-৯০ সনের দশকে, জার্ম্মাণ পণ্ডিত ও রাষ্ট্রিক মহলে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করে। তাহার ফলে জমিজমার আইনকানুনে বিপ্লব সাধিত হয়। নয়া জার্ম্মাণ কানুনের নকলে ডেন্মার্ক ১৮৯৯ সনে, আর ইংল্যাণ্ড ১৯০৮ সনে "পারিবারিক আবাদ" (ফ্যামিলি-ফার্ম), "স্মল হোল্ডিং" (ছোট আবাদ)", ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া হাজার হাজার "কিষাণ-মালিক" (পেজাণ্ট-প্রোপ্রাইটার) গড়িয়া তুলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ" নামক দাওয়াই ৪০ বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরি-কায় একটা সার্ব্বজনীন "পেটেণ্ট" রূপে চলিতেছে। ভারতের চাষ-চিকিৎসক মহলে এই দাওয়াইয়ের রেওয়াজ আজও বোধ হয় চলে নাই। এমন কি এই দাওয়াইয়ের নামই বোধ হয় মাত্র দু'এক জন ধনবিজ্ঞান-সেবীর গণ্ডীতে আবদ্ধ।

যাহা হউক, ভারতে যাঁহারা জেরিঙের চাষ-দাওয়াইটার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে হাইনিশের ওস্তাদিটা যথার্থরূপে উপভোগ করা সম্ভব। কেননা হাইনিশ জেরিঙের সকল পাঁতি খাইয়া হজম করিয়াছেন। জেরিঙের দাওয়াইয়ে সমাজের যতটা উপকার সাধিত হইতে পারে তাহা ইয়োরোপের নানা দেশে সাধিত হইয়াছে ও এই সকল তথ্য দখল করিয়া হাইনিশ বলিতেছেন, "এখন আবার আরও কিছু আবশ্যক। জেরিঙের পেটেণ্ট অথবা অন্যান্য টোট্কা যাকিছু একালের কবিরাজদের নিকট পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে চাষ-চিকিৎসা সুচারুরূপে চলিতে পারেনা।" বুঝিতে হইবে যে, ইয়োরোপ আর্থিক উন্নতির বিজ্ঞানে আর আর্থিক উন্নতির কর্ম্মকৌশলে ১৮৯০-১৯০৮ সনকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। হাইনিশ জেরিঙের পরের ধাপ।

পুঁজিতন্ত্রে শিল্প বনাম চাষ

একালের আর্থিক ছুনিয়া,—বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকার বড় বড় দেশ—হইতেছে পুঁজিতন্ত্রের জগতে। এক সঙ্গে বহু মাল উৎপন্ন হয়। কারবারের বহর বিপুল বিস্তৃত। টক্কর চলে আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে বা শহরে শহরে, নয়ত দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। কুদরতী মাল সংগ্রহ করায় এই টক্করের এক রূপ দেখিতে পাই। অন্য রূপ হইতেছে কারখানা-জাত মাল বাজারে ফেলার হাঙ্গামায় পরিস্ফুট। সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির গতিবিধি, লেনদেন, আমদানি-রপ্তানিও, বিশ্ব-জোড়া। টাকাকড়ি অহরহ এক মুলুক হইতে আর এক মুলুকে, এক মহাদেশ হইতে আর এক মহাদেশে—জাতিধর্ম্মরাষ্ট্র-নির্ব্বিশেষে ভবঘুরেগিরি করিতেছে।

ছুনিয়ার ধরণ ধারণই যখন এইরূপ, তখন সকল প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টাকেই এই সবের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলিতে হইবে। যে সকল কারবার এই সমুদয় ধরণ ধারণের সঙ্গে খাপ খাইবে না, সেই সকল কারবারের পক্ষে সফলতা লাভ করা অসম্ভব অথবা সুকঠিন। ধনীরা টাকা খাটাইবার জন্য এই কথাটা বিশেষরূপে খতাইয়া দেখিতে বাধ্য। মজুরেরাও নক্‌রি ঢুঁড়িতে বাহির হইয়া বর্ত্তমান জগতে কোন্ কোন্ কারবার বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ তাহার আলোচনা করিয়া দেখিতে অগ্রসর হয়। যে সকল কারবার বর্ত্তমান যুগে বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না সেই সব কারবারের দিকে ধনীও ধন চালিবে না, মজুরও বেশী ঝুঁকিবে না। এই গেল অতি স্বাভাবিক কথা।

প্রশ্ন হইতেছে, বর্ত্তমান জগতের ধরণ-ধারণ দেখিয়া কোন্ কোন্ কারবারকে টেঁকসই বিবেচনা করা চলিতে পারে। শিল্প-কারখানাসমূহকে প্রথমেই বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত সমঝিয়া লওয়া সম্ভব। কেননা পুঁজিতন্ত্রের অধীন বিপুল বহরশীল কারবার বলিলে যন্ত্রপাতিনিয়ন্ত্রিত কারখানা শিল্পই সর্ব্বদা চোখে পড়ে। কারখানা-শিল্পকে যখন তখন লম্বায়-চৌড়ায় বাড়াইয়া তোলা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী বাজার সৃষ্টি করা আর গোটা ছুনিয়া হইতে পুঁজি সংগ্রহ করাও কারখানা-শিল্পের উন্নতির জন্যই সম্ভব।

কিন্তু চাষ-আবাদ অর্থাৎ কৃষিকর্ম্মের কারবারটা শিল্প-কারবারের মতন নয়। ইহাকে বাড়াইয়া বিশ্বব্যাপী করিয়া তোলা একপ্রকার অসম্ভব। চাষীরা অথবা চাষ-ধুরন্ধরেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও একই ঢঙের ইচ্ছানুরূপ পরিমাণ ফসল সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। জগদ্ব্যাপী বাজারের জন্য মাল তৈয়ারী করাও তাহাদের কারবারে অসম্ভব। পুঁজিতন্ত্রের যুগ বলিলে আর্থিক জীবনের যে সকল লক্ষণ নজরে আসে, সেই সব লক্ষণ চাষ-আবাদের পক্ষে পুরাপুরি প্রকট করা এক প্রকার অসাধ্য। কৃষিকর্ম্মের প্রকৃতি এখনো এই পুঁজিতন্ত্রের চরম লক্ষণগুলার সঙ্গে খাপ খায় না।

কাজেই শিল্পের সঙ্গে চাষের লড়াই সুরু হওয়া মাত্র বর্ত্তমান জগতে চাষ ফেল মারিতে বাধ্য। অর্থাৎ ধনী লোকেরা নেহাৎ ইচ্ছায় কৃষিকর্ম্মে টাকা খাটাইতে রাজি হইতে পারেনা। যে সকল লোকের ট্যাঁকে পয়সা আছে তাহারা লাভের জন্যই টাকা খাটাইতে যায়। তাহারা বুঝিতেছে যে, একালে টাকা খাটাইয়া দু'পয়সা আনিবার সুযোগ আছে প্রধানতঃ শিল্প-জগতে। কৃষি-কর্ম্মে লাভবান হইবার সম্ভাবনা কম। এই বুঝিয়া তাহারা চাষ বর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইবে। মজুরেরাও স্বাভাবিক কারণেই নক্‌রি ঢুঁড়িবার বেলায় কৃষিকর্ম্মের কর্ত্তাদের নিকট উমেদারি বেশী না করিয়া ফ্যাক্টরির আওতায় কারখানার আবহাওয়ায় তীর্থের কাকের মতন ঘুরিয়া বেড়াইবে। মজুরদের পক্ষে গুড় মিলিবার বেশী সম্ভাবনা এই শিল্প-জগতে।

কি মজুর, কি পুঁজিপতি, দুই শ্রেণীর লোকেই নিজ নিজ সম্পত্তির অর্থাৎ মেহনতের আর পুঁজির চরম সদ্ব্যবহার করিতে প্রয়াসী। তাহার সুযোগ আছে একালে প্রচুর। যানবাহনের সুবিধা পাওয়া যায় অনেক। মজুরেরা ঠিক প্রায় পুঁজির মতনই ভবঘুরেগিরি করিয়া বেড়াইতে পারে। যখন যেখানে বেশী মজুরির আশা তখন সেখানে মজুরেরা হাজির হয়। টাকা পয়সার আর কর্জ্জ লেনাদেনার গতিবিধিও বিলকুল এইরূপ। চরম লাভের টানে আজ টাকা এখানে, কাল আবার আর এক জায়গায় তাহার আবির্ভাব বা কেন্দ্রীকরণ। এইরূপ প্রায় ষোল আনা

অবাধ গতিবিধির যুগে একই সময়ে কোনো সমাজে এক-প্রকার পরিশ্রমের জন্য দুই প্রকার মজুরি থাকিতে পারে না। সেইরূপ একই সময়ে কোনো সমাজে এক প্রকার লগ্নি কারবারের জন্য দুই প্রকার সুদের ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। যেখানে মজুরি বা সুদের হার বেশী সেইখানেই মজুর আর পুঁজির অভিযান অবশ্যম্ভাবী।

অবস্থাটা আরও তলাইয়া বুঝা যাউক। ফ্যাক্টরির কারবারে মজুরেরা বেশ উঁচু হারে বেতন পায়। এই কথাটা শুনিবামাত্র কৃষিক্ষেত্রের মজুরেরা চাঙ্গা হইয়া উঠে। তাহারা কৃষিক্ষেত্রের মালিক বা ধুরন্ধরের নিকট ঠিক সেই ফ্যাক্টরির মজুরি-হার হাঁকিয়া বসে। আর যদি সেই হার অনুসারে তাহাদের তখা না জুটে তাহা হইলে তাহারা চাষের কাজ ছাড়িয়া অ-চাষের কারবারে নকরি টুঁড়িতে লাগিয়া যায়। আসল কথা অনেক ক্ষেত্রেই চাষের কর্ত্তারা মজুরদিগকে যথোচিত হারে,—বিশেষতঃ ফ্যাক্টরির মজুরি-মাফিক বেতন দিতে অসমর্থ। কাজেই চাষের মজুরেরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আর চাষ-সেবায় মসগুল থাকিতে সচেষ্ট হয় না। সুরু হয় "লাণ্ড ফ্লুখ্‌ট্‌"—চাষবর্জ্জন।

অপর দিকে পুঁজিপতিদের চিত্তটা বিশ্লেষণ করা যাউক। তাহারা কৃষিকর্ম্মে টাকা ঢালিয়া দেখিতেছে যে, তাহাদের লাভ বড় কম অথবা হয় না। অন্যান্য ব্যবসায় তাহাদের যেসব বন্ধুরা টাকা খাটাইতেছে তাহারা বেশ মোটা হারে দু'পয়সা করিতেছে। কাজেই দরকার হইলে যেমন জুতার কারবার ছাড়িয়া লোকে বইয়ের কারবার খোলে, অথবা বইয়ের কারবারে পয়সা নাই দেখিলে তেলের কারবার করে, সেইরূপ পুঁজিপতিরা চাষের কারবার বর্জ্জন করিয়া অ-চাষের শরণাপন্ন হয়। "লাণ্ড-ফ্লুখ্‌ট্‌"টা মজুরের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক পুঁজিপতির পক্ষেও তেমন স্বাভাবিক।

এই অবস্থায় জমিটা লইয়া পড়িয়া থাকে কাহারা? যাহাদের অন্য কোনো গতি নাই তাহারা দায়ে পড়িয়া, নেহাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও মাটিটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাতে আর্থিক জীবনবত্তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এই অবস্থায় কোনো মতে দিন গুজরানো অথবা চরম দারিদ্র্যের নিদর্শন কপালে ও চোখে-মুখে বহন করা ছাড়া চাষী জমীদারদের আর কোনো লক্ষণ নাই।

চাষকে লাভজনক করিবার উপায়

ভাবার্থ হইতেছে যে, চাষ কারবারটা লাভজনক নয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার লোকেরা বর্ত্তমান জগতের এই আর্থিক তথ্যটা খুব নিরেট ভাবে পাকড়াও করিয়াছে। ভারতবর্ষে এই নিরেট তথ্য-জ্ঞান এখনো জন্মেই নাই। জন্মে নাই বলিয়া ব্যাধিটা এখনো ভারতবাসী পাকড়াও করিতে অসমর্থ। এই কারণে আমাদের দেশে গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইয়োরামেরিকার ওস্তাদেরা হাতুড়েরা সকলেই খোলাখুলি জানে যে, শিল্পের সঙ্গে টক্করে চাষ জয়ী হইতে পারিবে না। তাহারা কোনো প্রকার গোঁজামিলের বড় একটা পক্ষপাতী নয়। সোজাসুজি ব্যাধিটা আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাহারা প্রতীকারের ফিকিরে মগজ খেলাইতে লাগিয়া গিয়াছে।

ব্যাধি হইতেছে,—চাষ আর্থিক হিসাবে লাভজনক নয়, অতএব লোক-প্রিয় নয়, অতএব পুঁজিপতি আর মজুর চাষের পথে পা বাড়াইতে রাজি নয়। প্রতীকারটা তাহা হইলে স্বভাবতই নিম্নরূপ,—চাষকে আর্থিক হিসাবে লাভজনক করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে এই কারবার লোক-প্রিয় হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে পুঁজিপতি এই কারবারে তাহার টাকা ঢালিতে ঝুঁকিবে আর মজুরও চাষ-বাসে "বসতে লক্ষ্মী" বুঝিয়া আবাদ-নিষ্ঠ হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকায় যতগুলা বড় বড় আর্থিক আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহার ভিতর চাষ-ব্যবসাটাকে লাভজনক করিয়া তোলার চেষ্টা অন্যতম।

কত উপায়ে চাষ-ব্যবসাকে লাভজনক করিয়া তোলা সম্ভব? অনেক উপায়ে। একটা উপায়ের কথা আজ বিশ বৎসর ধরিয়া ভারতেও সুপরিচিত। সে হইতেছে সমবায়। উনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণরা এই দাওয়াই আবিষ্কার করে। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে

আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। এই উপায়টা ভারতে আজও এক প্রকার অপরিচিত। কিন্তু অল্পদিনের ভিতরই এই উপায়ের প্রচার ভারতে সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

এইবার তৃতীয় উপায়ের কথা বলিব। এইটা হইতেছে হাইনিশের উদ্ভাবিত অথবা প্রচারিত। পূর্ব্বোল্লিখিত দাওয়াই দুইটা খাঁটি কৃষিকর্ম্ম-সম্পর্কিত নয়। একটা হইল সমাজ-গঠনের অঙ্গ, আর একটা হইতেছে জমির পরিমাণ সম্পর্কিত আইনের অন্তর্গত। এই দুই দাওয়াইয়ের প্রভাব জবর। সকল দেশেই যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে। কিন্তু খাঁটি ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে চাষ-সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।

মূল্যতত্ত্ব

হাইনিশের বিশ্লেষণে সমস্যাটা আসলে মূল্যতত্ত্বের অন্তর্গত। চাষ-ধুরন্ধরেরা তাহাদের মজুরদিগকে উঁচুহারে তন্খা দিতে অসমর্থ কেন? চাষ হইতে চাষ-ধুরন্ধরদের নিজের আয়টা নীচু বলিয়া। তাহাদের আয়টাই বা নীচু কেন? যে দরে তাহারা বাজারে ফসল বেচে সে দরটা নীচু এই জন্য। সুতরাং ফসলের বাজার-দর উঁচু না হইলে চাষ-মজুরেরা উঁচুহারে মজুরি পাইবে না। কাজেই তাহারা চাষ-বর্জ্জন করিবে। ভাল কথা, ফসলের বাজার-দর যেন বাড়িল। কিন্তু তাহা হইলে জমির দাম বাড়িয়া যাইবে না কি? খুবই সম্ভব। কিন্তু তাহা বন্ধ করা আবশ্যক। অর্থাৎ "লাণ্ড-ফ্লুখ্ট" নিবারণ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত জমিরই দামের উপর দেশের,—অর্থাৎ রাষ্ট্রের—কড়া নজর থাকা চাই।

"লাণ্ড-ফ্লুখ্ট" অর্থাৎ চাষ-বর্জ্জন যে নিবারণ করা আবশ্যক তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সকল দেশেই। চাষের কারবার একদম উঠিয়া যাওয়া কোনো সমাজের পক্ষেই মঙ্গলকর নয়। বহুসংখ্যক চাষী যাহাতে সুখেস্বচ্ছন্দে চাষ চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা দেশের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আবশ্যক।

কিন্তু উপায়টা হইতেছে শেষ পর্য্যন্ত জমির দাম, ফসলের বাজার-দর আর মজুরির হার এই তিন বস্তু সম্বন্ধে বিহিত করা। ধনবিজ্ঞানের তথাকথিত "স্বাভাবিক" বা "প্রাকৃতিক" নিয়মে এই তিনের যথোচিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি? পারে না। প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলে বহুক্ষেত্রেই ঠকিতে হয়। মহা-লড়াইয়ের সময় বৃটিশ গবর্মেণ্ট বিলাতী চাষ-সংরক্ষণের জন্য প্রচুর অ-প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত অর্থাৎ শাসন-যন্ত্রের হস্তক্ষেপ চালাইয়াছে। যুদ্ধের পরেও ইংরেজ জাতি কয়েক বৎসর ধরিয়া মজুরির নিম্নতম হার বিষয়ক আইন বানাইয়াছে। ফসলের দাম সম্বন্ধেও ইংরেজরা সরকারী শাসনে বেশ সুফল পাইয়াছে।

সুতরাং চাষ-আবাদের কর্ম্মে গবর্মেণ্টের শাসন হাইনিশের পছন্দসই। শাসনটা নানা দিকে চলিতে পারে। ফসলগুলার উপর গবর্মেণ্টের একচেটিয়া একতিয়ার কায়েম করা তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। সংরক্ষণ-নীতির চেয়ে একচেটিয়া একতিয়ার নীতি দেশের পক্ষে বেশী উপকার-জনক। বিদেশ হইতে যে সকল মাল আমদানি হইবে তাহার উপর গবর্মেণ্টের ষোল আনা একতিয়ার থাকিলে বিদেশী মালের দাম নির্দ্ধারণ করা গবর্মেণ্টের পক্ষে সুসাধ্য। কিন্তু মাত্র সংরক্ষণ-নীতির আইন জারি থাকিলে বিদেশী মালের দাম সম্বন্ধে বেপারীরা স্বাধীন। এই কারণে "মনপলি"-প্রথা কায়েম হইলে সুফল লাভ হইবার কথা। বিদেশী মালের দামটার উপর কর্ত্তৃত্ব কায়েম হইবামাত্র দেশের ভিতর যে সব মাল উৎপন্ন হইতেছে তাহার দাম ঠিক করিয়া দেওয়া হাতের পাঁচ স্বরূপ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার আর জমির দাম সম্বন্ধেও কর্ত্তৃত্ব চালানো সহজ কথা। গবর্মেণ্ট যদি মূল্যতত্ত্বটার পাকা মালিক হইয়া বসে তাহাহইলে চাষের কারবারকে লোক-প্রিয় করিয়া তোলা বেশী কঠিন নয়। চাষ-বর্জ্জন নিবারণের এই দাওয়াই রাষ্ট্র-সর্ব্বস্ব কমিউনিজমের অন্যতম যুগ-লক্ষণই মালুম হইবে। হাইনিশ অবশ্য বোলশেভিক আদমি নন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাম ও কাম

আমাদের দেশে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কায়েম হইবার কথা উঠিয়াছে তাহার নামটা আসিয়াছে মার্কিণ মুল্লুক হইতে।

এই ধরণের ব্যাঙ্ক নানা দেশে নানা নামে পরিচিত। মার্কিণ ব্যাঙ্কটা বেশী দিনের পুরানা জিনিষ নয়। এমন কি, এই জাতীয় জাপানী ব্যাঙ্কটার চেয়েও মার্কিণ ব্যাঙ্ক বয়সে ছোট।

সাধারণতঃ এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলা দেশের নামে পরিচিত হইয়া থাকে। বিলাতের ব্যাঙ্কটার নাম "ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড"। ফরাসী ব্যাঙ্কের নাম "বাঁক দ' ফ্রাঁস"। ইতালির ব্যাঙ্কের নাম "বাঙ্কাদি তালিয়া"। জাপানী ব্যাঙ্কের নামটা ইংরেজিতে "ব্যাঙ্ক অব্ জাপান।" তবে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের নাম "ব্যাঙ্ক অব্ জার্ম্মাণি" নয়। জার্ম্মাণি শব্দের স্বদেশী জার্ম্মাণ নাম ডায়েচলাণ্ড"। কাজেই বিলাতী ফরাসী নজির অনুসারে ব্যাঙ্কটার নাম হওয়া উচিত ছিল "ব্যাঙ্ক অব্ ডায়েচলাণ্ড।" কিন্তু নাম হইতেছে "রাইখস্-বাঙ্ক"। "রাইখ্" শব্দের অর্থ "এম্পায়ার" বা সাম্রাজ্য। ইংরেজিতে ব্যাঙ্কটার নাম দাঁড়াইবে "ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক"।

এই গেল নামের মামলা। কামের মামলারও বিভিন্নতা আছে যথেষ্ট। একটা সোজা কথা এই ক্ষেত্রে বলিব। "সেণ্ট্রাল" (কেন্দ্র) ব্যাঙ্ক শব্দ এই ব্যাঙ্কগুলা সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রেওয়াজ বড় একটা দেখা যায় না। সেইরূপ "ষ্টেট" (সরকারী) ব্যাঙ্ক শব্দও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। ভারতবর্ষে যে ব্যাঙ্কটা কায়েম করিবার কথা চলিতেছে তাহার আকার প্রকার বুঝিবার জন্য এই সকল নাম ও কামের বিভিন্নতা প্রথম হইতেই জানিয়া রাখা উচিত।

"রিজার্ভ" "সেণ্ট্রাল" বা "ষ্টেট" এই তিন শব্দের কোনো একটা কায়েম করা হইতেছে শুনিলেই ধাঁ করিয়া তাহার রূপ-রঙ্ সম্বন্ধে মতামত জারি করিতে যাওয়া অনুচিত। প্রথমতঃ হয় বিলটার বা আইনটার ধারাগুলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ না হয় যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার বাৎসরিক কর্ম্মগণ্ডীর বিভিন্ন খতিয়ান করা আবশ্যক। ঐতিহাসিক ভাবে পাঁচ দশ বৎসরের কর্ম্মগণ্ডীটা এক সঙ্গে দেখিতে চেষ্টা করিলেই রিজার্ভ সেণ্ট্রাল বা ষ্টেট শ্রেণীর "ব্যাঙ্ক-লক্ষণ" ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বে আমরা কোনো কোনো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৃত্তান্ত অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছি। "আর্থিক উন্নতি" একমাত্র বা প্রধানতঃ ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় পত্রিকা হইলে এই দিকে অনেক বেশী আলোচনা চলিতে পারিত। কিন্তু আর্থিক জীবনের সকল দিকেই অনুসন্ধান গবেষণা চালানো আমাদের উদ্দেশ্য। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্রিকা আবশ্যক। বাঙ্লা দেশে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বাঙ্লা পত্রিকা এবং ব্যাঙ্ক পরিচালকদের বার্ষিক সম্মেলন কায়েম করিবার দিন আসিয়াছে। বাঙালী ব্যাঙ্কারগণ সঙ্ঘবদ্ধ হউন।

ফরাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাসন

ফরাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কটার নাম "বাঁক দ' ফ্রাঁস"। তাহার পরিচালকদের সঙ্গে আমাদের কিছু লেনদেন আছে। সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের ১৩ বৎসরের তেরটা বার্ষিক বিবরণী হস্তগত হইয়াছে। এই রিপোর্টগুলায় ১৯১৫ জানুয়ারি হইতে ১৯২৭ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের জীবন-বৃত্তান্ত পাকড়াও করিতে পারি।

ফরাসী ব্যাঙ্কটা "অংশীদারদের" ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ একটা "সরকারী" বা "ষ্টেট" ব্যাঙ্ক নয়। ইহার রিপোর্ট বাহির হয় "অংশীদারদেরই সভার" নামে। কেতাবের নাম "কঁৎ রঁদ্যু ও নঁ দ্যু কঁসেই জেনেরাল দ'লা বাঁক্" (ব্যাঙ্কের পরিচালনা সভার নামে প্রচারিত কার্য্য-বিবরণী)।

ব্যাঙ্কের শাসনকর্ত্তা হইতেছে "আসেম্ব্লে জেনেরাল" (সাধারণ সভা)। এই সভার সভ্যসংখ্যা ২০০। অংশীদারদের ভিতর সব চেয়ে যারা বহরে ভারি" অর্থাৎ অধিক-সংখ্যক অংশের ক্রেতা, একমাত্র তাহাদের ঠাঁই এই সভায়।

এই সভার কার্য্য পরিচালিত হয় দুই উপ-সভার মারফৎ। একটার নাম "কঁসেই" আর একটার নাম "কমিতে।" কঁসেইয়ের সভ্য-সংখ্যা ১৫। তাহাদেরকে বলে "রেজাঁ" (ইংরেজিতে রেজেণ্ট অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা)। "কমিতের" সভ্য-সংখ্যা ৩। তাহাদের নাম "সাঁস্যুর" (সেন্সর,—পরিদর্শক বা পরীক্ষক)। যে বইগুলার কথা এই সমালোচনায় বলা হইতেছে, সেই বইগুলার জন্য এই দুই উপসভা দায়ী। বস্তুতঃ বইগুলায় থাকে দুই অংশ,—(১) ১৫ "রেজাঁর"

(শাসনকর্ত্তার) কঁসেইয়ের রিপোর্ট, (২) সাঁস্তয়রের (পরীক্ষকের) কমিতের রিপোর্ট। এই ১৮ জনের কাজ ও দায়িত্ব বেশ গুরু। তাহারা সকলেই এক হিসাবে কঁসেইয়ের অন্তর্গত। পরীক্ষকদের স্বতন্ত্র কতকগুলা অধিকার আছে।

রেজঁা নামক শাসনকর্ত্তা আসে কোথা হইতে? "সাধারণ সভা" (আসেম্‌ব্লে জেনেরাল) অর্থাৎ ব্যাঙ্কটার পার্ল্যামেন্ট এই ১৫ জনকে বাছাই করিতে অধিকারী। অন্ততঃ ৫ জন রেজঁা আসা চাই অংশীদারদের ভিতর হইতে। তাহারা ২০০ সভ্যের অন্তর্গত না থাকিতেও পারে। কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের কারবারে তাহাদের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। এই হইল আসল কথা। ৩ জন রেজঁা নির্ব্বাচিত হয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতর হইতে। কিরূপ কর্ম্মচারী? প্রথমতঃ তাহারা ধনভাণ্ডার বিভাগের চাকুর্‌য়ে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা মফঃস্বলের চাকুর্‌য়ে। অবশিষ্ট ৭ জন রেজঁার বাছাই সম্বন্ধে আসেম্‌ব্লে জেনেরাল বিলকুল স্বাধীন।

সাঁস্তয়রদের আসল কাজ হিসাবপত্র দেখা। সোজা কথায় তাহারা "অডিটর" আর রেজঁারা হইল আসল শাসনকর্ত্তা। পরীক্ষকেরা যে-কোনো অংশীদারের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে। পরীক্ষকরাও কৃষিশিল্প বাণিজ্যের অভিজ্ঞতাওয়ালা লোক।

ব্যাঙ্কটার মাথায় থাকে একজন গবর্ণর আর দুই জন ডেপুটি গবর্ণর। তিনজনই ভূতপূর্ব্ব উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুর্‌য়ে। গবর্ণর বাহাল থাকে আজীবন। ৩ জনই গবর্ণমেন্ট-কর্ত্তৃক নিয়োজিত।

গবর্মেন্টের হাত দেখা যাইতেছে দুই দিকে। প্রথমতঃ, তিন জন রেঁজার নির্ব্বাচনে সাধারণ সভা সরকারী চাকর্‌য়ে বাহাল করিতে বাধ্য। অবশ্য তাহারা গবর্মেন্টের মনোনীত আদমি নয়। দ্বিতীয়তঃ এই তিনজন গবর্ণর ও ডেপুটি গবর্ণর খোদ গবর্মেন্ট কর্ত্তৃক সরকারী চাকুর্‌য়েদের শ্রেণী হইতে বহাল করা লোক।

ব্যাঁক দ' ফ্রাঁসের আইন-কানুন

শাসন সম্বন্ধে যেসকল কথা বলা সংক্ষেপে হইল সেসব অবশ্য আইন-কানুনের অন্তর্গত। ফরাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কটা কোন্ নিয়মে পরিচালিত হয় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্যারিসের "পোল দু প" কোং একখানা বই বাহির করিয়াছে। ১৯২৬ সনে প্রকাশিত। তাহাতে আছে ১৮ জানুয়ারি ১৮০০ সন হইতে ৭ আগষ্ট ১৯২৬ পর্য্যন্ত কতগুলা ব্যাঁক দ' ফ্রাঁস সম্পর্কিত আইন বা আইনজাতীয় বুঝা-পড়া জারি হইয়াছে সবই এই বইয়ের ভিতর ধারাবাহিকরূপে পাই ৩৫০ পৃষ্ঠায়। ১২৬ বৎসরে ১৩২ বার ব্যাঙ্ক লইয়া "লোঅ," "দেক্রে" অথবা "কঁ ভাঁসিঅঁ" ইত্যাদি নামধারী আইন সৃষ্টি অথবা আইন-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বইটার নাম "লো আ এ স্তাতু কি রেজিস্ লা ব্যাঁক্ দ' ফ্রাঁস (ব্যাঁক দ' ফ্রাঁসের শাসনসংক্রান্ত আইন-কানুন)। ব্যাঙ্কটা নেপোলিয়ানের কায়েম-করা প্রতিষ্ঠান।

ধারাবাহিক হিসাবে আইনগুলাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে:—

(ক) ফরাসী বিপ্লবের প্রথম যুগ,—রিপাব্লিকের আমল (১) রিপাব্লিকে"র অষ্টম বৎসর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাঁক্ দ ফ্রাঁস নামক একটা বে-সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত। তাহার কর্ম্ম-ভঙ্গী ও শাসন-প্রণালী "স্তাতু জিমিতিফ" নামে পরিচিত।

(২) সেই বৎসরই রিপাব্লিকের কনসালেরা ব্যাঁক দ' ফ্রাঁসের কোষাগারে সরকারী টাকা পয়সা রাখিবার ব্যবস্থা করে। কনসালদের আলোচনা-সভায় এইরূপ সাব্যস্ত হয়। দলিলটা সুরু হইয়াছে "রিপাব্লিকের কনসালদের কাজ হিসাবে। কিন্তু বোনাপার্টের নাম সহি আছে প্রথম কনসাল ভাবে দলিলের নীচে।

(৩) ১৮০৩ সনের (১৪ এপ্রিল) আইনটা সুরু হইয়াছে "বোনাপার্ট প্রথম কন্‌সালের" নাম লইয়া। আইনের নীচেও বোনাপার্টের সহি আছে। এইটাই ব্যাঙ্ক-বিষয়ক প্রথম আইন। ইহাতে ব্যাঙ্ককে নোট-জারি করিবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইতেছে।

(খ) নেপোলিয়ানের আমল (১) ১৮০৬ সনের আইনটার (২২এ এপ্রিল) দেখিতেছি "নাপলেঅঁ, ফরাসী নরনারীর সম্রাট।" সহিও "নাপলেঅঁ" রূপে অর্থাৎ মামুলি "বোনাপার্ট" আর নাই।

(২) ১৮০৮ সনের (১৬ জানুয়ারি) আইন। ইহার গোড়ায়ও বাদসা "নাপলেওঁ। আর সহিও তাঁরই। এই তারিখে নাপলেওঁ আবার সংযুক্ত রাইণ-প্রদেশের রক্ষাকর্ত্তা। এই আইনটা ব্যাঙ্কের "স্তাতু ফঁ দামেন্তেঁ।" অতএব সকলেরই অবশ্য প্রণিধানযোগ্য।

(৩-৪) নেপোলিয়ানের সহি-করা আর দুইটা ছোট ছোট আইন আছে (৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৮, ৮ সেপ্টেম্বর ১৮১০) এই দুইটায়ই বাদসা নাপলেওঁর আর এক উপাধি হইতেছে "সুইস যুক্তরাষ্ট্রের সালিশ।"

(গ) রাজতন্ত্রের যুগ :—

(১) ৪ জুলাই ১৮২০—রাজা তগন লুই বুর্বঁ (নং ১৮)

(২) ৬ ডিসেম্বর ১৮৩১—রাজা লুই-ফিলিপ।

এই দুই আইনে "রিজার্ভে"র কিয়দংশ অংশীদারদিগকে বাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩-৬) রাজা লুই ফিলিপের আমলে আরও চারটা আইন জারি হয়। তাহার ভিতর ৩০ জুন ১৮৪০ আর ২৫ মার্চ্চ ১৮৪১এর আইন দুইটা বিশেষ দ্রষ্টব্য। ব্যাঙ্কের মিয়াদ ১৮০৬ সনের ২২ এপ্রিল তারিখে একবার বাড়ানো হইয়াছিল। এইবার ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লওয়া হইল।

(ঘ) দ্বিতীয় রিপাব্লিক :—(১) প্রথম চারটা আইন জারি হয় অস্থায়ী বিপ্লবী গবর্মেণ্টের নামে (২৫ মার্চ্চ ১৮৪৮, ১৬ মার্চ্চ ১৮৪৮, ২৭ এপ্রিল ১৮৪৮, ২ মে ১৮৪৮)। লুই ব্লাঁ নামক প্রসিদ্ধ মজুর-নায়কের নাম সহি দেখা যায় প্রত্যেকটাতে।

(২) লুই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে চারটা আইন জারি করেন।

(ঙ) দ্বিতীয় নেপোলিয়ানি সাম্রাজ্য (১) ১ জুন ১৮৫৭ আইনজারি হয় বাদসা নাপলেওঁ (নং ৩) এর নামে। এই আইনটা প্রণিধানযোগ্য।

(২-৯) ১৪ আগষ্ট ১৮৭০ পর্য্যন্ত আরও আটটা আইন তৃতীয় নেপোলিয়ানের নামের সঙ্গে জড়িত।

(চ) তৃতীয় রিপাব্লিক

(১) ১৮৭০—১৮৯৭

(২) ১৮৯৭—১৯১১

(৩) ১৯১১—১৯১৮

(৪) ১৯১৯—১৯২৬

প্রথম নেপোলিয়ানের দুইটা আইন (১৮০৬,১৮০৮), লুই ফিলিপের দুইটা আইন (১৮৪০, ১৮৪১)। আর তৃতীয় নেপোলিয়নের একটা আইন (১৮৫৭),—এই পাঁচটা আইনে ব্যাঙ্কের গঠন সম্বন্ধে আসল তথ্য পাইতে পারি। পরবর্ত্তী কালের বিভিন্ন যুগে কার্য্য-পরিচালনার উপলক্ষ্যে নানা নতুন নতুন ঘটনা ঘটিয়াছে। যাঁহারা ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনটা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ফ্রান্সের "সেকাল" বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই প্রত্ন-তত্ত্বে মসগুল হইবার জন্য আমরা ১৮০৬ হইতে ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত জারি-করা ফরাসী আইনগুলার ধারাবাহিক খতিয়ান করিয়া দেখিতে বাধ্য। কিন্তু এবার তাহা থাক।



"ই সুওহিব স্‌ভিলুপ্পি দেল্' একনমিয়া আগ্রারিয়া" (কৃষি-ব্যবস্থায় একালের ক্রমবিকাশ), মাউরি, মিলান, হ্বিতা এ স্পেন্‌গ্লর কোং ৩৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৬

"ফিনান্‌স্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক ম্যানুয়্যাল অব্‌ জাপান" (জাপানের আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা), ২৬ বার্ষিক সরকারী বিবরণ, ২৯৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

"তার্দ এ লোকোনোমী সেসিয়োলেজিক" (ফরাসী সমাজ-তত্ত্ববিৎ তার্দ ও ধনবিজ্ঞানের চিন্তকথা), রোশ-আগুসল,—প্যারিস, রিহ্বিয়্যার কোং, ৯৩পৃষ্ঠা ১৯২৬।

"হ্বেকেশুস্‌স্ ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ওয়ার্কার্স" (ফ্যাক্টরির মজুরদের ছুটি), মিল্‌স্, নিউইয়র্ক, রোনাল্ড প্রেস ৮+৩২৮ পৃষ্ঠা ১৯২৭, ৫ ডলার।

"দি ওয়ার্কার লুক্‌স্ অ্যাট্ গবর্মেণ্ট" (মজুরের চোখে গবর্মেণ্ট), কার্ল হুন, নিউইয়র্ক ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল পাব্‌লিশার্স ১৭৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ১.৬০ ডলার।

"ডেমক্রেসি অ্যাণ্ড ফিনান্স ইন চায়না" (চীনে আত্ম-কর্তৃত্ব ও রাজস্ব ব্যবস্থা),—শ, নিউইয়র্ক, কলাম্বিয়া ইউনি-ভার্সিটি, ৩১৫ পৃষ্ঠা ১৯২৬, ১.৫০ ডলার।

"নৎ স্থির ল' সিস্তেম মনেতেয়ার ফ্রাঁসে" (ফরাসী টাকাকড়ি),—হ্বল্‌ফ,-প্যারিস, গোটিয়ে-হ্বিলার কোং, ১০৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

"পোলিটিক এ তেওরী মনেতেয়ার আঁগ্লেজ্ দাপ্রে-গেয়ার" বিলাতী মুদ্রাবিষয়ক মতামত,—যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের কথা।—লাজার, প্যারিস, সিবে-কো, ১২৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

"ল' কম্যার্স এ ল্যাঁদুস্ত্রী দহ্বাঁ লা দপ্রেসিয়াসিওঁ এ-লা স্তাবিলিজাসিওঁ মনে-তেয়ার,—লেক্‌সপেরিয়াঁস আলমাঁদ" (মুদ্রা-পতন আর মুদ্রা-স্থিরীকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা,—জার্ম্মাণির অভিজ্ঞতা) জ্যুস্তি-নিয়ানি,—প্যারিস, আল্‌কাঁ কোং, ২১+২১১ পৃষ্ঠা ১৯২৭।

"লেতা সিঁদিকা এ-লা রেপ্রেজাঁতাসিওঁ কর্পরাতিহ্ব" (সঙ্ঘ-গত রাষ্ট্র ও সঙ্ঘসংক্রান্ত প্রতিনিধি),—হ্বালেআ, প্যারিস, মুহ্বেল লিব্রেয়ারি ন্যাশন্যাল, ৬৪+৩৬৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৭

"মাইগ্রেশ্যন অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস সাইক্‌ল্‌স" (মজুরদের গমনাগমন ও আর্থিক চক্র),—জেরোম,-সেইণ্ট অনিবান্‌স্। মেসেঞ্জার প্রেস,-২৫৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

"প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অব্‌ লেবার লেজিসলেশ্যন" (মজুর ও মজুরি-বিষয়ক আইন কানুন),—কমন্‌স্ ও অ্যাণ্ড্রুজ্, নিউ ইয়র্ক, হার্পার কোং, ১৬+৬১৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ৩ ডলার।

"দি মডার্ণ ডেহ্বেলপমেণ্ট অব্‌ সিটি গবর্মেণ্ট ইন দি ইউনাইটেড কিংডম অ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স" (নগর শাসনের আধুনিক ক্রমবিকাশ,—বিলাতী ও মার্কিণ অভিজ্ঞতা),—গ্রিফিথ, নিউ ইয়র্ক অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস,—২খণ্ডে ৭৪৫ পৃষ্ঠা, ১৪ ডলার, ১৯২৭।

জার্ম্মাণির পুনরুত্থান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

পুঁজিপাটার বৃদ্ধি

১৯২৬ সনে ডিস্‌কোন্টো গেসেলশাফ্‌ট্‌ ও ড্রেস্‌ড্‌নের বাঙ্ক নামক ব্যাঙ্ক দুইটার পুঁজিপাটা বাড়িয়াছে। ৭টা ব্যাঙ্কের পুঁজিপাটা ও রিজার্ভ একত্রে ১৯২৬ সনের শেষে হইয়াছিল ৭৬৭·২ মিলিয়ন মার্ক। এই পরিমাণটা ১৯২৫ সনের ৩১ ডিসেম্বর ৬৫৬·৭ মিলিয়ন মার্ক ছিল।

অতএব বাড়্‌টা ১১১·৫ (?) মিলিয়ন মার্ক। তন্মধ্যে পুঁজিপাটা বাড়িয়াছে ৫৭ মিলিয়ন আর রিজার্ভ বাড়িয়াছে ৫৪·৫ মিলিয়ন মার্ক। শেষের মোটটায় নয়া "ইস্যু" বা "চালান" সম্পর্কে প্রাপ্ত শেয়ার প্রিমিয়ামগুলিও ধরা হইয়াছে।

"ব্যালান্স শীট্‌" বা বাকীজায় হইতে দেখিতে পাই, ডিপোজিট্‌ বা আমানত ও চল্‌তি হিসাবের উত্তমর্ণ অনেক বাড়িয়াছে—৪,৭৩০·৪ মিলিয়ন হইতে ৬,৩১৮·৯ মিলিয়ন মার্ক হইয়াছে। "লায়েবিলিটি বা দেনা মোট ৪,৯৭০·৯ মিলিয়ন হইতে ৬,৬৪৮ মিলিয়ন মার্কে দাঁড়াইয়াছে। "অ্যাসেট্‌" বা পাওনার মধ্যে—বিবিধ খাতক ৫৯৭·৫ মিলিয়ন মার্ক বাড়িয়াছে অর্থাৎ ২৯৭৩·৭ মিলিয়ন মার্ক হইয়াছে হাতে ও ব্যাঙ্কগুলিতে মজুত। নগদ ৯৩৪ মিলিয়ন হইতে ১,১০৭ মিলয়ন মার্ক হইয়াছে; "ডিসকাউন্ট" বা বাট্টার পরিমাণ ১,৩২৩·৫ মিলিয়ন হইতে ১.৬২৬·৯ মিলিয়ন মার্কে দাঁড়াইয়াছে; আর "ইনভেষ্টমেণ্ট" বা খাটানো টাকার পরিমাণ ৬৬·৫ মিলিয়ন হইতে ১১৪·৬ মিলিয়ন মার্কে উঠিয়াছে।

বৌর্সের কাজ বেশ জোরসে চলিয়াছে। কোন্টান্‌গো ঋণ ইত্যাদি—১২১·৬ মিলিয়ন (১৯২৫ সনের শেষ) ৭৮৩·১ মিলিয়ন মার্ক (১৯২৬)। কিন্তু পণ্য অল্প বাড়িয়াছে—৪৭১·৭ মিলিয়ন হইতে ৪৮৯·৮ মিলিয়ন মার্ক। ১৯২৫ সনে নগদ, বাট্টা, লোন ও খাটান টাকার পরিমাণ মোট ছিল ২,৯১৭ মিলিয়ন মার্ক। ১৯২৬ সনে মোটটা হইয়াছে ৪,১২১·৫ মিলিয়ন মার্ক। অর্থাৎ দেনার ৫৮·৭% (১৯২৫) ও ৬২% (১৯২৬)। অন্যান্য পাওনার মধ্যে অন্য ব্যাঙ্কগুলিতে স্থায়ী কাজের পরিমাণ ৫·৩ মিলিয়ন বাড়িয়াছে অর্থাৎ ১৪২·৯ মিলিয়ন মার্ক হইয়াছে। কিন্তু ঘরবাড়ীর দাম খাতায় ৩ মিলিয়ন কমিয়া ১৮১·৭ মিলিয়ন মার্ক হইয়াছে।

৪। জার্ম্মাণির রাষ্ট্র ঋণ

রাজনৈতিক পরিভাষায় সমগ্র জার্ম্মাণিকে রাষ্ট্র বলা হয়। কিন্তু জার্ম্মাণরা জার্ম্মাণিকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য ও তার ভিতরকার এক এক দেশকে রাষ্ট্র বলিয়া সমঝিতে অভ্যস্ত।

ফিনান্স্যাল টাইম্‌স্‌ পত্রের বিশেষ সংখ্যা জার্ম্মাণ রাষ্ট্রগুলির ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন খবর বাহির করিয়াছে।

১

মুনিখ্‌ হইতে উপদেশ পাইয়া বাহ্বেরিয়ান্‌ গবর্মেণ্ট সম্প্রতি নিউইয়র্কে ১ কোটি ডলারের কতকগুলি ষান্মাসিক "ট্রেজারি বিল" বাজারে উপস্থিত করিয়াছে। এই বিল ইচ্ছা করিলে আরও ছয় মাসের জন্য বহাল চলিবে। দরদস্তুর জানা যায় নাই। কিন্তু বিলগুলি এক বাঁধা বার্লিন ব্যাঙ্কের নিকট বেচা হইয়াছিল। বার্লিন ব্যাঙ্ক সেগুলি বাট্টা করিয়া নিউইয়র্কের কয়েক ব্যাঙ্কের কাছে আবার বেচিয়াছে। সরকারী এক খবরে প্রকাশ, "গবর্মেণ্ট যদি সোজাসুজি আমেরিকান্‌ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেচাকেনা করিত, তবে এত সস্তায় বাটা হইত না।"

ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স বলিতেছে, "ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের চেয়ে ব্যাঙ্কাররা ঢের বেশী ওস্তাদ ও উপযুক্ত লোক। সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ব্যাঙ্কাররা সর্ব্বদা এই বিষয় লইয়াই মাথা ঘামাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাণিজ্য-সচিব তাঁর স্বভাব-সুলভ জিদ্‌ ছাড়িয়া দিয়া এই রকম একটা কাজ করিয়াছেন।"

২

বাহ্বেরিয়ার ঋণ গ্রহণটা নূতন ব্যাপার নয়। গত ১৫ মাস বাহ্বেরিয়া বিদেশে দুইটা ঋণ স্থাপন করিয়াছে। একত্রে তাদের দাম ২২ কোটি ডলার—সুদের হার ৬১°/০। বাহ্বেরিয়া এক জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কিং সীণ্ডিকেটের কাছে ৫ কোটি মার্ক ধার লইয়াছে। ধারটা লওয়া হইয়াছে ৯৬১% দরে ট্রেজারি বণ্ড কিনিয়া তিন বছরের জন্য। সুদের হার ৭°/০। এই ব্যাঙ্ক সর্ব্বসাধারণকে ৯৮১°/০ করিয়া বণ্ড বেচে ও নিট্‌ সুদ আদায় হয় ৭১°/০।

ইহার পড় প্রুশিয়া ৬.৭°/০ হারে ঋণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বেই ৪% বেশী করিয়া দিতে হইয়াছিল। সাধারণ ভাবে, এই কথা বলা যায় যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ "ইন্‌ভেষ্টার" বা "লগ্নিদার" ৬ মাস আগে যা পাইত তার চেয়ে প্রায় ৫°/০ কম পাইয়াও সন্তুষ্ট থাকিতেছে। একথা মিউনিসিপ্যাল ও ব্যবসা-সংক্রান্ত বণ্ড সম্বন্ধেও খাটে।

৩

এ বছর (১৯২৬) রাইখ্‌ এবং ফেডারেল রাষ্ট্রগুলি দেশের বাজারে "লং টাইম ইষু" বা "লম্বা চালান" খুব কম করিয়াছে। ডায়টস্‌শে বাঙ্ক "ষ্ট্যাটিষ্টিক" বা "আদম-সুমারি" প্রস্তুত করিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, গত ১১১ মাসে রাইখ্‌ ও ফেডারেল রাষ্ট্রগুলি সর্ব্ব মোট ৩৬ কোটি ৩০ লক্ষ মার্ক বাজারে উঠাইয়াছে (১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত)। তন্মধ্যে "খাট চালান" বাবদই ৩২ কোটি ৮০ লক্ষ মার্ক উঠান হইয়াছে (ট্রেজারি বিল ও বণ্ড)। অতএব "লম্বা চালান" মাত্র ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কের।

৮

ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স্‌ বলিতেছেন, "সাধারণ অবস্থার উন্নতি হইতেছে। লম্বা চালানের ঋণও শীঘ্রই বেশী বেশী দরকার হইবে।"

১৯২০ সনে থুরিঙ্গেন্‌ নামে এক নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। পূর্ব্বে নানা স্যাকসন ডাচি ও মধ্য জার্ম্মাণির অন্যান্য জনপদ লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হয়। থুরিঙ্গেন অধিবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা চাহিতেছে। ঋণের পরিমাণ ২১ কোটি মার্ক। সুদের হার ঋণের উপর ৭°/০। বণ্ডের দাম ৯৫১% হইবে। শোধটা ১৯৩১-১৯৫২ সনের মধ্যে ঘটিবে। শতকরা দুই মার্ক দরের "কিউমুলেটিভ সিঙ্কিং ফাণ্ড" দ্বারা (১৯৩০ সন হইতে ইহার কাজ আরম্ভ হইবে) ঋণ শোধ হইবে। ১৯৩২ সনের ১লা জানুয়ারীর পর হইতে "একসিলারেটিভ্‌" বা বর্দ্ধিত হারে শোধ করার অনুমতি দেওয়া হইবে।

এই ঋণগ্রহণের উদ্দেশ্য "ফ্লোটিং লায়েবিলিটি" বা "ভাসা দেনা"গুলি শোধ করিয়া দেওয়া।

উদ্বর্ত্ত পত্র বলিতেছে, "গদীচ্যুত রাজাদের শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কিছু ক্ষতিপূরণ ধরিয়া দিতে হইবে। সেটা বাদে, ১৯২৬ সনের ১লা ডিসেম্বরে মোট দেনার পরিমাণ ২,৬২, ৫০,০০০ মার্ক ছাড়াইয়া যায় নাই। আর আশা করা যায়, ঐ আর্থিক বছরের সরকারী বন ও অন্যান্য বাবদ প্রাপ্ত স্থূল রাজস্ব ১ কোটি ৭০ লক্ষ মার্কের উপর হইবে।"

ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স্‌ মন্তব্য ঝাড়িতেছে, "উদ্বর্ত্ত পত্রটা" পরিষ্কার নয়। আর্থিক অবস্থার কথাটা কিছু কিছু জানা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা যায় না।

"একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার মত। ঋণের আসল ও সুদ লণ্ডন সোনার দরে ও লণ্ডন চেকের হারে সোনা দিয়া শোধিতব্য। কিন্তু বিশুদ্ধ সোনার দাম যদি প্রতি কিলো-গ্রামে ২,৭৬০ মার্ক হইতে ২,৮২০ মার্কের মধ্যে থাকে, তবে রাইখস্‌ মার্ককেও সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করা হইতে পারে।"

৫

১৯২৬ সনের ১১১ মাসে প্রদেশ ও মিউনিসিপ্যাল

কর্পোরেশনগুলি জার্ম্মাণ বাজারে ৪০ কোটি ২০ লক্ষ মার্ক উঠাইয়াছে। অর্থাৎ গবর্মেণ্ট লোনের চেয়ে ৪ কোটি মার্ক বেশী। অন্যান্য ঋণ গ্রাহকেরা ৫৮ কোটি ৮০ লক্ষ মার্কের বণ্ড আনিয়া ফেলিয়াছে। "মর্ট্‌গেজ লোন ব্যাঙ্ক" বা বন্ধকী ঋণ ব্যাঙ্কগুলি যে "চালান" বাহির করিয়াছে, তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

অতএব একুনে আভ্যন্তরিক "চালানে"র পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ মার্ক। তন্মধ্যে ৩৭ কোটি মার্ক হইল "খাট ঋণ" (শর্ট টাইম্ ডেট্) বাবদ।

সবসুদ্ধ "চালান" বাহির হইয়াছে ১৩৪। অতএব গড়পড়্‌তা পরিমাণটা ১ কোটি মার্কের কিঞ্চিৎ বেশী বা মোটামুটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড।

৬

মর্ট্‌গেজ লোন ব্যাঙ্কগুলির চালান সম্বন্ধে ঠিক আঁক-জোক দেওয়া অসম্ভব। এইমাত্র বলা যায় যে, ১৯২৬ সনের ৩০ শে সেপ্টেম্বর অবধি ৬ মাসে বার্লিন বৌর্সে সরকারী বাজার দর যতটার জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তার মোট পরিমাণ হইতেছে ৭০ কোটি মার্কের কাছাকাছি।

এই ৭০ কোটি মার্ক বা তদ্রূপ কিছু সত্য সত্যই যে বাজারে বিকাইয়াছে, তা নয়। অন্যান্য সকল চালানও রাম শ্যাম যদু ইত্যাদি ইন্‌ভেষ্টারের হাতে চলিয়া যায় নাই। কিন্তু একটা কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। সে এই যে, সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্কগুলি খুব মোটা রকম একটা অংশ হাত করিয়াছে। সরকারী আদমসুমারি বলিতেছে, ১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর অবধি সেভিংস ব্যাঙ্কগুলিতে ১০০ কোটি মার্কের উপর আমানত বাড়িয়াছে।" অর্থাৎ যেখানে এই পরিমাণের অনেকটা "ট্রাষ্ট সিকিউরিটি"তে গেলে ভাল হইত, সেখানে সবটাই সেভিংস ব্যাঙ্কে গিয়া হাজির হইয়াছে।

৫। জার্ম্মাণিতে বাণিজ্যিক এভিয়েশন বা নভশ্চরণ

১

যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ-সৃষ্ট জেপেলিন ইত্যাদির কথা শুনা গিয়াছিল। জার্ম্মাণি যে আকাশ-যুদ্ধে কৃতবিদ্য তাও জানা গিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণি যে আকাশযানকে বাণিজ্যের কাজেও লাগাইতে পারে, তার পরিচয় এখন শান্তির সময় পাওয়া যাইতেছে।

১৯১৬ সনে ড্যয়টশে লুফ্‌ট্ রেএডেরাই (কোম্পানী) বার্লিন-লাইপ্‌ৎসিগ্‌-হবাইমার পথে প্রথম আকাশ লাইন খুলিল। তখন হইতেই জার্ম্মাণিতে বাণিজ্যিক এভিয়েশন আরম্ভ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

অল্প কিছুকাল পরে ঐ কোম্পানী আরও কতকগুলি "দেশী" লাইন খুলিল। খরচ অবশ্য বেশী বেশী হইতে লাগিল। মাল-যাতায়াতের পরিমাণও অল্প হইল। কিন্তু চলাফেরার দিক্ হইতে বেশ সুবিধা হইল।

১৯২০ সনে এই কোম্পানী জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে সাবসিডি পাইল। সাবসিডির নিয়ম হইল, দূরত্ব অনুযায়ী মার্ক দেওয়া হইবে। এই আর্থিক সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া কতকগুলি ছোট কোম্পানী চলাফেরার জন্য আকাশযান চালাইতে লাগিল। এগুলি সবই দেশী বা শুধু দেশের মধ্যে আবদ্ধ রহিল।

২

১৯২১ সনের শেষ দিকে ড্যয়টশে লুফ্‌ট্ রেএডেরাইর সহযোগী রূপে এক কোম্পানী স্থাপিত হইল। নাম ডেরুলুফ্‌ট্ আগারে। কোম্পানীগুলির কার্য্যাবলী দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। এই কোম্পানী বিদেশের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইল। ফলে জার্ম্মাণি হইতে রুশিয়া অবধি এক আকাশ-পথ খোলা হইল। পরে এই পথ জার্ম্মাণি ও রুশিয়ার বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষারও উপায় হইল। অর্থাৎ জার্ম্মাণি আকাশ-পথে রুশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালাইতে লাগিল।

ছোট ছোট কোম্পানীগুলি কিন্তু অবিলম্বে পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইল। কারণ দুইটা।—

(১) আর্থিক অবস্থার জন্য জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট সাবসিডি কমাইয়া দিতে বাধ্য হইল।

(২) ১৯২১ সনের মে মাসে লণ্ডন "এগ্রিমেণ্ট" বা সমঝৌতা করা হইয়াছিল। তার "নব ধারা" বা "নাইন

রুল" অনুসারে জার্ম্মাণি নভশ্চরণ সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল।

৩

আমেরিকায় ও জার্ম্মাণিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নয়া লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। দুই বা ততোঽধিক প্রতিষ্ঠান মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। এই একাকারের নাম ট্রাষ্ট ও কার্টেল বা "সঙ্ঘ"। এই সঙ্ঘ-প্রবণতা জার্ম্মাণির আকাশপথেও দেখা দিয়াছে।

উপরি উক্ত দুই প্রতিকূল ঘটনায় জার্ম্মাণির উন্নতি বাধা পাইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৩ সনের বসন্ত কালে দুই আকাশ যান কোম্পানী গঠিত হয়।

কোম্পানী দুইটার নাম—এয়ারো লয়েড ও জুঙ্কের্স। তন্মধ্যে প্রথমটা আগেকার অধিকাংশ আকাশগামী কোম্পানী লইয়া গঠিত। এক জুঙ্কের্স ব্যতীত জার্ম্মাণির সমগ্র আকাশ-যান-নির্ম্মাতা বেপারীরা ইহাকে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু জুঙ্কের্স প্রতিষ্ঠান নিজে নিজে এক আকাশ-যান কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে।

অতঃপর ৩ বছর ধরিয়া এই দুই কোম্পানী পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ায় ও একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকে।

কিন্তু গত বছর (১৯২৬) এই দুই কোম্পানী একত্রে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নাম হইয়াছে ডায়টশে লুফ্‌ট্‌ হান্‌সা এ জি। ইহাই এখন জার্ম্মাণির একমাত্র আকাশ-পারাপারের জন্য মোতায়েন কোম্পানী।

৪

জার্ম্মাণির অন্য সব আকাশযান কোম্পানী একদম উঠিয়া গিয়াছে, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিন্তু এগুলির কার্য্যকলাপ শুধু জিলার মধ্যেই আবদ্ধ। আর এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জার্ম্মাণদের মনে নভশ্চরণ-সম্বন্ধে কৌতুহল ও ব্যগ্রতা জাগ্রত করা। পারাপারের ব্যবস্থাটা লুফ্‌ট্‌ হান্‌সার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। এগুলি ঐ কোম্পানী ও অন্যদিকে জার্ম্মাণ রাইখের ভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে মধ্যবর্ত্তীর কাজ করে।

ব্যবসায়ী লোক ও গবর্মেণ্ট, রাষ্ট্র ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিনিধি লইয়া এই কোম্পানীর বোর্ড অব্‌ ডিরেক্টর গঠিত। তাছাড়া একটা টেক্‌নিক্যাল উপদেশ-কমিটি আছে। তাতে জার্ম্মাণ আকাশযান নির্ম্মাণ ব্যবসার বড় বড় মাথা রহিয়াছে।

বড় বড় শহরে ম্যানেজার নিযুক্ত রহিয়াছে। তাদের তলে গ্রাউণ্ড ম্যানেজার বা মাঠ ম্যানেজার কাজ করিতেছে। এই মাঠ ম্যানেজারের তাঁবে রহিয়াছে তার নিজ জিলার এয়ারোড্রোম্‌ বা আকাশ ঘরগুলি।

জার্ম্মাণির বাণিজ্যিক নভশ্চরণে আয় বেশী হয় না। চালাইতে যত খরচ হয় তার মাত্র ৩০°/০ ভাগ উঠে। বাকীটা আসে হয় গবর্মেণ্ট প্রদত্ত স্যাবসিডি হইতে, নয়ত রাষ্ট্র, কমিউন ও নানা কর্পোরেশ্যন প্রদত্ত সাবসিডি হইতে।

সাধারণতঃ আন্তর্জ্জাতিক লাইনগুলি গবর্মেণ্টের সাহায্য পায়। আর দেশী লাইনগুলিকে অন্যান্যেরা টাকা দেয়।

৬। জার্ম্মাণ ব্যবসার নয়া মূর্ত্তি

যুদ্ধ হেতু ইয়োরোপের আর্থিক ও বাণিজ্যিক অনিশ্চিত অবস্থা ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। নানা দেশের শিক্ষাতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল বলিয়া শিল্প-কারবারগুলিকে নানাপ্রকার কৃত্রিম সাহায্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। তাহা এখন আর দরকার হইতেছে না। কিন্তু কতকগুলি বাধা রহিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের পর একটা লক্ষণ সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সব দেশ প্রাণপণে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। আর অবাধ বাণিজ্যের বোলচাল যতই কেন ঝাড়ুক না, প্রত্যেক দেশের লক্ষ্য হইয়াছে কি করিয়া নয়া নয়া শিল্প ও ব্যবসা মাথা খাড়া করে ও পুরানা ব্যবসাগুলি আরও জোর পায়।

আর্থিক দুনিয়ার নূতন যুগ

ব্যবসায়ী দেশগুলির পক্ষে আজিকার প্রধান আশঙ্কা অত্যধিক উৎপাদন নয়, কিন্তু কম খাদন। যত দরকার তার চেয়ে বেশী উৎপাদন হইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

খরচ বা খাদনটা বাড়িতেছে না। আর্থিক দুনিয়ার এই ভাবটা স্থায়ী ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে জার্ম্মাণি, বৃটেন, সুইট্‌সারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে বিব্রত হইতে হইতেছে।

উপায় কি? উপায় হইতেছে উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া অথবা পরস্পর ভীষণ ভাবে বাণিজ্যিক লড়াই আরম্ভ করা।

অতি উৎপাদনের ফল জার্ম্মাণিতে ট্রাষ্টের উৎপত্তি ও দুই বা ততোঽধিক ট্রাষ্ট মিলিয়া একত্র হওয়া, ফ্রান্সে নূতন টারিফের আয়োজন, ও কোন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা।

জার্ম্মাণ প্রচেষ্টা

দুনিয়ার এই শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাসে নানা কারণে সকলের চোখ জার্ম্মাণির উপর পড়িয়াছে। ড'স প্ল্যান্ ইয়োরোপীয় প্রধান দেশগুলিতে বাণিজ্যিক সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ঐ ড'স্ প্ল্যানের দরুণই জার্ম্মাণিকে একটা শক্তিশালী রপ্তানি-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে হইতেছে।

সুতরাং জার্ম্মাণি অন্যান্য জাতির সঙ্গে পাল্লায় জিতিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তার দ্রব্যাদির উৎকর্ষ বাড়াইতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরটা যদি সস্তা না হয়, তবে জার্ম্মাণ দ্রব্য ভাল হইলেও লোকে কিনিবে না। জার্ম্মাণিকে দুই দিকে নজর রাখিয়া কাজ করিতে হইতেছে। তার জিনিষ ভাল হইবে অথচ অন্য দেশের জিনিষের তুলনায় আক্রা হইবে না।

জার্ম্মাণি প্রস্তুত হইয়া লড়াইয়ের আসরে নামিতেছে। বলা বাহুল্য, জার্ম্মাণির বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রণালী সমগ্র দুনিয়ার ব্যবসায়-জগতে কিছু না কিছু হেরফের্ ঘটাইয়াছে। কারণ জার্ম্মাণির এই উন্নতির অর্থ বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্রের কারবারীদের সমূহ ক্ষতি। সুতরাং জার্ম্মাণির নব কার্য্যধারাটা বুঝিয়া দেখিবার বস্তু।

যুক্তরাষ্ট্র বনাম বৃটেন—ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন

কোন্ অস্ত্রবলে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করা যায় নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। উৎপাদনে উৎকর্ষসাধন করিলেই সব সময় জিতা যায় না। অর্গানিজেশন বা তত্ত্বাবধান ও গঠন-ক্রিয়া বেশী কার্য্যকরী হইতে পারে।

বৃটেনের ব্যবসায়ী কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে, বাণিজ্য-জগতে আমেরিকার প্রতিষ্ঠার হেতু যন্ত্রের ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন মাত্র। বস্তুতঃ, উৎকর্ষে বল, ডিজাইনের শ্রেষ্ঠতায় বল, এবং বহুক্ষেত্রে দরে বল, বৃটিশ ব্যবসায়ী জানে, সে আমেরিকান্‌কে হটাইয়া দিতে পারিবে। অবশ্য তার দ্রব্যের জন্য চাহিদা যদি থাকে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন বা সমতা-রক্ষা করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করা বৃটেনে চরম অবস্থায় গিয়া পৌছিয়াছে। আমেরিকা এ বিষয়ে বৃটেনের সমকক্ষ কি না সন্দেহ। বরং বৃটেনে অতি ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশনের কুফল দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা উৎপাদনকে গতিরহিত করিয়া রাখে। নূতন নূতন আবিষ্কার ও গবেষণায় নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বৃথা হইয়া যায়। অবশ্য আবার নূতন ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন হইতে পারে। কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছু করা হয় না। ইতিমধ্যে অন্যেরা সুযোগটা রীতিমত গ্রহণ করিয়া ফেলে।

বৃটিশ কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার ও ডিজাইনার যে বিশেষ করিয়া রপ্তানিমূলক ব্যবসায়ে আপনাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বাহাদুরি দেখাইয়াছে তাতে সন্দেহমাত্র নাই।

আমেরিকার কৃতিত্ব না সৌভাগ্য

তবে বৃটেনের তুলনায় আমেরিকার কি সুবিধা রহিয়াছে যে আমেরিকা বৃটেনকে পশ্চাৎপদ করিয়াছে?

আমেরিকান্ কারবারী "লার্জস্কেল প্রডাক্‌শন" বা এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ উৎপাদনের "হাড়হদ্দ" শিখিয়া ফেলিয়াছে ও প্রত্যেক ব্যবসায়কে ঐ উপায়ে দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে।

তার হাতের বোমা দুইটা—(১) স্তূপাকার উৎপাদন প্রণালী ব্যবহার করিবার অন্ধিসন্ধি সে ভাল করিয়া জানে; (২) নিজের দেশের বাজারে কি করিয়া দরটাকে ইচ্ছামত

বাঁধিয়া রাখা যায় তার মর্ম্ম-কথা বুঝিয়াছে। সে দেশের মধ্যে একটা দর-লড়াই চালায়। অন্য দেশের জিনিষগুলির উপর এমনভাবে শুল্ক ইত্যাদি সরকারকে দিয়া বসাইয়াছে যে, সেগুলির দর সর্ব্বদাই দেশী জিনিষের দরের চেয়ে বেশী হইতে বাধ্য হয়। দেশের মধ্যে চড়া দর পায় বলিয়া আমেরিকান্ বেপারীর বহির্ব্বাণিজ্যে কোন ক্ষতি হয় না। বরং সে দেদার পুঁজিপাটা খরচ করিতে সমর্থ হয় বিদেশী বাজারে তার জিনিষ বেচিবার জন্য। তার সমগ্র বিক্রয়ের ৯২% টা দেশের বাজারে হয়, আর ৮% মাত্র হয় বিদেশে। এই ৮% দ্রব্য সে অসম্ভব রকম সস্তা দরে বেচিতে সমর্থ হয়।

এই দুই উপায়ে আমেরিকান্ ব্যবসায়ের মুনাফা-অর্জ্জনের ক্ষমতাটা যেন বাড়িল। বৃটেন যদি এই দুই উপায় অবলম্বন করে তবে বৃটেনের কি তুল্যরূপ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে?

আসল কথা বৃটেন এই দুই উপায় পুরাপুরি খাটাইতে পারিতেছে না। বৃটেনের জিনিষ বেচিবার বাজার এত বড় নয়।

একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, দুনিয়ার চাহিদা-বাজারের ৪০% অংশ আজ আমেরিকার হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। এই চাহিদাকে মিটাইবার জন্যই আমেরিকা ক্রমাগত তার উৎপাদন ও যোগান বাড়াইতে পারিতেছে। বলা বাহুল্য এই চাহিদাটা তার নিজ দেশের মধ্যেই অর্থাৎ দুই আমেরিকাতে। কিন্তু নিজ দেশের মধ্যে এই চাহিদার সৃষ্টি বৃটেনও করিতে পারে না, জার্ম্মাণিও করিতে পারে না।

কোন ব্যবসায়-বিশেষের মোট টার্ণওভার ৬ কোটি পাউণ্ড। অন্যটার ৬০ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয়টাকে কয়েকটা খণ্ড খণ্ড খুব বড় প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত করা যত সহজ, প্রথমটাকে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসারূপে পরিণত করা তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন। অবশ্য আমেরিকা ও বৃটেনের ব্যবসায়ের অনুপাত ১০:১ নয়। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায় ৪:১ অনুপাতে।

বৃটেন ও জার্ম্মাণি

বৃটেন ও জার্ম্মাণিতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন শিল্প-কারবারে "এক সঙ্গে রাশীকৃত উৎপাদন"-প্রণালী অনুসৃত হইবার সুবিধা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাতে বাণিজ্য-সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল হইয়াছে।

ফল হইয়াছে বাণিজ্যে বেশী উঠা-নামা, পরস্পর ঘোরতর কামড়া-কামড়ি এবং মুনাফার ঘর কমিতে কমিতে শূন্যে গিয়া পৌঁছা।

আদায় বনাম পারদর্শিতা—লড়াই

ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধি কিসে হয়? কিসের উপর নির্ভর করে? আদায়ের উপর না পারদর্শিতার উপর?

পারদর্শিতা কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। সাধারণ লোকের ধারণা, প্রতি শ্রমিক বা কারিগরের শক্তি বাড়াইতে পারিলে অর্থাৎ কার্য্য-ক্ষমতা বা কার্য্য-দক্ষতা বাড়াইতে পারিলে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে জয়ী হওয়া যায়।

কারিগরের শক্তি বাড়াইবার একটা উপায় হইতেছে তার হাতে যন্ত্র বা কল তুলিয়া দেওয়া। কলের শক্তি মানুষের শক্তিকে বহুগুণ বাড়াইয়া দিতে পারে। যে মানুষ যত বেশী শক্তিমান্ কল ব্যবহার করিতে জানে, সে তত বেশী কাজ যথাসময়ে করিতে পারিবে।

শক্তিটার মাপ হইবার রীতি অশ্ব-শক্তিতে। একটা ঘোড়া "স্বাভাবিক" অবস্থায় গড়ে যে পরিমাণ বেগে দৌড়ায় তাই হইল অশ্ব-শক্তি। কলের শক্তি—তা মোটরের হোক্ বা ট্রেণের হোক্ বা জাহাজের হোক্ বা আর কিছুর হোক্—মাপিয়া বলা হয় ইহার এতটা অশ্বশক্তি।

সাধারণের বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ে নিযুক্ত প্রত্যেক মজুরের পিছনে ৪ অশ্ব-শক্তি বলের কল ও যন্ত্র রহিয়াছে অথচ বৃটেনের আছে মাত্র ১ অশ্ব-শক্তির যন্ত্রপাতি।

সত্য কথা এই যে, উৎপাদন সেন্সাস অনুসারে আমেরিকান ব্যবসায়ে ১৯২৪ সনে মোট প্রাথমিক সামর্থ্যের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ অশ্ব-শক্তি অর্থাৎ মজুর প্রতি ১ অশ্ব-শক্তির কিঞ্চিৎ বেশী; জার্ম্মাণিতে ১৯২৪ সনে উহা জনপ্রতি ১ অশ্ব-শক্তির প্রমান ছিল; বৃটেনেও তদ্বৎ। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই যন্ত্র-সামর্থ্যের পরস্পর তুলনা দ্বারা পারদর্শিতার পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। বরং

ইহা হইতে শুধু বোঝা যায়, কোন্ দেশ কত বেশী ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েলিষ্ট বা ব্যবসা-প্রবণ হইয়াছে।

কিন্তু যন্ত্রপাতি কোন্ স্থানে কি পরিমাণে না থামিয়া ক্রমাগত ব্যবহৃত হইতেছে—সেই কথাটা বেশী গুরুতর। অথচ এখানেই প্রতিকূল অবস্থা তুলনাটা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে।

বাজারের অবস্থা যদি স্থায়ী ও বেশ আশাজনক হয়, ম্যানুফ্যাক্‌চারীং যন্ত্রাদির জন্য ক্রমাগত চাহিদা বাড়িতে থাকিবে। তাতে জন প্রতি ও যন্ত্রাদির অশ্ব-শক্তি প্রতি আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। অন্যদিকে বৃটেন ও জার্ম্মাণির মত চাহিদায় উঠানামা থাকিলে আদায় বাড়িবার সম্ভাবনা কম। যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া কয়লার খনিতে এবং লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে মজুর প্রতি ও অশ্ব-শক্তি প্রতি আদায়ের পরিমাণ বৃটেনের চেয়ে বেশী।

তুলনায় বিপদ

দুই পারদর্শিতার তুলনায় এক রকম বিপদের কথা বলা হইল। আরও একটা বিপদ আছে।

এক ব্যবসায়-যন্ত্রের ভিতরকার ডিজাইন্ ও কর্ম্মক্ষমতা অন্য যন্ত্রের চেয়ে এতটা আলাদা হইতে পারে যে, উভয়ের তুলনা দ্বারা কোন ঠিক ফল পাওয়া না যাইতেও পারে।

ধর ম্যানুফ্যাক্‌চারীং প্রক্রিয়াগুলিকে বিদ্যুতের সাহায্যে সম্পন্ন করা আধুনিক "সাজসজ্জার" একটা লক্ষণ। ১৯২৪ সনে যে ইলেকট্রিক মোটর যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত হইয়াছে, তার মোট সামর্থ্য ছিল ২ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার অশ্বশক্তি বা মোট মৌলিক শক্তির ৬৫°/০। সেই সময় বৃটেনে উহা ৫০ লক্ষ অশ্ব-শক্তি ছিল বা ৪৫°/০।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ফস্ করিয়া বলিয়া দেওয়া যায় না কোন্ দেশ কিরূপ পারদর্শী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা বা সমৃদ্ধি একমাত্র পারদর্শিতা নহে।

ব্যবসার একটা খুব বড় কথা শাসন-ব্যাপার। শাসন ব্যাপার বলিতে বুঝিতে হইবে উৎপাদনে অর্গানিজেশন বা শৃঙ্খলা-বিধান, ম্যানুফ্যাক্‌চারীং ও বিক্রয় কার্য্যাবলীর কো-অর্ডিনেশন বা সু-ব্যবস্থা এরূপ ভাবে করা যেন প্রভূততম ফল পাওয়া যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ধরণের যন্ত্রাদিকে বেশ গুছাইয়া কাজে লাগান ইহার অন্তর্গত।

বস্তুতঃ, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং উৎপাদন-যন্ত্রের উৎকর্ষসাধনের দিকে আজ সমগ্র মনোযোগ সর্ব্বাগ্রে দিতে হইতেছে। জার্ম্মাণি এই দুই দিকেই তার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজিত করিয়া ব্যবসায়-জগতে অগ্রণী হইতে চাহিতেছে।

৭। জার্ম্মাণির শিক্ষা-ব্যবস্থা

১৯২৫-২৬ সনের শীত টার্মে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে জার্ম্মাণ পড়ুয়ার মোট সংখ্যা ছিল ৮২,৬০২। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৩,০০০ জন মাত্র পড়িত। মনে রাখিতে হইবে, এটা আমাদের এম, এ'র ছাত্রদের সঙ্গে তুলনীয়।

ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুই টার্ম হইতে ১৯২৫-২৬ সনের শীত টার্মের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১% ও ৪% বেশী।

১

১৯২৫-২৬ সনের শীতকালে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ৬,৯৮৩ জন নারী পড়ুয়ার নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে। পূর্ব্ব টার্মের সংখ্যা ছিল ৬,৯২৩ জন।

আমাদের দেশে এককালে ছাত্রদের মধ্যে দর্শন পড়িবার বাতিক ও পিপাসা খুব প্রবল ছিল। আজ ৫।৭ বছর ধরিয়া গতি ফিরিয়াছে। সহজে কেহ দর্শন পড়িতে যায় না। জার্ম্মাণিতেও ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে "থিওলজি" বা ধর্ম্ম-দর্শন পড়িবার ঝোঁক ঐরূপ ছিল। প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক এই উভয়প্রকার ধর্ম্ম-দর্শনের ছাত্র কমিয়াছে।

রসায়নবিদ্যায়, ফার্ম্মাসীতে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতেও ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের দেশে এই তিনটাতেই ছাত্র বাড়িতেছে।

দন্তবিজ্ঞান, পশু-চিকিৎসা, টেক্‌নিক্যাল বিষয় এবং ফাইলোলজি বা শব্দতত্ত্বের পড়ুয়ার সংখ্যা স্পষ্টই বাড়িয়াছে।

১৯২৫-২৬ সনের শীতকালে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে মোট ডাক্তারি-পড়া ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৬,৪৩৮।

এই অসম্পূর্ণ তালিকা হইতেই বর্ত্তমান জার্ম্মাণির মতিগতি কিছু বুঝা যাইবে। সমগ্র জার্ম্মাণ জাত্ জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নত করিতে চায়, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সংক্রান্ত পটুতা

লাভ করিতে চায়, আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যকে অধিকতর প্রসারিত করিতে চায়।

২

জার্ম্মাণিতে মৃত্যু-হার কমিতেছে। কিন্তু লোকবল বাড়িতেছে। বিশ্বজনীন রণ-শিক্ষার পরিবর্ত্তে বিশ্বজনীন খেলার প্রচলন হইতেছে।

জার্ম্মাণিকে বাণিজ্য-জগতে পূর্ব্বের স্থান অধিকার করিতে হইবে। সেজন্য দরকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা। বিদেশী বাজার দখল করিতে হইলে টেক্‌নিক্যাল পারদর্শিতা, ব্যবসায় শৃঙ্খলা-বিধান ইত্যাদি ত চাই-ই, আরও একটা জিনিষ চাই। যে দেশে জিনিষ বেচিতে হইবে সে দেশের ভাষাটা ভাল করিয়া জানা থাকিলে খুব সুবিধা হয়। এইজন্য বহু জার্ম্মাণ পড়ুয়া আজ রুশ, স্পানিশ, ইংরেজী, ইতালিয়ান্, ফার্সি, তুরস্ক এবং হিন্দুস্থানী ভাষা পড়িতে আরম্ভ করিতেছে। এত বেশী ছাত্র কোনদিন বিদেশী ভাষা পড়ে নাই।

৩

ভারতের লোক-সংখ্যা জার্ম্মাণির পাঁচ গুণ। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালী জার্ম্মাণির মত উৎকৃষ্ট নয়। যদি ঐরূপ শিক্ষা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাওয়া সম্ভব হইত, তবে জার্ম্মাণির তুলনায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৪লক্ষ হওয়া উচিত ছিল ও নারী ছাত্রীর সংখ্যা ২৮,০০০ হওয়া উচিত ছিল।

ভারতের মৃত্যু-হার জার্ম্মাণির দ্বিগুণ। জার্ম্মাণিতে নিবারণ-যোগ্য ম্যালেরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি নিত্যকার ভারতীয় পীড়ার প্রকোপ নাই। অন্য যে কোন সভ্য দেশের চেয়ে ভারতে ডাক্তারি শিক্ষার অনেক বেশী প্রয়োজন।

তবু যদি ধরিয়া নেওয়া হয়, ভারতে ঠিক জার্ম্মাণির অনুপাতে ডাক্তারের দরকার, তবে ভারতীয় মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পড়িবার জন্য অন্ততঃ ৩২,০০০ পড়ুয়া দরকার।

টেক্‌নিক্যাল বিষয়, ডাক্তারি ও বিদেশী ভাষা শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশে শোচনীয়।

৪

কলা, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য পড়িবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্রেরা জার্ম্মাণিতে পড়িতে আসে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি ছাত্র পাঠায়। আগে রুশ, পোল, প্রভৃতি যাদের নিজদেশে শিক্ষা-সৌকর্য্য কম, তারাও জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা পাইত। ১৯২৫-২৬ সনের শীত টার্মে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও পলিটেক্‌নিক্ স্কুল-সমূহে ৭,৮০৪ জন বিদেশী ছাত্র পড়িত। কিন্তু তার আগের টার্মে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৮,৫৯৭।

বিদেশী ছাত্র কমিয়া যাওয়ায় শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ও রাজনীতি ধুরন্ধরদের মাথার টনক নড়িয়াছে। তারা মাথা ঘামাইতেছে—কেন এরূপ হইল? কিসে আরও বেশী বেশী ছাত্র টানিয়া আনা যায়?

বস্তুতঃ, জার্ম্মাণরা বিদেশী ছাত্রদের একপ্রকার সম্পদ্ বলিয়া বুঝিতে অভ্যস্ত। এই বিদেশী ছাত্রেরা জার্ম্মাণ কাল্‌চার, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রমত বিস্তারের মধ্যস্থ-বিশেষ।

রাইখ্‌ষ্টাগের বাজেট কমিশন সম্প্রতি ৫লক্ষ মার্ক বা প্রায় ৩লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এক অট্টালিকা তৈয়ারী করিবার জন্য দান করিয়াছে। বার্লিনে যে সব বিদেশী ছাত্র পড়াশুনা করিতে আসে, তাদের থাকিবার জন্য এই বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে।

তুরস্ক, জাপান ও চীন হইতে খুব বেশী ছাত্র আসে না। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে তার চেয়েও কম লোক আসে। অথচ জার্ম্মাণরা প্রাচ্য ছাত্রদের সংস্পর্শে বেশী করিয়া আসিতে চায়।

আর্থিক জীবনে পরের ধাপ*

আমি এঞ্জিনিয়ার নই, রাসায়নিক নই। রেল চালান আমার ব্যবসা নয়, লাঙ্গল চালান আমার ব্যবসা নয়। কারবার গড়ে' তোলায় আমার অভিজ্ঞতা নই। বিদেশী মাল দেশে এনে বেচা আর দেশী মাল বিদেশে পাঠান আমার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। ব্যবসা যদি থাকে, তবে কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি, বই মুখস্থ করা ইত্যাদি। ব্যস্। কাজেই আমার মতন লোকের কাছে ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের সভ্যেরা কিছু কাজের কথা আশা যদি করেন তার জন্য তাঁরাই দায়ী। আমার তাতে কোন দোষ নাই। আমি বেশ জানি যে, আমার মতন লোকের পক্ষে এই বণিক-সঙ্ঘে এসে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে দু'চারটা কথা বলা ঠিক তেমনি যেমন আজকে যদি কেহ আসামে বা জলপাইগুড়িতে চা নিয়ে ব্যবসা করতে যায়। আমি যদি ইংরেজ হতাম তাহলে বলতাম নিউ-কাস্‌ল মুলুকে কয়লা নিয়ে যাওয়া যা, বণিক-সঙ্ঘের সভ্যদের কাছে একটা "পড়ুয়া" লোকের ব্যবসা সম্বন্ধে কথা বলাও তাই।

আর একটা দুর্ব্বলতা কিছু গুরুতর রকমের। বণিক-সঙ্ঘের কেহ হাজার পতি, কেহ দশহাজার পতি, কেহ পঞ্চাশহাজার-পতি, কেহ লক্ষপতি কেহ কোটিপতি। টাকা ঢালাঢালি করা, টাকা চালাচালি করা হচ্ছে তাঁদের কাজ। আর আমার যে নসিব তাতে টাকার মুখ না দেখতে পাওয়াই হচ্ছে একপ্রকার স্বধর্ম্ম। আমরা হচ্ছি বেকার-দলের লোক, আমরা চাকরি-গত প্রাণ। চাকুরী জোটে না, যদি বা জোটে তাতে পেট ভরে না। এই অবস্থায় টাকাওয়ালা লোকের কাছে এসে কেমন করে অর্থলাভ হবে আমার মতন লোকের পক্ষে তার আলোচনা করা নেহাৎ ধৃষ্টতা। ধৃষ্টতা যদিও বটে তবু এসব বিষয়ে আলোচনা না করে' আমাদের উদ্ধার নাই। কেননা, টাকাওয়ালা আপনারা নতুন নতুন পথে টাকা যদি না খাটাতে ঝুঁকেন তাহলে বেকারের দল বাঁচতে পারেনা। কাজেই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা আমাদের চরম স্বার্থ।

দেশোন্নতির সীমানা

আর্থিক জীবনের আলোচনা করতে গিয়ে বছর বিশেক আগে ১৯০৫।৬।৭ সনে আমরা যে ধরণের কথা বলতাম, অন্ততঃ আমি যে ধরণের কথা বলেছি,—সে কথা আজ আর বলতে পারি না। তখনকার সুর ছিল—"দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আমার নিজের আশার কোনো সীমা নাই, সাহসের কোন ভয় নাই।" আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি,—দেশের সাধারণ উন্নতি কতটা সম্ভব কিংবা দেশ আর্থিক হিসাবে কতবড় হবে সেই সম্বন্ধে আমার চোখের সামনে কতকগুলা সীমানা দেখতে পাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমার আশার সীমা আছে। জোর জবরদস্তি করে' প্রাণপণ চেষ্টা করলেও সে সীমানার বাইরে দেশকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারবনা।

প্রথম কথা—আর্থিক হিসাবে দেশকে যত বড় করেই তুলিনা কেন, ১০।১২।১৫।২০।৩০ বৎসরের ভিতর ম্যাঞ্চেষ্টার বা লীড্‌সের বড় বড় ফ্যাক্টরী-কেন্দ্রকে কোন মতেই ধ্বসাতে পারবনা। ব্যবসা সম্বন্ধে আমরা বাঙালী বা ভারতবাসী যত-বড় হইনা কেন, লয়েড্‌স ব্যাঙ্ককে কোনদিনই পটল তোলাতে পারবনা। এই যে বৃটিশ ইণ্ডিয়াষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী আছে তাদের জাহাজে জাহাজে তালা লাগাতে পারবনা। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই। ইংরেজের সম্পদ্ আজ যা আছে তা বোধ হয় থাকবে। তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছেনা। বরং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে বলেই আমার সম্পূর্ণ ধারণা। আমাদের ভারতের উন্নতি

---

* বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অব্ কমার্স—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত (৪।৩।২৭)। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

যাকিছু হতে থাকবে তা ইংরেজের স্বার্থপুষ্টির বিরোধী কিনা সন্দেহ ইংরেজদের লাভালাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-সন্তানের লাভালাভ সুজড়িত। এইরূপই আমি বুঝতে পাচ্ছি।

দেশোন্নতির আর একটা সীমানার কথা বলা আবশ্যক। আজকালকার দুনিয়ায় আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এই চার দেশ যা কিছু করছে,—আর্থিক হিসাবে, এঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে, রাসায়নিক কারখানা হিসাবে, ব্যাঙ্ক হিসাবে যা কিছু খাড়া করছে, তার কাছাকাছি যাওয়া আমাদের যুবক বাংলা বা যুবক ভারতের পক্ষে অনেকদিন পর্য্যন্ত অসম্ভব। এরা দুনিয়া চালাচ্ছে। আমরা দূরে থেকে দুনিয়া কি ভাবে চলছে দেখতে পারি, মাথা যদি থাকে হয়ত কিছু বুঝলেও বুঝতে পারি। কিন্তু ওদের কাছাকাছি যাওয়া আগামী বিশ ত্রিশ বৎসরের ভিতর কোনমতেই সম্ভবপর নয়। এই সব কথা হয়ত অনেকের ভাল না লাগতে পারে। কিন্তু দেশোন্নতির একটা সীমানা স্বীকার করা আমার স্বদেশ-সেবার গোড়ার কথা। এই সব জাতি আজ সমাজের সু-কু, রাষ্ট্রের ভালমন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আদর্শ বা কার্য্য-প্রণালী প্রচার করে, যে ধাপে দাঁড়িয়ে তারা ফ্যাক্টরির যোসাবিদা করে, ব্যাঙ্কের সংগঠন করে আর আর্থিক জীবনের সংস্কার কায়েম করে, সে ধাপ বুঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা সে ধাপের অনেক নীচে রয়েছি। যে ধাপে আমরা রয়েছি এই সব ধাপ ইংরেজ ফরাসী জার্ম্মাণ আমেরিকান জাতিসমূহ ৩০।৪০।৫০।৬০ বৎসর আগে পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ আজ আমরা ভারতে যে ধাপে রয়েছি সেই ধাপ দুনিয়ার ১৮৩২।১৮৪৮।১৮৭০ সনের কাছা-কাছি। এই তুলনা বা অনুপাতটা যদি বুঝি তাহলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের দেশকে কৃষি-শিল্পের কোন্ পথে, এঞ্জিনিয়ারিংএর কোন্ লাইনে, ব্যবসার কোন্ ঘাঁটিতে চালাতে হবে কিছু কিছু বুঝতে পারব।

স্বদেশী আন্দোলন ও মহালড়াই

একটা কথা বারবার মনে হবে। আমরা এখন রয়েছি কোন্ ধাপে? আমরা আর্থিক জীবনের ঠিক কোন্ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি? চোখের সামনে যা দেখতে পাওয়া যায় তা আলোচনা করলে মনে হবে যে, বিগত বিশ বৎসরের ভিতর সব চেয়ে বড় বড় দু'টা শক্তি বাঙলায় ও ভারতে কাজ করেছে। (১) স্বদেশী আন্দোলন। আজ এখানে যাঁরা বসে আছেন কিংবা আজ যাঁরা বড়লোক হয়েছেন, তাঁদের অনেকে কোন না কোন রকমে স্বদেশী আন্দোলনকে পুষ্ট করে তুলেছেন। অথবা যাঁরা পুষ্ট করে তোলেন নি তাঁরা এই স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে নিজেকে বড় করে তুলেছেন। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের কৃতিত্ব-প্রভাব আজকে যুবক বাংলার ও যুবক ভারতের আর্থিক জীবনে খুব বেশী। (২) স্বদেশী আন্দোলনের মত আর একটা বড় শক্তি কাজ করেছে। সেটা হচ্ছে মহালড়াই (১৯১৪-১৮)। কুরুক্ষেত্রের এই চার পাঁচ বৎসরের ভিতর আমাদের দেশের যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ রসায়নবিদ্, কেহ ব্যাঙ্কার কেহ ব্যবসাদার—তাঁরা এক একটা "দাঁও" মেরেছেন। সেই সুযোগে আমরা অনেক জিনিষ কিছু না কিছু করে তুলেছি। ১৯২৭ সনে এই দুই শক্তিকে বাদ দিলে আমরা কিছু বুঝতে পারব না।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্বদেশী আন্দোলনই হউক কি মহালড়াই হউক দুই ধাক্কাতেই আমরা কৃষি শিল্প বাণিজ্যে যা কিছু করতে পেরেছি তার সঙ্গে ইংরেজ এবং বাঙালী (ও ভারতবাসী) উভয়ে জড়িত আছে। অর্থাৎ ইংরেজকে বয়কট করে, আমরা বড় হতে পারিনি। আমাদের আর্থিক জীবনের ধারা ইংরেজ-বাঙালীর, ইংরেজ-ভারতবাসীর মেলমেশে পরিপুষ্ট। যতই বয়কট করতে চেষ্টা করি না কেন শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এই—আজ ১৯২৭ সনে যে কয়জন করিৎ-কর্ম্মা ভারতবাসী দু'পয়সা করে খাচ্ছে তাদের কর্ম্মদক্ষতা, কৃতিত্ব, পটুত্ব সব জিনিষ ইংরেজের ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি সম্পদ্ ব্যাঙ্কের প্রসারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ নাই এমন এক ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। প্রেসিডেন্সি কলেজ সরকার-প্রতিষ্ঠিত কলেজ। এই জিনিষটার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজ, রিপন কলেজ

সিটি কলেজ ইত্যাদি বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই সকল কলেজের প্রভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজটার বেঞ্চগুলা খালি হয়ে গিয়েছে কি? হয় নি। প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে সঙ্গে এই সব কলেজ,—যাকে আপনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজ বলে থাকেন—চলেছে। ঠিক সেই-রূপই আমি বলছি যে, স্বদেশী আন্দোলন অথবা মহালড়াইয়ের হিড়িকে যে কয়জন করিৎকর্ম্মা লোক আমাদের দেশে জন্মেছে আর নতুন নতুন উপায়ে সম্পদ্ বৃদ্ধি করছে তারা অনেকেই লয়েডস ব্যাঙ্ক বা নর্থ-বৃটিশ ইন্‌শিওর‍্যান্স কোম্পানী বা অন্যান্য বিদেশী কারবারের ছায়ায় আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে। এই হচ্ছে প্রথম স্বীকার্য্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি

আজকাল পৃথিবীতে কোন্ শক্তির কাজ চলেছে বেশী? আর্থিক হিসাবে কোন্ কোন্ শক্তি দুনিয়াকে প্রভাবান্বিত করছে? প্রতিদিন একটা স্বদেশী আন্দোলন আসে না। প্রতিদিন দুনিয়ায় মহালড়াই উপস্থিত হয় না। তীর্থের কাকের মত কেহ বসে থাকে না কবে স্বদেশী আন্দোলন আসবে, কবে মহা লড়াই আসবে, আর সেই সুযোগে তারা কিছু করবে। এই রকম একটা একটা মহা-হুজুগের আশায় কেহ জীবন নষ্ট করে না। প্রতিদিন আটপৌরে কর্ত্তব্য করে' সকলে চলে। ইংরেজ ফরাসী, মার্কিণ, জার্ম্মাণ জাপানী চেষ্টা করছে, লড়াই আসুক বা না আসুক, বড় গোছের একটা আন্দোলন আসুক বা না আসুক, প্রতিদিন এমন ভাবে চলবে যেন যখন যা দরকার পড়ে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। ইংরেজ, জাপানী জার্ম্মাণ, ফরাসী নিজেকে কর্ম্মক্ষম করবার জন্য কত রকমে চেষ্টা করছে সে সব কথা বলে' সময় নষ্ট করতে চাইনা। একটা কথা মাত্র বলতে চাই। কতকগুলা জিনিষ আজকার পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক শক্তি। তার সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ আছে নিবিড় যদিও সে সব শক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ কিছু বলবনা। কিন্তু "বৃটিশ এম্পায়ার ডেভেলপ্‌মেণ্ট" বা বৃটিশ সাম্রাজ্যপুষ্টি নামে একটা আন্দোলন চলছে। সে জবর শক্তি। গোটা পৃথিবীতে তার প্রভাব রয়েছে। ফ্রান্স-জার্ম্মাণি-জাপান-আমেরিকায় কি ভাবে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করছে সেটা দেখাতে চাই না। এই শক্তিটা ভারতবাসীর উপর যে প্রভাব এনে ফেলেছে সেইটা দেখাতে চাই। স্বদেশী আন্দোলনে যেমন শক্তি ছিল, লড়াইয়ে যেমন শক্তি ছিল, তেমনি, স্বদেশী আন্দোলন ও লড়াইয়ের উন্মাদনা না থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি নামক আন্দোলন ভারতের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করছে। এতে আমাদের আর্থিক জীবন কি রকম ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে অতি সামান্য ভাবে তার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়ে যাচ্ছি।

ইংরেজ বুঝেছে যে, ভারতবর্ষকে আর্থিক হিসাবে কিছু মজবুত করে না তুল্লে তারা আর বাঁচতে পারবে না। অর্থাৎ ভারতবাসীকে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে, রাসায়নিক হিসাবে, যন্ত্রবীর হিসাবে চাষী হিসাবে ওস্তাদ না করে' তুল্লে, ব্যাঙ্ক পরিচালন হিসাবে তাহাদিগকে খানিকটা প্রশ্রয় না দিলে, জাপানের বিরুদ্ধে, রুশিয়ার বিরুদ্ধে, তুর্কীর বিরুদ্ধে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে তখন ইংরেজ ফেল মারতে বাধ্য। এই প্রথম কথা। কথাটা প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক, আন্তর্জ্জাতিক, সামরিক। কিন্তু আমি ওদিক থেকে কিছু বলতে চাইনা। ঘোড়াকে দিয়ে যদি গাড়ী টানাতে হয় তাহলে তার খোরপোষ দেওয়া আবশ্যক। ঘোড়াকে মেরে ফেলা কোন ঘোড়াওয়ালার উদ্দেশ্য হতে পারে না। তেমনি ভারতের নগর ও শহর-গুলি যদি মজবুত হয়ে না উঠে তাহলে যথার্থ কাজের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বা ইংরেজ জাতির এই স্বার্থের ভিতর ভারতবাসীর স্বার্থও প্রচুর। ভারতের মধ্যে যদি কোন হুসিয়ার লোক থাকে সে লোক এই শক্তিটাকে নিজ কাজে লাগাতে পারবে। আমাদের যাঁরা এঞ্জিনিয়ার ব্যবসাদার ব্যাঙ্কার চাষ-ব্যবসায়ী, জমীদার, তাঁরা এই সুযোগে নতুন কিছু দাঁড় করাবার সুবিধা পেতে পারেন। এই শক্তি সম্বন্ধে যদিও আমরা সজাগ নই তবু আমার বিবেচনায় এটা একটা বিপুল শক্তি।

ভারতীয় ও বৃটিশ শুল্ক-নীতি

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'কি কি লক্ষণ দেখ্‌ছ যাতে আমরা ভাবতে পারি যে, বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষকে পোক্ত করে তোলা ইংরেজরা নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে? গোটা কয়েক তথ্যের উল্লেখ করব। প্রথমতঃ শুল্ক-নীতি (১) ভারতবর্ষের শুল্ক-নীতি (২) ইংরেজের শুল্ক-নীতি। ভারতবর্ষের শুল্কনীতিতে দেখতে পাই "সংরক্ষণ শুল্ক" নামক বস্তু একরকম দাঁড়িয়ে গেছে বা যাচ্ছে। আমাদের দেশে ছাপাখানার কাগজ, বই লিখবার কাগজ যে যে ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় তাকে বাঁচাবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক বসান হয়েছে পাউণ্ডে এক আনা। তারপর টিন প্লেটের কারবার বাঁচাবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক আছে। দিয়াশলাইয়ের শিল্পেও সংরক্ষণ বসেছে। লোহা লক্কড়ের ব্যবসাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা চলছে। যাতে এদেশে কতকগুলি কারবার দাঁড়ায় এবং তাতে কতকগুলি লোক, যেমন এঞ্জিনিয়ার, কেমিষ্ট ইত্যাদি জন্মায় তা দেখা বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টির একটা অঙ্গ। তা ছাড়া কোন কোন তাঁত শিল্প, বয়ন শিল্পের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্র আনতে হয়, না আনলে চলে না। সেই যন্ত্র পাতি যদি সস্তায় পাওয়া যায় তা হলে আমাদের শিল্প-বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়। তাঁত শিল্পের যন্ত্রপাতির জন্য আগে যেখানে শতকরা ১৫ টাকা শুল্ক দিতে হত এখন সেখানে ২॥০ টাকা দিতে হয়। এই শুল্ক-নীতি আমাদের দেশের কোন কোন কারবারকে ফুলিয়ে দিতে চলেছে।

এইবার বৃটিশ শুল্কনীতির দিকে তাকানো যাক্। ইংরেজের মাথায় ঢুকেছে তার স্বপক্ষে ভারতবাসীকে পক্ষপাতী করাতে হবে। ইংরেজ তার লোহালক্কড় সস্তায় বেচবার জন্য আমাদের ভজাতে চেষ্টা করছে, একথা ঠিক। কিন্তু অপর দিকে আমাদের কোন কোন জিনিষও পক্ষপাত-মূলক শুল্কনীতির দ্বারা নিজেদের ঘরে আমদানি করতে ইংরেজরা চেষ্টিত। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকেও বিলাতে চা কফি যায়। কিন্তু তারা যে শুল্ক দেয় ভারতবর্ষের চা কফি দেয় তার ⅙ অংশ মাত্র। ভারতীয় কিসমিস মনক্কা বা অন্যান্য শুকনা ফল—এ সব জিনিষকে বিলাতে অন্যান্য দেশের মালের সঙ্গে টক্কর দিতে হয় তাহলে শুল্ক দিয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু ইংরেজ বলছে, "এই ধরণের মাল ভারতবর্ষ থেকে আসলে আধ পয়সাও শুল্ক নিবনা।" তারপর রেশমের জিনিষ ধরুন। চীন জাপানের মাল যদি বিলাতে যায় পুরো শুল্ক দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের রেশম গেলে তিন-চতুর্থাংশ শুল্ক দিতে হয় মাত্র। ফিতা, তামাক, সিগার ইত্যাদি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ বিলাতের পক্ষপাত ভোগ করে। এই শুল্কনীতি থেকে বুঝা যায় কতটা কোন দিকে সাম্রাজ্য-পুষ্টির কাজ চলছে। এই হিসাবের ভিতর ভারতবর্ষের লাভের কথা একদম ফেলে দিলে চলবে না। অবশ্য আমি বলছি না যে, এতে আমরা স্বর্গে উঠেছি। শুধু বলতে চাই যে বৃটিশ সাম্রাজ্য বুঝেছে যে ভারতবর্ষকে একটা কর্ম্মক্ষম অঙ্গ করে তোলা আবশ্যক। সেই জন্য ভারতবর্ষকে অল্প বিস্তর সুযোগ সুবিধা, "পক্ষপাত" ইত্যাদি বিতরণ করা দরকার। একথা যদি বুঝি তা হলে আমাদের ভিতর যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক, জোয়ান লোক তাঁরা এই শক্তিকে নতুন শক্তি বিবেচনা করে' আজকালকার সংসারে উল্লেখ-যোগ্য অনেক-কিছু করতে পারেন।

যাঁরা হাজারপতি, দশ হাজার পতি, লক্ষপতি, কোটি-পতি তাঁরা ভেবে দেখুন বাস্তবিক এ সব সুযোগের কোন্ দিকে কাজ করলে নিজেরা লাভবান হতে পারবেন। টাকাওয়ালা লোকেরা যদি লাভবান হয় তাহলে বেকারের অন্ন জুটবে। আগেই বলেছি, টাকাওয়ালা লোকের টাকা জোটানো আমাদের স্বার্থ।

চাই বিদেশে বাঙালী আড়ৎ

এইবার কয়েকটা টাকা খাটাবার পথের কথা বলব। প্রথমতঃ বহির্ব্বাণিজ্যের কথা, মাল আমদানি রপ্তানি করার কথা। তিন হাজার রকমের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে লম্বা চওড়া অনেক বক্তৃতা চলতে পারে। সে সব কথা না বলে' বহির্ব্বাণিজ্যের একটা সামান্য অঙ্গের কথা বলছি। সেটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আড়ৎ কায়েম করা লাভবান হওয়ার একটা বড় উপায়। কি রকম? [illegible] আমেরিকার সওদাগরেরা আমাদের দেশে মাল বেচে। তারা বলতে পারে বাঙালী

ব্যবসাদার, রয়েছে, চিঠি লিখলে মাল পাঠাইলেই হবে", এই বলে তারা নিজ মুল্লুকে বসে রয়েছে কি? তারপর ভারতে আমেরিকার কনসাল রয়েছে। তার কাজ হচ্ছে ভারত-বর্ষের ভিতর কতগুলি দোকান, বাজার ও কোম্পানী আছে, কত রকমের আর্থিক আইন হল, সে সব কথা তার নিজের দেশকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার কোন্ কোন্ জিনিষ এখানকার বাজারে চলতে পারে, এখানকার লোকেরা কোন কোন জিনিষ পছন্দ করে ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ দেশে পাঠান কনসালের কাজ। কিন্তু কনসাল ত দুচারজন মাত্র। আমেরিকা দশকোটি নরনারীর দেশ। সকলে এই কয়জন কনসালের উপর নির্ভর করতে পারেনা। তাই মার্কিণ সওদাগরেরা এখানে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায়। দুই রকমের প্রতিনিধি। কেহ এদেশে এসে দোকান করে বসে। আর যারা দোকান করে বসেনা, তাদের প্রতিনিধিরা শীতকালের দু'তিন মাসে গোটা ভারত ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করে, অর্ডার পর্য্যন্ত নিয়ে যায়।

এইবার জাপান দেখুন। জাপানীদের ধরণ ধারণও মার্কিণদেরই মতন। এরা কলিকাতায় একটা প্রকাণ্ড দোকান খুলে বসেছে। নাম "ইন্দো-জাপানীজ কমার্শ্যাল মিউজিয়াম"—ইন্দো-জাপানী প্রদর্শনী। এই এই জিনিষ এখানে আছে, অর্ডার দাও, দূরে যেতে হবে না। যে মাল জাপান বেচে সেটা বাড়ীতে এনে দেখাবে। ইংরেজের ত কথাই নাই। মুল্লুকই ত ওদের। জার্ম্মাণি ফরাসী, ইতালিয়ান ইত্যাদি জাতের ধরণ ধারণ কি? তা এই। যে দেশের সঙ্গে ব্যবসা করবে সে দেশে গিয়ে এরা সকলেই আড়ৎ গাড়বে। তাতে নিজেদের ব্যবসা ৫।৭।১০ গুণ পর্য্যন্ত বড় করে তোলে।

ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি?

জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণি ইত্যাদির সঙ্গে বাঙালীর যে যে কারবার চলছে সেই সব কারবার যদি ভাল করে, চালাতে চান তাহলে তার জন্য এক একটা আড্ডা বা দোকান বিভিন্ন বিদেশে হাজির করা চাই। জিজ্ঞাসা করতে পারেন কোন্ কোন্ দেশে বাঙালীর আড়ৎ প্রতিষ্ঠা করা দরকার? বিলাতের কথা বলছিনা। ওত হাতের পাঁচ। ওদেশে যেতেত হবেই। দেখতে হবে আমাদের বাজার সব চেয়ে বড় কোন্ কোন্ জায়গায়। ভারতবর্ষ বিদেশে যত মাল বেচে তার ২৪/১০০ যায় বিলাতে। জাপানে যায় ১৫/১০০। জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব বেশী রাখা উচিত, কারণ তারা বড় খরিদ্দার। খরিদ্দার চটান ব্যবসাদারের স্বার্থ নয়। আমেরিকায় যায় ২১/১০০। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণিতে গিয়াছে ৬/১০০ অংশ। আগামী বৎসর যাবে হয়ত শতকরা ১০।১০॥০।১২। ফ্রান্সে ৫/১০০ আর ইতালিতে ৫/১০০। শতকরা ৫ অংশের মানে এই,—২০ ক্রোর টাকার মাল ভারত ইতালিতে বেচে। এই ৫টী দেশে বাঙালী ব্যবসাদারদের ৫।১০।২০।২৫টী আড়ৎ চলতে পারে যদি বলি তাহলে বেশী বলা হয় না। বিদেশে যারা এজেন্সী কায়েম করেছে তারা প্রত্যেকে কোটিপতি নয়। খুব কম খরচে দুনিয়ায় কারবার চালাতে পারা যায়। মাসিক হাজার টাকায়ও একটা আড়ৎ চলতে পারে। হুসিয়ার লোকদের মনে রাখা উচিত যে, আড়ৎ কায়েম করা একটা বড় ব্যবসা।

যানবাহনের ব্যবসা

এখন অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব। গোটা ভারতে কোটি কোটি টাকার মাল চলাচল করে। আমাদের মতন মামুলি লোকের বিবেচনায় লাখটাকা লাখটাকা দু'কুড়ি দশ টাকা। কাজেই মোটা মোটা টাকার তোড়ার কথা বলতে চাই না। অন্তর্ব্বাণিজ্যের এমন একটা দিকের নাম করতে চাই যেটা সম্বন্ধে আমাদের ধনী লোকেরা সাধারণতঃ কখনও বেশী ভাবেন না, বা এত কম ভাবেন যে, তাকে ভাবনার মধ্যেই গণ্য করা চলে না। আমরা জানি যে, বরিশালের মাল কলিকাতায় এনে বেচা হয়। আবার কলিকাতার বিদেশী মাল ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে যায়। এই কেনা-বেচাই কি বাণিজ্যের একমাত্র অঙ্গ? কিন্তু আর একটা জিনিষ রয়েছে সেদিকে সাধারণতঃ আমাদের নজর পড়ে না। মালটা যায় কি করে? যাতায়াতের পথ, গমনাগমনের সুযোগ, যানবাহন নামক বস্তু একটা বিপুল ব্যবসার সামগ্রী। তাতে কোটি কোটি টাকা খাটে, লাভও হয় তদ্রূপ। বিদেশীরা লাভ করে এই পথে

বিস্তর। এই ব্যবসাটার সাদা ইংরেজি নাম ট্রান্সপোর্ট। মালপত্র চলাচলের সুবিধা যারা করে তারা বড় মোটা হারে লাভ করে। একথা বাঙ্গালীর মগজে বসা আবশ্যক সহজেই প্রশ্ন উঠবে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান মাঝিমাল্লা এরাই আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করছে। এতে টাকাই বা কোথায় আর লাভই বা কোথায় ?

ছোট রেল

প্রথম নম্বর বলি স্থলপথের কথা। রেলের নাম শুনে অনেকে আঁৎকে উঠবেন। ই, বি, আর, বি, এন, আর এসব বাঙ্গালীর ক্ষমতায় কুলাবে না। রেল মস্ত কাণ্ড। আমি কিন্তু অতি-কিছু—কোটি কোটি টাকার কথা বলতে চাইনা। বলতে চাই যে, আমাদের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন লোকে মনে করত রেলে চড়লে জাত যাবে ধর্ম্ম যাবে। এখন এইটুকু হয়েছে যে, রেলে গেলে জাত যায় না, লোকে চড়তে চায়। অতএব ব্যবসাদার হিসাবে সকলেই বুঝতে পারে যে, রেল যদি সৃষ্টি করা যায় তা হলে লাভ আছে। কিন্তু রেল করা সোজা কথা নয়। ভারত সরকার বৎসরে হাজার মাইল রেল করছে। এখন পর্য্যন্ত ৬ বৎসরের যে বরাদ্দ রয়েছে তাতে দেখা যায় প্রতি বৎসর হাজার মাইল রেল হবে। আজ ৩৮ হাজার মাইল রয়েছে। ৬ বৎসরে ৪৪ হাজার মাইল হবে। এই যে বৎসরে হাজার মাইল হচ্ছে বা হবে, এর খরচপত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। সে সব এলাহি কারখানা। আমি দেখতে পাই বরিশালের লোক রেল চায়, খবরের কাগজ পড়ে বুঝেছি রেল না হলে তাদের অসুবিধা। গোয়ালন্দ জলপাইগুড়ির লোকেরা রেল হবে হবে শুনে খুশী। আমার বক্তব্য এই যে, ছোট খাট রেল চালান অতি-কিছু নয়। ওরা হাজার হাজার মাইল রেল করে' কোটি কোটি টাকা লাভ করছে। আমাদের টাকা নাই। কিন্তু বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলাতে এমন সুযোগ রয়েছে যে অনেক জায়গায় ২০।২৫ মাইল ব্যাপী ছোট ছোট রেল চালান যেতে পারে। না হয়, কেরোসিন তেল দিয়েই চালান যাবে, তাতেও হাতে খড়ি হতে পারে। ১৯০৫ সনে রেল চালাবার কথা শুনলে বাঙালীরা ভয় পেত। কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে ভয় হয়ত বেশী পায় না। বড় হাট কিংবা বড় জমীদারি কাছারী কিংবা বড় ষ্টেশন থেকে রেল চালান যেতে পারে। প্রত্যেক জিলাতে ১০।১৫। ২০।২৫ মাইলের এইরূপ পথ ৫।৭।১০টা আছে। যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে অথবা পার্টনারশিপ হিসাবে কেহ যদি মফঃস্বলে কিছু টাকা ঢালতে যান তাহলে তাঁরা লাভবান হবেন এবং আমাদের ন্যায় বেকার লোকেরও অন্ন জুটবে। উপেনবাবু যশোহর-ঝিনাইদহ রেল চালাচ্ছেন। তাঁর কাছে অনেক হদিশ পাওয়া যাবে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, যে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে, সে ধাপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে ২৯০০২ ফিট দেখতে চেষ্টা করলে ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। ১৯২৭ সনের দুনিয়ায় এরোপ্লেনের যুগ এসেছে। এখন যেন রেলের দরকার কিছু কমে আসছে। রেলে যাবে মাল। লোক যাবে বোধ হয় উড়ে।

ষ্টীম-নৌকা

এরোপ্লেনের যুগ হলেও জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান কেহ পানিকে ভুলেনি বরং দরিয়া আর খালের ইজ্জৎ বেড়ে উঠেছে। ঐ সব উন্নত দেশের ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা খালে-দরিয়ায় বেশ জেঁকে উঠছে। বৎসর কয়েক হল বিলাতে কমিশন বসেছিল। খাল-ও-দরিয়া-তদন্ত করবার জন্য। এই কমিশনের ফর্দ্দ উঁচু দরের জিনিষ। এ বিষয়ে ফরাসীরাও বেশ আগুয়ান হয়েছে। রোণ উপত্যকাকে খাল কেটে কি করতে হবে তাতে তারা মাথা খাটাচ্ছে। সকলকে হারিয়েছে জার্ম্মাণি। রাইণ ইত্যাদি ৪।৫টী নদী যা দক্ষিণ থেকে উত্তরের সাগরে গিয়ে পড়েছে, সেগুলাকে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে খালের সাহায্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে পশ্চিম জার্ম্মাণি থেকে খালে খালে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব। জার্ম্মাণিতে রেলের অভাব নাই। তা সত্ত্বেও তারা খাল কেটেছে আরও কাটছে। জার্ম্মাণিতে খাল প্রধানতঃ তিন কেন্দ্রের অন্তর্গত। একটা রাইণের দিক্‌কার, একটা হেবলারের দিক্‌কার আর একটী এলবের দিক্‌কার।

আর এই তিনটাকে ডানিয়ুবের সঙ্গে জুড়ে দিবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাহলে বাল্‌টিক সাগরের নোনা পানিতে না গিয়েও আর ইংলণ্ডের উত্তর সাগরের জল না মাড়িয়েও জার্ম্মাণি একেবারে রাইন থেকে ব্ল্যাক-সীতে এসে হাজির হতে পারবে। তার ফলে,—পরবর্ত্তী যে লড়াই আসছে তাতে জার্ম্মাণিকে আটলাণ্টিকে আসতে হবে না। বলকান অঞ্চলটা হাতে রেখে জার্ম্মাণি একদিকে রুশিয়ার আর অন্যদিকে তুর্কীর খাদ্য শস্য টেনে আনতে পারবে।

যাক্ এসব লম্বা চৌড়া কথা। কিন্তু এই যে আমাদের ছিপ, বজরা, পান্সী রয়েছে, এগুলিকে রাতারাতি ষ্টীম লঞ্চে পরিণত করতে পারা যায়। জাপানে তাই হয়েছে। জাপানের তোকিও থেকে পল্লীতে বেড়াতে যাবার সময় ঠিক মনে হয়েছে যেন বিক্রমপুরের মামুলী 'গয়নার নাওয়ের সওয়ারি'! শুধু তার ভিতর রয়েছে একটা এঞ্জিন। অর্থাৎ মেঘনায় আমাদের যে সব নৌকা চলে তার ভিতর একটা কেরোসিনের বা রেড়ীর তেলের এঞ্জিন যেই বসাবেন অমনি আপনাদের লাভের পথও হবে, মাল চলাচলের সুবিধাও হবে। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের কর্ম্ম-ক্ষেত্রও সৃষ্ট হবে। আজ বাঙ্‌লাদেশের অন্ততঃ দশ হাজার লোক এই ভাবে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সহায়তা করতে পারে। যানবাহনের ব্যবসায় প্রত্যেকেই কিছু কিছু টাকা নিজের ঘরে আনতে পারে।

মোটর বাস্

আর একবার ডাঙ্গায় আসা যাক্। রেল খাল রয়েছে, তা সত্ত্বেও সড়ক রাস্তা চলছে। সড়ক রাস্তাগুলিতে মাল চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। সে ব্যবস্থা—আপনারা জানেন—অমনিবাস্, অটোমোবিল, মোটর লরী। মফঃস্বলের প্রত্যেক জেলাতে যেখানে সরকারী কাছারী, বড় হাট বা গঞ্জ, অথবা কারবারের স্থান রয়েছে, সে সকল জায়গায় যেমন ছোট ছোট রেল চালাবার সুযোগ আছে, তেমনি এক একজন লোক কিংবা এক একটী কোম্পানী গোটা পাঁচেক মোটর লরী নিয়ে বসলে দু'পয়সা লাভ করতে পারে। আট দশ বিশ মাইলের যাওয়া আসার পথে এই রকম কল্কী অতি-কিছু নয়। বাংলায় ১৯০১ সনে অটোমোবিল বস্তুটাকে বিলাসের বস্তু বিবেচনা করা হত। আজ তা করা হয় না। ১৯২৬ সনের খবর দিচ্ছি। এই বৎসর আমরা আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স এবং বিলাত থেকে ২০ হাজার "অটোমোবিল, যার দাম ৪৷৷০ কোটি টাকা, হজম করেছি। ১৯১২-১৩ সনের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়,—যেখানে দু'হাজার অটোমোবিল, এক হাজার মোটর সাইকল ছিল বাস্ নামক বস্তু তখন ছিলই না,—আজ সেখানে ১৩ হাজার অটোমোবিল দু' হাজার মোটর সাইকল ও পাঁচহাজার বাস্ আসছে। যারা চলাফেরা করে তারা সকলে বিলাসের জন্য করে না। ডাক্তার উকিল, ব্যাঙ্কার ব্যবসাদার যারা বাস্ বা অটোমোবিলে চলাফেরা করে, তারা নিজ কর্ম্মদক্ষতার জন্য নিজের আয়-বৃদ্ধির পথ করে নেয়। অটোমোবিলের বিরুদ্ধে লোকের কোন রকম বিদ্বেষ আর নাই। বাংলার প্রত্যেক জেলাতে যদি ৫টী করে কোম্পানী খাড়া হয় তাহলে গোটা বাংলা দেশে কমসে কম একশ'টা কোম্পানী হবে। এই একশ' কোম্পানীর প্রত্যেকে যদি এক একটী জেলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম বেছে নিয়ে ৪।৫ খানি করে অটোমোবিল বা মোটর লরী চালায়, তাহলে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধা হবে, সঙ্গে সঙ্গে লাভবান হওয়ার পথ বেরিয়ে পড়বে।

ইয়োরামেরিকার একাল

এখানে আর একটী কথা বলে রাখা মন্দ নয়। ইয়োরামেরিকা আজকাল যে ধাপে রয়েছে তার তুলনায় আমি যা-কিছু বলে যাচ্ছি সবই নেহাৎ ছেলে খেলা মাত্র। সবই সে-কেলে ব্যবস্থার সামিল ছাড়া আর কিছু নয়। ওসকল দেশে রেল কোম্পানীগুলো মিলে একটা বিপুল "ট্রাষ্ট" গড়ে তুলছে। খালের আর একটা "ট্রাষ্ট।" সড়ক দিয়ে যানবাহন চালাবার আর একটা "ট্রাষ্ট" আছে। এই সকল প্রকার ট্রাষ্টের সমবেত কারবার আবার একটা বিপুল ট্রাষ্টরূপে দেখা দিচ্ছে। আর তার মাথায় রয়েছে গবর্মেণ্ট। অর্থাৎ যাতায়াতের যত প্রণালী হতে পারে সবই এক মাথা থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমি অত

উঁচু কথা বলি না। আমি বলছি বাঙ্‌লা দেশে ছোট খাট রেল চালাতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। ষ্টীম চালিত নৌকা চালাতে পারে, গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। অটোমোবিল চালাতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। এই তিনশ' কোম্পানী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ কারবার চালাতে সমর্থ।

তারপর কি করে বিদেশের বেপারীরা অটোমোবিল বেচে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। একটী বড় মার্কিণ ব্যাঙ্কের চিঠি পেয়েছি। এক কোম্পানী এক বৎসরে দু'লক্ষ অটোমোবিল বেচেছে। এর জন্য একটা স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক খাড়া হয়েছে। তার নাম অটোমোবিল ফিনান্সিং কোম্পানী। কি ভাবে তাদের কারবার চলে? যারা মাল খরিদ করছে, তাদের কাছে এসে কোম্পানী বলে "পয়সা না থাকে কোম্পানী পয়সা দিবে। দু'হাজার কি চার হাজার টাকার মাল তুমি কিনে নাও নিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে দাও। মাসে মাসে অত করে দিও।" অটোমোবিলটা তক্ষুণি বীমা করতে হবে। বীমার সার্টিফিকেট ব্যাঙ্ক নিজের হাতে রেখে দেয়। দু'খানা কাগজ (১) মাসে মাসে অত টাকা শুধবে (২) ইনসিওর সার্টিফিকেট। সে মাসে মাসে গুনে এই টাকা কোম্পানীকে দিবে, ব্যস। অটোমোবিল কোম্পানী এই প্রণালীতে দু' দশ বিশ কোটি টাকার কারবার করছে। এই ধরণের ব্যবসা গড়ে তুলতে হলে দেশের কর্ম্ম-ক্ষেত্র নানা দিকে কতটা ফুলে উঠা দরকার ভেবে দেখুন। ভারতবর্ষে এই ঢঙের ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা দরকার কিনা তার আলোচনা করছি না। সামান্য ভাবে ৪।৫ খানি অটোমোবিল খরিদ করে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা চলতে পারে কিনা তাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। তারপর যথাসময়ে উঁচু ধাপে পা ফেলা যাবে। এইভাবে চল্লে কারবার টেঁকসই হবার সম্ভাবনা আছে।

যন্ত্রপাতির কারখানা

আপনারা দেখছেন আমি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বলতে বলতে মোটের উপর যন্ত্রপাতির কথাই বলেছি। যন্ত্রপাতি ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না। দেশটাকে একমাত্র যন্ত্রপাতি দ্বারাই মজবুত করে তুলতে পারব এইরূপ আমার বিশ্বাস। এমন কি ম্যালেরিয়ার যমও যন্ত্রপাতি। ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে চান, জল ছেঁকে ফেলবার বন্দোবস্ত করতে হবে। যেমন ইতালি করেছে অথবা প্যানামায় করেছে মার্কিণরা। এসবই এঞ্জিনিয়ারিংয়ের মামলা। যাক্ সে কথা।

প্রথমেই বলেছি ছোট খাট রেলের কথা। তারপর ধরুন ষ্টীম-নৌকা ষ্টীমার ইত্যাদি। তৃতীয় নম্বর অটোমোবিল লরী। সব জিনিষেই লোহালক্কড় কব্জা স্ক্রু বা যন্ত্রপাতির কারবার। এই তিন মহলে বাংলাদেশের দু'চার শ' লোক যদি ব্যবসা করতে আরম্ভ করে, তক্ষুণি প্রত্যেক জেলাতে কতকগুলি ওয়ার্কশপ আবশ্যক হবে। প্রথমতঃ দরকার হবে অটোমোবিলের পায়া ভেঙ্গে গেলে তার মেরামত করা। ছোট খাট অংশ তৈয়ারী করাও আবশ্যক হবে। মেরামতের কারখানায় আনুষঙ্গিক ভাবে নানা কাজ এসে জুটবে বলে বিশ্বাস করি। যেখানে যেখানে কারখানা আছে সেখানে সেখানে বাড়ীঘরের কাজ, টেকনিক্যাল ইস্কুলের কাজ ইত্যাদি কাজ হতে পারে। পয়সাওয়ালা লোকেরা বলতে পারে—"আমার বাড়ীতে বিজলীর বাতি ও পাখা চালিয়ে দাও।" রেল ষ্টেশনের কাছে বড় গোছের কারখানা হতে পারে।

এই ধরণের কারবার বাঙলাদেশে একদম অজানা নয়। কেননা আজ বাঙ্‌লা দেশে ১৩৫টী এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে। তাতে ২১।২২ হাজার মজুর খাটছে। টাকাও খাটছে বিস্তর। কম সে কম বোধ হয় ২৫ কোটি। এই ১৩৫টার ভিতর ১০০টা বিদেশী। মাত্র ৩৫টা বাঙালীর কারবার। কলিকাতায় বা তার কাছাকাছি জায়গায় এগুলা চলছে। এই ৩৫টার তাঁবে প্রায় ১২শ' কি ১৫শ' লোক খাটছে। ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলে কোথাও এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বলে' কিছু নাই। বোধ হয় যা আছে সবই বিদেশী কোম্পানীর হাতে। আমার বক্তব্য যাঁদের টাকা আছে তাঁরা অটোমোবিল কারখানা, আয়রণ ফ্যাক্টরী ইত্যাদি নানা নামে লোহালক্কড়ের কারবার খুলবার জন্য মফঃস্বলে চলে গেলে পয়সা রোজগারের পথ বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠবে। আমাদের মফঃস্বলকে বড় করে তুলবার সঙ্গে সঙ্গে টাকা-

ওয়ালাদের ট্যাঁকেও কিছু আসবেই আসবে। সাবান, রাসায়নিক ওষুধ, সিগারেট, দিয়াশলাই ইত্যাদি ইত্যাদি যে কারবারের কথাই বলুন প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি দরকার। অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়ে বর্ত্তমান যুগ চলতে পারে না। কাজেই যন্ত্রপাতির কারখানা খুললে পুঁজিপতির লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

নতুন ঢঙের জমীদার

অনেক সময়ে মনে হয়েছে, চাষবাসে কেন লোক ঢুকবে না। অনেকে মনে করেন চাষবাসে টাকা ঢালা ক্ষতিকর। অবশ্য যার চরম মাত্র দু'তিন বিঘা জমি, তার পক্ষে জমি থেকে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে বেশী টাকা রোজগারের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চাষের ব্যবসাকে যদি এঞ্জি-নিয়ারিংএর মধ্যে এনে ফেলতে পারি তাহলে টাকা রোজ-গারের পথ আছে সুবিস্তৃত। অর্থাৎ যার শ' পাঁচশ' হাজার বিঘা জমি আছে, সে যদি যন্ত্রপাতি আনতে রাজী হয় তবে অর্থাগমের পথ হবে। তার সঙ্গে তাকে সারের জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের গোবরের সারে আর চলবে না। গরু খায়ইবা কি, আর তার গোবরইবা কোথায়? থাক্‌লেও তার কিম্মৎইবা কতটুকু? রাসায়নিক সার নিতেই হবে। চাষে যদি টাকা রোজগার করতে চান,—একদিকে যন্ত্রপাতি আর এক দিকে রাসায়নিক সার নিয়ে যদি বসেন তাহলে নতুন ধরণের জমীদার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন হয়েছে জার্ম্মাণিতে আর আমেরিকায়। জার্ম্মাণিতে তথাকথিত "সে-কেলে" জমীদার উঠে গেছে। অথচ হাজার হাজার বিঘা জমি নিয়ে টাকা রোজগার করছে অনেক অনেক জমীদার। যেমন রাসায়নিক কারবার চালিয়ে টাকা রোজগার করে, লক্ষপতি, কোটিপতির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি জমি চাষের ব্যবসায়ও এই সব দেশে বড় বড় ধনী খাড়া হচ্ছে। আমি বলতে চাই যে, বাঙ্‌লা দেশে হাজার দু'হাজার বিঘা জমি কোনো কোনো লোকের পক্ষে এমন কিছু বেশী কথা নয়। যাঁদের হাঁড়ি চড়িয়ে বসে থাকতে হয় না এমন ৫।৭।১০ জন লোক যদি এদিকে অগ্রসর হন, তাহলে তাঁরা নতুন ধরণের জমীদারি সৃষ্টি করে বংশধরদিগের জন্য নতুন ঢঙের ধনদৌলত রেখে যেতে পারবেন।

মফঃস্বলে জীবন-বীমা

বীমা-ব্যবসা সম্বন্ধে একটা কথা মাত্র বলব। বীমা ব্যবসায় ফেল হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এমন আইন কানুন হয়েছে যে, কোন কোম্পানীর পক্ষেই ফেল হওয়ার যো নাই। খরচপত্রের আঁকজোক ইত্যাদি কারবার-সম্পর্কিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্স পাঠাতে হয় বিলাতে। সেখানকার "অ্যাকচুয়ারী" বলে দেন—"সাবধানে চল, ভুল হচ্ছে। এই ভাবে চল্লে মারা যাবে, এইভাবে কাজ কর" ইত্যাদি। বীমা-ব্যবসার নানা বিভাগ আছে। আমরা তার সা রে গা মা সাধতে সুরু করেছি মাত্র। আমেরিকা ফ্রান্স জার্ম্মাণিতে গরু ইন্‌সিওর হচ্ছে। আমাদের দেশে তা হবে কবে এখনো জানি না। লম্বা লম্বা কথা না বলে একটা সামান্য কথা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে মফঃস্বলে জীবন বীমার বিস্তার। বীমা নিয়ে মফঃস্বলে মফঃস্বলে অনেক-কিছু করবার আছে। তাতে টাকা রোজগারও করা যাবে আর দেশের মধ্যবিত্ত ও চাষীপরিবারের উপকারও সাধিত হবে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নবজীবন

এখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলব। আজ বাংলাদেশে কমসে কম তিনশ' লোন অফিস আছে। "সেকালে" অর্থাৎ আমার বিদেশে যাবার যুগে যেখানে এসবের নাম নেহাৎ অল্প শুনেছি এখন সেখানে এই ব্যবসাটা বেশ গুলজার। বাঙ্‌লার নরনারী লোন আফিস বা ব্যাঙ্ক নামক ব্যবসা-কেন্দ্রকে আপনার বলে গ্রহণ করেছে। লোকেরা নিজের টাকা কোম্পানীর হাতে ফেলে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে শিখছে। এটা আর্থিক জীবনের ক্রমবিকাশ হিসাবে বড় কথা। টাকা পুঁতে নিজের ঘরে রাখব সে ভাব আর বেশী নাই। আমার ট্যাঁকের টাকা আর ব্যাঙ্কের ঘরে পরের হাতে রাখলে মারা যাবে না। বাঙলাদেশের সবকয়টা লোকই বাটপার নয়। এইসব ধারণা বড় কথা। একথাটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারীরা সুদ

বাবদ কিছু কিছু টাকা রোজগার করতে শিখেছে। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান বাঙালী জীবনকে নতুন আকারে গড়ে তুলছে একথা বলতে আমি বাধ্য।

এখনকার সমস্যার কথা বলি। আমদানি রপ্তানির মাল বন্ধক রেখে আমাদের লোন আফিস যদি টাকা দিতে পারে তাহলে বলব যে খাঁটি ব্যাঙ্কের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কোন লোন আফিস তা করছেনা তা বলছিনা। করছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই দিকে আমাদের লোন আফিসের গতি বড় বেশী নয়। মাল বন্ধক রাখা এক জিনিষ আর মাল সম্বন্ধে যে কাগজ, মাল চলাচল যে হচ্ছে তার সার্টিফিকেট,—সেটা দেখে তাকে বিশ্বাস করে টাকা দেওয়া আর এক জিনিষ। খাঁটি ব্যাঙ্কের কারবার এই দিকেও অনেক বেশী। শ' তিন চারেক ব্যাঙ্ক মফঃস্বলে জন্মেছে। টাকাওয়ালা লোক যাঁরা তাঁরা যদি মনে করেন যে এই সব নতুন লাইনে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো দরকার, আর এজন্য কিছু টাকা ঢেলে তারা নতুন রঙের ব্যাঙ্ক কায়েম করেন, তা হলে মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে লোন আফিসগুলা নবজীবন লাভ করতে পারবে।

আমার বিশ্বাস এইদিকে আমাদের মতিগতি অল্পকালের ভিতরই চালিত হতে থাকবে। ছোট ছোট ব্যাঙ্কের পুঁজিতে এক একটা নতুন বড় ব্যাঙ্ক গড়ে উঠতে থাকবে। তা হলে দেড় দুই আড়াই বৎসরের ভিতর বাঙ্লাদেশের কোথাও বাঙালীর তাঁবে কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক খাড়া হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হাজার থেকে কোটিতে উঠলাম আশ্চর্য্য হবেন না। কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক আজ ভারতবাসীর তাঁবে চলছে। নাম মাত্র মূলধন নয়, আসল সত্যিকার আদায় করা মূলধন। সে জিনিষ কঠিন নয়। যদি দু'চার জন পয়সাওয়ালা লোক নিজে বেশ মোটা টাকা নিয়ে পুঁজি সৃষ্টি করেন আর অন্যান্যেরা কেহ ৫ হাজার কেহ ১০ হাজার করে' তাতে টাকা দেন, তাহলে লাখ পঞ্চাশেক টাকা মূলধন কায়েম হয়। মফঃস্বলের লোন আফিস বা ব্যাঙ্কগুলা থেকে তখন অপর পঞ্চাশ লাখ পুঁজি স্বরূপ তুলবার চেষ্টা চলতে পারে। তবে ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের কারবারে নতুন নতুন দফার আবির্ভাব হওয়া চাই।

ব্যক্তিগত কারবার, পার্ট্‌নারশিপ, কোম্পানী

আর্থিক সংগঠনের কাজ কি ভাবে চলবে? ইংরেজীতে যাকে "বিজনেস অর্গ্যানিজেশ্যন" বলে আমি তাকে বলি "ইকনমিক মর্ফলজি"। শরীরের যেমন কাঠাম আছে আর্থিক জীবনের তেমন কতকগুলি মূর্ত্তি। একজন লোক রোজ আনে রোজ খায়। এই এক প্রকার আর্থিক গড়ন। আর একজন তিন মাসের খাবার একত্র সংগ্রহ করে রেখে দেয়। তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দরকার। আর একজন লোক তার ভাই অথবা ঐ ধরণের চার পাঁচজন বন্ধু নিয়ে একটা কোম্পানী খাড়া করে' দিল। এই কোম্পানীর নামকরণ হতে পারে নানা রকম, এও এক শ্রেণীর আর্থিক গড়ন। সমাজের গড়ন বা রূপগুলা রকমারি। বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা তাতে "জয়েন্ট ষ্টক" নামক কোম্পানী ক্রমশঃ বেড়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে। বেড়ে উঠা মন্দ নয়। আমি তার পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত আছি। তবে যাঁরা খুব বেশী পয়সার মালিক তাঁদেরকে পরামর্শ দিতে হলে বলি যে, "কারবারটা নিজে নিজে নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একত্রে করুন।" ব্যক্তিগত কারবারকে আমি এঁদের জন্য বেশী পছন্দ করি। অবশ্য এমন কারবার আছে যার জন্য প্রচুর পুঁজি আবশ্যক আর যা কোম্পানী ভিন্ন চলতে পারে না। পয়সাওয়ালা লোকেরা সে জিনিষ যদি করতে চায় তবে মামা, ভাগ্নে, দাদা প্রভৃতির সঙ্গে পার্টনারশিপ করে চালাতে পারেন। অবশ্য সকলের পক্ষে ঐরূপ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ ঘটে উঠেনা। তখন দুই তিনজন বন্ধু মিলে পার্টনারশিপ খাড়া করা যেতে পারে। এখন দুনিয়ায় ট্রাষ্টের যুগ চলছে। ট্রাষ্টের কথা ভাবতে গেলে ভীমরতি লেগে যাবার সম্ভাবনা। আর সেখানে আমি বলছি, "ব্যক্তিগত" কারবার কর। বুঝতেই পারছেন,—আমার আশার সীমানা কত নীচে।

আর্থিক গড়নের দ্বিতীয় কথা মূলধন। আমি যে সব কারবারের কথা বলেছি তাতে সাধারণতঃ কত টাকা লাগা সম্ভব? ছোট খাট কুটির-শিল্প যে যা পারছে করছে। কিন্তু আপনারা হাজার-পতি, লক্ষ-পতি। ছোট খাট রেল,

মোটরলরী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি চালাতে হয় তাহলে কমসে কম ২৫ হাজার টাকা দরকার। পাঁচ দশ হাজারে এ সব কারবার চলতে পারে না। ব্যক্তিগত হিসাবে যাঁরা বড় কারবার ফাঁদতে চান, তাঁদের জন্য আমার মোসাবিদার বরাদ্দ সাধারণতঃ পাঁচ লাখ। ২৫ হাজার থেকে ৫ লাখ, এই গণ্ডীর ভিতর টাকা ফেলতে পারে বাংলা দেশে অন্ততঃ শ' পাঁচেক লোক। আমাদের যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে যদি হুসিয়ার ভাবে কাজে লাগাতে চান তাহলে ২৫ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা নিয়ে মফঃস্বলে মফঃস্বলে কোম্পানী খাড়া করা দরকার। ব্যক্তিগত ভাবে না হলে পার্টনারশিপ বা জয়েণ্ট ষ্টক ভাবে চলতে পারে। টাকা ঢালতে না পারলে বেকার-সমস্যার মীমাংসা হতে পারেনা। লক্ষপতিরা যদি কারবার খুলেন তাহলেই সুখের কথা।

এঞ্জিনিয়ার রাসায়নিক ও ধনবিজ্ঞানসেবীর সমন্বয়

আর্থিক সংগঠন বা বিজনেস অর্গ্যানিজেশ্যনের পিছনে আর একটা জিনিষ আছে। সেটা বলা দরকার। ভারতবর্ষে আমরা একটা শব্দ যখন তখন কায়েম করে থাকি। এই বক্তৃতায় সে শব্দ আমি ব্যবহার না করলে আপনারা হয়ত সুখী হবেন না। কাজেই বলছি, সেটা "আধ্যাত্মিকতা।" আর্থিক সংগঠনের কথা বলছি। এর পিছনেও একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে। তাকে ভুলে গেলে চলবে না। আজকাল যে দিনকাল পড়েছে একমাত্র টাকার জোরে টাকা রোজগার করা সম্ভব নয়। লাভবান হতে হলে চাই বিদ্যা, চাই অভিজ্ঞতা, চাই কর্ম্মদক্ষতা। "আধ্যাত্মিকতা" বলতে এই সব গুণই বুঝি। বাজারের মামুলি অর্থে আমি এই শব্দ প্রয়োগ করিনা। বিদ্যা কর্ম্মদক্ষতা অভিজ্ঞতা এর নাম আধ্যাত্মিকতা। এখানে আর একটু খোলাখুলি ভাবে বলা আবশুক। কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিরূপ আধ্যাত্মিকতা চাই? আমার বিবেচনায় যিনি যে কারবারই করুন না কেন আজকালকার দিনে সকল ক্ষেত্রেই কথঞ্চিৎ বড় গোছের কারবারের জন্য এঞ্জিনিয়ার একজন চাই-ই চাই। ধরা যাক, একজন এসে বল্লে "আমি জাপান, বিলাত বা আমেরিকা থেকে এই এই বিদ্যা শিখে এসেছি। অত হাজার টাকা দিলে কারবার চালিয়ে দিতে পারি। এই এই যন্ত্র চাই ইত্যাদি।" কিন্তু পুঁজিপতি যিনি কারবার করছেন তিনি ঐরূপ করলে লাভবান হতে পারবেন কিনা সন্দেহ। না বুঝে যদি টাকা ঢালা যায় তা হলে টাকার বরবাৎ হতে পারে। কেননা একমাত্র এঞ্জিনিয়ারের জোরে কোনো ব্যবসা চালানো সম্ভবপর নয়। চাষ থেকে আরম্ভ করে' অনেক কারবারে আজকাল রাসায়নিকও দরকার। অধিকন্তু যে লোক ব্যবসা বুঝে, টাকার বাজার বুঝে, বিজ্ঞাপন প্রণালী বুঝে আর বাজার দর বুঝে এইরূপ লোকও আশুবক। ১৯২৭ সনে ২৫ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে যাঁরা কারবারে নামবেন তাঁরা যদি এঞ্জিনিয়ার রাসায়নিক, ধনবিজ্ঞানবিৎ এক যোগে এই তিন শ্রেণীর অভিজ্ঞ লোক না আনতে পারেন তবে একমাত্র টাকার জোরে কিছু সুফল লাভ করতে পারবেন না। গত ২০ বৎসরের ভিতর বাঙ্‌লা দেশে যত "স্বদেশী" কারবার ফেল মেরেছে তার বৃত্তান্ত যদি হিসাব করে দেখেন, দেখতে পাবেন যে, সকল ক্ষেত্রেই যে টাকা গ্যাঁড়া মারার জন্য কারবার ফেল মেরেছে তা নয়। ফেল মেরেছে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় গণ্ডগোলের জন্য। অর্থাৎ ধরুন আমি এক-জন এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক বা ধনতাত্ত্বিক, তিন বৎসর কি সাড়ে তিন বৎসর জাপানে ছিলাম, আমেরিকায় ছিলাম। এসে বল্লাম যদি ১৫ হাজার টাকা তুলে দিতে পারেন তবে কারবার চালিয়ে দিতে পারি। দিলেন আপনারা টাকা আমায় বিশ্বাস করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি একা কি করতে পারি? হয়ত মালটা তৈয়ারী করে দিতে পারি। কিন্তু মালটা বাজারে চালাবে কে? সে কথা ভাববার ভার ত আমার ঘাড়ে নাই। আপনিও ভাবেন না। আমি অঙ্ক কষে দেখাতে পারি ল্যাবরেটরীতে এই এই হয়। কিন্তু আমার পাল্লায় পড়ে আপনি আমার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিলেন। ফলতঃ, সবজান্তা রাসায়নিকের দৌরাত্ম্যে সবজান্তা এঞ্জিনিয়ারের দৌরাত্ম্যে কারবার ফেল মারে। এদের পাল্লায় পড়লে যখন তখন পটল তুলতে হবে। ছোট কাজ হউক বড় কাজ হউক তাতে তিন রকমের অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট

লোক চাই সমানভাবে। তাকে তিন দিয়ে গুণ করে ৩×৩=৯ অথবা ১৪ দিয়ে গুণ করে ৩×১৪=৪২ করতে পারেন। কিন্তু কমসে কম তিনটি তিন শ্রেণীর, তিন ঢঙের মাথা চাই। এই তিনটি মাথা পরস্পর তর্ক করে', সহযোগ চালিয়ে কারবার যদি করতে পারে, তা হলে কারবার টি'কে যাবে। এই মগজ-সমন্বয় যদি টাকাওয়ালাদের আওতায় সম্ভবপর হয় তা হলে ১৯২১ সনের উপযুক্ত নতুন ধাপে আমরা উপস্থিত হতে পারব।

মিত্র শক্তি-বর্গের ঋণ

[ইণ্টারন্যাশনাল কনসিলিয়েশন, ডিসেম্বর ১৯২২। নং ১৮১]

ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রে "জার্ণ্যাল অব্ দি আমেরিকান্ ব্যাঙ্কারস্ এসোসিয়েশন" বলিয়া এক মাসিক পত্র আছে। তার ১৯২২, নভেম্বর সংখ্যায় বিগত মহাযুদ্ধের দরুণ কোন্ দেশ কি পরিমাণ ঋণী তার এক তালিকা বাহির হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই হিসাবের মধ্যে ঐ দিন অবধি সুদটাও ধরা হইয়াছে।

এই তালিকাটা "ন্যাশন্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রীয়্যাল কনফারেন্স বোর্ডে"র (জাতীয় ব্যবসায়ী সম্মিলন বোর্ড) সম্পত্তি।

দেশের নাম	কত ঋণী	কত ঋণ দিয়াছে	মোট পরিমাণ
যুক্তরাষ্ট্র	—	১১৫২,৫০,০০,০০০ ডলার	+১১৫২,৫০,০০,০০০ ডলার
যুক্তরাজ্য	৫২৬,৩০,০০,০০০ ডলার	৯৬২,৫০,০০,০০০ ,,	+৪৫৫,৬০,০০,০০০ ,,
ফ্রান্স	৬৮৬,৭০,০০,০০০ ,,	৩১২,২০,০০,০০০ ,,	--৩৭৪,৫০,০০,০০০ ,,
ইতালি	৪৫৬,১০,০০,০০০ ,,	— ,,	—৪৫৬,১০,০০,০০০ ,,
রুশিয়া	৪৫১,০০,০০,০০০ ,,	—	—৪৫১,০০,০০,০০০ ,,
বেলজিয়াম	১২০,৯০,০০,০০০ ,,	—	—১২০,৯০,০০,০০০ ,,
যুক্তরাজ্য ডোমিনিয়ান	৭৩,২০,০০,০০০ ,,	—	— ৭৩,২০,০০,০০০ ,,
অন্যান্য দেশ	২১৩,২০,০০,০০০ ,,	৮০,৮০,০০,০০০ ,,	—১৩২,৪০,০০,০০০ ,,
মোট	২৫২৫,০০,০০,০০০ ,,	২৫২৫,০০,০০,০০০ ,,	

কার কাছে কত ঋণী

ঋণী দেশ	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	অন্যান্য দেশ
ফ্রান্স	৩৭৭,১০,০০,০০০ ডলার	২৬৪,৪০,০০,০০০ ডলার	—	২৫,২০,০০,০০০ ডলার
যুক্তরাজ্য	৪৭৪,৭০,০০,০০০ ,,	—	—	৫২,২০,০০,০০০ ,,
ইতালি	১৬৯,১০,০০,০০০ ,,	২৪৫,০০,০০,০০০ ,,	১৬,৫০,০০,০০০ ডলার	৩,৪০,০০,০০০ ,,
রুশিয়া	২২,৫০,০০,০০০ ,,	৩১৯,০০,০০,০০০ ,,	১০৯,২০,০০,০০০ ,,	—
বেলজিয়াম	৪২,৮০,০০,০০০ ,,	৪,৪০,০০,০০০ ,,	৭৩,৭০,০০,০০০ ,,	—
যুক্তরাজ্য ডোমিঃ	—	৭৩,২০,০০,০০০ ,,	—	—
অন্যান্য দেশ	৪৬,০০,০০,০০০ ,,	৫৬,৫০.০০,০০০ ,,	১১০,৭০,০০,০০০ ,,	—

প্রথম অধ্যায়

ফ্রান্স, ইতালি, সার্ব-ক্রোট-শ্লোভেনে রাষ্ট্র, রুমানিয়া পর্ত্তুগাল এবং গ্রীস দেশীয় লণ্ডনস্থ প্রতিনিধিবর্গকে যুদ্ধ-ঋণ সম্বন্ধে এক ডেস্প্যাচ পাঠান হইয়াছিল।[১]

পররাষ্ট্র সচিবের আফিস হইতে ১৯২২, ১ লা আগষ্ট তারিখে আর্ল বেলফোর ফরাসীদূতকে যে পত্র লিখেন তার মর্ম্ম এইরূপ :—

"সুদ বাদ দিলে, আজ পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেনের মোট প্রাপ্যের পরিমাণ হইতেছে ৩৪০ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি। তার বিস্তারিত হিসাব এই—

জার্ম্মাণি ধারে ১৪৫ কোটি পাউণ্ড।
রুশিয়া " ৬৫ কোটি পাউণ্ড।
মিত্রবর্গ " ১৩০ কোটি পাউণ্ড।

"অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রেট বৃটেনের ঋণটা এর ¼ অংশ মাত্র। অর্থাৎ ৮৫ কোটি পাউণ্ড। অবশ্য ১৯১৯ সন হইতে সুদটাও জমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"এযাবৎ কোন প্রকার আন্তর্জ্জাতিক আলোচনার অবকাশ ঘটে নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট দাবী করিয়াছেন যে, ১৯১৯ সন হইতে এযাবৎ যে সুদ জমা হইয়াছে, আমাদের তা শোধ করিতে হইবে। ঋণটাকে সরকারী কাগজরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং "সিঙ্কিং ফাণ্ড" দ্বারা ২৫ বছরের মধ্যে সমস্তটা শোধ করিতে হইবে। গোড়াতে আমরা এইরূপ চুক্তিও করিয়াছিলাম। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। তার দাবী ন্যায্য। কিন্তু এর ফলে গ্রেট বৃটেনকে অনিচ্ছাসত্বেও তার কার্য্যপ্রণালী বদ্লাইতে হইতেছে। কারণ অ্যাংগ্লো-আমেরিকান্ ঋণটা একটা বিচ্ছিন্ন জিনিষ নয়। এক দেশ অন্য দেশের কাছে ঋণী থাকিতে পারে, কিন্তু তৃতীয় এক দেশ আবার তার নিকট ঋণী হইতে পারে। যদি খাতক হিসাবে আমাদিগকে ঋণ-শোধে বাধ্য করা হয়। তবে মহাজন হিসাবে আমরাই বা আমাদের অধিকারটা কেন ছাড়িয়া দিব?

"ইংলণ্ড যতটা ঋণী, তার চেয়ে বেশী ঋণ দিয়াছে। সুতরাং ইংল্যণ্ড জোর করিয়া তার সব টাকা আদায় করিলে লাভবানই হইবে। কিন্তু কথাটা শুধু পাউণ্ড শিলিং পেন্সের নয়। আমরা সবাই লড়িয়াছিলাম উচ্চ আদর্শ লইয়া, স্বাধীনতার জন্য। আমরা এক মহৎ কাজের অংশীদার ছিলাম। ঋণ করা হইয়াছিল কিন্তু তাতে কোন রাষ্ট্রবিশেষ উপকৃত হয় নাই। সকলে মিলিয়া উপকৃত হইয়াছিল।

"আর্থিক বহুপ্রকার অমঙ্গল আজ জগতকে পীড়িত করিতেছে। তার অনেক নৈতিক ও ভৌতিক কারণও রহিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটা গুরুতর কারণ হইতেছে আন্তর্জ্জাতিক ঋণগ্রস্ততা। তারই জন্য ক্রেডিট্ এবং বিনিময়ের, জাতীয় উৎপাদন এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের আজ এই দুর্দশা। জগতের সমস্ত লোক উদ্গ্রীব হইয়া আছে কবে সুদিন ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় সুদিনের আশা করা যায় কি?

"এপর্য্যন্ত আমরা অধমর্ণ দেশগুলির নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করি নাই। বাকী সব দেশও তা করিতে থাকিলে আমরা এ বিষয়ে মাথা ঘামাইতাম না। এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হইতে পারে না। এ হইতে পারে না যে অংশীদারদের একজন যা ধার দিয়াছিল তার সব ফিরিয়া পাইবে, আর অন্যজন কিছু না পাইলেও সব শোধ করিবে আর ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিবে। বিশেষ, এখন এদেশের লোক অভূতপূর্ব্ব করভারে প্রপীড়িত রহিয়াছে। জাতীয় ধনে অপরিমেয় ক্ষতি ঘটিয়াছে। বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং দরকারী ব্যয়টাকে কঠোর ভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।

"আমাদের দেশবাসীরা সাহসের সঙ্গে এই সব অমঙ্গল সহ্য করিতেছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাটা একতরফা হইলে, বৃটিশ করদাতা অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, 'আচ্ছা, যে ভারটা সকলে মিলিয়া বহন করিবার কথা সেটা শুধু আমার ঘাড়েই কেন চাপান হইতেছে?

"এর একটি মাত্র উত্তর আছে। আমরা জার্ম্মাণির

১ বৃটিশ হোয়াইট পেপার কম্যাণ্ড ১৭৩৭ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

নিকট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যা পাইব তার সমস্তটাই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আর সকলে যা পাইবে, তা ছাড়িয়া দিক্। তা যদি অসম্ভব হয়, আমরা সোজাসুজি বলিতে চাই যে, এই ঋণ-শোধরূপ ব্যাপারের দ্বারা কোনরূপ মুনাফা মারা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ঋণ-শোধের জন্য যতখানি দরকার তার চেয়ে বেশী আমরা কিছু আমাদের অধমর্ণদের কাছে চাহিব না। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, বেশী যেমন লইব না, কমও লইব না। একটুও না। আমরা ঋণ করিয়াছিলাম নিজেদের জন্য নয়, পরের জন্য। গ্রেট বৃটেনের বিশাল নৌবহর ও স্থলসৈন্যের জন্য কাঁচামাল, খাদ্য, গোলাগুলি এবং মিত্রশক্তিবর্গের জন্য মোট ঋণের—২০০ কোটি পাউণ্ডের—আধাটা জোগাইয়াছে বৃটেনের লোক সরকারকে ধার দিয়া ও যুদ্ধ-কর দিয়া। অন্য কোন ইয়োরোপীয় জাতির তখন সে শক্তি ছিল না। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের হাত পাতিতে হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু আমরা দায়িত্ব লইবার পর ঐ ঋণটা দিয়াছিল, যদিও খরচটা করিয়াছে আমাদের মিত্রগণ।

"আমাদের পূর্ব্ব শত্রু জার্ম্মাণি আমাদের সব চেয়ে বড় অধমর্ণ। জার্ম্মাণি অন্যান্য মিত্রগণের ঋণ শোধ করিবে না, আমরা একথা বলিতেছি না। আমরা শুধু গ্রেট বৃটেনের কথা বলিতেছি। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান অবস্থাটা জগতের গুরুতর আর্থিক ক্ষতি ঘটাইতেছে। এর আশু প্রতিকার হওয়া দরকার। আমরা বলিতেছি আমরা স্বচ্ছন্দে জার্ম্মাণির নিকট ক্ষতিপূরণস্বরূপ এবং মিত্রবর্গের নিকট ঋণস্বরূপ যা পাইব, সব ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি, যদি অন্য সমুদয় শক্তি তাদের নিজ নিজ দাবী ছাড়িয়া দেয়।"

মিত্রশক্তিবর্গের ঋণ সম্বন্ধে ফ্রান্সের অবস্থা

(১৯২২, ১লা সেপ্টেম্বরের মন্তব্য)

বেলফোরের পত্রের জবাব স্বরূপ পঁয়কেরের এক মন্তব্য-লিপি ১৯১২, ২রা সেপ্টেম্বরের "নিউইয়র্ক টাইম্‌স্" পত্রিকায় ছাপা হয়। পঁয়কেরে প্যারিস্ হইতে লিখিতেছেন, [১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২২]

"ইংরেজ আমাদিগকে ঋণ-শোধ করিতে বলিতেছেন। তাঁদের কথা—'ফরাসী এবং অন্য মিত্র শক্তিবর্গের মোট ঋণ ও তার সুদের পরিমাণ কত. তা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতেছি না। যা আমাদের আমেরিকাকে না দিয়া নিস্তার নাই, তাই অন্যদের নিকট চাহিতেছি।

"ফরাসী সরকারের মত এই যে, যুদ্ধের জন্য ক্ষতি-পূরণের সমস্যাটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ছিল। সেজন্য প্রত্যেক মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের লইয়া এক সম্মিলনীর বৈঠক বসাইলে বেশ হইত। কিন্তু ইংরেজের এই ১লা আগষ্টের পত্র তার মূলে কুঠারাঘাত করিল। বিগত লণ্ডন বৈঠকটাতেই কিছু হেস্তনেস্ত হইতে পারিত। তা হইল না।

"ঋণ-দান সম্পর্কে বলা চলে, ঋণ যদি না পাওয়া যাইত তবে হয় আমরা হারিয়া যাইতাম, নয় যুদ্ধ আরও অনেক-কাল স্থায়ী হইত। আর উভয় ক্ষেত্রেই তখন ঋণদাতা দেশগুলিকে আসরে নামিতে হইত, যুদ্ধ ইত্যাদি করিতে হইত। অধিকন্তু ঋণ করা হইয়াছিল সকলের এক সাধারণ স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত। সমুদয় ক্রীত দ্রব্য জয়লাভের উপাদান যোগাইয়াছিল। ইতিহাসে এই প্রথম বিজিত দেশের নিকট হইতে যুদ্ধের খরচটা চাওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ, লর্ড বেলফোর বেশ বলিয়াছেন যে, আমাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। নৈতিক দিক্ হইতে এ বিষয়টা বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই ঋণগুলি এখনি বাদ দেওয়া উচিত। অন্ততঃ, এগুলি সাধারণ আন্তর্জ্জাতিক ঋণ হইতে ভিন্ন জিনিষ।

"অপর পক্ষে, জার্ম্মাণি যুদ্ধকালে ইচ্ছাপূর্ব্বকও অনেক জায়গায় মিছামিছি ধ্বংস করিয়াছে। মিত্রশক্তিবর্গকে জার্ম্মাণি-কৃত ক্ষতি নিবারণার্থ অনেক সরকারী পেন্সনও দিতে হইয়াছে। এইগুলির ফল জার্ম্মাণির ক্ষতিপূরণ ঋণ। জার্ম্মাণির এই ঋণ শোধ করা উচিত।

"আর অন্য সকল বন্দোবস্তের আগে এই ঋণ-শোধের বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। ফ্রান্সের মত রাজ্য-নাশ কারও হয় নাই। সেই দুঃখ-ক্লিষ্ট ফ্রান্স আজ নিজেই তার বিধ্বস্ত প্রদেশের পুনর্গঠনে অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মাণি তার অঙ্গীকৃত

অর্থ এখনো দেয় নাই। তার সম্বল হইতে সে অগ্রিম দিয়াছিল বলিয়াই বর্ত্তমানে ফ্রান্সের বাজেট বেতালা হইয়া গিয়াছে।

"যাবৎ সে এই টাকা বা এর মোটা অংশটা জার্ম্মাণির নিকট না পায়, তাবৎ সে কোন-বন্দোবস্তের কথায় কাণ দিতে পারে না।

"জার্ম্মাণি এটা শোধ করিয়া দিক্ তারপর অন্য কথা। তারপর ফরাসী সরকার আন্তর্জ্জাতিক ঋণশোধের কথা লইয়া আলোচনা করিতে দ্বিধা করিবে না।

"ইংরেজের কাছে আমাদের ঋণটার স্বরূপ পরীক্ষা করিবার সময় কয়েকটা কথা মনে রাখিতে হইবে।

"১ম। ফরাসী সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের নিকট ধার লইয়াছিল শুধু তার খরিদা দ্রব্যের দাম দিতে। কিন্তু খাঁটি যুদ্ধ-ঋণ আর বাণিজ্য-ঋণ ভিন্নভাবে দেখা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঋণের কতকটা যুদ্ধশান্তির পর লওয়া হইয়াছিল। ফরাসী সরকারকে আমেরিকা যে ষ্টক পাঠাইয়াছিল এটা তার দাম বাবদ্। এটা ফরাসী কোষাধ্যক্ষকে বেচিয়া লাভ হইয়াছিল। সুতরাং এটাকে বাণিজ্য ঋণ বলিতে পারি। বাকী ঋণটা অবশ্য আন্তর্জাতিক ঋণের মত। একথা মনে রাখিতে হইবে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নামিয়াছিল। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তার অস্তিত্ব, বা আদর্শ, সভ্যতা সম্মান কিছুই বিপদ্‌গ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু তখন ইংল্যণ্ডের ফ্রান্সেরই মতন প্রাণ লইয়া টানাটানি। তার অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন।

"২য়। গ্রেট বৃটেনের কাছে আমাদের মোট ঋণের পরিমাণটার অঙ্ক ঠিকমত জানা যায় নাই। তার পরিবর্ত্তনেরও দরকার আছে। উদাহরণ—ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে রসদ ও মাল-চলাচল হইয়াছে, তাতে ইংরেজ সর্ব্বোচ্চ দর চাহিয়াছে। তার সঙ্গে আবার "বিভাগীয় খরচ" অর্থাৎ শাসন খরচ ও রপ্তানি-শুল্ক যোগ দিয়া সেটা আরও বাড়াইয়াছে। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যকে ফরাসী যে মাল যোগাইয়াছে তার দর ধরিয়াছে দেশের মধ্যে যে হার চলে সেই হারে। শাসন-খরচ ও রপ্তানি-শুল্কও বাদ দিয়াছে।

"ফরাসী চায়, আগে ক্ষতিপূরণটার মীমাংসা হইবে, তারপর মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর ঋণগুলির সুব্যবস্থা হইবে। সেই সুব্যবস্থা-কালে সাবধান ও সতর্ক হইয়া ঋণগুলি যথাযথভাবে ন্যায্য অঙ্কে কষিয়া বাহির করিতে হইবে, যেন কোথাও অবিচার না হয়।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯২২, ৩রা অক্টোবর তারিখে, নিউ ইয়র্ক শহরস্থ আমেরিকান ব্যাঙ্কারস্ এসোসিয়েশনের কন্‌ভেন্‌শনে শ্রীযুক্ত টমাস্ ডব্লিউ ল্যামণ্ট এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "আজিকার আমেরিকান্ ব্যাঙ্কারদের দায়িত্ব।" সেই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটা কথা এইরূপ :—

আভ্যন্তরিক ব্যবসার অবস্থা

"মনে হইতেছে যেন আমাদের ব্যবসার একটা চক্র শেষ হইল কিংবা নূতন একটা চক্র আরম্ভ হইল। আমাদের ব্যবসার সফলতা ও সঙ্কটের কালগুলি আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে।

"প্রথম আসিল যুদ্ধের পরের অবস্থায় সকল প্রকার দ্রব্যের জন্য বিপুল টান, দ্রুত বর্দ্ধমান দর, বাণিজ্যের অবিরত প্রসার ও আনুষঙ্গিক ইন্‌ফ্লেশন।

"দ্বিতীয়, ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা দিল। ১৯১৯ সনের শেষার্দ্ধে সিকিউরিটির দামগুলা ভয়ানক কমিয়া গেল।

"তৃতীয়, দ্রব্যাদির দর দ্রুত কমিতে লাগিল, শুধু আমেরিকায় নয় কিন্তু সমগ্র জগতে। এই সময়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত ব্যাঙ্কাররা আপনারা নিজ নিজ দূরদর্শিতা ও সাহসের বলে আমেরিকার বাণিজ্যকে সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য আপনাদের পিছনে ছিল ফেডারেল রিজার্ভ প্রথা। আর ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের মাথায় ছিলেন গবর্ণর হার্ডিং, সূক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞানওয়ালা দক্ষিণ দেশী ব্যাঙ্কার।

চতুর্থ, শেষ আসিল মুদ্রার স্বচ্ছন্দতা। দর ঢিট্ হইয়া গেল। ১৯২১সনের গ্রীষ্মে এই মুদ্রা-স্বচ্ছন্দতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর এখন ১২ মাস পরে আমরা আবার অগ্রসর হইতেছি।

"অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিবার পর মনে হইতেছে যেন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা অনন্ত বিশ্বাস ও আশা সম্বল করিয়া যাত্রা করিতে পারিব। কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, জয়লাভের এখন ঢের দেরী। পথে কতকগুলি বেড়া ডিঙ্গাইতে হইবে।

"আমাদের চাষীরা বলিয়া দিবে যে, প্রথম বেড়া হইতেছে চাষের উৎপন্নের বর্ত্তমান কমি-দর। তারা বলে, 'সত্য বটে, এ বছর ফসল হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু মুদ্রার হিসাবে আমাদের লাভ হইবে সামান্য।'

"এই বছরের সঙ্গে গত বছরের ফসলের পরিমাণটা একবার তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

		১৯২২		১৯২১
গম *	...	৮১ কোটি ৮০ লক্ষ বুশেল	...	৭৯ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল
কর্ণ	...	২৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল	...	৩০৮ কোটি বুশেল
ওট্‌স্	...	১২৫ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল	...	১০৬ কোটি ১০ লক্ষ বুশেল
৭টা সিরিয়েল	...	৫২৭ কোটি ৪০ লক্ষ বুশেল	...	৫১৯ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল
তুলা	...	১ কোটি ৬ লক্ষ বেল	...	৮০ লক্ষ বেল্

"আমি শুধু একটা কথা বলিব। নীচু দরের জন্য কোন দিন কোন দেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ফসলের প্রাচুর্য্য আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। আজ চাষীরা একটু কষ্ট পাইতেছে বটে, কিন্তু ১৯১৯ ও ১৯২০ সনে তারা চড়া দর পাইয়াছিল। তবু তার ফলটা তাদের পক্ষে ভাল হয় নাই। সমাজের সকলের পক্ষেই নরম দরটা মঙ্গলকর। অতএব, এই প্রথম বেড়াটা খুব সহজে পার হওয়া যায়।

শ্রম ও পুঁজিপাটা সমস্যা

"মজুরদের ধর্ম্মঘট হইল আর একটা বেড়া। বেশ বড় বেড়া। এই শ্রেণী-যুদ্ধ লইয়া আমরা সকলেই দুঃখ করি। কিন্তু ইহা নিবারণ করিবার কোন চেষ্টা আমরা করি কি?

"স্বীকার করি মজুরদের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও দম্ভ দেখা দিয়াছে। মনে রাখিবেন, মনিবদের মধ্যে এখনও ঔদ্ধত্য ও দম্ভ রহিয়াছে। আর এটা মনিবদের পক্ষে যতটা দোষের কথা মজুরদের পক্ষে ততটা নয়। মজুররা যুদ্ধের সময় ও তারপর কতকদিন চড়া হারে মজুরি পাইয়াছিল। তাতে তাদের মনে এই এক ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এ মজুরি তারা বরাবর পাইবে। আমার দুঃখ যে এ ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ভুলিয়া যাইবেন না, ইহারই প্রসাদে মজুরেরা অনেকখানি সুখের মুখ দেখিয়াছিল, খেলিবার ও সুখী হইবার জন্য একটুখানি সময় ও অবকাশ পাইয়াছিল। তাতে সমগ্র সমাজ উপকৃত হইয়াছিল।

"দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। কিন্তু মানুষের বেলা এই অঙ্ক খাটে না। মানুষের হৃদয়ে কত তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। কত অন্বেষণ! কত প্রতীক্ষা! তা কি শুধু অঙ্ক কষিয়া বাহির করা যায়? বস্তুতঃ, শ্রম ও পুঁজিপাটা সমস্যাটা মানুষের সমস্যা। এর মীমাংসা করিতে হইলে আপনাদিগকে আগে ভাল করিয়া মজুরের হৃদয়ের কথাটা জানিতে হইবে, তাদের সুখ-দুঃখের সন্ধান লইতে হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের ও আমার গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে।

রাষ্ট্র ও ব্যবসা

"অনেকে বলিবে, 'অন্য এক বেড়া হইতেছে রাষ্ট্র'। তা যদি সত্য হয় ত দোষ আমাদের। আমরা কেন এমন লোকের হাতে শাসন-ভার তুলে দেই যে আমাদের স্বার্থ বুঝে না অথবা আমাদের বিপক্ষতাচরণ করে?

"আইন তৈয়ারীর চেয়েও বে-বন্দোবস্ত অবস্থাটা বেশী ক্ষতিকর। বোনাস্ বিল ভয় দেখাইল যে আমেরিকার লোকদের নিকট হইতে কর লইয়া কয়েক অযুত ডলার পাওয়া যাইবে, সে ডলার এমন ভাবে ব্যয় করা হইবে যে, কারও উপকারে আসিবে না। প্রেসিডেন্ট হার্ডিংএর ভিটোতে সমস্ত দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

"টারিফ্ কি করিতেছে? এমন কতকগুলি ব্যবসাকে রক্ষা করিতেছে, যার রক্ষার প্রয়োজন নাই। যে যে বিদেশী বাজারে আমাদের চাষীরা ও বেপারীরা মাল পাঠাইতে পারিত তা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

"আমাদের দেশের ঢের লোক "বাণিজ্য" কথার অর্থটা এখনো ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তারা মনে করে ছুনিয়ার বাজারে বাজারে আমরা বিনা বাধায় মাল বেচিয়া বেড়াইব, কিন্তু অন্যের কাছে কিছুই কিনিব না বা অল্প কিনিব, তবেই আমরা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জিতিয়া যাইব। টারিফ্ আইনের ভিত্তি এই মনোভাব। এক শতাব্দী পূর্ব্বে বণিকরা কথায় কথায় বলিয়া বসিত 'যে কিনিবে না, সে বেচিবেও না।' আজিকার দিনে আমেরিকার উৎপাদক ও ব্যবস্থাপকের এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখার দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

"আপাততঃ সমুদ্রের অপর পারে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মনে হইতেছে বাণিজ্যের অবস্থা অন্ধকার। ইয়োরোপে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের গুজব লাগিয়াই আছে। তুরস্ক হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া গ্রীস্‌কে লাথি ছুড়িতেছে। রুশিয়া, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, উত্তেজিত আয়ারল্যাণ্ড কোন স্থানই আশাপ্রদ নয়।

"কিন্তু আপনারা ব্যাঙ্কাররা খরিদ্দার ঢুঁড়িবার সময় সাদা চোখে দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না। তার অতীত চরিত্র, জীবনব্যাপী সাধনা ও অদৃশ্য শক্তির কথা আপনাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, অদৃশ্য শক্তি ইয়োরোপকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আজ ইয়োরোপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ইয়োরোপ আর্থিক ব্যাপারে সংস্কারের পথে চলিয়াছে।

অদৃশ্য শক্তি

কতগুলি অদৃশ্য শক্তি ইউরোপকে রক্ষা করিতেছে এই অদৃশ্য শক্তিগুলি কি?

(১) উৎপাদনশীলতা। ৫ বছর যাবৎ যে শক্তি মানুষমারার কাজে নিয়োজিত ছিল, তা ছাড়া পাইয়াছে। সেই শক্তি আজ ফসল জন্মাইতেছে, জিনিষ তৈয়ারী করিতেছে।

(২) বাণিজ্য বাড়িতেছে। ছুনিয়ার চিরকেলে বণিক্ গ্রেটবৃটেনও খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ইউরোপও ইতিমধ্যেই মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। রুশিয়াও। ইংল্যাণ্ড ১৯১৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া তার বাহিরের ঋণ ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড শোধ দিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার সমগ্র জাতীয় ঋণ ছিল মাত্র ২০ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার। গত বছর ফ্রান্স তার বাণিজ্যের "বিরুদ্ধ ব্যালান্স" ২,৩০০ কোটি ফ্রাঁ হইতে ২০০ কোটি ফ্রাঁতে আনিয়াছে।

(৩) ইয়োরোপের লোকেরা সঞ্চয় করিতেছে। যুদ্ধকালে ও পরে খরচের মরসুম্ পড়িয়া গিয়াছিল। এখন সঞ্চয়ের সময় আসিয়াছে। রাজনীতিবিদ্‌রা ক্ষতিপূরণ লইয়া মাথা ঘামাইতে থাকুক। ইতিমধ্যে সাহসী ফরাসী চাষী দিন দিন তার গম জন্মাইতেছে, একটা একটা করিয়া তার সেণ্টগুলি জমাইতেছে। যুদ্ধের পর ফরাসীরা সরকারী সিকিউরিটিতে জমাইয়াছে ১০০ কোটি ফ্রাঁ।

গত গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে আমি লণ্ডন ত্যাগ করি। সে সময় রুশিয়ার অবস্থাভিজ্ঞ খাঁটি ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা আমার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, রুশিয়া অচিরে ছুই উপায়ে নিজ উন্নতিসাধন করিবে:—(ক) সোভিয়েট সরকার বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার, বেপারী, বৈজ্ঞানিকদের ডাকিয়া আনিবে, তাদের হাতে নানা উৎপাদন ও মাল চালনার ভার দিবে। (খ) বিদেশী বণিকেরা সোজাসুজি রুশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য না করিয়া বাণিজ্যটা কতকগুলি "শিখণ্ডী" দেশের সঙ্গে জোর্‌সে চালাইবে। লাত্‌ভিয়া এস্থোনিয়া ইত্যাদি শিখণ্ডী দেশের বণিকেরা রুশিয়ার বাণিজ্যের অন্ধিসন্ধির খবর খুব ভাল করিয়া রাখে। সুতরাং এইসব স্থানে ক্রমে ক্রমে জাহাজ বোঝাই মাল আসিতে থাকিবে।

"এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবে বলিয়া মনে হয়। সময়টা অবশ্য দীর্ঘ হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

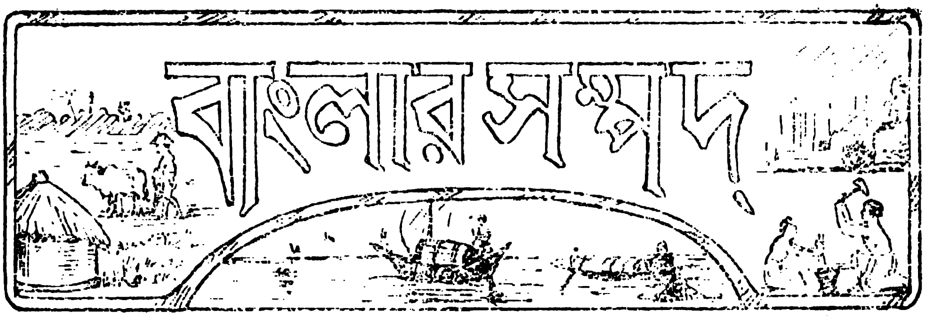
আর্থিক উন্নতি

অগ্রহায়ণ—১৩৩৪ ২য় বর্ষ—৮ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



এঞ্জিনীয়ার

কর্ম্মেতে বীর, উদ্যমশীল, ধৈর্য্য অসীম, ধীর,
তা'রা বিশ্বপিতার সৃষ্টিসহায়,—এঞ্জিনীয়ার বীর।
বিস্ময়ময়ী বিপুলা সৃষ্টি বিশ্বের বিধাতার,
তা'রা নবীন বস্তু করিয়া সৃষ্টি পূর্ণতা সাধে তার।
গড়ে পর্ব্বতোপরি দুর্গ, প্রাকার, সৌধ, প্রাসাদ, সেতু,
সাগর-বক্ষে আলোকস্তম্ভে উড়ায় উভয়-কেতু;
হের আল্প্‌স ভেদিয়া বর্ত্মিকা আর টেম্‌স্ নদের টানেল,
ভুবন-বিদিত কীর্ত্তি তাদের পানামা-সুয়েজ ক্যানেল।
তা'রা হল্যাণ্ড-রাজ্য সতত রক্ষে জলধি ঠেলিয়া দূর,
করে ডাইভার্ট কাটি খরস্রোতার স্রোতের গর্ব্ব চূর,
গড়ে কৃত্রিম নদী, বন-উপবন, নয়ন-লোভন বাওয়ার,
গগনচুম্বী স্কাই-স্ক্রে'পার, বিরাট এফেল টাওয়ার।
হের পদ্মা উপরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, বৃটানিয়া ফার্থ সেতু,
রোম-নগরীর সেন্টপিটার—শত মনুমেণ্ট্‌-শিরে কেতু,

মস্তকোপরি ওভার্‌হেড রেল, টানেল শতেক শত,
ভূতল-গর্ভে চলিছে তাদের টিউব রেলের পথ।
তা'রা ডিনামাইট্‌ যোগে পর্ব্বত চুরি গড়ে সুড়ঙ্গ ফাঁকা,
নায়েগারা-জল রোধিয়া গর্ব্বে ঘুরায় কলের চাকা;
তা'রা মরুময় ভূমি করি' ইরিগেট শস্য ফলায় তায়,
পর্ব্বত বন করিয়া তুচ্ছ রেলওয়ে পাতি' যায়।
তা'রা ফার্‌নেসে করে আয়রন্‌ স্মেল্ট ষ্টীলের কাটিছে "চপ্‌"।
বিপুলশিল্প সাধিতে ত্বরায় চালায় ওয়ার্কশপ্‌।
গড়ে ষ্টীম্‌ টার্‌বাইন্‌, গ্যাস্‌এঞ্জিন্‌, অটোমবাইল্‌ কার্‌,
বিদ্যুৎগতি মেইল্‌, এক্সপ্রেস্‌—বাহনসভ্যতার।
ষ্টীম্‌ রো'লারে ভাঙ্গিছে পাথর, ক্রেইনে তুলিছে মাল,
পাম্প করি' শোষে তড়াগের জল, ড্রেজারে কাটিছে খাল
গড়ে লিনোটাইপ্‌, রোটারী মেশিন্‌, টাইপকল্‌, বায়স্কোপ্‌,
টেক্সটাইল্‌ কল্‌, আলোকযন্ত্র, গ্রামোফোন্‌, গ্যাস্‌ষ্টোভ্‌।
তা'রা ওয়াচ ক্লকেতে করে নিরূপণ সেকেণ্ড, মিনিট, আওয়ার্‌
'লেক্‌ট্রিসিটি করে জেনারেট্‌ ট্রান্সমিট্‌ করে পাওয়ার!
গভীর মন্দ্রে চলে টারবাইন্‌, ডায়নামো ঘোরে তায়,
পাওয়ার-হাউস্‌ কাঁপে থর্‌ থর্‌—ভিত্তি বসিতে চায়;
সেথা ট্রান্সফর্ম্‌ করি' ভোল্টেজ্‌ তার সাধিছে বিবিধ কাজ,
"এ, সি"রে করিছে "ডি, সি"তে আনীত—ব্যাটারী করিছে চার্জ্জ।
গড়ে মস্তকোপরি' মৃত্যু ভীষণ হাই টেনশন্‌ লাইন্‌
পলিফেজ্‌ "এ.,সি" ভ্রমিছে তাহাতে—পাবে কি তাহার সাইন্‌?
সেই তাম্রতারেতে করিয়া বহন বিজলীর মহাবল,
ঝম্‌ ঝম্‌ রবে বসুধা-আলোড়ি চালায় বিশাল কল।
হের বিদ্যুৎবলে চলে ট্রামকার্‌—মেশিনারী আদি যত,
'লেক্‌ট্রিক্‌ রেল—ওয়ার্কশপ আর ফ্যাক্টরী শত শত।
হের সুইচ্‌ টিপিয়া গভীর আঁধারে দিবালোক আনে তারা,—
সার্চ্চলাইট্‌ জ্বালি সাগর-বক্ষে ফেলিছে আলোক-ধারা।
বেতারবার্ত্তা করি' ট্রান্সমিট্‌ ব্রডকাষ্ট্‌ করে তার,
টেলিগ্রাম্‌', ফোন্‌ লইয়া বারতা আঁখির পলকে ধায়।
এ্যারো এঞ্জিন্‌ করি নির্ম্মাণ নীল নভতলে যায়,
তা'রা লঙ্ঘি সাগর পর্ব্বত মরু দিগ্‌ দিগন্তে ধায়।
গড়ি মেরিন্‌ এঞ্জিন্‌ চালায় বেগেতে বিশাল তরীর কল,
হের ষ্টীম্‌শিপ্‌ ছুটে সাগর বক্ষে মথিয়া জলধি জল।

গড়ে ধ্বংসের রূপে প্রলয়ঙ্কর মৃত্যুর মহা অস্ত্র,
করে নিমেষে প্রলয় করিয়া সৃষ্টি বসুধায় সন্ত্রস্ত।
যবে গর্জ্জে তাদের ভীষণ কামান্—মন্দ্রিত চরাচর
প্রলয় লীলার রুদ্র আভাষে কম্পিত থর থর্।
গড়ে বজ্রউগারী হাউ'জার অই—ধ্বংসের মহাবাণ,
প্রলয়কম্বু নিনাদী বিকট লুইস্—মেশিন্‌গান্।
শার্প্‌নেল্ শেল্—বম্—ডিনামাইট্—কার্ট্রিজ্—ম্যাগাজিন্,
ক্যাটার্‌পিলার-চক্রবাহিত ট্যাঙ্ক্‌স্—"বিঘ্ন-হীন"!
গড়ে 'লেক্‌ট্রিফায়েড্ বার্ব্ড্ ফেন্‌সিং—পরশে মৃত্যু যায়,
মিনিট্‌গান্ আর রাইফেল্, শেল্ কুইক্ রিভল্‌ভার্।
—জ্বালায় সাগরে মহাকালানল ব্যাটল্ শিপের শট্
ডেষ্ট্রয়ার্ আর ভাসমান্ ফোর্ট—নির্ভীক ড্রেড্‌নট্।
ফাটিছে সাগর করি' তোলপাড় জাহাজ-ধ্বংসী মাইন্,
ডিনামাইট্ যথা উড়ায় স্থলেতে রেলওয়ে ব্রিজ্ লাইন্।
তীব্র বেগেতে সাগর মথিয়া ব্যাট্‌ল্-ক্রুজার ধায়,
শত্রু পোতের সন্ধান করি' চূর্ণিত করে তায়।
সাব্‌মেরিণ অই অতলে ডুবিয়া ভ্রমিছে শত্রু-ধার,
দিগ্‌দিগন্ত করিয়া চকিত টর্পেডো ছুটে তার!
ঊর্দ্ধে উড়িয়া প্লেন্—জেপেলিন্ অনল বরষি ধায়,
দুর্গ—প্রাকার—পরিখা—সাগর পারেনা রোধিতে তায়।
মহাপ্রলয়ের রুদ্রলীলার করাল নায়ক তারা,
শঙ্কিত করি দিগ্‌দিগন্ত বহায় রক্ত ধারা।
তা'রা করিছে সৃষ্টি, করিছে পালন, করিছে তাহার লয়,
আবার গড়িছে, বিঘ্ন বিপদে নিরাশ তাহারা নয়।
ব্যস্ত তাহারা সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সূক্ষ্ম কারণ নিয়া,
থাকে না তাহারা কদাপি তুষ্ট দেবের দোহাই দিয়া;
ভ্রান্ত শতেক সংস্কার-জাল—কুসংস্কারের মেলা,
মুক্ত তাদের স্বাধীন চিত্ত করিছে সদাই হেলা।
প্রতিভা তাদের সদা নিয়োজিত স্বদেশ স্বজাতি' পরে,
হয় নাই তার বৃথা ব্যবহার নিগড়-রচনা তরে,
মানুষে মানুষে নাহিক প্রভেদ্—প্রভেদ্ তাদের কাজে,
'সকল জগৎ ব্রহ্মময়' যে তাদের বলাই সাজে।
ধ্বনিল যে বাণী কুরুক্ষেত্রে—'কর্ম্মযোগের" সার,
তারাই বুঝিল সে মহামন্ত্র—"কর্ম্মেতে অধিকার"।

তাদেরই গৃহেতে অচলা লক্ষ্মী—বাণীর অধিষ্ঠান,
কমলার সনে কমলাসীনার বিরোধের অবসান।
তাদেরই গৃহেতে লভিছে জনম মহাতপা ঋষিদল,
প্রচারে বিশ্বে অভিনব জ্ঞান তাদের তপের বল।
শক্তি পুজিয়া মহা শকতি তাদের বাহুতে আজি,
সকল কর্ম্মে প্রকাশ তাদের কর্ম্মবীরের কাজ।
দেবতার কৃপা যাচে নাই তারা পুষ্পবিল্ব দলে,
তোষিয়াছে তারা বিশ্বপিতায় বিরাট সাধনাবলে!
কর্ম্মেতে ধীর, উদ্যম-শীল, ধৈর্য্যে অসীম, ধীর,
বিশ্বপিতায় তোষিয়া তাহারা দিক্-বিজয়ী বীর।

শ্রীহিমাংশু বিকাশ রায় চৌধুরী
(বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট ম্যাগাজিন)

মাছের ব্যবসা

মাছখোর বাঙ্গালীর মুল্লুকে, মাছের স্থান যেখানে খাদ্য-তালিকায় ভাতেরই ঠিক নিম্নে, সেই বাঙলা দেশ ও তাহার শ্রেষ্ঠ সহর কলিকাতার মাছ-সরবরাহের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

মৎস্যের চাষআবাস সম্বন্ধে বাঙলার মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে আলোচনা হইয়াছে বিস্তর। এখানে সে পুরাণো কাসুন্দি না ঘাঁটিয়া যুবক বাঙলার নিকট একটা নূতন উপার্জ্জনের পথ বাতলাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইবে।

মাছের আবাদ করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থ, সাজসরঞ্জাম ও হাতিয়ার পত্রের দরকার। ইহার জন্য ২।৪, ২০।৪০, ২০০।৪০০, ২০০০।৪০০০ বিঘার ক্ষেত্রও পর্য্যাপ্ত নহে। পোনা মাছ ছাড়া ও তাহাদের চাষ আবাদ করা ইত্যাদি ব্যবসা বহু দূরের কথা, যাহা আপনি জন্মিতেছে ও কাজে না লাগিয়া নষ্ট হইতেছে তাহা কাজে লাগানই সম্প্রতি আসল মামলা। রুই কাৎলা ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে চুঁণো পুঁটী হইতেই আরম্ভ করা যাক্।

কাজ—মাছ-ধরা ও তাহা বিক্রয় করা। এই হইল ব্যবসা।

মাছ আসিবে কোথা হইতে?

কলিকাতা ও মফঃস্বলের সহরগুলির নিকটে (বিশেষতঃ ২৪ পরগণা যশোহর ও ফরিদপুর জেলায় কলিকাতা হইতে অদূরবর্ত্তী স্থানসমূহে) যথেষ্ট হাজা মজা বিল ও জলা আছে। এইগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। বর্ষার সময় জলের সাথে এইগুলিতে অসংখ্য মাছ পড়ে। এই জলা বা বিল-গুলিতে কারবার চলে। বন্দোবস্ত লইয়া এইগুলি হইতেই মাছ ধরিবার ও তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ব্যবসার কাল

মাছের মরশুম হইল জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত। সুতরাং এই সময়ই ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট কাল। বৎসরের অন্যান্য সময়ও ব্যবসা চলিতে পারে—মন্দা রকমের। বাঁধা ভেরী হইলে বৎসরের সব সময়েই মাছ ধরিতে ও বিক্রয় করিতে পারা যায়।

পুঁজি

মাছের ব্যবসার মূলধন-সমস্যা অন্যান্য ব্যবসার মূলধন-সমস্যার ন্যায় জটিল নহে। কারবারে খুব বেশী পুঁজির দরকার হয় না। ৪০০।৫০০ টাকা হইলেই ছোট রকমের একটা ব্যবসা করা যাইতে পারে। আড়ৎ হইতেও পুঁজি দেওয়া হয়। আড়ৎদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলে

সেখান হইতে পুঁজি সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে।

জলকর

কারবার করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন জলকরের বন্দোবস্ত করা। চারিদিকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিয়া জলকর লইতে হয়। মোটামুটি এই বিষয়গুলি দেখিলেই চলিতে পারে:—মাছ ধরার সুবিধা আছে ও হইবে কিনা। মাছ বিক্রয়ের সুবিধা আছে কিনা ও বাজার নিকটে কিনা, যানবাহনের ব্যবস্থা আছে কিনা, নিকটস্থ মাছের বাজার কতদূরে ও সেখানে খুব মাছ বিক্রয় হইতে পারে কিনা ইত্যাদি।

এই সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া মালিকের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য জলকর ইজারা বা বন্দোবস্ত লইতে হয়। ভেরী বা ক্ষেত্র বুঝিয়া খাজনা ও সেলামী। এখানে ট্যাঁকে হাত দিয়া ভাবা দরকার।

মাছ ধরিবার ব্যবস্থা

মাছ ধরিবার জন্য মৎস্যজীবী পাওয়া যায়। মাছ ধরিবার লোকের অভাব হয় না। ধৃত মৎস্যের অর্দ্ধাংশ সাধারণতঃ তাহাদের মজুরী। বাকী অর্দ্ধেক ব্যবসায়ীর। প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাদের অংশ উচিত মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে। অনেক স্থলে জেলেদের নিকট হইতে মাছ ধরিবার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা আছে। তাহাদিগকে প্রবেশমূল্য দিয়া মাছ ধরিতে হয়। প্রবেশমূল্য স্থলবিশেষে ।০ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত হয়। জাল ও মাছ ধরিবার হাতিয়ার জেলেরা লইয়া আসে।

ঝাঁকিজাল, পাতিজালদ্বারা মাছ ধরা হয়, প্রয়োজন হইলে পাটা ও পাতন দেওয়া হয়।

বরফ

মাছের ব্যবসা করিতে হইলে বরফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। মাছ অবিকৃত রাখিতে হইলে বরফ চাই-ই চাই। সেজন্য স্থান-নির্ব্বাচন কালে দরকার হইলে যথেষ্ট বরফ পাওয়া যাইতে পারে কিনা তাহা দেখা দরকার। মাছ বিক্রয়-কেন্দ্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ভাবা প্রয়োজন।

আড়ৎ

উৎপাদকের হাত হইতে দুই হাত ঘুরিয়া মাছ ক্রেতার নিকট পৌঁছায়। ইহাদের একজন আড়ৎদার বা দালাল, দ্বিতীয় জন খুচরা বিক্রেতা। আড়ৎদারেরা উৎপাদকের নিকট হইতে কিছু মুনাফা (প্রায় বিক্রীর শতকরা ৫ ভাগ মাছ) দিয়া কিনিয়া খুচরা বিক্রেতাদের নিকট পাইকারী দরে বিক্রয় করিয়া দেয়। মাছ বাকীতে (শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে মুনাফা লইয়া) দেয় বলিয়া খুচরা বিক্রেতারা ইহাদের বাধ্য থাকে। মাছের দর ইহারা ইচ্ছা করিলেই কম বেশী করিতে পারে। নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির জন্য আড়ৎদারের মারফতে মাছ বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

১। ইহারা টাকা দাদন দেয়—পুঁজির অভাব হইলে সামান্য কিছু মুনাফার বদলে পুঁজি সরবরাহ করে। উৎপন্ন মৎস্য বিক্রয়ের টাকা হইতে ঋণশোধের করারে ইহাদের নিকট টাকা পাওয়া যায়।

২। বাজারের উপর ইহাদের প্রভাব খুব বেশী। ইহারা ইচ্ছা করিলেই দর উঠাইতে নামাইতে পারে।

৩। মাছের দর ঠিক করিয়া মাছ ওজন করিয়া ইহারা টাকা দেয়।

৪। ইহারা উৎপন্ন সমস্ত মাছ বিক্রয় করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। মাছ অবিক্রী থাকিলে ক্ষতিপূরণ করে।

কলিকাতার মাছের বাজার

কলিকাতার মাছের বাজার সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলা আবশ্যক। কলিকাতায় ৪টী মাছের বাজার আছে (পাইকারী বিক্রয়ের)। হাওড়া, শিয়ালদহ, হাতীবাগান ও হগমার্কেট। এই কয়টী বাজার ব্যতীত অন্য কোন বাজারে আড়ৎদার নাই, কাজেই পাইকারী মাছ বিক্রয় হয় না। উপরোক্ত ৪টী বাজারের মধ্যে শিয়ালদহ বাজারে শুধু রেলের চালানী মাছ বিক্রয় হয়। ইহাদের প্রত্যেক বাজারেই কতকগুলি করিয়া আড়ৎ আছে। এই সকল আড়তে ভোরে ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে সমস্ত মাছ বিক্রয় হইয়া যায়। ব্যবসায়ীদিগকে ইহাদের যে-কোন আড়তের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়।

একটী শিশু ব্যবসা

কলিকাতার একটী শিশু মৎস্য ব্যবসার কথা বলিতেছি। মৎস্য ব্যবসায় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রতিষ্ঠানের নাম বেঙ্গল অ্যাগ্রিকালচারাল্ অ্যাণ্ড ফিসারী কোম্পানী। মূলধন ২৩,৮০০ টাকা। ইহারা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোন বিলের (৮০০ বিঘার) জলকর লইয়া মাছের আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে আবাদের দূরত্ব ৩৪ মাইল। শ্যামবাজার-বসিরহাট লাইনের বেড়াচাপা ষ্টেশনের ১০ মাইল দূরে ইহাদের আবাদ। ইহারা নিজেদের লরীতে প্রত্যহ কলিকাতায় মাছ চালান দিয়া থাকে। দৈনিক গড়পড়তা ১০ মণ মাছ চালান হইয়া থাকে। দৈনিক আয় ২৯০৲ হইতে ৩৫০৲ টাকা। খরচ ২৩০ টাকার মত।

আদমদীঘি মহাজন সমিতি লিমিটেড্

রিজার্ভ ফণ্ড

গত বর্ষের উদ্বর্তপত্রে নগদ ৫৩৮৬।৫ আনা ও প্রাপ্য অনাদায়ী সুদ মোকদ্দমা খরচ সহ ১৭৭২৮৮১১॥ আনা মোট ২৩১১৫৲১৬॥ আনা দেখান হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ব্যালান্সশীটে নির্দ্ধারিত লাভ হইতে নগদ আরও ১,০০০৲ এক হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে বিগত বর্ষের নগদ ৬৩৮৬।৫ মধ্যে ৫৩৮৬।৫ আনা সমিতিতে পৃথক ভাবে সপ্ত বার্ষিক আমানত রাখায় তাহার সুদ ৫০১৮/১০ আনা একুনে ৫৮৮৮৵১৫ ও প্রাপ্য অনাদায়ী সুদ ও মোকদ্দমা খরচ ইত্যাদি সহ ১৯১৪১৮/০ ও নগদ ১০০০৲ মোট ২৬০২৯৮৵০ টাকা দেখান হইল। গত বর্ষের রক্ষিত রিজার্ভ ফণ্ডের নগদ ১,০০০৲ টাকা দুপচাঁচিয়া লোন অ্যাণ্ড ট্রেড লিমিটেডের পঞ্চ বার্ষিক হেডে আমানত রাখা হইয়াছে।

সন ১৩৩৪ সনে আমরা কলিকাতার বেঙ্গল সেণ্ট্রাল লোন কোম্পানীর ২৫০৲ টাকার অংশ খরিদ করিয়াছি। এই সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত কোম্পানীর অংশ আমাদের সমিতির রিজার্ভফণ্ডকে দৃঢ় করিতেছে।

আমানত

আলোচ্যবর্ষের শেষ তারিখে সমিতির নিকট সর্ব্ব-প্রকার মোট ১,৪৩৯৭৩৷১০ আনা আমানত ছিল।

গত বৎসর হইতে এ বৎসর ৬৪৩৯২॥৵০ টাকা আমানত বৃদ্ধি হইয়াছে।

আদায় ও অনাদায়ী সুদ

গত বর্ষের অনাদায়ী সুদ ১৮৩৫৬৮৶০ আনা ও আলোচ্যবর্ষের প্রাপ্য সুদ ২৫৪১৯॥৵৩॥ আনা একুনে ৪৩৭৭৬৷৶১০ আনার মধ্যে আলোচ্যবর্ষে ২২৯৭৪৮৫ আনা আদায় হইয়া ২০৮০১॥৶৫ আনা বাকী আছে। ইহাতে শতকরা প্রায় ৫১॥০ টাকা আদায় হইয়াছে। মোকদ্দমার জাবেদা খরচ ১৯০৫॥১৫ আনার মধ্যে আদায় ৪০৭৮৵৫ আনা বাদ ১৪৯৭॥৵১০ আনা বাকী দেখান হইয়াছে।

পর পর কয়েক বৎসর আদমদীঘি অঞ্চলে অজন্মা হওয়ায় বাকী সুদের পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ সতর্কতার সহিত দাদন করা হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে, ১৩৩৪ সনে ফসল ভাল হইলে এই বাকীর অনেক টাকা শীঘ্রই আদায় হইতে পারিবে।

দাদন

গতবর্ষের শেষে খাতকগণের নিকট ১,২০,৯২৭৮৵১৫ আনা পাওনা সহ আলোচ্যবর্ষে নূতন দাদন ১১০,৪৫৫৲ টাকা একুনে ২,৩১,৩৮২৮৵১৫ মধ্যে ৫০,৮৩৪॥৶৫ টাকা আদায় হইয়া ১,৮০,৫৪৮৵১০ টাকা বাকী আছে। তন্মধ্যে, নালিশী ১৭৭২৲ বাদে অবশিষ্ট ১,৭৮৭৭৬৵১০ টাকা উদ্বর্ত্ত পত্রে দেখান হইয়াছে।

গতবৎসর অপেক্ষা এবৎসর ৩১৭৮৩৲ টাকা অধিক দাদন হইয়াছে। বগুড়া শহরে শাখা স্থাপিত হওয়ায় সমিতির এই উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

আয়-ব্যয় ও লাভ

আলোচ্যবর্ষে সুদ প্রভৃতি বাবদ—২৩৫৩৪॥৶১৫ আনা আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে খরচ বাবদ ১৪৮৪৵০ আনা বাদ দিলে লাভ ৮৭৩০॥৶১৫ দাঁড়ায়। গত সনের লাভের উদ্বৃত্ত ৫৯০৵১০ সহ মোট মুনাফা ৯৩২০৮৵৫ আনার মধ্য হইতে শতকরা ২২॥০ টাকা হারে ৯২৮১।০ টাকা

ডিভিডেণ্ড দিবার ও অবশিষ্ট আগামী বর্ষের হিসাবে রাখিবার জন্য ডিরেক্টারগণ প্রস্তাব করিতেছেন।

এই সম্পর্কে এই কথা অংশীদার মহোদয়গণকে জানান আবশ্যক যে, সমিতির প্রথম বৎসরে (১৩২৫) শতকরা ১২৷৷০ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে (১৩২৬) শতকরা ২০৲ টাকা, তৃতীয় বৎসরে (১৩২৭) শতকরা ২০৲ টাকা, চতুর্থ বৎসরে (১৩২৮) শতকরা ১৭৷৷০ টাকা, পঞ্চম বৎসরে (১৩২৯) শতকরা ১৫৲ টাকা, ষষ্ঠ বৎসরে (১৩৩০) শতকরা ১৭৷৷০, সপ্তম বৎসরে (১৩৩১) শতকরা ২০৲ টাকা, অষ্টম বৎসরে (১৩৩২) শতকরা ২২৷৷০ টাকা হারে ও নবমবর্ষে শতকরা ২২৷৷০ টাকা হারে একুনে প্রতি শত টাকায় ১৬৭৷৷০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ডিরেক্টর সভা

আলোচ্যবর্ষে ১০টী ডিরেক্টর সভা হইয়াছে ও মাসে ২ দুইজন ডিরেক্টর তহবিল ও হিসাব আদি পরীক্ষা করিয়াছেন।

মোকদ্দমা

আলোচ্যবর্ষে ২২টী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের দায়েরী ১টী লইয়া ২৩টী মোকদ্দমার মধ্যে ২১টী নিষ্পত্তি হইয়াছে, নালিশী ও কিস্তিবন্দি বাবদ ৬৭৮৩৸১৫ টাকার মধ্যে ৩১৩০৸১০ টাকা আদায় হইয়াছে।

শাখা আফিস স্থাপন

কোম্পানীর দাদন ও আমানত-বৃদ্ধির সুবিধার জন্য বগুড়া সদরে গত ১৭ই কার্ত্তিক তারিখে ভাড়াটিয়া ঘরে সমিতির শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় ২০৲ টাকা বেতনের একজন জয়েণ্ট সেক্রেটারী ও ১০৲ টাকা বেতনের একজন পিয়ন দ্বারা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধানে আফিসের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। যেরূপ ভাবে শাখা আফিসের কার্য্য বাড়িতেছে তাহাতে শাখা আফিসে অপর একজন কর্ম্মচারীর আবশ্যকতা আছে।

শেষ কথা

দেশে প্রায়শঃ নূতন নূতন কোম্পানী গঠিত হইতেছে। নূতন কোন ব্যবসায় লিপ্ত না হইয়া একমাত্র কর্জ্জ দাদনী ব্যবসাই সকলে সম্বল করিয়াছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে কোন কোম্পানীই ভালভাবে সফলতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে না।

বীরভূমে দুর্ভিক্ষ

বীরভূম জিলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে। রামপুরহাট মহকুমার অধিবাসীদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তথায় বহু লোক অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করিতেছে। প্রতিদিন শত শত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিতেছেন না। দুর্ভিক্ষের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া বহু লোক আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া চাকুরী ও খাদ্যের সন্ধানে ট্রেণে নানা স্থানে চলিয়া যাইতেছে।

সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

জেটুয়ার হাটে ধান্যের দর ২৷৷০ আড়াই পালিরও কম। চাউল—'মোটা' ৭৷৷০ সাড়ে সাত টাকা মণ। কিন্তু টাকা আসিবে কোথা হইতে? যাহারা জন খাটিয়া খায়, তাহারা দৈনিক ৷৷০ আট আনা পাইতেছে। কিন্তু কাজ কই? "জাতীকালী" ধান্যের পাতা গোঁজকা হইয়াছে। জমি ব্রাহ্মডাঙ্গা, জল বাধিল না চাষ দিতে পারিল না। রুইবে কোথায়? সুতরাং পাতা খাওয়াইয়া দিয়াছে।

আমন ধান্যের পাতা জেটুয়ার মাঠে আদৌ দিতে পারে নাই। জালালপুরের কোনও স্থানে কিছু কিছু "কনা" ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তেমন বাড়িল না; রোজানের জমিও চষিতে পারিল না। "অনাবৃষ্টি" প্রবন্ধ লেখার পর ৯ই শ্রাবণ যে জলটুকু হয়, তাতে "কনা" ফেলে। ১লা ভাদ্রও একটু জল হইয়াছে। এ জলে পাট এবং মরিয়া ছাড়িয়া যে আউশ ধান্যগুলি আছে, তাহাদেরই কোন রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। তবে ঝাল বেগুণের অবস্থা ভাল।

কিন্তু পাট পচাইবার বা কাচিবার জল ত হইল না? ধুইতে পারিলে পাটের মালিকের কিছু খাইবার সংস্থান

হইত। সরকারী রিপোর্টে এবং 'সরজমিনে' দেখা যাইতেছে, গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর পাটের জমি কম। সুতরাং দর কিছু চড়িবে। পাট ধুইতে পারিলে পাটের মালিক ও মজুর-দিগের কিছু দিন চলিত। এখন মধ্যবিত্তদের উপায় ?

জেটুয়ার মাঠ বলিলে জেটুয়া নেহালপুর ধুলগুড়া, বুঝায়। বারুইপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলির দক্ষিণ প্রান্ত বুঝায়। এই মাঠের উপর দিয়া ডিঃ বোর্ডের "মাগুরা বড়দল" রাস্তা গিয়াছে। "রাস্তার উভয় পার্শ্বে এতদিনে "জ্যাতিশাল" ধান্যের গাছ আজানু উচ্চ হইয়া তর তর তরঙ্গায়িত হইত। আজ সেখানে ধু ধু করিতেছে; অপরিণামদর্শী যুবক ও কিশোরগণ অপরাহ্নে পরমানন্দে সেই খানে "ফুটবল" খেলিতেছে। অচিরে অদূর ভবিষ্যতে গো, মনুষ্য অনাহারে মারা যাইবে সে চিন্তা তাহাদের অন্তরে উদিত হয় না।

ইহার দক্ষিণে নিম্নভুমি—বিল যতদূর দৃষ্টি যায় ধু ধু করিতেছে। জালালপুর, শ্রীমন্তকাটী, দোহার, আটলা, তেঘরি হরিপুর নগর, মূড়াগাছা প্রভৃতি গ্রামের পশ্চিম এবং দক্ষিণ বড়দলেরও দক্ষিণ বহুদূর পর্য্যন্ত এই একইভাব। ধান্য জন্মিবার আর কোনও আশা নাই !

শ্রীতারিণী চরণ মুখোপাধ্যায় (খুলনা)

বাঁকুড়ায় অন্নাভাব

বর্ত্তমান বর্ষে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর থানায় ধান্য একেবারে হয় নাই বলিলেও চলে। কয়েকটি ইউনিয়নে ধান্য রোপণ পর্য্যন্ত একেবারে হয় নাই, মধ্যে মধ্যে কোন কোন গ্রামের কৃষকগণ ধান্য রোপণ করিয়াছিল, কিন্তু জল অভাবে সমস্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই তিন মাস দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের আশু ধান্য বা আউশ ধান্য দ্বারা অন্নসংস্থান হইত, কিন্তু এবারে যে আশু ধান্য হইয়াছে তাহাতে এক-মাসও চলিবে না। মধ্যে মধ্যে অজন্মা হওয়ায় কৃষকদের গৃহে ধান্য মজুত থাকে না। সেজন্য দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী-গণের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। দরিদ্র শ্রমিকগণের মধ্যে কেহ কেহ অর্থের আশায় কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে, আবার অনেকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হা হুতাশ করিতেছে, দরিদ্র কৃষকগণ তাহাদের শেষ সম্বল গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া ধান্য কিনিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ইহাতে ভবিষ্যতে চাষের আশাও ক্রমশঃ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পুষ্করিণীসমূহ জলশূন্য, পানীয় জলের অভাবে শীঘ্রই কতকগুলি স্থানে হাহাকার উঠিবে, আলু প্রভৃতি রবি ফসলের জন্য যে জলের আবশ্যক, তাহার সংস্থান না থাকায় অনেকস্থলে রবিশস্যও আবাদ হইবে না। শীঘ্রই ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে বলিয়া জনসাধারণ সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। দরিদ্র পল্লীসমূহের দরিদ্র অধিবাসিগণকে কি উপায়ে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে, তাহাই এখন বিষম সমস্যার বিষয় হইয়াছে।

বাগেরে দুর্ভিক্ষ

এদেশে সন ১৩৩০ সালে অনাবৃষ্টির জন্য শস্য জন্মায় নাই। ১৩৩১ ও ১৩৩২ সালেও সুবৃষ্টি হয় নাই। তবে ফসল যাহা জন্মিয়াছে তাহাতে সাধারণকে নিতান্ত নিরাশ হইতে হয় নাই; পরবর্ত্তী বৎসরের দিকে আশা-দৃষ্টি রাখিয়া দিন কাটাইয়াছিল। গত সন ১৩৩৩ সালে যে শস্য জন্মিয়াছিল তাহা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জলাভাবে বহু পরিমাণে মরিয়া যায়। বর্ত্তমান বৎসর এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায়, দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি যেন চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। কৃষি মজুর ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ঋণের পর ঋণ করিয়া একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ ও বালক শ্রমজীবীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে; কিন্তু খাটাইবার লোক নাই। দেশের অবস্থা আরও কি ভীষণতর হইবে ভাবিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আপনাদের সহৃদয় পাঠকবর্গ কি এই সকল মুটে মজুরদের জন্য কোন কর্ম্মবহুল স্থানের সন্ধান দিতে পারেন না ? কলিকাতা বা তৎসন্নিকটস্থ সহরগুলিতে কিংবা কলকারখানাগুলির কোনটীতে কি নিরক্ষর মুটে মজুরের আবশ্যক নাই ? কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোথাও কি বিনা সেলামীতে ও অল্প খাজানায় পতিত জমিও পাওয়া যায় না ? আশা করি এই কয়টী বিষয়ের বিস্তৃত সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বহু দীন-

দরিদ্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবার জন্য অনেক ব্যক্তি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। শ্রীকালীকিঙ্কর

বাগৌর, জীবন্তী পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

(১)

বর্দ্ধমান জেলায় দুর্ভিক্ষ

এবৎসর বর্দ্ধমান জেলায় সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় বহু স্থানেই ধান্য হইবে না। গত বৎসরও আশ্বিন মাসের শেষভাগে বৃষ্টি না হওয়ায় আশানুরূপ ফসল হয় নাই। তজ্জন্য কৃষকগণের গৃহে খাদ্যোপযোগী ধান্যও সঞ্চিত নাই। কাল্না, কাটোয়া ও সদর মহকুমায় ধান্যের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বৎসর মোট ফসল সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের সিকি অংশেরও কম হইবে। সদর মহকুমার অন্তর্গত গল্সী, আউসগ্রাম ও সাহেবগঞ্জ থানার অনেক গ্রামেই খোরাকী ধান্য দূরের কথা, পর বৎসর আবাদের জন্য বীজের উপযুক্ত ধান্যও উৎপন্ন হইবে না। এখন হইতেই গরিব লোকেরা গ্রামে কাজ পাইতে না থাকায় উদরান্নের জন্য নিজ নিজ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। এ জেলায় রবিশস্যের উপযুক্ত জমি অতি অল্প। উহা সময়ে আবাদ হইলেও দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে বিশেষ কোন সাহায্য হইবে না। গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর খাদ্যের অবস্থা আরও ভীষণতর। ইতিমধ্যেই খড়ের অভাবে গৃহস্থেরা গ্রাম ছাড়িয়া কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে গোচারণের ভূমির সন্ধান পাইয়া তথায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, যদি কোনও রকমে গরু বাছুরগুলির জীবন রক্ষা পায়।

বর্দ্ধমান জেলায় উল্লেখযোগ্য কোনও কুটীর-শিল্প নাই। তুলা উৎপাদন ও চরখায় সুতাকাটা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা সত্ত্বেও বর্দ্ধমান জেলাবাসিগণ অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য ও জড়তা নিবন্ধন তাহা গ্রহণ করেন নাই। যদি ঐ সামান্য শিল্পটুকুও আজ গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে প্রাণরক্ষার উপযুক্ত সামান্য উদরান্নের জন্য আজ এমন হাহাকারধ্বনি উঠিত না।

দুর্ভিক্ষ সুনিশ্চিত। এখন হইতেই আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে ও দুর্ভিক্ষের প্রতীকার-কল্পে চেষ্টা করিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কি করিতেছেন? আশা করি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সহৃদয় মেম্বারগণ দুর্ভিক্ষ সাহায্য-কল্পে রাস্তা ও জলাশয় আদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা সত্বর করিবেন। আর গবর্ণমেণ্ট? যাঁহাদের কর্ম্মচারীরা এই মর্ম্মে রিপোর্ট দিতে পারেন—"এখনও গাছে পাতা আছে, মেয়েরাও বেশ্যা হয় নাই, তবে দুর্ভিক্ষ কিসের?" তাঁহাদের নিকট দুর্ভিক্ষের কথা তোলাই বোধ হয় বাতুলতা, অন্ততঃ অসম্মানকর বলিয়া মনে করি।

গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের ব্যবস্থা করুন আর না করুন, আমাদিগকে করিতেই হইবে, ইহা আমাদের দেশবাসিগণের বদ্ধমূল ধারণা হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের লোক না খাইয়া মরিবে, আর অপরে কবে সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে, তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিব কিংবা পূর্ব্বোক্তরূপ রিপোর্ট পড়িতে থাকিব ও তাহারই সমালোচনা করিতে থাকিব, ইহা কলঙ্কের কথা হইবে। আমাদের সম্মান ও প্রাণরক্ষার ভার আমাদের নিজদিগকেই লইতে হইবে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

বর্দ্ধমান জেলাবাসী পাঠকগণের প্রতি বিনীত অনুরোধ যে, তাঁহাদের গ্রামের নিকটস্থ গ্রামসমূহে ধান্যের ও গ্রামবাসিগণের বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত
শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা,
সেক্রেটারী,
বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি, বর্দ্ধমান।

(আত্মশক্তি)

(২)

বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ স্থানেই এবার অজন্মার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বৃটিশ ভারতে দুর্ভিক্ষে লোক-মৃত্যুর সংখ্যা নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৩১৩।১৪ সনের দুর্ভিক্ষে বর্দ্ধমান সম্মিলনী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের জন্য বিশেষ চেষ্টা করাতে কথঞ্চিৎ সুফল দেখা গিয়াছিল। এবার গবর্ণমেণ্ট, জমীদার এবং কংগ্রেস একযোগে এই বিষম দুর্দ্দিনের প্রতিকারে অগ্রসর হইলে অন্নাভাবগ্রস্ত লোকের না খাইয়া মরিতে হইবে না।

প্রথম কর্ত্তব্য রাজশক্তির। কতগুলি গ্রামে এবং কত জন লোকের মধ্যে প্রকৃত অন্নাভাব ঘটিয়াছে, তাহা প্রথমে নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে ইহা সহজ হইবে। সরকার যেমন কিছু নয় বলিয়া অনেকই উড়াইয়া দেন, তেমন করিলে হা অন্ন হা অন্ন করিতে করিতে বহু লোক মৃত্যুমুখে পড়িবে।

তাহার পর ঋণদান। যাহাতে বিনা সুদে লোকে ঋণ পায়, সে ব্যবস্থাও করা চাই। এবং পথ ও পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্য বিস্তৃতভাবে আরম্ভ করিয়া যাহাতে সন্তোষজনক রিলিফ কার্য্য চলে, তাহার সুবন্দোবস্তেরও প্রয়োজন। এই সঙ্গে, যাহাতে জেলা বোর্ড, লোক্যালবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির রাস্তাঘাট, ইঁদারা জলাশয় খনন প্রভৃতি কার্য্য চলে, গবর্ণমেন্টকে সতর্ক হইয়া তাহাও করাইয়া লইতে হইবে। এই সঙ্গে আমরা বলিতেছি যে, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কয়েক লক্ষ টাকা যে জলাভাব-পীড়িত জেলায় খরচ করিতে না পারিয়া বাহবা লইবার জন্য সরকারে ফেরৎ পাঠাইয়াছেন, সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট সেই টাকাটা এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে ব্যয় করিলে যথার্থ রাজশক্তির পরিচয় দেওয়া হইবে।

তাহার পর জমীদারবৃন্দের কথা। যাঁহারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের জমীদার, তাঁহারা পৈতৃক পুষ্করিণী প্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার করিলে ও বিলাসবাহুল্য কমাইয়া এবং মামলা মোকদ্দমা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক-অনুসরণে নূতন করিয়া জলাশয়াদি খনন করিলে ও দেবালয় এবং রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ করিলে তাঁহাদের সন্তানতুল্য প্রজাগণ বাঁচিয়া যাইবে। বৰ্দ্ধমান মহারাজের বিলাতী মোহ ঘুচাইয়া এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত।

আর একটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে, জেলার ধনী মহাজন সমাজের। তাঁহারা একটি কেন্দ্রীয় ধর্ম্মগোলা স্থাপন করুন; এবং তাহা হইতে যাহাতে প্রতি দুর্ভিক্ষ-কেন্দ্রে সাহায্য যায়, কংগ্রেস কমিটীর সাহায্যে তাহার উপায় নির্দ্ধারিত করুন।

এই বিপদের দিনে মহীয়ান মানবধর্ম্মের দোহাই দিয়া গবর্ণমেণ্ট, রাজা, জমীদার, ধনী, বণিক, দেশসেবক প্রত্যেক-কেই অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। এই মহান উদ্দেশ্য রহিবে—আমরা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিব,—একটি প্রাণীও যেন ক্ষুধার জ্বালা না সহে।

(শক্তি)

আর্থিক ভারত

বিদেশে ভারতীয় মালের বাজার অন্বেষণ

টারিফ বোর্ডের নির্দ্দেশমত ভারত সরকার এক ট্রেড মিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে সরকারি প্রতিনিধি ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক সংবাদের ডিরেক্টর জেনারেল ডাক্তার মিক ও মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মনোনীত একজন প্রতিনিধি থাকিবেন। ইঁহারা শীঘ্রই মিশর, সুদান, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, তুর্কি, এডেন, আবিসিনিয়া, বৃটিশ, ফেঞ্চ, ও ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড, ইরাক, পারশ্য, ওমান, আরব, কেনিয়া, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিকা, জাঞ্জিবার, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা ষ্ট্রেট সেটল্‌মেণ্টস, ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটস, ইষ্টইণ্ডিজ, শ্যাম, ফিলিপাইন দ্বীপ প্রভৃতি এশিয়া-আফ্রিকার প্রধান প্রধান বাজারগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ঐ সমস্ত স্থানে ভারতীয় উৎপন্ন মালের কাটতির সম্ভাবনা কিরূপ আছে তাহা নির্দ্দেশ করিবেন। বোম্বাই মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যান তাঁহাদের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত টী, মালোনিকে ঐ মিশনের প্রতিনিধি হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মালোনি ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছেন। নবেম্বর মাস হইতে মিশনের কাজ আরম্ভ হইবে।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯২৬-২৭

১৯২৬-২৭ সনে ভারতবর্ষ বিদেশে ৩০৯ কোটি টাকার মাল বেচিয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে ঐ সংখ্যা ৩৮৫ কোটি টাকা ছিল। তাহা হইলে দেখা যায় পূর্ব্ব সনের তুলনায় আলোচ্য সনে ভারতবর্ষ শতকরা বিশ ভাগ মাল কম বেচিয়াছে। ভারতবর্ষ সাধারণতঃ বিদেশীদের নিকট কাঁচা মাল বিক্রয় করে। আলোচ্য বৎসরে দুনিয়ার বাজারে তূলা ও পাট প্রভৃতি কাঁচা মালের দাম পড়িয়া যাওয়ার ফলেই রপ্তানি-বিভাগে মূল্যের হ্রাস হইয়াছে।

অন্য দিকে পূর্ব্ব সনের তুলনায় ১৯২৬-২৭ সনে বিদেশীরা ভারতে শতকরা দুই ভাগ বেশী মাল পাঠাইয়াছে। এই সনে ভারতে ২৩১ কোটি টাকার মাল আমদানি হয়। ১৯২৫-২৬ সনে ঐ সংখ্যা ২২৬ কোটি ছিল। বিদেশী মাল, যাহা ভারতে আমদানি হয়, তাহার চারি ভাগের তিন ভাগই শিল্প-কারবার উৎপন্ন মাল, কাঁচা মাল নহে। আবার ভারতবর্ষ বিদেশীর নিকট যাহা বিক্রয় করে তাহার প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগই কাঁচা মাল। আমাদের ও তাহাদের মধ্যে তফাৎ কোন্‌খানে দেখুন। আমরা যে কাঁচা মাল অল্প পয়সায় তাহাদের নিকট বিক্রয় করি, তাহাই তাহাদের শিল্প-কারখানা হইতে বিভিন্ন দ্রব্যে পরিণত হইয়া এদেশে বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়। লাভের বখরা বেশীর ভাগ তাহাদের পকেটেই যায়। এই সনের আমদানি বিভাগে একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বিদেশে তৈয়ারী শিল্প মাল এই সনের মোট আমদানির শতকরা ৭২·৮ ভাগ ছিল। পূর্ব্ব সনে ঐ সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৪·৩ ভাগ। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ছিল শতকরা ৭৬·৬ ভাগ। শিল্পজাত বিদেশী মালের পরিমাণ ধীরে ধীরে আরও কমিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় ভারতের রপ্তানি অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের আমদানি বাড়িয়াছে

বিদেশী বস্ত্রের আমদানি শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ১,৭৮৮০ লক্ষ গজে পৌছিয়াছে। পূর্ব্ব সনের চাইতে ২২৪০ লক্ষ গজ কাপড় বেশী আমদানি হইয়াছে। বিদেশী

বস্ত্রের মূল্যের হার কমিয়া যাওয়ায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৫১ লক্ষ টাকা বা শতকরা এক টাকা মাত্র হইয়াছে। ১৭২ কোটি টাকার ধোল্লাই কাপড় আমদানি হয়। পূর্ব্ব সনে ঐ সংখ্যা ১৬ কোটি টাকা ছিল। ১৭২ কোটি টাকার রঙ্গিন বস্ত্র আমদানি হয়। কোরা কাপড় ৩৯০ গজ বেশী আমদানি হইলেও ইহার মূল্য ২২ কোটি হইতে ১৯৪ কোটি টাকায় নামিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ৬৪ কোটি টাকার বিদেশী সূতা ভারতে আমদানি হয়। পূর্ব্ব সনে ভারতবাসী ৭৪ কোটি টাকার বিদেশী সূতা খরিদ করিয়াছিল।

চিনি

ভারতে বিদেশী চিনির কাটতি শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সনে ১৯ কোটি টাকার ৯২৪০০০ টন চিনি এদেশে আমদানি হয়। পূর্ব্ব সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৮০৫,০০০ টন। ইহার জন্য ভারতবাসীকে ১৬ কোটি টাকা মূল্য দিতে হয়। মূল্যের দিক্ দিয়া পূর্ব্ব সনের তুলনায় এ সনে ভারতবাসীকে শতকরা ২১ টাকা বেশী দিতে হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত

লৌহ ও ইস্পাত আমদানির হার শতকরা ৪ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ১৬২ কোটি মূল্যে ৮৪৫০০০ টন লৌহ-ইস্পাত আমদানি করা হয়। পূর্ব্ব সনের সংখ্যা ছিল ৮৮৪০০০ টন। ইহার জন্য ভারতবাসীকে ১৮ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হয়। লৌহ ইস্পাত আমদানি কম হওয়ায় এই বিভাগে আমাদের শতকরা ৭ টাকা করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

যন্ত্রপাতি

পূর্ব্ব সনের তুলনায় মিল ও কারখানার যন্ত্রপাতির আমদানি এক কোটি টাকার কমিয়াছে। এই সনে মোট ১৪ কোটি টাকার মাল আমদানি হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে রেলওয়ে প্লান্ট ও রোলিং ষ্টক আমদানির পরিমাণ ৫ কোটি হইতে ৩২ কোটিতে নামিয়াছে।

অন্যান্য লোহালক্কড় ও মোটর গাড়ীর আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সনে ঐ বিভাগে মোট ৫ কোটি টাকার মাল আমদানি হয়। পূর্ব্ব সনে ঐ সংখ্যা ৩ কোটি টাকা ছিল।

খনিজ তৈল

খনিজ তৈল পূর্ব্ব সনের ২০ কোটি গ্যালনের তুলনায় এই সনে ১৮২ কোটি গ্যালন আমদানি হয়। ভারতবাসীকে ইহার জন্য ৯ কোটি টাকা দিতে হয়। পূর্ব্ব সনে ঐ বাবদে তাহাদিগকে ১০ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছিল।

বিদেশী তুলা

১৯২৬-২৭ সনে ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৪৫৭০০ টন তুলা ভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব সনে ১৭,৫০০ টন মাত্র বিদেশী তুলা ভারতে প্রবেশলাভ করে এবং ইহার জন্য আমাদিগকে ৩৪ কোটি টাকা দিতে হয়।

মদ ও কাগজ

আলোচ্য সনে ৩,৫৩ লক্ষ টাকার মদ ও ২,৭৮ লক্ষ টাকার কাগজ এদেশে আমদানি হয়। ১৯২৫-২৬ সনের তুলনায় ১৯ লক্ষ টাকার মদ ও ২৬ লক্ষ টাকার কাগজ বেশী আমদানি হইয়াছে।

বস্ত্র রপ্তানি কমিয়াছে

রপ্তানি বিভাগে তুলার কাঁচা মাল ও শিল্পজাত মালের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে ভারতবাসী মোট ১০৫ কোটি টাকার তুলা, বস্ত্র ও সূতা বিদেশে রপ্তানি করে। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ বিভাগে মাত্র ৭০ কোটি টাকার মাল বিদেশে চালান হইয়াছে। তুলার কাঁচা মালের রপ্তানি শতকরা ২৪ ভাগ কমিয়া ৭৪৫,০০০ টন হইতে ৫৬৯০০০ টনে নামিয়াছে। ইহার মূল্য শতকরা ৩৮ টাকা কমিয়া ৯৫ কোটি হইতে ৫৮২ কোটি টাকায় নামিয়াছে।

পাট

কাঁচা পাটের রপ্তানি শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি হইয়া ৬৪৭,০০০ টন হইতে ৭০৮,০০০ টনে পৌছে। কিন্তু ১৯২৫-২৬ সনের মত পাটের দাম চড়া না থাকায় মূল্য শতকরা ২৯ ভাগ হ্রাস পাইয়া ৩৮ কোটি হইতে ২৬¾ কোটিতে নামিয়াছে। পাটের বস্তা ও চটের রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়; কিন্তু পাটের বাজার নরম থাকায় মূল্য অনেকটা কমিয়া যায়।

মোট ৮০ কোটি টাকা মূল্যের পাট, বস্তা ও চট বিদেশী জাহাজে ভর্ত্তি করা হয়। ১৯২৫-২৬ সনে ঐ সংখ্যা ৯৭ কোটি ছিল।

খাদ্য শস্য

খাদ্য শস্যগুলির পরিমাণ ৩,০৬৩,০০০ টন হইতে ২,৪২৯,০০০ টনে এবং মূল্য ৪৮ কোটি হইতে ৩৯ কোটি টাকায় নামিয়া যায়।

আলোচ্য সনে মোট ৩৩ কোটি টাকা মূল্যের ২০৩৫০০০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯২৫-২৬ সনের ভারতবর্ষ ৩৯⅓ কোটি টাকা মূল্যের ২৫৪৯০০০ টন চাউল বিদেশে পাঠায়। গম রপ্তানির পরিমাণ ২১২০০০ টন হইতে ১৭৬০০০ টনে এবং ইহার মূল্য ৩⅓ কোটি হইতে ২¾ কোটি টাকায় নামিয়া যায়। বার্লি ও কলাই প্রভৃতির রপ্তানিও কমিয়া যায়। এই সনে মোট ২৯ কোটি টাকা মূল্যের ৩৪৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হয়। পূর্ব্ব সনের তুলনায় মূল্য ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

তৈল-শস্য

তৈল শস্যের রপ্তানি ৪৩২০০০ টন কমিয়া ৩৩৮০০০ টনে দাঁড়ায়। মূল্য ১০½ কোটি কমিয়া ১৮ কোটি টাকায় পৌছে।

উপরের সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, গত তিন সনের তুলনায় ১৯২৬-২৭ সনে ভারতে রপ্তানি ব্যবসা কতকটা মন্দা ভাবে চলিয়াছে। অন্যদিকে তাহার আমদানি ব্যবসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানির চাইতে রপ্তানি মালের মূল্য-হার অনেকটা কম।

ভারতের চা

১লা এপ্রিল, ১৯২৭ হইতে ১৮ই অক্টোবর ১৯২৭ পর্য্যন্ত ভারতীয় চা-রপ্তানির হিসাব এইরূপ :—

যে দেশে রপ্তানি হইয়াছে	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭
যুক্তরাজ্য (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম)	১৫,৫১,৬১,৭২২	১৪,৮১,৮৬,৪০৫
অষ্ট্রেলিয়া	১২,২০,৯৭০	১৯,৫১,২২৪
কানাডা	৪৩,৫৯,৪৮৪	৫৭,৫০,৫৩০
যুক্তরাষ্ট্র	৩৭,২৪,৯৯৪	৩৯,৬২,৬৩৮
দক্ষিণ আমেরিকা	৫,৮৬,২৭৭	৪,৩৫,৮৫৫
হাম্বুর্গ ও ব্রেমেন	২,৮৩,৯২৬	২,৬২,১১৮
ইয়োরোপীয় বন্দরসমূহ	২,৩৪,৫৬৩	৩,৫৮,৬৩৩
কনস্তান্তিনোপল	৪৬,৬০৫	৩,০০০,৭৫০
হাঙ্কৌ	১৩,০০,৯৭৭	...
ব্লাডিভোষ্টক	৫৪,৯৯,৭৮০	...
ওডেশা	৩,৩৬৪	...
সাংহাই	৩,৪৮০	৫০০
বাতুম্	৬,৭১,০৮০	৪,০৯,৪৮০
বোম্বাই রেলে	২৬,৬০,৮৩৫	১৭,৬৭,০৮৫
„ জলে	১২,১০,১৪৭	৩,১৩,২৮১
ভারতীয় বন্দরসমূহ	৩,৬৬,৫৫৫	৪,৪০,২৭৮
পারস্য উপসাগর	৩২,২৫,৩০২	৫২.৫৭,৫৫৮
ষ্ট্রেট্ সেটেল্মেণ্ট	১,৬৩,৬৯২	১,৫৬,২৩৫
ব্রহ্মদেশ	১৬,১৫,৫০৭	১৫,৮৩,৫১০
মিশর	১৯,২২,৩৩৫	২৯,৫২,২৪৪
আফ্রিকা (উত্তর)	১,১০,১৩৮	১,২৪,১৬৮
„ (দক্ষিণ)	১,৩২,৩১৯	৬,৪২,৩২৮
অন্যান্য স্থান	৩,২০,৪৪৪	২,৭০,৩৫৭
মোট পাউণ্ড	১৮,৩৭,২৭,৪৯৬	১৭,৫০,২৮,১৬৭

দক্ষিণ ভারত হইতে ঐ কালে রপ্তানি—

১৯২৭ ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে আগষ্ট ১৯২৭ পর্য্যন্ত

যুক্তরাজ্য	১,৫৯,৮২,৬২৯	১,৭৫,০৪,৯২৮
কলম্বো	১৬,৭৪,১৮৯	২১,৩৪,৫৬৩
অন্যান্য স্থান	৩,০৮,২০৭	৩,৫০,৮৫৫
মোট পাউণ্ড	১,৭৯,৬৫,০২৫	১,৯৯,৯০,৩৪৬

তূলা ভারত

২৯২৭-২৮ সনের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১লা অক্টোবর ভারতের নানাস্থান হইতে তূলা সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

এ পর্য্যন্ত যতদুর জানা গিয়াছে তাতে মনে হয় গোটা ভারতের তুলার আয়তন ২,০৫,৯২,০০০ একর হইবে। গত বছর ছিল ২,২০,৫৫,০০০ একর। অর্থাৎ এ বছর ৭°/০ ঘাট্‌তি পড়িবে।

প্রাদেশিক হিসাব

প্রদেশ বা রাজ্যের নাম	১৯২০-২১ হইতে ১৯২৫-২৬ অবধি ৫ বছরে গড়ে যতটা আয়তনে তুলা চাষ হইয়াছে তার কত অংশ	মোট আয়তন একর	গত বছরের তুলনায় কত বেশী (+) বা কম (–)	মন্তব্য
১। বোম্বাই	২৭.৮°/০	৫৩,১৪,০০০ [তন্মধ্যে দেশী রাজ্যে ১২,৯৮,০০০]	–৯°/০	পরিমাণটা প্রথম ও শেষ বপন ধরিয়া।
২। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার তন্মধ্যে বেরারে	২০.৮°/০	৪৮,৫১,০০০ ৩২,৯৪,০০০	–৬°/০	তুলার দর গত বছর নামিয়া যাওয়ায় এই হ্রাস। ফসলের অবস্থা গড়ে উত্তম। গত বছর নর্ম্মালের ৯০°/০ পাওয়া গিয়াছিল। এ বছর ১০৯°/০ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়।
৩। মান্দ্রাজ	১০.৫°/০	২৬,৮০,০০০	–৭°/০	সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি বপনের হিসাব। মাদুরা, রামনাদ, টেনেভেলি, ত্রিচিনপলি ইত্যাদি গত বছরের শস্য রোপিত স্থানের আয়তন কমিয়াছে। আগষ্ট মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় বেলারির আয়তন কমিয়াছে কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ কুর্ণুলে বৃষ্টি হওয়ায় শোধবোধ হইয়াছে।

প্রদেশ বা রাজ্যের নাম	১৯২০-২১ হইতে ১৯২৫-২৬ অবধি ৫ বছরে গড়ে যতটা আয়তনে তুলা চাষ হইয়াছে তার কত অংশ	মোট আয়তন একর	গত বছরের তুলনায় কত বেশী (+) বা কম (−)	মন্তব্য
৪। পাঞ্জাব	৮.৬%	২২,৭৯,০০০	−১৩%	গত বছর তুলার দর পড়িয়া গিয়াছিল। বপনের সময় জল বৃষ্টি হয় নাই। এই দুই কারণে গত বছরের চেয়ে কম। নর্ম্মালের ৯৪%।
দেশী রাজ্য		২,১৩,০০০		
বৃটিশ জিলাগুলিতে				
দেশজ		১১,৩৪,০০০		
আমেরিকান্		৯,৩২,০০০		
৫। যুক্ত প্রদেশ	৩.৫%	৭,৩৩,০০০	−২৫%	নর্ম্মালের ৬০% বা ৭৫%।
রামপুর রাজ্য		১৪,০০০		
৬। ব্রহ্মদেশ	১.৪%	৩.৮৬,০০০	−১১%	অবস্থা ভাল।
৭। বঙ্গদেশ	০,৪%	৭৮,০০০	+২·৭%	গত বছরের শোধিত হিসাব ৭৬,০০০। গোড়ার দিকে মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ জলাভাবে এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য অতি-বৃষ্টির ফল ভোগে। পরে অবস্থা ভাল। বাঁকুড়া বরাবর ভাল।
৮। বিহার ও উড়িষ্যা	০·৩%	৭৭০০০	১%	বন্যা ও ঝড় বৃষ্টিতে কটক ও মানভূমে ক্ষতি হইয়াছে। সর্ব্বত্র অবস্থা আশাপ্রদ।
৯। আসাম	০·২%	৪৫.০০০	−২%	গত বছরের পরিমাণ ৪৬,০০০। মোটামুটি অবস্থা ভাল।
১০। আজমীর মাড়বার	০·২%	৩৩,০০০	−৩২%	গত বছরের পরিমাণ ২৫,০০০। অবস্থা ভাল।
১১। উ-প সীমান্ত	০·১%	২১,০০০	−৩৬%	গত বছরের পরিমাণ ৩৩,০০০। মোট আদায় ৫,০০০ বেল হইবার সম্ভাবনা।
১২। দিল্লী		৩.০০০		গত বছর ৬,০০০ ছিল। কারণ বৃষ্টির অভাব। ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

প্রদেশ বা রাজ্যের নাম	১৯২০-২১ হইতে ১৯২৫-২৬ অবধি ৬ বছরে গড়ে যতটা আয়তনে তুলা চাষ হইয়াছে তার কত অংশ	মোট আয়তন একর	গত বছরের তুলনায় কত বেশী (+) বা কম (−)	মন্তব্য
১৩। হায়দ্রাবাদ	১৪·৬%	৩২,৭৯,০০০	+১৪%	গত বছরের পরিমাণ ২৮,৭২,০০০।
১৪। মধ্যভারত	৪·৫%	১২,৪৪০০০	−৬ ”	
১৫। বড়োদা	২·৮%	৫,৭০,০০০	−১৭ ”	
১৬। গোয়ালিয়র	২·৩%	৬,১০,০০০ (?)		গত বছর ৬,৫১,০০০।
১৭। রাজপুতানা	১·৫%	৩,৭১,০০০	−৮ ”	
১৮। মহীশূর	০·৩%	১৮,০০০		গত বছর ছিল ৫২,০০০ একর।



আঙ্গোরায় সিমেণ্ট-কারখানা

"আজৎ ফ্রাঁসে" নামক ফরাসী কোম্পানী আঙ্গোরায় সিমেণ্ট-কারখানা চালাইবার ভার পাইয়াছে। দায়িত্ব আধা-আধি হইল আঙ্গোরা-শহরের আর আধা-আধি ফরাসী কোম্পানীর। বিদেশী পুঁজির আমদানি হইতে যুবক তুর্ক নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহে না। এদিকে কারখানাটা তৈয়ারী করিল কে? বার্লিনের ফোন গ্রুবার নামক কোম্পানী। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি আসিল জার্ম্মাণি হইতে আর কাজ চালাইবার পুঁজি জুটিতেছে ফ্রান্স হইতে। কারখানাটা "নাগরিক"।

বেলজিয়াম ট্রাষ্ট

"ট্রাষ্ট"-গঠনের ধুম আজকাল বেলজিয়ামেও জবর। "র‍্যাশন্যালিজেশ্যন" বা যুক্তি-যোগ চলিতেছে এই দেশের নানা শিল্প-কারখানায়। গবর্মেণ্ট স্বয়ংই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আইন ছিল যে, কতকগুলা কোম্পানী মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাহিলে তাহাদের নিকট হইতে একটা কর আদায় করা হইত। বিগত সেপ্টেম্বর মাসের আইনে করের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগে যেখানে ১৲ টাকা দিতে হইত এখন সেখানে ৷৷৵০ আনা দিলেই হইবে।

কয়লার খাদে আর ধাতুর কারখানায় সঙ্ঘমূর্ত্তির বিকাশ দেখিতেছি খুব স্পষ্ট। দুইটা মাত্র বিরাট সঙ্ঘ থাকিবে। আর সবই হইল এই দুইয়ের কুক্ষিগত। অপর দিকে তিনটা বড় বড় বোণ্টের কারখানা কেন্দ্রীকৃত হইল। বাজারে মাল বেচিবার জন্য তাহারা একটা সমবেত আড্ডা কায়েম করিয়াছে। কেহ আর স্বতন্ত্রভাবে মাল বেচিবে না।

অন্যান্য কারবারের গতিও ঐরূপ। কেব্‌ল্‌ ও তারের কারখানাসমূহ কেন্দ্রীকৃত হইতেছে। মদের কারখানা-গুলায় কেন্দ্রবদ্ধতা দেখা যাইতেছে। যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরিতেও ঐক্যবন্ধন দেখিতেছি। তাহা ছাড়া কাগজের কলগুলাও আর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছে না।

অটোমোবিল-সঙ্ঘ

অটোমোবিলের কারখানাগুলা ট্রাষ্টমূর্ত্তির বিকাশে সকলকে পরাস্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। বেলজিয়ামে এখন হইতে মাত্র একটা অটো-কোম্পানী থাকিবে। চুক্তির দ্বারা ব্যবস্থা হইয়াছে যে প্রত্যেক কোম্পানীই দু'একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের গাড়ী বাজারে ছাড়িবে। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোনো বিষয়ে টক্কর চালাইবে না। কেহ তৈয়ারী করিবে বিলাস-মোটর, কাহারও ভাগে পড়িতেছে ছোট গাড়ী। কেহ কেহ বা দু'একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের দায়িত্ব লইবে। সকলের জন্য এক কেন্দ্রে কুদরতী মাল খরিদ করা হইবে। বিদেশী বাজারে গাড়ী ছাড়িবার জন্যও ব্যবস্থা থাকিবে ঐক্যবদ্ধ।

নবীন শিল্প-বিপ্লব

স্বতন্ত্রতা ভাঙিবার ঝোঁক দেখা যাইতেছে সিমেণ্টের কারখানায় আর চিনির কারখানায় অর্থাৎ যাঁহা জার্ম্মাণি, যাঁহা রুশিয়া, যাঁহা আমেরিকা, যাঁহা বিলাত,—তাঁহা ক্ষুদ্র বেলজিয়াম।

বিপুল ট্রাষ্ট-সঙ্ঘ পৃথিবীতে নতুন একটা শিল্প-বিপ্লব

হাজির করিয়া ছাড়িতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে শিল্প-বিপ্লব আসিয়াছিল সেটা বিংশ শতাব্দীর এই নবীন শিল্প-বিপ্লবের মাপকাঠিতে ছেলে-খেলা মাত্র। ভারতে আমরা কিন্তু সেই উনবিংশ শতাব্দীর সেকেলে ছেলেখেলাটায় মাত্র হাঁতমকৃস করিতেছি। এইরূপ বুঝিয়া রাখিলেই বেলজিয়ামের বর্ত্তমান ক্রমবিকাশটা বুঝিতে পারিব।

বিশ্বব্যাপী বিজলী-ট্রাষ্ট

বিজলী বাতীর বাজারে বিশ্বব্যাপী ট্রাষ্ট কায়েম হইয়াছে। ট্রাষ্টের কেন্দ্রস্থল হইতেছে সুইটসার্ল্যাণ্ডের জেনেহ্বা নগরে। কোম্পানীর নাম ফীবুগ। বাতী তৈয়ারী, বাতী বেচা আর বাতীর দর এইসকল বিষয়ে ট্রাষ্টের অধীনস্থ জগতের বিভিন্ন কারখানাগুলা একমতে কাজ করিতেছে। ট্রাষ্ট গঠনের ফলে ছোট ছোট অনেক কারবার তুলিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে "অক্ষমের তিরোভাব" যুক্তিযোগেরই অঙ্গবিশেষ। সুইট-সার্ল্যাণ্ডের চার নগরে চারটা বাতীর কারবার ইতিমধ্যে কারবার-লীলা সম্বরণ করিয়াছে।

বিলাতী নাইট্রেট

বিলিংহাম অঞ্চলে বিলাতের "সিন্থেটিক অ্যামোনিয়া অ্যাণ্ড নাইট্রেট্স্ কোম্পানীর" কারখানাগুলা অবস্থিত। কোম্পানীর তৈয়ারী মাল প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ফরাসী "জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল" খবর দিতেছে যে, নাইট্রেটের দুনিয়ায় জার্ম্মাণির সঙ্গে বিলাত এইবার প্রায় সমানে সমানে টক্কর দিতে চলিল। নাইট্রেট লাগে চাষের ক্ষেতে সারের জন্য।

ইতালিতে ইংরেজ বনাম জার্ম্মাণ

ইতালিতে ইংরেজরা তেলের বীচি বেচিত। কিন্তু আজকাল ইতালির বাজার ইংরেজদের হাত-ছাড়া হব' হব'। সুইডেন আর জার্ম্মাণির বেপারীরা ইংরেজ বেপারীকে ইতালি হইতে হটাইতেছে। হটাইবার কৌশল অতি সোজা। ইংরেজরা জাহাজে মাল বোঝাই করিয়া দিবামাত্র ইতালিয়ান খরিদ্দারদের নিকট হইতে নগদ টাকা চায়। কিন্তু জার্ম্মাণরা প্রথমতঃ ইতালিয়ান বন্দরে মাল পৌঁছাইয়া দিতে হইলে দাম কত পড়িবে তাহার ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা তিনমাস পর্য্যন্ত ধারে বেচিতে রাজি।

রুমেনিয়ায় সংরক্ষণ-শুল্ক

পাট আর পাটের বস্তার আমদানির উপর রুমেনিয়া চড়া হারে শুল্ক চাপাইয়াছে। হারটা ১৪ এপ্রিল তারিখে ডবল করা হইয়াছে। সংরক্ষণ-নীতির একটা বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। কৃষি কোম্পানীগুলা যে সব জিনিষ আমদানি করিতেছে তাহার উপর শুল্কের হার নরম। আসল কথা এই কোম্পানীগুলা আধা সরকারী। অর্থাৎ গবর্মেণ্ট স্বয়ং বেপারী। সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধাগুলা ভোগ করিবার জন্য জার্ম্মাণির পুঁজিপতিরা রুমেনিয়ার নানা কারবারে টাকা ঢালিতেছে। ইংরেজরাও পুঁজি ঢালিবার ব্যবস্থা করিতেছে। বিদেশী পুঁজি যাচিয়া মাগিয়া আনা রুমেনিয়ার সরকার দেশোন্নতির একটা বড় কর্ম্ম-কৌশল বিবেচনা করিতেছে।

আমেরিকার বোতল-তাজা ফল

ফলমূলকে বোতলে তাজা করিয়া রাখিবার কারবারে মার্কিণ মুল্লুক দুনিয়ায় একমেবাদ্বিতীয়ম। আর মার্কিণ মাল খাইতে ওস্তাদ ইংরেজ। ১৯২৬ সনে যুক্তরাষ্ট্র যত "বোতল তাজা আপেল" বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে তাহার শতকরা ৯২.৩ অংশ উদরস্থ হইয়াছে ইংরেজের। পেয়ারের বেলায় অংশটা ৮৭। অ্যাপ্রিকট ফলের বেলায় ৮৩ আর পীচের বেলায় ৭৯.৭। কিন্তু আনারসের বেলায় অংশটা মাত্র ৩৩।



ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ভারতের ট্রেড্ কমিশনার

টারিফ বোর্ডের সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যে বোম্বাই মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যন আলেকজন্দ্রিয়া, এডেন, বসরা, মোম্বাসা, ডারবান ও সিঙ্গাপুরে ছয় জন স্থায়ী ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করিবার জন্য এক জোরাল দাবী পেশ করেন। টারিফ বোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে মাত্র মোম্বাসা ও বসরায় দুইজন ট্রেড কমিশনার রাখিবার জন্য ভারত সরকারকে উপদেশ দেন এবং প্রত্যেক ট্রেড কমিশনারের নিকট বোম্বাই মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যনের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি রাখিবার জন্য ভারত সরকারকে উৎসাহ দেন। ঐ স্বতন্ত্র প্রতিনিধি রাখিবার খরচা মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যন ও ভারত সরকার সমভাবে বহন করিবেন। তাঁহাদের মতে ঐ খরচা ২৫,০০০ টাকার বেশী কোন ক্রমেই হইতে পারিবে না। ভারত সরকার ট্রেড কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত এমনকি টারিফ বোর্ড অনুমোদিত মোম্বাসা ও বসরায়ও ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা স্থগিত রাখিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ তুলা অনুশাসন

ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর এক বৎসরের জন্য "হায়দ্রাবাদ্ ষ্টেট কটন ট্রেড্‌স পোর্ট অর্ডিন্যান্স" বা "হায়দ্রাবাদ্ রাজ্যে তুলার বাণিজ্য বন্দর অনুশাসন বাহাল করিয়াছেন। নিজামের রাজ্যে কতকগুলি আয়তনে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে। এই তুলা রক্ষা করিবার জন্য আইন।

আদেশটা এইরূপ :—রেলে হোক্ রাস্তায় হোক বা জলপথে হোক্ কোন দিক্ দিয়াই কেহ নিজামের রাজ্যে তুলা আনিতে পারিবে না। আনিতে হইলে ঐ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট লাইসেন্স লইতে হইবে। নিয়ম-ভঙ্গকারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবে।

বড়োদায় বিবাহ আইন

সম্প্রতি বড়োদায় বালক-বালিকার বিবাহের বয়স বিষয়ে লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেমব্লি কর্ত্তৃক এক নূতন আইন পাশ হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যর মনুভাই মেহতার উদ্যোগে বড়োদার গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। বর্ত্তমান আইন অনুসারে বালিকাদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ১২। কমিটি ঐ আইন বদলাইয়া বালিকাদের ১৪ ও বালকদের ১৮ করিবার পরামর্শ দেন।

অ্যাসেমব্লির অধিকাংশ সভ্য কমিটির ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দেন। কেহ কেহ ১৮ ও ২২ অথবা ২৪ বছর করিবার কথা বলেন। কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই নিয়ম ভাঙ্গিলে শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে কারাগার। যাঁরা ১৪ ও ১৮ বছরের বিপক্ষে ছিলেন, তাঁহারা এই শাস্তির পক্ষে ভোট দিয়াছেন। কোন জাতকেই রেহাই দেওয়া হইবে না। সমাজ ও আচারের দোহাইও খাটিবে না।

রেলওয়ে কনফারেন্স

ভারতের বিভিন্ন রেল কোম্পানীর মধ্যে একতা সৃষ্টি ও পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ও রেলওয়ে বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৮৭৬ সনে রেলওয়ে কনফারেন্সের সৃষ্টি হয়। ১৯০৩ সন হইতে প্রতি বৎসর ঐ কন্‌ফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। এ বৎসর বোম্বাই

বড়োদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের স্তর আর্ণেষ্ট জ্যাকসনের সভাপতি হইবার কথা। কিন্তু অসুস্থতা-নিবন্ধন তাঁহাকে হঠাৎ ভারত ত্যাগ করিতে হয় বলিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী যোগ্যতম লোক মাদ্রাজ অ্যাণ্ড সাদার্ণ মারহাট্টা রেলয়ের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এ, এ, কিগস্ সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য আহুত হন।

কনফারেন্সের সভ্যগণের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি পুরাপুরি ইয়োরোপীয়গণের দখলে। ৬০ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ৪জন ভারতবাসী উহাতে দেখা যায়। যথা শ্রীযুক্ত টি, এস, আয়ার (এন, ডব্লিউ, রেলওয়ে), এফ, এইচ, বিবরা ও স্তর প্রভাশঙ্কর পট্টনী (ভবনগর ষ্টেট রেলওয়ে) এবং মিষ্টার এস্, এন, ফ্যানসে (ঢোলপুর রেলওয়ে)। মহীশূর রেলওয়েরও একজন ভারতীয় সভ্য ঐ কনফারেন্সে আছেন। কিন্তু তিনি এবারের অধিবেশনে যোগদান করেন নাই।

ভারতীয় রেলওয়ে কনফারেন্স এই প্রতিষ্ঠানের নাম হইলেও ভারতবাসীর ইহাতে গৌরব করিবার কিছুই নাই। ইহা সম্পূর্ণ বিদেশীদের তাঁবে। ভারতের রেলওয়েগুলির উপরওয়ালা কর্ম্মচারী সকলেই ইংরেজ। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ লইয়াই ঐ কনফারেন্স গঠিত। লী কমিশন প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় রেলওয়েগুলির উচ্চ বিভাগে শতকরা ৭৫ জন ভারতবাসী লওয়া চাই। ঐ প্রস্তাব কাগজে কলমেই রহিয়াছে। উহা যত দিন কার্য্যে পরিণত না হইবে ততদিন রেলওয়ে কনফারেন্সে ভারতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। মিষ্টার কিগস্ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, অনেক ইয়োরোপীয়ান অফিসারের মতে উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলে রেলওয়ের হানি হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐ প্রস্তাব তাঁহারা যথাসম্ভব পালন করিবার চেষ্টায় আছেন। লী কমিশনের রিপোর্টের পরে শতকরা কতজন ভারতবাসী রেলওয়ে বিভাগের উচ্চ পদে বাহাল হইয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে, ভারতীয় কনফারেন্সের ৬০ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ৪ জন ভারতবাসীর স্থান দেখিয়াই ঐ সংখ্যা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সভাপতি দুঃখ করিয়াছেন যে, অনেক স্থলেই ভারতীয়গণকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বড় অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। দেখা গিয়াছে নাকি তাঁহারা ঐ কাজের অনুপযুক্ত। ইহার ফলে অধিকাংশ স্থলে রেলওয়ের কাজে বিস্তর অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। রেলওয়ে বিভাগে ভারতীয়গণের কর্ম্মক্ষমতায় এই সন্দেহ ন্যায্য হইলে তাহা দেশের পক্ষে বড়ই অকল্যাণকর। কিন্তু বর্ত্তমানে যুবক ভারত বিভিন্ন বিভাগে যে কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেছে তাহাতে ঐ অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা বিবেচনার বিষয়। রেলওয়ে বিভাগের উচ্চ কাজের জন্য ভারতবাসীর প্রস্তুত হওয়া উচিত। এদিকে সরকারেরও দৃষ্টি দেওয়া চাই। প্রস্তাবিত দেরাদুনের রেলওয়ে ষ্টাফ কলেজে অধিকসংখ্যক ভারতীয় ছাত্রের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ও ঐদিকে ভারতবাসীকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

ফ্রান্সের আফ্রিকা-সমিতি

"উনি অঁ কলনিয়াল ফ্রাঁসেজ" (ফরাসী উপনিবেশ পরিষৎ) নানা শাখায় বিভক্ত। একটার উদ্দেশ্যে পশ্চিম আফ্রিকার খোঁজখবর রাখা। আফ্রিকা-সমিতির এক বৈঠকে "ফীভ্বর জ্যন" (হল্‌দে জ্বর) ব্যাধির বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাইবার জন্য গবর্ণরকে অনুরোধ করা হইল। গবর্ণর বাহাদুরের কাজকর্ম্মে ফরাসীরা খুসীই আছে এই কথাও জানানো হইয়াছে।

ফরাসী ওষুধ যাতে পশ্চিম আফ্রিকায় বেশী বিক্রী হইতে পারে তাহার আলোচনায় বেশ মনোযোগ ছিল। কান্তলাক বন্দরটার উন্নতিবিধান সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা চলিয়াছে।

হাঙ্গারী ও নব্য নারী-সমাজ

মধ্য ইয়োরোপে নব্য সমাজে সংস্কারের একটা আন্দোলন দেখা দিয়াছে। হাঙ্গারীর কতকগুলি মেয়ে ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, চামড়ার রংয়ের মোজা পরিয়া এবং খাট সেমিজ গায়ে দিয়া কেহ ইস্কুলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পাউডার ও রুজ মাখিয়া যাহার

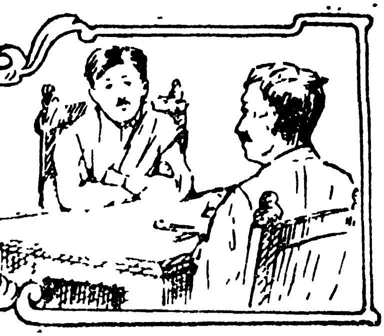
ইস্কুলে আসিবে তাহাদিগের বেলায়ও ঐ নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

প্রত্যহ হাঙ্গারীর ৮০ লক্ষ অধিবাসীর ১২ জন ক্ষয় রোগে মারা যায়। ইহার প্রতিকারের জন্য স্বাস্থ্য-সচিব এক ফিল্ম প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। চলন্ত ছায়া-চিত্রে ক্ষয় রোগের বিভীষিকা ও ইহার প্রতিকার সাধারণের নিকট প্রদর্শন করাই ঐ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। ম্যাডাম ম্যারিয়া খুরি হাঙ্গারীর শিশুপাঠ্য পুস্তক ও গল্প লেখিকা। ইনি ক্ষয় রোগের প্রতিকার-বিষয়ক একখানা নাট্য পুস্তক রচনা করিয়া ঐ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানি চলন্ত ছায়াচিত্রে হাঙ্গারীর রঙ্গমঞ্চে দেখান হইতেছে।

নিজনিনভগোরদ মেলা

সোভিয়েট রুশিয়ার ১৯২৭ সনের নিজনিনভগোরদ মেলায় এশিয়ার অনেক দেশের ব্যবসায়ী জমা হয়। খোরাসান, জিলান, পারস্যের আজারবাইজান, মাজান্দারাণ এবং পারস্য ও ইরাকের অন্যান্য শিল্প শহর হইতে ব্যবসায়িগণ ঐ মেলায় যোগদান করেন। ইহা ছাড়া আফগানিস্থান, তুর্কী ও পশ্চিম চীন ঐ মেলায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। মোটের উপর প্রাচ্যের প্রায় ৪০০ ফার্ম্ম ঐ মেলায় দোকান-পসার খোলে। এই মেলার সাফল্য হইতে অনুমান করা যায় যে, রুশিয়া এশিয়ার সঙ্গে দুস্তি রাখিতে খুব চেষ্টা পাইতেছে। এইরূপ মেলার ফলে এশিয়া ও রুশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এশিয়ার দেশগুলি ঐ মেলায় কাঁচা মালই বেশী পাঠায়। এবারকার মেলায় পশ্চিম চীন তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি কাঁচা মাল বেশী পাঠায়। পারস্য ও আফগানিস্থানও ঐ ধরণের কাঁচা মালই মেলায় প্রেরণ করে। ভারতবর্ষের কোন চিজই ঐ মেলায় প্রদর্শিত হয় নাই। মেলায় প্রাচ্য দেশগুলি কর্তৃক বৈদ্যুতিক বাতি, প্লাণ্ট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। মেলায় এশিয়ার সঙ্গে রুশিয়ার মোট চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ডের কারবার হয়।

মোলাকাৎ



কলিকাতার মুচি

[শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দের সঙ্গে এক মুচির নিম্নরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল]

প্রঃ—তোমার নামটা জানিতে পারি কি ?

উঃ—আজ্ঞে, বেহারী।

প্রঃ—তোমাদের আরও দু'দশ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাদের নামও বেহারী। তোমাদের মধ্যে এই নামটার খুব চল আছে ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—তোমার বাড়ী কোথায় ?

উঃ—মুঙ্গের জেলায়।

প্রঃ—এখানে কোথায় থাক ?

উঃ—জোড়াবাগান থানার পিছনে।

প্রঃ—তুমি কলিকাতায় কবে আসিয়াছ ?

উঃ—সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন ছোট ছিলাম। বয়স ৫ কি ৬ বছর ছিল।

প্রঃ—এখানে কতকাল আছ ?

উঃ—অনেকদিন—২৫।৩০ বৎসর হইবে।

প্রঃ—তুমি বরাবর কি কলিকাতায় আছ ? দেশে গাঁয়ে যাও না ?

উঃ—আমি মাঝে মাঝে দেশে গিয়া থাকি বটে। মাস দুই হইল দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

প্রঃ—তুমি সেই ছেলেবেলায় কার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলে ?

উঃ—আমার এক সম্পর্কিত দাদা মহাশয়ের সঙ্গে।

প্রঃ—দেশের বাহিরে যাইবার মতি তোমার কেন হইল ?

উঃ—আজ্ঞে, বাড়ীতে আমার দাদা আছে। সেই বিষয়-আশয় দেখিয়া থাকে। বাড়ীতে শুধু বসিয়া থাকিয়া লাভ কি ? অন্যত্র যদি দু'পয়সা উপার্জ্জন হয় মন্দ কি ? তাই ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য বিদেশে আসা হয়।

প্রঃ—অত ছোট বয়সে কি তুমি এইরূপ ভাবিয়াছিলে ?

উঃ—আমি ভাবি নাই। তবে আমার হইয়া সকলে ভাবিয়াছিল।

প্রঃ—আচ্ছা, কলিকাতায় আসিয়া তুমি প্রথম কোথায় উঠিলে ?

উঃ—জোড়াবাগানে।

প্রঃ—সেই তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত বরাবর ওখানেই আছ ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—তুমি কি কি বাবদে কত খরচ কর তার হিসাবটা জানিতে চাহি। তুমি ঘর-ভাড়া কত দাও ? কিরূপ ঘরে থাক ?

উঃ—আজ্ঞে থাকি খোলার ঘরে। মাসে ১৲ টাকা করিয়া ভাড়া দেই।

প্রঃ—মোটে ১৲ টাকা ! একটা ঘর ১৲ টাকায়—খুব সস্তা বলিতে হইবে।

উঃ—না মহাশয়, সমস্ত ঘরটা আমার নয়। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আমার চুক্তি রহিয়াছে। ঘরের উপর আমার কোন এক্তিয়ার নাই। ঘরের মধ্যে যত জন ইচ্ছা সে লোক রাখিতে পারে। প্রত্যেকের মাসে ১৲ করিয়া ভাড়া দিতে হইবে।

প্রঃ—তোমার ঘরে ক'জন লোক আছে ?

উঃ—এখন ৬জন।

প্রঃ—তারা কি তোমার পরিচিত লোক? না, দেশবাসী? তাদের ব্যবসা কি?

উঃ—না, আমার ঘরে আমার জেলার লোক কেহ নাই। অন্যত্র অবশ্য আমার জাতীয় ও জেলাস্থ লোক আছে। কিন্তু এরা ছোট জাত। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই। যদিও সবাই মুচি।

প্রঃ—'ছোট জাত' অর্থ কি? তুমি কি এদের হাতে জল খাও না?

উঃ—আজ্ঞে না। এদের হাতে জল খাইলে আমার জাত যাইবে।

প্রঃ—তুমি খাওয়া দাওয়ার জন্য কিরূপ ব্যয় করিয়া থাক?

উঃ—মাসে ১০।১২ টাকা ব্যয় হয়।

প্রঃ—দুই বেলা কি খাও? ভাত খাও কি?

উঃ—আজ্ঞে, এক বেলা ভাত খাই। অন্যবেলা ভাত খাই না, রুটি খাই।

প্রঃ—চা খাও না?

উঃ—হাঁ, সকালে চা খাইয়া থাকি।

প্রঃ—নেশাটেশা কর না কিছু?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ, করি বৈকি। দারু(=মদ) পীই।

প্রঃ—দারু কি রোজ খাও? সর্ব্বদাই?

উঃ—আজ্ঞে না, তবেত মরিয়া যাইব। এক দারুতেই আমার সমস্ত পুঁজি উড়িয়া যাইবে। ছুটিছাটার দিনে খাই। পরব উপলক্ষ্যে আমোদ উৎসবের দিনে বিশেষ করিয়া খাই।

প্রঃ—সেদিন কত টাকার মদ খাও? দারু বাবদে মাসে তোমার কত খরচ হয়?

উঃ—আজ্ঞে, দারু সদাসর্ব্বদা খাইনা। পরব উৎসব উপলক্ষ্যে খাই। বন্ধু-বান্ধব লইয়া আমোদ করিবার জন্য খাই। সুতরাং একা খাইতে যত খরচ হইত, তার চেয়ে বেশী করিতে হয়। দারুর জন্য মাসে টাকা দুই খরচ হইয়া যায়। কখনো কখনো বেশীও হয়।

প্রঃ—তুমি নিজে কখনো একা মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়া থাক না?

উঃ—আজ্ঞে না। তাতে আমারই কাজের ক্ষতি হইবে।

প্রঃ—তোমার কারও কাছে ধারটার আছে কি? কাহাকেও মাসে মাসে টাকা বা সুদ দিতে হয় কি?

উঃ—আজ্ঞে না, আমি অঋণী। কারও নিকট ধার করি নাই।

প্রঃ—তোমার খাওয়া-দাওয়ার কথা ত শুনিলাম। পরার কি ব্যবস্থা কর?

উঃ—আজ্ঞে, আপনারা ৫জন বাবু ভায়া লোক থাকিতে কি আমাকে পরার কথা ভাবিতে হইবে? আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার কাপড়-চোপড় জুটিয়া যায়। শুধু যখন বাড়ী যাই তখন কিছু নূতন জামা-কাপড় কিনি। একেবারে ফিট্‌ফাট্‌ বাবু সাজিয়া গিয়া উপস্থিত হই।

প্রঃ—এইবার বল, তুমি দিনে কত উপার্জ্জন কর।

উঃ—তার কোন ঠিক নাই। সব কপালের খেলা। কোন দিন বেশী কাজ পাই, বেশী উপার্জ্জন করি। কোন দিন হয়ত সামান্য কিছু পাই। আর মেহনতের কোন বাঁধা দস্তুরি ত নাই। একই রকম কাজ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন হারে কিম্মৎ নিতে বাধ্য থাকি। কিম্মতের পরিমাণটা সব সময়েই খরিদ্দারের মর্জ্জি অথবা গরজের উপর নির্ভর করে। দৈনিক উপার্জ্জনটা সাধারণতঃ ১৲ টাকার কিছু এদিক্ ওদিক্ হইয়া থাকে।

প্রঃ—জুতা শেলাই, মেরামত ইত্যাদির জন্য তোমাকে মাসে কত খরচ করিতে হয় বলিতে পার কি?

উঃ—বুঝিতেই পারিতেছেন—তা স্থির করিয়া বলা চলে না। বেশী কাজ হইলে, বেশী চামড়া, সুতা, ইত্যাদি দরকার হয়। কম কাজ হইলে কম দরকার হয়। তবে আমার সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে যে ১৲ টাকার চামড়া কিনিয়া আমি যেন তাহা হইতে ৪৲ পাই। দরদস্তুরটাও সেইরূপ ভাবে হাঁকিয়া থাকি।

প্রঃ—আমি মোটামুটি জানিতে চাহিতেছি, তুমি মাসে চামড়া ইত্যাদি কিনিতে কত খরচ কর?

উঃ—টাকা চারেক হইবে।

প্র—শুধু জুতাতে কালি দিতে কত করিয়া লও?

উঃ—আমার কালি হইলে ৪ পয়সা। আর আপনি কালি দিলে ৩ পয়সা। কখনো ২ পয়সা।

প্রঃ—জুতাশেলাই বা মেরামতের দস্তুরিটা তোমরা কি ভাবে নাও?

উঃ—আজ্ঞে আপনাকে বলেছি ত আমাদের কোন নিয়ম নাই। আমরা যা খুসী একটা মজুরি হাঁকিয়া বসি যেখানে সুবিধা পাই, বেশী আদায় করিয়া লই। অনেকে অবশ্য এমন আছে যে মজুরি নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে দিতে চায় না, অথবা অল্প দিয়া তাড়াইয়া দেয়। সে সব আমাদের সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ ক্ষতিগুলি অন্যত্র পোষাইয়া না নিলে আমাদের চলে কি করিয়া? তাই আমাদিগকে লোক ঠকাইতে হয়।

প্রঃ—বাবুরা কি সকলেই তোমাদের ঠকায়?

উঃ—আজ্ঞে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবুদের কাছে ন্যায্য পাওনাটা পাই। কিন্তু যাঁরা বঞ্চিত করে তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। আমরা গরিব মানুষ। আমরা ত আর তাঁদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়িতে পারি না। অনেক সময় গালাগালি দিয়াও ফল হয় না।

প্রঃ—আমি শুনিয়াছি আজকাল তোমাদের মাসিক আয়টা কমিয়া গিয়াছে। সে কথা কি সত্য?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ। কতকটা সত্য বটে।

প্রঃ—কলে জুতা তৈয়ারী হওয়ায় কি এরূপ ঘটিতেছে?

উঃ—আজ্ঞে না। আমাদের ব্যবসায় চিরকালই জুতা মেরামত করা, তৈয়ারী আমাদের মধ্যে বহুকাল যাবৎ অল্প লোকেই করিয়া আসিয়াছে। কল হইবার পুর্ব্বে হয়ত অনেকে করিত। কিন্তু আমাদের আয় কমিয়া যাইবার কারণ হইতেছে আমাদের নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি। এই ধরুন কলিকাতা শহর। আগে এখানে এত মুচি ছিল না। কাজেই আমরা প্রত্যেকেই এখনকার চেয়ে কিছু বেশী কাজ পাইতাম। তার উপর প্রতি বৎসর অসংখ্য মুচি কলিকাতায় উপার্জ্জনের আশায় আসিতেছে। জুতা-পরা লোকের সংখ্যা যতটা বাড়িতেছে, মুচির সংখ্যা তার চেয়ে বেশী বাড়িতেছে। কাজেই আমাদের রুজি মরিতেছে।

প্রঃ—ভাল। মাসে তোমার হাতে মোট কত টাকা বাঁচে?

উঃ—আজ্ঞে, ২০।২২ টাকা।

প্রঃ—এই টাকাটা তুমি কি কর?

উঃ—দেশে পাঠাইয়া দি।

প্রঃ—দেশে তোমার কে আছে?

উঃ—বাপ, মা, দাদা, কাকা, আরও আত্মীয় স্বজন।

প্রঃ—তোমরা ক ভাই?

উঃ—আজ্ঞে, আমরা দু'ভাই। বড় ভাই দেশে রহিয়াছে।

প্রঃ—সে কোন চাকরী বাকরী করে কি? তার চলে কি করিয়া?

উঃ—তার চাকরী বাকরী করিবার অবসর নাই। দেশে আমাদের যে ক্ষেত-খামার আছে তার দেখা শোনা ও চাষবাস করিতেই তার সময় চলিয়া যায়।

প্রঃ—তোমার জমি আছে?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—কত?

উঃ—৪ বিঘা।

প্রঃ—এই ৪ বিঘা জমিতে তোমরা কি কি লাগাইয়া থাক? ধান?

উঃ—আমাদের দেশে ধান কেহ লাগায় না। আমরা ক্ষেতে সাধারণতঃ লাগাই—

(১) ভুট্টা

(২) তিসি

(৩) অড়হড় বা ছোলা

(৪) গম ইত্যাদি

প্রঃ—তোমার ক্ষেতে গম ইত্যাদি যে লাগান হয়, তাতে

বৎসরের খোরাক কি যোগাড় হয়? না, আরও খরচ করিতে হয়?

উঃ—আজ্ঞে না। সাধারণতঃ আমাদের পারিবারিক অভাব ক্ষেত হইতেই মিটে। কখনো কখনো কোন দ্রব্য বেচিয়া পয়সা পাই। তাতে জুতা, জামা ইত্যাদির যোগাড় হয়। তেল নুণ হয়।

প্রঃ—জমির দরুণ বছরে খাজনা দাও কত করিয়া?

উঃ—এখন ২০৲ করিয়া দিতে হইতেছে।

প্রঃ—এ টাকাটা কোথা হইতে দাও?

উঃ—মহাশয়, জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই ক্ষেতে তিসি দিয়া থাকে। প্রত্যেকেই প্রায় তার জমির খাজনাটা তিসি বেচিয়া দেয়। তিসি বেচিয়াই আমরা কাঁচা টাকা ঘরে আনি। খাজনা শোধের পর যা বাকী থাকে তাতে হয় মহাজনের ঋণ শোধ করি, নয়ত অন্য বিষয়ে ব্যয় করি বা বাবুগিরি করি।

প্র:—মহাজনের ঋণ কি বলিতেছ?

উঃ—বীজ লাগাবার সময় থেকে টাকার দরকার। এ টাকা নহিলে বীজ কেনা চলিবে না। কিন্তু এক সঙ্গে অত টাকা আমরা কোথায় পাই? তাই মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। সে টাকা ধার না দিলে আমাদের উপায় নাই।

প্রঃ—তবে তাকে সুদও দিতে হয়?

উঃ—নিশ্চয়। সে বেশ চড়া হারেই সুদ আদায় করিয়া লয়। আর ফসল ফলিলে তার ভোগ আগে। তাকে সন্তুষ্ট না রাখিলে কি রক্ষা আছে? দরকার হইলে তার কাছে জমি পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া টাকা লইতে হয়।

প্রঃ—তোমার দেশে অন্য কোন খাদ্য পাইবার সুযোগ পাও কি? দুধ খাও?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—দুধ কোথায় পাও?

উঃ—আমাদের বাড়ীতে ২টা গাই আছে। যথেষ্ট দুধ দেয়। কাঁজেই বাড়ী গেলে দুধ মিলে।

প্রঃ—তোমার দাদার স্ত্রী-পুত্র আছে?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—তুমি বিবাহ করিয়াছ কি?

উঃ—করিয়াছি।

প্রঃ—তোমার স্ত্রী কি তোমার কাছে আছে? না, মুঙ্গেরে রাখিয়া আসিয়াছ?

উঃ—দেশে রহিয়াছে। সে কখনও এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে থাকে না।

প্রঃ—তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি? তারা কত বড় হইয়াছে?

উঃ—আজ্ঞে আমার ১টি ছেলে ও ১টি মেয়ে। ১ জন ৫।৬ বছরের, অন্যজন ৭।৮ বছরের হইবে।

প্রঃ—তুমি দেশে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা রাখিয়া আসিয়াছ। তুমি যা বলিলে, তাতে ত মনে হয় তোমার বাড়ীর অবস্থা বেশ সচ্ছল। তবে তুমি তাদের ফেলিয়া এই দূরদেশে মুচির কাজ চালাইতেছ কেন?

উঃ—বাবু সাহেব, আপনাকে ত বলিয়াছি, সেখানে আমি অনাবশ্যক। আমার বাবা মা, দাদা বৌদি, চাচা ইত্যাদি চাষবাস ইত্যাদির পক্ষে যথেষ্ট। আমি ছোট ছেলে। ঘরে বসিয়া না থাকিয়া বাহির হইতে দু'পয়সা কামাইয়া স্ত্রী-পুত্রের জন্য পাঠাইয়া দিতেছি, মন্দ কি? ২০।২২ টাকা বেশী আয় ত হইতেছে।



পত্রিকা-জগৎ

"আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ"

আমেরিকায় "আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশুন" বা "আমেরিকান্" অর্থনৈতিক সংসদ" মোতায়েন আছে। এই সংসদের বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

সভাপতি...টমাস্, এস্, অ্যাডাম্‌স্, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়।

সহকারী সভাপতি { শ্যাম এ লিউয়িজোহন, নিউইয়র্ক শহর। ফ্র্যাঙ্ক এইচ,ডিক্সন,প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ ফ্রেডারিক এম্. ডীবলার, নর্থওয়েষ্টার্ণ-বিশ্ববিদ্যালয়।

কাউন্সেল...এডওয়ার্ড এ, হ্যারিম্যান্ ওয়াশিংটন ডি সি।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি {
এড্‌মাণ্ড ই ডে, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়।
উইলিয়াম্ এইচ, কিয়েক হোফার, উইস্‌কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়।
রিচার্ড টি, ইলি, নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়।
ক্লাইড্ ও রাগল্‌স, ওহিও রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়।
ফ্রেড্ আর, ফেয়ার চাইল্ড, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়।
জর্জ্জ ডব্লিউ ডাউরি, ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

এক্স-অফিসিও

সভাপতি, সহকারী সভাপতি দ্বয়, সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ, কার্য্যাধ্যক্ষ, সম্পাদক, ৩ জন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (ওয়েস্‌লি সি, মিচেল, এ, এ, ইয়ং, এডউইন ডব্লিউ কেমেরার্)।
}

এই সকল কর্ম্মচারী বাছিবার জন্য একটা "বাছাই সমিতি" আছে। "বাছাই সমিতির" বর্ত্তমান কর্ম্মচারি-বৃন্দের নাম :—

চেয়ারম্যান...জন্ আর, কমন্স, উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়।

টি, এন্, কার্ভার, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

ই, আর, জন্‌সন্, পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

এইচ, জি, মৌল্টন, অর্থশাস্ত্র গবেষণা মন্দির।

ইরা বি, ক্রস; কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

আর, বি, ওয়েষ্টারফীল্ড, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়।

সংসদের সভ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইতে পারেন। কিন্তু কর্ম্মচারি-নিয়োগের শেষ ক্ষমতা এই বাছাই সমিতির। সংসদের কর্ম্মচারীরা কে কতকাল নিজপদে বাহাল থাকিবেন তা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট :—

সভাপতি	১ বৎসর
সহকারী সভাপতি	১ বৎসর
কার্য্য-নির্ব্বাহক	
সমিতির সভ্য	৩ বৎসর
সম্পাদক-সজ্ঘ	৩ বৎসর
কার্য্যাধ্যক্ষ সম্পাদক	৩ বৎসর

বাছাই সমিতি সংসদের এই সব কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হয় না। একটা সমাজ-বিজ্ঞান-গবেষণা-গৃহ আছে। তিন তিন বছর অন্তর তার সভ্য ঠিক করিয়া দিতে হয়। প্রগ্রাম কমিটিতেও তিন বছর অন্তর লোক পাঠাইতে হয়। আর সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ প্রতি বছর নিয়োগ করিতে হয়।

বুঝা যাইতেছে, সবটাই ভোটের কারবার নয়। বলা বাহুল্য, ৫ ডলার চাঁদা দিলে যে-কোন লোক এই সংসদের সভ্য হইতে পারে। চীনে, জাপানে, ভারতে কেহ কেহ সভ্য হইয়াছেন। সভ্য-সংখ্যা অনেক।

এ সংসদ্ যে লোকবল ও অর্থবল উভয় দিকেই জবরদস্ত তাতে সন্দেহ নাই। একথাটা আরও পরিস্ফুট হইবে ইহার পরিচালিত কাগজখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে।

সংসদের বাহন

"দি আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ"কে এই সংসদের মুখপত্র রূপে বিবেচনা করিতে পারি। ত্রৈমাসিক। মার্চ্চ জুন, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের স্থান সেন্ট অ্যালবানস ভিটি ও ইভ্যানষ্টান ৩। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ ডলার।

এটা একটা প্রকাণ্ড কাগজ। প্রতি সংখ্যায় ২০০ বা ততোঽধিক করিয়া পৃষ্ঠা থাকে। প্রবন্ধের সংখ্যা ৩।৪।৫। আর বিস্তর বইয়ের সমালোচনা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পণ্ডিতরা এই সব প্রবন্ধ, সমালোচনা মন্তব্য ইত্যাদি লেখেন। বলা বাহুল্য, সমালোচিত বইয়ের জাতি বা ভাষা বিচার করা হয় না। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, জাপানী, ইতালীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতদের লেখার সহিতও এঁরা সম্যক্ পরিচিত ও "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" ইহাতেও পত্রিকার কাজ শেষ হয় না। দেশ বিদেশে প্রকাশিত পত্রিকা হইতে প্রবন্ধের চুম্বক বাহির করিয়া ৫।৭ লাইনে পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া হয়। তারপর থাকে সরকারী আধা-সরকারী অথবা রেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের, উদ্যোগে প্রকাশিত বুলেটিন বা গ্রন্থাবলীর নাম, ধাম ও কখন কখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা পণ্ডিতের কার্য্যকলাপ, চাকরী বাকরী ইত্যাদির খবরও পাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এই পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত :—

জে, এম, ক্লার্ক

জন, আইস্

এফ্, এইচ, নাইট্

ই, জি, নৌস্

ই, এম্, প্যাটারসন্

আর্, বি, ওয়েষ্টারফীল্ড

কার্য্যাধ্যক্ষ-সম্পাদক ডেভিস্ আর ডিউঈ।

এই সব পাকা মাঝির হাতে আমেরিকাবাসীরা তাদের এই পত্রিকাখানির হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

ভিতরে এস

এই ত গেল মলাট-সমালোচনা। এখন একবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা যাক্ সাপ ব্যাঙ্ মাছ আছে, না কি আছে।

১৯২৭ সনের জুন অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যা লইতেছি। ইহার পত্র-সংখ্যা ২০৮। তন্মধ্যে—

প্রবন্ধের জন্য গিয়াছে মাত্র ৭১ পৃষ্ঠা,
সমালোচনা ও নূতন পুস্তকের নামকরণে ৮৪ পৃষ্ঠা,
নানা কাগজের চুম্বকে ৩৭ পৃষ্ঠা,
দলিল দস্তাবেজ রিপোর্ট ইত্যাদি বাবদ্ ৬ পৃষ্ঠা,
অন্যান্য ১০ পৃষ্ঠা।

প্রথম ৭১ পৃষ্ঠার অর্থাৎ প্রবন্ধাবলীর বিবেচনাটা আপাততঃ মুলতুবী থাক্। বাকী সওয়া শ'র উপর পৃষ্ঠার ভিতর কোন্ মাল পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে তার একটু খোঁজ লওয়া দরকার।

আমেরিকান্ সমালোচনার রীতি

পুস্তক সমালোচনার মধ্যে ৫১৮টা গ্রন্থের নাম পাইতেছি। অবশ্য এতগুলি বইয়ের সমালোচনা করা কোন পত্রিকার সাধ্য নয়। সমালোচনা দূরে থাক্, গ্রন্থকার, প্রকাশের বৎসর, স্থান, দাম, ইত্যাদি সুদ্ধ এতগুলি গ্রন্থের, নাম করিতেই অনেক পৃষ্ঠার দরকার হয়। সুতরাং সবগুলি সমালোচনার চেষ্টা করা হয় নাই।

অধিকাংশের নূতন বই বলিয়া নামমাত্র করা হইয়াছে (ক)। নাম করার অর্থ শুধু বইয়ের নামটা বলিয়া খালাস

নয়। প্রথমে গ্রন্থকারের নাম পদবী থাকে, তারপর আদ্যক্ষর-গুলি অথবা পুরা নাম। মধ্যে বইয়ের পুরা নাম। অন্তে যে স্থান হইতে প্রকাশিত তার নাম, যে কোম্পানী প্রকাশ করিয়াছে তার নাম। প্রকাশিত হইবার সন। পৃষ্ঠা (ভূমিকা ইত্যাদি সুদ্ধ)। দাম।

নামকরণের মধ্যে কোন কোন বইয়ের কিঞ্চিৎ সমালোচনা বা বর্ণনা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। কতক-গুলি ২।৪।১০ লাইনে সারা হইয়াছে (গ)। এগুলি বর্ণনা মাত্র। নীচে সমালোচনার নাম নাই। নাম-আঁটা সমালোচনার দৈর্ঘ্য ৫।১০ লাইন হইতে ১॥০-২ পৃষ্ঠা (খ)।

অল্প কয়েকটা বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনা হইয়াছে। বিস্তৃত সমালোচনা বলিলে ৫।৬ পৃষ্ঠার বেশী বুঝিতে হইবে না। সাধারণতঃ ২।৩ পৃষ্ঠা (ক)।

সমালোচনা বা নাম-করণ সম্বন্ধে দরকারী কথা এই যে, একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করা হইয়াছে। এই প্রণালী অনুসরণ করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগগুলি দেখা দিয়াছে।

৫১টা গ্রন্থ ১৭টা বিভাগের মধ্যে ঠাঁই পাইয়াছে। গ্রন্থগুলিকে বিষয় অনুসারে এক একটা ভাগের ভিতর ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে বইগুলি সাজান হইয়াছে গ্রন্থকারদের নাম লইয়া ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে। পরিষদ্, সঙ্ঘ ইত্যাদির গ্রন্থাবলী তারপর নিজ নিজ আদি বর্ণমালা অনুসারে বসিয়াছে।

এই ১৭টা বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিব, আমেরিকানরা অর্থশাস্ত্র বলিতে কোন্ চিজ্ বুঝে, আর দেশ-বিদেশের কত অসংখ্য লোক ইহার সেবায় নিরত।

সমালোচনার কঙ্কাল

আমেরিকান্ সমালোচনা সমস্তই তুলিয়া দেখান অসম্ভব। এখানে শুধু কঙ্কালটা খাড়া করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

বিভাগের নাম	সমালোচিত বইয়ের সংখ্যা ক খ গ	ঘোষিতের সংখ্যা ঘ	মোট	সমালোচকের সংখ্যা
১। সাধারণ গ্রন্থাবলী তত্ত্ব ও তার ইতিহাস	৪ + ২ + ২	৩৩	৪১	৬
২। আর্থিক ইতিহাস ও ভূগোল ...	২ + ৫ + ৭	৪৭	৬১	৭
৩। কৃষি, খনি-বিদ্যা, বন-বিজ্ঞান, মৎস্য-পালন ...	১ + ২ + ৫	৩৭	৪৫	৩
৪। ম্যানুফ্যাক্চারিং ব্যবসা ...	১	১২	১৩	
৫। যান-বাহন ও বার্ত্তা-সন্দেশ	১ + ১	১৯	২১	১
৬। ব্যবসা, বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক চক্র	১ + ১	১৭	১৯	১
৭। হিসাব- খতিয়ান, ব্যবসা-প্রণালী, টাকা খাটান ও বিনিময়-প্রথা	৫+৪+১১	৭১	৯১	৮

	বিভাগের নাম	সমালোচিত বইয়ের সংখ্যা	ঘোষিতের সংখ্যা	মোট	সমালোচকের সংখ্যা
৮।	পুঁজিপাটা ও পুঁজিপাটা-মূলক প্রতিষ্ঠান	১	৮	৯	
৯।	মজুর ও মজুর প্রতিষ্ঠান ...	৫ + ৪ + ১	২৪	৩৪	৯
১০।	মুদ্রা, দর, ক্রেডিট্‌ ও ব্যাঙ্কিং ...	১ + ৫	৪০	৪৬	১
১১।	সরকারী কোষ, করাদায় ও টারিফ্‌ ...	১ + ৬	৩৪	৪১	১
১২।	লোকবল ও উপনিবেশ ...	১	১৪	১৫	১
১৩।	সমাজ-সমস্যা ও সংস্কার ...		২	২৭	২৯
১৪।	বীমা ও পেন্সন	১	১৬	১৭	১
১৫।	দারিদ্র্য, দান ও সাহায্য ব্যবস্থা		৪	৪	
১৬।	সোশিয়েলিজ্‌ম ও সমবায় আন্দোলন	৩ + ১	৭	১১	৩
১৭।	ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌ ও তাহার প্রণালী ...		২১	২১	
	মোট	১৯+২৫+৪৩	৪৩১	৫১৮	৪২

এই কঙ্কালটার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। ৪৩১খানা বইয়ের নাম-করণ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। ৪৩ খানা বই ছুঁইয়া দেখা হইয়াছে। মাঝারি সমালোচনা হইয়াছে ২৫ খানা গ্রন্থের। আর বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ১৯ খানা গ্রন্থের। এই সমালোচনা বিভাগে লোক খাটিয়াছে ৪০।৪৫ জন।

সমালোচকের দৌড় কতদূর ?

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ১৯ খানা বইয়ের বড় সমালোচনা হইয়াছে। অর্থাৎ অনেক হাজার পৃষ্ঠা অন্ততঃ উল্টাইতে হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপে বছরে ৫০০।১০০০ বা ততোঽধিক পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইবার সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য, এইরূপ পাতা উল্টাইয়া গেলেও লাভ আছে। পড়িতে পারিলে কিংবা হজম করিতে পারিলে ত কথাই নাই।

সমালোচকেরা অজ্ঞাত-কুলশীল নহেন। কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কেহ বা কোন আর্থিক, বৈজ্ঞানিক বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সভ্য অথবা পরিচালক। কাগজ-সম্পাদক, সমাজ-সেবক, এঞ্জিনিয়ার, হিসাব-নবীশ ইত্যাদিও বাদ যায় নাই। গবেষক আছে, ডাক্তারও আছে।

সাধারণতঃ, যে যে বিষয় ভাল জানেন বা যে বিষয় লইয়া বহু দিবস যাবৎ কার্য্য করিতেছেন, তিনি সেই বিষয়ের পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করেন। এইজন্য চীন বা আফ্রিকার কথাই হোক্, আর এঞ্জিনিয়ারিং বা হিসাব-

তত্ত্বের দুরূহ বিষয়ই হোক্, কাহাকেও অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতে হয় না। চীনে বা আফ্রিকায় বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও তাদের আর্থিক অবস্থা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, বা ঘামাইবেন এমন লোকের অভাব নাই। অন্য বিষয়েও তদ্রূপ।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি অধ্যবসায়ের সহিত নিরলসভাবে পরিশ্রম করিয়া গেলে নিজের নির্দ্দিষ্ট বিভাগে কি দান করিয়া যাইতে পারে, তার একটা আভাষ এই পত্রিকা হইতে পাইতে পারি। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে এই পত্রিকার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনেক কাগজ চলিতেছে। তথাপি, এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমালোচকদের উপর কোন প্রকার অশ্রদ্ধা না দেখাইয়াও বলিতে পারি অধিকাংশ সমালোচনাই খুব উঁচুদরের নয়। কোন কোন সমালোচক বইয়ের ভিতরকার অশুদ্ধ ভাষার আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কেহবা গ্রন্থকারের ২।১ টা মাত্র তত্ত্বের সহিত ভাসাভাসা ভাবে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। অন্য কেহ বা নিজের কোন বদ্ধমূল সংস্কারকে খাড়া রাখিবার জন্য কোন গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। অবশ্য উৎকৃষ্ট সমালোচনাও আছে। কিন্তু গণনায় বেশী নয়।

সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও বলিয়া রাখা ভাল যে, সমালোচিত সব বই-ই মার্শেল টৌসিগের বই নয়।

কিন্তু কিবা গ্রন্থপ্রণেতা, কিবা সমালোচক, সকলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয় লইয়া অবিরত পরিশ্রম করিতেছে এবং সর্ব্বত্র তথ্য-তালিকার প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। সরকার, মেহতা প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থকারদের লেখার সহিত ইঁহারা পরিচয় রাখিতেছে।

ইয়োরামেরিকার নানা ভাষায় পত্রিকা-জগতের ভিতর দিয়া তার আর্থিক আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। ইহার সহিত সাধারণ পাঠককে পরিচয় করাইয়া দিবার উপায় কি?

এই পত্রিকা এক অভিনব অথচ কার্য্যকর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। গ্রন্থ-সমালোচনার মত এক্ষেত্রেও অর্থশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলিকে রাখা হইয়াছে। তারপর প্রত্যেক কাগজ হইতে প্রবন্ধগুলি একে একে চুনিয়া লইয়া যথাযথ বিভাগে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য গোটা প্রবন্ধ কোথাও স্থান পায় নাই। হয় প্রবন্ধটার নাম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, নয়ত ৫।৭।১০ লাইনের ভিতর তার চুম্বকটা প্রকাশ করা হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেকটা প্রবন্ধ এক বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—যদিও পত্রিকা-গর্ব্ব তাতে কিছু ম্লান হইয়াছে।

	বিষয়	চুম্বকের সংখ্যা	নামকরণ	মোট	চুম্বক-কর্ত্তা
১।	তত্ত্ব ...	২১	৬	২৭	মরিস এ, কোপ্‌ল্যাণ্ড
২।	আর্থিক ইতিহাস (যুক্তরাষ্ট্র)	১৭	৯	২৬	এমেলিয়া সি, ফোর্ড
৩।	আর্থিক ইতিহাস (বিদেশী)	১১	২৫	৩৬	
৪।	কৃষিসম্বন্ধীয় অর্থনীতি	৪২	”	৪২	এ, জে, ডেভিসম্যান
৫।	কমার্স বা বাণিজ্যিক লেনদেন	১৫	”	১৫	এইচ, আর, টোসডল
৬।	রেলওয়ে ও যানবাহন	২৪	১৮	৪২	জে, এইচ্, পার্মেল
৭।	সর্ব্বসাধারণের "হিতসাধক"	৪৬	২	৪৮	চার্লস এস, মর্গ্যান্
৮।	হিসাবনবীশ	১৭	১১	২৮	আর্থার ডব্লিউ, হ্যানসন্
৯।	ব্যবসা পরিচালনা বা তত্ত্বাবধান	৯		৯	
১০।	মজুর ও মজুর সংগঠন	৫৯	১৯	৭৮	ওয়াল্টার জে, কাউপার
১১।	মুদ্রা, দর ক্রেডিট ও ব্যাঙ্কিং	৪১	২	৪৩	উইলিয়াম ও ওয়োর্কার্থ
১২।	সরকারী কোষ	৩২		৩২	চার্লস পি, হস্

বিষয়	চুম্বকের সংখ্যা	নামকরণ	মোট	চুম্বক-কর্ত্তা
১৩। লোক-সমস্যা	১৮	২	২০	এ, বি, উল্ফ
১৪। বীমা	২৪	২	২৬	এফ্, ই, উল্ফ্
১৫। দারিদ্র্য, দান ও সাহায্য ব্যবস্থা	৬		৬	জর্জ্জ বি ম্যানগোল্ড
১৬। ষ্ট্যাটিষ্টিক	৩০		৩০	হ্যারি জেরোম্
	৪১২	৯৬	৫০৮	১৪ জন

দেখিতেছি ইয়োরামেরিকার নানা পত্রিকা হইতে ৫০৮ টা প্রবন্ধের নাম সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪১২ টার চুম্বক আছে। এই চুম্বক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম। অনেকগুলির কাজ ১ অথবা আধ লাইনে সারা হইয়াছে।

চুম্বককারী রূপে যাঁদের নাম আছে, তাছাড়া পাইতেছি নিম্নলিখিত নামগুলি :—

ডেনিশ, ওলন্দাজ ও সুইডিশ পত্রিকার জন্য আর এস্, হ্যাবি। ইতালিয়ান পত্রিকার জন্য রালফ্ র্যাডক্লিফ্ হোয়াইটহেড্। কানাডিআন্দের রচিত প্রবন্ধের জন্য হ্যারল্ড এ, আনিস্। মোট ৩ জন।

অতএব ১৭ বা ততোঽধিক ব্যক্তি এই বিভাগের জন্য খাটিয়াছেন।

নিরলস আমেরিকা

এই পত্রিকার মারফৎ আমেরিকার সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধেও কিছু কিছু জ্ঞান লাভ ঘটে। আমেরিকায় ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ-সেবকের অন্ত নাই। এগুলির উদ্যোগে অসংখ্য পত্রিকা, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশিত হইতেছে।

তথাপি সরকার—সমগ্র দেশের ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের—উদাসীন নয়। অর্থনৈতিক বিভাগে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দপ্তরখানা হইতে, মজুর-শক্তি বুরো হইতে, কোষবিভাগ হইতে ও অন্যান্য দিক্ হইতে নিয়মিত ভাবে পুস্তিকা, পত্র অথবা বড় বড় গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। পর-দেশে প্রকাশিত দলিল দস্তাবেজও উপস্থিত করিবার চেষ্টা আছে।

সমালোচনাই বলি, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-চুম্বকই বলি বা দলিল দস্তাবেজ খবরাখবরের কথাই বলি এই পত্রিকার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই পত্রিকা বলিয়া দিতেছে, কোথায় গেলে দরকারী তথ্য-তালিকা অঙ্ক-হিসাব ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইব। পাঠকের কাছে খাটিবার ও কাজ করিবার জন্য হাজারো রকম প্রস্তাব তোলা হইতেছে, হাজারো দিকে কর্ম্ম-প্রচেষ্টার নমুনা দেখাইয়া উদ্বোধিত ও উৎসাহিত করা হইতেছে। পরন্তু তথ্যের জন্য অঙ্কের জন্য কাহাকেও অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতে হইতেছে না। কোথায় তাদের সাজান গুছান অবস্থায় পাওয়া যাইবে, কোন্ বিষয় কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, তা পরিষ্কার হইতেছে।

আজিকার দিনে যদি কেহ বলে, "আমি মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাই। কিন্তু সেজন্য অত শত পুস্তিকা, গ্রন্থ অথবা পত্রিকা ঘাঁটিবার কি দরকার? সেগুলিকে একটা পত্রিকার মারফৎ ধরিবার চেষ্টা করারই বা কি সার্থকতা?" তবে বুঝিতে হইবে অর্থশাস্ত্রের প্রথম পাঠই তার মাথায় ঢোকে নাই। অর্থশাস্ত্রকে উন্নতির পথে ধাওয়া করাইতে হইবে। তার একমাত্র উপায় এ বিষয়ে দেশ বিদেশের জ্ঞান কতখানি অগ্রসর হইল তার খোঁজ রাখা।

বস্তুতঃ, এইজন্যই দেখা যাইবে যে, ইয়োরামেরিকার প্রত্যেক বড় কাগজই অধিকাংশ পৃষ্ঠা সমালোচনা ইত্যাদিতে ব্যয় করিয়াছে। দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক কাগজেরই এই দায়িত্বজ্ঞান রহিয়াছে যে, বর্ত্তমান দুনিয়ার জ্ঞানভাণ্ডারের প্রত্যেক যোগ-বিয়োগের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়া দিতে হইবে ও তার মধ্যে যাচাই করিবার প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে চালিত করিতে হইবে।

আমরা ও তাহারা

এইবার আর্থিক উন্নতির সহিত এই আমেরিকান্ পত্রিকাখানির একটুখানি তুলনা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। তাহা দ্বারা আমাদের দৈন্যটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

আমাদের দেশে, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে, আর্থিক রচনা, পুস্তিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি কত বিরল, এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। বেসরকারী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হইতে তথ্য-তালিকা প্রকাশিত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সরকারী কেতাবও অল্পমাত্র।

গ্রন্থ নাই, পত্রিকা নাই, সমালোচনা কি করিয়া চলিবে? এ যুক্তি অবশ্য টেঁকসই নয়। ইয়োরামেরিকায় এ বিষয়ে কি বিপুল সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে, সম্প্রতি সেদিকে নজর দিলেই যথেষ্ট হইবে।

এই এক সংখ্যা পত্রিকার জন্য ১০ বা ততোঽধিক ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের অথবা ভারতবর্ষের ইংরজীতে সম্পাদিত কোন আর্থিক পত্রিকাই কি এতগুলি বিদ্বান ব্যক্তিকে কাজে লাগাইবার কল্পনা করিতে পারে? বাঙ্গালায় পরিচালিত "আর্থিক উন্নতির" কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম।

আমেরিকান্ কাগজখানা ১৭ বৎসর যাবৎ চালিত হইতেছে। ইহার পক্ষে এই অভিজ্ঞতাটা মূল্যবান বস্তু।

কিন্তু এই পত্রিকা তার শক্তি লাভ করিতেছে অর্থনৈতিক সংসদ হইতে। এই পিছনের জোর মস্ত জোর। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ টেক্‌নিকাল বা বৈজ্ঞানিক পত্রিকার পিছনে এই জোর নাই। "আর্থিক উন্নতি"কে জীয়াইয়া রাখিতে ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে বাঙ্গালা দেশে অবিলম্বে অর্থশাস্ত্র-পরিষৎ কায়েম করা দরকার।

জমির খাজনা—রিকার্ডো বনাম জেহ্বন্‌স্

সম্প্রতি "আর্থিক উন্নতি"তে রিকার্ডোর অনুবাদ বাহির হইতেছে। এই প্রসঙ্গে খাজনা সম্বন্ধে আমেরিকান্ লেখকের মূল বক্তব্যটা বুঝিবার চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

শ্রীযুক্ত হেইস বলিতেছেন:—পণ্যদ্রব্যের দরের সঙ্গে জমির খাজনার সম্পর্ক কি? ডেভিড্ রিকার্ডো রায় দিয়াছেন, "কোন সম্পর্ক নাই। পণ্যের দর বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। কিন্তু সেজন্য খাজনা দায়ী নয়। বরং জমিতে উৎপন্ন ফসলের দাম চড়িলে খাজনা বাড়িবে। দর জিনিষটা অবশ্য অবিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু খাজনা দর গঠনের উপাদান নয়। দরকে আকার দিবার জন্য খাজনা প্রবেশ করিবার পথ পায় না।"

সোজা কথায়, কোন দ্রব্য উৎপাদনের খরচ বলিলে বুঝিতে হইবে, মজুরি, সুদ, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, এমন কি বাড়ী-ভাড়া বাবদ খরচ। কিন্তু খাজনা এই পরিধির বাইরে। এদের সহিত খাজনা যোগ করিয়া দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে।

মিল্ তাঁর বই "রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বে" "খাজনা" নামক পরিচ্ছেদে এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু পরে "মূল্য-তত্ত্বের সারকথা" নামক অধ্যায়ে বলিয়াছেন, "জমির ব্যবহারটা ত ফসল উৎপাদনেই আবদ্ধ নয়। অন্য রকম ব্যবহারও আছে। সেই ব্যবহারের বেলা যে খাজনা লাগে, তাকে অবশ্য উৎপাদন খরচ রূপে ধরিতে হইবে।"

জেহ্বন্‌স্ বলিলেন, "রিকার্ডো ও মিলের ভুল হইয়াছে। মিল যা ব্যতিক্রম বলিয়াছেন, তাই নিয়ম। আর রিকার্ডোর নিয়মটাই ব্যতিক্রম। দরের সঙ্গে মজুরির যে সম্পর্ক, খাজনারও সেই সম্পর্ক। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই।" জেহ্বনস্ অবশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া আপনার তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবেন।

কিন্তু রিকার্ডোর জনপ্রিয় মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সোজা কথা নয়। তাঁর তত্ত্ব গৃহীত হয় নাই। প্যাটেন, হব্‌সন, জনসন, ড্যাভেনপোর্ট, টেলর, ক্যানেল প্রভৃতি বহু পরিশ্রম ও গবেষণার পর জেহ্বন্‌সকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

মনে হইয়াছিল, এতদিনে দ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু না। সম্প্রতি ফেয়ার চাইল্ড, ফুর্নিস, ও বাক্ এক কলেজ-পাঠ্য কেতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ঐ মৃত তত্ত্বকে আবার নবজীবন দান করা হইয়াছে।

মজুরির সহিত দরের সম্বন্ধটা কি? মজুরির সঙ্গে দরের কার্য্যকারণ-সম্পর্ক আছে কি নাই?

অর্থশাস্ত্রবিদেরা সকলেই বলিবেন, আছে। সকল অবস্থাতেই বলা চলে কি মজুরির জন্য পণ্যের দর বাড়িতেছে অথবা কমিতেছে? টান প্রবল অথচ পণ্য দুষ্প্রাপ্য এরূপ অবস্থাতে দর চড়ে। পণ্যের দরবৃদ্ধির কারণ মজুরি তখনি বলিতে পারি যখন মজুরি যোগান বৃদ্ধিতে বাধা দিতেছে। কিন্তু মজুরি যদি যোগান-বৃদ্ধিতে বাধা দিতে অসমর্থ হয় তবে ব্যাপারটা উল্টিয়া যাইবে।

ছুতার মিস্ত্রী টেবিল চেয়ার নির্ম্মাণ করে। ধর সে চেয়ার তৈয়ারী করিয়া ৫ ডলার উপার্জ্জন করে। কোন্ অবস্থায় তার পক্ষে টেবিল তৈয়ারী করিয়াও ৫ ডলার রোজ পাওয়া সম্ভব হইবে? যখন টেবিল পাওয়া দুষ্প্রাপ্য। এরূপ অবস্থায় টেবিল বা চেয়ারের দর মজুরি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। কিন্তু ছুতারের পক্ষে যদি একমাত্র চেয়ার তৈয়ারীর কাজ খোলা থাকিত অর্থাৎ ইচ্ছামত নিয়োগ বদলের মধ্যে না থাকিত, তবে চেয়ারের দর দ্বারাই মজুরি নির্দ্ধারিত হইত।

একথা জমি সম্বন্ধেও তুল্যভাবে খাটে। জমিকে একটা মাত্র কাজে যদি ব্যবহার করা যায়, তবে উৎপাদিত পণ্যের দর মজুরি নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু জমিকে একের অধিক কাজে লাগান যায়—গোধূম ও গম জন্মান যায়। সে অবস্থায় (গোধূম ও গমে প্রতিযোগিতা চলিতেছে) গোধূমের যোগানটা যে কারণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে তার একটা গমের দর। সুতরাং এরূপে গোধূমের দরও স্থির হইতেছে। অর্থাৎ গমের দর নয়। কিন্তু গম বুনিয়া যে নিট আদায় হয় (খাজনা) তাহা দ্বারাই গোধূমের দর স্থির হয়।

বস্তুতঃ, কলেজী পণ্ডিতগণ যাই বলুন সাধারণ বেপারীরা ব্যাপারটা ভাল করিয়াই বুঝে। সে আপনার উৎপাদন খরচার মধ্যে জমির খাজনটাও পুরিয়া দেয়।

প্রান্তিক জমি ও প্রান্তিক চাষী

রিকার্ডো "মার্জিনালিটি" বা প্রান্তিকতা লইয়া বড় বেশী মাথা ঘামাইয়াছেন। একটা নাই-খাজনা জমির কল্পনা করিয়া খাজনাটা আঁক করিয়া বাহির করিয়াছেন। হেইস বলিতেছেন, ফেয়ারচাইল্ড, কুর্নিশ ও বাক রিকার্ডোর অনুসরণে আরও তাল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন।

বাস্তব জগতে কি দেখি? নাই-খাজনা জমি কখনও কাহাকে চাষ করিতে হয় কি?

রিকার্ডো প্রান্তিক জমির কথা বলিয়াছেন। কোনটাকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের জমি বা লোককে প্রান্তিক মার্কা দিয়া দিবেন, তা সম্ভব নয়। কারণ বর্ত্তমান দুনিয়ায় অবিরত প্রতিযোগিতার যুগে, কেহই প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিবার অপেক্ষা করিতে পারে না। জমির প্রান্তিক উৎপাদক একজন নয়, বহু। অব্যাহত স্রোতের মত জমির ব্যবহারে লোকের ব্যবসা মনোনয়নে অথবা যন্ত্রপাতির নিয়োগে অদল-বদল ঘটিতেছে। এই পরিবর্ত্তন কখনও বা স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যের দর নামার দরুণ আবার কখনও বা অন্য দ্রব্যের দরে বৃদ্ধির দরুণ ঘটিতেছে। মধু যদি তার চাষ ফেলিয়া কারখানায় কাজ করিতে যায় ত তার অর্থ এই নয় যে সে নাই-খাজনা জমি ফেলিয়া গিয়াছে। এমন হইতে পারে মধুর জমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। তবু সে কারখানায় যাইবে, যদি তুলনায় কারখানাতে কাজ করাটা লাভজনক মনে করে। বর্ত্তমান যুগের সকল ব্যবসায়ে পরিবর্ত্তনের ধারাই এইরূপ। প্রান্তিকের সাক্ষাৎ কোথাও পাই না। না জমির বেলায়, না চাষীর বেলায়, না তার লাঙ্গলের বেলায়। সাক্ষাৎ পাই শুধু অদল-বদলের।

সুতরাং জমির প্রান্তিকতা হইতে খাজনার গণনা করিলে ভুল হইবে। গণিতে হইলে বরং নিয়োগের পরিবর্ত্তন (অদল-বদল) প্রান্তিকতা হইতে গণিতে হইবে।

দেশের ভিতর ফসলের হ্রাস-বৃদ্ধি কিসে হয়

রিকার্ডোর মতাবলম্বীরা বলিতেছেন, "নাই-খাজনা প্রান্তে উৎপাদনের খরচাটা যে কোন উৎপন্নের বেচা দরটা ঠিক করিয়া দেয়।" অতএব সিদ্ধান্ত "যে খরচা দ্বারা দর নির্দ্ধারিত হয়। আর্থিক খাজনা তার অঙ্গ হইতে পারে না।" এ দুই-ই ভুল।

নীচে যুক্তরাষ্ট্রের ৮টা প্রধান প্রধান ফসলের পূর্ব্ব

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় হ্রাস-বৃদ্ধির একরটা দেখান যাইতেছে—

(হাজার একর)

শস্যের নাম	কত একর				আগের বছরের চেয়ে কত বেশী		
	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
গম...	৬৩,৬৯৬	৬২,৩১৭	৫৯,৬৫৯	৫২,৩৬৪	−১,৩৭৯	−২,৬৫৮	−৭,২৯৫
গোধুম...	১০৩,৭৪০	১০২,৮৪৬	১০৪,৩২৪	১০১,০৭৬	−৮৯৪	+১,৪৭৮	−৩,২৪৮
"হে"...	৫৮,১৬৯	৬১,১৫৯	৫৯,৮৬৮	৬১,৪৫১	+২,৯৯০	−১,২৯১	+১,৫৮৩
"ওটস"...	৪৫,৪৯৫	৪০,৭৯০	৪০,৮৯১	৪২,৭৫৬	−৪,৭০৫	+১৯১	+১,৭৭৫
কটন...	৩০,৫০৯	৩৩,০৩৬	৩৭,১২৩	৪১,৩৬০	+২,৫২৭	+৪,০৮৭	= ৪,২৩৭
বার্লি...	৭,৪১৪	৭,৩১৭	৭,৮৩৫	৬,৮৫৮	−১৭	+৫১৮	−৯৭৭
রাই...	৪,৫২৮	৬,৬৭২	৫,১৭১	৪,০১৯	+২,১৪৪	−১,৫০১	−১,১৫২
আলু...	৩,৯৪১	৪,৩০৭	৩,৮১৬	৩,৩৪৮	+৩৬৬	−৪৯১	−৪৬৮
মোট আয়তন	৩১৮,০৯২	৩১৮,৪৪৪	৩১৮,৭৭৭	৩১৩,২৩২			
নির্দ্দিষ্ট ফসলগুলির মোট আয়তন বৃদ্ধি......	...				৭,৪২৭	৬,২৭৪	৭,৫৯৫
নির্দ্দিষ্ট ফসলগুলির মোট আয়তন হ্রাস......	...				৭,০৭৫	৫,৯৪১	১৩,১৪৩
৮টা ফসলে মোট পরিবর্ত্তনের পরিমাণ......	...				+৩৫২	+৩৩৩	−৫,৫৪৫

মনে রাখিতে হইবে এই ৮টা প্রধান ফসল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ঢের ফসলের চাষ হয়। বস্তুতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের চষা জমির পরিমাণ ইহার ৩ গুণ। আর এই হিসাবগুলি "এষ্টিমেট" মাত্র। তথাপি বলা যাইতে পারে, এই কয় বছরে ঐ ৮টা ফসলে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনের হেতুটা কি? নাই-খাজনা জমিতে পৌঁছিয়া তা ত্যাগ করার দরুণ কি এইরূপ ঘটিয়াছে? ১৯২৩ সনের তুলনায় ১৯২৪ সনের হ্রাসটা প্রায় ৫৫½ লক্ষ একর। যদি ধরা যায় যে, ২৮ লক্ষ একর হ্রাস নাই-খাজনা জমি ত্যাগ করাতে ঘটিয়াছে, তবু উহা ৮টা ফসলে যে পরিমাণ জমি নিয়োজিত হইয়াছে তার ১% মাত্র। ইতিমধ্যে জমিকে এক কাজের বদলে অন্য কাজেও লাগান হইয়াছে। সুতরাং দরের কতটুকু ইতর-বিশেষ ঘটিবে?

১৯২১ সনের সঙ্গে ১৯২২ সনের তুলনা করিলেও নাই-খাজনা জমি ত্যাগ করিবার কথা প্রমাণিত হয় না।

সোজা ভাষায় বলিতে পারি, ফসল রোপণের আয়তনে এই পরিবর্ত্তনের অর্থ চাষীরা যে ভাবে ১৯২১ সনে ফসল বুনিয়াছিল, ১৯২২, ১৯২৩ বা ১৯২৪ সনে সেরূপ ভাবে বুনে নাই। প্রত্যেক বছরই এই অদল-বদল ঘটিতেছে। ১৯২৪ সনে মোট হ্রাসের পরিমাণ ৫৫½ লক্ষ একর। কিন্তু এই ৮টা ফসলে গিয়াছে মাত্র ⅔ ভাগ জমি। সুতরাং এইরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই ৫৫½ লক্ষ একর জমি অন্যান্য ফসল ইত্যাদির জন্য অপসৃত হইয়াছে।

এ গেল ব্যাপক চাষের কথা। এখন "ইন্‌টেনসিভ" বা গভীর চাষের কথাটা ধরা যাক্। তাতেও এই কথা প্রমাণিত হইবে।

বৎসর	একর প্রতি গড় আদায় বুশেল	যথানির্দ্দিষ্ট কারণে পূরা আদায় কত কম পড়িয়াছে %	পূরা আদায় বুশেল	উৎপাদনকারীরা ১লা ডিসেম্বর বুশেলে কত পাইয়াছে-সেণ্ট	কৃষি ছাড়া অন্যত্র উৎপাদিত পণ্যের বুশেল প্রতি পাইকারী দরের "ইন্‌ডেক্স"-সেণ্ট
১৯০৯	২৬.১	২৯.৬	৩৭.৩	৫৮.৬	
১৯১০	২৭.৭	২৬.০	৩৭.৪	৪৮.০	৪৭.১
১৯১১	২৩.৯	৩৩.৭	৩৬.২	৬১.৮	৬৪.৪
১৯১২	২৯.২	২৬.৩	৩৯.৫	৪৮.৭	৪৮.৭
১৯১৩	২৩.১	৩৮.৯	৩৭.৯	৬৯.১	৬৫.৮
১৯১৪	২৫.৮	৩০.৬	৩৭.৪	৬৪.৪	৬৬.৪
১৯১৫	২৮.২	২৯.৯	৪০.৩	৫৭.৫	৫৬.৯
১৯১৬	২৪.৪	৩৪.৭	৩৭.৫	৮৮.৯	৬৪.৪
১৯১৭	২৬.৩	৩৩.৮	৩৯.৮	১১৭.৯	৭০.৩
১৯১৮	২৪.০	৩৭.৭	৩৮.৭	১৩৬.৫	৭২.৬
১৯১৯	২৮.৯	২৫.৪	৩৮.৫	১৩৪.৫	৬৭.৬
১৯২০	৩১.৫	১৫.৯	৩৭.৫	৬৭.০	২৭.৮
১৯২১	২৯.৬	১৮.৭	৩৬.৫	৪২.৩	২৫.২
১৯২২	২৮.৩	২৩.০	৩৬.৮	৬৫.৮	৩৯.২
১৯২৩	২৯.৩	২৩.৪	৩৮.০	৭২.৬	৪২.৫
১৯২৪	২২.৯	৩৯.৭	৩৮.০	৯৮.২	৬০.৬

এটা হইল গোধূম শস্তের হিসাব। যুক্তরাষ্ট্রে এই শস্তেরই চাষ সর্ব্বাপেক্ষা গভীর।

যথানির্দ্দিষ্ট কারণের মধ্যে (৩য় কলম) সর্ব্বমোট ১৩টা কারণের উল্লেখ আছে। প্রথম ৮টা জল-বাতাসের প্রতিকূলতা; তারপর গাছের ব্যেরাম, পতঙ্গশত্রু, জানোয়ার শত্রু, ও অপরিণত বীজ। ১৩শটির নাম—অন্যান্য অজ্ঞাত কারণ। পূরা আদায় না হইবার জন্য প্রধানতঃ জলবাতাস দায়ী। কোন রিপোর্টেই এই কথা পাওয়া যায় না যে, এই ১৬ বছরে একটা ফসলেরও পূরা আদায় না হইবার কারণ দর-হ্রাস-জনিত চাষ-গভীরতার হ্রাস।

বস্তুতঃ, এই ১৬ বছরের অঙ্কগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটা জিনিষ চোখে না ঠেকিয়া যায় না। তা হইতেছে ১৬ বছর ধরিয়া এই শস্তের দরে নানা উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু একর প্রতি পূরা আদায়টা (৪র্থ কলম) প্রায় অবিকৃত রহিয়াছে গড়পড়তা পরিবর্ত্তনটা মাত্র ১·৩ বুশেল।

ইহার অর্থ স্পষ্ট। অন্যান্য অজ্ঞাত কারণগুলিকে দরের পরিবর্ত্তন বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাদের প্রভাব খুব অল্প—কোনকালেই ১°/০এর উপর উঠিতে পারে নাই।

সুতরাং বছর বছর ভিন্ন ভিন্ন ফসলের যোগানে হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া একথা কেহই বলিবেনা যে, (১) ব্যাপক, নাই-খাজনা, আবাদের প্রান্তে অবস্থিত চষা জমির মোট পরিমাণ বাড়িতেছে, কমিতেছে, অথবা (২) চাষীরা তাদের জমি চাষের গভীরতা কম বা বেশী করিতেছে। বলিবে, জমিকে এক কাজ হইতে অন্য কাজে ব্যবহার করা হইতেছে। বস্তুতঃ, পণ্যাদির দর রূপ নাটকের প্রধান নায়ক হইতেছে অদল-বদলের (ট্রান্সফারেন্সের) প্রান্তিকতা।

"ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান"

ভারতের জনমত। ইহাকে ভারতের শাশ্বত (আজ, কাল, পরশুর) পত্রিকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অল্প দিন যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সাপ্তাহিক। কলিকাতা। বিলাতী টাইম্‌সের আকার ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রতি সপ্তাহে ৵০ আনা। প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

(১) আমাদের মত—শ্রীযুক্ত শাক্লাৎবালা (তাঁকে ভারতে আসিতে বাধা দেওয়ায় নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ হইয়াছে); বি, এন্, রেলওয়ের ব্যয়-হ্রাস; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (অল্প পরিসরের ভিতর ২১৷১টি বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা); পরবর্ত্তী কংগ্রেসের সভাপতি (ডাক্তার আন্‌সারি); কলিকাতা কর্পোরেশন (জাতি-বিচার হিতকর না অহিতকর তার মীমাংসা); বাঙ্গালার মন্ত্রিত্ব; উড়িষ্যায় জল-প্লাবন; রঙ্গিলা রসুল।

(২) এলো-পাথালি ভাব ও চিন্তা।

(৩) তুলার সুতা সংরক্ষণ "বিল্"—শ্রীযুক্ত ডাক্তার নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত নানা দিক্ হইতে এই বিষয়টার উপর আলোক ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর মোটা কথাটা এই যে "এই বিল পাশ করাটা অন্যায় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী ও গজনভি ইহার সমর্থন না করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য অন্ধের মত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁরা গরিবের ও মজুরের স্বার্থের কথা একদম ভুলিয়া গিয়াছেন।

(৪) রবীন্দ্রনাথ—জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিকতা—শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল্। মালয় উপদ্বীপে রবীন্দ্রনাথের কোন উক্তি এবং কার্য্যের নির্ভীক সমালোচনা।

(৫) আমাদের কয়লার ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থা।

(৬) ভারত সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

(৭) দর্পণের ভিতর দিয়া (বিভিন্ন পত্রিকার উদ্ধৃতাংশ)।

(৮) হাসি-তামাসা।

(৯) পাঁচ ফুলের সাজি।

(১০) নানা কথা।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য (২) শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ, এম, এ, বি, এল্।

(১২) আর্থিক আলোচনা (প্রতি সপ্তাহের টাকার বাজার, ব্যাঙ্ক, সিক্কা ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য ও আলোচনা)।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

উল্লেখযোগ্য রচনা।—

(১) আমাদের মত—নিখিল বঙ্গীয় মুসলমান যুবক সমিতি; "যেমন আগে ছিলে"—শ্রীযুক্ত বসু বলেন; ল্যাম্প পোষ্ট থিওরি; শোষিত বাঙ্গালা।

(২) ধর্ম্ম অনুসারে প্রতিনিধিত্ব-শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, ডি, এল্।

(৩) কয়লার ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থা।

"ইকনমিকা"

লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্ বা লণ্ডনের অর্থশাস্ত্রীদের মুখপত্র। ত্রৈমাসিক।

জুন ১৯২৭।

(১) সমাজ-তত্ত্বের "স্কোপ্" বা সম্পাদ্য—এম্ গিন্‌সবার্গ সমাজ-তত্ত্ব বা "সামাজিকী (সোসিওলজির) উদ্দেশ্য কি কি হওয়া উচিত তার তালিকা (কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া অনুসন্ধান করিলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা, তারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে)।

ফ্রেডারিক্ ফোন হ্বীসের—এইচ হিগ্‌স্ (হ্বীসেরের জীবন চরিত ও প্রচারিত তত্ত্বাদির সম্যক্ আলোচনা।

(৩) ব্যাঙ্ক আমানতের উৎপত্তি—এফ্, ডব্লিউ, ক্রিক্। সত্য সত্যই ব্যাঙ্ক আমানতের সৃষ্টি করে কি? করিলে কতটা বা কতদূর পর্য্যন্ত করে?—এই সব প্রশ্নের সদুত্তরের চেষ্টা।

(৪) সামাজিক বীমার ইতিহাস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—এ, প্লুমার।

এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত এল্, রবিন্‌স্ শ্রীযুক্ত হট্রের অর্থশাস্ত্র ও শ্রীযুক্ত আর, এফ্, হ্যারড্ শ্রীযুক্ত রবার্টসনের "ব্যাঙ্কিং নীতি ও দরের গতি" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

"কোয়ার্টারলি জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্স্"

ত্রৈমাসিক। হার্ভার্ড। মে, ১৯২৭।

(১) ইংল্যাণ্ডে "কাগজ মুদ্রা"র বিবর্ত্তন—আর, ডি, রিচার্ডস্। সেই মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিকাশ-ধারাটাকে পাকড়াও করিবার যত্ন।

(২) প্রতিষ্ঠানমূলক ভাব-রাশির কয়েকটা বিশিষ্ট দান-এল্ ডি এডি। মানুষের উপর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রভাব কম নয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্ত্তন ঘটাইলে মানুষের আর্থিক চাল-চলন বদ্‌লাইয়া যায় কি? এ, লইয়া বিস্তৃত গবেষণা বেশী হয় নাই। এদিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুসন্ধান চালাইতে হইলে প্রথমতঃ অনুসন্ধানের ধারা বদলাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ অর্থশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অধ্যায় যেমন উৎপাদন, বণ্টন-নিয়মন, খাদকের খেয়াল-খুসী ইত্যাদি লইয়া নূতন করিয়া মাথা ঘামাইতে হইবে।

বাণিজ্য-চক্র বিষয়ে মুদ্রা-তত্ত্ব ও সংখ্যা-বিজ্ঞানে তার কি প্রমাণ হয়—আর, জি, হট্রে। ইয়োরোপের বহু ধুরন্ধর আজ বাণিজ্যের আকাশে ধূমকেতু দেখিয়া শঙ্কিত। ইহা লইয়া বহু আলাপ ও আলোচনা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত পিগু কর্ত্তৃক প্রণীত একখানা বইয়ের নামই "ব্যবসা-সংক্রান্ত জোয়ার ভাঁটা" (ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ফ্লাকচুয়েশুন)। এই "চক্রটা" সমঝিতে গিয়া নানা মুনি নানা থিওরি বা তত্ত্ব খাড়া করিয়াছেন। তার একটা মনিটারি থিওরি বা মুদ্রা তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত হট্রে এই তত্ত্বটাকে আঁক জোকের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতেছেন এটা কতকটা টেঁকসই।

(৪) মজুর-সমস্যা আমেরিকার অর্থশাস্ত্রীরা যে ভাবে সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন—সি, ই, পার্সন্স্।

(৫) যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইয়োরোপে বাণিজ্য-নীতি—এইচ, ভ্যান্ ভি ফে।

"ইণ্টার ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

"লীগ্ অব্ নেশনের" আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘের মুখ-পত্র। মাসিক। জেনেভা।

এপ্রিল, ১৯২৭।

(১) অর্থতত্ত্বের আলোকে আন্তর্জ্জাতিক মজুর আই-নের মূল্য নির্ণয়—এইচ, ফীজ।

(২) অষ্ট্রিয়ার ওয়ার্কস কাউন্সিল্স্ (মজুর-সমিতি) অ্যাক্ট বা আইন (২) ই, আদ্‌লের।

(৩) গ্রেট বৃটেনে "ভোকেশনাল" পথ নির্দ্দেশ—সি, ই, ক্লিফ্ট।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের বাটী নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে "ইউনিয়ন" বা সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকোপ—ই, ই, কামিন্স্।

মে, ১৯২৭।

(১) জাতীয় স্বাস্থ্য "প্রকারে" (সীষ্টেম) পীড়ার স্থান—অধ্যাপক জি, লরিজা।

(২) জার্ম্মাণিতে মজুর আইনের কিরূপ ব্যবহার হইতেছে—এইচ্, সীফার্ট।

(৩) মজুরের প্রয়োজনাবলীর উপযোগী ঋণ সমবায়—আর, এফ্, বার্জেনগ্রেন।

জুন, ১৯২৭।

(১) বেকার-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে মিলিত স্বার্থ বিষয়ক আইন ও নিয়ম-কানুনের তাঁবে ইতালিতে বাণিজ্য সংগঠন।

(২) স্পেনিশ ব্যবসায়ে জাতীয় সমবায় আন্দোলন—কাউণ্ট ডি, আল্‌ডিয়া।

(৩) জার্ম্মাণিতে মজুর-আইনের কিরূপ ব্যবহার হইতেছে (২)?

খাদ্য গবেষণা মন্দিরে গম-বিশ্লেষণ

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কালিফোর্ণিয়ায় অবস্থিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা-ভবন বা মন্দির মোতায়েন আছে। উপরি উক্ত পত্রিকা তার একটি মুখ-পত্র। মাসিক। কালিফোর্ণিয়া হইতে প্রকাশিত হয়।

জুন, ১৯২৭।

যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় গমের দরের আপেক্ষিক গতি (লেভেল)।—যুক্তরাষ্ট্রে গমের উপর টারিফ্ বসিয়াছে, কানাডায় বসে নাই। ফলে কানাডার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে

গমের দর চড়া রহিয়া যাইতেছে। অথচ গড়পড়তা কানাডিআন গম আমেরিকান গমের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আমেরিকান গম হইতে লব্ধ প্রিমিয়ামে সর্ব্বদা ইতরবিশেষ ঘটিতেছে; কিন্তু এই প্রিমিয়াম কদাচিৎ টারিফ শুল্কের কাছাকাছি পৌঁছিতেছে, অধিকাংশ সময় নীচে থাকিতেছে।

জুলাই, ১৯২১।

গম উৎপাদক ও রপ্তানিকারক হিসাবে ভারতবর্ষের "আট সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পারে"র দেশ আমেরিকা। সেই খানে ভারতীয় গম ও অন্যান্য শস্য লইয়া কত না তর্ক আলোচনা চলিতেছে। অথচ আমরা দিব্য সুখে ঘুমাইতেছি। বাঙ্গালা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে অবিলম্বে প্রধান শস্যগুলি লইয়া আলোচনা করিবার জন্য খাদ্য-গবেষণা-মন্দির খাড়া করা দরকার। জাতীয় স্বাস্থ্য জাতীয় সম্পত্তি ত বটেই। কিন্তু স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ব্যতীত এই গবেষণা-ভবনগুলি হইতে আর্থিক তর্কযুক্তির মালমশলাও পাওয়া যাইবে প্রচুর। এই প্রবন্ধের মোট কথা:—গম উৎপাদন বিষয়ে ১ম যুক্তরাষ্ট্র ২য় রুশিয়া, ৩য় কানাডা। ভারতবর্ষ ৪র্থ। কিন্তু রপ্তানি-কারক হিসাবে ভারতবর্ষের মূল্য শূন্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১১ বছর অবধি নিট্ গড়ে রপ্তানি ৪½ কোটি বুশেল ছিল। যুদ্ধের পর হইতে এই গড় দাঁড়াইয়াছে ১·৩ কোটি বুশেল। সুতরাং ভারতের গম-রপ্তানির পরিমাণ যে বহুকাল নগণ্য থাকিবে তা আর বিচিত্র কি?



জমীদার বনাম পুঁজিপতি

নানা স্থানে নানা উপলক্ষ্যে আমরা দেখাইয়াছি যে, ধনদৌলত যুগে যুগে নানারূপে দেখা দিতেছে। আর ধনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-শক্তি আর রাষ্ট্রশক্তিও রূপরঙ্ বদলাইতেছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আগে ছিল প্রধানতঃ জমি-জমার ধনদৌলত। জমীদারতন্ত্র ছিল সেই সব যুগের প্রধান কথা। সহজে তাহাকে বলে ফিউডালিজম বা ফিউদার প্রথা। সে ছিল মোটের উপর পল্লী-সভ্যতার পল্লী-স্বরাজের, কুটির-শিল্পের যুগ।

যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুগ ভাঙিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিলাতে এই যুগান্তর সাধিত হয়। তখন দেখা দেয় ধনদৌলতের নবরূপ। জমীদার-প্রাধান্য লোপ পাইতে থাকে। মাথা খাড়া করে কাঁচা টাকার মালিক শিল্প-পতি, ফ্যাক্টরি-পতি, কারখানা-পতি। এক কথায় ইহার নাম পুঁজি-তন্ত্র বা ক্যাপিট্যালিজ মের যুগ।

পুঁজিতন্ত্রের ধারা

(১৮১৫-৮৫)

পুঁজিশাহি জগতের সর্ব্বত্রই দেখা দিয়াছে,—কোথাও আগে কোথাও পরে। ১৮১৫ সনের কাছাকাছি বিলাত এই নবীন ধনদৌলতে আর নবীন সমাজ-শক্তিতে এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮৩০-৪০ সনের কাছাকাছি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-বিপ্লবের স্বাদ চাপিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে। ১৮৫০-৭০ সনের ভিতর ফ্রান্স আর জার্ম্মাণি নবীন ধনদৌলতের মহিমা বুঝিতেছে। ১৮৮৫ সনের পরবর্ত্তী যুগে জাপান, ইতালি, রুশিয়া আর ভারত শিল্প-বিপ্লবের সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কলিকালের ধর্ম্ম

কে আগে আসিল, কে পরে আসিল সে কথাটা সম্প্রতি দিনক্ষণ মাপিয়া নিক্তির ওজনে বিচার করিব না। এই মাত্র জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই নবযুগের লক্ষণ হইতেছে জমীদার-প্রাধান্যের ঠাঁইয়ে পুঁজিপতি-প্রাধান্যের, ক্যাপিটালিষ্ট-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই যুগে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ভূমিপতিরা নিষ্প্রভ। টাকার জোরও তাহাদের কমিয়া আসিয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে রূপ চাঁদের জোরে যে সমাজ-শক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, সভ্যতাশক্তি দেখা দেয়, তাহাও জমীদারদের আর নাই। যে সকল জমীদারেরা সেয়ানা তাহারা কলিকালের "স্বধর্ম্মটা" প্রথম হইতেই বুঝিয়া লইয়া শিঙ্ ভেঙ্গে বাছুরদের দলে" আসিয়া জুটিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা জমিজমার "ফিউদারি"গিরির উপর অত্যধিক নির্ভর না করিয়া শিল্পে, যন্ত্রপাতিতে, কারখানায় লোহালক্কড়ে ব্যাঙ্কে, বীমায়, আমদানি-রপ্তানিতে মাতিয়াছে। মাতিয়াছে বলিয়াই তাহারা নিজ নিজ বংশের জন্য বাতি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বিলাতে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, জাপানে ভারতে যে দিকেই তাকাই না কেন, জমীদারদের অনেকেই নাকে তেল দিয়া ঘুমাইয়াছিল। তাহারা নবযুগের বিপ্লব কাণ্ডটা সমঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলতঃ, তাহাদের নাম আর কেহ করে না। যে যে জমীদার বংশ একালের ধরণ-ধারণ রপ্ত করিয়া নবযুগের জোয়ারে সাঁতার কাটিতে সাহসী হইয়াছে তাহারাই আজকালকার পুঁজিপতি-সমাজে শির-দাঁড়া খাড়া করিয়া চলিতেছে। কিন্তু তাহাদের ইজ্জৎ এখন আর জমীদার হিসাবে নাই। পুঁজিপতি, ক্যাপি-টালিষ্ট, কারখানা-পতি, ব্যাঙ্কপতি হিসাবে তাহাদের

ইজ্জৎ। পুরাণা জাতের বদলে তাহারা নতুন জাত পাইয়াছে।

"বুর্জোআ" "মধ্যবিত্ত" ও "ভদ্রলোক"

এই গেল ধনদৌলতের বিকাশ-ধারার এক কথা। আর একটা কথাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পুঁজিপতিরা জমীদারদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে খেদাইয়া দিল। কিন্তু পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এক নবীন শক্তি দেখা দিল। তাহাদেরই "অন্নে প্রতিপালিত" নরনারী। এই সকল নরনারীর একদল হইতেছে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক,—ইস্কুল মাষ্টার, কেরাণী, উকিল, খবরের কাগজের লেখক, রাষ্ট্র-নৈতিক বক্তা ইত্যাদি—এক কথায় ইহার নাম "মধ্যবিত্ত" শ্রেণী। কখনো কখনো এই শ্রেণীকে "ভদ্রলোক" বলিতে পারি। বিদেশী পারিভাষিকে সহজে ইহাকে বলিব "বুর্জোআ"। অপর ফল হইতেছে মজুর-ফ্যাক্টরির শ্রমিক খাদের মজুর, রেলের কুলী, জাহাদের খালাসী ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত ও মজুর এই দুই দলের ভিতর মধ্যবিত্ত প্রথম হইতেই পুঁজিপতির অনেকটা "লেজুর" হিসাবে চলাফেরা করিতেছে। তবে পুঁজিপতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার কাজে এই মধ্যবিত্তই অগ্রণী। তাহাদেরই কলম আর গলা হইতেছে পুঁজিপতির চরম আধ্যাত্মিক শত্রু। কিন্তু যথার্থ বাস্তব শত্রু হইতেছে মজুর, মজুরের দল, মজুর-আন্দোলন।

মধ্যবিত্তের চরিত্র

এইখানে বুঝিয়া রাখা ভাল যে, "মধ্যবিত্তে"র চরিত্র কিছু বিচিত্র। লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক অর্থাৎ মস্তিষ্ক-জীবীরা কেরাণী হিসাবে, উকিল হিসাবে, লেখক হিসাবে বা বক্তা হিসাবে যে ধরণের ধনসম্পদ্ সৃষ্টি করে তাহাতে চিত্তের আনন্দ, বিবেকের আনন্দ, মগজের আনন্দ সৃষ্টি হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাতে পেটের আনন্দ সৃষ্ট হয় না। উদরানন্দের জন্য তাহারা অপরাপর লোকের ধনসৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। হয় জমীদার, না হয় পুঁজিপতি, না হয় মজুর এই তিন শ্রেণীর লোকেরা মস্তিষ্কজীবীগুলাকে কাণ ধরিয়া উঠায় বসায়। কাজেই মস্তিষ্কজীবীদের ধরণ ধারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন। কখনো তাহারা জমীদারের সেবক, কখনো তাহারা পুঁজিপতির সেবক, কখনো তাহারা মজুরের সেবক। সকল ক্ষেত্রেই হয়ত এই সম্বন্ধটা সজ্ঞান নয়। অজ্ঞাতসারেই মস্তিষ্কজীবীরা অনেক সময়ে মজুরপন্থী বা পুঁজিপন্থী বা ভূমিপন্থী হইয়া থাকে। তবে অনেকে বুঝিয়া শুনিয়াই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয় সন্দেহ নাই।

আর একটা গোলমেলে কথা এই সঙ্গে বিবেচ্য। খাওয়া পরা, ভাতকাপড়, ডালরুটি ইত্যাদি বস্তু মানুষের জীবনে বিপুল শক্তি। কিন্তু মানুষের জীবনটা একমাত্র ডাল রুটির জোরে চলে না। কাজেই জমীদার, পুঁজিপতি আর মজুর একমাত্র এই তিন শ্রেণীর জোরেই জগতের কোথাও সমাজ চলিতেছে না। অন্যান্য শ্রেণীর,—যথা মস্তিষ্কজীবীর প্রয়োজনও আছে। বস্তুতঃ, এই তিন শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই মস্তিষ্কজীবীর শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। সুতরাং মস্তিষ্কজীবীরা জমীদারকে, পুঁজিপতিকে আর মজুরকে অনেক সময়েই কাণে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে পারে। যে-কোনো আন্দোলনই হউক না কেন, তাহার পশ্চাতে চাই লেখাপড়ার জোর, গলাবাজির জোর "কথকতার" জোর অর্থাৎ অধ্যাত্মশক্তি। সেই শক্তিটা যে শ্রেণীর হাতে তাহার সঙ্গে ভাব না রাখিলে জমীদারেরও চলে না, পুঁজিপতিরও চলে না মজুরেরও চলে না।

মজুর-শক্তি—ক্রমবিকাশ

যাক্। দুনিয়ায় আজকাল যে যুগ চলিতেছে সেটাকে প্রধানতঃ "পুঁজিপতি বনাম মজুর" রূপে বিবৃত করা চলে। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই এই "বনাম" সম্বন্ধ সুরু হইয়াছে। যাঁহা যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরি, পুঁজি, পুঁজিশাহি তাঁহাই মজুর, মজুর দল, মজুর-আন্দোলন। অর্থাৎ সমাজ-শক্তি আর রাষ্ট্রশক্তি শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতেই খানিকটা মজুরদের হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বিশ্বশক্তি বলিলে মজুরশক্তি সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য।

(১) ফ্যাক্টরি আইন (১৮০১)

মজুর-শক্তির ক্রমবিকাশে নানাধাপ দেখিতে পাই।

পুঁজিপতিদের কারখানাগুলা শাসন করিবার দিকে গবর্মেণ্টের ঝোঁক প্রথম হইতেই দেখা যায়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বিলাতী আইন এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম। তারপর বিলাতী সমাজে আর ইয়োরামেরিকার সকল সমাজেই ফ্যাক্টরি আইন ক্রমশঃ পুরু হইয়া উঠিয়াছে। জাপানে আর ভারতেও "ফ্যাক্টরি-অ্যাক্ট" সুপরিচিত।

(২) মজুর-সঙ্ঘ (১৮৭১)

অপর দিকে মজুরেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সুরু করে। "ট্রেড-ইউনিয়ন" নামে এই সকল সঙ্ঘ সুপরিচিত। কিন্তু বহু কাল পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট মজুরদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম্ম চালাইতে দেয় নাই। এই কারণে মজুরেরা দলে দলে নানা সরকারী নির্য্যাতন সহিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ১৮৭১-৭৬ সনে "ট্রেড-ইউনিয়ন" নামক মজুর-সঙ্ঘ বিলাতী আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ফ্রান্সের এইরূপ আইন তাহারও পরের কথা। ১৮৮৪ সনের আইনে মজুরদের সঙ্ঘাধিকার আর ধর্ম্মঘটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। জার্ম্মাণিতে মজুর-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কঠোর আইন ছিল না বটে। কিন্তু বিস্মার্কের আমলে (১৮৭০-৯০) জার্ম্মাণ মজুর-সঙ্ঘকে অনেক সরকারী উৎপাত সহিতে হইয়াছে। যাহা হউক ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান বিগত ৩০।৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জগতের এক প্রবল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

(৩) মজুর রাষ্ট্রীয় দল (১৮৭৫)

এইখানে আর একটা কথা জানিয়া রাখা দরকার। ট্রেড-ইউনিয়নগুলার একটা কাজ হইতেছে কারখানার মালিকদের সঙ্গে মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ লেনদেন। এ পুরাপুরি অর্থনৈতিক কারবার। আর একটা কারবার হইতেছে ষোল আনা রাষ্ট্রনৈতিক। মজুরেরা মজুর হিসাবে মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ম রাষ্ট্রীয় দল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই দিকে অগ্রণী কিন্তু বিলাত নয়, অগ্রণী হইতেছে জার্ম্মাণি। ১৮৭৫ সনে জার্ম্মাণ ট্রেড-ইউনিয়নগুলা সমবেত হইয়া সোৎসিয়াল—ডেমোক্রাটিশে পার্টাই অর্থাৎ সমাজ-সাম্যের দল কায়েম করে। বিলাতী লেবার পার্টি বা মজুর রাষ্ট্রীয় দল ১৯০৫সনে কায়েম হয়। যে নামেই হউক আজকাল ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্রই,—মায় জাপানেও মজুর-সঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় দল চলিতেছে। পার্ল্যামেণ্টে বসিয়া মজুরদের মজুর-প্রতিনিধিরা পুঁজি-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে সমানে বচসা চালাইতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাষ্ট্রশক্তির আর সমাজশক্তির অনেক-কিছুই মজুর-সঙ্ঘের করতলগত।

ভারতের মজুর-সঙ্ঘ

ভারতবর্ষে ট্রেড-ইউনিয়ন বিধিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র ১৯২৫ সনে। ইহার দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে, ভারতে বর্ত্তমান সভ্যতার বিকাশ দ্রুতগতিতে সাধিত হয় নাই। আসল কথা "পুঁজিশাহি" বলিলে যে সকল সু-কু বুঝা যায় এখনো তাহাই বেশী মাত্রায় পরিস্ফুট নয়। জমীদার-প্রাধান্যের সু-কু-গুলাই এখনো অনেক পরিমাণে চলিতেছে।

কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র ও চিন্তাক্ষেত্রের মতন মজুর-ক্ষেত্রেও দুনিয়ার আবহাওয়াটা ভারতীয় সুধীদের নিকট সুপরিচিত থাকা আবশ্যক। কাস্‌সাও-প্রণীত "ডী গেহ্বের্ক শাফ্‌টস-বেহ্বেগুঙ্" (মজুর-সঙ্ঘের আন্দোলন) গ্রন্থে মজুর-জীবনের সমাজ-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রকাশক হাল্‌বারষ্টাট নগরের মায়ার কোং। ৩৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

জার্ম্মাণ মজুর-সঙ্ঘে পুরুত ঠাকুরের প্রভাব

"একালের" ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে গ্রন্থকার নানা তথ্য দিয়াছেন। জার্ম্মাণির—কেবল জার্ম্মাণির কেন?—অন্যান্য দেশেরও ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন অনেক সময়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাস্‌সাওয়ের বৃত্তান্তে জানিতে পারা যায় যে, জার্ম্মাণ সমাজের কতকগুলা ইউনিয়ন "খৃষ্টিয়ান"দের পাল্লায় প'ড়িয়া অতিমাত্রায় ধর্ম্ম-প্রাণ হইয়া প'ড়িয়াছে। সেই সবেরই বিরুদ্ধে কাস্‌সাও খড়্গহস্ত। তাঁহার সমালোচনা নিম্নরূপ:—"আরে তোরা এসেছিস কারখানার মনিবদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে, দরমাহা বাড়ার ব্যবস্থা করতে, আর ধর্ম্মঘট চালাতে; কিন্তু সেদিকে নাই তোদের মতিগতি। দেখ্‌ছি কেবল হাতে বাইবেল আর পরকাল চর্চ্চা! আমার

কাহিনী স্বর্গীয় জীবনের স্বাদ আর ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির বুখ্‌নি চালাইলে কি ট্রেড-ইউনিয়নের স্বধর্ম্ম রক্ষা পাইবে?" ইত্যাদি।

কাস্‌সাওয়ের এই সমালোচনা হইতে বুঝা যায় যে, ট্রেড-ইউনিয়নগুলাকে হাত করিবার জন্য পুঁজিপতিরা পুরুত-ঠাকুরদের শরণাপন্ন হয়। পুরুত ঠাকুররা যদি ভুজুং ভাজাং লাগাইয়া মজুরদেরকে খানিকটা শান্তশিষ্ট গোবেচারা ভগবদ্ভীরু ভাল মানুষে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে পুঁজিপতিদের প্রাধান্যের আয়ু আরও কিছুকাল টিঁকিয়া যাইবে। কিন্তু মজুরদের ভিতর অধিকাংশই পুরুতঠাকুরদের যজমান নয়। তাহারা "স্বাধীন"। তাহাদের নীতিশাস্ত্র হইতেছে মজুর-প্রাধান্যের পরিপোষক। লড়াই চলিতেছে মজুর-প্রাধান্য বনাম পুঁজিপতি-প্রাধান্যের।

মজুর-শক্তির দিগ্বিজয়

১৯১৯ সনে নির্ণ্যবার্গ শহরে জার্ম্মাণ ট্রেড-ইউনিয়নগুলার কংগ্রেস বসে। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ৭।৮ বৎসরের ভিতর মজুর-সঙ্ঘসমূহ বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। দরমাহা-বৃদ্ধির লড়াইয়ে তাহাদের দিগ্বিজয় রুখিবার ক্ষমতা জার্ম্মাণ সমাজে আর কাহারও নাই। সমসাময়িক মজুর-সঙ্ঘের অবস্থা ও ক্রমবিকাশ বিবৃত করিবার জন্য জাইভেল "ডী গেহ্বের্কশাফ্‌টেন নাখ্‌ ডেম ক্রীগে" (যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের মজুর-সঙ্ঘ) লিখিয়াছেন। প্রকাশক বার্লিনের ডীট্‌স্‌ কোম্পানী। ২৫৬ পৃষ্ঠা। এই ধরণের সমসাময়িক বৃত্তান্তবিষয়ক গবেষণামূলক আর্থিক কেতাব ভারতীয় সাহিত্যে বিরল।



"দি রেলওয়েজ অব্ গ্রেট-বৃটেন "(বিলাতের রেলপথ), মক্সওয়েল, লণ্ডন, জ্যাক্রে কোং, ২৫৪ পৃষ্ঠা ১২ শি, ৬ পেন্স, ১৯২৬।

"ডী এণ্টহ্বিক্লুঙ ড্যর লুফ্‌টশিফ-ফার্ট" (উড়ো-জাহাজের ক্রমবিকাশ),—বাউলাথ, ইন্‌সব্রুক, টিরোলিয়া কোং, ৭৯ পৃষ্ঠা, ২·৫০ মার্ক, ১৯২৬।

"লাহ্বিয়াসিঅঁ কমার্সিয়াল" (বাণিজ্যিক আকাশ-যান) বনম, প্যারিস হ্বিহ্বিয়া কোং, ১২০ পৃষ্ঠা, ১২ ফ্রাঁ, ১৯২৬।

"ডয়েচ-ইটালিয়েনিশে হাণ্ডেলস্ বেৎসীহুঙ্গেন" (জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান বাণিজ্যিক সম্বন্ধ)—শ্নাইডার্স। বন, মার্কুস কোং, ১০৮ পৃষ্ঠা, ৪ মার্ক, ১৯২৬।

"ওয়ার্ল্ড ডেহ্বেলপমেণ্টস ইন দি কটন ইণ্ডাষ্ট্রী" (তুলার কারখানায় দুনিয়ার ক্রমবিকাশ)—বাভার, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০৪ পৃষ্ঠা ৩৬ ডলার ১৯২৫।

"আমেরিকান ফরেন ইনভেষ্টমেণ্টস্ (বিদেশে মার্কিণ পুঁজি), ডান, নিউইয়র্ক, হ্বিবশ্ কোং, ৪২১+১১ পৃষ্ঠা, ৫ ডলার, ১৯২৬।

"কারেন্সীজ অব্ চায়না" (চীনের টাকা-কড়ি), কান, শাংহাই, কেলী অ্যাণ্ড ওয়াল্শ কোং, ৫৪০ পৃষ্ঠা, ১৯২৬।

"ৎসুর কাপিটাল-কোন্‌ৎসেণ্ট্রাট্সিয়ান ড্যর বার্লিনার গ্রোস-বাঙ্কেন ফোন ১৯১৪-২৩" জার্ম্মাণির বড় বড় ব্যাঙ্কের পুঁজি-বৃদ্ধি-১৯১৪হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত কালের বৃত্তান্ত,—ফেণ্ডলার বার্লিন, ক্রিষ্টিয়ান্স্ কোং ১০৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৬।

"লা স্তাবিলিজাসিঅঁ দ্যু ফ্রাঁ। (ফরাসী মুদ্রার স্থিরীকরণ) ল্যর‍্যাঁস, প্যারিস, জিয়ার কোং ১৭৮ পৃষ্ঠা, ১২ফ্রাঁ, ১৯২৬, "ডেফ্লাট্‌সিয়োন ওডার ডেফাল্‌ফাট্‌সিয়োন?" মুদ্রাসংস্কারের কোন্ প্রণালী ভাল,—মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস (যথা চেকো-শ্লোহ্বাকিয়া ইংল্যাণ্ড, সুইডেন) না, মুদ্রার মূল্য বদ্‌লানো (যথা অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণি পোল্যাণ্ড) হ্বের্স্, গ্রাইফ্‌স্‌হ্বল্ডে, বাম্বার্গ কোং ১০৫ পৃষ্ঠা, ২·৫০ মার্ক ১৯২৬।

"লা প্রোদ্যুক্সিঅঁ দে রিশেস্" (ধনদৌলতের উৎপাদন), মাস, প্যারিস জিয়ার কোং ৯৭৯+১৭ পৃষ্ঠা, ৫০ফ্রাঁ ১৯২৫।

"মাৎসিনি এ বাকুনিন। ১২ আন্নি দি মহ্বিমেন্ত অপেরাইও ইন ইতালিয়া (১৮৬০-৭২)"—"ইতালিয়ান রাষ্ট্রবীর মাৎসিনি ও রুশ সাম্যপন্থী রাষ্ট্রবিরোধী বাকুনিন, ইতালির মজুর আন্দোলনের ১২ বৎসর (১৮৬০-৭২) রসসেলি, তরিন,—বকা কোং ৩৬ লিয়ার ১৯২৭।

আমেরিকার ঘর-সংসার

বড় ঘরের পারিবারিক কথা লইয়া অনেকে অবসর সময় কাটায়। কোন্ নেতার কয়খানা মোটর আছে, সহরে কাহার কতটা ইমারত আছে, কোন জজ ব্যারিষ্টার কত হাজার টাকা মাসে রোজগার করে, কাহার ছেলে মেয়ের বিবাহ কি রকম জাঁকজমকের সঙ্গে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, কাহার শ্রাদ্ধে কত হাজার ব্রাহ্মণের চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল, দান খয়রাতের হাত বড় কাহার ইত্যাদি হাজার রকমের চাটনী অবসর সময়ে সাধারণের রসনা-তৃপ্তি করে। সমাজের কতকগুলি লোকের ব্যবসাই এই ধরণের আভিজাত্যমূলক খবর সংগ্রহ করা ও সেগুলিকে বাড়াইয়া, ফলাইয়া দশজনের পাতায় পাতায় বাটিয়া দেওয়া। এইভাবে অবসর সময় কাটানোর লাভ-লোকসান খতিয়ান করিয়া দেখা মুস্কিল। মেঘ বরণ চুল কুঁচবরণ কন্যার সন্ধানে সাত সমুদ্র তের নদী পারে রাজপুত্রের ঘোড়া ছুটাইয়া দেওয়ার খবরে ঠানদিদির শিশু শ্রোতৃগণের কাহার কাহার মধ্যে যে একটা দিগ্বিজয়ের উদ্দীপনা আসে একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই মনে হয় সময়ে সময়ে বড় বড় লোকের বড় দেশের কথা লইয়া আলোচনা করা মন্দ নয়।

নিউওয়ার্ল্ড বা আমেরিকার ঘরোয়া খবর লইবার অধিকার আমাদের জন্মিয়াছে কিনা বা সে সময় আসিয়াছে কিনা ইহা বিবেচনাধীন। তবে ঐ বড় লোকদের মতন বা পরীর দেশের, রূপকথার মতন আমরা আমাদের অবসর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ঘর-সংসারের খবর লইলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। তবে তরুণদের একথা জানিয়া রাখা ভাল, যে, ঐ দেশটার বা ঐ জাতটার ধরণ ধারণ তাহাদের কাজ কারবার আয়ত্ত করিতে এখনও দুই এক শতাব্দী আমাদের শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। সেদিনকার ভুঁইফোড় জাতি সে এই একশ' দেড়শ' বছরে এত বড়টি হইয়াছে আর আমরা সেই দুনিয়ার আদিকাল হইতে কপালে দিগ্বিজয়ের রাজটীকা পরিয়া চলিয়াছি, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যুবকদের অসহিষ্ণু হইবার প্রয়োজন নাই। বেশী বাড়াবাড়িতে কাজ ভাল হয় না। বর্ত্তমানে আমেরিকার কাজ কারবারের সঙ্গে ভারত-সন্তানের সামান্য অক্ষর পরিচয় থাকা চাই। ওদেশের রূপকথা শুনিয়া আমরা যদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি তাহাই যথেষ্ট হইবে।

সকলের আগে মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা চরম ধনী, দুনিয়ার সেরা, আর আমরা চরম গরিব, দুনিয়ার ওঁছা। তবে আমাদের একটা বড় নাম-ডাক আছে সেটা যদিও পৈত্রিক সম্পত্তি। ভারতবর্ষ চরম অধ্যাত্মবাদের দেশ মুনি ঋষি, ফকির দরবেশের আশ্রম আস্তানা। এই ভারতের মাটীতে ধনী আমরা নাইবা হইলাম দেশের লোকের মুখে দুইবেলা দুইটা অন্ন নাই বা উঠিল, দেশ কালাজ্বর ম্যালেরিয়া বসন্ত -কলেরা প্রভৃতি মড়কে উচ্ছন্ন যাউক না কেন, তবুও জীর্ণ শীর্ণ মরণোন্মুখ জাতির মুখ আজও অধ্যাত্মবাদের গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহকালের সুখ চাইনা, কেননা পাই না। পরকালের অফুরন্ত সুখ ও শান্তি আমাদের কাম্য। দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত দেশের লোকের কাহার কাহার মুখে আজও এই কথা শুনা যায়। পেটে দানা না থাকিলে মগজ যে গোলাইয়া যায়, অধ্যাত্মবাদের চিন্তা সেখানে ঠাঁই পায় না একথা বুঝিতে গোটা দেশকে আরও দুরবস্থায় পতিত হইতে হইবে।

দুই নম্বরে মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা চরম কল-কারখানার দেশ আর এদেশের নেতারা কল কারখানার উচ্ছেদ-সাধন করিয়া জগতে সুখ ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের যেরূপ যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে তাঁহাদের এই আন্দোলন দেশের পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচিত হইত না। আজ সেকাল নাই, অবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে জন-সংখ্যা এত দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, এই বিপুল মানব সমাজের জন্য আশ্রম বা কুটীর বাসের ব্যবস্থা অধ্যাত্ম-

বাদের দিক্ দিয়া যতই কাম্য হউক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলি মোটেই যথেষ্ট হইবে না। আজ এই বাড়ন্ত মানব সমাজের বাসস্থানের জন্য, ইহাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য বিপুল বিশাল ইমারত ও যোজনব্যাপী কলকারখানা ও ধূম উদ্গারক মনুমেন্ট হাজার হাজার শিল্প সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের মধ্যে অনেক সহর-জনপদ গড়িয়া তোলা চাই। আর যদি সেকালের তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া আনিতে হয় তবে অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি, কালাজ্বর সেণ্টার, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মড়ক ও দুর্ভিক্ষ প্লাবন সমিতি, পল্লী ও সমাজ সেবা প্রভৃতি দেশোন্নতির আখড়াগুলি সর্ব্ব প্রথমে তুলিয়া দিতে হইবে। দেশ শশ্মানে পরিণত হইলে তবেই আবার অল্প কয়েকজন লোক লইয়া সেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। মানবজাতির ক্রম-বিকাশের ইতিহাস এই শেষোক্ত পন্থা সমর্থন করিবেনা। আর সকল দেশ যে পথে চলিয়াছে আমাদিগকেও সেই পথে চলিতে হইবে। একটা অভিনব কিছুর আয়োজন বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইবে। এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া আমেরিকা ইংলণ্ড জার্ম্মাণি প্রভৃতি উন্নত দেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দরকার।

যুদ্ধের সময় আমেরিকা খুব মোটা হাতে লাভ করিয়া লয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাই বলিয়া মহাযুদ্ধের দৌলতে আমেরিকা আজ এত বড়টি হয় নাই। যুদ্ধ একটা সাময়িক উপলক্ষ্য ছিল মাত্র। যুদ্ধের সময় আমেরিকার রপ্তানি-শিল্প খুব বাড়িয়া যায় ইহা খাঁটি কথা; কিন্তু বাড়াইবার মত ক্ষমতা ও পুঁজিপাটা আমেরিকার যথেষ্ট ছিল। ঐ সময় জাপানও ত খুব এক চোট মারিয়া লয়। ভারতবর্ষ সুযোগ থাকিতেও তেমন কিছু করিয়া লইতে পারে নাই। কারণ তার রসদ ছিল অপ্রচুর। আমেরিকার সার্ভে অব্ ওভারসিজ্ মার্কেট (বিদেশী হাট বাজার জরীপ) রিপোর্টে দেখা যায় ১৯১৩ সনে আমেরিকা ১,০৫২,৪০০০,০০০ টন মাল বিদেশে চালান দেয়। ১৯২৩ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১,৮৫০,৭০০০,০০০। আমেরিকার বোর্ড অব ট্রেড হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের বাজার-দরের তুলনায় আমেরিকার রপ্তানি-শিল্প এই দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতের অবস্থা কিন্তু ইহার উল্টা। ইউনাটেড কিংডম বা ইংরেজের মাতৃ-ভূমির রপ্তানি শিল্প ইহার তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৩ সনে দুনিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের খাতায় যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা ছিল শতকরা ১৬·৮৮ ভাগ, আর বিলাতের ছিল ১৪·০৩ ভাগ। ১৯১৩ সনে কিন্তু আমেরিকার প্রতি বিধি বাম ছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থা ছিল ঠিক ইহার উল্টা। ১৯১৩ সনে দুনিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা ১৩.০২ ভাগ ছিল বৃটেনের আর ১২.৪৭ ছিল আমেরিকার। ১৯১৩ সনে আমেরিকা ছিল সেকেণ্ড বয় আর ১৯২৩ সনে একলাফে ইংরেজকে ডিঙ্গাইয়া ফার্ষ্ট বয়ের আসন গ্রহণ করিয়াছে। ইহার দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, আমেরিকার শিল্পকারখানায় উৎপাদন জোর চলিতেছে। বিলাত ও জার্ম্মাণি এই দুই বাঘা বাঘা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল জাতির চাইতেও আমেরিকার রপ্তানি মাল উৎপাদন ঢের বেশী হইতেছে। তবুও কিন্তু আমেরিকা মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে—রপ্তানি ব্যবসায়ে এখনও সে ওস্তাদ হইতে পারিল না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে আর একটা বড় পার্থক্য দেখুন। রপ্তানি শিল্পের উপর ইংলণ্ডের জীবন মরণ নির্ভর করে অন্য দিকে আমেরিকা ধরার বুকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার রপ্তানি শিল্পের তোয়াক্কা রাখে না। এটা তাহার উপরি আয় মাত্র।

একমাত্র রপ্তানি-শিল্পের অঙ্ক দেখিয়া আমেরিকার শিল্প বা দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার মাপ জোঁক করা চলে না। আমেরিকা বাহিরে যা পাঠায় নিজে ঘরে তার চাইতে ঢের বেশী মাল খরচ করে। ১৯২৬ সনের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র ২,১৭৩,০৯৭ খানি মোটর গাড়ী প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহার মাত্র ১৪৩,৫০৭ খানা গাড়ী অর্থাৎ উৎপাদনের শতকরা ৬½ ভাগ মাত্র আমেরিকা বিদেশের বাজারে পাঠায়। ঐ সময় আমেরিকা ১৫৪,১৫৫,০০০ জোড়া জুতা প্রস্তুত করে, ইহার মধ্যে ৩,৪৭৩,০০০ জোড়া মাত্র বিদেশে রপ্তানি করে। তাহা হইলে মোট উৎপন্ন জুতার শতকরা ২.২ ভাগ মাত্র বাহিরে চালান দেয়। আমেরিকার মাল তার স্বদেশে বিকায় বেশী। ঘরে তার বিপুল বাজার

পড়িয়া আছে। স্বদেশে এই অসম্ভব রকম কাট্‌তির কথা ভাবিলে মনে হয় আমেরিকার উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রয়-ক্ষমতার চাইতে আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বহির্ব্বাণিজ্যের দিকে আমেরিকা আজকাল খুব বেশী নজর দিতেছে। জাহাজকে জাহাজ আমেরিকান ধনকুবের, ব্যবসায়ী, শিল্পী অধ্যাপক, ছাত্র আজ বিদেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া পরিয়াছেন। এই সে দিন একদল আমাদের দেশেও ঘুরিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, বিদেশের হাট বাজারের দিকে আমেরিকার ধনকুবের ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বিদেশের বাজারে আমেরিকা ইংরেজের এক জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চলিয়াছে।

এখন দেখা যাউক আমেরিকার উৎপাদন করিবার উপযোগী মাল মশলা ভাণ্ডারে তাহার কতটা আছে। আমেরিকায় ১১৫০ লক্ষ লোক বাস করে, বিলাতে বাস করে ৪৪০ লক্ষ। জনসংখ্যার হিসাবে আমেরিকা ইংরেজের আড়াই গুণের বেশী। তাহা ছাড়া আমেরিকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য অফুরন্ত। ইংরেজ তার শিল্প-কারখানার কাঁচা মালের অনেকটা পরিমাণ তাহার সাম্রাজ্য হইতে সংগ্রহ করে। এই হিসাবে ইংরেজ তাহার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাহিরের অন্যান্য দেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস অব অকুপেশন বা বসতির রিপোর্ট পড়িয়া দেখা যায় যে, ১৯২০ সনে ঐ রাষ্ট্রের ১২,৮১৮,৫২৪ জন অধিবাসী শিল্প কারখানায় এবং ১,০৯০,২২৩ খনিজ সম্ভার উত্তোলনে নিযুক্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-অধিবাসীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৪০ লক্ষ। এই বিশাল শিল্প জন সংখ্যার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পজাত দ্রব্য অপ্রচুর বলিতে হইবে। বৃটিশ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌সে দেখা যায়, ১৯২৬ সনে বীমাকারী শিল্প শ্রমজীবিগণের সংখ্যা ৭০ লক্ষ এবং খনিজ মজুর ১৩,৭৫,০০০। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত জন-সংখ্যা ইংলণ্ডের ডবল। অন্য দিকে তাহার খনিজ শ্রমজীবী সংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় অনেকটা কম বলিতে হইবে। এই মজুর জনপদের বিপুল বহর দেখিয়া মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা শিল্পজাত মাল উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্য সকল জাতিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। ভারতবর্ষ অনেক দূরে। সাগরের অতল গর্ভে তার স্থান। ইংরেজ ও জাপানী হুঁসিয়ার।

সার্ভে অব ওভারসিজ ট্রেড (বৈদেশিক বাণিজ্যের) রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২৬ সনে আমেরিকায় ১২১০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের শিল্পজাত মাল উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে মাত্র ৮৯৪০ লক্ষ পাউণ্ড দামের মাল বিদেশে চালান করা হয়। ইহার তুলনায় ইংরেজ ৭৪৩,৫০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করে। তাহা হইলে দেখা যায়, আমেরিকা তার মোট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা আট ভাগ মাত্র বিদেশে পাঠায়, আর ইংরেজ পাঠায় ২৫ ভাগ বা তারও বেশী। বিলাতের মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ কোটি পাউণ্ড আর আমেরিকার হইতেছে ১২০০ কোটি পাউণ্ড। তাহা হইলে দেখা যায় বৃটিশ শিল্প-জনপদ আমেরিকান শিল্প-জনপদের সিকি মাল তৈয়ারী করে। জন-সংখ্যানুপাতে ইংলণ্ড কিন্তু আমেকার অর্দ্ধেক। অন্য কথায় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন-ক্ষমতা ইংরেজের ডবল অর্থাৎ দুইজন ইংরেজ একজন ইয়াঙ্কির সমান।

মানুষ বনাম কল

চীনের লোক-সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের ৪ গুণ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে কাজ কারবার হয় তাহা সম্পন্ন করিতে চীনের লোক-সংখ্যার দশ গুণ লোকের দরকার হয় বা যুক্তরাষ্ট্রকে ঐ কাজ সম্পন্ন করিতে ৪০ গুণ লোক খাটাইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে কাজ কারবার চলে তাহার জন্য বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রকে তাহার জনসংখ্যার ৪০ গুণ লোক খাটাইবার প্রয়োজন করে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অধিবাসীর দ্বারাই ঐ কাজকারবারগুলি সম্যকরূপে সুসম্পন্ন হয়। ইহার দ্বারা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয় প্রত্যেক আমেরিকানের কার্য্য-ক্ষমতা ৪০ গুণ বেশী বা প্রত্যেক আমেরিকানের আর ৩৯ জন করিয়া অদৃশ্য দাস আছে। সত্য সত্যই প্রত্যেক আমেরিকানের অধীনে ৩৯ জন করিয়া কেনা গোলাম খাটিতেছে। এগুলি একেবারে দৈত্যের মত জ্যান্ত। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে ইহাদের আলস্য বা ক্লান্তি নাই। আর এগুলির ভরণ-পোষণ করিবারও

দরকার করেনা। ইহারা স্রষ্টার সৃষ্ট হাড়মাসের মানুষ না হইলেও মানুষের সৃষ্ট কলের মানুষ। আমেরিকা মানুষের তক্তে আজ কলের আসন দিয়াছে। কলকারখানায় সমগ্র দেশটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমেরিকার কর্ম্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধির ইহাই একমাত্র কারণ। কলকারখানাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল বলিয়াই আমেরিকা আজ দুনিয়ার সেরা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। এইখানে বিভিন্ন দেশের লোকের কর্ম্ম-ক্ষমতার তালিকা দেওয়া হইল। ইহাদ্বারা দেশ মাপা চলে।

চীন	...	...	১ গুণ
বৃটিশ ভারত	...	...	১¼ „
রুশিয়া	...	...	২½ „
ইতালি	...	...	২¾ „
জাপান	...	...	৩½ „
পোল্যাণ্ড	...	...	৬ „
হল্যাণ্ড	...	...	৭ „
ফ্রান্স	...	...	৮¼ „
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	৮½ „
চেকো-শ্লোভাকিয়া		...	৯½ „
জার্ম্মাণি	...	...	১২ „
বেলজিয়াম	...	...	১৬ „
গ্রেটবৃটেন	...	...	১৮ „
কানাডা	...	...	২০ „
যুক্তরাষ্ট্র	...	...	৩০ „

আর্থিক দিক্ দিয়া কোন্ দেশটা কতখানি সচ্ছল, কোন্ দেশের কিস্মৎ কতটা তাহাও এই তালিকা হইতে বোঝা যায়।

বিগত দশ বৎসরে আমেরিকায় মানুষ উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসের মান্থলি লেবার রিভিউ পত্রিকায় দেখা যায়, ইস্পাত মোটরগাড়ী জুতা ও কাগজ-শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন শতকরা ২৫ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯১৭-১৯২৫ মধ্যে পেপার ও পাল্প শিল্পে শতকরা ৩৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকলের চাইতে বেশী বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় মোটরগাড়ী শিল্পে। ঐ সংখ্যা প্রায় শতকরা ৮১ গুণ। ১৯২১ সন হইতে জুতা শিল্পে শতকরা ৬ ভাগ উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ রিপোর্টে দেখা যায় যে, ফ্যান্সি বাবুগিরির দিকে লোকের ঝোঁক বেশী হইয়াছে। ফ্যান্সি জিনিষ প্রায়ই হাতে তৈয়ারী হইলে বেশী সুন্দর হয়। এই জন্য হাতে তৈয়ারী জুতার আদর সেখানে বাড়িয়া গিয়াছে ও কলে তৈয়ারী জিনিষের কম কাট্‌তি হইতেছে। এখানে তাহা হইলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, কেবলমাত্র বৃহদাকার ভাবে শিল্প উৎপাদনে দ্বারাই গোটা দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকা কিন্তু পুরাপুরি কলকারখানায় বিশ্বাসী। যতদূর সম্ভব ততখানি সে কলকারখানার সাহায্যে তার কাজ কারবার সম্পন্ন করে। মানুষের খাটুনি কম করিয়া মানুষের পরিবর্ত্তে সেখানে কলের চলন হইয়া গিয়াছে। জাহাজ হইতে নামানো ওঠানোর জন্য বড় বড় কলকারখানা রহিয়াছে। সটিলের ক্রেন এলিভেটর (শস্য উত্তোলন যন্ত্র) মিনিটে ৯ টন করিয়া শস্য জাহাজে বোঝাই করে। ফোর্ড কারখানার ডকে কয়লা ইস্পাত লোহালক্কড় প্রভৃতির উঠানামা করান বোঝাই করা প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। রুজ নদীতে ফোর্ড কারখানার যে প্লাণ্ট বা যন্ত্র আছে তাহা ৫ লক্ষ অশ্ব-শক্তি-সম্পন্ন। সকল প্রকার কাজ সেখানে অদৃশ্যভাবে কলদ্বারা করান হইতেছে। লোকের ভিড় সেখানে নাই। কয়েকজন ভাল পোষাক পরিচ্ছদে ফিট-ফাট এঞ্জিনিয়ার ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া যন্ত্রগুলির কাজ কারবার তদারক করে মাত্র।

শিকাগোর বড় বড় কাটা কাপড়ের কারখানায় তৈয়ারী সুট পোষাক হাতে কাটা হয়না। পরন্তু একই সময়ে ইলেক্‌ট্রিক কাটারের দ্বারা ২০ টি সুট এক সঙ্গে কাটা হয়। রুটির কারখানার কলে ২০ জন রুটিওয়ালার কাজ একজনে করে। ইস্পাত শিল্প কারখানায় চার্জ্জিং মেশিনে ৪০ জন লোকের কাজ কলে এক জনে করে। আমেরিকার হাজার হাজার শিল্প কারখানায় এইভাবে কাজ চলিতেছে। প্রত্যেক বিভাগে যন্ত্রের সাহায্যে কাজ কারবার হওয়ার ফলে শ্রমজীবী ও শিল্পীদের অন্যান্য দেশের চাইতে

ঢের বেশী মজুরি দেওয়া সত্বেও আমেরিকার উৎপাদন খরচা অপেক্ষাকৃত কম পড়ে। বিলাতের সঙ্গে একটু তুলনা করিয়া দেখা যাউক। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের বাড়ী তৈয়ারীর খরচা সমান। প্রতি কিউবিক ফিটে আমেরিকায় ৭৫ সেণ্ট বিলাতে ৩ শিলিং। কিন্তু আমেরিকায় প্রতি ঘণ্টায় ১,৭৫ ডলার আর বিলাতে মাত্র ১ শিলিং ৯ পেন্স অর্থাৎ বিলাতের চাইতে ৪ গুণ বেশী মজুরি দিয়াও আমেরিকার ইমারত তৈয়ারীর উৎপাদন-খরচা বিলাতের সমান পড়ে।

১৯২৫ সনে জার্ম্মাণ ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশ্যন আমেরিকা পরিভ্রমণকালে সেখানকার লৌহ ইস্পাত শিল্প কারখানা পরিদর্শন করেন। তাঁহারা ঐ কারখানাগুলির কাজ কারবার দেখিয়া স্বীকার করেন যে, আমেরিকার উৎপাদন-ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব বেশী; কিন্তু তাই বলিয়া আমেরিকানদের শারীরিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃটিশ বা জার্ম্মানদের চাইতে বেশী উৎকৃষ্ট একথা মানিয়া লইবার কারণ নাই। কলকারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনই আমেরিকানদের বেশী উৎপাদন-শক্তির কারণ। আমেরিকার শিল্পী বা শ্রমজীবীরা বৃটিশ কারিগর বা শ্রমজীবীর চাইতে দক্ষ নহে। পরন্তু আমেরিকান শ্রমজীবীর অধিকাংশ শিল্প-কারখানায় একেবারে নূতন লোক, আর বৃটিশের তুলনায় তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাও অনেক কম।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ বার্ণস মহাশয়ের আর্থিক আমেরিকা বিষয়ে দুইখানা কেতাবে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার আমেরিকাজ্ কঙ্কোয়েষ্ট অব পভার্টি" ও "প্রডাকশুন এণ্ড লিভিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডস"গ্রন্থ দুইখানিতে বলিয়াছেন যে, আমেরিকা নূতন নূতন শিল্পের জন্ম দিয়া দারিদ্র্য জয় করিয়াছে। অটোমবিল বা মোটর-শিল্প, ফিল্ম বা চলন্ত ছায়াচিত্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও রসায়ন শিল্পের কারখানা বিশ বৎসর আগে আমেরিকায় ছিল না। আজ এইগুলি তিন কোটি আমেরিকানের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতেছে। এগুলিদ্বারা আমেরিকার এক বিরাট বেকার-সমস্যার সমাধান হইয়াছে। ভারতের স্বদেশী নেতাগণ এদিকে একটু মাথা ঘামাইলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত জে, এলিস বার্কার ১৯০৭ সনের বৃটিশ সেন্সাস অব্ প্রডাকশুন ও ১৯০৯ সনের আমেরিকান সেন্সাস এই দুইটির তুলনা করিয়া তাঁহার "ইকনমিক ষ্টেটসম্যানশিপ" কেতাবে লিখিয়াছেন যে, ২৬ টি শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ইংলণ্ডের প্রায় ৩ গুণ এবং মানুষ প্রতি কলকারখানার অশ্ব-শক্তি দ্বিগুণ। আমেরিকার কারিগর শিল্পী ও মজুর মনিব বিলাতের মজুর মনিবের চাইতে বেশী উৎপাদন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে, এমন কি বৃটিশ শিল্প কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের মজুরির ডবল মজুরি দিয়াও আমেরিকা এরূপ কম খরচায় মাল উৎপাদন করে যে, বাজারের প্রতিযোগিতায় আমেরিকান চিজ অনায়াসে টিকিয়া থাকিতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের গড়পড়তা মজুরি বেশী হইলেও সেখানকার উৎপাদনখরচ খুব কম। একজন কামার প্রতিদিন আটঘণ্টা ১০ অশ্ব-শক্তি হিসাবে খাটিয়া ১০ ডলার পায়, ঐ কামারের কাজ কলকারখানার দ্বারা করাইলে ঐ কারবারের জন্য ২ পাউণ্ড কয়লা খরচ হয়। দুই পাউণ্ড কয়লার দাম দুই পয়সা মাত্র। ফলে একজন কামার ১৮ পাউণ্ড কয়লা দ্বারা অর্দ্ধেক খরচায় প্রতিদিন দশজন কামারের সমান কাজ করিতে সমর্থ। ইহাতে উৎপাদন-খরচা ত কম পড়িলই, পরন্তু কলে তৈয়ারী জিনিষ হাতে তৈয়ারী জিনিষের চাইতে ভাল ও সুন্দর হইল।

আমেরিকান কোল মাইনার (খনি-মজুর) বৃটিশ কোল মাইনারের ৩৷৷ গুণ কয়লা উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহার মজুরিও বৃটিশের চাইতে অনেক গুণ বেশী। সে মোটরে চড়িতে পারে, তাহার থাকিবার স্থান স্বাস্থ্য ও আরামপ্রদ। ফলে তাহার কর্ম্মক্ষমতাও বেশী। একজন আমেরিকান কারিগরের একখানা মোটর তৈয়ারী করিতে যে সময় লাগে ইয়োরোপের একজন কারিগরের তাহার চাইতে ১০ গুণ বেশী সময় দরকার হয়।

আমেরিকায় চড়া মজুরি

একটা মজার ব্যাপার দেখুন। আমেরিকান মনিব সকল সময় চড়া মজুরির পক্ষপাতী। তাঁহাদের ইহার স্বপক্ষে

এখন যুক্তি হইতেছে যে, বেশী বেতন দিলে দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। স্বদেশে তাঁহাদের মাল বেশী কাটতি হইবে। ইহা ছাড়া চড়া মজুরির স্বপক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি আছে। আমেরিকা বেশী ধনী দেশ। সে মজুরদের বেশী টাকা দিতে পরোয়া করে না। কারিগর ও মজুরদের বেশী মাহিয়ানা দিলে স্বভাবতই ভাল কাজ পাওয়া যাইবে এরূপ ভরসা আমেরিকান মনিব যথেষ্টই রাখে। আমাদের দেশের মতন কুসংস্কারযুক্ত তাহারা নহে। এদেশের মনিবরা মজুরদের দুঃখ-দারিদ্র্য অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনেকস্থলেই প্রয়োজন মনে করে না। তাঁহাদের কাজ হইলেই হইল। যে বেতন ভারতীয় মনিব একজন মজুরকে দিয়া থাকেন তাহাতে ঐ মজুরের পরিবারের খরচা চলিতে পারে কিনা ইহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না! এই কারণেই এদেশে মজুরের অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ও এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশী বাজারে তেমন আদর পাইতেছে না। এই মজুর-অসন্তোষ নিবারণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে হওয়া উচিত। নচেৎ একদিন হঠাৎ এক দেশব্যাপী অনল জ্বলিয়া উঠিবে। তখন তাহা নির্ব্বাপিত করা সহজ হইবে না।

আমেরিকান মনিব মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দিকে বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন। অন্য শিল্প কারখানায় বেশী বেতনের লোভে যাহাতে তাঁহার শিল্প কারখানার কারিগর ও মজুর কর্ম্মত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করে সেইজন্য গোড়া হইতেই তাহাদের চড়া দরে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। ব্যাধিবার্দ্ধিকা ভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেনসন ইত্যাদি সুবিধা সেখানে আছে। আজকাল মজুর ধর্ম্মঘটের যুগে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেমোক্রাসি বা কল কারখানায় গণতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টাও সেখানে জোর চলিতেছে। মজুর-অসন্তোষ একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত শিল্প ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এম্প্লয়ি রিপ্রেজেনটেশ্যান প্লান বা মজুর প্রতিনিধি নিয়োগ ব্যবস্থা কায়েম করা হইতেছে। আমেরিকার পেনিসিলভ্যানিয়া রেলরোড সুইফ্‌ট মিটপ্যাকিং প্লাণ্ট (মাংস প্যাক করিবার কারখানা) এবং ইণ্টারন্যাশনাল হার্ভেষ্টার অয়েল কোং রিফাইনারি, জেনারেল ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ওয়েষ্টিং হাউস, বেথেলহাম ষ্টিল ওয়ার্কস প্রভৃতি এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পভবনে এইভাবে কাজ চলিতেছে।

ফিলাডেলফিয়া র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট কোং ১৯১১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ইহাতে সহরের ১০ হাজার ট্রামবাসের কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাচিত এক কমিটি আছে। শ্রমজীবী ও কারিগরদের নির্ব্বাচিত এইসকল সদস্যগণের ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যাপারে কথা বলিবার ক্ষমতা আছে। ঐ কোম্পানীর মূলধন ৩ কোটি ডলার। ইহাতে শ্রমজীবিগণের অংশ আছে এবং এই সম্পত্তি পরিচালনার্থ ডিরেক্টরগণের দুইজন শ্রমজীবী ও কর্ম্মচারিগণের প্রতিনিধি। আমেরিকার মনিবরা এই ধরণের বহুবিধ সুবিধা মজুরদিগকে দিয়াছে।

আমেরিকার চড়া মজুরির অন্যতম কারণ সেখানকার মজুরের চাহিদার চাইতে যোগান অপেক্ষাকৃত কম এবং এইজন্য আমেরিকার ফেডারেশ্যন অব্ লেবার ও ঐ দেশের ইমিগ্রেশ্যন ল অনেকটা দায়ী। আমেরিকান ফেডারেশ্যন অব্ লেবার বাহির হইতে মজুর আমদানির বিরুদ্ধে জোরে আন্দোলন চালায়। ফলে আমেরিকা আইন প্রণয়ন করিয়া বিদেশ হইতে মজুর আমদানি একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মজুর সঙ্ঘের দাবী "বিদেশী মজুর দেশে ঢুকতে দিওনা, তাহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, জীবনযাত্রার মাপকাঠি খাট হইয়া পড়িবে। বিদেশী মজুর যে বেতনে সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করিতে স্বীকৃত হইবে আমেরিকান মজুর তাহা অর্দ্ধ অনশনের সমান ভাবিবে।" শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, ই, ওয়ালিং মহাশয় রচিত "আমেরিকান লেবার অ্যাণ্ড আমেরিকান ডেমোক্রাসি" কেতাবে দেখা যায়, ১৮৮৯ সনে আমেরিকান মজুরের বাৎসরিক মজুরি ছিল ৬৩৫ ডলার। আমেরিকায় অবাধ বিদেশী মজুর আমদানি করার ফলে ১৯১৪ সনে ঐ সংখ্যা ৫৬৮ ডলারে নামিয়া যায়। ১৯০৭ হইতে ১৯১৪ সন এই সময়ের মধ্যে আমেরিকায় প্রায় ৮০ লক্ষ বিদেশী প্রবেশ করে। এই কারণে ঐ সময়ে মজুরি সামান্য বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সনে আমেরিকার মাটিতে বিদেশী মজুরের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করিয়া আইন প্রণয়নের ফলে, এমন কি কাজের

সপ্তাহ কম করা সত্ত্বেও ১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সন এই দশ বৎসরের মধ্যে মজুরি ১১২ পয়েন্ট বৃদ্ধি হয়। এই প্রতিরোধ আইনের আমলে ৪০ লক্ষের কম লোককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ইয়োরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশী মজুরকে আমেরিকায় আস্তানা ফেলিতে না দিলেও ইহাদের পরিবর্ত্তে আজ লক্ষ লক্ষ মেক্সিকান আমেরিকায় ঢুকিতেছে। ১৯১০-১৪ সনের মধ্যে ৮৪,০০০ ও ১৯২০-২৪ সনের মধ্যে ২৩২,০০০ মেক্সিক্যান আমেরিকায় কাজের অন্বেষণে আসিয়াছে। ইহা ছাড়াও হাজার হাজার লোক আমেরিকায় খাটিয়া খাইতেছে। এ সকল সত্ত্বেও আমেরিকা তাহার চাহিদা-মাফিক মজুর পাইতেছে না। ফলে মানুষের বদলে কলকারখানার রেওয়াজ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মজুরি বাড়িয়া চলিয়াছে। আমেরিকার শিল্প-ধুরন্ধরদের আজ মূলমন্ত্র "কম লোক ও বেশী উৎপাদন চাই"। আজ মানুষের পরিবর্ত্তে মেশিন শক্তি সেখানে কাজ করিতেছে।

আজ আমেরিকা এত বড়টি হইয়াছে কেবল শিল্পনীতির দৌলতে। শিল্প-কারখানার দিকে আমেরিকার ঝোঁক না চাপিলে সে আজ দুনিয়ার সব চাইতে সেরা ধনী হইতে পারিত না। আমেরিকা বড় বড় শিল্প ইমারত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলকারখানা সৃষ্টির দ্বারা আজ দারিদ্র্যকে জয় করিয়াছে। অধ্যাত্মবাদের বক্তৃতা যত জোরেই চলুক না কেন তাহাতে ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন বুভুক্ষু লোকের মুখে অন্ন উঠিবে না। চাই শিল্পনীতিবাদ।

শিল্পনীতির কৃপায় কেবলমাত্র আমেরিকার আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় নাই, কেবলমাত্র তাহার জীবন-যাত্রার মাপকাঠি উঁচু হয় নাই, প্রকৃত মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সকল প্রকার ব্যবস্থা ইহার দ্বারা হইয়াছে। আমেরিকার বীমা কোম্পানীর ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সে দেখা যায়, সে দেশের লোকের আয়ু শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা মাত্র বিগত ৪০ বৎসরের ফল। গত ২০ বৎসর শিশু-মৃত্যুর হার সেখানে শতকরা ৬০ ভাগ কমিয়াছে। ক্ষয় রোগে মৃত্যু ১৯০০ সনে যাহা ছিল আজ তাহার অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩০ সনের মধ্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপ্‌থিরিয়া রোগকে নির্ব্বাসন করিবার আয়োজন করিতেছে। আজ দেশকে উন্নত করিতে হইলে আমাদের ঐ শিল্পনীতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ

তামার কাহিনী

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইনস্, সিংভূম

তামার সঙ্গে অপরিচয় আমাদের কাহারও নেই। পূজায় তামার বাসনের ব্যবহার ও তামার পয়সা কোন্ অতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকেরাই জানেন। আমাদের পিতল কাঁসাতেও তামার ভাগ বেশী। ভারতের লোক-সংখ্যা যেমন বেশী তাতে মনে হতে পারে আমাদের দেশে অনেক পরিমাণ তামার দরকার। পৃথিবীতে বাৎসরিক প্রায় দশ লক্ষ টন তামা গালাই হয়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ১৭ হাজার টন তামার ব্যবহার। বৈদ্যুতিক কার্য্যে, এঞ্জিনে, কল-কব্জার তামা ও পিতলের ব্যবহার বেশী। আমাদের দেশে শিল্পের এখনও উন্নতি হয় নাই। সেজন্য তামার খরচ এত কম। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে তামা গালাই বন্ধ। আমাদের ব্যবহারের জন্য যে ১৭ হাজার টন তামার দরকার তা'র সমস্তই আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় ও এর মূল্য বাবদ আমাদিগকে প্রায় ১,২৫,০০,০০০৲ টাকা দিতে হয়।

বৃটিশ অধিকারের পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে তামা গালাই হ'তো তা সিংভূম জেলায় খরশোঁয়া, সরাইকেলা, ধলভূমগড় হইতে ময়ূরভঞ্জের কিনারা পর্য্যন্ত নানা জায়গা

তামা-পাথরের খাদান ও স্থানে স্থানে রাশীকৃত তামা-ময়লা তার সাক্ষ্য দেয়। ডাঃ বল তাঁর "ইকনমিক জিওলজি অব্ ইণ্ডিয়া"তে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন কালে সরাক নামে এক জাতি ছিল তারাই এ তামা গালাই করিয়াছে। তাঁর বিশ্বাস ২ হাজার বৎসর আগে সরাকরা এই তামার কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এখানকার জঙ্গলে প্রাচীন কালের তামা ময়লা এত অধিক পরিমাণে রহিয়াছে যে, বর্ত্তমানের কেপ কপার কোঃ এই পুরাতন তামা ময়লা সরবরাহের ব্যবসা করিতেছে। তামা ময়লা কংক্রীট তৈয়ারী করিবার জন্য একটী উত্তম জিনিষ। কলিকাতার পোর্ট কমিশনারেরা ডক তৈয়ারী করিবার জন্য এই তামা ময়লা কিনিতেছে।

বৃটিশ অধিকারের পর আমরা যে প্রথম তামা গালাই দেখিতে পাই তা ১৮৮৮ সনে। বেঙ্গল বারগুণ্ডা কপার কোঃ ১৮৮৮ সনে ২১৮ টন তামা গালাই করে। তারপর প্রায় ৩০ বৎসর তামা গালাই বন্ধ ছিল। রাখামাইনসের (সিংভুম) কেপ কপার কোঃ লিমিটেড্ ১৯১৮ সন হইতে ১৯২৬ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তামা গালাই করিয়াছিল। তাহারা বাৎসরিক গড়ে ৯০০ টনের উপর তামা গালাইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে আমরা দুই কোম্পানীর তামা গালাইয়ে অকৃতকার্য্যতা দেখিতে পাই। বেঙ্গল বারগুণ্ডা কপার কোঃ'র অকৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে লেখক কিছু জানেন না। কেপ কপার কোঃ'র বর্ত্তমান রিসিভার ও ম্যানেজাররা একজন বিশেষজ্ঞকে রাখামাইনসে তামা গালাইয়ে লোকসান পড়িবার কারণ অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞের মত "খাদান এ পর্য্যন্ত যা খোঁড়া হইয়াছে তাহাতে ব্লাষ্ট ফারনেসের ব্যবহারের পরিমাণানুযায়ী তামা পাথর বাহির করা যায় না। ব্লাষ্ট ফারনেস রীতিমত চালাইতে হইলে খাদান আরও খোঁড়া দরকার।" রাখামাইনস্ চল্‌তি অবস্থায় মাসের ভিতর কুড়ি দিনের বেশী কোন মাসেই ব্লাষ্ট ফারনেস চলেনি। যাহাদের রসায়নের সহিত সামান্য পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, ব্লাষ্ট ফারনেসের কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা যতদিন না খারাপ হয় চালাইতে হইবে। চল্‌তি অবস্থায় ব্লাষ্ট ফারনেসকে বন্ধ রাখা খুব ক্ষতিজনক। কেপ কপার কোঃ তামা গালাই করিবার জন্য যে তামাপাথর ব্যবহার করিত তাহাতে তামার ভাগ শতকরা গড় ৩'৫—৪'০ ছিল। কিন্তু তামাপাথরে শতকরা একভাগ তামা আছে। এরূপ পাথর হইতে তামা গালাইয়া অন্যান্য অনেক দেশ লাভবান হইতেছে।

লৌহপাথর ব্লাষ্ট ফারনেসে গালাইবার সময় তাহার সঙ্গে চুনাপাথর ও কোক্ মসলারূপে দেওয়া হয়। সেইরূপ তামা-পাথর ব্লাষ্ট-ফারনেসে গালাইবার সময়, কোক্ চুন পাথর ও উন্নত শ্রেণীর লৌহ পাথরও মসলারূপে ব্যবহার করা হয়। ব্লাষ্ট-ফারনেসে লৌহ-পাথর গালাইয়া যে লৌহ পাওয়া যায়, তাতে ঢালাই লৌহের কাজ চলে। কেপ কপার কোঃ ব্লাষ্ট-ফারনেসে তামা গালাইয়া যে জিনিষ পাইত তাহাকে কপার ম্যাট্ বলে। তাহাতে তামার ভাগ শতকরা ৫৫-৫৬। কপার ম্যাট্‌কে কনভার্টারে গালাইয়া হাওয়া সংযোগে তাহার ময়লা দূরীভূত করা হয়। কন্‌ভার্টার হইতে যে তামা পাওয়া যায় তাহা ব্লিষ্টার কপার। ব্লিষ্টার কপারে তামার ভাগ শতকরা ৯৭-৯৮ পর্য্যন্ত থাকে। ব্লিষ্টার কপারকে বিশুদ্ধ করিবার দুই রকম উপায়। (১) বৈদ্যুতিক, (২) আগ্নেয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে তামা সংশোধিত করিতে হইলে বৈদ্যুতিক শক্তি সস্তা হওয়া দরকার। বৈদ্যুতিক উপায়ে তামা বিশুদ্ধ করিলে তাহার বিশুদ্ধতা ৯৯'৯ পর্য্যন্ত হয় ও এইরূপে বিশুদ্ধ তামা অধিকতর মূল্যে বিক্রী হয়। আগ্নেয় উপায়ে বিশুদ্ধ করিতে হইলে রিভারবারেটরী ফারনেসে কাঁচা কাঠ কিংবা কাঠ-কয়লা সংযোগে পোড়াইলে তামা বিশুদ্ধ হয়। ইহার বিশুদ্ধতা ৯৯'৪'র বেশী হয় না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তামা পাথরে শতকরা এক ভাগ তামা থাকিলেও তাহা গালাইয়া লাভ হইতেছে। যেখানে ঐরূপ পাথর ব্যবহার করিতে হয় সেখানে প্রথমে ঐ পাথরকে মিলে গুঁড়াইয়া কন্‌সেনট্রেটিং টেবল্ কিংবা মিনারেল সেপারেশন প্ল্যাণ্টে উন্নত শ্রেণীর পাথরে পরিণত করা হয়। কন্‌সেন-ট্রেটিং টেবলে কিংবা মিনারেল সেপারেশন প্ল্যাণ্টে অনুন্নত শ্রেণীর পাথরকে উন্নত করিবার জন্য জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্বগুণ কার্য্যকর হয়। আমরা যেমন কুলায় জিনিষ ঝাড়িয়া এক জিনিষ হইতে আর এক

জিনিষ পৃথক করি কন্‌সেনট্রেটিং টেবলেও সেরূপ পাথরের ধাতব অংশ হইতে অধাতব অংশ পৃথক করা হয়।

মুসাবনির তামার খাদন

কেপ কপার কোঃ'র ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ জন টেলার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রায় ৭ বৎসর আগে মুসাবনিতে তামার খাদান আরম্ভ করে। মুসাবনির কোঃ'র নাম প্রথমে "করডোবা কপার কোঃ" হয়। তার তিন বৎসর পরে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনে পরিবর্ত্তিত হয়। এই বৎসরের প্রথমে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন জন টেলারের হাত হইতে অ্যাংগ্লো ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড জেনারেল ইন্‌ভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্টের হাতে গিয়াছে। এই নূতন কোঃ মুসাবনি খাদানের পাথর গালাইবার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করিতেছে। গালাইয়ের কারখানা ঘাটশিলার নিকট মহুভাণ্ডারে তৈয়ারী হইতেছে। মহুভাণ্ডার হইতে মুসাবনি প্রায় ৭ মাইল দূরে ও মধ্যে সুবর্ণরেখা নদী। মুসাবনি হইতে মহুভাণ্ডারে পাথর আনিবার জন্য এরিয়েল রোপওয়ে নির্ম্মাণ করা হইতেছে। তারে বাল্‌তি ঝুলাইয়া মাল লইয়া যাওয়া হইবে। মহুভাণ্ডারের কারখানার মালিকরা এক কোটি টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বাৎসরিক এক লক্ষ টন (মেট্রিক) তামা পাথর গালাইবে, ও তাহা হইতে বাৎসরিক ২,৮৭০ টন বিশুদ্ধ তামা পাইবে এরূপ আশা করে।

রাখামাইন্‌সে রাজদোহা কপার কোঃ ১৮৯১ সন হইতে ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত কাজ করে। কেপ কপার কোঃ ১৯০৮ সনে রাজদোহা কোঃ'র নিকট হইতে রাখামাইনসকে ২,১০,০০০ টাকায় কিনিয়া লয়। কেপ কপার কোঃ'র ১৯১৮ সনের (যখন রাখামাইনসে তামা গালাই হয়) কার্য্য-বিবরণীতে রাখামাইনসের খাদানের মূল্য ৩৮,৩২,১৫৫৵৫ ধরা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য

স্বদেশপ্রেমিক কবি অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে দিতে গান গেয়েছেন :—

"একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
তুই কিগো মা তাদের জননী ইত্যাদি।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কথা কবির কল্পনা নয়, কিন্তু সে কথা বলতে হলে অর্থনীতির শুষ্ক ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স আলোচনা না করে উপায় নাই। অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে হৃদয় ভারাক্রান্ত করবার ইচ্ছা নাই ; কিন্তু বর্ত্তমানের কঠোর সত্যকে ত উড়িয়ে দেবার উপায় নাই। অতীতের ইতিহাস যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, বর্ত্তমানের শূন্যতা ত তাদিয়ে পূর্ণ করা যায় না। বর্ত্তমানের সম্পদ্‌ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তাকেই আশ্রয় করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কথা আজ গর্ব্ব ও আনন্দের বিষয় না হলেও ভাববার কথা, বুঝবার কথা।

চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ না করে শুধু এই আফ্রিকার কথা বলবার চেষ্টা করলে দেখতে পাই যে, ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। বহুকাল হতে ভারত আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। কাথিয়াওয়ার ও গুজরাটের সন্নিকটবর্ত্তী পোর্টবন্দর হতে ভারতীয় বাণিজ্যপোত আফ্রিকার মাম্‌বাসা বন্দরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে সমগ্র আফ্রিকায় অল্পাধিক নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প ইয়োরোপীয়ানদের আগমনের বহুপূর্ব্ব হতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আজ ভারতীয়দের অপমান ও লাঞ্ছনার কথা সভ্যজগতে অবিদিত নাই, পূর্ব্ব আফ্রিকায় কেনিয়া-সমস্যা দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। ইয়োরোপীয় বণিকের অর্থলোলুপ দৃষ্টি তাদের স্বার্থের ইন্ধনে আজ বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসার সৃষ্টি করছে। আফ্রিকার আদিম

অধিবাসী আজ বিতাড়িত, নিষ্পেষিত হয়ে পশুর মত জীবন যাপন করছে, সমস্ত উর্ব্বর জমি ইয়োরোপীয়ানদের হস্তগত। কেনিয়ার মত অল্পদিনের কলোনি জগতে খুব কমই আছে। ইয়োরোপীয়ানরা নামমাত্র অর্থ ব্যয় করে প্রচুর জমি নিজেদের করায়ত্ত করে ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি করেছে। কৃষিকার্য্য দ্বারা ইয়োরোপীয়ানদের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাবার জন্য নিম্নে একটী তালিকা দিলাম :—

সন	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
দখলকারীর সংখ্যা	১১৮৩	১৩৪৬	১৩৮৬	১৪৬৬
দখলকরা জমির পরিমাণ (একর)	৩১৫৭৪৪০	৩৩৩৩১০৬	৩৮০৪১৫৮	৩৯৮৫৩৭১
কত একর চষা হয়	১৭৬২৯০	২০৬৯৫৯	২৩৪০৫৫	২৪৭৩১৯
দখলের শতকরা কত চষা	৫·৫৮%	৬·২১%	৬·১৫%	৬·৮৮%
দখলকারী প্রতি চষা জমি (একর)	১৪৯	১৫৪	১৬৯	১৮৬
অন্যান্য উপায়ে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (দখলকারী প্রতি)	৯৬১	৯৮৩	১০৪৭	১০৯২
দখলকারী প্রতি সকল উপায়ে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (একর)	১১১০	১১৩৭	১২১৬	১২৭৮

ন্যূনাধিক ৭০ লক্ষ একর উর্ব্বর উপত্যকাভূমি অর্থাৎ সমুদ্রকিনারা ৫০০ ফুট থেকে ৯০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত জমি একমাত্র ইয়োরোপীয়ানদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এশিয়াবাসীর তা পাবার অধিকার নাই। লর্ড ডালমারের নেতৃত্বে, কেনিয়ার ইয়োরোপীয়ান সম্প্রদায় সরকারকে স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে, ভারতবাসীকে উপত্যকাভূমি দিলে তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। ইংরেজ সরকার এই ঔদ্ধত্য নীরবে সহ্য করছেন।

ইংরেজ সরকার নানাপ্রকারে ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় করেছে। সত্যই উর্ব্বর উপত্যকাভূমি হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি; কিন্তু তবুও এদেশে কৃষিকাজ দ্বারা ভারতবাসী প্রচুর পরিমাণে লাভবান হতে পারে। অনেক ভারতবাসী এখানে কৃষিকাজদ্বারা লাভবান হয়েছে এবং এখনও যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। উপরোক্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কৃষিকার্য্যদ্বারা ইয়োরোপীয়ানগণ কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছে তা বোঝা যায়, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও একটা ধারণা করা যায়।

ভারতবাসীরা কি পরিমাণে কৃষিকাজ করছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে, তাদের সম্যক্ অবস্থা কি তার তালিকা দেওয়া কঠিন। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয়েরাও ইয়োরোপীয়ানদের মত কৃষিকাজের জন্য চেষ্টা করছে। নিম্নের তালিকা হতে বোঝা যেতে পারে, কোন কোন জিনিষ কি পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে। এবং এই তালিকা থেকে এ দেশের প্রধান প্রধান দ্রব্যের একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। এ তালিকা শুধু ইয়োরোপীয়ানদের সত্য, কিন্তু ভারতীয়েরাও এই সব জিনিষের জন্যই চেষ্টা করছে।

কেনিয়ায় ইয়োরোপীয়ানদের দখলে জমি

	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
দখলকরা জমির পরিমাণ (একর)	৩১৫৭৪৪০	৩৩৩৩১০৬	৩৮০৪১৫৮	৩,৯৮৫৩৭১	৪৪৪৩১৮০
দখলকারীর সংখ্যা ...	১১৮৩	১৩৪৬	১৩৮৬	১৪৬৬	১৭১৫

		১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
চষা জমির পরিমাণ	(একর)	১৪৭৫৫০	১৬৯৬৮৫	২০৫৮৯৭	২৩৮৭৬২	২৯৭৩৩৭
ভূট্টা	ঐ	৩২১০৯	৫৩৩৯৫	৭৫৪৪৪	৯৯৭৬৪	১৪১১৪৭
গম	ঐ	৪৬১৩	৭৮৫৮	১৩৬৯৬	১৫৪২৯	২০৯১০
যব	ঐ	৫৮৬	১০৯১	৯৩২	৮১৮	৭২৫
কফি	ঐ	২৭৮১৩	৩৩৮১৩	৪৩৭৫৯	৫২২৪৯	৬০০৫৪
সিসল	ঐ	৩০৬৯৮	৩১০৫০	৩৭১১৮	৩৯০২৬	৪৫৩২৩
ফ্লাক্স	ঐ	২৪১৭৪	১৪২২৭	১০২০৯	৫৮৮৯	২১৩৩
নারিকেল	ঐ	৯২৬২	১০১২০	৯৩৭৮	৮৮০৮	৮৯২৪
চিনি	ঐ	৬৯১	২৬১৬	৩৭৮৭	৪১৯৩	৫২৬৩
অন্যান্য	ঐ	১৯৬৩৬	১৯৬৩৫	২০৭৮৬	২১০০৩	১৯৩২০

কৃষিকাজের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখতে পাব ভারতীয় সম্প্রদায় এখানে জিনিং ফ্যাক্টরি স্থাপন করে লাভবান হয়েছেন। উগাণ্ডার তুলা জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। ইজিপ্টের তুলা ভিন্ন অন্য কোন তুলা এর সমকক্ষ নয়। ভারতে যেমন নানা শ্রেণীর তুলা আছে, এস্থলে প্রধানতঃ দুই প্রকার তুলা "এ, আর" ও "বি, আর" আন্তর্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১০০ পাউণ্ড বীজ-তুলা হতে ৩০ পাউণ্ড বীজবিহীন তুলা (লিণ্ট) ও ৭০ পাউণ্ড বীজ পাওয়া যায়। গুজরাট ও পঞ্জাবের উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা নানাস্থানে জিনারি স্থাপন করে, নানা স্থানে তুলা খরিদ করার কেন্দ্র স্থাপন করে তুলা থেকে বীজ পৃথক করে ঐ তুলা "প্রেস" করে, বেল করে (৪০০ পাউণ্ড এক বেল) বম্বে ও লিভারপুল বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করছে।

এ ব্যবসায় অদ্ভুত লাভ। অনেক সময় এই সব জিনারির সত্বাধিকারীরা ২০০% লাভ করে থাকেন। আজ এ ব্যবসায় এই মন্দা বাজারেও অনেকে ১০০% লাভ করছেন। লোকসান এ ব্যবসায় খুব কমই হয়। জিনারি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় মেসার্স নারাণদাস রাজারাম অ্যাণ্ড কোঃ এবং কাম্পালা জেনারেল এজেন্সী লিমিটেড, এই দুই কোম্পানী নানাস্থানে কেন্দ্রস্থাপন করে ভারতীয়দের সুনাম রক্ষা করেছেন। নারাণদাস রাজারাম অ্যাণ্ড কোঃ প্রকৃতপক্ষে বম্বের স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের ব্যবসা এবং কাম্পালা জেনারেল এজেন্সীর প্রধান অংশীদার আমেদাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ আম্বালাল সারাভাই। বম্বের আরও অনেক ব্যবসায়ীর জিনারি আছে। পাঞ্জাবেরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জিনারি স্থাপন করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

কাম্পালা মাওয়ানজা, গাবালে, জিন্জা প্রভৃতি এই যে তুলার ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র এদিকে বাংলার কোন স্থান নাই, নাম গন্ধও নাই। কোন বাঙ্গালীর নিজের জিনারি থাকা ত দূরের কথা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন বাঙ্গালী এই ব্যবসা সম্পর্কে চাকুরীতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলেও শুনি নাই। জিনারির মধ্যে ব্যবসা সম্পর্কে এত গোপনীয় কথা আছে এবং এ ব্যবসা এত লাভজনক যে, নিজের জিনারিতে কেউ অপরকে নিতে চায় না, পাছে সব শিখে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ীদের এ ভয় অমূলক নয়। দেখতে পাই আজ যারা জিনারির মালিক তাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে জিনারি-সংশ্লিষ্ট অফিসে সামান্য কাজ করতেন, পরে ধনী সংগ্রহ করে অংশীদার হয়ে ব্যবসা করছেন।

জিনারি স্থাপন করে তুলার এই ব্যবসা ব্যাপারটা কি এবং ইহাতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন একবার ভেবে দেখা যাক। মোটামুটি একটা জিনারির কথা ধরা যাক। একটা এনজিন্, ১২টা জিন্, একটা "ওপ্নার" একটা গুদাম, বাহিরে সুবিধামত স্থানে তুলা খরিদের জন্য একটি আড্ডা। সর্ব্বসমেত একলক্ষ টাকা হলে সব হয়ে যায়। এই হলো মূলধন ব্যয়। অপরের পুরাতন জিনারি কিনতে পারলে

অনেক সুবিধায়ও পাওয়া যায়। তারপর তুলা খরিদের জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য কাঁচা টাকা আর একলক্ষ পেলে অর্থাৎ মোট দুই লক্ষ টাকা হলে বেশ ভাল ভাবে ব্যবসা পত্তন করা যায়।

জিনারি বাঁধা রেখে ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা পাওয়া যায়। তুলা খরিদ ও বিক্রয়ের সময় ষ্টোরে যত তুলার "বেল থাকে তার তালিকা দিয়ে প্রচুর ওভার ড্রাফ্‌ট পাওয়া যায়। হিসাবী ব্যবসাদার হলে ঐ দুই লক্ষ টাকা দিয়ে আফ্রিকায় অন্ততঃ ৮লক্ষ টাকার ব্যবসা করিতে পারে।

পূর্ব্বে বলেছি ১০০ পাউণ্ড তুলায় ৩০ পাউণ্ড লিন্ট পাওয়া যায়। বাকী ৭০ পাউণ্ড থাকে তুলার বীজ। লিন্ট যেমন বম্বে ও লিভারপুল বাজারে বিক্রয়ের জন্য চলে যায়, তুলার বীজ শুধু ইয়োরোপে বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়। অনেক সময় ইয়োরোপীয়ান ব্যবসায়ীরা এস্থান থেকে তুলার বীজ খরিদ করে নিজেদের ব্যবসাক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন। ইয়োরোপে এই বীজ থেকে এক প্রকার তেল প্রস্তুত হয়।

এ প্রসঙ্গে গানি ব্যাগ ও হেসিয়ানের কথা উল্লেখযোগ্য। লক্ষ লক্ষ গানি ব্যাগে করে তুলার বীজ ইয়োরোপে রপ্তানি করা হয় এবং প্রচুর পরিমাণ হেসিয়ান দ্বারা তুলার বেল দেশ বিদেশে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই গানি ব্যাগ ও হেসিয়ান আসে কোথা হতে? বাংলা যে শুধু জিনারি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা নয়, বাংলার গানি ব্যাগ, বাংলার হেসিয়ান প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করা যায়। কিন্তু সমগ্র উগাণ্ডায় ১০।১২ জনের বেশী বাঙ্গালী নাই। ব্যবসায়ী একজনও আছেন বলে শুনি নাই।

কিন্তু বাংলার যুবকবৃন্দ কি করতে পারে? আজ এই কঠোর সংগ্রামের দিনে রিক্তহস্তে কিছুই করবার উপায় নাই। যেখানেই যাই দেখি ধনী দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রচুর অর্থব্যয় করে বিস্তৃত আয়োজন করে বিরাট ব্যাপার সাধন করছে। বাংলার যুবক যতই উৎসাহী ও কর্ম্মী হোক না কেন, রিক্ত হস্তে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থান লাভ করতে পারবে না।

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা, বাংলার সুনাম নির্ভর করছে বাংলার ধনীর অর্থে ও বাংলার যুবকের সামর্থ্যে। কিন্তু বাংলার জমীদারের টাকা যক্ষের ধন, তা পোতা থাকবে ঐ ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে, ব্যবসায় খাটানোর মত তার সাহস নাই। এই যে এত বড় তুলার ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা গুজরাট ও পাঞ্জাব আফ্রিকা থেকে নিয়ে যাচ্ছে বাংলা কি এর এক আনাও লাভ করতে পারত না? এই যে এত বড় একটা ব্যবসা চলছে এর সংবাদই বা রাখে ক'জন বাঙ্গালী?

বাংলার জমীদার শ্রেণী "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" আরাম শয্যায় আশ্রয় নিয়ে পার্টি ও মজলিসের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন। আজ অনেকের চাল নেই, চুলো নেই, কলকাতায় বসে কোনওরূপে আত্মসম্মান রক্ষা করছেন। বাহিরের চটকে বেশী দিন চলবে না। বাংলার জমীদার শ্রেণী আজ হয় এগিয়ে আসবে নতুবা তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। গুজরাটী, পার্শি, মাড়োয়ারী ধনকুবেরের সন্তানরা বেলা ১২টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত অফিসে কঠিন পরিশ্রম করছেন, শেয়ারের বাজার, বিনিময় বাজার, আমদানি রপ্তানির হালচাল দেখে এক একটা লেনদেনে কত অর্থ সংগ্রহ করছেন, আর বাংলার জমীদার বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা দিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে চলছেন!

কোথায় সেই বাংলার জমীদার, যে পিতার মত প্রজাকে ভালবাসত, যে বাংলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য-সম্পদকে গড়ে তুলত? আজ কোথায় সেই জমীদার শ্রেণী যারা প্রয়োজন হলে লাঠিয়াল নিয়ে বাংলার মান ইজ্জৎ বজায় রাখত? বাংলার জমীদার না জাগলে বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্যের উত্থান সুকঠিন। বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চরিত্রবান যুবকবৃন্দ আজ দুয়ারে দুয়ারে আঘাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে; কিন্তু বাংলার ধনী সম্প্রদায়ের তন্দ্রা কি ঘুচবে না? তারা কি এই গঠন-কার্য্যে যোগ দিবেন না?

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ, কাম্পালা (আফ্রিকা)

ফুটপাথের রূপান্তর

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

রূপান্তর কাকে বলে ?

মানুষ, পশু, পাখী, সব জীবের আলাদা আলাদা রূপ বা চেহারা আছে। এই চেহারা অপরিবর্ত্তনীয় নয়। সেইজন্যই এদের উন্নতি বা অবনতি হয়। যে জিনিষকে প্রকৃতি বা মানুষের কোন চেষ্টাই বদলাইতে পারে না তার উন্নতিও নাই অবনতিও নাই।

জাতির, রাষ্ট্রের, গ্রামের, শহরের, ঘর-বাড়ীর, সড়কের, ফুটপাথের কোন বিশিষ্ট ও স্পষ্ট রূপ বা চেহারা আছে কি ? যদি এগুলির উত্থান-পতন ঘটে, উন্নতি অবনতি হয়, তবেই বলিতে পারি রূপ আছে, নচেৎ নয়। রূপ-জ্ঞান হইতে রূপ-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে। আর রূপ-বিজ্ঞান হইতেছে সকলপ্রকার উন্নতির প্রথম পাঠ।

ফুটপাথের রূপ-বিজ্ঞান কোন্ পদার্থ ? ফুটপাথের চেহারা বলিতে কি বুঝিব ? (১) প্রতি ফুটপাথের—

(ক) দৈর্ঘ্য আছে,

(খ) বিস্তার আছে,

(গ) বেধ আছে।

এগুলিকে ফুট ইঞ্চি দিয়া মাপা চলে। এই মাপটাই কি রূপ-বিজ্ঞানের কাজ ? বিজ্ঞানের পক্ষে এইরূপ মাপ জোঁকের দরকার আছে বটে। তার দামও অনেক। আর-এই অঙ্ক লইয়া অনেক আলোচনা হইতে পারে। ২।১টার নমুনা—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, পরস্পরের অনুপাত কিরূপ হইবে ? কোনটাকে বাড়াইতে বা কমাইতে হইবে কি না ? আবেষ্টন ও চারিপাশের সহিত অর্থাৎ ঘরবাড়ীর সহিত কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে ? ইত্যাদি।

ফুটপাথের অঙ্ক-পর্ব্বটা একটা নিরবচ্ছিন্ন জিনিষ নয়। অন্য দশটা বিষয়ের সঙ্গে এর ঘনিষ্ট যোগ আছে। কিন্তু তবু ইহাই রূপ-বিজ্ঞানের সবটা নয়। এই অঙ্কের দিক্‌টা গোড়ার দিক্ মাত্র। শুধু এদিকে দৃষ্টি দিলে রূপ-বিজ্ঞান রূপ লইয়া উঠিবে না।

রূপ-বিজ্ঞানের প্রাণ

বস্তুতঃ, দৃষ্টিটাই হইল আসল কথা। ফুটপাথের-রূপ-বিজ্ঞান বলে, "ইঞ্চি ফুট সব নয়। ইঞ্চি ফুট ছাড়াইয়া উপাদান, উপকরণের কথা হইবে। কোন্ বিদ্যার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তা বিচার করিতে হইবে। প্রত্যেক ফুটপাথের স্বভাব, প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির পুরাপুরি খোঁজ লইতে হইবে। তারপর জানিতে হইবে উন্নতি কাকে বলে ও কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে উন্নতি হয়।"

ফর্দ্দটা বুঝিয়া দেখা দরকার। দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ ছাড়া ফুটপাথের আছে (২) একটা গতি। কোন ফুটপাথ সোজা, কোনটা বা বাঁকা। অন্য কতকগুলি হয়ত কতক সোজা কতক বাঁকা। এই সোজা-বাঁকার কথাটা ছোট কথা নয়। ইহা সমগ্র সহরকে একটা বিশিষ্ট আকার দেয়। ঘরবাড়ী ও সড়কের শ্রীছাঁদ এর উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

(৩) ফুটপাথের উপাদান, উপকরণ ইত্যাদিকে এক দিক্ দিয়া ফুটপাথের প্রাণ বলা যাইতে পারে। এ হইল ফুটপাথের মসল্লা-বিজ্ঞান। মসল্লা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে ফুটপাথের উন্নতি করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মসল্লা-বিজ্ঞানের অর্থ—ভিন্ন ভিন্ন মসল্লার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার-শক্তি; ঐ মসল্লাকে যথাকালে যথাপরিমাণে প্রয়োগ করিবার বিদ্যা; অবিরত উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর মসল্লার অনুসন্ধান ও নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

(৪) কিন্তু মসল্লা-বিজ্ঞান একাকী কার্য্যকর নয়, ইহা অন্যান্য বিদ্যার অপেক্ষা রাখে। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী ইত্যাদি সহযোগী বিদ্যার চর্চ্চা এবং প্রয়োগেরও দরকার।

(৫) ফুটপাথের স্বভাব, প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বলিয়া কিছু আছে কি? ফুটপাথের আবার স্বভাব কি? সেই স্বভাবকে জানিবারই বা উপায় কি? ফুটপাথের স্বভাব কিছু সৃষ্টিছাড়া পদার্থ নয়। প্রতি ফুটপাথের উপর বাড়ীঘর ইত্যাদি একই ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। এক এক পাড়া বা এক এক সড়কের এক এক রকম গঠন। এক এক ফুটপাথ-সংলগ্ন ঘরবাড়ীগুলি ও তাদের অধিবাসীদের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন তথ্যই যোগাড় করা হয় নাই। ফুটপাথের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি অনেকটা তাদের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। লোকজনের পথ হাঁটাহাঁটি, যান-বাহনের চলাচল ইত্যাদিও অনেকখানি কার্য্য করে।

এই পাঁচ বা ততোঽধিক দফা রূপ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত; কিন্তু এগুলিকে একত্র জোড়া দিলেই ফুটপাথের রূপটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে না। ফুটপাথের রূপটাকে বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে পারি, "ইহাতে এই দুই জিনিষ আছে।" কিন্তু ফুটপাথের সত্তাটা এর চেয়েও বড় জিনিষ। এগুলি ছাড়া তার মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যার জন্য ফুটপাথ ফুটপাথ। সেই জিনিষ হইতেছে ফুটপাথের সমগ্রতা। অর্থাৎ খণ্ড অংশগুলি জোড়া দিলেই ফুটপাথ মিলিবে না। ফুটপাথের সমগ্রতার একটা ছবি ও ধারণা মনের মধ্যে থাকা দরকার। সে ধারণা যদি থাকে তবেই ফুট-পাথের উন্নতি করা বা রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়। এক বা অন্য অংশগুলির দিকে মনোযোগ দিলে তালি দেওয়া হয় মাত্র। জোড়াতালি দিয়া কোন কিছু গড়িয়া তোলা যায় না।

এই সমগ্রতার বোধটা ফুটপাথের রূপ-বিজ্ঞানের প্রাণ। এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যতক্ষণ না হইতেছে, উচ্চ আদর্শ ও তজ্জন্য আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জাগিয়া না উঠিতেছে, ততক্ষণ বর্ত্তমান কলিকাতার ফুটপাথগুলিতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

ফুটপাথের উন্নতি

লোকে ঘোড়া গরুর বংশ-উন্নতি করিতে হইলে কি করে? ভাল ঘোড়া, ভাল গরু আর কিছু আকাশ হইতে জন্মে না। তার জন্য প্রথমতঃ চেষ্টা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ভাল ঘোড়া ইত্যাদি কাকে বলে সে বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

ফুটপাথের উন্নতির জন্যও এই দুই জিনিষের জ্ঞান ও মনোভাবের দরকার। শুধু জ্ঞান থাকিলে হয় না। তার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানুযায়ী কাজ করিবার শক্তির বা ইচ্ছা-শক্তির অভাব ঘটিলে কাজ সম্পন্ন হয় না।

মনোভাব সম্বন্ধে একটা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নানা প্রকারে মানুষের মনের মধ্যে নব ভাব জাগাইয়া তোলা যায়। যে ভাব আগে ছিল না তার আমদানি করা চলে। আর যে ভাব ক্ষতিকর তাকে দূর করিয়া দেওয়া যায়। কলিকাতাবাসীরা হয়ত এ পর্য্যন্ত ফুটপাথ সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা আলোচনা করে নাই। কিংবা তাদের চিন্তটাই প্রতিকূল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ও অন্তঃকরণ বদলাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে।

জ্ঞান বলিতে বুঝি ফুটপাথের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা। অবশ্য জ্ঞান ও সচেতনতা এক বস্তু নয়। জ্ঞানের ইতর-বিশেষ আছে। এখানে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলা যাইতে পারে।

(১) বহুলোকে ফুটপাথ লইয়া কোন প্রকার মাথা ঘামায় না। কারণ হয়ত অনেক কিছু হইতে পারে। যেমন—

(ক) অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা,

(খ) সময়াভাব,

(গ) রোগভোগ, অন্ধতা ইত্যাদি,

(ঘ) অধিকাংশ সময় দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান।

কলিকাতার অধিকাংশ লোক অজ্ঞ ও নিরক্ষর। তাদের একদম ভাবিবার শক্তিই নাই। তা ফুটপাথের কথা ভাবিবার সামর্থ্য তাদের না হইবারই কথা।

যারা সকাল বিকাল চাকুরী করে, যারা দিন মজুরি করে অথবা পেটের ধান্ধায় ২৪ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাদের সামর্থ্য থাকিলেও এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবকাশ কোথায়? এ বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া তারা যদি রুজির চিন্তা করে, ঘরে হয়ত দু'পয়সা বেশী আসিতে পারে। তা পরম লাভ।

অনেকে বৎসরের বেশীর ভাগ সময়টা বাহিরে কাটাইয়া অল্পমাত্র সময় কলিকাতার ফুটপাথের সম্পর্কে আসে। সে জন্ত ফুটপাথ লইয়া মাথা ঘামাইতে তারা কোন দরদ বোধ করে না।

অন্ধ আতুরদের ত কথাই নাই।

(২) অন্ত বহুলোক আছে তারা ফুটপাথ লইয়া মাথা ঘামায়; কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। তারা একবার মাত্র সচেতন হয়, জাগিয়া উঠে। আবার ঘুমাইয়া পড়ে। অথবা কেমন করিয়া ফুটপাথ সম্বন্ধে সকল রকম জ্ঞানলাভ করিতে হইবে ও অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, তা জানে না।

দরকার :—

(ক) কলিকাতার বর্ত্তমান ও অতীত ফুটপাথগুলি লইয়া তুলনামূলক আলোচনা করা।

(খ) বর্ত্তমান দুনিয়ার দেশ-দেশান্তরের ফুটপাথগুলি সম্বন্ধে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান লওয়া ও বিচার আলোচনা করা।

(গ) সম্ভব হইলে বিভিন্ন দেশের ফুটপাথগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করা।

(৩) অন্ত বহুলোকে ফুটপাথ লইয়া মাথা ঘামানোটা দরকার মনে করে না। এমন কি, লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করে। এদের ফুটপাথ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, একথা বলিতে পারি না। কেন না প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে কলিকাতাতে ফুটপাথে হাঁটিতে হইতেছে। প্রতিদিন কত না দুরবস্থা চোখে পড়িতেছে। তবু তারা সচেতন নয়, এবিষয়ে উদাসীন। তাদের মনের ভাবটা এইরূপ :—

"আরে ছি! ফুটপাথ আবার একটা বিষয়! তা লইয়া আবার আলোচনা! কেন, আলোচনা ও বিচার করিবার আর কি বিষয় নাই? রাজা উজীর মারিয়া শেষকালে কি না ফুটপাথ! আমরা এমন তুচ্ছ বিষয় লইয়া আলোচনা করা বা মাথা ঘামানো ছেলেমি মনে করি।"

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, "আমাদের এটা আধ্যাত্মিক দেশ। আর ফুটপাথ হইল ঘোরতর অনাধ্যাত্মিক—কি না ভৌতিক বিষয়। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পরলোকে কোন প্রকার সুবন্দোবস্তের আশা নাই। অতএব পাতি দেওয়া যাইতেছে, ফুটপাথ বিজাতীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়।" ইত্যাদি।

কিন্তু আমার মত এই, উন্নত ফুটপাথ আধ্যাত্মিকতার পক্ষে টনিকের কাজ করে। কেমন করিয়া, তা পরে বলা যাইবে। আর ফুটপাথও তুচ্ছ নয়। জাতীয় চরিত্র নির্ণয় করিবার পক্ষে ফুটপাথ একটা মস্ত জিনিষ।

এই সব লোকের এই উদাসীনতার মূলে রহিয়াছে :—

(ক) অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসন,

(খ) এই বিষয়ে শিক্ষার অভাব,

(গ) নাগরিক বুদ্ধির অভাব অথবা অস্পষ্টতা,

(ঘ) কোন বদ্ধমূল সংস্কারের প্রভাব,

(ঙ) নগর-শাসকের গোঁড়ামি ইত্যাদি।

যে চিরটা কাল জুড়িগাড়ী চাড়য়া কাটায়, তার পক্ষে ফুটপাথের কোন খোঁজ-খবর না রাখাটা অসম্ভব নয়। তাকে নিজে ফুটপাথের উপর হাঁটিতে হয় না। অথবা খুব কম হাঁটিতে হয়। সুতরাং অন্ত দশজন কষ্টে পথ হাঁটিতেছে অথবা অন্যান্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাতে তার কিছু আসে যায় না। সে ত দিব্য আরামে আছে। সে কেন ফুটপাথ লইয়া মাথা ঘামাইবে? বলা বাহুল্য, এ স্বার্থপরের মনোবৃত্তি। ইহা নাগরিক জীবনের প্রতিকূল।

বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ফুটপাথ লইয়া কোন দিন মাথা ঘামান নাই। ইহাতে হয়ত মনের আক্ষেপে বলিতে পারি "এঁরা যখন উদাসীন, তখন নগর তথা দেশের উন্নতির আর আশা কোথায়?" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ জিনিষও শিক্ষাসাপেক্ষ। যে লোক জন্মাবধি ফুটপাথকে অবহেলা করিতে শিখিয়া আসিয়াছে, সে রাতারাতি ফুটপাথের দরদী হইয়া উঠিতে পারে না।

বস্তুতঃ, অর্থশাস্ত্রের একটা প্রথম সত্য এই যে, "মানুষের রুচি জিনিষটা শিক্ষা-সাপেক্ষ।" ভাল লাগা না লাগার গতিটা ইচ্ছামত যে দিকে খুসী ফিরান যায়। চাকরকে না মারা স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, কেনাবেচায় লোককে না ঠকান ইত্যাদি বহু আদর্শ জগতের যেখানে সেখানে সুলভ

নহে। এই সব অত্যন্ত সামান্য ও অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও মানুষকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়া দিতে হয়। আর এরূপ হাজার বিষয় আছে। ফুটপাথও এইরূপ একটা বিষয়।

প্রত্যেক কলিকাতাবাসীর নাগরিক বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, একথা বলা চলে না। নাগরিক বুদ্ধি বলে, এমন কিছু করিও না যাতে অন্য দশজনের অসুবিধা বা ক্ষতি হয়। দশটা লোকের যদি উপকার হয় তবে না হয় তুমি সময় সময় নিজের একটা ক্ষতি স্বীকার করিলে কি একটা অধিকার ছাড়িয়া দিলে। নগরের যদি শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে লাভের ভাগ তুমিও পাইবে।"

স্বার্থ-বুদ্ধি কাণে ঠিক উল্টা মন্ত্র দেয়—"কি! আমার অধিকার আমি ছাড়িয়া দিব না। আমার প্রাপ্য আমি আদায় করিয়া লইব। তাতে অন্যের ক্ষতি হয় ত আমি কি করিব ?"

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষ যদি এই কথা বলে তবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ক্ষতি হইতে বাধ্য; কোন কোন ক্ষেত্রে মারামারিও হইতে পারে।

ফুটপাথের সম্পর্কে আমাদের নাগরিক বুদ্ধি হয় একেবারে নাই, নয়ত অত্যন্ত অস্পষ্ট। তার পরিচয় যেখানে সেখানে রাতদিন পাই। আমরা পথ হাঁটিতে জানি না। অযথা ভীড় করিয়া রাখি। ফুটপাথের যেখানে সেখানে যখন তখন থুথু, জল, পানের পিচ ফেলি দোতলা বা তিনতলা বাড়ীর উপর হইতে ময়লা জঞ্জাল ছুঁড়িয়া ফেলি ইত্যাদি।

বদ্ধমূল সংস্কার মাত্রই কুসংস্কার নহে। তবু তা অহিতকারী হইতে পারে। এ জগৎ ক্রমাগতই বড় হইতেছে, চারিদিকে সম্প্রসারিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাব ও কার্য্য-রাশিও বদলাইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন প্রাণের লক্ষণ। কিন্তু জড়বুদ্ধি বলে, "আমি যেখানে পৌছিয়াছি তার উপরে আর কেহ যাইতে পারে না। আমি যা করিতেছি বা আমার যা আছে, তা সর্ব্বোত্তম। আমি আর কোন পরিবর্ত্তন চাই না।"

ফুটপাথের সম্পর্কে সর্ব্বদা এই মনোভাবের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার।

সমগ্র নগরবাসী ফুটপাথের উন্নতি-বিষয়ে অবহিত না হইতে পারে। অজ্ঞতা রোগ, ও শিক্ষার অভাব, আলস্য ইত্যাদি ইত্যাদি নগরবাসীর পক্ষেও ক্ষমা-যোগ্য নয়। নগর শাসকের ত কথাই নাই। নগরের প্রতিনিধিরূপে তারা এদিকে মনোযোগ দিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। বস্তুতঃ, নগরবাসী তার নাগরিক সকল ভার প্রতিনিধির হাতে তুলিয়া দেয়। সে বলে, "আমাদের অনেকের মধ্যে তুমি যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনের সময় তুমি আমাকে বিচারক করিয়াছিলে। আর আমার কাছে তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেক যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলে। সেগুলির দিকে চাহিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি ও তোমার হাতে আমার ভার দিয়াছি। দেখিও, আমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিও।" সুতরাং প্রতিপদে নগর-শাসকের দায়িত্ব গুরুতর।

সন্তোষ সকল সুখের আকর

রূপান্তর-তত্ত্বের ভিতরের কথা হইতেছে, "বর্ত্তমানে যে রূপ দেখিতেছি, তাহাই রূপের চরম পরিণতি নয়। একে বদলাইতে হইবে। এর জায়গায় চাই আর কিছু যা আরও ভাল, আরও সুন্দর, আরও স্থায়ী ইত্যাদি।"

বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকাই হইল রূপান্তর ও উন্নতির মূলমন্ত্র। এক শ্রেণীর লোক আছে তারা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট। তাদের মনের কথা এই যে, "সন্তোষ সকল সুখের আকর। আকাঙ্ক্ষার কোন দিন নিবৃত্তি হয় না। যত আশা করা যায়, তত আশা বাড়িয়া যায়। অথচ আকাঙ্ক্ষা ও আশা না মিটিলে দুঃখের অন্ত থাকে না। সুতরাং আকাঙ্ক্ষাটাকেই গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল। আশা করিও না। যা আছ, যেখানে আছ, সন্তুষ্ট থাক। পরকালে পুরস্কারটা মিলিতেও পারে।"

এই মনের ভাব শক্তিহীনতা ও জড়তার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। যে জীবন্ত, প্রাণের আবেগে অস্থির, সে নিত্য নব বিঘ্ন-বিপদেরই সম্মুখীন হইতে চায়, জয়লাভ করিতে চায়। সে বলে, "বর্ত্তমান লইয়া আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট

থাকিতে পারি না। পরলোকের কথা পরলোকে ভাবিব। ইহলোকে এখনি সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার করতলগত হইবে না, এই ধারণাকেই আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি কাজ করিব। সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব না।"

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছে। তারা বলে, "বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়। তা জানি। চেষ্টা চরিত্র করিয়া এর যে অনেকখানি উন্নতি করা যায়, তাও স্বীকার করি। কিন্তু দরকার কি? আমাদের মতে যেমন আছ, তেমনি থাক। নগরবাসী যা চায়, তাই পাইবে। তার চাওয়ার অতিরিক্ত তাকে কিছু দিতে যাওয়া ভুল। তাতে হয়ত তার অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। অথবা তার কাজ যদি সর্ব্বদাই অন্যে করিয়া দেয়, তার নিজের নাগরিক বুদ্ধি কোনদিন উদ্বুদ্ধ হইবে না।"

এই মতবাদ লইয়া অনেক তর্ক ও ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম আলোচনার বিষয় কোন্ কোন্ কাজ করা হইবে ও কোন্ কোন্ কাজ করা হইবে না, এ দুয়ের মধ্যে সীমারেখা কি করিয়া টানা হইবে? দ্বিতীয়তঃ নগর-শাসক যে ফাঁকি দিতেছে না তা কি করিয়া বুঝা যাইবে? এমন ত হইতে পারে 'নগরবাসীর অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে' এই ছুতায় অনেক দরকারী কাজ অবহেলিত হইবে। সেখানে সদ্য প্রতীকারের কোন উপায় আছে কি?

এই দুই প্রকার মনোভাবই ফুটপাথের রূপান্তর প্রসঙ্গে পাওয়া যাইবে। ফুটপাথের উন্নতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সকল নগরবাসীর মাথায় না থাকিতে পারে। কেমন করিয়া সে উন্নতি হইবে তাও জানা না থাকিতে পারে। এমন কি, ভুল জ্ঞানও থাকিতে পারে।

কিন্তু এসব তেমন মারাত্মক নয় যেমন মারাত্মক এই ধারণা যে "কলিকাতার ফুটপাথের মত ফুটপাথ জগতে কোথাও নাই" অথবা "কলিকাতার ফুটপাথ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছে" কিংবা "কলিকাতা ফুটপাথের জন্য বর্ত্তমানে আর কোন কিছু করিবার দরকার নাই।" কিবা নগরবাসী, কিবা নগর-শাসক উভয়কে সর্ব্বদা বলিতে হইবে, "আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। আমার আশা পুরিতেছে না। এই কলিকাতা শহরে আমি আরও বহু ফুটপাথ চাই, পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর ফুটপাথ স্থায়ী ফুটপাথ চাই।" ইত্যাদি। তারপর নিরন্তর সেজন্য উদ্যোগ, পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন, মনোযোগ, বিদ্যাবুদ্ধি ইত্যাদি নিয়োগ করিতে হইবে।

রূপান্তরের দুইদিক্

ফুটপাথের রূপান্তর ঘটাইতে হইবে। আরও উন্নত ফুটপাথ চাই। এই উন্নতি দুই রকমে হইতে পারে। যেমন,—

(১) যা আছে তাকে দূর করা,

(২) যা নাই তাকে আনা।

ফুটপাথের আপদগুলি দূর করিয়া দিবার মত বস্তু। কিন্তু দূর করিয়া দেওয়াটাই আপদ নিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় নাও হইতে পারে। অথবা একেবারে দূর করিয়া দেওয়া সমীচীন বা সম্ভব না হইতে পারে।

আস্তাকুঁড়ের কথা বলিয়াছি। 'আস্তাকুঁড় উঠাইয়া দিবার দরকার নাই এই রায়ও দিয়াছি। ফুটপাথের উপর প্রস্রাবের স্থানগুলিও এই ধরণের জিনিষ। এগুলি সহিতে হয়।

কোন আপদ দূর করিয়া দিবার সময় বিবেচনা করা দরকার:—

(ক) দূর করা ছাড়া অন্য উপায় আছে কি না?

(খ) কি কি উপায় আছে?

(গ) বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে কোন্ উপায়কে শ্রেষ্ঠ মনে হইবে?

(ঘ) তা অবলম্বনের উপায় না থাকিলে কি করা হইবে? তার চেয়ে অল্প নিকৃষ্ট কোন্ উপায় আছে?

তারপর দেখিতে হইবে:—

(ক) আপদটাকে শোধিত করা যায় কি না?

(খ) পরিবর্ত্তিত করা যায় কি না?

(গ) পরিবর্দ্ধিত করা চলে কি না। ইত্যাদি।

পরিবর্ত্তিত ফুটপাথ

আপদগুলির সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দেখা দরকার আমরা ফুটপাথের উপর কি করিতে চাই।

আমরা চাই ফুটপাথে জল থাকিবে না থুথু থাকিবে না। গোবর, ময়লা, জঞ্জাল সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা দূর হইয়া যাইবে। ফুটপাথগুলি সকল সময়ে তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিবে। লোকের চলাফেরার কোন অসুবিধা হইবে না। টাকা পয়সার বা সময়ের বা স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। ফুটপাথগুলি স্থায়ী হইবে, সুনির্ম্মিত হইবে, সুগম হইবে। ভিক্ষুকের উপদ্রব দূর হইবে।

এটা হইল আপদগুলি দূর করিবার দিক্। সম্পদ্‌গুলির দিক্ হইতে যা চাই তার আলোচনা পরে হইবে। বলা বাহুল্য, এই উভয় দিক্ একত্র করিয়াই ফুটপাথগুলিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা যায়।

ফুটপাথের উপরকার জল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতা সড়কে একদিন একবেলা জল না ছিটাইলে চলে না। তাতে বিস্তর ধূলা জমিয়া ও উড়িয়া কাজের ব্যাঘাত জন্মায়। ফুটপাথগুলিও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

জল ছিটাইবার সুবন্দোবস্ত থাকিবে বই কি? বরং সমগ্র শহরকে কি উপায়ে আরও ভাল করিয়া ধৌত করা যায় তার সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর বেশ দরকার আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুব্যবস্থা থাকা দরকার যে এই জল কোথাও জমিয়া থাকিবে না, পথচারীদের নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটাইবে না।

পানের দোকান, মিঠাইয়ের দোকান, মোটর গ্যারেজ ইত্যাদির সম্মুখে জল জমিয়া থাকে বলিয়া এগুলিকে শহর তথা ফুটপাথের উপর হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে না। এগুলি থাকিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইবার বা শাসন করিবার উপায় থাকিবে।

অর্থাৎ আমি বলিতে চাই আপদের ভয়ে সম্পদ্‌কেই বিসর্জ্জন দিবার দরকার নাই। পানের দোকান, মিঠাইয়ের দোকান, মোটর গ্যারেজ ইত্যাদিকে জাতীয় সম্পদ্ বলিয়া মনে করি। এই সম্পদ্ বৃদ্ধি পাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এদের সঙ্গে যে আপদগুলি জড়াইয়া আছে, তাদের দূরীকরণটা এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নয়। দুঃসাধ্যও নয়।

আপদের শোধিত আকার

যা দূর করা যায়, তা দূর করিয়া দিতে চাই। ফুটপাথে জল থাকিবে না। যেমন করিয়া হউক যেখানে যেখানে জল জমিবার সম্ভাবনা আছে তার খোঁজ লইতে হইবে। কেমন করিয়া জমিয়াছে তাও জানিতে হইবে।

প্রত্যেক ফুটপাথ প্রতিদিন দুইবেলা ভাল করিয়া ধোওয়া দরকার। বৃষ্টির জলে বা ড্রেণের জলেই এই ধোওয়ার কাজটা শেষ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা বড় কর্ত্তব্য রহিয়াছে। জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথ ভাল করিয়া ঝাটাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এখন সকালে বিকালে মেথররা আসিয়া অনিয়মিত ভাবে ফুটপাথ ঝাট দেয় বটে কিন্তু জল ছিটানোর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। এই অবস্থার প্রতীকারস্বরূপ দরকার যে—

(১) প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবার করিয়া ফুটপাথ ধোওয়া হইবে।

(২) ফুটপাথ ধোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাট দেওয়া হইবে।

(৩) ফুটপাথের স্বভাব অনুসারে অর্থাৎ কোন্ ফুটপাথে কিরূপ লোক-চলাচল হয় তদনুসারে ব্যবস্থা হইবে কোন্ ফুটপাথে কতবার ঝাট পড়িবে।

এই ব্যবস্থার ফলস্বরূপ আশা করা যায়, ফুটপাথের উপর দাগ বা চিহ্ন থাকিবে না। জঞ্জাল ইত্যাদি ঝাট দিয়া জড় করা হইবে ও একস্থানে রাখা হইবে। জলেতে ও ধূলাতে বালিতে মিশিয়া ফুটপাথের উপর যখন তখন কাদার সৃষ্টি হইবে না। ফুটপাথ কতকটা ঠাণ্ডা থাকিবে। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা বৃষ্টির জল সম্বন্ধেও বটে।

ফুটপাথ ধোওয়ার, প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, ফুটপাথগুলি পরিষ্কৃত রাখা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণের নিত্য কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু সে কর্ত্তব্য করিতে গিয়া তাদের পথচারী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্যে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। তারা তাদের কাজ এমনভাবে করিবে যেন জনসাধারণকে তাতে যথাসম্ভব কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। জনসাধারণের কর্ত্তব্য খুব কম বাধা পায়। কিছু অসুবিধা কিছু বাধা সকলেরই সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এই বাধা অসুবিধা ইত্যাদি যাতে সর্ব্বদা খুব কম হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ—

(১) অসুবিধা ইত্যাদি যেন সব চেয়ে কম লোকে ভোগ করে।

(২) অসুবিধা ইত্যাদি যেন পরিমাণে সব চেয়ে কম হয়।

(৩) যে সময়ে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা, যেন সেই সময়টাকেই নিজ কাজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়।

ফুটপাথের উপরকার জলটা দূর করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। এ জলকে বদলাইয়া অন্য কিছু করা যায় না, কিংবা ইহা অন্য কোন কাজে লাগান যায় না। কিন্তু ফুটপাথের উপর এমন কতকগুলি আপদ সর্ব্বদাই দেখা যায় যা পরিবর্ত্তিত, বর্দ্ধিত বা শোধিত করা যায়।

ফুটপাথের উপরের মরা ইন্দুর, কুকুর ইত্যাদি কোন কাজে লাগে কি না ভাবিয়া দেখা দরকার। আপাততঃ বেমারাম-পীড়ার উৎপাদক বলিয়া এদেরকে নগদ নগদ বিদায় দেওয়াই হইল মঙ্গলকর।

কলিকাতার ফুটপাথে নিত্য অনেক গরু মহিষ হাঁটা-হাটি করিতেছে। প্রতিদিন প্রতি ফুটপাথে গোবরের পরিমাণ কম হয় না। এই গোবরটাকে রক্ষা করিয়া এবং অনেক স্থলে পরিষ্কার করিয়া প্রতিদিন বহু টাকার সার পাওয়া যাইতে পারে।

এই সারের অপচয় হওয়ায় কলিকাতা শহর দুই দিক্ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। (১) গোবর ফুটপাথগুলিকে দ্রুত নষ্ট ও ক্ষয় করিয়া দিতেছে। (২) গোবর হইতে অনেক টাকার যে সারটা পাওয়া যাইত তার কোন ব্যবহার হইতেছে না।

এখানে ওখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি এই গোবর হয়ত কিছু কিছু কাজে লাগাইতেছে—নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের জন্য প্রয়োগ করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে কেহই ব্যবসায়-বুদ্ধি খাটাইয়াছে বলিতে পারি না। না কর্পোরেশন নিজে, না কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দোকান বিশেষ।

অথচ কলিকাতার গোবর লইয়া একটা সারের ব্যবসা চালান যায়। শুধু গোবর বলিয়া নয়। আস্তাকুঁড়ের ময়লা জঞ্জাল হইতেও প্রতিদিন অনেকখানি সার তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

আস্তাকুঁড় ঘাটিয়া অনেক সময় গরিব দুঃখীরা কয়লা, ছাই, [illegible] খাবার, কলাপাতা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া যায়, দেখা গিয়াছে। কিন্তু তারা যা নেয় তা পরিমাণে অল্প। যা বাকী থাকে তা হইতে প্রচুর সার হইতে পারে। অবশ্য গরিব দুঃখীদেরও আস্তাকুঁড় ঘাঁটিতে দেওয়া উচিত নয়। স্বাস্থ্য-হানি হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু ফুটপাথের উপরকার গোবর ইত্যাদি রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। রক্ষা করা যায় কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করে। কারণ,

(১) গোবর ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লইবার কোন বন্দোবস্ত নাই।

(২) বন্দোবস্ত করিতে গেলে অনেক লোক মোতায়েন রাখিতে হইবে। অনেক খরচপত্র করিতে হইবে। একটা মাত্র জিনিষের জন্য তা সম্ভব নয়।

(৩) সম্ভব হইলেও ব্যয়ের মাত্রাটা সম্ভাবিত আয়ের চেয়ে বেশী দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

(৪) কোন্ ফুটপাথে কখন গোবর ইত্যাদি জমা হইল তার ঠিক খবর রাখা অত্যন্ত কঠিন।

(৫) আজকাল যে খুসী ফুটপাথ হইতে গোবর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে। নিবারণ করিবার কেহ নাই। কে কখন গোবর লইয়া যাইবে তার খবরদারি করা সহজ নয়।

মনে রাখিতে হইবে কলিকাতার ফুটপাথের ও সড়কের পর্ব্বত-প্রমাণ গোবরের পরিমাণকে কাজে লাগাইতে হইলে এই সব বাধা আগে অতিক্রম করিতে হইবে।

ফুটপাথের উপরে গোবর মাত্র একটা জিনিষ যা কোন না কোন কাজে লাগান যায়। এটাকে বর্দ্ধিত অর্থাৎ ভাল ভাল করিয়া যোগ করিয়া ও শোধিত করিয়া, সবখানি কাজ আদায় করা যায়। ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করিতে গেলে অপচয় হয় মাত্র।

ফুটপাথের উপরকার এই জাতীয় অন্যান্য জিনিষ হইতেছে ছেঁড়া নেকড়া বা কাগজ, মাটির ভাঁড়, কলাপাতা ইত্যাদি। রাসায়নিকের মাথা লইয়া কলিকাতা ফুটপাথের সমস্ত আপদগুলি লইয়া রীতিমত ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রয়োজন আছে। কোন্ দ্রব্যকে কিসে পরিবর্ত্তন করা যায় ও করিলে ভাল হয়, কোন্ কোন্ দ্রব্য মিলাইয়া নূতন কি

উপকারী দ্রব্য গঠন করা যায়, সে বিদ্যাতেও ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আল্‌কাত্‌রা হইতে চিনি আর ড্রেণের ময়লা হইতে মিঠাই তার সাক্ষ্য দিতেছে।

বস্তুতঃ, ফুটপাথ পরিষ্কার রাখা দরকার। কিন্তু ফুটপাথের উপরকার খড়কুটাটাকেও পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। কর্পোরেশুনের রাসায়নিক সর্ব্বদা চোখ কাণ খাড়া রাখিবে। বলিবে, "দেখি দেখি এটা কি জিনিষ। এটা ছেঁড়া কাগজ। ওটা ছেঁড়া নেকড়া। তার পরেরটা কলাপাতা। কুছ্‌পরোয়া নেই। সবগুলি মিলাইয়া ভাল কাগজ তৈয়ারী কর।" তারপর অমুকটা হইতে তমুকটা, আর তমুকটা হইতে অমুকটা, ইত্যাদি ইত্যাদি। রাসায়নিকের পরীক্ষাগারের চুল্লীর আর বিরাম নাই। দিনরাত জ্বলিতেছে।

তখন কোথায় ময়লা, আবর্জ্জনা, জঞ্জাল, কোথায় ও গোবর, কোথায় অন্য দশটা ভাঙ্গা পচা গলা জিনিষ। আলাদিনের প্রদীপ যেন কাজ করিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব বদলাইয়া যাইতেছে। যা ছিল ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক যা দেখিয়া মানুষের মনে বীভৎস রসের ও শরীরে গ্লানির সঞ্চার হইত, তাই হইয়া যাইতেছে সুন্দর, শোভন ও মঙ্গলকর। কোথাও সুগন্ধি আতর তৈয়ারী হইতেছে, কোথাও কাগজ, কোথাও আরও কত কি।

এই হইল আপদের শোধিত মূর্ত্তি। আর এটা কবি-কল্পনা নয়। বাস্তব জগতে এমনতর ঘটনা ঘটিতেছে। বিপুল কলিকাতা শহরের আপদগুলি যখন এই মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, তখনি বুঝিতে হইবে এই স্থানে বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ত এখন দুনিয়ায় মাত্র সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি। এখনো অনেক বাকী।

নূতন আইনের আবশ্যকতা

জল দিয়া ফুটপাথ ধুইয়া গেলাম। মেথর আসিয়া ঝাট দিল। ময়লা জঞ্জাল সাফ্‌ হইয়া গেল। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবর্জ্জনা ইত্যাদিকেও শোধিত করিয়া কাজে লাগান গেল। কিন্তু তারপরই হয়ত পানের দোকানে লোক পান খাইতে আসিল। পান খাইয়া ফুটপাথের উপর পিচ ফেলিল। হয়ত মিঠাই খাইয়া জল ফেলিল বা খুড়ি ভাঙ্গিল। আর কেহ বা অন্য রকমে ময়লা করিল। তার প্রতিবিধানের উপায় কি?

শুধু নগরবাসীর নাগরিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে কোন ফল পাওয়া যাইবে না। ফুটপাথের উপর কফ থুথু ফেলা, পানের পিচ ফেলা কিংবা জানালা দিয়া জঞ্জাল ছুড়িয়া দেওয়া যে অত্যন্ত অন্যায় এই জ্ঞান বহু শিক্ষিত লোকেরও নাই। আর এসব দিকে নগরবাসীকে পোক্ত করিবার মাত্র দুইটি উপায় আছে:—

(১) আইন।
(২) শিক্ষা।

কফ থুথু ইত্যাদি আমরা শাসন করিতে শিখি নাই। যখন খুসী ফুটপাথের যেখানে সেখানে হাক্‌থু' করিয়া থুথু বা কফ ফেলি। এতে প্রতি ব্যক্তিকে অসংখ্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সকলেই আর কিছু ফুটপাথের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটে না। অনেককেই থুথু, কফ, পানের পিচ আবর্জ্জনা ইত্যাদি মাড়াইয়া যাইতে হয়। তাতে যারা জুতা পায় দেয় তাদের, জুতা অপরিষ্কার হয়, রোগের বীজাণু ঘরে আসে। যারা খালি পায়ে হাঁটে তাদের আরও বেশী অনিষ্ট হয়। তারপর লম্বা কোঁচা, আলোয়ান ইত্যাদির সহিতও অনেক সময় এগুলি লাগিয়া যায়।

স্বাস্থ্য, সময় পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি যে দিক্‌ দিয়াই বিবেচনা করি এই সব জিনিষ প্রতি ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর এগুলি সম্বন্ধে ৩ প্রকার মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) এই ধরণের আপদ ও অসুবিধাগুলিকে ফুটপাথের উপর সহ্য করিতে হইবে। তা ছাড়া উপায় নাই। কারণ যত চেষ্টাই করা যাক্‌ না, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সচেতন করা সম্ভব নয়।

(২) এই আপদগুলি এমন কিছু ক্ষতিকর নয়। সকলেই ত ফুটপাথের উপর কফ-থুথু ফেলে, পানের পিচ ফেলে ও আবর্জ্জনা ছুঁড়িয়া দেয়। বরাবর এইরূপ হইয়া আসিয়াছে,

তাতে কারও কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ত শোনা যায় নাই।

(৩) এই আপদগুলিকে দূর করা যায়। দরকারও বটে। কিন্তু সেজন্য যে মনোযোগ, যত্ন, পরিশ্রম ও টাকা পয়সা খরচ করার কথা, তা নাই।

কিন্তু এই তিন বাধার একটাও অনতিক্রমণীয় নয়। পুলিশ যেমন কলিকাতা শহরের বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য একটিমাত্র অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তেমনি নূতন আইন করিয়া কফ, থুথু ইত্যাদি জিনিষকে শাসনে আনা যায়।

আইনের মূল কথাটা হইবে, "ফুটপাথের উপর কেহ কিছু ফেলিবে না।"

এই মূল নিষেধ-বাণী হইতে আর কয়েকটা বিধি-নিষেধ প্রচলিত করা যাইতে পারে। যেমন :—

(১) ফুটপাথের উপর কফ বা থুথু ফেলিও না।

(২) ফুটপাথের উপর পানের পিচ ফেলিও না।

(৩) ফুটপাথের উপর জল ফেলিও না।

(ক) দেওয়াল চুঁয়াইয়া জল পড়িলে তৎক্ষণাৎ মেরামত করিতে হইবে।

(খ) নির্দ্দিষ্ট সময়ে মোটর ধুইতে হইবে।

(গ) মিঠাই খাইয়া ফুটপাথের বাইরে হাত ধুইতে হইবে ও ভাঙ্গা খুড়ি ইত্যাদি ফুটপাথের বাইরে ফেলিতে হইবে।

(ঘ) বাড়ীর জানালা হইতে ফুটপাথের উপর জল ফেলিও না।

(৪) ছোট ছেলের মল ও সর্ব্বপ্রকার ময়লা-আবর্জ্জনা উপর হইতে ফুটপাথের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিও না।

(৫) ঐ সব জিনিষ নীচে নামিয়াও ফুটপাথের যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিও না, আস্তাকুঁড়ের মধ্যে রাখিয়া দিও।

(৬) আস্তাকুঁড় নিকটে না থাকিলে বা বহুদূরে থাকিলে কর্পোরেশনকে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করিতে বলিও।

(৭) আস্তাকুঁড় নিয়মিত পরিষ্কৃত না হইলে কর্পোরেশনকে জানাইও, ইত্যাদি।

সাধারণতঃ প্রতি পানের দোকানের সম্মুখে পানের পিচ ফেলা হয়। কফ থুথু যেখানে সেখানে ফেলা হয়। বহু বাড়ী হইতে যখন তখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ময়লা আবর্জ্জনা ফুটপাথের উপর আসিয়া পড়ে।

এগুলিকে না হয় আইন দ্বারা নিবারণ করা হইল। বলা হইল, "যে কেহ এই আইন অমান্য করিবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।" কড়া পাহাড়া বসিল। কিন্তু লোকের অভ্যাস ত সহজে দূর হইবার নয়। থুথু, পানের পিচ ইত্যাদি তারা কোথায় ফেলিবে? এগুলি আর কিছু প্রতিবার আস্তাকুঁড়ের কাছে গিয়া ফেলা সম্ভব না, উচিতও না। তবে উপায় কি?

একটা সহজ উপায় হইতেছে ফুটপাথের সংলগ্ন ছোট লম্বা লম্বা ড্রেণগুলিকে কাজে লাগান। থুথু ইত্যাদি ফুটপাথের উপর না ফেলিয়া প্রতিবার ড্রেণের উপর ফেলিয়া দেওয়া মন্দের ভাল। অন্য বন্দোবস্তও হয়ত হইতে পারে।

যেখানে সেখানে থুথু বা ময়লা ফেলার অভ্যাসটাকে সহজে দূর করা যায় না। এর জন্য রীতিমত তদ্বির ও চেষ্টার দরকার। বহু পূর্ব্ব সংস্কারের মূল ধরিয়াও উৎপাটন করিতে হইবে। মানুষের মনে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বোধ জন্মাইতে হইবে।

শিক্ষার সাহায্যে যতদিন এই বোধটা না জন্মে, ততদিন আইনকেই একমাত্র আশ্রয় জ্ঞান করিতেছি। আইন দ্বারা শুধু প্রত্যক্ষ দোষীকেই শাস্তি দেওয়া হইবে না, অন্য যারা সম্পর্কিত আছে তাদেরও শাসন করিতে হইবে। যেমন পানের দোকানের সামনে যে পিচ ফেলিতেছে, সেই শুধু দণ্ডনীয় হইবে না। এজন্য দোকানীকেও গুরুতর দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। তার দোকানের আশে পাশে কেহ পিচ না ফেলে সে জন্য তাকে দায়ী হইতে হইবে। শাস্তিটা সেও পাইবে।

ফলের চাষ—পেঁপে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ গোবিন্দপুর (২৪ পরগণা)

বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত ফল বাঙ্গালার বাহিরেও যথেষ্ট আদরণীয়, পেঁপে তাহাদের অন্যতম। বাঙ্গালার বাহিরের জমি পেঁপে চাষের পক্ষে অনুকূল কিনা সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিতেছি না। তবে পেঁপে যে ডালিম বা আঙ্গুরের ন্যায় "মেওয়া চিজ" বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

পেঁপে স্বাদু, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় ইহা নানা প্রকার ব্যাধি-নাশক। ইহা একাধারে পূজার নৈবেদ্য, রোগীর পথ্য ও সুস্থের খাদ্য। বাঙ্গালায়—অন্ততঃ আমাদের অঞ্চলে—এই মেওয়া চিজটীর উৎপাদনের জন্য কে কিরূপ যত্ন লয় এবং কিরূপে বিস্তৃত ভাবে চাষ আবাদ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ-আভাষ দিবার চেষ্টা করিব।

বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থ যেখানে আবর্জ্জনাদি ফেলিয়া দেয়, সেইখানে, ঘরের আনাচে-কানাচে অলক্ষিত ভাবে একটী বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কাহারও যত্ন-শ্রদ্ধার অপেক্ষা না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে একটী গাছ বাড়িয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ সেকারণ বলিয়া থাকেন, "পেঁপে বন্য ফল, আপনাআপনি যেখানে সেখানে জন্মিয়া থাকে, উদ্যানজাত ফলের ন্যায় ইহার চাষ আবাদ করা যায় না।" এইরূপ কথার কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে, অযত্নে, আনাচে কানাচে আবর্জ্জনাস্তূপে যে গাছটী জন্মায় সেটী যদি স্ত্রীবৃক্ষ হয় তবে বহু ফল দান করিয়া থাকে। ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, পেঁপে গাছের জন্য প্রচুর সার ও সরস, সতেজ আলগা জমির প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক লক্ষণাদির উপর দৃষ্টি রাখিয়া পেঁপে চাষের জন্য সরস দোআঁশ জমি নির্ব্বাচন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ পুরাতন গোবর সার ও পাঁক মাটির সার দিয়া উপর্যুপরি চাষ দিতে হইবে, যেন সারগুলি বেশ করিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায় এবং মাটি নরম ও আলগা হইয়া উঠে। কৃষকেরা সুকর্ষণের যেরূপ আভাষ দেয় তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, কর্ষিত জমির উপর একটী জলপূর্ণ কলসী নিক্ষেপ করিলেও কলসী ভাঙ্গিবে না। যে কৃষক এইরূপ আদর্শ সুকর্ষণের যত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে, চাষে তাহার তত সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

পেঁপে গাছে হাড়ের গুঁড়া বা বৈজ্ঞানিক সার দিতে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। বিশেষজ্ঞগণ ইহার বিশেষ বিবরণ সাধারণের গোচর করিবেন। পাঁকমাটি সদ্য এঁদোপুকুর হইতে তুলিয়া জমিতে বা গাছের গোড়ায় দিলে কোন উপকার হয় না, বরং পাঁক মাটির ঝাঁঝে গাছের অনিষ্ট হইতে পারে। পাঁক মাটি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উঠাইয়া রাখিলে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমিতে ছড়াইবার উপযুক্ত হয়। জমিতে হাল ও মই (বাসই) দিবার সময় যাহাতে জমি সমতল হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন দিকে ঢালু হইলে বৃষ্টির জলে সমস্ত জমির সারাংশ ধুইয়া ঢালু দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সে কারণ জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়।

চৈত্র মাসে প্রথম বৃষ্টিপাত হইলে পেঁপের বীজ ফেলিতে হয়। তবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের প্রথম পর্য্যন্ত ইহার গাছ লাগাইতে পারা যায়। যেখানে চৈত্র মাসে বীজ অঙ্কুরিত করাইয়া বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপে গাছ বাঁচাইয়া রাখা যায় না, সেখানে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই অর্থাৎ গ্রীষ্মশেষে ইহার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য।

দুই প্রকারে পেঁপের বীজ বপন করা যায়। প্রথমতঃ, বেগুণ বা কপির মত হাপরে (স্থানে স্থানে "তলা" ও "খোলা" বলে) বীজ ফেলিয়া পরে গাছগুলি ৪।৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে হাপর হইতে তুলিয়া জমিতে রোপণ করা (ট্রানস্-প্লানটেশন)। দ্বিতীয়তঃ, একেবারে জমিতে ৪হাত অন্তর "মাদা" কাটিয়া তাহাতে দুটী করিয়া বীজ বপন। চারা বাহির করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজনীয়। মাদায়

বা হাপরে যেন জলাভাব না ঘটে অথচ অতিরিক্ত জল ঢালিয়া প্লাবিত করা না হয়। হাপর বা মাদাগুলি সর্ব্বদা যেন রৌদ্রতাপে শুকাইয়া না উঠে অথচ সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রাখিয়া রবিকিরণে বঞ্চিত করা না হয়।

গাছ বাহির হইলে ভেক, ঝিল্লী বা অন্যান্য পোকা মাকড়ে চারাগুলি কাটিয়া নষ্ট করিতে থাকে। সেই সময় হাপর ও মাদাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করার বিশেষ প্রয়োজন। মাদার প্রতি গাছের গোড়ায় ৯ ইঞ্চি লম্বা খেঁজুর পাতার (ডাঁটা সমেত) টুকরা পুতিয়া দিলে প্রায়ই ভেক ও পোকা মাকড়ে কাটিতে পারে না। চারাগুলি সতেজ হইয়া উঠিবার সময় মধ্যে মধ্যে জমির আগাছাগুলি নিড়াইয়া দিতে হয় এবং কোদালি দিয়া অল্প কোপাইয়া মাটি আলগা রাখিতে হয়। জমি অত্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছে দেখিলে মাঝে মাঝে জলসেচ দিতে হইবে। পরে গাছগুলি বাড়িতে থাকিলে চারিদিকের অল্প মাটি চাঁচিয়া লইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। পেঁপে গাছের শিকড় মাটির বহু নিম্নে যাইতে পারে না। সেজন্য গোড়ায় মাটি জমা করিয়া না দিলে রৌদ্রতাপ অসহ্য হওয়ায় গাছগুলি শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতে পারে না।

এইরূপ সার মাটি ও চাষ দিয়া যদি চৈত্র মাসে গাছ লাগান যায় তাহা হইলে সেই গাছ আশ্বিনের শেষেই মুকুলিত হইবে। পুষ্পগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া একটী পেঁপে পাকিয়া উঠিতে ছয় মাস সময় লাগে। এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত গাছ লাগাইলেও এক বৎসরে ফল পাইবার আশা থাকে। ইহার পর লাগাইলে গাছগুলি সেবৎসর পুষ্পিত হইতে না পারায় ফলদান করিতে পারে না।

এইখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, স্ত্রী পুরুষ ভেদে পেঁপে গাছ দুই প্রকার। যথেষ্ট যত্ন ও সতর্কতা সত্ত্বেও অধিকংশ বৃক্ষ পুং পুষ্প ধারণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। পুং পুষ্প ফল জন্মায় না। প্রত্যেক পত্রসঙ্গম হইতে পুং পুষ্প দন্তের আকারে বাহির হইয়া প্রতি শাখা প্রশাখায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। স্ত্রী পুষ্প আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। পত্রসঙ্গম হইতে অসংলগ্ন ভাবে বাহির হইয়া প্রতি বৃন্তে একটী হইতে ৩টী ৪টী ফল ধারণ করে। যথেষ্ট যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ পুংবৃক্ষ জন্মায়, ইহাই পেঁপে চাষের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ, এবং কিরূপে সবগুলিই স্ত্রীবৃক্ষ উৎপাদন করা যায়, ইহাই গুরুতর সমস্যা। এ সম্বন্ধে নানা কৃষকের নানা মত। (১) কেহ বীজ রাখিবার সময় কতিপয় নিয়ম পালন করিতে বলে, যথা গাছের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও বৃহত্তম ফলটী পাকিলে তাহার বোঁটার মাঝখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাঁশ চিরিবার মত না কাটিয়া, ফলটীর মধ্যদেশে বলিদানের মত আধাআধি দুইভাগ করিয়া বোঁটার দিকের অংশ পরিত্যাগ করিবে এবং পশ্চাৎদিকের অংশের বীজের মধ্যে যে কয়টী বীজ অধিকাংশ পুষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ তাহাই বাছিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপ বীজ হইতে উদ্গত গাছ সমস্ত ফলবান হওয়া সম্ভব। (২) কেহ বীজবপনকালীন তিথিবিচারের উপর লক্ষ্য রাখিতে বলে। তাহাদের মতে কৃষ্ণপক্ষের তিথি এবং অমাবস্যায় বীজ ফেলিলে সমস্তই স্ত্রীবৃক্ষ হওয়া সম্ভব। (৩) কেহ কেহ বলে, "হাপর" হইতে গাছ তুলিয়া জমিতে বপন করিবার সময় হাপরে চারাটী যে অবস্থায় থাকে জমিতেও যেন সেই অবস্থায় রাখা হয়। অর্থাৎ হাপরে ইহার যে পাতাটী পূর্ব্বদিকে থাকে, বপন (ট্রান্সপ্ল্যান্টেশুন্) কালেও যেন সেই পাতাটী পূর্ব্বদিকে থাকে। এবং অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাই নাকি পুনর্ব্বপনের প্রকৃষ্ট সময়। (৪) আবার কাহার কাহারও মতে পেঁপে চাষ করিতে হইলে, পুংবৃক্ষ (কৃষকেরা "আড়া" গাছ বলে) হইবেই। ইহার কোনরূপ প্রতিকার নাই। ঘন সন্নিবেশে বীজ বপন এবং পুষ্পোদ্গম হইলে "আড়া" গাছটীর ডগা কাটিয়া দেওয়াই ইহার একমাত্র ব্যবস্থা। এইরূপে মুণ্ডিত বৃক্ষ পুনরায় গজাইলে ফলবান গাছ হইতে-পারে।* কিন্তু দ্বিতীয়বার গজাইবার পরেও যদি "আড়া" ফুল হয়, তাহা হইলে তাহার মূলোৎপাটন করিয়া দেওয়া দরকার। পেঁপে-ভক্তগণ নিয়মগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

* প্রায় পঞ্চাশটি পুংবৃক্ষের ডগা কাটিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে একটি পুংবৃক্ষ গজাইয়া স্ত্রীপুষ্প ধারণ করিয়াছে। তাহাতে যথেষ্ট ফল ফলিতেছে।—লেখক।

পেঁপে বারমেসে ফল। বৎসরের যে কোন সময়ে পেঁপে পাওয়া যায়। তবে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ইহার আমদানি কম। সেজন্য এই তিন মাসে পেঁপে যথেষ্ট উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। অন্যান্য সময় পেঁপের বাজার বেশ মন্দা থাকে। কিন্তু চতুর কৃষকেরা চৈত্রমাসে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও হিন্দুর অন্যান্য পূজা পার্ব্বণের সময় এবং মুসলমানের "রোজার" সময় সহজ ও কৃত্রিম উপায়ে পেঁপে পাকাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। কৃত্রিম উপায়ে পাকাইতে হইলে পুষ্ট পেঁপে গাছ হইতে পাড়িয়া ১ দিন ঘরে রাখিয়া দিবে। পরদিন একটি বড় মাটির জালার মধ্যে পুরিয়া একটি ভাঙ্গা সরা দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ ছিদ্রবিশিষ্ট ভাঙ্গা সরার উপর পল বা খড় রাখিয়া অগ্নি-সংযোগে ধুমোৎপাদন করিবে। উত্তপ্ত ধুম জালার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখটি একদম বন্ধ করিয়া একদিন রাখিবে। তাহা হইলে পেঁপে পাকিয়া উঠিবে, কিন্তু পেঁপে পুষ্ট না হইলে আদৌ পাকিবে না বরং পচিয়া যাইবে। কোন কারণ বশতঃ অপুষ্ট পেঁপে পাড়িতে হইলে, কাঁচা বিক্রয় করাই ভাল।

পরিমাণমত সার প্রয়োগ করিয়া, সুকর্ষণ, জলসেচ ইত্যাদির দ্বারা জমি সরস ও আলগা রাখিলে প্রতি গাছে ৫০টা হইতে ১০০টা বা আরও অধিক ফল পাইবার সম্ভাবনা। একটি গাছ হইতে ২০৲ টাকার পেঁপে বিক্রয় করিতে শুনিয়াছি। বৎসরের অন্যান্য সময়ের ন্যায় আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত পেঁপে বিক্রয় করিতে পারিলে আরো লাভ হইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি পুষ্প হইতে নির্গত হইয়া পেঁপে পাকিতে ছয়মাস সময় লাগে। সুতরাং আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সমান রূপে ফল পাইতে হইলে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের ফুল ও তন্নির্গত ফলগুলি রক্ষা করা দরকার। উদ্যানে ফুলের গাছের চতুর্দ্দিকে আইল বাঁধিয়া প্রতিদিন যেরূপ জল দিবার নিয়ম আছে, পেঁপে গাছেও প্রতিদিন সেই-রূপ জল দিবার ব্যবস্থা করিলে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের ফলগুলি রক্ষা করিতে পারা যায়।

পেঁপে অতি লাভজনক চাষ। চারিহাত অন্তর গাছ লাগাইলে একবিঘা জমিতে ৪০০টি গাছ জন্মিবে। তাহার মধ্যে, ১৫০ গাছ ফলোৎপাদনের অনুপযুক্ত মনে করিয়া বাদ দিলেও অবশিষ্ট ২৫০ শতের প্রতিবৃক্ষে ২০৲ টাকার স্থলে ৪৲ টাকার ফল পাইলে একবিঘা জমিতে এক সহস্র টাকার ফল পাওয়া যাইবে। একবিঘা জমির চাষে ২৫০৲ টাকা ব্যয় ধরিলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। আমার বিশ্বাস চাষের জন্য প্রতিবিঘায় ৫০০৲ টাকা বৎসরে ব্যয় করিলেও ক্ষতির ভয় নাই।

পেঁপে গাছ ২০ ফুট হইতে ৪০ ফুট লম্বা হয় এবং ৩ হইতে ৫ বৎসর ফল প্রদান করে। এতদঞ্চলে "দেশী" ও "বোম্বাই" দুইপ্রকার পেঁপে ফল হয়। "দেশী" পেঁপে বেঁটে ও গোল এবং "বোম্বাই" পেঁপে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং লম্বা। কোন জমিতে কেবলমাত্র পেঁপে করিতে দেখি নাই। সাধারণতঃ জমির আইলের চতুর্দ্দিকে পেঁপে গাছ দিয়া মধ্যে সময় মত বিবিধ ফসলের চাষ করে। "সিঙ্গাপুর," "রাঙ্কুসে" প্রভৃতি পেঁপের পক্ষেও এদিককার জমি অনুপযুক্ত নহে। উৎসাহী ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান তেল-কোম্পানী

নবীন দুনিয়ায় তেল এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। এক হিসাবে তেলের জোরে দুনিয়াটা চলে। এক মুহূর্ত্ত তেল না হইলে আজকালকার লোক চোখে ধাঁধা দেখে। কয়লার ব্যবহার দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। তেল কয়লার স্থান দখল করিয়া বসিতেছে। বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ কাজ তেলের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। লর্ড কার্জ্জন মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তেলের সমুদ্রের উপর দিয়া মিত্রশক্তি জয়লাভ করিয়াছেন।"

বর্ত্তমান সভ্যজগতের প্রধান যান মোটর গাড়ীর এক-মাত্র খোরাক পেট্রোলিয়াম তেল। আজকাল এরোপ্লেন

বা আকাশযানের চলন হইয়াছে। অনেকে আশা করেন, ভবিষ্যতে জল ও স্থলপথে চালিত বড় বড় জাহাজ ষ্টীমার, রেলগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের স্থান এরোপ্লেন দখল করিয়া বসিবে। কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যেই যাত্রী এরোপ্লেন ব্যবহার করা হইতেছে। অনেক সভ্য দেশেই এরোপ্লেনের সাহায্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন কি আমাদের ভারতবর্ষেও ব্যোমযান দ্বারা দ্রুত ডাক বিলির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এরোপ্লেন প্রচলনের ফলে মানব-সভ্যতার বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিতে চলিয়াছে। এহেন এরোপ্লেনের প্রাণ পেট্রোলিয়াম তেল। এই তেল-সম্পদ্ যে দেশের আছে, সেই দেশকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। শুধু সৈন্য-সামন্ত, গোলা-বারুদ, রসদ প্রভৃতি লাট বহর আজকালকার যুদ্ধজয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তেল না হইলে এ সকলই মূল্যহীন। আমাদের দেশের রাস্তা ঘাটে বি, ও, সি, এই তিনটি অক্ষরের ছাপ মারা প্লাকার্ড প্রায়ই নজরে পড়ে। এর পুরা নাম হইতেছে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী। গোটা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য ভূখণ্ডে এই কোম্পানী তেল সরবরাহ করে। ইহা খাস ইংরেজ কোম্পানী। ভারতবাসীর এতটুকু স্বত্ব ইহাতে নাই। কলিকাতা ও মফঃস্বলের সড়কে যত মোটর গাড়ী চলে তাহার তেল যোগায় বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী। আজ ইংরেজের অন্যতম বিপুল কীর্ত্তি অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর একটু পরিচয় দিব। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ এই অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী সব চাইতে বড় তেলের ব্যবসায়ী। পারস্য দেশে ইহার আড্ডা হইলেও পারস্যবাসীর আধলা পয়সাটি ইহাতে নাই। এই বিরাট কারবার সম্পূর্ণ ইংরেজের সম্পত্তি। এই তৈল-সমুদ্রের একমাত্র মালিক ইংরেজ।

লণ্ডনের এক বিখ্যাত খবরের কাগজে শ্রীযুক্ত পার্সিভ্যাল ল্যাণ্ডন নামক এক ইংরেজ লিখিয়াছিলেন,—"পারস্যের তেলের খনির মুখ হইতে আরবের আবাদান দ্বীপপর্য্যন্ত ১৪৫ মাইল লম্বা নিয়ত-প্রবাহিত যে কাল তেলের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে তাহাই একদিন আমাদের ধরার বুকে বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র খোরাক হইবে।" একথা সম্পূর্ণ সত্য। বৃটিশের গোটা প্রাচ্য জমীদারি তাঁবে রাখিবার অন্যতম সহায়ক ঐ অ্যাংলো পার্শিয়ান কোম্পানী। আজ ভারতবাসীর ঐ কোম্পানীর কারবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই কোম্পানীর জন্মদাতা হইতেছেন শ্রীযুক্ত উইলিয়ম নক্স ডার্সি। ইনি ছিলেন খাস বিলাতের লোক। ইহার পিতা একজন সলিসিটর ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার নয়া উপনিবেশের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সচ্ছলতা ইহাদিগকে উক্ত ভূখণ্ডে আকৃষ্ট করে। ইঁহারা সপরিবারে অষ্ট্রেলিয়ায় উঠিয়া আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ডার্সির পিতার একজন মক্কেল স্যাণ্ডি মর্গান ডার্সিকে একদিন অষ্ট্রেলিয়ায় কুইনস্ল্যাণ্ডের এক পাহাড়ে লইয়া যান। তিনি ডার্সিকে বলেন, ঐ পাহাড়ের নীচে সোনার খনি আছে। তখন হইতে তাঁহারা ঐ সোনা তোলার কাজে লাগিয়া যান এবং প্রভূত খনিজ-সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া কোটিপতি হইয়া বসেন। ঐ খনি দুনিয়ায় সুপ্রসিদ্ধ "মাউন্ট মর্গান গোল্ড মাইন" নামে পরিচিত।

ডার্সির আরও অনেক দুরাশা ছিল। তিনি অন্যের ন্যায় কোটিপতি সাজিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তখন দেখিলেন তেলের বাজারের একটা নাম ডাক পড়িয়া গিয়াছে। তেলের তখন খুব চাহিদা এবং ইহার দামও খুব চড়া। এই সময় কিতাবজি বলিয়া একজন পারস্যবাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। কিতাবজি তাঁহার দেশের উত্তর ভূখণ্ডের খনিজ সম্পদের গল্প তাঁহার নিকট করিতেন এবং সেই অফুরন্ত তেলের ভাঁটি উদ্ঘাটনের ব্যর্থ প্রয়াসের কথাও তাঁহাকে বলিতেন।

ডার্সির খেয়াল সেই হইতে পারস্যমুখী হইল। তিনি এইচ, টি, বার্ল'স নামক একজন ভূ-তত্ত্ববিদ্কে পারস্যের ঐ অঞ্চল জরিপ করিতে পাঠান। বাগ্দাদের উত্তরে অবস্থিত ইরাক, পারস্য সীমান্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ড তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটা আশা-জনক রিপোর্ট পেশ করেন।

ডার্সি রিপোর্ট পড়িয়া খুব আশান্বিত হন এবং তদানীন্তন পারস্য সম্রাটের নিকট তৈল-শিল্প-কারখানা খুলিবার বাসনা জানাইয়া এক দরখাস্ত পেশ করেন।

১৯০১ সনে পারস্যের শাহ কাস্পিয়ান হ্রদের ধার দিয়া অবস্থিত রুশিয়া-প্রভাবান্বিত ৫টা প্রদেশ ছাড়া গোটা পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম অ্যাস্ফল্ট প্রভৃতি আহরণ করিবার অধিকার প্রদান করেন। এই কন্‌সেশ্যান বা সুবিধার মিয়াদ ৬০ বছরের জন্য করা হয় এবং পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপী ইহার চৌহদ্দী দেওয়া হয়।

প্রথম দুই তিন বৎসর ডার্সি নিজের তহবিল হইতে তিন লক্ষ পাউণ্ড ঢালেন। ইহার দ্বারা মাত্র ২টা তেলের কূপ খনন করা হয়।

১৯০৪ সনে বৃটিশ নৌবিভাগ এই সম্বন্ধে ভালরূপ ওয়াকিবহাল হইবার নিমিত্ত পারস্যে এক কমিশন প্রেরণ করেন। এই কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, ডার্সির এই প্রচেষ্টায় বৃটিশের যথেষ্ট সাহায্য করা প্রয়োজন। লর্ড ষ্ট্রাথকোনা এবং বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী ডার্সির সাহায্যার্থ অগ্রসর হন।

১৯০৫ সনে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর টাকায় পারস্যের তৈল-ভাণ্ডার লুণ্ঠনের জন্য ভালরকম আয়োজন করা হয় এবং এজন্য একটি কন্‌সেশ্যান সিণ্ডিকেট কায়েম করা হয়।

১৯০৮ সনে কিন্তু ঐ কন্‌সেশ্যান সিণ্ডিকেটের পুঁজি নিঃশেষ হইয়া আসে। ডার্সি খুব মনমরা হইয়া পড়েন। অনেকেই বিফলতা দেখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, পারস্যের বালিতে টাকা ঢালা আর জলে টাকা ফেলিয়া দেওয়া একই কথা। পারস্যের তেলের ভাঁটি উদ্ঘাটন প্রচেষ্টায় আর টাকা ঢালা নেহাৎ বেকুবি হইবে। বিলাত হইতে কাজ বন্ধ করিবার হুকুমনামা আসে। ইহার মধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া যায়। ১৯০৮ সনের ২৬শে মে হঠাৎ তেলের ডেরিকে এক বিপুল শক্তিশালী প্রস্রবণ ভূঁই ফুড়িয়া বহু উচ্চে আকাশের দিকে ভীম বেগে ছুটিয়া যায়। এ যেন আগ্নেয় গিরির প্রস্রবণ। নায়াগ্রার প্রপাতের জল ধারার মত বেগ ছিল ঐ তেলের ফোয়ারার। এতদিনে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হইল। এই প্রস্রবণ পারশ্যের তৈল খনির অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান বলিয়া দিল।

ঠিক এক বৎসর পরে ১৯০৯ সনে অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী নাম দিয়া বিশ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে এক কোম্পানী খাড়া করা হয়। ১৯১২ সনে ঐ মূলধন ২৯,০০,০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। লর্ড ষ্ট্রাথকোনাকে প্রথম চেয়্যারম্যান করা হয়।

আজ ইহা এক অতি বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইহার কারবার। কত বড় ইহার চৌহদ্দি! ইংরেজের এক অভিনব কীর্ত্তি এই অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী। বর্ত্তমান চেয়ারম্যান স্যর চার্লস গ্রিনওয়ের বর্ণনায় এই কোম্পানীর বর্ত্তমান বিপুল বিস্তৃত একটা পরিচয় আমরা পাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে স্যর চার্লস গ্রিনওয়ে শেয়ার হোল্ডারদের এক সভায় বলিয়াছিলেন, "আমাদের বর্ত্তমানে ৭০০ মাইল তেলের পাইপ আছে। ইহা অধিকাংশই দশ ইঞ্চির বেশী চওড়া। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ১৫১০ টী ষ্টোরেজ ট্যাঙ্ক আছে। এ ছাড়া ৩৮২টী বয়লার এবং ৩১টী বয়লার হাউস রয়েছে। স্থানীয় নেটিভ কর্ম্মচারী ও কুলিদের জন্য ৪,২৩৯টী বাসগৃহ ও বাংলা আছে। এগুলি ৬৯টি দালানের সারিতে অবস্থিত। ইহা ছাড়াও ছোট বড় নানা ধরণের এক হাজারের বেশী পাকা বাড়ী দালান কোঠা আছে। আমাদের মাল সরবরাহ বিভাগের অধীনে ৬৮৫টি বাল্ক-অয়েল ইন্‌ষ্টলেশন আছে। ইহাদের মধ্যে ৪৮টি ওশেন-ইন্‌ষ্টলেশন অর্থাৎ দুনিয়ার বিভিন্ন বন্দরে স্থাপিত তেলের ভাঁটি এবং আরও ১০৮টি তেলের ছোট ভাঁটি আছে। আমাদের তেলের কারখানায় ও কারবারে ৫০ হাজার লোক খাটে। ইহাদের অর্দ্ধেকের কম অর্থাৎ ২০৫০০ হচ্ছে আমাদের জাতভাই খাস বিলাতী। আমাদের মালপত্র রপ্তানি করার কাজের ও কারখানার কাজের সুবিধার জন্য ১৬৪ মাইল রেললাইন ও নিজেদের গাড়ী আছে। ইহাও যথেষ্ট নহে। পথ ঘাট, রাস্তা সড়কের উপর দিয়া আমাদের ১,৮৪৭ খানি মোটর লরি ও ট্রাক্টর চলে। এ ছাড়া ট্যাঙ্ক কার বা তেল পুকুরের গাড়ী অহরহ চলছে। ঘোড়া খচ্চরের টানা গাড়ীও আছে ঢের। আমাদের জাহাজের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩৩১। নানা ধরণের জাহাজ ষ্টীমার মোতায়েন আছে। মাল রপ্তানির জন্য ইহার সবগুলিই কাজে খাটান হয়। ইহার মধ্যে ৬৭টি ট্যাঙ্ক বা পুষ্করিণী আছে।

এ সবই এই ৮ বৎসরের মধ্যে তৈয়ারী। আর এই সব জাহাজে মালপত্র তোলা নামা করার জন্য আমাদের ৮৯টি জেটী এবং হোয়ার্ফ আছে।

খাদ হইতে তেল বাহির করা, তেল পরিষ্কার করা তৈল পুষ্করিণীতে তেল মজুত করার বিভিন্ন রকমের বিরাট বিরাট বিভাগ চলিতেছে। আবার এই তেল দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের দুয়ারে হাজির করবার জন্য কোম্পানীর তরফ থেকে হাজার হাজার একর জমি গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে খরিদ করা হইয়াছে।

বুঝুন একবার ব্যাপারটা। ইহাও আবার দুই বৎসর আগেকার কথা। আজকাল আবার এর চাইতেও পাল্লা ভারি। দুই বৎসর আগের চাইতে ঢের ঢের বেশী ব্যবসার বহর বাড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পারশ্যে হইতেছে এই তেলের আড্ডা। সেখানে না গেলে অবস্থা ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন।

পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সমতল ভূমির উপর তেলের নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ বছর আগে সেখানে ছাগল ভেড়া চরিত বা মাঝে মাঝে অগ্নি-পূজকদের মন্দিরের ভগ্নাংশ চোখে পড়িত, আজ সেই সমস্ত স্থানে অয়েল-ব্যারাক বা তেলের ভাঁটির উচ্চ চূড়া পথিকের দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল তৈল-প্রদেশে শত শত মাইল পাকা রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মোটর লরী ও মোটর গাড়ীতে উপত্যকা ছাইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা মাল-পত্র-বোঝাই গাড়ী রাস্তাঘাটে চলিতেছে।

আবাদান বন্দর ও পার্শিয়ান গালফের মোহানায় মাল-পত্র বোঝাই তৈল-তরণী সদা মোতায়েন আছে।

মসজিদ-ই-সুলেমান, যাহা একদিন অনুর্ব্বর ভূমি ছিল, তাহা একটা সমৃদ্ধিশালী বহুজনপূর্ণ সদাকর্ম্মময় তেলের শহরে পরিণত হইয়াছে। এখান হইতে পারস্য উপসাগরের মোহানা পর্য্যন্ত ১৪৫ মাইলের তৈল নদীর স্রোত পাইপের মধ্য দিয়া অশ্রান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।

আবাদান বন্দরে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম রিফাইনারী (তৈল পরিষ্কারের কল) স্থাপন করা হইয়াছে এবং ইহার আশ-পাশ দিয়া দশ হাজার লোকের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কোম্পানীর অধীনে হাজারের উপর উপরওয়ালা ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী খাটে এবং ৩০ হাজারের উপর নিযুক্ত নিম্নকর্ম্মচারী ও কুলি মুজুর পারশ্যের অধিবাসী। দেশটার সকল তৈল-সম্পদের লাভ ইংরেজের ট্যাঁকে যাইতেছে।

১৯১৩-১৪ সনে অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী ২৩৩৯৬২ টন তেল উৎপন্ন করে।

১৯২৬ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনে ঐ সংখ্যা ৪,৫৫৬,১৫৭ টন দাঁড়াইয়াছে। কি অভাবনীয় তৈল-সম্পদের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছে ইংরেজ। ইংরেজ তার অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে পারশ্যের বালুকাভূমিতে।

(সাহিত্যিক)

বাঙ্গালী মোসলমানের অন্ন-সমস্যা*

আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অন্নসমস্যার আলোচনায় বিশ বৎসর কাটাইলাম। আপনারা আজ আবার আমার নিকট হইতে ঐ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চান। আপনারা বাঙ্গালার মোসলমান; কিন্তু এই বিষয়ে আপনাদিগকে আমি কোনমতেই বাঙ্গালী হিন্দুর অনুকরণ বা অনুসরণ করিবার উপদেশ দিব না। আমি আপনাদিগকে বোম্বাই, করাচী ও দিল্লীর বোরা, নাখোদা, মেমন, খোজা প্রভৃতি ব্যবসায়ী মোসলমান সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিবারই উপদেশ দিব। গত বৎসর আমি ইংলণ্ড

* বিগত নিখিল-বঙ্গ মোসলেম যুবক সম্মিলনীর বর্দ্ধমান অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক লিখিত শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট।

ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়াছি। বোম্বাই বন্দরে এক ভাটিয়া আমাকে বলিলেন, আপনি ঐ যে জাহাজটা দেখিতেছেন, ওটা ১৫০০০ টনের। এখানকার খোজা ধনী ব্যবসায়ি-গণের ঐরূপ অনেক জাহাজ দেশ-বিদেশে মাল আমদানি-রপ্তানির কাজে খাটে। স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা স্যর কজলভায় করিমভায়ের পুত্র। সেবার তিনি ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ইঁহারা লাখ-পতি, কোটি-পতি, মিলিঅনেয়ার, মাল্টিমিলিঅনেয়ার। এ রকম অনেক আছে বোম্বাইয়ের মোসলমান সমাজে। ইঁহাদের অনেকে জাপান হইতে সিল্ক আমদানির কাজে ও বিদেশে তুলা রপ্তানির কাজে নিযুক্ত আছেন। তোকিও, ওসাকা, হংকং, মার্সাই প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দরের স্বতন্ত্র হিসাবের খাতা আছে ইঁহাদেরই দপ্তরে। বোম্বাই আর কলিকাতার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বোম্বাইয়ের সব চাইতে মনোরম স্থান মালাবার হিল বা এলিফ্যান্টা অঞ্চলে যত বাড়ী সব দেশী লোকের—এই বোরা, খোজা মেমন, পার্শী প্রভৃতি ব্যবসায়িগণের। ইংরেজের সেখানে এতটুকু প্রতিপত্তি নাই। আর কলিকাতার অঞ্চল চৌরঙ্গী—ওটা সমস্ত সাহেবদের একচেটে। বাঙ্গালায় বাবু মানে যাহারা কেরাণী। আমাদের কেরাণীগিরিই একমাত্র ভরসা। সেই সুদূর বোম্বাই অঞ্চলের কচ্ছ-মেমন, বিদেশী রেলীব্রাদার্স এই মগরাহাট হইতে ১০।২০।২৫ লক্ষ টাকার চাউল রপ্তানির কাজে নিযুক্ত আছে। মোসলমানরা বাস্তবিকই ব্যবসায়ী জাতি। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী মোসলমান নয়। কলিকাতায় মোসলমানদের যত বড় বড় কারবার আছে, সবগুলিই পশ্চিমা মোসলমানদের হাতে। সেই কলুটোলা থেকে ক্যানিংষ্ট্রীট, মুর্গিহাটা অঞ্চল—সব দিল্লীওয়ালা মোসলমানদের এক্তিয়ারে। পশ্চিমারাই বাঙ্গালা দেশটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমি এক সভায় বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালায় বৃটিশ অধিকার যত না ক্ষতি করিয়াছে, তার চাইতে ঢের ঢের গুণ বেশী ক্ষতি করিয়াছে মাড়োয়ারীর ইকনমিক কঙ্কোয়েষ্টে—আর্থিক বিজয়ে।

সেবার আসামের তেজপুর কন্‌ফারেন্সে গিয়াছিলাম। সেখানে পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর প্রতিপত্তি! মাড়োয়ারীরা সেখানকার ব্যাঙ্কার। এমন কি ইংরেজ চা-বাগানগুলিও মাড়োয়ারীদের নিকট হইতে টাকা ধার লয়। সন্ধ্যা বেলা দেখিলাম, হাজার হাজার নোটের তাড়া সামনে করিয়া বসিয়া আছে এই মাড়োয়ারিগণ। আসামের একজন মাত্র মাড়োয়ারী যে অর্থ রোজগার করে, আসামের চা-বাগানগুলির সকল বাঙ্গালীর সমবেত আয়ও তাহার সমান নয়। বাঙ্গালীদের স্থান কোথাও নাই। হাওড়া ব্রীজ পার হইলেই কলিকাতার ব্যবসাকেন্দ্র বড়বাজার। বড়বাজারে আজকাল বাঙ্গালীর কিছুই নাই। যাহা কিছু ছিল সব ছোট ছোট দেনার দায়ে মাড়োয়ারীরা কিনিয়া লইয়াছে। যুদ্ধের পরেই ব্যবসা-মহলে ধুম আরম্ভ হয়। সেণ্ট্রাল এভেনিউয়ে ৪।৫ তলা ইমারত গড়িয়া উঠিল। কত বড় বড় বাড়ী! কিন্তু বাঙ্গালীর ইহাতে গৌরব করিবার কিছুই নাই। সব মাড়োয়ারীর টাকায় মাড়োয়ারীর সম্পত্তি। বাঙ্গালী মানে হিন্দু মোসলমান দুই-ই; কাহারও একখানা বাড়ী নাই ঐ রাজপথে। আমি চাই বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালায় থাকুক, হিন্দুর হাতে থাকুক বা মোসল-মানের হাতে থাকুক তাহাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালার মাটিতে থাকিলেই হইল। আজ-কাল মুদীর দোকান মিঠাইয়ের দোকান পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। ভেজিটেবল ঘী মাড়োয়ারীর অর্থাগমের বড় পথ। বিলাতী যত বস্ত্র এ-দেশে আমদানি হয়, সব রেলীব্রাদার্স, গ্রাহাম বা বোম্বাইয়ের স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার হাতে। গত বৎসর ঢাকায় এক কো-অপারেটিভ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। ঢাকার নবাব ছিলেন সভাপতি। আমি ঐ সভায় বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালার পাট-কলগুলি বৎসরে ৬০ কোটি টাকার পাট ক্রয় করে। ইহার লভ্যাংশের ৪ ভাগের ১ ভাগ যায় মাত্র মিড্‌ল্‌ম্যানের (মধ্যস্থ ফড়িয়ার) পকেটে। আর বাকী মোটা অংশ বিলাতে চালান হয়। নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাটের আড্ডা। ১৫ কোটি টাকার কারবার হয় নারায়ণ-গঞ্জে। এ-সব মাড়োয়ারী-ভাটিয়ার টাকা। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে কোনও মোসলমান গ্রাজুয়েট হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেওয়া হইত, আজকাল আর

সে দিন নাই। কত শত মোসলমান গ্রাজুয়েট পয়দা হইতেছে প্রতি বৎসরে। প্রত্যেকে হাকিম হইবার আশা করিতে পারেনা। কয় জন লোক চাকুরী করে? সেন্সাসের হিসাবে দেখা গিয়াছে হাজারকরা একজন লোক চাকুরে। আফিস-আদালতের পিয়ন, আমলা কর্ম্মচারী হইতে হাই-কোর্টের জজ—সকল ধরিয়া ঐ হাজারকরা ১ জন। তাহা হইলে দেখা যায়, অন্ন সমস্যার জন্য কোন মতেই চাকুরীর উপর নির্ভর করা চলে না। হাইকোর্টের সবগুলি জজিয়তি যদি মোসলমানদিগকে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও অন্ন-সমস্যার সমাধান হয় না। তাই বলিয়া আমি মোসলমান-দিগকে চাকুরী দিবার বিপক্ষে নই। আমি বলিতে চাই না, মোসলমানদিগকে চাকুরী দিও না। তাহাদিগকে খুব চাকুরী দাও।

নারায়ণগঞ্জে নদীর পারে করোগেটেড্ টীনের বিরাট বিরাট ঘরের সারি দেখিলাম। এ-সব হরদতলাল চামেরিয়ার কুঠি, ইংরেজের নয়। একজন সবডিভিশনাল অফিসার আমাকে বলিলেন যে, ঐ কুঠির এক একজন গোমস্তা ২০।২৫।৩০ লক্ষ টাকার পাট ক্রয় করে। ভাবুন ব্যাপারটা। এক একজন সামান্য গোমস্তার হাত দিয়া ২০।২৫ লক্ষ টাকা খরচা হয় সেখানে! তাদের মধ্যে বিশ্বাস বা আস্থা বলিয়া একটা জিনিষ আছে। আমরা যদি বাড়ীতে দশ হাজার টাকা পাঠাই আমাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে, ও নির্দ্দেশ করিয়া দেই যে এগুলি দ্বারা একটা পুকুর খনন করিতে হইবে, জমি ক্রয় করিতে হইবে, তাঁহারা টাকাটা হাতে পাইয়া সর্ব্বাগ্রে কি উপায়ে আত্মসাৎ করিবেন, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

বাঙ্গালার পাটকল

সেই বজবজের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত হুগলীর পারে ৮৫।৮৬টা পাটকল আছে। হিন্দু বলুন, মোসলমান বলুন, বাঙ্গালীর একটা কলও ইহার মধ্যে নাই। সব বিদেশীর। ২টি মাত্র ভারতবাসীর আছে। একটা হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদের, আর একটা বিড়লা ব্রাদার্সের। এ দুইটী মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানই খুব সচ্ছল ভাবে চলিতেছে। ৭৫।৮০ বছর পাটের কারবারে থাকিয়াও আমরা এ পর্য্যন্ত একটা পাটকল প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলাম না। এক একটা পাটকলের আয় কত! এই সেদিন ক্লাইভ, কাঁকনাড়া প্রভৃতি জুটমিলগুলি শতকরা দুইশত তিনশত ভাগ লভ্যাংশ দিয়াছে। এক একটা পাটকল ২৫।৩০ লাখ টাকা ডিভিডেণ্ড দেয়। বাঙ্গালার জমীদারের মধ্যে বর্দ্ধমানই শ্রেষ্ঠ। ইহার আয় ধরুন বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটা জুটমিলের আয় আমাদের বৃহত্তম জমীদারের আয়ের চাইতে বেশী। আবার জুটমিলগুলির ম্যানেজিং এজেণ্ট আসল মজা উড়ায়। তাহারা লুঠপাট করিবার পরও শতকরা ২০০।৩০০ ভাগ লভ্যাংশ দিতে পারে। কত কোটি কোটি টাকা জুটমিলের কল্যাণে বিদেশে চালান হইতেছে একবার ভাবুন।

চা-বাগান

আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি চা পান না বিষ পান চা পান ত একটা নেশা। চা পানে স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া কিছু কিছু ক্ষতি আছে। কিন্তু আমি আর্থিক ক্ষতির কথা চিন্তা করিয়াই ইহাকে বিষ বলিয়া থাকি। দেশের চা-বাগানগুলির শতকরা ৯৭ ভাগ ইংরেজের হাতে। ৩ ভাগ মাত্র বাঙ্গালীর হাতে। জলপাইগুড়িতে নবাব মোশারফ হোসেন, ও প্রফেসর রহমানের কয়েকটা চা-বাগান আছে। দেখা যায় যে, ১০০ টাকার চা বিক্রয় হইলে ৯৭ টাকা যায় ইংরেজের পকেটে আর বাকী তিন টাকা থাকে বাঙ্গালীর ঘরে। লর্ড কার্জ্জন টি এসোসিয়েশনের সেস করিয়া তাহাদিগকে টলটলে করিয়া দিয়া যান। অ্যাণ্ড ইউল পটলডাঙ্গা, হেদুয়ার মোড়ে বিনা পয়সায় চায়ের দোকান করিল। পয়সা পয়সা চায়ের প্যাকেট বিকাইতে লাগিল। ইহাদিগকে যদি চায়ের নেশাখোর করা যায়, তাহা হইলে আর পায় কে—ইহাই হইল তাহাদের বিনা পয়সায় চায়ের দোকান খোলার শুভ উদ্দেশ্য। হইয়াছেও তাহাই। আজকাল মাদ্রাজ অঞ্চলে যেমন লোকের কফির নেশা ধরিয়াছে, আমাদের বাংলায়ও চাষারা পর্য্যন্ত এলুমিনিয়মের কুজাতে চা প্রস্তুত করিয়া মাঠে লইয়া যায়।

ফলের চাষ—পেঁপে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ গোবিন্দপুর (২৪ পরগণা)

বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত ফল বাঙ্গালার বাহিরেও যথেষ্ট আদরণীয়, পেঁপে তাহাদের অন্যতম। বাঙ্গালার বাহিরের জমি পেঁপে চাষের পক্ষে অনুকূল কিনা সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিতেছি না। তবে পেঁপে যে ডালিম বা আঙ্গুরের ন্যায় "মেওয়া চিজ" বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

পেঁপে স্বাদু, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় ইহা নানা প্রকার ব্যাধি-নাশক। ইহা একাধারে পূজার নৈবেদ্য, রোগীর পথ্য ও সুস্থের খাদ্য। বাঙ্গালায়—অন্ততঃ আমাদের অঞ্চলে—এই মেওয়া চিজটীর উৎপাদনের জন্য কে কিরূপ যত্ন লয় এবং কিরূপে বিস্তৃত ভাবে চাষ আবাদ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দিবার চেষ্টা করিব।

বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থ যেখানে আবর্জ্জনাদি ফেলিয়া দেয়, সেইখানে, ঘরের আনাচে-কানাচে অলক্ষিত ভাবে একটী বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কাহারও যত্ন-শ্রদ্ধার অপেক্ষা না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে একটী গাছ বাড়িয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ সেকারণ বলিয়া থাকেন, "পেঁপে বন্য ফল, আপনাআপনি যেখানে সেখানে জন্মিয়া থাকে, উদ্যানজাত ফলের ন্যায় ইহার চাষ আবাদ করা যায় না।" এইরূপ কথার কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে, অযত্নে, আনাচে কানাচে আবর্জ্জনাস্তূপে যে গাছটী জন্মায় সেটী যদি স্ত্রীবৃক্ষ হয় তবে বহু ফল দান করিয়া থাকে। ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, পেঁপে গাছের জন্য প্রচুর সার ও সরস, সতেজ আলগা জমির প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক লক্ষণাদির উপর দৃষ্টি রাখিয়া পেঁপে চাষের জন্য সরস দোআঁশ জমি নির্ব্বাচন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ পুরাতন গোবর সার ও পাঁক মাটির সার দিয়া উপর্য্যুপরি চাষ দিতে হইবে, যেন সারগুলি বেশ করিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায় এবং মাটি নরম ও আলগা হইয়া উঠে। কৃষকেরা সুকর্ষণের যেরূপ আভাষ দেয় তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, কর্ষিত জমির উপর একটী জলপূর্ণ কলসী নিক্ষেপ করিলেও কলসী ভাঙ্গিবে না। যে কৃষক এইরূপ আদর্শ সুকর্ষণের যত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে, চাষে তাহার তত সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

পেঁপে গাছে হাড়ের গুঁড়া বা বৈজ্ঞানিক সার দিতে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। বিশেষজ্ঞগণ ইহার বিশেষ বিবরণ সাধারণের গোচর করিবেন। পাঁকমাটি সদ্য এঁদোপুকুর হইতে তুলিয়া জমিতে বা গাছের গোড়ায় দিলে কোন উপকার হয় না, বরং পাঁক মাটির ঝাঁঝে গাছের অনিষ্ট হইতে পারে। পাঁক মাটি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উঠাইয়া রাখিলে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমিতে ছড়াইবার উপযুক্ত হয়। জমিতে হাল ও মই (বাসই) দিবার সময় যাহাতে জমি সমতল হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন দিকে ঢালু হইলে বৃষ্টির জলে সমস্ত জমির সারাংশ ধুইয়া ঢালু দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সে কারণ জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়।

চৈত্র মাসে প্রথম বৃষ্টিপাত হইলে পেঁপের বীজ ফেলিতে হয়। তবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের প্রথম পর্য্যন্ত ইহার গাছ লাগাইতে পারা যায়। যেখানে চৈত্র মাসে বীজ অঙ্কুরিত করাইয়া বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপে গাছ বাঁচাইয়া রাখা যায় না, সেখানে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই অর্থাৎ গ্রীষ্মশেষে ইহার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য।

দুই প্রকারে পেঁপের বীজ বপন করা যায়। প্রথমতঃ, বেগুণ বা কপির মত হাপরে (স্থানে স্থানে "তলা" ও "খোলা" বলে) বীজ ফেলিয়া পরে গাছগুলি ৪।৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে হাপর হইতে তুলিয়া জমিতে রোপণ করা (ট্রানস্প্লানটেশন)। দ্বিতীয়তঃ, একেবারে জমিতে ৪হাত অন্তর "মাদা" কাটিয়া তাহাতে দুটী করিয়া বীজ বপন। চারা বাহির করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজনীয়। মাদায়

বা হাপরে যেন জলাভাব না ঘটে অথচ অতিরিক্ত জল ঢালিয়া প্লাবিত করা না হয়। হাপর বা মাদাগুলি সর্ব্বদা যেন রৌদ্রতাপে শুকাইয়া না উঠে অথচ সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রাখিয়া রবিকিরণে বঞ্চিত করা না হয়।

গাছ বাহির হইলে ভেক, ঝিল্লী বা অন্যান্য পোকা মাকড়ে চারাগুলি কাটিয়া নষ্ট করিতে থাকে। সেই সময় হাপর ও মাদাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করার বিশেষ প্রয়োজন। মাদার প্রতি গাছের গোড়ায় ৯ ইঞ্চি লম্বা খেঁজুর পাতার (ডাঁটা সমেত) টুকরা পুতিয়া দিলে প্রায়ই ভেক ও পোকা মাকড়ে কাটিতে পারে না। চারাগুলি সতেজ হইয়া উঠিবার সময় মধ্যে মধ্যে জমির আগাছাগুলি নিড়াইয়া দিতে হয় এবং কোদালি দিয়া অল্প কোপাইয়া মাটি আলগা রাখিতে হয়। জমি অত্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছে দেখিলে মাঝে মাঝে জলসেচ দিতে হইবে। পরে গাছগুলি বাড়িতে থাকিলে চারিদিকের অল্প মাটি চাঁচিয়া লইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। পেঁপে গাছের শিকড় মাটির বহু নিয়ে যাইতে পারে না। সেজন্য গোড়ায় মাটি জমা করিয়া না দিলে রৌদ্রতাপ অসহ্য হওয়ায় গাছগুলি শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতে পারে না।

এইরূপ সার মাটি ও চাষ দিয়া যদি চৈত্র মাসে গাছ লাগান যায় তাহা হইলে সেই গাছ আশ্বিনের শেষেই মুকুলিত হইবে। পুষ্পগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া একটী পেঁপে পাকিয়া উঠিতে ছয় মাস সময় লাগে। এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত গাছ লাগাইলেও এক বৎসরে ফল পাইবার আশা থাকে। ইহার পর লাগাইলে গাছগুলি সেবৎসর পুষ্পিত হইতে না পারায় ফলদান করিতে পারে না।

এইখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, স্ত্রী পুরুষ ভেদে পেঁপে গাছ দুই প্রকার। যথেষ্ট যত্ন ও সতর্কতা সত্ত্বেও অধিকংশ বৃক্ষ পুং পুষ্প ধারণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। পুং পুষ্প ফল জন্মায় না। প্রত্যেক পত্রসঙ্গম হইতে পুং পুষ্প দন্তের আকারে বাহির হইয়া প্রতি শাখা প্রশাখায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। স্ত্রী পুষ্প আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। পত্রসঙ্গম হইতে অসংলগ্ন ভাবে বাহির হইয়া প্রতি বৃন্তে একটী হইতে ৩টী ৪টী ফল ধারণ করে। যথেষ্ট যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ পুংবৃক্ষ জন্মায়, ইহাই পেঁপে চাষের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ, এবং কিরূপে সবগুলিই স্ত্রীবৃক্ষ উৎপাদন করা যায়, ইহাই গুরুতর সমস্যা। এ সম্বন্ধে নানা কৃষকের নানা মত। (১) কেহ বীজ রাখিবার সময় কতিপয় নিয়ম পালন করিতে বলে, যথা গাছের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও বৃহত্তম ফলটী পাকিলে তাহার বোঁটার মাঝখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাঁশ চিরিবার মত না কাটিয়া, ফলটীর মধ্যদেশে বলিদানের মত আধাআধি দুইভাগ করিয়া বোঁটার দিকের অংশ পরিত্যাগ করিবে এবং পশ্চাৎদিকের অংশের বীজের মধ্যে যে কয়টী বীজ অধিকাংশ পুষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ তাহাই বাছিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপ বীজ হইতে উদ্গত গাছ সমস্ত ফলবান হওয়া সম্ভব। (২) কেহ বীজবপনকালীন তিথিবিচারের উপর লক্ষ্য রাখিতে বলে। তাহাদের মতে কৃষ্ণপক্ষের তিথি এবং অমাবস্যায় বীজ ফেলিলে সমস্তই স্ত্রীবৃক্ষ হওয়া সম্ভব। (৩) কেহ কেহ বলে, "হাপর" হইতে গাছ তুলিয়া জমিতে বপন করিবার সময় হাপরে চারাটী যে অবস্থায় থাকে জমিতেও যেন সেই অবস্থায় রাখা হয়। অর্থাৎ হাপরে ইহার যে পাতাটী পূর্ব্বদিকে থাকে, বপন (ট্রান্সপ্ল্যান্টেশুন্) কালেও যেন সেই পাতাটী পূর্ব্বদিকে থাকে। এবং অমাবস্যা এবং পুর্ণিমাই নাকি পুনর্ব্বপনের প্রকৃষ্ট সময়। (৪) আবার কাহার কাহারও মতে পেঁপে চাষ করিতে হইলে, পুংবৃক্ষ (কৃষকেরা "আড়া" গাছ বলে) হইবেই। ইহার কোনরূপ প্রতিকার নাই। ঘন সন্নিবেশে বীজ বপন এবং পুষ্পোদ্গম হইলে "আড়া" গাছটীর ডগা কাটিয়া দেওয়াই ইহার একমাত্র ব্যবস্থা। এইরূপে মুণ্ডিত বৃক্ষ পুনরায় গজাইলে ফলবান গাছ হইতে-পারে।* কিন্তু দ্বিতীয়বার গজাইবার পরেও যদি "আড়া" ফুল হয়, তাহা হইলে তাহার মূলোৎপাটন করিয়া দেওয়া দরকার। পেঁপে-ভক্তগণ নিয়মগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

* প্রায় পঞ্চাশটি পুংবৃক্ষের ডগা কাটিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে একটি পুংবৃক্ষ গজাইয়া স্ত্রীপুষ্প ধারণ করিয়াছে। তাহাতে যথেষ্ট ফল ফলিতেছে।—লেখক।

পেঁপে বারমেসে ফল। বৎসরের যে কোন সময়ে পেঁপে পাওয়া যায়। তবে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ইহার আমদানি কম। সেজন্য এই তিন মাসে পেঁপে যথেষ্ট উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। অন্যান্য সময় পেঁপের বাজার বেশ মন্দা থাকে। কিন্তু চতুর কৃষকেরা চৈত্রমাসে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও হিন্দুর অন্যান্য পূজা পার্ব্বণের সময় এবং মুসলমানের "রোজার" সময় সহজ ও কৃত্রিম উপায়ে পেঁপে পাকাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। কৃত্রিম উপায়ে পাকাইতে হইলে পুষ্ট পেঁপে গাছ হইতে পাড়িয়া ১ দিন ঘরে রাখিয়া দিবে। পরদিন একটি বড় মাটির জালার মধ্যে পুরিয়া একটি ভাঙ্গা সরা দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ ছিদ্রবিশিষ্ট ভাঙ্গা সরার উপর পল বা খড় রাখিয়া অগ্নি-সংযোগে ধূমোৎপাদন করিবে। উত্তপ্ত ধূম জালার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখটি একদম বন্ধ করিয়া একদিন রাখিবে। তাহা হইলে পেঁপে পাকিয়া উঠিবে, কিন্তু পেঁপে পুষ্ট না হইলে আদৌ পাকিবে না বরং পচিয়া যাইবে। কোন কারণ বশতঃ অপুষ্ট পেঁপে পাড়িতে হইলে, কাঁচা বিক্রয় করাই ভাল।

পরিমাণমত সার প্রয়োগ করিয়া, সুকর্ষণ, জলসেচ ইত্যাদির দ্বারা জমি সরস ও আলগা রাখিলে প্রতি গাছে ৫০টা হইতে ১০০টা বা আরও অধিক ফল পাইবার সম্ভাবনা। একটি গাছ হইতে ২০৲ টাকার পেঁপে বিক্রয় করিতে শুনিয়াছি। বৎসরের অন্যান্য সময়ের ন্যায় আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত পেঁপে বিক্রয় করিতে পারিলে আরো লাভ হইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি পুষ্প হইতে নির্গত হইয়া পেঁপে পাকিতে ছয়মাস সময় লাগে। সুতরাং আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সমান রূপে ফল পাইতে হইলে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের ফুল ও তন্নির্গত ফলগুলি রক্ষা করা দরকার। উদ্যানে ফুলের গাছের চতুর্দ্দিকে আইল বাঁধিয়া প্রতিদিন যেরূপ জল দিবার নিয়ম আছে, পেঁপে গাছেও প্রতিদিন সেইরূপ জল দিবার ব্যবস্থা করিলে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের ফলগুলি রক্ষা করিতে পারা যায়।

পেঁপে অতি লাভজনক চাষ। চারিহাত অন্তর গাছ লাগাইলে একবিঘা জমিতে ৪০০টি গাছ জন্মিবে। তাহার মধ্যে, ১৫০ গাছ ফলোৎপাদনের অনুপযুক্ত মনে করিয়া বাদ দিলেও অবশিষ্ট ২৫০ শতের প্রতিবৃক্ষে ২০৲ টাকার স্থলে ৪৲ টাকার ফল পাইলে একবিঘা জমিতে এক সহস্র টাকার ফল পাওয়া যাইবে। একবিঘা জমির চাষে ২৫০৲ টাকা ব্যয় ধরিলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। আমার বিশ্বাস চাষের জন্য প্রতিবিঘায় ৫০০৲ টাকা বৎসরে ব্যয় করিলেও ক্ষতির ভয় নাই।

পেঁপে গাছ ২০ ফুট হইতে ৪০ ফুট লম্বা হয় এবং ৩ হইতে ৫ বৎসর ফল প্রদান করে। এতদঞ্চলে "দেশী" ও "বোম্বাই" দুইপ্রকার পেঁপে ফল হয়। "দেশী" পেঁপে বেঁটে ও গোল এবং "বোম্বাই" পেঁপে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং লম্বা। কোন জমিতে কেবলমাত্র পেঁপে করিতে দেখি নাই। সাধারণতঃ জমির আইলের চতুর্দ্দিকে পেঁপে গাছ দিয়া মধ্যে সময় মত বিবিধ ফসলের চাষ করে। "সিঙ্গাপুর," "রাঙ্কুসে" প্রভৃতি পেঁপের পক্ষেও এদিককার জমি অনুপযুক্ত নহে। উৎসাহী ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান তেল-কোম্পানী

নবীন দুনিয়ায় তেল এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। এক হিসাবে তেলের জোরে দুনিয়াটা চলে। এক মুহূর্ত তেল না হইলে আজকালকার লোক চোখে ধাঁধা দেখে। কয়লার ব্যবহার দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। তেল কয়লার স্থান দখল করিয়া বসিতেছে। বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ কাজ তেলের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। লর্ড কার্জ্জন মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তেলের সমুদ্রের উপর দিয়া মিত্রশক্তি জয়লাভ করিয়াছেন।"

বর্ত্তমান সভ্যজগতের প্রধান যান মোটর গাড়ীর একমাত্র খোরাক পেট্রোলিয়াম তেল। আজকাল এরোপ্লেন

বা আকাশ যানের চলন হইয়াছে। অনেকে আশা করেন, ভবিষ্যতে জল ও স্থলপথে চালিত বড় বড় জাহাজ ষ্টীমার, রেলগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের স্থান এরোপ্লেন দখল করিয়া বসিবে। কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যেই যাত্রী এরোপ্লেন ব্যবহার করা হইতেছে। অনেক সভ্য দেশেই এরোপ্লেনের সাহায্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন কি আমাদের ভারতবর্ষেও ব্যোমযান দ্বারা দ্রুত ডাক বিলির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এরোপ্লেন প্রচলনের ফলে মানব-সভ্যতার বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিতে চলিয়াছে। এহেন এরোপ্লেনের প্রাণ পেট্রোলিয়াম তেল। এই তেল-সম্পদ্ যে দেশের আছে, সেই দেশকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। শুধু সৈন্য-সামন্ত, গোলা-বারুদ, রসদ প্রভৃতি লাট বহর আজকালকার যুদ্ধজয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তেল না হইলে এ সকলই মূল্যহীন। আমাদের দেশের রাস্তা ঘাটে বি, ও, সি, এই তিনটি অক্ষরের ছাপ মারা প্লাকার্ড প্রায়ই নজরে পড়ে। এর পুরা নাম হইতেছে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী। গোটা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য ভূখণ্ডে এই কোম্পানী তেল সরবরাহ করে। ইহা খাস ইংরেজ কোম্পানী। ভারতবাসীর এতটুকু স্বত্ব ইহাতে নাই। কলিকাতা ও মফঃস্বলের সড়কে যত মোটর গাড়ী চলে তাহার তেল যোগায় বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী। আজ ইংরেজের অন্যতম বিপুল কীর্ত্তি অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর একটু পরিচয় দিব। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ এই অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী সব চাইতে বড় তেলের ব্যবসায়ী। পারস্য দেশে ইহার আড্ডা হইলেও পারস্যবাসীর আধলা পয়সাটি ইহাতে নাই। এই বিরাট কারবার সম্পূর্ণ ইংরেজের সম্পত্তি। এই তৈল-সমুদ্রের একমাত্র মালিক ইংরেজ।

লণ্ডনের এক বিখ্যাত খবরের কাগজে শ্রীযুক্ত পার্সিভ্যাল ল্যাণ্ডন নামক এক ইংরেজ লিখিয়াছিলেন,—"পারস্যের তেলের খনির মুখ হইতে আরবের আবাদান দ্বীপপর্য্যন্ত ১৪৫ মাইল লম্বা নিয়ত-প্রবাহিত যে কাল তেলের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে তাহাই একদিন আমাদের ধরার বুকে বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র খোরাক হইবে।" একথা সম্পূর্ণ সত্য। বৃটিশের গোটা প্রাচ্য জমীদারি তাঁবে রাখিবার অন্যতম সহায়ক ঐ অ্যাংলো পার্শিয়ান কোম্পানী। আজ ভারতবাসীর ঐ কোম্পানীর কারবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই কোম্পানীর জন্মদাতা হইতেছেন শ্রীযুক্ত উইলিয়ম নক্স ডার্সি। ইনি ছিলেন খাস বিলাতের লোক। ইহার পিতা একজন সলিসিটর ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার নয়া উপনিবেশের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সচ্ছলতা ইহাদিগকে উক্ত ভূখণ্ডে আকৃষ্ট করে। ইঁহারা সপরিবারে অষ্ট্রেলিয়ায় উঠিয়া আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ডার্সির পিতার একজন মক্কেল স্যাণ্ডি মর্গান ডার্সিকে একদিন অষ্ট্রেলিয়ায় কুইনস্‌ল্যাণ্ডের এক পাহাড়ে লইয়া যান। তিনি ডার্সিকে বলেন, ঐ পাহাড়ের নীচে সোনার খনি আছে। তখন হইতে তাঁহারা ঐ সোনা তোলার কাজে লাগিয়া যান এবং প্রভূত খনিজ-সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া কোটিপতি হইয়া বসেন। ঐ খনি দুনিয়ায় সুপ্রসিদ্ধ "মাউণ্ট মর্গান গোল্ড মাইন" নামে পরিচিত।

ডার্সির আরও অনেক দুরাশা ছিল। তিনি অন্যের ন্যায় কোটিপতি সাজিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তখন দেখিলেন তেলের বাজারের একটা নাম ডাক পড়িয়া গিয়াছে। তেলের তখন খুব চাহিদা এবং ইহার দামও খুব চড়া। এই সময় কিতাবজি বলিয়া একজন পারস্যবাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। কিতাবজি তাঁহার দেশের উত্তর ভূখণ্ডের খনিজ সম্পদের গল্প তাঁহার নিকট করিতেন এবং সেই অফুরন্ত তেলের ভাঁটি উদ্ঘাটনের ব্যর্থ প্রয়াসের কথাও তাঁহাকে বলিতেন।

ডার্সির খেয়াল সেই হইতে পারস্যমুখী হইল। তিনি এইচ, টি, বার্লস নামক একজন ভূ-তত্ত্ববিদ্‌কে পারস্যের ঐ অঞ্চল জরিপ করিতে পাঠান। বাগ্দাদের উত্তরে অবস্থিত ইরাক, পারস্য সীমান্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ড তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটা আশা-জনক রিপোর্ট পেশ করেন।

ডার্সি রিপোর্ট পড়িয়া খুব আশান্বিত হন এবং তদানীন্তন পারস্য সম্রাটের নিকট তৈল-শিল্প-কারখানা খুলিবার বাসনা জানাইয়া এক দরখাস্ত পেশ করেন।

১৯০১ সনে পারশ্যের শাহ কাস্পিয়ান হ্রদের ধার দিয়া অবস্থিত রুশিয়া-প্রভাবান্বিত ৫টী প্রদেশ ছাড়া গোটা পারশ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম অ্যাসফল্ট প্রভৃতি আহরণ করিবার অধিকার প্রদান করেন। এই কন্‌সেশ্যান বা সুবিধার মিয়াদ ৬০ বছরের জন্য করা হয় এবং পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপী ইহার চৌহদ্দী দেওয়া হয়।

প্রথম দুই তিন বৎসর ডার্সি নিজের তহবিল হইতে তিন লক্ষ পাউণ্ড ঢালেন। ইহার দ্বারা মাত্র ২টা তেলের কূপ খনন করা হয়।

১৯০৪ সনে বৃটিশ নৌবিভাগ এই সম্বন্ধে ভালরূপ ওয়াকিবহাল হইবার নিমিত্ত পারশ্যে এক কমিশন প্রেরণ করেন। এই কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, ডার্সির এই প্রচেষ্টায় বৃটিশের যথেষ্ট সাহায্য করা প্রয়োজন। লর্ড ষ্ট্রাথকোনা এবং বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী ডার্সির সাহায্যার্থ অগ্রসর হন।

১৯০৫ সনে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর টাকায় পারশ্যের তৈল-ভাণ্ডার লুণ্ঠনের জন্য ভালরকম আয়োজন করা হয় এবং এজন্য একটি কন্‌সেশ্যান সিণ্ডিকেট কায়েম করা হয়।

১৯০৮ সনে কিন্তু ঐ কন্‌সেশ্যান সিণ্ডিকেটের পুঁজি নিঃশেষ হইয়া আসে। ডার্সি খুব মনমরা হইয়া পড়েন। অনেকেই বিফলতা দেখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, পারশ্যের বালিতে টাকা ঢালা আর জলে টাকা ফেলিয়া দেওয়া একই কথা। পারশ্যের তেলের ভাঁটি উদ্ঘাটন প্রচেষ্টায় আর টাকা ঢালা নেহাৎ বেকুবি হইবে। বিলাত হইতে কাজ বন্ধ করিবার হুকুমনামা আসে। ইহার মধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া যায়। ১৯০৮ সনের ২৬শে মে হঠাৎ তেলের ডেরিকে এক বিপুল শক্তিশালা প্রস্রবণ ভুঁই ফুড়িয়া বহু উচ্চে অকাশের দিকে ভীম বেগে ছুটিয়া যায়। এ যেন আগ্নেয় গিরির প্রস্রবণ। নায়াগ্রার প্রপাতের জল ধারার মত বেগ ছিল, ঐ তেলের ফোয়ারার। এতদিনে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হইল। এই প্রস্রবণ পারশ্যের তৈল খনির অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান বলিয়া দিল।

ঠিক এক বৎসর পরে ১৯০৯ সনে অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী নাম দিয়া বিশ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে এক কোম্পানী খাড়া করা হয়। ১৯১২ সনে ঐ মূলধন ২৯,০০,০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। লর্ড ষ্ট্রাথকোনাকে প্রথম চেয়্যারম্যান করা হয়।

আজ ইহা এক অতি বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইহার কারবার। কত বড় ইহার চৌহদ্দি! ইংরেজের এক অভিনব কীর্ত্তি এই অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী। বর্ত্তমান চেয়ারম্যান স্যার চার্লস গ্রিনওয়ের বর্ননায় এই কোম্পানীর বর্ত্তমান বিপুল বিস্তৃত একটা পরিচয় আমরা পাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে স্যর চার্লস গ্রিনওয়ে শেয়ার হোল্ডারদের এক সভায় বলিয়াছিলেন, "আমাদের বর্ত্তমানে ৭০০ মাইল তেলের পাইপ আছে। ইহা অধিকাংশই দশ ইঞ্চির বেশী চওড়া। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ১৫১০ টী ষ্টোরেজ ট্যাঙ্ক আছে। এ ছাড়া ৩৮২টী বয়লার এবং ৩১টী বয়লার হাউস রয়েছে। স্থানীয় নেটিভ কর্ম্মচারী ও কুলিদের জন্য ৪,২৩৯টী বাসগৃহ ও বাংলা আছে। এগুলি ৬৯টি দালানের সারিতে অবস্থিত। ইহা ছাড়াও ছোট বড় নানা ধরণের এক হাজারের বেশী পাকা বাড়ী দালান কোঠা আছে। আমাদের মাল সরবরাহ বিভাগের অধীনে ৬৮৫টি বাল্ক-অয়েল ইন্‌ষ্টলেশন আছে। ইহাদের মধ্যে ৪৮টি ওশেন-ইন্‌ষ্টলেশন অর্থাৎ দুনিয়ার বিভিন্ন বন্দরে স্থাপিত তেলের ভাঁটি এবং আরও ৭০৮টি তেলের ছোট ভাঁটি আছে। আমাদের তেলের কারখানায় ও কারবারে ৫০ হাজার লোক খাটে। ইহাদের অর্দ্ধেকের কম অর্থাৎ ২০৫০০ হচ্ছে আমাদের জাতভাই খাস বিলাতী। আমাদের মালপত্র রপ্তানি করার কাজের ও কারখানার কাজের সুবিধার জন্য ১৬৪ মাইল রেললাইন ও নিজেদের গাড়ী আছে। ইহাও যথেষ্ট নহে। পথ ঘাট, রাস্তা সড়কের উপর দিয়া আমাদের ১,৮৪৭ খানি মোটর লরি ও ট্রাক্টর চলে। এ ছাড়া ট্যাঙ্ক কার বা তেল পুকুরের গাড়ী অহরহ চলছে। ঘোড়া খচ্চরের টানা গাড়ীও আছে ঢের। আমাদের জাহাজের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩৩১। নানা ধরণের জাহাজ ষ্টীমার মোতায়েন আছে। মাল রপ্তানির জন্য ইহার সবগুলিই কাজে খাটান হয়। ইহার মধ্যে ৬৭টি ট্যাঙ্ক বা পুষ্করিণী আছে।

এ সবই এই ৮ বৎসরের মধ্যে তৈয়ারী। আর এই সব জাহাজে মালপত্র তোলা নামা করার জন্য আমাদের ৮৯টি জেটী এবং হোয়ার্ফ আছে।

খাদ হইতে তেল বাহির করা, তেল পরিষ্কার করা তৈল পুষ্করিণীতে তেল মজুত করার বিভিন্ন রকমের বিরাট বিরাট বিভাগ চলিতেছে। আবার এই তেল দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের দুয়ারে হাজির করবার জন্য কোম্পানীর তরফ থেকে হাজার হাজার একর জমি গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে খরিদ করা হইয়াছে।

বুঝুন একবার ব্যাপারটা। ইহাও আবার দুই বৎসর আগেকার কথা। আজকাল আবার এর চাইতেও পাল্লা ভারি। দুই বৎসর আগের চাইতে ঢের ঢের বেশী ব্যবসার বহর বাড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পারস্যে হইতেছে এই তেলের আড্ডা। সেখানে না গেলে অবস্থা ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন।

পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সমতল ভুমির উপর তেলের নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ বছর আগে সেখানে ছাগল ভেড়া চরিত বা মাঝে মাঝে অগ্নি-পূজকদের মন্দিরের ভগ্নাংশ চোখে পড়িত, আজ সেই সমস্ত স্থানে অয়েল-ব্যারাক বা তেলের ভাঁটির উচ্চ চূড়া পথিকের দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল তৈল-প্রদেশে শত শত মাইল পাকা রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মোটর লরী ও মোটর গাড়ীতে উপত্যকা ছাইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা মাল-পত্র-বোঝাই গাড়ী রাস্তাঘাটে চলিতেছে।

আবাদান বন্দর ও পার্শিয়ান গালফের মোহানায় মাল-পত্র বোঝাই তৈল-তরণী সদা মোতায়েন আছে।

মসজিদ-ই-সুলেমান, যাহা একদিন অনুর্ব্বর ভূমি ছিল, তাহা একটা সমৃদ্ধিশালী বহুজনপূর্ণ সদাকর্ম্মময় তেলের শহরে পরিণত হইয়াছে। এখান হইতে পারস্য উপসাগরের মোহানা পর্য্যন্ত ১৪৫ মাইলের তৈল নদীর স্রোত পাইপের মধ্য দিয়া অশ্রান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।

আবাদান বন্দরে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম রিফাইনারী (তৈল পরিষ্কারের কল) স্থাপন করা হইয়াছে এবং ইহার আশ-পাশ দিয়া দশ হাজার লোকের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কোম্পানীর অধীনে হাজারের উপর উপরওয়ালা ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী খাটে এবং ৩০ হাজারের উপর নিযুক্ত নিম্নকর্ম্মচারী ও কুলি মজুর পারস্যের অধিবাসী। দেশটার সকল তৈল-সম্পদের লাভ ইংরেজের ট্যাঁকে যাইতেছে।

১৯১৩-১৪ সনে অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী ২৩৩৯৬২ টন তেল উৎপন্ন করে।

১৯২৬ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনে ঐ সংখ্যা ৪,৫৫৬,১২৭ টন দাঁড়াইয়াছে। কি অভাবনীয় তৈল-সম্পদের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছে ইংরেজ। ইংরেজ তার অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে পারস্যের বালুকাভূমিতে।

(সাহিত্যিক)

বাঙ্গালী মোসলমানের অন্ন-সমস্যা*

আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অন্নসমস্যার আলোচনায় বিশ বৎসর কাটাইলাম। আপনারা আজ আবার আমার নিকট হইতে ঐ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চান। আপনারা বাঙ্গালার মোসলমান; কিন্তু এই বিষয়ে আপনাদিগকে আমি কোন মতেই বাঙ্গালী হিন্দুর অনুকরণ বা অনুসরণ করিবার উপদেশ দিব না। আমি আপনাদিগকে বোম্বাই, করাচী ও দিল্লীর বোরা, নাখোদা, মেমন, খোজা প্রভৃতি ব্যবসায়ী মোসলমান সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিবারই উপদেশ দিব। গত বৎসর আমি ইংরেও

* বিগত নিখিল-বঙ্গ মোসলেম যুবক সম্মিলনীর বর্দ্ধমান অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার তামেরউদ্দিন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক লিখিত শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট।

ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়াছি। বোম্বাই বন্দরে এক ভাটিয়া আমাকে বলিলেন, আপনি ঐ যে জাহাজটা দেখিতেছেন, ওটা ১৫০০০ টনের। এখানকার খোজা ধনী ব্যবসায়িগণের ঐরূপ অনেক জাহাজ দেশ-বিদেশে মাল্ আমদানি-রপ্তানির কাজে খাটে। স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা স্যর ফজলভায় করিমভায়ের পুত্র। সেবার তিনি ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ইঁহারা লাখ-পতি, কোটি-পতি, মিলিঅনেয়ার, মাল্টিমিলিঅনেয়ার। এ রকম অনেক আছে বোম্বাইয়ের মোসলমান সমাজে। ইঁহাদের অনেকে জাপান হইতে সিল্ক আমদানির কাজে ও বিদেশে তুলা রপ্তানির কাজে নিযুক্ত আছেন। তোকিও, ওসাকা, হংকং, মার্সাই প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দরের স্বতন্ত্র হিসাবের খাতা আছে ইঁহাদেরই দপ্তরে। বোম্বাই আর কলিকাতার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বোম্বাইয়ের সব চাইতে মনোরম স্থান মালাবার হিল বা এলিফ্যান্টা অঞ্চলে যত বাড়ী সব দেশী লোকের—এই বোরা, খোজা মেমন, পার্শী প্রভৃতি ব্যবসায়িগণের। ইংরেজের সেখানে এতটুকু প্রতিপত্তি নাই। আর কলিকাতার অঞ্চল চৌরঙ্গী—ওটা সমস্ত সাহেবদের একচেটে। বাঙ্গালায় বাবু মানে যাহারা কেরাণী। আমাদের কেরাণীগিরিই একমাত্র ভরসা। সেই সুদূর বোম্বাই অঞ্চলের কচ্ছ-মেমন, বিদেশী রেলীব্রাদার্স এই মগরাহাট হইতে ১০।২০।২৫ লক্ষ টাকার চাউল রপ্তানির কাজে নিযুক্ত আছে। মোসলমানেরা বাস্তবিকই ব্যবসায়ী জাতি। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী মোসলমান নয়। কলিকাতায় মোসলমানদের যত বড় বড় কারবার আছে, সবগুলিই পশ্চিমা মোসলমানদের হাতে। সেই কলুটোলা থেকে ক্যানিংষ্ট্রীট, মুর্গিহাটা অঞ্চল—সব দিল্লীওয়ালা মোসলমানদের এক্তিয়ারে। পশ্চিমারাই বাঙ্গালা দেশটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমি এক সভায় বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালায় বৃটিশ অধিকার যত না ক্ষতি করিয়াছে, তার চাইতে ঢের ঢের গুণ বেশী ক্ষতি করিয়াছে মাড়োয়ারীর ইকনমিক কঙ্কোয়েষ্টে—আর্থিক বিজয়ে।

সেবার আসামের তেজপুর কন্‌ফারেন্সে গিয়াছিলাম। সেখানে পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর প্রতিপত্তি! মাড়োয়ারীরা সেখানকার ব্যাঙ্কার। এমন কি ইংরেজ চা-বাগানগুলিও মাড়োয়ারীদের নিকট হইতে টাকা ধার লয়। সন্ধ্যা বেলা দেখিলাম, হাজার হাজার নোটের তাড়া সামনে করিয়া বসিয়া আছে এই মাড়োয়ারিগণ। আসামের একজন মাত্র মাড়োয়ারী যে অর্থ রোজগার করে, আসামের চা-বাগানগুলির সকল বাঙ্গালীর সমবেত আয়ও তাহার সমান নয়। বাঙ্গালীদের স্থান কোথাও নাই। হাওড়া ব্রীজ পার হইলেই কলিকাতার ব্যবসাকেন্দ্র বড়বাজার। বড়বাজারে আজকাল বাঙ্গালীর কিছুই নাই। যাহা কিছু ছিল সব ছোট ছোট দেনার দায়ে মাড়োয়ারীরা কিনিয়া লইয়াছে। যুদ্ধের পরেই ব্যবসা-মহলে ধুম আরম্ভ হয়। সেণ্ট্রাল এভেনিউয়ে ৪।৫ তলা ইমারত গড়িয়া উঠিল। কত বড় বড় বাড়ী! কিন্তু বাঙ্গালীর ইহাতে গৌরব করিবার কিছুই নাই। সব মাড়োয়ারীর টাকায় মাড়োয়ারীর সম্পত্তি। বাঙ্গালী মানে হিন্দু মোসলমান দুই-ই; কাহারও একখানা বাড়ী নাই ঐ রাজপথে। আমি চাই বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালায় থাকুক, হিন্দুর হাতে থাকুক বা মোসল-মানের হাতে থাকুক তাহাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালার মাটিতে থাকিলেই হইল। আজ-কাল মুদীর দোকান মিঠাইয়ের দোকান পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। ভেজিটেবল ঘী মাড়োয়ারীর অর্থাগমের বড় পথ। বিলাতী যত বস্ত্র এ-দেশে আমদানি হয়, সব রেলীব্রাদার্স, গ্রাহাম বা বোম্বাইয়ের স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার হাতে। গত বৎসর ঢাকায় এক কো-অপারেটিভ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। ঢাকার নবাব ছিলেন সভাপতি। আমি ঐ সভায় বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালার পাট-কলগুলি বৎসরে ৬০ কোটি টাকার পাট ক্রয় করে। ইহার লভ্যাংশের ৪ ভাগের ১ ভাগ যায় মাত্র মিড্‌লম্যানের (মধ্যস্থ ফড়িয়ার) পকেটে। আর বাকী মোটা অংশ বিলাতে চালান হয়। নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাটের আড্ডা। ১৫ কোটি টাকার কারবার হয় নারায়ণ-গঞ্জে। এ-সব মাড়োয়ারী-ভাটিয়ার টাকা। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে কোনও মোসলমান গ্রাজুয়েট হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেওয়া হইত, আজকাল আর

সে দিন নাই। কত শত মোসলমান গ্রাজুয়েট পয়দা হইতেছে প্রতি বৎসরে। প্রত্যেকে হাকিম হইবার আশা করিতে পারেনা। কয় জন লোক চাকুরী করে? সেন্সাসের হিসাবে দেখা গিয়াছে হাজারকরা একজন লোক চাকুরে। আফিস-আদালতের পিয়ন, আমলা কর্ম্মচারী হইতে হাই-কোর্টের জজ—সকল ধরিয়া ঐ হাজারকরা ১ জন। তাহা হইলে দেখা যায়, অন্ন-সমস্যার জন্য কোন মতেই চাকুরীর উপর নির্ভর করা চলে না। হাইকোর্টের সবগুলি জজিয়তি যদি মোসলমানদিগকে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও অন্ন-সমস্যার সমাধান হয় না। তাই বলিয়া আমি মোসলমান-দিগকে চাকুরী দিবার বিপক্ষে নই। আমি বলিতে চাই না, মোসলমানদিগকে চাকুরী দিও না। তাহাদিগকে খুব চাকুরী দাও।

নারায়ণগঞ্জে নদীর পারে করোগেটেড্ টীনের বিরাট বিরাট ঘরের সারি দেখিলাম। এ-সব হরদতলাল চামেরিয়ার কুঠি, ইংরেজের নয়। একজন সবডিভিশনাল অফিসার আমাকে বলিলেন যে, ঐ কুঠির এক একজন গোমস্তা ২০।২৫।৩০ লক্ষ টাকার পাট ক্রয় করে। ভাবুন ব্যাপারটা। এক একজন সামান্য গোমস্তার হাত দিয়া ২০।২৫ লক্ষ টাকা খরচা হয় সেখানে! তাদের মধ্যে বিশ্বাস বা আস্থা বলিয়া একটা জিনিষ আছে। আমরা যদি বাড়ীতে দশ হাজার টাকা পাঠাই আমাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে, ও নির্দ্দেশ করিয়া দেই যে এগুলি দ্বারা একটা পুকুর খনন করিতে হইবে, জমি ক্রয় করিতে হইবে, তাঁহারা টাকাটা হাতে পাইয়া সর্ব্বাগ্রে কি উপায়ে আত্মসাৎ করিবেন, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

বাঙ্গালার পাটকল

সেই বজবজের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত হুগলীর পারে ৮৫।৮৬টা পাটকল আছে। হিন্দু বলুন, মোসলমান বলুন, বাঙ্গালীর একটা কলও ইহার মধ্যে নাই। সব বিদেশীর। ২টি মাত্র ভারতবাসীর আছে। একটা হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদের, আর একটা 'বিড়্লা ব্রাদার্সে'র। এ দুইটী মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানই খুব সচ্ছল ভাবে চলিতেছে। ৭৫।৮০ বছর পাটের কারবারে থাকিয়াও আমরা এ পর্য্যন্ত একটা পাটকল প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলাম না। এক একটা পাটকলের আয় কত! এই সেদিন ক্লাইভ, কাঁকনাড়া প্রভৃতি জুটমিলগুলি শতকরা দুইশত তিনশত ভাগ লভ্যাংশ দিয়াছে। এক একটা পাটকল ২৫।৩০ লাখ টাকা ডিভিডেণ্ড দেয়। বাঙ্গালার জমীদারের মধ্যে বর্দ্ধমানই শ্রেষ্ঠ। ইহার আয় ধরুন বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটা জুটমিলের আয় আমাদের বৃহত্তম জমীদারের আয়ের চাইতে বেশী। আবার জুটমিলগুলির ম্যানেজিং এজেণ্ট আসল মজা উড়ায়। তাহারা লুঠপাট করিবার পরও শতকরা ২০০।৩০০ ভাগ লভ্যাংশ দিতে পারে। কত কোটি কোটি টাকা জুটমিলের কল্যাণে বিদেশে চালান হইতেছে একবার ভাবুন।

চা-বাগান

আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি চা পান না বিষ পান চা পান ত একটা নেশা। চা পানে স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া কিছু কিছু ক্ষতি আছে। কিন্তু আমি আর্থিক ক্ষতির কথা চিন্তা করিয়াই ইহাকে বিষ বলিয়া থাকি। দেশের চা-বাগানগুলির শতকরা ৯৭ ভাগ ইংরেজের হাতে। ৩ ভাগ মাত্র বাঙ্গালীর হাতে। জলপাইগুড়িতে নবাব মোশাররফ হোসেন, ও প্রফেসর রহমানের কয়েকটা চা-বাগান আছে। দেখা যায় যে, ১০০ টাকার চা বিক্রয় হইলে ৯৭ টাকা যায় ইংরেজের পকেটে আর বাকী তিন টাকা থাকে বাঙ্গালীর ঘরে। লর্ড কার্জ্জন টি এসোসিয়েশনের সেস করিয়া তাহাদিগকে টলটলে করিয়া দিয়া যান। অ্যাণ্ড্ ইউল পটলডাঙ্গা, হেদুয়ার মোড়ে বিনা পয়সায় চায়ের দোকান করিল। পয়সা পয়সা চায়ের প্যাকেট বিকাইতে লাগিল। ইহাদিগকে যদি চায়ের নেশাখোর করা যায়, তাহা হইলে আর পায় কে—ইহাই হইল তাহাদের বিনা পয়সায় চায়ের দোকান খোলার শুভ উদ্দেশ্য! হইয়াছেও তাহাই। আজকাল মাদ্রাজ অঞ্চলে যেমন লোকের কফির নেশা ধরিয়াছে, আমাদের বাংলায়ও চাষারা পর্য্যন্ত এলুমি-নিয়মের কড়াইতে চা প্রস্তুত করিয়া মাঠে লইয়া যায়।

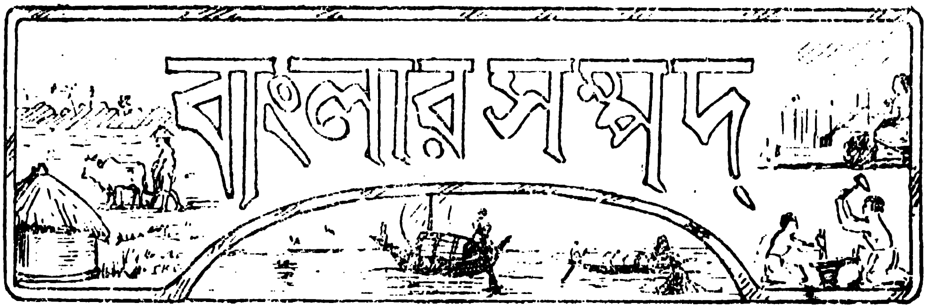
আর্থিক উন্নতি

পৌষ—১৩৩৪ ২য় বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্‌।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



বাংলার মজুর

বিগত ১৯২৫ সনে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রমজীবিগণের মজুরির একটা তালিকা ঠিক করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে যে মজুরি লইয়া মজুরগণ সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করিত বর্ত্তমানে তাহা তাহাদের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই অপ্রচুর। কারণ খাদ্য দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯০৮ সনে সর্ব্বপ্রথম এই বিভাগের সেন্সাস গ্রহণ করা হয়। পরে যথাক্রমে ১৯১১,১৯১৬ ও ১৯২৫ সনে বাংলার মজুরগণের মজুরির এক একটা তালিকা সংগ্রহ করা হয়।

১৯২৫ সনের সেন্সাসে গ্রাম্য মজুরির যে তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে সাধারণতঃ কৃষকশ্রেণী ও কর্ম্মকার, সূত্রধর, বস্ত্র-বয়নকারী প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পিগণের মজুরির হিসাব দেখিতে পাই। কৃষি-মজুরগণের মধ্যেও মাত্র ২০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের কর্ম্মঠ স্বাস্থ্যবান লোককে ধরা হইয়াছে। গৃহস্থগণ ইহাদিগকে ঠিকা দিনমজুর বা মাহিনা হিসাবে নিযুক্ত করে। ১৯২৫ সনে পাটের দাম খুব চড়িয়া যায়। ইহাই ঐ সনের একটা বিশেষত্ব। ঐ সনে পাটের ন্যায় খাদ্য দ্রব্যের দামও চড়িয়া যায়। ইহার ফলে গৃহস্থের একদিকে যেমন ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে দ্রব্যের মূল্যও অত্যধিক দিতে হয়। ফলে মজুরগণের মজুরির হার বাড়িয়া যায়। ১৯২৬ সনে যে সেন্সাস লওয়া হইয়াছিল তাহাতেও মজুরির হার বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ১৯২৫ সনের হিসাবে দেখা যায় বাংলার ১৬৭৪টি গ্রামে [illegible]রা মজুরগণের মেহনতী দেওয়া হয় এবং মাত্র ১৬১ টি গ্রামে মজুরি বাবদ অর্থ ও শস্য দুইয়েরই চলন দেখি পাওয়া যায়। নগদ টাকার পরিবর্ত্তে মজুরি বাবদ সাধারণতঃ তামাক, জলখাবার তেল প্রভৃতি দিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত। অনেক ক্ষেত্রে মজুরদের দুইবেলা খোরাক দেওয়া হয় এবং মজুরি বাবদ শস্য দিবার ব্যবস্থা থাকিলে সাধারণতঃ ধান্য দেওয়া হয়। নদীয়া মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কলাই শস্য দিবার

ব্যবস্থাও আছে। বাঁকুড়ার ১৮ টি, ঢাকার ১৫ টি, ফরিদপুরের ৪২টি ও বাখরগঞ্জের ৩৩টি গ্রামে মজুরদের মজুরি শস্য দ্বারা দিবার প্রথা আছে। ফসল কাটিবার মরশুমে ঐ সকল অঞ্চলে মজুররা গৃহস্থের ক্ষেত হইতে ফসল কাটিয়া আনে এবং তাহা মাড়াই করিলে যতটা পরিমাণ ফসল দাঁড়ায় তাহার সাত ভাগের একভাগ হিস্যা নিজেরা লয় ও বাকী গৃহস্থের গোলাবন্দি হয়। ৩৯৯ টি গ্রামে মজুরদের কেবলমাত্র নগদ টাকা দেওয়া হয় ইহা ছাড়া ১২৭৫টী গ্রামে জলখাবার, খাবার, স্নানের তেল প্রভৃতি-দ্বারা মজুরি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের পিরোজপুর মহকুমায় ফসল কাটার মরশুমে মজুরদের কেবলমাত্র ধান্য দেওয়া হয়। ফরিদপুরের অনেকস্থানেও ঐরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়।

বাংলার মধ্যে প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগে এবং রাজসাহী বিভাগের কোন কোন অঞ্চলে কৃষি কাজে অনেক সাঁওতাল মজুর নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐসকল সাঁওতাল কুলি আমদানি হওয়ার ফলে ঐসকল অঞ্চলে মজুরি অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে মজুরির হার সাধারণতই চড়া। ১৯১৬ সনের তুলনায় চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও রাজসাহীতে শতকরা ১০০ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ ১৯১৬ সনে চারি আনায় যে দিনমজুর পাওয়া যাইত আজকাল সেই মজুরকে ডবল মজুরি দিতে হয়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও শতকরা ৪০।৫০।৬০ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মজুরির হার গড়ে মাঝামাঝি ধরিলে ২৪ পরগণা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে মজুরগণ সাধারণতঃ দৈনিক ৮ আনা হইতে ১০ আনা রোজগার করে। কিন্তু যশোহর খুলনার মজুরি কিছু চড়া। ঐ সকল অঞ্চলে বার তের আনার কমে মজুর মিলা ভার। অন্যদিকে বর্দ্ধমানের সংলগ্ন বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মজুরির হার সাত আট আনার বেশী নয়। মালদহ জেলায় ছয় আনায় মজুর মিলে; কিন্তু ঐ জেলা বাদে রাজসাহী বিভাগের অন্যান্য জেলায় মজুরির হার খুব চড়া—দশ আনা হইতে তের আনার মধ্যে। পূর্ব্ব বাংলায় সাধারণতঃ এগার আনা হইতে তের আনা মজুরির রেট। কেবল নোয়াখালীর মজুরি আট আনা মাত্র।

বাংলার ১৫৬৯টি গ্রামের সূত্রধর ও কর্ম্মকারগণের দিন-মজুরির তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই সূত্রধরগণকে তাহাদের মেহনতের দাম বাবদ অর্থ দেওয়া হয়। গৃহস্থের লাঙ্গল জোয়াল প্রস্তুত করিয়া কিন্তু সূত্রধর টাকার পরিবর্ত্তে গৃহস্থের নিকট হইতে ধান্য লয়। চুক্তি হিসাবে ফুরণ কাজও ইহারা করে। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক জেলায় পাটের দাম চড়িয়া যাওয়ায় করগেট টিনের ঘর প্রস্তুতের ফরমাস খুব অত্যধিক হয়। ফলে সূত্রধরগণের মজুরির হারও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ সূত্রধরগণ গড়ে দিন চৌদ্দ আনা হইতে পাঁচ সিকা রোজগার করে। পূর্ব্ব সেন্সাসে ইহাদের মজুরির হার আট আনা হইতে তের আনার মধ্যে ছিল। ১৯২৫ সনের হিসাবে বীরভূম সদর ও ঝারগ্রাম এবং মেদিনীপুরে সূত্রধরগণের মজুরি মাত্র দশ আনা দেখা যায়। অন্য দিকে চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমা প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলের মজুরি পাঁচ সিকা।

কর্ম্মকারগণ তাহাদের দক্ষতা অনুযায়ী মজুরি পাইয়া থাকে। ইহারা সূত্রধরগণের মতই রোজগার করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের রামগড় ও হুগলীর শ্রীরামপুরে কর্ম্মকারগণের রোজগার খুব বেশী। এক একজন দিনে এমন কি দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা রোজগার করে। মেদিনীপুর ও বীরভূমে অন্যান্য মজুরগণের মত কর্ম্মকারের মজুরিও খুব কম—মাত্র দশ আনা।

খুলনা পশু-চিকিৎসালয়

খুলনায় তিনটি পশু-চিকিৎসালয় আছে,—সদরে একটি, সাতক্ষীরায় একটি, বাগেরহাটে একটি। সদরের এলাকা বিস্তৃত, কাজও বেশী। সম্প্রতি এখানে ১জন ডাক্তার কার্য্য করিতেছেন। আইনমতে তাঁহাকে মফঃস্বলে ভ্রমণ করিতে হয়। একজনের দ্বারা চণ্ডীপাঠ হইতে জুতা সেলাই পর্য্যন্ত কার্য্য হওয়া অসম্ভব। যতীনবাবু এই চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। তিনি যখন বাহিরে যান তখন দরজায় চাবি পড়ে, আবার তিনি যখন সদরে থাকেন তখন মফঃস্বলে

ত্রাহিত্রাহি ডাক পড়ে। অনেক লোক অনেক স্থান হইতে পশুদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। আর না হয় ২।৩ দিন বসিয়া থাকিতে হয়। এই অবস্থায় একজন ডাক্তারের দ্বারা এই কার্য্য হওয়া সম্ভব কিনা আমরা খুলনা ডিঃ বোর্ডকে সে বিষয়ে ভাবিতে অনুরোধ করি। যদিও সম্প্রতি ডিঃ বোর্ড নূতন লোক লইয়াছেন, উহা কিছু দিনের জন্য। এই বিভাগের অবস্থা অতীব শোচনীয়, ডাক্তারখানায় প্রায় শূন্য শিশি, ডাক্তারবাবুরা বিদেশস্থ, জীবগণও তজ্জন্য সত্বর তীরস্থ হয়। আমরা বলি যেভাবে হউক অর্থ সংগ্রহ করিয়া এখানে অন্ততঃ যাহাতে দু'জন স্থায়ী ডাক্তার থাকে তাহার ব্যবস্থা করা ডিঃ বোর্ডের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। আশাকরি আমাদের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যানবাবু এ বিষয়ে সদয় দৃষ্টিপাত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

(খুলনাবাসী)

মাহিষ্য ব্যাঙ্ক

ঘাটাল মহকুমার কয়েকটী গ্রামের মাহিষ্যগণের উদ্যোগে কৃষি শিল্পের উন্নতিসাধনের সাহায্যার্থ ঘাটাল মাহিষ্য ব্যাঙ্ক নামে একটী ব্যাঙ্ক ও একটী মাহিষ্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজার মাহিষ্য একটী সভায় সমবেত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের মূলধন ১০ হাজার টাকা এবং ৫ টাকা হারে শেয়ার সংগৃহীত হইবে। সভা-স্থলেই প্রায় সহস্রাধিক টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। শুধু ঘাটালে কেন, সকল স্থানেই গ্রাম্য কৃষিশিল্পের উন্নতি-সাধনের সাহায্যার্থ এই প্রকার ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক।

(নীহার)

কৃষি ফার্ম্ম

ফরিদপুরের ডিষ্ট্রীক্ট কৃষি বিভাগ রাজবাড়ীতে শীঘ্রই একটী "কৃষি-ফার্ম্ম" খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসার স্থানীয় সবডিভিসন্তাল অফিসার এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সহরের মধ্যে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যদি এই ফার্ম্ম হয়, তবে বহু দূরের জনসাধারণ এবং কৃষকশ্রেণী যথেষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই কার্য্যের উদ্যোক্তাগণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারা কোন গ্রামে এইরূপ ফার্ম্ম না খুলিয়া রাজবাড়ী সহরের নিকট খুলিলেই ভাল হইবে।

(রাজবাড়ী পত্রিকা)

ময়মনসিংহে লোনকোম্পানী

সেন্ট্রাল ময়মনসিংহ লোন কোম্পানী নামে নয়াবাজার মসজিদের সম্মুখে একটী লোন আফিস স্থাপিত হইয়াছে। অল্প সুদে টাকা দাদন দেওয়ার জন্য ইহা ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। ত্রৈবার্ষিক, দ্বিবার্ষিক ইত্যাদি নানা হেডে বিশেষ সুবিধাজনক সুদে আমানত রাখা হয়।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

বিদেশী আমদানি

১৯২৫-২৬ সনে বাঙ্গালাদেশে কত টাকার কোন্ বিদেশী জিনিষ আমদানি হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

সূতার জিনিষ	...	২৭৬৫৩৬৪৯৫৲
ধাতুদ্রব্য	...	১০১৫৩৫৭৪৭৲
চিনি	...	৬৬৭৪১৩৭৲
যন্ত্রপাতি	...	৪৪৬৮৯৫৫১৲
তৈল	...	৪৪৫২২৮৬০৲
রেলের জিনিষ	...	২১০৬৮১৬৪৲
লোহার জিনিষ	...	১৮১৬৯১৫৫৲
মসলা	...	১৪৪৬২৯৯৬৲
মোটরগাড়ী, মোটর সাইকেল	...	১৩১৫৪৭৫৮৲
মদ, স্পিরিট ইত্যাদি	...	৯৫৪৭৯৪৯৲
কাঁচের জিনিষ	...	৯৩৬৯০০০৲
কাগজ, পিচবোর্ড	...	৮০৭৯৯৭৭৲

রাসায়নিক জিনিষ	...	৭৯৭৮৬৫৪৲
তামাক	...	৭৫১০৬০৩৲
লবণ	...	৭০৩১৯০০৲
পশমী জিনিষ	...	৬৯৭৮০৭১৲
ঔষধ	...	৬৫৮৭৪৯১৲
রবার	...	৫৪১১৬৬২৲
রং	...	৪৫৬১৩০৯৲
সাইকেল	...	৪২৯১০১৭৲
অন্যান্য জিনিষ	...	৭৩৫৭৮৮২০৲

মোট ৭৯ কোটি ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৭৮ টাকা। আলোচ্য বর্ষে মদ স্পিরিট প্রভৃতির আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৫-২৬ সনে মোট ১৪৬ কোটি ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৭৯ টাকার জিনিষ কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

পিতল ও কাঁসার কারবার*

বীরভূম

দুবরাজপুর ও নলহাটী এই দুইস্থানে পিত্তল ও কাংস্যের জিনিষ তৈয়ারী হয়। নলহাটীর বাসন পালিশের জন্য খ্যাত। চাউল মাপিবার "পাই" (কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও উপরে পিতলের কাজ করা) নলহাটীতে প্রস্তুত হয়। ইহা এমনই সুন্দর যে, বিদেশী সাহেবগণ পর্য্যন্ত ইহা খরিদ করিয়া লইয়া ড্রয়িংরুম সাজাইয়া রাখেন।

বর্দ্ধমান

বনপাস, ডাঁইহাট, পূর্ব্বস্থলী ও কালনা। এই সকল স্থানে পিত্তল ও কাঁস্যর জিনিষ প্রস্তুত হয়। ডাঁইহাটে পিত্তলের বড় বড় পাত্র ও পেটা পিতলের নানাবিধ বাসন তৈয়ারী হয়।

হুগলী

আরামবাগের অন্তর্গত বালি এবং বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, সাহাগঞ্জ এইসকল স্থানে পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হয়। মগাইবাটা, শালবোট, রেকাবি সাহাগঞ্জের বিশেষত্ব। বৈচির নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে কংসবণিকগণ পিত্তলের কব্জা, ছিটকিনি ও ঘুঙ্গুর তৈয়ারী করেন।

হাওড়া

কল্যাণপুর অঞ্চলে কয়েকটী ছোট ছোট কারখানা আছে।

মেদিনীপুর

চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, খড়ার ও ঘাটাল বাসন প্রস্তুতের প্রধান স্থান। খড়ারের কাঁসার বড় বড় থাল, পিতলের বদনা, পাওলি এবং ঘাটালের পিতলের গাড়ু বিখ্যাত। খড়ারে প্রায় ১০০টী কারখানা আছে এবং তাহার বারো আনা অংশ অপর জাতীয় লোক কর্ত্তৃক অধিকৃত।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়র। বাঁকুড়ার বাসন বলিলেই সাধারণতঃ বিষ্ণুপুরের বাসন বুঝায়। বাঁকুড়ায় জল রাখিবার বড় বড় পাত্র প্রস্তুত হয় ও পাত্রসায়রে পিতলের বাটী, গেলাস ও লোটা তৈয়ারী হয়। বিষ্ণুপুরে প্রায় দুইশতটী পরিবার বাসন নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এখানকার অনেকে জার্ম্মাণ সিলভার ও গান্-মেটাল ধাতুর বাসন তৈয়ারী করেন। তামা, দস্তা ও রাং মিশ্রণে একটি মিশ্র ধাতু বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রস্তুত হয় এবং এই ধাতু-নির্ম্মিত বাসন, যথা গেলাস, বাটী প্রভৃতি ছোট নাগপুর, হাজারীবাগ, পঞ্চকোট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কলিকাতা

কলিকাতার সিমলা কাঁসারীপাড়া পিত্তলের বাসন প্রস্তুতের প্রধান স্থান। এই অঞ্চলে ছোট বড় অনেকগুলি কারখানা আছে। ডেকচি, গামলা, পরাত, হাঁড়ি বগুনা, ঘড়া, থালা, বদনা প্রভৃতি সিমলা ও পাথুরিয়াঘাটার

* তথ্যগুলা কংসবণিক পত্রিকা হইতে সংগৃহীত। লেখক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস।

বিশেষত্ব। পুষ্পপাত্র, বদনা প্রভৃতি তামার চাদরের অনেক জিনিষও সিমলায় তৈয়ারী হয়। ভবানীপুর ও বেহালায় পিত্তলের গহনা, পিত্তলের বোতাম, পিত্তলের কব্জা প্রভৃতি প্রস্তুতকারী কয়েকজন কারিগর আছেন।

কলিকাতা বড়বাজার ও কলিকাতা নূতন বাজার বাসন বিক্রয়ের প্রধান স্থান। ইহা ব্যতীত কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা ঘাটে বহুতর ছোটবড় বাসনের দোকান আছে।

ভবানীপুর, শোভাবাজার ও পটলডাঙ্গার কংসবণিকগণ জুয়েলার বা গহনা প্রস্তুতকারক বলিয়া খ্যাত। মণি-মুক্তা-হীরা-খচিত ও মিনের গহনা নির্ম্মাণ ভবানীপুরের বিশেষত্ব।

২৪ পরগণা

টাকী, বসিরহাট ও বাদুড়িয়া অঞ্চলে কয়েকটী কারখানা ও বাসনের দোকান আছে।

নদীয়া

নবদ্বীপ, শান্তিপুর ধর্ম্মদহ, মাটিয়ারী, ডাঁইহাট, বহিরগাছি, সাধনপাড়া, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর দৌলতগঞ্জ বাসন প্রস্তুত ও বাসন বিক্রয়ের প্রধান স্থান। শান্তিপুরের পিত্তলের নানা প্রকারের বাসন, রাণাঘাটের পিত্তলের পরী বৈঠক ও সর্প বাতিদান এবং তামার তুলসী-ঝরা এবং নবদ্বীপ ও ধর্ম্মদহের খাগড়ার অনুকরণে প্রস্তুত কাঁসার বাসনের বাজারে বিশেষ খ্যাতি আছে। এরূপ শুনা যায় যে, নবদ্বীপ ও বহিরগাছি অঞ্চল হইতে বৎসরে প্রায় পঁচিশ হাজার মণ বাসন কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে এই দুই গ্রামে প্রায় ৩০০ ঘর কারিগর ছিল। এক্ষণে তাহা কমিয়া গিয়াছে। কারিগরগণ প্রায় সকলেই মহাজনের নিকট দেনায় আকণ্ঠ বিক্রীত হইয়া আছে।

মুর্শিদাবাদ

খাগড়ার কাঁসার ডিস্, গ্লাস, ডিবা প্রভৃতি জগৎ-বিখ্যাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার হাত-পালিশ বাসন, বৈদ্যুতিক কলের পালিশকে হারি মানাইয়া দেয়। জঙ্গীপুরে অনেকগুলি কংসবণিকের বাস ও তাঁহারা কাঁসার জিনিষ তৈয়ারী করিয়া থাকেন।

যশোহর

কেশবপুর ও মূলগ্রামে পিতল-কাঁসার জিনিষ তৈয়ারী হয়। কোট চাঁদপুরের অন্তর্গত মহেশপুর এককালে বাসন প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল; কিন্তু এক্ষণে তথায় একটীও কারিগর নাই। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পতিত হইয়া তাঁহারা ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। বজরাপুর হইতে অনেকগুলি বাসনের নৌকা বাহির হইয়া বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় বিক্রী করিতে যাইত, এখন কমিয়া গিয়াছে। মুটের মাথায় দিয়া অথবা ঘোড়ার পৃষ্ঠে অথবা নৌকা ফেরি করিয়া—বজরাপুর, মূলগ্রাম, মুন্সেফপুর, বাটাজোড় প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক কংসবণিক বাসন বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বাটাজোড়, মুন্সেফপুর গ্রামের কংসবণিকগণ পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট পিতল কাঁসার গহনা প্রস্তুত করিতেন—মধ্যে জার্ম্মাণ সিলভারের ঢালাই গহনা প্রস্তুতে বাটাজোড়ের বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও কংসবণিকের সংখ্যা নিতান্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

খুলনা

এই জেলায় কোন কংসবণিকের আদি বাসভবন নাই। তবে বাটাজোড়ের কংসবণিকদের বাসন বিক্রয়ের ও পুরাতন বাসন মেরামতের অনেকগুলি দোকান খুলনা সহরে আছে। ইঁহাদের নিকট হইতে অনেকে পূর্ব্ববঙ্গের প্রস্তুত ও কলিকাতার বাসন লইয়া নৌকাযোগে বিক্রয়দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে।

রাজসাহী

কলম ও বুধপাড়ায় কাঁসার ও ভরণের বাসন প্রস্তুত হয়। পলুয়াপাড়া, কলম ও কানাইখালিতে উৎকৃষ্ট কাঁসার চামচ ও হাতা তৈয়ারী হয়। কানাইখালি ও পলুয়াপাড়ার কারিগরগণের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব ও মুসলমান আছে।

কানাইখালির চামচ-নির্ম্মাণকারিগণের মধ্যে একটী কো-অপারেটিভ সমিতি স্থাপন করিয়া কারিগরগণকে মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের প্রত্যেকের দৈনিক আয় ॥৵০ স্থলে ১৲ টাকা কি১।০ টাকা হইতেছে।

এক রাজসাহী অঞ্চলে বৎসর প্রায় চারি হাজার মণ পিত্তল ও কাংস্যের জিনিষ প্রস্তুত হয়। ইহার আনুমানিক মূল্য চারি লক্ষ টাকা।

দিনাজপুর

এই জেলার কংসবণিকগণের মধ্যে অনেকেই সোণারূপার গহনা প্রস্তুত করেন। বালুরঘাট অঞ্চলের কতিপয় উদ্যমশীল যুবক জাতীয় শিল্প-বাসনপ্রস্তুত কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য আজ প্রায় ৩ বৎসর হইল নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত স্থানসমূহের কারিগরগণ (যাহারা সাধারণতঃ অপরজাতীয় লোক) কংসবণিক যুবকগণকে কোনপ্রকার শিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এবং উক্ত স্থানসমূহের কারখানার মালিকগণ সম্পূর্ণভাবে অপরজাতীয় কারিগরগণের হস্তে পুত্তলিকা হইয়া থাকায় যুবকগণকে হতাশ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি

এই জেলায় পিত্তল বা কাঁসার জিনিষ প্রস্তুত হয় কিনা অদ্যাবধি কোন সংবাদ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

রংপুর

শুনা যায় যে, নিলফামারী মহকুমার অন্তর্গত গোমনাটী গ্রামে পিত্তল ও কাংস্যের নানাবিধ বাসন প্রস্তুত হয়।

বগুড়া

এই জেলায় কাঁসা পিতলের কোন জিনিস প্রস্তুত হয় কিনা সংবাদ পাওয়া যায় নাই। দুপচাঁচিয়া, বোড়াই, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি গ্রামের কংসবণিকগণ সোনারূপার কার্য্য করিয়া থাকেন।

পাবনা

পাবনার নিকটবর্ত্তী মালঞ্চী গ্রামে পূর্ব্বে কয়েক ঘর কংসবণিকের বাস ছিল ও তাঁহারা পিতলের গহনা প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এক্ষণে তথায় কোন কংসবণিক নাই।

সম্প্রতি মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানের কয়েকজন উৎসাহী কংসবণিক শিল্পী সিরাজগঞ্জ শহরে যাইয়া কংসবণিকের জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায় পরিচালন করিতেছেন।

মালদহ

এই জেলা কংসবণিকের জাতীয় শিল্পের একটী প্রধান স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জেলার কলিগ্রাম কুতুবপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও ইংরাজবাজার অঞ্চলে পিতলের নানাপ্রকার বাসন, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কুতুবপুরের লোটা ও নবাবগঞ্জের বাসনের বেশ নাম আছে। নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত শঙ্করবাটী, মাঝপাড়া ও বিল পাড়ায় অন্ততঃ এক হাজার ঘর মুসলমান কারিগর বাস করে। ইহারা কংসবণিকের শিল্প ও ব্যবসায় উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ গ্রামে কারখানা স্থাপন করতঃ মাল প্রস্তুত করিতেছে। উহাদের মধ্যে কয়েকজন যুবক লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছে এবং একটী যৌথ বিক্রয় কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে। যৌথ বিক্রয় কোম্পানীর কার্য্য হইতেছে কারিগরগণকে সর্ব্বদা কাজ দেওয়া ও তাহাদের হস্তনির্ম্মিত জিনিষের খরিদ্দার সংগ্রহ করা। উক্ত কোম্পানী কোম্পানী-আইনানুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত। সম্প্রতি কোম্পানীকে কো-অপারেটিভ আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করার কথা চলিতেছে। এক নবাবগঞ্জ অঞ্চলে আনুমানিক তিন হাজার মণ কাঁসার জিনিষ ও চারিহাজার মণ পিত্তলের জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে, যাহার মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। নবাবগঞ্জ কংসবণিকের জাতীয় গৌরব-পতাকা বহু কারখানায় পরিবৃত।

দার্জ্জিলিং

নেপাল অঞ্চলের কতিপয় কারিগর দার্জ্জিলিং ও কাসিয়াংএ বাস করে। তাহারা পিত্তলের জিনিষপত্র নেপাল হইতে আনাইয়া বিক্রয় করে। নেপালের পিত্তলের জিনিষের চাহিদা ভারতবাসী ও বিদেশীর মধ্যে খুব আছে।

ঢাকা

ঢাকা নিজ শহরের উপর কংসবণিকের কোন ব্যবসায় নাই; তবে সাহা প্রভৃতি জাতির কয়েকখানি বড় বড় বাসনের দোকান আছে। ঠাটারীবাজার, ফিরিঙ্গি-বাজারে পূর্ব্বে কিছু কিছু কাঁসা পিত্তলের জিনিষ তৈয়ারী হইত।

লৌহজং চাদর পিত্তলের কলসী, হাঁড়ী, বগুনা, রামচন্দ্রপুরী ঘটি প্রভৃতি বহু জিনিষ প্রস্তুতের বিখ্যাত স্থান। এই লৌহজং পূর্ব্ববঙ্গের কাঁসা পিত্তলের বাসনাদির বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানকার কংসবণিকগণের প্রস্তুত চাদরের পিত্তলের মাল বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। এ যাবৎকাল এই ব্যবসায়টি সম্পূর্ণ ই কংস-বণিকগণের হাতে ছিল। বর্ত্তমানে অপর জাতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

ধামরাইএর কাঁসার বাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে ইহার সমগ্রই বোধ হয় অন্যান্য জাতির প্রস্তুত; কারণ ধামরাইয়ে কংসবণিক আছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় নাই।

ফরিদপুর

পালং, বিলাসখান দাসর্ত্তা, কাঁঠালবাসী ও বাখিয়া অঞ্চলে বহু কংসবণিকের কারখানা আছে। তথায় চাদর পিত্তলের কলসী হাঁড়ি বগুনা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বহুস্থানে বিক্রী হয়। লৌহজং এবং এই সকল স্থানের প্রস্তুত বাসনগুলি "রাজনগরের বাসন" নামে প্রসিদ্ধ।

ময়মনসিং

জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত ইসলামপুর, টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কাগমারী পেটা পিত্তলের কলসী ও কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত। কিশোরগঞ্জ, হোসেনপুর, বাজিৎপুর ও ভৈরবে বাসন মেরামতের কয়েকখানি দোকান আছে।

বাখরগঞ্জ

ঝালকাঠী, মহদীপুর, নন্দপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে পিত্তলের ঘটি ও টুপি রাখিবার কালেফ প্রস্তুত হয়। মহদীপুর ও নন্দপাড়াবাসী কংসবণিকগণের মধ্যে পিত্তল কাঁসার বাসন মেরামতের অনেক সুদক্ষ কারিগর আছে। তাঁহাদের অনেকে বহু মেলা-মোকামে মেরামতের কার্য্য করিয়া স্বীয় অবস্থা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন।

ত্রিপুরা

ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বিটঘর, রামচন্দ্রপুর, মাদ্রা, বাহুরগড় ও পান্ধন খাঁ বাজারে চাদর পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণবেড়িয়া কাঁসারীপাড়া অঞ্চলে আনুমানিক ৫০টী পরিবার পিত্তলের বাসন প্রস্তুত কার্য্যে লিপ্ত আছেন। কলস, ঘটী, ডেকচি প্রভৃতি প্রস্তুত করা তাহাদের উপ-জীবিকা। এখানকার কংসবণিক শিল্পজীবিগণ আপনা-দিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

নোয়াখালি

নোয়াখালি সহরে ও চৌমোহনীতে কয়েকজন কংস-বণিকের বাসনের কারবার আছে। ফেনীতে কয়েক জনের বাসন ও ঝালাইএর কারবার আছে। এখানে পিত্তলের কুপী তৈয়ারী হয়। নোয়াখালিতে চাদর পিত্তলের উৎকৃষ্ট বদনা ও টুপী রাখিবার কালেফ প্রস্তুত হয়।

চাটগাঁ

চাটগাঁয় পিত্তলের হুঁকা প্রস্তুতের কয়েকটী কারখানা

আছে। এই হুঁকা ২৷৷০ হইতে ২৸০ টাকায় বিক্রয় হয়। এই হুঁকা বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

ট্রেনে শীতের বাজার

ই, বি, রেলওয়ের শীতের মরশুমের বাজার-ট্রেণখানি গত ৫ই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জে পৌছিয়া ২ দিন অপেক্ষা করিয়া উল্লাপাড়ায় গিয়াছে। উভয় স্থানেই এই স্পেশাল বাজার-ট্রেণের প্রদর্শনী দেখিবার জন্য অনেক দর্শক সমবেত হইয়াছিল। দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য রাত্রে সিনেমা চিত্রপট দেখান হইয়াছিল।

পোর্টকমিশনারের কুলী

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে পোর্টকমিশনারের ১৫০০ কুলী ধর্ম্মঘট করে। বেতন ও চাকুরী সম্বন্ধেই ইহাদের অভিযোগ। কলিকাতা পোর্টকমিশনারের অধিকাংশ কুলী আজিমগড় প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আমদানি। খাস বাঙ্গালী কুলীর সংখ্যা অতি নগণ্য, নাই বলিলেই চলে। ধর্ম্মঘটকারিগণের নিবেদন যে তাহাদিগকে কলিকাতা ও দেশে দুইটি বাড়ীর ভরণপোষণ খরচ খরচা চালাইতে হয়। খাদ্য দ্রব্য ও বস্ত্রাদির চড়া দাম, ও বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি কলিকাতার অত্যধিক খরচ বহন করিয়া দেশে পাঠাইবার মত টাকা তাহাদের হাতে আর থাকে না। তাহারা মাসিক ২৮৲ করিয়া বেতন পায়। বাৎসরিক কোন বৃদ্ধি নাই এবং পুরাতন ও নূতন লোক সকলকেই ঐ হারে বেতন দেওয়া হয়। সর্দ্দারগণ ৩০ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত বেতন পায়। উপরি মেহনতের জন্য ঘণ্টায় মাত্র এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়। রবিবারে কাজ করিলে ঐ দিনের জন্য ৸০ বেশী দেওয়া হয়। কিন্তু রবিবারে আবার কাজ না করিলে শনি ও রবি দুই দিনের বেতনই কাটা যায়। পীড়িত হইলে ডাক্তারী সার্টিফিকেট দেখাইলে অর্দ্ধ বেতন মঞ্জুর করা হয়। ডাক্তারী সার্টিফিকেট না দেখাইতে পারিলে বেতন কাটা যায়। এই সার্টিফিকেট যোগাড় করিতে টাকা লাগে। কুলীরা কয়েক দিন পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে তাহাদের হাতে মোটেই অর্থ থাকে না, সুতরাং ঐ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। ফলে তাহাদের অনুপস্থিতির বেতন কাটিয়া লওয়া হয়। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বা ভবিষ্যতের পুঁজি বলিয়া কোন জিনিষ এখানে নাই। বেতন সমেত ছুটী দিবার ব্যবস্থাও এখানে নাই।

মাত্র ৫০০ কুলীকে সরকার হইতে খিদিরপুর অঞ্চলে বাসস্থান দেওয়া হয়। ঐ সকল কুলী-ব্যারাকের এক এক কামরায় ৮জন করিয়া কুলী থাকে। এই ৫০০ শত ছাড়া আর সকল কুলীকেই অন্যত্র পয়সা খরচ করিয়া থাকিতে হয়। ইহাদের আরও অভিযোগ যে পোর্টকমিশনারের কুলীর চাক্‌রী পাওয়াও নাকি সহজসাধ্য নয়। যে বাবুটি কুলী ভর্ত্তি করেন তাঁহাকে দস্তর মত ৭ হইতে ৮ টাকা ঘুস দিতে হয়। ইহা না দিলে চাকরীতে বাহাল হওয়া যায় না। রান্না করিবার সময় না পাওয়ায় কুলীদিগকে রাস্তার হোটেলে খাইতে হয়। ইহার জন্য মাসিক ১৫৲ করিয়া ব্যয় হয়। খাওয়া বাদে বেতনের মাত্র ৩৲ তাহাদের হাতে অবশিষ্ট থাকে। ইহা দ্বারা বাসাভাড়া কাপড়চোপড় খরিদ প্রভৃতি অন্যান্য খরচা তাহাদিগকে চালাইতে হয়।

সরকারী কৈফিয়ৎ

পোর্টকমিশনারের আফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, খাদ্যদ্রব্যের বাজারদর মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই বরং কমিয়াছে। এ দিক্ দিয়া কুলীদের অভিযোগ অমূলক। সরকার নাকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে।

২০৲ টাকার বেশী কুলীদিগকে বেতন দেওয়া যাইতে পারে না। তাহারা মাহিনা ছাড়া উপরিও কিছু উপায় করে। খিদিরপুর কুলী কোয়াটারে যাহারা থাকে তাহাদিগকে পোর্টকমিশনারের তরফ হইতে গাড়ী করিয়া বিনা খরচায় পৌছাইয়া দেওয়া হয়। কুলীদের আহারাদি বাবদ মাসিক ১৫৲টাকা করিয়া ব্যয় হয়। সরকার এই তথ্য অনেক বিবেচনার পর গ্রহণ করিয়াছেন। চাকুরীতে ভর্ত্তি হইবার সময় কুলীদিগকে ৭।৮ টাকা ঘুস দিতে হয় এ অভিযোগ

অনেকাংশে সত্য; কিন্তু সরকার ইহা প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য

গত দশ বৎসরে গড়পড়তা জন্ম-সংখ্যার হার যত ছিল, তাহা অপেক্ষা ১৯২৫-২৬ সনে বাঙ্গালার ১৩টী জেলায় জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই উন্নতি বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে। মৃত্যুসংখার হার কলিকাতা ছাড়া বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলাতেই কমিয়াছে। বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানে এই সংখ্যা খুব কমিয়াছে। প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মৃত্যুসংখ্যা বেশী, কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে মুসলমানের মৃত্যুসংখ্যা হিন্দু হইতে সামান্য কম। আলোচ্য সনে সমগ্র বাঙ্গালায় মৃত্যুসংখ্যা হইতে জন্মের সংখ্যা ২১৮৬২৪ বেশী। বাঙ্গালা দেশে কালাজ্বরের প্রকোপ কি প্রকার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, এই বৎসরে খুব স্পষ্ট ভাবে তাহা ধরা পড়িয়াছে। নিম্নে কয় বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা দেওয়া হইল। ১৯২১—১৫৫২; ১৯২৩—৪৫৬৫; ১৯২৪—৯৯৯৭; ১৯২৫—১৬৭৬৬। ১৯২৫ সনে ৫ লক্ষেরও উপর লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে।

কৃষি বিদ্যালয়

বর্দ্ধমান জেলার অধীন অমরপুর নিবাসী রায় বাহাদুর মন্মথনাথ পাল মহাশয়ের স্থাপিত শ্রী বিমলা এগ্রি-কালচারাল হাইস্কুল অমরপুর গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের বিশেষ উপকার করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু দরিদ্র ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করিয়া আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পল্লীর ভিতর সামান্য পাঠশালায় পড়া ছাড়া দরিদ্র বালক-দিগের লেখাপড়া শিখিবার কোন উপায় ছিল না। সেই পল্লীর আজ এরূপ উন্নতি আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

(শক্তি)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোন-কোম্পানী

এই কোম্পানীর ষষ্ঠ বিংশতি বৎসরের উদ্বর্ত্তপত্র, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এপ্রিল ১৯২৬ হইতে মার্চ্চ ১৯২৭ পর্য্যন্ত বর্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর হইতে পুঁজি বাড়িয়াছে ২৫০৯৮৷৵৩॥০ পাই, সর্ব্বপ্রকার আমানত ৫২৪৪॥৫॥ পাই, সর্ব্বপ্রকারে প্রদত্ত ঋণ ১০৮৫৬১৸০ আনা। আলোচ্য বর্ষে নিট লভ্য ২১২৪৫৸৵॥ পাই মধ্যে ৩৭৯৯।৵০ আনা ডিক্রীভুক্ত অনাদায়ী সুদ। তাহা পূর্ব্বাপর বৎসরের ন্যায় সিংকিং ফাণ্ডে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৩৭৮১৯৸৶৩ পাই নিম্নলিখিতভাবে নিয়োজিত আছে:—অফিস কম্পাউণ্ড ১২০০০৲, দালানের মূল্য ৪৭২৫৲, খোস খরিদা সম্পত্তি ১৪২৯৪৷৵৩ পাই ও দায়ী-কানের নীলাম খরিদা সম্পত্তি ৬৮০০।৶০ আনা।

আলোচ্য বর্ষে ৩২ বার ডিরেক্টর সভার অধিবেশন হইয়াছে।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী

১৯২৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর তাহাতে ১৭০,৪২৬ পাউণ্ড বা প্রায় ২২ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রেফারেন্স শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বাবদ ৫০ হাজার পাউণ্ড বা ৬½ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া প্রায় ১৫½ লক্ষ টাকা থাকে। ইহার মধ্যে শেয়ার-হোল্ডারদিগকে ৫% হিসাবে লভ্যাংশ দিয়া প্রায় ৭০,০০০ পাউণ্ড বা ৯ লক্ষ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা করা হইয়াছে। যাহা লাভ হইতেছে তাহার অধিকাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডের হিসাবে দেখাইতেছে ও লভ্যাংশ বেশী দিতেছে না ও এইরূপে দেখাইতেছে যে, লাভ অতি সামান্য হইতেছে। কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ এখন ২১৩,৩২৮ পাউণ্ড বা প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। অথচ যে সকল লোক ট্রামে কার্য্য করে তাহাদের অধিকাংশের মাহিনা মাসিক ১২৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকা মাত্র।



ভারতের আমদানি বাজার

ভারত সরকার হইতে বছর বছর একখানা করিয়া আমদানি-রপ্তানির খতিয়ান্ পুস্তক বাহির হয়। এই পুস্তকের প্রাণ হইতেছে অঙ্ক ও তথ্য। লেখার অংশ কম থাকে।

এই অঙ্ক ও তথ্যগুলির দিকে বাঙ্গালীর ছেলেকে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হইবে। এগুলিকে নীরস বলিয়া উড়াইয়া দিলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারটাতে হাত মক্স করাও ঘটিয়া উঠিবে না। বাস্তবিক পক্ষে এই অঙ্ক ইত্যাদি নীরস বস্তু নয়। ইহাদের মর্ম্মকথা পড়িতে পারিলে বিশ্ব-বাণিজ্যের অনেক কাহিনী আপনাআপনি উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে।

২৩১ কোটি টাকার উপর আমদানি

১৯২৬-২৭ সনে ভারতের মোট আমদানির পরিমাণ মোটামুটি ২,৩১,৩১,৫৮,০০০৲ টাকা। তার আগের ৪ বছরের হিসাব এইরূপ :—

১৯২২-২৩	...	২,৩২,৭০,৭৭,০০০৲ টাকার
১৯২৩-২৪	...	২,২৭,৬১,২৩,০০০৲ „
১৯২৪-২৫	...	২,৪৬,৬২,৫৪,০০০৲ „
১৯২৫-২৬	...	২,২৬,১৭,৭৫,০০০৲ „

অর্থাৎ গড়ে প্রতি লোক ৭ টাকার বেশী বিদেশী জিনিষ কিনিয়াছে।

আমদানির মাথা ও লেজ

সমস্ত জিনিষ আর কিছু সমান আমদানি হয় না। কোনটা বেশী হয় কোনটা কম হয়। শুধু তাই নয়, কোন দেশ যে সর্ব্বদা কোন জিনিষ-বিশেষ সব চেয়ে বেশী কিনিতে পারিবে, তাও নয়। যেমন, ভারতবর্ষ আজ যদি কাঁচা মাল বেশী আমদানি না করে, তবে ৫০ বছর পরেও তা করিবে না বলা যায় না। ৫০ বছর পরে অবস্থা উল্টিয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ কাঁচা মাল বেশী আমদানি করিতে পারে।

শুধু এই তথ্যটা জানিবার জন্য চোখ কাণ খুলিয়া অঙ্কের গহন রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। অনবরত খোঁজ লইতে হইবে আমদানি রপ্তানির জিনিষগুলি কোন্ কোন্ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সম্প্রতি অবশ্য পরিমাণের কথা তুলিতেছি না, দামের কথা বলিতেছি।

ভারতের আমদানি-রপ্তানির সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা দরকার। কোন দ্রব্য শতকরার সামান্য অংশ মাত্র হইতে পারে, তবু তাদের দাম অনেক হাজার টাকা হইবে। যেমন্ তুলা ও তুলার দ্রব্য ১৯২৬-২৭ সনে ভারতীয় আমদানির ৩০·৩০ অংশ, কিন্তু ঘড়ি ইত্যাদি মাত্র ১১ অংশ। দামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারি, তুলার জিনিষের দাম ৭০ কোটি টাকার উপর, কিন্তু ঘড়ি ইত্যাদির দাম ২৫½ হাজার টাকার উপর। অর্থাৎ আমদানির, দিক্ হইতে এটাও ফেল্‌না নয়।

প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য

তথাপি সমগ্র আমদানি বা রপ্তানি দ্রব্যের হিসাব না লইয়া প্রধান প্রধানগুলি লইয়া আলোচনা করিলে আমাদের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতিটা বুঝা যাইবে।

প্রধান আমদানি দ্রব্যগুলিকে ১৯২৬-২৭ সনের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যাইতে পারে।—

দ্রব্যের নাম	মোট আমদানির %	আমদানির দাম (কোটি টাকা)
১। তূলা ও তূলার জিনিষ	৩০·৩০	৭০·০৮
২। ধাতু ও "ওর্"	১০·৩১	২৩·৮৫
৩। চিনি	৮·২৮	১৯·১৭
৪। মেশিনারি ও মিলওয়ার্ক	৫·৮৯	১৩·৬৩
৫। তেল	৩·৯৭	৯·১৯
৬। মোটরকার ইত্যাদি	২·৭৭	৬·৪০
৭। প্রভিশন ও অয়েলম্যান ষ্টোর	২·৩৮	৫·৫০
৮। হার্ডওয়েআর	২·১৯	৫·০৭
৯। কাঁচা ও তৈয়ারী রেশম	১·৯৯	৪·৬০
১০। কাঁচা ও তৈয়ারী উল	১·৯৩	৪·৪৬
১১। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	১·৭৩	৪·০১
১২। সিসা	১.৫২	৩·৫৩
১৩। রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও রোলিংষ্টক	১.৪১	৩.২৬
১৪। মস্‌লা	১.৩৪	৩.০২
১৫। কাগজ ও পোষ্টকার্ড	১.৩৩	৩.০৮
১৬। তামাক	১.১১	২.৫৬
১৭। গ্লাস ও গ্লাসওয়েআর	১.০৯	২.৫২
১৮। কেমিক্যাল	১.০৬	২.৪৪
১৯। ডাই বা রং	.৯২	২.১৩
২০। রবার	.৯১	২.১০
২১। ড্রাগ ও ঔষধ	.৮৯	২.০৭
২২। পোষাক	.৭৭	১৭৮
২৩। ফল ও তরকারী	.৭০	১.৬২
২৪। সাবান	.৬৬	১.৫২
২৫। পেণ্ট ইত্যাদি	.৬২	১.৪৪
২৬। লবণ	.৫৫	১.২৬
২৭। বাড়ী তৈয়ারীর ও এঞ্জিনিয়ারিং মাল	.৫৪	১.২৩

আমাদের দোকান কোথায় ?

এ ত গেল প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যের নাম। এই সব আমদানি দ্রব্য বিভিন্ন দেশ হইতে আসে। কোন্ দেশ কোন্ দ্রব্য কতখানি পাঠায় ?

বিদেশীরা মাল পাঠাইয়া আমাদের নিকট দাম আদায় করিয়া লয়। কথাটা শুনিতে অত্যন্ত সোজা। কিন্তু এই সোজা কথাটার ভিতর লুকাইয়া আছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বাজার গ্রাস করিবার জন্য এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভীষণ লড়াইয়ের কথা।

তুলার বাজারে ইংরেজ বনাম জাপানী

এই লড়াইয়ের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে ইংরেজ ও জাপানী তূলার ও তূলার জিনিষের তুলনায়। এই বিভাগের কটন ম্যানুফ্যাকচার বাবদ্ ১৯২৬-২৭ সনে বিদেশে গিয়াছে ৬৫.০৫ কোটি টাকা। এই বিভাগের মোটামুটি হিসাব এইরূপ :—

টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ	…	৬.৬২ কোটি টাকা
পীস্ গুড্‌স	…	৫৫.০১ " "
হোসিয়ারি	…	১.৪৭ " "
রুমাল ও শাল	…	.১৯ " "
সূতা	…	.৭৪ " "
অন্যান্য	…	১·০২ " "
মোট	…	৬৫.০৫ " "

উপরের তালিকার মধ্যে পীস্‌গুড্‌স এবং টুইষ্ট ও ইয়ার্ণকেই বেশী সম্ভ্রম দিতে হয়। কটন টুইষ্ট ও ইয়ার্ণে ইংল্যাণ্ড ও জাপানের প্রতিযোগিতা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(মোট বাণিজ্যের শতকরা অংশ)

		যুক্তরাজ্য		জাপান
১৯১৩-১৪	…	৮৬	…	২
১৯১৪-১৫	…	৮৭	…	২
১৯১৫-১৬	…	৯১	…	২
১৯১৬-১৭	…	৮৩	…	১৪
১৯১৭-১৮	…	৭৭	…	২২
১৯১৮-১৯	…	২৫	…	৭২

		যুক্তরাজ্য		জাপান
১৯১৯-২০	...	৮১	...	১৩
১৯২০-২১	...	৪৯	...	৪২
১৯২১-২২	...	৭০	...	২৬
১৯২২-২৩	...	৫২	...	৪৫
১৯২৩-২৪	...	৪৯	...	৪৬
১৯২৪-২৫	...	৩৭	...	৫৭
১৯২৫-২৬	...	৩১	...	৬৫
১৯২৬-২৭	...	৪১	...	৫৪

এই অঙ্কগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইংরেজের সহিত জাপানীর এই একটা বিষয়ে টক্করের গুরুত্বটা স্পষ্ট হইবে। জাপান যে ইংল্যাণ্ডকে "হটাইয়া দিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তা বুঝিতেও বিলম্ব হয় না।

পীসগুড্‌সের ক্ষেত্রে

পীসগুড্‌সের বেলায় এই প্রতিযোগিতার রূপটা একটু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে দেখা যাক্।

	যুক্তরাজ্য	জাপান	যুক্তরাষ্ট্র	নেদারল্যাণ্ডস	অন্যান্য দেশ
১৯১৩-১৪	৯৭·১	·৩	·৩	·৮	১·৫
১৯২০-২১	৮৫·৬	১১·৩	·৯	·৯	১·৩
১৯২১-২২	৮৭·৬	৮·৩	২·১	১·১	·৯
১৯২২-২৩	৯১·২	৬·৮	·৫	·৮	·৭
১৯২৩-২৪	৮৮·৮	৮·২	·৫	·৭	১·৩
১৯২৪-২৫	৮৮·৫	৮·৫	·৫	·৬	১·৯
১৯২৫-২৬	৮২·৩	১৩·৯	১·০	১·১	১·৭
১৯২৬-২৭	৮২·০	১৩·৬	·৯	১·১	২·৪

আমদানি বাণিজ্যের মোটা অংশটা ইংলণ্ড ও জাপান নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তীব্র নহে। জাপান ও ইংলণ্ডের রপ্তানির দিকে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, একের বৃদ্ধির অর্থ অন্যের হ্রাস।

তূলার বাজারটা তলাইয়া বুঝিলে ম্যানচেষ্টারের উদ্বেগ, জাপানের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও বোম্বাই-ওয়ালার রাগ ইত্যাদির অর্থ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ধাতব রাজ্য

ধাতব রাজ্যে (ধাতু ও ওর্) ধাতু ও ধাতুর ম্যানুফ্যাকচার আসিয়াছে ২৩.৮২ কোটি টাকার। তন্মধ্যে

লোহা ও ইস্পাত ... ... ১৬.৭৫ কোটি টাকার
অন্যান্য ধাতু ... ... ৭.০৬ „ „

লোহালক্কড়ের কাণ্ড

লোহালক্কড় পাঠায় যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম ও জার্ম্মাণি। এই কয় প্রধান দেশ গত ৩ বৎসর যে পরিমাণ পিগ্ আয়রণ আমাদের দিয়াছে, তার হিসাব এইরূপ :—

	যুক্তরাজ্য	বেলজিয়াম্	জার্ম্মাণি
	টন	টন	টন
১৯২৪-২৫	২,১৪৭	৮১৭	২৭
১৯২৫-২৬	২,৪৬৩	৪১	...
১৯২৬-২৭	৯৯৯	৫০	...

পিগ্ আয়রণ বাদে অন্যান্য লোহা ও ইস্পাতের হিসাব (কোটি টাকায়) :—

	যুক্তরাজ্য	বেলজিয়াম্	জার্ম্মাণি
১৯২৪-২৫	১২.০৫	৩.৭২	১.৬৫
১৯২৫-২৬	১২.২২	২.৮২	১.১৪
১৯২৬-২৭	১০.৩৬	৩.১৩	১.২৫

এটা গেল ভারতের আনীত আমদানির হিসাব। এই হিসাবে বুঝা যাইতেছে যুক্তরাজ্যের স্থান সর্ব্বাগ্রে। বিভিন্ন দেশের শতকরা অংশটা দেখান যাইতেছে :—

	যুক্তরাজ্য	জার্ম্মাণি	বেলজিয়াম	ফ্রান্স	যুক্তরাষ্ট্র	অন্যান্য
১৯১৩-১৪	৫৯.৮	১৯.৬	১৭.০	.১	২.২	১.৩
১৯১৯ ২০	৬৩.০	.২	৩.১	...	৩১.৬	২.১
১৯২০-২১	৭০.০	... ২.১	৯.৭	.৩	১৫.৯	২.০

	যুক্তরাজ্য	জার্ম্মাণি	বেলজিয়াম	ফ্রান্স	যুক্তরাষ্ট্র	অন্যান্য
১৯২১-২২	৪৫.৭	৯.৮	২৬.১	১.৫	১৩.৭	৩.২
১৯২২-২৩	৪৮.১	১২.১	৩০.৭	১.০	৫.১	৩.০
১৯২৩-২৪	৫৬.৭	৮.০	২৮.৭	.৫	২.৪	৩.৭
১৯২৪-২৫	৫০.৫	১০.১	৩১.৪	১.৮	২.০	৪.২
১৯২৫-২৬	৫৫.৩	৭.৮	২৫.৯	৫.১	২.৬	৩.৩
১৯২৬-২৭	৪৮.১	৯.৩	৩০.৪	৩.৯	৩.৪	৪.৯

এটাও বাণিজ্যিক লড়াইয়ের ইতিহাস। ক্ষুদ্র দেশ বেলজিয়াম বিরাট বৃটেনের প্রতিযোগী। ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের বহু পশ্চাতে জার্ম্মাণি, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। যুক্তরাষ্ট্র মাঝে ৩টা বছর ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আবার নামিয়া গিয়াছে।

চিনির বাজারে

চিনির বাজারে কোন্ দেশের অবস্থা কিরূপ? আমরা চিনি কিনি অনেক দেশ হইতে। প্রধান দেশগুলির হিসাব এইরূপ :—

	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
	টন	টন	টন	টন	টন	টন
১। জাভা	৬২৩,০০০	৩৭১,০০০	৩৬৮,০০০	৪৮০,০০০	৬৫৬,৯০০	৬১১,৭০০
২। জার্ম্মাণি	১০০	৯,০০০	৫,১০০	২১,৭০০	১,৫০০	৪৫,২০০
৩। অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গারি	...	...	৭,৮০০	১৩,৫০০	১২,১০০	৩৫,৭০০
৪। চেকো-শ্লোভাকিয়া	১০০	...	৫,৫০০	৫,১০০	১০,৩০০	২৮,৮০০
৫। যুক্তরাষ্ট্র	২,৮০০	১০,৩০০	৩০০	৬০০	২,১০০	১৫,৫০০
৬। বেলজিয়াম	১২,৮০০	৪,৯০০	২,১০০	৬,৫০০	৬,৮০০	১৩,৮০০
৭। মরিশাস্	৬১,৬০০	৩১,৪০০	১,৩০০	১৩৩,০০০	১৯,১০০	১০০
মোট	৭১৭,৬০০	৪৪২,৪০০	৪১১,৫০০	৬৭১,৭০০	৭০২,৬০০	৮২৬,৯০০
দাম (কোটি টাকা)	২৬.৭৮	১৪.৮৫	১৪.৭৮	২০.৩৫	১৫.২০	১৮.৩৭

যবদ্বীপ আমাদের চিনির শুধু বড় বাজার নয়, সেখান হইতে প্রায় ৭৫% অংশ আমদানি আসে। যবদ্বীপের বাস্তবিক প্রতিযোগী মরিশাসের অধঃপতন ঘটিয়াছে। চিনির বাজারে নূতন দেশ চেকো-শ্লোভাকিয়ার অভ্যুদয় লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মেশিনারী ও মিলওয়ার্ক

এই পর্য্যায়ে শতকরা অংশগুলি এইরূপ :—

	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	জার্ম্মাণি	বেলজিয়াম	অন্য দেশ
১৯১৩-১৪	৯০	৩	৬	...	১
১৯২৪-২৫	৮৩·৯	৯·৫	৩·৭	...	২·৯
১৯২৫-২৬	৭৯·৪	৯·৬	৬·০	...	৫·০
১৯২৬-২৭	৭৭·৯	১০·৫	৭·১	১·৭	২·৮

যুক্তরাজ্যকে আর ঠিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে না। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণি নিজ নিজ হিস্যা বাড়াইয়াছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র অগ্রগামী। সম্ভবতঃ অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার ওলটপালট হইয়া যাইবে।

খনিজ তেল

ভারতের বাজারে কে কত তেল পাঠাইতেছে? ১৯২৬-২৭ সনে জ্বালানি তেল (বেল জাহাজের জন্য) ৯ কোটি গ্যালনের উপর, আর কেরোসিন তেল প্রায় ৬ কোটি গ্যালন আমদানি হইয়াছে। মোট আমদানি খনিজ তেলের পরিমাণ ১৮·৩৬ কোটি গ্যালন।

কেরোসিন তেলের আমদানির বহর মাপিলে এইরূপ দাঁড়ায়:—

	১৯১৩-১৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
	কোটি গ্যাঃ	কোটি গ্যাঃ	কোটি গ্যাঃ	কোটি গ্যাঃ
যুক্তরাষ্ট্র	৪·২৩	৫·৪২	৫·৬২	৫·৫৬
বোর্ণিও (বৃ ও ডাচ)	২·০৮	১·১০	১·১৫	·৫০
পারশ্য	·২৩	...	...	...
ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্ট	·২৩ হাজার গ্যাঃ		·৪৭	·২৭
রুশিয়া	·১১	...	...	...
জর্জ্জিয়া		·৫৩	·৪৩	...
ঈজিপ্ট		·১৪	·০৮	...
সুমাত্রা	...	...	·১৭	৪.০
মোট	৬·৮৯	৭·২০	৭·৯২	৬·৪১

মোটর গাড়ীর বিলাসিতা

প্রথমতঃ মোটরকার। ভারতে আমদানি মোটর-কারের হিসাব নীচের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে।

	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	কানাডা	ফ্রান্স	ইতালি	মোট
১৯১৩-১৪	১,৬৬৯	৮৬৮	...	১১১	৭	২,৮৮০
১৯১৪-১৫	১,৩৫০	৫১০	...	৫৪	১৯	২,০০৫
১৯১৫-১৬	৭৮৭	২,১৩৬	...	১২৬	৫৭	৩,১২১
১৯১৬-১৭	৪৮৯	৪,১৬৯	...	৬২	৪৪	৪,৭৭৮
১৯১৭-১৮	৩৯	১,২২২	...	১	১৮	১,২৮২
১৯১৮-১৯	২১	৩৬৮	...	...	১	৪০০
১৯১৯-২০	৪৪৮	৯,৩৫৩	২০	৩	১৭	৯,৯২৫
১৯২০-২১	২,৫৪১	১০,১২০	১,৯৬৮	১৯২	২১৮	১৫,৪৩২
১৯২১-২২	৭৯০	৮০২	৫৭৬	১৫৮	২২২	২,৮৯৫
১৯২২-২৩	৪৪৯	১,৩৮৬	১,৮৪৬	৬১	১৩১	৪,৩২৩
১৯২৩-২৪	১,০০০৫	২,৮৬৫	৩,২৯০	১৫৩	৩৭০	৭,৯৮৪
১৯২৪-২৫	১,৬৮২	৩,১০৬	৩,৯৫৬	২১৫	২৩৫	৯,৩৮০
১৯২৫-২৬	২,৩৯৯	৪,১৪৩	৪,৭৭৫	৩৬৭	৮৬০	১২,৭৫৭
১৯২৬-২৭	২,৫৪৬	৪,০৩০	৪,৪৭৬	৬০৭	১,৪১৬	১৩,১৯৭

এই অঙ্কগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িলে বহু শিক্ষালাভ হইবে বলিয়া মনে করি। ইতালি একদিন ৭খানা মোটর পাঠাইয়াছিল, আজ পাঠাইতেছে প্রায় ১½ হাজার। অদূর ভবিষ্যতে ইতালি, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে টক্করটা আরও বাড়িয়া উঠিবে। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া যাইতেছে। কিন্তু কানাডার ব্যবসা বাড়িতে বাড়িতে আজ সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এটা কানাডার মস্ত বাহাদুরি। শতকরা অংশগুলি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে:—

	কানাডা	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	ইতালি
১৯২৬-২৭	৩৪%	৩০%	১৯%	১১%
১৯২৫-২৬	৩৭%	৩২%	১৯%	৭%

মোটর গাড়ী আমদানির ব্যাপারে কোন্ প্রদেশের স্থান কিরূপ তাও দেখান যাইতেছে:—

বঙ্গদেশ	বোম্বাই	সিন্ধুদেশ	মান্দ্রাজ	ব্রহ্মদেশ
৩২%	২৭%	১৪%	১৪%	১৪%

এ ত গেল শুধু মোটরকারের হিসাব। মোটর সাইকেল ও মোটরলরীর হিসাব অনুরূপ। মোটর লরীর ব্যবসায়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা নিজ নিজ প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু মোটর সাইকেলের বাজারে ইংরেজ আপনার স্থান অধিকতর দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

মোটর সাইকেলের আমদানি

	সংখ্যা	বৃদ্ধি	দাম	বৃদ্ধি
১৯২৫-২৬	১,৬২৯		৯৮৬ লাখ টাকা	
১৯২৬-২৭	১,৮০৩	১১%	১০·৬৭	৬%

ভিন্ন ভিন্ন দেশের হিস্যা

	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্স	জার্মানি
১৯২৪-২৫	১,২০১	১৮০		
১৯২৫-২৬	১,৪৫৮	১১৩	১৮	৬
১৯২৬-২৭	১,৬৬৫	৭৫	১৯	৮

অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ ... ৮২%
১৯২৫-২৬ ... ৮৯%
১৯২৬-২৭ ... ৯২%

আজকাল যাতায়াত ও বাণিজ্য সৌকর্য্যের জন্য বাস্, লরী ইত্যাদির খুব চলন হইয়াছে। এই সুপ্রচলনের সাক্ষ্য নীচের অঙ্কগুলি হইতেও পাওয়া যাইবে।

সন	সংখ্যা	দাম
১৯২৪-২৫	২,১৬২	৩৯ লাখ টাকা
১৯২৫-২৬	৪,৮৪০	৮৮ লাখ টাকা
১৯২৬-২৭	৬,৩৪৪	১২০ লাখ টাকা

সন	কানাডা		যুক্তরাষ্ট্র		যুক্তরাজ্য	
	সংখ্যা	দাম (লাখ টাকা)	সংখ্যা	দাম (লাখ টাকা)	সংখ্যা	দাম (লাখ টাকা)
১৯২৫-২৬	২,৩৭৮	৩০	২,০১৪	৪১	৩৪১	১৯
১৯২৬-২৭	৩,৫২৯	৪৮	২,৩২২	৪৯	৩৩৮	১৪

একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। উপরের হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের জিনিষ যুক্তরাজ্যের চেয়ে সস্তা। বস্তুতঃ, যে দেশ যত সস্তায় মাল ছাড়িতেছে সে তত জিতিয়া যাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সব চেয়ে সস্তা কানাডা, তারপর যুক্তরাষ্ট্র, তারপর যুক্তরাজ্য। আমদানির বেলায়ও ইহাদের স্থান ঐরূপ। দাম সস্তা করিতে না পারিলে ইংল্যাণ্ড কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না।

এইবার ভারতের দেশগুলির কথা একবার বিবেচনা করি। ১৯২৬-২৭ সনের অবস্থা:—

দেশের নাম	মোটরকারের সংখ্যা (ট্যাক্সি সুদ্ধ)	মোটর সাইকেলের সংখ্যা	লরী ইত্যাদির সংখ্যা	মোট
১। বঙ্গদেশ (কলিকাতা ধরিয়া)	১৯,৯৩৮	৩,৫৭৪	২,১৪৪	২৫,৬৫৬
২। বোম্বাই শহর	১০,০৭৯	৮৬৮	৭৮৭	১১,৭৩০
৩। বোম্বাই প্রদেশ (শহর ও সিন্ধুদেশ বাদে)	৬,১৮৯	৬৮৮	১৬১	৭,০৩৮
৪। মান্দ্রাজ শহর	৮,৩০৬	২,২০৭	৯৯২	১১,৫০৫
৫। মান্দ্রাজ প্রদেশ (শহর বাদে)	৪,২১৯	১,৫৪৮	২,৫৯২	৮,৩৫৯

দেশের নাম	মোটরকারের সংখ্যা (ট্যাক্সি সুদ্ধ)	মোটর সাইকেলের সংখ্যা	লরী ইত্যাদির সংখ্যা	মোট
৬। যুক্তপ্রদেশ	৫,৯৬৯	২,১৬০	১,৫৯৭	৯,৭২৬
৭। পাঞ্জাব	৮,২০৭	৩,১০০	২৯৮	১১,৬০৫
৮। ব্রহ্মদেশ	৯,৮৮৮	২,৬৯৯	২,০৯৮	১৪,৬৮৫
৯। বিহার ও উড়িষ্যা	৪,৪২৯	৮৯৫	৭৫১	৬,০৭৫
১০। মধ্য প্রদেশ	৩,১০৫	৮৩৭	৭৯০	৪,৭৩২
১১। সিন্ধুদেশ	২,০৮৭	৮১২	১৩১	৩,০৩০
১২। দিল্লী	২,৯০৭	৭৯২	৩৫৯	৪,০৫৮
১৩। উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	১,৭৩৭	১,১৫৬	৫৫৮	৩,৪৪১
১৪। আজমীড়-মারবার	১৯৯	৭৯	২৮	৩০৬
১৫। আসাম	১,৫০৮	২৭০	৫০০	২,২৭৮
মোট	৮৮,৭৬৭	২১,৬৬৫	১৩,৭৯৬	১২৪,২২৮

মোটরকারের বিলাসিতাটা অবশ্য সোজা বস্তু নয়। অনেক কাঠখড়ের দরকার হয়। কাঠখড় হইল রবারের তৈয়ারী টিউব, টায়ার ইত্যাদি বস্তু। গত দুই বছরের হিসাব নিম্নরূপ :—

	১৯২৫-২৬ সংখ্যা	১৯২৫-২৬ দাম লাখ টাকা	১৯২৬-২৭ সংখ্যা	১৯২৬-২৭ দাম লাখ টাকা
১। নিউমাটিক মোটর কভার	২৬১,০৮২	১,২৩	৩,১০,৫৫১	১,১৮
২। „ মোটর সাইকেল „	৯,৫৬১	২	১১,১৭৯	২
৩। „ সাইকেল „	৫,০৬,৬৫৯	১৫	৬,০০,৭১৩	১৪
৪। „ মোটর টিউব	৩,০৩,৮১৪	২৭	৩,৪৭,৩০২	২৩
৫। „ মোটর সাইকেল টিউব	১১,১৭৭	১	১৪,৯২৪	১
৬। „ সাইকেল „	৫,৭৭,৫৮১	৮	৭,৫১,৯১৯	৯
৭। মোটরকারের জন্য সলিড রবার টায়ার	১৬,৮৬৫	১৩	৯,৫২০	১২

এই সব জিনিষ কোন্ দেশ কতটা যোগাইয়াছে তারও হিসাব দেওয়া যাইতেছে—

		যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্স	কানাডা	
১ নং		৪২	২৩	২৬	১৭	লাখ টাকা
২ নং		৬৪%				
৩ নং		৪২%		৪৯%		
৪ নং		১১	৩	৬		লাখ টাকা
৫ নং	১৯২৫-২৬	৩৪%	৩৪%			
	১৯২৬-২৭	৫৯%	২৮%			

চা-বাগানের কুলী

আসাম সরকার আসাম উপত্যকা বিভাগের ১৯২৬-২৭ সনের আমদানি মজুর রিপোর্টে বলিতেছেন যে, ঐ সনে চা-শিল্পের অবস্থা সচ্ছল ছিল এবং চা-বাগানগুলিও আশানুরূপ চা উৎপাদন করিয়াছে। চা-বাগানগুলিতে কোন মারাত্মক মারী দেখা দেয় নাই। চা বাগানের মজুরদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই ছিল। আসাম উপত্যকার জন্মহার প্রতিমাইলে ৩০·৬২ হইতে ৩১·৬৪ ও সুর্ম্মা উপত্যকার জন্মহার ৩২·৪০ হইতে ৩৩·৭০ হইয়াছে। মৃত্যুহার যথাক্রমে ১৮·০৪ ও ২১·১৬ ছিল।

চা-বাগানগুলিতে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আসাম উপত্যকা অঞ্চলের পুরুষ মজুর মাসিক ১২৷৴৯ পাই রোজগার করিতে। স্ত্রী ও বালকগণের মজুরির হার যথাক্রমে ১০৷৵৭ পাই ও ৬৷৵৮ পাই ছিল। ১৯২৫-২৬ সনে পুরুষ, স্ত্রী ও বালক মজুর যথাক্রমে ১২৷৴১১ পাই, ১০৴১ পাই ও ৫৷৵১১ পাই রোজগার করিত। সুর্ম্মা-উপত্যকা অঞ্চলের মজুরির হার ১৯২৬-২৭ সনে যথাক্রমে ৯৵৯ পাই, ৮৵১ পাই ও ৫৴৭ পাই ছিল। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৯৷৴৯ পাই, ৭৸৴৪ পাই ও ৫৲ টাকা ৫ পাই ছিল। সকল চা-বাগানগুলিতেই এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হয় না; অনেক চা-বাগানের কুলীদিগকে চাষবাস করিয়া খাইবার জন্য জমি দেওয়া হয়। চা-বাগান হইতে কুলীদের চাউল দিবারও ব্যবস্থা আছে। ইহার জন্য অবশ্য কুলীদের বেতন হইতে দাম কাটিয়া রাখা হয়।

১৯২৬-২৭ সনের শেষ ভাগে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চা-বাগানগুলিতে ঐ সনে মোট ১০১০৪৭০ জন কুলী খাটিয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে চা-বাগানের কুলীর সংখ্যা ৯৯৪৭৩৪ জন ছিল। নতুন কুলী ৩৩০০৯ হইতে ৪৫৬৯৪ জন হইয়াছে। এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও স্থানীয় নতুন কুলীর সংখ্যা শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় কুলীদের বসতি হইতে মোটর লরি করিয়া চা-বাগানগুলির কর্ম্মক্ষেত্রে কুলী আমদানি করা হয়।

চা-বাগানগুলিতে কুলীর চাহিদা এখনও মেটে নাই। অন্যান্য শিল্পের প্রতিযোগিতার জন্য চা-বাগানের কাজে যথেষ্ট কুলী মিলিতেছে না।

এই সনে কতকগুলি চা-বাগানে ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি বাগানে ধর্ম্মঘট করিয়া কুলীরা তাহাদের পাওনা আদায় করায় লক্ষীপুর, শিবসাগর ও নওগাঁ জেলার অনেকগুলি বাগানে পর পর বিস্তর ধর্ম্মঘট হইতে থাকে। এই সকল ধর্ম্মঘটে চা-বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ ও কুলীদের মধ্যে তেমন কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। মাত্র দুইটি ঘটনা ভয়ানক আকার ধারণ করে। ডেরাং জেলার সহকারী ম্যানেজারকে কুলীরা খুব মারপিট করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলে। লক্ষীপুর জেলায়ও একটি বাগানের ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার কুলীদের হাতে জখম হয়।

খড়্গপুরে শ্রমিক চাঞ্চল্য

প্রায় একবৎসর হইতে চলিল খড়্গপুরে শ্রমিকদিগের সহিত রেলকর্ত্তৃপক্ষের বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার মীমাংসা হইল না। শ্রমিকদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করার ফলে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। কিছুদিন ধর্ম্মঘট চলিবার পর রেল কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদিগের কতকগুলি দাবী মানিয়া লইলে ধর্ম্মঘট মিটিয়া যায়। কিন্তু শ্রমিকেরা কাজ আরম্ভ করিলে রেলকর্ত্তৃপক্ষ সর্ত্তগুলি পূরণ করা দরকার বিবেচনা করেন নাই। তাহার ফলে শ্রমিকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার পর জুন মাসে ২০০ লোককে জবাব দেওয়া হয় এবং ওয়ার্কশপের ১০,০০০ লোকের মধ্যে ২০০০ লোককে জবাব দেওয়া হইবে বলিয়া নোটিস দেওয়া হয়। রেলকর্ত্তৃপক্ষ যে ধর্ম্মঘটকারীদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন, তাহা ইউনিয়নের নানা প্রতিবাদপত্রে পরিষ্কার ভাবে জানান হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। ৭ই সেপ্টেম্বর প্রায় ১৩০০ লোকের উপর নোটিস দেওয়া হয়। ইহাতে ওয়ার্কশপের সমস্ত শ্রমিকেরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে কর্ম্মত্যাগ করে। কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদিগকে অনাহারে বশ করিবার অভিপ্রায়ে ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে

ওয়ার্ক বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে ১০০০০ লোক বেকার হইয়া পড়ে ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত মহা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যবস্থা পরিষদে সভার কার্য্য একদিন বন্ধ করাইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং গভর্মেণ্টের উপর নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। খড়্গাপুরে শ্রমিকদিগের উপর এই অত্যাচারের ফলে বি, এন রেলের অন্যান্য স্থানের শ্রমিকেরা এবং অন্যান্য রেলের শ্রমিকেরা খড়্গাপুরে রেলওয়ে ফেডারেশানের একটী সভা আহ্বান করে। সেখানে স্থির হয় যে, যদি এইরূপে একসঙ্গে বহুলোককে ডিসমিস করা বন্ধ না হয় তবে সকল শ্রমিকের পক্ষেই বিশেষ বিপদের কথা। এজন্য গভর্মেণ্ট যদি ঐ নীতির পরিবর্ত্তন, না করেন তবে সকল রেলে সাধারণ ধর্ম্মঘট হইবে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাহা হউক ব্যাপার ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে বলিয়া সরকার একটা মীমাংসার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলেন ও এক ইস্তাহারে প্রকাশ করিলেন যে, ভবিষ্যতে শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট একটী অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিবেন। বি, এন, রেলের এজেণ্টও ইস্তাহার বাহির করিলেন যে, ওয়ার্কশপ যতদিন বন্ধ ছিল ততদিনের জন্য কোম্পানী দয়া করিয়া শ্রমিকদিগকে ভাতা দিবেন। শ্রমিকেরা যদি বিনাসর্ত্তে যাইয়া কাজে যোগদান করে তবেই ২ মাস পরে ঐ ভাতা পাইবে।

ইতিমধ্যে কানপুরে রেলওয়ে কনভেনশান ডাকা হয়। সেখানে এবং ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসে গভর্মেণ্টের ও এজেণ্টের নীতির তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য ১০০০০ টাকা তোলা হয়। যাহা হউক গভর্মেণ্ট ও এজেণ্ট আরও সুর নরম করিয়াছেন ও লক-আউট সময়ের মাহিনা দিতে রাজী হইয়াছেন। এখনও ইহাকে সম্মানজনক মীমাংসা বলা যায় না। কারণ ওয়ার্কশপে বিনা সর্ত্তে কাজে যোগদান করিলে ২ মাস বা ১ মাস পরে লকআউট কালের মাহিনা কোম্পানী দিবে। তদ্ভিন্ন মূল যে ডিসমিস লইয়া লক আউট হয়, তাহার কোন সম্মানজনক মীমাংসা হয় নাই। যাহা হউক প্রায় ১০ হাজার লোকের প্রায় তিন মাসের লকআউট কালের মাহিনা শ্রমিকগণের আদায় করিতে সমর্থ হওয়া ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে এই প্রথম। খড়্গাপুরের শ্রমিকেরা গোড়া হইতে যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা, স্বশ্রেণীপ্রীতি, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিরল। তাহারা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হইয়াও যেরূপ নির্ভীকভাবে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাতে বণিক শ্রেণীর বুঝা উচিত ভারতে অবাধ শোষণনীতি আর অধিকদিন চলিবে না।

শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



দুনিয়ার ধনদৌলত

ইতালিতে বাড়ীভাড়া

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইতালির পল্লীতে শহরে বাড়ীভাড়া যেরূপ ছিল তাহার চেয়ে "অত্যধিক চড়া" হারে আজকালকার বাড়ীওয়ালারা ভাড়া আদায় করিতেছিল। মুসোলিনি-রাজ জমীদারদের বিরুদ্ধে কড়া আইন জারি করিয়াছেন (১৪ জুন, ১৯২৭)। আইনটা নিম্নরূপ। যে-যে বাড়ীতে ৪খানা কুঠুরি তাহার ভাড়া সেকালের চারগুণ মাত্র বেশী হইতে পারিবে। এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইতালিয়ান মুদ্রার (লিয়ারের) ক্রয়শক্তি সেকালের তুলনায় প্রায় চার ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ আগেকার তুলনায় চার গুণ লিয়ার দেওয়া সেকালের দাম দেওয়ারই সমান। বুঝিতে হইবে যে, গুনতিতে যে কয়টা লিয়ারই আজ দেওয়া হউক না কেন, ভাড়াটিয়ারা আজকাল সেকালের দরেই বাড়ী পাইতেছে। এই আইনের প্রভাবে প্রত্যেক ভাড়াটিয়া কম ভাড়ায় গৃহস্থালী চালাইতে পারিতেছে। মাস কয়েক পূর্ব্বে যে সকল বাড়ীভাড়া ৫০ টাকা ছিল সেই সকল বাড়ীর জন্য জমীদারেরা এক্ষণে পাইতেছে মাত্র ৪২৲ টাকা।

এই গেল ছোট ছোট বাড়ীর কথা। বড় বড় বাড়ীর ভাড়াও কমিতেছে। ৮ খানা কুঠুরিওয়ালা বাড়ীর জন্য ভাড়া কমিয়াছে শতকরা ১০৲ টাকা। অর্থাৎ মাস কয়েক পূর্ব্বে যেখানে দিতে হইত মাসিক ১০০ টাকা এখন সেখানে দিতে হয় মাত্র ৯০৲ টাকা। দোকান-ঘরের ভাড়াও এই-রূপে কমানো হইয়াছে।

১৯২৩ সনের পর যে সকল ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না। ১৯২৪ সনের পর হইতে যে সকল বাড়ীর ভাড়া বাড়ে নাই তাহাদের অবস্থা এই আইনে বদলাইবে না।

রুমেনিয়ায় "স্বদেশী" ও "সংরক্ষণ"

রুমেনিয়ার শুল্কনীতি সুপরিচিত। স্বদেশী কারবার গড়িবার জন্য অথবা বাড়াইয়া তুলিবার জন্য গবর্মেণ্ট বিদেশী মালের উপর কড়া হারে শুল্ক চাপাইয়াছে। কিন্তু বিদেশী বর্জ্জন সুরু হইলেই ত স্বদেশী কারখানা মাথা তুলে না। স্বদেশী শিল্পকে সৃষ্টি করিবে কে? তাহার জন্য চাই পুঁজি বা মূলধন। কিন্তু অন্যান্য অবনত বা অনুন্নত দেশের মতন রুমেনিয়ায়ও পুঁজির অভাব যৎপরোনাস্তি। স্বাধীন বলিয়াই যে রুমেনিয়া পুঁজিশীল এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। স্বাধীন বলিয়া না হয় বিদেশী মালের উপর উঁচু শুল্ক বসানো সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু পুঁজি সংগ্রহ করা যাইবে কি করিয়া?

তাহার জন্য রুমেনিয়াকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। বিদেশে গিয়া নানা পুঁজিপতির সঙ্গে দহরম মহরম চালাইয়া রুমেনিয়ার শিল্প-বিশেষজ্ঞ আর বাণিজ্য-ধুরন্ধরেরা বিদেশী পুঁজি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে স্বাধীন হইয়া আর্থিক হিসাবে রুমেনিয়া পরাধীন। বিদেশী পুঁজিপতিরা দেখিতেছে যে, রুমেনিয়ায় যতদিন সংরক্ষণ-শুল্ক আছে ততদিন স্বদেশী কারখানায় যে সকল মাল তৈয়ারী হইবে তাহার সঙ্গে টক্কর দিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করা মাল টিঁকিতে পারিবে না। অতএব রুমেনিয়ায় নানা কারবারে বিদেশীরা টাকা ঢালিলে তাহাদের লাভবান হইবার সম্ভাবনা প্রচুর। অর্থাৎ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বিত হইলে দেশের ভিতর কারখানা গড়িয়া

জার্ম্মাণির খেলনা-শিল্প

খেলনা-শিল্পে জার্ম্মাণিই এতদিন সকলের উপর সর্দ্দারি করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রেও প্রভূত পরিমাণে খেলনা প্রস্তুত হইতেছে। ঘরে ও বাহিরের প্রতিযোগিতার ফলে জার্ম্মাণির খেলনা-শিল্প কারখানাগুলি শ্রমজীবীদের উপযুক্তহারে মজুরি দিতে পারিতেছে না। বিদেশী বাজারে রপ্তানিও হ্রাস পাইতেছে। জাপানী মাল প্রাচ্যের বাজার একরূপ দখল করিয়া বসিয়াছে। জার্ম্মাণিকে জাপানের সঙ্গেই বেশী টক্কর দিতে হইতেছে। এদেশের হাট বাজারে জাপান ও জার্ম্মাণ মালের আমদানি হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। ভারতের স্বদেশী খেলনা সেই মাটীর পুতুল, শোলার টুপির মধ্যেই নিবদ্ধ আছে।

বিলাতে ইউনিয়ানের মেম্বার হ্রাস

গত বৎসর বিলাতে জেনারাল ষ্ট্রাইক সফল না হওয়া ইউনিয়ানগুলির মেম্বারের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। শুধু কয়লার খনিতেই ১২৬০০০ মেম্বার কমিয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত গত বৎসর ২৮৯,০০০ মেম্বার কমিয়া গিয়াছে। শ্রমিক নেতাদিগের দুর্ব্বলতা, কমিউনিষ্টদিগকে ইউনিয়ান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া, রুশিয়ার সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, মাইনরিটী আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ান অ্যাক্টের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণে ইউনিয়ানগুলির মেম্বারের সংখ্যা আরও হ্রাস পাইবার আশঙ্কা খুবই বেশী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কমিউনিষ্ট দলের মেম্বারের সংখ্যাও ১০ হাজার হইতে মাত্র ৭ হাজার দাঁড়াইয়াছে। শ্রমিক নেতাদিগের মধ্যে মতানৈক্য দেখিয়া সাধারণ শ্রমিকেরা ইউনিয়ানের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।



ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

চুঁচুড়ায় কৃষি মোসাবিদা

চুঁচুড়া কৃষি-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের জন্য গবেষণাগার (ল্যাবরেটরী) ও লাইব্রারী স্থাপনের জন্য এক মোসাবিদা খাড়া করিয়াছেন। বিদ্যালয়টির সংলগ্ন সরকারী কৃষিফার্ম্মের একটি গৃহে ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। এই কার্য্যের জন্য আনুমানিক ৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার ৩ হাজার ল্যাবরেটরী ও বাকী ২ হাজার লাইব্রেরীর জন্য খরচ করা হইবে। আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যেই এই মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উন্নত প্রণালীতে রেশম চাষ করিবার মতলবও আঁটিয়াছেন। রেশম পোকার চাষ আরও বাড়াইবার আয়োজন চলিতেছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবায় পদ্ধতিতে ১০০ বিঘা জমি রেশম চাষের কাজে ব্যবহার করিতেছেন।

হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম

হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রমটি বালীগঞ্জের ৫৫নং গরাণহাটা রোডে অবস্থিত। এই আশ্রমে ২৫ জন বিধবা থাকেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পশিক্ষাও দেওয়া হয়। সাধারণতঃ সেলাইয়ের কার্য্যই এখানে বেশী হয়। বস্ত্রবয়ন শিক্ষাও এখানে দেওয়া হয়। আশ্রমটী সাধারণের অর্থে প্রতিপালিত। সম্প্রতি আশ্রমে ৪ দিন ধরিয়া একটি প্রদর্শনী হইয়া গেল। আশ্রমের বিধবাগণ ছাড়া বাহিরের লোকও সূচ ও হাতের কাজের অনেক জিনিষপত্র প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীর প্রবেশমূল্য ও প্রদর্শিত দ্রব্য বিক্রয় বাবদ দুই শত টাকার উপর সংগৃহীত হইয়াছিল।

বাণিজ্য-পোতে ভারতবাসী

গত ১লা তারিখ হইতে ভারতবাসী যুবকদিগকে বাণিজ্যপোত পরিচালনা-বিষয়ক শিক্ষাদানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য 'ডাফরিন' নামক জাহাজখানিকে উপযুক্ত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করা হইয়াছে। উক্ত জাহাজের কাপ্তেন যুবকদিগকে উৎসাহ দিবার সময় বক্তৃতা প্রদানকালে জাহাজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মহামান্য যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এই জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন ও মান্দ্রাজ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য এই জাহাজখানিকে নৌ-বিভাগের প্রধান সেনাপতির কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। যুবকদিগকে তিন বৎসর কাল জাহাজে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে জাহাজখানি বোম্বাই নগরীর মাজ্‌গাও হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। শিক্ষার্থি-নির্ব্বাচনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহার ফলে ৭৭ জন আবেদন করিয়াছিলেন। কেন্দ্র হিসাবে পরীক্ষার ফল—বোম্বে ২৯ জনের মধ্যে ১৭; লক্ষ্নৌ ১৪ জনের মধ্যে ৭; লাহোর ২০ জনের মধ্যে ১০; কলিকাতা ১১ জনের মধ্যে ৪; মাদ্রাজ ২ জনের মধ্যে ১; রেঙ্গুন ১ জনের মধ্যে ১ জন। সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চক্ষুপরীক্ষায় ১০ জন বাদ গিয়াছেন। অবশিষ্ট ৩০ জন যুবকের মধ্যে ছয় জন মাত্র বাঙ্গালী আছেন। তাঁহাদিগের নাম—(১) ফরিদপুরের

হবিবুল হক, (২) এলাহাবাদের কৈলাসনাথ লাহিড়ী, (৩) বরিশালের অমিয়াংশু চৌধুরী, (৪) বেনারসের বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) সিমলার প্রেমনাথ কাহিলী, (৬) মথুরার যশেন্দুপ্রসন্ন গুপ্ত।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য কংগ্রেস

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য কংগ্রেসের (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল কংগ্রেস) আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য যে সকল প্রস্তাবের খসড়ার নোটীশ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে কাঁচা ও শুষ্ক চামড়ার ব্যবসায়িগণের সমিতির পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিবার নোটীশ আছে :—

১। (ক) শিল্প-বাণিজ্য কংগ্রেসের কলিকাতার অধিবেশনে এই মর্ম্মে যে একটি প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছিল যে, কাঁচা চামড়া ও শুষ্ক চামড়া চালান দিবার ব্যাপারে যে রপ্তানি-শুল্ক আছে, তাহা বজায় রাখা হউক এবং তাহা শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে আরও বর্দ্ধিত করা হউক, সেই প্রস্তাবটি এই কংগ্রেস সমর্থন করিতেছেন।

(খ) শুল্ককে সেস্‌রূপে পরিবর্ত্তন করিবার যে কল্পনা করা হইয়াছে, সেই কল্পনার সমর্থন করিতে এই কংগ্রেস ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু যদি তাহার পরিবর্ত্তনই করা হয় তাহা হইলেও সেই সেস কেবল কাঁচা চামড়া ও শুষ্ক চামড়া রপ্তানির উপরই আদায় করা কর্ত্তব্য হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে রপ্তানি-শুল্ক যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, সেই পদ্ধতিতেই তাহা আদায় করা উচিত হইবে। অন্যান্য প্রস্তাবে সুগার ট্যাক্স তুলিয়া দিবার এবং ভারতীয় বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প-সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান বা সমিতিসমূহ হইতে পাবলিক বডিসমূহে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

এক্সচেঞ্জের অর্থাৎ মুদ্রা-বিনিময় পদ্ধতির হার সম্বন্ধে শেষ প্রস্তাবে এইরূপ বলা হইয়াছে :—এই কংগ্রেসের দৃঢ় অভিমত এই যে, মুদ্রা-বিনিময় পদ্ধতির হার যে ১ শিলিং ৬ পেন্সে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা ভুল ও অন্যায় নির্দ্দেশ এবং এই দেশে এই সম্পর্কে যে সকল ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা এই ভুল ও অন্যায়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য এই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাহাতে বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৪ পেন্স হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার এই সমস্যাটা পুনরায় উপস্থিত করুন অথবা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ অবস্থায়ই তাহা রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন।

ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান

কলিকাতা ট্রামওয়ে কর্ম্মচারিগণের অনেক প্রকার অভাব অসুবিধা আছে। তাহাদের মাহিনা কম, খাটুনি বেশী, থাকিবার ঘর নাই, কর্ম্মকালে বিপদ বা দুর্ঘটনা হইলে ক্ষতিপূরণ পায় না, ছুটী নাই, যখন তখন ডিসমিস হয় ইত্যাদি নানা অসুবিধাই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। কলিকাতার বুকের উপর জনসাধারণের চোখের সামনে যে এই ৩০০০ লোক কত কষ্ট পাইতেছে, তাহাতে কাহারও সাহায্য দূরে থাকুক একটু সহানুভূতিও পায় না। বহুদিন এজেণ্টের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অবশেষে তাহারা নিজেরা নিজেদের দুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে একটা ইউনিয়ান গঠন করিয়াছে। ৩০৲ টাকার কম কাহারও মাহিনা থাকিবে না, ৮ ঘণ্টার বেশী কেহ একদিনে কার্য্য করিবে না, বৎসরে ১ মাস পূরা বেতনে ছুটী পাইবে এবং এরূপ আরও কয়েকটী দাবী তাহারা এজেণ্টকে জানাইয়াছে। জার্ম্মাণি প্রত্যাগত ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এই ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট এবং শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্র কুমার সান্যাল এই ইউনিয়ানের সেক্রেটারী হইয়াছেন।

ট্রামওয়ে কর্ম্মচারীরা গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রতিনিধি মিঃ পার্শেল ও মিঃ হয়েস ওয়ার্মকে এক অভিনন্দন দিয়াছিল। তাহার উত্তরে ইহারা ইংলাণ্ডে ইউনিয়ান গঠনের ফলে তাহাদের মাহিনা এবং ছুটী কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে এবং কার্য্যের কিরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহার বিশদ বর্ণনা করেন এবং সকলকে ইউনিয়ানে যোগদান করিতে বলেন।

কানপুরে ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস

২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে নভেম্বর তারিখে কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ট্রেড ইউনিয়ান হইতে প্রায় ১০০ ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বৎসর ২ দিন মাত্র অধিবেশন হয়; কিন্তু তাহাতে সময়াভাবে কংগ্রেসের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া এবার তিন দিন চলিয়াছিল। এবার সভাপতি ছিলেন দেওয়ান চামনলাল।

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি ছাপান ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী এক অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহাতে তিনি এদেশের শ্রমিক-আন্দোলনের গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন এবং শ্রমিক আন্দোলন এদেশে কি ভাবে চালান উচিত তাহারও পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল কথা আলোচনা করা আবশ্যক তাহার কোনটাই সভাপতি বাদ দেন নাই। তাঁহার উপদেশ অনুসারে চালিত হইলে এ দেশে শ্রমিক আন্দোলন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই।

মিঃ পার্শেল ও মিঃ হল্‌স্‌ওয়ার্থ

বিলাত হইতে মিঃ কেয়ার হার্ডি সর্ব্বপ্রথম এদেশের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন; তাহার পর বিলাতের অনেক শ্রমিক নেতাই এদেশে শ্রমিকদের অবস্থা দেখিতে আসিয়াছেন এবং এক্ষণে প্রায় প্রতিবৎসরই ২।১ জন করিয়া আসিয়া থাকেন। এদেশে ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবৎসরই অধিবেশনের সময় বিলাতের ট্রেড ইউনিয়ান্ কংগ্রেস ভ্রাতৃভাবে অভিনন্দন পাঠাইয়া থাকেন। এবৎসর বিলাতের ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস সর্ব্বপ্রথম ভারতের ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসে মিঃ পার্শেল ও মিঃ হল্‌স্‌ওয়ার্থ নামে ২ জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। মিঃ পার্শেল পার্ল্যামেণ্টের একজন শ্রমিক-প্রতিনিধি। কয়েক বৎসর বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ান ফেডারেশান বা পৃথিবীর সকল দেশের ট্রেড ইউনিয়ান লইয়া যে সঙ্ঘ আমষ্টার্ডামে আছে, তিনি তাহারও সভাপতি ছিলেন। মিঃ হল্‌স্‌ওয়ার্থ বিলাতের ডিষ্ট্রীবিউটিভ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ানের সেক্রেটারী। ঐ ইউনিয়ানে প্রায় ১ লক্ষ মেম্বার আছে। প্রতিনিধিদ্বয় শুধু কংগ্রেসে ভ্রাতৃভাবে অভিনন্দন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন শ্রমিককেন্দ্রে যাইয়া তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

মিঃ জোন্স

মিঃ জোন্স আর একজন পার্ল্যামেণ্টের শ্রমিক প্রতিনিধি। ইনিও এদেশের শ্রমিকদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে এদেশে আগমন করিয়াছেন। ইনি কানপুর কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া বিলাতের শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে অভিনন্দন করেন।

মিঃ স্প্রাট

মিঃ স্প্রাট বিলাতের লেবার রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট হইতে এদেশের শ্রমিকদিগের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহার নামে বোম্বাইয়ে একটা রাজদ্রোহের মামলা হইয়াছিল। তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কানপুর ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও দর্শকগণ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে এবং সোল্লাসে অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

গৃহীত প্রস্তাব

কংগ্রেস সর্ব্বসম্মতিক্রমে কমিশন বয়কট করার প্রস্তাব পাশ করিয়াছে। বেঙ্গল অর্ডিনান্সের প্রতিবাদ করিয়া আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সাধারণ ভাবে শ্রমিকদিগের দাবী সম্বন্ধে এবং পৃথক পৃথক শ্রমশিল্পের বিশেষ দাবীগুলি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এ বৎসরও আমষ্টার্ডাম্ বা মস্কো কোন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সহিত কংগ্রেসকে যুক্ত না করা স্থির হয়।

কাউন্সিল অব্ অ্যাকশ্যান

যে সকল শ্রমিক ও কৃষক এখনও সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই, যাহাতে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় এজন্য এ বৎসর কংগ্রেসে মিঃ বামনদাসের চেষ্টায় কাউন্সিল অব্ অ্যাকশ্যান নামে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে এবং দেশের নানা স্থানে ইউনিয়ান গঠন করিবার জন্য ৩০০০৲ টাকা কমিটীর হস্তে দেওয়া হইয়াছে। কমিটী হইতে কয়েকজন প্রচারককে মাহিনা দিয়া নিয়োগ করা স্থির হয়। আশা হয় এই ভাবে কার্য্য চালাইলে শ্রমিক সংগঠনের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিবে।

নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ

এবৎসর মিঃ অ্যাণ্ড্রুজ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ জোশী এবৎসরও জেনারেল সেক্রেটারী রহিলেন। কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে এবার শ্রমিক ও কৃষকদল হইতে কয়েকটী নাম প্রস্তাব করা হইবে শুনা গিয়াছিল; কিন্তু পরে একটা আপোষ হইয়া যায় ও কংগ্রেসের নরম দল হইতেই এবার সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রনৈতিক প্রস্তাব

এবার ট্রেড ইউনিয়ানের বিশেষত্ব এই যে, কংগ্রেস অনেকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। শ্রমিক আন্দোলন এখন এদেশে এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে, এখন আর শুধু শ্রমিকদিগের আর্থিক দাবী করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; দেশের সর্ব্বপ্রকার ইষ্টানিষ্টের কথাতেই তাহাকে মাথা ঘামাইতে হইবে। এক কথায় শ্রমিক আন্দোলনের এবার নাবালকত্ব ঘুচিয়াছে বলা যাইতে পারে।

মৎস্যজীবীদের প্রার্থনা

বহুসংখ্যক মৎজীবীর স্বাক্ষরিত এক প্রার্থনাপত্র চট্টগ্রাম হিন্দুসভার সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুত কালীকুমার দাস মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তাহার স্থূল বিবরণ এই :—

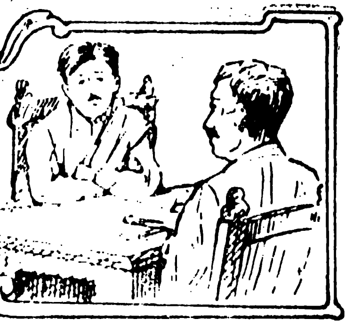
"আমরা হিন্দু সমাজভুক্ত মৎস্যজীবী। আচারে ব্যবহারে আমরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। কিন্তু আমরা এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনাদের ধোপা নাপিত হইতেও আমরা বঞ্চিত? যে সব খৃষ্টান ও মুসলমান মৎস্যের ব্যবসায় করে, আমাদের মধ্যে যাহারা চরিত্র ও ধর্ম্ম হারাইয়া বিধর্ম্মী হয়, এমন কি যে সব পাহাড়ী সর্ব্বভুক্, তাহাদের ক্ষৌরি করিতে বা তাহাদের কাপড় কাচিতে আপনাদের নাপিতেরা ও ধোপারা আপত্তি করে না। আমাদিগকে তীর্থস্থানে ও বাজারে কামাইতেও নাপিতেরা আপত্তি করে না; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কামাইতেই যত আপত্তি। অতএব যাহাতে আপনাদের ধোপা ও নাপিতেরা আমাদের কাজ করে আপনারা হিন্দু-প্রধানগণ মিলিয়া তাহাই করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রর্থনা।"

নদী সংস্কার

সম্প্রতি বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর স্যর ষ্ট্যান্লী জ্যাকসন মহোদয়ের খুলনা গমন উপলক্ষ্যে তত্রত্য জেলা-বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির অভিনন্দন উপলক্ষ্যে প্রতিনিধিগণ পূর্ব্বোক্ত নদী-সংস্কার সমস্যাটির প্রতি লাট বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ তৎপ্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, নূতন লাট সাহেবের নিকট এ সম্বন্ধে আশার বাণী শুনিতে পাইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, গবর্ণর মহোদয় এ বিষয়ের দায়িত্ব জিলা বোর্ড লোকালবোর্ড প্রভৃতির স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া শুধু মামুলি ধরণের উপদেশ দিয়াই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ডাক্তার বেণ্টলী প্রভৃতি বিশেজ্ঞগণের অভিমত গ্রহণ করতঃ বাঙ্গালার এই গুরুতর সমস্যাটির সমাধানে মাননীয় লাট সাহেবকে ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

মোলাকাৎ



ঘুটে কুড়ানীর কাহিনী

[এক বৃদ্ধা। বছর ষাটেক বয়স হইবে। তার চেয়ে কমও হইতে পারে। ঘুটে বেচিয়া খায়। তার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তার মর্ম্ম এইরূপ। শ্রীসুধাকান্ত দে]।

প্রঃ—তোমার বাড়ী কোথায় ?

উঃ—কাশী।

প্রঃ—তোমার বয়স কত বলিতে পার কি ?

উঃ—বয়সের কথা বলিতে পারিব না। তার ত কোন হিসাব রাখি নাই।

প্রঃ—তুমি কলিকাতায় কোথায় থাক ?

উঃ—আপনাদেরই কাছে। মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট।

প্রঃ—তুমি কলিকাতায় কবে আসিয়াছ, তোমার মনে আছে কি ?

উঃ—আমি ত বাবু কোন প্রকার হিসাব রাখি না। বছর ১৫।১৬ হইবে।

প্রঃ—তোমার স্বামী জীবিত আছে কি ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—সে কি করে জানিতে পারি কি ?

উঃ—শিবপুরে এক লোহার গুদামে কাজ করে।

প্রঃ—মাহনা পায় কত ?

উঃ—মাসে ২৪৲ টাকা।

প্রঃ—এতদূর হইতে তোমার স্বামী কাজে যায় কিসে করিয়া ?

উঃ—সে হাঁটিয়া যায়, হাঁটিয়া আসে। যাতায়াতের জন্য তার কোন প্রকার খরচ নাই। তা ছাড়া ফেরী পার হইবার ভাড়াটাও (৵১৫ পয়সা) সে কোম্পানী হইতে পায়।

প্রঃ—তোমার ছেলেমেয়ে কটি ?

উঃ—আমার ছেলে দুটি ছিল। একটি মারা গিয়াছে। একটি আছে। দুই মেয়ে।

প্রঃ—মেয়েদের বিবাহ দিয়াছ কি ?

উঃ—হাঁ, দুই মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। বড়টির একটি ছেলে হইয়া মারাও গিয়াছে। ছোটটি এখনও আমার কাছেই আছে।

প্রঃ—তবে তোমরা পরিবারে এখন কয়জন লোক ?

উঃ—আমি, আমার স্বামী, আমার ছোট মেয়ে ও আমার ছোট ছেলে।

প্রঃ—তবে ত তোমাদের অবস্থা সচ্ছল বলিতে হইবে। ২৪৲ টাকায় তোমাদের সংসার সুখে চলিয়া যাওয়ার কথা। তবু তুমি কেন এই ঘুটে কুড়ানীর কাজ কর ? এইরূপে তুমি নিজের দু' পয়সা আয় বাড়াইতেছ কি ?

উঃ—(কপালে করাঘাত করিয়া) হায় বাবু সাহেব ! আপনি সচ্ছলতার কথা কি বলিতেছেন ! আমার স্বামী যে বে-ইমান, আমরা সুখের মুখ দেখিব কোথা হইতে ?

প্রঃ—তোমর স্বামীকে গালি দিতেছ কেন ?

উঃ—গালি দিব না ? আপনি তার কীর্ত্তির কথা জানেন না, তাই ওরূপ বলিতেছেন। তার মত অপদার্থ লোক দুটী নাই। সে ২৪৲ টাকা কামায় বটে, কিন্তু তার একটা পয়সাও আমাদের দেয় না।

প্রঃ—সেই পয়সা দিয়া সে কি করে ?

উঃ—জুয়া খেলিয়া সব টাকা উড়াইয়া দেয়।

প্রঃ—কোথায় জুয়া খেলে ?

উঃ—সে যে লোহার গুদামে কাজ করে সেইখানেই। জুয়া খেলিয়া খেলিয়া সে ক্রমাগত হারিতেছে। ঋণের দায়ে তার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকাইয়া আছে। সে আমাদের পালিবে কি ? সে একটা পয়সা লইয়াও কারখানার বাহিরে আসিতে পারে না। একেবারে খালি হাতে বাড়ী ফিরে।

প্রঃ—এ ত বড়ই দুঃখের বিষয়। তুমি তোমার স্বামীকে শাসন কর না কেন ?

উঃ—শাসন! কত কাঁদিয়াছি, হাতে পায়ে ধরিয়াছি, গালি গালাজ করিয়াছি, কোন ফল হয় নাই। তার এই বদ্‌খেয়াল কিছুতেই যাইবার নয়। তা না হইলে দেখুন, সে ত মন্দ কামায় না। কোথায় সে আমাদিগকে পালন করিবে, না আমরাই তাকে খাওয়া পরা দিয়া পালিতেছি। তার উপর একদিন যদি ব্যতিক্রম হয় গালাগালি মার ধোর পর্য্যন্ত করে।

প্রঃ—আচ্ছা তোমার প্রথমে কলিকাতায় আসিবার মতি কেন হয় বলত।

উঃ—আমার স্বামী আমার আগেই এখানে আসিয়াছিল। কিন্তু সে আমাদের কোন প্রকার খোঁজ খবর লইত না। লইবে কি প্রকারে ? সে ত জুয়াতেই মাতিয়া আছে। তখন আমার মনে হইল কলিকাতায় যাই, সেখানে বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব। তবু পরের আশ্রয়ে থাকিয়া সুখ নাই।

প্রঃ—তারপর।

উঃ—কলিকাতায় আসিয়া আমি আমার ভাসুরের বাড়ীতে "চানা" ভাঙ্গার কাজ লইলাম। চানা ভাঙ্গিয়া গরুকে খাইতে দিতে হইত। ইহাতে কিছু উপার্জ্জন হইত। এই সময়েই নিজের আয় বাড়াইবার আর একটা পথ বাহির করিলাম। গোবর কুড়াইয়া ঘুটে দিতে লাগিলাম। এই ঘুটে বেচিয়া পয়সা পাইতাম। এই অভ্যাস করিয়াছিলাম বলিয়াই আজও বৃদ্ধ বয়সে সেটা কাজে লাগিয়া যাইতেছে।

প্রঃ—তোমার ছেলে কোন কাজ করে না ?

উঃ—করে বৈ কি। সে গাড়োয়ান। গরুর গাড়ী চালায়।

প্রঃ—কার গাড়ী ?

উঃ—আপনাদের পরিচিত এক হিন্দুস্থানীর। আগে সে দরোয়ান ছিল, এখন বেশ ধনী হইয়া উঠিয়াছে। অনেক টাকা হইয়াছে।

প্রঃ—তোমার ছেলের সঙ্গে এই ব্যক্তির কারবারটা কিরূপ ? তোমার ছেলে নির্দ্দিষ্ট কোন দর্ম্মাহা পায় কি ?

উঃ—না। এই মহাজনের আরও অনেক গাড়োয়ান আছে। কিন্তু কারও সঙ্গেই দর্ম্মাহার সম্পর্ক নাই। শুধু একটা চুক্তি এইরূপ যে, দিন চার আনার পয়সা আমার ছেলেকে দিতেই হইবে। অর্থাৎ এমন অনেক সময় হয় যে কাজকর্ম্মের অভাবে গাড়ী অনেক দিন বসিয়া থাকে। এই সব দিনে আমার ছেলে প্রতিদিন চার আনা করিয়া পাইবে।

প্রঃ—অন্যান্য দিন ?

উঃ—অন্যান্য দিনের "কামাই"টা সেইদিনের ব্যবসার উপর নির্ভর করে। যেদিন বাজার ভাল থাকে সেদিন বেশী উপার্জ্জন হয়। বাজার মন্দা পড়িলে উপার্জ্জন কমিয়া যায়। সুতরাং কোন ঠিক নাই। আয়টা ।৵০, ৷৴০, ॥০, ॥৵০, ৸০ আনা বা ততোধিকও হইতে পারে।

প্রঃ—তা হইলে তোমাদের গোটা পরিবার প্রতিপালনের জন্য তোমার ও তোমার ছেলের আয়টা লাগিতেছে। তোমার জামাতারা তোমাকে সাহায্য করে কি ?

উঃ—না, তারা আলাদা। তাদের পয়সা আমি লই না।

প্রঃ—আচ্ছা এখন বল, তুমি ঘুটে বেচিয়া কত উপার্জ্জন কর ?

উঃ—তার কোন ঠিক নাই। সবদিন সমান উপার্জ্জন হয় না। সাধারণতঃ দিনে ।০-।৵০ আনা পাই। বড় জোর ।৵০ আনা। তবে একটা কথা মনে রাখিবেন। বর্ষাকালের হিসাবটা অন্যরূপ। জল পড়িলে ঘুটে দেওয়া অসম্ভব হয়। সুতরাং সে সময়ে আয়ের ঘর শূন্য থাকে।

প্রঃ—তোমার ঘুটে কি দরে বেচ ?

উঃ—ঘুটে বেচার দরও দুই রকম করিতে হয়। বর্ষাকালে এক রকম, অন্যান্য সময়ে আর এক রকম। বর্ষাকলে এক পয়সায় ৩ গণ্ডার বেশী ঘুটে কিছুতেই দিতে পারি না। সাধারণতঃ ২ গণ্ডা বা ২½ গণ্ডা দি। অন্য সময়ে ৪ গণ্ডা দি।

প্রঃ—ঘুটের জন্য গোবর তুমি কোথা হইতে যোগাড় কর ? তোমাকে পয়সা দিয়া গোবর কিনিতে হয় কি ?

উঃ—না। গোবর আমি কিনি না। রাস্তায় অনেক গোবর পড়িয়া থাকে। তাই কুড়াইয়া লইয়া আসি। আমার ছেলে যে মহাজনের গাড়োয়ান তার অনেক গরু আছে। সেই গোবর আর কাকেও দেওয়া হয় না, আমি পাই। তার বদলে আমি তাদের জন্য কিছু পরিমাণ ঘুটে তাদের বাড়ীর সামনে দি। সেগুলি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। সেজন্য পয়সা দেয় না।

প্রঃ—তুমি একাই কি সব ঘুটে দাও ?

উঃ—না, আমার মেয়েও আমার অনেক সাহায্য করে। সেও ঘুটে দেয়।

প্রঃ—তুমি যেখানে থাক, সেখানে ঘর ভাড়া করিয়া থাক কি ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—মাসে কত টাকা করিয়া ভাড়া দাও ?

উঃ—চার টাকা।

প্রঃ—এবার তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার কথাটা জানিতে চাহিতেছি। খাওয়ার জন্য মাসে তোমার কত খরচ পড়ে ?

উঃ—তার কোন হিসাব রাখি না।

প্রঃ—তবু আন্দাজ করিয়া কিছু বলিতে পার না কি ?

উঃ—আমরা দিন আনি দিন খাই। অর্থাৎ যেদিন যেমন উপার্জ্জন করি, সেদিন সেইরূপ খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়। যেদিন বেশী পাই, সেদিন বেশী খাই। কম পাইলে কম খাই।

প্রঃ—সকাল বেলা কি খাও ? চা খাও কি ?

উঃ—সাধারণতঃ চা খাই না। তবে সর্দ্দি কিংবা জ্বর হইলে চায়ের ব্যবস্থা হয়। আমাদের সকাল বেলার স্বাভাবিক খাওয়া হইতেছে ভাত অথবা রুটি অথবা ছাতু।

প্রঃ—রাতে কি খাও ?

উঃ—রোজ রুটি খাই।

প্রঃ—তোমাদের ৪ জনের রোজ রাতে কত আটা লাগে ?

উঃ—রাতে ১সের আটার কমে হয় না।

প্রঃ—তুমি বলিলে, রোজ আনি রোজ খাই। তা যদি হয়, তবে অসুখ বিসুখ হইলে কি কর ? তখন ত তোমাদের হাতে কিছু না থাকার সম্ভাবনা। উপবাস নিশ্চয় কর না।

উঃ—রোজ আনি রোজ খাই বলিয়া, হাতে এক পয়সাও কি রাখি না ? তেমন ৵০ আনা ।০ আনা রাখিতেই হয়। সুতরাং অল্প স্বল্প বেয়ারাম হইলেও উপবাস করিতে হয় না।

প্রঃ—দেশে তোমার কে আছে ?

উঃ—ভাই, ভাইয়ের বৌ, তাদের ছেলেপিলে।

প্রঃ—তুমি তাদের খোঁজখবর রাখ কি ?

উঃ—রাখি। মাসে ৬ মাসে কখনও কচিৎ ২।৫ টাকা পাঠাইয়াও দিয়া থাকি।

প্রঃ—এই টাকা তুমি কোথায় পাও ?

উঃ—ঘুটে বেচিয়া ২।৫ আনা জমাইতে জমাইতে শেষে ২।৫ টাকায় পরিণত হয়। তাই পাঠাই।

প্রঃ—তোমার ধার আছে কি ?

উঃ—যারা ভাল লোক তারা ধার করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কি ? বুড়া হইয়া গিয়াছি, কবে মরিয়া যাইব তার ঠিক নাই। আমি ধার করিতে যাইব কোন্ সাহসে ?

প্রঃ—কিন্তু তোমার স্বামীর ত ধার আছে।

উঃ—সে ত বেইমান্। ক্রমাগত ধারের উপরই বসিয়া আছে। একবারও চিন্তা করে না বেয়ারামে পড়িয়া থাকিলে বা মরিয়া গেলে তার কি দশা হইবে।

প্রঃ—তোমার স্বামীর আত্মীয়স্বজন দেশে কেহ নাই ?

উঃ—আছে। তার ভাই আছে, ভাইয়ের বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। আরও আত্মীয়স্বজন আছে।

প্রঃ—সে তাদের খোঁজখবর লয় না? টাকা কড়ি পাঠায় না?

উঃ—আপনি কি বলিতেছেন! যে আপন ছেলেমেয়ের খোঁজখবর লয় না, সে যাইবে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ লইতে? সে পাঠাইবে তাদের টাকা? সে কি আর মানুষ আছে? সে মানুষ থাকিলে আমাদের আর এত দুঃখ কেন?

প্রঃ—তোমার এক ছেলে মারা গিয়াছে বলিয়াছ। কেমন করিয়া মরিল?

উঃ—কলেরায়। বেশ সুস্থ অবস্থায় কাজে গেল। ফিরিয়া আসিতেই কলেরা দেখা দিল। সেইদিনই শেষ হইয়া গেল। আমার বড় মেয়েটিও মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে। মোটর লরী চাপা পড়িয়াছিল। পেটের ছেলেটি মরা বাহির হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তারের ঔষধের গুণে সে নিজে বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

প্রঃ—তোমাদের রান্নাবান্নার কাজটা কে করে? তুমি কর কি?

উঃ—না, সে সব আমার ছোট মেয়ে করে। সে আমাকে সব দিক্ দিয়াই সাহায্য করিতেছে।



"দি ইকনমিক জার্ণ্যাল"

লণ্ডনে রয়েল ইকনমিক সোসাইটি বা রাজকীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোতায়েন রহিয়াছে। এটা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

এই সোসাইটির বর্ত্তমান কর্ম্মচারিবৃন্দের নাম নীচে দেওয়া যাইতেছে :—

পেট্রন—স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর।

কাউন্সিল

দি রাইট্ অনারেব্‌ল ভাইকাউন্ট হালডেন অব্ ক্লোন।

ও এম্ এফ্ আর এস্—সভাপতি

দি রাইট্ অনারেব্‌ল দি আর্ল অব্ ব্যালফোর, কে জি, ও এম্, এফ্ আর এস্, এফ্ বি এ, অধ্যাপক এইচ্ এস্ ফক্সওয়েল, এফ্ বি এ, — সহকারী সভাপতি

স্যর চার্লস্ এভিস্, কে সি এম জি

স্যর উইলিয়াম্ বিভারিজ্, কে সি বি,

ডাক্তার জেম্‌স বোনার

অধ্যাপক এড্উইন্ ক্যানান (অবৈতনিক সম্পাদক)

অধ্যাপক এ এম্ কার্-সৌণ্ডেরস্

স্যর সীড্‌নি চ্যাপম্যান, কে সি বি, সি, বি ই

ডাক্তার জে এইচ্ ক্ল্যাপহাম্, সি বি ই,

অধ্যাপক এইচ্ ক্লে

কুমারী কে ই কলেট্

অধ্যাপক জি ডব্লিউ ড্যানিয়েল্‌স্

শ্রীযুক্ত ও টি ফল্ক, সি বি ই

শ্রীযুক্ত এ ডব্লিউ ফ্লাক্স, সি বি

অধ্যাপক টি ই গ্রেগরি

শ্রীযুক্ত আর জি হট্রে

শ্রীযুক্ত হেনরী হিগ্‌স্, সি বি

অধ্যাপক জে এইচ্ জোন্‌স্

শ্রীযুক্ত ডব্লিব টি লেটন, সি এইচ্, সি বি ই

অধ্যাপক এইচ্ ও মেরিডিথ্

অধ্যাপক এ সি পিগু, এফ্ বি এ

শ্রীযুক্ত এল্ এল্ প্রাইস্ (অবৈতনিক সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ডি এইচ্ রবার্টসন

অধ্যাপক ডব্লিউ আর স্কট, লিট্ ডি, এফ্ বি এ

স্যর এইচ্ লিউয়েলিন স্মিথ, জি সি বি

স্যর জে সি ষ্ট্যাম্প, কে বি ই, এস্ সি ডি

শ্রীযুক্ত আর এইচ্ টনি

দি রাইট্ অনারেব্‌ল সীড্‌নি ওয়েব্

শ্রীযুক্ত হার্টলি উইথার্স্

অধ্যাপক অ্যালিন ইয়ং

শ্রীযুক্ত জে এম্ কেইন্‌স্, সি, বি সহযোগী কাগজ-সম্পাদক

অধ্যাপক ডি এইচ্ ম্যাকগ্রেগর, এম্ সি, সহযোগী কাগজ-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত আলফ্রেড্ হোর্, অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত এস্ জে বার্ট্রেস্, সহকারী সম্পাদক।

এই ৩৬ জন ব্যক্তি আর্থিক গগনে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইঁহারা কেহ কেহ আজীবন অর্থশাস্ত্রের চর্চ্চায় জীবন

কাটাইতেছেন ও অনেক গবেষণার কার্য্য করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে এঁদের নাম ও কামের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিলে উপকার হইবে বলিয়া মনে করি।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই কয় ব্যক্তিকে লইয়া প্রতিষ্ঠানটি শেষ নয়। বর্ত্তমানে কানাডা, ভারত, জাপান, জার্ম্মাণি ইত্যাদি নানা স্থানে এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যক্তি-বিশেষকে লেনদেন চালাইবার প্রতিনিধি করিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠান ৪ মহাদেশেই গোটা ষোল নামজাদা ব্যক্তিকে আপন কাজের জন্য ব্যবহার করিতেছে।

এ ছাড়া আছে ফেলো বা সভ্যগণ। বছরে ১ গিনি দিয়া যে কেহ সভ্য পদপ্রার্থী হইতে পারে।

রয়েল ইকনমিক সোসাইটির নাম, প্রতিষ্ঠার দিনে অর্থাৎ ১৮৯০ সনের ২০শে নবেম্বর ছিল বৃটিশ ইকনমিক এসোসিয়েশন। ঐ দিন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের এক সভাতে এই সভার গোড়াপত্তন হয়। সভাপতি ছিলেন রাইট অনারেব্‌ল জে জি গসেন, এম্ পি (স্বর্গীয় ভাইকাউণ্ট গসেন)। সভার উদ্দেশ্য বলা হয় 'আর্থিক জ্ঞানের প্রসার'। ১৯০২ সন হইতে ইহার বর্ত্তমান নাম কায়েম করা হয়।

সোসাইটি খাড়া করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে একটা পত্রিকাও চাই। দি ইকনমিক জার্ণ্যাল আজ ৩১ বৎসর যাবৎ ইহার মুখপত্ররূপে কাজ করিতেছে। ইহা কোন দল-বিশেষের পত্রিকা নহে। ইহাতে সকল দলের লোকের লেখা ও মতামতই আলোচিত হইয়া থাকে।

পত্রিকাখানা ত্রৈমাসিক—মার্চ্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে প্রকাশিত। প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানী। বাৎসরিক দাম ৬ শি। বর্ত্তমানে সম্পাদকতা করিতেছেন দুই ব্যক্তি জে এম কেইন্‌স ও ডি এইচ্ ম্যাক্‌গ্রেগর। ইতি মলাট-সমালোচনা।

পত্রিকার মূলনীতি

এইবার ১৯২১ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যাটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া দেখা যাক্।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেখিতেছি ১৬৬। কাগজটা সম্পাদিত হয় কতকগুলি মূলনীতির উপর নির্ভর করিয়া। সেই মূলনীতিগুলির পরিচয় পাই ইহার ভাগগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া।

এই কাগজের মোটা চারিটা ভাগ হইতেছে—

১নং। প্রবন্ধাবলী। মৌলিক প্রবন্ধ বা উচ্চধরণের আলোচনা স্থান পাইয়া থাকে। এ সংখ্যায় এরূপ প্রবন্ধ ৬টা আছে। কিন্তু ৬ষ্ঠটিকে প্রবন্ধ না বলিয়া পুস্তক-সমালোচনা বলিলে বেশী অন্যায় হয় না। লোক খাটিয়াছেন ৬ জন। পৃষ্ঠা রহিয়াছে ৬৩।

২নং। সমালোচনা। সমালোচনা রহিয়াছে ২৫খানা বইয়ের ৪৭ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া। ২৫ জন ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া এই বইগুলি পড়িয়াছেন ও সমালোচনা লিখিয়াছেন।

৩নং। নোট্‌স ও মেমোরেণ্ডা। নানাবিধ ১০টা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। লোক পাইতেছি ৮ জন। ৪৫ পৃষ্ঠা।

৪নং। নূতন পত্রিকাবলী ও গ্রন্থপঞ্জী। পৃষ্ঠার পরিমাণ ১১।

সম্পাদকের দায়

এইরূপ একখানা উৎকৃষ্ট কাগজ চালাইবার জন্য সম্পাদকের দায় কতখানি? এই পত্রিকাখানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে হইলে সম্পাদকদের কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে হয় কি?

মনে হইতে পারে বটে যে, "এই কাগজের সেবকের অভাব নাই। এক এক সংখ্যার জন্য ৪০।৪৫ জন লোক খাটিতেছে। তাহার পিছনে রহিয়াছে প্রকাণ্ড এক শক্তি-স্বয়ং রয়েল ইকনমিক সোসাইটি। সুতরাং সম্পাদকদের কাজের ও দায়িত্বের পরিমাণটা নেহাৎ হাল্কা।"

কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। ইয়োরামেরিকার কাগজ-গুলির দিকে বিশেষ করিয়া আর্থিক পত্রিকাগুলির দিকে নজর দিলে বুঝা যাইবে, কাগজ-পরিচালনার বিজ্ঞান-

বস্তুটা কি। বস্তুতঃ পত্রিকার সম্পাদকত্বও বহু চিন্তার পর ও একমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে।

বলা বাহুল্য, "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদককেও চোখ কান খুলিয়া রাখিতে হইয়াছে। ইয়োরামেরিকার সকল রকম নজীরকে চোখের সামনে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে ও যথাসাধ্য সম্পাদকের কর্ত্তব্য করিতে হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য দেশে যেখানে বহু লোকের পরিশ্রমে একটা বিজ্ঞানের নানা অঙ্গ পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আমাদের দেশে সেখানে গড়িয়া তুলিবার মত লোকের পরিশ্রমের অভাবটা প্রতিপদে অনুভব করিতে হইতেছে।

৬টী প্রবন্ধের হিসাব

এই সংখ্যায় যে ৬টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সেগুলির কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত এইরূপ :—

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১। মজুরি-নীতি ও বেকার-সমস্যা	এ, সি, পিগু	১৪
২। নিউজিল্যাণ্ডে পারিবারিক ভাতা	আর, এম্, ক্যাম্পবেল, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ, ওয়েলিংটন, নিউজিল্যাণ্ড	১৫
৩। বৃটিশ কয়লার বাবসায়ে প্রচলিত মজুরি-প্রণালীর আধুনিক ইতিহাসের আলোকে মজুরি স্থিরীকরণের নুতন ধরণ	জে, এ, বাউঙ্গ কলেজ অব্ টেক্নোলজি, ম্যানচেষ্টার	১১
৪। শহর ও গ্রামের লোকবলের ভিতর অদলবদলের আর্থিক কারণ বিশ্লেষণ	ই, ডব্লিউ, শানহান্	৯
৫। ইংল্যাণ্ডে শস্যের পূর্ব্বাভাষ	জে, এ, ট্যান্, স্কুল অব্ অ্যাগ্রিকাল্চার, কেম্ব্রিজ	৭
৬। বার্কলেস্ ব্যাঙ্কের ইতিহাস	এইচ্, এস্, ফক্সওয়েল	৭

বর্ত্তমান ইংল্যাণ্ডে মজুর-সমস্যা একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়লার ধর্ম্মঘট, ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল লইয়া পার্লামেণ্টে হৈ চৈ ইত্যাদি সেদিনকার ঘটনাগুলি প্রত্যেক অর্থনীতিজ্ঞের মনে গভীর ছাপ ফেলিতে বাধ্য। তা লইয়া নানা মুনির মাথা ঘামানোর ফলটা এই সংখ্যায় নানা আকারে দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ, প্রথম ৪টি প্রবন্ধ খাঁটি মজুর-সাহিত্যের অন্তর্গত।

শ্রীযুক্ত পিগু

প্রথম প্রবন্ধ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত এ, সি, পিগু। ইনি অজ্ঞাতকুলশীল নহেন। ইহার "ওয়েল্থ অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার" (ধন ও হিতসাধন), "ইকনমিক্স অব্ ওয়েলফেয়ার" (হিতসাধনের আর্থিক তত্ত্ব), প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিত মহলে পরিচিত।

সম্প্রতি ইনি একখানা বই লিখিয়াছেন "ইন্ডাষ্ট্রীয়েল ফ্লাক্চুয়েশন" (ব্যবসার জোয়ার-ভাঁটা)। বিদ্বান-মহলে তাহা লইয়া খুব আলাপ আলোচনা চলিতেছে। আর্থিক দুনিয়ার জোয়ার-ভাঁটা জিনিষটা সকল প্রকার উন্নতির দুষমন বিশেষ। সুতরাং এই দৈত্যটাকে বগল-দাবা করিয়া রাখাটা, অন্ততঃ রাখিবার চেষ্টা করাটা প্রত্যেক স্বদেশসেবীর অবশ্যকর্ত্তব্য। পিগু তাঁর বইয়ে এই কুকুরের মুগুর বাৎলাইয়াছেন। এই সংখ্যা পত্রিকায় স্যর যোশিয়া ষ্ট্যাম্প এই গ্রন্থের একখানা সমালোচনাও লিখিয়াছেন (৪১৮-৪২৪ পৃঃ)।

পিগুর অন্য পরিচয় হইতেছে তিনি এখন ডাক্তার মার্শালের পদে প্রতিষ্ঠিত—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধ্যাপক।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পিগু বেকার-সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ দুইটি—(১) বেকারের কারণ কি? অথবা, অন্য কথায় বেকারের সঙ্গে মজুরি-নীতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা? (২) এই বেকার-সমস্যার সমাধানের উপায় কি?

বর্ত্তমান মজুরি-নীতি

বর্ত্তমান বলিতে কোন্ সময়কে বুঝিতে হইবে? পিগু বলিতেছেন, যুদ্ধের পূর্ব্বের কাল সেকাল, আর পরের কাল

একাল। সেকালে একালে আকাশ-পাতাল তফাৎ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সেকালে স্বাভাবিক অবস্থায় বেকার-সমস্যার কথাটা কেহ শুনে নাই, অন্ততঃ এত বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। অস্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ ব্যবসার জোয়ার-ভাঁটার বা 'ধূমকেতু'র আবির্ভাবে অবশ্য সব ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। অন্য দশটা অহিতের সঙ্গে সঙ্গে কিছুকালের জন্য বেকারদলের উদ্ভবও হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় মজুরির হারটা প্রায় সর্ব্বত্র (দুঃসময়টা বাদ দিয়া আর কি) টান-যোগানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

একালে কি দেখিতেছি? দেখিতেছি যে, নিয়োগের সংখ্যার তুলনায় মজুরির হার খুব বেশী রকম চড়িয়া গিয়াছে। টান-যোগানের নিয়মটা তার আর নাগাল পায় না। এমন হইবার হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে দুই জায়গায়—

১। রাষ্ট্র সোজাসুজি আপন কাজের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

২। বেকার-বীমার প্রসার ঘটিয়াছে। ফলে, মজুর সঙ্ঘগুলি দরাদরি করিবার জন্য জোর পাইয়াছে।

বেকার অবস্থার জন্য দায়ী কে?

পিগুর মতে বর্ত্তমানের চড়া মজুরিই দেশের মধ্যে বেকার-সমস্যার উদ্ভবের জন্য দায়ী। অর্থাৎ কতকগুলি লোক জোর করিয়া বেশী বেশী সুবিধা ভোগ করিতেছে ও এইরূপে অন্য অনেক লোককে তুল্য সুবিধা অল্প পরিমাণেও ভোগ করিতে দিতেছে না।

কিন্তু একথার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই—ট্রেড ইউনিয়ান গণনা হইতে জানা যায় যে, ১৯২১ হইতে ১৯২৭ অবধি ৩ বছরে বেকারের শতকরাটা মাত্র ১ বছর (১৯২৪-৮·১%) ১০% এর নীচে ছিল। ১৯২৬ সনে কয়লা ধর্ম্মঘট হয়। ঐ সন বাদ দিলে গড়পড়তাটা ১২%।

অন্য দিকে যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩০ বৎসরের মধ্যে মাত্র একবার বেকারের সংখ্যা ছিল ১০% (১৮৮৬)। তা ছাড়া সর্ব্বোচ্চ সীমা মাত্র ৭·৮ (১৯০৮)।

যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থার মাপে যুদ্ধের পরের কয় বছরে বেকারের সংখ্যা যত হওয়া উচিত ছিল, প্রকৃত পক্ষে তার দ্বিগুণেরও বেশী দেখা গিয়াছে। নূতন একটা কারণ নিশ্চয় আছে। এই কারণ অতিরিক্ত ৮% বেকারের জন্য দায়ী।

এই কারণটা কি? অনেকে বলিবে, "কারণটা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় ধাতব ব্যবসাগুলি ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাতে দেদার লোক লাগান হইতেছিল। কিন্তু যুদ্ধ-শেষের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অনেক কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু লোক কর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় হইতে শান্তির সময়ে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব বৃত্তিতে মানুষ সহসা আর কিছু আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে না।"

কথাটা সত্য বটে। এই দুই কারণে কিছু বেকার বাড়িতে পারে। কিন্তু এতটা পারে না। তা যদি সত্য হইত তবে এমন দেখা যাইত যে, ব্যবসা-বিশেষে যেমন মজুর-বৃদ্ধির সংখ্যা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি অন্য কতকগুলিতে স্পষ্ট মজুর হ্রাস দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ যত লোক চাই, তত লোক পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এরূপ স্পষ্ট মজুর-হ্রাস কোথাও দেখা যাইতেছে না।

সুতরাং বলিতে বাধ্য যে, বিভিন্ন বৃত্তিতে মজুর-নিয়োগের ওলটপালট ছাড়া বেকারের অন্য কারণ আছে। মজার কথা এই যে, মজুরির কাজ করিবার হপ্তার সময় ⅒ কমিয়া গেলেও মজুরির হারটা ১৯১৪ সনের মত বা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী আছে।

বস্তুতঃ, একথা বলা চলে অন্যান্য কারণে বেকারের কিছুটা বাদ দিয়া সোজাসুজি ৫% বেকারের জন্য মজুরির চড়া দরকে দায়ী করিতেই হইবে।

৫% স্থায়ী বেকারের গুরুত্ব

যুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থাটা ৫% বেকারের ফল যোগ করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধের পর অর্থশাস্ত্রে এক নূতন সমস্যার উদয় হইয়াছে।

৫% স্থায়ী বেকার-সমস্যাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। সোজাসুজি ইহা দেশের ধনের অপচয় ঘটাইতেছে।

কিন্তু পরোক্ষভাবে ইহার ফল আরও মারাত্মক হইতেছে। কার্য্যপটুতা হ্রাস পাইতেছে, বেকার মনুষ্যের নিজের ও তার স্ত্রীপুত্রের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইতেছে।

স্থায়ী ৫% বেকারের অর্থ এই যে, সারা বছরে প্রত্যেক ব্যক্তির ১৮ দিন কোন কাজকর্ম্ম নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বেকার অবস্থাটা সমস্ত সমাজের মধ্যে চাড়াইয়া যায় না। মাত্র কতকগুলি হতভাগ্য ব্যক্তির উপর সমস্তটা বর্ত্তে।

এই অবস্থার প্রতীকারের কি কোন উপায় নাই? পিগু দুইটা উপায়ের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

১। আমদানি-বাধা।

২। সাব্‌সিডি বা ভিক্ষাদান।

আমদানি বাধার চৌহদ্দি

স্থায়ী বেকারদলকে কেমন করিয়া কাজ জোগাইয়া দেওয়া যায়? কেহ কেহ বলিবে, "কেন? যে সব জিনিষ আমদানি করিতেছ, সেগুলি আর বিদেশ হইতে আনিও না। সেগুলি নিজের দেশে তৈয়ারী করিতে আরম্ভ কর। তার পর বেকার লোকদিগকে কাজ জোটাইয়া দিতে আর কতক্ষণ লাগে?

ক্লাসিক্যাল স্কুলের অর্থশাস্ত্রীরা অবশ্য এই কথায় আপত্তি করিবে। তারা অবাধবাণিজ্যের পক্ষে পাতি দিয়াছে। তাদের কথা এই যে, আমদানি কমান মানেই সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি কমানো। কারণ যা আমদানি করি তার দাম দেই রপ্তানিতে। সুতরাং আমদানি বাধা দেওয়ার অর্থ মোট বাণিজ্য কমানো, দেশের ধনবল হ্রাস করা ও অবশেষে মজুরের কর্ম্মহীনতা।

এই দুই বিপরীত মতকে খাপ খাওয়ান যাইতে পারে কি? যদি যায় তবেই বলা যাইবে যে, সেই অবস্থায় উপকার দর্শিবে।

দুই প্রকার উৎপাদকের কথা ধরা যাক্। আমদানি-বাধাতে একজনের খুব সুবিধা হইতে পারে, অন্য জনের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয় যেখানে সুবিধা অসুবিধায় কাটাকাটি গিয়া সুবিধাটাই উদ্বৃত্ত থাকে। অর্থাৎ সাদা কথায় আমদানি হইতে যে সুবিধা পাওয়া যায়, তা বাদ দিলে সমাজের কিছু না কিছু অহিত হইবেই। কিন্তু দেশের মধ্যে দ্রব্য উৎপাদন করিয়া এই অহিত মানিয়া লইয়াও মোট হিতের পরিমাণটা বেশী হইতে পারে। আমদানি-বাধার এইরূপ অবস্থায় মজুরির হার বেশ চড়া রাখা যায় ও বেকারের কতকটা সমাধান হয়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই আমদানি-বাধাটার চৌহদ্দি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ, যে সব ব্যবসায়ে শুধু রপ্তানির জন্যই দ্রব্য তৈয়ারী হয়, সেগুলিতে এই বাধা-নীতি থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, যে সব ব্যবসায় নিজ দেশের অভাব মিটাইবার জন্য জিনিষ তৈয়ারী করে কিন্তু সেজন্য বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয় না, তাদের বেলায়ও এ নীতি অচল। তৃতীয়তঃ, দেশজ ব্যবসা বিদেশী প্রতিযোগিতার পাত্র হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে এ নীতি খাটে না, বরং অনিষ্টকর হয়।

সুতরাং বাধা-প্রদান নীতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কার্য্যকরী। যে সব দ্রব্যের জন্য দেশের ভিতর টানটা যথেষ্ট প্রচণ্ড, বা স্থিতিস্থাপক নয় (অর্থাৎ দ্রব্যের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে টান উঠানামা করে না), শুধু সেই সব দ্রব্যের বেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী আমদানিকে বাধা দিলে বেকার-সমস্যার কিছু মীমাংসা হইতে পারে। বলা বাহুল্য, বেকারের সমাধান ব্যাপক ভাবে করিতে হইলে এর চেয়েও ব্যাপক কোন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা দরকার।

ভিক্ষাবৃত্তির দৌড়

সাধু ভাষায় ভীখ্-মাগার আমরা যতই নিন্দাবাদ করি না কেন, আথিক দুনিয়ায় ভিক্ষার স্থান খুব বড়। গবর্ণমেন্টগুলি ত যখন তখনই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু গবর্মেন্টের আর একটারূপ ভিক্ষা-দান বা সাবসিডিও বটে।

সরকার অবশ্য নিজের গাঁটের পয়সা সাবসিডিরূপে দেয় না। কর বসাইয়া এক হাতে একদল লোকের কাছে নেয়, আর অন্য হাতে তা অন্য লোকদিগকে বিলায়।

বেকারের ভিক্ষারূপ মুষ্টিযোগের তত্ত্ব কথাটা কি? বাধা-প্রদান-নীতির চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে বেশী উপকার দর্শে। এ জন্য ভিক্ষাদান প্রশস্ত।

কিন্তু ভিক্ষাদান বিষয়েও একটা কথা আছে। রপ্তানি ব্যবসায়, অর্থাৎ যে ব্যবসায়ে শুধু রপ্তানির জন্য দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, তার উপর মুটি মুটি ভিক্ষা দিলে, ভিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের মধ্যে চড়া মজুরি বজায় রাখিয়াও মজুরকে সস্তা দরে জিনিষ কিনিতে সমর্থ করা। কিন্তু রপ্তানি ব্যবসায়ে ভিক্ষা দিলে, দেশের লোকের বদলে বিদেশীরা সস্তা দরের সুবিধাটা ভোগ করিবে। অর্থাৎ বিদেশীদের জন্য যা তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইতেছে তার দাম দিবে দেশের অ-মজুররা। কিন্তু সাবসিডি না দিলে বিদেশীদের ঐ সব দ্রব্য দাম দিয়া লইতে হইত।

ভিক্ষায় সুখ নাই

মোটামুটি বলা চলে, এক রপ্তানি ব্যবসা বাদে অন্যত্র সাবসিডির সাহায্যে বেশী সুফল ফলে।

কিন্তু ভিক্ষায় সুখ নাই। সাবসিডির ব্যবস্থাটাকে যখন একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তখনই বুঝা যায় গলদ কোথায়। দুইটা গলদ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১। বাস্তব জীবনে এক একটা বৃত্তি এক একটা সমস্যা নয়। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে মানুষ বিনা ক্লেশে এক বৃত্তি হইতে অন্য বৃত্তিতে আশ্রয় লইতেছে। তাকে বাধা দিবার কেহ নাই। সুতরাং সাবসিডির দ্বারাও কোন কাজে লোকসংখ্যার যোগাযোগ ঘটানো যাইতে পারে। যে ব্যবসায়ে মজুরির হার নীচু ও বেকারের সংখ্যা বেশী, স্বভাবতঃ তাতেই বেশী সাবসিডি দেওয়া হইবে। ঐ ব্যবসায়ে উৎপাদিত দ্রব্যের টান যত কমিতে থাকিবে, তার জন্য সাবসিডির দাবীও তত বাড়িতে থাকিবে। ফল হইবে এই যে, এক ব্যবসায়ে খুব বেশী লোক ঝুঁকিয়া পড়িবে, আর অন্য ব্যবসায়ে লোকের অভাব ঘটিবে। গবর্ণমেণ্ট খুব চতুর ও শক্তিশালী না হইলে এই অবস্থার দরুণ জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয় হইবে।

২। তারপর সাবসিডি রীতি অবলম্বন করিয়া যদি বেকার-সমস্যার সমাধান কিছু হয়, তবে আর রক্ষা নাই। মজুরেরা ক্রমাগত চড়া মজুরি চাহিতে থাকিবে। ব্যবসার মালিকেরাও লাভের আশায় তাদের সমর্থন করিবে। মজুরির হার ও সাবসিডির হার বাড়িতে বাড়িতে যাইবে। তারপর ব্যবসার ভাঁটার কালে মজুর ও মালিক একযোগে বেশী বেশী সাবসিডি চাহিতে থাকিবে। এইরূপে সাবসিডি যোগাইতে যোগাইতে জাতীয় রাজস্বকে হয়রাণ হইতে হইবে।

নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়

যদি মজুরেরা জিদ্ করে যে, তাদের চড়া দরে মজুরি দিতেই হইবে, আর রাষ্ট্র কোনপ্রকার প্রতীকারের বন্দোবস্ত না করে, তবে বেকার-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। মজুরি-সাবসিডিতে ও দুই কূল রক্ষা করা সম্ভব নয়। ইহাতে বেকার হ্রাস ঘটিলেও, বেবন্দোবস্তের দরুণ সামাজিক ক্ষতির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।

এইজন্য পিগুর চরম সিদ্ধান্ত এই যে, মজুরদের পক্ষে তাদের আর্থিক অনটন মিটাইবার জন্য যতটা দরকার তার চেয়ে খুব বেশী মজুরির জন্য জিদ্ করার অর্থ সমগ্র সমাজ ও দেশের ক্ষতি করা। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ধনীদের আয় হইতে যে টাকাটা টানিয়া আনা যায়, তা ভোগ করা তাদের পক্ষে অন্যায়। পরিবারে অনেক লোক হইলে সরকারের নিকট হইতে ভাতা পাওয়ার নিয়ম আছে। তার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার নাই। আর এখন মজুরের প্রকৃত মজুরিটা যা, তাকে তার নীচে কিছু দেওয়ার প্রস্তাবও হইতেছে না।

দরকার মজুরের কার্য্যপটুতা বাড়ানো (এটাও অবশ্য আংশিক ভাবে মজুরি-বৃদ্ধির ফল)। তা হলে বর্ত্তমান মজুরির হারে বহু লোক কাজ ঢুঁড়িয়া পাইবে। কারণ পুঁজিপাটা ও ব্যবসা চালাইবার ক্ষমতা যুদ্ধের পূর্ব্বের মত না হইলেও বাড়িতেছে, আর বিদেশীদেরও বৃটিশ দ্রব্য কিনিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি বাড়িতেছে।

বস্তুতঃ, বর্ত্তমান সময়েও পুঁজিপাটা যত তাড়াতাড়ি

বাড়িতেছে লোকবল তত তাড়াতাড়ি বাড়িতেছে না। বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য এইটাই সব চেয়ে আশার কথা। জাতীয় ঋণ ও করাদায় সমিতি আধুনিক জন্ম-হারের উপর গণনা করিয়া দেখিয়াছে যে, উপনিবেশের জন্য লোক বাদ দিয়া ১৯৩১ পর্য্যন্ত গড়ে মজুর বাড়িবে বছরে প্রায় সওয়া লক্ষ জন; তখন হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬,০০০ জন; এবং ১৯৩৬ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত প্রায় ২০,০০০ জন। নূতন মজুররা যাতে বর্ত্তমানে প্রচলিত জীবনযাত্রার ধারা বজায় রাখিতে পারে সেজন্য মাথা পিছু পুঁজিপাটার প্রায় ৪০০ পাউণ্ড দরকার হইবে। সুতরাং ১৯৩১ পর্য্যন্ত বছরে ৫ কোটি পাউণ্ডের দরকার ঘটিবে; ১৯১৩ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত ১·৮৪ কোটি পাউণ্ডের আর ১৯৪১ পর্য্যন্ত ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের।

আজকাল সময়টা খারাপ। কিন্তু তবু বাৎসরিক নূতন পুঁজিপাটার পরিমাণ ৪৫ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি। অতএব এই কথা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, যোগানের তুলনায় টানটা ক্রমাগতই বেশী হইতে থাকিবে। সুসময় আসিলে ত কথাই নাই। এইরূপে বেকার-সমস্যা আপনাআপনি মিটিয়া যাইতে পারে। ইতিমধ্যে মজুরির হার কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইলেই মাত্র গোল ঘটবার সম্ভাবনা আছে। মজুরির হার বাড়িলেই সব মাটি হইয়া যাইবে, বিশৃঙ্খলা আসিবে।

পারিবারিক ভাতা চাই

নিউজীল্যাণ্ডের পারিবারিক ভাতার বিল, (১৯২৬) তথাকার পার্ল্যামেণ্ট পাশ করিয়াছে। এই বিলের পরিচয় ও দোষগুণ লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন। এই বিল পাশ করিয়া নিউজীল্যাণ্ড অনেকের উপর টেক্কা দিয়াছে এবং সামাজিক ও আর্থিক প্রচেষ্টায় প্রথম শ্রেণীর দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

লেখক প্রথম দেখাইয়াছেন, রাষ্ট্রকর্তৃক এইরূপ একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরকার ছিল কি না। বিল্‌টা সংক্ষিপ্ত। সুতরাং উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে। তারপর বিলটার বিরুদ্ধে ব্যবসার দিক্ হইতে ও মজুরির সাধারণ হারের দিক্ হইতে কি কি আপত্তি হইতে পারে তার সমালোচনা হইয়াছে। এমনও ত হইতে পারে বিল্‌টা না প্রবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন প্রথার প্রবর্ত্তন করিলে ভাল হইত। সে বিষয়টাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

পরিশেষে লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে, নিউজীল্যাণ্ডের মত তরুণ ও ধনী দেশেও ব্যবসাগুলি তাদের বালক-বালিকাদের (মজুর) যথেষ্ট খবরদারী করে নাই। তাদের অবস্থা লজ্জাজনক। পারিবারিক ভাতার প্রচলনে অনিষ্ট অনেক। কিন্তু ভাতা প্রচলিত না থাকায় তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট হইতেছে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যদি হয় মজুরদের পরিবার বৃদ্ধি করা অর্থাৎ তাদের মধ্যে বেশী বেশী ছেলেমেয়ের জন্মের প্ররোচনা করা, তবে ইহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কিন্তু অন্যদিকে জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিবার পক্ষে ইহা সহায় হইবে। শিশু-মঙ্গল হিসাবে ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে সন্তোষজনক কার্য্য। কারণ ধনী লোকের উপর কর চাপাইয়া সেই টাকা মজুরদের মধ্যে বিতরণ করায় জাতীয় ধন-বণ্টনে সমতা আসিতেছে।

কয়লার ব্যবসায়ে মগজ চালনা

তৃতীয় প্রবন্ধে কয়লা ব্যবসার সম্বন্ধে মগজ চালনা করা হইয়াছে। একটা পুরাণা মজুরি-বণ্টন রীতির আলোচনা করিয়া নূতন রীতির উপকারিতা অপকারিতা বুঝান হইয়াছে। আঁকজোক আছে। সমস্তটাই অত্যন্ত ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু তাহা হইতেই আর্থিক তত্ত্ব জন্মলাভ করিতেছে।

লোকবল ও শস্যাভাব

৪ ও ৫ নং প্রবন্ধ দুটির পাল্‌টা প্রবন্ধ আমাদের দেশের আর্থিক সাহিত্যেও দেখিবার সময় আসিয়াছে।

লোক দলে দলে পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে ছুটিতেছে। পল্লী উজাড় হইয়া যাইতেছে। সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে—কেন? তারপর ইহা ভাল কি মন্দ? অথবা ইহাতে সুফল বেশী হইতেছে না কুফল বেশী হইতেছে? ইহাকে কোন ক্ষেত্রেই বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত কি না?

করিলে কি ফল হইবে? আর করিবার কোন উপায় আছে কি? ইত্যাদি ধরণের বহু প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কিছু কিছু এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশেও অঙ্ক ও তথ্য যোগাড়ের এবং পরীক্ষা চালাইবার অবকাশ রহিয়াছে।

বিলাতী শস্যের পূর্ব্বাভাষ লইয়া ৫ম প্রবন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এই পূর্ব্বাভাষ দিবারও একটা প্রণালী ও বিজ্ঞান আছে। সুতরাং তার সু কু ও আছে। আমাদের দেশেও অবিলম্বে শস্যাভাষ লইয়া বিস্তৃততর আলোচনা হওয়া দরকার।

সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করা সম্ভব নহে। প্রবন্ধের কথা এই পর্য্যন্ত।

আমেরিকান্ বনাম ইংরেজী সমালোচনা

গত মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে আমেরিকান্ সমালোচনার দৌড়টা মাপিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এইবার ইংরেজী সমালোচনার ধারাটা বুঝিবার চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, শুধু দু'য়ের কাঠামটার তুলনাই সম্ভবপর হইবে। অল্প পরিসরের ভিতর সমালোচনার স্বাদটা দেওয়া অসম্ভব।

গোড়াতেই একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। ইংরেজ সম্পাদক আমেরিকান্ সম্পাদকের মত অর্থশাস্ত্রের নানা ভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে কেতাবগুলিকে পুরিয়া দেখাইবার প্রয়াস পান নাই। সাধারণতঃ এক এক ব্যক্তি এক এক বইয়ের (কোথাও ২।৩ বইয়ের) সমালোচনা করিয়াছেন। তারপর ইংরেজী পত্রিকায় সমালোচনার ভিতর শুধু সমালোচনাই ঠাঁই পাইয়াছে। বইয়ের নামকরণটা অন্যত্র স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু ইংরেজ সমালোচকেরা অন্যদিকে পোষাইয়া লইয়াছেন। ৬ষ্ঠ প্রবন্ধটাকে সমালোচনা বলিয়াছি। কিন্তু তাহা বাদ দিয়াও যে ২৫ খানা বইয়ের সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তার প্রত্যেক লেখাটিকে প্রায় প্রবন্ধের তুল্য মর্য্যাদা দিতে হয়। অবশ্য সকলগুলিই প্রথম শ্রেণীর নয়।

সমালোচনার কুলশীল

প্রত্যেক বছরে ৮০।৯০।১০০ খানা করিয়া পুস্তকের সমালোচনা করা এই পত্রিকার দস্তুর। শুধু এই পত্রিকা বলিয়া নয়। ইয়োরামেরিকার আর্থিক পত্রিকা মাত্রেই সমালোচনার দাম অনেকখানি।

বস্তুতঃ এই সমালোচনা যেমন নানা কেতাবের মূল্য কষিয়া দেখাইয়া দিতেছে, অন্যদিকে তেমনি শ্রেষ্ঠগুলির চুম্বক পাঠক ও গবেষকের কাছে সংক্ষেপে উপস্থিত করিয়া দুই দিক্ দিয়া শ্রমটা সংক্ষেপ করিতেছে।

১। পাঠক ও গবেষককে অনর্থক বাজে বই পড়িয়া সময় নষ্ট করিতে হইতেছে না।

২। গবেষক একবার মাত্র চোখ বুলাইয়াই শ্রেষ্ঠ আর্থিক সাহিত্যের মর্ম্ম-কথাটা পাকড়াও করিতে পারিতেছে।

সমালোচনার দোষগুণ বা সমালোচকের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখাইবার এখানে প্রয়োজন নাই। মোটামুটি শুধু এই কথাটা মগজের মধ্যে বসাইয়া রাখা দরকার যে, ইয়োরামেরিকার প্রত্যেক দেশের অর্থশাস্ত্রীরা অন্যান্য দেশের আর্থিক সাহিত্যের জন্য যথেষ্ট দরদ দেখাইয়া থাকে। এইরূপ বিদেশ-প্রীতির আমদানি করা আর্থিক উন্নতির অন্যতম ধান্ধা। তজ্জন্য চাই যে বহু বাঙ্গালীর ছেলে বিদেশী গ্রন্থ ও মাসিকের পাতা উল্টাইবে।

এই সংখ্যার ২৫ খানা বইই আর কিছু প্রথম শ্রেণীর চীজ্ নয়। সমালোচকেরাও সেই কথা বলে না। তবে ২।১ খানা খুব নামজাদা বই বা যুগান্তকারী বইও ঠাঁই পাইয়াছে। যেমন, পিগুর ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল ফ্লাক্‌চুয়েশন্‌স (ব্যবসার জোয়ার-ভাঁটা), রিচার্ড ব্যিখপেয়ের ডী ফিনান্ৎস্ পোলিটিক উণ্ড ডাস্ বুণ্ডেসষ্টয়ের সীষ্টেম ডের্ ফেরিনিখ্‌টেন ষ্টাটেন ফোন্ আমেরিকা ফোন্ ১৭৮৯ বিস্ ১৯২৬ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসমূহের ফিন্যান্স নীতি ১৭৮৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত), লর্ড অলিভিয়ারের দি অ্যানাটমি অব্ আফ্রিকান মিজারি (আফ্রিকার দারিদ্র্যের কারণ-বিশ্লেষণ) ও চীন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বই ইত্যাদির নাম করিতে পারি। বলা

বাহুল্য সকল দেশেই যুগান্তকারী বই আর কিছু দশটা পাচটা মিলে না। বছরে এইরূপ বই সারা ইয়োরামেরিকায় যতগুলি বাহির হয়, তাদের আঙুলে গণিয়া শেষ করা যায়।

সমালোচিত বইগুলির প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ইয়োরামেরিকার সমালোচনা সাহিত্যের পুষ্টিটা ঘটিতেছে গণ্ডা গণ্ডা অধ্যাপকের দানের সাহায্যে। এ বিষয়ে আর্থিক উন্নতির পাতাগুলি উল্টাইয়া গেলে এই লজ্জা ও দুঃখজনক ব্যাপারটা নজরে আসিবে যে কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা অন্য স্থানের বাঙ্গালী অধ্যাপকের দান প্রায় শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার উত্তরে আমাদের দেশের অর্থশাস্ত্রীরা যে নানা ওজর দেখাইবেন, তা জানি। কিন্তু তথাপি বলিতে হয় যে, এক এক ব্যক্তি বছরে যদি এক আধখানা বই কষ্ট করিয়া পড়িয়া ৫।১০ পৃষ্ঠা করিয়াও লেখেন, তবে বছরে তাঁদের দানের সমষ্টিটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে না। অধিকন্তু তাহাতে তাঁদের নিজেদের ও পড়ুয়াদের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

জেনেভার বিশ্ব-আর্থিক সম্মিলন

এই পত্রিকার নোট্‌স ও মেমোর‍্যাণ্ডা নামক অধ্যায়ে নানা রকম আর্থিক প্রসঙ্গ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ, আছে গত ৪ঠা হইতে ২৩শে মে, ১৯২৭ অবধি জেনেভায় যে আর্থিক সম্মেলনের বৈঠক বসিয়াছিল (সভাপতি ছিলেন জর্জে‌স্ টিউনিস্) তার সম্বন্ধে ২।৪ কথা। বৈঠকটা লীগের সহিত সম্পর্কযুক্ত। প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল ৫০টা দেশ। ১৯৪ জন ব্যক্তি এই বিধানের হাট বসাইয়াছিল। তার মধ্যে ছিল ব্যবসায় ধুরন্ধর, পাকা বেপারী, কৃষিবিৎ, অর্থব্যবস্থাতত্ত্ববিৎ গবর্ণমেণ্টের চাকুর‍্যে, অর্থশাস্ত্রী, মজুর-নেতা ইত্যাদি। সঙ্গে ওস্তাদ আসিয়াছিল ১৫৭ জন।

লেখকের মতে লীগের দুই অ-সভ্য দেশ—যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়ার মধ্যে রুশিয়া এই মেলায় দিয়াছে শূন্য, আর যুক্তরাষ্ট্র নানা উপায়ে পরিষ্কার মাথায় অনেক সমস্যা আলোচনা করিবার সহায়তা করিয়াছে।

প্রথম ৪ দিন গিয়াছে পরস্পর মোলাকাতে ও আব্-হাওয়া সৃষ্টি করিতে। তারপর কন্‌ফারেন্সটা তিনটা প্রধান কমিটীতে ভাগ হইয়া গিয়াছে।

১। কৃষি কমিটি। সভাপতি ফ্রাঙ্গেশ (জুগো-স্লাভিয়া)। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষি সমবায় ও তার বৈজ্ঞানিকতা। কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা বাড়ান দরকার, খাদক সমবায় সমিতিগুলির সহিত তারা আরও বেশী একযোগে কাজ করুক, কৃষি ঋণদান সমিতি-গুলি আরও সুগঠিত হোক্, সংখ্যা ও তথ্য আরও চাই, ব্যাধির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অভিযান দরকার ইত্যাদি হইল এই কমিটির প্রস্তাব। কিন্তু সব চেয়ে সার্থক ও বড় প্রস্তাব হইতেছে কৃষি, ব্যবসা ও বাণিজ্যের পরস্পরের নির্ভরশীলতার কথাটা স্বীকার ও প্রচার করা।

২। ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল বা শিল্প কমিটি। সভাপতি হোডাচ (চেকো-শ্লোভাকিয়া)। সভাপতির অক্ষমতার জন্য এই কমিটির কাজকর্ম ভাল হয় নাই, কোন স্থির সিদ্ধান্তেও পৌঁছা যায় নাই।

৩। কমার্স বা যানবাহন বাণিজ্য কমিটি। সভাপতি কোলিয়ন্ (হল্যাণ্ড)। সভাপতি খুব যোগ্য ব্যক্তি ও তাঁর জন্যই এই কমিটি সব চেয়ে বেশী কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই কমিটি নিম্নলিখিত ৩টা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়:—

(ক) প্রথম কথা এই যে, বাণিজ্যকে "অবাধতর" করিয়া দেওয়া হউক। বলা বাহুল্য, "অবাধ বাণিজ্য" আর "অবাধতর বাণিজ্য" এক বস্তু নয়। বস্তুতঃ, বৈঠকে অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণের তর্কটা উঠিতে পায় নাই। মোদ্দা কথাটা হইতেছে, বিদেশী রাষ্ট্র ও কোম্পানীদের আরও বেশী বেশী সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হোক্।

(খ) স্বয়ং সভাপতি এই বিভাগে সভাপতিত্ব করিয়া-ছিলেন। প্রথম কথা শুল্ক টারিফের কথা। শুল্ক টারিফের বিষয় দুই দিক্ হইতে বিবেচনা করা যাইতে পারে—(অ) আকারের দিক্ হইতে (আ) পরিমাণের দিক্ হইতে। যত রকমে শুল্ক টারিফের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তাই বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা—বাণিজ্যিক নীতি ও সমঝৌতা। কন্‌ফারেন্সের মত এই যে, টারিফের গতিটা উল্টা দিকে ফিরাইবার সময় আসিয়াছে অর্থাৎ না বাড়াইয়া কমাইবার সময় আসিয়াছে। অন্যান্য জরুরি কথা হইতেছে—দেশে দেশে এই উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক সমঝোতা কায়েম হোক্, কাঁচা মাল ও খাদন দ্রব্যের উপর চড়া শুল্ক বসাইয়া আসিতে বাধা দেওয়া না হোক্, বাণিজ্যিক সমঝোতাগুলি লীগ্ অব্ নেশনের তাঁবে 'সব চেয়ে সুবিধা পাইবে আমাদের জাত' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হোক্।

তৃতীয় কথা সংরক্ষণের পরোক্ষ প্রণালী ও যানবাহন সম্বন্ধে বিচার (অর্থাৎ সকল যানবাহন সম্বন্ধে এক প্রকারের ব্যবস্থা নয়)।

কন্‌ফারেন্সের মতে গবর্ণমেন্টগুলি যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাবসিডির প্রশ্রয় দিবে না। ডাম্পিং বা 'বাজার মাটি'র নীতিটাকে নিন্দা করা হয় নাই। কিন্তু একটু নরম-সরম হইলে ভাল হয় বলা হইয়াছে। যানবাহন নিজের ঘর সামলাইয়াছে অর্থাৎ এতদিনে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে।

এই কমিটির মতামতগুলি প্রকাণ্ড রিপোর্টের আকারে বাহির হইয়াছে। এক রুশ ও তুর্কী প্রতিনিধি ছাড়া সবাই তাতে স্বাক্ষর দিয়াছে।

এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় এই কন্‌ফারেন্স ইয়োরোপের (বিশেষ করিয়া) পুনর্গঠনের কাজটা অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যালান্স বুঝাইবার আদর্শ আকার কি হইতে পারে?

এটা ঐই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক কেইন্‌সের রিপোর্ট দানের চেষ্টা মাত্র।

গত মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ আর্থিক দুনিয়ায় দুইটা বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে—(১) জার্ম্মাণ রিপ্যারেশন বা ক্ষতি-পূরণ (২) মিত্র শক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের জন্য ঋণ।

এই দুইটাই অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। সেই জটিলতার পাক খুলিবার জন্য ইণ্টারন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-গৃহ এক বিশেষ কমিটি নিয়োগ করে। সেই কমিটি আবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক বিশেষ সাব্ কমিটি নিযুক্ত করে।

অধ্যাপক শার্ল রিষ্ট, ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের সহকারী গবর্ণর
ডাক্তার এইচ্ ব্যিথের্।
শ্রীযুক্ত জে এম্ কেইন্‌স্
ডাক্তার এইচ্ ই চ্যাণ্ডলার্, নিউইয়র্কস্থ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স
অধ্যাপক এফ্ বাউধুইন

এই কমিটি ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাস ধরিয়া প্যারিসে বসিয়া মাথা ঘামাইতে থাকে, ঋণশোধের আন্তর্জ্জাতিক ব্যালান্সের রূপটা কি হইবে। তাঁদের ও শ্রীযুক্ত জে এইচ চ্যাপমানের পরিশ্রমের ফল এতদিনে আকার পাইয়াছে।

ব্যালান্সটা নিম্নলিখিত রূপে ভাগ করা হইয়াছে; প্রথমতঃ, কি কি বাবদ ক্রেডিট উৎপন্ন হইতেছে তার হিসাব :—

১। পণ্য দ্রব্য।

২। বুলিয়ন, স্পেসি ও কারেন্সি নোট।

৩। বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতে ব্যবসা-কর্ম্ম (ব্যাঙ্ক, বীমা, জাহাজ ইত্যাদি)।

৪। সুদ।

৫। ব্যক্তিগত হিসাবের মধ্যে অন্যান্য চলিত দফা (উপনিবেশ, বিদেশ হইতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য দান ইত্যাদি)।

৬। গবর্ণমেন্টের 'হাতে লওয়া কাজ'
(কন্সাল, লোন বা ঋণরূপে নেওয়া টাকা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি)।

৭। পুঁজিপাটার 'হাতে লওয়া কাজ'
(মিউনিসিপালাটী ঋণ শোধ, সিকিউরিটী-বিক্রয় ইত্যাদি)।

৮। ব্যালান্স করিবার দফা সমূহ
(মোট ক্রেডিট্ ও ডেবিটে গরমিলের অনির্দ্দিষ্ট কারণ, অল্প কালের ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি)।

তারপর, ডেবিট্‌টা কি কি বাবদ :—

পূর্ব্বোক্ত আট দফা।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

নোট্‌স ও মেমরেণ্ডার ছুইটা প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গগুলির নাম মাত্র করিয়া সারা যাইতেছে—

৩। আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সংরক্ষণের আর্থিক সার্থকতা বা উদ্দেশ্য—এইচ্, বারগমান।

৪। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বর্ণ-রপ্তানির সীমা (পয়েন্ট) —পল আইনজিগ্।

তারপর সরকারী দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত পুস্তক ইত্যাদি।

৫। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের কৃষি বাবদ আদায় ১৯২৫—জে, এ, হেবল্।

৬। শস্তের 'ভবিষ্যৎ' শাসন-কর্ত্তাদের রিপোর্ট (যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রকাশিত)—সি, টি, হালিনান।

৭। সমবায় শিল্প-গবেষণা।

৮। যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক বছরের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট, ১৯১১ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত।

৯। মজুর মন্ত্রীর বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২৬।

১০। চা, মদ ইত্যাদি পান গৃহের নিঃস্বার্থ তত্বাবধান সম্বন্ধে নিযুক্ত কমিটীর রিপোর্ট।

১১। বালক বালিকাকে কাজ জোটাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত গ্রেট মার্লবারা ষ্ট্রীট পরামর্শ সমিতির রিপোর্ট, ১৯২৬।

১২। ১৯২৬, ২০শে নবেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের সেভিংস ব্যাঙ্কের পরিদর্শন কমিটীর রিপোর্ট।

১৩। যুক্তরাজ্যের আধুনিক সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিকসের গাইড্, ৫ম ভাগ। ১৯২৬।

১৪। ১৯২৬ সনে পোল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা।

১৫। আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা।

১৬। মধ্য ইয়োরোপের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে মেমরেণ্ডা (আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক কন্‌ফারেন্সের তাঁবে প্রকাশিত ফরাসী পুস্তিকা)।

১৭। জাপানের ২৬শ তম ফিনান্স সম্বন্ধীয় ও আর্থিক বার্ষিকী (জাপান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত)।

১৮। আর্থিক ও সামাজিক সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড (ফরাসী)।

তালিকাটা লম্বা। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলি মূল্যবান্ চটি বই মাত্র অঙ্ক ও তথ্যের সমষ্টি। এই বইগুলি সম্বন্ধে পরিচয় ও মন্তব্যকে অনায়াসে সমালোচনার মধ্যে ফেলা যায়। অবশ্য অনেকগুলিই ৫।১০ লাইনে সারা হইয়াছে।

মৃত্যুর খবর

১৯। জোসেফ ফীল্ড নিকোল্‌সন (৮ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ বিশেষ)—ডব্লিউ, আর, স্কট।

২০। ফ্রেডারিক্ লেহ্বিংটম—এইচ্, ডব্লিউ।

তারপর টাটকা খবর অর্থাৎ কোথায় কে অধ্যাপক হইলেন, কে বদলী হইলেন ইত্যাদি।

নূতন পত্রিকা ও পুস্তক

এই পত্রিকার সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে দেশ বিদেশের কতক-গুলি আর্থিক পত্রিকার চুম্বক দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, ইহার রীতিটা আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ, এই ব্যাপারে কতজন লোক খাটিতেছে তার কোন পরিচয় পাই না। দ্বিতীয়তঃ, সাজানের মধ্যে কের্দ্দানি নাই। একটার পর একটা পত্রিকার নাম করা হইয়াছে ও তার এক বা ততোধিক প্রবন্ধের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন জায়গায় মাত্র নামটা করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকান্ পত্রিকার মত বিষয় ভাগ করিয়া তার নীচে লোকের নাম বর্ণমালা অনুসারে গুছাইবার চেষ্টা ইংরেজের ধাতে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না।



আর্থিক লেনদেনের আন্তর্জ্জাতিকতা

ফ্রান্সের মার্সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেণো "লা হ্বা একনমিক অঁ্যাতার্ণ্যাশন্যাল" (আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক জীবন) নামে একখানা বই লিখিয়াছেন। বহরে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। প্রকাশক প্যারিসের সিরে কোং ১৯২৬। গ্রন্থ পুরু পুরু পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমতঃ ধনোৎপাদনের কথা। দুনিয়ার নানা দেশে আজকাল ভিন্ন ভিন্ন মাল তৈয়ারী হইতেছে। এক একটা দেশ এক একটা মাল তৈয়ারীর দায়িত্ব লইতেছে। গোটা দুনিয়া যেন একটা দেশ মাত্র; আর বিভিন্ন দেশগুলা যেন সেই দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলাবিশেষ। মানবজাতির ভিতর একটা বিপুল শ্রমবিভাগ সাধিত হইতেছে।

মাল তৈয়ারীর কাজে আন্তর্জ্জাতিকতা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মাল বিনিময়ের ক্ষেত্রেও বিশ্বজনীনতা আসিয়াছে। দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমদানি রপ্তানির সম্বন্ধ এযুগের আর্থিক জীবনের গোড়ার কথা। ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলা নিজ নিজ বিশেষত্ব-সূচক দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু প্রত্যেককেই অন্যান্য দেশের বিশেষত্ব-সূচক দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রেণো এই আমদানি রপ্তানি বা বহির্ব্বাণিজ্য কাণ্ডের বর্ত্তমান লক্ষণগুলা বিবৃত করিয়াছেন। মাল-চলাচলের অপর পিঠই হইতেছে মুদ্রার আগমন বহির্গমন। মুদ্রা আর বাণিজ্যের আন্তর্জ্জাতিকতা এযুগের এক মস্ত কথা।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মজুর ও মজুরি-সমস্যা। অন্যান্য জিনিষের মতন মজুর-জীবনও একালে আন্তর্জ্জাতিক। কাজেই বেতন-বিষয়ক আলোচনায় এক সঙ্গে নানা দেশের তথ্য প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য। অর্থাৎ আজকালকার ধনোৎপাদন আর ধন "বিনিময়" যেমন বিশ্বজনীন, ধন "বিতরণ" বস্তুটাও ঠিক সেইরূপ। মজুরির হার আগাগোড়া আন্তর্জ্জাতিক।

আর্থিক জীবন বলিলে ধন-ভোগের কথা স্বভাবতই মনে আসে। বস্তুতঃ, ধনের সৃষ্টি আর বিনিময় হয় কিসের জন্য? ভোগের জন্য। এইখানেই মানুষের সুখ দুঃখের কথা, অভাব চাহিদার কথা আসিয়া পড়ে। একালের ধন-ভোগ ব্যাপারটাও আন্তর্জ্জাতিক। কোন এক দেশ ধন-ভোগে নেহাৎ দরিদ্র যত দিন থাকিবে ততদিন অন্যান্য দেশের পক্ষে ধনভোগে খুব উঁচু হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। বিভিন্ন জাতিগুলার ভিতর ভোগ-সূত্রে একটা ঐক্য ও সমতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে। আজকাল কোনো দেশের নরনারী একমাত্র নিজের সুখসম্পদ্ লইয়া মসগুল থাকিলেই শেষ পর্য্যন্ত সম্পদশালী দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবে না। এক সঙ্গে নানাদেশের ভোগের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া প্রত্যেক দেশেরই স্বার্থ। এই গেল চতুর্থ অধ্যায়ের মাল।

পঞ্চম অধ্যায়ের মাল হইতেছে সমাজবীমার আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা। আর্থিক জীবন বলিলে একালে নরনারীকে স্বাস্থ্যে, শক্তিতে বড় করিয়া তুলিবার নানা কল-কৌশলও বুঝিতে হয়। ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈববীমা এই সমুদয়ের অন্তর্গত। গবর্মেণ্ট, পুঁজিপতি, আর জমীদার একদিকে, অপর দিকে সাধারণ গৃহস্থ। মজুর ও চাষী সকলে নিজ নিজ তরফ হইতে অথবা সমবেতভাবে স্বাস্থ্যও শক্তির ব্যবস্থা করিতেছে। এই স্বাস্থ্যশক্তির সাধনায় বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। কিন্তু মোটের উপর সকলেই একটা উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে উঠিতে চেষ্টা

করিতেছে। অধিকন্তু কতকগুলা বিষয়ে নানা দেশের সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা দেখা যাইতেছে। প্লেগ, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, ডিপ্‌থেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ হইতে মানবজাতিকে বাঁচাইবার জন্য একটা আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রাম চলিতেছে।

রেণো সকল দিক্‌ হইতে এ কালের আর্থিক জীবনকে আন্তর্জ্জাতিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন। বহুদেশের তথ্যতালিকা ও অঙ্করাশি, নানা মুলুকের আর্থিক আইন-কানুন গ্রন্থে একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুনিয়া যে নানা সূত্রে ঐক্যগ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা পাঠক মাত্রেরই সহজে মালুম হইবে। কাজেই একালে যাঁহারা জগতের অন্যান্য মুলুকের ব্যাঙ্ক, বীমা টাকার বাজার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য মজুরির হার ও চাষী জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে চাহেন, তাঁহারা দেশের কথাও বুঝিতে পারিবেন না আর দেশকে ধনসম্পদে বড় করিয়া তুলিতে হইলে কখন কোথায় কিরূপ কৌশল কায়েম করা উচিত তাহাও তাঁহাদের রপ্ত হইবে না।

একালের বিশ্ব-দৌলত

মস্কো আর লেনিনগ্রাড্‌ শহর হইতে রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্মেণ্ট একখানা সুবৃহৎ বই প্রকাশ করিয়াছে। সম্পাদক সোল্‌ৎসেফ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এঞ্জেল, জার্ম্মাণ পণ্ডিত হার্ম্‌স্‌ ও শুন্‌টসে ইত্যাদি বিদেশী ধনবিজ্ঞানসেবীদের রচনাও এই গ্রন্থে আছে। রুশ লেখকদের ভিতর দেখিতেছি ট্রট্‌স্‌কি, বুখারিণ, রাভেক ইত্যাদি কয়েকজনের নাম। বইটা জার্ম্মাণ ভাষায় "ডী ভেল্টহ্বির্ট শাফ্‌ট্‌ নাখ্‌ ডেম ক্রীগে" (যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের আর্থিক জগৎকথা) নামে বাহির হইয়াছে। বুঝানো হইয়াছে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। ভার্সাই সন্ধির ফলে ইয়োরোপ কতকগুলা স্ব স্ব প্রধান আর্থিক স্বরাজশীল দেশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে ইয়োরোপের নানাদেশে অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছে। মুদ্রা-নীতির হযবরল আর বেকার-সমস্যাও অনেক পরিমাণে ভার্সাই-সন্ধিরই সন্তান। অপর দিকে এই সকল অশান্তি নিবারণের যে সব চেষ্টা হইয়াছে তাহার পশ্চাতে দেখা যায় আমেরিকার পুঁজিসাহীদের প্রয়াস ও প্রভাব। তাঁহারাই জগতের উপর চাপ লাগাইয়া ইয়োরোপের নানা দেশকে দুরস্ত করিয়া তুলিতেছে।

"সাম্রাজ্য-নীতি"র বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ একটা আলোচ্য বিষয়। প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য সমস্যা অন্যতম। তেলের লড়াই সম্বন্ধে একটা রচনা আছে। বিদেশী পুঁজির সাহায্যে রুশিয়ার আর্থিক জীবন উন্নত হইয়া উঠিতেছে। আর্থিক জগতে মাথা খাড়া করিবার পক্ষে রুশিয়ার আর কোনো পথ নাই।

আর্থিক স্বরাজ

আমেরিকার সমর-বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক লাউক একখানা বই লিখিয়াছেন। নাম পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেমক্রেসি।" (নিউইয়র্ক ১৯২৬)। ইহাতে ১৭৭৬ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত ১৫০ বৎসরের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক স্বরাজের কথা বিবৃত আছে। আর্থিক স্বরাজ বলিতে লাউক যাহা বুঝিতেছেন, তাহা নিম্নরূপ। প্রত্যেক কারখানায় কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য কর্ম্মসভা থাকিবে। কর্ম্ম-সভাগুলা অষ্ট্রীয়ান, জার্ম্মাণ-চোকোশ্লোভাকিয়ান "বেট্রীব্‌স্‌ রাট" শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। "ট্রেড্‌-ইউনিয়ন নামক মজুর-সমিতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে না। কারখানার বাহিরে কাজ করিবে "ট্রেড্‌-ইউনিয়ন," ভিতরে কাজ করিবে "কর্ম্ম-সভা।"

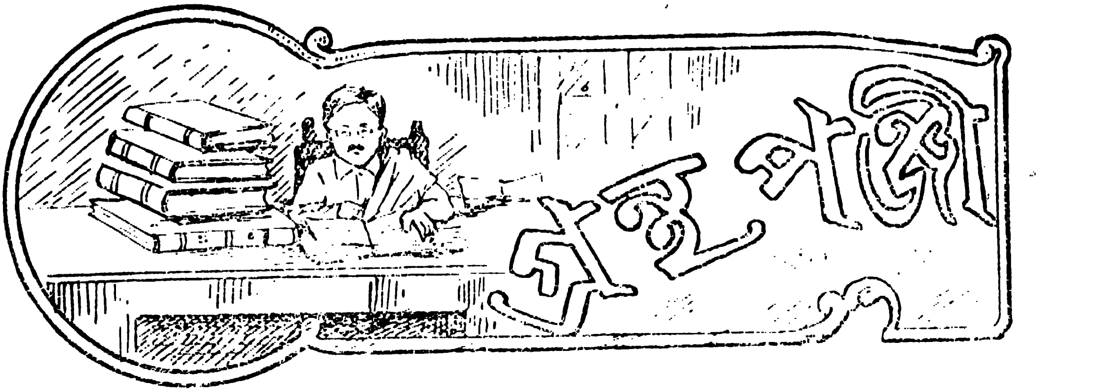
এই গেল একদিক্‌কার কথা। অপর দিকে সমাজের উপর ব্যাঙ্কের অত্যাচার নিবারণ করা আবশ্যক। আজকাল দুনিয়ায় চলিতেছে জমিদার-তন্ত্র, রাজ-তন্ত্র ইত্যাদির মতন ব্যাঙ্ক-তন্ত্র। তাহা রদ করিবার উপায় হইতেছে মজুর আর জনসাধারণের হাতে পুঁজি-গঠনের ব্যবস্থা। এই সকল লোকের ট্যাঁকে পুঁজি জমা হইতে থাকিলেই ক্রমশঃ কারখানাগুলা কারখানার মজুরদের তাঁবে আসিয়া পড়িতে পারিবে।

কথা হইতেছে, বর্ত্তমানে এইরূপ আর্থিক স্বরাজ গঠনের

সুযোগ পাওয়া যাইবে কি? সম্প্রতি সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা, এখন চলিতেছে শ্রেণী-বিরোধের যুগ আর দলাদলির যুগ। ধনস্রষ্টাদের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া মরিতেছে। পরস্পরের ভিতর চিত্ত-পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া প্রথমেই আবশ্যক। এক দিকে যেমন ধর্ম্মঘট ও হরতাল বন্ধ করা কর্ত্তব্য। অপর দিকে পুঁজিপতিদের তরফ হইতে বলপ্রয়োগও বন্ধ করা উচিত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাস হইতেছে যত দোষের গোড়া।

লাউক কতকগুলা বড় বড় মার্কিণ কারখানার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিতেছেন যে, মজুর-মনিব গণ্ডগোল একপ্রকার নিবারিত হইয়াছে। মজুর সভা, মজুরদের জন্য ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা, মজুরদের পেনশুন ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা সূত্রে মজুরে মালিকে সদ্ভাব বাড়িয়াছে। এই সকল ব্যবস্থাকে "আর্থিক স্বরাজের" ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিবার ফলে লাউক আমেরিকাকে অষ্ট্রীয়া-জার্ম্মাণি হইতে "ডেমক্রেসি" বা "স্বরাজ" হিসাবে খাটো করিয়াই ফেলিলেন। কেননা যে সকল কথা তাঁহার নিকট মোটের উপর একপ্রকার "আদর্শ" মাত্র, সেই সকল কথা মধ্য-ইয়োরোপের নানা দেশে সুপরিচিত সামাজিক তথ্য।

যাহা হউক এই সকল কথা ভারতবাসীর পক্ষে বেশ নতুন সন্দেহ নাই। লাউক-প্রচারিত অন্যান্য আদর্শের নমুনাও দিতেছি। মজুরে আর পরিচালকে মিলিয়া কারখানার খরচ কমাইবার ব্যবস্থা করিবে আর মালোৎপাদনের মাত্রাও বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। লাভের মাত্রা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মজুরে মালিকে বখরা ত সাধিত হইবেই। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দাম, রেলের মাশুল ইত্যাদি কমাইবার আয়োজনও চলিতে পারিবে। তাহাতে জনসাধারণের উপকার, বলাই বাহুল্য। ব্যাঙ্কের আধিপত্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কারখানার শেয়ার বেচা হইবে রেল-যাত্রীদের অথবা খরিদ্দারদের নিকট। বস্তুতঃ, মজুরেরা নিজেই অনেক শেয়ার কিনিবার সুযোগ পাইবে।



"ইল্‌রিস্ক্য এ লর্গানিজাৎস্তনে দেল্‌ইন্দুস্ত্রিয়া মদের্ণা" (আধুনিক শিল্প-কারবারের ঝুঁকি ও শাসন-ব্যবস্থা), কাস্‌সলা, মিলান, সাগ্রেন কোং, ১৯২৬, ১২+১৭৩ পৃষ্ঠা, ১৫ লিয়ার।

"কোয়েসচ্যান্‌স অ্যাণ্ড আন্‌সার্স অন দি ফেডার‍্যাল রিজার্ভ সিষ্টেম্" (মার্কিণ সরকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পদ্ধতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর), সম্পাদক পেপ্লে, রিচ্‌মণ্ডের ফেডার‍্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬, ১১+১৭৮ পৃষ্ঠা।

"পলিটিক্‌স্ অ্যাণ্ড দি ল্যাণ্ড" (রাষ্ট্রনীতি ও ভূমি-সমস্যা),—ডাম্পিয়ার,—কেম্ব্রিজ, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৭। ২১৫ পৃষ্ঠা, ৬ শি।

"ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার্স অব্ দি অটোমোবিল ইণ্ডাষ্ট্রী" অটোমোবিল-শিল্পের তথ্য ও আঁকজোক),—হ্বাশিংটন, ১৯২৭, ন্যাশন্তাল অটোমোবিল চেম্বার অব্ কমার্স, ৯৬ পৃষ্ঠা।

"মার্কস লেনিন অ্যাণ্ড দি সায়েন্স অব্ রেভোলিউশ্যন" (মার্কস, লেনিন ও বিপ্লব-বিজ্ঞান), ঈষ্টম্যান, লণ্ডন ১৯২৬, অ্যালেন ও আন্নুইন কোং, ২৬৭ পৃষ্ঠা, ৭ শি ৬ পে।

"অ্যাপ্‌ল ইণ্ডাষ্ট্রী ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেটস (যুক্তরাষ্ট্রের আপেল-সম্পদ্), সরকারী কৃষি-দপ্তর হইতে প্রকাশিত ১৯২৭, ১৭০ পৃষ্ঠা।

"দি ওয়ার অ্যাণ্ড দি শিপিং ইণ্ডাষ্ট্রী" (মহা-লড়াই ও জাহাজ-শিল্প), ফেইল, নিউ হেভন্, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২৪+৪৭২+১৬ পৃষ্ঠা, ১৭ শি।

"দি পোর্ট অব্ লণ্ডন" (লণ্ডন বন্দর),—ওয়েল লণ্ডন, ১৯২৭, হ্যারিসন কোং, ৮+১০৬ পৃষ্ঠা, ৭ শি ৬ পে।

"গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইন থিয়োরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস" (স্বর্ণ-মানের তত্ত্ব ও তথ্য), হট্রে, লণ্ডন, ১৯২৭, লংম্যানস, ১২৪ পৃষ্ঠা, ৩ শি।

"ডিমিনিশিং রিটার্ণস্ ইন্ অ্যাগ্রিকালচার" (কৃষিকর্ম্মে মুনাফার ক্রমিক হ্রাস),—প্যাটন নিউইয়র্ক ১৯২৬, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, ১০০ পৃষ্ঠা ১·৫০ ডলার।

"বিজ্‌নেস সাইক্‌ল্‌স অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস মেজারমেণ্ট্‌স্" (ব্যবসা-চক্র ও ব্যবসার আঁকজোক),—স্নাইডার, নিউইয়র্ক, ১৯২৭, ম্যাক্‌মিলান কোং, ১৪+৩২৬ পৃষ্ঠা।

"লে নম্ব্র অ্যাঁদিস্ দ'লা ভারিয়া সিঅঁ দে প্রি" (মূল্য-পরিবর্ত্তনের সূচী-সংখ্যা) অলিভিয়ে প্যারিস ১৯২৭, জিয়ার কোং, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, ৫০ ফ্রাঁ।

"দি ইকনমিক প্রব্‌লেম" (অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা), হট্রে, লণ্ডন, ১৯২৬, লংম্যানস কোং ১২+৪১৭ পৃষ্ঠা, ১০ শি ৬পে।

"আলগেমাইনে ফোল্‌ক্‌স্ হ্বির্ট্‌শাফট্‌সলেরে" (ধন-বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র)—কন্‌রাড্, দ্বাদশ সংস্করণ (সম্পাদক হেস্‌সে), য়েনা, ১৯২৭ গুষ্টাভ ফিশার কোং, ১৬+৫০৪, ১৬ মার্ক।

"ডার মর্ডার্ণে হাণ্ডেল" (আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য), হির্শ, দ্বিতীয় সংস্করণ,—ট্যুবিঙ্গেন, ১৯২৫, মোর কোং, ১৬+৩২৮, ১৬মার্ক।"

বৃটিশ সাম্রাজ্যে কাঁচা মালের সংস্থান

আমাদের একটা সাধারণ ধারণা যে ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণে কাঁচামাল পাওয়াতে ইংল্যণ্ডের বাণিজ্যে এবং শিল্পে খুব লাভ হয় এবং প্রাধান্যও থাকে। ইহা কতক পরিমাণে সত্য, কিন্তু সাম্রাজ্য অত্যন্ত বৃহৎ এবং বিস্তৃত; সুতরাং প্রায় সর্ব্বপ্রকার কাঁচামালই ভারতবর্ষ ব্যতীত সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতেও আসিয়া থাকে এবং তাহার পরিমাণও কম নয়। ভারতবর্ষ ইংরাজশাসিত বলিয়া অনেক বিলাতী তৈয়ারী মাল এদেশের বাজারে কাটতি হয়। তাহার এক কারণ অন্যান্য যে কোন দেশের লোক অপেক্ষা ইংরাজ আমাদের খবর বেশী রাখে। দ্বিতীয় কারণ আমরা ভারতবাসীরা অন্যান্য দেশের খবর বেশী রাখি না এবং সেই জন্য তাহাদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ তেমন করিয়া স্থাপন করি নাই। গভর্ণমেণ্ট এবং আংশিক ভাবে গভর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত ডিপার্টমেণ্টগুলির অনেক মাল ইংল্যণ্ড হইতে আসিয়া থাকে সন্দেহ নাই এবং তাহাতে এই সব বেচা কেনার যতটা মুক্ত প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত তাহা হয় না, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এতবড় দেশের প্রয়োজনে ইহা হইতেও অনেক অধিক মাল ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে আনে; ইহারা অন্য দেশের বাজারের খবর না রাখিয়া যদি বিলাত হইতে বেশী দরে মাল আনায় তাহার জন্য আমাদের অজ্ঞতাই প্রধানতঃ দায়ী।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত অঙ্কগুলি দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কাঁচামাল সরবরাহে ইংল্যণ্ড ভারতবর্ষের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিতেছে না। আজকাল পৃথিবীতে কাঁচামালের একচেটিয়া ব্যবসায় রাখা দায়। বোধহয় একমাত্র পাট ভিন্ন আর কিছুতেই ভারতের একচেটিয়া ব্যবসায় নাই। পাট যে সব কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহারও সাবষ্টিটিউট বাহির হইতেছে। সুতরাং আমরা পাটের দর খুসীমত বাড়াইতে পারি না। অন্যান্য দেশেও পাটের চাষ আরম্ভ হইতে পারে। তিসির তেলের কারবারে দেখিতে পাই যে, ইতিমধ্যে ইংল্যণ্ড ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে এই তেল এবং বীজ আর্জ্জেন্টিনা হইতে আমদানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত আমদানি-রপ্তানির হিসাব লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্সের জার্ণ্যাল হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১। প্লাটিনাম্—অলঙ্কারে এবং রাসায়নিক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

প্রাপ্তিস্থান—(ক) কুইবেক (ক্যানাডা)

১৯২৬-১৯২৭—মূল্য ৩১,৭১৩ পাউণ্ড

১৯২৫-১৯২৬—মূল্য ৫৪১১৫ পাউণ্ড

(খ) নিউ সাউথ ওয়েল্স্—১২০০০ পাউণ্ড

(গ) দক্ষিণ আফ্রিকা— ৯৩৩০৭ পাউণ্ড

(ঘ) গোল্ড কোষ্ট কলোনি—অত্যন্ত কম, সেইজন্য খনন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

২। পারদ—অনেক কার্য্যেই দরকার হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যে পাওয়া যায় না সুতরাং আমদানি করিতে হয়।

৩। ম্যাঙ্গানিজ—লোহা এবং ইস্পাতের কার্য্যে খুব বেশী দরকার। গত বৎসর ইংলণ্ডে লোহা ও ইস্পাতের কারখানার কাজ কমিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রমাণ ম্যাঙ্গানিজ ওর আমদানি হইতে বুঝিতে পারা যায়:—

		টন্		মূল্য (পাউণ্ড)
১৯২৪	...	৩২৫৩১১	...	১৩৬৩৪২৭
১৯২৫	...	২৭৮৬৪৭	...	১২৩১০৪৩
১৯২৬	...	১৪৪৩০৮	...	৬৩০৮৬৭

উৎপত্তিস্থান:—

(ক) বৃটিশ ভারত

	টন	মূল্য (টাকা)
রপ্তানি ১৯২৬-২৭	৫২৩৯১৬	১৪৭৬৩১৯৪
১৯২৫-২৬	৬০৪১৯৮	১৬০৩২২৭১

বেশীর ভাগই ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম নিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড প্রায় ৭৫০০০ টন নিয়াছিল। ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষে ৮৩৯৪৬১ টন (মূল্য ২৬১৭২২০ পাউণ্ড প্রায় ৩৬৬৪১০৮০ টাকা) ম্যাঙ্গানিজ ওর উৎপন্ন হইয়াছিল।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকা—ম্যাঙ্গানিজের বেশ ভাল খনি আছে। তাহাতে আমেরিকান্ ধনীদের বেশ অংশ আছে।

(গ) অষ্ট্রেলিয়া—খনির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

(ঘ) গোল্ডকোষ্ট কলোনি

রপ্তানি

১৯১৬ সন— ৪০০০ টন

১৯১৯ সন— ৩১০০০ টন

১৮২৬ সন—৩৪৪৯৩৩ টন

খনিতে বোধহয় সর্ব্বসমেত কুড়ি লক্ষ টন্ আছে।

(ঙ) নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড—খুব ভাল খনি পাওয়া গিয়াছে ; কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

৪। ক্রোমাইট—লোহার সহিত ক্রোমিয়াম্ মিশাইয়া ইস্পাত করিলে সেই ইস্পাতের বিশেষ কতকগুলি গুণ থাকে। আজকাল ক্রোমিয়াম্ ইস্পাত হইতেই নন্-রাসটীং ষ্টিল তৈয়ারী হয়। অর্থাৎ ইহাতে সহজে মরিচা ধরে না। ক্রোমাইট উচ্চতাপে চালিত ভাটির (ফারনেস) লাইনিংএর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রোম্‌ট্যানিংএ ক্রোমিয়াম সল্টের দরকার হয়। প্রায় সর্ব্বপ্রকার ক্রোমিয়াম্ সল্টই ক্রোমাইট্ হইতে তৈয়ারী হয়।

(ক) দক্ষিণ রোডেসিয়া

রপ্তানি—১৯২৫—১৪৪৭৭১ টন—৩১৫২৪৫ পাউণ্ড।

১৯২৬—১৭৩৭৫৬ টন— ৩৮৮১৩ পাউণ্ড।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকা

রপ্তানি—১৯২৫— ৬৬৪৫ টন—১০৬৯৪ পাউণ্ড।

১৯২৬—১৪১৮০ টন—১৮১২৬ পাউণ্ড।

(গ) ভারতবর্ষ

রপ্তানি—১৯২৫—৩৭৪৫২ টন—৪০১৭১ পাউণ্ড।

১৯২৪—৪৫৪৬২ টন —

(ঘ) নিউসাউথ্ ওয়েলস্, ক্যানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডেও ক্রোমাইট্ পাওয়া যায় ; কিন্তু এখনও কাজ ভাল আরম্ভ হয় নাই।

৫। বক্‌সাইট্—অ্যালুমিনিয়াম্ ধাতুর ওর অ্যালুমিনিয়াম ধাতু হইতেই প্রস্তুত হয়। সর্ব্বপ্রকার অ্যালুমিনিয়াম সল্টের ফটকিরি ইত্যাদির ইহাই কাঁচামাল।

(ক) বৃটিশ গিনি—ক্যানাডার অ্যালুমিনিয়ামের কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বক্‌সাইট এইখান হইতেই সরবরাহ হয়।

১৯২৫—১৭৪৯৯৯ টন—৮৮৬৩৪৩ পাউণ্ড।

১৯২৬—১৮৩৮৫৯ টন—৯৩০৬৮২ পাউণ্ড।

(খ) ভারতবর্ষ—১৯২৪—২৩২২৪ টন—১৩৫৩১ পাউণ্ড।

১৯২৫—১০০৭০ টন—৬৩২০ পাউণ্ড।

১৯২৬—উৎপন্ন ভালই হইয়াছে।

(গ) গোল্ড কোষ্ট্ কলোনি—বিশেষজ্ঞদিগের মতে এখানে খুব বেশী পরিমাণে বিশুদ্ধ বক্‌সাইটের খনি পাওয়া গিয়াছে এবং কলোনির ভবিষ্যৎ এই বক্‌সাইটের জন্যও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে।

৬। বিস্‌মাথ—বিস্‌মাথের মিশ্রধাতু কম তাপে গলে। এই জন্য নানাকার্য্যে ইহার ব্যবহার আছে। ইহার কোন্ কোন সল্ট ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

(ক) নিউসাউথ ওয়েলস্

(খ) ক্যানাডা

৭। মোলিব্‌ডেনাইট—লৌহের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহা হইতে এক বিশেষ ইস্পাত তৈয়ারী করা যায়। লৌহ কারখানায় মোলিব্‌ডেনামের খুব ব্যবহার।

(ক) পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও নিউসাউথ ওয়েলস্

রপ্তানি—১৯২৫-২৬—৭০০৪ পাউণ্ড।

(খ) নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড

রপ্তানি—১৯২৪-২৫—৫৩০২ পাউণ্ড।

৮। ওস্‌মিয়াম্ ও ইরিডিয়াম—

(ক) ট্যাস্‌মানিয়া—১৯২৫—১০৩৫৭০ পা। ৩৩৬৫ আঃ।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকা—১৯২৫ — ৬০৫৫ আউন্স।

৯। হোলফ্রাম অথবা টাংষ্টেন—ইস্পাতের কারখানায় এবং বিজলিবাতি তৈয়ারী করিতে দরকার হয়।

(ক) ভারতবর্ষ—হোলক্রাগিট—

১৯২৫—৭৭২ টন—৩৩৯৭৫ পাউণ্ড।

১৯২৪—৭৩৯ টন—২৪৫৫৯ পাউণ্ড।

(খ) বৃটিশ মালয় ষ্টেটস

১৯২৬—২৩৫ টন—৯৮৪২৬ পাউণ্ড।

(গ) অষ্ট্রেলিয়া—১৯২৫-২৬—১১৯৭২ পাউণ্ড।

১০। প্রকৃতিজাত ফটকিরি

(ক) প্রধানতঃ নিউসাউথওয়েলসে পাওয়া যায়। ১ মাইল লম্বা একটি পর্ব্বতশ্রেণী কেবল এই খনিজ পদার্থেই গঠিত।

(খ) পাঞ্জাবে মিয়ানওয়ালিতেও পাওয়া যায়

১৯২৫—১০৫০ হন্দর—১৭১৮ পাউণ্ড।

১৯২৪—৯২৬ হন্দর—১৩৫৯ পাউণ্ড।

১১। আসফাল্ট

(ক) ট্রিনিডাড—১২৭ একর একটি স্থান, গভীরতা অনিশ্চিত আসফাল্টেই ভরতি। ১৯২৬ সনে ১৮০৯৩৩ টন আসফাল্ট তোলা হইয়াছিল।

(খ) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাপ্তিস্থান ক্যানাডায়। স্থানটী ৭০ মাইল লম্বা এবং প্রায় ১৫০-২০০ ফুট চওড়া। ইহা ব্যতীত ইহার চতুর্দ্দিকে আরও আছে। সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০০০ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া আছে।

১২। ফ্লোরস্পার অথবা ক্যালসিয়াম ফ্লুরাইড

(ক) ক্যানাডা—অণ্টারিয়ো ও বৃটিশ কলাম্বিয়া

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকা

১৯২৫—৭১৬২ টন—২১৬৩০ পাউণ্ড।

১৯২৬—৭৮৫৬ টন—২০৮৫০ পাউণ্ড।

(গ) কুইনসল্যাণ্ড।

১৩। ম্যাগ্নেসাইট

ব্যবহার—(১) সেলুলোজ শিল্প

(২) ধাতু নিষ্কাষণ শিল্প

(৩) তাপসহন দ্রব্য প্রস্তুত করণ

(৪) সর্ব্বপ্রকার ম্যাগ্নেসিয়াম সল্ট প্রস্তুত করণ

প্রাপ্তিস্থান—(ক) ক্যানাডা

রপ্তানি—১৯২৬-২৭—১৩৫১০ হন্দর—২০১৩৪ পাউণ্ড।

রপ্তানি—১৯২৫-২৬—১৬৬৭৭ হন্দর—২১০৮৮ পাউণ্ড।

(খ) বৃটিশ ভারত

১৯২৫—২৯৬২০ টন—৩১১৭৯ পাউণ্ড।

১৯২৪—২৪৪৬১ টন—২১০৮৮ পাউণ্ড।

(গ) নিউসাউথ ওয়েলস্

১৪। মোনাজাইট—গ্যাসবাতিতে যে সাদা টোপর পড়াইয়া আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করান হয় তাহার প্রধান উপকরণ মোনাজাইট বালি হইতে লওয়া হয়।

প্রাপ্তিস্থান—(ক) ভারতবর্ষ—ত্রিবাঙ্কুর সম্প্রতি এখানে মোনাজাইটের উৎপাদন অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

১৯২১—১২৬০ টন

১৯২৪—৬২২ টন

১৯২৫—১ হন্দর

(খ) সিংহল

(গ) ট্যাসমানিয়া

১৫। গ্রাফাইট—ধাতুঢালাই, রং পেন্সিল, ঘর্ষণ নিবারণ এবং বৈদ্যুতিক কমিউটেটার ক্রস ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

(ক) সিংহল—রপ্তানি—১৯২৫—৩০৫৬০৮ হন্দর

১৯২৬—২৩২৩৫২ হন্দর

মাদাগাস্কারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সিংহলে গ্রাফাইটের বাজারে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ১৯১৮ সনে যত রপ্তানি হইত এখন তাহার অর্দ্ধেক রপ্তানি হইতেছে।

(খ) ক্যানাডা—১৯২৫-২৬—৫৪৩৯৬ হন্দর।

১৯২৬-২৭—৪২৮৬৭ হন্দর।

(গ) কেনিয়া কলোনি

১৬। ক্যালসিয়াম ফস্ফেট—জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

(ক) প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। প্রতিবৎসর এই দ্বীপসমূহ হইতে ২০০০০০-২৫০০০০ টন রপ্তানি হয়।

১৭। পাইরাইটিস—লৌহ পাইরাইটিস্

(ক) সাইপ্রাস্

রপ্তানি—১৯২৬—২০৯৬৬৪ পাউণ্ড।

১৯২৭—১৫৬২৪০ পাউণ্ড।

(খ) ক্যানাডা

(গ) ট্যাসম্যানিয়া

১৮। প্রকৃতিজাত সোডা

(ক) কেনিয়া কলোনি—

এই সোডা ভারতবর্ষেও ক্রনার মণ্ডের সোডার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে। পৃথিবীতে সোডার এত বড় সংস্থান প্রকৃতি আর কোথাও রাখেন নাই।

(খ) ক্যানাডা, বৃটিশ কলাম্বিয়ায় এগারটী ছোট ছোট সোডাহ্রদ আছে।

(গ) সুডান্

১৯। তিমি ও শীল মাছের তেল—ইংল্যাণ্ডে আমদানি

১৯২৫— ৪৩১৫১ টন ১,৬১০,০০০ পাউণ্ড

১৯২৬— ৫০৮৪৯ „ ১,৮৩০,০০০ ”

(ক) দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমদানি হয়।

১৯২৬-২৭ ২,৯৬০,০০০ গ্যালন ২৮৭২১৭ পাউণ্ড

১৯২৫-২৬ ৩,৯২০,০০০ „ ৪৭১১১৯ ”

(খ) ক্যানাডা

১৯২৬-২৭—৩৭০,১১৬ গ্যালন — ১৬৮৩৯০ ”

১৯২৫-২৬—৪২৪,৪৬৭ „ — ২৪২৬২৭ ”

অন্যান্য মাছের তেল, প্রধানতঃ লিভারের তেল

১৯২৬-২৭ ১,৭২০,০০০ গ্যালন ৭০০,৫৩৯ ”

১৯২৫-২৬ ৩৮৫,১৬৯ „ ১৭৪,৬৫৬ ”

(গ) নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড্

(ঘ) ফক্ক আইল্যাণ্ড্

(ঙ) নিউজিল্যাণ্ড

২০। মোম্ (মৌমাছির)

(ক) কেনিয়া কলোনি

(খ) ট্যাঙ্গানিকা

(গ) জাঞ্জিবার

(ঘ) জ্যামাইকা

(ঙ) নাইগেরিয়া

(চ) নিয়াসাল্যাণ্ড্

২১। অস্থি ফস্ফেট (জমির সার)—বোন্ চারকোল ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ক) ভারতবর্ষ

রপ্তানি ১৯২৫— ৮০৫৬৭ টন ৮৯০৩০৯৬৲ টাকা

১৯২৬— ৯৬৯৮৭ „ ৯৩৯৫৫৩৫ „

২২। আরবিগাম

শর্করাদ্রব্য, ঔষধ, কাগজ, কালি, ছাপাখানা, কাপড়ের কল, চীনামাটির বাসন তৈয়ারী ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

বিলাতে আমদানি—

১৯২৬— ১৫৪২২৯ হন্দর ৫৫৮৯১৪ পাউণ্ড

১৯২৫— ১২২৪৫৭ „ ৪৪৮৮৯৭ ”

(ক) সুডান্

রপ্তানি ১৯২৬— ৮৬০৩৭৪ পাউণ্ড

১৯২৫— ৮১২৭১৫ ”

(খ) পশ্চিম আফ্রিকা নাইগেরিয়া

(গ) পূর্ব্ব আফ্রিকা ট্যাঙ্গানিকা

(ঘ) ভারতবর্ষ

১৯২৫-২৬—১০৩১৪ হন্দর ২৪৬৮৫৫ টাকা

১৯২৬-২৭—১১৯৮৫ „ ৩০০৭৫৪ „

২৩। গালা—সিলমোহর, গ্রামোফোনের প্লেট, বোতাম, লিথোগ্রাফের কালি, ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটার ইত্যাদি অনেক জিনিষ তৈয়ারী করিতে ইহার ব্যবহার হয়।

(ক) ভারতবর্ষ

রপ্তানি ১৯২৬-২৭—৬৩৬৬৬০ হন্দর ৫৮৪১৯২২২ টাকা

১৯২৫-২৬—৪৮৬৪২২ „ ৭০৫০১৬৫৭ „

রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়াছে কিন্তু দাম কমিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও মার্কিণ দেশেই বেশীর ভাগ রপ্তানি হয়।

২৪। অন্যান্য গাছের আটা (কাউরি, কোপাল, ডামার ইত্যাদি) বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২৫। তার্পিণ তৈল—ইংল্যাণ্ডে আমদানি।

১৯২৬-২৭—৪১৮৫৬৯ হন্দর—১,২৫৩,৩১৪ পাউণ্ড।

(ক) ক্যানাডায় বৃটিশ কলাম্বিয়ায় এই তেলের উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

২৬। রজন্—তার্পিণ তৈল হইতেও ইহার আমদানি অধিক।

১৯২৫-২৬—১৫০৬৮১০ হন্দর ১,৫৪০,০০০ পাউণ্ড

১৯২৬-২৭—১৩৮২৩১৫ হন্দর ১,৮৩০,০০০ পাউণ্ড।

অন্যান্য যে কোন আটা হইতে ইহার আমদানি বেশী। ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতেই বেশী আসে।

২৭। চামড়া পাকাইবার মাল মশলা

ইংল্যাণ্ডে আমদানি

	১৯২৫		১৯২৬	
	১০০০ হন্দর	১০০০ পাউণ্ড	১০০০ হন্দর	১০০০ পাউণ্ড
আরক	১২৩৭	১২০৫	১১২২	১০৭২
ছাল	৪৪৬	২২৮	৪৩৯	২১৫
সুমাক্	৯৫	১২৭	১০১	৯৬
গাম্বীর	৪২	১৩৫	৩৫	৭৯
হরীতকী	৫৩৯	৩১৫	৬২৪	৩১২
ভালোনিয়া	১৮৮	১১৫	১১৮	৬৭
অন্যান্য	১৭	১৫	৩৩	২১

(ক) ভারতবর্ষ

হরীতকী—নরম চামড়া তৈয়ারী করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী।

রপ্তানি

১৯২৫-২৬	১০৯৩৮৬৪ হন্দর	৭৮৫৩১৯২	টাকা
১৯২৬-২৭	১২৯৮৫৫৭ ,,	৭৮৩৪৯০৬	,,

হরীতকীর আরক

১৯২৬-২৭ ...... ৪,২৮,২৪৮ ,,

ইহা ব্যতীত গাম্বীর ছালও রপ্তানি হয়

(খ) বৃটিশ মালয় ষ্টেট্স্

(গ) অষ্ট্রেলিয়া

(ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা—রপ্তানি

ছাল	১৯২৫-২৬	৭৮১০৯৩ পাউণ্ড	
	১৯২৬-২৭	৫৯২৮৩০	,,
আরক	১৯২৫-২৬	৩২৮০৬৮	,,
	১৯২৬-২৭	৩২৪৩৩৭	,,

(ঙ) ট্যাঙানিকা

১৯২৫-২৬—	৫৮৮৯৫ হন্দর	১৩৬২৯	,,
১৯২৬-২৭—	১২৪১৮৮ ,,	২৪৩৬১	,,

(চ) কেনিয়া কলোনি

১৯২৫— ২৫৯২১ পাউণ্ড

১৯২৬— ২০৯৯২ ,,

২৮। অন্যান্য নানা প্রকার গাছগাছরা চামড়া পাকাইবার মাল মশলা, ঔষধ এবং রং তৈয়ারী করিবার জন্য সাম্রাজ্যের নানা দেশ হইতে আমদানি হয়। কিন্তু প্রত্যেকেরই পরিমাণ কম এবং বিভিন্ন দেশ হইতে আনীত হয় বলিয়া বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইল না।

২৯। রেড়ির তেল—ঔষধ এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(ক) ভারতবর্ষ—১৯২৬-২৭ সনে ১৩৭২০০০ একর জমিতে ১৩২০০০ টন রেড়ির তেল উৎপন্ন হইয়াছিল

রপ্তানি রেড়ির বীজ

১৯২৬-২৭—১০১৯৫৪ টন্ ২০৫৪২৬৬৮ টাকা

১৯২৫-২৬—১১১১৩১ ,, ২৮৮৮৭১৫৫

ইহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিলাতে গিয়াছিল।

(খ) অষ্ট্রেলিয়াতে রেড়ির গাছের চাষ আছে।

(গ) কেনিয়া কলোনি ও উগাণ্ডাও বিলাতে রপ্তানি আরম্ভ করিয়াছে।

(ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা।

৩০। তিসির বীজ ও তেল—রংএর কাজে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বীজ—ইংল্যাণ্ডে আমদানি

দেশ	১৯২৫-২৬		১৯২৬-২৭	
	টন	১০০০ পাউণ্ড	টন	১০০০ পাউণ্ড
রুশিয়া	২৬৭৪৭	৫২২	৩৬৭১৩	৫৭৬
আর্জ্জেন্টিনা	১৫১০৪৯	৩০৪৫	২৬৯৮৬৫	৪১৪৫
ভারতবর্ষ	১৪৬৭২৬	৩৩৭৬	৪১০৬৯	৭৩৩
ক্যানাডা	১৫০৫	৩৫	—	—
অন্যান্য দেশ	১৪৪৪৯	২৯০	১৩১৯৬	২২৫
মোট	৩৪০৪৭৬	৭২৬৮	৩৬০৮৪৩	৫৬৭৯

ইহা ব্যতীত তেলের আমদানি

১৯২৫-২৬	১৭১৫১ টন	৭৭৩৮২৫ পাউণ্ড
১৯২৬-২৭	১৪২৮৭ ,,	৪৮৩০৯৭ ,,

(ক) ভারতবর্ষে

বীজের রপ্তানি—	১৯২৫-২৬	৩৫৬১৪৭ টন্	৯৫৫৭৭৮৭৬ টাকা
	১৯২৬-২৭	১৮৬৩৬৮ ,,	৩৮৬৮৩১৫৩

(খ) ক্যানাডা—রপ্তানি ১৯২৫-২৬ ১২৮৮০০০০ পাউণ্ড

(গ) কেনিয়া কলোনি ১৯২৬-২৭ ৫৩৭০০০০ ,,

(ঘ) সাইপ্রাস্।

শ্রীহীরালাল রায়

পাটের চাষের পূর্ব্বাভাষ

গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে কত একর জমিতে পাট চাষ হয় ও তাহাতে কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়া সম্ভব তাহার পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার একটী জুলাই মাসে ও অপরটী সেপ্টেম্বর মাসে বাহির হয়। এই পূর্ব্বাভাষের উপর পাটের দর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যে বৎসর প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হয়, সে বৎসর পাটের দর কম, ও যে বৎসর পাটের চাষ কম হয় ও চাহিদা বেশী থাকে সে বৎসর পাটের দর অধিক হয়। সুতরাং জুলাই মাসে পাট চাষের প্রাথমিক আনুমানিক বিবরণ বাহির হওয়ার পূর্ব্বে পাটব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সকলেই অত্যন্ত উদ্গ্রীব হইয়া ইহার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। যেইমাত্র ইহা প্রকাশিত হয় ব্যবসায়িগণ যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া দেশে ও বিদেশে পাট অগ্রিম বিক্রী করিতে আরম্ভ করেন। যদি এই প্রাথমিক অনুমান কোন

কারণে ভ্রমাত্মক হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়িগণ বা চাষিগণ এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইউনিয়ান পঞ্চায়েৎগণ সাধারণতঃ তাহাদের ইউনিয়ানস্থিত গ্রামসমূহে কত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার হিসাব থানা যোগে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল পঞ্চায়েৎ অধিকাংশ সময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের প্রেরিত হিসাব দেখিয়া বাড়ীতে বসিয়াই হয়ত মনগড়া হিসাব প্রস্তুত করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহাদের এই হিসাবের উপরই যে মুখ্যতঃ দেশের অর্থাগমের হ্রাস বা আধিক্য ঘটে তাহাদের অনেকেরই সে জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সব কারণে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত প্রকাশিত পূর্ব্বাভাষও ভ্রমাত্মক হইয়া পড়ে। ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ভ্রান্তি উৎপাদন করে এবং তাহারা ইহার ফল ভোগ করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গত বৎসরে প্রকাশিত প্রাথমিক আনুমানিক হিসাবে উল্লিখিত পাটের চেয়ে ফলতঃ অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে। সেজন্য পাটের দর আশাতীত কম হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অতঃপর প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের জন্য শুধু পঞ্চায়েৎগণের উপর নির্ভর না করিয়া অন্যরূপ সুব্যবস্থা করিলে পাটচাষী ও ক্রেতা উভয়েই উপকৃত হইবে।

সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বার যে পূর্ব্বাভাষ বাহির হয়, তাহাতে কত কম পাট উৎপন্ন হইবে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক নানা বিপর্য্যয়ে পাট ফসলের যে সকল অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা বিবেচনা ও প্রতি একরে ৩ গাঁইট (৫মণে এক গাঁইট) পাট উৎপন্ন হয় ধরিয়া মোট কোন্ জিলায় কত পাট উৎপন্ন হইবে তাহার আভাষ দেওয়া হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অভিজ্ঞতাই এবিষয়ে অনুমানের প্রধান ভিত্তি। অবস্থাভেদে ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও কার্য্যতঃ ইহাই প্রকৃত বিবরণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পূর্ব্বাভাষে প্রকাশিত এই আনুমানিক বিবরণ ছাড়াও অন্য কারণে পাটের দরের ইতর-বিশেষ হইতে পারে। সম্প্রতি মিলারগণ কৃত্রিম উপায়ে পাটের দর চাপিয়া রাখার ও নিজেরা অতিরিক্ত লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে মিলার এসোসিয়েশন নামে যে সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার নির্দ্দেশ মত পাটের দর নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বিদেশী বণিকগণ ও মিলকর্ত্তৃপক্ষগণই পাটের প্রধান ক্রেতা, পাটব্যবসায় তাহাদের একচেটিয়া। তাহারা পাট না কিনিলে পাটের বাজার একদম বন্ধ থাকে। এদিকে বিক্রেতাগণ, বিশেষতঃ পাটচাষী কৃষকগণ, অর্থাভাবেই হউক বা অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির ভয়েই হউক পাট হস্তান্তরিত করিতে পারিলেই রক্ষা পায়। এমতাবস্থায় কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া প্রার্থিত দর না পাইলে মিলারগণকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দরেই পাট বিক্রী করিতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি বিক্রেতাগণও সভাসমিতি করিয়া পাটের দর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন বটে; কিন্তু এক কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে দেশে এইরূপ বহু সমিতি প্রতিষ্ঠা না হইলে সুফল ফলিবে বলিয়া আশা করা যায় না।

পূর্ব্বাভাষ মত গত বৎসর সমগ্র দেশে ৩৮৫৬২০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক ময়মনসিংহ জেলায় ৭৩০০০০একর জমি পাট ফসলের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে সমগ্র দেশে ৩৩৮২১০০একর ও ময়মনসিংহ জেলায় ৬৬২০০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। সুতরাং এক ময়মনসিংহ জেলায় সমগ্র দেশের পঞ্চমাংশ পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় কোটিমণ পাট উৎপন্ন হয়। ময়মনসিংহবাসী পাট ব্যবসা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলে তাহাদের অবস্থা বহুপরিমাণে উন্নত হইতে পারে। ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে হঠাৎ জলাধিক্য হওয়ায় এক আনা পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে শুনা যায়। ইহা সত্ত্বেও উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বিগত বৎসরের চেয়ে বিশেষ কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি দর পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় হয় তবে কৃষকগণের দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। দেশের নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে মনোযোগী হইলে এবার পাটের দর আশানুরূপ হইতে পারে। নচেৎ দেশে হাহাকার উঠিবে। মিলকর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর শতকরা ১০০।২০০ টাকাও ডিভিডেণ্ড দিতে সমর্থ হন। তাহাদের এইভাবে অর্থ সচ্ছলতার স্রোত আরও বর্দ্ধিত হইলে দেশবাসীর দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। বিক্রেতাগণকে এখন হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

(প্রবাসী)

কৃষিকর্ম্ম ও গো-রক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র হিন্দুদিগের নিজ হাতে হাল চাষ করা ও ধান কাটা যে একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। উচ্চ-বংশজাত মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ যদি কৃষিকর্ম্মের প্রতি মনোযোগ না দেন তবে অচিরেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ঋণজালে জড়িত হইয়া ঋণের দায়ে একেবারে বিত্তহীন হইয়া পড়িতে পারেন। কারণ, আজকাল বিলাসিতার স্রোতে হিন্দুগণ ভাসমান। ব্যয়বাহুল্য অতিমাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ায় অনেকের পক্ষে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা বিদেশে যাইয়াও চাকুরী করিয়া সংসার চালইতে পারেন না, আবার ঘরে বসিয়াও শ্রমজীবী দ্বারা জমি চাষ করাইয়া খরচ পোষাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ২০৷২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে জমি শ্রমজীবী দ্বারা চাষ করাইতে ৫০৲ টাকা খরচ পড়িত এখন সেইস্থলে প্রায় ২০০৲ টাকা খরচ পড়ে। মজুরি অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক পরিবার খরচ পোষাইতে না পারিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রী করিয়া কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইতেছে। এখনও দেখা যায় যে, অনেকে নিজ হাতে হাল চাষ করিলে ও ধান কাটিলে মজুরি বাঁচাইয়া নিজেরা পোষিয়া থাকিতে পারেন। হাল চষায় ও ধান কাটায় সামাজিক নিন্দা না থাকিলে অনেকের বাঁচিবার পথ সুগম হয়। এই সকল কাজের মধ্যে পাপজনক কিছুই নাই। বিদেশে যাইয়া পরাধীনে নানারূপ হেয় কাজ করা অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে হাল চাষ ও ধান কাটার কাজ করা যে অনেক ভাল তাহা বলাই বাহুল্য।

যদি পরিশ্রম ও অযথা নিন্দার ভয়ে গোলার ধান, পুকুরের মাছ ও গাভীর দুধের প্রতি মন এখনও আকৃষ্ট না হয় তবে উচ্চবংশজ মধ্যবিত্তহিন্দুগণ শীঘ্রই উৎসন্ন যাইবে। কৃষিকর্ম্ম যে হেয় কাজ নয় এবং ইহাতে যে নিন্দনীয় বিষয় কিছুই নাই, তাহা যদি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ একটু মনোযোগ দিয়া বুঝাইয়া দেন তবে অনেকেই এই সকল কাজ করিতে সাহসী হইতে পারেন। টাকা দিয়া চাকর রাখিয়া সেই চাকরের দ্বারা হালের গরুগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দেওয়াইলে যদি পাপের সম্ভাবনা না থাকে, তবে নিজের গরু দিয়া যত্ন সহকারে নিজের জমি চাষ করিলে পাপ বা পাতিত্যের কোন কারণ থাকে কি? পূর্ব্বে গ্রামের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হইতে পারে না।

পেটের দায়ে বেতনভোগী হইয়া আজকাল ব্রাহ্মণগণ পূজারি ও পাচকের কাজ করিতেছেন। তাঁহারা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এখন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে অনেকেই এখন চাকুরীজীবী সে বিষয়ে মতভেদ নাই। এসব কাজ করিয়া তাঁহাদের পাতিত্য আসে না, অথচ স্বাধীন ভাবে নিজ হাতে হাল চাষ করিলে তাঁহারা পতিত হন এ কেমন কথা? দাস্যবৃত্তি পাতিত্যের কারণ নয় অথচ কৃষিকর্ম্ম পাতিত্যের কারণ এই শাস্ত্র কোথায়? শাস্ত্রে দেখা যায় আপৎ কালে ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। কৃষিকর্ম্ম কি বৈশ্যবৃত্তি নয়? দাস্যবৃত্তি অপেক্ষা বৈশ্যবৃত্তি কি হেয়?

দিন দিন গোহত্যার মাত্রা যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে ইহাতে বুঝা যায় ২০৷২২ বৎসর পরে গোদুগ্ধ পাওয়া দুষ্কর হইবে। গোবৎস্য ভূমিষ্ঠ হইয়া ২১ দিন কি একমাস মাতৃস্তন্য পান করে, তারপর আজীবন গোদুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি আমাদের দেহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকি। আমাদের দেশের কোন উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে গব্য দধি-দুগ্ধাদিই ইহার প্রথম অবলম্বন স্বরূপ। যাগ যজ্ঞাদিতে ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃতাদি প্রস্তুত করিতে গব্য ঘৃতাদিরই বিশেষ প্রয়োজন। একটী গাভী জীবনে ৫টী কি ৬টী বাছুর প্রসব করিতে পারে এবং প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১০৲ ১২৲ টাকার গোবরের সারও গৃহস্থকে প্রদান

করিয়া থাকে। একটী সাধারণ গাভীও সারা জীবনে দুধে বাছুরে ও গোবরে গৃহস্থকে অন্ততঃ হাজার টাকা প্রদান করিতে পারে। দুগ্ধবতী সামান্য গাভীকেও বৎসরে গৃহস্থকে প্রায় ১২৫৲ টাকা মূল্যের দুধ ও গোবরের সার যোগাইতে দেখা যায়। গোবরের দামে একটী গাভীর বৎসরের খরচ হইয়া যায়। সুতরাং ইচ্ছা করিলে ও পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় স্বীকার করিলে প্রায় সকলেই একটি করিয়া গাভী পালিতে পারেন। বিলাতী দুধে শিশুদিগের স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না। গাভী আমাদের নিকট আজীবনই মাতৃস্বরূপিনী। অতএব এই গাভীর সংখ্যা যাহাতে বাড়ে সেই দিকে সকলেরই লক্ষ্য থাকা দরকার। ষাঁড় ও বলদগুলি অতি কষ্টে হাল টানিয়া আমাদের জীবিকার জন্য নানারূপ ফসল উৎপাদন করিয়া দেয় এবং গোবরের সার যোগাইয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইয়া থাকে। গরুর সংখ্যা খুব কমিয়া যাওয়ায় আজকাল দুইশত টাকায়ও এক জোড়া ভাল গরু পাওয়া যায় না। হত্যাকারীরা এহেন মহোপকারী জীবগুলিকে স্ত্রী পুরুষ জাতি বিচার না করিয়া নানা অজুহাতে যখন হত্যা করিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না তখন আমাদের পক্ষে এই মহোপকারী জীবগুলি কিরূপে বৃদ্ধি ও রক্ষা পাইতে পারে ইহার উপায় উদ্ভাবন করা একান্ত কর্ত্তব্য। গরু বাড়ীতে থাকিলে বাড়ীর পবিত্রতা রক্ষা পায় বলিয়া স্বাস্থ্যোন্নতিও হইয়া থাকে। কারণ গোবর ও গোমূত্রে দূষিত বায়ু ও দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়।

(ত্রিপুরা গাইড)

মজুর দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ

আমাদের আলোচনা করা হইতেছে আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ—ইতালী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণির কথা। আর্থিক উন্নতির এক মস্ত বড় খুঁটা টাকাকড়ি। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ পকেট হইতে টাকা পয়সা দিয়া কোনও এক কেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই সব সঙ্ঘে টাকা পয়সার তোড়া শক্তির মানরূপে দেখা দেয়। যে শক্তি-কেন্দ্রে টাকা পয়সা জমা হয় সে কেন্দ্রের নাম ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক গঠনের কথা তাই আর্থিক উন্নতির এক প্রধান কথা।

তারপর রক্তমাংসের কথা। কেমন করিয়া দেশের প্রত্যেক নরনারী কর্ম্মক্ষম, কার্য্যদক্ষ হইতে পারে তাহার কথাও আর্থিক উন্নতিরই এক গোড়ার কথা। আর্থিক উন্নতির আর একটা মস্ত বড় খুঁটা হইতেছে চাষী, চাষ-আবাদ আর জমিজমা। পৃথিবীর যে কোন দেশেই আমরা যাই না কেন সর্ব্বত্রই চাষীর সংখ্যা খুব বেশী। কোন জায়গায় বা সমগ্র দেশের লোক-সংখ্যার আধা-আধি, কোথায়ও বা তিনভাগের এক ভাগ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, ডেন্‌মার্ক, জার্ম্মাণি, ইতালি, বলকান সকল অঞ্চলেই চাষীর আর্থিক অবস্থা দেখিয়া দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝা যায়। চাষীর উন্নতি ও দেশের উন্নতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় এক কথা। জমিজমার বিধিব্যবস্থা, চাষী সম্পর্কিত আইন কানুন ইত্যাদির আলোচনা, আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ আলোচনারই বিশেষ অঙ্গ।

আর্থিক জগতের স্তর-বিভাগ

অদ্যকার কথা হইতেছে মজুর দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ। এতদিন যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে মোটের উপর একটা ধুয়া আছে। যে সব দেশের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনেক পেছনে পড়িয়া আছি আমরা। যদিও আজ আমরা ১৯২৬ সনেই বাঁচিয়া আছি বটে; কিন্তু ১৯২৬ কি চিজ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। দুনিয়ার জমিজমার আইন কানুন এমন বদলিয়া যাইতেছে যে, সে সব বিষয়ে কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

আমি আপনাদিগকে ১৭৭০-১৮২০-১৮৯৪-১৯১৮ এই সব তারিখের কথা বলিয়াছি। এই সব তারিখগুলি চাষীর আর্থিক অবস্থার ইতিহাসের সহিত অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাহাদের ভাত কাপড়, তাহাদের খাওয়াপরা, তাহাদের ধন-দৌলত, তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের ব্যক্তিত্ব—যে দিকেই তাকাই না কেন, মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক উন্নতির সব দিক্ দিয়াই এই সব তারিখগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে কতকগুলি তারিখ মুখস্থ করি, ১৬৮৮-১৭৮৯-১৮১৫-১৮৫৭-১৯০৫ ইত্যাদি। এই তারিখ-গুলির দাম তাঁহাদের কাছে খুব বেশী, যাঁহারা "আন্তর্জ্জাতিক" অর্থাৎ পররাষ্ট্র-বিষয়ক বড় বড় কথা লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। ঠিক সেইরূপই এই ১৭৭০—১৯১৮ তারিখগুলি আর্থিক উন্নতির ইতিহাসেও যার পরনাই দামী। জার্ম্মাণি বা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের যে যে তারিখের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি সেই সব তারিখগুলি চাষীদের আর্থিক জীবনের সহিত অতি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

কিন্তু ইহার সকল তারিখের মর্ম্ম ভারতবাসীর মগজে এখন বসে কি? আমাদের তুলনায় ১৯২৬ সন এত দূরে অবস্থিত—যদিও কাল হিসাবে নিকটে, কিন্তু মাল হিসাবে এত উপরে ও দূরে অবস্থিত যে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করাও কঠিন। চাষীর জমিজমা সম্পর্কিত আইন কানুন আমাদের দেশে আগেও যেমন ছিল এখনও প্রায় তেমি কঠিন আছে। তবে জমিজমা কাণ্ডে দুনিয়ায় কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত বিপ্লব-বিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে—এসবই আমরা বাহিরে থাকিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারি না এমন নয়। কিন্তু মজুর দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ যে কি বস্তু তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের একদম নাই।

বুঝা কাহাকে বলে ?

আপনারা বলিবেন, "তুই তো বড় আহাম্মক। যুবক ভারত যে কোনো বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে। ত্রিভুবনে এমন কিছু নাই যাহা তাহার মগজের বাহিরে। আমাদের ভগ্নীপতির ঠাকুরদাদার পিসতুত ভাইয়ের জ্যাঠারাই তো উপনিষদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই জাত কিনা এমন একটা খেলো কথা বুঝিতে পারে না? ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যারা তর্কের খাঁড়ায় কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া আলোচনা করিতে পারিয়াছে তারা কি না এই সামান্য জিনিষটা বুঝিতে পারে না।" এর উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, বাস্তবিকই আমরা বুঝি না। বুঝা জিনিষটা বেশ কিছু কঠিন। প্রথম কথা হইতেছে—আজকালকার দিনেই হউক বা ঠাকুরদাদাদের আমলেই হউক আমাদের দেশের লোকেরা ব্রহ্ম বস্তুটা কতটুকু বুঝিয়াছেন? কেউ কেউ হয়ত জিনিষটা বুঝিতেন; কিন্তু অনেকেই "শব্দ" কপ্‌চাইতেন মাত্র। অধিকাংশ লোকেই কেবল বোলটা লইয়া আলোচনা করিতেন, তর্ক করিতেন। বুলিটা যে মালের প্রতিশব্দ সেই মালটার দিকে নজর ফেলা অনেকের ক্ষমতায় কুলায় নাই। আর এখনও অবস্থা তদ্রূপ।

"বস্তু"টা হাতে হাতে পাকড়াও করিয়া গায়ে ঠুকিবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। উপনিষদের একটা টুকরা-মাত্র একটা গৎ আওড়াইতেন। আর আজকালকার দিনে একটা গোটা শ্লোক মুখস্থ বলিবার ক্ষমতাই অনেকের নাই। কেউ বা এর আধখানা ওর একটুকু এই কপ্‌চাইতে পারেন মাত্র; কিন্তু মোটের উপর ইঁহাদের সকলেরই কারবার বস্তুটার সঙ্গে নয়, বস্তুর বোলটার সঙ্গে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের দৌড় এই পর্য্যন্ত। যে কোন বিষয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন বস্তুটা সম্বন্ধে আমাদের খেয়াল থাকে না, তখন আমি একথা বলিবই বলিব যে সে জিনিষটা আমরা মোটেই বুঝি না।

ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্প্রতি আমাদের মতলব নয়। বর্ত্তমানে আমি বলিতে চাই যে, অদ্য যাহা বলিতে যাইতেছি এইসব বিষয় আলোচনা করিবার, এমন কি চিন্তা করিবার অধিকারও আমাদের আছে কি না সন্দেহ। "মজুর-স্বরাজ" শব্দটার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের জন্মে নাই এইরূপই আমার বিশ্বাস। শব্দটা বাণান করিতে পারি, আওড়াইতেও পারি সন্দেহ নাই। শিল্প এবং কারখানা এসব ভাল বুঝিলে কথাটার অর্থ কতক মালুম হইতে পারে বটে। কিন্তু এসব শব্দ মাত্র বুঝিতে আমরা সমর্থ—আসল বস্তুটা আমরা বুঝি না।

১৯২৬ সনের দুনিয়া

ধরুন আমি নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। তারপর সেটা পাশ করা গেল, সেইখানেই আমার বিদ্যা খতম হইল। তারপর আর আমার অগ্রসর হওয়া হইল না। এখন যদি আমি বি, এ, বি, এস-সির কর্ম্মখালি দেখিয়া সেদিকে হাত বাড়াই তাহা হইলে আমাকে আহাম্মক ছাড়া আর কি বলা চলে? আমি নিম্ন প্রাইমারী বা উচ্চ প্রাইমারী পাশ করিয়াছি—একেবারে বি, এর খবর লইতে পারি না, অন্ততঃ লইবার অধিকারী নই। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন "বি, এ'র খবর লওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিটি কে?" তাহা হইলে আমি বলিব ছাত্রবৃত্তি পাশ করা লোকটিও নহেন আর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ লোকও নহেন। আই, এ পাশ বা আই, এ ক্লাসের কেউ কেউ মাত্র এ বিষয়ে কল্পনা করিতে কিছু কিছু সমর্থ এবং অধিকারী। ১৭৭০ সনে জমিজমার নবীন আইন প্রথম বিধিবদ্ধ হয়। সেই ১৭৭০-৮০র যুগ ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১৮৭০র জার্ম্মাণি বা ১৮৮০র ফ্রান্স ইহারা কি কখনো ১৯২৬ সনের জার্ম্মাণি বা ফ্রান্সের সম্বন্ধে কল্পনা করিতেও পারিয়াছিল। ইংলণ্ড কি ১৮১৫-৩২ সনে কল্পনা করিতে পারিত যে, এক বিরাট তেলের খনিওয়ালা মেসোপটেমিয়া তাহার দখলে আসিবে? চন্দ্রগুপ্ত, আলেকজান্দার হয়ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু ১৯১৮ সনের সন্ধির ফলে দুনিয়ায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেই বস্তুটা কল্পনা করা কাহারও ক্ষমতায় সম্ভব হয় নাই।

মজুর কোন প্রকার জীব?

আসল কথা বস্তু, বস্তু-জ্ঞান, বস্তুনিষ্ঠা। মজুর স্বরাজ! ইহার না-মজুর না-স্বরাজ এখন পর্য্যন্ত ভারতের ত্রিসীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আপনারা হয়ত বলিবেন "কি! মজুর পর্য্যন্ত ভারতে নাই। আমাদের বাড়ীতেইতো চাকর আছে—প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই দাস-দাসী আছে," আমি জবাব দিব, "আজ্ঞে না। মজুর আর দাসদাসী এক চিজ নয়। আমি যে মজুরের কথা বলিতেছি সে বস্তু একেবারেই এই সবে উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবস্তুর পাত্তাই ছিল না দুনিয়ায়। না ছিল জার্ম্মাণিতে, না ফ্রান্সে, না ইংল্যণ্ডে। মজুর এক অতি জটিল জীব। শব্দটাও পারিভাষিক "কটমট।" এখন এই ১৯২৬ সনে আমরা কি অবস্থায় আছি? মজুর যে যুগে পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয় সে যুগ ভারতে এখনও বড় বেশী দেখা দেয় নাই। আর সেই বস্তুটাই এখনও ভারতে এমন কাঁচা অবস্থায় রহিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে বুঝিবার বা কল্পনা চালাইবার অধিকারও ভারতীয় নরনারীর জন্মে নাই।

মজুর জিনিষটা কি? আমাদের দেশের শ্রমজীবীরা আগেও যেমনটি ছিল এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। টাকা পয়সা রোজগারের দিকে তাহারা বড় একটা যত্নবান নহে। আলসে কুঁড়ের মত দিন কাটাইবে, শেষে অভাবে পড়িলে ভিক্ষা করিবে। তবু নিজে খাটিয়া নিজের আর্থিক উন্নতি করার দিকে তাহাদের মেজাজ যায় না। "মজুর" বা "বর্ত্তমান যুগের শ্রমজীবী" হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজের উন্নতি করিবার জন্য, যখন যাহা করা দরকার তাহারই জন্য—তাহার নিজের ক্ষমতা, তাহার নিজের মাংসপেশী চোস্ত দোরস্ত করিতে সদা সচেষ্ট। "মজুর" সেই লোক যাহাকে দেখিয়া মনিবের হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়া যায়। হাঁটু গাড়িয়া মনিবের গুণকীর্ত্তন যে করে সে মজুর নয়। সেই হইল বিংশ শতাব্দীর মজুর, যাহাকে দেখিয়া মনিব বা কারখানাদার হিমশিম খাইয়া যায়।

এই গোটা ভারতবর্ষ যাহার লোকসংখ্যা ৩০ কোটি সেখানে এই ১৯২৬ সনে বোধ হয় মাত্র ৮-১০-১৫ লাখ শ্রমজীবী আছে যাহারা এই বিংশ শতাব্দীর মজুরের কাছাকাছি না হউক দূর হইতে তাহাদের ধরণধারণ যৎকিঞ্চিৎ সমঝিতে সমর্থ। গোটা ভারতে হাজার ছয়েক শিল্প-খানা আছে। এই ৬ হাজার শিল্প-কারখানার কিম্বৎ যন্ত্রপাতি, কর্ম্মক্ষমতা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ বা আমেরিকান কারখানাগুলির সঙ্গে তুলনা করিবার দরকার নাই। আমাদের এই কয়েক লাখ "আধা মজুর", "সিকি মজুর"কে ঐ শ্রেণীর শ্রমজীবীদের মাপকাঠিতে বিচার করা যুক্তি-সঙ্গত হইবে না।

এই ত্রিশকোটির মধ্যে বড় জোর পনর লাখ "মজুর"। ইহাদের ভিতর বড় জোর মাত্র পাঁচ লাখ হইতেছে ষোল কলায়—ষোল আনায় মজুর—বিংশ শতাব্দী-মাফিক মজুর।

মজুর-সমস্যায় ভারত ও দুনিয়া

ফ্রান্স অবশ্য একটা অতি ছোট দেশ। এই বাংলা দেশটার মত—তাহার চাইতেও ছোট। ফ্রান্স এই গোটা বাংলা দেশটার তিনপোয়া। কিন্তু এই ফ্রান্সে পঞ্চাশ লাখ মজুর। আর ত্রিশকোটি নরনারীর ভারতে মাত্র পনর লাখ! ফ্রান্স অনেক বিষয়ে কিছুকিছু ২য় শ্রেণীর দেশ। ১৯২৬ সনের কিছু পেছনে ইহার স্থান। ইংলণ্ড জার্ম্মাণি আমেরিকা বা জার্ম্মাণি আমেরিকা ইংলণ্ড বা আমেরিকা ইংলণ্ড জার্ম্মাণি এই ৩টা দেশ দুনিয়ার সেরা। এই ৩টা দেশের অভাবে দুনিয়া চলে না। ইহার বিশকোটি লোকের অভাবে পৃথিবী মারা যাইবে। ১৯২৬ সনে যদি কোন জাত জীবিত থাকে তো এই ৩টা।

বিলাতে কত বেকার কত মজুর বসিয়া আছে জানেন? বিশ লাখ। এখন মজুর কত ভাবুন। যুদ্ধের পর আমেরিকায় বেকার-সমস্যা খুব আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়ায়। সময় সময় ৭৫ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া ছিল। যে দেশে বেকারই এত, সে দেশের মজুর-শক্তির বিপুলতা ভারতবাসীর পক্ষে ঠাওরানো সম্ভব কি?

১৮৫০ সনের জার্ম্মাণি-ইংলণ্ড কি ১৯২৬ সনের জীবনকে কোনমতে বুঝিবার অধিকারী ছিল? আমরা ভারতে বোধহয় এখনো ১৮৭৫ সনেই আছি। আমরা কেমন করিয়া এই দীর্ঘ সময়টা মারিয়া লইতে পারি? ১৯২৬ সনের জার্ম্মাণ ফরাসী ইংরেজ আইনের বোল কপচাইতে পারি। রিসার্চ্চ গবেষণার দ্বারা হয়ত এইসব হাতের আগায় আসিয়া যায়। কিন্তু তাহা দ্বারা বস্তুটা পাকড়াও করা সম্ভব নয়।

মামুলি ট্রেড ইউনিয়ান

১৯১৬ সনে কি রকম মজুর-স্বরাজ গড়িয়া উঠিয়াছে? মজুর স্বরাজ অর্থ "ট্রেড ইউনিয়ান" না। আবার ট্রেড ইউনিয়ানও একটা ছোট খাট জিনিষ নয়। এই ট্রেড ইউনিয়ানের জন্য কত কত পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন। মজুর রাষ্ট্রীয় দল, মজুর সামাজিক দল, মজুর দার্শনিক দল, মজুর সাহিত্যিক দল ট্রেড ইউনিয়ান, ট্রেড ইউনিয়ান করিয়া ক্ষেপিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মজুর স্বরাজের দল ট্রেড ইউনিয়ানের জন্য মাতিয়াছে। যে যে দেশে ট্রেড ইউনিয়ান স্থাপিত হইয়াছে সে সে দেশে বুঝিতে হইবে কারখানা-শিল্প চরমে উঠিয়াছে। সেই সব দেশে শিল্প-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতক কতক বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিডনি ওয়েব তাহার ইনডাষ্ট্রিয়াল ডিমোক্রাসিতে বলিয়াছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ান অনেক কিছু করিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ান মজুরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে, ইহা একের সঙ্গে আর একজনের সখ্য স্থাপন করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ মজুর ক্যাপিটালিষ্টের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। মজুরদের প্রতিনিধি-সর্দ্দার মনিবের কাছ হইতে তাহার দলের ন্যায্য অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লয়। এই যে নামজাদা লেবার গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার পেছনে ছিল ট্রেড ইউনিয়ান।

ট্রেড ইউনিয়ানের পরের ধাপ

কিন্তু এহেন ট্রেডইউনিয়ান বর্ত্তমানে যে জিনিষটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। ট্রেডইউনিয়ানের পরের ধাপে যে বস্তুটা আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেইটি একেবারে ১৯১৮-১৯২৬ সনের আবিষ্কার একথা বলা হয়ত ঠিক হইবে না। কারণ জার্ম্মাণি ফ্রান্স আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে ছোটখাট ভাবে এই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল।

অষ্ট্রীয়ার বেট্রিব্‌স্ রাট্

১৯১৮ সনে অষ্ট্রীয়ায় সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) গড়িয়া উঠিল। তাহার কনষ্টিটিউশনের ভিতরে একটা ধারা বসাইয়া দেওয়া হইল—"শিল্প-স্বরাজ" কারখানাতে প্রবর্ত্তিত করিতেই হইবে। নাম তার "বেট্রিব্‌স-রাট" (কর্ম্মসভা)। ইহা দেশের আইন কানুনের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইল।

শিল্প-স্বরাজকে, মজুর-রাজকে অষ্ট্রীয়ানদের রিপাবলিকে শাসন-প্রণালীর ভিতরে স্থায়ী ভাবে স্থান দেওয়া হইল। এবং সেই আইনকানুন অতি বিস্তৃত ভাবে জার্ম্মাণিতে ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় নানা প্রকারে বিকাশলাভ করিয়াছে। ১৯২৬ সনে এই তিন দেশ ছাড়া আর কোন দেশে মজুর-রাজ সম্বন্ধে আইন প্রাথমিক ভাবেও দেখা দেয় নাই। তাহা হইলে দেখা যায় এ জিনিষটা বাঙ্গালায় কায়েম কর্‌সা কঠিন।

যেখানেই কোন কাজ হউক—সে কারখানা হউক বা আফিস হউক, যে কোন কর্ম্মকেন্দ্রে মানুষ যাহা-কিছু কাজ করুক, চাই সে আফিস হউক হোটেল হউক বা আর কিছু—সর্ব্বত্রই কায়েম হইয়াছে "কর্ম্ম-সভা"। মজুর আর কেরাণী এ একই কথা। বিলাতে সাদা কলারপরা লোক-গুলিকে কেরাণী বলা হয়। গোলাম তো সকলেই। বেশী মাইনে যে পায় সেও মজুর, আবার অল্প মাইনের কুলী দরোয়ানও মজুর। এখন 'মজুর-স্বরাজ' কাহাকে বলে? যে-কোন মজুর এবং যে কোন কর্ম্মচারীর স্বরাজকে বলে মজুর-স্বরাজ। শিল্প-ঘটিত যে কোন কর্ম্ম-কেন্দ্র ও যাহা কিছু কর্ম্ম তাহাতে মজুরদের আধিপত্য। ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত মজুর ও কেরাণীদের আত্মকর্ত্তৃত্ব। রেল, তার, ডাকঘর, টেলিফোন এবং লড়াইয়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা সরকারের অধীনে, ইহারও প্রত্যেক কেন্দ্র এই আইনের আমলে আসিয়াছে। একটা জিনিষ যাহা এখনও আইনের গণ্ডীর ভিতর আসে নাই, সেটা হইতেছে চাষবাস। কিন্তু তবুও প্রদেশে প্রদেশে চাষের ক্ষেত্রে মজুর-স্বরাজ দেখা দিয়াছে। এই অষ্ট্রীয়া দেশটা আমাদের বাঙ্গালা দেশের ২।৩টা জিলার সমান। ধরুন এই মেদিনীপুর আর ময়মনসিংহের সমান। ইহার নানা গাঁয়ে চাষ সম্বন্ধে কর্ম্মকেন্দ্র আছে। প্রত্যেকটিই ঐ সব আইনকানুন মানিয়া চলে।

বেট্রীব্‌স্ রাটের রাজ্য-সীমা

কোন্ কোন্ জায়গায় কেরাণী ও মজুর স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য? যত জায়গাতে টাকাপয়সা রোজগার করিবার ব্যবসাবাণিজ্য-বিষয়ক যতকিছু প্রতিষ্ঠান আছে ঐ সব জায়গাতেই কেরাণী ও মজুরদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চাষআবাদ বিষয়ে যাহা কিছু ছোটখাট শিল্প কারখানা, যেখানে ঘোড়ার নাল লাগান হয়, মিস্ত্রির কাজ হয়, করাত মেরামত হয়, সে সব জায়গাতেও কেরাণী ও মজুরস্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষ চলাচল মাল চলাচলের ট্রাম, রেলওয়ে ও অন্যান্য যানবাহন, সরকারী এবং বেসরকারী যত রকম ইমারত তৈয়ারী হইতেছে, যত কনট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ার, যত লোক নিয়োজিত করিতেছে প্রত্যেকে নিজ নিজ মজুরকে স্বরাজ দিতে বাধ্য। টাকা পয়সা ধার নেওয়া সম্পর্কিত যত কেন্দ্র থাকিতে পারে—ব্যাঙ্ক সেভিংস ব্যাঙ্ক, লোন আফিস—এই সব কেন্দ্রে মজুর ও কেরাণী স্বরাজ পাইয়াছে। সামাজিক বীমা প্রথার যত প্রকার আফিস থাকিবে তাহার প্রত্যেকটীর যে কোন বিভাগে মজুর আজ হইতে স্বরাজ পাইল। আর্থিক জীবনের যাহা কিছু সম্ভব থাকিতে পারে সেখানে। প্রত্যেক দেশেই সরকারের একচেটে কতক-গুলি ব্যবসা থাকে,—যেমন ভারতে গাঁজা আফিম প্রভৃতি, এই সমস্ত জায়গাতেও মজুর ও কেরাণীদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। যে কোন উকিল নিজের জন্য আফিস খাড়া করিবে, সে তাহার প্রত্যেক কেরাণীকে স্বরাজ দিতে বাধ্য। শরীর বিষয়ক ও শারীরিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যোন্নতির যত প্রকার হাঁসপাতাল, যত প্রকার প্রতিষ্ঠান থাকিবে সেখানে। প্রত্যেক হোটেল রেস্তরাঁ থিয়েটার বায়স্কোপ ইত্যাদির প্রত্যেক বাড়ীতে, প্রত্যেক জায়গায়, যেখানে আড্ডা মারা হয় বা আরাম বা গানের ক্লাবঘর আছে তথায় মজুর ও কেরাণী স্বরাজ ভোগ করিতে অধিকারী।

মজুর ও কেরাণীর স্বরাজ

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এটা আবার কি রকম স্বরাজ? এই সব লোকগুলা কি রকম স্বরাজ পাইল? কোন্ আইনের আমলে তাহারা আসিল? নূতন কি করা হইল যাহা পূর্ব্বে ছিল না? কথাটা একটু খতাইয়া বুঝা দরকার। ধরুন একজন উকিলের ঘরে কেরাণী, টাইপ-বাবু প্রভৃতি ধরিয়া কম সে কম পাঁচ জন "চাকর"। এখন

ইহাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই স্বরাজটা সামলান যায় কেমন করিয়া? এই পাঁচ জন চাকর বাছাই করিয়া যে একজনকে মাতব্বর করিল, সে উকিল মহাশয়ের আফিস চালাইবার কাজে একেবারে মনিবের সামনে দাঁড়াইল।

৫-১০ জনে ১ জন, ১০-২০ জনে ২, ২০-৫০ জনে ৩ জন, এমনি বাঁধা নিয়মে প্রতিনিধি বাছাই হয়। এই সব কেরাণী ও মজুরের প্রতিনিধিরা মনিবদের সঙ্গে আলোচনা করিবে তর্ক করিবে। ইহাতে রাজী আছেন তো? এরূপ স্বরাজ আমাদের দেশ সহিতে পারিবে কি? কোন্ কোন্ লোক এই প্রতিনিধি বাছাই করিতে অধিকারী?

যেই আমি কোথাও একমাস কাজ করিয়াছি অমনি আমার অধিকার জন্মিয়াছে। একমাস কাজ করিবার পর আমি প্রতিনিধি বাছাই করিতে পারি। ৬ মাস কাজ করিলে পর আমি নিজেই প্রতিনিধি হইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলাম। একমাসে বাছাই,—ছ'মাসে একেবারে মনিবের সমান! এখন বুঝুন স্বরাজ কাহাকে বলে।

বেট্রীব্স্ রাটের (কর্ম্মসভার) সঙ্গে মনিবের সম্বন্ধ

কি উদ্দেশ্যে এইসব কর্ম্মকেন্দ্র গঠিত হইল? মানুষের যাহা কিছু প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেকটিতেই এই "বেট্রীব্স্ রাটের" হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে। কর্ম্মকেন্দ্রের যে কোন বিভাগেই এই "কর্ম্মসভা" গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। মজুর-সম্পর্কিত যত প্রকার নিয়ম কানুন করা হইবে "কর্ম্মসভা" কর্ম্মকেন্দ্রে তা চালাইয়া লইবে। গভর্ণমেণ্ট মজুরের স্বার্থে মহাজনের বিরুদ্ধে যাহা কিছু আইন কায়েম করিবে তাহার তদ্বির করিবার ভারও এই "কর্ম্ম-সভার" হাতে। কাহাকে কত মাইনে দেওয়া হইবে, কাহাকে কোন্ সময় শাসন করা দরকার, এসব করিবে ঐ মজুরদের প্রতিনিধি, কারখানাদার নয়। এখন মনে রাখা আবশ্যক যে, যে সকল দেশে মজুর সমিতিই ভাল রকম গড়িয়া উঠে নাই সেই সকল দেশের লোক নাবালক মাত্র। নাবালকদের পক্ষে ট্রেড্ ইউনিয়ানের পরের ধাপ হচ্ছে "বেট্রীব্স্ রাট।"

যে যে স্থলে মনিবের সঙ্গে ট্রেড্ ইউনিয়ানের সম্বন্ধ চুক্তি করা হইয়াছে সেই সকল স্থলে "কর্ম্মসভা" চুক্তি-মাফিক কাজ হইতেছে কিনা তাহার তদ্বির করে। আর যেখানে চুক্তি নাই সেখানে মজুরদের সঙ্গে মালিকের চুক্তি করানো হইতেছে মতলব। এই স্বরাজের ফলে কর্ম্মকেন্দ্রের ভিতরে বসিয়া ট্রেড ইউনিয়ানের হুকুমগুলা জারি করানো সম্ভব। আমাদের দেশেও ট্রেডইউনিয়ান স্থাপিত হইয়াছে। এইটা কি জিনিষ তাহার কিছু কিছু ধারণা আমরা করিতে পারি। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ানের হুকুম বা ইচ্ছা তামিল হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য "বেট্রীব্স্-রাট্" নাই। ধরা যাউক যেন ট্রেড্ ইউনিয়ান বলিয়াছে ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আফিস চলিবে, ইহার বেশী নয়। যদি মনিব এ করিতে রাজী না হয় তাহার উপায় কি? উপায় হইতেছে প্রত্যেক ট্রেড্ ইউনিয়ান হরতাল রুজু করিতে পারে। তাহা ছাড়া আর কোন কর্ম্মপ্রণালী নাই।

কিন্তু যে যে দেশে "বেট্রীব্স্-রাট" আছে, সেইসকল দেশে ফ্যাকটরীর ভিতর, আফিসের ভিতর, ব্যাঙ্কের ভিতর, ইউনিয়ানের কাজ হাসিল করিবার মতন যন্ত্র রহিয়াছে। কাজেই সহজে মালিককে জব্দ করা যাইতে পারে। ট্রেডইউনিয়ান মজুরের সম্বন্ধে যে সব নিয়ম কানুন বাঁধিয়া দেয়, প্রত্যেক মালিককে সেই অনুযায়ী চলিতে বাধ্য করা আজকাল খুবই সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

ট্রেড ইউনিয়ান বাহিরের যন্ত্র; কিন্তু কারখানার ভিতরেই মজুরেরা তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিয়াছে। আজকাল ইহারা ঝাণ্ডা হাতে কলের বাহিরে দাঁড়াইয়া হুঙ্কার ছাড়ে না। লড়াই করিতে করিতে মজুরেরা কেল্লার ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে; আর সেখানে লাল নিশান খাড়া করিয়া দিয়াছে। মালিক তাহা কুর্ণিশ করিয়া চলিতেছে।

"বেট্রীব্স-রাট" একদিকে ট্রেড ইউনিয়ানের অন্তরঙ্গ বন্ধু, অপর দিকে গভর্ণমেণ্টের যন্ত্র-বিশেষ রূপেও এই কর্ম্ম-সভার কিম্মৎ ঢের। গভর্ণমেণ্ট মজুরের স্বার্থরক্ষণের জন্য যে সব আইন করিয়াছে, মনিব তাহা না মানিলে মজুরদের প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্টের কাছে নালিশ করিতে অধিকারী। সরকারী আইনকানুনগুলি অনুসারে কাজ বাগানো "কর্ম্ম-সভার" অন্যতম ধান্ধা।

মনিবের উপর মজুরের কর্ত্তামি

কারখানার প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে শাসনঘটিত যাহা কিছু নিয়ম করা আবশ্যক, মনিব মহাশয়েরা নিজেরা তাহা কায়েম করিতে পারিবেন না। ৫টা কি ৫॥টা পর্য্যন্ত আফিস চলিবে এ বিষয় মজুরদের মত না লইয়া ধার্য্য হইতে পারে না। অন্য শিল্প-কারখানায় ডিসমিস কে করিতেছে? অন্য জরিমানা কে করিতেছে? ট্রেড ইউ-নিয়ান তো বাইরে পড়িয়া আছে। মালিকের যাহাকে তাহাকে যখন ইচ্ছা শাস্তি দেওয়ার অধিকার আর নাই। এসব করিতেছে মজুর প্রতিনিধি। ২৫ বছরের পুরান কলে কাজ করিতে হাত ভাঙ্গিয়া যায়। ১৫ বছরের পুরান যন্ত্রে আর কাজ করা যাইতে পারে না, নতুন যন্ত্র চাই। এ জীর্ণ ঝাটায় আর ঝাড় দেওয়া চলে না। ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। মজুরদের "কর্ম্মসভা" এই সব বলিতেছে। আর মনিব তৎক্ষণাৎ এইসব অনুযোগ শুনিয়া তাহার প্রতিকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে বুঝুন—কোন পথে দুনিয়া চলিতেছে।

আপনারা বলিবেন, "ইহারা সব গোঁয়ারতামি করিতেছে। এই সব তাঁবেদার লোকগুলাকে তাড়াইয়া দিলেই তো সব গোল মিটিয়া যায়।" কিন্তু মজার কথা,—ডিসমিস করার অধিকারী কে? শাস্তি দেবে কে? সে সব "মজুর-রাজ!" মজুর-রাজ মনিবকে আদালতের বিচারে দাঁড় করায়। কোন প্রতিনিধি যদি মনিবের অপ্রিয় থাকে কারণ সে মজুরের স্বার্থই বেশী দেখে আর সেদিকে বেশী সময় অতিবাহিত করে, সে মজুরের স্বার্থ অধিক দেখিতেছে এক্ষেত্রে তাহাকে তাড়াইবার উপায় নাই। ইহার জন্য রীতিমত আইন রহিয়াছে। যদি এই সকল "কর্ম্ম সভার" কাজ করিবার জন্য কোন প্রতিনিধি কর্ম্ম-কেন্দ্রের কাজ কিছু কম করে, তাহা হইলে তাহার মাইনে কাটা যাইতে পারে না। একেই বলে,—"তোমারই শিল তোমারই নোড়া তোমারই ভাঙ্গবো দাঁতের গোড়া।" মনিব যদি বলে—"আমার পয়সায় মানুষ, আমার ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে, আমার সময় ও সুযোগের দিকে মন দিতে মজুর আইনতঃ বাধ্য," আর এই ওজুহাতে জবরদস্তি চালায়, তবে তার জরিমানা হইতে পারে ২ হাজার ক্রোন অর্থাৎ ১॥০ হাজার টাকা। মজুরের সঙ্গে বিরোধ করিলে ১॥ হইতে ৮ সপ্তাহ পর্য্যন্ত মনিবের জেল হইতে পারে।

বাঙ্গালার স্বদেশ-সেবকগণ, এইরূপ স্বরাজ হজম করিতে রাজি আছেন কি? মজুরেরা আজকাল আর ফ্যাক্টরির বাহিরে থাকিয়া আস্ফালন করিতেছে না। খাঁটি "শিল্প স্বরাজ" আসিয়া গিয়াছে। "ট্রেড ইউনিয়ান" সে তো ছেলে খেলা মাত্র। ট্রেড ইউনিয়ান বাহিরে বাস করিতেছে। কেল্লা ফতে করিবার জন্য ভিতরে ব্যাটেলিয়ান পাঠাইয়াছে। "বেট্রিব্‌স্‌-রাট" মনিবের বুকে বসিয়া দাড়ি ওপড়াইতেছে। একেই বলে মজুর-দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ।*

মিত্র শক্তিবর্গের ঋণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮৭১ সনের ক্ষতিপূরণ ফ্রান্স কি উপায়ে শোধ করিয়াছিল?

"ঠিক কি ভাবে পরিশোধটা হইয়াছিল, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই, ফ্রান্স পরিশোধের টাকাটা কোথায় পাইল? তার জার্ম্মাণ মার্ক বা মার্কের বিনিময়ে প্রাপ্য বিদেশী সিক্কা যোগাড় করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর তার উপায় ছিল মাত্র দুটি—(১) সে যে যে জিনিষ বেচে তা কিনিবার জন্য জার্ম্মাণ অথবা বিদেশী ক্রেতা

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত অন্যতম বক্তৃতার সারাংশ। লেখক—তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ।

টুঁড়িয়া টুঁড়িয়া বাহির করা। (২) তার "কর্জ্জে"র জন্য বিদেশী চাঁদা পাওয়া।

"ফ্রান্সের দেশী লোকের হাতে ঢের বিদেশী "সিকিউরিটি" বা "জামিন-পত্র" ছিল। তা বিস্তর বিক্রী হইয়া গেল। ফরাসী "কর্জ্জে" বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে চাঁদা আসিতে লাগিল। আর ফরাসী দ্রব্যের রপ্তানি এতদূর বাড়িয়া গেল যে, গড়ে বছরে যেখানে আমদানির পরিমাণ ৬½ কোটি ডলার বেশী ছিল (১৮৬৮—৭১), সেখানে তার পরবর্ত্তী চার বছরে গড়ে বছরে রপ্তানি বেশী দাঁড়াইল ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। ১৮৭৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমগ্র ক্ষতিপূরণটা শোধ হইয়া গেল। ফ্রান্স যে "কর্জ্জ" বাহির করিয়াছিল, তার জন্য অবশ্য দায়িত্ব রহিল; কিন্তু জার্ম্মাণি বা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে তার এক পয়সাও ঋণ রহিল না।

"এখানে দেখিতেছি একটা বড় রকমের আন্তর্জ্জাতিক ঋণ তাড়াতাড়ি শোধ হইয়া গেল, অথচ বিশ্বের বাণিজ্যে কোথাও বিশেষ কিছু গোলযোগ ঘটিল না। এটা কিরূপে সম্ভব হইল? যুদ্ধটা অল্পকালব্যাপী ছিল। আর ক্ষতিপূরণের পরিমাণটা ফ্রান্সের শোধ দিবার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। তার স্বদেশীয়দের হাতে প্রচুর বিদেশী "জামিন-পত্র" ছিল, সেগুলা বিদেশী বাজারে তখন তখনি বেচা চলিত। তার "ক্রেডিট" বা "সাউকারি" ছিল উত্তম। "কর্জ্জে" বিদেশী চাঁদা পাইতে কোন কষ্ট হয় নাই। আর তার রপ্তানি বাড়াইবার প্রচেষ্টাতে বাধা পড়ে নাই। তাকে বড় বড় "টারিফ" দেয়াল ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয় নাই।

ফ্রান্সের সংস্থান মৌজুদ্ ধনে

"ফ্রান্স 'স্বর্ণ নিরিখ' (গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড) হইতে চ্যুত হইল। ফ্রাঁর দাম নামিয়া গেল, কিন্তু হ্রাসটা কোন কালেই ৫%র উপর হয় নাই। সমস্ত সময়টা ধরিলে ১%র অতি অল্প বেশী হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসীর পরিশোধ করিবার সামর্থ্যের সব চেয়ে বড় কারণ তার ধনের মৌজুদ্ রিজার্ভ, স্বদেশীয়দের হাতের বিদেশী, 'জামিন-পত্র'।"

সে সময়ে ফ্রান্সের ব্যবসায়ের অবস্থা এইরূপ। লোকের কাজ জুটিতেছিল দেদার। আর উৎপাদন হইতেছিল বহুৎ। বাহিরের দেনার ভার তার মাথায়। বিদেশের বাজারে তাকে বেশী বেশী বেচিতে হইতেছিল। প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনে উন্নত নিরিখ ও শক্তি দেখা দিল। ক্ষতিপূরণ অতীত হইবার পরও বহুকাল পর্য্যন্ত ফ্রান্সের এই শ্রেষ্ঠতা বজায় ছিল।

"এদিকে জার্ম্মাণির অবস্থা অন্যরূপ। দেশের মধ্যে বহু পরিমাণ সোনারূপার আমদানি হওয়াতে, তখনকার অন্যান্য কারণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক দর তাড়াতাড়ি চড়িতে লাগিল।

ফরাসীর পরিশোধের দরুণ জার্ম্মাণিতে বিপর্য্যয়

"১৮৭২ সনে দেখা দিল স্বল্পকালস্থায়ী বাণিজ্য ও আর্থিক "বুম্।" তারপরের বছর আসিল "বাণিজ্য-সন্ধি "বা" ক্রাইসিস্।" একটার পর একটা বাণিজ্য-"ভাঁটা" ("ডিপ্রেশন") আরম্ভ হইল। আমি একথা বলিতেছি না যে, জার্ম্মাণ বাণিজ্যের এই অবস্থার জন্য দায়ী একমাত্র ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ-শোধ। কিন্তু এটা একটা বড় কারণ বটে। তা না হইলে বিসমার্কের নামে এ গল্প চলিত না যে, এর পরে ফ্রান্সকে যুদ্ধে হারাইলে তিনি ব্যবস্থা করিবেন যেন ক্ষতিপূরণটা জার্ম্মাণি দেয়।

"৫০ বছর আগে ফ্রান্সকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল, তার তুলনায় আজিকার ঋণের অঙ্কগুলি ঢের বড়। কিন্তু সমস্যাটা ও তার আসল বৃত্তান্ত মূলে একই। জার্ম্মাণির কাছে যে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হইতেছে, সেই হইল সব চেয়ে বড় ঋণ। সকলের আগে তার একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাওয়া দরকার।

জার্ম্মাণির ক্ষতিপূরণ শোধ দিবার সামর্থ্য

"আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, আমি জার্ম্মাণির স্বাভাবিক সংস্থান ও উৎপাদন শক্তিটা মাপিয়া দেখাইব। কিন্তু সে কাজ অনেক বার হইয়া গিয়াছে। ওস্তাদরা হ্বার্সাই

সন্ধির দস্তখত্ কালে বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণি ১২,০০০ হাজার কোটি ডলার দিতে পারে। কিন্তু আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে, জার্ম্মাণি কতখানি ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ তা নয়, বিদেশী ঋণ-শোধের সামর্থ্য তার কতখানি।

"ভার্সাই ওস্তাদদের ভুলটা এইখানে। জার্ম্মাণির উৎপাদন করিবার ক্ষমতা যে অসীম, তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু উৎপাদন করা এক কথা, আর তার রপ্তানির জন্য বাজার ঢুঁড়িয়া বাহির করা অন্য কথা। বস্তুতঃ, সমস্যাটা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায়—জার্ম্মাণ রপ্তানি বাণিজ্যের কতদূর প্রসার লাভের সম্ভাবনা আছে।

"আরও একটু কথা আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, যেকালে জার্ম্মাণির রপ্তানি বাড়িতেছে, সেইকালে তার আমদানি বাড়িতে পাইবে না। তবেই সে ক্ষতিপূরণ দিতে পারিবে, নচেৎ নয়। বিদেশে বেচিয়া সে যা পাইবে, তার থেকে সর্ব্বাগ্রে তাকে তার অপরিহার্য্য আমদানির দামটা দিতে হইবে। যা বাকী থাকে, রপ্তানি-যোগ্য উপরিটা মাত্র ক্ষতিপূরন বাবদ্ পাওয়া যাইবে।

"রপ্তানি-যোগ্য উপরি"র বিশ্লেষণ

"একটা দেশের রপ্তানি-যোগ্য উপরিতে আমদানির উপর ফাজিল রপ্তানি ছাড়া অন্য জিনিষও আছে। যথা, বিদেশে টাকা খাটানোর দরুণ প্রাপ্ত সুদ ও জাহাজ ইত্যাদির সাহায্যে লোক ও মাল নেওয়ার দরুণ প্রাপ্ত টাকা।

"যুদ্ধের পূর্ব্বে এই তিন সংস্থান হইতেই জার্ম্মাণির যথেষ্ট রপ্তানি-যোগ্য উপরি মিলিত। কিন্তু বিদেশে টাকা খাটাইয়া যে সুদ পাওয়া যাইত, তাই ছিল সব চেয়ে মোটা—৫৫০ কোটি ডলারের কম নয়। উৎপাদন বেচিয়া ও নানা কাজ করিয়া দিয়া, জার্ম্মাণি কোনদিন ১০ কোটি ডলারের বেশী বছরে পায় নাই।

"কিন্তু আজ জার্ম্মাণির বিদেশে খাটান অর্থ অধিকাংশই উপিয়া গিয়াছে। কিছুটা যুদ্ধকালে বেচা হইয়াছিল। আর কিছুটা মিত্র ও সংযোগী শক্তিবর্গ, শত্রুর সম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। বাকীটার প্রায় সবখানির দাম কমিয়া গিয়াছে বা নাই। যেমন রুশিয়ায় যে টাকা খাটান হইয়াছিল। জার্ম্মাণির জাহাজের ব্যবসাটা প্রধানতঃ শত্রু কবলে গিয়াছে। আর তার সব চেয়ে উৎপাদক আয়রন-আলসাস্ লোরেন্, সার বেসিন, ও পোল প্রদেশগুলি হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এইরূপে জার্ম্মাণির রপ্তানি-যোগ্য উপরি পাইবার যা-কিছু উপায় ছিল তা ক্ষতিগ্রস্ত অথবা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রপ্তানি হইতে শোধ দেওয়া জার্ম্মাণির পক্ষে অসম্ভব

"লণ্ডন আল্টিমেটাম্ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের পক্ষে জার্ম্মাণির রপ্তানি-যোগ্য উপরি কোনকালেই যথেষ্ট ছিল না। এখন ত নয়ই।

"সম্প্রতি কমন্স-গৃহে প্রধান রাজস্ব-সচিব এই উক্তি করিয়াছেন—জার্ম্মাণি এপর্য্যন্ত মুদ্রাতে ও সম্পত্তিতে যা অর্পণ করিয়াছে তার দাম মোটমাট ২০০ কোটি ডলার। তন্মধ্যে ১৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার হইতেছে জাহাজ, কয়লা ও অন্যান্য দ্রব্য বাবদ্ দাম, প্রত্যর্পিত ভূভাগের সম্পত্তিগুলির দাম ও "দখলদার" সেনার খরচা। নগদ টাকার পরিমাণ মাত্র ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

"কিন্তু এই অত্যল্প নগদ্ মুদ্রাশোধের পরিণাম কি হইয়াছে দেখা যাক্।

"ভার্সাই সন্ধিতে জার্ম্মাণি যখন ঋণ শোধ করিবে বলিয়া কথা ছিল, তখন তার মার্কের দাম যত ছিল, আজ তা তার $\frac{১}{২০}$ মাত্র। জার্ম্মাণি মার্ক বেচিয়া ঋণের টাকা যোগাড় করিতেছে। এর পর একথা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য যে, বর্ত্তমানে উৎপাদন রপ্তানি করিয়া জার্ম্মাণি "উপরি" পাইতেছে।

"এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আরও একটা যুক্তি আছে। নিঃসন্দেহ, গত তিন বছর ধরিয়া জার্ম্মাণি তার বহির্ব্বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। জার্ম্মাণ কারিগরের পটুতা ও কলানৈপুণ্য জগৎ-বিখ্যাত। তারা প্রাণপণে খাটিতেছে। সমস্ত দেশ জুড়িয়া কারখানাগুলি অনবরত কল চালাইতেছে।

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ প্রতিযোগিতা অভিযোগের কারণ হইয়াছে

"মার্ক নামিতেছে। কিন্তু প্রত্যেকটা নামা ভিতরের চেয়ে বাইরে অনেক বেশী। দেশে মার্কের দাম যত বিদেশে তার চেয়ে ঢের কম। ফলে জার্ম্মাণ রপ্তানিদাররা দেদার সুবিধা লুটিতেছে। এমন দেশ নাই যেখানে রপ্তানির উদ্দেশ্যে দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পীরা জার্ম্মাণ প্রতিযোগিতার নামে অভিযোগ করিতেছে না। যুদ্ধের জন্য জার্ম্মাণি তার রপ্তানি তৈয়ারীর পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিষও বিদেশ হইতে পায় নাই। সেই অভাব পূরণ হইয়া যাইবার অনেক-কাল পরেও দেখা যাইতেছে, এখানের রপ্তানি আমদানির সমান হইয়াছে বলিতে পারা যায় না।

জার্ম্মাণিকে ঘাড় ধরিয়া শোধ করাইলে ফল কি হয় ?

"সম্প্রতি লণ্ডনে মিত্রশক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ বৈঠকে প্রস্তাব হয়, 'ঘাড় ধরিয়া জার্ম্মাণির নিকট হইতে নগদানগদি টাকাটা আদায় করা হোক্। দরকার হয়ত "পিটুনি ফৌজ বসান যাক্।" যেন জার্ম্মাণির বাস্তবিক টাকা দিবার ক্ষমতা আছে। ঘাড় ধরিয়া টাকাটা আদায় করিলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যেরই বা কি অবস্থা হইবে আর উত্তমর্ণ দেশগুলিরই বা কি অবস্থা হইবে ?

"টাকা পাইবার একমাত্র উপায় তার রপ্তানি বাড়ানো। কিসের রপ্তানি ? সে অতি অল্প পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে বেচে। আসলে শিল্প-জাত দ্রব্য বেচাই তার ব্যবসা। তার খাদ্য বাহির হইতে আমদানি না করিয়া উপায় নাই। খনিযুক্ত ভূমিগুলি অধিকাংশই গিয়াছে। কারখানা চালাই-বার জন্য বাধ্য হইয়া লোহা ও কয়লা আমদানি করিতে হইতেছে। রপ্তানিযোগ্য উপরিটা বাড়াইবার একমাত্র উপায় হইতেছে শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়-বৃদ্ধি। কিন্তু অন্য দেশগুলি ত আর চুপ করিয়া নাই। তাদের সঙ্গে টক্করে জিতিতে হইলে জার্ম্মাণিকে খাটিবার ঘণ্টা বাড়াইতে হইবে অথচ মজুরি কমাইতে হইবে, মুনাফা কাটিতে হইবে, আমদানিটাকে না হইলে নয় গোছের করিতে হইবে।

"কিন্তু প্রতিযোগী দেশগুলা বসিয়া বসিয়া বাণিজ্যের ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না। বেকার-সমস্যা ও গুরুতর বাণিজ্য-নাশ দেখা দিবে। তারা হয়ত নিজ নিজ দেশের বাজারে জার্ম্মাণির জিনিষ ঢুকিতে দিবে না, টারিফ বসাইবে। কিন্তু উদাসীন দেশের বাজার হাতে রাখিতে হইলে তাহা-দিগকেও বাধ্য হইয়া মজুরি ও মুনাফা নামাইতে হইবে। সুতরাং এক কথায় সমগ্র জগতে জীবন-যাত্রার ধারা নীচু হইয়া যাইবে।

জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নালিশ এই যে, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যদি দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সহিত কাজ করিত, তবে মার্ক এত নামিত না, জগতের বাণিজ্যের এত দুর্দ্দশা হইত না। জার্ম্মাণি ইচ্ছা করিয়া তার সিক্কা নষ্ট করিয়াছে, যেন উত্তমর্ণ দেশগুলি বঞ্চিত হয়। জার্ম্মাণির লোকেরা অন্য কোন কোন দেশের মত যথেষ্ট কর দিতেছে না। দিলে ঋণ শোধ কঠিন হইত না।

অতিরিক্ত করভার চাপাইলে লাভ নাই

"আমার দেশে জার্ম্মাণির চেয়ে বেশী কর দিতে হয়, এ অতি সত্য কথা। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, আমরা করে অতি-প্রপীড়িত আর কর-প্রপীড়ন উৎপাদন ত বাড়ায় না-ই, কমায়। সে যাহা হোক, অতিরিক্ত করভার কিরূপে বহির্ব্বাণিজ্য বাড়াইবে ও রপ্তানি-যোগ্য উপরি ঘটাইবে, তা ত বুঝিতে পারি না। লোকে কর দিবে মার্কে। করটা যে রকমেই আসুক, সোজাপথেই আসুক আর ঘুরিয়াই আসুক। বিদেশী কোন রাষ্ট্র তা যথার্থ সিক্কা বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

"বিদেশের বাজারে জার্ম্মাণি ক্ষতিপূরণ শোধের জন্য মার্ক না বেচিয়া পারে না। আর এক উপায় আছে। যদি রপ্তানিদাররা জার্ম্মাণ মার্ক লইতে স্বীকার পায়। কিন্তু তা হয় না। অন্য দেশেও তার বাণিজ্য আছে। তার দরকার ডলার বা ষ্টার্লিং বা আর কিছু। কাজেই সে মার্ক বেচিবে, তার দরকারী সিক্কা কিনিবে। তার উপরে জার্ম্মাণরা নিজেদের সিক্কার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে বলিয়া মার্ক বেচিতেছে।

"এই সব কথা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে জার্ম্মাণ মুদ্রার দাম কেন এত ভয়ানক পড়িয়া গিয়াছে।

জার্ম্মাণির সুদে খাটানো টাকা উঠাইবার উপায়

"জার্ম্মাণি কিছু ঋণ নিশ্চয় শোধ দিতে পারে। কতটা কিরূপে? জার্ম্মাণদের বিদেশে ঢের সম্পত্তি আছে তা খাটানো—বিত্তই হোক্ আর বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ধনই হোক্। জার্ম্মাণরা এই সম্পত্তি যদি গবর্ণমেণ্টকে বেচিয়া দেয়, গবর্ণমেণ্ট তা ক্ষতিপূরণ কমিশনের হাতে দিয়া দিতে পারে।

"আসল কথা বিদেশী বিত্তের মালিকরা সম্পত্তি বেচিতে ইচ্ছুক থাকা চাই। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান অবস্থায় লোকদের বেচিতে বাধ্য করিতে পারে না। কিসে তবে এরা বেচিতে সম্মত হইবে?

"মালিকেরা যদি নিশ্চিত জানে যে, এই সব বেচিলে মুনাফা পাইবে, তবে তারা তৎক্ষণাৎ বেচিতে চাহিবে। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণরা ক্ষতিপূরণ হেতু মার্কের দাম অত্যন্ত নামিবে এই আশঙ্কাতেই মার্কের বদলে এই সব কিনিয়াছে। এই চাপ উঠাইয়া দেওয়া হোক্। অমনি মার্কের দাম বাড়িবে। এখনও দেশের মধ্যে মার্কের দাম বাহিরের চেয়ে বেশী। তখন বিদেশী সম্পত্তির জার্ম্মাণ মালিকেরা গবর্ণমেণ্টের কাছে বেচিয়া মার্ক লইবে ও লাভবান হইবে।

বিদেশে জার্ম্মাণির লাগান ধন মাত্র ১০০ কোটি ডলার

"জার্ম্মাণির বিদেশী সম্পত্তির দাম কত ঠিক করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু ১০০ কোটি ডলারের কম হইবে না বোধ হয়। পরিমাণটা যাই হোক্, মার্কের দাম নামা বন্ধ করা চাই। ঋণ শোধের একটা সর্ত্ত হইবে এই যে, অন্ততঃ বছর তিনের জন্য উত্তমর্ণ দেশগুলি জার্ম্মাণির কাছে আর টাকা চাহিতে পারিবে না। তাতে মার্কের নামা বন্ধ হইবে, জগতের বিনিময় হারে "স্থিত" ফিরিয়া আসিবে ও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

"জার্ম্মাণির নিকট মিত্রশক্তিবর্গের দাবীর ন্যায্যতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান নহি। কিন্তু একথা বলিতে পারি; রাষ্ট্রীয় বিচার-বিবেচনাকে যদি আর্থিক তথ্যের নীচে স্থান না দেওয়া হয়, তবে ইউরোপের ধ্বংস অনিবার্য্য।

জার্ম্মাণির "বাধা" সব দেশ সম্বন্ধেই খাটে

"ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা গেল। উদ্দেশ্য এই যে, ঋণ-শোধ ব্যাপারটা সহজ-বোধ্য হয়। রপ্তানিযোগ্য উপরি ছাড়া, ঋণশোধের উপায় নিজ দেশের বাইরে মৌজুদ ধন। এ নিয়ম সর্ব্বত্র সত্য।

"সুতরাং অন্যান্য দেশের ঋণ শোধের কথা বিবেচনার সময় দেখিতে হইবে সেই সেই দেশের (১) রপ্তানিযোগ্য উপরি আছে কি না ও (২) বিদেশী সম্পত্তির পরিমাণ কি?

"অধমর্ণ দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ডের প্রভূত পরিমাণ ধন বিদেশে মৌজুদ্ আছে। যুদ্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় বছরে, মিত্রশক্তিদের সব রকম জিনিষ যোগাইবার জন্য, ইংলণ্ড দেদার "সিকিউরিটি" বা "জামিন-পত্র" বাজারে বেচিয়াছিল। তথাপি এখনও ইংলণ্ডের হাতে যে বিদেশী জামিনপত্র আছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঋণের ২।৩ গুণ ঋণ শোধ চলিতে পারে। কিন্তু ফ্রান্স বা ইতালির এরূপ কোন "রিজার্ভ" নাই।

রপ্তানি উপরি হইতে অল্পমাত্র শোধ হইবে

"যুদ্ধকালে ফ্রান্সে বিদেশজাত দ্রব্যের টান অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ফ্রান্স ক্রমাগতই যুদ্ধক্ষেত্রে লোক পাঠাইতেছিল। তার আর নিজের অভাব নিজে পূরণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। তার হাতে ইংরেজের মত বিদেশী জামিন-পত্রও ছিল না। এদিকে যুদ্ধদ্রব্যাদি না কিনিলে যুদ্ধ চালান অসম্ভব। সুতরাং ফ্রান্সের ঋণ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

"যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নামিবার পুর্ব্বে ফ্রান্স বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ১০০ কোটি ডলার ঋণ করিয়াছিল। পরে উহা বাড়িয়া ২৫০ কোটি ডলার হয়। ফ্রান্সকে অবশ্য চড়া দরে জিনিষপত্র কিনিতে হইতেছিল। ফ্রান্সের তখন প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। দর যত চড়া হোক্, ফ্রান্সকে দিতে হইত।

আর সেই সুযোগে আমেরিকান্ ও বৃটিশ বাণিজ্য বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

ফ্রান্স কেমন করিয়া ঋণ শোধ দেয়

"ধর যেন ফ্রান্স তার ঋণ শোধ করিতেছে। তা সম্ভব হয় যদি ফ্রান্স, সাধারণ বাণিজ্যিক টান যতখানি তার চেয়ে ঢের বেশী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া রপ্তানি পাঠাইতে পারে। সুদ ও সিঙ্কিং ফাণ্ড শোধ দিবার মত বুদ্ধি মেহনতের শক্তি যেন আছে, কিন্তু এত এত জিনিষ কিনিবে কে? ইংল্যাণ্ডও না, অন্য কোনও দেশও না। শান্তির সময়ে যুদ্ধের সময়কার মত দ্রব্যের কাটতি কোথা হইতে আসিবে? আর কাটতি না হইলে ফ্রান্স টাকা পাইবে কোথায়?

"বস্তুতঃ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, যুদ্ধের অবস্থাটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তখন আমরা কোটি কোটি টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছি। অসম্ভব চড়া দরে জিনিষ বেঁচিয়াছি। আজ যুদ্ধ নাই। বহু জিনিষের টানও নাই। বহু জিনিষের দর পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ফ্রান্সের মৌজুদ ধন বা রপ্তানিযোগ্য উপরি থাকা অসম্ভব।

"কিন্তু এমন একটা অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, যখন ফ্রান্স খুব তাড়াতাড়ি ঋণ শোধ করিতে পারিবে। ধর যেন আমাদের যুদ্ধ করিতে হইতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে এত লোক পাঠান হইতেছে যে খনির কাজ ও কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ফ্রান্স যুদ্ধে ব্যাপৃত নয়। এরূপ অবস্থায় ফ্রান্স বোঝা বোঝা যুদ্ধ দ্রব্য আমাদের তীরে আনিয়া উজাড় করিয়া দিতে পারে। ঋণ শোধ হইতেও বেশী দেরী লাগে না। কিন্তু শান্তির সময় এরূপ সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্স সে রকম কিছু অসম্ভব অসম্ভব বেঁচিতে গেলে দুনিয়ার বাজার ওলটপালট হইয়া যাইবে। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব মিতে। জার্ম্মাণি ত আছেই তার উপর ফ্রান্স।

ফরাসী দৌলত ঋণের সমান নয়

"ঋণী দেশগুলির মধ্যে ফরাসীর ধনদৌলত সব চেয়ে বেশী। কিন্তু ফরাসীও ঋণশোধে আপারগ। উত্তমর্ণ দেশগুলির মনে রাখা উচিত, ঋণের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ফয়দা নাই। বরং তাতে উল্টা ফল ফলিতে পারে।

"বিনিময়ের ওলটপালট ও ভাঙ্গিয়া পড়া ক্রেডিটের চাপে বহির্ব্বাণিজ্য কিরূপ বিভীষিকাপূর্ণ হয় তা ইংল্যাণ্ড হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ব্বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত কম হইলেও কাবু হইতে কতক্ষণ লাগে?

"উত্তমর্ণ দেশগুলির চুপচাপ থাকাই সমীচীন। বাণিজ্যের অবস্থা ফিরিলে তারাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হইবে। তাদের ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কসপে বেশী লোক কাজ পাইবে।

রপ্তানিযোগ্য উপরি"র প্রকৃত অর্থ

"উত্তমর্ণ দেশ হিসাবে ইংল্যাণ্ডের অতীত অভিজ্ঞতাটা একবার দেখুন। দুই শতাব্দীর উপর বৃটিশ পুঁজিপাটা অন্যান্য দেশকে ধার দিয়া আসা হইতেছে। বছর বছর ইংরেজের যা দরকার তার বেশী উৎপাদন হইয়া আসিতেছে। লম্বা সময়ের জন্য ধার না দিলে এই উপরিটা বেচা যায় না। ইংল্যাণ্ডে বিদেশী "ঋণপত্র" বা অন্য কোনপত্র অনাদৃত হয় নাই। সেগুলিই উপরি উৎপাদনের টাকা যোগাইয়াছে। বৃটিশ ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কসপে বেকার দেখা দেয় নাই।

"মোটের উপর ধরিতে গেলে বৃটিশ মহাজনেরা এইরূপ টাকা খাটাইয়া বেশ মোটা আদায় পাইয়াছে। কিন্তু অধমর্ণদের ঋণ শোধের সামর্থ্য হয় নাই। আরো ঋণ পাইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইলে ঋণ শোধ চলিতে পারে। ইংলাণ্ড আবার ঋণ দিয়াছে। এইরূপে দেখা যাইবে ইংলাণ্ডের কাছে দুনিয়ার ঋণের পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে। আর ইংরেজ সুদ হিসাবে প্রতি বছর যা পাইয়াছে তার চেয়ে বেশী ঋণ দিয়াছে।

"মনে হইতে পারে বটে, ক্রমাগত ঋণ দিয়াই যদি চলিল তবে লাভ ত কিছুই হইল না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মোট ঋণ দেওয়ার পরিমাণটা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু একটা জায়গাতেই বাড়িতেছে বা মোট ঋণটা বাড়িতেছে মনে করিলে ভুল হইবে।

"তা ছাড়া বেপারী-বিশেষের পক্ষে যেমন জাতির পক্ষেও এ কথা সত্য, ঋণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেডিটও বাড়িতে পারে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, এমন কি সম্পদের পরিমাণ ঋণের চেয়ে অনেক বেশী দাঁড়াইতে পারে। কারণ, বিদেশী ঋণ বা পুঁজিপাটা গ্রহণ।

যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত

"আপনাদের নিজের দেশের কথা ধরুন। দুনিয়ার ইতিহাসে সব চেয়ে বেশী বিদেশী ঋণ করিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র। আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য আপনাদের পুঁজিপাটার দরকার ছিল। সেই উদ্দেশ্যে এক ইংল্যাণ্ড হইতেই অন্যূন ৩০০ কোটি ডলার ধার লইয়াছিলেন। যুদ্ধ যখন বাধিল আপনাদের ধার নেওয়াটা তখন আর বাড়িতেছিল না, আর সব সুদটা শোধ করিবার পক্ষে দ্রব্যাদির রপ্তানিযোগ্য উপরিটা যথেষ্ট দাঁড়াইয়াছিল।

"কিন্তু আসলটা শোধ করা বহুকালের জন্য আপনাদেরও সাধ্যের বাহিরে ছিল; যুদ্ধ বাধায় আপনাদের সুবিধা হইল। ইউরোপে আমেরিকান্ দ্রব্যের জন্য ক্রমাগত ডাক পড়িতে লাগিল। ফলে আপনাদের রপ্তানি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইংল্যণ্ডের হাতে যে সব "ষ্টক" ও "বণ্ড" ছিল সেগুলি বেচিয়া আমরা আমেরিকার টাকা শোধ দিতে থাকিলাম। এইরূপে দুই শতাব্দীর ঋণ অল্প কয়েক বছরের মধ্যে শোধ হইয়া গেল।

ভ্রান্ত মত দারুণ দুর্বিবপাকের কারণ

"আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা থাকিতে পারে। সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু এই ভুল ধারণার ফলে জগতের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

আগে জাতিতে জাতিতে দেনা পাওনার কারবারটা এত বিশাল ছিল না। দেনা পাওনার হিসাব কতক সোণার চলাচলে মিটিত, আর কতক ঋণী দেশে বিনিময় হারের পতনে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে মিটিত। আজ সে অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে ও আন্তর্জ্জাতিক ঋণশোধের সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিলে এই দুর্যোগ ও দুঃখের সমাধান সহজ হইবে।

"ব্যাঙ্কিংয়ের মূলনীতিগুলি এতদিন ভাল করিয়া না বুঝায় পুনঃপুনঃ আর্থিক সঙ্কট বা ক্রাইসিস্ সহিতে হইত। এমন কি লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল ১০।১২ বছর পর পর সঙ্কট ঘটিবেই। বুদ্ধিমান্ অর্থনীতিজ্ঞরা পর্য্যন্ত বলিলেন, "সূর্য্যে যখন কাল কাল দাগ দেখা দেয় তখন দুঃসময় আসে, ফসল হয় না বা নষ্ট হয়, তারপর ক্রাইসিস্ দেখা দেয়।" কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও সিক্কা সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেডিটের উপর সূর্য্য-চিহ্নের মন্ত্রপ্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে বশে আনা গিয়াছে।

উপসংহার

"এখন কথা এই যে, জার্ম্মাণির ঋণ শোধের পথ মাত্র দুইটি (১) বিদেশীর তাঁবে জার্ম্মাণির যে ধনসম্পত্তি আছে, (২) অবশিষ্ট বিদেশী জামিনপত্র বেচিয়া যে টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ঋণ শোধটা সম্ভব হয় যদি নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া জোর জবরদস্তি কিছু না হয়। সেই কাল মধ্যে মার্কে "স্থিত" পড়িবে। এই সময় শেষ হইয়া গেলেও যা চাওয়া হইবে তা তখনকার জার্ম্মাণির বাৎসরিক রপ্তানি-যোগ্য উপরির চেয়ে বেশী হইবে না।

"ইংল্যণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের সুদটা ও সিঙ্কিং ফাণ্ডটা শোধ দিবার সামর্থ্য আছে। কিন্তু অন্য দেশের কোনটাই খুব অল্পমাত্র ঋণের বেশী শোধ দিতে সমর্থ নয়। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় তাদের ঋণশোধের ব্যবস্থাটা কতককাল ধরিয়া বন্ধ করিয়া দিলে সকলেরই কল্যাণ হইবে। পরিশেষে কোন্ দেশ কত দিতে পারিবে তা কথাবার্ত্তা দ্বারা স্থির হইতে পারে।

"আমার বিশ্বাস অধমর্ণকে যদি সামর্থ্যের বাহিরে ঋণ শোধ দিতে বাধ্য করা হয়, তাতে সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মজুরি কমে, মুনাফা নামে, বেকার-সমস্যা তীব্র হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য আমার এই সিদ্ধান্ত একমাত্র আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক কারণ বা অধমর্ণদের নৈতিক দায়িত্ব বিচার করা আমার অভিপ্রেত নয়।"

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীযুক্ত হারবার্ট হুভার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-সচিব। তিনি ওহিওর অন্তঃপাতি টোলেডো নামক স্থানে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় "আমাদের গবর্ণমেন্টের নিকট ইউরোপীয় ঋণ শোধ।" তারিখ ১৬ই অক্টোবর, ১৯২২ সন।

হুভারের কাছে আমেরিকার বাণিজ্য-স্বার্থ সব চেয়ে বড় জিনিষ। সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি এই বক্তৃতায় ইউরোপকে এক সঙ্গে পিঠ চাপড়াইতেছেন, উপদেশ দিতেছেন ও ধমক দিতেছেন।

উপদেশের নমুনা নিম্নরূপ—"আহা ইউরোপ! অত ঘাবড়াইতেছ কেন? এই আর্থিক সমস্যাটাকে অত ছোট করিয়া দেখিও না। দশ বছর, পঞ্চাশ বছর, একশ বছরের কথা ভাব। বিনিময়ে উঠানামা বা যুদ্ধের জন্য বাণিজ্যের দুরবস্থা ত দুই দিনের ঘটনা। এই দেখ না যুদ্ধ শান্তির পর তোমরা কতখানি আর্থিক উন্নতি করিয়াছ। ভবিষ্যতে আরও করিবে। তোমাদের সমস্যাটা আর্থিক নয়, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক। ১৯১৯ সনে ইউরোপে জুড়িয়া ছিল বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভিক্ষ। আজ কৃষি, ব্যবসা, মাল-চলাচল, বাণিজ্য যেদিকে তাকাই, দেখি পুনর্গঠনের প্রতিভা সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

পিঠ চাপড়াইবার নমুনা—"ইউরোপ ত লোক মন্দ নয়। তবে দরকার শুধু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির। ইউরোপের লোকেরা কি কর্ম্মঠ! তার ব্যবসা ও উৎপাদন কি বিশাল! বুদ্ধি কি তীক্ষ্ণ! তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অপরিমেয়। আমেরিকার ঋণ শোধ করা আর কি কথা? শান্তি বজায় থাকিলে তা অনায়াসেই হইতে পারে।"

ধমকের নমুনা—"নীতিজ্ঞান ও আর্থিক স্থিরতার দোহাই দিয়া কেহ কেহ বলিয়াছে 'আমেরিকা, সবটা অথবা কিছুটা ঋণ ক্ষমা কর।' অথবা 'কংগ্রেসে যে সুদ ইত্যাদি ঠিক করিয়াছ, তাহা হইতে রেহাই দাও বা সময় দাও।' কিন্তু এটা কি একটা ছেলে খেলার কথা হইল!

"মূলে ২০টা জাতিকে যে ধার দেওয়া হইয়াছে তার পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি ডলার। বলিতে গেলে সবটাই ডাক ঋণ অর্থাৎ চাহিবা মাত্র শোধ দিবার কথা। এখন পরিমাণটা সুদে আসলে দাঁড়াইয়াছে ১১৫০ কোটি ডলার। কংগ্রেস সর্ত্ত দিয়াছে যে, এই ঋণ ২৫ বছরের মধ্যে শোধ করা চাই। ফাণ্ডিং কমিশনের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে এই হুকুম তামিল করা। কংগ্রেসের হুকুম ছাড়া আমরা এক চুলও পথভ্রষ্ট হইতে পারি না।"

শ্রীযুক্ত হুভারের মোটামুটি কথাটা এইরূপ—"এই ঋণগুলির সম্পর্কে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার।

"(১) এই ঋণগুলি আমাদের গবর্ণমেন্ট দেয় নাই। দিয়াছে করদাতারা। খাতকরা তখন পায় ধরিয়া ঋণ চাহিয়াছিল, যথাসময়ে শোধ দিবে, কথা দিয়াছিল। তারপর এই ঋণের ব্যাপারে প্রত্যেক জাতির সঙ্গে আমাদের আলাদা আলাদা কারবার। আমাদের অধমর্ণ দেশগুলির মত আমেরিকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে নাই, রাজ্যও জয় করে নাই। এই ঋণের সম্বন্ধে ধর্ম্ম বা চুক্তির কথা উঠিতে পারে না। আমার ত মনে পড়ে না ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কোন লোক বলিয়াছে, ঋণটা প্রত্যাহার করা হউক্। আমি ত নিশ্চয়ই বলি না।

"(২) কোন কোন দুর্ব্বল অধমর্ণ দেশের সুদটা মাপ করা উচিত, বুঝি। কিন্তু ইউরোপ আসল টাকাটা শোধ দিতে পারিবে না, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বড় জোর ৫% অনাদায় থাকিয়া যাইতে পারে। একটা কথা শুনিতে পাই যে, ঋণের বোঝাটা অধমর্ণ দেশগুলির পক্ষে বড় গুরু। ভয়ও দেখান হইয়া থাকে, ঋণী দেশগুলি আমাদের দেশে এত দ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিবে যে, বহু ফ্যাক্টরী বন্ধ করিতে হইবে, অসংখ্য মজুর নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য, এই দুই ধারণারই মূলে রহিয়াছে আর্থিক নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

"(৩) এইরূপ অনুরোধ আসিয়াছে যে, 'কয়েক বছরের জন্য সুদটা মাপ করা হোক্ বা কিছু কিছু কমাইয়া দেওয়া হোক্। এই অনুরোধের মূলে একটা বিশ্বাস কাজ করিতেছে যে, কোন কোন দেশের পক্ষে এই টাকা শোধ করা বাস্তবিক অসম্ভব। তাগাদা না করিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলে, আর্থিক সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবে, সব

দেশ মাথা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইবে ও তাতে সকলেই লাভের ভাগীদার হইবে।

"কিন্তু কই, বৃটিশরা আমাদের সহায়তা ত চাহিতেছে না। তারা বরং শোধ দিবার বন্দোবস্তই করিতেছে। মোট পাওনার ৪৭৫ কোটি ডলার বৃটিশের নিকট প্রাপ্য। অর্থাৎ সমস্যাটার প্রায় আধা পরিষ্কার হইয়া গেল। বাকী থাকে ইউরোপের ১৯টা দেশ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক একটা দেশের ঋণের ভার এক এক রকম। বাৎসরিক ঋণ শোধের মাত্রাটা সরকারী আয়ের ২% হইতে ১২%র মধ্যে পড়ে। তার বেশী কোন দেশকে দিতে হয় না।

"(৪) বলা হইয়াছে, 'এই এই দেশের সুদটা মাপ কর। আর্থিক সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।' কিন্তু তার প্রমাণ কৈ? সেই সেই দেশ আমেরিকাবাসী ও কংগ্রেসের নিকট প্রমাণ দিতে পারিবে কি তারা শান্ত সুবোধ ভাল ছেলে হইয়াছে? আমেরিকাবাসী ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া শেষ পর্যন্ত ঠকিবে না কে বলিল? কারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কৈ? বছর বছর প্রত্যেক দেশের সামরিক ব্যয় বেশী হইতেছে। অনবরত এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের কামড়া-কামড়ি চলিতেছে। অনেক সময় 'যুদ্ধ হয় হয়' অবস্থা। এই রকম হাওয়ায় বাণিজ্য বাড়িতে পারে? বাজেট ও মুদ্রার সংস্কার ঘটিতে পারে? বলা বাহুল্য, হাওয়া বদলাইলে ইউরোপের পুনরুত্থানে বেশী সময় লাগে না।

"(৫) আমেরিকা ত্যাগ ও বদান্যতায় পিছপাও নয়। তার অনেক প্রমাণ আমরা দিয়াছি। আমরা ইউরোপের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ নহি। কিন্তু একমাত্র ত্যাগ ও বদান্যতা দ্বারা আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয় না। আমরা বিশ্ব-শান্তির জন্য কম চেষ্টা করিতেছি না।

ভুল ধারণা

"কর বসাইয়া অথবা ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া শেষ অবধি ঋণশোধ করা যায় না, একথা কোন দেশ বলে নাই। ভাবনাটা হইতেছে, দেশী টাকাকে কি করিয়া আমেরিকানদের জন্য মাল ও সোণায় পরিণত করা যায়। এটা যেন বড়ই মুস্কিলকি বাত। কিন্তু এই ভাবনার মূলে রহিয়াছে কতকগুলি বদ্ধমূল ভুল ধারণা।

"কয়েকটা এই প্রকার:—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা ঋণশোধের একমাত্র উপায় হইতেছে জাহাজ বোঝাই মাল বা সোণা পাঠোনো; (২) এই মাল বা সোণা ঋণী দেশগুলি সোজাসুজি আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিবে; (৩) আমাদের ব্যবসা ও চাকরী বাকরী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; (৪) দরকার মত আমদানি করিয়া, তার চেয়ে বেশী ও উপরে যতটুকু ফালতু রপ্তানি উৎপাদন করিবার সামর্থ্য আছে, কোন দেশের শোধ-সামর্থ্য তারই উপর নির্ভর করে; (৫) কোন দেশের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে বুঝা যায়, তার ভবিষ্যতে শোধ করিবার ক্ষমতা কিরূপ।"

উত্তর

বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌কেন্নার নাম উল্লেখ না করিলেও শ্রীযুক্ত হুভার যে তাঁর জবাবদিহি করিতেছে, তা বুঝা যাইবে। হুভার ম্যাককেন্নার কথা অর্থনৈতিক দিক্ হইতে মিথ্যা এই কথা সপ্রমাণ করিতে চান। তিনি বলিতেছেন—

"আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যটা একটু আলাদা রকমের। ইহার ভিতর একটা তথা-কথিত অদৃশ্য "এক্সচেঞ্জ" বা বিনিময় আছে। অদৃশ্য বিনিময়ের প্রাণ হইতেছে—(ক) বছর বছর আমেরিকান্ পরিব্রাজকরা বিদেশে বহু টাকা খরচ করে; (খ) যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঔপনিবেশিকরা বিদেশে তাদের নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধুর কাছে দেদার টাকা পাঠায়; (গ) আমাদের লোকেরা বিদেশে উত্তরোত্তর বেশী টাকা খাটাইতেছে; (ঘ) যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট ঋণী দেশগুলি টাকা খাটাইয়া সুদ পাইতেছে; ইত্যাদি। এইগুলির বাবদ আমরা ইউরোপকে বছর বছর অনেক টাকা যোগাই। ইউরোপ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই টাকা দিয়া আমাদের সুদটা শোধ দিতে পারে অথবা আমাদের নিকট কেনা জিনিষের দাম দিতে পারে।

"এইগুলির বাবদ গত বছর ১৫০ কোটি ডলার হইয়াছিল।

অথচ গত আর্থিক বছর দুর্বৎসর বিশেষ। শান্তি থাকিলে এই পরিমাণ যে ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে, সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, এই পরিমাণ মুদ্রা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রধানতঃ ঋণীদেশগুলিতেই ব্যয় হইয়াছে।

"বিগত আর্থিক বছরে, আমাদের দেশে দুনিয়ার ২৬০ কোটি ডলার মূল্যের মাল জাহাজে করিয়া আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে "অদৃশ্য বিনিময়ে"র দাম যোগ দিলে, জগতের আমাদিগকে শোধ দিবার ক্ষমতাটা প্রায় ৪১০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। ইহার উপর, দুনিয়া হইতে সোণারূপায় ৪৫ কোটি ডলার আমাদের দেশে আসিয়াছে। ঠিক ঐ বছর আমরা ৩৮০ কোটি ডলারের মাল রপ্তানি করিয়াছি। অর্থাৎ আমাদের উপর জগতের ৭৫ কোটি ডলার দামের দ্রব্যাদি ফাল্তু ছিল। এই মুদ্রাটা হয়ত বেসরকারী ঋণ-শোধে গিয়াছে।

"ঋণ-শোধের ফলে আমাদের বাজার বিদেশী দ্রব্যে প্লাবিত হইয়া যাইবে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অদৃশ্য বিনিময়ের প্রসারে ত প্লাবন বাধা পাইবেই। তাছাড়া, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যটা সোজাসুজি চলে না, কোণাকুণি চলে। ধর, আমাদের ইন্‌ভেষ্টাররা আর্জ্জেন্টিনাকে টাকা ধার দিল। আর্জ্জেন্টিনা এই টাকা দিয়া ইউরোপ মহাদেশ হইতে জিনিষ-পত্র কিনিল। ইউরোপ এই টাকা পাইয়া আমাদের ঋণ-শোধে খরচ করিতে পারে অথবা আমাদের জিনিষ কিনিতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে আমাদের আমদানিটা এইরূপ একটা প্রকৃষ্ট ত্রিকোণাকার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উদাহরণ।

"ইউরোপের যে দ্রব্য আমাদের বাজারে আসিলে প্রতিযোগিতা হইতে পারে তা গ্রীষ্ম-মণ্ডলে পাঠান হইতেছে, আর গ্রীষ্ম-মণ্ডল হইতে যে দ্রব্য আমাদের পাঠান হইতেছে তা প্রতিযোগিতা করে না। এরূপ ঘটনা শুধু সম্ভব নয়, অহর্নিশি ঘটিতেছেও। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের উৎপন্নগুলি, রবার, কফি, চিনি, কাঠ ইত্যাদি আমরা যথেষ্ট উৎপাদন করিতে পারি না। এগুলি আসিলে আমাদের ব্যবসা ও চাকুরী বাকরীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আর এগুলি আমাদের ক্রমেই বেশী বেশী দরকার হইতেছে। মাত্র ৭ বছরের মধ্যে গ্রীষ্ম-মণ্ডল হইতে আমাদের আমদানি ৩৬% হইতে ৫৩% বাড়িয়াছে। আর এই গ্রীষ্ম-মণ্ডলটা প্রধানতঃ ইউরোপীয় অধমর্ণ দেশগুলির অধীন। আমাদের জীবন-যাত্রার ধারা ও লোকবল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম মণ্ডল হইতে আমদানির জন্য টানও বাড়িতে থাকিবে।

"আমদানির উপর রপ্তানির বর্ত্তমান "উপরির" পরিমাণ দ্বারাই বুঝা যায়, কোন দেশ লম্বা ঋণ শোধ করিতে পারিবে কিনা। এই ধারণার মূলে শুধু মাল-চলাচল ঋণ-শোধের একমাত্র উপায় নয় এরূপ একটা অজ্ঞতা আছেই। পরন্তু অন্য একটা অজ্ঞতা হইতেছে সময়কে শক্তি বলিয়া না ধরা। বস্তুতঃ, লোক-বৃদ্ধিতে, বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক উপায়ের উন্নতিতে, দুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যেক ১৫।২০ বছর অন্তর দ্বিগুণিত হয়। এদিকে এই ঋণটা হইল একটা স্থির দায়। প্রত্যেক বছর ইহা কমিতে কমিতেই যাইবে।

"আন্তর্জ্জাতিক ঋণে—এক গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অন্য গবর্ণমেণ্টের হোক্ বা দুই দেশের লোকের মধ্যে হোক্,—বিনিময় ও বাণিজ্যের উপর ফলটা একই হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে, বাকী দুনিয়া ইউরোপের কাছে বোধ হয় ৩০০০ কোটি ডলার ধারিত। এর বেশীর ভাগই বিগত ৪০ বছরে জমা হইয়াছিল। কিন্তু ঋণভারে দুনিয়ার বাণিজ্যে কোথাও গণ্ডগোল বাধে নাই। অর্থাৎ শান্তির সময় উৎপাদন ও শোধ করার ক্ষমতার এ একটা পরিচয়।

"ঋণটা একদম ক্ষমা করিয়া ফেল, ইত্যাকার মন্তব্য যে অর্বাচীন বুলিমাত্র, তা বুঝা যাইতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপের অনিশ্চিত অবস্থা, বহুস্থানে হ্রস্ব জীবন-যাত্রার ধারা, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হ্রাস, আমাদের উৎপাদন কিনিবার সামর্থ্য-হ্রাস, সদা পরিবর্ত্তনশীল বিনিময় এসব আসিয়া আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও হিতকে খণ্ডিত করিতেছে। কোন একটা সভ্যতা যদি চুরমার হইয়া যায়, তাতে আমাদের নৈতিক ও জ্ঞানের ক্ষতি অপরিমেয় হইবে। সুতরাং ইউরোপকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা আমাদেরই স্বার্থ। আমেরিকা সত্য সত্যই

সাহায্য করিতে চায়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এও চায় যে, আমেরিকাবাসীদের উপরও সুবিচার করা হইবে। তাদের ন্যায্য-প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

সচিব হুভারের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা

এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সনের ৫ই নবেম্বরের "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে"। লেখক শ্রীযুক্ত এডুইন্ আর, এ, সেলিগম্যান, পি-এইচ, ডি, এল, এল, ডি, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ম্যাক্‌ভিকার অধ্যাপক।

সেলিগম্যানের নাম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি-গুলির মূলতত্ত্ব-বিষয়ক কেতাবখানার পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। তাঁর এই পুস্তকখানার ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান্ রুশ, জাপানী ইত্যাদি অনুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং এই অনুবাদগুলিরও বহু সংস্করণ হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেলিগম্যান বাণিজ্য-সচিবের টোলেডোতে প্রদত্ত ১৬ই অক্টোবরের বক্তৃতার এক খাড়া জবাব লিখিয়াছেন। এই জবাবের প্রসঙ্গে একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। সেলিগম্যান গোড়াতেই বলিতেছেন যে, হুভারের মতটা অর্থাৎ আমেরিকা সরকারের মতটা আমেরিকাবাসীর মত নয়। আমেরিকাবাসী বলিতে শুধু ব্যবসায়ীদের বুঝিতে হইবে না, অধিকাংশ চাষী ও মজুর-সর্দ্দারদেরও বুঝিতে হইবে। কথাটা গুরুতর।

হুভার যে নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কারস্ কনভেনশনে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত ল্যামণ্টের বিপরীত কথা বলিয়াছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সেলিগম্যান বলেন, হুভারের মত বিশেষ ব্যক্তির আলোচনা কালে ৩টা মূল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে। যথা—

(১) ঋণগুলির স্বরূপ।

(২) অধমর্ণদের শোধ করিবার সামর্থ্য।

(৩) এখনই অথবা তাড়াতাড়ি মিটাইয়া দিবার জন্য জিদ করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত কি না।

১। মিত্রবর্গের ঋণটা ন্যায্য কি ?

মিত্রশক্তিবর্গ পরে শোধ দিবার কড়ার করিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, সত্য কথা। কিন্তু নীতিজ্ঞান কি বলে ?

প্রথমতঃ, ঋণটা বেশীর ভাগ যুদ্ধকালে করা হয়। রাম শ্যাম যোদ্ধা দেশগুলিকে হয়ত কিছু কিছু ঋণ দিয়াছিল, কিন্তু আমরা যুদ্ধে নামিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট একটা সেণ্টও ধার দেয় নাই।

তাপরপর "আর্মিষ্টিসের পর ছোটখাট কয়েকটা ঋণ দান করা হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি প্রায় সমস্তই যুদ্ধ-খরচা বাবদ।

মোট ঋণের পরিমাণ ১০০০ কোটি ডলার। তন্মধ্যে যুদ্ধের পর ঋণ দেওয়ার হিসাব এইরূপ :—

১৯১৯ সনের জুনে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইবার পর ১৫ই নভেম্বর অবধি বেলজিয়ামকে দেওয়া হইয়াছে— ৩০,০০,০০০ ডলার

আর ১৯১৯ সনের ১৫ই নবেম্বর হইতে পরবর্ত্তী সনের ১৫ই নবেম্বর অবধি বেলজিয়ামকে ১,০০,০০,০০০ ডলার

ঐরূপ প্রথম কিস্তিতে ফরাসীকে ২৫,০০,০০,০০০ ডলার

দ্বিতীয় কিস্তিতে ফরাসীকে ১১,০০,০০,০০০ ডলার

ঐরূপ ইতালিকে প্রথম কিস্তিতে ৬,০০,০০,০০০ ডলার

ইতালিকে দ্বিতীয় কিস্তিতে ৫,০০,০০,০০০ ডলার

গ্রেট বৃটেনকে কোন ঋণ এই সময়ে দেওয়া হয় নাই। মাত্র ৫০ কোটির কাছাকাছি যুদ্ধের পর দেওয়া হইয়াছে। মোট ঋণের তুলনায় ইহা কিছুই নয়। সুতরাং বলা চলে হাজার কোটি ডলারের প্রায় সমগ্র ঋণটাই যুদ্ধকালে করা হইয়াছে।

১৯১৯ সনের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে রিপোর্টে সচিব ম্যাক্ আডু বলিয়াছেন, "ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকার সহযোগীদের তখন ঘোরতর বিপন্ন অবস্থা। গোলা চাই, রসদ চাই, আরও কত কিছু চাই। আর আমেরিকা তার অর্থ সংস্থান লইয়া তাদের পিছনে দাঁড়াইয়াছে, এ জ্ঞানটাও তাদের যুদ্ধ করিতে কম উৎসাহ দেয় নাই, অপর দিকে জার্ম্মাণিকে কম কাবু

করে নাই। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সৈন্য সামন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইতে পারে ততক্ষণ ইউরোপে মিত্রগণ টি'কিয়া ছিল শুধু এই ঋণের বলে।"

বস্তুতঃ, যুদ্ধটাই একটা কয়েকজনের একজোটের কার্য্য। সকলেরই স্বার্থ এক, উদ্দেশ্যও এক। কিন্তু সামর্থ্য এক প্রকারের নহে। মানুষ যোগাইয়াছে প্রধনাতঃ ফ্রান্স ও ইতালি। দ্রব্যাদি যোগাইয়াছে প্রধানতঃ গ্রেটবৃটেন। আর খাদ্য সামগ্রী যোগাইয়াছে প্রধানতঃ আমেরিকা। যুদ্ধ জয়ের জন্য এই তিনটার প্রত্যেকটাই অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং একথা বলিতে পারি কি যে আমাদের দাবীটাই শুধু আলাদা রকমের ?

হাঁ অর্থদানে ও সৈন্যদানে আমরা কার্পণ্য করি নাই বটে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমাদের পার্থিব কোন লাভও হয় নাই। আমরা কোন প্রকার বিজিত রাজ্য গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করিয়াছি।

ভাল কথা। কিন্তু ছবির অন্য দিক্‌টা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত হুভার বলিতেছেন, আমেরিকা ক্ষতি পূরণের ভাগ লয় নাই, সন্ধির ফলে অন্য কোন লাভও পায় নাই। কিন্তু এটা কি সত্য কথা যে আমরা যুদ্ধ বাবদ কোন লাভই পাই নাই ? উল্টা কথাটাই কি সত্য নয় ? যখন সমগ্র ইউরোপ প্রাণান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, আমরা সর্ব্ব-প্রধান উদাসীন জাতি ছিলাম ও অজস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছিলাম।

আমাদের প্রেরিত যোগানের মূল্য স্বরূপ ইউরোপ কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমাদের কাছে পাঠাইতেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ইউরোপকে আমাদের দ্রব্যসম্ভারে প্লাবিত করিয়া ফেলিলাম। ইউরোপের ঋণ আমাদের কাছে বাড়িতে লাগিল। ইউরোপে যখন ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল, আমরা তখন সমৃদ্ধির উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতেছিলাম। সুতরাং যুদ্ধে আমাদের কোন লাভ হয় নাই একথা বলা কি সাজে ?

বরং যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশই সব চেয়ে উপকৃত হইয়াছে। যুদ্ধকালে মজুরির হার কত না চড়িয়া গিয়াছিল। আমরা অবশ্য জাহাজ পাই নাই। গ্রেটবৃটেন শত্রুর অনেক জাহাজ পাইয়াছিল। তাতে তার জাহাজের ব্যবসা মাটি হইয়া গিয়াছে। আমরা কোন উপনিবেশ লাভ করি নাই। উপনিবেশগুলি সম্পদ্ না হইয়া আপদ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা ধনের উপর ধন সাজাইয়া স্তূপাকার করিতে-ছিলাম। আর অন্য সমস্ত দেশ ধনহীন হইতেছিল।

এক ধাক্কায় আমরা আর্থিক দুনিয়ার ভাগ্য-বিধাতা বনিয়া গেলাম। এ বিপ্লব কি করিয়া সম্ভব হইল ? গোড়া হইতে আমরা যদি যুদ্ধে যোগ দিতাম তবে আমাদের দশাও কি মিত্রদের মত হইত না ? কোটি কোটি ডলার পাওনার কথা না ভাবিয়া কোটি কোটি ডলারের ঋণের কথা কি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হইত না ?

আজ কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হইয়া বসিয়া বলিতেছি কি না 'মুদ্রা দাও।' কাদের বলিতেছি ? যারা আমাদের পাশে দাঁড়াইয়া একমাত্র লক্ষ্যের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। যারা আমাদের চেয়ে অনন্তগুণ বেশী ত্যাগ করিয়া পরোক্ষে আমাদের ঐশ্বর্য্যের কারণ হইয়াছিল।

প্রায় প্রত্যেক দেশে যুগপৎ যুদ্ধ-মুনাফা কর দেখা দিয়াছে। ইহার অর্থ কি এই নয় যে, অন্যের রক্তপাত ও দুঃখ শোক জনিত মুনাফাটা অন্যায় ? ব্যক্তির পক্ষে একথা যদি সত্য হয়, জাতি বা দেশের পক্ষে এটা কি আরও বেশী সত্য নয় ?

এরূপ অবস্থায় মিত্রবৃন্দের ঋণটাকে ন্যায্য বলিতে পারি কি। অবশ্য আমরা ঋণ-হিসাবেই টাকা দিয়াছিলাম। কিন্তু ন্যায়বুদ্ধির দিক্ হইতে দেখিলে বুঝিব মিত্রদের ঋণভার আমাদেরও ঋণভার। আমরা পীড়াপীড়ি করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত হুভার বলিতেছেন, মিত্রগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তারা পরে ঋণ শোধ করিবে। সত্য কথা। মানুষ যখন ধার নেয়, সর্ব্বদাই বলে শোধ দিব, কিন্তু মিত্রেরা সত্য সত্য শোধ দিবার কথা ভাবিয়াছিল কি না সন্দেহ। আমাদের গবর্ণমেন্টেরও কেহ ফিরিয়া পাইবে ভাবিয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন অবস্থা এরূপ সঙ্গীন যে মিত্রেরা যদি চাঁদা চাহিত বা দান চাহিত, তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইত। ইংল্যাণ্ড তখন পতনোন্মুখ। ওয়াশিংটন একথা জানিত। আমরা

আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেকে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাই, তখন ত জিজ্ঞাসা করি নাই, ঋণ হিসাবে দিতেছি না দান হিসাবে দিতেছি। আজ ডলারের দাম কি মানুষের দামের চেয়েও বেশী হইল ?

শ্রীযুক্ত হুভার বলিয়াছেন, কোন দেশের সরকারী কোন লোক ঋণ প্রত্যাহারের কথা বলিয়াছেন, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাহা হইলে বলিতে হয় শ্রীযুক্ত হুভার ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি ধুরন্ধরদের কোন খবর রাখেন না। সত্য বটে অভিমানী গ্রেটবৃটেন ঘোষণা করিয়াছে, প্রত্যেকটা পেনি অবধি শোধ দিবে। অপরিশোধিত ঋণ লইয়া টিট্‌কারি গ্রেটবৃটেন সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, গ্রেটবৃটেন আমাদের নিকট হইতে যত ধার লইয়াছিল তার প্রায় দ্বিগুণ ধার দিয়াছিল। অথচ আমাদের নিকট ঋণের হাত হইতে যদি সে রক্ষা পায়, তবে বৃহত্তর ঋণটাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছে।

আমরা "পরিষ্কার হাত" লইয়া যুদ্ধ করিয়াছি ও জিতিয়াছি। কিন্তু আমাদের পরিষ্কার হাত ভর্তি হইয়া গিয়াছে। আমরাই একমাত্র দেশ ও জাতি, যে যুদ্ধের ফলে আগের চেয়েও শক্তিশালী ও ধনশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনতঃ মিত্রদের কাছে কর্জ্জ শোধের দাবী আমরা করিতে পারি। কিন্তু এই দাবী ধর্ম্মতঃ কি করিতে পারি ?

২। ইউরোপের দেনা মিটাইবার সামর্থ্য আছে কি ?

আমাদের দাবীটা আইনতঃ গ্রাহ্য। সুতরাং দেখা দরকার, খাতকদের দেনা মিটাইবার সামর্থ্য কতখানি।

সোজাসুজি বলিতে গেলে আমাদের প্রকৃত খাতকগণ সব দেউলিয়া। কারণ আমাদের প্রকৃত খাতক হইতেছে ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও অন্যান্য দশ বিশটা ইউরোপীয় দেশ।

হাজার কোটি ডলার ঋণের প্রায় আধাটাই অবশ্য গ্রেট বৃটেন গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গ্রেট বৃটেন যেমন একহাতে আমাদের কাছে ঋণ করিয়াছে এবং ঋণ করিয়াছে বলিয়াই তেমন অন্যহাতে ফ্রান্স, ইতালি, রুশিয়া ইত্যাদিকে তার চেয়েও বেশী ঋণ দিয়াছে। হাজার কোটি ডলার প্রকৃত পক্ষে ইউরোপকেই দেওয়া হইয়াছে শুধু তার কিছু ভাগটা গ্রেটবৃটেনের মধ্যস্থতায় দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং প্রশ্নটা হইতেছে, ইউরোপীয় দেশগুলি দেনা শোধ দিতে পারে কি না ? তাদের অবস্থা সেরূপ কি না ?

শ্রীযুক্ত হুভার বলিয়াছেন, দেনার উপর সুদ ও অ্যামর্টি-জেশন দায় বাবদ পরিমাণটা দেশগুলির বাৎসরিক আয়ের মাত্র ২% হইতে ১২%র মধ্যে দাঁড়ায়। কিন্তু আমার যুক্তি যদি সত্য হয় ও আমাদের জিদের দরুণ গ্রেট বৃটেনকে অন্য মিত্রদের ঋণ শোধ দিতে বাধ্য করিতে হয়, শ্রীযুক্ত হুভারের অঙ্কগুলিকে দ্বিগুণ করিতে হয়। অর্থাৎ বাৎসরিক আয়ের উপর ভারটা ৪% হইতে ২৪%র মধ্যে পড়ে। ২৪% কোন ক্রমেই সামান্য বিবেচনা করা চলিতে পারে না। বিশেষ ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায়।

তারপর শ্রীযুক্ত হুভার বলিতেছেন, ঋণী দেশগুলি তাদের ঋণ শোধ করিবে প্রধানতঃ একটা রপ্তানিযোগ্য উপরির দ্বারা অর্থাৎ কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের সাহায্যে। এটা খাঁটি কথা নয়। রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ ও ব্যবস্থাপক হিসাবে আমি শ্রীযুক্ত হুভারকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য, তাঁর অর্থশাস্ত্রে বিষম গলদ রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌কেন্নার বক্তৃতাতে বর্ত্তমান অবস্থার বিশ্লেষণটা ঢের বেশী যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ঋণশোধের ব্যবস্থাটা আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

(১) অবশ্য, নগদ টাকায় অর্থাৎ সোনায় ঋণটা শোধ করিয়া দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু এ প্রণালীটার আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ, ধরিতে গেলে ইউরোপীয় দেশগুলির হাতে সোনা একদম নাই। দুনিয়ার সোনার যোগান আসিয়া যুক্তরাষ্ট্রে সব জড় হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় সম্ভব উপায় হইতেছে গার্হস্থ্য বা পারি-বারিক সম্পত্তিটাকে বিদেশী মহাজনের হাতে তুলিয়া দেওয়া। মহাজন যেখানে স্বয়ং গবর্ণমেন্ট, সেখানে অবশ্য সম্পত্তি হাতে রাখা চলিতে পারে না। রাম শ্যাম ইত্যাদি

ব্যক্তি-বিশেষের কাছে তা বেচিয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ঋণশোধের উদ্দেশ্যে যদি বিদেশের জমি, রেলপথ বা ফ্যাক্টরি আমাদের গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্টকে সেই সব আবার ভিন্ন ভিন্ন "ইন্‌ভেষ্টারে"র কাছে বেচিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা ত মোটেই কাম্য জিনিষ নয়। কর-ভার ক্রমাগত বাড়িতেছে। অথচ আয়টা ক্রমাগত কমিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমেরিকাবাসী ইউরোপীয় জমি, রেলপথ বা ফ্যাক্টরির উপর কেন টাকা ঢালিতে যাইবে?

এ ত গেল অর্থনৈতিক দিক্‌ হইতে বিচার। রাষ্ট্রনীতির দিক্‌ হইতেও এই উপায় গ্রহণযোগ্য নয়। কোন আত্মমর্য্যাদাশালী জাতিই সহ্য করিবে না যে, তার সব জমি ও ব্যবসা অনুপস্থিত বা "পলাতক" মালিকের তাঁবে থাকুক। আর অন্যদিকে কোন জাতিই চাহিবে না তার বহু নাগরিক বিদেশে অতুল সম্পত্তির মালিক হইয়া থাকুক। কে জানে যে সে তার আর্থিক স্বার্থের জন্য মাতৃভূমির সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন করিবে না?

(৩) শ্রীযুক্ত হুভার "অদৃশ্য দফা"গুলির উপর খুব জোর দিয়াছেন। দফাগুলি যে আছে তাতে আর ভুল কি? সকল আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্বন্ধের বেলা আমাদিগকে এইগুলির দিকে চোক দিতে হইবে—ঔপনিবেশিকদের হাতে যে মুদ্রা আছে অথবা তারা যে মুদ্রা পাঠাইতেছে; জাহাজ চালাইয়া যে মুনাফা জোটে; ব্যাঙ্কাররা যে কমিশন পায়; বীমা প্রিমিয়াম এবং "ইনভেষ্টমেণ্টে"র উপর সুদ।

কেয়ারনেসের সময় হইতে আমরা "ব্যালান্স অব্‌ ট্রেড" বা "বাণিজ্য ফাজিল" ও "ইকুইলিব্রিয়াম অব্‌ কমার্সে" বা "বাণিজ্য যোগাযোগে সমীকরণে" পার্থক্যের কথাটা শিখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ব্যালান্স অব্‌ ট্রেডটা পরিচিত কথা দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানির কথা। রপ্তানি আমদানির শোধবোধ করিতে বাধ্য। আমদানি রপ্তানির শোধবোধ করিতে বাধ্য। আমদানির উপরে রপ্তানির উপরি যদি ঘটে, তাকে বলি অনুকূল ব্যালান্স অব্‌ ট্রেড। কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম্‌ অব কমার্স আলাদা জিনিষ।

তথা-কথিত অদৃশ্য দফাগুলি আছে বলিয়া যে কোন দুই দেশের মধ্যে জমা-খরচের সমীকরণের উপায়টা হইতেছে সাধারণতঃ রপ্তানির অথবা আমদানির বাড়তি। এই বাড়তিটা নিশ্চিত হওয়া চাই। যেমন, যুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেন সুদ, জাহাজ-ভাড়া, ব্যাঙ্কারদের কমিশন, বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি বাবদ এত অসংখ্য মুদ্রা লাভ করিত যে, বহির্ব্বাণিজ্যটায় সমীকরণ ঘটাইবার জন্য তাকে রপ্তানির চেয়ে কয়েক লক্ষ্য ডলারের আমদানি বেশী করিতে হইত। তার জন্য খরচের সমীকরণ হইত আমদানির বাড়তি দ্বারা। অর্থাৎ আমদানির মূল্য = রপ্তানি + মুনাফা।

১৮৭০ সনে ফ্রান্স কিরূপে জার্ম্মাণিকে ঋণ শোধ দিতে সমর্থ হইয়াছিল? অবশ্য তার বৃহৎ-স্বর্ণ পুঁজি ছিল। তা শত্রুর হাতে তুলিয়া দিল। তারপর সে বেশ বড় রকম আভ্যন্তরিক ঋণ বাহির করিল। সেগুলি বেচিয়া "বিল অব্‌ এক্সচেঞ্জ", বা "বিনিময় পত্রীর" সাহায্যে মুদ্রা অর্পণ করিল।

কিন্তু ঋণ শোধের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হইয়াছিল, রপ্তানিটা অসম্ভব রকম বাড়াইয়া। ১৮৭০ সনের পূর্ব্বে ফ্রান্সের সঙ্গে সারা দুনিয়ার বাণিজ্যের অবস্থা ইংল্যাণ্ডের মত ছিল। অর্থাৎ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী আসিতেছিল। ১৮৭০ সনের পরে বাণিজ্যিক লেনদেনের সমীকরণটা এমন জায়গায় পৌঁছাইল যে, আমদানির বাড়্‌তিটা রপ্তানির বাড়্‌তিতে পরিণত হইয়া গেল। ফ্রান্সের উৎপাদিকা শক্তি উচ্চ শ্রেণীর ছিল বলিয়াই ফ্রান্সের পক্ষে ঋণ শোধ সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত হুভার "অদৃশ্য দফা"গুলির আলোচনাকালে "নর্ম্মাল বাণিজ্য-ফাজিল ও "নূতন বাণিজ্য-যোগাযোগের সমীকরণ" এই দুইয়ের পার্থক্য রেখা টানিতে সমর্থ হন নাই।

ইউরোপের দেশগুলির অবস্থা কিরূপ? সোনা নাই। তারা জমি রেলপথ বা ফ্যাক্টরি আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিতে পারে না। ইংল্যাণ্ড যুদ্ধের সময়ে বিদেশের সিকিউরিটি হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। ইহাদের সেরূপ কোন সিকিউরিটি অবশিষ্ট নাই। অদৃশ্য দফাগুলি আমাদের কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে আর বাড়িবে তার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বরং বর্ত্তমান বিপদসঙ্কুল আর্থিক অবস্থাতে বিদেশে

টাকা খাটাইয়া কিছু পাইবার বা বাণিজ্য জাহাজ দিয়া মুনাফা মারিবার বা ব্যাঙ্ক বা বীমাকোম্পানীর প্রসার দ্বারা লাভ করিবার আশা সুদূরপরাহত। বিদেশে আমেরিকান্ ভ্রমণকারী বাড়িতে পারে। ঔপনিবেশিকেরা টাকা পাঠাইতে পারে। কিন্তু এগুলি ত সমুদ্রে জলবিন্দুর মত।

অতএব শ্রীযুক্ত হুভারের অন্যপ্রকার উক্তি সত্ত্বেও, সত্য কথা এই যে, যে কোন বড় রকম বিদেশী ঋণ শোধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে রপ্তানিযোগ্য উপরির মধ্যস্থতা।

ইহার দুই অর্থ (১) সামাজিক আয়ের উপরি হইতেছে। (২) উপরিটা রপ্তানির আকার গ্রহণ করিতেছে।

ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় সামাজিক আয়ের কোন উপরি নাই। বহুকাল যাবৎ হইবার সম্ভাবনাও নাই। যুদ্ধের ভীষণ ক্ষতিটা লোকের সহজে ধারণায় আসে না। মনুষ্য-শক্তির এবং পুঁজিপাটার এরূপ ভীষণ অপচয় ইতিহাসে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। কিঞ্চিৎ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে বটে। কিন্তু ইউরোপ ধীরে ধীরে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এমন কি গ্রেট বৃটেনে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মত এই যে, গ্রেট বৃটেনে পুঁজিপাটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অগ্রসর হইতেছে না। আর্থিক দিক্ হইতে ইউরোপ আজ দেউলিয়া। বহুকাল ধরিয়া সামাজিক আয়ব্যয় অসমান থাকিবে। ব্যয় বেশী রহিবে।

তারপর আবার যখন সামাজিক উপরি হইবে, এই উপরিকে রপ্তানিতে পরিণত করিবার জন্য অভূতপূর্ব্ব প্রতিযোগিতার অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত হুভারের একটা কথা সম্পূর্ণ মানি। ইউরোপ—ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র তুল্যভাবে—যদি খরচের সমস্যার দিকে না তাকায়, তবে আর আশা নাই। ইহার অর্থ অপব্যয় নিবারণ ও মিতব্যয়িতা। যুদ্ধের দরুণ সকল জাতির মধ্যে একটা বদ্ অভ্যাস জন্মিয়াছে—দরাজ হস্তে অবুঝের মত খরচ করা। সেটা বন্ধ করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট ফিনান্সে এই নীতি প্রয়োগের অর্থ গুরুতর ব্যয়-হ্রাস ও একরোখা ন্যাশানালিজ্‌মের পরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগ।

কিন্তু এই আদর্শের পিছনে রাজনৈতিক শক্তি কার্য্য করা চাই। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর না হইলে "অস্ত্র হীনতা"র কল্পনা কোনদিন সার্থক হইবে না। ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র সব চেয়ে কড়া সংরক্ষণ টারিফ্ সম্প্রতি তুলিয়াছে। আর যুক্তরাষ্ট্রই ইউরোপকে অবাধ বাণিজ্য ও আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছে।

বস্তুতঃ, আমরা যদি জিদ করি যে ঋণশোধ এখনই করিতে হইবে, ব্যাপার আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন যদি ফ্রান্সের ঋণের কথা একটুও বিবেচনা না করে, তবে ফ্রান্স জার্ম্মাণির নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ে মরণ-কামড় দিলে ফ্রান্সকে বেশী দোষ দিতে পারি কি? ক্ষতিপূরণ ও মিত্রবৃন্দের ঋণ পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত।

৩। দেনা মিটিলে আমাদের লাভ হইবে কি?

ধর যেন মিত্রগণ দেনা শোধ দিতে পারে। প্রশ্ন এই—আমরা কি দাবী করিয়া বসিব, এখনই—এই মুহূর্ত্তেই দেনা মিটাইয়া দিক্? শোধ দিবার সামর্থ্য যদি তাদের থাকে, গ্রহণ করিবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে?

শ্রীযুক্ত হুভার বলেন, হাঁ আছে। বাণিজ্যের গতি না কি সোজাসুজি নয়, ত্রিকোণাকৃতি। শ্রীযুক্ত হুভার আরও বলেন শিল্পজাত দ্রব্য আমাদের বাজার প্লাবিত করিয়া ব্যবসা চক্রের গতি রোধ করিবে, এ আশঙ্কা অমূলক; কারণ আড়াআড়ির কোন জিনিষ আসিবে না, আসিবে আমাদের দরকারী কাঁচা মাল—রবার, রেশম, কফি, কোকো ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত হুভারের বক্তৃতার এই অংশটা পড়িয়া আমি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, তিনি এরূপ প্রমাদপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন। ইউরোপের রপ্তানি-যোগ্য উপরি যদি না থাকে ত কেমন করিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলিতে শিল্পজাত দ্রব্য পাঠান যাইতে পারে? আর ইউরোপীয় রপ্তানিতে বাড়্তি ঘটিলে তদনুপাতে গ্রীষ্মমণ্ডলের কাঁচা মালের যোগান বাড়াইবার সামর্থ্য আছে কি? কিংবা যুক্তরাষ্ট্রই কি সবটা গ্রহণ করিতে পারিবে?

ধরা যাক্ যেন গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলি আমাদের আরও রবার, টিন, রেশম অথবা কফি পাঠাইতেছে; আর

ইউরোপীয় খাতকরা যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মমণ্ডলে তাদের শিল্পজাত দ্রব্য পাঠাইতেছে। তাহা হইলে আমরা চীনে, দক্ষিণ আমেরিকায় ও আফ্রিকায় যে কৃষিযন্ত্র, বৈদ্যুতিক কলকব্জা, বস্ত্রাদি পাঠাই, সেগুলির কি গতি হইবে? ইউরোপ হইতে আগত শিল্পদ্রব্যের জন্য তারা ত রবার ও কফি পাঠাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্য কিনিবার জন্য তবে আর কি অবশিষ্ট থাকিবে? বিদেশ হইতে রপ্তানি আসিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজার প্লাবিত করিয়া দেওয়া আর যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীষ্মমণ্ডলে রপ্তানি পাঠান বন্ধ হওয়া একই কথা। উভয়ের ফলে আমাদের দ্রব্যের কাটতি কমিবে অর্থাৎ ব্যবসা-চক্রের গতিরোধ হইবে।

বাণিজ্যটা কোণাকুণি বা ত্রিকোণাকৃতি, তাতে কিছু আসে যায় না। বাকী দুনিয়া ঋণশোধের জন্য যদি রপ্তানি বাড়াইতে থাকে, তবে আমাদের পক্ষে রপ্তানি কমানো অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় রপ্তানিটা লাভজনক জিনিষ। কারণ একটা দেশ রপ্তানি পাঠাইয়াই আমদানি আনিতে পারে অর্থাৎ আরও জিনিষ কিনিতে পারে। আমদানি রপ্তানি দেওয়া নেওয়া বই কিছুই নয়। আমাদের রপ্তানি কমার অর্থ হইতেছে আমাদের ফ্যাক্টরীগুলি বন্ধ করিতে হয়, ব্যবসাগুলি হীনতেজ ও হীনদশাগ্রস্ত হয় এবং ব্যবসার "অবসন্নতা" বা পতন ঘটে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এইরূপ অবস্থার একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি জুটিয়াছে। দৃষ্টান্তটা এই—সম্প্রতি জার্ম্মাণ বাণিজ্য-জাহাজ গ্রেট্ বৃটেনকে দেওয়া হইয়াছে। লোকে মনে করিল, আ! আমরা বেশ জিতিয়া গেলাম। প্রায় বিনা পয়সায় কিছু পাইলাম।' কিন্তু ফলটা কি হইল? প্রথমতঃ, জাহাজ ভাড়ার হার নামিয়া গেল, জাহাজের ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ ইংল্যাণ্ডে জাহাজ-নির্ম্মাণ এত পড়িয়া গেল যে ঐ ব্যবসায়ে দুর্যোগ আসিয়া পড়িল। তার পশ্চাৎ আসিল সমগ্র দেশ জুড়িয়া বেকার-সমস্যা।

গমের দর বুশেল প্রতি ১ ডলারের কিঞ্চিৎ বেশী। আমাদের ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়িয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত মুস্কিলটা কি? আমেরিকান্ চাষী কবে একথা বুঝিবে যে আমাদের খাতকরাই আমাদের ক্রেতা? তাদের সমৃদ্ধির অর্থ আমাদের মাল বেচিবার সুবিধা-বৃদ্ধি।

ব্যবসায়-জীবনে দেউলিয়া খাতকের সঙ্গে কারবার চালাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে তাকে নিজ পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া। ব্যক্তিগত জীবনে দেউলিয়াকে দাঁড় করাইয়া না দিলেও মহাজনের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। সে অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে লেনদেন চালাইতে পারে। কিন্তু জাতির বেলায় অবস্থাটা ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে হয় দেউলিয়া জাতিগুলিকে ভাল খদ্দেরে পরিণত করিতে হইবে, নয়ত আদৌ খদ্দের থাকিবে না। তাদের রক্ষা করিয়া আমরা নিজেদের রক্ষা করিব।

"ষ্টেট্ কমিশন আইনের" ফল হইয়াছে এই যে, কমিশনের হাত পা বাঁধা পড়িয়াছে। এটা সাধারণ ভোটদাতার অজ্ঞতা ও অন্ধসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়ার দরুণ ঘটিয়াছে। ফ্রান্সে ব্যবসায়ী ও অর্থশাস্ত্রবিদ্‌রা আপনার কাণে কাণে বলিয়া যাইবে, 'রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা সাধারণ লোককে চটাইতে রাজী নয়; কিন্তু তাদের মতামতের সঙ্গে আমাদের মিল নাই। শ্রীযুক্ত হুভারের অকপটতায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি অন্ততঃ আপনার অজ্ঞাতসারে রাষ্ট্রনীতি চিন্তাকেই সর্ব্বাশ্রয় করিয়াছেন।

এদেশে দরকার শ্রীযুক্ত হুভার কথিত সমস্যাটার জটিল বিষয়গুলির বিশদ্ আলোচনা হওয়া। তাহা হইলেই একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, আমেরিকাবাসী এখনই ঋণ-শোধের জন্য জিদ্ করিতে পারে না, আইন মাফিক রিফাণ্ডিংএর কথাও তুলিতে পারে না।

ঋণটা এখন কিছুকাল হিসাবের বাইরের মধ্যেই আবদ্ধ থাক্। যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়ার নিকট তুরস্কের ধারটাও এইরূপ পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে খাতকদের ঋণের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেই চলিবে। এখন বরং ভগ্নপ্রায় দুনিয়াকে জোড়া দিবার ব্যবস্থা দেখা যাক্।

ঋণ-শোধ এখন চলিতে পারে না। তাতে খাতকদের চেয়ে আমাদেরই ক্ষতি বেশী হইবে। আমরা নিজেরা নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট নহি। এটা শুধু নীতি বচন নয়, ভাল ব্যবসারও মূল কথা। আমাদিগকে উত্তরোত্তর বেশী

করিয়া রপ্তানির উপর—কাঁচামালই হোক্ বা শিল্পজাত দ্রব্যই হোক্—নির্ভর করিতে হইবে। ঝোঁকের মাথায় আমরা যেন শেষকালে এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়া না বসি। এই দুই পাখীকে বাঁচাইয়া রাখিতেই আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। পাখী দুইটি হইতেছে—(১) বিপুল মানবজাতির কল্যাণার্থে ইউরোপের পুনর্জ্জন্মের আশা (২) আমাদের নিজেদের সমৃদ্ধি—যা নাকি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খদ্দেররা ধ্বংস হইলে বা ক্রুদ্ধ ও অপ্রীতিযুক্ত হইলে বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেঞ্জামিন এম্, অ্যাণ্ডারসন জে, আর, পি-এইচ্, ডি, নিউইয়র্কের চেজ্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের "ইকনমিষ্ট" বা অর্থ-শাস্ত্রজ্ঞ। ইনি ১৯২২ সনের ১১ই নবেম্বর আরিজোনাস্থ ব্যাঙ্কারস্ এসোসিয়েশনের সম্মুখে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়—"ব্যাঙ্কিং সমস্যা হিসাবে মিত্রশক্তিবর্গের ঋণ।" এই বক্তৃতা "চেজ ইকনমিক বুলেটিন" দ্বিতীয় ভাগ ৫ নং হইতে পুনর্মুদ্রিত হয়।

বস্তুতঃ, ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন্ ব্যাঙ্কারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-শক্তি লইয়া ঋণটাকে কাটিয়া কাটিয়া পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। তাঁর মতে নৈতিক বা ধর্ম্ম-বুদ্ধির দিক্ হইতে ঋণের আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ আর্থিক বুদ্ধিও সেই একই পথ অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

এই বিষয় লইয়া আলোচনাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সম্পূর্ণ সুদটা আদায় করিয়া লওয়া হোক ও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসলটাও পুরাপুরি উদ্ধার করা হোক্। (২) ঋণটা একদম ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

এই দুইয়ের মধ্যখানে যে বহুবিধ সম্ভাবনা থাকিতে পারে অ্যাণ্ডারসন সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে চান।

একটা ব্যাঙ্ক যেভাবে দেখিত

যদি কোন ব্যাঙ্ক যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের অবস্থায় পড়িত, অর্থাৎ ঋণটা বদ ঋণ হইত বা "পাকিবার কালে" পূরা সংগ্রহ করা সম্ভব না হইত, তবে আরও সময় দেওয়া, সুদের হার হ্রাস করা, কিছু কালের জন্য সুদের আদায় স্থগিত রাখা ইত্যাদি রফার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিত। অধিকন্তু ব্যাঙ্ক খাতকের অবস্থাটা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে চাহিবে। খাতকের কি কি প্রাপ্য আছে; ইহার শতকরা যে ঋণ লইয়াছে সেগুলি কতটা নির্ভরযোগ্য; খরচ কি, আদায় বা কি—কেমন করিয়া আদায় বাড়ান যায় অথচ খরচ কমান যায়; ডিভিডেণ্ড অথবা মিছামিছি উচ্চ বেতন দেওয়া হইতেছে কি না, কিংবা লাভহীন বিভাগগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না; ব্যবসা অথবা কারখানার বিস্তারের জন্য নয়া ধার লওয়া হইতেছে কিনা—এই সব বিষয় আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এমন যদি হয় যে, তার দাবীর কিছুটা ছাড়িয়া দিলে, বাকীটা ব্যাঙ্ক নিশ্চয় ফেরৎ পাইবে, তবেই ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐ কিছুটা ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে নচেৎ নয়।

অ্যাণ্ডারসন এই তর্কপ্রণালী ইয়োরোপীয় ঋণ-শোধের বেলাতেও খাটাইতে চান। শুধু যুদ্ধ সহযোগী জাতিদের সহিত লেনদেনে আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্টের সহিত সাধারণ ব্যাঙ্কের একটা গুরুতর পার্থক্যের কথা মনে রাখিতে বলিতেছেন। খাতক যদি তার ঋণশোধ না করে তবে আইন আদালত আছে। সে নালিশ করিলে আদালত খাতককে ঋণ-শোধে বাধ্য করিতে পারে। আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট আর কার কাছে নালিশ করিবে?

কিন্তু তা বলিয়া অধমর্ণ দেশগুলি ঋণ-শোধ না করিলে সহজে নিস্তার পাইবে, একথা মনে করিবার প্রয়োজন নাই। আত্মমর্য্যাদা বোধ ত আছেই। বিশ্বের বাজারে সুনাম নষ্ট হইলে স্বার্থেও আঘাত লাগিবে। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের ঋণগুলি অস্বীকার করিলে ইউরোপের কোন লোকের যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভবিষ্যতে এক পয়সাও ধার করিবার পথ বা মুখ থাকিবে না।

এই ঋণগুলির ন্যায্যতা সম্বন্ধে ডাক্তার অ্যাণ্ডারসনের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঋণগুলি বিশ্বাস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইয়োরোপের নিকট হইতে কোন রকম

বন্ধক রাখা হয় নাই। সিকিউরিটিও না। আর সেইজন্যই ইয়োরোপের ঋণ-শোধ করিবার দায়িত্ব আরও বেশী, কম নয়।

শ্রীযুক্ত হুভার ঋণ প্রত্যাহার বা "রেপুডিয়েশনের" কথা বলিয়াছেন। ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন বলেন, রেপুডিয়েশন ও ক্যানসেলেশনে—প্রত্যাহার ও ক্ষমাঘেন্নায় পার্থক্য আছে। রেপুডিয়েশন হইতেছে খাতকের পক্ষে অকৃতজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যসূচক। কেহই তা সমর্থন করিবে না। কিন্তু ক্যানসেলেশনে মহাজনের দয়া ও বদান্যতা ঔদার্য্য ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সেটা অপ্রশংসনীয় নয়।

তারপর ব্যাঙ্কারে ও খাতকে নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলে তাহা হইতে রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রণাটা আলাদা জিনিষ। মন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রনীতিবিদের পক্ষে একেবারে পক্ষপাতশূন্যভাবে তথ্যনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য। তাঁর পক্ষে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন বা পার্লামেণ্টের কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার বস্তু নয়।

বড়-রকমের আর্থিক সম্মিলনের কম করিয়া হইলেও একই বিপদ্। প্রতিদিন প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাগজগুলিতে বর্ণিত হইতেছে। তাতে দেশ-বিদেশের লোকের মন অবসন্ন বা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন সব বাজে কথা বাদ দিয়া শুধু কাজের কথার দিকে সমগ্র মনোযোগ দিতে পারে না।. এই জন্য এগুলির কাজের পরিমাণ এত কম হয়।

"দি ডেট ফাণ্ডিং কমিশন" ও সুপ্রশস্ত প্ল্যান বিশেষ

ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন খুব সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন যে, মিত্রবর্গের ঋণের সম্পর্কে ইউরোপের সহিত আমেরিকার সম্বন্ধটা আলোচনা করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে এক পাঁচ ব্যক্তির কমিশনের উপর, যাদের দলপতি হইয়াছেন যুক্ত-রাষ্ট্রের ট্রেজারি বা কোষ-সচিব। আর অন্যতম সভ্য হইতেছেন রাষ্ট্র-সচিব। সৌভাগ্যক্রমে এই পাঁচ ব্যক্তিই আর্থিক ব্যাপারে ও রাজ্য পরিচালনায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ। এঁরা কোন রকম ভাব-বিলাসিতা দ্বারা বিচলিত হইবার পাত্র নন।

গবর্ণমেণ্ট কি নীতি অবলম্বন করিতেছে তা জানিবার দাবী ডিমোক্রাটিক দেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী। এই নীতির সম্পূর্ণ আলোচনার পর মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকারও আছে। বস্তুতঃ, গবর্ণমেণ্টের লুকাচুরি ভাবটা স্বাধীনতার শত্রু বিশেষ।

কিন্তু তাই বলিয়া যখন একটা খুব সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছে, তখন প্রতি পদেই তার হিসাব ও কৈফিয়ৎ দিতে হইবে? অ্যাণ্ডারসন বলেন, তাতে অনেক সময় মঙ্গল না হইয়া অকল্যাণ হয়। বিবাদ বাড়ে।

আপত্তি উঠিয়াছে—"ডেট্ ফাণ্ডিং কমিশন"কে আইন দিয়া বাঁধা হইয়াছে। কমিশনের কোন ঋণ কমাইবার, শোধরাইবার বা "ক্ষমা ঘেন্না" দিবার আদৌ ক্ষমতা নাই। ইহাকে মানিয়া লইতে হইবে যে ইউরোপের দেয় সুদটা ৪¼% হইবে এবং ২৫ বছর অন্তে ঋণ শোধের সময় আসিবে।" ইহা দ্বারা কমিশনের কার্য্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, এই ধারণা সত্য নয়। কংগ্রেস হইল প্রভু। ডেট্ ফাণ্ডিং কমিশন তার ভৃত্য। কংগ্রেসের সহিত খাতকদের যেরূপ চুক্তি ছিল সেই চুক্তিমাফিক কাজ করিতেই কমিশনকে নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া ভৃত্য কোন নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবে না, কে বলিল? বরং মনিব চায়, ভৃত্য চারিদিকের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইবে ও সেইজন্য পরামর্শ দিবে বা নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিবে।

চাই ব্যাঙ্কারের দৃষ্টি ও ক্ষতিপূরণ

তর্ক স্থলে বলা হয়, "আইনতঃ জার্ম্মাণ ক্ষতিপূরণের সহিত মিত্রবর্গের ঋণের কোন সম্পর্ক নাই। মিত্র সঙ্ঘের ঋণগুলির পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরেরও কোন সম্বন্ধ নাই।" অ্যাণ্ডারসন এই তর্কের সম্পূর্ণ সমীচীনতা ও সত্যতা স্বীকার করেন।

তাঁর কথার ভাবটা এই প্রকার—মিত্রবর্গের কেহ কেহ বলিয়াছে, আমেরিকা যদি আমাদের কিছুটাও ক্ষমা না

করিতে পারে, তবে আমরাই বা জার্ম্মাণ ক্ষতিপূরণটা আদায় না করিয়া ছাড়িব কেন? কিন্তু আমেরিকার পক্ষ হইতে সে কথার জবাব নিম্নরূপ—বটে! আমরা ঋণ ছাড়িলে তোমরা ক্ষতিপূরণ ছাড়িবে? অর্থাৎ আমাদের দিয়াই জার্ম্মাণির ক্ষতিপূরণটা আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু জার্ম্মাণির ঋণ ফ্রান্সকে দেওয়ায় বা ফ্রান্সের ঋণ গ্রেট বৃটেনকে দেওয়ায় অথবা ইতালির ঋণ ফ্রান্সকে দেওয়ায় আমাদের কি গরজ শুনি।

কিন্তু অ্যাণ্ডারসন ক্ষতিপূরণের কথাটা ছাড়িয়া দিতে চান না। ঠিক "হেতে হাতুড়ে" ব্যাঙ্কের মত ডেট্ ফাণ্ডিং কমিশনকে খাতকদের জমা খরচ, আভ্যন্তরিক দেনা, সিক্কার অবস্থা, বাণিজ্য-নীতি, বাণিজ্য সম্পর্ক, সৈনিকের বাজেট ইত্যাদি ইত্যাদি কাজের কথার যে কারণে খোঁজ করিতে হইবে, সেই কারণে ক্ষতিপূরণ সমস্যাটাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না।

এই জন্য ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন আশা করেন যে, ডেট্ ফাণ্ডিং কমিশন জার্ম্মাণ ক্ষতিপূরণটাও ব্যাঙ্কারের সকল দিক্ হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কারণ মিত্রগণ জার্ম্মাণির নিকট হইতে যত বেশী ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে, সেটা তত আমেরিকার পক্ষে ইষ্টজনক। আর জার্ম্মাণিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারিলে আমেরিকার লাভ বই লোকসান নাই।

"প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, ইউরোপীয় দেশগুলির ধ্বংসোন্মুখতার অনেক কারণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে সব চেয়ে অপ্রধান হইতেছে মিত্রশক্তিবর্গের ঋণ। বস্তুতঃ, গ্রেট বৃটেন ছাড়া আর কোন দেশ আমাদের ঋণ বর্ত্তমানে শোধ করিতেছে না। আমরাও এখনই শোধ দিবার জন্য জিদ্ করিতেছি না। তবু ইউরোপের পতন ঘটিতেছে।"

শ্রীযুক্ত ম্যাককেন্না ও শ্রীযুক্ত হুভারের মতামত

শ্রীযুক্ত ম্যাককেন্না ও শ্রীযুক্ত হুভার উভয়েই মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইউরোপ ঋণ-শোধ করিতে পারে না।

ম্যাককেন্না বলিয়াছেন, "এক ইংল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপের আর কোন দেশের ঋণ-শোধ করিবার সামর্থ্য নাই। ঋণ-শোধ করিবার উপায় "লিকুইড সিকিউরিটি বা তরল জামিন-পত্র। যে খাতক দেশের হাতে এই জামিন-পত্র যত বেশী আছে, সেই দেশ তত ঋণ-শোধে সমর্থ। ইংল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশের হাতে এই পত্র নাই বলিলেও চলে।"

হুভার বলিতেছেন, "তা নয়। ইউরোপীয় দেশগুলি ঋণ-শোধে অসমর্থ একথা সত্য নয়। অদৃশ্য বিনিময়-দফাগুলির কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। দুনিয়া আমাদের ১৯২১ সনের আর্থিক বছরে ৭৫ কোটি ডলারের বাড়্তি রপ্তানি পাঠাইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, দুনিয়া আমেরিকার ঋণটা অল্প অল্প করিয়া শোধ দিতে পারে। আর দুনিয়ার দ্রব্যে আমাদের বাজার প্লাবিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের আকার ত্রিকোণাকৃতি।" ইত্যাদি।

ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন ম্যাককেন্নার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। আর হুভারের কথাগুলি—অঙ্কপাতি একটু বিস্তৃত ভাবে তুলিয়া দিয়াছেন।

মাল রপ্তানি করিয়া আন্তর্জ্জাতিক শোধের ব্যবস্থা

ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন বলিতেছেন, "আমার মতটা এই দুইয়ের মাঝামাঝি রকমের। বর্ত্তমানকাল সম্বন্ধে আমি বরং ম্যাককেন্নার সঙ্গেই কতকটা একমত। কিন্তু দীর্ঘ ভবিষ্যতে যে ঋণটার মোটা অংশ শোধ দিতে হইবে, একথা আমি শ্রীযুক্ত হুভারের সহিত একযোগে স্বীকার করি।

"ঋণ-শোধের জন্য মাল আসিতে থাকিবে। কিন্তু উত্তমর্ণ দেশগুলির এই মাল গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে কত বেশী শ্রীযুক্ত ম্যাককেন্না তা ধরিতে পারেন নাই। তিনি এটাও লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই যে, মহাজন দেশগুলির পক্ষে আমদানি উপরিটা স্বাভাবিক অবস্থা ব্যতীত কিছু নয়; আর বিদেশী ঋণশোধের জন্য যে মাল আমদানি হয় আপনা হইতেই তার অর্থ জুটে ও যে দেশ মাল গ্রহণ করিতেছে তার নিজ ব্যবসায়ে উৎপন্ন দ্রব্য কিনিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র কমিয়া যায় না।[১] যদি ইউরোপ ৩৫ কোটি

[১] চেজ ইকনমিক বুলেটিন ১ম ভাগ, ৫নং "জার্ম্মাণ ইনডেমনিটি শোধ দিবার ধারা" দ্রষ্টব্য।

ডলারের মাল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাঠাইয়া বেচে ও সব ডলারগুলি বিদেশী ঋণ শোধার্থে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির হাতে তুলিয়া দেয় তবে ফল হয় এই যে, আমাদের গবর্মেন্টের যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ কোটি ডলার মূল্যের করভার মাপ করিতে পারে। অর্থাৎ আমেরিকাবাসী ঐ পরিমাণ মুদ্রা হাতে ছাড়া পাইয়া দেশী মাল খরিদের জন্য ব্যয় করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দ্রব্য দিয়া ঋণ শোধের ব্যবস্থাতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন আকস্মিক ও সাংঘাতিক পরিবর্তন না ঘটিলেই ভাল।

"ঠিক পুঁজিপতির মত মহাজন দেশ নিজের মেহনতে যা উৎপাদন করে তার চেয়েও বেশী খরচ করিতে সমর্থ হয়। কারণ একই।

"যে দেশকে ঋণ শোধ দিতে হইবে সেই দেশ যদি অধিবাসীদের উপর এমন কর চাপায় যে, আর্থিক উপরি বাজেটের সৃষ্টি হয়, তবে সেই দেশ যা উৎপাদন করে তার সবটা নিজে খরচ করিবার ক্ষমতা আপনা আপনি কমিয়া যায়। এইরূপে রপ্তানির জন্য বাড়্‌তি মালের সৃষ্টি হয়। কর বসাইয়া লোকেদের ক্রয়-ক্ষমতা কমান হইয়াছে। সুতরাং এই সব মালের উৎপাদকেরা দেখে তাদের দেশে জিনিষের দর নামিতেছে। অথচ যে দেশ মাল গ্রহণ করিতেছে, তার করভার কমিয়া যাওয়ায় অধিবাসীদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়াছে। অর্থাৎ সেই দেশে দর বাড়িতেছে। সুতরাং দর কমা ঋণী দেশ হইতে আপনা আপনি দর বাড়া গ্রহীতা দেশে মাল আসিতে থাকে। প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিলে খাতক দেশে দর বাড়িতে আরম্ভ করে ও মহাজন দেশে দর কমিতে থাকে। তারপর এক সময় উভয়ে সমীকরণে আসিয়া দাঁড়ায়। রপ্তানি-প্রেরক দেশের আর্থিক উপরি যখন রপ্তানি উপরির সহিত যুক্ত হয় ও গ্রহীতা দেশে ঋণ শোধের সমুদয় মুদ্রা খরচ হইয়া যায় তখন সমীকরণ আসে।

"অর্থাৎ একদেশের গবর্মেন্টের অন্য দেশের গবর্মেন্টকে ঋণ শোধ দিবার উপায় মূলতঃ নির্ভর করিতেছে (ক) খাতক দেশের নিজ অধিবাসীদের জন্য যতটা দরকার তার চেয়ে বেশী উৎপাদন করিবার সামর্থ্য আছে কি না, তার উপর; (খ) খাতক দেশ তার অধিবাসীদের উপর যথেষ্ট করভার চাপাইবার সামর্থ্য রাখে কি না তার উপর; (গ) গ্রহীতা দেশের গবর্মেন্ট তার অধিবাসীদের অ-দরকারে কর দিতে না বলিতে ইচ্ছুক আছে কি না তার উপর।

"তৃতীয় অবস্থাটা বাদ দিলেও চলে। প্রথম দুই অবস্থা লইয়াই যত গোলযোগ। গ্রহীতা দেশে যদি কর-ভার না কমায়, তবু সেখানকার মোট আয়টা ত বাড়িয়া যাইবে। বিদেশী গবর্মেন্ট যা পাঠাইতেছে আয়ে ততটা যোগ হইবে। সুতরাং একই কথা হরেদরে দাঁড়ায়। গ্রহীতা দেশে খরচ করিবে খরচ করিতে ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে গবর্মেন্ট কম পটু নয়।

"ইউরোপ তার শিল্পজাত দ্রব্য গ্রীষ্মমণ্ডলে পাঠাইবে, আর আমরা তদ্দেশের অ-প্রতিযোগী উৎপন্ন সব গ্রাস করিতে থাকিব—শ্রীযুক্ত হুভারের এই মতে আমি সায় দিতে পারি না। ইউরোপীয় দ্রব্য আমাদের বাজারে আসিয়া পৌঁছিলে আমাদের দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলিবেই। নিস্তার নাই। তখন হয়ত টারিফ্‌ও অবলম্বন করিতে হইবে। ত্রিকোণাকৃতি বাণিজ্যে কিছু ঋণ শোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে সোজাসুজি বাণিজ্য-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইউরোপের ঋণের কোন দিন সুরাহা হইবে না।

"শ্রীযুক্ত হুভার ত্রিকোণাকৃতি বাণিজ্যের কথা বলিতে আর্জেন্টিনার উদাহরণ দিয়াছেন। আর্জেন্টিনায় ইউরোপ হইতে আগত আমদানি না কি বাড়তি থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। ১৯২১ সনে আর্জেন্টিনা ৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল গ্রেট বৃটেনকে পাঠায়। কিন্তু গ্রেট বৃটেন হইতে মাত্র ২ কোটি ৭৬ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি করে। ঐ বৎসর ফ্রান্স আর্জেন্টিনা হইতে ৮৩ কোটি ৩০ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যের মাল আমদানি করে আর আর্জেন্টিনায় রপ্তানি করে মাত্র ২৪ কোটি ৯০ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যের মাল।

"সত্য কথা এই যে, ইউরোপের আমদানি রপ্তানির বর্তমান হিসাব ঋণের হিসাব। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নয়, দুনিয়ার কাছে ইউরোপ খাতক। কোন কোন জায়গায়

যদি বা পাল্লাটা রপ্তানির দিকে ঝুঁকে, অন্তত্র তার দশ গুণ ঘাটতি দেখা যাইবে। ইউরোপ জগতের কোন খানে রপ্তানি উপরি বানাইতেছে না।

শ্রীযুক্ত হুভার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যালান্স সীট
(বাকী জায়)

ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন মনে করেন যে, শ্রীযুক্ত হুভার ইউরোপীয় অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তার হাতে কলমে জ্ঞান প্রচুর। ঋণ শোধ সমস্যাটাকে পরিষ্কার করিবার জন্য কেহ তাঁর মত চেষ্টা করে নাই। তবু দুঃখ ও সম্মানের সহিত তাঁকে প্রতিবাদ করিতে হইতেছে।

"পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শ্রীযুক্ত হুভারের আশাবাদ টিকে না। তিনি বলেন ১৯২১ সনে ইউরোপের হাতে ৭৫ কোটি ডলার উপরি ছিল। বছর বছর এরূপ উপরি ডলার দিয়া ঋণ শোধ করাটা কঠিন ব্যাপার নয়।

"বাস্তবিক যদি এরূপ কোন উপরি অবশিষ্ট থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, আমাদের ঋণশোধ করিবার ক্ষমতাটা ইউরোপের যথেষ্ট আছে বটে। শ্রীযুক্ত হুভারের সমস্ত খুঁটিনাটি অঙ্কপাতিগুলি প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তিনি যা বলিয়াছেন তাহা হইতে এই কথা বুঝা যায় যে, তিনি একটা বিষম ভুল করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সমগ্র দুনিয়ার জায় আর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইউরোপের জায় একবস্তু।

"১৯২২ সনের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে শ্রীযুক্ত হুভার তার হিসাব দিয়াছেন। ঐ বছর আমেরিকান্ ইনভেষ্টার কর্ত্তৃক বিদেশী ঋণের তালিকা হইতে জানিতে পারি যে ১০০ কোটি ডলার বিদেশে ধার দেওয়া হইয়াছে। 'রিফাণ্ডিং ঋণ বাদ দিলেও ইহা ৮৫ কোটি ডলারের উপর দাঁড়ায়।

"এই ঋণের মাত্র প্রায় ২৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ইউরোপকে ধার দেওয়া হইয়াছে। বাকীটা ৬০ কোটি ডলারেরও উপর, সমগ্র দুনিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কানাডা অনেকখানি লইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার অংশটাও বেশ বড়। সুদূর প্রাচীর ভাগটাও মন্দ নয়।

"এই সব সংশোধনের পর ইউরোপের কল্পিত ৭৫ কোটি ডলারের উপরিটা তৎক্ষণাৎ ১৫ কোটি ডলারের নীচে নামিয়া যায়। সত্য বটে, কোন কোন অ-ইউরোপীয় দেশ ঋণ লইয়াছে ইউরোপের ঋণ শুধিবার জন্য অর্থাৎ অনেকগুলি ডলার ইউরোপে ফিরিয়া আসিয়াছে। ওলন্দাজ ঈষ্ট ইন্দীজ এইরূপ এক দৃষ্টান্ত। ওলন্দাজ ঈষ্ট ইন্দীজ যে ঋণ লইয়াছে তার আধাটা গিয়াছে দেশী মহাজনদের ধার শোধে আর আধাটা গিয়াছে "জননী ভূমি"র ধার শোধে। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে, অ-ইউরোপীয় দেশেও ইউরোপের ঋণ আছে এবং আমেরিকা হইতে গৃহীত ঋণের কিছু অংশ অ-ইউরোপীয় ধার শোধে ব্যয় করিতে হয়। সোজা কথায় পুঁজিপাটা দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও একে অন্যে "কাটাকাটি" হইয়া যাইতেছে। যথেষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে একথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র কানাডাকে যে ঋণ দিতেছে তদ্দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের ঋণটা শোধ দিবার ক্ষমতা ইউরোপের বাড়িতেছে।

(ক্রমশঃ)

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

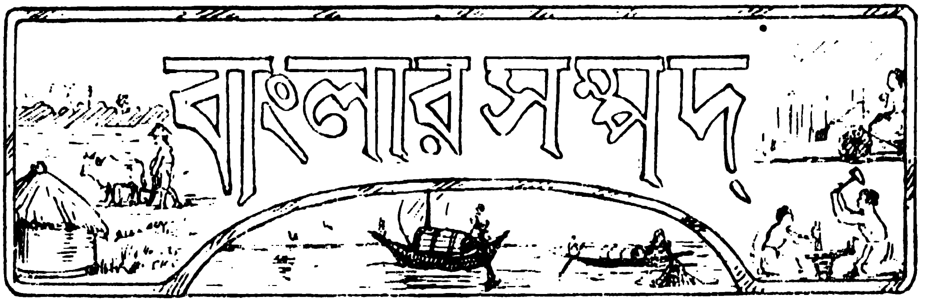
আর্থিক উন্নতি

মাঘ—১৩৩৪ ২য় বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



দামোদরের খাল

বঙ্গের গবর্ণর বর্দ্ধমান হইতে রোণ্ডিহি গিয়া নূতন দামোদর খালের খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য নবাব সৈয়দ নবাবালি চৌধুরীও সঙ্গে ছিলেন। স্যার ষ্ট্যান্লি জ্যাকসন্ স্বহস্তে এক কোদাল মাটি কাটিয়া এই খালের খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি সেখানে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—"এই খাল খননের ফলে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের যে যথেষ্ট উপকার হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পশ্চিম বঙ্গে জমি ক্রমনিম্ন বলিয়া, নদীর জল স্থায়ী হয় না; কিন্তু সেই জল খাল প্রভৃতি দ্বারা ধরিয়া রাখিতে পারিলে, অনেক কাজ হইতে পারে। এই কারণে এ অঞ্চলে জলের মূল্য অনেক। এতকাল পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতেই পশ্চিম বঙ্গের শস্যক্ষেত্রসমূহে সেচের জল গৃহীত হইত। এখন বহু পুষ্করিণীই মজিয়া গিয়াছে; কতকগুলির সংস্কার সাধন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইতে সর্ব্বত্র প্রয়োজন মত জল সরবরাহ সম্ভব হয় না। সুতরাং খাল খননই প্রকৃষ্ট উপায়। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এডামস্ উইলিয়মস্ বলেন যে, এই দামোদর খাল খনন শেষ হইলে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে চারিগুণ জমিতে চাষ-আবাদ হইতে পারিবে। আর এক কথা, জলের সুবিধা হইলে, শুধু যে চাষ-আবাদের উপকার হইবে, তাহা নহে; এই অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যেরও অশেষ উন্নতি সাধিত হইবে।" সর্ব্বসমেত খরচ পড়িবে ৭৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। খাল খনন শেষ করিতে সময় লাগিবে তিন বৎসরের উপর। ১৯৩০ সনে খাল আংশিক ভাবে খুলিয়া দেওয়া হইবে; সম্পূর্ণভাবে খোলা হইবে ১৯৩১ সনে।

চামড়া পাইট করা

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিপুলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ও ডিপুটী কমিশনার বাহাদুরের সহায়তায় বঙ্গীয় সরকারের ট্যানিং-বিশেষজ্ঞ দ্বারা

এখানে ট্যানিং বা চামড়া পাইট্ করা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। একজন বিশেষজ্ঞ, মুচী ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকটবর্ত্তী পশু-চিকিৎসালয়ে কাঁচা চামড়া কিরূপে পাইট্ করিতে হয় ইহা সাধারণকে শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষা প্রণালী অতি সরল। আজকালকার এই বেকার-সমস্যার দিনে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে অনেক আর্থিক কষ্ট দূর হইবে। আশা করি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও যুবকগণ এই সুযোগ হারাইবেন না। আগামী ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই শিক্ষা প্রদান চলিবে। শিক্ষার সময়— প্রাতে ৮॥০ হইতে ১০টা।

(ত্রিস্রোতা)

যন্ত্র শিল্পে বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরার নিবাস ৬৩ নং রাজবল্লভ সাহার লেন, হাবড়া। এই বাঙ্গালী যুবক উচ্চ শিক্ষিত নহেন। ইনি সামান্য ইংরাজি পড়িয়া কিছুদিন কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন। পরে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া মেকানিক্যাল বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করেন। সম্প্রতি ইনি অটোমেটিক-থিয়েটার নাম দিয়া গ্রামোফোন সহযোগে একপ্রকার পুতুল নাচ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই পুতুল নাচে প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় দেখিয়া অনেকেই আনন্দিত হইয়াছেন। গ্রামোফোনে যে সময় কথোপকথন বা সঙ্গীত হয় পুতুলও সেই সময় তালে তালে হাত পা নাড়িতে থাকে। সাঁতরা মহাশয় বলেন যে তিনি অতি দরিদ্র, অল্পমূল্যের একটি গ্রামোফোন কিনিয়া স্বহস্তে পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া এই অটোমেটিক থিয়েটার প্রস্তুত করিয়াছেন। যদি তিনি সাহায্য এবং উৎসাহ পান, তাহা হইলে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারেন। এই অটোমেটিক-থিয়েটার যে কোন ধনীবানের বৈঠকখানা গৃহে বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাটীর প্রাঙ্গনে হইতে পারে এবং ইহা দেখিয়া সকলে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারবর্গকে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদানের ইহা একটি সুন্দর উপায়। আমরা বাঙ্গালার, বিশেষতঃ কলিকাতার, ধনবান বাঙ্গালীদিগকে অটোমেটিক-থিয়েটারের আবিষ্কর্ত্তা সাঁতরা মহাশয়কে উৎসাহ এবং সাহায্য দান করিবার জন্য অনুরোধ করি। (কান্দী-বান্ধব)

কেরোসিন তৈলের মূল্য হ্রাস

গত অক্টোবর মাস হইতে কলিকাতার বাজারে কেরোসীন তৈলের মূল্য প্রতি গ্যালন ১৵০ হ্রাস পায়। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত বহু পরিমাণ তৈল ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। উহা বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে আমদানি হইতে থাকে। ফলে অন্যান্য কোম্পানীর মধ্যে দর লইয়া প্রতিযোগিতা চলিতে থাকায় তৈলের দর সহসা নামিয়া পড়িয়াছে। (বঙ্গরত্ন)

জল-নিকাশ সমস্যা

সুবর্ণরেখার বন্যা প্রতিকারের উপায় আলোচনার নিমিত্ত আগামী জানুয়ারী মাসে বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে তদন্ত সমিতির বালেশ্বরে আগমনের কথা আছে তাহার নিকট কাঁথি জল নিকাশ সমিতির মতামত উপস্থিত করিবার যাহাতে সুযোগ দেওয়া হয়, তজ্জন্য বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে সমিতির পক্ষ হইতে পত্র লেখা হইয়াছিল। পত্রোত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে ২৫শে নবেম্বরের মধ্যে কাঁথি জল-নিকাশ সমিতি তাহাদের মতামত জানাইলে তিনি তাহা ঐ তদন্ত সমিতির নিকট উপস্থিত করিবেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এল-সি মহাশয়ও যাহাতে সুবর্ণ-রেখা, কেলেঘাই ও কাঁথি মহকুমার জল-নিকাশ সমস্যা সম্পর্কে তৎপরতার সহিত কার্য্য হয়, তাহা আলোচনার জন্য গত শনিবার চীফ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চীফ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি উক্ত তদন্ত সমিতির একজন সদস্য। যাহাতে কাঁথি জল-নিকাশ সমিতির প্রতিনিধিগণ ঐ তদন্ত সমিতির আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কেলেঘাই বন্যা-প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমগেছিয়াতে আগমন করিবেন জানাইয়াছেন। ঐ সময়ে কাঁথি মহকুমার জল-নিকাশ সমস্যা সম্বন্ধেও

আলোচনা হইবে। গবর্ণমেণ্ট আগামী বর্ষার পূর্ব্বে কাঁথি মহকুমার জলনিকাশ সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থা না করিলে প্রজাগণের পক্ষে দেশে বাস করা অসম্ভব হইবে।

দেশী দিয়াশলাই

জলপাইগুড়ি ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড কোম্পানীর 'শিকারী ও হরিণ' মার্কা দিয়াশলাইর বাজারে বেশ কাটতি হইতেছে। দর অন্যান্য দিয়াশলাই অপেক্ষা সস্তা। খুচরা এক পয়সা, ডজন দুই আনা এবং গ্রোস ১।৶০ আনা। বাজারে ৴১৫ পয়সা ডজনে যে দিয়াশলাই পাওয়া যায় ইহা আকারে তার দ্বিগুণ।

রামপালের কলা

ঢাকা জিলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার প্রায় দুই মাইল দূরে রামপাল অবস্থিত। এখানকার কৃষকদের পটুতা ও অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ রামপালের কৃষক কলার চাষে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। সম্ভবতঃ রামপালের কলা পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলার দরবারে সম্মান লাভ করিবে।

চাষের গুণে কলার কিরূপ উন্নতি সম্ভব তা রামপালের অমৃতসাগর কলা দেখিলে বুঝা যায়। অমৃতসাগরের মত সুস্বাদু, সুগন্ধি ও বৃহৎ কলা ভারতে আর কোথাও নাই। এখানকার অন্যান্য কলার নাম অগ্নীশ্বর, দুধসাগর ইত্যাদি। এগুলিও খুব ভাল।

কলা বনাম ইক্ষু

দেখিতে দেখিতে রামপালে কলা ও ইক্ষুর চাষে এক প্রতিযোগিতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা প্রাচীন কাল হইতে উচ্চভূমিতে কলার চাষ করিয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণ জমিতে আকের চাষ করিয়াছে। কিন্তু গত ৪।৫ বৎসর যাবৎ রামপালের কলাবাগানে 'হলদে টানা' নামক এক প্রকার বৈদেশিক ইক্ষু ঢুকিয়াছে।

এই আক চাষ করিলে লাভ কিছু বেশী হয় বলিয়া কৃষকেরা এইদিকে ঝুকিতেছে। রামপালে আকচাষের ক্ষেত বাড়িতেছে। আশঙ্কা হয়, কালে সমগ্র রামপাল একটা ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত হইবে। কলা ও আকের মামলাটা এখানে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ব্যবসায়ীরা অনুসন্ধান চালাইলে বোধ হয় একটা সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন।

কলিকাতার বাণিজ্য

	আমদানী কোটি টাকা	রপ্তানী কোটি টাকা
১৯২৭ অক্টোবর	৭·৪৫	১২·৭১
১৯২৭ নবেম্বর	৭·৩১	১৫·৭৩
১৯২৬ „	৬·০৮	১১·৯২

আমদানীর হিসাব

প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্যের হিসাব নিম্নরূপ :—

পণ্যদ্রব্য	লাখ টাকা	১৯২৬ নবেম্বরের তুলনায় হ্রাস (−) বৃদ্ধি(+) লাখ টাকা
তুলার জিনিষ	২২১	+৫০
লোহা ও ইস্পাত	৭৭	+১৫
চিনি	৫৭	+১৮
কলকব্জা ও মিলওয়ার্ক	৫১	+১১
খনিজ তেল	৩০	−৮
প্রভিসন ও অয়েলম্যান ষ্টোর	২১	+৩
অন্যান্য ধাতু	১৯	−১
হার্ডওয়েআর	১৭	+৩
তামাক	১২	+১
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১১	−১
রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও রোলিং ষ্টক	১০	+৪
লিকার	১০	+২

গত বছর এই সময়ে পীস্‌গুড্‌স্ আমদানী হইয়াছিল ৫·৩ কোটি গজ, দাম ১·৪৩ কোটি টাকা। এ বছর আমদানী হইয়াছে ৭·৫ কোটি গজ, দাম ১·৯১ কোটি টাকা। পরিষ্কৃত চিনি গত বছর আসিয়াছিল ১৬,৯৫৩ টন, দাম ৩৬ লাখ টাকা। এ বছর আসিয়াছে ২৭,১৪০ টন, দাম ৫১ লাখ টাকা।

রপ্তানীর হিসাব

পণ্যদ্রব্য	লাখ টাকা	১৯২৬ নবেম্বরের তুলনায় হ্রাস (—) বৃদ্ধি (+) লাখ টাকা
পাট ম্যানুফ্যাক্চার	৫১৪	+১৩৯
কাঁচা পাট	৪০১	+১৩১
চা	৩৬৬	+ ৮৯
গালা	৬৭	—১০
হাইডস্ ও স্কিন্‌স	৩৮	+ ২
লিন্‌সীড্	৩২	+ ২
গোধূম ও গম শস্য	২২	—১০
পিগ্ আয়রণ	১৬	+ ৩
ম্যাঙ্গানিজ ওর	১৫	+ ৮

যুক্তরাষ্ট্র পাটের কাপড় আর চিলি পাটের ব্যাগ সব চেয়ে বেশী লইয়াছে। কাঁচা পাট, চা, লিন্‌সীড্ ও ম্যাঙ্গানিজ ওর যুক্তরাজ্যে, গালা ও স্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, হাইড্‌স্ জার্ম্মেনীতে সর্ব্বাধিক গিয়াছে। মরিসাস্ খুব চাউল চাহিয়াছে। পিগ্ আয়রণ প্রধানতঃ গিয়াছে জাপানে।

বঙ্গে কৃষি শিক্ষা

সরকারী ব্যবস্থা

বাঙ্গালা সরকার মধ্য বঙ্গ ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-গুলিতে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ষ্টেপল্টন, রায় মন্মথনাথ পাল চৌধুরী ও মিঃ কেনেথ ম্যাকলী—এই কয়জনে গঠিত কমিটী যে রিপোর্ট দেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা তাহারই উপর রচিত। কমিটী পাঞ্জাবের শিক্ষা পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া পরামর্শ দেন যে, কৃষি শিক্ষা চার বৎসরে শেষ করিতে হইবে। মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের উচ্চ দুই শ্রেণীতে ও হাইস্কুলের দুই শ্রেণীতে পাঠ শেষ হইবে। পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে শিক্ষকদিগকে কৃষি শিক্ষার জন্য পাঠাইবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বাঙ্গালাতেও প্রচলিত করিতে হইবে। তাঁহারা ২ বৎসরে ঐ শিক্ষা শেষ করিবেন। ঢাকার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

শিক্ষক তৈরি

এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ পাইয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার কমিটির ঐ পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সম্পর্কে সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা আগামী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। বর্ত্তমানে ৭ বৎসর কাল এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করিয়া দেখা হইবে। যদি কার্য্যক্ষেত্রে উহা উপযোগী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে উহা স্থায়ী করা হইবে। প্রথমেই ৬০ জন শিক্ষককে শিক্ষিত করিয়া লওয়া এবং শিক্ষকরা তৈয়ার হইলে তাহাদিগকে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ৬০টি স্কুলে নিয়োগ করা হইবে। ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে জানুয়ারী মাসে শিক্ষকদের কৃষি শিক্ষার স্কুল খুলিবে। মধ্য বাঙ্গালা ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে বৎসরে ৫০ জন করিয়া শিক্ষককে তথায় পাঠান হইবে। ঐ সকল শিক্ষকের শিক্ষা শেষ হইলে প্রতি স্কুলে কৃষিক্ষেত্র খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমে হাজার টাকা মঞ্জুর করিবেন। এইরূপে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা সহজেই সম্ভব হইবে।

এই নূতন কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম বৎসরে প্রায় ৬৩৭৫ টাকা খরচ হইবে; টাকার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া ৭ম বৎসরে খরচ হইবে ২৩৫২০ টাকা। স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টারগণ মধ্য বঙ্গ ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রথম দলের কৃষি-শিক্ষার্থী শিক্ষক মণ্ডলী মনোনীত করিয়াছেন; সরকার এখন তাঁহাদের নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। আগামী বৎসরের প্রারম্ভেই তাঁহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

নির্ব্বাচিত বিদ্যালয়

নিম্নলিখিত বিদ্যালয়সমূহে প্রথমে কৃষিশিক্ষা আরম্ভ হইবে এবং এইগুলির শিক্ষকদের মধ্য হইতেই কৃষি-শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী মনোনীত করা হইয়াছে;—শাজাদপুর হাইস্কুল পাবনা, ব্যাপটিষ্ট মিশন এম ই বরিশাল,' ঝিনোদপুর হাই যশোহর, ভিজোলা এম ই মালদহ, পুরাতন মালদহ এম ই দুর্গাপুর হাই নোয়াখালী, হাবাসপুর হাই ফরিদপুর, বেলদ হাই মেদিনীপুর, ঊষাগ্রাম এম ই বর্দ্ধমান, মহামায়া হাই

সিঙ্গুর, সুলতানপুর হাই বীরভূম, আমতলা হাই মুর্শিদাবাদ, চুপরা এম ই নদীয়া, নলিনীনাথ হাই যশোহর, বাবুপুর এম ই মেদিনীপুর।

চট্টগ্রাম বিভাগে কুটির শিল্প

কার্পাস জাত বস্ত্র শিল্প

চট্টগ্রাম বিভাগের বয়ন কার্য্যের প্রধান কেন্দ্র সমূহ বলিতে সাধারণতঃ সাতবেরিয়া, গাছবারিয়া, ধলঘাট, পটীয়া, কাটাখালি, নোয়াপারা, মাদার্সা, ফতেয়াবাদ, হাটাজারি, মামুদবাজার, ঢেমসা, সাতকানিয়া, মিরসরাই, তেতিয়া, বামনতলা, মহাজনহাট, কক্সবাজার, চকরিয়া, চন্দ্রকোণা, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি বুঝায়। উক্ত গ্রামসমূহের প্রায় সমস্ত তাঁতীরাই এই বয়ন কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

যে সমস্ত ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে তাহাদের অধিকাংশই জাতিতে তাঁতী, যুগী এবং জোলা। কিন্তু যুগী এবং জোলারা ইহাকে প্রধান ব্যবসায় বলিয়া মনে করে না। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এই বয়নকার্য্যের প্রসার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বহু ভদ্রলোকও ঠকঠকী প্রভৃতি অন্যান্য তাঁত সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। গত বৎসর চট্টগ্রাম জেলায় ছয়টি বয়নকুঠি ও চৌদ্দটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে চট্টগ্রাম জিলায় ছয় হাজার ঠকঠকী তাঁতের কার্য্য চলিতেছে।

মিহি কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতীরা প্রায় আমদানি সুতা ব্যবহার করে। কিন্তু যুগী, জোলা ও ভদ্রলোকেরা যে মোটা কাপড় প্রস্তুত করে তাহাতে 'টানা' ও 'পড়েন' এর জন্য যথাক্রমে কলের ও হাতে কাটা সুতা ব্যবহার করে। চাকমা, মগ এবং ডোমজ প্রভৃতি পাহাড়িয়ারা চরকার দ্বারা সুতা কাটিয়া বাঁশের তাঁতে কাপড় বুনিয়া লয়। দেখা গিয়াছে যে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে এই আদিম ও মৌলিক বাঁশের তাঁত প্রায় ১৪০০০ ব্যবহৃত হইতেছে।

ঠকঠকী তাঁতের মূল্য ৪৫৲ হইতে ৫০৲ টাকার মধ্যে। কিন্তু তাঁতীরা যে তাঁত ব্যবহার করে, তাহার মূল্য ১০৲ ১২৲ টাকার অধিক নহে। তাহার কারণ মাকু ব্যতীত তাঁতের সমস্ত দ্রব্যই তাঁতীরা বাঁশের দ্বারা নিজেরা তৈয়ারী করে।

চট্টগ্রাম জিলায় তাঁতীদের পাইকারী দরে সুতা সরবরাহ করিবার কোন শৃঙ্খলা ত নাইই উপরন্তু তাহাদের প্রস্তুত সামগ্রী সকল বিক্রয়েরও কোনও সুবন্দোবস্ত নাই। সম্প্রতি জোরারগঞ্জে শিল্পবিভাগ কর্ত্তৃক এক সুতার ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম হইতে বহুল পরিমাণে খদ্দর রপ্তানি হইতেছে। কার্পাসের তুলা জাত বাদামী রঙের বিনি কাপড় চট্টগ্রামের একটি বিশেষত্ব। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁতীদের এখন আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

ঠকঠকী তাঁত, সূতাটানার যন্ত্র প্রভৃতির প্রভূত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে ভবিষ্যতে সমবায় সমিতির গঠন হইতে পারে। তাঁতীদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার শিখাইবার জন্য শিল্প কেন্দ্রের মধ্যে বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করা হইতেছে। সুবিধা জনক দরে তাঁতীদের সুতা সরবরাহ করিবার জন্য 'সুতার ভাণ্ডার' এবং তন্তুবায় সমিতি গঠনের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে।

রেশম

চট্টগ্রামে রেশম বয়নের প্রধান কেন্দ্রস্থল—কক্সবাজার, রামু, টেকনাফ, মহিষখালি, এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে রাঙ্গামাটী। বিশুদ্ধ রেশম বয়নের প্রসার যথেষ্ট হয় নাই। শিল্পনির্ম্মিত কার্য্যসমূহ মাত্র রেশম ও কার্পাস তুলার সংমিশ্রণ। উক্ত প্রদেশে রেশম বয়নের জন্য ঠকঠকী তাঁতের প্রচলন হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কক্সবাজারে একটী বয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ে 'মগ' তাঁতীদের সংখ্যাই অধিক ছিল। যদিও স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই ঠকঠকী তাঁতের ব্যবহার শিখিয়াছিল, তথাপি মগবণিক কর্ত্তৃক গ্রামে ইহার প্রচলন বন্ধ হয়। তাহার কারণ গবর্ণমেণ্ট নাকি তাহাদের নিকট হইতে আদায়ের জন্য এবং গ্রাম্য রেশম বয়ন শিল্পের ধ্বংসের জন্য ইহার প্রসার করিয়াছিল। যখন দেখা গেল স্ত্রীলোকেরা

'মাকু'র ব্যবহার ছাড়িয়া ইহার ধ্বংস করিতে বাধ্য হইয়াছে, বয়ন বিদ্যালয়টী জোরারগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হইল। গ্রাম্য মহাজনেরা কলিকাতা প্রভৃতি অন্য স্থান হইতে রেশম আমদানি করিয়া তাঁতীদের নিকট হইতে বস্ত্র লয় এবং রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি করে। 'মগ'দের ভিতর স্ত্রীলোকেরাই এই সমস্ত কার্য্যে বিশেষ পটু, কারণ প্রথানুসারে তাহারাই সংসার নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করে। তাঁতে বোনা যে সব বস্ত্র সাংসারিক ব্যবহারের পরও উদ্বৃত্ত থাকে, সেই সব বস্ত্র তাহারা বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দেয়। প্রতি বৎসর মগেরা লাখ টাকার রেশম ও কার্পাস তুলার সামগ্রী প্রস্তুত করে।

কার্পাসতুলা পরিষ্কার

চট্টগ্রামে রেলি ব্রাদার্সের তুলা পরিষ্কারের এক বৃহৎ কারখানা আছে। তাহারা চন্দ্রকোণা, আসাম এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে তুলা ক্রয় করিয়া আমেরিকায় চালান দেয়। এখন হইতে উত্তমরূপে পরিষ্কার হইয়া যায় বলিয়া রেশমের সহিত বেশ একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়। প্রতি বৎসর রেলিব্রাদার্সের নিকট হইতে লক্ষ টাকার তুলা আমেরিকায় চালান হয়।

"দলনীওয়ালা" নামক কতকগুলি মুসলমান 'কার্পাস' তুলা ক্রয় করিয়া চরকা ও 'চরকী' দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লয়। তুলা পরিষ্কারের নিমিত্ত, নিজের হাতে তাহারা এই সব যন্ত্র তৈয়ারী করে। হাতে তুলা পরিষ্কার করায় এই সুবিধা যে তুলার আঁশগুলি নষ্ট হয় না।

'কাটাখালি' 'ফতেয়াবাদ' প্রভৃতি স্থানে অনেক স্ত্রী কুলি এই কার্য্যে তাহাদের বহু সময় ব্যয় করে। তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ তুলার বীচি প্রদান করা হয়। ইহার দ্বারা প্রত্যেকে মাসে ৪৲।৫৲ টাকা উপার্জ্জন করে। দেখা গিয়াছে, প্রায় ৮ হাজার কুলি এই তুলা পরিষ্কার করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। এই সমস্ত তুলা কখনও চট্টগ্রামে বিক্রয় হয়, কখনও বা কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়।

তুলা কিনিবার সময় সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক ইহারা যদি এই ব্যবসায়ে সাহায্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইহারা যথেষ্ট বাধিত হয়।

আঁশ হইতে সুতা প্রস্তুত

১। সুতা প্রস্তুত—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশেই কার্পাস তুলা যথেষ্ট জন্মে। তুলা পরিষ্কারের পর বেশীর ভাগই আমেরিকা এবং কলিকাতায় চালান হয়, এবং অবশিষ্ট সেখানকার লোকদের নিকট সুতা প্রস্তুত করিবার জন্য বিক্রীত হয়। মিরসরাই, পটিয়া, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া, চকরিয়া প্রভৃতি থানাগুলি সুতা প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। প্রায় ২০,০০০ চরকা সেখানে ব্যবহৃত হইতেছে।

তুলা পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ৫.৮ আনা সের বিক্রয় হয়। কিন্তু ইহা হইতে সুতা প্রস্তুতের পর দেড় টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা পর্য্যন্ত সের-করা বিক্রয় হয়। কল অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক হাতে কাটা সুতা বাজারে বেশী সুবিধা দরেই পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম একটী প্রধান সুতাপটি, স্ত্রীলোকগণ বাজারে বিক্রয়ের জন্য এবং নিজেদের জন্য দিনে এত বেশী সুতা কাটে যে তাহা নির্ণয় করা যায় না।

২। পাট—অন্য জিলা হইতে চট্টগ্রামে যে সমস্ত পাটের আমদানি হয়, আগ্রাবাদের ৫০টী গৃহস্থ তাহা হইতে দড়ি প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান। পুরুষেরা দড়ি প্রস্তুত করে এবং স্ত্রীলোকেরা তাহাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ইহাতে তাহাদের বাৎসরিক আয় প্রায় ১৮০৲ টাকা।

তাহারা দড়ির ছোট ছোট অংশগুলি তাহাদের নিজের হাতে গড়া বাঁশের চরকা হইতে প্রস্তুত করে। ভাল ভাল দড়ি চট্টগ্রামে প্রায় ৩০।৪০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

বর্দ্ধনা, রূপকানিয়া, মাদার্শা, জলিয়াপাড়া, রত্নপুর প্রভৃতি এই ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল। তাহাদের উদ্বৃত্ত সময়ে অনেক হিন্দু মুসলমান এই শিল্পের অনুরাগী থাকায় মাছ ধরিবার জালের জন্য মোটা দড়ি এবং টুইন সুতা প্রস্তুত হয়।

এই কুটির শিল্পের লভ্যাংশ মহাজনেরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। তাহারা কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি জিলা হইতে অতি নিকৃষ্ট দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া এখান হইতে অতি অল্প পারিশ্রমিকে উত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি করে এবং বিশেষ লাভবান হয়। কিন্তু আসল প্রস্তুতকারকেরা মাসিক ১৫৲ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে না।

বাংলার ধান

বাংলাদেশে এই সনে কি পরিমাণ ধান জন্মিবে সরকার তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ, এবার ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত একার জমিতে (৪৭৪০ বর্গ গজে এক একার) আমন ধান রোপণ করা হইয়াছে। গত সনে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩ শত একার জমিতে আমন ধান উৎপন্ন করা হইয়াছিল। সুতরাং এবার ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬ শত একার জমিতে আমন ধানের চাষ কম হইয়াছে। সুতরাং প্রতি একারে যদি পাকা ১২ মণ করিয়া ধান জন্মে তাহা হইলে ধানের উৎপাদন এবার কত কম হইবে তাহা সহজেই বোঝা যায়। এবার জলপাইগুড়ি ভিন্ন অন্য কোথায়ও সম্পূর্ণ ধান্য জন্মে নাই। বাংলায় এবার ৪৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত টন মাত্র ধান জন্মিবে। গত সনে জন্মিয়াছিল ৫৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩ শত টন।

পাবনায় জলের কল

পাবনা সহরে জলের কলের অসুবিধা বহুদিন হইতে চলিয়াছিল। সম্প্রতি সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাবনার স্থানীয় জনসাধারণ যদি ঐ কল স্থাপনের জন্য মোট ৮০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে পারেন তবে বাংলা সরকারও ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। এই সম্পর্কে টাকার জন্য তাড়াশের জমিদার রায় বাহাদুর ক্ষিতীশভূষণ রায় ও রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায়ের নিকট যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা ৫০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ঐ পরিমাণ অর্থ তাঁহারা তাড়াশ ব্যাঙ্কে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের নামে জমা দিয়া পাশ বইখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। চেয়ারম্যান জেলাবোর্ডকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত ২৫ হাজার টাকা দিবার জন্য লিখিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটিও আপাততঃ ১০ হাজার টাকা দিবেন। তাঁহারা পরে ঐ টাকা যে সকল লোক নিজ বাসের বাড়ীর জন্য কল পাইবে তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবেন। যাহা হউক, এতদিন পরে পাবনা সহরে জলের কল সত্যসত্যই প্রতিষ্ঠিত হইল।



পাঞ্জাবে তূলা শস্য

১৯২৭ সনের শেষ বিবরণীতে দেখা যায় যে ১৯২৫-২৬ সন পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে গড়ে গোটা ভারতের মোট শতকরা ৭৭ ভাগ তুলা পাঞ্জাবে জন্মে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ ভারতে মোট ১৮৬০৯০০ একর জমিতে তুলা উৎপন্ন করা হয়। ইহার মধ্যে ১৭২৯১৮০ একর জমিতে জল সরবরাহের প্রণালী আছে এবং ১৩১০০০ একর জমিতে ঐ ব্যবস্থা নাই। মোট জমির ১,০৮৮,৫০০ একরে দেশী তুলা ও ৭৭২৪০০ একরে আমেরিকান তুলা উৎপাদন করা হয়। এ বৎসর উৎপন্নের হার আশানুরূপ হয় নাই। মোট ৫৩৯,০০০ বেল তুলা জন্মিয়াছে। ইহার মধ্যে আমেরিকান ২৩৬,৯০০ ও দেশী ৩০২,১০০ বেল।

লায়ালপুর অঞ্চলে ১৯২৬ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি তুলা টাকায় সাড়ে তিন সের দরে বিকাইত। ১৯২৫ সনেও ঐ সময় ঐ দরই ছিল। ১৯২৭ সনের জানুয়ারীতে তুলার দাম পড়িয়া যাইয়া টাকায় চারি সের হইয়া দাঁড়ায়। গত মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ দর উঠানামা করিতে থাকে। এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে তুলার বেচা কেনা বন্ধ থাকে। গত অক্টোবর মাসে তুলার দাম চড়িয়া টাকায় মাত্র আড়াই সের হয়। গত নবেম্বর মাসে টাকায় ২।০ সের তুলা বিক্রয় হইতে থাকে। ১৯২৬ সনে ঐ সময় টাকায় ৪।০ সের তুলা বিকাইত।

বোম্বাই নগরে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে

গত ৬ই জানুয়ারী বোম্বাইএর লাট সার লেসলী উইলসন বোম্বাই সহরে সুবার্ব্বন অঞ্চলে এক বৈদ্যুতিক রেলওয়ের উদ্বোধন করিয়াছেন। ইহা বোম্বে বরদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সম্পত্তি। এই রেলওয়ে স্থাপনের ফলে বোম্বাইএর বহুদিনের যাতায়াত-অসুবিধা দূরীভূত হইল। বি, বি এণ্ড সি, আই রেলওয়ের সুবার্ব্বন শাখায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ১ খানা গাড়ী ছিল। ১৮৮৮ সনে ঐ রেলওয়েতে মাত্র এক কোটি যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিল। ১৯১৪ সনে ঐ সংখ্যা দুই কোটি চল্লিশ লক্ষে পরিণত হয়। গত ১৯২৮ সনে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তিন কোটিতে পৌঁছায়। গত সনের হিসাবে দেখা যায় যাত্রী সংখ্যা ৩ কোটি ৮০ লক্ষে উঠিয়াছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে যাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২২ সনের আর্থিক সচ্ছলতার বৎসরে সাড়ে চারি কোটি লোক বোম্বাইএর ঐ রেলে যাতায়াত করিয়াছিল। যাত্রী সংখ্যার বহর দেখিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইহা স্থিরীকৃত হয় যে বাষ্পীয় শকট দ্বারা আর যাত্রীর ভীড় কমান সম্ভবপর নহে। তখন হইতেই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। মাঝে মহাযুদ্ধ আসিয়া ঐ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটায়। যুদ্ধবিরতির পর ১৯২৩ সনে ভারত-সচিব কর্ত্তৃক বোম্বাইনগরে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে স্থাপনের মোসাবিদা মঞ্জুর করা হয়। এই বৈদ্যুতিক রেলওয়ের বিদ্যুৎ কে সরবরাহ করিবে ইহা লইয়াও মতান্তর চলিতে থাকে। অবশেষে টাটা হাইড্রো ইলেক্ট্রিক কোম্পানী ইহার বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সনের প্রথম ভাগেই এই রেলওয়ে উদ্বোধন হইবার কথা ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে বিলাতে কয়লা ধর্ম্মঘট হওয়ায় ইহার কার্য্য পিছাইয়া যায়।

প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইএর লাট নিউ হার্ব্বার ব্রাঞ্চ লাইনে বৈদ্যুতিক যানের উদ্বোধন করেন। সেই হইতে

জি, আই, পি রেলওয়ের অন্যান্য সুবার্ব্বন বিভাগেও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করা হয়। বি, বি, এণ্ড সি, আই রেলওয়ের সুবার্ব্বন বিভাগে এই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করার ফলে গোটা বোম্বাই ও সালসেট্টি অঞ্চলে বৈদ্যুতিক গাড়ীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইল। ভবিষ্যতে জি, আই পি রেলের মেন লাইনের পুনা ও ইগাটপুরি পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক গাড়ীর ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক রেল লাইনটি খুলিতে কমসে কম দুই কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

দিয়াশলাই শিল্প

দিয়াশলাই শিল্পে ভারত-সন্তানগণ জাপান ও সুইডেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছেন না। জাপান ভারতের এক জবর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। সুইডেন এমন কি এদেশের মাটিতে দিয়াশলাইএর কারখানা গড়িয়া তুলিতেছে। দিয়াশলাই শিল্পের মাল মশলা স্বদেশের মাটিতে প্রচুরই রহিয়াছে। দেশে লোক লস্করেরও অভাব নাই। তথাপি বিদেশীরা আমাদের উপরে কিরূপে টেক্কা মারিয়া যায় তাহার খতিয়ান করিয়া দেখা আবশ্যক। হিসাব নিকাশ করিলে দেখা যায় ১৯২১-২২ সনে জাপান এদেশে মোট ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার দিয়াশলাই পাঠায়। ১৯২৪-২৫ সনে ঐ সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৪০ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ঐ সময়ে ভারতে দিয়াশলাই শিল্প তেমন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তা সত্বেও ভারতবর্ষ জাপানের শতকরা ৮৮ ভাগ দিয়াশলাই বয়কট করিতে সমর্থ হয়। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে স্বদেশী দিয়াশলাই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দুনিয়ার অধিকাংশ দেশলাই ইয়োরোপ ও জাপান যোগায়। আমেরিকায় খুব অল্প সংখ্যক দেশলাইর কারখানা আছে। এগুলির মালের কাট্‌তি স্বদেশের মধ্যেই হয়! বিদেশে বড় একটা চালান দেওয়া হয় না। আমেরিকার ঘরোয়া চাহিদা কেবল তাহার স্বদেশের অল্প সংখ্যক দেশলাই কারখানার দ্বারা পুরণ হয় না; জাপান ও সুইডেন হইতে তাহাকে ঢের দেশলাই খরিদ করিতে হয়।

ইয়োরোপে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা নরওয়ে-সুইডেনই দেশলাই এর দেশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু বিগত উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ দেশ দুনিয়াকে কেবল দেশলাই প্রস্তুতের মাল-মশলা সরবরাহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল। মাত্র বিগত ১৮৭০ সন হইতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশলাই প্রস্তুতের শিল্পে নামিয়াছে। তাহা হইলেও দেশলাই প্রস্তুতের মাল মশলার প্রাচুর্য্য হেতু ইহার দেশলাই শিল্প আর সকল দেশের শিল্পকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার জন কোপিংএর বিরাট দেশলাই কারখানা দুনিয়ায় সবার সেরা। ১৮৭০ সন হইতে ১৯০০ সন পর্য্যন্ত নরওয়ে-সুইডেনের উৎপন্ন মাল বিদেশের বাজারে প্রভূত পরিমাণে চালান হইতে থাকে। ঐ দেশের উৎপন্ন দেশলাই আর সকল দেশের চাইতে ভাল হওয়ায় বিদেশের বাজারে সহজেই বিকাইয়া যাইত। ১৮৮০ সনে মোট উৎপন্ন মালের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে জাপান তাহার সস্তা মাল লইয়া দুনিয়ার বাজারে উপস্থিত হয়। জাপানী মাল সুইডেনের তুলনায় খেলো হইলেও সস্তার দিকেই লোকের ঝোঁক। ফলে সুইডেনের মালের বিদেশে কম কাট্‌তি হইতে থাকে।

১৯২৪-২৫ সনে মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার দেশলাই ভারতে আমদানী হয়। ইহার শতকরা ৫৬ ভাগ জাপান ও মাত্র ৩৪ ভাগ সুইডেন সরবরাহ করে। এই গেল সর্ব্বদা ব্যবহৃত দেশলাইএর হিস্যা। অন্য ধরণের দেশলাইএ কিন্তু সুইডেনের হিস্যা শতকরা ৬১ ভাগ। এই সঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সুইডেন ভারতে ভিনিয়ার্স, স্প্লিণ্টস্, বাক্স ও কাঠ প্রভৃতি দিয়াশলাই শিল্পের মাল মসলা সরবরাহের ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে জোর প্রতিযোগিতা চালাইতেছে।

ইয়োরোপের মধ্যে মধ্য জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়ায় সর্ব্বপ্রথম দিয়াশলাই শিল্প গড়িয়া উঠে। এমন কি আজও জার্ম্মাণি কমসে কম দুইশত দিয়াশলাইর কারখানার গর্ব্ব করিতে পারে। অষ্ট্রীয়ায় বর্ত্তমানে দেড়শত দিয়াশলাই ফ্যাক্টরি আছে। ঐ সকল কারখানাজাত মালের সাধারণতঃ রুশিয়া, ইতালী ও অদূর প্রাচী প্রভৃতি পরিপার্শ্বিক দেশে কাট্‌তি হয়।

ইয়োরোপের বড় বড় দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সেই দিয়াশলাই শিল্পের অবস্থা সব চাইতে অবনত। ঐ দেশের দিয়াশলাই শিল্প সরকারের একচেটে। সম্পূর্ণ সরকারের তদারকে সেগুলি পরিচালিত। ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত দুই একটা বেসরকারী কোম্পানী থাকিলেও তাহাদিগকে সরকারের খাজাঞ্চিখানায় উচ্চ হারে ট্যাক্স দিতে হয়। মোটের উপর, ফ্রান্সের দিয়াশলাই দামে খুব চড়া ও দুষ্প্রাপ্য।

জাপানের দিয়াশলাই শিল্প সব চাইতে আশ্চর্য্যজনক। মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এশিয়ার এই নব জাগ্রত দেশ দিয়াশলাই শিল্পে হাত দেয়। জাপান ইয়োরোপের অনুকরণে দিয়াশলাই শিল্পের আগড়া ফাঁদিয়া বসে। গোড়া হইতেই জাপানের মতলব অন্য রকম ছিল। কেবল মাত্র ঘরোয়া চাহিদা মিটানই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। দুনিয়ার বাজার দখল করাই তাহার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল।

জাপানের অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় দিয়াশলাই শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। ১৮৭৬ সনে জাপান সর্ব্বপ্রথম দিয়াশলাই ফ্যাক্টরি গড়িয়া তোলে। চারি বৎসর যাইতে না যাইতেই জাপান কেবল দুনিয়ার বাজারে বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া ক্ষান্ত থাকে না, পরন্তু দিয়াশলাই রপ্তানি শিল্প দ্বারা সে অনুন ৫৬,৫৩২ পাউণ্ড ঘরে তোলে। ১৮৮৬ সন হইতে জাপানী দিয়াশলাই দুনিয়ার হাট বাজার ছাইয়া ফেলিতে থাকে। যদিও বর্ত্তমানে দিয়াশলাইএর দাম অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে, তথাপি জাপানী শিল্প উত্তোরোত্তর সচ্ছলতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। জাপান খুব হুসিয়ার। তাই বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাহার শিল্প সে ঠিক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এ সম্পর্কে কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। (১) জাপানের অধিকাংশ দিয়াশলাই কারখানা আকারে ছোট এবং ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি। কারখানায় কারিগর সাধারণতঃ খুব গরিব লোকের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। তাহাদিগকে অল্প বেতনে খাটান যায়। প্রত্যেক কারখানায় খুব অল্প সংখ্যক লোক খাটে। শ্রমজীবিগণের বেশীর ভাগ স্ত্রী-মজুর। ইহাদিগকে ২ পেন্স হইতে ৫ পেন্স পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। (২) এই সকল কারখানায় সাধারণতঃ লোক-শক্তির দ্বারা কাজ চালান হয়। যন্ত্রপাতির ব্যবহার খুব সামান্য। সেইজন্য পুঁজিরও বেশী আবশ্যক হয় না। (৩) দিয়াশলাই শিল্পের মাল মশলা জাপানেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (৪) যে সকল দেশে জাপান তাহার দিয়াশলাই পাঠায় সেগুলিতে দিয়াশলাই শিল্প একরূপ নাই বলিলেই চলে। ভারতবর্ষ, চীন, হংকং, কোড়িয়া ও আমেরিকা জাপানী দিয়াশলাইএর খরিদ্দার। ১৯১৪-১৫ সনে জাপানী দিয়াশলাই রপ্তানি ১,২০০,০০০ পাউণ্ডে পৌঁছে। ১৯২১-২২ সনে ইহা খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। কারণ, ঐ সনে ভারতবর্ষ একাই জাপানকে দিয়াশলাইএর মূল্য বাবদ দেড় কোটি টাকা দেয়।

বিলাতের দিয়াশলাই শিল্প প্রধানতঃ মেসার্স ব্রায়া এণ্ড মে কোম্পানীর একচেটিয়া। বহুদিন ধরিয়া ঐ কোম্পানীর দিয়াশলাই ভারতের হাট বাজার দখল করিয়া ছিল। ব্রিটিশ দিয়াশলাই শিল্পের অনেক অসুবিধা। মাল মশলার জন্য উত্তর রুশিয়া ও নরওয়ের দ্বারস্থ হইতে হয়। নরওয়ের নিজেরই দিয়াশলাই প্রস্তুতের কারবার নামিয়া পড়ায় ইংরেজরা তাহার নিকট হইতে কাঁচা মালের রশদ তেমন পাইবার আশা করিতে পারে না। রুশের সঙ্গে তো ইংরেজের খুব দুস্তি! মোটের উপর পরনির্ভরতার জন্য ইংরেজ দিয়াশলাই শিল্প হারাইতে বাধ্য হইয়াছে। সুইডিস্ চেম্বার তাহার কাঁচা মাল বন রসদ কেবলমাত্র ঘরোয়া উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবে, এরূপ আইন জারি করায়, ইংরেজের ব্যবসা একেবারেই মাটি হইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে ইংরেজ ভারতে মাত্র ১৫,৪০০ টাকার দিয়াশলাই প্রেরণ করে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার হিস্যা পড়িয়াছিল ৪২ লক্ষ ও জাপানের হিস্যায় ৪০ লক্ষ।

ভারতে স্বদেশী দিয়াশলাই শিল্প গড়িয়া উঠিলেও ইহার মাল মশলা সরবরাহ করিতেছে জাপান ও সুইডেন। ১৯২৪ সনে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৬৭,০০০ পাউণ্ড দিয়াশলাই কাঠি ও ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বাক্স এদেশে আমদানি হয়। আহমেদাবাদ, বোম্বাই ও বার্ম্মা এগুলির সব চাইতে বড় খরিদ্দার ছিল।

আজকাল কলকারখানার যুগ

দুনিয়ার অন্যান্য দেশ দ্রুত পা ফেলিয়া চলিয়াছে। কেবল জাপানী বা সুইডিস্ দিয়াশলাইএর উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইলেই দেশী শিল্পের ইমারত গড়িয়া উঠিবে না। এজন্য চাই কর্ম্মশক্তি। চাই কলকারখানা। চাই পুঁজি। কলকারখানায় যদি এক সঙ্গে ২ কোটি দিয়াশলাই প্রস্তুত হয়, মানুষ হাতে ঐ তুলনায় মাত্র ৫০ লক্ষ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। এদেশে দিয়াশলাই প্রস্তুতের রসদ প্রচুর রহিয়াছে। শিল্প-নিষ্ঠার সঙ্গে পাশ্চাত্য ও জাপানী অভিজ্ঞতা লইয়া দিয়াশলাই শিল্পে দেশের পুঁজিপতিগণ অগ্রসর হইলে ভারতবর্ষ অচিরে সুইডেন ও জাপানের উপর টেক্কা দিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয়।

বাণিজ্য-পোতে ভারতবাসী

ভারতবাসী যুবকদিগকে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা বিষয়ক শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য 'ডাফরিন' নামক জাহাজখানিকে উপযুক্ত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করা হইয়াছে। উক্ত জাহাজের কাপ্তেন যুবকদিগকে উৎসাহ দিবার সময় বক্তৃতা প্রদানকালে জাহাজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মহামান্য যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এই জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন ও মান্দ্রাজ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য এই জাহাজ খানিকে নৌবিভাগের প্রধান সেনাপতির কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল।" যুবকদিগকে তিন বৎসর কাল জাহাজে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে জাহাজখানি বোম্বাই নগরীর মাঝগাঁও হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। শিক্ষার্থী নির্ব্বাচনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহার ফলে ৭৭ জন আবেদন করিয়াছিলেন। কেন্দ্র হিসাবে পরীক্ষার ফল—বোম্বে ২৯ জনের মধ্যে ১৭; লক্ষ্ণৌ ১৪ জনের মধ্যে ৭; ল্যাহোর ২০ জনের মধ্যে ১০; কলিকাতা ১১ জনের মধ্যে ৪; মান্দ্রাজ ২ জনের মধ্যে ১; রেঙ্গুন ১ জনের মধ্যে ১; সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চক্ষু পরীক্ষায় ১০ জন বাদ গিয়াছেন। অবশিষ্ট ৩০ জন যুবকের মধ্যে ছয় জন মাত্র বাঙ্গালী আছেন। তাঁহাদিগের নাম—(১) ফরিদপুরের হবিবুল হক, (২) এলাহাবাদের কৈলাসনাথ লাহিড়ী, (৩) বরিশালের অমিয়াংশু চৌধুরী, (৪) বেনারসের বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) সিমলার প্রেমনাথ কাহিলী, (৬) মথুরার যশেন্দুপ্রসন্ন গুপ্ত।

বিদেশী পুঁজি

ইংলণ্ডের মহাজনগণ প্রায় ৬ শত কোটি টাকার মূলধন নিয়োগ করিয়া ভারতে শোষণ কার্য্য চালাইতেছে। দেশের অবস্থা এরূপ যে, তথাকথিত ভারতীয় দ্রব্যের উৎপাদনেও আমাদিগের ইংলণ্ড হইতে আমদানী দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলে না। আবার ভারতের বন্দর, রেল, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যাহা কিছু বল, সকলই বৃটেনের ব্যবসায়ীদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইংলণ্ডে ভারতের পক্ষে যিনি হাই কমিশনে আছেন, তাঁহাকে ভারতে বৃটিশ পণ্য-বিক্রয়ের দালাল বলিলেও অন্যায় বলা হয় না। ভারত গবর্ণমেণ্টই বল, আর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিই বল, সকলেই বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের পৃষ্ঠ-পোষক মাত্র। ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, দেশের লোক বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেও কয়েক প্রকার বৃটিশ পণ্যের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। গত ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে যে সকল পণ্য ভারতে আমদানী হইয়াছে, তাহাদের মূল্য ১১১ কোটি টাকার কম নহে। ঐ ১১১ কোটি টাকার জিনিষের ভিতর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রীত হইয়াছে। তাহার উপর আমাদের কোন ক্ষমতাই নাই। ভারতের রেলসমূহ, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি কর্ত্তৃক বহু পরিমাণ ইংলণ্ডের কারখানাজাত দ্রব্য ক্রীত হইয়া থাকে। তাহাতে ভারতের কত টাকা যে ইংলণ্ডে বৎসর বৎসর চলিয়া যায়, তাহার হিসাব পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা না থাকিলেও ঐ কারণে যে প্রভূত পরিমাণ দেশের টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, তার সন্দেহ নাই।

মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইংলণ্ড হইতে যে ১১১ কোটি টাকার পণ্য ঐ বৎসর এ দেশে আমদানী হইয়াছিল, তাহার ভিতর ৩৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অবশিষ্ট ৭৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সম্বন্ধে আমরা বর্জ্জন নীতি চালাইতে পারি। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইংলণ্ড হইতে আমদানী বস্ত্র সম্বন্ধে বর্জ্জন নীতি চালাইলে অনেকটা কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা আছে। (বসুমতী)

আকের চাষ

যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত সাহাজানপুর জিলায় গবর্ণমেণ্টের একটি রিসার্চ্চ ফার্ম্ম আছে। তাহাতে কেবল মাত্র আকের চাষ কি করিয়া ভারতবর্ষে উন্নত করা যায় ও কম পয়সায় সুফল পাওয়া যায় তাহা দেখান হইতেছে। গত ১৯২৫ সালে এই ফার্ম্ম রিসার্চ্চ করিয়াও ছয় হাজার টাকা মোট লাভ করিয়াছে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের চাষীরা সমবেত হইয়া কয়েকটি আকের ক্ষেত করিয়া একার পিছু প্রায় পাঁচশত টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা কলেজ হইতে কয়েকটি ছাত্র সেখানকার চাষ প্রণালী দেখিতে গিয়াছিলাম ও তাঁহারা যে প্রণালীতে চাষ করেন তাহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। জনসাধারণকে জ্ঞাত করার জন্য সেই চাষ প্রণালী ও তাহার খরচা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথমতঃ আকের ক্ষেত সমান করিয়া লওয়া উচিত। কেন না, কয়েকবার আকের ক্ষেতে জল সেচন করিতে হয়। টারনরাষ্ট (দাম ৪৮৲) লাঙ্গল আকের ক্ষেতের পক্ষে সব চেয়ে ভাল। এই লাঙ্গল দিয়া বর্ষার পূর্ব্বে পাশাপাশি চষা হয়। এই লাঙ্গল দিবার পর বর্ষা শেষ হইয়া গেলে দেশী লাঙ্গল দিয়া দুই কিংবা তিনবার জমি চষা হয় ও পরে গোবর পচা একার পিছু ৫০ হইতে ১০০ শত মণ জমিতে মিশান হয়। নবেম্বর মাসের গোড়ায় খাদ বা নালী ও বাঁধ একার পিছু ১২০ করিয়া প্রত্যেকটি দুই ফুট অন্তর করা হয়। ৬০ খাদ ও ৬০ বাঁধ থাকে।

৩ জন লোকে দিনে আটটি করিয়া করিতে পারে। বাঁধগুলি প্রত্যেকটি ৯ ইঞ্চি করা হয়। ২২ জন লোক এক একার জমিতে একদিনে এই কাজ করে। এই কাজ করিতে মোট ৯৲ টাকা খরচ হয়। ইহা করার পর খাদ বা নালীগুলি ৯ ইঞ্চি করিয়া কোদালি দিয়া খোঁড়া হয়। যে ৯ ইঞ্চি মাটি খোঁড়া হয়, তাহা হইতে ৬ ইঞ্চি বা দুইয়ের তৃতীয়াংশ মাটি বাঁধেতে দেওয়া হয়। তাহা হইলে সর্ব্বসমেত ১ ফুট ৩ ইঞ্চি মাটি বাঁধে দেওয়া হইল। এই নালী কাটা ও মাটি দেওয়ার জন্য ১২ জন লোক এক একারে দরকার হয়। মোট খরচ ৪॥৵০। নবেম্বর মাসের শেষে চার জন লোক দিয়া মাটি কোপান হয় ও পরে ১০ হইতে ২০ মণ রেড়ির বা সরিষার খোল হো দিয়া বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই গোবর পচা ও খোল দিবার পর তিন চারি বৎসর আর কোন ফসল সে ক্ষেত্রে লইতে হইলে কোন সারের প্রয়োজন হয় না ও খুব ভাল ফসল পাওয়া যায়। এই গেল চাষের কথা।

ইহার পরে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কাটা আক বোনা হয়। কাটা মুখগুলা লাগালাগি করিয়া করিতে হয় এবং প্রথম সারে ও শেষ সারে বেশী করিয়া দেওয়া উচিত। এই আক বোনার পরেই কম করিয়া প্রথম বারে জল সেচন করা হয়। দেড় মাস পরে আবার দ্বিতীয় বার জল সেচন করা হয়। ইহার পরে একমাস বাদে তৃতীয়বার জল সেচন করা হয়। তাহার পর যদি বৃষ্টি হয় তবে আর জল দেওয়া হয় না। নতুবা ২৫ দিন বাদে আবার চতুর্থ বার জল সেচন করা হয়। যখন গাছগুলি এপ্রিল মাসের শেষে প্রায় ১ ফুট করিয়া উচ্চ হয় তখন গাছের গোড়ায় বাঁধের অর্দ্ধেক মাটি কাটিয়া লাগান হয়। এই কাজ প্রায় ১০ হইতে ১৫ দিনের ভিতর শেষ হয়। দুই তিনবার বৃষ্টির পর জমি সমান হইয়া যায় ও তখন গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করিয়া বাঁধ দেওয়া হয়। জুলাই মাসের শেষে বা আগষ্ট মাসের প্রথমে গাছগুলি গুচ্ছ করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টি না হইলে বর্ষার পর আর একবার জল দেওয়া হয়।

গুড় বা চিনি করিবার আক

সাহাজানপুর সব চাইতে ভাল। একার পিছু ৯০০ মণ আক, ৬০০ মণ রস, ৯১০ মণ রাব বা ৮০ মণ গুড়, ৬০ মণ চিনি ও ৫০ মণ চিটা গুড় পাওয়া যায়।

চিনির দর— ১২॥০ মণ

চিটা গুড়— ১৸০ মণ

সর্ব্বসমেত একার পিছু— ৮৩৭॥০ পাওয়া যায়।

চাষ ও তৈয়ারী করার খরচ—

লাঙ্গল দেওয়া—	২০৲ টাকা
বীজ—	২০৲ "
বোনা—	৫৲ "
হোইং ও অন্য কাজ—	৬০৲ "
জল সেচন—	৬০৲ "
মাটি দেওয়া—	৪৲ "
(লোক সস্তা, কেননা ক্ষেতে কোন কাজ থাকে না)	
সার—	২০৲ "
রাব করা—	৫০৲ "
চিনি "—	২৫৲ "
বাজে খরচ—	১৯৲ "
	২৮৩৲ টাকা

৮৩৭॥০
২৮৩৲
৫৫৪॥০ লাভ।
জমি কর— ২৫৲
৫২৯॥০ মোট লাভ।

আশা করি, পাঠকবর্গ এই প্রকারে চাষ করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিবেন।

শ্রীদেবপ্রসাদ গাঙ্গুলি,
এলাহাবাদ এগরিকালচার কলেজ।

ভারতের গরু

আমরা জন প্রতি মাত্র এক ছটাক দুগ্ধ খাইতে পাই। ১৯১৭।১৮ সালে গরু ছিল ভারতে মোট ১৮৫,১১,১২,০০০। ১৯২০।২১ সালে ভারতে গরু ছিল মোট ১৪৫,১১,০৯,০০৯। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রায় চারি বৎসরে ৪০,০০,০৯,০০০ গরু কমিয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ গরু নষ্ট হয় কেবল খাদ্যের জন্য।

পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির গো-শক্তি :—

দেশ	১০০ লোকে	সংখ্যা
ডেন্‌মার্ক	"	৭৪
আমেরিকা	"	৭৯
কানাডা	"	৮০
কেপ কলোনি	"	১২০
নিউজিল্যাণ্ড	"	১৪০
অষ্ট্রেলিয়া	"	২৫৯
ভারত	"	৫০

যেখানে শতকরা ৫০টী গরু, সে দেশের লোক এক ছটাকের বেশী দুগ্ধ কি করিয়া পাইতে পারে? অন্য দেশের তুলনায় দেশের গরুতে দুগ্ধও কম দেয়। তাহার কারণ আমরা গো-সেবা ঠিকভাবে করিতে পারি না। অর্থাভাব ইহার একমাত্র কারণ নয়।

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। এই চালান বন্ধ করা আমাদের বিশেষ দরকার। তাহা না করিতে পরিলে কয়েক বৎসর পরে আমরা দুগ্ধ চোখে দেখিতে পাইব না। আমাদের দেশে গরুতে দুগ্ধ দেয় ৩।৪ সের করিয়া। অন্য দেশে গরুতে ১৫ সের ২০ সের দুগ্ধ সচরাচর দিয়া থাকে। এমন কি, একবার বিলাতে একটি গরু ১ মণ দুগ্ধ দিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। লণ্ডনে ৭০ লক্ষ লোকের বাস। প্রতিদিন লোকের জন্য খাঁটি দুগ্ধ বাজারে টিনে টিনে ভরিয়া সরবরাহ হইতেছে, কিন্তু আমাদের সে ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ডিরেক্টার সার কার্গিল রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লক্ষ টাকা, মিঃ ইউ ন্যাও ২ লক্ষ টাকা ও রায় বাহাদুর সীতাম্বর রমানাথ রেভিয়ার ২ লক্ষ টাকা দান

করিয়াছেন। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ কনভোকেশনে গভর্ণর ৩ জনকে "ডক্টর-অব্ ল" উপাধি দান করিয়াছেন।

রেঙ্গুনে মাইনিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

ব্রহ্মদেশের লাট, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বার্মা-অয়েল কোম্পানীর মাইনিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উদ্বোধন করিয়াছেন।

ভারতে ইঞ্জিনিয়ার

সমগ্র ভারতের ৯টা প্রদেশে ৩৮২ জন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন, তাহার মধ্যে ১২১ জন ভারতবাসী।

মান্দ্রাজে সমবায়

১৯২৫-২৬

১৯২৪-২৫ সনে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		১১,১৪১
১৯২৫-২৬ " " " "		১১,৯৭৩

বৃদ্ধিটা আশানুরূপ না হওয়ার কারণ (১) ৪৫টি নব-প্রতিষ্ঠিত সমিতি রেজিষ্ট্রী করা সম্ভব হয় নাই (২) কতক-গুলিকে বাতিল করা হইয়াছে।

সমিতির সভ্য

১৯২৪-২৫	—	৬৯০,৭৪০	জন
১৯২৫-২৬	—	৭,৪৮,৭৮৩	"
তন্মধ্যে হিন্দু	—	৬,২৮,১১৩	"
মুসলমান	—	৪৫,৯৮০	"
খৃষ্টান	—	৬০,৯০০	"
অন্য জাতি	—	১৩,৭৯০	"
সমিতির সমুদয় সভ্যের মধ্যে			
কৃষক	—	৪,৪২,০৫৪	"
অ-কৃষক	—	৩,০৬,৭২৯	"

অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে

অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা সমবায়ের মর্ম বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। তাদের মধ্যে এই আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

অনুন্নত শ্রেণীর সমিতি

১৯২৪-২৫ সনে ছিল ১৭৩৮ টা

১৯২৫-২৬ সনে হইয়াছে ১৮৩২ টা

মান্দ্রাজ সরকারের শ্রমিক বিভাগ চালাইয়াছিল ১০৮০ টি, আর সমিতির সমবায় বিভাগ ৭৯২ টি। তাছাড়া মান্দ্রাজের অপরাধপ্রবণ লোকদের মধ্যে ৫টা, মিউনিসিপ্যালিটির অস্পৃশ্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে ৫৭টা, অনগ্রসর জাতিদের মধ্যে ২৭টা সমবায়ের কাজ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সমিতিসমূহের কার্য্যকরী মূলধন ১১,৩২·৮০ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর উহা প্রায় ৯,৮৬·৫৭ লক্ষ টাকা ছিল। সমিতি সমূহের প্রদত্ত অংশগত মূলধন ১,৩৫·৪৩ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৫৩·০২ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। আমানত জমা ৩,৫০·৭৭ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪,৩৭·৪৭ টাকা হইয়াছিল এবং সংরক্ষিত তহবিল ৪৬·৮৫ লক্ষ হইতে ৫৬·৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে অ-ঋণ সমিতি সমূহের কার্য্যের আশানুরূপ প্রসার হইতেছে না। আলোচ্য বর্ষে যদিও অ-ঋণ কৃষি সমিতির সংখ্যা ৭৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৮ হইয়াছে, তথাপি তাহাদের কার্য্যের বিশেষ প্রসার পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯২৫-২৬ সালে অ-কৃষি অ-ঋণ সমিতির সংখ্যা ১৫১ হইতে বাড়িয়া ১৬৯ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১০৮টি ষ্টোর সমিতি। আলোচ্য বর্ষে যদিও বয়ন-শিল্প সমিতির সংখ্যা ৪৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫২ হইয়াছে, তথাপি সরকারী শিল্প-বিভাগের সহযোগিতায় ইহাদের কর্ম্মশক্তি বাড়াইবার আরও চেষ্টা হইতেছে।

দক্ষিণ আরকোট জেলায় পশু-বীমা সমিতি সমূহ কার্য্য সুরু করিয়াছে। মান্দ্রাজ সরকার আশা করেন যে, এই অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আলোচ্য বর্ষে ফসলের অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহ সমিতিসমূহ, ক্রয় বিক্রয় সমিতি

সমূহ ও অন্যান্য প্রকার কৃষি ও অকৃষি সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্য প্রসার লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ডাক্তার বি, পট্টভাই সীতারামাইয়ার সভাপতিত্বে মাদ্রাজ প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি জেলা ও তালুকে সমবায় সম্মেলনের বৈঠক আহুত হয়। সরকারী কয়েকটি অধিবেশনে সরকারী কৃষি ও ভেটেরিনারি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজের বেসরকারী জনসাধারণ দিন দিনই সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য সমূহের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতেছেন এবং স্থানীয় ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ-সভা নানা প্রকারে উপদেশাদি প্রদান করিয়া আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছেন।

বোম্বাই বন্দরে ১৪ কোটি টাকার বাণিজ্য

১৯২৭ সনের নবেম্বর মাসে বোম্বাই বন্দরের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ১৪·৪৫ কোটি টাকা। গত বছর এই মাসে ছিল ১২·১৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৮·৫০% বাড়িয়াছে। মোট বাণিজ্যের অর্থ আমদানী + রপ্তানী। বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য বেশী আসিয়াছে। আর বেশী গিয়াছে দেশী ও বিলাতী পণ্যদ্রব্য ও রূপা। ধনরত্নের আমদানী কম হইয়াছে।

পৌনে আট কোটি টাকার পণ্য আমদানি

পণ্য আসিয়াছে ৭·৭২ কোটি টাকার। গত বছর এই সময়ে আসিয়াছিল ৫·৯১ কোটি টাকার। অর্থাৎ ৩০·৫০% বাড়িয়াছে।

গত বছরের নবেম্বরের তুলনায় এ বছরের নবেম্বরের প্রধান প্রধান পণ্য আমদানী কত বেশী আসিয়াছে তার হিসাব—

তুলার পীসগুড্‌স্	+১·৮৫ কোটি গজ	+৪৯ লাখ টাকা
রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও রোলিংষ্টক	...	+৩২·০৭ „ „
ধাতু ও ওর্	...	+২১·১৭ „ „
তন্মধ্যে লোহা ও ইস্পাত	...	+১২·৮৬ „ „
চিনি	+৯,১৭৪ টন	+১৮·৮৫ „ „
তুলার টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ	+১০ লাখ পাউণ্ড	+১৬·৫৮ „ „
পশম ম্যানুফ্যাক্‌চার		+১৩·২৮ „ „
এলিজারিন্ ও অ্যানিলিন্ রং		+১১·৯৬ „ „
শুষ্ক ফল—বাদাম ও তাল		+৮·৮১ „ „
মূল্যবান পাথর ও মুক্তা		+৬·৬১ „ „
তুলার অন্যান্য ম্যানুফ্যাক্‌চার		+৬·০৩ „ „
কয়লা	+২১,০৮৫ টন	+৪·৩৭ „ „
মেশিনারি ও মিলওয়ার্ক		+৩·২ „ „

অন্য দিকে কম আসিয়াছে—

কাঁচা তুলা	—৩,২১০ টন	—৩০·১২ „ „
রেশম ম্যানুফ্যাক্‌চার	...	—১০·০৪ „ „
সোণা	...	—১৩·৭২ „ „
রূপা	...	—১·:৪ „ কোটি

৩ কোটি টাকার রপ্তানী

ভারতীয় উৎপন্ন রপ্তানী গিয়াছে ৩·৪৯ কোটি টাকার। গত বছর এই সময় গিয়াছিল ২·৮২ কোটি টাকার। বৃদ্ধিটা ২৪%।

যে যে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, সেগুলির নাম ও বৃদ্ধির হিসাব—

বীজ	+১৫,০৮১ টন	+৩৭·৮৪ লাখ টাকা
কাঁচা তুলা	+ ৭৯১ টন	+১০·৯২ „ „
ধাতু ও ওর্	+	+ ৪·৩২ „ „
ট্যান করা হাইড্ ও স্কিন্		+ ৩·৩৮ „ „

১৯২৭-২৮ সনের ৮ মাসের খতিয়ান

১৯২৭ সনের আর্থিক বৎসরের প্রথম ৮ মাসে আমদানি কম আসিয়াছে ৪৫·৯৯ লাখ টাকার। আর রপ্তানি কম গিয়াছে ১·০৩ কোটি টাকার। এটা গত বছরের ৮ মাসের তুলনায়।

সোণা আমদানি হইয়াছে ৮৶ কোটি টাকার। হ্রাসটা

৪'৩ কোটি টাকার। রূপার আমদানি ৭'৪৮ কোটি টাকার। হ্রাসের পরিমাণ ২'৬৬ কোটি টাকা।

পৌণে সাতান্ন কোটি টাকার পণ্য আমদানি

পণ্য বেশী আমদানি আসিয়াছে ৬'৪২ কোটি টাকার। মূল্য ৫৬'৭১ কোটি টাকা।

বেশী আসিয়াছে—

কাঁচা তুলা +৩৪,৩১২ টন +২'৬৫ কোটি টাকা

তুলার পীস্‌গুড্‌স্ (ধূসর ও সাদা)

+৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার গজ +৮০'৫১ লাখ টাকা

রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও রোলিং ষ্টক	+৬০'৮৬	„	„
শুষ্ক ফল—বাদাম ও তাল	+২৮'৩২	„	„
লোহা ও ইস্পাত	+২৬'৯২	„	„
অ্যালজারিন্ ও অ্যানিলিন্ রং	+২৬'৫৯	„	„
তুলার অন্যান্য ম্যানুফ্যাক্‌চার	+২৪'৬	„	„
তুলার টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ +৩৭,৫০,০০০ পাঃ	+২০'৩৫	„	„
কয়লা +৬৬,৫২৮ টন	+১৭'৭৯	„	„

কম আসিয়াছে—

রেশম ম্যানুফ্যাক্‌চার	—২৬'০৩	লাখ	টাকা
তামা	—১৯'৪৩	„	„
ষ্টেশনারি	—১৩'৬৬	„	„
মসলা	—১৩'০৫	„	„
মেশিনারী ও মিলওয়ার্ক	— ১১'৮	„	„

রূপা বেশী গিয়াছে ১'০৮ কোটি টাকার। মূল্য ১'৭৯ কোটি টাকা।

৩২½ কোটি টাকার উপর ভারতীয় রপ্তানী

রপ্তানী কম গিয়াছে ৩'১৬ কোটি টাকার। মূল্য ৩২'৬৭ কোটি টাকার।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কম গিয়াছে—

কাঁচা তুলা —২০,৬৪৭ টন —৪'৪৩ কোটি টাকা

তুলার টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ—১,৩৫,০[illegible]০০ পাউণ্ড —৯২'৭৪ লাখ „

আর বেশী গিয়াছে—

বীজ +৪৮,৭১৩ টন +১'১৪ কোটি টাকা

হাইড ও স্কীন, ট্যান্ করা +১৮'৫৭ লাখ „

পুনরপ্তানী বাড়িয়াছে ১'০৮ কোটি টাকার। মূল্য ৪'৫৫ কোটি টাকা।

ভারতবাসীর সিগারেটে প্রীতি

'সঞ্জীবনী' সংবাদ দিতেছেন যে একা ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী এক ডিসেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রে ৩,৬৬,০০০৲ টাকার সিগারেট বিক্রয় করিয়াছে। এই ব্যবসায়ীগণ বঙ্গদেশে ১৩টি কেন্দ্র খুলিয়াছে। তাহার এক কেন্দ্রেই ৩॥ লক্ষাধিক টাকার সিগারেট বিক্রয় হইয়াছে। বাকী কয়েক কেন্দ্রে সিগারেট ক্রয় করিয়া বাঙ্গালী যে কত টাকা বিদেশী বণিকদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বোম্বাই কর্পোরেশন

বোম্বাই কর্পোরেশনের ১৯২৮-২৯ সনের বাজেটে দেখা যায়, কর্পোরেশনের মোট আয় ৩,২৭,৪৩,০০০ টাকা এবং মোট খরচ ৩,৩৩৩৭,০০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা খরচ বেশী হইবে বা ঘাটতি পড়িবে। এই সনে আরও দুইটী ওয়ার্ডে বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হইবে এবং তাহাতে বৎসরে ৪ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। তাহা ছাড়া কর্পোরেশন বাকী ওয়ার্ড গুলিতেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করিতে থাকিবেন।



কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন দিল্লী, ১৩ই ডিসেম্বর। "আমানে আফগানে"র সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৩ বৎসর মধ্যে কাবুলে এক বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ, আমানিয়া হাইস্কুলের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে আফগানরাজ উচ্চ শিক্ষার সুবিধা বর্ণনা করিয়া আগামী ২ বৎসর মধ্যে এক বিশ্ব-বিদ্যালয় খুলিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, আফগান গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য বৎসর ৬০ লক্ষ টাকা এবং শিল্পের জন্য ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু যদি লোকেরা আফগান সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে না পাঠায়, তবে শুধু বেশী টাকা খরচ করিলেই শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয় না। তাঁহার প্রজাগণ আপন আপন সন্তান-গণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সঙ্কোচ করিবে না, এই আশা প্রকাশ করিয়া, আমীর তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। আকা মোহাম্মদ ইছাহাক্ খাঁ ও অনেক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আমীরকে শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

নবীন রুশের শিশু-পরিচর্য্যা

ষ্টালিনগ্রাডে দুই হইতে চারি বৎসরের শিশুদিগের জন্য ছয়টি এবং চারি বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুদিগের জন্য তিনটি শিশু-পরিচর্য্যা-উদ্যান আছে। সকালে উঠিয়া, জননীরা শিশুদিগকে এই উদ্যানে রাখিয়া কাজে চলিয়া যায়; আবার সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া শিশুদিগকে নিয়া যায়। এই সব উদ্যানে ডাক্তার আছে, তাহারা প্রথমে শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, কিছু মাত্র অসুস্থতা দেখিলে শিশুকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সুস্থ শিশুকে প্রথমে স্নান করাইয়া, পরে পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হয়। তারপর খাইতে দেওয়া হয়; দিনের মধ্যে চারিবার খাইবার ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া শিশুকে শিক্ষিত করিবার নানা রকম বন্দোবস্ত আছে। যে শিশুর যে রকম বয়স, তাহাকে সেই রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের মনোহারিণী বিচিত্র রকম খেলারও আয়োজন আছে, সঙ্গে সঙ্গে শরীর পুষ্টির জন্য ব্যায়াম শিক্ষাও দেওয়া হয়। সমস্ত রুশিয়াতে এই ধরণের উদ্যান অনেক গুলি আছে। অবশ্য সমগ্র রুশিয়ার শিশুকে এই ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে যে অনুপাতে এই উদ্যানাবলীর দরকার অর্থাভাবে তাহার সিকি সংখ্যাও যে আজ অবধি গড়িয়া উঠে নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাণিজ্য তরণীতে জার্ম্মাণি

যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণির বাণিজ্য-তরী প্রায় ধ্বংস পায়। ১৯২১ সনে যুদ্ধের পূর্ব্বেকার মাত্র ¼ অংশ খাড়া করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে জার্ম্মাণি ৩৩ লক্ষ টন বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা হইতেই জার্ম্মাণির দ্রুত উন্নতির আভাষ পাওয়া যাইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির স্থান ইংল্যাণ্ডের ঠিক পিছনেই ছিল। মনে হয় জার্ম্মাণি তার দ্বিতীয় স্থান পুনরায় অবিলম্বে ফিরিয়া পাইবে। কারণ, ইতিমধ্যেই তার জাহাজের সংখ্যা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, ফ্রান্স ও ইতালির সমান।

১২ ডিসেম্বর, ১৯২৭ তারিখে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ ১৯২৮ সনের বাজেট প্রকাশ করিয়াছেন। তাতে জানা যায় যে ৯০ লক্ষ মার্ক নৌবিভাগের জন্য ব্যয় করা হইবে। একটা

নূতন যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের জন্তও ৪ কোটি মার্ক বরাদ্দ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংল্যাণ্ডে

যুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজের টনেজ যত ছিল, এখন তার ৭ গুণ হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের টনেজ যুদ্ধের পূর্ব্বেকার চেয়ে বেশী হইলেও, সমুদ্র পাড়ি কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে ছিল ছুনিয়ার ৪১·৭%। ১৯২১ সনে ৩৯·১%। আর ১৯২৭ সনে দাঁড়াইয়াছে ৩৬·১%।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিমান জাহাজ

বিলাতে ইয়র্কসায়ারের অন্তর্গত হাউডেনে আর ১০০ নামে একখানি বিরাট বিমান-পোত প্রস্তুত হইতেছে। ইহার আয়তন ৫০.০০,০০০ ঘন ফিট। জাহাজখানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে ৭শত ঘোড়ার জোর বিশিষ্ট ৬টি রোল্স রয়েস এঞ্জিন থাকিবে। ইহার গতি-বেগ ঘণ্টায় ৮২ মাইল। একদমে ইহা ৩৭৫০ মাইল ভ্রমণ করিতে পারিবে। ইহার দৈর্ঘ্য ৭০৯ ফিট এবং বৃহত্তম ব্যাস ১৩৯ ফিট। ইহার নাবিক সংখ্যা ৩৫ এবং ইহা একশত যাত্রী লইতে পারিবে। ইহার ভোজনাগারে ৫০টি যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হইবে। এ যাবৎ যত বড় জেপেলিন প্রস্তুত হইয়াছে—এই বৃটিশ বিমান-পোতখানির আয়তন তাহার দ্বিগুণ হইবে। ইহাতে নাবিক ও যাত্রীদের অবস্থান, চলাফেরা, আহারাদি, শয়ন, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতির ব্যবস্থা আশ্চর্য্যজনক হইবে। জাহাজের ভিতরেই একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হোটেলও থাকিবে। ইহাতে আরও থাকিবে নাচঘর, বৈঠকখানা, বারাণ্ডা এবং অলসভাবে শুধু ঘুরিয়া বেড়াইবার স্থান। পোতখানি চারি তলা হইবে। বর্ত্তমান বিমানপোতখানি নির্ম্মাণে মোট ৪,৫০,০০০ পাউণ্ড খরচ পড়িবে। তদনুসারে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে প্রতি যাত্রায় ১০০ পাউণ্ড ভাড়া লওয়া হইবে। জাহাজে আটলাণ্টিক পার হইতে ১২৫ পাউণ্ড ভাড়া ও যথেষ্ট সময় লাগে। সে হিসাবে বিমানের ভাড়া কম। আর ইহাতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক যাওয়া যায়।

সাহারা মরুভূমিকে হ্রদে পরিণত করিবার প্রস্তাব

আফ্রিকা মহাদেশের যে সুবৃহৎ ভূখণ্ড সাহারা মরুভূমি নামে খ্যাত তাহা দ্বারা মানব সমাজের কোনই উপকার সাধিত হয় না। সম্প্রতি মিশর গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে একটি খালদ্বারা সমুদ্রের সহিত যোগ করিয়া উক্ত মরুভূমিকে একটি সুবিস্তৃত হ্রদে পরিণত করা হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে যে আফ্রিকা মহাদেশের বাণিজ্য ও কৃষি বিস্তারে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানে বিশেষ সহায়তা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিউজিল্যাণ্ডে আয়ু

পৃথিবীর মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের আব্‌হাওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সেখানে গড়ে পুরুষের আয়ু ৬২৮ এবং স্ত্রীলোকের ৬৫ বৎসর। ইংল্যাণ্ডে গড়ে পুরুষ বাঁচে ৫৬·৫৮ এবং স্ত্রীলোক ৬০·৪৭ বৎসর।

গ্রেট বৃটেনের দুধ

গত বৎসর গ্রেট বৃটেন হইতে ৩০ কোটি গ্যালন দুধ রপ্তানি হইয়াছিল।

ছুনিয়ার ডিম

গোটা ছুনিয়ার বাজারে আস্ত ডিমের কাটতি কিরূপ হয়? ডিম হইতে উৎপন্ন দ্রব্যই বা কেমন বিকায়?

যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশে দেশে ডিম চালান যাইত প্রায় ৭০ কোটি ডজন। যুদ্ধের পর এই পরিমাণে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যটা এখনও পৌছায় নাই। কিন্তু ১৯২৩ হইতে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সমান হইবে। ১৯২৩ সনে ডিম-চালানের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ডজন। আর ১৯২৬ সনে ৬৫ কোটি ডজন হইয়াছে।

১৯২৬ সনে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ডিমের দাম ২০ কোটি ডলারের উপর।

ডিমের তৈরি জিনিষ

এ গেল শুধু ডিমের কথা। কিন্তু ডিমের তৈরি জিনিষও দেশ বিদেশে চালান যায়—ভাজা ডিম, শুক্‌না ডিম, আলবুমেন, ইত্যাদি। এগুলি কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বেকার পরিমাণ ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যাইত ১২ কোটি পাউণ্ডের উপর। ১৯২৩ সনে গিয়াছিল ১০ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের কিছু বেশী। আর ১৯২৫ সনে গিয়াছে ১৪ কোটি পাউণ্ডের উপর। দাম ৩ কোটি ডলারের উপর।

এই অঙ্কগুলা বড় সোজা নয়। ভারত সন্তানের এগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

ডিম আসে কোথা হইতে ?

এবার দেখা যাক্ কোন্ কোন্ দেশ প্রধানতঃ দুনিয়াকে ডিম যোগাইবার ভার লইয়াছে।

১৯২৩ ও ১৯২৬ সনের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ভারকেন্দ্রটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ১৯২৩ সনে সর্ব্বাধিক ডিম যে দেশগুলি যোগাইয়াছে, গুণানুসারে তাহাদের নাম—

১। চীন
২। ডেন্মার্ক
৩। আইরিশ্ ফ্রী ষ্টেট্
৪। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্
৫। যুগোশ্লাভিয়া

১৯২৬ সনে দেশগুলির স্থান এইরূপ হইয়াছে—

১। পোল্যাণ্ড
২। নীদারল্যাণ্ড্‌স্
৩। ডেন্মার্ক
৪। চীন
৫। যুগো-শ্লাভিয়া

দেখা যাইতেছে ৪ বছরের মধ্যে ডিমের বাজার একদম উলট্‌পালট্ হইয়া গিয়াছে। যে পোল্যাণ্ডের স্থান কোথাও ছিল না অর্থাৎ অনেক নীচে ছিল সেই প্রথম হইয়াছে। ভারতের পক্ষে এই কাহিনী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষ চেষ্টা করিলে এদিকে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারিবে না, এমন মনে হয় না।

কে কত ডিম কিনে ?

দুনিয়ার ডিমের রপ্তানির কতখানি কোথায় যায়? যুক্তরাজ্য বরাবরই প্রথম, ৩৪% কিনিতেছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মেণী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে ও ৩০% লইতেছে। বাকীটা নানান্ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চীন—ডিমের তৈরি দ্রব্যের দেশ

ডিমের বেলা যাই হোক, ডিমের তৈরি জিনিষে চীনকে কেহ হটাইতে পারে না। গোটা রপ্তানী বাজারটাই এক রকম চীনের দখলে রহিয়াছে। অন্যান্য দেশের উৎপাদনের পরিমাণ যৎসামান্য।

বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকার খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের নির্ম্মাণে এই চীনা চীজের খুব দরকার হয়। সেজন্য এই জিনিষের উৎপাদনও হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে।

জাভার চিনি

(১)

যে দেশে গিয়াছে	অক্টোবর ১৯২৫ মেট্রিক টন	অক্টোবর ১৯২৬ মেট্রিক টন	অক্টোবর ১৯২৭ মেট্রিক টন
বৃটিশ ভারত	৬৮,৫৯৩	৫০,৫৮৮	৮০,৬০১
জাপান	৭১,৪৩০	৭৫,৯৫৬	৭৭,৮৮৬
চীন	২৯,১৪৭	১৭,৫৭৬	২৩,৩৬৪
হংকং	২৬,১৯২	২০,১২৭	২০,০৭৪
সিঙাপুর	৮,৮৯০	[illegible]৯৭৬	[illegible]
ফ্রান্স	৫১	১০২	৬,৩১৪
শ্যাম	৩,২৫৪	১,৪০৪	৩,৮৫৯
পোর্ট সৈয়দ ইত্যাদি			৩,০৪৬
পেনাঙ্	১,৮৩৭	১,৪৯৫	২,১৪২
এ্যাডেন	১,০৪২		১,৭২৮
মোট	২,১২,৮৮৩	১,৭৪,৭৮৪	২,২৭,৬৫৯

প্রধান প্রধান দেশগুলায় মাত্র নাম উল্লেখ করা হইল। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়ও জাভার চিনি যায়। কিন্তু মোটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে পরিমাণ কম। বস্তুতঃ জাভার চিনির মোটা অংশটা বৃটিশ ভারত ও জাপান লয়।

(২)

জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ১৯২৭ সনের ১০ মাসে জাভা হইতে চিনি রপ্তানীর পরিমাণ এইরূপ :—

বৃটিশ ভারত	...	৬,৪৩,৭৯২ মেট্রিক টন
জাপান	...	৩,৫২,৬৭৩ „ „
হংকঙ	...	১,৬৪,৩৭৩ „ „
চীন	...	১,৫৩,৫৬৮ „ „
সিঙাপুর	...	৬৯,৮০৪ „ „
সুয়েজ খালের পশ্চিম	...	১,৭১,৬০৩ „ „
মোট		১৬,৩৫,৯৮৫ „ „

চিনিখোর জাপান

"জাপান সুগার রিভিউ" পত্রিকায় জাপানে চিনি খাদন বিষয়ে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি প্রকাশিত হইয়াছে :—

বছর	খাদন (টন)	মাথা পিছু পাউণ্ড
১৯১২	১৯১,৬৭৬	১০·৮০৯
১৯১৩	২৫৫,৪৫১	১৩·৪৪২
১৯১৪	২৫৩,১৭৬	১২·৯২৬
১৯১৫	২৮০,০৫৭	১২·৭৫৪
১৯১৬	৩১৯,৬৪৬	১৩·৬৯৩
১৯১৭	৩৪৫,৯৩৫	১৫·৪৩৯
১৯১৮	[illegible],০২৭	১৭·৯১৩
১৯১৯	[illegible],০২২	২২·৩৮৫
১৯২০	[illegible]০,১৩৭	১৪·৫৫৩
১৯২১	[illegible]০৭,১০২	২২·৫৮৪
১৯২২	৬৭১,৪৭১	২৬·৩৬৭
১৯২৩	৬২৮,৭০৩	২৪·৪০৯
১৯২৪	৬৬৪,৪২৩	২৫·৪৮২
১৯২৫	৬৯৫,৮৬৪	২৬·৩২৮
১৯২৬	৭৫৪,৪৪৯	২৭·৭৮৩

সাদা কথায় এই অঙ্কগুলির অর্থ এই যে জাপান ১৪।১৫ বছরের ভিতর ৩০০% এর কাছাকাছি বেশী চিনি খাইতেছে।

জাপান নিজের দেশে ও ফর্মোসায় চিনি উৎপাদন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাতে তার সব অভাব মিটে না বলিয়া বাহির হইতে অনেক পরিমাণ আমদানি করিতে হয়। জাপানের চিনি উৎপাদনের হিসাব এই :—

১৯১২-১৩	—	১১৩,১০০
১৯১৩-১৪	—	১৯০,০০০
১৯১৪-১৫	—	২৬২,০০০
১৯১৫-১৬	—	৪০৫,২২৭
১৯১৬-১৭	—	৪৩৬,০২৬
১৯১৭-১৮	—	৩৯৭,৬১৮
১৯১৮-১৯	—	৪১৫,৬৭৮
১৯১৯-২০	—	২৮৩,৪৮২
১৯২০-২১	—	৫৪২,১৭৬
১৯২১-২২	—	৪০৬,৯৬৬
১৯২২-২৩	—	৪০৫,৮০০
১৯২৩-২৪	—	৪৪৮,৭৩৬
১৯২৪-২৫	—	৫৫৪,৪৭৩
১৯২৫-২৬	—	৬১৬,৫৮৪
১৯২৬-২৭	—	৫০৪,০০৯

মৌরিটাসের চিনি

মৌরিটাস্ চিনির এক বড় আড্ডা। চিনি রপ্তানি সম্পর্কে জাভার পরেই মৌরিটাসের নাম করা হয়। জাভা ও মৌরিটাসের ভিতর একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। মৌরিটাসের চিনি-রপ্তানির পরিমাণটা বড় বেশী উঠানামা করে।

এখানে আগষ্ট মাস হইতে চিনির ফসলের বছর আরম্ভ হয়। ১লা আগষ্ট হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ পর্য্যন্ত লুইস্ বন্দরে ১৮৬,৭৭০ ব্যাগ চিনি আসিয়াছে। গত বছর ঐ সময়ে আসিয়াছিল ৪২৬,১৩৪ ব্যাগ।

ঐ সময়কার রপ্তানির পরিমাণ (টনে) এই—

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন
গ্রেট বৃটেন	২০,০৮৪	৯,৯৫৭	২১,৯৪৩
আমেরিকা	—	৪,৯৪৩	৭,৩৭৬
ভারতবর্ষ	২২	—	—
অন্যান্য স্থান	৩৬	৩৬	৫২
মোট	২০,১৪২	১৪,৯৩৬	২৯,৩৭১

অষ্ট্রেলিয়ান্ চিনি

বৎসর	উৎপাদন টন	আমদানি টন	রপ্তানি টন
১৯০১	...	৯৮,৫১৯	৪,৭৩৮
১৯০২	৯৮,৭৯৫	৯৩,৪৪৪	৩,৩৩৬
১৯০৩	১১১,৬৫৯	৯১,৬১৫	২,৩৬৫
১৯০৪	১৬৪,৬৭০	৩৮,০৮৬	২,৯৪৪
১৯০৫	১৭২,২৪২	২৪,৯৬৫	১১,১৫৮
১৯০৬	২০৫,৫৭৬	৪২,০২৫	৯,২৫২
১৯০৭	২১৪,২৪৪	৬,২০১	১৮,২৬০
১৯০৮	১৬৫,৭১৫	১৯,৫৯৮	১৪,৭৪১
১৯০৯	১৪৬,৪৭০	৯৯,৭৭৪	৮,০৫১
১৯১০	২২৯,৫৮৪	৩৪,০৬০	৬,৫৮৫
১৯১১	১৯০,৫৯৫	৩৩,২৭৫	৬,৫৫২
১৯১২	১২৯,৭৮৩	৯৮,৫৪১	২,২৫৬
১৯১৩	২৬৬,২৬৭	৭৪,৯০১	৩,৪১৯
১৯১৪	২৪৬,৪০৮	১৭,১২৫	১৩,০৯১
১৯১৫	১৫৯,৬৮১	২২,৫১০	৭,১৮১
১৯১৬	১৯২,৮৩১	১২৫,০৪৭	১,০৭১
১৯১৭	৩২৪,২৬০	৬৩,৯৩৬	১,৩৪৭
১৯১৮	২০৯,৮৫৩	৬,৪৩৬	২,২৩৯
১৯১৯	১৬২,২৯৮	১০৩,৩৩৭	২,৩১৪
১৯২০	১৬৭,৪০১	৯৯,০৬৭	২,৫৪৬
১৯২১	২৯৯,৬৬৫	৮৪,৪৭০	২৯,৪০৯
১৯২২	৩০৬,৬৭৮	৫,৩৮১	২,২০৫
১৯২৩	২৮১,৮৫৯	২,৮৬৮	৮,৪০৪
১৯২৪	৪৩৫,৬৮০	৩,০৬০	৮১,৬৯৬
১৯২৫	৫২২,৩৪৪	৩৪০	১৫৯,০৯৬
১৯২৬	৪০৫,৯৫৮	৩,৬২৪	৮০,০০৪
১৯২৭	৪০০,০০০	—	—

ইয়োরোপীয় বীট চিনি

ইউরোপীয় বীট চিনির ফসলের এষ্টিমেট শ্রীযুক্ত এফ্. ও‌্লিফ‌্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা এই—

১৯২৭-২৮ এষ্টিমেট

দেশের নাম	৩১ অক্টোবর, ১৯২৭	৩১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭	১৯২৬-২৭ প্রকৃত ফসল
জার্ম্মাণি	১৭,০০,০০০	১৭,০০,০০০	১৬,৫৭,০৮৮
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৩,০০,০০০	১৩,০০,০[illegible]	১০,৩১,৪৮৯
অষ্ট্রীয়া	১,০৫,০০০	৯৫,০০০	৭৯,৬৮৬
হাঙ্গেরি	১,৬৫,০০০	১,৬৫,০০০	১,৭৫,০৮৬
ফ্রান্স	৯,০০,০০০	৮,৮০,০০০	৭,০৫,১২৬
বেলজিয়াম	৩,০০,০০০	৩,০০,[illegible]	[illegible]
হল্যাণ্ড	২,৬০,০০০	২,৫০,০০০	[illegible]
ডেন্মার্ক	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	[illegible]
সুইডেন	১,৪৫,০০০	১,৪৫,০০০	[illegible]
পোল্যাণ্ড	৬,৬০,০০০	৬,৬০,০০০	৫,৬২,৭৯০
ইতালি	২,৮০,০০০	৩,০০,০০০	৩,১৩,৭৩৮
স্পেন	২,৪০,০০০	২,৪০,০০০	২,৪৫,০০০
জুগোশ্লাভিয়া	৯১,০০০	৮২,০০০	৭৮,৭৭০
ডানৎসিগ	৩২,০০০	৩০,০০০	৩১,৭১০
রুমাণিয়া	১,৪০,০০০	১,৫০,০০০	১,৪৮,৯১২
বুলগেরিয়া	৩২,০০০	৩০,০০০	৩১,৭১০
সুইট্জারল্যাণ্ড	৭,০০০	৭,০০০	৭,০০০
ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস	২,৫৫,০০০	২,৫৫,০০০	১,৭৫,০০০
আইরিশ ফ্রী ষ্টেট	২০,০০০	২০,০০০	১২,০০০
ফিন্ল্যাণ্ড	৬,০০০	৪,০০০	৪,০০০

দেশের নাম	৩১ অক্টোবর, ১৯২৭	৩১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭	১৯২৬-২৭ প্রকৃত ফসল
লাটভিয়া	১,০০০	১,০০০	১,০০০
তুরস্ক	৬,০০০	—	২,০০০
রুশিয়া বাদে ইয়োরোপ	৬৮,০৫,০০০	৬৭,৭৬,০০০	৫৯,৪২,২৮০
রুশিয়া	১৪,০০,০০০	১৩,২৫,০০০	৯,৮৩,০০০
মোট	৮২,০৫,০০০	৮১,০১,০০০	৬৯,২২,২৮০

ভারতের যন্ত্রপাতির বাজারে ইংরেজ বনাম মার্কিণ

১৯২১ সন ছিল "বুমের" সময়। যন্ত্রপাতি কিনা সম্পর্কেও তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মেশিনারি আসিয়াছিল সওয়া চৌত্রিশ কোটি টাকার। ১৯২৬-২৭ সনে সে জায়গায় আসিয়াছে মাত্র ১৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার।

যারা যন্ত্রপাতি জোগায় তাদের পক্ষে এটা ভাবনার কথা। ভারতের বাজারে কোন্ দেশ কত যন্ত্রপাতি ১৯২৬-২৭ সনে বেচিয়াছে, তার হিসাব এই—

দেশের নাম	দাম (লাখ টাকা)	শতকরা
যুক্তরাজ্য	১১,৩৮	৭৭·৯
যুক্তরাষ্ট্র	১,৫৩	১০·৫
জার্ম্মেণি	১,০৩	৭·১
বেলজিয়াম	২৫	১·৭
অন্যান্য দেশ	৪১	২·৮
মোট	১৪,৬০	১০০

১৯১৩-১৪ সনে

দেশের নাম	দাম	শতকরা
যুক্তরাজ্য	৭,৪১	৯০
যুক্তরাষ্ট্র	২৭	৩
জার্ম্মেণি	৫৬	৬
বেলজিয়াম	—	—
অন্যান্য দেশ	১২	১
মোট	৮,২৬	১০০

এই তালিকার অর্থ পরিষ্কার। যুদ্ধের পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক বেশী টাকা মেশিনারীর জন্য বিদেশে পাঠান হইতেছে। অবশ্য চড়া দর তার একটা কারণ। কিন্তু যন্ত্রপাতিও বেশী আসিতেছে।

এই বেশী যন্ত্রপাতি পাঠাইবার সুযোগ কাহারা গ্রহণ করিতেছে? বর্ত্তমানে ইংরেজের নীচেই মার্কিনের স্থান। বস্তুতঃ মার্কিন এই কয় বৎসর খুব অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজের পতন হইয়াছে।

ইংরেজের পতনেই আমেরিকার সুবিধা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে ইংরেজ ও মার্কিন একই প্রকার দ্রব্য পাঠায় না। ইংরেজ পাঠায় তুলা ও পাট সম্পর্কীয় কলকব্জা চালের যন্ত্রপাতি, বয়লার ইত্যাদি। এগুলির আমদানি খুব কমিয়া গিয়াছে। ১৯২১ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনের অত্যধিক বৈষম্যের কারণ এইখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমেরিকা অন্য প্রকার যন্ত্রপাতি পাঠায় বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ উৎপাদকের স্বার্থে ও মার্কিণ উৎপাদকের স্বার্থে কোন বিরোধ নাই।

১৯১৪ সনের তুলনায় যুক্তরাজ্য হইতে যন্ত্রপাতির আমদানি বাড়িয়াছে ১০০%, আর আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আসিয়াছে ৬ গুণ।



ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীর সম্মেলন

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীগুলি যাহাতে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে একটি 'ফেডারেটেড ব্যাঙ্ক' স্থাপন করিতে পারেন তাহার জন্য কিছুদিন হইতে দেশে একটা আন্দোলন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীটের বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ভবনে এক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলা ও মহকুমা হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। রঙ্গপুর লোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় বুঝাইয়া দেন যে বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ব্যাঙ্ক-ওয়ালাদের পারস্পরিক সহযোগ আবশ্যক এবং সে সহযোগ ফলপ্রসু হইতে পারে যদি একটা "ফেডারেল ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয়ের মত এই যে, কেবল বক্তৃতায় বা কাগজে ব্যাঙ্কওয়ালাদের মিলন প্রচার করিলেই কোন কাজ হইবে না। একটা ফেডারেল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে কোন কাজই হইবে না।

বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক এবং লোন অফিসগুলি যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিতেছে না, এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। অনেক সময় মফঃস্বলের কোন কোন ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস তাহাদের তহবিলের সব টাকা কাজে লাগাইতে পারে না, আর অনেক ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কাহারও কাছে টাকা পায় না। একটি ফেডারেল ব্যাঙ্ক গঠিত হইলে এই বিপদ হইতে বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসগুলিকে রক্ষা করিতে পারে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি কাজে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া আজ কাহাকেও কিছু বুঝাইবার চেষ্টা অনাবশ্যক। সকলেই তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু কেহই আগাইয়া আসিতেছেন না এদিক দিয়া জাতির উন্নতি সাধন করিতে। ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানী সম্মিলনের উদ্যোক্তারা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের মঙ্গল-জনক কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করিয়া বাঙ্গালার প্রতি ব্যাঙ্কের ও প্রতি লোন অফিসের কর্ত্তাদের অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিতে সহায়তা করুন।

মানভূম টেকনিক্যাল স্কুল

ডিঃ বোর্ডের গত অধিবেশনে পুরুলিয়ায় একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। বোর্ড এডুকেশান কমিটির নিম্নলিখিত স্কীম গ্রহণ করিয়াছেন—যথা, স্কুলে দরজির কাজ, মাটির কাজ (পুতুল ইত্যাদি গঠন), বেত ও বাঁশের কাজ, বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি, এবং সূত্রধরের কাজ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই স্কুলে দুই বৎসর হইতে চার বৎসর কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রথমতঃ ছাত্র কতক দূর পর্য্যন্ত এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে হইতে নেওয়া হইবে। এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইলে নিম্ন প্রাইমারী পাশ করা আবশ্যক। কোনও বেতন লাগিবে না। সাধারণতঃ এই শিক্ষাকার্য্য চালাইতে ১০০্ হইতে ১৫০্ টাকার বেতনের একজন সুপারিণ্টেণ্ড, ৬০্।৮০্ টাকায় পাঁচজন শিক্ষক, ৩০্।৪০্ টাকায় তিনজন সহকারী শিক্ষক, ৩০্।৪০্ টাকায় একজন কেরাণী রাখা হইবে। পিয়ন,

ঝাড়ুদার ও অন্যান্য বাজে খরচ সহ মোট ১০৪০৲ হইতে ৯৮০০৲ টাকা খরচ ধরা হইয়াছে।

পুরাতন হাঁসপাতালে এই স্কুল স্থাপনের জন্য বোর্ডের গবর্ণমেন্টের সহিত পত্রাদি চলিতেছে।

(মুক্তি)

ছায়াচিত্রে দেশের অবস্থা

কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মীগণ মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতার দ্বারা দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও প্রতিকারের উপায় জনসাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। ইতিমধ্যে অনেকস্থলে ঐরূপ সভা হইয়া গিয়াছে। বেতা হাটের সভায় কাঁথি কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এল-সি, মহাশয় ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতার দ্বারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, খদ্দর ও জাতীয় শিক্ষাদি সম্বন্ধে সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। উভয় স্থলের সভায়ই বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল।

(নীহার)

নৌ-বিদ্যা শিক্ষা

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নৌ-বিভাগের সেক্রেটারির নিকট কলিকাতা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক মিঃ এন্ পি গান্ধি একখানি পত্রে ভারতবাসীকে নৌ-বিদ্যা অর্জ্জনের সুযোগদান সম্বন্ধে পোর্টকমিশনারের কর্ত্তব্য আলোচনা করিয়াছেন। চট্টগ্রামও একটী বন্দর। সম্প্রতি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে প্রমোশন পাইয়াছে। চট্টগ্রামে একটী ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন আছে। এই বিষয়ে তাঁহাদেরও আলোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। মিঃ গান্ধি লিখিতেছেন :—

"লাট সাহেবকে ভারতীয় ব্যবসাগার হইতে মানপত্র প্রদান করা কালে হারবার মাষ্টার বিভাগে ভারতীয় গ্রহণ করার প্রার্থনা ছিল। তিনি আমাদিগকে নিশ্চিত করিয়া জানাইয়াছিলেন যে কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট তাহাদের টেকনিকেল চাকরীর জন্য ভারতীয়গণকে শিক্ষা দিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান যে এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন কার্য্যতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না। চেয়ারম্যান মহোদয় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষানবিশ লওয়ার কথা বলিয়াছেন। তাহা কাজের সুবিধার জন্য মাত্র। কিং জর্জ্জের ডক প্রস্তুত হইলেই তাহা কমাইয়া ফেলা হইবে। সেই শিক্ষানবিশদের চাকরী দেওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি নাই। সুতরাং এই বিভাগে ভারতীয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন চেষ্টা করা হইতেছে না।

ভারতবাসী সমুদ্রপথে চাকরী করিতে অনিচ্ছুক, চেয়ারম্যানের এই উক্তি অগ্রাহ্য। উপকূলবাহী ষ্টীমার সমূহে বহু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার কাজ করিতেছেন, চেয়ারম্যান তা নিশ্চয় জানেন। এই সেদিন ডফ্রিন্ জাহাজে বহু ভারতীয় যুবককে লওয়া হইল।

দরিয়া সার্ভেয়র

ইয়োরোপীয়ান্ ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্দেরই শুধু শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ভারতীয়ের জন্য দ্বার বন্ধ। কি গুণ থাকিলে তাহাতে প্রবেশ করা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষানবিশ লওয়া হয়, তাহাও ভারতবাসী জানে না। পোর্ট কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বার্থিং মাষ্টার

এই সকল চাকরীতে সাধারণ লস্কর শ্রেণীর লোকই লওয়া হইতেছে। কিন্তু কোন ভারতীয় লস্কর এই চাকরী পায় নাই। বম্বে পোর্টের অধীনে তাহারা কিন্তু যোগ্যতার সহিত কাজ চালাইতেছে। কলিকাতা পোর্টের অধীনে তাহারা সুযোগ পাইলে কাজ করিতে পারিবে না কেন, কেহ বলিতে পারেন কি? ভারতীয় বার্থিং মাষ্টার ২৫০৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি লইয়া ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক হইবে। ইহাতে দশ জন বার্থিং মাষ্টার বাবত বার্ষিক আঠার হাজার টাকা বাঁচিবে।

হারবার মাষ্টার

এযাবত এইরূপ পদ লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের কোন সুবিধা ভারতবাসী পায় নাই। কিন্তু বম্বেতে শিক্ষা-

নবিশি জাহাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবাসীর শিক্ষা লাভের অসুবিধা দূর হইয়াছে। কলিকাতা পোর্ট যদি খরচ দিয়া নিজেদের কর্মচারী শিক্ষিত করিয়া লয় এবং কয়েক বৎসরের জন্য তাহাদিগকে অল্প বেতনে চাকরী করিতে বাধ্য করে, তবে তাহাদের ব্যয় পোষাইয়া লাভ থাকিবে।"

আসল কথা মতলব ঠিক থাকা চাই। খুব ভাল স্কীমও সহানুভূতির অভাবে পণ্ড হইতে পারে। যদি ভারতীয়কে চাকরী দেওয়া সত্য সত্য তাঁহাদের মতলব হইয়া থাকে (যদি লাট সাহেবের প্রতিশ্রুতি কেবল বাহ্যিক প্রলেপ মাত্র না হয়) তবে এখনও তাঁহারা সরলতার পরিচয় দিতে পারেন, যেখানে যান্ত্রিক দক্ষতার প্রয়োজন নাই—সেই সকল পদে এখনও তাঁহারা ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিতে পারেন।" (আলোক, চট্টগ্রাম)

নিখিল এসিয়া কংগ্রেস

চীনদেশের সাংহাইয়ের নানতাও নামক সহরতলীতে গত ৩রা হইতে ৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত নিখিল এসিয়া কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে জাপান, চীন, কোরিয়া, আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক, শ্যাম ও ভারতের প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। জাপানের প্রতিনিধি মিঃ ইমাসাটো প্রথম দিবস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতের প্রতিনিধিরূপে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। এসিয়ার সকল দেশের ও সকল জাতির মধ্যে একতা স্থাপন করিবার জন্য এই কংগ্রেসে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসের অধিবেশন এবার বিশেষরূপে ফলদায়ক না হইলেও এসিয়াবাসীর মধ্যে একতার বর্দ্ধক বলিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই এই কংগ্রেসের সহিত সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

গন্ধবণিক্ মহাসম্মিলনী

পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন

গত ১৫ই ও ১৬ই পৌষ তারিখে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ১২ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ মাঠে উক্ত মহাসম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গ-দেশের প্রত্যেক জেলা হইতে এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত মানভূম প্রভৃতি জেলা হইতেও বহু প্রতিনিধি আগমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও মফঃস্বল হইতে সর্ব্বসমেত প্রায় ৬০০।৭০০ প্রতিনিধি মহাসম্মিলনীতে সমবেত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত প্রায় তিন শত মহিলা প্রতিনিধিও দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মিলনীর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে ইহার সংলগ্ন স্থানে গন্ধবণিক্ মহিলা ও পুরুষগণের প্রস্তুত বহু সুন্দর শিল্পদ্রব্যের এক প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। শিল্পদ্রব্য ব্যতীত ব্যবসায়ের দ্রব্য, যথা, মশলা, ভৈষজ্য সামগ্রী, গায় ফলফুল সমন্বিত বহু-দূর হইতে আনীত গাছগাছড়া, বহুবিধ অলঙ্কার দ্রব্য, ঔষধ তৈল, হীল্ সেফ্, রং, জীবদেহের প্রতিমূর্ত্তি, ডাক্তারী যন্ত্র, পুস্তক প্রভৃতিও প্রদর্শিত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মশলা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল যে সকল মশলা, ভৈষজ্য দ্রব্য এবং গাছগাছড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই দর্শনযোগ্য ছিল। গত বৎসরও তিনি এই সমস্ত দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া একটি সোণার মেডেল পাইয়াছিলেন।

এ বৎসর মহাসম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সাধু মহাশয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত। সভায় গন্ধবণিক্ সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যথাঃ—মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল, রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সি আই ই, রায় সাহেব মণীন্দ্রনাথ সাধু, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত প্রভাত-চন্দ্র দত্ত, এটর্ণী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, উকীল শ্রীযুক্ত কানাইধন দত্ত, শরচ্চন্দ্র দে, মৃত্যুঞ্জয় দে, নরেন্দ্রনাথ সাধু, বিভূতিভূষণ সাহা, কানাইলাল দাঁ, শ্যামাপদ দে প্রভৃতি, ময়মনসিংহ গৌরিপুর গন্ধবণিক্ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বজ্রেশ্বর দত্ত, শ্রীযুক্ত দত্তকুমার দাঁ, সিদ্ধেশ্বর সাহা, অনাথনাথ সাহা, অনাথনাথ সাধু, হরিপদ হালদার, ডাঃ মদনমোহন বণিক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত,

প্রমথনাথ দে, নীলমণি কুণ্ডু, হরিশঙ্কর দে, সুবলচন্দ্র দত্ত, যতীন্দ্রমোহন দে, অটলবিহারী হালদার, হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত সামান্তধন দত্ত, সত্যকেতু দত্ত, সুরেশচন্দ্র দাঁ, গিরিশচন্দ্র দে, যোগেন্দ্রনাথ সাধু প্রভৃতি।

এই মহাসম্মিলনীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল:—

(১) প্রত্যেক গন্ধবণিক্ বালকবালিকাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও উন্নতিবিধান।

(২) ব্যবসা শিক্ষার্থী যুবকগণকে বাণিজ্যনীতি, কৃষি ও শিল্পশিক্ষা প্রদান।

(৩) বাণিজ্যোন্নতির জন্য রাজনীতি ও অর্থনীতির চর্চ্চা।

(৪) যুবকগণের বিবাহের ন্যূন বয়স ১৭ বৎসর এবং বালিকাগণের ১২ বৎসর।—এই প্রস্তাবটি তিন বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।

(৫) বরপণ গ্রহণ নিবারণ এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় বাহুল্য না করা।

(৬) বৈশ্য-বার্ত্তার অনুশীলন ও বৈশ্যাচারপালন।

(৭) বাণিজ্যসঙ্ঘ ও যৌথ কারবার স্থাপনের আবশ্যকতা।—গত বৎসর গন্ধবণিক্ চেম্বার অব্ কমার্স নামে একটি বাণিজ্যসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে।

(৮) গন্ধবণিক্ ছাত্রাবাস ও গন্ধবণিক্ মহাসভার কার্য্যালয়ের জন্য একটি নিজস্ব বাটী ক্রয়।—ইতিপূর্ব্বেই তজ্জন্য ২৫০০০৲ টাকা সংগৃহীত ও প্রতিশ্রুত হইয়াছে। গত অধিবেশনের জন্য আরও প্রায় ২০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

(৯) গন্ধবণিক্ সমাজ চতুরাশ্রমে বিভক্ত থাকায়, এবং কোথাও কোথাও পরস্পরের মধ্যে খাওয়া দাওয়া ও আদান প্রদান না থাকায়, চতুরাশ্রমের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলন।—গত অধিবেশনে ৺কার্ত্তিকচন্দ্র দাঁর বাটীতে অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৭০০ বিভিন্ন আশ্রমের ব্যক্তি একত্র অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় ও অন্যত্র বিভিন্ন আশ্রমে আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে।

(১০) গন্ধবণিক্ তরুণসঙ্ঘ গঠন।—এই প্রস্তাবটি রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যুবকেরা চরিত্রবান্, নীতিবান্ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জ্জিত হইয়া সমাজ সেবা করিবেন ও মহাসভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন, এইজন্য সভাস্থলে প্রায় ১৪৫ জন যুবক সভাপতির সম্মুখে প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া তরুণসঙ্ঘ-ভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তরুণ উকীল, ডাক্তার প্রভৃতিও আছেন। ১৫ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক কোনও বালককে তরুণসঙ্ঘ-ভুক্ত করা হয় নাই। তরুণসঙ্ঘটি সুগঠিত ও সুপরিচালিত হইলে সামাজিক সংস্কার যে দ্রুতবেগে চলিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিগত ১৭ই পৌষ বৈকালে গন্ধবণিক্ মহিলাগণের একটি বিশেষ সম্মিলন হইয়াছিল। সভায় ৪০০ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাহাতে তাঁহারা সামাজিক সংস্কার সাধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং শিল্প প্রদর্শনী ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন। মহিলা সম্মিলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন রায় বাহাদুর হরিধন দত্তের পত্নী শ্রীযুক্তা মহারাণী দত্ত। অনেক মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় ছায়াচিত্র দ্বারা সমাজসেবা ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

গত মহাসম্মিলনীর কার্য্য সুন্দররূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। আশা করি, গন্ধবণিক্ সমাজ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

বাঙ্গালার নদী সংস্কার

বাঙ্গালার নদী সংস্কার সম্বন্ধে অনেক আলোচনার খবরই শুনিতেছি, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার কোন সুফলই দেখি না। নদীগুলির সংস্কারের অভাবে নানা প্রকারেই দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। যমুনার ভাঙ্গনে সিরাজগঞ্জ যাইতে বসিয়াছে। এদিকে আবার ব্রহ্মপুত্র শুকাইয়া যাওয়ায় তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি একটু অনুসন্ধান বা বিবেচনা করিলেই এই উভয়বিধ অসুবিধার প্রতিকার

সম্ভবপর হইতে পাবে। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ-স্থলে যে পাহাড় পড়িয়া স্রোতের বেগ ঘুরিয়া গিয়াছে, উক্ত স্থানটুকু সংস্কার করিলেই বোধ হয় যমুনার বেগ মন্দীভূত হইবে এবং ব্রহ্মপুত্রে রীতিমত জল নির্গমন হইয়া অনেকটা উপকার হইবে। নদী কাটিয়া ভরিয়া ঠিক করা অত্যধিক ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ এবং একরূপ অসম্ভব। শুধু বৈঠক ও পরামর্শে সময় ক্ষেপন না করিয়া অবস্থানুযায়ী কাজ সমাধা করাব চেষ্টা করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। নতুবা দেশেব অবস্থা যে দিন দিন কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বিশেষভাবে প্রার্থনীয়।

(শান্তি-বার্ত্তা)

নিখিলভারত নারী শিক্ষা সম্মিলনী

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌব কাইসারবাগ বাবদোরীতে মুণ্ডীর রাণী সাহেবা ললিতকুমারীর সভানেতৃত্বে নারীশিক্ষা সংস্কার সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রায় তিনশত ভদ্র মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভানেত্রী তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন :—

আগে চাই শিক্ষা

লক্ষ্ণৌর মত অগ্রসর নগরীতেও যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এতগুলি ভদ্রমহিলা মিলিত হইতে পারিয়াছেন, দেশেব হাওয়া ফিরিয়াছে বলিতে হইবে। ইয়োরোপীয় মহিলারাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখন আর বিতর্ক উঠে না ; গোঁড়া রক্ষণশীল দলের লোকও স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত—যদিও স্ত্রী-শিক্ষার ধরণ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার মত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু শিক্ষার যে প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিলে কোন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

ভারতকে যদি একটি জাতি বলিয়া জগৎ সভায় দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে ভারতের নারীদিগকে অগ্রে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। হিন্দু, মোসলমান, খৃষ্টান ও পারশী বালিকাদিগকে যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে সঙ্কীর্ণতা ও পার্থক্য কমিয়া যাইতে পারে ; তখন একের অপরের প্রতি সহানুভূতি আসিতে পাবে।

পর্দ্দা উঠাও

কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দ্দাপ্রথা বিদ্যমান আছে। সেই শ্রেণীর বালিকাদিগকে অল্প বয়সে অল্প কিছুদিন বিদ্যালযে পড়াইয়া তারপর বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তাহাব ফলে শিক্ষার উপকার হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকে। পর্দ্দাপ্রথা স্বাস্থ্যেব পক্ষেও অন্তরায়, কেন না মেয়েছেলেরা খোলা বাতাসে থাকিতে না পাইলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পাবে না। আমি জানি, বহুদিনের প্রথা একদিনে উঠাইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্ণৌর শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বলিতেছি,—তাঁহারা পর্দ্দা-প্রথার কড়াকড়ি কিছু কমান।

বিবাহেব বয়স বাড়াও

বাল্য-বিবাহের ফলে অল্প বয়সে সন্তানাদি হইয়া স্ত্রীলোকেব শরীর অকালে নষ্ট হইয়া যায়, স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে এবং শিশুমৃত্যু ও স্ত্রীলোকেব অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েরই উচিত, বিবাহের বয়স আরও বর্দ্ধিত করা। আমাদের দেশে যাহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অনেক ঘৃণা, বিদ্রূপ ও ঠাট্টা সহ্য করিতে হইয়াছিল। অনেক সংঘর্ষময় অবস্থার ভিতর আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা এক্ষণে দেশের মধ্যে আসন পাইয়াছে। আমি সরলভাবে বলিতেছি, ভারতে স্ত্রীলোকের আদর্শ পুরুষের আদর্শের কোনরূপ বিরোধী নয়। আমরা চাই শান্তি, প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতা, অমিলের পরিবর্ত্তে সামঞ্জস্য। শিক্ষার অভাবে নারীগণের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য এবং বিশেষতঃ বালবধূ ও বালবিধবাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরা সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। ভারতের মেয়েদের মুখের মলিন কষ্ট-রেখা মুছিয়া যাক্।

আফ্‌গান-রাজ আমানুল্লার ইয়োরোপ শফর

আফ্‌গান-রাজ আমানুল্লা ইয়োরোপে শফর করিতে বাহির হইয়াছেন। প্রাচ্যের ইতিহাসে কোন রাজপুরুষের এইরূপ বিদেশ ভ্রমণ এক স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনায় বিশ্বের দরবারে এশিয়ার মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইল বলিয়া মনে করি।

আমানুল্লা ইয়োরোপের ইতালি, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি জনপদে ভ্রমণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। আমেরিকাও যাইতে পারেন।

ভারতে আফগান-রাজ

করাচী বন্দরে

১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ২টা ৩৫ মিনিটের সময় আফগানিস্থানের রাজা ও রাণী সদলে করাচী ষ্টেশনে উপনীত হইলে জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত হন। ষ্টেশনটি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ষ্টেশনের প্রবেশ-পথ রক্ত ও শ্বেত-পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। প্রধান প্রবেশ-পথে আফগান পতাকা উড়িতেছিল। সমস্ত প্লাটফরম রক্তাভ কার্পেটে মুড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। আমীর আমানুল্লা ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া মনোহর দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে খাকী পোষাক ছিল এবং পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঘোড়সওয়ারদের ন্যায় জুতা ছিল। আফগানিস্থানের প্রচলিত টুপীই তিনি পরিধান করিয়াছিলেন। ষ্টেশনে সিন্ধুর কমিশনার মিঃ ডবলিউ এফ হাডসন, সেনানায়ক মেজর জেনারেল এম আর ডবলিউ নাইটিংগেল তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহাদের সহিত কয়েক মিনিট কথাবার্ত্তার পর সিন্ধুর জুডিশিয়াল কমিশনার, চীফ এঞ্জিনিয়ার, করাচীর কালেক্টর, করাচী বণিক্ সভার সভাপতি, করাচী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় বহু সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত আমীরের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

আমীর ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবার জন্য অগ্রসর হইবামাত্র শেরউড ফরেষ্টার সৈন্যদলের ব্যাণ্ড কর্ত্তৃক আফগান জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করেন। তাহার পর শেরউড ফরেষ্টারের ২য় সৈন্যদল দ্বারা গঠিত "গার্ড অব্ অনার" পরিদর্শন করিবার পর আমীর মহোদয় মোটরে উঠেন এবং সিন্ধুর কমিশনার সমভিব্যাহারে সদলে কমিশনারের প্রাসাদে যাত্রা করেন। রাণী তাঁহার মহিলা সহচরীবৃন্দ ও বালক রাজপুত্র সহ ট্রেণের কামরায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্লাটফরম হইতে লোকের ভিড় অপসারিত হইলে রাণী সিন্ধুর কমিশনারের পত্নী মিসেস্ হাডসনের সহিত কামরা হইতে অবতরণ করিয়া মোটরে উঠেন এবং শোভাযাত্রার সহিত যোগদান করেন। রাণী ও অন্যান্য মহিলাগণ প্যারিস ফ্যাসানের পোষাকে ভূষিত ছিলেন, কিন্তু অবগুণ্ঠন পরিধান করায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল দৃষ্ট হয় নাই। রাজদম্পতিকে দেখিবার জন্য ষ্টেশন হইতে কমিশনারের প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমগ্র রাস্তার দুই পার্শ্বে লোকের খুব ভিড় হইয়াছিল।

অভিনন্দন পত্রের উত্তরে

করাচী মিউনিসিপ্যালিটি, সিন্ধুর হিন্দু ও শিখ অধিবাসি-বৃন্দ এবং পার্শী মোসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রসমূহের উত্তর আমীর আমানুল্লা পার্শী ভাষায় প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলীর সুবিধার জন্য তাঁহার বক্তৃতা উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এইরূপ :—

জন সাধারণের সেবক

আন্তরিকতার সহিত প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দনের জন্য আমি ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট কৃতজ্ঞ। ভারতে পদার্পণ করার পর হইতেই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে আমি বিশেষ সদয় ব্যবহার পাইতেছি। হিন্দু, পার্শী ও মোসলমানগণকে আমার প্রতি তাহাদের ভ্রাতৃভাব প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। করাচী মিউনিসিপ্যালিটীকে ধন্যবাদ দিতেছি; কারণ, আফগানগণ করাচীকে বড় ভালবাসে।

আমি আফগানদিগকে বলিয়া থাকি, আমি জন-সাধারণের দীন সেবকমাত্র। জনসাধারণের অভিমত

তাহাদের প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা আমি সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকি। যখন আমি কোন ভাল কার্য্য করিতে সমর্থ হই এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়, তখন আমি প্রথমে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাকে ধন্যবাদ দিই ও মনে মনে বলি, সম্মান জনসাধারণেরই প্রাপ্য। কারণ, আমি জনসাধারণের মুখপাত্র হইতে দীনভাবে চেষ্টা করিয়াছি। আমার রাজ্যে হিন্দুমোসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সমান অধিকার বিদ্যমান। অধিকার সম্বন্ধে আমি ও অন্যান্য আফগানগণ সকলেই সমান।

মোল্লাদের দুষমণি

যদি কেহ রাগ না করেন, তাহা হইলে কাবুল ও কান্দাহারে আমি যাহা বলিয়াছি তৎসম্বন্ধে এখানে কিছু উল্লেখ করিতে চাহি। বিষয়টি এই,—অজ্ঞ মোল্লাগণ বিষম অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করে। এই সকল মোল্লা ভাল করিবার পরিবর্ত্তে জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়। এই মোল্লারা ভারতীয় ফকিরের ন্যায়। ভারতীয় ফকির যষ্টিহস্তে আফগানিস্থানে গিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং জনসাধারণকে তাহার চেলা করিবার জন্য ভুল বুঝায়; সেইরূপ আফগান ফকিরও ভারতে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও জনসাধারণের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে। এইরূপ লোক তাহাদের মাতৃভূমির অপমান ও বোঝা মাত্র। ইহারা আপনাদের উদরপূরণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই সব উপায় অবলম্বন করে। এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার নিন্দনীয়। জাতির উন্নতির জন্য তাহাদের কার্য্য করা উচিত। যে ফকির বা মোল্লা তাহার নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কার্য্য করে তাহার দ্বারা দেশের প্রকৃত সেবা হইতে পারে না।

পার্শী ও আফগান

পার্শীদের অভ্যর্থনা-পত্রে ইতিহাস ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ ছিল। আমীর উত্তরে বলেন, আফগানিস্থান পারস্যের পুত্র কি পারস্য আফগানিস্থানের পুত্র, তাহা তিনি জানেন না। এখন পিতা-পুত্রের দিন আর নাই, এখন ভ্রাতা ও সমানের দিন আসিয়াছে। (উচ্চ জয়ধ্বনি)।

সকল মানুষ সমান

কাবুল হইতে যাত্রাকালে ৩০ হাজার লোক তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য আসিয়াছিল। মোসলমানের ভিতর শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে চাহেন না। তিনি শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়কেই বলিতেছেন যে, তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের দীন সেবকরূপে ইসলামী আইন পালন করিতেছেন। আমীর বলেন একটী অঙ্গে বেদনা হইলে সমগ্র দেহের কষ্ট হয়। সকলকে ভ্রাতৃভাবে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া অবস্থান করিতে হইবে। আমীর উপসংহারে বলেন, "আমি আপনাদের অতিথি; এক্ষণে সুন্দর চা উপভোগে যোগদান করিতে আপনাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি।"

বোম্বাইয়ে

বোম্বাইএ ১৪ই ডিসেম্বর আফগান-রাজকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সকাল হইতেই বোম্বাই নগরে আফগানিস্থানের আমীরকে বিরাট অভ্যর্থনা দিবার জন্য আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। আমীরের আগমনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজপথের উভয় পার্শ্ব হিন্দু, মোসলমান্ ও পার্শী জনতায় ভর্ত্তি হইয়া যায়।

করাচী হইতে 'ম্যানোলা' জাহাজে চড়িয়া আফগানিস্থানের রাজা ও রাণী বেলা দুই ঘটিকার সময় বোম্বাই বন্দরে উপনীত হন। বন্দরের বোটগুলি সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমীরের জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র 'ক্লাইব' ও 'কর্ণওয়ালিশ' নামক রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরীন বোট দুইটি হইতে ৩১টি তোপধ্বনি করা হয়।

চারিটার সময় গবর্ণর ও বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী "ম্যানোলা" জাহাজে আফগানিস্থানের রাজা ও রাণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। তাহার পর একটি লঞ্চে করিয়া তীরে উপনীত হন।

বড়লাটের অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই, গবর্ণর তাঁহার স্থলে আমীরকে অভ্যর্থনা করেন।

এপোলো বন্দর ও রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। বেলা সাড়ে চারটার সময় মনে হইল যেন শহরের প্রায় সব লোক তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়াছে।

আমীরকে সরকারী ভাবেই অভ্যর্থনা করা হয়।

রাণী এবং রাজপরিবারের মহিলাগণ ইয়োরোপীয় পোষাকে ভূষিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখের উপর অবগুণ্ঠন ছিল।

আমীর গেটওয়ের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। গবর্ণর ও আমীর এক শকটে এবং রাণী ও লেডী আরউইন অন্য এক শকটে যাইতেছিলেন। পশ্চাতে প্রায় দ্বাদশখানি শকট আসিতেছিল।

দর্শকদিগের মধ্যে মোসলমানের সংখ্যাই বেশী ছিল। একদল পাঠান আফগান-পতাকা উড়াইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া আমীরের সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে তাঁহার শকটের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল।

ঐ দিন রাত্রিতে গবর্ণমেণ্ট হাউসে সরকারী ভোজ হইয়াছিল।

ছদ্মবেশে ভ্রমণ

বোম্বাইর ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সকালে আফগান-রাজ ছদ্মবেশে বোম্বাই শহরের কয়েকটী অঞ্চল দিয়া মোটরযোগে পরিভ্রমণ করেন। শুধু পুলিস কমিশনার আর একখানা গাড়ীতে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সীমান্তবাসী পাঠানেরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া এবং বড় বড় নিশান লইয়া লাট প্রাসাদে একটি মিছিল লইয়া গমন করে; কিন্তু তাহাদিগকে জানান হয় যে, তাহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইতে পারে না। তৎপরে তাহারা আফগান দূতাবাসে গিয়া যাহাতে আমীরের দর্শন লাভ করিতে পারে, সেজন্য অনুরোধ করে এবং আমীরকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। আমীরকে দেখিবামাত্র, তাহারা তাঁহাকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে, কেহ কেহ ব্যাগপাইপ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে।

পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা

১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার বোম্বাইয়ের জ্যামে মসজিদে আফগান-রাজ জুম্মার নমাজে এমামতী করিয়াছিলেন এবং খোতবাও তিনি নিজেই পাঠ করিয়াছিলেন। নমাজের পরও তিনি ৫০ হাজার মুসল্লীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনারা যদি নিজেদের ধর্ম্মকে সম্মানিত হইতে দেখিতে চাহেন তাহা হইলে অপরের ধর্ম্মকে সমান সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবেন। হিন্দুস্থানের মোসলমানেরা হিন্দুদের ধর্ম্মভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন না,—ইহা লজ্জার বিষয়। আপনারা পরধর্ম্মসহিষ্ণু হউন। জগতের সকল ধর্ম্মকেই আপনাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। অপরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করিলে মুসলমানেরা নিজেদের ধর্ম্মকে বিদ্রূপিত করিবার পথই করিবেন। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে আপনারা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের উপদেশকেও অপমানিত করিবেন।

গৃহশিল্প ও বাণিজ্য চাই

আপনারা মন্দিরে উপাসনা করুন, আর মসজিদে অথবা গীর্জ্জা ঘরেই উপাসনা করুন, তাহাতে অপরের সহিত ভ্রাতৃভাবে থাকিতে অন্তরায় ঘটে না। আশা করি, নিজেদের দেশের জিনিষ ভালই হউক আর মন্দই হউক, প্রত্যেক ভারতবাসী তাহা ব্যবহার করিয়া নিজেদের গৃহ-শিল্প ও বাণিজ্যকে উৎসাহ দান করা নিজের কর্ত্তব্য মনে করিবেন। আমি নিজে আমার দেশের গৃহ-শিল্পকে সর্ব্বদা উৎসাহ দান করিয়া থাকি। উপসংহারে তিনি সকলকে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে বলেন এবং বিরোধ বিস্মৃত হইতে অনুরোধ করেন।

পরদিন ১৭ই তারিখ আফগান-রাজ মোসলমান ছাত্রদের ও পাঠান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হন। ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বিশেষ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারণের উপর জোর দিয়া বলেন যে, কেহ আফগানিস্থানে গেলে দেখিতে পাইবেন যে, তথায় স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য কিরূপ চেষ্টা করা হইতেছে। সমস্ত কাজে নারী যাহাতে পুরুষের তুল্যাধিকার পায়, সে বিষয়ের প্রতি ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য রাখিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন।

ঐ দিনই আমীর সন্ধ্যার সময় 'রাজপুতানা' নামক জাহাজে চড়িয়া বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছিলেন।

জাপানে দিয়াশালাই সঙ্ঘ।

সুইডিশ্ ম্যাচ্ কোম্পানী বলিতেছে, যে জাপানে এক নূতন দিয়াশালাই কোম্পানী মোতায়েন হইয়াছে। নাম—দি গ্রেট অ্যামেলগ্যামেটেড ম্যাচ্ কোম্পানী লিমিটেড।

জাপানের সর্ব্ববৃহৎ দিয়াশলাই কোম্পানীর নাম তোকিও ম্যাচ্ কোম্পানী। এই কোম্পানীই এতকাল সুইডিশ কোম্পানীর সহিত টক্কর চালাইয়া আসিতেছিল। নূতন কোম্পানী ইহার সব ফ্যাক্টরী কিনিয়া লইবে।

অধিকন্তু এই নূতন কোম্পানী নিপুন ম্যাচ কোম্পানী ও কোয়েকিশা ম্যাচ কোম্পানীকেও কিনিয়া লইতেছে। এ দুটা সুইডেন কোম্পানীর সম্পত্তি।

নূতন কোম্পানীর পুঁজিপাটা ৬০ লক্ষ ইয়েন, আর জাপানে উৎপন্ন দিয়াশালাইয়ের ৬০% ৭০% ইহার কুক্ষিগত হইবে।

দিয়াশলাই লইয়া জাপানে ও সুইডেনে বানিজ্যিক লড়াই লাগিয়া উঠিল বলিয়া। এই সঙ্ঘকে তারই অগ্রদূত রূপে বিবেচনা করিতেছি।

তৈল যুদ্ধ

দুনিয়ার বাজারে তৈল সম্পর্কে আর্থিক লড়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লড়ায়ের পূর্ব্বপক্ষ ইংরেজ, প্রতিপক্ষ মার্কিণ।

নিউ ইয়র্কের তেল কোম্পানী ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর নাম দেশ-বিখ্যাত। সম্প্রতি এই কোম্পানী সস্তা দরে রুশিয়ার নিকট তেল কিনিয়াছে। তেলের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন বছরে। চুক্তিটা ৬ বছরের। এর আগেও রুশিয়ার তেল কিনা হইয়াছে। তার ফলে চুক্তিমত তেল কিনার জন্য মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ১৪ লাখ ডলার।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল গ্রূপের অন্তর্গত ভ্যাকুয়াম্ অয়েল কোম্পানীও বছরে সওয়া দুই লক্ষ টন করিয়া তেল কিনিতে যাইতেছে। এ চুক্তিও ৬ বছরের।

বুঝা যাইতেছে আমেরিকা রুশিয়ার নিকট হইতে দাঁও মারিয়াছে। তার পিছনে রহিয়াছে সোভিয়েট্ তেল হাত করিবার জন্য ইংরেজ-মার্কিণের বিপুল চেষ্টা ও প্রতিযোগিতা। মার্কিণ জয়লাভ করিয়াছে। এ সম্পর্কে রুশ-ইংরেজ মনোমালিন্য, আর্কোস্ চড়াও ইত্যাদি ব্যাপারকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

লড়ায়ের স্থান ভারত

মার্কিণ ত তৈল যোগাড় করিয়াছে। কিন্তু তেল বেচিবে কোথায়? মার্কিণের সঙ্কল্প ভারতে।

কিন্তু ভারতে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী, আসাম অয়েল কোম্পানী, রয়েল ডাচ্ শেল ও এসিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী বর্ত্তমান রহিয়াছে। মার্কিণকে নিজের তেল পাঠাইয়া এখানে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে।

তেলের ভাবনা মার্কিণের কয়েক বৎসরের জন্য নাই। ইচ্ছা করিলেই ভারতীয় বাজারে ডাম্পিং আরম্ভ করিবে। শক্তিশালী হইলেও ভারতের ইংরেজ তেল কোম্পানীগুলি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যেই আপনার দুর্গ দৃঢ় করিবার জন্য বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী রয়েল ডাচ্ শেল গ্রূপের সহিত যুক্ত হইয়া এক বিরাট সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে।

ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সোজা কথা নয়। পারস্য সম্ভবতঃ তেলের ব্যাপারে প্রথম। পারস্যের তেল এখনও মজুত আছে। এই তেল অ্যাংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর অর্থাৎ ইংরেজের। সেই হিসাবে ইংরেজকে তৈল-সম্রাট্ বলা যাইতে পারে। দরকার হইলে ভারতের কোম্পানীগুলি পারস্যের তেলের সাহায্য লইতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

সুতরাং আমাদের চোখের সম্মুখে দুই শক্তিশালী জাতি তৈল-সংগ্রামে নামিতেছে। ফলাফলের কথা এত আগে বলা যায় না। তবে খাদক হিসাবে আমরা বেশ কিছুদিন শস্তায় তেল পাইব বলিয়া আশা করি।

বগুড়া প্রজা সম্মিলনী

সম্প্রতি বগুড়াতে এক প্রজা কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি কাশেমপুরি সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি আমার যৌবনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই প্রজা, রায়ত ও কৃষক লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি। অন্যূন ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে বঙ্গদেশের জমিদারী প্রথা অতি প্রাচীন গৌরবের একটি

ক্ষীণ নিদর্শন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও কোচ শাসনকালের 'মণ্ডল' ও 'ভূঞা' সামন্ত রাজগণই মুসলমান শাসন যুগে জমিদার হইয়াছিলেন। ইহা শের সাহী সুশাসনের সনাতন বিধান। জমিদারী প্রথা বাঙ্গালীর স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক নিতান্ত গৌরব ও শক্তিসম্পন্ন সম্মানজনক প্রথা। ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেই এই সনাতন প্রথা নাই। পাঠান শাসনকালে জমীদারগণ বিপুল শক্তিশালী ও শাসনকার্য্যে একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। মোগল শাসনকালের প্রারম্ভে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার কালে বাংলার জমিদারগণ 'বার ভূঞার' আবরণে সজ্জিত হইয়া সংহতি শক্তিবলে পঞ্চাশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল আত্মশক্তিবলে বিভ্রান্ত মোগলকে বাংলা হইতে বিতারিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তখনকার জমিদারগণ আমাদের মত ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না।

রায়তি জোতের চিরস্থায়ীত্ব

আমরা আজ রায়তি জোতের চিরস্থায়ীত্বের দাবী করিতেছি। বাংলার জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়াই আজ প্রজা সাধারণ চিরস্থায়ী সত্বের দাবী করিতেছে, নতুবা সেরূপ দাবী উপস্থিত করা কোনমতেই সম্ভবপর হইত না। জনকতক কৃত্রিম প্রজাবন্ধুর মতে জমীদারগণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া যাউক আর রায়ত নামে জোতদারগণ চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিয়া বেচারী কৃষকের উপর ডাণ্ডাবাজী করুক, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়। জমিদারদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার জন্যই বাংলার প্রজারা সুবন্দোবস্ত বিহীন প্রদেশের তুলনায় ঢের বেশী উন্নত। গবর্ণমেন্টও শোষণ নীতির দিক দিয়া বড় বেশী কিছু করিতে পারিতেছেন না। আমরাও আজ পর্য্যন্ত অসংখ্য সিরাস আয়মা, লাখেরাজ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর মদাদমরাস, চাকরান, পাইকান, মাদুত্রাস প্রভৃতি চিরস্থায়ী নিষ্কর সত্ব ভোগ করিতেছি। নিশ্চয় জানিবেন জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিলে অধস্তন তালুকদার, আয়মাদার মৌরসীদার, পত্তনীদার, দর পত্তনীদার, মোকরারী, ইস্তমুরারী, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ভাটোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর, ভোগোত্তর, মদাদমরাস, সহত্রীন ইত্যাদি কোন স্বত্ব ও বন্দোবস্তই টিকিয়া থাকিতে পারেনা। তখন দেশের অবস্থা কিরূপ হইবে প্রজাবন্ধুর দল বলিয়া দিতে পারেন কি ?

বাংলার রাজত্ব গিয়াছে, জায়গীর নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, বাকি আছে সামান্য জমিদারি—তাহাও উচ্ছেদ করিয়া দেশকে সম্পদ্ ও দৌলত হীন করতঃ আপনারা দেশ হিতৈষণা দেখাইতে চান কি ?

সামাজিক অর্থোন্নতি সমিতি

গ্রামের সমাজনৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন এবং সর্ব্ববিধ বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতা ৩নং মল্লিক ষ্ট্রীটে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ডিরেক্টর মহাশয়ের প্রেরিত অনুষ্ঠান পত্রে দেখা যায় যে, দরিদ্র, অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীদের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করাই উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য। গ্রাম্য মহাজনগণের উৎপীড়ন ও অত্যধিক সুদের দায়ে নিরীহ পল্লীবাসীগণ যে প্রকার নিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এর উপর সহরে ও মফঃস্বলে বেকার সমস্যা দিন দিনই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য এই সমিতি প্রাণপণে ব্রতী হইবেন। এ ছাড়া অনেক সময় ক্রয় বিক্রয় দ্বারাও দেশের প্রভূত অর্থ ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত হইয়া থাকে। গরীব প্রজারা বহু কষ্টে পাট আদি পণ্য উৎপাদন করিয়া অতি অল্প মূল্যে ব্যবসায়ীগণকে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু গরীব প্রজার ভাগ্যে পরিশ্রমের তুলনায় কিছুই লাভ হয় না। যাহাতে ঐরূপ না হইয়া প্রজাদের পরিশ্রমজাত পণ্য সমূহ প্রকৃত মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে, এই সমিতি তাহারও বিশেষ চেষ্টা করিবেন। অধিকন্তু সহর ও মফঃস্বলে—দেশের সর্ব্বত্রই বেকার-সমস্যা দিন দিন যেরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এই সমিতি হইতে তাহার সমাধানেরও বিশেষ চেষ্টা হইবে। সমিতি যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য হইলে দেশের একটী প্রকৃত অভাব দূর হইবে আশা করা যায় এ বিষয়ে সকলেরই সহানুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। আমরা সকলকে এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাহাতে

উহার কার্য্য সুপরিচালিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। সাধারণের সহানুভূতি পাইলে উক্ত সমিতি সহরে ও মফঃস্বলে তাহার শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে উক্ত ঠিকানায় সমিতির নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। আমরা সমিতির সাফল্য কামনা করিতেছি। (নীহার)

ধাত্রীর অভাব

ফরিদপুর শহরে শিক্ষিতা ও বহুদর্শী ধাত্রীর দারুণ অভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কয়েকজন পাকা ধাত্রী ছিলেন, তাঁ'রা একে একে বার্দ্ধক্যবশতঃ কার্য্য-ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী অন্ততঃ দুইজন অতিরিক্ত ধাত্রীর আশু নিয়োগ স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ডের বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে একজন ধাত্রী আছেন, তিনি লোকের বিশেষ উপকারে আসেন না। প্রসবকালে শিক্ষিতা ও কার্য্যপটু ধাত্রী না পাইয়া লোকে যে কি বিপদে পতিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। অনেক সময় ধাত্রীর সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া প্রসূতি প্রাণত্যাগ করে ও সেই সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই স্থলে এক সঙ্গে দু'টী প্রাণীর হত্যা অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। আমরা পুনরায় বলিতেছি জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী অগোণে ইহার সুব্যবস্থা করুন, নচেৎ সশিশু প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা ভীষণ ভাবে বাড়িয়া যাইবে।

(সঞ্জয়, ফরিদপুর)

"বাংলার কৃষক ও পাটের অবস্থা"

পাট এদেশের একটা মস্ত বড় উপকারী ফসল মনে ক'রেই কৃষকগণ সর্ব্বাগ্রে তাহার সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রে থাকে। কিন্তু এবারকার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই পাট ফসলই দেশের অন্ন সমস্যার জন্য অনেকটা দায়ী। ১৩৩২ সনে যখন পাট মণ প্রতি ২৫৲—৩০৲ টাকা দরে বিক্রী হইয়াছিল, তখন তৎপর বৎসরও এই ভাবেই চলবে মনে ক'রে অনেকেই বিয়ে সাদি ও ঘর দরজার পারিপাট্যে এমন কি ঘোড়া বা সাইকেলের কল্যাণেও অনায়াসে একটু ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল। তারপর ১৩৩৩ সনে যখন পাটের পয়সায় ততটা জোর পায় নাই, তখন ঋণের কথা ভেবে বেশ আবার পাটই বুনতে প্রস্তুত হতে লাগল। খেতে না পেলেও ঋণ পরিশোধ দিতে হবেই। চাই টাকা এবং তাও পাট ছাড়া পাবার কোন যোগাড়ই নাই। কাজেই ধানের কথা ভু'লে গিয়ে প্রায় সব জমিতেই পাট বুনতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এখন? পাট ত কোন মতেই চলে না। যাও চলে, দর অতি কম। ঘরে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, ঋণ শোধ করা দূরে থাক্, পেটের ভিতর যে অন্ন-ঋণের তাড়ণা হচ্ছে, তার উপায়ও যে স্থির হচ্ছে না। দেশ চায় স্বরাজ, জাতি চায় নিজের আধিপত্য। আর তদ্দরুণ নানাপ্রকার ধাকাধাকির প্রকোপ বেশ বাড়াইয়া তোলা হচ্ছে। কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দশার প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা কেহ একটু ভেবেছেন কি? দেশের কৃষকগণ যদি নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে, তা হলে বড়লোক নেতৃবর্গের মর্য্যাদাই বা কে রাখ্‌বে বল? কাজেই দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টায় আগে করতে হবে—কৃষকের শক্তিরক্ষা। তাদের বাঁচতে দিতে হবে। নতুবা গরিব কৃষকগণের ক্ষীণ বুকের প্রতি নিশ্বাসে যে অগ্নি বর্ষিত হবে, তাহা দ্বারা পু'ড়ে ছাই হয়ে যাবে সমগ্র বাঙ্গালা এবং সেই ভস্মস্তূপের চারিদিকে পড়ে থাক্‌বে দীনা হীনা বঙ্গমাতার অভিশাপ। তাই বলি দেশের ও জাতির উন্নতি করতে হ'লে আগে বাঁচাও কৃষক। নইলে তাদের আগে মরবে তুমি। সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ একবার জাগ্রত অবস্থায় এদিকে লক্ষ্য করবেন কি? (পঞ্চায়েৎ, ঢাকা)

বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনী

বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন হইতেছে। গত ১৩ই ডিসেম্বর এই উদ্দেশ্যে ঢাকা বাহেরক সত্যাশ্রমে জনসাধারণের একটি সভা হয় এবং প্রদর্শনীর জন্য একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভাপতি স্থানীয় ধনী ও শিক্ষিত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বনবিহারী কুণ্ডু, বি এস সি মহাশয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সমবায়ে একটি

উপযুক্ত কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে কৃষি এবং শিল্পপ্রসূত প্রদর্শন-যোগ্য দ্রব্যগুলি সাদরে গৃহীত হইবে। বিগত চারি বৎসর যাবৎ যাঁহারা এই প্রদর্শনীতে তাঁহাদের নানারূপ প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়া ইহাকে উৎসাহিত করিতেছেন, আশা করি, এই বৎসরও তাঁহাদের দ্রব্যসমূহ এখানে পাঠাইয়া প্রদর্শনীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্যক্ রূপে সার্থক করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কুস্তি, লাঠি, ছোরা ইত্যাদি খেলার জন্য সমিতি এবৎসর বিশেষ আয়োজন করিবেন। বিক্রমপুরস্থ যাবতীয় শরীর চর্চ্চার অনুষ্ঠান এবং সমিতি সমূহের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণ শীঘ্রই বিজ্ঞাপিত হইবে।

এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা শিল্প এবং অন্যান্য দ্রব্য পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন অথবা দোকান খোলার বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লইবেন।

ঠিকানা :—শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ কুশারী, বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনীর সম্পাদক, পোঃ বাহেরক, জিলা ঢাকা।

কংগ্রেসের মান্দ্রাজ অধিবেশন

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভায় গৃহীত কয়েকটা প্রস্তাব—

(১) সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত যে সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, এবং গত ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রুসেল্স নগরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত কংগ্রেস ও সার্ব্বজনীন সঙ্ঘকে এই সভা সম্বর্দ্ধনা করিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের যুদ্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগস্থাপনের যে সিদ্ধান্ত নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি গ্রহণ করিয়াছে, এই সভা তাহা অনুমোদন করিয়া লইতেছে।

(২) চীনের অধিবাসিবৃন্দকে এই সভা আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে। চীনবাসীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই সভা সহযোগিতার ভাব জ্ঞাপন করিতেছে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে যে চিকিৎসক-বাহিনী প্রেরণ করিতে অনুমতি প্রদান করে নাই, তজ্জন্য নিন্দা প্রকাশ করিতেছে। ভারতীয় সৈন্যগণকে যে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চীনবাসীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইতেছে, এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অচিরে চীন এবং তৎসহ মেসোপটেমিয়া, পারস্য এবং বৃটিশ উপনিবেশসমূহ হইতে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশ ফিরাইয়া আনিতে বলিতেছে।

(৩) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে এবং প্রাচ্য সমুদ্রে যে সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কংগ্রেস তাহাতে উহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছে ; এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের স্বাধীনতা নিষ্পেষণ করিবার এই সম্ভাবিত চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীর উহা হইতে বিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য।

(৪) এই মহাসভা ঘোষণা করিতেছে যে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভই ভারতবাসীদের অভীষ্ট লক্ষ্য।

(৫) ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণে বঞ্চিত করিয়া যেহেতু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাটুটারী কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, সেইহেতু এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, উক্ত কমিশনটিকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করাই আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ—

(ক) এই কংগ্রেস দেশের অধিবাসীদিগকে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যে দিন কমিশন ভারতে পৌঁছিবে, সে দিন যেন ভারতের সর্ব্বত্র প্রকাশ্য প্রতিবাদের ব্যবস্থা করা হয় এবং কমিশন যেদিন যে সহরে পৌঁছিবে, সেই দিন সেই সহরে যেন ঐরূপ প্রতিবাদের আয়োজন হয়। প্রবল প্রচার কার্য্যের দ্বারা জনমত এরূপ ভাবে গঠন করা হয় যেন সকল শ্রেণীর লোকই বয়কটে যোগ দান করিতে পারে।

(খ) ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগকে, ভিন্ন ভিন্ন দলের ও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে এবং অপরাপর সকলকে কংগ্রেস অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দান না করেন, কমিশনকে কোন

রূপে সাহায্য না করেন অথবা কমিশন-সংক্রান্ত কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট না থাকেন।

(গ) এই কমিশন সম্পর্কে ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে যে কমিটি গঠিত হইবে, কোন সদস্য যেন সেই কমিটি গঠনের জন্য ভোট না দেন এবং এই কমিশন সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব হইবে অথবা টাকার বরাদ্দ হইবে, তাহার যেন প্রতিরোধ করেন।

(ঘ) এই কংগ্রেস ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সদস্যদিগকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহাদের সদস্যপদগুলি বজায় রাখার উদ্দেশ্য ভিন্ন বা বয়কট ফলপ্রদ অথবা সার্থক করিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন কিংবা মন্ত্রীমণ্ডল ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন অথবা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতে যে সকল ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে অহিতকর সেই সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাঁহারা যেন ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর অধিবেশনে উপস্থিত না থাকেন। কমিশন বয়কট সফল করিবার নিমিত্ত এই মহাসভা সকল দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিতে এবং সম্ভব হইলে নেতাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে ওয়ার্কিং কমিটিকে ক্ষমতা দান করিতেছেন।

(৬) বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন—বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হয় যে বৃটিশ পণ্য বয়কট কার্য্যকর করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া কতকগুলি নির্ব্বাচিত বৃটিশ পণ্য বয়কটের আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সমূহকে ভার দেওয়া হউক।

(৭) শাসনতন্ত্রের মুসাবিদা—এই প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটিকে ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটি মুসাবিদা করিবার ভার দেওয়া হয়, এবং বলা হয় যে, মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে নেতৃবর্গের একটি বিশেষ সভা আহুত হইবে। ইহাতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণ ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের ব্যবস্থা পরিষদ, রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সহিত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন।

মোলাকাৎ



নয়া বাংলার কৃষিকর্ম্ম

[সুরুল কৃষি বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সন্তোষ বিহারী মিত্রের সঙ্গে আমার কথোপকথনটা নীচে দেওয়া হইল—শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী ।]

প্রঃ—আপনি কি সুরুল কৃষি বিভাগের চার্জ্জে আছেন ?

উঃ—আমি কৃষিবিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ।

প্রঃ—আগে কোথায় ছিলেন ?

উঃ—বিভাগীয় প্রবীণ কৃষি কর্ম্মচারী রূপে (ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারাল অফিসার) বীরভূমে ৬ বৎসর ছিলাম । ১৯২৪ সালে এখানে আসিয়া সুরুল কৃষি বিভাগের পত্তন করি ।

প্রঃ—কি প্রণালীতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন ?

উঃ—সকলেই জানে বীরভূম জেলায় বৎসরে একটার বেশী ফসল হয় না । চাষীদের জিনিষ—তাদের গরু, তাদের লাঙ্গল, তাদের কোদাল নিয়ে একটা জায়গায় বৎসরে ৩টি ফসল করিয়েছি । জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বরে একটী, অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বরে একটী, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মার্চ্চে একটী । এটাকে বলে রোটেশন প্রণালী ।

প্রঃ—এখানকার সমস্যা কি ?

উঃ—সেচন সমস্যা । কম জলে অথচ একই রকম ফসল কিরূপে আদায় করা যেতে পারে তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয় । সেই জন্য সুরুলে ড্রাই সিষ্টেম্ [illegible] প্রবর্ত্তন [illegible]

প্রঃ—ড্রাই সিষ্টেম কি রকম ?

উঃ—এখানকার বালি জমিতে বৃষ্টির জল যখন পড়ে, তখন জমি সে জল ধরে রাখতে পারে না, সেটা শীঘ্রই মাটীর তলে চলে যায় । কিন্তু বেশী দূর যেন না যেতে পারে সেজন্য ভিতরকার জমিকে বেশী শক্ত করে দেওয়া হয় । গাছের শিকড় এই জল হইতে রস সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয় । ইহাকেই বলে ড্রাই সিষ্টেম ।

প্রঃ—উপর হইতে কয় ফুট নীচে জলকে এইভাবে আটক রাখা হয় ?

উঃ—৩ ফুটের মধ্যে । এইভাবে এক হাজার বিঘা জমিতে পেঁপে লাগান হয়েছে । আগষ্ট মাসে লাগিয়েছি ৩ মাসে তার ফসল ফলতে আরম্ভ হয়েছে । গাছগুলি ২।৩ হাতের বেশী উঁচু নয় । এক একটী পেঁপে প্রায় ১ হাত লম্বা । পেঁপে ক্ষেতের ফাঁকা জায়গায় আনারস লাগান হবে । তাহলে একসঙ্গে ২ ফসল হয়ে গেল ।

প্রঃ—পেঁপেতে লাভ কি রকম হবে ?

উঃ—এক একটী গাছে যদি আটআনা লাভ ধরা যায় তাহলে এক হাজার গাছে ৫০০৲ টাকা লাভ থাকবে । আপনি আমাদের পেঁপে বাগান দেখেছেন—কি মনে করেন ?

প্রঃ—অত বড় পেঁপে আমি আগে কখনও দেখি নাই । মনে হয় এক একটী পেঁপের ওজন ৫।৬ সের হবে । কলিকাতার বাজারে তাহার দাম আট আনার কম নয় । এক গাছে যদি ১০টী পেঁপে ধরে, তাহলে ৪৲ টাকা লাভ থাকে ।

উঃ—যতক্ষণ তা না হবে আমরা ধরবনা । এখানকার পেঁপের দর কলিকাতার চেয়ে অনেক সস্তা, আবার কতকগুলি পুরুষ গাছ আছে । কমলালেবু লাগান হয়েছে । আসছে বছর ডালিম লাগাব ।

প্রঃ—কি সার দেন ?

উঃ—সচরাচর চাষীরা যা দেয় সেই সার দিই। গরুর চনা খুব ভাল সার। সেটাকে আমরা "প্রিজার্ভ" করে রাখি। আক বা কপি ক্ষেতে দিলে, দশ মাসে যে ফসল ফলবে, সেটা ৯ মাসে ফলে। কপি ৩ মাসের জায়গায় দুই মাসে হয়।

প্রঃ—গরুর চনা দেওয়ার কি কোন নিয়ম আছে ?

উঃ—আছে। পাতলা করে দিতে হয়। এক টিন চনাকে ১০ টিন জলে মিশিয়ে দিতে হবে, না হলে জ্বলে যাবে। কখন কখন এক টিনকে আমরা ২০ টিনও করি। গাছ যখন ভাল করে শিকড় গজায় তখন দিতে হয়। তাহলে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। এই ভাবে গরুর চনা দ্বারা ১০ মণের জায়গায় ২০ মণ ফসল হয়েছে, অথচ তাতে খরচ কিছু বেশী নয়।

প্রঃ—আপনারা আলুর চাষ করেন কি ?

উঃ—হাঁ, করি। আলু যাতে পচে না যায় সেইভাবে গুদামজাত করবার জন্য আমাদের একটা ঘর আছে। মনে করুন আলু বাজারে নিয়ে গেলেন। বিক্রী হল না। বেশী দিন ঘরে রাখলে পচে যাবে। কাজেই বাধ্য হয়ে আপনাকে কম দরে আলু ছাড়তে হবে। এই অসুবিধার দরুণ এ অঞ্চলে যে চাষী এক বিঘা জমিতে আলু লাগাতে পারে সে লাগায় এক কাঠায়। কিন্তু সে যদি জানতে পারে আলু গোলাজাত করবার ব্যবস্থা আছে, তাহলে সে এক বিঘাতেই আলু লাগাবে। আমাদের যে ঘর আছে তাতে তিন শ' মণ পর্য্যন্ত আলু রাখতে পারা যায়। চাষী যখন আলু তোলে তখন দেড় টাকা মণ বিক্রী হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরে বিক্রী করলে ৪৷৫ টাকা মণ বিক্রী করতে পারে। আমরা চাষীদের বলব তোমরা এখানে এসে মণ পিছু মাসে মাসে দুআনা দেও। ১০ মণ বিক্রী করলে তখন ১৫ টাকা পেত, কিন্তু আমাদের ঘরে যদি গোলাজাত করে রাখে তাহলে চারমাস পরে বিক্রী করলে সে আলুর দাম হবে ৬০ টাকা। তখন ১৫৲, এখন ৬০৲। ৪ মাস রাখবার খরচ বিশ্ব ভারতী চার্জ্জ করবে মণ পিছু দুআনা। তাহলে ৫৲ বাদ গেল। ওজনও কিছু কমবে। তাও ৫৲টাকার মত। তাহলে দশ মণ আলুতে তার ৩৫৲ টাকা লাভ রইল। চাষীরা যদি এই ভাবে রাখবার জায়গা পায় তাহলে বেশী তৈয়ারি করতে পারে। ইচ্ছামত ধরে রাখতে পারলে লাভ পাইকারদের হাতে যায় না।

প্রঃ—যে ঘরে আলু রাখেন সেটা কি রকম ?

উঃ—ঘরটা এমন ভাবে তৈয়ারি করা হয়েছে যেন চারিধারে হাওয়া খেলতে পারে। অর্থাৎ টেম্পারেচারের ম্যাক্সিমাম্ ও মিনিমামে পার্থক্য যত কম হয় ততই ভাল। দিনের বেলা ১০০ ডিগ্রি রাত্রিতে ৮০ ডিগ্রি, অত বেশী পার্থক্য হওয়া খারাপ। আমাদের পার্থক্য ২।৪ ডিগ্রির। বেশী পার্থক্য না হলে আলু থাকে ভাল। তা ছাড়া ঘরের ভিতর খানিকটা চুণ রাখা হয়েছে যাতে ভিতরের হাওয়া শুকনো থাকে। এই ভাবে উত্তাপের পার্থক্যও কম হয়।

প্রঃ—এখানে তুঁতের চাষ হয় কি ?

উঃ—হয়। এতদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের বহরমপুর ও মালদহ জেলায় ভাল রেশম তৈয়ারি হত, কারণ "যথেষ্ট" জমিতে তুঁত গাছ ভাল হয়। যেখানকার হাওয়া গরম সেখানে ভাল হয় না—এপর্য্যন্ত জানা ছিল। এখানে বালি মাটি, গ্রীষ্মকালে এত গরম হাওয়া বয় যে উত্তাপ ১১৮ ডিগ্রিতে গিয়ে উঠে। গবর্ণমেন্টের সাহায্যে গত ৩ বৎসর পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে—খুব উৎকৃষ্ট তুঁত গাছ এখানে হতে পারে, হয়েছেও। আর খুব ভাল রেশম তৈয়ারি হয়েছে। বীরভূম জেলায় যত পতিত জমি আছে তাতে তুঁতের চাষ করা খুব লাভজনক এটা প্রমাণ হয়ে গেল। এতে কোন খরচ নাই বল্লেই হয়।

প্রঃ—এখানে তুলা হয় কি ?

উঃ—হয়। গত ২ বৎসর ধরে "ধারওয়ার আমেরিকান" বা আমেরিকার কার্পাস এখানে হয়েছে। সচরাচর এই তুলাতে ৪০ থেকে ৬০ নম্বর অবধি সুতা প্রস্তুত হতে পারে। গত বৎসর এখানে বিঘা প্রতি

২॥৹ মণ থেকে ৩ মণ "বাঁট্" তুলা হয়েছে। দাম সের দুই টাকা। সাধারণ তুলা সের বার আনা, এক টাকা। এর আঁশ এক ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয়েছে। পতিত জমিতে যে এত উৎকৃষ্ট তুলা হতে পারে আগে কেহ তা আশা করেনি। আশে পাশের কয়েক জনকে এই তুলা দেওয়া হয়েছিল। তাদের ক্ষেতে তুলা হয়েছে। কিন্তু বীজ ছাড়াবার কল না থাকাতে এবং লোক্যাল মার্কেট না থাকাতে এই চাষের উন্নতি হতে পারছে না। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব আমাকে বলেছেন—১০ হাজার টাকা অবধি "বীজ" তুলা গবর্ণমেণ্ট কিনে নিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রঃ—বীজ ছাড়াবার জন্য কি কলের দরকার?

উঃ—কলের নাম জিনিং মেসিন। গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এই কল যদি বসান হয়, তাহলে বীরভুম ও বাঁকুড়া জেলায় এই তুলার চাষ চলতে পারে। এখানে সার বা সেচন দরকার হয় না। শীতকালে যা লাগাতে হয় তার সার ও সেচ দরকার অথচ তার আঁশও অধিক। এই তুলা বর্ষাকালে রোপিত হয়, আর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে তুলতে হয়। তুলার কোয়ালিটী আমেরিকান তুলার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়—এটা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়েছে। বীরভুম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অনেক জমি আছে যেখানে এই তুলার চাষ হতে পারে। বিলাতে এই তুলার ডিমাণ্ড খুব বেশী। গবর্ণমেণ্ট যদি সুবিধা করে দেন তাহলে বাঙ্গালা দেশ থেকে এই তুলা বিলাতে রপ্তানি হতে পারে।

প্রঃ—কৃষির জন্য আপনারা নূতন জমি ক্রয় করিয়াছেন কি?

উঃ—হাঁ। এজন্য নূতন আড়াই হাজার বিঘা জমি গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে একোয়ার করা হয়েছে, তাতে ফডার, পৌল্ট্রী, সিরিকালচার, তুলা, ড্রাই কাল্টিভেশন, এসব চাষের প্রস্তাব আছে।

প্রঃ—পৌল্ট্রী ফার্ম্মিং সম্বন্ধে আপনারা কিছু করেছেন কি?

উঃ—এ বিষয়েও খুব ভাল কাজ হচ্ছে। ভবিষ্যতে ডিম যেন কলিকাতায় চালান দিতে পারি তার চেষ্টা হচ্ছে। কলিকাতায় কিছুদিন আগে যে অল ইণ্ডিয়া পৌলট্রী সো হয়েছে, তাতে আমাদের ৩টী ব্রিড্ প্রথম হয়েছে। (১) চিটাগাং ব্রিড্ (২) রোড আইল্যাণ্ড রেড ব্রিড্ (৩) হোয়াইট লেগ হরণ্।

প্রঃ—একটা মুর্গী কয়টা ডিম পাড়ে?

উঃ—আমাদের এক একটা মুর্গী ২০০ থেকে ২৫০ পর্য্যন্ত ডিম দিচ্ছে। দেশী মুর্গী ৩০।৪০ টার বেশী দেয় না।

প্রঃ—এত বেশী পার্থক্য করেন কি করে?

উঃ—আমরা ক্রস ব্রিড্ করছি। দেশীর সঙ্গে চিটাগং বা আমেরিকান ক্রস করছি। তাতে ৩০।৪০ টার জায়গায় ৭০।৮০ টা হচ্ছে। বাড়াবার আর একটা উপায় হচ্চে দেশী মুর্গীর ব্রুডিনেস ভেঙ্গে দেবার জন্য একটা কল তৈয়ারি করেছি, যার দ্বারা ডিমের থেকে বাচ্চা হয়, মুর্গীকে "তা" দিতে হয়না। ডিমের উপর অনেক্ষণ বসে "তা" দেয় বলে মুর্গীর অনেক শীঘ্র ক্ষয় হয়। কলের সাহয্যে এই "তা" দেওয়ার কাজ চলে। ইহাকেই বলে মুর্গীর "ব্রুডিনেস ভাঙ্গা"। অল ওয়ার্লড কম্পিটিশানে আমাদের চিটাগাং ব্রিড প্রথম হইয়াছে। কানাডায় আমাদের একটা মুর্গী সাড়ে চারিশত টাকায় বিক্রী হয়েছে। ২টা জংলী মুর্গী পাঠাইয়াছিলাম, ১৫০৲ টাকায় বিক্রী হয়েছে।

প্রঃ—লাভ দাঁড়াচ্ছে কিছু?

উঃ—গত বৎসর থেকে এই ফার্ম্ম্ সেল্ফ্ সাপোর্টিং হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে লাভ দাঁড়াবে।

প্রঃ—আপনাদের এই ফার্ম্মে শিক্ষানবীশ কয়জন আছে?

উঃ—৬ জন। ২১ জন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বৃত্তিধারী আছে।

প্রঃ—চাষীরা এখানে এসে খবরাখবর নেয় কি?

উঃ—সর্ব্বদাই আসে। কতকগুলি প্রণালী তারা আস্তে আস্তে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ফেসিলিটী না থাকায় এগুতে পারছে না। সেইজন্য বিশ্বভারতী একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছে।

প্রঃ—গরুর মূত ছাড়া আর কোন সার দেন কি?

উঃ—প্রাণ মেহুর দিই, খরচ বিঘা প্রতি ছয় আনা।



পত্রিকা-জগৎ

"ষ্ট্যাটিষ্টিকাল জার্ণাল"

সংখ্যা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিক। ৯০তম ভাগের ৪র্থ খণ্ডে আছে—

(ক) ট্রেড্ এসোসিয়েশন ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স বা বাণিজ্যিক সঙ্ঘ সম্পর্কে হিসাব বা সংখ্যা-বিজ্ঞানের কথা। লেখক ই টি এলবোর্ণ বলিতে চান, বাণিজ্য জগতে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ট্রেড্ এসোসিয়েশনগুলি এতাবৎ সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে তারা আরও সাহায্য করিতে পারে। দরকার মন্ত্রগুপ্তি প্রথা" অর্থাৎ ব্যবসা বিষয়ে গোপন রাখার প্রথা উপ্‌ড়াইয়া ফেলা, পূর্ব্বাভাষ বর্ণনটাকে, উৎপাদন ও টান নির্ণয়কে, তত্ত্বাবধান ও বাজেট তৈয়ারিকে সকলে মিলিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো।

(খ) যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে করাদায়। ডি কারাডগ জোন্‌স সার এইচ্ ম্যামুয়েলের অনুসন্ধানটাকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কলুইন কমিটির রিপোর্টেরও উল্লেখ আছে। (১) পরিবারওয়ালা শহুরে কারিগর, (২) খাঁটি মধ্যবিত্ত পরিবার, (৩) নির্দ্দিষ্ট হারে বাঁধা উচ্চ আয়-ভোগী পরিবার—যুদ্ধের পূর্ব্বে ও ১৯২৫-২৬ সনে এই তিনের কে কতখানি আয়কর বাবদ্ দিতেছে, তার তুলনামূলক আলোচনা। সমাজ সেবার জন্য যে অর্থ আসিতেছে তারই বা কতখানি কোথায় পাওয়া যাইতেছে, সে অনুসন্ধানও আছে।

(গ) দুনিয়ার মুদ্রা-পুঁজি—আর এ লেফেলড্ট্।

"জার্ণ্যাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি"

শিকাগো হইতে প্রকাশিত অর্থশাস্ত্র বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৯২৭ আগষ্ট সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—

১। যোগান সম্বন্ধে থিওরেটিক্যাল জল্পনা কল্পনা। এইচ্ সুল্‌ট্‌জ্।

২। "কম্প্যারেটিভ কষ্ট" বা তৌল খরচ মতবাদ লইয়া সমালোচনা ও পরীক্ষা। কে সিম্পসন।

৩। আর্থিক সাহিত্যে "এন্‌টারপ্রেনার" বা ব্যবসা-ভসারী। সি এ টাটল।

৪। ১৯১০-২৫ সনে টাকা কিরূপ খাটান হইয়াছে। এ জি কুন্‌স্।

৫। বাসন-পত্রের ব্যবসায়ে ব্যবসা-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ। ডি কেনেডি।

৬। সর্ব্বসাধারণের হিতসাধক কার্য্যাবলীকে কি প্রকারে কৃতকার্য্যতার সহিত শাসনে রাখা যায়। সি ই ক্লার্ক।

"জাগরণ"

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক। বাঙ্গালার গণ-আন্দোলনের মুখপত্র নামে প্রচারিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২; দাম ১০ পয়সা মাত্র।

৩রা পৌষ ১৩৩৪, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৭। জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তার কয়েকটা কথা এইরূপ—

বাঙ্গালার এই ভাব মেরুমজ্জাগত। কি ধর্ম্মে, কি রাজনীতিতে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা ভাবপ্রবণতাকেই

শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি। কর্ত্তা কাঁদিলে আমরা ফুঁপাইতে থাকি, কর্ত্তা হাসিলে আমরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসি এবং কর্ত্তা ঘুমাইলে আমরা নাকে সরিষার তেল দিয়া শাঁক বাজাইতে থাকি। এই কর্ত্তাভজার ভাব আমাদের দেশের পরাধীনতার মূল কারণ। কোনও বিজ্ঞানসম্মত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কর্ম্মসংকল্প লইয়া আজও আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনও নেতা বা দল অবতীর্ণ হন নাই। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে যাঁহারা উঁচু ডাঙায় উঠিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহারা এখনও বুঝেন নাই যে, যে জলের প্রবাহে তাঁহারা উঁচুতে উঠিয়াছেন, সে জল আর তাঁহাদের নীচে নাই। নেতৃত্বের অভিমানী এই সকল নেতা কথা গাঁথিয়া হিন্দু মুসলমানের বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। জনসাধারণ যে তাঁহাদের হাতে আর নাই সে কথা একটিবারও তাহাদের মনে পড়ে না। বুর্জোয়া নেতাগণের উপর অবিশ্বাসী জনসাধারণ নিজের হাতে আইন গ্রহণ করিয়াছে। কোহাট হইতে আরম্ভ করিয়া পাবনা পর্য্যন্ত যত জায়গায় হিন্দু মুসলমান বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে—তাহার মূলে অর্থ নৈতিক কারণ, ইহা সাম্প্রদায়িক ঠুলি খসাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়। কোহাটে হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ায় হিন্দুদিগের ফিরিবার সর্ত্তের মধ্যে একটা সর্ত্ত ছিল যে, টাকার সুদ কম লইতে হইবে এবং পাবনার দাঙ্গায় সেই সকল চরের মুসলমানেরা অগ্রগামী হইয়াছিল যাহারা ধনীর অত্যাচারে ঘর ছাড়িয়া চরবাসী হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় হিন্দুমুসলমান বয়কট ভাঙিয়া ছিল কেন—কেহ কি খোঁজ রাখেন? কুষ্টিয়ায় মুসলমান কুলি না হইলে মাড়োয়ারী মহাজনের পাট বাঁধা ও শালকাঠ তোলা চলে না। তাই-বাহির হইতে হিন্দু কুলি আনিয়াও মাড়োয়ারীগণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া মুসলমানের সহিত আপোষ করিয়াছিল। নদীয়া জেলার পলাশীপাড়ার দাঙ্গা জমিদার ও প্রজার বিরোধ। কিন্তু এই সত্য স্বীকার করিলে রাজনৈতিক দল ভাঙিয়া যায়। বণিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই বণিকগণ খদ্দরের ভেক ধারণ করিয়া আজ নেতাগিরি করিতেছেন এবং বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের সহিত একটা আপোষ করিয়া জনগণের রক্তশোষণের সুবিধা দেখিতেছেন। তাই গান্ধীর নির্ব্বিবাদী খদ্দর তত্ত্ব ইঁহাদের গ্রাহ্য হইয়াছে। জগতে যত শান্তিবাদী ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছে, সকলকালের সকল শ্রেণীর বণিকগণ তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রেষ্ঠীদের অচল আস্থা ছিল। মহাত্মার খদ্দর-ধর্ম্মে আজ বণিককুল বিশ্বাসী এবং ইংরেজরাও ক্রমশঃ বিশ্বাসী হইতেছে।

রয়েল কমিশনে ভারতীয় বণিককুলের কাহাকেও লওয়া হয় নাই বলিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ভিতর একতার গন্ধ পাইয়া আমাদের নেতাগণ কত সুখস্বপ্নই না দেখিতেছেন! কিন্তু একতা যাহারা অনুভব করে তাহারা সকলেই ভারতের জনগণের রক্তশোষক।

রয়েল কমিশনে ৭ জন ধলা কি ৭ জন কালা মেম্বর থাকিবে তাহাতে জনগণের কিছুই যায় আসে না। দলিত শ্রেণীর জন্য লর্ড বার্কেনহেডের যে দরদ, আমাদের নেতাদেরও সেই দরদ। লর্ড বার্কেনহেড আইরিশ স্বাধীনতার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন ও পণ্ডিত মতিলাল জমসেদপুরে বলিয়াছিলেন—কুলীর বাচ্চা কুলী।

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন যে বাঙ্গালার একমাত্র সমস্যা রাজবন্দীদিগকে মুক্ত করা। যুদ্ধে অগ্রসর সেনানী যদি বন্দীদিগের মুক্তিকেই লক্ষ্য করে, এবং দুর্গ জয় অপেক্ষা বন্দীর মুক্তি বা মৃত সৈনিকের সৎকার কয়া বেশী বলিয়া মনে করে—তাহা হইলে যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। যাহারা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের প্রথম কামনা নিজের মুক্তি নহে, তাহাদের চরম কামনা দেশের মুক্তি। সে মরিয়া যাক্, দেশের লোক না দেখুক, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।

যদি এই আত্মত্যাগীরা খবরের কাগজের প্রশংসা ও আলোচনার প্রার্থী হন এবং নেতারা ক্রমাগত তাহাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টায় থাকেন এবং গভর্মেণ্টকে দোষারোপ করেন যে বিনাবিচারে বিনা অপরাধে বন্দী করিয়া জামাই আদরে রাখিতেছেন না তাহা হইলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অপ্রাকৃত বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

ঘোরতর আন্দোলন ও বৃটিশ পণ্য বয়কট এই দুইটী অমোঘ অস্ত্র সব নেতাই প্রয়োগ করিতে চাহেন। জনসাধারণ কি শুধু বুঝিতে পারে নাই বলিয়া আজ বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতেছে না? আর নেতাগণ বলিয়া দিলেই অমনি তাহারা লাগিয়া যাইবে—এরূপ কোনও সম্ভাবনা আছে কি? অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং নিজের অধিকার লাভের আশা না থাকিলে জনগণ কোনও দিনই নেতাদের কথা শুনিবে না, এ কথা কেন ভাবা হয় না? যাঁহারা এই কথা ভাবিতে পারেন যে, ভারতের ও বৃটেনের স্বার্থ-সামঞ্জস্য এত সহজে হইতে পারে—তাঁহারা যে বৃটেনেরই সমস্বার্থভাগী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ভারতের সমস্যা রয়েল কমিশন নয়, বাঙ্গালার সমস্যা রাজবন্দীর মুক্তি নয়, আজ দেশের সমস্যা—জনগণের স্বার্থসংরক্ষণ ও প্রসারণ-মূলক কর্ম্মসংকল্প লইয়া ইম্পিরিয়েলিজ্‌মের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা।

"ময়মনসিংহ সমাচার"

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক। ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৭।

পল্লীসংস্কারে বাংলা সরকার

বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই বাঙ্গালার পল্লীসমূহের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণ। বাঙ্গালা এককালে নদীমাতৃক দেশ ছিল—"সুজলা সুফলা" বাঙ্গালা একদিকে যেমন স্বাস্থ্যপূর্ণ অপর দিকে তেমনি "ধনধান্যপূর্ণ" ছিল। নৈসর্গিক নিয়মে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বাভাবিক জলাশয়গুলি হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় একদিকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অপর দিকে বিবিধ রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া বাঙ্গালাকে দিন দিন ধ্বংসের পথে চালিত করিতেছে। সুতরাং পল্লী সংস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই পল্লীতে পল্লীতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করা।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের বর্ত্তমান মন্ত্রী স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য একটী স্কিম কল্পনা করিতেছেন। এবং এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান প্রভৃতিকে নিয়া বিগত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে বাঙ্গালার লাট প্রাসাদে এক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কন্‌ফারেন্সে বাঙ্গালার গবর্ণর, তৎসদস্য ও মন্ত্রিগণ, বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা ডাঃ বেণ্টলী এবং বিভিন্ন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় গবর্ণর স্যার ষ্টান্‌লী জ্যাকসন এই কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি এই অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়াছেন যে জলাভাবই পল্লীর প্রধান সমস্যা এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করাই বাঙ্গালার পক্ষে বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। তিনি আরও জানান যে গবর্ণমেণ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণের মারফতে আড়াই লক্ষ টাকা এই বাবদে জিলা বোর্ডসমূহকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মন্ত্রী স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বাহাদুর মূল প্রস্তাবটী কন্‌ফারেন্স সমক্ষে উপস্থিত করা উপলক্ষ্যে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে তিনি বলেন যে, বাঙ্গালা সরকার ও জিলা বোর্ডসমূহের হস্তে এ কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ নাই। তজ্জন্য ঐ উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এক কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিলে তাহার সুদ বার্ষিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হইবে। গত ১৩২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা বোর্ড মফঃস্বলে জল সরবরাহের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। প্রস্তাবিত এক কোটি টাকা ঋণের সুদ সাড়ে সাত লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে দিলে সরকার প্রদত্ত আড়াই লক্ষ টাকা নিয়া উক্ত ঋণের সুদ পরিশোধ হইয়া যাইবে।

আলোচনা অন্তে কন্‌ফারেন্সে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ৩টি গৃহীত হইয়াছে:—

(১) এই কন্‌ফারেন্স পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহার্থ ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য সুপারিস করিতেছেন।

(২) এই জন্য গবর্ণমেণ্ট যে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন তজ্জন্য এই কন্‌ফারেন্স গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতেছেন। কিন্তু উক্ত সাহায্য অপর্য্যাপ্ত বলিয়া

বিবেচিত হওয়ায় সাহায্যের টাকা বাড়াইয়া দিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) গবর্ণমেণ্টই ঋণ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু পরে জিলা বোর্ডসমূহের সহিত পরামর্শক্রমে টাকা বণ্টনের জন্ত যে নীতি স্থিরীকৃত হইবে, সে নীতি অনুসারেই জিলায় জিলায় টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত হইলে বাঙ্গালার পল্লীসমূহের জলাভাব যে কতকাংশে দূরীভূত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্যার প্রভাস মিত্র মহোদয়ের প্রস্তাবিত স্কিমে নূতন কূপ-পুষ্করিণী খনন ও নলকূপ বসানের পরিকল্পনাই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার জলকষ্ট দূর করিতে হইলে শুধু কূপ, পুষ্করিণী খনন করিলেই সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। নদী প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয়গুলিরও সংস্কার করা কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা একদিকে যেমন পানীয় জলের ব্যবস্থা হইবে, অপর দিকে তেমন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ বীজ অন্তর্হিত হইয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধিত হইবে। আশা করি স্যার প্রভাস, গবর্ণমেণ্ট ও জেলাবোর্ডসমূহের সহিত পরামর্শ করতঃ এই অত্যাবশ্যক বিষয়টীও তাঁহার স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাঙ্গালার জল সরবরাহের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে করিতে সচেষ্ট হইবেন। অবশ্য এই জন্ত আরও অনেক বেশী টাকা আবশ্যক। কিন্তু বিষয়টীর গুরুত্ব বিবেচনায় ইহা করাও নিতান্ত দরকার।

"বঙ্গরত্ন"

১০ই পৌষ ১৩৩৪, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৭।

চিকিৎসকদিগের মজলিস

এই সপ্তাহে (ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহে) কলিকাতায় এক চিকিৎসকের মেলা বসিয়াছে। পৃথিবীর নানাদেশ হইতে প্রায় ৯ শত চিকিৎসক আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। উষ্ণপ্রধান দেশের ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্ত সুদূর প্রাচীতে যে এক প্রতিষ্ঠান আছে, তাহারই উদ্যোগে গত ২০ বৎসর কাল প্রাচীর নানা দেশে চিকিৎসকদিগের এইরূপ একটি সম্মিলন হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে ইহাদিগের এই প্রথম সম্মিলন। এ স্থলে বলা আবশ্যক, পাশ্চাত্য এলোপাথিক মতের চিকিৎসকগণই এই সম্মেলনের পরিচালক। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় বা য়ুনানী মতের চিকিৎসকগণ এই মজলিসে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ নহেন। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সার ষ্টানলী জ্যাকশন এই মজলিসে সমাগত চিকিৎসকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার উপলক্ষ্যে এ দেশের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার প্রাচীনত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন; এবং যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এ কথাও সমাগত চিকিৎসকমণ্ডলীকে বিদিত করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থপ্রণেতারা যে সকলের সম্মান-ভাজন, সে কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত ভেষজ সকল উষ্ণ দেশের উপযোগী কি না এবং বর্ত্তমান কালে সেই সকল ভেষজের গবেষণা প্রয়োজন কি না সে বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই। এ দেশে য়ুনানী মতের চিকিৎসা এক সময়ে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সার ষ্টানলী জ্যাকশন সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। তিনি বৈদিক কালের চিকিৎসার কথা বলিয়া একেবারে ইংরেজ আমলের টাইমথি, লুইস, ক্যানিংহাম এবং মেজর রোণাল্ড রস ও সার লিওনার্ড রজার্স প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তির কারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেন।

বাঙ্গালা দেশের স্থায় অস্বাস্থ্যকর দেশ যে এই সারা ভারতবর্ষে আর নাই, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব এইরূপ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন চিকিৎসকগণের চেষ্টায় বাঙ্গালার রোগ নিবারণের যদি একটা উপায় হয়, তাহা হইলে এই চিকিৎসক সম্মিলন অকারণ হইবে না। কিন্তু এতাবৎ এই শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের যে সকল বৈঠক হইয়া গিয়াছে, সে সকলের দ্বারা দেশের ব্যাধি নিবারণের কোন সহায়তা হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এ দেশের পাশ্চাত্য মতের চিকিৎসকদিগের এক মজলিস হইয়াছিল।

তাহাতে এদেশবাসীদিগকে দুগ্ধ জাল দিয়া ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা শিখাইবার জন্য একটি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল।

বাঙ্গালার লাট এই উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন, ইংরাজ-শাসনের প্রথম কাল হইতে সাধারণ স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগের সম্মতি অনুসারে প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করাই সরকারের চিরন্তন নীতি। আমরা গবর্ণরের এই উক্তির অনুমোদনে অসমর্থ। এ দেশে যখন প্রথম রেলপথের বিস্তার হইয়াছিল, তখন কি দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল? বিদেশী বণিকদিগের ব্যবসায়-প্রসারের দিকে তখন কর্তৃপক্ষের এত আগ্রহ ছিল যে, রেলওয়ের বাঁধে দেশের জল-নিকাশে বিঘ্ন ঘটিবে এবং তাহার পরিণাম বিষময় হইবে, তাহা ভাবিবারও তাঁহারা অবসর পান নাই। তাহার পর যখন রেলওয়ে নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে মহামারী উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতীকারের নির্দ্ধারণ জন্য কমিশন বসিল, তখন রাজা দিগম্বর মিত্রের ন্যায় বহুদর্শী বাঙ্গালী রেলওয়ের ও অন্যান্য বড় বড় রাস্তার উচ্চ বাঁধে দেশের স্বাভাবিক জল-নিকাশে বাধা পড়িতেছে ইহা প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই। অদ্যাপিও সেই হেতু ও অন্যান্য কারণে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হইতেছে। তবে ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ জন্য কিছুকাল হইতে কুইনাইন ব্যবহার করিবার জন্য লোকদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা যে দারিদ্র্যবশতঃ লোকে সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে না, এ কথা কর্তৃপক্ষীয়ের অগোচর নাই। এই দারিদ্র্যের জন্যই এ দেশের জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অন্যান্য সভ্যদেশের অপেক্ষা অনেক কম। ওলাউঠা বা কলেরা এবং কালাজ্বর প্রভৃতি ইংরাজের আমলেরই ব্যাধি। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের পল্লীগ্রামের লোক ওলাউঠা কাহাকে বলে জানিত না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর কালাজ্বর আসাম হইতে হালে আমদানি। বাঙ্গালার পথ ঘাট সংস্কার ও পানীয় জল প্রভৃতির সুব্যবস্থার জন্য যে সময় হইতে বাঙ্গালায় পথকর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন হইতে ঐ কর যদি পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কারে নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে পল্লীগ্রামসমূহ আজিকার মত পরিষ্কার পানীয় জলের অভাবে ওলাউঠা রোগের আগার হইয়া দাঁড়াইত না। তাহার পর ওলাউঠা, কালাজ্বর প্রভৃতির প্রকোপ নিবারণের জন্য অধুনা যে টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা প্রতিরোধক হইলেও রোগের যাহা মূল কারণ, তাহা দূর করিতে না পারিলে কোন ফলোদয়েরই সম্ভাবনা নাই। এই এত বড় বাঙ্গালা দেশের সহরঘেঁসা কতকগুলি স্থান ব্যতীত ঐ টীকা দিবার সুবিধাই বা কোথায় আছে? এই চিকিৎসক সম্মিলনীতে যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের পল্লীগ্রাম অঞ্চল পরিদর্শনে যাইবেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহারা যদি তাহা করেন তাহা হইলে তাহাতে এক দিকে তাঁহাদিগের গবেষণার যেমন সুবিধা হইবে, তেমনই এই জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত ভারতবর্ষের আদর্শ প্রদেশ স্বাস্থ্য বিষয়ে অন্যান্য দেশের কিরূপ পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহার চাক্ষুষ পরিচয় পাইবেন।

এ দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে যে বিশেষ কিছুই করা হয় নাই, তাহা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মেজর জেনারেল সাইমন্‌স মনে মনে বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সমাগত চিকিৎসকদিগকে বলিয়াছেন, "আপনারা যখন পরিদর্শনে বাহির হইবেন, তখন হয় ত সময়ে সময়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ও স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্যপ্রবর্ত্তনে আরও অনেক করা যাইত।" এ দেশের চিকিৎসকগণও সে কথা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু হইলে কি হইবে, দেশের লোক কোন সাহায্য করে না, কেহ একটা হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিলে তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দেয় না। এইরূপ বাঁধি কথা বলিয়া সরকার কর্ত্তব্য উড়াইয়া দিয়াছেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি না, এইরূপ একটা জটলা করিবার প্রয়োজন কি। বহু দিন হইতে এইরূপ মজলিসের ব্যর্থতা দেখিয়া আমাদিগের আর নূতন কোন বিষয়ে আস্থা বা উৎসাহ জন্মে না। তথাপি যদি

তাহাতে দেশের কোন ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের আনন্দের অবধি থাকিবে না।

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"

ইং ১৯২৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজ বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্রুত প্রচারিত হইয়াছে। ইংরাজ সরকারী বেতার সেই সংবাদ প্রচারের সূত্রপাত করিয়াছে এবং ধনকোষের আয়-ব্যয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ মিঃ এ এম সামুয়েল এবং সমস্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানগণ সেই মতে মত দিয়াছেন। এমন কি অর্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ সতর্ক "ইকনমিষ্ট" সংবাদ পত্রও এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে সাহসী হইয়াছেন যে, গত দশ বৎসরের চেয়ে আমাদের বেশী আস্থা আছে। এই আনন্দের অনেক কারণ আছে। বাণিজ্যে শান্তিস্থাপন যদিও খুব বেশী অগ্রসর হয় নাই, তবুও সে বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উঠিবার কোন কারণ নাই। আয়-ব্যয়ের হিসাবে করদাতাগণের উপর আর নূতন কর ধার্য্য করিবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ নির্ব্বাচনেরও কোন কথা উঠিতে পারে না। ইয়োরোপ এই শান্তি স্থাপনে প্রকৃতই ইচ্ছুক। যুদ্ধের পর সর্ব্ববিষয়ের যে উচ্চ মূল্যের প্রবাহ বহিয়াছিল তাহাও নাবিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সাধারণ হিসাব অপেক্ষা বেশী শস্য আশা করা যাইতেছে। আমেরিকা কেবল সমৃদ্ধিতেই শীর্ষস্থান অধিকার করে নাই, পৃথিবীর আর্থিক প্রয়োজনীয়তায় মুক্তভাবে কার্য্য করিতেও তারা ইচ্ছুক; এবং দক্ষিণ আমেরিকা এ বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছে। ফলকথা, সমস্ত দেশই আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু না কিছু উন্নতির সীমায় পৌছিয়াছে। ইতালী তাহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য কমাইয়াছে এবং ফ্রান্স তাহার মুদ্রার মূল্য এক বৎসরের জন্য স্থির রাখিয়া একটা সাধারণ মূল্য নির্দ্ধারণে অগ্রসর হইয়াছে। সংবাদদাতাগণ যে বাণিজ্যের শুভ সংবাদ প্রচার করিবে এবিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি?

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিষ্টার টেনেন্ট আরও বলিয়াছেন যে, বিলাসিতার সমস্ত সামগ্রীকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছে এবং জীবিকার স্তরকে মহার্ঘ করিয়া দিয়াছে। তুলার কাপড়ের পরিবর্ত্তে নকল রেশমী কাপড়ের নিত্য ব্যবহারে নূতন ব্যবসার বৃদ্ধি হইয়াছে। মোটর গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু সহস্র লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হইতেছে। ব্যয়ে কিঞ্চিৎ মুক্তহস্ততায় সাধারণ অবস্থার উন্নতির সহায়তা করে। স্যার হ্যারী গসেন ধনবৃদ্ধির উপায়ের নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালায়ও চলচ্চিত্রালয়ে পূর্ব্বে কখনও এত ভিড় হয় নাই। খুচ্‌রা দোকান সকল দিন দিন চাকচিক্যময় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। এবং অন্যান্য ভাবেও বাণিজ্যে বহু লক্ষ মুদ্রা মূলধন রূপে পাওয়া যাইতেছে। ইহার অন্য একটা দিকও আছে। লক্ষাধিক শ্রমজীবী এখনও বেকার অবস্থায় আছে এবং ইহার এক চতুর্থাংশ খনির শ্রমজীবী। কতকগুলি প্রধান ব্যবসায় এখনও হীনাবস্থায় পড়িয়া আছে। তুলার ব্যবসায়ের অসীম দুর্গতির কথা শুনা যায়। পশমের ব্যবসায়ও তত উন্নত নয়। সুতরাং এ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। এই অবস্থা ফিরিবার বহু লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দূরীভূত হইবার পূর্ব্বে ইহার বহু সংস্কার আবশ্যক।

ইংলণ্ডের বাণিজ্যে সমৃদ্ধির দুটী কারণ আছে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য। অন্তর্ব্বাণিজ্য প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যও পুনঃস্থাপনের যথেষ্ট ভরসা আছে। মিঃ সামুয়েলের হিসাবে ১৯২৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড যেমন অন্তর্ব্বাণিজ্যে ও বহির্ব্বাণিজ্যে ১২ লক্ষ পাউণ্ড লোকসান দিয়াছে, তেমনি ১৯২৭ খৃঃ অব্দে ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড লাভ করিবে। এ সকল সংখ্যা মোটামুটী হিসাবে বলা যাইতে পারে। মিঃ কেইন্‌স্‌ চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, লোকসান পূর্ব্বে কখনও হয় নাই এবং এবার অন্য বার অপেক্ষা বেশী লাভ হইবে। প্রকৃত অবস্থা যাহাই হউক বিদেশের নিকট ইহার মোট 'লাগান' দেখিয়া ইহা সহজেই অনুমান হয় যে উত্তমর্ণ হিসাবে ও বিগত যুদ্ধের সময়ে বিক্রীত ধন সম্পত্তির বিদেশী

প্রতিভূ হিসাবে ইংলণ্ড পুনরায় তার পূর্ব্ব স্থান অধিকার করিতেছে। কালে এই সমস্ত লাগান অর্থ ইহার বহির্ব্বাণিজ্যের সহায়তা করিবে। এই ভাবে অল্পকাল মধ্যে বেশী লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যে টাকা থোক ভাবে লাগান যায়, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোট হিসাবে সুদ রূপে ফিরিয়া আসে। মূলধন মোট রূপে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে খুব কমই দেখা যায়। মোট কথা, ইহাই আশা করা যায় যে ১৯২৮ খৃঃ অঃ মোটামুটি হিসাবে সমৃদ্ধিশালী বৎসর হইবে। এবং বাণিজ্যে শান্তি স্থাপনের পর এই বৎসরই প্রথম বাণিজ্যে উন্নতি দেখা যাইবে। এখন ইংলণ্ডের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে তাহার বিপুল ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া। সম্প্রতিকার আলোচনাতে এবিষয়ে কিছু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ের সাফল্যে ইহাই বোঝা যাইতেছে যে শান্তি স্থাপনের প্রথম সাত বৎসরই সব চেয়ে খারাপ যাইবে।

"কৃষক"

গোজাতির উন্নতি

উৎকৃষ্ট জাতির ষাঁড়।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট গোজাতির উন্নতিকল্পে ঢাকা এবং রংপুরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। রংপুরে দুইটী বিভিন্ন জাতি আছে। (১) স্থানীয় গাভী,—নির্ব্বাচন দ্বারা এই দলের প্রত্যেকটীর ৩০০ দিনের দুগ্ধের পরিমাণ সর্ব্বনিম্নক্রমেও ২,৫০০ পাউণ্ড (বা দৈনিক ⁄৪ চার সের) পর্য্যন্ত উঠিয়াছে (২) দেশী এবং "হিসাব" সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি,—অধিক দুগ্ধ প্রদানকারী গাভী হইতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জাতির ষাঁড় দ্বারা প্রজনিত করিয়া এই দলেরও প্রত্যেকটীর সর্ব্বনিম্নক্রমে দুগ্ধের পরিমাণ ২,৫০০ পাউণ্ড (বা দৈনিক ⁄৪ সের) পর্য্যন্ত হইয়াছে। ঢাকাতে একটি ভাল সিন্ধি গরুর জাতি পালিত হইতেছে। সেখানেও এইরূপেই কাজ হইতেছে।

ইহা আরও দেখা যাইতেছে যে, দেয় দুগ্ধের এই নিম্নক্রম শীঘ্রই আরও বাড়িবে। এই সকল গাভী হইতে উৎপন্ন ষাঁড় সাধারণে বিক্রয় করা হয় আর এই সকল ষাঁড়ের কাটতি এবং চাহিদাও বাড়িতেছে।

খাদ্যশস্য।—দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাপ্রকার খাদ্যশস্যের পরীক্ষা দ্বারা খাদ্যশস্য সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান করা হইতেছে। কৃষিবিভাগ হইতে তন্মধ্যে কোন্‌গুলি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহা পরে লিখা হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইতেছে। ভাল গরু এবং খাদ্যের মীমাংসা গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়া দিতেছেন এখন এবিষয়ে জনসাধারণ নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া জাগিয়া উঠিলে তবেই কার্য্য অগ্রসর হইবে। গরুকে পেট ভ'রে খাওয়ান কেবল দয়ার কাজ নহে, তা'থেকে লাভ হবার সম্ভাবনা আছে, এটা মনে রাখিও।

ভালজাতির গাভী বা ষাঁড় দেশের মধ্যে বিলি হ'লে যদি সেখানে তাদের অনাহারে মরিতে হয় তবে তাহাতে লাভ কি? গ্রামে গ্রামে সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। তাঁরা সমস্ত সাধারণ লোককে ভাল গোজাতির সৃষ্টি, রক্ষা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সম্যক্ বুঝাইয়া দিবেন। তবেই গোজাতির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবে এবং দেশের উপকার সম্ভবপর হইবে।

এইরূপ সমিতি আছে এবং ক্রমশই গঠিত হইতেছে। কৃষিবিভাগ দ্বারা গঠিত গ্রাম্য কৃষিসমিতি দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে চলিতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই সকল সমিতি নিম্নলিখিত উপায়ে কার্য্য করিতে পারেন:—

(ক) এ বিষয়ে সাধারণ লোকের জ্ঞান-বৃদ্ধি ও শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত;

(খ) কৃষিবিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট ষাঁড় কিনিয়া গৃহস্থের গাভীগুলিকে তদ্দ্বারা প্রজনন করান। এই উদ্দেশ্যে ভাড়া লওয়া যাইতে পারে;

(গ) গরুর খাদ্যের জন্য খইল, কলাই প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যগুলি পাইকারী দরে খরিদ করা;

(ঘ) খারাপ ষাঁড়গুলি যাহাতে বৎস উৎপাদন করিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত করা। যথা, দামড়া করা;

(ঙ) খাদ্যশস্যের উপকারিতা প্রমাণ জন্য পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন করা;

(চ) বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক গোপালন প্রথা লোককে দেখান। যথা, থাকিবার ঘর, দলাই মালাই, ঔষধ ছিটাইবার যন্ত্রের ব্যবহার। ইত্যাদি।



জন্মশাসন

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত ; ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সংঘ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা বার আনা।

বইখানিতে লেখক জন্ম-সংরোধের আবশ্যকতা ও উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার গোড়াপত্তনেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, জাতিগত ভাবে না হউক অন্ততঃ শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে জন্মশাসন যে অত্যাবশ্যক তাহা সরল-বুদ্ধি লোকেরও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেখক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং অঙ্কপাতের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, অর্থ নৈতিক অবস্থা দৃষ্টে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই জন্ম সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য, নতুবা উক্ত শ্রেণীর দুর্দ্দশা কেবলই বাড়িতে থাকিবে।

জাতিগত ভাবেও জন্মশাসনের আবশ্যকতা আছে। সেই জন্যই টমাস্ রবার্ট ম্যাল্‌থাস্ নামক জনৈক খ্যাতনামা ইংরেজ দেশের উৎপাদিকা শক্তির সহিত মানুষের উৎপাদিকা শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিতে বলিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ম্যালথাস তাঁহার প্রিন্সিপল্ অব্ পপুলেশন্ গ্রন্থে এই মূল সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান যে, প্রকৃতি যেমন হারে প্রাণী বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছেন, সেইরূপ হারে যদি এ পর্য্যন্ত অবাধ প্রাণী-বৃদ্ধি চলিতে থাকিত, তাহা হইলে এই পৃথিবী ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া যাইত, তিলধারণের আর জায়গা থাকিত না। কিন্তু এক দিকে তিনি যেমন সৃষ্টি বাড়াইয়া যাইতেছেন, অন্যদিকে তেমনি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, যুদ্ধ প্রভৃতি সৃষ্টিধ্বংসী অভিসম্পাত প্রেরণ করিয়া এই বৃদ্ধিকে স্থগিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে এই মূল সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি এক নূতন তথ্য সমাবেশ করিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক ধ্বংস শক্তির প্রভাব সত্ত্বেও বর্ত্তমান পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২৫ বৎসরে দ্বিগুণিত হইতে পারে, অথচ এই অনুপাতে খাদ্য বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি অসম্ভব, সুতরাং জন্মবৃদ্ধি সংযত করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ; অন্যথা দারিদ্র্য এবং অকাল-মৃত্যু লোক-সমাজকে বিধ্বস্ত করিবে।

কিন্তু লোকসংখ্যা নিয়মিত করিবার ব্যবহারিক উপায় সম্বন্ধে ম্যাল্‌থাস্ কেবলমাত্র এই বলিয়াছেন যে উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান না করা পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখা, এবং প্রয়োজন মত অল্পসংখ্যক সন্তান জনন করিয়া অবশিষ্ট কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু ম্যাল্‌থাসের নির্দ্ধারিত এই অবশ্যম্ভাবী সমাজ-বিপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ না থাকিলেও পরবর্ত্তী কালের সমাজ-তত্ত্ববিদেরা ম্যালথাসের অনুমোদিত প্রতিকার পদ্ধতি অস্বাভাবিক না হইলেও অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস্ প্লেসের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অভিমত এই যে, সম্যক্ স্বাস্থ্য রক্ষা পূর্ব্বক সন্তানসংখ্যা নিয়মিত করিতে পারিলেই ম্যাল্‌থাসের উল্লিখিত স্বাভাবিক বিপর্য্যয়গুলি প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। ফ্রান্সিস প্লেস কোন গর্ভসংরোধক কৃত্রিম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। ইহার ফলে যে মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা

"নিউম্যাল্‌থুজিয়ানিজম্‌" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অভিনব মত অনভীপ্সিত সন্তান জনন প্রতিরোধ করিবার জন্য কৃত্রিম প্রক্রিয়া অবলম্বন করা সমর্থন করিয়া থাকে। এই মতবাদ নানা প্রকার বিপক্ষ যুক্তি এবং আইনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান জগতে অধিকাংশ সভ্য দেশেই নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া এই মতবাদ প্রচার হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ জাতিগত ভাবে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকিলে কোন প্রকার কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান বাস্তব জীবন যে কারণেই হউক এই আদর্শ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িতেছে। এদিকে আমাদের জনপ্রতি দৈনিক গড় আয় দুই আনাতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তথাপি প্রতি ঘরে বৎসরের পর বৎসর পুত্র কন্যা জন্মিতেছে প্রবল বন্যার ন্যায়।

১৯০১ সালে আদম্‌ সুমারে ভারতের লোকসংখ্যা প্রকাশ পায় কিছু বেশী ২৮৩½ কোটি। ১৯১১ সালে উহা বাড়িয়া হয় ৩১ কোটি ১৪½ লক্ষ। ১৯২১ সালের লোক গণনায় দেখা যায় উহার উপর আরও ৫৫ লক্ষ লোক বাড়িয়াছে। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন কোটি লোক বাড়িয়াছে; অর্থাৎ শতকরা প্রায় সাড়ে নয় জন করিয়া বাড়িয়াছে। এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সঙ্গে সঙ্গে অবাধ অপত্য উৎপাদনের ফলে দেহবল, মনোবল, ধনবল কমিয়া যাইতেছে। দুনিয়ার সকল জাতির সহিত টক্কর দিতে যাইয়া আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিতেছি। "শুধু জনবল বৃদ্ধি পাইলেই জাতির উন্নতি সূচিত হয় না, তাহার সহিত বুদ্ধিবল, ধনবল ও দেহবল চাই।" দেশের ধনসম্পদ্‌ বাড়িবার তুলনায় লোকসংখ্যা যদি বেশী বাড়িতে থাকে তাহা হইলে আমাদের দারিদ্র্য বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। ধনসম্পদ্‌ বাড়াইবার জন্য যেমন আমাদের মাথা ঘেলিতেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জাতির নাভিশ্বাস স্বর্গের বাতি দেওয়াইবার লালসা ত্যাগ করিয়া অবাধ অপত্য উৎপাদন সংরোধ করিবার সমস্যাও ভাবিতে হইবে। গ্রন্থকার তাই বলিয়াছেন "পরিপূর্ণ জীবন, পরিপূর্ণ সমাজ, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই ত জাতির চরম পরিণতি। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে আমরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছি, এক্ষণে সৃষ্ট জীবগুলিকে কেমন করিয়া মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও অকালমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতেই পারি, তাহাদের মনুষ্যত্বলাভের পথে কতটা আন্তরিক সহায়তা করিতে পারি, জীবনের অন্তবিধ পরিপূর্ণতা অর্জ্জনের দিকে কত বেশী যত্নবান হইতে পারি, তাহাই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে"।

কিন্তু আমাদের দেশের তথাকথিত নীতি সংস্কার এতই প্রবল যে আমাদের দেশে এই মতের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হইবে না। কিন্তু সামান্য অন্তর্দৃষ্টির ফলেই ইহা প্রমাণিত হইয়া যায় যে গর্ভ সংরোধ সকল সময়ে ও সর্ব্বাবস্থায় নীতি-বিরুদ্ধ নহে। প্রতি বৎসর কতগুলি সন্তানের জন্ম দিয়া দায়িত্ব-হীনতার চরম দেখাইবার পর তাহাদের মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিয়াও যে দেশের লোক কর্ম্মবাদের দোহাই দিয়া গলাবাজী করে, সে দেশের সমাজনীতি যে শুধু দোষাবহ তাহাই নহে, ভয়াবহও বটে। জন্মশাসন এই সব দৃষ্টান্তের আলোকপাতে বহুল পরিমাণে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একস্থানে বলিয়াছেন "জন্মশাসন দুইদিক্‌ দিয়া অপত্যস্নেহের পরিচয় দেয়, জগতে যাহারা আসে নাই তাহাদের রক্ষা করিয়া এবং যাহারা আসিয়াছে এতদ্বারা তাহাদিগের মানুষ হইবার সুবিধা করিয়া দিয়া"।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে জন্মশাসনের সকল প্রকার উপায়ই সহজ ও সুন্দর ভাবে সকলের সুবোধ্য করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সাধারণের আর একটা উপকার করিয়াছেন—জন্মশাসনের বিপক্ষ মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুযুক্তির সহিত বিস্তার করিয়া। এই আলোচনায় প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রমাণও দাঁড় করাইয়াছেন। ধ্বংসপথযাত্রী দরিদ্র বাঙ্গালা দম্পতীর সাহায্য-কল্পে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া বসু মহাশয় সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করি পুস্তক খানির বহুল প্রচার হইবে।

বর্ত্তমান ইতালির সমস্যা

নানা কারণে আজ কাল যে সকল দেশের দিকে

দুনিয়া তাকাইয়া আছে তন্মধ্যে ইতালি একটি। বর্ত্তমান ইতালিকে বুঝিবার জন্য কন্‌ষ্টান্‌টাইন্ ই ম্যাক্ গুইব্ একখানা কেতাব লিখিয়াছেন। কেতাবের নাম "ইতালির আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক স্থান"। প্রকাশক নিউ ইয়র্কের ম্যাক্ মিলান কোম্পানী। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮+৫৮৮। দাম ৩ ডলার। কেতাব প্রকাশিত হইয়াছে ১৯২৬ সনে।

সনের দিকে তাকাইলে বলিতে হইবে যে এটা আধুনিক কেতাব নয়। কারণ তারপর এই এক বৎসরের ভিতর ইতালিতে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে ও ফলাফল দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ আজিকার দুনিয়ার সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পুস্তককেই অসম্পূর্ণ জ্ঞান করিতে হইবে।

এই কেতাবটাতে ইতালির আর্থিক সমস্যাগুলির কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। সমস্যাগুলি বড় সোজা নয়। কিন্তু ইতালির বড় সাধ সে বড় হইবে, ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সঙ্গে একাসনে বসিবে। তার সকল প্রকার কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্যেই এই মনের বাসনাটা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। তাতে কেহ বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেছে, কেহ বা ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হইতেছে, অন্য কেহ বা বাহবা দিতেছে।

ইতালির বড় হওয়ায় বাধা

কিন্তু ইতালির শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জনের পথে বাধাটা কি? বাধা বিস্তর। এখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বাধার বিষয় আলোচনা করিবার দরকার নাই। আর্থিক প্রতিবন্ধকগুলি একে একে বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্। ম্যাক গুইব নিজে একজন অর্থশাস্ত্রী। সুতরাং তিনি এই দিক্ হইতেই কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

ইতালির প্রথম বাধা কয়লা সম্পদে হীনতা। আজিকার দুনিয়ার ব্যবসা জগতে প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে কয়লা রূপ অস্ত্রটা যথেষ্ট পরিমাণে হাতে থাকা চাই। ইতালির তা নাই। প্রতি বছর ১ কোটি টন করিয়া কয়লা ইতালিকে বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়।

তারপর তেল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে একটা বড় চীজ্। ইতালি এবিষয়েও কাণা। প্রতি বছর ৬½ লক্ষ টনের উপর পেট্রোলিয়াম আমদানি না করিলে চলে না।

ইতালি অবশ্য কয়লার অভাবটা অন্য উপায়ে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে। জল-শক্তির ব্যবহার হইতেছে। অর্থাৎ কয়লার যে কাজ পাওয়া যায় জল বিদ্যুতের সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিবার ধান্দা ইতালির মাথায় ঢুকিয়াছে। ১৯২৫ সনে এইরূপে প্রায় ২০ লক্ষ কিলো পাওয়া গিয়াছে। আগামী ৩ বছরে আরও ২½ লক্ষ পাওয়া যাইবে বলিয়া ভরসা আছে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই জল-শক্তি অসীম নয়। ইতালি শুধু জল-শক্তির সাহায্যে তার সকল অভাব মিটাইতে পারিবে না।

ইতালির কৃষি

ইতালির কৃষির দিকে তাকাইলেও অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ, এদিকে ভারতের অবস্থা ইতালির সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইতালির জমিতে অতি-কষ্টে কৃষকদের ভরণপোষণ হইতেছে। অর্থাৎ যত জমি দরকার তার চেয়ে জমির পরিমাণ ঢের কম। কাজেই কৃষককুলকে কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

এদিকে মুসোলিনী বলিতেছেন, "ইতালির বুকে ৬ কোটি লোক দেখিতে চাই।" এই ৬ কোটি লোক থাকিবে কোথায়? খাইবেই বা কি? ১৯২৩ সনে ইতালিতে সমস্ত জমির মাত্র ৪৬·৯% কর্ষণযোগ্য ছিল। অশেষ সাধ্য সাধনা করিলে ইহা ৪% র কিছু বেশী বাড়ান যাইবে। কিন্তু তাতে ইতালির কৃষি-সমস্যার সমাধান হইবে না।

ইতালি ও আমেরিকা

ইতালির ধন-সম্পদ্ সম্বন্ধে খোঁজ খবর লওয়ায় আমেরিকার স্বার্থের কথাটা ভুলিলে চলিবে না। ম্যাক্ গুইব্ নিছক অর্থতত্ত্বের প্রেমে পড়িয়া ইতালির আর্থিক শক্তির কথা আলোচনা করিয়াছেন এমন মনে করিবার কারণ নাই। ইতালি আমেরিকার নিকট ঋণী দেশ। এই

ঋণ যুদ্ধের সময় দেওয়া হইয়াছিল। পাকা ব্যবসায়ী হিসাবে দেখা দরকার ইতালির ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা কতখানি। আমেরিকা অবশ্য যা খুসী চাহিতে পারে। ইতালিও হ্যান দিব ত্যান দিব বলিতে পারে। কিন্তু সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাহিয়া বসিলে শেষ পর্য্যন্ত অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ উভয়কেই ঠকিতে হইবে। অধমর্ণ ডুবিবে। আর তার ডোবার দরুণ উত্তমর্ণের দেশে দারুণ আর্থিক বিপ্লব দেখা দিবে।

অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে, ঋণী দেশের ক্ষমতার পরিচয় লওয়া। সেই সম্পর্কে ধন-সম্পদের কথাই উঠে। ম্যাক্ গুইর এই দিকেই তাঁর মগজ চালাইয়াছেন। তাঁর সিদ্ধান্তকে ইতালির পক্ষে অনুকূল বলিতে পারি।

মার্শ্যালের শিষ্য

বিলাতের একটি অর্থনৈতিক সাপ্তাহিকের নাম ষ্টেটিষ্ট। এই ষ্টেটিষ্টের সহকারী সম্পাদক প্যাট্রিক ফিটজেরাল্ড "ইনডাষ্ট্রীয়েল কমবিনেশন ইন্ ইংল্যাণ্ড" বা ইংল্যাণ্ডে ব্যবসার সঙ্ঘবদ্ধতা নামে এক কেতাব লিখিয়াছেন। প্রকাশক সার আইজাক্ পিটম্যান অ্যাণ্ড সন্‌স লিমিটেড্। পৃষ্ঠা ২৬০। দাম ১০ শি ৬ পে।

ফিটজেরাল্ডকে ডাক্তার মার্শ্যালের শিষ্য হিসাবে গণ্য করিতে পারি। বস্তুতঃ মার্শ্যালের প্রচারিত ২।১টা নীতিকেই তিনি বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রয়োগ ও প্রমাণ করিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর ইংল্যণ্ড

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মাটিতে ট্রাষ্ট ইত্যাদি জিনিষগুলি বসিতে পারে নাই। তখন লোকে এসবকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। লোকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি চোখের সামনে দেখিয়া ইহাদের ভালমন্দ সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিতেছে।

বস্তুতঃ, এক্ষণে ব্যবসার সঙ্ঘটা একটা বাণিজ্যিক গতি মাত্র নয়। বাস্তব জগতের সত্যকার পদার্থরূপে দেখা দিয়াছে। তার সাক্ষী ব্রার্ডফোর্ড ডায়ার্স এসোসিয়েশন, কোটস কম্বাইন, লিভার ব্রাদার্স, বিগ্ ফাইভ্ বা বাঘা বাঘা পাঁচ ব্যাঙ্ক-যোগ।

কেতাবের উদ্দেশ্য

এই কেতাবের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিতে পারি—

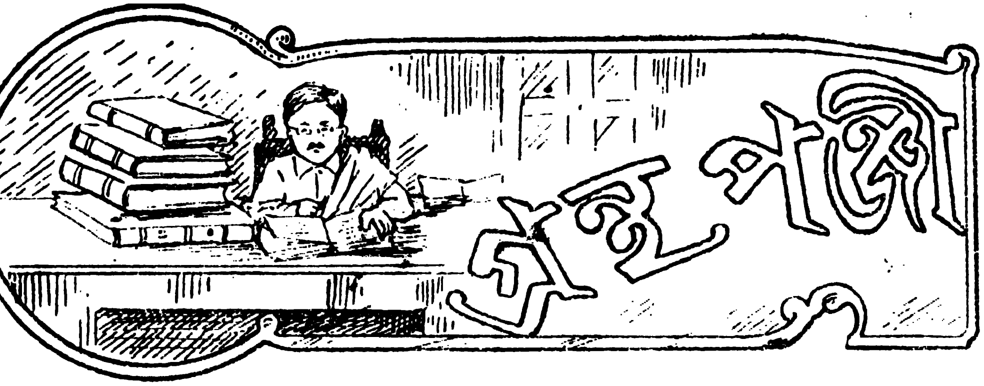
(১) প্রতিযোগিতা কতদূর পর্য্যন্ত দমিত ও বিদূরিত হইয়াছে, তা দেখা।

(২) বাস্তব জগতে এই সব সঙ্ঘের গঠন, ফলাফল ও দস্তু-নীতি পরীক্ষা করা।

(৩) কিরূপ ও কতদূর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধান সহ্য করা যাইতে পারে ও কিরূপ আইন প্রণয়ন সমীচীন হয় তাহা বিচার করা।

এই পুস্তকের কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম এই :—

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়।
৭ম পরিচ্ছেদ। রাসায়নিক ব্যবসা।
১২শ „ । নন্ ফেরাস্ ধাতুর ব্যবসায়।
১৩শ „ । এঞ্জিনিয়ারিং বাণিজ্য।
১৯শ „ । তেল সঙ্ঘ।
২১শ „ । রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক
২৩শ „ । রেলওয়ে সঙ্ঘ।
২৫শ „ । ব্যাঙ্কিং সঙ্ঘ।



দি ফাউণ্ডেশনস্ অব্ ন্যাশন্যাল প্রোগ্রেস ; এ স্কিম অব কনষ্ট্রাক্‌টিভ ওয়ার্ক ফর্ অ্যান্ ইণ্ডিয়ান্ প্রভিন্স (জাতীয় উন্নতির মর্ম্মকথা ; কোন ভারতীয় প্রদেশে গঠনমূলক কার্য্যের মোসাবিদা)। জে, এন, গুপ্ত। কলিকাতা। ২৮২ পৃষ্ঠা।

দি ইকনমিক থিওরি অব্ লীজার ক্লাস (বিলাসী শ্রেণীদের আর্থিক তত্ত্ব) এন্ বুখারিন্। ইণ্টারন্যাশন্যাল পাবলিকেশনস্, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৭। পৃষ্ঠা ২২০। দাম ২·৫০ ডলার।

অ্যান্ ইকনমিক হিষ্টরি অব্ মডার্ণ বৃটেন ; দি আর্লি রেলওয়ে এজ্, ১৮২০-১৮৫০ (আধুনিক বৃটেনের আর্থিক ইতিহাস। প্রথম রেলওয়ের যুগ)। জে, এইচ্, ক্লাপহাম। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ, ইংলণ্ড। ১৯২৭। পৃষ্ঠা ১৮+৬২২।

বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য। শ্রীবিনয়কুমার সরকার। কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস, কলিকাতা। ১৯২৭। পৃষ্ঠা ৪+৪৩৬। দাম ৩৲ টাকা।

দি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক)। জে, সি, কয়েজি। দি বুক কোম্পানী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩৭।

ডী এণ্ট্‌হ্বিক্‌লুঙ ডার টেওরেটিশেন ফোল্কসে হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্—লেরে ইম্ এর্‌ষ্টেন দির্‌টেন ডেস ২০ য়ারহুণ্ডের্টস (বিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে আর্থিক ব্যবস্থাতত্ত্বসমূহ পরিদর্শন বা আলোচনা। আমেরিকা ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইতালির কথা আলোচিত হইয়াছে। খেও সুরানি-উঙ্গের। গুষ্টাহ্ব ফিসার, য়েনা। ১৯২৭। পৃষ্ঠা ১২+৩২০। ১৫·৫০ মার্ক।

"লেৎস্যানি দি একনমিয়া পুরা" (অমিশ্র ধনবিজ্ঞান), দেল্ হ্বেক্‌ক্য, পাদোহ্বা, লা নিতভিপ কোং, ১৯২৭, ৪০ লিয়ার।

"লা ত্রাসলাৎস্যনে দেই ত্রিবুতি" (করের প্রভাব-বিকীরণ), মাজরাণ্য, কাতাঞা গালতি কোং, ১৯২৭, ১৫ লিয়ার।

"মর্ দি সচ্যল্‌জ্যা পলিতিকা" (রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ-বিজ্ঞান),—মিকেল্‌স্ মিলান, ইস্তিতুত এদিতারিয়ালে সিয়েন্তি-ফিক, ১৯২৭, ২০ লিয়ার।

"কাপিতালে এ কলনিয়ে" (পুঁজি ও উপনিবেশ),—গ্রাৎস্যাদেই, মিলান, কাজ এদিত্রিচে সচ্যালে, ১৯২৭, ৭ লিয়ার।

"ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব মডার্ণ ইয়োরোপ" (আধুনিক ইয়োরোপের আর্থিক ক্রমবিকাশ),—অগ ও শার্প, নিউ ইয়র্ক, ম্যাক্‌মিলান, ১৯২৬।

"ডার কোমেণ্ড হোখ্‌কাপিটালিস্‌মুস" (আগামী অতি-পুঁজিতন্ত্রের যুগ), হ্বর্‌ণ্ডালিখ, বার্লিন, প্রাগার কোং, ১৯২৭।

"গ্রুণ্ডরিস্ ডার সোৎসিয়ালয়োকোনোমিল" (সমাজ শাস্ত্রের বিশ্বকোষ), দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ, ট্যিবিঙ্গেনের মোর কোম্পানী প্রকাশক (১৯১৪—১৯২৭)।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে তুলার ব্যবসায় বাঙ্গালীদের সুযোগ

শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জী, সীতাবল্দী, নাগপুর

মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, ওয়ার্ধা, চাঁদা, ভাণ্ডারা, ছিন্দওয়াড়া, শিউনি, নরসিংপুর ও খাণ্ডোয়া জেলায় ও বেরারের প্রায় সকল স্থানে তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তুলা বীজ সমেত থাকিলে তাহাকে কার্পাস কহে ও কার্পাস হইতে জিনিং ফ্যাক্টরীতে বা কাঠের তৈয়ারী হাত কল দ্বারা বীজ আলাদা করিয়া লইলেই তাহাকে তুলা কহে। এই তুলার আবার প্রেসিং ফ্যাক্টরীতে গাঁট তৈয়ারী হয়। এই গাঁট অধিকাংশই বোম্বাই প্রান্তে ও আহমেদাবাদ প্রান্তে চলিয়া যায়। বোম্বাই প্রান্ত হইতে উহার প্রায় পুরাটাই ভারতবর্ষের বাহিরে নানা স্থানে চালান যায়। উল্লিখিত জেলা সকলে বহু 'জিনিং' ও 'প্রেসিং' 'ফ্যাক্টরী' আছে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে কাপড় বুনিবার মিল মোটে ৭।৮ টী আছে। তাহাদের নাম: 'এম্প্রেস মিলস—নাগপুর'—ইহা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন ও অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা বড় মিল; 'মডেল্ মিল—নাগপুর'; 'বন্সীলাল আবীর চাঁদ মিল—হিংগনঘাট'; 'রেখচাঁদ মেহতা মিল—হিংগনঘাট'; 'পুলগাঁও মিল—পুলগাঁও'; 'রাজনন্দ গাঁও মিল—রাজনন্দ গাঁও'। ইহা ছাড়া দু-একটি ছোট খাট মিল আছে। প্রথম দুটি পারশী দ্বারা পরিচালিত; পরের তিনটি মাড়োয়ারী দ্বারা পরিচালিত; শেষেরটি ইউরোপীয়ান দ্বারা পরিচালিত।

অতিশয় কম পুঁজিতে—ধরিতে গেলে কিছুই নয়—তুলার ব্যবসা বেশ বড় ধরণে হইয়া থাকে। ব্যবসা করিতে করিতে পরে মূলধন শীঘ্র বাড়িয়া যায়। বলিয়া রাখা উচিত যে আমি 'স্পেকুলেশন'—যাহাকে মাড়োয়ারীরা 'সাট্টা' কহে—ও 'তুলার খেলায়'—যাহা এক প্রকার জুয়া—বিশেষ বিবরণ এখানে দিব না। কারণ এ সকল শুদ্ধ ব্যবসা ও বাণিজ্যের ভিতর পরিগণিত হয় না। তুলার শুদ্ধ ব্যবসা ও বাণিজ্যে অতিশয় লাভ হইয়া থাকে, যদিও বা 'স্পেকুলেশন' বা 'সাট্টায়' ও 'তুলার খেলায়' রাতারাতি অতি সহজে ধনী হইতে ও রাতারাতি অতি সহজে ফকির হইতে পারা যায়। শুদ্ধ তুলার ব্যবসায় লোকসান মোটেই নাই। যদিও বা কখন হয়, তাহা অতি নগণ্য।

বিনা লোকসানের তুলার ব্যবসা দুই প্রকারের। প্রথম 'রেডি-বিজিনেস'—'হাজির ব্যবসা' ও দ্বিতীয় 'হেজ্ কণ্ট্রাক্ট্'—'সুরক্ষিত ঠিকা'। 'ফরওয়ার্ড্ কণ্ট্রাক্ট্' বা 'অগ্রিম ঠিকা'তে লোকসানের সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্য তাহারও বিশেষ বিবরণ এখানে থাকিবে না। রেডি বিজিনেসে, ব্যবসায়ী যদি কম টাকায় ব্যবসা করিতে চাহে, তাকে মোটে ১০০০৲ এক হাজার টাকা একজন ভাল ব্যাঙ্কার ও আড়ৎদারের নিকট রাখিতে হয়। বাজারে বাজার দরে কার্পাসের গাড়ী কিনিবার পর ঐ ব্যাঙ্কার ও আড়ৎদার বিক্রেতাদের সব দাম চুকাইয়া দেয় ও কার্পাসগুলি কোন জিনিং ফ্যাক্টরীতে 'জিন' করাইয়া বা বীচি আলাদা করাইয়া লইয়া, তুলাগুলি বিনা 'প্রেস' করাইয়া বড় বড় বিলাতী ও দেশী ব্যবসায়ীদের হাজির বেচিয়া দেয়। কার্পাস হইতে তুলার দর অধিক থাকে। তুলার দর বাড়িলে বা কমিলে কার্পাসের দর বাড়িয়া বা কমিয়া যায়। দু-এক দিনে জিন করাইতে করাইতে দামের তত তফাৎ হয় না ও তুলার বীচি (কটন্ সীড্) আলাদা বাজার দরে বিক্রয় হয়। সময় সময় তুলার বীচির দর এত বাড়িয়া যায় যে, সে সময় তুলার ব্যবসায়ীদের পোয়া বারো। তুলার বীচি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ও ভারতবর্ষের বাহিরে বিক্রয় হয়। তুলার বীচির দর প্রায় অধিকাংশ সময় সমান থাকে। কার্পাসের প্রায় ৩

অংশ ওজনে তুলার বীচি ও ⅓ অংশ ওজনে তুলা। মধ্য প্রদেশ ও বেরারের তুলাকে 'ওমরা কটন' বলে ও এই তুলার বাজার দরের সকল সময়ে নামা-উঠা হয়। তুলার ব্যবসায়ে যে ব্যাঙ্কার হয় সেই আড়ৎদার হয়। ব্যাঙ্কার ও আড়ৎদারদের বিনা কষ্টে ও বিনা লোকসানের সম্ভাবনায় খুব লাভ। ব্যবসায়ীর লোকসান হইবার সম্ভাবনার জন্য সে তাহার নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা অগ্রিম রাখিয়া লয়। সে যত টাকা খাটায়, টাকার উপর সুদ পায়; কার্পাস বিক্রেতাদের ও ক্রেতাদের নিকট হইতে দালালী পায়। কার্পাস ক্রেতা যখন পরে তুলা বেচে তখন তুলার জন্যও দালালী পায়। অনেক স্থানে একজনকে বহু প্রকারের ব্যবসা করিতে না দিলে—যথা যে কার্পাসের দালাল হইতে পারে সে তুলার ব্যবসায়ী হইতে পারে না—সে বেনামী করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকে। কার্পাস 'জিন' করাইবার পর যদি 'প্রেস' করাইয়া তুলা বেচিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেমন লাভের সম্ভাবনা তেমনি লোকসানের সম্ভাবনা। বিচক্ষণ ব্যবসায়ীরা সেজন্য এরূপ করে না। কার্পাসের ব্যবসা বারো মাস হয় না। বছরে ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সময়কে 'মৌসম' বা ইংরাজীতে 'সীজন' কহে। ভারতবর্ষে সকল স্থানে একই সময় তুলা উৎপন্ন হয় না। নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 'সীজন' আছে। ইউরোপীয়ান ব্যবসাদারদের নানা স্থানে মাল খরিদ করিবার আফিস আছে। ইহাদের নাম যথা,—মেসার্স রালী ব্রাদার্স, মেসার্স ভল্‌কার্ট ব্রাদার্স ইত্যাদি। ইহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তুলা-ব্যবসায়ী। জাপানী ও ভারতীয় ফার্ম্মও আছে। তবে খুব বড় ভারতীয়-ফার্ম্ম নাই বলিলেই চলে। এ ব্যবসায় যেমন কম পুঁজিতে প্রভূত লাভ তেমনি পরিশ্রম অত্যধিক। এ ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর চির-অভ্যস্ত ভিতর-বাহির বাবুগিরি চলিবে না। অন্ততঃ ভিতরে অসীম শক্তি থাকা চাই। বাঙ্গালীদের আর কালবিলম্ব না করিয়া এ ব্যবসায় ঢুকিয়া পড়া উচিত ও নিজেদের ও দেশের 'আর্থিক উন্নতি' করা উচিত। যিনি যে পরিমাণে ব্যবসা করিতে চাহেন তিনি সেই পরিমাণে টাকা খাটান। প্রথম হইতে টাকা খাটান উচিত নহে। এক 'সীজন' কটন মার্কেটে ও জিনিং ও প্রেসিং ফ্যাক্টরীগুলিতে ঘুরিয়া কাজটা মোটামুটি ভাবে বুঝিয়া লওয়া উচিত। পরের 'সীজন' হইতে 'সজোরে' ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত। ইহা সত্য যে বাঙ্গালীরা যদি প্রকৃত 'ব্যবসাদার' হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালীরা ভাটিয়া (গুজরাতী) ও মাড়োয়ারীদের 'কম্পীটিশনে' এমন পিছনে ফেলিয়া দিবে যে বাঙ্গালীরা পরে ভাবিবে যে তাহারা এত কাল ঘুমাইতেছিল কেন। বাঙ্গালীরা ইউরোপীয়ান, আমেরিকান ও জাপানীদের মত অতিশয় উঁচু দরের ব্যবসায়ী হইতে পারিবে। আমি বহু মাড়োয়ারী জৈনী, ভাটিয়া, গুজরাতী, অন্যান্য ভারতবাসী ও ইউরোপীয়ানদের সহিত বহুকাল কার্য্য করিয়া দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি যে বাঙ্গালীরা যদি অন্তরের সহিত 'ব্যবসা' আরম্ভ করে তাহা হইলে শীঘ্রই তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বণিক্ হইয়া যাইবে। একটু যদি উপর-চালাকী, রাতারাতি বড় লোক হইয়া যাইবার ইচ্ছা ও সুযোগ পাইলে জুয়াচুরি না করে, মজ্জাগত পরশ্রীকাতরতা যদি ছাড়িয়া দেয়।

হেজ্ কন্ট্রাক্ট বিজিনেসে একটু মূলধন বেশী দরকার পড়ে। কমে কিনে বেশী দরে বেচা। এটা যদি জানুয়ারী মাসে হয় তাহা হইলে কয়েক মাস পরের দর সাধারণতঃ বেশী থাকিবেই। বেচিবার পূর্ব্বেই কম দরে যতটা মাল কেনা হল ততটা মাল কয়েক মাস পরের দরে বেচিতে হইবে ও নির্দ্দিষ্ট তারিখে ক্রেতাকে মাল দিতে হইবে। ক্রেতার ভাবনা প্রায় থাকে না। সব দিক্ হইতে সুরক্ষিত হইয়া গেল। এইরূপ করিতে থাকিলে প্রভূত অর্থশালী হওয়া যায়, কিন্তু মাল কিনিয়া আটকাইয়া রাখিতে বেশী টাকার দরকার পড়ে। খুব বড় রকমের হেজ বিসিনেস সংক্ষেপে লেখা চলে না। হেজ বিজিনেসের কড়া নিয়মের একটু এদিক ওদিক হইলেই 'স্পেকুলেশন' বা অন্ততঃ কতক অংশে 'ফরওয়ার্ড' কন্ট্রাক্ট হইয়া যাইবে। মাল কম দরে কিনিয়া রাখিয়া, দর বেশী হইলে বেচিব বা বেশী দরে বেচিয়া রাখিয়া, দর কম হইলে মাল কিনিয়া বেচিব, এইরূপ ইচ্ছায় 'স্পেকুলেশন' হইয়া যাইবে। নির্দ্দিষ্ট দরে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাল বেচিয়া রাখিয়া, দর সুবিধা হইলে মাল কিনিয়া

মাল সরবরাহ করিব, এইরূপ করিলে 'ফরওয়ার্ড কণ্ট্রাক্ট' হইবে। সকল সময় দর নামিতে উঠিতে থাকে। তজ্জন্য স্পেকুলেশনে ও ফরওয়ার্ড কণ্ট্রাক্টে যেমন ধনী হওয়া যায় তেমনি ফকীর হওয়া যায়। যাহারা জন্ম-গত 'স্পেকুলেটার' তাহাদের বুদ্ধি অতিশয় তীব্র, অন্তশ্চক্ষু অতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তি-স"..। ; তাহাদের উপর ভাগ্য-লক্ষ্মী প্রায় সকল সময় সুপ্রসন্ন থাকেন। এ বিষয়ে পরে জানান যাইবে।

শেষ নিবেদন এই যে, অন্ততঃ সমর্থ বাঙ্গালীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে লাফাইয়া-ঝাপাইয়া পড়ুন, নতুবা বঙ্গমাতাকে দারিদ্র্য একেবারে ঘিরিয়া ফেলিবে ও বঙ্গসন্তানদের মাতার মৃত্যুর দিনে চিতার কাঠের পয়সা জুটিবে না। বঙ্গভূমি দারিদ্র্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত—একটু হইলেই মাথাটি পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। এই বেলা 'বিত্তার' বেদী হইতে 'রাইট এবাউট টার্ণ' করিয়া 'অর্থের' বেদীর দিকে অগ্রসর হউন।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ*

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্, এ, বি, এল্, পি, আর, এস্, পি-এইচ্, ডি

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পর হইতে বাজারে একটা নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নৈরাশ্যের কোন কারণ দেখিতে পাই না। যদি এই ঘটনা ১৯১০ এমন কি ১৯১৫ সনে ঘটিত, তবে আশঙ্কার কথা থাকিত। কিন্তু এখন সময় অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এখন বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলায় ৩৫০ এর উপর লোন কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক মোতায়েন রহিয়াছে। এদের কোন কোনটির আমানতের পরিমাণ বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের টাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। তাছাড়া প্রায় ১৩ হাজার কো-অপারেটিভ বা সমবায় ব্যাঙ্কে বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকার লেনদেন বাঙ্গালীর ছেলে চালাইতেছে।

এই সব কারবারের ফলে বাঙ্গালী কি কি উপকার লাভ করিতেছে?

১। যৌথ-কারবার চালাইবার কৌশলটা বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর আয়ত্ত হইতেছে।

ব্যবসার স্বত্ব দুই প্রকার হইতে পারে—(ক) যখন ব্যবসার মালিক এক বা অল্প কয়েকজন ব্যক্তি মাত্র; (খ) যখন ব্যবসার পুঁজিপাটাটা বহু অংশীদারের চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হয়, অর্থাৎ যৌথ কারবার।

যৌথ কারবারের প্রসার লাভ করিবার ক্ষমতা-অসীম। মালিকানী স্বত্বে চালিত কারবার যৌথ ব্যবসায়ের মত বৃহৎ হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান্ কারবারগুলির বিপুলতা।

বর্ত্তমান যুগ বড় বা সম্মিলিত ব্যবসায় চালাইবার যুগ। সুতরাং দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে ও অন্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে হইলে, আমাদিগকে অবিলম্বে যৌথ কারবারের মূলমন্ত্রটা পাকড়াও করিতে হইবে। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

২। কারবারীর পক্ষে ব্যবসায়ে সততা একটা মস্ত জিনিষ। বস্তুতঃ, সততা না থাকিলে কোন কারবার শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারে না। কিন্তু শুধু মৌখিক বক্তৃতা হইতে অথবা ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসা সম্পর্কীয় স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক হইতে এই সততা শিক্ষা করা যায় না। এ জন্য চাই প্রকৃত কার্য্যের চাপ। যৌথ কারবারে সদা সর্ব্বদা রাশি রাশি পরের টাকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়। হিসাব রাখিতে ও দিতে হয়। ইত্যাদি। ইহাতে লোকের মনে কার্য্যের গুরুত্ব বোধ হয়, দায়িত্ব জ্ঞান জন্মে। সততার শিক্ষাটা পাকা রকম হইয়া যায়।

৩। বর্ত্তমান সময়ে দেশী লোকের পক্ষে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

* চট্টগ্রামের মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের নব-নির্ম্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষ্যে সভাপতি ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহোদয়ের বক্তৃতার সারমর্ম।

শিখিবার জন্য বিদেশী-পরিচালিত ব্যাঙ্কে প্রবেশ লাভ করা কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা সকলেই জানেন। আশা করা যায়, আমাদের লোন কোম্পানী ও ব্যাঙ্কগুলির সাহায্যে এই অভাবটা কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতেছে।

৪। ব্যাঙ্ক ব্যতীত দেশের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার অসম্ভব। ব্যাঙ্কের সংখ্যা যত বাড়িবে ও তাহাতে নিয়োজিত পুঁজিপাটা যত বাড়িবে, শিল্প বাণিজ্য তত প্রসার লাভের সুযোগ পাইবে। এই সকল দিকে লোন আফিস গুলার সাহায্যে আমাদের কিছু কিছু উপকার হইতেছে।

ব্যাঙ্ককে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। শিল্প ব্যাঙ্ক। (বড় না হইলে চলিবে না। এক একটা কলেই অনেক টাকার দরকার হয়।)

২। (গবর্ণমেন্টের টাকায় অথবা দায়িত্বে) কৃষি ও জমি ব্যাঙ্ক। (অল্প সংখ্যক।)

৩। বাণিজ্য ব্যাঙ্ক।

আমি এই তৃতীয় প্রকার ব্যাঙ্কের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই ও সেজন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। মাল চলাচলের কাজে আশু টাকার দরকার। দেশের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, মাল চালানের উপর টাকা খাটানই সুবিধাজনক। কারণ, ২।৩ মাস বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে লাগান টাকাটা ঘুরিয়া হাতে আসে। টাকা আটক থাকে না বলিয়া কাজের অনেক সুবিধা হয়। টাকা অনেকবার ঘুরিতে পারে। আর ক্ষতির সম্ভাবনাটা বহু পরিমাণে হ্রাস পায়।

ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর অভ্যাসটা লোকের মধ্যে খুব বেশী ছড়াইয়া পড়া দরকার। পাশ্চাত্য দেশে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। "বিগ ফাইভ' বা বাঘা বাঘা পাঁচ ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। তার কোনো কোনোটার শাখার সংখ্যা প্রায় ২০০০ কি ২৫০০।

আমেরিকায় শাখা ব্যাঙ্কের চলন প্রায় নাই। কিন্তু সেখানে আলাদা আলাদা ৩০ হাজার ব্যাঙ্ক মোতায়েন আছে। আমেরিকাবাসীর ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস এতদূর বাড়িয়াছে যে, শুনিয়াছি সেখানে রাস্তায় জুতা বুরুস করিলেও চেকে টাকা দেওয়া চলে। মুচিও তার টাকা ব্যাঙ্কে রাখে।

ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য দ্রষ্টব্য একটি প্রধান বিষয় এই যে, প্রত্যেক বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ একত্র মিলিত হইবেন। সে সময় তাঁরা প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ আলোচনা করিবেন। এইরূপে কাজের সুবিধা হইবে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় কিংবা মফঃস্বলের কোন এক বৃহৎ কেন্দ্রে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান খাড়া করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠান তাঁদের মিলনভূমি হইবে।

আর্থিক জগতে আধুনিক নারী*

যা কিছু আমি বলিয়া যাই তা আপনাদের পছন্দসই নয়। তার কারণ আপনারা শুনিতে চাহেন আমি বলিয়া যাই বা আর কেহ বলিয়া যাউক যে, পাশ্চাত্য লোকেরা ভারতবাসীর শিষ্যত্ব করিবে, আমাদের পায়ে তারা মাথা ঠেকাইয়া চলিবে। আপনাদের যাঁরা অতদূর চরমে যাইতে রাজী নহেন, তাঁরা অন্ততঃ পক্ষে এটা শুনিতে ইচ্ছা করেন যে, "বেশ তো, ইয়োরোপ আর আমেরিকা, তারা হইতেছে সুয়েজ খালের ওপারের লোক, আমরা হইতেছি সুয়েজ খালের এপারের লোক। ওপারের যে পথ সে ওপারের দস্তুর; আমাদের এ পারের যে পথ সে হইতেছে আমাদের পূরবী লোকের বিশেষত্ব। ওরা যে পথে চলিয়াছে চলুক, আমরা আমাদের পথে চলিতেছি চলিব।" কাজেই আপনারা

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রদত্ত বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

চাহেন না যে, আমি মুখামুখি পশ্চিমের সঙ্গে পূরবের তুলনা করি কিংবা কখনো কখনো বলি যে, পশ্চিম যে পথে চলিয়াছে পূরবও সেই পথেই চলিবে।

এশিয়া ইয়োরামেরিকার গুরু নয়

যাক্, আমার কথাগুলি আপনাদের পছন্দসই হউক বা না হউক আমার বক্তব্য সোজা। এই যে দুই মত, এ দু'এরই আমি ঘোরতর বিরোধী। আমার কথা এই— এশিয়ার নরনারী ইয়োরামেরিকার অর্থাৎ পশ্চিমা নরনারীর গুরু কোন মতেই নয়। আজ ত নয়ই। আগামী ভবিষ্যৎ যতদূর দেখা যায়, সেই অনতিদূর কিংবা কিছুদূর কিংবা অতি-দূর ভবিষ্যতে ভারতের কিংবা এশিয়ার লোক যে ইয়োরামেরিকার গুরু হইবার উপযুক্ত হইবে আমি তা সম্প্রতি কল্পনাও করিতে পারি না। আর সঙ্গে সঙ্গে বলিতে চাই যে, কি মধ্য যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর আগে, কিবা প্রাচীন যুগে—সেই গ্রীস রোমের আমলে,—তখনও কি হিন্দু, কি চীনা, এরা কোন দিন ইয়োরোপের গুরু ছিল, এ কথা সজোরে বলা চলে না। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম এবং মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ইয়োরোপকে সভ্যতার হিসাবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিসাবে খুব বেশী রকম হারাইয়া এশিয়ার লোক দুনিয়াতে বিশেষ কিছু দেখাইতে পারিয়াছে, এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কাজেই, গুরুগিরি করার যে একটা দাবী এটা ইতিহাসগত দাবী নয়। বড় জোর আমাদের ঠাকুরদাদারা, কি ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদারা কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে ইয়োরোপের আজকালকার লোকের ঠাকুরদাদার, কি ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার সমানে সমানে চলিয়াছে। এই পর্য্যন্ত। কখনো কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ছটাক আধ ছটাক আগে পাছে হয়ত কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তাদেরকে ছাড়াইয়া একটা নূতন অতি-কিছু দেখানো আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ক্ষমতায় কখনো কুলায় নাই। এ হইতেছে দুনিয়ার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমার শেষ কথা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রকার প্রস্তত্ত্বের নির্গলিতার্থ আমার বিবেচনায় এইরূপ। আপনাদের যাঁর যেরূপ মর্জ্জি আপনারা তুলনা চালাইয়া ইতিহাস ঘাঁটিয়া দেখিতে পারেন। আমার আপত্তি নাই। যদি কখনো আপনারা আমাকে নূতন নূতন তথ্য ও যুক্তি দেখাইতে পারেন, তা হইলে আমার মত বদলাইতে প্রস্তুত আছি।

পশ্চিমের যে পথ পূরবের সেই পথ

তারপর আপনারা বলিবেন, পূরবের পথ আর পশ্চিমের পথ আলাদা আলাদা। ওরা যে পথে চলে, সে পথের পথিক নাকি আমরা নহি। আমরা যে পথে চলি সে পথের পথিক নাকি ওরা নয় ইত্যাদি। আমি বলি— এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই মতের পশ্চাতে কোন তথ্য, কোন যুক্তি নাই। সেই গ্রীক আমল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর আমল পর্য্যন্ত—জমিজমার আইন, জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ, স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ, স্ত্রীর স্বত্বাধিকার, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ, বাদসাহের গোলামী করা, কুর্ণিস করা—যা-কিছু আমরা ইয়োরোপে দেখি ভারতেও ঠিক তাই দেখি। অর্থাৎ এশিয়া যা-কিছু দেখাইয়াছে ইয়োরোপও যুগে যুগে ঠিক সে সবই দেখাইয়াছে।

তারপর বাষ্পযন্ত্র নামক একটা জানোয়ার পৃথিবীতে দেখা দিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। যন্ত্রটা প্রথম তুলার কারবারে দেখা দিল বিলাতে। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত এই যে ১২৫।১৫০ বৎসর, আমরা—ভারত, চীন, পারস্য, জাপান—ঠিক তাই করিতেছি, যা কিছু করিয়াছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান ও ইতালিয়ান। ওরা ট্রেড ইউনিয়ান কায়েম করিয়াছে, আমরাও ট্রেড ইউনিয়ান করিতেছি। ওরা ফ্যাক্টরী আইন করিল, আমরাও ফ্যাক্টরী আইন করিলাম। ওরা এক রকম কানুন করিল, তার নাম হইল নগর স্বরাজ বিষয়ক আইন। আমাদের দেশেও একটা কানুন তৈয়ারী হইল, তার নাম হইল নগর স্বরাজ বিষয়ক আইন। অবশ্য খাঁটি স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক আইন বলিতে যা বুঝায়, আমাদের দেশে ঠিক তা এখনো হয় নাই। ওরা ইস্কুল করে, বিশ্ববিদ্যালয় করে, আমরাও ইস্কুল করি, বিশ্ববিদ্যালয় করি—ঠিক একই প্রণালীতে। এই ক্রমবিকাশ এখন জায়গায় আসিয়া

ঠেকিয়াছে যে, ওরা যতখানি যে লাইনের চরমে যাইতে চায়, আমরাও ঠিক ততখানি সে লাইনের চরমে যাইতে চাই। আর যেখানে ওদের সমান সমান যাইতে না পারি, সেখানে ওদের বোলচাল, ওদের বুখ্‌নীগুলি বেমালুম গাপ্‌ করিয়া থাকি। এই হইতেছে বর্ত্তমান এশিয়ার ধরণ ধারণ। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় আধুনিক এশিয়াকে আমি প্রায় সকল বিষয়েই আধুনিক ইয়োরামেরিকার শিষ্য সমঝিতেই অভ্যস্ত।

কাজেই আমার কাছে যদি কেহ বলেন, পশ্চিমের পথ এদিকে, পূবের পথ ওদিকে,—তাঁকে আমি সম্মান করিতে অসমর্থ। দেশের লোক কিন্তু আমাদেরকে ডাইনে বাঁয়ে, এখানে ওখানে, কবিতা লিখিতে লিখিতে, গল্প লিখিতে লিখিতে, বক্তৃতা করিতে করিতে, কংগ্রেসে দলাদলি করিতে করিতে, খবরের কাগজে লিখিতে লিখিতে, শিখাইতেছে ঐ এক খাড়া বড়ি থোড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় গোলদীঘির হাওয়ায় যা কিছু আমরা শিখিতেছি, সে সবের অর্থ হইতেছে, "ওদের পথ এক, আমাদের পথ আর।" আমি দেখিতে পাইতেছি যে, ওদের পথ যা, আমাদের পথও তাই। মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটা পথেই পৃথিবী চলিতেছে। ঘটনাচক্রে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ওরা চলিতেছে আগে আগে, আমরা ওদের লেজুড় ধরিয়া লেজুড়ের পিছনে পিছনে ছুটিতে চেষ্টা করিতেছি। কাজেই কথাগুলি আপনাদের ভাল লাগে না, লাগিবার কথাও নয়। কিন্তু এ কথা আমার পক্ষে একমাত্র বেদান্ত।

আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ

এ কয়দিন আলোচনা করিতেছি, আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ। বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ বিগত ৩০।৩৫ বৎসরের ভিতর, কোন কোন লাইন, কোন কোন প্রণালী মানুষকে আর্থিক হিসাবে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। তার প্রথম কথা দেখিতেছি—আজকাল মানুষের টাকা পয়সাগুলি নিজের নিজের তোরঙ্গের ভিতর থাকে না অথবা মাটির হাঁড়িতে করিয়া মাটির নীচে পোতা থাকে না। সেগুলি যেমন করিয়া হউক, পাখায় উড়িয়াই আসুক কিংবা কোন পাখীতে লইয়াই আসুক, কোন এক জায়গায় কেন্দ্রীকৃত হয়। অর্থাৎ তাতে ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় কথা, দুনিয়ার নরনারী সাবেক কালে, এমন কি, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে চলিত। বেশ আছে, যদি হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, কি হইবে? সরকারের চাকুরী করিতে পারিব না, মাহিনা কাটা যাইবে। কুলী কেরাণী, মজুর-চাষী, প্রত্যেকের ভাবনা রেলে যাইতে যাইতে যদি ধাক্কা লাগে, কলিশন হয়! হঠাৎ যদি পথে মারা যাই, পরিবার না খাইয়া মরিবে! যদি হঠাৎ কোন রকমে হাত পা ভাঙ্গি, কি হইবে? ডাক্তারের ফি যোগাইতে হইবে, ছেলে মেয়ে পরিবারের খাওয়ার ভাবনা ভাবিতে হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। বর্ত্তমান জগতের সমাজ-বিজ্ঞান বলিতেছে, কুছ্‌পরোয়া নেই, মানুষগুলিকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, প্রত্যেক লোক—কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কেরাণী, মজুর, চাষী প্রত্যেকে নির্ভাবনায় নিরুপদ্রবে নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিয়া কাজ করিয়া খাইতে পারে, তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাবিবার দরকার নাই, কেবল কাজ করিয়া যাও, যদি মরিয়া যাও, তার জন্য, তোমার পরিবারের জন্য আমি দায়ী, ইত্যাদি।

তারপর ৩০।৪০ বৎসর আগে জমি-জমার নতুন আইন কায়েম হইয়াছে। সেকালের দস্তুর ছিল এই—তুমি বড়লোক—তোমার যদি কিছু জমি থাকে, বেশী বা কম,—পাঁচ ছেলে থাকিলে তাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিংবা ইচ্ছামত যাকে তাকে দিয়ে দেওয়া চলিত। আজকালকার লোক বলিতেছে—২৫।৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া বলিতেছে—বোলশেভিজ্‌মের জন্মের অনেকদিন আগে থেকে বলিতেছে—আইন পর্য্যন্ত করিয়াছে যে, যে লোকটার কম জমি আছে তাকে কিছু বেশী জমি দিতে হইবে; যে লোকটার জমি নাই তাকে জমিদার রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু জমি আসিবে কোথা হইতে? যার জমি আছে তার কাছ থেকে জমি লইয়া যাদের জমি নাই অথবা কম জমি আছে তাদেরকে দাও। কে দিবে? রাষ্ট্র। আর এক রকম হইল—আমার জমি, আমি যাকে তাকে দিয়া যাইতে পারি, এটা মান্ধাতার আমল থেকে চাণক্যের

সময় থেকে দুনিয়ার সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে। আজকালকার লোক বলিতেছে এ সব আইনে চলিবে না, যাকে তাকে দিয়া যাইবে, কিংবা ছেলেদের মধ্যে ভাগ ভাগ করিয়া টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া দিবে তা হইবে না। জমিগুলো বেচিতে হইলে তাতে পর্য্যন্ত সরকারের কথা মানিয়া লইতে হইবে। এইভাবে নতুন জমি-জমার আইন-কানুন করিয়া মানুষগুলোকে মজবুত করিয়া তোলা হইতেছে।

যারা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, অফিসে কেরাণীগিরি করে, তাদের জীবন এতদিন পর্য্যন্ত বড় জোর ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। তার মধ্যে থাকিয়া মালিকদের সঙ্গে দরদস্তর কষাকষি, খুব বেশী হইলে লাঠি চালান। আজ পর্য্যন্ত এইই পৃথিবীর লোক চরম ধরণের শিল্প-স্বরাজ মনে করিত। মজুর শ্রমজীবী কুলী কেরাণী এদের পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, এতে চলিতেছে না। আরো এক নতুন দুনিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ দুনিয়ার মজুর আর কেরাণী সকলে মালিকের সঙ্গে এক চেয়ারে বসিতেছে। কারখানা, অফিস, যা কিছু কর্ম্মকেন্দ্র আছে, সব জিনিষ শাসন করিতে তারা সমান অধিকারী। কেবল তা নয়, কবে কোথায় কত টাকা খরচ হইয়াছে ও হইবে তার হিসাব-নিকাশ করিতেও অধিকারী এই মজুর কেরাণী ও শ্রমজীবী। এ হইতেছে আর্থিক উন্নতির আর এক বনিয়াদ।

প্রত্যেক মানুষকে হাতের জোরে আর মাথার জোরে কাজ করিতে হয়। পৃথিবীতে এটা হইতেছে শক্তিমানের লক্ষণ। এই দুই জিনিষের জোরে শক্তিমানেরা দুনিয়ায় পূজা পায়। এখনকার লক্ষ্য হইতেছে জগতের প্রত্যেক মানুষকে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। একথা ২০।২৫।৫০।৬০ বৎসর আগে এমন সজোরে, এমন সজাগ ভাবে দুনিয়ার নরনারী ভাবে নাই। ভাবিতেছে এখন। প্রত্যেক লোককে মাথার জোরে এবং হাতের জোরে স্বাধীন করিতে হইবে। তা করিবার উপায় কি? যখন যে প্রদেশে, যে জেলায়, যে ধরণেরই স্কুল করা দরকার, তখন সেই জেলায় সেই প্রদেশে সেই ধরণেরই স্কুল কায়েম কর। এতদিন পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর বয়সের পুরুষ এবং স্ত্রী প্রত্যেক দেশে বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা পাইতে অধিকারী ছিল। এখন হইয়াছে কেবল মাত্র ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত নয়, কম্ সে কম্ ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী যেখানে কাজ করে প্রত্যেকে বিনা পয়সায় লেখা-পড়া শিখিতে বাধ্য।

আজকার আলোচ্য "আর্থিক জগতে আধুনিক নারী।" সেদিনকার আলোচনায় প্রধানতঃ বলিয়াছি ফ্রান্সের কথা। আর আজকে প্রধানতঃ বলিতে চাই জার্ম্মাণির কথা। জার্ম্মাণির মেয়েরা আর্থিক জগতে কত রকমে, কত প্রণালীতে কৃতিত্ব দেখাইতেছে সে কথা আপনাদের কাছে বলিব।

অদ্বৈতবাদের বুজরুকি

প্রথমেই একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। যাদের মাথা আছে তারা সাধারণতঃ যখন যে বিষয় লইয়া চিন্তা করে তখন সেই বিষয় লইয়া মসগুল থাকে, আর বলে, "এই যে তথ্য, এই যে সত্য, যা আমি আলোচনা করিতেছি এটা দুনিয়ার একমাত্র তথ্য ও সত্য। অর্থাৎ অন্যে যা-কিছু বলিতেছে সে-সব কাজের কথা নয়। আমি যা বলিতেছি তাই শুনিয়া যাও।" যেমন কোন এক মহাপুরুষ কোন দিন বলিয়াছিলেন—"আমিই একমাত্র পথ। দুনিয়ার প্রাণ যদি কিছু থাকে তবে সে আমি। আর সত্য নামক যদি কোন বস্তু থাকে তাও হইতেছি আমি।" আপনারা অনেকে খৃষ্টীয় সাহিত্য জানেন। এই হইতেছে স্বয়ং খৃষ্টের বাণী। তা অন্যান্য মহাপুরুষদের সঙ্গে মিলিয়া যায়। কেন না আর একজন বলিয়াছেন, "দুনিয়ার আল্লা বা ঈশ্বর এক, তাঁর প্রতিনিধি হইতেছি আমি। এই গেল মহম্মদের বাণী। ঠিক খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানের মত আমরাও আমাদের শাস্ত্র আওড়াইয়া থাকি। আমরাও জানি "সর্ব্বান্ ধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—"দুনিয়ার যা-কিছু আছে সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া কুর্ণিশ কর আমার পায়ে। আমি দুনিয়ার সব। আমি যা কিছু করিতেছি তা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। মানুষকে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে আমার প্রণালীতে রক্ষা হইবে" ইত্যাদি হইতেছে গীতার বচন।

এই ধরণের অদ্বৈতবাদ একমাত্র ধর্ম্মের মুলুকেই দেখা যায় এমন নয়। অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রেও অনেক সময়ে এইরূপ অদ্বৈত-নীতি প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রণালীতে যদি সংসার চালাইতে হয়, তা হইলে এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে হইবে যেটা শুনিলে সকলের লজ্জিত হইবার কথা। যেমন ধরুন আর্থিক জগতে নারীর কৃতিত্ব। এই বিষয়টা আলোচনা করিতে গিয়া হয়ত কেহ বলিবেন চরম ভাবে পৃথিবীতে যা-কিছু হইয়াছে একমাত্র মেয়েদের দৌলতে ঘটিয়াছে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে এর ভিতর সত্য পাই কতটা? ধর্ম্মের অদ্বৈত সত্য কতটা? আপনারা মনে করিবেন গীতা-বাইবেল-কোরাণের অদ্বৈতটা চরম সত্য। কিন্তু আমি পাষণ্ড বিবেচনা করি যে, এর ভিতর বেশী সত্য নাই। থাকিলেও সেটা আংশিক সত্য এবং তাকে অসত্যের মধ্যে পরিগণিত করা উচিত। তেমনি যদি কোন লোক বলে—মেয়েদের উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে, তা হইলে আমি বলিব—এর ভিতর সত্য বেশী নাই। যেটুকু সত্য আছে তাকে অসত্যে পরিণত করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। আর একটা দৃষ্টান্ত অন্যদিক্ থেকে দিতেছি। আজকাল কলিকাতায় দুধ পাওয়া যায় না কেন? গরু নাই। কেন গরু নাই? গোচারণের মাঠ নাই। তবে কি করা উচিত? এই লইয়া যদি কোন একটা লোক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে চায়, সে বলিবে, গো সেবা, গোচারণের মাঠ, গো পূজা ইত্যাদি যা-কিছু এ সব যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে না দেখা দিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত গরুর উন্নতি হইবে না। আর যত দিন পর্য্যন্ত গরুর উন্নতি না হইবে ততদিন দুনিয়ার উন্নতি অসম্ভব। এটা প্রমাণ করা কঠিন বিবেচনা করি না, কেন না গরু যদি হৃষ্ট-পুষ্ট হয় দুধ বেশী দিবে, দুধের গুণ ভাল হইবে, পরিমাণ বাড়িবে এবং সেই দুধ যদি পাওয়া যায় বাঙ্গালীর শিশু, পুরুষ, স্ত্রী বাঁচিবে। খাইয়া যদি বাঁচে তবে তারা হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে, তা হইলে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিবে। তারপর বি-এ পাশ করিয়া উকিল হইবে, উকিল হইলে গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিবে, কংগ্রেসে বক্তৃতা করিবে। এই ভাবের বক্তৃতা করিবার লোক যদি বাংলায় না থাকে স্বরাজ আন্দোলন চালাইবে কে? অতএব বলা যাইতে পারে যে, এই গরু আর স্বরাজ এক সঙ্গে গাঁথা।

আপনারা হাসিতেছেন। আমি বলিতে চাহিতেছি, এই রকম হাস্যজনক যুক্তি মান্ধাতার আমলে পৃথিবীর অনেক জায়গায় চলিয়াছে এবং আজও আমাদের ভারতে প্রভূতরূপে চলিতেছে, সে কথা আপনারা শয়নে-স্বপনে, নিশি-জাগরণে বেশ ভাল করিয়া জানেন। আমি হইতেছি অদ্বৈতবাদের কট্টর যম। আমার বিবেচনায়—আর্থিক উন্নতি একমাত্র জমি-জমার উপর কি একমাত্র মেয়ে জাতির উপর নির্ভর করিতেছে না। একসঙ্গে হাজার শক্তি কার্য্য করিতেছে। হাজার প্রতিষ্ঠান, হাজার আন্দোলন, হাজার নরনারীর ব্যক্তিত্ব একসঙ্গে কোন দেশের বা প্রদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। হয় ত সকলে সকল কার্য্য করিতে পারে না। আপনি চান জমি-জমা লইয়া লাগিয়া থাকিতে, আর একজন চায় শ্রমজীবী লইয়া থাকিতে, আর একজন বলিতেছে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল করিবে। আর একজন আর কিছু করিতে চায়। যার যেমন ইচ্ছা, যার যেমন শক্তি, যার যেমন মর্জ্জি সে সেই রকম কাজ করিতে অধিকারী। কিন্তু এ জিনিষটিকে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া যদি বলি—"দুনিয়া চলিতেছে ঐ চরখার উপরে" তা হইলে গোলমাল বাধে যুক্তি-শাস্ত্রের হাতে খড়ির বেলায়ই। আমি বলিতে চাই যে, আমাদের জননায়কই হউক, শিক্ষকই হউক, সমাজ-সংস্কারকই হউক, কবিই হউক, বক্তাই হউক আর ছাত্রই হউক, তাদের যতগুলি যুক্তি তার প্রায় সকলের ভিতর ঠিক এই রকম একটা বিশ্বাস, এই রকম একটা ধারণা কাজ করিতেছে। অদ্বৈতবাদের পাল্লায় পড়িয়া আমাদের ছেলেরা বুড়োরা অনেকেই যুক্তি-সম্পদকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য নারীর অ-স্বাধীনতা

আজ আমি দেখাইতে চাই—জার্ম্মাণ জাতির মেয়েরা কত উপায়ে টাকা রোজগার করিয়া খাইতেছে, কত উপায়ে দেশকে ধন-সম্পদে উন্নত করিয়া তুলিতেছে। একটা কথা সব দেশেই আছে, আমাদের দেশেও আছে, সেটা হইতেছে

নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন—সোজা কথায় "ফেমিনিজম।" এর ভিতর অনেক কথা আছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি। সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, একটি কথা শুধু বলিব। যাঁরা নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রচারক—পুরুষই হউন, স্ত্রীই হউন—তাঁরা প্রধানতঃ এ কথা বলেন—মেয়েরা আজকালকার দুনিয়ায় নিজ নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করে নাই। এমন কি তাদের নিজ সম্পত্তি বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় কথা, তাঁরা বলেন, "নিজ ইচ্ছানুসারে, স্বাধীনভাবে যে কোন ব্যবসা, যে কোন শিল্প, যে কোন কারবারের সুযোগ আইনতঃ মেয়েদের নাই।" এই যে দু'টি কথা, এ হইতেছে আর্থিক জীবন বিষয়ক; অর্থাৎ নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় ভিত্তি হইতেছে—আর্থিক স্বাধীনতার দাবী।

এ কথা থেকে একটা সোজা কথা স্পষ্ট হইতেছে। যেদেশে যেদেশে এই আন্দোলন উঠিয়াছে, সেই সকল দেশে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। যদি থাকিত তা হইলে আন্দোলন উঠিবে কেন? কোথায় উঠিয়াছে? বিলাতে, আমেরিকায়, জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে, ইতালীতে। এশিয়ায় আমরা একালে স্বাধীনভাবে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করি এতখানি মগজ আমাদের নাই—না ভারতবর্ষে, না চীনে, না পারস্যে, না জাপানে। এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আজ পর্য্যন্ত এশিয়ায় এমন কোন মাথা গজায় নাই যা স্বাধীনভাবে আন্দোলনের মতন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে। পৃথিবীর যা-কিছু উন্নতিজনক শক্তি, সে সব বর্ত্তমান যুগে—এই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন ধরুন, ইয়োরোপে উঠিয়াছে আমেরিকায় উঠিয়াছে। যাক, দেখা যাইতেছে যে, ইয়োরোপীয় সমাজে, আমেরিকান সমাজে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সমাজে নারী-স্বাধীনতা নামে একটা বস্তু কোনো দিনই ছিল না। এ-কথা প্রথমেই স্বীকার করা দরকার।

এ কথাটা বেশ খুলিয়া বলা প্রয়োজন, কেননা আমরা অনেক সময় আমাদের ঠাকুরদাদাদেরকে গাল দিতে দিতে স্বজাতিটাকে অপদার্থ মনে করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, পৃথিবীর যা কিছু জঞ্জাল, নোংরা, যা-কিছু ঘৃণিত সব জিনিষ ভারতের একচেটে বিবেচনা করিতে শিখিয়াছি। যেমন বলিয়া থাকি যে, নারী-স্বাধীনতার অভাব হিন্দু, মুসলমান ও চীনাদের বিশেষত্ব। আসল কথা, এই দোষ বা পাপটা সুয়েজ খালের অপর পারেও চিরকাল যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মজুত ছিল। নারী-স্বাধীনতার অভাব কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, আর্থিক ক্ষেত্রেও বটে, উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুনিয়ার সর্ব্বত্রই একভাবে চলিয়াছে। এর যদি দৃষ্টান্ত চান আমি দেখাইব—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে আলবানা প্রদেশে ছেলে-মেয়ের অভিভাবক জননী কোন দিনই নয়, অভিভাবক তার বাপ। এই গেল যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের কথা। উত্তর দিকে যান, নিউ ইংলণ্ড খুব উন্নত, সেখানকার ব্যাপার এই। মেয়ে যদি চাকুরী করিয়া টাকা রোজগার করিয়া আনে, তার কর্ত্তা সে নিজে নয় তার স্বামী। অর্থাৎ গৃহস্থ-পরিবারে টাকা রোজগার করিয়া আনিতেছে স্ত্রী, কর্ত্তামি করিতেছে স্বামী। এই বিধান ১৯২৬ সনেও চলিতেছে। এ ধরণের বিধান বা অবিধান যুক্ত-রাষ্ট্রের ৪৮ জেলা থেকে রকম রকম জোগাড় করিতে পারি।

জার্ম্মাণির কথা ধরুন। এই সে-দিন ১৯১৪ সনে যখন লড়াই বাধে তখন সবে মাত্র মেয়েদেরকে ইউনিভার্সিটিতে পাঠাইবার একটা আন্দোলন জবর ভাবে দেখা দেয়। এই কথায় আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আশ্চর্য্য হইবার কথা এই যে, জার্ম্মাণির এমন দিন গিয়াছে যে দিনটা অতিমাত্রায় "প্রাগ্ঐতিহাসিক" যুগের সামিল নয়—যে যুগটার কথা তারা বেশ ভাল করিয়া জানে। ৪০।৫০ বৎসরের বেশী নয়;—জার্ম্মাণিতে এমন যুগ গিয়াছে যখন ভিয়েনা, মিউনিক, বার্লিনের একটা মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়, জার্ম্মাণরা এটা কল্পনা করিতে পারিত না। এই সমাজ-ব্যবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। যেদিন জার্ম্মাণিতে আর অষ্ট্রীয়ায় মেয়েরা "এন্ট্রান্স" কি "এল-এ" পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল সে দিন সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, যে যেখানে ছিল, রাস্তার লোক, দোকানদার, মুটে মজুর, গাড়োয়ান রাস্তার দুধারে দাঁড়াইয়া গেল দেখিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মেয়ে পড়িতে যায়

সেটা কি রকম জানোয়ার! এতে বুঝিতে হইবে জার্ম্মাণিতে স্ত্রীজাতির নারী-স্বাধীনতা কত নতুন জিনিষ। এ জিনিষটার অভাব একমাত্র ভারতে নয়, অন্যান্য দেশে, এমন কি জার্ম্মাণ সমাজেও ছিল এবং এখনো অনেকটা আছে। তার কথা জার্ম্মাণির নরনারী আজও ভাল করিয়া জানে। ৩০।৪০ বৎসর আগে মেয়েরা পাস করিয়া ইউনিভার্সিটিতে "বি এ" পড়িতে আসিয়াছে এটা কি জিনিষ দেখিবার জন্য একেবারে হৈচৈ পড়িয়া গেল, খবরের কাগজে লেখালেখি চলিল, আশ্চর্য্য জিনিষ। আমাদের দেশে এখনও সেই অবস্থা চলিতেছে অস্বীকার করিবার কারণ নাই। বুঝিতে হইবে আমরা এ বিষয়ে জার্ম্মাণদের অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসর পিছনে আছি। এখন মনে করুন ১৯১৪ সনে জার্ম্মাণিতে,—জার্ম্মাণিতে ঠিক নয়, প্রুসিয়াতে আড়াই হাজার মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত। এখন সেখানে পাঁচ হাজার হইয়াছে। আমাদের তুলনায় এই সংখ্যা খুব বড়, কিন্তু আমেরিকার তুলনায় পাঁচ হাজার কিছুই নয়। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন এত নতুন জিনিষ যে, এখন পর্য্যন্ত এটা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

পরিবার-নিষ্ঠায় ল্যাটিন নারী

ফ্রান্সের একজন মস্ত বড় সমাজ-তাত্ত্বিক জোসেফ বার্থেলেমি মেয়ে জাতিকে অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাতে তিনি বলিয়াছেন—ল্যাটিন জাত ঘর-প্রেমিক, পরিবার-নিষ্ঠ। নারী স্বাধীনতার আন্দোলন ল্যাটিন সমাজে চলিবে না। তাঁর বই বাহির হইয়াছে ১৯২০ সনে। ল্যাটিন জাতে ফ্রান্স স্পেন ও ইতালী এই তিন দেশ ধরা হইয়াছে। অন্যান্য দেশে খাটিলেও খাটিতে পারে; কিন্তু ল্যাটিন জাতির মেয়েরা গৃহস্থালী ভক্ত, তারা মেয়েদেরকে ঘরে রাখিতে বাধ্য। ইতালীতে নারীজীবন বলিয়া একখানি বড় মাসিক কাগজ বাহির হয়। তার সম্পাদিকা একদিন আমাকে বলিতেছিলেন ;—"ইতালী দেশে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন যা দেখি—তা আমেরিকার থেকে আসিয়াছে। ইতালীর মেয়েদের আমেরিকার মত জীব হওয়ার যো নাই, সভা-সমিতিতে যাওয়া, কংগ্রেস করা এ সবে আমরা অগ্রসর হইব না। যদিও দেখিতে পাই বিশ্ব-নারী-সভার কর্ম্মকেন্দ্র রোমে রহিয়াছে তা সত্ত্বেও বলিতে হইবে, এটা আমেরিকা হইতে আমদানি। আমাদের সম্পাদক বা কর্ম্মকর্ত্তা রাখা দরকার, সেজন্য রাখিয়াছি।

তবেই দেখিতে পাইতেছেন যে, কি মার্কিণ কি টিউটনিক কি জার্ম্মাণ (আসল টিউটনিক) কি ফরাসী ও ইতালীয়ান ল্যাটিন জাতি, এদের যে পথ আর ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধের যে পথ,—দুইই এক। একই পথে আমরা সবাই চলিয়াছি হয়ত আমরা বেশ পিছনে আছি। কিন্তু সর্ব্বদাই আমাদের চোখের সম্মুখে রাখা দরকার দুনিয়ায় নারী-স্বাধীনতার ক্রমোন্নতির খবর, মেয়েরা স্বাধীন কতখানি হইয়াছে জার্ম্মাণিতে, আর কত নতুন নতুন স্বাধীন উপায়ে নিজের দেশকে ধনধান্যে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে তা ভারতের পুরুষ আর নারীমহলে সর্ব্বদা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই আলোচনাই আমাদেরকে কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকটা আগাইয়া দিতে সাহায্য করিবে।

জার্ম্মাণ নারীর আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্র

প্রথমেই বলিয়া দিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা জার্ম্মাণ মেয়েদের পক্ষে আর অসম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ যে সব টেক্‌নিক্যাল কলেজ আছে তাতেও মেয়েরা পড়িতেছে। পড়িয়া ডাক্তার, উকিল হইতে পারে, রাইখষ্টাগের (পার্ল্যামেন্টের) মেম্বর হইতে পারে। তারপর ব্যবসা করিয়া খবরের কাগজ চালাইয়া, লেখিকা হইয়া অনেকে টাকা রোজগার করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো অন্যান্য দিকে জার্ম্মাণ মেয়েদের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাষবাসেও লক্ষ লক্ষ মেয়ে খাটিয়া নিজের দেশকে উন্নত করিতেছে, সেকথা সম্প্রতি না বলিলেও চলিবে। আমি বলিতে চাই, প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উঁচু-নীচু মাঝারি এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা কি কি কাজ করে, আর কি কি উপায়ে পয়সা রোজগার করে, সেই কথাই বলিব।

প্রধানতঃ চারিটি বিষয় বলিতে চাই (১) গৃহস্থালীর কথা (২) মেয়েলী শিল্পের কথা (৩) বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল কাজের কথা (৪) সমাজ-সেবার কথা। আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে,—এই চার রকম কর্ম্মক্ষেত্রে জার্ম্মাণির মেয়েরা নতুন নতুন উপায়ে ধনসম্পদ্ সৃষ্টি করিতেছে।

(১) গৃহস্থালী

প্রথমতঃ গৃহস্থালী। আমাদের একটা বিশ্বাস আছে, সাদা-চামড়া যে সব মেয়ে তারা বাবু হইয়া জন্মিয়াছে। বাবু টাবু বলিলে কি বুঝা যায়, তা আপনারা বেশ বুঝেন, ব্যাখ্যার দরকার নাই। তারা কখনও কোন কাজ করে না, রেষ্টরাণ্টে বা হোটেলে খায়, নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়। অর্থাৎ জীবনটা তাদের হইতেছে ছেলে-খেলা, সংসার বলিয়া কিছু নাই, কাজ-কর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই। গৃহস্থালী রান্না-বান্না নামে কোন জিনিষ ইয়োরামেরিকায় আছে কি না এই ধরণের সন্দেহ পর্য্যন্ত আমরা করিয়া থাকি। মোটের উপর পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এইরূপ। আমাদের ভারত থেকে যে সব দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, মহাত্মা শ্রেণীর কেষ্ট বিষ্টু লোক অথবা ছাত্রছাত্রী নর-নারী ইয়োরামেরিকায় দু'চার মাস বা দু'চার-বছর কাটাইয়া আসিয়াছেন তাঁরাও পশ্চিম মুলুকের মেয়ে জাত সম্বন্ধে এই ধরণেরই তথ্য ভারতীয় সমাজে ছড়াইয়াছেন।

আমার অভিজ্ঞতা বস্তুনিষ্ঠ। দেশ-বিদেশের ছোট বড় মাঝারী বহুবিধ-পরিবারের হাঁড়ীর খবর আমার কিছু কিছু জানা আছে। তা ছাড়া মজুর, চাষী, বড়লোক, গরীব লোক, ছুতার কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টার ইত্যাদি নানা-রকম লোকজনের সঙ্গে এই সকল বিষয়ে লম্বা লম্বা তর্কপ্রশ্ন চালাইয়া জিনিষটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি বলিতে চাহিতেছি এই যে, গৃহস্থালীর কাজে জার্ম্মাণির মেয়েরা সকাল ৫টা থেকে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত—উচু, নীচু, মাঝারী শ্রেণীর মেয়েরা, যত খাটে, তা যদি দেখেন তা হইলে আপনাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ভারতীয় বা বাঙ্গালী পাঁচ পাঁচটা মেয়ে ওদের একটার সমান হইতে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়। এত হারভাঙ্গা খাটুনী তারা খাটিতে অভ্যস্ত। মেজে ঝাড় দেওয়া, দেওয়াল ঝাড় দেওয়া, ছাদ ঝাড় দেওয়া তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। তারপর আসবাব পরিষ্কার করা আর এক রকম কাজ। কাপড় পরিষ্কার করা আর এক রকম কাজ। যে ধরণের "পরিষ্কার" করার কথা বলিতেছি তা আমার বিবেচনায় ভারতে একদম অজ্ঞাত। তারপর রান্নাঘর—সে এক অদ্ভুত কারখানা। খুব গরীবের ঘরেও গিয়াছি, কাউকে কিছু না বলিয়া খবর না দিয়া ঢুকিয়াছি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব এমন হইয়াছে যে, বলিয়া কহিয়া যাওয়ার দরকার হয় নাই। এমন নয় যে, আমি যাইব বলিয়া ঘরদোর সব পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যখন তখন গিয়া হাজির হইয়াছি। এমন কখনও দেখি নাই কোন জার্ম্মাণ পরিবারে শিজিল-মিজিল নাই। রান্নাঘরে যখনই যান দেখিবেন এটা যেন উঁচু দরের একটি ল্যাবরেটরী। অন্যান্য ঘরে কোথাও একটু ঝুল থাকিতে পারে এটা কোন জার্ম্মাণ মেয়ের কল্পনায় অসম্ভব। আমরা যাকে গিন্নী বা গৃহিণী বলি—জার্ম্মাণিতে তাকে বলে—"হাউসফ্রাও।" সে বস্তু বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার যুগে এমন অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, চোখে না দেখিলে তা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

গরুর গাড়ীর বেশী যারা কিছু চোখে দেখে নাই তাদের পক্ষে এরোপ্লেন অটোমোবিল কল্পনা করা কঠিন। মামুলি গিন্নীগিরিতে অভ্যস্ত নরনারীর পক্ষে বিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ "হাউসফ্রাও"য়ের কৃতিত্ব কল্পনা করাও প্রায় ঠিক সেই দরের কঠিন চিজ।

এরা ২৪ ঘণ্টাই খাটিতেছে। মাথার খাটুনিও কম নয়। খবরের কাগজে—মাসিকে সাপ্তাহিকে—পড়িতেছে অমুক ঘণ্ট কি অমুক তরকারী বাঁধিবার কায়দা। খাবারটা একসঙ্গে সস্তা ও পুষ্টিকর। পড়িতেছে—ছেলেকে শিখাইবার জন্য এমন কৌশল হইয়াছে তাকে আর ইস্কুলে পাঠাইতে হইবে না, সে ঘরে বসিয়া নিজেই শিখিতে পারে। পড়িতেছে—কি একটা নতুন সুর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঘরে বসিয়া অল্প খরচে এরা নানাদিকে নিজ নিজ ক্ষমতা বাড়াইতেছে। এরা হারভাঙ্গা খাটুনী খাটিতেছে। এইবার

ভাবিয়া দেখুন, যদি অন্য লোক দিয়া কুঠুরী পরিষ্কার, আসবাব ঝাড়া, সন্তানসন্ততিপালন, রান্নাবান্না সব কাজ করাইতে হইত তা হইলে কত টাকা লাগিত অর্থাৎ গিন্নীপনার জোরে মেয়েরা পয়সা বাঁচাইতেছে।

গিন্নীপনায় পয়সা রোজগার

কেহ কেহ গিন্নীগিরি করিয়া পয়সা রোজগারও করিতেছে। আজকাল গিন্নীপনা একটা ব্যবসা। সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কলিকাতায় ২০০।২৫০ হোটেল মেস চলিতেছে। জার্ম্মাণিতে এই রকম হাজার হাজার রহিয়াছে। সে সবের কর্ত্তা হয় কারা? যারা গৃহিণীপনায় ওস্তাদ, তাদের দ্বারা এই সব হোটেল রেষ্টরেণ্ট বা ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। এই কাজে তারা পয়সা রোজগার করে। নিজের বাড়ীতে করিতে হইলে যা যা করিতে হইত এখানে ঠিক তাই করিতে হয়। এখানে লওয়া হয় "কর্ত্রীর" পদ। তার সহকারী অন্যান্য লোক থাকে। এই রকম প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণিতে অনেক। এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্ত্তৃত্ব করিয়া জার্ম্মাণির মেয়েরা পয়সা রোজগার করে।

এইবার আর এক প্রকার প্রতিষ্ঠানের কথা বলিব। ধরুন ডাক্তারি ব্যবসা। একজন অস্ত্র-চিকিৎসক এবং একজন মামুলী চিকিৎসক—দুজনে মিশিয়া কলিকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া নিল। ১৫।২০টি ঘর সাজাইয়া রাখিল। সে বাড়ীটা হইল আধখানা হাঁসপাতাল, আধখানা অতিথি রাখিবার হোটেল। সাধারণ নাম জার্ম্মাণ হিসাবে "সানা-টোরিয়াম" বা স্বাস্থ্য-নিবাস। সেখানে মফঃস্বলের রোগী আসে। কলিকাতায় যারা সপরিবারে বাস করে তাদের মধ্যেও যারা রোগী, তারা ডাক্তারের বাড়ীতে ছয় সপ্তাহ হউক, ছয়মাস হউক কাটাইতে পারে। আপনারা বলিবেন "নিজের মা বোন ফেলিয়া যাইবে ডাক্তারের বাড়ী! একি কখনও সম্ভব হিন্দু সমাজে? হিন্দুরা পরিবার-ভক্ত আধ্যাত্মিক।" বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ চিন্তার পশ্চাতে কোনো তথাকথিত হিন্দুত্ব বা আধ্যাত্মিকতা নাই। আছে আমাদের মগজের আলস্য আর চরিত্রের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা। ভিতরকার কথা, আমাদের যখন অসুখ হয় তখন আমরা মনে করি নিজের মা বোন থাকে ত খাটিবে, বিধবা মাসী পিসী থাকে তারা খাটিবে, এর চেয়ে আর কি ভাল হইতে পারে? বিধবাকে দিয়া খাটাইয়া নিতেছি, এক জনকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছি, তার সুবিধা অসুবিধা, তার ব্যক্তিত্ব একবার চিন্তা করিতেছি কি? যাক্ সে কথা। যদি আমাদের দেশে এমন একটা উপায় হয় যাতে শিক্ষিত ডাক্তারের অধীনে বাড়ী ঘর স্থান পাই, ডাক্তারের সাহায্য পাই, খাওয়া দাওয়ার আরাম থাকে, সপ্তাহে বা মাসে বাড়ীর লোক আসিয়া আমাদের দেখিয়া যায়, আমি বলি এ ব্যবস্থাটা কি নিন্দনীয় ব্যবস্থা? এ ধরণের ব্যবস্থা আমাদের নাই। যদি হয় আমাদের সুখ সুবিধা অনেক বাড়িবে। আপনারা স্বীকার করেন কিনা জানি না। জার্ম্মাণিতে এই প্রণালীর চরম উন্নতি হইয়াছে। বার্লিনে যান, মিউনিকে যান, প্রায় এমন কোন রাস্তা নাই যেখানে একটি না একটি স্বাস্থ্য-নিবাস—যা এক হিসাবে হোটেল, এক হিসাবে হাঁসপাতাল—চলিতেছে না। এর কর্ত্তা হয় কারা? গিন্নীপনায় শিক্ষিত যে সব নারী তারা এই সব স্থানে কর্ত্তৃত্ব করে।

তৃতীয় রকমের দৃষ্টান্ত—তাও আমাদের দেশে নাই। জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত লোক ইচ্ছা করিলেই সাধারণ ইস্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে পাঠাইতে পারে, কিন্তু সব সময় ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাইয়া সুখী হয় না। তারা চায় কোন একজন ভাল শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের দায়িত্ব লউক এবং সেখানে তার যত রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার সে করুক। এই ধরণের ব্যবস্থা জার্ম্মাণিতে অনেক আছে। স্বাস্থ্যকর জায়গায় আছে, বড় বড় সহরে আছে, পল্লীতেও আছে। সেগুলিকে "আদর্শ বিদ্যালয়" ইত্যাদি নাম দিতে পারি। এক হিসাবে ছাত্রছাত্রীর আবাস, আর এক হিসাবে ইস্কুল দুইই এক সঙ্গে চলিতেছে। এই ভাবে ১৫০।২০০ ছেলে মেয়ে লইয়া একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী থাকে। তার সঙ্গে আরো শিক্ষয়িত্রী সেখানে বাস করে। সেটাকে বলিতে পারি মেয়েদের জন্য 'উপনিবেশ'। যারা এর দায়িত্ব লয় প্রধান শিক্ষয়িত্রী বা তার সহযোগিনী সকলেই গৃহিণী ধরণে শিক্ষিতা। তারা এই সকল প্রতিষ্ঠানে

কর্ত্তৃত্ব করে নিজেদের আর্থিক উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

ঝি-রাঁধুনীর নববিধান

তারপর গৃহিণীপনার ভিতর আর একটি মামুলী জিনিষ ঝি-গিরিকরা; রাঁধুনীর কাজ করা। এ এক ধরণের ব্যবসা, বলাই বাহুল্য। এখন কথা হইতেছে—এ জিনিষ ত আগেও হইত, এখন এমন কি হইয়াছে? রান্না-বান্না তাও শিখিতে হইবে? এ ত সকলেই বুঝে! এই ধারণা আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত আছে। "রান্না-বান্না শিখিতে ইস্কুলের দরকার কি? এ শিক্ষা ত আমরা ঠান্‌দির কাছে পাইয়াছি, এখন কেন ইস্কুলে যাইতে হইবে?' জার্ম্মাণিও ঠিক এই রকম কথা বলিত। কতদিন আগে বলিত তাও বলিয়া দিতে পারি। মাপ-জোক ছাড়া আমার ভিতর আর কিছুই নাই। ১৮৫০-৬৫ সনে জার্ম্মাণিতে এই বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। তখন জার্ম্মাণরা বলিয়াছে গৃহস্থ হইয়াই জন্মিয়াছি; নতুন শিখিবার আবার কি আছে?"

মজার কথা হইতেছে জিনিষটাকে যত সোজা মনে করি তত সোজা নয়। কয়েক বৎসর আগে আমাদের দেশে কয়লার রান্নার চলন হয় নাই, কাঠের রেওয়াজ ছিল। তাতে স্ত্রী হউক, রাঁধুনী হউক, তাদের স্বাস্থ্য তত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইত কিনা জানিনা। কয়লা যখন হইল প্রত্যেক রান্নাঘর যেন এক একটি কয়লার খনি। সেখানে বোনকেই রাখি কি বিধবা মাসীকেই রাখি তার উপর একটা অত্যাচার হইতেছে। ঝি রাখি, চাকর রাখি, ঠাকুর রাখি তার উপর একটা অত্যাচার হইতেছেই হইতেছে। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল,—কয়লা বনাম কাঠ—বিপুল বিপ্লব।

জার্ম্মাণিতে এই রকম ধরণের বিপ্লব হইয়াছে ১৮৫০-৬৫ সনে। আজকে একটা নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার হইল তার কারখানা গড়িয়া উঠিল। ঝি চাকর আর পাওয়া যায় না, তারা পল্লী ছাড়িয়া কারখানায় ছুটিতেছে। চাকরের সঙ্গে কথা বলে কে, আগুন! জার্ম্মাণি তখন দেখিল—তাইত, এক একটা বিপ্লবে পল্লীগুলি ছারখার হইয়া যাইতেছে, চাকর-বাকর জুটিতেছে না। এদিকে গৃহস্থালী ঘরবাড়ী, বিছানা, রান্নাবান্না সব একটু একটু বদলিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া সংসার চালাই? গৃহস্থালীতেও আমাদের নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করিতে হইবে। সেই সময় লোকেরা বুঝিল আর পুরানো পথে চলিলে হইবে না, নতুন কিছু করা দরকার।

এই সঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলে ভাল করিয়া বুঝিবেন। 'চাষ-বাসের কথা'। আমরা সকলেই বাবু। কেহ চাষ বিজ্ঞান পড়িয়া ডিগ্রী লইয়া গ্রামে গিয়া যদি চাষীদের শিখাইতে চায় তারা বলিবে "দাদা! আমাদের শিখাইবে তোমরা! আমাদের বাপদাদা এই ভাবে শিখিয়া আসিয়াছে, তোমরা আমাদের কি চাষ-আবাদ শিখাইতে পারিবে?" চাষীতে বাবুতে এই ধরণের ঝগড়া ফ্রান্সে ছিল, জার্ম্মাণিতে ছিল। তারপর খনার বচন দেশ-বিদেশের কোন্ চাষা না জানে? আমরা যেমন বলিয়া থাকি—"যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ"। এই ধরণের বচন জার্ম্মাণিতে ছিল, ফ্রান্সেও ছিল। বস্তুতঃ এখনও আছে। "আকাশের অমুক কোণে যদি এই ধরণের মেঘ হয়, কুছ পরোয়া নাই; দাঁও মারিয়া লইব"—তাদের এই রকম ধারণা আছে। তাদের খনা বলিয়া গিয়াছে—"ঐ রকম মেঘ যদি হয় তা হইলে আলু গম যব—হাতী ঘোড়া একটা কিছু হইবেই হইবে।" কিন্তু হাওয়া একটু একটু বদলাইতেছে। জার্ম্মাণি ও ফ্রান্স বদলিয়া গিয়াছে। খনার বচনের উপর নির্ভর করিয়া আর ফরাসীরা জার্ম্মাণরা চাষ চালায় না। তারা চাষ আবাদ শিখিবার জন্যই ইস্কুল কায়েম করে।

নারী-সমস্যা সম্বন্ধে, গৃহস্থালী-সমস্যা সম্বন্ধেও আজকালকার জার্ম্মাণরা ফরাসীরা ঠিক ঐরূপ মীমাংসাই করিয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার কেন্দ্র গৃহ না ইস্কুল? এই প্রশ্নের জবাবে শেষ পর্য্যন্ত ইস্কুল নামক প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার হইয়াছে। সেই সমস্যাগুলি এতদিনে এশিয়ায় আসিতেছে। আমরাও সেই কালের ফরাসী-জার্ম্মাণদের মতন এদিক ওদিক ভাবিতেছি। হিন্দু মুসলমান পার্শী

চীনা বৌদ্ধ—এদের মাথায় একটা নতুন কিম্ভূতকিমাকার প্রশ্ন হাজির হয় নাই। সুয়েজ খালের ওপারে খৃষ্টিয়ান, সাদা চামড়া যাদের—তাদের কাছেও এই সমস্যা আসিয়াছিল—পরিবার বনাম বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইব কি পাঠাইব না? গৃহস্থালী শিক্ষার জন্য পরিবার আসল বিদ্যাকেন্দ্র, না ইস্কুল নামক কর্ম্মকেন্দ্র কায়েম করা দরকার? আমাদের দেশী একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন।

আগেকার লোকেরা তেঁতুল দিয়া ডেকৃচি পরিষ্কার করিত এখন তেঁতুল পাওয়া যায় না। অন্যান্য জিনিষের ন্যায় তেঁতুলের দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, তেঁতুলের ব্যবসা চালান যায়। ডেকৃচি পরিষ্কার করিতে অন্য জিনিষ আবিষ্কার করা দরকার। আবিষ্কার আরম্ভ হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে মামুলী ঝি তা দিয়া ডেকৃচি পরিষ্কার করিতে পারিবে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে দেখিবেন যে, কি করা দরকার তাকে শিখাইতে হইবে। সেজন্য ঝিগিরি রাঁধুনীর কাজ শিখিতেই জার্ম্মাণী ইস্কুল কায়েম করিয়াছে। দাসদাসীগিরি করা সোজা কথা নয়। এইজন্য ১৮৬৫ সনে জার্ম্মাণিতে যে পরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছিল সেটার নাম—সর্ব্ব-জার্ম্মাণ-মহিলা-পরিষদ। জার্ম্মাণির মেয়েদেরকে বর্ত্তমান শিল্প-বিজ্ঞানের যুগ মাফিক শিক্ষিত কর্ম্মদক্ষ করিয়া তোলা ছিল তার মতলব। খুঁপিয়া দেখিতে পারেন এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে কিনা। যদি না থাকে সোজা-সুজি বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করা উচিত—এখন পর্য্যন্ত আমরা ১৮৬৫ সনের দুনিয়ায় পৌঁছিতে পারি নাই।

(২) মেয়েলী-শিল্পের তিন মহল

এইবার মহিলা-শিল্পের কথা। এ জিনিষ এক হিসাবে মামুলী আর এক হিসাবে ৫০ বৎসর আগে দুনিয়ার কোথাও ছিল না। প্রথম নম্বর—গৃহস্থ-ঘরে দেখিবেন বাপ ছোটেলে কাজ করে, স্ত্রী ঘর-বাড়ী দেখে, মেয়ে চালাইতেছে ছোট-একটি দোকান। সেখানে পোষাক টোষাক, মনিহারীর জিনিষ, খেলনা ইত্যাদি রহিয়াছে। পোষাক তৈয়ারি করাও এই মেয়ের কাজ। এইখানে কিছু সামাজিক কথা বলা দরকার। যদিও জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ ধনবান, তা সত্ত্বেও সকল গৃহস্থই দোকান থেকে যে ৩০।৩৫ টাকা দিয়া তৈয়ারি পোষাক কিনিয়া থাকে তা নয়। যে পোষাক দোকানে কিনিতে ৩৫ টাকা লাগে সে পোষাক ঘরে তৈয়ারি করিতে অথবা কাউকে দিয়া তৈয়ারি করাইয়া লইতে খুব অল্প খরচ পড়ে। ধরুন ৮ টাকা দিয়া কাপড় কিনিয়া আনিল। আর তৈয়ারি করাইতে লাগিল ৮ টাকা। কেউ কেউ বলিবেন,—"পোষাক তৈয়ারি করা সহজ কথা কি?" এক একটা জামা, গেঞ্জি, মোজা, জোড়া দিতে বা সেলাই করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন কি? পারিবেন না সেলাই করিতে। বিদ্যার দরকার, কাজ চালাইবার মতন করিয়া বোতাম লাগাইতে পারিবেন, তা স্বীকার করি। কিন্তু সেলাই করিতে "শেখা" দরকার। প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মেয়েই যে পারিবে এটা কল্পনা করা উচিত নয়। কাজেই সমাজে এমন কতকগুলি লোকের দরকার আছে যারা সস্তায় গৃহস্থের পোষাক তৈয়ারি করিয়া দিতে পারে। এ হইতেছে এক ধরণের ব্যবসা।

দ্বিতীয় মেয়েলি ব্যবসা টুপী-তৈয়ারি করা। আপনারা বলিতে পারেন "টুপী আর পোষাক ত এক শ্রেণীতে পড়িয়া গেল।" তা নয়, টুপী ভয়ানক কঠিন জিনিষ। টুপীর উপর নির্ভর করে লোকটা কেমন দেখাইবে। আপনারা যারা ছবি আঁকেন, তাদের রং আর রূপ সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞান থাকা দরকার, টুপী তৈয়ারি করিতে ঠিক ততখানি বিদ্যার, মাথা খাটাইবার দরকার হয়। টুপীর ভিতর চাই রূপ আর রং। কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রং খাপ খাইবে আপনি আমি বলিয়া দিতে পারি না। যত সোজা মনে করি তত সোজা নয়। কোন্টা সরল, কোনটা গোল, কোনটা ত্রিভুজ, কোন্টা মোজার গড়নে করিতে হইবে বুঝা বেশ কঠিন। এ সবে নুন-তেল খরচ করিতে হয়। যেমন চিত্র-শিল্প বক্তৃতা করিয়া বুঝান যায় না, কোন্ গড়নটা কিরকম করা উচিত, সেটা মাথা থেকে বাহির হইবে, অর্থাৎ যে লোকটা ছবি আঁকিতে শিখিয়াছে, তার জন্য কষ্ট করিয়াছে, সেই এসব তৈয়ারি করিতে পারে, আর বুঝিতে পারে, এ ও তেমনি। টুপী-শিল্প ভয়ানক জটিল। চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য-বিদ্যা বলিলে পরে যতখানি রূপ রংএ দখল

থাকা প্রয়োজন, টুপী তৈয়ারি করিতেও ঠিক ততখানি দরকার।

নিউইয়র্ক, লণ্ডন, বার্লিনের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া দেখিয়াছি—যে সব দোকানে খুব মাল রাখে। কোথা থেকে আসিল খুঁজিয়া দেখি, সেটা নিউইয়র্কের জিনিষ নয়, লণ্ডনের জিনিষ নয়, বার্লিনের জিনিষ নয়। টুপী-বিজ্ঞানে পারিসের মেয়েরা দুনিয়াকে হারাইয়াছে। যখনই এ লাইনে কোন ভাল জিনিষ দেখিতে চাহেন তখনি বুঝিতে হইবে এটা জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকান করিয়া উঠিতে পারে নাই, পারিয়াছে ফ্রান্স। টুপীর "ডিজাইন" বা নক্সাটা ফরাসীরা তৈয়ারি করিল বটে, তার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ছবি তৈয়ারি হইয়া গেল। সে ছবি অনুসারে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, রোম সব জায়গায় দোকানে দোকানে খবরের কাগজের সাহায্যে টুপীর গড়ন প্রচারিত হইয়া গেল। সেই অনুসারে ইস্কুলে শিখান চলিতে থাকে। আর যখন মেয়েরা ব্যবসা খোলে, প্রতি সপ্তাহের কাগজে টুপীর নতুন নতুন নক্সা অনুসারে টুপী গড়িয়া থাকে। টুপীর হাঙ্গামা বাঙ্গালী সমাজে নাই। কাজেই টুপী-শিল্পের মাহাত্ম্য লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি না করিলেও চলিবে। তবে এর সঙ্গে আর্থিক জীবনের আর শিল্প-শিক্ষালয়ের যোগাযোগ কত নিবিড় তা বুঝিতে পারিলে আমাদের প্রয়োজনীয় মেয়েলি শিল্পগুলার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার খানিকটা বুঝিতে পারিব।

তৃতীয় রকম মহিলা-শিল্প হইতেছে কাপড়ের যত রকম কাজ। আপনারা মনে করিতে পারেন এটা ত তাহা পোষাকের অন্তর্গত। তা নয়। জামা তৈয়ারি করা এক জিনিষ, বিছানার চাদর তৈয়ারি করা আর এক জিনিষ, বালিসের ওয়াড়, লেপের ওয়াড় অন্য জিনিষ, চেয়ার টেবিলের ঢাকনি ভিন্ন জিনিষ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের দেশে এক জিনিষ চলে, যেমন তুলার সূতার জিনিষ। ইয়োরোপেও তুলার সূতা চলে বটে, তার সঙ্গে আরো অনেক জিনিষ চলে। লিনেন সূতা তুলার সূতার মত দেখিতে ;, কিন্তু ভিন্ন জিনিষ। তারপর রেশম পশমের কাজ আছে। খাঁটি পোষাক তৈয়ারি করা অথবা টুপী তৈয়ারি বলিলে যা বুঝায় এসব কাজ তা নয়।

চাই পাশ ও চাপরাশ

ধরা যাক্ যেন আমি শিখলাম টুপী তৈয়ারি করিতে। কিন্তু পোষাক তৈয়ারি করিতে লাগিয়া গেলাম। জার্ম্মাণিতে তা হইবার যো নাই। ঝি হইতে হইলেও ইস্কুলের পাশ দরকার; ঝির জন্য ইস্কুল আছে, রাঁধুনী বামুনের ইস্কুল আছে, ঝাড়ুদারের পর্য্যন্ত ইস্কুল আছে। এই সব ইস্কুলে পাশ করা চাই। সরকারী সার্টিফিকেট বা চাপরাশ পাইলে পরে তবে সে লোক ঝি, বামুন, ঝাড়ুদার ইত্যাদির কাজ করিতে অধিকারী হয়। আমি এক যন্ত্রের মিস্ত্রী, আর একটা যন্ত্র মেরামত করিতে লাগিলাম। সে সব হইবার যো নাই। মিস্ত্রী ছুতোর ধোপা নাপিত যত রকম ব্যবসা আছে প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য পাশ করা দরকার, সার্টিফিকেট দরকার, লাইসেন্স দরকার। বিনা লাইসেন্সে, বিনা সার্টিফিকেটে বিনা পাশে কোন লোক ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত হইতে অধিকারী নয়। এই প্রথম কথা মনে রাখা দরকার।

তারপর জার্ম্মাণিতে সব মেয়ে কমসে কম এণ্ট্রান্স পাশ। ঝি এণ্ট্রান্স পাশ, রাঁধুনী বামুন এণ্ট্রান্স পাশ। তার নীচে কোন পুরুষ কি কোন স্ত্রী থাকিতেই পারে না। এই পাশের বনিয়াদের উপর ব্যবসায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই পাশ করিবার পর তারা নানা দিকে, নানা কাজে, নানা ইস্কুলে চলিয়া যায়। কোন জায়গায় ছয় মাস, কোন জায়গায় ১।২।২॥০ বৎসর নানা রকম পাশের ব্যবস্থা আছে। তা খতম হইবার পর ইস্কুলের পাশ এবং তার সার্টিফিকেট চাই। তার পর মিউনিসিপালিটী বা পল্লীস্বরাজ। সেখানে পরীক্ষা দিয়া সরকারী সার্টিফিকেট চাই। সে সব হইলে ব্যবসা করিতে পারে। ব্যবসা সোজা জিনিষ নয়।

ব্যবসায়ের মধ্যে ধাপ আছে। এক রকম লোক আছে তারা নিজে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিতে পারে কিন্তু কোন লোক খাটাইতে অধিকারী নয়। তাদের বলা হয় আধা শিক্ষানবিশ।· আর এক রকম ব্যবসা আছে যা

লোকেরা নিজে করিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোককে লাইনে দিয়া খাটাইতে পারে। তাদের বলে ওস্তাদ।

(৩) রকমারি টেক্‌নিক্যাল সহকারিণী

প্রথমে গৃহস্থালীর কথা বলিয়াছি। তার পরে বলা হইল তিন প্রকার মেয়েলি-শিল্পের কথা। এখন বলিব মেয়েরা বিজ্ঞান সম্পর্কিত অথবা যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রিত যে সকল কারবারে পয়সা রোজগার করে, তার কথা।

এক নম্বর হইতেছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহযোগিতা। আমাদের দেশে এ জিনিষ এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ব্যাক্‌টিরিঅলজির কাজ, ভ্যাক্‌সিন তৈয়ারির কাজ এ সব করে মেয়েরা। তাদেরকে বলে ডাক্তারী লাইনে আসিষ্টেন্টিন (সহকারিণী)।

দ্বিতীয় নম্বর—যত জায়গায়, যত হাঁসপাতাল আছে, সেনিটারিয়াম আছে, সে সব জায়গায় ডাক্তারের নীচে কাজ করে যারা, তারাও মেয়ে, "আসিষ্টেন্টিন্"। তারা মাপ জোক করে। ডাক্তারী বিদ্যার যত রকম বিভাগের কাজ আছে, ব্যবসা, আছে, প্রত্যেক ব্যবসায়েই জার্ম্মাণিতে মেয়েরা সহকারিণী। মেয়েদের পক্ষে এ হইতেছে আয়ের একটা বড় পথ।

তৃতীয় নম্বর—টেকনিক্যাল কাজ। যত জায়গায় খনি আছে, তাতে যে সব ধাতু বাহির হয় তার ঝাড়া বাছা গণা মাপায় বাহাল থাকে মেয়েরা। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা, ধাতু গালান, ঢালান ইত্যাদি সবই মেয়েদের কাজ।

তারপর আরো একটি টেক্‌নিক্যাল বা বৈজ্ঞানিক কাজ আছে। সেটা রাসায়নিক। যে কোন সহরে বা পল্লীতে যাও না কেন, সব জায়গায়ই খাদ্যদ্রব্যের "স্বাস্থ্য-পরীক্ষার" ব্যবস্থা আছে। এও একটা বড় ব্যবসা। প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক পল্লীতে দুধ মাখন চিনি, "আলু পটল" সবই পরীক্ষা করা হয়। যা কিছু খাদ্যদ্রব্য থাকিতে পারে সব রাসায়নিক উপায়ে পরীক্ষার পর তবে বাজারে চলিবে। এই পরীক্ষাকাজে যে সব লোক বাহাল হয় তারা মেয়ে।

এইবার আর এক দিকে নজর দিতেছি। বড় বড় এঞ্জিনিয়ারদের আফিস দেখিয়াছি। এঞ্জিনিয়ার মাথা খাটাইয়া ৩০।৪০।৫০টি বড় বড় বৈদ্যুতিক কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন। কোথাও জলের প্রপাত চলিয়া যাইতেছে, এটাকে কেমন করিয়া কাজে লাগান যায় তা লইয়া তাঁরা অনবরত মাথা খাটাইতেছেন—ইত্যাদি। এই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এঞ্জিনিয়ার, তাঁদের আফিসে গিয়া দেখিবেন সাহচর্য্য করিতেছে কারা? অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ নয়, জার্ম্মাণির মেয়ে। সে বসিয়া মাপিতেছে, জুকিতেছে, ছবি আঁকিতেছে, অঙ্ক কষিতেছে। এ মামুলি সহযোগিতা নয়। রীতিমত টেক্‌নিক্যাল সাহচর্য্য। তাতে বেশ কিছু মগজের ঘি লাগে।

(৪) সমাজসেবায় অন্নসংস্থান

এখন চতুর্থ দফা,—সমাজ-সেবার কথা। এই শব্দ ব্যবহার করিলে আমরা বুঝি যে, লোকটা বিনা পয়সায় "দেশোদ্ধার" করিতে আসিয়াছে। আপনি কোথাও একটা বক্তৃতা দিয়া আসিলেন। অথবা দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, বন্যা হইয়াছে, দলে দলে লোক পাঠান গেল; স্বেচ্ছাসেবক পাঠান হইল। পাঠাইতেছেন ভাল কথা। এ ধরণের অবৈতনিক কাজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আছে, আমরাও করিতেছি, ভবিষ্যতেও করিব। কিন্তু সম্প্রতি আমি যে ধরণের সমাজ সেবার কথা বলিতেছি সেটা ঠিক আমাদের "দেশের" কাজ নয়। কেননা সে সব অবৈতনিক নয়। ওকালতী করা যেমন ব্যবসা, ডাক্তারী করা যেমন ব্যবসা তেমনি সমাজের সেবা করাও একটা ব্যবসা। আর এই সব কাজে মেয়েরা ওস্তাদ। ওকালতীর মত, ডাক্তারীর মত, এঞ্জিনিয়ারির মত দেশের লোকের সাহায্য করাও একটা বিশেষজ্ঞের পেশা। আর এতে পয়সা রোজগারও হয়।

এই ধরণের সমাজ-সেবা তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। (১) স্বাস্থ্যবিষয়ক। আপনাদিগকে আগে বলিয়াছি, মেয়েরা গৃহস্থালী করে, "স্বাস্থ্য-নিবাসে" কর্তৃত্ব করে। সেখানে যে কর্তৃত্ব, সেটা খাঁটি টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা নয়, সেটা গৃহস্থালী হিসাবে কর্তামি। কিন্তু এখানে স্বাস্থ্য-

হিসাবে নতুন ধরণের কাজ। তবে এটা ডাক্তারি নয়, আবার আর এক দিকে মামুলি গিন্নীপনাও নয়। এটা হইতেছে ওদের কথায় ভগ্নী, ইংরেজীতে যাকে বলে নার্স, জার্ম্মাণিতে বলে শ্বোয়েষ্টার। এই যে নার্সিং—সেবা করা, শুশ্রূষা করা ইত্যাদি জিনিষ জার্ম্মাণিতে অতি বিস্তৃত রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এক এক রোগের জন্য এক এক শ্রেণীর নার্স আছে। যদি আমি পেটের অসুখের জন্য নার্সিং বিদ্যায় পাশ করিয়া আসি তা হইলে আমাকে যক্ষ্মা রোগীর সেবায় কাজ দিবে না, অথবা আমাকে অস্ত্র চিকিৎসার কাজ করিতেও দিবে না। ভিন্ন ভিন্ন বেয়ারামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাঁসপাতাল, ভিন্ন ভিন্ন স্বাস্থ্য-নিবাস যেমন জার্ম্মাণির সহরে সহরে অলিতে গলিতে দেখা যায়, ঠিক তেমনি "ভগ্নী" বা "শ্বোয়েষ্টার" ইত্যাদিও রোগ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন। এক রোগের জন্য পাশ করা মেয়েকে অন্য রোগের জন্য সার্টিফিকেট দিবে না। সে যদি একটা নতুন কাজে আসে তার জেল হইবে এ রকম ব্যবস্থা আছে। যে কোন লোক যেমন ছুতোর হইতে পারে না—তার করাত আছে বলিয়াই সে কাঠ কাটাকাটি করিতে সুরু করিয়া দিবে এরূপ সম্ভাবনা জার্ম্মাণিতে নাই—তেমনি আমি নার্স নামক কোনো ভগ্নী, অতএব যে কোন রোগীর কাছে আমি হাজির হইতে পারি, জার্ম্মাণিতে তার যো নাই। এই হইতেছে এক নম্বরের সমাজ-সেবা।

দ্বিতীয় নম্বর, শিশু ঘটিত যা-কিছু। শিশু-জীবনের স্বাস্থ্যরক্ষা, আর ৬ বৎসর পর্য্যন্ত লেখাপড়া যা কিছু করিতে হয় তার জন্য হাজার হাজার মেয়ে তৈয়ারি হইতেছে, তারা খাঁটি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিশু সঙ্গিনী হইয়া তৈয়ারি হয়। এই সকল শিশু-কেন্দ্রে নানা বিভাগ ও তাতে নানা রকম শিক্ষা আছে। তার জন্য মেয়েরা বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র উপায়ে তৈয়ারি হয়। তার জন্য পরীক্ষা আছে।

তৃতীয় ধরণের সমাজ-সেবা—অর্থ-বিষয়ক। সমাজ-জীবনে বীমাপ্রথা জার্ম্মাণির বিশেষত্ব। বীমার প্রতিষ্ঠান, বীমার আইন—এসব জিনিষ তারা চরম বুঝে। টেক্‌নিক্যাল বিষয়ক, গ্যাস বিষয়ক, জল-বিজ্ঞান বিষয়ক, ইন্‌সিওরেন্স বিষয়ক, ব্যাঙ্ক বিষয়ক যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাতে গোটা দেশের ইতিহাস, জীবন, অর্থোন্নতির প্রণালী, ব্যবসা-বাণিজ্য কোথায় কেমন চলিতেছে তার খবর রাখা নেহাৎ জরুরি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজে মেয়েরা বাহাল হয়। তারা অর্থ-সেবাকে সমাজ-সেবা বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

সমাজসেবায় মহিলা-বিদ্যালয়

রকম রকম সমাজ সেবা করিয়া হাজার হাজার জার্ম্মাণ মেয়ে অন্নের সংস্থান করে। আর সমাজ-সেবার ব্যবস্থা শিখিবার জন্য ইস্কুল কলেজও আছে বিস্তর। এ জিনিষ অন্যান্য দেশে—এমন কি বিলাতেও বেশী নাই, এমন কি ১৮৯৯ সনের পূর্ব্বে এ জিনিস জার্ম্মাণিতেও ছিল না। ১৯১৪ সনে ১০।১২টি ছিল, আজকে গোটা ৪০টি প্রতিষ্ঠান—যাকে বলে "সমাজ সেবার মহিলা-বিদ্যালয়" জার্ম্মাণিতে পড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে ভর্ত্তি হইতে কমসে কম অন্ততঃ পক্ষে আমাদের বি-এ বি-এস-সি পাশ হওয়া চাই। যে সব মেয়ে এই পাশ নয় তাদের এসব ইস্কুলে স্থান দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় নম্বর—বি-এ, বি-এস-সি পাশ থাকিলেই এই ইস্কুলে ভর্ত্তি করা হইবে তা নয়। তাকে অন্ততঃ পক্ষে ২।৩ বৎসর নানা রকম কর্ম্মকেন্দ্রে কাজ করিতে হইবে। যদি সে নার্স হইতে চায় ২।৩ বৎসর হাঁসপাতালে কাজ করিতে হইবে। যদি সে শিল্পবিদ্যালয়ে সমাজ-সেবক হইতে চায়, ঐ রকম প্রতিষ্ঠানে ২।৩ বৎসর কাজ শিখিতে হইবে। যদি সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বীমার লাইনে, শ্রমিক লাইনে কি অন্যান্য যে সব পরোপকারক কর্ম্মকেন্দ্র আছে তার যে কোন বিভাগে সমাজ-সেবক হইতে চায়, তা হইলে তাকে সেইরূপ প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে কাজ করিতে হইবে। এই সকল কাজে অভিজ্ঞতার পর ইস্কুলে ভর্ত্তি করা হইবে। তার পর দস্তুর মত লেখাপড়া ও পরীক্ষা। তবুও চলিবে না। কমসে কম ২৪।২৫ বৎসরের হওয়া চাই। তার আগে কাহাকেও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না।

তা হইলে জার্ম্মাণি আজ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কোন রকমে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিলেই

চলিয়া যাইবে তার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক বিভাগে বিশেষজ্ঞ রহিয়াছে। এত দূর পর্যন্ত দেশটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে যে, সমাজ-সেবা করিতে হইলে ২০।২৫ বৎসরের কমে হইবে না। আপনি যদি কলিকাতায় একটা নার্স ইস্কুল খাড়া করিতে পারেন, তাকে লইয়া কত লাফালাফি, কত বক্তৃতা চলিবে। তার ছবি তুলিব, কত রকম প্রপাগাণ্ডা চালাইব; সমস্ত পৃথিবীকে উৎকর্ণ করিয়া তুলিব। এই রূপই সকল ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর করিয়া থাকি। কথাটা অন্যায় নয়, কারণ আমাদের দেশে "এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে।" খতাইয়া যদি দেখেন, ১৯০৫—২৬ সন পর্য্যন্ত যুবক ভারতের আমরা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে যা কিছু করিয়াছি তার প্রায় সবই "এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে।" অর্থাৎ আমাদের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত, বড় রাষ্ট্র-পতি, বড় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠাতা, সব চেয়ে বড় স্বদেশসেবক—কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই এক প্রকার "এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে" মাত্র। কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইল বোধ হয়। তবে খাঁটি সত্যটা বেশী দূরে নয়। কিন্তু জার্ম্মাণিতে "এরণ্ড" লইয়া আর চলে না। হয়ত ৭০।৭৫ বৎসর আগে চলিলেও চলিত। কিন্তু আজ আর চলে না। ওদের প্রত্যেক কাজের লম্বা লম্বা মাপ-কাঠি আছে। সেই মাপে চলা চাই। আমাদের একজন মেয়ে স্বদেশ-সেবক, কংগ্রেসকর্ম্মী, নার্স, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিৎ ইত্যাদি থাকিলে আমরা মাতামাতি করি। কিন্তু জার্ম্মাণি বলিতেছে "আগে বি-এ, বি-এস-সি পাশ কর্, তার পর কথা কহিব, এই পাশের পর ৩ বৎসর হাতে-কলমে কাজ কর্ গিয়া এখানে ওখানে সেখানে, তার পর আসিস্—দেখা যাইবে—কথা বলিব কি না। তার পর ২॥ বৎসর ৩ বৎসর লেখাপড়া কর্ অমুক ইস্কুলে। পাশটাশ করিয়া নে।" তখনও বলিতেছে, "উপযুক্ত হস্ নাই।" আরে মলো যা! কখন উপযুক্ত হইবে? যখন কমসেকম ২৫ বৎসর বয়স হইয়াছে তখন তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সেই সার্টিফিকেট লইয়া তবে সে কিছু টাকা রোজগার করিতে পারিবে। এই মাপ-কাঠি সোজা জিনিব কি? ১৯২৬ সনে আমরা এটা কল্পনা করিতে পারি না। ১৯০৫ সনে একথা বলিবার লোক ভারতে ছিল কি না জানি না। ১৯২৬ সনে যুবক ভারত এই পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দুনিয়াটা কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে তার ইঙ্গিত মাত্র প্রচারিত হইতেছে।

সূর্য্য উঠে পশ্চিমে

এখন কথা হইতেছে, আমরা কি এই অবস্থায় থাকিব? আমরা কি আমাদের নামজাদা জন-নায়কদের কথায় অন্ধ হইয়া থাকিব? আমাদের মহাপুরুষেরা, জ্ঞানবীরেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার তথাকথিত আহাম্মুকি সম্বন্ধে কত বুজরুকি শিখাইয়াছেন। আমরা কি তাঁদের কথা-মাফিক ইয়োরামেরিকাকে ভারতের চেয়ে অসুখী, ভারতের চেয়ে নীতিহীন, ভারতের চেয়ে পাপী বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব? আমি বলিতে চাই, আজ ১৯২৬ সনে যুবক ভারতের কর্ত্তব্য হইতেছে খোলাখুলি বলা—"হে পণ্ডিতগণ, তোমরা আমাদেরকে ঠকাইয়া রাখিয়াছ। তোমরা যা কিছু বলিয়াছ তার পশ্চাতে যুক্তি নাই, বস্তু নাই। তোমরা যা কিছু বলিয়াছ আমরা বোকার মত, তোতা পাখীর মত মুখস্থ করিয়াছি।" এখন জিজ্ঞাস্য—১৯২৬ সন ১৯৩০ সনের জন্য প্রস্তুত হইতে রাজী আছে কি না? ১৯০৫ সন যখন জন্মিয়াছিল তখন আমরা বলিয়াছি ১৮৮৬ সন হইতে ভারতে যা কিছু ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়। সব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে সেই ভাঙার ভিতর থেকে নতুন দুনিয়া গড়িয়া তুলিব।" আজ বিশ একুশ বৎসর ধরিয়া যুবক ভারত অনেক-কিছু ভাঙ্গিয়াছে, অনেক কিছু গড়িয়াছে। কিন্তু তবুও দেখিতেছি ১৯০৫—২৫ সনে বেশী কিছু হয় নাই। তাই আজ আবার জোরের সহিত বলিতে হইবে "১৯০৫—২৫ সন, তুই কিছুই করিস্ নাই, তুই যা কিছু করিয়াছিস্ সবই মান্ধাতার আমলের জিনিষ। দুনিয়ার সব কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন করিয়া ১৯৩০ সনের জন্য দুনিয়াকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

তার জন্য প্রথম দরকার;—পৃথিবীটা কি বস্তু তা নতুন ভাবে, গোঁজামিল না রাখিয়া, অতি সোজা প্রণালীতে নীরেট রূপে বুঝিতে চেষ্টা করা। এই বিষয়ে ভারতের পথ-প্রদর্শক তুর্কী আর জাপানী। ওরা করিয়াছে কি?

খোলাখুলি বলিয়াছে খোলাখুলি বুঝিয়াছে যে, তুর্কী সভ্যদেশ নয়, জাপান সভ্যদেশ নয়। তুর্কী-জাপানের সভ্যতা, তুর্কী-জাপানের শিক্ষা-দীক্ষা, তুর্কী-জাপানের আধ্যাত্মিকতা কোথা থেকে আসিয়াছে? বর্ত্তমান কালে সূর্য্য উঠে পূরবে নয়, পশ্চিমে,—তুর্কী তাই বুঝিয়াছে। "তুর্কী জানে, কামাল পাশা জানে, "যদি মানুষ হইতে হয় মুসলমানের দুনিয়াকে যদি মজবুদ করিয়া তুলিতে হয়, মুসলমানের আধ্যাত্মিক জীবন আনিতে হইবে সূর্য্যাস্তের দেশ থেকে।" সে কথা ১৯২৬ সনের বাঙালীকেও কোন রকম গোঁজামিল হ-য-ব-র-ল না রাখিয়া বার বার বলিতে হইবে। যুবক বাঙলা বল প্রাণ খুলিয়া "ভাই তুর্কী, তুই ওস্তাদ, ভাই জাপান, তুইও ওস্তাদ—ঠিক সময়ে বুঝিয়াছিস্ বর্ত্তমান এসিয়ায় অধ্যাত্মিকতা কিছুই নাই। এসিয়া যদি মানুষ হইতে চায়, তবে তাকে ইয়োরামেরিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।" একথা আজ খোলাখুলি চোখের ঠুলি খুলিয়া যুবক ভারত বলুক হাটে মাঠে। ১৯২৬ সন বলুক—যেন ১৯৩০ সনের জন্য সে প্রস্তুত হইতে পারে।

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্কসঙ্ঘ

(বাঙালীরা যাহাতে কতকগুলা বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কের সমবায়ে গঠিত "কেন্দ্রীকৃত ব্যাঙ্ক" গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য আমরা বৎসর দুয়েক ধরিয়া নানা প্রকার আলোচনা চালাইয়া আসিতেছি। অধিকন্তু বাঙালী ব্যাঙ্ক-পরিচালক আর ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরা সমবেত হইয়া একটা ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলুন এই মর্ম্মেও আমরা একাধিকবার নানা উপলক্ষ্যে নানা কথা বলিয়াছি। সম্প্রতি এই দুই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার দিকে যে আন্দোলন দেখিতে পাইতেছি আমরা তাহার সাফল্য কামনা করি।

(সম্পাদক)

(১)

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

এতৎসহ বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক এবং লোন আফিস সমূহের বিগত ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা নগরীতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কএর আফিস গৃহে যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহার কার্য্যবিবরণী প্রেরিত হইল। এই কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে অবগত হইবেন যে, বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত প্রাথমিক অধিবেশনের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। যাহাতে অবিলম্বে নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সঙ্ঘ গঠিত হয় তজ্জন্য উক্ত অধিবেশনে নির্ব্বাচিত অস্থায়ী কমিটির সদস্যগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে, যে উৎসাহ অধিবেশনকালে পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা শীঘ্রই সফলকাম হইবেন। এই অস্থায়ী কমিটিতে ব্যাঙ্কের বিধি-নিয়ম বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং আশা হইতেছে যে, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কমিটিকে তাঁহাদের উপদেশ প্রদানে সাহায্য করিবেন। অধিবেশনে প্রস্তাবিত নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্কসঙ্ঘ এবং ফেডার্যাল ব্যাঙ্ক বাংলা দেশের অভিনব প্রতিষ্ঠান হইবে এবং যাহাতে এই দুইটী প্রতিষ্ঠান ফলপ্রসূ হয় তজ্জন্য পৃথিবীর অন্যান্য জাতির এই প্রকার প্রতিষ্ঠান সমূহের ইতিবৃত্ত ও কর্ম্মপদ্ধতি অবগত হওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে। কমিটির সভ্যগণ আশা করেন যে প্রেরিত কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আপনি নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্কসঙ্ঘ এবং ফেডার্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে আপনার ব্যাঙ্কের অভিমত অবিলম্বে জানাইবেন। কমিটির সদস্যগণ আরও আশা করেন যে, আপনাদের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যে কর্ম্মভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। সবিনয় নিবেদন ইতি— চিরানুগত

অস্থায়ী কমিটীর সদস্যবৃন্দ—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়,
রংপুর লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীললিতমোহন সান্যাল,
বগুড়া লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘটক,
বরিশাল লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়,
খুলনা লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়,
নর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সুপারভাইজিং ডিরেক্টার
শ্রীসারদাকৃপা লালা,
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীযতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী,
হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ্ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার
শ্রীজ্যোতিসচন্দ্র দাস,
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীহরিশ্চচন্দ্র সিংহ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—সেক্রেটারী
১৭নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯২৮।

(২)

সবিনয় নিবেদন—

বাঙ্গালাদেশের সমস্ত লোন আফিস সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়। পূর্ব্বেও এই প্রয়াস করা হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দুইটী মূল কারণ দেখা যায়। প্রথমতঃ পূর্ব্বের প্রয়াস শুধু মফঃস্বল হইতে টাকা আনিয়া কলিকাতায় ঋণ দানে পর্য্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয়তঃ মফঃস্বলের টাকা কলিকাতায় খাটানোর উপরে মফঃস্বলের লোকের বিশেষ কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। এই দুইটীই গুরুতর কারণ এবং ইহাদের নিরাশ না হইলে এবারেও নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা সকলেই মফঃস্বলবাসী। তাঁহাদের প্রেরণাতেই ইহার উদ্ভব। যে ফেডারাল ব্যাঙ্ক অনুষ্ঠানের কথা হইতেছে তাহার অংশীদার মফঃস্বলের লোন অফিসগুলিই হইবেন, সুতরাং সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁদেরই থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ এই ফেডারাল ব্যাঙ্কের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য কলিকাতা হইতে টাকা যোগাড় করিয়া মফঃস্বলের লোন আফিসগুলিকে সময়ে অসময়ে সাহায্য করা। ব্যাঙ্কটীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলে কলিকাতাতে খুব কম সুদেই টাকা পাওয়া যাইবে। এরূপ কম সুদে মফঃস্বলে কখনই টাকা পাওয়া যাইতে পারে না।

এই বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা মাত্র নাই। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই কি নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃষ্ট সময়? বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাওয়াতে আমানতকারীদের মনে সমস্ত বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের উপরে বিষম অনাস্থা হইয়াছে। এমন কি অমূলক আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অপরন্তু অনেক আফিস জমিদারী বন্ধক রাখিয়া বা অনুরূপ স্থির বন্ধকে, এমন কি অস্থির আমানত পর্য্যন্ত আটকাইয়া ফেলিয়াছে। যদি অধিকাংশ আমানতকারীরা তাঁহাদের আমানত ফেরৎ চান, তবে অনেক লোন আফিসেরই অবস্থা বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। যদিও তাঁহাদের অ্যাসেটস্ যথেষ্ট আছে, কিন্তু নগদ টাকা না থাকায় টাকার টান মিটাইতে হয়ত কেহ কেহ অক্ষম হইবেন। কয়েকটী প্রতিষ্ঠান এইরূপে উঠিয়া গেলে, আমানতকারীরা আরও শঙ্কিত হইবেন। বিপদের গুরুত্ব বাড়িয়াই চলিবে।

বর্ত্তমান সময় বঙ্গদেশীয় লোন আফিসসমূহের পক্ষে দুঃসময় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানেই সমবেত চেষ্টার উদ্ভব ও বিকাশের কথা দেখা যায়, সেখানেই দেখা যায়, একটী অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের তীব্র অভাব বোধ। ঋণদান-সমবায় আন্দোলনের নেতা জার্ম্মাণ কর্ম্মবীর রাইফাইজেনের সময়ে জার্ম্মাণ কৃষক দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। তাই রাইফাইজেনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এইরূপ একবার নয়, বার বার জগতের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিতেছে যে, প্রয়োজন বোধ না থাকিলে সমবেত চেষ্টা হয় না,—হইতে পারে না।

আমাদের ভিতরে রাইফাইজেনের মত নেতা নাই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই নেতৃযোগ্য উদ্যম ও বিবেচনা-শক্তি দেখাইতে হইবে। প্রত্যেকের কাছেই চাই,—সমস্ত প্রাণভরা উৎসাহ এবং সমগ্র মন দিয়া বিবেচনা। যে উৎসাহ এবং যে বিবেচনা প্রাথমিক সভাতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, সাফল্যের যে তিনটী উপাদান আছে,—প্রয়োজন বোধ, উৎসাহ এবং বিবেচনা-শক্তি—এই তিনটীর কোনটীরই অভাব নাই।

এখন চাই, এই মনোভাবকে কার্য্যে পরিণত করা। প্রথমতঃ লোন আফিসগুলিকে একটি সঙ্ঘের মধ্যে আনিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই সঙ্ঘের সাহায্যে একটি ফেডার্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের জন্যই সকলের মতামত চাই। এই সঙ্গে যে আবেদন পত্র থাকিল, তাহা পূরণ করিয়া নিম্নের ঠিকানায় সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সিংহের নামে ফেরৎ দিবেন। এবং এই মতামত সংগ্রহ, ছাপার খরচ, ডাকব্যয়, আগামী ইষ্টারের বন্ধে লোন আফিসগুলির আর একটি অধিবেশনে এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা এবং পদ্ধতি নির্দ্ধারণ—এই সমস্ত অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য যাহা কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে চান, নিম্নের ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দাসের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আর এই বিষয়ে অন্য কিছু জানিতে চাহিলে নিম্নের ঠিকানায় সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়ের নিকটে পত্র লিখিবেন।

১৫ নং হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯২৮।

(৩)

সম্মতিপত্র

প্রস্তাবিত "নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্কসঙ্ঘ" এবং বেঙ্গল ফেডার্যাল ব্যাঙ্কের সহিত আমাদের ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

সঙ্ঘের বিষয়ে এবং বেঙ্গল ফেডার্যাল ব্যাঙ্কের গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের ব্যাঙ্কের মতামত আমাদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত

অস্থায়ী কমিটীর পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন। ……… তারিখের মধ্যে এখান হইতেই পত্র লিখিয়া জানাইব।

অস্থায়ী কমিটীর লিখিত প্রাথমিক খসড়া পাইলে, তাহা দেখিয়া পরে মতামত জানাইব।[১]

এই সঙ্গে আমাদের ব্যাঙ্কের সালের উদ্বর্ত্ত পত্র পাঠাইলাম।

"মেমোর্যাণ্ডাম এবং আর্টিকল্‌স্ অব অ্যাসোসিয়েশন পাঠাইলাম।[২]

ছাপা নাই, নকল করিয়া … তারিখের মধ্যে পাঠাইব।
বর্ত্তমান ব্যয় বাবদ …… টাকা এই সঙ্গে পাঠাইলাম।
ডিরেক্টারদের সভা …… তারিখে হইবে, তাহার পরে পাঠাইব।

স্বাক্ষর……………………………………………

ব্যাঙ্কের নাম……………………………………

ঠিকানা…………………………………………

তারিখ……………………………………………

---

১ দুইটী কাটিয়া দিবেন। ২ একটী কাটিয়া দিবেন।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

তাহের উদ্দীন আহ্‌মদ

ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে, বিশেষ করিয়া, বোম্বাইএর কলের মালিকদের মধ্যে কিছুদিন হইতে 'জাপান বয়কট' রব উঠিয়াছিল। দেশী ও বিদেশী মাসিক ও দৈনিক কাগজে জাপানের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চলিয়াছিল। এদেশের ফিরিঙ্গি কাগজওয়ালারা ও ল্যাঙ্কাসায়ার ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কলওয়ালারা ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়িগণের জাপানের বিরুদ্ধে এই 'স্বদেশী' আন্দোলনে পুরাপুরি সহানুভূতি দেখাইতে ত্রুটী করে নাই। জাপান ১৯১৯ সনের ওয়াশিংটন লেবর কনভেনশানকে তোয়াক্কা না করিয়া স্ত্রী ও বালক মজুরদের রাত্রে পর্যান্ত কাপড়ের কলের ঘানিতে জুড়িয়া অল্প খরচায় ভারতের বাজারে সস্তা মাল পাঠায়, ইহাই নাকি জাপানের বিরুদ্ধে এই বিরাট সমরায়োজনের একমাত্র কারণ ছিল। নিজেদের দেশের বাজারে হাঁদা মুখো হালে সভ্য জাপানীদের তৈয়ারি সস্তা মালের সাথে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাই তাঁহারা ইহার প্রতিকারের একটা দাওয়াই বাতলাইয়া দিবার জন্য ভারত সরকারের দপ্তরে আর্জ্জি পেশ করিয়াছিলেন। তখন নিয়ার ইষ্ট বা নিকট প্রাচ্য অর্থাৎ চীন, জাপান অঞ্চল খুব ঠাণ্ডা ছিল। চীন তখন পর্যান্ত ইংরেজের দোস্ত ছিল। সাংহাই, হংকং দাবী করিবার মত স্পর্দ্ধা চীনের তখনও হয় নাই। এদিকে ম্যানচেষ্টার ল্যাঙ্কাসায়ার ও ভারতীয় কলওলাদের জাপান বয়কট আন্দোলনের সাফল্য সর্ব্বতোভাবে কামনা করিতেছিল; কারণ জাপান তাহাদের প্রাচ্যের বাজারগুলি একে একে অধিকার করিয়া বসিতেছে। সরকার চারিদিকে দুনিয়ার ভাবগতি লক্ষ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়িগণের এই 'কি ইণ্ডাষ্ট্রীকে' জাপানের হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন বিবেচনা করেন। জাপানের সঙ্গে যে ব্যবসাসন্ধি ছিল তার কিছু এদিক ওদিক রদ বদল করিয়া জাপানের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসান যায় কিনা আর এইভাবে জাপানকে ভারতের হাট বাজার হইতে বিতাড়িত করা সম্ভবপর কিনা তার একটা ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করিবার জন্য সরকার ভারতীয় মিল ওয়ালাদের আব্দার কতকটা স্বীকার করিয়া লন এবং একটা দোসরা ট্যারিফ বোর্ড (শুল্ক কমিশন) নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত এফ, নয়েস্ আই-সি--এস (সভাপতি) রায় বাহাদুর পণ্ডিত হরিকিষাণ কাউল, এবং অধ্যক্ষ এন, এস, সুবারাও এই তিন জন সভ্য লইয়া ১৯২৬ সনের জুন মাসে ঐ ট্যারিফ বোর্ড নিযুক্ত হয়। এই ট্যারিফ বোর্ডের অনুসন্ধান নিম্নলিখিত ধারায় পরিচালিত হইবার কথা। (১) ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বিশেষ করিয়া বোম্বাই ও আহমদাবাদ অঞ্চলের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা অনুসন্ধান করা (২) বস্ত্র শিল্পের মন্দাভাব সম্বন্ধে ভালরূপ পরীক্ষা করা এবং ইহা সাময়িক কি স্থায়ী সে বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করা, (৩) অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘরে বাইরে প্রতিযোগিতাই ইহার কারণ কিনা, হইলে কতটা? (৪) যেহেতু ব্যবসাটি ভারতের বহুদিনের স্বদেশী শিল্প এবং ভারতের মাটীতে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইহার উৎপাদিত মালের ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্বার্থের দিকে চিন্তা করিয়া শিল্পটি সাহায্য পাইবার অধিকারী কিনা, পাইলে কি ভাবে কতদিনের জন্য তাহাকে সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে বোর্ড বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। (৫) শিল্পের ভিতরকার এমন কোন বিষয় যাহা বর্ত্তমানে জানা যাইতেছে না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবেন।

১৯২৬ সনের ১লা জুলাই বোম্বাই সহরে বৈঠক বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যান (কাপড় ও তুলার কলের মালিকদের এক সভা) বস্ত্র শিল্পের মন্দাভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের জন্য এই কয়েকটি প্রস্তাব পাঠান। (১) কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও মিল ষ্টোরের

উপর বর্ত্তমানে যে শুল্ক লওয়ার নিয়ম আছে। তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে, (২) কোম্পানীর উপর ধার্য্য সুপারট্যাক্স নাকচ করিতে হইবে, (৩) দেশের ভিতরকার বড় বড় সহর বাজারে মাল চালানীর সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানীর ভাড়া কমাইতে হইবে (৪) দুনিয়ার বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে বোম্বাই হইতে মাল রপ্তানির সুবিধার জন্য সামুদ্রিক জাহাজ কোম্পানীগুলির সঙ্গে ভাতার হার কমাইবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে। (৫) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সাহায্যার্থ জগতের বিভিন্ন দেশে ট্রেড কমিশনার রাখিতে হইবে। (৬) বিদেশের অসাধু প্রতি-যোগিতার হাত হইতে 'স্বদেশীকে' বাঁচাইবার জন্য বিদেশী মালের উপর প্রয়োজনীয় শুল্ক বসাইতে হইবে। (৭) উৎপন্ন খরচার দিক্ দিয়া ভারতের বস্ত্র-শিল্পকে বিদেশের বস্ত্র-শিল্পের সমান অবস্থায় দাঁড় করাইবার জন্য জাপানী ও বিলাতী সুতা ও বস্ত্রের উপর শতকরা ১৩ ভাগ স্বতন্ত্র শুল্ক কর স্থাপন করিতে হইবে। দেশী শিল্পে মন্দাভাবের সময় প্লান্ট ও যন্ত্রপাতির জন্য আরও কিছু সাহায্য দিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বোর্ড এক লম্বা-চওড়া প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেন এবং বিভিন্ন স্বার্থের তরফ হইতে উত্তর চাহিয়া পাঠান। সমগ্র ভারতে বোর্ড সফরে বাহির হন এবং আহমদাবাদ, সোলাপুর, নাগপুর, মাদ্রাজ, কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, অমৃতসহর, লাহোর প্রভৃতি বড় বড় বস্ত্র-শিল্প সহরগুলি পরিদর্শন করেন। তাঁহারা সমস্ত স্থানে বিভিন্ন স্বার্থের লোকের ও সমিতির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। সর্ব্বসমেত ট্যারিফ বোর্ডের ৪০টি বৈঠক বসে। ইহারা বোম্বাই, আহমদাবাদ ও বড়োদার মিলওনার্স অ্যাসো-সিয়েশ্যনের প্রতিনিধিদের পরীক্ষা করেন। ইহা ছাড়া ১৫টি চেম্বার অব্ কমার্স (বাণিজ্য সভা) ৪টি লেবর ইউনিয়ন (শ্রমজীবী সঙ্ঘ) ও ৬টি অন্যান্য সমিতি এবং ৩৯জন স্বতন্ত্র লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ইহাছাড়া ৮টা প্রাদেশিক সরকার ৩টি রেলওয়ে কোম্পানী ও ১৫জন সরকারী কর্ম্ম-চারী (ইহাদের মধ্যে অনেকে মৌখিক সাক্ষ্যও প্রদান করেন) এবং ২৭টি অন্যান্য ব্যক্তি ও সঙ্ঘ বোর্ডের নিকট লিখিত বিবরণী প্রেরণ করেন।

এই সকল সাক্ষ্য ও সংগৃহীত বিবরণীর সকলগুলির বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। বোম্বে মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যনের কয়েক দফা দাবীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এটা পুঁজিপতিদের কথা। এইবার শ্রমজীবী-দের কথা কিছু বলিব। শিল্প পরিচালনায় পুঁজিপতিদের দান যতখানি শ্রমজীবিদের দান তার চাইতে কোন হিসাবেই কম নয়। দুইএর সম্মিলনেই শিল্প-কারখানার কাজ চলিয়া থাকে। কেবল টাকা থাকিলেই তাহা দ্বারা কাজ হয় না। সেগুলি খাটাইবার মত মাথা ও কর্ম্মশক্তি চাই।

বোম্বাই টেক্সটাইল লেবর ইউনিয়ন বোর্ডের সমক্ষে যে বিবরণী পেশ করেন তাহাতে শ্রমজীবিগণের অভাব অভিযোগ, অসুবিধা ও তাহার প্রতিকার প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনা আছে। এই ইউনিয়ন যে সকল মতামত তাঁহাদের বিবরণীতে নিবদ্ধ করিয়াছেন দেশের অন্যান্য মজুরসঙ্ঘও সেই মতামত পোষণ ও সমর্থন করেন।

বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান মন্দাভাবের কারণ কি তাহা অনুসন্ধানের ভার ভারতসরকার বোর্ডের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তবে বোম্বাই লেবর ইউনিয়ন এই বর্ত্তমান দুরবস্থার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই অবস্থার উন্নতিকল্পে কতকগুলি দাওয়াইএর ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে বোম্বাই মিলগুলির পরিচালনা ও শ্রমবিভাগে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে বিদেশীদের সঙ্গে বোম্বাইএর কলওয়ালারা প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারিবেনা এবং ইহা স্বাভাবিক ও সচ্ছল অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইবে না। বোম্বাই-এর মিলগুলির পরিচালনা বিভাগে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। মিলগুলির গৃহস্থালীর প্রত্যেক বিভাগে অযথা বাহুল্য খরচ কমাইতে হইবে তবেই মিলগুলি চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই ইউনিয়নের মতে কাঁচামাল, মিলষ্টোর, বস্ত্র বিক্রয় ও বীমা প্রভৃতি কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে করা উচিত। এজেন্সি বা মধ্য-বর্ত্তী ফরিয়ার দলকে একেবারে উঠাইয়া দেওয়া দরকার। ব্যবসায়ের মন্দাভাবের সময়ও যাহাতে পুরাদস্তর মজুরি দেওয়া যাইতে পারে সে জন্য একটা রিজার্ভ ফণ্ড করা

উচিত। অংশীদারের লাভের বখরা কম করিতে হইবে। বোম্বাইএর বস্ত্রশিল্পের উন্নতি করিতে হইলে লেবর ইউনিয়নের মতে সর্ব্বপ্রযত্নে এই সকল সংস্কার সাধন প্রয়োজনীয়।

শ্রমজীবিগণের অশেষ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া ইউনিয়ন প্রস্তাব করেন যে, শ্রমজীবি-সংগ্রহের ভার দালালদের হাতে না দিয়া ঐ কাজের জন্য একটা স্বতন্ত্র সাধারণ এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো (চাকুরী বিভাগ) স্থাপন করা উচিত। কলকারখানায় শ্রমজীবিগণের জরিমানা কম করিতে হইবে। হঠাৎ ম্যানেজার বা অন্য কর্ম্মকর্ত্তা কর্ত্তৃক কোন শ্রমজীবীর চাকুরিতে জবাব দিবার ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিতে হইবে এবং শ্রমজীবিগণের শিক্ষার জন্য যাহাতে শিল্প-কারখানার কাজে তাহাদের কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধি পায় সেজন্য প্রাইমারি ও টেকনিক্যাল স্কুল (প্রাথমিক ও শিল্পবিদ্যালয়) খুলিতে হইবে। শ্রমজীবিগণের কর্ম্ম-দক্ষতা বাড়াইতে হইলে তাহাদের বর্ত্তমান অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানেরও উন্নতিসাধন প্রয়োজনীয়। বোম্বাই মজুর-সঙ্ঘের এ সকল দাবীই ন্যায়সঙ্গত। মজুর অসন্তোষ ষ্ট্রাইক (ধর্ম্মঘট) প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধির প্রতিকার না হইলে শিল্পোন্নতি সম্ভবপর নয়। ভারতীয় শিল্প-কারখানা প্রচেষ্টার অবনতির অন্যতম কারণ মজুর-সাধারণের প্রতি দেশের লোকের, বিশেষ করিয়া তাহাদের মনিবগণের ঘোর উদাসীনতা। মজুরদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিলে তাহাদের আহার ও বাসস্থানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে, ব্যাধি-বার্দ্ধক্যের সময় তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে মজুর সাধারণ যে প্রাণ ঢালিয়া মনিবের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পাবে না। এ সব করিতে হইলে মনিবদের হয়ত খরচ বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এই খরচের তুলনায় যে কাজ পাওয়া যাইবে তাহাতেই উহা পোষাইয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বোম্বাই লেবর ইউনিয়নের দাবীগুলি অনায়াসেই বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা মানিয়া লইতে পারেন। ইহাতে দুই পক্ষেরই লাভ হইবার কথা। এদেশের কলকারখানার মালিক, পুঁজিপতি ও মনিবরা তাঁহাদের মজুর খাটাইবার পদ্ধতিটা নতুন যুগমাফিক করিলে স্বদেশী শিল্পোন্নতির বড় সাহায্য হইবে। অন্যান্য দেশে পুঁজিপতি ও মনিবরা মজুর-সাধারণের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন সে সম্বন্ধে ইহাদের ভালরূপ ওয়াকিব হাল হওয়া প্রয়োজন। জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সিক ইনসিওর্যান্স (ব্যাধি বীমা) ওল্ড এজ পেনশ্যান (বার্দ্ধক্য ভাতা) প্রভৃতি কথাগুলি অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এগুলি কেবল সরকারী কেতাবে বা পুঁজিপতি কলকারখানার মালিকদের দপ্তরে শোভা পায় না। পরন্তু ঐ সকল দেশে দস্তুরমত এগুলিকে মানিয়া চলা হয়। এদেশের মনিবরা অতদূর অগ্রসর হইবার উদারতা না দেখাইতে পারিলেও অন্ততঃ তাহাদের কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমজীবিগণের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করিবেন ইহা আশা করা যায়। এই দিক্ দিয়া বোম্বাই লেবর ইউনিয়নের উদার প্রস্তাব-গুলির সম্বন্ধে বোম্বাই কলওয়ালারা ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

জাপানী মালের কথা উল্লেখ করিয়া ইউনিয়ন বলেন যে, জাপানী প্রতিযোগিতা যদি অন্যায্য ও অসাধু হয়, তবে জাপানী মাল যাহাতে ভারতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জাপান যে পর্য্যন্ত তাহার শ্রমজীবিদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটায়, যে পর্য্যন্ত সে বালক ও স্ত্রীমজুরদের শিল্প-কারখানায় নৈশ পরিশ্রম রহিত না করে, সে পর্য্যন্ত জাপানী মালকে ভারতে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

বোম্বাই মিল ওনার্স আর অন্যান্য যেসকল দাবী করিয়াছেন বোম্বাই লেবর ইউনিয়ন সে সকলই মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু যন্ত্রপাতি ও মিলষ্টোরের উপর সহর-কর উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অধিকার ইউনিয়ন ভারত সরকার ও বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশানের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। কারণ যন্ত্রপাতির উপর কর উঠাইয়া দিলে ভারত সরকারের আয় কমিবে ও তুলা গাইটের উপর সহর কর উঠাইয়া দিলে কর্পোরেশ্যান ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জাহাজ ভাড়া (সিপিং ফ্রেট) জাহাজ

কোম্পানীগুলির সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালান সম্বন্ধে ইউনিয়নের কোন আপত্তি নাই। তবে বাহির হইতে আমদানি সুতা ও বস্ত্রের উপর শতকরা ১৩ ভাগ স্বতন্ত্র শুল্ক স্থাপনের প্রস্তাব ইউনিয়নের পছন্দসই হয় নাই। ইউনিয়নের মতে বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের কোনরূপ সাময়িক সাহায্য দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহা বরং সরকার কোন একটা সাব্‌সিডি বা বিনা সুদে ধারস্বরূপ কর্জ্জ সাহায্যরূপে দিতে পারেন। বোম্বাই মিলগুলির উন্নতি করিতে হইলে এই কয়েকটি বিষয়ের দিকে মালিকগণকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(১) মিল মেসিনারির উন্নতিসাধন ও অটোমেটিক লুম (তাঁত) স্থাপনের ব্যবস্থা করা, (২) সম্ভব হইলে শিল্পে নূতনত্ব সৃষ্টি করিতে হইবে এবং (৩) চাহিদার চাইতে উৎপন্নের হার যাহাতে বাড়িয়া না যায় সেদিকে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে ও এই ভাবে আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা কমাইতে হইবে (৪) সরেস পয়লা নম্বরের মাল উৎপাদন করিবার জন্য পরীক্ষা চালাইতে হইবে (৫) ভারত ও অন্যান্য দেশে ভারতীয় মাল বেশী বেচিবার চেষ্টা দেখিতে হইবে (৬) শ্রমজীবী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কর্ম্মদক্ষতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি যাহাতে উঁচু হয় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সকল কাজের জন্য টাকার খুবই দরকার আছে। ইউনিয়নের মতে যাহারা টাকা দিতে সমর্থ সেই সকল লোকের উপর কর বসাইয়া ঐ টাকা তুলিতে হইবে। কলওয়ালারা শিল্পোন্নতি করিতে চাহিলে একাজে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদেরই অগ্রণী হওয়া উচিত।

টেক্‌সটাইল টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট ২০০ পৃষ্ঠার এক বিস্তারিত দলীল। ইহাতে ১৮৯৯ সন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তকার ভারতীয় তুলা ও বস্ত্র-শিল্পের কাহিনী বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান মন্দাভাবের কারণ কি? ইহার পরিমাণ কতটা? দুনিয়ার হাল চাল বাহিরের প্রতিযোগিতা মুদ্রানীতির পরিবর্ত্তন, ভিতরের পরিচালনায় গলদ, দেশের ভিতরকার প্রতিযোগিতা, স্থানীয় কর প্রভৃতি মন্দাভাবের জন্য কতটা দায়ী? এই সকল বিষয় উত্তমরূপ আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া বোর্ড এক বিরাট রিপোর্ট লিখিয়াছেন।

বোর্ড যেসকল দাওয়াইএর ব্যবস্থা করিয়াছেন আমরা মাত্র সেইগুলিরই উল্লেখ এখানে করিব। (১) কাঁচা মাল ও মিলের ব্যবহারের জন্য কয়লা, বিদ্যুৎ শক্তি, রসদ, শ্রম ও অন্যান্য খরচপত্রে মিতব্যয়িতা সাধন (২) পরিচালনা বিভাগের উন্নতি প্রয়োজন, (৩) ট্যারিফ শুল্কনীতির ও (৪) অন্যান্য সরকারী সাহায্যের পরিবর্ত্তন সাধন, প্রভৃতি মন্তব্য বোর্ড ঐ রিপোর্টের ১২৭টি বিভাগে, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বোর্ডের মতে বস্ত্রশিল্পে বর্ত্তমান মন্দাভাব ভারতের একার নয়। সমগ্র দুনিয়া ইহার ভুক্তভোগী। তবে বোম্বাইএর মত ভরিতের আর কোন শিল্পসহরে এই মন্দাভাব এতটা পরিলক্ষিত হয় না ইহাই একটা বিশেষত্ব।

বোম্বাই বস্ত্র-শিল্পের মন্দাভাবের কারণনিচয়ের মধ্যে বোর্ডের মতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হইতেছে—(১) আমেরিকান তুলার বাজারে দামের ধারা (২) জাপানী প্রতিযোগিতা। (৩) মুদ্রাসংস্কার কমিশন (কারেন্সি কমিশন) কর্ত্তৃক টাকার দাম ১ শিলিং ৬ পেন্সে স্থিরীকরণ (৪) পুঁজি আধিক্য, (৫) বুম বা শিল্প জোয়ারের সময় চড়াহারে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান (৬) এজেন্সি প্রথায় বা পাইকারিতে বন্দোবস্ত (৭) অনুপযুক্ত ও অকেজো যন্ত্রপাতি (৮) কলকারখানা পরিচালনায় আর্থিক বে-গোছাল (৯) চীনা বাজার বেহাত, (১০) আহমদাবাদ ও অন্যান্য কেন্দ্রের মিলগুলির মধ্যে উত্তরোত্তর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি (১১) বোম্বাই অঞ্চলে চড়া হারে করবৃদ্ধি।

জাপানের শ্রম ভারতীয় শ্রমের চাইতে সস্তা এবং সেখানকার কলকারখানায় বালক ও স্ত্রী-মজুরের নৈশ পরিশ্রমের অব্যবস্থা থাকায় ও কাজের ঘণ্টা বেশী হওয়ায় জাপান কম খরচায় সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। বোর্ডের মতে ইহাই ভারত ও জাপান এই দুইটি দেশের মধ্যে অসাধু প্রতিযোগিতার কারণ এবং ইহার প্রতিকার হইতেছে (১) কাঁচা মাল কিনিবার জন্য জাপানের মত "হেজ কন্ট্রাক্ট" পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হওয়া, (২) ঐকাজে এমন দালাল বা পাইকার ঠিক করিতে হইবে যাহাদের-

নিজেদের কোন তুলার কারবার নাই বা নিজস্ব কোন কোম্পানীর স্বার্থে যাহারা খাটিবে না। (৩) বোম্বাইএর জলের কলের ট্যাক্স আরও কমাইতে হইবে। (৪) মিলের ষ্টোর সংক্রান্ত মাল ক্রয় করিবার সময় মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (৫) প্রত্যেক গাঁইট প্রতি সহর-কর ১৲ হইতে ॥০ আনায় নামাইতে হইবে (৬) বোম্বে মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যনের পক্ষ হইতে অগ্নি-বীমার কাজ কারবার চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে (৭) অংশীদারগণের লভ্যাংশের হার কমাইতে হইবে (৮) ম্যানেজিং এজেন্টের কোন আত্মীয় কুটুম্বকে অডিটর (হিসাব পরীক্ষক) পদে বাহাল করা যাইতে পারিবে না (৯) মিলের হিসাব পরীক্ষার সময় মিলষ্টক পরীক্ষা করা চাই (১০) বোর্ডের মতে মিলের শ্রমজীবিগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইলে মিলগুলির অবস্থা অনেকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। মিলগুলির উন্নতি শ্রমজীবিগণের কর্ম্ম-দক্ষতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। (১১) অসুখ বিসুখ বা অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনার জন্য সর্ব্বদা একদল রিজার্ভ শ্রমজীবি-বাহিনী বোম্বাইতে মোতায়েন রাখিতে হইবে। নিয়মিত কাজের লোকের অনুপস্থিতির সময় তাঁহারা তাহাদের স্থলে কাজ করিবে। (১২) মিলের কাটুনীদের জন্য পিসওয়ার্ক (ফুরণ কাজ) পদ্ধতির প্রচলন করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক তাঁতীর হিস্যায় চরখা ও টাকু বাড়াইয়া দিতে হইবে। (১৩) তাঁতী ও কাটুনীর মধ্যে যে মজুরীর বৈষম্য আছে তাহা রহিত করিতে হইবে। (১৪) কারখানায় নিযুক্ত লোকদের প্রাতঃকালের আহারের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও বিশ্রামের সময় দিতে হইবে (১৫) মিলগুলি সরাসরি কারখানার কাজের জন্য লোক সংগ্রহ ও নিযুক্ত করিবে। পাইকার বা ফরিয়ার হাতে ঐ কাজের ভার থাকিতে পারিবে না (১৬) বিনষ্ট কাপড় তাঁতীদিগের দিয়া দিবার নিয়ম তুলিয়া দিতে হইবে (১৭) মজুরির একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি ঠিক রাখিতে হইবে (১৮) টেকনিক্যাল (শিল্প) শিক্ষার জন্য ট্রেড্ স্কুল স্থাপন করিতে হইবে (১৯) টেক্‌নিক্যাল বিষয়ক পুস্তকাদি রচনা ও তাহার বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে (২০) বোম্বাই মিল-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যনটির আশু পুনর্গঠন হওয়া প্রয়োজনীয়। (২১) সকল প্রকার আমদানি মালের প্রত্যেকটির নমুনা-সংগ্রহ ও সেগুলির দামের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুতের ভার বোম্বাই মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যনকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার সব কমিটী বিদেশী ও দেশী বাজারগুলির সম্বন্ধে আর্থিক ও শ্রমবিষয়ক খরচ সংগ্রহ করিবে (২২) মিলের উদ্বৃত্ত টাকা বেণিয়া মহাজনদের ব্যবসায়ে খাটাবার জন্য ধার দিবার পদ্ধতি তুলিয়া দিতে হইবে। (২৩) একই ম্যানেজিং এজেন্সির এক বিভাগের টাকা অন্য বিভাগে খাটাইবার রেওয়াজ বন্ধ করিতে হইবে (২৪) রঙ্গিন ও ছাপান বস্ত্রাদি এবং সূক্ষ্ম সূতার বস্ত্র বেশী করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে (২৫) মিলগুলির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার এবং কয়েকটী মিলকে একত্র করা যায় কিনা তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কি ভাবে কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বোর্ডের সকল সদস্য একমত হইতে পারেন নাই। সভাপতি শ্রীযুক্ত নয়েস্ কেবলমাত্র জাপানী বস্ত্র ও সূতার উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে শুল্ক-বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। সদস্যেরা বলিয়াছেন, সমস্ত আমদানী বস্ত্র ও সূতার উপরেই ৪ টাকা হিসাবে শুল্ক বাড়ানো দরকার। উপরন্তু ভারতীয় মিলে প্রস্তুত ৩২ নং অথবা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সূতার জন্য মিলওয়ালাদিগকে প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হিসাবে সাহায্য করাও সঙ্গত। ভারত সরকার কিন্তু এদুটি মতের কোনটিই গ্রহণ করেন নাই। না করিবার যথেষ্টই কারণ আছে। চীনে আজকাল যেরূপ গোলমাল চলিতেছে তাহাতে এই সময় জাপানের বিরুদ্ধে কোন শুল্কনীতি অবলম্বন করা চতুর ইংরেজ রাজ বিবেচনাসঙ্গত মনে করেন নাই। চীনের রাজনৈতিক অবস্থা গুরুতর না হইলে তাঁহারা ভারতীয় শিল্পোন্নতির জন্য না হইলেও অন্ততঃ ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের দিকে চাহিয়া তাঁহারা জাপানের বিরুদ্ধে যে কোন প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতেন এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ভারত

সরকার টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট বিবেচনা করেন নাই ও সে সম্বন্ধে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। ম্যানচেষ্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ বিলাতের বেকার-সমস্যা ও সাংহাই হংকং প্রভৃতি রপ্তানি বন্দর-গুলিই তাঁহাদের মতামত স্থির করিয়াছে। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের প্রতি সরকারের এই অশোভন আচরণ কিন্তু দেশের কোন পক্ষেরই পছন্দসই হয় নাই। কেবল বোম্বাইএর কলওয়ালারা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন নাই পরন্তু সমগ্র দেশ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছে।

বোম্বাই মিলওনার্সগণ বড় লাটের নিকট ডেপুটেশ্যান লইয়া গিয়াছিলেন। বড়লাট তেমন কোন সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন নাই। তবে তাঁহারা যে কমিশনের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন সেরূপ ভরসা হয় না। চীন এখনও পুরাদমে ইংরেজ তাড়ানোর কাজে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। বিলাতে এখনও বেকার সমস্যা প্রবল। এই সময় জাপানের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণ ঘটান ও বিলাতে বেকার-সমস্যা বাড়াইয়া আর্থিক শঙ্কট আনা সুবিবেচনার কাজ হইবে না। ভারত সরকার দেশী শিল্পের কোন সাহায্যই করিবেন না এটা স্থির নিশ্চয়। এমতাবস্থায় বোম্বাই কলওয়ালাদের সর্ব্বপ্রযত্নে মিলগুলির গৃহস্থালী ভাল করিয়া গোছান উচিত। মিলগুলির গলদ ঘাঁটিয়া বাহির করা দরকার। পরিচালনায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন প্রয়োজন। টারিফ বোর্ডের নিকট যে সকল বাছা বাছা ব্যবসায়ী সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাদের মতামতগুলি কাজে খাটাইয়া দেখা উচিত।

উপসংহারে জাপান কটন স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বোম্বাইস্থিত এজেন্ট শ্রীযুক্ত তামসকির কয়েকটি মূল্যবান কথা উদ্ধৃত করিলাম। বোম্বাই কলওয়ালারা এগুলি কাজে খাটাইলে বস্ত্র-শিল্পের বর্ত্তমান মন্দাভাব কাটিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত তামসকি বলেন, বোম্বাইয়ের মিলগুলি জাপানী প্রতিযোগিতার চাইতে ঘরোয়া প্রতিযোগিতাতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে ফ্যাক্টরি আইন না থাকায় বোম্বাইকে ঐসমস্ত রাজ্যের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বিগত তিন বৎসরে দেশীয় রাজ্যের উৎপন্ন ও জাপানের আমদানি পণ্যের তালিকা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। দেশীয় রাজ্য-সমূহে ১৯২৩-২৪ সনে ১৩৮০ লক্ষ গজ, ১৯২৪-২৫ সনে ১৭১০ লক্ষ গজ এবং ১৯২৫-২৬ সনে ১৮০০ লক্ষ গজ, বস্ত্র উৎপাদন করে। জাপান হইতে এই তিন বৎসরে যথাক্রমে ১২২০, ১৫৫০, ২১৭১ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে আমদানি হয়। এই কয়েক বৎসরে দেশীয় রাজ্যের মিল বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪২০ লক্ষ গজ কাপড় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাপানী আমদানী ৯৫০ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাপানী তুলা ও বস্ত্র-শিল্পের প্রতিনিধি আরও বলেন, বোম্বাইয়ের মত ক্ষুদ্র সহরে ভারতের অধিকাংশ মিল কেন্দ্রী-ভূত হওয়াও বোম্বাইয়ের কলকারখানাগুলির অবনতির অন্যতম কারণ। গোড়াতে এই মিলগুলি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল কেবল বিদেশে সূতা রপ্তানি করা। ব্যবসা জগতে বিরাট কারবার ও উহার পরিবর্ত্তনের প্রতি তখন কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই এবং প্রধানতঃ ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য এগুলি খাড়া করা হয় নাই। এগুলি যদি দেশের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইত তাহা হইলে ব্যবসার মন্দা ভাবের জন্য এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

উপযুক্ত কেন্দ্রে সূতা ও বস্ত্রশিল্প কারখানা স্থাপনের সময়ে ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ সমস্ত স্থানে (১) আবশ্যক পরিমাণ তুলা সংগৃহীত হইবে কিনা, (২) গাবচালনা শক্তি মিলিবে কিনা, (৩) উৎপন্ন মাল বিভিন্ন স্থানে পাঠাইবার সুবিধা, (৪) মজুর-সংগ্রহ এবং (৫) ঐ সমস্ত স্থানের মজুরির হার কিরূপ হইবে ইত্যাদি।

তামসাকির মতে (১) বোম্বাই মিলগুলিকে উৎকোচ ও ব্যবসা সম্পর্কিত দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে হইবে এবং ইহাদিগের পরিচালনার আরও উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজনীয়। জাপানী মিল তুলা আমদানিকারক ও বস্ত্র ব্যবসায়িগণের সহিত সরাসরি আদান প্রদান করে। সেখানে কোন মধ্যবর্ত্তী লোক নাই। মালিকরাই ব্যবসায়িগণের

সঙ্গে নিজেরা কথাবার্তা চালায় এবং তাহাদের পুঁজিপাটা নিজেরা খাটায় (৩) জাপানের মত বোম্বাইয়ে কোন সূতার বিনিময় বাজারে (কটন ইয়ার্ণ এক্সচেঞ্জ) নাই। জাপানী কলওয়ালারা ব্যবসার মন্দাভাব লক্ষ্য করিলেই তৎক্ষণাৎ "চেঞ্জ কন্ট্রাক্ট" দ্বারা এক্সচেঞ্জও মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে। বোম্বাইয়ে এইরূপ সুবিধা হওয়া আবশ্যক। (৪) জাপানে ডিরেক্টররা নিজে মিলগুলি পরিচালনা করেন। ইহারা মিলের সকল বিভাগের খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী; কারণ ইঁহারা সকলেই নিম্নতর স্তর হইতে উচ্চে উঠিয়াছেন।

জাপানের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিলে ভারতীয় তুলা ও বস্ত্রশিল্প-ব্যবসায়ীরা বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে হয়। কেবল বয়কট বা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিলে চলিবে না। বোম্বাইএর কলওয়ালাদিগকে সর্ব্বাগ্রে মিলগুলির ভিতরকার গলদ খাঁটিয়া বাহির করিতে হইবে। নিজেদের মিলগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

মিত্র শক্তিবর্গের ঋণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"তারপর, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সোজাসুজি বাণিজ্য সম্বন্ধ যখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, ইউরোপের অবস্থা অনুকূল নয়, প্রতিকূল। ১৯২২ সনের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্রব্য রপ্তানি আমদানির হিসাব এইরূপ :—

"ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি	২০৬,৭০,২৭,৬০৪	ডলার
ইউরোপ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি	৮৩,০৪,৭৩,৭১২	"
রপ্তানির বাড়্তি	১২৩,৬৫,৫৩,৮৯৩	"

"অর্থাৎ ইউরোপের বিরুদ্ধ ব্যালান্স, আমাদের সহিত সমগ্র জগতের বিরুদ্ধ ব্যালান্সের চেয়ে ৭,৩৩,৮১,৩০৪ ডলার বেশী।

"সোণারূপার অঙ্কপাতি পরীক্ষা করিলেও একই অবস্থা দেখা যাইবে। শ্রীযুক্ত হুভার ব্যালান্সটা ধরিয়াছেন ৪৫ কোটি ডলার। তৎপরিবর্ত্তে দেখা যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইউরোপের ব্যালান্স দাঁড়ায় মাত্র ৩৬ কোটি ডলার।

"বিগত আর্থিক বৎসরে শুধু ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ৭৫ কোটি ডলারের উপরির পরিবর্ত্তে ইউরোপের ঘাটতি দাঁড়াইতেছে।

"শ্রীযুক্ত হুভারের নিজের কথাতেই মালুম হইবে যে, সমগ্র দুনিয়ার যে উপরি আছে তা প্রধানতঃ আমাদের বাজারে ঋণ লওয়ার ও সোণা জাহাজে করিয়া পাঠানর দরুণ হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ঋণগ্রস্ততার দিক্ হইতে নয়া ঋণগ্রহণের অর্থ ঋণশোধ নয়। নয়া ঋণে শুধু মহাজন বদল হইতে পারে। কিন্তু ঋণটা ত থাকিয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপাটার বাজার হইতে ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টেরা ঋণ লইবে ও পরে আমাদের গবর্ণমেণ্টের ঋণ শোধ দিবে অথবা মহাজনরা গবর্ণমেণ্টের ঋণ-ভারটা নিজ নিজ কাঁধে তুলিয়া লইবে এরূপ অবস্থা হইতে এখনও বহুযুগ বাকী আছে।

"আমাদের বাজারে ইউরোপ সোণা পাঠাইয়া পরিশোধ করিতেছে। এটা আর একটা কুলক্ষণ। আমাদের সোণা জমিয়াছে দেদার আর ইউরোপে সোণাতে "তলানী" পড়িয়াছে। ইউরোপ যে তার ঋণশোধের জন্ত অযথেষ্ট সোনার রিজার্ভ হইতে সোণা টানিতেছে, ইহা তার দুর্ব্বলতার পরিচয়, শক্তির নয়। আর ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীযুক্ত হুভারের প্রদর্শিত আমাদের বাজারে উপরি বেচিবার ক্ষমতা ইউরোপের নাই। না, ইউরোপ বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু দিতে পারে না। গ্রেট বৃটেন অদ্ভুতপূর্ব্ব সাহসের সঙ্গে সুদ গণিয়া দিতেছে। কিন্তু

ইউরোপের বেলায় আমাদের সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে।"

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীযুক্ত নিকোলাস্ মারে বাট্‌লার লিখিতেছেন, [ইণ্টারন্যাশন্যাল কনসিলিয়েশন। জুন, ১৯২৪। নং ১৯৯]—

"১৯২৩ সনের ৩০শে নবেম্বর সংকল্প অনুসারে রিপারেশন কমিশন নিম্নলিখিত বিখ্যাত ব্যক্তিগণকে ফার্ষ্ট কমিটি অব্ এক্সপার্টস্ বা ওস্তাদদের প্রাথমিক কমিটিরূপে কাজ করিতে অনুরোধ করেন। উদ্দেশ্য জার্ম্মাণির" বাজেটে ব্যালান্স আনিয়া দিতে ও সিক্কায় স্থিত ফেলাইতে কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকার তাহা বিবেচনা করা হইবে :—

চার্লস্ জি ডয়েস্, চেয়ারম্যান	ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স
ওয়েন্ ডি ইয়ং	ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স
রবার্ট এম্ কিণ্ডারসলি	গ্রেট বৃটেন
জে সি ষ্ট্যাম্প	গ্রেট বৃটেন
জঁ পারমেঁতিয়	ফ্রান্স
এদ্‌গার্দ আলিক্স	ফ্রান্স
আলবার্তো পিরেল্লি	ইতালি
ফেদারিকো ফ্লোরা	ইতালি
ই ফ্রাঁকুই	বেলজিয়াম
মরিস্ হোতার্ভ	বেলজিয়াম

"ওস্তাদদের প্রথম কমিটি ১৯২৪ সনের ১৪ই জানুয়ারী হইতে ১৯২৪ সনের ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্যারিসে বৈঠক বসাইতে থাকে। খালি এক পক্ষ কাল বার্লিনে বসে। রিপোর্ট টা ১৯২৪ সন, ৯ই এপ্রিল তারিখ দিয়া রিপারেশন কমিশনের কাছে দাখিল করা হয়। ইহাকে এইরূপ তিনভাগে বিভক্ত করা হয় :—

১। নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কমিটির ধারণা, কোন্ কোন সিদ্ধান্তে পৌছান গিয়াছে, যে প্ল্যানটাকে খাড়া করা হইয়াছে তার একটা মোটা খসড়া।

২। কি কি কারণে কমিটি অমুক অমুক সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে, বিশেষতঃ জার্ম্মাণির প্রকৃত আর্থিক ইত্যাদি অবস্থার কোন কোন দিক্ হইতে বিচার করিলে কি দাঁড়ায়?

৩। পরিশিষ্ট হিসাবে কতকগুলি প্রস্তাবের খুঁটি-নাটি টেক্‌নিকাল বিবরণ, ১ম ভাগের অমুক অমুক অংশের ক্রোড়পত্র হিসাবে পঠিতব্য।

"এই রিপোর্টে ১ম ভাগের একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে। তাতে অল্প কথায় নির্দ্ধারিত প্ল্যানটার প্রধান প্রধান অঙ্গের কথা ও সেগুলি সফল করিবার জন্য কি কি কার্য্য অত্যাবশ্যক তাহা বর্ণিত হইয়াছে।"

সংক্ষিপ্ত সারটার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। এতৎসম্পর্কে দ্রষ্টব্য :—

১। ওয়ার্লড পীস্ ফাউণ্ডেশন (বিশ্ব-শান্তির ভিত্) ৬ষ্ঠ ভাগ, ৫ নং। বোষ্টন।

২। কারেন্ট হিষ্টরি (বর্ত্তমান ইতিহাস) মে, ১৯২৪। নিউ ইয়র্ক।

৩। ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিন। মে, ১৯২৪। ওয়াশিংটন। (সমগ্র পরিশিষ্ট সুদ্ধ)।

ওস্তাদদের প্রথম (ডয়েস্) কমিটি রিপোর্ট

প্রথম ভাগের সার

১। কমিটির "অ্যাটিচিউড" বা মনোভাব

ক। ব্যবসার দিক্ হইতে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন রাজনৈতিক মতবাদ খাড়া করা হয় নাই।

খ। রাজনৈতিক বিষয় যেখানে প্ল্যানটার সম্ভাব্য অসম্ভবতাকে খর্ব্ব করিয়াছে মাত্র সেইখানে সেটার আলোচনা হইয়াছে।

গ। ঋণটা ফিরিয়া পাওয়াই উদ্দেশ্য। পেনাল্টি বা দণ্ড দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

ঘ। জার্ম্মাণি কর্ত্তৃক এই ঋণ শোধের অর্থ, সে যুদ্ধে যে "ড্যামেজ" বা ধ্বংস সাধন করিয়াছে, সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

ঙ। সকল প্রকার লেনদেনের গোড়ার কথা বিশ্বাস। এই প্ল্যানটাকে বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা

সকল দলেরই স্বার্থের অনুকূল। আমাদের প্ল্যান এই মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

চ। জার্ম্মাণির পুনর্গঠনটাই মাত্র উদ্দেশ্য নয়। এটা বৃহত্তর সমস্যা—ইউরোপের পুনর্গঠনের একটা অঙ্গ মাত্র।

ছ। প্রস্তাবিত "গ্যারাণ্টি" বা "গিরমিট্"গুলি অর্থ-নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, নয়।

২। জার্ম্মাণির আর্থিক একত্ব ব অখণ্ডতা

জার্ম্মাণির সিক্কাতে স্থিত ফেলা ও বাজেট ব্যালান্স করা দরকার। সেটায় সফল হইবার উপায় ভার্সাই সন্ধি-দ্বারা নির্দ্দেশিত জার্ম্মাণ রাজ্যের যা কিছু ধন-সম্পদ্ সব জার্ম্মাণি পাইবে ও জার্ম্মাণি স্বাধীনভাবে তার সব আর্থিক প্রচেষ্টা চালনা করিতে পারিবে।

৩। সেনানীর কথা

"কন্‌টিন্‌জেণ্ট স্যাঙ্গশন" বা "অনিশ্চিত হুকুম" ও গিরমিট্

ক। রাষ্ট্রীয় গিরমিট্ বা দণ্ডদানের কথা আমাদের এলাকার বাইরে।

খ। এই সমস্যার সেনানীর কথাটা আমাদের আলোচ্যের মধ্যে পড়ে না।

গ। যখন প্ল্যানের কাজ অখণ্ড জার্ম্মাণ রাজ্যে জোরের সঙ্গে চলিতেছে, তখন দরকার—

১। যদি কোন সেনানিবাস থাকে, তা কোন প্রকারে স্বাধীনভাবে আর্থিক কার্য্যকলাপে বাধা দিতে পারিবে না।

২। এই প্ল্যানে প্রস্তাবিত ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিদেশী আর্থিক শাসন বা বাধাপ্রদান থাকিবে না।

ঘ। কিন্তু যথেষ্ট এবং উৎপাদনশীল গিরমিট্ রাখা হইয়াছে।

৪। কমিটির কর্ত্তব্য

ক। সিক্কায় স্থিত ফেলা এবং বাজেটে ব্যালান্স আনা পরস্পরের উপর নির্ভর করে—যদিও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা যায়।

খ। স্বভাবতঃ বাজেটে ব্যালান্স আনা যায়।

গ। জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক প্রয়োজন ও সন্ধি অনুযায়ী ঋণ মিটাইবার জন্য দুইটাই দরকার।

৫। জার্ম্মাণির আর্থিক ভবিষ্যৎ

ক। লোকবল বাড়িলে, টেক্‌নিক্যাল পটুতা, ও ব্যবসায় বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা হইতে উৎপাদনশীলতা আশা করা যায়।

খ। যুদ্ধের পর প্ল্যাণ্ট অর্থাৎ কলকব্জার সামর্থ্য বাড়িয়াছে ও তাহাতে উন্নতি ঘটিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

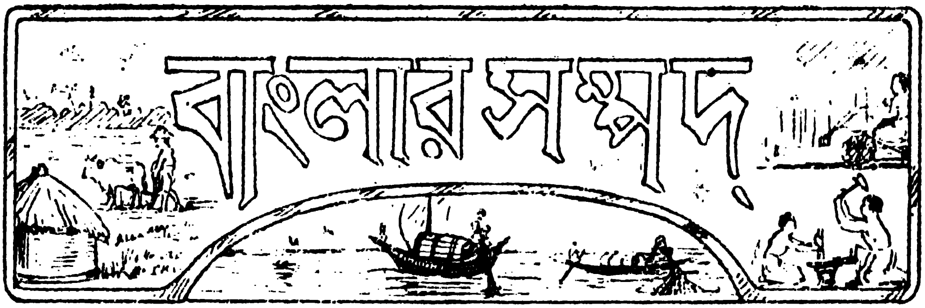
আর্থিক উন্নতি

ফাল্গুন—১৩৩৪ ২য় বর্ষ—১১শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



দিনাজপুরের মফঃস্বল

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ঘুরিতেছি। বালুরঘাট মহকুমার ভিতর দিয়া আত্রাই নদীর তীরে তীরে চলিতেছি। রাজসাহী জেলার কিনার দিয়া একেবারে মালদহ জেলার সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

প্রধান যান গরুর গাড়ী। বর্ষাকালে অবশ্য নৌকায় যাতায়াত চলে। কিন্তু শীতকালে আত্রাই নদীর যে চেহারা দেখিতেছি তাহাতে ভয় হয় নিকট ভবিষ্যতে বা নদীর বুকের উপর দিয়াই গাড়ী চলিবে। চর পড়িয়া স্থানে স্থানে নদী প্রায় বন্ধ হইয়াছে। এক হাত জলও অনেক জায়গায় পাওয়া যায় না। মানুষ হাঁটিয়াই পার হয়। এদিকের এই পল্লীগুলির সঙ্গে গোটা বাংলার আর্থিক যোগাযোগ এই নদীর সাহায্যে। এই রেল-মোটরের দিনেও এই নদী-মাহাত্ম্য কমে নাই; কারণ বগুড়া, রাজসাহী অথবা মালদহ যে জেলার সীমানায় যাইয়াই রেল ধরা যাউক না কেন, প্রায় ৩০ মাইল পথ না হাঁটিলে উপায় নাই। কাজেই এদিকে ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে সুগম ও সস্তা পথ এককালে নদীই ছিল, এবং এখনো আছে। তাই আত্রাইএর তীরে তীরে দেখিতে পাই কত বন্দর, কত পথ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কৃশকায় বাঙ্গালীর বড় সম্পদ্ নদীগুলিও ক্রমশঃ ক্ষীণাঙ্গী হইয়া যাওয়াতে কৃষককুলকে একবার মিনতি করিতে হয় মেঘের কাছে, আবার ফসল তুলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকিতে হয় বর্ষার দিকে—কবে নদীর যৌবন জোয়ার উজাইয়া বেপারীর নৌকার ছপুটি পাল দেখা দিবে। নদী হাজিয়া মজিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে এই দিকের পল্লীগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যেও মন্দা পড়িতেছে তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিলেও আন্দোলন করিবার লোক দেখিতেছি না। স্থলপথের অবস্থাও বিশেষ সুবিধাজনক নহে। এই অঞ্চল হইতে দিনাজপুর সদর, হিলিষ্টেসন, নওগাঁ ও মালদহ জেলার সিঙ্গাবাদ ও কুতুয়া ষ্টেসনে যাইবার জন্য ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সড়ক আছে বটে, কিন্তু উহাতে সারা-বৎসর মোটর ইত্যাদি চলিতে পারে না। লোকাল বোর্ডের পথ দেখাইয়া দিলেও চিনিতে পারা কষ্টকর। পথ-

ঘাট ও যানবাহন এদেশে একটা সমস্যা। পথঘাটের সঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নতির নাড়ীর যোগটা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় আসে নাই কি? এই জেলার প্রধান যান গরুরগাড়ীর চেহারা দেখিয়া বুঝিতেছি উহা মান্ধাতার আমলে যেমন ছিল, আজিও বোধ হয় তাহাই আছে। কি ছোট, কি বড় কি জমীদার, কি প্রজা সকলেই গরুর গাড়ীর সাহায্যে যাতায়াত করিলেও উহার উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইতে নারাজ সকলেই। তবে ফোর্ডের মোটর ২।১খানা এখন পল্লীর পথে চলিয়া পল্লীবাসীদিগকে সমঝাইয়া দিতেছে যে, বাংলাদেশটা ষোড়শ শতাব্দীর কোঠা ডিঙ্গাইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের আওতায় আসিয়াছে।

এই অঞ্চলে ধান ও আখের আবাদই বেশী। রাঙ্গামাটি হইতে পল্লীতলা ও কাঁটাবাড়ীর মাঠে মাঠে দেখিতেছি আখের আবাদ বেশী। আখ ক্ষেতে ঢুকিয়া দেখিলাম আখগুলি সরু ও লালচে রংএর। "বোম্বাই" বা ঢাকায় যাহাকে "গেণ্ডারী" বলে সেই জাতীয় নহে। অথচ এই অঞ্চলের আখের গুড়ের নামডাক আছে। পল্লীতলায় (নজীপুর) গুড়ের ব্যবসায়ীর আড়ৎ অনেক। অবশ্য ধানের ব্যবসায়ীও আছে।

অধিকাংশ কৃষকই নিজ হাতে চাষআবাদ করে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা জমি আধি বন্দোবস্তে দেয়। ফাল্গুনের প্রথম হইতে চৈত্রের প্রথম পর্য্যন্ত কুশাইর (এদেশে আখকে কুশাইর বলে) কাটিয়া গুড় তৈয়ারী করা হয়। গৃহস্থেরা নিজেরাই এই কাজ করে। কয়েকজন গৃহস্থ মিলিয়া এক একটা আখ মারাই কল ভাড়া করিয়া আনে। একটা কল ও গুড় জ্বাল দিবার বড় কড়াই ইত্যাদির ভাড়া এই দুই মাসে ৫০—৬০৲ লাগে। কল নষ্ট হইয়া গেলে কলের মালিকই মিস্ত্রি পাঠাইয়া বিনা খরচায় মেরামত করাইয়া দেয়। এই দুই মাসে আখমারা কল ভাড়া দেওয়াই একটা লাভজনক ব্যবসা। কয়েকজন বাঙ্গালীই এই ব্যবসাটা দখল করিয়া আছেন।

কিষাণ বন্ধু বলিলেন "এক বিঘা ভুঁইএ আখের আবাদ করিয়া যে আখ পাওয়া যায়, তাহাতে ৩ হইতে ৫ কোলা গুড় হয়। 'কোলা' মাটীর বড় কলসী। এক একটা কোলাতে প্রায় দুই মণ গুড় ধরে। বিঘাপ্রতি খাজনা দিতে হয় প্রায় ৫৲।৬৲ টাকা। কিষাণের মজুরি দৈনিক ।/০ হইতে ॥০ আনার মধ্যে। তার সঙ্গে দিতে হয় দুই ওক্তের (বেলার) খোরাকী ও একবারকার জলপানী। লাভ বেশী থাকে না, মহাশয়!" জিজ্ঞাসা করিলাম, চাষআবাদের টাকাটা নিজেরাই যোগান, না ধার করেন?

কৃষক বলিলেন, "না মহাশয়, নিজের ঘরে পুঁজি কোথায়? ধারই বা আমাদের কম সুদে দেয় কে? গুড়ের বেপারীরা ও আড়ৎদারেরা দাদন দেয়। দাদনের টাকায় কাজ চালাই। গুড়টা সবই দাদনদারকে একটা নির্দ্দিষ্ট দরে দিতে হয়। বাজার দরের চেয়ে তাহা প্রায়ই ১৲।১।০ কম থাকে। কোনো কোনো দাদনদারকে আবার ইহার উপরে গুড়েই একটা ধরাট দিতে হয়। গুড়ের বাজার দর ৪৲ টাকার নীচে নামে না, আর ৭৲ টাকার উপরে উঠে না। যাহারা দাদন লইয়াছে, এবং যাহাদের টাকার খাকৃতি বেশী তাহারা ফাল্গুনের প্রথমেই কম দামে গুড়টা ছাড়িয়া দেয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে দাম উঠে। বেপারী বা আড়ৎদারেরা গৃহস্থের বাড়ীতে গাড়ী পাঠাইয়া গুড় লইয়া যায়।"

"এই সব গুড় যায় কোথায়?" আড়ৎদার বলিলেন "আমরা 'রাখি' করি। বর্ষার সময় নদীতে জল হইলে পাবনা ও ঢাকার বেপারীরা নৌকা লইয়া আসে গুড় ও ধান কিনিতে। এখান হইতে গুড় ও ধান দুইই যায় বেশীর ভাগ পাবনা ও ঢাকাতে।

আগে নদীতে জল বার মাস থাকিত বলিয়া বার মাসই বেচা কেনা চলিত। কিন্তু আজকাল কেবল বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময় কারবার নাই। জলপথ ছাড়া গরুর গাড়ীতে বাণিজ্য চলেনা।"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

"পটারি"-শিক্ষায় সরকারী বৃত্তি

শিল্প-শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা সরকার একটী উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। বৃত্তিটীর বার্ষিক মূল্য ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩০০০৲ টাকা। এতদ্ভিন্ন ৪০ পাউণ্ড প্রায় ৬০০৲ টাকা বোনাস বা বিশেষ দানেরও ব্যবস্থা

আছে। পটারি বা কুম্ভকারবৃত্তি বা হাঁড়ি, কলসী ঘটী প্রভৃতি নির্ম্মাণ শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দুই বৎসর গ্রেট-বৃটেনের কোনও স্থানে বাস করিয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী কুম্ভকার-শিল্প আয়ত্ত করিবেন। এই সঙ্গে শিক্ষার্থীকে টালি, নল, চোঙ্গা প্রভৃতি পূর্ত্তবিভাগের আবশ্যক দ্রব্যাদি নির্ম্মাণও শিক্ষা করিতে হইবে।

এই শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, অন্ততঃ তাঁহার পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, গণিত বিদ্যা প্রভৃতিতে ইণ্টারমিডিয়েট পাঠ্যের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাঁহারা ঐ সকল ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন এবং বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াও যাঁহারা আপনার ব্যবসায় হিসাবে ঐ কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিবেন কেবল ঐরূপ একজনকেই ঐ বৃত্তি দেওয়া হইবে।

নোয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটী ও রাস্তা

আজকাল সহরে চলাফেরা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সহরের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা ভবানীগঞ্জ রোড। সহরের প্রায় সমস্ত লোকই এই রোড দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। তদুপরি রেল ষ্টেশনে দৈনিক ৪।৫ বার গাড়ী ঘোড়া, মোটর যান ইত্যাদি চলাচল করে। দিনরাত মফঃস্বল-আগত মোটরে ছড়াছড়ির ত কথাই নাই। এই সমস্ত কারণে ভবানীগঞ্জ রোডের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অগণিত গর্ত্তাকার নীচস্থানসমূহ কর্ত্তৃপক্ষকে যেন তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ সেভাব অনুভব করেন তখন,—যখন তাঁহারা ঘোড়ার গাড়ী, সাইকেল বা মোটর যানে আরোহণ করিয়া বহির্গত হন। কিন্তু তাঁহারা যেই আরাম কেদারায় পৌছেন সেই তাঁহারা সমস্ত কথা ভুলিয়া যান। রাস্তার উপর দিয়া এখন চলাফেরা বড়ই বিপদসঙ্কুল। একে অবস্থা এরূপ কদাকার, তদুপরি শকটাদি বা যানাদি যখন চলিতে থাকে তখন ধূলায় সমস্ত রাস্তা অন্ধকার হইয়া যায়। লোকজন ধূলা এড়াইতে চোখে হাত দিবে কি যানবাহন হইতে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইবে তাহা এক মহাসমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে।

রাস্তার দুই পার্শ্বের দোকানসমূহে অবস্থান করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দিনদিনই সহরে মিউনিসিপ্যাল করদাতাগণের করবৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু তাহাদের সুখ-সুবিধায় কর্ত্তৃপক্ষ যদি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন তবে তাহা কিরূপ হয়? (নোয়াখালী সম্মিলনী)

সুলভে সেলাইয়ের কল প্রদান

সরোজনলিনী মহিলা শিক্ষা সমিতি মেসার্স সিঙ্গার কোম্পানীর সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া মহিলা সমিতির ব্যবহারের জন্য সুলভে কল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন্দ্র সমিতি নগদ মূল্যে কল খরিদ করিয়া মহিলা সমিতিকে সহজে শোধের বন্দোবস্তে দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বৎসরে নিম্নলিখিত সমিতিগুলিকে কল দেওয়া হইয়াছে:—বারাসত, বারাসত চৌধুরীপাড়া, টালা, সুখচর, পানিহাটি, নিমতা, চাঁদপুর, হাওড়া, ব্রাহ্মণরাংদিয়া এবং রাজসাহী। এইরূপ সুলভে কল ক্রয় করিতে পারায় উপরোক্ত সমিতিগুলির সভ্যাদের মধ্যে সেলাই শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

কলিকাতার রাস্তায় দুর্ঘটনা

১ বৎসরে ১৫৮ জনের মৃত্যু

কলিকাতার রাস্তাঘাটসমূহে ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যান-বাহনের নীচে পড়িয়া ক্রমেই অধিক লোক মারা যাইতেছে। ১৯২৬ সনে এই ধরণের দুর্ঘটনায় ফলে ১০৩ জন লোক নিহত এবং ১৫৩১ জন লোক আহত হয়; কিন্তু ১৯২৭ সনে মৃতের সংখ্যা ১৫৮ এবং আহতের সংখ্যা ২০৩১এ দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে ১৯২৭ সনের কোন্ মাসে কতজন লোক এই ধরণের দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত হইয়াছে, তাহা দেওয়া হইল:—

মাস	আহত	নিহত
জানুয়ারী	১৩০	১৬
ফেব্রুয়ারী	১৪৯	১৩
মার্চ্চ	১৯৪	১১
এপ্রিল	১৬৪	২০

মাস	আহত	নিহত
মে	১৬০	১০
জুন	১৪৯	১৯
জুলাই	১৭২	৮
আগষ্ট	১৭৯	৯
সেপ্টেম্বর	১৬৪	১৪
অক্টোবর	১৭২	১৪
নবেম্বর	১৬৮	৬
ডিসেম্বর	২৩০	১২
	২০৩১	১৪৮

গত ডিসেম্বর মাসে কোন ধরণের গাড়ীর নীচে পড়িয়া কতজন নিহত ও আহত হইয়াছে, তাহা দেওয়া হইল :—

	আহত	নিহত
ট্রাম	২২	২
ট্যাক্সি	৮২	১
অন্যান্য মোটর গাড়ী	৮৩	৮
ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী	২	×
অন্যান্য যান	১৩	×
অশ্বচালিত গাড়ী	৩	×
মোটর বাস্	২৫	×
	২৩০	১১

দি টাঙ্গাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

মূলধন ৫০,০০০৲

সুদ লাভার্থে ঋণদান, সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা, হুণ্ডির কাজ করা ও নানা প্রকার ব্যবসা করা ও চালানই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত নিয়মে এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করেন ও বৎসরে দুইবার অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ও কার্ত্তিক মাসে আমানতি টাকার সুদ দেওয়া হয়।

আমানতি টাকার সুদের হার

১।	চলতি আমানত	শতকরা বার্ষিক	৪৲
২।	স্থায়ী ত্রৈমাসিক		৪॥০
৩।	„ ষাণ্মাসিক	„	৬॥০
৪।	„ ব্যর্ষিক	„	৭৲
৫।	" ত্রৈবার্ষিক	„	৭॥০
৬।	" পঞ্চবার্ষিক		৯॥০
৭।	" সাত বৎসর বা তদূর্দ্ধ	„	১০॥০

ইহা ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থগণের টাকা জমাইবার জন্য সাহায্যকল্পে এই ব্যাঙ্ক প্রভিডেন্ট আমানতও গ্রহণ করেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের আফিসে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীযামিনী মোহন নিয়োগী, সেক্রেটারী

বালুর ঘাটে দুর্ভিক্ষ

বালুরঘাট কংগ্রেস ফেমিন রিলিফ কমিটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু স্বয়ং তদন্ত করিয়া জানাইতেছেন যে, পত্নীতলা থানার ঝগড়ি গ্রামে রফতুল্লা মণ্ডলের দুই স্ত্রী। বড় স্ত্রী তার ছেলে সহ ভিন্ন। রফতুল্লা তাহার ছোট স্ত্রী, ২টি ছেলে ও ৫টি কন্যা লইয়া বাস করে। গত ৫ মাস যাবৎ এই পরিবারে ভীষণ অন্নকষ্ট চলিতেছে। ইহারা একবেলা খাইতে পাইতেছিল, তাহাও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে ভিক্ষা চাওয়া ভাতের ফেন। জানুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে রফতুল্লার স্ত্রী দুই তিন দিন ছেলেমেয়েদের তাহাও খাওয়াইতে পারে নাই। আড়াই বছরের একটি কন্যা, নাম মিছিরণ, খুব কান্নাকাটি করিতেছিল, সেই কান্নাকাটি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাতা উক্ত কন্যাকে মোল্লাকুড়ি নামক পুকুরে নিক্ষেপ করে। সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা উক্ত কন্যাকে তুলিতে গেলে রফতুল্লার স্ত্রী তাহাতে বাধা দিয়া বলে, "তুলিয়া খাওয়াইব কি?" যাহা হউক, রফতুল্লার ভাতিজার স্ত্রী মেয়েটিকে তুলিয়া জীবন রক্ষা করে।

কাঁটালগুড়ি টী কোম্পানী

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী উক্ত কোম্পানী শতকরা ৩৪০৲

অর্থাৎ প্রতি অংশে ১৭০৲ হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির করেন তৎপর দিন হইতেই লভ্যাংশ বিলি হইতেছে।

ম্যানেজার ৫০০০৲ এবং সহকারী ম্যানেজার ৫৫০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ (সদর ও বাগানের) প্রত্যেকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন। ফ্যাক্টরির চাকরদিগকেও ৩২০৲ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

সাহায্য পাইবার জন্য যে সমস্ত আবেদন ছিল সেগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

দেবপাড়া টি কোম্পানী

ঐ দিন বৈকালে সভায় শতকরা ১৬০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ৮০৲ হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হয় এবং গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে লভ্যাংশ বিলি হইতেছে।

ম্যানেজার ৪৩০০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ (সদর ও বাগানের) প্রত্যেকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন। ফ্যাক্টরির চাকরদিগকেও ২৫০৲ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

সাহায্য পাইবার আবেদনপত্রগুলির বিবেচনার ভার ডাইরেক্টরগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। (ত্রিস্রোতা)

হাওড়া জেলার খালবিল

হাওড়া সহর, লিলুয়া ও বালি মিউনিসিপ্যালিটী বাদে হাওড়া জেলার পরিমাপ ৫১৮ বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা ৭,৭৮,৮৯৩ এবং তন্মধ্যে চাষের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ৪,৭৮,২১০ জন অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬১ জন। ইহা ছাড়া বহুসংখ্যক লোক চাষ ও চাকরি উভয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এ জেলার প্রত্যেক বর্গ মাইলে লোকের বাস প্রায় ১৫০০ জন। প্রত্যেক বর্গ মাইলে এত অধিক লোকের বাস বোধ হয় খুব কম জেলাতেই আছে।

• হাওড়া জেলায় বৃষ্টিপাত

পশ্চিম বঙ্গের অপরাপর জেলার ন্যায় এ জেলাতেও চাষের ক্ষতি করে অতিবৃষ্টি ও অসাময়িক বৃষ্টি। জেলার সদর সাবডিভিশানে বেশীর ভাগ ক্ষতি করে অসাময়িক বৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি ক্ষতি করে উলুবেড়িয়া সাবডিভিসানে, বিশেষতঃ যে অংশটুকু দামোদরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত তথায়। অধিকাংশ সময় এরূপ দেখা যায় যে, এক পশলা বৃষ্টির অভাবে লোকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, সে সময় হয়ত একবার সেচন ক'রলে ফসল রক্ষা হতো বা সময়ে চাষ হ'তে পারতো; কিন্তু চাষা "হা জল হা জল" করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন না করতে পেরে বরুণ দেবতার পূজা দিতে থাকে। কি দোষে এরূপ হলো তা না ভেবে স্বাবলম্বন ভুলে নিজের ভাগ্যের দোষ দিতে থাকে। এ জেলায় তো বৃষ্টিপাত হয়, তবুও যদি পাঞ্জাবের মত ২০ ইঞ্চিরও কম জল হতো ও সেচন দ্বারা চাষ ক'রতে হতো তা হ'লে যে চাষীরা কি ক'রতো বলা যায় না।

নদী খাল বিল

এ জেলার মানচিত্র দেখলে দেখা যায়, এক দিকে পুণ্যতোয়া গঙ্গানদী অপর দিকে রূপনারায়ণ, মধ্যে প্রবল প্রতাপ দামোদর। ক্ষীণতোয়া সরস্বতীও অধুনা প্রায় বিলুপ্ত কানানদীও মজা। তাহা ছাড়া খাল বিলও আছে অগণিত। হাওড়া জেলার ৯৩৭টী গ্রামের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে মজা খাল বিল আছে এবং প্রায় প্রত্যেক মাঠেই বিল আছে। যখন ঐ সকল খাল বিল জীবিত অবস্থায় ছিল, তখন চাষে সোণা ফলত, লোকে প্রচুর খেতে পেত এবং হাওড়া জেলায় প্রত্যেক গৃহেই সুখ শান্তি বিরাজিত ছিল। তখন হাওড়া জেলায় ম্যানোফিলিস্ মশার নাম ছিল কবির কল্পনায় এবং লোকের জীবনী শক্তি ছিল বলিয়া ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের করাল মুখব্যাদান ও অকাল মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য আদৌ ছিল না।

বিলের অবস্থা

যদি পূর্ব্বের সহিত আজকালকার অবস্থার তুলনা করা যায়, তা হ'লে দেখা যায় যে, পুরাতন খালগুলি বহতা না থাকায় মাঠে সেচনের অভাব এবং বেশী জল হলে নিষ্ক্রমণের পথ বন্ধ হয়েছে। আমাদিগকে জেলায় সুখ

শ্রী ফিরিয়ে আনতে হ'লে উক্ত খাল বিলগুলির সংস্কার করাই প্রথম কার্য্য। গভর্ণমেন্টের একার চেষ্টায় বিশেষ কিছু হবে না। "বিল" কি একথা হয়তো অনেকে জানেন না। বিল হচ্ছে মাঠের মাঝের ডোবা, যার জলে মাঠের সেচন কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক মাঠে এরূপ অনেক বিল আছে। আমি বাদার মাঠে, কেদোর মাঠে, ডানকুনির মাঠে ও বড় জলায় ওরূপ অসংখ্য বিল দেখেছি। অধিকাংশ স্থলেই বিল জমিদারের কাটা। প্রজারা তাহার জল নিয়ে তাহাদের জমি সেচন করে এবং জমিদার মৎস্য ধরবার স্বত্ব জমায় বিলি করেন; অধিকাংশ বিলের অবস্থা এখন শোচনীয়। জমিদারেরা আর ঐ সকল বিল কাটাতে মনোযোগ দেন না। কারণ ঐ সকল বিল ভরাট হয়ে জমি হয়ে গেলে তাঁহারা উচ্চ হারে উক্ত জমি বিলি করতে পারবেন। কৃষি-কার্য্যের উন্নতি করতে হলে মজা খালের সহিত ঐ সকল বিলেরও সংস্কার করতে হবে। বঙ্গীয় ১৯২০ সালের ৬ আইনের ক্ষমতাবলে মজা খালের সহিত ঐ সকল বিলও কাটাতে পারা যায়। খালের ন্যায় বিল কাটালে জমিদারেরও লাভ কৃষকেরও লাভ। ধরুন, ১ বিঘা ১টা বিল সংস্কার করতে খরচ পড়ে ৮০০৲ টাকা। ঐরূপে এক বিঘা একটা বিলে যে জল থাকবে তাহাতে ২০ বিঘা জমিতে নিঃসন্দেহে দুইবার সেচন করা চলবে। আশ্বিন মাসে ও জ্যৈষ্ঠমাসে একবার সেচনের অভাবে যে ক্ষতি হয়, তাহা অনেকেই জানেন। অধিকন্তু বিল গভীর করে কাটালেও তাহাতে অধিক পরিমাণে মৎস্য জন্মালে জমিদারেরও লাভ হবে। উপরোক্ত ৮০০৲ টাকা খরচা জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে ভাগ হয়ে ধরুন জমিদারের অংশে ২০০৲ টাকা বাদে প্রজার অংশে রইল ৬০০৲ টাকা। উক্ত ৬০০৲ টাকা ২০ বিঘা জমির মধ্যে ভাগ করলে প্রতি বিঘায় খরচা পরে ৩০৲ টাকা। ঐ ৩০৲ টাকা কতিপয় কিস্তিতে দিলেও চলবে। বিলের পাঁক মাটির দ্বারায় যে সব জমি উপকৃত হবে তাহাতে বেশী ফসল জন্মাবে। তাহাতেও ঐ টাকা দুই বৎসরে নিঃসন্দেহে শোধ হবে। বিল উদ্ধার করতে কৃষকের এক পয়সাও ঘর থেকে দিতে হল না, অথচ কাটান বিলটি তাহাদের অনেকদিন উপকার করতে পারবে। জমিদারের খরচাও শোধ হয়ে যাবে মাছের আয় থেকে। অধিকন্তু ঐ সকল কাটানো খাল-বিলের দ্বারা দেশের মৎস্য-সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

বিল-সংস্কারে আইন

বিল ও ছোট ছোট খাল কাটাতে হলে যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা নিম্নে লিখিত হল।

(১) যেখানে সেচন কার্য্যের জন্য সমিতি নাই সেখানে যে সকল লোক উক্ত কার্য্যের দ্বারা উপকৃত হবেন তাঁহারা একযোগে জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব উক্ত দরখাস্ত পাইয়া উক্ত কার্য্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ১৯২০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা মতে অনুসন্ধান করবেন।

(৩) যদি কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্যটী হওয়া বিবেচনা করেন, তা হলে উক্ত আইনের ৪ হইতে ৮ ধারা মতে কার্য্যের এষ্টিমেট তৈয়ার করাবেন ও কিরূপে নির্ব্বাহ হবে তাহার বন্দোবস্ত করবেন।

(৪) ৮ ধারা মতে কার্য্যটী মঞ্জুর করবার পর ১৩ ধারা মতে ঐ কার্য্যের জন্য যিনি ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হবেন তাঁহাকে কার্য্য করতে হুকুম দিবেন ও কার্য্য করাবেন।

(৫) তৎপরে জমিদার ও প্রজাদিগের নিকট হতে টাকা যে কয় কিস্তিতে বিবেচনা করেন কালেক্টর সাহেব আদায় করবেন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বেরা (গ্রামের ডাক)

টাকা, এলট্‌মেণ্ট হইলে পাঁচ টাকা ; অবশিষ্ট টাকা তিন মাস অন্তর সমান চারি কিস্তিতে দেয়। প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত প্রবেশ ফি এক টাকা। অবিক্রিত অংশবিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্রই সচ্চরিত্র সুদক্ষ এজেণ্ট আবশ্যক।

চা বাগানের লভ্যাংশ ও দান

জলপাইগুড়ির চা বাগানসমূহে বিগত ১৯২৭ সনের বাবদ লভ্যাংশ দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসরই বাগানসমূহের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখিলে দেখা যায় যে, ডিরেক্টরগণ অংশীদারদিগকে তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ দিবার আগে সহরের যাত্রাগানে, থিয়েটারে, জলের কলে বিস্তর টাকা দান করিয়া-অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই অংশীদারদিগকে বিতরণ করিয়া থাকেন।

বাগান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং অংশীদারগণের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই দূরদূরান্তরের অংশীদারগণ উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক অংশীদারের অভিমত গ্রহণ না করিয়া তহবিলের অর্থ ঐ প্রকারে সহরের আমোদ প্রমোদ বা সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য দান করিবার ক্ষমতা কোনও ডিরেক্টরকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। অথবা বাগানের আর্টিকলস অব "অ্যাসোসিয়েশন" বহিতে ঐ প্রকার কোন দানধ্যানের উল্লেখ আছে বলিয়া আমরা জানি না।

সৎকার্য্যে দান করা মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মফঃস্বলে কত অংশীদার বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইতেছেন না, রোগে ঔষধ পাইতেছেন না, সহরের ডিরেক্টরগণ কি তাহার সংবাদ রাখেন অথবা ঐ সকল অসুবিধা দূর করণের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন? ডিরেক্টরগণের দান কেবল সহরে নিবদ্ধ না রাখিয়া সুদূর মফঃস্বলে ও বিস্তৃত হইলে দানের সার্থকতা লোকে উপলব্ধি করিবে। নতুবা চা বাগানগুলি কেবল সহরের "দাতব্যশালা" হইলে ডিরেক্টরগণ অংশীদারগণের বিশ্বাস হারাইবেন।

জলপাইগুড়ি টাউনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সহরবাসী ছোটবড় অনেকেই নিজ নিজ তহবিল হইতে আশানুরূপ দান করিতে সমর্থ। ইহার জন্য মফঃস্বলবাসী দরিদ্র অংশীদারগণের অর্থ শোষণ না করিলে আমরা বাধিত হইব। ইতি—

কতিপয় অংশীদার (জনমত)

সরিষার তৈলে ভেজাল

সহরের মৌলবীবাজারের গিরীশচন্দ্র দে ও চারুচন্দ্র দের মুদী দোকান হইতে ট্রেনিং কলেজ মেসের লোকেরা মতি মার্কা সরিষার তৈল ক্রয় করেন। ঐ তৈল ব্যবহার করায় তাহাদের মধ্যে উদরাময় রোগ দেখা দেয়। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ ওয়েষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগের লেবরেটারীতে ঐ তৈল পরীক্ষার জন্য পাঠান। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ঐ সরিষার তৈলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড আছে। মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ঐ দোকানের তৈলপূর্ণ সকল টীন ধৃত করিতে ও উহার নমুনা পরীক্ষার্থ আনয়ন করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(পঞ্চায়েৎ)

সাইমন হরতাল ও বিদেশী-বর্জ্জনের আগা পাছা

গতবারে বলিয়াছি, দেশের বর্ত্তমান নেতাদের কর্ত্তব্য আজ কেবল শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত কিংবা অবস্থা-সচ্ছল দুচারি জন দেশবাসীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবেনা। এই শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের অন্তরালে, যে ক্ষুধিত নিরন্ন বিপুল নাম-গোত্র-কুলহীন জনসাধারণ, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির ধারা আঁচিতে হইবে। দেশব্যাপী হরতালের কৃতকার্য্যতার উল্লেখে খুসী থাকিলেই সরকার হাত পা এবং পাততাড়ি গুটাইয়া পরবর্ত্তী জাহাজে বিলাত যাত্রা করিবে না। সাইমন কমিশন বর্জ্জনে শিক্ষিতের জনমত গঠন করিবার সঙ্গে সঙ্গে, অশিক্ষিত সর্ব্বহারা দলের দুঃখ বেদনাকে নিকট দৃষ্টিতে আনিতে হইবে। তাহা না আনিলে সরকারের মুখনিঃসৃত "প্রকৃত ভারত" হইতে ব্যবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার উল্লেখে উপহাসবাণী যতই শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হউক না

কেন, বিবেক কেবলই বিদ্ধ হইতে থাকিবে। সরকারের মুখে 'প্রকৃত ভারত' সম্পর্কে দরদ জ্ঞাপন, ভূতের মুখে রামনামের মতই। কিন্তু নেতাদের বিবেক তাই বলিয়া সরকারকে গাল দিলেই অক্ষুণ্ণ থাকেনা। একথা আমরা হাজার বার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি।

মিশরে মিলনার কমিশন সামান্ত কৃষাণকে সাক্ষ্য দিবার নিমন্ত্রণ করিয়া শুনিয়াছিল, 'আমরা উহার কিছু জানিনা, জগলুল পাশার নিকট যাও'—একথা বলিতে দেশনেতাদের আঁখি সজল হইয়া উঠে। আমাদের দেশের শ্রমিকদের কাছে নেতারা যদি ঐ রকম উত্তরের প্রত্যাশা রাখেন, তবে তাঁহাদের প্রত্যাশার বাহাদুরী দিবার সঙ্গে সঙ্গে কেবলই এই কথা মনে হয় যে, এই কৃষাণ শ্রমিকের জন্ত তাঁহারা যতই অশ্রুজল ফেলিয়া থাকুন, ইহাদের নিজেদের অশ্রুজল মুছিবার জন্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তাঁহারা করেন নাই। উপরন্তু সে চেষ্টাকে এড়াইয়া চলিবার ইচ্ছার অভাব কোনদিন দেখি নাই—পাছে দেশোদ্ধারের মহতী ইচ্ছা অভাব দৈন্তের সংস্পর্শে পঙ্কিল হইয়া উঠে, পাছে সরল দেশপ্রেম জটিল হইয়া উঠে, 'গণ'কে জাগাইতে গেলে, পাছে 'ধন'-সম্পদে টানাটানি পড়ে।

হরতালের নায়কবৃন্দকে একথা আমরা মনে করাইয়া দিই যে, হরতাল সার্থক করিবার জন্ত যদি কলের কুলীদের আর দিনমজুরদের দিকে না চাহিয়া উপায় নাই, তবে হরতালের পূর্ব্বে এবং পরে তাহাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া কেন? কাজ হারাইবার ভয়ে যদি ট্রামকর্ম্মচারীরা হরতালের দিন ট্রাম চালাইয়া থাকে, তাহাতে আপত্তি কেন? ঘোড়ার গাড়ী যদি চলিয়াই থাকে, তাহাতেই বা কথা উঠে কেন? ইহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে দেশনায়কদের কোনও দিন সচেষ্ট দেখা যায় নাই তো! নায়কবৃন্দের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, একটি দিন হরতালের জন্ত আনন্দে উল্লসিত হইবার আগে, ভবিষ্যতের বহুদিন গণনা করিতে হইবে। বক্তৃতামঞ্চ হইতে বারে বারে শুনিয়াছি সংগ্রাম আরম্ভের কথা, কিন্তু আরম্ভের পর্ব্ব আর কতদিন ধরিয়া চলিবে?

বৃটিশ পণ্যবর্জ্জনের কথা নূতন করিয়া আবার উঠিল। যাহাতে ইহা মাত্র কথার কথা না হয়, সেজন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার প্রয়োজন। শিক্ষিত সাধারণের জনমত বিলাতী পণ্যবর্জ্জন সম্বন্ধে এখনও উদাসীন। গত বহুবারে তাঁহাদিগকে এসম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াও বিশেষ সুফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। অশিক্ষিতের কথা বলিবার প্রয়োজন আসিয়াছে আজ। সহরের দোকান-পাটে, পল্লীর হাটে হাটে বিলাতী বস্ত্রসম্ভার ছাইয়া আছে। কিনিবার যে সামান্ত সংস্থান তাহাকে লুব্ধ করিবার জন্ত আকর্ষণীরও অভাব নাই। দেশীয় পণ্যের চাকচিক্যের অভাব, এবং মূল্যের আধিক্য দুইই সমান ভাবে পল্লীবাসী কৃষাণকে বিলাতী পণ্যের প্রতি লুব্ধ করে। ইহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত নেতারা কি করিবেন? এতদিন পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে উদাসীন হইয়াই তাঁহারা আসিয়াছেন। ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে যে দু'একটি বিলাতী পণ্য কম বিক্রয় হইয়াছে, তাহা লাভ-লোকসানের খতিয়ানে কোথাও জমা পড়ে নাই। সে ভুল সংশোধনের কথা এবার মনে রাখিতে হইবে। সরস্বতী আর লক্ষ্মীর কোলঘেঁষা দেশপ্রেমকে আজ গণেশের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(জাগরণ)

দি নারায়ণগঞ্জ বায়স্কোপ কোং লিমিটেড্

(মূলধন ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা।)

৫০০পাঁচ শত অংশে বিভক্ত। প্রতি অংশ ১০০৲ এক শত টাকা মাত্র।

ম্যানেজিং এজেন্ট—দি ইণ্ডিয়ান সিনেমা কোম্পানী, নারায়ণগঞ্জ।

উক্ত বায়স্কোপের জন্ত নারায়ণগঞ্জ সহরের মধ্যস্থলে নারায়নগঞ্জ রোডের উপর সুবিধাজনক স্থান সংগৃহীত হইয়াছে এবং বিল্ডিংএর সর্ব্বপ্রকার কার্য্যাদিও আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়, ৩।৪ মাসের মধ্যেই বায়স্কোপ দেখান সম্ভব হইবে।

কোম্পানীর সাফল্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপালিটি এতদর্থে স্থান দান করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এবং নারায়ণগঞ্জের

ইউরোপীয়ান ও দেশীয় ভদ্রমহোদয়গণের সহানুভূতিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে।

যেভাবে শেয়ার খরিদের জন্য আবেদনপত্র আসিতেছে তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে। শেয়ার প্রার্থিগণ সত্বর হউন। প্রতি শেয়ারে অগ্রিম ২৫৲ পঁচিশ টাকা দেয়। বক্রী ৭৫৲ টাকা ন্যূন পক্ষে তিন বারে আদায় হইবে। দরখাস্ত ফি ২৲ টাকা একবার মাত্র দেয়। নিম্ন ঠিকানায় শেয়ার খরিদের জন্য আবেদন করুন বা সাক্ষাৎ করুন :—

১। মিষ্টার ডি, এন, রায়, ম্যানেজিং, এজেণ্ট, দি ঢাকা বায়স্কোপ কোং লিঃ, সদরঘাট, ঢাকা অথবা ৩৭ নং তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, ঢাকা।

২। শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ধর, আমলাপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

বাঙলার বাজেট

বাঙলা-কাউন্সিলে অনারেব্‌ল মিঃ এ, মার বাঙলা সরকারের ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের আয়ব্যয়ের বাজেট পেশ করিয়াছেন। ১৯২৭-২৮ এবং ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দেও বাঙলা সরকারকে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করিতে হইয়াছিল। আগামী বর্ষেও তাহাই করিতে হইবে। আগামী বর্ষের আনুমানিক আয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ১০,৯২,৬১,০০০ কোটি টাকা ; কিন্তু ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ১১,৮৪,৫১,০০০ কোটি টাকা অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ৯১,৯০,০০০ টাকা বেশী। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হইবার অর্থ হইতেছে জাতির ঋণভার বৃদ্ধি। গত তিন বছর বাঙলার এই ঋণ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জাতির মঙ্গলজনক কাজ করিবার জন্য প্রায় সকল জাতিকে কখনো না কখনো ঋণ করিতে হয় ; সুতরাং ঋণ করিয়া ব্যয়-নির্ব্বাহ যে খারাপ এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু আমরা জানিতে ও বুঝিতে চাই বাঙলার কোন্ হিতসাধনোদ্দেশ্যে বাঙলা সরকারের হিসাব-নিকাশের কর্ম্মচারীরা বাঙলার দরিদ্র প্রজাদের উপর ঋণভার চাপাইয়া দিতেছেন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি-সাধন ব্যতীত জাতির উন্নতি যে হয় না, একথা সকলের স্বীকার্য্য। সুতরাং এই সব কাজের জন্য সরকারকে যদি ঋণ করিতে হয়, তাহা তেমন দোষের বলিয়া মনে হয় না। বাঙলা সরকার ঋণ করিতেছেন, কিন্তু এই সব বিষয়ের উন্নতির জন্য নহে—তাহাদের শাসন-প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে। নিম্নের এই তালিকা হইতে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে :—

শাসন বিভাগ	১,২৪,০২,০০০
বিচার বিভাগ	১,০৯,৪৯,০০০
পুলিস বিভাগ	১,৯৭,৭৫,০০০
জেল বিভাগ	৩৪,৮৩,০০০
সিভিল ওয়ার্কস্	১,০২,০৮,০০০
হোম চার্জ্জ	৬৯,৪৮,০০০
রিজার্ভ শিক্ষা বিভাগ	১৫,১৫,০০০
হস্তান্তরিত শিক্ষা বিভাগ	১,২৭,৮২,০০০
চিকিৎসা বিভাগ	৬০,০৬,০০০
স্বাস্থ্য বিভাগ	৫৮,০৪,০০০
কৃষি বিভাগ	২৫,৮১,০০০
শিল্প বিভাগ	১৩,৩৩,০০০

দেখা যাইতেছে যে, বাঙলা সরকার প্রায় বারো কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে প্রায় তিন কোটি টাকা প্রজার হিতকর বিষয়ের জন্য ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু একথা বলিলেও ঠিক বলা হয় না, কেননা শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যয় দেখানো হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্রই কাজের জন্য ব্যয়িত হইতেছেনা, অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় বেশী হইতেছে। (আত্মশক্তি)

সাইমন-বিরোধী হরতাল

৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বাঙলা দেশে ও সমগ্র ভারতে যে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়, তাহার উদ্বোধন-বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ :—

নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভা এবং সকল দলের প্রতিনিধিগণ স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী,

২০শে মাঘ (শুক্রবার) সাইমন কমিশনের বোম্বাই নগরীতে আগমন উপলক্ষ্যে ভারতব্যাপী হরতাল করা হইবে। ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বাহাদুর ভারতবর্ষের জনমত পদদলিত করিয়া সাইমন প্রমুখ সাত জন ইংরাজকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেছেন—এই জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য হরতাল করা হইবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী (২০শে মাঘ) তারিখে ভারতবাসীকে নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করিয়া হরতাল যাহাতে সফল হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে:—

(১) স্কুল ও কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ঐ দিন স্কুল ও কলেজে যাইবেন না।

(২) সব দোকান ও হাট সেদিন বন্ধ থাকিবে।

(৩) উকিল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার ও তাঁহাদের মক্কেলগণ সেদিন আদালতে যাইবেন না।

(৪) সব মজুরেরা সেদিন কাজ বন্ধ রাখিবেন।

(৫) হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনের কর্ম্মচারী ও কুলীরা সেদিন কাজ করিবেন না।

(৬) ট্রাম গাড়ী সেদিন বন্ধ থাকিবে।

(৭) বাস্ ও ভাড়াটিয়া মোটর সেদিন চলিবে না।

(৮) ঘোড়ার গাড়ী সেদিন চলিবে না।

(৯) গরু ও মহিষের গাড়ী সেদিন চলিবে না।

(১০) রিক্সা ও পাল্কী সেদিন বন্ধ থাকিবে।

(১১) কর্পোরেশন ও বে-সরকারী সকল আফিস সেদিন বন্ধ রাখিতে হইবে।

(১২) থিয়েটার, বায়স্কোপ সেদিন বন্ধ থাকিবে।

(১৩) চিকিৎসক ভিন্ন কেহ কোন যান বাহনাদি ব্যবহার করিবেন না।

উক্তদিবসে সকলেরই সাধ্যমত বাড়ীতে থাকা কর্ত্তব্য। অপরাহ্ন ৪॥০টা পর্য্যন্ত হরতাল হইবে—তারপর সকলেই ইচ্ছামত নিজ নিজ কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন। অপরাহ্ন ৪॥০ টায় বিরাট সাধারণ সভা হইবে।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতি

১৫ বিঘা জমি ও ২০০৲ ধার

বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর বেকার-সমস্যা নিরাকরণার্থ ফরিদপুরের মহামান্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুর একটী স্কীম প্রণয়ন করিয়াছেন। এই স্কীমটী গবর্ণমেন্ট অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা রাজবাড়ী পত্রিকার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহার চুম্বক নিয়ে দিলাম।

এই স্কীম অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে ফরিদপুরের কৃষি ফার্ম্মে এক বৎসরকাল হাতে কলমে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে। কৃষি কার্য্যের জন্য আবশ্যক ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ পশু-চিকিৎসা এবং সমবায়-নীতি অনুযায়ী ঋণদান প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষাকালে শিক্ষার্থী বালক অথবা যুবকদিগকে গবর্ণমেণ্টের কৃষি ফার্ম্মে মজুরের কার্য্য করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে তজ্জন্য প্রতি মাসে প্রত্যেককে ১২৲ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে বিনা ভাড়ায় থাকিবার জায়গা দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহাদের আহারের ব্যবস্থা নিজেদের করিয়া লইতে হইবে এবং বাসনপত্র বিছানা, থাকিবার স্থানের আসবাবপত্র আলো প্রভৃতি তাহাও সঙ্গে আনিতে হইবে। এক বৎসর শিক্ষা পাওয়ার পরে প্রত্যেক বালককে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য পনর বিঘা জমি দেওয়া হইবে এবং জমির উন্নতি-বিধায়ক অথবা কৃষিবিষয়ক ঋণদান আইনের বিধান অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সে প্রাথমিক খরচা বাবদ ২০০৲ টাকা পাইবে। কালেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত দুইজন লোকের একত্রিত অথবা পৃথক পৃথক সিকিউরিটী মূলে এই ঋণ দেওয়া হইবে। এই ঋণের টাকা প্রচলিত সুদসহ ঋণ দেওয়ার পর বৎসর হইতে প্রতিবৎসর এক এক কিস্তি হিসাবে চারি বৎসরে আদায় করিয়া লওয়া হইবে; কিন্তু যদি কোন কারণে কোন সময়ে কালেক্টর বাহাদুর এই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেন তাহা হইলে সমুদয় টাকা অথবা উহার বক্রী অংশ তৎক্ষণাৎ জমির দাতাগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইবে।

জমি এবং ঋণ দেওয়া হইলে প্রত্যেক বালক অথবা যুবককে নিজ হস্তে ঐ জমির আবাদ করিতে হইবে। ঐ জমি বা উহার কোনও অংশ ইজারা অথবা অন্য কোনও রূপে অপরের নিকটে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে দেওয়া হইবে না। জমিতে কিরূপ কাজ করা যাইতেছে তাহা ছয়মাস অন্তর জেলার কৃষি-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী অথবা খাস মহলের প্রধান কর্ম্মচারী পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং ইহাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কালেক্টর সাহেব বাহাদুর কোন বন্দোবস্ত চলিত থাকিবে কি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা ঠিক করিবেন। এই জমি অথবা ইহার কোনও অংশ অন্যরূপ বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা মাত্র এই বিধিব্যবস্থা শেষ হইবে। তিন বৎসর পরে সন্তোষজনক উন্নতি করিতে দেখিলে ঐ জমি গবর্ণমেন্টের যে এষ্টেটের অন্তর্গত ঐ এষ্টেটের প্রচলিত নিয়মানুসারে রায়তি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এজন্য কোনও সেলামী লওয়া হইবে না। কালেক্টার সাহেব উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রত্যেক বালক অথবা যুবক নিজে এবং তাহার পরিবারের লোক মিলিয়া নিজেরা যতখানি জমি আবাদ করিতে পারিবে সেই পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিবেন। (রাজবাড়ী পত্রিকা)

গুরগুরিয়া নদী

১৬।১৭ খানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্য দিয়া এই নদীর বহতা ছিল। কিন্তু গত দশ বৎসর হইতে এই নদীর মুখ মজিয়া যাওয়ায় এই নদীতে এখন বন্যার জল প্রবেশ করিতে পারে না। নানা প্রকার জলীয় উদ্ভিদ ও কচুরী-পানার যোগে এই নদীর জল এখন বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। জল ম্যালেরিয়া-মশকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গভর্মেন্ট ৮।১০ বৎসরের চেষ্টায় এই নদীর সংস্কার করিতে স্বীকৃত হইতেছেন ; কিন্তু গ্রামবাসীদের কত টাকা লাগিবে তাহা এখনও বলেন নাই। খুব শীঘ্র এই নদী সংস্কৃত না হইলে এই ১৬।১৭ খানি গ্রামের অস্তিত্ব লোপ পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীগোপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (নদীয়া প্রকাশ)

ঢাকা কৃষি-বিদ্যালয়ের উন্নতি

ধান, আখ, কপি, আলু, পান, তামাক, পাট, রেশম এমন কি দুগ্ধ ইত্যাদির উন্নতি সাধন নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট সমগ্র বঙ্গদেশে যে কয়েকটী পরীক্ষা কৃষিক্ষেত্র খুলিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে ঢাকা মণিপুরের কৃষিক্ষেত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার ক্ষেত্রফল দুই হাজার বিঘা। তন্মধ্যে প্রায় এক হাজার বিঘা আবাদের উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে নানাপ্রকার চাষের পরীক্ষা আজ বহু বৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে এবং গভর্ণমেণ্ট কয়েকটী বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রতি বৎসর কয়েকজন করিয়া ছাত্রকে এই ফার্ম্মের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাঁহারা দুই বৎসরে পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়া মফঃস্বলে গিয়া দেশের লোককে কৃষিবিষয়ে নানাপ্রকার শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার কয়েকটী উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে এই কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করায় বিগত ১৫ই জানুয়ারী হইতে মেদিনীপুর, বরিশাল, বীরভুম, চট্টগ্রাম, নদীয়া, হুগলী, যশোহর, মালদহ, ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েকটী জেলার উচ্চ ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছেন।

মফঃস্বলে প্রতি গ্রামে কৃষির বিস্তার জন্য স্কুলের শিক্ষকগণকে এই স্কুলে দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষকগণ স্ব স্ব স্কুলে গমন করিয়া একটী করিয়া কৃষিক্ষেত্র (১৫ বিঘা আন্দাজ) বা বাগান (৪ বিঘা আন্দাজ) তৈয়ারী করিয়া স্কুলের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন।



ভারতে বৃটিশ ক্ষতি

ভারতে বৃটিশ মালের আমদানি শতকরা দশ টাকা কমিয়া যাওয়ায় বিলাতে বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব আন্দোলন চলিয়াছে। জাপানী ও মার্কিণ মাল গত কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে অত্যধিক আমদানি হইতেছিল। জার্ম্মাণ মাল এক্ষণে এদেশে আমদানি হইতে আরম্ভ হওয়াতে বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

সরিষার চাষ

এ বৎসর সমগ্র ভারতে ২৯৬০০০০ একর জমিতে সরিষা বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে শতকরা ৪ ভাগ কম বপন করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশে ৬৯৮০০০ একর জমিতে, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ৬৯৮০০০ একর জমিতে, আসামে ৩৫৩০০০ একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছে। আসাম ব্যতীত সকল প্রদেশেই কম পরিমাণ জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছে।

সমগ্র ভারতে যত সরিষার চাষ হয়, তাহার শতকরা ৩৮.৯ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, ১৭.৯ ভাগ পাঞ্জাবে, ১১.১ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যায়, ১১.৬ ভাগ বঙ্গদেশে ও ৫.১ ভাগ আসামে উৎপন্ন হয়।

তিসির চাষ

সমগ্র ভারতে এ বৎসর ২৫৭৪০০০ একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে। ইহা গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৬ ভাগ কম।

এ বৎসর বঙ্গদেশে ১২০০০০ একর জমিতে এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ৬০৮০০৯ একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে।

সমগ্র ভারতে যত তিসির চাষ হয়, তাহার শতকরা ২৯.৯ ভাগ মধ্যপ্রদেশে ২৭.৪ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, ১.৯ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যায়, ৩.৫ ভাগ বোম্বাই প্রদেশে এবং ৩.৪ ভাগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়।

রেঙ্গুন ডকে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর ডাল্লা ডকে ৩ হাজার শ্রমিক কার্য্য করে। তন্মধ্যে ২ হাজারের অধিক শ্রমিক অদ্য প্রাতে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। উক্ত কোম্পানী ঐ ধর্ম্মঘটের কারণ অবগত নহেন, তাঁহারা শ্রমিকগণের তথাকথিত অভাব-অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন। প্রকাশ, শ্রমিকগণ বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করে। প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে একদল কুলী বেতন-বৃদ্ধির প্রার্থনা করে। কোম্পানী অবগত হয়েন যে, অন্যান্য কুলীর অপেক্ষা ঐ সকল কুলীর বেতন অধিক ; বিশেষতঃ সকল কুলী বেতনবৃদ্ধির প্রার্থনা করে নাই। প্রথমে বোধ হইয়াছিল, কুলীরা কোম্পানীর জবাবে সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গত কল্য প্রাতে ৩ হাজার শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৪ শত ৫০ জন শ্রমিক মাত্র কার্য্যে যোগদান করে। প্রকাশ, প্রস্তরনিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীতি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু পুলিশ ডাল্লায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সকলে শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। মধ্যাহ্নকালে ৭ শতের অধিক শ্রমিক কার্য্যে যোগদান করে। আগামী কল্য প্রাতে সম্ভবতঃ আরও অধিকসংখ্যক শ্রমিক কার্য্যে যোগদান করিবে।

ভারতে ইক্ষুর চাষ

কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই যে অধিবেশন হইয়া গেল উহাতে রায় এস, ভেঙ্কাটরমণ বাহাদুর ভারতবর্ষের চিনি সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা সাধারণতঃ চিনি ব্যবহার না করিয়া তাহার স্থলে গুড় ব্যবহার করে, কিন্তু যে পরিমাণ চিনি তাহারা ব্যবহার করে তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ বিদেশ হইতে আসে। এই বিদেশী চিনিতে প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকা ভারতবর্ষ হইতে যায়। অথচ ইক্ষুর চাষ এবং ইক্ষু উৎপাদন ভারতবর্ষে যেরূপ হয় পৃথিবীর অপর কোন দেশে সেরূপ হয় না। ইক্ষুর চাষ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা এদেশে আসিয়া ইক্ষু দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।

ভারতে ইক্ষুর চাষে বহু পরিমাণ জমি ব্যবহৃত হয় এবং ভারতে ইক্ষু উৎপন্নও হয় পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব চিনির ব্যবসায়ে ভারতের স্থান সকল দেশের শীর্ষে থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি? আমাদিগকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে হয়। ভারতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট রকমের ইক্ষুর চাষ হয় এবং ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করার প্রণালী অত্যন্ত পুরাতন রকমের, তাই আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়।

ভারতবর্ষের চিনির ব্যবসায়ের এই দুরবস্থা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইক্ষুকে কিরূপে ভারতের মাটি ও জলহাওয়ার উপযোগী করা যায় তাহা স্থির করার জন্য কোইম্বাটুরে একটি ইক্ষু-গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই কেন্দ্র হইতে বার বৎসর যাবৎ বিদেশী ভাল জাতের ইক্ষু বিতরণ করা হইতেছে। এবারে চাষীরা দেশী ইক্ষুর পরিবর্ত্তে এই কোইম্বাটুরের ইক্ষু লাগাইয়া ১৪ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে। এই নূতন ইক্ষুর চাষ দেশে আরও বেশী বিস্তৃত হইলে লাভ আরও অনেক বাড়িয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালন যে একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(শিক্ষাসমাচার)

ভারতের বিদেশী বাজার

ভারতবর্ষ পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা দ্রব্য গ্রহণ করিতেছে, অর্থাৎ আমদানি করিতেছে। তেমনি আবার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভারত হইতে মাল গ্রহণ করিতেছে। ইহাকে বলি রপ্তানি।

আমদানি রপ্তানি পরস্পর সাপেক্ষ। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বেপারী তথা দেশ-হিতৈষীদের একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমদানি বন্ধ করিয়া দিয়া রপ্তানি বাড়ান ত দূরের কথা, অনেক সময় বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশে আমদানি রপ্তানির তত্ত্ব-কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। লোকের মনে এই একটা ধারণা রহিয়াছে যে—"রপ্তানিকে সর্ব্বপ্রকারে বাড়াইতে হইবে, তাতে পরের দেশের ধন আমাদের দেশে আসিবে ; আর আমদানিকে সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব করিতে হইবে, তা হইলে আমাদের দেশের ধন বাহিরে যাইতে পাইবে না, দেশের ধন দেশে থাকিয়া যাইবে"। এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণের জটিল প্রশ্নাবলীর মধ্যে না ঢুকিয়াও এই কথা এখনই বলা চলে যে, বেশী আমদানির অর্থ' বেশী রপ্তানি, আর বেশী রপ্তানির অর্থ বেশী আমদানি—অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায়।

বাঙ্গালীর ছেলের দরকার বছরের পর বছর ভারতের আমদানি রপ্তানির দফাগুলি লইয়া তন্ন তন্ন ভাবে অনুসন্ধান, অন্বেষণ ও তর্ক চালানো। তাতে অনেক সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

রপ্তানির পদাঙ্কানুসরণ

সম্প্রতি রপ্তানির কথাটা পাড়িতেছি। ভারত হইতে প্রতি বছর পণ্যদ্রব্য বিদেশে যায়। সোণারূপাও যায় বটে। কিন্তু শুধু পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার মোটামুটি হিসাব এইরূপ :—

১৯২২-২৩	...	২,৯৯,১৬,১৯,০০০৲
১৯২৩-২৪	...	৩,৪৮,৮৩,৬১,০০০৲
১৯২৪-২৫	...	৩,৮৪,৬৬,৫৩,০০০৲

১৯২৫-২৬ ... ৩,৭৪,৮৪,২১,০০০৲
১৯২৬-২৭ ... ৩,০১,৪৩,১৬,০০০৲

অর্থাৎ ১৯২৬-২৭ সনে আমরা প্রত্যেকে গড়ে ১০৲ টাকার মাল বিদেশের বাজারে বেচিতে সমর্থ হইয়াছি। আমরা কিন্তু বিদেশ হইতে পণ্য কিনিয়াছি মাত্র ৭৲ টাকার। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, কেনাবেচায় আমাদের প্রত্যেকের গড়ে ৩৲ টাকা হাতে রহিয়াছে। অবশ্য এটা শুধু পণ্যগত হিসাব।

বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়

৪২টা রপ্তানি দ্রব্যের নাম পাইতেছি। তন্মধ্যে সব চেয়ে বেশী যায় পাট (কাঁচা ও ম্যানুফ্যাকচার)। ১৯২৬—২৭ সনে গিয়াছে প্রায় ৮০ কোটি টাকার। আর চিনি গিয়াছে সব চেয়ে কম—মাত্র প্রায় ৭ লাখ টাকার।

এই সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখা দরকার :—

(১) ১৯২৬-২৭ সনের সব চেয়ে বড় রপ্তানি ৮০ কোটি টাকার, আর সব চেয়ে বড় আমদানি ৭০ কোটি টাকার। কিন্তু সব চেয়ে কম রপ্তানি ও আমদানি যথাক্রমে ৭ লাখ ও ২৫½ হাজার টাকার। অর্থাৎ রপ্তানি আমদানির মাথায় মাথায় যতটা মিল, লেজে লেজে ততটা অমিল।

(২) আমদানি রপ্তানির হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, যে দ্রব্য আমরা বাহির হইতে আমদানি করিতেছি তা নিজের ঘরে উৎপাদন করিতেছি না বা বিদেশে বেচিবার জন্য পাঠাইতেছি না এমন নয়। চিনি আমরা প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিয়া থাকি। ১৯২৬-২৭ সনে পরিমাণটা ১৯.১৭ কোটি টাকার। অথচ এই সময়েই আমরা আবার চিনি রপ্তানি করিয়াছি প্রায় ৭ লাখ টাকার। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আমরা কোন পণ্যকেই "আমদানি পণ্য" বা "রপ্তানি পণ্য" নামে অভিহিত করিতে পারি না। প্রতি পণ্যেরই আমদানি রপ্তানি একই কালে হইতে পারে।

১৯২৬-২৭ সনের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যকে নিম্নরূপ ভাবে সাজান যাইতে পারে :—

	পণ্যের নাম	মোট রপ্তানির %	রপ্তানির দাম কোটি টাকা
১।	কাঁচা পাট	৮.৮৮	২৬.৭৮
	পাট ম্যানুফ্যাক্চার	১৭.৬৪	৫৩.১৮
২।	কাঁচা ও নষ্ট তুলা	১৯.২৬	৫৯.১৪
	কটন ম্যানুফ্যাক্চার	৩.৫৭	১০.৭৫
৩।	খাদ্যশস্য	১৩.০২	৩৯.২৫
৪।	চা	৯.৬৩	২০.০৪
৫।	বীজ	৬.৩৩	১৯.০৯
৬।	চামড়া	২.৪৫	৭.৩৮
৭।	ধাতু ও ওর্	২.৩৯	৭.২১
৮।	কাঁচা হাইড্ ও স্কিন	২-৩৮	৭.১৮
৯।	লাক্ষা	১.৮২	৫,৪৭
১০।	পশম, কাঁচা ও ম্যানুফ্যাক্চার	১.৫৫	৪.৬৮
১১।	কাঁচা রবার	.৮৬	২,৬০
১২।	তেলের খইল	.৮৪	২.৫৩
১৩।	আফিং	.৭০	২.১২
১৪।	প্যারাফিন্ মোম	.৬১	১.৮৫
১৫।	কাঠ ইত্যাদি	.৫৪	১.৬২
১৬।	মসলা	.৫২	১,৫৫
১৭।	কফি	.৪৪	১.৩৩
১৮।	সার	.৪১	১.২৫
১৯।	ডাই ও ট্যান্ করিবার বস্তু	.৩৯	১.১৮
২০।	অভ্র	.৩৬	১.০৮
২১।	ছিচালি ইত্যাদি	.৩৫	১.০৬
২২।	তামাক	.৩৪	১.০৪
২৩।	দড়ি	.৩৩	১.০০
২৪।	তেল	.৩২	.৯৬
২৫।	ফল ও তরকারী	.৩০	.৯০
২৬।	কাঁচা শণ	.২৭	.৮০
২৭।	কয়লা ও কোক্	.২৭	.৮১
২৮।	মাছ	.২৫	.৭৫

২৯।	ক্রম্পটন ও গ্রিভস্‌ অয়েলম্যান ষ্টোর	.২০	.৬০
৩০।	জীবন্ত জন্তু	.১৩	.৩৮

বিদেশে ভারতের বাজার

আজ অবধি আমাদের আমদানি-রপ্তানির মোটা অংশটা ইংলণ্ডের সহিত হয়। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কটা ক্রমেই বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা।

বিদেশের বাজারে মাল ফেলা এবং বাজার দখল করাও বিদ্যা-বিশেষ। এই বিদ্যায় বাঙ্গালীর ছেলেকে অবিলম্বে পাকা হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মর্ম্মকথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমাদিগকে বহুদিকে বহু প্রকারে ঠকিতে হইয়াছে।

অথচ মজার কথাটা এই যে, যে পাট রপ্তানি পণ্যের ২৪°/。র উপর টাকা আদায় করে ও প্রধান জিনিষ, সেই পাট আমাদের ঘরের দুয়ারে জন্মায়। এই সম্পর্কে তুলার বেপারী বোম্বাইওয়ালাদের অবস্থা আমাদের অনুকরণীয়। বস্তুতঃ, পাটের কারবার যদি আমাদের মুঠার মধ্যে থাকিত বাঙ্গালা দেশ সব চেয়ে ধনী দেশ হইত।

পাট ও তুলার খবর

১৯২৬-২৭ সনে পাট ও তুলা রপ্তানির তুলনা করিয়া দেখিতেছি। পাটের বেলা কাঁচা পাটের চেয়ে পাট ম্যানুফ্যাক্‌চার বেশী গিয়াছে। আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচনা করিলেও এই সম্পর্ক বজায় আছে দেখা যাইবে। যথা:—

	পাট কাঁচা (কোটি টাকা)	পাট ম্যানুফ্যাক্‌চার (কোটি টাকা)
১৯২২-২৩	২২.৫৩	৪০.৪৯
১৯২৩-২৪	২০	৪২.২৮
১৯২৪-২৫	২৯.০৯	৫১.৭৭
১৯২৫-২৬	৩৭.৯৫	৫৮.৮৪

তুলার বেলা কিন্তু উল্টা। তুলার ম্যানুফ্যাক্‌চার কাঁচা তুলার চেয়ে সর্ব্বদাই অনেক কম রহিয়াছে। যেমন:—

	কাঁচা তুলা (কোটি টাকা)	তুলা ম্যানুফ্যাক্‌চার (কোটি টাকা)
১৯২২-২৩	৭২.০৭	১৩.০৬
১৯২৩-২৪	৯৯.৭২	১০.৯৬
১৯২৪-২৫	৯১.৯৬	১১.২৮
১৯২৫-২৬	৯৫.৯১	৯.৬৪

সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য

সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে যে—

১। বাঙ্গালা বোম্বাইয়ের চেয়ে অথবা পাট তুলার চেয়ে বেশী "ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজড্‌" হইয়াছে।

২। পাট ও তুলার মধ্যে প্রাধান্যলাভের জন্য একটা লড়াই অনবরত চলিতেছে। তার ফলে কখনো পাট কখনো বা তুলা প্রধান রপ্তানি-পণ্য রূপে পরিগণিত হইতেছে। ১৯২৪-২৫ সনে পাট গিয়াছিল ৮০.৮৫ কোটি টাকার (১৯২৬-২৭ সনের প্রায় সমান); কিন্তু তুলা গিয়াছিল ১০৩.২৪ কোটি টাকার (১৯২৬-২৭ সনের প্রায় দেড় গুণ)।

৩। পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্যই হোক্‌ বা দাম বৃদ্ধির জন্যই হোক্‌ পাট ম্যানুফ্যাক্‌চার বাবদ আমাদের লাভের অঙ্কটা ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটের বাবদ প্রাপ্ত মূল্যটা বাড়িতেছে না। অর্থাৎ কাঁচা পাটের বাজার অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাই চাষী টান-যোগানের হদিস্‌ পায়না ও তাল সাম্‌লাইতে পারেনা। কিন্তু পাট ম্যানুফ্যাক্‌চারের বাজার খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মাধীন। (এই বাজার প্রায় সবটাই ইয়োরোপীয় বেপারীদের তাঁবে রহিয়াছে। সুতরাং লাভটা তাদের পকেটেই যাইতেছে।) অন্যদিকে তুলার গোটা বাজারটাই উঠা-নামার অধীন। বাজারটা অত্যন্ত চপল বলিতে হইবে।

এই কথাটা বুঝিতে পারিলে বুঝা যাইবে পাট-চাষীদের হাহাকার কেন কখনও ঘুচে না। অন্যদিকে তুলার চাষীদের মুখে তুল্যরূপ আক্ষেপের বাণী না শুনিবার কারণও অনুসন্ধানযোগ্য।

৪। এই পাট ও তুলায় মিলিয়া ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধেকের বেশী রপ্তানি-মূল্য উঠাইয়া লইয়া আসে। পাট ও তুলা হইতে প্রাপ্ত টাকার হিসাব কয়েক বছরের জন্ম এইরূপ :—

	কোটি টাকা		কোটি টাকা
১৯২২-২৩	১৪৮	(মোট রপ্তানি	২৯৯)
১৯২৩-২৪	১৭৩	(„ „	=৩৪৯)
১৯২৪-২৫	১৮৪	(„ „	=৩৮৫)
১৯২৫-২৬	২০২	(„ „	=৩৭৫)
১৯২৬-২৭	১৫০	(„ „	=৩০১)

এই হিসাব হইতে বুঝা যাইবে ভারতের পাট ও তুলার বাণিজ্য কত গুরুতর ব্যাপার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে এই দুই বিষয় লইয়া পঠন-পাঠন সুরু করা দরকার।

৮০ কোটি টাকার পাট

১৯২৬-২৭ সনে পাট জন্মান হইয়াছে ৩৮,৪৬,০০০ একরে। আদায়টা ১০৯ লাখ বেল।

কাঁচা ও ম্যানুফ্যাক্চার পাটের মোট ওজন ১৫,৬৮,০০০ টন। আগের বছর ছিল ১৪,৫৮,০০০ টন। কিন্তু দামটা কমিয়াছে। গত বছর ছিল ৯৭ কোটি টাকা। এ বছর হইয়াছে ৮০ কোটি টাকা। পাট রপ্তানি করিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তার ৩৩% কাঁচা পাট বাবদ, আর ৬৭% পাট ম্যানুফ্যাক্চার বাবদ। গত বছর এই অঙ্কদ্বয় যথাক্রমে ৩৯% ও ৬১% ছিল।

পাট কোথায় যায় ?

কোন্ রকম পাট কি পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছে তার হিসাব এই :—

	১৯১৩-১৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
পাট (হাজার টন)	৭৬৮	৬৯৬	৬৪৭	৭০৮
ব্যাগ (কোটি)	৩৬·৯	৪২·৫	৪২·৫	৪৪·৯
কাপড় (কোটি গজ)	১০৬·১	১৪৫·৬	১৪৬·১	১৫০·৩

এ গেল রপ্তানির পরিমাণ। এখন প্রত্যেক দফার কতটা কোন্ দেশে গিয়াছে দেখা যাক্।

প্রথমতঃ কাঁচা পাট। কাঁচা পাটের প্রধান প্রধান খরিদ্দার—

১। জার্ম্মাণি
২। যুক্তরাজ্য
৩। ফ্রান্স
৪। যুক্তরাষ্ট্র
৫। ইতালি
৬। বেলজিয়াম
৭। স্পেন
৮। ব্রাজিল
৯। নেদারল্যাণ্ডস্
১০। জাপান

গত দুই বছরে এই সব দেশের হিস্যাটার উঠানামা বেশ চিত্তাকর্ষক। যুদ্ধের আগেকার গড়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখান যাইতেছে। হিসাবটা বেলের।

দেশের নাম	যুদ্ধের পূর্ব্বেকার গড়	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
যুক্তরাজ্য	১৬,৯১,০০০	৯,৭৭,০০০	৯,৬৮,০০০
বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ	৪,০০০	৩,০০০	৪,০০০
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১৬,৯৫,০০০	৯,৮০,০০০	৯,৭২,০০০
জার্ম্মাণি	৯,২০,০০০	৮,১০,০০০	১০,২৫,০০০
ফ্রান্স	৪,২৮,০০০	৪,৯৬,০০০	৫,০৪,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৫,৩৫,০০০	৩,৮৮,০০০	৪,৮৯,০০০
ইতালি	২,১৩,০০০	২,৭৫,০০০	২,৫৩,০০০
বেলজিয়াম্	...	১,৮৫,০০০	২,৪৮,০০০
স্পেন	১,২২,০০০	১,৬৭,০০০	১,৮৭,০০০
ব্রাজিল	১৫,০০০	৮৫,০০০	৬৪,০০০
নেদারল্যাণ্ডস্	—	৭২,০০০	৬১,০০০
জাপান	১৭,০০০	৬৪,০০০	৫১,০০০
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি	২,৫০,০০০	...	...
মোট বিদেশ	২৫,৮৬,০০০	২৬,৪৪,০০০	২৯,৯২,০০০
সর্ব্ব মোট	৪২,৮১,০০০	৩৬,৩৪,০০০	৩৯,৬৪,০০০

সাদা কথায়, ভারতের কাঁচা পাটের সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার বৃটেন বা বৃটিশ সাম্রাজ্য নয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা ইংরেজকে যত কাঁচা পাট যোগাইতাম, এখন তার চেয়ে ঢের কম যোগাই—মাত্র ৪ অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যে যাইতেছে।

কাঁচা পাটের বেপারীরা ইংরেজ রাজত্বের বাইরে আপনাদের বাজার ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। আগে জার্ম্মাণি ইংরেজের চেয়ে কম পাট লইত। কিন্তু আজ সে আমাদের পাটের বাজারে নং ১ খরিদ্দার। বৃটেন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে।

ইয়োরোপে কাঁচা পাট বিস্তর যাইতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণির সমান লওয়া ত দূরের কথা, সম্প্রতি এক ফ্রান্স ব্যতীত আধাও কেহ লয় না। জার্ম্মাণি ও ফ্রান্স একত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যে পাট যায় তার আধা লয়। এই দুই খরিদ্দার বিশ্বাসযোগ্যও বটে। অর্থাৎ ইহাদের টানটা হঠাৎ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম।

তারপর বিশ্বাসযোগ্য খরিদ্দার হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র। বহরের দিকে চাহিলে ক্ষুদ্র বেলজিয়ামকে নগণ্য বিবেচনা করিতে পারি না। ভবিষ্যতে সে আরও বেশী কিনিতে পারে। ইতালি ও স্পেন এই দুই দেশের সঙ্গে আরও বেশী লেনদেন চালাইবার অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়।

কাঁচা পাটের ঘরের খবর

কাঁচা পাট রপ্তানির সম্পর্কে ঘরের খবরটা লওয়া যাইতে পারে। পাটের বছরটা জুলাই হইতে জুন অবধি ধরা হয়। পাট কতটা উৎপাদিত হইয়াছে (ক), কতটা মিলে খরচ হইয়াছে (খ), আর কতটা রপ্তানি গিয়াছে (গ), তা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

সন	ক (লাখ বেল)	খ (লাখ বেল)	গ (লাখ বেল)
১৯১২-১৩	৯৮	৪৬	৪০
১৯১৩-১৪	৮৯	৪৫	৪৩
১৯১৪-১৫	১০৪	৪৯	৩০
১৯১৫-১৬	৭৩	৫৮	৩২
১৯১৬-১৭	৮৩	৫৭	২৮
১৯১৭-১৮	৮৯	৫৪	১৮
১৯১৮-১৯	৭০	৫১	২২
১৯১৯-২০	৮৩	৫২	৩৪
১৯২০-২১	৫৯	৫৬	২৩
১৯২১-২২	৪০	৪৪	৩০
১৯২২-২৩	৫৪	৪৭	২৯
১৯২৩-২৪	৮৪	৫১	৩৮
১৯২৪-২৫	৮১	৫৭	৩৯
১৯২৫-২৬	৮৯	৫৪	৩৬
১৯২৬-২৭	১০৮	৫৫	৪৫

বুঝা যাইতেছে খ ও গ যোগ দিলেই ক পাওয়া যায় না। আগের বছরের উদ্বৃত্ত কাঁচা পাট থাকায় হিসাবে গরমিল ঘটে। রপ্তানির পরিমাণে সব চেয়ে বেশী ও ঘরের খাদনে সব চেয়ে কম ইতরবিশেষ ঘটিয়াছে।

পাট ম্যানুফ্যাক্‌চার

পাট ম্যানুফ্যাক্‌চারের অর্থ :—

১। পাটের গানি ব্যাগ্
　(ক) হেসিয়ান্ ব্যাগ্
　(খ) স্যাকিং ব্যাগ
২। পাটের গানি কাপড়
　(ক) হেসিয়ান কাপড়
　(খ) স্যাকিং কাপড়
৩। পাটের ব্যাগ
৪। পাটের কাপড়।

হেসিয়ান্ ব্যাগ গিয়াছে—

দেশের নাম	১৯১৬-১৯ গড় লাখ বেল	১৯২৫-২৬ লাখ বেল	১৯২৬-২৭ লাখ বেল
যুক্তরাজ্য	২৫,২৩	১,৯৫	১,৮৫
অষ্ট্রেলিয়া	৭৭	১,০৪	১,০৫
যুক্তরাষ্ট্র	৩,২৩	২,৫০	২,৫৬
আর্জেন্টিনা রিপাবলিক	৮৪	...	১৮
অন্যান্য দেশ	১১,২০	২,২০	৩,৩৭
মোট	৪১,২৭	৭,৬৯	৮,৯১

স্যাকিং ব্যাগ গিয়াছে—

দেশের নাম	১৯১৬-১৯ গড়	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
	লাখ বেল	লাখ বেল	লাখ বেল
যুক্তরাজ্য	১,০২	২,৪০	২,০৩
অষ্ট্রেলিয়া	৬,৩৩	৫,৯৪	৭,৫৩
জাপান	১,৩৪	১,৬৬	২,৪৩
ইন্দো-চীন	১,৮৬	৯৩	১,০৩
জাভা	২,১৩	৩,১৯	২,৭০
যুক্তরাষ্ট্র	৯২	১৪	৫২
চিলি	৪,৬৭	৪,৩০	২,৭৮
পেরু	৫১	৪৭	৫৫
কিউবা	২,১০	৪,০৭	২,৮৯
অন্যান্য দেশ	৯,৪১	১১,৭২	১৩,৭৪
মোট	৩০,২৯	৩৪,৮২	৩৬০০

হেসিয়ান্ কাপড় গিয়াছে—

	(লাখ গজ)		
যুক্তরাজ্য	১২,৮৭	৫,৪৭	৪,৮৪
কানাডা	৫,৬১	৬,১৭	৫,৯৬
অষ্ট্রেলিয়া	১,৭৭	২,০২	১,৯১
যুক্তরাষ্ট্র	৭৯,৫৭	৯৮,৭০	৯১,৫০
আর্জ্জেন্টিনা	১১,৩৪	২১,১৮	৩১,১০
উরুগুয়ে	৪২	১,২২	১,৫৫
অন্যান্য দেশ	৯২,০৯	৫,২৪	৫,৩০
মোট	১১৪,৬০	১৪০,০০০	১৪২,২৫

স্যাকিং কাপড় গিয়াছে—

	(লাখ গজ)		
যুক্তরাজ্য	১,০৩	৫৬	২০
অষ্ট্রেলিয়া	৭৪	১,০১	৭৪
যুক্তরাষ্ট্র	২৯	৩,০৯	৫,৯৬
আর্জ্জেন্টিনা	৪২	৮৬	৭২
অন্যান্য দেশ	৫৫	৬২	৪৪
মোট	৩,০৩	৬,১৪	৮,০৬

এক হেসিয়ান্ ব্যাগ্ যুদ্ধের আগেকার গড়ের অনেক নীচে রহিয়াছে। স্যাকিং ব্যাগ অল্প বাড়িয়াছে। কিন্তু হেসিয়ান্ কাপড় ১$\frac{১}{৩}$ গুণ ও স্যাকিং কাপড় প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়াছে।

পাটের গানির ব্যাপারেও যুক্তরাজ্য পশ্চাতে পড়িয়া আছে বা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের প্রধান খরিদ্দার হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ার হিস্তাটা প্রণিধানযোগ্য। স্যাকিং ব্যাগে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম, তাছাড়া হেসিয়ান্ ব্যাগের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের নীচেই তার স্থান।

যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এখন আমাদের প্রধান খরিদ্দার, হেসিয়ান ব্যাগ্ নিয়াছে সব চেয়ে বেশী। হেসিয়ান্ কাপড় এবং স্যাকিং কাপড়ও সব চেয়ে বেশী নিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র হেসিয়ান কাপড় নিয়াছে $\frac{২}{৩}$ অংশ, স্যাকিং কাপড় $\frac{২}{৪}$ অংশ। আর্জ্জেন্টিনা যুক্তরাষ্ট্রের $\frac{১}{৩}$ অংশ হেসিয়ান কাপড় লওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয়। তৃতীয় যুক্তরাজ্য আর্জ্জেন্টিনার $\frac{১}{২}$ অংশ লইয়াছে।

অন্যান্য দেশের হিস্তাও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। অর্থাৎ বাঙ্গালার পাট গানি দুনিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।

পাটের ব্যাগ গিয়াছে—

দেশের নাম	১৯১৬-১৯ গড়	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
	লাখ বেল	লাখ বেল	লাখ বেল
	(সংখ্যা—কোটিতে)		
যুক্তরাজ্য	৩·০৫	৪·৩৬	৩·৮৮
ইয়োরোপ (যুক্তরাজ্য বাদে)	২·০৬	১·২৮	১·৯৪
ইজিপ্ট	১·১৯	১·১৫	১·৪৪
দক্ষিণ আফ্রিকা (রোডেশিয়া সুদ্ধ)	১·১৯	১·৮৮	১·৬৩
পূর্ব্ব আফ্রিকা (মরিসাস্ সুদ্ধ)	·৯৯	১·৫৮	১·৯৩
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড	৬·২৮	৭·৯৭	৯·৬৬
জাভা	১·৩০	৩·১৯	২·৭০
জাপান	·৩৫	১·৬৮	২·৪৯

দেশের নাম	১৯১৬-১৯ গড় লাখ বেল	১৯২৫-২৬ লাখ বেল	১৯২৬-২৭ লাখ বেল
সুদূর প্রাচী (জাভা ও জাপান বাদে)	৩'৯৩	৫'১৭	৬'৯৩
দক্ষিণ আমেরিকা	৪'৩১	৫'২৮	৩'৭২
মধ্য আমেরিকা	১'৩০	৫'০৭	৩'৯০
অন্যান্য দেশ	৭'৯৬	৩'৯০	৪'৭০
মোট	৩৩'৯১	৪২'৫১	৪৪'৯১

পাটের কাপড় গিয়াছে—

	(কোটি গজ)		
যুক্তরাজ্য	৪.২৩	৬.০৩	৫.০৪
কানাডা	৩.৩৩	৬.১৯	৫.৯৬
অষ্ট্রেলিয়া	২.০৯	৩.০৩	২.৬৫
যুক্তরাষ্ট্র	৬৬.৩৯	১০১.৮০	৯৭.৫৪
আর্জ্জেন্টিনা	১৭.২৭	২২.০৪	৩১.৮২
অন্যান্য দেশ	৩.৬৯	৮.০৫	৭.৩০
মোট	৯৭.০০	১৪৬.১৪	১৫০.৩১

পাটের কাপড়ের বড় বাজারটা স্থির হইয়া আছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৳ অংশ আর আর্জ্জেন্টিনা ½ অংশ। বস্তুতঃ, আমেরিকায় পাটের কাপড়ের প্রায় ৮৫% অংশ যায়। বাকীটা অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

পাটের ব্যাগ কিন্তু যায় না এমন দেশ খুব কম আছে। পাটের ব্যাগের বিশেষত্ব এই যে, অষ্ট্রেলিয়া, জাভা, জাপান আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ) ইত্যাদি দেশই আমাদের প্রধান খরিদ্দার।

বাঙ্গালার পাটের কথাটা বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। পাট বেচিয়া আমরা বহু স্থান হইতে টাকা কুড়াইতেছি। টাকাটা অবশ্য কাগজে কলমে কুড়াইতেছি, কারণ পাটের কলের মনিবরা বিদেশী। তথাপি হাজার হাজার মজুর এই সব কলে কাজ করিয়া আপনাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে।

পাটের আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহা দুনিয়ার একমাত্র বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি—অবশ্য আজ পর্য্যন্ত।



দুনিয়ার ধনদৌলত

জমীদারের উপর মুসোলিনির জুলুম

যে-সকল ভূম্যধিকারীরা জমি চাষ না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, তাহাদের উপর সিনর মুসোলিনী আদেশ দিয়াছেন যে, তাহারা যদি নিজেদের জমি ফেলিয়া রাখে তাহা হইলে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, ইটালীতে কোন জমি শুধু শুধু ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। সম্প্রতি এ সম্পর্কে ফ্লোরেন্সের একজন জমীদারের বিচার চলিতেছে এবং এই প্রকার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য একটী বিশেষ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে।

ইয়োরোপীয় ব্যবসার দিক্‌নির্ণয়

ব্যবসার রূপ ও তত্ত্বাবধান এক বিশেষ বস্তু। এই বস্তু লইয়া অর্থশাস্ত্রে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা চলিতে পারে।

বর্ত্তমান ইয়োরোপে ব্যবসার এক বিশেষ রূপ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একে এক কথায় বলা চলে "কার্টেল" বা "সঙ্ঘ"-করণ। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান যুগ সঙ্ঘবদ্ধতার যুগ।

প্রতিযোগিতা বনাম সহযোগিতা

এক কালে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিযোগিতা অর্থশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার কুফলগুলি যখন দৃষ্টিগোচর হইল, তখন লোকের মনে প্রতিক্রিয়া সুরু হইল, সহযোগিতাকে পরম মঙ্গলের আকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ব্যবসা-জগতে সহযোগিতার বিবর্ত্তনটা প্রণিধানযোগ্য। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি মিলিতে পারে, দলের সঙ্গে দল মিলিতে পারে, অথবা জাতির সহিত জাতি মিলিতে পারে। সমগ্র বিশ্ব মিলিত হইতে পারে। কিন্তু মিলনের উদ্দেশ্যটা কি? একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, দলের সঙ্গে যখন দলের প্রতিযোগিতা চলিতেছে তখন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বকে কোনমতেই বাঁচাইয়া রাখিতে দেওয়া যায় না। তেমনি জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালে দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করিতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসার ক্ষেত্রটাও ব্যক্তি-বিশেষের প্রচেষ্টা হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিপুলায়তন আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে পৌঁছাইয়াছে।

কার্য্যকলাপ যেমন বাণিজ্য-নীতিতে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, নব নব বাণিজ্য-নীতিও তেমনি কার্য্যকলাপের নূতন পথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

বর্ত্তমান ইয়োরোপের সঙ্কটে আমেরিকা

বর্ত্তমান ইউরোপের বাণিজ্য-দুনিয়ায় ভাঁটা দেখা দিয়াছে। সেটা আকস্মিক হইতে পারে। কিন্তু সেটাকে আকস্মিক মনে করিয়া ইয়োরোপীয় জাতিগুলি চুপ করিয়া থাকিতে রাজী নয়। আমেরিকা দুনিয়ার বাজারগুলি বিশেষ করিয়া দখল করিতে চলিতেছে। এইজন্যই ইয়োরোপীয় দেশগুলি বিশেষ বিশেষ পণ্যের উৎপাদকরূপে ক্রমাগত সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে।

আমেরিকা ইয়োরোপের এই নূতন চাল যে বেশ করিয়া বুঝিয়াছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, ইয়োরোপের সঙ্ঘগুলির দিকে তার খর দৃষ্টি রহিয়াছে। বস্তুতঃ, আমেরিকার

সরকারী বাণিজ্যবিভাগ হইতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য-তালিকা সর্ব্বদাই বাহির হইতেছে।

ওয়াশিংটন হইতে ১৮ই ডিসেম্বর, (১৯২৭) এক খবর প্রকাশিত হইয়াছে। তাতে জানা যায়, ইয়োরোপে গত দুই বছরে ১৩টা বড় বড় কার্টেল মোতায়েন হইয়াছে। শীঘ্রই আরও ৬টা খাড়া করা হইবে। তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে প্রস্তাবিত রাসায়নিক দ্রব্যসঙ্ঘ একটি।

এ সম্পর্কে দুইটা কথা মনে রাখিতে হইবে।

(১) ইয়োরোপে এ ছাড়া আরও অনেক কার্টেল বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকগুলিকে এখন পর্য্যন্ত গণিয়া গাঁথিয়া তোলাও সম্ভব হয় নাই।

(২) দুনিয়ার রপ্তানি বাজারে আমেরিকা জোরসে আপনার স্থান করিয়া লইবার পর হইতেই ইয়োরোপের এই প্রবণতাটা প্রবল হইয়াছে।

ইয়োরোপের ১৩টা বড় বড় কার্টেল

আমেরিকার বাণিজ্য বিভাগ নিম্নলিখিত ১৩টা কার্টেলের হিসাব দিতেছে।

পণ্যদ্রব্যের নাম	কোন্ কোন্ দেশ যোগ দিয়াছে ?	কবে আরম্ভ ?
১। কাঁচা ইস্পাত	ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম্, চেকো-শ্লোভাকিয়া, লুক্সেম্বুর্গ, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারি	সেপ্টেম্বর, ১৯২৬
২। রেল	গ্রেট্‌বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম্, লুক্সেমবুর্গ	জুন, ১৯২৬
৩। টিউব্	জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম্, লুক্সেমবুর্গ, গ্রেটবৃটেন, অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড	জুন, ১৯২৬
৪। অ্যালুমিনিয়াম্	ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, গ্রেটবৃটেন, সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড, নরওয়ে (আংশিক), অষ্ট্রিয়া (আংশিক)	আগষ্ট, ১৯২৬
৫। এনামেল বাসন	জার্ম্মাণি, পোল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি	১৯২৬
৬। আঠা	ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ	জুলাই, ১৯২৬
৭। কৃত্রিম রেশম	গ্রেটবৃটেন, জার্ম্মাণি, ইতালি (যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র-শাসিত কলকারখানা লইয়া)	জানুয়ারি ১৯২৭
৮। তামা	যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, বেলজিয়াম্, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রেট বৃটেন	অক্টোবর, ১৯২৬
৯। বৈদ্যুতিক্ বাল্‌ব্	জার্ম্মাণি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স, ইতালি স্ক্যাণ্ডিনাভিয়া, গ্রেট বৃটেন, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারি	১৯২৪
১০। প্লেট্ গ্লাস্	ফ্রান্স, বেলজিয়াম্	১৯০৪
১১। কাচের বোতল	জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, স্ক্যাণ্ডিনাভিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি, হল্যাণ্ড	১৯০৭
১২। বোরাক্স	গ্রেট বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া	১৮৯৯
১৩। কাঁটা (তার)	জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম্, চেকো-শ্লোভাকিয়া, নেদারল্যাণ্ডস	ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭

মাসতুত ভাইদের খবর

কার্টেলের মাসতুত ভাইও আছে। অর্থাৎ উৎপাদকদের পরস্পরের ভিতর এমন কতকগুলি "মিলন" আছে, যেগুলিকে ঠিক সঙ্ঘ বলা চলে না। ইয়োরামেরিকায় এইরূপ বহু মিলন মোতায়েন রহিয়াছে ও পণ্য-বিশেষের

উৎপাদনকে আপনাদের তাঁবে রাখিয়াছে। এইরূপ কয়েকটা মিলনের নাম—

১। সুইডিস্-আমেরিকান্ দিয়াশলাই ট্রাষ্ট্। এর ফ্যাক্টরিগুলি গোটা দুনিয়ায় ছড়ান রহিয়াছে। কতকগুলি দেশে দিয়াশলাইয়ের ব্যবসা সরকারের একচেটিয়া রহিয়াছে।

৩। ফরাসী জার্ম্মাণ পটাশ্ মিলন।

২। এক্সপ্লোসিহ্ব্স্ বা আগেয়াস্ত্র মিলন (জার্ম্মাণি ও গ্রেট বৃটেন)।

ভবিষ্যতের জঠরে

কিন্তু কার্টেল বা কম্বিনেশন গঠন শেষ হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। দুনিয়ায় এখনও গণ্ডা গণ্ডা দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। কতকগুলি দুনিয়ার প্রায় তামাম দেশও জুড়িবে বটে।

কতকগুলি প্রস্তাবিত কার্টেল কম্বিনেশনের নাম এই :—

১। দস্তা-বিক্রয়ের মিলন। এটা তামা রপ্তানি মিলনের অনুরূপ হইবে।

২। কাষ্ট আয়রণ পাইপ কার্টেল। এটা আধা সমাপ্ত ইস্পাত ইত্যাদি বেচিবার সঙ্ঘ হইবে।

৩। জার্ম্মাণ-বৃটিশ ফরাসী রাসায়নিক মিলন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপে কার্টেল ইত্যাদি ছিল কি? যদি ছিল, তাদের স্বরূপ কি? বর্ত্তমান ও অতীত প্রবণতার ভিতর পার্থক্যটা কি? এই হইল ১নং প্রশ্ন।

২ নং প্রশ্ন। এই সব সঙ্ঘ-করণের ফলে আমেরিকার অবস্থাটা কেমন দাঁড়াইতেছে?

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপে সঙ্ঘের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। কার্টেল কথাটাই জার্ম্মাণদের মগজে তৈয়ারী হইয়াছে। আর কার্টেলের এই আন্তর্জ্জাতিকতা যুদ্ধের পরের বস্তু নয়, আগের বস্তু।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেকার সঙ্ঘ ইত্যাদির জন্ম সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে হইয়াছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই সেগুলি জীবিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বহু সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবার ভিতরকার কথা রাজনৈতিক। যে যে দেশের মধ্যে মিলন বা সমঝোতা কায়েম হইতেছে, তাদের পরস্পরের ভিতর সদ্ভাব ও মৈত্রী বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বাড়ে। দুনিয়ার শান্তি-রক্ষার পক্ষে সেটা আশার কথা।

৩। যদি হয় তবে ভয়টা কিসের? আমেরিকার ভয়ের কারণ আছে বলিয়া মনে হয়।

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইয়োরোপের দেশগুলি একত্র জোট বাঁধিলে, আমেরিকার ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্য-জগতে ইয়োরোপ জোট বাঁধিয়া আমেরিকার বহির্ব্বাণিজ্যকে কানা করিয়া দিতে পারে। সেটা বড় গুরুতর কথা। আমেরিকা অবশ্য পাল্টা গাহিতে পারে। অর্থাৎ ইয়োরোপের কোন কোন দেশের সহিত যুক্ত হইয়া সঙ্ঘের সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন, গুজব রটিয়াছিল যে, বৃটিশদের সহযোগে আমেরিকা এক রেল সৃষ্টি করিতে যাইতেছে।

কিন্তু অবস্থাটা তেমন সঙ্কটজনক নহে। উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, এই সব স্বার্থ আমেরিকার স্বার্থের প্রতিকূল নহে। বিশেষতঃ কতকগুলিতে আমেরিকা স্বয়ং যোগ দিয়াছে। যেমন,—

১। তামা।

২। বৈদ্যুতিক বাল্ব।

৩। বোরাক্স।

রিজ্যান বা জেলা সংবাদ বিভাগের কর্ত্তা লুইস্ ডোমেরাটৎস্কি বলিতেছেন :—

"যুদ্ধের পরবর্ত্তী মিলনগুলি কোন কোন দিকে অনেক বেশী গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সব ফল পাওয়া গিয়াছে, সে জন্য একথা বলিতেছি না। বলিতেছি এই জন্য যে, তারা এক নূতন আব্হাওয়ার মধ্যে বাড়িতেছে। আর্থিক কার্য্যকারণ যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

জার্ম্মাণি পুরোভাগে

"জার্ম্মাণি নব নব কার্টেলের প্রবর্ত্তন করিতেছে ও প্রবর্ত্তন করিবার জন্য দেশ-বিদেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। জার্ম্মাণির মত আর্থিক উন্নতিতে অগ্রসর জাতির পক্ষে ইহা ঠিক হইয়াছে বটে। এর ব্যবসা জোটের দিকে চির জাগ্রত দৃষ্টি রহিয়াছে।

"জার্ম্মাণিতে কার্টেলের সংখ্যা ৩,০০০ ছিল ১৯২৫ সনে। তন্মধ্যে ২৫০০ ব্যবসা সম্পর্কীয়, আর বাকীটা পাইকারী ও খুচরা বেচাকেনার জন্য সৃষ্ট।"

ফরাসী জার্ম্মাণ রং সঙ্ঘ

সুইডিস্ দিয়াশলাই সঙ্ঘ একটা বিপুলায়তন পদার্থ। ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালী আছে। সেই প্রণালী রাসায়নিক ব্যবসায় প্রয়োগ করিতে যাইতেছে প্রথম ফরাসী জার্ম্মাণ ডাই সিণ্ডিকেট। কর্ত্তাব্যক্তিরা হইতেছেন ফার্ব্বেন ইনডুষ্ট্রীর কার্ল বোশ ও ফরাসী আদার রঙের ৭৫°/০ এর অধিপতি কুহলমানের সভাপতি আগাথে কুহলমান্।

সিণ্ডিকেট গঠনের মতলবটা নাকি আমেরিকার বিরুদ্ধে রঙের যুদ্ধ করিবার জন্য নয়।

দেশের বাজারে মাল বিকাও

এই মিলনের উদ্দেশ্যটা তবে কি? আগাথে কুহলমান বলিতেছেন, "দুনিয়ার সমুদয় রঙ-উৎপাদক জোট বাঁধিয়া একটা সমঝৌতা করুক, আমরা চাই। আমাদের নীতিটা হইতেছে যে, প্রত্যেকে তার নিজ দেশের বাজারে রঙ বেচিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। আমরা স্থির করিয়াছি যে, আমেরিকার বাজারে ভীড় করিবনা—আমাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টাটা আমেরিকান্ উৎপাদকের প্রতি চ্যালেঞ্জ ত নয়ই বরং আমাদের সঙ্গে যোগ দিবার নিমন্ত্রণ-বিশেষ। আশা করি আমেরিকা ভবিষ্যতে আমাদের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে।

"ব্যবসায়ীদের একথা অজ্ঞাত নয় যে, এই সঙ্ঘ-গঠনের পূর্ব্বে রঙের ব্যবসায় অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ ছিলনা। উৎপন্নের বাজারটা স্থিতিস্থাপক নয় অর্থাৎ ইচ্ছামত কমান যায় না। অথচ ১০০০—২০০০ রং উৎপাদন করিতে পুঁজিপাটা খাটাইতে হয় অনেকখানি। আগে কোম্পানীগুলিকে রঙের খুচরা দরের ৫৩°/০ খরচ করিতে হইতেছিল মাল বাজারে ফেলিবার জন্য। আর এখন একযোগে বেচার ব্যবস্থা হওয়াতে ঐ খরচ কমিয়া ১৫°/০ হইয়াছে। এই সুবিধাটা প্রত্যেকেই ভোগ করিতেছে।

"রঙের ক্ষেত্রে সমঝৌতার ফলে অন্যান্য রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানেও উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইবে। বিশেষ করিয়া ফার্টিলাইজার বা সার ব্যবসায়ে পুঁজিপাটা আরও লাভজনক রূপে খরচ করা চলিবে।"

এক দরে বেচা

শেষ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কার্ল বোশ্ বলিয়াছেন, "কার্বেনের নীতি হইতেছে, যাতে রাসায়নিক উৎপাদকেরা (আমেরিকা অবশ্য বাদ নয়) বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া বাজার-দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় ও পেটেণ্ট অদল-বদল ও আর্থিক প্রচেষ্টায় একত্র হইতে সম্মত হয় তাই দেখা। রাসায়নিক কল-কারখানা বড় বেশী তৈয়ারী হইতেছে; তাতে অনর্থক অনেক পুঁজিপাটা নষ্ট হইতেছে অথবা বাজার অত্যধিক মালে ছাইয়া যাইতেছে। এই সবের প্রতিষেধক হইতেছে সমঝৌতা।"

সঙ্ঘের চৌহদ্দি

ফরাসী জার্ম্মাণ রং সঙ্ঘের ফলে ফরাসী বা জার্ম্মাণের নিজ দেশের বাজার হাত-ছাড়া হইবেনা, নিজেদের তাঁবেই থাকিবে। ফরাসী ঔপনিবেশিকবাজার ফরাসীরই থাকিবে, মাত্র জার্ম্মাণরা তার ৮% গ্রহণ করিবে (এইটুকু তাদের নিজেদের তৈয়ারী নয়)। দুনিয়ার রপ্তানি বাজারের জার্ম্মাণি লয় ৭৫%, ফরাসী ১৩% আর বৃটিশরা (যোগ যদি দিত) ১২%। বৃটিশরা বাহিরে আছে, সুতরাং জার্ম্মাণ ও ফরাসী তাদের অংশটা হারাহারি ভাবে ভাগ করিয়া লইবে।

জার্ম্মাণরা সুদূর প্রাচীতে ফরাসীদের এজেণ্ট স্বরূপ

হইবে ও নিজেদের রঙের সঙ্গে ফরাসীদের রং বেচিবে। স্পেন ও অন্যান্য দেশে আবার ফরাসীরা জার্ম্মাণ প্রতিনিধি হইবে। "কোটা" বা পরিমাণটা স্লাইডিং স্কেল অনুযায়ী। দলের কেহ যদি তার অংশটা পুরা না লয় তবে সে অন্য রাসায়নিক দ্রব্য বেচিয়া তার কোটা পূরণ করিয়া দিতে পারে।

সমঝোতাটা সম্প্রতি শুধু বাজারে মাল ফেলার সম্পর্কেই; কিন্তু জার্ম্মাণরা স্তূতকগুলি রং তৈয়ারী করিতেছে; সেই জন্য ফরাসীরা বাজারের উপযোগী নানা প্রকার রং প্রস্তুত না করিবার জন্য সম্মত হইয়াছে।

একটা স্থায়ী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। তার তিন জন জার্ম্মাণ, ২ জন ফরাসী। একমত ছাড়া কাজ হইবেনা। আশা করা যায় যে, বাজারে ফেলিবার খরচ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ৪০% কমিয়া যাইবে। পরে ৭৫% কমিবে।

বৈদ্যুতিক কোম্পানীর পেন্‌শনে মগজ-চালনা

জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী বিদ্যুতের একটা বড় কারবার। বৃদ্ধাবস্থায় কর্ম্মচারীদিগকে পেনশন দিবার ব্যবস্থা এই কোম্পানীতে আগে থেকেই ছিল। ১৯১২ সনে তা প্রবর্ত্তিত হয়। সম্প্রতি এই কোম্পানীর সভাপতি জেরার্ড স্বোপ আরও এক নূতন পেনশন প্রথার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তদনুসারে প্রতি কর্ম্মচারী তার মজুরির খুব ছোট একটা অংশ বছর বছর একটা পেন্‌শন ফাণ্ডে জমা রাখিবে। এই টাকাটা পরে বৃদ্ধবয়সের পেন্‌শনের সঙ্গে জমা হইবে।

৫০ লক্ষ ডলার ট্রাষ্ট

শুধু তাই নয়। কোম্পানী একটা পেন্‌শন ট্রাষ্টেরও সৃষ্টি করিবে। কর্ম্মচারীদের অবসর লইবার সময় আসিলে তাদের পেন্‌শন মিটাইয়া দিবার টাকা হাতে থাকা দরকার। সেই জন্য বরাবর কোম্পানীর ব্যালান্স শীটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের এক রিজার্ভ রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি তা না করিয়া কোম্পানী নূতন ট্রাষ্টের ট্রাষ্টিদের হাতে ৫০ লক্ষ ডলার রাখিয়া দিয়াছে।

এখনকার নিয়ম এই যে, গোটা বছর ধরিয়া কাজ করিলে পেন্‌শনের পরিমাণ হয় কর্ম্মচারীর উপার্জ্জনের ১½%। নূতন ব্যবস্থাটা ১৯২৯ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে কার্য্যকরী হইবে। তদনুসারে কর্ম্মচারীদের বার্ষিক আয়ের ১½% ট্রাষ্টিদের হাতে রাখা হইবে। ট্রাষ্টির সংখ্যা ৭। তন্মধ্যে কর্ম্মচারীদের প্রেরিত প্রতিনিধিরও স্থান আছে। এই টাকাটা সুদে খাটান হইবে এবং প্রত্যেক কর্ম্মচারীর ভিন্ন ভিন্ন নামে জমা থাকিবে। সুদটা জমিতে দেওয়া হইবে।

৬৫ বছরে অবসর গ্রহণ

আগে অবসর গ্রহণের বয়স ছিল ৭০ বছর, এখন হইবে ৬৫। মেয়েদের অবসর গ্রহণের বয়স আগের মত থাকিবে ৬০ বছর।

কোন কর্ম্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স হইলে ফাণ্ডের কর্ত্তারা সঞ্চিত অর্থটা পুরা দিয়া দিবে অথবা কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে থাকিবে। যদি কোন লোক কাজ ছাড়িয়া যায় অথবা অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে মরিয়া যায় তবে তাকে অথবা তার উত্তরাধিকারীকে সুদসুদ্ধ সঞ্চিত অর্থটা দেওয়া হইবে।

১২৫০ কোটি মার্কের জার্ম্মাণ ঋণ

কৃষিকে বাঁচাইবার জন্য জার্ম্মাণির আরও ঋণ চাই। এক্ষণে কৃষিগত ঋণের পরিমাণ ১২৫০ কোটি মার্ক বা ৩১২½ কোটি ডলার। এটা যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ঋণের ⅞ অংশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুদের কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বছরে সুদ দিতে হইতেছে ৮৫ কোটি মার্ক বা সওয়া একুশ কোটি ডলার। ফসল আদায়ের তুলনায় ইহা গুরুতর বটে। চাষীরা বলিতেছে যে, বিগত দুই বছর যাবৎ জার্ম্মাণ কৃষির ৪৭% ক্ষতি দিয়া কাজ চালাইয়াছে।

৫ কোটি ডলার ঋণের দরকার

জার্ম্মাণি ঋণ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছে। দরকার ৫ কোটি ডলার। প্রথম কিস্তি আগামী বছরের গোড়ার দিকেই বাহির হইবে। ঋণটা পাকিবে ২০ হইতে ২৫

বছরের মধ্যে আয় খাটান হইবে "জমির উদ্ধারে"র জন্য। রেণ্টেন ব্যাঙ্ক ক্রেডিটান্‌ষ্টাণ্ট ও জে হেনরি শ্রোডের ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ইহাতে স্বার্থ আছে।

সুদ যোগাইবে কে ?

৫ বছর অবধি. সুদের কতকটা অংশ যোগাইবে রাইখ বছরে ৬০ লক্ষ মার্ক। তারপর উদ্ধৃত জমি হইতেই দায় মিটান হইবে।

২৫ কোটি মার্কের বসত ঋণ

২৫ কোটি মার্ক বা সওয়া ছয় কোটি ডলারের আরও একটা ঋণ জার্ম্মাণি গ্রহণ করিবে। উদ্দেশ্য জমিতে জমিতে বসতি স্থাপন করিয়া দেওয়া, বিশেষতঃ ছোট ছোট জোতের বিলি-বন্দোবস্ত করা। প্রথম কিস্তিতে ১$\frac{১}{২}$ কোটি ডলার আগামী বছরের গোড়ার দিকেই চাওয়া হইবে। রাইখ্ জমি বন্দোবস্তের জন্য গত দুই বৎসরে ৫ কোটি মার্ক বছরে খরচ করিয়াছে। আর আগামী ৫ বছরের প্রত্যেক বছর ২৫ কোটি মার্ক খরচ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে।

৭ কোটি মার্কের তৃতীয় ঋণ

পোল্যাণ্ডের কতক অংশ আগে জার্ম্মাণির শাসনাধীন ছিল। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণিকে সেই অংশ ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে। পোল্যাণ্ড হইতে জার্ম্মাণ চাষীরা দলে দলে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। এদের ব্যবস্থা কি হইবে ? জমিজমা লইয়া এদেরকে বসাইয়া দিবার জন্য ৭ কোটি মার্কের অথবা পোনে দুই কোটি ডলারের এক ঋণ করা হইবে। এই ঋণটা সম্ভবতঃ রেণ্টেন ব্যাঙ্ক স্বয়ং গ্রহণ করিবে।

২ কোটি মার্কের ঋণ দুধের ব্যবসায়ে

দুধের ব্যবসায়ে ও গোপালনে আধুনিক প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ২ কোটি মার্কের বা $\frac{১}{২}$ কোটি ডলারের এক ঋণ গ্রহণ করা হইবে। ফল হইবে ডেয়ারী উৎপন্ন আমদানি ১২$\frac{১}{২}$ কোটি ডলার কম হইবে। সুদটা প্রথম ৫ বছর সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবে।

এই ঋণগুলি ছোটখাট জিনিষ নয়। এগুলির অর্থও পরিষ্কার। ঋণগুলির বার্ত্তা আগেই প্রকাশিত হইতেছে ও ব্যবসায়ী মহলে আলোচিত হইতেছে। জার্ম্মাণিকে ঋণ দিবার অনিচ্ছাটা সভ্য জগতে অনেক কমিয়াছে অর্থাৎ জার্ম্মাণি বাণিজ্য-জগতে আপনার স্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

বীমা-নীতির নব ধারা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক চা-বেচা দোকান এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করে। ব্যবস্থা হয় যে, যে সব বিধবা তাদের দোকানে নিয়মিতভাবে চা কিনিবে, তাদের বিনা টাকায় পেন্‌শন দেওয়া হইবে। অবশেষে জীবন বীমা ব্যবসায়ের কাজ চালাইবার জন্য এই দোকানকে গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রচলিত ২০ হাজার পাউণ্ড আমানত রাখিতে হয়।

সম্প্রতি লণ্ডনের এক ষ্টোরস্ বিক্রেতা খরিদ্দারদের সুবিধার জন্য অনুরূপ জীবন-বীমার প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মৃত্যুর ১২ মাস পূর্ব্বে খরিদ্দাররা যে পরিমাণ দ্রব্য কিনে ঠিক তার দামটা তাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে হাতে দিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য পরিমাণটা ৫০ পাউণ্ডের কম ও ৩০০ পাউণ্ডের বেশী হইলে চলিবে না। খরিদ্দারকে একটা রেজিষ্টার কার্ড ও একটা সংখ্যা দেওয়া হইবে। যখনি সে কিছু কিনিবে সংখ্যাটা দিলেই চলিবে।

খরিদ্দারের বয়স যদি ৫০-এর নীচে হয় সে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিনা সর্ত্তে নাম রেজিষ্টারি করিতে পারে। অন্যথা তাকে এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে সাধারণতঃ তার স্বাস্থ্য বেশ ভাল।

এই দোকান এক বড় বীমা-কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে চুক্তিপালনের গ্যারাণ্টি থাকিবার জন্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বীমার প্রসার

ঔপনিবেশিক জীবন-বীমার কথা বলিলেই লোকে সাধারণতঃ কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার কথা মনে করে। কিন্তু

বীমা ব্যবসায়ে দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ আফ্রিকাও বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে দুইটি কোম্পানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা খোদ ইংল্যণ্ডে পর্য্যন্ত আপনাদের জাল বিস্তার করিয়াছে। ইহাদের সর্ত্তগুলি খুব সুবিধাজনক হওয়ায় বেশ প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে। ইহাদের বিশেষত্ব নিম্নরূপ।

(ক) সাধারণতঃ চুক্তি করিতে গেলে কোন প্রকার সর্ত্ত মানিতে হয় না।

(খ) প্রিমিয়ামের হার নীচু।

(গ) অ্যানুইটি কিনিবার বন্দোবস্ত খুব সুন্দর ও সস্তা।

প্রথম কোম্পানীটির নাম হইতেছে সাদার্ণ লাইফ্ এসোসিয়েশন। সম্প্রতি ত্রৈবার্ষিক হিসাব লওয়া হইয়াছে। তাতে দেখা যায় যে, ৩ বছরে মৃত্যু, বরবাদ, গাফিলি ইত্যাদি হেতু সমস্ত অনাটন পূরণ করিয়াও ব্যবসায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছে। বাৎসরিক ৩৫ শি হারে চক্রবৃদ্ধি বোনাস্ দেওয়া হইবে। গত ৩ বছরে দেওয়া হইয়াছিল ৩২ শি হারে।

দ্বিতীয়টির নাম সাউথ্ আফ্রিকান্ মিউচুয়াল সোসাইটি। গত বছর ১১,০১৭টা পলিসি বাহির হইয়াছে—বীমাকৃত মুদ্রার পরিমাণ ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর। এইরূপ ব্যবসা এই সোসাইটির জীবনে আর হয় নাই। মোট ফাণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড। খরচা প্রিমিয়াম্ আয়ের ১১%। আর জীবনী ফাণ্ডে ট্যাক্স বাদ দিয়া সুদের নিট্ হার দাঁড়াইয়াছে ৫ পা ৩ শি।

৫ কোটি পাউণ্ডের যুগোশ্লাভ ঋণ

যুগোশ্লাভের মুদ্রায় স্থিত্ ফেলিবার জন্য ও পূর্ত্ত-বিভাগের কাজ চালাইবার জন্য বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভিয়া এক নূতন ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ঋণটা দিবে ইংরেজ ও আমেরিকান্ ব্যাঙ্কারের দল। ইহাদের নাম :—

রথ্‌সচাইল্‌ডস্ বেরিং ভ্রাতৃগণ হেন্‌রী শ্রোক্‌ডের অ্যাণ্ড কোম্পানী হ্যামব্রোস্ ব্লেয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানী	লণ্ডন
চেজ্ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক কুহনলোয়ের্	নিউইয়র্ক

চুক্তিমাফিক সমগ্র ঋণের পরিমাণ ৫ কোটি পাউণ্ড। তন্মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে দেওয়া হইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

এই ঋণদানের অর্থ স্পষ্ট। যুগোশ্লাভিয়ার ব্যবসা-জগতে মর্য্যাদা বাড়িবার সম্ভাবনা হইতেছে।



আবার ১৯০৫

নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা জারি করিয়া যুবক বাঙ্‌লা আবার ১৯০৫ সনের বিদেশী বয়কট ও স্বদেশী-প্রচার ব্রতে দীক্ষিত হইতেছে:—

স্বদেশী সঙ্কল্প

"আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া দেশবাসিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত না হইবে, আমি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিব না, স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহার করিব। ভগবান্‌ আমার সহায় হউন।"

মেথর ও ঝাড়ুদার

ভারতবর্ষ যদি কখনো স্বরাজ পায়, তা হলে আমাদের ভাগ্য যে কতবেশী সুপ্রসন্ন হবে তা কলিকাতা কর্পোরেশনের দ্বারা নিয়োজিত মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। নাগরিকগণের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যে যারা রাতদিন খেটে খেটে মরে, যারা একটি দিন কাজ বন্ধ করলেই এই রমণীয় নগরটি নরকে পরিণত হয়ে পড়ে, সেই মেথর ও ঝাড়ুদারগণকে কর্পোরেশন কি অবস্থায় রেখেছে! গরীব মেথর ঝাড়ুদাররা যতই ময়লা ঘাঁটুক না কেন, নাগরিকগণের জীবনের সহিত যতই দুচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাদের থাকুক না কেন, তাদের প্রতি চেয়ে দেখবারও আবশ্যক কর্ত্তাদের নেই। যেরূপ দুর্গন্ধময় স্থানসমূহে এবং যেরূপ গৃহনামীয় সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কূপসমূহে এই মেথর ও ঝাড়ুদাররা ঠাসাঠাসি হয়ে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে পশুকে বাস করতে দিলে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতাবিরোধী আইনের কবলে কর্ত্তাদের পড়তে হত। তাঁদের পরম সৌভাগ্যবশতঃ মেথর-ঝাড়ুদাররা আজ পর্য্যন্ত মানুষ নামে অভিহিত হচ্ছে ব'লেই তাঁরা এ আইন থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছেন।

মেথর আর ঝাড়ুদাররা মাসে ১২ টাকা থেকে ১৪টাকা পর্য্যন্ত মাইনে পেয়ে থাকে। কর্পোরেশনের সুবন্দোবস্তের ফলে ঘুষ না দিলে কোনো মেথর বা ঝাড়ুদারেরই চাকরী হয় না। সে ঘুষও এক মাসের মাইনের চেয়ে কিছুতেই কম নয়। কিন্তু গরীব মেথর ঝাড়ুদার ত পকেটে টাকা নিয়ে আর কলিকাতায় চাকুরী করতে আসে না। কাজেই, টাকা প্রতি মাসিক দু'আনা সুদে তাকে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়। তারপরে মাইনের এই ১২ বা ১৪টি টাকাও যে সবটা তাদের পকেটে আসে তাও নয়,—এই থেকে আবার মাসে ২টাকা ক'রে দিতে হয় ব্লক সরকার আর বাবুকে। অতি অল্পসংখ্যক ঝাড়ুদারই মাত্র কর্পোরেশনের গাওখানাগুলিতে থাকতে পায়। আর বাকী সবাইকে ঘর নামক অন্ধকূপগুলি ভাড়া ক'রে থাকতে হয়। এই অন্ধকূপগুলির ভাড়া স্থানমাহাত্ম্যে মাসে ৬ টাকা হতে ২॥০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। ঝাড়ুদাররা আর মেথররা ছুটি কখনো পায় না। কাজ থেকে অনুপস্থিত থাকলে দৈনিক আট আনা হিসাবে তাদের মাইনে কাটা যায়। অসুখ-বিসুখের জন্যে কাজ থেকে গরহাজির তাদের থাকতেই হয়। আর মাইনে যখন পাওয়া যায় তখন পাওনাদারের, বিশেষ ক'রে কাবুলীর তাড়নায় সহর ছেড়ে দু'চার দিনের জন্যে তাদের পালিয়েও যেতে হয়। কাবুলীর দেনা

তারা কখনো শোধ দিতে পারে না। কোথা থেকে দেবে? শীতকালের রাত্রিতে যখন তারা কাজ করে তখনো তাদের ভাগ্যে এক টুকরো গরম কাপড় ত জোটেই না, সূতোর কাপড়ও যে ভাল জোটে তা'ও নয়। কর্পোরেশন ফ্রী প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেছে অনেকগুলো, কিন্তু তার একটিও মেথর ও ঝাড়ুদারদের পাড়ায় স্থাপিত হয়নি। তাদের ছেলেকে ছ' বছর বয়স থেকে কাজে লেগে যেতে হয়। সে কাজও যে-সে কাজ নয়—নর্দ্দমার গর্ত্তের ভিতরে ঢুকে কাদা তোলা। ভারতবর্ষের ন্যায় ধনিক-শোষিত দেশেও কারখানায় ১২ বছরের কম বয়সের ছেলেকে কাজে নিযুক্ত করাটা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, আর আমাদের কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বরাজ গবর্মেণ্টের আমলে ছ'বছরের ছেলেরা নর্দ্দমার গ্যাস খেয়ে তিল তিল ক'রে মরছে।

মাদ্রাজ কর্পোরেশন ওখানকার মেথর আর ঝাড়ুদারদের সহিত যে ব্যবহার করছে, সে ব্যবহারও কলিকাতা কর্পোরেশন এখানকার মেথর আর ঝাড়ুদারদের সহিত করছে না। মাদ্রাজ সহরে তারা মাইনে পায় মাসে ১৭৷৷০ আনা, আর কলিকাতায় পায় ১২৲ ও ১৪৲ টাকা। পূর্ণ বেতনের সহিত মাদ্রাজের মেথর ও ঝাড়ুদার সাময়িক অবকাশ পেয়ে থাকে বছরে ১৫ দিন। আর এখানে একদিনও দেওয়া হয় না। পরন্তু, অনুপস্থিতির জন্যে প্রাপ্য মাইনের চেয়েও বেশী কেটে নেওয়া হয়। মাদ্রাজে দুর্ঘটনার জন্যেও পূর্ণ বেতনের সহিত ছুটী মঞ্জুর করা হয়, আর এখানে তা হয় না। সেখানে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা আছে, এখানে তা নেই। সেখানে ডেথ্ বেনিফিট্ দেওয়া হয়, আর কলিকাতায় যে মেথর ও ঝাড়ুদার মরে যায়, তার প্রাপ্য মাইনেটাও দেওয়া হয় না। কলিকাতায় ক্লার্ক সরকার আর বাবু ইচ্ছা করলেই মেথর ও ঝাড়ুদারদের ডিস্‌মিস ক'রে দিতে পারে, আর মাদ্রাজে হেলথ্ অফিসার ব্যতীত আর কারো বরখাস্ত করার ক্ষমতা নেই,—তা'ও আবার তাঁকে মেথর আর ঝাড়ুদারদের ইউনিয়নকে জানিয়ে করতে হয়।

যাঁরা স্বরাজ আর স্বাধীনতার জন্যে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, তাঁদের নিয়োজিত শ্রমিকগণ যখন এরূপ নির্দ্দয়ভাবে শোষিত হচ্ছে, তখন একথা খুব সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের নিজেদেরই জন্যে স্বরাজ লাভ করতে চান, দেশের জনগণের জন্যে নয়। এই বে-রোজগারের কড়ি খানেওয়ালাদেরই জন্য জনগণ সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই খেটে খেটে মরুক, এটাই শুধু তাঁরা প্রাণে-মনে কামনা করে থাকেন।

কিন্তু মেথর এবং ঝাড়ুদারেরাও মানুষ। তারা বে-রোজগারের অন্ন খেয়ে কখনো বেঁচে থাকতে চায় না। আপনাদের শ্রমের মূল্যই তারা পেতে চায়। নিরবচ্ছিন্ন শোষণই তাদের সচেতন ক'রে দিয়েছে। তাই এবারে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। কলিকাতা কর্পোরেশন যদি তাদের উপস্থিত দাবীসমূহ পূর্ণ না করে দেয়, তাহলে তারা ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হবে। তারা জেনেছে তাদের শক্তি কত বেশী। কিন্তু মেথর ও ঝাড়ুদাররা ধর্ম্মঘট করলে কলিকাতার নাগরিকগণকে অশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হবে। তাই তাঁদের উচিত মেথর ও ঝাড়ুদারদের দাবী-পূরণে কর্পোরেশনকে বাধ্য করা।

মজফ্‌ফর আহ্‌মদ

মাদ্রাজ কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘের আবেদন

মাদ্রাজ কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘের সেক্রেটারী মিঃ পি, এস খাণ্ডাপাণি চেটিয়ার নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন,—

ভ্রাতৃগণ, ভারতের এই বিশাল ভূখণ্ডের ত্রিশকোটী অধিবাসীদিগের মধ্যে ২৮ কোটীই আমাদের শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ২৮ কোটীর মধ্যে ৩৫ লক্ষ মাত্র স্বদেশী বা বিদেশী নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচ্যের প্রবীণ নেতা দাদাভাই নৌরজীর ভাষায় ইহাদের অবস্থা 'সহনাতীত'। ভারতের বিপুল কৃষক সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন,—তাহারা জমিদার, মিরাশদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। পৃথিবীর কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থাই

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ইহাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর, কোন প্রকার শিক্ষার লেশমাত্র পায় নাই। দুর্ভিক্ষরাক্ষসী ইহাদিগের প্রতি মুখব্যাদান করিয়া আছে। এই বিপুল জনসঙ্ঘের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটী প্রচেষ্টার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। ভারতের গণ-আন্দোলনের উদ্যোক্তৃগণ—বিশেষতঃ কমুনিষ্ট সম্প্রদায় বাঙ্গালা বোম্বাই পাঞ্জাব শ্রমিক ও কৃষক সমবায় ও ইত্যাকার সঙ্ঘের সাহায্যে ভারতের এই জনসঙ্ঘকে তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রচেষ্টায় পরিচালনা করিতেছেন। সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতের, এই শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যোগ রাখিয়া মাদ্রাজে এই প্রকার একটী শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ স্থাপন করা প্রয়োজন হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শ্রমিক আন্দোলনের কতিপয় নেতা দক্ষিণ ভারতের শ্রমিকদের মানুষের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এইরূপ সঙ্ঘের অনুযায়ী একটী সঙ্ঘ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রদেশের সমগ্র শ্রমিক ও কৃষকদিগকে—তাহারা তামিল, তেলেগু, অথবা ক্যানাড়ী যে কোন জাতীয় হউন—এই সমিতির সভ্য হইয়া ইহার পুষ্টিসাধনের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

চিঠিপত্র, মিঃ পি, এস, খাণ্ডাপাণি চেটিয়ার, (সেক্রেটারী), চেটিয়ার ষ্ট্রীট, পট্টুকোটাই, তাঞ্জোর জেলা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

রেলওয়ে নীতি

স্যর জর্জ্জ রেনী রেলওয়ে বোর্ডের জন্য ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা মঞ্জুরীর দাবী করেন।

স্বরাজ্যদলের সদস্য শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা সরকারী রেলওয়ে নীতির প্রতিবাদকল্পে ঐ দাবী ছাঁটিয়া এক টাকা করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, রেলওয়ে বোর্ড সাইমন কমিশনেরই পকেট সংস্করণ। সাইমন কমিশন নিয়োগ যেমন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থরক্ষার জন্য, এই রেলওয়ে বোর্ডের উদ্দেশ্যও তাহাই। কমিশনের উপর যেমন আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, এই রেলবোর্ড পরিচালনের উপরও আমাদের তেমনই কর্ত্তৃত্ব নাই। সাইমন কমিশনের সম্বন্ধে যে বিচার করা হইয়াছে, রেলওয়ে বোর্ডও তেমনই বিচার পাইবার যোগ্য। আমি গবর্ণমেণ্টকে এই প্রশ্ন করিতে চাই, রেলবোর্ডে নিযুক্ত হইতে পারে এমন কোন ভারতবাসী কি এখনও জন্মে নাই? যদি না জন্মিয়া থাকে, তবে কিসে তেমন লোক জন্মিতে পারে?

শ্রীযুত মেটা বলেন, রেলপথের কাজে শ্বেতাঙ্গদিগকে মোটা মোটা বেতন দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রমিকদের বেতন দৈনিক পাঁচ আনা পর্য্যন্ত আছে। এই পয়সায় মেম সাহেবরা কুকুর পুষিয়া থাকেন। তৃতীয় শ্রেণী এবং ইণ্টার ক্লাসের যাত্রীদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ঐ শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতেই বেশী টাকা উঠে, অথচ তাহাদের সম্বন্ধে কোন যত্ন লওয়া হয় না।

শ্রীযুত নীলকণ্ঠ দাস বলেন, রেলপথ পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সামরিক। এজন্য কর্ত্তৃত্ব সরকারের হাতে রাখা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়ীতে ২৪ জন যাত্রী লওয়ার কথা, সেই গাড়ীতে আমি এক সময় ১১৪ জন যাত্রী দেখিয়াছি। সব লাইনেই প্রায় এইরূপ ব্যাপার চলে।

শ্রীযুত অ্যানে বলেন, রেলওয়ে বোর্ড একটি স্বেচ্ছাচারী প্রতিষ্ঠান। ইহাতে অন্ততঃ দুইজন ভারতীয় সদস্য থাকা উচিত।

কর্ণেল গিডনী স্বরাজ্যদলকে আক্রমণ করিয়া বলেন, গতকল্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার সম্বন্ধে আলোচনা উঠিয়াছিল, কিন্তু স্বরাজ্যদল তখন অনুপস্থিত ছিলেন। স্বরাজ্যদল রেলওয়ে বোর্ডের জন্য এক টাকা মঞ্জুর করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা কেহ কি এক টাকায় বোর্ডে কাজ করিতে রাজী আছেন?

শ্রীযুত রঙ্গআয়ার বলেন,—এক টাকায় কেন, আমরা বিনা পয়সায় রেলওয়ে বোর্ডের কমিশনারের কাজ করিতে রাজী আছি।

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী রেলওয়ে নীতির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, রেলের কাজে ভারতবাসীদের অপেক্ষা

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের উন্নতির সুবিধা বেশী দেওয়া হয়। আমরা এদিকে রেলের কাজে ভারতবাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছি, ওদিকে গিডনীর গোষ্ঠিগোত্রের প্রাধান্য সেখানে ক্রমেই বাড়িতেছে। এই জন্যই কর্ণেল গিডনী রেলওয়ে নীতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে চাহেন না। বিশুদ্ধ ভারতীয় রক্ত যাহাদের ধমনীতে বহে, আমরা রেলের কাজে তাহাদের প্রাধান্য চাই। সম্প্রতি আমাকে কোন সরকারী কাজের জন্য রেলপথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল, কিন্তু তাহা সত্বেও আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে বলা হয়। আমার প্রধান অপরাধ এই যে, আমার কাছে দুইটা বালিসের খোল ছিল না, যাহার ভিতর পা ঢুকাইয়া আমি অন্ততঃ এংলো-ইণ্ডিয়ানও সাজিতে পারি। স্যর জর্জ্জ রেণী তাঁহার নিজের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যেমন গর্ব্ব বোধ করিয়া থাকেন, আমি আমার জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ঠিক তেমন গর্ব্বই বোধ করিয়া থাকি।

শ্রীযুত যমুনাদাস মেটার প্রস্তাবের পক্ষে ৪০ এবং বিপক্ষে ৫২ ভোট হওয়াতে উহা অগ্রাহ্য হয়।

টারিফ বোর্ডে দিয়াশলাই শিল্প

বঙ্গের শ্রমশিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এ, টি, ওয়েষ্টন এবং উক্ত বিভাগের এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুত এস, সি, মিত্র ভারতে দিয়াশলাই শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে টারিফ বোর্ডের নিকট যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

শ্রীযুত মিত্র বলেন যে, কুটীরশিল্প হিসাবে যদি দিয়াশলাই প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলেই দেশের লোকের উপকার হইতে পারে। সম্প্রতি দিয়াশলাই প্রস্তুত সম্বন্ধে একটা সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর দিয়াশলাইএর ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লওয়াই উক্ত সঙ্ঘের লক্ষ্য। তাহাদের মূলধন এবং উপকরণ সংগ্রহের ক্ষমতা অসীম। উক্ত শিল্প সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতাও খুব বেশী। সামান্য মূলধন এবং সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা লইয়া সেই সঙ্ঘের সহিত প্রতিযোগিতা করা ভারতের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। অন্ততঃ এখনও কয়েক বৎসর ভারতের পক্ষে তাদৃশ চেষ্টা অনিষ্টকর হইবে। যদি এখন দিয়াশলাই প্রস্তুতের জন্য বড় কারখানা করা যায়, তাহা হইলে উক্ত সঙ্ঘের প্রতিকূলতাহেতু তাহা অচিরে ধ্বংস হইবার কথা।

ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর যেরূপ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কুটীরশিল্প হিসাবে দিয়াশলাই প্রস্তুতের চেষ্টা হইলে দেশের অনেক বেকার লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে। যদি গভর্ণমেণ্ট কুটীরশিল্প স্বরূপে এ দেশে দিয়াশলাই প্রস্তুতের সাহায্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে দিয়াশলইএর কাঠি প্রস্তুতের জন্য একটা কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। সেই কারখানা হইতে দেশের ছোট ছোট দিয়াশলাইএর কারখানাকে সুলভ মূল্যে কাঠি যোগাইতে হইবে এবং বড় বড় দিয়াশলাইএর কারখানার উপর উচ্চ হারে কর বসাইতে হইবে।

মিঃ ওয়েষ্টন সাক্ষ্য দিয়া শ্রীযুত মিত্রের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, এ দেশে বড় বড় দিয়াশলাইএর কারখানা উক্ত সঙ্ঘের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও চলিতে পারে।

হরতাল সম্পর্কে মাদ্রাজে দলাদলি

তামিল নাড়ু কংগ্রেস কমিটি হরতালের সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিয়াছেন দেখিয়া অদ্য বৈকালের (২৩ ফেব্রুয়ারী) সভা খুব সরগরম হইয়াছিল। মহাজন সভা হলে এই সভা হয়। যদিও সি, আই, ডি'গণকে এড়াইবার জন্য টিকেট দ্বারা সভায় প্রবেশের নিয়ম করা হয়, তথাপি সভায় খুব বেশী লোক সমাগম হইয়াছিল। সভার প্রথম দিকটা শান্তভাবে চলিলেও শেষের দিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন লোক, যাহারা সরকারী আদেশ অমান্যের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা তামিল নাড়ু কংগ্রেস কমিটি বিষয়টা পণ্ড করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া যান।

হরতাল বন্ধ সম্পর্কে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। যদিও তামিল কমিটিই এই সভা আহ্বান করেন—অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ডাঃ বি, শাম্বমূর্ত্তি, এ, গোবিন্দ চারি এবং এম, অন্নপূর্ণিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি ডাঃ বরদারাজালু নাইডু তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেন যে, ৩রা তারিখের হরতাল খুব সফল হইয়াছিল। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, সাইমন কমিশন মাদ্রাজে অবতরণ করিবার দিন যে প্রকার স্বাভাবিক ভাবে লোকে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়াছিল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ অতিমাত্রায় স্তম্ভিত হইয়া পড়েন এবং হরতাল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন। হরতাল ভঙ্গ করিবার জন্য এবং কংগ্রেসের মর্য্যাদা লাঘব করিবার জন্য একদল লোক ঐ দিন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই দলই নানাস্থানে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। এইসব বিষয় চিন্তা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটীর উপদেশ মত তামিল কমিটি আর হরতাল করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। আগামী ২৬শে তারিখে কমিশন এখানে আসিলে হরতালের পরিবর্ত্তে সার্ব্বজনীন আন্দোলন চলিবে। কমিশন গ্রামে গ্রামে যাইয়া শিক্ষিত সমাজকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। গ্রামবাসীদিগকে এই জন্য কমিশন বয়কট করিবার জন্য বুঝাইতে হইবে। অনুন্নত হিন্দুদের দুরবস্থার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বৃটিশ রাজত্বের জন্যই তাহাদের আজ এই দুর্দ্দশা হইয়াছে।

ডাঃ সত্যমূর্ত্তি বলেন যে, এই কথা খুবই ঠিক। পাশ্চাত্য দেশে ইহুদীদেরও অবস্থা গত শতাব্দী পর্য্যন্তও আমাদের দেশের অনুন্নতদের মতই ছিল; কিন্তু জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে আজ তাহারা ইউরোপে রাজনীতি ক্ষেত্রে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি সকলকেই বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন।

মিঃ সি, এন, মুথুরঙ্গ মুদালিয়র বলেন যে, প্রথমে কমিশন বয়কট করিতে হইবে এবং তৎপর বৃটিশ পণ্য এবং বিশেষভাবে বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিতে হইবে। এই সময়ে সভাস্থলে সকলেই মিঃ সত্যমূর্ত্তির বক্তৃতা শুনিতে চায় এবং সভাপতি তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে বলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বলেন যে, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ২৬শে তারিখে কোন হরতাল হইবে না। এই সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে চান না। বয়কট কমিটির ভিতরে ও বাহিরে কোথাও নিরুপদ্রব প্রতিরোধক উপযুক্ত আবহাওয়া নাই। সুতরাং তাঁহারা হরতাল করিবেন না স্থির করিয়াছেন। যেদিন কমিশন মাদ্রাজে আসিবে, সেই দিন হরতালের পরিবর্ত্তে সর্ব্বসাধারণ আন্দোলন চালাইবেন। ঐ দিন কেহ যেন কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে কোন বিষয়ে যোগদান না করেন।

মিঃ বরদাচারি বলেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি আরম্ভ করিতে যতটা সাহসের দরকার উহা হইতে বিরত হইতেও ততটা সাহসেরই দরকার।

ডাঃ শাম্বমূর্ত্তি বলেন যে, হরতাল না করার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তামিল নাড়ু কংগ্রেসের সঙ্গে অনেকের মতদ্বৈধ আছে। এখানে সাহসের কোন কথা আসেনা। তবে তাঁহার মনে হয় [illegible] নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আরম্ভ করিলে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ক্ষতি হইত না। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় অনেকে তাঁহাকে বাধা দেয়।

তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদিগকে একদিন জেলে যাইতেই হইবে, তা আজই হউক আর কালই হউক।

এই সময়ে একজন সভায় বলিলেন—'মাদ্রাজ দুর্ব্বল'।

মিঃ শাম্বমূর্ত্তি বলেন, "মাদ্রাজ কখনও অন্য প্রদেশ হইতে পিছপাও হইবেনা।" এই সময়ে পুনরায় তাঁহাকে বাধা দেওয়া হয়। তৎপর মিঃ বসির আহম্মদ বক্তৃতা দেন ও সভাপতি তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য উঠেন।

শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কেবল নেতাগণ বক্তৃতা করিলেই চলিবে না, শ্রোতাদের মধ্য

হইতেও বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিতে হইবে। কিন্তু কাহাকেও বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয় নাই। উহাতে একদল শ্রোতা সভা ত্যাগ করেন এবং জানান যে, আগামী কল্য লায়ন স্কোয়ারে সভা হইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে, মাদ্রাজ আইন অমান্যে প্রস্তুত আছে।

সভাপতি বলেন সাহস দরকার বটে কিন্তু মূর্খের ন্যায় কাজ করা সঙ্গত নহে।

আফগানিস্তানে নবযুগ

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, নোয়াখালীর কৃতী সন্তান মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ওবায়েদউল্লা কার্য্য গ্রহণ করিয়া কাবুল গিয়াছেন। তিনি অল্প কয়েকদিনের ছুটী নিয়া সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছেন। সহরবাসী কতিপয় ব্যক্তির অনুরোধে তিনি কাবুল রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বতন আমীর হবিবউল্লার সময়ের কাবুল ও বর্ত্তমান আমীর আমানউল্লা খাঁর সময়ের কাবুলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

শিক্ষা

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্ত্তমান আমীর কাবুলে শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন। পূর্ব্বতন আমীর কাবুলের লোক-শিক্ষার জন্য বৎসরে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। বর্ত্তমান আমীর তাঁহার রাজস্বের প্রায় ১/৮ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেছেন। তথায় বালকদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক, করা হইয়াছে। কিন্তু বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। কারণ মোল্লাগণ ইহার বিরুদ্ধবাদী। তবে রাজকর্ম্মচারীদের কন্যাদিগের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার ব্যয় সম্পূর্ণ রাজকোষ হইতে বহন করা হয়। শিক্ষার্থিগণ ৮টার সময় স্কুলে যায় এবং ৪টার সময় ফিরিয়া আসে। দ্বিপ্রহরে জলযোগের ব্যবস্থা স্কুল গৃহেই হইয়া থাকে। তথায় শিক্ষার কার্য্য অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। প্রতি বৎসর আমীর তাঁহার রাজ্যের ২০০ উপযুক্ত যুবককে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভারই রাজ-ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেহ কেহ রাজ-সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং কেহ কেহ রাজ সরকার হইতে অর্থ লইয়া নানাপ্রকার উন্নতিজনক কার্য্যে লিপ্ত হন। কাবুলে বহু জার্ম্মাণ, রুশ, ফরাসী, ও ভারতবাসী অধ্যাপক আছে। শিক্ষার সমুদয় ভার শিক্ষামন্ত্রীর উপরেই ন্যস্ত। তিনি কাবুলবাসী।

সৈন্য

রাজস্বের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা সৈন্য-রক্ষায় ব্যয় করিয়া থাকেন। কারণ মোল্লাগণ বর্ত্তমান আমীরের প্রবর্ত্তিত পন্থা গ্রহণ করিতে অনেক সময় নারাজ। এই সকল মোল্লাদিগকে বশে আনিতে তাঁহাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। তিন বৎসর কাল ইহাদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বিশেষ কোন গোলযোগ নাই।

স্বদেশপ্রিয়তা

কাবুলবাসী সকলেই দেশীয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সকলেরই দেশের জন্য একটা বিশেষ টান রহিয়াছে। তাহারা কাবুলবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করে।

পর্দ্দা

রমণীগণ বোরকা লইয়া রাজপথে বাহির হয়। হিন্দু রমণীগণ হলদে রংএর বোরকা ও মুসলমান রমণীগণ কাল রংএর বোরকা ব্যবহার করেন।

হিন্দু-মুসলমান

হিন্দু-মুসলমান বলিয়া তথায় কোন প্রশ্ন নাই। তাহারা সকলেই কাবুলবাসী। তথায় বহু হিন্দু আছে। তাহারা প্রধানতঃ কাপড়ের ব্যবসা ও মহাজনী কারবার করে। শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ রাজসরকারে কার্য্য করিয়া থাকে।

বিচার

বিচারের জন্য সামান্য কোর্টফি দিতে হয়। তথায় উকীল মোক্তারের বাহুল্য নাই। প্রত্যেক বিচারকের নিকট এক এক জন করিয়া কাজি থাকেন। কাজির মতানুসারেই ধর্ম্ম-বিষয়ক মোকর্দ্দমার মীমাংসা হইয়া থাকে। সরকারের পক্ষে একজন এবং মোকর্দ্দমাকারীর পক্ষে একজন, এই দুইজন উকীলই মাত্র এক এক বিচারকের সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন।

খাদ্য

তাহাদের প্রধান খাদ্য রুটী ও মাংস। মাঝে মাঝে তাহারা পোলাও খাইয়া থাকে। পোলাওর চাউল অতি সরু ও অত্যুত্তম। এই চাউল তাহাদের নিজের দেশেই উৎপন্ন হয়। দরও সস্তা।

রাজকর্ম্মচারীর বেতন

কোন মন্ত্রী কাবুলী মুদ্রায় হাজার টাকার উপরে বেতন পান না। (কাবুলী ১০০০৲ টাকা আমাদের ভারতীয় ৫০০৲টাকার সমান) বিচারকগণও ৫০০৲ টাকার (কাবুলী মুদ্রায়) উপর বেতন পান না। তবে বিদেশ হইতে যাঁহারা কার্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি যে ভারতীয় মুদ্রায় ১৫০০৲ টাকা বেতন পাই, তাহা ঐ দেশের সাধারণ লোক বিশ্বাস করিতে চায় না।

ক্রীত দাস দাসী

বহুকাল যাবৎ আফগানিস্তানে ক্রীত দাস দাসী রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসকে গোলাম ও ক্রীত দাসীকে কনীজ বলা হইত। প্রকাশ্য ভাবে এই দাসদাসী বেচা-কেনা হইত। আমীর আমানউল্লা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরেই এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন।

ভাষা

আফগানিস্তানে রাজকীয় আফিস আদালতে পারসী ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের মধ্যেও পারসী ভাষা প্রচলিত। দেশের অভ্যন্তরে কেবল সাধারণ সমাজের মধ্যে কোথাও কোথাও পস্তু ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি একদিন আমীর হবিবুল্লা খাঁনের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি বিশুদ্ধ পারসী ভাষায় অনর্গল ভাবে ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সভায় প্রায় ২০।২৫ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

খনি

আফগানিস্তানে কয়লা, লৌহ, পেট্রোলিয়াম, তামা, সীসা, সোনা, প্রভৃতি ধাতু ও পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরেরও খনি আছে। এইসব খনির কার্য্য আরম্ভ হইলে অদূর ভবিষ্যতে আফগানিস্তান পৃথিবীর মধ্যে একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যে পরিণত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাস্তা

ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভালরকম রাস্তাঘাট পূর্ব্বে ছিল না। বর্ত্তমানে ক্রমে ক্রমে তাহার উন্নতিসাধন হইতেছে। একদিকে আফগান সীমান্ত পর্য্যন্ত রুশিয়ার রেল লাইন এবং অপর দিকে ইংরেজের রেল লাইন আসিয়াছে। এই সমস্ত রেললাইন পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভাল রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে।

তৎপর তিনি তথাকার মিউনিসিপ্যালিটি, গ্রামের কথা, উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য বিষয়ে আরো অনেক কথা বলেন। তৎপরে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার বক্তৃতা শেষ হয়।

(নোয়াখালি হিতৈষী)

মোলাকাৎ



চৌমাথার মোড়ে কাগজ-বিক্রেতা

[কলিকাতার কোন চৌমাথার মোড়ে এক কাগজ-বিক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তার সারাংশ নীচে দেওয়া যাইতেছে।]

প্রশ্ন—আপনি কি বাঙ্গালী ?

উত্তর—হাঁ।

প্রঃ—রোজ সন্ধ্যার সময় দেখি এই আলোর নীচে ফুটপাথের উপর আপনি নানা রকম কাগজ বিছাইয়া বসিয়া আছেন। এই সব কাগজ বেচাই বোধ হয় আপনার ব্যবসা ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—কতদিন যাবৎ আপনি এই ব্যবসা করিতেছেন ?

উঃ—৪ বছর হইবে।

প্রঃ—তার আগে কি করিতেন ?

উঃ—রেলে চাকরী করিতাম।

প্রঃ—কি চাকরী ?

উঃ—ট্রলি কেরাণী ছিলাম।

প্রঃ—ছাড়িয়া দিলেন কেন ?

উঃ—ঠিক ছাড়িয়া দিয়াছি বলা যায় না। বাবার অত্যন্ত অসুখের সংবাদ পাইয়া বাড়ী যাই। অনেক দিন ভুগিয়া তাঁর মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে আমি বাড়ীতে দেড় বছর বসিয়া থাকি। কাজেই আমার চাকরী আর কি করিয়া থাকে ?

প্রঃ—তারপরই বুঝি আপনি কাগজ বেচা আরম্ভ করিলেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—রেলে আপনাকে কতক্ষণ আফিসে থাকিতে হইত ? কত টাকা মাহিনা পাইতেন ?

উঃ—কাজ করিতাম ১০টা-৫টা। মাহিনা ছিল ৩৫৲ টাকা।

প্রঃ—রেলের চাকরী ছাড়িয়া এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আপনার কি মনে হইতেছে ? ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন ! ব্যবসাটা আপনার কেমন লাগে ?

উঃ—মন্দ করিয়াছি বলিতে পারি না। আয়ের দিক্ থেকেও নয়। ১০টা-৫টা চাকরী করিয়া আফিস্ হইতে যখন বাহির হইতাম, তখন ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করিত। গায়ে মাথায় খড়, ময়লা, কালি ইত্যাদি মাখিয়া বাহির হইতাম। এখানে সে সব বালাই নাই। মুক্ত আকাশের নীচে বসায় প্রাণটাও ভাল থাকে। এখন যথেষ্ট স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করি, কিছু বলিবার কেহ নাই। সুতরাং আমার মত থার্ড ক্লাস বিদ্যাওয়ালা ব্যক্তির এই কাজ ভাল না লাগিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বড় খাটুনি।

প্রঃ—আপনাকে খুব খাটিতে হয় কি ? খাটুনির কথা বলিতেছেন কেন ?

উঃ—আমার কাজের হিসাবটা নিন্। তারপর আপনিই বিচার করিয়া দেখুন খাটুনি বেশী কি না। ভোর ৪টার সময় উঠিয়া আমার আস্তানা হইতে দৌড়াইতে হয় কাগজের সন্ধানে। কাগজগুলিতো আর এক

জায়গায় পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জায়গায় গিয়া কাগজ লইয়া আসিতে হয়। এদিকে এই মোড়ে ভোর ৬টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। তারপর ১২টা পর্য্যন্ত খবরের কাগজ লইয়া এই মোড়ে ছুটাছুটি করি। ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ছুটি। সেই সময় নিজ আস্তানায় গিয়া কিছু নাকে মুখে গুঁজিয়া আসি। সেও কম দূর যাইতে হয় না। ২টার সময় ফিরিয়া আসিয়া আবার ফুটপাথের উপর এই সব বই কাগজ বিছাইয়া বসি। শীত-কালে ৯৷১০টার আগে উঠি না। গ্রীষ্মকালে কখনো কখনো ১১টা পর্য্যন্তও থাকি। সুতরাং বুঝিতেছেন, বসিয়া বসিয়া আমার হাতে পয়সা আসে না।

প্রঃ—আপনাকে আমি কয়েকদিন এই মোড়ে কাগজ ফিরি করিতে দেখিয়াছি বটে। আপনি সকাল বেলা কাগজ আনিতে না না আফিসে যান। যাওয়াটা কিসে হয়? সেজন্ত আপনার কিছু খরচ পড়ে কি?

উঃ—নিশ্চয়। আমার সর্ব্বদাই লক্ষ্য কিসে আমি সব কাগজ লইয়া আগে আসিয়া এই মোড়ে উপস্থিত হই। কাজেই অনেক সময় বাসে যাতায়াত করি। কখনো কখনো হাঁটিয়া যাই এবং কাগজ লইয়া বাসে ফিরিয়া আসি।

প্রঃ—আপনার এই ব্যবসাটা একটু বুঝাইয়া দিন্ দেখি।

উঃ—ব্যবসাটা অবশ্ব খুবই সামান্ত। অনেকগুলি দিক্ হইতে ইহা বিচার করা যাইতে পারে। যেমন ধরুন মোড় নির্ব্বাচন। আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বীডন স্কোয়ারের সাম্‌নে বিপরীত দিকের ফুটপাথে সকালে ও বিকালে কাগজ-ওয়ালাদের কাগজ বেচিতে দেখা যায়। কিন্তু হেদুয়ার কোণে বীডন ষ্ট্রীটের উপর কেহ বসে না। বসে মাণিকতলার ফুটপাথে। মনে রাখিবেন মোড় নির্ব্বাচন একটা মস্ত কথা।

প্রঃ—আচ্ছা, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে কেমন বিক্রী হয়?

উঃ—সেখানে খুব বেশী হয়। আমার এখানকার চেয়ে বেশী। তার কারণ অবশ্ব স্কুল-কলেজের ছেলে ছোকরার দল। তারাই সব চেয়ে বেশী কাগজ পত্র কিনে।

প্রঃ—আপনি তবে কলেজ স্কোয়ারে গিয়া বসেন না কেন?

উঃ—তা কেমন করিয়া হয়? সেখানে প্রত্যেক বসিবার স্থানে একজন করিয়া লোক আছে। আমি ত আর তাদের জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে পারি না? কারও জায়গা খালি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সেখানে গিয়া বসিতে পারি না। অবশ্ব কেহ যদি তার জায়গা আমাকে ছাড়িয়া দেয়, সে স্বতন্ত্র কথা।

প্রঃ—তবে আপনি আপনার এই স্থানটা জোটাইলেন কিরূপে?

উঃ—এখানে আগে যে বসিত, সে মরিয়া গেলে আমি এই জায়গাটা পাই। সে ৪ বছরের কথা।

প্রঃ—আপনার ব্যবসার অন্ত ২৷১টা দিকের কথা বলুন।

উঃ—মোড় সম্বন্ধে আপনাকে আর একটা কথা বলি। ধরুন কেহ যদি আমার এই জায়গাটা জোর করিয়া দখল করিয়া বসে, সে আজকেই বিশেষ কিছু বেচিতে পারিবে না।

প্রঃ—কেন?

উঃ—আমার খদ্দেরদের আমি চিনি। তারাও আমাকে বেশ চেনে। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। অন্ত কেহ যদি এখানে বসে তাহা আমার বহু পুরাণা খদ্দেরের মনঃপূত হইবে না। তারা অন্ত জায়গায় গিয়া কিনিবে।

প্রঃ—তারপর?

উঃ—আমার ব্যবসাটা দুইবেলা দুই রকম করিতে হয়। ১২টা অবধি আমি বসি না, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। ট্রামে, বাসে, গাড়ীতে, মোটর ও পথ-চলা লোকের কাছে খবরের কাগজ বেচি। আর বিকালে অর্থাৎ ২টা হইতে ফুটপাথের উপর নানা রকম কাগজ সাজাইয়া বসি, বড় একটা ছুটাছুটি করি না।

প্রঃ—দুই বেলার ব্যবস্থা দুই রকম কেন? দুই বেলার বেচায় কোন রকম তারতম্য আছে কি?

উঃ—আছে। সকাল বেলা লোকে দৈনিক কাগজই সাধারণতঃ পড়িতে চায়। সেই জন্য ঐ কাগজগুলিই দৌড়াদৌড়ি করিয়া হাতে হাতে পৌঁছাইয়া দিতে হয়। আর বিকালের দিকে ২।১খানা করিয়া সাপ্তাহিক এবং মাসিকগুলি বিক্রী হয়।

প্রঃ—আপনি কোন্ কোন্ কাগজ রাখেন?

উ—দৈনিকের মধ্যে বসুমতী, ফরওয়ার্ড, বাঙ্গালার কথা, ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান ইত্যাদি আছে। মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, পুষ্পপাত্র, বঙ্গবাণী ইত্যাদি আছে। আত্মশক্তির মত সাপ্তাহিকও ২।৪খানা আছে।

প্রঃ—এদের প্রত্যেকের সহিতই বোধ হয় আপনার পাওনার হারটা বাঁধা রহিয়াছে। কোন্ কাগজ কত দেয় জানিতে পারি কি?

উঃ—সকলে সমান দেয় না। কেউ বেশী দেয় কেউ কম। মাসিক কাগজগুলি মাথাপিছু ⁄০ আনা অথবা ৩৫ দেয়। এই হারটা কাগজের দামের উপর নির্ভর করে না। কালি কলম ⁄০ আনা দেয়। প্রবাসী এবং বিচিত্রাও তাই দেয়। আবার বসুমতী ৩৫ পয়সা দেয়। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সম্বন্ধেও ঐ কথা। ফরওয়ার্ড ও ষ্টেট্‌সম্যান আধ পয়সা দেয়, বসুমতীও আধ পয়সা দেয়, ইংলিশম্যান ৩৫ পয়সা দেয় ইত্যাদি।

প্রঃ—আপনার এখানে কোন্ কোন্ কাগজের কাটতি সব চেয়ে বেশী বলিতে পারেন কি?

উঃ—বসুমতীই সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয় তার পর ফরওয়ার্ড।

প্রঃ—আচ্ছা বাঙ্গালার কথা বাহির হওয়ার পর কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন কি?

উঃ—মহাশয় আমরা কাগজ-হাঁকনেওয়ালারা পত্রিকা-জগতের সকল প্রকার উত্থান-পতনেরই আঁচটা আগে পাই। বাঙ্গালার কথা বাহির হওয়ায় ফরওয়ার্ডের কাটতি কিছু কমিয়াছে। মনে রাখিবেন কাগজে কাগজে লড়াই অনবরত চলিতেছে। আজ এ দাম কমাইতেছে, কাল ও এক বাঙ্গালা সংস্করণ বাহির করিতেছে, পরশু অন্যজন ছবি বাহির করিতেছে।

প্রঃ—রোজ আপনার কত টাকা অর্জ্জন হয়?

উঃ—তার কোন স্থিরতা নাই। সাধারণতঃ আমার দৈনিক আয়ের পরিমাণ ১৲, ১।০ সিকা।

প্রঃ—এটা কি আপনার কাগজ বেচার প্রাপ্ত মোট টাকা, না আপনার মহাজনদের দিয়া যা থাকে তাই?

উঃ—মহাজনদের সমস্ত টাকা পয়সা সমস্ত মিটাইয়া দিয়াই আমার হাতে এক টাকা পাঁচসিকা থাকে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ সময়ে এর চেয়ে বেশীও উপার্জ্জন করি। বিশেষ খবর থাকিলে কাগজ বেশী বিক্রী হয়। যেমন ধরুন কংগ্রেসের সময়। তখন কোন কোন কাগজ অল্প সময়েই ফুরাইয়া যায়। বিকালের জন্য আর থাকে না।

প্রঃ—ভাল। আপনি দোকান বা ষ্টল খুলিয়া বসেন না কেন?

উঃ—মহাশয়, আমার মত গরিবের সাধ্য কি যে ষ্টল বা ঘর রাখে। একটা ঘরের ভাড়াতেই ১০৲ টাকা দিতে হয়। বাতির জন্য খরচ আছে। এখানে সে সব খরচ নাই। রাতে এই কর্পোরেশনের বাতিতেই কাজ চলে।

প্রঃ—আপনার খাওয়াপরা, ঘরভাড়া ও অন্যান্য খরচ পত্রের কথা বলুন।

উঃ—ঘর ভাড়ার জন্য দিই ১।০ সিকা। অন্য ২ জনের সঙ্গে আমি এক কুঠরীতে থাকি। খাওয়াতে যায় ১০।১২ টাকা। সকালে বিকালে অবশ্য বাহিরে যাহোক্ কিছু খাইয়া লইতে হয়।

প্রঃ—এই কাগজের ব্যবসা করিয়া মাসে আপনার কত বাঁচে?

উঃ—১০।১৫ টাকা।

প্রঃ—এই টাকাটা কি করেন ?

উঃ—বাড়ী পাঠাইয়া দিই।

প্রঃ—সব টাকা বাড়ী পাঠাইয়া দেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—বাড়ীতে আপনার কে আছেন ?

উঃ—মা, কাকা, ছোটভাই।

প্রঃ—আপনি বিবাহ করিয়াছেন কি ?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনার ক্ষেত-খামার আছে কি ?

উঃ—হাঁ। বিঘা দশেক জমি আমাদের আছে। ভাই দেখে। তাতে আমাদের খরচটা চলিয়া যায়।

প্রঃ—আপনার এখানে বা দেশে কোনপ্রকার ঋণ আছে কি ?

উঃ—না আমি অঋণী।

প্রঃ—আপনার বাড়ীতে কোন অভাব নাই। তবু মাসে মাসে ১০।১৫ টাকা পাঠাইয়া দেন কেন? সে টাকাটা জমাইলে আপনি এখানেই ত বড় কোন ব্যবসা করিয়া বসিতে পারিতেন।

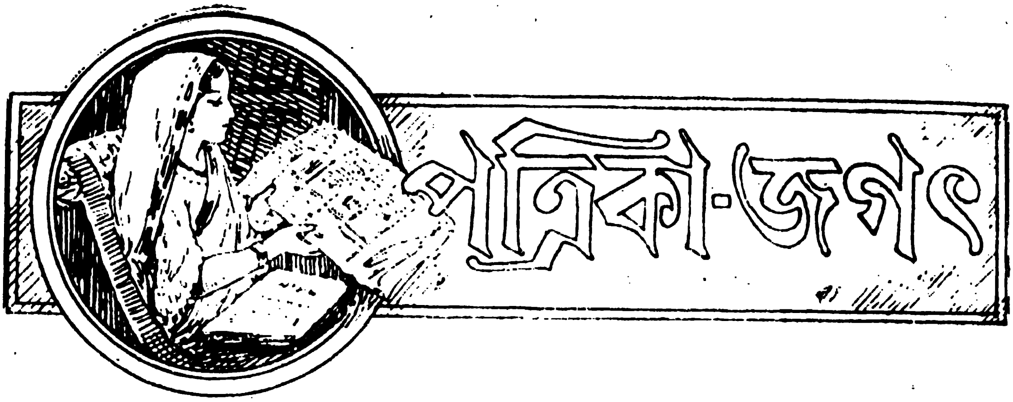
উঃ—বাড়ীর খাঁই বড় বেশী। পুনঃ পুনঃ টাকা চাহিয়া পাঠায়। না দিয়া উপায় নাই।

প্রঃ—আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। প্রথমতঃ জানিতে চাই, ঋতুভেদে কাগজ বেচায় তারতম্য ঘটে কি না। তারপর জানিতে চাই আপনি ধারে কাকেও কাগজ দেন কিনা।

উঃ—শীতকালেই কাগজের কাটতি বেশী। আর আমার পক্ষেও শীতকালে বসিয়া থাকা বেশী সহজ। গরমে বসিয়া থাকা বড় কষ্টকর। তবে কাগজের কাটতিটা সাধারণতঃ ঘটনা-বহুলতার উপর নির্ভর করে। ধার সম্বন্ধে বলিতে চাই যে, অত্যন্ত পরিচিত প্রতিদিন-কার খদ্দেরকেই মাত্র ধারে কাগজ দিয়া থাকি।

প্রঃ—তাতে আপনার ক্ষতি হয় না কি ?

উঃ—না। সাধারণতঃ লোকে ঠকাইতে চেষ্টা করে না। ২।৪ পয়সার গরমিল কখন কখন হয়। কিন্তু বুঝিতে পারি সেটা যে ইচ্ছা করিয়া দেয় না তা নয়, ভুলে দেওয়া হয় না। কিন্তু লোকেরা খুব বিশ্বস্ত। বিশ্বাস করিয়া আমাকে ঠকিতে হয় নাই।



"জার্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা"

ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা (মাসিক); রোম হইতে প্রকাশিত। মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মর্ত্তারা সম্পাদক। নভেম্বর ১৯২৭ এর সংখ্যায় আছে:—(১) মুদ্রা-সংস্কারের বিভিন্ন ফলাফল তুলনা। লেখক মর্ত্তারা বলিতেছেন যে, মহাযুদ্ধের পর দুনিয়ার নানাদেশেই মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ইতালির মুদ্রা-সংস্কারে এই হিসাবে কোনো বিশেষত্ব নাই। তবে একটা বিশেষত্ব আছে সংস্কারের মাত্রায়। ইতালির মুদ্রা আজ প্রাগ-যুদ্ধ মুদ্রা-ব্যবস্থার অনুপাতে শতকরা ২৮·২৪ অংশ সোনায় প্রতিষ্ঠিত। যখন ইতালিয়ান লিয়ারের চরম দুর্গতি তখন —অর্থাৎ ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে সোনার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬·৯৭%। বুঝিতে হইবে যে, মুদ্রা-সংস্কারকেরা শতকরা ১৬·৯৭ হইতে লিয়ারকে ২৮·২৪ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ সংস্কারের মাত্রা শতকরা ৬৬ অংশ। লেখক ২২টা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-সংস্কারের মাত্রা তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, ইতালির সমান কোনো বড় দেশে এই মাত্রা দেখা যায় না। (২) লড়াইয়ের রাজস্ব-নীতি আর যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের ইতালিয়ান রাজস্ব-ব্যবস্থা (রেপাচি)। (৩) গ্রন্থসমালোচনা (৪০ খানা ইংরেজী ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান বইয়ের ছোট বড় মাঝারি খতিয়ান)।

এই পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় আছে,—(১) চেকো-শ্লোভাকিয়ার মুদ্রা-কথা (ক্রগিয়ের) (২) যানবাহনে অটোমোবিলের স্থান (বুচেল্লা) (৩) গ্রন্থসমালোচনা (২৫খানা বইয়ের পরিচয়) (৪) ১৯২৭ সনের প্রথম আট মাসে ইতালির বিভিন্ন পত্রিকায় যত আর্থিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার সূচীপত্র। সূচীপত্র নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত:—(ক) আর্থিক মতবাদের ইতিহাস, (খ) আর্থিক জীবনের ইতিহাস, (গ) জীবন বৃত্তান্ত, (ঘ) আর্থিক ভূগোল ও লোক-বৃত্তান্ত, (ঙ) আর্থিক তত্ত্ব, (চ) সমাজ-বীমা, (ছ) রাজস্ব, (জ) আর্থিক জীবন। এই বিষয়টা স্বতন্ত্র দশ শাখায় বিভক্ত:—(১) বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা (২) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক-নীতি, (৩) কৃষিশিল্পবাণিজ্যের শাসন ও পরিচালন, (৪) আর্থিক সঙ্ঘ, (৫) টাকাকড়ি ও বাজার-দর, (৬) যানবাহন, (৭) ঘরবাড়ী, (৮) ভূমি ও বনসম্পদ্, (৯) খনি ও ধাতু শিল্প, (১০) তুলা ও অন্যান্য শিল্পের বাজার ও কুদরতী মাল।

"রিভিস্তা ইন্তার্ণাৎস্যনালে দি সিয়েন্ৎসে সচ্যালি"

সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকা; ইতালিয়ান ভাষায় সম্পাদিত। ত্রৈমাসিক। ১৯২৭ সনের তৃতীয় সংখ্যায় রোম সহরের ঘরবাড়ী-সমস্যা সম্বন্ধে রমাণ নামক এক ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত আট বৎসরের কথা বিবৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও লোকেরা পল্লী ছাড়িয়া সহরে আসিতেছে। গৃহ-সমস্যার সনাতন কারণই এই। অপর দিকে গবর্মেণ্ট সকল দেশেই

বাড়ীওয়ালাদের উপর খড়্গহস্ত। জনসাধারণের সুখ-দুঃখে দরদী হইয়া গবর্মেণ্ট পুঁজিপতিদের নিকট হইতে ঘরবাড়ী বাবদ চড়া হারে কর আদায় করিতে অভ্যস্ত। কাজেই পুঁজিওয়ালারা আর বাড়ী তৈয়ারীর ব্যবসায় গা করে না। গৃহ-সমস্যার এই গেল দ্বিতীয় সনাতন দফা। তাহা ছাড়া অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালিতেও সমবায়-নিয়ন্ত্রিত গৃহনির্ম্মাণ-সমিতি নামক কতকগুলা কোম্পানী আছে। তাহারা অনেক সময়েই নামে মাত্র সমবায়-ধর্ম্মী। কিন্তু গায়ে সমবায়ের গন্ধ থাকার দরুণ তাহারা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে। ফাঁকতালে কতকগুলা হুঁদে লোক দু' পয়সা করিয়া লইতেছে। কাজেই মোটের উপর ব্রাহস্পর্শ। এই তিন দফার আওতা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? লেখক বলিতেছেন,—"ঘরবাড়ীর ব্যবসাটাকে সরকারী আইনকানুনের বাঁধ হইতে রেহাই দাও। পুঁজিওয়ালারা নিজ স্বার্থের খাতিরেই গণ্ডা গণ্ডা ডজন ডজন ইমারত কায়েম করিতে লাগিয়া যাইবে।

"নুঅহ্বা আন্তলজ্যা"

ইতালিয়ান মাসিক। আঞ্জেল লিখিয়াছেন ১৯২৭ সনে জেনেহ্বায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন সম্বন্ধে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ (১) দুনিয়ার ধনদৌলত-বিষয়ক তথ্যমূলক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা, (২) আর্থিক দুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিকতার অর্থাৎ ঐক্যবন্ধনের পথ বাতলাইয়া দেওয়া। সম্মেলনের আলোচনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে তিনটা, (১) ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশেই শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক (২) শিল্পকর্ম্মের ক্ষেত্রে মালোৎপাদনের খরচ যাহাতে কমিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। এই জন্য আবশ্যক রাশ্য-ন্যালিজেশুনে অর্থাৎ যুক্তি-যোগ বা সঙ্ঘগঠন। আরও আবশ্যক শিল্প-সঙ্ঘগুলাকে আন্তর্জ্জাতিক ভাবে পরিচালিত করা। (৩) কৃষিকর্ম্মে জোর দেওয়া চাই সমবায় প্রথার উপর। চাষ ও চাষীর জন্য চাই সহজে টাকা কর্জ্জ পাওয়ার ব্যবস্থা। আর চাষের ফসল যাহাতে নির্ব্বিবাদে দেশ হইতে দেশান্তরে চালান হইতে পারে সেই দিকে নজর রাখাও আবশ্যক।

"গেরার্গ্যা"

ইতালিয়ান পত্রিকায় ফেরি জেনেহ্বায় অনুষ্ঠিত উপরোক্ত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন সম্বন্ধে টিপ্পনী মারিয়াছেন। বলিতেছেন:—"দুনিয়ার দেশগুলাকে এক্ষণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। কতকগুলা শিল্পনিষ্ঠায় উঁচুদরের দেশ। যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারবারে তাহারা পাকিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দেশগুলা এই বিষয়ে নাবালক। সবে হাতে খড়ি দিতেছে মাত্র। প্রবীণ দেশের লোকেরা একটা তথাকথিত 'উদার'মত, মাল চলাচলের স্বাধীনতা, বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যবন্ধন ইত্যাদি বোলচালে বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁহাদের এই বোলের পশ্চাতে আন্তরিক মাল নাই এক কাঁচ্চাও। "স্বাধীন গতিবিধি" অবাধ চলাচল ইত্যাদি শব্দে কি বুঝা উচিত? বুঝা উচিত ধনোৎপাদন-বিষয়ক সকল প্রকার শক্তি ও সরঞ্জামেরই চলাফেরা। কাজেই লোকজনের গতিবিধি ও আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে স্বচ্ছন্দ ও বাধাহীন হওয়া আবশ্যক। ইতালিতে লোকসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। লোক-রপ্তানি করা ইতালিয়ান স্বার্থ। কিন্তু প্রবীণ দেশের মাতব্বরেরা ইতালি হইতে লোক আমদানির বিরুদ্ধে কড়া আইন জারি করিয়াছে। অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য শব্দটা নিজ স্বার্থমাফিক ব্যাখ্যা করা এই সকল যন্ত্রনিষ্ঠ উন্নত দেশের পণ্ডিতদের রেওয়াজ। এইখানে সমঝিয়া রাখা উচিত যে, ইতালি বাস্তবিক পক্ষে ইয়োরোপের একটা অবনত দেশ। কাজেই ইতালির লোকেরা প্রবীণদের কার্য্য-নীতিকে যে চোখে দেখে, তাহাতে আমাদের ভারতেও কিছু কিছু কাজ হাসিল করিবার যুক্তি পাওয়া যায়। ইতালির সঙ্গে ভারতের ভাব রাখার যতগুলা কারণ থাকিতে পারে, তাহার ভিতর ইতালির অবনত অবস্থা অন্যতম।

"রেহ্ব্যি দেকোনোমি পোলিটিক"

অধ্যাপক জিদ্ সম্পাদিত ফরাসী ধনবিজ্ঞান পত্রিকা।

বৎসরে ছয় বার বাহির হয়। ১৯২৭ সনের শেষ সংখ্যায় আছে; (১) আমেরিকা ভূখণ্ডে স্পেন দেশের হুণ্ডি, ষোড়শ শতাব্দীর বৃত্তান্ত। সেকালের দুনিয়ায় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বলিলে স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার আর পর্ত্তুগালের সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদান একটা বড় ধর অধিকার করিত। কিন্তু এই সকল আমদানি-রপ্তানির কর্ম্মকাণ্ড বা ব্যবসা-পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান গবেষণা একপ্রকার অনুষ্ঠিতই হয় নাই। জার্ম্মাণ পণ্ডিত সম্বর্টে প্রণীত "ডার মডার্ণে কাপিটালিস্‌মুস্‌"এ ("আধুনিক পুঁজিনীতি") এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা আশা করা যাইত। কিন্তু পাওয়া যায় না। অপর দিকে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরেশিয়া আর ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রীয় ঔপনিবেশিক ইতিহাস লইয়া দেশ-বিদেশের নানা পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়া থাকেন। তাঁহারাও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিচালনা-প্রণালী, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, হুণ্ডি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো তল্লাস চালাইতে অভ্যস্ত নন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ফরাসী পণ্ডিত সায়ু পৃষ্ঠা ত্রিশেকের ভিতর নানা তথ্য দিয়া এই মহলে অনুসন্ধানের সূত্রপাত করিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী সম্পর্কে যে-সকল ভারতীয় সুধী ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের লেনদেন খতিয়ান করিতে বাধ্য, তাঁহারাও এই দিকে নজর ফেলিলে আর্থিক জীবনের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে নতুন তথ্য বাহির হইতে পারে। (২) "বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনা"। মার্কিণ ওস্তাদ টেলার যুক্তরাষ্ট্রের নানা শিল্প-কারখানায় বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনা কায়েম করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী "সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেণ্ট" নামক গ্রন্থে সুবিস্তৃত আছে। দুনিয়ায় আজকাল "টেলার প্রণালী (টেলার-সিষ্টেম) অথবা "সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেণ্ট" পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নয়। জগতের নানা দেশে এই প্রণালী কায়েম হওয়া সম্ভবপর কিনা তাহার পরীক্ষা চলিতেছে জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে, ইতালিতে, বিলাতে। অধিকন্তু এই বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রথম সম্মেলন বসে প্যারিসে (১৯২৩), তাহার পর প্রাগে (১৯২৪) ও ব্রুসেল্‌সে (১৯২৫)। এই বার ১৯২৭ সনে বসিয়াছে রোমে। এইসকল বিষয়ে ওসয় একটা সুবৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। (৩) চীনে বিদেশীর স্বার্থ ও একতিয়ার (এস্কারা) (৪) অর্থনৈতিক সূচীসংখ্যা (রোআ) (৫) যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক জীবন (৬) আর্থিক আইন-কানুন (ফরাসী), (৭) গ্রন্থ-সমালোচনা (২২ খানা বইয়ের এক এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ; সমালোচক-সংখ্যা ১৪) (৮) পত্রিকা-জগৎ (ছোট হরপে ৪০ পৃষ্ঠা)।

"লে দোকুমাঁ দু ত্রাভ্বাই"

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে আঁরি ফুর "অর্থ-নৈতিক যুক্তিযোগ" ও "বেকার-সমস্যা" এই দুই বিষয় একসঙ্গে আলোচনা করিয়া কয়েকটা সিদ্ধান্তে হাজির হইয়াছেন। "যুক্তি-যোগ" বস্তুটা "আর্থিক উন্নতির" পাঠকদের পক্ষে সুপরিচিত। এবার ১৯২৭ সনে জেনেভায় যে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহার আলোচনায় যুক্তিযোগই ছিল এক বড় কথা। এই জন্য জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্য-কথা সুবিস্তৃত রূপে খতাইয়া দেখা হইয়াছে। ১৯২৪ সন এই যুক্তিযোগ নীতির প্রথম বৎসর। তিনচার বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝা যাইতেছে যে, "যুক্তিযোগ," একমাত্র কারখানার পরিচালনায় কায়েম করিলে বেকারের দল কমিবে না। এই জন্য চাই আর্থিক জীবনের সকল বিভাগে যুক্তিযোগের প্রবর্ত্তন। কৃষি-শিল্পের সকল মহলে ত চাই-ই। আরও চাই ব্যবসা বাণিজ্যের সর্ব্বত্র।

"বুলতাঁ দ্য লা শাঁবর দ্য কমার্স দ্য পারি"

প্যারিসের বাণিজ্য-সঙ্ঘকর্ত্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক কাগজ। ১৯২৭ সনের এক সংখ্যায় সুরি "রপ্তানি বাণিজ্যে কর্জ্জ দান" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দিয়াছেন। জগতের নানা দেশে আজকাল বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক

কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্কসমূহের কাজে সাহায্য করিবার জন্য বীমা-প্রতিষ্ঠান কায়েম হইতেছে। ফ্রান্সেও আছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে গবর্ণমেণ্ট কর আদায় করিবে কোন্ প্রণালীতে? ফ্রান্সে এই সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে যে, সমুদ্র-বীমা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলার সঙ্গে এই নতুন কর্জ্জবীমা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই গোত্রে ফেলা উচিত। সেই মর্ম্মে আইনের খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছে।

"রেহ্বি দ্য'ফ্রাঁস"

১৯২৭ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বনে ইতালির মুদ্রা-নীতি সম্বন্ধে সমালোচনা চালাইয়া ফরাসী জাতিকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। ইতালির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ফরাসী মুদ্রা-সংস্কারকেরা ফ্রান্সে নতুন আইন চাহিয়া থাকেন। বনে বলিতেছেন,—ইতালিতে মুদ্রা-সংস্কার ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার জন্য ইতালিকে আর্থিক হিসাবে ভুগিতেও হইতেছে জবর। ইতালির আমদানি রপ্তানিতে একটা সমতা দেখা দিতেছে বটে। কিন্তু তাহার আসল কারণ কি? ইতালিয়ানরা জোর জবর-দস্তি করিয়া বিদেশী মাল কিনিতেছে কম। অপর দিকে শিল্প-জগতে মন্দা চলিতেছে। বেকার-সংখ্যা তাহার এক সাক্ষী। নতুন নতুন কোম্পানী কায়েম হওয়া অনেকটা কমিয়াছে। টাকার বাজারে ব্যবসায়ীরা ধার পাইতেছে না। অনেক কোম্পানীর অংশের দাম নামিয়া গিয়াছে। মুদ্রা-সংস্কারের ফলে শিয়ারের দর বাড়িয়াছে। কাজেই বাজার দর কমা উচিত ছিল, কিন্তু যথোচিত পরিমাণে কমে নাই। দর কমাইবার জন্য কড়া আইন জারি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সুফল ফলিতেছে না। তাহার উপর আর এক কথা। ইতালিয়ান বাজেটের তিন ভাগের এক ভাগই হইতেছে সরকারী কর্জ্জের চাপ। বাজেটের আয় অনুসারে ব্যয় চালানো অসম্ভব। মার্কিণ পুঁজিপতিদের নিকট হইতে প্রতি মাসে ইতালিয়ান শিল্প-বাণিজ্যের জন্য টাকা আমদানি হইতেছে। তাহার ফলে সরকারী গৃহস্থালীতে খরচমাফিক আয় জুটিতেছে। কিন্তু এই অবস্থাকে কোনো মতেই অনুকরণযোগ্য বিবেচনা করা চলে না।

"রেহ্বি্য দ্য পারি"

১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে লেস্কুর ইতালির মুদ্রা-সংস্কার সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, ইতালি ছাড়া অন্য কোন দেশে এইরূপ জবরদস্তি চলিতে পারিত না। কোনো স্বরাজশীল সমাজ মুসোলিনির আইন সহিবে না। অধিকন্তু এই সংস্কারে সুফল ফলিবে কিনা সন্দেহ। দেশের ভিতরকার সরকারী কর্জ্জ আধাআধি রদ করিবার পর মুসোলিনি মুদ্রা-সংস্কারে হাত দিয়াছেন। এই জুলুম ফরাসী ধাতে হজম করা অসম্ভব। ইত্যাদি।

"ইকনমিষ্ট"

বিলাতের আর্থিক সাপ্তাহিক, ফেব্রুয়ারী ৪,১৯২৮। (১) আমাদের শিল্পভবিষ্যৎ (২) দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ অবস্থা (৩) নয়া মূলধন (৪) ১৯২৭ সনের লৌহ ইস্পাত (৫) কিউবার ইক্ষু (৬) কতক-গুলি নাইট্রেট কোম্পানীর ফলাফল (৭) ১৯২৭ সনের জমিজমা (৮) আমেরিকান রেলওয়ে (৯) যানবাহন (১০) ইরাক ও তাহার পারিপার্শ্বিক রাজ্যসমূহ (১১) ব্যবসায় ব্যালান্স, (১২) আমেরিকার জাহাজ কোম্পানীর মালিক (১৩) তুলা শিল্প সমস্যা (১৪) ফরাসী জাহাজ নির্ম্মাতৃগণের ধনবল (১৫) কেবল্‌স ও ওয়্যারলেস (১৬) যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত ঘাটতি (১৭) স্কটল্যাণ্ডের বিধবা তহবিল।

"ক্যাপিট্যাল"

কলিকাতার শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক। ফেব্রুয়ারী ২৩,১৯২৮। (১) আর্থিক বয়কট, (২) ত্রিবাঙ্কুরের কয়ার শিল্প (৩) ভারতীয় রাজস্ব, (৪) পুসার কৃষি গবেষণাভবন (৫) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (৬) বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়া (৭) দুনিয়ার লৌহ ইস্পাত উপাদানের হিসাব, ১৯২৭ (৮) লয়েড ব্যারেজ স্কিম্, (৯) আভ্যন্তরীণ ষ্টিমার

পরিচালনা (১০) কোচিন বন্দর উন্নতি (১১) তুতিকরিণ বন্দর মোসাবিদা (১২) চট্টগ্রাম বন্দর আইন (১৩) দিনাজপুর রেলওয়ে।

"কমার্স"

কলিকাতার আর একখানি ইংরাজি আর্থিক সাপ্তাহিক, ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯২৮। (১) পাঞ্জাবের জলসিঞ্চন প্রণালী (ইরিগেশান) (২) আফগানিস্তান, ইরাক ও প্যালেষ্টাইনে আর্থিক উন্নতি (৩) ইয়োরোপের রাষ্ট্র উন্নতি (৪) ভারতের পেট্রোলিয়াম সম্পদ্ :—গত ১৯২৬ সনের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯২৫ সনে সমগ্র দুনিয়ায় মোট ১৫১০½ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি টন। পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত নবম স্থান অধিকার করিয়া আছে। জগতের পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের খাতায় ভারতের হিস্যা শতকরা ০·৪ ভাগ মাত্র। ১৯১৯ সনে পেট্রোলিয়াম তৈলের খুব সচ্ছল বৎসর গিয়াছে। ঐ সনে ব্রহ্মদেশ ধরিয়া ভারতবর্ষ মোট ৩০৫৫ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করে। ১৯২৫ সনে ভারতের উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ ছিল ২৪৯৫ লক্ষ গ্যালন। (৫) ভারতীয় রাজস্ব, ১৯২৭, (৬) করাচি মিউনিসিপ্যাল কর্জ্জ (৭) পুনার ব্যবসা, (৮) কাথিওয়ার বন্দর, (৯) আহমেদাবাদ বৈদ্যুতিক কোম্পানী, (১০) নিউজিলাণ্ডের বনসম্পদ, (১১) বোম্বাইএর কয়লা ব্যবসায়িগণ (১২) ইণ্ডিয়ান ট্রেড মিশন (১৩) বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘট ই, ভি স্যাস্থন, ইউনাইটেড মিলস। (১৪) ভারতীয় তুলা কোম্পানী (১৫) ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে (১৬) সিমেণ্ট ও ম্যাঙ্গানিজ (১৭) শিপিং ইনশিওর‍্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং (১৮) লৌহ ইস্পাত (১৯) বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘট ইহার আর্থিক সমস্যা ও শ্রমজীবিগণ (২০) আমেরিকার ঐশ্বর্য্য (২১) মিল বনাম তাঁত (২২) নৌশিল্প (ক) ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল মেরিণ (ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী, (খ) রেঙ্গুন যাত্রী-জাহাজ কোম্পানী, (গ) গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যাল মোসাবিদা (ঘ) দুনিয়ার জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প, (ঙ) সিঙ্গাপুরে ভাসমান ডক। (চ) সুয়েজ ক্যানাল, (ছ) লিভারপুলের ডকসমূহ (জ) ব্যবসা সম্প্রসারণ (২০) বীমা—(ক) ১৯১০ সনের বীমা, (খ) বৃটিশ ওক বীমা কোম্পানী, (গ) মেরিণ মোকর্দ্দমা (ঘ) হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনশিওর‍্যান্স জীবন তহবিল, অংশীদারগণের অবস্থা, ব্যালান্স সিট, অডিটারগণের রিপোর্ট। (ঙ) অষ্ট্রেলেসিয়ার ন্যাশন্যাল মিউচুয়াল লাইফ অ্যাসুর‍্যান্স (চ) মেট্রোপলিটান লাইফ অব্ নিউইয়র্ক (ছ) সম্মিলিত বীমা। (২১) ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কার্স—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার হিসাবনিকাশ। (২২) মহীশূরের খনিজসম্পদ (২৩) বাজার-দর (২৪) শেয়ার বাজার।

"ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণ্যাল"

ভারতীয় তুলা ও বস্ত্র-বয়ন বিষয়ক মাসিক। বোম্বাই, ৩১শে জানুয়ারি। (১) বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘট, (২) ল্যাঙ্কাসায়ারের অসুবিধা (৩) জাপানী সূতার আমদানি (৪) বিলাতী ব্যবসার বহর (৫) বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্য, (৬) ভারতে সূতি কাপড়ের কাট্‌তি (৭) ভারতের মোজা গেঞ্জি শিল্প (৮) বৃটিশ শিল্প মেলা ১৯২৮, (৯) ব্লিচিং ডাইং ও ক্লিনিং—মাজা রংকরা ও ধোলাই পদ্ধতি (১০) বোম্বাই মিল ইণ্ডাষ্ট্রী, (১১) ভারতীয় উদ্ভাবন ও পেটেণ্ট, (১২) মহারাষ্ট্র ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (১৩) বাঙ্গালোর কটন মিলস (১৪) শ্রমজীবিগণের যোগ্যতা।

"ইণ্ডিয়ান রিভিউ"

ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮; (১) জাতীয় জীবনে মেয়েদের স্থান। লেডি সিনথিয়া মোজলি (২) পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা (পোলক) (৩) খৃষ্টধর্ম্ম ও দাসত্ব, এস, হালদার (৪) ভারতে ইংরেজ স্বার্থ; স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ও দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও (৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ও দেশীয় রাজ্যসমূহ (৬) কৃষি-সমস্যা; স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায়।



লাভের পরিমাণে ক্রমিক হ্রাস

সকল প্রকার কৃষিকর্ম্মের দস্তুর সম্বন্ধে একটা সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত ধনবিজ্ঞানের আসরে অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাহার মোটা কথা এই যে, জমির উপর যত বেশীই খরচ কর না কেন, খরচার অনুপাতে লাভ উশুল হওয়া অসম্ভব। লাভের পরিমাণটা খরচের অনুপাতে বাড়ে না, ক্রমেই কমিতে থাকে। লাভের পরিমাণে ক্রমিক হ্রাস কৃষিকর্ম্মের একটা খাঁটি বিশেষত্ব। এই সিদ্ধান্ত কতটা টেঁকসই তাহা যাচাই করিবার জন্য মার্কিণ পণ্ডিত প্যাটন নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে একটা গবেষণা চালাইয়াছেন। শ'খানেক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯১৬ সনে রচনা ছাপা হইয়াছে "ডিমিনিশিং রিটার্ণস্ ইন অ্যাগ্রিকালচার" (কৃষিকর্ম্মে লাভের পরিমাণে ক্রমিক হ্রাস) নামে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, সিদ্ধান্তটা মোটের উপর টেঁকসই বটে। প্রথমতঃ, ধরা যাউক যেন টাকা কড়ি বা মুদ্রার চল নাই। অর্থাৎ চাষ ব্যবসায় যাহা কিছু খরচ করা যাইতেছে তাহার দাম টাকায় পয়সায় হিসাব করা হইতেছে না। আবার চাষের শেষে যে ফসলটা পাওয়া যাইতেছে তাহারও টাকায় পয়সায় বাজার-দর কষা হইতেছে না। অতগুলা লোক অত ঘণ্টা করিয়া খাটিল। আর অত সের অত মণ সার, বীজ ইত্যাদি চাষের কাজে লাগিল। গো-বলদের মেহনত, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদিও "বস্তু" হিসাবে মাপিয়া রাখা হইল, দাম বা ভাড়া হিসাবে নয়। এই গেল খরচপত্রের কথা। অপর দিকে ফসলের বেলায় হিসাব রাখা হইল কত মণ মাল উঠিল ইত্যাদি। দুই তরফের তুলনা করিয়া প্যাটন বলিতেছেন যে, বাস্তবিকই মেহনত, গো-বলদ, সার ইত্যাদি পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়িতেছে ফসলের পরিমাণ তাহার চেয়ে কম অনুপাতে বাড়িতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ধরা যাউক যেন দেশে টাকাকড়ির চল আছে, আর টাকা কড়ির মাপেই মেহনত ইত্যাদির আর ফসলের দামও কষা হইতেছে। বাজার-দর অনুসারে যাচাই করিলে এই দুই তরফের সম্বন্ধ কিরূপ দেখা যায়? অবশ্য প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে, চাষ সুরু করা হইতে ফসল বাজারে ফেলা পর্য্যন্ত বাজার-দরের কোনো বিভাগে উঠা-নামা ঘটে নাই। তাহা হইলে মজুরি, গো-বলদ যন্ত্রপাতির দাম বা ভাড়া আর সার বীজ ইত্যাদির দাম একত্র করিলে যে পরিমাণ টাকা পয়সা দাঁড়ায় তাহাই হইল খরচপত্র। এই খরচপত্র যদি ডবল করা যায় তাহা হইলে ফসল যাহা পাওয়া যাইবে তাহার বাজারদর ডবল হইবে কি? প্যাটনের আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, চাষী ডবল খরচ করিয়া ফসলের বেলায় ডবল দামের চেয়ে কম দাম পাইতেছে।

তৃতীয় দফায় প্যাটন বলিতেছেন যে, ঐতিহাসিক হিসাবে এই সিদ্ধান্তটা টেঁকসই নয়। প্রত্যেক দেশেই এমন অনেক জমি আছে যাহার উপর ডবল খরচ করিলে লাভ ডবল বা তাহার চেয়েও বেশী হওয়া সম্ভব। তবে এই সব জমির বিশেষত্বগুলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। যে সব জমিতে খরচ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাভ বাড়িতেছে, সে সকল জমি হয়ত একদম অ-চষা, ভাজা জমি। এইরূপ "পতিত্ জমি"তে আবাদ চালাইতে গিয়া অনেক চাষী হয়ত বা "সোনা" ফলাইয়া ছাড়িতেছে। কিন্তু "পতিত

জমি'' চিরকাল পতিত্ থাকেনা। শেষ পর্য্যন্ত "লাভের পরিমাণে ক্রমিক হ্রাস'' আসিয়া দেখা দেয়ই দেয়। আবার হয়ত এমন অনেক জমি আছে যে সব জমিতে চাষী অনেক দিন ধরিয়া হাল জুতিতেছে বটে। কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রে যতটা সার দেওয়া উচিত অথবা যে ধরণের উৎকৃষ্ট বীজ ছড়ানো উচিত অথবা যতটা শারীরিক মেহনত, যন্ত্রপাতি বা গো-বলদ কায়েম করা উচিত ততটা করা হয় নাই। এই সকল জমিকে আধা চষা, সিকি-চষা বা দু'আনা-চষা বলা চলিতে পারে। এই ধরণের আধাচষা জমির উপর যদি চাষী চাষের খরচ বাড়াইয়া দেয়,—অর্থাৎ বেশী মেহনত লাগায়, ভাল বীজ ছড়ায়, যথোচিত সার দেয় আর যন্ত্রপাতির সাহায্য লয় তাহা হইলে জমিগুলা পুরা-চষায় পরিণত হইবে। এইরূপ আবাদকে "গভীরতর" বা পুঙ্খানুপুঙ্খ চাষ বলা হইয়া থাকে। বিদেশী পারিভাষিকে ইহার নাম "ইনটেন্সিভ্" চাষ। এই ধরণের "গভীরতর" চাষ যখন চলিতে থাকে তখন অবশ্য খরচ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুপাতে অথবা এমন কি খরচের অনুপাতের চেয়েও উচু হারে—লাভ উশুল হওয়া সম্ভব। কিন্তু "পতিত্ জমি" যেমন একদিন না একদিন চষা জমিতে পরিণত হয়ই হয়, তেমনি আধা-চষা জমিও কোনো দিন পুরা চষা বা "ইন্‌টেন্‌সিভ" চষা জমিতে দাঁড়াইয়া যায়। তখন আবার শেষ পর্য্যন্ত "ক্রমিক হ্রাসের নিয়ম" লাভের পরিমাণ ও অনুপাতকে আক্রমণ করে।

পুঁজি ও যন্ত্রপাতি

ডেনমার্কের কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বির্ক জার্ম্মাণির কীল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেইটা "টেখনিশার ফোর্টশ্রিট উণ্ড য়িবার প্রোডুকটসিয়োন,' (যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে মাল-উৎপাদনে অতিবৃদ্ধির যোগাযোগ) নামে বাহির হইয়াছে (১৯২৭)। মাল-উৎপাদনের "অতিবৃদ্ধি" হইলে সমাজে "আর্থিক দুর্যোগ" "বাণিজ্যিক ধূমকেতু'' ইত্যাদি উপস্থিত হয়। তাহার ফলে কিছুকাল ধরিয়া বহুলোক বেকার থাকিতে বাধ্য। আর অনেক বেপারীর মাল পচে। সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিওয়ালাদের টাকাকড়িও নষ্ট হয়। মার্কস্-পন্থীরা পুঁজিতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহাদের বিচারে পুঁজি-সংগ্রহ, পুঁজি-নিষ্ঠা ইত্যাদিই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। যতদিন সমাজে ধন "সঞ্চয়ে"র বাতিক থাকিবে ততদিন "আর্থিক দুর্যোগ" লাগিয়া থাকিবেই। বির্ক বলিতেছেন, এই যুক্তি টেঁকসই নয়। তাঁহার মতে "চাই আরও পুঁজি"। দুনিয়ায় যে পরিমাণ পুঁজি আছে তাহাতে জগতের নরনারীর অভাব মোচন হইতে পারে না। মানুষের উদ্ভাবিত কলযন্ত্র আজকাল অনেক দিকে উন্নত হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা আর জটিলতাও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ আজকাল অনেক নতুন উপায়ে তাহার দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলাকে মানুষের কাজে লাগাইতে হইলে চাই রুধির চাই "পুঁজি"। এককথায় মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা যে পরিমাণে বাড়িতেছে মানুষের ধনসঞ্চয়, মানুষের পুঁজিনিষ্ঠা, মানুষের পুঁজিসংগ্রহ সেই পরিমাণে বাড়িতেছে না। কাজেই যথোচিত সংখ্যক নরনারীকে মজুর, কেরাণী, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক হিসাবে বাহাল করা সম্ভবপর হইতেছেনা। পুঁজির পরিমাণ বাড়ুক তাহা হইলে কলযন্ত্রগুলাকে ধনোৎপাদনের কাজে গোলামের মতন খাটাইয়া মধ্যবিত্তের আর মজুর-চাষীর বেকার-সমস্যা মীমাংসা করা সম্ভবপর হইবে।

"যুক্তি-যোগ'' ও "স্বদেশ-যোগ''

চাষ ব্যবসায় পাকা ওস্তাদ এক জার্ম্মাণ জমিদার যুক্তি-যোগের স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন। তাঁহার নাম ব্লাঙ্কেন্ষ্টোনিঙ্গেন। বইটার নাম রাটসিওনাল-হ্বির্টশাফ্‌ট্ উণ্ডনাট্সিওনাল-হ্বিট্‌শাফ্‌ট্ (যুক্তিযোগের ধনব্যবস্থা আর জাতীয়তার ধনব্যবস্থা)। ১১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ রচনায় লেখক বলিতেছেন যে,—শিল্প কারখানায় সঙ্ঘগঠন যেমন জরুরি তেমনি জরুরি সঙ্ঘগঠন কৃষিকর্ম্মেও। বিশেষভাবে গাভী, শুয়র ইত্যাদি "পারিবারিক" জানোয়ার-চাষের

কারবারে বৃহদাকার ব্যবস্থা না থাকিলে লাভবান হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ছোট ছোট পশুপালন ব্যবসা ছাড়িয়া এই দিকে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিতে অগ্রসর হইলেই যুক্তি-যোগের নিয়ম পালন করা হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। শস্য, তরী-তরকারী আর ফলমূলের চাষে গা-ঢিলা দিলে চলিবেনা। এই দিকে নজর রাখা চাই দস্তুরমত। অধিকন্তু কোনো এক প্রকার চাষে বিশেষজ্ঞ হইয়া পড়িলে দেশের পক্ষে ক্ষতির সম্ভাবনা। চাই এক সঙ্গে নানাবিধ ফসল ও ফলমূলের চাষ। লেখক এইখানেই খতম করেন নাই। তিনি স্বদেশকে খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে ষোল আনা অথবা যথাসম্ভব স্বরাজী করিয়া তুলিতে চাহেন। এইরূপ আত্ম-নির্ভরতার উপায় হইতেছে সংরক্ষণ-শুল্ক। এই শুল্কের সাহায্যে বিদেশী ফসল ও ফলমূল হইতে দেশের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে।

ক্যানাডিয়ান অ্যানুয়্যাল রিভিউ অব্ পাব্লিক অ্যাফেয়ার্স ১৯২৬-২৭

(দি ক্যানাডিয়ান রিভিউ কোম্পানী লিঃ টরেন্টো, ক্যানাডা), ১৯২৭।

এই বাৎসরিক কেতাবখানি শ্রীযুক্ত জে, ক্যাষ্টেল হপকিন্স কর্তৃক বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ইহাতে ক্যানাডার আর্থিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সকলপ্রকার তথ্যমূলক সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। বর্ত্তমান বাৎসরিকখানিতে মোট ৮০০ পৃষ্ঠা আছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার বুক অ্যাগ্রিকালচারাল ষ্টাটিসটিকস্ ১৯২৬-২৭

(দি ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব অ্যাগ্রিকালচার, রোম) ১৯২৭।

রোমের আন্তর্জ্জাতিক কৃষিভবন হইতে প্রকাশিত এই ইয়ার বুক খানিতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের কৃষি-বিষয়ক বহু প্রয়োজনীয় তথ্যমূলক খবর দেওয়া হয়। দুনিয়ার কোন্ দেশের চাষের জমি কতখানি, কোন্ দেশের জমিতে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসের কাজ চালান হয়, কোন কোন সার উন্নত ধরণের ফসল জন্মাইবার পক্ষে উপযোগী, ইত্যাদি সকল বিষয় ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অফিশিয়্যাল ইয়ার বুক অব্ দি ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা

(সুপারিন্টেনডেন্ট, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং অ্যাণ্ড ষ্টেশনারি অাফিস, প্রিটোরিয়া, সাউথ আফ্রিকা) ১৯২৭।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নের অধীন রাষ্ট্র ও উপ-নিবেশগুলির শাসনতন্ত্র, জন-সংখ্যা, ভাইটাল ষ্টাটিসটিকস্, সাধারণ স্বাস্থ্য, হাঁসপাতাল, শিক্ষা, শ্রমজীবী ও শিল্প অবস্থা, বাজার দর, জীবন যাত্রা প্রণালী, সামাজিক অবস্থা, বিচার-পদ্ধতি, পুলিশ, নির্ব্বাচন-প্রণালী, "নেটিভ" সমস্যা। জমি ইরিগেশান, কৃষি, মৎস্য শিল্প, খনি, শিল্প-বাণিজ্য, বন্দর, শিপিং, রেলওয়ে, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সকল সংবাদ ইহাতে পাওয়া যায়। সাময়িক বাৎসরিক সংবাদ ব্যতীত বিগত ১৫ বৎসরের তুলনামূলক সংবাদ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

ইয়ারবুক অব্ দি ইউনিভার্সিটিজ অব্ দি এম্পায়ার—১৯২৭

(মেসার্স জি, বেল অ্যাণ্ড সন্স, লিঃ লণ্ডন) ১৯২৭।

ইহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির সংবাদ আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ইয়ারবুক, ১৯২৭

(জর্জ্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন লিঃ, ৪০ মিউজিয়াম ষ্ট্রীট)।

সোভিয়েট গণতন্ত্রের এই বার্ষিকী—শ্রীযুক্ত এ, এ, ষ্টানলো অ্যাণ্ড লুই সেগাল, পি-এইচ, ডি, এম, এ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার সংবাদ ও তথ্যের বহর দেখিয়া ইহাকে

রুশ দুইটেকার বলা চলে। রুশিয়ায় এক অভিনব আর্থিক ও সামাজিক চিন্তাধারার পরীক্ষা চলিতেছে। বর্ত্তমান রুশিয়াকে জানিবার জন্ত এই কেতাবখানি খুব প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

বোম্বে ইণ্ডাষ্ট্রীজ অ্যাণ্ড কটন মিলস্

(দি ইণ্ডিয়ান টেকস্‌টাইল জার্ণ্যাল লিঃ, বোম্বাই), ১৯২৭।

ইণ্ডিয়ান টেকসটাইল জার্ণালের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস, এস রতনাগর কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত। ইহাতে বোম্বাইএর বস্ত্রশিল্প ও কটন মিলগুলির বিষয় পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতী বস্ত্র বয়কটের আন্দোলনকারী বাঙ্গালী সন্তানগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভাল হয়।

দি সিটিজেন

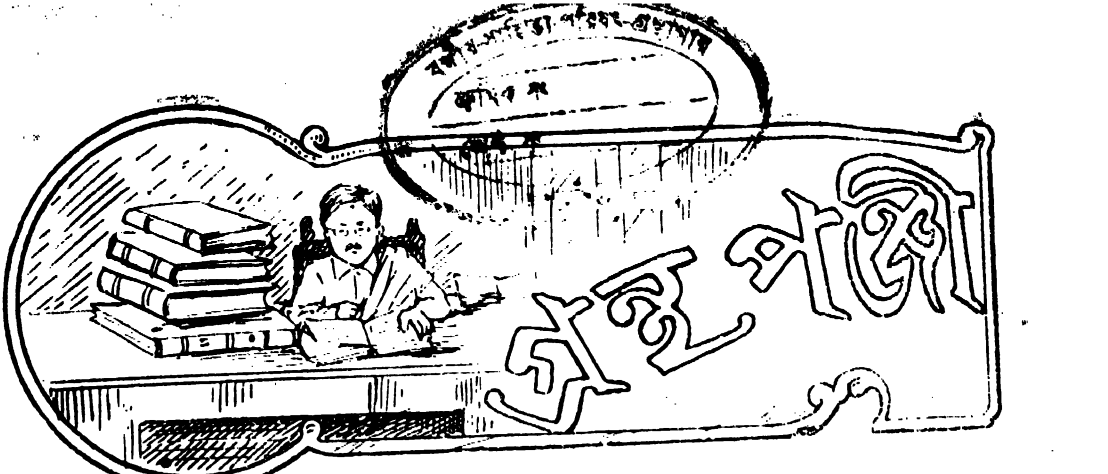
(নাগরিক), শ্রীযুক্তা এইচ, এ, এল ফিসার কৃত (ডব্লিউ আর চেম্বার্স লিঃ লণ্ডন) ১৯২৬। ৫+২৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য ২॥ শিলিং।

এই গ্রন্থখানায় ইংরেজ জাতির রাজ্যশাসন প্রণালী দেখান হইয়াছে। নাগরিক শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ফিসার মহোদয়া বলিয়াছেন,—"নাগরিকের কর্ত্তব্য হইবে গোটা মানব জাতির ইতিহাসকে সাধারণভাবে অবগত হওয়া এবং তাহার স্বদেশের ইতিহাসের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত হওয়া। ইহার দ্বারা সে তাহার নিজের ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ কারবার লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বীয় নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইতে পারিবে।"

সোশ্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হিষ্টরি অব্ বৃটেন

বিলাতের সমাজ ও শিল্প ইতিহাস। শ্রীযুক্ত এ, এ, ডব্লিউ রামজে প্রণীত। ডব্লিউ অ্যাণ্ড আর চেম্বার্স লিঃ লণ্ডন ১৯২৬। ৬+৩২২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ শিলিং।

ডাক্তার রামজে এই কেতাবখানায় বলিতেছেন,— "সামাজিক ইতিহাসে একটা জাতির অতীত জীবন-ধারা তাহাদের আচার ব্যবহার, ধরণ ধারণ এবং অন্যান্য জাতির সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ এই-সকলের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে শিল্প-ইতিহাসে ঐ জাতির লোক কি ভাবে পরিশ্রম করিত, কি ভাবে তাহারা তাহাদের পরিবার চালাইত তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিত এবং গৃহ প্রস্তুত করিত তাহার কথা জানিতে পারা যায়।" শিল্প-ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র ভারতবাসীর পরিধানে কেমন করিয়া আসে, হল্যাণ্ডের টিনভরা দুধ কি প্রকার এদেশের পোষ্যদের জীবন-ধারণের কার্য্যে সহায়তা করে। বস্তুতঃ, শিল্প-ইতিহাস বা একটা জাতির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচিত না হইলে তাহার রাষ্ট্রীয় জীবন বুঝিতে পারা যায় না।



"দি এম্পায়ার বিল্ডার," শ্রীযুক্ত লর্ড ওলিভিয়ার প্রণীত। (হেগোর্থ প্রেস, লণ্ডন) ১৯২৭, ৪৮ পৃষ্ঠা।

"ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্সমেন", ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ, ন্যেটসান এণ্ড কোং ম্মাদ্রাজ) ১৯২৭, ৮+৩৮৪ পৃষ্ঠা মূল্য ৩৲।

"দি ট্রেজারি", খাজাঞ্চিখানা, সার টমাস এল হেলথ (জি, পি, পুটন্যামস্ সন্স লিঃ লণ্ডন) ১৯২৭, ২৬৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৭শিঃ ৫পেঃ।

"ল্যাণ্ড টেনিওর অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালচারাল প্রডাকশান ইন দি ট্রপিক্স", গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমি ও কৃষিজাত দ্রব্য, এইচ, মার্টিন লিক, (ডব্লিউ হেফার অ্যাণ্ড সন্স, লিঃ ক্যাম্ব্রিজ) ১৯২৭, ১৩৯ পৃঃ মূল্য ৫শিঃ ৬ পেঃ।

"কন্‌টেম্পোরারী থট্ ইন্ জাপান অ্যাণ্ড চায়না", জাপান ও চীনের সমসাময়িক চিন্তাধারা, ডাক্তার কাইসন সুচিদা (উইলিয়াম্‌স্ অ্যাণ্ড নর্গেট লিঃ লণ্ডন) ১৯২৭. ২৩১১ পৃঃ মূল্য ৫ শিঃ।

"এ কমপ্যারেটিভ ষ্টাডি অব দি ল অব ইনসলভেন্সি ইন বৃটিশ ইণ্ডিয়া", বৃটীশ ভারতে দেউলিয়া আইনের তুলনামূলক গবেষণা। ডি বি ক্ষীরসাগর প্রণীত। ১৯২৭, ২৩৯ পৃঃ মূল্য ৫৲ টাকা।

"লেপ্রসি ইন ইণ্ডিয়া", ভারতে কুষ্ঠব্যাধি (ওয়ার্ল্ড ডমিনিয়ন প্রেস, লণ্ডন) ১৯২৭, ২২ পৃঃ মূল্য ২ শিঃ।

"লেনিন অ্যাণ্ড গান্ধি", লেনিন ও গান্ধি, রেনি এফ্ মিলার (জি, পি পুটন্যাম্‌স্ সন্স লণ্ডন) ১৯২৭, ৩৪০, পৃঃ, মূল্য ২১ শিঃ।

"ভেকেশান্স ফর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস" শিল্প-মজুরগণের ছুটী। চার্লস এম মিলস (দি রোনাল্ড প্রেস কোং নিউইয়র্ক) ১৯২৭ ; ৩২৮ পৃঃ মূল্য ৫ ডলার।

"দি আউটলরি অব ওয়ার- এ কনষ্ট্রাকটিভ পলিসি ফর ওয়ার পিস" যুদ্ধ বে-আইনীকরণ জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার দাওয়াই, চার্লস ক্লেটন মরিসন প্রণীত (উইলেট ক্লার্ক এণ্ড কোলবি, শিকাগো) ১৯২৭,৩০০ পৃঃ, মূল্য ৩ ডলার।

"দি ট্রুথ অ্যাবাউট দি চাইনিজ রিপাবলিক", চীনগণতন্ত্র সম্বন্ধে সত্যকথা, এইচ জি ডব্লিউ ভহেড (হার্ষ্ট অ্যাণ্ড ব্লাকেট লিঃ লণ্ডন) ১৯২৭, ২৮৭ পৃ মূল্য ৭ শি ৬ পে।

"প্রিন্‌সিপ্‌লস্ অব এমপ্লয়মেণ্ট সাইকোলজি" হ্যারল্ড আর্নেষ্ট ব্রাট (হাফটন মিফ্লিন কোম্পানী, বষ্টন, ১৯১৭, ৫৬৮ পৃ।

"নিউ ট্যাকটিক্‌স্ ইন সোশ্যাল কনফ্লিক্ট", সামাজিক বিপ্লবের নূতন ধারা, এইচ ডব্লিউ লেডলার ও নর্ম্মাণ টমাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ভ্যানগার্ড প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯২৬। ১৩০ পৃঃ মূল্য ৫০ সেণ্টস।

"ইজিপ্ট", জর্জ্জ ইয়ং ; মডার্ণ ওয়ার্ল্ড সিরিজ, আর্ণেষ্ট বেন লিঃ, লণ্ডন, ১৯২৭, ৩৫২ পৃঃ, মূল্য ১৫ শিঃ।

মিত্র শক্তিবর্গের ঋণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬। সিক্কা ও চালান ব্যাঙ্ক

ক। সকল শ্রেণীর লোক, বিশেষতঃ মজুররা সিক্কায় স্থিত ঘটিলে উপকৃত হইবে।

খ। বর্ত্তমান অবস্থায় রেণ্টেন্‌মার্ক স্থিতটা অস্থায়ী মাত্র।

গ। একটা নয়া ব্যাঙ্ক খাড়া করা হইবে অথবা রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক পুনর্গঠিত হইবে।

ঘ। ব্যাঙ্কের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ হইবে :—

(১) স্থিত ভুমির উপর নোট বাহির করা। স্থিত অর্থ সোনার সম্পর্কে স্থিত। এই সুবিধা আর কোন ব্যাঙ্কের থাকিবে না।

(২) ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করা। ইহাই সরকারী ডিস্‌কাউণ্ট বা বাটার হার বাঁধিয়া দিবে।

(৩) গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করা। কিন্তু কোনপ্রকার গবর্ণমেণ্ট শাসন থাকিবে না।

(৪) গবর্ণমেণ্টকে আগাম দেওয়া খুব সীমাবদ্ধ রাখা হইবে।

(৫) ক্ষতি-পূরণের মুদ্রাগুলি আমানতে গচ্ছিত রাখা।

(৬) ব্যাঙ্কের পুঁজিপাটা ৪০ কোটি স্বর্ণ মার্ক হইবে।

(৭) ইহা একজন জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্ট ও ম্যানেজিং বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহাদিগকে একটা জার্ম্মাণ পরামর্শ-সমিতি সাহায্য করিতে পারে।

(৮) ষ্ট্যাটিউট বা নিয়ম মানাইবার জন্য একটা জেনারেল বোর্ড থাকিবে। তার আধা সভ্য (একজন কমিশনার ধরিয়া) বিদেশী হইবে।

৭। বাজেট ও অস্থায়ী ক্ষতিপূরণ সাহায্য

জার্ম্মাণ বাজেটে ব্যালান্স আনিবার জন্য দরকার :—

ক। সম্পূর্ণ আর্থিক ও রাজস্ববিষয়ক স্বামিত্ব বা কর্ত্তৃত্ব। শুধু এই রিপোর্টে যে "সুপারভিশন্‌" বা তত্ত্বাবধানের কথা আছে, তা মানিতে হইবে।

খ। স্থিত সিক্কা।

গ। সন্ধিঋণগুলি মিটাইবার জন্য বাজেটের উপর "চার্জ" বা দায়গুলি হইতে সাময়িক অব্যাহতি।

ঘ। এরূপ অব্যাহতিতে অত্যাবশ্যক মাল অর্পণ বন্ধ থাকিবে না।

৮। জার্ম্মাণির বাৎসরিক "ভার" তত্ত্বের গোড়ার কথা

ক। সন্ধিনামার ঋণ স্বীকার অপ্রতিহত বাজেট ব্যালান্স।

(১) বাজেট ব্যালান্সের অর্থ শুধু আভ্যন্তরিক শাসন-খরচ চালানোর অর্থ সংস্থান নয়।

(২) জার্ম্মাণি তার যতদূর সাধ্য ততদূর পর্য্যন্ত, সন্ধিনামার ঋণগুলি শোধ দিবার ব্যবস্থা করিবে।

(৩) জার্ম্মাণির মোট পুঁজিপাটা ঋণের খবর না লইয়াও বাজেট ব্যালান্স হইতে পারে।

(৪) যদি বাৎসরিক দায়টা আগে হইতে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া না হয় তবে বাজেট ব্যালান্স অব্যাহত রাখা অসম্ভব।

খ। "কমেনসুরেট্‌ ট্যাক্সেশন" বা সমানুপাতিক কর আদায়।

(১) সিক্কার "ডিপ্রিশিয়েশন" বা মূল্য হ্রাস হেতু বলিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরিক ঋণ উঠিয়া গিয়াছে।

(২) করাসী ইংরেজ ইতালিয়ান্‌ ও বেলজিয়ান করদাতার ভারের সমানুপাতে নয়া ঋণদায় মিটান উচিত।

(৩) ভার্সাই সন্ধি এই মূলতত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে।

(৪) ইহা নীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত বটে।

(৫) উৎপাদন খরচার উপর প্রভাবের ব্যাপারে ইহা অর্থনৈতিক দিক্ হইতেও ন্যায়সঙ্গত।

(৬) এই তত্ত্ব কাজে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে।

গ। জার্ম্মাণির সমৃদ্ধিতে মিত্রগণের অংশ।

(১) জার্ম্মাণির সমৃদ্ধিতে উন্নতি ঘটিলে জার্ম্মাণির মহাজনদিগকে তার ভাগ দিতে হইবে।

(২) সমৃদ্ধ-নির্ঘণ্ট দ্বারা ইহার সঠিক বার্ত্তা পাওয়া যাইবে।

ঘ। জার্ম্মাণির কর দিবার সামর্থ্য ও জার্ম্মাণির বিদেশে ধন-সম্পত্তি হস্তান্তর ঘটাইবার সামর্থ্য এই দুয়ের মধ্যে একটা গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে।

৯। কোন্ কোন্ সঙ্গতি হইতে ঋণ শোধ হয়?

জার্ম্মাণির সন্ধির দায়গুলি শোধ দিবার উপায় তিনটা। ক। কর। খ। রেলওয়ে; গ। শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত ডিবেঞ্চার।

ক। সাধারণ বাজেট হইতে।

১। ১৯২৪-২৫ সনের বাজেট ব্যালান্স হইতে পারে, যদি শান্তি সন্ধিনামার দায়গুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২। ১৯২৫-২৬ সনের বাজেট বিশেষ বিশেষ 'উপায়ে'র বাবদ ৫০ কোটি সোণার মার্ক পাইবে। এটা ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

৩। ১৯২৬-২৭ ... ১১ কোটি সো-মা

৪। ১৯২৭-২৮ ... ৫০ কোটি সো-মা

৫। ১৯২৮-২৯ ... ১২৫ কোটি সো-মা

এই বছরটাকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা পাকা বছর ও ঋণ শোধটাকে প্রমাণ ঋণশোধ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহার পর অতিরিক্ত শোধ চলিবে, আর তা নির্ভর করিবে সমৃদ্ধির উপর।

খ। রেলওয়ে হইতে।

(১) রেলওয়ে বণ্ড।

(প) ক্ষতিপূরণের জন্য ২৬ মিলিয়ার্ড বা ২৬ শত কোটি পুঁজিপাটা খরচার বিরুদ্ধে ১১ শত কোটি (মার্ক) প্রথম "মর্টগেজ" বা বন্ধকী রেলওয়ে বণ্ড সৃষ্টি করা হইবে।

(ফ) এই বণ্ডগুলির বাৎসরিক সুদ ৫% ও সিঙ্কিং ফাণ্ড ১% হইবে।

(ব) পুনর্গঠন হইবে। এই হেতুতে নিম্নলিখিত সুদ গ্রহণ করা হইবে।

১৯২৪-২৫—৩৩ কোটি স্বর্ণমার্ক

১৯২৫-২৬—৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ স্বর্ণমার্ক

১৯২৬-২৭—৫৫ কোটি স্বর্ণমার্ক

১৯২৭-২৮ ও তারপর—৬৬ কোটি স্বর্ণমার্ক।

এই বণ্ডগুলির পিছনে, সৃষ্টি করা হইবে :—

২ শত কোটি প্রেফারেন্স শেয়ার। এগুলি সর্ব্বসাধারণের কাছে বেচিবার জন্য রিজার্ভ করিয়া রাখা যাইবে; এবং ১৩ শত কোটির সামান্য ষ্টক [সংখ্যাগুলি মার্ক সম্বন্ধীয়]।

প্রেফারেন্স শেয়ার বেচা মুদ্রার ¾ অংশ ঋণ-শোধে এবং রেলওয়ের পুঁজিপাটা খরচে প্রয়োগ করা হইবে। বাকী ৫০০ শত কোটি প্রেফারেন্স শেয়ার ও সমস্ত সামান্য শেয়ারগুলি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট পাইবে [সংখ্যা মার্কের]।

(২) "ট্রান্সপোর্ট ট্যাক্স" বা মাল চালানের কর। ১৯২৫-২৬ সনের পর ক্ষতিপূরণের জন্য বৎসরে ২৯ কোটি স্বর্ণ মার্ক। বাকীটা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের।

গ। শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত ডিবেঞ্চার।

(১) ক্ষতিপূরণের জন্য ৫ শত কোটি শিল্প-বাণিজ্য ডিবেঞ্চারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) ইহাতে ব্যবসার উপর যে দায় চাপান হইবে তা যুদ্ধের পূর্ব্বে যা ছিল এবং মূল্যহ্রাস হেতু যা মুছিয়া গিয়াছে, তার চেয়ে কম হইবে।

(৩) এই বণ্ডগুলির সুদ ৫% আর সিঙ্কিং ফাণ্ডে ১% অর্থাৎ বাৎসরিক ৩০ কোটি স্বর্ণ মার্ক।

(৪) আর্থিক পুনঃসংস্কার না হওয়া অবধি নিম্নলিখিত ভাবে সুদ ও সিঙ্কিং ফাণ্ড গ্রহণ করা হইবে :—

প্রথম বছর—কিছুই না,

দ্বিতীয় বছর—১২ কোটি ৫০ লক্ষ সো-মা,

তৃতীয় বছর—২৫ কোটি সো-মা,

তৎপরে—৩০ কোটি সো-মা।

১০। সন্ধি অনুযায়ী ঋণ শোধ ব্যবস্থার সার মর্ম্ম

ক। (১) বাজেট মরেটোরিয়াম কাল।

১ম বছর।—বিদেশী ঋণ এবং রেলওয়ে বণ্ডের উপর আংশিক সুদ হইতে মোট ... ১শত কোটি সো-মা

২য় বছর।—রেলওয়ে বণ্ডের উপর ও শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ডিবেঞ্চারের উপর আংশিক সুদ, বাজেট আনুকূল্য, রেলওয়ে শেয়ার ৫০ কোটি সো-মা বিক্রয় হইতে

মোট... ১২২ কোটি সো-মা।

(২) "ট্রান্‌জিশন" বা অবস্থান্তর কাল।

৩য় বছর।—রেলওয়ে বণ্ডের উপর ও শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ডিবেঞ্চারের উপর আংশিক সুদ, মাল-চালনার কর এবং বাজেট হইতে

মোট ১২০ কোটি সো-মা।

(ইহার সহিত বা ইহা হইতে যোগ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা আছে অনিশ্চিত ২৫ কোটি সো-মা'র)।

৪র্থ বছর।—রেলওয়ে বণ্ডের উপর ও শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ডিবেঞ্চারের উপর আংশিক সুদ, মাল-চালনার কর এবং বাজেট হইতে

মোট... ১৭৫ কোটি সো-মা।

(ইহার সহিত বা ইহা হইতে যোগ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা আছে অনিশ্চিত ২৫ কোটি সো-মা'র)।

(৩) ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা পাকা বছর।

৫ম বছর।—রেলওয়ে বণ্ডের উপর ও শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ডিবেঞ্চারের উপর আংশিক সুদ মাল-চালনার কর এবং বাজেট হইতে

মোট ... ২৫০ কোটি সো-মা।

(ইহার পর ২৫০ কোটি সো-মা+সমৃদ্ধি-নির্ঘণ্টের উপর গণনীয় অতিরিক্ত কিছু)।

এই সব অঙ্কপাতির মধ্যে সিকিউরিটির উপর সুদ ধরা হইয়াছে, কিন্তু সিকিউরিটি বেঁচা মুদ্রা ধরা হয় নাই।

খ। যে দিন হইতে প্ল্যানটা গৃহীত হইবে ও তদনুযায়ী রীতিমত কাজ আরম্ভ হইবে, সেইদিন হইতেই ১ম বছরের আরম্ভ।

১১। এই হিসাবে কোন্ পরিমাণ ও দ্রব্যাংশ আছে?

ক। পূর্ব্ব-উল্লিখিত মুদ্রার মধ্যে মিত্র ও সহযোগী শক্তিবর্গের নিকট জার্ম্মাণ যতটার জন্য দায়ী, তার সব ধরা হইয়াছে।

খ। দ্রব্যাদির দ্বারা শোধটা চলিতে থাকিবে; কিন্তু তাদের মূল্য দেওয়া হইবে ব্যাঙ্কে যে ব্যালান্স আছে তাহা হইতে।

১২। জার্ম্মাণি কিরূপে বাৎসরিক ঋণ শোধ করিতেছে?

ক। মুদ্রা স্বর্ণমার্কে উঠান হইবে এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে।

খ। এই গচ্ছিত ধন জার্ম্মাণির বাৎসরিক ঋণ শোধের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

১৩। মহাজনরা শোধটা কিরূপে গ্রহণ করিতেছে?

ক। জার্ম্মাণির মহাজনরা মুদ্রাগুলি জার্ম্মাণিতে ব্যবহার করিবে অথবা এগুলিকে বিদেশী সিক্কায় পরিণত করিবে।

খ। অভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিবে এই পরিণতি কি হারে এবং কতদূর পর্য্যন্ত নিরাপদ ভাবে ঘটিতে পারে।

গ। অত্যধিক অর্পণের ফলে স্থিত বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। এই বিপদকে বাধা দিবার জন্য ট্রান্সফার কমিটি মোতায়েন থাকিবে।

ঘ। মুদ্রা না পাঠাইলে জমিতে থাকিবে। কিন্তু কি পরিমাণ জমিতে পারিবে তার একটা সীমা আছে।

৪। রেলওয়ে ও ব্যবসায় বণ্ড ত আছেই—আরও গিরমিট

ক। বাজেট আনুকূল্য ও অন্যান্য উপায়ে ঋণ-শোধের জন্য নিম্নলিখিত রাজস্বগুলি কোলেটারেল সিকিউরিটি হিসাবে বাঁধা রাখা হইয়াছে:

(১) সুরাসার

(২) তামাক

(৩) বিয়ার (মদ্য)

(৪) চিনি

(৫) কাষ্টমস বা শুল্ক

খ। এইগুলির রাজস্ব ঋণ-শোধের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী।

গ। বাড়্তিটা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। বাহিরের ঋণ—সর্ত্ত ও উদ্দেশ্য

৮০ কোটি স্বর্ণ মার্কের বিদেশী ঋণে দুইটা উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।

ক। নয়া ব্যাঙ্কের স্বর্ণ রিজার্ভের প্রয়োজনটা মিটিতেছে।

খ। ১৯২৪-২৫ সনে অত্যাবশ্যক সন্ধির উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরিক ঋণ শোধ হইতেছে।

১৬। সংগঠন

সংগঠনে থাকিবে:—

ক। রেলওয়ে ব্যবসায় বণ্ডের জন্য এক ট্রাষ্টি।

খ। তিনজন কমিশনার—(১) রেলওয়ের, (২) ব্যাঙ্কের, (৩) পরবশ রাজস্বের।

গ। ক্ষতিপূরণের জন্য একজন এজেণ্ট। ইনি উল্লিখিত ব্যক্তিদের সহিত একযোগে কাজ করিবেন ও ট্রান্সফার কমিটির সভাপতিত্ব করিবেন।

১৭। প্ল্যানের প্রকৃতি

ক। প্ল্যানটা অবিভাজ্য একক বস্তু।

খ। প্ল্যানের উদ্দেশ্য।

(১) জার্ম্মাণি হইতে সর্ব্বাধিক পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

(২) জার্ম্মাণির মহাজনদের হাতে যাতে উর্দ্ধতন পরিমাণ আসে।

(৩) "জার্ম্মাণি কি দিতে পারে" এই কথাটাকে কল্পনারাজ্য হইতে বাস্তব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

(৪) সুবিধা হইলেই ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ও বিস্তৃত সমঝৌতার বন্দোবস্ত করা।

অষ্টম অধ্যায়

সমালোচনা

১। বর্ত্তমান দুনিয়া যুদ্ধের পরের দুনিয়া

মনে হইতে পারে বটে যুদ্ধ হইয়া চুকিয়া গিয়াছে আজ বছর দশেক। জার্ম্মাণির ক্ষতিপূরণ ও ইউরোপের ঋণ শোধ লইয়া তারপর বহু বক্তৃতা আলোচনা ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে। সেই পুরাণা কথা আবার ঘাঁটিয়া ফয়দা আছে কি? নূতন কোন আলোক পাইবার সম্ভাবনা আছে কি?

ইহার উত্তরে একথা না হয় নাই বলিলাম যে, সমসাময়িক ঘটনার অপক্ষপাত ও সংস্কারশূন্য বিচার সম্ভব নয়। আজ ৮।১০ বছর পরে ঘাঁটাঘাঁটি করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই।

সম্প্রতি এই ঋণ শোধের ব্যাপার লইয়া আমেরিকাতে ও ইংলণ্ডে বেশ একটু মন-কষাকষি হইয়া গিয়াছে। আমেরিকায় গুজব রটিল, "ইংলণ্ড আমেরিকাকে যতখানি ঋণ শোধ দিতেছে তার দ্বিগুণ পরিমাণ পাইতেছে ইউরোপীয় খাতকদের কাছ হইতে।" অর্থাৎ ইংলণ্ড অবিশ্বাসীর কাজ করিতেছে। এক সময়ে বড় গলা করিয়া বলিয়াছে আমেরিকা আমাদের কাছে যা পাইবে শুধু সেইটুকু ইউরোপ আমাদিগকে দিক। আমরা তখন আমেরিকার ঋণ শুধিয়া দিব ও ইউরোপের কাছে বাকীটা চাহিব না। এই কথার সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রথম ও পঞ্চম মুদ্রিত বিষয়গুলির মধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

আমেরিকার গুজবটা সরকারী গুজব বা অভিযোগ

নয়। কিন্তু আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট গুজবটা রটিতে বাধা দেয় নাই। ইংল্যাণ্ডে সরকার হইতে, বিভিন্ন কাগজের পক্ষ হইতে, ব্যবসায়ী মহল হইতে ঘোরতর প্রতিবাদ উঠিয়াছে। আমেরিকা সরকার এই প্রতিবাদ স্বীকার করিয়াছে, গুজবটা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে; কিন্তু আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলে নাই। কাজেই কারো মনের মেঘ কাটিয়া যায় নাই।

এইরূপে ক্ষতিপূরণ ও ঋণ-শোধের ব্যাপারটা আবার নূতন করিয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যাইতেছে।

বস্তুতঃ, যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু দুনিয়া এখনও তাল সামলাইতে পারে নাই। তাল সামলাইবার উপায়টাও যথাযথ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

মানুষ বা জাতি আপন অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নূতন পথে যাত্রা করে। কিন্তু কোন জাতি বা রাষ্ট্র যুদ্ধের পর আজ আর হালে পানি পাইতেছে না। ইহার পূর্ব্বেও যুদ্ধ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও যুদ্ধ-শান্তির সমস্যা-গুলি বিপুল আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেই বিপুল-তাকে আজিকার সমস্যার বিপুলতা উপহাস করিতেছে।

বিপ্লব ঘটিয়াছে কার্য্যে বাক্যে চিন্তায়—রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ইত্যাদি মানব-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে। শুধু ইউরোপ আমেরিকায় নয়, সমগ্র দুনিয়ার উপর দিয়া ভীষণ ঝঞ্ঝা বাত্যা বহিয়া গিয়াছে।

তাই বর্ত্তমান দুনিয়া বলিতে বুঝিতে হইবে যুদ্ধের পরের দুনিয়া। গত মহাযুদ্ধের আগের দুনিয়া অর্থাৎ ১৯১৪ সনের ৪ঠা আগষ্টের আগের দুনিয়া সেকেলে হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দুনিয়া ১৯১৮ সনের ১১ই নবেম্বর জন্মলাভ করিয়াছে। এই দুনিয়ার অর্থশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রও অচিরে জন্মলাভ করিবে। তার লক্ষণ সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৭০-৭১ সনের ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধটা একটা বড় যুদ্ধ। এত বড় যুদ্ধ ১৯১৪ সনের আগে একটিও ঘটে নাই। ১৮৭০ সন হইতে ১৯১৪ সন অবধি কালটাকে এক কোঠায় ফেলিতে পারি। কিন্তু এই কোঠাটা তার আগের দুনিয়াকে সেকেলে করিয়া ফেলে নাই। তার কিছু আর্থিক ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌কেন্নার বক্তৃতা পড়িলে বুঝা যাইবে।

দুনিয়ার এই পরিবর্ত্তনটা মাপিবার বাটখারাটাও বদলাইতে হইবে। ছোট বাটখারা—ছোট দৃষ্টির কর্ম্ম এ নয়। ইউরোপ সাহসের সঙ্গে সেই প্রচেষ্টা করিতেছে। তারই অর্থনৈতিক দিক্‌টার আভাষ উপরের বক্তৃতা ইত্যাদিতে পাওয়া যাইবে।

২। মূল্য-নির্দ্ধারণ

ভূমিকার অঙ্কগুলিই যে সকল প্রকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিভূমি তাহা বলা বাহুল্য। এই অঙ্কগুলির দিকে তাকাইলে ইউরোপের নানাদিকের ঋণ-গ্রস্ততার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে বিশ্ব-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কি ওলট-পালট ঘটিতেছে (ঘটিতেছে বলিতেছি, ঘটিয়াছে বলিতেছি না) তার পাকা হিসাব পাইবার জন্য বিষয়টা শেষ অবধি তল্লাস করিয়া দেখা দরকার।

এই তল্লাসের এক একটা রূপ এক এক জন দিয়াছেন। ল্যামণ্ট, ম্যাককেন্না, বাণিজ্য সচিব হুভার, সেলিগম্যান, অ্যাণ্ডারসন—কেহই 'কেও কেটা' ব্যক্তি নন। ইঁহাদের লেখার মূল্য ইহারা উচ্চপদে অবস্থিত বলিয়া নয়, কিন্তু সত্য-নির্দ্ধারণের প্রাণপণ চেষ্টা এবং সেই সত্যকে নির্ভয় প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া।

এই তল্লাসের মধ্যে ৫টা বক্তৃতা। আর ডাক্তার সেলিগম্যান লিখিয়া শ্রীযুক্ত হুভারের কথার উত্তর দিতে চাহিয়াছেন। শেষকালে যে ওস্তাদ কমিটির সারমর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে, তাহাই ব্যাপারটাকে কল্পনার রাজ্য হইতে বাস্তব রাজ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

ডয়সের নাম ভারতে অবিদিত নয়, বিশেষতঃ সংবাদপত্র মহলে। ডয়েস কমিটির বিস্তৃত রিপোর্ট ইউরোপের পুনর্গঠন অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষে বাইবল-বিশেষ। তাঁরা এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক পাইয়া তৃপ্ত হইবেন না। কিন্তু বঙ্গভাষায় ডয়েস কমিটির সংক্ষিপ্ত চুম্বকটার অনুবাদও এ পর্য্যন্ত কোন-খানে প্রকাশিত হয় নাই। অথচ ইউরোপের বর্ত্তমান

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা জানিবার পক্ষে ইহাই অ আ ক খ।

ক্ষতিপূরণ ও ঋণ সমস্যাটা ব্যাঙ্ক-সমস্যা, না বাণিজ্য সমস্যা, না ক্রাইসিস বিশেষ? সকল লোকের চোখের দৃষ্টি এক প্রকার নয়। এই জন্য ৭টা পর্য্যায়ে ৭ রকম মনোভাবের সাক্ষাৎ হইবে। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের ছাত্রের চিন্তাধারা ৭।৮ দিক্ হইতে পুষ্টিলাভ করিবে।

কিন্তু একটা মূল সুর সর্ব্বত্র রহিয়াছে। আর অর্থশাস্ত্রীর এই মূল সুরের সহিতই দেশভক্ত ও রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের যত বিরোধ। সেই মূল সুর হইতেছে, "জার্ম্মাণিকে আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে দাও। তার ক্ষতিপূরণ লইয়া পীড়াপীড়ি করিও না। ইউরোপকে আপন অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দাও। ঋণ-শোধে বাধ্য করিও না।"

যুক্তিটা ধর্ম্ম বা নীতির দোহাই নয়। প্রত্যেকে আলোচনাটা করিয়াছেন ঠাণ্ডা মাথায় একমাত্র স্বদেশের অথবা সমগ্র জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌কেন্না বিদেশী। কিন্তু তিনিও এমন কথা বলিয়াছেন যাতে আমেরিকার উপকার হয়।

এই যুক্তিগুলি অনুসরণ করিলে বুঝা যাইবে, কেন এক সময়ে জার্ম্মাণ মার্ক ভয়ানক রকম কমিতে আরম্ভ করে, কেন ফরাসী আজও তার বাজেটের তাল রক্ষা করিতে পারিতেছেনা, কেন আমেরিকা অসম্ভব রকম ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, কি উপায়ে জার্ম্মাণ ও ইউরোপ স্ব স্ব ঋণ শোধ করিতেছে, ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে চীন, আমেরিকা, ১৮৭০-৭১ সনের জার্ম্মাণি ও ফ্রান্স, রকমারি ব্যাঙ্কিং, আন্তর্জ্জাতিক ঋণ গ্রহণ ও ঋণশোধ, দেশে দেশে বাণিজ্যিক লেনদেন, ইউরোপের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনেক কথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

২। তত্ত্ব বনাম তথ্য

বেলফোর বলি, পঁয়কারে বলি, অধ্যাপক সেলিগম্যান বলি, ব্যাঙ্কার ম্যাক্‌কেন্না বা অ্যাণ্ডারসন বলি, বাণিজ্য সচিব হুভার বলি আর ল্যামণ্ট বলি, এমন একজনকেও পাইবনা যে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িতেছে। গাদা গাদা তথ্য, রাশি রাশি অঙ্ক সর্ব্বদা ইহাদের "গলার কাছে" "নখের ডগায়" মজুত হইয়া রহিয়াছে। এবং দরকারের সময় সেগুলি বাহির করিবার ও সাজাইয়া গুছাইয়া কাজে লাগাইবার ক্ষমতাটাও আছে।

এই ক্ষমতাটাকে অসাধারণ কিছু মনে করিবার দরকার নাই। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য যুবক বাঙ্গালা বা ভারতকে বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

কিন্তু আমরা জানি, আমাদের দেশে অনেকে বলিবে তথ্য বা অঙ্ক ঘাঁটাঘাঁটি করা এমন কি কঠিন কথা? সে ত রামা শ্যামাও পারে। তত্ত্ব বাহির করা কঠিন কথা বটে।

হুঁা তথ্য ও অঙ্ক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটিই চাই। যে সত্য বাণী এই পত্রিকার মারফৎ অনেকবার ঘোষণা করা হইয়াছে, তারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি, "তথ্য চাই। আরও অনেক তথ্য চাই। যুবক বঙ্গ ও যুবক ভারত তত্ত্বের কথা এখন বরং একদম ভুলিয়া যাক্। সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি মনপ্রাণ তথ্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত হউক।"

শুধু তাই নয়। তত্ত্বের চেয়ে তথ্যের জন্য দরকার উঁচু দরের বুদ্ধিবৃত্তির বিনিয়োগ, মনোযোগ, বিশ্লেষণ ও বিচারশক্তি, তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সহিষ্ণুতা এবং অপরাজেয়তা। এগুলির প্রত্যেকটা এক এক জাতিকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

তথ্যের ইট-পাথর দিয়া তত্ত্বের কোঠাবাড়ী নির্ম্মাণ যে সহজ কাজ তার প্রমাণ মুদ্রিত লেখাগুলির মধ্য হইতে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। যে ৫ ব্যক্তির বক্তৃতা ও প্রবন্ধ এবং যে কমিটির রিপোর্টের চুম্বক দেওয়া হইয়াছে, তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে তথ্যরাশি বা অঙ্করাশি একই প্রকারের বা এক জাতীয় ছিল। তথাপি প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত এক জাতীয় হয় নাই। মূল সুরটা এক হইলেও প্রত্যেকের রচনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। যে কারণগুলি একত্র করিয়া শ্রীযুক্ত

হুতায় দেখাইতেছেন ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের দেনাশোধের সামর্থ্য আছে বা ইউরোপ প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকার রপ্তানি উপরি আমেরিকায় পাঠাইতেছে, সেই কারণগুলি হইতেই ডাক্তার আণ্ডারসন ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

একটা মাত্র উদাহরণ দিলাম। আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে এরূপ আরও ঢের উদাহরণ মিলিবে। কেন এরূপ হয়? এরূপ প্রশ্নের অর্থ নাই। কারণ এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সমগ্র সমস্যাটা বিপুল সমস্যা। যে ব্যক্তি যে দিকে জোর দিয়া দেখিতেছে, সে ব্যক্তি সেই প্রকার তত্ত্ব খাড়া করিতেছে।

ইতিমধ্যে পুরাণা তথ্যগুলির সঙ্গে ক্রমাগত নূতন তথ্য আসিয়া যোগ দিতেছে। সেগুলির খোঁজ-খবর করিতে হইতেছে।

বস্তুতঃ, কোন তত্ত্বকেই চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তনীয় রূপে খাড়া করিলাম বলিয়া জেদ করা চলেনা। মানুষের নব লব্ধ জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক তত্ত্ব নানা আলোচনার ও কাটাকুটির ভিতর দিয়া গিয়া শেষে আপনার চরম রূপ পাইতে পারে।

৪। চাই ভারতীয় মগজ

মসলা ছাড়া কোন ইমারত গড়া চলে না। উদ্দেশ্যটা অবশ্যই ইমারত। কিন্তু তার আগে প্রচুর মসলার দরকার।

তত্ত্বরূপ ইমারতের মসলা তথ্য। ভারত-সন্তান আজ অবধি যথেষ্ট মসলা জড় করিয়া উঠিতে পারে নাই। অসম্পূর্ণ তথ্য লইয়া তত্ত্ব গড়িবার বিপদটা পুনঃ পুনঃ চোখে আঙুল দিয়া দেখান দরকার। যুবক ভারতের মনে তথ্যপ্রীতি এবং তথ্যনিষ্ঠা জন্মানোও দরকার।

ক্ষতিপূরণ ও ঋণ-শোধ ব্যাপারটাকে একদিক্ হইতে দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরই একটা অধ্যায় বলিয়া বিবেচনা করা চলে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই অধ্যায়ের উপর আলোক ফেলিবার জন্য বিষম শ্রম করিতেছে। কিন্তু এদিকে ভারতীয় প্রচেষ্টা কৈ? ভারতীয় প্রতিভার দান কি?

কিছুদিন যাবৎ প্রাচীন ভারতের দিকে যুবক ভারতের মনোযোগ ও মেহনত নিয়োগ দেখা দিয়াছে। যেখানে শুধু ইউরোপীয় চোখ কাজ করিত আজ সেখানে ভারতীয় চোখও আসিয়া জুটিয়াছে। ইহাতে সত্য-নির্দ্ধারণের জন্য ভারতীয় প্রতিভার দান পৃথিবীর চিন্তারাশিকে পরিপুষ্ট ও ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

অত্যল্পকাল যাবৎ বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধেও যুবক ভারত মাথা খেলাইতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বর্ত্তমান ভারত বর্ত্তমান দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ-বিশেষ নয়। শত সহস্র পথ দিয়া বর্ত্তমান দুনিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের যোগ স্থাপিত ও রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতকে জানিতে হইলে বর্ত্তমান দুনিয়াকেও জানিতে হইবে।

বর্ত্তমান ভারতকে বেশী জানে ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা। ভারত সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বা গ্লানির কথা প্রচার করে না, একথা বলিতেছি না। কিন্তু ভারতীয়ের ভারত-জ্ঞান তাদের চেয়ে কম একথা স্বীকার করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তন্ন তন্ন করিয়া তথ্য খুঁজিয়া বাহির করা কি চিজ তা তারা জানে।

এই দিকে যুবক ভারতকে আরও বেশী করিয়া মগজ চালনা করিতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে।

শুধু ভারত সম্পর্কে ইউরোপ আমেরিকায় পণ্ডিত-মহলে কুসংস্কার ইত্যাদি ঠাঁই পাইয়াছে, তা নয়। নিজেদের দেশ সম্বন্ধেও বহু অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার তাদের মনের কোণে বাসা বাঁধিয়াছে। এই নাড়গুলি নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। যুবক ভারতকে এই ক্ষেত্রে যুবক ইয়োরামেরিকার সঙ্গে পাল্লা কষিতে হইবে।

কিন্তু যুবক ভারতের লড়াই করিবার অস্ত্র কৈ? অস্ত্র কি? ইউরোপ আমেরিকার তথ্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া ঢুঁড়িয়া বেড়াইবার জন্য চাই ভারতীয় মগজ। ইউরোপ আমেরিকার পুরাণা ইতিহাস, পুরাণা সভ্যতা, পুরাণা অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, যুবক ইউরোপ

আমেরিকাকে চাখিবার মত তাজা রুচি ও প্রাণ যুবক ভারতের চাই। যুবক ভারতের প্রতিভা চাই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, মুষ্টিমেয় দু'চার জনের ছাড়া এই ব্যাপারে এখনও কারো চোখ পড়ে নাই—না বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির, না বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের, না ব্যবসায়ী মহলের। এই ব্যবস্থার অচিরে প্রতীকার হওয়া আবশ্যক।

৫। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের নয়া মূর্ত্তি

দেশে দেশে স্বাভাবিক আমদানি-রপ্তানির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সোজা কথায়, সব দেশ সমান সুবিধাজনক ভাবে নিজের দরকারমাফিক সব দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ অনেকগুলি হইতে পারে। সেই কারণগুলির মধ্যে সম্প্রতি প্রবেশ না করিয়া একথা বলা চলে, কৃত্রিম বাধা না দিলে স্বভাবতঃ প্রত্যেক দেশ সেই সব দ্রব্য রপ্তানি করে, যা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থায় উৎপাদিত হয়। প্রত্যেক দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থাটা ভিন্ন বলিয়া একে অন্যের সহিত আমদানি-রপ্তানিতে লাভবান্ হয়। বিস্তৃততর ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাগের আর এক নমুনা আর কি।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি আমদানি রপ্তানির সমীকরণ। কিন্তু এই সমীকরণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষিত হইতেছে না। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ডাইনে বাঁয়ে দোল খাইতে খাইতে স্থির হইতেছে, আবার দোল খাইতেছে।

দোল খাওয়াটা দোষের নয়। কিন্তু দোলটা যখন কোন একদিকে ভয়ানক জোরে হয় তখনি বিপর্য্যয়—প্রলয় কাণ্ড। এই প্রলয়টা ধরা পড়িতেছে ব্যাঙ্করূপ ব্যারোমিটারে। তখনি বলি ক্রাইসিস্ বা বাণিজ্য "সঙ্কট" ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান দুনিয়ার অর্থশাস্ত্রে যুদ্ধ ও তার অবশ্যম্ভাবী ফল ক্ষতিপূরণ ও ঋণ-গ্রস্ততাকে যে একটা খুব বড় স্থান দিতে হইবে, সে কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখনও ভাল করিয়া সমঝিয়া উঠেন নাই।

বস্তুতঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন যুদ্ধ বা ক্ষতি-পূরণ ও ঋণ-গ্রস্ততা এরূপ কাণ্ড বাণিজ্য-জগতে—বিশেষ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঘটায় নাই। আর ইহার পরবর্ত্তী সমস্ত যুদ্ধই অল্পবিস্তর এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইবে।

অর্থাৎ দেশ-বিদেশে স্বাভাবিক আমদানি-রপ্তানির গতিটা এযাবৎ যে-সব কারণে নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে করিয়া আসা হইয়াছে, তার সহিত যুদ্ধ ও ঋণ শোধটাও যোগ করিয়া দিতে হইবে। তাতে সমগ্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যই এক নয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে দেখা যাইবে। এই কথা মুদ্রিত ৭টি পল্লবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইহাই সব নয়। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগেও যুদ্ধফল ও ঋণশোধ ব্যাপারটা বহু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে ও ঘটাইতেছে। সেগুলির খোঁজ লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার ক্ষেত্র বর্ত্তমান আলোচনা নয়।

ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকৌশল

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল,

ও

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি, এ

বর্ত্তমান জগতে নানাপ্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাঙ্ক অন্যতম। ইহা পরস্পর বাধ্যতামূলক আস্থা এবং নির্ভরশীলতার উপর বনিয়াদ গড়িয়া কিরূপে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই সম্যক আলোচিত হইবে।

ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এই পরস্পর আস্থামূলক

বৈশিষ্ট্য প্রথম লক্ষিত হয় নাই। তখন ব্যাঙ্ক টাঁকশালের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহার কারণ এই যে, গোড়াপত্তনে অনেক দেশেই যাহারা ব্যাঙ্কের কাজ চালাইয়াছে তাহারা স্বর্ণকার-শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের মূল্যবান ধনরত্নাদির জন্য সুরক্ষিত গৃহ নির্ম্মাণ করিত, এবং দস্যুতস্কর হইতে এই সকল রক্ষা করিবার জন্য যথাযথ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিত। তারপর সমাজভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি আপন আপন সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রাখিবার জন্য এই স্বর্ণকারদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করে। এই রক্ষা-কার্য্যের জন্য দায়িত্বভার লইতে স্বভাবতই এই শ্রেণীর লোকেরা গচ্ছিত-কারীর নিকট হইতে পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু আদায় করিয়া লইত। গচ্ছিতকারী স্বর্ণকারের নিকট হইতে রক্ষিত অর্থের প্রাপ্তিসূচক একটি প্রতিজ্ঞাপত্র পাইত, এবং স্বর্ণকার দাবীমাত্র গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিত। ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই সময় 'সুদ' বলিয়া কোন বস্তু উদ্ভূত হয় নাই, এবং ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষণ যে পরস্পর বিশ্বাস, তাহাও সম্যক আত্মপ্রকাশ করে নাই।

এই অবস্থা হইতে স্বর্ণকারেরা ক্রমশঃ আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পদে উন্নীত হইয়াছে। এই ক্রমোন্নতি যে কিরূপ বহুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সাধিত হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

মনে করুন, বনোয়ারীলাল শেঠ কলিকাতায় একজন বিখ্যাত ধনী মণিকার। তাঁহার ধনসম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য যথাযথ বন্দোবস্ত আছে। দেশে কোন ব্যাঙ্ক কিংবা তদ্রূপ কোন অনুষ্ঠান নাই। তারপর ধরুন যে ঘনশ্যাম কাঞ্জিলাল নামে জনৈক এটর্ণি পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছেন;—কিন্তু তাহা লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকায় মানসিক অশান্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি তাহার সঞ্চিত অর্থ শেঠজীর নিকট গচ্ছিত রাখা উচিত বিবেচনা করিলেন। শেঠজী রক্ষাকার্য্যের জন্য শতকরা একটি মূল্য পাইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া ১লা বৈশাখ উক্ত পরিমাণ অর্থ রাখিতে স্বীকৃত হইলেন, ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া কাঞ্জিলাল মহাশয়কে এই সূত্রে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র দিলেন যে, "দাবীমাত্র পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা কিংবা তদংশ তিনি দিতে বাধ্য থাকিবেন।" এই লেনাদেনার পর শেঠজী তাঁহার খতিয়ানে কাঞ্জিলাল মহাশয়ের নামে যে হিসাব খুলিবেন তাহার নমুনা দেওয়া হইল :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

পৃষ্ঠা নং

খতিয়ান সন

শ্রীঘনশ্যাম কাঞ্জিলাল এটর্ণি

(ঠিকানা) কলিকাতা

জমা—		খরচ—
তারিখ		
১লা বৈশাখ	৫০,০০০৲	

এখন মনে করুন যে, কাঞ্জিলাল মহাশয় কোন প্রয়োজন বশতঃ তাঁহার প্রতিজ্ঞা-পত্রের জোরে গচ্ছিত অর্থ ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে দাবী করিলেন। শেঠজী আপন চুক্তিমত উক্ত পরিমাণ অর্থ যথাসময়ে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই ঘটনার পর খতিয়ান খরচের ঘরে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠাইয়া কাঞ্জিলাল মহাশয়ের হিসাব বন্ধ করা যাইবে।

যদি কাঞ্জিলাল মহাশয় সম্পূর্ণ গচ্ছিত অর্থ দাবী না করিয়া মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দাবী করেন, তবে উক্ত পরিমাণ অর্থ খরচ লিখিয়া জমার বাকী অংশ জের টানিয়া লওয়া হইবে, এবং ভবিষ্যতে শেঠজী তাঁহার জন্য দায়ী থাকিবেন। নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে তাহার নমুনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীদুর্গা

পৃষ্ঠা নং

খতিয়ান সন

শ্রীঘনশ্যাম কাঞ্জিলাল এটর্ণি

(ঠিকানা) কলিকাতা

জমা—		খরচ—	
তারিখ		তারিখ	
১লা বৈশাখ	৫০,০০০৲	১লা জ্যৈষ্ঠ	২৫০০০৲
১লা জ্যৈষ্ঠ	২৫,০০০৲		

উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহার সহিত আমাদের দেশের প্রচলিত তেজারতি কারবারের কার্যাপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মনে করুন, শেঠজী কাঞ্জিলাল মহাশয়কে স্বীয় অর্থ হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিয়াছে। অবশ্য একটি শতকরা নির্দ্দিষ্ট সুদ দাবী করিয়া এই ক্ষেত্রে কাঞ্জিলাল মহাশয়ের নামীয় হিসাবে খরচের ঘরে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিবে, ও উক্ত টাকা সুদসহ প্রত্যর্পণকালে জমার ঘরে উঠাইয়া হিসাব বন্ধ করা হইবে।

* পোষ্টআফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ও আমরা যাহাকে লোন আফিস নামে অভিহিত করি,—তাহাদেরও কার্য্যপদ্ধতি এইরূপ। তবে একটু প্রভেদ রহিয়াছে এইজন্য যে, এই সকল অনুষ্ঠান গচ্ছিত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে ও তাহার নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার বৈষম্য থাকিলেও সকলেই এই মূলসূত্র অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যে, সামান্য সুদে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাই উচ্চতর সুদে নিয়োগ করিতে হইবে। দেয় ও প্রাপ্য সুদের প্রভেদজনিত লব্ধ অর্থই এইসকল অনুষ্ঠানের উপার্জ্জন।

উপরোক্ত সকল অনুষ্ঠানেরই কার্য্য-পদ্ধতি অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাদের মূলে পরস্পর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা নাই। ইহাদের মধ্যে বিশ্বাস এবং নির্ভরতা সর্ব্বত্রই একমুখী হইয়া গিয়াছে, যথা গচ্ছিত অর্থের পুনঃ প্রাপ্তির জন্য গচ্ছিতকারীকে এই সকল অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং নিয়োজিত অর্থ উদ্ধার করিতে এই সকল অনুষ্ঠানকে বন্ধকাদি দলিলের উপর বিশ্বাস রক্ষা করিতে হয়। কোন স্থলেই বিশ্বাস এবং নির্ভরতা উভয়মুখী হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই উভয়মুখী বিশ্বাসই আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। ইহা কিরূপে উদ্ভূত হয় তাহাই দেখিতে হইবে।

মনে করুন প্রথম দৃষ্টান্তে শেঠজী সমস্ত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেখিলেন যে, কাঞ্জিলাল মহাশয় তাঁহার সমস্ত টাকা কোন এক সময়ে দাবী করিয়া বসেন না। কেবল মাঝে মাঝে আংশিক পরিমাণের জন্য "হুণ্ডী" কাটিয়া থাকেন ও হাতে টাকা আসিলেই বৎসরান্তে পুনরায় তাহা জমা দিয়া সাবেক পঞ্চাশ হাজার টাকা পূরণ করিয়া রাখেন। এই প্রকার "হুণ্ডী" কাটা সত্ত্বেও শেঠজী দেখিলেন যে, বৎসরের শেষাশেষি কাঞ্জিলাল মহাশয়ের গচ্ছিত টাকার পঁচিশ হাজার তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকে। মনে করুন শেঠজীর ইহা ব্যতীত নগদ টাকা আর নাই এবং কল্পনা করুন যে, বৎসরান্তে অধরচন্দ্র বসাক নামক কোন বিশিষ্ট মহাজন শেঠজীর নিকট বৎসর কালের অনধিক সময়ের জন্য দশ হাজার মুদ্রা কর্জ্জ প্রার্থনা করে। শেঠজীর মাথায় স্বভাবতঃই এই সময় একটা বুদ্ধি খেলিবে। তিনি টাকা নাই বলিয়া অমনি অধরচন্দ্রকে ফিরাইয়া দিবেন না। তিনি অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছেন যে, কাঞ্জিলাল মহাশয়ের পঁচিশ হাজার টাকা তাঁহার নিকট সারা বৎসর অনর্থক পড়িয়া থাকে, ইহা হইতে তিনি অবলীলাক্রমে দশ হাজার টাকা ধার দিতে পারেন এবং সেজন্য কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সম্পূর্ণ দাবী মিটাইতে না পারিবার ভয়ও তাঁহার থাকে না। কাজেই তিনি অধরচন্দ্রকে দশ হাজার টাকা ধার দিতে আপত্তি করিবেন না। ফলে তাঁহার খাতায়ানে অধরচন্দ্রের নামে আর এক হিসাব খোলা হইবে। বৎসরান্তে যে নিকাশপত্র তৈয়ারী হইবে তাহার নমুনা এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা

নিকাশপত্র সন—

দেনা—	সম্পত্তি—
কাঞ্জিলালের গচ্ছিত দরুণ	নগদ ১৫,০০০৲
২৫,০০০৲	অধরচন্দ্রের নিকট পাওনা ১০,০০০৲
২৫,০০০৲	২৫,০০০৲

কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সাময়িক প্রয়োজন-বশতঃ আংশিক টাকার দাবী তিনি নগদ টাকা হইতেই মিটাইতে

* পোষ্টআফিস সেভিং ব্যাঙ্কের ধার দেওয়া সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

পারিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতি মত কাজ করিয়া তিনি অধরচন্দ্রের নিকট হইতে দশ হাজার টাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট শতকরা হারে সুদ পাইবেন।

আমরা পূর্ব্বদৃষ্টান্তে ধরিয়া লইয়াছি যে, শেঠজী কাঞ্জিলালের নিকট হইতে গচ্ছিত অর্থ সাবধানে সংরক্ষণের জন্য একটা দাবী করিবেন। এই প্রকার দাবী সামাজিক শৃঙ্খলা না থাকিলেই কেবল স্বাভাবিক বোধ হইবে। কিন্তু যদি গভর্ণমেণ্ট দস্যু-তস্কর দমনের যথাযথ বন্দোবস্ত করেন, তবে কাঞ্জিলাল মহাশয় অযথা খরচ করিয়া শেঠজীর নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিবেন না, ইহা আমরা স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। বর্ত্তমান জগতে সভ্য দেশগুলিতে সমাজ-শৃঙ্খলার এই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমত ক্ষেত্রে শেঠজীই টাকা গচ্ছিত রাখিবার জন্য কাঞ্জিলাল মহাশয়কে শতকরা একটা সুদ দিতে রাজী হইবেন, কারণ গচ্ছিত টাকা অধরচন্দ্রের মত আরও পাঁচজনকে উচ্চতর সুদে ধার দিয়া তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে পারেন। কাঞ্জিলাল মহাশয়ও অযথা তাঁহার টাকা বাক্সবন্দী না করিয়া সুদের খাতিরে গচ্ছিত রাখিবেন। ধরিয়া লউন তিনি এবার স্থায়ী আমানতে টাকা গচ্ছিত রাখিলেন এবং বৎসরান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকা শেঠজীর নিকট পড়িয়া থাকাই রীতি হইল। এই দৃষ্টান্তে আমরা আরও ধরিয়া লই যে অধরচন্দ্রকে সোজাসুজি দশ হাজার টাকা হাতে না দিয়া শেঠজী অস্থায়ী আমানতে দশ হাজার টাকা জমা করিয়া লইবেন ; প্রয়োজন মত অধরচন্দ্র ঐ পরিমাণ টাকা কিংবা তদংশের দাবী করিয়া হুণ্ডী কাটিলেই তিনি তাহা দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই পদ্ধতি অনুধাবন করিলে সহজেই অনুমান হইবে যে, ইহাতে কার্য্যতঃ অধরচন্দ্রকে দশ হাজার টাকা ধার দেওয়াই হইতেছে, কারণ ইহার সহায়তায়ও অধরচন্দ্র উক্ত অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন। অতঃপর ধার দিবার তারিখে খতিয়ানে নিকাশ পত্রের নমুনা দাঁড়াইবে এইরূপ—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

নিকাশ পত্র সন—

দেনা		সম্পত্তি	
কাঞ্জিলালের জমা		নগদ	৫০,০০০৲
(স্থায়ী আমানত)	৫০,০০০৲	অধরচন্দ্রের দেয়	
অধরচন্দ্রের জমা			১০,০০০৲
(অস্থায়ী আমানত)	১০,০০০৲		
	৬০,০০০৲		৬০,০০০৲

উক্ত দৃষ্টান্তে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, অধরচন্দ্র তাহার কর্জ্জের পরিমাণ টাকা গুনিয়া লওয়ায় শেঠজীর নগদ তহবিল হইতে ১০,০০০৲ হ্রাস পাইয়াছে। মনে করুন, অধরচন্দ্র শ্যামাচরণ পালের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ খরিদ করিয়া শেঠজীর উপর ঐ পরিমাণ অর্থের জন্য হুণ্ডী কাটিল, এবং ঐ টাকা শ্যামাচরণকে দেয় বলিয়া স্বাক্ষর করিল। শ্যামাচরণের হয়ত তখনই নগদ টাকার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সে শেঠজীকে হয়ত বলিবে যে, তাহার নামে হিসাব খুলিয়া ঐ টাকা নির্দ্দিষ্ট সুদে জমা করিয়া লওয়া হউক। বলা বাহুল্য, শেঠজী তাহাই করিবেন। ফলে যে দশ হাজার টাকা তাঁহার তহবিল হইতে বাহির হইয়া যাইবার কথা ছিল, তাহা হইবেনা। তা ছাড়া জমার সুদ কর্জ্জের সুদ অপেক্ষা কম হইবার জন্য শেঠজীর একটা লাভ থাকিয়া যাইবে ; কারণ অধরচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্য সুদে শ্যামাচরণকে তাহার সুদ মিটাইয়াও কিছু বাঁচিবে। তারপর অধরচন্দ্র যথাসময়ে তাহার দেনা মিটাইয়া দিলে তাহার দ্বারা শ্যামাচরণের দাবী মিটানও সহজসাধ্য হইবে। এই সমস্ত লেন-দেন মিটিবার পর বৎসরান্তে নিকাশপত্রের নমুনা দাঁড়াইবে এইরূপ—

শ্রীশ্রীদুর্গা
নিকাশ পত্র সন—

দেনা	সম্পত্তি
কাঞ্জিলালের জমা (স্থায়ী আমানত) ৫০,০০০৲	নগদ ৫০,০০০৲ + অধরচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০,০০০৲
শ্যামাচরণের জমা—অধরচন্দ্রের হিসাবের আগত, দরুণ অধরচন্দ্র শ্যামাচরণ পালের বরাবর যে হুণ্ডী দেয় তদ্বাবদ অস্থায়ী আমানত ১০,০০০৲	
৬০,০০০৲	৬০০০০৲

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত অস্বাভাবিক এই জন্য যে, শেঠজীকে সুদ দিতে হইতেছে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর, অথচ তিনি সুদ পাইতেছেন মাত্র দশ হাজার টাকার উপর। কার্য্যতঃ ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। শেঠজী অল্পকাল মধ্যে অভিজ্ঞতার ফলে দেখিবেন যে, হয়ত সমস্ত দেনার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ নগদ টাকা রাখিলেই তিনি কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন অথচ তাহার ফলে অনেক পরিমাণ ধার দিয়া তিনি বিস্তর সুদ অর্জ্জন করিতে পারেন। মনে করুন, বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে শেঠজী বিস্তর সুদ অর্জ্জন করিতে ক, খ, গ তিন ব্যক্তির প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিয়াছেন। এমত ক্ষেত্রে আমরা যে স্বাভাবিক নিকাশ পত্রের নিদর্শন পাইব তাহার নমুনা এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা
নিকাশপত্র সন—

দেনা		সম্পত্তি	
কাঞ্জিলাল (স্থায়ী আমানত)	৫০,০০০৲	নগদ	৫০,০০০৲
*ক (অস্থায়ী আমানত)	৫০,০০০৲	বিলাতী দেনা (বৎসর-কাল মধ্যে প্রাপ্য) ক	৫০,০০০৲
খ „	৫০,০০০৲	খ	৫০,০০০৲
গ „	৫০,০০০৲	গ	৫০,০০০৲
	২,০০,০০০৲		২,০০,০০০৲

এই দৃষ্টান্তে সমষ্টি দেনা দুই লক্ষের মধ্যে নগদ মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা শেঠজীর নিকট রহিল। অভিজ্ঞতার ফলে শেঠজী দেখিয়াছেন যে, এই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াই তিনি সকলের দাবী আপাততঃ মিটাইতে পারিবেন। কারণ ক, খ, গ হুণ্ডী কাটিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত তাহাতে একজনের হিসাবে খরচ লিখিয়া আর একজনের হিসাবে জমা উঠাইলেই চলে। যেমন আমরা পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে অধরচন্দ্র এবং শ্যামাচরণের মধ্যে দেখিয়াছি। আর যে সকল হুণ্ডীর দাবী টাকায় মিটাইতে হয়, তাহার জন্য হয়ত অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকাই যথেষ্ট। এখানে শেঠজী মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ দিতেছেন, কিন্তু সে সুদ অর্জ্জন করিতেছেন দেড় লাখ টাকার উপর। ইহাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের আসল কেরামতি। এমতাবস্থায় আমরা শেঠজীকে যথার্থ ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত করিতে পারি।

এক্ষণে এইসকল লেনা-দেনার তাৎপর্য্য আমাদিগকে সম্যক বুঝিতে হইবে। উক্ত দৃষ্টান্তে খাতকরা কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে দেনা মিটাইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া তৎপূর্ব্বেই দেনার পরিমাণ টাকা হুণ্ডী কাটিয়া যথেচ্ছ ভাবে উঠাইয়া লইতেছে। তাহারা এই সকল হুণ্ডী দিয়াই ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনা দেনা মিটাইতেছে ও তাহাদের বাজারসম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে। নগদ অর্থ দিয়া তাহারা হুণ্ডী কাটিয়া দেনা মিটাইতে সাহস পাইতেছে এইজন্য যে, তাহারা মহাজনের (অর্থাৎ শেঠজীর প্রতিজ্ঞতা সম্বন্ধে এতই আস্থাবান যে, কোন হুণ্ডী প্রত্যাখ্যাত হইবার আশঙ্কা তাহাদের মনেই স্থান পায় না। তারপর অপর দিকে মনঃসংযোগ করিলে দেখা যাইবে যে, মহাজন সামান্য নগদ টাকার উপর ভর করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার দিয়া তাহার কারবার চালাইতে সাহসী হইতেছেন এইজন্য যে, খাতকদারদিগের যথাসময়ে দেনা মিটাইবার চুক্তি সম্বন্ধে তিনিও আস্থাবান। নতুবা অচিরাৎ তাঁহার ব্যবসা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। উপরের দৃষ্টান্তে মনে করুন যে ক, খ, গ হুণ্ডী কাটিবার ফলে চল্লিশ হাজার নগদ টাকা

* অস্থায়ী আমানতে সুদ 'সাধারণতঃ' দেওয়া হয় না। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত অন্য প্রসঙ্গে বলা হইবে।

বা'হর হইয়া গিয়াছে এবং বৎসরান্তেও তাহা পরিশোধ হয় নাই। এমত ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী সালের প্রারম্ভেই কাল্লিলাল মহাশয় তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকা (স্থায়ী আমানত) দাবী করিলে শেঠজীর তাহা পূরণ করা অসম্ভব হইবে। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে দেউলিয়া তালিকা-ভুক্ত হইতে হইবে।

তাহা হইলে আমরা স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, খাতকদার এবং মহাজন উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি আস্থাবান না হইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় চলিতে পারে না। উভয় পক্ষের এই বাধ্যতামূলক পরস্পর নির্ভরশীলতাই আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইতেছে।

বাংলার স্বাস্থ্য

শ্রীসুকুমার মিত্র

সরকার বাহাদুরের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ১৯২৫ সালের যে বার্ষিক স্বাস্থ্য-বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহার এবং উক্ত বিবরণী অবলম্বনে "স্বাস্থ্য সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু লিখিত 'সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী ১৯২৫ সাল' নামক প্রবন্ধের সাহায্য লইয়া বাংলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছি।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য বিভাগ বাদ দিয়া ১৯২১ সালের আদম সুমারি অনুসারে বাংলার মোট লোক-সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ৪৬,৫২২,২৯৩ জন। জন্ম-মৃত্যুহার যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯২৪ সালে জন্মহার হাজার করা ২৯.৫ এবং মৃত্যুহার ২৫.৯। আর ১৯২৫ সালে জন্মহার হাজার করা ২৯.৬ এবং মৃত্যুহার ২৪.৯। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় পঁচিশ সালের জন্মহার কিছু বাড়িয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে। জন্মসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা .৩৬ ভাগ এবং মৃত্যুসংখ্যা কমিয়াছে ৩.৮৬ ভাগ। তবে এই অঙ্কগুলিকে একেবারে ঠিক বলিয়া মনে করিলে মস্ত ভুল হইবার সম্ভাবনা। নৃপেন্দ্র বাবু এইসকল অঙ্ক সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং স্বয়ং স্বাস্থ্য বিভাগও অনুমান করিতেছেন যে, মোট জন্মমৃত্যু উভয় সংখ্যা হইতেই অন্ততঃ শতকরা সাতাশটী কেস্ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। যাহাই হউক মোটের উপর জন্ম-সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ-ই নাই। কিন্তু এই জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাপারে আনন্দের কোন কারণ আছে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। এখন এই জন্ম-সংখ্যা কিরূপ তাহা দেখা যাউক। ১৯২৫ সালে বাংলা দেশে মোট ১,৩৭৭,০৯৭টী জন্মের কেস্ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ছেলে আছে ৭১৭, ৩৩০ এবং মেয়ে আছে ৬৫৯,৭৬৭টী। ছেলের সংখ্যা মেয়ের চাইতে বেশী অর্থাৎ মেয়ে যেখানে হইয়াছে ১০০টী, ছেলে সেখানে হইয়াছে ১০৮টী। এখন মৃত্যুহারটীও দেখা যাউক। ঐ সালে মৃত্যুর কেস্ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ১,১৫৮, ৪৭৩টী। ইহার মধ্যে পুরুষ আছে ৬১৪,৭৩৬ ও স্ত্রীলোক আছে ৫৪৩,৭৩৭ জন। অর্থাৎ যেখানে নারী মরিয়াছে ১০০ জন সেখানে পুরুষ মরিয়াছে ১১৩ জন। হাজারকরা মৃত্যুর হার খৃষ্টানদিগের মধ্যে ১৭.১, হিন্দুদিগের মধ্যে ২৪.৫, মুসলমানদিগের মধ্যে ২৫.০, বৌদ্ধদিগের মধ্যে ১৯.১ এবং অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ৩২.৫। খৃষ্টানদিগের মৃত্যুহার কম করিয়া লেখানো হইয়াছে বলিয়া স্বাস্থ্য-বিভাগ সন্দেহ করেন। তাহা হইলেও 'অন্যান্য শ্রেণী' বাদ দিলে মুসলমানদিগের মধ্যে মৃত্যুহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহা মুসলমান-সম্প্রদায়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। মুসলমান নেতারা এইদিকে নজর দিবেন কি? হিন্দুর পক্ষেও একথা খাটে। এই সকল সংখ্যায় ভুল অবশ্যই আছে এবং তাহার জন্য দায়ী মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটি এবং তথাকার জনসাধারণের অসাবধানতা ও অবহেলা। এসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া

নিম্নলিখিত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

কাটোয়া, কুমিল্লা, খুলনা, গোবরডাঙ্গা, গাইবান্ধা, চাঁপদানী, চাঁদপুর, জলপাইগুড়ি, ঝালকাঠি, উত্তর দমদমা, রাজবাড়ী, সিউড়ী, বারাকপুর, বরিশাল, বগুড়া, বর্দ্ধমান, বজবজ, মহেশপুর ও যশোহর।

এক্ষণে জেলা-হিসাবে জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা কত হইয়াছে দেখা যাউক :—

জেলাসমূহের নাম	১৯২৪ সালের হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	১৯২৫ সালের হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	১৯২৪ সালের হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা	১৯২৫ সালের হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা
মুর্শীদাবাদ	৪১.৫	৪৭.৪	২৬.৯	৩০.৯
দিনাজপুর	৩৫.০	৩৮.৩	৩০.৭	৩৩.৩
রাজসাহী	৩২.৫	৩৫.৪	৩৪.৬	৩৭.৪
নদীয়া	৩৩.৭	৪০.৩	২৯.২	৩৪.৬
মালদহ	৩০.০	৪০.৫	২৩.৪	২৯.০
বীরভূম	৩৭.৫	৪৩.৭	২৮.৬	২৪.৯
বাঁকুড়া	৩৩.৫	৩৭.৫	২৭.৮	২৩.৭
জলপাইগুড়ি	৩১.৯	৩০.৪	৩১.২	২৭.২
চট্টগ্রাম	৩৪.২	৩০.৫	২৩.২	২১.৭
নোয়াখালি	৩৫.১	৩০.৬	২৫.৫	২৩.৪
বাখরগঞ্জ	৩১.৫	২৬.৯	২৬.১	২৩.২
রংপুর	৩১.৬	২৯.২	৩১.৮	১৯.৮
দার্জ্জিলিং	৩৩.৫	৩৩.৭	৩৬.১	৩২.৫
খুলনা	২৯.৫	২৯.৪	২৩.৯	২৩.৮
ফরিদপুর	২৯.৯	২৮.১	২৫.০	২৩.৭
ঢাকা	২৯.০	২৬.৪	২২.৭	২০.৬
বর্দ্ধমান	২৭.৪	৩২.৯	২৫.৩	২৪.৫
মেদিনীপুর	২৭.২	২৯.৭	১৪.৭	২২.৫
হাওড়া	২৭.৩	২৭.৬	২৪.৩	২৪.৫
ময়মনসিংহ	২৮.৯	২৫.৫	২৩.৯	২০.৩
পাবনা	২৩.৬	২৭.৯	২৯.১	২৪.৪
হুগলী	২৫.৪	২৬.৭	২৫.৬	২৫.৭
যশোহর	২৮.২	২৬.৪	২৭.২	২৯.২
বগুড়া	২৪.৬	২৮.১	২৬.৪	২৩.৭
ত্রিপুরা	২২.৭	২১.৩	১৬.০	১৬.৪
২৪ পরগণা	২২.২	২৪.৬	২৪.২	২২.৩
কলিকাতা	১৮.৩	১৮.৯	২৯.৬	৩২.৭

এই সংখ্যা হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, হুগলী, মালদহ ও হাওড়া এই নয়টী জেলাতেই মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে আবার যশোহরের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কাজনক। কারণ ইহার যুগপৎ জন্মহার কম এবং মৃত্যুহার বেশী হইয়াছে। সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে ত্রিপুরার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা আশাপ্রদ। স্বাভাবিক সংখ্যা-বৃদ্ধির দ্বারা পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৪ সাল অপেক্ষা ১৯২৫ সালে লাখ ২১২½ লোক বৃদ্ধি হইলেও বাংলাদেশ লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা হীন। কিরূপ হীন তাহা নিম্ন তালিকা দেখিলে বোধগম্য হইবে :—

নং	প্রদেশের নাম	হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা	স্বাভাবিক হাজার করা লোকবৃদ্ধি
১।	মধ্যপ্রদেশ	৪৩'৯	২৭'৩	১৬'৬
২।	বিহার ও উড়িষ্যা	৩৫'৬	২৩'৭	১১'৯
৩।	বোম্বাই	৩৪'৭	২৩'৭	১১'০
৪।	পঞ্জাব	৪০'১	৩০'০	১০'৯
৫।	মান্দ্রাজ	৩৩'৭	২৪'৪	৯'৩
৬।	যুক্তপ্রদেশ	৩২'৭	২৪'৮	৭'৯
৭।	উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	২৬'৯	১৯'৮	৭'১
৮।	বার্ম্মা	২৫'৪	১৮'৭	৬'৭
৯।	আসাম	২৯'১	২২'৫	৬'৬
১০।	বাংলা	২৯'৬	২৪'৯	৪'৯

যাহা হউক, যে জাতি ধুঁকিতে ধুঁকিতে মরিতে মরিতেও ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে, সে জাতটা সহজে মরিবে না এ ধ্রুব সত্য। এখন সংখ্যা-বৃদ্ধির উপর লোলুপ দৃষ্টি না ফেলিয়া যে লাখ ২১২½ সংসারে আসিয়াছে তাহাদের উপযুক্ত সেবা-যত্নের দ্বারা যেন সুস্থ-সবল করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করি। তাহার পর তাহারা যখন মানুষ হইয়া উঠিবে তখন দেশের সকল বোঝা তাহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেও তাহারা হাসিমুখে তাহা বহন করিতে পারিবে, নচেৎ নহে। নিজেদের আর্থিক অবস্থাই এই সব কার্য্যে বাধা দিবে জানি। তাহা হইলেও যাহাদের অন্ততঃ এ সংসারে আনয়ন করিয়াছি, নিজেদের দায়িত্ববোধে যতদূর সম্ভব ভালভাবে তাহাদের লালন-পালন করিতে আমরা যেন দ্বিধা বোধ না করি।

মৃত্যুহার কমানো ব্যাপারে আমরা নিম্নলিখিত যে কোন একটী দেশের সঙ্গে যেন ১০ বৎসরের মধ্যে সমান হইতে পারি—

(বাংলা দেশ অপেক্ষা লোক-সংখ্যা কম এমন দেশসমূহ)

	দেশের নাম	লোকবল	হাজারকরা মৃত্যুহার
১।	নিউজিল্যাণ্ড	১২ লক্ষ	৯'৫
২।	অষ্ট্রীয়া	৫৫ ,,	১০'৫
৩।	নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	২½ ,,	১০'৬
৪।	নরওয়ে	২৬ ,,	১৪'২
৫।	সুইডেন	৬০ ,,	১৩'৮
৬।	যুক্তরাজ্য	৪ কোটি ৫৪,,	১৪'৬
৭।	বেলজিয়াম	৭৫ ,,	১৫'২
৮।	বাংলা	৪ কোটি ৬৮ ,,*	২৪'৯

বৎসরে হাজারকরা এক করিয়া কমাইতে পারিলেও ১০ বৎসরে মৃত্যু-সংখ্যার হার উল্লিখিত দেশসমূহের যে-কোন একটীর সমান করা যাইতে পারিবে।

* ১৯২১ সালের আদমসুমারীতে যে লোকসংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত ১৯২৫ সালের লোক-বৃদ্ধির আনুমানিক সংখ্যা যোগ করিয়া ৪কোটি ৬৮ লক্ষ ধরা হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ ও সমবায়

শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজতন্ত্রবাদের যুগ

জগতের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার এবং ভাবের ধারারও আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দী ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যুগ—বুরজুয়াকি বা পুঁজিদার সম্প্রদায় সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার নামে জমীদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও যে সকল দেশ আর্থিক হিসাবে উন্নত ছিল, সেখানে জমীদারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বা তাঁহাদের স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রিত করিয়া গণতন্ত্র স্থাপন করেন। যে সকল দেশে সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র-স্থাপন হয় নাই সে সকল দেশেও গণতন্ত্রের আদর্শই জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তারপর পুঁজিদারদিগের পুঁজি যখন খুব বাড়িয়া যাইতে লাগিল—পূর্ব্বে যেখানে ছোট ছোট শ্রমশিল্প ছিল তাহার স্থানে বিরাট শ্রমশিল্প দেখা দিতে লাগিল—এক এক কলকারখানায় ২।১ শত লোকের স্থানে সহস্র সহস্র লোক এক সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, ইহাদের অভাব অভিযোগ দূর করা বা অভিলাষ পূর্ণ করা আর তখন কাহারও পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে সম্ভব রহিল না। এইরূপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি খসিয়া গেল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণ-মাতানো সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ডাকেও আর লোকে সাড়া দিতে লাগিল না। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ছড়াইয়া পড়ায় সমষ্টির ভাব এখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তি-বিশেষের লাভ-ক্ষতির বিষয় বিবেচনা না করিয়া সমাজের কিসে মঙ্গল হয় কিসে অমঙ্গল হয় তাহাই এখন লোকের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হয় এরূপ ভাবে সমাজকে গঠন করিবার চেষ্টা বা এক কথায় সমাজতন্ত্রবাদের দাবী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীকে যেমন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যুগ, বিংশ শতাব্দীকে সেইরূপ সমাজতন্ত্রবাদের যুগ বলা যায়। বর্ত্তমানে জগতের দিকে একটু নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টিপাত করিলেই এ সত্য চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

ভারতের অনুন্নত অবস্থা

এ যুগটা সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের যুগ হইলেও ভারতে এখনও এ চিন্তাধারা বিশেষরূপে প্রকাশ পায় নাই। তাহার কারণ ভারতের আর্থিক অনুন্নত অবস্থা। সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের আর্থিক ভিত্তি হইতেছে বিরাট কলকারখানা ও শ্রমশিল্পগুলি। এই ভিত্তি ভারতে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে; কিন্তু ইহা এখনও ভাল মজবুত হয় নাই। ভারত আর্থিক উন্নতি হিসাবে অনেক পিছনে বলিয়াই সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে দেশের লোক বিশেষ খবর রাখেন না এবং অনেকের ইহা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ধারণাও আছে। কিন্তু যেরূপ দ্রুত ভারতের তথা জগতের পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে দেশের লোককে শীঘ্রই সমাজতন্ত্রবাদের কথা বিশেষ নিবিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ রূপেই ভাবিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সমবায়ের সহিত সমাজতন্ত্রবাদের সম্বন্ধ এবং সমাজতন্ত্রবাদের একটি সমস্যা ও তাহার সমাধানের একটী ইঙ্গিত পাঠকদিগের সামনে ধরা হইল।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

কোন সমাজের আর্থিক জীবনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা উৎপাদন ও বণ্টন। উৎপাদন ও বণ্টনের সমস্ত যন্ত্র ও উপকরণগুলির উপর হইতে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিয়া কিরূপে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়, উৎপাদন ও বণ্টনের কার্য্য

স্থায্যরূপে ও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করা যায়, পরভোজী সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন করা যায় ইহাই সমাজতন্ত্রবাদীদিগের সমস্যা। এই উদ্দেশ্যসাধনে সমবায় কতটা সাহায্য করিতে পারে তাহা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পরভোজী সম্প্রদায়

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রবাদীদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে বহুসংখ্যক পরভোজী শুধু পালিত হইতেছে এমন নহে; অধিকন্তু তাহারা উৎপাদক জনসাধারণকে শোষণ করিয়া আরও ধনী হইয়া বিলাস-ব্যসনে মত্ত হইবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা পাইতেছে। যাহারা উৎপাদন বা বণ্টনের পরিশ্রমে কোন ভাগ লয় না, অথচ ভোগের বেলায় কৃষক ও শ্রমিকদিগের শ্রমলব্ধ ফল হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা বড় ভাগ বসায়, তাহাদের ন্যায় পরভোজীদিগের উপর উৎপাদকদিগের আক্রোশ হওয়া স্বাভাবিক।

কয়েকটি উদাহরণ

ময়মনসিংহের কৃষকেরা রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া পাট চাষ করিয়া একবুক জলে দাঁড়াইয়া পাট ছাড়াইয়া পাট বাজারে আনিল। কয়েক হাত ফিরিয়া পাটকলের মালিকদের নিকট গেল; কিন্তু পাটের উৎপাদক হইতে ব্যবহারক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পাটের দাম শতকরা ১০০৲, ২০০৲, ৩০০৲ বা সময়ে সময়ে তাহার চেয়েও বেশী বাড়িয়া গেল। এইরূপ বরিশাল বা রেঙ্গুনের চাউল, পদ্মার ইলিশ মাছ, শিলং বা নৈনিতালের আলু, সিলেট বা নাগপুরের কমলা, মুর্শিদাবাদের সিল্ক, আসামের মুগা বা কাশ্মীরের শাল সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যই উৎপাদক যাহা পায় তাহার অনেকগুণ বেশী দিতে হয় ব্যবহারককে। সমাজ-তন্ত্রবাদীরা বলেন, কেন আমরা অনর্থক বেশী দাম দিব? মাল চালান দিবার যে খরচ তাহাত লাগিবেই কিন্তু তদতিরিক্ত কেন দিতে যাইব?

সমস্যা

সমাজতন্ত্রবাদী কেন, বুদ্ধিমান লোকই জিনিষের যে প্রকৃত দাম তাহার বেশী দিতে রাজী হইবেন না; কিন্তু দিতে রাজী না হইলেই ত হইল না। উৎপাদক জিনিষ উৎপাদন করিল সুদূর ময়মনসিং, বরিশাল, রেঙ্গুন বা রেল লাইন হইতে ১৫।২০ মাইল দূরে কোন পল্লীতে। সে-সকল স্থান হইতে ব্যবহারক জিনিষ পাইবে কিরূপে? যে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়িগণ কোটী কোটী টাকা মূলধন খাটাইয়া দূর দুরান্তর হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া ব্যবহারকগণের সম্মুখে ধরিতেছে ও ৪।৫ গুণ আদায় করিতেছে, ইহাদের স্থান কে পূরণ করিবে? এইরূপে লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লোকের বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করিবার ভার কে লইবে? বহির্ব্বাণিজ্য বা পাইকারী ব্যবসায়গুলি সরকারী ভাণ্ডার (ষ্টোর্স্) খুলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের সাহায্যে সুবিধায় সম্পন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু যে সকল অগণিত বিপণিতে সহর বাজারের রাস্তার দু'ধার পূর্ণ তাহাদের স্থান কাহারা পুরাইবে?

সমবায় ভাণ্ডার

পাশ্চাত্য শ্রমশিল্প-বহুল দেশগুলির কথা আলোচনা করিলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাইব। সে সকল দেশে শ্রমিকেরা ব্যবসায়ীদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া অবশেষে নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরা সমবেতভাবে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জিনিষ কিনিলে শুধু দাম বেশী লইয়া ক্ষান্ত হয় না; তাহারা খাদ্যে নানাবিধ স্বাস্থ্য-হানিকর দ্রব্য মিশাইয়া চালাইয়া দিয়া থাকে। তাহারা নিজেরা ত ব্যবহার করিবে না, খরিদ্দারেরা খারাপ জিনিষ খাইয়া অসুস্থ হইলে তাহাদের কি? দুধে জল, ঘৃতে চর্ব্বি বা বাদামী তেল, চাউল ডাইলে কাঁকর, আটায় পাথর গুঁড়া মিশান প্রভৃতির কথা এ দেশে সকলেই অল্পবিস্তর জানেন। নিজেরা সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করিলে এরূপ ভেজাল, বাসি, পচা দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে বাধ্য

হইতে হয় না; অথচ জিনিষের দামও কম পড়ে। অধিকন্তু সমবায় ভাণ্ডারে যে লাভ হয় তাহারও ভাগ পাওয়া যায়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্য দেশে সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা ও তাহাদের কার্য্যের গণ্ডী ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

ইংল্যাণ্ড

ইংল্যাণ্ডে ১৯২২ সালে ১৪৪৫টী খুচরা ক্রয়-বিক্রয় সমিতি ছিল। ইহাদের মেম্বারের সংখ্যা ৪½ লক্ষ এবং ইহাদের অংশগত মূলধন ১২ কোটি পাউণ্ড বা দেড়শত কোটি টাকার উপর। সমবায় ভাণ্ডারগুলিতে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার লোক কাজ করিত। অথচ রকডেল পাই-ওনিয়ারগণ এই আন্দোলন মোট ৭০।৭৫ বৎসরের পূর্ব্বে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণিতে

শুলট্জে ডেলিট্স্ প্রবর্ত্তিত সমবায় সমিতিতে জার্ম্মাণি ছাইয়া যাইতেছে। সেখানে ১৯২২ সালে ৮ হাজারের বেশী সংখ্যক ষ্টোর বা ভাণ্ডার ছিল; ইহাদের মেম্বারের সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ।

রুশিয়া

শ্রমশিল্পের দিক্ হইতে রুশিয়া অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেও সমবায় আন্দোলনের প্রসার এদেশে যেরূপ হইয়াছে এরূপ আর কোন দেশেই নহে। সোভিয়েট সরকার মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়কে (মিডল্‌মেন) লোপ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন; এবং এ কার্য্য একমাত্র সমবায় দ্বারাই সম্ভব জানিয়া নানা প্রকারে সমবায় আন্দোলনকে সাহায্য করিতেছেন। গত বৎসর রুশিয়ায় বিক্রয়-সমিতি ছিল ২৭৪০০ ও তাহাদের মেম্বারের সংখ্যা এককোটি ১৪ লক্ষ। সকল প্রকার সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার ও তাহাদের মেম্বারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। বিক্রয়-সমিতিগুলির মূলধন ৩৩ কোটি রুবল বা প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

ভারতের কথা

ভারতে সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা খুবই কম আর যে-গুলি আছে তাহাদের অবস্থাও খুব খারাপ। মাদ্রাজের ট্রিপলিকেন ষ্টোর ছাড়া আর একটিও সুপরিচালিত ষ্টোর নাই বলিলেই চলে। উক্ত ষ্টোরটী ৩১০ টাকা মূলধনে আরম্ভ হইয়া আজ লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করিতেছে। ইহার মেম্বারের সংখ্যা ৪ হাজারের উপর। ইহার ২৩টী শাখা আছে; অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৩০,০০০৲ এবং ১৩০ জনের অধিক লোক এই ষ্টোরে কাজ করে।

সমবায় ভাণ্ডারের মোট সংখ্যা

ভারতে এবং অনুন্নত দেশে সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা কম হইলেও সমগ্র পৃথিবীতে সমবায় আন্দোলন খুবই বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীতে কত সমবায় ভাণ্ডার আছে বা তাহাদের মেম্বারের সংখ্যা কত ইহার ঠিক সংবাদ পাওয়া দুষ্কর হইলেও আনুমানিক হিসাবে বলা যায় যে, পৃথিবীতে অন্যূন ১ লক্ষ সমবায় ভাণ্ডার আছে এবং ইহাদের মেম্বারের সংখ্যা অন্যূন ৫ কোটি। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট লোক-সংখ্যা ১৫০ কোটি ধরিলে প্রতি ৩০ জনের মধ্যে ১ জন সমবায় ভাণ্ডারের সভ্য। সকল মধ্যবর্ত্তিগণকে লোপ করিতে হইলে পৃথিবীর সকল লোককে সমবায় ভাণ্ডারের সভ্য হইতে হইবে এবং সকল জিনিষ সমবায় ভাণ্ডার হইতে কিনিতে হইবে। এখনও তাহার দেরী আছে; কিন্তু জগতের গত কয়েক বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমবায় ক্রয়-বিক্রয়-সমিতির সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোপ হইতে বেশী দেরী হইবে না।

উৎপাদনে সমবায়

বণ্টনের কার্য্যে সমবায় কিরূপে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী লোপ করিতে পারে তাহাই বিশেষ করিয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা গোঁড়া সমবায়ী তাঁহারা মনে করেন যে, উপাদানের দিক্ হইতেও সমবায়ের সাহায্যে

সকল প্রকার ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিয়া সমাজতন্ত্র প্রচলন করা যাইবে। তাঁহারা বলেন যে, যদি সকলেই সমবায় সমিতির সভ্য হয় তবে তাঁহাদের ব্যবহার্য্য জিনিষ সমবায় সমিতিই উৎপন্ন করিবে এবং এইরূপে সমবায়ের সাহায্যে সমাজতন্ত্র বা সমস্বত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাস্তবিক পক্ষে সমবায় সমিতিগুলি এখন আর শুধু জিনিষ ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট নয়। ইংল্যণ্ডের ও স্কটল্যণ্ডের সমবায় সমিতিগুলি মেম্বারদিগের জন্য ১৯২২ সালে প্রায় ২২ কোটি (?) মূল্যের খাদ্যদ্রব্য, কাপড় চোপড়, আসবাব পত্র বাসন ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সমিতিগুলির কয়লার খনিতে প্রত্যহ ১০০০ টন কয়লা তোলা হয়। তাহাদের জমাজমি ও কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ৩৩,৫০০ একর। ভারতেও তাহাদের ৩৩,০০০ একর চা-বাগান আছে। জার্ম্মাণির সমবায় সমিতিগুলিও মেম্বারদিগের জন্য সাবান, তামাক, রুটী, বিস্কুট, ম্যাচ, বাক্স, আসবাব পত্র, ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এমন কি বাংলা দেশেও সমবায় সমিতিগুলি কাপড়ের কল, রেশমের কারখানা, শাঁখার কারখানা, জুতার কারখানা, ডেয়ারি ইত্যাদি খুলিয়াছে। এই সকল হইতে কেহ কেহ আশা করেন যে, সমবায়ীরা ক্রমে ক্রমে সকল প্রয়োজনীয় জিনিষই নিজেদের কল-কারখানা স্থাপন করিয়া উৎপন্ন করিয়া লইতে পারেন; ও এইরূপে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম ধ্বংস করিয়া এক বিরাট সমবায় পরিবার গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

নিছক থিওরির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে কোন মতে অসম্ভব বলা যায় না; কিন্তু উৎপাদনের জন্য যন্ত্র শিল্প-গুলি এরূপই বৃহদায়তন হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের মূলধন যেরূপ কোটী কোটী টাকা হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে বড় যন্ত্র শিল্পগুলি সমবায়ের সাহায্যে হাত করিতে বহু সময় লাগিবে বা তাহার পথে বহু বাধা উপস্থিত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। এই সঙ্গে আবার শ্রমিক ও ধনিকে শ্রেণীগত সংগ্রাম এরূপ তীব্র আকার ধারণ করিতেছে যে, কি উপায়ে যে বৃহৎ শ্রম-শিল্পগুলি মজুরদিগের হাতে আসিবে তাহা কিছুই বলা যায় না। যাহা হউক উৎপাদনে সমবায়ের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বণ্টন-সমস্যা যে সমবায় ছাড়া আর কোন রূপে সমাধান করা যাইবে না তাহা বিশেষ করিয়া রুশিয়ার সোভিয়েট সরকারের অভিমত হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদে সমবায়ের স্থান অতি উচ্চে এ কথা বলাই বাহুল্য।

কৃষকের স্বাবলম্বন

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

চারিদিক্ থেকে শুনা যাইতেছে এবং নিয়ত চক্ষে দেখা যাইতেছে বাঙ্গালার কৃষকদের আজ বড় দুরবস্থা। জলের অভাব বা প্রাচুর্য্য প্রতি বৎসরই শস্যহানির কারণ হই-তেছে। আধি-ব্যাধি, অকাল মৃত্যু, শোক-তাপ, গো-মড়ক—বাঙ্গালার কৃষক যেন বেড়াজালে পড়িয়াছে। পাওনাদার, দোকানদার, জমীদার, মহাজন, কাবুলীওয়ালা, ফেরীওয়ালা এক একটী ঘাঁটি আগলাইয়া পাহারা দিতেছে। কৃষক যায় কোথায়? তাহার বাঁচিবার পথ কোনটী?

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, তাহাদের এ অবস্থা আসিল কিরূপে? প্রশ্নটী অতিশয় জটিল। তথাপি নানা-স্থান হইতে নানা প্রকারে ইহার উত্তর আসিতেছে। সে সকলের পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। এখন সকলেরই নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার আজকাল-কার দিনে কৃষকদের পক্ষে পথ কোন্‌টী।

ধনী দরিদ্র সকলের মুখে আজ একই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, সকলেরই আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। এই অভিযোগটীর মধ্যে কি যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহার এক প্রকার ব্যবহারিক

অর্থ আমরা ধরিয়া লইতে পারি—আমরা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নহি। কেহ হয় ত বলিবেন নিজের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সংসারে উন্নতির পরিপন্থী। কথাটী খুবই সত্য এবং এইখানেই জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। তবে অদৃষ্টের দোষে আমাদের অসন্তোষের গতি ভিন্নমুখী। একজন ব্যবসাদারের সহসা বিস্তর লোকসান হওয়ায় তাহার পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায়ের আদব-কায়দা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি তখন বাজারের খ্যাতি নষ্ট হইবার, ভয়ে, যথাসাধ্য ব্যয়-সঙ্কোচ না করিয়া বরং নানা বিষয়ে আড়ম্বর দেখাইয়া নিজের সুনাম জাগাইয়া রাখিতে লাগিলেন। ফলে যা চিরকাল হয় তাহাই হইল। বাজার-সুখ্যাতি গেল, ব্যবসা গেল, যথাসর্ব্বস্ব গেল। আমাদের অবস্থা এবং ঐ ব্যবসাদারের অবস্থা একই। সত্য আমরা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নই। আমরা সভ্যতার নজির দিয়া, নানা অজুহাতে নিত্য একশত একটী অভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকি। কিন্তু কিরূপে উপার্জ্জনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারা যায়, সেকথা একটীবার ভাবিয়া দেখি না। আমাদের চিন্তা যাহাতে বাহিরের আড়ম্বর বৃদ্ধি করিয়া বড় পরিচয় দিতে পারি। সকলেই প্রায় বলিয়া থাকে, "পেটে খাইয়াছি কিনা কেহ দেখিতে আসে না, বসন-ভূষণটাই আগে দেখে।" এই কথা শুনিলে, যে পালক অশ্বকে খাইতে দিত খুব কম কিন্তু ডলাই মলাই করিত খুব বেশী তাহার কথাই মনে পড়ে। আমাদের বাহ্য চাকচিক্যময় দেহ সেই অদ্ভুত অশ্বদেহের সহিত তুলনার যোগ্য।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, বসন-ভূষণের সমস্ত আহার্য্যে ব্যয় করিয়া দেশশুদ্ধ নাগা সন্ন্যাসী সাজিয়া বসিয়া থাকুক। যদি যথাসম্ভব আয় বৃদ্ধি করিয়া খাওয়ার ও পরার সামঞ্জস্য রাখা না যায় তাহা হইলে আমি এই বলিতে চাই যে, অন্তদিকে সম্ভবমত ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া নিজের দেহরথখানি সুদৃঢ় ও কর্ম্মঠ রাখিতে হইবে। পার্থিব সর্ব্ব প্রচেষ্টার মূলে স্বাস্থ্য। পেট ভরিয়া খাইলে শরীরে যে তেজ সঞ্চার হইবে তাহা শীতের পাঁচটা জামার চেয়েও বেশী। মিহি কাপড়, যাহা তিন মাসে ছিঁড়িয়া যায়, তাহা বিলাতী হউক বা তাঁতের হউক—সর্ব্বথা পরিহার্য্য। কৃষক যখন সব শস্যের চাষই করে তখন দশ বিশটা তুলা কাপাসের গাছ লাগান এবং যখন ক্ষেতে খামারে বেশী কাজ না থাকে তখন চরকা কাটিয়া পরিবারবর্গের মোটা মজবুত কাপড় বুনাইয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। সকলেই সভ্যতার দোহাই দিতে দিতে সমুদ্রে লম্ফ দিতেছে। ধারণা হইয়াছে জামা জুতা পরিয়া বাবু সাজা এবং নিত্য সাবান মাখিয়া অঙ্গ প্রসাধন করাই সভ্যতা। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, সুদৃঢ় দেহ, সরল নিষ্পাপ মনই সভ্যতার আদর্শ। অযথা জামা কাপড়ের ব্যবহার পাপের আবরণ স্বরূপ ঘৃণা করা উচিত।

যে সমস্ত দুর্ঘটনা, ব্যাধি বা উৎপাত কখন ছিল না বা কখন আশঙ্কা করা যায় নাই, তাহাই আজকাল শস্যহানির কারণ হইতেছে। মোটের উপর যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মাত্র চাষের উপর নির্ভর করা চলে না। আমাদের দেশের কৃষকেরা মাত্র জমির ফসল ও দেবতার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। দেবতা প্রসন্ন হইলে তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, আবার দেবতা বিমুখ হইলে তাহাদের অশ্রু-ধারায় বুক ভাসিয়া যায়। কৃষকের প্রতি দেবতা এখন প্রায়ই বিমুখ। তথাপি তাহারা নূতন রাস্তা খুঁজিয়া দেখিয়া লইতেছে না। জমিতে "জো" হইলে হাল দেয় ও বীজ বপন করে—এইখানেই তাহাদের কার্য্যের অবসান। সুতরাং মুক্তির উপায় কোথায়?

যখন দেখা যাইতেছে, চাষে সাফল্যের স্থিরতা নাই, তখন এমন কোন বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে চাষও চলে, আবার সেই বৃত্তিটীও চালান যায়। বাঙ্গালার কৃষকেরা সর্ব্বত্র বারমাস সমানভাবে মাঠের কাজে লিপ্ত থাকে না। তখন তাদের কোন না কোন গৃহশিল্পের আশ্রয় লওয়া দরকার। পরিবারের কাপড়, ডাক্তারের দর্শনী, জমীদারের খাজনা, মুদিখানার দেনা, মহাজনের ঋণ ইত্যাদি খুচরা খরচগুলি যাহাতে তাহার ধান বা পাট বিক্রয় করিয়া সরবরাহ করিতে না হয় এমন উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। পূর্ব্বে ঘরে ঘরে রেড়ীর তেল তৈয়ারী হইত—কেরোসিন কিনিবার প্রয়োজন ছিল না। কলার বাসনা, অড়হর,

বাবলাগাছ আল দিয়া তাহার ভস্মের ক্ষার-জলে কাপড় কাচা চলিত—সোডা, সাজিমাটী কেহ চিনিত না। বাড়ীতে লোক-পিছু একটী করিয়া ছাতা ছিল না—ঘরে তালপাতার ছাতা, টোকা বা মাতালী তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করিত। এখন এইরূপ শত শত ব্যাপারে ঘরের পয়সা বাহিরে যাইতেছে কিন্তু আয়ের মাত্রা এতটুকুও বাড়িতেছে না, বরং নানা প্রকারে সংক্ষেপ হইতেছে। কথায় বলে, কলসীর জল ঢালিতে ঢালিতে ফুরাইয়া যায়। কৃষকের এখন সেই দশা—তাহার ধান বা পাট বিক্রীর কটা পয়সা কত দিক আর সামলাইতে পারে?

বর্ত্তমান সভ্যতা তাহাদের চক্ষে যে ধাঁধা লাগাইয়াছে সেই ধাঁধা তাহাদের ঘুচাইয়া দিতে হইবে। আমাদের শিক্ষার ধারা যে দিল্লীর লাড্ডুর প্রলোভন দেখাইয়াছে, সেই প্রলোভন মুক্ত করিয়া শিক্ষার স্বরূপ তাহাদের দেখাইতে হইবে। তাহাদের যে সমাজ আছে, সংসার আছে, আধি, ব্যাধি, শোকতাপ, দুঃখ দুর্দ্দশা আছে, শিক্ষার সাহায্যে সে সকলের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজকাল কৃষকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে বা প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। তাহাতে কৃষকদের ব্যবহারিক জীবনে কিছু ফল হইবে ত? তাহাদের সমাজ যাহাতে উন্নত হয়, সংসার যাহাতে সচ্ছল হয়, তাহাদের অস্তিত্ব সমস্যার যাহাতে মীমাংসা হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার যাহাতে শক্তি সঞ্চয় হয় এমন কোন ব্যবস্থা থাকিবে ত? বাঙ্গালার কৃষক আজ এই আশায় কাজের কথাটি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

কে আজ মহাপ্রাণ ভাবুক আছেন, বাঙ্গালার কৃষকদিগকে বাঁচাইবার জন্য সেই পথের রেখাটী দেখাইয়া দিয়া অগ্রসর হউন। বাঙ্গালা দেশ ধন্য পবিত্র হউক,—বাঙ্গালার কৃষি-আন্দোলন সার্থক হউক।

যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্র*

আর্থিক আইন-কানুন ও স্বদেশ-সেবা

সত্য কথা বলিবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা জানিনা। কিন্তু অপ্রিয় কথা বলিতে আমি ওস্তাদ।

প্রথমতঃ, বিদেশ হইতে পুঁজি আমদানি করিয়া ভারতের ধন-সৃষ্টিতে আর বেকার-সমস্যায় সাহায্য করা আমি বিচক্ষণ স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকি। তাহার অন্যান্য সুফলের ভিতর আমি দেখিতে পাই যে, চাষীরা অল্পমাত্র জমির উপর নির্ভর করিয়া গণ্ডা গণ্ডা লোকের ভরণ-পোষণ করিতে আর বাধ্য হইবে না, জেলায় জেলায় অসংখ্য আধুনিক প্রণালীর শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে, মজুর আর মধ্যবিত্ত নামক দুই শ্রেণীর লোক-বল, ধন-বল, জ্ঞান-বল ও চরিত্র-বল বাড়িতে পারিবে আর সমাজের সর্ব্বত্র যন্ত্র-নিষ্ঠার জয়জয়কার চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের হাতে জনগণকে বেশী পরিমাণে ট্যাক্স দিতে উৎসাহিত করা আমি স্বরাজ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। কেননা স্বরাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতের নানাপ্রকার কাজে টাকা খরচ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করানো আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, আঠার পেন্সের রূপেয়ার স্বপক্ষে আমি প্রথম হইতেই আছি। তাহাতে বাঙলার চাষীর ক্ষতি আমি দেখিতে পাই না। চতুর্থতঃ, সরকারী কৃষি-কমিশনের বিপক্ষে যুক্তি দেখানো আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর পঞ্চমতঃ, আজকাল যে "রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আইনের কথা উঠিয়াছে তাহার স্বপক্ষেই আমার চিন্তা খেলিতেছে।

বোলশেভিক রুশিয়ায় "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা "সরকারী"

* ঢাকা জেলার যুবক সম্মেলনে অর্থনৈতিক বিভাগের সভাপতি শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ (১৯২৭ সন)।

প্রতিষ্ঠান, ইতালিতেও তাই। অর্থাৎ অংশীদার নামক জীব এই দুইটার শাসনকর্ত্তা নয়। অপরদিকে ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেখা যাইতেছে যে, দুনিয়ায় সরকারী এবং বে-সরকারী দুই প্রকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কই চলিতেছে। কাজেই ভারতে যদি বিলাতী-জার্ম্মাণ আদর্শের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কায়েম হয় তাহা হইলে একটা মারাত্মক কিছু সয়তানি ঘটিবে বলিয়া আমি সন্দেহ করি না।

তবে ইহার শাসনে ও কর্ম্ম-পরিচালনায় ভারত-সন্তানের হাত বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক কিছুতেই "ইণ্ডিয়ানিজেশ্যন" বা ভারতীকরণ এখনো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। কাজেই একমাত্র ইণ্ডিয়ানিজেশ্যনের ওজরে রিজার্ভ-ব্যাঙ্ককে খাড়া হইতে না দেওয়া আমার মতে অতিমাত্রায় চরম-পন্থিতা। সাধারণতঃ চরম পন্থিতার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই চরমপন্থিতা বাঞ্ছনীয় কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ব্যাঙ্কটাকে অন্যান্য তরফ হইতেও শাসন হিসাবে উন্নত করা সম্ভব। প্রস্তাবে আছে যে, মাত্র চারটা "ভারতীয়" ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক কাগজপত্র এই ব্যাঙ্কে স্বীকার করা হইবে। অথচ ২২টা বিদেশী ব্যাঙ্ক এই অধিকার ভোগ করিবে। এই বিধানের বিরুদ্ধে আমি বলিতে চাই যে, অন্ততঃ গোটা চল্লিশেক "ভারতীয়" জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ককে এই অধিকার দেওয়া উচিত। অধিকন্তু, ভারতের প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলারও এই অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।

শাসন-সংক্রান্ত এই ধরণের কয়েকটা দফা বাদ দিলে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের প্রস্তাবে যে সকল সর্ত্ত আছে তাহার অধিকাংশই আমার বিবেচনায় যুক্তি-সঙ্গত এবং গ্রহণীয়। বিশেষতঃ, ইয়োরামেরিকার চরম অভিজ্ঞতার সুফল এই ব্যাঙ্কের নোট-জারী আর নোটে-সোনায় সম্পর্ক সম্বন্ধে কায়েম করিবার ব্যবস্থা আছে। সহজে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নোট সম্বন্ধে ফরাসী কায়দা ত বর্জ্জিত হইয়াছেই, এমন কি বিলাতী রীতিও গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে আছে জার্ম্মাণ-জাপানী রীতি।

বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তাই হউক অথবা প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-বিষয়ক বিলই হউক,—কোনো বিষয়েই বিপুলায়তন কেতাব লিখিবার সময় বা সুযোগ আমার জুটে নাই। তবে নানা উপলক্ষ্যে সিদ্ধান্তগুলা কয়েক কথায় প্রচার করা গিয়াছে।

মতামতের অনৈক্য

বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের মতন আর্থিক আইন-কানুন বিষয়েও আমার মতামতগুলা লোক-প্রিয় নয়। সর্ব্বত্রই আমি কিছু বেআড়া রকমের কথা বলিয়া থাকি।

কাজেই আমার নিকট হইতে আজও হয়ত পুরাপুরি অপ্রিয় কথাই বাহির হইবে। অন্যান্য দুনিয়ার মতন আর্থিক দুনিয়ায়ও বহুসংখ্যক মতভেদ আর দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমি অবশ্য দল পুরু করিবার মতলব রাখি না। মতটা জাহির করিবার স্বাধীনতা পাইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকি।

আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন কিংবা স্বরাজশীল থাকিত তাহা হইলেও একাধিক পরস্পর-বিরোধী আর্থিক মত বাজারে চলিত। কাজেই যখন-তখন যেখানে-সেখানে যে-সে মতকে দেশ-হিতকর অথবা দেশের অনিষ্টকারক বলিতে গেলে অবিচার করা হইবে।

আজ ভারতে স্বরাজ বা স্বাধীনতা নাই বলিয়া সর্ব্বদা দেশসুদ্ধ লোককে কোনো এক মতের স্বপক্ষে "দেশের-নামে" বিনা বাক্যব্যয়ে রায় দিতে উদ্বুদ্ধ করা স্বদেশ-সেবার লক্ষণ না হইতেও পারে। তাহাতে "দেশের স্বার্থ" রক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর উপর অত্যাচার ও জুলুম ঘটিতে বাধ্য। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাধারাণতঃ আমরা না ভাবিয়া চিন্তিয়া চাষী আর মজুর এই দুই শ্রেণীর লোককে এক গোত্রের অন্তর্গত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই দুইএর স্বার্থ অনেক সময়েই একরূপ নয়। বিদেশী মাল বয়কট সুরু হইলে অথবা তাহার উপর চড়া হারে শুল্ক চাপাইলে খরিদ্দার

হিসাবে চাষীদের ক্ষতি। কিন্তু যে সকল স্বদেশী ফ্যাক্টরীতে সেই সব মাল তৈয়ারী হয় বা হইবার সম্ভাবনা তাহার মজুরেরা তাহাতে বিচলিত হইবে কেন?

কাজেই চাষী আর মজুরকে অনেক সময়ে দুই বিভিন্ন স্বার্থের লোক অতএব দুই বিভিন্ন পথের পথিক দেখিতে পাওয়া স্বাভাবিক। আবার কলের মালিকেরা যে আইন বা কর্ম্ম-প্রণালীকে দেশহিতকর বিবেচনা করেন তাহাকে মজুরেরাও "দেশের পক্ষে" মঙ্গলজনক বিবেচনা করিবে এরূপ কথা বলা চলে না।

তারপর, তথাকথিত মধ্যবিত্তের মতি-গতি, স্বার্থ বা নীতি কিরূপ? এই শ্রেণীর লোকেরা আজ হয়ত জমিদারের পথকে, কাল হয় ত ফ্যাক্‌টরি-মালিকের পথকে, "দেশের পথ" বিবেচনা করিতে পারে। এমন কি কখনও বা চাষীকে আবার কখনও বা মজুরকে তোয়াজ করা তাহাদের স্বার্থ-মোতাবেক বা যুক্তি-মাফিক দাঁড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং জোর জবরদস্তি করিয়া কোনো দাগ-দেওয়া বিশিষ্ট মতকে স্বদেশসেবার মত বা স্বরাজের পথরূপে প্রচার করা গা-জুরি মাত্র। কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে, শ্রেণী-বিশেষকে বা দল-বিশেষকে দেশের এক-মাত্র বা প্রধান প্রতিনিধি বিবেচনা করা পুরাপুরি অন্যায়।

আর্থিক জীবনে ভাঙন-গড়ন

যৌবনশক্তির চাষ চালাইয়া বাঙলাদেশের যে কয়টা জেলা বাঙালী জাতিকে বর্ত্তমান জগতে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহার ভিতর ঢাকার ইজ্জৎ খুব বেশী। যুবক বাঙলার ১৯০৫-৭ সন ঢাকার আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছিল। আর এই বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতি দুনিয়ায় যাহা-কিছু করিয়া আসিতেছে তাহার প্রধান ফোয়ারা সেই ১৯০৫-৭ সনের কর্ম্ম ও চিন্তারাশি।

সেই যুগের সাধনাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবার জন্য যুবক বাঙালা দেশে বিদেশে নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙালীরা বহির্ব্বাণিজ্যে কিছু কিছু নজর দিতেছে। বাঙালীরা শিল্প-কারখানা কায়েম করিতেছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদের চেষ্টা বাঙলায় দেখা যাইতেছে। বাঙালীর তাঁবে "যৌথ" ব্যাঙ্ক আর "সমবেত" ব্যাঙ্ক কতকগুলা মাথা খাড়া করিয়াছে।

বাঙলার বাহিরে যুবক বাঙালা বাঙালী যৌবনশক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়িতেছে। ভারতের বাহিরেও বাঙালী সাঁতার কাটিয়া গিয়া আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে বর্ত্তমান ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জাপানী সমাজে বাঙালীর যৌবনশক্তি ভারত-সুহৃৎ ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে, রুশিয়ায় সর্ব্বত্রই যুবক বাঙলা নবীন ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে জীবন্ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। দুনিয়ার বড় বড় চিন্তা-কেন্দ্রে আর কর্ম্মকেন্দ্রে যুবক বাঙলা একটা "বৃহত্তর ভারত" কায়েম করিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের জীবনস্রোত আজ জগতের মজুর, পুঁজিপতি, শিল্পী, বিজ্ঞানসেবী, সাংবাদিক, রাষ্ট্রবীর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নরনারী মহলে গিয়া ঠেকিয়াছে। দুনিয়ার অনেক প্রকার আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীন ও সমানভাবে জীবন-বিনিময় সাধিত হইতেছে।

প্রবীণেরা যাহা কখনো কল্পনা করিতে পারিত না ১৯০৫-৭ সনের নবীনেরা সেই স্বপ্নাতীত খেয়ালগুলাও কার্য্যে পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছে। যুবক বাঙলার এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইল কি করিয়া? যৌবন-শক্তির যুক্তিশাস্ত্রই এই অসাধ্য-সাধনের জন্য দায়ী। ভাঙন আর গড়ন হইতেছে সেই যুক্তিশাস্ত্রের মোটা কথা।

দুনিয়া সম্বন্ধে যুবারা ভাবিত,—

সূর্য্য ভাঙিয়া গড়েছে পৃথিবী, পৃথিবী ভাঙিয়া গড়েছে চাঁদ,
আগ্নেয়গিরি ভাঙিয়াছে ধরা,—নদী ভাঙিয়াছে গিরির বাঁধ।
ধাতুরে গ্রাসিয়া বাঁচিতেছে গাছ, জীব বাঁচিতেছে গাছেরে খেয়ে,
অতীতে গ্রাসিয়া হল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানেরই মেয়ে।
ব্যক্তিমাত্রে বহুত্বময়, নীতিধর্ম্ম বদলায় ক্ষণে ক্ষণে;
জীবনের প্রাণ চির-বিপ্লব,—স্থিতি নাহি তাহার পুরাতনে।
ভাঙার দাগ ত চারিধারে দেখি, দুনিয়াতে হেরি নিক্ষল সব,
সবই অপূর্ণ বিশ্ব ব্যাপিয়া, শেষ পরিণাম শুধু পরাভব।
হিন্দু-গ্রীক ছাড়, ডারুইন্-কেপ্লার,—তারাই কক্ষে পায়না হে!

রেডিয়াম এসে বাষ্প-তড়িতে ভিটেমাটি-ছাড়া করিল যে!
পরাজয়ই বটে উন্নতি, আর হারিল যাহারা তারাই বীর,
পরাজিত বীর কমেনা যাদের, অমরতা ভাগ্যে সেই জাতির।
ছুনিয়ার গায়ে লেখা আছে ছুই, বিপ্লব,—বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র্য,—তাহাই সার্থকতা।

যুবক বাঙলা পরাজয় আর বিফলতাকে ডরায় নাই। অসাধ্য-সাধনই তাহার একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল। এই অসাধ্য-সাধনের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরা অতীতেই তোয়াক্কা রাখে নাই, অভিজ্ঞতার ধার ধারে নাই, ফেল-মারার ভয়ে জড়সড় হয় নাই। তাহাদের বিচারে বর্ত্তমানই একমাত্র কাল। ভবিষ্যৎকে গোলাম করিয়া রাখিবার জন্য বর্ত্তমানের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিই ছিল তাহাদের জীবন-দর্শন।

আজ ১৯২৭ সন। অসাধ্য-সাধন আর বর্ত্তমান-নিষ্ঠা ধাপের পর ধাপে এক কথঞ্চিৎ উন্নত ঠাঁইয়ে আসিয়া খাড়া হইয়াছে। বাঙলার যৌবন-শক্তি এই উঁচু ঠাঁইয়ের মাপে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইতে পারিবে কি? এই ঠাঁইয়ে দাঁড়াইয়া যুবক বাঙলা প্রবীণদের দিকে তাকাইয়া বলিতে সাহসী হইবে কি,—

"ছুনিয়ার গায়ে লেখা আছে ছুই,—বিপ্লব, বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র্য, তাহাই সার্থকতা?"

ছুনিয়া আজ বাঙলার যৌবনশক্তিকে এই পরীক্ষায় ফেলিয়াছে। ভাঙনগড়নের ক্ষমতা আছে কিনা তাহারই আবার যাচাই হইতেছে।

আজ অর্থশাস্ত্রের পালা। এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের অনেকেই কেতাব-পুঁথির ধার ধারেন না। অনেকে আবার কেতাবের পোকা-বিশেষ। কেহ বা কাজের লোক, খুবই ব্যস্ত। তাঁহারা যুক্তি তর্কের ধান্ধায় সময় খরচ করিতে অনভ্যস্ত। আবার অনেকে হয়ত তার্কিক। "কামের কথা পরে হবে" বলিয়া তাঁহারা তর্কের খাতিরে তর্ক চালাইতেই সুপটু।

জীবন আমাদের এইরূপ বিভিন্নতাময়। কিন্তু সকলেই যৌবনের ভাঙন-গড়নে মাতিবার জন্য এইখানে উপস্থিত হইয়াছি। আর্থিক জীবন সম্বন্ধে যে সকল চিন্তা-প্রণালী ও কর্ম্ম-প্রণালী এতদিন সনাতন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর কোন্‌টা গ্রহণীয় আর কোন্‌টাই বা বর্জ্জনীয় তাহার কিছু কিছু খতিয়ান করা আজকার উদ্দেশ্য। বিরাট বিশ্বকোষ ঘাড়ে বহিয়া আনি নাই। যেসকল কথা আলোচনা করা যাইতেছে সেই সবও নেহাৎ সূত্রাকারে আলোচিত হইবে। মোটা সিদ্ধান্তগুলা দেখানো হইবে মাত্র।

গোটা কয়েক অর্থনৈতিক স্বীকার্য্য

যে ধরণের ধনবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র আমার মেজাজ-মাফিক তাহার কয়েকটা মূলসূত্র প্রথমেই বলিয়া রাখি। এইগুলা আমার নিকট নেহাৎ গোড়ার কথা,—স্বতঃসিদ্ধ বা প্রাথমিক স্বীকার্য্য-বিশেষ।

১। ইতালি ও জাপানের অর্থনীতি

বিদেশের নজির, বিদেশী অভিজ্ঞতা আর বিদেশ-নিষ্ঠা যুবক বাঙলার আর্থিক ভাঙা-গড়ায় এক বিপুল শক্তি। কিন্তু বিদেশ ত এক বিরাট ছুনিয়া। এই ছুনিয়ার কোন কোন্ অঞ্চলের নজির ও অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে আজ-কালকার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় বিশেষরূপে কার্য্যকর? আমার বিবেচনায় একদিকে ইতালিয়ান আর অপরদিকে জাপানী কৃষি-শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের খুব বেশী কাজে লাগিবে। ইতালির আর জাপানের আর্থিক কর্ম্মপ্রণালী আর চিন্তাপ্রণালী বাঙলার ব্যবসায়ী মহলে আর ধনবিজ্ঞান-সেবীদের আবহাওয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

কারণগুলা অতি সোজা। ইতালি ইয়োরামেরিকার "সভ্য" বা "উন্নত" বা "যন্ত্রনিষ্ঠ" বা "ধনশালী" দেশগুলার ভিতর নিকৃষ্ট। আর জাপান হইতেছে এই সকল বিষয়ে এশিয়ার সেরা।

ঘটনাচক্রে প্রাচ্য জাপান আর পাশ্চাত্য ইতালি সভ্যতার সিঁড়িতে প্রায় এক ধাপেই অবস্থিত। উভয়ের সমস্যাই একরূপ। উভয়েই আজও কৃষি-প্রধান অবস্থায় রহিয়াছে। উভয়কেই আস্তে আস্তে যন্ত্রনিষ্ঠ, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠ, শিল্প-নিষ্ঠ সমাজ-জীবনের কোঠায় উঠিতে হইতেছে। এই

সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত আজ তিন দেশ,—ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর আমেরিকা। এই তিন দেশকে ধ্রুবতারা করিয়া জাপান আর ইতালি জীবন-সাধনায় ব্রতী রহিয়াছে। ফ্রান্সের ঠাঁই এই তিন দেশের কিছু নীচে।

এইখানেই ভারতের সঙ্গে ইতালির আর জাপানের আধ্যাত্মিক সংযোগ অতি নিকট। আজ আমরা ভারতে আর্থিক জীবনের যে ধাপে রহিয়াছি ইতালি আর জাপন ঠিক যেন তাহার পরের ধাপ। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর আমেরিকা ও ফ্রান্স পর্য্যন্ত "প্রোমোশুন" পাইতে হইলে যুবক ভারতকে আগে ইতালি-জাপান নামক আর্থিক-সামাজিক পুলটা পার হইয়া যাইতে হইবে।

২। আর্থিক স্বার্থ ও হিন্দু-মুসলবান

"হিন্দুর স্বার্থ" আর "মুসলমানের স্বার্থ" ইত্যাদি বোল আজকালকার বাঙলায় খুব শুনা যায়। কিন্তু খাওয়া-পরা আর টাকা-রোজগারের কর্ম্মক্ষেত্রে এই ধরণের ধর্ম্ম হিসাবে স্বার্থভেদ আমি স্বীকার করিয়া চলিতে অসমর্থ। আমার স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ একদম অন্য ঢঙের।

যে-যে প্রণালী অবলম্বন করিলে বাঙলার চাষী, মজুর, কেরাণী, শিল্পী ও বণিক পরিবারগুলা দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারিবে, শীতকালে গায়ে আলোয়ান জড়াইবে, গরমে-বর্ষায় ছাতা মাথায় দিবে, স্বাস্থ্যকর ঘর-বাড়ীতে শুইতে পারিবে, ইস্কুল কলেজে পড়িতে পারিবে, অসুখ হইলে ডাক্তার-কবিরাজ-হাকিম ডাকিতে পারিবে আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা জমাইয়া রাখিতেও পারিবে,—সেই প্রণালীগুলা বাঙালী-হিন্দুর পক্ষেও যা, বাঙালী-মুসলমানের পক্ষেও তাই।

ধন-বিজ্ঞানে জাতিভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, ভাষা-ভেদ নাই। এ হইতেছে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মামলা। "সূচী-সংখ্যায়" ধরা পড়ে কোন্ লোকটা সুখে আছে আর কোন্ লোকটা দারিদ্র্য-সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছে। দাড়িতে আর টিকিতে তফাৎ করা "ইণ্ডেক্স্ নাম্বারে"র কোষ্ঠীতে লেখা নাই। এই সনাতন, বিশ্বজনীন বিদ্যার পতাকা-তলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐক্য-বদ্ধ হইতে বাধ্য।

যদি অনৈক্য দেখা দেয়, সে অনৈক্য দাড়ি আর টিকির অনৈক্য নয়। সে অনৈক্য জীবন-যাত্রার মাপকাঠির অনৈক্য। তুমি বেশী খাইতে পাইতেছ, ভাল কাপড় পরিতেছ, তোফা বাড়ীতে বাস করিতেছ আর আমি এই সকল বিষয়ে ঘৃণ্য নগণ্য জীবন যাপন করিতেছি, সেই অনৈক্য। অর্থাৎ ধনী-নির্ধনে, মজুর-মালিকে, চাষী-জমিদারে, কেরাণী-মনিবে অনৈক্য। এ সব অনৈক্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনৈক্য নয়,—আর্থিক ও সামাজিক অনৈক্য। আর এই সকল নূতন ধরণের অনৈক্য নিবারণের দাওয়াইও আছে হরেক রকমের। সে কথা সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না।

৩। সভ্যতার গতি সহর-মুখো

বড় বড় সহর কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়োরামেরিকায়ও ছিল না। পল্লী-জীবন, পল্লী-সভ্যতা, পাড়াগাঁয়ের আদর্শ ইত্যাদি মাল মান্ধাতার আমল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সমাজেরও অতি পরিচিত বস্তু। কিন্তু মহানগরী নামক জনপদ বা জীবন-কেন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছে। আর তাহার ধারা বিংশ শতাব্দীতে জোরেই বহিতেছে। আমাদের ভারত এই পল্লী-নগর সমস্যায় আগাগোড়া পাশ্চাত্যেরই জুড়িদার। তবে আমরা কাল হিসাবে ইয়োরামেরিকার পেছনে পেছনে চলিতেছি—এই যা প্রভেদ। মাল হিসাবে ভারতে এবং পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ নাই।

বর্ত্তমান জগতের বিশেষত্ব দুনিয়া-নিষ্ঠা, সংসার-শ্রদ্ধা আর শক্তি-পূজা। নগর-জীবনে এই সবই পুঞ্জীকৃত। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায় নানাপ্রকার সমাজ-সমস্যা দেখা দিয়াছে। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি, নরনারীর যৌন সম্বন্ধ, বিবাহ-প্রথা, নগরের চৌহদ্দি ও বহর, নগরের গৃহ-নির্ম্মাণ আর গৃহ-সংখ্যা,—এই সকল দফায় অনেক নূতন কিছু ঘটিতেছে। সরকারী ও বে-সরকারী লোকহিতের প্রতিষ্ঠান এই যুগেরই সন্তান। নগর-পরিচালিত শিল্প-কর্ম্ম, সেভিংস ব্যাঙ্ক, শিক্ষাকেন্দ্র, "যৌবন-ভবন" আর গ্রন্থশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও অতিমাত্রায় নবীন চিহ্ন।

এইসব চিহ্ন "সেকেলে" ইয়োরোপে ছিল না। পশ্চিমা

মুল্লুকেও এমন যুগ গিয়াছে যখন লড়াই চলিত চাষীতে আর শিল্পীতে। আর তখন প্রাচীন শিল্প-ওয়ালারা নবীন শিল্প-পতির দলকে দুশমন বিবেচনা করিত। প্রাচীনেরা নবীনের কর্ম্ম-কৌশল আর সফলতা দূর হইতে দেখিয়া হা-হুতাস করিত।

এই "সেকাল" কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের সামিল নয়, একশ' দেড়শ' বৎসরের পুরাণো কাল মাত্র। বিলাতী ইতিহাসে ১৭৬০ সনকে সাধারণতঃ শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তারিখ রূপে ধরিয়া লওয়া হয়। ফ্রান্সে আর জার্ম্মাণিতে শিল্প-বিপ্লবের তারিখ আরও ৫০।৬০।৭০ বৎসর পরের কথা। অর্থাৎ আজকাল ২০।৩০।৫০ বৎসর ধরিয়া ভারতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে যে-সকল ওলট-পালট চলিতেছে সেই সব সাধিত হইয়াছে ইয়োরামেরিকায় আমাদের একপুরুষ বা দুই পুরুষ আগে। দুনিয়ার সকল দেশেই শিল্প-বিপ্লবের সম-সম কাল প্রায় এক ধরণেরই কাল। আর সেই যুগটা পল্লী-নগরে ভাঙন-গড়নের যুগ।

বাঙলার ঢাকা ও ফ্রান্সের রাঁস

একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

১৮৭২ সনে ঢাকা সহরে ৬৮,৫৯৫ জন নরনারীর আস্তানা ছিল। ঠিক সেই বৎসর উত্তর-পূর্ব্ব ফ্রান্সের রাঁস নগরে ৬৯,৭৩৭ জন লোক বসবাস করিত। সংখ্যা দুইটা প্রায় কাছাকাছি, তবে ফরাসী নগরে কিছু বেশী। ১৯১১ সনে ঢাকার লোক-সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখের কিছু উপর,—১,০৮,৫৫১ আর রাঁস সহরে সেই বৎসর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১,১৫,১৭৮। এই সংখ্যাটার লাগালাগি সংখ্যা ঢাকায় দেখা দিয়াছে ১৯২১ সনের লোক-গণনায়। আজ-কাল বোধ হয় ১,২০,০০০ অথবা ১,২২,০০০ নরনারী ঢাকায় বাস করে।

ঘটনাচক্রে রাঁস সহরে লোক-সংখ্যা ১৯২১ সনে মাত্র ৭৬,৬৪৬। এই অধোগতির কারণ সকলেরই জানা কথা, কেননা ১৯১৪-১৮ সনের কুরুক্ষেত্রে রাঁস নগর ধ্বংস হয় আর লোকজন বাস্তভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করে। ফরাসী কাগজ-পত্রে দেখিতেছি, এক্ষণে পুনর্গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। লোকজন অনেকে ফিরিয়া আসিতেছে। বহুসংখ্যক বিদেশী লোকও বাসিন্দা হইতেছে। লোকসংখ্যা ইতিমধ্যে লাখ পার হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, দেখিতেছি যে, এশিয়ার একটা সহর আর ইউরোপের একটা সহর,—দুইই প্রায় একই মাপে বাড়িয়া চলিতেছে; পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে দুনিয়ার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নাগরিক জীবনের গতি মোটের উপর এক-মুখো। অর্থাৎ পশ্চিমকে নগর-নিষ্ঠ বা নগর-প্রধান আর পূবকে পল্লী-নিষ্ঠ বা পল্লী-প্রধানরূপে বর্ণনা করা ধনবিজ্ঞানের ধাতে অসম্ভব। লোক-বহুল জনপদ অর্থাৎ নগর ইউরোপের "সেকালে" ছিল না। পাশ্চাত্য রক্তও পল্লী-কেন্দ্রেই মসগুল থাকিতে অভ্যস্ত ছিল। ১৮০৮ সনে রাঁসনগরে লোক বাস করিত মাত্র হাজার বিশেক; আজকালকার বিষ্ণুপুর বা কিশোরগঞ্জ সেই কোঠায় রহিয়াছে।

বাঙলায় আজকাল শ'দেড়েক মিউনিসিপ্যালিটি চলিতেছে। দুনিয়ার মাপে এ উল্লেখযোগ্যই নয় বটে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের ক্রমবিকাশ হিসাবে এই সংখ্যা নেহাৎ নিন্দনীয় নয়। ১৮৭২ সনের বাঙলায় সহুরে লোক ছিল গুনতিতে ১৮,৫৭,৫০৪ জন। ১৯২১ সনের জরীপে দেখা যাইতেছে ৩১,১১,৩০৪।

৪।• ভারতে মজুর-নিষ্ঠা

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতি যত কারণে নবশক্তির আধার হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতর আধুনিক শিল্পকর্ম্মের সেবক, দীন মজুর সম্প্রদায় অন্যতম। বাস্তবিক পক্ষে সহর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ফ্যাক্টরি আর মজুর এই চার বস্তু আধুনিক আধ্যাত্মিকতার সমান প্রতিমূর্ত্তি। ভারতবর্ষ এই কর্ম্মক্ষেত্রে কোনো নতুন সৃষ্টি দাবী করিতে অসমর্থ। কিন্তু ইয়োরামেরিকার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া আমরাও জাপানীদের মতনই নবীন অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছি।

বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য দেশের মতন ভারতও ক্রমশঃ ফ্যাক্টরি-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও মজুর-শক্তিই স্বরাজ ও স্বাধীনতার

প্রধান সহায়রূপে দেখা দিতেছে। কাজেই মজুর-আন্দোলনের ক্রমিক উন্নতিকে আমি ভারতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিরই এক বড় খুঁটা সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত।

এই বৎসর দিল্লীতে নিখিল-ভারত মজুর কংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। আগামী বৎসর কলিকাতায় অধিবেশন বসিবে। অপরদিকে জেনেহ্বার আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সম্মেলনের সঙ্গে ভারতীয় মজুর-আন্দোলনের যোগাযোগ কায়েম হইয়াছে। উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ও অন্যান্য ভারতবাসী এই আন্দোলনে মজুরদের সুহৃৎভাবে দাঁড়াইয়া ভাবুকতার নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া ধরিতেছেন। মজুর-আন্দোলনে ক্রমশঃ নানা দল দেখা দিতে থাকিবে। তাহাতে ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

মজুর-ভারতের লোক-বল

কোনো কোনো বৎসর গড়ে প্রায় ২,০০০,০০০ শ্রমিক, স্ত্রী ও পুরুষ, ধর্ম্মঘট করিতে শিখিয়াছে। ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য ইয়োরামেরিকার শ্রমিকদের উদ্দেশ্য হইতে এক চুলেও এদিক্-ওদিক্ নয়। অর্থাৎ সকলেরই আকাঙ্ক্ষা—"কম ঘণ্টা খাটিয়া বেশী পারিশ্রমিক লইব, ভাল বাসস্থান পাইব এবং কর্ম্ম-শাসন-বিষয়ক অনেক সুবিধা ভোগ করিব।" তবু বলিতে বাধ্য, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এখনও শৈশব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও তাহার আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে জাগে নাই। কেন একথা বলিতেছি তাহা পরবর্ত্তী বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

বাংলার বহু কয়লার খনি ও পাটের কল, আসাম ও বাংলার অনেকগুলি চা-বাগান এবং উত্তর-পশ্চিম ও মাদ্রাজ প্রদেশের অনেকগুলি পশম-কলের মালিকগণ বিদেশী। শুধু ইহাদের বিরুদ্ধেই ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন সুরু হইয়াছে একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির মালিক ত আর বিদেশী নয়; তাহারা ত দেশেরই লোক। তাহাদিগের বিরুদ্ধেও এ আন্দোলন বন্ধ থাকে নাই। বলা বাহুল্য, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে এই মন-কষাকষি প্রায়ই কোনরূপ জাতিবিদ্বেষ-প্রসূত নয়। স্বদেশানুরাগ, জাতীয়তা বা রাজনীতির গন্ধও ইহার মধ্যে এক প্রকার নাই। শুদ্ধমাত্র আর্থিক অবস্থার দরুণই এই আন্দোলনের সূত্রপাত।

অনধিক ৩০,০০০্ টাকা মূলধন লইয়া যে সমস্ত "ছোট খাট" শিল্প-ব্যবসা চলিতেছে, তাহাদের কথা বর্ত্তমানে না হয় বাদই দিলাম। তাহাতে বেশী লোক খাটেওনা এবং সেখানে ফ্যাক্টরি চালানোর সমস্যা বা শ্রমের অবস্থা তেমন সঙ্গীনও নয়।

কিন্তু "মাঝারি" ও "বিরাট" শিল্পকারখানাগুলিতেই শ্রমসমস্যা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তা সে কারখানাগুলি স্বদেশীরই হউক আর বিদেশীরই হউক। টাটার লৌহ-কারখানায় ২৫,০০০ হাজার, হুকুমচাঁদের পাটের কলে ৫,০০০ হাজার মজুর খাটে। কাপড়ের কলগুলায় গড়ে এক হাজারের উপর লোক কাজ করে। এ সমস্তই দেশীয় কারখানা।

সরকারী গোলাগুলির কারখানার প্রত্যেটিতে গড়ে প্রায় ১,৭০০ লোক খাটে। অন্যান্য শিল্প-কারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের গড় ১০০ হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত। এইরূপ শ্রমিকসংখ্যার গড় (ফ্যাক্টরি প্রতি) বৃটিশ ভারতে ২৩০ এবং দেশীয় রাজ্যে ১৪০।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলিকে ঠিকের কাছাকাছি বলিয়া ধরিতে হইবে। যে সংখ্যা উপরে দেওয়া গেল সেটা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। জাপানে, ইতালিতে, এমন কি ফ্রান্সেও—এক একটা ফ্যাক্টরির কথা ধরিলে—অবস্থা এখনকার অবস্থা অপেক্ষা বেশী ঘোরাল নয়। শ্রমিক পুরুষ ও স্ত্রীর মোট সংখ্যা হয়ত ভারতবর্ষ অপেক্ষা সে সব জায়গায় বেশী। কিন্তু ফ্যাক্টরির শ্রম-বন্দোবস্ত-সমস্যা এবং মালিক ও ম্যানেজারদিগের উপর শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া ভারত ও বিদেশ সর্ব্বত্রই সমান। শিল্প-মজুরদের সমস্যা আজ আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপিয়া বর্ত্তমান।

কিন্তু ভারতের সাধারণ জীবনে শ্রম এখনও একটি প্রধান শক্তিরূপে কাজ করিতেছে না। শ্রমিক-সংখ্যাই তাহা বলিয়া দিতেছে। শিল্প-মজুরের সংখ্যা ভারতে ১৩,৭৫,১৩৬ মাত্র। এই সংখ্যাকে ভারতের অধিবাসীর

সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে, ইহা নিতান্তই নগণ্য। রেলের লোক, জাহাজের খালাসী, খনির মজুর, চা-বাগানের কুলী, কারিগর এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিক ইত্যাদি সকলের (স্ত্রী ও পুরুষ ধরিয়া) সংখ্যা ধরিলে দেখা যায়, ভারতের সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় দশ ভাগ লোক এই "শ্রেণীর"র অন্তর্গত। তবু এই সংখ্যাটা গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের "সঙ্ঘবদ্ধ" শিল্প-মজুরের তুলনায় খুব সামান্তই বলিতেই হইবে।

শ্রমিক বনাম ধনিক

ভারতে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা কিরূপভাবে পূর্ণ হইতেছে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—মন্দভাবে নয়। সপ্তাহে কত ঘণ্টা খাটিতে হইবে তাহা জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক মজলিসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতের ব্যবস্থাপক সভাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রেটবৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ এখনও কিন্তু "আইনে" পরিণত হয় নাই। এই হিসাবে ভারতবর্ষকে আধুনিকতমই বলিতে হইবে। হয় ত একটু অকালেই তাহার এই আধুনিকতা।

কিন্তু এখনও অনেক-কিছু করিবার আছে। শ্রমিকদের নেতারা একটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি সুবিধা দেওয়ার জন্যই ঐ বিলের উত্থাপন। কিন্তু উহা এখনও পাশ হয় নাই। উহার পাশ হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ—কলের মালিকদিগের আপত্তি। মালিকদের সমিতি গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্রে জানাইয়াছেন যে, ঐ বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁহারা একমত। তাঁহারা তেজের সহিত বলিয়াছেন, ঐ বিষয়ে জন-সাধারণের মত এখনও প্রবল নয়। ব্যবস্থাটা প্রবর্ত্তিত হইলে, ঐ বিষয়ে তদারক করাও কঠিন হইবে—ইত্যাদি। তাঁহাদের প্রদর্শিত কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, শ্রমিকেরা বিশেষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। আর একটি কারণ এই যে, স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নয়। সুতরাং বিলের সর্ত্তানুসারে ডাক্তারী সাহায্য প্রদান করা শক্ত।

একপুরুষ আগে ঐ ধরণের যুক্তি ইয়োরোপেও শুনা যাইত। মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় গভর্মেণ্ট এখনও জানেন না—বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার আইন কি বস্তু। তাঁহাদের ব্যবস্থা হইতেই বেশ বুঝা যায়—আর ভারতীয় শ্রমশক্তির দৌড় কতদূর এবং যে বিশ্ব-শ্রমের মধ্যে আজ সে আসন পাইয়াছে, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগের কোন্ স্তরে তাহার অবস্থিতি। অবশ্য আর্থিক জগতে উন্নতি করিতে হইলে ভারতের পন্থা আধুনিক দেশের পন্থা হইতে বিভিন্ন হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। শ্রম-বীমা কি বস্তু তাহা কিন্তু ভারতে এখনও অজ্ঞাত। আকস্মিক বিপদ, রোগ অথবা বার্দ্ধক্য শ্রমিক স্ত্রীপুরুষেরা বিশেষ কিছু সাহায্য পায় না। প্রথম ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল আইন-রূপে পরিগণিত হইয়াছে কেবল মাত্র ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাইয়ের কলের মালিকেরা ভারতবর্ষেরই লোক, ইয়োরোপের লোক নন। জাতীয়তা বা স্বদেশিকতার কোনো দিক্ দিয়াই তাঁহাদের আচরণ প্রাচ্যের প্রতি প্রাচ্যের অনুরূপ নয়। অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার ইংরেজ মালিকদের ব্যবহারেরই সমতুল। কাজে-কাজেই ভারতের মজুরেরা দেশীয় ও বিদেশীয় মালিকদের মধ্যে কোনো রকম ইতর-বিশেষ করিতে পারে না। আজ তাই ভারতের শ্রমিক-সমাজ পুঁজির বিপক্ষে, "ধন-তন্ত্রে"র বিপক্ষে দাঁড়াইতে শিখিতেছে। কোন্ জাত, কোন্ দেশের লোক, কোন্ ব্যক্তি-বিশেষ এই পুঁজির মালিক তাহার প্রতি তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভারতীয় শ্রমিক-পত্রিকা

ভারতের শ্রমিক এখন উদ্বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যেই "নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" দেখা দিয়াছে। তাহার শাখা-প্রশাখাও প্রদেশে প্রদেশে

ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং প্রতি বর্ষে তাহার বৈঠকও বসিতেছে। ত্রিশ বৎসর আগে কেবলমাত্র একখানি শ্রমিক-পত্রিকা ছিল। বোম্বাইয়ের স্বদেশ-প্রেমিক লখনদে গুজরাটি ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন। তাহার নাম ছিল "দীনবন্ধু"। কিন্তু আজ সেইখানে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরাজীতে প্রকাশিত প্রায় বিশখানি পত্রিকার নাম করা যায়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই পরিচালিত। অন্য সম্প্রদায়ের তাহাতে হাত নাই।

মারাঠীভাষায় "কামগর উদয়" নামে একখানি পত্রিকা আছে। বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল লেবার বোর্ড-কর্তৃক তাহা প্রকাশিত। মারাঠী সাপ্তাহিক "কামকরী" ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয়। আহাম্মদাবাদে গুজরাটীভাষায় "মজুরসন্দেশ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। কানপুর হইতে হিন্দীতে "মজদুর পত্রিকা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হয়। কলিকাতায় 'শ্রমিক' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। তাহার দুইটী করিয়া সংস্করণ বাহির হয়, একটী বাংলাতে, আর একটী হিন্দীতে। কলিকাতার সাপ্তাহিক "লাঙল" উঠিয়া গিয়াছে। এখন দেখা দিয়াছে "গণ-বাণী"।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের স্বার্থের কথা প্রকাশ করিবার জন্য অনেকগুলি পত্রিকা ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ান-কর্ত্তৃক "ইণ্ডিয়ান লেবার জ্যার্ণ্যাল" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সাঁতরাগাছি হইতে বাহির করা হয়। বোম্বাই হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউনিয়ন কর্ত্তৃক "জি, আই, পি, হ্যারল্ড" নামে একখানি পত্রিকা মাসে দুইবার করিয়া বাহির করা হইয়া থাকে। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ইউনিয়ান-কর্ত্তৃক একখানি সাপ্তাহিক লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। আউদ-রোহিলাখণ্ড রেলওয়ে-কর্ত্তৃক 'মজদুর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়। সাউথ ইণ্ডিয়ানের 'দি রেলওয়ে গার্জ্জিয়ান' একখানি সরকারী পত্রিকা। নাগাপত্তন (মাদ্রাজ) হইতে উহা প্রকাশিত। তারপর 'রেলওয়ে টাইম্‌স' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের যাবতীয় রেল-কর্ম্মচারীদের যা-কিছু সমস্যা, সে সমস্তই ইহাতে স্থান পায়। ঐ সব কর্ম্মচারীদের মিলনসঙ্ঘ-কর্ত্তৃক মুখপত্ররূপে ইহা বোম্বাই হইতে বাহির করা হয়।

ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদেরও অনেকগুলি পত্রিকা আছে। বাংলা এবং আসামের পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক 'লেবার' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। আর একখানির নাম 'পোষ্টম্যান'। ইহা বোম্বাই প্রদেশের 'পিয়নে'র মুখপত্র। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ই ইংরাজীতে লেখা হয়। বোম্বাই প্রদেশের পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্ত্তৃক 'জেনারেল লেটার্স' নামে একখানি মাসিক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নামের আর একখানি মাসিক পত্রিকা পুনার পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। লাহোর হইতে পাঞ্জাব এবং নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন 'পঞ্জাব কমরেড' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলিকাতা হইতে 'জেনারেল লেটার্স' নামে আর একখানি মাসিক নিখিল ভারতীয় (ব্রহ্মদেশ ধরিয়া) পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

ইংরাজীতে দুইখানি শ্রমিক-পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। একখানি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। নাম 'সোশ্যালিষ্ট'। ইহা সাপ্তাহিক। আর একখানি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত। নাম স্বধর্ম্ম। ইহাও সাপ্তাহিক।

বোম্বাই গভর্মেণ্টের 'লেবার বিউরো' মাসে মাসে একখানি বুলেটিন প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতে দেশী-বিদেশী সকল প্রকার তথ্যই থাকে।

৫। নারীত্ব ও বর্ত্তমান জগৎ

আদর্শ এবং জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ভারতীয় নারীতে আর পাশ্চাত্য নারীতে কোনো প্রভেদ নাই। আইনের চোখে, আর্থিক তরফ হইতে এবং রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে ইয়োরামেরিকার মেয়েরা এশিয়ার মেয়েদের মতনই 'গোলাম'

ছিল। মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন পশ্চিমা জগতে চলিতেছে। অর্থাৎ পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সাম্য কায়েম করিবার চেষ্টা পশ্চিম মুল্লুকে বেশী পুরাণো চিজ নয়।

এইদিকে পশ্চিমা মেয়েরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেও। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতের নারী আর খ্রীষ্টিয়ান পশ্চিমা নারী প্রায় একগোত্রের জীবই ছিল। গোটা জগৎ একই পথে, একই মতে, একই আদর্শে চলিয়াছে। ভারতের নারী খ্রীষ্টিয়ান নারী অপেক্ষা উন্নত ছিল না। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার নারী মানব-সভ্যতার নতুন এক অধ্যায় খুলিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। এই পথ তাহাদের আবিষ্কৃত চিজ। ভারতীয় নারীও সেই পথেই চলিতেছে এবং চলিবে। পূর্ব্বে পশ্চিমে এখন টক্কর চলিতেছে ঠিক যেন ঘোড়দৌড়,—পশ্চিমারা আগে আগে ছুটিতেছে, কিন্তু উহাদের কানটা মাত্র সম্প্রতি আগে আছে। ভারতীয় নারীকে বর্ত্তমানজগৎ-মাফিক কর্ম্মদক্ষতা, জীবনবত্তা ও ভাবুকতা অর্জ্জন করিবার জন্য এখনও কিছুকাল পশ্চিমা মেয়েদের পেছনে ছুটিতে হইবে। ইহাই যুবক বঙ্গের—যুবক ভারতের—যুবক এশিয়ার নারী-সমস্যা।

সমগ্র বিশ্ব ও সমস্ত জাতি সেই পুরাকাল হইতে এক পথে চলিতেছে। পাশ্চাত্যের কর্ম্মপদ্ধতি এক প্রকার আর প্রাচ্যের অন্য প্রকার একথা ঠিক নয়। সুয়েজ খালের এক পারের লোকদের যে পথ,—অপর পারের লোকদেরও সেই একই পথ। প্রাচ্যদেশ যে আধ্যাত্মিক হিসাবে জগতের গুরুস্থানীয় এ কথাও সত্য নয়। প্রাচ্যদেশ কোনো অতীতকালে জগতের গুরু ছিল, তাহাও ঠিক বলা চলে না। বড় জোর প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হইয়া চলিয়াছিল এই পর্য্যন্ত। সকলে এক দিকে চলিয়াছে। তবে কেহ বা আগে, কেহ বা পশ্চাতে। কেহ বা দশম ধাপে, কেহ বা অষ্টম ধাপে, কেহ বা তৃতীয় ধাপে, আবার কেহ কেহ প্রথম ধাপেও রহিয়াছে।

ইউরোপে "ভদ্র-ঘরের" মেয়েরা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আফিসে বা ব্যাঙ্কে চাকুরি করিত না। আজকাল করিতেছে। ভারতে আজও মেয়ে-মহলে এইরূপ চাকুরির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আছে। কিন্তু বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। আর মধ্যবিত্ত ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা ত চিরকালই সকল দেশে গতর খাটাইয়া খাইতে অভ্যস্ত।

৬। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও স্বদেশী আন্দোলন

আর্থিক দুনিয়ায় একঘরো জীবন কাটানো অসম্ভব। জগতের নানা লোকের সঙ্গে মালের আদান প্রদান অবশ্যম্ভাবী। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া মানবজাতিকে "কলা দেখানো" কখনই চলিতে পারে না।

বিদেশে কিছু কিছু মাল প্রত্যেক দেশকে কিনিতেই হইবে। তাহা না হইলে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য অচল থাকিতে বাধ্য। অপর দিকে বিদেশে প্রত্যেক দেশেরই কিছু না কিছু মাল বেচিতেও হইবে। তাহা না হইলে বিদেশী জিনিসের দাম সমঝাইয়া দেওয়া যাইবে কোথা হইতে? এই সকল গোড়ার কথা ধামা চাপা দিয়া রাখিলে "স্বদেশী আন্দোলন" সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা অসম্ভব।

সকল ক্ষেত্রেই অঙ্ক কষিয়া দেখা আবশ্যক, এক একটা জিনিস তৈয়ারী করিয়া বাজারে ফেলিতে খরচ পড়িতেছে কত। যদি দেখা যায় যে, বিদেশী মাল সস্তায় পাওয়া যাইতেছে তাহা হইলে এই দুই দরের প্রভেদটাকে শুল্কের দ্বারা যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ব্যবসাটির বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহার জন্য বিদেশী মালের উপর মোটা হারে শুল্ক বসানো অসঙ্গত। আবার যখন-তখন যে-সে স্বদেশী কারবারকে শিল্প-কারবার বলিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জলের মত টাকা ঢালাও আহাম্মুকি।

লড়াইয়ের পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতে একটা কাণ্ড বিশেষরূপে দেখা দিয়াছে। কারখানাওয়ালাদিগকে তাহাদের দেশের বাজার হইতে সমূলে উৎপাটন করিবার মতলবে বিদেশী কারখানাওয়ালারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছে। এই সকল কৌশলের ভিতর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অন্যতম। তাহার ফলে বিদেশের বাজারে অতি সস্তায় মাল হাজির করা হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ যদি কোনো দেশে ঘটনাক্রমে মজুরির হার

অন্য দেশের তুলনায় নীচু থাকে, তাহা হইলে যে-দেশে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত উচু সেই দেশের কারখানাওয়ালারা নিজ মুলুকেই বিদেশী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে অসমর্থ হয়। যে সকল দেশে "ইন্‌ফ্লেশ্যন" বা কাগজী-মুদ্রার অতিবিস্তারের দরুণ মুদ্রা-পতন ঘটিয়াছে সেই সকল দেশের মাল অন্যান্য দেশে পৌছিলে তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। শুল্ক-দুনিয়ার পারিভাষিকে তাহার নাম "ডাম্পিং"। ডাম্পিং-বিরোধী শুল্ক এক্ষণে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই চলিতেছে। তবে ইহাকে মামুলি সংরক্ষণ-শুল্ক হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করা ধনবিজ্ঞানের ন্যায়-শাস্ত্রের পক্ষে সুকঠিন।

ভারতের জাপানী-সমস্যা

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সংরক্ষণ-নীতির দিগ্‌বিজয় চলিতেছে। এখন প্রশ্ন কেবল খরচ-পত্রের আঁকজোক আর আমদানি-রপ্তানির সূচী-সংখ্যা। এই উপলক্ষ্যে ভারত সম্বন্ধে জাপানী জটিলতার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতেছি।

জাপান ভারতবাসীর পক্ষে মাল বেচিবার এক বড় বাজার। জাপানীরা আমাদের মাল কিনে ৮৫ ক্রোর টাকার। আর আমরা ভারতে মাত্র ২৬ ক্রোর টাকার জাপানী মাল খরিদ করিয়া থাকি। জাপানী মালের খরিদ্দার হিসাবে ইয়াঙ্কিস্থান আমাদের ভারতের চারগুণ বড়।

জাপানের সঙ্গে বোম্বাইওয়ালারা খোলাখুলি আড়ি চালাইয়া থাকেন। কিন্তু সত্যসত্যই আড়ি চালাইলে ভারতবাসীর লোকসান কতটা এই অঙ্কে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। জাপানীরা ভারতীয় মাল বয়কট করা সুরু করিলে লোকসান আমাদের নেহাৎ কম নয়। আর আমরা যদি গায়ে পড়িয়া জাপানীদের সঙ্গে দুশমনি চাগাইয়া তুলি তাহা হইলে আমরা নিজ বাজারটা নিজেই খোয়াইয়া বসিব।

জাপানে আর বোম্বাইয়ের বাণিজ্য-লড়াইটা এক বিচিত্র আকারে দেখা দিতে পারে। জাপানীদের সঙ্গে ভারতবাসীর যে আমদানি-রপ্তানি চলিয়া আসিতেছে তাহার পশ্চাতে আছে একটা "কন্‌ভেনশ্যন" বা বাণিজ্য-সমঝৌতা। ১৯০৫ সনে এই বিষয় লইয়া জাপানে আর বৃটিশ গভর্ণমেন্টে সন্ধি-জাতীয় বন্দোবস্ত কায়েম হয়। বোম্বাইওয়ালারা এইটা রদ করাইবার আন্দোলন চালাইতেও পশ্চাৎপদ নয়।

তাহার পাল্টা জবাব দিয়া জাপানী ব্যবসায়ীরা বলিতেছে,—"বহুত আচ্ছা! আমরা ভারতীয় লোহার বিরুদ্ধে আন্দোলন রুজু করিতেছি।" জাপানে ভারতীয় লোহার উপর কড়া শুল্ক বসিলে ভারতীয় লোহাওয়ালাদের ক্ষতি বিস্তর। কাজেই লড়াইটা চলিতেছে,—কাপড় বনাম লোহা। অতএব স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাখ্যায় ভাঙন-গড়ন অবশ্যম্ভাবী।

ইস্পাত ও সংরক্ষণ-শুল্ক

সংরক্ষণ-নীতি চালাইলেই যে দেশের উপকার হয় তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। আমাদের চোখের সম্মুখে দুইটা বড় দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

টাটার লোহা আর ইস্পাত কারখানার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই অনেকের চোখ ফুটিবার কথা। সরকারী ধন-ভাণ্ডার অর্থাৎ ভারতীয় নরনারীর দেওয়া ট্যাক্‌স হইতে সাহায্য না পাইলে টাটা কোম্পানী একদম অচল। কতবার ৬০ লাখ টাকা করিয়া দিতে হইবে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। এদিকে টাটা কতদিন বাঁচিবে তাহাও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যাচাই করা হয় নাই।

সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারতের নরনারীকে নানা তরফ হইতে অর্থকষ্ট সহিতে হইতেছে। কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসাকে নিজ পায়ের উপর দাঁড় করাইবার জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ ট্যাক্‌স-দাতাদের পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় ত অনুচিত নয়। কিন্তু সংরক্ষণ-নীতির অপর দিকটাও ভারতীয় স্বদেশসেবকগণের মগজে বসা দরকার। যে-যে শিল্পকে বা ব্যবসাকে বাঁচাইবার জন্য ভারত-সন্তান নিজের রক্ত দিতে বাধ্য হইতেছে, সেই সকল শিল্প ও ব্যবসার কর্ম্ম-পরিচালনায় তাহাদের মতামত এবং স্বার্থ রক্ষিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। স্বরাজ-নীতিকে বাদ দিলে সংরক্ষণ-নীতির আধখানাই মাঠে মারা যাইবে। টাটার উপর কঠোর নজর রাখা প্রত্যেক বিচক্ষণ স্বরাজ-সেবকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বৎসর পক্ষপাতমূলক ইস্পাত-সংরক্ষণ আইন জারি

হইয়াছে। বিদেশী ইস্পাতের আওতা হইতে স্বদেশী ইস্পাতের বাজারকে রক্ষা করা এই আইনের মতলব।

কিন্তু "বিদেশী"কে ভাগ করা হইয়াছে দুই খণ্ডে, (১) বিলাতী, (২) অন্যান্য বিদেশী, যথা মার্কিণ, ফরাসী বেলজিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি। বিলাতী ইস্পাতের উপর যে হারে শুল্ক বসানো হইল "অন্যান্য বিদেশীর" উপর তাহার চেয়ে বেশী হারে চাপানো হইয়াছে।

আসল কথা,—এই ক্ষেত্রে বিলাতী ইস্পাতকে ভারতের বাজারে বাঁচানো হইল "অন্যান্য বিদেশী" ইস্পাতের আক্রমণ হইতে। "অন্যান্য বিদেশী" ইস্পাতের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে টক্কর চালাইয়া বিলাতী ইস্পাত ভারতের বাজারে আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ।

বিলাতী ইস্পাতের স্বপক্ষে এইরূপ হামদর্দ্দি দেখানো ভারতীয় ক্রেতা ও জনসাধারণের পক্ষে আর্থিক হিসাবে ক্ষতিকর। ভারতবাসী আজকাল অনর্থক অত্যধিক মূল্যে বিদেশী ইস্পাত কিনিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাতে বিলাতের ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের লাভ আছে যথেষ্ট, কিন্তু ভারতীয় নরনারীর লাভ আধ কাঁচ্চাও নাই। বরং আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি বড় বড় দেশের অপ্রীতি অর্জ্জন করা হইতেছে মাত্র। তাহাতে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক দুই প্রকার ক্ষতিই ভারতের কপালে জুটিয়াছে।

৭। রেল-বিস্তারে আর্থিক উন্নতি

বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথগুলা একত্রে লম্বায় ৩৮,৫৭৯ মাইল। এই সব তৈয়ারী করিতে মাইল প্রতি গড়ে প্রায় ২,০০,০০০ টাকা লাগিয়াছে। ফী বৎসর মোটের উপর ৬০ কোটি লোক রেলপথে যাতায়াত করে আর মাল চলাচলের পরিমাণ ৮ কোটি টন। অর্থাৎ ভারতের লোক-সংখ্যা সংক্ষেপে ৩০ কোটি ধরিয়া লইলে প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া রেলে মোসাফিরি করে, আর ফী মোসাফির গড়-পড়তা প্রায় সিকি টন (৭ মণ) মাল লইয়া চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত।

আজ হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভিতর ১৫৯টা নতুন পথ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাতে ৯০০০ মাইলের মোসাবিদা আছে। ১৯৩২ সনের শেষের দিকে ৬০০০ মাইল নতুন রেলপথ খোলা হইয়া যাইবে। আর তখন প্রায় ৩০০০ মাইলে কাজ চলিতে থাকিবে।

রেলপথের বিস্তারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে আর ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কিন্তু আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। বহুসংখ্যক লোকের স্থায়ী অন্নসংস্থানও রেলপথের এক মস্ত কথা। আজকালকার ৩৮,৫৭৯ মাইলে ৭,৫০,০০০ লোকের ভাতকাপড় জুটিতেছে। এই সাড়ে সাত লাখের ভিতর মোটা মাহিয়ানাওয়ালা বিদেশী বা দো-আঁশলাদিগকে বাদ দিলে সকলেই খাঁটি ভারত-সন্তান।

কাজেই ১৯৩২ সনের ভিতর যদি ৬,০০০ মাইল নতুন পথ খোলা হইয়া যায় তাহা হইলে আরও অনেক কুলী-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ারের অন্নসংস্থান ঘটিতে পারিবে। একথা সহজেই বিশ্বাস করা চলে।

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। দেখা গিয়াছে যে, ফী মাইল রেলপথের জন্য গড়ে প্রায় দুই লাখ টাকা পড়ে। এই দুই লাখ টাকা খরচ হয় কিসে? একটা বড় হিস্যা যায় লোহা-লক্কড়, যন্ত্র-পাতি ইত্যাদি মালে। তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আসে। কাজেই এই খরচের অধিকাংশ বিদেশীর ভোগে যায়। তাহা ছাড়া আর সবই খরচ হয় লোকের মেহনতের মজুরি বাবদ। মাথার মেহনতের উঁচু দিক্‌টা অধিকাংশ বিদেশীদের কপালে লেখা। অবশিষ্ট ভারত-সন্তানের। হাতপায়ের মজুরি সবই অবশ্য ভারতবাসীর একচেটিয়া। অতএব মাইল প্রতি দুই লাখ টাকার অনেক-কিছুই শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় নরনারীর অন্ন জোগাইয়া থাকে। নানা দিক্ হইতেই রেল আমাদের আর্থিক উন্নতির এক বড় খুঁটা।

ম্যালেরিয়ার অন্যতম সহায়ক হিসাবে রেলপথগুলা নিন্দনীয় বটে। ইতালিতেও রেলপথের জন্য নরনারী আর জীবজন্তুকে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ ইতালির রেল-এঞ্জিনিয়ারেরা পুরাণো দোষ শুধরাইয়া লইয়াছে। ভারতেও এঞ্জিনিয়ারিংয়ের তরফ হইতে রেলনীতির সংস্কার সাধিত হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

তর্ক-প্রশ্ন

নব বর্ষাতির জন্মদাতা বাঙ্গালী

গত কার্ত্তিক মাসের "আর্থিক উন্নতি"র মোলাকাৎ অধ্যায়ে আমি "বাঙ্গালীর বর্ষাতি ব্যবসায়" সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বাহির করিয়াছিলাম। বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সে সম্বন্ধে এক চিঠি লেখেন। তাঁর কয়েকটা কথা এইরূপ :—

"(১) যুক্তপ্রদেশে অন্তরীণ থাকা কালে এক পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি অন্যত্র বদলী হইয়া গেলে তাঁর বাড়ীটা আমাকে দিয়া যান। ১৯১৭ সনে সেই বাড়ীটাতেই আমি ওয়াটারপ্রুফিং-এর উদ্দেশ্যে এক ল্যাবরেটারি সাজাইয়া বসি। সেই ক্ষুদ্র ল্যাবরেটারি গৃহেই আমাদের বর্ত্তমান "ডাক্ ব্যাক্" প্রণালীর উদ্ভব। আমি একাকীই সমগ্র ব্যাপারটা গড়িয়া তুলি। বস্তুতঃ আবিষ্কারটা আগাগোড়াই আমার নিজস্ব। তারপর এতদিনে আমি প্রণালীটার প্রভূত উন্নতি-সাধন করিয়াছি। বর্ত্তমানে ইয়োরোপ ঘুরিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাতে অকপটে বলিতে পারি যে, আমরা এ বিষয়ে ইয়োরোপকেও ছাড়াইয়া গিয়াছি। আমাদের রাসায়নিক প্রুফিং-এর মত কোন ইয়োরোপীয়ান্ রাসায়নিক প্রুফিং আমাদের দেশের অবিশ্রান্ত ও ঘোরতর ঝড়বৃষ্টি সহ্য করিবার উপযোগী নয়।

"আমাদের প্রণালীটার জন্মদাতা পাদ্রীসাহেব নয়, একজন বাঙ্গালীই বটে। বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া বহু পরিশ্রমের পর আমাকে ব্যবসাটা দাঁড় করাইতে হইয়াছিল। কারণ সে সময় আমার মাসহারা যৎসামান্য ছিল।

"বর্ষাতির ব্যবসা প্রথম আরম্ভ করি কানপুরে। আর কলিকাতাতে ফ্যাক্টরী গড়িয়া তুলি ১৯২০-২১ সন হইতে (১৯২৩ সনে নয়)। আমরাই ভারতে প্রথম রাসায়নিক প্রুফিং-এর ব্যবসা আরম্ভ করি।

"(২) রেইনকোটের কাপড় আমরা সবটাই বিদেশ হইতে আমদানি করি না। বোম্বাই, আহমদাবাদ ও মান্দ্রাজের মিলে তৈয়ারী ও কানানোরের তাঁতে তৈয়ারী কাপড় আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা যে কাপড় ব্যবহার করি তার ৫০% উপর ভারতে প্রস্তুত হয়। আমরা চেষ্টা করিতেছি যেন ভারতীয় মিলগুলি আমাদের সব রকম কাপড়ের অভাব মিটাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় মিলগুলি এবিষয়ে বড় পশ্চাৎপদ ও অলস।"

উত্তর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় এই পত্র লেখার জন্য ধন্যবাদের পাত্র। তাঁর ব্যবসার উন্নতি কামনা করি। তাঁর টেক্‌নিক্যাল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অপরিমেয়। এ পর্য্যন্ত মাত্র একদিকে তিনি মনোযোগ দিতে পারিয়াছেন। ভরসা আছে যুবক বাঙ্গালাকে তিনি বিভিন্ন পথ বাৎলাইয়া দিতে পারিবেন। এজন্য চাই যে তিনি আপনার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তাদের কাণে ঢালিয়া দিবেন। আমি জানি "আর্থিক উন্নতির" পাতা সর্ব্বদাই তাঁর জন্য সাগ্রহে খোলা থাকিবে।

পূর্ব্বোক্ত মোলাকাতের বৃত্তান্তে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু তিনি বিস্তৃততর ভাবে আপনার অভিজ্ঞতা ইত্যাদির কথা প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না।

শ্রীসুধাকান্ত দে

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

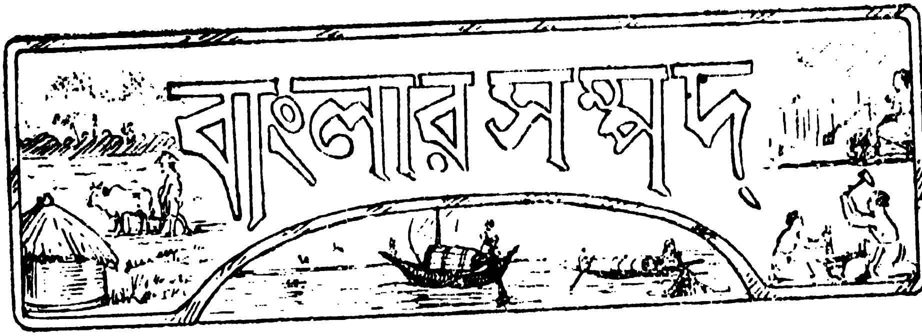
আর্থিক উন্নতি

চৈত্র—১৩৩৪ ২য় বর্ষ—১২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।



বাঙালী সমাজের "হাত পা"

"আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা বাঙালী সমাজের "হাত পা", "মেরুদণ্ড" "মগজ" ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নরনারীর আর্থিক সুযোগ দুর্যোগ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ করিয়াছি। কি মফঃস্বলের পল্লীসমাজ, কি সহরের জাত-পাঁত কিছুই আমাদের আলোচনায় বাদ যায় নাই। এমন কি মোলাকাৎ-অধ্যায়েও আমরা ছোট-বড়-মাঝারি সকল প্রকার জাতের, শ্রেণীর বা ব্যবসায়ীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পাঠকদিগকে সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সকল তথ্য বিদেশী পারিভাষিকে "সোশ্যাল ইকনমিক্স্" বা সামাজিক অর্থনীতির অন্তর্গত। সামাজিক অর্থনীতির তথ্য ও তত্ত্বগুলা আমাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির পক্ষে কতদূর মূল্যবান তাহা হাতে হাতে প্রমাণিত হইয়া গেল এই সেদিনকার মেথর-ঝাড়ুদার-ধর্ম্মঘটে। এই ধর্ম্মঘট বাঙলার সমাজ-বিপ্লবের এক বিপুল বস্তুনিষ্ঠ নিদর্শন। ইহার ভিতর যে নবীন শক্তি খেলিতেছে তাহার যথোচিত ইজ্জৎ দিতে শিখিলেই ভারতের স্বদেশসেবকগণ ভবিষ্যতের জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠাহরাইয়া লইতে পারিবেন। "হাত পা"-গুলাকে সকল প্রকারে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ করিয়া তোলা সমগ্র জাতির আর্থিক উন্নতির এক মস্ত লক্ষ্যও বটে উপায়ও বটে।

কলিকাতায় ঝাড়ুদার ও মেথরদের ধর্ম্মঘট

গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখ গড়ের মাঠে কলিকাতার ঝাড়ুদার ও মেথরদের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় "ধাঙ্গড় সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং ২১ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে সমিতির আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমিতি মেথর ও ঝাড়ুদারদের পক্ষ হইতে কর্পোরেশনের নিকট প্রত্যেক ঝাড়ুদারের বা মেথরের জন্য মাসিক ৩০্ টাকা (কম নয়) বেতন, ভাত

বাসস্থান, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, বিনা ব্যয়ে ঔষধপত্র, বেতন-সহ ছুটি, ঘুষগ্রহণ বন্ধ করা ও তাহাদের ছেলেদের জন্য বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি দাবী জানান।

এই দাবীর কোন উত্তর কর্পোরেশন হইতে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কর্পোরেশন হইতে শ্রমিকদিগকে নানারূপ ভয়ও নাকি দেখান হইতে থাকে। শ্রমিকগণ কর্পোরেশনের নিকট হইতে কোনরূপ জবাব না পাইয়া ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া উঠে। তৎপর ৪ঠা মার্চ্চ সকাল বেলা শ্রমিকগণ সমিতিকে না জানাইয়াই নিজেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বসে এবং পরে সমিতিতে খবর দেয়। ১ ও ২নং ওয়ার্ডে সকালবেলাই পূর্ণ ধর্ম্মঘট হয়। ৩ ও ৪নং ওয়ার্ডেও বৈকালের দিকে পূর্ণ ধর্ম্মঘট হয়।

বৈকালবেলা দেশবন্ধু পার্কে সমিতির প্রেসিডেণ্ট কুমারী প্রভাবতী দাসগুপ্তার সভানেত্রীত্বে উত্তর বিভাগের মেথর ও শ্রমিকদিগের এক সভার অধিবেশন হয়। প্রায় দেড় হাজার মেথর ও ঝাড়ুদার সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভায় শ্রমিকগণ দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করিয়া থাকিবে বলিয়া দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। এই ধর্ম্মঘট প্রসঙ্গে হাতীবাগানের ৫ জন ধাঙ্গড়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। সমিতির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মুজাফর আহম্মদ ও সেক্রেটারী ধরণীকান্ত গোস্বামী এতৎপ্রসঙ্গে বড়তলা থানায় গিয়াছিলেন। শোনা যায় যে, কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে উঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল।

প্রকাশ যে, ধর্ম্মঘটে যোগদানের জন্য সহকর্ম্মিগণকে অনুরোধ করিতে যাওয়াতেই উক্ত ৫ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দুইজন পুলিশ দুইজন ধাঙ্গড়কে মারপিট করিয়াছে এবং উঁহাদের একজন রীতিমত জখম হইয়াছে বলিয়াও খবর আসিয়াছে। (আনন্দবাজার)

মেথরদের দাবী

৫ঠা মার্চ্চ দেশবন্ধু পার্কে ১ এবং ২নং ডিষ্ট্রিক্টের ধাঙ্গড়দিগের এক সভা হইয়াছিল। শ্রীমতী প্রভাবতী দাসগুপ্তা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ২৫শে জানুয়ারী কলিকাতায় ধাঙ্গড়গণ যে যে বিষয় দাবী করিয়াছিল, সভায় সেই সমস্ত দাবীই পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সেই সমস্ত দাবী এই :—

(১) বাঙ্গালার ধাঙ্গড়সমিতিকে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদন (২) প্রতিমাসে ৩০ টাকা মাহিয়ানা (৩) আলো ও বাতাস খেলে এমন বাসগৃহ এবং সেই সমস্ত বাসগৃহে রান্নাঘর, কল ও পাইখানার ভিন্ন বন্দোবস্ত থাকা চাই। (৪) বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। (৫) সমস্ত প্রকার ঘুষ বন্ধ করা (৬) পূর্ণ বেতন সহ ১৫ দিনের ছুটি ও পূর্ণ বেতন সহ "প্রিভিলেজ লীভ" অনুযায়ী ছুটি, পূর্ণ বেতন সহ দৈবদুর্ঘটনার জন্য ছুটি (৭) এক মাস পূর্ব্বে নোটিশ না দিয়া কাহাকেও বরখাস্ত করা যাইবে না। (৮) প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতির সুবিধা থাকা চাই। (৯) ধাঙ্গড় বালক-বালিকাদিগের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও অসময়ে ধাঙ্গড়দিগকে ঋণ দিবার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা।

ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের অবসান

৬ দিন কার্য্যবন্ধের পর গতকল্য (২৫ ফাল্গুন) ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। এই ৬ দিন সহরবাসিগণের চলিতে ফিরিতে যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।

ধাঙ্গড় সমিতির প্রেসিডেণ্ট কুমারী প্রভাবতী দাসগুপ্তার নেত্রীত্বে মিঃ মৃণালকান্তি বসু, মিঃ কিশোরীলাল ঘোষ, মিঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য, মিঃ এম, কে, মামুদ এবং ধাঙ্গড় সমিতির সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক মেয়রের গৃহে মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ আলোচনার পর মেয়র ঝাড়ুদারদিগকে মাসিক মাহিয়ানা ২৲ টাকা বাড়াইয়া দিতে স্বীকৃত হন। একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনা করিতেও তিনি সম্মত হন।

ডেপুটেশন মেয়রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ধাঙ্গড় সমিতি ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিতে সম্মত হন।

গড়ের মাঠের সভা

সহকারী সভাপতি ও সেক্রেটারীকে সঙ্গে লইয়া কুমারী প্রভাবতী দাসগুপ্তা ময়দানের সভায় আগমন করেন। ডেপুটেশনের ফল জানিবার জন্য তথায় মনুমেণ্টের নিকট ধর্ম্মঘটকারীদের এক বিরাট জনতা হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট আনন্দধ্বনির মধ্যে মেয়রের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ধর্ম্মঘটকারীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠে।

কর্পোরেশনের সভা

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র প্রকাশ করেন যে, ধাঙ্গড়-ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে এবং গতকল্য সন্ধ্যা হইতে তাহারা আবার কাজে যোগদান করিয়াছে।

তিনি নিজের দায়িত্বে ধাঙ্গড়দিগকে বলিয়াছেন যে, তাহাদের অভিযোগগুলি একটী কমিটীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইবে। ঐ কমিটিতে তিনি নিজে, চীফ এক্‌জিকিউটীভ অফিসার ও কয়েকজন কাউন্সিলার এবং অল্ডারম্যান থাকিবেন। কমিটীতে ধাঙ্গড়গণের ৩ জন প্রতিনিধি কর-দাতাগণের ২ জন প্রতিনিধি এবং বেঙ্গল ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশনের দুইজন ভদ্রলোকও থাকিবেন। আগামী মঙ্গলবার কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সভা হইবে এবং ঐরূপ কমিটি গঠন করা উচিত কি না সভা তাহা বিবেচনা করিবেন এবং তখন কর্পোরেশন ভাবিয়া দেখিবেন যে, যাহা করা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য কি না। এই সম্পর্কে ধর্ম্মঘট অবসানের ব্যাপারে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি নিজের ক্ষমতার হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মঘটকারীদের মাহিয়ানা কিঞ্চিৎ বাড়ান হইবে এবং বেতন ক্রমবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করা হইবে এবং তাহাদের মাহিয়ানা সংক্রান্ত ঘুষ বন্ধ করা হইবে।

সহরবাসিগণের স্বাস্থ্য ও ব্যাপারটির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তিনি নিজের দায়িত্বে ঐ সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন এবং উহা সঙ্গত হইয়াছে কিনা কর্পোরেশন মঙ্গলবার তাহা বিবেচনা করিবেন।

হাওড়ায় মেথরদের বেতন-বৃদ্ধির দাবী

গতকল্য (?) অপরাহ্ন ৪৷৷০ ঘটিকার সময় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গড় ও মেথরদের একটি বিরাট সভা হয়। প্রায় ১ হাজার শ্রমিক উহাতে যোগদান করিয়াছিল। হাওড়া ধাঙ্গড়-সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুত পাঁচানন চাটার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় কলিকাতার ধাঙ্গড় এবং মেথর ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়, এবং মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া বেতন দাবী করা হয়।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

যুদ্ধের পর দেশ-বিদেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার যে উৎসাহ জাগিয়া যায় সেই উৎসাহবশেই কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর এই প্রতিষ্ঠানটীর ক্ষুদ্র জীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ উৎসাহ ও উদ্যমের প্রতিদানে দেশবাসীও পরিচালকবর্গকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করে নাই। পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা মূলধন লইয়া এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিগঞ্জে প্রায় কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করিয়া, দেশবিদেশ হইতে বিবিধ প্রকার যন্ত্রপাতি বসাইয়া এ সাবান প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। এই বিপুল আয়োজন, করিতে যতপ্রকার সাহায্য প্রয়োজন তাহা দেশবাসী সাগ্রহে কারখানা-পরিচালকগণকে প্রদান করিয়াছে।

তারপর সাবান প্রস্তুত হইল। কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস-এর প্রথম প্রচেষ্টা 'নির্ম্মলিন' সাবান দেখিয়া দেশবাসী উৎফুল্ল হইল। দেশে বিলাতী সাবান বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী নির্ম্মলিন ব্যবহারের ধুম পড়িয়া গেল। তারপর কার্ব্বলিক সাবান এবং গায়ে মাখিবার সাবান, বকুল, চন্দন, হোয়াইটরোজ ইত্যাদি। প্রত্যেকটী সাবান দেশে স্বদেশী প্রীতির নূতন প্রেরণা সৃষ্টি করিল। গত পাঁচ ছয় বৎসর বাঙ্গালা দেশে যত সাবান ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার হিসাব লইলে দেখা যাইবে, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস-এর প্রস্তুত সাবানের স্থান তাহাদের মধ্যে অতি

উচ্চে ছিল। বাঙ্গালী কাপড় ক্রয়ের সময় যেরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী'র খোঁজ করে, সাবান ক্রয় করিবার সময়ও তেমনি 'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস'-এর খোঁজ করিত এবং অনেক সময় উচ্চ মূল্য দিয়া স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বাঙ্গালীর স্বদেশী প্রীতির পক্ষে এ কম প্রশংসার কথা নহে। কিন্তু সোপওয়ার্কস-এর কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর এই সহানুভূতি ও সংরক্ষিতার কিরূপ প্রতিদান করিয়াছেন সে কথা আজ প্রকাশ করিয়া বলিতেও লজ্জাবোধ হয়।

অতীতের কথা ভাবিয়া কাঁদুনী গাহিয়া লাভ নাই। প্রায় আট মাস হইল কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস কিঞ্চিদধিক মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা দেনার দায়ে হাত পা গুটাইয়া লিকুইডেটরের গৃহে বসিয়া আছে। এত বড় কারখানা, মালের এরূপ বিরাট চাহিদা, বাজারে ব্যবসায়ের সুখ্যাতি সত্ত্বেও আজ ব্যবসায় বন্ধ। আট লক্ষ টাকার কারবার মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা দেনার দায়ে নীলামে চড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

ইতিমধ্যেই বহু বিদেশী বণিক বাঙ্গালার এই বিরাট ব্যবসায়টী হস্তগত করিবার মতলবে ঘুরিতেছেন। এ ব্যবসায়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। মাত্র একটু তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধান হইলে সাত দিনের মধ্যে পুনরায় এ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া যায় এবং এখনও বাজারে ইহার মালের যেরূপ চাহিদা আছে, তাহাতে মাল প্রস্তুত হইতে না হইতে তাহার বিক্রয় অবশ্যম্ভাবী। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা ও বিহার সরকারের যে সকল অর্ডার এবং মিলিটারীর যে সকল কন্‌ট্রাক্ট পুরাতন কোম্পানী ভোগ করিত, পুনঃ প্রচলিত হইলে তাহা লাভ করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না। যিনি এ কার্য্যের ভার লইতে অগ্রসর হইবেন তাঁহার যে টাকা ব্যয় হইবে, লাভ হইবে তাহার চতুর্গুণেরও অধিক, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার একটী প্রধান ব্যবসায় বাঙ্গালীরই করায়ত্ত থাকিবে।

দুই বা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে একটী স্বদেশী প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করিয়া ব্যবসায় জগতে বাঙ্গালার মান রক্ষা করিতে পারেন এরূপ বাঙ্গালী কলিকাতা সহরেই অনেক আছেন। আর ধনবান ও খ্যাতনামা ব্যক্তি হইলে এখনই যে সকল টাকা ব্যয় করিতে হইবে ইহারও প্রয়োজন নাই। 'ক্রেডিট'ও অনেক কাজ হইবে। চাই শুধু তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি ও স্বদেশ-প্রীতি, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানটীর জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গালায় বিদেশী বর্জ্জনের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কি নারী, কি পুরুষ আজ সকল ব্যাপারে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। এরূপ শুভ মুহূর্ত্তে বাঙ্গালার এই প্রধান স্বদেশী প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিবার মত সৎসাহস ও উদারতা কি কাহারও নাই? (বাংলার কথা)

পাবনায় ভদ্রলোকের কৃষি

আমরা পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহর থানার অধীন বনগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে দুই বৎসর হইল নিজ হাতে চাষ আবাদ করিতেছি। সকলেই চাকুরী ছাড়িয়া স্বহস্তে কলমের পরিবর্ত্তে হল-চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কৃষিকার্য্য যদিও আমাদের কাছে প্রথম প্রথম কঠিন লাগিত কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আর বোধ হইতেছে না; কারণ এই দুই বৎসরে আমরা আশাতিরিক্ত ফসল পাইয়াছি।

চাষের উন্নতির জন্য গত অগ্রহায়ণ মাসে আমরা ফোর্ড কোম্পানীর ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গল আনিয়াছি। তাহাতে মন্দ আবাদ হইতেছে না। ঘণ্টায় ২ বিঘা জমি চাষ হইতেছে। ট্রাক্টর আনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে একটী সমবায়-ঋণ-দান-সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সমিতির সেক্রেটারীর কাছে জমি চাষের জন্য ট্রাক্টরের ফি দিতে হয় এবং ট্রাক্টরের চালকদেরও সমিতি হইতেই বেতন দেওয়া হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রামেরই কয়েক ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ আমাদিগকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা যাহাতে সমাজে আবদ্ধ হই তাহার জন্যও চেষ্টায় কোন ত্রুটি হইতেছে না। আমাদিগকে "জেলো কায়েত" "জেলো বাওন" প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করিতেছে না। কিন্তু আমরা ইহার কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিতেছি না; কারণ কুকুরে

কামড়াইলে প্রতিশোধ লইবার জন্য সেই কুকুরের পায়ে কামড়ান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুধীসমাজের কাছে আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন কৃষিকার্য্য পবিত্র না অপবিত্র। ইতি। নিঃ—

শ্রীত্রিলোচন ভৌমিক, বনগ্রাম, পোষ্ট পার্শ্বডাঙ্গা, পাবনা।

(বাংলার কথা)

ঢাকায় মেথরদের সভা

২৭শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় করোনেশান পার্কে ঢাকা মিউনিসিপালিটির মেথরগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং পানদোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের একটি সমিতি গঠন করিয়াছে।

টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটী

মিউনিসিপ্যালিটী হইতে ৪ হাজার টাকা ব্যয়ে সহরের অস্বাস্থ্যকর গর্ত্ত প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য ট্রলী ও লাইন প্রভৃতি আনয়ন করা হইয়াছে এবং উক্ত কার্য্য আরম্ভও হইয়াছে। সহযোগী "সঞ্জীবনী" সতর্ক করাইয়া দিতেছেন যে, টাঙ্গাইল সহরের গর্ত্ত বুজাইয়া দিলেই যে তথাকার স্বাস্থ্য ভাল হইবে ও ম্যালেরিয়া দূর হইবে একথা যেন মিউনিসিপ্যালিটী মনে না করেন। টাঙ্গাইলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ স্বাস্থ্যকর না হইলে টাঙ্গাইল সহরও স্বাস্থ্যকর হইবে না। সে জন্য টাঙ্গাইলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ স্বাস্থ্যকর করা প্রয়োজন। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের গর্ত্ত বুজাইবার জন্য ঐ ট্রলি ও লাইন যদি ব্যবহার করিতে চাহে তবে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যান্তে তাহা ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত।

ঢাকার রমনায় অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ছিল ও মশার আধিক্য ছিল। সেজন্য তথাকার গর্ত্ত সকল বুজাইয়া জলাশয়ে কেরোসিন দিয়া প্রায় ছয় মাসের চেষ্টায় মশা দূর করা হইল, কিন্তু চৈত্র মাসে একদিন একটু জোরে বাতাস বহিয়া যাওয়ায় ঢাকা সহর হইতে সমস্ত মশা আসিয়া রমনা ভরিয়া ফেলিল এবং সকল কার্য্য ও পরিশ্রম পণ্ড হইল। টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটি যেন ইহা স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

গো-মড়ক

১৯২৬-২৭ সনে বাংলাদেশে ৩৫৭১৯টি গরু মারা গিয়াছে। তৎপূর্ব্ব সনে মারা গিয়াছিল ৩৩২২৪। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গো-মৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। মৃত পশুর হিসাব সঠিক হওয়া মুস্কিল। সরকারী দপ্তরে যাহা প্রকাশ তাহার চাইতে ঢের বেশী গরু এদেশে প্রতি বৎসর মারা যায়। যাহাহউক এই অসম্পূর্ণ সরকারী হিসাবেই প্রকাশ যে ১৯২৬-২৭ সনে বাংলায় মোট ৩৫৭১৯টি গরু মারা গিয়াছে। প্রত্যেক গরুর মূল্য গড়ে ৩০৲ ধরিলে ১০৭১৫৭০৲ টাকা হয়। এ দেশের চাষার পক্ষে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হওয়া তাহার সর্ব্বনাশেরই কারণ। আলোচ্য সনে শতকরা ৯৩টি গরু মড়কের জন্য মারা গিয়াছে। পায়ের ও মুখের ক্ষত হেতু মরিয়াছে ৩৩৪০৫টী। ইহার মধ্যে মেদিনীপুর, খুলনা ও বরিশালে ৪৬৮টি মারা গিয়াছে। মড়কে চট্টগ্রামে মোট ৪৪০০টী গরু মারা গিয়াছে, তাহার মধ্যে পা ও মুখের ঘায়ে মরিয়াছে ৩২৩৯টী। গোদপুর ও পিঞ্জরাপোলে ১৯৩টি মারা গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দুই বৎসরে গোদপুর ও পিঞ্জরাপোলে যথাক্রমে ১৭৪৩ ও ৮৫টী মারা গিয়াছে। গত সনে মোট ২০,৬১৮টী পশুকে টীকা দেওয়া হয়। সমস্ত বাংলা দেশে ৫২॥ লক্ষ গরু আছে। সে হিসাবে শতকরা ১টারও কম সংখ্যার টীকা হইয়াছে। গত সনে গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসকের দ্বারা ১২৬৬৬১টী প্রাণী চিকিৎসিত হইয়াছিল। ৪ জন রিজার্ভ ডাক্তারও গত সনে নিযুক্ত হইয়াছিল।

গত সনে খড়্গপুর ও টাঙ্গাইলে দুইটি পশু চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে এবং সাধারণের অর্থে পূর্ব্ব সন অপেক্ষা ৪জন অতিরিক্ত ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছে। সাধারণের নিযুক্ত ডাক্তার দ্বারা ৫৬,৮৪টী গরু চিকিৎসিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সনে ৫১০২৫টী চিকিৎসিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কার্য্যকরী মূলধন ৭৮·৮৪ লাখ হইতে ৯৩·৬৬ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে; অংশ-মূলধন ৫·৮৪ লক্ষ হইতে ৮·১৩ লক্ষ হইয়াছে এবং সভ্যসংখ্যা ১২৭ হইতে ১৪১ হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণীটী সভায় দাখিল করেন:—

আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ পরিচালকগণ অডিটর দ্বারা পরীক্ষিত বিগত বৎসরের (১৯২৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে) হিসাবপত্র আনন্দের সহিত দাখিল করিতেছেন—

	টাকা	আনা	পাই
খরচ খরচা বাদ লাভ	১২৫,৪০৫	১১	১
এই লাভের এক-চতুর্থাংশ রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখা হইবে বলিয়া বাদ যাইবে	৩১,৩৫১	৬	৯
বাকী	৯৪,০৫৪	৪	৪
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করা হইল	৪,২৭৫	১৩	১০
সুতরাং বণ্টনের জন্য বাকী থাকিল	৯৮,৩৩০	২	২

এই টাকা নিম্নলিখিতমতে খরচের অনুমোদন করি—

	টাকা	আনা	পাই
শতকরা ৭৲ টাকা হিসাবে প্রত্যেক অংশের ডিভিডেণ্ড	৪৮,৬৯৪	২	০
রিজার্ভ ফণ্ডের দরুণ অতিরিক্ত	৩৫০	১৪	০
সমবায় প্রসার ফণ্ডে	৫,০০০	০	০
বিশেষ রিজার্ভ ফণ্ডে	১৬,৬৯২	৭	৪
দাতব্য ফণ্ডে	২০০	০	০
শিল্পের উন্নতির জন্য ফণ্ড—এই টাকা সমবায় শিল্প-সমিতিগুলিকে কর্জ্জ বা দান স্বরূপ দিবার জন্য অথবা সেই সমিতিগুলির আর্থিক সাহায্যার্থ থাকিবে	১৫,০০০	০	০
সুপার ট্যাক্স	৪,৭১২	১৪	০
কর্ম্মচারীদের বোনাস	১,০৯৬	০	০
আগামী বৎসরে নীত	৬,৫৮৩	১২	১০
মোট	৯৮,৩৩০	২	২

উপরিলিখিত মত এই বৎসরের টাকা জমা দিলে রিজার্ভ ফণ্ডে ১,১২,০০০ টাকা ও স্পেশাল রিজার্ভে এক লক্ষ টাকা জমা থাকিবে।

রেশম-শিল্পে সাহায্য

রাজসাহী রেশম বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইল। একজন শিক্ষার্থীকে এক বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং পাশ করার পরে রেশম পোকা পালনের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৪০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীর বয়স ১৬ বৎসরের কম হইলে চলিবে না। অন্যান্য বিষয় বগুড়া ডিঃ বোর্ড হইতে জানা যাইবে।

চৌকিদারী ট্যাক্স

পল্লীগ্রামের হেথা-হোথা সিঁদেল চোরের উৎপাত ও গৃহদাহের সংবাদ নিয়ত শোনা যাইতেছে। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর অভাব অভিযোগের জন্যও যদি দরখাস্ত হাতে ক'রয়া দরবার মহলায় হাজির হইতে হয় তবে নেহাৎ পরিতাপের বিষয়। অবস্থানুযায়ী সব পল্লীবাসীরা কম-বেশী চৌকিদারী ট্যাক্স দিয়া থাকে। এই ট্যাক্স হইতে বেতন দিয়া চৌকিদার নিযুক্ত করা হয়। এই চৌকিদারদিগকে নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করে ইউনিয়ন বোর্ড। এই ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তব্য সাধ্যানুযায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যদি এ সামান্য অভাব ও অভিযোগের জন্য সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করি, সরকার বলিবেন না কি,—কেন লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসপালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড সবত তোমাদের হাতে, তোমাদের দেশের লোক যদি না তোমাদের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ত আমরা কি করিব? আমরা ত তোমাদিগকে

সবটা খাইয়ে দিতে পারি না। এ জোরেই তোমরা আবার স্বরাজ—; ইহা খাঁটি ও অপ্রীতিকর সত্য। আমরা বড় বড় বিষয়ে স্বপ্ন দেখি, বড় বড় বিষয়ে ভাবি,—আশার কথা। আজ যে সরকার এটা সেটার নজির দেখাইয়া আমাদের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা কি নেহাৎ ভিত্তিহীন? সব বিষয়েই আমাদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিচয় দিতে হইবে। 'হামবড়া' কোন জিনিষই ভাল নয়। অন্তঃসারশূন্য ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তব্য এসব অভাব অভিযোগের প্রতিবিধানে সচেষ্ট ও সজাগ থাকা। প্রত্যেক অভাব-অভিযোগই আমাদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

(আলোক)

বর্দ্ধমানে জলাভাব ও দুর্ভিক্ষ

জেলার প্রধান ভূস্বামী মহারাজ বিলাতে, মহারাজ কুমার শিকার খেলিতেছেন, শাসনকর্ত্তাগণ কাগজে কলমে দুর্ভিক্ষ নাই বলিয়া দায় খালাস হইবার চেষ্টায় আছেন। অথচ আমাদের বিভিন্ন স্থানের 'সংবাদদাতারা' অন্ন নাই, জল নাই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। আমরাও স্বচক্ষে দেখিতেছি জেলার সুদীর্ঘস্থান জলাভাবে মরুভূমিতুল্য। দুর্দ্দশাগ্রস্ত বর্দ্ধমানের দিকে কেহ কি ফিরিয়া তাকাইবে না?

(শক্তি)

নদীয়ায় দুর্ভিক্ষের সূচনা

সাধনপাড়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এদিকে পিতল কাঁসার ব্যবসায়ে প্রায় ৫ শত লোক মজুরী করিয়া খাইত। এ বৎসর এই ব্যবসায় হঠাৎ অত্যন্ত মন্দা হওয়ায় মজুরেরা মজুরি করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর আউশ ধান ব্যতীত অন্য কোনও ফসল না হওয়ায় ও পাটের দর না উঠায়, কৃষক-মহলেও বেশ অভাবের সাড়া পড়িয়াছে। বোধ হয় আর দু'এক মাস পরেই সাধারণের এক বেলা অন্ন জোটাও কঠিন হইবে। ওদিকে মেহেরপুর থানার ভেহট্ট এলাকার আর সদর থানার ও কালীগঞ্জ থানার চাষীরাও চাষের ফসল পরিমাণ করিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। জিলা বোর্ডের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে।

(বঙ্গরত্ন)

রেলে পক্ষপাতিতা

বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেল-কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাঁহাদের রেলের ভাড়ার হার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পত্রান্তরে ঐ অঞ্চলের একজন অধিবাসী লিখিয়াছেন,—রেল-কর্ত্তৃপক্ষের এই নূতন ভাড়ার হার একান্ত পক্ষপাতমূলক। ইন্টার ক্লাসের ভাড়া ছিল প্রতি মাইল ৬ পাই, এখন হইয়াছে ৮ পাই; কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া কমাইয়া প্রতি মাইল ২১ পাইর স্থানে ১৮ পাই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। শুনা যায় গত বৎসর তিস্তা নদীর ভীষণ প্লাবনে বি-ডি রেলের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিবার জন্যই রেল-কর্ত্তৃপক্ষ ইন্টারক্লাসের ভাড়া বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা ভাল কথা; কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া কমাইয়া রেল-কর্ত্তৃপক্ষ কোন্ ক্ষতি পূরণ করিতে চাহেন? ইন্টার ক্লাসের যাত্রীরা ভারতীয়, সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীরা সাধারণতঃ ইয়োরোপীয়। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে,—রেল-কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য কি।

(বঙ্গরত্ন)

যশোহরে জলকষ্ট ও কলেরা

যশোহর জেলার অন্তর্গত জয়দিয়া ও নিকটস্থ গ্রামে ভীষণভাবে কলেরা হইতেছে। প্রত্যহ এখানে ২।১টি মানুষ মারা যাইতেছে। ইহার কারণ এই স্থানে একটি জলাশয় আছে, ইহা প্রায় ৭ মাইল লম্বা এবং চওড়ায় প্রায় ১ মাইল হইবে। শুনা যায় নাকি ইহা প্রথমে ভৈরব নদের শাখানদী ছিল। কালক্রমে ইহার দুইদিকের মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। এই জলাশয় হইতে প্রায় ১২।১৩টি গ্রামের লোকে জলপান করিয়া থাকে। জলাশয়ের জল বার মাসই পানের অযোগ্য। কলেরা আরম্ভ হওয়াতে জল একেবারে দূষিত হইয়া গিয়াছে, গরিব চাষীরা কোন উপায় না দেখিয়া ঐ জলই পান করিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতেছে এবং অকালে

প্রাণত্যাগ করিতেছে। তাহাতে আবার জলাশয়ে জল কম। এই স্থানে কোন উপযুক্ত ডাক্তার অথবা কবিরাজ অথবা কোন দাতব্য চিকিৎসালয় নাই।

২৫।২৬ বৎসর আগে এই জলাশয়ে বন্যা আসিত এবং তাহাতে দূষিত পদার্থ সকল ধুইয়া যাইত; কিন্তু আজকাল রেলের সেতু প্রভৃতি হওয়ায় নদী একেবারে মজিয়া যাইতেছে। এই দেশে প্রতি বৎসর এই সময়ে কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে লোক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তবে কলেরা, ম্যালেরিয়া এই গ্রামে প্রতি বৎসর এই সময়ে ভীষণভাবে আরম্ভ হয়। বোধ হয় সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা অনায়াসে নিবারণ হয়।

যশোহর জেলায় ভৈরব নদ আজকাল মাত্র ১০।১১ হাত চওড়া আছে। দুইদিন পরে তাঁহাও যাইবে। তাহাতে আবার শৈবালে পরিপূর্ণ, খুব সামান্য স্রোত মাত্র আছে। এই ভৈরব নদের জন্য এ অঞ্চলের চাষবাস আগে খুব ভালই হইত এবং স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল। ভৈরবনদ মজিয়া যাওয়াতে এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা খুব কম হইতেছে। প্রায়ই লোকে জলকষ্ট বলিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অন্য স্থানে গিয়া বসবাস করিতেছে। কিছুদিন পরে এই উর্ব্বরা ভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইবে। এদেশের প্রজাদের জীবনরক্ষা করিতে হইলে প্রথমে ভৈরবনদটা কাটান কর্ত্তব্য। এ বৎসর দেশের অবস্থা শোচনীয়, বোধ হয় দুর্ভিক্ষও হইতে পারে। ভৈরবনদ মজিয়া যাওয়াতে জমির উর্ব্বরতা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

জয়দিয়া গ্রামে জলকষ্ট অত্যন্ত বেশী। সেই জন্য সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, সরকার, যেন টিউবওয়েল দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে জল কষ্ট নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন। সরকার যেন এই হিতকর কার্য্য করিয়া প্রজারঞ্জন করেন। নচেৎ গ্রামের মানুষ পশু সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কারণ যে জলাশয় আছে তাহার জল অত্যন্ত খারাপ এবং পানের অযোগ্য। জেলা বোর্ডেরও এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। ফসলের অবস্থা শোচনীয়, মাঠে ফসল নাই বলিলেই হয়।

শ্রীমনোজমোহন মুখোপাধ্যায়

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের বাজেটে কলের জল সরবরাহের জন্য ২৫,৭৩৭৲ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

সহরে জলাভাব দিন দিন বাড়িতেছে। দুই বেলায় মাত্র ৪ ঘণ্টা জল দেওয়া হয়।

রাস্তায় জল দেওয়ার জন্য 'জলের মোটর গাড়ী' ও গরুতে টানা জলের গাড়ী প্রচুর আছে, কিন্তু টাউনের সদর রাস্তাগুলিতেও নিয়মিতভাবে জল দেওয়া হয় না। আগেকার আমলে মিউনিসিপ্যালিটির আয় কম থাকা সত্ত্বেও ভিস্তি ও কলসীর দ্বারা জল ছিটাইবার সুব্যবস্থা ছিল।

সহরে মোট ৪৮৬টি আলো আছে। ঠিকাদারের সহিত আলো প্রতি মাসিক ১৶০ খরচ ধার্য্য হইয়াছে। আগামী বর্ষে আলোর জন্য বাজেটে ৬,৫৫২৲ টাকা বরাদ্দ আছে, খরচ দস্তুরমতই হয়, পরন্তু রাস্তার অন্ধকার মোটেই দূর হয় না। তবে ভরসার কথা সহরে বিজলী-বাতি শীঘ্রই বসিবে।

টীকা দেওয়ার জন্য ৫৬৪৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর যথেষ্ট খরচ হয়।

হাঁসপাতাল

বহরমপুর সদর হাঁসপাতালে সংক্রামক রোগীদিগের আদৌ যত্ন লওয়া হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে এক কলেরা রোগীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। সাধারণ রোগীদিগকে যেরূপ পথ্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা অত্যন্ত কদর্য্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার এবং অন্যান্য অনেক জেলার অনেক রোগী এই হাঁসপাতালে আশ্রয় পাইয়া আসিতেছে।

মুর্শিদাবাদের আম

মুর্শিদাবাদ জেলার আম্র একটা প্রধান ফসল। নানা জাতীয় আম্রের জন্য মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত। এবার সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত আম্রমুকুল হইয়াছে, আম্র ঠিকমত জন্মাইলে টাকায় এক কাহন বিক্রয় হইবে। গরীবরা দুর্ভিক্ষের বৎসরে আম্র খাইয়াও ৩ মাস কাটাইতে পারিবে।



ভারতের চিনি

কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে রায় এস, ভেঙ্কটরমন বাহাদুর ভারতবর্ষের চিনি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন ভারতবাসীরা সাধারণতঃ চিনি ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্তে গুড় ব্যবহার করে। কিন্তু যেটুকু চিনি তাহারা ব্যবহার করে, তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ বিদেশের আমদানি। এই বিদেশী চিনির জন্ত ভারতকে বৎসরে ১৫ কোটি টাকা খরচ করিতে হয়। এই অপব্যয় দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভারতের ইক্ষুর চাষ ও চিনির ব্যবসা ইহাতে অত্যন্ত বিপন্ন হইতেছে। এরূপভাবে চলিলে হয়ত একদিন ভারতের এই একটি প্রধান কৃষি-সম্পদ্ লোপ পাইতেও পারে।

ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ভারতে ইক্ষু-চাষের জন্ত যে পরিমাণ ভূমি কর্ষিত হয় তাহা সমস্ত পৃথিবীর অন্ত সমস্ত দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং চিনির ব্যবসায়ে ভারতেরই অপ্রতিদ্বন্দ্বা হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতকে এখনও বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে হয়। ইহার প্রধান কারণ ভারতে বিঘাপিছু অত্যন্ত অল্প চিনি উৎপন্ন হয়। কিউবায় বিঘাপিছু ভারতের তিনগুণ চিনি উৎপন্ন হয়, জাভায় ছয় গুণ এবং হাওয়াইতে সাত গুণ। ভারতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয় এবং ঐ ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত প্রণালীও অত্যন্ত পুরাতন ধরণের। ভারতে গুড়ই বেশী প্রস্তুত হয়। আবার গুড় এক বৎসরের বেশী রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়। অন্তদিকে চিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রয় হয় এবং থাকেও অনেক দিন।

কোইম্বাটোর চিনিগবেষণা-কেন্দ্র

ইক্ষুকে কি প্রকারে ভারতের মাটী ও জলহাওয়ার উপযোগী করা যায় এবং জাভা ও হাওয়াই প্রভৃতি চিনির দেশের মত ইহার ফলন বৃদ্ধি করা যায় তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত গভর্ণমেন্ট কোইম্বাটোরে একটি ইক্ষুগবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক চেষ্টার ফলে এই কেন্দ্র হইতে বিদেশী ভাল জাতের ইক্ষু বিতরণ করা হইতেছে। গত বারে চাষীরা দেশী ইক্ষুর পরিবর্ত্তে এই কোইম্বাটোরের ইক্ষু লাগাইয়া ১৪ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে। কোইম্বাটোরের গবেষণা-কেন্দ্রের খরচ সে তুলনায় মাত্র ৫০,০০০৲ টাকা। কৃষিবিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য লইলে যে অনেক উপকার পাওয়া যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ায় ১৯২৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মোট ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ২২ হাজার ৬৫৪ টাকা অস্থায়ী আমানত ছিল। ১৯২৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই ধরণের জমার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৯৭ টাকা। আপাতঃ দৃষ্টিতে ১৯২৬ সনের শেষে অস্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৪৬ লক্ষ টাকা কম হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অস্থায়ী আমানতের পরিমাণ কমে নাই। বৎসরের শেষে কিছুদিন টাকা পয়সার টানাটানি পড়ায় এবং সুদের হার শতকরা ৭ টাকাতে উঠায় অনেক বেশী লোকে টাকা উঠাইয়া লইয়াছিল। পক্ষান্তরে ১৯২৭ সনে ব্যাঙ্কের প্রাত্যাহিক জমা টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি

হইয়াছিল। কোম্পানী এই সনে এইজন্য সওয়া লক্ষ টাকার উপর সুদ দিয়াছেন। তারপর গভর্ণমেণ্ট শেষ ৫ মাসে শতকরা ৫ টাকা হইতে ৫।৷০ টাকা সুদে ট্রেজারি বিল বাহির করিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন। এজন্য দেশীয় ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ কতকটা হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য সনে পূর্ব্ব সন অপেক্ষা ব্যাঙ্কের নিকট লাভের পরিমাণ কিছু কম হইয়াছে। কোন কোন শাখায় নানাভাবে ক্ষতি হওয়াতে, বিশেষভাবে কলিকাতার বড়বাজার শাখায় তহবিল তছরূপ হওয়াতে এবং হেড অফিসে কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ ১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করাতেই নেট লাভের পরিমাণ কিছু কম হইয়াছে। কোম্পানী বর্ত্তমানে উহার ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে এই বাবদ ১ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

কোম্পানী ১৯২৭ সনে পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা সহ মোট ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৫১ টাকা ১১ আনা ১ পাই লাভ করিয়াছেন এবং অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা সুদ দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সিনকোনা চাষ

গত সনে সিনকোনা বৃক্ষ রোপণের কাজ বেশ ভাল ভাবে চলিয়াছে। সিনকোনা রোপণের কাজ তদারক করিবার জন্য ১৯২৭-২৮ সনের শীতকালে সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার তরফ হইতে এক জরীপ কার্য্য চালান হইবে। একর প্রতি সিনকোনা জমিতে কতখানি কুইনাইন পাওয়া যায় তাহারও একটা হিসাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মুংপু ও মানসং প্রভৃতি সিনকোনা প্রদেশের জমিগুলিতে ২১,৭৬২,৫০০ পাউণ্ড সিনকোনার কাঁচা ছাল পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ। ইহা হইতে ৮,৬০৫,০০০ পাউণ্ড কার্য্যোপযোগী শুকনা ছাল পাওয়া যাইবে। এই সিনকোনা ছালগুলির মূল্য অন্যূন ১৫,৮০,০০০ টাকা হইবে। মোটের উপর মাংপু ও মানসং প্লানটেশনে যথাক্রমে ৮,০৮,২৫৪, ও ১৮,০৫,০৫৭ টাকার কুইনাইন পাওয়া যাইবে। প্রতি পাউণ্ড সিনকোনা ছাল হইতে সাধারণতঃ ।/৫ পাই মূল্যের কুইনাইন পাওয়া যায়।

আলোচ্য সনে সিনকোনা ফ্যাক্টরি সমূহে মোট ১,১১৭, ৫১৯ পাউণ্ড শুক্না ছাল ব্যবহার হয়। ইহার ৫৮৭,০০০ পাউণ্ড মাত্র বাংলা হইতে প্রাপ্ত। অবশিষ্ট ভাগ ভারত সরকারের জাভা ক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত।

এই সকল সিনকোনা ফ্যাক্টরি সমূহে পাউণ্ড প্রতি ১৫৯ টাকা খরচায় ৫৫,১৩৬ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট ও পাউণ্ড প্রতি ১৷৵০ ব্যয়ে ১৯,১৯৭ পাউণ্ড ফেব্রিফিউজ উৎপাদন করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৫৮৭ পাউণ্ড কুইনাইন গুড়া পাউণ্ড প্রতি ৩৲টাকা খরচায় ও ১৬১ পাউণ্ড অন্য জাতীয় কুইনাইন পাউণ্ড প্রতি ২৲খরচায় উৎপাদন করা হয়। প্রতি পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট হইতে কম সে কম ১৩৲।১৪৲ টাকা লাভ হয়।

কুইনাইন বিষয়ে ভারতকে স্বাবলম্বী হইতে হইলে তাহার সিনকোনা চাষ বাড়াইতে হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া বনবিভাগ কালিম্পং সবডিভিশনের সামসিং রিজার্ভ ফরেষ্টের দুই হাজার একর উৎকৃষ্ট জমিতে সিনকোনা চাষের পরীক্ষা চালাইবার মতলব আঁটিতেছেন।

ভারতে ধানের চাষ

এই সনে মোট ৭৭৮৯০০০০ একর জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছে। গত সনে ৭৯৭১৮০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য সনে ২৭৯৭২০০০ টন ধান্য জন্মিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। গত সনে ২৯৬৩০০০০ টন ধান্য জন্মিয়াছিল।

গড়ে সমগ্র ভারতে প্রতি বর্গ একরে ৪০২৷৷০ সের ধান্য উৎপন্ন হয়।

সমগ্র ভারতে যত জমিতে ধান্য জন্মে তাহার শতকরা ২৫·২ ভাগ বঙ্গদেশে, ১৭·৪ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যায়, ১৩·৯ ভাগ ব্রহ্মে, ১৩·২ ভাগ মাদ্রাজে, ৮·৭ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, ৭·৩ ভাগ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে, ৫·৫ ভাগ আসামে ও ৩·৬ ভাগ বোম্বাইতে আছে।

চাউল ও ধান্য কত বিদেশে চালান হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

সন	বাংলা ও বিহার উড়িষ্যা	গোটা ভারত
১৯২৩	২৭১৫০০ টন	২০৩৯২০০ টন
১৯২৪	৩৪০৩০০ "	২২৮৭৭০০০ "
১৯২৫	১৯৭৪০০ "	২৪৬৯৪০০ "
১৯২৬	১১৯২০০ "	২৩১৩৯০০ "
১৯২৭	১১৬৪০০ "	২২২৬৪০০ "

ভারতের চাউল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি হয় সিংহলে। তৎপরে জার্ম্মাণি, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, জাপান, চীন, সুমাত্রা, কিউবা, ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে।

ভারতে তূলার চাষ

১৯২৭—২৮ সনে সমগ্র ভারতে ২৩৮১২০০ একর জমিতে তূলার চাষ হইয়াছে। তাহার পুর্ব্ব সনে ২৪৬৭০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। এই সনে ৫ মণ গাঁইটের ৫৮৪০০০০ গাঁইট তূলা উৎপন্ন হয়। গত সনে ৫০০৩০০০ গাইট তুলা হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতে যত তূলার জমি আছে তাহার শতকরা ২৭·৮ ভাগ জমি বোম্বাইতে, ২০·৮ ভাগ মধ্য প্রদেশ ও বেরারে, ১০·৬ ভাগ জমি মাদ্রাজে, ৮·৬ ভাগ পঞ্জাবে, ৩·৫ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, ১·৪ ভাগ ব্রহ্মে, ·৪ ভাগ বঙ্গদেশে, ·৩ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যায়, ·২ ভাগ আসামে।

ইংলণ্ড ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে যথাক্রমে ১৫৩০০০ ও ৮৫০০০ গাঁইট তূলা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করে। ইংলণ্ড ছাড়া ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ঐ দুই সনে যথাক্রমে ১০৩৪০০০ ও ৮৩২০০০ গাঁইট তূলা চালান দেওয়া হয়। মোটের উপর ভারতের বাহিরে ঐ দুই সনে যথাক্রমে ৩৭৭৭৫০০০ ও ২৮৩০০০০ গাঁইট তূলা প্রেরিত হয়। ভারতের কলসমূহে ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে যথাক্রমে ১৯৮৩০০০ ও ২৮৩০০০০ গাঁইট তূলা ব্যবহৃত হয়।

ভারতে প্রস্তুত গুড়

১৯২৫-২৬ সনে দেশী রাজ্য সমেত সমগ্র ভারতবর্ষে ২,৯৪০,১২০ টন ইক্ষু এবং খেজুর গুড় প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৩,৮০০ টন গুড় গলাইয়া ও পরিষ্কার করিয়া চিনি তৈয়ারী করা হইয়াছিল। প্রাচীন দেশীয় প্রণালীতে ছোট ছোট কারখানায় আনুমানিক ১২৫,০০০ টন রাব চিনি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাদ বাকী ১,৭৪১,৩২০টন গুড় আমাদের আহারের জন্য ছিল।

জল এবং স্থলপথে সাধারণতঃ প্রতি বৎসর আনুমানিক ৮০০০টন গুড় রপ্তানি হয়। ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রায় সমস্ত গুড়ই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। বিগত আদমসুমারী, অনুযায়ী ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৩১৮,৯৪২,৪৮০। কাজেই মাথা পিছু ১৯·২ পাউণ্ড ইক্ষু ও খেজুর গুড় ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে প্রস্তুত ইক্ষু ও খেজুরের গুড়ের পরিমাণ ছিল ৩,১৭২,৮০০টন। তন্মধ্যে ১০৬,৪৭০ টন গলাইয়া আধুনিক কারখানায় চিনি তৈয়ারী করা হইয়াছিল এবং আনুমানিক ১২৫,০০০ টন রাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশী কারখানায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। কাজেই বাদবাকী ২,৯৩১,৩৩০ টন গুড় খাদ্যের জন্য ছিল। ভারতবর্ষে আনুমানিক ৯০০,০০০ টন সাদা চিনি ব্যবহৃত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে প্রতি টন সাদা চিনির স্থলে কিঞ্চিদধিক তিন টন গুড়ের প্রয়োজন।

গুড়ের বাজার ভারতবর্ষ

সোজাসুজি খাদ্যরূপে গুড় ভারতবর্ষের বাহিরে বিক্রয়যোগ্য নহে। কাজেই ইহার বাজার শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘামিয়া উঠে বলিয়া গুড়ের দাম সাধারণতঃ বর্ষাকালে চড়া। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সংযুক্তপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষুর চাষ এবং গুড় প্রস্তুত হয়। ১৯২৬-২৭ এবং ১৯২৭-২৮ সনে যথাক্রমে ১,৬২৬,০০০ এবং ১,৬০২,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। প্রতি একরে গড়ে যথাক্রমে ২,৩২৮ এবং ২,১৫১ পাউণ্ড ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯২৫-২৬ এবং ১৯২৭-২৮ সনে বাঙ্গালা দেশে যথাক্রমে ২০১,০০০ এবং ২০৯,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ এবং

২,৩৯৬ এবং ২,৫২৯ পাউণ্ড ইক্ষু গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দুই বৎসরে খেজুরে গুড়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১০৮,০০০ এবং ৯৬,০০০টন। বিগত আদমসুমারী অনুসারে বাঙ্গালা দেশের জনসংখ্যা ৪৭,৫৯২,৪৬২—প্রকৃতপক্ষে যুক্ত প্রদেশের সমান। কিন্তু চাষ ভূমির পরিমাণ অনেক কম। কাজেই বঙ্গদেশে গুড়ের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী। "বাঁকুড়া জেলা কৃষি ফার্ম্মের" ১৯২৬-২৭এর বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, উক্ত বৎসর গুড়ের দর ছিল মণ প্রতি ১০৲। উক্ত বৎসর ফরিদপুরের গুড়ের মণ ১২॥০ টাকা, রাজসাহীতে ৮৲ টাকা কালিম্পংএ ১২॥০ টাকা ইত্যাদি।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তৈয়ারী হইলে গুড় একটি অতীব পুষ্টিকর খাদ্য। স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে ইহার ব্যবহারে কোনই আপত্তি উঠিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে কোন কোন ভারতীয় গৃহ-প্রস্তুত খাবারের জন্য চিনি অপেক্ষা গুড়ই লোকে বেশী পছন্দ করে। ইহার সুমধুর ঘ্রাণ এবং সুমিষ্টতায় সকলেই আকৃষ্ট হয়। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন আছে—যাহা সাদা চিনিতে নাই।

১৯২২ সনের জুনসংখ্যা "ইন্টার্ণ্যাশন্যাল সুগার জার্ণালে" মিঃ জে, পি, অগিল্‌ভি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—সোজা-সুজি আহারের জন্য মোটা দানাযুক্ত যে চিনি তৈয়ারী হয় তাহা পরিষ্কৃত চিনি অপেক্ষা অধিক মিষ্ট ও সুস্বাদু। যৎকিঞ্চিৎ ক্ষার এবং সামান্য অ-শর্করা জাতীয় উপাদান থাকাতে গৃহে ব্যবহৃত চিনির মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। গুড় যে কেন পরিষ্কৃত চিনি অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট এবং ভারতবর্ষে গোঁড়ালোকেরা ইহা কেন পছন্দ করে, তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

তিনটি জিনিষ প্রয়োজন

গুড়ের পক্ষে তিনটি জিনিষ বিশেষ বাঞ্ছনীয়,—পবিত্রতা ভাল বর্ণ এবং শ্রেণীভেদ। সাধারণতঃ লোকে সাদা অথবা লাল রংএর গুড় অপেক্ষা স্বর্ণাভ হরিদ্রা বর্ণের গুড় বেশী দাম দিয়া কিনিয়া থাকে। শক্ত গুড় তৈয়ারীর পক্ষে চুন অপরিহার্য্য। চুন মিশাইলে গুড়ের রং ময়লা হইয়া যায়। গুড়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ইনভার্ট চিনি থাকায় বর্ষাকালে ইহা জলশোষণ করে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ইহা রাখা বড় কঠিন। চুন যত পরিমাণে বেশী মিশান যাইবে, গুড় ততই শক্ত এবং কালো হইবে। গুড়ের কারখানায় জ্বালের শেষভাগে অঙ্গার সাহায্যে ঐ অতিরিক্ত চুন বাহির করিয়া নেওয়া হয়। যাহাতে গুড় শক্ত এবং রং পাতলা হয়, ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘামিয়া না ওঠে এবং ভবিষ্যতে কাল না হইয়া যায়,—সেইরূপ কোন উন্নত প্রণালী উদ্ভাবন করার জন্য পুসাতে রাসায়নিক কেন্দ্রে পরীক্ষা চলিতেছে। বহু প্রকারের ইক্ষু এবং বিভিন্ন রকম প্রস্তুত-প্রণালীর দরুণ গুড়ের উপাদানও বিভিন্ন প্রকারের। গুড় একটি বিশিষ্ট ভারতজাত দ্রব্য। গুড় তৈয়ারী একটি কুটিরশিল্পবিশেষ। ইহাতে প্রচুর মূলধন লাগে না।

ইক্ষুর চাষবৃদ্ধি

১৮৯০-৯১ হইতে ১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত প্রতি পাঁচ বৎসরে এবং গত তিন বৎসরে গড়ে বার্ষিক কত জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া গেল :—

			একর
১৮৯০-৯১	হইতে	১৮৯৪-৯৫	২,৮৬৩,৪০০
১৮৯৫-৯৬	"	১৮৯৯-১৯০০	২,৭৩৫,৪০০
১৯০০-০১	"	১৯০৪-৫	২,৩৭৫,৬০০
১৯০৫-০৬	"	১৯০৯-১০	২,৩৮৫,০০০
১৯১০-১১	"	১৯১৪-১৫	২,৫১১,০০০
১৯১৫-১৬	"	১৯১৯-২০	২,৭০৪,০০০
১৯২০-২১	"	১৯২৪-২৫	২,৭৯৪,৮০০
১৯২৫-২৬	"	১৯২৭-২৮	২,৯৫০,০০০

বিদেশী চিনি

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (যখন প্রচুর পরিমাণে সস্তা বিদেশী চিনি আমদানি হইতেছিল) চাষ-ভূমির পরিমাণ ছিল কম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মহাযুদ্ধ এবং তাহার পরবর্ত্তী ফলের দরুণ চিনির দাম ও সঙ্গে সঙ্গে গুড়ের দাম বাড়িয়া

যায়। ইহার ফলে ইক্ষু-চাষের ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চিনির উপর আমদানি-শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়াতেও তাহা প্রকারান্তরে ইক্ষু-চাষীদের সাহায্যই করিয়াছিল। আরও একটি বিষয় দেখিবার আছে; যদিও গত ৩০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে ৩১ কোটি ১৮ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ইক্ষু-চাষের ভূমির পরিমাণ বাড়িয়া সবে মাত্র ৯০ এর কোঠা ছাড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে বিদেশী আমদানি চিনির পরিমাণ ছয় গুণ বাড়িয়া ১৯২১ সনের ১৩৭,০০০ টন হইতে ১৯২৬ ২৭ সনে ৮২৬,৯০০ টন হইয়াছে।

সাদা চিনির মোহ

যাহা হউক, বিগত ৩৬ বৎসরের মধ্যে আমদানি চিনির পরিমাণ শতকরা ৬০০ টন বৃদ্ধি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এ দেশবাসীর রুচি ক্রমশঃ সাদা চিনির অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শিক্ষিত পরিবারের আয়ব্যয়ের হিসাবে গুড় একটি অতি সামান্য জিনিষ বলিয়া ধরা হয়। ইহার কারণ, তাঁহারা বেশীর ভাগই সাদা চিনি ব্যবহার করেন। মনে হয়, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও অধিক পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হইবে, এবং গুড়ের বাজার ক্রমশঃ মন্দার দিকে যাইবে। যাহা হউক, এখনও গ্রামে গরিব লোকের বাড়ীতে গুড় একটি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাজেই কৃষি-বিভাগের যথাযোগ্য দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক উন্নত ধরণের কল ও নূতন নূতন প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে আশা করা যায়, কৃষিবিভাগের অবিরত কার্য্যের ফলে, বর্ত্তমান অপেক্ষা কম জমিতে ইক্ষুর চাষ করিয়াও দেশের গুড়ের প্রয়োজন মিটাইতে পারা যাইবে। (বাংলার কথা)

মাদ্রাজের মৎস্য বাণিজ্য

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সমুদ্রের তীরভাগ দিয়াই মাছ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বতীরে বহির্ব্বাণিজ্যের তেমন সুবিধা না থাকায়, পশ্চিম তীরেই মাছের ব্যবসা বেশী চলিয়া থাকে। নাগাপট্টনই পূর্ব্ব তীরের একমাত্র বন্দর, এবং এখান থেকে প্রধানতঃ মাছের পাকস্থলী ও হাঙ্গরের ডানা ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্টে চালান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মৎস্য-বাণিজ্যে দুইটী উন্নতি সাধিত হয়। প্রথমতঃ মাছ লবণাক্ত মাটি দিয়া মাখা হইত। সে সময় সমুদ্রের তীরভাগ দিয়া বহুস্থানে মাছে লবণ মাখার আড়ৎ খোলা হইত। সেখানে জেলেদের মাছে লাগাবার জন্য লবণ বিনা শুল্কে কিনিবার অধিকার দেওয়া হইত। যখন সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ লবণ পাওয়া যাইতে লাগিল তখন প্রচুর পরিমাণে লবণ মাছে উপযুক্ত ভাবে মাখাইতে লাগিল। এইরূপে পশ্চিম তীরজাত লবণাক্ত মাছ প্রধান খাদ্যের মধ্যে গণ্য হইতে লাগিল। এই ব্যবসায় এখন বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ইহার রপ্তানির অধিকাংশ মাছই এখন রেলপথে টুটিকোরিণ অথবা দানুষ্কাদি দিয়া সিংহলে চালান হইয়া থাকে। শুষ্ক ও লবণাক্ত মৎস্যের বাণিজ্যও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারও বেশীর ভাগ টুটিকোরিণ দিয়া সিংহলে চালান হইয়া থাকে। এবং ইহার কিয়দংশ মাদ্রাজ হইতে ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্যব্যবসায়ের মত মৎস্য ব্যবসায়ও মাদ্রাজী কুলীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কর্ম্ম স্থানে প্রচলিত হইয়া থাকে। যদিও মাদ্রাজে কোন সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় মৎস্য ভক্ষণ করে না, তথাপি সেখানে শতকরা ৮০ জন লোক মৎস্য সুলভ হইলে ভক্ষণের পক্ষপাতী। সমস্ত মাছের আড়তে বরফ না মেলাতে, সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কয়েক মাইলের ভিতর ছাড়া টাট্‌কা মাছ পাওয়া যায় না। শুষ্ক ও লবণাক্ত মাছ তীরবর্ত্তী প্রদেশেই কাটতি হইয়া থাকে এবং মালবার কুর্গ ও মহীশূরের সমস্ত চা ও কাফি বাগানে চালান হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে রপ্তানির হিসাবের সংখ্যা অপেক্ষা মাছের ব্যবসায় আরও বেশী চলিয়া থাকে।

মৎস্যবিভাগ কর্ত্তৃক অন্য একটা প্রধান উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। সমুদ্রের বালুময় তটে রৌদ্রে শুকাইবার জন্য মাছ ফেলিয়া না রাখিয়া, মাছগুলিকে একটা খোলা পাত্রে সিদ্ধ করা হয়, তারপর সে সব সিদ্ধ মাছ থলীর মধ্যে পূরিয়া কলে পিসিয়া তেল বাহির করা হয়। ইহাতে শুধু পূর্ব্ব উপায়ে যে তেল নষ্ট হইয়া যাইত, তাহার উদ্ধার

সাধিত হয় তাহাই নয় এবং পূর্ব্বরূপে প্রস্তুত তৈলযুক্ত মৎস্য সার শুধু যে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হইত তাহা নহে, ইহাতে উপযুক্ত সারও প্রস্তুত হইত না। এক্ষণে এই পিষ্ট মাছ মূল্যবান নির্ম্মল সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন প্রথা অনুসারে প্রস্তুত সারের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বালি থাকিত।

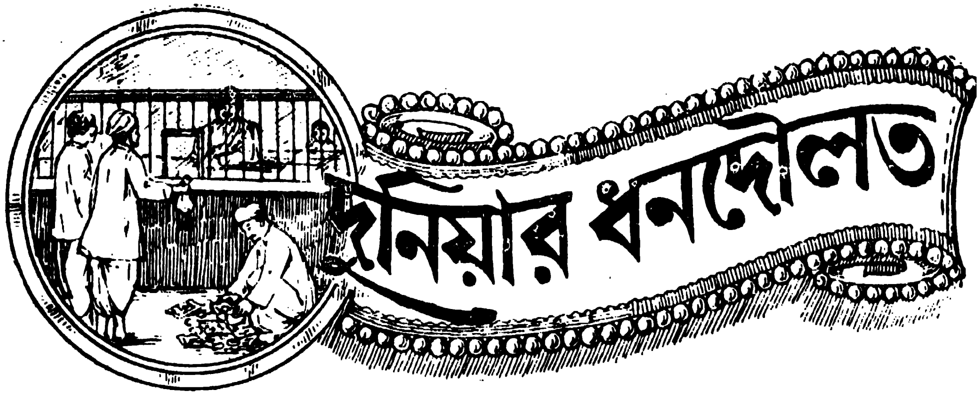
বর্ত্তমান সময়ে প্রস্তুত মৎস্য সারের অধিকাংশই বাহিরে রপ্তানি হইয়া যায়। কতক অংশ এমন কি জাপানেও রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহার দেশের মধ্যে যাহাতে প্রচুর ভাবে হয় সে বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে। ধোঁয়ায় শুকান মাছ, পাত্রে রক্ষিত মাছ এবং মৎস্যে প্রস্তুত নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য মৎস্য বিভাগ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও বিক্রীত হইতেছে।

রোড বোর্ডের সিদ্ধান্ত

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী শিলংএ রোড বোর্ডের যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, সুরমা উপত্যকার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি লোকালবোর্ডের হাত হইতে পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে নিয়া পাকা করা হইবে কি না তদ্বিষয়ে তদন্ত করা হইবে:—(১) গোবিন্দগঞ্জ—সুনামগঞ্জ রাস্তা (২) শ্রীহট্ট—সেরপুর—নবীগঞ্জ—হবিগঞ্জ রাস্তা (৩) হবিগঞ্জ—বানিয়াচঙ্গ—আজমীরগঞ্জ রাস্তা (৪) জুরি—ফুলতলা বাজার রাস্তা (৫) লতু—নীলামবাজার রাস্তা। সুপারিনটেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার ও একজিকিউটীভ এঞ্জিনিয়ার এক মাসের মধ্যেই এসম্বন্ধে স্থানীয় তদন্ত করিবেন।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী তাহাদের নিম্নলিখিত ষ্টেশনগুলির নিকটবর্ত্তী রাস্তা পাকা করার জন্য আসাম সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন—ইবিখোলা ($\frac{1}{8}$ মাইল), সাতগাঁও ($\frac{1}{8}$ মাইল), টীলাগাঁও ($\frac{1}{8}$ মাইল), জুরী ($\frac{1}{8}$ মাইল), দক্ষিণ ভাগ, কাঠালতলী, হাইলাকান্দি ($\frac{1}{8}$), মনাছড়া ($\frac{1}{2}$), লালবাজার ($\frac{1}{8}$)।

ফেঁচুগঞ্জ ষ্টীমার কোম্পানীর এজেন্ট ফেঁচুগঞ্জ হইতে কুলাউড়া পর্য্যন্ত ১৫ মাইল রাস্তা পাকা করার আবদার করিয়াছেন। (জনশক্তি)



দুনিয়ার যন্ত্রশক্তি

যন্ত্রশক্তির বহর দেখিয়া একটা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি পরিমাপ করা যায়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে দপ্তর হইতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্প-কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে কি পরিমাণ জলশক্তি ব্যবহার করা হয় তাহার একটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন। কল-কারখানায় জলশক্তি ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। গোটা ইয়োরোপ শিল্প কারখানা ও অন্যান্য কাজে যে পরিমাণ জলশক্তি ব্যবহার করে ঠিক ততটা শক্তি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খরচ হয়। এখানে বিভিন্ন দেশের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৯২৬ সনের শেষ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক কারখানাগুলিতে একশত অশ্ব শক্তি প্ল্যাণ্টের ১১,৭০০,০০০ অশ্বশক্তি ব্যবহৃত হয়। ইহার তুলনায় ইয়োরোপে ১৩,১০০,০০০ অশ্বশক্তি খরচ হয়। ১৯২১ হইতে ১৯২৬ এই পাঁচ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে শত শক্তিওয়ালা প্ল্যাণ্টগুলির ৩,৮০০,০০০ অশ্বশক্তি প্ল্যাণ্ট যুক্ত হয়। ইয়োরোপে ঐ সময়ে ৪,২০০,০০০ অশ্বশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। ঐ সময়ের প্রথম তিন বৎসরে ইয়োরোপের চাইতে আমেরিকার বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ইয়োরোপের মধ্যে ইতালি ২,৩০০,০০০, ফ্রান্স ২০০০,০০০, নরওয়ে ১,৯০০,০০০, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ১,২৫০,০০০ ও সুইডেন ১৩৫,০০ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন ব্যবহার করে।

আফ্রিকায় মাত্র ১৪০০ অশ্ব শক্তির প্ল্যাণ্ট ব্যবহার হয়। জাপান কিন্তু ১,৭৫০,০০০ অশ্বশক্তির প্ল্যাণ্ট স্থাপন করিয়াছে। ভারতবর্ষ ২০০,০০০ অশ্বশক্তির প্ল্যাণ্ট স্থাপন করিয়াছে। নিউজীল্যাণ্ড কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ প্ল্যাণ্ট নির্ম্মাণে রত আছে। তবে এপর্য্যন্ত যেগুলি সম্পন্ন হইয়াছে তাহা মোট ৬০,০০০ অশ্বশক্তির হইবে। জাভা সুমাত্রা ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে ৮০,০০০ অশ্বশক্তির প্ল্যাণ্টে কাজ চলিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় জলশক্তি ব্যবহারে ব্রাজিল প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্রাজিলে ৫০০,০০০ অশ্বশক্তির প্ল্যাণ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার অধিকাংশ রায়ও-ডিজেনেরো ও স্যানপলো নামক শিল্পকেন্দ্রে ব্যবহৃত হইতেছে। চিলির প্ল্যাণ্টের পরিমাণ ১১৪,০০০ অশ্বশক্তি এবং পেরুর ৫৫,০০০ অশ্বশক্তি। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে ৬০০,০০০ অশ্বশক্তির প্ল্যাণ্ট আছে। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কানাডা। কানাডার প্ল্যাণ্টের ক্ষমতা ৪,৫৫৬,০০০ অশ্বশক্তি। ইহা ১৯২৬ সনের শেষ ভাগ পর্য্যন্তের হিসাব। ১৯২০ সনে কানাডার প্ল্যাণ্টের ক্ষমতা ছিল ২,১৩৮,০০০।

১৯২৬ সনের শেষভাগ পর্য্যন্ত উত্তর আমেরিকার প্ল্যাণ্টের ক্ষমতা ১৬,৮০০,০০০ অশ্বশক্তি উঠিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা ১৭৫,০০০০, ইয়োরোপ ১৩১০০,০০০, এশিয়া ২,১০০,০০০, আফ্রিকা ১৪,০০০ ওশেনিয়া ২১০,০০০। ১৯২৬ সনে দুনিয়া মোট ৩৩,০০০,০০০ অশ্বশক্তির প্ল্যাণ্টে পৌছিয়াছে। ১৯২০ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ২৩,০০০,০০০ অশ্বশক্তি। এই ৬ বৎসরে মোট শতকরা ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প মাতব্বরদের সম্প্রতি মস্কো সহরে এক সভা হইয়া গিয়াছে। একটি প্যান-সোভিয়েট চেম্বার অব্ কমার্স প্রতিষ্ঠা করাই সভার উদ্দেশ্য। পশ্চিম

ইয়োরোপ ও আমেরিকার বাজারগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় শিল্প ব্যবসায়িগণের সহিত পশ্চিম ইউরোপের শিল্প-ব্যবসায়ীর চুক্তি কায়েম করা এই সভার প্রধানতম কার্য্য হইবে। এই সভার পক্ষ হইতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও শিল্প সহরে সোভিয়েট রুশিয়ায় উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং বিদেশী সংবাদপত্রসমূহে রুশিয়ার শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক সঠিক খবর সরবরাহ করা হইবে।

ক্রিমিয়ার সিবাষ্টোপল হইতে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যে এক নতুন যুগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রুশিয়ার সমবায় ক্রয়-বিক্রয়-সমিতি-গুলিতে বিগত জানুয়ারী মাসে সূতি, পশমি বস্ত্র, রেডিমেড্ কাপড় চোপড়, ও জুতা বিক্রয়ার্থ জমা হইয়াছে। এসকলই কিষাণ সম্প্রদায়ের উপযোগী। কিষাণরা কিন্তু আজকাল জিনিষপত্র খরিদ করিবার সময় একটু বেশী সতর্কতা লইতেছে। সাধারণ কাপড় জুতা তাহারা আর পরিতে ইচ্ছুক নহে। সহুরে ফ্যাসান তাহাদের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। তাহারাও সহরবাসীদের মত সুন্দর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। কিষাণদের উপযোগী করিয়া যে সকল বস্ত্র ও জুতা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবিক্রীতই পড়িয়া আছে।

রুশিয়াতে আরও বেশী সংখ্যায় সেলাইয়ের কল তৈয়ারী করা হইতেছে। পোডোলস্ক ষ্টেট সোইং মেশিন ট্রাষ্টে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ সেলাইয়ের কল প্রস্তুত হয় তাহার চাইতে তিন বা সাড়ে তিন গুণ হারে বৃদ্ধি করিয়া প্রতি সনে ৬ লক্ষ করিয়া সেলাইয়ের কল প্রস্তুত করা হইবে। ঐ কারখানায় এইজন্য দ্বিগুণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইবে। এবং শ্রমজীবীর সংখ্যা ৫ হাজার হইতে ৭,৪২২ জন করা হইবে।

সুইডেন-লণ্ডন জাহাজ কোম্পানী

বিলাতের স্বেনস্কা লয়েড শিপিং কোম্পানী লণ্ডন ও সুইডেনের মধ্যে যাতায়াতের কি সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে সে বিষয়ে সুইডিস সরকারকে এক মোসাবিদা প্রেরণ করিয়াছেন। কোম্পানী রেডেরিয়াকৃটি বোলা গেট স্বেনস্কা লয়েডস লণ্ডন লাইন নামক লণ্ডন ও সুইডেনের মধ্যে যাতায়াতকারী এক জাহাজ কোম্পানী খুলিতে চান। এই জাহাজ কোম্পানী ৬৬ লক্ষ ক্রাউন ব্যয়ে দুইখানি দ্রুত জাহাজ কিনিবে। গোটেনবুর্গ ও লণ্ডন হইতে প্রতি শনিবার জাহাজ ছাড়িবে ও সোমবার প্রাতঃকালে ঐ দুটি স্থানে পৌঁছিবে। স্বেনস্কা লয়েড সুইডেন সরকারের নিকট এই সম্পর্কে ৩৫ লক্ষ ক্রাউন ধার করিয়াছেন।

তুর্কিতে গাড়ী প্রেরণ

"নিড্‌কিষ্টথ হোল্ম" কারখানায় প্রস্তুত ৬খানি বৃহৎ এঞ্জিন ও ৫০ খানি ট্রাক্টস্ জাহাজযোগে গোটেনবুর্গ হইতে তুর্কিতে চালান দেওয়া হইয়াছে। এঞ্জিনগুলির প্রত্যেকখানি ১৩২ টন ভারি এবং সুইডেনে প্রস্তুত রেল-গাড়ীর এঞ্জিনের মধ্যে সব চাইতে বৃহৎ।

বিলাতের পশম-শিল্প

বিলাতের পশম-শিল্পে বর্ত্তমানে যেরূপ সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে এরূপ বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বড় একটা হয় নাই। ১৯২৫ সনের চাইতে বর্ত্তমানে পশম শিল্পে বেশী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে। উল উৎপাদনকারিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনের ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। বাজারে উলের সূতা মিলিতেছে না। ফলে অনেক পরিবারেই গৃহে প্রস্তুত উলের দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুবিধা পাইতেছে না। এই জন্য কলের উৎপাদিত উলের দ্রব্যের কাটতি বাড়িতেছে। উল ব্যবসায়িগণের গুদামে পূর্ব্ব হইতেই অনেক উলের সূতা জমা ছিল। বর্ত্তমানে উলের মূল্য চড়িয়া গেলেও উলের দ্রব্য উৎপাদনকারিগণ তাহাদের জমান উল দ্বারাই কলকারখানা চালাইতেছে এবং বেশ মোটা হাতে লাভ করিতেছে। বর্ত্তমানের গুদামজাত করা মাল ফুরাইয়া গেলে স্বভাবতঃ উলের দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যাইবে। উলের দাম চড়িয়া গেলে বর্ত্তমানের চাহিদা অক্ষুন্ন থাকিবে বলিয়া ভরসা হয় না। যাহা হউক বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় খুব উলের দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। জাপান

আমেরিকা ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও উলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল দেশেই কিন্তু সূক্ষ্ম উলের বস্ত্রের বেশী কাটতি হইতেছে না। সকলেই সাধারণ উলের দ্রব্য বেশী ক্রয় করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার কিষাণগণ সব চাইতে সরেশ উল উৎপাদন করিতেছিল; কিন্তু তাহাদের ঐ উল বাজারে বেশী বিকাইতেছে না। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেও উল শিল্পের অবস্থা বেশ ভালই চলিতেছে।

ব্যবসায় জুয়াখেলা

ব্যবসার বাজারে জুয়া খেলা বা স্পেকুলেশুন করা অনেক দেশই পছন্দ করিতেছে না। বিশেষ করিয়া ফ্রান্স ও ইতালী তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যকে স্পেকুলেশুনের হাত হইতে রক্ষা করিবার যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতেছে। কেবল শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কেই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না, পরন্তু কারেন্সি বা মুদ্রা-বিষয়ক স্পেকুলেশুনও ঐ সকল দেশ উঠাইয়া দিবার চেষ্টায় আছে।

রবারের বাজারে খুব স্পেকুলেশুন চলে। দুনিয়ার রবার উৎপাদন কতকটা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহা এখনও বিচারাধীন। টিনের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত না থাকায় টিনের বাজারে স্পেকুলেশুন খুব চলতি। টিনের মূল্য বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। টিন-উৎপাদনকারিগণের ক্ষতিকর স্পেকুলেশুন বাজারে চলিতেছে; কিন্তু দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কোম্পানী কর্ত্তৃক টিন উৎপাদিত হয় এজন্য টিনের সম্পূর্ণ ষ্ট্যাটিসটিক্স পাওয়া সম্ভবপর হয় না। ফলে টিনের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে না।

শস্য বিষয়ে কানাডার গম উৎপাদনকারী কৃষকরা কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে তাহাদের শস্য বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে তাহারা বেশ ফল পাইতেছে। শস্য-শিল্পজাত দ্রব্য বা মুদ্রা-সম্পর্কিত স্পেকুলেশুন হ্রাস করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এগুলির যথাযথ নিরেট নির্ভুল ষ্ট্যাটিসটিক্স সংগ্রহ করা চাই। উৎপন্নদ্রব্যের নির্ভুল ষ্ট্যাটিসটিক্স সংগৃহীত না হইলে ব্যবসায়ে জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভবপর নয়।

কানাডার লৌহ ইস্পাত শিল্প

সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে কানাডার লৌহ ইস্পাত শিল্পের অবস্থা খুব সচ্ছল বলিতে হইবে। রেলওয়েগুলি নিয়মিতভাবে লৌহ ইস্পাত খরিদ করিতেছে। লৌহ ইস্পাত কারখানাগুলি আরও অনেক বড় বড় অর্ডার পাইয়াছে। মোটরকার ও খনিজ যন্ত্রপাতির অর্ডারও ঢের আসিতেছে।

গম রপ্তানি

বর্ত্তমান সনে কানাডায় ২৩৭,১৬৯,০০০ ডলার মূল্যের গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গত সনের তুলনায় ৭,৮৬৪,০০০ ডলার মূল্যের গম কম উৎপন্ন হইবে।

আর্জ্জেন্টিনায় কৃষি জমি উদ্ধার

আর্জ্জেন্টিনার কর্ড্ডোবা ও স্যানফে নামক প্রদেশ দুইটিতে বিরাটভাবে পয়ঃপ্রণালী স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই দুইটি প্রদেশে অনেক ঘাসের জমি পড়িয়া আছে, কিন্তু এখানকার জমি খুব অনুর্ব্বর। এগুলির মধ্যে খাল কাটিয়া দিলে এগুলি অনেকটা উর্ব্বর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আর্জ্জেন্টিনার মধ্যপ্রদেশের এইরূপ ১২৬ হাজার একর গোচারণের অনুর্ব্বর মাঠকে কৃষি উপযোগী শস্যশ্যামল করিবার আয়োজন চলিতেছে। ইহাতে প্রাথমিক ২ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

স্পেনের আমদানি শিল্পের অবস্থা

অনেক আলোচনার পর স্পেনিশ সরকার উপকূলে ব্যবহারের জন্য শুল্ক সমেত ৪৪ হাজার টন গম স্পেনে আমদানি করিবার হুকুম দিয়াছেন। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব উপকূলের তিনটি বন্দরে মাত্র গম আমদানি করিবার ফরমাস দেওয়া হইয়াছে। আভ্যন্তরিক গমের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই স্পেনিশ সরকার এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

স্পেনিশ সরকার দেশীয় চিনি উৎপাদনকারিগণকে

আশ্বাস দিয়াছেন যে, বাহির হইতে চিনি আমদানি কিছুদিন বন্ধ রাখা হইবে।

সুইডিস আয়রণ ওর খনিগুলিতে ধর্ম্মঘট হওয়ায় স্পেনের খনিতে অসম্ভব রকম অর্ডার আসিতেছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা খনি হইতে ৩৫ হাজার টন লৌহ প্রেরিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে জাহাজ নির্ম্মাণ

লোয়ার রাইন শিপইয়ার্ডে আবার জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে। যে সকল শ্রমজীবীকে পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে আবার জাহাজে লাগান হইয়াছে। যেরূপ অর্ডার আসিতেছে তাহাতে শিপ ইয়ার্ডের কাজ আরও কয়েক সপ্তাহ চলিবে; কিন্তু চড়া লৌহ ইস্পাতের দাম ও চড়া মজুরির জন্য শীঘ্রই জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ বন্ধ হইবার আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে সকল অর্ডার ওলন্দাজ জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে দেওয়া হইবে।

জার্ম্মাণির কৃত্রিম রেশমশিল্প বেশ সচ্ছলতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। সরকারী হিসাব মোতাবেক ঐ সকল শিল্প কারখানায় আরও ৬ মাস পুরাদমে কাজ চলিবে।

দুনিয়ার জাহাজের হিসাব

লয়েডস্ রেজিষ্টারে দেখা যায় গোটা জগতে ১৯২৭ সনে ২,২৮৫,০০০ টন ভারবাহী জাহাজ সমুদ্রে নামান হয়। ইহার মধ্যে গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ১,২২৫,০০০ টন, জার্ম্মাণির ২৮৯,০০০ টন, যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৯,০০০ টন এবং হল্যাণ্ডের ১১৯,০০০ টন।

গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডে পূর্ব্বাপেক্ষা ৫৮৬,০০০ টন জাহাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯১৪ সনের তুলনায় জগতের জাহাজ টনেজের পরিমাণ ৪,৮৬০,০০০ টন কম হইয়াছে।

১৯২৭ সনে ১০ হাজার টনের উপর ১৯ খানা জাহাজ সাগরে ভাসান হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৯ খানি ১৫ হাজার টন মালবাহী। ঐ সনে ৩৬৩ খানা জাহাজে ষ্টিম টার্বাইন ও ৮৬৪ খানায় কমবাসশান এঞ্জিন সংযোজিত করা হইয়াছে।

সমগ্র দুনিয়ায় আলোচ্য বৎসরে মোট ১,৩৭৫,০০০ টনের ষ্টিম জাহাজ সমুদ্রে ভাসান হইয়াছে।

কানাডার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক মোসাবিদা

কানাডায় হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক (জলধারা হইতে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি) আখড়াগুলির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নতি দ্রুত চলিয়াছে। গত সনে ২২১,০০০ অশ্বশক্তির জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ইহার ফলে ঐ সনে মোট জল বিদ্যুতের আখড়াগুলিতে ৪,৭৭৮,০০০ অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হয়। বর্ত্তমান সনের প্রথম ছয় মাসে কানাডায় আরও ৩৭৮,০০০ অশ্ব শক্তির ইঞ্জিন খাড়া করা হইবে। ইহার ফলে কানাডার জল-বৈদ্যুতিক শক্তির আখড়াগুলিতে মোট ৫১০০,০০০ বা ১৯২০ সনের ডবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকিবে। ১৯৩০ সনের পূর্ব্বেই আরও ২০ লক্ষ জল বৈদ্যুতিক শক্তির ষ্টেসন স্থাপন করা হইবে। এই কাজের জন্য অন্ততঃ বিশ কোটি ডলার মূলধন খাটিবে। ঐ বিশাল বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারণ শিল্পোন্নতির কাজে ব্যবহৃত করিবার জন্য আরও কোটি কোটি ডলার মূলধনের প্রয়োজন হইবে।

আমেরিকায় বিজ্ঞাপনের খরচ

আমেরিকার সাবান ও গ্লিসিরিন প্রস্তুতকারিগণের অ্যাসোসিয়েশ্যন স্থির করিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী দুই বৎসরের জন্য খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজের বিজ্ঞাপনে তাঁহারা ১,২৫০,০০০ ডলার খরচ করিবেন। উক্ত অ্যাসোসিয়েশ্যনের ম্যানেজার কি ভাবে ঐ টাকাটা খরচ করিতে হইবে তাহার একটা মোসাবিদা ঠিক করিয়াছেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য সাবান ও গ্লিসিরিনের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী সে বিষয়ে বিজ্ঞাপন দ্বারা লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে।

পেট্রোলবিহীন মোটর

এতদিন আমরা পেট্রোল বা খনিজ তৈল খরচ করিয়া

জোরবেগে পথে ঘাটে হাওয়াগাড়ী চালাইয়া আসিতেছি। এবার বুঝি পেট্রোলের রাজত্ব উঠিল। আমেরিকায় একপ্রকার পেট্রোলবিহীন মোটরকার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে কোনই তরল রসদ আবশ্যক হয় না, চুম্বক ও তড়িতের সাহায্যে ইহা আপনিই চলিতে পারে। একটা বড় চুম্বক ও বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপাদক একটা ব্যাটারী থাকিলেই হইল। এই নবাবিষ্কারটি যাহাতে শীঘ্রই দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণের সেদিন একটি বৈঠক বসিয়াছিল। ২।১ বৎসর মধ্যে ভারতে ইহার আমদানি আশা করা যায়।

বিলাতে বস্ত্র-শিল্প-সঙ্কট

ম্যাঞ্চেষ্টারে তুলা কাটুনী সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতি হইয়া মিঃ ফ্রেড হল রয়েড জানাইয়াছেন অনেক কাপড়ের কল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; তাহাদের চালাইবার সত্বর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে। বস্ত্রের বাজার এতদিন ধরিয়া খারাপ থাকিবে এ কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারে অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদনের ও উৎপাদনের ব্যয় কমাইবার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী

ডাচ ইষ্টইণ্ডিজ বা ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব উপদ্বীপে "রোসেলা" নামক এক প্রকার উদ্ভিদ-তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার তন্তু পাট অপেক্ষা দ্বিগুণ মজবুদ এবং উহা লবণাক্ত জলে সহজে নষ্ট হয় না। এই নূতন তন্তু আবিষ্কৃত হওয়াতে ভারতের পাট-ব্যবসায়ীদের মনে এইরূপ আতঙ্ক হইয়াছে যে, রোসেলার চাষ বৃদ্ধি পাইলে হয়ত পাটের চাষ হ্রাস পাইবে এবং হয়ত কিছু দিন পরে পাট রোসেলার সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে। এখন পাট ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে গণ্য। যদি রোসেলার সহিত প্রতিযোগিতায় পাটের পরাজয় হয়, তাহা হইলে এ দেশের পাটের ব্যবসায় বন্ধ হইবে, ফলে আর্থিক হিসাবে ভারতের বিস্তর ক্ষতি হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, রোসেলার আবির্ভাবে পাট-ব্যবসায়ীদিগের এত ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ পাটের সমপরিমাণ রোসেলা উৎপাদন করিতে না পারিলে পাটের আবাদ বন্ধ হইবে না। আজকাল প্রতি বৎসর যত পাট উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ব উপদ্বীপে কখনও তত রোসেলা উৎপন্ন হইবে কি না সন্দেহ। তাহার উপর যে মূল্যে পাট বিক্রয় হয়, রোসেলা সেরূপ অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়।

বিলাতে কাপড়ের কল

ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাসায়ারের সূতার বস্ত্রের কলসমূহে লোকসান হইতেছে। তাহার ফলে ২০০ কারখানা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১৫০,০০০০০ পাউণ্ড ঋণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল কারখানা এই প্রস্তাব করিয়াছে যে, ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকা লোকসান না দিয়া ১০০০০০০ বা ২০০০০০০ পাঃ পর্য্যন্ত লোকসান খাতে লিখিলে মিলগুলির টিকিবার সম্ভাবনা আছে। কতকগুলি মিল সম্মিলিত করিয়া বড় করিয়া কেন্দ্রীভূত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হইলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রের ব্যবসা বন্ধ হইবে।

জাপানে দিয়াশলাই-ট্রাষ্ট

চীন, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি স্থানে জাপানী দিয়াশলাইয়ের তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই জন্য গিসাকু তাকিগওয়ার সভাপতিত্বে একটী নতুন কোম্পানী গঠন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ২৮ লক্ষ ইয়েন মূলধন সহ তোয়ো দিয়াশলাই কোম্পানী, ১০ লক্ষ ইয়েন মূলধন সহ লিহন দিয়াশলাই কোম্পানী, ৮ লক্ষ ইয়েন সহ কৌয়ে কি আ দিয়াশলাই কোম্পানী এবং ৭।৹ লক্ষ ইয়েন মূলধন সহ কোরায়াসী দিয়াশলাই কোম্পানী নামক জাপানের ৪টা প্রধান দিয়াশলাই কোম্পানী মিলিত হইয়া এই ট্রাষ্ট গড়িয়া তুলিবে।

জাপানে মোট ৫০টার উপর দিয়াশলাই কোম্পানী আছে। কিন্তু যে চারিটী কোম্পানী লইয়া ট্রাষ্ট গঠিত

হইতেছে জাপানের মোট দিয়াশলাইয়ের উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ এই সব কোম্পানী হইতে হইয়া থাকে। ১৯২৫ সনে মোট ১,২৮,৬৫,০০০ গ্রোস (মূল্য ৮,৭৩৩,০০০ ইয়েন) এবং ১৯২৬ সনে ১২,১৯৫,০০০ গ্রোস (মূল্য ৬,৮৯৫,০০০ ইয়েন) প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল দিয়াশলাইয়ের বৃটিশ ভারত, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নিম্নলিখিত রূপে বণ্টন হইয়াছিল :—

	১৯২৫		১৯২৬	
	পরিমাণ (গ্রোস্)	মূল্য (ইয়েন)	পরিমাণ (গ্রোস্)	মূল্য (ইয়েন)
বৃটিশ ভারত ...	২,৭৩৭,০০০	১,৯৭১,০০০	১,১১২,০০০	৭৫০,০০০
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট ...	১,৯৯৪,০০০	১,৫০১,০০০	১,৮৭৮,০০০	১,২৬৫,০০০
ডাচ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া ...	৯৭৮,০০০	৬৭৬,০০০	১,০২৬,০০০	৫৮৩,০০০
ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ ...	৮৩৭,০০০	৭০৮,০০০	৯৯২,০০৯	৬৬৭,০০০

জাপানের বন-সমিতি

জাপানে ১৯২৬ সালে ১৪০,০০০ কো জঙ্গল লইয়া (কো—২·৪৫ একর—প্রায় আট বিঘা) ৭৬০ ফরেষ্ট ইউনিয়ান বা বন-সমিতি গঠিত হয়। ইহাতে ১৪,৬০০ সভ্য হয়। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ইহা ৪·৫ ভাগ বেশী দেখা গিয়াছে। নতুন সভ্যের সংখ্যা ১·৪ ভাগ বেশী হইয়াছে। এ বৎসরে ৩,৭০০ কো ও ১,৪৫০ সভ্য সহ ৯টা সমিতি ব্যবসা তুলিয়া দিয়াছে। ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে ৩৭৮,০৬৫ কো জঙ্গল নিয়া ৭৪,০৯০ সভ্য সহ ৫৫৫টী ফরেষ্ট ইউনিয়ান বর্ত্তমান ছিল।

জাপানে ভূমি-সমিতি

১৯২৬ সালের শেষভাগে জাপানে নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী ৫০৭,৬৮০ সভ্য সহ ৫,৪০২টী ভূমিবিষয়ক সমিতি বর্ত্তমান ছিল :—

	সমিতি	সভা
রায়ত সমিতি	৩,৯১৫	৩৩৮,৭০৪
জমীদার সমিতি	৫৯৩	৫৫,৮৭৯
রায়ত ও জমীদারের মিলিত সমিতি	৮৯৪	১১৩,০৯৭
মোট	৫,৪০২	৫০৭,৬৮০

নিম্নে কতকগুলি অধিকসংখ্যক ভূমিবিষয়ক সমিতি-যুক্ত বিভাগের নাম দেওয়া গেল।

	রাইয়ত সভা	জমীদার সভা	সংযুক্ত	পূর্ণ সংখ্যা
নিগাতা	৪৩৬	২৪	৭০	৫৩০
গিফু	৩২৩	৩৮	৮৭	৪৪৮
কাগাওয়া	২৫৯	২৫	৬৬	৩৫০
হিয়োগো	২৪০	৪২	৮২	৩৬৪
য়ামানাশি	২৫৬	৮	৬০	৩২৪
ওকায়ামা	২০২	৩৩	৪৯	২৮৪

তোকিও, নাগাসাকি, হুওয়াতে, আওমরি এবং ওইতা বিভাগে অল্পসংখ্যক কতকগুলি ভূমিবিষয়ক সমিতি আছে এবং একমাত্র ওকিনাওয়া বিভাগে কোনও ভূমিবিষয়ক সমিতি নাই। বর্ত্তমান সময় বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া প্রজা ও জমীদারের মধ্যে জমি লইয়া বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। গভর্ণমেণ্টের বিবরণী অনুসারে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমার্দ্ধে প্রজা ও জমীদারের নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষার জন্য বিপুল সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইয়াছিল এরূপ প্রায় ৯০০ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৎসর বৎসর জমিবিষয়ক সঙ্ঘ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। গত সাত বৎসরে প্রজাগণ কিরূপ জমির কর দিত তার একটা তালিকা দেওয়া গেল। জলসেচনের জমির জন্য চাউল এবং আড়ৎ বাড়ীর জন্য মুদ্রা দেওয়া হইত।

জাপানী বাণিজ্য-সঙ্ঘের পুনর্গঠন

শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার জন্য শীঘ্রই জাপান হইতে বাণিজ্য ভবন উঠিয়া যাইবে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে বাণিজ্যের সঙ্ঘ আইনভুক্ত করা হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে জাপানে মোট ৭৯টী বাণিজ্যসঙ্ঘ আছে। ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও চীনে ১৬টী সঙ্ঘ বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে যে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য সঙ্ঘের অধীনে আছে তাহার অধিকাংশই এই নূতন ব্যবসা ও বাণিজ্য সঙ্ঘের অন্তর্গত হইবে। তবে ইহার কার্য্যপ্রণালীতে একটু বিভিন্নতা থাকিবে।

জাপানের চিনি

১৯২৬ খৃঃ অব্দে জাপান ও তাহার অধিকৃত স্থান-সমূহে মোট ৮,৩০৩,২৩৭ পিকুল চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। নিম্নে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল :—

ফরমোশা	৬,৮১৪,৫৮২	পিকুল
লুকু	৬৬৮,৭৫০	"
ডাইটো দ্বীপ	৮৭,৪০৫	"
কিউসু	১৭২,৫০০	"
হোক্কাতো	৩০০,০০০	"
সাইবান দ্বীপ	১৮০,০০০	"
অন্যান্য স্থান	৮০,০০০	"
মোট	৮,৩০৩,২৩৭	পিকুল

এই বৎসরে ১২,৬৭৪,৭৪০ পিকুল চিনির কাটতি হইয়াছিল এবং ইহা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৯৮৪,০০০ পিকুল বেশী।

দুনিয়ায় জাপানী জাহাজ

গত মহাযুদ্ধের পর জাপান সমুদ্রপোতে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এ বিষয়ে গ্রেট বৃটেন প্রথম স্থান এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১০০ টনের উপরে সমুদ্রপোতে কাহার অধিকার কিরূপ নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

	পোত	টন্ (১,০০০ টন)
গ্রেট বৃটেন	৯,৯২৩	২১,৯৫৫
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৩,৭১৮	১৩,৮২১
জাপান	২,০৮৭	৩,৯৬৮
ফ্রান্স	১,৪৯৮	৩,৩২৪
ইতালী	১,০৯৯	৩,১৫০
জার্ম্মাণি	১,৯২৮	৩,০৬২

যদি জাহাজের বয়স ও গতি লইয়া কথা উঠে, তবে জাপান তাহার তৃতীয় স্থান রাখিতে পারে কিনা দেখা যাউক। জাপানের সংবাদ-বিভাগের বিবরণ অনুসারে ১০০০ টনের উপর জাপানী জাহাজের বয়সের একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

বয়স				জাহাজ সংখ্যা	মোট টন (১০০০ টন)
৫ বৎসরের নিম্নে				৮৮	৩০৫
৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে				৪৩৭	১,৬১৩
১০	" ১৫	"	"	৭২	৩২৭
১৫	" ২০	"	"	৬১	২৬৭
২০	" ২৫	"	"	১০১	৩১৫
২৫	" ৩০	"	"	১০৬	৪২৬
৩০	" ৩৫	"	"	৪৭	১৪২
৩৫	" ৪০	"	"	৫১	১২৯
৪০ বৎসরের উর্দ্ধে				৩৯	৭৭
মোট				৯৯২	৩,৬০১

৫০০,০০০ টন জাহাজের মালিক গ্রেট বৃটেনে ৬টী কোম্পানী আছে, কিন্তু জাপানে এরূপ অবস্থায় কেবল মাত্র এন্, ওয়াই, কে কোম্পানীকে ফেলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব বৎসরে ৫০,০০০ টন যুক্ত ২,৩৬২৭ জাহাজে মোট ১৪,৪৮১,০০০ টন ছিল। কিন্তু মাত্র ৮টী কোম্পানীর ৫০,০০০ টনের উপর জাহাজ ছিল এবং তাহাদের মোট ১,৬৫১,০০০ টন সমেত মোট ৩৬৯টী জাহাজ ছিল।

জাপানী পুঁজির ইস্তাহার

মিট্সুই ব্যাঙ্কের অনুসন্ধান অনুসারে ১৯২৫-২৬ খৃঃ অব্দে জাপানের নূতন লাগান মূলধন মোট ১,৭৯৮,১৯৭,১০০ ইয়েন। ইহার মধ্যে ৬৮৫,৩৮৫,২০০ ইয়েন নূতন প্রতিষ্ঠানে এবং ১,১১২,৮১১,৯০০ বিস্তারের কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে। এই শেষোক্ত মোটের মধ্যে ঋণে ৪১৬,০৬০,০০০ লাগান আছে। বিভিন্ন কার্য্যে কিরূপে মূলধন লাগান হইয়াছে, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া গেল—

	নতুন কারবারে ইয়েন	বাড়তির কারবারে ইয়েন
ব্যাঙ্ক	১,৫০০,০০০	১৭৫,২৩৯,০০০
ট্রাষ্ট	৮১,৪৫০,০০০	৪১,৪৪০,০০০
রেল	৪৩,৭১০,০০০	২০২,২০৫,০০০
যানবাহন	২৮,৬০০,০০০	৩৩,৪৬৬,০০০
বীমা	—	—
গুদাম	৫,৮৫০,০০০	—
মাছধরা	৬,৭১০,০০০	১,১০০,০০০
বন ও কৃষি	২২,৯১০,০০০	১,০০০,০০০
খনি	৩০,৪৪০,০০০	৩,৯৫০,০০০
বিজলী	১৩৯,৪০০,০০০	২৬৬,৩৬৪,০০০
গ্যাস	৮০০,০০০	৬১,৭৫০,০০০
সূতাকাটা	৮,৮০০,০০০	১৭,৭৩০,০০০
খাওয়ার জিনিষ	১১,২৯৭,০০০	১৬,২৬০,০০০
যন্ত্রপাতি	২১,২২৪,০০০	১৪,৫২৩,০০০
বিবিধ	১২৮,৬৮৬,০০০	১৬২,৪৪৮,০০০
ব্যবসা	৬৫,৫৭০,০০০	৭,১৪০,০০০
অন্যান্য	৩৪,৪৩৭,০০০	১০৭,৯২৮,০০০



পাটের চাষ কমাইতে হইবে

১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ায়, কাঁচা পাটের দাম যথেষ্ট নামিয়া গিয়াছে। গত ১৮ মাস যাবৎ পাট চাষিগণ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অনেক ক্ষেত্রে পাট বিক্রয় করিয়া চাষের খরচাও তুলিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং যাহাতে চাষীদের অবস্থার উন্নতি এবং দুর্দ্দশার কতকটা লাঘব হয়, সেই জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। পাট চাষ কমাইয়া দেওয়াই ইহার একমাত্র প্রতীকার।

যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রায় ৮৪ লক্ষ গাঁট পাটের চাহিদা ছিল। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৯৫ লক্ষ গাঁট, ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৯৩ লক্ষ গাঁট এবং ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১ শত লক্ষ গাঁট পাট দরকার হইয়াছিল।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১ শত লক্ষ গাঁট পাটের চাহিদা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে যে পাট চাষ হইয়াছিল, তাহা হইতে ৯২ লক্ষ গাঁট পাট হইয়াছিল (ইহাই প্রকৃত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ), ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দেও প্রায় ঐরূপ অর্থাৎ প্রায় ৯২ লক্ষ গাঁট পাট হয়। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন পাট হইতে প্রায় ১২২ লক্ষ গাঁট পাট হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১০২ লক্ষ গাঁট পাটের চাহিদা হইবে অনুমান করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ উহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কাঁচা পাটের পাইকারী দর ৪ শত পাউণ্ডের (প্রায় ৫ মণ) গাঁটে গড়ে ৬৩ টাকা করিয়া ছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে উহার দর বাড়িয়া ৭১ টাকা ৮ আনা হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আরও দর চড়িয়া ১০৯ টাকায় দাঁড়ায়, কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দর হঠাৎ নামিয়া গিয়া ৮৪ টাকা হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আরও নামিয়া গিয়া ৬৫ টাকায় দাঁড়ায়। উপস্থিত দর প্রায় ৬০ টাকা।

বলা বাহুল্য যে, উপরের লিখিত দর চাষীরা পায় না,—দরিদ্র চাষারা প্রকৃত পক্ষে অনেক কম টাকা পায়। অনেক ক্ষেত্রে চাষের খরচ উঠিবার মত দরও তাহারা পায় না।

বর্ত্তমান ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে পাটের বাজারে ৪৯ লক্ষ গাঁট পাট উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহার মধ্যে ভারতের পাটকলসমূহে প্রায় ৩৫ লক্ষ গাঁট পাট উদ্বৃত্ত থাকিবে। মোট প্রায় ৫৬ লক্ষ গাঁট পাট দরকার হয়। সুতরাং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যদি পাটের চাষ কমান না হয়, তাহা হইলে চাহিদা অপেক্ষা বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। ফলে পাটের দর আরও পড়িয়া যাইবে।

সেই হেতু বাঙ্গালার পাটচাষ প্রধান জেলাসমূহের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে পাট চাষ কমানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চাষীদের ভিতর অবিলম্বে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর
সভাপতি।
১৯—৩—২৮।

কৃষক ও রায়ত সভা

২০ ফাল্গুন রবিবার হুগলী জিলার দত্তপুর গ্রামে ২০।২৫খানি গ্রামের প্রজাগণকে লইয়া শ্রীরামপুর লোক্যালবোর্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত ননীলাল শুক্কের সভাপতিত্বে

স্থানীয় কৃষক ও রায়ত সভা স্থাপন, জমীদারের অত্যাচার নিবারণ, অজন্মা ও জলকষ্টের প্রতিকার এবং সমবায় ব্যাঙ্ক, সিঞ্চন সমিতি আদি প্রতিষ্ঠার দ্বারা পল্লীগঠনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য একটি সভা হয়। কানানদী রায়ত-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত পদরত্ন ঘোষাল, চাঁপাডাঙ্গা ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন পান, শ্রীযুত কেশবচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সভার আবশ্যকতা ও উপকারিতার কথা বুঝাইয়া দেন এবং সভায় সমাগত সহস্রাধিক জনমণ্ডলী রামনগর ইউনিয়ান বোর্ডের দত্তপুর গ্রাম ও চাঁপাডাঙ্গা গ্রামে দুইটি শাখা সভা স্থাপনের মত স্থির করেন এবং কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

(বাংলার কথা)

অপরাধ-বিজ্ঞান ও সমাজ-সংস্কার

আমেরিকায় আজকাল অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন করা একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি হলে অপরাধীরা কু-অভ্যাস ত্যাগ করে—এ নিয়ে মনোবিজ্ঞান-বিৎগণ খুব গবেষণা করছেন। তাঁরা অপরাধকে আর অপরাধ না বলে "নৈতিক পাগলামো" বলে ঘোষণা করেছেন।

তাঁরা বলেন,—শুধু শাস্তি বিধান করলেই অপরাধীদের চরিত্র সংশোধিত হয় না। যদি কোন প্রকারে তাদের মনকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যায়—তবেই তাদের চরিত্র প্রকৃত সংশোধিত হতে পারে। তাই আজকাল ওদেশে অপরাধীদের চরিত্র-সংশোধন করবার ভার মনোবিজ্ঞান-বিৎগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতে তাদের চরিত্র সংশোধন করবার চেষ্টা করছেন।

কয়েদীদের মারপিটের পরিবর্ত্তে জেলের ভিতরে নানা রকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হচ্ছে। গীত, বাদ্য, বক্তৃতা, বায়স্কোপ প্রভৃতি নানা রকম আমোদজনক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তাদের মনকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একমাত্র মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন করা যেতে পারে—অন্য কিছুতে নয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান তাদের বিশিষ্ট বিভাগে সমাজ ও জগতের অসংখ্য কল্যাণ সাধন করছে—কিন্তু 'মনোবিজ্ঞান' এখনও সে রকম কিছু করে উঠ্‌তে পারেনি। মনোবিজ্ঞান যদি অপরাধীদের চরিত্র প্রকৃত সংশোধন করতে সমর্থ হয়, তবেই তার পূর্ণ সার্থকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌বে।

মনোবিজ্ঞানের যেমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে—তাতে আমাদের মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে কারাগৃহগুলি অপরাধীদের চিকিৎসাগারে পরিবর্ত্তিত হবে এবং মনোবিজ্ঞানবিৎগণ হিপনটিজম্ ইত্যাদি দ্বারা অপরাধীদের মনের ভাবধারাকে অন্যদিকে নিয়োজিত করবেন ও তাতে বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে।

অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন করবার ভার সাধারণতঃ বিচারকদের হাতেই থাকে। সুতরাং বিচারকদের লোক-চরিত্রের জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট যদি বিচারকদের মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন তবে জগতের বাস্তবিক কল্যাণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আজকাল আমেরিকায় অপরাধীদের দণ্ডকাল শেষ হবার পূর্ব্বেই তাদের মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। এ মুক্তি দেবার অধিকার মনোবিজ্ঞানবিৎগণের হাতে ন্যস্ত আছে। তারা যদি মনে করেন—দোষীর চরিত্র শুধ্‌রে গেছে তবে সরকারী কোন কর্ম্মচারীর অধীনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই কর্ম্মচারী অপরাধীর সম্বন্ধে প্রতি মাসে রিপোর্ট দাখিল করেন। সেই রিপোর্টে যদি দেখা যায় তখনও দোষীর চরিত্র সম্যকরূপে সংশোধিত হয়নি তাহলে তাকে আবার কারাগৃহে নিয়ে আসা হয়। এই ভাবে ক্রমশঃ তাদের দোষ একেবারে শুধ্‌রে যায়। একে "প্যারোল" প্রথা বলে।

১৯২৫ সালের সরকারী রিপোর্টে জানা গেছে—আমেরিকায় এই ধারা প্রবর্ত্তন করে আর্থিক ও নৈতিক খুবই উন্নতি হয়েছে। ১৯২৫ সালে পাঁচ হাজার কয়েদীর উপর এই ধারা প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল। এদের প্রত্যেকেরই

দোষ শুধরে গেছে, তা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের একলক্ষ ডলারের উপর লাভ হয়েছে।

আশা করি শীগ্‌গিরই সমগ্র পৃথিবী আমেরিকার পথ অনুসরণ করে জগতের বাস্তবিক কল্যাণ সাধন করবেন।

শ্রীজিতেন দাসগুপ্ত (বাংলার কথা)

স্বাস্থ্য-চর্চ্চায় শ্রীশ্যামাদাস বাচস্পতি

শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় ১ নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে গত বৃহস্পতিবার একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেকার যুগে যখন অকালমৃত্যু ছিল না, তখনকার স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল জীবন যাপন প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া হিউয়েন সাং, মেগাস্থিনিস, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বাল্যকাল পর্য্যন্ত দেশের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল তাহার দৃষ্টান্ত দেখান। প্রধানভাবে তিনি দারিদ্র্য ও খাদ্যের রপ্তানি নিবন্ধন খাদ্য ও পরিধেয়াভাব, বিদেশী ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও ঐ রূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজের অনুকরণে অশিক্ষিতদের মধ্যে নানারূপ কদর্য্য ও উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপন, পল্লীর নদনদী ও কূপ তড়াগাদির রক্ষা ও বর্দ্ধনে গবর্ণমেণ্টের যথাযথ যত্নের অভাব ও যে ধর্ম্মবুদ্ধির ফলে লোক জলাশয় আদি প্রতিষ্ঠা করিত তাহার ন্যূনতাই সাধারণ স্বাস্থ্যহানির ও মড়কাদির প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করেন। রোগবৃদ্ধির কারণ আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন, যে সব প্রথায় এদেশে পূর্ব্বপুরুষদের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকিত সে সব প্রথা, যেমন দাঁতন করা, তেল মাখা প্রভৃতি বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ অসভ্যোচিত বলিয়া ঘৃণা করায় ও উঠাইয়া দেওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করার ফলে আজ দাঁতের রোগ, চোখের রোগ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগের এত বাড়াবাড়ি। যে সমস্ত কারণে রাজযক্ষা, মধুমেহ প্রভৃতি হয় তাহার সবগুলি বর্ত্তমান সমাজে সম্পূর্ণভাবে চলিতেছে। শিশুমৃত্যুর কারণ ও প্রসূতির রোগ ও মৃত্যুর কারণ যে অসদাচার তাহাও তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। সবশেষে তিনি ১নং ওয়ার্ডের বস্তি-সমস্যা, কলসমূহ থাকার জন্য ধূম-সমস্যা, ড্রেন-সমস্যা, রাস্তার পরিচ্ছন্নতা, বেলেঘাটার খাল পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও তজ্জন্য কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সর্ব্বোপরি ১নং ওয়ার্ডের যুবকগণের এই সব কার্য্যের অগ্রসরতার উল্লেখ করিয়া ভেজাল দ্রব্য তাড়াইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে বলেন। প্রত্যেক পাড়াই সেই পাড়ার লোকদের মূলধন লইয়া সমবায় প্রথানুসারে দুগ্ধ ঘৃত তৈল মৎস্য চাউল প্রভৃতি প্রধান খাদ্যদ্রব্য-সংক্রান্ত ব্যবসায় অগ্রসর হইতে বলেন।

ল্যাঙ্কাশায়ারে আতঙ্ক

ভারতে বিলাতী কাপড়ের চাহিদা কমিয়াছে। ফলে, সারা ইংলণ্ডে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। ভারতে বিলাতী পণ্য কেমন কাটিতেছে, তাহার প্রতি নজর রাখিবার জন্য ট্রেড কমিশনার আছেন। তিনি প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ভারতের ও সিংহলের বিলাতী বেসাতির হিসাব-নিকাশ পাঠাইয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি ১৯২৬-২৭ সালের যে হিসাব পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড়ের চাহিদা দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, তাঁহার মতে, ভারতে জাপানী ও মার্কিণ পণ্যের প্রচারবাহুল্য। সিনিয়র ট্রেড কমিশনার এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ উক্তি করিয়াছেন।

ল্যাঙ্কাশায়ারের অর্থাৎ বিলাতী কাপড়ের দর বাড়িয়াছে, কিন্তু ভারতের বাজার এখনও এত বেশীদরে কাপড় লইতে প্রস্তুত হয় নাই। ভারতের অধিবাসী সস্তা বিদেশী মালের দিকেই দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ভারতের বাজারে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ক্রমেই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। সেই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা এবং জাপান লাভবান হইতেছে; পরন্তু ল্যাঙ্কাশায়ার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেছে। শেষে এই ট্রেড কমিশনার ভারতের নানাস্থানে বিলাতী মাল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বিলাতের কাপড়ওয়ালাদিগকে আফিস খুলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কলিকাতার এক কাপড়ের ব্যবসায়ী বলেন,—"কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধিই, কাপড়ের চাহিদা হ্রাসের একমাত্র কারণ। পূর্ব্বে

যাহারা বৎসরে ছয়খানা কাপড় কিনিত, এখন তাহারা দুই খানায় কোন রকমে চালাইয়া লইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক জোড়া কাপড়ের মূল্য ছিল ২৲ টাকা কি তাহারও কম। এখন তাহার স্থানে একজোড়ার মূল্য হইয়াছে ৩৲ টাকা কি তাহারও উপর। জামার কাপড়ও ভারতে এখন খুব কম কাটিতেছে। ফলে, ভারত হইতে ল্যাঙ্কাশায়ারে অর্ডার যাইতেছেও খুব কম। ১৯২০ সাল হইতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের দর চড়িয়া গিয়াছে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে কিছু কমিয়াছিল; কিন্তু আবার বেশ চড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতের জন্য যে কোরা, ধোঁয়া ও ছিটের কাপড় তৈয়ারী করিয়া থাকে, তাহার তূলা ও সূতা খরিদ করে আমেরিকা হইতে। কাজেই ল্যাঙ্কাশায়ারের বাজার আমেরিকার হাতে। মিশর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতেও তূলা এবং সূতা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সব সাধারণতঃ মিহি কাপড়ের জন্য। তূলার ও সূতার দর হইতেই কাপড়ের দরের হার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জাপানের প্রতিযোগিতাও কাপড়ের দর বৃদ্ধির একটা বিশেষ কারণ। বোম্বাই এবং আমেদাবাদের কলে যে কাপড় তৈয়ারী হইতেছে, তাহাতেও ল্যাঙ্কাশায়ারের কিছু যে ক্ষতি করে নাই তাহা নহে। খদ্দরের জন্য অবশ্য কিছুই ক্ষতি হয় নাই। কারণ খদ্দর খুব কম লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের দর যদি না কমে, তবে ভারতে আর তাহার বেশী কাটতির কোন আশা ভরসাই নাই।" বৃটিশ ট্রেড কমিশনারও ঠিক এই সব কথাই তাঁহার রিপোর্টে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি শেষে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—যদি ভারতের বাজার রাখিতে হয় তাহা হইলে বিলাতী কাপড়ের কলের মালিকদের আর নিশ্চেষ্ট হইয়া বিলাতে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা ভারতে আসিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া এখানকার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করুন এবং যাহাতে আবার বিলাতের কাপড় ভারতের বাজারে সাদরে বিক্রীত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন। ট্রেড কমিশনার ভরসা দিয়াছেন—কেবল দর সস্তা করিতে পারিলেই বিলাতী কাপড়ের মহাজনেরা ভারতের বাজারে বাজীমাৎ করিতে পারিবেন। (ত্রিপুরা হিতৈষী)

বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃষি-শাখা

রায় বাহাদুর টি, এস, বেঙ্কটরমণ বিজ্ঞান কংগ্রেসে কৃষি-শাখায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতীয় ইক্ষু চিনি এবং কৃষি-বিষয়ক গবেষণা। তিনি বলেন, ভারতে ইক্ষুজাত দ্রব্য প্রধানতঃ গুড় রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতে পরিষ্কৃত চিনির ব্যবহারও যথেষ্ট। ভারতে পরিষ্কৃত চিনি যত ব্যবহার হয়, তাহার শতকরা ৮৫ অংশ বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। সেজন্য আমাদিগকে প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকা প্রদান করিতে হয়।

বিদেশ হইতে এই পরিষ্কৃত চিনি আমদানি হওয়ার ফলে দেশের প্রচুর অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। উহার ফলে দেশে ইক্ষুর চাষ এবং তজ্জাত শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এমন কি উহার ফলে দেশ হইতে ইক্ষু শিল্পের লোপ হইবারও সম্ভাবনা। এক্ষণে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, ভারতই ইক্ষুর প্রকৃত জন্মস্থান। খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে যে সকল লোক এদেশে আগমন করিত তাঁহারা ইক্ষু দেখিয়া উহাকে একটা অদ্ভুত পদার্থ মনে করিত। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ইক্ষু দেখিয়া উহার "মধুযষ্টি" নাম দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, ইহা মধুমক্ষিকার সাহায্য ব্যতীতও মধু উৎপাদন করে।

অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন বলেন, কাঠের গুঁড়া হইতে "এলকোহল" এবং বিলাতী পানা হইতে পোটাসিয়াম ক্লোরাইড, স্পিরিট এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পদার্থ নিষ্কাসিত হইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন যে ১ টন গেঁও কাঠের গুঁড়ায় ৩০-৪০ গ্যালন বিশুদ্ধ এলকোহল প্রস্তুত হইতে পারে। এই গেঁও কাঠ সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। মাত্র কয়েকটি কাঠের কল হইতে কলিকাতায় প্রত্যহ অন্যূনপক্ষে ১০০টন গুঁড়া সরবরাহ হইতে পারে। ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারীর সাহায্যে সহরে একটী ভাটী বা চোঁয়াইবার কারখানা হইতেছে। প্রতি গ্যালন এলকোহল প্রস্তুতে সাড়ে ছয় আনা খরচ।

টিন সোনা রূপার দরে বিকাইবে

লর্ড অ্যাসকুইথ বলিতেছেন "রূপার চাইতে টিন মানুষের নিকট বেশী মূল্যবান এবং সোনার চাইতে ইহা বেশী দরকারী। বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে টিন সোনা ও রূপার ন্যায় দামী হইবে। ইনি বর্ত্তমান জগতের টিনের অবস্থা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। ইনি বলেন, দুনিয়ায় টিন উৎপাদন সীমাবদ্ধ ভাবে চলিতেছে। বর্ত্তমানে যে হারে টিন উৎপাদন করা হইতেছে তাহা হইতে উৎপাদনের হার আর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় আমরা প্রতি বৎসর দেড় লক্ষ টন টিন ব্যবহার করিতেছি এবং ইহা আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। জগতে যত টিন উৎপাদন করা হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধেক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র খরচ করে। গত সনে এইজন্য আমেরিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ২ কোটি পাউণ্ড মূল্য দিয়াছিল। বাজারে টিনের চাহিদা শতকরা ৮১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু অন্যদিকে টিন উৎপাদন মাত্র শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জগতের উৎপন্ন টিনের শতকরা ৪২ ভাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে উৎপাদন করা হয়। ভবিষ্যতেও যাহাতে দুনিয়ার টিন সরবরাহের ভার বৃটিশ সাম্রাজ্যের হাতে থাকে সেজন্য ইনি সকল টিন উৎপাদনকারী বৃটিশ কারখানা ও টিন গলান কারখানাগুলিকে একটা ট্রাষ্টে পরিণত করিবার উপদেশ দিতেছেন। এই টিন ট্রাষ্ট স্থাপনের ফলে তাঁহারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান কর্ম্মের সংস্পর্শে আসিবেন। কো-অপারেটিভ বা সমবায় প্রণালীতে টিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেও ঐ উদ্দেশ্য সফল হইবে।

গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতি

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি স্যর ফিরোজ সেথনা উক্ত ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"কারেন্সি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের অন্যায় ব্যবহারের ফলে বোম্বাইএর বস্ত্র-শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ নূতন বাট্টার হার নির্দ্দিষ্ট করার পর হইতে উহা বজায় রাখিবার জন্য নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতেছেন; কিন্তু উহা সত্ত্বেও বাট্টার হার নামিয়া যাইতেছে। এই কারণে বৎসরের যে সময় বাট্টার হার সব চেয়ে বেশী হওয়ার কথা সেই সময়েও উহা অনেক নামিয়া গিয়াছে।

"বোম্বাইএর কলওয়ালাদের রক্ষা করিবার জন্য টারিফবোর্ড যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করেন নাই। তবে অনেক উপরোধে পড়িয়া বড়লাট সূতার উপর কিছু রক্ষণ-শুল্ক বসাইয়াছেন।"

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে মিঃ সেথনা বলেন যে, বর্ত্তমানে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল না, তখন দেশী ব্যাঙ্কগুলির রক্ষা কল্পে ও সেগুলির উন্নতিবিধানের জন্য সরকারের একটা স্থায়ী কমিটী নিয়োগ করা উচিত এবং জন-সাধারণ যাহাতে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া আধুনিক উপায়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

কৃষি ব্যাঙ্ক

অবশেষে তিনি বলেন যে, কৃষি কমিশন তাহাদের রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিতেছেন। বর্ত্তমানে দেশের মহাজনগণ শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা হারে সুদ লইয়া থাকেন। উহাতে দেশের মেরুদণ্ড কৃষককুলের সর্ব্বনাশ হইতেছে। উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার অনুসরণে কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং কৃষকগণ যাহাতে জমির ফসল বন্ধক রাখিয়া অসময়ে ঋণ না লইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। দেশে ব্যাঙ্কের প্রসার হইলে গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা লোকের ব্যাঙ্কের সাহায্যে টাকা আদান-প্রদানের অভ্যাস হইলে গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাম্পকর বাবদ বহু টাকা পাইবেন।

হাওড়ায় শ্রমিক চাঞ্চল্য

(১)

কিছুদিন আগে লিলুয়ায় ই, আই, রেলওয়ের কারখানার দুইজন শ্রমিককে বরখাস্ত করায় কারখানার সমস্ত শ্রমিক

ধর্ম্মঘট করে। কর্ত্তৃপক্ষও কারখানা বন্ধ করিয়া দেন। শ্রমিকেরা এখন এই দুইজনকে পুনরায় কার্য্যে গ্রহণ করিতে দাবী করিয়া তাহাদের মাহিয়ানা বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। ই, আই, রেলওয়ের এজেন্ট এ সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য করায় হাওড়ার অন্য সমস্ত কারখানার শ্রমিকরাও ইহাদের সহিত যোগ দিয়া ধর্ম্মঘট করিবে ঠিক করিয়াছে।

হাওড়া মাঠে শ্রমিকদের এক বিরাট জনসভা হইয়াছিল। হাওড়ার সমস্ত রেলওয়ে কারখানা, মিল, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি হইতে প্রায় হাজার শ্রমিক তাহাতে যোগ দেয়। ই, আই, রেলওয়ে ইউনিয়নের সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুত দেবকী প্রসাদ সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতি ও অন্যান্য বক্তারা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের বিশেষ নিন্দা করিয়া বলেন, তাঁহারা অন্যায় করিয়া দুইজন শ্রমিককে বরখাস্ত করিয়া এই অবস্থা ডাকিয়া আনিয়াছেন। লিলুয়া কারখানার শ্রমিকেরা এই জন্যই ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

সভার প্রস্তাব

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই সভায় হাওড়ার সমস্ত কারখানা ইত্যাদির শ্রমিকেরা লিলুয়ার রেলওয়ে কারখানা বন্ধ ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছে। ই, আই, রেলওয়ের শ্রমিকেরা তাহাদের দুইজন অন্যায়ভাবে বরখাস্ত সহকর্ম্মীকে পুনরায় কাজে লইবার জন্য ও শতকরা অন্ততঃ ২৫৲ টাকা হিসাবে তাহাদের মাহিয়ানা বাড়াইবার জন্য যে ন্যায্য প্রস্তাব করিয়াছে তাহা সমর্থন করিয়া এই সভা জানাইতেছে যে, দশদিনের মধ্যে সে ন্যায্য দাবী না মিটাইলে হাওড়ার সমস্ত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিবে।

পূর্ব্বদিন রাত্রে ই, আই রেলওয়ের এজেন্ট মিঃ কলভিন্ ইউনিয়ানের সভাপতির টেলিগ্রামের উত্তরে তাঁহাকে, ইউনিয়ানের সেক্রেটারী ও একজন শ্রমিক প্রতিনিধিকে লইয়া সোমবার বেলা ১২টার সময় তাঁহার কলিকাতার আফিসে দেখা করিতে বলেন। ইউনিয়ানের কর্ম্মচারীরা শ্রমিকদের ইচ্ছা জানিবার জন্য সকাল ৮টায় লিলুয়া মাঠে একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় শ্রমিকেরা এই সমস্ত দাবী উপস্থিত করেন :—

শ্রমিকদের দাবী

(১) যে দুইজন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছে, তাহাদের পুনর্ব্বার কাজে লইতে হইবে। (২) কারখানা বন্ধের সময়কার মাহিয়ানা দিতে হইবে। (৩) এখন হইতে ৩০৲ টাকার নীচে আর মাহিয়ানা থাকিবে না এবং সকলের শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে মাহিয়ানা বাড়াইতে হইবে। (৪) ইউনিয়নকে কর্ত্তৃপক্ষ এখন হইতে মানিয়া লইবেন। (৫) শ্রমিকদের থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে তাহাদের মাহিয়ানার শতকরা ২০ ভাগ টাকা বাড়ীভাড়ার বাবদ অতিরিক্ত দিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ এ সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

(২)

শ্রীদেবকী প্রসাদ সিংহের বক্তব্য

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত দেবকী প্রসাদ সিংহ ফ্রি প্রেসের প্রতিনিধির কাছে বলেন, হাওড়ার শ্রমিকদের দাবী ও অভিপ্রায় লইয়া ই, আই, রেলওয়ের এজেণ্ট মিঃ কলভিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, মিঃ কলভিন্ ইউনিয়ানকে স্বীকার করা ছাড়া শ্রমিকদের কোন দাবীতে কর্ণপাত করিতে চাহেন না। যে দুইজন বরখাস্ত শ্রমিককে কাজে লইবার কথা বলা হইতেছে তাহাদের কথা তিনি আলোচনা করিতে চাহেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুটি শ্রমিককে দাঙ্গা করার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, তাহারা দু'জনেই বলিতেছে যে, তাহারা মোটেই মারামারি করে নাই। অন্যান্য শ্রমিকরাও বলিতেছে যে, একটি ছোট দরজার ভিতর দিয়া লোক প্রবেশ করিতে যাওয়ায় ধাক্কাধাক্কি হইয়া ঐ দুইজন শ্রমিক পড়িয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ কাহারও কাছে সংবাদ না লইয়া নিজের মতে হঠাৎ ইহাদের বরখাস্ত করিয়া বসেন। এখন একবার ইহারা মারামারি করিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে ভাল করিয়া

তদন্ত করিলে কোন ক্ষতিই হইতে পারে না। কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু তাহা করিতে গররাজী।

মাহিয়ানা বাড়ান বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, তাঁহারা তদন্ত করিয়া ব্যাপার জানিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করিবেন না। কলিকাতার কারখানা ইত্যাদি লিলুয়ার অপেক্ষা মাহিয়ানা বেশী বা কম দেয় জানিবার জন্য এখনই নাকি তদন্ত করা হইতেছে। কিন্তু এরূপ ভাবে তদন্ত করার শ্রমিকেরা বিরোধী। কলিকাতায় কোন লোক কম মাহিয়ানায় শ্রমিকদের খাটায় বলিয়া রাষ্ট্র পরিচালিত রেলওয়েও তাহাই করিবেন একথা যুক্তিযুক্ত নয়। শ্রমিকেরা অন্যায় দাবী করে নাই। তাহারা বলিতেছে যে, লিলুয়া, জামালপুর, ও লক্ষ্ণৌর শ্রমিকদের মনিব এক। তবে তাহাদের মাহিয়ানায় পার্থক্য হওয়ার কারণ কি? বরং ঐ সকল স্থানের তুলনায় লিলুয়ার শ্রমিকদের মাহিয়ানা বেশী হওয়া উচিত, কারণ লিলুয়ায় খরচ বেশী পড়ে।

ইউনিয়ানকে এজেন্ট স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ সামান্য ব্যাপার। ইহাতে আপাততঃ কিছুই আসিয়া যাইতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষ আসল কথায় কাণ যতক্ষণ না দিতেছেন ততক্ষণ শ্রমিকদের আন্দোলন চালান ছাড়া কোন উপায় নাই।

পরিশেষে শ্রীদেবকীপ্রসাদ বলেন শ্রমিকদের দাবী যে অন্যায় নয় তাহা জনসাধারণ বুঝিয়াছেন আশা করা যায়। কর্ত্তৃপক্ষের উৎকট লাভের লোভ হইতেই এই গণ্ডগোল বাধিয়াছে।

(৩)

ই, আই, আর শ্রমিকসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কে, সি, মিত্র জানাইতেছেন :—

সিগন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ষ্টাফের প্রায় ৪০০ শ্রমিক অদ্য (২২শে মার্চ্চ) সত্যাগ্রহ করিয়াছে। সর্ব্বত্র শ্রমিকগণ শান্তিপূর্ণ ভাবে অবস্থান করিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়, শ্রমিকগণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। ২১শে মার্চ্চ হাওড়াতে আই, কে, আর ষ্টাফের সাতটি কোয়ার্টার গবর্ণমেণ্ট পুলিশ কর্ত্তৃক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ঐ সকল কোয়ার্টারের অধিবাসী শ্রমিকগণ সেই হইতে না খাইয়া আশ্রয়হীন হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ ভাবের প্ররোচনা ও ভীতিপ্রদর্শনের ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে শান্তিভঙ্গ ঘটিতে পারে।

প্রকাশ, জেনারাল ষ্টোর্সের যে সকল শ্রমিকের কাজ বন্ধ রাখা হইয়াছে, তাহাদের স্থলে একটি ইউরোপীয় কোম্পানী কর্ত্তৃক শ্রমিক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। লিলুয়া কারখানা হইতে যে ৩০০ চীনা শ্রমিকের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, অদ্য তাহাদিগকে হাওড়াতে আই, কে, আর, ষ্টাফের স্থলে নিযুক্ত করা হইয়াছে; ইহার ফলে হাওড়া ও লিলুয়ার শ্রমিকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইউনিয়ানের কর্ম্মচারিগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যথাসময়ে ব্যবস্থা হাতে লওয়ায় অবস্থা শৃঙ্খলার অধীন আছে এবং সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে।

হাওড়া ময়দানে সভা

অদ্য (২২শে মার্চ্চ) সকালে হাওড়া ময়দানে একটি বিরাট সভা হইয়াছিল। তাহাতে লিলুয়া কারখানার যে ব্যয়হ্রাস নীতি অবলম্বিত হইবার কথা হইতেছে, তাহার নিন্দা করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এই সভা জোরের সহিত বলিতেছেন যে, ই, আই, রেলওয়ে কারখানার ব্যয়হ্রাস সম্পর্কে ভারতসরকারের ইস্তাহারটী অশুভ প্রতিহিংসামূলক এবং ক্ষতিকর। এই সভা বলিতেছেন যে, লিলুয়া কারখানার শ্রমিক কমাইবার সম্পর্কে রেলকর্ত্তৃপক্ষের নীতিটী দুষ্ট এবং এই সভা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, লিলুয়ার বর্ত্তমান অবস্থার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা শ্রমিকগণ ও রেল কর্ত্তৃপক্ষ উভয়ের স্বার্থের খাতিরে ব্যয়হ্রাস সম্পর্কে তদন্তে অগ্রসর না হন, কারণ এই সভার মতে সরকার ঐরূপ করিলে বর্ত্তমান অবস্থা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইবে এবং শ্রমিকদিগের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

এই সভা আরও ঘোষণা করিতেছেন, এবং সকল রেলওয়ের কারখানার শ্রমিকগণকে অনুরোধ করিতেছেন

যে, যদি এই সঙ্কট সময়ে রোজারস কমিটি প্রেরিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যেন তাহা বয়কট করেন। এই সভা সকল ভারতীয় রেলওয়ের শ্রমিকগণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারা এই ব্যয়হ্রাস নীতিটিকে চিরতরে রোধ করিয়া দিবার জন্য উপায় অবলম্বন করুন।

(৪)

শিবপুর শ্রমিকদের সভা

হাওড়া, ২২শে মার্চ্চ

গত বুধবার আন্দুলরাজ মন্দিরের বিপরীত দিকস্থ ময়দানে শিবপুর ও অন্যান্য মিলের প্রায় তিন হাজার শ্রমিকের এক বিরাট সভা হয়। সভায় লিলুয়ার শ্রমিকদিগের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয় এবং রেলকর্তৃপক্ষদের ব্যবহারের নিন্দা করা হয়।

হাওড়া মেটাল ওয়ার্কস ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি ডাঃ এস, কে, বসু শ্রমিকদিগের সমক্ষে ইউনিয়ান গঠনের উপযোগিতা, ইউনিয়ান-সমূহের মারফতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রচার এবং মনিবদের সমক্ষে মিলিতভাবে দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। লিলুয়ার কারখানা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, লিলুয়ার ১৪০০০ শ্রমিকের দুর্দ্দশা সম্পর্কে সরকার ও রেলকর্তৃপক্ষ যে উদাসীন থাকিবেন, তাহাতে তিনি মোটেই আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই। তিনি শ্রমিকদিগকে বলেন যে, তাহারা তাহাদের শ্রমিকসঙ্ঘের মারফতে কর্তৃপক্ষের উপরে চাপ দিতে থাকুন।

সভায় শ্রীযুক্ত সিঙ্গারাভেলু, কে, সি, মিত্র, মুকুন্দলাল সরকার, সুরেশচন্দ্র চাটার্জ্জী এবং ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী বক্তৃতা করেন। সভায় নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

শিবপুরের শ্রমিকগণ এই সভায় সমবেত হইয়া লিলুয়ার শ্রমিকদিগের সাহসিক প্রচেষ্টার প্রতি তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন এবং রেলকর্তৃপক্ষ এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া ১৪০০০ শ্রমিককে বেকার করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যের নিন্দা করিতেছেন, এই সভা গবর্ণমেণ্ট ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করিয়া ফেলুন।

চাঁদপুরে সমবায় ব্যাঙ্ক

বিগত ৮ই মার্চ্চ প্রাতে ১০ টার সময় কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রার রায় জে, এম, মিত্র বাহাদুরের পত্নী চাঁদপুর কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দালানের ভিত্তি স্থাপন করেন। অপরাহ্নে সস্ত্রীক মিত্র বাহাদুরকে এক সান্ধ্য সম্মিলনে কোঅপরেটিভ ডিপার্টমেণ্টের লোকগণ আপ্যায়িত করিয়াছেন।

কৃষক ও শ্রমিকদলের বার্ষিক অধিবেশন

আগামী ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল তারিখে ভাটপাড়াতে (ই, বি, রেলের কাঁকিনাড়া ষ্টেশনের নিকট, কলিকাতা হইতে ২২ মাইল) বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদিগের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

আলোচ্য বিষয়—(১) কার্য্যকারী সমিতির রিপোর্ট (২) নিম্নলিখিত বিষয়ক প্রস্তাব (ক) রাজনৈতিক অবস্থা (খ) ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন (গ) কৃষক আন্দোলন (ঘ) সঙ্ঘ গঠন (ঙ) বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন (চ) যুবক আন্দোলন (ছ) অন্যান্য (৩) কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন (৪) অন্যান্য।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত,
সভাপতি।

"রিলিফ" ও খাদি কার্য্য

"বঙ্গীয় রিলিফ কমিটী"র নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাহার বর্ত্তমান কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব। বঙ্গের বিবিধ প্রধান গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম। ১৩২৯ সনে উত্তরবঙ্গ প্লাবনে এই কমিটির অবতারণা হয়। প্রথমাবস্থায় নানারূপ দাতব্যসাহায্যান্তে রাজসাহী জেলায় আত্রাই প্রধান কেন্দ্র করিয়া রাজসাহী ও বগুড়া জেলার বিবিধ কেন্দ্র হইতে স্থায়ী ভাবে দুঃস্থ গ্রামবাসীদের সাহায্যার্থ

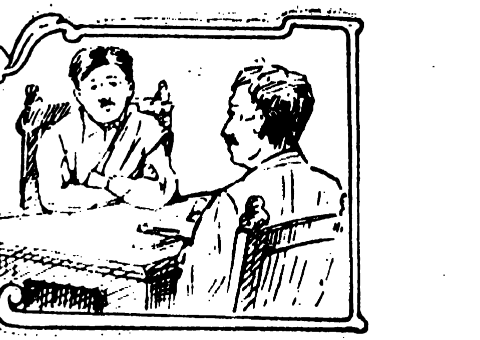
খাদি ও চিকিৎসা কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়। গত ৫ বৎসর যাবৎ এই কাজ কতিপয় একনিষ্ঠ দেশ-সেবক কর্ম্মীর সাহায্যে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমানে খাদি স্বরাজ-সংগ্রাম এবং সংগঠন-কার্য্যের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। "বঙ্গীয় রিলিফ কমিটী" হইতেই বঙ্গদেশে 'বিস্তৃতভাবে' এই খাদি কার্য্যের সূত্রপাত হয়। বহু অর্থব্যয়ে উক্ত কমিটি বঙ্গদেশে খাদির বিশেষ উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালার এই 'রিলিফের' সূতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাধারণ ২০।২৫ নম্বর পর্য্যন্ত চরকার সূতার বয়নের ব্যবস্থা আত্রাই ও শাণ্ডাহারে হইতেছে। তদূর্দ্ধ ৮০ নম্বর পর্য্যন্ত চরকার সূতা এই স্থানে হইয়া থাকে। তাহা ঢাকায় বয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত বস্ত্র রিলিফের প্রধান কেন্দ্র আত্রাই এবং "খাদি প্রতিষ্ঠানের" কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্তব্য এবং দ্রষ্টব্য। ইহার জন্য শ্রেষ্ঠ ক্যাম্বোডিয়া তুলা ব্যবহৃত হয়। আজকাল উৎকৃষ্ট এবং সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বস্ত্রাদি পাইবার সুযোগ 'রিলিফ কমিটী' করিয়াছে।

গত এক বৎসরে উক্ত কমিটী হইতে মোট প্রায় ৩৩/ মণ সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই প্রায় ২০ নম্বরের সূতা। রাজসাহী ও বগুড়ার মোট ৭টি কেন্দ্র হইতে মাত্র ১৪ জন কর্ম্মী দ্বারা এই কমিটির সমস্ত কার্য্যই সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতেছে।

এখানে আরও একটি বিষয়ে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাঁহারা নিজেরা চরকা ব্যবহার করেন, পূর্ব্বে নিজ সূতায় বস্ত্র বয়ন করান পক্ষে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা-ভোগ করিতে হইত। এখন তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। চরকা কাটা সূতা আত্রাই বঙ্গীয় রিলিফ কমিটীতে প্রেরণ করিলেই বস্ত্র বয়ন করাইয়া দেওয়া যায়। সূতার নম্বর অনুযায়ী এক জোড়া ১০ হাত বস্ত্রের জন্য /১ হইতে /১॥০ পর্য্যন্ত সূতা প্রয়োজন হয়। অন্যান্য বিষয় কমিটীতে পত্র দিলেই জ্ঞাত হইবেন।

আত্রাইতে কমিটীর একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। এই চিকিৎসালয়ে গত বৎসর প্রায় ৩,৫০০ নূতন এবং ১০,০০০ পুরাতন—মোট প্রায় ১৩,৫০০ রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। ইহার মধ্যে জ্বর ও পেটের অসুখই অধিকাংশ। ২০০ কালাজ্বর এবং অন্যান্য সকল প্রকার রোগীও চিকিৎসিত হইয়াছে। কয়েকটি সাধারণ অস্ত্রোপচারও হইয়াছে।

মোলাকাৎ



বঙ্গদেশের চাষ ও গো-পালন

[আমার সঙ্গে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের বাংলার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তারই একভাগের সারমর্ম্ম নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। অন্য ভাগের সার পরে প্রকাশিত হইবে।—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—আমাদের দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। আপনি প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিয়াছেন কি?

উঃ—আমি এ লইয়া কিছু চিন্তা করিয়াছি বটে। কিন্তু সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ হয় নাই। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের আর্থিক উন্নতির একটা বড় অন্তরায় হইতেছে, আমাদের জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অভাব।

প্রঃ—শিক্ষার অভাবটাকে আপনি এত বড় করিয়া দেখিতেছেন কেন?

উঃ—আপনি মনে রাখিবেন যে, আমি শিক্ষার অভাবটাকে একমাত্র অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিতেছি না। অন্যান্য অন্তরায়ও আছে। কিন্তু আমার কথা এই যে, চাষী যদি নিরক্ষর হয়, তার স্বার্থ সম্পৃর্কীয় অনেক জিনিষ সহজে বুঝা বা চালানো তার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয় না। এই উন্নতির প্রচেষ্টা সরকার হইতেই হোক্ বা দেশী প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধানে হোক্ তাতে কিছু আসে যায় না। প্রথমতঃ তাদের জন্য কোন উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে, তারা হয়ত সন্দেহের চোখে দেখিবে। সন্দেহের কারণটা যে অমূলক তাদের তা বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ কৃষির উন্নতির কথাটা সহজে সকলের মধ্যে প্রচার করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে ঐ বিষয়ে পুস্তিকা ইত্যাদির প্রচার করা, সেগুলি চাষীদের মধ্যে যথারীতি বিতরণ করা। কিন্তু যাদের জন্য এসব বই লেখা হইবে ও যাদের মধ্যে এগুলি বিতরণ করা অত্যন্ত দরকার, তারাই যদি অজ্ঞ হয়, তবে আর কেমন করিয়া আশা করা যাইতে পারে যে দেশের চাষীরা অবিলম্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ সুরু করিয়া দিবে বা চাষের উন্নতি সাধন করিবে?

প্রঃ—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে শিক্ষা ছাড়া এ সব সম্ভব নয়? চাষীকে তার উন্নত চাষ-প্রণালীর কথা, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কথা ইত্যাদি মুখে মুখে বলিয়া দেওয়া চলে না কি?

উঃ—আমি এমন কথা বলিতেছি না যে চলে না। কিন্তু শিক্ষা পাইলে যত তাড়াতাড়ি ও যত বেশী সুফল ফলে, অন্যথা তত সুফল ফলিবার সম্ভাবনা হয় না। আমাদের চাষীরা তাদের বহুদিন পোষিত সংস্কারসমূহ সহজে ত্যাগ করিতে চায় না। সমবায় প্রণালীর কথাই বলি, বা যন্ত্রপাতি ও বীজাদি কাঁচামালের উৎকর্ষ সাধনের কথাই বলি, চাষীরা সহজে নূতন পথে আসিতে চায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় তাদের বুঝাইয়া দেওয়াও সহজ নয়। বহু লোকে বহু স্থানে অনেক পরিশ্রম করিয়া কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। তাহা সময় সাপেক্ষ।

প্রঃ—আমাদের দেশের চাষীরা শিক্ষিত হইলে পাশ্চাত্য

চাষীদের সমকক্ষ হইতে পারিবে বলিয়া মনে করেন কি ?

উঃ—আমাদের কৃষকদের যদি কিঞ্চিৎ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে রকম অভাবনীয় কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই রকম উন্নতি এদের মধ্যেও হইতে পারে—এ রকম আশা করা অযৌক্তিক নয়।

প্রঃ—আচ্ছা, চাষের জমিতে যদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি—ট্রাক্টর ইত্যাদি লাগান যায়, তবে কি আপনি মনে করেন না যে অনেক বেশী ফসল পাওয়া যাইবে ও তুলনায় খরচটা কম হইবে ?

উঃ—ট্রাক্টর ব্যবহার সম্বন্ধে একটা কথা আছে। সকল কৃষকের পক্ষে ট্রাক্টরাদির প্রবর্ত্তন করিয়া কৃষিকার্য্য চালানো সম্ভবপর নয়। এই ধরণের চাষ ছোট জমিতে হয় না, বড় জমি চাই।

প্রঃ—কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অনেক কৃষকই ছোট জমির মালিক। পুরুষ-পরম্পরায় এবং বিক্রয়াদির ফলে সন্তানদের মধ্যে ভাগ হইতে হইতে জমি ক্রমাগতই ছোট হইয়া চলিয়াছে। এখানে তবে যান্ত্রিক চাষের উপায় কি ?

উঃ—উপায় অবশ্য একটা আছে। অনেক চাষী একত্র মিলিয়া অনেক খণ্ড জমিতে যদি একযোগে সমবায় প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারে, তবে সেখানে ট্রাক্টর আনিলে খুব উপকারের সম্ভাবনা আছে।

প্রঃ—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ না করায় আমাদের চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া মনে করেন কি ?

উঃ—তা হইতেছে বই কি। আমাদের দেশে যত জমিতে চাষ হইতেছে, তার পরিমাণ না বাড়াইয়াও ট্রাক্টর যোগে বেশী ফসল আদায় হইতে পারে। অল্প জমিতে বেশী ফসল যাতে উৎপন্ন হয় তাই আমাদের দেখা উচিত। এদিকে দেখুন, আমাদের জমিতে যে সার দেওয়া হয়, তা ত উৎকৃষ্ট নয়ই, অধিকন্তু তার পরিমাণটাও ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে।

প্রঃ—কিন্তু তা সত্ত্বেও ত সেই অনুপাতে ফসলের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

উঃ—তার কারণ আমাদের দেশের জমি স্বভাবতই অত্যন্ত উর্ব্বর। সার না দেওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় ফসল উৎপন্ন হইতেছে। যদি আমাদের জমি এরূপ উর্ব্বর না হইত, তবে সারের অভাবে আদৌ ফসল উৎপন্ন হইত না।

প্রঃ—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের প্রথাটা আমাদের দেশে বহুলভাবে প্রচার করা সম্ভবপর কি ?

উঃ—আমার মনে হয়, চাষের উন্নতি সম্পর্কে আমাদের দেশের জমিদারদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। জমিদারিতে এক "ব্লক" অথবা কাছাকাছি খাসের খণ্ড খণ্ড বড় জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার আদি প্রদান ও যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন, সেচের উদ্দেশ্যে নলকূপ খনন ইত্যাদির সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রত্যেক জিলার স্থানে স্থানে জমিদাররা যদি যেখানে সম্ভব সেখানে এই রকম নিজের খরচে কৃষিকার্য্য করিতে সুরু করেন ও তাতে সফলতা দেখাইতে পারেন, তবে প্রজা-সাধারণেরও শিক্ষা হইয়া যায় ও চোখ ফোটে।

প্রঃ—আপনারা এই রকম কোথাও কিছু করিয়াছেন কি ?

উঃ—হাঁ। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আমাদের জমির একাংশে আমরা চাষের জন্য নলকূপ খোঁড়ার ব্যবস্থা করিতেছি। এ বিষয়ে কতদূর সফল হইব বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালার ২।১ জায়গার জমিদারগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। যেমন, রাণাঘাটের রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক।

প্রঃ—আপনি ট্রাক্টর যোগে চাষের কথা বলিতেছিলেন। আপনার কি মনে হয় অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া এই প্রকার চাষ করিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে ?

উঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ও অন্যান্য কর্ম্মী মিলিয়া চুঁচুড়ায় এক কৃষি-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। তাঁদের জমিতে উৎপন্ন ফসল দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে

যে, আমাদের দেশে ট্রাক্টর চালাইয়া বেশ ভাল চাষই হইতে পারে। এস্থানে প্রথমে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত ও পরিচালিত হইত। সেটা ভাল চলে নাই। সেইজন্য ১২০ বিঘার এক খণ্ড জমি ও আনুষঙ্গিক ৪০।৫০ হাজার বা ততোঽধিক টাকার ঘরবাড়ী এঁদের প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি এঁরা কয়েক বৎসর সফলতা দেখাতে পারেন, তবে বোধ হয় আরও জমি পাইবেন এবং সরকার হইতে সাহায্যও পাইবেন।

প্রঃ—এই স্কুলটির বিশেষত্ব কি ?

উঃ—এঁরা ছেলেদের ৩ বছর কুরিয়া পড়ান। প্রথম হইতেই ছেলেরা স্বয়ং রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ট্রাক্টর চালাইতে সক্ষম হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা। দেখা হয় যেন মাটির কাজ ইত্যাদি ছেলেরা সব নিজের হাতে করে। পুঁথিগত বিদ্যার দিক্ হইতেও মৃত্তিকা-বিজ্ঞান, মৃত্তিকা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সকল প্রকার অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান লাভের সুযোগ এখানে রহিয়াছে।

প্রঃ—ট্রাক্টর চাষের ফল কিরূপ হইবে মনে করেন ?

উঃ—ফল ভাল হইবে তার আর সন্দেহ কি ? আমাদের দেশের ফসলের পরিমাণ ২।৩ গুণ বাড়িবে। দেশে যদি আর অধিক পরিমাণ জমিতে চাষ না করাও হয় কিন্তু যদি প্রতি বিঘার ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, তবে সেটা আমাদের দেশের পক্ষে কম লাভ নয়।

প্রঃ—ট্রাক্টর চাষের সম্পর্কে কোন প্রকার স্কীম বা পরিকল্পনা আপনার মাথায় আছে কি ? এর খরচপত্রের মোটামুটি একটা আভাষ পাইলে জিনিষটা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত।

উঃ—বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস ও কৃষিবিৎ শ্রীযুক্ত হরিচরণ বিশ্বাস মহাশয় ট্রাক্টর চাষের এক মোসাবিদা খাড়া করিয়াছেন। এটা আমার মনে ধরিয়াছে। এটাকেই আপাততঃ আপনার সমক্ষে হাজির করিতেছি। জমি দরকার হইবে অন্ততঃ ৫০০ বিঘা। জমি পরীক্ষা করিয়া তাঁরা বলিয়াছেন যে, ধান্য ব্যতীত নিম্নলিখিত দ্রব্য-গুলি জন্মান যাইতে পারে।

(১) আলু
(২) চীনাবাদাম
(৩) রেড়ীর বীজ
(৪) হলুদ
(৫) আদা

খরচের সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, খরচটা দুই প্রকারের—(ক) গোড়ায় একটা মোটা টাকা ফেলিতে হইবে। এই টাকার উপরেই চাষটাকে দাঁড় করাইতে হইবে। (খ) বছর বছর একটা খরচ করিতে হইবে।

(ক) শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে ঘরবাড়ী, ওয়ার্কশপ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

ঘরবাড়ীতে অর্থাৎ আফিস কাছারি, যন্ত্রাগার, গুদাম, মজুরদের ঘর, কৃষি-ওস্তাদ ও ট্রাক্টর চালকের বাড়ী ও ২।১টা অতিরিক্ত ঘর ইত্যাদিতে খরচ পড়িবে ২,০০০৲ টাকা। যন্ত্রাদি সারাইবার ছোটখাট ওয়ার্কশপে পড়িবে ৫৪০৲টাকা।

চাষের যন্ত্রাদির জন্য খরচ এই প্রকার :

২	ফোর্ডসন ট্রাক্টর	৩৮০০৲ টাকা
১	তিন ফারো ডিস্‌ক লাঙ্গল	৬০০৲ „
১	তিন বটম মোল্‌ড বোর্ড লাঙ্গল	৫০০৲ „
১	বীজ পেষক	৫০০৲ „
১	ডিস্ক হ্যারো	৫০০৲ „
১	ছোট থ্রেশার	৪০০৲ „
১	স্প্রিং টুথ হ্যারো	২০০৲ „
১	কাল্‌টিভেটার	২৫০৲ „
১	কাল্‌টিপ্যাকার	২৫০৲ „
১	উইনোআর	২৫০৲ „
১	মুভার	২৫০৲ „
৪	চাষ ওয়াগন	২০০৲ „
১	রোটারি আলুর খন্তা	৩০০৲ „
১	সেচের জন্য ইঞ্জিন	২০০৲ „

১	পাম্প চালাইবার জন্য ইঞ্জিন	৪০০৲ "
১	নলকূপ (ব্যাস ৩"।৪")	৫০০০৲ "
	বিবিধ	১০০৲ "
		১৩,৭০০৲

মোট ১৬,২৪০টাকা এক কালীন খরচ করিতে হইবে।

তারপর বছরকার খরচ আছে। কৃষি ওস্তাদ, হেড্ ট্রাক্টর ও ড্রাইভার বাবদ যাইবে ২,৭৬০৲ টাকা। আর মজুর, কেরোসিন তেল, পেট্রোল ইত্যাদি বাবদ যাইবে ২,৩৯৩৲ টাকা। বাকী খরচটা হইতেছে বীজ ও সারের মূল্যের দরুণ।

আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব নিম্নরূপ হইবে :

জমা (কম পক্ষে) — খরচ

(১) আলুর বীজ ১০০ বিঘায়

জমা: মণ × বিঘা × টাকা
৫০ × ১০০ × ৩ = ১৫,০০০৲

খরচ: মণ × টাকা × বিঘা
বীজের দাম ৩ × ১০ × ১০০ = ৩,০০০৲
সারের দাম ১০ × ৪ × ১০০ = ৪,০০০৲
৭,০০০৲

(২) চীনা বাদাম ১০০ বিঘায়

১৫ × ১০০ × ৭ = ১০,৫০০৲

বীজ বিঘা প্রতি ১০ সের = ২॥০ টাকা
১০০ বিঘায় = ২৫০৲
সার ২ মণ বিঘা প্রতি
১০০ বিঘায় = ৮০০৲
১০৫০৲

(৩) রেড়ী বীজ ১০০ বিঘায়

৫ × ১০০ × ৬ = ৩,০০০৲

বীজ বিঘা প্রতি ৫ সের = ১।০
১০০ বিঘায় = ১২৫৲
সার বিঘায় ১ মণ
১০০ " ১০০ মণ = ১০০ × ৪
= ৪০০৲
৫২৫৲

(৪) হলুদ ১০০ বিঘায়

১৫ × ১০০ × ১০ = ১৫,০০০৲

বীজের দাম ১ × ১২ × ১০০ = ১২০০৲
সারের দাম = ৪০০০৲
৫২০০৲

(৫) আদা ১০০ বিঘায়

১২ × ১০০ × ১০ = ১২,০০০৲

	সের	টাকা	বিঘা
বীজ	৩৫	১৫	১
সুতরাং ১০০		বিঘায়	=১৫০০৲
সারের দাম			=৪০০০৲
			৫৫০০৲

মোট ৫৫,৫০০৲

১৯,২৭৫৲

(৬)	কৃষি ওস্তাদ ইত্যাদি দফায় ও মজুর, কেরোসিন ইত্যাদি দফায় একত্রে	...	৫,১০৩৲
(৭)	জমির খাজনা	...	৫০০৲
(৮)	ডিপ্রিসিয়েশন	...	২৫০০৲
		মোট	২৭,৪২৮

অর্থাৎ বাৎসরিক খরচ প্রায় ২৮ হাজার টাকা ও আদায়টা কম পক্ষে ৫৫½ হাজার টাকা। মোট লাভটা ১৭ হাজার টাকার উপর হইবেই।

প্রঃ—ট্রাক্টর চাষের প্রথাটা পুঁজিপতি ছাড়া অপরের মধ্যে কিরূপে প্রচলিত হইবে?

উঃ—এক উপায় হইতেছে সমবায়-প্রণালীর অবলম্বন। কোন চাষীর পক্ষে একা ট্রাক্টর যোগে চাষ করা সম্ভবপর না হইতে পারে। টাকার অভাব ত আছেই, তাছাড়া বাঙ্গালা দেশের চাষীদের জমির আয়তন ছোট। অনেক চাষী একত্র হইলে বৃহদায়তন ক্ষেত্রে ট্রাক্টর চালাইয়া সুফল পাওয়া যাইবে।

প্রঃ—আমাদের দেশে সমবায়ের প্রসারের সম্ভাবনা আছে কি?

উঃ—আছে নিশ্চয়। আমাদের দেশের অবস্থা সমবায়ের অনুকূল। পাট পৃথিবীর আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। পাটের তুল্য উপযোগী "সাবষ্টিটিউট" বা পরিবর্ত্তিত দ্রব্যও এখনও বাহির হয় নাই। এরূপ অবস্থায় পাট যে দরে বেচা হয় তার চেয়ে চড়া দরে বেচা সম্ভব হইত যদি আমাদের চাষীদের মধ্যে সমবেতভাবে বেচিবার একটা প্রতিষ্ঠান থাকিত।

প্রঃ—কেমন করিয়া?

উঃ—যেমন করিয়া আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে তারা বেচা-কেনা শাসন করে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকায় তুলার দর নামিয়া যায়। চাষীরা সেই দরে তুলা বেচা সমীচীন নয় মনে করিয়া সকলে মিলিয়া তাদের সমস্ত তুলা গুদামজাত করে। আর বড় বড় ব্যাঙ্ক তাদিকে টাকা কর্জ্জ দিতে সুরু করে। অবশ্য গচ্ছিত থাকে বেপারীদের নিজ নিজ তুলা। তার ফল হইয়াছিল এই যে, কয়েক মাস পরে যখন তুলার দর চড়িল, তখন তারা নিজ নিজ তুলা বেচিয়া ব্যাঙ্কারদিগের পাওনা ও সুদ ত মিটাইয়া দিলই অধিকন্তু যা লাভ করিল তা আগের চেয়ে অনেক বেশী।

প্রঃ—কিন্তু আমাদের দেশের চাষীদের কাছ থেকে এতটা আশা করা যাইতে পারে কি ?

উঃ—পারে না, কারণ আমাদের চাষীরা শিক্ষার অভাবে তত কর্ম্মঠ ও চতুর নয়। বুঝা যাইতেছে যে, প্রতি পদেই শিক্ষার সার্থকতা রহিয়াছে। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক হয় তার জন্য চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তারপর জিলা অনুসারে অথবা রিজিনাল (স্থানীয়) ব্যবসা অনুসারে যাতে তাদের ব্যবসা-পক্ষপাতিত্ব জন্মানো হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া দরকার। স্থানীয় প্রচলিত ব্যবসার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্যকরী শিক্ষা দিলে প্রায়ই সে শিক্ষা কাজে লাগে না। যে গ্রামে পাট জন্মে সেখানে যাতে পাটের অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাই দেখা উচিত। আর যেখানে কলকারখানা গড়িয়া উঠিতেছে সেখানে কল, হাতিয়ার ইত্যাদির ব্যবহার শিখানো উচিত। ফলে, শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিজের জীবিকার জন্য পথটা সম্মুখেই খোলা রহিয়াছে দেখিতে পায়।

প্রঃ—চাষের কথায় গরুর কথা মনে পড়িল। গো-পালন সম্বন্ধে আপনাকে ২।১টি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমাদের দেশে দিন দিন গরুর সংখ্যা যেমন হ্রাস পাইতেছে. তেমনি ভাল গরুরও অভাব ঘটিতেছে। প্রতিবিধানের উপায় কি ?

উঃ—উপায় আমাদের নিজের হাতেই রহিয়াছে। দেখুন সাহেবরা গরু খায়, কিন্তু তাদের দেশে গরুগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও বেশী দুধ দেয়। দৈনিক একমণ দুধ দেয় এমন পর্য্যন্ত শোনা যায়। অথচ আমরা গরুর পূজা করি, কিন্তু গরুগুলি রোগা অস্থিচর্ম্মসার, দুধ দেয় সামান্য। এর অর্থ কি ? আমরা কি গরুর সেবা-যত্ন করি না ? আমরাও গরুর আদর যত্ন করিয়া থাকি। কিন্তু কি ভাবে করিলে সব চেয়ে বেশী ফললাভ হয় সেইটাই আমরা জানি না।

প্রঃ—আমাদের দেশে গরুর সংখ্যা-বৃদ্ধি ও দুধ-বৃদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে ?

উঃ—দুইটারই মূল কথা এক—কি করিয়া গরুর বংশোন্নতি হইতে পারে। গরুর বংশোন্নতিটা এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নয়। বিলাতের গরুর দশা ৭০।৮০ বছর আগে আমাদের দেশেরই মত ছিল। বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে গো-পালন। গো-পালনও একটা বিজ্ঞানবিশেষ। ষাঁড় নির্ব্বাচন, গরুর খাদ্য নির্ব্বাচন, গোচারণের মাঠ তৈয়ার, রোগ প্রতীকারের ব্যবস্থা, বাসস্থান নির্দ্দেশ ইত্যাদি লইয়া যথেষ্ট মাথা ঘামাইবার অবকাশ আছে। এই সব দিকে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নতিসাধন করিতে পারিলে, আমাদের দেশে ভাল গরু জন্মিবে। ভাল গরু হইলে অর্থাৎ প্রতি গরুতে দুধ অনেক গুণ বেশী পাইলে গরুর সংখ্যা কম বাড়িলেও ফল অধিক হয়।

প্রঃ—কিন্তু ইতিমধ্যে দুগ্ধ-সমস্যার কি উপায় হইবে ? দেশের মধ্যে যথেষ্ট দুধ পাই না। যা পাই তা অত্যন্ত আক্রা। শুধু তাই নয়, খাঁটি দুধ দুষ্পাপ্য। জলমিশ্রিত দুধ খাইলে উপকারের চেয়ে অপকার বেশী।

উঃ—দেশের মধ্যে দুধের যোগান বাড়ান এক জিনিষ, আর খাঁটি দুধের যোগাড় অন্য জিনিষ। সম্প্রতি খাঁটি দুধের অভাবে আমাদের অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইতেছে ? যে যে উপায়ে খাঁটি দুধের সরবরাহ হইতে পারে তার একটা হইতেছে গোয়ালারা যাতে দুধ বিশুদ্ধ রাখিতে পারে সেইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিখান ও দুগ্ধ-পর্য্যবেক্ষণের আইন কড়া করা ও তজ্জন্য উপযুক্ত লোক যথেষ্ট পরিমাণে রাখা। অন্য উপায় হইতেছে সমবায় প্রণালীতে দুধের যোগান দেওয়া। যেমন কো-অপারেটিভ মিল্ক ইউনিয়ন করিতেছে। ভদ্রলোকের ছেলেরাও মনে হয় এই উপায়ে নিজেদের বেকার-সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ও নগরে খাঁটি দুধ যোগাইবার ভার লইতে পারেন। কিন্তু দুধের যোগান দেশের মধ্যে বাড়াইতে হইলে গো-পালন-বিদ্যায় হাতেখড়ি হওয়া চাই।



পত্রিকা-জগৎ

"জুর্ণাল দেজ্ একনোমিস্ত"

ধনবিজ্ঞানসেবীদের মাসিক পত্র। প্যারিসের "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক" নামক ধনবিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র। ১৯২৮ সনে ৮৭ বৎসর সুরু হইল। জানুয়ারি সংখ্যায় আছে, (১) ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের সরকারী আয়ব্যয়ের সমতা (ঈভ্ গীয়ো), (২) রেল-মজুরদের বেতন (রয়শিল্ড্), (৩) মরক্কোয় ফরাসী শাসন (লুভিঅঁ), (৪) পুঁজিবিষয়ক রপ্তানি নিরোধের আইন-রদ, (৫) দেশবিদেশের মুদ্রায় স্থিরতাস্থাপন, (৬) ফ্রান্সের চেক-খালাস ভবন,—১৯২৭ সনের কারবার, (৭) ইন্দোচীনের বর্ত্তমান অবস্থা (পিয়ের), (৮) প্যারিসের বসতবাড়ী, স্বাস্থ্য ও বাজার-দর, (৯) সাহারায় রেলের প্রস্তাব (ভালো), (১২) ফরাসীরা কুৎরত্তি মাল আমদানি করে কত আর কারখানা-জাত মাল রপ্তানি করে কত (পুপ্যাঁ), (১৩) ফ্রান্সের বোলশেভিক-বিপদ (মঁদে), (১৪) অশুল্ক-বাণিজ্য-পরিষদের কাজকর্ম্ম, (১৫) আর্থিক সংবাদ, (১৬) ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষদের মাসিক সভায় জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের অধীন ব্যাঙ্ক-ব্যবসাবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা, (১৭) গ্রন্থসমালোচনা, (১৮) আর্থিক ইতিহাসের তথ্য।

●

ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়:—(১) পঁয়কারের বক্তৃতা, ২৩শে জুলাই ১৯২৬ হইতে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ পর্য্যন্ত ফরাসী জাতির আর্থিক ক্রমবিকাশ এই সরকারী বক্তৃতার কথাবস্তু। জনসাধারণের তরফ হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে বাজারদরের সঙ্গে বেতনাদির সম্বন্ধ। ১৯১৪ সনের তুলনায় বাজারদর বাড়িয়াছে ৫গুণ (অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য কমিয়াছে,—পঞ্চম অংশে আসিয়া ঠেকিয়াছে)। পঁয়কারে বলিতেছেন,—সকলেই আশা করিবে যে, মজুরি, মাহিয়ানা ইত্যাদিও কমসে কম ৫ গুণ বাড়া উচিত। কিন্তু আসল কথা বাড়িয়াছে ৬.৮৬ অর্থাৎ পৌনে সাত গুণের কাছা-কাছি। ১৯১৪ সনে সরকারী চাকুরেদের বেতন বাবদ গবর্ণমেণ্টকে খরচ করিতে হইত ১,৩৪৩,০০০,০০০ ফ্রাঁ। (তখনকার দিনে ফ্রাঁ ছিল আমাদের আনা দশেকের সমান)। আর আজ সরকারী বেতন বাবদ খরচ হইতেছে ৯,১২৪,০০০,০০০ ফ্রাঁ। এই গেল একটা সুখের খবর। আর একটা সুখের খবর পঁয়কারে আরও জোরের সহিত সদর্পে প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "দেশের নরনারীর সুখসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সরকারী খরচের ব্যবস্থা আছে তাহাতে আমরা এক দামড়িও কমাই নাই। ১৯১৩ সনের বাজেটের সঙ্গে ১৯২৮ সনের বাজেট তুলনা করিয়া দেখুন। এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। ১৯১৩ সনে গর্ভবতী নারীদের সাহায্যের জন্য গবর্মেণ্ট খরচ করিত কত? এক আধলাও নয়। আর আজ? এক কোটি ফ্রাঁ (ভারতীয় হিসাবে ১২॥০ লাখ টাকা)। ১৯১৩ সনে সন্তান জন্মের পর জননীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট ভাতা পাইত কত? এক আধলাও নয়। আজ ১৯১৮ সনে গবর্ণমেণ্ট এই বাবদ বাজেট করিয়াছে কত? ৩৫ লাখ ফ্রাঁ। এক বৎসর বয়সের শিশুরা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৯১৩ সনে পাইত কত? ৮॥০ লাখ ফ্রাঁ। আর আজ? ২,৪০০,০০০ ফ্রাঁ। প্রসব-হাঁসপাতালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৯১৩ সনে ৭ লাখ ফ্রাঁ।

১৯২৮ সনের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছি ৫০ লাখ ফ্রাঁর। ১৯১৩ সনে পরিবারে পরিবারে লোক-সংখ্যা বাড়াইবার উৎসাহ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট খরচ করিত এক আধলাও নয়। ১৮২৮ সনে আমরা খরচ করিব ১ কোটি ৩৫ লাখ ফ্রাঁ (১৭ লাখ টাকা)। যে যে পরিবারে লোকসংখ্যা বেশী, তাহাদেরকে সাহায্য করিবার জন্য ১৯১৩ সনে গবর্ণমেণ্ট কিছুই খরচ করিত না। ১৯২৮ সনের বাজেটে আছে ১ কোটি ২০ লাখ ফ্রাঁর (১৫ লাখ টাকার) বরাদ্দ।"

এই সঙ্গে আরও কয়েকটা দফা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সস্তায় বাড়ীঘর তৈয়ারী করিবার জন্য অন্যান্য উন্নত দেশের মতন ফ্রান্সেও কতকগুলা কোম্পানী আছে। তাহা ছাড়া এই কোম্পানীর ব্যবসায় সাহায্য করা কতকগুলা বাস্তুনির্ম্মাণব্যাঙ্কের কাজ। এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠানই আজকাল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছে। সাহায্যটা হইতেছে অল্পসুদে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ পাওয়ার ব্যবস্থা। ১৯১৩ সনে এই বাবদ গবর্ণমেণ্ট ঋণ দিয়াছিল মাত্র ১৷৷০ কোটি ফ্রাঁ। ১৯২৫ সনে দেখিতেছি ২১ কোটি ফ্রাঁ, ১৯২৬ সনে ২৪ কোটি ফ্রাঁ, ১৯২৭ সনে ৫০ কোটি ফ্রাঁ। এই জন্য মোটের উপর গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানা হইতে কিছু না কিছু লোকসান দিতে হয়ই হয়। ১৯১৩ সনে গবর্ণমেণ্টের খরচ হইয়াছিল মাত্র ৫৬,০০০ ফ্রাঁ। ১৯২৮ সনে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ লগ্নি কারবারে ৭৷৷০ কোটি ফ্রাঁ লোকসান দিতে প্রস্তুত আছে। অর্থাৎ প্রায় এক কোটি টাকা সস্তায় ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীকে সরকারী তহবিল হইতে জলের মতন ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

তাহার উপর ঘরবাড়ীর নির্ম্মাণ-কাণ্ডে অন্যান্য সরকারী সাহায্যও আছে। বেশী সংখ্যক লোকওয়ালা পরিবারের জন্য কতকগুলা স্বতন্ত্র কোম্পানী ঘর তৈয়ারী করিতেছে। তাহাদিগকে ১৯১৩ সনে গবর্ণমেণ্ট এক পয়সাও সাহায্য দিত না ১৯১৮ সনে প্রায় ৫ কোটি ফ্রাঁ দিবার জন্য প্রস্তুত।

"পারফিউমারি অ্যাণ্ড এসেন্‌শ্যাল অয়েল রেকর্ড"

সুবাসিত তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্যের সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ৮ নং সার্দি ষ্ট্রীট, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত। বাৎসরিক মূল্য ২১ শিলিং। প্রতি সংখ্যায় প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা পড়িবার মাল ও প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা সুচিত্রিত বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ১৯ বৎসর চলিতেছে। জানুয়ারী ১৯২৮ সংখ্যায় আছে (১) নভেল ও পাঠ্যপুস্তকে সুগন্ধি দ্রব্যের পরিচয়। (২) অ্যারোমেটিক গাছ্‌উডঅয়েল, গন্ধ ও সুবাস, (ম্যাকস্ ডাইসন, পি, এইচ, ডি) (৩) চন্দনতৈল সমস্যা (জিওফ্রে ড্যালটন) (৪) সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতে মোমের ব্যবহার (চার্লবুট এইচ, সাইমনস, জি, এস, সি, এফ, আই, সি) (৫) কানাডায় সুগন্ধি দ্রব্য ও সাবান শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ (৬) বিংশ শতাব্দীর সুগন্ধি দ্রব্যের ইতিহাস, (৭) বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যের রাসায়ানিক গবেষণা। (৮) সোপ কসমেটিক্‌স (৯) ইংরেজের সুগন্ধি তৈল ব্যবসায়।

"অয়েল অ্যাণ্ড কলার ট্রেডস্ জার্ণাল"

তেল এবং রং বিষয়ক বিলাতী মাসিক। ৮ নং ব্রডওয়ে, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত। বাৎসরিক মূল্য ১ পাউণ্ড। ৭৩ খণ্ড ১৫৩০ সংখ্যায় ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সংখ্যায় আছে,—(১) কেমিক্যাল শিল্প, (২) সিস সীসা ও দস্তার বাজার। (৩) বৃটিশ রং ও তৈল শিল্প (৪) কেমিক্যাল শিল্প সমিতি। (৫) বৃটিশ রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার। (৬) টেমস্ নদীতে পেট্রল ট্যাঙ্কার্স। (৭) যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়ামের কাটতি (৮) পেট্রোলিয়াম সংবাদ। (৯) মোটরগাড়ীর তেল ও লুব্রিক্যান্ট খরচ। (১০) সব্জী তৈল ও জানুয়ারী বাজার। (১১) তারপিন ও রোসিন বাজার (১২) সুবাসিত তৈল ও সুগন্ধি শিল্প। (১৩) গ্লাসগোর চেম্বার্স অব কমার্স। (১৪) ভারতীয় তৈল শস্য। (১৫) তৈল পরিষ্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। (১৬) বিলাতে রং ও তেলের আমদানি (১৭) বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব্ কেমিষ্টস। বিলাতের রাসায়নিক সম্মিলনী। (১৮) চন্দন তৈল।

"পটারী গেজেট অ্যাণ্ড গ্লাস ট্রেড্ রিভিউ"

চীনা মাটীর বাসন কোসন ও তৈজস পত্র প্রভৃতি মৃৎ শিল্পের মুখপত্র। ৮নং ব্রডওয়ে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত। বাৎসরিক মূল্য ১৫ শিলিং। ৫৮ খণ্ড, ৬০৭ সংখ্যা। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় আছে। (১) অবিভাজ্য চীন, (২) চীনা মাটি ও গ্লাস শিল্প ভবন। (৩) নবেম্বর মাসের শিল্প-সংবাদ। (৪) গ্লাস শিল্পে ও অন্যান্য মৃৎপাত্র শিল্পে শ্রমজীবিগণের অবস্থা। (৫) নিউজিল্যাণ্ডে চীনা মাটি ও কাচের বাসনের বিস্তৃত বাজার। (৬) ক্রেতাগণের পৃষ্ঠা। (৭) আর্জেন্টিনায় মৃৎপাত্র শিল্প। (৮) মৃৎপাত্র শিল্পে জনৈক বিখ্যাত পুরুষ। (৯) উরচেষ্টার রয়্যাল পোর-সেলিন কোম্পানী লিঃ। (১০) একটি পটারী কারখানায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত। (১১) চীনা মাটি ও কাচ দ্রব্যের প্রদর্শনী। (১২) বর্ত্তমান রুচিসম্পন্ন বাসন পত্র।

"জার্ণাল অব্ দি মিনিষ্ট্রি অব্ অ্যাগ্রিকালচার"

বিলাতের কৃষি-মন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। জানুয়ারী ১৯২৮ সংখ্যায় আছে ;—(১) সম্পাদকীয় মন্তব্য—(ক) বাড়ী ঘরের আইন কানুন (খ) সাম্রাজ্যে বীট চিনি উৎপাদন (গ) দুধ সরবরাহ, (ঘ) আখরোট চাষ। (ঙ) মুর্গী পালন ব্যবসায়। (২) প্রবন্ধাবলী—কৃষি রিসার্চ্চে সাম্রাজ্য সহযোগ (ডাব্লিউ আর ব্লেক, বি, এস, সি) (৩) রয়্যাল কমিশন ও ল্যাণ্ডড্রেনেজ, (৪) রোন উপত্যকায় ফল ও সব্জীর চাষ, (এইচ, ডি, টেলর এম, বি, ই) (৫) ইংলণ্ড ও ওয়েলসের কৃষি উৎপাদন, ১৯২৭ (৬) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ অ্যাগ্রিকালচারাল বোটানি। (৭) জানুয়ারীর ফার্ম্ম (৮) জমির সার।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল কটন বুলেটিন"

জানুয়ারী ১৯২৮ সংখ্যায় দেখিতেছি :—(১) তুলা ব্যবসায়ের অবস্থা—অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হাঙ্গারি, ইতালী জাপান, স্পেন, সুইজার্ল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র। (২) আমেরিকান কটন, (৩) ইজিপশ্যান কটন। (৪) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কটন। (৫) নূতন নূতন দেশে তুলার চাষ—আলজিরিয়া, ব্রাজিল, সাইলেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা। মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে, স্পেন, তুর্কিস্থান। (৬) তুলা আবহাওয়া। (৭) কটন মিলগুলির অবস্থা—দক্ষিণ আমেরিকায় তুলা উৎপাদন—জাপানের তুলা শিল্প। ভারতীয় বস্ত্র কারখানায় শ্রমজীবি-সমস্যা। বিলাতে বস্ত্রপ্রস্তুতের চল্‌তি খরচ। জাপান ও অল্প সময়। (৮) বিবিধ—ভারতীয় সূতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ের আলোচনা। (৯) তুলা জগতের ষ্ট্যাটিসটিক্স।

"ইণ্টারন্যাসন্যাল লেবার রিভিউ"

রোমের আন্তর্জ্জাতিক লেবার আফিস হইতে প্রকাশিত মাসিক। জানুয়ারী ১৯২৮ সংখ্যায় আছে (১) সামাজিক দিক্ হইতে শিল্প জোট নিয়মিত করা (রেনিহ ফহার) বর্ত্তমান জগতে ধনিক ও শ্রমজীবীর লড়াই কিরূপ জমিয়া উঠিতেছে তাহা সকলেই জানেন। বিখ্যাত ভার্সাই সন্ধির ৪২৭ ধারায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রম সঙ্ঘকে শ্রমজীবী ও পুঁজি-পতিদের সকল প্রকার আইনসঙ্গত সঙ্ঘ বা জোট গড়িবার যে ক্ষমতা হইয়াছে তাহার যাহাতে যথাযথভাবে অনুশীলন করা হয় সেই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতার অপব্যবহারও অনেক স্থলে হইতেছে। লেখক তাহার এই ২৭ পৃষ্ঠার রচনায় বহু মূল্যবান তথ্য সমাবেশ করিয়া ধনিকের বর্ত্তমান কার্টেল (বহু শিল্প ব্যবসা সঙ্ঘ) গড়িবার উপকারিতা ও অপকারিতা এবং সমাজের উপর এগুলির প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। (২) যুক্তরাষ্ট্রে নূতনতম মজুরি আইন (রুডলফ ব্রেডো) এই রচনায় লেখক মজুরি আইন ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহার প্রচলন সমন্ধে ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। (৩) লাটিন আমেরিকার শ্রম আইন (এম পবলেটট্রাকসকো)। (৪) বিগত মহাযুদ্ধে পলাতক-সমস্যা ও ইহার সমাধান। বিগত মহাযুদ্ধের বহুলোকের জীবন ধ্বংস হয় এবং বহুলোক স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যেসমস্ত দেশে ঐ সকল পলাতক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের লইয়া বর্ত্তমানে জাতি সঙ্ঘের সম্মুখে এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। লেখক সেই সমস্যা বিস্তৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ইহার কি সমাধান

হইবে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। (৫) রিপোর্ট ও জিজ্ঞাসা (৬) ১৯২৬ সনে রুমানিয়ার শ্রম-সমস্যা (৭) জাপানে স্ত্রী মজুরদের অবস্থা। (৮) বিভিন্ন দেশের শ্রম আইন, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি সংক্রান্ত ষ্ট্যাটিসটিক্‌স।

"কনটেম্পোরারী রিভিউ"

মাসিক। নামেই প্রকাশ যে ইহা সমসাময়িক সাহিত্য লইয়া আলোচনা করে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য-নীতি কোন বিষয়ই আলোচনা হইতে বাদ যায় না।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার দাম ৩শি ৬পে। পৃষ্ঠা থাকে ১২০ বা ততোঽধিক।

গত ১৯২৭ সনের নবেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত বি, এস্ রৌন্‌ট্রী এই কাগজে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—"চড়া দরের আর্থিক তত্ত্ব।" এই প্রবন্ধের বিশেষ মূল্য আছে। রৌন্‌ট্রী নিজে বড় রকম কারবারে লিপ্ত আছেন। তিনি যে সকল আর্থিক তত্ত্বের কথা প্রচার করিতেছেন, সেগুলি সাক্ষাৎভাবে প্রয়োগ করিবার ও ফলাফল বিচার করিবার তাঁর অবকাশ ঘটিয়াছিল। নিজের অভিজ্ঞতার দরুণ তাঁর কথাগুলি বেশ স্পষ্ট ও জোরালো হইয়াছে।

প্রশ্ন নং ১

রৌন্‌ট্রীর ১নং প্রশ্ন হইতেছে "ব্যবসা-নীতিতে মজুর ও মনিবের জাতি ও মানবের স্বার্থ তথা কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিবার দরকার আছে কি? থাকিলে কতটা ও কতদূর পর্য্যন্ত?"

ইংরেজ মজুরের দুরবস্থা

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রৌন্‌ট্রী নিজে ইয়র্ক শহরের মজুরি লইয়া অনেক গবেষণা চালাইয়াছিলেন। জেনারেল বুথ ও প্রভৃতি বিলাতের নানাস্থান লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাতে সকলে মিলিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, ইংল্যণ্ডের মজুর-শ্রেণীর ⅓ অংশ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অবস্থায় বাস করিতেছে। খবরের কাগজ, ট্রাম চড়া, চিঠি লেখা বা মদের জন্য তারা সারা বছরে একটা পয়সাও খরচ করিতে পারে না। এই অবস্থার অর্দ্ধেকেরও বেশীর জন্য দায়ী নীচু মজুরি।

সম্প্রতি অধ্যাপক বাউলি ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ আপনাদের গবেষণার ফলে দেখাইয়াছেন যে, ২৫ বছরের মধ্যে ইংরেজ মজুরের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু কি প্রকার উন্নতি? আজও দশ লাখের উপর লোক দারিদ্র্যের কোঠায় বাস করিতেছে। আর তার চেয়ে অনেক বেশী লোক দারিদ্র্যের কাছাকাছিই রহিয়াছে।

মনিবদের আত্ম-বিস্মৃতি

ইংরেজ মজুর দুঃখে কাল কাটাইতেছে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তার অবস্থার সহিত আমেরিকান্ বা ঔপনিবেশিক মজুরের অবস্থার তুলনা করিলে তার হীনাবস্থাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে।

এজন্য দায়ী কে? প্রতিকারেরই বা উপায় কি?

মনিবেরা নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়ী। মুনাফার দিকে অত্যধিক লোভটা সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে রাখিতে মনিবেরা ভুলিয়া গিয়াছে জাতীয় জীবনে তাদের স্থানটা কোথায়। লোক-সেবা যে শুধু কথার কথা নয়, কিন্তু ব্যবসাও এক ধরণের লোক-সেবা এই কথা বলিতে গেলে আজ উপহসিত হইতে হয়। তবু সত্য কথাটাই বলিতে হইবে।

কাল যদি চাষীরা একযোগে সকলে কাজ বন্ধ করিয়া দেয়, সমগ্র দুনিয়ায় হাহাকার-ধ্বনি উঠিবে। আমাদিগকে ভাতে মারিবার অস্ত্র তাদের হাতে আছে। সুতরাং একথা মনে রাখিতে হইবে যে, তাদের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিবার সুযোগ দিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য।

কেন আমাদের মনিবদের চিত্তটা শুধুমাত্র টাকা আনা পাইএর জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে? কেন আমরা মজুরদের স্বার্থের কথা একদম ভুলিয়া বসিয়া আছি?

দুই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে

(১) ব্যালান্স-শীট-প্রীতি। মনিবকে সর্ব্বদা ব্যালান্স

শীটের দিকে নজর রাখিয়া কাজ করিতে হয়। সর্ব্বদা দেখিতে হয় কিসে সে লভ্যাংশ বেশী করিয়া বিতরণ করিতে পারে। তার খাটানো টাকা নিজের টাকা নয়, অন্য বহু জনের কাছে ধার লওয়া টাকা। যত বেশী লভ্যাংশ সে দিতে বা দেখাইতে পারিবে তত সে আরও পুঁজিপাটা যোগাড় করিতে পারিবে ও ব্যবসার উন্নতি ঘটাইতে পারিবে। কিন্তু ব্যালান্স শীট্‌কে মানার অর্থ এই কথা ভুলিয়া যাওয়া যে, সমাজের সেবা করিতেছে বলিয়াই সে মুনাফার আকারে পুরস্কারটা পাইতেছে।

(২) বর্ত্তমান ব্যবসা ও বাণিজ্যের জটিল প্রকৃতি। বর্ত্তমান কালে যে লোক কিনিতেছে অর্থাৎ সেবা পাইতেছে তার সঙ্গে যে লোক বেচিতেছে বা সেবা করিতেছে তার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। দুইজনের ভিতর পার্থক্যটা বিশাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার মিলের এক ম্যানেজার হয়ত জানিতেই পায় না তার কাজটা সমাজের কোন্ কাজে কোথায় লাগিতেছে।

সেবার আদর্শ

ব্যবসার গোড়ার কথাটা জনসাধারণের সেবা করা। মনিব ও মজুর উভয়কেই এই কথা মনে রাখিতে হইবে। এই একমাত্র ক্ষেত্রে উভয়ে মিলিত হইতে পারে, উভয়ে উভয়ের সহায়তা করিতে পারে। নচেৎ মনিব ও মজুর কারও কল্যাণ হয় না।

মনিব ও মজুর যদি নিজের স্বার্থটাই ষোল আনা বুঝে ও আদায় করিয়া লইতে চায়, তবে ব্যবসাক্ষেত্রে সহযোগিতার কথাটা নেহাৎ কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হয়। অথচ সহযোগিতা ছাড়া আমাদের জাতীয় ধন-সম্পদ্ কিছুতেই সেই অবস্থায় পৌছিতে পারে না, যে অবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের অভাব যথাসম্ভব মিটান চলিতে পারে।

এই সেবার আদর্শটা বিশেষ করিয়া ব্যবসা চালকদের চোখের সাম্‌নে রাখিতে হইবে। সমাজে যে জিনিষের দরকার আছে, সেগুলি উৎপাদন করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। কিন্তু উৎপাদনের প্রণালীটাও এমন হওয়া দরকার যে, তাতে গোটা জাতীয় স্বার্থটা রক্ষিত হয় অর্থাৎ উৎপাদিত ধন, ধনপতি, মজুর ও খাদকের মধ্যে এমন ভাবে বণ্টিত হয় যে তাতে জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। একথা মনে রাখিলে এ প্রশ্ন মনে উঠে না—মজুর সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে না থাকিলে আমার কি আসে যায়? এই কথা মনে হয়—তার শ্রমের বদলে আমি কেমন করিয়া যথেষ্ট দিব? মজুরও মনিবকে ফাঁকি না দিয়া ভাবিবে—কেমন করিয়া আমি মনিবকে তথা দেশকে যথেষ্ট সেবা করিব?

ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ

এই কথাগুলি নেহাৎ খাপছাড়া শুনাইতেছে। কিন্তু এগুলি সত্যই খাপছাড়া নয়। মনিব ও মজুর যদি জাতীয় স্বার্থের কথা সর্ব্বদা সর্ব্বাগ্রে চোখের সামনে রাখিতে না পারে, তবে ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়!

এখনই চোখের সাম্‌নে কি দেখিতে পাইতেছি? ইংরেজরা যেন এক সাধারণ মহান্ স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। সবাই নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। প্রতি দল কি করিয়া কড়ায় গণ্ডায় তার পাওনাটা পুরাপুরি আদায় করিয়া লইবে সে জন্য অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ফল কি ভাল হইয়াছে? ১৯২১ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ৫ বছরে, "ষ্ট্রাইক" ও "লক্ আউটে"র জন্য ২০ কোটি দিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে! মনিব ও মজুরের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতার অভাবের ফল এই। কিন্তু জাতির সমগ্র ক্ষতির এ ত একটু অংশ মাত্র। সমগ্র ক্ষতির হিসাব লইতে গেলে আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইব।

নবীন দুনিয়ায় ইংল্যাণ্ডের স্থান

কেহ কেহ বলিবেন, "নিজের স্বার্থ পরিপুষ্ট করা ইংরেজের চিরকেলে স্বভাব, আজ নূতন ত নয়। ইংরেজ মনিব বা মজুর কোনদিনই সমাজের স্বার্থের জন্য মাথা ঘামায় নাই। অন্যান্য জাত, যাদের ঐশ্বর্য্য আজ আমাদের অনুকরণস্থল, তারাও এই পথেই অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যেকে যখন নিজের জন্য যথাসাধ্য করে, তখন সমগ্র সমাজই তদ্দ্বারা লাভবান্ হয়, অ্যাডাম স্মিথের একথা মিথ্যা কথা নয়।"

তার উত্তর এই : নবীন দুনিয়ায় ইংলাণ্ডের স্থান আগের মত নাই। দুনিয়ার বাজারে আপনার প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত রাখিতে হইলে ইংরেজকে তার কার্য্যধারা বদলাইতে হইবে। এককালে ইংল্যণ্ড ক্ষতিজনক প্রণালী অবলম্বন করিয়াও সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে, আজ আর পারিবে না। নূতন প্রতিযোগীর উদ্ভব হইয়াছে—একদিকে আমেরিকা অন্যদিকে উপনিবেশ। এরা অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী বলিয়া মজুরে মনিবে নিত্য বিরোধিতা সত্ত্বেও সফলতা লাভ করিবে। ইংরেজ পারিবে না।

প্রশ্ন নং ২

১নং প্রশ্নের উত্তর এতক্ষণে পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন নং ২ হইতেছে—কেমন করিয়া কি উপায়ে এই স্বার্থ বা কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে?

প্রথমতঃ, জাতীয় স্বার্থের কথাটাই ধরা যাক্। বর্ত্তমানে বেকার-সমস্যাই যে ইংলাণ্ডের সব চেয়ে বড় সমস্যা সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে—দেশের সর্ব্বসাধারণের "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং" বা "জীবন যাত্রার ধারা" কেমন করিয়া বাড়ান যাইতে পারে?

আপাততঃ মনে হয় যেন এ দুটা পরস্পর বিরোধী। জীবনযাত্রার ধারাটা কমাইলেই কি বরং বেকার-সমস্যার কিছু সমাধান হয় না? আর ধারার উন্নতির অর্থ কি বেকার-সমস্যা বাড়ান নয়?

এই দুই সমস্যার মূলে রহিয়াছে এই সত্য কথাটা যে, ইংরেজ তার বহির্ব্বাণিজ্য অর্থাৎ রপ্তানি বাজার হারাইয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্যের আয়তন নির্ভর করে বাহির দুনিয়ায় ইংরেজ কোন্ দরে জিনিষ বেচিতেছে বা বেচিতে পারে, তার উপর।

উদ্ধারের কোন পথ আছে কি?

চড়া মজুরির পথে

যদি মজুরি অর্থাৎ মজুরিরূপে প্রদত্ত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তদনুপাতে উৎপাদন না বাড়ান হয় বা অন্যান্য খরচ কমান না হয়, তবে কি এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে?

না। কারণ এইরূপ অবস্থায় জিনিষপত্রের দর চড়িবে। তাতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ইংরেজ কাবু হইবে, বেকারের সংখ্যা বাড়িবে, আর যাদের কাজ আছে তাদের অবস্থার একটুও উন্নতি হইবে না। সুতরাং সোজাসুজি মজুরি বাড়াইয়া কোন ফল নাই।

মজুরি কমাইয়া দিলে

অন্য উপায় হইতেছে মজুরি অর্থাৎ মজুরিরূপে প্রদত্ত মুদ্রার পরিমাণ কমান। উৎপাদন ও অন্যান্য খরচ অবশ্য আগের মত থাকিবে। মজুরি-সংক্ষেপে টাকা বাঁচিবে—জিনিষপত্রের দর কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। ফলে গোড়াতে কিছু রপ্তানির বিক্রয় বাড়িবে। তারপর মজুরি যতটা নামে দেশের জিনিষের দর যদি ততটা সস্তা হইয়া যায়, তবে দেশের ভিতর বিক্রয়ের পরিমাণ আগের মত বেশী হইবে। আগের জীবনযাত্রার ধারাটা বদলাইবে না। কিন্তু বেকার কমিবে।

যারা মজুরি-হ্রাসের পক্ষপাতী, তাদের যুক্তি পূর্ব্বরূপ। কিন্তু এই যুক্তি কার্য্যতঃ টেঁকসই নয়।

(১) রপ্তানি ব্যবসায়ে মজুরি কমাইলে কিছুকালের জন্য বিদেশের বাজারে বেশী জিনিষ বেচা চলিবে। কিন্তু বিদেশের প্রতিযোগীরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তারাও জিনিসের দর কমাইবে। তখন আগের অবস্থা ফিরিয়া আসিতে আর কতক্ষণ লাগে?

(২) দেশের ভিতর জিনিষপত্রের দর আস্তে আস্তে ও আংশিক কমিবে মাত্র। সকল প্রকার ব্যবসায়ী এই অবস্থার সুযোগ লইতে গিয়া পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে। মজুরির আয় কমিয়া যাওয়ায় দেশের মধ্যে আর বেশী জিনিষ বেচিবার সম্ভাবনা থাকিবেনা—পড়তা খরচ বাড়িবে ও জিনিষের দর চড়িবে। বিদেশে মাল রপ্তানি চলিবে বটে। তাতে কিছু সুবিধা হইবে। কিন্তু সমগ্র উৎপাদনের মাত্র ৩০% রপ্তানি হয়। তাতে মোটামুটি বিশেষ সুবিধা হইবে না।

(৩) যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মজুরি-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত জিনিষের দর কমিয়া যাইবে, তবু মজুরের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হইবে।

(ক) মোট খরচের সবটাই ত আর মজুরি নয়। মজুরি একটা শতকরা অংশ মাত্র। সুতরাং যে পরিমাণে মজুরি কমিবে, দরটা শতকরা তার চেয়েও কম পরিমাণে কমিবে।

(খ) মজুর যে সব জিনিষ ব্যবহার করে তার কতকটা দেশে উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাকী অনেকটা অংশ বিদেশ হইতে আসে। দেশের জিনিষের দর কমিলেও ২।১টা ছাড়া অধিকাংশ বিদেশী জিনিষের দর ত আর কমিবে না।

নীচের ১৯২৬ সনের বহির্বাণিজ্যের অঙ্কগুলি প্রণিধান-যোগ্য—দাম কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি।

	খাদ্য পানীয় ও তামাক	কাঁচামাল	ম্যানুফ্যাকচার দ্রব্য	মোট
আমদানি …	৫৩·০	৩৯·৩	৩১·৫	১২৪·৩
পুনঃ রপ্তানি	২·৬	৭·৪	২·৫	১২·৬
রপ্তানি …	৫·০	৪.৭	৫৩·৮	৬৫·২

মজুরের ঘর ভাড়াও কমিবে না।

সুতরাং মজুরি কমানকে কোনরূপেই উপায়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। বেকারের সংখ্যা কমিবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু জীবনযাত্রার ধারায় অবনতি ঘটিবে।

কঃ পন্থাঃ ?

মজুরি বাড়ান বা কমান দুইটাই যদি নামঞ্জুর হয়, তবে উপায় কি? রৌন্ট্রী নিজে এক উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। বলিতেছেন, জাতীয় ও ব্যবসায়গত "এফিসেন্সি" বা কার্য্যশক্তি বাড়াও। এই এফিসেন্সি জিনিষটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজের বাণিজ্যকে পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তজ্জন্য জিনিষপত্রের দরে হ্রাস ঘটানো দরকার। সুতরাং উৎপাদন খরচা কমাইতে হইবে। কিন্তু মজুরের প্রকৃত সাপ্তাহিক মজুরি কমাইলে চলিবে না, বরং বাড়াইলেই ভাল হয়।

এটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কারণ মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র উৎপাদন খরচার একটা মাত্র অংশ মজুরি। মজুরি বাড়াইয়াও মোট খরচাটাকে কমান যাইতে পারে। ব্যবসার খরচ কমাইবার সোজা উপায় মজুরি-হ্রাস। মনিবেরা সাধারণতঃ এদিকেই মনোযোগী হয়। কিন্তু প্রকৃষ্টতর উপায় হইতেছে কিসে মজুর প্রতি অধিকতর কাজ আদায় করা যায় তাই দেখা। অর্থাৎ চড়া মজুরি বজায় থাকিবে অথচ উন্নত প্রণালী, উৎকৃষ্টতর যন্ত্রপাতি ও মনিবে মজুরে প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতি মজুরের উৎপাদনশক্তি বাড়াইয়া দিবে।

বর্ত্তমানে প্রতি মজুর যে পরিমাণ উৎপাদন সমাজকে দিতেছে, মজুরি ও দ্রব্যের দর কমাইয়াও তা বজায় রাখা যায়। কিন্তু তাতে বেকারের সংখ্যা কমে না, জীবন-যাত্রার ধারা নীচু হইয়া যায়। কিন্তু মজুরি না কমাইয়া, বরং বাড়াইয়া এবং দর হ্রাস করিয়া জনপ্রতি আদায়ের পরিমাণ যদি বাড়ান যায় তবে উত্তরোত্তর বেকার-হ্রাস ও জীবনযাত্রার ধারার উন্নতি ঘটে। চড়া মজুরির ইহাই মূল আর্থিক তত্ত্ব।

চড়া মজুরি কেমন করিয়া ক্রমাগত উন্নতি ঘটায়? এফিসেন্সি ও সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ইংরেজের রপ্তানি-বাণিজ্যে মজুরের সংখ্যা ও অন্যান্য খরচ কমান যায়, দরে হ্রাস ঘটে। তখন বিদেশের হাটে ইংরেজের মালের কাটতি বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ দেশের ভিতর বেকারের কাজ জুটে। এদিকে বিদেশের কাটতি ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে "ওভারহেড চার্জ্জেস্" বা উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়, দরে আরও হ্রাস ঘটে এবং আরও বেকারের অন্ন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়। এদিকে বেকার কমার অর্থ দেশের ভিতর ক্রয় করিবার শক্তিবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা বাড়া। সুতরাং দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য দেশের ভিতরই টান বাড়িবে। অর্থাৎ আরও বেকারের অন্ন জুটিবে। এ গেল বেকার-সমস্যার কথা। কিন্তু বেকার কমার পীঠ্ পীঠ্ আসিবে জীবনযাত্রার ধারার উন্নতি। মনে রাখিতে হইবে, নূতন যে সব বেকার দেশের মধ্যে অন্ন পাইতে আরম্ভ করে, তারা চড়া মজুরিই পায়।

এরূপ সমগ্র দেশে চড়া মজুরিটা ছড়াইয়াও বেকার কমানো চলে। বস্তুতঃ, নীচু মজুরি, বেকার ও চড়া খরচ মানব-সমাজের শত্রু।

মজুরির মামলা

মজুরি লইয়া মামলাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার দরকার। সমাজের কোন অবস্থাতেই মজুরি কমান উচিত নয়, এমন কথা কেহই বলিবে না। যুদ্ধের পরে সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্ত্তন ঘটে। মজুরিতেও ঘটিবে। বিশেষ কোন ব্যবসা অন্য ব্যবসার তুলনায় তাল হারাইতে পারে। অথবা কখনো কখনো বাণিজ্যে ভাঁটা এমন আকস্মিক ভাবে আসে যে, আশু প্রতিকার না করিলে সর্ব্বনাশ। এই রকম সব ক্ষেত্রে মজুরি কমাইতে হইবে।

কিন্তু তথাপি একথা জোরের সঙ্গে বলিতে হইবে যে, দুঃসময়ে ব্যতীত অন্য সময়ে মজুরি কমান বা কম মজুরি দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। ব্যবসায়ের মালিকদের দৃষ্টি রাখা উচিত মজুরি কমানোর দিকে নয় কিন্তু মজুরের এফিসেন্সি বাড়ানোর দিকে ও বৃথা অপচয় নিবারণের দিকে।

ইংলণ্ডে এমন ফ্যাক্টরি আছে যেগুলি দুনিয়ার সেরা ফ্যাক্টরির সঙ্গে একাসনে বসিতে পারে। কিন্তু আবার এমন অসংখ্য ফ্যাক্টরিও আছে যেগুলিকে কোন ক্রমে সুচারুরূপে চালিত বলা চলে না। অনেকগুলি রীতিমত খারাপ অবস্থায় রহিয়াছে। এ রকম প্রত্যেক ফ্যাক্টরিকে জাতির পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচনা করিতে হইবে। মনিবেরা এই সবের মজুরদের চড়া মজুরি দিতে পারে না, অর্থাৎ তার মজুরদের ক্রয়শক্তি নীচুই থাকিয়া যায়। তাতে সমগ্র ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে সুপরিচালিত ফ্যাক্টরির উৎপাদন-খরচা খারাপ ফ্যাক্টরির খরচার সমান হইলেও প্রথমোক্তের মনিব মজুরদের ২৫% বেশী মজুরি দিতে পারে। তাতে দেশের বাজারে উন্নতি ঘটিতে পারে। কিন্তু অন্য ফ্যাক্টরিগুলি যদি দুর্দ্দশাপন্ন হয়, তবে এই ফ্যাক্টরি সুপরিচালিত হইয়াও লাভ নাই। এরা না হয় নিজের মালের জন্য ক্রয়শক্তি বাড়াইল, কিন্তু তাতে ত আর সমগ্র দেশের ক্রয়শক্তি বাড়িতে পারে না। সুতরাং দরকার দেশের সর্ব্বত্র এফিসেন্সি বাড়ান।

"এফিসেন্সি" বনাম বেকার

এফিসেন্সিটা কোন চীজ? এফিসেন্সির ফলই বা কি? এফিসেন্সি বাড়ানোর অর্থ প্রতি মজুরের ধন উৎপাদন করিবার শক্তি বাড়ান। সোজা কথায় আগে যেখানে দশ জন লোকের দরকার হইত, এখন সেখানে ৯ জন লোকে চলে। তা হইলে এফিসেন্সির ফলে কতকগুলি লোক কি কর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে না? তবে ত বেকার-সমস্যার সমাধান দূরের কথা, বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িবে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে তুলার ব্যবসায়ে যন্ত্রপাতির প্রচলন সুরু হয়। সে সময় মজুররা কলের বিপক্ষে ভয়ানক লড়িয়াছিল ও এই রকম যুক্তি দেখাইয়াছিল। কিন্তু দুটা কথা মনে রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ, কোন একটা কাজ যদি বাস্তবিকই ৯ জন লোকের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত হয়, আর তাতে ১০ জন নিযুক্ত থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, এই দশম ব্যক্তিটিকে সমাজ "সাহায্য" দান করিতেছে। বেকার বীমার জাতীয় স্কীম অনুসারে যে সাহায্য পাওয়া যায় তার চেয়ে এই সাহায্যের পরিমাণ বেশী ও ইহা ঢের বেশী মারাত্মক।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বকথিত প্রণালী বা উপায় অবলম্বন করিলে মজুরের জন্য টান উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে, অর্থাৎ

(ক) বিদেশে মালের কাটতি বাড়িবে,

(খ) নূতন কল, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে ও তৎতুল্য কাজে লোক দরকার হইবে,

(গ) দেশের ভিতর মালের টান বাড়িবে।

এফিসেন্সি বাড়াইলে যে মজুরেরা তাড়াতাড়ি নিজের কর্ম্মক্ষেত্র ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিবে, তার এক প্রমাণ এই যে, দ্রুততর কলের উন্নতি সত্ত্বেও বেকার মজুর বাড়ে নাই। সত্য কথা, আজ যদি প্রত্যেক মনিব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয় যে, এফিসেন্সি রক্ষা করিবে বা বাড়াইবে, তবে বাণিজ্য-জগতে কিছু উলট্-পালট ঘটিবে। কিন্তু

সেটা অস্থায়ী ও সময়ে অবস্থার ঢের উন্নতি হইবে। অবশ্য দেশ জুড়িয়া এক কালে এফিসেন্সির প্রবর্ত্তন আশা করা চলে না। কিন্তু সকলের আগে দরকার যে, যারা অপটু তারা নিজেদের অপটুতা সম্বন্ধে সচেতন হইবে ও তা দূর করিতে সচেষ্ট হইবে। লোকে নিজের অপূর্ণতা বুঝিতে পারে না বলিয়াই যত বিপদ।

এফিসেন্সির উপায়

এফিসেন্সি বাড়ান দরকার, একথা যেন বুঝা গেল। কিন্তু এই এফিসেন্সি বাড়াইবার উপায়টা কি?

প্রথম উপায় হইতেছে মনিবে মজুরে প্রীতি স্থাপন। এই প্রীতির অভাবে গুরুতর জাতীয় ক্ষতি ঘটিতেছে। বস্তুতঃ, এই প্রীতি বা ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না, যদি মনিবেরা দেশের ও মানব জাতির স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া শুধু ব্যালান্স শীটের দিকে তাকায়। মনিবদের দৃষ্টি থাকিবে কিসে মজুরদের জীবনযাত্রার ধারায় উন্নতি ঘটে। মজুরকে ভাতে মারিয়া যদি খুব মুনাফা জুটে, বুঝিতে হইবে বিফলতাই লাভ হইয়াছে। কোন মনিব যদি একবার মজুরদের এই কথাটায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারে যে সে সত্যই তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, নিজের ও অংশীদারের স্বার্থের চেয়ে তাদের স্বার্থকে একটুও কম বলিয়া মনে করে না, তবে সহযোগিতার ভিত্তি অতি সহজেই স্থাপিত হইতে পারে।

মনিবদের এই প্রকার দৃষ্টিই যথেষ্ট হইবে না। এটা প্রধান হইলেও, কল্পনা-শক্তি বা দূর দৃষ্টিকেও একটা বড় স্থান দিতে হইবে। যে মনিব মজুরের সম্পূর্ণ সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকে কল্পনা করিয়া বুঝিতে হইবে, ঐ অবস্থায় সে ব্যবসায় প্রাণপাত খাটিতে রাজী হইবে কখন অর্থাৎ কোন্ মজুরিতে।

লোকে একটা কল কত না সাবধানতার সহিত ব্যবহার করে। তার জন্য কত না যত্ন ও মনোযোগ,—পাছে কল বিগড়াইয়া যায়। দামী কলকে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়া বিস্তর ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করে। আর মজুরের বেলা কি দেখি? মজুর ত সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম কলের চেয়েও সূক্ষ্ম। তবুত এখানে কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা মনে পড়ে না। নিয়োগ বিভাগ অনেক স্থানে নাই। যেখানে আছে সেখানেও এটা অত্যন্ত অবজ্ঞার বিষয়—বাজে খরচ।

আশা করা হয় যে, মজুরেরা কারখানার প্রতি দরদ ও মমতা দেখাইবে। অথচ সারা জীবনের মধ্যে তাদের কখনও বলা হয় না, ফ্যাক্টরির মূলগত কথাটা কি বা কোথায় কি ঘটিতেছে। মনিবদের ফ্যাক্টরি চালাইয়া মুনাফা বাহির করিতে হইবে ও প্রতি অংশীদারকে লভ্যাংশ বিতরণ করিতে হইবে। কিন্তু একথা কি মজুরদের সাধারণতঃ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে পুঁজিপাটা খাটাইয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিলেই সমগ্র ব্যবসাটা দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে ও মজুরি পাইবার পক্ষে এক স্থায়ী ফণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে?

মনিব মজুরে প্রীতির তৃতীয় কথা হইতেছে আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মনিবের মজুরদের সঙ্গে আরও বেশী খোলা-খুলি হওয়া। ব্যবসা সংক্রান্ত সকল কথাই মজুরদের কাছে গোপন করিয়া যাওয়া হয়। তারা ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না। এ প্রথা নিন্দনীয়। মজুরদের, বিশেষতঃ তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সময় সময় ব্যবসার অবস্থাটা আলোচনা করা সকল দিক্ হইতেই কল্যাণকর হইতে পারে।

এই সব দিকেই মনিবেরা উদ্যোগী হইয়া অনেক-কিছু করিতে পারে।

ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট্ অব্ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সাইকোলজি

এফিসেন্সির অন্যান্য উপায়ও আছে। এ বিষয়ে "বাণিজ্যিক মনস্তত্ত্বের জাতীয় মন্দিরের" কার্য্যকলাপ উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন খরচা যে কতদূর কমান যায় তা এই মন্দির দেখাইয়াছে। সমিতি নানা ফ্যাক্টরিতে গবেষক পাঠাইয়া সর্ব্বত্র অদ্ভুত ফল দেখাইয়াছে।

রিপোর্ট হইতে জানি যে, এক মোটরকার ব্যবসায়ে উৎপাদন বাড়িয়াছে ২৮%, তেল পরিষ্কারের ব্যবসায়ে ৩৩%, ব্যাঙ্ক বিভাগে ১০% প্লেটের খনিতে ৫০%, চকোলেট ফ্যাক্টরিতে ৪০%, এক পশমের কারখানায় যানবাহন কমান গিয়াছে ৭৫%।

ব্যবসা পরিচালনা সমিতি

রৌনট্রী প্রবন্ধ শেষে বলিতেছেন, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে, চেকো-স্লোভাকিয়াতে, বেলজিয়ামে, পোল্যাণ্ডে রুমানিয়ায়, জুগো-শ্লাভিয়ায়, অষ্ট্রিয়ায়, স্পেনে ও রুশিয়াতে এবং আমেরিকাতে এক একটা "ম্যানেজমেণ্ট এসোসিয়েশন" বা ব্যবসা পরিচালনা সমিতি মোতায়েন আছে। এ বিষয়ে একমাত্র ইংল্যাণ্ডই সৃষ্টিছাড়া দেশ। এরূপ কোন সমিতি সেখানে নাই। এর অর্থ কি?

ইংল্যাণ্ড না "দুনিয়ার কারখানা" হইতে চায়? অথচ এমন একটা দরকারী প্রতিষ্ঠান সেখানে নাই! মনিবেরা উদাসীন। ইংল্যাণ্ডে "ফেডারেশন অব্ বৃটিশ ইন্ডাষ্ট্রিজ্" ও "ন্যাশনাল কন্‌ফেডারেশন অব্ এম্প্লয়ার্স্ অর্গ্যানিজেশন" আছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। ব্যবসা-পরিচালনাও বিজ্ঞান-বিশেষ। তা শিখা, উৎপাদন খরচা কমাইবার ও এফিসেন্সি বাড়াইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আয়ত্ত করা ও মজুরে মনিবে প্রীতির সম্পর্ক বাড়ান হইতেছে পরিচালনা-সমিতির উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি জেনেভাতে এক আন্তর্জাতিক পরিচালনা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এক দেশের সমিতির সহিত অন্য দেশের সমিতির যোগস্থাপন ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে মাথাই নাই, মাথা ব্যথা করিবে কিরূপে?

"নীহার" (কাঁথি)

বন্যা-বিপদ ও প্রতিকারের উপায়

সুবর্ণরেখার বন্যা হইতে প্রায়ই কাঁথি মহকুমার বন্যা হইয়া থাকে। সুবর্ণরেখার বন্যা সম্বন্ধে অনেকেই বলেন, রেলের বাঁধের জন্য ইহা হইয়া থাকে। একথা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। কেননা তাহা হইলে বন্যার প্রকোপ রেল বাঁধের অন্যপারেও অনুভূত হইত। বন্যার কারণ-সমষ্টির মধ্যে এ স্থলে রেল বাঁধ অন্যতম কারণও নয়। বরং রেল বাঁধে বাধা পাইয়া বন্যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার কথা, কিন্তু সুবর্ণরেখা বেলা তাহাও হয় না। উড়িষ্যার রেবা নদীর বন্যায় দেখা গিয়াছে যে, সেখানে রেল লাইন ধুইয়া গিয়াছে বাঁধের চিহ্ন পর্য্যন্তও লোপ পাইয়াছে। সুবর্ণরেখার বেলায় তাহা হয় নাই এবং কখনও হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তবে বন্যার কারণ কি?

বিগত বন্যার পর আমি একখানি ছোট ডিঙ্গী নৌকায় বুড়ি বলঙ্গ নদীর মোহনা হইতে পিপলি মোহনা পর্য্যন্ত সমস্ত নদীর মোহনা দেখিয়া আসিয়াছি। দেশের লোকের অজ্ঞতা ও গভর্ণমেণ্টের অবহেলার জন্য নদীর মোহনা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া ও চড়া পড়িয়া একরূপ বন্ধ হইতে বসিয়াছে। ইহাই ঘন ঘন বন্যা হইবার কারণ বলিয়া মনে হয়।

নদীগুলিকে যদি পরিষ্কার করা না হয়, যদি মোহনা সংস্কার করিয়া গভীর করা না হয়, তবে কাঁথি মহকুমা, জলেশ্বর ও ভোগরাই থানা এবং বালীয়া পাল থানার কতক অংশ ম্যালেরিয়ায় জনশূন্য হইয়া যাইবে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ওমেলি সাহেবের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, সুবর্ণরেখার মোহনায় পিপলি নামক একটি বন্দর ছিল। সেখানে ইউরোপ হইতে বড় বড় জাহাজ সকল আসিয়া নঙ্গর করিত ও বহু লক্ষ টাকার মাদুর, কাপড়, কাঁসা ও পিত্তলের নানাবিধ বাসন ও খেলনাদি লইয়া যাইত। এখন সেখানে বন্দরের চিহ্নমাত্র নাই। কেবল জালিকগণের ও দেশী নৌকার দাঁড়ীমাঝির নিকট 'পিপলি মোহনা' নামে পরিচিত রহিয়াছে। এই বন্দর হইতে অতি অল্প দূরে দীঘা নামক এক স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। বড় বড় সাহেবগণ এই স্থানে গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় বসবাস করিতেন। এই সব স্থান এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

১৯১২ সন পর্য্যন্ত কাঁথি মহকুমা ও বালেশ্বর জেলা একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অধীন ছিল। তাঁহার অধীনে কাঁথিতে একজন সব ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁহার এলাকা সুবর্ণরেখা হইতে গেঁওখালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে বন্যা হইলে সেই সবইঞ্জিনীয়ার লক গেট আদি খুলিয়া দিতেন। এখন সেটী হইবার যো নাই। এইটীও একটা বিবেচ্য বিষয়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর গিরি।



লড়াই আর লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগ

কোনো কোনো বিষয়ে ১৯০৫ সনকে আমরা বর্ত্তমান জগতের প্রথম বর্ষ সমঝিয়া থাকি। ১৯০৫-১০ এই পাঁচ বৎসরকে বর্ত্তমান জগতের আদি অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে। যুবক ভারতের কৃতিত্ব কতটা বাড়িতেছে কমিতেছে, ভারতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার কতটা উন্নতি সাধিত হইতেছে এই সব বুঝিবার জন্য ১৯০৫—১৯১০ সনের ভারতকে আর ১৯০৫-১০ সনের দুনিয়াকে সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা আমাদের দস্তুর।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ১৯১৪-১৮ সনের লড়াইটা জগতের সর্ব্বত্র আর ভারতেও একটা আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় যুগান্তর ঘটাইয়া ছাড়িয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান জগৎ বলিলে ১৯১৮ সনের পরবর্ত্তী দুনিয়াটাই বুঝিয়া রাখা উচিত। যুবক ভারতের ধনবিজ্ঞানসেবক আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সেবকগণকে পুরাপুরি বর্ত্তমাননিষ্ঠ হইবার জন্য ১৯১৪-১৮ সনের ধনদৌলত, রাষ্ট্রীয় লেনদেন আর আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাগুলা সর্ব্বদা কব্জার ভিতর রাখিতে হইবে। লড়াইয়ের বৎসর পাঁচেক সম্বন্ধে সকল প্রকার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় তথ্য মাথায় না রাখিলে একালের জন্য কর্ত্তব্যপালনে যোগ্যতা জন্মিবে না। লড়াইয়ের পর আজ দশ বৎসর চলিয়া যাইতেছে। এই দশ বৎসরের মানবসমাজও যুবক ভারতের "ঐতিহাসিক" গবেষণার বস্তু হওয়া আবশ্যক।

জগতের অন্যান্য দেশে লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে লড়াইটা আর লড়াইয়ের পরবর্ত্তী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব কিছুই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে খুব বড় ঠাঁই অধিকার করিতেছে। এই সকল বিষয়ে পঠনপাঠন ত চলেই তুমুল বেগে; অধিকন্তু এই সকল তথ্য লইয়া "রীসার্চ," গবেষণা, অনুসন্ধান, মৌলিক ব্যাখ্যা-সমালোচনা আর পুস্তিকা প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি প্রকাশ চলিতেছে অজস্র। "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকগণের নিকট তাহার কিছু কিছু ধরিয়া দেওয়া হইয়াছেও। কিন্তু ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত মহলের নানা মজলিসে লড়াইয়ের আর লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগটা যেন এখনো জোরের সহিত তাহার প্রভাব ছড়াইতে পারে নাই। এই সকল বিষয়ে বাঙালীর লেখা বই বা সন্দর্ভও সাধারণতঃ একটা চোখে পড়ে না।

বিলাতী রাজস্ব

যাহা হউক এই সংখ্যায় মার্কিণ বর্ত্তমান-নিষ্ঠার সামান্য পরিচয় দিতেছি। নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং নামক বিপুল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান আমাদের নিকট একখানা বই পাঠাইয়াছেন। নাম "ইংলিশ পাবলিক ফিনান্স" (বিলাতের সরকারী আয়ব্যয়)। বইয়ে বিলাতী রাজস্ব-ব্যবস্থার একাল-সেকাল সবই আছে; তবে একালটার সম্বন্ধেই কয়েকটা কথা বলিব।

রাজস্ব বস্তুটা আর্থিক জীবনের একটা বড় জিনিষ। বাঙালীরা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে এইদিকে বিশেষ নজর দিত না। তবে ১৯০৫ সনের যুগে এদিকে আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকজনের নজর কিছু কিছু পড়িতে থাকে। বোধ হয় বিগত পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর,—বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে "স্বরাজ দলের" মাথা তুলিবার পর—বাংলা গবর্ণমেণ্টের সরকারী আয়ব্যয় সম্বন্ধে মাথা খেলাইবার জন্য বাঙালী লেখক, সম্পাদক ও রাষ্ট্রিকদের দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে। যতই আমাদের স্বদেশী-স্বরাজ

আন্দোলন আর আর্থিক উন্নতির প্রয়াস বাড়িতে থাকিবে ততই রাজস্ব সম্বন্ধে বাঙালীর দৃষ্টি ক্রমশই আরও তীক্ষ্ণ হইতে থাকিবে।

বাঙালীর ২৷৵০ বনাম ইংরেজ ২৫৲

বিদেশী রাজস্বে নাক গুঁজিবার পূর্ব্বে স্বদেশী তথ্য দু'একটা বগল-দাবা করিয়া রাখা ভাল। আমাদের বাঙলা দেশের জন্য ১৯২৮-২৯ সনে খরচ করা হইবে প্রায় ১২ কোটি টাকা। নাক গুনতিতে বাঙ্গালী আমরা প্রায় ৪॥০ কোটি ভাইবোন। অর্থাৎ মাথা পিছু প্রায় ২৷৵০ সরকারী খরচ। লোকসংখ্যায় ইংরেজ আর বাঙালী প্রায় সমান। ১৯১৪ সনে লড়াইয়ের সম-সমকালে ইংরেজ জাতও গুনতিতে প্রায় ৪॥০ কোটিই ছিল। সাধারণ "সিবিল" (অর্থাৎ অ-সামরিক) খরচা তাদের তখন ৭॥০ কোটি পাউণ্ড তাহা হইলে প্রায় ১ পাউণ্ড ১৩ শি হয় গড়ে জনপ্রতি সরকারী খরচা। ভারতীয় ১৫৲ টাকায় পাউণ্ড ধরিলে প্রত্যেক ইংরেজের জন্য ১৯১৪ সনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খরচ করিত প্রায় ২৫৲ টাকা। অর্থাৎ বাঙালীর কিস্মৎ যেখানে ২৷৵০ আনা ইংরেজের কিস্মৎ সেখানে ২৫৲। সহজে বুঝা যাইতেছে যে, এক একটা ইংরেজের দাম প্রায় দশ দশটা বাঙালীর সমান। এই তুলনাটা আরও তলাইয়া মজাইয়া বুঝা যাইতে পারে। সে সব খুঁটিনাটি এ যাত্রায় থাক্। যে অনুপাতটা পাওয়া গেল তার কিস্মৎও ঢের।

১ ইংরেজ=৯।১০ বাঙালী

তবে এইখানে গোটা ভারতের সরকারী খরচের বহরটা জুড়িয়া দিলে মন্দ হয় না। আজকাল অর্থাৎ ১৯২৫-২৮ সনের ফী বৎসর গড়ে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা ভারত-সরকারের খরচ হয়। সংক্ষেপে ৬০ কোটি নরনারীর পক্ষে মাথাপিছু পড়ে প্রায় ৪।/০। বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বাঙালীর জন্য তাহা হইলে ২৷৵০ আর ৪।/ অর্থাৎ ৬৸৶০ বা ৭৲ টাকা খরচ করা হয়।

এইবার ইংরেজের জন্য ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল প্রকার খাতে কত খরচ করে তাহা দেখা দরকার। ১৯১৪ সনে ২১।০ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হইয়াছিল। তাহা হইলে ফী ইংরেজ প্রতি গড়ে দাঁড়ায় ৪ পাউণ্ড ৭ শিলিং (প্রায় ৬৫৲)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙালীরা ভারত-সন্তান হিসাবে যেখানে ৭৲ টাকা মাত্র খরচ করে ইংরেজরা সেখানে খরচ করে ৬৫৲। এই হিসাবে প্রত্যেক ইংরেজ "ওজনে" ৯ জন বাঙালীর চেয়ে কিছু বেশী।

শান্তির সময়ে সামরিক খরচ মাথাপিছু ২৫৲

সাড়ে চার কোটি বাঙালী যদি একটা স্বাধীন স্বরাজ গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহার পল্টনের খরচ পড়িবে কত? আজকালকার বৃটিশ ভারতে বাঙালীকে আলগা করিয়া লড়াইয়ের খরচ জোগাইতে হয় না। ভারতীয় ১৩০ কোটি টাকা খরচের ভিতর বাঙালীর দেওয়া হিস্যা আর বাঙালীর জন্য সামরিক খরচটা ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাড়ে চার কোটি ইংরেজ নিজের দেশকে সুরক্ষিত করার জন্য ফী বৎসর সামরিক খরচ বহন করে কত? তাহা হইলেই একটা স্বাধীন বাঙলার সামরিক খরচেরও কিছু আঁচ পাওয়া যাইবে।

বিলাতের সামরিক খরচ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এ খরচ "অ-সামরিক" (অর্থাৎ সিবিল) খরচের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, এমন কি অপেক্ষাকৃত শান্তির সময়েও সামরিক খরচ অ-সামরিক খরচকে ডিঙাইয়া চলিত। ১৯১৪ সনে ৭ কোটি ৭২ লক্ষ পাউণ্ড ছিল সামরিক খরচ। তখন অ-সামরিক খরচ প্রায় ৭॥০ কোটি ছিল।

১৯০৯ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের বিলাতী সামরিক ও অ-সামরিক খরচ নিম্নরূপ :—

বৎসর	সামরিক খরচ (পাউণ্ডে)	অ-সামরিক খরচ (পাউণ্ডে— ডাকঘরের আয়ব্যয় ইহাতে নাই)
১৯০৯	৫ কোটি ৯০ লাখ	৪ কোটি ৯৭লাখ
১৯১০	৬ কোটি ৩০ লাখ	৫ কোটি ৫৭ লাখ

বৎসর	সামরিক	অ-সামরিক
১৯১১	৬ কোটি ৭৮ লাখ	৬ কোটি ৯ লাখ
১৯১২	৭ কোটি ৫ লাখ	৬ কোটি ৭৪ লাখ
১৯১৩	৭ কোটি ২৪ লাখ	৭ কোটি ১ লাখ
১৯১৪	৭ কোটি ৭২ লাখ	৭ কোটি ৫২ লাখ

বিনা লড়াইয়েই ফী ইংরেজকে সামরিক মতলবে খরচ করিতে হয় বৎসরে প্রায় ২৫৲। এই হিসাবটা মনে রাখিলে স্বাধীনতার মাপকাঠি কথঞ্চিৎ মালুম হইবে। যুদ্ধের সময়কার সামরিক খরচ, ত এলাহি কারখানা!

"ভারত-সন্তান" সামরিক মতলবে খরচ করিতেছে কত? ৩০ কোটি নর-নারীর জন্য ১৯২৮-২৯ সনের "ভারতীয়" বাজেটে আছে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা। এই অঙ্ক সকল প্রকার খরচের তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ১৯২০-২১ এই কয় বৎসর ধরিয়া "ভারতীয়" বাজেটের প্রায় আধাআধি ছিল সামরিক খরচ। সহজে অঙ্কটাকে ৬০।৬৫ কোটি ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে প্রত্যেক বাঙালী আর অ-বাঙালী—"ভারত-সন্তান" হিসাবে—গড়পড়তা ২৲ বা ২।০ আনা মাত্র খরচ করিতে অভ্যস্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শান্তির সময়কার সামরিক খরচের মাপেও প্রায় দশ দশটা ভারতবাসীর সমান হইতেছে এক এক ইংরেজ।

আসল লড়াইয়ের খরচা

একটা কথা লক্ষ্য করা দরকার। বর্ত্তমান জগৎ লড়াইয়ের জগৎ। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা একালের নরনারীর স্বধর্ম্ম। যেসকল নরনারী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকেনা,—আর লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন কিছু কিছু "রুধির" (টাকা ইতি ভাবার্থ) ঢালেনা তাহারা মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে,—বুয়ার লড়াইয়ের সম-সমকালে শান্তির সময়কার সামরিক খরচ ছিল বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই খরচ ছিল গড়ে প্রায় ৫॥০-৬ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধে (১৯১০-১৪) দেখিলাম ৬॥০-৭॥০ কোটি।

এইবার কতকটা আসল লড়াইয়ের হিসাব দেখা যাউক। তাহাতেও খরচের বাড়তি নজরে পড়িবে।

সন	লড়াই	মোট খরচ
১৮৫৪-১৮৫৭	ক্রিমিয়ায় রুশ লড়াই	৭ কোটি ৩০লাখ পাউণ্ড (৩বৎসরে)
১৮৯৯-১৯০৩	বুয়ার লড়াই	২৮কোটি ১০লাখ পাউণ্ড (৪বৎসরে)
১৯১৪-১৯১৮	বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র	৯৫৭কোটি পাউণ্ড (৫বৎসরে)

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে ইংরেজ জাতির এত বেশী খরচ হইয়াছে যে, সাধারণ এবং অসাধারণ কোনো লোকই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। অথচ ইহার ভিতর একদম কিছুই "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন।" হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত ২২৬ বৎসরে বৃটিশ সরকার সকল প্রকার সামরিক, অসামরিক এবং লড়াই কার্য্যে যত কিছু খরচ করিয়াছে ১৯১৪ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে তাহার চেয়ে বেশী খরচ করিতে হইয়াছে। ফর্দ্দটা নিম্নরূপ:—

সময়	সকল প্রকার সরকারী খরচ
১৬৮৮-১৯১৪ (২২৬ বৎসর)	১,০৯৪ কোটি পাউণ্ড
১৯১৪-১৯২০ (৬বৎসর)	১,১২৬ কোটি পাউণ্ড

ইহাকেই বলে বর্ত্তমান জগতের আধুনিকতম যুগ,—নবীনের নবীন,—কট্টর নয়া দুনিয়ার আর্থিক খরচ বার্ষিক ১৮৭ কোটি পাউণ্ড।

লড়াইয়ের যুগে খরচ বার্ষিক ১৮৭ কোটি পাউণ্ড

১৯১৪-২০ সনে লড়াইয়ের দিনে সকলপ্রকার মতলবে বৃটিশ গবর্মেণ্টকে খরচ করিতে হইল ১,১২৬ কোটি পাউণ্ড। গড়ে ফী বৎসর পড়িয়াছে ১৮৭ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু ইংরেজ হঠাৎ এত টাকা খরচ করিল কোথা হইতে? ইংরেজের গড়পড়তা খরচ ত ছিল অনেক কম, যথা,—

সন	সরকারী খরচ (সকলপ্রকার)
১৮১৭	৭ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড
১৯১৪	২১ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড।

তাহার পরেই ধাঁ করিয়া ১৯১৬-২০ সনে ফী বৎসর গড়ে ১৮৭ কোটি পাউণ্ড (অর্থাৎ ৯ গুণ) সম্ভবপর হইল কি করিয়া ?

ঋণং কৃত্বা লড়াই চালাও

এই ১,১২৬ কোটি পাউণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ আসিয়াছে ট্যাক্স ও অন্যান্য খাজনা হইতে। ইংরেজরা ট্যাক্স দিতে ডরায় না। খাঁটি নিক্তির ওজনে হিসাব চাপাইলে দেখা যায় যে, এইরূপ খাজনা হইতে আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৩৬ অংশ। অবশিষ্ট ৬৪ অংশ (অর্থাৎ বেশীর ভাগ) আসিয়াছে কর্জ্জ হইতে। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—নীতি অনুসারে জীবন চালাইলে লোকেরা নিন্দনীয় হয় কিনা জানি। কিন্তু "ঋণং কৃত্বা লড়াই চালাও" হইতেছে দুনিয়ার সনাতন দস্তুর। বৃটিশ গবর্মেণ্টও সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই ছয় বৎসরে ৭৩৬৷৷০ কোটি পাউণ্ড কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল।

কর্জ্জ দিল কে ? তিন শ্রেণীর লোক। প্রথমতঃ, ইংরেজরা নিজে বৃটিশ গবর্মেণ্টকে ৬০১ কোটি পাউণ্ড ধার দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ গবর্মেণ্ট মার্কিণ মুল্লুকে কর্জ্জ লইয়াছে ১০২৷৷০ কোটি পাউণ্ড। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ উপনিবেশ ইত্যাদি হইতে কর্জ্জ আসিয়াছে ৩৩ কোটি পাউণ্ড।

কিন্তু বৃটিশ গবর্মেণ্ট বিদেশকে কর্জ্জ দিয়াছেও বিস্তর। প্রথমতঃ, উপনিবেশগুলা কর্জ্জ লইয়াছে ১৮৷৷০ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয়তঃ, লড়াইয়ের "অ্যালাইজ" অর্থাৎ ইংরেজ-পক্ষীয় বিদেশী ইয়ারের দল বৃটিশ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়াছে ১৬১৷৷০ কোটি পাউণ্ড। ইংরেজের কর্জ্জ লেনা-দেনাটা নিম্নের সংখ্যায় বিবৃত হইতেছ। হিসাবটা কোটি পাউণ্ডে।

ইংরেজ কর্জ্জ লইয়াছে		ইংরেজ কর্জ্জ দিয়াছে	
নিজ দেশে	৬০১	অ্যালাইদিগকে	১৬৬৷৷০
মার্কিণ মুল্লুকে	১০২৷৷০	উপনিবেশ সমূহকে	১৮৷৷০
উপনিবেশ হইতে	৩৩		
মোট	৭৩৬৷৷০ কোঃ পাঃ		১৮৪ কোঃ পাঃ

বৃটিশ গবর্মেণ্ট ইংরেজদের নিকট হইতে যে কর্জ্জটা লইয়াছে সেটা বাদ দিলে বিদেশের সঙ্গে লগ্নি-কারবারে ইংরেজের অবস্থা কিরূপ ? ইংরেজরা বিদেশকে ধার দিয়াছে ১৮৪ কোটি পাউণ্ড। আর বিদেশ হইতে ধার লইয়াছে ১৩৫৷৷০ কোটি পাউণ্ড। অর্থাৎ বিদেশে ইংরেজদের ধার নাই এক আধলাও। ইংরেজরাই বরং বিদেশ হইতে পাইবে ১৮৪ – ১৩৫৷৷০ অর্থাৎ ৪৮৷৷০ কোটি পাউণ্ড।

ইংরেজ জাতের পায়া কত ভারি এইবার বেশ বুঝা যাইতেছে। এই ছয় বৎসরে তাহারা নিজ ট্যাঁক হইতে সরকারী খরচের জন্য তুলিয়াছে :—

ট্যাক্স ও খাজনা বাবদ	...	৩৩৯ কোটি পাউণ্ড
ঋণ বাবদ	...	৬০১ কোটি পাউণ্ড
বিদেশের জন্য ঋণ বাবদ	...	৪৮৷৷০ কেটি পাউণ্ড
মোটের উপর		৯৮৮৷৷০ কোটি পাউণ্ড

(প্রায় ৯৯০ কোটি পাউণ্ড)।

সাড়ে চার কোটি নরনারী ৯৯০ কোটি পাউণ্ড দিতে পারিয়াছে। গড়ে তাহা হইলে মাথাপিছু ২২০ পাউণ্ড পড়ে। এই গেল ছয় বৎসরের হিসাব। তাহা হইলে ফী বৎসর প্রত্যেক লোক দিয়াছে প্রায় ৩৭ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৫৫৲ টাকা। বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের কোমরের জোর খুব জবরদস্ত।

খাজনার পরিমাণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লড়াইয়ের ছয় বৎসরের সকল প্রকার খরচের মধ্যে শতকরা ৩৬ অংশ আসিয়াছে ট্যাক্স ও অন্যান্য খাজনা হইতে। এই সকল খাজনার আকার-প্রকার দেখা যাউক।

লড়াইয়ের প্রথম বৎসর (১৯১৫ সনে) খাজনা উঠিয়াছিল ১৮ কোটি ৯০ লাখ পাউণ্ড। ইংরেজরা ফী বৎসরই ক্রমশঃ উঁচু হারে খাজনা দিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১৯২০ সনে খাজনা দাঁড়ায় ৯৯ কোটি ৯০ লাখ পাউণ্ড। গবর্মেণ্টের মতলব ছিল যে, খাজনার দ্বারা অ-সামরিক সকল প্রকার খরচ চালানো হইবে। আর পুরাণা কর্জ্জের

সুদ শোধা হইবে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু খাজনা এত উঠিয়াছে যে, এই দুই মতলব হাসিল করিবার পরও অনেক টাকা বাঁচে। এই টাকা খোদ লড়াইয়ের কাজে খরচ করা হইয়াছে। অর্থাৎ একমাত্র কর্জ্জের উপর নির্ভর করিয়া লড়াই চালানো হয় নাই। খাজনার কিয়দংশও লড়াইয়ের খাতে গিয়াছে।

বিলাতী খাজনার আকার-প্রকার

বিলাতে খাজনা উঠে কোন্ কোন্ নামে তাহা জানা দরকার। লড়াইয়ের ছয় বৎসরে (১৯১৫-২০) নিম্নলিখিত সাত দফায় খাজনা উঠিয়াছে। কোন্ কোন্ দফায় কত উঠিয়াছে পাশের অঙ্ক হইতে তাহাও বুঝা যাইবে :—

১।	কাষ্টম বা বহির্ব্বাণিজ্য-শুল্ক (আমদানি-শুল্ক)	৪৯ কোটি ৩০ লাখ পাঃ
২।	এক্সাইজ (আবকারি-শুল্ক)	৩৯ কোটি ২০ লাখ পাঃ
৩।	"এষ্টেট ডিউটীজ" (জমিদারি পাইবার সময় উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে আদায়। ইহাকে "(ডেথ-ডিউটীজ" বা মৃত্যু-করও বলে)	১৯ কোটি ৩০ লাখ পাঃ
৪।	ষ্ট্যাম্প্‌স্	৬ কোটি ৬০ লাখ পাঃ
৫।	জমিজমা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি হইতে আদায়	১ কোটি ৮০ লাখ পাঃ
৬।	সম্পত্তি-কর, আয়-কর	১২৯ কোটি ২০ লাখ পাঃ
৭।	"একসেস-প্রফিট্‌স্" ("অতি-লাভ" কর)	৯৩ কোটি ৫০ লাখ পাঃ
	মোট	৩৩৮ কোটি ৯০ লাখ পাউণ্ড

আমদানি-শুল্ক ও আয়কর

খাজনার নামগুলার কোন কোনোটা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতেছি। প্রথমতঃ, কাষ্টম বা বহির্ব্বাণিজ্য (আমদানি-শুল্ক)। ইংরেজরা সেকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কট্টর "প্রোটেক্‌শুনিষ্ট" (সংরক্ষণশীল) ছিল। বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসানো ছিল তাহাদের দস্তুর। পরে তাহারা ক্রমশঃ অবাধ বা অশুল্ক আমদানি নীতির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে। ১৮৪২ সনে তাহারা ১,২০০ বিভিন্ন মালের উপর আমদানি-শুল্ক উসুল করিত। ১৮৫৩ সনে এই সংখ্যা ৪৬৬ এ নামিয়া আসে। ১৮৬০ সনের শুল্ক-সংস্কারে সংখ্যাটা দাঁড়ায় মাত্র ৪৮ এ। ১৮৮০ সনে বিলাতী শুল্ক-সংস্কার আরও চরমে গিয়া ঠেকে। তখনকার দিনে মাত্র ১০ প্রকার বিদেশী মালের উপর আমদানি-শুল্ক উসুল করা হইত। ১৯১৪ সনে ৫।৬ প্রকার জিনিষ আমদানি-শুল্কের অধীনে থাকে। এইগুলার নাম—(১) তামাক, (২) চা, (৩) চিনি, (৪) স্পিরিট (৫) কোকো, (৬) কাফি।

উপরের, তালিকায় যে ৪৯ কোটি ৩০ লাখ পাউণ্ড দেখানো হইয়াছে তাহার সবই এই ৫।৬ প্রকার জিনিসের উপর আমদানিকর। অবশ্য ছয় বৎসরের আদায়।

আয়কর বস্তুটা ফরাসী সমরের পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৪৩ সনে আবার ইহার সঙ্গে মোলাকাৎ। তখন হইতে আয়-কর পরিমাণে আর হারে বেশ জাঁদরেল হইয়া উঠিয়াছে। লড়াইয়ের ছয় বৎসরে আয়-করকে সবসে মোটা আকারে দেখিতে পাইতেছি।

"অতি-লাভ-কর"টা লড়াইয়ের যুগের অন্যতম আবিষ্কার।

১৯১৪ সনের অ-সামরিক খরচ

লড়াইয়ের আয়-ব্যয় ছাড়িয়া এইবার মামুলি ডাল ভাতের অবস্থাটা কিছু আলোচনা করা যাউক। শান্তির সময়ের "অ-সামরিক (বা সিবিল) খরচের দফাগুলা আলোচনা করিতেছি। ১৯১৪ সনে ৭ কোটি ৫২ লাখ বা ৭॥০ কোটি পাউণ্ড এই দিকে খরচ হইয়াছিল। তাহার ভিতর প্রবেশ করা যাউক। এইখানে আমাদের বাঙলা দেশে ১৯২৭-২৮ সনের জন্য ১২ কোটি টাকা খরচের কথাটা মনে রাখা দরকার হইবে।

বিলাতী খরচের কায়দায় দু'একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু আছে। ৭॥০ কোটি পাউণ্ডের খরচে দেখিতেছি যে,

"দেশ-শাসন" বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহার জন্য খরচ পৌনে দুই কোটিরও কম।

১। সরকারী ইমারত ইত্যাদির জন্য খরচ		৩৩ লাখ
২। সরকারী চাকরদের বেতনাদি	...	৪৩ লাখ
৩। বিচার ইত্যাদি	...	৪৫ লাখ
৪। খাজনা আদায় ইত্যাদি	...	৪৫ লাখ
মোট		১ কোটি ৬৬ লাখ

কিন্তু "সমাজ-সেবার" জন্য সরকারী বাজেট বিপুল; যথা,—

১। শিক্ষা ব্যবস্থার খরচ	...	১ কোটি ৯৪ লাখ
২। বৃদ্ধদের পেন্‌শ্যন ভাতা, সামাজিক জীবন-বীমা ইত্যাদির জন্য সরকারী খরচ	...	১ কোটি ৯৭ লাখ
মোট		৩ কোটি ৯১ লাখ

দেখা যাইতেছে যে, ৭৷৷০ কোটি পাউণ্ডের অর্দ্ধেকেরও বেশী খরচ হয় সমাজ-সেবায় অর্থাৎ দেশের নরনারীর আর্থিক ও আত্মিক পুষ্টি-সাধনের জন্য। আর মাত্র এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশী খরচ হয় দেশ-শাসনের খাতে। অধিকন্তু দেশ-শাসনের জন্য যত খরচ হয় তাহার ডবলেরও বেশী খরচ হয় দেশ-সেবার জন্য।

দেশ-সেবা বনাম দেশ-শাসন

এইবার দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচের ফর্দ্দতে,—

(১) শিক্ষা-বিভাগ	প্রায়	১ কোটি ৪৩ লাখ
(২) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য	...	৯৮ লাখ
(৩) কৃষি ও শিল্প	...	৩৯ লাখ
মোট		২ কোটি ৮০ লাখ টাকা

অর্থাৎ সমগ্র খরচের প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র (তার চেয়ে কিছু বেশী) খরচ হয় দেশ-সেবায় 'আর সবই যায় "দেশ-শাসনে"। বিলাতী রাজস্ব-প্রথায় আর বাঙলার রাজস্ব-প্রথায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বিলাতে গবর্মেণ্ট প্রধানতঃ দেশ-সেবক। বাঙলার গবর্মেণ্ট প্রধানতঃ দেশ-শাসক।

বাঙালী ইংরেজের ৪০ বৎসর পেছনে

এইখানে দেশ-সেবা সম্বন্ধে কিছু তলাইয়া দেখা দরকার। দেশ-সেবা যে গবর্মেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য এই জ্ঞানটা ইয়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিল না। তখনকার দিনে গবর্মেণ্টের আর জনসাধারণের এমন কি পাকা-মাথাওয়ালা লোকেরাও ভাবিত যে, দেশ-সেবা হইতেছে নরনারীর ব্যক্তিগত দায়িত্বের আর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এমন কি শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করাটাও গবর্মেণ্ট স্বধর্ম্মের সামিল সমঝিত না।

বিলাতের দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৩৩ সনে বিলাতী গবর্মেণ্ট শিক্ষার জন্য এক দামড়িও সরকারী বাজেটে রাখে নাই। ১৮৪২ সনে মাত্র ৩ লাখ পাউণ্ড এই জন্য খরচ করা হইয়াছিল। সেই বৎসর ৯৪ লাখ পাউণ্ড বাজেট হয় "অ-সামরিক" (সিবিল) খরচের জন্য। অর্থাৎ তখন সব কিছু খরচই হইত দেশ-শাসনের জন্য।

শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিলাতী গবর্মেণ্টের বাজেট নিম্নের তালিকায় বুঝা যাইবে:—

সন	শিক্ষার খরচ	গোটা সিবিল খরচ
১৮৪২	৩ লাখ পাউণ্ড	৯৪ লাখ পাউণ্ড
১৮৪৫	৫ লাখ "	১ কোটি ১৪ " "
১৮৬৭	১৪ লাখ পাউণ্ড	১ কোটি ৪৫ " "
১৮৭৪	২৪ লাখ "	২ কোটি ২৪ " "
১৮৮৬	৫২ লাখ "	৩ কোটি ৭৯ " "
১৯০৩	১ কোটি ৩৩ লাখ "	৫ কোটি ৮৫ " "
১৯১৪	১ কোটি ৯৪ লাখ "	৭ কোটি ৫২ " "

দেখা যাইতেছে যে, ১৮৮৬ সনেও ইংরেজরা ৩ কোটি ৭৯ লাখ সিবিল খরচের ভিতরে শিক্ষার জন্য খরচ করিয়াছিল ৫২ লাখ মাত্র। অর্থাৎ দেশ-সেবার জন্য খরচ এক-সপ্তমাংশের চেয়েও কম। অনুপাতের দিকে তাকাইলে মনে হইবে যে বাংলা দেশের গবর্মেণ্ট আজ ১৮৮৬ সনের পরবর্ত্তী যুগে আছে। বিংশ শতাব্দীতে এখনো তাহার পদার্পণ হয় নাই।

১৮৯৫ সনের সীমানা পার হইতেও অনেক দেরী। বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে বাঙালী আজ ১৯২৮ সনের প্রায় ৪০ বৎসর পেছনে পড়িয়া আছে।

বিলাতী গবর্মেণ্টের "স্বদেশ-সেবায়" ১৯১৪ সনে আর একটা বড় দফা দেখিতে পাই। তাহার কিম্মৎ ১ কোটি ৯৭ লাখ পাউণ্ড। শিক্ষাব্যবস্থার খরচ ১ কোটি ৯৪ লাখ। কিন্তু তাহার চেয়েও পরিমাণে বড় এই দফাটা। তাহার নাম বৃদ্ধদের ভাতা ও সমাজ-বীমা। এইসব বস্তু উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজরা জানিত না। অবশ্য জার্ম্মাণরা এই বাবদ অনেক-কিছুই খরচ করিত। ১৮৮৬-৮৯ সনের আইনে তাহারা এই সকল সমাজ-বীমা সুরু করে। ইংরেজদের হাতে খড়ি ১৯০৮-১১ সনে। জার্ম্মাণরা ইংরেজদের চেয়ে ২০।২২ বৎসরের বড়।

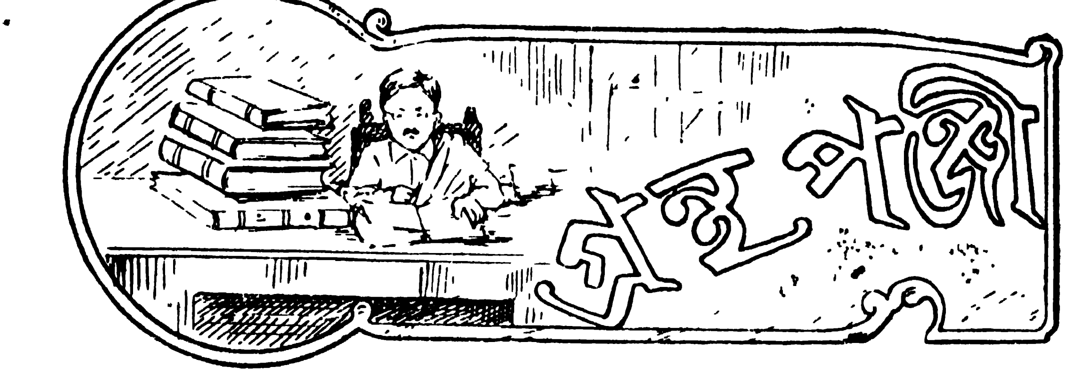
১৯২৭-২৮ সনের বিলাতী আয়-ব্যয়

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে বিলাতী আয়-ব্যয় ১৯১৪ সনের সীমানা টপকাইয়া গিয়াছে সকল দিকেই। ১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর পূর্ণ হইল তাহার আয়-ব্যয় নিম্নরূপ। আয়—৮৪ কোটি ২৮ লাখ, ২৪ হাজার ৪৬৫ পাউণ্ড, ব্যয়—৮৩ কোটি ৮৫ লাখ ৮৫ হাজার ৩৪১ পাউণ্ড।

প্রায় ৪॥০ কোটি নরনারী হইতে সরকারী আয় প্রায় ৮৪ কোটি পাউণ্ড। অতএব গড়ে মাথা পিছু আয় প্রায় ১৮ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ২৪৩৲ টাকা)। আর ১৯২৭-২৮ সনে বাঙালীরা "ভারত-সন্তান" হিসাবে সরকারী খরচ করে প্রায় ৭৲ টাকা মাত্র। অতএব প্রায় ৩৫টা বাঙালীর সমান আজ এক এক ইংরেজ (১৯২৭-২৮ সনে)। কিন্তু ১৯১৪ সনের বিলাতী মাপে বাঙালীরা ১৯২৭-২৮ সনে প্রায় দশ দশটায় এক এক ইংরেজের সমান। অর্থাৎ এই ১৪ বৎসরে ইংরেজ যে হারে বাড়িয়াছে বাঙালী সেই হারে বাড়িতে পারে নাই।

ইংরেজের বাড়তি বাঙালীর বাড়তির চেয়ে বেশী

১৯১৪ সনে ইংরেজ যত সরকারী আয়ব্যয় দেখাইত আজ দেখাইতেছে তাহার প্রায় ৬ গুণ বেশী। অতএব আজ এক একজন ইংরেজ প্রায় ৬০ জন বাঙালীর সমান হইলে ১৯১৪ সনের অনুপাতটা বজায় থাকিত। কিন্তু দেখিতেছি ইংরেজ মাত্র ৩৫ জন বাঙালীর সমান। বুঝিতে হইবে যে বাঙালীর ক্ষমতা বাড়িয়াছে। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির হার বিলাতে যত বেশী বাঙলায় তত বেশী নয়। ইংরেজ যখন বাড়িল ৬ গুণ, বাঙালী তখন বাড়িল মাত্র ১½ গুণ অর্থাৎ ডবলেরও কম। মোটের উপর ১৯১৪ সনে বাঙালীর তুলনায় ইংরেজ যত বড় ছিল আজ ১৯২৮ সনে তাহার চেয়ে বেশী বড় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই হইল রাজস্ব-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বস্তুনিষ্ঠ বিচার।



১। "ত্রেতে দেকোনোমী পোলিটিক" (ধনবিজ্ঞান), আস্তনেলি, ফেলিক্স আল্‌কঁ কোং, প্যারিস, ৩৫ ফ্রাঁ, ১৯২১।

২। "লা রুস্‌সি সোভিয়েটিক্" (সোভিয়েট রুশিয়া), লিঅঁ,—আল্‌কঁ কোং, প্যারিস,—১৮ ফ্রাঁ, ১৯২১।

৩। "লে মেতোদ অঁা সিয়াঁস সোসিয়াল" (সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালী),—হ্বাল্‌হ্বর,—রুসো কোং, প্যারিস, ৩০ ফ্রাঁ, ১৯২১।

৪। "বিজনেস সাইক্‌ল্ থিয়োরি" (ব্যবসা-চক্র-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্ব)—হান্‌সেন,—গুম্ কোং, নিউ-ইয়র্ক, ২৮৮ পৃষ্ঠা, ১৯২১।

৫। পোলিটিক দে তেয়োরি মোনেতেয়ার অঁাগলেজ দা প্রে-গেয়ার (লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের বিলাতী মুদ্রা-দর্শন ও মুদ্রানীতি),— লাজার, সিরে কোং, প্যারিস।

৬। "এ ষ্টাডি ইন পাব্‌লিক ফিনান্স" (রাজস্ব-বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা)—পিগু, ম্যাক্‌মিলান, লণ্ডন, ৩২৩ পৃষ্ঠা, ১৬ শি, ১৯২৮।

৭। "ফ্রী থট্ ইন্ দি সোশ্যাল সায়েন্সেজ (সমাজ-বিষয়ক বিদ্যায় স্বাধীন চিন্তার ঠাঁই)—হব্‌সন,—অ্যালেন কোং, লণ্ডন, ২৮৮ পৃষ্ঠা, ১০ শি, ১৯২৬।

৮। "রিফ্লেস্‌স্তনি সুল একিনিব্রিঅ একনমিক্" (আর্থিক স্থিতি-সাম্যের স্বরূপ-বিচার)"—এম্পলি,—হ্বিতালনে কোং, রেজ্য কালাব্রিয়া,—৭২ পৃষ্ঠা ১৫ লিয়ার ১৯২৬।

৯। "ষ্টেবিলাইজিং বিজনেস্" (শিল্প-বাণিজ্যে স্থিরতা প্রতিষ্ঠা),—সম্পাদক মুন, নিউইয়র্ক, অ্যাকাডেমি অব্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স, ১৫২ পৃষ্ঠা, ১৯২১।

১০। "ইণ্ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড পলিটিক্স" (শিল্প-কারখানা ও রাষ্ট্রনীতি),—মণ্ড্, ম্যাক্‌মিলান, লণ্ডন, ৩৩৭ পৃষ্ঠা, ১৯২১।

১১। "দি ফর্ম্‌স্ অব ওয়ার গবর্ণমেণ্ট ইন ফ্রান্স" (লড়াইয়ের সময়কার বিভিন্ন ফরাসী গবর্মেণ্ট),—রেমুঁর্ভা, নিউহেভ্‌ন্, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস,—১৬৬ পৃষ্ঠা, ২ ডলার ৫০ সেণ্ট, ১৯২১।

১২। "কাভূর একনমিস্তা" (ইতালিয়ান রাষ্ট্রবীর কাভুরের অর্থনীতি),—কামৎসিনি, লাত্তেস কোং, তুরিণ, ২২৩ পৃষ্ঠা, ১৫ লিয়ার, ১৯২৬।

১৩। "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ট্রেড" (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য), টাওসিগ—ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক, ৪২৫ পৃষ্ঠা, ১৯২১।

১৪। "দিবার ডী বেৎসীহুঙ্গেন ৎস্বিশেন আউসেন-হাণ্ডেল উণ্ড ফোল্‌কস্-হ্বোলষ্টাণ্ড" (বহির্ব্বাণিজ্যের সঙ্গে দেশের আর্থিক সম্পদের সম্বন্ধ),—গুসাট্-ফিশার কোং, য়েনা, ২৪ পৃষ্ঠা, ১ মার্ক, ১৯২১।

যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্র*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবীন ধনবিজ্ঞানের নমুনা

আজকালকার দুনিয়ায় ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রে ভাঙন-গড়ন চলিতেছে খুব জোরের সহিত। একটা নবীন ধন-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতেছে। যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্রীদিগের সঙ্গে তাহার কিছু মোলাকাৎ হওয়া আবশ্যক। এক এক শ্লোকে বিপুল মহাভারতের কোনো কোনো পর্ব্ব আওড়াইয়া যাইতেছি।

১। সঙ্কট, চক্র ও কর্জ্জ-নীতি

ইয়োরামেরিকায় পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন "ক্রাইসিস"—বাণিজ্য-সঙ্কট, শিল্প-সঙ্কট বা আর্থিক দুর্যোগ-তত্ত্ব। কাল-বৈশাখী বা ধূমকেতুর মতন কয়েক বৎসর পর পর সংসারে এই দুর্যোগ দেখা দিয়া থাকে। এই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করা, আর সম্ভব হইলে সেটাকে পাকড়াও করিয়া ঘাড় মটকাইয়া দেওয়া হইতেছে নবীন ধন-বিজ্ঞানের এক বড় সমস্যা।

মূল্য-তত্ত্বের আলোচনাও এই দুর্যোগ-তত্ত্বের আনুষঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ধনোৎপাদন, ধন-বিতরণ মজুরির হার, বাজারের দর,—সব-কিছুই আর্থিক কালবৈশাখীর আকার-প্রকার বিশ্লেষণের এ-পীঠ-ও-পীঠ বিশেষ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রানীতি, নোট ছাড়িবার কৌশল, ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্ট-প্রণালী এই সব কথাও দুর্যোগ-তত্ত্বের বড় কথা। কারেন্সী আর ব্যাঙ্কিং স্বাধীনভাবেও বর্ত্তমানে খুব বেশী আলোচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রাইসিস-তত্ত্বের সঙ্গে এই টাকা-কড়ি-তত্ত্বের যোগাযোগ আজকাল বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে।

বাণিজ্য-সঙ্কট দেখা দেয় "সাইক্ল" বা চক্রের আকারে। আর্থিক চক্রের প্রথম অবস্থায় দেদার মজা,—যাহাকে বলে "বুম"। তাহার পর ভ ঙ্ক ক ট, শেষ পর্য্যন্ত অবসান বা "ডিপ্রেশ্যন"। বেকার-সমস্যা আর পুঁজির অপব্যয় এই সবের আনুষঙ্গিক। আবার ধীরে ধীরে স্থিতি-সাম্যে পুনর্গমন। আর্থিক উঠা-নামার ধারা হইল এইরূপ।

ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধনবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।

আলোচনার একটু নমুনা দেখাইতেছি। বাজার-দরের ওঠা-নামাই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। এইটাকে কাবু করিতে পারিলেই আর্থিক সমতা সাধিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা করা যায় কি করিয়া? তাহার জন্য চাই বাণিজ্যের ওলট-পালট বা অতি দ্রুত পরিবর্ত্তন (ফ্লাকচুয়েশ্যন) বন্ধ করা। বাণিজ্য-বস্তুটা অর্থাৎ লেন-দেন, কেনা-বেচা, আমদানি-রপ্তানি নির্ভর করে ব্যাঙ্কের উপর। কেননা ব্যাঙ্কগুলা কারবারকে যেরূপ কর্জ্জ দেয় তাহার উপরেই নির্ভর করে মাল কেনা-বেচার আকার-প্রকার। ব্যাঙ্ক যদি বেপারীকে অতি সহজে মালের রসিদ দেখিবামাত্র টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে বেপারীরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে। আর তাহারা একেবারে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া বাজারে মাল চালাইতে লাগিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, ব্যাঙ্কগুলা সহজে টাকা ছাড়িতে

---

* ঢাকা জেলার যুবক-সম্মেলনে অর্থনৈতিক বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ (১৯২৭ সন)।

রাজি হয় কেন? তাহাদের তহবিলে কাঁচা টাকা অনেক মজুত হয় বলিয়া। কিন্তু কাঁচা টাকা মজুতই বা হয় কেন? দেশের গবর্মেণ্ট অথবা নোট-ব্যাঙ্ক যদি অনেক পরিমাণ সোনার মালিক হইয়া পড়ে, আর সোনা পাইবামাত্র তাহার সমান দামের নোট ছাড়িতে সুরু করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলাও টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে থাকিবে।

অতএব প্রধান সমস্যা হইতেছে ব্যাঙ্কগুলাকে টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে না দেওয়া। অর্থাৎ বেপারীদিগকে কর্জ্জ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কগুলার হাতে কম থাকিলেই অথবা উচিত পরিমাণের মাত্রা ছাড়াইয়া না গেলেই আপদঃ শান্তিঃ। তাহা হইলে কর্জ্জ-নীতিকে শাসন ও সংযত করা দাঁড়াইতেছে বর্ত্তমান দুনিয়ার আসল রাষ্ট্র-নীতি ও অর্থ-শাস্ত্র।

২। নয়া বিলাতে জমিদারি

এক গ্রন্থে আরুইন ও পীল নামক দুইজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন,—মান্ধাতার আমলের জমিদারি প্রথা বিলাতে এখনো চলিতেছে। তাহা উঠাইয়া দেওয়া দরকার। প্রজা, রায়ত ইত্যাদি নামের লোক ইংরেজ সমাজে আর থাকিবে না। প্রত্যেক চাষীই নিজ নিজ জমির মালিক হইবে। আর এই ব্যবস্থায় "স্বত্বের যাদুতে বালু হইবে সোনায় পরিণত"। লেখকদের একজনও বোল্‌শেভিক-পন্থী নন। কৃষিবিজ্ঞানে সুদক্ষ বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি আছে।

১৯২৩ সনে "লিবার্য্যাল" দলের রাষ্ট্রনায়কেরা একটা কমিটি কায়েম করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ভূমি-সমস্যা আলোচনা করিয়া কমিটি মন্তব্য প্রচার করিয়াছে।

কমিটির মতে চাষ-আবাদের প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজ-সমাজে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। জমিদারি প্রথা উঠাইয়া না দিলে বিলাতে কৃষিসংস্কার অসম্ভব। গবর্মেণ্টের হাতে সকল আবাদী জমির দখল আসুক। যে সকল চাষীরা জমি চাষ করিতে প্রস্তুত এবং সমর্থ, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে জমি ভাড়া দেওয়া উচিত। জমিদারদের জমি কিনিয়া লইয়া গবর্মেণ্ট তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার দায়িত্ব লইতে বাধ্য। কিন্তু যে সব কিষাণ বা জমিদার নিজ হাতে অথবা মজুর খাটাইয়া জমি চষিতে অভ্যস্ত তাহাদের জমি কাড়িয়া লইবার প্রয়োজন নাই।

এই ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থায় ছোট ছোট বহুসংখ্যক চাষী সৃষ্ট হইবার কথা। তাহাদের হাতে হয়ত অনেক সময়েই প্রচুর পুঁজি না থাকিতেও পারে। কিন্তু পুঁজি দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা গবর্মেণ্টের একটা বড় কর্ত্তব্য থাকিবে। এই জন্য ভূমি-বিষয়ক কর্জ্জ-ব্যবস্থা নূতন সরকারী আইনের অন্যতম অঙ্গ হইবে।

বিলাতে আজকাল যে আদর্শে জমিজমার আইন-কানুন গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন চলিতেছে তাহার গোড়া ঢুঁড়িতে হইবে জার্ম্মাণির আইন-কানুনের ভিতর। বার্লিনের অধ্যাপক জেরিং এই আদর্শের অন্যতম জন্মদাতা।

মনে রাখিতে হইবে যে, লিবার্য্যাল দলের মাথায় আছেন লয়েড জর্জ্জ আর লর্ড অ্যাস্‌কুইথ। তাঁহারা এবং তাঁহাদের পেটোআরা এমন কি মজুরপন্থীও নন আর বোলশেভিক ত ননই।

৩। বিশ্ব-বাণিজ্যের বিজ্ঞান-বস্তু

মাল আমদানি-রপ্তানির কারবারে করিৎকর্ম্মা বেপারীদের কর্ম্মকাণ্ডই আমাদের একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দুনিয়ায় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-কাণ্ডের ঠাঁইও খুব বড়। কর্ম্মদক্ষ ব্যবসায়ী হইতে হইলে এই "তত্ত্বাংশ", "বিজ্ঞান-বস্তু" বা "থিয়োরি"র তরফটাও বুঝিয়া দেখা দরকার। এই বিষয়ে এক উঁচু দরের বই সম্প্রতি ইতালিয়ান ভাষায় বাহির হইয়াছে। লেখক জেনোআ শহরের ব্যবসায়-কলেজে এবং মিলান শহরের ব্যবসায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। নাম আর্ত্তিলিও কাব্যাতি।

আজকালকার দিনে প্রত্যেক দেশের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে জটিলতা দেখা দিয়াছে। আমদানি-রপ্তানির তালিকা দেখিয়াই দুনিয়ার মালের চলাচল সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা যায় না। যে দেশে রপ্তানি হইতেছে ঠিক সেই দেশই হয় ত মালটার আসল ক্রেতা নয়। এই মালই

আবার অন্য কোন দেশে রপ্তানি হইতে পারে। অপর দিকে প্রত্যেক দেশেই আমদানি-রপ্তানির যন্ত্রে যথেষ্ট পাক-চক্র দেখা যায়। মাল অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের জিম্মায় থাকে। বীমাকোম্পানীর হাত, যাতায়াত অর্থাৎ রেল জাহাজ সংক্রান্ত কোম্পানীর হাত এবং মালগুদামওয়ালা কোম্পানী ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবসায়-সঙ্ঘের মধ্যস্থতার ফলে মালের গতিবিধি স্পষ্টরূপে ঠাওরাইয়া উঠা কঠিন হয়। বাস্তবিক পক্ষে কোন্ ব্যক্তি বা কোম্পানী ক্রেতা এবং কেই বা যে বিক্রেতা এই সামান্য বিষয়েই পরিষ্কার ধারণা জন্মে না।

তাহার উপর গোলযোগ উপস্থিত হয় মালের দাম দিবার প্রণালীতে। "কাগজে-কলমে দামটা অবশ্য টাকা-পয়সায়ই বুঝাইয়া দিবার দস্তুর আছে। কিন্তু কোনো দেশ হইতে অপর কোনো দেশে নগদ মুদ্রার চলাচল হয় যার পর নাই কম। সংসারে দেখিতে পাই কেবল মালেরই গতিবিধি। এক দেশের টাকা অন্যদেশে রপ্তানি হয় না বলিলেই ঠিক হয়। চলে কেবল "চেক" বা "কাগজ" আর মাল।

কাজেই বিশ্ববাণিজ্যের জটিলতা যারপরনাই বাড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। এই জটিল পাকচক্রের ভিতরও কোনো সূত্র চুঁড়িয়া পাওয়া সম্ভব কি? সেই সূত্রগুলা আবিষ্কার করাই বিজ্ঞান বা দর্শনের কাজ।

প্রথম সূত্র এই যে, কোনো মাল যখন বিদেশে বেচা হয় তখন তাহার পরিবর্তে বিদেশ হইতে পাওয়া যায় অন্য কোনো মাল। বিদেশে যদি স্বদেশী মাল বেচিতে চাও, ত কোনো না কোনো বিদেশী মাল কিনিতে হইবেই হইবে। মালে মালে বিনিময়ই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথা। এক মালের দাম হইতেছে অপর এক মাল। মালে মালে কাটাকাটি হইয়া গেলেই আমদানি-রপ্তানির মামলা চুকিয়া যায়।

অতএব বিজ্ঞানের আসল সমস্যা হইতেছে, কোন্ মালের পরিবর্তে কোন্ মাল পাওয়া যায় তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা। অন্তর্বাণিজ্যের বেলায় মালে মালে অদল-বদল মান্ধাতার আমলে দেখা যাইত। তাহা অবশ্য আজ-কালকার দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার ঠাঁইয়ে দেখিতে পাই মুদ্রার সাহায্যে মূল্য-নিরূপণ এবং মূল্যে মূল্যে সমতা-স্থাপন ও কাটাকাটি। আমদানি-রপ্তানির কারবারেও সেই নিয়মটাই খাটিতেছে। তবে এই সমতা-স্থাপনের কারবারে মুদ্রার ঠাঁই এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

আমদানিতে রপ্তানিতে যদি সমতা না ঘটে অর্থাৎ যদি পরস্পর কাটাকাটির সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সমতা-স্থাপন এবং কাটাকাটি না ঘটা পর্য্যন্ত বাণিজ্য-জগতে অস্থিরতা বিরাজ করে। ঘরোআ বাজারে মূল্য-বৃদ্ধি নামক "অসাম্য" ঘটিলে মাল-স্রষ্টারা লোভে পড়িয়া অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়। মালের পরিমাণ বাড়িবামাত্র ক্রমশঃ আবার দাম কমিতে সুরু করে। শেষ পর্য্যন্ত ক্রেতায় বিক্রেতায় সাম্য দেখা দেয়। আমদানি-রপ্তানির মুল্লুকেও এই সোজা নিয়মটাই সর্ব্বদা কাজ করে। নানা দিক্ হইতে নানা শক্তি আসিয়া অসাম্যের অবস্থাকে সাম্যের দিকে লইয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক দেশ ও লোকের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। অধিকন্তু, কোন্ দেশের চাহিদা বাড়িবামাত্র কোন্ দেশে মাল তৈয়ারী করিবার হুজুগ চাগে তাহা অনেক সময়েই ধরিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে বিশ্ব-বাণিজ্যের সমতা-সাধন কাণ্ডটা সহজে পাকড়াও করা সম্ভব নয়।

কাব্যাতি এই সাধারণ সূত্র দিয়াই জটিলতম লেনদেন-ময় বিশ্ব-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিতেছেন। বুঝা যাইতেছে যে,—ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার অন্যতম জন্মদাতা ইংরেজ-রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এক শতাব্দী পরেও আমরা সেই সকল সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি।

আর একটা সূত্র কাব্যাতির গ্রন্থে পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। ইনি বলিতেছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সমতা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল তাহা পুরাপুরি খাটে সোনায় প্রতিষ্ঠিত মুদ্রানীতির আমলে। দুনিয়ায় একটা বড় গোছের লড়াই বাধিবামাত্র আমদানি-রপ্তানির

কারবারে সমতা বাঁচাইয়া চলা খুবই কঠিন। তখন আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া টাকার বিনিময়-হার সম্বন্ধে দর-কষাকষি করিতে হয়। অধিকন্তু, প্রত্যেক দেশেই তখন গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ এবং আইন-কানুনই ব্যবসা-বাণিজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতারূপে দেখা দেয়। কিন্তু তখনও এইসকল বৈঠক এবং সরকারী শাসনের সাহায্যে একটা চলনসই বাণিজ্যিক "স্থিতি" বা সাম্য খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টাই চলিতে থাকে।

গ্রন্থকারের তৃতীয় বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লড়াইয়ের পর হইতে মুদ্রায় মুদ্রায় বিনিময়ের হার লইয়া মহা দুর্যোগ চলিতেছে। যে সকল দেশের মুদ্রা-প্রণালী এখনো পুনর্গঠিত হইয়া স্থিরতা লাভ করে নাই, তাহাদের অসুবিধা ঢের। কাব্যাতির মতে কোনো প্রকার কৃত্রিম কৌশলে সিক্কার স্থিরতা আনা সম্ভবপর হইবে না। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ সোনায় প্রতিষ্ঠিত সিক্কা-প্রণালী প্রচলিত ছিল সেইরূপ ব্যবস্থাই পুনরায় কায়েম করা আবশ্যক।

৪। রুশ চাষী ও মূল্য-তত্ত্ব

আমাদের ভারতে এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা চাষীদিগকে পল্লী-প্রেমিক, কুটির-শিল্পী, পরিবার-সেবী রূপে বিবৃত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দর্শনে চাষী-চরিত্র শহুরো-চরিত্র হইতে পুরাপুরি পৃথক। এই ধরণের মত কোনো কোনো বিদেশী পণ্ডিতের মতেরই ছায়াবিশেষ। রুশিয়ায় এই দর্শন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। নারদ্নি-প্রবর্ত্তিত "কট্টর স্বদেশী" দল এইরূপ মন্তের প্রচারক।

এই মত কতটা টেঁকসই তাহার বিচারও চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া। সম্প্রতি রুশ পণ্ডিত স্তুদেনস্কি প্রণীত দুইখানা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। কৃষি-ব্যবস্থাকে মূল্য-বিজ্ঞানের ভিতর ফেলিয়া লেখক আর্থিক জগতের একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতে চাষ-আবাদ বলিলে দুই শ্রেণীর কাজ বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ, আধুনিক বা নব্য কৃষি-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে পুঁজিনীতি-শাসিতরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে। আজকালকার ফ্যাক্টরিতে, ব্যাঙ্কে, আমদানি-রপ্তানিতে যে ধরণের "পুঁজি-শাহী" বা পুজিতন্ত্র চলে, চাষ-আবাদের কাজেও সেই ধরণেরই মূলধন-মাহাত্ম্য, মজুর-মালিক সম্বন্ধ, বাজারে কেনা বেচার রীতি দেখা যায়।

বর্ত্তমান জগতের অন্য প্রকার চাষ-ব্যবস্থা হইতেছে প্রাক্‌-পুঁজিসাহীর অন্তর্গত। এই ব্যবস্থাকে সহজে "সেকেলে", আদিম বা মান্ধাতার আমলের কৃষিকর্ম্ম বলা চলে। এই কৃষিকে "প্রাকৃত" বলিলে পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত কৃষিকে "সংস্কৃত" বলিতে পারি।

সাধারণতঃ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে, এই দুই ধরণের চাষ-আবাদে দুই বিভিন্ন ধন-সূত্র খাটে। "প্রাকৃত" কৃষিতে মজুরির নিয়ম, দামের নিয়ম, খরচপত্রের নিয়ম যেরূপ তাহা একালের নিয়ম দেখিয়া বুঝা যায় না। এই মতের বিরুদ্ধে রায় দিয়া স্তুদেনস্কি বলিতেছেন যে,—সকল প্রকার চাষ-ব্যবস্থায়ই এক বিনিময়-নীতি, এক মুদ্রা-নীতি, এক মূল্য-নীতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই পুঁজি-নীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগিতা, টক্কর, বাজারের দর-কষাকষি তথাকথিত "সেকেলে" আদিম বা "অ-সভ্য" কৃষি দুনিয়ায়ও পাকড়াও করা সম্ভব।

স্তুদেনস্কির বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় কতকগুলা নতুন তথ্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বকার রুশিয়ায় চাষীরা উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ বাজারে বেচিত। নিজ পরিবারের ভরণপোষণই তাহাদের কৃষিকর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত না।

কট্টর "স্বদেশী আদর্শের" প্রচারকেরা বলিয়া থাকেন যে, "অ-সভ্য" চাষীরা পারিবারিক ভোগের জন্য যেটুকু দরকার তাহার বেশী ফসল উৎপাদন করে না। স্তুদেনস্কি বলিতেছেন,—তাহা হইলে প্রত্যেক চাষীরই মাসিক বা বার্ষিক আয় ফসলের মাপে সমান হওয়া উচিত। কেননা খাওয়া পরার জন্য প্রত্যেক পরিবারেরই সমান দরকার। আয়ের সমতা "প্রাকৃত" চাষী-সমাজের একটা বিশেষত্ব বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, "সেকেলে" কৃষি-ব্যবস্থায় আয়-সাম্য দেখা যায় কি? যায় না। বরং উল্টাই দেখা গিয়াছে। কোনো ব্যক্তির আয় হয় ত মাত্র

২১ রুব্‌ল, আবার কোনো ব্যক্তির আয় ১০০ রুব্‌ল। পল্লী-গ্রামের আনাড়ি চাষীরা বাজার বুঝে না,—তাহারা খুব সাদাসিধা লোক,—নিজ গৃহস্থালীর জন্য জিনিষ তৈয়ারী হইয়া গেলেই তাহারা স্বর্গসুখ অনুভব করে,—ইত্যাদি কথার পশ্চাতে কোনো নিরেট যুক্তি নাই। "সেকেলে" চাষীরাও নিজ নিজ মেহনৎকে পারিবারিক প্রেমের ডাক বিবেচনা করে না। তাহার দাম কষিয়া দেখিতে তাহারা বেশ পটু।

৫। ধনবিজ্ঞানের জার্ম্মাণ-মূর্ত্তি

ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বলিলে জার্ম্মাণরা সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকে ওপ্পেনহাইমার-প্রণীত এক গ্রন্থ তাহার এক সেরা নমুনা। লেখক ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সমাজ-তত্ত্ববিৎ রূপে ওপ্পেনহাইমারের নামডাক বড়। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার "সিষ্টেম ড্যার সোৎসিও-লোগী" (সমাজ-বিজ্ঞান) বিষয়ক বিপুল চিন্তা-সৌধের অন্যতম খুঁটা।

ফ্রান্সে, বিলাতে এবং ইতালীতে "ধনবিজ্ঞান" শব্দের জন্য "একনমী" "ইকনমিক্‌স" "একনমিয়া" ইত্যাদি শব্দ কায়েম হইয়া থাকে। জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ তাহার জন্য "ফোল্‌ক্‌স্‌-হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স্‌-লেরে" (সার্ব্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা-বিষয়ক বিদ্যা) নাম ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। কোনো কোনো জার্ম্মাণ লেখক "এ্যাকোনোমী" শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। ওপ্পেনহাইমার তাঁহাদের অন্যতম।

কিন্তু ওপ্পেনহাইমারের বইয়ের নামে একটা বিশেষত্ব আছে। জার্ম্মাণির আর্থিক সাহিত্য বুঝিবার জন্য এই বিশেষত্বটার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ফরাসীরা "একোনোমী পোলিটিক" আর ইংরেজরা "পোলিটিক্যাল ইকনমি" নাম ব্যবহার করিবার সময় পোলিটিক্যাল (রাষ্ট্রীয়) বিশেষণটার ইজ্জৎ বড় বেশী দেয় না। "ইক-নমিক্‌স্‌" আর "পোলিটিক্যাল ইকনমি" দুই-ই তাঁহাদের চিন্তায় প্রায় একরূপ। কিন্তু জার্ম্মাণরা "পোলিটিশেন" শব্দ ব্যবহার করিবামাত্র তাহা হইতে পৃথক অ-পোলিটী-ক্যাল (অ-রাষ্ট্রীয়) অতএব 'রাইণ' (অর্থাৎ অমিশ্র) একটা কিছু খাড়া করিতে অভ্যস্ত। আর্থিক ব্যবস্থা ("হ্বির্টশাফ্‌ট") বিষয়ক "লেরে" বা বিদ্যাটা জার্ম্মাণ চিন্তায় দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইহা অমিশ্র বা স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্য কোন বিদ্যার আনুষঙ্গিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এই বিদ্যার অন্তর্গত বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব সেই দিক্‌ হইতেও এই বিদ্যার আলাদা আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই ধরণের বিদ্যাই ওপ্পেনহাইমারের গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের আরম্ভেই গ্রন্থকার বিদ্যার "তত্ত্বাংশ" এবং "কলা" এই দুই বস্তুর প্রভেদ বিচার করিয়াছেন। "ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা" কি তাহার বিশ্লেষণ আছে। এই তত্ত্বের "সীমানা" কোথায় তাহা জানান হইয়াছে। "সমাজ" কাহাকে বলে এবং "আর্থিক ব্যবস্থার বহির্ভূত সমাজ-জীবনে যাহা কিছু থাকিতে পারে তাহার উল্লেখও বাদ পড়ে নাই। পরে আলোচিত হইয়াছে আর্থিক উদ্দেশ্য-সাধনের বিভিন্ন উপায়সমূহ। এইগুলা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত :—(১) রাজনৈতিক, (২) অর্থনৈতিক।

এই গেল ভূমিকা। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে আলোচনা-প্রণালী। ধনবিজ্ঞানের সমস্যাগুলা কোন্‌ কোন্‌ প্রণালীতে কিরূপ আলোচিত হয় তাহার পরিচয় পাইতেছি। আলোচনা-প্রণালীর ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। প্রথমেই আছে "ক্ল্যাসিক্যাল" প্রণালীর কথা। তারপর আছে "ঐতিহাসিক" প্রণালীর কথা। "ঐতিহাসিক" পন্থীরা "ক্লাসিক"-পন্থীদিগকে কিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকে তাহার বৃত্তান্ত আছে। বিজ্ঞান-রাজ্যের এই "দ্বন্দ্ব" কেমন করিয়া সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

"আর্থিক সমাজ-কেন্দ্র" অথবা আর্থিক ব্যবস্থার সমাজ কেমন করিয়া স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে তাহার আলোচনা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "সমবায়"-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। শ্রম-বিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ, কর্ম্ম-বিভাগ একদিকে, আর অপর দিকে শৃঙ্খলা-বিধান, ঐক্যবন্ধন, সামঞ্জস্য-স্থাপন ইত্যাদি সমাজ-জীবনের দুই তরফই যথোচিত উল্লেখ পাইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের

নিট্ ফল কি তাহাও বুঝান হইয়াছে। "সৃষ্টি"-প্রণালীর নিয়ম আর সৃষ্টি করিবার "শক্তিপুঞ্জ" এই উভয় দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। সমাজে শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে কি কি বস্তু দেখিতে পাই? প্রথমতঃ, ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র পরিবার। দ্বিতীয়তঃ পরিবার বৃদ্ধি, এবং তৃতীয়তঃ, বাজার।

প্রথম খণ্ড এইখানেই খতম। এই সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র হইতে অন্ততঃ এইটুকু আন্দাজ করা চলিবে যে, জার্ম্মাণির ছাত্র-ছাত্রীরা ধনবিজ্ঞান হিসাবে যে মাল হজম করিতে অভ্যস্ত ইংরেজ ও মার্কিণ পণ্ডিতদের ভারতীয় শিষ্যেরা তাহাকে সচরাচর ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত করিতে শিখে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে গ্রন্থকার ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে বিদেশী মজুর-কেরাণীর কথা আলোচিত হইয়াছে। আর্থিক সমাজের উচ্চতর কর্ম্মচারীদের কৃতিত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। কর্ম্ম-কেন্দ্রের সকল প্রকার লোকজনের পরস্পর আইনগত সম্বন্ধও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে "গ্যিটার আর্ৎসয়গুঙ্" (ধনোৎপাদন)। মানবীয় সৃষ্টি-কার্য্যে এই "ধনোৎপাদন"ই একমাত্র বস্তু নয়। মাল বিনিময় এবং যান-বাহন এই দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যেও "সৃষ্টি" ঘটিয়া থাকে। ধন সৃষ্ট হইবার পর তাহার শাসন, স্বত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা প্রকার প্রশ্ন উঠে। এই সম্পর্কে সম্পত্তি-বিষয়ক আইন, আয়ের নিয়ম, ধনদৌলতের ভাগাভাগি ইত্যাদি তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় "নাট্সিওনাল এ্যাকোনোমিক" (অর্থাৎ সঙ্ঘগত আর্থিক ব্যবস্থা)। পূর্ব্বের আলোচিত ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থা হইতে এই ব্যবস্থা পৃথক। এই আলোচনার গোড়ার কথা "বাজার"। বাজারের কথা,—বাজারে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিঘ্নস্বরূপ যে সব শক্তি দেখা দেয়,—যথা একচেটিয়া প্রভুত্ব, তাহার বিশ্লেষণও দেখিতেছি। বাজার-বিশ্লেষণের প্রথম তথ্য প্রতিযোগী শক্তিসমূহের "সমতা"-বিধান। এই সমতার উপর আর্থিক কর্ম্মমণ্ডলের "স্থিতি" প্রতিষ্ঠিত। সমতা ও স্থিতির আলোচনাই "মূল্য"-বিজ্ঞানের আসল কথা। সেই সকল কথা গ্রন্থে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিতও হইয়াছে।

মামুলি দ্রব্যের দাম বিশ্লেষণ করিবার পর ওপ্পেনহাইমার মূলধনের কিম্মৎ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক একটা স্থিতি-সমতার অবস্থা আছে সত্য। কিন্তু দ্রব্যগুলার ভিতর পরস্পর-সংযোগের ক্ষেত্রে আর একপ্রকার স্থিতি-সমতার অবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। এই তুলনামূলক এবং আপেক্ষিক স্থিতি-সমতার সম্বন্ধ আলোচনা না করিলে মূল্য-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। ওপ্পেনহাইমার সেই অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। আলোচনার প্রণালী নিম্নরূপ। প্রথমে গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন মালের সঙ্গে তুলনায় প্রত্যেক মালের দাম-সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর দেখান হইয়াছে টাকার হিসাবে মালের দাম এবং মালের হিসাবে টাকার দাম। সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাজারে কর্জ্জ নেওয়া-দেওয়ার প্রভাব বিশ্লেষিত হইয়াছে। বাজার, তুলনামূলক স্থিতি, বিনিময়, ও মূল্য ইত্যাদি যে দুনিয়ায় প্রভাবশালী সেই দুনিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থা শ্রমবিভাগ-নীতির জন্মদাতা। ধনবিজ্ঞানে কাজেই শ্রমবিভাগের কথা এক বড় ঘর অধিকার করে। শ্রমবিভাগ ঘটিয়া থাকে প্রধানতঃ দুই দফায়,—প্রথমতঃ, স্থান বা জনপদ হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বা কর্ম্মহিসাবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে মাল-সৃষ্টির কাণ্ডে এবং মাল-বিতরণের কাণ্ডে দুই দিকেই শ্রমবিভাগ-নীতির প্রভাব-বিশ্লেষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষ কথা "ক্যাপিটালিস্‌মুস" বা পুঁজি-নীতি। বর্ত্তমান জগতে আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বড় বড় ধন-পুঁজির তাঁবে। তাহার প্রভাব বাজার-বিজ্ঞানের উপর অতি প্রবল। কি শ্রমবিভাগ, কি মূল্য, সর্ব্বত্রই কতকগুলা আত্ম-শাসনের বিরোধী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। আর্থিক কর্ম্মকেন্দ্রের কোন অনুষ্ঠানই একমাত্র নিজের প্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। কাজেই পুঁজিপতিদের আর্থিক দুনিয়া সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তা জাগিয়াছে। মাল কিনিবার ক্ষমতায় জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। কাজে

কাজেই মাল-বিতরণের কাণ্ড নেহাৎ সহজ ও সরল নয়। লাভ-লোকসানের হিসাব করা আজকাল বড় কঠিন। সুতরাং মাল-সৃষ্টির কাণ্ড যার পর নাই গোলমেলে। মুদ্রা-সমস্যা বর্ত্তমান যুগের এক বড় তথ্য। এই সমস্যা আর্থিক দুনিয়ার মাল-চলাচল কাণ্ডকে বিশেষরূপেই দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর দু'চার বৎসরের ভিতর একবার করিয়া জগতের সর্ব্বত্র এক একটা "ভির্টশাফ্‌ট্‌স্‌-ক্রিজে" (আর্থিক সঙ্কট) দেখা দেয়। ফলতঃ, মাল-সৃষ্টির সঙ্গে মাল-বিতরণের এক বিরোধ আসিয়া জুটে। "কাপিটালিসমুসের" এই সমুদয় লক্ষণ বিশ্লেষণ করা ওপ্পেনহাইমারের কতকগুলা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

পুঁজিনীতির ক্রমবিকাশ দেখানো হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধনবিজ্ঞান-সেবীদের চিন্তার ধারা কিরূপ ছিল তাহা বুঝান হইয়াছে। ম্যালথাস্, রিকার্ডো ইত্যাদি কেহই বাদ যান নাই। পরবর্ত্তী যুগের জন্য কার্ল মার্কস্‌কে প্রধান স্তম্ভ বিবেচনা করা হইয়াছে। অবশেষে পুঁজিনীতির বর্ত্তমান স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

ওপ্পেনহাইমারের মতামত খতাইয়া দেখা হইল না। জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানের কাঠামটা বুঝিবার জন্য সম্প্রতি একখানা বইয়ের আলোচনা-রীতি ছুঁইয়া রাখা গেল মাত্র।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

১। ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বীকার্য্যগুলা অথবা নবীন ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ কাহাকেও বিনা বিচারে হজম করিতে উপদেশ দেওয়া আমার স্বধর্ম্ম নয়। আর্থিক জীবনে ভাঙন-গড়নের যুক্তি-শাস্ত্র বা কর্ম্ম-প্রণালীটা দেখাইলাম মাত্র।

এইসকল বিষয় লইয়া উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মহলে তর্ক-প্রশ্ন গবেষণা-সমালোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এইদিকে বাঙালী পণ্ডিতগণের শৈথিল্য খুব জবর। ধন-বিজ্ঞান আর আর্থিক জীবন সম্বন্ধে যুবক বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে বিশাল।

বাঙলার প্রত্যেক জেলায়ই দু'চার দশজন করিয়া উচ্চশিক্ষিত গবেষক আবশ্যক। দেশী-বিদেশী আর্থিক তথ্যে দক্ষতা লাভ করিবার জন্য আমরা বাঙলায় আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা করি নাই। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা সুরু করিবার জন্য দেশব্যাপী একটা আন্দোলন চালাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কৃষি-ক্ষেত্রে বিচরণ, পল্লী-পর্য্যটন আর বস্তি-নিরীক্ষণ তথ্য-সংগ্রহের এক উপায়। কারখানায় কারখানায় ঘুরিয়া ফিরিয়া মজুরদের-মালিকদের ঘর বাহির দুই দিক্ বুঝিয়া বেড়ানো আর এক উপায়। রেল আফিসে, ষ্টিমার ষ্টেশনে, ফেরি ঘাটে, রাস্তায় সড়কে লোকজনের আর মালপত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা অন্য উপায়। তাহা ছাড়া ষ্টক-এক্সচেঞ্জের দালাল পাড়ায় নাক গুঁজিয়া পাটের "গন্ধ" তেলের "গন্ধ" শুঁকিয়া আসা অন্য উপায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্ম্মগুলা স্বচক্ষে দেখা আর মুটে-মজুর, কিষাণ-জমিদার, মনিব-মালিক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করা তথ্য-সংগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল মহলেই সব সময়ে কোনও লোকের পক্ষে হাজির থাকা সম্ভব নয়। কাজেই ছাপার হরপে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক-বিবরণী, কারখানার বার্ষিক হিসাব, মজুর-সমিতির ইস্তাহার, গবর্মেণ্টের সরকারী বাণিজ্য-সংবাদ ইত্যাদি দলিল অত্যাবশ্যক। আর যে সকল দেশের সংবাদপত্রগুলা দেশনিষ্ঠ সেই সকল দেশের সংবাদপত্রসমূহ বস্তুনিষ্ঠ ধনসাহিত্যের দলিল।

এই সকল প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াই ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ, ইতালিয়ান পণ্ডিতেরা জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, তাঁহারা এখান ওখান সেখান হইতে "আর্থিক সংবাদ" সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হন। এই সকল সংবাদ লইয়া মাঝে মাঝে দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে লিখিবার রেওয়াজও তাঁহাদের আছে। বিদেশী ভাষা হইতে তর্জ্জমায় আর সঙ্কলনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নন।

তাহা ছাড়া মাল যখন বহরে বেশ পুরু হইয়া উঠে তখন তাঁহারা বিশ্বকোষ-সদৃশ ঢাউস ত্রৈমাসিকের শরণাপন্ন হন। তাহার পরেই "কপালে যদি থাকে" ত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা। ইয়োরামেরিকায় "বাঘা" "বাঘা" সকল পণ্ডিতের দস্তুরই এইরূপ।

এই ধরণের "নিয়মিত" আর্থিক-গবেষণার দৃষ্টান্ত বাঙলা দেশে খুব কমই দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান আর পরিশ্রমনিষ্ঠা এখনো যুবক বাঙলায় অনেকটা অজ্ঞাত। কিন্তু এই দিকে সকলে মিলিয়া দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" নামক একটা গবেষক-ও-লেখক-সঙ্ঘ কায়েম করা আবশ্যক।

২। রাষ্ট্র-শক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা চাই। কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লির আসল কাজ হইতেছে আইন-কানুন তৈয়ারী করা। আর এই আইন-কানুনের বার আনা চৌদ্দ আনা অংশ হইতেছে ধনদৌলত-সম্পর্কিত। বহির্ব্বাণিজ্য অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করা এই সকল আইন-গঠনের অন্তর্গত। রেলের আইন, জাহাজের আইন তাহাদের অন্যতম। আর ফ্যাক্টরি- কারখানার শাসন-পরিচালনাও এই সব আইনের অধীনেই চলিয়া থাকে।

বাঙলাদেশে কাউন্সিল-আসেম্ব্লির সভ্য অথবা উমেদার আর কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের সভ্য অথবা উমেদার গুন্‌তিতে আজকাল কম নন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই আর্থিক আইন-কানুনের নানা কথা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। সেই জ্ঞান বিস্তার করাই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য থাকিবে।

রাষ্ট্র একটা বিপুল যন্ত্র। লোকহিতের বাহনস্বরূপ এই যন্ত্রকে যখন-তখন অস্বীকার করিয়া চলা উচিত নয়। বস্তুতঃ রাষ্ট্র-যন্ত্রকে ভারত-সন্তানের কব্জায় আনা চাই-ই চাই। কিন্তু রাষ্ট্রকে হাতিয়ারের মতন ব্যবহার করিতে হইলে পাকা কারিগর হওয়া আবশ্যক। আর্থিক হিসাবে দেশকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্রকে কত উপায়ে নিজের কব্জায় আনা সম্ভব সে সম্বন্ধে বাঙালী স্বদেশ-সেবকগণ এখনো বেশ সজাগ হইয়া উঠেন নাই। রাষ্ট্রশক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার করিতে হইলে আমাদিগকে দলে দলে নতুন নতুন যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেই যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য আর তাহা সমাজের নানা স্তরে ছড়াইবার জন্য যুবক বাঙ্‌লার ধনবিজ্ঞানসেবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হউন।

ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা

অর্থশাস্ত্রের নানা তত্ত্বের কথা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। এইবার কাজের কথা, ভাতকাপড়ের কথা পাড়িতেছি। কোন্ কোন্ দিকে আমরা এখনি নতুন নতুন কারবার খুলিতে পারি তাহার কথাই আলোচনা করিব।

১। বিদেশে বাঙালী বণিক্

প্রথমেই বহির্ব্বাণিজ্যের দিকে যুবক বাঙলার নজর টানিয়া আনিতে চাই। শত শত রকমের কাঁচা ও পাকা মাল আর শত শত রকমের যন্ত্রপাতির কথা বলা যাইতে পারে। সে সব কথা না বলিয়া বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে মাত্র রপ্তানি-বিষয়ক একটা অঙ্গের উল্লেখ করিব। বিদেশে আড়ৎ কায়েম করিবার কথা বলিতেছি। পয়সা রোজগারের এ একটা বড় উপায়। এই বিষয়ে বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট আমরা অনেক-কিছু শিখিতে পারি।

মার্কিণ বেপারীরা আমাদের দেশে মাল বেচে। কিন্তু তাহারা বাঙালী বা অন্যান্য ভারতবাসীর নিকট একমাত্র চিঠিপত্র লিখিয়াই এদেশের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করে এরূপ নয়। ভারতে আমেরিকার কনসাল আছে, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি শহরে। কনসাল ভারতের দোকান-হাট, ভারতীয় নর-নারীর চাহিদা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী, ভারত-গবর্মেণ্টের আর্থিক আইনকানুন সম্বন্ধে ফী সপ্তাহেই মার্কিণ গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণের নিকট খবর পাঠাইয়া থাকে। অপর দিকে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতীয় বেপারীদিগকে সংবাদ দেওয়াও কনসালের কাজ। কিন্তু দশ কোটি মার্কিণ নরনারী কি দু'চার জন

কন্‌সালের কাজের উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে?

তা থাকে না। তাহারা ভারতে নিজ নিজ ব্যবসার জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাস প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেয়। এই প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। কেহ কেহ কলিকাতায়, বোম্বাইয়ে অথবা অন্যান্ত স্থানে মার্কিণ মালের দোকান খুলিয়া বসে। আর এক প্রকার প্রতিনিধির কাজ হইতেছে শীতকালে ভারত-পর্য্যটন। "রথ দেখা আর কলা বেচা" একসঙ্গে চলিতে থাকে। ভারতের নানা শহর ও গঞ্জ ঘুরিয়া তাহারা বাঙ্গালী, মাড়োয়ারি ইত্যাদি ব্যবসাদারদের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়া সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করে। বহুবিধ মার্কিণ মালের অর্ডার পর্য্যন্ত পর্য্যটক-প্রতিনিধিদের হাতে আসিয়া পড়ে।

জাপানী বেপারীরা কি করিতেছে? তাহারা জাপানে বসিয়া ভারতবাসীর নিকট চিঠিপত্র ঝাড়িয়া ক্ষান্ত হয় না। তাহারা কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা জাপানী বাজার কায়েম করিয়াছে। নাম তাহার "ইন্দো-জাপানীজ কমার্শ্যাল মিউজিয়াম"। এই প্রদর্শনী বা সংগ্রহালয়ে এক প্রকার গোটা জাপানই মজুত। বাঙালীরা বাঙলা দেশে বসিয়াই রকমারি জাপানী মালের নমুনা দেখিতে পাইতেছে, আর নমুনা-মাফিক অর্ডার দিতেছে।

মার্কিণ, জাপানী, ইংরেজ বা অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ীর ধরণ-ধারণ যুবক বাঙলাকে আজ আত্মস্থ করিতে হইবে। ভারতীয় মালের আড়ৎ, ডিপো বা সংগ্রহালয় আমাদিগকে কায়েম করিতে হইবে হাম্বুর্গে, নিউ ইয়র্কে, তোকিওয়, জেনোয়ায়। কোন্ কোন্ বিদেশী মুল্লুকে ভারতীয় বেপারীদের আড্ডা গাড়া আবশুক এই বিষয়ে সন্ধান দেওয়া কঠিন নয়।

দেখিতে হইবে ভারতীয় মালের বাজার সব চেয়ে বড় কোন্ কোন্ দেশে? ভারতবর্ষ যত মাল বিদেশে বেচে তাহার শতকরা ২১ অংশ যায় বিলাতে। তাহার পরেই জাপান আমাদের বড় খরিদ্দার। জাপানে যায় শতকরা ১৫ অংশ। আজকাল তৃতীয় ঠাঁই আমেরিকার। মার্কিণরা আমাদের বিদেশী রপ্তানির শতকরা ১০·৪ অংশ কিনিয়া থাকে। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণিতে গিয়াছে শতকরা ৭ অংশ মাত্র। কিন্তু জার্ম্মাণিতে ভারতের মাল আরও বেশী,—প্রায় ডবল কাটিবার কথা। ফ্রান্সে যায় শতকরা ৫·৫ অংশ। ইতালির বাজারে ভারতীয় রপ্তানির শতকরা ৫ অংশ কাটে। এই ৫ অংশের কিম্মৎ ১৯।২০ কোটি টাকা।

বিলাতের কথা বাদ দিলে দেখিতেছি পাঁচটা বড় দেশের সঙ্গে আমাদের বেচার সম্বন্ধ। তাহার ভিতর যে সকলের নীচে, যেমন ইতালি,—সেও প্রায় ২০ কোটি টাকার ভারতীয় মাল কিনিয়া থাকে। অতএব যদি বলি যে, এই পাঁচ দেশে বাঙালী ব্যবসাদারদের ২০।২৫ টা আড়ৎ একসঙ্গে চলিতে পারে তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মাসিক হাজার টাকা খরচ করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশেই ছোট ভাবে এক একটা আড়ৎ, এজেন্সি বা বাণিজ্য-সংবাদের ডিপো খাড়া করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইবার সম্ভাবনা আছে। এ কাজে প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন হয় না।

২। ছোটখাটো রেলপথ

এইবার অন্তর্বাণিজ্যের কোনো কোনো অঙ্গ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। প্রথমেই হয়ত মনে উঠিবে চায়ের কিংবা কয়লার কথা। অথবা হয়ত পাট-চাষীদিগকে বিক্রয়-সঙ্ঘে আবদ্ধ করিবার আন্দোলনটা নজরে আসিবে। আমি সেই দিকে সম্প্রতি দৃষ্টি ফেলিতেছি না।

আমরা সকলেই জানি যে, বরিশালের মাল কলিকাতায় আসে আর কলিকাতার মাল যায় জলপাইগুড়িতে। আমরা মালগুলা চোখে দেখি আর বেপারীদের নাম ধাম জানি অথবা বাজারের দোকানপাটগুলার বহর দেখিয়া আন্তর্বাণিজ্যের খুঁটাগুলার সংস্রবে আসি। কিন্তু এই মাল-চলাচলের আর একটা কাণ্ড আছে। সে দিকে আমাদের নজর খুব কমই পড়ে। প্রশ্নটা হইতেছে,—মালগুলার চলাচল হয় কি করিয়া? এই চলাচল-কাণ্ডের ভিতর টাকা রোজগারের ফিকির কিরূপ? যাতায়াতের পথ, গমনাগমনের সুযোগ, যান-বাহন ইত্যাদির সঙ্গে একটা

বিপুল ব্যবসা জড়িত আছে। তাহাতেও ক্রোর ক্রোর টাকা লাভ হয়। কিন্তু "ট্র্যান্‌স্‌পোর্ট" নামক ব্যবসার দিকে বাঙালী ব্যবসায়ীদের নজর এখনো ভাল করিয়া পড়ে নাই।

প্রথমেই বলি রেলের কথা। রেলের নাম শুনিবামাত্রই আমরা সকলে আঁৎকাইয়া উঠি। বাঙালীর তাঁবে বিপুল পুঁজিই বা কোথায় আর বাঙালীর কর্ম্মদক্ষতাই বা কোথায়? কিন্তু রেল চালানো বলিলে আমি বি, এন, আর বা ই, বি, আর ইত্যাদির মতন রেল পরিচালনার কথা বলিতেছি না। অত লম্বাচৌড়া স্বপ্ন দেখিয়া "পরকাল ঝরঝরে" করিতে চাহি না। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলাতেই ছোট খাটো রেল চালাইবার সুযোগ অনেক আছে। ২৫।৩০।৩৫ মাইলের রেল চালাইবার কাজে বাঙালীর টাকাও জুটিতে পারে আর লাভবান হইবার সম্ভাবনাও আছে। যশোহর-ঝিনাইদহ রেল বাঙালীর কব্জায়ই চলিতেছে। আর তাহাতে পনর-বিশ লাখ টাকার বেশী লাগিতেছে না। যেখানে যেখানে বড় হাট, ষ্টীমার ঘাট বা রেল ষ্টেশন অথবা জমিদারের কাছারি, সেইখানেই লাভজনক ছোট রেলের সুযোগ আছে।

৩। নৌকায় এঞ্জিন

এইবার জলপথে যাতায়াতের ব্যবসার কথা বলিব। বর্ত্তমান যুগ রেল-এরোপ্লেনের যুগ বটে। কিন্তু খাল-দরিয়ার ইজ্জৎ এ যুগে কম নয়। বিলাতে খালের স্বপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কয়েক বৎসর হইল একটা খাল-কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনের প্রস্তাবিত ফর্দ্দ বিরাট কাণ্ড। ফরাসীরাও নদীগুলাকে চাঁছিয়া-ছুলিয়া দুরস্ত করিতেছে। রোণের খালগুলা প্রসিদ্ধ। এই দিকে সকলের টেক্কা জার্ম্মাণি। রাইণের সঙ্গে ডানিউবের যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। অর্থাৎ উত্তর সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত মালের চলাচল সাধিত হইবে জলপথে,—দরিয়া আর খালের উপর দিয়া।

খাল কাটার খরচ অনেক। ইংরেজ-জার্ম্মাণ মাপ অতি-উঁচু। কিন্তু দরিয়ার উপর ষ্টীমার চালানো অত্যধিক মারাত্মক খরচের কারবার নয়। বিদেশী ষ্টীমার-কোম্পানীর সঙ্গে টক্করের কথা উঠিবে। কিন্তু টক্কর আর ঠোক্কর খাইতে খাইতেও বাঙ্গালীর ইষ্ট্‌ বেঙ্গল রিভার ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। মূলধন লাখ দশেক টাকা মাত্র।

আমাদের কানে ষ্টীমার-জাহাজ ইত্যাদি শব্দ রেলের মত ভয়ঙ্কর মালুম হইয়া থাকে। এ সব চিজে দন্তস্ফুট করা কঠিন এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। তাহা হইলে জলপথের যানবাহন সম্বন্ধে আরও এক ধাপ নীচে নামিয়া কথাটা পরিষ্কার করিতেছি। আমাদের মামুলি ছিপ, বজরা, পান্সী ইত্যাদি শ্রেণীর নৌকাগুলাকে "আধুনিক" ভাবে "রূপান্তরিত" করিতে পারিলেও অনেক ফায়দা হইতে পারে। জাপানীরা মানোয়ারী জাহাজ কব্জায় রাখে। ডুবো-জাহাজ চালাইতেও তাহারা মজবুদ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তোকিওর সুমিদা-গাওয়া দরিয়ায় মোসাফিরি করিয়াছি "সেকেলে" নৌকায়। সে সব নাও ষ্টীম-এঞ্জিনের জোরে চলিত। বিক্রমপুরের "গয়নার নাও"য়ে ছোট একটা তেলের এঞ্জিন লাগাইতে পারিলে বাঙালীরাও জাপানী জীবনের ছটাক খানেক আধ্যাত্মিকতা চাখিতে সমর্থ হইবে। এই কাজের জন্য এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় মহা দিগ্‌গজ হইবার দরকার নাই। বিপুল কলকব্জা বা কারখানার যন্ত্রপাতি চাই না। এই দিকে যুবক বাঙলার বাণিজ্যিক ভাবুকতা প্রযুক্ত হউক।

৪। মোটর বাস

আর একবার স্থলপথের কথা বলিব। বড় রেল আছে, ছোট রেলের কথা বলিলাম। কিন্তু তথাপি মামুলি সড়কে যানবাহনের ব্যবসা অনেক চলিতেছে আর চলিতে পারেও। প্রত্যেক জেলায়ই বড় বড় হাট, কাছারি, ষ্টীমার ঘাট বা রেল ষ্টেশনের নিকট এক একটা মোটর কোম্পানীর ব্যবসা-ক্ষেত্র আছে। ব্যক্তিগত ভাবে গোটা চার পাঁচেক লরি, বাস ইত্যাদি শ্রেণীর অটোমোবিল চালাইবার কাজ সর্ব্বত্রই ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে ট্যাক্‌সি-অটোমোবিলকে আর বিলাস-সামগ্রী বিবেচনা করা হয় না। এই সবের

বিরুদ্ধে বাঙালী নরনারীর কোনো বিদ্বেষ আর নাই। বস্তুতঃ মোটরের সওয়ারি আর খরিদ্দার ভারতে বেশ দ্রুত বাড়িতেছে। ১৯২৫-২৬ সনে ভারতবাসী প্রায় ৪।৹ কোটি টাকার অটোমোবিল খরিদ করিয়াছে। ১৩,০০০ মোটর গাড়ী, ২০০০ মোটর সাইকল, আর ৫০০০ মোটর বাস আমদানি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কী বৎসর গড়ে আমদানি হইত মাত্র ২০০০ গাড়ী আর ১০০০ সাইকল। তখনকার দিনে বাস এত কম আসিত যে তাহা স্বতন্ত্র ভাবে গুনিয়া দেখা হইত না।

দেখিতেছি লোকেরা মোটর চায়। এই বস্তুর বাজার বেশ গড়িয়া উঠিতেছে। বাজারটা বাড়ানোও সম্ভব। কাজেই যুবক বাঙলা বেশ বুঝিতে পারিতেছে যে মোটর গাড়ীর কেনা-বেচা নামক ব্যবসায় টাকা খাটানো লাভজনক।

মোটর কেনা-বেচায় ব্যবসায় আমেরিকা জগৎকে অনেক-কিছু শিখাইতেছে। সেখানকার ব্যাঙ্কগুলা গাড়ী খরিদ করিয়া গৃহস্থের নিকট বেচে। গৃহস্থ বীমা-কোম্পানীর ঘরে গাড়ীটা বীমা করিয়া লয়। বীমার সার্টিফিকেটটা ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার-ঘরে জমা থাকে। আর কিস্তীতে কিস্তীতে দাম শোধ করা হয়। মার্কিণ ব্যাঙ্ক আর বীমাকোম্পানীর নিকট যুবক বাঙলা কিছু কিছু সাগ্‌রেতি করিলে মোটর-ব্যবসায় হাতযশের সম্ভাবনা আছে।

৫। যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি

ইংরেজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ ইত্যাদি বড় বড় জাতির "এলাহি কারখানা" যুবক বাঙলায় আজ সম্ভবপর নয়। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সর্ব্বনিম্ন ধাপগুলায় হাত মক্স করা আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকা রোজগার করা বর্ত্তমানে আমাদের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। সেই ধাপেরই কতকগুলা শিল্পফ্যাক্টরি চালাইবার দিকে আমাদের প্রত্যেক জেলায় কয়েকজন লোকের মোতায়েন থাকা চলিতে পারে।

ছোট রেল, ষ্টীম নৌকা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসা চালাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু এই সকল "ব্যবসা"র সঙ্গে সঙ্গে বা পশ্চাতে কিছু কিছু "শিল্প"ও আবশ্যক। এঞ্জিন, লঞ্চ, গাড়ী, কলকব্জা ইত্যাদি জিনিষের হিকমত করিবার জন্য চাই নানা প্রকার কারখানা। যে কয়টা ব্যবসার কথা বলিয়াছি তাহার সবগুলা যন্ত্রপাতির সন্তান, দাস বা আত্মীয়। অতএব প্রত্যেক জেলায়ই চাই কতকগুলা কারখানা। গ্যাস বা বিজলীর কলকব্জা, রবারের জিনিষ, লোহা লক্কড়ের মাল, স্ক্রু-প্যাঁচ ইত্যাদি বস্তু মেরামত করিবার জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সোজা কথায়, গাড়ীর পায়া ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার চিকিৎসাও চাই আর হাঁসপাতালও চাই। এই সব কারখানাকে এক কথায় "এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্" বলা হইয়া থাকে।

এই ধরণের কারখানা বাঙলাদেশে একদম নতুন নয়। আজকাল ১৩৫টা ফ্যাক্টরি চলিতেছে। তাহাতে মজুর খাটে ২১,৮১৭ জন। আর টাকা খাটে বোধ হয় প্রায় ২৫ কোটি। কিন্তু এইগুলার কম-সে-কম ১০০টা বিদেশী তাঁবে। মাত্র ৩০।৩২টা বোধ হয় বাঙালীর পরিচালিত। বাঙালীর অধীন কারখানায় বোধ হয় মাত্র ১,২০০।১,৫০০ মজুরের অন্নসংস্থান হয়। অর্থাৎ বেশী লোকের অন্ন জুটে বিদেশীদের কারখানায়।

যাহা হউক এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌গুলার প্রায় সবই কলিকাতা আর হাবড়া অঞ্চলে অবস্থিত। মফঃস্বল এক-প্রকার এঞ্জিনিয়ারিং-হীন। মাত্র ১০টি জেলায় এই সকল কারখানার কাজ চলিতেছে। তাহার বোধ হয় একটাও বাঙালীর কারবার নয়।

এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দিকে যুবক বাংলার মতিগতি ফিরিলে নানা প্রকারে আমরা লাভবান হইতে পারিব। মফঃস্বলের নরনারীকে যন্ত্র-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র উপায় হইতেছে এইসকল কর্ম্মকেন্দ্র।

সরকারী তাঁবে রেল বাড়িতেছে। বাঙালীর তাঁবেও রেল, ষ্টীমার, মোটর বাড়াইবার সুযোগ দেখিতেছি। কাজেই মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে এক সঙ্গে বহুসংখ্যক এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার খোরাক জুটিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু কারখানা দাঁড়াইয়া গেলে স্থানীয় লোকেরা

নতুন নতুন কলকব্জা কিনিবার দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে। টিউব-ওয়েল বা জলের জন্য নলকূপ বসাইবার খেয়াল মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মাথায় সহজেই ঢুকিতে পারিবে। পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীর জন্য বিজলীর সরঞ্জাম, গ্যাসের সরঞ্জাম ইত্যাদি "আধুনিক" জিনিষপত্রের খরিদ্দার হইতে সুরু করিবে। তাহা ছাড়া সাবান, রং, কালি, ঔষধপত্র, কাচ, দেশলাই, পেন্সিল, বরফ, মোমবাতী, কৃত্রিম ঘী ইত্যাদি সংক্রান্ত নানাপ্রকার রাসায়নিক আর নিম-রাসায়নিক কারবারেও যন্ত্রপাতির ডাক পড়িতে বাধ্য। এমন কি আজকালকার দিনের কৃষিকর্ম্মও যন্ত্রপাতির সঙ্গে সুজড়িত। অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান যুগের কোনো আর্থিক আয়োজন চলিতে পারে না। কাজেই বৈদ্যুতিক অথবা অন্যবিধ যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত কারখানা খুলিলে যুবক বাঙলার পক্ষে লাভবান হইবার পথ প্রশস্ত।

এইখানে আমি খোলাখুলি আরও বলিতে চাই যে, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক আর অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা না বাড়িলে যুবক বাঙলা সভ্যতার সিঁড়ির উঁচু ধাপে পা ফেলিতে পারিবে না। যন্ত্রপাতি আমার চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অস্থিমজ্জা। বাঙলার নরনারীকে মানুষের বাচ্চা হিসাবে মজবুদ করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিবিড় কুটুম্বিতা স্থাপন। যুবক বাঙলায় যন্ত্র-সাধনা আর যন্ত্র-দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার পরস্পর মেলমেশ কায়েম করা আমি নিজ জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। আনুষঙ্গিক ভাবে বলিতে পারি যে, ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কাজেও যন্ত্র-চালিত পাম্পের সাহায্যে খানাডোবার জল নিষ্কাসন আবশ্যক হইবে। আর তাহার জন্য জরুরি কলকব্জার কারখানা আর এঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মদক্ষতা।

৩। জমিদারের নয়া আয়

ছোট খাটো চাষে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুযোগ কতটা আছে বলা কঠিন। প্রথমতঃ জমিই নাই। দ্বিতীয়তঃ চাষ-আবাদ সুরু করিতে হইলেও কম্‌সে-কম হাজার দেড় দুই টাকা পুঁজির দরকার হয়। তাহা প্রায় কোনো বি, এ, বি, এসসি পাশ করা যুবার ট্যাঁকে নাই।

দেড় দুই-তিন বিঘা জমি যেসকল চাষীর আছে তাহাদের পক্ষে "সমবেত" ঋণ আর ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করা আর্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। তবে সমবায়-ব্যাঙ্কগুলার উন্নতি নির্ভর করিতেছে শেষ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের উপর। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা গড়িয়া উঠিলে, ফরাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত তাহাকে বাধ্য করাইয়া সমবায়-ব্যাঙ্কের জন্য সস্তায় টাকা ধার দিবার আয়োজন করা চলিতে পারে। মোটের উপর বুঝিয়া রাখা দরকার যে, দেড়-দুই-তিন বিঘা জমি হইতে রগড়াইয়া বেশী কিছু টাকা রোজগার করা অসম্ভব।

কিন্তু চাষবাসকে এঞ্জিনিয়ারিং আর রসায়নের আওতায় আনিয়া ফেলিতে পারিলে বাঙলায় কৃষিকর্ম্ম নবীন ধন-দৌলতের সূত্রপাত করিবে। শত শত বা হাজার হাজার বিঘার মালিকেরা নয়া ঢঙের জমিদার দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবেন। এই বিষয়ে যুবক বাঙলার মাথা খেলানো অন্যায় হইবে না।

প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতি। তারপর চাই সার। আমাদের গোবরের সারে আর চলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাঙলার গরুগুলা খায় কি? তার আবার গোবরের কিম্মৎ কতটুকু? চাই রাসায়নিক সার। এই দুয়ের জন্য নগদ টাকা ঢালিতে হইবে—বলাই বাহুল্য।

জার্ম্মাণিতে মামুলি জমিদার অর্থাৎ রাইয়ত-শাসক রাজা-বাহাদুর আর নাই। অথচ জমিজমার আয় হইতেই লক্ষপতি লোক আছে অনেক। এই সব লোক মজুর বাহাল করিয়া হাজার হাজার বা শত শত বিঘার জমিতে শাকসব্জী হইতে ফলমূল, গম, ভুট্টা পর্য্যন্ত সবেরই আবাদ চালায়। তাহার সঙ্গে থাকে গরু, শুয়র, মুর্গী, মৌমাছি ইত্যাদির "চাষ"। দুধ, মাখন, পনির, ডিম, মাংস ইত্যাদি সবই উৎপন্ন হয়। নিজেরা কারবার তদবির করে, রোজ আট দশ-বার ঘণ্টা করিয়া খাটে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক যেমন করিয়া

যতখানি খাটে জমিদারেরাও ঠিক তেমন করিয়া ততখানি খাটিতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস আমাদের বাঙালী জমিদার সমাজে পয়দা হইয়া গেলে চাষ ব্যবসাটা আধুনিকতা লাভ করিতে পারিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মে প্রচুর উপার্জ্জনও চলিতে থাকিবে। তবে এই ব্যবসা সাধারণ লোকের হাড়ে পোষাইবে না। যে সকল ব্যক্তি দুই চার বৎসর টাকা রোজগার না করিয়াও কারবারে টাকা ঢালিতে পারেন একমাত্র তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের নবীন চাষ বাঙালী জাতিকে উপহার দেওয়া সম্ভব।

৭। খদ্দরে টাকা রোজগার

মামুলি পাড়াগেঁয়ে "কুটির-শিল্পে" যুবক বাঙলার ভাত কাপড় জুটিতে পারে কিনা তাহার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। আমার বিশ্বাস এই দিকে আমাদের অনেকের কিছু কিছু দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। টাকা রোজগারের পথ হিসাবে কি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক আর কি অন্যান্য শ্রেণীর লোক সকলেরই এই সম্বন্ধে মাথা খেলানো উচিত।

যন্ত্র-নিষ্ঠা আর যন্ত্র-দর্শন যুবক বাঙালায় আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, "হস্ত-নিষ্ঠা" আর "হস্ত-দর্শন" আজও দুনিয়ার উচ্চতম দেশসমূহ হইতে সমূলে লোপ হইয়া যায় নাই। আজও ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র হাতের কাজ, কুটির-শিল্প, পরিবার-গত ছোট-খাটো কারবার চলিতেছে। চরম ভবিষ্যপন্থী ধনবিজ্ঞানদক্ষ পণ্ডিতেরা আজও এই সবের স্বপক্ষে "যথাস্থানে" আর "নির্দ্দিষ্ট সীমানার ভিতর" রায় দিতে লজ্জা বোধ করেন না।

দুনিয়ায় সাগরে সাগরে দেখিয়া আসিয়াছি পালের জাহাজ আজও হাওয়ার জোরে চলিতেছে। অর্থাৎ বিজুলী গ্যাস, কেরোসিন তেল আর ডীজেল মোটর এখনও ধরা-খানাকে মামুলি মধ্যযুগের আর্থিক জীবন হইতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারে নাই। ইতালির কোন কোনো পল্লাতে মেয়েরা আজও ঘাড়ে বাঁক বহিয়া বাল্‌তি বাল্‌তি জল টানে। আর ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বলে গরুর গাড়ীও দু'একটা চোখে পড়িয়াছে।

ফ্রান্সের ওৎলোয়ার জেলায় প্রায় আশী হাজার লোক হাতের তৈয়ারী ফিতার কাজে প্রতিপালিত হয়। মেয়েরা এই শিল্পে ওস্তাদ। শিল্পটার কিছুকাল ধরিয়া দুর্গতি চলিতেছিল। প্যারিসে থাকিবার সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে, ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হইতে সুরু করিয়া নামজাদা শিল্প-পতি পর্য্যন্ত সকলেই এই শিল্প আর ব্যবসাটাকে বাঁচাইবার জন্য যারপরনাই চেষ্টিত।

তাঁহাদের যুক্তি অনেকটা নিম্নরূপ:—"মেয়েরা কৃষি-কার্য্যের অবসরে বা অন্য অবকাশে ঘরে বসিয়া এই সকল শিল্প-কারুময় ফিতা তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত। অধিকন্তু শীতকালে যখন চাষ-আবাদ চলে না, তখন মেয়েদের পক্ষে হস্তশিল্পই প্রধান কাজ। এই শিল্পটা ফ্রান্স হইতে বিলুপ্ত হইলে দেশের মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনের একটা বড় উপায় নষ্ট হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতে যন্ত্রচালিত কলকারখানা যতই বাড়ুক না কেন, হাতের কাজ বড় শীঘ্র লুপ্ত হইবে না। পাশ করা ডাক্তারের যুগেও "হাতুড়ে" ডাক্তারেরা পয়সা রোজগার করিতেছে। "সেকেলে" ছুতার, মিস্ত্রী, ঘরামি, নুনিয়া, চুণিয়া, কামার, ইত্যাদি কারিগর এখনো বহুকাল আমাদের সমাজে থাকিবেই থাকিবে। তবে যন্ত্রকলায় তাহাদের কিছু কিছু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে।

হাতের তাঁত বাঙলা দেশে আজও চলিতেছে বিস্তর। কাপড়ের কলে মাত্র ১৩,৭৩৬ জন মজুরের অন্ন জুটিয়া থাকে। কিন্তু হাতের তাঁতী ২,১১,৪৯৯ জন। এই সকল কুটির-শিল্পে প্রায় ৫,০০,০০০ নর-নারীর অন্নসংস্থান হয়। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১১,০০০ হাতের তাঁতের কাজ চলিতেছে। ঢাকা আর ময়মনসিংহে প্রায় ১২,০০০ করিয়া হাতের তাঁত চলে। ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ১২,৫০০।

কাজেই যাঁহারা খদ্দরের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন তাঁহারা আহাম্মুক নন। খদ্দর-শিল্পে বহু পরিবারের ভাত কাপড় জুটিতেছে। কুমিল্লার এক "অভয় আশ্রমের" ব্যবস্থায়ই ফী মাসে গড়পড়তা প্রায় ১০।১১ হাজার টাকার খদ্দর বিক্রী হয়। খদ্দর তৈয়ারী হয় মাসিক ১৩ হাজার টাকার। এই কারবারটা বর্ত্তমান জগতের হিসাবে বড়

কিছু নয়। কিন্তু যুবক বাঙলার আর্থিক মাপকাঠিতে ইহাকে একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিবেচনা করিতেই হইবে। অধিকন্তু, "খাদি-প্রতিষ্ঠানের" অঙ্ক হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৯২১ সনের তুলনায় আজ খদ্দরের দাম কমিয়াছে প্রায় অর্দ্ধেক। অপর দিকে খদ্দর টেঁকসই হইয়াছে ডবল। অর্থাৎ এই চার পাঁচ বৎসরে খদ্দরের উন্নতি চার গুণ।

খদ্দরের কারবারে একদিক্ হইল শিল্পের তরফ অর্থাৎ মালটা তৈয়ারী করা, অপর দিক্ হইতেছে ব্যবসা বা বাণিজ্য। অর্থাৎ বাজারে মাল ফেলা, ফেরি করিয়া বেচা দোকান করা, হাটে যাওয়া এই কারবারের দ্বিতীয় দফা। সুতরাং খদ্দরে একমাত্র তাঁতী জোলা অথবা শীতকালের অবসরওয়ালা চাষীর অন্নসংস্থান ঘটিতেছে এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। ইহাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার আর ষ্টোর্সের যোগাযোগও আছে। অর্থাৎ শহুরে নর-নারীর—এম, এ, বি, এল ইত্যাদি পাশ-ফেলকরা লোকের মেহনৎ আর আয়ের পথও আছে।

খদ্দরের কারবারটা ভাল করিয়া চালাইতে পারিলে নানা শ্রেণীর অনেক বাঙালীরই দু'পয়সা আসিতে পারে। এই জন্য খদ্দরের কথা পাড়িলাম। কিন্তু কলের কাপড়ের সঙ্গে খদ্দর দাম হিসাবে অথবা গুণ হিসাবে টক্কর দিতে পারিবে কি না সে কথা স্বতন্ত্র। বাঙলাদেশের লোক আমরা যতই গরিব হই না কেন, আমাদের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কোনো না কোনো দিকে কিছু না কিছু বিলাসভোগ আছে। বিলাসের অর্থ সোজা। হয় অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক জিনিষ খরিদ করা হইয়া থাকে অথবা হয়ত দরকারী জিনিষের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী দাম দেওয়া হয়। এক কথায় আর্থিক হিসাবে বিলাসের অর্থ অপব্যয়। খদ্দরকে আমি সম্প্রতি এইরূপ "বিলাসের" সামগ্রীই বিবেচনা করিতেছি। অন্যান্য হাজার রকমের বিলাস-সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত আর ধনী বাঙালী পরিবারে খদ্দরের বাতিক যদি কিছুদিন ধরিয়া লাগিয়া থাকে তাহা হইলে বহুসংখ্যক তাঁতী জোলা চাষী আর তথাকথিত শিক্ষিত "ভদ্রলোকে"র ঘরে হাঁড়ী চড়িবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। সুতরাং "খদ্দর-বিলাসে" গা ঢালিবার জন্য আমি যুবক বাঙলার যে কোনো মহলে পাঁতি দিতে ইতস্ততঃ করি না।

বাঙলাদেশের সকল কারিগর, সকল মিস্ত্রী, সকল তাঁতী আর সকল চাষীকে অল্পদিনের ভিতর আধুনিকতম যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারবারে চালিত করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির তাঁবে নাই। কাজেই "সেকেলে" "হাতুড়ে" "আদিম" আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে যেখানে কিছু কিছু লাভজনক দেখিতে পাই সেইখানেই যুবক বাঙলার অন্নের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান-নিষ্ঠা আমাদের আর্থিক ভাঙন-গড়নের ভিত্তি। দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়া বর্ত্তমানের সুযোগগুলা তুচ্ছ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৮। রকমারি ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় অন্নসংস্থানের কথা বলিতে সুরু করিলে আজ বাঙালী সমাজে কল্কে পাওয়া সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। কেন না বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতনকাণ্ডে বাঙালীর চোখে ব্যাঙ্কিং-কারবার অতিমাত্রায় বিপজ্জনক বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু যুবক বাঙলার পক্ষে অবিবেচকের মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার কোনো কারণ নাই। বাঙালীর ব্যবসা-শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ সোজা। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মতন কম-সে-কম ২৫০।৩০০ ছোট বড় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক বাঙলায় মফঃস্বলে কারবার চালাইতেছে। তাহা ছাড়া আছে ১৩,০০০ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। এইগুলার কথা না ভাবিয়া হা-হুতাস করিতে থাকিলে কলিকাতাকে অন্যায়ভাবে বাঙালী সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা বিবেচনা করা হইবে মাত্র।

বেঙ্গল ন্যাশন্যালের পতনে বাঙালী ব্যবসায়ীরা সতর্কতার সহিত কাজকর্ম্ম চালাইতে অভ্যস্ত হইবে। যে-সকল ব্যবসা-সম্পর্কিত আর চরিত্রগত দোষের দরুণ এই ব্যাঙ্কের দুর্গতি ঘটিল সেই সকল দোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি যুবক বাঙলায় দেখা দিতে থাকিবে। অধিকন্তু যে সকল ব্যাঙ্ক বাঙালীর তাঁবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলাকে ক্রমশঃ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর ঠেলিয়া তুলিবার দিকে আমাদের ব্যবসায়ীরা অগ্রসর হইতে

পারিবে। মোটের উপর লাভই দেখিতেছি। ইহার নাম "শাপে বর"।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় দিকে বাঙালী জাতির নজর যে গিয়াছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা, কারবারে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো ইত্যাদি কাজের স্বভাব বাঙালী সমাজে যে ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে তাহাও সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে খাঁটি ব্যাঙ্কের ব্যবসা যত প্রকারের হইতে পারে তাহার অনেক কিছুই এখনো আমাদের রপ্ত হয় নাই।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় আসল কারবারটা কি বা কিকি? মোটের উপর ১৬ প্রকার। কারবারগুলা নিম্নরূপ :—(১) সোনা-রূপার বেচা-কেনা, (২) টাকাকড়ি ভাঙ্গানো বা পোদ্দারি (৩) লোকের টাকাকড়ি জমা রাখা, (৪) যে সকল লোক ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি জমা রাখিয়াছে তাহাদের পরস্পর দেনা-পাওনা কাটাকাটি করা। এ জন্য টাকার চলাচল আবশ্যক হয় না। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্রে একজনের জমা হইতে খরচ লিখিয়া আর একজনের হিসাবে জমা করা হয় মাত্র। খাঁটি ব্যাঙ্কিং বলিলে এই কারবারটার কথাই খুব বেশী মনে পড়ে। ব্যবসায়ী মহলে এই ব্যাপার অহরহ চলিতেছে। (৫) ব্যবসাদারের "চিঠিপত্র" বা কাগজ "ভাঙানো"। বর্ত্তমান জগতে এই কাগজ-বস্তুটার রেওয়াজ খুব বেশী। রামার নিকট টাকা পাইবে শ্যামা। রামা দিল শ্যামাকে একখানা চিরকুট। শ্যামা এই চিরকুটের জোরে আবদুলের নিকট হইতে মাল খরিদ করিল। আবদুল শেষ পর্য্যন্ত রামার নিকট টাকা সমঝিয়া লইতে আসিল। রামার নিকট আসিবার দরকার নাই। রামা যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করে সেই ব্যাঙ্কই আবদুলকে চিরকুটটা ভাঙাইয়া দিবে। এই হইল অতি সহজ ধরণের বাণিজ্য-কাগজ। এই চিরকুটটা যখন এক শহর হইতে আর এক শহরে যায় অথবা যখন এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের নামে চিরকুট ঝাড়ে, তখন তাহার নাম হয় আর-কিছু। এই সব পারিভাষিকে সম্প্রতি প্রবেশ করিবার দরকার নাই। তৃতীয় শ্রেণীর "কাগজ" হইতেছে "চেক"। আর এক প্রকার কাগজ হইতেছে গুদামজাত মালপত্রের সার্টিফিকেট বা রসিদ। এই কাগজটা দেখিয়া ব্যাঙ্ক বুঝে যে, কাগজওয়ালার তাঁবে অমুক জায়গায় অত পরিমাণ মাল আছে। আমাদের ফসল সম্বন্ধেও এইরূপ গুদামি রসিদ চলিতে পারে। এই সকল রকমারি কাগজ, চিরকুট, হুণ্ডি, চেক, রসিদ ভাঙানো ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বড় কাজ। এই দিকে বাঙালীর হাতে খড়ি সুরু হইতেছে মাত্র।

(৬) মক্কেলদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে তাহাদের পাওনা টাকাকড়ি আদায় করিয়া দেওয়া। (৭) এক শহর বা দেশ হইতে অন্য শহরে বা দেশে টাকা পাঠাইবার জন্য বাটা আদায় করা হইয়া থাকে। (৮) ভিন্ন ভিন্ন শহরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের রকমারি "কাগজের" সওদা করা। এক স্থানের কাগজ কিনিয়া অন্য স্থানে বেচা হইয়া থাকে। টাকা চলাচলের দরকার উঠিয়া যায় (৪নং দ্রষ্টব্য)। এই ধরণের কাগজ ভাঙাভাঙি করা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে একটা মস্ত ব্যবসা। বাঙালী এখনো এই পথের পথিক হইতে শিখে নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান জগতের ইহা একটা বিশেষত্ব। এই হিসাবে বাঙালীরা এখনো বর্ত্তমান জগতের লোক নয়।

(৯) "কাগজ"গুলা লইয়া অন্যান্য ভাঙাভাঙিও স্বতন্ত্র কারবার। তাহার একটাকে বলে কাগজ "ডিস্কাউন্ট" করা। আবদুলের সইওয়ালা অর্থাৎ দেনার স্বীকারওয়ালা কাগজটা রামার নিকট হইতে লইয়া কোনো ব্যাঙ্ক যদি তাহাকে তৎক্ষণাৎ নগদ টাকা সমঝিয়া দেয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক কাগজটা "ডিস্কাউন্ট" করিল। এই ডিস্কাউন্ট কাণ্ডে ঝুঁকি অনেক, বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে-দেশের ব্যাঙ্ক এই ঝুঁকি লইতে সাহসী হয় না, সেই দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া স্বীকার করা চলে না। এই কষ্টিপাথরে ঘষিলে দেখিব বাঙালীসমাজ এখনো প্রায় ব্যাঙ্ক-হীন অবস্থায়ই যেন রহিয়াছে।

কাগজ ভাঙাইবার আর এক কায়দাকে ফরাসীতে বলে "আক্সেপ্তাঁস", জার্ম্মাণে "আকৎসেপ্টু", আর আমাদের চলতি ইংরেজি "অ্যাকসেপ্ট্যান্স"। সোজা কথায় কাগজ স্বীকার করা বুঝিতেছি। এই "স্বীকার"

বা "গ্রহণ" করাটা নগদ টাকা দেওয়ার সামিল নয়। ব্যাঙ্ক কাগজটার উপর সহি দিয়া বলে মাত্র,—"যদু, তোর মালপত্র বা সম্পত্তি বা পুঁজি সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে"। যদু ব্যাঙ্কের এইরূপ সহিওয়ালা চিরকুট লইয়া অন্য এক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা পাইতে পারে। এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক "ডিস্কাউণ্ট" করিল,—প্রথম ব্যাঙ্কটা করিয়াছে মাত্র "অ্যাকসেপ্ট" অর্থাৎ স্বীকার, গ্রহণ বা বিশ্বাস। নগদ টাকা দিল দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের ঝুঁকিতে। যদি যদুর অবস্থা কাহিল হয়, তাহা হইলে স্বীকারকারী প্রথম ব্যাঙ্কের ঘাড় ভাঙা হইবে। কাজেই "আকসেপ্তাঁস" ব্যবসাটা গুরুতর রকমের।

(১০) চল্‌তি হিসাবের খাতাপত্র রাখা। বাজার হইতে মক্কেলদের জন্য তাহাদের দেনা শুধিয়া দেওয়া ব্যাঙ্কের এই শ্রেণীর কাজ। সংখ্যা এবং পরিমাণ হিসাবে এই কাজ খুবই বেশী,—কেননা প্রত্যেক মক্কেলের জন্য প্রতিদিনই এই ধরণের কাজ কিছু না কিছু সামলাইতে হয়ই হয়। ব্যাঙ্কের খাতায় প্রতিদিনই মক্কেলদের জমা-খরচের হিসাব চলিতে থাকে।

(১১) নোট ছাড়ার কাজ। যে যে লোককে টাকা দিতে হইবে তাহাদিগকে নগদ টাকা না দিয়া একটা প্রতিজ্ঞাপত্র দেওয়ার নাম নোট জারি করা। আগেকার দিনে একাধিক ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রায় সকল দেশেই গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবসাটা শেষ পর্য্যন্ত কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের একচেটিয়া কারবারে পরিণত করিয়া দিয়াছে। প্রতিজ্ঞাপত্র বা নোট জারি করিবার নিয়ম-কানুন বিলাতে, জার্ম্মাণিতে এবং ফ্রান্সে পৃথক পৃথক। বাঙালী এই ব্যবসা একদম জানেই না। আর জানিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই। তবে এখন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই হিড়িকে দেশের লোকের ভিতর নোট, কাগজী টাকা, নোট-ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের প্রতিজ্ঞা-পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা এবং তর্কপ্রশ্ন সুরু হইতেছে।

(১২) সওদাগরি মাল বা মাল চালানের রসিদ বন্ধক রাখিয়া মক্কেলকে টাকা দেওয়া। চাষ আবাদের ফসল সার্ব্বজনিক গোলায় ("ধর্ম্মগোলায়") বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক চাষীদিগকে নগদ টাকা দেয়। (১৩) এই ধরণের তৃতীয় বন্ধকি কারবার হইতেছে জমিজমার বন্ধকে টাকা দেওয়া। সকল প্রকারের বন্ধকি রসিদই অন্যান্য বাণিজ্য-চিরকুটের মতন বাজারে কেনা-বেচা চলে। আর এই কেনা-বেচার কাজও ব্যাঙ্কে করা হয়। এই সকল বিষয়ে চর্চ্চা বাংলাদেশে কিছু কিছু সুরু হইয়াছে। কিন্তু কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

(১৪) রেল-কোম্পানী, শিল্প-কারখানা, বা ঐ জাতীয় কারবারের সঙ্ঘেরা বাজারে টাকা ধার করিতে চাহিলে তাহাদের হইয়া ব্যাঙ্ক ঐ কর্জ্জ চায় কিংবা এই সঙ্ঘের "শেয়ার" বেচিবার ভারও ব্যাঙ্ক লইয়া থাকে।

(১৫) বাজারে জনসাধারণের নিকট হইতে "কর্জ্জ" না চাহিয়া অথবা জনসাধারণের নিকট "শেয়ার" বেচিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যাঙ্কগুলা খোদই কারবারী সঙ্ঘগুলাকে কর্জ্জ দেয় এবং তাহাদের শেয়ার খরিদ করে। এই সব "এলাহি কারখানা" বাঙালীর পক্ষে সম্প্রতি সুদূর ভবিষ্যতের কথা। ফ্রান্সেও সকল ব্যাঙ্ক এই সব দিকে মাথা খেলাইতে সাহস পায় না। এজন্য ব্যাঙ্কে টাকার জোর থাকা চাই খুবই বেশী।

(১৬) ষ্টক-এক্‌সচেঞ্জে যত রকমের "কাগজ" লইয়া লেনাদেনা চলে তাহার ভিতর নাক গুঁজিয়া রাখাও ব্যাঙ্কের এক বড় কারবার। ষ্টক-বাজারের দালালদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। মক্কেলদের জন্য নানা প্রকার কাগজ কেনা-বেচা করিতে করিতে ব্যাঙ্কগুলাকে খানিকটা জুয়াড়ি হইয়া পড়িতে হয়। ইহাতে ঝুঁকির পরিমাণ প্রচুর। বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে এই কারবার সম্প্রতি স্বপ্নাতীত।

অবশ্য কোনো একটা ব্যাঙ্কের পক্ষে এই ধরণের সকল কারবারে হাত দেওয়া সম্ভবপরও নয় অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গতও নয়।

বাঙলাদেশে বাঙালীর তাঁবে আধ-কোটি বা ১ কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক অল্পকালের ভিতরই গড়িয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মফঃস্বলের বিভিন্ন

ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে এক একটা "কেন্দ্রীকৃত" ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। বিলাত, জার্ম্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের ব্যাঙ্ক-গঠন গত শতাব্দীতে ধাপের পর ধাপে যে-প্রণালীতে উঠিয়াছে ভারতেও সেই প্রণালীরই দিগ্বিজয় দেখিতে পাইব। বাঙলার আর্থিক অভিজ্ঞতা পাকিয়া উঠিতেছে। যুবক বাঙলাকে অনতিদূর ভবিষ্যতে বড় বড় পুঁজিওয়ালা ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব লইতে হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না।

তবে সুধু একটা প্রস্তাব করিব। বাঙলা দেশে আজকাল ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় অন্ততঃ হাজার চার পাঁচ লোক লাগিয়া আছেন। কেরাণী হিসাবে, ম্যানেজার হিসাবে, খাতাপত্রের পরীক্ষক হিসাবে আর ডিরেক্টর হিসাবে এতগুলি বাঙালী ব্যাঙ্ক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে। এই সকল অভিজ্ঞতাওয়ালা লোকের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মফঃস্বলের কোনো কোনো কেন্দ্রে অথবা কলিকাতায় তাঁহারা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইতে থাকুন। বাঙালী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা আর তাহা উন্নত করিবার উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মদক্ষ ও চিন্তাদক্ষ লোকেরা মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করুন। "বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ" নামে একটা প্রতিষ্ঠান এই আয়োজনের দায়িত্ব লইতে পারে।

৯। কারবার-পরিচালনা

আজকালকার দুনিয়ায় চলিতেছে "কার্টেল" আর "ট্রাষ্ট" নামক আর্থিক গড়নের যুগ। সে ধাপটা যুবক বাঙ্‌লার পক্ষে এত উঁচু যে তাহার দিকে তাকাইতে গেলেও ভীমরতি লাগিবার ভয় আছে। ঠিক যেন শিলি-গুড়িতে হিমালয়ের পায়ে দাঁড়াইয়া খাড়া ২৯,০০২ ফিটের ডগাটা দেখিবার প্রয়াস আর কি!

তবে ফী মাসে বাঙ্‌লার জেলায় জেলায় দু'চারটা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী গড়িয়া তোলা আমাদের পক্ষে এখনি সম্ভব। এই ধরণের লিমিটেড কোম্পানীকে আমি ডরাই না। এই সব হজম করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির হাড়-মাসে আছে।

কিন্তু আমার বিবেচনায় এখনও অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত কারবার আর পরিবারের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ "পার্টনারশিপ"ই বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের গড়ন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিবে। আপ্‌সে-আপ্ স্বাধীনভাবে কারবারে নামিবার প্রয়াসই সহজসাধ্য বিবেচিত হইবে।

পুঁজি সম্বন্ধে কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখা আমার দস্তুর নয়। অল্প-কালের ভিতর লাখ লাখ টাকার কারবারও যুবক বাঙলার তাঁবে বড় বেশী চলিবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। যে সকল শিল্প-বাণিজ্যের ফর্দ্দ দিয়াছি তাহা মোটের উপর গড়পড়তা ৫।১০।১৫ হাজার টাকার মামলা। পাঁচ লাখ টাকা হইতেছে সম্প্রতি আমার বরাদ্দে চরম সীমা। অবশ্য যে-ব্যক্তি বা যে-কোম্পানী যত বেশী টাকা ঢালিতে পারিবে তাহার পক্ষে তত বেশী বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ সৃষ্ট হইবে। আর লাভের সম্ভাবনাও তেমন তেমন বাড়িবে। "যত গুড় তত মিষ্টি"। বিশেষতঃ পাটের কল, তুলার কল, সুতার কল, রেশমের কল, কাপড়ের কল চালাইতে হইলে বেশী টাকার হাঁকই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর ২০।২৫ লাখ টাকা-ওয়ালা বাঙালী কল দু'চারটা মাথা তুলিতে পারিবে কিনা এখনো বুঝা যাইতেছে না।

কারবার-পরিচালনায়ও আধ্যাত্মিক শক্তির দরকার হয়। আজকালকার দিনে কোনো ব্যবসাই একমাত্র বা প্রধানতঃ টাকার জোরে চালানো সম্ভবপর নয়। বাঙলার জমিদার আর লক্ষপতিরা এই কথাটা বেশ মনে রাখিবেন। চাই বিদ্যা, চাই অভিজ্ঞতা, চাই কর্ম্মদক্ষতা।

এই জন্য আবশ্যক প্রায় প্রত্যেক আধুনিক কারবারেই প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর মাথা ও হাত। এঞ্জিনিয়ার তাহাদের অন্যতম। রাসায়নিকের ইজ্জৎ এঞ্জিনিয়ারেরই সমান। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে ধনবিজ্ঞানবিৎ বাজার দক্ষ ম্যানেজার গোত্রের অন্তর্গত। এই তিন জাতীয় লোক বা বিদ্যার সমন্বয় যেখানে নাই সেখানে প্রায় সকল কার-বারই ঠুঁটো হইয়া থাকিতে বাধ্য। কোনো সব-জান্তা এঞ্জিনিয়ার বা সব-জান্তা রাসায়নিক বা সব-জান্তা ধনবিজ্ঞান-বিদের পাল্লায় পড়িলে পুঁজিপতি মহাশয় পটল তুলিবেন,

একথা জোর করিয়া বলা যায়। বিগত বিশ বাইশ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের আর্থিক অভিজ্ঞতায় যে সকল অকৃতকার্য্যতার তালিকা পাওয়া যায় তাহার সব কয়টাই একমাত্র নৈতিক দোষের কুফল নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সবজান্তা "এক্‌স্‌পার্ট"এর দৌরাত্ম্য অথবা বিভিন্ন কর্ম্মদক্ষতার সমবায়ের অভাব এই সকল অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ।

চামড়ার ব্যবসা ও রপ্তানি-শুল্ক

ইস্পাত, কাপড়, দিয়াশলাই প্রভৃতি কতকগুলি অনিশ্চিত ব্যবসায়ের বাণিজ্য-শুল্কের প্রতি সবার দৃষ্টি পড়িয়াছে; কিন্তু চামড়ার ব্যবসা এখনও কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। চামড়া ও জুতার ব্যবসার মত ভারতের অন্য কোনও ব্যবসা এখনও এত দ্রুত এবং আশ্চর্য্যজনক সফলতা লাভ করে নাই। যুদ্ধের সময় ও পর হইতে দেশী চামড়া ও জুতার শিল্প এমন সুন্দর ও সস্তা হইয়া গিয়াছে যে বিদেশীর আমদানি এক রকম বন্ধই হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার আসে পাশে, মাদ্রাজ, কানপুর, বোম্বাই, গোয়ালিয়র প্রভৃতি সহরে এবং পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র, আগ্রা ও হাজারিবাগে শত শত চামড়ার কারখানা বেশ লাভজনক ব্যবসা করিতেছে। এই সব কারখানায় প্রস্তুত জুতা বিদেশী জুতা অপেক্ষা কোন অংশে মন্দ নয়। বরং এতকাল এদেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ যে যে ইংলিশ ও আমেরিকান জুতা ব্যবহার করিত, দেশী জুতা তাহার চেয়ে অর্দ্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ দামে কম। এমন কি চীনারাও এখন এ ব্যবসায় প্রতিযোগিতা না করিয়া কেবল মাত্র তাহাদের পরিশ্রমই দিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, এই ব্যবসায় ও শিল্পে ভারত আজ বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করে। কোন সাম্রাজ্যিক অপারগতা অথবা কোন দুষ্ট প্রতিযোগিতা এ বিষয়ে যাহাতে না আসে সে দিকে সাধারণের এবং শাসন বিভাগের দৃষ্টি রাখা উচিত।

চামড়ার ব্যবসার এইরূপ দ্রুত উন্নতির পথে একটা খুব বড় বিঘ্নের আশঙ্কা হইয়াছে। এতকাল ধরিয়া এই চামড়ার ও জুতার ব্যবসা সমস্ত ভারতে বেশ সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং এইসব চামড়া ও জুতার কারখানায় লক্ষ লক্ষ মজুর সৎভাবে খাটিয়া দিন চালাইতেছিল। এখন সমস্ত চামড়া চালানকারীরা ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স কাঁচা চামড়ার উপর রপ্তানি-শুল্ক হঠাৎ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই শুল্কেই যে সমস্ত কারখানার খরচ চলিয়া যায় ও কারখানার লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর যে একটা বাঁধা আয় থাকিয়া যায় একথা বুঝা সহজ। ইহার অভাবে সমস্ত চামড়ার ব্যবসাটা সুচালিত ও বহু মূলধনযুক্ত ইউরোপীয়, জাপানী ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ দয়ার উপর নির্ভর করিবে। এরূপ যাহাতে না ঘটিতে পারে সেই জন্য জনসাধারণ ও শাসন বিভাগের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। উৎকল এবং অন্যান্য চামড়ার কারখানা ফেল পড়ায় ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, আজকালকার সফলতার দিনেও সমস্ত আপদবিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে এদেশের চামড়ার ব্যবসায় এখনও ক্ষুদ্র শিশু।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশের পালিশ করা চামড়ার বিলাতে বেশ কাটতি দেখা যায়। সমস্ত ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে ইহার চলন দিন দিন বেশ বাড়িয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে ইহার রপ্তানি-শুল্ক যে বিলাতের পক্ষে ক্ষতিজনক ইহা বলাই বাহুল্য। কতকগুলি বড় বড় চামড়ার চালানী ও আড়তদারেরা এই শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে যোগ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা উঠিয়া গেলে সমস্ত চামড়ার কারখানা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইহারা তাহার চেয়ে কোন অংশে কম হইবেন না। ইহাদের সবার মূলধন সমস্ত ভারতের চামড়ার ও জুতার কারখানার মূল-

ধনের দশভাগের একভাগও হইবে না। কলিকাতার কতকগুলি বিক্রেতা তাহাদের দালাল ও ক্রেতার স্তোক-বাক্যে ভুলিয়া অথবা বাধ্য হইয়া এই ভয়ানক ক্ষতিকারক প্রস্তাবে মত দিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের নিজেদের বিশেষ লাভ বা লোকসান হইবে না। কিন্তু যে সমস্ত লোকের প্ররোচনায় তাহারা মত দিয়াছেন, এই শুল্ক কিছু কমিয়া গেলে অথবা উঠিয়া গেলে পরে বিদেশী প্রতিযোগিতায় তাহারাই লাভবান হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চামড়ার রপ্তানি-শুল্ক উঠিয়া গেলে, যে চামড়ার ও জুতার নূতন ব্যবসা এদেশে দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, এবং ফলে যাহাদের চেষ্টায় ইহা হইতেছে তাহারা এবং আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান লাভবান হইবে।

সুতরাং চামড়ার উপর রপ্তানিশুল্ক তুলিয়া দিবার এইরূপ ক্ষতিকর প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। এ ব্যাপারে সুধু যে এদেশের চামড়ার ব্যবসায়ই বিশেষ ক্ষতি হইবে তাহা নয়, চামড়ার এই রপ্তানিশুল্ক উঠিয়া গেলে জুতা ও কাঁচা চামড়ার দর বাড়িয়া যাইবে এবং এইরূপে যে সমস্ত গরিব লোক নিত্য জুতা ব্যবহার করে, তাহাদের পক্ষেও বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়িবে। দেশের মাতব্বর ও খবরের কাগজওয়ালাদের এই বিষম ব্যাপারের বিরুদ্ধে সময় থাকিতে তীব্র প্রতিবাদ করা দরকার। সমস্ত জুতার কারখানাওয়ালাদেরও এবিষয়ে এখন হইতেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। জুতার কারখানাওলাদের নিজেদের মধ্যে সমিতি গঠন করিয়া এবিষয়ের প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট অগ্রসর হওয়া দরকার। এই শুল্ক যাহাতে কোন প্রকারে কমিয়া বা উঠিয়া না যায়, তজ্জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ধাঙ্গড়-মেথরদের ধর্ম্মঘট*

(১)

ধাঙ্গড়-মেথরদের ধর্ম্মঘটের ফলে কলিকাতার রাস্তাগুলি দুইদিন ধরিয়া আবর্জ্জনাপূর্ণ আছে। ধর্ম্মঘটকারীরা রবিবার ২০শে ফাল্গুন কাজ ছাড়িয়া দেয় এবং দেশবন্ধু পার্ক ও কলিকাতা ময়দানে সভা করে। সভায় তাহারা স্থির করে যে, তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কাজে ফিরিয়া যাইবে না।

ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের প্রতিনিধির নিকট বলে যে, বেতনবৃদ্ধির জন্য তাহারা কয়েকদিন আগে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ তাহাদের আবেদনের সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা না করাতে তাহারা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটকারীরা এপর্য্যন্ত শান্তভাবেই আছে। প্রকাশ যে গত রবিবার সকালে বড়তলা থানার এলাকাধীন কর্পোরেশনের গোখানার কাছে কিছু গোলযোগ হয়, কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারী তথায় গিয়া কতকগুলি লোককে ধর্ম্মঘটে যোগদান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, কেহ কেহ নাকি ভয়ও দেখাইয়াছিল। পুলিশ এই খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে পৌছে এবং ৫ জন ধর্ম্মঘটকারীকে গ্রেপ্তার করে।

তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, কলিকাতায় প্রায় ১০ হাজার ধাঙ্গড় আছে, ইহাদের অধিকাংশই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। মাত্র দুই হাজার ধাঙ্গড় কাজ করিতেছে।

ময়দানে বিরাট সভা

গতকল্য সোমবার (২১ ফাল্গুন) অপরাহ্ণকালে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকট ধাঙ্গড়-মেথরদের একটি বিরাট

* "আনন্দবাজার" হইতে সঙ্কলিত।

সভার অধিবেশন হয়। কুমারী প্রভাবতী দাসগুপ্তা সভানেতৃর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মঘটকারীদের অভাব অভিযোগের যতদিন পর্য্যন্ত প্রতিকার না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ধর্ম্মঘটে দৃঢ় থাকিতে প্ররোচিত করিয়া এই সভায় কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করেন। ধর্ম্মঘটকারীরা একবাক্যে বলে যে কলিকাতা কর্পোরেশন তাহাদের দাবী না মানিয়া লওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কিছুতেই কাজে ফিরিবে না।

স্বামী করুণানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, ধর্ম্মঘটের প্রথম দিবস পুলিশ কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারীকে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। ভবিষ্যতে ধর্ম্মঘটকারীরা যেন একটু সতর্ক থাকে এবং যে সব পুলিশ তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে তাহাদের নম্বর জানিয়া লয়। ঐ সব পুলিশের নম্বর পাইলে আমি তাহাদের নামে মামলা আনিব। বক্তা বলেন, কলিকাতা কর্পোরেশন এখন প্রকৃত পক্ষে স্বরাজ্য-দলের কর্তৃত্বাধীনে। এরূপ অবস্থাতেও যে গরিব ধাঙ্গড়-মেথরদের দাবী রক্ষিত হইতেছেনা, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বোম্বাইয়ের ধাঙ্গড়-মেথরেরা আজকাল মাসে ৩০৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইয়া থাকে। তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। বক্তা অতঃপর ধর্ম্মঘটকারীদিগকে শান্তিপূর্ণ থাকিতে বলেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:—

"কলিকাতা কর্পোরেশন প্রত্যক্ষ ভাবে স্বরাজ্যদলের কর্তৃত্বাধীন, সেই কর্পোরেশন ধাঙ্গড়-মেথরদের শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য কলিকাতা কর্পোরেশন এবং টালিগঞ্জ মিউনি-সিপ্যালিটির ধাঙ্গড় ও মেথরদের এই সভা উক্ত দলের এবং কর্পোরেশনের কার্য্যের তীব্র নিন্দাবাদ করিতেছে।

"শান্তিপূর্ণ ভাবে পিকেটিং করিবার জন্য কোন ধর্ম্মঘট-কারীকে গ্রেপ্তার করিবার কোন অধিকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের নাই। আট জন ধাঙ্গড়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে মারপিট করিবার জন্য এই সভা কলিকাতার পুলিশের কার্য্যের তীব্র নিন্দাবাদ করিতেছে।

"পুলিশ যে আট জন ধাঙ্গড়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে, এই সভা তাহাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে।"

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের অবিচারের কথা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নকে জ্ঞাপন করিয়া উক্ত ইউ-নিয়নের সেক্রেটারীর নিকট একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করার জন্য অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর সভানেত্রী ধর্ম্মঘটকারীদিগকে শান্ত এবং সংযত ভাবে তাহাদের নিজেদের সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতে অনুরোধ করেন। তিনি ঐক্যের শক্তির কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া অভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রমিকদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে বলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ

গত রবিবার হইতে কলিকাতায় ধাঙ্গড় ও মেথরের ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। গত রবিবার দিবসই ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের ধাঙ্গড় ও মেথরগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, ৪নং ওয়ার্ডেও আংশিক ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। গতকল্য বৈকাল-বেলা গ্রান্ট ষ্ট্রীট, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, মার্কুইস ষ্ট্রীট, কলিন ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, রিপন ষ্ট্রীট, ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, রাসেল ষ্ট্রীট প্রভৃতিতে খোঁজ লইয়া জানিতে পারা গেল যে, সকালবেলা ৮টার পর ঐ সব অঞ্চলে অতি অল্পসংখ্যক ধাঙ্গড় কাজ করিয়াছিল, কিন্তু বৈকালবেলা ঐ অঞ্চলে ধাঙ্গড় বা মেথরগণ কাজ করে নাই। বৈকালে ঐ সব অঞ্চলে ধাঙ্গড় বা মেথরগণ কাজ না করায় এই সমস্ত রাস্তায় স্থানে স্থানে জঞ্জাল জড় হইয়া থাকিতে দেখা গেল। উত্তর কলিকাতার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা জড় হইয়া অল্প পরিসর রাস্তাগুলিকে

প্রায় বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। দুই দিনের আবর্জ্জনা তরিতরকারীর খোসা, মাছের আঁইস ইত্যাদি পচনশীল জিনিষ পচিয়া বিষম দুর্গন্ধে রাস্তাগুলি দিয়া লোকচলাচল অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এই অসহ্য গরমের মধ্যে,—কলেরা বসন্তের প্রাদুর্ভাবের দিনে এই বিষম বিপৎপাতে উত্তর কলিকাতাবাসিগণ অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

শুনা গেল যে, সাহেব পাড়া পরিষ্কার রাখিবার জন্ম কলিকাতা কর্পোরেশন উচ্চ পারিশ্রমিকের সর্ত্তে খড়্গপুর হইতে ৫০ জন ধাঙ্গড় আমদানি করিয়াছেন। এসংবাদ সত্য হইলে উত্তর কলিকাতাবাসিগণ কর্পোরেশনের এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২)

গতকল্য বুধবার (২৩শে ফাল্গুন) মেথর ধর্ম্মঘটের চতুর্থ দিন গিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে কার্য্য বন্ধ করার ফলে উত্তর কলিকাতার রাস্তাসমূহ সর্ব্বত্র ধূলি, কাদা ও জঞ্জালে পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত ছিল। আপার চীৎপুর রোড, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট ও অন্যান্য স্থানে আবর্জ্জনা এমন ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে যে, লোকজনের চলাফিরা করিতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন ডিষ্ট্রীক্ট সমূহে সন্ধান লইয়া জানা গেল যে, ধাঙ্গড় মেথরের মধ্যে ৩ শত ব্যতীত আর সকলেই ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ ৩০০ লোকই কিছু কিছু কার্য্য করিতেছে।

স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্য

বিভিন্ন স্থলে কয়েকজন যুবক নিজেরা সহরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া নাগরিকগণের উপকারসাধন করিতেছেন। শ্যামপুকুর থানার কম্বুলিটোলা ও অন্যান্য স্থানে ১ নং ওয়ার্ডের কমিশনার ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছা-সেবকগণের সহিত মিলিত হইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া-ছিলেন। কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে রাস্তা পরিষ্কার করিবার সকল প্রকার জিনিষপত্র সরবরাহ করিয়াছিলেন।

ভবানীপুরের অবস্থা

উত্তর কলিকাতার চেয়ে ভবানীপুরের অবস্থা আরও সাংঘাতিক হইয়াছিল। এখানকার বাসিন্দাগণ অভিযোগ করিতেছিলেন যে, ধাঙ্গড়দিগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া মেথরেরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণ কর্পোরেশনের লরীগুলি লইয়া স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যে কোন কোন স্থান পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

খিদিরপুর ও মেটিয়াবুরুজ

৪ নং ডিষ্ট্রীক্টে অংশতঃ ধর্ম্মঘট হইয়াছে। তবে সেখানে কার্য্য চলিতেছে। খিদিরপুর অঞ্চলের ধাঙ্গড়গণও অন্যান্যের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া গতকল্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রকাশ যে মেটিয়াবুরুজের ধাঙ্গড়গণও অদ্য (বৃহস্পতিবার) কার্য্য বন্ধ করিবে।

গ্রেপ্তার

ভবানীপুরে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একজন ধাঙ্গড় ধৃত হইয়াছিল এবং গতকল্যই তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। ধৃত ব্যক্তির ৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

মাণিকতলায় গোলমাল

প্রকাশ যে, মাণিকতলা ও আপারসারকুলার রোডের মোড়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। যাহারা ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়নাই এরূপ ৫০ জন লোক কর্পোরেশনের চাপরাশিদিগকে লইয়া রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার জন্য ঐ স্থানে গিয়াছিল। ধর্ম্মঘটকারিগণ তাহাদিগকে কাজ করিতে নিষেধ করে। ইহাতে একজন চাপরাশি বাধা দেয় এবং ফলে একটা ঝগড়া বাধে। ধর্ম্মঘটকারিগণ কাহারও কাহারও উপর ইট ছুঁড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ এবং ইহাতে কয়েকজন চাপরাশি ও ধর্ম্মঘটবিরোধী ধাঙ্গড় আহত হইয়াছে।

এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মঘটকারিগণ সহজে নিরস্ত হইতেছে

না ও ভিড় ভাঙ্গিতেছে না দেখিয়া পুলিশ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারী ধৃত ও থানায় নীত হয়। কেহ কেহ আহত হয়।

সুকিয়া ষ্ট্রীটে গোলযোগ

সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার অধীন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ঐরূপ আর একটী গোলমাল হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথায় পুলিশ আসিয়া ভিড় ভাঙ্গিয়া দেয় ও ৫ জন ধর্ম্মঘটকারীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত লোকদিগকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটকারিগণের বর্ণনা

গ্রে ষ্ট্রীটের কর্পোরেশন গোখানার নিকট যে সমস্ত ধর্ম্মঘটকারী বিচরণ করিতেছিল তাহারা বলে যে, ধর্ম্মঘটকারিগণ হাজরা পার্কে এক সভার আয়োজন করিয়াছিল; কিন্তু ঐ পার্কটি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকারভুক্ত বলিয়া ঐ স্থানে তাহাদিগকে সভা করিতে দেওয়া হয় নাই। অতঃপর তাহারা নিকটবর্ত্তী একটী বস্তিতে সভা করে। হাজরা পার্কের নিকট দুইজন ধর্ম্মঘটকারী গোলমাল বাধাইবার অভিযোগে ধৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কেহ কেহ পুলিশের অত্যাচার ও কর্পোরেশন কর্ম্মচারিগণের জবরদস্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

(৩)

কর্পোরেশন অফিসারগণের বর্ণনা

কর্পোরেশনের কয়েকজন অফিসার আমাদের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ধাঙ্গড়দিগের মাহিয়ানা মাসিক ৭৲ টাকা ছিল। পরে বাড়িয়া ১৪৲ হয়। অনেকেই অতিরিক্ত সময় খাটিয়া ১৮৲ টাকা উপার্জ্জন করে। ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউশন ষ্ট্রীটে ধাঙ্গড়দিগের জন্য একটি আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা তথায় থাকিতে সম্মত নহে। সহর ও সহরতলীতে তাহাদের জন্য কর্পোরেশনের হাঁসপাতাল আছে।

কর্পোরেশন সভায় আলোচনা

কলিকাতা কর্পোরেশনের গতকল্যকার সভায় কয়েকজন কাউন্সিলার চীফ একজিকিউটিভ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য ও ধর্ম্মঘট মিটাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

মিঃ ঈশ্বরদাস—বড়বাজারের অবস্থা বিশেষভাবে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ৭নং ওয়ার্ডে কলেরা দেখা দিয়াছে।

মিঃ ডব্লিউ, এইচ, ফেলপস্—মিঃ দায়ুদ তো একজন শ্রমিক নেতা, তিনি এবিষয়ে কোন সংবাদ দিতে পারেন কি?

মিঃ দায়ুদ—চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ধাঙ্গড় সমিতির নিকট হইতে কোন দাবী-দাওয়াপূর্ণ বর্ণনাপত্র পাইয়াছেন কি? এবং তিনি উহার উত্তর দিয়াছেন কি?

মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জী—মিঃ দায়ুদ যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদ্দ্বারা কোন উপকার হইবে না। বরং উহাতে আমাদের অসুবিধা আরও বাড়িয়া যাইবে।

মিঃ সি, সি, বিশ্বাস—ধর্ম্মঘটের অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিবার সহিত কর্পোরেশনের কোন সভ্য পরোক্ষে অথবা প্রত্যক্ষে জড়িত আছেন বলিয়া চীফ একজিকিউটিভ অফিসার কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?

মিঃ সন্তোষকুমার বসু—অবস্থা যাহাতে বাধাবিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে এমন কোন সংবাদ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু অবস্থা যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যতটা সম্ভব সংবাদ জানিবার জন্য কলিকাতার করদাতাগণের পূর্ণ অধিকার আছে।

উত্তরে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার বলেন যে, কর্পোরেশন এবিষয়ে যতদূর সংশ্লিষ্ট আছে, তাহাতে এই বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মঘট অকস্মাৎ সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ১ এবং ২ নম্বর ডিষ্ট্রীক্টে গোলমাল দেখা দেয়, ৩ নম্বর ডিষ্ট্রীক্টে কিছু গোলমাল ঘটিয়াছিল বটে, তবে তেমন ব্যাপকভাবে নহে। ৪নং ডিষ্ট্রীক্টে গতপরশ্ব পর্য্যন্তও কোন গোলযোগ ছিল না। অন্যান্য অঞ্চলে প্রথমতঃ কোন গোলমাল ছিল না, কিন্তু গতকল্য হইতে সকলেই কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। ৪নং ডিষ্ট্রীক্টের ধাঙ্গড়গণ কার্য্য বন্ধ না করিলে, যাহারা অতিরিক্ত সময় খাটে, তাহাদিগকে লইয়া অন্যান্য অঞ্চলের কার্য্য কোনও প্রকারে চালান

যাইত। বর্ত্তমানে তাঁহারা কর্পোরেশনের লরিগুলিকে বিভিন্ন ডিষ্ট্রীক্টের কার্য্য চালাইতে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বাহির হইতেও লোকসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। রাস্তাগুলির কার্য্য যাহাতে চলিতে পারে, দুই একদিনের মধ্যে তাঁহারা এমন লোক জোগাড় করিতে পারিবেন আশা করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাহিরের লোকদের প্রয়োচনার ফলে কার্য্যে যোগদানেচ্ছু ধাঙ্গড়েরা পুনরায় যোগ দিতেছে না। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে, ৪নং ডিষ্ট্রীক্টে কয়েকজন ব্যক্তি ধর্ম্মঘটকারীদিগকে বুঝাইযাছে যে, তাহারা যদি আরও কযেকদিন ধর্ম্মঘট রাখিতে পারে, তবে কর্পোরেশন তাহাদের সমস্ত দাবীই পূর্ণ করিবে। কোথাও কোথাও কার্য্য করিতে গিযা ধর্ম্মঘটকারীদিগেব হস্তে কার্য্যরত লোকেরা লাঞ্ছিতও হইয়াছে এবং এই জন্য পুলিশের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছে। ১ এবং ২ নং ডিষ্ট্রীক্টে অনেক ভদ্রলোকের ছেলে স্বেচ্ছাসেবকরূপে রাস্তাসমূহ পরিষ্কার কবিযাছেন।

কুমারী প্রভাবতী দাশগুপ্তার চিঠি

বঙ্গীয় ধাঙ্গড় সমিতিব চেয়ারম্যান কুমারী প্রভাবতী দাশগুপ্তা এবং সেক্রেটারী ধরণীধর গোস্বামী কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসারেব নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক চিঠি লিখিযাছেন :—

গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখ ময়দানে কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়দিগের সভায় যে সমস্ত দাবী গৃহীত এবং যে ধাঙ্গড় সমিতি গঠিত হইযাছে, তৎসম্পর্কে মেয়র ও আপনার নিকট বর্ণনাপত্র প্রেরিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য কর্পোরেশনকর্ত্তৃক ঐগুলিব সম্পর্কে অনুকূল বিবেচনা। ধাঙ্গড়দিগের অভিযোগ সম্পর্কে "আনন্দবাজার পত্রিকায়"ও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল এবং ঐ পত্রিকার সেই সমস্ত সংখ্যা আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছে।' কিন্তু প্রথম সভার পর হইতে ব্লক সরকারগণ ধাঙ্গড়দিগকে ভয় দেখাইতেছে ও সমিতিতে যোগ দিতে নিষেধ করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, সমিতির মারফত বেতনবৃদ্ধির দাবী জানাইলে, তাহাদের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে ধাঙ্গড়গণ রুষ্ট হইয়া অকস্মাৎ গত রবিবার ধর্ম্মঘটা-ঘোষণা করে। ট্রেড ইউনিয়নের নীতি অনুসারে ধর্ম্মঘট চালানো সমিতির কর্ত্তব্য। কিন্তু এই ধর্ম্মঘটের সহিত সহরের স্বাস্থ্য বিশেষরূপে জড়িত আছে বলিয়া সমিতি সর্ব্বদাই কর্পোরেশনের সহিত সম্মানজনক আলোচনা কবিতে প্রস্তুত আছেন।

(৪)

নানাস্থানে গোলযোগ

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের পঞ্চম দিন গিযাছে, ধর্ম্মঘটের অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আরও দুই একদিন এই ভাবে চলিলে সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা ভাবিয়া সকলেই শঙ্কিত হইযা পড়িযাছে।

কর্পোরেশনেব অফিসারগণ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদিগের সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কারের জন্য যতটুকু কার্য্য করিতেছেন, তাহা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। অনেক স্থলে দুষ্ট ছেলেদিগকে রাস্তায় স্তূপীকৃত জঞ্জালগুলি চতুর্দ্দিকে ছড়াইযা ফেলিতে দেখা গিযাছে।

ট্রাম লাইনে আবর্জ্জনা

সুকিযা ষ্ট্রীট ও কর্ণওযালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে কযেকজন ধর্ম্মঘটকারী দুষ্ট ছেলেদের সাহায্যে দুপুর বেলা ট্রাম লাইনের উপর আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত করিযা রাখিয়াছিল। উদ্দেশ্য ট্রামগাড়ীকে লাইনচ্যুত করা।

ধর্ম্মঘটের বিস্তৃতি

বুধবার সন্ধ্যা হইতে খিদিরপুরের ধাঙ্গড়গণ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে এবং গতকল্য সম্পূর্ণরূপে কার্য্য বন্ধ ছিল। কর্পোরেশন নূতন লোক পাঠাইয়া কার্য্য করিতে চাহিযাছিলেন এবং কোন কোনও রাস্তায কিছু কিছু কার্য্যও করাইয়াছিলেন।

অগ্নি সংস্কারের ব্যবস্থা

আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার এক অভিনব পন্থা

স্বেচ্ছাসেবকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ফুটপাথের উপরিস্থ জঞ্জালগুলি একত্র করিয়া তাঁহারা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া ভস্মসাৎ করিতেছেন।

আরও গ্রেপ্তার

রাজাবাজারে যাহারা কাজ করিতে গিয়াছিল, ধর্ম্মঘটকারীরা তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সুকিয়া ষ্ট্রীটেও অনুরূপ অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হাতী-বাগান্ গোখানার ৬ জন ধাঙড়কে পুলিশ গত কল্য সকালে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহারা জামীনে খালাস আছে।

ছাত্রগণের প্রশংসনীয় কার্য্য

গতকল্য সি, এম, এস্ কলেজের দুইজন মিশনারী সাহেব অধ্যাপক বহু ছাত্র সঙ্গে লইয়া কলেজের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে রাস্তার উপরকার স্তূপীকৃত জঞ্জাল স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছিলেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, (হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত), সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, নবীন পালের লেন, কোরিশ চার্চ্চ লেন,—এই সমস্ত রাস্তায় তাঁহারা কাজ করিয়াছিলেন।

"সার্ভিস" পায়খানা

এ কয় দিন মাণিকতলা, গড়পার, নারিকেল ডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে 'সার্ভিস' পায়খানা পরিষ্কার না হওয়াতে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। গতকল্য ২নং ডিষ্ট্রীক্টের ইঞ্জিনিয়ার কয়েকজন মেথরকে বুঝাইয়া সুজাইয়া লইয়া গিয়া ঐ পায়খানাগুলি পরিষ্কার করাইয়াছেন।

কর্পোরেশন হইতে মোটরলরী বাহির করিয়া সহরের স্থানে স্থানে রাস্তা হইতে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা হইয়াছিল।

ময়দানে বিরাট সভা

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা ময়দানে মনুমেন্টের নিকট ধর্ম্মঘটকারীদের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। কুমারী প্রভাবতী দাশগুপ্তা সভানেতৃর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় ৫ হাজার ধর্ম্মঘটকারী এই সভায় যোগ দিয়াছিল। কয়েকজনক ংগ্রেসকর্ম্মী ও শ্রমিক নেতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী কুমারানন্দ, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু পুরুষোত্তম রায়, বাবু রাধাকুমার মিত্র ও বাবু কালিদাস ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেযোগ্য।

সভায় খুব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। বক্তার পর বক্তাগণ উঠিয়া ধর্ম্মঘটকারীদিগকে দৃঢ় ও শান্ত থাকিতে অনুরোধ করেন এবং আশ্বাস দেন যে, তাহারা যদি তাহাদের সঙ্কল্পে অটল থাকিতে পারে, তবে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে।

সভানেত্রীর বক্তৃতা

সভানেত্রী বলেন যে, এরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশন ধর্ম্মঘটকারীদিগকে ভয় দেখাইয়া বা লোভ দেখাইয়া কার্য্যে যোগ দেওয়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

যদি ধর্ম্মঘটকারীরা দুর্ব্বলতা দেখায় বা আপোষ না করিয়াই কার্য্যে পুনরায় যোগ দেয়, তবে তাহারা বর্ত্তমান মাহিয়ানা ১৪৲টাকার অধিক পাইবেনা। কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে ঝাড়ুদারদের মাহিয়ানার কথা নাই, তবে সভা করিবার প্রস্তাব আছে বটে। ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্য হইতে ৩ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব তাঁহারাও করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সমস্ত কমিটির দ্বারা কিছুই সুবিধা হইবে না। কর্পোরেশন আপোষের কোন প্রস্তাব করিলে উহা স্থির করিবার ভার ধাঙড় সমিতির উপর দেওয়া উচিত। প্রলোভনে ও প্ররোচনায় ভুলিয়া তাহারা যেন ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া না ফেলে। তাহারা দৃঢ় থাকিলে কর্পোরেশন নরম হইবে এবং তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবে।

অতঃপর আরও কয়েকজন বক্তৃতা করিলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—স্বরাজ্য কর্পোরেশনের উন্নতি-বিমুখ ভাবভঙ্গী ও কলিকাতার ধর্ম্মঘটব্যাপারে পুলিশের সাহায্যে উহাদের জোর জবরদস্তি প্রকাশের কথা নিখিল ভারতরাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারীকে তারযোগে জ্ঞাপন করা হউক।

ধর্ম্মঘটে অর্থসাহায্য

জনৈক ভদ্রলোক ধর্ম্মঘটকারীদের সাহায্যার্থ ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের ইস্তাহার

কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ এক ইস্তাহার জারি করিয়া বলিতেছেন যে, ধাঙ্গড়দিগের ধর্ম্মঘটের জন্য কলিকাতার বাসিন্দাগণকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন উপযুক্ত স্থান পাইলে জঞ্জালগুলি একত্র করিয়া পোড়াইয়া ফেলেন কিংবা একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখেন। কর্পোরেশনের লোক আসিয়া ঐগুলি সরাইয়া ফেলিবে। কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার বা হেল্থ্ অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলে বিনামূল্যে পায়খানায় ব্যবহারের জন্য সংক্রামকতা-নিবারক দ্রব্য পাওয়া যাইবে।

ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট ও কংগ্রেসের কার্য্য

উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দেব লিখিতেছেন:—

ধাঙ্গড়দের দাবী ন্যায় ও অধিকারসঙ্গত কি না তাহা বিচার করিবার জন্য ও ধর্ম্মঘট-সম্পর্কে কংগ্রেস ও করদাতাগণের কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মঘটের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য গত ৭ই মার্চ্চ, পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় উত্তর কলিকাতা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির একটী জরুরি সভা হয়।

বেতন-বৃদ্ধির দাবীটি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দাবীই সামান্য বাদছাট দিয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীকে অন্যান্য জিলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীগণ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সেক্রেটারীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই ধর্ম্মঘট অবসান করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার প্রদত্ত হয়।

তাঁহারা সকলে মেয়রের ঘরে মেয়র এবং কংগ্রেসদলভুক্ত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলারদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধাঙ্গড়দিগের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। ধাঙ্গড় সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারীকে মেয়র মহোদয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফোন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ দিন মেয়র মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা ভাল মনে করেন নাই।

রাত্রি ১১ টার সময় উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী, কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীর সহিত ধাঙ্গড় সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ধর্ম্মঘটের ফলে কলিকাতা নগরীর স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা যে সঙ্গত, এ বিষয়ে তাঁহারা রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত নানা প্রকার যুক্তি দেখান। কংগ্রেসকর্ম্মীরা প্রতিশ্রুতি দেন যে, যাহাতে কর্পোরেশন এবং ধাঙ্গড়দের মধ্যে সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা হয়, তজ্জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ধাঙ্গড়-সমিতির প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীদের এ বিষয়ে অধিকার এবং ক্ষমতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। কংগ্রেসকর্ম্মীদের অকপটতায়ও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিতে সোজা অস্বীকার করেন।

কর্পোরেশনের এবং ধাঙ্গড় সমিতির কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যাহাই হউক না কেন, কলিকাতার অধিবাসিগণের এবং কংগ্রেসেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। কলিকাতার স্বাস্থ্য বিশেষ বিপন্ন, কয়েক স্থানে ইতিমধ্যেই কলেরা দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস-কর্ম্মীরা নাগরিকদের সহায়তায় সহর পরিষ্কার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ইতিমধ্যেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

এমতাবস্থায় কলিকাতার জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে সহায়তা করিয়া কলিকাতাবাসীদিগকে আসন্ন মহামারীর হাত হইতে রক্ষা করুন।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Arthik Unnati

British Library of Political and Economic Science (London School of Economics. University of London)—May I appeal to you for a gift to the Library of this school of a copy of the undermentioned publication (*Arthik Unnati*) as being of special interest to its students and readers? * * * I can assure you that any donation of documentary material you care to make will be much appreciated, readily acknowledged and carefully catalogued and preserved.

Professor Julius Jolly (Wuersburg, Germany, Late Tagore Law Lecturer Calcutta)—*Arthik Unnati* appears to be a very valuable new review like the previous works of Professor Benoy Kumar Sarkar which I value very highly. I hope it will soon have a wide circulation. Economics is such an important subject.

Professor Andre Varagnac, College de Vitre, France:—"I have read the program and contents of *Arthik Unnati*, which seem to me the most timely attempt towards modern science and information. You are known in France as one of the most qualified men to take this lead, and I trust that, under your able leadership, your review will cover the great field it intends to explore.

"I sincerely regret not to be in a position to read your articles. May I even ask you if you could introduce me by letter to some of your Indian friends in France, so that I may try to arrange for some sort of translation?"

Prof. Gide, Editor, *Revue d' Economie Politique*, Paris: My journal will be sent to you regularly. I hope you will care to propagate the theory and practice of co-operation in your new Review. You can depend upon me for books and brochures on this subject.

Prof. Remme, Ministry of Education, Berlin: I have sent you publications of our Institute and hope that we shall maintain constant intercourse with each other in our allied fields.

Prof. Nicefore, University of Naples, Italy: I have read as much as I could, i. e. the indications written in English, and I congratulate you on your work. I hope to be able to send you some of my publications for reference.

Prof. Haepke, University of Marburg Germany: I am circularizing it among scholars interested in economics. From my side I have sent you some work likely to be of interest to the scholars in India.

Prof. Mortara, University of Milan, Italy, Editor, *Giornale degli Economisti*: I am sending you in exchange a copy of my work *Economic Prospects for 1927*, (Italian) in which you will find my frequent observation on India and its products.

Prof. Vogel, University of Berlin: The contents of your journal as given in English have appeared to me rich and interesting. I have already mailed you my recent book on the economic geography of France and shall not in future fail to invite your attention to those publications in which you are likely to be interested.

Calcutta Commercial Gazette—We welcome the publication because we fully believe that the Journal will do real good to the country. The issues so far to hand make an excellent beginning, just what one might expect from our illustrious countryman, Professor Benoy Kumar Sarkar, who is the editor. He is more than enough guarantee of the continued excellence of the journal and of the benefits people will derive from it. It is fortunate that he is applying his profound scholarship, unrivalled knowledge of the current of events and thought throughout the world and his sound experience to the production of a journal which is undoubtedly meant for public good.